সাপ্তাহিক বসুমতী

দিল্লীতে গো-হত্যা বিরোধী বিক্ষোভের তাণ্ডব

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে নন্দজীর বিদায়

সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ ৬ 17th Nov., 1966 * Vol. 71, No.

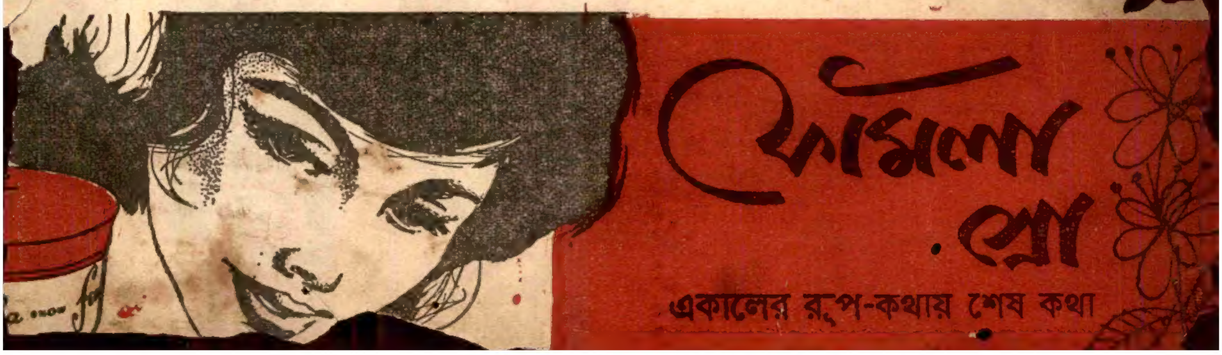

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		১৪১১
আজকের মানুষ		১৪১২
ভারতদর্শন		১৪১৩
আন্তর্জাতিক		১৪১৯
প্রত্যাশার মৃত্যু ও দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা	— কৃত্তিবাস ওঝা	১৪২১
ভয় (গল্প)	— ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়	১৪২৩
অস্ট্রেলিয়া থেকে লিখছি	— সুরেশচন্দ্র সাহা	১৪২৫
গ্রন্থমেলা	— জয়ন্তী সেন	১৪২৮
"ইতিহাসের উপাদান" কি সত্যই ইতিহাস?	— কামাখ্যাচরণ রায়	১৪৩০
ঋষি শ্রীঅরবিন্দ (প্রবন্ধ)	— শ্রীদিলীপকুমার রায়	১৪৩৪

14

সর্বপুরাণ, সর্বতন্ত্র, সর্ব উপনিষদ, সমস্ত ভক্তিগ্রন্থ হইতে সংকলিত

স্তবকবচমালা

(পঞ্চম সংস্করণ)

যে ঋষির যে স্তবে যে দেবতা আকৃষ্ট হইয়া বর প্রদান করিয়াছিলেন—পুরাণ, উপনিষদ তন্ত্র, ভক্তিগ্রন্থরাশি মথিত করিয়া সেই সকল শ্রেষ্ঠ ভক্তিনিবেদন অতি যত্নে সুনির্বাচন—সংকলন করিয়া স্তবকবচমালারূপে গ্রথিত। স্তব—ভক্তির উচ্ছ্বাস—দেবতার বন্দনাগীত। আত্মনিবেদিত প্রাণে তন্ময় হইয়া স্তব পাঠে যে লাভ হয়—জাগতিক শক্তি তাহার নিকট অতি তুচ্ছ। স্তবকবচমালায় প্রায় ৫০০ দেব-দেবীর স্তব-সন্নিবেশিত।

মূল্য পাঁচ টাকা।

পৃথিবীর তরুণ-সমাজের হৃদয়জয়ী

সার ওয়াল্টার স্কটের গ্রন্থাবলী

দ্বিতীয় ভাগ
শরৎচন্দ্র মিত্র অনূদিত
আইভ্যানহো, হাইল্যান্ড উইডো, ফেয়ার মেড অফ পার্থ, সার্জনস্ ডটার
মূল্য—২·০০

তৃতীয় ভাগ
সরোজনাথ ঘোষ অনূদিত
দি ব্রাইড অব ল্যামারমুর, লিজেন্ডস অব মনট্রোজ, দি এ্যান্টিকোয়ারি
মূল্য ১।।০ টাকা।

সাহিত্য-জগতের গৌরবপ্রভা—হাস্যরসাবতার—নাট্যসাহিত্যের প্রবর্তক—রস-সাহিত্যের স্রষ্টা—রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের

দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—জীবনী ও কবির সমালোচনা, নীলদর্পণ, জামাই বারিক, বিয়ে পাগলা বুড়ো, নবীন তপস্বিনী, কমলে কামিনী।

২য় ভাগে—সধবার একাদশী, যমালয়ে জীবন্ত মানুষ, পোড়ামহেশ্বর, কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ, লীলাবতী, সুরধুনী কাব্য, দ্বাদশ কবিতা, পদ্য সংগ্রহ।

প্রতি ভাগ দুই টাকা

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

রবীন্দ্রনাথ বলেন—"আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সঙ্গীত এরূপ সহস্রধারে উৎসের মত কোথাও প্রোৎসারিত হয় নাই। এমন সুন্দর ভাবের আবেগ, কথার সহিত এমন সুরের মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না।"

বাঙ্গালার নব গীতিকবিতার প্রবর্তক, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির কাব্যগুরু ঋষি কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর রচনার সমাবেশ।

কবির জীবনী, সুবিস্তৃত সমালোচনা সহ সুবৃহৎ গ্রন্থ
মূল্য তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বঙ্গদর্শন		১৪৩৭
বিপ্লব প্রচেষ্টার একটি বিস্মৃত অধ্যায়	— সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	১৪৪১
সুবর্ণলতা (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— আশাপূর্ণা দেবী	১৪৪৪
বিশ্বসাহিত্যের আদিপর্ব	— ডঃ নরেন ভট্টাচার্য	১৪৪৭
ঈলের বাৎসল্য ও মানুষের বিজ্ঞান (প্রবন্ধ)	— আশিসকুমার সিংহ	১৪৫২
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	১৪৫৫
নিষ্ঠুর ঘুম (কবিতা)	— সুজিত বসু	১৪৫৮
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	— শিলালি	১৪৫৯
রঙ্গজগৎ		১৪৬১
পাঠকমন		১৪৬৭
খেলাধুলা	— শ্রীঅমিতাভ	১৪৬৯

শ্রীমদ্ভাগবত

প্রাচীন ভক্তদের রচিত সুললিত বাংলা পয়ারে

মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র

এই সুবৃহৎ গ্রন্থে আছে—শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভাগবতামৃত গ্রন্থের কবিচন্দ্রের বঙ্গানুবাদ এবং শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়তম ভাগবতাচার্য্য রঘুনাথ পণ্ডিতের প্রেমতরঙ্গিনী।

ইহাতে আছে দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভাগবতামৃতের অনুবাদ কবিচন্দ্রের

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত

এবং

ভাগবতাচার্যের বিশ্বপ্রসিদ্ধ

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী

সমগ্র ভারতে প্রথম বঙ্গানুবাদ

"...শুনিয়া তাহার ভক্তিযোগের পঠন।
আবিষ্ট হইল গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥"

ইহা কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারতের ন্যায় বাংলার প্রতি গৃহস্থের অবশ্যপাঠ্য হউক, এই নিবেদন। এই মূল্যবান গ্রন্থ বাংলার প্রতি ঘরে প্রতিষ্ঠিত করুক।

সাহিত্য-সম্রাট—বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের ঋষি

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

—উপন্যাস—

প্রথম খণ্ড :—রাজসিংহ, বিষবৃক্ষ, যুগলাঙ্গুরীয়, মৃণালিনী, রজনী। [সচিত্র]। মূল্য—৩. টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড :—দুর্গেশনন্দিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল ইন্দিরা, রাধারাণী, সীতারাম। মূল্য—তিন টাকা

তৃতীয় খণ্ড :—আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা, দেবী চৌধুরাণী। [সচিত্র]। মূল্য—৩. টাকা

—সাহিত্য—

প্রথম খণ্ড :—কৃষ্ণচরিত্র, লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ (১ম)। মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড :—(১ম ভাগ অনুশীলন), মুচিরাম গুড়, বিবিধ প্রবন্ধ (২য়), বিজ্ঞান রহস্য। মূল্য—তিন টাকা

তৃতীয় খণ্ড :—শ্রীমদ্ভগবদগীতা, কমলাকান্ত, সাম্য, সাহিত্য-প্রসংগ, মানস, ললিতা। মূল্য—তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড: ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

৭১ বর্ষ ঃ ২৩শ সংখ্যা মূল্য ২৫ পয়সা · বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত · Price : 25 Paise
বৃহস্পতিবার, ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ · সাপ্তাহিক পত্রিকা · Thursday, 17th Nov., 1966

নন্দ-বিদায়

অবশেষে শ্রীগুলজারিলাল নন্দ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। রাজনীতির নির্দয় আঘাতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকে এই আকস্মিক বিদায় গ্রহণের জন্য স্বয়ং শ্রীনন্দের দুর্বলতাও অনেকাংশে দায়ী বলে মনে হওয়া অসম্ভব নয়। যে সদাচার সমিতি প্রতিষ্ঠা করে তিনি একদা সংকটের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তা থেকে ধীরে ধীরে তাঁর পশ্চাদপসরণ থেকেই বোঝা গেছিল যে, রাজনীতিক্ষেত্রে জোড়াতালি দিয়ে চলা ছাড়া তাঁর পক্ষে গত্যন্তর ছিল না। নচেৎ যে ব্যক্তি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে আসীন থেকেও প্রতিশ্রুত দু-বছরের মধ্যে দেশে সততার প্রতিষ্ঠা করতে অক্ষম হন—তাঁর মতো অসহায় ব্যক্তি আর কে আছেন? বরং প্রতিশ্রুত সেই দু-বছরের অন্তে তাঁর একমাত্র সাধু সমাজেই স্থান হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এমনই হৃদয়বিদারক ব্যাপার যে, যে সাধু সমাজের প্রতি তাঁর কিছুটা দুর্বলতা ছিল সেই সাধু সমাজই গো বধ নিষিদ্ধকরণের জন্য যুদ্ধং দেহি মনোভাবে পরোক্ষে নন্দ-নিপাত ঘটিয়েছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শৃংখলা রক্ষা করতে পারেন নি—কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক এই অভিযোগে দায়ী হয়েছেন। কিন্তু অভিযুক্ত হওয়ার সংগে সংগে তড়িঘড়ি এমন বিদায় ইতিপূর্বে রাজধানী দিল্লীতে ঘটে নি। বিশেষত এবারের অভিনবত্ব এই যে, সাধু সমাজের প্রতি দীর্ঘকালীন অনুকম্পার জন্য নন্দর বিরুদ্ধে জনসাধারণের বৈপরীত্য থাকলেও তাঁর বিরুদ্ধে কোনোদিনই অনাস্থা বা ক্ষোভ ছিল না, আর তাঁর পদত্যাগের পূর্বে জনসাধারণ কোনো রকম অভিযোগও প্রকাশ করে নি। তিনি স্বদলীয় আঘাতেই বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছেন। এর দ্বারা এমন প্রশ্নও উত্থাপিত হতে পারে যে, কেন্দ্রীয় [illegible]সভার মধ্যে সবলতা, না অধিকতর [illegible]জন্যে এই ধরণের উত্থান-পতন

অবশ্য শ্রীনন্দ তাঁর প্রস্থানকালে সংবাদপত্রে বিবৃতি মারফৎ বলেছেন যে, তাঁর বিদায় গ্রহণে তাঁদেরই সাফল্য লাভ হয়েছে, যাঁদের কাছে তাঁর নীতি ও ধ্যান-ধারণা মনের মতো ছিল না এবং তিনি যে পদে ছিলেন সেই পদই ছিল তাঁদের কাছে অসুবিধাজনক। আইন ও শৃংখলা রক্ষার নামে তাঁর বিরুদ্ধে দুর্বল নীতির অভিযোগ অস্বীকার করে তিনি বলেছেন যে, বিগত তিন বছরের মধ্যে কঠোরভাবে শৃংখলা রক্ষা করার প্রমাণ ভুরিভুরি আছে। বর্তমান আইন ও শৃংখলা পরিস্থিতির নাম করে তাঁকে বিদায় নিতে বাধ্য করা হয়েছে।

শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে শ্রীনন্দ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকার সময় যে সব বাধার সম্মুখীন হয়েছেন—তা আরো স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কাছে লিখিত চিঠিতে। প্রসংগত তিনি স্বরাষ্ট্রদপ্তরের সেক্রেটারীর উপর দোষারোপ করে বলেছেন যে, ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যে তিনি তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার অভিপ্রায় প্রকাশ করলেও সে ব্যাপারে সক্ষম হন নি। এমন কি তাঁকে সরানোর ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সহায়তা থেকেও তিনি বঞ্চিত হয়েছেন।

শ্রীনন্দের এই অভিযোগ-এর সত্যতার জন্যে লিখিত প্রমাণের দাবি উঠলেও একথা আজ আবার প্রমাণিত হলো যে, দেশের শাসন ব্যবস্থা একেবারেই ভেঙে পড়ার সামিল না হলে মন্ত্রিসভার পরিবর্তে আমলাতান্ত্রিক আধিপত্যের কথা শ্রীনন্দর মতো মানুষের মুখ থেকে কিভাবে প্রকাশ পায়। অবশ্য আমলাতন্ত্রের এই আধিপত্যের দ্বারা কবলিত হয়ে কিভাবে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মতো দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন—এই প্রশ্ন উঠলেও আমরা একথা বলতে পারি যে, একদিকে প্রগাঢ় শুভ ইচ্ছা আর একদিকে বাধা দূরীকরণের অক্ষমতাসূচক দুর্বলতাই উপদলীয় বাণবিদ্ধ শ্রীনন্দকে স্বধর্মচ্যুত হতে বাধ্য করেছিল। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রীর সহায়তা তাঁর পক্ষে কতোটা কার্যকর হয়েছিল তা লোকসভায় প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি থেকে অনুধাবন করা যায়। নতুন সেক্রেটারী নিয়োগের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেটের সাব-কমিটির দায়িত্বের কথা বললেও তিনি শ্রীনন্দের সেক্রেটারীকে সরিয়ে দেবার অক্ষমতার ব্যাপারেও কি স্বীয় দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন? প্রধানমন্ত্রীর কাজ এমনই যে, সরকারের যে কোনো কর্মপ্রণালী এমন কি, দলীয় ঐক্য স্থাপনেও তাঁর দায়িত্ব সর্বাধিক। এই দায়িত্বকে তিনি অস্বীকার করতে পারেন না।

কিন্তু সারা ভারতে আজ কি ঘটছে? একদিকে উপদলীয় কোন্দল, আর একদিকে বিশৃংখলা। এই বিশৃংখলার জন্যে মূলত দায়ী কে? শ্রীনন্দ প্রধানমন্ত্রীর কাছে লিখিত তাঁর চিঠিতে এই ব্যাপারে যা বলেছেন তা হয়তো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালীন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলতে পেরেছেন। তাঁর মতে জনগণের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা ও দারিদ্র্য আজ সরকার কর্তৃক অবহেলিত। রাজনৈতিক দলগুলি কি করছে সেদিকেই সরকারের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ। অত্যুচ্চ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি খাদ্যাভাব, বৈষম্যমূলক বিতরণ এবং সংহতির অভাবজনিত নৈরাশ্য ও ক্রমাগত ক্রোধের জন্যই যে শৃংখলাভংগ—তা জেনেও তিনি পুরাতন নিয়মকানুনেই শৃংখলা রক্ষা করেছেন। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, রাজ্যে রাজ্যে ঢের বেশি শৃংখলা ভংগ হয়েছে, সে সব রাজ্যে কখনো-সখনো নন্দ নিজে গিয়েও পরামর্শ দিয়ে এসেছেন, কিন্তু স্বক্ষেত্রে তিনি ত্রিশূলবিদ্ধ হয়েছেন তিন দিক থেকে—একদিকে উপদল, আর একদিকে আমলাতন্ত্র, অন্য দিকে সাধু সমাজ।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

নন্দজীর পতনকে বীরবাহুর পতন হয়তো বলা যাবে না, কিন্তু এ যে একটা বিরাট ছন্দঃপতন এটুকু বলা চলে। সুদীর্ঘ ষোলো বছর ধরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার তিনি সদস্য, খবরের কাগজে তাঁর ছবি, তাঁর নাম প্রায় প্রতিদিনই উপস্থিত। নেহরু মন্ত্রিসভা থেকে ইন্দিরা মন্ত্রিসভা—তিনটি ক্যাবিনেটেই তাঁর নিশ্চিত আসন; বস্তুত বর্তমান মন্ত্রিসভায় শ্রীনন্দই ছিলেন সবচেয়ে প্রবীণ। কিন্তু রাজনীতিতে প্রবীণ-নবীনে কোন তফাৎ নেই, দিন ফুরোলেই যেতে হবে, স্বেচ্ছায় না হলেও বাধ্য হয়ে। রাজনীতির নিয়মই এই।

গো-হত্যা বন্ধ করার দাবিতে নয়াদিল্লীতে সেদিন যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল কয়েকটি দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল দলের কয়েক লক্ষ লোক তারা মিছিল প্রতিবাদের মধ্যেই তাদের কর্মসূচী সীমাবদ্ধ রাখে নি। পরিক্রমার পথে যা পেয়েছে তাই আক্রমণ করেছিল, আকাশবাণীর অফিস, বাড়ি গাড়ি কিছুই বাদ যায় নি তাদের লক্ষ্যস্থল থেকে। পুলিশকে গুলী চালাতে হয়েছিল যার ফলে আটজন লোক মারা যায়। দিল্লীতে এ-ধরণের ঘটনা আর হয় নি। বিরোধীরা মুখ খোলার আগেই স্বদলীয়রা মারমুখো হলেন, কংগ্রেস দলের নন্দ-বিরোধীরা এ-সুযোগ ছাড়লেন না। আইন ও শৃংখলা ভেঙে পড়েছে এবং বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সাধু সমাজ যুক্ত ছিল যে সাধু সমাজ নন্দজীর আশীর্বাদপুষ্ট—এ-অভিযোগেই নন্দজীকে কাবু করা হলো—পদত্যাগপত্র দাখিল করতে বাধ্য হলেন যদিও তিনি বলতে ছাড়েন নি যে ওইদিনের ঘটনার জন্য মন্ত্রিত্ব ছাড়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। নন্দজী একথা জানাতেও ভোলেন নি যে পদের প্রতি তাঁর কোনো মোহ নেই, জনসেবাই তাঁর জীবনের আদর্শ।

এ কথা বলার হক্ নন্দজীর অবশ্যই আছে, কারণ ক্ষমতা বা পদ তিনি কম লাভ করেন নি, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা তিনি গত ৪৫ বছর ধরে কংগ্রেসের মাধ্যমে জনসেবাই করে আসছেন। সেই ১৯২০-২১ সালে যখন সারা ভারত জুড়ে অসহযোগ আন্দোলন চলছে তখন থেকেই শ্রীনন্দ কংগ্রেস-সেবক।

ভালো ছাত্রই ছিলেন গুলজারীলাল স্কুল-কলেজে। লাহোর, আগ্রা, এলাহাবাদে পড়াশুনো করেছেন, পাঠ সমাপ্ত করে কলেজে অধ্যাপনা। কিন্তু দেশপ্রেমের আগুন যাঁর অন্তরে তিনি নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারলেন না কলেজগণ্ডীর মধ্যে। শ্রমিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। ক্লাসঘর পাল্টালেন তিনি; কলেজ থেকে শ্রমিক বস্তীতে। বোম্বাই-আহমেদাবাদ সুতাকল চটকল শ্রমিকদের পাঠ দিতে লাগলেন তিনি, সচেতন করতে লাগলেন শ্রমিকদের অধিকার, তাদের আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে।

১৯৩৭ সালে জাতীয় কংগ্রেস নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করলো, কয়েকটি রাজ্যে সরকার গঠনেরও। সেই বছরেই শ্রীনন্দ বোম্বাই আইনসভায় প্রবেশ করলেন জন-প্রতিনিধি হয়ে। কিন্তু শ্রমিকদের জন্যে যিনি এত স্বার্থত্যাগ করলেন, শ্রমিকদের উন্নতিবিধানের

শ্রীনন্দ

সুযোগ তিনি প্রথম পেলেন আরো প্রায় এক যুগ পরে। স্বাধীনতা পাবার পরেই নন্দজী বোম্বাই মন্ত্রিসভায় স্থান লাভ করেন, অবশ্যই শ্রমদপ্তর।

দেড় শো বছরের বিদেশী শাসন ভারতকে পেছিয়ে রেখেছিল অনেকখানি, অথচ এই বিশাল দেশে অভাব নেই কোন সম্পদেরই, সম্ভাবনা তার প্রচুর। সে সম্পদের সদ্ব্যবহার করার জন্যে চাই সুষ্ঠু পরিকল্পনা, চাই প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী, ডায়নামিজম বা গতিশীলতা। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু নন্দজীকেই আমন্ত্রণ জানালেন ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানের পদ নেবার জন্যে, চেয়ারম্যান তো স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। সেই যে ১৯৫০ সালে দিল্লীতে এসে বাসা বাঁধলেন নন্দজী রয়েই গেলেন এখানে তিনি বিভিন্ন কাজে, বিভিন্ন দায়িত্ব নিয়ে। পরের বছরই তিনি নেহরু ক্যাবিনেটের পুরোদস্তুর মন্ত্রী হলেন ঃ পরিকল্পনা দপ্তর পেলেন তিনি। পরবর্তী নির্বাচনের পর নতুন মন্ত্রিসভায় শ্রীনেহরু নন্দজীর সুদৃঢ় স্কন্ধে দায়িত্বের আরো বোঝা চাপালেন, সেচ ও বিদ্যুৎ যুক্ত হলো পরিকল্পনা দপ্তরের সংগে।

শ্রীনেহরু সব সময়ই যোগ্যতাকে পুরস্কৃত করতেন, তার মর্যাদা দিতেন। তাই ১৯৬২ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করার পর তিনি তাঁর শেষ যে ক্যাবিনেট গঠন করেন তাতে নন্দজীকে দেখা গেলো তাঁর পুরোনো প্রিয় দপ্তর ফিরে পেতে, পরিকল্পনা ছাড়াও শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং পরে স্বরাষ্ট্র দপ্তর এলো নন্দজীর হাতে। নেহরু-হীন রাষ্ট্রতরণীর হাল ধরার সাময়িক দায়িত্ব পড়লো প্রবীণ দেশনেতা নন্দজীর ওপর, ভারতের অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করলেন শ্রী জি এল নন্দ। প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীজীর আকস্মিক বিয়োগে নন্দজীকে আবার অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিতে হয় যতদিন পর্যন্ত শ্রীমতী ইন্দিরা দলনেত্রী নির্বাচিত না হলেন।

দুর্নীতি দেশে নেহরু-আমল থেকেই, অথচ দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করতেই হয়, তাই তিনি জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন দু বছরের মধ্যে দেশ থেকে দুর্নীতি ঝেঁটিয়ে বিদায় করবেন। এ বাবদে তিনি সদাচার সমিতিও গঠন করলেন। তাঁর কর্মপন্থা কার্যকর করতে গিয়ে বহু অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হলো, তিনি তখনো বোঝেন নি যে কী ভয়ঙ্কর শক্তিশালী কায়েমী চক্রের গায়ে হাত দিয়েছেন তিনি। নন্দজী সমর্থন লাভ করেন নি, তাঁর দুর্নীতি-বিরোধী অভিযানের হাস্যকর পরিণতি ঘটেছিলো।

শ্রীনন্দ মন্ত্রিসভা থেকে বিদায় নিয়েছেন, কিন্তু কাজ তাঁর ফুরোয় নি, দেশসেবকের ভূমিকালিপি থেকে তিনি বাদ পড়েন নি। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট কামরাজ তাঁকে আসন্ন নির্বাচনে কংগ্রেস দলের পরিচালক মনোনীত করেছেন, শক্ত কাজ সন্দেহ নেই—বিশেষত বামপন্থীদের সক্রিয় ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে কংগ্রেস দলের মধ্যে তিনি অনেকটা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছেন, তাঁর প্রগতিশীলতা, তাঁর সততা তাঁকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে। কংগ্রেসে আজ দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলতার ঝোঁক, নন্দজী আবার মন্ত্রিস[illegible] ফিরে আসবেন কী করে তাঁর [illegible] চিন্তাধারার ধ্বজা ধরে।

গরুর জন্য শহীদ

মানুষের জন্য, মানবতার জন্য, আদর্শের জন্য, কুটিল রাজনীতির জন্য এবং স্বার্থপর ভাব-অনুভাবের জন্য প্রাণ দান ও প্রাণ হননের বহুতর নজীর আছে। ইতিহাস এসবেরই ইতিবৃত্ত। কিন্তু গরুর জন্য শহীদ ভারতের ইতিহাসে এব বিচিত্র ঘটনা। বিদেশে কুকুর নিয়ে বাড়াবাড়ি আছে, এদেশে গো-জাতির প্রতি ধর্মীয় গোঁড়ামি আছে। দুটিই অস্বাস্থ্যের লক্ষণ সন্দেহ নেই। অবশ্য এই দুই জাতীয় জীবই মানুষের প্রভূত সাহায্যে এসেছে। যদিচ সাহায্যের প্রশ্নে ছাগকুল ঘোটক-বাহিনী এমনকি গর্দভ গুণভৃৎদেরও গণনা করতে হয়। জানওয়ার যূথের মধ্যে ধর্মের ষাঁড়ই অকেজো। তা এই ধর্মের ষাঁড় কিন্তু ধার্মিকের কাছে যথেষ্ট খাতিরের বিষয়। ধর্মের ষাঁড় আমরা পুষতে ভালবাসি। 'বিশ্বনাথের দরবার' ছাড়িয়েও 'এ'দের' মহার্ঘ আসন আমরা অন্যত্রও দান করে আসছি; কেবল কোথাও কোথাও ঐ বিশেষ জীব চতুষ্পদাদি ত্যাগ করে দ্বিপদাবিশিষ্ট হয়ে থাকে। কিন্তু সেকথা থাক। ধর্মের ষাঁড় ও তদীয় উপাসকবৃন্দ যথেচ্ছ চরে খাক অথবা ঘুরে বেড়াক, একমাত্র গুঁতানো পর্যন্ত এদের নিয়ে শিরশীর্ষ গরম করার এদেশে অন্তত কখনই কোন কারণ ঘটবে না। সুতরাং ও-দুঃখ এখন থাক। বর্তমানে প্রসঙ্গত যে প্রশ্নে আসতে হয়েছিল, তার থেকে প্রসঙ্গান্তরে যাই। পথিমধ্যে এইটুকু বলে নেওয়া গেল যে, গো-কুলের প্রতি উত্তেজনা ধর্মের ষাঁড় অবধি ঠেকে আছে, দেশের বর্তমান ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে সেই কথাটাও মনে রাখা প্রয়োজন।

নন্দ-বিদায়ের পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার রদবদল সম্পর্কে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের জোর কর্মতৎপরতা।

নেপথ্য সংবাদ

গরু নিয়ে গুঁতোগুঁতি যে প্রায় একটা ছোটখাট বিদ্রোহী উৎপাতের আকার নেবে এতটা হয়ত গত সোমবার পার্লামেন্ট স্ট্রীটের ওপর উন্মত্ত 'সাধু'-জনতার রাহাজানি সংঘটনের আগে জানা যায় নি; কিন্তু ইন্টেলিজেন্স রিপোর্টে পূর্বাহ্নেই সতর্কীকরণ আভাস ছিল। প্রকাশ, প্রথম প্রতিবেদনে নাকি জানান হয়েছিল যে, (তথাকথিত) 'সাধু'রা যেহেতু শৃঙ্খলার ধার ধারে না, হাঙ্গামার সম্ভাবনা তাই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্রধানমন্ত্রীর অট্টালিকার সামনে তথাকথিত বিবস্ত্র 'সাধু'রা যখন গ্রেপ্তার বরণ করছিলেন, ঐ প্রতিবেদন সেইসময় প্রচার করা হয়। সোমবারের উৎপাতের আগেও প্রতিবেদন প্রচারিত হয়েছিল এই মর্মে ঃ যেহেতু মন্ত্রিসভাটি দল সম্মিলিতভাবে বিক্ষোভের দুর্বলতার [illegible]ছে সুতরাং কোন একটি দল ঘটছে। [illegible]ন ধরতে পারবে বলে আশা রাখা যায় না। এছাড়া আরও ইঙ্গিত ছিল যে, ভি-আই-পি গৃহের ওপর এবং যানবাহনের ওপর হামলা হতে পারে।

এ সমস্ত প্রতিবেদন থেকে একটি জিনিস অনুমান করা চলে যে, দুষ্কৃতকারীরা আগে থেকে তৈরি হয়েই লাঠি-বর্শা হাতে মিছিল বার করেছিলেন। স্থানীয় ব্যবসায়িবৃন্দ অর্থ খাদ্য ও অন্যান্য সুবিধা দিয়ে জোটবন্ধ হামলাকারীদের রাজধানীতে আপ্যায়িত করেছেন। জনসংঘী এবং কংগ্রেসীসহ সাম্প্রদায়িকতাবাদী কুচক্রী রাজনীতিজ্ঞরা মিলে রাজধানীর ঐসমস্ত হামলাবাজ অতিথিদের জন্য নাকি তাঁবুর ব্যবস্থাও করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ 'রামলীলা কমিটি'র তাঁবু এবং যমুনা বাজার তাঁবুর উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, কমিটির মধ্যে দিল্লী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অনেক হোমরা-চোমরাও ছিলেন। ঐ প্রতিবেদনে স্পষ্টত উল্লেখ আছে যে মূলত দুটি প্রধান সাম্প্রদায়িক দলই রাজধানীতে সর্বপ্রকার ব্যবস্থার নেতৃত্ব করে। অন্য চমকপ্রদ সংবাদ, ঐদিন রাজধানীতে বিক্ষোভকারীদের স্যাফ্রন টুপি প্রতিটি পঞ্চাশ পয়সায় বিক্রি হয়।

হামলাকারীদের খাদ্য যোগান দেওয়ার জন্য বেশ কিছু হালুইকরের কর্মসংস্থানও হয়েছিল। এলাহি পর্ব। অর্থাৎ যুদ্ধের সব আয়োজনই নিখুঁতভাবে সাজানো হয়। আর এতো কিছু হয়েছে ভারতবর্ষের রাজধানী শহর নয়াদিল্লীর বক্ষস্থলে, বা অনায়াসে শান্তিরক্ষকদের লক্ষ্যস্থল হওয়া উচিত ছিল।

দুঃখের বিষয় এতোবড় একটা কান্ডকে যতটা মূল্য দেওয়ার কথা, প্রশাসনিক তৎপরতায় ততদূর দূরদৃষ্টিই ছিল না। থাকলে শ্রীকামরাজের গৃহে অমনভাবে হামলাকারীরা ফ্রিহ্যান্ড পেতেন কি!

উল্টে দুর্ঘটনাঘটনপটীয়স রেল দপ্তর এদের জন্য স্পেশাল ট্রেন বরাদ্দ করেছে! হাজারে হাজারে, কাতারে কাতারে মানুষ এসেছে দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে!

উত্তর প্রদেশ দিয়েছে সম্মিলিত বিক্ষোভকারীদের প্রায় অর্ধাংশের যোগান। পাঞ্জাবের দান তারপরই, প্রায় বিশ হাজার। মধ্যপ্রদেশ থেকে উপহার এসেছে প্রায় সাত হাজার স্বেচ্ছাসেবক এবং রাজস্থান-বিহারের দান, হাজার পাঁচেক করে প্রতি-ক্ষেত্রে। খোদ দিল্লীতে জড় করা হয়েছিল দশ হাজার। অন্যান্য রাজ্য থেকে মাত্র চার হাজারের মত।

এতোগুলি পেটের ব্যবস্থা করতে কত হাজার মুদ্রার প্রয়োজন! এ টাকা ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক দল-উপদল এবং মঠ-মন্দির থেকে সংগৃহীত।

সহস্র সহস্র গো-বন্ধুরা পানাহার করে গণতান্ত্রিক সংসদ ভবনে চড়াও হতে চললেন। পথে যা কিছু বেওয়ারিশ মাল বলে তাঁদের ধারণা হ'ল অন্ধ গো-প্রেম বশত তাই দরাজ হস্তে ধ্বংস করে গেলেন। বাদ পড়ল না আকাশবাণী ভবন, সংসদ ভবন, সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান পি, টি, আই ভবন। পরিবহন ভবনের গাড়িগুলি চুরমার করা হ'ল। ওদের অগ্নিরোষ থেকে অব্যাহতি পেল না প্রাইভেট গাড়ি ও স্কুটার। আর যারা গরুর জন্য শহীদ হলেন তাঁরা সবই খুইয়ে গেলেন।

ইতিমধ্যে উত্তেজিত আন্দোলন মুহুর্মুহু হ'য়ে গেছে কিন্তু এমন বেপরোয়া রাহাজানি কোথাও হয় নি, আর তাও কেবলমাত্র গরুকে কেন্দ্র করে। সন্দেহ কি, এতো গরু-প্রেমিক থাকতে এদেশের শাসন শুধুই ঠেঙাবে। না ঠেঙিয়ে দুষ্টু গরু শাসন সম্ভব নয়।

গরু-প্রেমিকরা শহীদ হয়েও দেশবাসীর সহানুভূতি কুড়তে পারেন নি। কেন না, এ ধারণা সঠিক নয় যে, আন্দোলনে নামলেই তা জনসমর্থিত হবে। বিশেষ 'সাধু-সজ্জন'(?) ব্যক্তিকে এমনভাবে নির্বিচারে ধ্বংসে মাততে দেখলে ধর্মপ্রাণ ভারতবর্ষের পিত্তবমন হওয়া ছাড়া আর কি হতে পারে। গেরুয়ার মধ্যে গরুর জন্য যেমন গর্জন শোনা গেল, গণদাবির ক্ষেত্রে তেমন গঠনমূলক আন্দোলনে তাঁদের কখনো দেখা যায় নি।

আশ্চর্য এবং আশঙ্কার কথা, দেশে এতো গো-প্রেমিক আছেন, যাঁরা সরোষে সাংঘাতিক অগণতান্ত্রিক জেহাদে যে কোন মুহূর্তে ফেটে পড়তে পারেন। এই প্রতিক্রিয়াশীল গণবিদ্বেষী গরু-প্রেমিকদের থেকে যতটুকু সাবধান হওয়া উচিত ছিল, সরকার ততদূর হতে পারেন নি। বরং নির্বাচনীকৃত অনেক কেন্দ্রীয় নেতাকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছিল যে, তাঁরা আপন কর্তব্য ভুলে স্বীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করে সরকারী নীতি-বিরোধী এমন কি সংবিধান-বিরোধী দাবির পক্ষে গঠিত আন্দোলনকে মদৎ দেওয়ার জন্য "স্পেশাল" ব্যবস্থাও করে বসেছেন। অথচ সাধুসঙ্গের অজুহাতে অক্ষমতার অপবাদ চাপিয়ে প্রতি-ক্রীয়াশীল শক্তির দ্বারা তাঁরাই আবার নেপথ্য হাতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদ থেকে শ্রীগুলজারিলাল নন্দাকে অপসারিত করলেন (নন্দার পদত্যাগ নেপথ্য চাপের ফলশ্রুতি)। কিন্তু নিজেদের দায়িত্ব এতোটুকু স্বীকার করেন নি। যে রেল-মন্ত্রী রেলদপ্তর না সামলে সামলাচ্ছেন দলীয় স্বার্থ; যাঁর দিবারাত্রের চিন্তা, প্রগতিবাদী শক্তিকে কোণঠাসা করে কেমনভাবে কায়েমী স্বার্থকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া যায় তাই নিয়ে; তিনি যথাযথ রেলদপ্তর আঁকড়ে আছেন। নিজের ক্ষমতার গুরুত্ব তিনি অনুভব করেন পার-দর্শিতার দ্বারা নয়; দলশক্তির দ্বারা। তিনি নন্দার অপসারণে হাত মেলান। কৃষ্ণমেননকে বোম্বাই নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে হটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন জবরদস্তভাবে। কিন্তু রোজ রেল দুর্ঘটনা ঘটলেও গায়ের জোরে (দলের জোরে) গদি আঁকড়ে থাকেন ঠিকই। এই রেল-দপ্তরই সরকারী বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনকে মদৎ দেয় স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করে। এমতাবস্থায় এদেশে গো-প্রেমিকের পক্ষে শহীদ হওয়া এবং সরকার বিরোধী আন্দোলনে মদৎদান-কারীর পক্ষে মন্ত্রিত্ব বজায় রাখা সম-ভাবেই সম্ভব বৈ কি।

দিল্লীতে সেদিন যে অগণতান্ত্রিক বিক্ষোভ-রোষাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছে, তা নেপথ্য প্রশ্রয় না পেলে এতদূর উন্মাদ হতে সাহস করত কি না সন্দেহ। আর এই সুযোগে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি নন্দার মতো ক্যাবিনেটের একজন প্রবীণ সদস্যকে কত সহজেই পদত্যাগে বাধ্য করল।

সত্য বিচিত্র এই গো-ময় ভারত!

গতি যাঁর সাধুসহ
ধিক সে রাজনীতি

দিল্লীর বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির জন্য শ্রীনন্দাই সমালোচ্য হয়েছেন। রাঁচি কংগ্রেসের পর থেকে এই দুঃসাহসী সদাচার স্বপ্নসম্বল মানুষটির পেছনে অনেক শক্ত হাত সক্রিয় ছিল। তবু নন্দার শান্ত প্রকৃতি এবং ধৈর্য তাঁকে মন্ত্রিসভায় টিকিয়ে রেখেছে এতোকাল। নন্দাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন এবং দায়িত্বভারে প্রধানমন্ত্রীর পরেই তাঁর গুরুত্ব। হলে কি হয়। নন্দা ট্রেড য়ুনিয়ন করেছেন, দু-চারটে ভালো কাজ করার অভীপ্সা পোষণ করেছেন মনে প্রাণে, কিন্তু দল গঠন করেন নি কখনো। নেহরুজী থাকতে নন্দা বটগাছের আড়ালে ছিলেন। কেন্দ্রে রাজ্যে তাঁর দলবল নেই বলে মন্ত্রিসভায় তাঁকে নাস্তানাবুদ হতে হয় নি। কিন্তু লালবাহাদুর গত হলে নন্দাকে রক্ষা করার মতো স্ট্রং ম্যান আর রইলেন না। পরন্তু দলবলে বলীয়ান নন্দা-বিরোধীরা তাঁর মতো পথের কাঁটাকে উৎপাটিত করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। কিন্তু নন্দার স্বপক্ষে জনমত প্রবল ছিল। কেন না শ্রমমন্ত্রী নন্দা কিম্বা পরিকল্পনা-মন্ত্রী নন্দার মধ্যেও জনগণ তাঁর শুভ ইচ্ছার পরিচয় পেয়েছে ইতিপূর্বে। দেশ থেকে দুর্নীতি তাড়াতে না পারলেও (কেউ কি পারবেন।) এবং এজন্য সময়ে পদত্যাগ না করলেও নন্দা দেশের মধ্যে দুর্নীতি জিনিসটার বিরুদ্ধে জোর জন-মত তৈরি করে গেছেন। বলা বাহুল্য, দুর্নীতির মদৎদারগণ এ সব দেশহিতৈষণা ভালো চোখে দেখেন নি। নন্দাকে অনেক চোখরাঙানী সহ্য করতে হয়েছে। আর পদত্যাগের পর নন্দা স্বয়ং যে সব কথা বেফাঁস করে দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে তিনি ক্রমেই মন্ত্রিসভায় একটি ব্যক্তিত্ব-হীন নামমাত্রে পরিণত হচ্ছিলেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কী সহযোগিতা করেছেন এবং কেমনতর সহানুভূতি জানিয়ে আসছিলেন তার সঠিক বিবরণ অপ্রকাশিত। কিন্তু নন্দার নিজস্ব বিবৃতিতে প্রমাণ হচ্ছে, তিনি যে শুধু পদে পদে মন্ত্রিসভার অসহযোগিতাই লাভ করেছেন, তাই নয়; তাঁর স্বরাষ্ট্রসচীবও তাঁকে যথেষ্ট পরোয়া করে চলেন নি। অথচ নন্দাজী মন্ত্রিত্বের মোহ ত্যাগ না-করে এতোদিন কেন যে শেষ ও মোক্ষম চাপের অপেক্ষায় বসেছিলেন, নন্দা চরিত্রের এও এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য।

যে গুলজারীলাল নন্দা নিজেকে রক্ষা করার জন্য একদল কংগ্রেসী তৈরি করতে পারেন নি; যিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েও কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটের দুরন্ত রেলগাড়ির তলায় চাপাই পড়ে ছিলেন, তথাপি চাপের কাছে নতি স্বীকার করে কুচক্রী উপদলীয় রাজনীতির সঙ্গে আঁতাত করতে যান নি, তিনিই এতোকাল মন্ত্রিত্ব আঁকড়ে ছিলেন কেন? কায়েমী স্বার্থের ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপের মালা গলায় পরে নাটকীয় বিদায় গ্রহণের জন্য? তবু ভালো, যাবার বেলা নন্দাজী ভাঙা ক্যাবিনেটের তেল-জলের কাহিনীটি প্রকাশ করে দিয়েছেন এবং সেজন্যও মুখোসঢাকা মুখের বিকৃতি তাঁকে আক্রমণ করতে ছাড়ে নি। অবশ্য ইদানীং মুখোসেরও আর প্রয়োজন হচ্ছে না। দুর্জনের পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়লে সে দুর্বিনীত হয়ে পড়ে, কংগ্রেসে কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধিরাও এখন জোর যার মুলুক তার নীতিতে অবতীর্ণ হতে চলে-ছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের লেজুড় দৈনিক পত্রগুলিও নির্লজ্জ কথা-সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে।

[illegible] ল্যানোলিন লোশন শ্যাম্পু

[illegible] (ইউ. এস্ এ.)—এর [illegible] গুলি নষ্ট হয়ে যায়, ল্যানোলিন [illegible] ☐ সরের মত প্রচুর ফেনার অতি- [illegible] বারের ব্যবহারের পরই আপনার চুলে প্রাণের স্ফূর্তি ☐ সাধারণ শ্যাম্পুতে যে [illegible] তুলবে ☐ আজ থেকে [illegible] ল্যানোলিন তা আবার এনে দিয়ে [illegible] করা শুরু করে দিন—এই বিশেষ জিনিসটি একান্তভাবেই তাড়াতাড়ি [illegible] অপরূপ ক'রে তুলবে !

Helene Curtis
where beautiful young ideas begin

ভারতে প্রস্তুতকারক : জে. কে. হেলেন কার্টিস্ লিমিটেড, বোম্বাই—৭

জে.কে. হেলেন কার্টিসের [illegible] আয়োজিত ফেমিনার মিস ইণ্ডিয়া ১৯৬৭ প্রতিযোগিতায় যোগ দিন।

নন্দাজীর বিদায়ে কেউ বলেছেন, ঐ দুর্বল লোকটার অনেক আগেই সরে যাওয়া উচিত ছিল। অপেক্ষাকৃত চতুররা ধুয়ো তুলেছেন, আসলে নন্দাই তো গো-হত্যা নিবারণের জন্য সার্কুলার পাঠিয়েছেন রাজ্য স্তরে। কেউ কেউ ঘুরিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে আপনজনকে বসাবার বাসনায় এক ঢিলে দুই পাখী বধের আয়োজন করে বলেছেন ঃ স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীর পদে এবার একজন শক্ত মানুষ চাই। কিন্তু যে মানুষটি গত পাক-ভারত সংঘর্ষের কালে অশক্ততার কিঞ্চিন্মাত্র পরিচয় রাখেন নি, লেজুড় কাগজওয়ালারা সেই চ্যবনকে একবারও ঐ পদে বরণ করতে চান এমন কথা মুখ ফুটে বলেন নি। অথচ ঐ পদটি থেকে নন্দকে হটিয়ে তাঁদের মনোমত প্রতিনিধি বসাবার জন্য এতোকাল যে উন্মুখ ছিলেন এ বিষয়টি আগ্রহাতিশয্যে সুস্পষ্ট করে তুলেছেন তাঁরা

অতি উৎসাহীরা ইতিমধ্যেই মোরারজী দেশাই-এর স্বপ্ন দেখছেন। বাংলা দেশের পোড়া কপাল এখানেও কিছু মোরারজীভ্রাতার কলম নিসপিস করে উঠেছে। এ'রা মোরারজীভাই মোরারজী-ভাই করে প্রথম পাতার তিন-চার কলম ভরিয়ে ফেলেছেন। পরে স্বরাষ্ট্র দপ্তর প্রধানমন্ত্রী অস্থায়িভাবে স্বয়ং রাখছেন খবর পেয়ে উৎসাহী কলম এ্যান্টি ক্লাইম্যাক্সে ভেঙে পড়েছে। সতর্কবাণী শোনা যাচ্ছে, কাজটার ফলাফল অনেকদূর এগোতে পারে।

আর এগোবেও। কেন না নন্দাজীর পদত্যাগের পেছনেও বহুদূরের সুতোর টান ছিল, বহুকালের প্রচেষ্টায় বর্তমান ফলশ্রুতি লভ্য হয়েছে।

নন্দাজীকে ট্র্যাজিক রাজনীতির নায়ক বলে মনে হচ্ছে। প্রতিকূল সমুদ্রে একাই তিনি পাল খাটাতে চেয়েছিলেন। তেমন কর্ণধার হলে হয়ত নেহরুসদৃশ অগ্রগতি তাঁর জীবনেও ঘটে উঠতে পারত। কিন্তু মহৎ অনুভাবনা এবং রাজনীতি, কদমে কদম ফেলে না। তার ওপর এই প্রকান্ড অসাধুতার স্রোতে তিনি গেছলেন সাধুসংগ করতে। সাধুরাই তাঁর পতনের নিমিত্তভাগী হ'ল। আসলে কিন্তু নন্দাজীর দল রক্ষার অক্ষমতাই তাঁর অসহায়তার কারণ। তাছাড়া কড়া রাজ-নীতির খেলোয়াড় না হয়েই তিনি কেউটের ল্যাজে পা দিতে গেছলেন। দংশন সাংঘাতিক হয়েছে।

সাধু রাজনীতি আধা-স্যোসালিস্ট-বুলি-সর্বস্ব রাজত্বে ধোপসই নয়। নন্দাজী কংগ্রেসী মন্ত্রিসভায় তাঁর কর্ম-ময় সময় দিয়ে তাই প্রমাণ করে গেলেন।

সম্মিলিত দায়িত্ব

নন্দা-বিদায় পালাকে নন্দা-বিরোধীদের কেউ কেউ স্রেফ "প্রহারেণ ধনঞ্জয়" আখ্যায় ভূষিত করে তৃপ্তি বোধ করছেন। কিন্তু ব্যাপারটার মীমাংসা অত সহজে হচ্ছে না। এবং নন্দা বিদায়ে বিগলিত হওয়ার বিশেষ কোন কারণও দেখা যাচ্ছে না; অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, আভ্যন্তরীণ শৃংখলা রক্ষা, গো-হত্যা নিবারণ প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে সামগ্রিক-ভাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নীতিও জড়িত আছে। সুতরাং নন্দা বিদায়ে মন্ত্রিসভা দায়মুক্ত এমন ভাববার কারণ নেই। দায়-ভাগ নিতে হলে বর্তমান মন্ত্রিসভার ভাঙা হাটকেই ভেঙে সাজাতে হয়। তাছাড়া ব্যর্থতার নজীর অন্যান্য দপ্তরেও পর্বত প্রমাণ। বিদায়ের পালা সেখান থেকে শুরু হলে বাস্তবিকই ধন্য ধন্য পড়ে যেত। কিন্তু যেহেতু নন্দা-বিদায়ের পেছনে সুদীর্ঘকাল যাবৎ শুভশক্তির সঙ্গে অশুভশক্তির টাগ অব ওয়ারের সংবাদ দেশের লোকের অজ্ঞাত নেই, সে কারণেই নন্দা-বিদায় পর্ব মন্ত্রিসভার ইজ্জত বাড়ায় নি, বরং দুর্বলতাই প্রকাশ করে দিয়েছে। নন্দাজী প্রকৃতপক্ষে পদত্যাগে বাধ্য হয়েছেন আর সে হিসেবে 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়' খুব লাগসই হয়েছে সন্দেহ নেই।

নন্দাজীর পত্রে এই মর্মে অভিযোগ আছে যে, মন্ত্রিসভার নীতি নির্ধারণে তার কোন বক্তব্যই আমলে আনা হ'ত না। এতদ্দ্বারা একথাই বুঝতে হবে যে, মন্ত্রি-সভা সম্মিলিত দায়িত্বে পরিচালিত হচ্ছিল না আর নন্দাজী সেখানে পাত পান নি। এর পরেও নন্দাজীর স্কন্ধে দোষ বর্ষণ কতদূর সঙ্গত হতে পারে। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শুধু বলতে পেরেছেন, তিনি নিজে তাঁর যথাসাধ্য সহযোগিতা দান করেছেন। কিন্তু এই উত্তরও তো গণ-তান্ত্রিক মন্ত্রিসভার পক্ষে যথেষ্ট বলে ধরে নেওয়া যায় না। তাছাড়া সহযোগিতা কী শ্রেণীর সে কথাও সুস্পষ্ট উল্লেখিত হয় নি। সুতরাং নন্দাজীর অভিযোগ যথেষ্টভাবে খণ্ডিত হয়েছে এমন মনে করারও কারণ নেই। যে সচীবকে নন্দা নিজে মানিয়ে চলতে পারছিলেন না, তাঁকেই তাঁর দপ্তরে জোর করে বসিয়ে রাখার মধ্যে দপ্তর-নেতা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতি কী জাতীয় সহযোগিতা প্রদত্ত হয়েছে জনসাধারণ তাও সম্যক উপলব্ধি করে উঠতে পারেন নি। এমন অবস্থায় নন্দা-বিরোধী সমালোচকরা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছেন। তাঁরা বলছেন, বাপু হে, মন্ত্রিসভা থেকে সরে দাঁড়াবার আগেই ইজ্জত বাঁচিয়ে তবে পদত্যাগ কর নি কেন। [illegible] কারে ফাঁপরে ফেলতে চেষ্টা [illegible] মন্ত্রিসভাকে। ঘোর অন্যায়, ঘোর কেলেঙ্কারী। কিছুটা হক কথা যে এ [illegible] নেই এমন নয়। কিন্তু কথায় বলে, আশা মায়াবিনী। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। নন্দার যে চরিত্রের সঙ্গে সাধারণে পরিচিত, সে মানুষটি সহ্যশক্তির অবতার। সুতরাং অ[illegible] কথা কি শুভ ইচ্ছা নিয়ে সুদিনের বিদায়পর্ব যৎকাল্ক না-ছিলেন বিশেষ, তখন বিশ্বাস [illegible] এমন নন্দাজী শেষ পরিণতি পর্যন্ত তাঁর ইচ্ছাকে জিইয়ে রাখতেই চেয়েছিলেন. হলে নিজের টলমলে অবস্থাতেও তিনি 'বিগ গাই'দের পেছনে সি বি আই ছেড়ে দিতেন না, গুপ্তচরবৃত্তির মতো গর্হিত পাপ কাজের কারসাজির চেহারাও ধরা পড়ত না। নন্দাজীর যদি কোথাও ভুল হয়ে থাকে তবে তা এই যে, তিনি অন্যায়ের ওপরও আস্থা রাখতে গেছলেন। তিনি অসাধু দেশে সাধু সমাজ করার স্বপ্ন দেখেছিলেন, এবং তাঁর মধ্যে কিছু কিছু অসমসাময়িক ধর্মীয় সংস্কার থেকে গেছে; যার কঠিন ফলশ্রুতিতে বিবস্ত্র 'সাধুরা'ও মূর্খামির চূড়ান্ত করে বসেছেন।

উল্লাসের কারণ নেই

নন্দা-বিদায়ে নন্দা-বিরোধীরা স্থান-কাল-পাত্র এবং কার্যকারণ ভুলে যেভাবে উল্লসিত হয়ে উঠেছেন তাতে আর কিছু না হোক সাধারণের সামনে অনেকেরই সযত্ন রক্ষিত মুখোস খসে পড়েছে। নীতির প্রশ্নে নয়, (কেন না নন্দাজী বিদায় নিলেই সরকারী নীতি পরিবর্তিত হবে এমন কোন 'গ্যারাণ্টি' সরকারী তরফে সাধারণকে দেওয়া হয় নি) শৃংখলা রক্ষার প্রশ্নেও নয়, (কারণ নন্দাজীর দপ্তর প্রশাসন নন্দাজীকে আগ্রহ করেই কাজ চালাচ্ছিলেন বলে নন্দাজীর নিজস্ব অভিযোগে প্রকাশ। সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী তাঁকে সমুচিত সাহায্যদানে ব্যর্থ হয়েছেন। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং স্বীকার করে-ছেন, ক্যাবিনেট থেকে নন্দাকে বিযুক্ত করার সঙ্গে বিগত সোমবারের সাধু-রাহাজানির সম্পর্ক নেই)। নন্দাজীর পদত্যাগের পেছনে অন্যতর "উন্মুক্ত রহস্য" লুকিয়ে আছে। তাই বিরোধীরা সম-স্বরে নন্দা-বিদায়ে অসহিষ্ণু প্রশ্নবাদ তুলে ধরেছেন। ফলত অনেক মহলে বিদ্রূপ শোনা গেছে যে, বিরোধীরা অকস্মাৎ নন্দাভক্ত হয়ে উঠলেন কেন! বিদ্রূপ যখন স্বার্থপ্রণোদিত হয় তখনই তার ধার

ভীতা হয়ে বোকামিটাই স্বপ্রকাশ হয়ে পড়ে। কায়েমী স্বার্থের এ প্রশ্নেও ঠিক তাই হয়েছে। বিরোধীরা এতোকাল নন্দাকে নিন্দাবাদ যা করেছেন তার কারণ হ'ল এই যে, নন্দাকে একজন পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিরূপেই দেশবাসীর সঙ্গে তাঁরাও জেনে আসছিলেন। নন্দার পত্র প্রকাশ হওয়ায় জানা গেল, দেশটা মন্ত্রীতে চালাচ্ছিলেন না, চালাচ্ছিল কয়েকটি মুষ্টিমেয় ব্যুরোক্র্যাট অফিসরে। আর সেই অফিসরদের হাতের পুতুল ছিলেন মন্ত্রীরা। যে অসহায় অবস্থা থেকে প্রধানমন্ত্রী তাঁর সহকর্মীকে রক্ষা করতে পারেন নি। এই ঘটনা-পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধীরা উত্তেজিত হয়েছেন সঙ্গত কারণেই। নন্দা-প্রীতিতে নয়, কিম্বা নন্দাজী আজ মন্ত্রিসভার দুর্বলতা প্রকাশ করে দিয়েছেন বলেই নয়। সাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁদের এ সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপনের অধিকার যে আছে স্বয়ং সভার অধ্যক্ষও তা স্বীকার করেছেন এবং প্রধানমন্ত্রীর উত্তর যথেষ্ট নয় বলে মন্তব্য রাখতে কসুর করেন নি।

লোকসভায় মুহুর্মুহু সমগ্র মন্ত্রিসভায় পদত্যাগ দাবি করা হয়েছে।

ক্লান্তিকর পরিস্থিতি

গোধন নিধনে প্রতি-বন্ধন সৃষ্টি-কারীরা সমগ্র দেশের অভিশাপ কুড়ালেন তাঁদের মধ্যযুগীয় হুজুগে। কোন আন্দোলনের পর, বিশেষত এমনধারা তীব্র আন্দোলনের পর, আন্দোলনের মূল ইস্যুটাই মাঠে মারা গেল এবং দ্বিতীয় প্রশ্নটি আলোচ্য হয়ে উঠল এমন দুর্ভাগ্য গো-প্রেমিকরাই অর্জন করলেন। বোঝা গেল, যেখানে মনুষ্যজাতির ধন-প্রাণই আজ সর্বাল্প মূল্যে বিকোচ্ছে, সে দেশে গো-হত্যা নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। এজন্য গরুর জন্য যাঁরা শহীদ হলেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁদের মৃত্যুতে কেউ বিশেষ নয়নবারিপাত করেন নি। গোটা ব্যাপার-টাই দেশের বুকে একটা মূর্খ উত্তেজনা ও ব্যর্থ প্রচেষ্টার নিষ্ফল নজির হয়ে রইল। আর এই ক্লান্তিকর পরিবেশে সাধারণের আশঙ্কা হ'ল, আমরা ধীরে ধীরে কোন পথে এগোচ্ছি! নন্দা বিদায়েও অনুরূপ আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

কেন না এ ব্যাপারে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে, আমাদের দেশের কেন্দ্রীয়

দিল্লীতে পার্লামেণ্ট ভবনের সম্মুখে গো-হত্যা বিরোধী বিক্ষোভকারী সাধুদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ

মন্ত্রিসভায় শুধু নন্দার মতো প্রবীণ সদস্যই অসহায় নন, অসহায় বোধ করছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। তিনি নন্দাজীর পত্র নিয়ে সে-কারণেই বিসম্বাদে নামতে গররাজি। কে আর দাবি করে ঘরের কেলেঙ্কারীর ঝুড়ি পরের দোরের সামনে উপুড় করে ধরেন! নন্দাজীর ওপর খড়্গহস্ত কংগ্রেসীরা কিন্তু এই ক্লান্তিকর পরিবেশকে আরও টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যেতেই সম্যক উৎসাহী। এঁরা বড্ড ক্ষমতাসচেতন হয়েছেন। কথায় কথায় যাকে-তাকে শাস্তি-মঞ্চে টেনে তোলার জন্য ব্যগ্র। নন্দাজীকেও রেহাই দিতে নারাজ। কেলেঙ্কারীর কারখানায় নন্দা-বিদায়ের রন্ধ্রপথে কিছু বাইরের আলো এসে পড়েছে। বন্ধ গবাক্ষের অন্তরাল-বর্তীরা তাই খেপে গেছেন বিলকুল।

প্রধানমন্ত্রী কিছুতেই তাল রাখতে পারছেন বলে মনে হয় না। ক্ষিপ্ত কার্যকরী সমিতির সদস্যদের মাঝেও তিনি ঢোক গিলে চুপ করে থাকেন। আবার নন্দার অভিযোগেও তাঁকে 'স্পিকটি নট' হয়েই থাকতে হয়। প্রকাশ, তাঁর নাকি এই সুযোগে মন্ত্রিসভা থেকে আরও দু'জন মন্ত্রীকে নড়িয়ে বসানোর ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সেই আরও দু'জন মন্ত্রী নন্দাজীর মতো নিঃসম্বল নন; তাৎক্ষণিক তৎপরতা দিয়ে তাঁদের রক্ষকরা প্রধানমন্ত্রীর এমত বাসনা বানচাল করে দিয়েছেন।

বেশ বোধগম্য হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী নিজেও শ্রীনন্দার চেয়ে স্বাধীনভাবে তাঁর সভার নেতৃত্ব করার সুযোগ পাচ্ছেন না।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার এই ক্লান্তিকর পরিবেশ সমগ্র দেশের চোখ খুলে দিয়েছে। হতভম্ব নাগরিকরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন, জনগণের দান কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা শেষ বিচারে কতকগুলি প্রতি-ক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থচক্রের অঙ্গুলি সংকেতের নির্দেশবাহী মাত্র।

ঠিক সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে এহেন অভিজ্ঞতা প্রচন্ড আঘাতের মতো নির্বাচকমণ্ডলীর ওপর এসে পড়েছে। যার এক ধাক্কা সাধারণ নির্বাচনেরও গাত্র স্পর্শ করে যাবে বলে আশঙ্কা করা যায়।

সম্মুখে শঙ্কা

কিন্তু গো-রক্ষক কল্যাণে ও ফল-শ্রুতিস্বরূপ নন্দা-বিদায় পর্বে ক্ষমতাসীন দলের এক শ্রেণীর মধ্যে নতুন কুচক্রী ভাবনা ইতিমধ্যে স্থানলাভ করতে সুরু করেছে। দেশে গণতন্ত্রের প্রকৃত বিপদ ওদিক থেকেও তাই বিশেষভাবে আশঙ্কা করা যায়।

গো-রক্ষক হাঙ্গামাকে দেশের লোক সমস্বরে নিন্দা করেছেন, করবেনও। কিন্তু এই সুযোগে যদি এক শ্রেণী সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের গলা টিপে ধরার নতুন করে চেষ্টা সুরু করেন, তবে সেটাই হবে সব বড়া দুঃখের কথা। বলা বাহুল্য তেমন চেষ্টা তলে তলে সুরু হয়েও গেছে, যার থেকে সাধারণকে খুবই সাবধানে থাকতে হবে। কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী করার জন্য যাঁরা চাঙ্গা হয়ে উঠছেন, তাঁদের স্মরণযোগ্য ঘটনা ইতিপূর্বে খুবই অল্প ব্যবধানের মধ্যে ঘটে গেছে। তাঁরা নিশ্চয় জেনে রাখবেন, জনসাধারণ অন্যায় আবদার বলেই গো-হত্যা নিবারণী অভিযানকে সমর্থন করে নি। আবার সেই জনমতই গণতন্ত্রের গতিরোধ করার অন্যতর চেষ্টা হলে আগের মতই অমিত বিক্রমে রুখে দাঁড়াবে। গো-হত্যা নিবারণী হামলাও গণতন্ত্রকে আঘাত করতে গিয়েই জনসমর্থনে বঞ্চিত হয়েছে। না হলে কতিপয় গো-প্রেমিক যদি গোধন বাঁচা-বার জন্য গণ্ডায় গণ্ডায় অনশন করতে সুরু করতেন, তবে অনশনকারীর আসন্ন স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্যও হয়ত কিছু লোক দুটো সহানুভূতির কথা বলতেন। চাই কি গাঁদার মালাও জুটতে পারত। কিন্তু গণতন্ত্র হননের উদ্যোগ বা প্রতিক্রিয়া-শীলতার বাঁকা পথে ভারতের নবলব্ধ আশা-উদ্দীপনাকে টেনে নামানোর যে কোনো তরফের যে কোন চেষ্টাই জনগণ যে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসবেন, দেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী তার যথেষ্ট প্রমাণ রেখেছে। সুতরাং এ বিষয়ে পুনশ্চ উত্তেজনা সৃষ্টির যাতে কোনও কারণ না ঘটে, সকলের প্রতি প্রসঙ্গত সে অনুরোধ জানিয়ে রাখতে হচ্ছে এই সঙ্গে।

দপ্তর পুনর্বণ্টন

গত ১২ই নভেম্বর অবধি প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, অবশেষে হয়ত শ্রীচ্যবনই স্বরাষ্ট্র দপ্তরের গুরুভার প্রাপ্ত হবেন। শ্রীচ্যবনকে উক্ত দপ্তর দানের আগ্রহ শ্রীমতী গান্ধী পূর্বাহ্ণেই প্রকাশ করেছিলেন। পাতিল সাহেবের সংযত অনিচ্ছায় ব্যাপার-টার ওপর কিছু টালবাহানা হ'ল মাত্র। তবে যাঁরা মোরারজী ভাইয়ের জন্য হাত আঁচিয়ে খাড়া হয়ে বসেছিলেন, তাঁদের আশায় ছাই পড়ল। অবশ্য নিরাশ হওয়ার কারণ নেই, শ্রীদেশাই এখন উপ-প্রধানমন্ত্রী হওয়ার চেষ্টায় জলাঞ্জলি দেন নি।

সর্দার স্বরণ সিং সেক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা দপ্তর গ্রহণ করবেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পোর্টফোলিও বণ্টনের সমস্যা এ পর্যন্ত শিকেয় ঝুলছে।

মন্ত্রিসভা থেকে যাঁদের অপসারিত করার জন্য বিরোধী পক্ষে বারম্বার দাবি উত্থিত হয়েছে, তাঁরা কিন্তু যথাস্থানেই বহাল থেকে গেলেন।

গো-হত্যা বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে সতর্কতা

গো-হত্যা বিরোধী আন্দোলন যাতে দেশের অন্যত্র মারমূর্তি গ্রহণ না করে এজন্য সরকার যে তৎপরতা অবলম্বন করছেন তাতে সাধারণের পূর্ণ সমর্থন মিলবে সন্দেহ নেই।

কোন বিশেষ জীবের প্রতি এহেন সংস্কার রক্ষা করার স্বপক্ষে যুগোপ-যোগী সমর্থন নেই। তাছাড়া গো-জাতির এজাতীয় সংরক্ষণে দেশে যে আর্থিক বিপর্যয় দেখা দেবে এ সম্পর্কেও হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হয়েছে। বিষয়টি পূর্বেই সর্বাধিক প্রচারিত হওয়া উচিত ছিল। দুঃখের বিষয় গণতান্ত্রিক ভারতে জনমত গঠনের দায়িত্বটা একেবারেই উপলব্ধি করা হয় না। না করার কারণ হয়ত কর্তাদের ক্ষমতাদম্ভ বা ক্ষমতান্ধতা। অথচ গো-হত্যা নিবারণে কি কি অসুবিধা আছে, শ্রী এন সি চ্যাটার্জীর মতো প্রাজ্ঞ আইনবিদরা তা দেরিতে প্রকাশ করায় প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং দুঃখবাহী মন্তব্য করেছেন। প্রশ্ন হ'ল, তবে ক্ষমতাসীন দলই বা কেন সময়ে উপযুক্ত প্রচারে নামেন নি! সেখানেও কি নন্দা কথিত অভিযোগেরই ক্রিয়া-কলাপ সক্রিয় ছিল। অর্থাৎ প্রশাসনিক ব্যুরোক্রাসীই কি প্রয়োজনীয় ব্যাপারকে চাপা দিয়ে গণ্ড-গোলকে অবাধ হওয়ার সুযোগ দিচ্ছে। যদি তাও হয়, তবে ক্ষমতাসীন দলই বা হাত গুটিয়ে ব'সে থাকেন কেন। জনসংযোগের কোন দায়িত্বই কি সরকার গঠনের পরদিন থেকেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

বিচিত্র সরকার, বিচিত্র তার রীতি-নীতি এবং বিচিত্র এই সরকারী দল। এঁরা বিরোধী আন্দোলনের জন্য (অন্য ক্ষেত্রে নয়, কিন্তু এই প্রতিক্রিয়াশীল আন্দো-লনের ক্ষেত্রে) স্পেশাল ব্যবস্থা করেন। আন্দোলনকে অঙ্কুরে বিনাশের জন্য জনমত গঠন করেন না।

গো-হত্যা নিবারণ দেশের অর্থ-নীতিতে যে চাপ সৃষ্টি করবে তা গো-জাতি ছেড়ে মনুষ্যজাতির ঘাড়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে। কিন্তু তার তালিকা এখানে উপস্থাপিত করার স্থান নেই। (উৎসাহী জিজ্ঞাসুদের দৃষ্টি এ প্রসঙ্গে ৮ই নভেম্বরের দৈনিক বসু-মতীর প্রতি আকর্ষণ করি।)

এ প্রশ্নের সর্বদিক বিবেচনার পর এ জাতীয় আন্দোলনকে সঙ্কীর্ণ স্বার্থ-প্রণোদিত বলেই পরিহার করতে হবে, এবং এমনতর অঘটন ভবিষ্যতে যাতে পুনঃ সম্ভব না হয় তার জন্য গণশক্তিরও সক্রিয় সহায়তা দরকার। অন্যথা সুবিধে-বাদীদের হাতের মুঠোয় দেশের দুর্দিনকে ত্বরায় তুলে দেওয়া হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র :

মধ্যবর্তী নির্বাচন শেষ হলো, মানে প্রেসিডেন্ট জনসনের যে প্রতিচ্ছবি বা 'ইমেজ' ছিল নির্বাচনের ফলাফল তা বেশ খানিকটা ক্ষুণ্ণ করলো। কারণ, কি সেনেট, কি হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস কিংবা গভর্নর নির্বাচনে প্রতিটি ক্ষেত্রেই জনসনের ডেমোক্রাট দলের হার হয়েছে, উল্লেখযোগ্য জয়লাভ করেছেন রিপাবলিকান দল। বুঝতে কষ্ট হয় না, এ নির্বাচনের ফলাফল ১৯৬৮ সালের প্রেসিডেন্ট পদের নির্বাচনের ওপরও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করবে। সেই সঙ্গে প্রেসিডেন্ট জনসনও নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এ শিক্ষা লাভ করলেন যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি যে নীতি অনুসরণ করে চলেছেন সাধারণ লোক তা অনুমোদন করছেন না, কাজেই আগামী নির্বাচনে যদি দলের মান বজায় রাখতে হয়, তবে ইতিমধ্যে নীতি পাল্টাতে হবে।

সত্যি বটে এ নির্বাচন নেহাতই মধ্যবর্তীকালীন, সব আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় নি, প্রেসিডেন্ট পদে তো নয়ই। হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস-এর সব কটি ৪৩৫ আসনে সেনেটের ১০০টির মধ্যে ৩৫টি এবং ৫০টি রাজ্যের মধ্যে ৩৫টি রাজ্যের গভর্নর পদে নির্বাচন হয়েছে। সেদিক থেকে প্রেসিডেন্ট আসনের সঙ্গে এর কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক অবশ্যি নেই, কিন্তু তা হলেও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ভোটারদের, দেশবাসীর চিন্তাধারা কোন্ খাতে বইছে তার স্পষ্ট ধারণা এর মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হলো। ডেমোক্রাট দল এই ভেবে সান্ত্বনা পেতে পারেন যে, সেনেট এবং হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস—দুটো কক্ষেই তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে, কমলোই বা তাঁদের কয়েকটি আসন। অর্থাৎ সেনেটে আগে যেখানে ক্ষমতাসীন ডেমোক্রাট দলের আসনসংখ্যা ছিল ৬৮ এবার তা কমে হয়েছে ৬৪, উল্টো দিকে রিপাবলিকানদের শক্তি ৩২ থেকে ৩৬-এ বেড়েছে। আর হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস-এ রিপাবলিকানরা তাঁদের শক্তিবৃদ্ধি করেছেন ১৪০ থেকে ১৮৭ আর ডেমোক্রাটদের শক্তিহানি ঘটেছে ২৯৪ থেকে ২৪৪-এ নেমে। সেনেটের মতো গভর্নর পদেও ৩৫টি ক্ষেত্রে নির্বাচন হয়েছে, এবং এখানেও কয়েকটি 'মর্যাদার লড়াইয়ে' রিপাবলিকান দল গুরুত্বপূর্ণ আসন লাভ করেছেন।

কয়েকটি নির্বাচনকেন্দ্র ও নির্বাচনপ্রার্থীর কথা বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয়। প্রথমেই নাম করতে হয় ম্যাসাচুসেটস নির্বাচনকেন্দ্রে এডওয়ার্ড ব্রুকের। এডওয়ার্ড ব্রুক একজন নিগ্রো, এবং তাঁর নির্বাচনে আমেরিকায় একটা নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হলো এজন্যে যে, গত ৮৫ বছরের নির্বাচন ইতিহাসে এর আগে আর কোন নিগ্রো প্রার্থী সেনেটে নির্বাচিত হন নি।

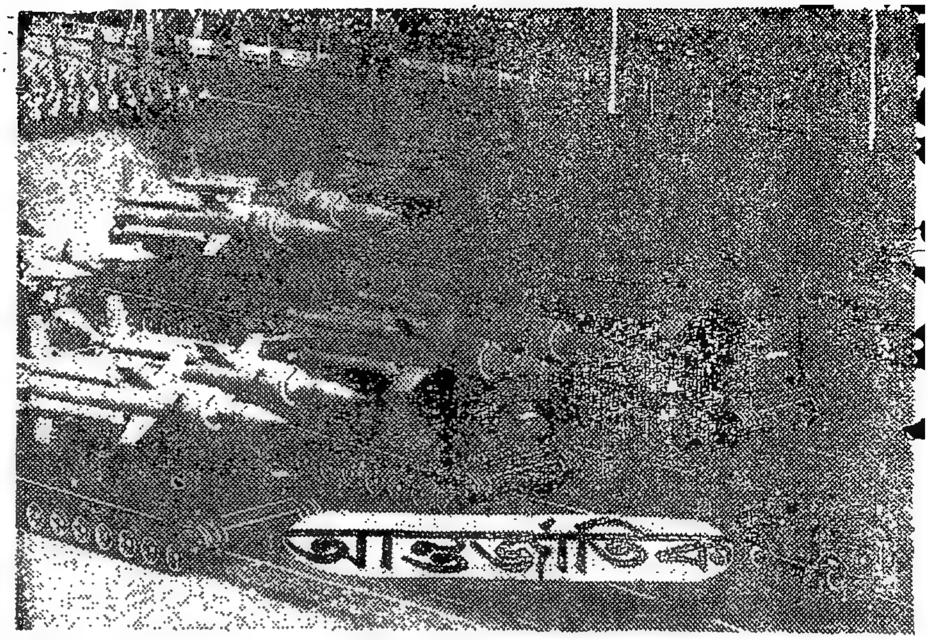

অক্টোবর বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষে মস্কো রেড স্কোয়ারে রকেট ও মিসাইলের শোভাযাত্রা

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, সবচেয়ে বেশি ভোটের ব্যবধানে যিনি জয়লাভ করেছেন, তিনি হলেন রিপাবলিকান প্রার্থী হলিউডের বিখ্যাত চিত্রতারকা রোনাল্ড রিগ্যান। ক্যালিফোর্নিয়া নির্বাচনকেন্দ্র থেকে তিনি ডেমোক্রাটদলের ঝানু রাজনীতিজ্ঞ প্যাট ব্রাউনকে হারিয়ে দিয়ে সেনেটে নির্বাচিত হয়েছেন। আলাবামার কুখ্যাত বর্ণবিদ্বেষী গভর্নর জর্জ ওয়ালেস এবার নিজে নির্বাচনে দাঁড়াতে সাহস করেন নি, তাঁর হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী মিসেস লুৎলীন ওয়ালেস। ভদ্রমহিলা জিতেছেন আলাবামা থেকে ডেমোক্রাট দলের হয়ে। মিচিগান থেকে গভর্নর জর্জ রোমনি তৃতীয়বারের মত পুনর্নির্বাচিত হলেন, এবার প্রেসিডেন্ট পদের জন্যে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা-উৎসাহ বৃদ্ধি পেলো। নিউ ইয়র্ক থেকে গভর্নর নেলসন রকফেলারও আবার নির্বাচিত হয়ে তাঁর পূর্ব জনপ্রিয়তা ফিরে পেতে চলেছেন। অর্থাৎ ৩৫টি গভর্নর আসনে ২২টিই দখল করে রিপাবলিকানরা ডেমোক্রাট দলের সামনে নতুন মূর্তিতে হাজির হয়েছে।

ব্রুক এডওয়ার্ড

১৯৬৪ সালে রিপাবলিকান দলপ্রার্থী ব্যারী গোল্ডওয়াটার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লিন্ডন জনসনের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলে দলের মর্যাদা অনেকখানি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, মধ্যবর্তী নির্বাচনে সে-মর্যাদা খানিকটা ফিরে পেয়েছেন তাঁরা। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল দেখে দক্ষিণপন্থীরই জয় হয়েছে মনে করার কোনো কারণ নেই, আর প্রেসিডেন্ট জনসনও যে রিপাবলিকান দলের শক্তিবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়েছেন, তা দেশের দক্ষিণপন্থা ঝোঁকের জন্যে নয়, ভিয়েতনাম, বর্ণবিদ্বেষ, মূল্যবৃদ্ধি, অর্থনৈতিক সংকট ইত্যাদি নীতি ও কারণেই ডেমোক্রাট দলের হার হয়েছে। কাজেই এ-ভ্রান্ত নীতির যদি এখুনি পরিবর্তন না করা হয়, তবে ১৯৬৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রাট দলকে আরো চড়া মাশুল গুণতে হতে পারে।

পশ্চিম জার্মানীঃ

এরহার্ডকে যেতেই হলো, নতুন চ্যান্সেলর হলেন কিসিংগার। না গিয়ে এরহার্ডের উপায় ছিল না, যেতে বাধ্য হয়েছেন তিনি। কারণ, বাজেটের প্রশ্নে কোয়ালিশন সরকারের অন্যতম শরিক ফ্রি ডেমোক্রাট দলের সঙ্গে যে তাঁর মতবিরোধ উপস্থিত হয়েছিল তার সুযোগ নিতে কেউ ছাড়ে নি, ফ্রি ডেমোক্রাট দল তো নয়ই, এমন কি তাঁর ক্রিশ্চান ডেমোক্রাট দলের উচ্চাকাঙ্ক্ষী নেতারাও না। ফলে বুন্দেস্টেগে (পার্লামেন্ট) সরে দাঁড়ানোর কথা লুডউইগ এরহার্ডকে ঘোষণা করতেই হলো।

দেশের বাজেট ও ঘাটতি বাজেট পূরণের পন্থা নিয়ে ক্রিশ্চান ডেমোক্রাট দলের চ্যান্সেলর এরহার্ডের সঙ্গে ফ্রি ডেমোক্রাট দলের ভাইস-চ্যান্সেলর এরিখ মেন্ডের যে মতানৈক্য হয়েছিল, তার খবর গত সপ্তাহেই দিয়েছি। মতবিরোধের ফলে যখন ফ্রি ডেমোক্রাট দলের চারজন সদস্য কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করলেন, তখনই বন্ সরকারের সংকট উপস্থিত হলো। ক্রিশ্চান ডেমোক্রেটিক দলের নেতারা চ্যান্সেলর এরহার্ডের সঙ্গে একযোগে বসে মুক্তির উপায় বা ফ্রি ডেমোক্রাট দলের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার চেষ্টা করলে ফল কী হতো বলা যায় না, কিন্তু কয়েকজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ক্রিশ্চান ডেমোক্রাট নেতা তা না করে ডঃ এরহার্ডের ওপর উল্টো চাপ সৃষ্টি করলেন। এরহার্ডের ওপর যে তাঁদের আস্থা নেই এ-কথা প্রকাশ্যে বলাবলি করতেও তাঁরা ইতস্তত করলেন না একটুও: 'Erhard governs like a motorist without a driver's licence.' এ-কথাও বললেন এরহার্ডের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুঃ 'I would sincerely welcome it if the Chancellor would assist in the naming of his successor.' সরাসরি চ্যালেঞ্জ নিক্ষেপ করে জানিয়ে দিলেনঃ 'If the Chancellor refuses to come through with an acceptable resignation statement, we'll have to call a blitz confidence vote...to show that he has no confidence in the party.' কাজেই ডঃ এরহার্ডের না গিয়ে উপায় কী?

যদিও চ্যান্সেলর পদের দিকে হাত বাড়িয়েছিলেন অনেকেই, যাঁদের মধ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী গেরহার্ড শ্রোডার, ডেপুটি দলনেতা রেনার বার্জেল, জোসেফ স্টাউস, ইউজিন গেরস্টেনমেয়ার প্রমুখ নেতৃবৃন্দই প্রধান, জর্জ কিসিংগারের নামও সে লিস্টে উঠেছিল। জয়মাল্য জুটলো কিসিংগারেরই। চ্যান্সেলর কিসিংগারের নেতৃত্বে পশ্চিম জার্মানীর কোন্ দিকে উন্নতি-অবনতি হবে না হবে, তা এখনি ভবিষ্যদ্বাণী করা শক্ত। তবে উনি যে একজন জবরদস্ত শাসক হতে চাইবেন, সেটুকু বোঝা যায় তাঁর অতীত জীবন থেকে। কিসিংগার হিটলারের আমলে নাৎসী নেতা ছিলেন, সংযোগরক্ষাকারী অফিসার ছিলেন তিনি পররাষ্ট্র বিভাগ ও গোয়েবলস-এর প্রচার দপ্তরের মধ্যে।

কিন্তু ফ্রান্সের সঙ্গে কিম্বা আমেরিকা বৃটেনের সঙ্গে পশ্চিম জার্মানীর সম্পর্কের মধ্যে কি চ্যান্সেলর কিসিংগার কোন পরিবর্তনের সূচনা করবেন? ডঃ এরহার্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নিবিড় বন্ধুত্বের সম্পর্ক রেখে চলছিলেন, ডঃ এ্যাডেন্যুয়ের তাঁকে মার্কিন-ঘেঁষা বলে নিন্দাও করতেন। বৃটেনের সঙ্গেও পশ্চিম জার্মানীর বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠ ছিল এরহার্ডের আমলে, কমন-মার্কেটে বৃটেনের পুনঃপ্রবেশের জন্যে ডঃ এরহার্ড যথেষ্ট উমেদারী করছিলেন। কিন্তু ফ্রান্সের সঙ্গে পশ্চিম জার্মানীর যেন বনিবনা হচ্ছিল না। বিরোধীদের মতে ডঃ এরহার্ডের বৈদেশিক নীতিই তাঁর পতনের মূল কারণ। তা যদি হয়, তবে নতুন চ্যান্সেলর কিসিংগার কি সেই পুরোনো নীতি অনুসরণ করে নিজেরই বিপদ ডেকে আনবেন?

সোভিয়েট ইউনিয়নঃ

বিরাট জাঁকজমক করে ৪৯তম অক্টোবর বিপ্লব-বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হলো এখানে। এ-উপলক্ষে মস্কোর রেড স্কোয়ারকে চমৎকার সাজানো হয়েছিল। এ ধরণের সমাবেশে এ-দেশে যে কর্মসূচী নেওয়া হয় ও পালন করা হয়, এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি, অর্থাৎ মিলিটারী ও অসামরিক প্যারেড থেকে শুরু করে রকেট, মিসাইল ও দূরপাল্লার রকেট শোভাযাত্রা পর্যন্ত কিছুই বাদ যায় নি।

এ-উৎসবে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধিরা—আদর্শের দিক দিয়ে যাঁরা সমধর্মী তাঁরা এবং বিরোধী যাঁরা তাঁরাও। এই ধরণের অনুষ্ঠানে যেখানে বিদেশী প্রতিনিধিরা উপস্থিত তাঁদের সামনে অস্ত্রের শোভাযাত্রা করার মানে কি? তাঁদের দেখিয়ে দেওয়া কি যে, শক্তির দিক দিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন পেছিয়ে নেই, তাকে আঘাত করলে পাল্টা আঘাত খাবার সম্ভাবনা রয়েছে—এ কথাটি? নাকি দেশবাসীর মরাল (moral) উঁচু রাখার জন্যে এ-ধারণায় যে, তাঁদের ভয় পাবার কোনো কারণ নেই, শত্রুর মোকাবিলা তাঁরা সহজেই করতে পারবেন এ-আস্থা জানানোর জন্যে? যে-কারণই এর পিছনে থাক, এ-কথা তো কেউ অস্বীকার করে না যে, পৃথিবীর দুই প্রচণ্ড শক্তিশালী দেশের মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়ন একটি।

উৎসব উপলক্ষে সোভিয়েট প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী মার্শাল ম্যালিনভস্কি এক জোরালো ভাষণ দিচ্ছিলেন। কিন্তু সে ভাষণের চোটে উপস্থিত চীনা কূটনীতিকরা সরে পড়লেন। জানি না, বক্তৃতা করতে গিয়ে মার্শাল ম্যালিনভস্কির গত মাসের চীন বিপ্লব দিবসের ঘটনার কথা মনে পড়েছিল কি না। চীন বিপ্লব দিবসের অনুষ্ঠানে চীনা নেতারা এমন কঠোরভাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিকে আক্রমণ করছিলেন যে, সংশ্লিষ্ট দেশের নিমন্ত্রিত কূটনৈতিক প্রতিনিধিরা সভাস্থল ত্যাগ করতে বাধ্য হন। মার্শাল ম্যালিনভস্কিও তাঁর বক্তৃতায় চীনা নীতির নিন্দে করেন, যা চীনা প্রতিনিধিদের পক্ষে হজম করা শক্ত হয়ে পড়ে এবং তাঁরা স্থান ত্যাগ করেন। মিঃ ম্যালিনভস্কি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে লেনিনের লেখা উদ্ধৃত করে তাঁর ভাষণে বলেছিলেন যে, দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অতীত গৌরবের যে কাহিনী রয়েছে, তাকে সমৃদ্ধশালী করাই যেখানে দরকার, সেখানে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে চীন তার বিরোধিতা করছে এবং নষ্ট করে দিচ্ছে। ম্যালিনভস্কি কমিউনিস্ট রাষ্ট্র ও পার্টিগুলির দায়িত্ব সম্পর্কে এ-কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়ে চীনের বিভেদমূলক নীতির কথাও বলেছিলেন এবং এ-হুঁশিয়ারীও দিয়েছিলেন যে, চীনের বিভেদপন্থা ও তার অবাধ্যতা সাধারণ শত্রু সাম্রাজ্যবাদ ও বিশ্বের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিরই সহায়তা করবে মাত্র।

আগের দিন অক্টোবর বিপ্লব দিবস উপলক্ষে ক্রেমলিনে অনুষ্ঠিত সভায়ও মার্শাল ম্যালিনভস্কি বলেছিলেন যে, চীনই ভিয়েতনামী সংগ্রামীদের বিপদ ঘটাচ্ছে। কারণ, ভিয়েতনামের জাতীয় মুক্তি-বাহিনীকে সর্বতোভাবে সাহায্য পাঠাবার জন্যে সোভিয়েট ইউনিয়ন সহ পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি প্রস্তুত হয়ে রয়েছে; কিন্তু চীন তার ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে সে সমরোপকরণের সাহায্য-ভাণ্ডকে যেতে দিচ্ছে না বলেই আজ ভিয়েতনামীরা মার খাচ্ছে। এতে করে চীন কার্যত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদেরই সহায়তা করছে বলে মার্শাল ম্যালিনভস্কি অভিযোগ করেছেন। একই অভিযোগ অবশ্য ইতিপূর্বে প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন এবং পার্টি নেতা ব্রেজনেভও করেছিলেন চীনের বিরুদ্ধে।

প্রত্যাশার মৃত্যু ও দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা

কৃত্তিবাস ওঝা

বাংলাদেশের মানুষের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা আর প্রত্যাশার মৃত্যু ঘটিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী ফ্রন্ট গঠনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেওয়া হয়েছে। অগণিত মানুষের শত নির্যাতন আর শহর গ্রামের শতাধিক মানুষের মৃত্যুবরণ নিষ্ফল হয়ে গেল কয়েকজন রাজনৈতিক জুয়াড়ীর বিশ্বাসঘাতকতায়। শহীদ নুরুল-আনন্দ-জব্বরের অতৃপ্ত আত্মা আজ কাঁদছে, আর অভিশম্পাত দিচ্ছে এই বিশ্বাসঘাতকদের, যারা চক্রান্ত করে আরো পাঁচ বছরের জন্য কংগ্রেসকে পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসতে সহায়তা করলো।

কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে চিরদিনই ভোট কম পেয়েছে কিন্তু আসন দখল করেছে বেশি। দেশের মানুষ বার বার কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করে বামপন্থীদের শত দৈন্য-দুর্বলতা, এমন কি অনেককে দেশপ্রেমিক নয় জেনেও শাসনক্ষমতায় বসাতে চেয়েছে। তার কারণ সকলে ভেবেছে বামপন্থীরা ক্ষমতা পেলে অন্তত আর কিছু করতে না পারুক, বেপরোয়া ও চরম দুর্নীতিপরায়ণ কিছু লোকের হাত থেকে দেশের মানুষকে রক্ষা করতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে বামপন্থীরা কখনই জনগণের মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা বোঝে নি বা বুঝেও রূপ দেবার চেষ্টা করে নি। ১৯৫২ সালের পর থেকে প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তরই দেশের মানুষ ক্রমাগত বামপন্থীদের জন্য শাসনক্ষমতা দখলের দরজা খুলে দিয়েছে। আর বামপন্থীরা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আত্মকলহে নিজেদের মগ্ন রেখে পরস্পরের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে দায়-দায়িত্ব ও জনগণের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

বামপন্থীদের শেষ বিশ্বাসঘাতকতা ঘটে গেল ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নির্বাচন ফ্রন্ট গঠনের প্রশ্নে। গত মার্চ-এপ্রিল মাসের পর থেকে খাদ্য আন্দোলনের ঢেউ থামলে নির্বাচনী হাওয়া ওঠে ও সকল দলের মধ্যে নির্বাচনী ফ্রন্ট গঠনের তৎপরতা সৃষ্টি হয়। এপ্রিল মাসে দুই বৎসর পর বাম কম্যুনিস্টরা কারাগার থেকে মুক্ত হলে তৎপরতা সুস্পষ্ট রূপ নেয়। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে সর্বাপেক্ষা জোরদার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে কংগ্রেসত্যাগী বাংলা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের নির্বাচনী প্রস্তুতিতে। বামপন্থীরা ১৯৫২ সাল থেকে নিজেদের শক্তিতে রাজ্যের কংগ্রেসকে পরাজিত করার যে চেষ্টাই করে থাকুক না কেন, সেই চেষ্টা তাদের সীমাবদ্ধ শক্তির জন্য কখনও সফল হয় নি। কিন্তু এবার বাংলা কংগ্রেসের সৃষ্টি হবার পর সর্বপ্রথম যে লক্ষণটা প্রকাশ পায় সেটা হল কংগ্রেস-বিরোধী শক্তি কংগ্রেস অপেক্ষা জোরদার হয়েছে

শ্রীঅতুল্য ঘোষ

এবং কংগ্রেস এবার সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্তও হবে বাংলা কংগ্রেসের কাছে। অতীতে ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ, ডাঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত নেতৃবৃন্দ কংগ্রেস ত্যাগ করে এলেও তাঁদের কংগ্রেস ত্যাগ ব্যক্তি-বিশেষের দলত্যাগ ছাড়া কোন তাৎপর্য সৃষ্টি করতে পারে নি। কারণ এই নেতৃবৃন্দ দলত্যাগ করে সোজা বিরোধী শিবিরে যুক্ত হয়েছিলেন, ফলে তাঁরা শুধু বিরোধী হিসাবেই কংগ্রেসের সমর্থক জনগণের কাছে পরিচিত হয়েছেন। কিন্তু বাংলা কংগ্রেস দলই সর্বপ্রথম কংগ্রেসের মূল শক্তিতে আঘাত হানে। বাংলা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের ধ্বনি ছিল যে, তাঁরা কংগ্রেস-বিরোধী নন, কংগ্রেসের দুর্নীতি-বিরোধী, আর তাঁরাই হলেন আসল কংগ্রেস এবং যারা কংগ্রেস দখল করে আছে তারা হল দুর্নীতিগ্রস্ত, তাদের বিরুদ্ধেই বাংলা কংগ্রেসের জেহাদ।

একদিকে সফল খাদ্য আন্দোলন ও সুদূর গ্রাম থেকে শহরের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে অভূতপূর্ব গণ-জাগরণ ও কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাব—গত এপ্রিল-মে মাসে এমন অবস্থা সৃষ্টি করে যে, কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ নেতৃবৃন্দ জনগণের কাছে সম্পূর্ণভাবে একঘরে হয়ে পড়েন। শ্রীঅতুল্য ঘোষের মত নেতাকেও প্রাইমারী স্কুল উদ্বোধন করতে গিয়ে বেলেঘাটায় পুলিশ ভ্যানের দ্বার উদ্ঘাটন করে আত্মরক্ষা করতে হয়। শ্রীপ্রফুল্ল সেন আরামবাগে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে গিয়ে ছেলেদের তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শনের ফলে ফিরে আসেন, শ্রীবীজেশ সেন নিজের জমিদারী আর নির্বাচনী এলাকায় চরম নির্যাতন ভোগ করে কালোমুখে ফিরে আসেন। এইখানেই শেষ নয়; অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, শ্রীঅতুল্য ঘোষ ও শ্রীপ্রফুল্ল সেন যেখানে যান, সেখানেই কাল পতাকা আর বিক্ষুব্ধ মানুষ তাঁদের যাত্রা নাস্তি করে দেয়। শ্রীঅতুল্য ঘোষ নিউ বারাকপুরে পৌরসভার উদ্বোধন করতে গিয়ে আবার পুলিশের গাড়িতে আত্মরক্ষা করে ফিরে আসেন আর শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, দিনাজপুর যেখানে যান সেখানে হরতাল হয়, গুলী চলে, লোক মরে এবং মুখ্যমন্ত্রীকে ফিরে আসতে হয়। সমগ্র রাজ্যে তখন অগ্নিগর্ভ অবস্থা—যেখানে লক্ষ লক্ষ সরকারী কর্মচারী সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য লড়াইয়ে নেমে পড়ে, যেখানে সর্বশ্রেণীর শিক্ষক-অধ্যাপক বিদ্যায়তন ছেড়ে রাজপথে নেমে সরকারের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে বসে, যেখানে স্বর্ণশিল্পী; মিষ্টান্ন কর্মচারী সহ সকল শ্রেণীর ছোট বড় ব্যবসায়ী সরকার-বিরোধী শিবিরে নিজেদের সৈনিক হিসাবে নাম লেখায়, যেখানে ছাত্র-যুবক-কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত মানুষ সভা শোভাযাত্রা, অনশন,

হরতাল, ধর্মঘট করে সরকারের প্রতি অনাস্থা জানায়। ঠিক এই পরিবেশে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা মত বামপন্থীরা বসেন রাজ্যে বিকল্প সরকার গঠনের শপথ নিয়ে কংগ্রেসকে পরাজিত করার প্রতিজ্ঞায় বামপন্থী ফ্রন্ট গঠনের উদ্যোগে।

পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বাম কম্যুনিস্ট পার্টি সর্ববৃহৎ দল এবং তাদের সম্পর্কে গত পাঁচ বৎসর নানা কৌতূহল সৃষ্টি হয় জনমনে। জেল থেকে বেরুবার পর বাম দলের রাজ্য কমিটির প্রথম বৈঠক বসে সার্কুলার রোডে কলিকাতা জেলা কমিটির দপ্তরে। বৈঠক সুরুর দিনই বাম কম্যুনিস্ট দলের রাজ্য কমিটির সম্পাদক শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত দুটি দৈনিক সংবাদপত্রে যে ভাষ্য দেন আজ কয়েক মাস পরে দেখা যাচ্ছে সেইদিনের সেই ভাষ্য নির্মম সত্য ছিল। শ্রীদাশগুপ্ত বলেছিলেন—বাম কম্যুনিস্ট দল আগামী নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বিকল্প সরকার গঠনের ধ্বনি দেবে না, সংযুক্ত ফ্রন্ট করবে না, আর ডাঙ্গেপন্থী-দের ১৯৬২ সালের নির্বাচনের ভিত্তিতে একটি আসনও দেবে না। উক্ত কথাগুলি যে কত সত্য ও আন্তরিক ছিল সময়ের ব্যব-ধানে তা প্রমাণিত হয়েছে আর দিনে দিনে চক্র ও চক্রান্তে বাম কম্যুনিস্ট পার্টি তাদের দলের সম্পাদকের বক্তব্য অক্ষরে অক্ষরে রক্ষা করছে—। বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রত্যাশার মৃত্যু সুরু হয় এই দিন থেকে আর পর্বে পর্বে শেষ হয় গত ৯ই নভেম্বর। আর এই শেষ হবার দিন-লিপি ও চিত্র পরম উপভোগ্য ও রোমাঞ্চকর। এই চিত্রে দেখা যাবে দেশের মানুষ মনেপ্রাণে কি চেয়েছিল আর বাম-পন্থী দলগুলি এবং তাদের মধ্যে প্রধান দল বাম কম্যুনিস্ট পার্টি কিভাবে রাজ্যং ভাতে ছাই ঢেলে দিয়েছে।

ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ

২৪শে জুন বাংলা কংগ্রেস এবং কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতার আলোচনার শুরু হয়, আর ৯ই নভেম্বর ১৩টি বামপন্থী দলের বৈঠকে রাজ্যে বামফ্রন্ট গঠনের সম্ভাবনা লুপ্ত হয়। প্রায় ছ'মাস আলোচনায় প্রত্যেক দলের সঙ্গে প্রত্যেক দলই কম-পক্ষে পাঁচবার করে আলোচনা-বৈঠকে বসেছে। আর এই বৈঠকগুলি ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে ৩০শে আগস্ট ১৩টি পার্টির এক যুক্ত ইস্তাহারে রূপ নেয়। এই যুক্ত ইস্তাহারে রাজ্যের ১৩টি বামপন্থী দলের নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেন যে, রাজ্যে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেবার উদ্দেশ্যে এবং কংগ্রেসকে পরাজিত করবার জন্য তাঁরা সকলে একযোগে কাজ করবেন ও রাজ্যে কংগ্রেসকে পরাজিত করে বিকল্প সরকার গঠন করবেন। মূলত ১৩ দলের এই বৈঠকের ইস্তাহারটি জনগণের মনের কথাটিই যথাসময়ে প্রকাশ করে ও অপরিমিত আশা ও উৎসাহের সৃষ্টি করে। ৩০শে আগস্টের বৈঠকে সর্ব-প্রথম ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বামপন্থী দলের বৈঠকে উপস্থিত থাকেন। অবশ্য ডঃ ঘোষ ইতিপূর্বে অভয় আশ্রমে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আগামী নির্বাচনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে-ছিলেন। বামপন্থী দলগুলি যখন পরস্পরের সঙ্গে আলোচনায় রাজ্যে বাম ফ্রন্ট গঠনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল করে তুল-ছিলেন, তখন কংগ্রেস শিবির থেকে দলে দলে সদস্যদের কংগ্রেস ত্যাগ এক নূতন পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে। অক্টোবর মাসে রাজ্য বিধানসভা অল্প কয়েকদিনের জন্য চালু হলে গড়ে প্রত্যহ একজন করে সদস্য কংগ্রেস ত্যাগ করে বাংলা কংগ্রেসে যোগ-দান করে। তাই একদিকে কংগ্রেসে ভাঙন, অপরদিকে বামপন্থীদের ঐক্য প্রচেষ্টা দুই মিলিয়ে রাজ্যের জনমনে আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসের নিশ্চিত পরাজয় সম্পর্কে একটি ইমেজ গড়ে ওঠে। কংগ্রেস শিবিরেও এই একই সময়ে কিছুটা কম্পনের ভাব লক্ষ্য করা যায়। সর্বত্র কংগ্রেসকর্মীরা, এমন কি রাজ্য কংগ্রেসের মন্ত্রী ও নেতারা পর্যন্ত বাম ঐক্যের সম্ভাবনার সম্পর্কে কিছু নেতিবাচক কথা বলতে শুরু করেন। কেউ কেউ নরম-সুরে বলেন, না না, কংগ্রেস হারবে না, তবে আসন কমে যাবে মাত্র; কেউ বলেন, কংগ্রেস একক দল হিসাবে নিশ্চয়ই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবে। আবার স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন থেকে আরম্ভ করে, ছোট-বড় সকলে রাজ্যে কংগ্রেস পরাজিত হলে এবং বামেরা ক্ষমতা পেলে কি ভয়ংকর অবস্থা হবে, সেই কাল্পনিক চিত্রও জনগণের সামনে তুলে ধরেন। এই একই সময়ে দিল্লীর ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক ওপিনিয়ন তাঁদের গ্যালপ পোলের মাধ্যমে দেখায় যে, পশ্চিমবঙ্গে যে কংগ্রেস জানুয়ারী মাসে শতকরা ৬০ ভোট পেয়েছিল, জুন মাসে সে-ই কংগ্রেস মাত্র শতকরা ২৬ ভোট পেয়েছে। বিভিন্ন গোয়েন্দা দপ্তরের—যথা সি-বি-আই, সি-আই-এ নামেও কিছু খবর বেরোয় যে, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস নিশ্চিতভাবে পরাজিত হবে। কিন্তু এত ঘটনার মধ্যে শ্রীঅতুল্য ঘোষ কিন্তু পরম নিশ্চিন্তে ছিলেন এবং মাস দুয়েক আগে নিশ্চিন্তে একটি ঘোষণাও করেছিলেন রাজধানী দিল্লীতে। কংগ্রেস দলের এক সভায় সেদিন তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলে-ছিলেন—আগামী নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস জয়যুক্ত হবেই, আর বামপন্থীদের ঐক্য কোনক্রমে হবে না। সেইদিন হয়তো শ্রীঘোষের কথা অনেকে আজগুবি বলে মনে করেছিলেন, কিন্তু সময়ের পরীক্ষায় দেখা গেল, শ্রীঘোষ যেকথা বলেছিলেন, সেই কথাই অক্ষরে অক্ষরে সত্য। শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত বলেছিলেন তথাকথিত বাম-ফ্রন্ট হবে না, ডাঙ্গেপন্থীদের আসন দেওয়া হবে না, আর শ্রীঅতুল্য ঘোষও বলেছিলেন, বামপন্থী ঐক্য হবে না বা বামফ্রন্ট হবে না—দুটো কথাই সত্য প্রমা-ণিত হয়েছে। এইবার সেই সত্যের ইতিহাস কোন্ পথে সৃষ্টি হয়েছে দেখা যাক।

শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত

(ক্রমশঃ)

—এই আমার হাতটা ধর না!

রাধার ভয় পাওয়া দেখে হাসছিল সুমন মনে মনে। শহরের আলো ঝলমল পথে এই মেয়েরই সাহস দেখা গিয়েছিল কত। এই অন্ধকারের মধ্যে বাড়ি ফেরার প্রস্তাবে সায় দিয়েছিল রাধাই। সুমন একটা রাত থাকার জায়গা খুঁজে নিতে পারত একটু চেষ্টা করলেই। ওর এক মাসির বাড়ি এই ব্যাদরাপাড়ার গলির মধ্যে। যাতায়াত না থাকলেও বোনপো আর তার নতুন বৌকে পেলে খুশিই হতো বুড়ি। কত আদরেই না রাখত রাতটুকু।

—না, না, কোথাও থাকব না, মা ভাববে! বলবে বৌ-এর ধিঙ্গিপনা দেখ! বিয়ে হয়ে আসার সংগে সংগেই স্বাধীন! থাকবি না হয় থাক, একটু বলে যেতে হয়তো! সারারাত ভেবে মরি!

কথাটা সুমনেরও মনে ধরেছিল। শুধু রাধাকে বকবে না। তাকেও। বলবে—বৌটা না হয় ছেলেমানুষ, তোর তো বয়েস হয়েছে! মায়ের কথাটা ভাবতে নেই! মাসির বাড়ি থাবি সে তো আনন্দের কথা! বলে যেতে হয়। কেন, বলে গেলে নিষেধ করতাম নাকি!

দরকার বোধ করে নি শেষ পর্যন্ত ঝামেলার। কতটুকুই বা পথ। রেল-লাইন ধরে এই রাত্রে বাড়ি গিয়েছে অন্তত দশ-বিশ বার। শিবের বিয়ে দেখে বাড়ি ফিরেছে বহুবার।

—এই ধর না আমাকে! কিছুছু দেখছি না! নিজের হাতটাও দেখতে পাচ্ছি না!

কাছে এল সুমন। আসলে ভয় পেয়েছে রাধা। এইরকম গভীর রাত্রে সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্য দিয়ে যাওয়া দূরের কথা কল্পনাও করে নি। আজ শহরে সিনেমা দেখতে এসে এই কান্ড। একেবারে পিছনের বেশি দামের সিটে বসে খুব আরামেই ছবি দেখেছে তারা। ছবি দেখার আনন্দে মনে ছিল না বাইরের কথা। ছবিঘরের অন্ধকারের মধ্যে ছিল নায়ক-নায়িকার মন আলো করা রঙ্গ-রসের নির্মল ফোয়ারা। যতক্ষণ ছবি দেখেছে আঁধারের মধ্যেও আলো জ্বলেছে মনে। বাইরে আসতেই সেই আলোটা নিভে গিয়ে মনটা ভয়ের অন্ধকারে ভরে উঠেছে।

—চল, মাসির বাড়ি যাই! এ রাত্রে বাড়ি গিয়ে কাজ নেই।

সুমনের কথায় মাথা নেড়েছে রাধা। না, না, মা কি ভাববে! চল না হেঁটেই চলে যাই!

—যেতে পারবে তো!

—খুব পারব!

—ভয় করবে না!

—ভয় করবে কেন! তুমি তো আছ সংগে!

পকেটে হাত দিয়ে দেখেছে সুমন চা দু'কাপ খাওয়া চলাতে পারে। অনেক কষ্টে জমিয়েছিল পাঁচটা টাকা। তিন টাকায় সিনেমার টিকিটে আরাম করে দেখা হবে দু'জনার। দু' টাকা যাওয়া-আসার ট্রেন ভাড়া ও খাওয়া। কিন্তু কে জানত দু' টাকা চার আনার কমে টিকিট পাওয়া যাবে না। ন' মাসে ছ' মাসে একদিন শহরে সিনেমা দেখতে এসে ফিরে যাওয়ার বিড়ম্বনা কম নয়। নতুন বৌকে নিয়ে সিনেমা দেখতে এসে পয়সার অভাবে ফিরে গেলে, শুধু বৌ-এর কাছে নয় অন্য লোকের সামনেও মুখ দেখানো যাবে না। বলবে—অভাব তো কি! যাব না ভাল, গেলে না দেখে ফিরব না। তাতে যা হয় হোক!

হয় নি এমন কিছুই! শুধু হেঁটে-বাড়ি ফেরা রেললাইন ধরে। শহরের আলোয় যে অন্ধকারের তীব্রতা মাপা সম্ভব হয় নি রেললাইনে পা দিয়েই তা ধরা পড়েছে আর ঐ অন্ধকার দেখে চমকে উঠেছে রাধা।

ভয়

ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়

—কি করে যাব গো বাড়ি!

নিজেরও ভয় ভয় করেছে সুমনের। তা সত্ত্বেও নিজের ভয় চাপা দিয়ে বলেছে—ভয় কি! ঠিক চলে যাব। কত রাতে এপথ দিয়ে একা একা গিয়েছি! দু'জনে যেতে পারব না!

ঢোক গিলে এদিক-ওদিক চেয়ে দুর্গা নাম জপতে জপতে পা বাড়িয়েছে। কোথাও মানুষজন দেখা যায় না। এই রাত্রে জেলা কর্ডন ভেঙে চালের চোরাকারবারি আর পুলিশ ছাড়া কেউ নেই পথে। দু'পক্ষের লুকোচুরি চলে। লুকোচুরি করে জোনাকির দল রাধার সংগে। চোখের সামনে দিয়ে উড়ে উড়ে চলে জোনাকিরা পিছনে লণ্ঠন জেলে। সে আলোয় আলোকিত হয় না পথ। শুধু অন্ধকারকে করে আরো ভয়াল আরও তীব্রতর।

—কই, কোথায় তুমি, দেখতে পাচ্ছি না যে!

—এই তো আমি!

—আঃ, ছাড়ো ছাড়ো শুধু আমার কাছে কাছে থাকতে বলেছি! আমি বলে মরছি ভয়ে উনি এলেন—

রাধাকে ছেড়ে দিয়ে আবার পথ চলার শুরু। রেললাইনের পাশে সরু প্রায়ে-হাঁটা পথ। সে পথে পাথর বিছানো কোথাও কোথাও। রেললাইনের ওপর জড়ো করা টুকরো পাথর, চলতে গেলে হোঁচট খেতে হয়। রাধার পায়ে পায়ে জড়িয়ে আসে যেন। দুবার পড়তে পড়তে সামলে নিয়েছে। শেষে বিরক্ত হয়ে বলেছে ঃ

—তুমি আমার হাত ধরে থাক!

হাত ধরেছে সুমন। হাত ধরা হয়তো পথ রোধ করা। চলার গতিকে থামিয়ে দেওয়া।

—আচ্ছা এই অন্ধকারের মধ্যে তোমার এই আনন্দ কিসে বলতো ঃ

—তোমাকে একা পেয়ে!

—আমাকে একা তুমি পাও নি কোনোদিন!

—সে পাওয়া আর আজকের পাওয়ার মধ্যে অনেক তফাৎ! বাড়িতে মনে হয় চারপাশে যেন মানুষ কিলবিল করছে, এখানে তুমি আর আমি ছাড়া কেউ নেই! মনে হচ্ছে এ পৃথিবীতে যেন আমরা দু'জন মাত্র চলেছি এই অন্ধকারে পথ হাতড়ে হাতড়ে!

—কে?

চমকে উঠেছে দু'জনেই। কর্কশ কণ্ঠ একটা হঠাৎ চারদিকের নৈঃশব্দ ভেদ করে গর্জন করে উঠেছে—কে তোমরা?

—আমরা শহর থেকে ফিরছি!

—এত রাতে! কি আছে সঙ্গে! চাল নিশ্চয়ই!

—চাল কোথায় পাব! সিনেমা দেখে ফিরছি!

তবু সন্দেহ ঘোচে না। টর্চ ফেলে মুখের ওপর। দু'জনকেই দেখে নেয়। রাধা ঘোমটা টেনে দিয়েছে চোখে টর্চ ফেলা দেখে।

ঝাড়া হাত-পা দেখে সন্দেহ গিয়েছে। শেষে উপদেশ বর্ষণ ঃ

—এত রাতে মেয়েছেলে নিয়ে আসতে আছে?

পুলিশ দেখে বুকে দুর দুর করছে রাধার। কথা বলবে কি ভয়েই বাঁচে না। এতক্ষণ মানুষ না দেখে শুধু অন্ধকারকে ভয় করছিল, এখন মানুষ দেখে ভয় বাড়লো। আবার যদি পথ আটকায়।

—রাধা!

—বল! —ঢোক গিলে কথার উত্তর দিল কোনরকমে।

—ভয় পেয়েছ না কি খুব?

—না, ভয় পাব কেন?

—চাল ধরতে বেরিয়েছে পুলিশ!

—আ মরণ পুলিশের! এত রাত করে আমরা পথ চলতেই পারছি নে বলে—

—এই রাত্তেই তো চাল পাচার করার সুবিধে!

রাধার ভয় কেটেছে। চালের কথায় সংসারের কথা মনে পড়েছে। চালের কষ্টে নিজেদের আর সেই সঙ্গে গাঁয়ের মানুষের দুঃখের চেহারা স্মরণ করে ভয় গিয়ে রাগ

হয়েছে। বলেছে—যাদের সুবিধে তাদের ধরুক! তা' পারবে না! কোথায় কে দু' সের পাঁচ সের নিয়ে যাচ্ছে সেই দিকে নজর!

—এ রাজত্বে তাই তো হবে! বড় চোরাকারবারীরা তো ওদের বন্ধু! গরীবকে মারতে যত আইন!

হন হন করে পথ চলেছে রাধা। পাথরে হোঁচট খাচ্ছে বটে কিন্তু মনটা ভয় থেকে দৈনন্দিন জীবনের সঙ্কটের গল্পে ঘুরপাক খাচ্ছে।

গাঁয়ে ঢোকার আগে বনের গভীরতা বেড়েছে। এ পর্যন্ত উঁচু রেললাইন আর নিচে বনের রেখা। এখন গভীর জঙ্গল যেন ওদের মাথার ওপর দিয়ে কুঞ্জবনের শামিয়ানা তুলে ধরেছে।

—এই কোথায় তুমি! উঃ, কি অন্ধকার!

সাড়া দিল না সুমন।

—আমার হাত ধর না!

তবু নিশ্চুপ।

হঠাৎ পাশেই কোন বন থেকে শেয়াল ডেকে উঠল তারস্বরে—হুকি-হুয়া-হুয়া-হা-হা—

রাধা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল হাউ-মাউ করে। তার পরেই সুমনকে কাছে পেয়ে রাগে ভয়ে কেঁদে চেঁচিয়ে ওকে কামড়ে খিমচে যখন শান্ত হল সুমনও শান্ত হয়েছে তখন। রাধাকে গ্রামের মধ্যে ঢুকে একটু ভয় দেখাতে গিয়ে শাস্তি পেয়েছে খুব। তামাসার সময়টা বুঝতে না পেরে শিয়ালগুলো ডেকে উঠেই গোলমাল বাধিয়েছে। হাতের দুটো জায়গায় ছড়ে গিয়ে জ্বলছে। রাধার নখে ছিঁড়েছে নিশ্চয়ই! ও যে এতটা ভয় পাবে বোঝে নি। রেললাইন ধরে আসার সময় বনের মধ্যে পাতা পড়ার শব্দে চমকে উঠে তাকে চেপে ধরেছে রাধা। গাঁয়ে ঢুকে সাহস বাড়বে আশায় মজা করতে গিয়েছিল।

হঠাৎ আবারও কিসের একটা শব্দ। রাধা এবারে তার হাত ছাড়ে নি। এখন শব্দ শুনে জড়িয়ে ধরেছে ওকে!

—কে!

—তুমি কে? পাল্টা প্রশ্ন করেছে সুমন!

টর্চের আলো জ্বলেছে মুখের ওপর। পুলিশ ভেবে চাইতেই যাকে দেখেছে অবাক হয়েছে তাকে দেখে। এই গভীর রাত্রে তিনু রায় দাঁড়িয়ে তার সামনে। পিছনে গাড়ি বোঝাই চালের বস্তা! গাড়োয়ান বিনয় দাস। গাঁয়েরই চেনা লোক।

বাবু! আপনি এত রাতে!

—এই একটু - বেড়াতে আর কি! মানে—ও ধরলো, বাবু পুলিশ বড্ড হয়রানি করে—তাই আর কি!

অঞ্চল প্রধান তিনু রায়কে দেখে সাহস পেল রাধা। গাঁয়ের মানুষ শুধুই নয় একেবারে গাঁয়ের হাকিম সরকারী লোক বললেই হয়। অন্যদিকে দেশের নেতা। এতক্ষণে সাহস পাবার মতো একজন মানুষ দেখল রাধা। ওঁকে রাধা খদ্দরের ঐ এক পোশাকেই দেখেছে বরাবর। আর শুনেছে দেশের জন্যে তাঁর প্রাণমাতানো বক্তৃতা।

—ভয় করছে না রাধা!

সুমনের হাত ছেড়ে দিয়ে রাধা কি যেন ভাবতে ভাবতে চলেছে।

ভাবছে অন্য কথা। সে গ্রামেরই মেয়ে, এতটুকু বয়স থেকে দেখে আসছে। কিন্তু এমন আকাল জীবনে কখনও দেখে নি। গ্রামের মধ্যে চাল-ধানের এই আকাল, চাল থাকতেও নেই। সব চোরাবাজারে যাচ্ছে—আর সেই চোরাবাজারে পাঠাচ্ছে দেশের যারা হোমরা-চোমরা নেতা তারাই।

মনে এল কালই চাল নিয়ে চুলোচুলি বাধবে সুমনের সঙ্গে। চালের দাম দু'টাকা কিলো হওয়ার রহস্য যেন বোঝা গেল একটু!

আর ভয় লাগছে না রাধার। যে মনটা ভয়ে ভয়ে প্রতি পদে হোঁচট খাচ্ছিল সেই মনটাই কুঁচকে গেল ঘৃণায়। সিনেমার নায়কের বদলে চালের বিভীষিকা রইল মন জুড়ে।

সেলিং এজেন্টস: বেলরেক্স ইণ্ডিয়া লিমিটেড
কলিকাতা • দিল্লী • আমেদাবাদ
হেড অফিস: ১০, প্রিন্সেপ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

অস্ট্রেলিয়া থেকে লিখছি

সুরেশচন্দ্র সাহা

॥ আজকের অস্ট্রেলিয়া ॥

লিওনার্ড বিলের সঙ্গে কথা হচ্ছিল মারে উপত্যকায় যাওয়া নিয়ে। সেখানে ওর বোনের বাড়ি। ফোনে কথা বলে বিল বন্দোবস্ত পাকা করে ফেলেছিল যে সপ্তাহ শেষের দুইদিন আমরা তার বোনের বাড়িতে থাকব, মারে নদীর হাওয়া খাব, আর আঙুর ফলের রস গিলব। ফোর্ডের ফ্যালিকন গাড়িটি পরিষ্কার করতে করতে বিল বলল—তোমার মত এলোপাতাড়ি ঘুরে বেড়াবার পক্ষে এই গাড়িই হচ্ছে আদর্শ। অস্ট্রেলিয়াতে আজ কিন্তু বেশি কাটছে হোল্ডেনের স্টেশন ওয়াগন। সপ্তাহ শেষের দুইদিনে বৌ নিয়ে বাইরে গেলে আর হোটেলে থাকবার দরকার নেই; গাড়ির পেছনে দিব্যি টান টান হয়ে শোওয়া যায়। বিল অবশ্য বৌয়ের জন্য কিনেছে হোল্ডেন।

এডিলেডে শ্রমিকের সর্দার লিওনার্ড বিল অন্য অনেক অস্ট্রেলিয়ানের চাইতে ভিন্ন ধরণের লোক। লেখাপড়ার দিকে দারুণ ঝোঁক। বড় ছেলে তার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী। এখন বড় অফিসার। ছোট ছেলে আর মেয়েটির এখনও ছাত্রদশা কাটে নি। মাত্র তের বছর বয়সের পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি লম্বা মেয়েটির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বিল বলল—বারবারা হবে হাওয়াই জাহাজের পাইলট।

বিল অনেকক্ষণ ধরে আলাপ করল, বাড়ি গাড়ি ফুলের বাগান কত কিছু দেখাল। ওর বোনের বাড়িতে এবার আমাদের না গেলেই যে চলবে না সে কথা স্মরণ করিয়ে দিল। অথচ বিলের সঙ্গে আমার পরিচয় দুই দিনের বই ত' নয়। এই হচ্ছে খাঁটি অস্ট্রেলিয়ান। বাইরে থেকে বুঝবার উপায় নেই এরা এত সহজে বন্ধু হয়, এত কম পরিচয়ে এত বেশি কাজে লাগে! —অস্ট্রেলিয়ার অন্তরে প্রবেশ না করতে পারলে এরাই আবার কালো লোককে মোটে আমল দেয় না।

বিলের পূর্বপুরুষ এসেছিল আয়র্ল্যান্ড থেকে। অস্ট্রেলিয়ার অনেকের মতই বিলের মনে মনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে একটু আক্রোশের ভাব আছে। অস্ট্রেলিয়ার মানুষরা ইংরেজদের বলে পমি। বিল কথায় কথায় বলছিল—ঐ হোথায় পমিরা থাকে, পমিরা এহ বলেছে, পমিরা তা করেছে ইত্যাদি। সিডনির ট্যাক্সিতে নিশ্চিন্তে উঠে বসেছে সদ্য ইংলণ্ড-আগত ইংরেজ। একটু আলাপের সূত্রপাত হলেই ট্যাক্সি ড্রাইভার তাকে নির্ঘাৎ শোনাবে—পমিজ আর নট পপুলার হিয়ার। অস্ট্রেলিয়ার সর্বত্র একটি চালু গল্প হল এই—আমাদের পাড়ায় এক ছোকরা ছিল। দুদিনও হয় নি ইংলণ্ড থেকে এসেছে। কি বলব মশাই—এসেই গুরুগিরি শুরু—কোন্‌টা করা উচিত, কোন্‌টা উচিত নয় আমাদের শেখাতে যাচ্ছিল। যত সব পমির দল!

অস্ট্রেলিয়ানদের ধমনীতে আছে ইউরোপীয় বহু জাতির রক্ত। তবু এরা এমন একটি জীবনছন্দ বেছে নিয়েছে যা একান্তভাবে এদের নিজস্ব। এরা কেতা কানুন ফরম্যালিটির বড় ধার ধারে না, কোট টাই হ্যাটে টিপটপ হয়ে থাকাও অপছন্দ করে, গরম একটু বেশি হলে পায়ের জুতোটি পর্যন্ত খুলে রাখে। বিলেতের ট্রেনে শীতের মধ্যে লোকে খুব করে কোট টাই এঁটে একাই একশর মত হামবড়া ভাব নিয়ে বসে পত্রিকা খুলে পড়ে বা পড়ার ভান করে—পাছে অন্যের সঙ্গে কথা বলতে হয়। অস্ট্রেলিয়াতে এমন কথা অকল্পনীয়।

অস্ট্রেলিয়াতে আমেরিকানদের জনপ্রিয়তা একটু বেশি। এরা হামেশা আমেরিকার সঙ্গে বৃটেনের তুলনা করে বলে—আমেরিকার দক্ষিণ অঞ্চলের অধিবাসীদের পূর্বপুরুষরা এসেছিল ইংলণ্ড থেকে। তাই আজও সেখানে দলাদলি ভেদাভেদের শেষ নেই। সে তুলনায় উত্তরের লোকদের পূর্বপুরুষরা ইউরোপের নানা অঞ্চল থেকে এসেছিল বলেই উত্তর অঞ্চলে ভেদাভেদ বর্ণবিদ্বেষ অনেক কম। অস্ট্রেলিয়া আমেরিকানদের মত বার জাতির বংশধর বলে এরা অন্ধ সংস্কার মুক্ত—অন্তত আজকের অস্ট্রেলিয়ানরা বিশ্ববাসীকে এই ধরণাগুলি দিতে চায়। এরা নিজেদের জীবনছন্দে আমেরিকার সুর কল্পনা করতে ভালবাসে। আজ আবার আমেরিকার মত এখানে ডলার-মুদ্রা প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে পাউণ্ড স্টার্লিঙের কলোনিয়াল প্রেতছায়াকে গলা ধাক্কা দিয়ে বিদায় করে দেওয়া হল।

স্যার রবার্ট মেনজিসের যুগ পর্যন্ত লণ্ডনের গৌরব, লণ্ডনের জৌলুস কিছু সংখ্যক বৃটিশ ভক্তের চোখ ধাঁধিয়ে রেখেছিল। সরকারী লক্ষ্য ছিল লণ্ডনে—হাজার হাজার মাইল দূরে বাস করেও সরকারী অনুগ্রহপুষ্ট লোকেরা বৃটেনদের উত্তরপুরুষ বলে নিজেদের কল্পনা করতে ভালবাসত। যেন তারা বৃটনীয়ার প্রশান্ত-মহাসাগরীয় সংস্করণ মাত্র। এখন কিন্তু সবাই জোরের সঙ্গে বলছে—আমরা অস্ট্রেলিয়ান।

আসলে দীর্ঘ তিরিশ বছর রাজনৈতিক জীবনের পর মেনজিসের স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ায় নতুন যুগের অভিক্ষেপ। ইংলণ্ডের রাজতন্ত্রের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করার কথা যে মেনজিস-যুগে কল্পনা করা যেত না, আজ সেখানে ডলার-যুগের প্রবর্তন থেকে এমন একটি মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে বৃটিশ-রাজের সম্পর্ক-মুক্ত প্রজাতন্ত্রের যুগ আর যেন দূরে নয়। হয়ত তেমন যুগ খাস বৃটেনেও আর অকল্পনীয় নয়— কবে ফেল্ট-টুপি-পরা ছাতা-হাতে বুড়ো-মত এক বৃটেনকে ইংলণ্ডবাসীরা যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করে বসবে কে জানে!

টাউন্সভিল থেকে টাসমেনিয়া, সিড্‌নি থেকে ফ্রিম্যান্টেলে—সর্বত্র অস্ট্রেলিয়ানরা ইংরেজী বলে প্রায় একই উচ্চারণে; ইংলণ্ডের ইয়র্কশায়ার লিঙ্কনশায়ারের উচ্চারণ-পার্থক্য, অথবা বাংলার নদে-মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক টানের বিভিন্নতা অস্ট্রেলিয়ার দুই-তিন হাজার মাইলের ব্যবধানেও গড়ে ওঠে নি। তাই উচ্চারণের যে গুণ, যে দোষ দেখা যায় ফ্রিম্যাণ্টেলে, দুই হাজার মাইল দূরের সিডনিতেও সেই একই বৈশিষ্ট্য বর্তমান। ফ্রিম্যাণ্টেলের ট্যাক্সিতে বসলেও ট্যাক্সিওয়ালা বলবে—কেম হিয়ার টু ডাই অর্থাৎ টু-ডে? সিড্‌নিতেও সেই একই প্রশ্ন—কেম হিয়ার টু ডাই? রহস্য করে অনেকে জবাব দেয়—নো, কেম হিয়ার টু লিভ্ মেট!

অস্ট্রেলিয়ানদের সংসার-জীবনটা কিন্তু দিন দিন অত্যন্ত স্ব-কেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে। এরা স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আপন আপন গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ; বাইরে আর পাঁচটি দেশে কি হচ্ছে তা নিয়ে কারও বেশি মাথাব্যথা নেই। এমন কি পাশের বাড়ি সম্পর্কেও

সবাই যেন নাবকার। পাশের বাড়ির কথা উঠলে বলে—সম্পর্কটা না থাকাই ত' ভাল। বেশি মাখামাখিতে প্রতিবেশিত্ব নষ্ট হয়।

স্বচ্ছন্দতার দেশ অস্ট্রেলিয়া। সবাই রোজগার করছে, খাচ্ছে দাচ্ছে, যখন খুশি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ছে, আর প্রচুর গাড়ি দুর্ঘটনা করছে। ভিক্টোরিয়া রাজ্যে দুর্ঘটনার হার নাকি পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি। ছুটির দিনে সবাই ছোটে মাঠময় গ্রামাঞ্চলের দিকে, নয়ত সমুদ্রসৈকতে। অথচ গ্রাম বলতে ত' তেমন কিছু নেই অস্ট্রেলিয়াতে।

পোর্টপিরি একটি ছোট জায়গা। অধিবাসীদের দেখলে কিন্তু মনে হয় তারা যেন জলের উপর তেলের মত ভাসছে। আবার পঞ্চাশ মাইল দূরের ওয়ালারুর লোক সংখ্যা দুই হাজার। চার পাশের ফার্ম থেকে গম আমদানি হয়ে এইখান দিয়ে বিশ্বের বাজারে চালান হয়। জাহাজ-ঘাটায় কাজ করা ছাড়া অধিবাসীদের অন্য কোন জীবিকা নেই। এখানেও শহরের মত প্ল্যান করা রাস্তাঘাট। প্রতি বাড়ির লনে লনে ফুলের বাগান। সামনে গাড়ি। বাড়িতে বাড়িতে টেলিভিশন। আমাদের গ্রাম দেশের মত পাশের বাড়ির বৈঠকখানায় তাসপেটা, এ বাড়ির গিন্নীর ও বাড়ি থেকে কিছু কর্জ আনা, আলাপ করতে গিয়ে দু' ঘণ্টা কাটিয়ে একেবারে হাঁড়ির খবর নিয়ে বাড়ি ফেরা—এ সবের বালাই নেই। এদের মত হল, পাশের বাড়ির সঙ্গে বন্ধুতা করলেই শত্রুতায় দাঁড়াবে। এইজন্যই মাত্র দুই হাজার লোকের জন-পদেও প্রতিবেশিত্ব বলে কিছু নেই।

অস্ট্রেলিয়াতে গীর্জায় গিয়ে ধর্ম করার মত লোকের সংখ্যা পৃথিবীর অন্য দেশের মতই কমের দিকে, যদিও শতকরা ৬০ জন ক্যাথলিক লোক নিয়মিত উপাসনা করে। তবে যেখানে অভাব নেই, রোগ কম, অস্বাস্থ্য অল্প, সেখানে লোকে ভগবানকে ডাকবেই বা কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে? হে ভগবান, চাকুরি দাও, রোগটা সারাও, মাদুলিটি ভাল কাজ করুক—ইত্যাদি রকমের প্রার্থনার সুযোগ কোথায়? তাই বলে অস্ট্রেলিয়ানরা অধার্মিক বা অসাধু নয়। কালোবাজারে খাদ্য পাচার করে এরা পুজোর মন্দির গড়ে না, চাকুরিতে ঘুষ খেয়ে বাড়িতে গণক ঠাকুর পোষে না, কালীপুজো, শনিপুজো করে না। স্নেহময়ী মাতা, কর্তব্যপরায়ণ পিতা বা প্রেমাসক্ত স্বামী আমাদের তুলনায় অস্ট্রেলিয়াতে কম নয়।

বিলেতের মত লম্বা এক ফ্ল্যাটে পঁচিশটি পরিবার বাস না করে শতকরা আশীজন লোক বাস করে যার যার আলাদা বাড়িতে। এক টুকরা নিজস্ব জমিতে তৈরি করা বাড়ি। যে ব্যক্তি শ্রমিকের কাজ করে তারও একটি ব্যক্তিগত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আছে; পাঁচ বছরে নিজের বাড়ি, তারপর গাড়ি চাই। গাড়ি বাড়ি না হলে নবদম্পতীরা অনেকেই সন্তান কামনা করে না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজনে এরা ইউরোপ থেকে লোক আনছে, অথচ নিজেদের পরিবারে পাইকারী হারে সন্তানের জন্ম না দিয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ করছে। আমাদের বাড়ি নেই, গাড়ি নেই, খাদ্য নেই—তবু ফি বছর সন্তান হওয়ার কামাই নেই।

অস্ট্রেলিয়াতে সুপরিকল্পিতভাবে হোয়াইট অস্ট্রেলিয়া পলিসি অনুসরণ করা হচ্ছে বলে বিস্তর অভিযোগ শোনা যায়। আমেরিকাতেও শাদা-কালোর সমস্যা আছে। পার্থক্যটা এই, সেখানে কালো লোক থাকার জন্য বর্ণবৈষম্য চলছে; অস্ট্রেলিয়াতে তাদের আসতে না দিয়ে বর্ণবিদ্বেষ চালানো হচ্ছে। আমেরিকায় বর্ণবিদ্বেষের অনুমোদন করে শাদা চামড়ার জনসাধারণ—সরকার অপেক্ষাকৃত সহানুভূতিশীল। অস্ট্রেলিয়ার জনসাধারণ কালো রঙের বহিরাগতদের স্বাগত জানাতে চায়; সরকার তেমন পক্ষপাতী নন। সরকারী নীতি হল দেশটাকে নিভাঁজ শাদা রাখা, যাতে ভবিষ্যতে আমেরিকার মত শাদা-কালোর সম্ভাব্য সংঘর্ষ এড়ানো যায়। কালো লোক আমদানির সুযোগ থাকলেই ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি কালো শ্রমিক নিয়োগ করে অল্প পয়সায় বেশি লাভবান হওয়ার সুযোগ পাবে। ফলে যে সব শ্বেতাঙ্গ শ্রমিক আজ রোজ পঞ্চাশ টাকা মজুরী পায় তাদের সে-পথ হবে রুদ্ধ। অর্থাৎ দেশে ধনবৃদ্ধির আশীর্বাদ সকল স্তরের লোক সমান হারে লাভ করবে না। ধনীদের আরও ধনবৃদ্ধি হবে, ধনী-দরিদ্রের দুস্তর প্রভেদ আরও বাড়বে, আর সেই পুঞ্জিত অসাম্যের মধ্যে শোনা যাবে সাম্য-বাদের জয়ধ্বনি। তাছাড়া ভবিষ্যতে আমেরিকার মত একটি শাদা-কালোর যুদ্ধক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়াও অসম্ভব নয়। আজ কিন্তু এই সরকারী মতের পরিবর্তন সূচনা হয়েছে ভিয়েতনামের দিকে তাকিয়ে। আজ যেন সরকারী কর্তারাও বলতে চান—কালা-ধলা ভাই-ভাই, এশিয়া-অস্ট্রেলিয়া ভাই-ভাই।

মনে হচ্ছে কোন দিক দিয়েই যেন কোথাও শান্তি নেই। আগামী পঁচিশ বছরে হয়ত পৃথিবীর বর্তমান ধনশালী দেশগুলি আরও ধনী হবে, গরিব দেশের দারিদ্র্য আরও বাড়বে। এদিকে কলের ব্যবহার বাড়তে বাড়তে হাতে করার মত কাজ থাকবে অনেক কম। তখন অকেজো মস্তিষ্ক হবে শুধু শয়তানের কারখানা। যেদেশে লোকের হাতে অঢেল খাদ্যবস্তু থাকবে, অ-কাজের সময় হয়ত তারা খেয়ে খেয়েই কাটাবে। স্বভাবতই খাওয়ার পরিমাণ বাড়বে, আর বাড়বে যৌন সম্ভোগ-স্পৃহা, তাসপাশা জুয়োখেলার নেশা। পর-চর্চার অভ্যাস। সুতরাং কোথায় শান্তি অনাগত ভবিষ্যতের অস্ট্রেলিয়ায়, ঐশ্বর্যের আমেরিকায়, দীনের হতে দীন এশিয়ায়?

ভারতবর্ষের মত দেশে আমাদের জীবন আবশ্যকীয় নিরাপত্তায় তত সুরক্ষিত নয়; মেয়েদের ত' নয়ই। যে ছেলে ভাল রোজগার করে বিয়ের বাজারে তার আজও আদর আছে; তার আর্থিক নিরা-পত্তায় স্ত্রীর সাংসারিক জীবনে অনিশ্চয়তা-বোধ অনেক কম। এই অবস্থা চলতে থাকলে পুরুষের প্রতি মেয়েদের মনের টান কমতি হওয়ার আশঙ্কা নেই। অস্ট্রেলিয়ার মত দেশে মেয়েদের আর্থিক নিরাপত্তা পুরুষের তুলনায় কিছু মাত্র কম নয়। তাই সেখানে নারী-পুরুষের মধ্যে সেক্‌স্ ছাড়া আরও কিছু যে থাকতে পারে তেমন ধারণা ক্রমশ অদৃশ্য হচ্ছে। বিয়ে না করেও ত' দিব্যি চলে যায়—খাওয়া পরা বিলাস ব্যসনের ত' কমতি নেই।

বিবাহিত জীবনের কর্মবিভাগ আজ নতুন করে ঢালাই করা হয়েছে অস্ট্রে-লিয়াতে। রবিবারের ছুটির দিনে স্ত্রী আর স্বামীর আগে বিছানা ছেড়ে উঠে প্রাতরাশের আয়োজনে তৎপর হয় না। অনেকটা মানবতার খাতিরে স্বামী আগে স্ত্রীকে বাড়ির কাজে সাহায্য করত। এখন তার মধ্যে এসেছে বাধ্যবাধকতা।

৩ মাসের জন্য বিনামূল্যে উপহার

স্ত্রীলোকের সৌন্দর্যে, কাশ্মীর আর্ট শাড়ী। সর্বাধুনিক মনোরম ডিজাইন এবং রং লইয়া মরশুমের নূতন নূতন মাল আসিয়াছে। আমাদের কাছে কেবলমাত্র বড় সাইজের কাপড় পাওয়া যায়। ১টি ডিল্যুক্স শাড়ীর মূল্য ১১৲ টাকা; ২টি শাড়ী ২০৲ টাকা; ৩টি ২৮৲ টাকা; ৪টি ৩৬৲ টাকা। দুইটি বা তদধিক শাড়ীর অর্ডারের সহিত বিনামূল্যে ব্লাউজ পীস। পোস্ট পার্শেল যোগে অর্ডারের মাল পাঠান হয়।

Arvind Agencies (WBC—22)
P.O. Box 1408, Delhi-6.

গৃহের অধীশ্বরী তার গৃহকর্মের শৃংখলে আশ্রিত স্বামীকে একটু একটু করে বেঁধে ফেলেছে। অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে, কোন স্বামী গৃহকাজে হাত দেবে না এমন কথা ভাবতে পারে না—মুখ খুলে কিছু বলার ত উপায় নেই-ই। বাসন ধোওয়া, ইস্ত্রি করা, স্ত্রীপুত্রের জুতো পালিশ করা—কার হিম্মৎ আছে এসব না করে খোশ মেজাজে থাকার?

বিয়ের দুই বছরের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার স্বামীদের অনেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—বিয়ে ত' নয়, জীবনের মূর্তিমান বিরোধিতা। স্ত্রী এদের কাছে পার্লামেন্টের বিরোধী দলের সদস্যের মত—যার অভিসন্ধি পরিষ্কার—মুখ খোলার অর্থই বিরোধিতা করা। অথচ স্ত্রী ত' বিরোধী দলের মার্কা পরে ঘরে আসে না; তবু কেন এমন হয়? আসলে তারা রহস্যময়ী—ব্যালট বাক্সে ভোট দেওয়া মানুষের মতই!

পোর্টপিরির এলান একদিন তার মস্ত গাড়িতে আমাকে দূর দূরান্তর ঘুরিয়ে আনল, বড় হোটেলে দামী খাবার খাওয়াল, গেলাস গেলাস বীয়ার গিলে পরম তৃপ্তিতে বলল--বেস্ট ইন দি ওয়ার্ল্ড! তারপর অস্ট্রেলিয়ার উন্নতির ইতিহাস থেকে শুরু করে নিজের সংসার জীবনের অনেক কথা শোনাল। আগামী বছর যে আবার নতুন মডেলের গাড়ি কিনবে সে কথাও জানাল। এলানকে জিজ্ঞেস করলাম—তোমার স্ত্রীও কি চাকুরি করে? এলান বলল—না। তবে চাকুরি করার জন্য তার বড় সাধ। বাড়ি গাড়ি করার সময় অনেক টাকার দরকার হয়। তখন অবশ্য দু'জনের আয় যোগ করলে অনেক সুবিধা হয়। কিন্তু বাড়ি গাড়ি ত' আমার আছে। এখন ওর চাকুরির কি দরকার বল ত'? এলানের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ একমত হয়ে বললাম—কিছুমাত্র দরকার নেই।

অনেকটা সময় চলে গেছে। ঘড়ি দেখে এলান বলল—পাঁচটা বাজে। এইবার ফিরতে হবে। এলানের মুখে একটু উদ্বেগের ছায়া আছে বলে মনে হল। কারণ ছ'টায় ডিনারের আগে বাড়ি ফিরে রান্নার কাজে সাহায্য করতে হবে, টেবিল সাজাতে হবে। সুতরাং ঠিক সময়ে হাজির না হলে হাজার রকম প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। অনুমান করলাম সে সব উৎকট প্রশ্নের যত সদুত্তরই এলান দিক, প্রেয়সী তা সহজভাবে গ্রহণ করবে না। বিদায় নেওয়ার আগে এলান জিজ্ঞেস করল—বিয়ে থা করেছ? যেন আমার জবাবটা না-বোধক হলে অজস্র অভিনন্দন জানিয়ে বলবে—তোমার চেয়ে বুদ্ধিমান লোক আর হয় না।

অস্ট্রেলিয়া দেখলে মনে হয় সত্যি বিচিত্র এই দেশ। প্রথমে ক্যাঙ্গারুর নাম বাহির বিশ্বে এর পরিচিতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু আর নয়, ক্যাঙ্গারু আর সে আকর্ষণের বস্তু নয়। আদিম অধিবাসীর যুগ, কনভিক্ট-যুগ, কলোনীর যুগ অতিক্রান্ত হয়ে আজ অস্ট্রেলিয়ায় এসেছে নবযুগের আহ্বান; তার যন্ত্র, কৃষি, বিজ্ঞান সে আহ্বানের সাড়া—সাগরের তীরে তীরে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মানুষের জলকেলীর উচ্ছ্বাস তার প্রতিধ্বনি; বিবাহের পর স্বপ্নভাঙা যৌথ জীবন তার প্রতিবাদ।

গ্রন্থমেলা

ধ্রুপদী—সম্পাদক ঃ সুশীল রায়। ৫৯বি, (পুরাতন ১৩বি) কাঁকুলিয়া রোড, কলিকাতা-১৯। দাম ঃ ৫০ পয়সা।

কবিতার এই মাসিক পত্রিকাটির সর্বাপেক্ষা গৌরবের বিষয় এই যে, সাত বছর সাত মাস ধরে এটি প্রতিমাসে নির্দিষ্ট তারিখে প্রকাশিত হয়ে আসছে। কবিতার জগতে এ . এক গর্বের কথা। স্বভাবতই মন্তব্য করা যায়, কবিতার পাঠক আজো আছেন। তবে একথাও ঠিক, বিকৃতরুচির কবিতার বিরুদ্ধেই পাঠকরা উষ্মা প্রকাশ করেন, অথবা যা কবিতা পদবাচ্য নয় তাকে আধুনিক কবিতা বলে চালালেই কবিতার পাঠক পাওয়া যায় না। 'ধ্রুপদী'র কবিতা সেক্ষেত্রে এক আশ্চর্যজনক ব্যতিক্রম। এর প্রতিটি কবিতাই সুবোধ্য, অর্থবহ এবং ধ্বনিময়। প্রসঙ্গত, ধ্রুপদীর সম্পাদকীয় পাঠ করার জন্য পাঠকসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। এতে যুগের যন্ত্র ও আধুনিক কবিতার আলোচনা আছে। দুঃখের ব্যাপার আলোচনাটি অত্যন্ত আকর্ষক হলেও আয়তনে ছোট। আলোচ্য সংখ্যায় ৩৯ জন প্রবীণ ও নবীন কবি কবিতা লিখেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন সুশীল রায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যাম রায়, সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গাদাস সরকার, নবনীতা সেন, শান্তনু দাস প্রমুখ।

দীপান্বিতা—সম্পাদক ঃ শ্যামল চক্রবর্তী। ২৪৯, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য—৪·০০।

দীপান্বিতার শারদ সংখ্যাটি উল্লেখযোগ্য প্রচ্ছদপট ও রচনাগুণে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উপন্যাস লিখেছেন তারাশঙ্কর, সমরেশ বসু, স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, সুধীরঞ্জন ও মহাশ্বেতা দেবী। তারাশঙ্করের উপন্যাসটি বৎসরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলা যায়। এ ছাড়া আছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর রহস্য উপন্যাস। গল্প লিখেছেন বিমল মিত্র, নরেন্দ্র মিত্র, বিমল কর।

সচিত্র শ্রীমতী—সম্পাদিকা—আভা চট্টোপাধ্যায়, ২৯, ওয়াটারলু স্ট্রীট, কলিকাতা—১। মূল্য—৩·৫০।

অন্যান্য বছরের তুলনায় বর্তমান বছরের শারদীয় শ্রীমতী আরো সমৃদ্ধ ও সুন্দর হয়েছে। চারটি উপন্যাস লিখেছেন সমরেশ বসু, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী ও নরেন্দ্রনাথ মিত্র। প্রবীণ ও নবীন কবি ও গাল্পিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রেমেন্দ্র মিত্র, দীনেশ দাস, সুশীল রায়, সাগরময় ঘোষ, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, হরেন ঘোষ, দুর্গাদাস সরকার, শান্তনু দাস, দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ও আভা পাকড়াশীর রচনা।

ঘরণী—সম্পাদিকা—করুণা মুখোপাধ্যায়। ২৪৬, মাণিকতলা মেন রোড, কলিকাতা—৫৪। মূল্য ৩·০০।

জয়ন্তী সেন

শারদীয় ঘরণীর বর্তমান সংখ্যাটি রচনাবৈচিত্র্যে বিশেষত মহিলাদের আকর্ষণ করবে। উপন্যাস ও গল্প লিখেছেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, দিব্যেন্দু পালিত, আশাপূর্ণা দেবী, স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্র মিত্র, সমরেশ বসু, রমাপদ চৌধুরী, লীলা মজুমদার, বারীন্দ্রনাথ দাশ এবং আরো অনেকে। পারুল সেনগুপ্তের বিজয়ার মিষ্টিমুখ উল্লেখযোগ্য রচনা কিন্তু ঘরণীর অন্যতম আকর্ষণ সেলাই বিভাগের অনুপস্থিতি চোখে লাগে।

সংস্কৃতি—সম্পাদক ঃ সুধাংশুকুমার বসু, সোনারপুর, ২৪ পরগণা। মূল্য ঃ এক টাকা।

এই শারদ সংকলনটিতে আছে গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ। কয়েকটি প্রবন্ধ বর্তমান যুগ-বিচারে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেগুলি ভিয়েৎনাম, ২৪ পরগণার স্ত্রী-শিক্ষা, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন, মুদ্রামূল্য হ্রাস সম্পর্কে লিখিত। এছাড়া আছে গল্প, কবিতা ও অনুবাদ। লেখকদের মধ্যে কল্যাণ দত্ত, প্রভাত রায়-চৌধুরী, গোলাম কুদ্দুস, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, খাজা আহম্মদ আব্বাসের নাম উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক কবিতা—সম্পাদনা ঃ রেখা দত্ত। ১ মিড্‌ল রোড, কলিকাতা-৩২। দাম ঃ ৭৫ পয়সা।

এটি আধুনিক কবিতার শারদ সংকলন। প্রায় ৬৯ জন কবির কবিতা এতে স্থান পেয়েছে। লিখেছেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য, গোপাল ভৌমিক, মৃত্যুঞ্জয় মাইতি, সন্তোষকুমার অধিকারী, প্রফুল্লকুমার দত্ত, স্বদেশরঞ্জন দত্ত, মনোরমা সিংহরায় প্রমুখ। কবিতাগ্রহীদের আধুনিক কবিতা ভালোই লাগবে।

প্রগতি—সম্পাদক ঃ আশুতোষ ধর। ৩৯বি, ডেন্ট মিশন রোড, কলিকাতা-২৩। দাম ঃ প্রতি সংখ্যা ৫০ পয়সা।

বছরে চারবার প্রকাশিত হবে প্রগতি। এটি প্রথম বছরের প্রথম সংখ্যা। পত্রিকার নামের সঙ্গে রচনার সঙ্গতি লক্ষণীয়। আমরা আশা করবো, পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হবে। এ সংখ্যায় লিখেছেন কালিদাস রায়, দুর্গাদাস সরকার,বেদুইন, কুমারেশ ঘোষ প্রমুখ কবি ও গল্প-লেখক। প্রবন্ধগুলিও সুলিখিত।

মিলন তীর্থ—সম্পাদক ঃ অমিতাভ বিশ্বাস। পোঃ ও জেলা বাঁকুড়া। মূল্য ঃ ৫০ পয়সা।

এই শারদীয় পত্রিকাটির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে বাঁকুড়ার সাহিত্য-সংস্কৃতিকে বিভিন্ন দিক্‌ দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। মাণিকলাল সিংহের "বাঁকুড়ার কবির রচিত জগতি মঙ্গল" সেই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই সংখ্যাটিতে গল্প, কবিতাও আছে এবং অভিনয়যোগ্য একটি নাটিকাও রয়েছে। শারদীয় মিলন তীর্থে লিখেছেন বনফুল, শক্তিপদ রাজগুরু, দুর্গাদাস সরকার, বেণু গঙ্গোপাধ্যায়, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ খ্যাতিমান লেখক।

ভাস্বর—সম্পাদকঃ গোপেশচন্দ্র পাল, পোঃ অঃ—বারুইপুর (কুমারপাড়া)। দাম ঃ ৪০ পয়সা।

'ভাস্বর' ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা। এর শারদ সংকলনে লিখেছেন কালিদাস রায়, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, জগদীশ ভট্টাচার্য, দুর্গাদাস সরকার, ব্রজেন সাহা প্রমুখ। পত্রিকাটির গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধগুলি ভালোই। তবু আমরা আশা করবো, এতে যেন আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যকেও তুলে ধরা হয়।

উত্তরা—সম্পাদকঃ সুরেশ চক্রবর্তী। ভেলুপুরা রোড, বারাণসী। মূল্যঃ ১·৮০ পয়সা।

চল্লিশ বছর গৌরবের সঙ্গে অতিক্রম করেছে যে পত্রিকাটি, বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে সেই পত্রিকার যে বিশেষ ঐতিহ্য আছে সেকথা বলার প্রয়োজন নেই। এই শারদ সংখ্যাটির লেখকদের মধ্যে আছেন, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল ভৌমিক, দুর্গাদাস সরকার, আশাপূর্ণা দেবী, মন্মথ রায়, নচিকেতা ভরদ্বাজ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রণজিৎ সেন, বনফুল, গোরাচাঁদ নন্দী, এবং আরো অনেকে।

গণবার্তা—সম্পাদকঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, ৩৭ রিপন স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬, মূল্যঃ ১·৫০ পয়সা।

গণবার্তার শারদ সংখ্যাটিতে কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন ত্রিদিব চৌধুরী, প্রিয়তোষ মৈত্রেয়। দুটি গল্প লিখেছেন সত্যপ্রিয় ঘোষ, প্রলয় সেন। কবিতার সংখ্যা একটু বেশি। অন্নদাশঙ্কর রায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের কবিতা পত্রিকার গৌরব বৃদ্ধি করেছে।

বৈতানিক—সম্পাদকঃ ভবানী মুখোপাধ্যায়, এম, সি, সরকার এ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ। ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ঃ ২·০০।

রুচিস্নিগ্ধ প্রচ্ছদ ও রচনাবৈচিত্র্যে উজ্জ্বল শারদ বৈতানিক বিদগ্ধ পাঠকমণ্ডলীর প্রশংসা অর্জন করবে। প্রবন্ধ ও আলোচনা, গল্প কবিতা ও বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ, প্রতিটি দিকেই সম্পাদক মহাশয় লক্ষ্য রেখেছেন। ডঃ লোকনাথ ভট্টাচার্যের 'সাহিত্যের মরু ও ভিয়েৎনাম' একটি অবশ্যপাঠ্য রচনা। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানী মুখোপাধ্যায় ও সঞ্জীবকুমার বসুর, প্রবন্ধ পত্রিকার মর্যাদাবৃদ্ধি করেছে। দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, খগেন্দ্র দত্ত, বীরেশ্বর বসু ভালো গল্প লিখেছেন। প্রখ্যাত প্রবীণ ও তরুণ কবিদের একগুচ্ছ কবিতা পাঠককে আনন্দ দেবে। কবিতা লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুশীল রায়, দুর্গাদাস সরকার, গোপাল ভৌমিক, আনন্দ বাগচী, বেণু দত্তরায় শিপ্রা পাল, মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, শান্তনু দাস এবং অন্যান্য অনেকে।

সাহিত্যতীর্থ—সম্পাদক ঃ রমেন্দ্রনাথ মল্লিক, ৬৭, পাথুরিয়াঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য—২·০০।

অন্যান্য বছরের মত এ বছরও সাহিত্যতীর্থের বার্ষিক শারদ সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধ, জীবনী, কবিতা, গল্প, রসরচনা, নাটিকা, আলোকচিত্র, স্কেচ, কার্টুন, একবর্ণ চিত্র আলোচ্য সঙ্কলনটিকে সর্বশ্রেণীর পাঠকের উপযোগী করে তুলেছে। প্রবন্ধ ও জীবনী লিখেছেন হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়, মলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রণজিৎ সেন, নরেন্দ্র দেব ও আরো অনেকে। কবিতা ও গল্প লিখেছেন, কুমুদরঞ্জন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, গোপাল ভৌমিক, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, বনফুল, সুশীল রায়, মানবেন্দ্র পাল, নচিকেতা ভরদ্বাজ এবং আরো অনেকে। নন্দলাল বসু ও সতীন্দ্রনাথ লাহার স্কেচ ও একবর্ণ চিত্র সুন্দর।

লোকসেবক—সম্পাদক ঃ জ্যোতির্ময় দে, ৮৬-এ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা—১৪। মূল্য—২·০০।

লোকসেবক শারদীয় সংখ্যাটিতে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ লিখেছেন অধিকাংশ তরুণ লেখক। তবু সংখ্যাটি আর পাঁচটি সাধারণ পত্রিকার চেয়ে ভালো হয়েছে। ভূপেন্দ্র রক্ষিতরায়, অনন্ত সিংহ ও নমিতা রায়ের প্রবন্ধ ভালো লাগবে। দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, সাধন তফাদারের গল্প, গোবিন্দ চক্রবর্তী ও মলয়শঙ্কর দাশগুপ্তের কবিতা পত্রিকার গৌরব বৃদ্ধি করেছে।

শারদীয়া স্বরান্তর—সম্পাদক ঃ অমল রায়চৌধুরী, ২৯, নয়াপট্টি রোড, কলিকাতা—২৮। মূল্য ঃ ২·০০।

ছোট গল্পের একমাত্র মাসিকপত্রের এই শারদ সংখ্যাটিতে রুচির ছাপ আছে। পরিচ্ছন্ন প্রচ্ছদ ও সুমুদ্রিত সঙ্কলনটিতে শুধুমাত্র ছোট গল্পই আছে। লেখকদের মধ্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছাড়া আর সকলেই তরুণ কবি ও গাল্পিক। যশোদাজীবন ভট্টাচার্য, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প ভালো লাগবে।

বিচিত্রা—সম্পাদক ঃ নলিনীকুমার চক্রবর্তী। গ্রন্থালয় ১১-এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য—১·০০।

নামটি অতি পরিচিত হলেও এটি সেই প্রখ্যাত বিচিত্রা নয়, নবজাত পত্রিকা। শিল্প, সাহিত্য ও সমালোচনাপত্র বিচিত্রার শারদ সংখ্যায় প্রবন্ধ লিখেছেন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, জগন্নাথ চক্রবর্তী এবং আরো অনেকে। দুটি গল্প এবং একটি উপন্যাস ছাড়া এই সংখ্যাটিতে অনেকগুলি কবিতা আছে। জীবনানন্দ, গোপাল ভৌমিক, অরুণকুমার সরকার, আনন্দ বাগচীর কবিতা উপভোগ্য।

একালীন—সম্পাদিকা ঃ কুমকুম দে। ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রো, কলিকাতা—৯। মূল্য—১·৫০।

আলোচ্য শারদ সংখ্যাটিতে গল্প লিখেছেন স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সুধীরঞ্জন প্রমুখ প্রবীণ সাহিত্যিকবৃন্দ। একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস, রম্যরচনা, কাব্যনাটক, একাংকিকা ও কবিতাও সংখ্যাটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। দক্ষিণারঞ্জন বসু, কৃষ্ণ ধর, কল্যাণকুমার দাশগুপ্তের রচনা উল্লেখযোগ্য।

মোহনা—সম্পাদক ঃ অরুণ বসাক। রহড়া, ২৪ পরগনা। মূল্য—১·০০।

'নতুন প্রথার তরুণপত্র' মোহনার শারদ সংখ্যায় ছোট গল্প ও কবিতা লিখেছেন প্রবোধবন্ধু অধিকারী, দুলেন্দ্র ভৌমিক, কৃষ্ণ ধর, গোপাল ভৌমিক, সুনীল বসু এবং আরো কয়েকজন তরুণ কবি ও গল্পকার। প্রবন্ধের দিকে আরো একটু নজর দিলে ভালো হত।

ঢেউ—সম্পাদকঃ অজিত রায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক। ৫বি, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট, কলিকাতা-৭। মূল্যঃ ১·০০।

অধিকাংশ তরুণ লেখকদের রচনায় সমৃদ্ধ 'ঢেউ'-এর শারদ সংখ্যাটির লেখকদের মধ্যে আছেন রাম বসু, বাসুদেব দেব, বিনোদ বেরা, রবীন্দ্র গুহ, মানবেন্দ্র পাল, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। সম্পাদনায় উল্লেখযোগ্য কিছু চোখে পড়ল না।

পারাবত—সম্পাদকঃ আনন্দ বাগচী। প্রসন্ন ব্যানার্জী রোড, বাঁকুড়া। মূল্যঃ ২·০০।

বাঁকুড়া জেলার একমাত্র মাসিক সাহিত্য পত্র 'পারাবত'-এর শারদ সংখ্যাখানি ভালো লেগেছে। সম্পাদক যেহেতু কবি, স্বভাবতই তিনি কবিতার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন। কবিতা লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুরেন্দ্র মিত্র, গোপাল ভৌমিক, জগন্নাথ চক্রবর্তী, দুর্গাদাস সরকার, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ। একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস লিখেছেন সুকৃতি বক্সী। সুশীল রায়ের গল্প ভালো লাগবে।

মহাদিগন্ত—সম্পাদকঃ সমীর আচার্য, আলোক মৈত্র। ২০/এ, লেক রোড, কলিকাতা-২৯। মূল্যঃ ১·৫০।

শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির প্রগতিশীল মাসিক পত্রিকার আলোচ্য শারদ সংখ্যাটির লেখকসূচীতে আছেন—বিষ্ণু দে, জগন্নাথ চক্রবর্তী, বাণী রায়, সরোজ আচার্য এবং আরো অনেকে।

"ইতিহাসের উপাদান" কি সত্যই ইতিহাস?

সাপ্তাহিক বসুমতীর কয়েকটি সংখ্যায় ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের 'ইতিহাসের উপাদান' সাগ্রহে পড়িতেছি। প্রবন্ধগুলি তাঁহার স্নেহভাজন পৃথ্বীন্দ্রনাথকে লিখিত পত্রাবলী। পত্রগুলি ভূপেন্দ্রবাবুর মতে ঐতিহাসিক উপাদানে পরিপূর্ণ।

ইতিহাসের উপাদান বলিতে লেখক কি পরিবেশন করিতে চান তাহা জানিবার ঔৎসুক্য থাকা অন্যায় নহে। উপাদান অর্থে তিনি 'ডকুমেন্টারী এভিডেন্স' মনে করেন, না কোন্ পদ্ধতিতে তথ্য পরিবেশন করা বিধেয় তাহা বুঝাইতে চান সে-বস্তু উপলব্ধি করার তাগিদ হয়তো আমাদের মত আরো অনেকেরই আছে। কিন্তু পর পর কয়েকটি প্রবন্ধ পড়িয়া বুঝা গেল যে ভূপেন্দ্রবাবু তাঁহার জানিত 'শোনাকথা'-ই লিখিয়া যাইতেছেন। লেখার অল্পাংশেই 'ডাইরেক্ট এভিডেন্স' তিনি দিতে পারিয়াছেন। ১৯০৫ সাল হইতে প্রাক্‌স্বাধীনতা কাল পর্যন্ত বাংলার ব্যাপক বিপ্লবান্দোলনের 'ডাইরেক্ট এভিডেন্স' কোন একজন কেন, একাধিক বিপ্লবী একত্রিত হইয়াও দিতে পারেন না। তা তিনি বা তাঁহারা যত বড় ও পুরাতন বিপ্লবীই হউন। কারণ দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরব্যাপী সঙ্গোপনে বিভিন্ন লোক ও গ্রুপ্ দ্বারা অনুষ্ঠিত বিভিন্ন অ্যাকশান-এর direct evidence যোগাড় করার পদ্ধতি আলাদা। ভূপেন্দ্রবাবু তাঁহার যেসব শোনাকথা জোর ভাষায় লিখিয়া যাইতেছেন তাহা বিচার-বিশ্লেষণ সাপেক্ষ এবং তাহার মূল্য অপর বিপ্লবীদের লিখিত স্মৃতিকথা হইতে কিছুমাত্র অধিক নয়। তাই তাঁহার প্রবন্ধগুলিকে 'ইতিহাসের উপাদান' জাতীয় গালভরা আখ্যা দিবার কোন সার্থকতা দেখি না। 'তথ্য' পরিবেশনের দিক হইতে তিনি ডিস্‌প্যাশনেট্ তথা নিরপেক্ষভাবে কিছু লিখিবার চেষ্টা করিতেছেন না। তাঁহার লেখায় বিপ্লবী চরিত্রের মাধুর্য পরিস্ফুট হইবার সম্ভাবনা নাই; পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে অতীতের দলাদলি, পর-নিন্দা ও পরের কুৎসা লইয়া মনগড়া থিসিস্ খাড়া করিবার আত্মতৃপ্তি। যুগান্তর দলের নেতা হিসাবে তিনি যে কত শক্তি, বুদ্ধি ও দক্ষতার অধিকারী ছিলেন এবং তাঁহার 'যুগান্তর' যে কত বড় দল ছিল সে-সব বার্তাই শ্রীমান পৃথ্বীনের মাধ্যমে তিনি দেশবাসীকে শোনাইবার দায়িত্ব এভাবে নেওয়াতে তাঁহার মর্যাদা কিছু বৃদ্ধি পাইতেছে না।

উল্লিখিত প্রবন্ধটির প্রারম্ভে ভূপেন্দ্রবাবু বসুমতীর পাতায় উত্থাপিত বিপ্লব-ইতিহাসের নানা তর্ক ও তথ্যগত মতানৈক্য এবং তজ্জনিত পাঠক সাধারণের নানা বিভ্রান্তি অপগত করার যে আশা কিছু লোকের কাছে অন্তত সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা ক্রমশ ব্যর্থ হইতেছে দেখিয়া আমরা দুঃখিত। সংক্ষেপে সেই কথাই আমরা ব্যক্ত করিতেছি।

প্রবন্ধের সুরুতেই ভূপেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন ঃ "দ্যাখো এটা বিজ্ঞাপনের যুগ—সবাই স্বনামে বা বেনামে নিজের এবং জ্ঞাতিগোষ্ঠীর বিজ্ঞাপন দিতে এবং বিজ্ঞাপনের আয়নায় নিজেদের মুখ দেখিতে ব্যগ্র। কিন্তু সে বস্তু তোমার আমার ধাতের বাইরে (সাঃ বসুমতী ২৪শে মার্চ, '৬৬—পৃঃ ২৬৩৬)।

অতি চমৎকার কথা। কিন্তু ভূপেন্দ্রবাবু বুঝিলেন না যে ঐ উক্তির মধ্যেই নিজেরা যে নিজেদের বিজ্ঞাপন দিতে চান না সেই বাহাদুরী বিজ্ঞাপিত হইয়া গেল! তৎপরই দেখা যায় যে, উক্ত ২৬৩৬ পৃষ্ঠারই দ্বিতীয় প্যারা হইতে গোটা পৃষ্ঠায় তাঁহার পত্রপ্রাপক শ্রীমান পৃথ্বীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ প্রশংসা। ভক্তের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত ভগবান বোধ হয় এমনই ব্যাকুল হন। নইলে ভূপেন্দ্রবাবুর মত অভিজ্ঞ ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বিজ্ঞাপনের তীব্র নিন্দা করিয়া, উহারই নিচের প্যারাগ্রাফ হইতে শ্রীমান পৃথ্বীনের অসীম গুণবত্তার কথা দেশবাসীকে জানাইবার উদ্দেশে লিখিতে গেলেন কেন? ইহা কি 'জ্ঞাতিগোষ্ঠীর প্রচার' নয়?

অতঃপর প্রত্যেক পত্রেই তিনি অনায়াসে বিজ্ঞাপন দিয়া গেছেন নিজের ও নিজের গ্রুপের। তিনি নিজের এবং তাঁহার নিজস্ব গ্রুপের কাহিনী লিখিলে আমরা কিছুমাত্র প্রতিবাদ করিতাম না। কারণ ঐ সম্পর্কে direct evidence যোগাড় করিবার ক্ষমতা তাঁহারই থাকিবার কথা। কিন্তু তিনি তো কোন গ্রুপের লোক নহেন বলিয়া প্রচার করিতে চাহেন, তিনি তো গ্রুপগুলির যে-সমাবেশ, তাহারই নেতা? তাঁহার প্রবন্ধগুলির মূল প্রতিপাদ্য বস্তু হইল যে তিনি প্রায় অদ্বিতীয় এক বিপ্লবী নেতা এবং তাঁহার গ্রুপই (মুখে 'গ্রুপ' স্বীকার না করিলেও) যুগান্তর দলের কর্ণধার। অর্থাৎ ভূপেন্দ্রবাবু ও তাঁহার বন্ধুবর্গই সকলের কানে কানে বিপ্লব-মন্ত্র দিয়াছেন, সকলকে নেতৃত্বদান করিয়াছেন—এবং তাঁহাদের বাণী ও সংকেত লইয়াই যে যাহার কাজ করিয়া গিয়াছে। সেই হিসাবেই 'যুগান্তর' একটি গ্রুপ নহে, 'যুগান্তর' একটি বিপ্লবী দল। বিপ্লবের আইডিয়া, নির্দেশ ও পথ-সঙ্কেত দিয়াছে যুগান্তর—গোষ্ঠীর সঙ্কীর্ণতায় যাইবার পরামর্শ সে দেয় নাই। যতীন্দ্র মুখার্জীর আমলেই প্রথম এহেন যুগান্তরের পত্তন ঘটে বলিয়া ইতিহাস জানে। সবগুলি গ্রুপ লইয়া একটি বিরাট বিপ্লবী দল গড়ার সামর্থ্য তাঁহারই ছিল। কিন্তু সেই যুগান্তর এবং ভূপেন্দ্রবাবুদের যুগান্তর তো এক বস্তু নয়। ভূপেন্দ্রবাবুদের যুগান্তরের চূড়ায় উপবিষ্ট কিন্তু ভূপেন্দ্রবাবু স্বয়ং। অবশ্য তাঁহারই কথা হইতে পাওয়া যায় যে তাঁহার সঙ্গীদের অন্যতম ছিলেন অরুণচন্দ্র গুহ, মনোরঞ্জন গুপ্ত, হরিকুমার চক্রবর্তী এবং কখনো-সখনো সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ। মোটের উপর দেখা যায় সঙ্গোপনে পর্দার অন্তরাল হইতে 'সরস্বতী প্রেস গ্রুপ'-ই বিপ্লব পরিচালনার সর্বময় দায়িত্ব লইয়াছিল ভূপেন্দ্রবাবুর মাধ্যমে। এতাবৎ প্রকাশিত সবগুলি প্রবন্ধে এই প্রচার সাড়ম্বরে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

সাঃ বসুমতীর ১৪ই জুলাই (১৯৬৬) তারিখের সংখ্যায় (পৃঃ ৩৬৯) সত্যরঞ্জন বক্সী মহাশয়ের জবানীতে ভূপেন্দ্রবাবু লিখিতেছেনঃ "এক আপনাদের 'সরস্বতী প্রেস গ্রুপেরই' ভূপেন্দ্রবাবুদের নাকি এই নামটি এক (সত্যবাবুর মুখেই প্রথম ও শেষ শোনা) ভেতর মনে হয়, একটা 'ফায়ার' আছে। ওখান থেকেই যদি কিছু হয়।" এখানে যদিও বাহ্যত তিনি ঐ 'গ্রুপ' নামটি পছন্দ করেন নাই (কারণ তাঁহারা যে যুগান্তরের কর্ণধার), কিন্তু কার্যত তাঁহাদের মধ্যে যে 'ফায়ার' আছে তাহা শুনিয়া খুশি হইয়াছিলেন। কারণ ভূপেন্দ্রবাবুর খুশির প্রকাশ আমরা দেখি যখন মেজর সত্য গুপ্ত মহাশয়ের বন্দী-জীবনের জবানীতে তিনি সাপ্তাহিক বসুমতীর ১৫ই সেপ্টেম্বরের (১৯৬৬) সংখ্যায় (পৃঃ ৯২৯) লিখিতেছেন ঃ "কি স্টাফ আপনাদের। একটা বাড়ি থেকেই চারজন স্টেট্-প্রিজনার!" এ বাক্যের অর্থ অবশ্য ভূপেন্দ্রবাবু করিলেন—"আমাদের আস্তানা ছিল ৭১ মির্জাপুর স্ট্রীটের বাড়িতে।" কিন্তু মেজর গুপ্ত কি 'মির্জাপুরের বাড়ি'র কথা বলিয়াছিলেন? না 'সরস্বতী-প্রেস-পার্টি'র কথা বলিয়া-

নির্ম্মল বার সাবানে কাচলে
আপনার কাপড়-জামা হবে
ধবধবে ফরসা
হালকা সুগন্ধে ভরপুর
Nirmal
নির্ম্মল
BAR SOAP
Nirmal
নির্ম্মল বার সাবানে কাচা কাপড়-জামা দেখতে ঝকঝকে পরিষ্কার হয়, আর সদ্য ধোয়ার সুগন্ধে ভরে উঠে।
নির্মল বার সাবানে চটপট দেদার ফেনা হয় আর সেই ফেনায় তেলকালি ও ধূলোময়লা জড়সুদ্ধ বেরিয়ে যায়। আপনার কাপড়-জামা ঝকঝকে তকতকে দেখায়, সদ্য ধোপ দেওয়ার সুগন্ধে ভরে থাকে।
নির্মল দিয়ে কাচলে পয়সারও সাশ্রয় হয়। ঢের বেশী দিন চলে—সাবানটি শক্ত থাকে, তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যায় না।
নির্ম্মল
পূর্ব ভারতে এই বার সাবানই
কাটতিতে সবার ওপরে
কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড, কলিকাতা-১

ছিলেন? ঐ একটা 'বাড়ি'তে কাহারা ছিলেন? যুগান্তরের বিভিন্ন গ্রুপের লোক? না একটি বিশেষ গ্রুপের লোক?......

ভূপেন্দ্রবাবু যতই অস্বীকার করুন না কেন, যুগান্তর যদি বহু গ্রুপের সমাবেশ হয় তবে ভূপেন্দ্রবাবুরাও কোন একটি বা দুটি গ্রুপেরই লোক। কর্মসূত্রে বি ভি, চট্টগ্রাম গ্রুপ, মৈমনসিংহ গ্রুপ, উত্তরবঙ্গ গ্রুপ, মাদারীপুর গ্রুপ, বরিশাল গ্রুপ, দৌলতপুর গ্রুপ বা অপরাপর গ্রুপ যদি একত্রে কাজ করিয়াই থাকে তবে তাহাদের নিজস্ব কর্ম-ত্যাগিদেই করিয়াছে, সেই কাজের কৃতিত্ব দলসমাবেশের (যুগান্তর) ততটুকুই প্রাপ্য যাহা ইতিহাস এ-পর্যন্ত জানিয়াছে। তাহার অধিক দাবি করিবার প্রয়াসে যুগান্তরকে ছোট করা হয়, এই প্রচেষ্টায় ভূপেন্দ্রবাবুর মান বাড়ে না।......

বাংলাদেশে অনুশীলন সমিতির contribution আছে, contribution আছে প্রত্যেক গ্রুপ বা গ্রুপ-সমাবেশরূপী যুগান্তরের। কিন্তু ভূপেন্দ্রবাবু অনুশীলন সমিতিকে কিছুতেই পাত্তা দিতে চান না (তাঁহার 'বিপ্লবের পদচিহ্ন' দ্রষ্টব্য), এই দলের কোন অবদানই তাঁহার কাছে স্বীকার্য নয়। ভূপেনবাবুর মতে আত্মোন্নতি সমিতির কার্যকলাপ ১৯১০ সালেই নাকি স্তব্ধ হইয়া যায়, কারণ পুলিশের রিপোর্ট যে তাহাই! কিন্তু একথা ভূপেন্দ্রবাবু কেন বুঝিতে চান না যে পুলিশ সর্বজ্ঞ নহে, এবং নন্দলাল হত্যা হইতে শুরু করিয়া রডা অস্ত্র লুট ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক য়্যাক্‌সন ও ডাকাতির মধ্যে আত্মোন্নতি সমিতির প্রত্যক্ষ অবদান স্বাক্ষরিত করার মূলেও যে রহিয়াছে পুলিশ-বিদিত এই সমিতির স্তব্ধতা! ইহা বুঝিতে গেলে যুগান্তরের মাহাত্ম্য কমিয়া যায় কি? কিন্তু ভুলিলে চলিবে কেন যে এই ধরণের 'স্তব্ধতা' প্রস্তুতিপর্বেরই লক্ষণ।......

গত ১৫ই সেপ্টেম্বরের (১৯৬৬) সংখ্যায় শ্রীযুক্ত দত্ত যাহা লিখিয়াছেন তাহা যদি ইতিহাসের উপাদান হয় তবে ঐ উপাদানে গঠিত ইতিহাস-ইমারতটি আত্মম্ভরিতা, মিথ্যা ও অর্ধ-সত্য প্রচারের পীঠস্থান হইবে।

স্বর্গগত মেজর সত্য গুপ্ত এককালে ভূপেন্দ্রবাবুদের সঙ্গে State Prisoner রূপে পাঞ্জাবে ও বোম্বাই প্রদেশে বিভিন্ন জেলে বন্দী ছিলেন। তাঁহাকে সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার জবানীতে ভূপেন্দ্রবাবু চমৎকার একটি নাটক জমাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। নাটক জমিয়াছে কিনা জানি না, তবে তাঁহার নিজের মুখোশটি যে খুলিয়া গিয়াছে তাহা জানি।......মেজর গুপ্ত আজ জীবিত নাই। বাঁচিয়া থাকিলে ভূপেন্দ্রবাবু এসব উক্তি প্রকাশ করিতেন কিনা সন্দেহ। কারণ, এ-সবের কঠিন প্রত্যুত্তর তাঁহাকে পাইতে হইত। সত্য গুপ্তের ছিল অপূর্ব দেশপ্রেম ও বৈপ্লবিক-সত্তা এবং তাহার উপর ছিল Sense of history—তাই কাদামাটি ছোঁড়াই যদি ইতিহাসের উপাদান হয়, তথাপি। তিনি হয়তো সেই পথ নিতেন না। তবে ভূপেন্দ্রবাবু নিজে কাচের ঘরে বাস করিয়া যখন অপরকে ঢিল ছুঁড়িতে থাকেন তখন স্মরণ রাখিতে পারেন যে, অপরেও বহু উপাদান সরবরাহ করিয়া ভূপেন্দ্রবাবু বা তাঁহার অন্তরঙ্গদিগকে জর্জরিত করিতে পারেন। ভূপেন্দ্রবাবুর মত অপরেও সরকারী 'আর্কাইভ্' হইতে আগত যে কোন তরুণ অধ্যাপককে জুটাইতে পারিতেন—যে-ব্যক্তি প্রমাণ করিতেন যে, ভূপেন্দ্রবাবুর 'হিরো'-শ্রেষ্ঠ 'বন্ধু'দের কারো কারো রাজনীতিক-চরিত্র কলুষিত ছিল। পুলিশের দেওয়া প্রমাণ লইয়া ভূপেন্দ্রবাবু নিজের সুবিধামত পুলিশ-উক্তি (তথ্যদাতা রূপে) দেখাইতে পারেন, কিন্তু সকলে তাহা দেখাইবে না। কারণ, পুলিশ যেমন কতিপয় ক্ষেত্রে খ্যাতিমান বিপ্লবীকে যথার্থই হাত করিতে পারিয়াছিল, তেমনি উদ্দেশ্যমূলকভাবে কাহাকেও বা মিথ্যা অপবাদে ভূষিত করিয়া দল ভাঙাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। অতএব কোন বিপ্লবী দলের দুঃসাহসী ও সফল কর্মযাত্রার কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া যে-সব বন্ধুকে বিশ্বাস করায় বা কর্মনেতৃত্ব দেওয়ায় উক্ত দলকে কোন ক্ষেত্রেই ঠকিতে হয় নাই, তাঁহাদের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারের অপচেষ্টায় ভূপেন্দ্রবাবু পঞ্চমুখ হইলেও (সাঃ বসুমতী ২৪-৩-৬৬ দ্রষ্টব্য) তাঁহাদের বন্ধু ও সহ-কর্মীরা সেই কুৎসা-ঘৃণ্য উপাদানকে ঐতিহাসিক-সত্য বলিয়া মানিবেন না। বৃটিশ-পুলিশের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে যাহারা অজ্ঞ তাহাদিগকে ভূপেন্দ্রবাবু যাহা খুশি বুঝাইবার চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু কোন বুদ্ধিমান ঐতিহাসিক ও-সব তথ্যের উপর নির্ভর করিবেন না। অতএব এবম্বিধ জংধরা পলিটিক্স হইতে নিবৃত্ত থাকাই ভূপেন্দ্রবাবুর মত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির উচিত। চিরকালই দেখা গিয়াছে যে, লোককে ঘায়েল করিবার দুইটি অস্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে উহাদের প্রয়োগ অধিক। যাঁহাকে দাবাইতে হইবে তাঁহার বিরুদ্ধে দিতে হইবে 'চরিত্রহানি'র বা 'পুলিশ-স্পাই'-এর অপবাদ। ভূপেন্দ্রবাবু কেন এই নোংরা পথে বিচরণ করিবেন? নোংরা ঘাঁটিলে গায়ে নোংরা লাগিবেই, তিনি ঠেকাইতে পারিবেন না।......

গত ১৫ই সেপ্টেম্বরের (১৯৬৬) সাঃ বসুমতীর ৯২৯ পৃষ্ঠা হইতে ৯৩২ পৃষ্ঠার প্রত্যেকটি পংক্তি জুড়িয়া মেজর সত্য গুপ্তের জবানীতে 'যুগান্তর' তথা ভূপেন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রশস্তিপাঠে অস্থির হইতে হয়। ভূপেন্দ্রবাবুর স্মৃতিপটের ডাইরি অনুসারেঃ—

সত্য গুপ্ত বলিতেছেনঃ "কি সময়েই আপনারা ও আমরা একত্র হয়েছিলাম। না হলে, আমরা কি করতাম কে জানে?"

সত্য গুপ্ত বলিতেছেনঃ "আমরা কাজ যা-ই করে থাকি বা করি, political leadটা সারা দেশেরই এসেছে আপনাদের কাছ থেকে, 'স্বাধীনতা'র লেখা থেকে।"

সত্য গুপ্ত বলিতেছেনঃ "অমুক (অর্থাৎ সত্য বক্সী) কি আপনাদের সঙ্গে আমাদের থাকতে দেবে?"

সত্য গুপ্ত বলিতেছেনঃ "এখন থেকে 'যুগান্তর' বলে আর আমাদের পরিচয় থাকবে না। (বার্জ-মার্ডারের পর পুলিশ হেমচন্দ্রের দলের নামকরণ করিয়াছে 'বি ভি') অমুক (সত্য বক্সী) আমাদের পরিচিত করবে সুভাষ বোসের দল হিসাবে। ও (সত্য বক্সী) সব পারে। এর পর সুভাষ বোসও আর আপনাদের সঙ্গে থাকবে না, আমরাও না। থাকতে দেবে না। সুভাষ বোসের-দল বলে পরিচিত হবার লোভে, Kings Own Regiment বলে পরিচিত হবার লোভে আমাদের কর্তারাও এখন নিজেদের 'বি ভি' বলে পরিচয় দেবেন। আর আপনাদের সঙ্গে সম্পর্কও ভেঙে দেবেন।"

ভূপেন্দ্রবাবুর নাটকে মেজর সত্য গুপ্তের ভূমিকা দেখা যাইতেছে একটি আকাট নাবালকের। তাঁহার শক্তি-সামর্থ্য সব কিছুই আছে, নাই শুধু সাবালক হইবার সাহস। ভূপেন্দ্রবাবুর পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সত্য গুপ্তরা বাঁচিয়া গিয়াছেন। এখন শুধু ভয়, তাঁহাকে ও তাঁহাদের না-লায়েক গ্রুপটিকে (যদিও ১৯৩০ সাল হইতে ১৯৩৫ সাল অবধি দুর্ধর্ষ বৈপ্লবিক কর্মের প্রচণ্ড অধিকারী এই দল) সত্যরঞ্জন বক্সীর মত কুচক্রী) না অর্বাচীন সুভাষের হাতে তুলিয়া দেন?...

ভূপেন্দ্রবাবু মেজর গুপ্তকে নাবালকের ভূমিকা দান করিয়া তাঁহার জবানীতে নিজে বাঙালীর সমগ্র বিপ্লব-আন্দোলন ও কর্মকাণ্ডের নেতৃত্ব দাবি করিতে ব্যগ্র। তাই হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের দলের নাম 'বি ভি' রূপে চিহ্নিত হবার সম্ভাবনায় তিনি অসহিষ্ণু।

ভূপেন্দ্রবাবু বলিতেছেনঃ "'বি ভি' গ্রুপ কবে কোথা থেকে হল? 'বি ভি' মানে মনে পড়ল, কলকাতা কংগ্রেসের সময় আমি-ই তৈরি করেছিলাম, 'Bengal Volunteers' সংক্ষিপ্ত নামের পিতলের ব্যাজ ভলান্টিয়ারদের পোষাকে লাগাবার জন্য। কিন্তু সে নামে বিপ্লবীদল কবে হল?"

ইতিহাস জানে যে হেমচন্দ্র ঘোষের বিপ্লবী দল 'Bengal Volunteers'-এর বৈপ্লবিক-আদর্শ কার্যে পরিণত করায় অপরাপর গ্রুপ হইতে আলাদা করিয়া বুঝিবার জন্য পুলিশ ঐ দলের নাম দেয় 'বি ভি'—ভূপেন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পিতলের ব্যাজগুলির অঙ্গে খোদাই করা হরফ হইতে 'বি ভি'-র নামকরণের বাতুলতা পুলিশের নিশ্চয়ই হয় নাই।

এই সূত্রে উল্লেখ করিব যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেও বলা যাইত যে, যুগান্তর' আবার বিপ্লবী দল "কবে কোথা থেকে হল?" কিন্তু তখনই মনে করা উচিত যে, ডক্টর ভূপেন দত্ত সম্পাদিত স্বদেশীযুগের 'যুগান্তর' কাগজ হইতেই এক বিপ্লবী দলকে অনুশীলন হইতে আলাদা করিয়া 'যুগান্তর' নাম দেয় পুলিশ। ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 'যুগান্তর' কাগজের এডিটর ছিলেন বলিয়াই যেমন তাঁহাকে পুলিশ বিপ্লবী-যুগান্তর দলের প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করে নাই, শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্তকেও তেমনি তিনি পিতলের 'বি ভি' নামাঙ্কিত ব্যাজ তৈয়ার করাইয়াছিলেন বলিয়াই পুলিশ বিপ্লবী 'বি ভি' দলের সঙ্গে সেই ব্যাজ সহ যুক্ত করে নাই।

সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে ভূপেনবাবু লিখিয়াছেন (সাঃ বসুমতী—১৫-৯-৬৬—পৃঃ ৯৩০)ঃ "সুভাষের সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯১৪-১৫ সাল থেকে।......ছোট বড় কোনো কোনো ব্যাপারে আমাদের মতানৈক্য হয়েছে—যেমন সহকর্মী ও বন্ধু-বান্ধবে অনেক সময় হয়। ওর কোন কোন ভুল মেনেও নিতে হয়েছে। আবার কোনো কোনো ভুলের জন্য আমাদের তিরস্কার ও ধমকও (ওকে) সইতে হয়েছে। আমরা সুভাষকে কখনও আমাদের বিপ্লবী দলের নেতা বলে মনে করি নি, এমন কি 'Primus Inter Pares' হিসাবেও দেখি নি। বিপ্লবীদের প্রাধান্য যে কংগ্রেস দলে; সেই কংগ্রেস দলের নেতা আর বিপ্লবী দলের নেতা এক নয়। তবু কোন কোন বিপ্লবী-মহল যেখানে সুভাষকে আমাদের দলের নেতা মনে করতো, সেখানে বিপ্লবী হিসাবে (তার) যথেষ্ট inferiority-র ভাবের প্রাধান্য ছিল।"

ভূপেন্দ্রবাবুর এই উক্তির মধ্যে হয়ত সত্য আছে। কারণ, সুভাষচন্দ্র ভূপেন্দ্র দত্তের এক বয়সী হইলেও বাংলার বিপ্লবী দল তাঁহাদের উভয়ের অপেক্ষাই অনেক প্রাচীন। সুতরাং সুভাষচন্দ্র সহসা বিপ্লবী হইয়া উঠেন নাই এবং বিপ্লবমঞ্চে তাঁহার আগমনও অনেক পরে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহা মানিতেই হইবে যে, ভূপেন্দ্রবাবু ও তাঁহার বন্ধুরা সুভাষচন্দ্রকে 'বিপ্লবী' রূপে স্বীকার না করিলেও তিনি চিন্তার জগতে ছিলেন আজন্ম বিপ্লবী এবং তাঁহার মধ্যেকার মহাবিপ্লবীর ক্রমবিকাশ 'গ্যালপিং স্পীড্'-এ ঘটিয়াছিল। এই 'স্পীড্' তথা সুভাষচন্দ্রের এই 'বৈপ্লবিক পরিণতি' ভূপেন্দ্র দত্ত প্রমুখ তৎকালীন নামী বিপ্লবীদের শ্রেয়মন্যতাদুষ্ট ধারণার বহির্ভূত ছিল। তাঁহাদের বিপ্লবী-সত্তা ক্ষীণ হইয়া আসাতেই বিপ্লবী সুভাষকে তাঁহারা চিনিতে পারিলেন না। তাই ১৯৩৯ সালে দেখি আপোষহীন-সংগ্রামী সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত, কিন্তু ভূপেন্দ্র দত্ত প্রমুখ প্রাক্তন দুর্ধর্ষ বিপ্লবীবৃন্দ 'এ্যাড্ হক্ কংগ্রেসে'-র কৃপালোভী! অতঃপর মহাবিপ্লবী সুভাষের 'আজাদ্ হিন্দ ফৌজে'র মহানায়করূপে যে অভূতপূর্ব role, তাহার সম্মুখে চরকাহস্তে ভূপেন্দ্রবাবু প্রমুখের 'বৈপ্লবিক-রোল্' কত না তুচ্ছ ও হাস্যাস্পদ।

সুতরাং সূর্যের মত যে-বস্তু সত্য ও লোকচক্ষুর কাছে প্রতিভাত, সেখানে ভেজাল 'উপাদান' চালান দেবার বুদ্ধি শুভ নহে, সুন্দর নহে, শোভন নহে—ভবিষ্যৎ বংশধরদের পক্ষে স্বাস্থ্যকরও নহে।

স্বর্গগত সত্য গুপ্তের উক্তি যদি সত্যও হয়, তবে তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয়, যে বৈপ্লবিক নেতৃত্ব ভূপেন্দ্র দত্ত প্রমুখের মধ্যে তিনি দেখিয়াছিলেন তাহা অচিরে মিথ্যা হইয়া যাওয়াতেই তিনি এবং তাঁহার বন্ধুরা (বৈপ্লবিক-বুদ্ধি হইতেই) আগামী কালের শ্রেষ্ঠতম বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রকে চিনিতে পারিয়া তাঁহারই সঙ্গে বিপ্লব-সমুদ্রে ঝাঁপ দেন এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সত্য গুপ্ত 'নেতাজী' তথা তাঁহার আদর্শবাদকেই সকল আনুগত্য দিয়া যান। দক্ষিণ-কংগ্রেস-পন্থী এবং ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করার দুষ্কার্যে সহায়ক ভূপেন্দ্র দত্তদের সঙ্গে ১৯৩৮ সালের পর সত্য গুপ্তর বিন্দুমাত্র যোগাযোগও থাকে নাই, কারণ, উহা থাকিতে পারে না।

সত্যরঞ্জন বক্সী মহাশয়ের উপর 'সরস্বতী প্রেস গ্রুপ' তথা ভূপেন্দ্রবাবুদের ক্রোধের কারণও তাঁহার লেখায় স্পষ্ট হইয়া আছে। সুভাষচন্দ্রকে যুগান্তরের হাতের মুঠায় রাখিবার ষড়যন্ত্রে সত্য বক্সী বাদ সাধিতেন বলিয়া যুগান্তর-কর্তাদের ধারণা হওয়ায় তাঁহাদের কাছে তিনি (সত্য বক্সী মহাশয়) ছিলেন একটি বিভীষিকা!......

মোটের উপর ভূপেন্দ্র দত্ত মহাশয় বাংলার বিপ্লব-যুগে যে নেতৃত্ব দাবি করিয়াছেন, তাহাতে তিনি কি নিজের ও বন্ধুদের ঢাক-ই নিজ স্কন্ধে স্থাপন করেন নাই? আত্মপ্রচারের এ কী মর্মান্তিক রূপ। 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' নামে স্বেচ্ছাসৈনিক বাহিনী গড়ার মূলে তাঁহাদের অবদান কেহ অস্বীকার করে না, বহু পূর্বে পূর্ণ দাস মহাশয়ও 'শান্তি সেনা' গড়িয়াছিলেন। বাংলার বিপ্লবকাণ্ডই বহুর চেষ্টায়, ত্যাগে ও নেতৃত্বে বিরচিত। সেই চেষ্টায় ও নেতৃত্বে নিশ্চয়ই ভূপেন্দ্রবাবুদের যোগ্য অবদান রহিয়াছে। কিন্তু তাহাকে ফুলাইয়া-ফাঁপাইয়া অতি বড় করিবার জন্য আজও যদি সুভাষচন্দ্রকে 'গরু'-এর মর্যাদা দিবার মতলব থাকে তবে তাহা আত্মঘাতী মারাত্মক নীচতা। 'বি ভি'-নামাঙ্কিত পিতলের ব্যাজ তৈয়ার করা বা লেফ্ট্-রাইট না মানিয়াও 'কর্নেল' হওয়া ইত্যাদির বৈপ্লবিক মূল্য আছে জানি, কিন্তু তৎসত্ত্বেও যিনি 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'-এর রূপান্তর ঘটাইলেন আজাদ হিন্দ বাহিনীর পদভারে—সেই নেতাজী সুভাষচন্দ্রের উপর ভূপেন্দ্রবাবুর মাতব্বরী ও তাঁহার দলের নানা মাতব্বরী-সূচক কাহিনীর চাহিদা কি দেশবাসীর কাছে একটুও আছে? অথবা ইতিহাসের উপাদান রূপেই কি ঐ সবের কোন মূল্য স্বীকার করা যায়? ভূপেন্দ্রবাবুর লেখা পড়িয়া তাই পাঠকরা অধিকতর বিভ্রান্ত হইবেন, ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকও ইতিহাস রচনার কোন নির্ভরযোগ্য উপাদান না পাইয়া নিরাশ হইবেন।

অতএব বিপ্লবী ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়কে আমরা শ্রদ্ধা করি বলিয়াই তাঁহার কাছে নিবেদন করি যে, এরূপ আত্মপ্রচার হইতে বিরত হওয়া কি উচিত নয়? বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে মার্টায়ারদের কাহিনী, বালাসোর যুদ্ধ, কলতাবাজার-গোহাটির সংঘর্ষ, চট্টগ্রামের সংগ্রাম, বি ভি-র প্রচণ্ড কর্মকাণ্ড এবং বিশ্ব-বিশ্রুত আজাদ-হিন্দ-ফৌজের কীর্তি সূর্যের মত ভাস্বর এবং স্বয়ং প্রকাশিত। এই ইতিহাস ভূপেন্দ্র দত্ত মহাশয়ের হীনমন্যতাপ্রসূত অপব্যাখ্যায়ও তাঁহার ইচ্ছামত 'টুইস্ট'-লাগান রূপ ধারণ করিবে না। সুতরাং আমরা আশা করি যে, শ্রদ্ধেয় ভূপেন্দ্রবাবুর শ্রীমান পৃথ্বীনকে লিখিত বাকি অপ্রকাশিত পত্রাবলী ঐতিহাসিক-তথ্যে পূর্ণ থাকিবে এবং ভাবীকালের বংশধরদেরকে অনুপ্রাণিত করে এমন কাহিনীতে বিচিত্র হবে।

শ্রীকামাখ্যাচরণ রায়
৭০৩, ডি, নিউ আলিপুর
কলিকাতা-৫৩

ঋষি শ্রীঅরবিন্দ

শ্রী দিলীপকুমার রায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সাবিত্রীর আদিপর্বের এই মহামন্ত্রের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই শেষ পর্বে মহীয়ান পিতার মহীয়সী পুত্রীর কণ্ঠে যিনি বলেছিলেন ভগবানকে ঃ

In me the spirit of immortal love
Stretches its arms out to embrace mankind.
Imperfect is the joy not shared by all

(আমার অমর প্রেম বাহু মেলি ডাকে আলিঙ্গন
করিতে মানবে।...নয় নয় পূর্ণ অনবদ্য কভু
সে-আনন্দ স্বাদ যার পায় নি বিশ্বের প্রতি জীব।)

এ-বাণীর আভাস বৈদিক যুগেও দিয়েছিলেন কোনো কোনো ঋষি। কিন্তু সেখানে মূল প্রস্বন (emphasis) ছিল আত্মবোধের পরেই সর্বমানবের দুঃখ ব্যথার সরিক হতে তাঁরা চান নি সে যুগে। "এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ" বটে, কিন্তু মহাত্মা বিশ্বস্রষ্টাকে জানার পরে যে জীব হৃদিবাসী শিবের সেবা করতে হবে এমন কোনো অনুজ্ঞা নেই—বরং পরের যুগ্মপাদেই বলা হল—এ মহাত্মাকে সাধনায় যাঁরা জানতে পারেন তাঁরা অমৃত হন—যে এতাদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি গীতায় একস্থানে আছে বটে যে ঋষিরা "ব্রহ্মনির্বাণ" লাভ করে "সর্বভূতহিতরত" হয়ে থাকেন, কিন্তু এখানেও প্রস্বন ব্রহ্মনির্বাণ-এর পরেই জীবসেবার পরে নয়। ভাগবত সম্বন্ধেও ঐ কথা ঃ খুঁজলে দু-চারস্থলে মেলে বৈকি "পরার্থনিষ্ঠার" কথা কিন্তু এক রন্তিদেবের বিখ্যাত প্রার্থনায় ছাড়া সর্বত্রই মূল প্রস্বন সাধকের "পরম ভাগবত" হওয়ার পরেই পরার্থনিষ্ঠ হওয়ার পরে নয়। অশ্বপতির কণ্ঠে শ্রীঅরবিন্দ জুগিয়েছেন তাঁর স্বকীয় বিশিষ্ট সর্বজীব মুক্তি-অভীপ্সার সুর তাঁকে এঁকেছেন পরদুঃখমোচনব্রতী রূপে—যাঁর হৃদয় এত বিশাল যে সব স্বার্থবোধ মুছে গেছেঃ

But now his being was too wide for self;
His heart's demand had grown
immeasurable :
His single freedom could not satisfy,
Her (The world-Mother's) light, her bliss
he asked for earth and men..
...to the darkness of the suffering world
(3.2)

(সত্তা তাঁর অহঙ্কার-মমকার-মুক্ত, হৃদয়ের
অভীপ্সা অপরিমেয়, শুধু আপনার মুক্তি তাঁর
ছিল না বাঞ্ছিত আর, চাহিতেন তিনি তারিণীর
আলোক আনন্দবর মর্ত্যের ও মর্ত্যবাসী তরে
আর্তা পৃথিবীর যুগ-অন্ধকার ঘুচাতে সাধনে)

বৈদিক যুগের তপস্বীদের তপস্যার মহিমা অনস্বীকার্য বটেই তো। কিন্তু সে যুগের ধর্ম ছিল আলাদা ঃ সাধকের আত্ম উপলব্ধিকে সর্বজীব সেবায় নিযুক্ত করতে হবে—এ বাণী এ যুগের, যার বাণীবাহরূপে শ্রীঅরবিন্দ অশ্বপতিকে এঁকেছেন অপূর্ব কাব্যোচ্ছ্বাসে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর পূর্ণযোগের যে বাণী দিয়েছেন তাঁর Life Divine-এ Synthesis of Yoga-এ সাবিত্রী মহাকাব্যেও সেই বাণী ফুটেছে তিনটি চরিত্রে নারদ, সাবিত্রী ও অশ্বপতি। কেবল অশ্বপতির মধ্যে এ-বাণী ফুটেছে তাঁর মহৎ প্রাণের বেদনা-বিধুর প্রশ্নে ঃ

"Ever the centuries and millenniums pass.
Where in the greyness is thy coming's ray?
Where is the thunder of thy victory's
wings ?....
Too little the strength that now with us is
born,
Too faint the light that steals through
Nature's lids.
Too scant the joy with which she buys our
pain.
In a brute world that knows not its own
sense,
Thought-racked upon the wheel of birth we
live
The instruments of an impulse not our own,
Moved to achieve with our heart's blood
for price
Half-knowledge, half-creations that soon
fire.

(...............................শতাব্দীর পরে যায় বহি,
শতাব্দী, যুগের পরে যুগ পুনরাবর্তনে—শুধু তোমার
আগমনীর রশ্মি কোথা এ ধূসরতায়?
তোমার বিজয়ী পক্ষ-বিধূলন-নির্ঘোষ কোথায়?......
....যে শক্তি আমরা জন্ম হতে
লভিয়াছি হায়, তাহা অতি নিঃসম্বল। সে আলোক
অতি ক্ষীণ প্রকৃতির মুখাবরণের ফাঁকে ফাঁকে
নামে যে অলক্ষিতে। বেদনার শুল্কে করি ক্রয়
যে সুখ আমরা তার কাছে—তাহা অতি ক্ষণস্থায়ী।
জন্মচক্রে চিন্তাক্লিষ্ট আমরা জীবন যাপি এক
এমন পাশব লোকে—যে জানে না নিহিতার্থ তার:

আপন নয় যে-প্রণোদনা—হয়ে তাহারি বাহন
হৃদয়ের রক্তমূল্যে করি লাভ শুধু এই অর্ধ জ্ঞান
অর্ধ সৃষ্টিকীর্তি যাহা হয় ম্লায়মান দুইদিনে।

জগজ্জননী তাঁকে আদেশ দিলেন বটে, তোমার কাজ করে যাও নিষ্কামভাবে—তাহলে যথাকালে ফলবে পরম ফল—

All things shall change in God's
transfiguring hour

(যাহা কিছু ক্ষুণ্ণ ম্লান সব হবে রূপান্তরিত
আনিবেন যবে তাঁর যুগান্তর নিখিলের নাথ)

কিন্তু যার মহাপ্রাণ মানুষের দুঃখে অশান্ত বিনিদ্র সে কি পারে ভবিতব্যের পরে সব ছেড়ে দিয়ে বলতে—তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ? না, শ্রীঅরবিন্দ বার বার বলেছেন যে, মাটির অভীপ্সা আকুলতাই একটি সর্ত দিব্যজ্যোতির অবতরণের। সাবিত্রীর মুখে এ-বাণী আরও দীপ্ত এ-এষণা আরো প্রাণস্পর্শী। কিন্তু সাবিত্রী তখনও জন্মায় নি তো—অশ্বপতির এ তপস্যা পর্বে। তাই তিনি চাইলেন দিব্যশক্তির কাছে এমন এক অবতরণ যার শক্তিতে অসম্ভব সম্ভব হবে। বললেন ব্যাকুলকণ্ঠেঃ

Mission to earth some living form of thee.
One moment fill with thy eternity,
Let thy infinity in one body live,
All-Knowledge wrap one mind in seas of
light,
All-Love throb single in one human heart.
Immortal, treading the earth with mortal
feet
All heaven's beauty crowd in earthly
limbs!..
Let a great word be spoken from the
heights
And one great act unlock the doors of
Fate.

স্বরূপের তব এক জীবন্ত প্রতিভূ ধরাতলে
পাঠাও তোমার দৌত্যে। একটি মুহূর্ত শিহরিয়া
উঠুক চিরন্তনীর স্পন্দে। তব আনন্ত্যের আলো
উঠুক একটি দেহে ঝলকিয়া। তোমার প্রজ্ঞান
হোক স্ফূর্ত মর্ত্য মনে। একটি মানব মর্মকোষে
প্রেম তব উঠুক উচ্ছ্বসি গাঢ়চ্ছন্দে। একবার
আমাদের এ পার্থিব পন্থে সে করুক বিচরণ
লয়ে অমরার রূপকান্তি অঙ্গে অঙ্গে।......একবার
একটি মহতী বাণী হোক ঝঙ্কারিত ঊর্ধ্ব হ'তে,
একটি মহাসাধনা খুলে দিক নিয়তির দ্বার।

সত্যনিষ্ঠ বাস্তববাদের (realism) সঙ্গে স্বপ্নব্রতী দুরাশার কী দীপ্ত প্রাণস্পর্শী সমন্বয়! আমরা মৃন্ময় বটে; কিন্তু তাই বলে কি চিন্ময় নই? মাটিকে মানলে কি আকাশকে বাতিল করতে হবে? না—

Its (the spirit's) feet are steadied upon
finite things,
Its wings can dare to cross the
Infinite (2.11)

অশ্বপতির অন্তর্দ্বন্দ্বের মূল এইখানেই। তিনি যুগপৎ আদর্শবাদী ও বাস্তববাদী। তাই তো তাঁর এত বেদনা—উপলব্ধি করে যে আমাদের শক্তি সীমাবদ্ধ। আমরা দুঃসাহসী হতে পারি, অসীম গগনস্পর্ধীও হতে পারি, কিন্তু মাত্র দু-চারজন পারে, এ অসাধ্যসাধন করতে। বাকি সবাইয়ের বেলায়ঃ

An imperfection dogs our highest strength
Portions and [illegible] reflections are our
share. (2.12)

(তুঙ্গতম প্রাণশক্তি মানে হার ত্রুটি-চ্যুতি-পাশে;
আমাদের অধিকার—শুধু স্বল্পে খণ্ডে প্রতিভাসে)

তাই অশ্বপতি চেয়েছিলেন দেবীশক্তির অবতরণ কোনো সীমিত মানবীর আধারে যে মানবী হয়েও হবে দেবীর প্রতিনিধি, প্রতীক। এইখানেই কাহিনী (legend) হল প্রতীক (Symbol): মানুষই হবে দেবতার প্রতিভূ, সেইজন্যেই তো তিনি মানুষের মধ্যে অবতীর্ণ হন—দেবমন্ত্রে দীক্ষা দিতে

He has made this tenement
of flesh His own..
That to His divine measure
we might rise (1.4)

(এ-মৃন্ময় দেহাধারে মূর্ত হল দেবদেব—তার
দিব্যলোকে আমাদের ঊর্ধ্বাভিসারের দীক্ষা দিতে।)

জগজ্জননীর পূর্ণ সায় ছিল এ প্রার্থনায়, তাই তো এ প্রার্থনা হয়ে উঠল অভীপ্সা (aspiration) যার ডাকে সাড়া দিতে দেবীর এত আনন্দ। বললেন তিনি বীর ভক্তকে বরাভয় দিয়েঃ "মা ভৈঃ!"

"O strong forerunner,
I have heard thy cry.
One shall descend and break the iron Law,
Change Nature's doom by the lone
Spirit's power.
Beauty shall walk celestial on the earth,
Delight shall sleep in the cloud-net of her
hair
And in her body as on his homing tree
Immortal Love shall beat his
glorious wings.
A music of griefless things
shall weave her charm;
The harps of the Perfect
shall attune her voice,
The streams of Heaven
shall murmur in her laugh,
Her lips shall be the honeycombs of God,
Her limbs his golden jars of ecstasy,
She shall bear wisdom in her
voiceless bosom,
Strength shall be with her
like a conqueror's sword
And from her eyes the
Eternal's bliss shall gaze.

A seed shall be sown in
Death's tremendous hour,
A branch of heaven transplant
to human soil;
Nature shall overleap her mortal step;
Fate shall be changed by an
unchanging will."

"ওগো মহীয়ান

অগ্রদূত! আবেদন শুনেছি তোমার আমি। হবে
অবতীর্ণা দেবী—চূর্ণ করিবে যে বজ্রের বিধান
কাটিবে যে প্রকৃতির মৃত্যুপাশে আত্মশক্তি বলে।
সুষমা স্বর্গীয় ছন্দে হবে বসুন্ধরায় চারণী,
উল্লাস ধুমাবে তার মেঘকৃষ্ণ কুন্তলের জালে।
নীড়-নিলয়ের মাঝে বিহঙ্গের সম দেহে তার
করিবে অমর প্রেম তার দিব্য পূর্ণবিধুনন।
বীতশোক ঝঙ্কারেরা বুনিবে লাবণ্য, কান্তি তার।
অচ্যুতের বীণা তার বাঁধিবে কণ্ঠের সুরে সুর
নন্দনের মন্দাকিনী হাস্যে তার উঠিবে নিক্কণ।
বিম্বোষ্ঠ তাহার হবে ভাগবত মধুচক্র। হবে
প্রতি অঙ্গ তার সুখশিহরের হিরণ্য ভৃঙ্গার।...
জ্ঞানের সে হবে ধাত্রী তার গাঢ় নিথর অন্তরে।
বিজয়ীর অসি সম শক্তি রবে সহচরী তার।
নয়নযুগলে তার ফলিবে চাহনি শাশ্বতের।
মরণের ঘোর লগ্নে উপ্ত হবে পরম অঙ্কুর।
অধরার শাখা হবে রোপিত ধরার ভূমিকায়।
আপনার মর্ত্য ছন্দে প্রকৃতি করিবে অতিক্রম।
শাশ্বত সংকল্পে এক নিয়তির হবে রূপান্তর।

সাবিত্রীর জন্মের আগে অশ্বপতি আঠারো বৎসর যজ্ঞ করেছিলেন—মহাভারতের এই কাহিনীকে শ্রীঅরবিন্দ রূপান্তরিত করেছেন প্রতীকে—দেবীর অবতরণ মানবীতে এই মহাপ্রকাশে। সূচনা করেছেন ঋষি কবি যথাযথ। ওদেশে বলে—দেবতা যদি কথা কইতেন তো বরণ করতেন প্লেটোর দিব্যভাষা। শ্রীঅরবিন্দের মহাকাব্য সাবিত্রীকে দেবীর এই অঙ্গীকার সম্বন্ধেও ঠিক কথাই বলা চলে: দেবীর বাক তো বচন নয়—সে তো বাণী, তাই ঝঙ্কার বিনা সে উচ্চারিত হবে কেমন করে?

আমার এক প্রিয় গুরুভাই আর্জব (ওরফে চ্যাডউইক) তার একটি অপরূপ কবিতায় শ্রীঅরবিন্দকে উপাধি দিয়েছিল:

A nameless is garbed in
Name's disguise..
A fadeless rhythm wrung
from Dawn's echoing skies!

(এ কোন অনামী প্রেম এল গো নামের ছদ্মবেশে
উষার ঝংকৃত নভ হতে সাঙ্গহীন ছন্দরেশে!)

সত্য কথা। শ্রীঅরবিন্দ অশ্বপতি ও পরে সাবিত্রীর মাধ্যমে যে নিখিল প্রেমের বাণী ঝংকৃত করে তুলেছেন উভয়ের নানা বিচিত্র অধ্যাত্ম ও গুহ্য (occult) উপলব্ধির পটভূমিকায় তার তুলনা নেই ইংরাজি কাব্য সাহিত্যে। ব্লেক প্রমুখ দু-একটি কবির রচনায় কিছু গুহ্যতত্ত্বের পরিচয় মেলে বটে, কিন্তু তাদের নেই বৈচিত্র্য ও ঔদার্য। চ্যাডউইক একথা আমাকে প্রায়ই বলত। তাই সেও চেয়েছিল তার নানা কবিতার প্রতীক আভাসে ইংরাজী কাব্যে নব সৌন্দর্যের আমদানী করতে। তার অকাল মৃত্যুর জন্যে তার কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেছে তবু তাঁর কবিতায় মন আমাদের মুগ্ধ হত এই নানা মধুর প্রতীকের কাব্যরূপে—যে কথা শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লিখেছেন তাকে সাধুবাদ দিয়ে* যে, আর্জব চেয়েছিল অন্তর্জীবনের নানা গভীর অনুভূতির কাব্যরূপ দিতে প্রতীকের মাধ্যমে। প্রতীকের প্রয়োজন ঐহিক কাব্যেও থাকে, কিন্তু গৌণভাবে। আধ্যাত্মিক কাব্যে প্রতীক—অবশ্য তার প্রয়োগ জানলে—যেন এক (কৃষ্ণপ্রেমের ভাষায়) স্বপ্নালু সূক্ষ্ম লাবণ্য মাখিয়ে দেয় প্রতি কবিতার কম্প্রমুখে। কিন্তু এই সুষমাই প্রতীকের একমাত্র দান নয়। প্রতীক ভাষার মাধ্যমে আমাদের এমন জগতের আভাষ দেয় যার আভাষ প্রতীক ছাড়া ফোটানো অসম্ভব। শ্রীঅরবিন্দ গভীরভাবে ভালোবেসেছিলেন বৈদিক কাব্যের এই প্রতীকবিলাস—(তাঁর Hymns to the Mystic Fire-এর অমূল্য প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, এখানে সে সব কথা বলার অবকাশ নেই, প্রয়োজনও দেখি না)—তাই সাবিত্রীর ছত্রে ছত্রে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন নানা সুষমা ও সৌরভ। উদাহরণতঃ: প্রথম সর্গেই শ্রীঅরবিন্দ দেবতাদের জাগরণের বর্ণনা করেছেন সূক্ষ্ম সান্দ্র প্রতীকবিলাসী আভাষে:

It was the hour before the Gods awake
Across the path of the divine Event
The huge foreboding mind of Night, alone
In her unlit temple of eternity
Lay stretched immobile upon
silence marge.

(যে-লগ্নে দেবতাবৃন্দ জাগে তার প্রাগুষা প্রহর।
দিব্যস্ফুরণের পথে রাত্রির ভবিষ্যচিন্তাকুল
মহামন তার অপ্রদীপ চিরন্তনের মন্দিরে
নিস্পন্দ নিষণ্ণ ছিল নৈঃশব্দ্যের তটপ্রান্তে একা।)

প্রতীকবিলাসের নানা অপরূপ দৃষ্টান্ত মেলে রবীন্দ্রনাথের বিবিধ মর্মস্পর্শী কবিতায়। একটি উদাহরণ দিই তাঁর বিখ্যাত কবিতা "বলাকা" থেকে কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করে:

"মন হল এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।
পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ,
তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি
ওই শব্দরেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা।
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।......
বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে—
"হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোনখানে।"

যাঁরা স্বচ্ছ বুদ্ধি দিয়ে এ-জাতীয় কবিতার মর্মজ্ঞ হতে চান তাঁরা নিরাশ হবেনই হবেন, কারণ এ-জাতীয় কবিতার দেয় যে বস্তু তাকে ভাষায় ধরা যায় না ছুঁয়েই তৃপ্ত। অর্থসম্ভার নয়, গন্ধবিলাস।

(ক্রমশঃ)

---

* "The mere literary critic will admire the delicate dream-like beauty of these poems, but unless his insight is more than literary, he will go no deeper, for they deal with the mysteries of the inner life and only he who can read their symbols will be able to penetrate to their heart." (POEMS by Arjava alias Chadwick..Preface by Sri Krishnaprem)

বঙ্গদর্শন

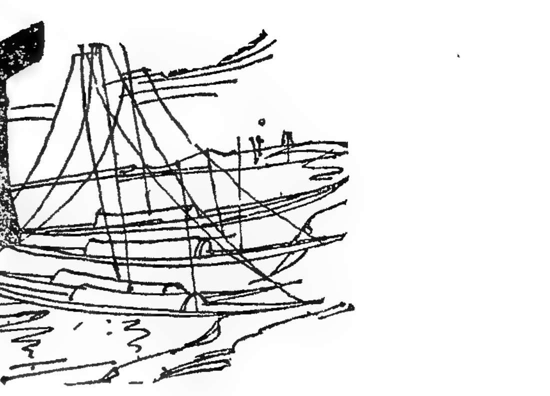

মুখ্যমন্ত্রীর একটি বিশেষ উক্তি

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীমশাই সম্প্রতি সমবায় সপ্তাহ উপলক্ষে একটি নতুন ধরণের কথা আমাদের শুনিয়েছেন। কথাটি হচ্ছে কমিউনিজমকে একমাত্র পরাজিত করতে পারে সমবায়। কথাটি শুনে একই সংগে বিস্মিত দুঃখিত ও আনন্দিত হলাম। কমিউনিজমের মূল আদর্শের সংগে সমবায়ের মূল আদর্শের তফাৎ কতখানি সেকথা অবশ্যই বিচার-সাপেক্ষ, কিন্তু তার পূর্বে এটাই আমাদের জিজ্ঞাস্য যে সমবায় বলতে আমরা এদেশে বর্তমানে যা বুঝি সেটা কি এমনই একটা আশাপ্রদ বিষয় যার উপর ভিত্তি করে এতবড় কথাটা বলা যায়?

এদেশে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে, সমবায় বলতে আমরা বুঝি কতকগুলি মতলববাজ লোকের একটি প্রতিষ্ঠান, এবং যার সদস্যবর্গের চোদ্দ আনাই বেনামী, যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন কিছু একটা করা হচ্ছে এটা দেখিয়ে সরকারী টাকা নিজেদের পকেটস্থ করা। ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, কিন্তু এটাই স্বাভাবিক নীতি। উৎপাদনমূলক সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি, দু-একটি বাদ দিয়ে, এই আদর্শই মেনে চলছে। মতলববাজ লোকের পক্ষে, বিশেষ করে শাসকদলের সংগে যাদের দহরম-মহরম আছে, সমবায়ের নামে সরকারী টাকা আদায় করা খুবই সহজ, এবং এটি একটি নিয়মিত ব্যবসা হয়ে উঠেছে। কেননা একটি ঘর, দু-একটি মামুলি যন্ত্রপাতি, এবং ব্যাঙ্কে সমিতির নামে কিছুটা গচ্ছিত অর্থ দেখাতে পারলে, কিঞ্চিৎ হাঁটাহাঁটি ও তৈলপ্রদানের দ্বারাই, ঘোষিত মূলধনের দশগুণ পর্যন্ত সরকারের কাছ থেকে পাওয়া যায়, তারপর যদি সোসাইটি ডুবে যায় বা ডুবিয়ে দেওয়া হয় তাহলেও কোন হাঙ্গামা নেই, কেননা সদস্যদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ। এই সব ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোঅপারেটিভ দিয়ে কি মুখ্যমন্ত্রী কমিউনিজমের সংগে মোকাবিলা করবেন?

সম্প্রতি আর এক ধরণের সমবায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে যার নাম কনজিউমার্স কোঅপারেটিভ বা ক্রেতা সমবায়। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি প্রতিহত করার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এগুলি গড়ে উঠেছে, কিন্তু সেগুলির ধাক্কায় দ্রব্যমূল্য কিছু কমেছে বলে খবর পাওয়া যায় নি। এদেরই বড় ভাই হচ্ছে 'সমবায়িকা' যার উদ্বোধন সেদিন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং করলেন। কিন্তু এই ক্রেতা সমবায় দিয়ে কিভাবে মুখ্যমন্ত্রী কমিউনিজমের সংগে লড়বেন তা বোঝা গেল না। আর আছে আমাদের সেকেলে সমবায় ঋণদান সমিতি যেগুলির সম্প্রতি নাভিশ্বাস উঠেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি ফতোয়ার ধাক্কায়। এই কারণেই মুখ্যমন্ত্রীর উক্তিতে বিস্মিত হয়েছি।

কিন্তু দুঃখিত এবং সেই সংগে আনন্দিত হলাম কেন? তার কারণ নিছক কথার কথা হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী যা মন্তব্য করেছেন তার মধ্যে সত্যতা যে একেবারে নেই তা নয়; বরং কথাটি খুবই সত্য। কমিউনিজমের সংগে সমবায়ের আদর্শ ও লক্ষ্যের পার্থক্য বোধ হয় খুব বেশি নেই, তবে পদ্ধতিগত পার্থক্য যথেষ্ট। শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্র আনতে গেলে তা সমবায়ের মাধ্যমেই আনা সম্ভবপর। অবশ্য এক্ষেত্রে সমবায় সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাগুলিকে অবশ্য বদলে নেবার প্রয়োজন আছে।

প্রসংগত এখানে একটি কথা উল্লেখ না করলে নয়। সামবায়িক অর্থনীতির কথা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও মহাত্মা গান্ধী বলে গেছেন, কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তির উপর সামবায়িক অর্থনীতিকে স্থাপন করে গেছেন আমাদের দেশেরই একজন বিপ্লবী ও চিন্তানায়ক যাঁর নাম মানবেন্দ্রনাথ রায়—যিনি বলেছিলেন যে প্রকৃত সমাজতন্ত্র সমবায়ের মাধ্যমেই নিখুঁতভাবে গড়ে তোলা সম্ভব, কেননা রাষ্ট্রশক্তি নির্ভর সমাজতন্ত্রে সামাজিক উৎপাদন ও রাষ্ট্রীয় মালিকানার বিরোধ সেইরকমই থাকবে, যেরকম বর্তমান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আছে সামাজিক উৎপাদন ও ব্যক্তিগত মালিকানার বিরোধ। একমাত্র সামবায়িক অর্থনীতির দ্বারাই সামাজিক উৎপাদন ও সামাজিক মালিকানার সমন্বয় হতে পারে। তার অর্থ হচ্ছে প্রতিটি যন্ত্রশিল্পের মালিকানা ধাপে ধাপে সেই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের হাতে তুলে দিতে হবে, দেশের সমগ্র কৃষি-যোগ্য জমির মালিকানা ভূমিহীন ভূমিশ্রমিকদের হাতেই তুলে দিতে হবে, কেননা শ্রম ও মূলধনের বিরোধের একমাত্র সার্থক মীমাংসা হতে পারে সমবায়মূলক নীতির প্রযুক্তির দ্বারা। যেহেতু সামবায়িক ব্যবস্থা শ্রমিকদেরই পারস্পরিক যৌথ উদ্যোগের ফল, সেখানে আলাদা কোন মালিক-শ্রমিক শ্রেণী থাকতে পারে না। এই অর্থে সমবায় কমিউনিজম ঘোষিত লক্ষ্যে হয়ত কোনদিন সমাজকে নিয়ে যেতে পারে, কমিউনিস্ট পদ্ধতি অবলম্বন না করেও।

কাজেই মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের মধ্যে কিছুটা সত্য থাকলেও, তিনি এবং তাঁর রাজনৈতিক দল যখন এইরকম কোন সামবায়িক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করার কোন পরিকল্পনা নেন নি, এবং অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতেও নেবেন না, তখন শুধু শুধু এই জাতীয় উপদেশ দেওয়া কেন? মুখ্যমন্ত্রী কুচো চিংড়িকে গলদা চিংড়ির বাচ্চা বলে চালাতে চাইছেন। কিন্তু তা হবে কেন? পশ্চিমবঙ্গের সমবায় সমিতিগুলির হাল দেখে এই কথা কি কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি কল্পনাতেও আনবেন যে এইগুলি কমিউনিজম রোধ করার সাক্ষাৎ অ্যাটম বোমা?

অথ-পুলিশ-ঘটিত

হঠাৎ যদি আপনাকে কেউ এসে বলে যে বাজারে চাল পঞ্চাশ নয়া পয়সা কিলো, গম পঁচিশ নয়া পয়সা কিলো, চিনি সত্তর

দরে বিক্রী হচ্ছে, তাহলে আপনি ভাববেন যে হয় লোকটির মাথা খারাপ, না হয় ঈশ্বরের করুণায় ভারতবর্ষে স্বর্গরাজ্য অকস্মাৎ নেমে এসেছে।

কিন্তু বিশ্বাস করুন সে স্বর্গরাজ্য সত্যই নেমে এসেছে, তবে ঈশ্বরের করুণায় নয়, কংগ্রেস সরকারের করুণায়, তবে সকলের দুয়ারে নয়, ঊনষাট হাজার পুলিশ কর্মচারীর জীবনে। সরকার তাদের বেতন না বাড়িয়ে সম্প্রতি উপরি-উক্ত মূল্যে তাদের খাদ্যশস্য সরবরাহ করবেন বলে স্থির করেছেন। গণ-আন্দোলন-সমূহকে লাঠিবাজি ও গুলীবাজির দ্বারা সায়েস্তা করার এবং ভবিষ্যতে তারা যাতে নির্বিচারে আরও বেশি করে তা করতে পারে সেইজন্য পুলিশের বরাতে এই প্রাপ্তিযোগ।

কিন্তু পুলিশের প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই দাক্ষিণ্য সত্ত্বেও যে জিনিসটি সর্বাগ্রে আমাদের চোখে পড়ছে তা হচ্ছে এই যে পুলিশ চরিত্রভ্রষ্ট হয়েছে। যে কোন সভ্য দেশেই সাধারণ মানুষের হিতকারী ও বন্ধুভাবাপন্ন হিসাবে পুলিশ শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু স্বাধীন ভারতের পুলিশ নিজ কর্মফলে জন-সাধারণের অশ্রদ্ধা ও ঘৃণাই কুড়োচ্ছে, এবং এমন একদিন আসবে যেদিন এর পরিণাম হবে মারাত্মক।

পুলিশ আইনের শাসনের প্রতীক, কিন্তু বর্তমানে স্বাধীন ভারতের উনিশ বছরে তার মূল কাজের ক্ষেত্রটি বিনষ্ট হয়েছে। প্রশাসনিক দূরদৃষ্টির অভাবে এবং অযোগ্যতায় সারা দেশ আজ হয়েছে দুর্নীতির মধুচক্র, আর সেই মধুচক্রের মধু লোটার কাজেই পুলিশের আজ সকল সময় নিয়োজিত। যেখানে যেখানে সরকারের শ্রীহস্ত প্রসারিত হচ্ছে সেখানেই পুলিশের ফালতু উপার্জনের উৎস খুলে যাচ্ছে। সরকারের খাদ্যনীতির কৃপায় পুলিশের চেয়ে লাভবান আর কেউ হয় নি। ছানাজাত মিষ্টান্ন বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও প্রায় প্রতিটি দোকানেই তা গোপনে বিক্রয় হয় এবং ফাঁকতালে পুলিশের পকেটেও দু'পয়সা আসে। বিনা পরিশ্রমে কালোটাকা অর্জনের ক্ষেত্র পুলিশের যতই বেড়ে যাচ্ছে ততই সে তার মূল কাজ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

এতখানি দীর্ঘ ভূমিকার কিছুটা প্রয়োজন আছে। কল্পনা করতে পারেন পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যে কলকাতার উপ-কণ্ঠে একটি শহরতলীতে মানুষের জীবনের প্রাথমিক নিরাপত্তাটুকু নেই? কল্পনা করতে পারেন, আপনি বাইরের লোক, বেলঘরিয়ায় কোন কাজের জন্য এসেছেন, রাস্তার মাঝখানে সহস্র চক্ষু তথা পুলিশের নাকের ডগার উপর আপনার যথাসর্বস্ব ছিনতাই করে নেওয়া হবে, আপনি বাধা দিতে গেলে আপনাকে প্রহার করা হবে, হত্যা পর্যন্ত করা হতে পারে, অথচ কোন প্রতিকার চেয়ে পাওয়া যাবে না? কল্পনা করতে পারেন, এই এলাকার পুলিশের দুয়ারে আপনার উপর অত্যাচারের কথা লিপিবদ্ধ করাতে গেলে আপনার অধিকতর নিগৃহীত হবার সম্ভাবনা? কল্পনা করতে পারেন, যাদের চোখের সামনে মানুষ খুন করা হয় তারা প্রাণের ভয়ে এ বিষয়ে যথাস্থানে জানায় না, কেননা তারা জানে যে পুলিশ ওই খুনেদেরই দোসর? কল্পনা করতে পারেন, এই এলাকার মুকুটহীন সম্রাট পশ্চিমবঙ্গ সরকার নয়, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নয়, একজন কুখ্যাত সমাজবিরোধী? এর পরেও কি কল্পনা করতে পারেন যে বেলঘরিয়া নামক অঞ্চলটি পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত?

বেলঘরিয়ায় সমাজবিরোধীদের উপদ্রব আজ নতুন নয়। অথচ আশ্চর্যের বিষয় চব্বিশ পরগনার পুলিশ এ বিষয়ে শুধু উদাসীনই নয়, পরোক্ষে এই সমাজ-বিরোধীদের সমর্থক। কোন কোন দায়িত্বশীল মহল থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে শাসকদলের মাতব্বরদের সঙ্গে বেলঘরিয়ার সমাজবিরোধীদের দহরম-মহরম সম্বন্ধ, যে কারণে তারা প্রকাশ্য দিবালোকে সর্বজনসমক্ষে মানুষ খুন করেও পার পেয়ে যায়। এ অভিযোগ যদি সত্য হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গে আগামী দিনগুলির বীভৎস ছবি এখনই মনশ্চক্ষে ভেসে উঠছে। কলকাতার নিকটবর্তী আরও কতকগুলি স্থানেও বেলঘরিয়ার হাওয়া লেগেছে।

একজন দায়িত্বশীল পুলিশ কর্মচারী আমায় বলেছিলেন যে পুলিশ ইচ্ছা করলে মাত্র এক ঘন্টায় বেলঘরিয়ার আইন ও শৃঙ্খলার সমস্যা সমাধান করতে পারে। আইন পুলিশের হাতে যে ক্ষমতা দিয়েছে তাতে পুলিশের পক্ষে তামাম সমাজ-বিরোধীদের লক আপে পুরতে ওর চেয়ে বেশি সময় লাগার কথা নয়। প্রিভেন্টিভ মেজার হিসাবে পুলিশ যে কোন মুহূর্তে তা করে নাগরিকজীবনে নিরাপত্তার মনো-ভাব পুনরায় ফিরিয়ে আনতে পারে। কিন্তু কোন্ গূঢ় স্বার্থে অথবা কাদের প্ররোচনায় পুলিশের এই সদিচ্ছা জাগছে না? এ বিষয়ে অবিলম্বে তদন্ত হওয়া দরকার।

শিরে হৈল সর্পাঘাত

প্রথম সংবাদ, রেশনে চাল ও গমের মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে; দ্বিতীয় সংবাদ রেশনে চাল দেওয়া স্থগিত থাকবে; তৃতীয় সংবাদ খাদ্যের জাহাজ নাকি আটকে আছে কিন্তু খাদ্য তোলা হচ্ছে না; চতুর্থ সংবাদ পশ্চিমবঙ্গের সরকারী গুদাম শূন্যপ্রায়; পঞ্চম সংবাদ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঘন ঘন কেন্দ্রের নিকট এস-ও-এস অর্থাৎ সেভ আওয়ার সোল, অর্থাৎ আমাদের আত্মাকে (বরঞ্চ বেলী বা পেট বললেই ভাল হত) রক্ষা কর, এই আর্ত আবেদন ঘন ঘন কেন্দ্রের নিকট পাঠাচ্ছেন এবং কেন্দ্র যথারীতি সমবেদনার পর সমবেদনা জানিয়ে যাচ্ছে এক কণা চালও না পাঠিয়ে।

সপ্তম সংবাদটি অবশ্য সংবাদপত্রের নয়, আমার নিজস্ব অনুসন্ধানের ফল, কালোবাজারের চালের দর হু-হু করে চড়ে যাচ্ছে এবং কর্ডনের বেষ্টনী পার হয়ে চাল নিয়ে আসার প্রবণতা ভয়ানকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। (অবশ্য এই পাচার করা চাল সকলের ভোগে লাগবে না, বেশি দাম দিয়ে চাল কেনার সামর্থ্য যাদের আছে তারাই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারবে)। আর দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ ইতিমধ্যেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে।

সম্রাট পঞ্চদশ লুই মরবার আগে বলে গেছলেন, আফটার মি দি ডেলিউজ। অর্থাৎ আমার পরেই বন্যা আসছে যা রোধ করা যাবে না। এবং সত্যিই বন্যা এসে-ছিল ফরাসী বিপ্লবে এবং তা রোধ করা যায় নি। তবে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমানে যা অবস্থা, মুখ্যমন্ত্রীমশাই বুক ফুলিয়ে বলতে পারবেন, 'আমার জীবনকালেই বন্যা আসবে এবং পশ্চিমবঙ্গের অর্ধেক লোক তাতেই ডুবে মরবে, আর আমি বহাল তবিয়তে টিকে থাকব।'

লোকে রেশনের দোকানে গিয়ে শূন্য হাতে থলি নিয়ে ফিরে আসছে, চাল নেই। অথচ কোন প্রতিবাদ নেই, কোন বিক্ষোভ নেই। পশ্চিমবঙ্গে আশ্চর্য এক ভেড়ার পালের সৃষ্টি হয়েছে। অথচ ভাবতে অবাক লাগে মাত্র ক'মাস আগেই সারা পশ্চিমবঙ্গে আগুন জ্বলেছিল।

অবশ্য জনসাধারণকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। তাঁরা সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন তুলতে পারেন, "কোন্ ভরসায় এবং কিসের ভরসায় আমরা জীবন তুচ্ছ করে আন্দো-লনে ঝাঁপিয়ে পড়ব? কাদের কথায় বিশ্বাস রাখব? আমরা যাদের হাতে আগামী পাঁচ বছরের জন্য নেতৃত্ব তুলে দিতে রাজী ছিলাম তাঁরা আমাদের ইচ্ছার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। যাঁদের কথায় বিশ্বাস করে আমরা পূর্বে আন্দো-লনে নেমেছি, পুলিশের গুলীতে জীবন দিয়েছি এখন দেখছি আমাদের সেই আত্মত্যাগের মূল্যে তাঁরা রাজনৈতিক বার্গেনিং করতে চেয়েছিলেন। আমরা

গেছে যে আম ফলে না সে সত্য আমরা তিক্ত অভিজ্ঞতায় নতুন করে উপলব্ধি করছি।"

শাসকদল তথা মুখ্যমন্ত্রী জনসাধারণের এই মনের কথাটি উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলেই নির্বাচনের প্রাক্-মুহূর্তে তাঁরা বুক ফুলিয়ে বলতে পারছেন, "চাল দিতে পারব না; রেশনে চাল ও গমের দাম আরও বাড়াব, কি করতে পার কর।" গত ইলেকসনের আগেও এই রকম কথা বলতে কংগ্রেস সরকার সাহস করত না, বরং আমার যতদূর স্মরণ হয়; নির্বাচনের প্রাক্-মুহূর্তে সকল ক্ষেত্রেই জনসাধারণকে কিছুটা কনসেশন দেওয়া হত। গত খাদ্য আন্দোলনের পরেও কিছুকাল কংগ্রেস সরকারের মনে ভীতির মনস্তত্ত্ব কাজ করছিল, কিন্তু যে মুহূর্তে সরকার দেখলেন যে পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলের স্বয়ংঘোষিত মাতব্বরগোষ্ঠী খাদ্যসমস্যা আলোচনা টেবিলে বন্দীমুক্তির কথাই মুখ্য করে তুললেন তখনই সরকার বুঝে নিলেন যে এরা ঢোড়া সাপ যতই ফোঁস ফোঁস করুক না কেন দংশন করার শক্তি এদের নেই।

একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল চিরকাল দাবি করে আসছে যে গত ফেব্রুয়ারী-মার্চের খাদ্য আন্দোলন নাকি তারাই করেছে। তাই যদি হয় তাহলে সেই আন্দোলনে নিহত ব্যক্তিদের মৃত্যুর দায়িত্ব সেই পার্টির উপরেও অনেকখানি বর্তায়, কেননা তাদের ভাষ্য অনুযায়ী তারাই এই মানুষগুলিকে গুলীর মুখে ঠেলে দিয়েছে। পৃথিবীর সকল স্থানেই আজও পর্যন্ত সাফল্যের উপরেই উপায়ের ন্যায্যতা নির্ভর করে। যদি আগামী নির্বাচনে তাঁরা কংগ্রেসকে পরাজিত করতে পারতেন, তাহলেই বোঝা যেত তাঁদের সেই আন্দোলন সাফল্যলাভ করেছে। কিন্তু যখন তাঁরা পুরোনো ব্যবস্থাকে বদলাতে সক্ষম নন, এবং নিজেদের শক্তির সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে তাঁরা রীতিমত সচেতন তাহলে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে ওঠে যে তাঁরা জেনেশুনেই লোকগুলিকে মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দিলেন? বিগত খাদ্য আন্দোলনে অতগুলি লোক প্রাণ দিয়েছিল কিসের জন্য?

বস্তুত কয়েকমাস পূর্ব পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে যে একটা আশাবাদ দেখা দিয়েছিল, তার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটেছে। সাধারণ মানুষ অধিকতর নৈরাশ্যে আজ ভেঙে পড়েছেন। তাই আজ যখন সকলের মুখের উপর সরকার স্পষ্ট ঘোষণা করছেন যে তাঁরা আর দেশবাসীকে চাল যোগাতে পারবেন না, মানুষ তাঁদের প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন, আর কারো উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে না পেরে হয়ত তাঁরা ভাবছেন যে সরকার বুঝি শেষ পর্যন্ত এতটা নিষ্ঠুর হবেন না।

বাম ঐক্য প্রচেষ্টা ব্যর্থ

২০ই নভেম্বর সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলাম বাম ঐক্য প্রচেষ্টার সর্বশেষ সংবাদ জানার জন্য। আলোচনার ঘটনাচক্রের গতি দেখেই পরিণামটা আঁচ করা গেছল, তবুও একটা ক্ষীণ আশাবাদ অনেকের মনের মধ্যে ছিল।

খোলাখুলিভাবে স্বীকার করতে বাধা নেই যে বিগত কয়েক মাসের গণ-আন্দোলন, বিক্ষোভ ইত্যাদির ফলে বামপন্থী দলগুলি একে অন্যের যত কাছাকাছি এসেছিলেন এবং জনসাধারণের চোখে তাঁদের মর্যাদা যেভাবে বেড়ে গিয়েছিল, কমিউনিস্ট পার্টির দুই শরিকের কোন্দলে তার পরিসমাপ্তি ঘটল অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে।

আমরা কোন বিশেষ ক্রীডে আস্থাশীল নই, কোন দলের ঢাক পেটানও আমাদের কাজ নয়। জনসাধারণের অবস্থা চিন্তা-ভাবনা, আশা-নিরাশার চিত্র প্রতিফলনের পবিত্র দায়িত্বই আমরা বহন করে চলেছি। নিজেদের সাংবাদিকজীবনের অভিজ্ঞতায় আমরা যা দেখেছি তা থেকে একটিমাত্রই সিদ্ধান্ত করা যায়। জনসাধারণ বামপন্থী নেতাদের কার্যকলাপ দেখে সঙ্গতভাবেই এ কথা অনুধাবন করেছেন যে তাঁরা জনসাধারণের স্বার্থের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।

এ-অভিযোগ শুধু আমরাই করছি না, বামপন্থী ঐক্য প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার সংবাদে জনসাধারণের বিক্ষোভ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। চলচ্চিত্র সঙ্গীত নাট্যশিল্পীদের একজন প্রতিনিধি প্রকাশ্যেই ঐক্যভঙ্গের জন্য জনসাধারণের প্রতি বিশ্বাসভঙ্গের দায়ে বামপন্থী নেতাদের অভিযুক্ত করেছেন। শহর ও শহরতলীর কয়েকটি ক্লাব ও সংগঠনের প্রতিনিধিরা ঘোষণা করেছেন যে জনসাধারণ বামপন্থীদের এই অনৈক্যের পথ বরদাস্ত করবেন না। এমন কি কয়েকজন দায়িত্বশীল বামপন্থী নেতা জানিয়েছেন যে জনসাধারণের নিকট কোন কৈফিয়ত দেবার অধিকার তাঁদের নেই।

ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা বামপন্থী নেতাদের আশা করি বোঝানোর কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু যাঁরা দলীয় স্বার্থে দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিতে উদ্যত হয়েছেন সেই বিবেকহীন নেতাদের একটি বাস্তব শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয়তা আছে। সেই শিক্ষাটি হচ্ছে, জনমত পার্টি নেতার অনুশাসনে চলে না। গতকাল সন্ধ্যায় একজন বামপন্থী কর্মী আমাকে বলেছিলেন যে নেতাদের সামান্য ভুলেই কর্মীদের সর্বনাশ হয়। যাঁরা এই ঐক্য বানচাল করতে সবচেয়ে বেশি তৎপর হয়েছিলেন তাঁরা তাঁদের কর্মীদের মতামত কি ইতিপূর্বে নিয়েছিলেন?

সাধারণ শত্রুকে উপেক্ষা করে জ্ঞাতি-শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করার যে প্রচেষ্টায় দেশটাকে জাহান্নমের পথে ঠেলে দিতে যাদের আপত্তি নেই তারা নিজেরাই যে আগামী নির্বাচনে সেই একই পদ্ধতির শিকার হবে। এ কথাটা বোধ হয় খেয়াল করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছে না। এই ব্যাপারে তারা নিজেদের জনসাধারণের সামনে এতই বিরক্তিকর করে তুলল যে নিশ্চিতভাবে যে ভোটগুলি বামপন্থী বাক্সে পড়ত তার একটা উল্লেখযোগ্য অংশই কংগ্রেসী বাক্সে পড়বে। দেশের জনসাধারণ এখনো পর্যন্ত মনে-প্রাণে নন-পোলিটিকাস কাজেই বামপন্থীরা কোন কার্যের নয় শুধুমাত্র এই শ্লোগানেই কংগ্রেস অধিকতর ভোট সংগ্রহ করতে পারবে।

কিন্তু জনসাধারণ বোধ হয় এবার চুপ করে থাকবেন না। একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক দল যতই চিল্লান না কেন বিগত খাদ্য আন্দোলন তাঁরা করেন নি, করেছিলেন জনসাধারণ—সেটা ছিল জনসাধারণের ক্ষোভের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ। সেই বিকাশ আবার ঘটবে, সেদিন কি তাল সামলাতে এই সব নেতারা সক্ষম হবেন? শিল্পীসমাজের মুখপত্র জানিয়েছেন যে এই বিষয় তাঁরা নীরব থাকবেন না, জনস্বার্থের তাগিদে নিজস্ব পদ্ধতিতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবেন যাতে তথাকথিত কয়েকজন বামপন্থী নেতা নিজেদের স্বার্থে দেশের স্বার্থ নষ্ট করতে না পারেন।

রাষ্ট্রীয় পরিবহনের এন্তেকাল

কলকাতার রাস্তায় নতুন করে প্রাইভেট বাসের অভ্যুদয় নানাবিধ কারণে সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য বহন করছে, এটিকে কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে দেখলে চলবে না। কেন না এই একটি ঘটনার মধ্য দিয়েই ভারতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের আভ্যন্তরীণ চিত্রটি ফুটে উঠছে অতি নিখুঁতভাবে।

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ নিশ্চয়ই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটা একটা লক্ষ্য করার বিষয় যে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর মৃত্যুর পর থেকেই ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্রের আদর্শ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীর আমলেও সমাজতন্ত্র কথাটির ব্যবহার ছিল, কিন্তু বর্তমানে

এই কথাটির ব্যবহারও আস্তে আস্তে কমে আসছে। সেই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের এলাকাও ধীরে ধীরে সংকুচিত হচ্ছে, এ কথাটাকে জোর করে অস্বীকার করা যাবে না। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে দক্ষিণ-পন্থী প্রবণতা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। নয়াদিল্লীর বর্তমান রাজনীতির টানা-পোড়েন থেকে যে কোন বুদ্ধিমান সংবাদপত্রপাঠকই এ কথা বুঝে নেবেন।

তাহলে কি এমন একটা সিদ্ধান্ত করা যায় যে ভিতরের দক্ষিণপন্থী প্রবণতার ক্রমবর্ধমান চাপ এবং বাইরের পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলির সতর্ককণ্টকিত দাক্ষিণ্যের ক্রম-বর্ধমান প্রভাবের ফলে সরকার রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের নীতি পরিহার করতে চলেছেন, এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগসহ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পুরোদস্তুর স্বরূপে ফিরিয়ে আনার যে চেষ্টা শুরু হয়েছে তার প্রথম বলি পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রীয় পরিবহন?

পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থাকে লিকুইডেশনের দেবার মত এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয় না, তবুও এর পক্ষে যে একটা সূক্ষ্ম প্রচারকার্য চলছে এটাকে অস্বীকার করা যায় না এবং যখন আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করা যায় যে, সরকারের তরফ থেকেই রাষ্ট্রীয় পরিবহনের ব্যর্থতা নিয়ে বেশ জোরের সঙ্গেই ঢাক-ঢোল বাজানো হচ্ছে, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন মারফত বেশ জোরের সঙ্গেই এই সংস্থার দৈনিক লোকসানের কথা প্রকাশ করা হচ্ছে তখন সিদ্ধান্ত অনেকটা অনিবার্য হয়ে ওঠে যে এর পিছনে কোন গুরুতর মতলব আছে।

যাত্রীরা টিকেটের পয়সা ফাঁকি দেন এবং সেই কারণেই এই প্রতিষ্ঠানের প্রত্যহ এত লোকসান হয় একথাটা শুধু মিথ্যাই নয়, দুরভিসন্ধিমূলক। বিনা টিকেটের যাত্রীর সংখ্যা এত কম যে সেটাকে একটা ফ্যাক্টর হিসাবে গণ্য করার কোন অর্থই হয় না। সেরকম বিনা টিকেটের যাত্রী প্রাইভেট বাসেও থাকে, এবং প্রাইভেট

কালিদাস নাগ

বাসের কণ্ডাক্টররাও চতুর্মুখ ব্রহ্মা নয় যে তাদের চোখ এড়ানো যাবে না।

আসলে স্টেট বাস ততক্ষণ পর্যন্ত লাভজনক সংস্থা হয়ে উঠবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত আমলাতান্ত্রিক পরিচালনব্যবস্থা থেকে এই প্রতিষ্ঠানকে মুক্ত করা যায়। মাথাভারী শাসনব্যবস্থাই স্টেট বাসকে জাহান্নামের পথে পাঠাচ্ছে। যেখানে আমলাতন্ত্র সেখানেই কায়েমী স্বার্থ, দুর্নীতি, অযোগ্যতা, অলসতা এবং দূর-দৃষ্টিহীনতা। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ তখনই সার্থক হতে পারে যখনই তাকে আমলা-তন্ত্রের ফাঁস থেকে মুক্ত করা যায়। কথাটা শুধু স্টেট বাসের ক্ষেত্রেই নয়, সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই আমলাতান্ত্রিকতার জন্যই ভারতের সকল রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের অবস্থাই সমান শোচনীয়।

কিভাবে রাষ্ট্রীয় পরিবহনকে লাভ-জনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা যায় সে কথা আমরা পূর্বে বহুবার বলেছি, গত সংখ্যার বঙ্গদর্শনেও তা আলোচনা করেছি। প্রাইভেট বাসের কর্মীরা যে সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে সেগুলি রাষ্ট্রীয় পরিবহনের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। সর্বাগ্রে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে কণ্ডাক্টার ও ক্লিনারের সংখ্যা বৃদ্ধি, কেন না প্রতিটি প্রাইভেট বাসে যেখানে দুজন করে কণ্ডাক্টার এবং দুজন করে ক্লিনার থাকে সেখানে স্টেট বাসে মোট দুজন কণ্ডাক্টার, অতিকায় স্টেট বাসের পক্ষে যা একান্তই নগণ্য। দ্বিতীয়ত কণ্ডাক্টার-দের কমিশনভিত্তিক কাজ হওয়া উচিত যাতে তারা অধিকতর কর্মক্ষম হতে পারে। তৃতীয়ত বাসগুলির দায়িত্ব দিতে হবে ড্রাইভার-কণ্ডাক্টার, ক্লিনারদের হাতে। প্রতিটি বাসের স্টাফ নির্দিষ্ট থাকা দরকার, একই 'ড্রাইভার' আজ এ বাস, কাল ও বাস, পরশু সে বাস করলে বাসের আয়ু বেশিদিন থাকে না।

পরিচ্ছন্ন নীতির অভাবেই রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা আজ ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। সম্ভবত সরকারও চান যে এই সংস্থার মৃত্যু ঘটুক যে কারণে আজ তাঁরা খাল কেটে কুমীর আনার বন্দোবস্ত নিজেরাই পাকা করেছেন। আমাদের আশঙ্কা আজ স্টেট বাসের বরাতে যা ঘটেছে আগামী কাল তা অপরাপর রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্রেও ঘটবে। সেই অশুভ দিনগুলির ইঙ্গিত এখন থেকেই পাওয়া যাচ্ছে।

কালিদাস নাগ স্মরণে

এ সপ্তাহের অপরাপর উল্লেখযোগ্য সংবাদের মধ্যে আছে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক কালিদাস নাগের পরলোকগমন। তাঁর মত প্রথিতযশা ঐতিহাসিক বিশেষ কোন পরিচয়ের অপেক্ষা রাখেন না। রবীন্দ্র-নাথের সাহচর্যে সৌভাগ্যবান এই প্রতিভা-ধর পুরুষ ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মকথা জগদ্বাসীর নিকট শুনিয়েছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীও আমাদের শাশ্বত সম্পদ। পরিণত বয়সে তাঁর মৃত্যু হলেও তাঁর মনীষার ফসল দেশবাসী আরও কিছুকাল ভোগ করতে পারলে অবশ্যই ভাল হত। আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায় সংকলিত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায়ণ

মূল্য: দুই টাকা

"অমূল্য গ্রন্থ হয়েছে।"
—স্বামী অপূর্বানন্দ।

"বইখানি নতুন ধরণেরই হয়েছে।"
—স্বামী সদাত্মানন্দ।

"বইখানি দেখিতে সুন্দর, বিষয়বস্তু অমল ও অতুলনীয়। একখানি গ্রন্থে এত মহামূল্য রত্নের সন্নিবেশ পূর্বে আর হয় নাই।"
—স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী।

মহাকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বৃত্র-সংহার কাব্য

দাম: ২·৫০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

বিপ্লবী প্রচেষ্টার একটি বিস্মৃত অধ্যায়

—সত্যেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বিপিনদা স্মরণে

জন্ম—৫ই নভেম্বর, ১৮৮৬

তিরোধান—১৫ই জানুয়ারী, ১৯৫৪

[বিপ্লবী অধিনায়ক বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় জীবিত থাকলে এই বছরের নভেম্বর মাসে তাঁর আশি বছর বয়স পূর্ণ হোত। সেই হিসেবেই তাঁকে এই স্মরণ করার প্রয়াস।]

বাংলায় বিপ্লব-প্রচেষ্টার লুপ্ত পাতার কথা ভাবতে গেলে মনে পড়ে শ্রীঅরবিন্দের শাশ্বত বাণী—"দিয়ে দাও তোমাদের যথাসর্বস্ব; আপনাকে চিনে পবিত্র কর নিজেদের সত্তাকে; পূর্ণ কর আমার ইচ্ছা, পরিহার কর কল্পনার অনুসরণ।" (দি আইডিয়া অফ দি কর্মযোগীন—শ্রীঅরবিন্দ পৃঃ ১৬)—। দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে বাংলায় বিপ্লবের বলিষ্ঠ সংগঠন প্রচেষ্টায় যে সমস্ত বিপ্লবী নিঃশব্দে নিজেদের কর্মশক্তি আজন্ম তিলে তিলে প্রয়োগ করে গেছেন, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী তাঁদেরই অন্যতম। এই জীবনটিতে হিংসা অহিংসার তত্ত্বকথা চিন্তা করার সময় ছিল অল্প, জয়-যশ-আদর্শ প্রতিষ্ঠার কল্পনা ছিল দূরে পরিত্যক্ত। বেপরোয়া ছিলেন তিনি সত্য, কিন্তু মরীয়া হয়ে নিরাশ উন্মত্ততা এই জীবনে কখন প্রকাশ পায় নি। বিপিনবিহারী বাংলার বিপ্লবী জগতে 'বিপিনদা' নামেই ছিলেন সুপরিচিত।

প্রায় এক শতাব্দী ধরে বাঙালীর স্বাজাত্যবোধের যে ক্রমবিকাশ ঘটেছিল বিংশ-শতাব্দীর সুরু থেকেই তার সক্রিয় প্রকাশ। দেশপ্রেমের আইডিয়া, দেশোদ্ধারের জন্য আত্মত্যাগের মধ্যেই পরম সার্থকতার পথ যাঁরা সেদিন খুঁজে নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিপিনদার ছিল একটা বিশেষ ব্যক্তিত্ব। দেশের মাটিতে সুরু থেকেই বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে ছিল তাঁর আত্মার সংযোগ। ঊনবিংশ শতাব্দী ছিল আমাদের দেশের এক যুগ-সন্ধিক্ষণ। এই সময়ে যে সমস্ত মনীষীর জন্মগ্রহণে বাংলা দেশ উজ্জ্বল, ভাস্বর, বিপিনদাকে তাঁদের মধ্যেই একজন ধরলে নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হবে না। আজন্ম বিপ্লবী এই মানুষটির বৈপ্লবিক ক্ষেত্রে চলা ফেরার কথা অধিকাংশই ছিল রহস্যজনক। মিস্টার টমাস জোনসের ভাষায় "তিনি ছিলেন একজন বিপ্লব বা প্রজাতন্ত্রের প্রতীক; এমন একটি মানুষ যাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রে বহু সুন্দর ও কোমল গুণ ছিল; কিন্তু তবুও, তিনি ছিলেন এমন একটি সত্তা যাঁকে ভালবাসা অপেক্ষা লোকে ভয় করতো বেশি।" (ডিউটিজ অফ ম্যান এন্ড আদার এসেজ—জোসেফ মেজিনি, পৃঃ সাত)—। মিথ্যা যা কিছু, অন্যায় যা কিছু এই মানুষটির কাছে তা সকল সময়ই নাড়া খেয়েছে কঠোর হাতে। সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে দেশে প্রজাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য। তবে তাঁর কর্মপন্থা ছিল গুপ্ত। আপনার বলতে ছিল তাঁর দেশের দুরন্ত ও সাহসী ছেলের দল। সাধনক্ষেত্র ছিল তাঁর লোকচক্ষুর অন্তরালে, নির্জন, নিভৃত স্থানে। স্বদেশপ্রেম যখন এদেশে গুরু অপরাধ বলে গণ্য হতো, রাজনৈতিক চেতনা যখন অতি সামান্য সংখ্যক মধ্যবিত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ, ঠিক সেই আবহাওয়ার মধ্যে বিপিনদার কাছে শত শত যুবক দেশের জন্যে বৈপ্লবিক আন্দোলনে দীক্ষিত হয়েছিলেন—সম্ভবত এইটাই তাঁর জীবনের বৃহত্তর কৃতিত্ব। এই সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের কথা মনে পড়ে। কথা প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছিলেন—"এখন আমার একমাত্র বাসনা দেশটাকে জাগিয়ে তোলা—নিজের ক্ষমতায় বিশ্বাস হারিয়ে কিছুতেই সাড়া দিচ্ছে না ঐ ঘুমন্ত লিভাইয়্যাথানটি।" (স্বামী বিবেকানন্দের ওয়ার্কস, পার্ট-সাত—মায়াবতী এডিসন, পৃঃ ১৮৬)—। স্বামীজী অন্য সময় বলেছিলেন—"আমরা যা চাইছি সেটা হচ্ছে কতকগুলি যুবক যারা সকল কিছু ত্যাগ করে দেশের জন্যে জীবনটিকে উৎসর্গ করবে। (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৬৮)—। বিপিনদা জেলে গেছেন, কিংবা রাজবন্দিরূপে গ্রেপ্তার হয়েছেন, অথবা বন্দীজীবন থেকে সাময়িক মুক্তিলাভ করে বাড়ি ফিরেছেন, সকল সময়ই অগ্র পশ্চাৎ জয়ধ্বনি লাভের সৌভাগ্য থেকে তিনি ছিলেন বঞ্চিত। আবার স্বাধীনতা লাভের পরেও মন্ত্রিত্ব ইত্যাদি পদ থেকে তাঁর স্থান ছিল একটু দূরে।

সাধারণ দেশবাসীর কাছে তিনি ছিলেন একজন অ্যানার্কিস্ট নামে পরিচিত। তবে ইংরেজ কর্মচারীরা তাঁকে ঠিকই দেখেছিলেন একটি স্বাধীনতা-প্রয়াসী বিপ্লববাদী হিসেবে। পূজা-পদ্ধতি, যোগাভ্যাস ইত্যাদি তাঁর কাছে ছিল অজ্ঞাত। যোগ ছিল তাঁর কর্ম। আর পূজার প্রতীক ছিল তাঁর দেশের অসহায় দুর্বল, নির্যাতিত মানুষ। শেষের দিকে তিনি তাই প্রায়ই বলতেন চাষী, শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে কাজ করার জন্যে। কেন না তাঁর বিশ্বাস ছিল "পরবর্তী বিপ্লব আসবে কৃষক ও শ্রমিকের দ্বারায়।" মাননীয় প্রাক্তন মন্ত্রী কালীপদ মুখোপাধ্যায় একবার বলেছিলেন—"১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পর এই প্রবীণ বিপ্লবী নায়ক সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে শ্রমিকের কল্যাণে তাঁর সমস্ত কর্মশক্তি একান্তভাবে নিয়োজিত করেছেন।" (নয়া সমাজ—বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর ৬৪তম জন্মোৎসব সংখ্যা—পৃঃ ১৫)—। কিন্তু কেন? তিনি জানতেন দেশের যারা প্রাণ, তারা হচ্ছে এই কৃষক আর মজুরের দল। বিদেশী ও স্বদেশীর অত্যাচার ও উৎপীড়নে এরা সমস্ত শক্তি তিলে তিলে নষ্ট করে ফেলেছে। কিন্তু এরাই আবার জাতির মেরুদণ্ড। এই মনুষ্যত্বের অবমাননার ফলেই ভারতকে চরম দুর্দশা ভোগ করতে হয়েছিল। স্বাধীনতা লাভের পরে আজ পর্যন্ত অন্তত বাঙালী জাতির ললাট থেকে এই কলঙ্ক-কালিমা কতখানি মুছেছে তা চিন্তার বিষয়। বিপিনদা জীবিত থাকলে এই অবস্থার প্রতিকারের জন্যে কোন পন্থা অবলম্বন করতেন তাও আজ বলা শক্ত।*

বিপিনদা ছিলেন আজীবন ব্রহ্মচারী, বিদ্রোহী সন্ন্যাসী, বাংলার বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের এক জীবন্ত প্রতীক। শ্রেণীহীন শোষণমুক্ত নূতন সমাজ গঠনের জন্যে স্বাধীনতার পরেও এই চির-বিপ্লবীকে দেখা গেছে সংগ্রামের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে থাকতে। এমন আত্মভোলা

*আঠার বছর পরে অল্প কিছুদিন আগে কংগ্রেস প্রকৃত চাষীর হাতে জমি দেওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন বলে জানা যায়। কিন্তু সেই প্রস্তাব কার্যকরী করতে হলে—'লাঙ্গল যার ভূমি তার' নীতি পুরাপুরি গ্রহণ, ব্যক্তিগত মালিকানার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে নিরপেক্ষ সরকারী বন্টনের ব্যবস্থা, কলকারখানার সম্পূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ইত্যাদি আপোষ নিষ্পত্তিহীন কঠোর ব্যবস্থা ছাড়া দেশে সমাজতন্ত্রের নিখুঁত রূপায়ণ সম্ভব কি না সেটা চিন্তার বিষয়।

দেশপ্রেমিক ব্যক্তি আর দ্বিতীয় দেখা যায় না। জীবনে তাঁর প্রয়োজন বলে জিনিস ছিল না, চাহিদার বালাই ছিল না —এমন কি পরিধেয় বা খাদ্যের ব্যাপারেও মানুষটি ছিলেন কেমন যেন উদাসীন। দেশের দুঃখ দুর্দশাই ছিল তাঁর একমাত্র ধ্যানের বস্তু। এই চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে নাম, যশ, বিষয় সম্পত্তি, এমন কি নিজের শরীরের কথাও তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। বৃথা বাক্যব্যয়ের তিনি ধার ধারেন নি। স্বাধীনতা লাভের পরেও 'পাওয়ার পলিটিকস' নামে যে বস্তুটি দল, মত, ব্যক্তি নির্বিশেষে এখন সকলের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে, তার প্রতি তিনি কখন ভ্রূক্ষেপ করেন নি। কোন ব্যক্তি বিশেষকে কখনও গালি দেন নি, অথবা তার প্রতি বিরক্ত হন নি। মৃত্যুর সময় ১৫।১।৫৪ তারিখে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে তাই বোধ হয় তাঁর সম্বন্ধে লেখা হয়েছিল—"স্বাধীনতার জন্যে শক্তিশালী যোদ্ধা, সারা জীবন তিনি ছিলেন একজন গোঁড়া কংগ্রেসসেবী, যদিও তিনি কখন নিজেকে কোন উপদল বা মণ্ডলীর সঙ্গে সনাক্ত করেন নি। যে আদর্শের জন্যে শ্রীবিপিন গাঙ্গুলী প্রচুর আত্মত্যাগ করেছিলেন, সেই স্বাধীনতা এসেছিল, কিন্তু তিনি কোন উচ্চ পদ বা বিশ্রামের কথা ভাবেন নি। দেশে একটা শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যে তাঁর কর্মের অক্লান্ত উৎসাহ এক নূতন গণ্ডীতে প্রবেশ করেছিল।" স্বাধীনতার পূর্বে পুলিশ কর্মচারী, যাঁরা সদাই তাঁর ছায়া অনুসরণ করে বিরুদ্ধাচরণে নিযুক্ত থেকেছেন, তাঁদের প্রতিও তিনি কখন বিরক্ত হন নি। তাঁর ক্লান্তিহীন চলার গতি ছিল স্বচ্ছন্দ। বিপিনদা সম্পর্কে সাহিত্য-সম্রাট শরৎচন্দ্রের একটা মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা গেল।—'বিপিনদা সম্পর্কে ছিলেন শরৎচন্দ্রের মাতুল, কিন্তু বয়সে ছিলেন ছোট। বিপিনদাকে শরৎচন্দ্র বিপিন বলতেন। কি ভালোই বাসতেন তিনি বিপিনদাকে। কতবার দুঃখ করতেন, 'কি অদ্ভুত এই বিপ্লবীরা তার একটা দৃষ্টান্ত আমাদের বিপিন। কি কষ্টই তারা সারা জীবন দেশের জন্যে করেছে; অর্ধেক জীবন তো জেলেই কাটালে। কত বলি, বিপিন আমার বাড়িতে এসে মাঝে মাঝে দু-চার দিন থাকো, একটু ভালো খাও, একটু ভালো বিছানায় শোও, একটু আদর-যত্ন গ্রহণ কর—তা' ওর সময় হয় না। সময় হবে কোত্থেকে। দেশের চিন্তা ছাড়া ওর কি আর কোন চিন্তা আছে? কিছুই নেই" (শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন —শ্রীশচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৫৯)—।

বিবেকানন্দের মানসপুত্রেই ছিলেন বিপিনদা। স্বামীজীর আবির্ভাব ১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারী, আর তিরোধান ৪ঠা জুলাই ১৯০২ সাল। এই সময়ে বিপিনদার বয়স ১৫।১৬ বছর, কৈশোর আর যৌবনের সন্ধি। স্বামীজীর মৃত্যু সংবাদ শুনে বিপিনদা বলেছিলেন, 'লোকটিকে ভাল করে দেখা হলো না, তাঁর কে কোথায় আছে খুঁজে বার করতে হবে আমাকে।' চেষ্টা চলল, আলাপ হলো ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে (পরে ডক্টর)—। তারপরে আজীবন তাঁদের মধ্যে সে কি নিবিড় ভালবাসা, যার স্বাভাবিক অভিব্যক্তি হয়েছিল নিমতলার শ্মশান ঘাটে, ১৯৫৪ সালের ১৫ই জানুয়ারী। পরলোকগত বিপ্লবী নেতার পুষ্পাচ্ছাদিত মরদেহ অল্পক্ষণ আগে শ্মশানে পৌঁছেছে। শবাধার বাহক শোকযাত্রীদের একজন, বিপিনদার সহকর্মী, বিপ্লবী শ্রীকালীপদ বাগচী, তখন সেই স্থানে প্রবেশ দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। হঠাৎ তাঁর লক্ষ্য হলো একটি ব্যস্ত সমস্ত প্রবীণ রুদ্ধশ্বাসে রেল লাইন অতিক্রম করে ঘাটের দিকে এগিয়ে আসছেন। অল্পক্ষণেই চিনে ফেলেন—এ-যে ভূপেনদা।...হাঁপাতে হাঁপাতে তাঁর কাছে এসে ভূপেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করেন—'বিপিন কোথায়?'

উত্তর আসে—'তিনি তো আর ইহলোকে নেই, শবাধার এনে ভিতরে রাখা হয়েছে।'

নির্বাক, নিস্পন্দ মানুষটি ছুটে যান শবাধারের দিকে, বসে পড়েন শবাধারের পাশে, তারপরে বিপিনদার নির্মল, স্তিমিত মুখের দিকে চেয়ে ভূপেন্দ্রনাথের সে কি ক্রন্দন।......থামান যায় না। সকলে স্তম্ভিত। ডাঃ দত্তের মত ইস্পাত নির্মিত হৃদয়েও এই কোমলতা কোথায় লুকান ছিল, কে তার সন্ধান দেবে।

শৈশব থেকেই বিপিনদা দেশকে ভালবাসতে শিখেছিলেন অন্তরের অন্তর থেকে। দেশের মুক্তি আন্দোলনের জন্যে কোন পন্থাই তিনি উপেক্ষার চোখে দেখেন নি। দেশের স্বাধীনতা ছিল তাঁর হৃদয়ের ধ্যান, জীবনের লক্ষ্য। কাজেই দেশের স্বাধীনতাকল্পে যখন যে পন্থা তাঁর সামনে এসেছে, সে ভায়োলেন্সই হোক, আর নন-ভায়োলেন্সই হোক, কোন তারতম্য না করেই তিনি তাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, কারাবরণ করেছেন, অম্লানবদনে সকল নির্যাতন সহ্য করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের মূলনীতি 'সেবায়' তিনি ছিলেন উদ্বুদ্ধ প্রাণ। দেশবাসীর দুঃখে তিনি ছিলেন অধীর—সে দুঃখ রাজনৈতিক কারণেই হোক, অথবা কোন দৈব-দুর্বিপাকের জন্যেই হোক, কিংবা অন্য কোন কারণেই হোক। তাই এক জাতি যখন অপর জাতির ওপর অন্যায় অত্যাচার করেছে, কিংবা এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে আক্রমণ করেছে, অথবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দ্বারা সম্প্রদায় নির্বিশেষে দেশের সকল মানুষই সমভাবে আক্রান্ত হয়েছে—সকল অবস্থাতেই সেই সমস্ত দুর্ঘটনের প্রতিকার কল্পে তাঁকে দেখা গেছে অধীর হয়ে উঠতে।

জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে অথবা মানুষকে দুঃখ বা বিপন্মুক্ত করার আহ্বানে হিংসা-অহিংসার তত্ত্বকথা চিন্তা করার সময় এই জীবনে কখনই হয় নি। দুঃখের মূল্য দিয়ে দুর্লভকে জয় করার বাসনা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল বিপিনদার সত্তাটির মধ্যে। তাই দুঃসাহসের মূর্ত প্রতীক ছিল এই অম্লান জীবনের প্রতিটি স্পন্দন। তারই ফলস্বরূপ ছেষট্টি বছর বয়সের মধ্যে এই জীবনটি কিঞ্চিদধিক আটাশ বছর অতিবাহিত করেছিলেন কারাগারের অন্তরালে অকুণ্ঠচিত্তে। অপরাধ দেশভক্তি, দেশকে দুঃখ-মুক্ত করার জন্যে অদম্য আকাঙ্ক্ষা।—

(১) প্রথম কারাবরণ ১৯৩৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অপরাধে।

(২) মুক্তির অল্পকাল পরেই আবার গ্রেপ্তার বৈপ্লবিক ব্যাপারে—পাঁচ বছর সশ্রম কারাবাস।

(৩) ১৯১৮ সালের ৩নং রেগুলেশন আইনের বলে আবার বন্দীজীবন।

(৪) কিছুদিন পরে মুক্তি পেয়ে বিনা বিচারে আবার বন্দী হয়ে বর্মা প্রভৃতি জেলে বহুদিন অতিবাহিত করার পরে মুক্তি পান ১৯২৮ সালে।

(৫) ১৯৩০ সালে রাজসাহী কন্ফারেন্সে সভাপতিত্ব করার সময় আবার গ্রেপ্তার হন চট্টগ্রাম সংক্রান্ত ঘটনার পরে, আর বহুদিন বিনা বিচারে অতিবাহিত করেন এই বন্দী অবস্থায়।

(৬) ১৯৪২ সালের আগস্ট মুভমেন্টের সময় গ্রেপ্তার হয়ে আবার কারাবাস করেন বেশ কিছুদিন। অতঃপর মুক্তি পান ১৯৪৬ সালে। (স্টেটস্‌ম্যান—১৬ই জুলাই, ১৯৫৪)—।

১৮৮৬ খৃস্টাব্দের ৫ই নভেম্বর বিপিনদার জন্ম হয়েছিল তাঁর মাতুলালয়ে, হুগলী জেলার জগৎবল্লভপুরের অন্তর্গত 'বাগান্দা' নামক গ্রামে, যে স্থানটি নিখিল ভারত কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ডবলিউ সি ব্যানার্জীর (উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) জন্মভূমি হিসেবে প্রসিদ্ধ। আর রামপ্রসাদের ভিটে 'হালিসহর' ছিল তাঁর পিতৃভূমি। পিতা অক্ষয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, আর মাতা

ক্ষীরোদা দেবীর হারা-মরা ছেলে বিপিনদা। অক্ষয়নাথের জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন ললিতমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। পরে অক্ষয়নাথ ও ক্ষীরোদা দেবীর কয়েকটি শিশুসন্তান শৈশবেই পর পর মারা যান। কাজেই কনিষ্ঠ বিপিনদা ছিলেন তাঁর পিতা-মাতার স্নেহের দুলাল। শিশু বিপিনদার জন্যে স্নেহ-ভালবাসাই ছিল যথাসর্বস্ব। যা' মন চাইত তাই তিনি করে যেতেন, শাসনের কোন বালাই ছিল না। তবে জন্মাবধি শিশু-বিপিনদার প্রকৃতি ছিল একটু চাপাধরণের। 'ফুট্-ফুটে ছিপ-ছিপে নিরীহ বালকটি' হালিসহরের শিবের গলিতে ছিলেন জীবন্ত শিবমূর্তি, যেন বটুকভৈরব। কল্পনার কল্লোল তখন থেকেই ঐ শিশুমনে হয়তো উদ্বেলিত হোত এই বলে—"আমি জানি আমি কি। বাহিরের লোকে পোশাক দেখে, আমি জানি ভিতরে আমার কি আছে।" (সেন্চুরী অফ্ লাইফ্—শ্রীঅরবিন্দ, পৃঃ ৪৪)। এই কথাগুলিই শেষে তাঁর জীবনের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল নানাভাবে আপন ভঙ্গিতে। খাওয়া-পরার স্পৃহা ছিল না, ভোগের বাসনা বিবর্জিত, জন্মাবধি কিসের ধ্যানে তিনি যে সদাই বিভোর থাকতেন, আপনাতেই আপনি সন্তুষ্টচিত্তে, সে কথা বুঝবার উপায় ছিল না। তবে শিশু-বিপিনদার ঐ ধ্যানের গভীরতার মাধ্যমেই যে তাঁর চিত্তবৃত্তির উন্মীলন ঘটেছিল পরবর্তী জীবনে সেই সিদ্ধান্তে আজ নিঃসন্দেহে পৌঁছান যায়। আর এই ভাবেই তিনি যে পরবর্তীকালে ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র আকৃতি আর বাসনা-কামনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন সেই বিষয়ে সন্দেহ কোথায়।

২৪ পরগনার হালিসহরের গাঙ্গুলী পরিবার তখনকার দিনে দান-ধ্যান, জনসেবা ইত্যাদি বিবিধ লোকহিতকর কাজে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। প্রকৃতির উদারতা, স্বদেশপ্রেম ইত্যাদি ছিল এই বংশের বৈশিষ্ট্য। আদর্শচরিত্র পিতা অক্ষয়নাথের প্রথম জীবন কেটেছিল সমাজসেবায় আর নিজেদের অল্পকিছু জমিজমা দেখার মধ্য দিয়ে। 'হালিসহর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে অক্ষয়নাথ ছিলেন অন্যতম। এই সময় শিশু-বিপিনদার আশৈশব দেশভক্তি, জনকল্যাণের জন্যে প্রাণের বিপুল আবেগ, পিতা অক্ষয়নাথ প্রথম থেকেই লক্ষ্য করেছিলেন, আর সেইগুলির প্রস্ফুটনের জন্যে সর্বদাই সহায়তা করতেন। অপরদিকে ভগবৎ-পূজায় উৎসর্গীকৃতা প্রাণ ভক্তিমতী ক্ষীরোদা দেবী হারা-মরা শিশু-বিপিনদাকে পেয়েছিলেন কতই সাধনার পরে। আজানুলম্বিত কেশ, জীবন্ত উমা মূর্তি জননী ক্ষীরোদা, প্রাণ উজাড় করা স্নেহ-ভালবাসায় ছেলেটিকে জড়িয়ে নিয়ে শিশুসন্তান এই ভৈরব মূর্তিটিকে—

"আশীর্বাদ করি কত
স্নিগ্ধ হয়ে অবিরত
করিতেন স্নেহে তাই বদন চুম্বন।"

(বৃত্রসংহার—হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী পৃঃ ১৬০)।

এইভাবে শিশু-বিপিনদার জীবন-মুকুলটি যখন আপনভঙ্গিতে বিকশিত হওয়ার প্রয়াস পাচ্ছিল, পিতা অক্ষয়নাথ, জ্যেষ্ঠপুত্র ললিতমোহনকে কলকাতায়

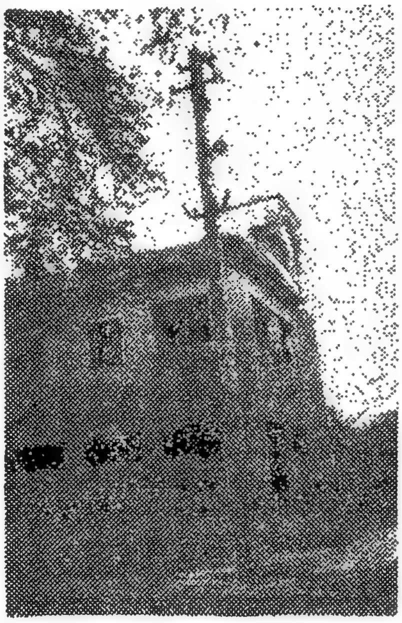

বিপিন গাঙ্গুলী পরিকল্পিত নয়া সমাজ আশ্রমের জন্যে হালিসহরের বাড়ি।

পাঠান কাস্টমস্ হাউজে চাকুরি করার জন্যে। তার কিছুদিন পরে নিজেও কলকাতায় আসতে বাধ্য হন ইন্‌কাম্ ট্যাক্স অফিসে এক কার্যভার গ্রহণ করে। অতঃপর অক্ষয়নাথ কার্যান্তরে সপরিবারে কলকাতায় এসে বহুবাজার অঞ্চলে ৪নং দুর্গা পিতুরী লেনে একটি বাড়ি ভাড়া করেন ১৮৯৫-৯৬ সালের কোন সময়। এইবারে অক্ষয়নাথ বালক বিপিনদাকে নিয়ে ভর্তি করে দেন খেলাৎচন্দ্র স্কুলে। খেলাৎ স্কুলটি তখন ছিল ওয়েলিংটন্ স্কোয়ারের (বর্তমানে সুবোধ মল্লিক পার্ক) উত্তর-পূর্ব কোণের একটি বাড়িতে (সম্ভবত এই বাড়িটি ছিল তখনকার ৬নং ওয়েলিংটন্ স্কোয়ার)—। বিপিন-দার বয়স তখন দশ-এগার বছর মাত্র। এই সময়েই তিনি সংস্পর্শে আসেন হরিশচন্দ্র সিকদার প্রমুখ উক্ত স্কুলের অগ্রণী ছাত্রদের, যাঁরা তখন একটি বৈপ্লবিক সমিতি স্থাপনে ব্যস্ত—পরবর্তীকালে এই সমিতিরই নামকরণ হয়েছিল আত্মোন্নতি সমিতি বলে। সেই আলোচনা অন্যত্র করা হয়েছে। অতঃপর আত্মোন্নতি সমিতিতে যোগদান করে তাঁর সঙ্গলাভ হয় শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রনাথ নন্দী প্রমুখ বিপ্লবীদের। শোনা যায় ইন্দ্রনাথের কাছেই বিপিনদার বিপ্লবমন্ত্রে প্রথম দীক্ষা। তারপরে রিপন কলেজে ছাত্রাবস্থায় তাঁর সান্নিধ্যলাভ হয় অরবিন্দ, বালগঙ্গাধর তিলক, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ডন্ সোসাইটি) প্রমুখ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে। পরবর্তী আলোচনা অন্যত্র করা হয়েছে। প্রকাশ—"বিপিন-বিহারীর সাহায্য এবং অস্ত্র দ্বারা সাহায্য ব্যতিরেকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের পরিকল্পনা সূর্য সেনের নেতৃত্বে সম্ভব হইত না।" (যুগান্তর—১৫।১।৫৪)।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, জীবনাবসানের আগে এই মহান নেতা কংগ্রেস সেবাদল শিবিরের* উদ্বোধন, আর তাঁর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান নয়া সমাজ আশ্রমের** সংগঠন সম্পর্কীয় কাজে হালিসহরে যান। অতঃপর ট্রেনযোগে কলকাতায় ফেরবার পথে ট্রেনের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। কলকাতায় পৌঁছানর সঙ্গে সঙ্গে, ১৫ই জানুয়ারী ১৯৫৪ তারিখে তাঁকে মেডিকেল কলেজ হসপিটালে স্থানান্তরিত করা হয় এবং রাত্রি ৮-১১ মিনিটের সময় তাঁর দেহান্তর ঘটে।

প্রকাশ, উক্ত শিবির ও আশ্রমের প্রতিষ্ঠাকল্পে বিপিনদা তাঁর যথাসর্বস্ব ব্যয় করে হালিসহরে একটি গৃহ নির্মাণও করেছিলেন। গৃহের প্ল্যান্ দেখে বুঝতে বাকি থাকে না যে ঐ গৃহ কোন পারিবারিক আশ্রয়ের জন্যে পরিকল্পিত ছিল না। আজ বিপিনদারই আদর্শে উদ্বুদ্ধ প্রাণ, সর্বহারা রাজনৈতিক নিপীড়িত গোষ্ঠী যখন নিরাশ্রয় অবস্থায় তিলে তিলে মৃত্যুর অন্তিম পথে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছেন, তখন ঐ গৃহটিকে যদি বিপিনদার স্মৃতিসৌধ হিসেবে তাঁদেরই শেষ জীবনের একটি আশ্রয়কেন্দ্রে পরিণত করা সম্ভব হোত, সেই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করার সুযোগ নিলাম। এই মহান আত্মাটিকে স্মরণ করার পক্ষে এতদপেক্ষা আর কোন উত্তম পন্থা আছে বলে আমাদের মনে হয় না। এর দ্বারায় বিপিনদার বংশ-গৌরবও নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাবে।

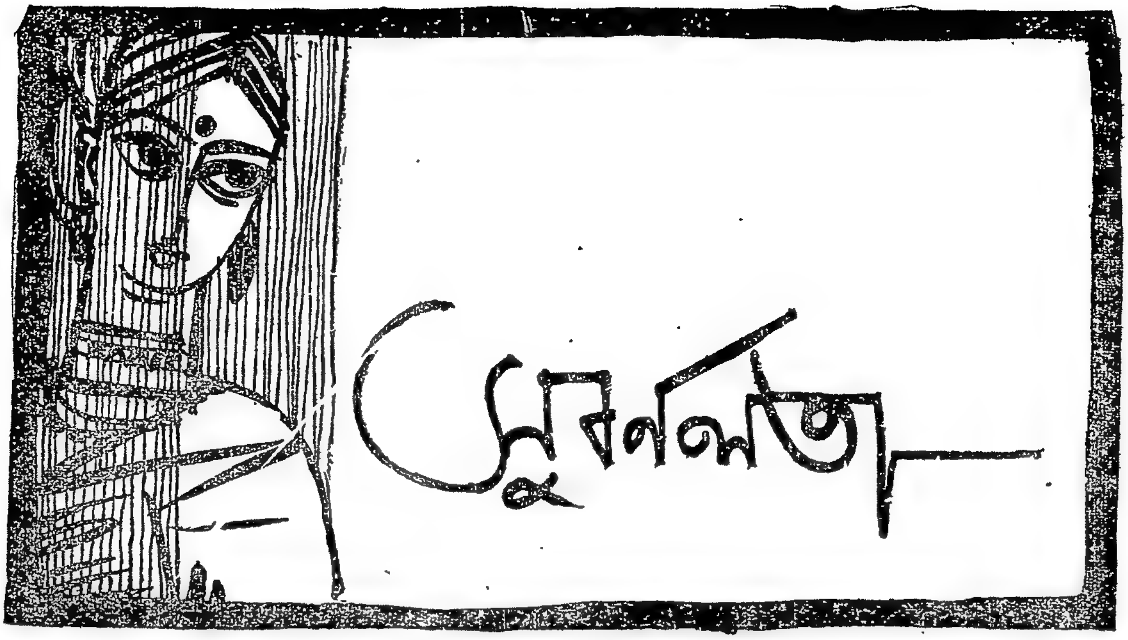

ধারাবাহিক উপন্যাস

আশাপূর্ণা দেবী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সুবর্ণলতা বলেছিল, 'আমি নিজেই যাব!'

সুবর্ণলতা পাগল তাই এমন একটা অদ্ভুত আর অস্বাভাবিক কথা বলে বসেছিল। কিন্তু সুবর্ণলতার স্বামী-পুত্র তো পাগল নয় যে, একটা মেয়েমানুষকে একা চৌকাঠ পার হতে দেবে? বিধবা বুড়িরা কালীঘাট গঙ্গার ঘাট করে বেড়ায়, সে আলাদা কথা। বলতে গেলে তারা বেওয়ারিশ। কমবয়সী বিধবারাও মাঝে মাঝে পথে বেরোবার ছাড়পত্র পায়, বুড়িদের দলে মিশে যেতে পারলে।

'পথে' মানে অবশ্য তীর্থপথে।

অল্পবয়সে যারা সর্বস্ব হারিয়ে বসে আছে সমাজের কাছে এটুকু কৃপা তারা পায়। অথবা সমাজের উপর এটুকু দাবি তারা রাখে। অবশ্য বুড়িদের মধ্যে সপ্তরথী বেষ্টিত অবস্থায়, তাদের খিদমদগারী করতে করতেই যাওয়া।

তা হোক—তবু পায়ে হাঁটা পথ।

অর্থাৎ রাজরাস্তায় পা ফেলবার সৌভাগ্য!

কিন্তু সধবারা?

নৈব নৈব চ!

তারা তো আর বেওয়ারিশ নয় যে, যা খুশি করতে চাইলেই করতে পারে? তবে আর মেয়েতে পুরুষেতে তফাৎ কি? কাছাকোঁচা দিয়ে কাপড়ই বা পরবে না কেন তবে?

তা' করা যাবে কি?

মা-বাপের মৃত্যুকালে উপস্থিত থাকাটা ভাগ্যের কথা। সে ভাগ্য সবাইয়ের হয় না। তা ছাড়া সুবর্ণর পক্ষে তো ও আবদার করা আদিখ্যেতার সামিল। মা-বাপ তো তোর জ্যান্তে মরা। এখন যে হঠাৎ একটা খবর পাঠিয়েছে এই আশ্চর্য্যি।

হ্যাঁ এই সব যুক্তি দেখিয়েছে প্রবোধ, যখন সুবর্ণকে নিয়ে গেছে তার বাপের-বাড়ি।

পাল্কি নয়, ঘোড়ার গাড়ি!

থার্ড ক্লাস ছ্যাকড়া গাড়ি।

যেমন একখানা গাড়ি চড়ে অনেকদিন আগে বাবার সঙ্গেই ফিরে এসেছিল সুবর্ণলতা। বাবার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে।...তবু বাপ মরণকালে ডেকেছে। সুবর্ণলতা সেই কথাই ভাবছে চুপচাপ।

সুবর্ণলতা গাড়িতে উঠে পর্যন্তই স্তব্ধ।

নবকুমার বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে আছেন।

নবকুমার হয়তো আশা ছেড়েই পড়ে আছেন।

ওদের বাড়িতে খবর দেবার পর থেকেই প্রতি মুহূর্তে অপেক্ষা করছেন, আশা করছেন, দরজাটা বাতাসে নড়লেও চমকাচ্ছেন, আবার বারেবারেই হতাশ নিশ্বাস ফেলে বলছেন, 'সে আর এসেছে! ...আসবে না কক্ষণো। আসবে না।'

এমনি অনেক যন্ত্রণাময় মুহূর্ত পার করে, অনেক হতাশ নিশ্বাস ফেলে যখন নবকুমার প্রায় শেষ নিশ্বাসের জন্য তৈরি হচ্ছেন, তখন সহসা শুনতে পেলেন, 'এসেছে!'

এসেছে সুবর্ণ আর তার বর।

নবকুমারের মেয়ে আর জামাই।

নবকুমারের জীবন থাকতে যারা কোনো দিন এল না।

নবকুমারের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো, নবকুমার ক্ষীণকণ্ঠে কি যে বললেন, বোঝা গেল না।

তারপর নবকুমার আর একটু সচেষ্ট হলেন, আস্তে আস্তে ভেঙে ভেঙে কথা বললেন, বোঝা গেল।

নবকুমার বললেন, 'সেই এলে, শুধু সব যখন শেষ হয়ে গেল।'

সুবর্ণ ডুকরে কেঁদে উঠতে পারতো, কিন্তু সুবর্ণ তা করল না।

সুবর্ণ শুধু মাথাটা নিচু করলো!

সুবর্ণ শুধু কাঁপা কাঁপা ঠোঁটটাকে কামড়ে ধরলো।

নবকুমার বললেন, 'আমি আর বেশিদিন নেই সুবর্ণ, বুঝতে পারছি ডাক এসেছে।'

সুবর্ণ মাথা তুলে একবার তাকালো, আবার মাথাটা নিচু করলো!

নবকুমার আস্তে থেমে থেমে বললেন, 'জানি ক্ষমা চাওয়ার কথা আমার মুখে আনা উচিত নয়, তবু এই শেষকালে তোর কাছে একবার ক্ষমা না চেয়ে মরতেও তো পারছি না!'

'বাবা!'

সুবর্ণ রুদ্ধকণ্ঠে বলে, 'ওকথা বলে আমায় শাস্তি দেবেন না বাবা!'

'শাস্তি নয় রে সুবর্ণ, এ একেবারে সত্যিকার অপরাধীর কথা। যে অপরাধ আমি তোর কাছে করেছি—'

সুবর্ণ আরো কাছে সরে আসে, আরো রুদ্ধকণ্ঠে বলে, 'তাই যদি হয় তার শাস্তিও কম পান নি বাবা!'

'তা বটে!' নবকুমারের নিষ্প্রভ দুটি চোখ দিয়ে আর এক ঝলক জল গড়িয়ে পড়ে, 'সে কথা মিথ্যে নয়! এক এক সময় মনে হতো বুঝি বা লঘু পাপে গুরু দণ্ডই হয়েছে আমার! আবার যখন তোর জীবনটা দেখেছি; তখন মনে হয়েছে নাঃ, এ দণ্ড আমার ন্যায্য পাওনা! তবে একটা কথা বলে যাই রে, যা করেছি, না বুঝে করেছি! বুঝে জেনে অত্যাচার করতে করি নি। কিন্তু সেই একজন তা' বুঝল না কোনোদিন—'

নবকুমার থামলেন, জলের গ্লাসের দিকে তাকালেন!

সুবর্ণ জল দিতে গেল, দিতে পেল না, সাধনের বৌ এগিয়ে এসে তাড়াতাড়ি মুখের কাছে গেলাসটা ধরে বলে উঠলো, 'এই যে বাবা জল খান!'

নবকুমার মুখটা কোঁচকালেন।

নবকুমার আধ ঢোক জল খেয়ে সরিয়ে দিলেন, তারপর বললেন, 'ক্ষমা করতে যদি পারিস তো—'

'বাবা আপনি চুপ করুন। আমি সব বুঝতে পারছি! আপনার কষ্ট, আপনার দুঃখ, সব বুঝেছি!'

নবকুমার একটা নিশ্বাস ফেললেন, তারপর বললেন, 'ক্ষমা চাইলাম, সারা জীবনে তো পারি নি এখন এই মরণ-কালে—তবু, আমার নিজের জন্যে তোকে ডাকি নি সুবর্ণ, ডেকেছিলাম এইটা দিতে!'...হাতটা তোষকের তলায় ঢুকিয়ে একটু বুলিয়ে নিয়ে টেনে বার করলেন একটা ভারী খাম। বললেন, 'এইটা আগলে নিয়ে বসে আছি, তোকে দেব বলে!'

সুবর্ণ হাত বাড়ায় না।

সুবর্ণ কি এক সন্দেহে আরক্ত হয়ে ওঠে।

সুবর্ণ অস্ফুটে বলে, 'কী এ?'

নবকুমার বোধ করি বুঝতে পারেন। তাই তার সন্দেহভঞ্জন করেন। সামান্য একটু হাসির গলায় বলেন, 'ভয় নেই দলিল নয়, দানপত্র নয়। শুধু চিঠি।'

'চিঠি!'

'হ্যাঁ— নবকুমার কাঁপা গলায় বলেন, 'তোর মা'র চিঠি।'

মা'র চিঠি!

মা'র চিঠি!

সুবর্ণর মা'র চিঠি!

কাকে লেখা?

সুবর্ণকে নয় তো!

হুঁ, তাই আবার হয়? তে পারে? সুবর্ণর এত ভাগ্য।

কি জানি কি!

সুবর্ণ তাই নিষ্পলকে তাকিয়ে থাকে। নবকুমার হাতের উল্টোপিঠে চোখটা মুছে নিয়ে বলেন, 'চিরদিনের একবগ্গা মানুষ, কি ভেবে কি করে কেউ বোঝে না! কখনো কোনো বার্তা করে না, তোর ছোড়দা যাই ওদিকে কাজ নিয়েছে, তাই জানতে পারি বেঁচে আছে। হঠাৎ একবার তার হাত দিয়েই দুটো চিঠি পাঠালো, একটা আমাকে লেখা, একটা তোকে লেখা—'

'বাবা আপনার কষ্ট হচ্ছে, একসঙ্গে বেশি কথা বলবেন না।'

'না-রে সুবর্ণ, আর আমার কোনো কষ্ট নেই, তুই ক্ষমা করিস আর নাই করিস, আমি যে তোর কাছে ক্ষমা চাইতে পারলাম, এতেই মনটা বড় হালকা লাগছে। এবার শান্তিতে মরতে পারবো।...হ্যাঁ সেই চিঠি—'

হ্যাঁ সেই চিঠির একখানা নবকুমারের, একখানা সুবর্ণর।

'একবগ্গা' সত্যবতীর না কি কড়া নিষেধ ছিল তার জীবৎকালে যেন এ চিঠি খোলা না হয়। মৃত্যু সংবাদটা অবশ্যই পাবে নবকুমার, তখন সুবর্ণরটা সুবর্ণকে পাঠিয়ে দেবে, নিজেরটা খুলে পড়বে।

সে সংবাদ এসেছে—

না, শেষরক্ষা হয় নি।

সুবর্ণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে পারে নি। সুবর্ণ তীব্র তীক্ষ্ণ একটা ডাকের সঙ্গে ভেঙে পড়েছিল। ডাক নয় আর্তনাদ। 'বাবা!'

শুধু ওই!

শুধু 'বাবা' বলে একটা তীব্র আর্তনাদ! তারপর স্তব্ধতা।

পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধতা!

পাশের ঘরে প্রবোধ তখন তার শালাজকে প্রশ্ন করছে, 'কী হয়েছিল বললেন?...কিছু হয় নি? আশ্চর্য তো। একেই বলে, পুণ্যের শরীর। তবে আপনাদেরও বলি—যতই যেমন হোক, মা' বলে কথা। মরে গেল, আপনারা একটা খবর দিলেন না! বলি চতুর্থীটাও তো করতে হতো আপনার ননদকে!'

শালাজ মৃদুস্বরে বলে, 'কি করবো বলুন? হাত-পা বাঁধা যে। কড়া হুকুম দেওয়া ছিল তাঁর মৃত্যু খবর না পাওয়া পর্যন্ত যেন বাবার চিঠিটা খোলা না হয়, আর ঠাকুরঝির চিঠি ঠাকুরঝিকে দেওয়া না হয়। আর চতুর্থী করার কথা বলছেন? সেও তো কড়া হুকুম ছিল তাঁর জন্যে কেউ যেন অশৌচ পালন না করে।'

প্রবোধ কৌতূহলী হয়ে বলে, 'সন্ন্যাস নিয়েছিলেন বুঝি?'

'না না, তা তো কই শুনি নি। না কি বলেছিলেন, বহুকাল সংসারকে ত্যাগ করে এসেছি, তার সুখ-দুঃখের কোনো দায়ই নিই নি, এতকাল পরে মরে তাদের গলায় এতবড় একটা দুঃখের দায় দিতে যাব কেন?'

'তা ভাল!' প্রবোধ বলে, 'ওই মানুষটির সৃষ্টিছাড়া বুদ্ধির জন্যেই দু-দুটো সংসার মজলো। এই তো শ্বশুরমশাইয়েরও তো 'গঙ্গা পানে পা' দেখতে পাচ্ছি—'

সাধনের বৌ বলে, 'তা সেও ওই একই কারণ! যেই না খবর এল ওনার কাশীলাভ হয়েছে—শ্বশুরঠাকুর যেন একেবারে ভেঙে পড়লেন। বলতে গেলে সেই যে শুয়ে পড়েছিলেন, সেই শোয়াই এই শেষ শোয়া। কবরেজ তো বলেছে বড়জোর আর দু-চারটে দিন।'

প্রবোধ কখনো শালাজ রসের আস্বাদ পায় নি, তাই প্রবোধ কথা থামাতে চায় না কথার পিঠে কথা গেঁথে গেঁথে চালিয়ে যায় আলাপ, আর সেই সূত্রেই জানতে পারে রোগ-বালাই কিছুই ছিল না নবকুমারের, এখনো এই বয়সেও এগুলি করে খেতে পারতেন, নিজে বাজারে না গিয়ে থাকতে পারতেন না, আর গিয়ে রাজ্যের শাক-পাত কিনে এনে বলতেন 'রাঁধো' আর সেইগুলো খেয়ে হজম করতেন। মেজাজটা অবিশ্যি তিরিক্ষি ছিল, তা সে তো বরাবরই ছিল,

সুধীরবালা বিয়ে হয়ে পর্যন্তই তো দেখছে, সর্বদাই যেন মেজাজ 'টঙে' চড়ে বসে আছে। কিন্তু স্বাস্থ্য, শক্তি ছিল। অথচ স্ত্রী মারা যেতেই একেবারে গ'ড়ো হয়ে পড়লেন।

প্রবোধ এসব শুনে-টুনে মুচকি হেসে মন্তব্য করে, 'ভেতরে ভেতরে এখনো এত ছিল?'

সাধনের বৌ মৃদু হাসে।

প্রবোধ আবার বলে, "তবে উচিত ছিল পায়ে ধরে সেধে নিয়ে আসা!'

বৌ মাথা নাড়ে।

'মাথা খুঁড়লেও আসতেন না। শুনেছি তো প্রকৃতির কথা! তাঁর নিজের ছেলের কাছেই শুনেছি। একেবারে অন্য ধরণের—'

'হুঁ! মেয়েটিও তাই হয়েছেন!' প্রবোধ আক্ষেপ করে বলে, 'আপনাকে বলেই বলছি—আপনার ননদটিও ঠিক তাই। একেবারে সৃষ্টিছাড়া। আমি শালা চিরকাল চোর হয়ে আছি মহারাণীর মেজাজের কাছে। অথচ এই তো আপনি—দিব্যি সোজাসুজি।'

'কী করে জানলেন?' শালাজ হাসে, 'জন্মে তো এই একবার দেখলেন?'

'তাতে কি। পাকা রাঁধুনীরা হাঁড়ির একটা ভাত দেখলেই বুঝতে পারে কেমন সেদ্ধ হয়েছে। যাক শ্বশুরমশাইয়ের অবস্থা তাহলে শেষাবস্থা?'

'তাই তো বললে কবরেজ। তা' বয়েসও তো হয়েছে—'.

প্রবোধ কথাটা লুফে নেয়। নিয়ে হেসে ওঠে।

'তা' বটে! তবে কিনা রোগ-বালাই হল না পত্নীশোকে প্রাণটা গেল, এটাই যা দুঃখের কথা। ত্রেতাযুগে রাজা দশরথের পুত্রশোকে প্রাণ গিয়েছিল। আর কলিযুগে এই আমাদের শ্বশুর-ঠাকুরের পত্নীশোকে—টেনে টেনে হাসতে থাকে প্রবোধ যেন ভারী একটা রসিকতা করেছে।

'ঠাকুরঝিকে কি রেখে যাবেন?'

ঠাকুরজামাইকে জামাই জনোচিত জলখাবারে আপ্যায়ন করে শালাজ প্রশ্ন করেন।

প্রবোধ হাত উল্টে বলে, 'সে আপনার ঠাকুরঝির মন মর্জি! যদি বলেন 'থাকবো,' পৃথিবী উল্টে গেলেও রদ হবে না। যদি বলেন 'থাকবো না,' পায়ে মাথা খুঁড়লেও বদলাবে না—'

সুধীরবালা হাসে, 'আপনি তো তা' হলে বেশ মজায় আছেন বলুন?'

'হুঁ! সে কথা আর বলতে? মজা বলে মজা! তা' আপনার কি মনে হয়? আজ রাত্তিরের মধ্যেই কিছু হয়ে-টয়ে যাবে?'

সুধীরবালা মাথা নাড়ে।

বলে, 'আজ-কালের মধ্যেই কিছু হবে বলে অবিশ্যি মনে হয় না! কেন, এক রাত্তিরও গিন্নীকে ছেড়ে থাকতে পারবেন না বুঝি?'

'কী যে বলেন? এই বয়সে আবার অত—' প্রবোধ হ্যা হ্যা করে হাসতে থাকে, 'তা ছাড়া আপনার ঠাকুরঝিটি তেমনি কি না! একটি পুলিশ সেপাই!'

প্রবোধেরও একটা দুঃখের দিক আছে বৈকি। প্রবোধ দেখে সংসারের সবাই দিব্যি সহজ স্বাভাবিক, শুধু বেচারা প্রবোধের বৌটাই সৃষ্টিছাড়া। আজীবন এই দুঃখেই জ্বলে মলো বেচারা।

এই তো একটা মেয়েমানুষ।

সুবর্ণলতার মত অত রূপ না থাক দিব্যি মেয়েলী লাবণ্য রয়েছে, মেয়েলী কথাবার্তা, প্রাণটা সহজ হয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। আর সুবর্ণ, তার দিকে যেতেই তো ভয় করছে। বাপ-বেটিতে তো কোনোকালেও মুখ দেখাদেখি নেই। অথচ মরছেন. খবর শুনে দিশেহারা হয়ে ছুটে এলেন।

প্রবোধ যেন কেউ নয়!

প্রবোধকে যেন চিনতেই পারছে না। কে বলতে পারে নিয়ে যাওয়া যাবে কি, বাপের রোগশয্যে আঁকড়ে পড়ে থাকবে।

বিপদের ওপর বিপদ।

এই সময়- আবার মাতৃশোক-সংবাদ।

মা'র সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ছিল না, ভেতরে ভেতরে তো ভক্তির সমুদ্দুর ভরা ছিল প্রাণে।

তা কপালই বলবো।

একই সঙ্গে মাতৃপিতৃ বিয়োগ!

মা মরেছে আজ কুড়ি দিন, খবর নেই বার্তা নেই! এখন একেবারে—

প্রবোধেরই গেরো।

গেরো কি সোজা? তিনি যতই বলে যান, তাঁর মরণে কেউ যেন অশৌচ না নেয়। সমাজ তা মানবে? এখুনি তো প্রবোধকে মায়ের কাছে ছুটতে হবে—নিয়মকানুন জানতে। তারপর পুরুত-বাড়ি।

বেঁচে থেকে কোনোকালে উপগার করলেন না শ্বশুর-শাশুড়ী, এখন মরে যন্ত্রণা দিয়ে যাচ্ছেন।

একেই বলে পূর্বজন্মের শত্রুতা!

প্রবোধের দিক থেকে এসব যুক্তি আছে বৈকি।

কিন্তু সুবর্ণ?

সুবর্ণ কোন যুক্তি দিয়ে ক্ষমা করবে তার মাকে?

মরে গিয়ে তবে সুবর্ণকে উদ্দিশ করে গেল মা? চিঠিখানা পড়ে উত্তর দেবার পথটা পর্যন্ত যাতে না থাকে?

কেন? কেন? কেন মা আজন্ম এভাবে শত্রুতা করল সুবর্ণর সঙ্গে?

ত্যাগই তো করেছিলে, মরে গেলো তবু জানতে পেল না সুবর্ণ, এখন তবে আবার কেন একখানা চিঠি দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে যাওয়া?

প্রবোধের ভয় অমূলক!

সুবর্ণ থাকতে চাইল না!

সুবর্ণ বাপের পায়ের ধুলো নিয়ে চলে গেল। বললো, 'এই শেষ দেখা দেখে গেলাম বাবা! শাপ দিয়েছিলে মরা মুখ দেখতে, সেটুকু থেকে যে অব্যাহতি পেলাম, সেই পরম ভাগ্যি।'

'আর আসবি না?'

সুবর্ণ তার সেই বড় বড় চোখ দুটো তুলে বললো, 'আর এসে কী করবো বাবা? আর আসতে ইচ্ছে নেই। মনে জানবো একই দিনে মা বাপ হারিয়েছে হতভাগী সুবর্ণ!'

অভিমানে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছিল।

যেন সেই পরলোকগতার পিছু পিছু ছুটে গিয়ে ফেটে পড়ে বলতে ইচ্ছে করছে, কেন? কেন? কী অপরাধ করেছিল তোমার কাছে সুবর্ণ যে, এতবড় শাস্তি দিলে তাকে? (ক্রমশঃ)

স্বরাজ—স্বাধীনতার দীপ্তিবিষাণ—বাংলা জাতীয়-জীবন সংগঠনে নিবেদিত প্রাণ স্বদেশ-প্রেমিক মনীষী—যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের

যোগেন্দ্র গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগে ঃ—ম্যাটসিনী, গ্যারিবল্ডী, বীরাঙ্গনা অ্যানিটা।

যে মহাপুরুষদ্বয়ের জ্বলন্ত উদ্দীপনা, প্রাণপণ প্রয়াস—আত্মসুখ, ঐশ্বর্য-বিলাস উপেক্ষা-ত্যাগে সমুজ্জ্বল আদর্শের প্রভাবে পদদলিত—নিদ্রিত ইটালী রণোন্মাদনায় অধীর হইয়া স্বাধীনতা-সংগ্রামে বিজয়ী হইয়াছিল—সেই স্বাধীনতার সূর্য—রাজনীতিক চিরজাগ্রত দেবতা—ম্যাটসিনী ও গ্যারিবল্ডীর জাতীয় জীবনের সংঘর্ষ—রাজনৈতিক তরঙ্গ-ভঙ্গময় তেজোদ্দীপ্ত মহাজীবনী এই মহাগ্রন্থত্রয় মাত্র ১৲ টাকায়।

দ্বিতীয় ভাগে ঃ—কীর্তিমন্দির, হৃদয়োচ্ছ্বাস, বীরপূজা, প্রাতঃস্মরণীয় চরিতমালা, চিন্তাতরঙ্গিণী, জন ষ্টুয়ার্ট মিল। শক্তিমন্ত্রসমাহিত গ্রন্থরাজি ১৲ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

বিশ্বসাহিত্যের আদিপর্ব

ডঃ নরেন ভট্টাচার্য

॥ ১০ ॥

রোমক সাহিত্য ঃ খৃস্ট-পরবর্তী যুগ

ঐতিহাসিক লিভি

খৃস্টপূর্বাব্দ ও খৃস্টাব্দের সংগম-কালের অনবদ্য রোমক প্রতিভা হচ্ছেন টাইটাস লিভিয়াস, লিভি নামেই যিনি বেশি পরিচিত (৫৯ খৃস্টপূর্বাব্দ—১৭ খৃস্টাব্দ)। লিভি ছিলেন ইতিহাসলেখক, ১৪২ খণ্ডে যিনি রোমের সামগ্রিক ইতিহাস রচনা করেছিলেন, রোম নগরীর পত্তন থেকে ড্রুসারের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটনাবলী সেখানে স্থান পেয়েছে। লিভির পূর্বেও অনেক রোমক ঐতিহাসিক রোমের আদ্যন্ত ইতিহাস লিখেছিলেন, কিন্তু লিভির মূল্য তাঁর জাতীয়তাবাদী দৃষ্টি-কোণের জন্য। তাঁর ইতিহাসে উপন্যাসের চমক আছে, তা বর্ণনাধর্মী এবং জীবন্ত। ঐতিহাসিকের বাঁধা পথ তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন, তাই তাঁর রচনায় খুঁটিনাটি বিষয়ের উপর তেমন কোন গুরুত্ব পড়ে নি। তাঁর যুগের রুচি এবং চাহিদাই তাঁর রচনাকে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর গ্রন্থের সব ক'টি খণ্ড পাওয়া যায় নি। তিনিও থুকিডিডেসের মত স্বকপোল-কল্পিত ভাষণ তাঁর ইতিহাসের চরিত্র-গুলির উপর আরোপ করেছিলেন, যার ফলে যেমন একদিকে তা সুখপাঠ্য হয়েছিল অপরদিকে তা রোমক জাতীয় চরিত্রের গঠনে অত্যন্ত সাহায্য করেছিল। লিভির ইচ্ছা ছিল যে সম্রাট অগাস্টাসের যুগ পর্যন্ত তিনি তাঁর ইতিহাসকে টেনে নিয়ে যাবেন, কিন্তু মৃত্যু তাঁর সেই ইচ্ছা পূর্ণ হতে দেয় নি।

প্রথম শতকের গদ্যসাহিত্য ঃ প্লিনি ও পেট্রোনিয়াস

খৃস্টীয় প্রথম শতকে রোমক গদ্য-সাহিত্যের অভূতপূর্ব বিকাশ হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে যাঁর নাম উল্লেখ করতে হয় তিনি হচ্ছেন প্লিনি (বড়) যিনি ছিলেন সে যুগের জীবন্ত বিশ্বকোষ। প্লিনির জন্ম ২৩ খৃস্টাব্দে। তরুণ বয়সেই তিনি অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন। সমরবিজ্ঞান থেকে শুরু করে ব্যাকরণ, অলংকারশাস্ত্র, জীবনীসাহিত্য, ইতিহাস কোন কিছু লেখাই তিনি বাদ দেন নি। তাঁর রচিত দুটি ইতিহাসগ্রন্থ আছে, একটি ২০ খণ্ডে রচিত জার্মানীর (টিউটন) যুদ্ধের ইতিহাস অপরটি ৩১ খণ্ডে রচিত তাঁর নিজের যুগের ইতিহাস। কিন্তু তাঁর সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত কাজ হচ্ছে ৩৭ খণ্ডে রচিত **ন্যাচারালিস হিস্টোরিয়া,** যা আমাদের হাতে আছে। এই মহাগ্রন্থ তিনি তাঁর পৃষ্ঠপোষক টিটাসকে উপহার দিয়েছিলেন, বিষয়বস্তুর দিক থেকে এই মহাগ্রন্থকে বিশ্বকোষের পর্যায়ে ফেলা যায়। মোট ২০,০০০ বিষয় এতে আলোচিত হয়েছে এবং ৪৭৪ জন লেখকের ২০০০টি গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সার সংকলন হচ্ছে প্লিনির রচনার বিষয়বস্তু। প্রথম খণ্ডে প্লিনি তাঁর ব্যবহৃত লেখকদের নাম ও রচনাবলীর পরিচয় দিয়েছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে আছে পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যার তথ্যাবলী। তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ খণ্ডে ভূগোল ও জাতিতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। সপ্তম খণ্ডের বিষয়বস্তু হচ্ছে নৃ-তত্ত্ব। অষ্টম থেকে একাদশ খণ্ডে প্রাণীবিজ্ঞান স্থান পেয়েছে। দ্বাদশ থেকে ঊনবিংশ খণ্ডের বিষয়বস্তু হচ্ছে উদ্ভিদবিদ্যা। বিংশ থেকে সপ্তবিংশ খণ্ডে আলোচিত হয়েছে বিভিন্ন গাছগাছড়ার গুণাবলী, অষ্টাবিংশ থেকে দ্বাবিংশ খণ্ডের বিষয়-বস্তু হচ্ছে প্রাণীজগতের রহস্য, ত্রয়োত্রিংশ থেকে সপ্তত্রিংশ খণ্ডে স্থান পেয়েছে খনি, ঔষধ, চিত্রাঙ্কন, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য। প্লিনির এই বিশ্বকোষ যদিও তৎকালীন যুগের জ্ঞানের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ, তথাপি যুগ যুগ ধরে এই মহাগ্রন্থ পণ্ডিতদের নিকট আদৃত হয়ে এসেছে।

পেট্রোনিয়াস ছিলেন প্লিনির সম-কালীন, এবং তাঁর রচনার যেটুকু নিদর্শন এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে তাঁকে ব্যঙ্গমূলক উপন্যাসের জনক বলা যায়। সামাজিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে তিনি লিখেছিলেন **স্যাটিরি**। এই গ্রন্থের খুব সামান্য অংশই অবশিষ্ট আছে। বরং সামান্যভাবে তাঁর **সেনা ট্রিমালচিওনিস** গ্রন্থটি রক্ষিত হয়েছে। চরিত্রচিত্রণের অপূর্ব দক্ষতা এবং সামাজিক সমস্যাসমূহ খোলাখুলি ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গীতে আলোচনা করার ক্ষমতা তাঁর রচনাকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করেছে।

কুইণ্টালিয়ান, ট্যাসিটাস এবং পরবর্তী-কালের গদ্যলেখকগণ

কুইণ্টালিয়ানের জন্ম ৩৫ খৃস্টাব্দে স্পেনে। পেশায় তিনি ছিলেন বক্তা এবং সেই হিসাবে অলংকারশাস্ত্রের উপর তিনি যথেষ্ট পড়াশোনা করেছিলেন। শেষ বয়সে তিনি যাতে বক্তারা নিজ পেশা সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানলাভ করে সেই উদ্দেশ্যে বারো খণ্ডে লিখেছিলেম **ডে ইনস্টিটিউসনে ওরাটোরিয়া**। এ ছাড়া বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য তিনি একটি পাঠ্যগ্রন্থের সিরিজ প্রস্তুত করেছিলেন যা **ডেক্লাম্যাটিওনেস** নামে পরিচিত। শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর মতামত আমাদের বর্তমান যুগের দৃষ্টি-ভঙ্গীর সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। ৯৭ থেকে ১০০ খৃস্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে কুইণ্টালিয়ান মারা যান।

ট্যাসিটাস ছিলেন রোমের বিখ্যাত ঐতিহাসিক যাঁর রচিত জার্মানীর ইতিহাস বা **জার্মানিয়া** আজও পর্যন্ত ঐতিহাসিক-দের নিকট বিশেষ মূল্য বহন করে। মূল গ্রন্থটির নাম **ডে সিটু এক গোপুলিস মোরিবাস জার্মানী**। জার্মানীর প্রাচীন ইতিহাসের সকল তথ্যের আকর হচ্ছে এই মহাগ্রন্থ। ঐতিহাসিক ট্যাসিটাস জন্ম-গ্রহণ করেছিলেন ৫৪ খৃস্টাব্দে, তাঁর মৃত্যুর তারিখ সম্ভবত ১১৭ খৃস্টাব্দ। জার্মানিয়া ছাড়া তিনি আরও কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থের লেখক। তাঁর প্রথম গ্রন্থ **ডায়া-লোগাস ডে ওরাটোরিবাস** সম্ভবত কুইণ্টা-লিয়ানের প্রভাবে রচিত। গ্রন্থটি কথোপ-কথনের ছলে রচিত, বিষয়বস্তু হচ্ছে তৎকালীন যুগে বাগ্মিতার অবক্ষয়। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ **ডে ভিটা এট মোরিবাস ইউলি এগ্রিকোলা** তাঁর শ্বশুর এগ্রিকোলার জীবন অবলম্বনে রচিত। চোদ্দ খণ্ডে তিনি তাঁর নিজ যুগের ইতিহাস

হিস্টোরিয়া রচনা করেছেন যার প্রথম চারটি খণ্ড এবং পঞ্চম খণ্ডের কিছু অংশ এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। এ ছাড়া তিনি অগাস্টাসের মৃত্যুর পর থেকে জুলিয়ান বংশের রাজাদের ইতিহাস লিখেছেন যার মূল নাম এ্যাব এক্সেসু ডিভি অগাস্টি। কিন্তু এই গ্রন্থটি অ্যানালস নামেই পরিচিত। ট্যাসিটাস বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক এবং সেই হিসাবে লিভির সঙ্গে তাঁর পার্থক্য মৌলিক। লিভি যেখানে ইতিহাসের বর্ণনামূলক দিকটিকেই গ্রহণ করেছিলেন ট্যাসিটাস সেখানে বিশ্লেষণধর্মী দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করেছিলেন। তিনি ইতিহাসের নামে জমজমাট কাহিনী পরিবেশন করেন নি। নিখুঁত বস্তুনিষ্ঠা এবং ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসাই ছিল তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য।

ছোট প্লিনি ছিলেন বড় প্লিনির ভ্রাতুষ্পুত্র, জন্ম ৬২ খৃস্টাব্দে। তিনি ছিলেন সম্রাট ট্রাজানের বিশেষ অনুগৃহীত ব্যক্তি, এবং তৎকালীন সমস্ত মনীষীর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ছিল। তাঁর রচনাসমূহের কিছুমাত্রই অবশিষ্ট নেই, শুধু তাঁর পত্রাবলী ছাড়া। প্রথম শতকের অপরাপর লেখকদের মধ্যে ছিলেন ভেল্লেইয়াস প্যাটারকুলাস যাঁর দুই খণ্ডে রচিত হিস্টোরিয়া রোমানা লিব্রি ডুয়ো নামক গ্রন্থের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অধ্যায় পাওয়া গেছে। এই লেখকের মৃত্যু হয়েছিল সম্ভবত ৩০ খৃস্টাব্দে। ভ্যালেরিয়াস ম্যাক্সিমাস ছিলেন ইতিহাসের গবেষক, নয় খণ্ডে পূর্ববর্তী ইতিহাসকারদের রচনা থেকে প্রয়োজনীয় অংশ সংকলন করেছিলেন। এই সংকলনটির নাম ফ্যাক্টোরাম এট ডিক্টোরাম মেমোরাবিলিয়াম লিব্রি যা তিনি সম্রাট টাইবেরিয়াসকে উৎসর্গ করেছিলেন। কুরসিয়াস রুফাস, যিনি খৃস্টীয় প্রথম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জীবিত ছিলেন, দশখণ্ডে আলেকজাণ্ডারের অভিযানের ইতিহাস লিখেছিলেন, যদিও তাঁর রচনার ঐতিহাসিক মূল্য সামান্যই। প্রথম শতকের অপরাপর রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কলুমেল্লার কৃষিবিষয়ক রচনা ডে রে রাস্টিকা। এই গ্রন্থের গ্রন্থকার যেমন একদিকে পূর্ববর্তী কৃষিবিষয়ক রচনাসমূহকে ব্যবহার করেছেন অপরদিকে তেমনি স্পেন, ইটালী ও এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথাও লিখেছেন। এই গ্রন্থটি কলুমেল্লা রচনা করেছেন ভার্জিলের জিওর্জিয়ান্স পরিশিষ্ট হিসাবে। দ্বাদশটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থটির প্রথম দুটি অধ্যায়ে আছে সার ও বীজ, তৃতীয় থেকে পঞ্চম অধ্যায়ে আছে বিভিন্ন ধরণের ফসল আবাদের পদ্ধতি, ষষ্ঠ থেকে নবম অধ্যায়ে আছে যথাক্রমে পশু, পাখী, মাছ ও মক্ষিকা পালন পদ্ধতি, দশম অধ্যায়ে উদ্যান চাষ, একাদশ এবং দ্বাদশ অধ্যায়ে কৃষকের কর্তব্য। এরপর যাঁর নাম উল্লেখ করতে হয় তিনি হচ্ছেন ফ্রন্টিনাস (৪০-১০৪ খৃস্টাব্দ)। তাঁর এ পর্যন্ত তিনটি রচনা পাওয়া গেছে। প্রথমটি শিরোনামাহীন, বিষয়বস্তু হচ্ছে সমরবিজ্ঞান, দ্বিতীয় গ্রন্থটি দুই খণ্ডে বিভক্ত, বিষয়বস্তু হচ্ছে জমি জরিপ, নাম ডে আগ্রোরাম কোয়ালিটেট এবং ডে কন্ট্রোভার্সিস আগ্রোরাম। তাঁর আর একটি গ্রন্থ রোমনগরীর নালা নর্দমার সমস্যা নিয়ে রচিত, নাম ডে অ্যাকুইস আরবিস রোমা। পম্পোনিয়াস মেলা ছিলেন খৃস্টীয় প্রথম শতকের ভূগোলবিদ যিনি তিনখণ্ডে রচনা করেছিলেন ডে কোরোগ্রাফিয়া। সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে এ যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন প্রোবাস এবং অ্যাসকোনিয়াস পেডিয়ানাস। প্রোবাস ভার্জিলের রচনার উপর টীকা লিখে বিখ্যাত হয়েছিলেন অ্যাসকোনিয়াস পেডিয়ানাস কিকেরোর রচনাবলীর টীকাকার ছিলেন।

হাড্রিয়ানের পরবর্তীকাল থেকেই রোমক সাহিত্যের অবক্ষয়ের যুগ সূচিত হয়েছিল, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকের ল্যাটিন গদ্যসাহিত্যে আইন বিষয়ক রচনাই বেশি প্রাধান্যলাভ করেছিল যার পথিকৃৎ ছিলেন গেইয়াস, প্যাপিনিয়ান, উলপিয়ান এবং পলাস। এঁদেরই শ্রমকে ভিত্তি করে পরবর্তীকালে (ষষ্ঠ শতকে) সম্রাট প্রথম জাস্টিনিয়ানের যুগে সংকলিত হয়েছিল কর্পাস ইউরিস সিভিলিস। দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ শতকের ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন সুয়েটোনিয়াস, ফ্লোরাস, অগাস্টা, জাস্টিন অরেলিয়াস ভিক্টর, ইউট্রোপিয়াস, অ্যাম্মিয়ানাস মার্সেলিনাস ইত্যাদি। এঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন সুয়েটোনিয়াস। ভ্যারোর মতই সুয়েটোনিয়াস নানাবিধ বিষয়ের রচনার দ্বারা ল্যাটিন সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। ইতিহাস, সাহিত্য, পুরাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, প্রকৃতিবিজ্ঞান কোন কিছুই তিনি বাদ দেন নি। তাঁর বিশ্বকোষতুল্য গ্রন্থ প্রাটা দশখণ্ডে বিভক্ত। তাঁর রচিত ডি ভিটা সীজারাম গ্রন্থে তিনি সীজার থেকে নীরো পর্যন্ত বারোজন সম্রাটের চরিত্র চিত্রিত করেছেন। তাঁর অপরাপর গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ভিরিস ইলাস্ট্রিবাস যাতে তিনি রোমক কবিসাহিত্যিকদের কথা বলেছেন। তাঁর আর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে ডে হিস্টোরিকস।

শেষ উল্লেখযোগ্য রোমক ঐতিহাসিক ছিলেন অ্যাম্মিয়ানাস মার্সেলিনাস যিনি ৩৯০ খৃস্টাব্দে ৩১ খণ্ডে রেরাম গেস্টারাম লিব্রি নামক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থের প্রথম তেরটি খণ্ড বিলুপ্ত হয়েছে। চতুর্থ শতকের পর থেকেই ইতিহাস রচনায় খৃস্টীয় দৃষ্টিভঙ্গীর

ভারতের
আদিতম
রসায়ন

চ্যবনপ্রাশ

আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত

চ্যবনপ্রাশ নূতন ও পুরাতন সর্দ্দি কাশি, স্বরভঙ্গ ও শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় বিশেষ উপকারী।

টনিক হিসাবে নিয়মিত ব্যবহারে দেহের দৌর্ব্বল্য ও রুগ্নতা দূর করে ও শরীরের পুষ্টি সাধন করিয়া স্বাস্থ্যশ্রীর পুনরুদ্ধার করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা বোম্বাই কানপুর

যে কোনো ব্যথা বা শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য আমরা আমাদের সমস্যা বলে মনে করি... কি করে আমরা আপনার সাহায্য করতে পারি দেখুন।

রিসার্চ : আমি 'অ্যাস্‌প্রো' রিসার্চ ইনষ্টিটুয়েটের একজন। আমাদের কাজই হচ্ছে ব্যথা বা অস্বাচ্ছন্দ্য দূর করার নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবনা করা। সারা পৃথিবীতে যে সব ইন্সটিটিউট এই রিসার্চে নিয়োজিত আছে আমরা তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। আমরা স্থির জানি যে ব্যথা বা শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য দূর করার সর্বাধুনিক উপায় 'অ্যাস্‌প্রো' ফর্মূলাতেই পাওয়া যায়।

সম্প্রতি ইউনাইটেড স্টেটস্ গভর্নমেন্টের উদ্যোগে যেসব পরীক্ষানিরীক্ষা হয়েছে তাতে পরিস্কার দেখা গেছে যে 'অ্যাস্‌প্রো'র সক্রিয় উপাদান গতি ও কার্যকারিতার বিচারে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যথা-নিবারক। তাই পৃথিবীর সর্বত্র বিভিন্ন হাসপাতালে ও ডাক্তাররা 'অ্যাস্‌প্রো' ব্যবহার করে থাকেন।

শারীরিক বেদনার কি কারণ? আমাদের দেহতন্তুতে মেটাবলিক বস্তু জমা হ'য়ে নানা জায়গায় ফুলে ওঠে। নার্ভের ওপর চাপ পড়লে আমরা ব্যথা বা শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি।

'অ্যাস্‌প্রো' কিভাবে কাজ করে : 'অ্যাস্‌প্রো' মুহূর্তের মধ্যে দেহের রক্ত চলাচলের সংগে মিশে যায়—ফোলা কমিয়ে—নার্ভের ওপর চাপ দূর করতে সাহায্য করে—শরীরের অস্বাচ্ছন্দ্য দূর করে।

কখন 'অ্যাস্‌প্রো' গ্রহণ করবেন : ব্যথা-বেদনা • মাথাধরা • গা ব্যথা • দাঁত ব্যথা • গাঁটে ব্যথা • গা-জর জর • ফ্লু • ডেঙ্গু জরে 'অ্যাস্‌প্রো' গ্রহণ করতে পারেন।

মাত্রা :
বয়স্ক : দুইটি বড়ি।
আবশ্যক হলে আবার গ্রহণ করা উচিত।
শিশু : একটি বড়ি অথবা ডাক্তার অনুমোদিত মাত্রা।

A.G.3.65

'অ্যাস্‌প্রো' ব্যথা-বেদনা বার করে নেয়!

প্রচলন শুরু হয় এবং এই বিষয়ে যাঁরা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁরা হচ্ছেন সুলপিসিয়াস এবং ওরোসিয়াস। এ'রা উভয়েই সামগ্রিকভাবে জগতের ইতিহাস রচনা করেছিলেন। ব্যাকরণ রচনায় খৃস্টীয় দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম শতকের মধ্যে যাঁরা কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন তাঁরা হচ্ছেন গেল্লিয়াস, নোনিয়াস, ডোনাটাস, চারিসাস, ডাওমেডেস, সার্ভিয়াস, ম্যাক্রোবিয়াস এবং প্রিস্কিয়ান। এ যুগের ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থসমূহের যশস্বী লেখক ছিলেন মারিসিয়ানাস কাপেল্লা এবং ক্যাসিওডোরাস, জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে লিখেছিলেন সেন্সোরিনাস, ফারমিকাস ও মেটোরনাস, এবং কৃষিবিদ্যার লেখক ছিলেন পাল্লাডিয়াস। এ'রা প্রত্যেকেই তৃতীয় থেকে পঞ্চম শতকের লোক ছিলেন।

ওভিড ও সেনেকা

খৃস্টীয় প্রথম শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ ল্যাটিন কবি ছিলেন ওভিড। হোরেস টিবুল্লাস এবং প্রোপারসিয়াস কাব্যের ক্ষেত্রে যে ধারার প্রবর্তন করেছিলেন, সেই ধারাটির পরিপূর্ণতা ঘটেছিল ওভিডের হাতে। ওভিডের জন্ম ৪৩ খৃস্টপূর্বাব্দে এবং মৃত্যু ১৭ খৃস্টাব্দে। তাঁর পিতার সাধ ছিল যে ওভিড আইনজীবী হবেন এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি বাল্যকালেই রোমে প্রেরিত হন সেখানে তিনি প্রখ্যাত আলংকারিকদের নিকট শিক্ষালাভ করেন। শিক্ষান্তে তিনি গ্রীস ও এশিয়াতে ভ্রমণ করেন। এই সময় তিনি **মীডিয়া** নামক একটি ট্র্যাজেডি রচনা করেছিলেন যেটি এখন লুপ্ত হয়ে গেলেও তৎকালীন সমালোচকদের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছিল।

পরিণত বয়সে ওভিড রোমক সরকারে চাকুরী গ্রহণ করেছিলেন। এই সময় তিনি তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ **মেটামরফোসেস** রচনা করছিলেন। কিন্তু ৯ খৃস্টাব্দে তিনি আকস্মিকভাবে সম্রাট অগাস্টাস কর্তৃক কৃষ্ণসাগরের পরপারে নির্বাসিত হন। নির্বাসিত অবস্থায় তিনি তাঁর দণ্ডাজ্ঞা তুলে নেবার জন্য সম্রাটের কাছে আবেদন করেন। তাঁর সেই সময়কার যন্ত্রণা তাঁর আত্মজীবনীমূলক কাব্যগ্রন্থ **ট্রিসটায়** প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর দণ্ডাজ্ঞা মকুব হয় নি। নির্বাসিত অবস্থায় ভগ্নহৃদয়ে তিনি প্রাণত্যাগ করেছিলেন।

এবার তাঁর রচনাবলীর একটি তালিকা দেওয়া যাক। ১৪ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল **অ্যামোরেস**। এতে কবির ৪৯টি প্রেমের কবিতা আছে যেগুলি করিন্না নামক এক অজ্ঞাত কবিমানসীকে উদ্দেশ্য করে লেখা। (২) **একুশটি** পত্র-কবিতার সংকলন, নাম **হেরোইডেস**, বিষয়বস্তু হচ্ছে স্বামী বা প্রণয়ীর নিকট স্ত্রী বা প্রেমিকার পত্র, মাইকেলের বীরাঙ্গনা কাব্য সম্ভবত এই **হেরোইডেস** অনুকরণে লিখিত। কিন্তু এই কাব্যগ্রন্থটি ওভিডের নামে চললেও এটি অপরের লেখা। (৩) **মেডিকামিনা ফাসিই**—অসম্পূর্ণ এই কাব্যগ্রন্থটি নারীদের প্রসাধন সম্পর্কে রচিত। (৪) **আমাটোরিয়া**—তিন খণ্ডে রচিত এই কাব্যগ্রন্থে মেয়েদের হৃদয় জয়ের কৌশল আলোচিত হয়েছে। (৫) **রেমিডিয়া অ্যামোরিস**—এই কাব্যটি পূর্বোক্ত কাব্যগ্রন্থটির পরিশিষ্ট। (৬) মেটামরফোসিস —এটি একটি ঐতিহাসিক কাব্য, ওভিডের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য বলে স্বীকৃত। (৭) **ফাস্তি**—রোমের বাৎসরিক উৎসবগুলিকে কেন্দ্র করে এই কাব্যটি রচিত হয়েছিল। (৮) আত্মজীবনীমূলক কাব্য **ট্রিসটিয়া** (৯) **এপিস্থলে একস পন্টো**—পন্টাস নামক এক বন্ধুর উদ্দেশ্যে রচিত কবিতাকারে পত্র। (১০) **ইবিস**—এই নামেরই কবি ক্যালিম্যাকাসেত একটি কবিতার অনুসরণ। (১১) **হ্যালিউটিকা**—সপ্তমাত্রিক ছন্দে রচিত কৃষ্ণসাগরের মাছের উপর এই কাব্য রচিত।

রোমের ইতিহাসে সেনেকা ছিলেন দুজন, একজন বিখ্যাত বক্তা ও আলংকারিক, অপরজন দার্শনিক, কবি ও গদ্যলেখক। দ্বিতীয়জনই আমাদের আলোচ্য ব্যক্তি। প্রথম জীবনে তিনি সম্রাট ক্লডিয়াস কর্তৃক কর্সিকায় নির্বাসিত হন, পরে রাণী এগ্রিপ্পিনার অনুরোধে তাঁকে ফিরিয়ে আনা হয় এবং তিনি এগ্রিপ্পিনার পুত্র নীরোর গৃহশিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে নীরো সম্রাট হলে সেনেকা কিছুকাল তাঁর উপদেষ্টা ছিলেন।

লেখক হিসাবে সেনেকা তাঁর সরল স্টাইলের জন্য বিখ্যাত। তাঁর অজস্র গদ্য রচনার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় দর্শন ও নীতিশাস্ত্রের উপর রচনা **ডে ক্লেমেন্সিয়া**। এর পরেই উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রকৃতি বিজ্ঞানের উপর সাতখণ্ডে রচিত **কোয়েশ্চেন্সে ন্যাচারালেস**। এ ছাড়া তাঁর পত্রাবলীও বিশেষ উল্লেখযোগ্য যেগুলি **ডে কনসোলাটিওনে** শিরোনামায় সঙ্কলিত হয়েছিল কিন্তু কবি ও নাট্যকার হিসাবেই সেনেকা অধিকতর জনপ্রিয় হয়েছিলেন। বলতে গেলে সেনেকাই হচ্ছেন একমাত্র রোমক ট্রাজেডিকার। এ পর্যন্ত তাঁর রচিত দশটি ট্রাজেডি পাওয়া গেছে **হারকিউলেস ফুরেনস, হারকিউলেস ইটিয়াস, থিস্টেস, ফেড্রা, ইডিপাস, ট্রোয়াডেস, মীডিয়া অ্যাগামেমনন, থিবাইস ও অক্টেভিয়া**। এই ট্রাজেডিগুলির বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিক গ্রীক আদর্শে রচিত কিন্তু চরিত্রসমূহের গঠন সম্পূর্ণ রোমক। এদিক থেকে এস্কিলাস এবং পাকুভিয়াসের সঙ্গে সেনেকার পার্থক্য মৌলিক।

পরবর্তী যুগের ল্যাটিন কাব্য

খৃস্টীয় প্রথম শতকে, অর্থাৎ মোটামুটি টাইবেরিয়াসের সময় থেকে ট্রাজানের মৃত্যু পর্যন্ত এক শতাব্দীর ইতিহাসে গদ্য-সাহিত্যের যেমন উন্নতি হয়েছে, কবিতা ও কাব্যসাহিত্য মানের দিক তেমন উচ্চ স্তরে যেতে পারে নি। তবে এযুগে কবিতা তথা কাব্যসাহিত্যের বিকাশ যে একেবারে হয় নি তা নয়। এই শতকে আমরা তিনজন মহাকাব্যকারের উল্লেখ পাই। তাঁরা হচ্ছেন জার্মানিকাস, ম্যানিলাস এবং লুসিলিয়াস। জার্মানিকাস (১৫ খৃস্টপূর্বাব্দ—১৯ খৃস্টাব্দ) ছিলেন ওভিডের সমকালীন, এবং শেষোক্তজন তাঁর **ফাস্তি** কাব্যটি জার্মানিকাসকে উৎসর্গ করেছিলেন। জার্মানিকাসের নিজস্ব রচনা বিলুপ্ত হয়েছে। এ-পর্যন্ত তাঁর **ফেনোমেনা** কাব্যের মোট ৭২৫ লাইন পাওয়া গেছে। মহাকবি হিসাবে জার্মানিকাসের উল্লেখ একমাত্র ওভিডই করেছেন। মহাকবি নামে উল্লিখিত ম্যানিলাসও কোন মহাকাব্য রচনা করেন নি। জ্যোতির্বিদ্যার উপর তিনি পাঁচ খণ্ডে রচনা করেছিলেন অ্যাস্ট্রোনমিকা। তৃতীয় জন ছিলেন লুসিলিয়াস যাঁর **এটনা** নামক কাব্যগ্রন্থের কিছু অংশ এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। মহাকাব্যকারদের অনুসরণে এ'রা সপ্তমাত্রিক ছন্দে লিখতেন এই মাত্র।

ঐতিহাসিক কাব্য লিখেছিলেন লুকান (মৃত্যু ৬৫ খৃস্টাব্দ) এবং সিলিয়াস **ইটালিকাস** (মৃত্যু ১০১ খৃস্টাব্দ)। লুকান ছিলেন সেনেকার ভ্রাতুষ্পুত্র। প্রথম জীবনে তিনি সম্রাট নীরোর সুদৃষ্টিতে ছিলেন, কিন্তু স্বয়ং কবি প্রতিভার অধিকারী নীরো লুকানের জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে সম্রাট সাধারণের মধ্যে তাঁর কবিতার আবৃত্তি নিষিদ্ধ করে দেন। শেষ পর্যন্ত লুকান সম্রাট নীরোকে হত্যার জন্য একটি চক্রান্তে লিপ্ত হন, কিন্তু অবশেষে ধরা পড়ে আত্মহত্যা করেন। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে **ফারসালিয়া**। দশ খণ্ডে রচিত এই বিশাল কাব্যগ্রন্থে সীজার ও পম্পেইর গৃহযুদ্ধের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সিলিয়াস ইটালিকাসের জন্ম ২৫ খৃস্টাব্দে। অবসর জীবনে তিনি সতের খণ্ডে **পিউনিকা** নামে দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের কাহিনী অবলম্বনে একটি কাব্য রচনা করেছিলেন। এ যুগে বীররসপূর্ণ কাব্য রচনা করেছিলেন স্ট্যাটিয়াস (মৃত্যু

৯৬ খৃস্টাব্দ) এবং ভ্যালেরিয়াস ফ্ল্যাকাস (মৃত্যু ৯০ খৃস্টাব্দ)। প্রাচীন যুগের বীররসপূর্ণ কাহিনীগুলিই ছিল স্ট্যাটিয়াসের রচনার উপজীব্য বিষয়। ১২ খণ্ডে তিনি লিখেছিলেন **থিবাইস,** ইডিপাসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদের মধ্যে রাজ্য লাভের জন্য সংগ্রামের কাহিনী অবলম্বনে এই কাব্য রচিত হয়েছে। এ ছাড়া দু' খণ্ডে রচিত **অ্যাকিলিস** নামক কাব্যগ্রন্থের কথাও উল্লেখযোগ্য। স্ট্যাটিয়াসের মধ্যে গীতিকবির প্রতিভাও ছিল, এবং তাঁর একটি গীতিকবিতার সঙ্কলনও পাওয়া গেছে, নাম **সিলভি**। ভ্যালেরিয়াস ফ্ল্যাকাস জেসন ও মীডিয়ার কাহিনী অবলম্বনে লিখেছিলেন **আর্গোনটিকা**। গ্রামজীবনের চিত্র কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন কালপুর্নিকাস মিকুলাস (মৃত্যু ৫৫ খৃস্টাব্দ) তাঁর মোট সাতটি দীর্ঘ কবিতা পাওয়া গেছে যেগুলি **ইকলোগ** নামক সাধারণ শিরোনামায় রচিত। কবি হোরেস যে ব্যঙ্গমূলক কবিতার সূত্রপাত করেছিলেন পরবর্তীকালে তা অনুসরণ করেন পার্সিয়াস (মৃত্যু ৬২ খৃস্টাব্দে) এবং জুভেনাল (মৃত্যু ১৩০ খৃস্টাব্দ)। পার্সিয়াসের এ পর্যন্ত মোট ছয়টি ব্যঙ্গাত্মক রচনা পাওয়া গেছে। জুভেনালের প্রাপ্ত কবিতার সংখ্যা ষোলটি।

ল্যাটিন সাহিত্যের অবক্ষয়ের যুগে, অর্থাৎ হাড্রিয়ানের (১১৭ খৃঃ) যুগ থেকে খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত কবিতা ও কাব্যসাহিত্যের স্রোত রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল বলেই মনে হয়। চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের মোট চারজন কবির নাম আমরা পাই। তাঁরা হচ্ছেন অউসোনিয়াস, ক্লডিয়ান, নমাটিয়ানাস এবং ড্রাকোনিসাস অউসোনিয়াস ছিলেন বিস্ময়করভাবে সাবজেক্টিভ লেখক। নিজে মানসিক সংঘাতগুলিকে তিনি ছন্দোবন্ধ করেছেন দুটি কাব্যগ্রন্থে, একটি হচ্ছে **পেরেন্টালিয়া** অপরটি হচ্ছে **মোসেল্লা**। ক্লডিয়ান ছিলেন খৃস্টীয় চতুর্থ শতকের কবি। তাঁর যুগে রোম বৈদেশিক আক্রমণে বিপর্যস্ত। কিন্তু ক্লডিয়ান ভ্যান্ডল আক্রমণকারীদের নেতা স্টিলিকোর সুনজরে পড়তে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত রচনা হচ্ছে প্রোসারপাইনের ধর্ষণ, **রেপটাস প্রোসারপাইন**। এই অসমাপ্ত মহাকাব্যে তাঁর কবিপ্রতিভার চরম স্ফুরণ হয়েছে এ কথা বলা যায়। তাছাড়া তিনি প্রশস্তিমূলক বহু কাব্য লিখেছেন। ড্রাকোনিসাস ছিলেন পঞ্চম শতকের কবি। পরবর্তীকালের লেখকেরা তাঁর রচনার সুখ্যাতি করে গেছেন, কিন্তু তাঁর রচনার সামান্য ভগ্নাংশমাত্রই অবশিষ্ট আছে। তাঁর একটি দীর্ঘ কবিতা **স্যাটিসফ্যাক্টিও** অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়। কবি নমাটিয়ানাসও পঞ্চম শতকের লোক। গথ নেতা অ্যালারিক যখন রোম লুণ্ঠন করে, তখন তিনি রোম ত্যাগ করে অন্যত্র পালিয়ে যান। তাঁর সেই সময়কার এডভেঞ্চার সমূহ তাঁর দুই খণ্ডে রচিত কাব্যগ্রন্থ **ডে রেডিটু সুও**-তে বর্ণিত হয়েছে।

৪৭৬ খৃস্টাব্দে রোম সাম্রাজ্যের পতন হয়। কিন্তু ল্যাটিন সাহিত্যের মৃত্যু হতে আরও সময় লেগেছিল। মধ্যযুগের ইউরোপেও ল্যাটিন ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা ছিল। সে ইতিহাসের স্থান অবশ্য অন্যত্র।

ত্র্যহস্পর্শ—

ঈলের বাৎসল্য ও মানুষের বিজ্ঞান

আশিসকুমার সিংহ

জীবজগতের সবচেয়ে বুদ্ধিমান জীব মানুষের জীবধর্মের সঙ্গে তার দর্শন, ঔচিত্যবোধ প্রভৃতি বুদ্ধির ফসলের সম্পর্ক কী এ নিয়ে তর্ক-বিতর্কের অন্ত নেই। জীবধর্মটা যেহেতু জীববিজ্ঞানের আওতায় পড়ে সেই জন্যে এই বিতর্কে জীব-বিজ্ঞানীদের একটা অংশ আছে। তাঁরা জীবজগৎ থেকে উদাহরণ হাজির করতে পারেন। এমন একটি মাছকে আমরা এখানে সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত করছি। ডিম পাড়বার জন্যে যে অশেষ কষ্ট এই মাছটি স্বীকার করে তার তুলনা নেই। এই কষ্ট স্বীকারকে নিশ্চয়ই তার বাৎসল্যের নিদর্শন হিসাবে ধরা যায়। আবার বাৎসল্য হল এমন একটা জীব-ধর্ম যার মাধ্যমে বুদ্ধির যথেষ্ট প্রকাশ হয় বলে আমরা স্বীকার করি।

যে মাছটার কথা বলছি তার এক স্বজাতির সঙ্গে অধিকাংশ বাঙালীর অল্প-বিস্তর পরিচয় আছে। বাইন মাছ কে না দেখেছেন? গ্রামের দিকে পুকুরের মিঠে জলে এদের দেখা যায়; সাধারণত একেবারে তলায় পাঁকের ওপরে শুয়ে থাকে এরা, কখনও বা পুকুরের ধারে জলের ওপরে মাথাটা তুলে দিয়ে পড়ে থাকে। আট-লাণ্টিক মহাসমুদ্রের পূব-পশ্চিম দু পাশেই ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশে নদীর মিঠে জলে এই বাইন মাছের একদল স্বজাতি বাস করে। তাদের নাম ঈল মাছ। ঈল জাতীয় মাছের অনেক-গুলি উপজাতি আছে। মিঠে নদীর এই ঈলদের নাম আসল ঈল বা True Eel. বাইন মাছের নাম বাংলার ঈল বা Bengal Eel. এদের একটি উপজাতি শরীরে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। সেই বৈদ্যুতিক ঈলের কথা আমরা আগে একদিন আলোচনা করেছি—পাঠকদের হয়তো তা স্মরণে আছে।

ইউরোপীয়রা চিরকালই মিঠে জলের ঈল খেতে ভালবাসে। সেদেশের জেলেরা বহু শতাব্দী ধরে এদের ধরতে খুব উৎসাহী: এবং সেই জন্যে স্বভাবতই এদের জীবন-ইতিহাস সম্বন্ধেও তাদের কৌতূহল কম নয়। কিন্তু বহুদিন যাবৎ এই মাছেদের ব্যাপার-স্যাপার তাদের কাছে একটা অদ্ভুত ধাঁধার মত মনে হত। কেন না বড় হলেই এরা তাদের নদী থেকে হঠাৎ যেন উবে যেত, আর কিছুদিন পরে কিছু ছোট ছোট ঈল দেখা দিত নদীতে, কিন্তু পরিণত বয়সের ঈল বা ঈলের ডিম কেউ কখনো কোথাও দেখতে পায় নি।

এই অবস্থায় যেভাবে প্রকৃতির অন্যান্য তথাকথিত ধাঁধার উত্তর দিয়েছে মানুষ তার আদিযুগে, এখানেও সেই পদ্ধতির কোন ব্যতিক্রম হয় নি। লোকের মুখে নানারকম উপকথা আর গান চালু ছিল। অনেকে বলত এরা স্বয়ম্ভূ অর্থাৎ আপনিই জন্মায়। আইজাক ওয়ালটন নামে আগের যুগের এক সমুদ্রবিশারদ তাঁর Compleat Augler-এ বলেছেন: "অনেকে বলে, যেমন শিশিরবিন্দুর থেকে মুক্তার উৎপত্তি, তেমনি মে বা জুন মাসের এক বিশেষ ধরণের প্রাতঃকালীন শিশির, যা কি না কোন বিশেষ পুকুর বা নদীর তীরেই ঝরে পড়ে, সূর্যতাপের সাহায্যে জন্ম দেয় ঈল মাছের।" আবার এমন মতও প্রচলিত ছিল যে ঘোড়ার চুল বা ছোট বোলতা সমুদ্রে পড়ে গেলে তার থেকেই ঈলের জন্ম হয়। অবশেষে বিজ্ঞানের হাতে যখন সমস্যাটির সমাধান হল তখন দেখা গেল বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরস্পরের অজ্ঞাতেই একযোগে একটি চমৎকার গোয়েন্দা কাহিনীর সৃষ্টি করেছেন।

কাউফ (Kauf) নামে এক জার্মান বিজ্ঞানী ১৮৪৬ খৃস্টাব্দে গোয়েন্দা কাহিনীটির সূত্রপাত ঘটালেন। তিনি একদিন সমুদ্রে ছোট্ট ফিতের মত একটা ছোট্ট মাথাওয়ালা মাছ আবিষ্কার করলেন এবং তার বৈজ্ঞানিক নাম দিলেন লেপটো-সেফালাস ব্রেভিরোস্ট্রিস। নামটা দেওয়া হল ল্যাটিন ভাষায়। যাতে জগতের সব বিজ্ঞানী কোন নবাবিষ্কৃত বা পুরাতন জীবকে একই নামে চিনতে পারে সেই উদ্দেশ্যে উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যায় এই ল্যাটিন ভাষায় নামকরণের দস্তুর প্রচলিত। যাহোক, বিজ্ঞান সে সময় এই আবিষ্কারটি নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামাল না, সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এক বোতল এ্যালকোহলে মাছটিকে রেখে দিল যাতে মৃত অবস্থায় ওটা অবিকৃত থাকে বহুদিন। এবং তার-পরে এ ব্যাপারে সব কিছু ভুলে গেল।

এই ঘটনার পঞ্চাশ বছর পরে ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে গ্রাসী নামে এক ইতালীয় বিজ্ঞানী দ্বিতীয়বার যবনিকা তুললেন। তিনি ভূমধ্যসাগরে কাউফের কয়েকটি ছোট্ট মাছ ধরলেন এবং গবেষণার জন্যে তাদের জিইয়ে রাখলেন গবেষণাগারে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তিনি দেখতে পেলেন মাছগুলি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি তাদের আকৃতি পাল্টে ফেলছে। এবং অবশেষে কি আশ্চর্য!—তাঁর চোখের সামনেই কাউফের মাছগুলি ছোট ছোট ঈলে রূপান্তরিত হয়ে গেল। এ যেন ঠিক শুঁয়োপোকা থেকে প্রজাপতি বেরিয়ে আসার মত ব্যাপার। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করাই কঠিন।

একটা বিরাট ধাঁধার সমাধান হল গ্রাসীর এই আবিষ্কারে। এতদিন পরে অন্তত এটুকু বোঝা গেল ঈল বড় হলে উবে যায় না, আসলে নদী থেকে সমুদ্রে চলে যায় এবং ছোট শূককীটগুলি সমুদ্রের থেকেই দেশের ভিতরে মিঠে জলের নদীতে চলে আসে, প্রাতঃকালীন শিশিরবিন্দু বা ঘোড়ার চুলের ব্যাপারটার খুব বেশি কোন সম্পর্ক নেই।

তাহলে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে ঈল ডিম পাড়ে সমুদ্রে! কিন্তু কোথায়? সমস্ত ঈলই কি কোন নির্দিষ্ট স্থান বেছে নেয়, না নানাস্থানে ডিম পাড়ে? যদি কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রই তাদের গন্তব্য হয় তবে কোথায় সেই ক্ষেত্র? সে কি কোন অজানা দ্বীপে? অথবা এমন কোন দেশের উপকূলে যে দেশটাকে আমরা জানি যদিও জানি না যে তার উপকূলেই এই

রহস্যময় ডিম্বপ্রসবক্ষেত্র? শতাব্দীর প্রথম দশকে ডঃ জোহানস স্মিথ (Johannes Schmidt) নামে ডেনমার্কের এক বিজ্ঞানী ব্যাপারটার সমাধান করবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন।

স্মিথ যখন সমুদ্রে বেরোলেন সেটা ১৯০৬ সাল। সমস্ত আটলান্টিক জাল দিয়ে তন্ন তন্ন করে খোঁজা শুরু করলেন তিনি। বড় ঈলেদের চেয়ে বাচ্চাদের খোঁজা সহজ। জাল ফেলে তাদেরই ধরা শুরু হল। যেহেতু সমুদ্রের মধ্যেই ডিম থেকে ঈলের শুককীট বা কাউফের লেপটোসেকালাস জন্ম নেয় অতএব স্মিথ সিদ্ধান্ত করলেন যেখানে জালে যত ছোট লেপটোসেকালাস ধরা পড়বে সেই জায়গা ডিম্বপ্রসবক্ষেত্রের তত কাছে। এইভাবে বিশাল আটলান্টিক জরীপ শুরু হল এবং জরীপের ফলাফল থেকে মানচিত্র তৈরি করতে শুরু করলেন স্মিথ। কেটে গেল দীর্ঘ পনের বছর। তার পরে তাঁর মানচিত্রগুলি ধীরে ধীরে অর্থময় হয়ে উঠতে শুরু করল। ১৯২২ সালে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলেন এবং ঘোষণা করলেনঃ ২০ ডিগ্রী থেকে ৩০ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ এবং ৫০ ডিগ্রী থেকে ৭০ ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমাংশের মধ্যে বার্মুডা ও বাহামা দ্বীপপুঞ্জের কাছে, যে জায়গাটাকে সারগাসো সমুদ্র বলা হয় এবং যেখান থেকে উপসাগরীয় স্রোতের উৎপত্তি হয়েছে সেইখানে, প্রায় ১০০ ফ্যাদম জলের তলায় ঈল তার ডিম পাড়ে। ইউরোপীয় এবং আমেরিকান ঈলের ডিম পাড়ার জায়গার মধ্যে সামান্য দূরত্ব আছে। ইউরোপীয়দের প্রসবক্ষেত্র আমেরিকানদের সামান্য পূর্বদিকে অবস্থিত। এখানে স্মিথ ঈলের ডিম খুঁজে পেলেন না। অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং আকারে মটরশুঁটির মত দেখতে এই ডিমগুলি।

সারগাসো সমুদ্র ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে দুই থেকে তিন হাজার মাইল দূরে। অন্তহীন মহাসমুদ্রে পথ চিনে এই দূরত্ব পাড়ি দিয়ে ঈলেরা পৃথকভাবে এখানে আসে, আর বাচ্চারা কিভাবে আবার তাদের পিতৃপিতামহের বাসভূমিতে ফিরে যায় সে খবর এখনও রহস্যাবৃতই থেকে গেছে। বোধ হয়, সমুদ্রস্রোত তাদের এ কাজে সাহায্য করে। আর কেনই বা তারা বাসভূমিকে বাদ দিয়ে এক বিদেশ-বিভূঁইকে ডিম পাড়বার জন্যে বেছে নিয়েছে তাও এখন জানা যায় নি। হয়তো এ এক পুরুষানুক্রমিক অভ্যাসের ফল যাতে করে একমাত্র এই বিশেষ স্থানেরই জলস্রোত, তাপমাত্রা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক অবস্থা ঈলের ডিম থেকে বাচ্চার জন্মের অনুকূল।

ডিম ফুটে যখন ঈল মাছের বাচ্চা বাইরে আসে তখন তার দৈর্ঘ্য থাকে মাত্র ¼ ইঞ্চি। দেখতে সে একটা লম্বাটে পাতার মত যেটা বোঁটা থেকে ক্রমাগত চওড়া হতে হতে মাঝ বরাবর এসে সবচেয়ে চওড়া হয়েছে এবং তারপরে কমতে কমতে সরু হয়ে একটা বিন্দুতে শেষ হয়ে গেছে। বোঁটার দিকটায় ছোট্ট একটা মাথা বসানো, আর সমস্ত শরীরটা অত্যন্ত স্বচ্ছ। এই হল ঈলের শুককীট বা কাউফের লেপটোসেকালাস। জন্মের পরে এরা স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করে। লিটল আমেরিকানরা যায় আমেরিকায়, আর লিটল ইউরোপীয়রা ধরে ইউরোপের পথ। স্বদেশে পৌঁছতে আমেরিকানদের লাগে এক বছর আর ইউরোপীয়দের প্রায় তিন বছর। এই সময়ের মধ্যে এদের শুককীটের জীবন শেষ হয়ে ঈল-জীবন শুরু হয়। স্বদেশের উপকূলে নদীর মোহনায় এদের দৈর্ঘ্য হয় প্রায় তিন ইঞ্চির কাছাকাছি, পাতার মত আকৃতি চলে গিয়ে এদের দেখতে হয় ছোট ছোট ঈলের মত লম্বা। তবে স্বচ্ছতাটা তখনও থাকে, তাই তখন এদের বলে কাচের ঈল বা গ্লাস ঈল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে জন্মের পর থেকে কাচের ঈল হতে অর্থাৎ শুককীটের জীবন শেষ করতে এদের লাগে ঠিক ততটা সময় যতটা এরা কাটায় সমুদ্রে। তাই আমেরিকানদের শুককীটের জীবন এক বছর হলেও ইউরোপীয়দের এই একই দৈহিক পরিবর্তন ঘটে প্রায় তিন বছরে। পরিবর্তনের হারটা কেমন চমৎকারভাবে এরা পারিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে।

ঝাঁকে ঝাঁকে কাচের ঈল এবার মিঠে জলের নদীতে প্রবেশ করে। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদের দৈহিক স্বচ্ছতা ক্রমে চলে যায় এবং ৮ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে এরা পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। পুরুষ ঈলের পরিণতি একটু দ্রুত আসে। এরা সাধারণত ১৬ ইঞ্চির মত লম্বা হয়, আর স্ত্রী ঈলের দৈর্ঘ্য ৩ ফুটও হতে পারে।

তারপরে পরিণত ঈলের জীবনে হঠাৎ একদিন একটি অবশ্যম্ভাবী হেমন্তের আগমন ঘটে যখন তারা এক দুর্নিবার আকর্ষণে এতদিনের অভ্যস্ত বাসভূমি ছেড়ে সমুদ্রের দিকে যাত্রা করে। কোন বাধাই তখন তাদের ঠেকাতে পারে না। এমন কি জলস্রোত মজে গেলে তারা ডাঙার ওপর দিয়েও চলতে থাকে। এর জন্যে বর্ষণসিক্ত রাত্রিগুলিকে তারা বেছে নেয়। আবদ্ধ জলাশয়ের ঈলও এইভাবে পাড়ি জমায় সমুদ্রের দিকে। যাত্রার প্রাক্কালে ঈলের দেহ ঈষৎ রুপালী বর্ণ ধারণ করে; লোকে বলে এ হল তার ডিম পাড়বার রুপালী পোশাক।

সমুদ্রে পৌঁছানো মাত্র তাদের খাওয়া-দাওয়া যায় বন্ধ হবে। দেহে সঞ্চিত চর্বি এবং পেশীর ওপরেই তখন তাদের নির্ভর। বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ঈলের দল কাতারে কাতারে সারগাসো সমুদ্রের দিকে গা ভাসায়। বিজ্ঞানীরা তাদের গতিবেগও নির্ধারণ করেছেন। তাঁরা বিভিন্ন স্থানে

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর
বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গৌহাটী

ঈল ধরে তাদের চিহ্ন দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। তার পরে অন্যত্র আবার যখন তারা ধরা পড়েছে হিসাব করে দেখেছেন কতদিনে এরা কতটা পথ এসেছে। দেখা গেছে দিনে এরা প্রায় দশ মাইল পথ অতিক্রম করে। এই হারে আমেরিকানরা প্রায় তিন মাসে এবং ইউরোপীয়রা প্রায় ছয় থেকে দশ মাসে সারগাসো সমুদ্রে পৌঁছায়, পৌঁছে ডিম পাড়ে এবং তারপরে—সম্ভবত মারা যায়।

মারা যাওয়ার ব্যাপারটা অনেকটা অনুমানের ওপর নির্ভর করে ঠিক করা হয়েছে। আটলাণ্টিকে সালমন নামে এক ধরণের মাছ পাওয়া যায় যাদের ডিম পাড়ার কাহিনী একই রকম চমকপ্রদ, যদিও তাদের গতি বিপরীত দিকে। অর্থাৎ তারা যায় সমুদ্র থেকে দেশের মধ্যে মিঠে জলের নদীতে এবং সেখানে ডিম পাড়ে। ঈল যেমন সমুদ্রে ঢুকেই খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে, সালমন তেমনি করে নদীতে ঢুকে। যারা খুব বড় নদীতে (যেমন রাইন) প্রবেশ করে না খাওয়ার জন্যে তাদের শরীরের ওজন কমে যায় প্রায় শতকরা চল্লিশ ভাগ। আর সেই জন্যে ডিম পাড়বার পরেই তারা মারা যায়। ছোটখাট নদীতে যারা ডিম পাড়ে তারা অবশ্য বেঁচে যেতেও পারে। ঈলকে না খেয়ে দীর্ঘদিন কাটাতে হয় বলে ডিম পাড়বার পরে তারা মারা যায় এ রকম ধারণা করা যুক্তিসংগত।

বন্দী অবস্থায় ঈল প্রায় ৫০ বছর বেঁচে থাকে। কিন্তু মিঠে জলে আসল ঈল ডিম পাড়ে না কখনও। বাংলার ঈল বাইন মাছ কিন্তু পুকুরের মিঠে জলেই ডিম পাড়ে। যদিও এরা আসল ঈলের স্বজাতি এবং যদিও ডাঙার ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্যে এক-জোড়া ফুসফুসও এদের আছে তবুও ডিম পাড়বার জন্যে সমুদ্রে যাওয়ার নামও করে না এরা। সরষের দানার মত বড় একটু কালচে এদের ডিমগুলি পুকুরেই বাচ্চার জন্ম দেয়। মিঠে জলের অনেক মাছ পোনা বা নিজেদের শুককীট চরায়, অর্থাৎ তারা বড় না হওয়া অবধি গাইড হিসেবে তাদের কাছে কাছে থাকে। বাইন মাছের অবশ্য ততটা বাৎসল্যের পরিচয় পাওয়া যায় নি।

জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যে প্রাণীর যত বেশি সংখ্যক বাচ্চা বেঁচে থাকে সে প্রাণী জীবন-সংগ্রামে টিকে থাকবার জন্যে তত বেশি যোগ্য। বাৎসল্য তাই জীবধর্ম, বাৎসল্যের বা জীবন-সংগ্রামের এই তাগিদেই ঈল সীমাহীন আটলাণ্টিকের দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয় বলে আমরা অনুমান করতে পারি। তাতে তার নিজের জীবন চলে গেলেও সে বিমুখ হয় না। ডিম পাড়বার পরে মারা যায় বলেই তার বাৎসল্যের আর কোন পরিচয় আমরা পাই না। বাইন মাছকে এদিক দিয়ে একটু স্বার্থপর মনে হতে পারে। কেন না, ফুসফুস থাকা সত্বেও সে ডাঙার ওপর দিয়ে অন্যত্র যেতে নারাজ; এমন কি ডিম পাড়বার পরে বেঁচে থাকলেও সে সন্তানের দায়িত্ব নেয় না।

কিন্তু একটু চিন্তা করলেই আপনি হয়তো মতটা পরিবর্তন করবেন। নিজ বাসভূমিতেই যখন তার ডিম ফুটে বাচ্চার জন্মের অনুকূল পরিবেশ বর্তমান তখন কেন সে বনবাদাড় ঠেঙিয়ে অন্যত্র যাবে? তার চেয়ে বরং পুকুরের ধারে মুখ উঁচু করে বাতাস থেকে সরাসরি অক্সিজেন নিয়ে ফুসফুসের সদ্ব্যবহার করলে ক্ষতি কি? আর বাচ্চার যখন নিজে নিজে চরে বেড়ানর সামুদ্রিক অভ্যাসটাই থেকে গেছে তখন সেখানেই বা সময় দেওয়ার কি প্রয়োজন? মানুষের উচিত-অনুচিতের বোধকে জীবজগতে আরোপ না করাটাই বোধ হয় যুক্তিসংগত।

কেন না, আমাদের প্রাথমিক প্রসঙ্গে ফিরে গিয়েই আমরা এখানে বলতে পারি, মানুষের উচিত-অনুচিতের বোধ অনেক ক্ষেত্রেই তার জীবধর্মকে অস্বীকার করে। যেমন, এই টিকে থাকার ব্যাপারটাই ধরুন। সন্তান পালন না করলে মানুষকে দোষ দেওয়া যায়, কিন্তু বাইন মাছকে যায় না। কেন না, টিকে থাকার জন্যে যে সন্তান পালনের প্রয়োজন আছে এটা তার বুদ্ধির কাছে যত পরিষ্কার, বাইন মাছের কাছে ততটা নয়। এ সত্বেও মানুষের ঔচিত্যবোধ অনেক সময়েই এমন পথে চলে যায় যে পথে খুব বেশিদূর গেলে মানুষ নামক প্রাণীটি একেবারে লোপ পেতে পারে। মধ্যযুগে বিবাহ না করাটা ধার্মিকতার খুব বড় নিদর্শন ছিল। এই মত এখনও একেবারে বিরল নয়। একাধিক জীব-বিজ্ঞানী মতটাকে কটাক্ষ করেছেন। মানুষের ঔচিত্যবোধ তার সহজবুদ্ধি এবং জৈবিকতাকে অস্বীকার করলে এমন অদ্ভুত ব্যাপার ঘটবেই। ঠিকমত টিকে থাকার জন্যে এ দুয়ের একটা বিজ্ঞানসম্মত সামঞ্জস্য প্রয়োজন।

আবার দেখুন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতির দ্বারা আমরা মৃত্যুকে অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করেছি। শিশুমৃত্যুনিয়ন্ত্রণ আমাদের সমবেত বাৎসল্যের পরিচায়ক। কিন্তু জন্মকে আমরা সে তুলনায় নিয়ন্ত্রণ করতে পারি নি; কিংবা, বলা ভালো, চেষ্টা করি নি। এই চেষ্টাহীনতার একটা কারণ অনেক বাঙালী জন্মনিয়ন্ত্রণকে অনুচিত বলে মনে করেন। নীট ফল দাঁড়াচ্ছে এই যে খাদ্যের সঞ্চয়ে অপরিসীম চাপ পড়ছে। এখানেও ঔচিত্যবোধ, সহজবুদ্ধি ও জীবধর্মের একটা সামঞ্জস্যের প্রয়োজন।

ঈল বা বাইন মাছ, কিংবা অন্যান্য মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে এই সামঞ্জস্যটা সহজে হয়েছে। বিবর্তনের ফলে মানুষের স্নায়ুতন্ত্র এত বেশি উন্নত হয়ে গেছে যে তার বুদ্ধিটা হঠাৎ বেড়ে গেছে খুব বেশি। সেই জন্যেই তার ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যটা সহজ নয়। এমন অনেক দার্শনিক আছেন যাঁরা এই অসহজ ব্যাপারটিকে খুবই তারিফ করেন, বলেন এটাই হল মানুষের মনুষ্যত্ব। জীবের সংগে এ ব্যাপারে একটা তফাৎ দেখে খুবই আত্মতৃপ্তি পান তাঁরা। যেমন, প্রায় সব ধর্মই চারপাশের যে জগৎটাকে আমরা সাদা চোখে দেখতে পাই এবং সহজ-বুদ্ধিতে বুঝতে পারি সেটাকে অবিশ্বাস করে এমন কিছুকে বিশ্বাস করতে বলে যাকে সহজবুদ্ধি নাকচ করে দেয়। এটা হল বিশ্বাসের এক হাস্যকর বিকৃতি। অনেক দার্শনিকের মতে এই বিকৃত বিশ্বাসই মনুষ্যত্বের লক্ষণ।

হরিণশিশু বা গোবৎসের শৃঙ্গোদ্গমের সময় তারা চারপাশের সব কিছুকে ঢুঁ মেরে বেড়াতে থাকে। মানবশিশু দাঁত ওঠার সময় সব কিছুকেই মুখে পুরে কামড় দিতে চায়। মানুষের হঠাৎ-বেড়ে-যাওয়া বুদ্ধিটা জীবজগতের হাতে এ ধরণের একটা নতুন অস্ত্র। আমার মনে হয়, বিবর্তনের ইতিহাসে অস্ত্রটা একটু পুরনো হয়ে গেলেই (সম্ভবত সেটা হতে আরো কয়েক মিলিয়ন বছর লাগবে) সহজবুদ্ধির ওপরে এর ধার পরীক্ষাটা শেষ হবে। ওপরে যে সামঞ্জস্যের কথা বললাম সেটা সহজে প্রতিষ্ঠিত হবে তখন। কিন্তু শিং বা দাঁত দিয়ে যেমন প্রয়োজনীয় কাজও করা যায় তেমনি ঐ নতুন অস্ত্রের সাহায্যেই সামঞ্জস্যটা সম্ভবত এখনই প্রতিষ্ঠা করা যায়। এর জন্যে কোপ দেওয়ার দিকটা শুধু পাল্টে দিতে হবে, দেখতে হবে সহজবুদ্ধিকে নষ্ট না করে কোপটা যেন পড়ে অসহজ বুদ্ধি ও বিকৃত বিশ্বাসের ওপরে।

সোনার আনারস

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

মূল্য ঃ দুই টাকা

কিশোর-কিশোরীদের উপযুক্ত রোমাঞ্চকর উপন্যাস। ছাপা, বাঁধাই চমৎকার।

উপহার দিবার মত বই

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-১২

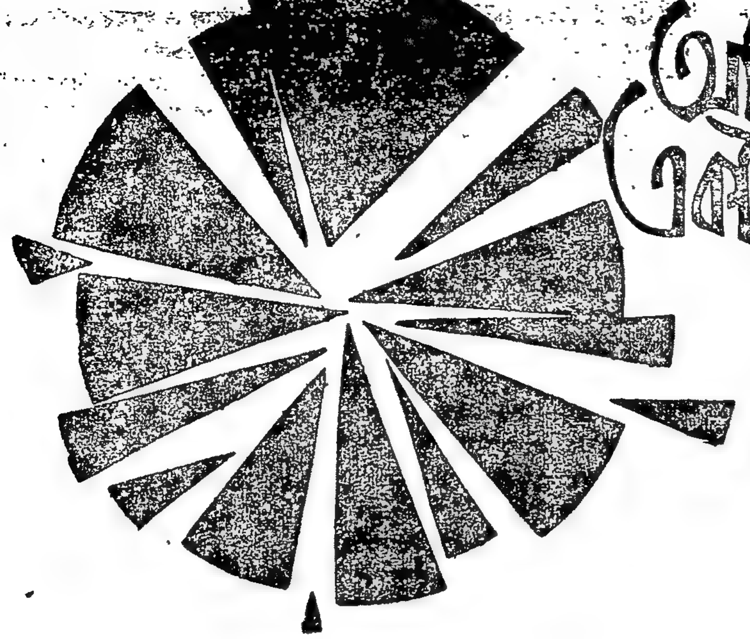

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

বিপথে পরিচালিত করার সুদক্ষ রণ-নীতি

আমাদের খুঁটিনাটি ছোট ছোট কাজ একেবারে শেষে যা' বাকি ছিল তার একটু আভাস দিয়েছি। তা'ছাড়া ওপরের কয়েকটি পাতায় সরকারী তথ্য থেকেই বর্ণনা দিয়েছি যে চট্টগ্রামের মত ছোট একটি শহরে, ১৮ই এপ্রিল, যুব-বিদ্রোহের দিনটির কয়েকদিন আগেও পুলিশের গুপ্ত বাহিনী দিন রাত কিভাবে জোঁকের মত আমাদের পেছনে লেগে থেকে অনুসরণ করেছে ও পাহারা দিয়েছে। যদি ঘরের শত্রু বিভীষণের অস্তিত্ব না থাকে ততক্ষণ বাহ্যিক পাহারার ব্যবস্থা করে পুলিশ কি বা কতটুকু বুঝতে পারে? পুলিশের বাহ্যিক পাহারার ব্যবস্থা ও দূরে থেকে লক্ষ্য রেখে আমাদের তৎপরতার সন্ধান পাওয়ার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার জন্য দুটি সহজ পাল্টা পন্থা অবলম্বন করেছি। একটি ব্যবস্থার কথা আগে বলেছি—আমরা তাদের বিরুদ্ধে পাল্টা গোয়েন্দাগিরি করবার সক্রিয় পরিকল্পনা গ্রহণ করি। সরকারী তথ্য থেকেও সেই কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এখানে আর একটু উল্লেখ করছি—"..both the Inspectors (P. W. 70) and S. I Ramani Majumder (P. W. 149) state that it was noticed that members of the party were being deputed to keep an eye on their movements and (P. W. 149) adds that he had personally seen Himangshu Bimal Sen watching Saroda Babu's house.." (P. 139-140; Juagement in Armoury Raid case No. 1 of 1930. Chittagong.) সরকারী সাক্ষী, ইন্সপেক্টার ও সাব-ইন্সপেক্টার দুজনই বলেছে যে, পুলিশের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য আমাদের দল সদস্যদের নিযুক্ত করেছে। তাছাড়া সাব-ইন্সপেক্টার রমণী মজুমদার হিমাংশুকে আই-বি-ইন্সপেক্টার সারদাবাবুর বাড়ির ওপর লক্ষ্য রাখতে স্বচক্ষে দেখেছে।

সত্যি বলতে কি আমাদের পক্ষেও ঐরূপ বাইরে থেকে লক্ষ্য রেখে তাদের বাহ্যিক গতিবিধির পূর্বাভাস পাওয়া ছাড়া আর বেশি কিছু ফল লাভের আশা ছিল না। আগে থেকে তাদের গতিবিধির তৎপরতা দেখে তাদের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য-স্থল আন্দাজ করা সম্ভব হয়েছে বলেই হয়ত আমরা অনেক ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ, তারক ও অর্ধেন্দুকে সময় মত স্থানান্তরিত করতে পেরেছি। আর যথাসম্ভব আমরা নিজেরাও সাবধানতা অবলম্বন করেছি। খুব ছোট শহর বলেই দুই পক্ষেরই পরস্পর ঐরূপ বাহ্যিক গতিবিধির ওপর প্রখর ও সজাগ দৃষ্টি রাখা সম্ভব হয়েছিল এবং দুই বিরোধী পক্ষই এইরূপ ব্যবস্থার সীমিত ফল লাভ করেই নিজেকে সন্তুষ্ট রেখেছিল।

আমরা খুব ভাল করেই জানতাম যে, যতদিন পর্যন্ত তাদের সুদৃঢ় ব্যূহ ভেদ করে ওপরমহলের কোন অফিসারকে হাত করতে সমর্থ না হব ততদিন আমাদের ঐ ব্যাপক কষ্টসাধ্য process-এর ওপর নির্ভর করে সাংগঠনিক নিরাপত্তা বজায় রাখতে চেষ্টা করতে হবে। আমাদের জনৈক স্কুলের বন্ধু ও সহপাঠী কোন এক অ্যাসিসটেন্ট সাব-ইন্সপেক্টারের পদে নিযুক্ত ছিল। তার সঙ্গে গণেশের ও আমার সামান্য যোগাযোগ ছিল। তার মারফৎ আমাদের দলের মাত্র একজন সভ্য সম্বন্ধে সঠিক ও নির্ভুল সংবাদ জানতে পেরেছিলাম। এ ছাড়া ওপরওয়ালা কোন পুলিশ অফিসার বা পলিটিক্যাল সেক্রেটারিয়েট ডিপার্টমেণ্টের বড় কারোকে হাত করতে পারি নি।

এইরূপ অবস্থায় কেবলমাত্র সক্রিয় বাহ্যিক পাহারার ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে সন্তুষ্ট না থেকে আমরা একেবারে প্রথম থেকেই Strategic Diversion এর জন্য, অর্থাৎ, শত্রুকে বিপথে পরিচালনা করার জন্য সুদক্ষ পন্থা নিলাম। অভ্যুত্থানের মাস দু'তিন আগে থেকে আমাদের চাল-চলন ঘোরাফেরা সব হাল্কা ধরণের করার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করেছি। বিশেষ করে পুলিশকে বিভ্রান্ত করবার জন্যই আমরা বিভিন্ন বিলাসবহুল পোষাক পরিচ্ছদে সব সময় সেজে চলতে লাগলাম। ক্রীম, স্নো, পাউডার পুলিশের নজরে পড়বার জন্য 'কোঠারীর' ও 'ইজীক্যালের' দোকান থেকেই সব সময় কিনেছি। এই দুটি দোকান, গণেশের দোকান ও কোতওয়ালীর মাঝপথে ছিল। কেবল যে ঐ সব শুধু কিনেছি তা নয়, স্নো-পাউডার যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহারও করেছি। রেস্টুরেণ্টে খাওয়া, সিনেমায় যাওয়া, থিয়েটার দেখা, গানের আসর বা যাত্রাগানে যোগ দেওয়া আমাদের কর্তব্যের মধ্যে নির্ধারিত ছিল। ঐরূপ কোন সুযোগ থাকলেই তা যেন আমাদের যুবক-সাথীরা গ্রহণ করে তার

জন্য নির্দেশ ছিল। এই সব না করে উপায় ছিল না। ঐগুলির অন্তরালে তাদের ষড়যন্ত্রমূলক কাজ ও পুলিশের ওপর নজর রাখবার কাজ করতে হোত। বিশেষ করে এই কারণেই আমাদের প্রথম সারির সভ্যরা বাড়িতে থাকত না—এমন কি যাদের বয়স খুব কম তারাও রাত্রে বাড়ি ছেড়ে চলে আসতো। এ ছাড়াও আমাদের সব সময় চেষ্টা ছিল যেন আমরা রাস্তায় চলা-ফেরা বা গণেশের দোকানে বসে কথা বলা বা ক্লাবে ব্যায়াম করার সময় হৈ-হুল্লোড়, হাসি-ঠাট্টার মাধ্যমে অত্যন্ত হালকা পরিবেশের সৃষ্টি করে রাখতে পারি।

তবে Diversion সৃষ্টির ওজর দেখিয়ে পান, তামাক, সিগারেট বা বিড়ি ব্যবহার করার সুযোগ যেন কোন সাথী না নেয় তার জন্য কঠোর নির্দেশ ছিল। হাল্কা জীবনযাত্রার অভিনয় করতে গিয়ে পাছে নিষ্ক্রিয় ও শিথিল জীবনের শিকার না হয়ে পড়ি সেই দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলাম। আমাদের মধ্যে এই বিষয়ে মানসিক প্রস্তুতির জন্য যথেষ্ট আলাপ-আলোচনা হতো। মনে রাখা প্রয়োজন দু-বছরের মৃত্যু-সংকল্প নিয়ে যে সবুজ ও তরুণ বিপ্লবী যুবকদল সুসংগঠিত হয়ে উঠেছিল, তাদের পক্ষে পুলিশকে বিভ্রান্ত করার জন্য যেরূপ অভিনয় করা সম্ভব হয়েছিল, বাইরে লেবেল আঁটা তথাকথিত বিপ্লবী সংগঠনের প্রাপ্তবয়স্ক সভ্যদের পক্ষে সেরূপ অভিনয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার মধ্যে ভয়াবহ ও শোচনীয় পরিণতির আশংকা ছিল—মদ ও আনুষঙ্গিক প্রভাবের বিচ্যুতিই প্রাধান্য লাভ করার বহু নজীর আছে।

আমাদের ঐগুলিকে অভিনয় বলুন বা যাই বলুন না কেন, সেইরূপভাবে চলা ছাড়া কোন উপায় ছিল না—কারণ, আমাদের অস্বাভাবিক জীবন-যাত্রার মাধ্যমে প্রমাণ হতো যে, আমরা বৈপ্লবিক কাজ-কর্মের ধার ধারি না—আমরা সব বখে যাওয়া ছেলের দল। পুলিশ মামলার সময় তাদের রিপোর্ট জাহির করে আমাদের ব্যাপক ষড়যন্ত্রের তীব্রতা প্রমাণ করতে গিয়েছিল, কিন্তু যুব-বিদ্রোহ ঘটে যাওয়ার পূর্বে কি পুলিশ সত্যি সত্যি আমাদের অস্বাভাবিক হাল্কা ধরণের জীবনযাত্রাকে কোন গুরুত্ব দিয়েছিল? সদরঘাট ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট, প্রখ্যাত ব্যবসায়ী ও জনপ্রিয় নেতা, পদত্যাগের ভয় দেখিয়ে গণেশ ঘোষের কাছে চিঠি লিখলেন—"..their wards..do not even stay at home at night and sometimes do such things which are against principles of morality.." (Judgement of our case. Page —10).

সুরেশবাবু লিখলেন ছেলেরা রাত্রেও বাড়ি থাকে না এবং এমন সব কাজ করছে যা নৈতিক চরিত্রবিরুদ্ধ।

চট্টগ্রামের আই-বি পুলিশও যে বিভ্রান্ত হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। তারা এই টোপটি গলাধঃকরণ করে বিপ্লবীদের ষড়যন্ত্রমূলক কাজের সংবাদ সংগ্রহ করার চাইতে চট্টগ্রামের যুবকদের ভাল করার জন্য নিজেরাই নিজেদের moral sentry-র (নৈতিক চরিত্রের অতন্দ্র প্রহরী) পদে বহাল করা শ্রেয় মনে করলেন। তাই তাঁরা অভিভাবকদের কাছে গিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে বললেন ও তাঁদের ছেলেদের আমাদের প্রভাব থেকে মুক্ত করে নিতে উপদেশ দিলেন। পুলিশের অভিজ্ঞতার পরিসীমার বাইরে—সাধারণের ধারণারও বহুদূরে—কি করে তারা ভাববে যে সারাদিন হৈ-চৈ, সিনেমা, থিয়েটার, রেস্টুরেণ্টে খাওয়া, হাসি-ঠাট্টা, গল্প-গুজবে মত্ত বখে যাওয়া এক যুবকদল অতখানি দৃঢ়তার সঙ্গে চট্টগ্রাম শহরে বৃটিশ সরকারী ঘাঁটি সব দখল করে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠা করার ষড়যন্ত্রে ব্যাপৃত আছে। এত হাল্কা চরিত্রের ছেলেরা কি কখনও মৃত্যু-সংকল্প নিয়ে চরম আঘাত হানতে পারে! চরম আত্মত্যাগ করতে পারে!

সাধারণভাবে পুলিশের কাছে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবার জন্য সর্বপ্রথম এই পন্থা অবলম্বন করি। যদিও অভিভাবকদের কাছে তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হয়েছি সাময়িকভাবে, তবু চট্টগ্রামের সুদক্ষ ও বিচক্ষণ বৃটিশ পুলিশকে সফলতার সঙ্গে বিপথে পরিচালিত করতে যে আমরা সক্ষম হয়েছি তার ব্যাখ্যা করা আজ নিষ্প্রয়োজন। বাহ্যিক গতিবিধির রিপোর্টের ওপর পুলিশের নির্ভর করতে হয়েছিল বলে, আসল ষড়যন্ত্রমূলক কাজের সন্ধান স্থগিত রেখে moral sentry-র কর্তব্যে বেশি ব্যাপৃত থেকেই তারা আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে।

পৃথিবীর কোন পুলিশই নিশ্চেষ্ট থাকতে পারে না যে পর্যন্ত না তারা ষড়যন্ত্রমূলক বিপ্লবী সংগঠনের আভ্যন্তরীণ সংবাদের জন্য দলের কোন সভ্যকে এজেণ্ট হিসেবে সংগ্রহ করতে পারছে। চট্টগ্রামের বৃটিশ আমলের সুদক্ষ পুলিশ আমাদের সংগঠনের সুদৃঢ় প্রাচীর লঙ্ঘন করে প্রথম সারির কোন সভ্যকে বিশ্বাসঘাতকরূপে পাওয়ার চেষ্টা করেও বিফল হয়েছে বার বার।

পুলিশ তাদের প্রাথমিক সংবাদ সংগ্রহের কাজ শেষ করার পর আমাদের কয়েকজন দলের সভ্যের আর্থিক অবস্থা ও তাদের সাংগঠনিক উচ্চপদ সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করেছে। তারপর চট্টগ্রামের পুলিশ কর্তারা নিয়মিতভাবে চেষ্টা করে চলেছিল আমাদের দলের ছেলেদের অর্থের লোভ দেখিয়ে হাত করার জন্য। পুলিশ তখনও জানে না যে আমরা সশস্ত্র যুব-অভ্যুত্থানের প্রায় ছয় মাস পূর্ব থেকেই কোন নতুন ছেলেকে দলভুক্ত না করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। প্রথম থেকে যারা দলে ছিল তারা সবাই তখন নানা ধরণের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তবে প্রথম শ্রেণীতে স্থান পেয়েছে।

আই-বি সাব-ইন্সপেক্টার রোহিণী ভৌমিক, খুব নিম্ন-অবস্থাপন্ন, আমাদের এক সাথী—সারদা শীলকে হাত করার চেষ্টা করল। সারদা শীল তখন বি-এ, (প্রথম বর্ষ) পড়ত। রোহিণীবাবু কলেজ যাওয়ার কিছু আগে থেকে সারদা শীলের বাড়ির সামনে পাহারায় ব্যস্ত। কলেজ যাওয়ার সময় নানাভাবে সুযোগ করে নিয়ে সারদা শীলের সঙ্গে রোহিণীবাবু কথা ফাঁদলেন। রোহিণীবাবু, সারদা শীলের আর্থিক দুরবস্থার কথা তুলে তার অভাবের জন্য সমবেদনা জানালেন—একটি টিউশানি তাকে দিতে চেষ্টা করবেন, তারপর অন্যান্যভাবেও সাহায্য করতে প্রস্তুত ইত্যাদি ইত্যাদি বলার পর সারদা শীলের সঙ্গে সন্ধ্যেবেলা দেখা করবার জন্য সময় ও স্থান ঠিক করলেন। সারদা শীল তখনই কলেজে গিয়ে তারকেশ্বর দস্তিদারকে সব কথা বলল। সে একটু বিচলিত হল। তারককে সে আরও বলল যে, বোধ হয় পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করবে এবং সেই জন্য তারকের কাছ থেকে সারদা শীল বিদায়ও চেয়ে নিল। সারদা শীলের মত তারকও অনভিজ্ঞ। তবু তারকের সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনা ও বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা সারদা শীলের চাইতে অনেক বেশি প্রখর ও স্বাভাবিক। তারক যুক্তি দিয়ে সারদা শীলকে বোঝাতে চেষ্টা করল, পুলিশ তাকে কোনমতেই গ্রেপ্তার করতে পারে না—তারা তাকে অর্থলোভ দেখিয়ে বশ করতে চায় ও গুপ্তচরের পদে বহাল করবার চেষ্টা করবে। সারদা শীল আমাদের দলের বিশ্বাসী সদস্য কিন্তু ভীতু প্রকৃতির যে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তারক তার স্নায়বিক দুর্বলতা উপলব্ধি করে আমাকে গিয়ে এই রিপোর্ট দিল। আমি তখন অর্ধেন্দু দস্তের বাসায় ছিলাম। সুখেন্দু দস্তিদারের বাড়িতে অর্ধেন্দু থাকত। সে তারকের সহপাঠী—তখন কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র তারা। অর্ধেন্দুর বাসাবাড়িটি চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের একেবারে সন্নিকটে। তারক আমাকে এই রিপোর্টটি দেওয়ার পর জানাল যে সারদা শীলকে

সে এখানে আসতে বলেছে এবং সে এলে আমি যেন তাকে একটু চাঙ্গা করে ও হুঁশিয়ার করে দিই।

একটু পরে সারদা শীল এল। আমি পুলিশের নানাপ্রকার কৌশল ও বিভিন্ন পন্থার কথা বলে তাকে সজাগ করে দিলাম। রোহিণীবাবু সারদা শীলের সঙ্গে কথা মত নির্ধারিত স্থানে ও সময়ে দেখা করলেন ও তাকে দিয়ে সোজা ডি-আই-বি ইন্সপেক্টার সারদাবাবুর বাসায় গেলেন। সারদা শীল একটু বাদেই বুঝতে পারলো যে, তাকে গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্য তাদের ছিল না—চেয়েছিল এজেন্ট হিসেবে পেতে। সারদা শীলের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর ডি-আই-বি মহাশয়রা বুঝতে পারলেন ঐটি বড় শক্ত ঠাঁই—সেখানে কিছু হওয়ার নয়।

তারপর এল মনোরঞ্জন সেনের পালা। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর মনোরঞ্জন আমার প্রথম 'রিক্রুট'—অর্থাৎ, সমস্ত সুলক্ষণ দেখে প্রথম তাকেই দলভুক্ত করি। এই মনোরঞ্জনই জালালাবাদ যুদ্ধের পর কালার পোল (যুলদা) যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে। হেম দারোগা সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে জবানবন্দীতে বলেছে যে, যখন চোঙ্গা মুখে দিয়ে চিৎকার করে মনোরঞ্জনদের আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়, তখন এই চির-উন্নত শির বিপ্লবী বীর উত্তর দিল—Monoranjan doesn't know how to surrender! Monoranjan wants to be a Jatin Mukherjee of Balassore? (মনোরঞ্জন জানে না আত্মসমর্পণ কাকে বলে—মনোরঞ্জন বালেশ্বর খ্যাত যতীন মুখার্জীর পদাঙ্ক অনুসরণ করবে!)। পরক্ষণে হেম দারোগা তার বিবৃতিতে বলল—দু'বার পর পর পিস্তলের আওয়াজ শোনা গেল! তারপর সব শান্ত নিস্তব্ধ! মনোরঞ্জন নিজের গুলীতে প্রাণ দিল!

ডি-আই-বি ইন্সপেক্টার সারদাবাবু! মনোরঞ্জনদের আর্থিক দুস্থ অবস্থার সুযোগ নেবার উদ্দেশ্যে একজন পুলিশে চাকুরে আত্মীয়কে খুঁজে বার করলেন। মনোরঞ্জনের বাবার কাছে টোপ ফেলতে সারদাবাবু সেই আত্মীয় পুলিশকে পাঠালেন। সংসারের অভাব অনটন কঠিন দারিদ্র্য সহ্য করতে না পেরে পুলিশের অর্থের বিনিময়ে মনোরঞ্জনের বাবা তাঁর আত্মীয় পুলিশের কাছে স্বীকার করলেন তিনি তাঁর ছেলেকে রাজী করাতে চেষ্টা করবেন। পুলিশের প্রস্তাব ছিল—তাঁর ছেলে মনোরঞ্জন, অনন্ত সিংহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে এবং এই কারণে অনন্ত সিংহদের বৈপ্লবিক চক্রান্তের সংবাদ মনোরঞ্জন অতি সহজে সরবরাহ করতে পারে। সে যদি পুলিশকে এইভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকে তবে পুলিশও তাদের যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করবে।

মনোরঞ্জনের বাবা কাতর হয়ে তাঁর ছেলের কাছে নিদারুণ অভাবের কথা জানালেন। মনোরঞ্জনই বাড়ির বড় ছেলে। পিতা, পুত্রের কাছে পুলিশের প্রস্তাবটি বিবৃত করে অর্থের বিনিময়ে মনোরঞ্জনকে আমাদের ষড়যন্ত্রমূলক কাজের গুপ্ত সংবাদ সরকারকে সরবরাহ করতে "অনুরোধ" করলেন।

মনোরঞ্জনের পিতা একি করলেন! মূর্খ সারদাবাবু, ততোধিক মোহগ্রস্ত ও ভ্রান্ত মনোরঞ্জনের পিতা! স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিকের কাছে তাঁর একি প্রস্তাব! তখনই হয়ত এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, যদি সেইদিন সেই সময়ে মনোরঞ্জনের কাছে পিস্তলটি থাকত। তার বাবার কাছ থেকে ঐরূপ জঘন্য প্রস্তাব সে কোনদিন শুনবে বলে আশা করে নি। পিতা—যাকে মনোরঞ্জন শ্রদ্ধা করেছে, অন্তরে পূজা করেছে, ভক্তি করেছে—সেই পিতা তাকে আজ বলছেন বিশ্বাসঘাতকতা করে অর্থ উপার্জনে করতে! আগুনে ঘি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আগুন যেমন তীব্রভাবে জ্বলে ওঠে, ভয়ানক আকার ধারণ করে, মনোরঞ্জন তার পিতার কাছ থেকে ঐ প্রস্তাব শোনামাত্র রাগে, অভিমানে, দুঃখে, লজ্জায় ও ক্ষোভে এক ভীষণ মূর্তি ধারণ করল। তীব্র ভাষায় তার বাবাকে তিরস্কার না করে সে পারে নি। তৎক্ষণাৎ সে তার বাবাকে শাসিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল—বলে গেল তাঁকে সে গুলী করবে!

সকাল দশটা, আমি তখন আমার নিজ বাড়িতে ছিলাম। মনোরঞ্জন ছুটে আমার কাছে এল। সে খুব উত্তেজিত—অশান্ত, অধীর! ক্রোধে তার কপালের শিরাগুলি ফুলে ফুলে উঠেছে। চোখ থেকে যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ ঝলকে ঝলকে বেরিয়ে আসছিল। মনোরঞ্জন আমার কাছে এসেই খুব অসংযত ও উত্তেজিত স্বরে বলল,—

"আমাকে এক্ষুণি একটা পিস্তল দিন। আমার বাবাকে খুন করতে হবে!" এক নিঃশ্বাসে সে সবই বলল। তারপর অভিমানে দুঃখে সে একেবারে কেঁদে ফেলল। অভাব অনটন, দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ তার বাবাকে আজ কতখানি নিচে টেনে নামিয়েছে! তার অভিযোগ দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, তার অন্তরের ক্ষোভ ক্রূর বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে, তার প্রকাণ্ড নালিশ পিতার অসহায় নীচ অবস্থার বিরুদ্ধে!

মনোরঞ্জন বলল—'বাবাকে তাঁর দেশদ্রোহিতা করার নীচ প্রস্তাবের জন্য আজ আমার হাতেই মৃত্যু-বরণ করতে হবে—তাঁর প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন আছে, আমাকে এক্ষুণি একটি পিস্তল দিন। দেশদ্রোহী পিতারও পুত্রের হাতে নিষ্কৃতি নেই—এইটি ভবিষ্যৎ বিপ্লবী ভারতের কাছে আদর্শ হয়ে থাকুক। আমাকে একটি পিস্তল দিন!'

যা হোক মনোরঞ্জনকে শান্ত করতে বেশ কষ্ট হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত হয়ত আমার যুক্তি সে মন থেকেই মেনে নিয়েছিল। বললাম,—'অসহায় পিতা দারিদ্র্যের তাড়নায় হয়ত দুর্বল মুহূর্তে তোমাকে ঐরূপ ঘৃণ্য প্রস্তাব করে ফেলেছেন। কিন্তু তোমার স্বদেশপ্রেমের নিষ্ঠা ও আদর্শকে তাঁর একদিন শ্রদ্ধা করতেই হবে। সময়ে তিনি তাঁর ভুল বুঝবেনই। সেইদিন পুত্রের স্বদেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ তাঁকে শিক্ষা দেবে—নতুন আলোর সন্ধান দিয়ে পথ দেখাবে।'

তারপর তাকে বললাম—'চল আজই একবার সারদাবাবুর ওখান থেকে ঘুরে আসি। তোমাকে আমাদের সঙ্গে দেখে বুঝবে যে তুমি আমার কাছে সব ফাঁস

বি. সি. মাইতি এণ্ড কোং

—ইলেকট্রো প্লেটিং সামগ্রী—

নিকেল ভ্যাট ও ব্যারেল * ডাইনামো * পলিশিং মেসিন এবং প্লেটিং করিবার জন্য যাবতীয় সামগ্রীর আদি সরবরাহক।

শো রুম :—৯৪, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কলি-১২। ফোন : ৩৪-৩১৭৩

৩, রাধামোহন পাল লেন, কলি-১২ : অফিস-ফোন—৩৪-৪৮৪৬

নিষ্ঠুর ঘুম

সুজিত বসু

যদি কোন আগামী কালে
আমি এ স্বপ্নের দিশা না পাই,
হয়তো রৌদ্র, ঝঞ্ঝা ও বাতাসের দিন
অথবা জলপ্রপাতের রাত্রি
অস্থির জীবনের তাল ভেঙে দেয়,
কখনো শব্দের ভোর শেষ হয়।

যেদিন পিছু-হটে যাওয়া
কোন কক্ষচ্যুত তারকার দল
পৃথিবীতে পড়ার আগে মৃত্যুভয়ে
আয়োনোস্ফিয়ারের আগুনে পুড়ে
বিবর্ণ ধরিত্রীর বুকে নেমে আসে
শাবকের নীড় থেকে শালিখ তাকায় আকাশে।

তখনও দূরান্তের ডাক
ছায়া ছায়া শহরের মাথার উপর,
অনুজ্জ্বল বৃষ্টির ওধারে
সায়ন্তনী মল্লিকার শবের মতন
সরে যায়। তখন আবার স্বপ্ন ঘোর
নিয়ে আসে বিস্মৃতি, কুয়াশা আর অন্ধকার,
মৃত্যুর প্রান্ত থেকে খোলা রাখে প্রাণের দুয়ার।

করে দিয়েছ। তাহলে আর সেদিকে ঘেঁষতে সাহস করবে না।'

তাই করা হল। সাপের মুখে 'জড়ি' ছোঁয়ালে যা হয়—সারদাবাবুর মাথা নুয়ে গেল!

মনোরঞ্জনের বাবা সদর আদালতের একজন উকিল—আইন-ব্যবসা করতেন। দুর্বল মুহূর্তে ছেলের কাছে এক অপরাধ করেছেন। সেই অপরাধের কি কখনও ক্ষমা নেই? কোন প্রায়শ্চিত্তই কি তাঁকে সেই পাপ থেকে মুক্তি দেবে না? দেশদ্রোহিতার ক্ষণিক চিন্তাও বা মনে কেন এল? শত দুঃখ দারিদ্র্য যদি নিজের ছেলে হাসিমুখে মেনে নিতে পারে তবে বাপ হয়ে তা তিনি পারবেন না কেন? তাঁর দুর্বল মুহূর্তের ভুল তিনি বুঝেছিলেন। যুব-বিদ্রোহের দিন থেকে বিপ্লবীদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার অবধি ছিল না। তাঁর বীর ছেলের মহান আদর্শের পথ-নির্দেশ তাঁকে বিপ্লবীদের প্রতি আসক্ত করেছে—অনুপ্রাণিত করেছে। মুলদা (কালার পোল) যুদ্ধ প্রাঙ্গণে মনোরঞ্জনের মহান আত্মত্যাগের আদর্শ তাঁকে অনুভূতির চরম প্রান্তে নিয়ে গেছে। মনোরঞ্জনের বাবার স্বদেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের কঠোর পরীক্ষার দিনও ঘনিয়ে এল।

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকার অম্বিকাদার গ্রেপ্তারের বিনিময়ে "খাঁ-বাহাদুর" পুরস্কারে ভূষিত করল পুলিশ ইন্সপেক্টার আসানুল্লাকে! এই খাঁ-বাহাদুর-পুরস্কারের যাদুমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শত্রু আসানুল্লাকে প্ররোচিত করেছে চট্টগ্রামের বুকের ওপর অত্যাচার ও নিষ্পেষণের তাণ্ডব নির্বিবাদে চালাতে। তারই প্রতি-শোধ নেওয়া হল—আসানুল্লাকে হরিপদ ভট্টাচার্যের পিস্তলের মুখে প্রাণ দিয়ে তার অভিশপ্ত জীবনের প্রায়শ্চিত্ত করতে হল।

আসানুল্লার হত্যাকাণ্ডের পর চট্টগ্রামের শাসকবর্গ প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠল। নির্বিচারে সকলের ওপর বর্বরোচিত অত্যাচার চালিয়েছে। আসানুল্লার হত্যার পরদিন সকালে যখন সারা চট্টগ্রাম জুড়ে মর্মান্তিক অত্যাচারের বিভীষিকা ছড়িয়ে পড়েছে তখন একদল পুলিশ পাথরঘাটায় মনোরঞ্জনের বাড়িতে প্রবেশ করে। কোন বিশেষ অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে পুলিশ মনোরঞ্জনের বাড়িতে ঢোকে নি। তারা সেইদিন যেখানে একটুও বিপ্লবীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংযোগের গন্ধ পেয়েছে, সেখানেই হানা দিয়ে বাড়ির সব জিনিষপত্র তছনছ করেছে এবং মনের আনন্দে তরুণ ও যুবকদের বিনা কারণে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করেছে। মনোরঞ্জনের ছোট ভাই তখন মাত্র অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। তাকে, অর্থাৎ মনোরঞ্জনের ছোট ভাইকে তার বাবার সামনে নিষ্ঠুরভাবে বেদম প্রহার করতে লাগল। এই নিদারুণ দৃশ্য দেখে বৃদ্ধ পিতা রুখে দাঁড়ালেন। আজই তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী পুলিশের সঙ্গে মোকাবিলা করবেন বলে মনস্থির করলেন। মুহূর্তে তিনি তাঁর পুত্রকে আড়াল করে দাঁড়ালেন। কঠোর স্বরে তিনি পুলিশদের কাছে ঘোষণা করলেন—"প্রাণ থাকতে তোমাদের আমি আমার ছেলের একটি কেশও স্পর্শ করতে দেব না!"

মনোরঞ্জন সেই সময় বেঁচে নেই। যদি বেঁচে থাকত তবে মনোরঞ্জন আজ তার পিতার এই বলিষ্ঠ মনের পরিচয় পেয়ে তার সেই দিনের ক্ষণিক দুর্বলতাকে ভুলে গিয়ে গর্ব অনুভব করত নিশ্চয়ই।

মনোরঞ্জনের বাবার রোষদৃপ্ত চক্ষু, কঠিন প্রতিজ্ঞা, ক্রোধকম্পিত অধর দুটি পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছিল যে, প্রাণ থাকতে তিনি পুলিশের অত্যাচার প্রতিরোধ করবেন। পুলিশের সামনে ছেলেকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছেন—যেন সুদৃঢ় প্রাচীর! মনোরঞ্জনের বাবার 'যুদ্ধং দেহি' ভাব বৃটিশ পুলিশের সম্মানে ও ঔদ্ধত্যে কঠোর আঘাত হানলো। সার্জেন্ট কেলী সাহেবের ধৈর্যের সীমা, এই সামান্য কারণে, অতিক্রম করল। পিতা নিরপরাধ ছেলের প্রতি বর্বরোচিত পুলিশ অত্যাচার স্বচক্ষে দেখতে অস্বীকার করেছেন—অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষীণ প্রতিবাদ মাত্র মুখে জানিয়েছেন! বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি 'গোলাম ভারতবর্ষের' প্রতিবাদ শুনতে তো অভ্যস্ত নয়—বৃহদাকার সার্জেন্ট কেলী, মনোরঞ্জনের বাবার বুক লক্ষ্য করে সজোরে বুটের লাথি বসিয়ে দিলেন। মনোরঞ্জনের বাবার দুর্বল বৃদ্ধ-দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তিনি তখনই মারা গেলেন।

মনোরঞ্জন তার স্বদেশপ্রেমের একনিষ্ঠ আদর্শে তার পিতাকে দীক্ষা দিয়েছিল। বৃদ্ধ পিতা ক্ষ্যাপা আক্রমণ-মুখী পুলিশদের পিস্তল, রাইফেল দেখেও সেদিন ভয় পান নি। প্রতিবাদ করেছেন, সংগ্রামে তাদের আহ্বান করেছেন; ছেলের রক্ষার্থে পুলিশের সামনে নিজের বুক পেতে দিয়েছেন। শহীদ পুত্রের ধন্য শহীদ পিতা!

(ক্রমশঃ)

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

শিলাদিত্য

কিছুকাল ধরে কলকাতার একটি দল রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকটি মাঝে মাঝে মঞ্চস্থ করছেন। এ'দের মতে 'রাজা' নাটকটি নাকি অন্ধকারের নাটক—যেমন ইডিপাস অন্ধকারের নাটক। কয়েকটি কাগজের তথাকথিত সমালোচকও এ'দের সুরে সুর মিলিয়ে 'রাজাকে অন্ধকারের নাটক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন। রাজা নাটকের অন্ধকারের স্তরে স্তরে রয়েছে অদৃশ্য আলো—যে আলোক নিখিল জ্যোতির জ্যোতি। রাজা অন্ধকার ঘরে আবির্ভূত হন বলেই রাজাকে অন্ধকারের নাটক বলতে হবে। এ ধরণের মৌলিক চিন্তা বোধহয় আমাদের দেশের বিশেষ শ্রেণীর নাট্যপরিচালক এবং নাট্য-সমালোচকের উর্বর মস্তিষ্কে গজিয়ে ওঠে। অধিচেতন মনের সাহায্যে লেখা নাটকে অন্ধকারের স্থান থাকতে পারে না। এ কথা অবশ্য এ জাতীয় লোকেদের বুঝিয়ে দেওয়াও সম্ভব নয়।

সাঙ্কেতিকতাবর্জিত নাটকগুলিতেও রবীন্দ্রনাট্য-প্রতিভা একটা পরম পরিণতিতে পৌঁছেচে একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। অহেতুক ঘটনার সমাবেশে নাটককে নাটকীয়তা-পূর্ণ জমকালো প্রদর্শনী করবার প্রচেষ্টা তিনি কখনও করেন নি। তাই বলে তাঁর নাটক বহির্জগতের ঘটনাবলীকে বর্জন করে রচিত হয়েছে এ অভিযোগের কোনই অর্থ নেই। রবীন্দ্র-পূর্ব নাট্যরচয়িতাদের নাটকে যে অনাবশ্যক বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মের প্রাবল্য লক্ষিত হয় তিনি তার পরিশোধন ও পরিমার্জন করেছেন নিজের রচনায়। সত্যকার বাংলা নাট্যসাহিত্যের শুরু রবীন্দ্রনাথ থেকেই। তাঁর আগেকার নাট্যকারেরা প্রায় কেউই চারিত্রিক অন্তর্দ্বন্দ্বের দিকটাতে বিশেষ নজর দেন নি। অথচ মানুষের জীবনে এই অন্তর্দ্বন্দ্বের একটা বিশেষ স্থান আছে এবং এই জন্যই এই দিকটার উপর রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট জোর দিয়েছেন তাঁর নাট্যরচনায়।

সংলাপ সৃষ্টিতেও রবীন্দ্রনাথ অদ্বিতীয়। শব্দচয়ন ক্ষমতার উপরই সংলাপের সৌন্দর্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব অনেকাংশে নির্ভরশীল। ভাষা সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল প্রগাঢ়। একে কবি, তায় বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ্। সুতরাং যে কোন রচনায়, শব্দ, বাক্য প্রভৃতির ব্যবহারে তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। রচনায় ভাব এবং ভাষার এমন চমৎকার সংগতিপূর্ণ ব্যবহার, এমন আদর্শ সংযোগ, শেক্সপীয়ারের পর এক রবীন্দ্রনাথেই দেখা যায়। অনেক সময়ে অনেক শক্তিশালী নাট্যকারও শব্দ-সম্পদের দারিদ্র্যহেতু ঠিক যথার্থ স্থানে যথার্থ ভাবকে সুষ্ঠুরূপে পরিস্ফুট করতে অকৃতকার্য হন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভাষার রাজা—বাণীর বরপুত্র। প্রগাঢ় অনুভূতিলব্ধ ভাবধারাকেও স্বল্প কথায় ব্যক্ত করার ক্ষমতা তাঁর ছিল অসাধারণ। সংলাপে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দের কার্যকারিতা এবং উপযোগিতা সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টি ছিল প্রখর। এইসব কারণেই রবীন্দ্রনাট্যের সংলাপের এমন একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে যে এ ডায়লগকে ভাষার উৎকর্ষের চরমতম নিদর্শন বললেও অত্যুক্তি করা হয় না।

নাট্যাভিনয়ে দৃশ্যপটাদির ব্যবহারকে রবীন্দ্রনাথ অনাবশ্যক উৎপাত হিসাবেই গণ্য করতেন। 'তপতী' নাটকের ভূমিকায় কবি লিখেছেন ঃ "আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রবরূপে প্রবেশ করেছে। ওটা ছেলেমানুষী। লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা। সাহিত্য ও নাট্যকলার মাঝখানে ওটা গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত। কালিদাস মেঘদূত লিখে গেছেন, ঐ কাব্যটি ছন্দোময় বাক্যের চিত্রশালা। রেখাচিত্রকর তুলি হাতে এর পাশে পাশে তাঁর রেখাঙ্ক ব্যাখ্যা যদি চালনা করেন তাহলে কবির প্রতিও যেমন অবিচার, পাঠকের প্রতিও তেমনি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়। নিজের কবিত্বই কবির পক্ষে যথেষ্ট বাইরের সাহায্য তাঁর পথে সাহায্যই, সে ব্যাঘাত এবং অনেক স্থলে স্পর্ধা।

"শকুন্তলায় তপোবনের একটি ভাব কাব্যকলার আভাসেই আছে। সেই-ই পর্যাপ্ত। আঁকা ছবির দ্বারা অত্যন্ত বেশি নির্দিষ্ট না হওয়াতেই দর্শকের মনে অবাধে আপন কাজ করতে পারে। নাট্যকাব্য দর্শকের কল্পনার উপরে দাবি রাখে। চিত্র সেই দাবিকে খাটো করে, তাতে ক্ষতি হয় দর্শকেরই। অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান্, প্রাণবান্, গতিশীল। দৃশ্যপটটা তার বিপরীত ঃ অনধিকার প্রবেশ করে সচলতার মধ্যে থাকে সে মূক, মূঢ়, স্থাণু; দর্শকের চিত্তদৃষ্টিকে নিশ্চল বেড়া দিয়ে সে একান্ত সঙ্কীর্ণ করে রাখে। মন যে জায়গায় আপন আসন নেবে সেখানে একটা পটকে বসিয়ে মনকে বিদায় দেওয়ার নিয়ম যান্ত্রিক যুগে প্রচলিত হয়েছে, পূর্বে ছিল না। আমাদের দেশে, চিরপ্রচলিত যাত্রার পালাগানে লোকের ভিড়ে স্থান সংকীর্ণ হয় বটে, কিন্তু পটের ঔদ্ধত্যে মন সংকীর্ণ হয় না। এই কারণেই যে নাট্যাভিনয়ে আমার কোনও হাত থাকে সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো নামানোর ছেলেমানুষীকে আমি প্রশ্রয় দিই নে। কারণ বাস্তব সত্যকেও এ বিদ্রূপ করে, ভাব-সত্যকেও বাধা দেয়।"

শিশিরকুমারের দ্বারা মঞ্চস্থ 'তপতী' নাটকের অভিনয় আমি দেখি নি। তবে আমি যখন আমার 'রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা' নামে সমালোচনার বইটি লিখছিলাম তখন শিশিরকুমার রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি নাটক আমাকে আগাগোড়া পড়ে শুনিয়েছিলেন—যেমন রক্তকরবী, তপতী, বিসর্জন প্রভৃতি। শিশিরকুমারের রিডিং শুনেই বুঝতে পারছিলাম কি রোবাস্ট পার্সন্যালিটি মণ্ডিত করে তিনি বিক্রম চরিত্রকে মঞ্চে রূপায়িত করেছিলেন। অথচ তাঁর সংলাপ বাদন ছিল ন্যাচ্যারেলাইজিড্ স্টাইলের। যাই হোক 'তপতী'র মঞ্চরূপায়ণ দেখে শিশির-বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত অমল মিত্র মহাশয় যে সমালোচনা লিখেছেন তার থেকে কিছুটা তুলে দিচ্ছি ঃ

"এবার নাট্যমন্দিরে কবির আর একটি নাটক 'তপতী'র অভিনয় প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে। পেশাদার রঙ্গালয়ে কোনদিন কেউ 'তপতী' মঞ্চস্থ করতে সাহসী হবেন, এ সেদিন সকলের কল্পনাতীত ছিল। শিশিরকুমারের শুভাকাঙ্ক্ষী কয়েকজন তাঁকে নাটকটি মঞ্চস্থ করতে বারবার মানাও করেছিলেন। তাঁদের ভয়, অত উঁচুদরের নাটক দর্শকরা হয়তো নিতে পারবেন না এবং শেষ পর্যন্ত লোকসান দিতে হবে। নাট্যশালার একনিষ্ঠ উপাসক শিশির-কুমারের কাছে এ যুক্তি অর্থহীন। চিরদিন তিনি আন্তরিক বিশ্বাস করতেন এবং বলতেনও, রঙ্গালয়ের মহান উদ্দেশ্য হল দর্শক গড়ে তোলা, শুধু অর্থ উপার্জন নয়। অতএব তপতীর বিজ্ঞাপন বেরোল এবং প্রচুর অর্থব্যয়ে একদিন আরম্ভ হল নাটকটি।

"মাত্র কয়েকমাস আগে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে পরপর চার রাত নাটকটি অভিনীত হয়। কবি স্বয়ং অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন জলন্ধররাজ বিক্রমদেবের ভূমিকায়।

"...নির্দিষ্ট তারিখে 'তপতী' শুরু হল। বিক্রমদেবের ভূমিকায় দেখা দিলেন স্বয়ং শিশিরকুমার। নরেশ জীবন গাঙ্গুলী এবং রত্নেশ্বর রবীন্দ্র রায়। দেবদত্তের ভূমিকায় ছিলেন যোগেশ চৌধুরী। রাণী সুমিত্রা সেজেছিলেন প্রভা এবং বিপাশা কঙ্কাবতী।

"আশাতীত সফল এই অভিনয়ের

দীর্ঘ সমালোচনা বেরুল কাগজে। (বোধহয় নাচঘর পত্রিকার কথাই বলেছেন অমলবাবু।) সমালোচক গোড়াতেই বলেন, 'শিশিরকুমারের অভিনয়ে কবির বিক্রমদেবের কোন ছাপ চোখে পড়ল না।' তিনি লেখেন, 'শিশিরকুমারের বিক্রমদেব শিশিরকুমারেরই উপযোগী হয়েছে।' দীর্ঘ সমালোচনার সব কথা উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়। শুধু এইটুকু বললেই হবে, সমালোচকের মতে দুরন্ত, উদ্ধত, রাজধর্মগর্বিত ও অশান্ত বিক্রমদেব চরিত্র অসাধারণ নিপুণতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছিলেন শিল্পী। শেষ দৃশ্যে মার্তণ্ডমন্দিরে তাঁর মৌন অভিনয়ে দর্শকদের বিস্মিত করেন, মুগ্ধ করেন। শিল্পীর অনন্যসাধারণ আবৃত্তিশক্তি সম্বন্ধে সমালোচক মন্তব্য করেন, তাঁর আবৃত্তি আর রবীন্দ্রনাথের বাণী—এ এক অপূর্ব মণি-কাঞ্চন সংযোগ। কেবল ভঙ্গীর ভেতর দিয়ে নয়—তাঁর ভাবানুসারে পরিবর্তনশীল কণ্ঠস্বর এবং অনাহত আবৃত্তির ভিতর দিয়েও বিক্রমদেবের প্রেম, অভিমান, ক্রোধ, অনুতাপ প্রভৃতি ভাব এমন চমৎকার ফুটে উঠেছে, যার বিশেষ বর্ণনা করতে গেলে 'নাচঘরে' স্থান সংকুলান হবে না। তাঁর বিক্রমদেবের ভিতরে কোনরকম অপূর্ণতা নেই। প্রভা—অন্যান্য ভূমিকায় তাঁর আর সব প্রশংসিত অভিনয়ও পরিম্লান হয়ে গেছে।

বিপাশা—নিপুণতার সঙ্গে গাওয়া হলে রবীন্দ্রনাথের গানের সুর যে রঙ্গমঞ্চের উপরে যথেষ্ট জমে উঠতে পারে তারও প্রমাণ পাওয়া গেল 'তপতী'র অভিনয়ে।" (৩রা মাঘ ১৩৩৬—নাচঘর)

তপতী এবং যোগাযোগ

তপতী এবং যোগাযোগের মঞ্চরূপায়ণের সম্বন্ধে নাট্যামোদীদের দু'একটা কথা জানা প্রয়োজন। নাটককে মঞ্চোপযোগী করতে হলে অনেক সময়েই এডিট করবার দরকার হয় পরিচালকের নির্দেশ অনুসারে। এ নিয়ে অনেক সময়ে নামজাদা লেখকেরা খুবই বিরক্ত হয়েছেন শিশিরকুমারের উপর। কেউ কেউ হয়তো এ কারণে এত রেগে গিয়েছেন যার ফলে তাঁদের নাটক শেষ পর্যন্ত শিশিরবাবুর থিয়েটারে মঞ্চস্থ করা সম্ভব হয় নি। শরৎচন্দ্রের সঙ্গেও সময়ে সময়ে এ নিয়ে মতদ্বৈধ হয়েছে শিশিরকুমারের এবং মতপার্থক্য হওয়াতেই শরৎচন্দ্র পল্লী-সমাজের নাট্যরূপ শিশিরকুমারকে প্রথমটায় দিয়েও ফেরৎ নিয়ে গিয়ে অন্য মঞ্চে অভিনয় করতে দেন। শেষে সেখানে নাটকটি ফ্লপ করলে সেটি এনে শিশিরকুমারের হাতে দিয়ে বলেন যে শিশিরকুমার যা ভাল বোঝেন সেইভাবেই যেন নাটকটির অভিনয় করেন। সবাই জানেন পল্লীসমাজের নাট্যরূপ রমা শিশিরবাবুর নির্দেশে এবং পরিচালনায় বিরাট সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল। নাট্যাচার্যের পরামর্শেই এর আগে দেনাপাওনার নাট্যরূপ ষোড়শীর শেষ দিকটা ট্র্যাজেডীতে পরিণত হয়।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এসব বিষয়ে ছিলেন চিরকালই অত্যন্ত উদার প্রকৃতির। শিশিরকুমারের নাট্যপরিচালনার ক্ষমতা এবং অভিনয়-প্রতিভার সম্বন্ধে কবি অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। তপতী (১ম সংস্করণ) অভিনয়ের সময় কিছু কিছু জায়গায় রি-রাইট করে দেবার জন্য কবিকে অনুরোধ করেন নাট্যাচার্য এবং সেই অনুসারে কবিও সেই জায়গাগুলো আবার নতুন করে লিখে দেন। এই পরিমার্জিত তপতীই শিশিরবাবু মঞ্চস্থ করেন। পরে ঐ পরিমার্জিত তপতীই দ্বিতীয় সংস্করণ হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল। শিশিরবাবুর একমাত্র পুত্র শ্রীঅশোককুমার ভাদুড়ী আমাকে বলেছেন যে প্রথম সংস্করণের তপতী এবং তার সঙ্গে কবির সাদা কাগজে নিজের হাতে লেখা সংশোধিত অংশগুলো (ঐ বইয়ের সঙ্গে স্টিচ্ করা হয়েছে) অশোকবাবুর কাছে রয়েছে। আর একথাও অনেকেই জানেন না যে, শিশিরকুমার যখন যোগাযোগ মঞ্চস্থ করেন তখন ঐ উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। দুর্ভাগ্যবশত রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে লেখা নাট্যরূপটি অশোকবাবু খুঁজে পান নি নাট্যাচার্যের মৃত্যুর পর—তবে অন্যের হাতে লেখা সেই নাট্যরূপের এ্যাকটিং কপি তাঁর কাছে আছে। কিন্তু স্বহস্তে লেখা কপিটি হারিয়ে গেছে বলেই তো এত বড় একটা ব্যাপারকে অগ্রাহ্য করা যায় না। এলিজাবীথান টাইমসে রচিত কয়েকটি নাটক শেক্সপীয়ারের লেখা কিনা সে সম্বন্ধেও তো অনেক বাক্-বিতণ্ডা আছে এবং ভাষাবিদেরা বছরের পর বছর তাই নিয়ে গবেষণা চালিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগের নাট্যরূপটিও তো একইভাবে আমাদের দেশের ভাষাবিদ্‌দের গবেষণার বিষয় হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা করবার জন্য আমি বিশ্বভারতী এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষীয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাঁরা যদি শ্রীযুক্ত অশোক ভাদুড়ীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন তাহলে আরও বিশদভাবে এ ব্যাপারের খুঁটিনাটি জানতে পারবেন। আমার নিজেরও একথা মনে আছে যোগাযোগ মঞ্চস্থ হবার কিছু আগে কলেজ স্ট্রীটে একটি বইয়ের দোকানে শিশিরকুমারের সঙ্গে একদিন সকালে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি আমাকে বললেন যে কয়েকদিনের জন্য তিনি শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে—রবীন্দ্রনাথ তখন নব-নাট্যমন্দিরে অভিনয়ের জন্য যোগাযোগের নাট্যরূপ দিচ্ছিলেন এবং শিশিরবাবুকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন দু'একটি জায়গা সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য। নব-নাট্যমন্দিরে অভিনীত তপতী নাটক দেখবার সুযোগ আমার হয় নি সেকথা আগেই বলেছি। তবে একটি বাইরের পার্টি একবার শ্রীরংগমে তপতীর অভিনয় করেছিল এবং সে অভিনয় দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিল—এতে বিক্রমের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন শ্রীজ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, সুমিত্রা সেজেছিলেন শ্রীমতী সাধনা রায়চৌধুরী এবং বিপাশার ভূমিকায় রূপদান করেন শ্রীমতী নিবেদিতা দাস। শিশিরবাবু আমাকে বলেছিলেন যে শ্রীমতী সাধনা এবং শ্রীমতী নিবেদিতা দাস এ নাটকে অভিনয় করবার জন্য তাঁর কাছে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। মঞ্চাভিনয়ের সময় শ্রীমতী সাধনার সুমিত্রা আমার মনে কোন রেখাপাত করে নি। কিন্তু শ্রীমতী নিবেদিতা দাসের অভিনয় সমবেত দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল—বিপাশা চরিত্রের প্রিস্টাইন পিওরিটির দিকটা অতি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছিল শ্রীমতী দাসের সংলাপবাদনে এবং মুভমেন্ট ও ভাবের অভিব্যক্তিতে জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়ের রাজা বিক্রমের চরিত্ররূপায়ণ হয়েছিল যাত্রা ঘেষা। তাছাড়া বিক্রম চরিত্রের ব্যক্তিত্বের অত্যন্ত অভাব দেখা গিয়েছিল এই অভিনেতার ভেতর। রত্নেশ্বর চরিত্রের রূপায়ণে যিনি নেমেছিলেন তাঁকে মঞ্চে নামানোটাই উচিত হয় নি। শিশিরোত্তর যুগে তপতী জাতীয় নাটকের মঞ্চরূপায়ণের কথা ভাবাই যায় না—কারণ এ নাটকের বা বিসর্জনের অভিনয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীর ভেতর যে রোবাস্ট পার্সন্যালিটির দরকার, কণ্ঠস্বরে যে মডুলেশন আবশ্যক, চোখেমুখে যে ভাবাভিব্যক্তির প্রয়োজন আজকের আর্টিস্টদের ভেতর তার নিতান্ত অভাব। আজকালকার তথাকথিত নাট্যাচার্য বা নটসূর্যের দল ন্যাচারাল এ্যাকটিং এর নামে যে ধরণের অভিনয় করে থাকেন তাকেই বলে স্টাইলাইজড্ এ্যাকটিং। আসলে স্বাধীনোত্তর ভারতে জীবনের সবক্ষেত্রেই যেমন bankruptcy দেখা দিয়েছে, অভিনয়ের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয় নি। তবে মঞ্চের উন্নতি পেশাদারী মঞ্চ থেকেই হবে। ঐমাসে দু'চারদিন নিউ এম্পায়ার মঞ্চে অভিনয় করে এবং বড় বড় অসার বুলি আউড়ালে মঞ্চের সংস্কৃতি সাধন কোনোকালেই সম্ভব হবে না। (ক্রমশঃ)

রূপজগৎ

দর্শকের দৃষ্টিতে

ছবির ছাড়পত্রে যখন 'ইউ' বা ইউনিভার্সাল চিহ্ন দেওয়া হয় তখন ধরে নেওয়া হয় যে, এই ছবি বাড়ির ছেলেমেয়ে নিয়ে সপরিবারে দর্শনযোগ্য। কিন্তু সকলে মিলে আসন গ্রহণ করার পর শুরু হল বিভিন্ন বিদেশী ছবির ট্রেলর বা খণ্ড অংশ দেখান। সেই ছবি কেবলমাত্র বয়স্কদের জন্য চিহ্নিত, এবং দৃশ্যগুলি যা দেখান হচ্ছে মা'র পাশে ছেলে বা বাপের পাশে বসে মেয়ের দেখা ওদের পক্ষে বিড়ম্বনার ব্যাপার। এই রকম ব্যাপার প্রতিটি প্রেক্ষাগৃহেই চলছে।

বেলেঘাটার অবিনাশ ব্যানার্জী লেনের শ্রীতিমির দাশগুপ্ত এক চিঠিতে এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং সিনেমার প্রদর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। তিনি চিঠিতে আরো লিখেছেন, যেসব ছবিতে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য বা 'এ' চিহ্ন দেওয়া থাকে সেসব ছবির ম্যাটিনী শোতে অপ্রাপ্তবয়স্কদের ভিড় কম থাকে না। অভিভাবকদের কাছে লুকিয়ে অনেক ছেলে এসব ছবি দেখে থাকে। সিনেমার বুকিং কাউন্টার এ ব্যাপারে লক্ষ্য রাখে না। যাঁরা প্রবেশ পথে থাকেন আশ্যারদের প্রতিও সিনেমা কর্তৃপক্ষের কোন নির্দেশ থাকে না। কাজেই নিষিদ্ধ ছবি দেখার প্রলোভন অপ্রাপ্তবয়স্কদের একদলকে পেয়ে বসে। এ ব্যাপারে বহুবার পত্র-পত্রিকায় লেখা হয়েছে। শ্রীতিমির দাশগুপ্ত এ ব্যাপারে আবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে সতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু দুটি ব্যাপারই নির্ভর করছে সিনেমাগুলির কর্তৃপক্ষের বোধশক্তির ওপর। আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, এসব সাধারণ সমাজবোধের ব্যাপারেও জনমতের প্রবল চাপ অথবা আইনের প্রয়োগ ব্যতীত কিছু করা যায় না। সিনেমা কর্তৃপক্ষের নিজেদের বিবেক-বোধে যে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, টাকার লোভে সে বিষয়ে তাঁরা উদাসীন থাকেন। একমাত্র টাকা আয় ছাড়া সমাজের প্রতি, ভবিষ্যৎ নাগরিক জীবনের প্রতি তাঁদের যেন কোন কর্তব্য নেই। তাঁরা হয়ত বলবেন কোন্ অপ্রাপ্তবয়স্ক টিকেট কিনছে সেদিকে নজর রাখবার মত তাঁদের সময় বা লোক নেই। অথবা পাড়ার মস্তানদের ভয়ে তাঁরা এ ব্যাপারে ইচ্ছা থাকলেও আটকাতে পারেন না। প্রসংগত একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, মেট্রো সিনেমার ম্যানেজার এবং সহকারী ম্যানেজার বহুদিন এরূপ ক্ষেত্রে টিকেট কিনতে বা প্রবেশ পথে অপ্রাপ্তবয়স্কদের বাধা দিয়েছেন। তাতে তাঁদের কোন বিপদ হয় নি, বরঞ্চ সবাই তাঁদের সমীহ করেন। অভিভাবকদের তাঁরা ধন্যবাদভাজন। সিনেমার ম্যানেজাররা সতর্ক থাকলে এ ব্যাপারে বাধা দিতে পারেন। তার চেয়ে বড় কথা 'ইউ' ছবির শোতে 'এ' ছবির ট্রেলর দেখান। যেটা একান্তভাবে সিনেমার ম্যানেজারদের উপর নির্ভর করছে। ম্যানেজাররা ছবির ট্রেলর নির্বাচিত করেন। তা রবিবারের সকালের ছবির বিজ্ঞাপন মাত্র। এই বিজ্ঞাপন যদি চলতি ছবির সংগে সংগতি-সম্পন্ন না হয় ইচ্ছা করলে তা দেখান বন্ধ রাখার অধিকার ম্যানেজারদের আছে।

এ ব্যাপারে সরকার ও কর্পোরেশন আশ্চর্যজনক নির্বাক। উভয় দিক থেকে সিনেমার ম্যানেজারদের নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। যদিও ম্যানেজারদের স্বেচ্ছায় এ কাজ করা সম্মানজনক কিন্তু তা যেক্ষেত্রে হচ্ছে না সেক্ষেত্রে সরকারী নির্দেশ ছাড়া পথ থাকে না। সিনেমার মালিক ও ম্যানেজাররা সমাজে বাস করেন এবং সমাজের ভাল-মন্দের সংগে তাঁরা যুক্ত। সুতরাং কেবলমাত্র মুনাফার কথা না ভেবে সমাজের দিকেও তাঁদের দৃষ্টি থাকা দরকার। কিন্তু সম্প্রতি তাঁরা যে ধরনের ক্ষতিকর বিদেশী ছবি প্রদর্শনে প্রলুব্ধ হয়ে উঠেছেন, তাতে সমাজের কথা ভাবার অবসর তাঁদের অনেকের হয়ত নেই।

—সুজন।

উত্তমকুমার

চিত্র আলোচনা

শঙ্খবেলা

(অনুরাধা ফিল্মস)

অগ্রগামী গোষ্ঠী বাঙালী চলচ্চিত্র দর্শকদের মনে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। 'ডাকহরকরা' থেকে 'হেড মাস্টার' কেবলমাত্র দেশে নয় বিদেশেও প্রশংসিত। এঁদের নতুন ছবি 'শঙ্খবেলা' দর্শকমহলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। ছবিটি নিয়ে, এবং ছবির বিভিন্ন আংগিক বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা হচ্ছে। এই আলোচনায় পক্ষে এবং বিপক্ষে দুটি মতই প্রকাশ পাচ্ছে। অনিবার্য কারণে মুক্তিলগ্নে ছবিটি আমার দেখা হয় নি। এই আলোচনা আমাকে আগ্রহান্বিত করেছে ছবিটি দেখতে।

'শঙ্খবেলা'র মূল কাহিনী সাহিত্যিক আশুতোষ মুখার্জী রচিত। অগ্রগামীর চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় কাহিনীর অন্ত-র্নিহিত বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, এবং বক্তব্যে যেমন সচেতন মনের পরিচয় রয়েছে, আংগিকে তেমন রয়েছে চমক।

সলিল দত্ত পরিচালিত 'প্রস্তর স্বাক্ষর'-এর দুটি চরিত্রে সৌমিত্র ও সন্ধ্যা

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ভারতীয় সমাজজীবনে এক শ্রেণীর হঠাৎ নবাবের সৃষ্টি হয়েছে। যারা মূলত নিম্নমধ্যবিত্ত হলেও কোন বিদেশী ফার্মের সেলস- ম্যান, ঠিকাদারী বা কালোবাজারীর দৌলতে হঠাৎ বড়লোক হয়েছে। এরা নিজেদের মূল ভিত্তি থেকে সরিয়ে বড়লোকের সারিতে দাঁড় করাতে চায়। মধ্যকলকাতা থেকে নিউ আলিপুরে আসাকে জীবনের পরম সৌভাগ্য মনে করে। অথচ এদের পায়ের নিচের মাটি এত আলগা যে, বড় সাহেবের সুনজরে পড়ে এরা যেমন উপরে ওঠে আবার তারই নেক নজরে পড়লে বা ওদের স্বার্থের অনুকূল কাজ না করতে পারলে মুহূর্তে নিচে নেমে আসতে বাধ্য হয়। দোলদোলায়মান এদের জীবন। এমনই একজন এ ছবির নায়ক—সুনীল। বড় হবার নেশায় পাগল হয়ে যে ছুটছে অর্থহীন হেঁয়ালী জীবনের পাল্লায়। ক্লাবে যাওয়া, মদ খাওয়া, পার্টিতে হুল্লোড় করা, বৌকে পার্টিতে নিয়ে মদ খাওয়ানোকে যে জীবনের একটা বড় জিনিস মনে করে; যার মতে এতেই সুখ, এটাই সভ্যতা, এতেই প্রমোশনের পথ খোলসা হয়। বরাবর সুনীল উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিল; কিন্তু তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাকে নিজের সমাজ ও পরিজন থেকেও যে দূরে নিয়ে যাবে একথা তৃপ্তি কখনো ভাবতে পারে নি। তাদের প্রথম প্রেমের দিনগুলি কত মাদকতা ভরা, কত রোমাঞ্চ, কত সুখময়। 'আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী' এভাবে যেন তারা কালের স্রোতের সঙ্গে চলতে চেয়েছিল। কিন্ত সুনীলের অভিজাত হবার নেশা অথচ তার সমাজ সম্পর্কে চেতনাহীনতার সঙ্গে তৃপ্তি পাল্লা দিয়ে চলতে পারল না। তাকে এক জায়গায় থেমে যেতে হল। দুজনের বিচ্ছেদ হল। তারপরে দুজনের আবার দেখা হয়েছিল হাসপাতালে তাদের ছেলের অপারেশনের এক সঙ্কট মুহূর্তে। মা-বাবার প্রেমহীন জীবনে বিমর্ষ সন্তানকে মাঝখানে রেখে তাদের পুনর্মিলন হয়েছিল। এই পুনর্মিলনের পথ করে দিয়েছিল হাসপাতালের সহৃদয় ডাক্তার।

এই কাহিনীকে বিকশিত করার জন্য চমৎকার কয়েকটি দৃশ্য রচনা করা হয়েছে। সুনীল-তৃপ্তির প্রেমের দৃশ্যগুলি কাব্যময়। বাংলা ছবির পক্ষে কিছুটা চমকপ্রদ মনে হলেও এতে সঙ্গতি কোথাও ক্ষুন্ন হয় নি, বা হিন্দী ছবির মত স্থূল মনে হয় নি। মাইথনের হ্রদের বুকে তাদের স্বচ্ছন্দ নৌকাবিহার দর্শকরা উপভোগ করবেন। পার্টির দৃশ্যে একদিনে অর্থহীন উন্দামতা, এবং সব শেষে শূন্যতাবোধ—চমৎকার প্রকাশ পেয়েছে। জীবন উপভোগের নামে এই যে উন্দামতা, অর্থহীন প্রলাপ ও নাচের নামে অঙ্গভঙ্গী; এই মধুময় জীবনের শেষ কোথায় তারাও জানে না। সমাজ, মানুষ এবং বিবেকের প্রতি চোখ বন্ধ করে ওরা যেন জীবনকে সন্ধান করছে। এরাই আমাদের সমাজের তথাকথিত নতুন আধুনিক—ধনিক সমাজের উচ্ছিষ্টভোজীর দল। বড় বড় বনেদী ক্লাবে, হোটেলে, বারে এই জীবনবিমুখ নর-নারীর সন্ধান প্রতি রাত্রেই পাওয়া যায়।

অভিনয়াংশে তৃপ্তির চরিত্রে মাধবী মুখার্জী এবং সুনীলের চরিত্রে উত্তমকুমার পরস্পর সঙ্গতি রেখে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে দুটি ভূমিকা প্রকাশ করেছেন। এক অংশে তরুণ প্রেমের মধুরতা, আর এক অংশে সুনীলের মধুর জীবনের নামে বিভ্রান্তি এবং তৃপ্তির মধ্যে শূন্যতাবোধ এ দুজনের অভিনয়ে চমৎকার ফুটে উঠেছে। এক ব্যক্তিত্বসম্পন্না, স্বাভাবিক জীবনে বিশ্বাসী বাঙালী তরুণীরূপে মাধবী মুখার্জী তৃপ্তিকে সার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন। ছোট্ট বাবুর চরিত্রে ছোট ছেলেটি পরিচালকের নির্দেশ প্রশংসনীয়ভাবে কার্যকরী করেছে। সংলাপে ও অভিব্যক্তিতে ছেলেটি ছবির সার্থকতায় অনেকখানি অংশ পালন করেছে। দরদী ডাক্তাররূপে বসন্ত চৌধুরী এবং অন্যান্য চরিত্রে পাহাড়ী সান্যাল, শোভা সেন, নবাগত মৃণাল মুখোপাধ্যায়, তরুণকুমার প্রমুখ যথাযথ অভিনয় করেছেন।

ছবিতে দীনেন গুপ্তের চিত্রগ্রহণের কাজ বেশ সুন্দর। বিশেষ করে প্রাকৃতিক দৃশ্য ও জনসঙ্কুল কলকাতার পথের দৃশ্য তুলে ধরার ব্যাপারে তাঁর কাজ প্রশংসনীয়। সম্পাদনা আরো দক্ষতার সঙ্গে হতে পারলে ছবির গতি কিছুটা বৃদ্ধি হবে এবং কোন কোন দৃশ্য অনাবশ্যক সময় ক্ষেপণের একঘেয়েমী হতে মুক্ত হত। সুধীর খানের শিল্প নির্দেশনার কাজ প্রশংসার দাবি রাখে। সুধীন দাশগুপ্তের পরিচালনায় সঙ্গীতের কাজ ভাল। দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীত এখানে সুন্দরভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।

যাঁরা সমাজ ও মানুষকে ভুলে গড্ডালিকা স্রোতে গা ভাসানোকে মধুর জীবন মনে করেন এ ছবি তাঁদের চেতনা ফেরাতে সাহায্য করবে, অন্যদের সতর্ক করবে।

উত্তমপুরুষ

(এম কে জি প্রোডাকসন্স

পরিচালনা : চিত্রকর)

সত্যকে সবাই নন্দর ভাগ্নে বলেই জানত। নন্দ ছাড়া তার আসল পরিচয় কেউ জানত না। সেও যা জানত তা সম্পূর্ণ পরিচয় নয়।

কারখানার ডাক্তারকে ধরে সত্য খাস বেয়ারার চাকরী পেল শঙ্কর চৌধুরীর বাড়িতে। শঙ্কর চৌধুরী কারখানার মালিক। সত্য সব সময় তার মায়ের ছবি সঙ্গে রাখে। এই ছবি নিয়ে এবং তার বাবার কথা নিয়ে পাড়ার বহু লোকের সঙ্গে তার ঝগড়া হয়েছে। তার বাবা যে কে, কি তার উপাধি তা পর্যন্ত সত্য জানে না। একদিন ডাক্তার নন্দ মিস্ত্রীর কাছে শুনল সত্যর মা কে ছিল এবং কিভাবে ওরা নন্দর আশ্রয়ে এসেছিল। কিন্তু ডাক্তার সে কথা বলে যেতে পারল না শঙ্কর চৌধুরীকে। মত্ত অবস্থায়—

উত্তেজনায় সে শঙ্করের বাড়িতেই এসে গেল।

এই উত্তেজনার কারণ, ডাক্তার অনিল এবং শঙ্কর ছোটকালের বন্ধু। তারা গ্রামের একটি মেয়েকে ভালবেসেছিল। কিন্তু মেয়েটি ভালবেসেছিল শঙ্করকে। এবং শঙ্করের বাবার অজানাতে শঙ্করের সঙ্গে তার বিয়েও হয়েছিল। শঙ্করের বাবা দোর্দন্তপ্রতাপ জমিদার এ কথা শুনে মেয়েটিকে পুড়িয়ে মারার জন্য বাড়িতে আগুন দিয়ে শঙ্করকে জোর করে নিয়ে যায়। মেয়েটি তখন গর্ভবতী ছিল। পাড়ার লোকরা তাকে গোপনে বাঁচিয়ে দেয়। সে দেশত্যাগ করে নন্দর আশ্রয়ে থাকে। একথা শঙ্কর বা ডাক্তার কারো জানা ছিল না। ডাক্তার এতকাল নীরবে শুধুমাত্র বিরহ বেদনা সয়ে এসেছে। আর শঙ্কর নতুন করে সংসার পাতলেও সুখী হতে পারে নি। বাড়ির চাকরদের ঈর্ষায় ও স্ত্রীর অবিবেচনায় একদিন শঙ্কর সত্যকে মিথ্যা অপরাধ দিয়ে প্রচন্ড বেত্রাঘাত করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবার পর জানতে পারল, তারই সন্তান, তার প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত। সত্যকে সে ফিরিয়ে আনল, সত্য তার পরিবারের উত্তরপুরুষ।

কাহিনী ও সংলাপ লিখেছেন অজিত গাঙ্গুলী। চিত্রনাট্য লিখেছেন ছবির প্রযোজক সুনীল বসুমল্লিক। কাহিনী মামুলী পেশাদার ছবির ছাঁচে ঢালা। বহু স্থানে অসঙ্গতি রয়েছে এবং বাস্তববোধ নিয়ে কাহিনী অগ্রসর হতে পারে নি। যেমন, শঙ্করের স্ত্রীর মন হঠাৎ কেন পরিবর্তন হল, তার কারণ বোঝা যায় নি। প্রচলিত হিন্দী ছবির ধারায় দর্শকদের বিভিন্ন রসে তৃপ্ত করার দিকে লক্ষ্য রেখে ছবি অগ্রসর হয়েছে।

প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন বসন্ত চৌধুরী, অনুপকুমার, সন্ধ্যা রায়, অনুভা গুপ্ত, বিকাশ রায়, শমিতা বিশ্বাস, গীতা দে, তরুণকুমার, রবি ঘোষ, বঙ্কিম ঘোষ শিখা ভট্টাচার্য, অমর মল্লিক প্রমুখ।

নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত পরিচালিত 'ঋতুরঙ্গ' নৃত্য নাট্যে কুমারী পাপড়ি বসু ও শুতপা দত্ত।

নাটকের কথা

গণনাট্য সঙ্ঘের দুটি নাটিকা

ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ৮ই নভেম্বর সন্ধ্যায় প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে দুটি নাটিকা অভিনীত হয়েছে। প্রান্তিক শাখা অভিনয় করেছে: 'হারানের নাত জামাই'। বিখ্যাত সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের নাট্যরূপ। নাট্যরূপ দিয়েছেন শিশির সেন। এই নাটকটি দেখে আমাদের গণনাট্য সঙ্ঘের প্রথম যুগের কথা মনে পড়ে গেল। মঞ্চসজ্জা, অভিনয় রীতি এবং সংলাপে গণনাট্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পেশা-

প্রত্যাখ্যানের অভিনন্দন

সঙ্গীত নাটক আকাদেমী ঘোষিত শ্রেষ্ঠ নাট্য পরিচালকের সম্মান প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত করায় আমাদের কাছে সারা দেশ থেকে অসংখ্য অভিনন্দন বার্তা আসছে। দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমাদের যে একাত্মতা এইসব অভিনন্দন বার্তার জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে তার অমর্যাদা করব না। অগণিত নগণ্য সাধারণ মানুষের জয়মাল্যে ভূষিত "কল্লোল" বিক্ষুব্ধ বিড়ম্বিত মানুষের মনের কল্লোল।

'কল্লোল' মিনার্ভা থিয়েটারে

বৃহস্পতি ও শনি ৬॥ টায় চলছে

রবিবার এবং ছুটির দিন এবং

৩টা ও ৬॥টায় চলবে

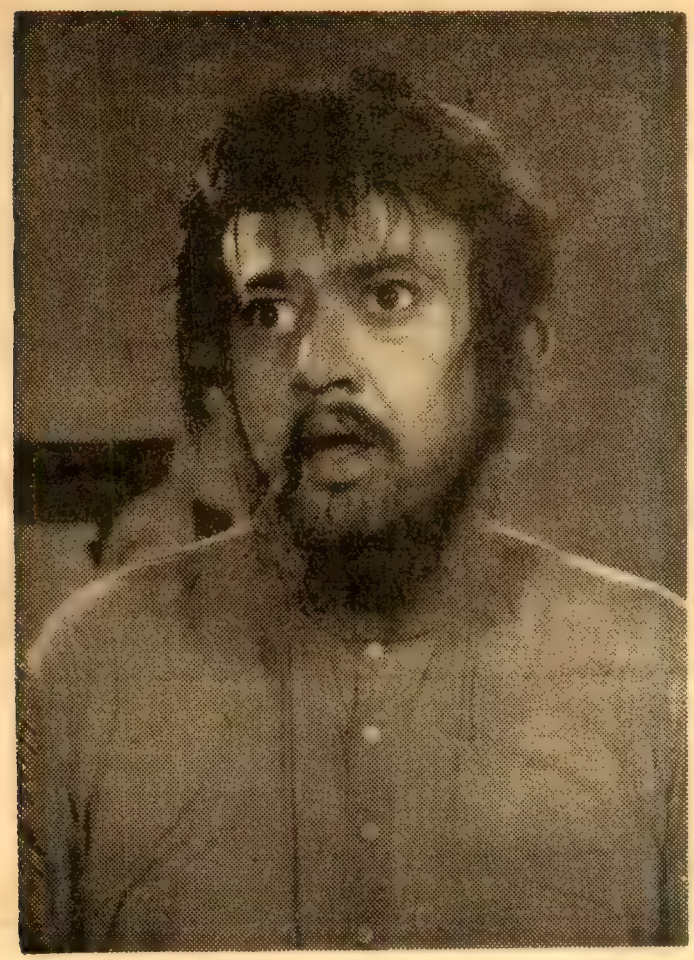

'৮০তে আসিও না' ছবিতে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

কায়েমী স্বার্থের দল তাদের উপর নজর রেখেছে। পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে ভুবন মণ্ডল নামক এক কৃষক সমিতির কর্মীকে ধরবার জন্য। একদিন ভুবন মণ্ডলকে সত্যিই পুলিশ পেল, কিন্তু সে হারানের নাত জামাই হয়ে বেঁচে গেল। এ খবর শুনে আসল নাত জামাই এল কৈফিয়ৎ চাইতে; পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করল ভুবন মণ্ডল বলে। কৌতুকাত্মক পরিস্থিতির মধ্যে এখান থেকে নাটক চরম পরিণতিতে পৌঁছল, যা বাংলার কৃষকের জীবনের অভিজ্ঞতা, যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে কৃষকরা আবার নতুন করে সংগ্রামে নামতে বাধ্য হচ্ছে।

ময়নার মা, ময়না, ভুবন মণ্ডল, নাত জামাই, এবং অন্যান্য চরিত্রগুলির যাঁরা রূপদান করেছেন তাঁরা অতুলনীয় সার্থকতার জন্য ধন্যবাদভাজন। নাটকটির পরিচালনা কৃতিত্ব বিমলেন্দু মুখোপাধ্যায়ের। দারোগার ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেছেন বিখ্যাত অভিনেতা জ্ঞানেশ মুখার্জী।

কিম্‌লিস : কলাকার শাখা একটি হিন্দী নাটক অভিনয় করেছে। নাটকের নাম 'কিমলিস'। সমরেশ বসুর একটি ছোট গল্পের নাট্যরূপ দিয়েছেন বাসুদেব বসু। 'কিমলিস' ক্যাম্পেন নাটক। মূলত নির্বাচনকে সামনে রেখে নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে।' নাটকীয় রসের অপেক্ষা এখানে প্রচার প্রধান হয়ে উঠেছে। নাটকীয় গঠন এখানে পুষ্ট হয়ে উঠতে পারে নি।

এক মজুরের ছেলে জেল খেটে সদ্য মুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে। সে জেলে কমিউনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী হয়েছে।

দারী অথবা অপেশাদারী নাটকের দলগুলির অভিনয় রীতির সঙ্গে এদের প্রচুর তফাৎ। মঞ্চে যাদের দেখেছি তাদের কখনো অভিনেতা মনে হয় নি, মনে হয়েছে কোন এক অখ্যাত, অবজ্ঞাত গ্রামের অতি সাধারণ মানুষগুলিকে দেখছি। সাম্প্রতিক কালে গণনাট্য সঙ্ঘের যে নাটকগুলি আমরা দেখেছি তার মধ্যে 'ভাসান' এবং 'হারানের নাত জামাই' রসোত্তীর্ণ নাটক। কৃষি সমস্যার উপর অন্যান্য দলের যে সব নাটক সম্প্রতি অভিনীত হয়েছে তার মধ্যেও 'হারানের নাত জামাই' শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে। নাট্যরূপের কৃতিত্ব নাটকটিকে রসোত্তীর্ণ করেছে। অভিনেতারা নাটকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে এত নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেদের মিশিয়ে নিয়েছেন যে, তাঁরা নিখুঁত গ্রামের মানুষ হয়ে উঠেছেন।

এক অখ্যাত গ্রামের মানুষগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাঁচার চিন্তা করছে। গ্রামের

'কেদার রাজা' ছবিতে অসিতবরণ ও পাহাড়ী সান্যাল

তার মুক্তির পর মালিকের দালালরা ভীত হয়ে উঠেছে। তার বাবাকে ভয় দেখিয়ে ছেলেকে ঘরের বার করে দিতে বাধ্য করল কিন্তু মজুররা তাকে গ্রহণ করল। ছাঁটাই-বিরোধী সংগ্রামে তার বাবা প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করে গেল মালিকের সঙ্গে মজুরের মিল হতে পারে না। মালিকরা যাই বলুক না কেন তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য মুনাফা।

এই নাটকে অনেক কথা আছে কিন্তু কোন নির্দিষ্ট সমস্যার উপর নির্ভর করে নাটক গড়ে ওঠে নি। তবে নাটকের উপস্থাপনা এবং অভিনয় ভাল।

'দাবী' নাটকের শততম অভিনয়

আগামী ২৩শে নভেম্বর '৬৬ বুধবার সন্ধ্যা ছয়টায় স্টার থিয়েটারে অভিনীত "দাবী" নাটকের শততম অভিনয়ের স্মারক উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধেয় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ সভাপতি ও প্রখ্যাত কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত মনোজ বসু মহাশয় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করিবেন।

এতদুপলক্ষে স্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সলিলকুমার মিত্র মহাশয় নাটকের সংগঠনকারী শিল্পী ও নেপথ্য কর্মীদের পুরস্কৃত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

রুপোলী চাঁদ

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভা কর্মিবৃন্দের রিক্রিয়েশন ক্লাব কর্তৃক আগামী ২১শে নভেম্বর, সোমবার সন্ধ্যা ৬টায় স্টার রঙ্গমঞ্চে ধনঞ্জয় বৈরাগী রচিত 'রুপোলী চাঁদ' নাটকটি অভিনীত হবে। নাটক পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন সাংবাদিক রণজিৎ দত্ত। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করবেন—শিপ্রা সাহা, সুজাতা ব্যানার্জী, যুথিকা ভট্টাচার্য, সুকুমার গুপ্ত, দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, আসাদুর রহমান, প্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কানাইলাল মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ ভৌমিক, নিত্যানন্দ শেঠ, বলাই চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল দাস, হরেন চক্রবর্তী, পরিমল সরকার, তরুণ সেনগুপ্ত, অনিল রায়, গণেশ রায়গুপ্ত, গণেশ দাস, স্বাধীন চট্টোপাধ্যায়, মহম্মদ তকরিম, অনাদি মুখোপাধ্যায়, হিমাদ্রি চট্টোপাধ্যায়, ও আরো অনেকে।

চরিত্রহীন

এসো স্টান্ডার্ড ইস্টার্নের কর্মচারীরা গত ২রা নভেম্বর স্টার মঞ্চে তাঁদের বার্ষিক নাটক অভিনয় করেছেন। শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন নাটকটি তাঁরা সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছেন।

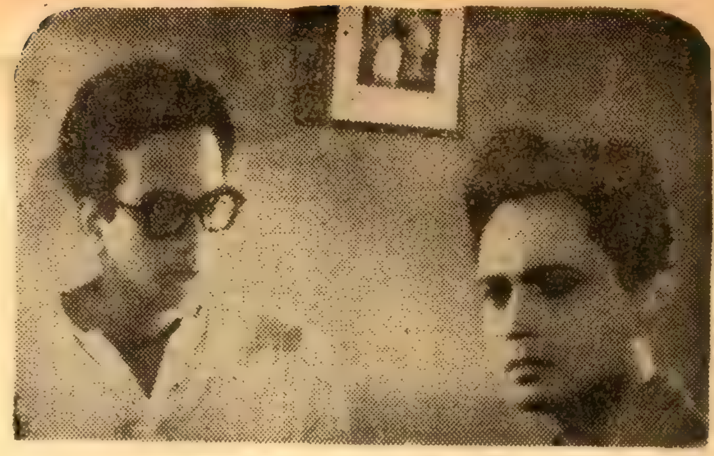

নাবিক প্রোডাকসন্সের 'দিবারাত্রির কাব্য' ছবিতে অসীমকুমার ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টুডিও খবর

গুপী গায়েন-বাঘা বায়েন

আর, ডি, বনশালের প্রযোজনায় সত্যজিৎ রায় 'গুপী গায়েন-বাঘা বায়েন' ছবির কাজ আরম্ভ করেছেন। বাংলার বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী লিখিত এই গল্প প্রত্যেক বাঙালীর পড়া থাকার কথা। ছবিতে গুপীর ও বাঘার অভিযান দেখাবার জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহির্দৃশ্য তোলা হবে। ছবিটিতে সাতটি গান থাকবে। সত্যজিৎ রায়ের কোন ছবিতে এত গান থাকে না। এই মাসেই গানগুলি গৃহীত হবে। এই দুটি চরিত্রে রূপ দেবার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন সাংবাদিক জীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিনেতা রবি ঘোষ। জীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় দৈনিক বসুমতীর সহসম্পাদক।

বিষ পাথর

গত ১১ই নভেম্বর ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে সিনে ইন্টারন্যাশনালের প্রথম ছবি 'বিষ পাথর'-এর মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবিটি পরিচালনা করবেন প্রশান্তকুমার চক্রবর্তী।

শ্রীরামচরিত-মানস

ভক্তকবি তুলসীদাস

অধ্যাপক শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গানুবাদ

শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা-গানে ভারতবর্ষের বহু গুণী ও জ্ঞানীজন লেখনী ধারণ করিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। সেই সকল অমর লেখনীর প্রতিভা-নির্ঝরে ভারতবর্ষের মহাকাব্য পৃথিবীর সাহিত্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ভক্তকবি গোস্বামী তুলসীদাস তন্মধ্যে অন্যতম—যিনি সহজ সরল ভাষায় পতিতপাবন সীতা-রামের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন সুমধুর সঙ্গীতের মাধ্যমে। তুলসীদাসের জীবনসর্বস্ব মহামানব শ্রীরামচন্দ্রের সেই বন্দনা-গানের সুললিত বাংলা অনুবাদ এই প্রথম—বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের অপূর্ব কীর্তির নূতন এক পরিচয় এই শ্রীরামচরিত-মানস। বহু রঙীন চিত্রে সুশোভিত।

মূল্য—১ম খণ্ড দুই টাকা, ২য় খণ্ড দুই টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

সঙ্গীত কথা

নিউইয়র্কে ভারতীয় কোকিলকণ্ঠী শিল্পী শ্রীমতী শ্ভলক্ষ্মী

একটি সঙ্গীত-সন্ধ্যা

মহাজাতি সদনে ১লা থেকে ৭ই নভেম্বর পর্যন্ত সদানন্দ সংগীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সম্মেলনে খ্যাত ও অখ্যাত অনেক শিল্পী সমাবেশ হয়েছিল। একদিকে যেমন রবিশঙ্করের মত খ্যাতনামা শিল্পী ছিলেন, তেমন এমনও কেউ কেউ ছিলেন পয়সা খরচ করে যাঁদের গান শোনার কোন অর্থ হয় না। কিন্তু সম্মেলনের উদ্যোক্তারা তাঁদের বহু পৃষ্ঠপোষককে তুষ্ট রাখার জন্য বিচিত্র শিল্পী সমাবেশ ঘটান। তাতে প্রোগ্রাম দীর্ঘ হয়, দিনও বাড়ে, যা পাঁচ দিনে হতে পারত সেটা হল সাত দিনে। মহাজাতি সদনের মত হলের ভাড়া কম নয়, তাও এঁরা বহন করেছেন পৃষ্ঠপোষকদের অর্থানুকূল্যে। কিন্তু শ্রোতারা অর্থ ব্যয় করলেও সময়ের মূল্য বোঝেন। খুব আগ্রহসহকারে ছয় তারিখের অনুষ্ঠানে গিয়ে দেখলাম জনৈকা শিল্পী গান করছেন কিন্তু বিরাট হলে মাত্র পনের জন লোক বসে আছেন। কল্যাণী রায় যখন সেতার বাজাতে বসলেন তখন বড় জোর শ'খানেক লোক। অথচ এই তরুণী শিল্পীর বাজনা বহু লোকে শুনলে ভালই হত এবং বহু লোকের মধ্যে উপস্থিত করার যোগ্য শিল্পী তিনি। কল্যাণী রায় বাজালেন প্রথমে বেহাগ, তারপরে তিলক কামোদ। তাঁর মিষ্টি বাজনা সুরের মাদকতায় প্রেক্ষাগৃহ ভরে তুলেছিল। শ্রোতারা তাঁর খুব প্রশংসা করছিলেন।

অপর্ণা চক্রবর্তী

তারপরে আসরে এলেন সুগায়িকা শ্রীমতী অপর্ণা চক্রবর্তী। এসময় প্রেক্ষাগৃহ প্রায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। রাত তখন নয়টা। শ্রীমতী চক্রবর্তী ক্ল্যাসিকাল গাইয়ে হিসাবে সুপরিচিতা। কলকাতার সংগীত অনুরাগীদের মধ্যে যেমন, তেমন বাংলার বাইরেও তাঁর পরিচিতি রয়েছে। গাম্ভীর্যের সংগে আসন গ্রহণ করে সুর বন্দনা করলেন। তাঁর সংগে তবলা সংগত করলেন অনিল রায়চৌধুরী ও সারেংগী বাজালেন মহম্মদ সগিরুদ্দিন। এই দুই গুণী শিল্পীর সহযোগিতায় শ্রীমতী চক্রবর্তী প্রথমে গাইলেন তিলক, তারপরে ঝিঁঝিট। তিলকের সুর গাম্ভীর্য-বিস্তার করে রাশভারি গতিতে স্থায়ী থেকে অগ্রসর হয়ে আভোগে পৌঁছল চিত্রতারকার মধ্যে। শ্রীমতী চক্রবর্তীর গায়কী উত্তর ভারতীয়। উত্তর ভারতে এই রাগে কোমল নিখাদের ব্যবহার কম। এই অভাব তিনি পূরণ করে দিয়েছেন মধুর ভাবাপন্ন ঝিঁঝিট গেয়ে। শ্রীমতী চক্রবর্তীর মার্জিত কণ্ঠে সুরের মাদকতায় এই গানটি শ্রোতাদের পরম তৃপ্তি দান করেছে। এতক্ষণে শ্রোতারা সংগীতলোকের আনন্দের স্বাদ পেলেন। তাঁর গান যখন শেষ হল রাত তখন দশটা বেজে গেছে। তাঁর পরে ওস্তাদ আমির খাঁর নাম ঘোষিত হল। কিন্তু দূরবর্তী স্থানের মানুষ বাড়ি ফেরার কথা ভেবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে পড়লেন। আগ্রহ সত্ত্বেও আমির খাঁর গান শোনা হল না। আমিও ছিলাম তাঁদের দলে।

পাঠক মন

গত ২০শে অক্টোবর আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত আমার একটি পত্রে spade-কে sword না বলিয়া spade বলিয়াছি বলিয়া দেখা যাইতেছে কোন একটি মহল, যাহা ঐ spade-টিকে sword বলিয়া চালাইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে, বিশেষ বিচলিত হইয়াছে। জানি না শ্রীঅজিত সেন ঐ মহলের মুখপত্রস্বরূপে হইয়া আমার বক্তব্যের অসারতা প্রমাণে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন কি না। শ্রীসেনের মতে আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত তৃতীয় শ্রেণী প্রাপ্ত যে অধ্যাপকের কথা বলিয়াছি তিনি নাকি মাত্র তিনটি paper-এ পরীক্ষা দিয়াই তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। অতীত যখন স্মৃতির অতলে চলিয়া যায় তখন অনেক মিথ্যাকেই সত্য বলিয়া প্রচার করা যায়। শ্রীসেনের দুর্ভাগ্য যে আমাদের মত দু-একজন প্রাচীন ব্যক্তি এখনও জীবিত আছেন যাঁহারা জানেন যে ঐ অধ্যাপকটি কয়টি পেপার-এ পরীক্ষা দিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি ছাত্রজীবনে কোন কৃতিত্বের পরিচয় রাখিতে পারেন নাই, যিনি B.A. পরীক্ষায় অনার্স পাইবার যোগ্যতা অর্জন করিতে পারেন নাই, যিনি স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় একটি তৃতীয় শ্রেণী লাভ করিলেন (যাহা তাঁহার উপযুক্ত প্রাপ্য) তিনি যখন হঠাৎ অপর একটি বিষয়ে পরীক্ষা দিয়া প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন তখন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকমাত্রই ঘটনাটিকে সহজভাবে গ্রহণ করিতে দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু কীর্তি-কাহিনীই ত' প্রকাশিত হইয়াছে। এই কলঙ্কের ইতিহাসের আর একটি অধ্যায়ের খুঁটিনাটি প্রকাশ করিয়া লাভ কি? শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই প্রথম শ্রেণীপ্রাপ্ত ব্যক্তিটির পাণ্ডিত্যের খ্যাতি এতই বিস্তৃত ছিল যে সুদূর উত্তরবঙ্গের কোন একটি স্কুল পর্যন্ত শিক্ষকপদের জন্য তাঁহার আবেদন-পত্র প্রত্যাখ্যান করে।

শ্রীসেন আলোচ্য ব্যক্তিটির পাণ্ডিত্যের প্রমাণস্বরূপ কয়েকজন মনীষী প্রদত্ত প্রসংশাপত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীসেনের অবগতির জন্য জানাই যে, ইঁহাদের একজন এই অধ্যাপকটির পাণ্ডিত্যে এতই মুগ্ধ যে তিনি তাঁহার P.R.S.-এর জন্য প্রদত্ত thesis টি নাকচ করিয়াছিলেন। তিনিই আবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কারমাইকেল অধ্যাপক পদের জন্য তাঁহার আবেদনকে অগ্রাহ্য করিয়া প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের বর্তমান প্রধানকে ঐ পদে নিয়োগ করিবার দৃঢ় সুপারিশ করেন।

এই অধ্যাপকটি ভুল তথ্য সম্বলিত এবং অশুদ্ধ ভাষা জর্জরিত কয়েকটি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর পুস্তক রচনা করিয়াছেন। পত্রের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় ঐ পুস্তকসমূহের বিভিন্ন অংশ উদ্ধৃত করিবার বাসনা ত্যাগ করিলাম। যিনি এরূপ গ্রন্থ রচনা করেন তিনি যে গবেষণা কার্যে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিবেন ইহা তো স্বাভাবিক। শ্রীসেন নিশ্চয়ই জানেন আমাদের মহা-পণ্ডিত অধ্যাপকটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গবেষকের বৃত্তি ভোগ করিয়াও কোন গবেষণা গ্রন্থ প্রণয়নে অপারগ হন। ভাবিতেও বেদনা বোধ করি যে আজকাল প্রকৃত পাণ্ডিত্য অপেক্ষা পাণ্ডিত্যের অভিনয়ই অধিক সমাদৃত এবং উহার অভিনেতাকে পণ্ডিত বলিয়া প্রচার করিতে স্বার্থসন্ধানী ব্যক্তির অভাব নাই।

অমলেশ সিংহরায়
১৫, চৌধুরী বাগান লেন
কলিকাতা

* * *

গত ১৯শে আশ্বিন সংখ্যায় শ্রীমতী চিত্রা গুপ্তার "পাঠকমনে" প্রকাশিত বক্তব্য পাঠান্তে এ আলোচনায় প্রবৃত্ত হলাম। বি ই কলেজের সাম্প্রতিক হাঙ্গামার কার্যকারণ পর্যালোচনা বা কাউকে কটূক্তি করার উদ্দেশ্যে আমার বর্তমান রচনার অবতারণা নয়। বর্তমান লেখক কোনও সাংবাদিক বা বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদে সংস্কারাচ্ছন্ন কেউ নয়। দীর্ঘদিন যাবং কলকারখানায় যুক্ত এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিক্ষা ও শিক্ষকতা সম্পর্কে সামান্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নাগরিক।

বর্তমান গলদযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যায়তনে প্রাপ্তপাঠ ছাত্রছাত্রীর প্রয়োজন অনুযায়ী প্রায়শই হয় না। কোনও কোনও বিদ্যায়তন ব্যতিক্রম হলেও এ সত্য সর্বজনগ্রাহ্য। ফলত অধিকাংশ উত্তম ফল লাভেচ্ছু ছাত্রছাত্রীর পৃথকভাবে গৃহে পাঠ লওয়ার প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় ছাত্রছাত্রীর অযোগ্যতা বশত নয়—শিক্ষাব্যবস্থার গলদের জন্য। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, অভিভাবকদের বিদ্যায়তনের শিক্ষকদের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করার প্রবণতা দেখা যায়। এর কারণটিও তলিয়ে ভাবার অপেক্ষা রাখে।

বস্তুত সকল ছাত্রছাত্রী অসামান্য প্রতিভা নিয়ে জন্মায় না—অল্পবিস্তর মেধা নিয়ে নিশ্চয় জন্মায়। মেধার স্ফূরণ তখনই সম্ভব যখন সে উপযুক্তভাবে পরিচালিত বা নির্দেশিত হয়। অর্থবানের সে সুযোগ বেশি। তাই পরীক্ষাগত যোগ্যতার মাপকাঠিতে তাদের ফলাফলও ভাল হওয়া স্বাভাবিক। আবার এই ফলাফলের উপর উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ বহুলাংশে নির্ভরশীল। অর্থাৎ বর্তমান ব্যবস্থায় অর্থকৌলীন্য উচ্চশিক্ষার সুযোগ আনে বেশি। এ ছাড়াও ব্যক্তিগত প্রভাব প্রতিপত্তির প্রশ্নও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সুতরাং অল্পবিত্ত ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষায় ক্ষান্তি দিয়ে রোজগারের দিকে পা বাড়ায়। অথচ এদের থেকে অনেকাংশে কম মেধার ধনীর সন্তান "ফরেন" পর্যন্ত "রিটার্ন" হয়ে এসে ফালতু গরব বাড়ায়।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যারা পড়ার সুযোগ পায় তারা শ্রেষ্ঠ—আর যারা পায় না তারা? বস্তুত বিশেষ কলেজে প্রবেশাধিকার পাওয়ার পরীক্ষায় সফলতাই শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয়। তাই যদি হত তবে এসব কলেজে কেউ অকৃতকার্যও হত না, আর আমাদের দেশ সফল ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে ভরে যেত। সবাই জানেন এমনটি হয় না। ব্যবহারিক জীবনে একই পদে আসীন একজন বি ই পাশ ছেলে ও অন্যজন নন-বি ই ছেলের মধ্যে সাধারণভাবে লক্ষণীয় পার্থক্য আমার নজরে আসে নি। একই বিষয় অধ্যয়ন কলেজে ও বাইরে সমানভাবে সম্ভব। সুতরাং একজন বি ই-র পক্ষে কলেজে পাঠ করে কারিগরী দিক যতটা জানা সম্ভব অন্য আর একজনের পক্ষে কলেজের বাইরে থেকেও অনুরূপভাবে সম্ভব।

আনন্দের বিষয় নাইট কলেজ অল্পবিত্ত ছাত্রদের তথাকথিত "ডিগ্রী" লাভে সহায়তা করছে ও ইনসটিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ার্সের অনুরূপ প্রতিষ্ঠানগুলি উচ্চশিক্ষালাভে বঞ্চিত ছাত্রদের সামনে বিরাট সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। এককালের 'হাতে-খাটা' ছেলেও কালে 'ইঞ্জিনিয়ার' হতে পারছে।

বেলেল্লেপনার জন্য ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই সমান নিন্দার্হ। দরিদ্রেই কেবল বেলেল্লেপনা করে, ধনীর ছেলে করে না এমন কথা কেউ বলতে পারেন না। বরং ধনীর ছেলের প্রশ্রয় অপেক্ষাকৃত বেশি একথা সবাই জানেন। আর এটাও সকলের জানা যে বেলেল্লেপনা ও বেয়াদবির ফলে সৃষ্ট অপ্রীতিকর ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা ধনী তথা প্রভাবশালী অভিভাবকেরাই করে থাকেন। সুযোগ যাকে বলে।

বি ই কলেজের কিছু ছাত্রের মধ্যে অশালীন আচরণ করার প্রবণতা আছে সে সত্য শিবপুরের বাসিন্দাদের বয়ান

থেকেই মেলে। সেক্ষেত্রে শিক্ষিত নাগরিকের মুষ্টিমেয় কয়েকজন বেয়াদব ছাত্রের সমর্থনে বিবৃতি দেওয়া মোটেই উচিত নয়। দরিদ্র হোক ধনী হোক তারা সমান নিন্দার্হ।

উপসংহারে বলি, শ্রীমতী চিত্রা গুপ্তা অহেতুক দরিদ্রদের হেয় করতে চেয়েছেন ও সাংবাদিকতাকে সস্তা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। সাংবাদিক সর্বদেশে সম্মানীয়। উচ্চশিক্ষা যেমন শ্রীমতী গুপ্তার মতে কষ্টসাধ্য—সাংবাদিকতা তার চেয়ে কিছু কম নয়। কোনও সাংবাদিকের পরিবেশিত সংবাদ পক্ষপাতদুষ্ট বা ভ্রান্ত হলে সঠিক সংবাদের জন্য অন্য সাংবাদিকের সংবাদের ওপর নির্ভর করতে হয় না কি?

শ্রীসুহৃৎ ঘোষ
রিফাইনারী টাউনশীপ
মুঙ্গের

* * *

'গ্রাম-বাংলার কথা' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবার পর থেকেই পাঠকমনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে। পুরাতন ও বর্তমানের অবস্থার একটা তুলনামূলক চিত্র আঁকতেও চেষ্টা করেছেন লেখিকা। স্বল্প অবসরের মধ্যেও তাঁর রচনায় অধ্যবসায়ের, নিষ্ঠার ও পর্যবেক্ষণ শক্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট।

সম্প্রতি রমা দেবীর একটি প্রতিবাদপত্র ও লেখিকার উত্তরের প্রতি আমাদের দৃষ্টি পড়েছে। রমা দেবীর বক্তব্য বিষয়ঃ লেখিকা, পারুল ভট্টাচার্য, সুধীর মিত্র মহাশয় রচিত 'হুগলী জেলার ইতিহাস' থেকে সব কিছু হরণ করেছেন এবং কৃতজ্ঞতা জানান নি। প্রমাণ হিসেবে তিনি একটি অনুচ্ছেদের উল্লেখ করেছেন। উক্ত অনুচ্ছেদটি অপর এক ব্যক্তির লেখা 'হুগলী জেলার ইতিহাসে' নিম্নরূপঃ—

> "চুঁচুড়ায় ওলন্দাজদিগের অধিকারভুক্ত যে স্থান ছিল, তাহা হইতে তাহারা ১৩ হাজার ১ শত ২২ টাকা রাজস্ব আদায় করিত।...খাজনার হার বাস্তুভিটাতে বিঘা প্রতি ২২৸৹ টাকা পর্যন্ত ছিল। এই বাস্তুভিটা প্রায় সর্বসমেত ৬৫৮ বিঘা হইবে।"

এই অনুচ্ছেদটির লেখক শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (জ্যোতিরত্ন) এবং উক্ত অনুচ্ছেদটি সুধীরবাবুর গ্রন্থের অন্তত দশ বছর আগে লেখা (মাসিক বসুমতী, ১৫শ বর্ষ—ভাদ্র, ১৩৪৩) রমা দেবীর থিয়োরী মেনে নিলে সুধীরবাবুও এগুলি হরণ করেছেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন নি। কিন্তু এরূপ ধারণা শুধু অলীক নয়, অন্যায়ও। কোন জেলার ইতিহাসকারই প্রামাণ্য তথ্যের বিবরণে দুরকম হতে পারেন না। পত্রলেখিকার এই সাধারণ জ্ঞানের অভাব বিস্ময়ের ব্যাপার।

দ্বিতীয়ত, 'ধর্মপুস্তক' সম্বন্ধে যে সোচ্চার দাবি জানিয়েছেন রমা দেবী, তা সুধীরবাবুর গ্রন্থেরই প্রতিধ্বনি ও নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ, সুধীরবাবুর গ্রন্থে বলা হয়েছে কেরীর সম্পাদিত ধর্মপুস্তকের (১৮০১) পূর্বে ধর্মপুস্তক (সুধীরবাবুর কথিত) প্রকাশিত। এবং প্রকাশিত শ্রীরামপুর থেকেই এবং এই প্রসঙ্গে ১৭৯৭ সালে শ্রীরামপুর থেকে মুদ্রিত 'শিক্ষাগুরু' বা The Tutor-এর উল্লেখও করেছেন তিনি। কিন্তু 'শিক্ষাগুরু'র মুদ্রণ কলকাতাতেই হয়েছিল, এমন অনুমান করা হয়েছে বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ গ্রন্থে। (পৃঃ ৩৭)। ১০ই জানুয়ারী ১৮০০ সালের পূর্বে শ্রীরামপুরে ছাপাখানা ছিল, তার কোনও প্রমাণ কোথাও এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। অতএব, শুধু অনুমানের ওপর নির্ভর করে ৮০০ পাতার ধর্মপুস্তকে অষ্টাদশ শতকে মুদ্রিত (শ্রীরামপুরে) বলা ও 'বঙ্গের প্রথম মুদ্রিত গদ্য পুস্তক' বলা হয়ত সহজ, কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য নীরবতার সঙ্গে সুধীরবাবুর এতবড় 'আবিষ্কার'কে কেন যে বাংলা সাহিত্যের সকল ইতিহাসকারই অপাংক্তেয় করে গেলেন—তা কি তিনি ভেবে দেখেছেন? যদিও বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ, কি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সুধীরবাবুর গ্রন্থের পূর্বেই প্রকাশিত। কিন্তু পরবর্তী সংস্করণে বা একালের গবেষক, অধ্যাপকদের কাছে 'ধর্মপুস্তক' কেন স্থান পেল না প্রথম মুদ্রিত গদ্য পুস্তক হবার—তার নিশ্চয় কোনও কারণ আছে। বর্তমান কালের বাংলা সাহিত্যের কোনও ইতিহাসকারই প্রতাপাদিত্য চরিতকে 'বঙ্গের প্রথম মুদ্রিত' বলে মনে করেন না। একালে লিখেও সুধীরবাবু ঊনিশ শতকের একটা মতকে ধরে রেখেছেন এ-ব্যাপারে—যার যৌক্তিকতা পরবর্তীকালে সুনিশ্চিতভাবে খণ্ডিত হয়েছে। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার এতবড় একটা আবিষ্কার (!) কেবল ধরতে পারলেন তিনিই, যিনি, সুধীরবাবুর প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন—সেই শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়—আর কেউ নয়—এটাও কেমন যেন আশ্চর্য লাগে (পৃঃ ৫৪৩॥ হুগলী জেলার ইতিহাস)।

রমা দেবীর পত্রে সুধীরবাবুর প্রশংসা ও গুণকীর্তন স্বাভাবিক—কারণ তিনি সুধীরবাবুর হুগলী জেলার ইতিহাস পড়েছেন। কিন্তু তাঁকে কি আমরা স্মরণ করিয়ে দিতে পারি যে, গ্রন্থ বিপুলাকার হলেই বা সরকারী অনুদানে প্রকাশিত হলেই লেখক পণ্ডিত হন না বা গ্রন্থ মহৎ-কীর্তি-সূচক হয় না।

মাণিক গুহ
পশ্চিম পুটিয়ারী
কলিকাতা-৪১

* * *

সম্প্রতি সাপ্তাহিক বসুমতীতে 'পেশাদারত্ব ও অপেশাদারত্বের প্রশ্ন' নিয়ে একটি লেখা এবং দুইটি প্রতিবাদপত্র পড়লাম। এই সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য রাখছি।

আমার ধারণা পেশাদারত্বের অভিযোগের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত খেলোয়াড়গণ যে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন সেটা লেখক সমীর দত্ত-র মত পত্রলেখক কাজী জহর আলীর (৬ই অক্টোবর) চোখ এড়িয়ে গেছে। সেটি কিন্তু ৮ই সেপ্টেম্বরের পত্রলেখিকাবৃন্দ নির্দেশ করেছিলেন।

কাজী সাহেব লিখেছেন "অপেশাদারত্বের নামাবলী গায়ে দিয়ে, তাঁদের কেউ সিনেমায় নামছেন, কেউ কেউ দৈনিক কাগজে নিজেদের নাম দিয়ে লিখে অর্থ উপার্জন করেছেন।"—কিন্তু যতদূর জানি অভিযুক্ত খেলোয়াড়বৃন্দ লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন যে, উক্ত কাজগুলির জন্য তাঁরা কিছু অর্থ গ্রহণ করেন নি।

কাজী সাহেব এ্যাথলেট অনিতা মুখার্জীর সাসপেন্ড হওয়ার ব্যাপারটি অবান্তরভাবে টেনে আনায় মনে হচ্ছে যে, "বিশিষ্ট ফুটবল তারকার নামে কলঙ্ক রটনায়" লেখিকাগণ হয়ত কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়েছেন, কিন্তু "উদীয়মানা তরুণী এ্যাথলেটের" সাসপেন্ড হওয়ার ব্যাপারটি পত্রলেখককেও কম বিচলিত করে নি।

আন্তর্জাতিক ক্রীড়াসংস্থার সভাপতি মিঃ আভেরী ব্রাণ্ডেজের পত্রের কিয়দংশ কাজী সাহেব তুলে দিয়েছেন। কিন্তু সভাপতির ওই উক্তি তাঁর নিজস্ব ধারণা-মাত্র। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে ঐ সব অভিযুক্ত খেলোয়াড়দের সম্পর্কে সঠিক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে বা হবে।

কাজী জহর আলীর অলংকৃত ভাষায় লেখা উপসংহারটি আমিও সমর্থন করি। পেশাদারত্ব ও অপেশাদারত্বের মূল প্রশ্নে কারোরই দ্বিমত থাকতে পারে না। আমার শুধু এইটুকু বলবার যে এই প্রশ্নটি যেন ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে পড়ে সর্বজনপ্রিয় খেলোয়াড়, এ্যাথলেট ইত্যাদি কারোরই সম্মান ক্ষুণ্ণ না করে।

শ্রীসুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়
উত্তরপাড়া, (হুগলী)

এশিয়ান গেমসের প্রস্তুতি

ব্যাঙ্ককের আগামী এশিয়ান গেমসে ভারত থেকে একশত চারজন বিশিষ্ট একটি দল প্রেরিত হচ্ছে। ভারতের প্রতিনিধিদলের মধ্যে ক্রীড়াবিদ হলেন সাতাশীজন এবং কর্মকর্তা ষোলজন। ভারত হকি, ফুটবল, এ্যাথলেটিকস, মল্লযুদ্ধ, ভলিবল, ব্যাডমিণ্টন, টেবিল টেনিস, মুষ্টিযুদ্ধ, ভারোত্তোলন, সন্তরণ এবং সুটিং-এ অংশ গ্রহণ করবে। এবার সর্বপ্রথম ব্যাঙ্ককের এশিয়ান গেমসে টেনিসকে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। ভারত থেকে তিনজন খেলোয়াড় টেনিসে অংশ গ্রহণ করবে। এশিয়ান দেশগুলির মধ্যে ডেভিস কাপের খেলায় ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত, তাই মনে হয় টেনিসের স্বর্ণপদক ব্যাঙ্ককে ভারতেরই করায়ত্ত হওয়া উচিত।

ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার সভাপতি রাজা ভালিন্দর সিং কিন্তু এই ভারতীয় প্রতিনিধিদলের তালিকা দেখে সম্পূর্ণ খুশি হতে পারেন নি। রাজা ভালিন্দর সিং বহু চেষ্টা করেছিলেন সাইক্লিং, বাস্কেটবল এবং ওয়াটারপোলো দলকে ব্যাঙ্ককে প্রেরণের জন্য, কিন্তু তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

অনেক চেষ্টার পর অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অব স্পোর্টস ভারত থেকে সন্তরণে একজন প্রতিনিধিকে এশিয়ান গেমসে অংশ গ্রহণের অনুমতি দেন। মনে হচ্ছে ভারতীয় সন্তরণ জগতের নতুন আবিষ্কার মিস রীমা দত্তের ভাগ্যেই শেষ পর্যন্ত শিকে ছিঁড়বে। অল্প কিছুদিন পূর্বে পাতিয়ালার জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতার আসরে মহিলাদের বিভাগে একাই সবকটি রেকর্ড ভেঙেছেন রীমা দত্ত।

জাকার্তায় ভারত ফুটবলে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ান হবার গৌরব অর্জন করেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রথম এশিয়ান গেমসে ভারত ইরানকে পরাজিত করে ফুটবলে স্বর্ণপদক লাভ করে। মার্দেকায় এবছর ভারতীয় দলের খেলার মান দেখে মনে হচ্ছে তারা ফুটবলের সম্মান হয়ত দখলে রাখতে সক্ষম হবে, অবশ্য আর একটি সম্ভাব্য বিজয়ী হিসাবে ইরানের নাম বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। টোকিও অলিম্পিকে ভারত হকির হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করেছে বটে, কিন্তু জাকার্তায় পরাজয় আমরা এখনও ভুলি নি। ব্যাঙ্ককে হকিতে ভারতের স্বর্ণপদক লাভের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত।

জুনিয়ার জাতীয় ফুটবল

বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত জুনিয়ার জাতীয় ফুটবলের ফাইন্যালে অন্ধ্র-

রাজ্য টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার পুরুষদের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান অজিত বসু

প্রদেশ ২—১ গোলে মহীশূরকে পরাজিত করে বি, সি রায় স্মৃতি কাপ লাভ করেছে। গত বছর অন্ধ্রপ্রদেশ দল রানার্সের সম্মান লাভ করেছিল। মহীশূর দলের দুর্ভাগ্য যে মুনিরাসের আত্মঘাতী গোলে তাদের পরাজয় স্বীকার করতে হল। প্রথমার্ধে

শ্রীঅমিতাভ

খেলা ছিল এক এক গোলে অমীমাংসিত। খেলার শেষে মহীশূরের রাজ্যপাল শ্রী ভি ভি গিরি পুরস্কার বিতরণ করেন।

রাজ্য টেবিল টেনিস

রাজ্য টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা শেষ হল চৌরঙ্গী ওয়াই এম সি এ-তে। পুরুষদের সিঙ্গলসে এবার একটি নতুন মুখ বিজয়ীর সম্মান ছিনিয়ে নিয়েছে সরোজ ঘোষের কাছ থেকে। এই নতুন বিজয়ী হলেন অজিত বসু, অবশ্য তাঁকে নতুন বললে ঠিক বলা হবে না, যদিও এই সম্মান তাঁর প্রথম ভাগ্যে জুটল।

মহিলাদের বিভাগে রুপা মুখার্জী অনায়াসে দেইজী কাপাদিয়াকে পরাজিত করে লাভ করলেন মহিলাদের সিঙ্গলসের সম্মান। মহিলাদের বিভাগে রুপার একচ্ছত্র প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত। জুনিয়ার বিভাগে নান্টু মুখার্জী অমিত মিত্রকে পরাজিত করে বিজয়ীর গৌরব অর্জন করেছেন।

ক্রিকেট মরশুমের সুরুতে

মরশুমের ক্রিকেট ধীরে ধীরে ময়দানের আসর অধিকার করে বসছে। মরশুমের প্রথম সেঞ্চুরী করার কৃতিত্ব এবার অর্জন করেছেন কালীঘাট ক্লাবের তরুণ খেলোয়াড় রবীন মুখার্জী। কালীঘাট এবং দক্ষিণ কলিকাতা সংসদের মধ্যে অনুষ্ঠিত একটি প্রীতি খেলায় রবীন মুখার্জী ১০১ রানে অপরাজিত থাকেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবার

তিনজন তরুণ খেলোয়াড় হায়দ্রাবাদে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একাদশের ট্রায়ালে অংশ গ্রহণ করবেন এবং রবীন মুখার্জী এ'দের অন্যতম। অন্য দুজন খেলোয়াড় হলেন দেব মুখার্জী এবং সুব্রত গুহ। দেব মুখার্জী এবং সুব্রত গুহর পরিচয় দেবার প্রয়োজন নেই কারণ এ'রা বর্তমানে যথেষ্ট পরিচিতি লাভ করেছেন।

এখানে রবীন মুখার্জী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। সর্বভারতীয় স্কুল ক্রিকেটে বাংলা এবং পূর্বাঞ্চল স্কুল দলের পক্ষে রবীন মুখার্জী যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেন। রবীন মুখার্জী প্রথম রঞ্জী ট্রফিতে খেলার সুযোগ পান ভারতীয় রেল দলের পক্ষে। প্রথম আবির্ভাবে জম্মু এবং কাশ্মীরের বিপক্ষে তিনি ৯০ রানে অপরাজিত থাকেন। উত্তর পাঞ্জাবের বিপক্ষে রঞ্জী ট্রফিতে তিনি ৬৫ রান এবং ৩৫ রান সংগ্রহ করার কৃতিত্ব অর্জন করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেটে রবীন মুখার্জী যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

ডেভিস কাপ টেনিস

ডিম ফোটবার আগেই বাচ্চা গুণতে নেই—এ প্রবাদ বাক্য বহুকালের। আমেরিকার লন টেনিস এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী—এই প্রবাদবাক্য অগ্রাহ্য করে ব্রেজিলের সংগে আমেরিকার খেলা হবার আগেই ধরে নিয়েছিলেন আমেরিকা জিতবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছিলেন ভারতকে। তিনি আশা করেছিলেন আমেরিকা যেমন সহজেই ব্রেজিলকে হারাবে, ভারতও তেমনি নিরুদ্বেগে জার্মানীকে হারাবে। আমেরিকা-ব্রেজিলের খেলায় তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী বিফল হয়েছে—ভারত-জার্মানীর খেলার ফলাফল ১২ই নভেম্বরের পর জানা যাবে।

শক্তিশালী আমেরিকান ডেভিস কাপ টীমকে হারিয়ে দিয়ে ব্রেজিল প্রমাণ করেছে ঐকান্তিক সাধনায় সবই সম্ভব। ব্রেজিলের ট্রেনিং ক্যাম্পে ছিল কঠোর শাসন। প্রত্যেক খেলোয়াড়কে শপথ করতে হয়েছিল—ধূমপান ও মদ্যপান থেকে সে বিরত থাকবে। স্বেচ্ছায় তারা মেনে নিয়েছিল ব্রহ্মচর্যের কঠোর সাধনা। অতীতের স্পার্টান আদর্শে দিনের পর দিন তারা অক্লান্ত অনুশীলন চালিয়ে খেলার ফলাফলে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। আমেরিকাকে ৩—২ গেমে হারিয়ে দেওয়া কম কৃতিত্বের কথা নয়! স্বদেশের মন্থর ক্লে কোর্ট ব্রেজিলকে এ বিষয়ে অনেকটা সাহায্য করেছে।

ভারতের টেনিস ইতিহাসে আজ সুবর্ণ সুযোগ। জার্মানীকে হারাতে পারলে পরের রাউন্ডে ব্রেজিলকে পরাজিত করা খুব কঠিন হবে না। বিশেষ করে ঘাসের কোর্টে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্মান—ডেভিস কাপের ফাইন্যাল—অস্ট্রেলিয়ার সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা—আজ ভারতের প্রায়

রাজ্য টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় মহিলাদের সিংগলস চ্যাম্পিয়ান রূপা মুখার্জী।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সংগে ভারত এবং পশ্চিম জার্মানীর ডেভিস কাপের খেলোয়াড়বৃন্দ।

নাগালের মধ্যে এসেছে। রোজলের আদর্শকে সামনে রেখে ভারত ১২ই নভেম্বর জার্মানীর বিরুদ্ধে লড়াই করবে।

ভারতের আশা কৃষ্ণান—জার্মানীর আশা বুঙ্গার্ট। এ'রা দুজন এর আগে ৪ বার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন—প্রত্যেকেই দু'বার করে জিতেছেন। টেনিসের এই দুই শ্রেষ্ঠ শিল্পীর খেলায় দিল্লীর টেনিস অনুরাগীরা দেখতে পাবেন উচ্চাঙ্গের ক্রীড়ানৈপুণ্য। জার্মানীর অন্য খেলোয়াড় বাডিং বয়সে তরুণ—এবং নির্ভরযোগ্য হার্ড কোর্ট খেলোয়াড়। ভারতে এসে ঘাসের মাঠে কঠোর অনুশীলন করছেন। অন্যদিকে অধিনায়ক কৃষ্ণানের উপর নির্ভর করছে—জয়দীপ অথবা প্রেমজিৎ—ভারতীয় দলে খেলবেন। জয়দীপ অথবা প্রেমজিৎ যেই খেলুন না কেন—ভারতের স্বপ্ন—ডেভিস কাপের ফাইন্যাল—যেন সার্থক হয়।

১১।১১।৬৮

সমাচার দর্পণ

একটি পশ্চিম জার্মানী ফুটবলদল কলকাতায় একটি প্রদর্শনী খেলায় অংশ গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করে ভারতীয় ফুটবল সংস্থার কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল, কিন্তু ভারতীয় ফুটবল সংস্থা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। ভারতীয় ফুটবল সংস্থার সভাপতি শ্রী এম দত্তরায় বলেছেন যে পশ্চিম জার্মানীর দলটি যে সময় খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে, সে সময় খেলোয়াড় একত্রিত করে খেলার ব্যবস্থা করা খুবই মুস্কিল। কারণ ভারতীয় ফুটবলদল ব্যাঙ্ককে এশিয়ান গেমস থেকে প্রত্যাবর্তন করে দেশে ফিরলে খেলোয়াড়রা যে যার দলের সঙ্গে মিলিত হবেন। কারণ ডুরাণ্ড কাপের খেলা সুরু হচ্ছে ১৫ই ডিসেম্বর—এর পর জাতীয় ফুটবল সন্তোষ ট্রফির খেলা ১৫ই জানুয়ারী সুরু হবে হায়দ্রাবাদে—এর পর আছে বোম্বাইয়ের রোভার্স কাপের খেলা।

রবীন মুখার্জী

বিশ্ব পেশাদার সাইক্লিং চ্যাম্পিয়ান কোলোনের রুডি আলটিক

* * *

সাইকেল দৌড়ে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান

কোলোন (ডি, এ, ডি,) পেশাদারি সাইকেল চালনা প্রতিযোগিতায় এখন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হলেন কোলোনের রুডি আলটিক। সম্প্রতি দূর পাল্লার সাইকেল প্রতিযোগিতায় ইনি ফ্রান্সের জ্যাঁ আঁকুতিলকে হারিয়ে এই সম্মান লাভ করেছেন। একাদিক্রমে পাঁচ-ছয় দিন-ব্যাপী সাইকেল চালাতেও ইনি ওস্তাদ। ১৯৬০ থেকে তিনি পেশাদার হিসেবে সাইকেল প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে দু'বার জার্মানীর চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করেছেন এবং এক হাজার ও পাঁচ হাজার মিটারের সাইকেল দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন।

ব্ল্যাক প্যান্থার ইউসেবিও

দুটি নাম পেলে আর ইউসেবিও পাগল করে দেয় সারা বিশ্বের ফুটবল রসিকদের, কে বড় কে ছোট বিচার করা বোধহয় সবচেয়ে বড় সমস্যা। ফুটবলের এই দুই নিপুণ শিল্পীকে এবার ইংলন্ডের বিশ্বকাপের আসরে বিশেষজ্ঞরা পাশাপাশি রেখে বিচার করার সুযোগ পেয়েছিলেন। খেলোয়াড়ী জীবনের জোয়ার-ভাঁটাকে অস্বীকার করা যায় না, তরুণ প্রাণচঞ্চল ইউসেবিওর খেলায় এখন পূর্ণ জোয়ার আর অন্যদিকে আঘাতে জর্জরিত পেলের খেলায় ভাঁটার চিহ্ন। বিশ্বকাপের খেলার শেষে ইংলন্ড থেকে বিদায় নেবার প্রাক্কালে অনেক দুঃখে এডসন পেলে তাই বলেছিলেন আর বিশ্বকাপে খেলব না। সত্যিই পেলেকে তাঁর আসল খেলা খেলতে দেওয়া হয় নি। এবার বিশ্বকাপে প্রতিদ্বন্দ্বীদের লক্ষ্য ছিল পেলেকে আহত করা। বুলগেরিয়ার বিপক্ষে খেলায় বিপক্ষের এই জঘন্য অপচেষ্টা সফল হয়েছিল, আহত পেলে সেদিন মাটিতে পড়ে ছটফট করেছিলেন। একটি পূর্ণ বিকশিত ফুলকে ঝরিয়ে দেখায় কি নির্লজ্জ চেষ্টা।

ফুটবলের ব্ল্যাক পার্ল পেলে অতুলনীয়, বলেছেন স্বয়ং ইউসেবিও। বিশ্বের ফুটবল রসিকদের উদ্দেশ্য করে ইউসেবিও বলেছেন যে, 'পেলেকে যেন তাঁর সঙ্গে তুলনা করা না হয়, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় পেলে এখনও ফুটবলের রাজা, পেলের সমকক্ষ হতে হলে তাঁকে অনেক-অনেক কঠোর অনুশীলনের বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে হবে।'

ফুটবল জগতের বিরাট গুঞ্জন যে লিসবনের বেনিফিকা ক্লাবের এই অমূল্য রত্নটি বোধহয় দল পরিবর্তন করবেন। ইউসেবিও দলত্যাগ করলেই পর্তুগাল জাতীয় দলেও হবে মণিহারা। এবার বিশ্বকাপের আসরে পর্তুগালের পক্ষে একাই খেলেছেন ইউসেবিও। বিশেষ করে উত্তর কোরিয়ার বিপক্ষে ইউসেবিও ত্রাণকর্তার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। উত্তর কোরিয়া খেলার সুরুতেই পর পর তিনটি গোল দিয়ে প্রায় নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছিল পর্তুগালকে, শেষ পর্যন্ত ইউসেবিওর যাদু পর্তুগালকে পরাজয়ের মুখ থেকে টেনে তুলে উন্নীত করল সেমি-ফাইন্যালে।

ইউসেবিও ফেরেরা দ্য সিলভা জন্মগ্রহণ করেন পর্তুগালের পূর্ব আফ্রিকার উপনিবেশ মোজাম্বিকের রাজধানী লরেন্স মার্কে। নগ্ন পায়ে ফুটবলের হাতেখড়ি ইউসেবিওর হয়েছিল এই লরেন্স মার্কে। পর্তুগালের সেরা ফুটবল বেনিফিকা ক্লাবে এসেই পূর্ণ বিকাশ হল ইউসেবিওর। অবশ্য মাত্র পনেরো বছর বয়েসেই ইউসেবিও 'পেশাদার খেলোয়াড়' হিসাবে লরেন্স মার্কের স্পোর্টিং ক্লাবে যোগদান করেন। এর পরই লিসবনের বেনিফিকা ক্লাবে তাঁর আগমন হয়।

ইউসেবিও পর্তুগালের পক্ষে প্রায় ২৬টি আন্তর্জাতিক খেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন। এমন কি অবশিষ্ট বিশ্ব একাদশ এবং ফিফা বিশ্ব একাদশে খেলবার দুর্লভ গৌরব অর্জন করেছেন। বেনিফিকার পক্ষে তিনবার ইউরোপীয় কাপের ফাইন্যালে খেলেছেন এবং তার মধ্যে দুবার হয়েছেন বিজয়ী। ১৯৬৫ সালের শ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় ফুটবলারের সম্মান লাভ করেছেন ইউসেবিও।

ক্রীড়ামোদীরা আদর করে ইউসেবিওর নাম দিয়েছেন ব্ল্যাক প্যান্থার। বিশ্বকাপের আসরে অগণিত দর্শক এবং টেলিভিসন দর্শকদের মাতাল করে দিয়েছেন ইউসেবিও তাঁর পায়ের যাদুর সাহায্যে। মূলত তাঁরই জন্যে পর্তুগাল লাভ করেছে তৃতীয় স্থান। বিশ্বকাপের আসরে একাই নয়টি গোল করে ইউসেবিও করায়ত্ত করেছেন হাজার পাউন্ডের পুরস্কার।

ইউসেবিও বলেছেন যে, বর্তমানে তিনি বিদেশে খেলতে ইচ্ছুক। ইতালীর ইণ্টার মিলান, নেপলস এবং মাদ্রিদের এ্যাথলেটিকোর কাছ থেকে তিনি আহবান পেয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, তিন বছরের জন্য কোন ক্লাবের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলেই ভবিষ্যতের জন্য তাঁকে আর চিন্তা করতে হবে না। ইউসেবিওর মতে, বিদেশের মাঠে বিদেশী খেলোয়াড়ের সঙ্গে খেললে খেলার মান অনেক উন্নত করে।

যে দলই ইউসেবিওকে লাভ করুক না কেন তারা লাভ করবে একেবারে সাচ্চা একটি হীরে, আর কোন জাতীয় দলের পক্ষে ইউসেবিও তো অমূল্য সম্পদ।

—সমর পালচৌধুরী

ইউসেবিও

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের

অমূল্য গ্রন্থরাজি

——(::)——

কালীসিংহ মহাভারত		— ১ম —	বোর্ড বাঁধাই (যন্ত্রস্থ)	
				—১২-০০
" "		— ২য় —	বোর্ড বাঁধাই	—১০-০০
" "		— ৩য় —	"	—১০-০০
" "		— ৪ —		—৬-০০
" "		— ৫ম —		—৬-০০
বাল্মীকি রামায়ণ		— ১ম —	বোর্ড বাঁধাই	—৮-০০
" "		— ২য় —	"	—৮-০০
কৃত্তিবাসী রামায়ণ			"	—৮-০০
শ্রীরামচরিত মানস		— ১ম —	লি. বাঁধাই	—২-০০
"		— ২য় —	"	—২-০০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী	— উপন্যাস	— ১ম —		—৩-০০
"	— "	— ২য় —		—৩-০০
"	— "	— ৩য় —		—৩-০০
"	— "	— ১ম —		—৩-০০
"	— "	— ২য় —		—৩-০০
"	— "	— ৩য় —		—৩-০০
রাজভাষা	— উর্দু-ইংরাজী		বোর্ড বাঁধাই	—৩-০০
"	— বাংলা- "		"	—৩-৫০
দীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলী		— ১ম —		—২-০০
" "		— ২য় —		—২-০০
মাণিক গ্রন্থাবলী		— ১ম —		—২-০০
"		— ২য় —		—২-০০
মাইকেল গ্রন্থাবলী		— ১ম —	বোর্ড বাঁধাই	—৪-৫০
"		— ২য় —	"	—৪-০০
দীনেন্দ্র গ্রন্থাবলী		— ১ম —	"	—৩-৫০
"		— ২য় —	"	—৩-৫০
প্রেমেন্দ্র গ্রন্থাবলী		— ।· —	"	—২-৫০
পেন্দ্র গ্রন্থাবলী		— ।· —	"	—৩-৫০
হেমেন্দ্রকুমার গ্রন্থাবলী		— ।· —	"	—৩-০০
রামপদ গ্রন্থাবলী		— ।· —	"	—৩-০০
রামনাথ গ্রন্থাবলী		— ।· —	"	—৩-০০
শিবরাম গ্রন্থাবলী		— ।· —	"	—২-৫০
বিভূতি মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাবলী		— ।· —	"	—৩-৫০
প্রভাবতী দেবীর গ্রন্থাবলী		— ।· —	"	—৩-৫০
শ্রীমদ্ভাগবত (পয়ার)		— ।· —	"	—৫-০০

আমার দেখা মেয়েরা	— ।· —	বোর্ড বাঁধাই	[illegible]
নেপোলিয়ান	— ।· —	"	[illegible]
কবিকঙ্কণ চণ্ডী	— ।· —	"	[illegible]
ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী	৪র্থ হইতে ৮ম —	প্রতি খণ্ড	[illegible]
দৃশ্যকাব্য পরিচয়	—	বোর্ড বাঁধাই	[illegible]
বিদগ্ধ মাধব	—		[illegible]
জ্যোতিষ রত্নাকর	—		[illegible]
পরলোক	—		[illegible]
পরলোক ও প্রেততত্ত্ব	—		[illegible]
পরলোকরহস্য	—		[illegible]
প্রতাপাদিত্য	—	বোর্ড বাঁধাই	[illegible]
মহারাজা নন্দকুমার	—	"	[illegible]
ছত্রপতি শিবাজী	—	"	[illegible]
সেক্সপীয়র গ্রন্থাবলী	— ১ম —	বোর্ড বাঁধাই	[illegible]
" "	— ২য় —	"	[illegible]
	—	"	[illegible]
অনন্ত গ্রন্থাবলী	—		[illegible]
ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী	—		[illegible]
কালিদাস গ্রন্থাবলী	— ১ম —	বোর্ড বাঁধাই	[illegible]
" "	— ২য় —	" যন্ত্রস্থ	[illegible]
" "	— ৩য় —	"	[illegible]
যৌনমনোদর্শন	— ২য় —	"	[illegible]
"	— ৩য় —	"	[illegible]
"	— ৪র্থ —	"	[illegible]
"	— ৫ম —	"	[illegible]
"	— ৬ষ্ঠ —	"	[illegible]
নরের বুকে বেদনা	—	"	[illegible]
কুলীনতত্ত্ব	—	"	[illegible]
ক্রিয়াকাণ্ড বারিধি	— ১ম —		[illegible]
শ্রীকৃষ্ণ	—	বোর্ড বাঁধাই	[illegible]
চৈতন্যভাগবত			[illegible]
ভক্তমাল গ্রন্থ			[illegible]
যোগশাস্ত্র	—	বোর্ড বাঁধাই	[illegible]
আত্মানুসন্ধান	—		[illegible]
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী	— ১ম —		[illegible]
" "	— ২য় —		[illegible]
" "	— ৩য় —		[illegible]

দি বসুমতী প্রাইভেট লিঃ

১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

SAPTAHIK BASUMATI   Regd. No. C 71
Price : 25 Paise   GRAM : "BASUMATI"   Phone : [illegible], 72, 73

18 NOV 1966

মাত্র ৩ টাকায় আপনি আপনার কম্পোস্টের খাদ* থেকে ৩,০০০ কিলো বাড়তি সার পাবেন প্রতি বছরে....
...এনক্যাপ ব্যবহার করলে।

আপনার কম্পোস্টের খাদে এনক্যাপ ছিটিয়ে নিজেই যাচাই ক'রে দেখুন।

এসো-র এই নতুন জিনিসটি কম্পোস্টের খাদের ওপর আগাগোড়া একটা কালো সর ফেলে দিয়ে সূর্য্যের উত্তাপ টেনে নিয়ে জমিতে তা ধরে রাখতে সাহায্য করে এবং আবর্জনায় তাড়াতাড়ি পচন ধরিয়ে তোলে।

এনক্যাপ সময় বাঁচিয়ে দেয়। এনক্যাপ কম্পোস্ট তৈরীর সময়কে দেড়গুণ তাড়াতাড়ি ক'রে তোলে, আপনি বছরে দু'বারের জায়গায় তিনবার খাদের ব্যবহার করতে পারেন। ৩ মিটার × ১.৫ মিটার × ০.৯ মিটার মাপের খাদে এনক্যাপ ব্যবহার করলে সার পাওয়া যায় ৯ টন---আর তা না করলে পাওয়া যায় মাত্র ৬ টন।

এনক্যাপ নিশ্চিতভাবে সারকে নাইট্রোজেন-সমৃদ্ধ ক'রে তোলে। হাতে-নাতে পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে, এনক্যাপ ব্যবহার-করা খাদে যে সার হয় তাতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ দেড়গুণ বেশী থাকে।

এনক্যাপ অর্থের সাশ্রয় করে। এনক্যাপ ব্যবহার ক'রে আপনি সারা বছরে অনেক বেশী সার তৈরী করতে পারবেন খাদগুলিতে। তার চেয়েও বড় কথা, আপনি এনক্যাপ-এর জন্য যা-খরচ করবেন তার প্রতি টাকায় আপনি বাড়তি সার পাবেন ২৫ টাকার।

এনক্যাপ : আরও বেশী নাইট্রোজেন-সমৃদ্ধ সার পাবার নতুন অল্প-খরচের উপায়!

* ৩ মিটার ×১.৫ মিটার ×০.৯ মিটার মাপের

এসো স্ট্যাণ্ডার্ড ইস্টার্ন ইনক.
(সীমিত দায়িত্ব সহ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সমিতিভুক্ত)
বোম্বাই কলিকাতা মাদ্রাজ নিউ দিল্লী

ESSO CHEMICALS

CME-7.8N

বসুমতী

দিল্লীতে ইন্দিরা-নোভোৎনী বৈঠক

ভারত-চেক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আরো সম্প্রসারণের আশা

: ২৪শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ * * * 24th Nov., 1966 * Vol. 71, No. 2

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		১৪৭৫
আজকের মানুষ		১৪৭৬
ভারত দর্শন		১৪৭৭
আন্তর্জাতিক		১৪৮১
প্রত্যাশার মৃত্যু ও দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা	কৃত্তিবাস ওঝা	১৪৮৩
ক্যালিডোস্কোপ (কবিতা)	মলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১৪৮৪
দিল্লী থেকে	বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য	১৪৮৫
অস্ট্রেলিয়া থেকে লিখছি	সুরেশচন্দ্র সাহা	১৪৮৭
অচঞ্চল পাখা (কবিতা)	অমিয়কুমার হাটি	১৪৯০
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	অনন্ত সিংহ	১৪৯১
গ্রন্থমেলা	জয়ন্তী সেন	১৪৯৫
একটি স্পাইয়ের কাহিনী (গল্প)	রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী	১৪৯৯

বিশ্বসাহিত্যের সম্রাট—মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে শারদ-জ্যোৎস্না—চরিত্র-সৃষ্টির ইন্দ্রধনু—
অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধীশ্বর
চার্লস ডিকেন্সের

ডিকেন্স গ্রন্থাবলী

অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পী—সর্বরসের অনন্ত নির্ঝর—বিশ্বসাহিত্যগৌরব ঔপন্যাসিকের পরিচয় প্রদান অসম্ভব।

২য় ভাগ—নিকোলাস নিকলবি : বারনাবি রুজ, চরিত্র-চিত্র। সাহিত্য জগতের এই পুণ্যপ্রভা মাত্র ১৷৷০ টাকা

আত্ম-জীবনী

স্বর্গীয় অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী
মূল্য—দুই টাকা

"এই আত্মজীবনী পাঠ করিয়া বাঙালী পাঠক একসঙ্গে শিক্ষা ও আনন্দলাভ করিবেন"—

—সুপ্রসিদ্ধ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—প্রবাসী

"একাধারে ব্যবহারজীবী, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও কর্মী সচরাচর দেখা যায় না। কাজেই তাঁহার আত্মজীবনী অত্যন্ত সুখপাঠ্য গ্রন্থ হইয়াছে।"

—রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

মোহন মেলা

মূল্য এক টাকা

কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রধান কথা-শিল্পীর রস-সাহিত্য-সম্ভার ছাড়াও গল্পে ভরপুর।

—ইহাতে আছে—

গল্প—বৌনির দিনে, বুদ্ধদেবের বুদ্ধি, কাঠুরের কপাল, হাঙর মানুষের চোখের জল, ভুলুর ভুল, মুর্গী চাচা, বুদ্ধদেবের গল্প, একটার বদলে দুটো, নতুন সিনেমার ছবি, দাদুর গল্প, ইঁদুরের কীর্তিকাহিনী, বাঁদরের মেটুলিচচ্চাড়ি।

ছড়া—হট্টমালার যজ্ঞবাড়ী, হোহোহো বৃষ্টি ঝরে, পালোয়ান প্যালারাম, উলটো বাজির দেশে, আজব দেশ, বাঁকা শ্যামের ব্যায়রাম, হাবুবাবুর মনের কথা, আদ্দিকালের বদ্দি বুড়ি।

প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী সূর্য রায় কর্তৃক সুচিত্রিত

উপহার দিবার মত বই।

হংসেশ্বর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

মঞ্জুষা

২৷৷০

রাজনৈতিক-গগনের দীপ্ত সূর্য—পাঞ্জাব-কেশরী

লালা লাজপৎ রায়ের জীবনী

[ইংরেজীতে]

রাজনৈতিক জীবনের ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতময় মহাজীবনী।

জেলের শাস্তি—বিচার-রহস্য পর্যন্ত আমূল ইতিহাস। অসার জীবনী নহে—লালাজীর জীবন-সাধনার — রাজনৈতিক সংগ্রাম—দেশাত্মবোধে যদি সুপরিচিত হইয়া ধন্য হইতে চান ত সত্বর লালা লাজপৎ রায়ের জীবনী পাঠে উদ্দীপিত হউন—স্বদেশমঙ্গলযজ্ঞে আত্মাহুতির জ্বলন্ত আদর্শ দেখিয়া সম্মোহিত হইবেন।

মূল্য—চার আনা

—ঔপন্যাসিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান—
দামোদর মুখোপাধ্যায়ের

দামোদর-গ্রন্থাবলী

১ম খণ্ড ১-৫০   ২য় খণ্ড ২-৫০
৩য় খণ্ড ১-০০   ৪র্থ খণ্ড ২-৫০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বঙ্গদর্শন		১৫০১
এইচ, জি, ওয়েলস্-এর গল্প	ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	১৫০৫
সুবর্ণলতা (ধারাবাহিক উপন্যাস)	আশাপূর্ণা দেবী	১৫১২
গ্রামবাংলার কথা	পারুল ভট্টাচার্য	১৫১৭
বিশ্বসাহিত্যের আদিপর্ব	ডঃ নরেন ভট্টাচার্য	১৫২১
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	শিল্পালি	১৫২৪
রঙ্গজগৎ		১৫২৬
পাঠকমন		১৫৩১
খেলাধূলো	শ্রীঅমিতাভ	১৫৩৩

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল এম, এস, সি প্রণীত

আমার দেখা মেয়েরা

(রহস্য রোমাঞ্চের স্বর্ণখনি)

'রক্তনদীর ধারা', 'অপরাধ বিজ্ঞান' ও 'বিখ্যাত বিচার কাহিনী' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলির লেখকের সত্যঘটনামূলক রূপদান। মেয়েদের মন আর মতি স্বয়ং দেবাঃ ন জানন্তি। বিভিন্ন ও বিচিত্র নারী-চরিত্রের রহস্য উদ্ঘাটন ও যথাযথ অভিজ্ঞ ও দক্ষ লেখকের রচনার বৈশিষ্ট্যে বাংলা দেশের নারী-সমাজের এক অজানা অংশ সাধারণের চোখে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে। পড়তে পড়তে বই শেষ না করে ওঠা যায় না। বইয়ের আদ্যোপান্ত রুদ্ধশ্বাস উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা।

উপন্যাসের চেয়েও সুখপাঠ্য।

মূল্য চার টাকা

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগ :—মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, পদ্মাবতী নাটক, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা? (বোর্ড বাঁধাই)—সাড়ে চার টাকা।

দ্বিতীয় ভাগ :—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্মিষ্ঠা নাটক, তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য, মায়া কানন, হেক্টর বধ। (বোর্ড বাঁধাই)—চার টাকা।

উপন্যাস-সাম্রাজ্যের রত্নমুকুট,—সেই সর্বজনপ্রমোদন—অমর-কীর্তি ঔপন্যাসিক—লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার—শক্তিমান রস-শিল্পী 'ভারতী' সম্পাদক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের—

সৌরীন্দ্র গ্রন্থাবলী

৫ম ভাগে :—বাদলা, মমতা, নির্ঝর, অতঃপর, পরদেশী সুরা, যবনিকার অন্তরালে, লেখার গলদ, পারিবারিক উপন্যাস, প্রগতি, অনাগত যুগ, আদর্শ এডিটোরিয়াল, আদর্শ সমালোচনা, সম্পাদকের দপ্তর, সংবাদপত্রের দৌলতে, মো[illegible] কাশ্মীর, এক যাত্রায়, ফুলকাটা, দুঃখীরাম, পান-সুপারি।

মাত্র ১৷৷৹ টাকায়।

ডঃ মতিলাল দাশ প্রণীত

মতিলাল গ্রন্থাবলী

মূল্য—দুই টাকা

—ইহাতে আছে—

১। চলার পথে (উপন্যাস)
২। মনীষা (উপন্যাস)
৩। বিদ্যুৎশিখা (১১ খানি গল্প সমষ্টি)
৪। দীপশিখা (কবিতা সংকলন)
৫। চার্বাক (নাটক)

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

৭১ বর্ষ : ২৪শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পয়সা   বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত   Price : 25 Paise
বৃহস্পতিবার, ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ   সাপ্তাহিক পত্রিকা   Thursday, 24th Nov., 1966

শীত

আপন নিয়মেই শীত আসছে। কন-কনে ঠাণ্ডা বাতাসে হাড় ঠকঠক না করুক, সন্ধ্যে হলেই গা শিরশির করছে, ভোরের হিম ঢেকে দিচ্ছে দৃশ্যময় পৃথিবীর বুক। ইতিমধ্যে শেফালিদের ফোটার পালা এ বছরের মতো শেষ হয়েছে। তাদের শেষ নিশ্বাস ঝরা-পাতার তলে হারিয়ে গেছে কোন্ কালে। পুষ্পবিলাসীদের লক্ষ্য এখন সেদিকে নেই। বরং শীতকে তারা সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বলছে: স্বাগত, স্বাগত। উচ্চ হারের টিকিটের চমকদারী মজলিসে সে-আহ্বান বড়ই গভীর, বড়ই বেগবান। ক্রিকেট খেলার মাঠের বাইরে ক্রীড়ামোদীদের আকুল কণ্ঠস্বরে সেই শীত তবু বেপথুমান!

এদিকে বিজ্ঞানীদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। কেউ বা বসেছেন মাথায় হাত দিয়ে কেউ বা দূরবীন চোখে লাগিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছেন সন্ধ্যে থেকে ভোর। কিন্তু কোথায় সেই উল্কাবৃষ্টি? সাল-তারিখ-ক্ষণ মেনে অপরূপ নৃত্যের ভঙ্গিতে উল্কারা নেমে আসে নি এই মর্তলোকে। শুধু আপন নিয়মে আসে আর যায় একা শীত। এর চাইতে মেক্সিকোর সেই পঞ্চাশ টন ওজনের উল্কাপাত হলেই বা কি ক্ষতি ছিল?

উল্কাবৃষ্টি নেই। তবু এখন চারদিকে সংবাদ শুধু খরার। শীতেও তার বুঝি বিনাশ নেই। উল্কাপাতের পরিবর্তে দেশময় তাই আজ অশ্রুপাত। কিন্তু এতো অশ্রুপাতেও তো খরা দূর হয় না। বরং খরার নামে বাজারদর আগুন। শীতকালে কে কবে এই বাংলাদেশে ধান-চালের অভাবের কথা শুনেছে? এবার যে পৌষ আসবে—সে তো কুলবধূদের কণ্ঠে লক্ষ্মী-মাসরূপে উদ্‌যাপিত হবে না। বরং তখন শুনতে হবে রাত-বেরাতে পেচককুলের তীক্ষ্ণস্বর। এই স্বর শুনে যখন থমথমে অন্ধকার রাতে আমাদের হৃৎকম্প হবে—তখন যে ডাক আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করবে—তা হচ্ছে—ভোট দাও, ভোট দাও। সুতরাং এবার হাড়-কাঁপুনির দিনগুলিতে রাজনীতির বাজার গরম হবে। শুধু ঠাণ্ডার জমে নিষ্পদ হয়ে যাবে গণতন্ত্র-রক্ষক ভিক্ষুক মানুষ!

ভিক্ষুক মানুষের কপালে এবার শীতের মরশুমে সস্তায় কলাটা, মূলোটাও জুটবে না। আলুর অবস্থা আর বলার নয়। হিমঘরের মাহাত্ম্যে তার দাম বাড়তে বাড়তে এমন হয়েছে যে, খাদ্যবিলাসীরাই হয়তো ঐ বস্তু একদা আহার করবেন।

তবে শীতের শুরুতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নাকি একটা বড় কাজ করেছেন। মাছ নিয়ে তো আমাদের সরকার দীর্ঘকাল নাজেহাল হয়েছেন। সরকার এবার ভেড়ি-গুলি দখল করছেন। এই সংবাদ শুনে পাতে মাছ পড়ার আশায় অনেকেই হয়তো এরই মধ্যে পাত পেড়ে বসেছেন। কিন্তু কথায় বলে, গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল। আমরাও বলি, খালে-বিলে মাছ, তাই ভোঁদড়ের নাচাটাই সার। কারণ, কেই বা বলতে পারে যে, সরকারের নতুন পন্থা গ্রহণের পর খাল-বিল-পুকুর-নালা সব শুকিয়ে যাবে না? সুতরাং মৎস্যের আশা দিয়ে আর লাভ কি? সত্যি কথা এই—বাঙালীরা মাছের কথা এখন ভুলতে বসেছে—তখন আবার মাছের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কি লাভ? সোজা কথা, বাঙালীরা মাছ না খেতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। মাংসের যা দর—তাও তাদের জোটে না। সুতরাং একদা বাঙালীরা হিংস্র নিরীহ বাঙালী জাতিতে রূপা-ন্তরিত হবে—এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কি আছে?

রূপান্তর চারদিকেই। রূপান্তর নেই শুধু ঋতুচক্রের আবর্তনে আগত শীতের।

শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বাড়িতে যাঁরা থাকেন, গাড়িতে যাঁরা চলেন—তাঁদের কাছে শীত-গ্রীষ্ম সবই সমান। ভোজন-কালে তাঁদের চর্ব, চোষ্য, লেহ্য, পেয় সহ যাবতীয় আইটেমেরও এদিক-ওদিক হয় না। একালের সাহিত্যের তীর্থক্ষেত্রে এঁরাই জগন্নাথ, সঙ্গীতের আসরে এঁরাই হন আমন্ত্রিত প্রথম শ্রেণীর অতিথি। সাহিত্যের রসবোধ এঁদের না থাক, সঙ্গীতের তাল-লয়-মাত্রার জ্ঞান এঁদের শূন্য হোক—তবু এঁরা না থাকলে আসরের তাল থাকে না—একথা চতুর সমঝদার বোঝেন। সেই কারণে ভক্তের আকুল আহ্বানে এঁদের সাড়া না দিয়ে উপায় নেই এবং সমাজে এঁদের কৃপায় কেউ কেউ প্রতিষ্ঠাও পেয়ে যায়। শীতের মরশুমেই যে এ-জাতীয় সুযোগ আসর-মজলিস ও সভার মাধ্যমে প্রায়ই জুটে যায়, তা রসিক ব্যক্তিই বোঝেন।

আমরাও তাই বলি, হে শীত, তুমি অন্তত একবার ঋতুচক্রকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে গরহাজির হও।

কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত করতে শীত যেন রাজী নয়। পৃথিবীতে পরিবর্তনের যে লীলা তীব্রভাবে লক্ষ্য করা যায়—তা তো শীতকালেই। সুতরাং জীবনে সমাজে, রাজনীতিতেও পরিবর্তন যে অবশ্যম্ভাবী—তা নিরূপিত করার জন্যে একমাত্র শীতের গরহাজির হবার কোনো উপায় নেই।

শীতের পর ফোটে যেমন বসন্তের ফুল, তেমনি মানুষের দুশ্চর তপস্যাও ব্যর্থ নয়—সে কথাই শীত যেন আকারে-ইঙ্গিতে, আত্মোৎসর্গে আমাদের বোঝাতে চায়।

আমরা কি তা অগ্রাহ্য করবো?

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

ক্ষমতার লড়াই সুরু হয়েছিল বেশ কিছুদিন আগে থেকেই, সে-লড়াইয়ের বলি হয়েছেন ডঃ এরহার্ড, আর বলীয়ান হয়েছেন ডঃ কিসিংগার। চ্যান্সেলরের গদী দখলের জন্যে, ডঃ এরহার্ডকে সরানোর চক্রান্ত-নাটকে যাঁরা প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁরা এরহার্ডেরই বিশিষ্ট বন্ধু, তাঁরই দলের প্রথম সারির নেতা। ফ্রি ডেমোক্রেটিক দল 'ভিলেন' চরিত্রে অভিনয় করলেও সমগ্র নাটক পরিচালনার দায়িত্ব ছিল এরহার্ডের ক্রিশ্চান ডেমোক্রেটিক দলেরই। এরহার্ডের পতন তাই অপ্রত্যাশিত ছিল না।

তবে, রঙ্গমঞ্চে ডঃ কিসিংগারের প্রবেশ খানিকটা আশাতীত ছিল, অন্তত কট্টর এরহার্ড-বিরোধী উপদলের তালিকায় ডঃ কিসিংগারের নামটি দেখা যায় নি, যদিও উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁর কম নয় কারো চেয়ে। তা যদি না থাকতো তবে তিনি অমন আইনের পসার ছেড়ে রাজনীতির অশান্ত সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে যাবেন কেন?

বাডেন উর্টেনবুর্গে ১৯০৪ সনে এক ক্যাথলিক পরিবারে কুর্ট জর্জ কিসিংগারের জন্ম। ইতিহাস ও আইন অধ্যয়ন শেষ করে ডঃ কিসিংগার এলেন বার্লিনে অন্নের সন্ধানে। আর্টিক্‌ল্ ক্লার্ক হয়ে কিছুদিন কাটলো, তারপর পুরোদস্তুর আইন ব্যবসায়ই করলেন সুরু। কিন্তু বেশিদিন মক্কেলের হয়ে ওকালতী করতে হলো না, সওয়াল-জবাব করতে হলো না জজের সামনে দাঁড়িয়ে। জার্মানীতে তখন বান ডেকেছে নাৎসীবাদের বান—সাল তখন ১৯৩৩, ক্ষমতায় এসেছেন এ্যাডলফ হিটলার, জার্মানীর বলদর্পী চ্যান্সেলর।

এ-সুযোগ হেলায় ছাড়লেন না উচ্চাকাঙ্ক্ষী কিসিংগার, ভিড়ে গেলেন নাৎসী পার্টিতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় উনি পেলেন এক দায়িত্বপূর্ণ পদ, হিটলারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপ এবং প্রচারমন্ত্রী গোয়েবল্‌স-এর মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী লিয়াসন অফিসারের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কাজেই নাৎসী পার্টির সঙ্গে যুক্ত থাকা যদি কলঙ্কের হয়ে থাকে তো সে-কালিমা ডঃ কিসিংগার গায়ে মেখেছিলেন বৈ কি! নাৎসীদের হয়ে কোর্টে ওকালতী করতে তিনি রাজী হন নি বটে, কিন্তু নাৎসী বেতারের বৈদেশিক প্রচার বিভাগে তিনি বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা তো ছিলেন।

পশ্চিম জার্মানীর বাইরে আছেন যাঁরা তাঁদের অনেকে ভেবেছিলেন ডঃ কিসিংগারের চ্যান্সেলর পদ পাওয়ার পথে তাঁর ওই মলিন অতীতই অন্তরায় হবে। কিন্তু তাঁরা ডঃ কিসিংগারের বর্তমান সম্পর্কে বিস্মৃত হয়েছিলেন, অতীত দিয়ে কি সব সময়ে সবার বিচার করা চলে, বিশেষ করে রাজনীতির মতো 'আনপ্রেডিক্টাবল' বিষয়ে, যেখানে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে না!

রাজনীতিতে যে কত রোমাঞ্চ তা ডঃ কিসিংগার বুঝেছিলেন বিশ্বযুদ্ধের সময়কার সেই অবিস্মরণীয় দিনগুলিতে, যখন হের হিটলার অবিশ্বাস্য গতিতে একটার পর একটা দেশকে পদানত করে-

ডঃ কিসিংগার

ছিলেন, গোটা ইয়োরোপের কাছে রুদ্র জার্মানী একটা আতঙ্ক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দিলেন কিসিংগার, ক্রিশ্চান ডেমোক্রেটিক দলের সদস্যপদ নিলেন। নাৎসী প্রচার-কৌশলের শিক্ষা কি না জানি না, ডঃ কিসিংগার তাঁর রাজনীতির কার্যকলাপের ক্ষেত্র বেছে নিলেন একটা ছোট প্রদেশে—তাঁর নিজের প্রদেশ বাডেন উর্টেনবুর্গে, বার্লিনের ঝানু রাজনীতিবিদদের মধ্যে তাঁকে যে 'হংসমধ্যে বকো যথা'র ভূমিকা নিয়ে থাকতে হবে—এ-বিচক্ষণতা তাঁর জন্মেছিল। হিটলারের ঝটিকাগতি তিনি পছন্দ করতে পারেন নি, তার কী পরিণতি সে তো ডঃ কিসিংগার স্বচক্ষে দেখেছেন। তাই ধাপে ধাপে এগুলেন তিনি। নির্বাচন জিতে ডঃ কিসিংগার বাডেন উর্টেনবুর্গের মিনিস্টার-প্রেসিডেন্টের পদ নিয়ে রইলেন—অর্থাৎ ক্রিশ্চান ডেমোক্রেটিক দলের মধ্যে ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলেন।

দলের মধ্যে ভেতরে ভেতরে তিনি কী পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তার বড় প্রমাণ তো এই শক্তিদ্বন্দ্বে তাঁর জয়লাভেই পরিষ্কার বোঝা গেল। কে ভাবতে পেরেছিল অমন বাঘা বাঘা রাজনীতিক-প্রতিদ্বন্দ্বীদের তিনি হারাতে পারবেন? অথচ যখন বুন্দেস্ট্যাগে (পার্লামেন্টে) ভোট নেওয়া হলো চ্যান্সেলর পদের জন্যে তখন দেখা গেল ১৩৭টি ভোট পেয়ে ডঃ কিসিংগার সবার শীর্ষে, আর যিনি নাকি দলের প্রধান নেতা, দীর্ঘকাল ধরে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আসন অলঙ্কৃত করে রয়েছেন সেই ডঃ শ্রোয়ডার পেয়েছেন ৪২টি ভোট আর উচ্চাভিলাষী ক্রিশ্চান ডেমোক্রেটিক দলের আরেকজন উঁচু দরের নেতা ডঃ রেনার রাজেলের বাক্সে মাত্র ২৬টি ভোট! অথচ ডঃ কিসিংগার পার্লামেন্টের একজন সাধারণ মেম্বারও নন; সুদূর একটা প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মাত্র!

তবে হ্যাঁ, কিসিংগার হলেন আপোষরফার প্রতীক, খুব একটা নামী প্রার্থী নন বলে তাঁর বিরোধীর সংখ্যা বিশেষ ছিল না, অপরপক্ষে অন্য যে সব দাবিদার এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের স্বপক্ষ-বিপক্ষ দুই-ই ভারী ছিল এবং এঁদের যে কোন একজন ক্ষমতা লাভ করলে উপদলীয় কোন্দল থেকেই যেত, তিক্ততা-বিরোধিতা বন্‌ রাজনীতিকে আরো কলুষিত করত।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, ডঃ কিসিংগার ধোপে টিকবেন তো? কারণ, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই ক্রিশ্চান ডেমোক্রেটিক য়ুনিয়ন দলের মধ্যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে, ডঃ এরহার্ডের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই সে-সঙ্কটের অবসান ঘটেছে মনে করার কোনো কারণ নেই। ডঃ কিসিংগারের ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতা, তাঁর কর্মক্ষমতা ও বুদ্ধির ওপরেই দলের সংহতি অনেকখানি নির্ভর করছে, কারণ, পশ্চিম জার্মানীতে সাধারণ নির্বাচন আসন্ন।

দেশের অভ্যন্তরে যেমন তাঁকে রাজনৈতিক বিচক্ষণতা, সহিষ্ণুতা ও বুদ্ধির পরীক্ষা দিতে হবে, তেমনি আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স বা রাশিয়া প্রভৃতি বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গেও কূটনৈতিক পাঞ্জা কষতে হবে। কিন্তু ভেতরে-বাইরে সাফল্য করায়ত্ত করা ডঃ কিসিংগারের পক্ষে সম্ভব হবে তো?

দিল্লীতে ছাত্র-শোভাযাত্রা প্রতিরোধে পুলিশী অভিযানের একটি দৃশ্য

পাতিল সাহেব গদি ছাড়ছেন না

গদি ছাড়ব না, অন্তর্ঘাতকদের ঠান্ডা করব—কলকাতায় শ্রীপাতিল তাঁর পদত্যাগ দাবির প্রত্যুত্তরে একথা সদম্ভে ঘোষণা করেছেন। দুঃখের বিষয়, এ পর্যন্ত যত রেল দুর্ঘটনা হয়েছে, সে তুলনায় কেন, কোন ক্ষেত্রেই রেলদপ্তর প্রচারিত তথাকথিত অন্তর্ঘাতক পাকড়াও এবং তাদের সমুচিত শাস্তি দানের দ্বারা রেলমন্ত্রী শায়েস্তা করতে পারেন নি। পারলে দেশের জন-প্রতিনিধিগণ দুই কেন্দ্রীয় কক্ষেই শ্রীপাতিলের পদত্যাগ দাবি করে বৃথা সময় নষ্ট করতেন না নিশ্চয়ই। আরও দুঃখের কথা এই যে, শ্রীপাতিল দিল্লী থেকে উড়ে এসে কলকাতায় মন্তব্য করলেন; কেন্দ্রীয় আইনসভায় সযুক্তি তাঁর বক্তব্য সজোরে উপস্থাপিত করলেও বরং সাধারণের কাছে তিনি কিছু পরিমাণে বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রতীয়মান হতে পারতেন।

শিলিগুড়ির রেলপথ দুর্ঘটনা পাতিল সাহেবকে কিছুটা নতুন সুযোগ দান করেছে। যেহেতু শিলিগুড়ি দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে একটি বিশেষ সামরিক রেলযান, সেজন্য দোষটা এযাত্রা ভাগীদার স্কন্ধে চাপানোর একটা সুযোগ এসেছে বটে। তাছাড়া শিলিগুড়ি দুর্ঘটনায় ফিশপ্লেট অপসারণের অভিযোগও পাওয়া গেছে। প্রশ্ন উঠেছে, সামরিক গতায়াত একটি গোপনীয় ব্যাপার, তাই-বা প্রচার হয় কি ভাবে। এতোগুলি টাটকা যুক্তি শ্রীপাতিলকে বেশ কিছুটা উৎসাহিত করেছে সন্দেহ নেই। কারণ অপসারিত ফিশপ্লেট স্যাবোটেজের সাক্ষ্য, সামরিক বাহিনী চলাচলের গোপনীয়তা রক্ষায় অক্ষমতা ইত্যাদিতে এবং সামরিক ট্রেন দুর্ঘটনায় প্রতিরক্ষা দপ্তরের দায়িত্বও কিছুটা থেকে যাচ্ছে। সম্ভবত এই সব টাটকা কারণেই শ্রীপাতিল মনে মনে মদত পেয়েছেন। তাছাড়া তিনি এ ব্যাপারে এখন যানবাহন মন্ত্রণালয়কেও জড়িয়েছেন।

শ্রীপাতিল অবশ্য স্ফীতবক্ষ পুরুষ। তাঁর মধ্যে দুই দশ কথায় মুষড়ে পড়ার চারিত্র্য-দৌর্বল্য নেই। এজন্যই কবে ভারতের নীতিবান পুরুষ স্বর্গত লালবাহাদুর শাস্ত্রী কেবলমাত্র রেলপথ দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়েই পদত্যাগ করে-ছিলেন, সেসব সেন্টিমেন্টাল কাহিনী শুনিয়ে শ্রীপাতিলের ওপর কোনরকম নৈতিক চাপ দিয়ে ফল হয় নি। ঐ ঘটনাটি ভারতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মনে চিত্রবৎ প্রোথিত হয়ে গেছে। কিন্তু জনতার মন নিয়ে জনাব পাতিল বড় একটা মাথা ঘামান না। তিনি জানেন দলীয় খুঁটি শক্ত থাকলে নন্দা-প্রতিম দুর্ঘটনার কদাচ আশঙ্কা নেই। শ্রীপাতিল সারকথা বুঝেছেন; গণতন্ত্রে ঠিক কোথায় গোছাতে হয় তাও তাঁর অজ্ঞাত নয়। সুতরাং......

সুতরাং গলবস্ত্র হ'য়েও পাতিল সাহেবকে যাঁরা অবশেষে গদি ছাড়াতে পারলেন না, তাঁরা সখেদে এখন বিলাপোক্তি করছেন।

খাস দিল্লীর একটি দৈনিক সম্পাদকীয় মন্তব্যে দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন এই বলে যে, Mr. Patil has said that he will not quit. The people therefore must be prepared to suffer him for at least three more months. অর্থাৎ গদি ছাড়ছেন না পাতিল সাহেব। অগত্যা জনগণকে আরও মাস তিনেক তাঁকেই সহ্য করতে হবে।

কিন্তু তিন মাস পাঁচ বছর যে নয় একথা কে বলবে?

. এম পি শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী, শ্রীহেম বড়ুয়া এবং শ্রীএস এম ব্যানার্জী প্রশ্ন

তুলেছেন এই মর্মে যে, রেল ও প্রতিরক্ষা দপ্তরের মধ্যে দায়িত্ব স্কন্ধান্তর করার যে চেষ্টা পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করছে তার কোন্‌টি সত্য এ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে বক্তব্য রাখতে হবে।

ইতিমধ্যে রেলদপ্তর কিছু সি আই ডি ছেড়েছেন এবং জনাতিনেক ব্যক্তিকে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। ফলাফল ভবিষ্যতে জ্ঞাতব্য।

পাতিল সাহেব হটলেন কি রইলেন, মনে হয় রেলদুর্ঘটনার প্রশ্নে সেটাই বড় কথা নয়। (অন্য কারণ স্বতন্ত্র ব্যাপার)। বড় প্রশ্ন হ'ল, দুর্ঘটনা নিবারণ। আমরা রেলদপ্তরে পাতিল সাহেবের তিন মাস আয়ুষ্কাল গণনা করেই তৃপ্ত হতে পারি না। আমরা বরং পাতিল সাহেবের কাছে এই আবেদনই রাখব যে,—আপনি স্বস্থানেই অবস্থান করুন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, তবে অনুগ্রহ করে আপনার উক্তিকে প্রমাণ করে দুর্ঘটনাজনিত অকারণ লোকক্ষয় ও জাতীয় সম্পত্তির বিনাশ সাধনের অবসান ঘটান! আপনারা জাতির সম্পত্তি রক্ষার জন্য খুবই ব্যস্ত-সমস্ত বলে আমাদের বিশ্বাস করতে বলেন, রেলপথ দুর্ঘটনায় যে ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে, তা নিবারণের দায়িত্বের প্রশ্নে তাই পরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে এমনভাবে আর এড়িয়ে যাবেন না।

নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হুঙ্কার

প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দার পদত্যাগে কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটে যে রদবদল করা হ'ল, (বিগত সংখ্যার আলোচনায়ই উল্লেখ করেছি), তাতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী তাঁর নিজস্ব করণীয় কিছুই করে উঠতে পারেন নি।

নন্দাকে হটিয়ে দেওয়ার ব্যাপারেও যেমন শ্রীমতী গান্ধীর ভূমিকা ছিল অসহায়, শ্রীচাবনকেও স্বরাষ্ট্রদপ্তরের শূন্য পদে বসাবার ব্যাপারে তেমনি তাঁর হাত সরাসরি সক্রিয় হতে পারে নি। শ্রীপাতিলের সমর্থনের প্রশ্নে তাঁকে কিছুটা ইতস্তত করতে দেখা গেছে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত চাবন প্রতিরক্ষার দায়িত্ব সর্দার স্বরণ সিং-এর ওপর ছেড়ে দিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চার্জ নিলেন, আর নিয়েই প্রস্তাবিত ছাত্র শোভাযাত্রা রাজধানীর রাজপথে যাতে সহজে চলাফেরা করতে না পারে তার জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত কঠোরতা অবলম্বন করে উপদল-নিন্দিত নন্দা-দৌর্বল্যের প্রতিবাদস্বরূপ নিজেকে খাড়া করতে চাইলেন। অবশ্য এই মুহূর্তেই তাঁর কার্যাবলীকে ইংরেজি সুরে 'মর্নিং শোজ দি ডে' বলে চিহ্নিত করা সমীচিন নয়, কেন না গণ-আন্দোলনের গলা টিপে ধরার জন্য শ্রীচাবন যে এতোকাল বোম্বে কংগ্রেসের অতি উৎসাহীদের মতো মুখিয়ে বসে ছিলেন, এমন অপবাদে তাঁকে ভূষিত করা যায় না। বোম্বে বন্ধ ও ঘেরা ডালো দিবসে নরম পন্থা অবলম্বনের জন্য চাবনপন্থীরাই কট্টর শক্তিদম্ভী রাজনীতির সমালোচ্য হয়েছিলেন। কিন্তু স্বরাষ্ট্রদপ্তর হাতে পেয়েই শ্রীচাবন যেন বেশ খানিক স্বধর্মচ্যুত বাড়াবাড়ি করে বসলেন।

কেবলমাত্র আন্দোলন দমনই নয়, শ্রীচাবন শাক্ত শ্রেষ্ঠের মতো হুঙ্কার ছাড়লেন : এবার 'মা' আমি তোমায় খাব।

লোকসভায় এস এস পি সদস্য শ্রীকিষেণ পট্টনায়ক যখন বললেন দিল্লী ছাত্র-শোভাযাত্রার ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত না হলে তার ফলাফল শোচনীয় হতে পারে, তখন নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী ওয়াই বি চাবন প্রত্যুত্তরে বললেন, "I can digest you and digest the threat." শ্রীচাবনের এতাদৃশ হজমশক্তির সঙ্গে ইতিপূর্বে আমাদের পরিচয় ছিল না। তাঁর মন্তব্যে মনে হয়, তিনি বিক্ষুব্ধ ভারতমাতাকেই বেবাক হজম করার প্রতিশ্রুতি জমা রেখে নতুন দপ্তরকর্তা হয়ে এসেছেন। কিন্তু, যেমন স্বাভাবিক, শ্রীচাবনের এহেন উক্তি এবং দিল্লী শাসন-কর্তৃপক্ষের ছাত্র-শোভাযাত্রা নিরোধের জন্য রণসাজ সমর্থনের হাঁক-ডাক বিরোধী-পক্ষের ক্ষেত্রে বদহজম হওয়ারই কথা। হয়েছেও তাই। কেউ কেউ চাবনেরও পদত্যাগ দাবি করে বসেছেন।

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে কথাটা নেহাতই কথার কথা নয়; সরকার তার প্রমাণ দিলেন ঐ রাজধানী দিল্লীর চৌহদ্দির মধ্যেই। ৭ই নভেম্বর সরকারী অদূরদর্শিতা দিল্লীতে যে উৎপাত অবাধ হওয়ার সুযোগ দিয়েছিল, আঠার তারিখের ছাত্র-শোভাযাত্রা বন্ধ করতেও সরকার ঠিক একই রকম দূরদর্শিতার অভাব প্রকাশ করেন। দুটো ঘটনাকেই কৌশলবিহীন অপশাসনের নজীর করে জনসমক্ষে তুলে ধরা হল। বোঝা গেল, বর্তমান শাসন যুগপৎ লঘুক্রিয়া এবং অতিক্রিয়ার শিকার হয়েছে। অর্থাৎ ব্যালান্স হারিয়ে শাসনের ঘড়ি বে-চাল হয়ে গেছে।

শ্রীচাবন বলেছেন, (যদিও বস্তাপচা কথা মাত্র) ছাত্রদের অভিযোগ উত্থাপনের জন্য আন্দোলন করা অনুচিত। বলেছেন এমন সময়, ছাত্র-আন্দোলনের চোটে যখন উত্তর ভারতকে চোখে অন্ধকার দেখতে হয়েছিল এবং বৈঠক গবেষণা অনুসন্ধান ইত্যাদির হিড়িক পড়ে গেছল। বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন যে, অভিযোগ প্রকাশের 'সঠিক পথ' ছাত্রদের আবিষ্কার করতে হবে। শ্রীচাবন হয়ত ভুলে গেছেন, অভিযোগ প্রকাশের গণতান্ত্রিক পথ-সভা শোভাযাত্রা সংবাদপত্র এ শিক্ষা অবশ্য মুমুক্ষু, ভারত কংগ্রেসী নেতাদের কাছেই এক সময় লাভ করেছেন; বর্তমানে কংগ্রেস কায়েমী মালিকানায় অধিষ্ঠান করছেন বলে যদি নতুন কোন শিক্ষা তাঁদের কাছে জনগণের প্রাপ্য হয়ে থাকে তবে নেতাদের অত ঢাক ঢাক গুড় গুড় কেন, পষ্টাপষ্টি বলে ফেললেই তো হয়। কিন্তু তা তাঁরা বলবেন না। ভোট-কুড়ানি সভায় বলবেন, আন্দোলনের অধিকার গণতন্ত্রে স্বীকৃত বটেই তো। আবার একটা শোভাযাত্রা বন্ধ করার জন্য যত্রতত্র গ্রেপ্তার, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সশস্ত্র প্রহরা, রাজধানী অবরোধ করে শান্ত্রী প্রহরা মোতায়েন এবং রেল কামরা সার্চের মতো বিভীষিকাময় অবস্থারও সৃষ্টি করবেন। সমগ্র দিল্লীতে ১৪৪ ধারা জারি করে, সংসদ সদস্যদের অবমাননাকর পরিস্থিতিতে নিক্ষেপ করে ও গ্রেপ্তার করে স্বরাষ্ট্র শাসনে যে ভীতিপ্রদ আবহাওয়ার সৃষ্টি করা হ'ল তা ভারতের গণজীবনযাত্রায় এক নয়া চ্যালেঞ্জ।

সংসদে এজন্যই সদস্যগণ তীব্র মন্তব্য করে বলেছেন, শ্রীচাবন পশ্চাৎদ্বার দিয়ে নয়া নীতি আমদানীর চেষ্টা করছেন। বলা বাহুল্য, এ-হেন বজ্র আঁটুনি অসন্তোষে ইন্ধন যোগান দেয় শুধু। ৭ই নভেম্বরের অক্ষমতা যে সরকারের পক্ষে রণরঙ্গিণী মূর্তির দ্বারা অপনোদন করা অসম্ভব, এই বাস্তব সত্যটা কোনও বড় রকম নীতি পরিবর্তনের সময় বিবেচ্য হওয়া উচিত। অন্যথা অবস্থার সরলীকরণ না হয়ে, শান্ত পরিস্থিতিও বিগড়ে যেতে পারে।

দিল্লী ছাত্র-শোভাযাত্রা বন্ধের জন্য সরকার যে সাজ-সাজ ব্যাপার করেছিলেন, তা কঠোর শাসনের নয়, শাসন দৌর্বল্যেরই সাক্ষ্য হয়ে রইল।

৭ই নভেম্বর যা ঘটে গেছে, সে শোচনীয় বর্বরতাকে সমগ্র দেশ একবাক্যে নিন্দা করছে। এমতাবস্থায় ছাত্ররা ঠিক যে ঐ জাতীয় উন্মত্ত আচরণই করতেন এমন কথা ভাববার সত্যই কোন অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। বিশেষত শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রাই আহূত হয়েছিল এবং কতিপয় ছাত্রনেতা বিরোধী কয়েকজন নেতার সঙ্গে শান্তিরক্ষার আলোচনায়ই নিযুক্ত ছিলেন যখন ছাত্র-নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এই ঘটনায় কাঠিন্যের অতিরেকই প্রমাণিত হল।

স্মরণীয় নভেম্বর

১৪ই নভেম্বর ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী স্বর্গত নেহরুজীর জন্মদিবস শিশু-

পুরুষের পদমর্যাদা
অটুট রাখে
বাটার জুতো
বাটার জুতোর নির্মাণ তাঁদেরই কথা মনে রেখে যাঁরা কর্ম-সাধনে তৎপর। রূপবান, বলিষ্ঠ, পুরুষোচিত বাটার জুতো—তাঁদেরই জন্য যাঁদের পদক্ষেপ অবিরাম জীবনের বিচিত্র পথে। বাটার জুতোর গঠন আধুনিক রুচিসম্মত, নির্মাণ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত, কারিগর নিপুণ, কুশলী; উপকরণ হাতবাছাই, উৎকৃষ্ট। ফলে আরামে চলনে দীর্ঘ-স্থায়ী, নিশ্চিত। দিনের পর দিন, সকল ক্ষেত্রে, পুরুষের পদমর্যাদা অটুট রাখে বাটার জুতো।
Bata

দিবসরূপে পালিত হয়েছে। ১৯শে নভেম্বর নেহরুকন্যা ভারতের তৃতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর জন্মদিবস শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন বর্ষণের দ্বারা বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। এই দিন শ্রীমতী গান্ধী তাঁর স্বর্গত পিতা যে তিনমূর্তি ভবনে পরলোকগমন করেন সেখানেই প্রাতঃকাল অতিবাহিত করেন এবং সমাগত শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছা গ্রহণ করেন। অভিনন্দন-জ্ঞাপনকারীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী জি, এল, নন্দা।

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিবসে বিহার, উত্তর প্রদেশের খরা পীড়িতদের সাহায্যার্থে খরা তহবিলে তিন লক্ষাধিক টাকা সংগৃহীত হয়। খাদ্যবস্তুও জমা হতে থাকে। এই তহবিল সংগ্রহে গ্রীসের রাজার দান প্রায় ৭৫ হাজার টাকা। আমাদের রাষ্ট্রপতি দিয়েছেন পাঁচ হাজার, শ্রীমতী গান্ধীর নিজস্ব দান এক হাজার এক। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পাঠিয়েছেন সহস্র মুদ্রা, জম্মু ও কাশ্মীরের গভর্নর দশ সহস্র। যোজনামন্ত্রী শ্রীমেহতা দিয়েছেন পাঁচ হাজার। আর সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র থেকে এসেছে দু' হাজার টাকার দান।

পিতা স্বর্গত নেহরু ভারতের ইতিহাসে যে মহিমোজ্জ্বল অধ্যায় যোজনা করে গেছেন, যে সাধ, যে কল্পনার রঙে তিনি চেয়েছিলেন সমাজবাদী ভারতবর্ষের চেহারাকে দুই কক্ষে বিভক্ত বিশ্বে একটি অনন্যসাধারণ আসন দান করতে; কন্যা শ্রীমতী গান্ধীর আমলে পিতার সেই স্বপ্নিল কল্পনাময় ভারত প্রকাণ্ড ব্যাঙের মত অন্যতর শরীর গ্রহণ করতে চলেছে। নেহরু-উত্তাপে লালিতা শ্রীমতী গান্ধী নেহরু-স্বপ্নকে অতীতের নিদ্রাবিলাসমাত্রে পরিণত হতে যেন দেখে যেতে বাধ্য না হন, তাঁর জন্মদিবসে তাঁর প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপনের মুহূর্তে এই কামনাই রাখি।

স্বাগত নোভোৎনী

বিগত ১৯শে নভেম্বর পালাম বিমান বন্দরে বিপুল অভিনন্দন সহকারে ভারতবাসী স্বাগত জানান চেক রাষ্ট্রপতি শ্রীআন্তোনিন নোভোৎনীকে।

রাষ্ট্রপতি ভবনে এক সম্মানজ্ঞাপক ভোজসভায় শ্রীনোভোৎনী বলেন, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, সাম্য সংহতি সহযোগিতা ও মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্কের ওপরই চেক পররাষ্ট্রনীতি প্রতিষ্ঠিত।

রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণ ভারত-চেক মৈত্রীর দৃঢ়তর বন্ধন কামনা করে চেক রাষ্ট্রপতিকে অভিনন্দিত করেন। এখানে উল্লেখ্য এই যে, সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা ও পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সম্পর্কে একটি চেক-ভারত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

গত বছর ভারতের রাষ্ট্রপতি চেকোশ্লোভাকিয়া সফরে যান। তাঁর সফরকাল থেকে চেক-ভারত সম্পর্কে হৃদ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। চেক রাষ্ট্রপতির শুভাগমনে সে সম্পর্ক বর্ধিত হবে সন্দেহ নেই।

ভারত-চেক উভয় রাষ্ট্রই শান্তি ও সহাবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী। উভয়েরই কামনা, বিশ্বে আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ হোক। পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার, সৃষ্টিকল্পে নয়, সৃজনশীল শান্তিপূর্ণ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হোক। এই মূল নীতিতে আস্থাবান দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি তাই অবিসংবাদিত। অন্য রাষ্ট্রের ব্যাপারে অকারণ হস্তক্ষেপও দুই রাষ্ট্র সমর্থন করে না।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে চেক রাষ্ট্রপ্রধানকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও মন্ত্রিগণ সহ উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী এবং বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী এম, সি, চাগলা।

রাজস্থান:

নতুন উপহার

পঁয়ত্রিশ বছরের সে কন্যার নাম বাসন্তী দেবী বাল্মীকি। জন্ম নীচ কুলে। বাসন্তীর নিজস্ব ঘোষণা, "আমি ঝাড়ুদারনী"। কিন্তু এই ঝাড়ুদারনীই আজ জয়পুরের তথা দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ মাথায় নিয়েই বাসন্তীর যাত্রা শুরু। ঝাড়ুদার পরিবারে জন্মে কিতাবের পাতা উল্টানোর মতো দুঃস্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন এবং স্বামীর সহায়তায় এই হরিজন মহিলাই নিজেকে অন্ধকার থেকে আলোকের পথে সমুত্তীর্ণ করেছেন। শিক্ষার আলোক দু' চোখ ভরে গ্রহণ করেছেন। হরিজন সমাজের উন্নয়নের জন্য সদাব্যস্ত স্বামীর পাশে এসে দাঁড়িয়ে প্রকৃত সহধর্মিণীর মতো তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন তাঁর কাজে। বাসন্তী আজ পরিচয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণা তাঁর সমাজে আদর্শ মহিলা।

বাসন্তী দেবী আগামী নির্বাচনে প্রার্থীরূপে কংগ্রেস টিকেটের জন্য আবেদন করেন। তাঁর আবেদনের উপযুক্ততা সন্ধান করতে গিয়ে রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমিশ্র সবিস্ময়ে জানলেন, এক মেথরানী চাইছে জনপ্রতিনিধিত্বের প্রবেশপত্র। মন্ত্রীমহোদয় তাঁর প্রার্থীপদ সুপারিশ করেছেন। বাসন্তী যাবেন এবার ইন্দিরার সঙ্গে আলাপ করতে।

বলা বাহুল্য, বাসন্তীর চেষ্টা নিষ্ফল হয় নি। তাঁর হরিজন সমাজ ছাড়াও তাঁর সমর্থনে আজ এগিয়ে আসছেন, ব্রাহ্মণ বৈশ্য এবং রাজপুত।

মনে পড়ছে ডঃ রামমনোহর লোহিয়ার এক প্রশ্নের জবাবে শ্রীমতী গান্ধী বলেছিলেন, শুধু পিসিমা ভাইঝিরাই নয়; দিন আসছে, যখন সামান্যাও আসবেন দেশকে নেতৃত্ব দিতে।

শ্রীমতী গান্ধীর এই উক্তিকে লোহিয়া সহ সকলেই স্বাগত জানিয়েছিলেন। আজ আমরা বাসন্তী দেবী বাল্মীকিকে তারই সূচনাস্বরূপ পাচ্ছি কি?

পাই ভালো। কিন্তু বাসন্তীদের মনে রাখতে হবে, তাঁদের কাজের জগৎ থেকে যেন কোন চাকচিক্যই কখনো তাঁদের বিচ্যুত না করে।

অন্ধ্র:

সঞ্জীব রেড্ডির জিগির

পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত ভারতের অনেক রাজ্যেই (আজ যাঁরা কেন্দ্রীয় নেতা বলে পরিগণিত তাঁরাই) বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ স্ব স্ব রাজ্যের জন্য নির্বাচনের প্রাক্কালে কিছু আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি আদায়ের প্যাঁচ কষে চলেছেন। একমাত্র পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পনাগুলির বেশ কটিই বিশ বাঁও জলের তলায় নাকানিচুবানি খাচ্ছে।

সম্প্রতি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি ঘোষণা করেছেন যে, পরবর্তী ইস্পাত কারখানা নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ভারত সরকার সংগ্রহ করতে পারলেও যদি বিশাখাপত্তনমে কারখানা নির্মাণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়, তিনি তবে তাঁর মন্ত্রিপদে ইস্তফা দেবেন:

ইলেকসন স্টান্ট হিসেবে শ্রীরেড্ডি বেশ লাগসই জিগির তুলেছেন, যদিচ বর্তমানে ব্যাপারটি হাইপোথেটিক্যাল। যদি অর্থের সঙ্কুলান হয়, যদি অন্ধ্রের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয় তবে পদত্যাগ।

পদত্যাগের হিড়িক পড়েছে অন্ধ্রে। রাজ্য বিধানসভার স্পীকার ৬৯ জনের (বিরোধী সদস্য) পদত্যাগ ঘোষণা করেছেন। এঁদের ৬৭ জনই ইস্পাত কারখানার ইস্যুতে ইস্তফাপত্র দাখিল করেছেন। দুজন মাত্র গো-হত্যা নিষিদ্ধকরণের প্রশ্নটিকেই তাঁদের পদত্যাগের প্রেরণাস্বরূপ গ্রহণ করেছেন।

বিশ্বসুন্দরী রীতা ফারিয়া

বৃটেনঃ

প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন গত সপ্তাহে কমন্সসভায় ঘোষণা করেছেন, তাঁর শ্রমিক দলের সরকার য়ুরোপীয় কমন মার্কেটে যোগ দেবার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী, এবং এই উদ্দেশ্যে যা করা দরকার তা তাঁরা করবেন।

উইলসনের এই ঘোষণার মধ্যে শ্রমিক দলের নীতির বড় রকমের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কমন মার্কেটে যোগ দেবার ব্যাপারে শ্রমিক দলের কখনও আগ্রহ দেখা যায় নি, বরং বরাবরই তাঁদের মধ্যে একটা বিরোধিতার ভাব ছিল। ১৯৬১ সালে হ্যারল্ড ম্যাকমিলানের সরকার যখন কমন মার্কেটে যোগদানের জন্য আবেদন করেছিলেন, তখন বিরোধী শ্রমিক দল থেকে তার তীব্র বিরোধিতা করা হয়েছিল। গত সাধারণ নির্বাচনেও শ্রমিক দলের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল দলের আক্রমণের অন্যতম প্রধান বক্তব্য ছিলঃ শ্রমিক দল জয়লাভ করলে বৃটেনের কমন মার্কেটে যোগ দেবার সম্ভাবনা নষ্ট হবে।

তবে আজ হঠাৎ শ্রমিক দল কমন মার্কেটে যোগ দেবার জন্য আগ্রহী হ'ল কেন? এর কারণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, উভয়ই। বৃটেনের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীমহল কমন মার্কেটে যোগ দেবার জন্য সরকারের ওপর বিশেষভাবে চাপ দিচ্ছে। তাদের ধারণা, বৃটেনের বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট সমাধানের জন্য এই ব্যবস্থা একান্ত আবশ্যক। তা ছাড়া 'ইফটা' (EFTA) বা 'য়ুরোপীয়ান ফ্রি ট্রেড অ্যাসোসিয়েশনের' অন্যান্য সদস্যরা কমন মার্কেটে যোগ দেবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। বৃটেন যেতে না চাইলেও তারা চলে যাবে বলে মনে হচ্ছে।

কেবলমাত্র শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরাই নন, শ্রমিক দলের অনেক বামপন্থী সদস্যও এখন চাইছেন, বৃটেন য়ুরোপীয় অর্থনৈতিক সংস্থায় যোগ দিক। তাদের ধারণা, এর ফলে বৃটেনের মার্কিন ঘেঁষা নীতির পরিবর্তন হবে। কমন মার্কেট বা 'ই-ই-সি' (য়ুরোপীয় ইকনমিক কমিউনিটি) য়ুরোপীয় সংহতির প্রাথমিক অর্থনৈতিক রূপ, এর পর রাজনৈতিক স্তরে সংহতি সাধনের চেষ্টা করা হবে। য়ুরোপীয় রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগের ফলে মার্কিনী প্রভাব হ্রাস পাবে। কমন মার্কেট ও য়ুরোপীয় সংহতির প্রধান নায়ক চার্লস দ্য গল। আর দ্য গল স্পষ্টতই মার্কিন কর্তৃত্বের বিরোধী। সুতরাং বৃটেন যদি দ্য গলের সঙ্গে যোগ দিয়ে কমন মার্কেটে প্রবেশ করে, তবে মার্কিন ঘেঁষা নীতি তাকে অনেকখানিই ছাড়তে হবে।

কিন্তু প্রশ্ন হলঃ দ্য গল কি বৃটেনের কমন মার্কেট প্রবেশকে স্বাগত জানাবেন? ১৯৫৮ সালে এই দ্য গলের 'ভেটো'র ফলেই বৃটেন কমন মার্কেটের সদস্য হতে পারে নি? অবশ্য তারপর বৃটেনের সঙ্গে ফ্রান্সের সম্পর্কের কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তাহলেও দ্য গল কি ভুলে যাবেন, ১৯৬২ সালের নাসাউ চুক্তি অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৃটেনকে পরমাণু শক্তি বিশিষ্ট পোলারিস সাবমেরিন সরবরাহে অংগীকারবদ্ধ? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু শক্তির কোন অংশীদারকে দ্য গল কিছুতেই য়ুরোপীয় গোষ্ঠীর ভেতর নিতে চাইবেন না। অতীতে দেখা গেছে, কমন মার্কেটের অন্যান্য অনেক সদস্যই বৃটেনের যোগদানে রাজী। এবারও নিশ্চয়ই তাদের আগ্রহ থাকবে। কিন্তু ফ্রান্স রাজী না হলে কিছু হবে না।

হ্যারল্ড উইলসন বলেছেন, এই ব্যাপার নিয়ে য়ুরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অবিলম্বে আলোচনা সুরু করা হবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ কথাও বলেছেন, বৃটেন ও কমনওয়েলথের স্বার্থ রক্ষা করে তবেই তাঁরা কমন মার্কেটে যোগ দেবেন।

যদি শেষ পর্যন্ত সত্যিই বৃটেন কমন মার্কেটে যোগ দেয়, তবে বৃটিশ পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স তথা য়ুরোপ সম্পর্কে বৃটেনের নীতির পরিবর্তন হবে।

* * *

এই সপ্তাহের একটি উল্লেখযোগ্য খবর। এবার লণ্ডনে অনুষ্ঠিত বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় ভারতের শ্রীমতী রীতা ফারিয়া বিশ্বসুন্দরী বা 'মিস ওয়ার্লড্' রূপে নির্বাচিতা হয়েছেন।

ভারত কেন, এশিয়ার আর কোন মেয়ে পূর্বে এই সম্মান লাভ করতে পারে নি। ৬১টি দেশের প্রতিযোগীর মধ্য থেকে বিচারকরা শ্রীমতী রীতাকে শ্রেষ্ঠা সুন্দরী রূপে বেছেচেন।

২৩ বৎসর বয়স্কা শ্রীমতী রীতার বাড়ি বোম্বাই। তিনি বর্ত্তমানে মেডিকেল

ছাত্রী। বিশ্বসুন্দরী রূপে নির্বাচিতা হবার পর তিনি লণ্ডনে সাংবাদিকদের কাছে বলেছেন, চিত্রতারকা হবার বিন্দুমাত্র বাসনা তাঁর নেই, চিকিৎসক হয়ে তিনি জন্মভূমি ভারতের সেবা করতে চান।

জর্ডান:

ইজরায়েল সীমান্তে জর্ডানের তিনটি গ্রামের ওপর গত ১৩ই নভেম্বর ইজরায়েলী বিমান থেকে ব্যাপকভাবে বোমাবর্ষণ করা হয়েছে।

এই সীমান্তে ছোটোখাটো সংঘর্ষ কোন নতুন ঘটনা নয়। উভয়পক্ষে এই ব্যাপার লেগেই আছে। কিন্তু এবারের আক্রমণ এতই নগ্ন যে ইজরায়েলের সবচেয়ে বড় সমর্থক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত এর নিন্দা না করে পারে নি। রাষ্ট্রসঙ্ঘে স্থায়ী মার্কিন প্রতিনিধি ও এ মাসে নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি আর্থার গোল্ডবার্গ এই আক্রমণের তীব্র নিন্দা করে বিবৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, প্ররোচনার কারণ থাকলেও এভাবে অস্ত্রের ব্যবহার করা সমীচীন নয়। তিনি সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের কাছে শান্তির জন্য আবেদন করেছেন।

ইজরায়েলের বিরুদ্ধে আরব রাষ্ট্রগোষ্ঠী সর্বদাই উত্তেজিত। ইজরায়েলের পূর্ণ বিলোপ ছাড়া তাদের শান্তি নেই। জর্ডানের এই ঘটনায় সমগ্র আরব জগতে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। সিরিয়া তো সোজাসুজি প্রস্তাব করেছে, আরব রাষ্ট্রসমূহের সম্মিলিত সৈন্যবাহিনী ও প্যালেস্টাইনের জনসাধারণের পক্ষ থেকে যুক্তভাবে ইজরায়েল আক্রমণ করা হোক।

জর্ডানের অনুরোধে এই ঘটনা নিয়ে আলোচনার জন্য ১৬ই নভেম্বর থেকে নিরাপত্তা পরিষদের জরুরী বৈঠক শুরু হয়েছে। জর্ডানের প্রতিনিধি ডঃ মহম্মদ আল্-ফারা নিরাপত্তা পরিষদে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন, "কেবল নিন্দাই যথেষ্ট নয়, এ ব্যাপারে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।" ডঃ ফারার মতে এই আক্রমণ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, আরব জগতের বিরুদ্ধে ইজরায়েলের ব্যাপক চক্রান্তের এটা অংশ মাত্র।

বুলগেরিয়া:

১৫ই নভেম্বর সোফিয়ায় বুলগেরিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলনে ভাষণ দেবার সময় সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক লিওনিদ ব্রেজনেভ বলেন, বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বানের সময় উপস্থিত হয়েছে। বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট নেতা তোদর জিকোভ বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই সম্মেলন আহ্বানের যে প্রস্তাব করেন, সেই প্রসঙ্গেই ব্রেজনেভ এই কথা বলেন।

কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে গত দু' বছর ধরে উত্থাপন করা হচ্ছে। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত এ ব্যাপারে সোভিয়েট ইউনিয়ন কোন আগ্রহ প্রকাশ করে নি। এই প্রথম সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতা এরূপ সম্মেলনের বিষয়ে তাঁদের সম্মতির কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সম্মেলনে চীনের সমালোচনা করা হবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই জাতীয় সম্মেলনের ভেতর দিয়ে চীনের বিরুদ্ধে, সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষে, কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সমর্থন প্রচার করা হবে।

ভিয়েতনামের বিষয়েও এই সম্মেলনে আলোচনা হবে। ভিয়েতনামের মুক্তি-সংগ্রামে কমিউনিস্ট জগৎ কিভাবে আরও সাহায্য করতে পারে, সে সম্পর্কে নিশ্চয়ই কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ আলোচনা করবেন। এই প্রসঙ্গেও চীনের সমালোচনা করা হবে। ভিয়েতনামে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলির ব্যাপক সাহায্য প্রেরণের কাজে চীন কোনরূপ সাহায্য করছে না। ব্রেজনেভ তাঁর সোফিয়া ভাষণে এ ব্যাপারে চীনের আচরণের তীব্র নিন্দা করেছেন। ব্রেজনেভ বলেন: চীন মুখে ভিয়েতনাম মুক্তি-সংগ্রামীদের সমর্থনের কথা বললেও কাজে কোনরূপ সাহায্য করছে না।

অস্ট্রেলিয়া:

গত মাসে মার্কিন রাষ্ট্রপতি লিনডন বি. জনসন যখন অস্ট্রেলিয়া সফরে এসেছিলেন, তখন বিভিন্ন স্থানে তাঁর বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়াবাসীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ক্যানবেরা ও সিডনিতে ছাত্র ও শ্রমিকরা জনসনের ভিয়েতনাম নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানায়।

অস্ট্রেলিয়া সরকার মার্কিন ঘেঁষা নীতি গ্রহণ করায়, বিশেষ করে ভিয়েতনামের যুদ্ধে অস্ট্রেলিয়া বেশি করে জড়িয়ে পড়ায়, দেশবাসীর এক ব্যাপক অংশ সরকারী নীতির বিরোধী হয়ে পড়েছে।

এই বছরের গোড়ার দিকে রবার্ট মেঞ্জিস প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অবসর গ্রহণ করায় হ্যারল্ড হল্ট প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। হল্ট আরও বেশি করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকেছেন। দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে একযোগে কাজ করার জন্য অস্ট্রেলিয়ার পনের শত সৈন্য ছিল। হল্ট প্রধানমন্ত্রী হয়ে এই সৈন্যসংখ্যা তিনগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। বর্তমানে ভিয়েতনামে অস্ট্রেলীয় সৈন্যের সংখ্যা ৪৫০০। প্রয়োজন হলে আরও সৈন্য ভিয়েতনামে পাঠানো হবে বলে ঘোষণা করেছেন হল্ট।

জুলাই মাসে হল্ট ওয়াশিংটন গিয়েছিলেন মার্কিন কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য। জনসন অক্টোবরে ঘুরে গেলেন অস্ট্রেলিয়া।

অস্ট্রেলিয়ার আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের দিকে তাকিয়েই হল্ট এই নীতি অনুসরণ করছেন। তাঁর ধারণা, অধিকতর মার্কিন সহযোগিতার ফলে অস্ট্রেলিয়ার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হবে এবং অস্ট্রেলিয়ার জনসাধারণ হল্টকে সমর্থন করবে।

কিন্তু বিরোধী শ্রমিক দল সরকারের ভিয়েতনাম নীতিকেই প্রধান নির্বাচনী প্রশ্নে পরিণত করেছে। শ্রমিক দল ভিয়েতনামে অস্ট্রেলীয় সৈন্য প্রেরণের বিরোধী। হল্ট প্রধানমন্ত্রী হবার পর ভিয়েতনামে যে অতিরিক্ত সৈন্য প্রেরণ করা হয়েছে, এখনই তা ফিরিয়ে আনতে হবে এবং অন্যান্য সৈন্যের প্রত্যাবর্তনের বিষয়েও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা শুরু করতে হবে—এই হল শ্রমিক দলের দাবি। নতুন করে ভিয়েতনামের জন্য কোন সৈন্য সংগ্রহ করাও চলবে না।

গত সপ্তাহে মেলবোর্নে এক বিরাট সমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রমিক দলের নেতা আর্থার কলওয়েল বলেছেন, অন্তত ছয় লক্ষ জননী নিশ্চয়ই তাঁদের ভোট দেবেন। এই মায়েরা তাঁদের সন্তানদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরিয়ে আনতে চান, ভবিষ্যতে যাতে আর কোন জননীর সন্তানকে ভিয়েতনামে যেতে না হয়, তা তাঁরা চান।

হল্ট এবং তাঁর সমর্থকরা অবশ্য আশা করছেন শ্রমিক দলের এই বক্তব্য অস্ট্রেলীয়রা সমর্থন করবে না। দক্ষিণ ভিয়েতনামকে বিপদে ফেলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে চটিয়ে কোন কাজ তারা করতে চাইবে না।

নির্বাচনের ফল কি হবে, সে পরের কথা, কিন্তু অস্ট্রেলিয়াতেও জনসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হচ্ছে, দেশের প্রধান বিরোধী দল ভিয়েতনাম রণাঙ্গন থেকে অস্ট্রেলীয় সৈন্যের প্রত্যাবর্তন দাবি করছে, এর গুরুত্ব কম নয়।

প্রত্যাশার মৃত্যু ও দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা

● কৃত্তিবাস ওঝা ●

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

দ্বিপাক্ষিক ও ত্রিপাক্ষিক আলোচনায় সকল দলই আশার আলোক দেখতে পেয়েছিলেন, কিন্তু অক্টোবর মাসের শুরু থেকেই হাওয়া ঘুরতে শুরু করলো। বাম-দক্ষিণ কম্যুনিস্ট পার্টির শরিকী-ঝগড়া তীব্র আকার ধারণ করায় পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতাতেও তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো। ১২ই অক্টোবর সন্ধ্যায় সকল বামপন্থী দলের দপ্তরে বাম কম্যুনিস্ট দলের পক্ষ থেকে একটি আসন বন্টনের তালিকা প্রেরণ করা হয়। পরবর্তী ১৩-দলের বৈঠকের দিন নির্দিষ্ট ছিল ১৬ই অক্টোবর। তালিকা প্রেরণ সম্পর্কে বাম কম্যুনিস্ট পার্টির বিচারে নিম্ন হারে সকল দলকে আসন বণ্টন করা হয়ঃ বাম কম্যুনিস্ট—১২২, দক্ষিণ কম্যুনিস্ট—৩৫, বাংলা কংগ্রেস—৩৪, এস, এস, পি—২৪, ফরওয়ার্ড ব্লক—২০, আর, এস, পি—১৫, এস, ইউ, সি—৭, লোকসেবক সঙ্ঘ—৫, নির্দলীয়—৯, অন্যান্যকে দুই-এক করে। এই তালিকায় পি, এস, পি ও কম্যুনিস্ট ইউনিটি কমিটিকে কোন আসন দেওয়া হল না। এই তালিকার মোকাবেলা করবার জন্য বাংলা কংগ্রেস দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে আলোচনা করে একটি তালিকা প্রণয়ন করলো। এই তালিকায় নিম্ন হারে আসন দেওয়া হল। বাম কম্যুনিস্ট—৭২, দক্ষিণ কম্যুনিস্ট—৫২, বাংলা কংগ্রেস—৬০, ফরওয়ার্ড ব্লক—৩৪, এস, এস, পি—১৪ আর, এস, পি—২৬, এস, ইউ, সি—৪, লোকসেবক সঙ্ঘ—৬, পি, এস, পি—৮ এবং অন্যান্য—৩ থেকে ১ পর্যন্ত। ১৬ তারিখের বৈঠক বসলেই দুইটি তালিকা পেশ করা হল এবং দেখা গেল, দুই তালিকা যতই যে দলের অপছন্দের হোক না কেন, তার মধ্যে ১৮৫টি আসন বিরোধমুক্ত হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে এই দুইটি তালিকা বিরোধের ক্ষেত্র প্রসারিত করলেও আসনের ক্ষেত্রে অনেক সমঝোতার সুযোগ এনে দিল। কিন্তু বৈঠক শুরু হতেই দেখা গেল—বিরোধমুক্ত আসনগুলি বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা না করে কোন কোন দল সেই দিনই বামফ্রন্ট ভেঙে দেবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা নগ্নভাবে প্রকাশ করতে লাগলেন। তবু সেই দিন একটা জোড়াতালি দিয়ে বৈঠক শেষ করে সকলে বেরিয়ে গেলেন ২৫শে অক্টোবর আবার বসবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে। কথা হল উক্ত দুইটি তালিকা অকেজো আর ২৪ তারিখ পর্যন্ত আবার দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করে ২৫শে নূতন ভাবে আলোচনায় বসা হবে। ১৬ থেকে ২৫ তারিখ সব দল আবার দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন চিত্র ফুটে উঠতে লাগলো। ইতিমধ্যে এস, এস, পি দল থেকে আবার একটা তালিকা সকল দলের কাছে প্রেরণ করা হল আসন ভাগ করে। ২৫শে অক্টোবরের বৈঠকে একটি অদ্ভুত পরিস্থিতি সৃষ্টি হল, যে পরিস্থিতি দেখলে অন্ততপক্ষে ১৩-দলের অনেক দলকে অনেকের রাজনৈতিক দল হিসাবেই মনে হ'ত না। ১৬ তারিখের বৈঠকে যেখানে সব দলের মধ্যে ১৮৫টি আসনে ঐকামত দেখা দিয়েছিল, ২৫শে সেই সংখ্যা নেমে ১১৯-এ এল। প্রায় সকল দলের পক্ষ থেকেই আসন দাবির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হল মাত্র দু-একটি দল ছাড়া। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে গত কয়েক মাসে বাম কম্যুনিস্ট পার্টি যে আসনগুলি অন্য দলকে ছেড়ে দিয়েছিল, সেইসব আসনই আবার এস, এস, পি, মার্ক্সবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক দাবি করে বসল উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে। কিন্তু আবার দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের প্রতিশ্রুতি নিয়ে দলগুলি সেই দিনের মতও বামফ্রন্টের প্রাণ বাঁচিয়ে রাখলেন। পরবর্তী বৈঠকের দিন স্থির হল ৩রা নভেম্বর।

২৫শে অক্টোবরের পরে একটা সত্য প্রকট হয়ে পড়ে যে, নির্বাচনী প্রশ্নে দল ১৩টি থাকলেও এবং তাদের বিরোধ অনেক থাকলেও আসল বিরোধ দুই কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যেই। দুই কম্যুনিস্ট পার্টি যদি তাদের শরিকী-বিবাদ মিটিয়ে আসনের রফা করতে পারে তবে অন্য দলের পক্ষে রফা করা অসম্ভব নয় এবং রাজ্যে সামগ্রিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা কঠিন নয়। ৩১শে অক্টোবর দুই কম্যুনিস্ট পার্টি একটা বৈঠকে বসল, অতি গুরুত্বপূর্ণ এক মুহূর্তে। এখানে একটা প্রশ্ন উল্লেখ করতে পারা যায় যে, অতীতে দুই কম্যুনিস্ট পার্টি কমপক্ষে পাঁচবার বৈঠকে বসেছে, কিন্তু আসন ভিত্তিতে আলোচনা প্রায় একদিনও হয় নি। প্রকৃতপক্ষে ৩১শে বৈঠকে বসে দুই পার্টি আসন ভিত্তিতে আলোচনায় বসেন। এই দিন দেখা গেল, দুই পার্টির মধ্যে আসনগত বিরোধের সংখ্যা প্রায় ৭৬টি। আলোচনা ক্রমে সেই সংখ্যা ৪৬-এ নেমে এল। আবার বৈঠকের দিন ৪ঠা নভেম্বর স্থির করে

শ্রীজ্যোতি বসু

দুই পার্টি ফিরে গেল নিজ নিজ রাজ্য কমিটির বৈঠকে পরিস্থিতি আলোচনার জন্য। ৪ঠা বৈঠকে বসে বাম কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীজ্যোতি বসু খোলাখুলি একটা প্রশ্ন শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জীর সামনে রাখলেন। সেই প্রশ্ন হল দুই কম্যুনিস্ট পার্টির বিরোধ ৪৬টি আসনে, কিন্তু দক্ষিণ কম্যুনিস্ট পার্টি এই ৪৬টির মধ্যে কতগুলি আসন অবশ্যই চায়। শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জী জানালেন ২৩টি আসন অবশ্যই চাই। ২৩টি আসনের বিরোধ নিয়ে দুই কম্যুনিস্ট পার্টি ফিরে গেল, তবে শ্রীজ্যোতি বসু বলেছিলেন ৪ঠা নভেম্বর তাঁদের রাজ্য কমিটির বৈঠকে আলোচনার পর এই ২৩টি আসনের বিরোধ কতটা ছাড়া যায় ভেবে দেখে তাঁদের (দক্ষিণ কম্যুস্টিদের) সঙ্গে আবার বসবেন। কিন্তু প্রস্তাবিত সেই বৈঠক আর বসে নি।

৬ই নভেম্বর আবার ১৩ পার্টির বৈঠক। বৈঠকে এই দিন শ্রীজ্যোতি বসু বাস্তব অবস্থার প্রতি সজাগ হতে বলে সকলকে বললেন—সার্বিক ঐক্য হল না, হবে না—আজই সেই ঘোষণা করা হোক। কিন্তু ফরওয়ার্ড ব্লক থেকে বলা হল, না এখনও চেষ্টা করতে হবে। এই দিনের বৈঠকে যদিও ফ্রন্টের সমাধি হয়ে গেল তবু—শ্রীমাখন পাল, শ্রীঅশোক ঘোষ আর শ্রীনরেন দাস দায়িত্ব নিলেন যে, তাঁরা দুই পার্টির মধ্যে আবার একবার আলোচনা করে দেখতে চান। ৯ই নভেম্বর আবার বৈঠক হবে ঠিক করে এবং তিনজন দুই কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে আলোচনার দায়িত্ব নিয়ে সেই দিনের মত বৈঠক শেষ করলেন। ৬ই থেকে ৮ই পর্যন্ত অশোক ঘোষ, নরেন দাস, মাখন পাল দুই পার্টির সঙ্গে আলোচনা করে দেখলেন কোনক্রমেই দুই পার্টির বিভেদের জগদ্দল পাথর বাইরের কারো দ্বারা সরানো সম্ভব নয়। ৯ই তারিখের বৈঠকে বসে সকলে মিলে প্রায় এক সঙ্গে বললেন, পশ্চিমবঙ্গে সার্বিক বামফ্রন্ট গঠনের চেষ্টা এইখানেই শেষ, এরপর যে যার পথে চলতে পারে।

কিন্তু আশার বুঝি মৃত্যু নেই। ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ, শ্রীহেমন্ত বসু, শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ও শ্রীহুমায়ুন কবীর এক নূতন মিশন নিয়ে অগ্রসর হলেন। চারজন বর্ষীয়ান নেতা আবার শ্রীজ্যোতি বসু ও শ্রীভবানী সেনের দ্বারস্থ হয়ে ১২ তারিখ পর্যন্ত চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁদের সেই চেষ্টাও বিফল হল। শেষ চেষ্টা বোধ হয় করলেন শ্রীহেমন্ত বসু। তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন যে, বিরোধকে না বাড়িয়ে বিরোধের আসনগুলি একটি কমিশনের সামনে। মীমাংসার জন্য রাখা হোক। কমিশন বিচার করে যে রায় দেবে সকলে সেই রায় মেনে নেবে। কিন্তু সেই

শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়

প্রস্তাবে কেউ সাড়া তো দিলই না, পরন্তু ১৯শে বাম কম্যুনিস্ট পার্টি এককভাবে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে দিয়ে সার্বিক ঐক্য প্রচেষ্টার শেষ সমাধি রচনা করল। এই তালিকায় ২৮০টি বিধান সভার আসনের মধ্যে ১২২টি, লোকসভার ৪০টি আসনের মধ্যে ১৯টি আসনে প্রার্থী দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। এই তালিকা অনুসারে লোকসভার ৭টি ও বিধান সভার ১৫টি আসনে বাম কম্যুনিস্ট পার্টি বর্তমান বামপন্থী সদস্যদের বিরুদ্ধে প্রার্থী দেবার সঙ্কল্প ঘোষণা করে। লোকসভায় বালুরঘাটে শ্রীসরকার মুর্মুর বিরুদ্ধে, বারাকপুরে শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে, আলিপুরে শ্রীইন্দ্রজিৎ গুপ্তের বিরুদ্ধে, কলকাতা দক্ষিণ কেন্দ্রে শ্রীরণেন সেনের বিরুদ্ধে, হাওড়ায় শ্রীমহম্মদ ইলিয়াসের বিরুদ্ধে, হুগলীতে শ্রীপ্রভাত করের বিরুদ্ধে এবং উলুবেড়িয়ায় ডাঃ পূর্ণেন্দু খাঁর বিরুদ্ধে প্রার্থী দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। বিধান সভায় জোড়াবাংলায় শ্রীভদ্রবাহাদুর হামালের বিরুদ্ধে, বহরমপুরে শ্রীসনৎ রাহার বিরুদ্ধে, সাঁকরাইলে শ্রীদুলাল মণ্ডলের বিরুদ্ধে, চাঁপদানিতে শ্রীগিরিজা মুখার্জীর বিরুদ্ধে, খড়্গপুরে শ্রীনারায়ণ চৌবের বিরুদ্ধে, বড়বাণীতে শ্রীহরিদাস চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে, রাজারহাটে শ্রীপ্রণব রায়ের বিরুদ্ধে, ডায়মণ্ডহারবারে শ্রীজগদীশ হালদারের বিরুদ্ধে, কোচবিহার দক্ষিণে শ্রীসুনীল বাসুনিয়ার বিরুদ্ধে, বলরামপুরে শ্রীপদক মাহাতোর বিরুদ্ধে, যাদবপুরে শ্রীখগেন রায়চৌধুরীর বিরুদ্ধে, দার্জিলিং-এ শ্রীদেওপ্রকাশ রায়ের বিরুদ্ধে, শান্তিপুরে শ্রীকানাই পালের বিরুদ্ধে প্রার্থী দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। যে সকল বামপন্থী প্রার্থীদের বিরুদ্ধে বাম কম্যুনিস্ট পার্টি প্রার্থী দিয়েছে, তার মধ্যে দক্ষিণ কম্যুনিস্ট, ফরওয়ার্ড ব্লক, বাংলা কংগ্রেস, লোকসেবক সঙ্ঘ, গোর্খা লীগ দলের বর্তমান সদস্যারা আছেন।

বাম কম্যুনিস্ট পার্টির ১২ই অক্টোবর তারিখে এককভাবে সকল দলের আসন ভাগ করে তালিকা রচনা ও ১৯শে নভেম্বর এককভাবে প্রার্থী তালিকা প্রকাশই রাজ্যের বামফ্রন্ট গঠনের প্রশ্নকে জটিল করেছে এই বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কারণ, উক্ত দুইটি কাজই আরো পরে করা যেতে পারতো বা আরো আলাপ-আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করেও করা যেতে পারতো, কিন্তু সেটা করা হয় নি। এই সম্পর্কে সর্বাগ্রে দেখা দরকার, এই ঐক্য সঙ্কট সৃষ্টিকারী কাজের জন্য বাম কম্যুনিস্টদের নিজস্ব বক্তব্য কি?

(আগামীবারে সমাপ্য)

ক্যালিডোস্কোপ

মলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ঝলসে ওঠে প্রতিধ্বনির রঙ
উথলে ওঠে যৌবন গভীর
দূরে দেবালয়ে ঘণ্টার ঢং ঢং

তুমি আমি সাজছি সবাই সং
মঞ্চে নামার দৈনিক নজীর
অধিকারীমশায় রেগেই টং

লক্ষ্যভেদে উদ্যত কার তীর
মাখছে মুখে বিদূষক রংচং
অরণ্য মন দুর্বহ অস্থির

পেয়াদা আনে সমন গম্ভীর
কলজেটাতে গিয়েছে পড়ে জং
পুনর্জন্ম প্রয়োজন শিল্পীর।

দিল্লী থেকে—

বহুদিন কেটে গেছে। দুলেরার কোনো খবর নেই। জানেন না জাহান্ আরা প্রিয়তমর হঠাৎ এ উদাসীনভাব এলো কেন। কেন আর তিনি রাজসভায়ও যোগদান করছেন না। কেন ও-মধুকণ্ঠে দিল্লীবাসী শুনতে পাচ্ছে না মীরার অমিয়ঢালা ভজন। তারা তো আর কোনো দোষ করে নি?

কোনো অশোভন আচরণ করে নি কেউ রাজদরবারে? ভারি অভিমানী লোক। যেন ছোট্ট শিশুটির সরল মন। আজকাল কখনও এ রকম মন নিয়ে চলা যায়! মানুষ মানুষকে দিচ্ছে না তার প্রাপ্য সম্মানটুকু। ভালবাসা তো হৃদয়ের কথা। কে জানে কবে কোন্ পথে হয়ত নজবৎ খানই তাঁকে ধরে অপমানিত করেছে কি না।

নজবৎ খানকে দেখলে জাহান্ আরার সর্বাঙ্গ যেন জ্বলে যায়। আজকাল কি হয়েছে তিনি নিজেই জানেন না। লোকটাকে দেখলে মুখ দিয়ে যেন কথাটুকুও বেরোয় না। লোকটাকে আগে কিন্তু জাহান্ আরা এতখানি ঘৃণা করতেন না। তবুও লোকটা বেহায়ার মতন আশে পাশে ঘুরে বেড়ায়। সর্বদাই যেন খোঁজে একটা নিরালা নিভৃত পরিবেশ। জাহান্ আরা জানেন কখন কোথায় নজবৎ তাঁকে কিভাবে অনুসরণ করে চলেছে। তিনি জানেন এ পথকুক্কুরের এ আচরণের প্রত্যুত্তর।

কি সাহস?

সেদিন সাইপ্রাসবীথিতে একাকিনী বসেছিলেন রাজেন্দ্রনন্দিনী। মনটা কিছুক্ষণের জন্য যেন অন্য জগতে ছুটে গিয়েছিল। আকাশে মেঘের খেলা দেখছিলেন জাহান্ আরা। পাশে পিয়াল গাছের ডালে ঝুলছিল মাধবীলতা। ফুল ফুটেছে। মন মাতানো গন্ধ ছেয়ে ফেলেছে প্রাসাদ। নার্গিস, হাসনাহানা যেন গন্ধে অন্ধ করে দিতে চলেছে সবাইকে। চামেলীর হার দিয়ে সাজিয়েছে তাঁকে দরিয়া। মনে সুখ আছে। প্রাণে সুখ আছে। সর্বাঙ্গে যে তার যৌবনের ছোঁয়া। এই সখীপ্রাণা দরিয়া, মরিয়ম না থাকলে বোধ হয় জাহান্ আরা বাঁচতেই পারতেন না।

দুঃখ হয় মাঝে মাঝে গুলরুখের জন্য। ভারি মিষ্টি ছিল মেয়েটার ব্যবহার। মাটিতে যেন পাটুকু পড়তো না। নেচে নেচে চলতো। কথা কইতো মুখে নাকে চোখে। কানে কানে ফিস ফিস করে বলতো তার ছোট্ট জীবনের প্রণয়কাহিনী। ভারি সরল ছিল তার মন। নেচেই মরলো।

যখন তখন, কারণে-অকারণে নাচতো গুলরুখ। জাহান্ আরা জানতেন এ নাচের কারণ। শুধু বিরহিণী রাজ-নন্দিনীর প্রাণে একটু আনন্দ ঢালাই ছিল

শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

তার একমাত্র উদ্দেশ্য। গুলরুখ নাচছিল নাচঘরের পাশের অপরিসর বারান্দার পাশে। ওর যে জায়গারও বিচার-আচার ছিল না। পাশে জ্বলছিল শত প্রদীপের ঝাড়লণ্ঠন। নাচের তালে আপন ঝঙ্কারে তার মন মাতিয়েছে কোন্ মাতাল? ঢাকাই মসলিনের ওড়নায় ধরলো আগুন। নবযৌবনের আগুন জ্বলছে যার বুকে অগ্নিশিখার দিকে তাকাবার তার সময় কোথায়?

জাহান্ আরা তাড়াতাড়ি ছুটে আসেন গুলরুখকে বাঁচাতে। এ বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা কোথায়? চিরদিন যাঁরা শুধু সেবা গ্রহণই করেন, সেবা করার অভ্যাস-টুকু তাঁরা পাবেন কেমন করে? তবুও কোমল মন টেনে নিল বেদনাহতের কাছে। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ স্পর্শ করলো রাজকন্যার সর্বাঙ্গ। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো আগুন। যে আগুন এতদিন জ্বলছিল শুধু হৃদয়ে সেই আগুনই আজ ব্যাপ্ত হল সর্বাঙ্গে। অজ্ঞান রাজকন্যার দেহতনু লুটিয়ে পড়লো প্রাসাদ অঙ্গনে।

সম্রাটের কানে পৌঁছুলো সংবাদ। রাজা কর্ণেন পশ্যতি। এ ঘটনা যে কর্ণ দিয়ে দেখলে চলবে না: ২৫৩ ...
সম্রাট শাহ্জাহান সব রাজকাজ ফেলে। জাহান্ আরা যে তাঁর জান্। তাঁর জীবন গেলে এ দুনিয়াতে তিনি কি নিয়ে থাকবেন?

চৈতন্য তখনও ফেরে নি। সম্রাট শাহাজাহান শিশুর মতন আকুল ক্রন্দনে রাজসভাকে বিস্মিত করে দেন। সম্রাট হলেও তিনি যে মানুষ। পিতৃহৃদয় মানে না কোনো বাধা। সর্বজনসমক্ষে শাহজাহান নতজানু হয়ে বিশ্বপিতার চরণে জানান আকুল প্রার্থনা। জাহান্ আরার জীবন প্রার্থনা।

হাকিম এলো। এলো দিল্লী আগ্রার সেরা কবিরাজ বৈদ্য। সবার এক কথা। রাজকন্যার জীবন বাঁচানো দায়।

সামান্য জ্ঞান এসেছে ফিরে।

কিন্তু এরা সব কারা পাশে দাঁড়িয়ে! এরা কি চায়? একি? নতজানু হয়ে সম্রাট তখন থেকে কি করছেন? জাহান্ আরার অবসন্ন চোখ চারিদিকে দৃষ্টি ফেলে খুঁজছে শুধু একটি মানুষকে। কোথায় সেই প্রাণের মানুষটি? দিলের রাজা দুলেরা? অদূরে দাঁড়িয়েছিলেন যুবরাজ প্রিয়তমা রাণা দিল্। জাহান্ আরার চোখ খুলেছে দেখেই তিনি এগিয়ে এলেন। বসলেন পাশে। স্বর্ণাঙ্গ জ্বলে পুড়ে একি হলো? কার অভিশাপে?

রাণার মাথা নাড়াতে জাহান্ আরা অবাকভাবে তাকিয়ে থাকেন তাঁর দিকে।

সত্যি বলছো রাণা দিল? ভাবীজান তিনি একবারও আসেন নি আমাকে দেখতে? মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকেন রাণা দিল! বাদশা বেগমের অন্তঃপুরে কি করে আসবেন রাজপুত ছত্রশাল দুলেরা? হ্যাঁ তিনি থাকতে পারেন রাজকন্যার হৃদয় অন্তঃপুরে। প্রাসাদে প্রবেশ করার পথ কোথায়?

জানো রাণা, তোমরা দিন-রাত এত সেবা করছো আমার। দরিয়ার তো চোখের ঘুম গেছে ক'দিনে। তুমি এত রাত জাগছো। সম্রাট এত সহস্র কুর্নিস পেশ করছেন খোদাতালাকে এর কোনোটাই যেন আর আমার মন টানে না। ভেবে-ছিলাম অন্তত এইবেলা তাঁর স্পর্শটুকু পাবো। তাঁর হাতের ওপর মাথাটা রেখে মরলে আমি যে তোমাদের ইন্দ্রপুরীও চাই না। আমি চাই না বেহেস্ত। তুমি জানো সত্যি তিনি একদিনও আসেন নি আমাকে দেখতে?

কম্পিতকণ্ঠে রাণা দিল্ কি যেন বলেন। শোনা যায় না।

জাহান্ আরা আপন মনে আবৃত্তি করেন। স্বগতোক্তি। তাঁর এ বেদনা রাখার যে জায়গা নেই কোথাও। প্রদীপের আগুন আর কত ব্যথা দিয়েছে তাঁকে। প্রিয়তমের উদাসীন ভাব, তার বিরহ আগুনে যে তিলে তিলে তাঁকে দগ্ধ করে

চলেছে প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ, প্রতি পল অনুক্ষণ। এ প্রাসাদে কে বুঝবে এ দহন-জ্বালার গভীরতা?

সম্রাট ছেড়ে দিয়েছেন রাজকাজ। ছেড়ে দিয়েছেন আহার নিদ্রা। শুধু কন্যার জীবনটুকু ছাড়া বিশ্বপিতার চরণে আর তাঁর নেই কোনো ভিক্ষা।

সসাগরা হিন্দুস্থানের শাহানশা বাদশার এ কি ভিখারীর বেশ? এ কি আকুল প্রার্থনা? এ কি আকুল আকৃতি? অপত্যস্নেহ। মায়ার গভীর বন্ধন মানুষকে করে মোহান্ধ। রাজাকে করে ফকীর। ফকীরকে করে রাজা। এ ধনে যে ধনী নয় এ ধনের মর্যাদা সে কি করে বুঝবে? সম্রাট জাহান্ আরার অসুস্থ শয্যার পাশেই কাটান অষ্টপ্রহর। জাহান্ আরা প্রাণাধিক প্রিয় পিতার সর্বক্ষণ উপস্থিতিতেও যেন বিরক্ত বোধ করেন আজকাল। কি করে আসবেন এখানে দুলেরা?

নিজেই ভাবেন মাঝে মাঝে সেই বীর-হৃদয় নিশ্চয়ই বেদনার ভারে অবনত। দুলেরা কি জানেন না জাহান্ আরার এ দুর্যোগের কথা? এ দুর্ঘটনার কাহিনী যে হিন্দুস্থানের নগরে নগরান্তে, গ্রামে গ্রামান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। সবার মুখেই যে শুধু এক কথা। শাজাহানের দীনহীন ফকীর বেশের কথা। তাঁর রাজকাজে পূর্ণ ঔদাসীন্যের কথা। যে রাজ্য জয়ের নেশায় জীবনের পূর্ণ যৌবনটা গেল কেটে শুধু রণাঙ্গনে, সেই রাজ্যে পূর্ণ বিতৃষ্ণার কথা। রাজ্য যায় যাক। প্রাণের প্রিয় কন্যার জীবন চাই খোদাতালা। এ প্রার্থনা যে শুনেছে অনেকে কানে।

কোত্থেকে সেদিন কে এসে জানালো আরিফের কথা। আরিফ আফ্রিকান ক্রীতদাস। ঔরঙ্গজেবের ক্রীতদাস। সে নাকি চিকিৎসা করতে চায়।

সবাই বললে সে কি কথা? রুই কাৎলা গেল তল, পুঁটি বলে কত জল? হিন্দুস্থানের নামকরা হাকিম, কবিরাজ, বৈদ্য কেউই বাদ যায় নি। তারা সব হিম-সিম খেয়ে গেল। এখন আফ্রিকার ক্রীত-দাসের চিকিৎসা!

কে জানে কেন সম্রাটের কি খেয়াল হলো। শাজাহান ডাকলেন ক্রীতদাসকে।

কি নাম বললে? আরিফ? জানো কিছু ডাক্তারি? তবে? মলম বানাতে জানো? শুধু মলমে কি সারবে এ জীবন? বেশ। সবাই যখন জবাব দিয়ে গেছে স্বতঃপ্রবৃত্ত এ সেবা প্রত্যাখ্যানের কি দরকার?

এগিয়ে আসে আরিফ। ঔরঙ্গজেব তখন বেকার। দাক্ষিণাত্যের ভার অর্পিত ছিল তার উপর। শাজাহানের হুকুমেই গেছে তাঁর ক্ষমতা।

তাহলে ধূর্ত ঔরঙ্গজেবও এসেছে রাজধানীতে। না হলে তার ক্রীতদাস এলো কোত্থেকে?

আশ্চর্য ঘটনা।

ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন জাহান্ আরা। শাজাহানের মুখে ফুটলো হাসি। রাজ্যের বর্ষাক্রান্ত আকাশে দেখা দিল রামধনু। আলোর রশ্মির পূর্বাভাস। সত্যি সত্যি সেরে উঠলেন জাহান্ আরা। আরিফ-এর ওষুধেই নিশ্চয়। কেউ বা বলে শুধু সম্রাটের আকুল প্রার্থনায়। রাজ্য জুড়ে হলো মহোৎসব। রাজভাণ্ডার খুলে দিলেন শাজাহান নিজহাতে। আগ্রায় দিল্লীতে শহরে শহরে হলো উৎসবায়োজন। রাজকন্যার মুখে তবু হাসি নেই। শাজাহান চিন্তায় কাতর হয়ে পড়েন। দু'হাতে সবাইকে দান করেন সম্রাট।

ধূর্ত ঔরঙ্গজেব এ সুযোগ ছাড়বে কি?

কোথায় লুকিয়ে বসেছিল। চুপ করে এসে পড়লো জাহান্ আরার পায়ে। 'আমি এসেছিলুম বলেই তো আমার ক্রীতদাস আরিফ বাঁচালো তোমাকে। আমাকে কিছু দেবেন না সম্রাট?

'তোমার জন্য আমি কি করতে পারি বলো।'

'তুমি কি না করতে পারো? হিন্দু-স্থানের চাবিকাঠি তো তোমার হাতে। সম্রাট তোমার কথায় ওঠেন বসেন। তোমার অসুস্থতার সময়ে রাজকাজ ছেড়ে, স্নানাহার ছেড়ে দিনের প্রতিটি মুহূর্ত কিভাবে কাটিয়েছেন আমরা দেখি নি কি?'

'বেশ তো। কি বলবো তোমার হয়ে?'

'শুধু বলো আমার দক্ষিণাবর্তের পরিচালনাভার আমার হাতে ফিরিয়ে দিতে। তাহলেই আমি খুশি।'

শুনে সম্রাট শাজাহান প্রিয় কন্যার চিবুকে হাত দিয়ে বললেন, 'এ তো অতি সামান্য প্রার্থনা। তুমি কি জানো না তোমার জন্য আমি জীবনটুকুও বিসর্জন দিতে পারি জাহান্ আরা।'

জাহান্ আরা তা জানেন। তবুও মুখ ফুটে বলতে সাহস পান না, চাই না রাজ্য, চাই না সম্পদ, ঐশ্বর্য, প্রাসাদ। শুধু দাও প্রাণের মানুষটিকে পাশে রেখে জীবন-সাথী হিসেবে গ্রহণ করতে।

মুখে এসে পড়ে। ঠোঁটে বাধে। বলি বলি করেও যে ঠিক বলে উঠতে পারেন না। দারার সাথে যখন রাণা দিলের পরিণয় হতে পারে তখন দুলেরার সাথে তাঁর পরিণয়ের বাধা কোথায়? আকবর বাদশার হুকুম? কেন সম্রাট শাজাহান হুকুম পরিবর্তন করতে পারেন না কি?

না বলা বাণী ঘন যামিনীর অন্ধকারের মতনই মনকে ঘিরে থাকে।

মেয়ের মুখে আঁধার দেখে শাজাহান ভাবেন আলোর দ্যুতি কমেছে কি এ দীর্ঘ অসুস্থতায়?

রাজ্য ফিরে পেলো ঔরঙ্গজেব। জাহান্ আরাই ফিরিয়ে দিলেন। না জেনে জাহান্ আরা নিজের জীবনে ডেকে আন-লেন ঘন কালো আঁধার! কে জানতো এই ধূর্ত ঔরঙ্গজেবই একদিন জাহান্ আরার জীবনের সব আশার আলোটুকু কেড়ে নেবে!

দুলেরাকে ভালবাসেন দারা। দারার বন্ধু ছত্রশাল দুলেরা। দারা তাঁকে 'রাও' বলে ডাকেন। দুজনের ভারি ভাব। লজ্জার কথা। দারা সব কিছু জেনে ফেলেছেন। প্রিয় অনুজ। যুবরাজ দারাকে লুকোনো গেল না। বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যুবরাজ দারা, দিল্লীর সিংহাসনে বসে তাঁর প্রথম হুকুম হবে আকবর বাদশার হুকুম বদলে বাদশা বেগমকে পরিণয়ের অনুমতি দান। জীবনের প্রতিটি ক্ষণ যে জাহান্ আরা সেই শুভ মুহূর্তের প্রতীক্ষায় রয়েছেন রত। কবে আসবে সেই শুভদিন। কবে রাজার বেশে বসবেন শাহ্ বুলন্দ একবার—দিল্লীর সিংহাসনে। শাহ্ বুলন্দ্ একবাল—ভাগ্যবান শাহ্‌জাদা!

দারার রাজ্যাভিষেকের স্বপ্নের সাথে যে মেশানো রয়েছে জাহান্ আরার ফুল-শয্যার রোমাঞ্চ। সে কথা কি জানেন না হৃদয়-দেবতা দুলেরা? তবে? তবে এ দীর্ঘ বিরহানলে তাঁকে একাকিনী পুনর্দাহনের অর্থ কি? হিন্দুদের মৃত্যুর পর অগ্নিতে দাহ করা হয়। এ দেহ তো একবার জ্বলে গেছে। মনটাকেও এরকম পলে পলে তিলে তিলে জ্বালিয়ে দুলেরা কি পাচ্ছেন কোনো নতুন অনুভূতি? না হলে এরকম দূরে দূরে পালিয়ে বেড়াবার মানে কি? তিনি কি জানেন না দিল্লীর এ রাজপ্রাসাদে নেই কোনো শক্তি যা তাঁর নখাগ্র স্পর্শ করতে পারে যতদিন বাদশা বেগম জাহান্ আরার দেহে আছে প্রাণ।

তবে?

তবে তিনি কি ভয় পাচ্ছেন লোক-লজ্জাকে? জাহান্ আরার সর্বাঙ্গে একটা রোমাঞ্চের শিহরণ খেলে গেল। দুলেরার নামোচ্চারণেও তাঁর দেহে জাগে অভিনব অনুভূতি। তাঁর চিন্তাতেও মনে খেলে অপূর্ব শিহরণ। নিরালা নিভৃতে অলস মুহূর্তে রাজপুতবেশে মেঘের খেলায় তন্ময়চিত্তে দুলেরার কখনও মনে পড়ে কি তাঁর দুখিনী অবহেলিতা বান্ধবী জাহান্ আরার কথা?

অস্ট্রেলিয়া থেকে লিখছি

সুরেশ চন্দ্র সাহা

সিডনির মহারাণী

মেলবোর্নের এক ভদ্রমহিলার ঘরে বসে গান শুনছিলাম। রেকর্ড-প্লেয়ারে বেজে চলছিল বাংলার লোকসংগীত। ভাটিয়ালী। কীর্তন। বাঁশি—যমুনার তীরে রাধা-কাঁদা বাঁশির সুর। সামনের টেবিলে কাঠের রেকাবে কেক ছিল, অজন্তা গুহার নক্সা-কাটা পেয়ালায় চা ছিল। রেকাবের কেক, পেয়ালার চা অমনি পড়ে রইল। অস্ট্রেলিয়ার প্রবাসে ইংরেজী কেতা-কানুন পরিবেশের মধ্যে অনেক দিনের রুদ্ধ বাঙালী আবেগ, বাঙালী মন, বঙ্গ-মানস বেদনা মুহূর্তে মুক্তি পেল। মনে হল অনেক দিনের হারানো সুরটি যেন ফিরে পেয়েছি।

গৃহকর্ত্রী মিসেস স্টিভেনসন জাতে ইহুদি। বিয়ে হয়েছিল খৃস্টধর্মাবলম্বী অস্ট্রেলিয়ানের সঙ্গে। বিবাহবিচ্ছেদের পর মেলবোর্নের তুরাক অঞ্চলে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নিয়ে একমাত্র কন্যা লোরেনের সঙ্গে বাস করছেন। লোরেন শিল্পী। তিন মাস পর বিয়ে হবে—এখন বসে বসে ছবি আঁকছে।

মিসেস স্টিভেনসন মেলবোর্ন শহরে ভারতীয় হস্তশিল্পের রকমারি জিনিসের দোকান খুলেছেন। নাচে, গানে, চিত্রে ভদ্রমহিলার অশেষ অনুরাগ। ভারতীয় নৃত্য গীত চিত্রের অনুরাগ। এলবাম থেকে ছবি দেখালেন—সিডনির রঙ্গমঞ্চে চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের ভূমিকায় মিসেস স্টিভেনসন সহ অনেকের ছবি। না-বলা পর্যন্ত বুঝি নি শাড়ি পরা দীর্ঘ কেশের বেণীবন্ধনে ফুল-গোঁজা ফুলের গয়নাপরা সব অস্ট্রেলিয়ার মেয়ে কবিগুরুর নৃত্যনাট্যে এমন করে অভিনয় করেছিলেন। এ তো চিত্রাঙ্গদা নাটকের রূপদান নয়, ভারতীয় মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়ে যেন একেবারে ভারতীয় হয়ে পড়া। এত গীত, এত সুর, বিদেশের বিজাতীয় ঘরে এমন অভাবনীয় ভারতীয় রুচি সৃষ্টির নেপথ্যে রয়েছেন একজন বাঙালী ঘরের মেয়ে—কুমারী জ্যোতিকণা রায়। মিসেস স্টিভেনসনের বন্ধু। সিডনির মহারাণী। অপর দুই ভারতীয় রেবতী উপাধ্যায়, রবীন্দ্র বিশ্বাস এবং আমি যখন বাঁশির সুরে তন্ময় ছিলাম, মহারাণী মিসেস স্টিভেনসনের রান্নাঘরে বসে তখন মাছের ঝোল ভাত রাঁধছিলেন।

জ্যোতি রায়ের পূর্বপুরুষের বাস ছিল শান্তিপুরে। পিতার কর্মস্থল লক্ষ্ণৌ শহরে তাঁর জন্ম। চৌদ্দ বছর বয়সে কলকাতায় এসে পড়ার জীবন শুরু করলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের দূর-বংশে জন্মসূত্রে জ্যোতি রায়ের পরিবার ত' রক্ষণশীল হওয়ার কথা নয়। কিন্তু তাঁর মা-বাবার আপত্তি ছিল নাচে গানে। ঘরে বসে নাচ শিখতে সাহায্য করলেন হরেন ঘোষ। মাসতুতো বোন সাধনা বোস হলেন তাঁর নৃত্যশিল্পের প্রেরণা। তারপর কত নাচের আসর গানের জলসা জমে উঠল জ্যোতি রায়ের প্রতিভায়। পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল ডাঃ কাটজু বিশেষ মুগ্ধ হলেন। ভারতীয় সংস্কৃতির জয়গান করতে তাঁকে দলনেত্রী করে দেশের বাইরে পাঠালেন। সিঙ্গাপুর, হংকং হয়ে গান গেয়ে, নাচ দেখিয়ে জ্যোতি রায় এলেন সিডনিতে। এলেন আর থেকে গেলেন।

সরকারী কাজে ইস্তফা দিয়ে জ্যোতি রায় ছ'মাসভরে খুব করে অস্ট্রেলিয়া দেখলেন; ভাবলেন একটা কিছু করা দরকার। শুরু করলেন থাই সিল্কের ব্যবসা। কিন্তু মন ছিল তাঁর অন্য দিকে—একদিন তাই সিডনির কিংস ক্রস অঞ্চলে রেস্তোরাঁ খুললেন; ভারতীয় খাবারের দোকান। নাম দিলেন মহারাণী। কিছুদিন পর হঠাৎ একদিন তাঁর অস্ট্রেলীয় পার্টনার বেঁকে বসলেন—হয় আমাকে বিয়ে কর, নয়ত আমার অংশের টাকা ফেরৎ দাও। জ্যোতি রায় বললেন—তখন তো আর টাকার জোর ছিল না; মাত্র পাঁচ শ' পাউণ্ড—হাজার পাঁচেক টাকার বেশি তো নয়। কিন্তু বিয়ের প্রস্তাবই বা কি করে মেনে নিই—বর জোটাবার জন্য ত' আর বাংলাদেশ ছেড়ে অস্ট্রেলিয়ায় এসে হোটেল খুলি নি। সুতরাং অংশীদারকে বললাম—বিদায় হও। ভাবলাম নিজের শক্তিটাকে এইবার পরখ করা যাবে।

শক্তি পরীক্ষায় যে জ্যোতি রায় জিতেছেন তার প্রমাণ আজকের মহারাণী। লণ্ডনের কিংস ক্রসের সঙ্গে যাঁরা বৃথাই তুলনা করেন, তাঁদের জানা দরকার সিডনির কিংস ক্রসের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ধরণের। এখানে লণ্ডনের মত রেল স্টেশন নেই, তবে অসংখ্য খাবারের দোকান আছে। সেখানে মহারাণী আপন বৈশিষ্ট্যে সবার চেনা। মহারাণী আজ শুধু একটি হোটেল-রেস্তোরাঁ নয়, একটি বিশেষ নাম। সিডনি শাখার ভারতীয় দূতাবাসের বার্তা-সচিব জ্যোতির্ময় মৌলিক জ্যোতি রায়কে রহস্য করে বলেন রায় সাহেব। রায় সাহেব নিজেকে পরিহাস করে বলেন রায়বাঘিনী। সিডনির লোকে তাঁকে বলে মহারাণী।

মহারাণীকে যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা দিতে জ্যোতি রায়কে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছিল, নিজে হাতে রান্না আর বাসন ধোওয়ার কাজ করতে হয়েছিল, অবাঞ্ছিত বিয়ের প্রস্তাব উপেক্ষা করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয়েছিল। তারপর একদিন তাঁর আর একজন অংশীদারও জুটল; মাইনে দিয়ে রান্নার লোক কাজের লোকও নিয়োগ করলেন। এবার তাঁর অনেক অবসর। খুললেন নাচের ক্লাশ আর গানের ক্লাশ। ভারতনাট্যম থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখার জন্য ভিড় বাড়ল। নিজের আয়েস আর আরাম থেকে কিছুটা ছাঁটকাট করতে হল। যখন সিডনির আর এক প্রান্তে আর একটি দোকান খুলে ভারতীয় মাল অস্ট্রেলিয়ায় জনপ্রিয় করার কাজে লেগে গেলেন—ইণ্ডিয়ান হ্যাণ্ডিক্র্যাফ্ট্ গুডস্। তখন সিডনিতে আরও পাঁচজন ভারতীয় ব্যবসায়ীও ছিলেন—কিন্তু তাঁদের লক্ষ্য শুধুই টাকা, যেনতেন প্রকারে রোজগার বাড়লেই হল। ভারতীয় মাল, ভারতীয় রুচি, ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিদেশীর আগ্রহ বৃদ্ধি করতে তাঁদের দায় পড়েছে। জ্যোতি রায়ের ভিন্ন পথ। সিডনিতে প্রথমেই তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে, তাঁর লক্ষ্য মূলত অভারতীয়—অভারতীয় মানুষদের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য কারি ভাত শাড়ি, হ্যাণ্ডিক্র্যাফ্ট্ গুডস্ চালু করলেন, ভারতনাট্যম রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির স্বাদ বিতরণ করলেন। সিডনিতে থাই সিল্কের প্রচলন যেমন প্রথমে তাঁর মাধ্যমেই হল, তেমনি একদিন প্রচলিত হল ব্যাঙ্গালোরী সিল্ক, ভারত থেকে আমদানি করা পেতলের ফুলদানী, কাঠের কাজ করা ছোট টেবিল, কাঠের ট্রে বারকোশ রেকাব, কাঠের টেবিল লণ্ঠন। মহারাণীর সার্থকতার প্রমাণ এই, সিডনি থেকে মেলবোর্ন, মেলবোর্ন থেকে এডিলেডে তাঁর কর্মকেন্দ্রের বিস্তার। ভারতীয় দূতাবাসের লোকেরা বিদ্যা-বুদ্ধি স্বদেশপ্রেম থাকা সত্ত্বেও যখন মনে করেন দূতাবাসের টাকা খরচের ক্ষমতা আরও বেশি থাকলেই ভারতের জন্য

আরও বেশি কাজ করা সম্ভব হত, তখন রবিশঙ্কর, উদয়শঙ্কর, জ্যোতি রায়রা লোকের মন কত সহজে জয় করেন, দেশের কত মঙ্গলই না সাধন করেন।

মহারাণীর আমন্ত্রণে খেতে গিয়েছিলাম তাঁর কিংস ক্রসের রেস্তোরাঁয়। একটি অনতিবৃহৎ হলঘর। গোটা কতক মোরাদাবাদী পেতলের লণ্ঠনে মৃদু আলো জ্বলছে। মধ্য-ঘরের দেয়াল ঘেঁষে আলপনা-আঁকা ছোট টিপয়ে মঙ্গলঘট। একদিকের দেয়ালে নটরাজের বৃহৎ চিত্র অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে। তার পাশে কার্পেটে কাজ করা মণিপুরী নৃত্যের দৃশ্যপট। অপর দিকে খাজুরাহের চিত্র-প্রদর্শনী। মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, পণ্ডিত নেহরু ঘর জুড়ে বিরাজ করছেন। এক পাশে রঙ করা চটের পরদায় করাচী থেকে কেনা উটের চামড়ার রঙীন দীপের আলো পড়ে একটা রহস্যময়তার আভাস এনেছে। ছোট ছোট সব টেবিলে ফুল তোলা টেবিলক্লথ; দু'জন দু'জনে মুখোমুখী বসে সবাই খাচ্ছে। কাঠের বারকোশে পরিবেশিত পাঁপড় ভাজায় বিশেষ ভঙ্গীতে বুড়ো আঙুলের চাপ দিয়ে মুড় মুড় করে ভেঙে মুখে ফেলছে। একটি বিশেষ দম্পতি এসে বসলেন। সদ্য বিবাহিত। বড় ব্যস্ত ভাব। প্লেন ধরবেন ইউরোপের পথে। যাওয়ার আগে একটু বিশেষ খাবার খেয়ে মুখ বদলাবার জন্য এসেছেন মহারাণীর দ্বারে। জিজ্ঞেস করলাম—এ খাবার তোমাদের ভাল লাগে? দু'জনে প্রায় এক সঙ্গে বললেন—এ পর্যন্ত যত খাবার খেয়েছি তার মধ্যে সবার সেরা মহারাণীর খাবার। এপাশ-ওপাশের অনেক জোড়া চোখ দেখে বুঝলাম এই মন্তব্যে তাদের পূর্ণ সমর্থন আছে, শুধু জিজ্ঞেস করা হয় নি বলে মুখ খুলতে পারছে না।

ভারতীয় লোকেরা মহারাণীর খাবার খেতে গিয়ে নিয়ন আলোর ঝলকানি, বাসন-কোসনের জেল্লা, দামী দামী পরদা না দেখে মনে মনে ভাবে—বড় গরিবী বন্দোবস্ত! মহারাণী এসব শুনে অস্ট্রেলীয় খদ্দেরদের কাছে বলেছিলেন—কিংস ক্রসের আর সব সভ্য-ভব্য রেস্তোরাঁর মত এটিকেও চটকদার করলে কেমন হয়? তাঁরা ব্যগ্র হয়ে বলেছিলেন—দোহাই মহারাণীর, এখানকার ভারতীয় পরিবেশটিকে বিদায় কোর না, আমাদের কারি ভাত খাওয়ার শান্তিটুকু কেড়ে নিও না।

কোণের দিকে একটি টেবিল দখল করে মহারাণীর সঙ্গে বসে খেতে খেতে গল্প আর গল্প করতে করতে খাচ্ছিলাম। মহারাণী বললেন—ডিনারের আগে একটু কিছু পান করার ভদ্রসম্মত রীতি আছে। আমি বললাম—সে ত' বিলেতি কায়দা; কারি ভাতের সঙ্গে অচল। মহারাণী বললেন—কিন্তু কারি ভাতটা খাচ্ছেন ত' সিডনিতে বসে। আমি বললাম—আমারও একটু পান-দোষ আছে, তবে খাওয়ার শেষে। যদি মিষ্টি পান একটা খাওয়াতে পারেন ত' খুশি হই। আমাকে খুশি করার উপায় মহারাণীর ছিল না, কারণ সিডনির হাটে কেউই পান বেচে না।

ককটেলের কত রকম মিকশ্চার মহারাণীর জানা আছে সে কথা জিজ্ঞেস করি নি। কিন্তু সেদিন এক অদ্ভুত পানীয়ের স্বাদ পেলাম। খুব খানিকটা মধুর সঙ্গে অল্প একটু জিন, কয়েক ফোঁটা ভারমুথ, একটু গোলাপ নির্যাস, একটুকরো বরফ। তার উপর সামান্য আপেল কুচি। ইটালীয়ান টামব্লারে পরিবেশিত। খেয়ে বললাম—এ কি মহারাণী-স্পেশাল নাকি?

মহারাণীর নিজের গেলাসে ছিল হুইস্কি আর বরফ; হাতে সিগারেট। গেলাসের বরফ গলে জল হল, হাতের সিগারেট পুড়ে ছাই হল। খেলেন না কি খেতে ভুলে গেলেন জানি না। অথচ এই মহারাণী কখনও গেলাসের পর গেলাস গিলেই চলেছেন, রাশি রাশি সিগারেট টেনেই চলেছেন। আবার হয়ত ক' মাস হুইস্কি, সিগারেট, বীয়ার, ব্র্যান্ডি একেবারে বন্ধ—খাওয়ার কথা মনেও হয় নি, কোন উপলক্ষও ঘটে নি।

তখন জেনারেল কারিয়াপ্পা অস্ট্রেলিয়াতে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত। সিঙ্গাপুর হঙকঙ হয়ে জ্যোতি রায় সিডনিতে এসেছেন। সিডনির অপরিচিত পরিবেশ দেখে মনটা মোচড় দিয়ে উঠেছিল, ভেবেছিলেন পত্রপাঠ বিদায় হবেন। প্রাক্তন সেনাপতি কারিয়াপ্পা আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন—কিচ্ছু ঘাবড়িও না জ্যোতি। সব ঠিক হবে'খন। সত্যি সব ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছিল কারিয়াপ্পার ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপে: সিডনি ভাল লাগতে শুরু করেছিল. প্রাথমিক 'নারভাস' ভাব কেটে গিয়ে মনটা ক্রমে আত্মস্থ হয়েছিল। তারপর জেনারেলের আহ্বানে কতবার জ্যোতি রায় ক্যানবেরায় গিয়েছেন, প্রজাতন্ত্র দিবসে সাংস্কৃতিক সম্মেলনে গান গেয়েছেন নাচ দেখিয়েছেন।

কারিয়াপ্পা ছিলেন একটু ভিন্ন ধরণের রাষ্ট্রদূত। ক্যানবেরার খাস দূতাবাসে যখন প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হচ্ছে তখন আবার সিডনিতে আলাদা অনুষ্ঠান করে খরচের দরকারটি কি? সুতরাং ট্রাক ভরা সব ভারতীয় ছাত্র অ-ছাত্রকে ক্যানবেরায় নিয়ে গেছেন, ব্যক্তিগতভাবে প্রায় সবার সঙ্গে অন্তত একটি করে কথা বলেছেন, তারপর জলযোগ করিয়ে বিদায় দিয়েছেন। সবাই পেয়েছে তাঁর প্রাণের স্পর্শ; অভারতীয়রা মুগ্ধ হয়েছে তাঁর সৈনিকোচিত আচরণে।

অনেক দিন পরের কথা। জ্যোতি রায় তখন জেঁকে বসেছেন। তাঁর হাতে একদিন জ্বলন্ত সিগারেট দেখে জেনারেল কারিয়াপ্পা বললেন—শাড়ির সঙ্গে সিগারেট কি খাপ খায় জ্যোতি? খুব জোরে সিগারেটে টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে জ্যোতি রায় বলেছিলেন—বেখাপটি যে কোথায় আজও ত' বুঝে উঠতে পারলাম না, জেনারেল। কালাপানি পার হয়ে সিডনিতে এসে থাই সিল্কের ব্যবসা করাও কি ভারতীয় মেয়ের পক্ষে খুব খাপ খাওয়ানো কাজ?

টেবিলে টেবিলে খাবার পরিবেশন করছিল শার্দুল সিং। পাঞ্জাবী যুবক। শিখ। দাড়ি গোঁফ পাগড়ি আছে, হাতের কব্জীতে লৌহবলয়ও আছে। চেহারাতে খুব যে একটা ঐশ্বর্য আছে তা নয়, অথচ হঠাৎ দেখলে চট করে এড়ানোও যায় না। এ এক বিশেষ ধরণ—অনেকটা পুস্তক প্রকাশকের দোকানে পার্ট টাইম কাজ করা গরীব প্রফেসারের মত, যিনি দুপুরে অখ্যাত কলেজে লেকচার দেন, বিকেলে মেড ইজি নোট লেখেন। শার্দুল সিং ঘটনাব নানা অভিঘাতে সিডনিতে এসে জুটেছিল। তখন বয়স কম। নেহাৎ শুভবুদ্ধির উদয়ে পড়াশুনার পথ বেছে নিয়েছিল। জেনেটিকসের পি-এইচ-ডি পাওয়া শার্দুল সিংয়ের পড়াশুনার কাজ সবে শেষ হয়েছে। কিন্তু যে মহারাণীর দরবারে এসে একদিন সে হাজির হয়েছিল পেট ও পড়ার খরচের টাকা রোজগারের ফিকিরে, সে দরবার ছেড়ে এখনও দূরে যায় নি।

আজ মহারাণী নিজে রান্না করেছেন। ভাত, সর্ষের তেল প্রলিপ্ত উচ্ছেভাতে, ঢেঁড়স ভাজা, পেঁয়াজ লঙ্কায় মশুর ডাল, মাছের ঝোল; রসম। খাওয়ার শেষে দৈ আর পেঠা। পেঠা হল উত্তর ভারতীয় মিষ্টি। খাওয়ার ব্যবস্থাটা বাঙালীর মত তেতো থেকে শুরু হয়ে মিষ্টিতে শেষ হলেও তার মধ্যে ছিল একটি সর্বভারতীয় বৈচিত্র্য।

কাজের চাপে ব্যবসার প্রসারে জ্যোতি রায়ের আজ অবসর নেই। অথচ রেস্তোরাঁ তাঁর তেমন লাভের ব্যবসা নয়। বর্তমান স্কচ অংশীদারটি মাঝে মাঝে বলে—মহারাণীর পাট চুকিয়ে দিলে কেমন হয়? জ্যোতি রায় বললেন—এ প্রস্তাব আমি মোটে সইতে পারি না। মহারাণীকে ত' আমি ব্যবসা বলে মনে করি না। এটা আমার বাড়ি; সবাইকে এখানে খাওয়াই, নিজের হাতে পরিবেশন করি—মনেই

হয় না আমি একা। আমি ত' ভাবতে পারি না মহারাণীকে কখনও হাতছাড়া করব। নিজের দেশকে এইখানে যে আমি ধরে রাখতে পেরেছি। এইখানে বাস করেই ত' আমি ঘরকে হারাই নি।

মহারাণীকে ঘিরে আছেন জ্যোতি রায় আর জ্যোতি রায়কে আশ্রয় করে আছে শার্দুল সিং, মিসেস প্রধান, দারার দল। মিসেস প্রধান রান্না করে, আর দারা আনাজ মাংস মাছ কাটে, বাসন ধোয়, খুচরো ফরমাইস খাটে। খাওয়ার টেবিলে এসে মহারাণীর কানের কাছে ঝুঁকে দারা বলল—দুটি বীয়ার খাব মহারাণী? আচ্ছা, ফ্রেজার থেকে বের করে নাও। একটু পরে শার্দুল এলো আর এক আবেদন নিয়ে। কিছু টাকা চাই মহারাণী, আজ যে পকেট খালি। নিস্পৃহ নিরাসক্তে আলমারীর চাবি শার্দুলের হাতে দিয়ে বললেন—নাও গে। মহারাণী হোটেল খুলেছেন, ব্যবসা করছেন, মানুষ চরাচ্ছেন—অথচ ভাবখানা এমন, যেন বোঝা নিয়েছি, তার ভার গ্রহণ করি নি।

দারার বাবা ঘরানা সিং তার ভাইয়ের সংগে মিলে সাংহাইয়ে কাপড়ের ব্যবসা করত। একদিন মন কষাকষি হতেই সাংহাই থেকে পালিয়ে এলো সিডনিতে তখন অস্ট্রেলিয়ায় কলোনী যুগের জড়তা সবে একটু করে কাটতে শুরু করেছে। সিডনি ব্রীজ তখনও তৈরি হয় নি। ঘরানা সিডনিতে মজুরের কাজ করে দিব্যি চালাচ্ছিল। সিডনি কোভের কাছে এক 'পাবের' মধ্যে সে একদিন ঢু মারল। 'পাবের' মদ গেলা মানুষেরা ত' আর মানুষ থাকে না—মদ গিলে গিলে ভাবটা এমন হয় যেন বৌ থাকলে এই মুহূর্তে ডাইভোর্স করবে, ছেলে থাকলে ত্যাজ্য করবে। কুস্তি করার লোক পেলে আলু-ভরতা করে ছাড়বে। মদে টইটুম্বুর একটি লোক এগিয়ে এসে ঘরানাকে বলেছিল—ওয়াণ্ট এ ফাইট ম্যাইট? ইংরেজী না-জানা ঘরানা বলেছিল—ইয়েস। বাস, ঘরখানাকে আক্রমণ করে কিল ঘুষি লাথির চোটে মুহূর্তের মধ্যে মাতালটি তাকে অজ্ঞান করে ফেলল। এরপর ঘরানা পঞ্চাশ বছর জীবিত ছিল; আর পঞ্চাশ বছরই সেই কারও কোন কথায় ইয়েস বলে নি।

শক্তি অর্জনের প্রতিজ্ঞায় ঘরানা ডন বৈঠক করল। কুস্তি শিখল। তারপর অস্ট্রেলিয়ার শহরে শহরে কুস্তি করে বিস্তর পয়সা কামিয়ে ভিক্টোরিয়া রাজ্যে যখন গম চাষের ফার্ম করল, তখন তার বয়স অনেক। বৌয়ের বয়স কম। কারণ ধনী হওয়ার পর দেশে গিয়ে সবে বিয়ে করে বৌ নিয়ে এসেছে।

ঘরানার বিধবা জলের দামে ফার্ম বিক্রি করে যখন পাঞ্জাবে চলে গেল তখন তার হাতে দেদার টাকা; ঘরানার উইলের বলে দারা দলিপ কানওয়ালদের পকেটও ভারি। মাস কয়েকের মধ্যেই দারার মায়ের অল্প বয়স আর বহু টাকার লোভে পড়ে এক সর্দারজী তাকে বিয়ে করল; আর অপক্ক বুদ্ধির দারারা পথে পথে ঘুরে ফতুর হল। ঠিক তখনই এক হৃদয়বান পাঞ্জাবী উকিল দারাদের নথীপত্র ঘেঁটে বললেন—অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে যখন তোমাদের জন্ম, সেখানে ফিরে যেতে ত' কোন বাধা নেই। তারপর অস্ট্রে-লীয় সরকারের সংগে তাঁরই যোগা-যোগের ফলে দারাদের অস্ট্রেলিয়া আগ-মনের আবেদন মঞ্জুর হল। দারা এসে উঠল কুইন্সল্যাণ্ডে তার এক পিতৃবন্ধুর আশ্রয়ে। সেখানে খেয়ে কাজ করে কিছু পয়সা হল। তখন সিডনির শ' চারেক মাইল উত্তরে কিছু জমি কিনে কলার চাষ শুরু করল। ইতিমধ্যে সিডনির মহারাণীর সংগে তার পরিচয় হয়ে গেছে। কলার মরশুম শেষ হলেই দারা এখন প্রতি বছর নাকি সময় কাটায় মহা-রাণীতে; খাটে খায়, পয়সা কামায়। বৌ তখন কলাবাগান তদারক করে। এখন দারার আর শার্দুলের মত দাড়ি নেই, গোঁফ নেই; গুরু নানক, স্বর্ণ মন্দির গ্রন্থ সাহেব নিয়ে সে আর এখন মাথা ঘামায় না, শিখ বলেও তাকে চেনা যায় না। অথচ শার্দুল এবং অন্য সব সর্দার-জীর মত দারাও মনে প্রাণে বিশ্বাস করে দাড়ি পাগড়ি না থাকলে শিখ হয় না। দারা সাব্যস্ত করেছে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের অস্ট্রেলিয়াতেও পুত্রদের সে শিখরূপে গড়ে তুলবে। জানি না মোগল সিংহাসনের দাবিদারদের নাম মনে রাখার কৌশল স্কুল মাস্টারের মত সে তার পুত্রদের শেখাবে কি না—আওরংজেব মুরাদ থাকে সোজা হয়ে দাঁড়া।

মিসেস প্রধানের উপর মহারাণীর অশেষ স্নেহ। তার স্বামী আছে, কন্যা আছে, সিডনি শহরে মাথা গোঁজার ঠাঁই আছে। অথচ স্বামীটি পরনারীতে আসক্ত। একদিন কেঁদে এসে মিসেস প্রধান বলেছিল—মহারাণী, তোমার এখানে আমার একটু রোজগারের পথ করে দাও; আমি সন্তানগুলিকে মানুষ করব। সেই দিন থেকেই সে মহারাণীর কাছে আছে। মহারাণী বললেন—মারাঠী মিসেস প্রধান এখন বাঙালীর মত সুক্তো ঘন্ট কপির ডালনা রান্না করে, আর আমার মত তাই খায়। শুধু খদ্দেরদের জন্য রাঁধে মসলা-কষা মাংস। পেঁয়াজটা লঙ্কাটা বড্ড বেশি খরচ করে বলে মাঝে মাঝে ধমকাই। আমি যেন ওর শাশুড়ী!

অবতার পুরুষদের আবির্ভাব ঘটলে নাকি তাঁর লীলাসংগীরাও কোথাও না কোথাও জন্ম নিয়ে ঠিক খুঁজে পেতে এসে তাঁরই কাছে জড় হন। আশ্চর্যের ব্যাপার, মহারাণীর সংগী-সাথীগুলোও কোথা থেকে কি করে তাঁরই মত ছিটকে এসে এক জায়গায় মিলেছে যোগ্যেন যোগ্যং যুজ্যতে।

জ্যোতিকণা রায় ভারতীয় সবাইকে সিডনির হোটেলে এনে শুধু একত্র করেন নি—বাঙালী, মারাঠী, পাঞ্জাবীর সংগে এক করে ফেলেছেন। সাহিত্যরথী মুলকরাজ আনন্দ, কে নারায়ণ সিডনিতে এসেছিলেন। কাজের শেষে দিনান্তে তাঁরা রোজ ছুটে এসেছেন মহারাণীর খাবার খেতে। মাদ্রাজী নারায়ণ দরজা থেকেই হাঁক দিতেন—অন্নপূর্ণা খেতে দাও। দোষা, সাম্বার রসম খেয়ে শুধু ঘরের খাবার খাচ্ছেন বলেই তিনি ভাবেন নি—ধনে পাতার ডাল, বড়ির ফোড়ন দেওয়া লাউঘণ্ট, সুক্তো, আলু ছেঁচকির নিরামিষ পদে ভাত খাওয়ার শেষে কিসমিস দেওয়া পায়স, রেকাবভরা রসগোল্লায় মিষ্টি মুখ করে ভেবেছেন কি করে সম্ভব একটি মেয়ের পক্ষে বারো জাতির তের স্বাদের সংগে পোষ মানিয়ে এমনি রান্না করা, মহারাণীতে এমনি সর্বভারতীয়ত্বের ছাপ ফেলা। নাচ, গান, আলপনা এবং শ্যামা, চিত্রাঙ্গদার অভিনয় শেখানো, জলসা, সংস্কৃতি সম্মেলনে বক্তৃতা—এ সব ত' আছেই।

দীর্ঘ পনের বছর অস্ট্রেলিয়া প্রবাসের মধ্যে মাত্র একবার দেশে গিয়ে মনে হয়েছিল যেন বিদেশে এসেছেন। দিল্লীর সড়কগুলো আর তত মনে নেই, কলকাতার রাস্তাগুলিতে গোলমাল হয়। রাসবিহারীর মোড়ে একদিন ট্রামের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এক ভদ্রলোক গুটি গুটি এগিয়ে এসে বললেন—

৩ মাসের জন্য বিনামূল্যে উপহার

স্ত্রীলোকের সৌন্দর্যে, কাশ্মীর আর্ট শাড়ী। সর্বাধুনিক মনোরম ডিজাইন এবং রং লইয়া মরশুমের নূতন নূতন মাল আসিয়াছে। আমাদের কাছে কেবলমাত্র বড় সাইজের কাপড় পাওয়া যায়। ১টি ডিলাক্স শাড়ীর মূল্য ১১৲ টাকা; ২টি শাড়ী ২০৲ টাকা; ৩টি ২৮৲ টাকা; ৪টি ৩৬৲ টাকা। দুইটি বা তদধিক শাড়ীর অর্ডারের সহিত বিনামূল্যে ব্লাউজ পীস। পোস্ট পার্শেল যোগে অর্ডারের মাল পাঠান হয়।

Arvind Agencies (WBC—22)
P.O. Box 1408, Delhi-6.

অচঞ্চল পাখা

অমিয়কুমার হাটি

রাতদিন ঃ দিনরাত
অবক্ষয় থেকে বাঁচবার
অথর্ব আগ্রহ
লীন অন্ধকারে।
খাঁচার বসন্ত
মৃত্যুশয্যায় হাসছে।

আঁতি হা-অন্ত অন্তর
'ক্ষয়'-ক্ষতিতে কাশছে
অবিরত।
অকারণ এই বেঁচে থাকা।
অতিক্রান্ত মুহূর্ত যে কতো
অচঞ্চল.
মেলে নাকো পাখা।

মাপ করবেন আমি একটি মেয়েকে জানতাম। নাচে-গানে তার বড় খ্যাতি। দেখতে আপনারই মত। নাম তার জ্যোতি রায়। জ্যোতি রায়ের মনে হল কলকাতা ত' আজও তাঁকে ভোলে নি। সিডনির নিঃসঙ্গ দিনে আজও তাঁর মনে হয় দেশে ফিরে যেতে, যেখানে লোকে একবারটি বলবে—জ্যোতি, তুমি কেমন আছ? আলাপ করতে করতে জ্যোতি রায় কত কথাই বললেন; বললেন তাঁর হরেনদার কথা, সাগরদা (সম্পাদক সাগরময় ঘোষ) শান্তিদার কথা (সঙ্গীতাচার্য শান্তিদেব ঘোষ)। হরেনদা শান্তিদার কাছে তাঁর যে অনেক ঋণ।

একদিন প্রশ্ন করলাম—জীবনে কি কখনও প্রেম করেছিলেন, মহারাণী? জানি না এমন প্রশ্ন আর কেউ তাঁকে করেছিল কি না। সিডনির মহারাণী ক্ষণেকের জন্য কলকাতার ব্রাহ্মসমাজের মেয়ে নাচ শেখা গান গাওয়া জ্যোতিকণা রায়ের দিকে ফিরে চাইলেন। তারপর কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে বললেন—প্রেম আবার করি নি! প্রেমের জন্য আমি যে— তারপর হঠাৎ থেমে বললেন—যাক গে কি আর হবে সে কথা বলে, আর সে কথা শুনে।

শেষপর্যন্ত জ্যোতি রায় কিন্তু সবই বলেছিলেন; বলেছিলেন তাঁর জীবনেতিহাসের একটি করুণ অধ্যায়ের কথা। তখন তিনি কলকাতার কলেজে ছাত্রী। প্রেম হল এক মুসলমান যুবকের সঙ্গে। সদ্য বিলেত ফেরৎ। রূপ গুণ মিলিয়ে পাত্র হিসেবে খাসা। অথচ অনেক মন দেওয়া-নেওয়ার পর অনেক এগিয়ে জ্যোতি রায় অনেক পিছিয়ে গেলেন। ভাবলেন—বিয়ে ত' আমার জন্য নয়; আমার যে অনেক কাজ আছে। প্রত্যাখ্যাত যুবক ফিরে গিয়ে চারদিন পর জ্যোতি রায়ের কাছে একটি চিঠি পাঠালেন— অন্য মেয়ের সঙ্গে তার সদ্য ঠিক করা বিয়ের চিঠি, সোনার জলে লেখা। জ্যোতি রায় চোখের জল মুছে রওনা হলেন হঙ-কঙের পথে।

জ্যোতি রায় এখন পরের কত সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামান। মিসেস প্রধান শার্দুল দারাদের সমস্যা হ্যান্ডিক্র্যাফট গুডসের সমস্যা, ভারতবর্ষের সমস্যা। সম্প্রতি আবার উঠে পড়ে লেগেছেন এক উড়িয়া যুবকের সমস্যা নিয়ে, দুই বছর কোর্টশিপের পর তার অস্ট্রেলীয় প্রণয়িনী স্পষ্ট জানিয়েছে যে, এখন থেকে তারা শুধুই বন্ধু—প্রণয়ী-যুগল নয়। বঞ্চিত যুবক জ্যোতি রায়ের কাছে এসেছে সান্ত্বনা খুঁজতে। আমি সব শুনে রহস্য করে বললাম—এ মেয়েটিকে দোষারোপ করা আপনার শোভা পায় কি? মনে হল জ্যোতি রায় কথা বলতে চাইলেন কিন্তু মুখ খুলতে পারলেন না। জ্যোতি রায়রা সত্যি অদ্ভুত মানুষ। এ'রা গড়তে পারেন, ভাঙতে পারেন, হয়ত সুযোগ পেলে বিশ্বজয়ও করতে পারেন। এ'দের মত শক্তমনা মানুষ নেই; আবার আবেগের চাপে চোখের জলে একাকার হওয়ারও এ'দের বিরাম নেই।

একদিন যাকে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, আজও তার বিয়ের চিঠি জ্যোতি রায় নিজের কাছে রেখেছেন, হয়ত নির্বুদ্ধিতার কাছে আপন পরাজয়ের চিহ্নের মত। বহু সহস্র মাইল দূরে সিডনির এই স্বেচ্ছা-নির্বাসনে সেই অভিমানী যুবকের কুণ্ঠিত মুখটি আজও তাঁর মনে পড়ে কিনা জানি না। হয়ত সে ব্যর্থ প্রেমিক জ্যোতি রায়কে ক্ষমা করেছে, ভুলেও গেছে। মনে হয় জ্যোতি রায় যেন নিজেকে ক্ষমা করেন নি।

সিডনি থেকে ছুটি নিয়ে জ্যোতি রায় এবার বের হবেন বিশ্ব ভ্রমণে, না বেরিয়েই কি উপায় আছে? এদের জন্ম অশান্ত লগ্নে; জীবনভোর এরা ঘুরে বেড়ায়, অথচ জানে না কেন ঘুরছে—কার আহবানে, কোন্ আকর্ষণে। এরা জীবনের অনেক পাওনা না চাইতেই পায়, আবার পেয়েই হারায়—পাওনার ধন পায়ে ঠেলতে ঠেলতে অবুঝের মত এগিয়ে চলে। এরা প্রেম করে, ভালবাসে, ঈপ্সিত ধন যখন হাতের মুঠোয় আসে, তখন আপনভোলা হয়ে সব ভণ্ডুল করে দেয়। এরা উদাসী পথিক।

জ্যোতি রায় বলেলেন—অজানার টান, নতুনের স্বপ্ন তরুণদের দূরদূরান্তরে টেনে আনে। তারা ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়; বিদেশ দেখার মোহভঙ্গও একদিন হয়। তখন তারা খতিয়ান করে দেখে এত দেশ ঘুরে এত দৃশ্য দেখে এত মানুষ চিনে নিজের ব্যক্তিগত লাভটা আর এমন কি হল। ঘুরেফিরে তখন ত' সেই কথা—মন চল নিজ নিকেতনে।

আজ জ্যোতি রায়ের অর্থ, যশ, প্রতিপত্তির অভাব নেই। সিডনিতে একাধিক বাড়ি করে ভাড়াটে বসিয়ে রেখেছেন। সব ক'টি বাড়িতেই নিজের জন্য রেখেছেন একখানা করে ঘর, যদি সাধ হয় ত' কখনও গিয়ে থাকবেন। কিন্তু মহারাণীকে ছেড়ে কোথাও থাকতে আজও তাঁর মন সরে না। জ্যোতি রায় বলে গেলেন প্রশান্ত মহাসাগর তীরে বোন্ডাই বীচের পাশে তাঁর অধুনাতম বাংলোর কথা। তাঁর বড় প্রিয় বাড়ি। প্রথম দিনে নিজের কক্ষে মনের আনন্দে শুয়েছিলেন। ছ'টার আগে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল পাখী ডাকার শব্দে। আধো ঘুমে, আধো জাগরণে মনে হয়েছিল যেন কত চেনা সে স্বর; তবু যেন কত দূরের। জ্যোতি রায় পাশ ফিরে শুয়ে পড়লেন। আবার যখন ভোরের পাখীরা ডাকল, তখন প্রায় জেগে উঠেছেন। মাত্র পঁচিশ গজ দূরের গর্জন করা ঢেউ-ভাঙা প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়া, জানালার ওপারে সোঁ সোঁ করছে। মনটা ব্যথায় ভরে উঠল। মনে হল, এত পাখীর কলকণ্ঠে যেন একটি পাখী আছে যার সুরটি বিশেষভাবে চেনা। হাই তুলে জ্যোতি রায় ভাবলেন এক কাপ চা হলে মন্দ হয় না। রবিবারের সকালে দশটার আগে যেখানে লোকের ঘুম ভাঙে না, সেই সিডনির পাখী-ডাকা-ভোরে অসময়ে জেগে তাঁর ভারি আশ্চর্য বোধ হয়, পাখীরা কি করে জেনেছে যে, এইখানে জ্যোতি রায়ের বাড়ি, আর সেই বাড়িরই গাছে গাছে নীড় বেঁধে তাদের ঘুমভাঙা গান গাইতে হবে! ঠিক তখন সেই এলোমেলো ভাবনাগুলোর মুহূর্তে জ্যোতি রায় আবিষ্কার করলেন অস্ট্রেলিয়ার কোকো-বারো বেল পাখী রোবিন পাখীদের দলে বাংলাদেশের পাখীও আছে। ডালিম গাছের ডালে বসে সে-পাখী তখনই আবার ডেকে উঠল—বউ কথা কও।

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

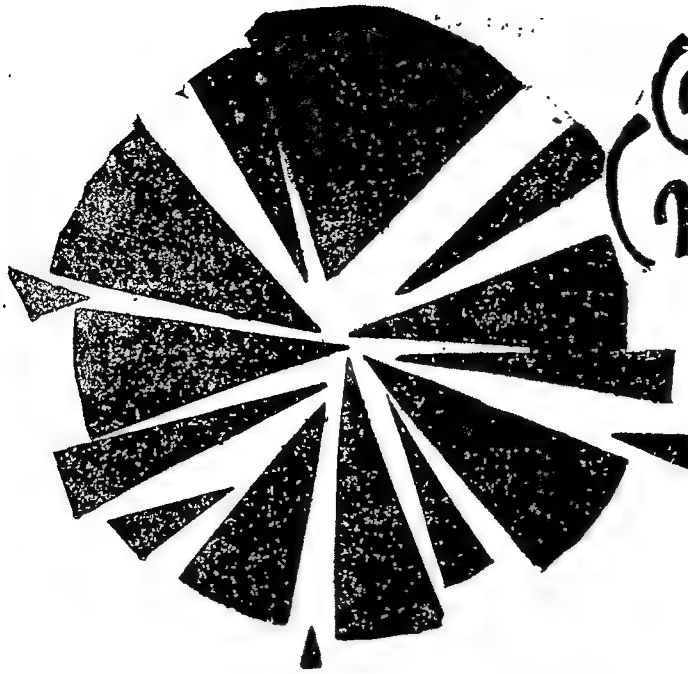

অনন্ত সিংহ

সারদা শীল আমাদের যুবক সাথী। তাকে প্রলোভন দেখিয়ে দলের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির কাজে প্ররোচিত করতে গিয়ে ডি-আই-বি সাব-ইনস্‌পেকটার রোহিণীবাবু শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হলেন। তারপর স্বয়ং ডি-আই-বি ইনস্‌পেকটার সারদাবাবু আসরে নামলেন। সারদাবাবু কোন এক আত্মীয় পুলিশ অফিসার মারফৎ প্রস্তাব পাঠালেন মনোরঞ্জনের বাবার কাছে। সারদাবাবুর ইচ্ছে মনোরঞ্জনের বাবা ছেলেকে যেন উপযুক্ত মূল্যে তাঁদের কাছে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য 'বিক্রি' করেন। সারদাবাবু এই ক্ষেত্রেও তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করলেন—দেশপ্রেমের দুর্ভেদ্য প্রাচীর লঙ্ঘন করা পুলিশের পক্ষে সম্ভব হল না।

তবুও সরকারী চাকরীর খাতিরে ও উন্নতির আশায় উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী কি নিশ্চেষ্ট থাকতে পারে? তারাও কি ছেলেবেলা থেকে স্কুলে মুখস্থ করে আসে নি—"Failure is the piller of success!" অকৃতকার্যতা ভবিষ্যৎ সাফল্যের স্তম্ভস্বরূপ! সারদাবাবু এবার আমাদের তরুণ সদস্য ভবতোষ ভট্টাচার্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। ভবতোষ ও আশুতোষ দুই ভাই। ভবতোষ—ছোট ভাই, প্রথম সারির অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এই দুই ভাইয়ের পিতা সদরঘাট কালীবাড়ির মালিক ও পূজারী বা মোহান্ত। এ'রা আবার ডি-আই-বি ইনস্‌পেকটার সারদাবাবুর আত্মীয়। আমাদের দলের সঙ্গে ভবতোষ ভট্টাচার্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা করা তাদের পক্ষে খুব কঠিন ছিল না। ব্যায়ামচর্চা ক্লাবে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে, মার্কামারা মোটর গাড়িতে, গণেশের দোকান প্রভৃতি স্থানে ভবতোষের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ মেলামেশা তারা লক্ষ্য করেছে।

সারদাবাবু তাঁর নিজের আত্মীয়তার সুযোগ নিয়ে ভবতোষের বাবা, মা, দাদা ও বোনেদের সবাইকে কোন-এক ছুটির দিনে নেমন্তন্ন করলেন। আপনজনকে নেমন্তন্ন করবেন তাতে আপত্তির কি আছে! আপত্তি যদি কারও থাকেও বা তা' তিনি শুনবেন কেন? আমাদের অবশ্য আপত্তি নয়, তবে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ ছিল। ভেবে নিয়েছিলাম গুপ্ত বিভাগের পুলিশ ইনস্‌পেকটার সারদাবাবু এবারে অন্তত খুব আটঘাট বেঁধে অতি সন্তর্পণে ও সতর্কতার সঙ্গে পা বাড়াবেন। তাই ভবতোষ ও তাদের বাড়ির সবাইকে তিনি তাঁর বাড়িতে সামাজিক নেমন্তন্ন করলেন।

আমরা এই নেমন্তন্নের কথা ভবতোষ ও তার দাদা—আশুতোষের কাছে জেনেছিলাম। ভবতোষ—তারা কালীবাড়ির পেছনে, তাদের নিজ বাড়িতে থাকত। কালীবাড়িটি আবার মাখন ঘোষালদের বাড়ির উল্টোদিকে, রাস্তার অপর পারে। গণেশের দোকান এই বাড়িটির থেকে পায়ে হাঁটা পথে প্রায় দু' মিনিটের রাস্তা। সারদাবাবুর বাড়িতে নেমন্তন্নের দিন যে সময়ে ভবতোষেরা সেখানে যাবে ও যে সময়ে তারা সেখান থেকে খাওয়া-দাওয়ার পর ফিরে আসবে, সেই সময়টা লক্ষ্য রাখবার জন্য মাখনকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। ঠিক করেছিলাম যে, ঐ সময়ে আমি গণেশের দোকানে উপস্থিত থাকব, যাতে ভবতোষেরা ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে মাখন আমাকে খবর দিতে পারে।

এটা বোঝা কঠিন নয় যে, ভবতোষ ঘুণাক্ষরেও এইরূপ বন্দোবস্ত সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারে নি। ভবতোষ আমাদের প্রথম সারির সদস্য। তাই বলে mutual vigilence (পারস্পরিক সজাগ দৃষ্টি) রাখব না তা' কখনও হতে পারে না। এই বিষয় যদি কখনও ভবতোষ জানতে পারত তবু সে যে আমাদের প্রতি ক্ষুব্ধ হোত না সে সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম। যারা বয়সে বড় ও অভিজ্ঞ ছিল তারাও তাদের প্রতি এইরূপ সতর্ক দৃষ্টি রাখবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে। আমরা সকলেই mutual vigilence system-কে মেনে চলেছি। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক কাজ সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন করবার জন্য mutual vigilence system আমরা স্বেচ্ছায় আমাদের সংগঠনে প্রচলিত রেখেছি। এতে আপত্তি বা ভয়ের কি আছে? আমার বিপ্লবী বন্ধুরা আমার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখুক, আমাকে পরীক্ষা ও পরখ করে নিক—এই আমাদের বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী হওয়া উচিত। তাই এইরূপ পারস্পরিক সতর্কতা ও সজাগ দৃষ্টি রাখবার জন্য আমরা, যারা প্রথম আক্রমণ ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করবার জন্য নির্বাচিত হয়েছিলাম, স্বেচ্ছায় ও আনন্দের সঙ্গে mutual vigilence system-কে ষড়যন্ত্রমূলক সংগঠনের এক অপরিহার্য অঙ্গ বলে মেনে নিয়েছিলাম।

ভবতোষ ও তাদের বাড়ির সবাই 'সামাজিক নিমন্ত্রণ' রক্ষা করতে আই-বি ইনস্‌পেকটার সারদাবাবুর বাড়িতে যথা সময়ে গেলেন ও ফিরে এলেন এবং যথা

সময়ে পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী যাখন আমার কাছে খবর পৌঁছে দিল—ভবতোষ ফিরে এসেছে। তখন প্রায় দুটো-তিনটে বেজেছে। আমি কালবিলম্ব না করে সাইকেলে কালীবাড়ি ছুটে গেলাম। ভবতোষকে ডেকে পাঠালাম। সে হাসতে হাসতে আমার কাছে এলো। সব সময়েই তার হাসিতে ভরা মুখ। এখনও সেই একই রকম হাসি না কি সেই হাসিতে কোন পার্থক্য আছে, তা' আমি নিরীক্ষণ করে দেখছিলাম। ভবতোষের কি-ই বা বয়স—স্কুলে পড়ছে তখনও। পুলিশের কাছে সে যদি কোন দুর্বল মুহূর্তে তাদের জঘন্য প্রস্তাবে মত দিয়ে থাকে, তবে এই অল্প সময়ের ব্যবধানে আমার সামনে দাঁড়িয়ে মুখে হাসি ও সহজভাব বজায় রাখা তার পক্ষে সম্ভব হোত না।

ভবতোষকে আরও পরীক্ষা করে দেখবার জন্য নানা প্রকার প্রশ্ন করলাম—কতক্ষণ ছিল, কখন খাওয়া হল, পাতে বসার আগে কার সংগে কথা হয়েছে, নেমন্তন্ন শেষ হওয়ার পর কে কি বলল, সারদাবাবু সবচেয়ে বেশি কথা কার সংগে বলেছেন, বিশেষভাবে তার সংগে সারদাবাবু কতক্ষণ কি কথা নিয়ে আলোচনা করেছেন, একান্তে তার সংগে কোন্ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার সুযোগ সারদাবাবু নিয়েছেন কি না, তাকে সারদাবাবু আবার তাঁদের বাড়ি যেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কি,—ইত্যাদি, ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন করেছি ভবতোষকে। প্রশ্ন করা ও তার বিভিন্ন উত্তর দেওয়ার সময় আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল ভবতোষের ওপর। তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করছিলাম। বিশেষ বিশেষ প্রশ্নে তার ভাববৈলক্ষণ্য ঘটে কি না বা কোন সন্দেহের উদ্রেক করে কি না, মনে মনে তার দ্রুত বিশ্লেষণ করে যাচ্ছিলাম।

সারদাবাবুর বাড়ি থেকে ফিরে আসার সংগে সংগে এই পরীক্ষায় ভবতোষ সন্দেহাতীতভাবে উত্তীর্ণ হলো। তার কাছে জানলাম, সারদাবাবু বিশেষ করে তার সংগে খুব হৃদ্যতাপূর্ণ আলাপ করেছেন। ভবতোষকে তাদের বাড়িতে বেড়াতে যেতে বলেছেন ও মাঝে মাঝে তাঁর সংগে দেখা করলে তিনি যে খুব খুশি ও আনন্দিত হবেন ভবতোষকে তা' বার বার করে জানিয়েছেন।

সেইদিন ভবতোষকে সারদাবাবুর "মহৎ উদ্দেশ্যের" কথা ভালভাবে বুঝিয়ে দিলাম এবং সারদাবাবুর আমন্ত্রণ ভবিষ্যতে কি-ভাবে সে চালাকি করে এড়িয়ে যাবে সেই সম্বন্ধেও কতকগুলো উপদেশ দিলাম। এই ঘটনার পর, দিন সাতেকের মধ্যে, যুব-বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। তাই সারদাবাবুর "মহৎ উদ্দেশ্য" কাজে পরিণত হওয়ার সুযোগ আর আসে নি।

আগেই বলেছি, যুব-বিদ্রোহের প্রায় ছয় মাস পূর্বে, যখন থেকে আমরা সশস্ত্র প্রস্তুতির কাজ আরম্ভ করলাম, তখন থেকে নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিলাম যে নতুন আর কাউকে দলে গ্রহণ করব না। প্রথম সারিতে মনোরঞ্জনের মত সক্রিয় সভ্যদের শিক্ষা দিয়ে ও বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাই করে গ্রহণ করেছি। তাদের দুর্ভেদ্য দুর্গ-প্রাচীর ভেদ করা শত্রুপক্ষের কাছে সম্ভব ছিল না। তা' ছাড়া পুলিশ জানত না যে, আমরা যখন থেকে সক্রিয় সশস্ত্র প্রস্তুতির কাজ আরম্ভ করেছি, তখন থেকে আর নতুন রিক্রুট দলে নিচ্ছি না। এই কারণে দলের সভ্যদের টাকা দিয়ে ও নানা প্রলোভন দেখিয়ে হাত করতে গিয়ে নিষ্ফল হওয়ার পর পুলিশ এক নতুন কৌশল নিল।

সদরঘাট ক্লাবে বিকেলবেলা ব্যায়াম চর্চা প্রতিদিনই হোত। তবে যুব-অভ্যুত্থানের পূর্বে ছয়টি মাস ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে আগের মত উৎসাহ ছিল না। কারণ, প্রথম সারির সক্রিয় যুবক সভ্যরা নানা ধরণের গুপ্ত কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ল, আর আমরাও প্রতিদিন ঠিক সময় ক্লাবে হাজির হতে পারতাম না। তবু প্রায় সব দিনই নিয়ম রক্ষার্থে ক্লাবে যেতাম এবং নিয়মিত ন্যূনতম ব্যায়াম করতাম। পুলিশ ও অভিভাবকদের কাছে ক্লাবের বহিঃপ্রকাশটি বজায় রাখার জন্য যেটুকু না করলে নয় তা' আমাদের শেষদিন পর্যন্ত করতে হয়েছে।

দুই-তিন দিন ধরে ক্লাবে একটি নতুন ছেলে আসতে আরম্ভ করেছে। সুন্দর স্বাস্থ্য, ছোট ছোট করে চুল কাটা, খদ্দরের পাঞ্জাবী পরা। ছেলেটি খুব চটপটে আর মুখে হাসি লেগে আছে। এই ছেলেটির নাম ভুলে গেছি। এককথায় বলতে গেলে আপাতদৃষ্টিতে তাকে দেখে আমার মনে হচ্ছিল সে যেন দ্বিতীয় মনোরঞ্জন সেন। নতুন কাউকে রিক্রুট করা হবে না বলে যদি নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া না হোত তবে ক্লাবের এই নতুন আগন্তুকটিকে দলে নেওয়ার জন্য আমি নিশ্চয়ই সচেষ্ট হতাম। এই ছেলেটি বিশেষ করে আমার সংগে অদ্ভুত ব্যবহার করতে লাগল। সব সময় আমার কাছে কাছে আছে নানাভাবে তার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য সে চেষ্টা করেছে—কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ, জিমনাস্টিক প্রভৃতিতে তার পারদর্শিতা দেখিয়ে। ব্যায়াম করবার পর প্রায় দিনই আমরা নদীর ধারে বা সদরঘাট জেটিতে বেড়াতে যেতাম। এই সময়েও সেই ছেলেটি আমার পাশে পাশে হেঁটে চলেছে—কখনও ছেলেমানুষের মত উৎসাহভরে আমার হাত ধরেছে—কত কথা, কত গল্প, কত তার হাসি!

জানি না এই ছেলেটির প্রতি অজান্তে কোন অবিচার করেছি কি না! বাহ্যত সেই ছেলেটির সব রকম বিপ্লবী সুলক্ষণ থাকা সত্ত্বেও আমার মনে হল সে যেন ডি-আই-বি সাব-ইনস্পেকটার রোহিণীবাবুর একজন trained (শিক্ষিত) ছেলে; সে আমাকে তার প্রতি আকৃষ্ট করতে চায় যাতে আমি তাকে রিক্রুট করে নিজেই ফাঁদে পড়ি। সেই ছেলেকে দেখার সংগে সংগে কেন আমার মনে হয়েছিল যে, অত পুলিশ অফিসার থাকা সত্ত্বেও সে রোহিণীবাবুর লোক হবে—এর কোন যুক্তিপূর্ণ কারণ নেই। Intutively আমার তাই মনে হয়েছিল। হয়ত সেই ছেলে সত্যিই খুব ভাল ছিল—সেও হয়ত আজ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর শহীদ বা যোদ্ধা নামে পরিচিত হোত। কে জানে হয়ত সেই ছেলে কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছে এবং দেশের একজন বরেণ্য নেতা হয়েছেন! কর্তব্যের খাতিরে আমাকে কঠোর হতে হয়েছে—পুলিশ টোপ ফেলেছে মনে করে আমি তাকে বর্জন করেছি। এতদিন পরে নানা ঘটনা ও পুলিশের কৌশলাদির উল্লেখ করতে গিয়ে এই ছেলেটির বিষয় আমি লিখলাম। আমার অনিচ্ছায় যদি তার প্রতি ভ্রান্ত ধারণাবশত কোন অন্যায় বা অবিচার সেইদিন হয়েও থাকে তবে তার জন্য আমাকে দেশবাসী ক্ষমা নিশ্চয়ই করবে।

অ-নামী এই ছেলেটি সম্বন্ধে এত কথা লিখলাম তার কারণ—এইরূপ আর একটি ঘটনা শেষে প্রমাণ করেছিল যে, নীতিগতভাবে যাকে দলে অন্তর্ভুক্ত করি নি সে-ই আজ যুদ্ধের (কালার পোল) রণক্ষেত্রে অমর হয়ে আছে। স্বদেশ রায়, দেবপ্রসাদ গুপ্ত প্রমুখের সহপাঠী। দেবু ও নরেশ রায়েদের সংগে সে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশত। নরেশ রায় তার সংগে খুব ভাল করে মিশেছে। দলভুক্ত করবার জন্য যেভাবে সে যুগে কথা বলতাম নরেশ স্বদেশ রায়ের সংগে দিনের পর দিন সেভাবে আলোচনা করেছে। নরেশ বুঝতে পেরেছিল যে, স্বদেশ রায় প্রথম শ্রেণীভুক্ত হওয়ার উপযুক্ত এবং সে নিশ্চয়ই অনায়াসে যুব-অভ্যুত্থানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারে। নরেশ একদিন খুব সংকোচের সংগে আমার কাছে প্রস্তাব করল—"দেখুন আমি জানি নতুন রিক্রুট এখন আর গ্রহণ করা হবে না। আমি স্বদেশ রায়ের সংগে প্রায় চার মাস খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি—অনেক কথা হয়েছে। আমার মনে হয় সে দলভুক্ত হওয়ার উপযুক্ততা অর্জন করেছে। সেই কারণে আমার ইচ্ছা আপনি নিজে তার সংগে একটু

মিশে তাকে পরীক্ষা করে দেখুন। যদি আপনি মনে করেন তাকে সভ্যপদ দেওয়া যায় এবং সশস্ত্র আক্রমণের জন্য তার উপযুক্ততার অভাব নেই, তবেই তাকে আমরা গ্রহণ করব।"

নরেশ তার প্রস্তাব শেষ করবার পর আমি বললাম—"দেখ নরেশ, আমি চাই না নতুন কাউকে আর দলে নেওয়া হোক। আমার বিশ্বাস পুলিশ শিখিয়ে-পড়িয়ে যুবকদের আমাদের কাছে পাঠাচ্ছে যেন আমরা তাদের টোপ গিলি। স্বদেশ রায় কলেজের পড়া ছেড়ে এখন তার দাদার সঙ্গে বাড়ি তৈরি করার কনট্রাকটারী ব্যবসা করছে। সে টাকা উপার্জন করতে শিখেছে। এ রকম যুবকদের এখন দলের গুপ্ত কাজের জন্য নেওয়া মারাত্মক ভুল হবে।"

হোক না কেন স্বদেশ রায় একজন কনট্রাকটার—নরেশ যে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছে! নরেশ আমার কঠোর নীতিগত প্রশ্নকে উপেক্ষা করতে পারছিল না বটে, আবার কোনমতেই সে মন থেকে মেনে নিতে পারছিল না যে, স্বদেশ রায় পুলিশের চর। নরেশের মনোভাব আমি বুঝতে পেরেছিলাম। তাই নরেশকে আমি বললাম—"দেখ নরেশ, তুমি যদি দায়িত্ব নাও, তবে স্বদেশকে অভ্যুত্থানে অংশ নিতে নির্বাচন কর, তাতে আমার আপত্তি নেই।" নরেশ রায়ের দায়িত্বজ্ঞান, বিচক্ষণতা ও বিচারবুদ্ধি সম্বন্ধে আমাদের পূর্ণ আস্থা ছিল বলেই স্বদেশ রায়ের ক্ষেত্রে নিয়মের ব্যতিক্রম করতে রাজী ছিলাম যদি নরেশ নিজে ব্যক্তিগতভাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিত।

কিন্তু নরেশ উত্তর দিল,—"সে দায়িত্ব আমি তো নিতে পারব না। আপনারই সে বিবেচনা করতে হবে। তাই আপনাকে তার সঙ্গে একবার একটু মিশে দেখতে বলছি।" নরেশের আগ্রহের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু তার প্রস্তাবে আমি রাজী হতে পারলাম না। তাকে বললাম—"আমার বিন্দুমাত্র সময় নেই। একটু মিশলাম আর স্বদেশকে বুঝে নিলাম—এইরূপ ভাবা তোমার ভুল। তার সম্বন্ধে সুচিন্তিত অভিমত দিতে হলে আমায় বেশ কিছুদিন তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে হবে। সেই সময় আমার কোথায়? তাই তোমার একার দায়িত্বে তাকে নিতে হবে, আর নইলে স্বদেশ রায়কে আমরা গ্রহণ করতে পারি না।" শেষ পর্যন্ত অভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণ করতে স্বদেশকে নির্বাচন করা গেল না।

বিপ্লবী গুপ্ত-সমিতিতে বাছাই করার সময় একজনও ভুল নির্বাচিত হওয়ার চাইতে সহস্র বিশ্বাসী থোক বাদ পড়াও সহস্রগুণে শ্রেয়। এই কঠোর নীতি অনুযায়ী স্বদেশ রায়ও বাদ পড়ে গেল।

প্রত্যক্ষভাবে এই ক'টি ঘটনা বা পুলিশের চক্রান্তের কথা আমরা জানতাম এবং সেইসব চক্রান্তকে আমাদের যুবক-সাথীরা ব্যর্থ করেছে। সারদা শীল, মনোরঞ্জন সেন ও ভবতোষ ভট্টাচার্য পুলিশ চক্রান্তকে নিষ্ফল করে দিল। সদরঘাট ক্লাবে নতুন আমদানী 'সেই ছেলেটি' আমাকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছিল, পারে নি। নীতিগতভাবে আর কাউকে নেওয়া হবে না বলে স্বদেশ রায়কে আমরা বাদ দিলাম। এইভাবে আমাদের সাংগঠনিক দুর্গের প্রাচীর আমরা আরও দৃঢ় করে তুললাম। এমন সময় গণেশ ও আমি অত্যন্ত বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেলাম প্রকাশ্য ফ্রন্টে আমাদের দলের একজন বিশিষ্ট যুবক-সাথী ডি-এস-পি'র সঙ্গে গোপনে সংযোগ রক্ষা করে চলছে। আমাদের এক সহপাঠী আই-বি বিভাগে এ্যাসিসট্যান্ট সাব-ইনস্পেকটারের পদে নিযুক্ত ছিল। প্রথমে গণেশ তার মারফৎ এই খবরটি পায়। পরে গণেশ ও আমি এক সঙ্গে তার কাছ থেকে আমাদের দলের যুবকসাথীর নাম-ধাম সব পেলাম। আমাদের সহপাঠী পুলিশ কর্মচারী আমাদের আরও জানাল কোন্ কোন্ সময় সচরাচর দলের যুবকটি ডি-এস-পি মহাশয়ের সঙ্গে কোথায় গোপনে মিলিত হয়। কর্ণফুলী নদী-তীরে কয়েকটি জায়গায় এবং ইউরোপীয়ান পল্টনে সাহেবদের টেনিস খেলার মাঠ-সংলগ্ন ছোট্ট ঘরটিতে—যেখানে সাহেবরা পোষাক বদলাতো এবং চা, সোডা, লেমনেড, হুইস্কি প্রভৃতি পান করত, সেইসব স্থানে তারা গোপনে মিলিত হোত। এই ঘরটি খেলার পর সন্ধ্যায় খালি পড়ে থাকত। সন্দেহ ভঞ্জন করবার জন্য নিজের চোখে দেখব বলে স্থির করলাম। গণেশ ও আমি সেই বিশিষ্ট যুবক-সাথীকে ডি-এস-পি'র সঙ্গে মিশতে দেখেছি।

সারদাবাবু ও রোহিণীবাবু যদি আমাদের দলের একজনকেও তাদের চর হিসেবে ব্যবহার করতে পারতেন, তবে আমাদের অজান্তে হয়ত অনেক গোপন তথ্যই সংগ্রহ করতে তাঁরা সমর্থ হতেন। যদি দলের এই বিশিষ্ট যুবকের সংবাদ আমরা পূর্বাহ্নে জানতে না পারতাম তবে যে আমাদের অনেক ক্ষতি হোত—এমন কি চট্টগ্রামে যুব-বিদ্রোহও যে সম্পূর্ণ নিষ্ফল হোত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যখন আগেই আমরা তার স্বরূপ জেনে ফেললাম, তখন তাকেই আবার পুলিশ-চক্রান্ত ব্যর্থ করবার কাজে খুব সার্থকতার সঙ্গে ব্যবহার করলাম। এই যুবকটি কংগ্রেস অফিসের কাছেই থাকত। মাস্টারদার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে সে চলত। বলা বাহুল্য, আমরা মাস্টারদাকে সঙ্গে সঙ্গে তার আসল স্বরূপ জানিয়ে দিলাম।

পুলিশের সঙ্গে তার গোপন সম্পর্কের কথা জানবার পর আমরা সেই যুবকটির সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করবার অভিনয় করতে থাকি। তাকে আমরা নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা ক'রি যে, তার প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে এবং অনেক গোপন কথাও তার সঙ্গে বিশ্বাস করে আলাপ করি।

১২ই মার্চ, ১৯৩০ সাল। গান্ধীজীর সেই জগদ্বিখ্যাত 'ডান্ডী অভিযান' শুরু হ'ল। উনআশিজন বাছাই করা সত্যাগ্রহী গান্ধীজীর নেতৃত্বে দু' শ' মাইল পথ চব্বিশ দিনে অতিক্রম করে ৫ই এপ্রিল ডান্ডী পৌঁছলেন। ইতিমধ্যে সারা ভারত জুড়ে লবণ-আইন ভঙ্গ করবার জন্য প্রস্তুতি চলল। ৬ই এপ্রিল ডান্ডী সমুদ্র উপকূলে গান্ধীজীর নেতৃত্বে প্রথম লবণ-আইন ভঙ্গ করা হ'ল। লবণ-আইন ভঙ্গ করার এই সংগ্রামী সঙ্কেত সারা ভারতের বিক্ষুব্ধ জনতাকে উদ্বুদ্ধ করে তুলল। চট্টগ্রামে অনুশীলন পার্টির নেতৃত্বে কংগ্রেসের এক অংশ লবণ-আইন অমান্য করার জন্য ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক শিবির স্থাপন করেছে এবং তারা লবণ-আইন ভাঙতে শুরু করে দেয়।

মাস্টারদার নেতৃত্বে চট্টগ্রাম জেলা-কংগ্রেসের আর একটি অংশ, সুভাষ-পন্থীরা তখনও লবণ-আইন ভাঙবার জন্য প্রস্তুত হয় নি। আমরা তখন সশস্ত্র যুব-বিদ্রোহের জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুত হয়েছি। লবণ-আইন ভাঙবার কথা আমরা সেই সময় ভাবতেও পারি নি। কিন্তু তাই বলে সারা ভারত যেখানে লবণ-আইন অমান্য করবার অভিযান শুরু করেছে সেখানে জেলা-কংগ্রেস সেক্রেটারী সূর্য সেনের নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ না হলে আমাদের বিরুদ্ধে পুলিশের সন্দেহ উদ্রেকে আরও বেশি সাহায্য করা হবে।

সেইজন্য এই সময়ে ও এই পরিপ্রেক্ষিতে দলের সেই বিশিষ্ট পুলিশ-প্রভাবান্বিত যুবকটিকে বিভ্রান্ত করবার জন্য আমরা তার সঙ্গে খুব গুরুত্ব দিয়ে আইন-অমান্য সংগ্রাম চালাবার নীতি ও কৌশল স্থির করার ব্যাপারে গোপন মন্ত্রণাকক্ষে এক অভিনয় করলাম। বলা বাহুল্য তাকে আমরা বিপথে পরিচালিত করতে চেয়েছিলাম—সে যেন আমাদের আইন-অমান্য সংগ্রামের মিথ্যে প্ল্যানটি সম্বন্ধে তার ডি-এস-পি প্রভুকে রিপোর্ট করে। আমরা তাকে আমাদের "গোপন প্ল্যান" ও "সিদ্ধান্ত" এইভাবে জানালাম—

"আমরা লবণ-আইন অমান্য করবার কর্মসূচী বর্জন করছি এবং তৎপরিবর্তে রাজদ্রোহাত্মক আইন-অমান্য করবার প্রোগ্রাম গ্রহণ করব। আমরা চাই আমাদের বিপ্লবী চিন্তাধারার প্রচার। গান্ধীজীর অহিংসাবাদকে আমাদের expose (উদ্ঘাটন) করতে হবে। রক্তাক্ত বিপ্লব ছাড়া ভারতের স্বাধীনতা লাভ করা যাবে না—এইরূপ প্রচার করবার সুযোগ আমাদের নিতে হবে। গান্ধীজী Sedition Law (রাজদ্রোহাত্মক-আইন) ভাঙবারও নির্দেশ দিয়েছেন। তাই আমরা ঠিক করছি সভা ডাকব, আইনত নিষিদ্ধ সব বই জনসাধারণের সামনে পড়া হবে ও আমরা রাজদ্রোহাত্মক বক্তৃতা দিয়ে কারাবরণ করব। সেইজন্য আমাদের স্বেচ্ছাসেবক শিবির স্থাপন করতে হবে ও জেলে যাওয়ার জন্য ভলাণ্টিয়ার সংগ্রহ করবার সক্রিয় কর্মপন্থা নেওয়া অপরিহার্য। গোপনে রিজার্ভ বাহিনীও গঠন করতে হবে তা' নইলে নিরবচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া যাবে না। রিজার্ভ বাহিনীর চার্জ বিশেষ করে তোমাকেই নিতে হবে।"

আজ দ্বিধাহীনচিত্তে জোর করে বলতে পারি ডি-এস-পি মহাশয় আমাদের ফাঁদে ফেলতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তিনি নিজেই আমাদের কাছে চালে পরাস্ত হয়েছেন ও তাঁকে যে আমরা বিপথে পরিচালিত করতে পেরেছিলাম তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

পুলিশকে বিভ্রান্ত করবার এই চাল ও কৌশলকে আরও বিশ্বাসযোগ্যভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী জেলা-শাসকদের কাছে পরিবেশন করতে চেয়েছি। আমাদের হেড কোয়ার্টারের সভায় গণেশ প্রস্তাব করল যে রণ-নীতির প্রয়োজনে জেলা-শাসকদের বোকা বানাতে হবে—তাদের সফলতার সংগে বিপথে পরিচালিত করতে হবে। তাই গণেশের প্রস্তাব মতে ডি-এস-পি মহাশয়কে আমরা লবণ-আইন ভাঙবার সংগ্রামকে মিথ্যা সাজিয়ে রাজদ্রোহাত্মক আইন-অমান্য সংগ্রামে পরিণত করবার রণ-কৌশলের গোপন কর্মসূচী তাঁরই চর মারফৎ জানিয়েছি। এই মিথ্যা কর্মসূচী আরও বেশি বিশ্বাস করবার জন্য গণেশ প্রস্তাব করল যে খুব তাড়াতাড়ি একটি অনুরূপ প্রচারপত্র ছাপিয়ে বিলি করা হোক। আমরা সবাই গণেশের এই প্রস্তাব সংগে সংগে মেনে নিলাম।

গণেশকে এই প্রচারপত্র লিখে ছাপাবার ভার দেওয়া হ'ল বা সে নিজেই সেই ভার নিল। দু-এক দিনের মধ্যেই সে প্রচারপত্র লিখে ছেপে ফেলল। সেই সবগুলি আমরা এমন ভাবে বিলি করলাম যাতে জনসাধারণ সেগুলি পাক আর নাই পাক, পুলিশ যেন নিশ্চয়ই পায়। আমরা নিজেরাই যেচে সেই বিশেষ প্রচারপত্রটি কোন কোন পুলিশকে দিয়ে দিলাম।

আমাদের মামলার রায় থেকে এই বিষয় সম্বন্ধে একটু উদ্ধৃত করছি—

"On 17th April printed leaflets with the heading CHATTAL BASHIDER PRATI (to the people of Chittagong) and the names of Surjya Sen, Ambika Chakravarti and Ganesh Ghosh as signatories were distributed in the town. The following morning Abdul Azim obtained one from Ganesh Ghosh [Exh. CDLV (4)]. The leaflet states that the trumpet call of independence has been heard throughout the land, and on every side the war of Civil Disobedience has commenced, that it is a matter of regret and shame that Chittagong, the pioneer of independence in 1921 should lay behind in the struggle; and that about a month previously a Satyagraha Committee had been formed for the purpose of disobeying the Salt Law.

" 'We shall wait some days more', the leaflet goes on, to see what that Committee does. But in Calcutta and other places disobedience of laws other than the Salt Law —for example, the law of sedition—has begun. We want to commence disobedience of the sedition law in Chittagong also without delay.

" 'For this purpose we require the sympathy of the public of all classes—we want Satyagrahi soldiers. We hope the public will help us with men and money. Those willing to be volunteers should see any of the under-signed by 21st April next.' "

(Judgement in Armoury Raid Case, No. I of 1930. PP. 11 & 12).

'চট্টলবাসীদের প্রতি'—শিরোনামা দিয়ে বাংলায় লিফ্‌লেট্ ছাপান হয়েছিল। সেই প্রচারপত্রের স্বাক্ষরকারী ছিলেন সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী ও গণেশ ঘোষ। সদর কোতওয়ালীর ইন্-চার্জ—আব্দুল আজিম সাহেব, ১৮ই তারিখ সকালবেলা এই প্রচারপত্র একটি শ্রীগণেশ ঘোষের নিকট হতে পান। জজ সাহেব প্রচারপত্রের প্রথম দিকের সারাংশ তাঁর ভাষায় ব্যক্ত করে লিখলেন—প্যাম্পলেটে লেখা ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষাণ বেজে উঠেছে এবং দিকে দিকে আইন-অমান্য সংগ্রাম সুরু হয়েছে। কিন্তু ১৯২১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রদূত চট্টগ্রামবাসীর পক্ষে খুব দুঃখ ও লজ্জার কথা যে আজ তাঁরা সংগ্রামে পেছিয়ে আছেন। প্রায় এক মাস আগে লবণ-আইন অমান্য করার জন্য চট্টগ্রামে সত্যাগ্রহ কমিটি গঠিত হয়েছে। জাজ্‌মেন্টে প্রথম দিকের সারাংশটুকু এইভাবে লেখবার পর ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট প্রচারপত্রের বাকিটুকু ইংরেজীতে অনুবাদ করে লিখলেন—

'সত্যাগ্রহ কমিটি কি করে তা' আমরা আরও কিছুদিন অপেক্ষা করে দেখব। কিন্তু ইতিমধ্যে কলকাতা এবং অন্যান্য স্থানে লবণ-আইন অমান্য করা ছাড়াও রাজদ্রোহাত্মক-আইন ভঙ্গ করা আরম্ভ হয়েছে। চট্টগ্রামে আমরা কালবিলম্ব না না করে রাজদ্রোহাত্মক আইন-অমান্য শুরু করা মনস্থ করেছি।

'এই উদ্দেশ্যে আমরা সর্বশ্রেণীর কাছ থেকে সহানুভূতি পেতে চাই—আমরা চাই সত্যাগ্রহী সৈনিক। আমরা আশা করি দেশবাসী আমাদের লোকবল ও অর্থবল দিয়ে সাহায্য করবে। যাঁরা সত্যাগ্রহী সৈনিক হওয়ার বাসনা রাখেন তাঁরা ২১শে এপ্রিলের মধ্যে যে কোন একজন স্বাক্ষরকারীর সংগে সাক্ষাৎ করবেন।'

এই প্রচারপত্রে লক্ষ্য করবার আছে—আমরা ১৮ই এপ্রিল, যুব-বিদ্রোহের দিনটিকে খুব সযত্নে গোপন রাখতে চেষ্টা করেছি। ১৭ই এপ্রিল প্রচারপত্র ছাপান ও বিলি করা হল। ১৮ই এপ্রিল সকালে পুলিশকে একটি প্রচারপত্র দেওয়া হ'ল। প্রচারপত্রে বলা হ'ল ২১শে এপ্রিলের মধ্যে স্বেচ্ছা-সৈনিকেরা যেন স্বাক্ষরকারীদের সংগে দেখা করে—অর্থাৎ বোঝাতে চাইলাম যে, ২১শে এপ্রিলের পর আমরা রাজদ্রোহাত্মক বক্তৃতা দিয়ে আইন-অমান্য করব। পুলিশ কর্তারা যাঁরা আমাদের সন্দেহজনক চলাফেরায় শঙ্কিত হয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন, তাঁরা আমাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছুটা হদিস পেলেন। হয়ত ভেবেছিলেন কিছুদিন আমাদের জেলে আটক রাখবার সুযোগ পাবেন এবং সেই

গ্রন্থমেলা

দর্শক—সম্পাদক ঃ রবি মিত্র, দেবকুমার বসু। ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ঃ ৭৫ পয়সা।

'দর্শক'-এর ৭ম বর্ষ চলছে। বর্তমান আলোচ্য সপ্তম সংখ্যাটি শারদোৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে। 'দর্শক' মূলত চিত্রকলা সম্বন্ধে বিদগ্ধ পত্রিকা। সেই কারণে 'সমকালীন চিত্র.' 'ভিত্তি চিত্র,' 'প্রাচীন চিত্রের পুনরুদ্ধার,' 'চীনা শিল্প-শাস্ত্র,' 'চিত্র সংস্কার', 'ভ্যানগঘ পত্রাবলী', 'খাজুরাহো' প্রভৃতি প্রবন্ধ চিত্রকলা-সচেতন পাঠকদের গভীরভাবে আকৃষ্ট করবে। বিশেষত ভ্যানগঘের পত্রগুলি শিল্পীদের নতুন জিজ্ঞাসায় নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করবে। নাট্যমঞ্চ, চলচ্চিত্র, আশু প্রকাশিত গ্রন্থের বিশদ পরিচয়, সংগীত, নৃত্য, সমাজ, বিজ্ঞান, পরিকল্পনা সম্পর্কিত লেখাগুলিতে দর্শকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্পষ্টবাদিতা। 'দর্শকে' এবার শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়-এর আঁকা 'বাংলা—১৩৭৩'-তে যে মূর্তি মূর্ত হয়ে উঠেছে তা এ বছরের আঁকা শ্রেষ্ঠ ছবি বলেই আমাদের মনে হয়। অন্যান্য ছবির মধ্যে 'প্রাচীন ভাস্কর্য'-এর মোটামুটি পরিচয়ও এবার আমরা পেলাম। রুশশিল্পী ভেনেতোসিয়ানাভ-এর অঙ্কিত 'স্নানরত' ছবিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চারুকলা—সম্পাদক ঃ অসীম বসু। ১।২ স্যার গুরুদাস রোড, কলিকাতা-১১। দাম—এক টাকা।

আলোচ্য শারদীয় সংখ্যাটি ক্ষীণ কলেবর, কিন্তু মূল্যমানের বিচারে এর ওজন অনেক বেশি। এর প্রবন্ধগুলির দ্বারা শুধু চিত্রশিল্পে যাঁরা অংশভাগী তাঁরাই উপকৃত হবেন তাই নয়, সাধারণ পাঠকবর্গও চিত্রশিল্পের বিবর্তন থেকে সুরু করে নানা দেশ-বিদেশের শিল্প-ইতিহাস, শিল্পধারার গতিপ্রকৃতি ও সামাজিক মূল্যায়ন প্রভৃতি বিষয় তথ্য-সমৃদ্ধ ও রসগ্রাহী আলোচনায় জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করবেন। আমাদের বিশ্বাস, চারুকলার মত পত্রিকার প্রচার সাধারণের মনে চিত্রশিল্প সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে আগ্রহ সঞ্চার করবে। সমীর ঘোষের 'ভারত শিল্পচেতনা', অজিত দত্তের 'গর্গ শিল্প ঃ মেক্সিকো' গোপাল দাসের

জয়ন্তী সেন

'শিল্প সংগ্রামের হাতিয়ার' এবং সুধীর চৌধুরী অনুদিত আর্নেস্ট ফিসারের 'শিল্পের ভূমিকা'—এই প্রবন্ধ চতুষ্টয় নিঃসন্দেহে পত্রিকাটির গৌরব বৃদ্ধি করেছে।

জয়ধ্বনি—সম্পাদকঃ গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু। ৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। মূল্যঃ ১·৫০।

প্রধানত কিশোরদের পত্রিকা হলেও সব রকমের পাঠক এই সঙ্কলনটি পড়ে আনন্দ পাবেন। শিবরাম চক্রবর্তীর রস-রচনা, মনোজিৎ বসুর বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প উপভোগ্য। এ ছাড়া আছে কমিকস, মজার ধাঁ-ধাঁ, একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস ও লঘু গল্প।

শিবম—১, মহেশ চৌধুরী লেন কলিকাতা-২৫। মূল্যঃ ১·৫০।

তৃতীয় বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যাটি বিশেষ শারদ-সংখ্যা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রধানত ধর্ম-ভিত্তিক অধ্যাত্মবাদী রচনা এই পত্রিকার বৈশিষ্ট্য। গোপীনাথ শাস্ত্রী, অবধূত, শঙ্করনাথ রায় প্রমুখের রচনায় পত্রিকাটি সমৃদ্ধ।

মহানগরী—অমলেন্দু বসু সম্পাদিত। ২, পোলক অ্যাভেনিউ; কলিকাতা—২৮। দাম ঃ ৭৫ পয়সা।

'মহানগরী' বিগত বছরের মতো শারদীয় সংখ্যাটি রচনাসম্পদে এবারও সমৃদ্ধ। এই সংখ্যাটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, এর বিতর্কমূলক রাজনৈতিক রচনা পাঠকদের চাঙ্গা করে তুলবে। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'চীন-ভারত বিরোধ' এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রবি-শঙ্করের সঙ্গীতের (সঙ্গীত?) নন্দনরূপ চিত্তাকর্ষক—তথ্যমূলক রচনা। সমরেশ বসু গল্প-ভাবনায় নবনিরীক্ষাপন্থী গল্পলেখকদের সাবধান করেছেন। সেই সাবধানবাণী তাদের কর্ণগোচর হওয়া উচিত। এ ছাড়া গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতি লিখেছেন—প্রেমেন্দ্র মিত্র, আবুল ফজল-(পূঃ বঃ), দুর্গাদাস সরকার, রবীন্দ্র কবিরাজ প্রমুখ।

পূর্বাচল (চতুর্দশ সাহিত্য সংকলন)। সম্পাদিকা—অপর্ণা সান্যাল। ৪২এ/১ এল রাজা সন্তোষ রোড। কলিকাতা-২৭। দাম—এক টাকা।

উচ্চমানের রুচিসম্মত অঙ্গসজ্জায় প্রকাশিত এই পত্রিকাখানি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সমুজ্জ্বল। 'সকলের বড়মা' শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুর সম্বন্ধে বহু অপরিজ্ঞাত তথ্য এই পত্রিকায় সন্নিবেশিত হয়েছে। ঠাকুর পরিবারের ত্রিনবতিতম বর্ষীয়া এই মহিলা কবিশিল্পীর জীবনী ও কর্ম-কৃতি সম্বন্ধে আলোচনাগুলি অনিসন্ধিৎসু পাঠকসমাজের কাছে গবেষণার অপেক্ষা রাখে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকগণের রসোত্তীর্ণ কয়েকটি রচনাসম্ভারে সংকলনখানি সমৃদ্ধ। শিল্পরুচিসম্মত বাংলা পত্রিকাগুলির মধ্যে এই পত্রিকাখানি একটি মূল্যবান সংযোজন। যাঁদের রচনা পত্রিকাখানিকে সমৃদ্ধ করেছে তাঁদের মধ্যে আছেন ডঃ রাধাকৃষ্ণান, ডঃ রামমনোহর লোহিয়া, প্রেমেন্দ্র মিত্র, হেমলতা ঠাকুর এবং আরো অনেকে।

সময় যদি ভবিষ্যতে গুপ্তচর বৃত্তির জন্য কাউকে হাত করতে পারেন! এইভাবে তাঁরা কোন আশার স্বপ্ন দেখেছিলেন কিনা তা' অবশ্য সঠিক বলা যায় না, তবে এটুকু খুব জোরের সঙ্গে বলা যায় যে, আমরা বৃটিশ শক্তিকে পরাভূত করে, চট্টগ্রাম শহর দখল করে সামরিক গণতন্ত্র বিপ্লবী সরকার গঠন করার এক বিপুল আয়োজন করেছি—এটা, তাঁরা বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করতে পারেন নি। আবার বলে রাখি—বিভ্রান্তিমূলক প্রচারপত্র আমাদের সংগঠন ও সক্রিয় যুব-বিদ্রোহের প্ল্যানকে রক্ষা করতে কখনই সক্ষম হোত না যদি গুপ্ত-বিপ্লবী দলে বিশ্বাসঘাতকের প্রবেশ সম্ভব হোত। একজন বিশ্বাসঘাতক থাকা সত্ত্বেও এবং তার অবধি প্রকাশ্য মেলা-মেশার সুযোগ থাকাতেও সে কখনই আমাদের গোপন প্রস্তুতি সম্বন্ধে আন্দাজ করতে পারে নি। তাই বলি পুলিশ বাইরে থেকে প্রকাশ্য কার্যকলাপ দেখে কতটুকু বুঝতে পারে, যদি না দলের লোক বিশ্বাসঘাতকতা করে? বিশ্বাসঘাতককে আগে চিনে ফেলেছিলাম বলে তাকে হত্যা না করে বিপ্লবের কাজে লাগালাম—ডি এস পি-কে তার মারফৎ "সংবাদ" পাঠালাম রাজদ্রোহাত্মক-আইন ভঙ্গ করে আমরা জেলে যাব। আর এই সংবাদটিকে প্রচার-পত্রের মাধ্যমে সমর্থন করলাম। শত্রুপক্ষকে কাবু করবার জন্য এই Strategic Diversion (বিপথে পরিচালনা করবার রণনীতি) সফলতার সঙ্গে প্রয়োগ করতে পেরেছিলাম বলেই চরম সঙ্কটের শেষ মুহূর্তেও আমরা সংগঠনকে বাঁচিয়ে রেখে চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহকে সফল করেছি।

(ক্রমশঃ)

রান্নাঘর থেকে বীণা অসহিষ্ণু কণ্ঠে মেয়েকে বলে; একবার দেখতো কে যেন কড়া নাড়ছে।

তারপর দরজা খুলেই কেতকী উল্লাসে প্রায় চীৎকার করে উঠল, ও মা দেখ, দাদু এসেছে।

বীণা রান্নাঘর থেকেই নিরাসক্ত মন্তব্য করে, তবে আর কি, ঘণ্টা কাঁসর বাজিয়ে নাচ জুড়ে দাও।

খানিক পরে কেতকী রান্নাঘরের দরজার কাছে গিয়ে মোলায়েম সুরে ডাকে, মা।

কি? বীণার কণ্ঠে বিরক্তি।

দাদুর শরীরটা খুব খারাপ হয়ে গেছে।

তা আমি শুনে কি করব, বড়লোক মেয়ে অফিসার জামাই—গুরু আদরেই নাকি ছিলেন।

একটু দাঁড়িয়ে থেকে কেতকী ভয়ে ভয়ে বলল, দাদু চা খাবে মা।

তবে আর কি, অফিসের রান্না নামিয়ে রেখে আমি চা করতে বসে যাই। জানেই তো বাড়িতে পাঁচ-সাতটা বেয়ারা নেই।

অতগুলো বেয়ারা কার বাড়িতে আছে বল?

৩

কেন তোমার বড় মেয়ের বাড়িতে।

কেতকীর পেছনে কখন ভবতারণ এসে দাঁড়িয়েছিলেন ওরা কেউ লক্ষ্য করে নি। কেতকী দাদুকে বেতের মোড়াটা এগিয়ে দিয়ে বলে, বোসো, আমি স্টোভ ধরিয়ে তোমাকে চা করে দিচ্ছি।

হ্যাঁ, স্টোভ ফাটিয়ে একটা কিছু না ঘটালে বুঝি তোমার শান্তি হচ্ছে না!

একটি জামাইয়ের কাহিনী

রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী

কেতকী জানে এই স্টোভ ধরানোর প্রতি মায়ের একটা অহেতুক আতঙ্ক আছে। ওদের ফরিদপুর টাউনে একবার একটি মেয়ে স্টোভ ধরাতে গিয়েই নাকি পুড়ে গিয়েছিল। পুড়ে গিয়ে মেয়েটির নাম হয়েছিল, মুখপুড়ি। মুখপুড়ির বিয়ে হয় নি। এই গল্প শোনার পর থেকেই বীণা কাউকে স্টোভের ধারে-কাছে যেতে দেয় না, বিশেষ করে নিজের মেয়েদের।

অসময়ে ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে, উনুনে চায়ের জল বসিয়ে বীণা যেন খানিকটা দেওয়ালকে শুনিয়ে প্রশ্ন করে, বড়লোক মেয়ের আদর যত্ন ফেলে হঠাৎ কি মনে করে?

ভবতারণ মৃদু তিরস্কারের ভঙ্গিতে মেয়েকে থামিয়ে বলেন, তুই আর বড়লোক বড়লোক করিসনে বাপু, কে যে কত বড়-লোক এবার গিয়েই সব বুঝে নিয়েছি।

বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বীণা একটা ভ্রূকুটি করে। তার মানে যেন কথাটা ঠিক শুনতে পায় নি, শুনতে পেলেও অর্থটা ধরতে পারছে না।

ওকে আশ্বস্ত করে ভবতারণ বলেন, বলব, সব কথাই বলব, অনেক কথা আছে—আগে একটু চা খাই।

চায়ের পেয়ালায় আরামের চুমুক দিয়ে ভবতারণ প্রশ্ন করেন—সুকুমার বুঝি বাজার থেকে ফেরে নি।

না।

নোটনকে দেখছি না?

গেছে কোথাও, ঐতো কাজ, কেবল আড্ডামারা আর খেলা দেখা।

একটু ইতস্তত করে বীণা একসময় বলে, সত্যি তোমার শরীরটা একদম গেছে। আরও কিছুটা সময় অতিবাহিত করে—বীণা স্মরণ করিয়ে দেয়, কি যেন বলবে বলছিলে?

করুণ গলায় ভবতারণ সংক্ষিপ্ত অথচ মর্মস্পর্শী আবেদন করেন। ওখানে তো আর টিকতে পারব না বীণু।

কেন, ওখানে আবার কি অসুবিধে হ'ল। প্রশ্ন করেই বীণা ভ্রূ কুঁচকে প্রতীক্ষা করে থাকে, যেন এই মুহূর্তে সাংঘাতিক কোন গোপন কথা ভবতারণের মুখ থেকে শোনা যাবে।

এ প্রশ্নের কোন জবাব না পেয়ে বীণা বাবাকে আরও কিছুটা তাতিয়ে দিতে থাকে, সামান্য কি একটা বলায় তুমিই তো জামাইয়ের ওপর রাগ করে বড়লোক মেয়ের কাছে চলে গেলে। বছর খানেকের মধ্যে একটা চিঠি দিয়েও তো খোঁজ নিলে না। যাক, ওরা সব আছে কেমন?

ওদের আবার থাকা! ছেলেটা তো মানুষ হল না, মেয়েটাও......

বাবাকে চোখের ইঙ্গিতে থামিয়ে বীণা বলে—কেতকী একটু পাশের ঘরে যা তো।. গল্প পেলে মেয়ের যেন গেকড় গজায়।

কেতকী চলে যেতেই বীণা প্রশ্ন করে, তুমি যে সেবার বলেছিলে দিদির বড় ছেলেটা জলপানি নিয়ে পাশ করেছে।

আমি কি করে জানব বল, ওরা বলে তাই শুনি।

বিনোদ পড়ছে কি? বিনোদই তো নাম।

হ্যাঁ, বিনোদ। পড়ছে আর কই, বি-এ পর্যন্ত পড়ে এখন বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরছে। মাঝে মাঝে বাড়ি আসে, মুখে কেবল এক বুলি—টাকা আর টাকা। দু-চারদিন ঘরে থাকে, তারপর এটা-ওটা হাতিয়েই আবার সরে পড়ে। একটু থেমে ভবতারণ গলাটা কয়েক পর্দা নিচে নামিয়ে বলেন, বীণার গায়ে তো আর একখানাও গয়না নেই।

ও মা সে কি? বিস্ময়ে বীণা চোখ বড় করে। সেবার ওরা কলকাতায় এসে কয়েকটা জড়োয়ার জিনিস করিয়ে গেল না?

ঠিক এমন সময় বাজারের থলি হাতে সুকুমার এসে পড়ায় কিছু সময়ের বিরতি পড়ল।

বাজারের থলিটা নামিয়ে রেখে সুকুমার কিছুটা বিরক্ত গলায় বলল, কখন থেকে কড়া নাড়ছি শুনতে পাও না?

বীণা খুব লজ্জা পায় সুকুমারের কথায়। স্বামীর কাছে গিয়ে অনেুর অশ্রুত গলায় বলে, রাগ কোরো না—জান বাবা এসেছে। এতক্ষণ বড়দিদিদের সব খবর শুনছিলুম।

কণ্ঠে একটু শ্লেষ মাখিয়ে নিয়ে সুকুমার বলে, তবে আর কি, আমি ধন্য হয়ে গেলুম।

বীণা অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলে, এক-বার বাবার সঙ্গে কথা বলে দেখ, দেখবে বাবা সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

তোমার বড়লোক দিদির গল্প শোনার সময় আমার নেই।

আরে না, না, এবার গিয়ে বাবা ওদের হাঁড়ির খবর জেনে এসেছে। তুমি কথায় কথায় নোটনের ওপর রাগ কর, দিদির বিনোদের কীর্তি শোন একবার।

বাজারের জামা খুলে হাতপাখা চালাতে চালাতে সুকুমার প্রশ্ন করে, তাহলে এবার কদ্দিনের পালা?

ছিঃ, অমন কথা বোলো না, বাবা আর কদ্দিন। যে ক'টাদিন আছে—আমাদের এখানেই থাক, কি বল?

আর কিছু নয়। খোলা বাজারে আজ চাল কত করে যাচ্ছে জান? আড়াই টাকা। তাও পুলিশের ভয়ে বেচতে চায় না।

ছিঃ, তুমি অমন কথা বোলো না আজ দেশ ভাগ না হলে বাবারটাই কে খায়। শোন তোমাকে একটা কথা বলি।

কি বল।

চারিদিকে ভাল করে দেখে নিয়ে বীণা বলে, বাবা বলছিল, ওর পাকি-স্তানের সব প্রপার্টি আমার নামেই লিখে দেবে।

পাকিস্তানের বিষয় আর চাঁদের জমিদারি দুই সমান।

কণ্ঠে চরম আশাবাদ ফুটিয়ে বীণা ওর বহুকাল পোষিত বিশ্বাসটাকে ব্যক্ত করে, আচ্ছা আজ না হয় দুই বঙ্গ আলাদা হয়ে আছে, দুদিন পরে যে এক হবে না, সে কথা কে বলতে পারে। ধরলাম আমরা না হয় ভোগ করতে পাব না, কিন্তু আমাদের ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনিরাও তো পেতে পারে।

মন্দ বল নি কথাটা। দেখ। আমার কিন্তু স্নানের বেলা হয়ে যাচ্ছে।

তোমার ভাবনা নেই গো, ওদিকে কেতকী আছে।

সে কি, ওর আজ কলেজ নেই?

থাকবে না কেন, কলেজে ওর তিন মাসের মাইনে বাকি, তাই নাম কেটে দিয়েছে। আজকাল কলেজগুলোও হয়েছে তেমনি।

কলেজের কথা উঠতে কেতকী রান্না-ঘর থেকে বেরিয়ে বলল, অন্তত মাস দুয়েকের মাইনেটা দিয়ো বাবা, নইলে খাতায় নাম তুলবে না।

নাম না হয় নাই ডাকল, ক্লাস লেকচারটাও তো ফলো করলে পারিস।

বা-রে পার্সেণ্টেজ না পেলে ক্লাস করে কি লাভ।

হঠাৎ সুকুমারের এক অধ্যাপক বন্ধুর গল্প মনে পড়ে যায়। নতুন অধ্যাপক, প্রথম দিন কলেজ করে তার অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক পিতাকে গিয়ে বলেছিল, কলে-জের সব ভাল, কেবল রোল কলটা বাদে। অধ্যাপক পিতা হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, প্রথম প্রথম তাই মনে হয় পরে কিন্তু ঐ রোল কল ছাড়া আর কিছুই ভাল লাগবে না।

ভবতারণের আবার তামাক খাওয়া বাতিক। কয়েক বছর আগে সেই পাকিস্তান থেকে চলে আসার সময় ভব-তারণ কেবল একটা হুঁকো হাতে করে এসেছিলেন। তাই মাঝে মাঝে নাতি-নাতনিদের তিনি রসিকতা করে বলেন, একেবারে খালি হাতে তো আসি নি ভাই, অন্তত একটা হুঁকো হাতে ছিল।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বীণা সেই পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে যাবার আগে হুঁকোটা ধুয়ে-মুছে কল্কেয় নতুন

তামাক সেজে বলল, তোমাকে বিছানা করে দেব?

বিছানা—তা দে। একটু গড়িয়ে নি। তুই আবার তামাক আনলি কোত্থেকে।

এই তো গলির মুখেই নতুন তামাকের দোকান হয়েছে, নোটনকে দিয়ে আনালুম।

ওঃ আজ কতদিন পরে তামাক খাচ্ছি।

কেন কানপুরে বুঝি তামাক পাওয়া যায় না?

পাওয়া যাবে না কেন, কানপুরের তামাক হ'ল বিশ্ববিখ্যাত, কিন্তু এনে দিচ্ছে কে বল।

গলায় একটা কৃত্রিম কারুণ্য ফুটিয়ে বীণা প্রশ্ন করে বড়দির ছেলেটা তা'হলে বয়েই গেল কি বল?

শুধু ছেলে কেন, মেয়েটাই বা কোন পদের, কলেজে যায় ঐ নামমাত্র, এদিকে মেয়ের কেলেঙ্কারীতে পাড়ায় কান পাতা দায়।

সে কি? অদম্য উত্তেজনায় বীণার দু'চোখের তারা চকমক করে ওঠে।

হ্যাঁ রে মেয়ে নাকি কোন কায়েতের ছেলের সঙ্গে রেজিস্ট্রি করে বসে আছে।

ও মা সেকি কথা গো! দাঁড়াও তোমার কল্কেটা বদলে দি, কয়লার আগুন কি না নেশিক্ষণ থাকে না, তোমার জামাইকে বলেছি ওবেলায় সেরখানেক টিকে এনে দেবে।

নতুন কল্কে সাজিয়ে বীণা কিছু-ক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসে। তার পর একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলে, শেলী আমার মেয়ে হলে ওকে কেটে ফেলতুম, ছি ছি কি ঘেন্নার কথা।

অদম্য উত্তেজনাটা বীণার দু'চোখের তারা হয়ে জ্বলতে থাকে। তাহলে দিদির ছেলেমেয়ে দুটো কেউ মানুষ হ'ল না বল। আচ্ছা জামাইবাবুর সেই বারোশো টাকার প্রমশনটার কি হ'ল, হয়ে গেছে?

কোথায় আর হ'ল, পরীক্ষা দিয়ে তো আগে পাশ করা চাই। শুনি সে তো বারবার ফেল করছে।

সন্ধ্যেবেলায় একটা গঙ্গার ইলিশ হাতে সুকুমার বাড়ি এল। বীণা বলল, বাবা কি খাবে বল, সর্ষে ইলিশ না ভাতে। কেতকী মায়ের কথাটা লুফে নিয়ে দাদুর হয়েই উত্তর দেয়— দুটোই।

কেতকী ইলিশ কুটতে কুটতে বলে, আজ কতদিন ইলিশ খাই নি জান দাদু, স্বাদটা প্রায় ভুলেই গিয়েছি।

এ আর কি ইলিশ রে, ইলিশ হ'ল মধুমতীর, জিজ্ঞেস কর তোর মাকে। একদিন মাছ খেলে সাতদিন থালা-বাটি থেকে ইলিশের ঘ্রাণ তোলা যেত না। সে মাছও নেই, আর সে দেশও নেই। তবে এভাবে বেশিদিন চলবে না। জানিস্ বীণা, সেবার গয়ায় এক সন্ন্যেসীর কাছে কথাটা পেড়েছিলুম, মানে এই দেশ ভাগের কথা, শুনে সন্ন্যেসী বললেন, 'দুনো মিলকে এক হো যায়েগা'।

তাই বলছিলুম, ওখানে আমার যা আছে না আছে তোর নামেই সব লিখে যাই।

নিরাসক্ত কণ্ঠে বীণা বলে, দিতে চাও দিও, কিন্তু তোমার বড় মেয়ে আবার......

বড় মেয়ে কি বলবে শুনি, আমার বিষয় আমি যাকে ইচ্ছে দিয়ে যাব।

খানিক আগে মশারি গুঁজে জলের গেলাসটা বাবার মাথার কাছে রেখে বীণা শুতে যায়।

ঘুমের ভান করে পড়ে থাকলেও ভবতারণের চোখে ঘুম কিন্তু আসতে চায় না। আজ তার বারবার মনোরমার কথাই মনে পড়তে থাকে। আজ এই মুহূর্তে এই রাত, এই ঘর, খাট, মশারি, বিছানা সবকিছুই যেন ঘুরতে ঘুরতে আঠারো উনিশ বছর আগেকার দিনগুলির মধ্যে মিশে যেতে থাকে। পাকিস্তান হওয়ার বছর চারেক আগে একমাত্র মনোরমার উৎসাহেই তিনি মেয়েদের বিয়ে দিয়ে-ছিলেন। তার নিজের কিন্তু অত ছোট বয়েসে মেয়েদের বিয়ে দেবার ইচ্ছে ছিল না। কেবল মনোরমাই ধরে বসল, দুটি ভাল ছেলে যখন পাওয়া গেছে তখন সুযোগটা হাতছাড়া কোরো না। না সুযোগ হাতছাড়া করেন নি ভবতারণ। এক মাসেই দুই মেয়ের বিয়ে দিয়ে সংসার-জীবনের শেষ কর্তব্য পালন করেছিলেন।

তারপরেই দেশের ওপর দিয়ে সেই কুখ্যাত রাজনৈতিক ঝড়টা বয়ে গেল। সাতপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে নির্বিবাদে মানুষগুলি পালাতে লাগল। গ্রামের পর গ্রাম পড়ে রইল শ্মশান হয়ে। সেই শ্মশান জাগিয়ে কেবল পড়ে থাকলেন ভবতারণ চাটুজ্যে। পড়েছিলেন মনো-রমার মুখের দিকে তাকিয়ে। ঘর-বাড়ি বেচে অপরিচিত দেশে যাবার ইচ্ছে ছিল না মনোরমার। না যাওয়ার অন্য কারণও অবশ্য ছিল। খুব ছোটবেলায় ভবতারণের একমাত্র ছেলে রাজবাড়ির মেলায় হারিয়ে যায়। সে সব অনেক বছর আগের কথা। তারপর দু-দুটি মেয়ের জননী হলেন মনোরমা, মেয়েরা বড় হ'ল, ভাল ঘরে চাকুরে পাত্র দেখে মেয়েদের বিয়েও দেওয়া হ'ল। কিন্তু মনোরমার মন থেকে সেই ক্ষীণ আশাটা মৃত্যুর পূর্বেও মুছে যায় নি। মনোরমা বিশ্বাস করতেন তার খোকা ফিরে আসবে। এই বিশ্বাসের জন্যে একজন আলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সন্ন্যাসীর ভবিষ্যৎ বাণীই অনেকটা দায়ী ছিল।

বিয়ের পর বড় জামাই সুরেন বদলি হয়ে গেল কানপুরে। আর ছোট সুকুমার কলকাতার সওদাগরী অফিসের কেরাণী। কলকাতায় ওর বাসা। মেয়েরা অবশ্য মাঝে মাঝে চিঠি লিখে খোঁজ-খবর নিয়েছে, এমন কি মা বাবাকে দু-একবার ওদের কাছেও নিয়ে যেতে চেয়েছে কিন্তু মনোরমাই সেদিন রাজী হয় নি।

সেই মনোরমাই যখন ভবতারণকে ফেলে চলে গেল তখন কিসের জন্যে আর বান্ধববর্জিত দেশে পড়ে থাকা। সব ফেলে একদিন ভবতারণ বড় মেয়ের কাছে কানপুরে গিয়ে উঠল। কানপুর থেকে কলকাতায়। আবার কলকাতা থেকে কানপুরে। কলকাতা আর কানপুরের মধ্যে ন'মাসে ছ'মাসে দু-একটা চিঠিপত্র ছাড়া অন্য কোন যোগসূত্র ছিল না। ভবতারণ আসার পর আবার নতুন করে দু'বোনের সংসারে সেতুবন্ধন হয়।

মাস ছয়েক পরে, একদিন ভবতারণ বাজার থেকে ফিরে মেয়েকে বলল, একটু চা করবি মা।

এই তো বাজার যাবার আগে চা খেলে, অত চা খাওয়া কি ভাল। বাজার থেকে কিছু ফিরল?

না তো।

সে কি, তিনটে টাকাই খরচ করে এলে, বীণার কণ্ঠে বিস্ময় আর বিরক্তি।

ভবতারণ কিছুটা লজ্জিতভাবে বলে, চার আনা ছিল, তামাক এনেছি। আজ ক'দিন তামাকটা ফুরিয়ে গেছে—জামাইকে কাঁহাতক আর বলি বলত। একটু দিবি না কি সেজে।

বীণা কেতকীকে উদ্দেশ্য করে বলে, দাদুকে একটু তামাক সেজে দাও, আমার কি এখন অবসর আছে নাকি।

রান্নাঘরের দরজার কাছে মোড়া পেতে হুঁকো টানতে টানতে ভবতারণ মেয়েকে লক্ষ্য করে বলেন, আজ ক'দিন থেকেই ভাবছি—একটু কানপুর ঘুরে আসব। জানিস বীণু সেদিন রেশন দোকানের লাইনে কানপুরের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা...।

বীণার কণ্ঠে একসঙ্গে উচ্ছ্বাস, উত্তেজনা আরও অনেক কিছু, কিছু নতুন খবর টপর আছে নাকি?

না, ভদ্রলোক খুলে কিছুই বলতে চাইল না, তাই ভাবছি একবার ঘুরে আসব কি না।

বেশ তো যাও না দু'দিন ঘুরে এসো।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বীণা একটু গড়িয়ে নেবার ব্যবস্থা করছে এমন সময় ভবতারণ এসে হাজির। বাবাকে দেখে বীণা প্রায় চমকে ওঠে। একি বাবা, কি চেহারা হয়েছে তোমার।

ম্যাট্রিক ফেল বলেই তো যত গণ্ডগোল। একবার ভেবেছিলাম সুকুমারকে গিয়েই

আর বলিসনে মা, তোর ওপর অভিমান করে গিয়েই এই শাস্তি।

শাস্তি? শাস্তি কেন, গেলে বড়লোক মেয়ের আদর খেতে......।

বীণার কণ্ঠের শ্লেষটা লক্ষ্য করে ভবতারণ বলেন, সব বলবার আগে একটু চা কর। আর হুঁকোটা বের করে একটু তামাক সাজ, আজ কতদিন তামাক খেতে পাই নি।

সে কি, তোমার বড়লোক মেয়ের এত আর্দালি পিওন থাকতেও, একটু তামাক কিনে খাওয়াতে পারে নি। এমনটা যে হবে সে তো আমি আগেই জানি, তুমিই কেবল বীণার নামে অজ্ঞান হয়ে যেতে।

হঠাৎ পয়সার মুখ দেখে বীণার কি আর মাথার ঠিক আছে। বিয়ের সময় তোমার ঐ সুকুমার ছিল একশো টাকা বেতনের কেরাণী,—সে এখন হাজার বারোশো টাকার অফিসর হয়েছে, আঙুল ফুলে কলাগাছ হবে না!

অফিসর না ছাই ওসব হ'ল বীণার বানানো কথা; আমরা হলুম গাঁইয়া মানুষ অত কি আর বুঝি, যা বলে তাই বিশ্বাস করি।

বীণার চোখে বিস্ময় উত্তেজনা আর তৃপ্তির আমেজ। ও মা সে কি, তুমিই না বলেছিলে সুকুমার অফিস থেকে গাড়ি পেয়েছে?

অফিসর না হলে তো গাড়ি দেয় না, যেমন ওদের গুপ্তসাহেব অফিস থেকে গাড়ি পেয়েছেন।

আ রে ও গাড়ি হ'ল সুকুমারের কোন বড়লোক বন্ধুর, অফিস যাবার পথে ওকে তুলে নেয়। এবার গিয়েই সেটা ধরে ফেলেছি।

তাই বল আমি তো ভাবি সুকুমার ম্যাজিক জানে নাকি! একশো টাকার কেরাণী থেকে অতবড় অফিসর। বীণার গলাটা উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে। এই বিনোদ তোর দাদু এসেছে, ওঠ একটু তামাক কিনে আন।

দিবানিদ্রার আমেজ কাটিয়ে উঠে বসতেই বিনোদ দাদুকে দেখতে পায়, আ রে দাদু যে, কখন এলে?

এইমাত্র, আমার দিদি কই রে, তাকে তো দেখছিনে কলেজে বুঝি।

না শেলী অফিস গেছে।

অফিস।

হ্যাঁ, আজ কয়েক মাস হ'ল তোমার জামাইয়ের অফিসেই ঢুকেছে। এছাড়া কি উপায় ছিল বল। তোমার জামাই আজকাল বুকের ব্যথায় মাসের মধ্যে দশদিন বিছানায় পড়ে থাকছে। দিন গেলে এতগুলি প্রাণীর মুখ কি দিয়ে ভরাই বল। বিনোদটা কোথাও ঢুকতে পারলে তো ভাবনাই ছিল না, কিন্তু ধরব—যাদ কোথাও একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারে। এখন যা শুনছি তাতে তো......

আরে রাম রাম, সুকুমারের চাকরী দেওয়ার ক্ষমতা আছে নাকি, ওর নিজের চাকরীই বলে এই যায় সেই যায় অবস্থা।

আচ্ছা বীণার ছেলেটা এখন কি করছে? এম-এ পাশ দিল?

কে নোটন তার কথা আর বলিসনে।

গভীর উত্তেজনায় বীণার চোখের তারা দুটো যেন জ্বলতে থাকে। বলে, দাঁড়াও আগে তোমার চায়ের জলটা চড়িয়ে আসি। কিছু খাবে নাকি?

না এখন অবেলায় কিছু খাব না।

তারপর চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে মেয়ের হাত থেকে হুঁকো নিয়ে ভবতারণ টানতে থাকেন। গন্ধওয়ালা তামাকের আবেশে দু'চোখের পাতা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে আসে। এক সময় হুঁকো থেকে মুখ তুলে ভবতারণ প্রশ্ন করেন, এমন সুন্দর কাঠকয়লা কোথায় পেলি রে বীণু!

কাঠকয়লা তো বাড়িতেই আছে, তোমার জামাইয়ের বুকে সে'ক দিতে হয় কি না।

আলোচনার পূর্বসূত্র টেনে বীণা প্রশ্ন করে, বীণার ছেলের কথা কি যেন বলছিলে?

তার কথা আর বলিসনে মা এই বুড়ো বয়েসে কতই দেখব।

কেন কি আবার হ'ল?

ছেলে ওর কলেজের কোন মেয়েকে গোপনে বিয়ে করে বসে আছে!

বীণার গলায় উত্তেজনাটা আর চাপা থাকে না, ও মা সে কি গো, স্বঘর তো, না আজকাল যা হচ্ছে তাই?

একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে যেন ঘরের দেওয়ালগুলোকেও গোপন করে ফিসফিসে গলায় বলেন, মেয়ে নমঃশূদ্র।

বীণার বাকরুদ্ধ মুখের ওপর বিচিত্র ভাব খেলে যাচ্ছে, না বীণার দেখছি থোতা মুখ ভোঁতা হয়ে গেল। আমার বিনোদটা না হয় লেখাপড়াই করল না, কিন্তু ওদিকে ছেলে আমার হীরের টুকরো। এই যে পাড়ায় এত মেয়ে আছে, কেউ বলতে পারবে আমার বিনোদ কারও মুখের দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছে। আহা বেচারা, বীণার জন্যে আমার দুঃখ হয়।

এইতো গেল ছেলে, মেয়েই বা কম যায় কিসে।

কেন, ওর মেয়ের আবার কি হ'ল? বীণা উত্তেজনায় বাবার দিকে এগিয়ে গিয়ে বসে।

কিছু হয় নি তবে শোনা যাচ্ছে নাকি হ'বে।

কি রকম? উত্তেজনায় বীণার গলা কাঁপছে, চোখের তারা আবেশে যেন অবশ হয়ে আসে।

ওর মেয়ে নাকি তার গানের মাস্টারকেই বিয়ে করবে। এই নিয়ে ওদের মায়ে-ঝিয়ে দিনরাত তুমুল কাণ্ড চলছে। সাধে কি আর পালিয়ে এলুম রে। তারপর একটু থেমে বীণার মুখের ওপর দিয়ে চোখটা বুলিয়ে নিয়ে বলেন, যে ক'দিন আছি ভাবছি তোর কাছেই থেকে যাই।

আমি ত' তাই বলি, তুমিই তো সামান্য কি একটা কথায় আমার ওপর রাগ করে বড়লোক মেয়ের বাড়ি গিয়ে উঠলে।

কিছুটা নিরাসক্ত মনেই ভবতারণ যেন বিড় বিড় করে বলতে থাকেন, ওদিকে যা আমার পড়ে আছে তোকেই সব দিয়ে থুয়ে নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে যেতে চাই। আজ না হয়

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু—৬·০০ —ডঃ ধীরেন্দ্র দেবনাথ
রবীন্দ্র সুভাষিত—১২·০০ —শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ
চৈতন্যোদয়—২·৫০ জ্ঞান দর্পণ—৩·০০ —হরিশচন্দ্র সান্যাল
Studies in Artistic creativity—১৫·০০ —ডঃ মানস রায়চৌধুরী
A critique of the theories of Viparyaya—১৫·০০
—ডঃ ননীলাল সেন
The House of the Tagores—২·০০ —হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
Studies in Aesthetics—১০·০০
Tagore on Literature and Aesthetics—৮·৫০
—ডঃ প্রবাসজীবন চৌধুরী

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭
পরিবেশক ঃ জিজ্ঞাসা, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯
১৩৩এ, রাসবিহারী এ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯

দুবঙ্গ আলাদা হয়ে আছে কিন্তু এক হতে কতক্ষণ। এই তো সেদিন কালীঘাটের এক সন্ন্যেসীর মুখে শুনলুম, মাতৃভূমি কখনও দ্বিখণ্ডিত হয়ে থাকতে পারে না।

রীণা ওর মুখের আসক্তিহীনতাটা বজায় রেখেই বলে, বেশ দিতে চাও দিও। এখন যাই তোমার খাবার করি গে। না বীণার জন্যে মনটা আমার পুড়ে যাচ্ছে।

মাঝরাতে দাদুর বিছানা থেকে কান্নার শব্দ পেয়ে বিনোদের ঘুম ভেঙে যায়। এই রাতদুপুরে বুড়োর আবার কি হ'ল, মুখে বালিস চেপে কাঁদে কেন?

বিনোদের সাড়া পেয়ে ভবতারণ কান্না থামিয়ে ভালমানুষ সাজার চেষ্টা করেন।

বুড়ো বয়সে কি কান্নার রোগটাই না ধরেছে ভাই। রোজ রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে না কেঁদে পারি না।

বিনোদ সরল মনে সহানুভূতির সুরে প্রশ্ন করে, এর আগেও তো তোমার কাছে শুয়েছি, এটা তো লক্ষ্য করি নি।

না তখন ছিল না, এবার কলকাতা গিয়ে প্রথম রাত থেকেই আরম্ভ হয়েছে।

চল কাল তোমাকে বর্মণ ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। এসব রোগ হোমিওপ্যাথিতেই ভাল সারে।

না বর্মণ ডাক্তারের কাছে নয়, যেখানে গিয়ে সারাদিন ঈর্ষাতুর মনের উত্তেজনা জুগিয়ে মধ্যরাত্রে উঠে বিবেকের নিষ্ঠুর দংশনে বালিস মুখে দিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে হয় না, সীমান্ত পারে তাঁর সেই পরিত্যক্ত সাম্রাজ্যেই ভবতারণ পালিয়ে ছিলেন।

সেটা দিন তিনেক পরের ঘটনা। সকাল থেকেই ভবতারণকে কানপুরের কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। পার্ক, পরিচিত লোকজনের বাড়ি, নদীর ধার, কালীবাড়ি। না কোথাও নেই ভবতারণ।

রীণার কান্নাকাটিতে বাধ্য হয়েই পরদিন সুরেন কলকাতায় টেলিগ্রাম করল।

না। ওখান থেকে আরও একদিন পরে উত্তর এল। ভবতারণ কলকাতায় যান নি।

এমন সময় কাশ্মীর আর লাহোরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই দেশের যুদ্ধ সুরু হয়ে গেল। কাগজে কাগজে গরম যুদ্ধের খবর, বীর জোয়ান আর শহীদের ছবি পাতায় পাতায়।

এমনি দিনে কেমন করে যেন সুকুমারের হাতে একখানি বিদেশী কাগজ এসে পড়ল। নিষ্প্রদীপ রজনী। একটু আগেই ওদের অফিস ছুটি হয়ে যায়। যুদ্ধের রেয়ার ইনফরমেশন সংগ্রহের জন্যে ও এসপ্ল্যানেডের একটি বিখ্যাত দোকানে গিয়ে ঢোকে। রেকর্ড-বই আর দেশ-বিদেশের নানান পত্র-পত্রিকা। অধিকাংশই নিষিদ্ধ। কেমন করে সেগুলো পাহারাদারদের চোখে ধুলো দিয়ে দিনের পর দিন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে এসে পৌঁছায় সে রহস্য না হয় গোপনই থাক।

চোরা দোকানের কাউন্টারে একটা বিদেশী সংবাদপত্র সুকুমারের হাতে পড়ে যায়। নানান ছবি, এশিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে বিদেশী মন্তব্য, অনুন্নত দেশগুলিকে দীর্ঘমেয়াদী বিদেশী ঋণের তালিকা, তারপর......তারপর, এক জায়গায় এসে সুকুমারের চোখ দুটো আটকে যায়। এক বৃদ্ধের ছবি। ছবির তলায় মন্তব্য "এ্যান ইন্ডিয়ান স্পাই ডায়েড এ্যাট বনগাঁ বর্ডার।" ভবতারণ চাটুজ্যেকে চিনতে অসুবিধে হয় না সুকুমারের। হাজার হলেও শ্বশুর তো।

ছাত্র অভিযান ব্যর্থ—চ্যবন

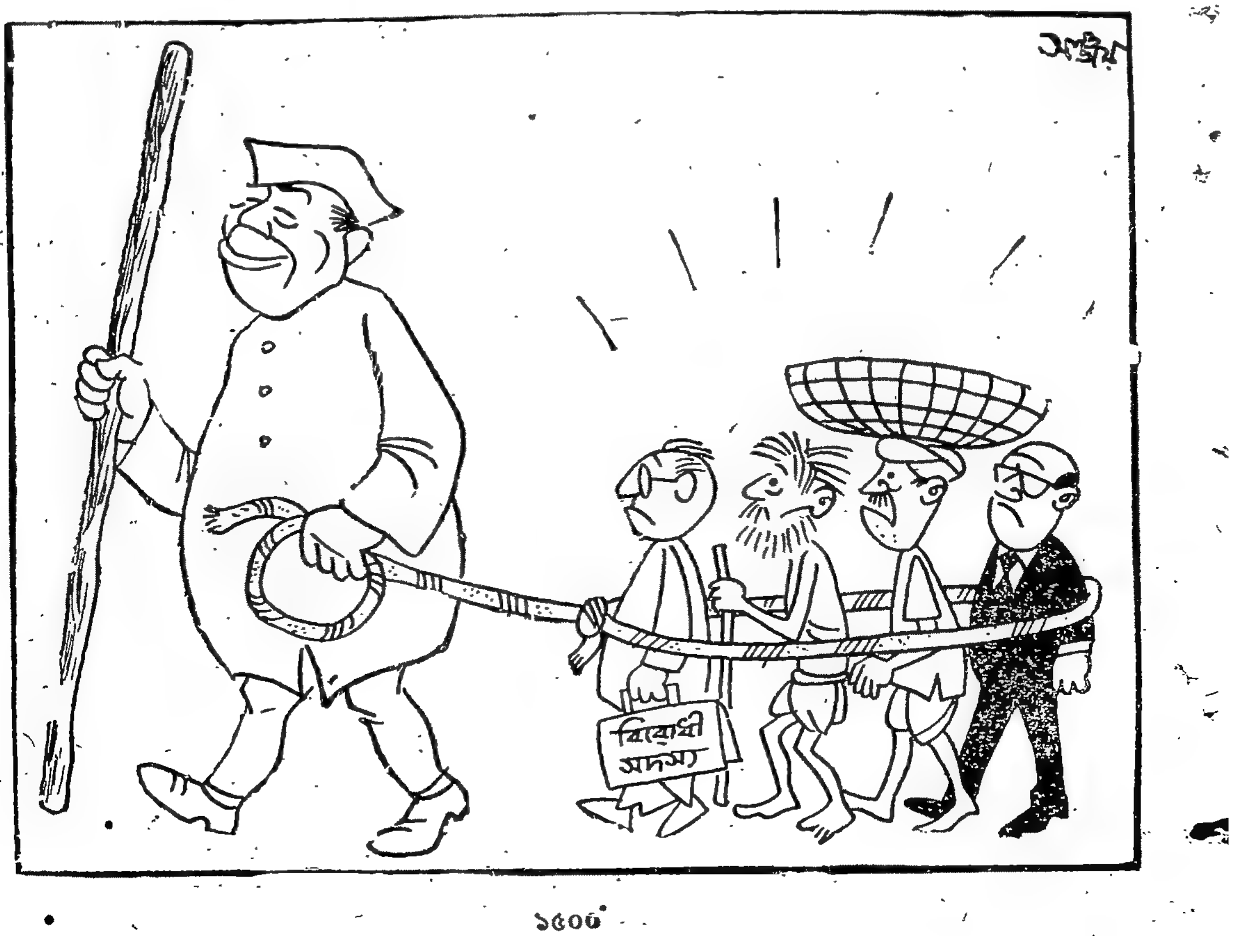

বঙ্গদর্শন

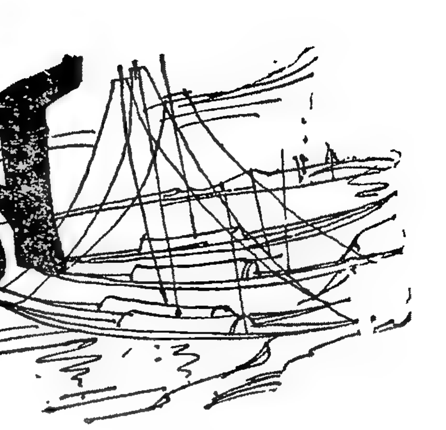

শিক্ষাজগতে অচল অবস্থা

প্রেসিডেন্সী সহ কয়েকটি কলেজের ছাত্র বহিষ্কারের ব্যাপার নিয়ে সংশ্লিষ্ট কলেজগুলিতে ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন একটা অচল অবস্থার উদ্ভব হয়েছে যা কিভাবে দূর হবে কিছুতেই ভেবে পাওয়া যাচ্ছে না।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে আছে গত ১২ই অক্টোবর থেকে। ছাত্রগণ কর্তৃক অবরুদ্ধ অবস্থাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পূজার ছুটি হয়ে যায় এবং গত ১৭ই নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দিন থাকলেও আজ ২০শে নভেম্বর বঙ্গদর্শন লেখার দিন পর্যন্ত তা কার্যত বন্ধই হয়ে আছে।

এইভাবে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে থাকার দরুণ সর্বস্তরেই অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্মীরা বেতন পান নি, অধ্যাপকেরা খাতা দেখার টাকা পান নি, আরও বহু লোক নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। সবচেয়ে দুঃখের কথা—এর ফলে 'স্নাতকোত্তর' পরীক্ষাগুলিও পিছিয়ে গেল, যার পরিণামটা মোটেই ভাল হবে না।

এই প্রসঙ্গে আমরা পূর্বেই প্রচুর লিখেছি যাতে উভয় পক্ষের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হয়। কাজেই সেগুলির পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। তা' ছাড়া তিক্ত সত্যে কারুরই রুচি হয় না, বিশেষ করে ছাত্ররা (অবশ্য বয়স্করাও বাদ যান না, একটি বিশেষ ক্ষেত্রে আমরা তা' ভাল করেই বুঝতে পারছি) বড়ই ভাবপ্রবণ, তাঁদের সেন্টিমেন্টের বিরুদ্ধে কোন কথা গেলেই তাঁরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।

আমরা পূর্বেও বহুবার বলেছি, অনুসন্ধানে আমরা যা পেয়েছি তার ভিত্তিতে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, যে ক'জন ছাত্র-ছাত্রীকে বহিষ্কার করা হয়েছে, তাদের মধ্যে কয়েকজনের ক্ষেত্রে তা খুবই সঙ্গত হয়েছে এবং কয়েকজনের ক্ষেত্রে তা অসঙ্গত ও অন্যায় হয়েছে। ছাত্র-আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই দুটি বিষয় একসঙ্গে মিশে গেছে, যে কারণে কর্তৃপক্ষ তথা ছাত্রদল উভয় পক্ষেরই অনমনীয় হবার প্রবণতা নিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ছাত্রগণ দাবি করছেন যে, বহিষ্কৃত সকলেই নির্দোষ, এবং কলেজ কর্তৃপক্ষ দাবি করছেন বহিষ্কৃত সকলেই দোষী। এই দুটি দাবির কোনটাই সত্য নয়। এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য আমরা পূর্বেই নিবেদন করেছি। যাতে বিষয়টির ন্যায়-সঙ্গত সমাধান হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই কর্তব্য।

কেন্দ্রের নিকট সাহায্য ভিক্ষা

পশ্চিমবঙ্গের চারটি জেলার খরা এলাকাগুলিকে বাঁচাবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রের কাছে তিন কোটি টাকা সাহায্য চেয়েছেন বলে প্রকাশ। অবশ্য কেন্দ্র এ বিষয়ে কতদূর কৃপা করবে একথা বলা শক্ত। তবুও খরাক্লিষ্ট পশ্চিমবঙ্গের শোচনীয় অবস্থার স্বীকৃতি সরকারী তরফ থেকে ঘটেছে এবং সরকার একটা কিছু যে ব্যবস্থা করতে চাইছেন এইটুকুই আশার কথা।

বস্তুত সেই পুরাতন কথাটাই বার বার পুনরাবৃত্তি করতে হচ্ছে যে, এতগুলি পরিকল্পনা পার হয়ে যাবার পরেও সেই যদি জলের জন্য দেবতার পায়ে মাথা কুটতে হয় তাহলে দুর্গতির আর শেষ কোথায়? পুরুলিয়াতে শতকরা ৮০ ভাগ জমিতে কোন চাষই হয় নি। বাঁকুড়ার দুই-তৃতীয়াংশ জমি খাঁ খাঁ করছে, মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরে যথাক্রমে ৪০ ও ৬০ ভাগ জমিতে চাষ হয়েছে। হাওড়া, হুগলী, চব্বিশ পরগনার অবস্থাও এমন কিছু ভাল নয়।

অথচ উত্তম সেচ ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গেই হওয়া উচিত ছিল। পশ্চিমবঙ্গের অজস্র নদী-নালা সংস্কারের অভাবে মজে গেছে, সেগুলি উদ্ধারের কোন ব্যবস্থাই হয় নি। এইগুলি সংস্কার করলেই প্রচুর জল পাওয়া যেত, যা দিয়ে শুধু চাষের জমিতেই জলসেচ হত না, উপরন্তু মাছের চাষ তথা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে গমনাগমনের নতুন পথও খুলে যেত। পশ্চিমবঙ্গে এক গঙ্গা ছাড়া এখন আর কোন নদীপথ নেই। পৃথিবীর যে কোন জায়গাতেই নদী একটি সম্পদ। অথচ বাংলাদেশ নদীমাতৃক হওয়া সত্ত্বেও পরিকল্পনাকারেরা এদিকে মোটেই দৃষ্টি দেন নি। আমাদের নদী পরিকল্পনাগুলির পিছনে আছে বিদ্যুৎশক্তি আহরণের মতলব, সেচের ব্যাপারটা সর্বক্ষেত্রেই গৌণ।

যে দেশের মাটি হাজার হাজার বছর ধরে মানুষকে অন্ন জুগিয়ে আসছে সে মাটি এখনো এত বন্ধ্যা হয়ে যায় নি যে, মার্কিন মুল্লুকের সঙ্গে চুক্তি করে সারের কারখানা বসিয়ে সে মাটিকে উর্বর করতে হবে। এ দেশের মাটির সর্বাল্প প্রয়োজন কিছুটা জল এবং সেটুকুর যোগান দিতেই পরিকল্পনা কমিশন হায় হায় করছেন আজ দীর্ঘ আঠার বছর ধরে। একে কি শুধু ভাগ্যের বিধান বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়? আজ শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয় সারা ভারতেই জলের সমস্যা সর্বাপেক্ষা মারাত্মক, সর্বত্রই অনাবৃষ্টি খরা ও দুর্ভিক্ষের সংবাদ। স্বাধীনতা লাভের উনিশ বছর পরে যারা দেশকে এই অবস্থায় নামিয়ে এনেছে কোন যুক্তিতেই তাদের ক্ষমা করা যায় না। রাতারাতি দেশকে মার্কিন মুল্লুক বানাবার উদগ্র বাসনায় এরা দেশের আসল প্রাণদায়িনী শক্তিকে হত্যা করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট আমা-

দের নিবেদন, দেখে শিখতে না পারেন, তাঁরা যেন ঠেকে শিক্ষালাভ করেন। সরকারের পক্ষে সদিচ্ছা থাকলে দেশের মধ্যে উন্নত ধরণের সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলা অসম্ভব ব্যাপার নয়। পশ্চিমবঙ্গের জন্য তাঁরা অন্তত এটুকু করুন। তাহলে দিল্লীর কাছে হাত পাততে হবে না অথবা ঘন ঘন তারবার্তায় এস, ও, এস পাঠাতে হবে না।

আসন্ন স্টেটবাস ধর্মঘট

আমাদের আশংকাগুলি ধীরে ধীরে সত্যে পরিণত হতে চলেছে। কলকাতা শহরের ৩২টি বাস রুটের মধ্যে ৪টি রুট থেকে স্টেটবাস তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে, অপর রুটগুলিও সরকারী সিদ্ধান্তের মুখ চেয়ে এখনো পর্যন্ত অপেক্ষা করছে।

শেষ পর্যন্ত স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্তৃপক্ষ মাথা কেটে মাথাব্যথা সারাবার বিধান দিলেন। সহজ বুদ্ধিতে মনে হয় এর কোন প্রয়োজন ছিল না। যে যুগে একটি বাসের লাইসেন্স পাওয়াকে লোকে জমিদারী পাওয়ার মত জ্ঞান করে, সে যুগে রাষ্ট্রীয় পরিবহন কর্তৃপক্ষ লোকসানের পর লোকসান গুণে যাচ্ছেন, আর নিজেদের অক্ষমতা তথা প্রশাসনিক ত্রুটির কথা ভুলেও উচ্চারণ না করে সব দোষ চাপাতে চাইছেন বাসকর্মীদের উপরে।

এখন ঢাকী সমেত প্রতিমা বিসর্জন করতে গেলে ঢাকীরা অবশ্যই প্রতিবাদ করবে কেন না তাদের কাছে নিজেদের প্রাণের মূল্যটা অনেক বেশি। এই কারণেই স্টেটবাস কর্মীরা আন্দোলনে নামছেন। কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগের সীমা নেই, সবচেয়ে বড় অভিযোগ যে, রাষ্ট্রীয় পরিবহন কর্তৃপক্ষ কলকাতার রাজপথে প্রাইভেট বাস আমদানী করে শুধু যে তাঁদেরই জীবিকার পথ রুদ্ধ করছেন তাই নয়, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পথ সংকুচিত করে তাঁরা জনসাধারণের স্বার্থবিরোধী কাজ করে দেশকে অধিকতর দুর্দশার পথে নিয়ে যাচ্ছেন। এ ছাড়া বাসকর্মীদের বৈষয়িক অভাব অভিযোগের বিষয়ও তাঁদের ধর্মঘটের পথে এগিয়ে যাবার সিদ্ধান্তকে জোরদার করেছে।

অবশ্য রাষ্ট্রীয় পরিবহন কর্তৃপক্ষ বলছেন যে, তাঁদের পাততাড়ি গোটাবার ইচ্ছে নেই। কিন্তু তাঁদের কথায় বড় একটা ভরসা রাখতে অনেকেই রাজী নন। তদুপরি যে হারে বিভিন্ন রুট থেকে স্টেটবাস সরিয়ে আনা হচ্ছে তাতে কর্তৃপক্ষের মতলব সম্বন্ধে সন্দেহ জাগাই স্বাভাবিক। স্টেটবাস ধর্মঘট হলে জনজীবনে অসুবিধার সীমা থাকবে না, তা থেকে অধিকতর বিক্ষোভ হবার সম্ভাবনাও আছে। কাজেই সর্বদিক বিবেচনা করে সমগ্র বিষয়টির একটা সন্তোষজনক মিটমাট করে নেওয়া উচিত।

হলদিয়া প্রকল্পের সলিল সমাধি

সংবাদে প্রকাশ যে চতুর্থ পরিকল্পনায় হলদিয়ার স্থান নেই, তবে পঞ্চ পরিকল্পনায় নাকি তার কিছু গতি হতে পারে। এ সংবাদটিতে অবশ্য বিস্ময়ের কিছুই নেই। সত্য কথা বললেই হয়ত অনেকেই প্রাদেশিকতার গন্ধ পান, তবে মূল ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ মনোভাব কোনক্রমেই গোপন থাকে না। পশ্চিমবঙ্গের প্রাণস্বরূপ কলকাতা বন্দরের বিলুপ্তি অনেকেই চান, যে কারণে হুগলী নদীকে অধিকতর নাব্য করার জন্য ফরাক্কায় বাঁধ দেবার বিষয়টা বরাবরই ঝুলে থাকে, হলদিয়ায় বিকল্প বন্দর স্থাপনের কাজও বন্ধ হয়ে যায়। বিদেশী জাহাজ প্রতিষ্ঠানগুলি কলকাতায় আসতে হবে শুনলেই আঁৎকে ওঠেন, কেন না স্যান্ডহেড থেকে কলকাতা পর্যন্ত জাহাজ ঠেলে আনা একটা মহা বিরক্তিকর ব্যাপার! এদিকে গঙ্গানদীও দ্রুত শুকিয়ে আসছে, শরৎকালেও বড় বড় চড়া পড়ছে, যেটা পড়ে শীতকালে। বার বার এ সব দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির দিকে কেন্দ্রীয় সরকার তথা পরিকল্পনা কমিশনের কোন দৃষ্টি নেই। পশ্চিমবঙ্গের কর্তব্য অন্ধের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।

ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ সার্ভিস

ডাক্তারী রাজত্বের স্বর্গের সিঁড়িটা কোথায়? এই প্রশ্ন করেছিলাম একজন তরুণ ডাক্তারকে। তার জবাবে তিনি একজন ডাক্তারের জীবন ইতিহাস আগাগোড়া আলোচনা করে সেই সিঁড়িটা কোথায় তা বুঝিয়ে দিলেন। সে কাহিনী বিস্তারিত আলোচনা করার মত পরিসর এখানে নেই তবে সুযোগ মত সেই মহাপুরুষের কাহিনী একদিন আপনাদের শোনাব।

যে সব বড় বড় ডাক্তারের নাম আজ লোকের মুখে মুখে, যাঁরা সাফল্য এবং উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছেন, তা তাঁরা করতে পেরেছেন একটি মাত্র সোনার কাঠির পরশে, আর সেই সোনার কাঠিটি হচ্ছে হাসপাতাল। হাসপাতালরূপ সোনার কাঠিটি হাতে থাকলে প্রাইভেট প্র্যাকটিশ হু-হু করে বেড়ে যায় সে কথা আজকের দিনের শিশুতেও জানে। আজকের দিনের কলকাতার ও মফস্বলের বড় বড় হাসপাতালগুলিতে ভর্তি হতে গেলে বা সেগুলির সুযোগ নিতে গেলে সরল পথে তা কদাপি সম্ভব নয়, তার জন্য দরকার বিশেষ রেকমেন্ডেশন এবং যিনি রেকমেন্ড করবেন তাঁকে কয়েকবার ভিজিট না দিলে কিছুতেই কিছু সম্ভব নয়। এই রীতি চলে আসছে এক-আধদিন নয় প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে, আর এইখানেই আছে ডাক্তারদের সাফল্যের সোপান।

হাসপাতালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ডাক্তারদের প্রাইভেট প্র্যাকটিশ বন্ধ করতে পারলেই এই কায়েমী স্বার্থের অবসান ঘটবে। এ দাবিও অর্ধশতাব্দীর দাবি। কিন্তু আজ যারা চিকিৎসা বিভাগ, স্বাস্থ্য-দপ্তর ও স্বাথ্যমন্ত্রকের মাথায় চেপে বসে আছে তারা যাতে এই নোংরা প্রথাটি আরও দীর্ঘকাল টিকে থাকে তার জন্য এমন কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে যার বিরুদ্ধে জনমত গঠিত হবার প্রয়োজনীয়তা আছে।

হাসপাতালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ডাক্তারেরা যদি প্রাইভেট প্র্যাকটিশ বন্ধ করে শুধুমাত্র হাসপাতাল নিয়েই থাকেন তাহলে হাসপাতালগুলির চিকিৎসার মানের উন্নতি হবে দরিদ্র শ্রেণীর লোকের চিকিৎসালাভের সুযোগ ঘটবে, হাসপাতালে প্রবেশ করার আণ্ডার হ্যাণ্ড প্র্যাকটিশটি বন্ধ হলে চিকিৎসাজগতের কায়েমী স্বার্থের প্রথম দুয়ারে আঘাত পড়বে। কিন্তু ডাক্তাররা তা করেন না কেন? পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম্য হেলথ সার্ভিসগুলিতে পর্যন্ত সদ্য পাশ করা ডাক্তাররা যেতে চান না। শহরাঞ্চলের হাসপাতালগুলিকে বুড়ি ছোঁয়া করে রেখে সকলেই প্রাইভেট প্র্যাকটিশের মরীচিকার পিছনে ছোটেন। নিম্নলিখিত কারণগুলি এর জন্য দায়ী ঃ

(১) এঁদের বেতন অত্যন্ত অল্প ৩০০ থেকে ৮০০ টাকা। এত অল্প বেতনে এঁদের পোষায় না। তাই এঁরা প্রাইভেট প্র্যাকটিশের দিকে ঝোঁকেন।

(২) বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই, কলকাতার কয়েকটি হাসপাতাল বাদ দিলে, মফস্বলের হাসপাতাল ও ভিলেজ হেলথ সেণ্টারগুলি রোগীদের ডাম্পিং গ্রাউণ্ড। সদ্য পাশ করে তাঁরা যে বিদ্যা শিখে আসছেন, এ সব জায়গায় কাজ করলে তা ভুলে যেতে হয়। না আছে আধুনিক বৈজ্ঞানিক সাজ-সরঞ্জাম, না আছে ঔষধপত্র, না আছে চিন্তা ও গবেষণার সুযোগ।

(৩) শাসনতান্ত্রিক লালফিতাতন্ত্র।

আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র

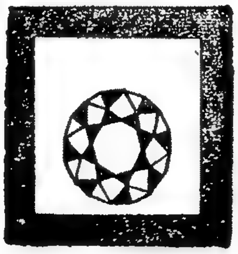

সুরক্ষিত ও নিরাপদ

কারণ তা রয়েছে

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক-এর

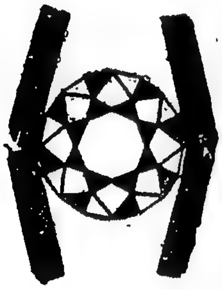

দৃঢ়

সেফ ডিপজিট ভল্টে

PR6536/ben

যত্রতত্র বদলী; কর্তৃপক্ষের মন জুগিয়ে চলা; গুণের অস্বীকৃতি।

ফলে তরুণ ডাক্তারদের সোজা পথে করে খাওয়ার উপায় নেই। কাজেই তাঁদের পুরোনো বাস্তুঘুঘুদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতে হয়। এবং সেই পথে গিয়ে দু-চারজন হয়ত আখের গোছান। বেশির ভাগই কিছু করতে পারেন না। ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ সার্ভিস গালাগাল দিয়েই মনের ক্ষোভ মেটান।

আপনারা লক্ষ্য করেছেন কি না জানি না উচ্চতর মেডিকাল ডিগ্রিসমূহ বড় সহজে পাওয়া যায় না। কেন না উচ্চতর ডিগ্রিধারীদের সংখ্যা বাড়লে কায়েমী স্বার্থের ঘোরতর অসুবিধা। তাই এম· ডি· বা এম· এস বড় একটা কাউকে দেওয়া হয় না। কাগজে-কলমে এ তত্ত্ব কোনদিনই প্রমাণ করা যাবে না, কিন্তু ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন ব্যাপারটা কী মর্মান্তিক রকম সত্য।

যে মহাপুরুষ ডাক্তারটির ইঙ্গিত দিয়ে বর্তমান প্রসঙ্গ আরম্ভ করেছিলাম তিনি আজ স্বাস্থ্য দপ্তরের একজন কেষ্ট-বিষ্টু, প্রকাশ্য মিটিং-এ গাঁক গাঁক করে হাসপাতালের ডাক্তারদের প্রাইভেট প্র্যাক-টিশের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেন, কিন্তু আমার যতদূর স্মরণ আছে বহু বছর আগে তাঁকেই মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বলতে শুনেছিলাম, "যাঁরা আমার চেম্বারে আমায় দেখিয়েছিলেন তাঁরাই এখানে থাকুন আর সবাই চলে যান, সবাইকে আমি দেখতে পারব না।"

একটি ন্যায়সংগত দাবি

কল্যাণী উপনগরীর নবনির্মিত হাসপাতালটির নাম পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর নামে রাখা হয়েছে। নেহরুর স্মৃতির প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও সেখান-কার স্থানীয় অধিবাসীরা এই সিদ্ধান্তে খুশি হতে পারছেন না, তাঁরা চাইছেন পশ্চিমবঙ্গের পরলোক-গত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নামে কল্যাণী হাসপাতালটির নাম-করণ হোক। স্থানীয় অধিবাসীদের এই দাবি ন্যায়সংগত। সারা ভারতের অজস্র প্রতিষ্ঠানের সংগে নেহরুজীর নাম যুক্ত হয়েছে, ভবিষ্যতে হয়ত আরও হবে। কিন্তু বিধানচন্দ্র রায়ের স্মৃতির প্রতিও যথোচিত শ্রদ্ধাপ্রদর্শন প্রয়ো-জন, বিশেষ করে কল্যাণী উপনগরীটি যখন বিধানচন্দ্রেরই আগ্রহে গড়ে উঠে-ছিল, যে কারণে কল্যাণীকে ডাঃ রায়ের মানসকন্যা বলা হয়। কাজেই কল্যা-ণীতে কোন প্রতিষ্ঠান ডাঃ রায়ের নামাঙ্কিত হলেই তা সব দিকে শোভন হয়। এই দিকটি বিবেচনা করে হাস-পাতালটির নামকরণ বিধানচন্দ্র রায়ের নামে হলেই তা জনসাধারণের ইচ্ছার সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

গোপালচন্দ্র মজুমদার

সংবাদপত্রে নিশ্চয়ই সকলে ইটা-চুনা কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীগোপালচন্দ্র মজুমদারের আত্মোৎসর্গের কাহিনী পাঠ করেছেন। খন্যান স্টেশনের নিকটে দুটি বালককে রেলে কাটা পড়া থেকে রক্ষা করতে গিয়ে তিনি নিজেই জীবন বিসর্জন দেন। এই আত্মবিসর্জনের কাহিনী চিরদিনই মানুষ শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করবে।

কিন্তু শ্রীমজুমদারের মহৎ চরিত্রের পরিচয় তাঁর এই আত্মবিস-র্জনেই সীমাবদ্ধ নয়। তাঁকে আমরা বহুদিন থেকেই চিনি। আদর্শ শিক্ষক

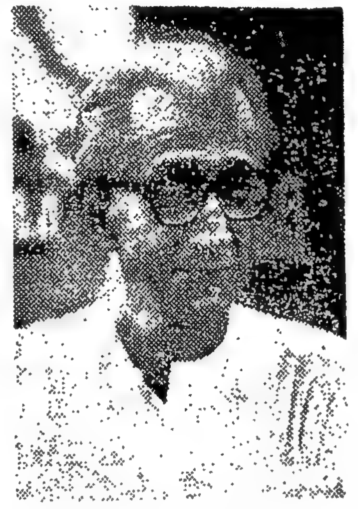

মোহিত মৈত্র

হিসাবেই তাঁর আসল পরিচয়। বজ্রের মত কঠোর এবং কুসুমের মত কোমল এই মানুষটি শুধু ছাত্রছাত্রীদেরই প্রিয় ছিলেন না, স্থানীয় জনসাধারণের নিকটেও তিনি ছিলেন একান্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র। সাধারণ অবস্থা থেকে তিনি ইটাচুনা কলেজকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সর্বশ্রেষ্ঠ কলেজরূপে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়ে-ছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা, এই কলেজে কোনদিন ছাত্র বিক্ষোভ হয় নি, রাজনীতির কুটিল আবর্ত থেকে তিনি বরাবরই ছাত্রছাত্রীদের রক্ষা করে এসেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে বোধ হয় এই একটিই প্রথম শ্রেণীর কলেজ যেখানে কোন ছাত্র ইউনিয়ন নেই, এবং যার জন্য ছাত্রদের মনে কোন বিক্ষোভও নেই। কতখানি ব্যক্তিত্ব থাকলে এযুগে ছাত্রদের উপর এতখানি প্রভাব রাখা যায়।

সেই ব্যক্তিত্ব শ্রীমজুমদারের ছিল। অবিশ্বাস্য হলেও, একথা সত্য, ওই কলেজের যে কোন ছাত্রছাত্রী, প্রাক্তন কিম্বা বর্তমান, একথা বলবেন যে, তিনি ছিলেন ছাত্রছাত্রীদের নিকট পিতার গাম্ভীর্য এবং মাতার স্নেহের জীবন্ত প্রতীক। তাঁর মৃত্যু সংবাদে দূরবর্তী অঞ্চলসমূহে পর্যন্ত যে শোকের প্লাবন বয়েছিল তা যিনি দেখেন নি তিনি উপলব্ধি করতে পারবেন না।

ছাত্র ও শিক্ষকের সম্পর্ক এযুগে অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। ছাত্রদের সংগে শিক্ষকদের যে একটি শ্রদ্ধা, প্রীতি ও স্নেহের সম্পর্ক আছে এটা এযুগে ছাত্র ও শিক্ষক কোন তরফই স্বীকার করতে নারাজ, এ সব যেন মিডিয়েভাল সেন্টিমেন্ট। আজ প্রিন্সিপালকে মুখের উপর ছাত্ররা সি, আই-এর দালাল বলতেও দ্বিধাবোধ করে না, কলকাতার সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনে এর নিদর্শন পাওয়া গেছে।

এই কারণেই গোপালবাবুর মত লোকের মৃত্যু আমাদের কাছে অধিক-তর বেদনাদায়ক বলে মনে হয়। তাঁর আত্মা শান্তিলাভ করুক।

মোহিত মৈত্র

মোহিত মৈত্রের মৃত্যু সংবাদ পশ্চিম-বঙ্গবাসীর নিকট সত্যই শোকাবহ। সাংবাদিক এবং রাজনৈতিক নেতা হিসাবে শ্রীমৈত্র দেশবাসীর নিকট দীর্ঘকাল ধরেই সুপরিচিত ছিলেন। প্রথম যৌবনেই তিনি দেশের মুক্তি-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং দেশের কাজে বার বার তিনি কারাবরণ করেছিলেন, এমন কি মৃত্যুর কিছুকাল আগে পর্যন্ত তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন। সার্থক সাংবাদিক হিসাবে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিষয়ের অধ্যাপক হিসাবেও তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী আন্দোলন তাঁর কাছে প্রভূত পরিমাণে ঋণী। মতবাদের দিক থেকে তিনি ছিলেন বামপন্থী কমিউনিস্ট, কিন্তু আদর্শের প্রতি তাঁর দৃঢ় নিষ্ঠা, কর্তব্যবোধ ও ত্যাগস্বীকার বিস্ময়কর। দুরারোগ্য ব্যাধি, কারাগার, সরকারী নির্যাতন, অসহনীয় দারিদ্র্য, বিভিন্ন মহলের প্রলোভন—কোন কিছুই তাঁকে তাঁর আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। আমরা এই কর্তব্যনিষ্ঠ, দৃঢ়-চেতা, নির্মল চরিত্র, আদর্শবাদী জন-নায়কের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

এইচ. জি. ওয়েলস-এর গল্প

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

সপ্তম অধ্যায়ঃ হাসির হাটে

ওয়েলস-এর গল্পে অসম্ভবের দেশ দেখেছি আমরা। দুঃসাহসের নেশায় পাওয়া বিচিত্র কয়েকটি মানুষকেও দেখলাম। কিন্তু এদের দেখতে গিয়ে আগাগোড়া গম্ভীর থেকেছি সবাই। হাসবার অবকাশ মোটেই পাই নি। রহস্যের ইন্দ্রজাল বারবার বিস্মিত ও বিমূঢ় করেছে আমাদের; সমস্ত পরিবেশকে ভারী ও থমথমে করে রেখেছে। হাল্কা মনে একটু জিরিয়ে নেবার সুযোগ দেয় নি। সে সুযোগ মিলল ওয়েলসের হাসির গল্পে। এখানে এসে প্রাণ খুলে নিশ্বাস নিলাম আমরা। দমবন্ধ করে-দেওয়া আতঙ্কের জগৎ থেকে হাসির হাটে এসে পৌঁছুলাম। এ এক আলাদা জগৎ। ভয় নেই এখানে; গা-ছমছমে বিভীষিকা নেই। এখানে যারা এসেছে তারা লঘু চালে কথা কয়, চলে এমন অদ্ভুতভাবে, যা' দেখে অতি বড় 'রামগরুড়ের ছানা'রও গাম্ভীর্যের মুখোস আলগা হয়ে যায়। তাই বলে 'সিরিয়াস' লোক এ হাটে একেবারেই নেই, এমন কথা বলছি নে। বরং বলছি এখানকার সিরিয়াসরা আমাদের হাসাতে লঘুচেতাদের চেয়ে আরও বেশি ওস্তাদ। ওদের কান্ডকীর্তি দেখে কখনও মুখ টিপে হাসি আমরা, কখনও আবার অট্টহাসিতে লুটিয়ে পড়ি।

এই প্রসংগে প্রথমেই 'ইন দি মডার্ন ভেইন' গল্পের নায়ক আরে ভেয়ারের কথা মনে পড়ছে। নায়কটি একজন আধুনিক কবি। লেখক-মহলে নাম-ডাক নেই তাঁর। অপ্রধান কবিদের মধ্যে কোনো রকমে নিজের একটু স্থান করে নিয়েছেন। মোটামুটি সুখী মানুষ তিনি; স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা নিয়ে শান্তিতেই ঘর-সংসার করেন। হঠাৎ বড় বেশি রোমান্টিক ভাবনা তাঁকে পেয়ে বসল, দেখতে দেখতে তাঁর শান্তিময় নিস্তরঙ্গ জীবনে অশান্তির ঢেউ উঠল। তিনি ভাবলেন, আধুনিক ঢঙ-এ প্রেম না করলে জীবনটাই বৃথা। এমন সময় মিস স্মিথের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। পরিচয় থেকে প্রেম। আরে ভেয়ার আগে থাকতেই তৈরি ছিলেন। অতএব প্রেম গাঢ় হতে সময় লাগল না। কবিটি রঙে-রসে হাবুডুবু খেতে লাগলেন। আর সোহাগে-চুম্বনে অধীর করে তুললেন নায়িকাকে।

নায়িকা মিস স্মিথও কিছুকালের জন্যে কান্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলল। ভক্তের তোষামোদের দাপটে ফানুস হয়ে ঘুরে বেড়াল আকাশে। তোষামোদের একটু নমুনা তুলে ধরছি। তার আগে বলে রাখি, নমুনাটি শৈশবকে কেন্দ্র করে। মিস স্মিথ শৈশবের একটি ঘটনা উল্লেখ করেছিল শুধু। শুধুমাত্র মুহূর্তের জন্যে ছেলেবেলার প্রসঙ্গ তুলেছিল। কিন্তু ওই একটুতেই উচ্ছ্বসিত হলেন তাঁর স্তাবক। ছেলেবেলার প্রশস্তিতে মুখর হয়ে উঠলেন। জানালেন,

"বলছিলুম কি, আমার ধারণা, এখনও আমি শিশুসুলভ আমোদ-আহ্লাদের মধ্যে অদ্ভুত তৃপ্তি খুঁজে পাই। আমার ছোট্ট এক ভাগ্নে আছে।......ওকে সংগে নিয়ে যখন ঘুড়ি ওড়াই তখন, সত্যি বলছি তখন, আমাদের দু'জনের মধ্যে কে যে বেশি খুশি হয়, তা বলা আমার পক্ষে শক্ত।"

প্রেম নিয়েও অনেক মন-ভোলান কথা বলেছেন আমাদের কবিটি। একবার যা' বলেছেন, তার মর্মার্থ এই রকম দাঁড়ায়—

প্রেম যাদের জীবনে এল না ওরা হচ্ছে অদ্ভুত এক একটা ফুলের টব। সেখানে আত্মারূপ গাছ লাগান হয় নি কোনোদিন। তাই মানুষের আত্মার পুষ্টির জন্যে শৈশবের মধ্যে নিত্য নতুন করে ফিরে যাওয়া দরকার।

অন্য এক জায়গায় প্রেমের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে নায়ক বেসামাল হয়ে পড়েছেন। বলেছেন,

"আমি বিশ্বাস করি, প্রেমই হচ্ছে জগতের একমাত্র সত্য ও সার বস্তু। এ বস্তুটি যুক্তি স্বার্থ ও ব্যাখ্যার ঊর্ধ্বে। কিন্তু আমি এমন কোনো যুগের কথা জানি নে যখন প্রেম আজকের মতো উপেক্ষিত ছিল, যখন এমন ধরাবাঁধা পথ ধরেই প্রেম এগোবে বলে সকলে প্রত্যাশা করত।"

প্রেমিকদের সম্বন্ধে আরে ভেয়ারের প্রত্যাশা কিন্তু খুবই উঁচুদরের। স্পষ্টই তিনি স্বীকার করেছেন,

"আমরা হচ্ছি বাজীর মতো। যতক্ষণ অবধি না নির্দিষ্ট স্ফুলিঙ্গটি আসছে ততক্ষণ অবধি মৃত এবং নিষ্ক্রিয় এবং তারপরে মিইয়ে না যাই যদি তো সুপ্ত আত্মার সমস্ত উত্তাপ ও সৌন্দর্যকে নিয়ে জ্বলে উঠি। একেই বলে বেঁচে থাকা। জানো তুমি, এক এক সময় আমার মনে হয়, ওই সুন্দর সময়ের ঠিক পরেই মরতে পারতাম যদি তো আমরা আরও অনেক সুখী হতাম।"

প্রেম-পাগল কবিটি বলেছেন বটে এ কথা! কিন্তু সুখের খাতিরে তিনি নিজে কিন্তু হঠাৎ জ্বলে উঠে নিঃশেষিত হতে পারেন নি। তাঁর জ্বলাটা বাজীর মতো নয়, ভিজে কাঠ-কয়লার মতো ধুঁকে ধুঁকে।

ধুঁকতে ধুঁকতেই অল্প পরে নিভে গেছেন তিনি। সংসার ও সমাজের বাধা-নিষেধ জল ও বাতাসের রূপ ধরে তাঁর সমস্ত আবেগ-উত্তাপকে নির্বাপিত করেছে।

কেমন করে করেছে, সে কথা বলবো এবার। এবার বলবো আমাদের এই মহান্ প্রেমিকটির সাফল্যের সংগে পশ্চাদপসরণের কাহিনী।

প্রেম তো জমে উঠল। কবির হৃদয়-সমুদ্রেও জোয়ার এল। সেই অবসরে নায়িকা মিস স্মিথ প্রস্তাব করলেন, প্রেমিককে নিয়ে নিরুদ্দেশ-যাত্রা করতে চান তিনি। মোদ্দা কথায়, পালাতে চান।

এই প্রস্তাবে আরে ভেয়ারের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। তাঁর হৃদয়-রাজ্যের অত চঞ্চল প্রেম-সমুদ্রটা মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল যেন। যেন জমে বরফ হয়ে গেল। রাজ্যের দ্বিধা ও সংশয় ঘিরে ধরল তাঁকে। ওদিকে, প্রেমিকা মিস স্মিথকে হাতছাড়া করতেও তিনি নারাজ।

তিনি চান ঘর-গেরস্থালী যেমন চলছে ঠিক তেমনি চলুক। সেই সঙ্গে এই উপরি-পাওনাটুকুও ষোল আনা বজায় থাকুক।

কিন্তু বরাত খারাপ প্রেমিকের। দেনেওয়ালা পাওনা দিলেন না। বেঁকে বসলেন। মহিমময় প্রেমিকটিকে কেঁচোর মতো গর্তে ঢুকে পড়তে দেখে তাড়াতাড়ি হাত গুটিয়ে নিলেন তিনি।

কিন্তু হলে হবে কি! ভক্ত ছাড়লে তো! হাত জোড় করে, হাতে-পায়ে ধরে, কেঁদে কঁকিয়ে প্রেমিকাকে তিনি অস্থির করে তুললেন।

প্রেমিকা অচল অটল। ভক্তের দৌড় ধরে ফেলেছেন তিনি। তাই নাছোড়বান্দা অপদার্থের কাছ থেকে এবার তিনি মুক্তি চান।

এই অংশে গল্পটি খুব আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এখানে একদিকে আর্রে ভেয়ারের শঙ্কা ও অস্বস্তি এবং অপর-দিকে দায়-দায়িত্বহীন প্রেমের জন্যে তাঁর উম্মত্ততার চিত্রটি নির্মল কৌতুকরসের সৃষ্টি করেছে। অবশ্য কৌতুকরস এ গল্পের আনাচে-কানাচেও অপর্যাপ্ত। নিজের কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে আর্রে ভেয়ারের বিপুল ধারণা, মিস স্মিথের প্রতি প্রথম থেকেই তাঁর অদ্ভুত আচরণ, আধুনিক ঢং-এ তাঁর বিচিত্র প্রেম-নিবেদন—এই সব কিছুর মধ্যেই কৌতুকের অজস্র উপাদান খুঁজে পাই আমরা। এ ছাড়া রোমান্টিক কবির বর্ষীয়সী বধির আত্মীয়াটি নায়ক-নায়িকার প্রেমোচ্ছ্বাসের পথে বাধার সৃষ্টি করে রঙ্গরসকে আরও জমিয়ে তুলেছেন। তবে রঙ্গরস জমে উঠেছে গল্পটির শেষ পর্বে। সেখানে দেখি, মিস স্মিথ নায়কের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন। নায়ক কোনোরকম ঝুঁকি নিতে নারাজ। অথচ একেবারেই অসহায় তিনি; ফ্যালফ্যাল করে অপসৃয়মাণা নায়িকার দিকে তাকিয়ে আছেন।

তারপর বাড়ি ফিরেছেন আর্রে ভেয়ার এবং সুবোধ মানুষটির মতো আলু ভাজা খেতে খেতে স্ত্রীর রান্নার তারিফ করেছেন।

'ইন দি মডার্ন ভেইন' বা আধুনিক ধরণে' একটি সার্থক রঙ্গরসাত্মক গল্প। গল্পটির উপনাম হল 'অ্যান আনসিপ্-পেটেটিক লাভ স্টোরী'—অর্থাৎ 'একটি বেদরদী প্রেমের কাহিনী'। নাম দেখেই বোঝা যায়, কাহিনীটির হাল্কা সুর সম্বন্ধে গোড়াতেই লেখক আমাদের অবহিত করতে চেয়েছেন এবং তাঁর এই প্রয়াস যে অকারণ নয়, গল্প-পাঠ শেষ করে তা' আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করি।

হাসির হাটের আর একটি অবিস্মরণীয় চরিত্র মিঃ লেডবেটার। ছুটির দিনে নেহাৎই খেয়ালবশে তিনি যে কাণ্ডটি করে বসলেন, সারা হাটকে মাতিয়ে রাখবার পক্ষে তা' যথেষ্ট। অনেকের অনেক 'ভ্যাকেশান'কেই কালক্রমে ভুলে যাবো আমরা; কিন্তু 'মিঃ লেডবেটারস ভ্যাকেশান'কে কোনোদিনই ভোলা সম্ভব নয়। কেন নয়, তা'র কৈফিয়ৎ দিতে গেলে ভদ্রলোকটির কাণ্ডকীর্তির কাহিনী বুঝিয়ে বলা দরকার।

মিঃ লেডবেটার ইংল্যাণ্ডের এক স্কুল-শিক্ষক। নিরীহ ভালমানুষ তিনি। তাঁর পেশা শিক্ষকতা, আর নেশা দাবা-খেলা। লঘু-গুরু সব ব্যাপারেই হঠাৎ সিরিয়াস হয়ে পড়া তাঁর স্বভাব। এছাড়া সব কিছুকেই তিনি খুঁটিয়ে দেখার পক্ষপাতী। অনেক অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়েও অদ্ভুত আগ্রহ দেখিয়ে ফেলেন তিনি। কথা কন বেশ ভারী গলায়। এতে বিরক্ত হয় অনেকেই; অনেকেই তাঁকে এড়িয়ে চলে। কিন্তু লেডবেটার-এর ওতে ভ্রূক্ষেপ নেই। বিচিত্র সব বিষয়ে তাঁর কৌতূহল দিন দিন বেড়েই চলে। এবং এই কৌতূহলই শেষ অবধি কাল হয়।

গ্রীষ্মের অবকাশে লেডবেটার গেলেন জামাইকা-ভ্রমণে। একদিন দুঃসাহসের নেশায় তাঁকে পেয়ে বসল। অতীতের মানুষদের দুঃসাহসিক জীবনযাত্রার কথা ভেবে হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলেন তিনি। নেশার ঘোরে এক সন্ধ্যায় স্থির করলেন, রোমাঞ্চকর কিছু একটা না করলে আর চলছে না। জীবনটা ক্রমেই কেমন যেন নীরস ও একঘেয়ে হয়ে পড়ছে।

ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে পড়লেন লেডবেটার। জ্যোৎস্না-ঢালা পথ ধরে একাই এগিয়ে চললেন। নির্জন পথ। চারিদিক থমথমে। লেডবেটার আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন। বার বার মনে হল তাঁর, জীবনটা একেবারেই ব্যর্থ। স্কুল-শিক্ষকের নিরুত্তাপ জীবন-যাপন করেন তিনি। সেখানে না আছে রহস্যের উম্মাদনা, না আছে রোমাঞ্চের স্বর্গসুখ। সেই বদ্ধ জীবনে বৈচিত্র্যের স্থান কোথায়? দুঃসাহস প্রদর্শনের অবকাশ সেখানে কতটুকু? লেডবেটারের মনে পড়ল, মধ্যযুগের দিনগুলোর কথা। তাঁর অন্তরাত্মা হাহাকার করে উঠল এই ভেবে যে, সে যুগের মানুষরা না জানি কত সুখী ছিল! কত শৌর্যবীর্যপূর্ণ কাজ করত ওরা! নির্ভীক ও দুর্দমনীয় হয়ে কত না সুন্দর জীবন-যাপন করত! আর লেডবেটার? কি আছে তাঁর একঘেয়ে বর্ণহীন জীবনে? এই সব ভাবতে গিয়ে নিজের জন্যে খুবই দুঃখ হল তাঁর। মধ্যযুগের বীরধর্মী মানুষদের জন্যে হিংসা হল। হঠাৎ বিচিত্র এক কল্পনার ফাঁদে পড়লেন তিনি। ভাবলেন, তিনি নিজে কি সত্যি সাহসী? রেলগাড়ি, পুলিশ এবং প্রতিরক্ষার সব রকম আয়োজন যদি নিমেষের মধ্যে পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যায়, তবে তিনি কি খুব খুশি হবেন? সিঁদেল চোরের কথা মনে এল তাঁর। মনে পড়ল, আহা! ওরা কত সুখী! আর শুধু কি সুখী; পৃথিবীতে সত্যিকারের দুঃসাহসী অভিযাত্রী তো ওরাই। কী অদ্ভুত কৌশলে সমস্ত সভ্য পৃথিবীর বিরুদ্ধে একা একাই ওরা সংগ্রাম করে! জীবন থেকে কত যে কৌতুক ও আনন্দ আহরণ করে ওরা।

মুহূর্তের মধ্যে লেডবেটার নিজেকে দাগী চোরদের সঙ্গে তুলনা করে নিলেন। আপন মনেই বললেন, 'আমি কম কিসে! ইচ্ছে করলেই ওই সব কিছু করতে পারি আমি। করতে প্রাণ চায় আমার। কিন্তু নীতিবোধ এসে বাধা দেয় বলেই ওই সব পাপ-প্রবৃত্তিকে আমি দমন করি।

গল্পটির প্রারম্ভ-অংশে লেডবেটারের এই আত্মদর্শন বিশেষভাবে আমাদের মুগ্ধ করে। স্কুল-শিক্ষকটি এবার তাঁর বদ্ধ-জীবন থেকে বেরিয়ে আসবেন, সাংঘাতিক কিছু একটা করে ফেলবেন তিনি; এই ভেবে আমার কৌতুক এবং উত্তেজনা দুই-ই অনুভব করি। আমাদের প্রশ্ন জাগে, জাঁহাবাজ চোরদের প্রতি এই অপরিসীম শ্রদ্ধার অর্ঘ্য উপযুক্ত কোনো কাজের মধ্য দিয়ে নিবেদিত হবে না তো?

গল্পটির ঠিক পরবর্তী অংশেই দেখি, ভক্ত পূর্বসূরীদের পথ ধরে মনে মনে চলতে সুরু করেছেন। সামনেকার এক বাড়িকে দেখে ভাবছেন, যেন ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করবেন বলে ভিতরে ঢুকে পড়েছেন তিনি। যেন উপরে উঠেছেন; অন্ধকার বারান্দা ধরে পথ চলছেন চুপি চুপি।

দিব্যি স্বপ্নজাল বুনছিলেন লেডবেটার। এমন সময় হঠাৎ বাধা পড়ে। সন্দেহ এসে মূর্তিমান পরাজয়ের রূপ ধরে চোখ রাঙায় তাঁকে। বলে, আরে ধ্যেৎ! তুমি পারলে তো!

সন্দেহকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করলেন লেডবেটার। চুপি চুপি এগিয়ে গেলেন ওই বাড়িটির দিকে। রাত তখন এগারোটা। চারিদিক নিস্তব্ধ। সমুদ্র-তীরের ছোট্ট শহর তখন গভীর ঘুমে অচেতন। লেডবেটার এসে দাঁড়ালেন ওই নিঝুমপুরীর সামনে। আবার সন্দেহ এসে পথ-রোধ করল তাঁর। বলল, 'পরীক্ষা করে দ্যাখই না একবার। প্রমাণ করে দেখাও না যে তুমি ওই বাড়ির ভিতরে ঢুকবার সাহস রাখ। সরাসরি চুরি করে

ফেল বন্ধু। মনে রেখো, কোনোমতেই সেটা অপরাধ নয়।

এইখানে লেডবেটারের অন্তর্দ্বন্দ্ব চমৎকার ফুটেছে। একদিকে সন্দেহ ও সংশয় এবং অপরদিকে দুঃসাহসিক কিছু একটা করবার মোহ আমাদের রহস্য-সন্ধানী নায়কটির অবস্থাকে করুণ ও হাস্যকর করে তুলেছে।

শেষ অবধি দুঃসাহসে বুক বেঁধে এগিয়ে গেছেন আমাদের বীর-পুরুষটি। দুর্জয় সংকল্পের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে ওই রহস্যপুরীতে অভিসার করেছেন। পা কেঁপেছে বটে তার, বুক ধড়ফড় করেছে, রোমাঞ্চের স্বর্গসুখের চেয়ে ধরা পড়বার নরক-যন্ত্রণা তাঁকে ঘিরে ধরেছে, অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে এক একবার কেঁদে ফেলবার উপক্রম করেছেন তিনি; কিন্তু তবু চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না। পথ-প্রদর্শক চোর-বদমায়েসদের পথ ধরে সাধ্যমতো এগোবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন তিনি; এবং তাঁর এই চেষ্টা দেখে মধ্যযুগের অসম-সাহসীদের আত্মা কতখানি পরিতৃপ্ত হয়েছে, তা' জানি নে, তবে আমরা যে হেসে আকুল হয়েছি, এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি।

এদিকে সত্যিকারের দাগী চোর যিনি, যিনি চুরি-বাটপাড়ির দুনিয়ায় নিজ-গুণেই উল্লেখযোগ্য একটি স্থান করে নিয়েছেন, তিনি কিন্তু হতভাগ্য লেডবেটারকে চুরির পরীক্ষায় পাশ-নম্বরও দিলেন না। কেন দিলেন না, তা' বলতে গেলে পরীক্ষক বা পরীক্ষার্থী কাউকেই দায়ী করা চলে না। এজন্যে দায়ী লেডবেটারের দুর্ভাগ্য। ভুল করে খাঁটি একটি চোরের বাড়িতেই চুরি করতে ঢুকেছিলেন তিনি।

চুরি সুরুও করেছিলেন বেশ কায়দামাফিক। কায়দাটা চৌর্যবিজ্ঞান-সম্মত না হতে পারে, কিন্তু খুব যে অভিনব ধরণের এবং সকলকে তাক লাগিয়ে দেবার মতো, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আর দশজন চোরের মতো লোহার সিন্দুক খুললেন না লেডবেটার। দরজা ভাঙলেন না। বিনা বাধায় পরিত্যক্ত বাড়িতে সম্মানিত অতিথির মতো ঘুরে বেড়ালেন খানিকক্ষণ। খানিকক্ষণ আবার দাঁড়িয়ে থেকে ঠক ঠক করে কাঁপলেন। এবং তারপরেই চুরির দুনিয়ায় নতুন রেকর্ডটি করে বসলেন। একটুকরো সাবান তুলে নিলেন একটি ঘর থেকে এবং মহা-সমারোহে সেটিকে নিজের পকেটে রাখলেন। ওই হল তাঁর ট্রফি। ওই ট্রফিই মধ্যযুগের বীরদের সঙ্গে তাঁর সেতু রচনা করল। এ যুগের চোর-বাটপাড়দের আসরে তাঁর স্থান করে দিল।

মিঃ লেডবেটার ভাবলেন বটে এই-রকম। কিন্তু আসল বাটপাড়ের ভাবনাটা অন্য পথ ধরে এগোল। কেমন করে এগোল, তা বলতে গেলে আমাদের হতভাগ্য স্কুল-শিক্ষকের অভিজ্ঞতার কথা সূত্রাকারে বর্ণনা করতে হয়। আর বলতে হয়, সেই সূত্রের দিকে তাকিয়ে অট্ট-হাসিটা সকলেই চাপবার চেষ্টা করবেন। কেন না অনেক দুঃখ-কষ্ট ও অশেষ জ্বালা-যন্ত্রণার বিনিময়ে লেডবেটার আমাদের আনন্দ যুগিয়েছেন।

প্রথমেই ধরা পড়েছেন তিনি; আর পড়েছেন ওই জালিয়াৎটির হাতে। তবে তাঁর পালাবার পদ্ধতিটা এমন বিশুদ্ধ রকমের ছিল এবং সরে পড়বার জন্যে এমন এমন অদ্ভুত কৌশল দেখিয়েছিলেন তিনি যে, জালিয়াৎটিকে তাঁকে ধরবার জন্যে বিশেষ কোনো বেগ পেতে হয় নি। সত্যি বলতে কি, আত্মরক্ষার যে নির্ভেজাল উপায় খুঁজে বের করেছিলেন লেডবেটার, সেজন্যে চোরের সমাজে আবিষ্কর্তার সম্মান তাঁর প্রাপ্য। কিন্তু সে সম্মান যে তিনি পেলেন না, সে জন্যে দায়ী ঐ জালিয়াৎ এবং লেডবেটারের ভাগ্য। অল্পের জন্যে আমাদের এই দুঃসাহসীর সমস্ত উদ্যোগ-আয়োজন ব্যর্থ হয়ে গেল। হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেলেন তিনি।

সাবান-চুরি সবে শেষ হয়েছে। লেডবেটার সবে একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করতে যাবেন। এমন সময় কার যেন পদ-শব্দ শোনা গেল। মনে হল, বাড়িটির উঠোন বরাবর কে যেন এগিয়ে আসছে। দরজা খোলার শব্দ হল পরক্ষণেই। বেশ বোঝা গেল, নিচের হল-ঘরে দাঁড়িয়ে কেউ একজন দেশলাই ধরাচ্ছে।

তারপরেই সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল আগন্তুক। ভয়ে-বিস্ময়ে লেডবেটার এবার দিশাহারা হলেন। ভাবলেন,—"কী সর্বনাশ! এ থেকে এখন বেরোব কেমন করে? ইস! কি বোকামীই না করেছি?"

ভাবতে ভাবতে, কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে গেলেন লেডবেটার। তাড়াতাড়ি গিয়ে ঢুকলেন সেই ঘরে যেখান থেকে সাবান চুরি করে তিনি রোমাঞ্চ-সুখ উপভোগ করেছিলেন। শোবার ঘর ছিল সেটি। ফলে আমাদের দুঃসাহসী অভি-যাত্রীটির আত্মরক্ষার বেশ সুবিধাই হল। হামাগুড়ি দিয়ে সুড় সুড় করে তিনি গিয়ে ঢুকলেন খাটের তলায়। গা-ঢাকা দেবার কায়দাটা একটু সেকেলে ঢঙ-এর হল বটে; কিন্তু সাবান চুরি করতে গিয়ে এমন কেরামতি লেডবেটার ছাড়া নিশ্চয় আর কেউ কোনোদিন দেখান নি। এই কেরামতিরই কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল খাটের তলায় নিশ্চল হয়ে শুয়ে থাকা, ইঁদুর এবং আরশোলার উৎপাত সহ্য করা, হাত-পা চুলকালেও যোগমগ্ন সন্ন্যাসীর মতো নির্লিপ্ত থাকা এবং হাঁচি পেলেও অদ্ভুত কৌশলে তা চেপে রাখা।

এত সাবধানতার কারণও ছিল যথেষ্ট। ঘরের মালিক ঘরে এসে পড়েছিল। হাতে প্রদীপ ছিল তার। আর ছিল চুরি করে আনা কিছু সোনার বাট। লেডবেটার খাটের তলায় শুয়ে থেকে আভাসে-ইঙ্গিতে আঁচ করবার চেষ্টা করছিলেন অনেক কিছু। বেশ বুঝতে পারছিলেন তিনি, লোকটি দরজা বন্ধ করছে কখন, কখন হাত-মুখ মুছছে।

খাটের তলা থেকে লেডবেটারের দেখা জগৎটি বড় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে এখানে। আমাদের কৌশল-পরায়ণ রহস্য-সন্ধানীটির অভিজ্ঞতা বড় বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছে। তারপর ধরা পড়ে যে সব কাণ্ড করেছেন তিনি, সেগুলোও অস্বাভাবিক নয় মোটেই। দুঃসাহসের ভূতে-পাওয়া নিরীহ একজন স্কুল-শিক্ষক বেকায়দায় পড়ে ওইরকম করলেও করতে পারেন। লেডবেটারের মতোই হাঁটু গেড়ে বসতে পারেন তিনি। দু' হাত উপরের দিকে তুলে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করতে পারেন।

কিন্তু লেডবেটারের ফরিয়াদী-পক্ষ বড় কড়া ধাঁচের ছিল। তাই আত্মসমর্পণ করেও রেহাই পেলেন না তিনি। রিভলবার উঁচিয়ে ধরে খাটের তলা থেকে বের করা হল তাঁকে। রিভলবার মুখে ধরেই তাঁকে দিয়ে অনেক কাজ করান হল। ঘরের মালিক তাঁকে পরীক্ষাও করে নিল একবার। এবং যখন দেখল, তার ঘরে অনুপ্রবেশকারীর সঙ্গে সামান্য একটা রিভলবার পর্যন্ত নেই, বরং রয়েছে একটুকরো সাবান, তখন সে দারুণ ঘৃণায় এবং বিদ্বেষে জ্বলে উঠল।

এত সহজে লেডবেটার হয়তো ধরা পড়তেন না যদি না খাটের তলা থেকে তাঁর উঁকি মারবার আকাঙ্ক্ষা অদম্য হয়ে উঠত। উঁকি মারতে গিয়েই ফ্যাসাদ বাধালেন তিনি এবং আসল জালিয়াৎ-টিকে রুদ্রমূর্তি ধরবার সুযোগ দিলেন।

জালিয়াতের নাম ছিল মিঃ বিংহ্যাম। পিলে-চমকানো গালি-গালাজে বেশ দক্ষ ছিল সে। অল্পক্ষণের মধ্যে লেডবেটারকে সে এমন কতকগুলো বাক্যবাণে আপ্যায়িত করল, নিরীহ স্কুল-শিক্ষক যাদের একটিও শুনতে অভ্যস্ত নয়।

লেডবেটার কষ্টে হাসবার চেষ্টা করে-ছিলেন একবার। বারবার কী যেন বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বিংহ্যাম শুনলে তো! অশ্রান্ত শিলাবৃষ্টির মতো গালি-গালাজ বর্ষণ করল সে। এবং

সেই বর্ষণের মুখে লেডবেটারের অবস্থা হয়ে উঠল অসহায় কোনো চারা-গাছের মতো। কিছুতেই মাথা তুলতে পারলেন না তিনি। কিছুতেই আসল কথাটি বুঝিয়ে বলতে পারলেন না। বারবার আঘাতে জবুথবু হয়ে রইলেন।

গল্পটির এই অংশে লেডবেটারের শোচনীয় অবস্থার চিত্রটি খুব সুন্দর। এখানে আমরা যেন সেই রহস্যালিপ্সু হতভাগ্যকে দেখতে পাই। যেন অনুভব করি, ডাঙায় তোলা মাছের মতো অব্যক্ত যন্ত্রণায় কী যেন প্রকাশ করতে চাইছেন তিনি। কিন্তু কিছুই করতে পারছেন না। তাঁর সামনে দাঁড়ান মূর্তিমান যমদূত মিঃ বিংহ্যাম কিছুতেই বুঝতে চাইছে না তাঁকে।

বলছে,

...'এ যে দেখছি সাবান! না না! তুমি একটা বদমায়েস! খবরদার হাত নেড়ো না যেন।'

লেডবেটার বললেন, 'হ্যাঁ, একটু সাবান। আপনার ধোয়া-মোছা করার গামলা থেকে নিয়েছি। অবশ্য সন্দেহ নেই যদি—'

শক্ত-সামর্থ্য লোকটি খেঁকিয়ে উঠল, 'চোপরাও! এ যে সাবান তা আমি নিজের চোখেই দেখছি।'......

—'আমাকে একটু বুঝিয়ে বলার সুযোগ দেন যদি—'

—'না, বলতে আর হবে না। নিশ্চয় তুমি মিথ্যে বলবে, আর ওই সব বকুনি শোনবার সময় নেই আমার। হ্যাঁ, কি যেন প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম? তোমার সঙ্গী-সাথী আছে কেউ?'

—'কয়েক মিনিটের মধ্যেই সব বলছি, যদি আপনি—'

—'আরে ধ্যেৎ! সঙ্গী-সাথী আছে তোমার? বাজে, বকবকানি সুরু করো যদি তো গুলী করবো। কি, আছে নাকি কোনো সঙ্গী?'

লেডবেটার বললেন,—'না, নেই।'

জওয়ান লোকটি বললে,—'আমার ধারণা, এ একটা ডাহা মিথ্যে কথা।'

মিথ্যেই বটে। এক একবার কান্না আসছিল লেডবেটারের। মনে হচ্ছিল, সামান্য একটু রোমাঞ্চিত হতে গেলেও এত মূল্য দিতে হয়?

এদিকে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে থেকে থেকে হাত ব্যথা করছিল তাঁর। তাই মরীয়া হয়েই সন্ধির প্রস্তাব আনলেন তিনি। বিষণ্ণভাবে হাসলেন একটু।

বললেন,

'এইভাবে হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে আমার একটু অস্বস্তি হচ্ছে।'

স্থূল লোকটি বললে, 'ওই ঠিক আছে। কিন্তু তোমাকে নিয়ে কী যে করবো আমি তা ঠিক জানি নে।'

—'বুঝতেই পারছি, আমার অবস্থাটা বেশ সন্দেহজনক।'

মোটা লোকটি আর্তনাদ করে উঠল,—'কি বললে তুমি, সন্দেহজনক! হায় ঈশ্বর!'

এর পরেই লেডবেটারকে ঈশ্বরের কাছে পাঠাবার আয়োজন করছিল বিংহ্যাম। কিন্তু অল্পের জন্য সে আয়োজন ব্যর্থ হল। অগত্যা শাস্তি নূতন এক পথ ধরে এগোল। বিংহ্যাম পাকা লোক। শিকার হাতের কাছে পেলে কেমন করে তাকে নিয়ে খেলতে হয়, তা সে ভালভাবেই জানে। লেডবেটারকে নিয়েও খেলার সুখ সে ষোল আনা মিটিয়ে নিল। তাকে দিয়ে ভার বহাল পশুর মতো; আর কাজ করাল এমন শক্ত ধরনের যা করতে ক্রীতদাসরাও হিম-সিম খেত। নাকের ডগায় রিভলবার উঁচিয়ে ধরে লেডবেটারকে দিয়েই বিংহ্যাম তার জামা-কাপড়, বিছানা-পত্র, টাকা-পয়সা সব কিছু গুছিয়ে নিল। এমন কি সোনার বাটগুলোও বাদ গেল না। তারপর ওই হতভাগ্যের পিঠে উঠল 'ড্রেসিং-ব্যাগ', ঘাড়ে ট্রাংক আর হাতে গ্ল্যাডস্টোন-ব্যাগ। এই সব কিছুর মধ্যেই ছিল প্রচুর সোনা। অতএব চলতে কষ্ট হচ্ছিল লেডবেটারের। এক একবার পা টলছিল তাঁর। মাথা ঘুরছিল। কিন্তু বিংহ্যামের বজ্রগম্ভীর নির্দেশের বিরুদ্ধতা করতে কোনোমতেই সাহস হচ্ছিল না।

সিঁড়ি বেয়ে অতি কষ্টে নেমে এলেন লেডবেটার। খিড়কীর দরজা দিয়ে বাইরে বেরোলেন। তার পর বিংহ্যামের আদেশ-মাফিক গিয়ে থামলেন সমুদ্রের তীরে। সেখানে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। তখন মধ্যরাত্রি। চারিদিক তখন নিস্তব্ধ। বিংহ্যামের পাশে বসে চরম সর্বনাশের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন লেডবেটার।

অবশেষে নৌকো নিয়ে আর একটি জালিয়াতের আবির্ভাব হল। বিংহ্যামের নির্দেশে লেডবেটার সমস্ত মালপত্র ওই নৌকোয় উঠিয়ে দিলেন। তারপর নিজেও গিয়ে বসলেন দুই দস্যুর মাঝখানে। বসতে বাধ্য হলেন। বাধ্য হয়েই বিংহ্যামের সঙ্গে সমুদ্রযাত্রা করতে হল তাঁকে। দীর্ঘ পথ পেরিয়ে শেষটায় ওরা গিয়ে পৌঁছুল এক দ্বীপে। জনমানবহীন নির্জন সেই দ্বীপ। সেখানে লেডবেটারকে নির্বাসিত করে বিংহ্যাম ফিরে এল।

ওই দ্বীপ থেকে অনেক কষ্টে উদ্ধার পেয়েছিলেন লেডবেটার। এক ধীবর তাঁকে বাঁচিয়েছিল। শেষ অবধি লেডবেটারকে রক্ষা করল এ গল্পের 'আমি'-চরিত্র। এই 'আমি'র সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ও বন্ধুত্বের কাহিনী বর্ণনা করে মধুররসের মধ্য দিয়ে গল্পটির উপসংহার করা হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে আলোচনা করলে মনে হয়, সাবানের মালিকের কাছ থেকে লেডবেটার যে শাস্তি ভোগ করলেন, তা' অপরাধের তুলনায় কিঞ্চিৎ গুরুতর। তবে এজন্যে গল্পটির কৌতুকরস ব্যাহত হয় নি। বরং 'মিঃ লেডবেটারের ছুটির দিন' একটি নির্ভেজাল হাসির গল্প হয়ে উঠেছে।

ঠিক একই কথা বলা চলে 'মিস উইন্‌চেলসিয়াজ্ হার্ট' প্রসঙ্গে। আগের গল্পটিতে লেডবেটারের কাণ্ডকীর্তি ও দুঃখ-কষ্টের দৌলতে আর এখানে 'মিস উইন্‌চেলসিয়ার হৃদয়ের' মহিমায় প্রাণ খুলে হেসে নিতে পারি আমরা।

মিস উইন্‌চেলসিয়া নামে এক ইংরেজ তরুণী কেমন করে এক যুবকের প্রেমে পড়ল এবং কেমন করেই বা যুবকটির শ্রুতিকটু নামের জন্যে সেই প্রেম পরিণয়ে পর্যবসিত হল না, এই গল্পে তা' বলা হয়েছে। বলার ভঙ্গিটি খুব মধুর ও হৃদয়গ্রাহী। দুই উৎসাহী বান্ধবী হেলেন ও ফ্যানী সহ উইন্‌চেলসিয়ার রোম-যাত্রা, পথে মিঃ স্নুক্‌স্ নামে এক যুবকের সঙ্গে ওদের পরিচয় এবং পথেই মিঃ স্নুক্‌সের সঙ্গে উইন্‌চেলসিয়ার প্রেম গল্পটির গোড়ার দিকে কৌতুক-রসকে জমিয়ে তুলেছে। ফ্রান্সের পরিবেশে এবং রোমের পটভূমিতে এই রস আরও রঙীন হয়েছে। কিন্তু বিপদ ঘটেছে তখন যখন উইন্‌চেলসিয়া জানতে পেরেছে যে, তার প্রণয়ীর নাম স্নুক্‌স্। এই ধরণের নামের প্রতি নায়িকার বিরক্তির পরিচয় গল্পটির গোড়া থেকেই আমরা পাই। অতএব এই নামটির কথা ভেবে নায়িকাকে যখন কঠিন হতে দেখি, তখন আমরা প্রচুর কৌতুক অনুভব করি বটে, কিন্তু এতটুকুও বিস্মিত হই না। বিস্মিত হয় এ গল্পের নায়ক। এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে তার প্রেম নতুন এক খাত ধরে এগোয়। উইন্‌চেলসিয়ার বান্ধবী ফ্যানীর সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। রোম থেকে ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাবার পর এই অন্তরঙ্গতা আরও বেড়ে চলে। শেষ অবধি প্রেমে পড়ে এরা দু'জন।

এদিকে উইন্‌চেলসিয়ার সঙ্গে ফ্যানীর নিয়মিত পত্রালাপ চলত। এই প্রেমের কথাও পত্র-মারফতই সে জানতে পারে। আরও জানতে পারে যে, তার পূর্ব-প্রণয়ীর নাম স্নুক্‌স্ নয়, সেভ্‌ন-ওক্‌স্; বিকৃত উচ্চারণের ফলেই নামটা ওইরকম শোনাত।

আকাশ থেকে পড়ে উইন্‌চেলসিয়া।

তার কুমারী-জীবনের নিঃসঙ্গতা দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। স্কুলের কাজকর্ম জগদ্দল পাথরের মতো চেপে ধরে তাকে। কিন্তু তখন আর কিছু করার নেই। ফ্যান্নীর সঙ্গে সেভ্‌নওক্‌স্‌-এর বিয়ের সব কিছু ঠিক হয়ে গেছে।

তারপর যথাসময়ে শুভকর্ম সম্পন্ন হল। উইন্‌চেলসিয়া উপহার পাঠাল দূর থেকে। কিছুকাল পরে একবার সে তার বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে গেল। বন্ধু ফ্যান্নী খুশি হল খুবই। কিন্তু পূর্ব-প্রণয়ী সেভ্‌নওক্‌স্‌-এর পরিবর্তন দেখে উইন্‌চেলসিয়া খুশি হতে পারল না। বেদনার সঙ্গে সে লক্ষ্য করল, সেভ্‌নওক্‌স্‌ রোমের দিনগুলোর কথা একেবারেই ভুলে গেছে। পূর্ব-প্রণয়িনী সম্বন্ধে একেবারেই নিরুত্তাপ সে।

কয়েকদিন পরে আবার যথাস্থানে ফিরে এল উইন্‌চেলসিয়া। এদিকে বন্ধু ফ্যান্নীর কাছ থেকে আসা চিঠির সংখ্যা ক্রমেই কমে আসতে লাগল। অবশেষে চিঠি বন্ধ হয়ে গেল একেবারে। ফ্যান্নী তার 'অতি পুরনো বন্ধু'কে আর নিমন্ত্রণ জানাল না। সেভ্‌নওক্‌স্‌-এর বাড়ির যে ঘরে গিয়ে উইন্‌চেলসিয়ার মতো অতিথিরা থাকত, সে ঘর দখল করল সেই বাড়ির দুই শিশুপুত্র। অর্থাৎ উইন্‌চেলসিয়া কেমন করে তার বন্ধু ও পূর্ব-প্রণয়ীর কাছ থেকে দূরে সরে গেল, গল্পটির শেষদিকে তার মর্মস্পর্শী বর্ণনা আছে। এ ছাড়া উইন্‌চেলসিয়ার অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং বন্ধু ফ্যান্নীর সঙ্গে তার পত্রালাপের অধ্যায়টিও খুব আকর্ষণীয়।

সব দিক মিলিয়ে বিচার করলে মনে হয়, এ গল্পটি পড়তে বসে হাসতে হাসতে শেষ অবধি গম্ভীর হয়ে উঠি আমরা। উইন্‌চেলসিয়ার হৃদয়বেদনা আমাদের ঘিরে ধরে।

কিন্তু বেদনার স্পর্শমাত্র নেই, এমন কিছু পূর্ণাঙ্গ হাসির গল্পও ওয়েল্‌স লিখেছিলেন। এই শ্রেণীর গল্পের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'দি প্যার্‌পল্‌ পিলিয়াস্‌'। বক্তব্যপ্রধান হাসির গল্প এটি। পুরুষ নরম হলে সে সংসারে শান্তিরক্ষা হয় না, এমনকি স্ত্রীও তা'কে পেয়ে বসে, ঘর-সংসারে শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখতে হলে পুরুষকে যে সময়-বিশেষে একটু কঠিন হতে হয়, এই ধারণাটি এখানে কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। তবে গম্ভীর-ভাবে এ গল্পের বক্তব্যকে গ্রহণের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তার কারণ, গল্পটির প্রথম থেকে শেষ অবধি হাল্কা ও লঘু সুর অনুরণিত।

এ কাহিনীর নায়ক মিঃ কুম্বেস। প্রথমেই বলা হয়েছে, জীবন সম্বন্ধে চরম বিতৃষ্ণা এসেছে তাঁর। কারণ তাঁর স্ত্রী একরোখা, অমিতব্যয়ী ও দুর্বিনীত প্রকৃতির। বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে বাড়িতে হৈ-চৈ করেন তিনি। মিঃ কুম্বেসের ভাল-মন্দ কোনো অভিমতকেই আমল দেন না।

মিসেস কুম্বেসের বান্ধবী মিস জেনী। জেনীর বন্ধু মিঃ ক্লারেন্স্‌। এ'রা দু'জনেই মিসেস কুম্বেসের বাড়িতে এসে-ছেন। গল্প-গুজব ও হাসি-ঠাট্টায় মশগুল হয়েছেন সহজেই। সারা বাড়িকে মাতিয়ে তুলেছেন। কিন্তু এ মাতামাতির মধ্যে বাড়ির মালিক মিঃ কুম্বেস যেন নেহাৎই বেমানান। বাইরের লোকজনের উপদ্রব মোটেই ভাল লাগছে না তাঁর। অথচ বাধ্য হয়ে তাঁকে সব কিছু সহ্য করতে হচ্ছে। শেষ অবধি মরীয়া হয়ে উঠলেন তিনি। অতিথিদের সঙ্গে বাগ্‌-বিতণ্ডা সুরু করলেন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন ওদের। কিন্তু মিসেস কুম্বেসের প্রশ্রয় পেয়ে বেরোতে ও'রা রাজী হলেন না। তাই ভগ্নমনে মিঃ কুম্বেসই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পথে যেতে যেতে বিষাক্ত এক উদ্ভিদের দেখা পেলেন তিনি। জীবন সম্বন্ধে বীতরাগ হয়ে সেই উদ্ভিদের খানিকটা খেলেন। দেখতে দেখতে তাঁর দেহে বিষের প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত হল। তারপর ঘরে ফিরে এসে সেই বিষাক্ত উদ্ভিদের প্রভাবে তিনি অগ্নিমূর্তি ধারণ করলেন। পরিশেষে স্ত্রী ও অতিথিরা তাঁর হাতে শায়েস্তা হল কেমন করে, এ গল্পে তার মনোরম বর্ণনা আছে। আর গল্পটির একেবারে শেষ দিকে এ ঘটনার পাঁচ বছর পরেকার যে চিত্র আছে, সেখানে অন্য এক কুম্বেসকে দেখি আমরা। সেখানে দেখি, কুম্বেস জীবন সম্বন্ধে আস্থার ভাব ফিরে পেয়েছেন। তাঁর সাংসারিক অশান্তি কেটে গেছে। অর্থাৎ বিষের প্রকোপে জেগে ওঠা তাঁর ওই একদিনের উত্তাপেই কাজ হয়েছে ম্যাজিকের মতো।

কৌতুকধর্মী রচনা হিসেবে এ গল্পটি পুরোপুরি রসোত্তীর্ণ। মিঃ ও মিসেস কুম্বেস, জেনী ও তাঁর বন্ধু মিঃ ক্লারেন্স্‌ সকলেই নিজ নিজ বিশিষ্টতা নিয়ে এখানে জীবন্ত হয়ে উঠেছেন। আর সবচেয়ে জীবন্ত মনে হয় মিঃ কুম্বেসকে; বিষের প্রতিক্রিয়ার বশে অদ্ভুত সব কাণ্ডকীর্তি করেন যিনি; যিনি আমাদের আনন্দরসে অভিষিক্ত করেন।

'দি স্টোলেন ব্যাসিল্যাস' গল্পে আনন্দরস অন্য এক পরিস্থিতি থেকে উৎসারিত। এ গল্পটি এক জীবাণু-বিজ্ঞানী ও এক নৈরাজ্যবাদীকে কেন্দ্র করে লেখা। শক্তি ও দম্ভ প্রকাশের উপকরণ হাতের কাছে পেলে এক শ্রেণীর ক্ষমতা-লিপ্সু কেমন স্বার্থান্বেষী ও বেসামাল হয়ে পড়ে, নৈরাজ্যবাদীর হাস্যকর আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে এখানে তা' দেখান হয়েছে।

নৈরাজ্যবাদী এসেছিল জীবাণু-বিজ্ঞানীর পরীক্ষাগারে। বিজ্ঞানী তাকে একটি কাঁচের পাত্র দেখিয়ে বলেছিলেন, এর মধ্যে আছে কলেরার জীবাণু। ওরা সকলেই জীবিত। মহামারী-সৃষ্টির মারাত্মক ক্ষমতা আছে ওদের। এই কথা শুনে নৈরাজ্যবাদী লুব্ধ হয়। সে ওই জীবাণুভর্তি কাঁচের পাত্রটি চুরি করে এবং তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে পড়ে তা' দিয়ে লণ্ডন শহরের জলকে দূষিত করবে বলে। কিন্তু আসলে ওখানে কলেরার জীবাণু, বাঁদরের গায়ে যারা নীলচে জীবাণু, বাঁদরের গায়ে যারা নীলচে দাগের সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানী ইচ্ছে করেই আসল সত্যকে গোপন করেছিলেন।

যা'ই হোক, নৈরাজ্যবাদী কাঁচের পাত্রটি নিয়ে পালাবার সময় বিজ্ঞানী তাকে অনুসরণ করলেন এবং শেষ অবধি ধরেও ফেললেন তাকে। কিন্তু মৃত্যুবাণকে হাতের কাছে পেয়ে নৈরাজ্যবাদী তখন একেবারেই আত্মহারা।

এই আত্মহারা ও বেসামাল নৈরাজ্য-বাদীর এবং তাকে অনুসরণরত জীবাণু-বিজ্ঞানীর চিত্র এখানে অতি সুন্দরভাবে আঁকা হয়েছে। পরিশেষে বিজ্ঞানীর স্ত্রীও এর সঙ্গে যোগ দেওয়ায় মূল ঘটনাটি আরও রসঘন হয়ে উঠেছে। যেন দেখতে পাই আমরা, নৈরাজ্যবাদী ঘোড়ায়-টানা গাড়িতে করে এক জনবহুল পথ ধরে এগোচ্ছে। তাকে ধরবেন বলে বিজ্ঞানী ছুটছেন তার পিছু পিছু। রাস্তা বরাবর দৌড়ুচ্ছেন। তাঁর এক পায়ে জুতো নেই। পোশাক একেবারেই অবি-ন্যস্ত। বিজ্ঞানীর পিছনে আসছেন তাঁর স্ত্রী; ঘোড়ায়-টানা গাড়িতে স্বামীর অনুগমন করছেন। আর রাস্তার আশে-পাশের সমস্ত লোক এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে কৌতুকে ফেটে পড়ছে।

খুব একটা উচ্চাঙ্গের গল্প এটি নয়। কিন্তু বক্তব্যপ্রধান কৌতুকধর্মী গল্প হিসেবে এর যে একটা আবেদন আছে, তা' বোধ করি অস্বীকার করা চলে না।

'হ্যামারপণ্ড পার্ক বার্গল্যারী'তে বক্তব্য নেই কিছু; সর্বত্রই কৌতুক ও হাল্কারসের ছড়াছড়ি। মিঃ টেডী ওয়াট্‌কিন্‌স্‌ নামে এক আনাড়ী চোর এক সম্ভ্রান্ত বাড়ি থেকে গহনা চুরি করতে গিয়ে কেমন করে বিচিত্র ঘটনার জালে জড়িয়ে পড়ল, এই গল্পে তা'

বলা হয়েছে। গল্প বলার ভঙ্গীটি খুব চমৎকার। লঘু সুর এর সর্বত্র অনুরণিত। আরম্ভে, মাঝখানে, শেষে—সর্বত্র। আরম্ভ অংশটির কথাই ধরা যাক। লেখক পরিহাসের ছলে প্রশ্ন তুলছেন,

"চুরিবিদ্যাকে খেলা বা বাণিজ্য বা কলা হিসেবে ধরা হবে কি না, তা' একটা সমস্যা বটে। একে বাণিজ্য হিসেবে গণ্য করার অসুবিধে হল, এর কায়দা-কানুনগুলো মোটেই ধরাবাঁধা নয়। তা' ছাড়া এ বিদ্যায় সাফল্যের সঙ্গে টাকাকড়ির প্রশ্ন জড়ান থাকে বলে একে 'কলা' নামে অভিহিত করার পথেও অন্তরায় আছে। সব দিক মিলিয়ে দেখলে মনে হয়, চুরিকে খেলা হিসেবে গণ্য করাই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত। এমন এক খেলা যার জন্যে বিশেষ কোনো নিয়মকানুনের বালাই নেই; এবং যে খেলায় পুরস্কার দেওয়া হয় বড়ই রীতিবিরুদ্ধভাবে। চুরিবিদ্যার ক্ষেত্রে এই রীতি-বিরুদ্ধতাই হ্যামারপন্ড পার্কে দু'জন উদীয়মান চোরের অস্তিত্বকে মুছে দেবার জন্যে দায়ী।"

এই সরস গৌরচন্দ্রিকার পরেই লেখক মূল প্রসঙ্গের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বলেন, 'ধনী আভ্‌লিঙের বিবাহ হয়েছে লর্ড আভ্‌লিঙের সঙ্গে। এ বিবাহে যৌতুক মিলেছে প্রচুর। বিভিন্ন সংবাদপত্রে এ সব সংবাদ ফলাও করে ছাপা হয়েছে। পাঠকরা জেনেছেন, নবদম্পতি তাঁদের মধুচন্দ্রিমা যাপন করবেন হ্যামারপন্ড পার্কে। এ নিয়ে চোরদের সমাজে বেশ উত্তেজনা দেখা দিয়াছে। টেডি ওয়াট্‌কিন্‌স্‌-এর দলটিও বাদ যায় নি। খুদে যে দু-চারজন চোর নিয়ে তার দল, বেশ সাড়া পড়ে গিয়েছে সেখানে। স্থির হয়েছে, সুযোগ্য একজন সহকারীকে নিয়ে ওয়াট্‌কিন্‌স্‌ হ্যামারপন্ডের গ্রাম পরিদর্শন করবে। আর্টিস্টের ছদ্মবেশে যাবে সে। প্রথমে যাবে সে নিজে; তারপর যাবে তার সহকারী। হ্যামারপন্ডে ওয়াট্‌কিন্‌স্‌-এর নাম হবে স্মিথ।

গল্পটির পরবর্তী অংশে মূল কাহিনীর যে পটভূমি আঁকা হয়েছে, তা' বিশেষভাবে আমাদের মুগ্ধ করে। বনাচ্ছন্ন নির্জন গ্রাম হ্যামারপন্ড ও সেখানে আভ্‌লিঙ্‌-দের রাজকীয় আবাসস্থলটিকে যেন দেখতে পাই আমরা। দেখতে পাই, ছায়ায় ঢাকা মনোরম পথ ধরে ওয়াট্‌কিন্‌স্‌ এগোচ্ছেন। ছবি আঁকার কিছু সাজ-সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়েছে সে। আর নিয়েছে ছোট্ট একটি মই, একটি শাবল ও কিছু তার। অনেকেরই দৃষ্টি পড়ছে আগন্তুকটির দিকে। কিন্তু আগন্তুক শিল্পের মহিমায় তন্ময় হবার ভান করছে।

মদের দোকানে শিল্পীকে অবশ্য একটু বেকায়দায় পড়তে হল। স্থানীয় এক ব্যক্তি পর্সন আর্ট নিয়ে জেরা সুরু করল ওয়াট্‌কিন্‌স্‌কে। আর্ট-এক্‌জিবিশনের প্রসঙ্গ উঠল।

বিপদে পড়ল ওয়াট্‌কিন্‌স্‌। মদের দোকানে সে ঢুকেছিল হ্যামারপন্ডের বাড়ি সম্পর্কে খবরাখবর নেবে বলে। অথচ প্রশ্নবাণের কবলে পড়ে নতুন কোনো খবর তো সে পেলই না, উপরন্তু তাকেই নানান সব মন-গড়া খবর জোগাতে হল। পর্সনের হাত থেকে অতি কষ্টে পরিত্রাণ পেল সে। কিন্তু আর্ট বা চিত্রবিদ্যা সম্পর্কে এমন সব অদ্ভুত কথা বলল, এমন নীরেট অজ্ঞতার পরিচয় দিল, যা' দেখেশুনে আমরা না হেসে থাকতে পারি না। একবার বলল,

—'আমি এখানে এসেছি, চাঁদের আলোতে হ্যামারপন্ড বাড়িটিকে আঁকবো বলে।'

—'সত্যি!' পর্সন জানাল, 'এ খুব একটা ভাল আইডিয়া বটে!'

—'হ্যাঁ!' ওয়াট্‌কিন্‌স্‌ সুরু করল, 'যে মুহূর্তে এ আইডিয়া মনে এল, তখনই আমি এর ভাল দিকটা চিন্তা করেছিলাম। আগামীকাল রাত্রে কাজ সুরু করবো বলে ভাবছি।'

... ...

পর্সন আপত্তি করল, 'কিন্তু অমাবস্যা এসে গেল যে। আগামীকাল চাঁদই উঠবে না।'

ওয়াট্‌কিন্‌স্‌ বলল, 'চাঁদ না উঠলেও যেমন করেই হোক বাড়িটি থাকবে তো! দেখুন আমি প্রথমে বাড়িটিকে আঁকবো বলে ভেবেছি। পরে সেখানে চাঁদের আলো জুড়ে দেব।'

পরদিন সন্ধ্যের দিকের ঘটনা। হ্যামারপন্ড পার্কের বাড়িটির খুব কাছাকাছি একটা জায়গায় ওয়াটকিন্‌স্‌ বসে আছে। ছবি আঁকবার অনেক কিছু মাল-মশলা তার সঙ্গে। এক মনে সে গাঢ় সবুজ একটা রঙ গুলছে। এমন সময় মিঃ র‍্যাফেল সন্টের সঙ্গে তার দেখা। র‍্যাফেলের কাছেও চিত্রবিদ্যা সম্পর্কে হাস্যকর অজ্ঞতার পরিচয় দিল সে। এমন কিছু বেফাঁস কথা বলল যা শুনে অতি বড় গম্ভীর মানুষেরও হেসে লুটিয়ে পড়ার কথা। ওদের আলোচনাটা সুরু হয়েছিল এইভাবে—

সন্ট বললে, 'আমার রূঢ়তা মার্জনা করবেন। কিন্তু সত্যি বলতে কি, ওই সবুজ বড় অদ্ভুত ঠেকছে। রঙটা যেন আঘাত করছে আমাকে। এ দিয়ে কি করতে চান আপনি?'

...ওয়াট্‌কিন্‌স্‌ বললে, 'আমার কাজে বাধা দেবেন বলে এখানে আসেন যদি তো আপনার মুখে ওই রঙ মাখিয়ে দেব।'

বেগতিক বুঝে সন্ট তাড়াতাড়ি সরে পড়ল। খানিক পরেই এল পর্সন ও ওয়েইনরাইট। ওয়াটকিন্‌স্‌ রঙের তাৎপর্য বুঝিয়ে বলল এবার। জানাল, এই গাঢ় সবুজ পদার্থটাকে সে তার ছবির প্রথম দফা রঙ হিসেবে ব্যবহার করে। ছবি আঁকবার এ এক অভিনব পদ্ধতি। সে নিজেই এর আবিষ্কর্তা।

অল্পক্ষণের মধ্যেই বিরক্ত হয়ে উঠল ওয়াট্‌কিন্‌স্‌। বলল, 'প্রতিটি পথচারীর কাছেই সে তার চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির রহস্য বুঝিয়ে বলতে রাজী নয়।'

অগত্যা পর্সন ও ওয়েইনরাইট তাড়াতাড়ি বিদায় নিল। গল্পটির এই অংশে নিজের অজ্ঞতাকে ঢাকবার জন্যে ওয়াটকিন্‌স্‌ যে বিরক্তি ও উষ্মা প্রকাশ করেছে, তা খুবই বাস্তবধর্মী বলে মনে হয়। ধুরন্ধর প্রকৃতির লোক বলেই সহজে দমে যায় নি সে, প্রশ্নকর্তাদের হাত থেকে পরিত্রাণের ফিকির খুঁজেছে।

কাহিনীর পরবর্তী পর্বে দেখি, রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। আকাশে একটি দু'টি করে তারা ফুটছে। আর হ্যামারপন্ড পার্কের বাড়িটিকে মনে হচ্ছে ছায়ামূর্তির মতো। এদিকে ওয়াটকিন্‌স্‌-এর সহকারী জিম এসে গেছে। আসল কাজ হাসিল করার আয়োজন চলছে পুরোদমে। জিম এরই মধ্যে পথের উপরে তার ছড়িয়ে দিয়েছে; যা'তে করে কেউ আসতে গেলে হোঁচট খেয়ে পড়ে।

ওয়াটকিন্‌স্‌ এবার তার ছোট্ট মইটি নিয়ে এগিয়ে গেল। পা টিপে টিপে বাড়িটির জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। এমন সময় ঘটল বিভ্রাট। জিমের খাটান তারের উপরে হোঁচট খেয়ে পড়ল আর এক চোর। চোরটির সঙ্গে দু'চারজন অনুচরও ছিল। ওরা সবাই এসেছিল একই উদ্দেশ্য নিয়ে; এসেছিল, লেডী আভ্‌লিঙের গহনা চুরি করবে বলে।

দু'দল চোরের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘাত হল এবার। চোরদের হাতে বেদম মার খেল ওয়াটকিন্‌স্‌। কিন্তু অভ্যর্থনা লাভ করল বাড়ির মালিক লর্ড আভ্‌লিঙের কাছ থেকে। আভ্‌লিঙ ভাবলেন, চোর-বদমায়েসদের হাত থেকে ওয়াটকিন্‌স্‌-ই বুঝি ওদের বাঁচিয়েছে। ভাবা মাত্রই শ্রদ্ধায় আর কৃতজ্ঞতায় গদগদ হলেন তিনি। ওয়াট্‌কিন্‌স্‌কে বাড়ির অন্দর

মহলে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন এবং তারপর অতিথি-সংকারের আয়োজন করলেন রাজোচিত কায়দায়।

গল্পটির এই বিচিত্র পরিসমাপ্তির মধ্যে এমন একটা লঘু সুর আছে যা পাঠকদের চোখে-মুখে কৌতুকহাস্য ফুটিয়ে তোলে।

হাস্যরস 'মিঃ ব্রিসারস্ ট্রেজার'-এও দুর্লভ নয়। মিঃ ব্রিসার-এর সঙ্গে জেইন-এর প্রণয় ও বিচ্ছেদ, ব্রিসারের গুপ্তধন-দর্শনের কাহিনী এবং পরিশেষে তা হারানো—এই সব কিছুর মধ্যেই এমন একটি সহজ সারল্য আছে, যা পাঠ করে অতি বড় গম্ভীর পাঠকের পক্ষেও হাসি সংবরণ করা কঠিন। ব্যর্থপ্রেমিক মিঃ ব্রিসারের জীবনবেদনা নয়, জীবনরঙ্গই আমাদের মুগ্ধ করে। আমরা সকৌতুকে লক্ষ্য করি, এই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি কাহিনীর সুরুতেই প্রেম ও বিবাহ সম্বন্ধে লঘু-গুরু মন্তব্য করেছেন। বলছেন, 'যাকে বিবাহ করবেন তার সম্বন্ধে আপনার অতিরিক্ত সজাগ থাকবার জো নেই।'

এই অবধি বলে একটু থামলেন মিঃ ব্রিসার। তারপরেই ফিরে এলেন তাঁর ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে। বললেন,—'কি জানেন, অনেকেই আমাকে পেতে চেয়েছে। এই শহরের অনেকেই। ওদের নামও করতে পারি আমি। কিন্তু কেউ ঠিক ওইরকম করে নি। কেউ নয়।.........তরুণ বয়সে বেশ চালাক-চতুর ছিলাম আমি।......... তবে বড় বেশি সাবধানীও ছিলাম। বড় বেশি সাবধানী।......প্রেমে পড়েছি একবার। বাগ্‌দানও করেছি।......এবং যদি সে মরে না গিয়ে থাকে ও অপর কারও সঙ্গে যদি তার বিয়ে বা অন্য কিছু না হয়, তবে এখনও সেই বাগ্‌দত্তই আছি।......বাগ্‌দত্তার কাছ থেকে ছুটে পালিয়েছিলাম।......বাড়ি চলে এসে-ছিলাম।......আপনি বিশ্বাস করবেন না সে কথা। কিন্তু আমি গুপ্তধন পেয়েছিলাম। সত্যিকারের গুপ্তধন।...... চমৎকার মেয়ে ছিল সে। আর ছিল বেশ অভিজাত প্রকৃতির।'

মিঃ ব্রিসারের এই সব অসংলগ্ন কথা শুনে তাঁর প্রেম ও জীবন সম্বন্ধে কৌতুহল অনুভব করি আমরা। আমাদের মনে হয়, একটি নারী এবং প্রেম, বাগ্‌দান ও গুপ্তধনকে কেন্দ্র করে এই মানুষটি জীবনে খুব বড় রকমের একটা ঘা খেয়েছেন। তারপর গল্পটি যখন এগোয়, ঘা-খাওয়া ব্রিসারকেও তখন প্রত্যক্ষ করি এবং ওই প্রেমিক-পুরুষটিকে হোঁচট খেতে দেখে বেদনায় বিমর্ষ হই যতটা, হেসে আকুল হই তার চেয়ে অনেক বেশি।

হাসির দাক্ষিণ্যে গোড়া থেকেই অভিভূত হই সবাই। লক্ষ্য করি, মিঃ ব্রিসারের জীবন রঙে-রসে টুইটুম্বর ছিল একদিন; আর সেই জীবন সম্বন্ধে আজও তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। অতীত দিনের অতি ক্ষুদ্র ঘটনাকেও মহিমা দান করতে চাইছেন তিনি। বোঝাতে চাইছেন, তিনি নিজেও তখন মহিমার ছোটখাট একটি পিরামিড ছিলেন। তাঁর চাল-চলন, কথাবার্তা সব কিছু থেকেই মহিমা তখন ঠিকরে বেরোত।

ব্রিসার-এর উক্তি থেকেই আমরা জানতে পারি, যৌবনে খুব চটপটে ছিলেন তিনি। খুব সুন্দর ছিলেন দেখতে। ভাল জামা-কাপড় পরতেন। মাথায় চাপাতেন পেল্লাই আকারের এক সিল্কের টুপি। হাতে বাহারী ছাতা নিতেন একটা; আর চলতেন খুব সাবধানে।

কিন্তু মানব-প্রকৃতি বড় চঞ্চল এবং অনেক সাবধানে চলেও ভবিতব্যের হাত থেকে মানুষ রেহাই পায় না। প্রেম নামক বস্তুটি যে কখন তার চোখে রঙীন চশমা পরিয়ে দেবে তা সে নিজেই জানে না। মিঃ ব্রিসারও জানতেন না, পৃথিবীটা কখন তাঁর কাছে রামধনু হয়ে উঠেছে। যখন জানলেন, মিস জেইন তখন তাঁর হৃদয়-সরোবরে শতদল হয়ে সৌরভ ছড়াচ্ছে।

আনন্দে উল্লাসে আত্মহারা হলেন ব্রিসার। নায়িকাকে নিয়ে গল্পে-গুজবে, হাসি-ঠাট্টায় মেতে উঠলেন। লণ্ডন শহরের পার্ক, পথ-ঘাট, দোকান-রেস্তোরাঁ প্রথম-প্রেমের আবেশে ভারী হয়ে উঠল।

এদিকে প্রেমনাট্যের পট-পরিবর্তন হল কয়েকদিনের মধ্যে। জেইন তার পিতার সঙ্গে এসেক্স-এর কলচেস্টার-এ গেল। সঙ্গে গেল ভক্তটিও। মিঃ ব্রিসার জেইনদের বাড়ির খুব কাছাকাছি একটা জায়গায় আস্তানা গাড়লেন। ফলে প্রেম-স্রোতস্বিনীর সুবিধেই হল। নতুন পরিবেশে নব নব তরঙ্গ তুলে প্রবাহিত হল সে। আর সেই তরঙ্গাঘাতে মিঃ ব্রিসার একেবারে কাবু হয়ে পড়লেন। জেইন-এর কাছে বিয়ের প্রস্তাব করলেন তিনি। প্রস্তাব অচিরেই গৃহীত হল। নায়িকা মঞ্জুর করলেন আবেদন, কিন্তু নাকচ করলেন তাঁর পিতা। বললেন, জীবনে এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নি ব্রিসার। অতএব তার সঙ্গে ওর মেয়ের বিয়ে দেওয়া চলে না।

কথা শুনে ব্রিসারের পৌরুষে ঘা লাগল। প্রতিষ্ঠার জন্যে উঠে-পড়ে লাগলেন তিনি; এবং ঘটনাচক্রে গুপ্তধনের সন্ধান পেলেন। সে ধন ছিল জেইনদের বাড়ির বাগানে। বাড়িটি জেইন-এর পিতা এক জোচ্চোরের কাছ থেকে কিনে-ছিলেন। জোচ্চোরের দৃষ্টি বাড়ির চেয়েও গুপ্তধনের দিকে বেশি নিবদ্ধ ছিল নিশ্চয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সাত রাজার ধন মাণিক সে সরিয়ে না রেখেই ফ্যাসাদ বাধিয়েছে। ব্রিসার পেয়েছেন সেই গুপ্তধনের সন্ধান এবং স্বপ্ন দেখেছেন, ওই ধন তাঁর প্রতিষ্ঠার সিংহ-দ্বার খুলে দেবে। বেশ কিছু রূপোর মুদ্রা ছিল সেখানে এবং ধন-ভাণ্ডারটি বেশ ভারী ছিল।

একদিন রাত্রির অন্ধকারে পা টিপে টিপে এগোলেন মিঃ ব্রিসার। গুপ্তধন সরিয়ে আনবেন ভেবে বাগানে বসে মাটি খুঁড়তে লাগলেন। কিন্তু ভাগ্য খারাপ ওই উচ্চাভিলাষী যুবকটির। ঘুম ভেঙে গেল জেইন-এর বাবার। বন্দুক হাতে বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি। এসেই জামাতা-পদপ্রার্থী মিঃ ব্রিসারকে দেখলেন।

সেযাত্রায় অনেক কায়দা করে রেহাই পেলেন ব্রিসার। বললেন, মাঝরাতে জল-তেষ্টা পাওয়াতেই সে এদিকে এসেছে।

তৃষ্ণা-নিবারণের পক্ষে অন্ধকারাচ্ছন্ন নিভৃত উদ্যান প্রশস্ত জায়গা কিনা জানি নে, তবে সেবারে কোনোক্রমে মুখরক্ষা করেছিলেন মিঃ ব্রিসার।

বিপদ বাধল পরের বারে। নায়িকার পিতা মূর্তিমান রাহুর রূপ ধরে গ্রাস করবার উপক্রম করলেন তাঁকে। মাঝ-রাতে শব্দ শুনে উঠে পড়লেন তিনি। এগোলেন বন্দুক হাতে নিয়ে। গুলীও ছুঁড়লেন দু-একটা।

বিপদ বুঝে মিঃ ব্রিসার দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটলেন। ছুটতে ছুটতে কলচেস্টার থেকে এসে থামলেন একেবারে লণ্ডনে। পিছন ফিরে তাকালেন না একবারও। ভেবে দেখলেন না, নায়িকার পিতা তাঁকে চিনতে পেরেছেন কিনা।

সেই থেকে তিনি লণ্ডনেই আছেন। আর নায়িকার ঘরমুখো হন নি। চিঠি অবশ্য দিয়েছিলেন দু-তিনবার। কিন্তু জবাব পান নি।

এই হল মিঃ ব্রিসারের গল্প। উদ্ভটত্ব আছে বলেই এ গল্প পড়ে হাসি আমরা। ব্যর্থপ্রেমিক মিঃ ব্রিসারের কথা ভেবে বেদনা অনুভব করি না। আমাদের মনে হয়, এ গল্পের নায়ক সেই হতভাগ্যদের দলে, যাঁরা বিনা নোটিশেই নিজেরা কেঁদে অপরকে হাসাবার দায়িত্ব নিয়েছেন।

সব দিক মিলিয়ে দেখলে মনে হয়, ওয়েল্‌স-এর গল্প পড়তে বসে মাঝে মাঝে হাসির হাটে ঘুরে আসি আমরা। খুশি হই যখন-তখন; আর আনন্দের অনেক সওদা নিয়ে ঘরে ফিরি।

ধারাবাহিক উপন্যাস

আশাপূর্ণা দেবী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুবর্ণলতা বলেছিল, 'মনে জানবো একই দিনে মা-বাপ হারালাম আমি।'

কিন্তু মা-বাপ কি ছিল সুবর্ণর?

কবে ছিল?

কবে পেয়েছে সেই থাকার প্রমাণ?

তবে?

যে বস্তু ছিল না, তার আর হারাবার প্রশ্ন কোথায়?

তবু নির্বোধ সুবর্ণলতা অসীম নক্ষত্রে ভরা আকাশের দিকে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে একটি নতুন নক্ষত্রের সন্ধান করতে করতে সেই বলে-আসা কথাটাই আবার মনে মনে উচ্চারণ করে, 'একই দিনে মা-বাপ দুই-ই হারালাম আমি।'

কোনো এক নতুন নক্ষত্র কি শুনতে পাবে সে কথা? আর শুনতে পেয়ে হেসে উঠবে? বলবে, 'যা ছিল না তাই নিয়ে হারানোর দুঃখ উপভোগ করতে বসলি তুই? ছি, ছি!'

সুবর্ণলতা সে হাসি, সে কথা শুনতে পাবে না হয়তো। সুবর্ণলতা ওই আকাশটা থেকে চোখ সরাতে পারবে না।

এ বাড়িতে আকাশ আছে।

সুবর্ণলতার এই গোলাপী-রঙা দোতলায়। কারণ এ বাড়িতে আছে ছাদে ওঠার- সিঁড়ি। আছে দক্ষিণের বারান্দা। যে বারান্দায় বাতাসের অফুরন্ত দাক্ষিণ্য, যে ছাদে— অন্তহীন অন্ধকারের নিবিড় গভীর প্রগাঢ় প্রশান্তি।

এই ছাদেই তো আকাশ!

ঊর্ধ্বসীমায় স্থির হয়ে আছে সেই অসংখ্য নক্ষত্রের মালা-পরানো নির্মল আকাশ।

সুবর্ণলতার কি তবে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত নয়? যদি না দেয় তো সুবর্ণলতা অকৃতজ্ঞ।

কিন্তু সুবর্ণ অকৃতজ্ঞ নয়।

তাই সে যখন সেই অন্তহীন অন্ধকারের মাঝখানে উঠে এসে দাঁড়ায়, তার হৃদয়ের সেই ধন্যবাদ উঠে আসে একটি গভীর নিঃশ্বাসের অন্তরাল থেকে।

এখানে ছাদে উঠে আসতে পারে সুবর্ণলতা!

আর সেটা পারে বলেই দু' দণ্ডের জন্যেও অন্তত ভুলে থাকতে পারে— সুবর্ণলতা হচ্ছে একটা কর্মে উত্তাল আর শব্দে মুখর স্থূল আর ক্ষুদ্র সংসারের গৃহিণী। ভুলে থাকতে পারে সেই সংসার তার স্থূলতা আর ক্ষুদ্রতা নিয়ে অহরহ সুবর্ণলতাকে ডাক দিচ্ছে। তার দায় এড়াবার উপায় নেই সুবর্ণলতার।

তবু আজ বোধ হয় আর কেউ ডাক দিতে আসবে না।

আজ সুবর্ণলতাকে বোধহয় কিছু কিঞ্চিৎ সমীহ করবে সুবর্ণলতার ছেলে-মেয়েরা।

ডাক দেবে না, অতএব সুবর্ণলতা স্তব্ধ হয়ে বসে মনে ভাবতে পারে 'মা ছিল তার!' রাজরাজেশ্বরী মা!

ছিল সুবর্ণর সমস্ত চেতনার মধ্যে সমস্ত ব্যাকুলতার মধ্যে, সমস্ত অনুভবের মধ্যে। মূঢ় সুবর্ণলতা শুধু একটা মূঢ় অভিমানে মুখ ফিরিয়ে থেকেছে সেই মায়ের দিক থেকে।

নইলে একবার কি সব দিকের সব মান-অভিমান ধুলোয় বিকিয়ে দিয়ে মায়ের কাছে গিয়ে আছড়ে পড়া যেত না? বলা যেত না, 'মা, তোমায় একবার দেখবার জন্যে বড্ড ইচ্ছে হচ্ছিল—'

সুবর্ণ তা করে নি।

সুবর্ণ তার অভিমানকেই বড় করেছে। সুবর্ণ ভেবেছে, 'মা তো কই একবারও ডাক দেন নি।'

সুবর্ণ ভেবেছে, 'স্বামীর কাছে হেঁট হব না আমি!'

তাই সুবর্ণর মা 'ছিল না'।

এখন সুবর্ণলতা তার সব মান-অভিমান ধুলোয় লুটিয়ে দিলেও আছড়ে পড়ে বলতে পারবে না সেই কথাটি।

'মা, তোমাকে একবার দেখবার জন্যে মরে যাচ্ছিলাম আমি।'

কিন্তু অভিমান কি দূর হয়?

এখনো যে বাপের উপর একটা দুরন্ত অভিমানে পাথর হয়ে আছে সুবর্ণ। সেই পাথর যদি ফেটে পড়তো তো, হয়তো কপাল কুটে কুটে চীৎকার করে উঠতো, 'কেন? কেন তোমরা সবাই মিলে আমাকে ঠকাবে? কেন এমন করে নিষ্ঠুরতা করবে আমার সঙ্গে? কী ক্ষতি হতো যদি তুমি সুবর্ণলতার মায়ের সেই চিঠিটা সুবর্ণলতাকে চুপি চুপি পাঠিয়ে দিতে?'

যদি বলতে 'সুবর্ণ রে, তোর মা

বলেছে, সে মরে না গেলে চিঠিটা না দিতে, কিন্তু আমি পারলাম না অত নিষ্ঠুর হতে, আমি দিয়ে গেলাম তোকে। এখন তুই বোঝ, খুলবি কি খুলবি না।'

সুবর্ণ বুঝতো!

কিন্তু সুবর্ণর বাবা তা' করে নি।

আর সুবর্ণর মা তার চিঠির জবাব চায় না বলে, বলে গেছে—'আমি মরলে তবে দিও সুবর্ণকে!'

'কী দরকার ছিল এই মুষ্টিভিক্ষায়?'

সারা শরীর তোলপাড়-করা একটা প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাস যেন সেই পাথরকে ভাঙতে চাইছে।

হাতের মুঠোর মধ্যে বন্ধ রয়েছে সেই মুষ্টিভিক্ষার নমুনাটুকু।

বন্ধ খাম বন্ধই রয়েছে।

সুবর্ণলতা খুলবে না ও খাম, দেখবে না কী লেখা আছে ওতে।

নিরুচ্চার থাক সুবর্ণলতার নিষ্ঠুর মায়ের নিষ্ঠুরতার নমুনাটা!

মাকে বাদ দিয়েও যদি এত বড় জীবনটা কেটে গিয়ে থাকে সুবর্ণর, তো বাকী জীবনটাও যাক।

সুবর্ণলতা ভাবুক, যে বস্তু ছিল না, তার আবার হারানো কি! সুবর্ণলতার মা নেই, মা ছিল না।

কিন্তু সত্যই কি ছিল না?

কোনোদিনই না?

সুবর্ণলতার জীবনের ন'টা বছর একেবারে নয় হয়ে যাবে?

সুবর্ণলতার সেই ন' বছরের জীবনের সমস্ত জীবনাকাশ জুড়ে নেই একখানি অনির্বাণ জ্যোতি? সেই জ্যোতির পরিমণ্ডলে ও কার মুখ?

সুবর্ণলতার মায়ের মুখ কি ভুলে গেছে সুবর্ণ?

সুবর্ণর জীবন-আকাশের সেই জ্যোতি চিরতরে মুছে গেছে? মুছেই যদি গেছে তো সুবর্ণলতা কোন্ আলোতে দেখতে পাচ্ছে ওই ফ্রক-পরা ছোট মেয়েটাকে?

যে মেয়েটা স্কুল থেকে ফিরেই হাতের বইখাতা নামিয়ে রেখে দুদ্দাড়িয়ে ছুটে এগিয়ে গেছে তার মায়ের কাছে। দু'-হাত বাড়িয়ে।

'মা! মা! মা!'

মা অবশ্য হাঁ হাঁ করে উঠেছে, 'ছুঁসনে, ছুঁসনে, ইস্কুলের জামা-কাপড়—'

কিন্ত মায়ের চোখের কোণে প্রশ্রয়, মায়ের ঠোঁটের কোণে হাসি।

আর শোনে কেউ তার মিথ্যে নিষেধের সাজানো বুলি! জড়িয়ে না ধরে ছাড়ে?

অন্ধকার, নিঃসীম অন্ধকার। এই অন্ধকারের সমুদ্রে তলিয়ে গিয়ে বুঝি ঐ ছোট্ট মেয়েটার সঙ্গে একাকার হয়ে যাচ্ছে সুবর্ণ।

কিন্তু ওই অতল অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি তেমন চলে না। শুধু শব্দতরঙ্গ পড়ে আছড়ে আছড়ে।

সেই তরঙ্গে তরঙ্গে ভেসে যাচ্ছে সুবর্ণ।

শব্দ, শব্দ!

স্মৃতির কৌটোয় ভরা ছিল বুঝি স্তরে স্তরে? আজকের ধাক্কা লেগে তারা উঠে আসছে, ছড়িয়ে পড়ছে, নতুন করে ধ্বনিত হচ্ছে।

প্রথম ভোরে যে শব্দটা ঘুমের শেষ রেশকে সচকিত করে ধাক্কা দিয়ে যেত সে হচ্ছে হাড়-পাঁজরা বার-করা ঘোড়ায়-টানা ময়লাগাড়ির ঝড়ার ঝড়ার শব্দ!

অবিশ্বাস্য একটা জঞ্জালের স্তূপ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে গাড়িটা। আর শব্দ উঠছে ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ। সেই শব্দের সঙ্গে আর এক শব্দ, 'সুবর্ণ এবার উঠে পড়।' দুপুরের নির্জনতায় আর একটা শব্দ উঠতো 'ঠং, ঠং, ঠং!' বাসনওলা চলেছে চড়া রোদ্দুরে তার মাথার ওপর বাসনের ঝাঁকা, আর হাতে একটা কাঁসির সঙ্গে এক টুকরো কাঠ! সেই কাঠ-টুকুতেই কাঁসির গা থেকে শব্দ উঠছে 'ঠং, ঠং, ঠং!'

সে শব্দ—

দুপুরের নির্জনতায় যেন একটা শিহরণ জাগিয়ে দিয়ে যেত। মনটা হু-হু করে উঠতো। শেলেট পেনসিল রেখে মায়ের কাছে গিয়ে গা ঘেঁসে বসতে ইচ্ছে করতো।

মা বলতো, 'কি হল? লিখতে লিখতে উঠে এলি যে?'

মেয়েটা মায়ের গা ঘেঁসে বসে বলতো, 'এমনি!'

মা মেয়েটার ঝুমরো চুলগুলো কপাল থেকে সরিয়ে দিতে দিতে স্নেহে-ভরা গলায় বলতো, 'এমনি মানে? এমনি কিছু হয় না কি?'

মেয়েটা মায়ের গায়ে গাল ঘষে ঘষে বলতো, 'হয়, হয়! এই তো হলো!'

তখন যদি দুপুরের সেই নির্জনতা ভেদ করে আবার হাঁক উঠতো, 'ট্যাঁপারি, টোপাকুল, নারকুলে কু—ল!'

অথবা হাঁক উঠতো—'চীনের সিঁদুর! চাই চীনে—র সিঁদুর—' কিছুই এসে যেত না মেয়েটার।

বুক গুর গুর করে উঠত না, গা ছম্ ছম্ করে উঠতো না। যেন সব ভয় জয়ের ওষুধ মজুত আছে ঐ মিষ্টি গন্ধেভরা গা-টার মধ্যে!

কিসের সেই মিষ্টি গন্ধ?

চুলের? শাড়ির? না শুধু মাতৃ-হৃদয়ের?

.....

শব্দ উঠতো, 'বেলোয়ারি চুড়ি চাই, কাচের পুতুল খেলনা চাই! সাবান, তরল আলতা চাই!' শব্দ উঠতো, 'পাংখা বরো—ফ! পাংখা বরো—ফ!'

তখন আর ভয় নয়, আহ্লাদ।

আহ্লাদ আগ্রহ উৎসাহ।

শুনতে পেলেই জানলার কাছে ছুটে যেত মেয়েটা, তারপর সরে এসে উতলা গলায় বলতো, 'মা, মাগো!'

মা হেসে হেসে বলতো, 'ভারী যে আদর দেখছি! কী চাই শুনি?'

'কাচের পুতুল একটা—'

'আর পুতুল কি হবে রে? কত রয়েছে—'

মেয়েটা তীক্ষ্ণ গলায় বলতো, 'বা রে, আমার বুঝি কাচ পুতুল আছে?'

অতএব কাচ পুতুল!

অথবা বরফ! পাংখা বরফ! তখন মা বলতো, 'দূর, দূর, ও বরফ বিচ্ছিরী জলে তৈরি হয়। ও সব কি খায় মানুষে?'

'খায় না তো বিক্রি করে কেন?' পরণে খাটো ফ্রক থাকলেও তর্কে খাটো ছিল না মেয়েটা। বলতো, 'খায় না তো বিক্রি করে কেন?'

মা পয়সা বার করতো, আর বলতো, 'বিক্রি তো সাপের বিষও করে। খাবি তাই?'

বলতো, আবার পয়সা দিতো!

বলতো, 'শুধু আজ, আর নয় কিন্তু!'

তাই, তাই, তাতেই সই।

'নগদ যা পাও, হাত পেতে নাও, বাকির খাতায় শূন্য থাক।' আর একদিনের কথা পরে ভাবা যাবে।

গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৩, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা-১
ফোন: ২২-৬৫৮০

এক একদিন আবার মা বকতো।

বলতো, 'কেবল কেবল পড়া ফেলে উঠে আসিস কেন বলতো?' 'মন নেই কেন পড়ায়?'

মেয়েটা বলে ফেললেই পারতো ভয় দুপুরে ওইরকম সব শব্দ শুনলে ভয় করে আমার। বললে অনেক কিছু সোজা হয়ে যেত। কিন্তু মেয়েটা তা বলতো না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতো।

মা বলতো, 'যাও হাতের লেখা করে ফেল গে। এবারই স্কুলে ভর্তি হতে হবে।'

মেয়েটা আস্তে আস্তে চলে যেত।

আর সময় মিনিট গুণতো কখন রাত্তির আসবে। রাত্তিরে তো আর মা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলতে পারবে না, 'যাও পড় গে!'

রাত্তিরে মায়ের বুকের কাছে ঘেঁষটে শুয়ে গায়ের ওপর হাত রেখে পরম সুখময় একটু আবেশ নিয়ে করেক মুহূর্তের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়া!

....

ছোট সেই মেয়েটার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে থাকে সুবর্ণলতা। তার মায়ের কাছে বসে চুল বাঁধে, ভাত খায়, পড়া মুখস্থ করে। বই-খাতা গুছিয়ে নিয়ে স্কুলে যায়।

যায় দুর্গাপুজোর প্রতিমা দেখতে। যেখানে যায় তার নামগুলো যেন ভেসে ভেসে উঠছে চালচিত্র-ঘেরা জগজ্জননী মূর্তির ধারে ধারে।

রাণী রাসমণির বাড়ি, শোভাবাজারের রাজবাড়ি, শ্যামবাজারের মিত্তির বাড়ি।... কোথায় যেন নাগরদোলা চড়ে আসে, কোথায় যেন সঙের পুতুল দেখে।

তারপর ব্যথা-করা পা নিয়ে বাড়ি ফিরেও ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে,' মা, মাগো, কতো ঠাকুর দেখেছি জানো? পাঁ-চখানা।'

মা হেসে হেসে বলতো, 'ঠাকুর তো দেখেছিস? নমস্কার করেছিস?'

'আহা রে, নমস্কার করব না? আমি যেন পাগল!'

মা ওর কপালের চুলগুলো গুছিয়ে দিতে দিতে বলতো, 'করেছিস তাহলে? নমস্কার করে কি বর চাইলি?'

'বর? এই যাঃ, কিছু চাই নি তো?'

মা হেসে ফেলতো।

'চাস নি? তা ভালই করেছিস!'

মা চাওয়াই ভালো। তবে এইটুকু চাইতে হয়, 'মা, আমার যেন বিদ্যে হয়!'

বিদ্যে!

বিদ্যে!

উঠতে বসতে ওই কথাই বলতো মা।

'বিদ্যেই হচ্ছে আসল বুঝলি? মেয়েমানুষের বিদ্যে সাধ্যি নেই বলেই তাদের এত দুর্দশা।...তাই তাদের সবাই হেনস্থা করে!' আর যে-সব মেয়েমানুষরা বিদ্যে করেছে, করতে পেরেছে, বিদুষী হয়েছে? ...কত গৌরব তাদের, কত মান্য! সেই মান্য, সেই গৌরব তোরও হবে!'

সুবর্ণলতার সর্বশরীরে প্রবল একটা আলোড়ন ওঠে।

সুবর্ণলতা ছাদে ধুলোর ওপর শুয়ে পড়ে মুখটা ঘষটে বলে, 'শেষরক্ষা করতে পার নি মা! শুধু তোমার দেওয়া সেই মন্ত্রের দাহে সারাজীবন জর্জরিত হয়েছে তোমার সুবর্ণ!'

অনেক চোখের জল ফেলে ফেলে দুঃসহ যন্ত্রণাটা স্তিমিত হয়ে আসে। সুবর্ণলতা এখন তাই দেখতে পায়। শব্দের তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে দৃশ্যের ঘাটে এসে ঠেক খায়।

তাই সুবর্ণলতা দেখতে পায়, সুবর্ণলতার মা রান্নাঘরে বসে রাঁধছে, মা ছাদে উঠে কাপড় শুকোতে দিচ্ছে। মা ঝেড়ে ঝেড়ে বিছানা পাতছে।...মা মাটিতে আরসি রেখে চুল বাঁধছে।

ধবধবে মুখখানি ঘিরে একরাশ কালো পশমের মত চুলের রাশি! কপালে ঘষে-যাওয়া সিঁদুর-টিপের আভাস!

প্রাণভরা, বুকভরা, চোখভরা!

আশ্চর্য!

এতখানি মা ছিল সুবর্ণর, আর সুবর্ণ কিনা তুচ্ছ একটু অভিমান নিয়ে নিজেকে ঘিরে প্রাচীর তুলে রেখে বসেছিল!

ঠিক হয়েছে সুবর্ণ, তোর উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছে! মা একটা চিঠি লিখে রেখে গেছে সুবর্ণকে; তাও আদেশ দিয়ে গেছে, 'আমি মরে গেলে তবে দিও।'

এ ছাড়া আর কি-হবে তোর?

অভিমান আর আত্মধিক্কার এরা দুজন যেন ঠেলাঠেলি করে নিজের নিজের শিকড় পুঁততে চায়।

আর শেষ পর্যন্ত আত্মধিক্কারই বুঝি জয়ী হয়।

মা, মাগো, ওই নির্মায়িক লোকটার পায়ে ধরেও কেন একবার দেখতে গেলাম না তোমায়? এখন যে আমার জীবনের সব গান থেমে গেল; সব আলো মুছে গেল।

টের পাই নি আমার জীবনের অন্তরালে তুমি ছিলে আলো হয়ে, গান হয়ে। যেন আমার একটা বিরাট ঐশ্বর্য নিজের লোহার সিন্দুকে ভরা ছিল। মনে হতো, ইচ্ছেমত ওটাকে খুলবো আমি। খুললেই দেখতে পাবো!

বুঝতে পারি নি হঠাৎ একদিন দেখবো শূন্য হয়ে গেছে সে সিন্দুক!... কেবল অন্যের দোষই দেখেছি আমি, আর অভিমানে পাথর হয়েছি। নিজের দোষ দেখি নি। মা না হয় দূরে ছিল আমার; কিন্তু বাবা?

বাবাকে অপরাধী করে রেখে ত্যাগ করেছিলাম আমি। আজও ত্যাগ করে এলাম। জীবন্ত মানুষটার মুখের উপর বলে এলাম, 'মনে জানবো আমি মা-বাপ দুই-ই হারিয়েছি।'

আমি কি!

আমি কি গো!

শুধু কঠোর, কঠিন!

সারাটা জীবন শুধু সেই কাঠিন্যের তপস্যা করলাম! আমার ছেলেমেয়েরা কি অনেকদিন পরে ভাবতে বসবে মায়ের কাছে এলেই কিসের সেই সৌরভ পেতাম? চুলের? শাড়ির? না শুধু মাতৃ-হৃদয়ের?

কিন্তু সুবর্ণলতা কবে কখন সময় পেয়েছে সেই স্নেহ-সৌরভে কোমল হতে? সুবর্ণলতাকে যে অবিরাম যুদ্ধ করে আসতে হচ্ছে। সুবর্ণলতা যদি কোমল হতো, মুক্তকেশীর সংসার থেকে মুক্তি পেত কোনোদিন? পেত না। মুক্তকেশীর ছেলে গ্রাস করে রেখে দিত তাকে! তার ইচ্ছায় উঠতে বসতে হতো, তার চোখ রাঙানিতে জড়সড় হয়ে যেতে হতো, আর তার লুব্ধ ইচ্ছার দাসীত্ব করতে করতে আত্মাকে বিকিয়ে দিতে হতো।

কিন্তু আজো কি আছে সেই আত্মা?

'বিকিয়ে যেতে দেব না' পণ করে যুদ্ধ করতে করতে ধ্বংস হয়ে যায় নি?

সেই ধ্বংস হয়ে-যাওয়া আত্মাকে কি আবার গড়ে তুলতে পারা যায়? চেষ্টায় যত্নে সাধনায়?

হয় না।

হতে পারে না!

সুবর্ণ বলে ওঠে অসুরের সঙ্গে লড়াইয়ে নামতে হলে দেবীকেও চামুণ্ডা হতে হয়। বীণাবাদিনী সরস্বতীর কড়ির ঝাঁপি হাতে লক্ষ্মীর সাধ্য নেই সে ভূমিকা পালনের।

সুবর্ণলতা কি তবে লড়াই থেকে অব্যাহতি নেবে এবার? তার সংসারকে নিজের ইচ্ছেয় চলতে দেবে?

নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে একান্তে বসে সেই ধ্বংস-আত্মার ইতিহাস লিখবে বসে বসে? লিখে রাখবে।

লিখে রাখবে—শুধু একজন সুবর্ণলতাই নয়, এমন হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ সুবর্ণলতা এমনি করে দিনে দিনে তিলে তিলে ধ্বংস হচ্ছে। কেউ লড়াই করে চূর্ণ-বিচূর্ণ হচ্ছে; কেউ ভীরুতায় অথবা সংসারের শান্তির আশায় আপন সত্তাকে বিকিয়ে দিয়ে পুরুষসমাজের 'ইচ্ছের পুতুল' হয়ে বসে আছে।

'আগে আমি ওদের অবজ্ঞা করতাম—' সুবর্ণলতা ভাবে যারা লড়াইয়ের পথ ধরে

নি নির্বিচারে বশ্যতা স্বীকার করে বসে আছে। এখন আর অবজ্ঞা করি না তাদের। বুঝতে পারি, এদের লড়াইয়ের শক্তি নেই, তাই নিরুপায় হয়ে ঐ দ্বিতীয় পথটা বেছে নিয়েছে। ওদের অনুভূতি নেই, ওরা ওতেই খুশি, একথা ভাবা আমার ভুল হয়েছে।

সত্তার বদলে শান্তি কিনেছে ওরা, আত্মার বদলে আশ্রয়। কারণ, এ ছাড়া আর উপায় নেই ওদের!

সমাজ ওদের সহায় নয়, অভিভাবকরা ওদের অনুকূল নয়, প্রকৃতি পর্যন্ত ওদের প্রতিপক্ষ! ওরা অন্ধকারের জীব।

খামে বন্ধ চিঠিটা হাতে দিয়ে অনুভব করলো সুবর্ণলতা! এই নিঃসীম অন্ধকারে বসে যদি পড়া যেত!

হয়তো দিনের আলোয় কি দীপের আলোয় এমন একটু নিঃসীম নির্জনতাও পেত সুবর্ণ, খুলে ফেলতো রুদ্ধ কপাট। বিহ্বল দৃষ্টি মেলে দেখতো কোন কথা দিয়ে গেছে তাকে তার মা!

কিন্তু কোথায় সেই নির্জনতা?

চারিদিকে চোখ।

বিদ্রূপে অথবা কৌতুকে, কৌতূহলে অথবা অনুসন্ধিৎসায় যে চোখেরা সর্বদা প্রখর হয়ে আছে। কত বেশি চোখ পৃথিবীতে। সুবর্ণলতার এই নিজের গোলাপী-রঙা দোতলাটাতেও এত বেশি লোক জমে উঠেছে? এত বেশি চোখ। অথচ এদের জন্যে অসহিষ্ণু হওয়া চলে না, এরা সুবর্ণলতার। এদের সমস্ত দায়-দায়িত্ব বহন করে করেই চলতে হবে সুবর্ণলতাকে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত। এদের বিয়ে দিতে হবে, সংসারী করে দিতে হবে, অসুখ করলে দেখতে হবে, আঁতুড়ে ঢুকলে আঁতুড় তুলতে হবে, আর এদের মন-মেজাজ বুঝে বুঝে কথা বলতে হবে। এদের অবহেলা করা যাবে না, এড়ানো যাবে না, তুচ্ছ করা যাবে না। তা' করতে গেলে এরা তৎক্ষণাৎ ফোঁস করে উঠে তার শোধ নেবে! কারণ সুবর্ণলতাই এদের শিখিয়েছে 'সব মানুষই সমান।' শিখিয়েছে—মানুষ মাত্রেরই স্বাধীনতার অধিকার আছে।

ওরা যদি সে শিক্ষার আলাদা একটা অর্থ বোঝে, নিশ্চয় ওদের দোষ নয়, দোষ সুবর্ণলতার শেখানোর।

নিজের হাতের তৈরি ড্রাগনের হাঁ থেকে পালাবে কি করে সুবর্ণ?

সুবর্ণ উপায় খোঁজে।

পালাবার, অর্থাৎ পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবার চিরাচরিত পদ্ধতিগুলোয় আর রুচি নেই সুবর্ণর। অনেকবার চেষ্টা করেছে, যম তাকে ফেরত দিয়ে গেছে। একবার নয়, বার বার।

আহা, যদি অকারণ শুধু শুয়ে পড়ে থাকা যেত। কোনো দিকে তাকাতে হত না। শুধু দিনে-রাতে আকাশের দিকে তাকিয়ে পড়ে থাকা!

মৃত্যুর পরে যেমন করে সংসারের দিকে মুখ ফিরোয় মানুষ, তেমনি।

আজ এই ভয়ঙ্কর একটা শূন্যতার মুহূর্তে সংসারটা যেন তার সমগ্র মূল্য হারিয়ে একটা মৃৎপিণ্ডের মত পড়ে থাকে। সুবর্ণলতা সেই মৃৎপিণ্ডটাকে ত্যাগ করবার উপায় খোঁজে। সুবর্ণলতা বুঝি ঐ মাটির বোঝার ভার আর বইতে পারবে না।

'শুনেছ 'মা, তোমার ভাগ্নের বাড়ির খবর?'

জগু বাজার থেকে ফেরে একজোড়া ডাব হাতে ঝুলিয়ে, পিছন পিছন নিতাই কাঁধে ধামা নিয়ে।

ভারি জিনিস-টিনিসগুলো নিজেই বয়ে আনে জগু, হাল্কাগুলো নিতাইয়ের ধামায় দেয়। দেয় নেহাৎই মাতৃভয়ে। ফুলকোঁচা দিয়ে ধুতি পরতে শিখেছে নিতাই, গায়ে টুইল সার্ট। খাওয়া-দাওয়ায় বাবুয়ানার শেষ নেই। এর ওপর যদি দেখা যায়, খালি হাত নাড়া দিয়ে বাজার থেকে ফিরছে নিতাই, আর জগু আসছে মোট বয়ে, রক্ষে রাখবে না মা।

অবশ্য মা'র চোখে পড়বার সুযোগ বড় একটা হয় না, কারণ বাজার থেকে যখনই বাড়ি ঢোকে জগু চেঁচাতে চেঁচাতে আসে, 'বাজার-টাজার করা আর চলবে না, গলায় ছুরি-মারা দর হাঁকছে! ডবল পয়সা ভিন্ন একটা নারকোল দিতে চায় না, ডাবের জোড়া ছ' পয়সা! আর মেছুনী মাগী-

বেঙ্গল কেমিক্যালের
পারফেক্টেড্
কোল্ড ক্রীম অব রোজেস
ল্যানোলিন সংযুক্ত
সকল ঋতুতে ত্বক অম্লান ও নিরাপদ রাখে
টিউবে এবং
সুদৃশ্য আধারে পাওয়া যায়

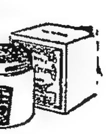
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর • দিল্লী
Progressive/BC

গুলোর চ্যাটাং চ্যাটাং বুলি শুনলে তো ইচ্ছে করে, ওরই ওই আঁশবটিটা তুলে দিই নাকটা উড়িয়ে।......ভাবলাম, নিতাই ছোঁড়াটা সুদ্ধু আমাদের সঙ্গে জুটে নিরিমিষ্যি গিলে গিলে মরে, নিয়ে যাই পোয়াটাক কাটা পোনা, তা' বলে কিনা চার আনা সের।...গলায় ছুরি দেওয়া আর কাকে বলে! একটা আধলা ছাড়ল না, পুরো আনিটা নিল। গলায় ছুরি আর কাকে বলে?

এমনি বহুবিধ ধুয়ো।

সেই ধুয়োর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যান শ্যামাসুন্দরী। ইত্যবসরে জগু হাতের মালপত্র নামিয়ে ফেলে।

তারপর নিতাইকে নিয়ে হাঁক-ডাক শুরু করে দেয়। ছেলেটা যে শ্যামাসুন্দরীর হৃদয়মধ্যস্থিত বাৎসল্য রস আদায় করে ফেলেছে, এটা টের পেয়ে গেছে জগু, যতই কেন না সেটা চাপতে চেষ্টা করুন শ্যামাসুন্দরী। তাই জগু এখন নিশ্চিন্ত এবং সেই নিশ্চিন্ততার বশেই ছেলেটাকে শাসন করার ভান করে।

'হাত-পা গুটিয়ে বসে রইলি যে? সংসারে একটা কাজে লাগতে পার না? কী একেবারে কুইন ভিক্টোরিয়ার দৌত্তুর এসেছো তুমি? একেই বলে কাজে কুঁড়ে, আর ভোজনে দেড়ে!'

শ্যামাসুন্দরী এক এক সময় বলে ওঠেন, 'থাম জগা, আর ফাঁকা বন্দুকের আওয়াজ করিস না। ওর উপগারের বদলে মাথাটাই খেলি ওর। গরীবের ছেলেকে লাটসাহেব করে তুললি—'

জগু আবার তখন অন্য মূর্তি ধরে। বলে, 'লাটসাহেব হয়ে কেউ জন্মায় না। আর গরীবের ছেলে বলেই চোর দায়ে ধরা পড়ে না। লাটসাহেবী, লাটসাহেবীর কি দেখলে? একটা ফরসা জামাকাপড় পরে তাই? বলি ভগবানের জীব নয় ছোঁড়া?'

প্রত্যহ প্রায় একই ধরণের কথাবার্তা শুধু আজকেই ব্যতিক্রম ঘটলো। আজ জগু তার মা'র কাছে অন্য কথা পাড়ে।

বলে, 'শুনেছ তোমার ভাগ্নের বাড়ির কান্ড!'

ছেলের কথায় কান দেওয়া শ্যামাসুন্দরীর স্বভাব নয়, দেনও না, আপন মনে হাতের কাজ করতে থাকেন। জগু ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'বড়লোকের মেয়ের যে দেখছি গরীবের ছেলের কথাটা কানেই গেল না! বেচারা বৌটা একসঙ্গে মা-বাপ হারালো, সেটা এমন তুচ্ছ কথা হলো?'

একসঙ্গে মা-বাপ হারানো!

বেচারা বৌটা!

এ আবার কোন্ ধরণের খবর?

কাদের বৌ!

এবার আর ঔদাসীন্য দেখানো যায় না। মান খুইয়ে বলতেই হয় শ্যামাসুন্দরীকে, 'হলোটা কি?'

'হল নাটা কি, তাই বল? মা গেল খবরটাও দিল না কেউ, তারপর পিঠ পিঠ ক'দিন পরেই বাপ গেল, তখন খবর। নে এখন জোড়া চতুর্থী করে মর!'

শ্যামাসুন্দরীও এবার ক্রুদ্ধ হন।

বলেন, 'কার বৌ, কি বৃত্তান্ত বলবি তো সে কথা?'

'কার বৌ আবার? প্রবোধবাবুর বৌয়ের কথাই হচ্ছে। বেচারা মেজবৌমার কথা। বাপ বুঝি মরণকালে একবার দেখতে চেয়েছিল, তাই গিয়েছিলেন মেজবৌমা। তখন বলেছে, 'মা তোর মরেছে, তবে অশৌচ নেওয়া নিষেধ।' দু'দিন বাদে নিজেও পটল তুললো।'

শ্যামাসুন্দরী যদিও বুড়ো হয়েছেন, কিন্তু কথায় সতেজ আছেন। তাই সতেজেই বলেন, 'তোর মতন মুখ্যুর সঙ্গে কথা কওয়াও আহাম্মুকি। বলি, খবরটা তুই পেলি কোথায়?'

'আরে বাবা, স্বয়ং তোমার ভাগ্নের কাছেই। আসছিল এখানেই, বাজারে দেখা। আসবে, এক্ষুণি আসবে। দুদুটো চতুর্থী, ব্যাপার তো সোজা নয়, ঘটা-পটা হবে। তাই আমার কাছে আসবে পরামর্শ করতে। এই জগা শর্মা না হলে যজ্ঞি সুশৃঙ্খলে উঠুক দেখি। হুঁঃ বাবা!'

শ্যামাসুন্দরী কিন্তু এ উৎসাহে যোগ দেন না। বলীরেখাঙ্কিত কপালে আরো রেখা পড়িয়ে বলেন, 'ঘটাপটাটা করছে কে?'

'কে আবার! তোমার ভাগ্নেই করছে। বললো, 'তোমার মেজবৌমার বড় ইচ্ছে—'

শ্যামাসুন্দরী অবাক গলায় বলেন, 'মেজবৌমার ইচ্ছে? মা-বাপের সঙ্গে তো কখনো—'

'ওই তো—এখন অনুতাপটি ধরেছে —সেই যে কথায় আছে না, 'থাকতে দিলে না ভাত-কাপড়, মরলে করছে দানসাগর' তাই আর কি!'

শ্যামাসুন্দরী দৃঢ়গলায় বলেন, 'মেজবৌমা সে ধরণের মেয়ে নয়।'

জগু অবাক গলায় বলে, 'তাই নাকি! তবে যে পেবো বললো—'

কথা শেষ হয় না, স্বয়ং পেবোই ঢোকে দরজাটা ঠেলে।

বলে, 'এই যে মামী তুমি রয়েছ। পরামর্শ করতে এলাম। মায়ের তো শরীর খারাপ, এখন তুমিই ভরসা। দায়টা উদ্ধার করো তোমরা মায়ে-ছেলেয়। সোজা দায় তো নয়, শ্বশুরদায় শাশুড়ীদায়। মাতৃদায় পিতৃদায়ের অধিক।'

জগু আপন রসিকতাশক্তির পুলকে ঢেলে টেনে হাসতে থাকে প্রবোধ হ্যা হ্যা করে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরামচরিত-মানস

ভক্তকবি তুলসীদাস

অধ্যাপক শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গানুবাদ

শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা-গানে ভারতবর্ষের বহু গুণী ও জ্ঞানীজন লেখনী ধারণ করিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। সেই সকল অমর লেখনীর প্রতিভা-নির্ঝরে ভারতবর্ষের মহাকাব্য পৃথিবীর সাহিত্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ভক্তকবি গোস্বামী তুলসীদাস তন্মধ্যে অন্যতম—যিনি সহজ সরল ভাষায় পতিতপাবন সীতা-রামের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন সুমধুর সংগীতের মাধ্যমে। তুলসীদাসের জীবনসর্বস্ব মহামানব শ্রীরামচন্দ্রের সেই বন্দনা-গানের সুললিত বাংলা অনুবাদ এই প্রথম—বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের অপূর্ব কীর্তির নূতন এক পরিচয় এই শ্রীরামচরিত-মানস। বহু রঙীন চিত্রে সুশোভিত।

মূল্য—১ম খণ্ড দুই টাকা, ২য় খণ্ড দুই টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

গ্রামবাংলার কথা

পাণ্ডুয়া

পারুল ভট্টাচার্য

গৌতম-জনক শুদ্ধোদন ভ্রাতা অমৃত দ্রোণ।—তাঁরই এক পুত্র পাণ্ডু শাক্য। তিনিই এই পাণ্ডু রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই বংশেরই এক উত্তর-পুরুষ রাজা পাণ্ডুদাস হুগলী জেলার পেঁড়ো বসন্তপুরে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। এবং নিজ নামানুসারে স্থানটির নতুন নামকরণ করেন 'পাণ্ডুয়া'।

কিংবদন্তী এই। কিন্তু অবিশ্বাসী তর্ক তুলতে পারেন অনায়াসে। অমৃত দ্রোণ শাক্য বংশসূত। তাঁর পুত্রও তাই। হিমাচল পাদভূমি কপিলাবাস্তু তাঁদের জন্ম এবং কর্মস্থান। তাঁদেরই কেউ অকস্মাৎ এতদূর অতিক্রম করে রাঢ়বঙ্গের এই নাবাল ভূমিতে রাজ্য স্থাপনা করতে চাইবেন—একথা ভাবতে যেন কেমন কেমন লাগে। বিশেষত গৌতম বুদ্ধের জন্ম এবং ধর্ম প্রচারের পর হতেই ধর্মমতে প্রায় সমস্ত শাক্য বংশই বুদ্ধ অনুগামী হয়েছিলেন। শাক্য বংশধর কোন রাজার রাজধানী হিসেবে পাণ্ডুয়াতে কিছু বুদ্ধমূর্তি, বৌদ্ধস্তূপ, এক কথায় বৌদ্ধ ধর্মের কিছু নিদর্শন পাওয়া উচিত ছিল কিন্তু পাওয়া যায় নি। মুসলমান পূর্ববর্তীকালের অল্পবিস্তর নিদর্শন যা পাওয়া গেছে, সবই নির্ভেজাল হিন্দু ধর্মাবলম্বী রাজগীর নিদর্শন। একমাত্র এই কারণেই পাণ্ডুয়াতে শাক্য রাজবংশের অবস্থিতির সম্ভাবনাকে বাতিল করে দেওয়া চলে।

তথাপি এর স্বপক্ষে যুক্তিও যে একেবারে কিছু নেই এমনও নয়। রাজকন্যা ছলনায় দাসীকন্যার বিবাহ দিয়ে শাক্য বংশে যে রক্তাক্ত বিপর্যয় নেমে এসেছিল, তার ফলে শাক্য বংশোদ্ভূত অনেক কুমারই দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন শুধুমাত্র প্রাণরক্ষার তাড়নায়। সেই ডামাডোলের গণ্ডগোলে কোন এক পাণ্ডুদাসের পক্ষে ছিটকে পালিয়ে এসে এই সুদূর রাঢ়বঙ্গের নিভৃতাঞ্চলে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করায় খুব বেশি আশ্চর্য কিছু নেই। বিশেষত সেই যুগে এইসব এলাকা ছিল দূর-দুর্গম, নদী এবং অরণ্যানী বেষ্টিত—এক কথায় প্রকৃতি কর্তৃক সুরক্ষিত। ক্রুদ্ধ, রক্তপিপাসু এবং অধিকতর বলশালী শত্রুর চক্ষু ও ক্ষমতার পরিধি এড়িয়ে শান্তিতে বাস করবার আদর্শ স্থান। কাজেই 'পাণ্ডুয়ায় শাক্য রাজবংশ' এই তথ্যটি হতে পারে, নাও হতে পারে এই সন্দেহ-সংশয়ের দোলায় দুলছে, প্রমাণিত কিছু হয় নি এখনও।

হিন্দু অধিকারের এবং মুসলমান শাসনের সূত্রপাত সম্বন্ধেও একটি প্রাচীন কথা-কল্প কাহিনী প্রচলিত আছে পাণ্ডুয়ায়। পুত্রসন্তান লাভে প্রসন্ন পাণ্ডুয়া অধিপতি রাজ্য জুড়ে এক বিরাট উৎসব ও ভোগের আয়োজন করেছিলেন। কয়েকজন মুসলমান প্রজা এই উপলক্ষে একটি গাভী হত্যা করে। যদিও কুকর্ম খুব গোপনেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু তথাপি শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে যায়। এবং গো-হত্যায় ক্ষুব্ধ হিন্দু প্রজাকুল রাজ্য জুড়ে এক বিরাট তান্ডব বাধিয়ে তোলে। প্রকৃত অপরাধীরা পালিয়ে গিয়েছিল পাণ্ডুয়া ছেড়ে। তাদের আয়ত্তের মধ্যে না পেয়ে উত্তেজিত প্রতিবিধিৎসু দল রাজবাড়ি আক্রমণ করে এবং যে রাজপুত্রের জন্ম উপলক্ষে এই অঘটন সেই রাজপুত্রকে হত্যা করে। ক্রুদ্ধ এবং পুত্র শোকাতুর রাজা মুসলমান প্রজাকুলের কাছে গো-হত্যার কৈফিয়ৎ তলব করে পাঠান। দাঙ্গা-হাঙ্গামার সূত্রপাত দেখেই বেশির ভাগ মুসলমানই পাণ্ডুয়া ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। এখন রাজরোষের আভাস পেয়ে বাদবাকি যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও ছড়িয়ে পড়লেন এদিকে-ওদিকে। পাণ্ডুয়া প্রায় মুসলমান শূন্যই হয়ে পড়লো কিছুদিনের জন্য।

এই পলাতক দলেই ছিলেন শাহসুফী। দিল্লীর পাঠান সম্রাট দ্বিতীয় ফিরোজ শাহের ভাগিনেয় সপ্তগ্রাম-বিজেতা জাফর খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। স্বয়ং ধর্মাচরণেই কাটিয়েছেন জীবনের এতাবৎকাল। তথাপি প্রয়োজনে কোরাণ ফেলে কৃপাণ ধরতে দ্বিধা দেখা গেল না তাঁর। দিল্লী সম্রাটের সাহায্য এবং জাফর খাঁ গাজীর পৃষ্ঠবল নিয়ে সসৈন্যে পুনরায় তিনি ফিরে এলেন পাণ্ডুয়ায়। কয়েকদিনের কঠিন যুদ্ধ শেষে পাণ্ডুয়ায় হিন্দু

কুঠারক্ষত প্রস্তরশ্রেণী। খণ্ডিত দেবীমূর্তির অস্পষ্ট আভাস

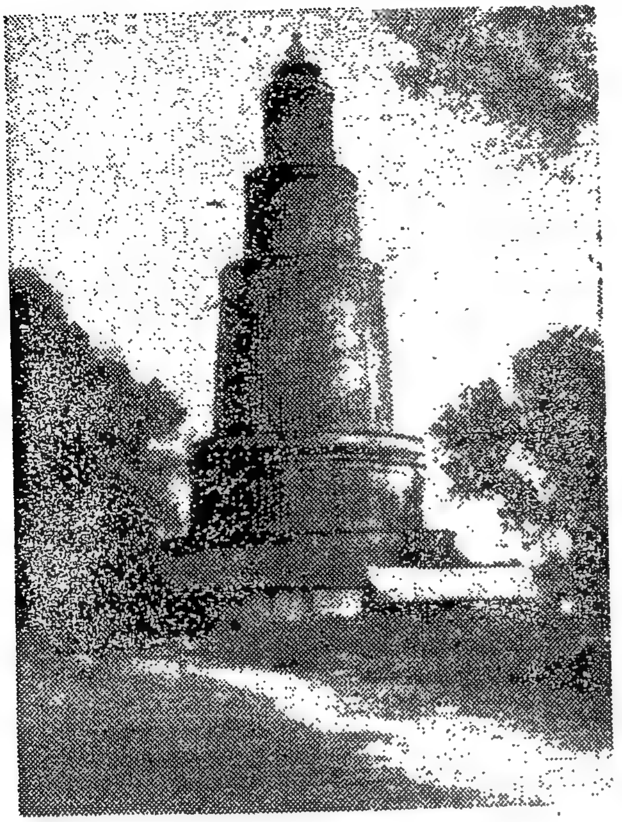

পাণ্ডুয়ার মিনার। কেউ কেউ একে হিন্দু রাজগণের সূর্যদর্শন স্তম্ভ বলে অনুমান করেন

অধিকারের পতন ঘটলো। প্রকাণ্ড রাজ-প্রাসাদ ভেঙেচুরে করা হলো শ্রীহীন। কুঠারক্ষত দেবমূর্তিগুলিকে নিক্ষেপ করা হলো ইতস্তত এদিকে-ওদিকে।

গল্পটির প্রথমার্ধ ভাগ নিয়ে সন্দেহ করার কিছু অবকাশ আছে। প্রকৃতই এমন একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পাণ্ডুয়ায় ঘটেছিল কি না, তা নিয়ে মতবিরোধ আজও অক্ষুন্ন। বিশেষত রাজপুত্রের জন্ম উপলক্ষে উৎসব কারণে অজানিতভাবে গো-হত্যা ঘটেছে বলে স্বয়ং সেই রাজ-পুত্রকেই হত্যা করে ফেলবে এমন ক্ষিপ্তোন্মাদ প্রজা ভারতীয় রাজতন্ত্রে বিরল। সম্ভবত এটি পরবর্তীকালে মুসলমান শাসককুলের রচনা অথবা রটনা করার কাহিনী হবে।

কিন্তু গল্পের দ্বিতীয়ার্ধ সম্বন্ধে সন্দেহ বা সংশয়ের অবকাশ নেই। শাহসুফী সত্যই পাণ্ডুয়ায় মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। দিল্লী সম্রাট এবং জাফর খাঁর সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তাসূত্রও বিদিত। শাহসুফী জননী পাণ্ডুয়াতেই বসবাস করতেন। ১২৯৬ খৃস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। এবং আন্দাজ ১৩৪০ খৃস্টাব্দ নাগাদ শাহসুফী পাণ্ডুয়া অধিকার করেন। বিগত পাণ্ডুয়া-রাজের প্রাসাদটি কতক পরিমাণে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে বাদবাকি ব্যবহার্য অংশ বাইশ দরওয়াজা নামে ব্যবহার করা হতো। তার কিছু ভগ্নাবশেষ এখনও অবশিষ্ট আছে। কিছু খণ্ডিত দেবমূর্তি যার মধ্যে পিছন দিকে আরবী লিপি সম্বলিত দ্বিখণ্ডিত সূর্যমূর্তিটি উল্লেখযোগ্য। আজও দেখতে পাওয়া যায়। মসজিদগুলি সম্ভবত পৃথকভাবেই নির্মিত হয়ে থাকবে। বাইশ দরওয়াজার মধ্যে কাল পাথরের একটি সুন্দর সিংহাসন আজও আছে। সম্ভবত এটা রাজকুলের কুলবিগ্রহের সিংহাসন ছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পাণ্ডুয়ার মিনার। মিনারটি হিন্দু রাজত্বকাল থেকেই আছে অথবা পাণ্ডুয়া বিজয়ের স্মারক স্বরূপ শাহসুফী এটিকে নির্মাণ করিয়েছিলেন তা আজ সঠিক করে বলা শক্ত। কিন্ত সে যাই হোক. মিনারটি যে বাংলার প্রাচীনতম স্থাপত্য-কীর্তির নিদর্শন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এবং কোন কোন ইতিহাসকার যে এটিকে মুসলমান পূর্ববর্তী হিন্দু রাজবংশের সূর্য প্রণাম স্তম্ভ বলে উল্লেখ করেছেন তা নিয়েও খুব বেশি সংশয় প্রকাশ না করাই সমীচীন হবে। পাণ্ডুয়া, সপ্তগ্রাম, ত্রিবেণী, ব্যাণ্ডেল প্রভৃতি আশপাশের এলাকায় জল, জলা এবং জঙ্গলের আড়াল-আবডাল থেকে নিক্ষিপ্ত কুঠারক্ষত ভগ্ন অর্ধভগ্ন বহু সূর্যমূর্তি আবিষ্কার এবং উদ্ধার হয়েছে। এইসব দেবতা কোনকালে কোন মন্দিরেরই দেবতা ছিলেন। দেবমূর্তি-গুলিকে নষ্ট করে পরিশেষে মন্দিরও ধ্বংস করা হয়েছিল। সূর্য পূজা এবং সূর্য আরাধনার একটি ব্যাপক চল তখন দেশে ছিল। (পাণ্ডুয়া থেকে আবিষ্কৃত আরবী লিপি সমন্বত দ্বিখণ্ডিত সূর্য-মূর্তির কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সূর্য পূজা এবং অগ্নি আরাধনার একটি চল তখন দেশে ছিল। প্রথামত পাণ্ডুয়াতেও একটি সূর্য মন্দির ছিল নিঃসন্দেহে এবং প্রভাতে উঠে সদ্য উদিত সূর্য দর্শন আকাঙ্ক্ষায় এই স্তম্ভটি নির্মিত হয়েছিল একথা বিশ্বাস করার মধ্যে অসম্ভাব্যতা কিছু নেই। পাণ্ডুয়ায় মুসলমান অধিকার শাহসুফীর যৎসামান্য পরিচয় এবং পাণ্ডুয়া মিনার সম্বন্ধে List of Ancient Monument of Bengal গ্রন্থে দীর্ঘ উল্লেখ আছে।

At the close of the 13th century, Shah Sufi, whose mother was sister to the Emperor Firoz Shah II, who died in 1296 A. D. lived at Pandua. At that time, the Hindu Pandua Raja ruled over the district and lived at Mahanad not far off. Being oppressed by the Raja, Shah Sufi fled to his uncle at Delhi, obtained assistance and with a large army and two men of renowned Zafarkhan Ghazi and Bahram Sakka, overthrew the Raja. The old temple of Pandua was then destroyed and the present mosque built with its remains. The large tower was used as a Minarch or a Minarct (Call for Prayer). Every Hindu was driven out of the town. The vault of Pandua in which Sufi was buried still exists. This story does not give the date of erection of the tower but of its use as a Mazinah, Mr, Blockmann of the East Asiatic Society was of opinion that the tower resembles in structure well-known Kutabminar, near Delhi.

The town of Pandua consists of a very curious old town about 125ft. in height, a large long Masjid and also a square Masjid near the famous tomb of Shah Safi-ud-din.

It is not improbable that the Masjid and Minar might have been built by the nephew of the Firoz as the style of the long Masjid is very like that of the other mosques built during his reign. The great tower is the Mazina or Muazzin's Minar; its entrance is on the west towards the Masjid.

The Minar at Pandua is a very curious structure, quite different from all others that are generally to be found.

মিনারের উচ্চতা আগে ছিল প্রায় ১৪০ ফুট। ১৮৮৫ খৃস্টাব্দের ভূমিকম্পে উপরের কিছু অংশ ভেঙেচুরে ১২৫ ফুটে দাঁড়িয়েছে। পাঁচতলার প্রথম তলায় ৬০ ফুট ব্যাসযুক্ত হাতীর শুঁড়ের মত আকার বিশিষ্ট মিনারটি উপরের দিকে ক্রমশ কিঞ্চিৎ সরু। প্রত্যেক তলায় একটি করে চক্রাকার বারান্দা এবং উপরে উঠবার আগাগোড়া ঘোরানো সিঁড়ি। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দুখানি ধাপ বাদ দিলে মোট ১৫৯টি সিঁড়ি আছে মিনারের। মিনারের চূড়ায় একটি ছড়ি দেখা যায়। লোকে বলে ছড়িটি নাকি সুলতান শাহসুফীর। কিন্তু দেখে মনে হয় খিলান কিংবা গাঁথনীর ভিতরের কোন লোহার টুকরো হবে এটি। উপরের অংশ ভেঙে পড়ার পর যা আত্মপ্রকাশ করেছে। এবং ত্রিবেণীর গাজীর দরগার গাজীর কুড়ুলের মত একটি জনশ্রুতিও লাভ করেছে।

মিনারের মাথায় চড়লে সমস্ত পাণ্ডুয়া এবং আশপাশের এলাকার কিছু অংশ দেখতে পাওয়া যায়। যদিও অত্যন্ত বেশি রকমের খাড়া এবং ক্রমাগত ঘোরানো সিঁড়ি চড়তে চড়তে মাথা ঘোরে, বুকে প্রায় হাঁপ ধরবার উপক্রম।

মিনারের অবস্থা তত সুবিধের নয়। পুরানো খিলানগুলি জীর্ণ, জোরে লাথি মারলে সিঁড়িগুলি কাঁপতে থাকে বলে মনে হয়। মিনার এবং পার্শ্ববর্তী বাইশ দরওয়াজা সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সংরক্ষণে আছে। কিছু মেরামতী কাজ করতে তাঁদের অনুরোধ জানাই। দ্বিতীয়ত মেরামত যতদিন না হয়, অন্তত ততদিন পর্যন্ত দল বেঁধে ভ্রমণকারীদের উপরে চড়া নিষিদ্ধ হওয়া দরকার। দুর্ঘটনা যে কোন সময়ে হতে পারে। এবং দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর সতর্ক হওয়ার চেয়ে অগ্রিম সতর্কতাই বেশি বাঞ্ছনীয়।

বহু প্রাচীন একটি মেলা আজও চালু আছে পাণ্ডুয়ায়। কত প্রাচীন তা সঠিক করে বলা সম্ভব নয়। তবে সুপ্রাচীন। পয়লা মাঘে এর আরম্ভ। সম্ভবত সূর্যের উত্তরায়ণ গমন উপলক্ষে। এবং এক মাসেরও কিছু অধিককাল পর্যন্ত স্থিতি। এই মেলাটিও নিঃসন্দেহে পাণ্ডুয়ায় মুসলিম অধিকারের আগে থেকেই চলে আসছে। মুসলমান শাসনকালের মধ্যে আর যাই হোক উত্তরায়ণের মেলা চালু হতে নিশ্চয়ই পারে নি। পাণ্ডুয়ার সূর্যভক্ত রাজকুলের সাহায্যে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় নিশ্চয়ই একদা আরম্ভ হয়েছিল মেলাটি এবং আজও তা চলে আসছে অব্যাহত গতিতে। মিনারের প্রায় মুখোমুখি জি টি রোডের ধারে শাহসুফীর দরগা এবং একটি মসজিদ আছে। ফটকে কোন শিলালিপি বা সাধারণভাবে কোন স্মারকলিপিও দেখা গেল না, মসজিদটি চমৎকার। নির্জন, ঠাণ্ডা, ছায়া-নিবিড়। আরবী লিপি-খোদিত দ্বিখণ্ডিত সূর্যমূর্তিটি এইখানেই শাহসুফীর সমাধির মধ্যেই রাখা ছিল এককালে। পূর্বে দেখেছিলাম। এখনও আছে কি না বোঝা গেল না। কারণ মসজিদ এবং সমাধি মন্দির উভয়েই চাবি বন্ধ। খোঁজা-খুঁজি করেও কোন লোকজনের সাক্ষাৎ পেলাম না। জানি না ইত্যবসরে মূর্তিটি অপসারিত হয়েছে কি না।

শাহসুফীর দরগার ঠিক গায়েই আর একটি দরগা আছে। মিঞা মকদুলের দরগা। মিঞা মকদুল কে জানা গেল না। তবে পাশাপাশি এত কাছাকাছি সমাধি যখন, অনুমান করি শাহসুফীর কোন বিশ্বস্ত ভৃত্য অনুচর অথবা সুফী বংশেরই কেউ হবেন।

সুফীর দরগা সংলগ্ন মসজিদ, বাজারের বড় মসজিদ এবং বিখ্যাত ও পুরাতন মীর সাহেবের মসজিদ ছাড়া আরও নয় দশটি মসজিদ আছে পাণ্ডুয়ায়। বেশির ভাগই পুরানো। অযত্ন আর পরিত্যক্ত নির্জনতার ছাপও পড়েছে কোন কোনটির অঙ্গে। গাবার পাড়ের মসজিদটির অবস্থা তো বিধ্বস্ত-প্রায়। সামনের চাহার দিওয়ারী অদৃশ্য ঝোলানো ছাদ ফেটে ভেঙে পড়েছে দুপাশের। স্তম্ভ দুটির একটি হেলে পড়েছে একদিকে, অপরটিরও প্রায় একই দশা। সামনের পীরের স্থানটুকুর অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। সকালবেলা ঝাঁট পড়ে, সন্ধ্যায় প্রদীপও জ্বলে। একটি দুটি ধূপ আর মোমবাতিরও দগ্ধাবশিষ্ট দেখা গেল।

পীরের পুকুর দর্শনীয় পাণ্ডুয়ায়। কেউ বলে রাজা পাণ্ডুদাসের কাটানো, কেউ বলে শাহসুফীর সাধনায় সত্যপীরের কৃপায় স্বয়ং আত্মপ্রকাশ। ৩৫ হাত গভীর বলে প্রসিদ্ধি পুকুরটির। লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল ক্র্যাফোর্ডও একে ৫০

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ

প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেজওয়াড়া - শ্রীনগর - গৌহাটী

সিংহাসনের আকারযুক্ত বেদীসহ বাইশ দরওয়াজার ভিতরের এক অংশ

ফুট গভীর বলে উল্লেখ করেছেন। ৫০ ফুট কি না জানি না। তবে গভীর যে যথেষ্টই এটা বোঝা যায়। পরিষ্কার স্বচ্ছ ঈষৎ সবুজাভ প্রায় অতলান্ত জলরাশি হাওয়ায় হেলছে, পান্না রংয়ের গলানো ঢেউ দুলছে, উঠছে, পড়ছে, ভেঙে যাচ্ছে শত কুচি হয়ে। সত্যপীরের কৃপাশ্রিত দুটি কুমীর না কি বাস করে এখানে। মানসিক করে শিরনী দিলে মানসকারী যদি নির্মল পবিত্র চিত্ত হয়, তবে তারা এসে খায়। অনেক পুণ্যফল থাকলে তবেই ওরা আসে।

কুমীর আমি দেখি নি। তবে এই পুকুর তার তলদেশের মাটি এবং আপপাশের ভূখণ্ড ছানলে বাছলে অতীতের হিন্দু রাজত্বের কিছু কিছু নিদর্শন আবিষ্কার হতে পারে বলেই আমার বিশ্বাস। এর স্বপক্ষে কোন সুস্পষ্ট যুক্তি এই মুহূর্তে দেখানো যাবে না। তবে কয়েকটি টুকরো পাথর ছড়ানো-ছিটনো কিছু অদ্ভুত গড়নের ইট এবং মাটির ধরণ দেখেই একথা মনে হয়েছে আমার।

প্রাচীনকালে অনেক ব্যবসা এবং শিল্প ছিল পাণ্ডুয়ায়। কাগজ তৈরি হত —কলে নয়, ঘরে ঘরে মেহনতী মানুষের হাতের কুটিরশিল্প। চুন তৈরি হত, ইট আর চুনের ভাটি ছিল বলে পাশের গ্রামের নামকরণ হয়েছে ইটাচুনা। নীল-কুঠি ছিল অনেকগুলি অত্যাচারের লীলা-ভূমি। প্রচুর ধান হত। ফোলানো ফাঁপানো ধানের ব্যবসা পাণ্ডুয়ায় অনেক দিনের।

ব্যবসা-বাণিজ্য আজও কিছু কিছু আছে। ধান-চালের ব্যবসায় যার মধ্যে অন্যতম। কুটিরশিল্পের মধ্যে কাগজ তৈরির স্মৃতিটুকু মাত্র বাঁচিয়ে রেখে টিকে আছে কাগজিপাড়া। আগে এই পাড়ার ঘরে কাগজ-শিল্পীদের বাস ছিল। এখন আর কেউ নেই। দু-চারজন যা আছে পেটের ধান্দায় অপর পেশার বাঁধনে পড়েছে বাঁধা। হাতে তৈরি কাগজের প্রসার নেই প্রতিপত্তিও লোপ পাচ্ছে, সেই সঙ্গে শিল্পিদলও।

পুরানো দুটি-তিনটি কুটিরশিল্প আজও টিকে আছে। পাণ্ডুয়ার জলের কুঁজো, খন্যানের কুলো-ডালা, ঝুড়ি-চাঙারি, আর হরলদাসপুরের শোলার ডাক কিংবা ঘর সাজাবার মনোহারী। প্রবাদের মত একটা চলতি কথাই চালু হয়ে গেছে এ অঞ্চলে। খন্যানের কুলো, পাণ্ডুয়ার কুঁজো আর হরালদাসপুরের শোলার সাজ। পাণ্ডুয়ার মেলার আজও এইগুলিই বিশেষ সওদা।

বালি হুগলী জেলার একমাত্র খনিজ সম্পদ। সুবিখ্যাত মগরা স্যাণ্ড বা মগরার বালি নামে পরিচিত প্রচুর লৌহযুক্ত লাল বালির বড় বড় আকর পাণ্ডুয়াতেও আছে। মাটিতে গর্ত করে বালিগুলি খুঁড়ে তুলে নেওয়া হয়, রয়ে যায় ছোট ছোট ডোবার আকার থেকে বড় বড় দীঘির মত প্রকাণ্ড গর্ত। বর্ষার ধোয়াট নামা জলে ভরে যায় গর্তগুলি। মাছ চাষে খুব সুবিধা। পাণ্ডুয়ায় মাছের চাষও তাই প্রচুর।

পাণ্ডুয়ার গরুর হাট প্রসিদ্ধ। প্রতি রবিবারে আর বুধবারে হাট বসে। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, মুরগি, হাঁস সব পাওয়া যায় এখানে। এত বড় পশু বাজার পশ্চিমবঙ্গে আর খুব বেশি নেই।

* * *

বাংলার প্রথম রেলপথ হাওড়া থেকে পাণ্ডুয়া পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। ১৮৫৪ খৃস্টাব্দের ২৮শে জুন পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম রেল ইঞ্জিন ফেয়ারী-কুর্ডন চালিয়ে দেখা হয় হাওড়া থেকে পাণ্ডুয়া পর্যন্ত। চালিয়েছিলেন মিঃ হজসন নামে এক ইংরাজ ড্রাইভার। লাইনের দুধারে বিপুল ভিড় জমে গিয়েছিল—"দুই দণ্ডে চলে যায় দু'দিনের পথ"—যে যন্ত্র তাকে দেখবার জন্য মেয়েরা শঙ্খধ্বনি, হুলু-ধ্বনি, পুষ্পমাল্য সহযোগে অভ্যর্থনাও জানিয়েছিলেন প্রথম রেলগাড়িকে। আবার প্রকাণ্ড অদ্ভুত-দর্শন ধূম, অগ্নি এবং শব্দময় এই যন্ত্রটিকে ধ্বংসেচ্ছুক শয়তানের অনুচর ভেবে ভয়ও পেয়েছিলেন অনেকে।

স্বীকার করতে লজ্জা নেই পাণ্ডুয়ার অতীত নিয়ে যথেষ্ট অনুসন্ধান হয় নি আজও। যদিও সরকার সাতগাঁওয়ের অন্তর্ভুক্ত এইসব এলাকা রাজধানী সপ্তগ্রামকে বেষ্টন করেই গড়ে উঠেছিল তাদের বিস্তার, উত্থান এবং অগ্রগতি। তথাপি কয়েক শতাব্দী আগেকার যে একটি সভ্য, সংহত ও সুপ্রশস্ত ও রাজকীয় রাজতন্ত্রের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন চূর্ণ-ভগ্নাংশ ছড়ানো-ছিটানো পড়ে রয়েছে এদিকে-ওদিকে। কোথায় তার উৎপত্তি, কেমন করে তার অস্তগমন, কবে কি ভাবে, কী করেই বা তার পূর্ণতা, পরিপুষ্টি আর বিস্তার—তা জানা হয় নি আজও ভাল করে। পাণ্ডুয়ার প্রাচীনত্ব আজও অন্ধকারে ঢাকা। জঙ্গলে, জলায় আর ছোট ছোট জনপদের আড়ালে আচ্ছাদিত। মসজিদে, দরগায়, পুষ্করিণীতে আর মিনার শীর্ষে তার স্তব্ধ অনুচ্চারিত বাণী। জনবিরল পথে-প্রান্তরে, যন্ত্র সভ্যতার চক্রঘর্ঘর ধ্বনি-মুখরিত গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারে ধারে, প্রকাণ্ড বনস্পতির পাতায় পাতায়, চূড়ায়, শাখায়, কাণ্ডে পত্র-মর্মরে, হাওয়ার শিরশিরানী, ফিসফিসানি বুঝি অনেক না-বলা কথা, অনেক অনুদ্ঘাটিত ইতিহাসেরই অনুরণন।*

(*আলোকচিত্র লেখিকা কর্তৃক গৃহীত আসছে বারে পাণ্ডুয়া উত্তর পর্ব)।

বিশ্বসাহিত্যের আদিপর্ব

ডঃ নরেন ভট্টাচার্য

প্রাচীন হিব্রু সাহিত্য

প্রাচীন হিব্রু সাহিত্য ইহুদিদের জাতীয় সাহিত্য। সম্পদ ও বৈচিত্র্যের দিক থেকে প্রাচীন হিব্রু সাহিত্য গ্রীক, ল্যাটিন ও সংস্কৃত সাহিত্যের মতই বিশাল। মিশর বা মেসোপটেমীয় সাহিত্যের মত তা শুধু কেবলমাত্র লোকসাহিত্যের স্তরেই আবদ্ধ নয়। হিব্রু সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় ৮০০ খৃস্টপূর্বাব্দের কয়েকটি লেখমালায়। আদি হিব্রু লিপি সেমিটিক সাধারণ লিপিরই প্রকার ভেদ মাত্র, তবে পরবর্তীকালে আরামায়িক লিপিতেও হিব্রু সাহিত্যের কিছু কিছু অংশ রচিত হয়েছে।

হিব্রু সাহিত্যের যে বিশেষ নিদর্শনটির সঙ্গে আমরা অনেকেই পরিচিত তা' হচ্ছে পবিত্র বাইবেলের **ওলড টেস্টামেন্ট** যা পুরাতন নিয়ম। বাংলা বাইবেল সম্রাট প্রথম জেমসের আমলে রচিত ইংরাজী বাইবেলের অনুবাদ, এবং ইংরাজী বাইবেলের ওলড টেস্টামেন্ট অংশটুকু আদি হিব্রু থেকেই অনূদিত হয়েছে, যদিও **নিউ টেস্টামেন্ট** পর্যায়ের রচনাগুলির উৎস হিব্রু নয়, গ্রীক।

সমগ্র ওলড টেস্টামেন্ট একই সময় এবং এক হাতে রচিত হয় নি। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, প্রথমে পাঁচটি খণ্ডে আদি বাইবেল রচিত হয়েছিল **জেনেসিস, একসোডাস, লেভিটিকাস, নাম্বার্স** এবং **ডিউটারোনমি**। এই পাঁচটি খণ্ডকে একত্রভাবে বলা হয় **পেন্টাটিয়ুখ**। আধুনিককালের পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, আদি বাইবেল রচিত হয়েছিল সাত খণ্ডে, পরবর্তীকালের দুটি খণ্ডকে সময়ের দিক থেকে আরও পিছিয়ে দেবার নাকি প্রয়োজন আছে। ওলড টেস্টামেন্টের অবশিষ্ট অংশ অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন।

পেন্টাটিয়ুখ

বাইবেলের প্রথম খণ্ড **জেনেসিস বা আদি পুস্তক** পঞ্চাশটি অধ্যায়ে বিভক্ত যা শুরু হয়েছে ঈশ্বর কর্তৃক জগৎ ও জীবন সৃষ্টির কাহিনী দিয়ে। সংক্ষেপে জেনেসিসের বিষয়বস্তু হচ্ছে সৃষ্টিরহস্য; মানুষের আদি পাপ ও ঈশ্বরের অভিশাপ; আদি মানব-মানবীর বংশাবলী; পাপের বিস্তার, মহাপ্লাবন ও নোহ; নোহের বংশাবলী, আব্রাহাম থেকে জোসেফ পর্যন্ত।

চল্লিশ অধ্যায়ে বিভক্ত **একসোডাসে** বর্ণিত হয়েছে মিশরে ইস্রায়েলীয়দের বৃদ্ধি ও অত্যাচারভোগ; মোজেসের জন্মবিবরণ, ঈশ্বরোপলব্ধি, মিশরের উপর ঈশ্বরের দশটি আঘাত, মিশর থেকে ইহুদিদের দেশান্তর গমন; মোজেস কর্তৃক স্থাপিত নিয়মাদি; মোজেসের লৌকিক ও অলৌকিক ক্রিয়াসমূহ।

লেভিটিকাস সাতাশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এতে আছে মোজেসের অনুশাসন-সমূহ, যথা বলিদানের নিয়ম, ভক্ষ্য-নৈবেদ্যের নিয়ম, পাপ ও দণ্ড, রজস্বলা ও প্রসূতির শুচি হবার বিধান, কুষ্ঠরোগ, শৌচাশৌচ, প্রায়শ্চিত্ত, পবিত্র আচরণ, মানত ইত্যাদি।

ছত্রিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত **নাম্বার্সের** বিষয়বস্তু হচ্ছে ইহুদিদের গোষ্ঠীগণনা, শিবির বাসের নিয়ম, লেবীয়দের উপর অর্পিত ভার, নাসরীয় ব্রত, দীপবৃক্ষ, নিস্তার পর্ব পালন, সীনয় পাহাড় থেকে ইহুদিদের যাত্রা, তাদের দ্বন্দ্ব, বিদ্রোহ ও শাস্তি, দেবপূজা ও ব্যভিচার ইত্যাদি।

ডিউটারোনমি চৌত্রিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এতে আছে স্থানান্তরগামী ইস্রায়েলীয়দের ইতিহাস, দশ আজ্ঞা বিষয়ক মোজেসের বক্তৃতা। ইহুদিদের অবাধ্যতা, ঈশ্বরোপাসনার বিধি, বিচারক ও রাজগণের কর্তব্য ইত্যাদি।

ওলড টেস্টামেন্টের অবশিষ্টাংশ

ওলড টেস্টামেন্টের অবশিষ্টাংশ চৌত্রিশটি খণ্ডে বিভক্ত। এই চৌত্রিশ খণ্ডের মধ্যে দুই খণ্ডে রচিত **কিংস** বা রাজবৃত্তান্ত এবং **ক্রনিকলস** বা বংশাবলী আদি হিব্রু ইতিহাসের আকর। অবশিষ্ট তিরিশটি খণ্ডের মধ্যে **সামস** বা গীতসংহিতা হচ্ছে ধর্মসঙ্গীতের সংকলন, **প্রোভার্বস** বা হিতোপদেশ ছন্দে রচিত উপদেশমালা, **একলিজিয়াস্টেস** ডেভিডের পুত্র বিরচিত নীতিবাক্যের সংকলন, তা' ছাড়া আরও দুটি খণ্ডে আছে সলোমনের গান ও জেরেমিয়ার বিলাপ যেগুলির কাব্যমূল্য অসাধারণ। উপর্যুক্ত পাঁচটি খণ্ডের কাব্যমালা এক সময়ে রচিত হয় নি।

অবশিষ্ট পঁচিশটি খণ্ডের মধ্যে **জোসুয়া, জাজেস** এবং **রুথ** নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বেশি পুরাতন। জোসুয়া ছিলেন মোজেসের পরবর্তী হিব্রুদের নেতা, এবং তিনি নেতা থাকাকালীন হিব্রুদের জীবনে যে সকল ঘটনা ঘটেছিল সেগুলিই হচ্ছে জোসুয়া নামক গ্রন্থের বিষয়বস্তু। জাজেস বা বিচারকর্তৃগণের বিবরণ নামক গ্রন্থের বিষয়বস্তু হচ্ছে ইস্রায়েলীয়দের সঙ্গে আরামীয় ও মোয়াবীয়দের সংঘর্ষ, তাদের উপর মিদীয়দের অত্যাচার এবং গিডিওন কর্তৃক মিদীয়দের পরাজয়। বিখ্যাত স্যামসন ও ডেলাইলার কাহিনী জাজেস গ্রন্থের অন্তর্গত। রুথ একটি পতিপুত্রহীনা বিধবা ও তার পুত্রবধূর কাহিনী। দুই খণ্ডে রচিত **স্যামুয়েলের** বিষয়বস্তু হচ্ছে ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে পুরোহিততন্ত্রের পরিবর্তে রাজতন্ত্রের প্রবর্তন, রাজা সল ও ডেভিডের জীবনেতিহাস।

ওলড টেস্টামেন্টের অবশিষ্ট খণ্ডগুলি হচ্ছে **এজরা, নেহেমিয়া, এস্থার, জব, ইসাইয়া, জেরেমিয়া, এজেকিয়েল, ড্যানিয়েল, হোসেয়া, জোয়েল, আমোস, ওবাদিয়া, জোনা, মিকা, নাহুম, হাবাকুক, জেফানিয়া, হাগগাই, জেকারিয়া** ও **মালাচি**। এগুলি অধিকাংশই উল্লিখিত মহাপুরুষ বা প্রেরিত পুরুষদের নামে রচিত, তাঁদের জীবনী, কর্মধারা ও বাণীই গ্রন্থগুলির বিষয়বস্তু।

তালমুদ ও মিদ্রাস

ওলড টেস্টামেণ্ট রচনার পরবর্তীকালে যে সকল হিব্রু গ্রন্থ রচিত হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে আগে উল্লেখ করতে হয় তালমুদ ও মিদ্রাস নামক গ্রন্থমালার। প্রাচীনকালের পণ্ডিতেরা তালমুদকে দুটি অংশে বিভক্ত করেছেন—হাগ্গাদ ও হালাচা। মিদ্রাস গ্রন্থমালারও হাগ্গাদ এবং হালাচা এই দুইটি শ্রেণী আছে। হাগ্গাদে অজস্র কথা ও কাহিনীর সাহায্যে ওলড টেস্টামেণ্টের মূল বক্তব্যগুলি ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং সেই দিক থেকে পবিত্র কোরান শরীফের অনুগামী ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ হাদিসের সমধর্মী।

হাগ্গাদ প্রসঙ্গে বিখ্যাত জার্মান লেখক জুঞ্জ বলেছেন, স্বর্গকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনা এবং পৃথিবীকে স্বর্গে উত্তোলন করাই হচ্ছে হাগ্গাদের উদ্দেশ্য। এর লক্ষ্য হচ্ছে একদিকে ঈশ্বরের মহিমা-কীর্তন অপরদিকে ইস্রায়েলকে তৃপ্তি-দান। হাগ্গাদ শুধু কথা ও কাহিনীর সংকলন নয়। এতে আছে ধর্মীয় সত্য, নৈতিক অনুশাসন এবং হিব্রুদের এমন একটি অতীত ইতিহাস যা দেশছাড়া মানুষগুলিকে অনুপ্রাণিত করতে পারে। প্রথম দিকে হাগ্গাদ অতীন্দ্রিয়বাদের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল, কালক্রমে পূর্বদেশীয় রীতি অনুযায়ী ক্রমে ক্রমে তা এখানে অনুপ্রবিষ্ট হয়। জার্মান কবি হাইনে হাগ্গাদকে স্নিগ্ধ চন্দ্রালোক এবং ব্যাবিলনের ঝুলন্ত বাগানের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

তালমুদ ও মিদ্রাসের অপর শ্রেণী হালাচা অতিশয় নীরস ও গদ্যময়, এতে ওলড টেস্টামেণ্ট বর্ণিত আইনকানুন এবং আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাখ্যা আছে। তালমুদ ও মিদ্রাস পর্যায়ের গ্রন্থগুলির নামের একটি তালিকা এখানে উদ্ধৃত করছি।

তালমুদঃ—
১। সেডার জোরাইম
২। সেডার মোয়েড
৩। সেডার নাসিম
৪। সেডার নেজিকিন
৫। সেডার কোদাসিন
৬। সেডার তাহারোৎ

মিদ্রাস ঃ—
১। মিদ্রাস আগাদা
২। মিদ্রাস বামিদবার রাব্বা
৩। মিদ্রাস বেরেশিথ রাব্বা
৪। মিদ্রাস হাগ্গাদোল
৫। মিদ্রাস কোহেলেৎ রাব্বা
৬। মিদ্রাস লেকাচ তব
৭। মিদ্রাস সেমুয়েল
৮। মিদ্রাস সেমথ রাব্বা
৯। মিদ্রাস দেব্যারিম রাব্বা
১০। মিদ্রাস সির হাসিরিম
১১। মিদ্রাস তানচুমা
১২। মিদ্রাস তেহিলিম

আদি হিব্রু সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

অপরাপর দেশের কথা ও কাহিনীর সঙ্গে হিব্রু সাহিত্যের সাদৃশ্য থাকলেও কতকগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় রয়েছে। প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে দেবতাজ্ঞানে কল্পনা করা পৃথিবীর সকল প্রাচীন দেশেই বহু দেববাদ বা পলিথিইজমের সৃষ্টি করেছিল, যার চিহ্ন বিভিন্ন দেশের লোকসাহিত্যসমূহের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহুদি লোকসাহিত্যে একেশ্বরবাদী প্রবণতা গোড়া থেকেই লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিতীয়ত অপরাপর দেশের লোক-সাহিত্যে যেখানে নীতিবাদের বিশেষ কোন স্থান নেই সেখানে আদি হিব্রু সাহিত্য একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। গ্রীক তথা ভারতীয় দেবদেবীরা আর যাই হোন নীতিবাদের বড় একটা ধার ধারতেন না। কিন্তু তালমুদ ও মিদ্রাসের সর্বত্রই নৈতিক অনুশাসনের ছড়াছড়ি।

তৃতীয়ত হিব্রু সাহিত্যের সঙ্গে শিল্পকলার এক আশ্চর্য বিরোধ বর্তমান। প্রাচীন গ্রীক লোকসাহিত্য যেমন একদিকে নাটকে রূপান্তরিত হয়ে জনসমক্ষে অভিনীত হয়েছে; অপরদিকে তা ভাস্কর্যে এবং চিত্রে উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এই রকম কোন ব্যাপার ইহুদিদের ক্ষেত্রে ঘটে নি। এর জন্য অবশ্য মোজেসের আইন অনেকাংশে দায়ী, যে আইন অনুযায়ী এমন কি প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রও আঁকা চলবে না বা ভাস্কর্যে তার উপস্থাপনা চলবে না, কেন না তা করলে ঈশ্বরের সৃষ্টিকে ব্যঙ্গ করা হবে।

চতুর্থত হিব্রু কাহিনীকারেরা নারী-চরিত্রের উপর আলোকপাত বিশেষ করেন নি। যেটুকু করেছেন তা নারীর প্রতি কোনরূপ মর্যাদাসূচক নয়। কোন দেবীর অস্তিত্ব হিব্রু কল্পনায় নেই। এমন কি দেবদূতের মধ্যেও কোন স্ত্রীচরিত্র নেই। তবে দানবী অনেক আছে।

হিব্রু সাহিত্যের উপর বৈদেশিক প্রভাব

ঈশ্বরের বাঞ্ছিত ভূমি প্যালেস্টাইনে মোজেস ইহুদিদের নিয়ে গিয়ে তুলেছিলেন মিশর থেকে। কাজেই মিশরীয় সংস্কৃতির কিছুটা অংশ তাদের সঙ্গেই গিয়েছিল। আর প্যালেস্টাইনের ভৌগোলিক অবস্থান এমনই যে সেখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় সংস্কৃতিরই কিছুটা অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা ছিল। ফলে আদি হিব্রু চিন্তাধারার উপরে যেমন একদিকে গ্রীক চিন্তাধারার প্রভাব পড়েছে, অপরদিকে তেমনই মিশরীয়, পারসিক ব্যাবিলনীয় এবং ভারতীয় চিন্তাধারার প্রভাবও বর্তমান। তালমুদ ও মিদ্রাসের হাগ্গাদীয় অংশগুলিতে এই প্রভাবের চিহ্ন প্রচুর। এখানে কয়েকটি উদাহরণ দেবার প্রয়োজন আছে।

আদম ও ইভের মৃত্যুদৃশ্যের বর্ণনায় আছে যে দেবদূতেরা তাদের সমাধিস্থ করবার জন্য এসেছিল। যখন মোজেস মারা যান, তালমুদের বর্ণনা অনুযায়ী, ঈশ্বর স্বয়ং তাঁর আত্মাকে গ্রহণ করতে এসেছিলেন। তিনজন দেবদূত—মাইকেল, গ্যাব্রিয়েল এবং জাগমাগেল, তাঁর মৃতদেহের আচ্ছাবরণ বুনে দিয়েছিলেন। এই কাহিনীটির উপর মিশরীয় প্রভাব সুস্পষ্ট, কেন না মিশরীয় ধারণায় চারজন দেবদূত—আমসাথ, লুফি, দৌমাতুফ এবং কোয়ার সালুফ—প্রতিটি ব্যক্তির মৃত্যুকালে উপস্থিত থেকে মৃত আত্মার তত্ত্বাবধান করেন। মৃত্যুকালীন চারজন দেবদূতের অবস্থিতির ধারণা পরবর্তীকালে খৃস্টান ও নস্টিকেরা গ্রহণ করেছিলেন।

ইভ সংক্রান্ত কাহিনীগুলি মিশরীয় দেবী আইসিসের কাহিনীগুলিকে স্মরণ করিয়ে দেয়, আদমের কাহিনী খিম (খম) বা খেমসিসের কাহিনীর অনুরূপ এবং জোসেফের কাহিনী অসিরিসের কাহিনীর ছাঁচে গড়া। আইসিস অসিরিসের কফিনের সন্ধানে দুঃসাহসিক যাত্রায় প্রবৃত্ত হয়েছিল, মিদ্রাস কোহেলেথে বর্ণিত হিব্রু কাহিনীতে অনুরূপ অভিযান করেছিল সেরাহ্। সেরাহ্র পিতা অস্‌সরের সঙ্গে অসিরিস নামটির ধ্বনিগত সাদৃশ্যও প্রচুর।

এ তো গেল মিশরীয় প্রভাবের কথা। থিসিউস এবং এরিয়াডনের গ্রীক কাহিনী হিব্রু মিদ্রাস-সির-হাসিরিম এবং মিদ্রাস কোহেলেথে বর্ণিত একটি কাহিনীর সঙ্গে—আশ্চর্যরকম সাদৃশ্যযুক্ত। প্রোক্রাস্টেসের বিছানার গ্রীক কাহিনীটির হিব্রু সংস্করণ পাওয়া যায় সানহেদ্রিন-এ। ভারতীয় পঞ্চতন্ত্রের কাহিনীগুলির সঙ্গেও তালমুদ এবং মিদ্রাসের লেখকরা পরিচিত ছিলেন। নাহুম-ইষ-গিমশোর কাহিনীটি—পঞ্চতন্ত্র থেকে নেওয়া। মহাপ্লাবন ও নোহের জাহাজের আখ্যানটির উৎস ভারতীয়। রাজা সলোমন এবং অ্যাসমোডিয়াসের কাহিনীটিও ভারতীয় কাহিনী থেকে নেওয়া হয়েছে। মিদ্রাস বেরেশিথ রাব্বা বা জেনেসিস রাব্বায় বর্ণিত ইভের সৃষ্টির কাহিনী অনুরূপ ভারতীয় কাহিনীর প্রভাবে গড়ে উঠেছে ঃ ঈশ্বর ইভকে

আদমের মাথা থেকে তৈরি করেন নি পাছে সে গর্বিত হয়, চোখ থেকে সৃষ্টি করেন নি পাছে সে চপলা হয়, মুখ থেকে তৈরি করেন নি পাছে সে মুখরা হয়, কান থেকে তৈরি করেন নি পাছে সে কানপাতলা হয়, হাত থেকে তৈরি করেন নি পাছে সে অকাজ করে, পা থেকে তৈরি করেন নি পাছে সে ঘরছাড়া হয়, হৃদয় থেকে তৈরি করেন নি পাছে সে ঈর্ষার আকর হয়। এই কারণে তিনি বেছে নিয়েছিলেন আদমের পাঁজরা। কিন্তু ঈশ্বর এত সাবধান হওয়া সত্ত্বেও নারী সব বদগুণ-গুলিই পেয়েছে যেগুলি থেকে ঈশ্বর তাকে দূরে রাখবার চেষ্টা করেছিলেন।

জেনেসিস রাব্বায় বর্ণিত আব্রাহাম ও নিমরোদের কাহিনীর উৎসও ভারতীয়। আব্রাহামের পিতা টেরাহ্ আব্রাহামকে সমর্পণ করেছিলেন নিমরোদের হাতে যাতে সে পৌত্তলিক আব্রাহামকে কিছু শিক্ষা দেয়।

"যদি তুমি তোমার পিতার ঈশ্বরকে পূজা না কর তাহলে অন্তত অগ্নিকে পূজা কর," নিমরোদ বলল আব্রাহামকে।

আব্রাহাম জবাব দিল, "কেন? জল তো আগুনের চেয়ে বেশি শক্তিমান, কেন না জল আগুনকে নেভাতে পারে। অতএব জলকেই পূজা করা উচিত।"

"বেশ তাই কর। তুমি জলেরই উপাসনা কর।"

"কিন্তু মেঘেরা জলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, কেন না জলীয় উপাদান মেঘেই থাকে।"

"বেশ, তাহলে মেঘেরই পূজা কর।"

"বায়ু নিশ্চয়ই মেঘের চেয়ে বেশি শক্তিমান কেন না তা মেঘকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।"

"বেশ, তাহলে বায়ুরই পূজা কর।"

"মানুষ বায়ুর চেয়ে বেশি শক্তিমান কেন না সে বায়ুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে। অতএব কেন আমরা মানুষকে পূজা করব না?"

আব্রাহামের এই কথা শুনে নিমরোদ ক্ষেপে গেল। সে আব্রাহামকে জ্বলন্ত চুল্লীর মধ্যে নিক্ষেপ করল।

ইস্রায়েলীয়রা তাদের পারসিক প্রতিবেশীদের কাছ থেকেও অনেক কিছুই গ্রহণ করেছিল। আদমের কল্পনার মূলে আছে বেন্দিদাদ গ্রন্থে বর্ণিত যিম এবং বেদবর্ণিত যমের কল্পনা। আদমের সঙ্গে যমের শুধু ধ্বনিগত সাদৃশ্যই নেই, আদমের মত যমই হচ্ছে আদিতম মরণশীল পুরুষ।

মধ্যযুগীয় কথাসাহিত্যে হিব্রু সাহিত্যের প্রভাব

নিজেদের মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে ইহুদিরা পৃথিবীর নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়ে, বিশেষ করে ইউরোপে। এবং সেই সঙ্গে তারা নিয়ে যায় তাদের অমূল্য সাহিত্যসম্ভার। ফলে তাদের সাহিত্যের প্রভাব ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের উপর পড়েছিল।

মধ্যযুগে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত তিনজন ইহুদি হিব্রু সাহিত্যকে ইউরোপে জনপ্রিয় করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রথমজন হচ্ছেন পেট্রাস আলফোনসাস যিনি হিব্রু সূত্র অবলম্বনে রচনা করেছিলেন **ডিসিপ্লিনা ক্লেরিকালিস**। দ্বিতীয় জন হচ্ছেন জন অফ কাপুয়া যিনি রাব্বি জোয়েল লিখিত কাহিনীসমূহের ল্যাটিন অনুবাদ করেছিলেন **কালিলা এন্ড দিমনা** নামক গ্রন্থে। তৃতীয় জন হচ্ছেন **স্কিমফ এন্ড আর্নেস্ট**-এর লেখক পউলি। অবশ্য প্রথম যিনি হিব্রু ঐতিহ্যকে ইউরোপের মাটিতে স্থাপন করেন তিনি হচ্ছেন সেন্ট পল।

খৃস্ট ধর্ম এবং খৃস্টীয় কথা ও কাহিনীর উপর হিব্রু সাহিত্যের প্রভাব সুবিদিত। এখানে আরও একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন। মধ্যযুগের ইউরোপীয় খৃস্টানেরা ছিল চূড়ান্ত রকমের ইহুদি বিদ্বেষী, যার প্রমাণ পাওয়া যায় সেক্সপীয়ারের **মার্চেন্ট অফ ভেনিস** নাটকে। সেই বিদ্বেষের দ্বারা পরিচালিত হয়ে একদল মধ্যযুগীয় পণ্ডিত তালমুদ সাহিত্যমালার বিরুদ্ধে ক্রমাগত অপপ্রচার চালিয়েছিলেন।

ইউরোপের আঞ্চলিক আখ্যান ও উপকথার সঙ্গে ক্ষেত্রবিশেষে হিব্রু কাহিনীর সমন্বয় হয়েছে। পূর্ব ইউরোপে, বিশেষ করে হাঙ্গেরী ও ইউক্রেনের লোকসাহিত্যে বলা হয়েছে যে কুকুরের লেজ থেকে নাকি নারীর উদ্ভব হয়েছে যে কারণে নারী যখন কিছু পেতে চায় তখন সে কুকুরের লেজ নাড়ার মতই পুরুষকে তোয়াজ করে, এবং তার ইচ্ছা পূর্ণ না হলে কুকুরের ঘেউ ঘেউ করার মতই সে বিরক্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করে। এই গল্পটি হিব্রু কাহিনীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে নিম্নলিখিত আকার ধারণ করল। ঈশ্বর যখন ইভকে সৃষ্টি করবার জন্য আদমকে অচেতন করে তার বুকের একটি পাঁজরা খুলে সেটিকে পাশে রেখে তার রক্তস্রাব বন্ধ করার চেষ্টা করছিলেন তখন অকস্মাৎ একটি কুকুর এসে সেই পাঁজরাখানি মুখে করে নিয়ে পালিয়ে যায়, এবং একজন দেবদূত কুকুরটির পিছনে ধাওয়া করে শেষ পর্যন্ত তার লেজটি কেটে আনতে সক্ষম হন। সেই লেজ দিয়েই ঈশ্বর নারী সৃষ্টি করেন এবং মেয়েদের কেশ এত দীর্ঘ হয়। এই কাহিনীর উল্লেখ করেছেন হ্যান্স সাকস ১৫৫৭ খৃস্টাব্দে রচিত একটি কবিতায়। কিন্তু এরকম কোন কাহিনী তালমুদ ও মিদ্রাস গ্রন্থমালায় নেই। অনুরূপ একটি আষাঢ়ে গল্প ইংরাজ কবি টমাস মুর তাঁর রাব্বিনিকাল ওরিজিন অফ উওম্যান কবিতায় বলেছেন যার বক্তব্য হল ঈশ্বর আদমকে লেজসমেত সৃষ্টি করেছিলেন, কালক্রমে লেজটি খসে পড়ে, এবং তা থেকে ইভের সৃষ্টি হয়।

মধ্যযুগের ইউরোপীয় সাহিত্যের অনেক দৈত্য ও দানবের কাহিনী হিব্রু সাহিত্য থেকে সংগৃহীত হয়েছে। সেগুলির অধিকাংশ ইউরোপে আমদানী হয়েছে ইহুদিদের দ্বারাই, এবং ক্রুসেডারদের মারফতও অনেক কাহিনী ইউরোপে এসেছে। আরবীয় সাহিত্যের উপরেও হিব্রু সাহিত্যের প্রভাব যথেষ্ট। আমরা যখন আদি আরবীয় সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করব তখন এই বিষয়টি আমরা আরও স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হব। কোরানের ভাষ্যকারেরা বহু ক্ষেত্রেই হিব্রু সাহিত্যের উপর নির্ভর করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তালমুদে বর্ণিত সেমহাজাই ও আজায়েলের উপাখ্যান, যা সরাসরি ভারতীয় সুন্দ উপসুন্দের কাহিনী থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, আরবীয় সাহিত্যে হারুত-মারুতের কাহিনীতে রূপান্তরিত হয়েছে।

তালমুদ ও মিদ্রাস গ্রন্থমালার রচনাকাল শেষ হয় খৃস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে। হিব্রু সাহিত্য অবশ্য এখানেই শেষ হয়ে যায় নি। যুগ-যুগান্তর ধরে ইহুদিরা মাতৃভূমি থেকে বহুদূরে থাকলেও, নিজেদের সাংস্কৃতিক সত্তাকে রীতিমত অনুশীলনের দ্বারা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। কাজেই আদিযুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত হিব্রু সাহিত্য অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়েছে, এখানে শুধু আদিযুগটুকুর বর্ণনা করেই ছেদ টানছি।

'গুলাবি চা'
তাজা ও সেরা। একবার খেয়ে দেখুন।
৪৫নং ফ্রী স্কুল স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
(পার্ক স্ট্রীট থেকে মাত্র ৩ মিনিটের পথ)।

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

দিলালি

তপতীর পর নাট্যমন্দিরে আর নতুন নাটক মঞ্চস্থ হয় নি। ২৫শে মার্চ ১৯৩০ সালে শেষ অভিনয় হল সীতা আর ষোড়শীর। সীতার অভিনয়ের পর দর্শকদের কাছে শিশিরকুমার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বললেন ঃ

"আজকের অভিনয়ই আমাদের এখানে শেষ অভিনয়; আর আমরা এখানে অভিনয় করবো না। কেউ যেন না মনে করেন, নাট্যমন্দির উঠে গেল; নাট্যমন্দির রইল ঠিকই; মাত্র আমরা এই স্টেজটি ছেড়ে দিচ্ছি। এবং যতদিন না সুযোগ সুবিধা হবে, ততদিন পর্যন্ত কলকাতায় অভিনয় করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। এখন আমরা কলকাতা ছেড়ে বাংলাদেশের নানা স্থানে ঘুরে বেড়াব। ভবিতব্য জানেন, আবার কবে আমরা আপনাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করব। এইখানে এই স্থানটি ছেড়ে দিচ্ছি কেন, তা জানানো দরকার। কলকাতার landlordism বলে বস্তুটি প্রবল হয়ে উঠেছে। আমাদের এই বাড়িটির জন্যে মাসের মাস তিন হাজার দুশো পঞ্চাশটি করে টাকা গুণতে হয়। এত বাড়ী ভাড়ার সংগে অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ চালানো দুষ্কর আমাদের দেশে। থিয়েটারে যে হারে টিকিটের দাম করা হয়েছে, তা এদেশের পক্ষে খুব বেশী।

"থিয়েটার জিনিসটা exotic—এই যে set-scene, এই যে আলোর প্যাঁচ—এ হচ্ছে বিলাতীর কতকটা অনুকরণ। আমাদের জাতি যদি বেঁচে থাকত, তার মধ্যে যদি জীবনীশক্তি থাকত, তাহলে আমাদের যে নিজস্ব যাত্রাভিনয়, তাই আজ এমন অবস্থায় এসে পৌঁছতে পারত, যাকে জগতের সামনে দাঁড় করাতে পারতুম। তার জন্যে যে ধরণের নাটক লেখা হতো, তাই হতো আমাদের বাঙ্গালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নাটক; যেমন আমাদের বাঙ্গালীর কীর্তন, বাউল, কালীঘাটের পট প্রভৃতি। জাপানের লোক যে-নাট্যাভিনয় করে, সে তাদের নিজের মত; আমাদের তেমন জিনিষ নেই।

"নানারকম কল্পনা মাথায় নিয়ে এই নাট্যমন্দির খোলা হয়। নাট্যমন্দির একা শিশির ভাদুড়ী গড়েন নি; অনেক বন্ধুবান্ধব মিলে এটির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়; এই রকম আরও অনেক আছেন। আমাদের বাসনার এক অংশও পূর্ণ হয় নি। বিলাতীর অনুকরণের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে experiment-এর দরকার এবং তার জন্যে টাকা চাই; কিন্তু তা পাইনি। আগে বড়লোকদের কাছ থেকে অনেক ভরসা পেয়েছিলুম; ঐ পর্যন্ত। নাট্যমন্দির লিমিটেড করা হল, অথচ শেয়ার বিক্রী হল মাত্র সাতাশ হাজার টাকার। এই অবস্থায় থিয়েটার চালাতে গেলে যা হয় তাই হয়েছে—ঋণের সুদ ও বছরে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা বাড়ীভাড়া দিতে প্রাণ বেরুচ্ছে, অথচ লাভ—অর্থাৎ নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধি—হচ্ছে না একটুও। তাই ঠিক করা গেছে, দেনার অঙ্ক বাড়িয়ে আর কাজ নেই। এ সদভিপ্রায় এর আগেও বার দুয়েক হয়েছিল। কিন্তু কাজে তা পরিণত হয়নি। অনেকের ধারণা, টিকিট বিক্রী বাড়াবার জন্যে ও একটা চাল, তা নয়। আমাদের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল কতকটা Charles Dickens-এর নভেলের সেই ঘোড়াটার মত—"The horse is going to go, but not going." আমি থিয়েটারই করতে শিখেছি, ব্যবসা শিখিনি।

"যা হোক, আমি এখনও হতাশ হয়ে পড়িনি। আমার অন্তরে নাট্যভারতীর যে-মূর্তি সাধনার দ্বারা গড়ে তুলেছি, তাকে আমি দেখাবই দেখাব। আমার যথেষ্ট আশা আছে, আমার দেহপাতের পূর্বে আমি আপনাদের satisfaction-এর জন্য একটা-না-একটা-কিছু করবো। যাঁরা আমাদের থিয়েটার দেখেন, টিকিট কেনেন, অনুগ্রহ করেন, ভালবাসেন, তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ।"

উপরের ভাষণটি ইন্দ্র মিত্র রচিত সাজঘর থেকে উদ্ধৃত হল।

এরপর শিশিরকুমার দলের কিছু অভিনেতা-অভিনেত্রী নিয়ে আর্ট থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কয়েকটি নাটকে অভিনয় করলেন। তারপর এল আমেরিকাতে গিয়ে অভিনয় করবার আমন্ত্রণ। আমেরিকাতে শিশিরকুমারের অভিনয় সম্বন্ধে নানা ধরণের বিরূপ সমালোচনা হয়েছে এদেশে—কিন্তু যে সময় শিশিরবাবু ওদেশে যান, ভেতরে ভেতরে ইংরাজ এবং মার্কিনদের যে একটা বিরাট ষড়যন্ত্র চলেছিল ভারতীয়দের জগতের চক্ষে হেয় করবার, এ-কথাটা শিশিরকুমার আগে টের পাননি। এর কিছুকাল বাদেই ইংলণ্ডে ভারতীয়দের সঙ্গে রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স বসে—সুতরাং তাদের সৎ-ভাই মার্কিনীরা চেষ্টা করেছিল ভারতীয় শ্রেষ্ঠ অভিনেতার দলকে নিজেদের দেশে নিয়ে গিয়ে কলঙ্কমণ্ডিত করতে—জগতের কাছে প্রমাণ করতে যে ভারতীয়রা এখনও বর্বরের জাত, কৃষ্টির দিক থেকে তারা এখনও সমাজের অত্যন্ত নিম্নস্তরে রয়েছে—এ জাতির স্বাধীনতা পাবার কোন রকম যোগ্যতাই নেই। কিন্তু মার্কিনী রাজনীতিকদের এ ধরণের ষড়যন্ত্র ঠিকমত সাফল্য লাভ করলো না—তাদের চক্রান্তে শিশিরকুমারের আর্থিক ক্ষতি হল প্রচুর—কিন্তু তাঁর দলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বের হল ওখানকার সব কাগজে। কিন্তু এই আমেরিকার অভিনয় ব্যাপারের আলোচনার আগে আমাদের রঙ্গজগতে নাট্যমন্দিরের প্রযোজক শিশিরকুমারের বিরাট অবদানের কথাটা একটু আলোচিত হওয়া দরকার। এ আলোচনা অতি সুন্দরভাবে করেছেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'প্রযোজক শিশিরকুমার' প্রবন্ধে। এ প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত মণি বাগচি তাঁর 'শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার' বইটির পরিশিষ্টে তুলে দিয়েছেন। মূল রচনা ইংরাজীতে অনুবাদ করেছেন শ্রীনির্মলকুমার ঘোষ। শ্রদ্ধেয় রাখালদাসবাবু লিখেছেনঃ

প্রযোজক শিশিরকুমার

"শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অভিনয়দক্ষতা ঘরোয়া প্রশংসার সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। নাটক সম্পর্কে এদেশে যাঁহাদের অনুরাগ আছে তাঁহারা সকলেই তাঁহার অভিনয়-প্রতিভা অবগত আছেন। কিন্তু তাঁহার নাটক প্রযোজনা সম্পর্কে যথেষ্ট এবং বিস্তারিত আলোচনা হয় নাই। প্রযোজনার ক্ষেত্রে তিনি যে কয়টি বিষয়ে ঔৎকর্ষ দেখাইয়াছিলেন এই প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিব।

"সাধারণ দর্শকের নিকট বোধ হইতে পারে যে, নাট্যকার ও অভিনেতাদের উপরই নাটকের মঞ্চ-সাফল্য নির্ভর করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নাটককে মঞ্চস্থ করার সাফল্যে ইঁহাদের অবদান ততটা নহে।

"ভালো লেখক এবং সু-অভিনেতা অবশ্যই একটি সু-অভিনীত নাটকের পক্ষে অপরিহার্য, কিন্তু তাঁহারা যদি একটি দক্ষ প্রযোজকের দ্বারা পরিচালিত না হন, তবে ফল নৈরাশ্যজনক হইয়া উঠিতে বাধ্য। এক কথায় বলিনত গেলে বলিতে হয়, প্রযোজকই হইতেছেন নাট্যাভিনয়ের আদত মানুষ।

"বহুতর সীমা নিষেধের ভিতরে

থাকিয়া প্রযোজককে ভাবপ্রকাশ এবং শিল্পসম্মত উপস্থাপনের দ্বারা একটি কল্পনার পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হয়। নাটকের দুর্বল অংশগুলির সংশোধন ও পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে তাহাকে সঙ্গতিহীন বা আত্মবিরোধী বিষয়গুলিকে বাদ দিতে হয় এবং নূতন বিষয়সমূহ সন্নিবিষ্ট করিয়া অভিনয়ের পারম্পর্য রক্ষা করিতে হয়। প্রচলিত ভদ্রতা বোধের মাপকাঠিতে এবং আইনে শেষোক্ত পন্থা অবলম্বন নিষিদ্ধ। সুতরাং নাটকের সংশোধন শুদ্ধ আংশিক পরিবর্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিতে বাধ্য; বাংলা দেশের মঞ্চাভিনয়ে শিশিরকুমার ভাদুড়ী এ বিষয়ে পথিকৃতের গৌরবের অধিকারী। তাঁহার পূর্বে প্রযোজকরা ক্বচিৎ এই পন্থা অবলম্বন করিতেন এবং নাটকের এইরূপ সংশোধন করিলে দর্শকরা ধৈর্যচ্যুত হইত, কারণ তাঁহারা ঔৎকর্ষ অপেক্ষা নাটকের বিস্তৃত পরিধিই অধিকতর পছন্দ করিত। এ যুগের দর্শকদের শিল্পবোধের মাপকাঠির পরিবর্তন হইয়াছে, এখন পরিধি অপেক্ষা নাটকের ঔৎকর্ষই সমধিক আদৃত হইতেছে। এক একটি দৃশ্য যদি অবাস্তব বলিয়া মনে হয়, তবে বর্তমানকালের দর্শকরা পীড়িত হইয়া ওঠেন।

"নাটকের দৃশ্যবস্তু ও আনুষঙ্গিক চরিত্র পরিবর্জন ও সংশোধন ছাড়াও, শিশিরকুমার আরেকটি রীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। অঙ্ক ও গর্ভাঙ্কগুলির বিন্যাস পরিবর্তন করিয়া এবং একটি চরিত্রের উক্তি অন্য চরিত্রকে দিয়া বলাইয়া অথবা কোনও দৃশ্য বা অঙ্কের সামান্য এদিক-ওদিক করিয়া তিনি অভিনবত্ব দেখাইয়াছিলেন। ইহার ফলে নাটকের গতি ও পরিণতি সুসম্মত ও সরল হইয়াছে। নাটকীয় মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ও সঙ্গতির দিক দিয়া এই অভিনবত্ব যাদুকরী হইয়া উঠিয়াছে। এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, সর্বত্রই এইরূপ প্রয়োগরীতি নাটকের ঔৎকর্ষ সাধন করিতে পারে নাই। যতদিন অবধি নিখুঁৎ নাটক যথেষ্ট পরিমাণে রচিত না হইতেছে, ততদিন প্রযোজকের এইরূপ পরিমিতি ক্ষেত্রেই তাঁহার নৈপুণ্য দেখাইতে হইবে। মাত্র ইহাই নয়। কলাবিদগ্ধ অভিনেতা, অভিপ্রেত দৃশ্য ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত অর্থ-সংস্থানের অভাব এবং সর্বোপরি সমাজ-চেতনা—এই সমুদয়ই নাটক-প্রযোজকের কৃতিত্ব প্রদর্শনের পক্ষে প্রবল অন্তরায়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, শিশিরকুমারের পূর্বে দেব-দেবীদিগকে মানবীয় রীতিনীতির মাধ্যমে মঞ্চে দেখানো বিশেষ আপত্তিকর ছিল। কাল পরিবর্তিত হইয়াছে এবং সুষ্ঠু মনোভাব দেখা যাইতেছে; ইহা সুলক্ষণ।

সোনার আনারস

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

মূল্য ঃ দুই টাকা

কিশোর-কিশোরীদের উপযুক্ত রোমাঞ্চকর উপন্যাস। ছাপা, বাঁধাই চমৎকার।

উপহার দিবার মত বই

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

"প্রত্যেক নাটকেই একটি মূলবস্তু বিদ্যমান—কোনো একটি সমস্যার সমাধান এবং শেষ পরিণতির দিকে নাটককে অপসৃত করিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি নাট্য-চরিত্রের সহক্রিয়তা প্রয়োজন। অনাবশ্যক ও সঙ্গতিহীন কোনো চরিত্রকেই মঞ্চে উপস্থিত করা বিধেয় নহে। জগতের বৃহত্তর এই জীবনমঞ্চে উচ্চ, নীচ প্রত্যেক চরিত্রেরই স্থান আছে এবং জীবন অভিনয়ে তাহাদের প্রত্যেকেরই সহক্রিয়তার দ্বারা প্রতিদিকের অভিনয় সাধিত হইতেছে। এই সহক্রিয়তার মূল্য সম্পর্কে শিশিরকুমার সজাগ ছিলেন এবং জীবনের অভিনয় হইতেই তিনি নাট্য-অভিনয়ের প্রয়োজনারীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

"এক অভিনেতা যখন অন্য অভিনেতাকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য নিজেকে জাহির করিবার চেষ্টা করিতে থাকে তখনই সহক্রিয়তার মূল্য নিঃশেষ হইয়া যায়। শিশিরকুমার প্রত্যেক অভিনেতাকে বিশেষভাবেই পরখ করিয়া নিতেন এবং নাটকের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যে অভিনেতাকে নাটকের সাফল্যের দিক দিয়া প্রয়োজন, তাহাকেই সমধিক প্রাধান্য বিস্তার করিতে দিতেন। একটা দৃষ্টান্ত দিইঃ রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' নাটকে নাট্যকার ইন্দুমতীকে অন্যান্য চরিত্র অপেক্ষা বেশি প্রাধান্য দিয়াছিলেন: শিশিরকুমার কিন্তু কমলমণি ও ক্ষান্তমণিকে এমনভাবে অভিনয়ে নিযুক্ত করিলেন যে, তাহাদের অভিনয়ের ফলে ইন্দুমতীরই প্রাধান্য হইয়া উঠিল। যদি এই চরিত্র দুইটি প্রযোজকের নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করিয়া স্ব-স্ব প্রধান হইবার চেষ্টা করিত, তাহা হইলে সহক্রিয়তার কোনো মানেই হইত না। সহযোগী অভিনেতাদিগকে প্রত্যেক চরিত্রেই শিশিরকুমারের নাটকে উপযুক্ত প্রাধান্য দিতে দেখি। নাটকের গতি অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্যে তিনি সর্বদাই চরিত্রগুলির দুর্বলতা বিভিন্ন অভিনেতার অভিনয়ের ভিতর দিয়া সুসংহত ও সংশোধন করিয়া দিতেন। এই একটি দৃষ্টান্তেই বোঝা যাইবে যে, তিনি 'টিমওয়ার্ক' বা বিভিন্ন অভিনেতৃর সহক্রিয়তাকে কতোটা মূল্য দিতেন ও আগাইয়া নিয়াছিলেন।"

[রাখালদাসবাবুর বক্তব্যের টিম্-ওয়ার্কের কথাটায় এসে আপনা থেকেই সেই প্রখ্যাত সাপ্তাহিকের নাট্য সমালোচক শ্রীযুক্ত হ-য-ব-র-ল মহাশয়ের কথা মনে পড়ে গেল—পাঠকদের নিশ্চয় মনে আছে ইনি এঁদের সাপ্তাহিকে মন্তব্য করেছিলেন, শিশিরবাবু ভাল অভিনয় করতেন বটে, কিন্তু তাঁর দলের লোকেরা দলগত অভিনয় করতে জানতো না। মস্তিষ্কে ধূসর বস্তুর অভাব না থাকলে এ ধরণের মন্তব্য বোধ হয় কেউ করতে পারে না। তবে এ কাগজটির পক্ষে সবই সম্ভব। সম্প্রতি দেখছি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কুৎসায় উঠে-পড়ে লেগেছেন এই সাপ্তাহিকটি। পৃথিবীর সর্বকালের সেরা রাজনৈতিক নেতাদের ভেতর দেশবন্ধুর স্থান নির্দিষ্ট হয়ে থাকবে, যখন ভারতীয় কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সঠিকভাবে লিখিত হবে। সেই দেশবরেণ্য নেতাকে যে সাপ্তাহিকে হেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা হয় তাদের দ্বারা সবই সম্ভব। সুতরাং শিশির-প্রতিভা সম্বন্ধে এদের হ-য-ব-র-ল যে অবান্তর কথা লিখবে এটাই তো স্বাভাবিক!]

এরপর রাখালদাসবাবু লিখেছেনঃ

"নাটকের অভিনয়-সাফল্যে দর্শকদের সহযোগিতাও প্রচুর কার্যকরী হইয়া থাকে। অপ্রয়োজনীয় ও অসময়ে করতালি প্রদান দর্শক-বিশেষের ব্যক্তিগত উল্লাসের নিদর্শন হইতে পারে, কিন্তু তাহা অনেক সময়ে নাটকের গতি ব্যাহত করে। সীতার বনবাস যাত্রার পূর্বদৃশ্যে রাম ও সীতার বিদায় সময়ে যদি করতালি দেওয়া হয়, তবে সেই বিদায়-দৃশ্যের ঘনীভূত রসসৃষ্টি ব্যর্থ হইয়া পড়ে। আবার, সীতার পরিচারিকাদের কৌতুককর অভিনয়ে যদি দর্শক করতালি না দেয়, তবে সেই দৃশ্যও অকিঞ্চিৎকর হইয়া উঠে। অবশ্যই মঞ্চ এবং দর্শকদের মধ্যে একটি ফাঁকা জায়গা আছে। কিন্তু এই দূরত্বও এক-এক সময়ে, নাটকের সাফল্যের জন্য অতিক্রম করিতে হয়। শিশিরকুমার এক-এক সময়ে দর্শকদের কয়েকজনাকে মঞ্চে আহবান করিয়া নিতেন, কিন্তু তাহা নাটকের সাফল্যের জন্যই। "শেষরক্ষা" নাটকে বিবাহ বাসরের দৃশ্যে শিশিরকুমার এইরূপ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য দেশে নাটকে সমবেতকণ্ঠে গানের সময় দর্শকরাও অনেক সময়ে যোগ দিয়া থাকে।

[ক্রমশঃ]

রূপজগৎ

চলচ্চিত্রে সহযোগী সঙ্গীত

চলচ্চিত্রে সহযোগী সংগীত সম্পর্কে একটা অভিযোগ বরাবরই শোনা যায়। বনের মধ্যে পথশ্রান্ত পথিক বসে গান করছে, সেই গানের সহযোগী সংগীত বাজছে। তবলার চাঁটি থেকে পিয়ানোর শব্দ-তরঙ্গ শোনা যাচ্ছে। গান শুনতে হয়ত খারাপ লাগছে না, কিন্তু বাস্তবতার দিক থেকে প্রশ্ন উঠলে তার কোন জবাব নেই। পুরানো দিন থেকে থিয়েটারে-সিনেমায় এই রীতি চলে আসছে। চলচ্চিত্রে ও নাটকে বাস্তবধর্মী কাহিনী ও আঙ্গিক যোগ হয়েছে কিন্তু এই সনাতন রীতির পরিবর্তন হয় নি। হিন্দী ছবির ক্ষেত্রে এর কোন তুলনা নেই। পিয়ানো একোর্ডিয়ান থেকে নানা বিদেশী বাদ্যযন্ত্রের ঝঙ্কার শোনা যাবে বাথরুমে নায়িকার গানের সঙ্গে। তার জন্য শুধু হিন্দী ছবিকে দুষলে চলে না, বাংলা ছবিও এই অসংগতি থেকে মুক্ত হতে পারে নি।

বিশেষ করে বাংলা ছবির কথাই যদি বলা যায়, কাহিনীর দিক থেকে বাংলা ছবি অনেক বেশি বাস্তবধর্মী। ব্যক্তিজীবনের সমস্যা, সামাজিক সমস্যা থেকে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক, যুদ্ধ ও শান্তি, সমাজের উঁচু-নিচু মানুষের কথা ইত্যাদি অনেক বাস্তব বিষয় নিয়ে বাংলা ছবি তৈরি হচ্ছে, নাটক অভিনীত হচ্ছে। পুরানো ভাবধারা ও দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিচালকদের কথা ছেড়ে দিয়ে আধুনিক পরিচালকদের কথা যদি বলা যায় তবে তাঁরাও এ দোষ থেকে মুক্ত হতে পারছেন না। ছবিকে বাস্তবধর্মী করবেন, সমস্যা নিয়ে ছবিতে আলোচনা করবেন অথচ সংগীতের ক্ষেত্রে সেই পুরানো রীতিকে আঁকড়ে ধরে থাকবেন, কেবলমাত্র শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য। যেমন অগ্রগামীর ছবি। এঁরা ভাল ছবি করেন। এঁদের প্রত্যেকটি ছবিতে সমাজের বা ব্যক্তিজীবনের দোষ-গুণ দেখি। অথচ 'শঙ্খবেলা'-তে মাইথনে নৌকায় বসে নায়ক-নায়িকা যখন গান করছেন তখন সঙ্গে বাজছে যন্ত্রসংগীত। হ্রদের বুকে দু-জনের একান্তভাবে জীবন উপভোগে যদিও এই কৃত্রিমতা বাধা সৃষ্টি করে, কিন্তু পরিচালক অনেক খুঁটিনাটি ব্যাপারে নজর রাখলেও এই ব্যাপারে উদাসীন। এই ছবির আর একটি দৃশ্যে অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে, নায়িকা গান করছে, বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে বরষার গান হয়ত খুবই ভাল লাগত এবং বরষার পরিবেশকে ফুটিয়ে তুলতে পারত, কিন্তু সেখানেও বৃষ্টির শব্দকে অতিক্রম করে যন্ত্রসংগীত বেজে উঠছে। স্বভাবত যে স্বাভাবিক পরিবেশ রচিত হয়েছিল এবং রোমাণ্টিক মেজাজ এতে নষ্ট হল। একই ভাবে 'রাধা' নাটকে সংগীত গানগুলি যন্ত্র-সংগীতের ঝঙ্কারে স্বাভাবিক মাধুর্য হারিয়ে ফেলল। সেখানে পরিচালক আরো বাড়াবাড়ি করে টেপ রেকর্ড চালালেন, মঞ্চে দাঁড়িয়ে চরিত্রগুলি কেবল মুখ নাড়ল। প্লে-ব্যাক সংগীত সিনেমায় চললেও মঞ্চে অচল। মানুষ থিয়েটার দেখতে যায় অভিনেতা-অভিনেত্রীর শিল্পসৃষ্টিকে চোখের সামনে দেখতে। সুতরাং শিল্পীকে কেবল দেহ-সর্বস্ব রূপে দর্শকরা মেনে নিতে পারে না।

চলচ্চিত্রে গানের সঙ্গে সহযোগী যন্ত্রসংগীতের বাহুল্য সম্পর্কে রসগ্রাহী দর্শকরা অনেক মন্তব্য করেছেন। অনেক সমালোচক এ বিষয়ে লিখেছেন, কিন্তু প্রগতিশীল বা বাস্তববাদী বলে যাঁরা দাবি করেন তাঁরাও এই দোষ থেকে মুক্ত নন, কেবল-মাত্র সত্যজিৎ রায় ও ঋত্বিক ঘটক এ ব্যাপারে সত্যিই বাস্তববাদী। —সুজন।

'গবন' ছবির নায়ক সুনীল দত্ত

নাটকের কথা

এরিনা

মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সমাজের জীবন থেকে নাটক ক্রমে শ্রমজীবী মানুষের জীবনে প্রবেশ করছে। নাটকের জীবনধর্মিতায় এটা বিকাশের লক্ষণ। সমাজের বিভিন্ন অংশকে নিয়ে নাটক লেখা ও অভিনীত হচ্ছে। এতে যেমন আসছে বৈচিত্র্য, তেমন নাটকের দর্পণে সমাজের বিভিন্ন দিকের প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে।

সম্প্রতি মুক্ত-অঙ্গন মঞ্চে আমরা 'মাস' থিয়েটারের 'এরিনা' নাটক দেখলাম। এই নাটকটি প্রায় বৎসরকাল মাঝে মাঝে অভিনীত হচ্ছে এবং দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। সার্কাসের খেলোয়াড়দের জীবনকে কেন্দ্র করে নাটকের বিকাশ ঘটেছে। গত দুই বছর কাল বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে সার্কাস ও সার্কাসের জীবন বিষয়বস্তুরূপে দেখা যাচ্ছে। সম্ভবত তারই একটি পদক্ষেপ 'এরিনা'র মত নাটক। নাটকে সার্কাসের মালিক ও ট্রেনার, খেলোয়াড়, নারী খেলোয়াড় এবং তাদের নিয়ে মালিকের বিলাস ইত্যাদির সঙ্গে এসব খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত জীবন, সুখ-দুঃখ, প্রেম, বিবাহ, ব্যর্থতা এবং প্রতারণা এবং গ্লানিময় জীবনের জ্বালা ইত্যাদি প্রকাশ হয়েছে। তার সঙ্গে নিজেদের মধ্যে ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা, আবার সারল্য ও মনের উদারতা ইত্যাদিও রয়েছে। হাজার ভল্টের আলোতে দড়ির ওপর যারা ট্রাপিজের খেলা দেখিয়ে হাততালি নেয়, বাঘের মুখে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে অবাক করে দেয় অথবা মোটর সাইকেল বা ঘোড়ার খেলায় বাহাদুরী দেখায়, তাদের জীবনের ওপিঠ, অর্থাৎ আলোর পেছনের অন্ধকার দিক নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে।

যেসব বাহাদুরকে দেখে দর্শকরা হাততালি দেয়, তাদের জীবনকে জানার সুযোগ এই নাটকে আছে। আর সঙ্গে রয়েছে ধনতান্ত্রিক শোষণব্যবস্থা এখানে কিভাবে কার্যকরী হয়। মুনাফালোলুপতা কিভাবে অজগরের মত মানুষগুলিকে গিলে খায়। সার্কাসের মালিক প্রথম জীবনে ছিল বিপ্লবী। যুবশক্তিকে জাগাবার আদর্শ নিয়ে নাকি সে সার্কাস খুলেছিল। তারপরে মুনাফার লালসা তাকে পেয়ে বসল। অন্যকে বঞ্চিত করে সে হল বড়। ধনের সঙ্গে সঙ্গে তার আদর্শ ভেসে গেল, সে হল নারীদেহভোগী লম্পট। তার মুনাফা ও লাম্পট্যের পথে যাকে সে অন্তরায় মনে করেছে, তাকে সে খতম করে দিয়েছে ট্রাপিজের দড়ি ছিঁড়ে অথবা বাঘকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে। সে এক ভয়ঙ্কর ও হিংস্রতার কাহিনী। কিন্তু ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আছে। যারা মুখ বুজে এতদিন সহ্য করেছিল তাদের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ একদিন মুখোমুখী দাঁড়াবার সাহস করেছিল। মূলত সার্কাসকে কেন্দ্র করে হলেও থিয়েটার হতে আরও বৃহত্তর জগতে এর বক্তব্য প্রতিফলিত।

ঘটনা-বৈচিত্র্যের জন্য নাটকটি দেখতে ভালই লাগে। তবে দুই অঙ্কে নাটকের বক্তব্য ব্যক্ত হয়েছে। তাকে টেনে তিন অঙ্কে না নিলেও চলত। নাটকে বহু নারীচরিত্র। সার্কাসের খেলোয়াড়রূপে সর্ট-পরা অবস্থায় এঁরা মঞ্চে উপস্থিত। তাঁদের মধ্যে দীপিকা দাস এবং আরও অনেকে রয়েছেন, পেশা যাঁদের অভিনয়। পুরুষ অভিনেতাদের মধ্যে জ্ঞানেশ মুখার্জি, নিরঞ্জন রায় এবং আরও বহু চরিত্রের অভিনেতা রয়েছেন। নারী ও পুরুষ চরিত্রে প্রত্যেকের অভিনয় প্রশংসনীয়।

দৃশ্যসজ্জা ও সঙ্গীত প্রশংসার দাবি রাখে। নাটকটি পরিচালনা করেছেন জ্ঞানেশ মুখার্জি।

'হেঁয়ালী'র শিল্পীদের অভিনয়

গত ১৩ই নভেম্বর 'প্রবুদ্ধ সমিতি'র প্রযোজনায় 'হেঁয়ালী'র শিল্পীরা প্রথমে সুনীল দত্তর 'দোলা' ও পরে বিমল রায়ের 'অন্তরালে' নাটক দু'টির অভিনয় পরিবেশন করেন। অভিনয়ে প্রথমেই নাম করতে হয় 'পাগল' ও 'মিঃ মিত্র' এবং 'গৃহকর্তা'-রূপী যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও জগন্নাথ ভট্টাচার্যের। এরপর আসে 'পাঁচু'রূপী বিমল রায়। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেন তাপস কুন্ডুচৌধুরী, বিজন বসু, প্রণব চক্রবর্তী, বাবলু বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুমারী আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীতাংশে সমীর শীলের বেহালার সুর ভাল লাগলো। আলোকসম্পাতে সুজিত দত্ত প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। নাটকের শেষে মূকাভিনয় প্রদর্শন করেন বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য।

দিলীপ নাগ পরিচালিত 'বধূবরণ' ছবিতে অজয় বিশ্বাস, ভারতী দেবী, জীবেন বসু ও প্রদীপকুমার।

দি পাপেটস

কলকাতায় একদল উৎসাহীর উদ্যোগে 'দি পাপেটস' নামে একটি সংস্থা পরিচালিত হচ্ছে। এঁদের তৈরি ছবি 'হট্টগোল বিজয়' ১৯৬১ সালের রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ করেছে। ১৯৬০ সালে উদয়পুরে অনুষ্ঠিত সারা ভারত পাপেট ফেস্টিভ্যালে এই সংস্থা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। নিজেদের উৎসাহকে সম্বল করে এই সংস্থা গত চোদ্দ বছর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে—বর্তমানে এমন এক অবস্থায় এসেছে—যা পশ্চিমবঙ্গের পুতুল নাচের জগতে কেবল নয় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক গর্বের জিনিস। বাংলায় এবং ভারতের নানা রাজ্যে পাপেট এক প্রাচীন আনন্দ মাধ্যম, আমাদের দেশে যা পুতুল নাচ নামে পরিচিত। কিন্তু উপযুক্ত শিল্পদৃষ্টি, বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা, আলো প্রক্ষেপণ এবং কলাকৌশলের আধুনিকতম পদ্ধতি সম্পর্কে পুতুল নাচওয়ালাদের সম্যক জ্ঞান না থাকায় আমাদের দেশের পুতুল নাচ গ্রাম্যতার বাইরে আসতে পারে নি। অথচ রাশিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশে পাপেট এমন শিল্পময় ও সুন্দর হয়ে উঠেছে যে সারা বিশ্বের এক সাংস্কৃতিক সম্পদরূপে তা গণ্য হচ্ছে। এই পুতুল খেলা বুদ্ধিদীপ্ততে এত উজ্জ্বল যে তা আর ছোটদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বড়দের কাছেও তার আকর্ষণ প্রবল।

কলকাতায় 'দি পাপেট'-এর উদ্যোক্তাদের মধ্যে রয়েছেন শিল্পী রঘুনাথ গোস্বামী প্রমুখ কয়েকজন। কলাকৌশল ও প্রদর্শন-রীতিতে এঁরা আধুনিক। গত ১৪ই নভেম্বর এঁদের একটি অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ হয়েছিল থিয়েটার সেন্টারে। ছোট হলে শিশুদের পাশে বসে বড়দের এই অনুষ্ঠান দেখতে বড় ভাল লেগেছে। প্রথমে ছোট্ট এক পুতুল নর্তকী মঞ্চে এসে নাচের মধ্যে সবাইকে অভিবাদন জানিয়ে গেল। তার পরে এল ম্যাজিসিয়ান। পুতুলের রাজ্যের ব্যাপার আলাদা—পুতুল ম্যাজিসিয়ান আর এক পুতুলের মাথা ব্যথার রোগ সারাবার জন্য মাথাটা কেটে তাতে আর একটি মাথা বসিয়ে দিল। নকু পাকড়াশী এসে যা বেহালা বাজালো তা শুনে ছেলেরা হেসেই খুন। তিনটি শুয়োরের ছানা এক নেকড়েকে কেমন জব্দ করেছিল তারই এক মজাদার কাহিনী 'কেমন জব্দ'। 'রাবণের চিকিৎসা' আরো মজার। রাবণের রোগ সারাবার জন্য পূর্ববঙ্গের এক কবিরাজকে ডেকে আনা হয়েছে। রাবণের দশটি মাথা আর ২০টি হাত থাকায় কবিরাজ তো ৮০ টাকা ফি দাবি করে বসল। সবার শেষে দেখান হল 'আগডুম বাগডুম'। এটা 'দি পাপেট'-এর সর্বাধুনিক প্রচেষ্টা। 'আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে' ছড়াটিকে অবলম্বন করে—পুতুলের এই খেলা তৈরি হয়েছে। তবে এখানে কিছু পরিবর্তন আছে। এই যুগটা তো বুঝতে হবে। তাই ছড়ার পুতুলরাও বিগড়ে বসল। ঢুলি বলল আমি যে কতকাল থেকে বাজাচ্ছি, টাকা

'তিসরি কসম' ছবির একটি দৃশ্যে রাজকাপুর ও ওয়াহিদা রহমান

[illegible] পাপেটস-এর 'আগডুম-বাগডুমে' পুতুল নাচের একটি চরিত্রে [illegible]

না দিলে বাজাব না, আগডুম-বাগডুম-ঘোড়াডুম বলল আমরাও না। একটি মেয়ে এল উত্তেজিত হয়ে—মায়ে-ঝিয়ে ঝগড়া করে কথাটার প্রতিবাদ জানাতে। তার পরে সূর্যিমামা এসে সব মীমাংসা করে দিল। পুতুলদের এই খেলা ছোটদের যেমন-তেমন, বড়দেরও আনন্দ দিয়েছে।

'দি পাপেট'-এর আগের পুতুলের তুলনায় আগডুম-বাগডুমের পুতুলগুলি বড়। তাই দেখতে ভাল লেগেছে। 'দি পাপেট' ধীরে ধীরে পুতুলগুলিকে বড় করলে খেলা বেশি উপভোগ্য হবে। এই সঙ্গে পুতুলের সংলাপ আরো ছোট ছোট সরল কথায় হলে ভাল। রাবণের চিকিৎসায় কিছু কথা ছোটদের বুঝতে অসুবিধা হতে পারে। আলোর দিকটাও আর একটু নজর রাখা উচিত। আরো উজ্জ্বল আলো—অথচ বর্ণালী হলে ভাল হবে মনে হয়।

'দি পাপেট' ৬ নম্বর হেস্টিংস স্ট্রীটে ছোট্ট একটি পাপেট থিয়েটার করেছে, যার নাম দিয়েছে পুতুলপুরী। পুতুলের এই খেলা প্রত্যেকটি ছুটির দিনে নিয়মিত-ভাবে যাতে দেখান যায় তার ব্যবস্থা 'দি পাপেট' করছে। এ ব্যবস্থা হলে পশ্চিম বাংলার সংস্কৃতির ও শিশুদের আনন্দদানের ক্ষেত্রে আর একটি নতুন সংযোজনার জন্য তাঁরা ধন্যবাদভাজন হবেন।

স্টুডিও খবর

গুপী গায়েন-বাঘা বায়েন

সত্যজিৎ রায় তাঁর ছবির প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তাঁর আগামী ছবি 'গুপী গায়েন-বাঘা বায়েন' নির্মাণের প্রেরণার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেনঃ "এটা আমি তুলছি আমার এগার বছরের ছেলেকে খুশি করতে। ওর মতে, ওর বাবার ছবি খালি দুঃখের; তাই ওর ইচ্ছেঃ ঠাকুর্দার লেখা ছোটদের একটা রূপকথা নিয়ে যেন আমি ছবি তুলি। এটা হবে গানে ভর্তি ফ্যানটাসী; দেব-দৈত্য গাইয়ে বিদুষক পাত্র-পাত্রী; দুটো জাতির মধ্যে ওরা যুদ্ধ থামাবার চেষ্টা করছে। একটা ভাল রাজা, একটা খারাপ রাজা; মহামারীতে দুজনাই বোবা হয়ে এক অজানা ভাষায় কথা বলে। এটা হবে আমার নিরীক্ষামূলক ছবি। অনেক টেকনিক্যাল এফেক্ট থাকবে। উড়ন্ত স্লিপারের দৌলতে সারা ভারত ভ্রমণ আছে। ছবির কিছু অংশ তোলা হবে হেলিকপ্টারে, যেখান থেকে ছবির নায়করা নামবে মোঘল প্রাসাদে, মহারাজদের দুর্গে, ঐতিহাসিক কেল্লায়, এবং তাজমহলে, তবে নিস্তব্ধ ফতেপুরসিক্রী আমার বেশি পছন্দ। লোকেশন আমি ঠিক করে রেখেছি, প্রয়োজনীয় অনুমতিও জোগাড় হয়ে গেছে" ('ফিল্ম' পত্রিকা থেকে)।

সত্যজিৎ রায়ের 'গুপী গায়েন-বাঘা বায়েন'-এর প্রযোজক আর, ডি, বনশাল। ছবিটি ভারতে ফ্যানট্যাসী চিত্রের ক্ষেত্রে এক নতুন পদক্ষেপ। এই ছবিতে প্রধান দুটি ভূমিকায় যাঁরা অভিনয় করবার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের একজন হলেন দৈনিক বসুমতীর সম্পাদকীয় বিভাগের শ্রীজীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ছাত্র আন্দোলনের কর্মী থেকে তিনি সাংবাদিকতায় এসেছেন। শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় সাংবাদিকতায় তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এবার আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন চলচ্চিত্র স্রষ্টা শ্রীসত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় তিনি চলচ্চিত্র অভিনয় জীবনে প্রবেশ করছেন। বাঘা বায়েনের চরিত্রে অভিনেতা শ্রীরবি ঘোষের নাম শোনা যাচ্ছে।

এই ছবির জন্য শ্রীসত্যজিৎ রায় নিজেই সাতটি গান রচনা করেছেন। গানগুলি রচনার দিক দিয়ে সরস। বোম্বাইয়ের কিশোরকুমারের নাম শোনা যাচ্ছে গানের প্রসঙ্গে। এক প্রবাসী বাঙালী তরুণকে নাকি নির্বাচিত করা হয়েছে বাকি গানের জন্য। এই তরুণ অপূর্ব সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী।

বিদেশী ছবিতে রবিশংকরের সুর

সুরশিল্পী পণ্ডিত রবিশংকর লুই ক্যারলের বিখ্যাত 'অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডার-ল্যাণ্ড' ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। 'অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড' বাংলায় 'আজব দেশে অমলা' নামে অনুদিত হয়েছে। বি. বি. সি টেলিভিশন ফিল্ম ছবিটির প্রযোজক। ভারতীয় পদ্ধতিতে ছবির সুর সংযোজনায় ভিক্টরীয় যুগকে প্রকাশ করতে পারবে এবং জনসাধারণের চিত্ত জয় করবে বলে প্রযোজকের বিশ্বাস।

জালিয়ানওয়ালাবাগ

গত ১৮ই নভেম্বর সকাল দশটায় ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে সন্ধ্যাদীপ চিত্রমের প্রথম ছবি 'জালিয়ানওয়ালাবাগ'-এর মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দণ্ডকারণ্য রিক্রিয়েশন ক্লাবের নাটক

দণ্ডকারণ্য রিক্রিয়েশন ক্লাবের দুর্গা-পূজা ও দীপান্বিতা উপলক্ষে ব্যবস্থাপনায় ডাঃ সুধীরঞ্জন দাশগুপ্তের পরিচালনায় পার্থপ্রতিম চৌধুরী রচিত "চার দেয়ালের গল্প" এবং শ্রীমুকুল বিশ্বাসের পরি-চালনায় পরীক্ষিৎ রচিত 'অন্তরঙ্গ' নাটক দুটি যথাক্রমে ২৬শে অক্টোবর ও ১২ নভেম্বর মঞ্চস্থ হয়েছে। নাটক দুটির অভিনয়ে অংশ নিয়েছেন, পুষ্প সাহা, অলকা বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপ্তি ভট্টাচার্য, বীথিকা বন্দ্যোপাধ্যায়; কেশব রায়, মুকুল বিশ্বাস, সুধীরঞ্জন দাশগুপ্ত, হরিশ বিশ্বাস, আশুতোষ ভট্টাচার্য, বিজয়কৃষ্ণ পাল, আর, এস মজুমদার, রমাপ্রসাদ চৌধুরী, কাশীনাথ ঘোষ, কল্যাণ ব্যানার্জী, সমীর সেনগুপ্ত, অনিল ঘোষ, অমল গোস্বামী, তুষার বিশ্বাস, তরুণ চ্যাটার্জী, ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী ও মাস্টার নান্টু।

'লবকুশ' ছবির একটি দৃশ্যে মাঃ সুশোভন, মাঃ শঙ্কর ও শঙ্করনারায়ণ

সংগীত কথা

মণিপুরী নৃত্যানুষ্ঠান কৃষ্ণলীলা

গত ১৭ই নভেম্বর সন্ধ্যায় রবীন্দ্র-সদনে কলকাতার সংস্কৃতি অনুরাগীদের এক দুর্লভ অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ হয়েছিল। যাঁরা এই অনুষ্ঠান দেখেছেন তাঁদের কাছে সেদিনের সন্ধ্যা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। মণিপুর থেকে এসেছিলেন নৃত্যশিল্পীদল। নৃত্যগুরু আমোবা সিংহের নেতৃত্বে ইম্ফলের জহরলাল নেহরু মণিপুর ড্যান্স একাডেমির শিল্পীরা 'কৃষ্ণলীলা' নৃত্য পরিবেশন করলেন। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করলেন শ্রম ও প্রচারমন্ত্রী শ্রীবিজয়সিং নাহার। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমতী অমলাশঙ্কর। শ্রীমতী শঙ্কর মঞ্চে গুরু অমোবা সিংহের পদধূলি গ্রহণ করে তাঁর ভাষণে বললেন, যতদিন গুরু অমোবা সিং বেঁচে আছেন ততদিন মণিপুরী নৃত্যে বিশুদ্ধতা থাকবে। তিনি নিশ্চয় এমন ছাত্র রেখে যাবেন যাঁরা মণিপুরী নৃত্যকে বিকৃত হতে দেবেন না।

মণিপুর বৈচিত্র্যময় নৃত্যের দেশ। লোকনৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণালী পোশাক আর বাদ্য—মণিপুরী নৃত্য ঝলমলময়। বৈষ্ণব ধর্মমতে মণিপুরীদের বিশ্বাসের সঙ্গে এই নৃত্য ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে নৃত্যের রূপ গ্রহণ করে অপরূপ হয়ে উঠেছে। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ নৃত্যের মধ্যে মণিপুরী নৃত্য অন্যতম, এবং বিশিষ্ট। এই বৈশিষ্ট্য ১৭ তারিখের সন্ধ্যায় প্রতিটি দর্শক অনুভব করে তৃপ্ত হয়েছেন। প্রথমে লাইহারবা বা পূজার্চনার নৃত্য দিয়ে অনুষ্ঠান সুরু। রাধাকৃষ্ণ মূর্তিকে সামনে রেখে পূজারিণীর অর্চনা, প্রাণের আকুতি এবং লোকোৎসবে এই নৃত্যের সমাপ্তি। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, গোষ্ঠে গমন এবং সুবিখ্যাত রাস নৃত্যে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটেছে। রঙে, রসে, ভক্তিতে ও প্রাণোচ্ছ্বাসে এই নৃত্য অপূর্ব। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান মন্দির-চত্বরে অন্তরে ভক্তিভাব নিয়ে যেভাবে সকলে অংশ গ্রহণ করে থাকেন, সেই ভক্তিভাব নিয়ে মঞ্চে নৃত্য পরিবেশিত হয়েছে। দর্শকদের মনোরঞ্জনের দিকে লক্ষ্য রেখে নৃত্যকে কোথাও বিকৃত করা বা লঘু করা হয় নি। নৃত্যের ভাব বর্ণনায় দর্শকরা আত্মিক দিক থেকে তৃপ্ত হয়েছেন। এক পবিত্র আনন্দে প্রাণ-মন ভরে তুলেছে।

একটি লোকনৃত্য এই সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে। গোষ্ঠীজীবনের জঙ্গী ভাব ও একাগ্রতা এই নাচে প্রতিফলিত। তিনজন শিল্পী মৃদঙ্গ বাদ্য ও সেই সঙ্গে নৃত্যে দেহের যে লালিত্য ও নমনীয়তা দেখিয়েছেন তাতে দর্শকমাত্রেই বিস্মিত। কঠিন সাধনার ফলেই এরূপ নৃত্য ও বাদ্য সম্ভব। এই নৃত্যানুষ্ঠানে আর একটি মনোমুগ্ধকর জিনিস আবহসঙ্গীত। বাঁশী, পাখোয়াজ, মৃদঙ্গ, ঢোলক, মন্দিরা ও তারযন্ত্র সহযোগে মধুর এই সংগীতের সুর যেন অনুষ্ঠান শেষেও কানে লেগেছিল। সেই সুমধুর সুরমূর্ছনায় মন অভিভূত হয়ে পড়েছিল।

এমন সুন্দর নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রশংসনীয়। কিন্তু এই পবিত্র নৃত্যানুষ্ঠানের রস গ্রহণে প্রবল বাধা সৃষ্টি করেছে তাঁদের নিয়োজিত আলোকসম্পাতকারী। অনর্থক রঙ-বেরঙের আলো দিয়ে শিল্পীদের অভিব্যক্তি উপভোগে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। পেছনে অর্থহীন ছায়াপাত করে এমন স্বাভাবিক নাচে অস্বাভাবিক পটভূমি রচনা করা হয়েছে। পর্দায় প্রতিফলিত অস্বাভাবিক যমুনার তরঙ্গের সঙ্গে তরঙ্গ সৃষ্টিকারীর হাত দেখা যাওয়া হাস্যকর শুধু নয়, বিরক্তিকর ব্যাপার। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যবস্থাকারীরা এরূপ নাচে কেন যে এক আনাড়ী আলোকসম্পাতকারীকে জুড়ে দিলেন আমরা বুঝলাম না। অথচ তাঁরা একটি নৃত্য-সূচী ছাপাবার জন্য অর্থব্যয় করতে পারেন নি। বিদেশী দর্শকদের জন্য যার বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

স্বনামধন্য কথাশিল্পী

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

স্বর্গাদপি গরীয়সী (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড), দৈনন্দিন ও বসন্তে।

মূল্য : ৩·৫০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

অলকানন্দা এণ্টারপ্রাইজের 'ফিরে চল' ছবির পরিচালক ও নায়ক অতনুকুমার

পাঠক মন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ এবং তৎসংশ্লিষ্ট গবেষণা কেন্দ্রের সম্পর্কে আমাদের কোনও অভিযোগের (সাপ্তাহিক বসুমতী, ২০শে অক্টোবর) সন্তোষজনক উত্তর শ্রীঅজিত দত্ত মহাশয় (সাপ্তাহিক বসুমতী, ৩রা নভেম্বর) দিতে পারেন নি।

তাঁর অবগতির জন্য জানাই যে কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত তিনটি ইউ-জি-সি সেমিনারের মধ্যে দুইটিই ডঃ রায় অধ্যক্ষ থাকাকালীন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সুতরাং ঐগুলি আয়োজন করার কৃতিত্ব ডঃ রায়ের। মাসিক সেমিনারগুলিতেও আজ অবধি কোনও উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয় নি। আজ অবধি বাইরের কোন্ কোন্ পণ্ডিত এই সেমিনারগুলিতে আলোচনায় যোগদান করেছেন জানতে পারি কি?

আশুতোষ বিল্ডিং থেকে 'দূরে' নয়, একটু কাছে গেলে দত্ত মহাশয় নিজেই বুঝতে পারতেন কেন্দ্রে গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ আছে কিনা। যাঁরা এই কেন্দ্র ছেড়ে গেছেন তাঁরা সকলে আরও ভাল সুযোগ পেয়েছেন বলে চলে যান নি। ওখানকার পরিবেশ থেকে মুক্তিই তাঁদের প্রধান কাম্য ছিল। দত্ত মহাশয় তাঁদের সঙ্গে এই বিষয়ে পত্রালাপ করতে পারেন। তাঁদের ঠিকানা বোধহয় কেন্দ্রের কার্যালয়ে আছে।

শিক্ষক ছাত্রের নিবিড় সম্পর্ক, পরিচালনাধীন গবেষণার সাফল্যের পক্ষে যা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়, তা যে কেন্দ্রে নেই ছাত্র-ছাত্রী সাসপেন্ডের ঘটনাই তা প্রমাণ করে দিয়েছে। দত্ত মহাশয় বোধহয় স্বীকার করবেন যে কাউকে সাসপেন্ড করবার আগে (পরে নয়) তাকে, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ খণ্ডনের সুযোগ দেওয়া উচিত। কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এই শিষ্টাচার সরকারী বেসরকারী যে কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী পেতে পারে না কি? দুঃখের বিষয় ঐ ছাত্র বা ছাত্রীর প্রতি সৌজন্যটুকুও দেখানো হয় নি।

ঐ ছাত্র ও ছাত্রীকে সাসপেন্ড করার ঔচিত্য সম্পর্কে বিচারের জন্য যে কমিটি নিয়োগের পরিকল্পনার কথার উল্লেখ আমরা করেছি, তা সত্য কিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দত্ত মহাশয় সে সম্পর্কে খোঁজ নিতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রেরিত ব্যক্তির মন্তব্যের কথা আমরা নির্ভরযোগ্য মহল থেকেই জেনেছি।

দত্ত মহাশয় কি প্রমাণ করতে পারেন যে, ভৌগোলিক অভিধান সম্পর্কে সংকলিত তথ্যাদি বর্তমান অধ্যক্ষের বাড়িতে রাখার আগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ও ইউ-জি-সি-এর লিখিত সম্মতি নেওয়া হয়েছিল? কোন শৌখিন ভারততত্ত্ববিদ বহুদিন থেকে কেন্দ্রের অধ্যক্ষপদ পেতে ইচ্ছুক বলে দত্ত মহাশয় শুনেছেন। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বা সংশ্লিষ্ট কেউ এ ধরণের গুজবই অদ্যাবধি শুনেছেন বলে জানি না। উপরন্তু কেন্দ্রের বয়স মোটে কিছু বেশি ২ বছর সুতরাং দত্ত মহাশয়ের কথা সত্যি হলে বলতে হবে ঐ শৌখিন ভদ্রলোক কেন্দ্রের জন্ম থেকেই তার কেন্দ্রের অধ্যক্ষ পদপ্রার্থী।

কিছুকাল আগে আমরা বঙ্গদর্শনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ সম্বন্ধে আমাদের নিজস্ব অনুসন্ধানলব্ধ তথ্যাবলীর ভিত্তিতে যে বক্তব্যগুলির প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম, কতিপয় ব্যক্তি নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে সেগুলির যথার্থতা নির্ণয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাদের বক্তব্যসমূহের সমর্থনে ও অসমর্থনে চিঠিপত্রে পরস্পরের উদ্দেশ্যে সমানে যেভাবে কাদা ছোড়াছুড়ি করে চলেছেন তাতে সমগ্র বিষয়টিই এমন কদর্য হয়ে উঠেছে যে এই বিষয়ে 'পাঠক-মনে' আরও চিঠিপত্র ছাপা থেকে আমরা বিরত থাকব। —সম্পাদিকা

কিন্তু কই ডাঃ রায়ের অধ্যক্ষতার সম্পর্কে কাউকেও কোন কুৎসা রটনা করতে শুনি নি। তবে কি দত্ত মহাশয়ের এই অভিযোগ কাল্পনিক?

হওয়াই সম্ভব। কারণ দত্ত মহাশয় কোনও এক বিশেষ শ্রেণীর মুখপাত্র হিসেবে নিজের পরিচয় আরেক স্থলে দিয়ে ফেলেছেন। বর্তমান অধ্যক্ষের দুইখানি বইকে তিনি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে দাবি করেছেন। সে দাবি আমরা স্বীকার করি। তবে সন্দেহ হয় দত্ত মহাশয় প্রথম বইখানি আদৌ চোখে দেখেছেন কিনা। কারণ বইখানির নাম তিনি ভুল লিখেছেন। মনে হয় কোন মহলকে খুশি করবার জন্য তিনি প্রশংসার আতিশয্য দেখাচ্ছেন।

বর্তমান অধ্যক্ষের পাণ্ডিত্যকে কটাক্ষ করি নি। তিনি অতুলনীয় বা অসাধারণ পণ্ডিত বলে যে দাবি করা হয়েছে, তার যৌক্তিকতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছি মাত্র।

তাঁর পাণ্ডিত্যের সমালোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্যও নয়। আমাদের অভিযোগ শুধু বিভাগ ও কেন্দ্র সম্পর্কিত তাঁর কার্যপদ্ধতির বিরুদ্ধে। তিনি যদি তাঁর কার্যপদ্ধতির ধারা পরিবর্তন করতে পারেন, তবে অভিযোগের কিছু থাকবে না।

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের জনৈক শুভানুধ্যায়ী

* * *

আমাদের মত সাধারণ মানুষেরা মনে করে যে, সদিচ্ছা থাকলে যে কোন সমস্যারই সমাধান বোধ হয় অসম্ভব নয়, কিন্তু যাঁরা ডায়ালেকটিকসের রঙীন চশমা দিয়ে জগতকে দেখেন তাঁদের কেতাবে সদিচ্ছা নামক শব্দটি একেবারেই অনুপস্থিত; কেন না ওটা কোন বস্তুর পর্যায়ে পড়ে না। ইতিহাস-নির্ধারিত যন্ত্র হিসাবে যাঁরা চূড়ান্ত বিপ্লবের পথে দেশকে নিয়ে যাবেন—তাঁদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন কথাই থাকতে পারে না, বিশেষ করে ওই সব অ্যাবস্ট্রাক্ট কথাগুলি যখন তাঁদের অভিধানে নেই।

আরও একটি কথা এই আলোচনার প্রারম্ভে মনে রাখতে হবে। যাঁদের নিয়ে আমরা কথা বলছি তাঁরা আন্তর্জাতিকতাবাদী হলেও একটি বিষয়ে ঘোরতর জাতীয়তাবাদী। অর্থাৎ বিশুদ্ধ ভারতীয় যার অকাট্য প্রমাণ তাঁদের একটি আচরণে—খাঁটি ভারতীয়ের মতই তাঁরা দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে বড় ভালবাসেন, অপরের ঘাড়ে দোষের বোঝা চাপিয়ে দিতে তাঁরা বড়ই সিদ্ধহস্ত, কোনরকম চক্ষুলজ্জায় তা বাধে না।

এঁরা আরও একটি বস্তুতে বড় বেশি আস্থাশীল, সেটা হচ্ছে তাঁরা নিজেরা যা ভাবেন সেটাই একমাত্র সত্য এবং যারা তাঁদের সমালোচনা করবে, তা যতই যুক্তিনিষ্ঠ হোক না কেন, শুধু মিথ্যাই নয়, স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত। যখন এঁরা অবিভক্ত ছিলেন তখন যারাই এঁদের সিদ্ধান্তের বিপক্ষে গেছে বা সমালোচনা করেছে তারা সবাই ছিল বুর্জোয়াদের দালাল, এখন হাঁড়ি আলাদা হয়ে যাবার পর, যদি কারো কথা বামেদের বিপক্ষে যায় তবে সেই ব্যক্তি নির্ঘাৎ শোধনবাদী অথবা শোধনবাদীদের দালাল, অনুরূপ অবস্থায় ডানেরা কি বলেন সেটা আমার জানা নেই, তবে কিছু একটা বলেন নিশ্চয়ই।

মার্কস ও লেনিনের নামাবলী এঁদের উভয় তরফের শ্রীঅঙ্গে জড়ানো, নিজ

ও লেনিনের রচনাবলী উদ্ধৃত করতে সিদ্ধহস্ত। দেশে যা কিছু ঘটনা ঘটে সেগুলির সমস্তই এ'দের কাছে ঐতিহাসিক তাৎপর্য বহন করে আনে এবং সমস্ত কিছু থেকেই তাঁরা বিশেষ ইঙ্গিত পান।

এই উভয় তরফই হচ্ছেন দেশের বামপন্থী শক্তির বড় শরিক। জনসাধারণের কিছুটা অংশের উপর এ'দের প্রভাব আছে। অবশ্য দু'তরফের প্রভাব সমান নয়, কিছুটা উনিশ-বিশ।

এ'রা ছাড়া বামপন্থীদের মধ্যে আরও কয়েকটি মার্ক্সবাদী দল আছেন। এ'দের বরং আমরা অকুলীন কমিউনিস্ট বলতে পারি। এ'রা যখন বড় দুই তরফের যে কোন এক তরফের অভিভাবকত্ব মেনে নিতে রাজী থাকেন তখনই তাঁরা সেই তরফের নিকট প্রগতিশীল এবং অপর তরফের নিকট প্রতিক্রিয়াশীল বলে গণ্য হন।

এ ছাড়া আছেন কয়েকটি অ-মার্ক্সবাদী কংগ্রেস বিরোধী দল, যথা সংযুক্ত সোসালিস্ট পার্টি, প্রজা সোসালিস্ট পার্টি, বাংলা কংগ্রেস, লোকসেবক সঙ্ঘ ইত্যাদি। এ'রাই হচ্ছেন মোটামুটি কংগ্রেস-বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং এ'দের মধ্যে এক পি. এস. পি. ছাড়া আর সকলেই আগামী নির্বাচনে বামপন্থী ঐক্য ও বিকল্প সরকারের শ্লোগান ধরেছিলেন।

তার পরের ইতিহাস সকলেই জানেন। যাঁরা 'ক্ষেতে কিষাণ কলে মজুর এক হও জোট বাঁধ' এই শ্লোগানে একদা আকাশ-বাতাস মুখরিত করেছিলেন—তাঁরা নিজেরাই এক হবার যে নমুনা দেখালেন তা চিরকাল পশ্চিমবঙ্গবাসীর নিকট হাসির খোরাক হয়ে থাকবে।

কারুর উপর বিশ্বাস রাখা পাপ নয়। বামপন্থী দলগুলির উপর জনসাধারণ যদি বিশ্বাস রেখে থাকেন তাহলে তাঁরা অবশ্যই কোন পাপ করেন নি। কিন্তু এবার বামপন্থীরা যে খেল্ দেখালেন, তা দীর্ঘকাল অনেকেরই মনে থাকবে। এবারেই প্রমাণিত হয়েছে শাসকদলের সঙ্গে বামপন্থীদের মূলগত চরিত্রের কোনই প্রভেদ নেই, দেশের স্বার্থের চেয়ে এ'রা সবাই দলের স্বার্থকে বড় করে দেখেন।

ফেব্রুয়ারী-মার্চের খাদ্য-আন্দোলন আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছিল যে কংগ্রেসী অপশাসনের হাত থেকে জনসাধারণকে রেহাই পেতে হলে একটি বিকল্প বামপন্থী সরকার গঠন করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন, এবং যাতে আগামী নির্বাচনে কংগ্রেস সংখ্যালঘু দলে পরিণত হয় তার জন্য বিভিন্ন বামপন্থী দলগুলির মধ্যে একটা পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রয়োজন।

অবশ্য এই জাতীয় চিন্তার মনোগলি আমাদের ছিল না। সেই সময় থেকেই কয়েকটি রাজনৈতিক দলও এই একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট, ফরোয়ার্ড ব্লক, আর. এস. পি, বাংলা কংগ্রেস ইত্যাদি। পি. এস. পি. কোনদিনই বামপন্থী ফ্রন্ট গঠনে বিশেষ উৎসুক ছিলেন না, এই কারণে তাঁরা আমাদের তীব্র সমালোচনার পাত্র হয়েছিলেন।

এইবার বাম কমিউনিস্টদের কথায় আসা যাক। খাদ্য আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবে তাঁরা আটক অবস্থা থেকে মুক্তিলাভ করবার পর জনসাধারণের চোখে কিছুটা মর্যাদার আসন লাভ করেছিলেন। জনসাধারণ এটাই আশা করেছিলেন যে কারামুক্তির পর বাম কমিউনিস্টরা পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী আন্দোলনকে জোরদার করবেন। কিন্তু বাম কমিউনিস্টদের তিনজন নেতা প্রথমেই ঘোষণা করলেন যে আসন্ন নির্বাচনে তাঁরা একাই লড়বেন এবং কোনরকম সমঝোতাতেই তাঁরা আসতে রাজী হলেন না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাঁদের মনোভাবের কিছুটা পরিবর্তন হয়েছিল, যখন তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁদের একতরফা ঐক্য-বিরোধী মনোভাব জনসাধারণ মেনে নিতে পারছেন না। এই বিষয়ে তাঁদের চরম শিক্ষা ঘটল বিধান পরিষদের একটি উপনির্বাচনে তাঁদের প্রার্থীর শোচনীয় পরাজয় দেখে। তখন তাঁরা অনুভব করলেন যে শুধুমাত্র তত্ত্বকথা আউড়ে জনসাধারণকে ভোলান যাবে না। অগত্যা তাঁরা অপরাপর দলগুলির সঙ্গে একটা নির্বাচনী বোঝাপড়ায় আসতে রাজী হলেন।

কিন্তু এটাও শুধুমাত্র জনসাধারণকে ভাঁওতা দেবার জন্য। তাঁরা কোনদিনই বামপন্থী ঐক্যে আস্থাশীল ছিলেন না। এইরকম ভাঁওতা দেবার অভ্যাস কমিউনিস্টদের বহুদিনের। তাঁদের বিশ্বাস ও আচরণের পার্থক্য দুস্তর। সাপ্তাহিক বসুমতীতে সম্প্রতি শ্রীমণীন্দ্র দাসের একটি চিঠি পড়েছিলাম। সেখানে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, কমিউনিস্টরা যখন বুর্জোয়া নির্বাচনে বিশ্বাসই করেন না তখন তাঁরা সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন কেন? এ অভিযোগ আজকের নয় দীর্ঘকালের। যে কোন কমিউনিস্টই এর জবাবে বলেন যে, জনসাধারণের বিশ্বাস অর্জনের জন্য এটা তাঁদের ভানমাত্র।

আমি বহু বাম কমিউনিস্ট কর্মীকে জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁরা খোলাখুলি জবাব দিয়েছেন যে কংগ্রেসকে পরাজিত করার চেয়েও দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টদের উচ্ছেদ করাই তাঁরা অধিকতর প্রয়োজনীয় কর্তব্য বলে মনে করেন। এটা এতই ওপেন সিক্রেট এবং সর্বত্র ঘোষিত যে সংশ্লিষ্ট তরফ অস্বীকার করলেও কিছু আসে যায় না। যেখানে তাঁরা এই মনোভাব নিয়ে চলছেন সেখানে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে বামপন্থী ঐক্য তাঁদের সেই উদ্দেশ্যের প্রতিকূল।

অর্থৎ, ঐক্য বানচাল করার দায়িত্ব বাম কমিউনিস্টরা যতই অপরের ঘাড়ে চাপাতে চান না কেন, ইংরাজীতে যাকে বলে সারকমস্টানসিয়াল এভিডেন্স তা অনুযায়ী তাঁদের দায়িত্ব অত সহজে এড়ানো যায় না। প্রথম দিকে তাঁরা প্রকাশ্যেই তাঁদের অসহযোগিতামূলক মনোভাবের কথা ব্যক্ত করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের চাপে বৈঠকে বসলেও, অপরাপর পার্টির ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজেদের সাফাই গাইতে তাঁদের কোন অসুবিধা হয় নি।

বামপন্থী ঐক্য প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর জনসাধারণের মধ্যে তুমুল বিক্ষোভ দেখা গেছে। আরও একটি বিষয়ের আবির্ভাব হয়েছে যেটি নেতৃবৃন্দ ধারণায় আনতে পারেন নি। সেটি হচ্ছে র‍্যাঙ্ক এণ্ড ফাইল অর্থাৎ কর্মী-স্তরে বিক্ষোভ। অনেক বাম কমিউনিস্ট কর্মীকেও এ বিষয় নিয়ে খেদ করতে দেখা যাচ্ছে, এবং চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী তাঁরা অপরাপর দলের ঘাড়ে দোষ চাপাতে এবারে একটু নারাজ হচ্ছেন। পার্টি নেতাদের প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্য এবারে চিড় খেয়েছে, এটা যে হবে বোধ হয় নেতারা আশা করেন নি।

জনসাধারণ কি এখনো পর্যন্ত এই সব সুবিধাবাদীদের প্রতি আস্থা রাখবেন? গত ফেব্রুয়ারী-মার্চের খাদ্য আন্দোলন জনসাধারণই করেছিলেন, কোন রাজনৈতিক দলের নির্দেশে তা হয় নি। সেবারে যে মানুষ গুলীর সামনে বুক পেতে দিতে ভয় পান নি, প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কংগ্রেসী শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, সেই মানুষ কি এই সব সুবিধাবাদী নেতাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন না?

জনসাধারণ ইতিমধ্যেই বামপন্থী নেতাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শুরু করেছেন। তবে অনশন ধর্মঘট করে এ'দের হৃদয় গলানো অসম্ভব, কেন না হৃদয়নামক কোন পদার্থই এ'দের নেই। গত খাদ্য আন্দোলনের সময় কংগ্রেসী নেতাদের যে হাল হয়েছিল, যেমন তাঁদের এখানে-ওখানে লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল, বামপন্থী নেতাদের সেই হাল না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের শিক্ষা হবে না। উৎকট রোগের জন্য উৎকট দাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

ডঃ নরেন্দ্র ভট্টাচার্য
চুঁচুড়া

রবীন্দ্রসরোবরে অনুষ্ঠিত আন্তঃ সার্ভিসেস ফুটবল ফাইন্যালে ইস্টার্ন কম্যান্ড এবং ইস্টার্ন কম্যান্ডের খেলার দৃশ্য

ভারত ডেভিস কাপের আঞ্চলিক ফাইন্যালে

শ্রীঅমিতাভ

শুধু আর একটি বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম হলেই ভারত ডেভিস কাপের মূল ফাইন্যালে অস্ট্রেলিয়ার সম্মুখীন হবার গৌরব অর্জন করবে। এখন প্রশ্ন হল যে আঞ্চলিক ফাইন্যালে ব্রেজিলের বিপক্ষে ভারত কি জয়ী হবে? আমেরিকাকে পরাজিত করার পর অনুপ্রাণিত ব্রেজিলও আপ্রাণ চেষ্টা করবে জয়লক্ষ্মীর অনুগ্রহ লাভের জন্য। ব্রেজিলদলের ডেভিস কাপ বাহিনীর ভরসা হলেন মান্দারিনো এবং কচ। মান্দারিনো এবং কচ টেনিস-জগতে যথেষ্ট পরিচিত হলেও বিরাট কোন সাফল্যের পুঁজি তাঁদের সংগ্রহশালায় নেই।

ডেভিস কাপের ফাইন্যালে খেলার এরকম সুবর্ণ সুযোগ খুবই কম পাওয়া যায়। ভারতকে ব্রেজিলের বিপক্ষে জয়ী হতেই হবে। ভারত-ব্রেজিলের খেলাটি কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে, সুতরাং একদিক থেকে ভারতীয় খেলোয়াড়রা বিরাট সুবিধা লাভ করবে, কারণ কলকাতার কোর্ট ভারতীয় খেলোয়াড়দের পরিচিত।

ভারত আঞ্চলিক সেমিফাইন্যালে জয়ী হল ৩—২ খেলায়। শেষ সিঙ্গলস খেলাটিতে রমানাথন কৃষ্ণান অংশ গ্রহণ করেন নি এবং তিনি খেললে শেষ সিঙ্গলসটি ভারতের হাতছাড়া হত না। অবশ্য পূর্বের সিঙ্গলস খেলার পরই খেলার ভাগ্য নির্ধারিত হবার ফলে কৃষ্ণানের পরিবর্তে প্রেমজিৎ লাল বাডিংয়ের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন।

ভারত-পশ্চিম জার্মানী ডেভিস কাপ যুদ্ধের শ্রেষ্ঠ খেলা হিসাবে অভিহিত করা যায় জয়দীপ মুখার্জী এবং বুঙ্গার্টের খেলাটি। উইমবলডেনের "ডার্ক- হর্স" নামে খ্যাত বুঙ্গার্ট বিশ্ব টেনিসের বহু রথী-মহারথীকে ঘায়েল করেছেন। বুঙ্গার্টের বিপক্ষে জয়দীপের জয়ের আশা ভারতের অতিবড় সমর্থকও ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু জয়দীপ তাঁর বলিষ্ঠ এবং দৃপ্ত ক্রীড়াধারার সাহায্যে বুঙ্গার্টকে নতি স্বীকার করতে বাধ্য করলেন। যদিও খেলার সুরুতে বুঙ্গার্ট তাঁর নিখুঁত ভলি এবং লাইন ঘেঁসা জোরালো সটের সাহায্যে জয়দীপকে একটু বেকায়দায় ফেলে দিয়েছিলেন। প্রথম সেটটি বুঙ্গার্ট লাভ করেন ৬—৪ . গেমে। দ্বিতীয় সেটেও বুঙ্গার্ট অগ্রগামী ছিলেন ৫—৪ গেমে কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়দীপ দ্বিতীয় সেটটি লাভ করলেন ৮—৬ গেমে। তৃতীয় সেট থেকে জয়দীপ খেলার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করলেন। তৃতীয় এবং চতুর্থ সেটটি জয়দীপ লাভ করলেন ৮—৬ এবং ৬—৩ গেমে।

বুঙ্গার্ট খেলার মাঝে কিছুটা অশান্ত হয়ে উঠেছিলেন দর্শকদের আনন্দোচ্ছ্বাসের ফলে এবং হারিয়েছিলেন তাঁর মনোবল। দর্শকদের চিৎকার সহ্য না করতে পেরে বুঙ্গার্ট আম্পায়ারকে প্রতিবাদ জানান এবং লাইন্সম্যানদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও তিনি প্রতিবাদ করেন। খেলতে খেলতে এক সময় বিরক্ত হয়ে বুঙ্গার্ট তাঁর হাতের র‍্যাকেট মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেন। এই অখেলোয়াড়ী মেজাজ তাই বুঙ্গার্টের পরাজয়ের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল।

এবার পূর্বের খেলাগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। প্রথম দিনের দুটি সিঙ্গলস খেলাতেই ভারত জয়ী হয়। একটি খেলায় স্ট্রেট সেটে কৃষ্ণান পরাজিত করেন বুঙ্গার্টকে। খেলার ফলাফল হয় ৭—৫, ৭—৫, ৬—৪। বুঙ্গার্ট আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকেন নানা মারের সাহায্যে কৃষ্ণানকে আক্রমণ করার জন্য, কিন্তু কৃষ্ণান সহজেই সমস্ত মার প্রতিহত করে পাল্টা আঘাতে পর্যুদস্ত করে তোলেন বুঙ্গার্টকে।

জয়দীপ মুখার্জী প্রথম সেটটি হাতছাড়া করে শেষ পর্যন্ত বাডিংকে পরাজিত করেন ২—৬, ৭—৫, ৬—৩, ৬—৪ খেলায়। জয়দীপ এবং বাডিংয়ের

খেলাটি একশো তিরিশ মিনিট স্থায়ী হয়। নেটে এবং সুন্দর পাশিং সটের সাহায্যে জয়দীপ বিব্রত করে তোলেন প্রতিপক্ষ বাড়িংকে। খেলার সুরুতে বাড়িং কিছুটা সম্ভাবনা দেখিয়েছিলেন বটে কিন্তু পরে তিনি জয়দীপের ক্রীড়াচাতুর্যের কাছে নতি স্বীকারে বাধ্য হন।

ভারত ডাবলস খেলাটিতে পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হয়। প্রথমে ঠিক ছিল যে, ভারতের পক্ষে ডাবলসে খেলবেন কৃষ্ণান এবং প্রেমজিৎ, কিন্তু পরে সেই জুটির পরিবর্তন করে জয়দীপ এবং প্রেমজিৎকে খেলান হয়। জয়দীপ এবং প্রেমজিৎ জুটি অনেকদিন একসংগে খেলেন নি, ফলে তাঁদের দুজনে ঠিক মানিয়ে নিয়ে খেলতে পারেন নি। অন্যদিকে বাড়িং-বুঙ্গার্ট জুটি যথেষ্ট আস্থার সংগে খেলেছেন। অবশ্য ডাবলসে কৃষ্ণান-প্রেমজিৎ জুটিকে না খেলিয়ে ভালই করেছেন নির্বাচক-মণ্ডলী। কারণ ডাবলসে ওই জুটি খেল্লেও ভারতের জয় সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু বলা যেত না। পরের দিন বুঙ্গার্টের বিপক্ষে জয়দীপের সম্বন্ধেও আশা ছিল কম। সেইজন্য কৃষ্ণান-বাড়িং সিংগলস খেলার ওপর ভারতের জয়-পরাজয় নির্ভর করছিল। মনে হয় ওই সমস্ত কারণ বিবেচনা করেই নির্বাচকেরা কৃষ্ণানকে ডাবলসে খেলাবার ঝুঁকি নিতে চান নি। ডাবলস খেলাটি ৬—১, ১০—৮, ৬—৪ খেলায় সাতাত্তর মিনিটের মধ্যে শেষ হয়।

শেষদিন জয়দীপ এবং বুঙ্গার্টের খেলায় জয়দীপ জয়ী হবার ফলে ভারত ফাইন্যালে উন্নীত হয়। শেষ সিংগলস খেলায় কৃষ্ণান অংশ গ্রহণ করার ফলে ফলাফল দাঁড়ায় ৩—২। কৃষ্ণানের পরিবর্তে প্রেমজিৎ বাড়িংয়ের সংগে এক প্রদর্শনী খেলায় অংশ গ্রহণ করেন। দর্শকেরা কৃষ্ণানকে না খেলানোর জন্য মাঠে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

ইরানী ট্রফি

ইরানী ট্রফির খেলা আগামী ২৫শে নভেম্বর সুরু হচ্ছে ইডেন উদ্যানে। চারদিনব্যাপী এই প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলায় রঞ্জী ট্রফি বিজয়ী বোম্বাই দলের বিপক্ষে খেলবে অবশিষ্ট ভারতীয় একাদশ। অবশিষ্ট ভারতীয় একাদশের অধিনায়কত্ব করবেন পতৌদির নবাব। এই খেলায় এবং আগামী দলীপ ট্রফির ফাইন্যাল খেলায় বিভিন্ন খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত সাফল্য বিচার করে টেস্টদল গঠন করা হবে। বাংলার তরুণ মিডিয়াম পেস বোলার সুব্রত গুহকে এই অবশিষ্ট ভারতীয় একাদশে দলভুক্ত করা হয় নি। কারণ সুব্রত গুহ হায়দ্রাবাদের ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নির্বাচনী ট্রায়ালে ওই সময় অংশ গ্রহণ করবেন। এই ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় এবার ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সংগে সফরের উদ্বোধনী খেলায় মিলিত হবে।

অবশিষ্ট ভারতীয় একাদশে নিম্ন-লিখিত খেলোয়াড়েরা স্থান পেয়েছেন। পতৌদির নবাব, জয়সীমা, বোরদে, আব্বাস আলি বেগ, হনুমন্ত সিং, সেলিম দুরানী, কুন্দরন, চন্দ্রশেখর, প্রসন্ন, অম্বর রায়, ভেঙ্কটরাঘবন, ইন্দ্রজিৎ সিং, রমেশ সাক্সেনা এবং ফার্নাণ্ডেজ।

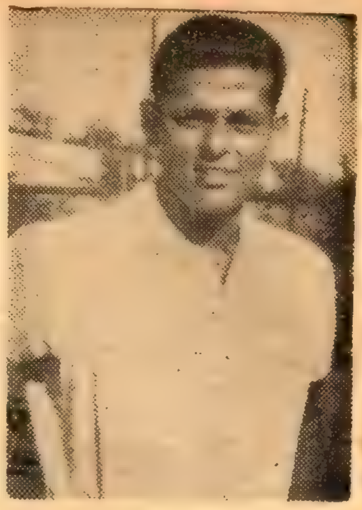

প্রেমজিৎ লাল

রমানাথন কৃষ্ণান

পতৌদি অধিনায়ক নির্বাচিত

ভারত সফরকারী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়কত্বের ভার অর্পণ করা হয়েছে পতৌদির নবাব মনসুর আলি খাঁর ওপর। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে তিনটি টেস্টেই পতৌদি নেতৃত্ব করবেন। ভারত-ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম টেস্ট বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে সুরু হবে আগামী তেরই ডিসেম্বর। দলীপ

ট্রফি ফাইন্যাল খেলা শেষ হবার পর ভারতীয় টেস্ট দল গঠন করা হবে। কারণ দলীপ ট্রফির ফাইন্যালের দুটি দল দক্ষিণাঞ্চল এবং পশ্চিমাঞ্চলের দলের পক্ষে ভারতের সেরা খেলোয়াড়েরা অংশগ্রহণ করছেন।

পতৌদি প্রথম ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন ১৯৬২ সালে ভারতীয় ক্রিকেট দলের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরের সময়। এই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরের সময় নির্বাচিত অধিনায়ক নরি কন্ট্রাক্টার আহত হবার পর পতৌদি এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

জয়দীপ মুখাজী

সমাচার দর্পণ

ভারতের অর্থদপ্তর আগামী ব্যাঙ্ককের এশিয়ান গেমসে যোগদানের জন্য ৮১ জনের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুর করেছেন। শিক্ষাদপ্তর এবং অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অব স্পোর্টস কিন্তু ১০৪ জনের জন্য সুপারিশ করেন। ভারতীয় অলিম্পিক এ্যাসোসিয়েশন বিভিন্ন বিষয়ে মোট ১৫১ জনের নামের একটি তালিকা পেশ করেছিলেন। অর্থদপ্তরের এই সিদ্ধান্তের ফলে পূর্বে প্রস্তুত তালিকা পরিবর্তন করতে হবে

* * *

ব্যাঙ্ককের এশিয়ান গেমসে ভারতীয় হকি দলের অধিনায়কত্ব করবেন সার্ভিসেস-এর শঙ্কর লক্ষ্মণ। দলের খেলোয়াড়েরা হলেন গোলে—শঙ্কর লক্ষ্মণ এবং জগদীপ সিং; ব্যাকে—গুরুবক্স সিং, পৃথ্বীপাল সিং এবং ধরম সিং; হাফে—মহীন্দরলাল, বলবীর সিং, হরমিক সিং, জগজিৎ সিং এবং ফ্রাঙ্ক; ফরোয়ার্ডে—বলবীর সিং (রেল), বলবীর সিং (পাঞ্জাব), পিটার, হরবিন্দার সিং, হরিপাল কৌশিক, ইন্দার সিং, তারসিম সিং, নিওল টেম্পো।

পতৌদির নবাব

* *

সাউদার্ন কম্যাণ্ড আন্তঃসার্ভিসেস ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে ইস্টার্ন কম্যাণ্ডকে ৫—১ গোলে পরাজিত করে অষ্টমবার বিজয়ীর গৌরব অর্জন করেছে। খেলার প্রথমে কিন্তু একটি গোল দিয়ে ইস্টার্ন কম্যাণ্ডই অগ্রগামী ছিল কিন্তু পর পর পাঁচটি গোল দিয়ে সাউদার্ন কম্যাণ্ড শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়।

* * *

ভারত সফরকারী রাশিয়ান ভলিবল দল আগামী ২৮শে নভেম্বর কলকাতায় খেলবে। ভারত সফরে রাশিয়ান দল মোট সাতটি টেস্ট ম্যাচে অংশগ্রহণ করবে এবং কলকাতার টেস্ট ম্যাচটি হচ্ছে তাদের সফরের শেষ টেস্ট ম্যাচ। এই দলে মোট বারোজন খেলোয়াড় আছেন। এ'দের মধ্যে তিনজন খেলোয়াড় ইতিপূর্বে কলকাতায় খেলে গিয়েছেন।

* * *

দিল্লীর ডুরাণ্ড কাপের খেলা সুরু হচ্ছে আগামী ডিসেম্বর মাসের ১০ তারিখ থেকে। এবারের প্রতিযোগিতায় মোট ৪০টি বিভিন্ন রাজ্যের দল অংশগ্রহণ করবে। কলকাতা ময়দানের মোট ছ'টি দলকে এবার ডুরাণ্ডের আসরে অংশগ্রহণ করতে দেখা যাবে। এই দলগুলি হল মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান স্পোর্টিং, এরিয়ান্স, বি, এন, রেল এবং ইস্টার্ন রেল। গতবারের প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয় কলকাতার মোহনবাগান ক্লাব।

ক্লের আর একটি বিজয়

মুষ্টিযুদ্ধ জগতের বিচিত্র চরিত্র ক্যাসিয়াস ক্লে নিজেকে মহম্মদ আলি ক্লে নামে জাহির করতে চান। মনে হচ্ছে মহম্মদ আলি ক্লের মধ্যে ধীরে ধীরে একটা পরিবর্তন আসছে। বকবকিয়ে বক্সার ক্লে এখন দেখা যাচ্ছে একেবারে শান্ত হয়ে পড়েছেন। পূর্বে যে কোন লড়াইয়ের আগেই দেখা যেত ক্লে কথার ফুলঝুরি ছোটাচ্ছেন ছড়া কেটে। অবশ্য এটা ছিল তাঁর একটা কৌশল, কারণ একবার ক্লে স্বীকার করেছিলেন যে ওই বকবকানির দ্বারা বিপক্ষের মনোবল ভেঙে দেওয়াই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য।

মহম্মদ আলি বক্সিং নিয়ে ছেলে-খেলা করে চলেছেন; একে হারাচ্ছেন এক মিনিটে, ওকে দেড় মিনিটে। অবশ্য একথা সত্য যে ক্লের বিপক্ষে অবতীর্ণ হতে গেলে একেবারে সাধারণ মানের মুষ্টিযোদ্ধা হলে মার খেয়ে মরে যাবে। দু-একজন মুষ্টিযোদ্ধা ছাড়া অন্য কেউ ক্লের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারছেন না, ব্যর্থ হচ্ছেন।

টেক্সাসের "বিগ ক্যাট" ক্লীভল্যান্ড উইলিয়ামস নামে খ্যাত হেভিওয়েট মুষ্টি-যোদ্ধা ক্লের নিকট পরাজিত হলেন তৃতীয় রাউন্ডে। ক্লে মাত্র এক মিনিট আট সেকেন্ড সময়ের মধ্যে উইলিয়ামসকে পরাজিত করেন। প্রায় দু'বছর পূর্বে একটি ঘটনায় ক্লীভল্যান্ড উইলিয়ামস এক মারাত্মক আঘাত লাভ করেন। ১৯৬৪ সালের নভেম্বর মাসে টেক্সাসের পথে একজন পুলিশের সঙ্গে উইলিয়ামসের এক ঝগড়ার সময় পুলিশটি গুলী ছোঁড়েন। গুলী এসে লাগে উইলিয়াম-সের তলপেটে। অপারেশনের পর একটি কিডনী হারান তিনি এবং একটি বুলেট তাঁর পায়ের মধ্যে থেকে যায়। এরপর উইলিয়ামস আর রিংয়ে অবতীর্ণ হতে পারবেন না বলে বহু বিশেষজ্ঞের ধারণা ছিল কিন্তু উইলিয়ামস আপ্রাণ চেষ্টা এবং অনুশীলনের সাহায্যে আবার রিংয়ে ফিরে আসেন।

ক্লীভল্যান্ড উইলিয়ামস আজ পর্যন্ত বাহাত্তরটি মুষ্টিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং এর মধ্যে পরাজিত হয়েছেন মাত্র দু'বার। নক-আউট তিনি হয়েছেন তিনবার; সোনী লিস্টনের কাছে দু'বার এবং বব স্যাটারফিল্ডের কাছে একবার।

ক্যাসিয়াস ক্লে

টেক্সাসের হাউসটনে অনুষ্ঠিত ক্লে-ক্লীভল্যান্ড মুষ্টিযুদ্ধে ক্লে যে এত সহজে জয়ী হবেন অনেকেই আশা করতে পারেন নি। কিন্তু ক্লে সত্যই এদিন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানের মত লড়েন। চব্বিশ বৎসর বয়স্ক নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধা ক্লের জীবনের বোধহয় এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ লড়াই। ক্লের ক্ষিপ্রগতির জন্য উই-লিয়ামসের পক্ষে ক্লে-কে জোর আঘাত করা সম্ভব হয় নি। লড়াইয়ের সুরুতে ক্লে কিন্তু কিছুটা গা বাঁচিয়ে চলছিলেন। কিন্তু সুযোগমত বিপক্ষকে আঘাত করতে ছাড়ছিলেন না। প্রথম রাউন্ডে ক্লের জোরালো দুটি লেফট এবং একটি রাইট হুক প্রায় বেকায়দায় ফেলে দিয়েছিল উইলিয়ামসকে।

দ্বিতীয় রাউন্ডের সুরুতেই ক্লের একটি লেফট হুকের আঘাত উই-লিয়ামসকে ধরাশায়ী করল, কিন্তু গণনার মধ্যেই তিনি আবার উঠে দাঁড়ালেন। দ্বিতীয় রাউন্ড শেষ হবার ঠিক অব্য-বহিত পূর্বে ক্লের কয়েকটি প্রচণ্ড আঘাতে আবার রিংয়ে পড়ে গেলেন উইলিয়ামস। এর পর রাউন্ডের অন্তর্বর্তীকালীন এক মিনিট সময়ে বিশ্রামের পর তৃতীয় রাউন্ডের খেলা সুরু করার সময় মনে হল উইলিয়ামস লড়তে পারবেন। কিন্তু বাঘের মত ক্লে ঝাঁপিয়ে পড়ে আঘাতের পর আঘাতে পর্যুদস্ত করে দিলেন উই-লিয়ামসকে। ক্লীভল্যান্ড উইলিয়ামস লুটিয়ে পড়লেন রিংয়ে। নিউইয়র্কের রেফারী হ্যারী কেসলার তখন ক্লে-কে জয়ী বলে ঘোষণা করলেন।

মহম্মদ আলি ক্লে পেশাদারত্ব গ্রহণের পর লড়েছেন মোট সাতাশটি লড়াই। আজ পর্যন্ত কেউই তাঁকে পরাজিত করতে পারে নি। বর্তমানে ক্লে অল্প সময়ের মধ্যেই অনেকগুলি মুষ্টিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলেন—এর মধ্যে জার্মানীর মিল্ডেনবার্জার এবং ইংলন্ডের হেনরী কুপার তবুও ক্লের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। কিছুদিন পূর্বে অবশ্য মহম্মদ আলি ক্লের পরবর্তী প্রতিদ্বন্দ্বী আর্নি টেরেল। বিশ্ব সংস্থা কর্তৃক সরকারীভাবে স্বীকৃত বিশ্ব হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ান হলেন এই আর্নি টেরেল। টেরেল যতদূর সম্ভব ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে ক্লের বিরুদ্ধে রিংয়ে উঠবেন।

—অমিয় চক্রবর্তী

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট্স্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের

ম হা ভা র ত

প্রথম খণ্ড বোর্ড বাঁধাই (যন্ত্রস্থ) : মূল্য—বার টাকা
দ্বিতীয় খণ্ড " " : মূল্য—দশ টাকা
তৃতীয় খণ্ড " " : মূল্য—দশ টাকা

চতুর্থ খণ্ড: মূল্য—ছয় টাকা

পঞ্চম খণ্ড: মূল্য—ছয় টাকা

অন্ন-সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা

চাকরীর উমেদারী না করিয়া বিজ্ঞানবলে
বলীয়ান হউন

বাণিজ্যে লক্ষ্মী লাভ

করিয়া সৌভাগ্যবান হউন

হাজার জিনিষ

সহস্র পণ্য প্রস্তুত করিবার সহজ ও সরল উপায়

প্রতি ভাগ এক টাকা

—প্রথম ভাগে আছে—

রন্ধন-প্রক্রিয়া ১৫৬ রকমের। ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ ৩৪১ প্রকারের। চমকপ্রদ যাদু-বিজ্ঞান ৮৫ প্রকারের। মনোহারী আতসবাজী ৪১ প্রকারের—এতদ্ভিন্ন

বস্ত্ররঞ্জন—ধাতুরঞ্জন
কাষ্ঠরঞ্জন—ধাতুশিল্প
পেন্ট ও বার্ণিশ—প্রভৃতির
ব্যবহারিক উপদেশ সহ বিস্তৃত ব্যবহারিক প্রস্তুতপ্রণালী।

—দ্বিতীয় ভাগে আছে—

প্রসাধন সুরভি ১৩২ রকমের; বিস্তৃত সাবান প্রস্তুত প্রণালী; সিরাপ প্রস্তুত প্রণালী; মোমবাতী প্রস্তুত প্রণালী; ফলপ্রদ গৃহ-চিকিৎসা—হেকিমী ও হোমিওপ্যাথি; মন্ত্র-তন্ত্র; ভাগ্যফল; বুননির প্যাটার্ণ।

সংসারযাত্রার যে কিছু, যত কিছু, যাহা কিছু আবশ্যক তাহা শিখিবার ও শিখাইবার একমাত্র পুস্তক।

জনসাধারণের বর্তমান অসচ্ছলতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নামমাত্র মূল্য নির্ধারিত।

বিশ্ব-সাহিত্যে বসুমতীর অমর অ...

শ্রীঅরবিন্দের

ANANDAMATH

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অমর আনন্দমঠের অমর ইংরাজী ...

০ আনন্দমঠে—স্বাধীনতার সক্রিয় সংগ্রামের ...
০ আনন্দমঠে—'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের পূত-প্রকাশ।
০ আনন্দমঠে—ঋষি বঙ্কিম ও ঋষি অরবিন্দের আদর্শ

আনন্দমঠের এই মহামন্ত্রের অর্ধশতাব্দীর সাধনে ...
স্বাধীনতা অর্জিত

ভারতের প্রতি গৃহে এই পবিত্র গ্রন্থ শোভা পা...

মূল্য—তিন টাকা

গীতিনাট্য-সম্রাট
পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের

ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী

৪র্থ ভাগে—রঞ্জাবতী, নারায়ণী, দুর্গা, ফুলশয্যা, ...
জয়শ্রী, ফুলী।

৫ম ভাগে—আলিবাবা, রামানুজ, বাদশাজাদি, ...
বৃন্দাবনবিলাস, রূপের ডালি।

৬ষ্ঠ ভাগে—আলমগীর, অশোক, চাঁদবিবি, বাসন্তী, ...
খাঁজাহান, বিরাটকুঞ্জ, রাধাকৃষ্ণ।

৭ম ভাগে—রঘুবীর, জুলিয়া, বেদোরা, কুমারী, ...
কবিকাননিকা, রত্নেশ্বরের মন্দিরে।

৮ম ভাগে—আহেরিয়া, উলুপী, দৌলতে দুনিয়া, ...
প্রেমাঞ্জলি, মন্দাকিনী, গৃহামধ্যে, ...
সিন্ধি, ধ্রুব। মূল্য প্রতি খণ্ড ২৸৹ ...

ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বেকার, চাকুরীপ্রার্থী ও ...
রাগীদের ভাষা শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য একমা...

॥ বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ স...

* * স্বল্পশ্রমে পর্যাপ্ত জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী *

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

রা জ ভা ষা

(ইংরাজী ভাষা সহজে শিক্ষার অদ্বিতীয় সাহায্য...

এক আধারে: ভাষা - ব্যাকরণ - শব্দার্থ

ইংরাজী হইতে বাঙলা—৩·৫০ ॥ ইংরাজী হইতে উর্দু...

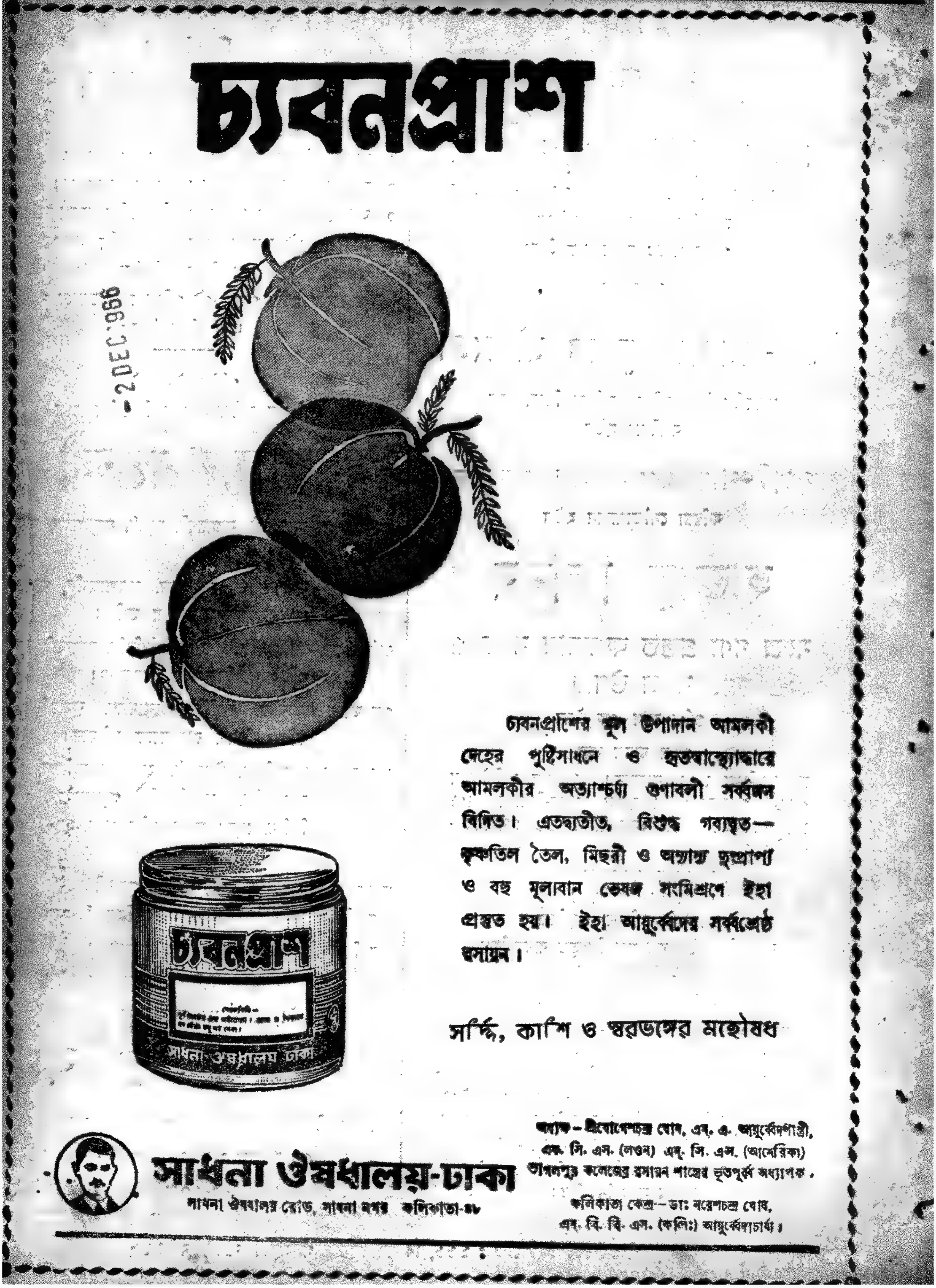
চ্যবনপ্রাশ
চ্যবনপ্রাশের মূল উপাদান আমলকী দেহের পুষ্টিসাধনে ও হৃতস্বাস্থ্যোদ্ধারে আমলকীর অত্যাশ্চর্য্য গুণাবলী সর্ব্বজন বিদিত। এতদ্ব্যতীত, বিশুদ্ধ গব্যঘৃত—কৃষ্ণতিল তৈল, মিছরী ও অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য ও বহু মূল্যবান ভেষজ সংমিশ্রণে ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসায়ন।
সর্দ্দি, কাশি ও স্বরভঙ্গের মহৌষধ
চ্যবনপ্রাশ
সাধনা ঔষধালয় ঢাকা
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর কলিকাতা-৪৮
অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ. আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ. সি. এস. (লণ্ডন) এম্. সি. এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।
কলিকাতা কেন্দ্র—ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম্. বি. বি. এস. (কলিঃ) আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য।

সাপ্তাহিক বসুমতী

অনশ-সভা-শোভাযাত্রায় উত্তাল কলকাতা মহানগরীর কয়েকটি চিত্ররূপ

বর্ষ : ২৫শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ 1st Dec., 1966 Vol. 71, No

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		১৫৩৯
আজকের মানুষ		১৫৪০
ভারতদর্শন		১৫৪১
আন্তর্জাতিক		১৫৪৬
ছায়ারা সব	মিহির পাল	১৫৪৯
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	সুনন্দ সিংহ	১৫৫৪
বেদব্যাস-এর রস-রচনাঃ অমৃতসমান		১৫৬০

ধনেখালি ফরাসডাঙা সিল্ক ও তাঁত বস্ত্র * ছিট কাপড়

শৈললাল মনিলাল

বহুবাজার · শ্যামবাজার

ফোন-৩৪-২১২৬ · ট্রামডিপোর দক্ষিণে

লেপ তোষক বিছানা * শাল ও আলোয়ান

শ্রীমদ্ভাগবত

প্রাচীন ভক্তদের রচিত সুললিত বাংলা পয়ারে

মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র

এই সুবৃহৎ গ্রন্থে আছে—শ্রীল সনাতন গোস্বামীর 'ভাগবতামৃত' গ্রন্থের কবিচন্দ্রের বঙ্গানুবাদ এবং শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়তম ভাগবতাচার্য্য রঘুনাথ পণ্ডিতের প্রেমতরঙ্গিনী।

ইহাতে আছে দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভাগবতামৃতের অনুবাদ কবিচন্দ্রের

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত

এবং

ভাগবতাচার্যের বিশ্বপ্রসিদ্ধ

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী

সমগ্র ভারতে প্রথম বঙ্গানুবাদ

'...শুনিয়া তাহার ভক্তিযোগের পঠন।
আবিষ্ট হইল গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥"

ইহা কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারতের ন্যায় বাংলার প্রতি গৃহস্থের অবশ্যপাঠ্য হউক, এই নিবেদন। এই মূল্যবান গ্রন্থ বাংলার প্রতি ঘরে প্রতিষ্ঠিত করুক।

সাহিত্য-সম্রাট—বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের ঋষি

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

—উপন্যাস—

প্রথম খণ্ড :—রাজসিংহ, বিষবৃক্ষ, যুগলাঙ্গুরীয়, মৃণালিনী, রজনী। [সচিত্র] মূল্য—৩, টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড :—দুর্গেশনন্দিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, ইন্দিরা, রাধারাণী, সীতারাম। মূল্য—তিন টাকা

তৃতীয় খণ্ড:—আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা, দেবী চৌধুরাণী। [সচিত্র] মূল্য—৩, টাকা।

—সাহিত্য—

প্রথম খণ্ড :—কৃষ্ণচরিত্র, লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ (১ম)। মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড :—(১ম ভাগ অনুশীলন), মুচিরাম গুড়, বিবিধ প্রবন্ধ (২য়), বিজ্ঞান রহস্য। মূল্য—তিন টাকা

তৃতীয় খণ্ড :—শ্রীমদ্ভগবদগীতা, কমলাকান্ত, সাম্য, সাহিত্য-প্রসঙ্গ, মানস, ললিতা। মূল্য—তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বিপ্লব প্রচেষ্টার একটি বিস্মৃত অধ্যায়	— সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	১৫৬৩
নভেম্বরের ডাক (কবিতা)	— দিনেশ দাস	১৫৬৪
[illegible]দর্শন	...	১৫৬৫
রূপলেখা	— জয়ন্তী সেন	১৫৬৮
আমি যাদের দেখেছি	— পরিমল গোস্বামী	১৫৬৯
সুবর্ণলতা (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— আশাপূর্ণা দেবী	১৫৭৬
ধূলীর ভূমিকা : উনিশ শো ছেষট্টি (কবিতা)	— নারায়ণ পাত্র	১৫৮১
রূপ রঙ তুলি (কবিতা)	— রবিয়ুল হোসেন খান	১৫৮১
এইচ, জি, ওয়েলস্-এর কথা	— ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	১৫৮২
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	— শিলালি	১৫৮৯
রঙ্গজগৎ	...	১৫৯১
খেলাধূলা	— শ্রীঅমিতাভ	১৫৯৭

সর্বপুরাণ, সর্বতন্ত্র, সর্ব উপনিষদ, সমস্ত ভক্তিগ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত

স্তবকবচমালা

(পঞ্চম সংস্করণ)

যে ঋষির যে স্তবে যে দেবতা আকৃষ্ট হইয়া বর প্রদান করিয়াছিলেন—পুরাণ, উপনিষদ, তন্ত্র, ভক্তিগ্রন্থরাশি মথিত করিয়া সেই সকল শ্রেষ্ঠ ভক্তিনিবেদন অতি যত্নে সুনির্বাচন—সঙ্কলন করিয়া স্তবকবচমালারূপে গ্রথিত। স্তব—ভক্তির উচ্ছ্বাস—দেবতার বন্দনাগীতি : আত্মনিবেদিত প্রাণে তন্ময় হইয়া স্তব পাঠে যে লাভ হয়—জাগতিক শক্তি তাহার নিকট অতি তুচ্ছ। স্তবকবচমালার প্রায় ৫০০ দেব-দেবীর স্তব সন্নিবেশিত।

মূল্য পাঁচ টাকা।

পৃথিবীর তরুণ-সমাজের হৃদয়জয়ী

স্যার ওয়াল্টার স্কটের গ্রন্থাবলী

দ্বিতীয় ভাগ

শরৎচন্দ্র মিত্র অনূদিত

আইভানহো, হাইল্যাণ্ড উইডো, ফেয়ার মেড অফ পার্থ, সার্জনস্ ডটার

মূল্য—২·০০

তৃতীয় ভাগ

সরোজনাথ ঘোষ অনূদিত

দি রাইড অব ল্যামারমুর, কিনিলওর্থ অব মনট্রোজ, দি এ্যান্টিকোয়ারি

মূল্য ১॥০ টাকা।

সাহিত্য-জগতের গৌরবপ্রভা—হাস্যরসাবতার—নাট্যসাহিত্যের প্রবর্তক—রস-সাহিত্যের স্রষ্টা—রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের

দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—জীবনী ও কবির সমালোচনা, নীলদর্পণ, জামাই বারিক, বিয়ে পাগলা বুড়ো, নবীন তপস্বিনী, কমলে কামিনী।

২য় ভাগে—সধবার একাদশী, যমালয়ে জীবন্ত মানুষ, পোড়ামহেশ্বর, কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ, লীলাবতী, সুরধুনী কাব্য, দ্বাদশ কবিতা, পদ্য সংগ্রহ।

প্রতি ভাগ দুই টাকা

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

রবীন্দ্রনাথ বলেন—"আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সংগীত এরূপ সহস্রধারে উৎসের মত কোথাও প্রোৎসারিত হয় নাই। এমন সুন্দর ভাবের আবেগ, কথার সহিত এমন সুরের মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না।"

বাঙ্গালার নব গীতিকবিতার প্রবর্তক, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির কাব্যগুরু, ঋষি কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর রচনার সমাবেশ।

কবির জীবনী, সুবিস্তৃত সমালোচনা সহ সুবৃহৎ গ্রন্থ

মূল্য তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

CUTTA
CENTRAL LIBRARY
UNIVER

৭১ বর্ষ : ২৫শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

Price : 25 Paise
Thursday, 1st December, 196(

ছাত্র-সমস্যা সম্পর্কে

সারা ভারতে কোথাও না কোথাও ছাত্র-আন্দোলন চলছে। এই ছাত্র-আন্দোলনের কি উদ্দেশ্য অথবা এর স্বরূপ কি এই ব্যাপারে বড় বড় মাথাওয়ালাদের এখন মাথাব্যথার অন্ত নেই। অথচ এই আন্দোলন হঠাৎ গজিয়ে ওঠে নি; বরং বলা যায় এর শিকড় এখন অনেক গভীরে। একথাও ঠিক, যদিও কারো কারো অভিমতে এই ছাত্র-আন্দোলন বিদেশের ছাত্র-আন্দোলনের অনুরূপ,—আমরা মনে করি তাদের অভিমত সর্বৈব মিথ্যা অথবা কল্পনাপ্রসূত। কারণ আমাদের দেশের এবং বিদেশের ছাত্রদের সমস্যা এক প্রকার নয়। বিশেষত এদেশে শিক্ষাটাই যেখানে গৌণ ব্যাপার, বিদেশে সেটাই হচ্ছে মুখ্য। আমাদের দেশের সৌভাগ্যবান কেউ কেউ তাদের সন্তানদের আশাতীত ব্যয়ে বিদেশে পাঠিয়ে নিশ্চয়ই স্বদেশীয় নীতির শিক্ষায় দীক্ষা নেবার জন্যে পাঠান না। ছাত্র-অশান্তি বা আন্দোলনের স্রোত পার্লামেন্ট পর্যন্ত এখন গড়িয়েছে; তাই মনে করি, বাজে কথায় জল ঘোলা না করে ছাত্র-আন্দোলনের মূল কারণটি সর্ব সমক্ষে তুলে ধরা উচিত—যাতে আসল সমস্যা চাপা না পড়ে, এবং ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়।

সমস্যা ছোট বা বড় হোক—সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করলে তা বৃহৎ আকার ধারণ করে না এবং ছাত্র-সমাজকে অনায়াসে তুষ্ট করাও যায়। বলা বাহুল্য, এ কথাটি প্রথমেই স্মরণে রাখতে হবে যে, তারা আমাদের ঘরের সন্তান; তাদের অর্থের অভাব সম্পূর্ণ দূর করবার শক্তি না থাকলে স্নেহ দিয়ে যেন সেই অভাব দূর করতে পারি। তাছাড়া ছাত্রদের যা বয়স—সেই বয়সে আবেগাশ্রিত চাপল্য থাকাই স্বাভাবিক, সেই চপলতাকে যেন পুলিশী মেজাজে নিবারণ করার স্পৃহা না জাগে। আমাদের দেশে ছাত্র-আন্দোলনের মারাত্মক পরিণতি লাভের কারণ হিসেবে আমরা বরাবরই পুলিশ পক্ষের অভিযান দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি; কিছুদিন আগে দিল্লীতে ছাত্র-আন্দোলন দমনের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েও সরকার কি বলতে পারেন—ঐ পথে তাঁরা সারা ভারতের ছাত্র বিক্ষোভ নিবারণ করতে সমর্থ হবেন? তা সম্ভব নয় এবং কোনোকালে সম্ভব হয় নি। কারণ যে উত্তেজনাকে লগুড়াঘাতে চাপা রাখার চেষ্টা হয়, কিছুদিন পরেই সেই উত্তেজনা আগ্নেয়গিরির উদ্গারের মতো প্রকাশ হয়ে পড়ে। ফলে অঘটনের আর কিছু বাকি থাকে না। তখন সুরু হয় রীতিমতো দক্ষযজ্ঞ। এবং সেই সুযোগে যদি রাজনৈতিক দলগুলি অন্যায় প্রতিরোধের জন্য এগিয়ে আসে—তখন সেই সুযোগ গ্রহণের জন্য তাদের দোষ দেওয়া নিরর্থক।

ছাত্র-আন্দোলন বা তাদের যে কোনো সমস্যার কথা যথাদ্রুত বিবেচনা করার আগে, আমাদের মনে হয়, কোনো দলেরই মাথা গলানো উচিত নয়। এমন কি এই ব্যাপারে স্বনির্দেশিত পথে সরকারেরও যাওয়া অনুচিত।

সোজা কথা, ছাত্রদের কথা যাঁরা জানেন বা বোঝেন—তাঁদের বাদ দিয়ে কখনোই ছাত্র সমস্যা দূরীকরণ সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে সর্বাধুনিক একটি ঘটনা উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের কাছে রয়েছে। সেটি হচ্ছে এই যে, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সংগ্রাম—সেখানে শ্রীত্রিগুণা সেনের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই সমাপ্ত হয়েছে।

কিন্তু এও কি সম্ভব? অর্থাৎ সরকার তাঁর রাজকোষ থেকে অর্থ দেবেন—অথচ খবরদারী করতে পারবেন না? কিন্তু এই রাজকোষ যে জনসাধারণের দেয় অর্থে পরিপূর্ণ সে কথাটাই সরকার মাঝে মাঝে ভুলে যান। তাই থাকে না চোখ পাকানির অন্ত। শুধু ছাত্ররাই নয় শিক্ষকরাও পান না এই চোখ পাকানি থেকে রেহাই। সেই কারণে সৎ শিক্ষকরাও এখন শিক্ষকতার জগৎ থেকে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হচ্ছেন। এই সঙ্গে তাঁদের নিজেদের অর্থনৈতিক সঙ্কটের কথা বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, ছাত্রদের আদর্শের বুলি শোনাবার ইচ্ছে তাঁদের থাকলেও তা থেকে তাঁরা বিরতই থাকেন। কারণ ভাবের ঘরে চুরি করা অন্যায়—এই বোধটুকু তাঁদের মধ্যে এখনো পর্যন্ত থাকায় সমাজে অবহেলিত, দরিদ্র, নিষ্পিষ্ট, বুভুক্ষু শিক্ষকগণ একমাত্র পুঁথির মাধ্যমেই ছাত্রদের সঙ্গে বাঁধাধরা যোগাযোগ রক্ষা করেন। কিন্তু এই পথ জাতির সর্বনাশের পথ। এই সর্বনাশের পথের দিকে একবার আমাদের নেতারা চোখ খুলে তাকালেই বুঝতে পারতেন—ছাত্র সমস্যা কেন এতো গভীর। শেষে, আমরা একথা বলি—দীর্ঘ আড়াই বছর ধরে আমরা ছাত্র সমস্যার ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ব্যর্থ হয়েছি। হয়তো সমস্যা গভীরে গেলেই সরকার সচেতন হন—তাই লোকসভাও চঞ্চল ছাত্রদের নিয়ে আলোচনায় অধিকতর চঞ্চল।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

কৃষ্ণমেননের রাজনৈতিক জীবন কি শেষ হতে চলেছে? তা যদি হয় তবে তাতে ব্যক্তিগতভাবে ওঁর ততটা ক্ষতি হবে না যতটা হবে দেশের—যে-দেশ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কারণ ঘুণ-ধরা কংগ্রেসের মধ্যে যে সুস্থ অংশটুকু রয়েছে, যে-প্রগতিশীল বাহু রয়েছে, তারই নেতৃত্ব করছেন শ্রী ভি, কে, কৃষ্ণমেনন। সেই সুস্থ, সবল অঙ্গ ছেদ করলে কংগ্রেসের গর্ব করার কিছুই থাকবে না, কেবল তার পচনকেই ত্বরান্বিত করা হবে মাত্র।

গত দশ বছর ধরে বোম্বাইয়ের উত্তর বোম্বাই শহর লোকসভা নির্বাচনী কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব করে আসছেন মেনন, ১৯৬২-এর নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকে তিনি প্রায় দেড় লক্ষ ভোটের রেকর্ড মার্জিনে আচার্য কৃপালনীকে হারিয়ে মর্যাদার লড়াইয়ে জিতেছিলেন। বস্তুত বোম্বাইয়ের এই উত্তর বোম্বাই শহর লোকসভা নির্বাচনী কেন্দ্রটিকে প্রতিনিধিত্ব করা তাঁর একটা অধিকারে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পাঁচজনে স্বীকার করলে কি হয়, ঘর-শত্রু বিভীষণ রয়েছে না! আর এই বিভীষণ-কুলের পান্ডা হলেন শ্রী এস, কে, পাতিল যিনি কথায় কথায় পদত্যাগের হুমকী দেন, কিন্তু দেশবাসী দাবি করলে লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে জবাব দেন: 'কভি নহী!' শ্রীপাতিলের অঙ্গুলি সঞ্চালনে এবার বোম্বাই প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি শ্রীমেননকে তাঁর পুরোনো কেন্দ্রে প্রার্থীপদের মনোনয়ন দেয় নি, দিয়েছে প্ল্যানিং কমিশনের সদস্য শ্রী এস, জি, বার্ভেকে। মেননের বিরুদ্ধে বিরোধীপক্ষের অভিযোগ তিনি নাকি কমিউনিস্ট-ঘেঁষা, তাই উত্তর বোম্বাই কেন্দ্রে ওঁকে মনোনয়ন দেওয়া হলে বোম্বাইয়ের বাকি কেন্দ্রগুলিতেও তাঁর "অশুভ প্রভাব" বিস্তৃত হবে, অর্থাৎ কংগ্রেস হেরে যাবে। প্রদেশ কংগ্রেসের দয়ার শরীর বলতে হবে, কারণ শ্রীমেননকে ওই উত্তর বোম্বাই ছাড়া যে কোন কেন্দ্রে দাঁড়ানোর "ঢালাও" অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। স্বভাবতই শ্রীমেনন এ-অপমান হজম করতে রাজী হন নি, তাঁর পুরোনো নির্বাচকমন্ডলীদের ছেড়ে অন্য কোথাও নিয়ে নির্বাচনপ্রার্থী হবার কথা তিনি চিন্তাও করতে পারেন নি। তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য ছিল, হয় উত্তর বোম্বাই নয়তো কোথাও না; লোকসভার বাইরে থেকেও দেশ-সেবা করা যায়।

মেননের পরাজয়ের জন্যে দায়ী তাঁর উদার মতবাদ, সমাজতন্ত্রের ওপর তাঁর অগাধ আস্থা, 'বিগ বিজনেস'-এর ওপর তাঁর ক্ষমাহীন আক্রমণ, দলিত মানবাত্মার প্রতি তাঁর সীমাহীন দরদ। মেনন ঠোঁট-কাটা স্বভাবের লোক, যুক্তি তাঁর ক্ষুরধার, বুলি তাঁর চোখা চোখা। কাজেই শত্রুর সৃষ্টি তো হবেই, যুক্তির ধার ধারে আর ক'জন? বুদ্ধির লড়াইয়ে আগ্রহীর সংখ্যা নগণ্য, লতা-প্যাঁচ দেখতে কুস্তির আখড়াতেই ভিড় জমে বেশি। তা সে লড়াই রাষ্ট্রসংঘেই হোক আর কংগ্রেস ভবনেই হোক। ভারতের জোট-নিরপেক্ষতা, বিশ্বশান্তিতে তার অকৃত্রিম আগ্রহ, বস্তুত ভারতের যে পররাষ্ট্রনীতি সমস্ত বিশ্বের অভিনন্দন লাভ করেছে তার অন্তরাল-স্থপতি ছিলেন কৃষ্ণমেননই। যৌবনকাল থেকেই শ্রীনেহরু সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় যন্ত্র হাতে নিয়ে সে সমাজতন্ত্রের

কৃষ্ণমেনন

ধারা বেয়ে চলা হয়তো একা তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না, প্রতিক্রিয়াশীলতার রথচক্র অগ্রাহ্য করে যদি পাশে তাঁর সহোদরপ্রতিম মেনন না থাকতেন।

ইংলন্ডে ছিলেন মেনন, দীর্ঘকাল ধরেই। কেরল-সন্তান মেনন মালাবার ও মাদ্রাজে পড়াশুনা শেষ করে ব্যারিস্টারী পড়তে গেলেন লন্ডনে। নেহরু-সুভাষ স্বাধীনতার জন্যে লড়েছেন ভারতবর্ষের মাটিতে দাঁড়িয়ে, মেনন এই সংগ্রামকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বুকে বসে, লবী সৃষ্টি করেছিলেন তিনি লন্ডনে ইন্ডিয়া লীগের মাধ্যমে। সুদীর্ঘ ১৮ বছর তিনি ইন্ডিয়া লীগের সেক্রেটারী পদে থেকে বিলেতের লিবারেলদের সমর্থন আদায়ে চেষ্টা করেছেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি, চার বছর সেন্ট প্যানক্রাস শহরের কাউন্সিলরও ছিলেন। শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রেই নয়, বুদ্ধিজীবীদের আগে দলে টানতে পারলে সাধারণ লোকের মন অনায়াসেই জয় করা যাবে—এ-বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টি মেননের ছিলো। তাই তিনি বুদ্ধিজীবী আন্দোলন সুরু করলেন অভিনব এক পন্থায়। আজ পেলিক্যান বুক্‌স-এর খ্যাতি জগৎজোড়া; এই পেলিক্যান বুক্‌স সিরিজের প্রথম সম্পাদক ছিলেন এই ভারতীয় বুদ্ধিজীবী শ্রী ভি, কে, কৃষ্ণমেনন।

পররাষ্ট্রনীতিতে গভীর পান্ডিত্য, তাঁর অপূর্ব বাচনভঙ্গী ও বাগ্মিতা সহজেই সকলকে মুগ্ধ করে ছিল, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে তাঁর ডাক পড়লো। কিন্তু শ্রীনেহরু তাঁকে প্রথম কাজের ভার দিলেন ব্রিটেনে ভারতের হাই কমিশনারের পদ দিয়ে। কিন্তু মেননের যোগ্যতার তুলনায়, তাঁর উৎসাহ, উদ্দীপনা, কর্মক্ষমতার তুলনায় সে-কাজ নিতান্ত তুচ্ছ। নেহরু তাঁকে দূরে রেখে শান্তি পাচ্ছিলেন না, তাঁর যে দরকার মেননকে। মেনন নেহরু-মন্ত্রিসভায় দপ্তরবিহীন মন্ত্রী হলেন। মেননের বুদ্ধি, চাতুর্য এবং বাগ্মিতাকে কাজে লাগালেন নেহরু তাঁকে রাষ্ট্রসংঘে পাঠিয়ে। যে-কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তান এত লম্ফ-ঝম্ফ করছে তা হয়তো তার বিদেশী মুরুব্বিরাও এতদিন পাকিস্তানের হাতেই তুলে দিতেন যদি না কৃষ্ণমেনন তাঁর অকাট্য যুক্তি ও অতুলনীয় বাচনভঙ্গী দিয়ে বিশ্বসভার সদস্যদের সেদিন হৃদয়ঙ্গম করাতে না পারতেন। ১৯৫৭-র ঐতিহাসিক নির্বাচন-যুদ্ধে জয়লাভ করার পর শ্রীমেনন প্রতিরক্ষা দপ্তর পেলেন, কিন্তু সে-পদ তিনি বেশি-দিন রাখতে পারেন নি। তিনি রাষ্ট্র-সংঘে এতদিন আমেরিকা-ব্রিটেনকেই তাঁর শত্রু মনে করে এসেছিলেন, ঘরে যে বিভীষণ বেড়ে উঠছিলো এ খবর তাঁর জানা ছিলো না, মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করতে হলো তাঁকে চীনা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে।

শ্রীমেনন ভারতে সমাজতন্ত্রের শিকড় মূলীভূত করার জন্যে সমাজবাদী সংগঠন গড়ে তোলায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। শ্রীনেহরুর লোকান্তরে তিনি নেতৃ-হীন হলেন বটে, কিন্তু নেহরুর আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব উপেক্ষা করতে পারেন নি। শ্রীমেননের গুণের সীমা নেই, কিন্তু তাঁর একটি বড় দোষ তিনি ভয়ানক রগচটা, আর যখন কারুর সমালোচনা করেন তখন অগ্নিস্রাবী মূর্তি ধারণ করেন যা অনেকের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হয় না। শ্রীমেনন শতেক বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও তাঁর আদর্শকে জলাঞ্জলি দিতে পারেন নি, মন্ত্রিত্ব তাঁর গিয়েছে, হয়তো এম-পি সীটও জুটবে না, কিন্তু ভারতীয় জনতার মুক্তিমন্ত্র সমাজতন্ত্রকে তিনি কিছুতেই ত্যাগ করতে পারবেন না, কোন মূল্যেই নয়!

আবার খাদ্য নিয়ে বিদেশী চাপ

ভারতে খাদ্য প্রেরণ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন প্রেসিডেন্ট জনসন। মার্কিনী চোখ রাঙানীর প্রতিবাদে, সুতরাং ভারত সরকার পুনশ্চ বোধ হয় দেশবাসীর প্রতি অনশন ধর্মঘটের, কিম্বা অর্ধাশন ধর্মঘটের আহ্বান জানাবেন। গত বছর ভারত-পাক সংঘর্ষের সময় ভারত এতাদৃশ অভিমানে টসটস করে উঠেছিল। ক্ষমতা-বানকে কায়দা করার জন্য এ ধরণের অনশন সত্যাগ্রহ দেশে যেমন সরকার-বিরোধী আন্দোলনের বেশ একটা চমকপ্রদ উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে; আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এতাদৃশ অভিমান প্রদর্শন কম ফলপ্রসূ নয়; দেশেও তাতে অনুকূল জনমতে সঙ্গে সঙ্গে পাক ধরে।

১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের অনুকূলে পাক-ভারত বিরোধ মিটিয়ে ফেলার জন্য ভারতের পেট-মেরে চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন মার্কিন সরকার। তখন স্বর্গত লালবাহাদুর শাস্ত্রী থেকে আমাদের রেশন বিশেষজ্ঞ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন পর্যন্ত সকলেই সমস্বরে শ্লোগান তুলেছিলেন, কম খাবো, না-ই খাব, চাপ মেনে নেবো না। বস্তুতপক্ষে এরপর যা মানতে হয়েছিল, তা হল, পি এল ৪৮০-র চাপ নয়, তাসখন্দে ঘোষিত চুক্তি। আর এই সময় খাদ্যোৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হওয়ার প্রয়োজনীয়তাও ভারত সবিশেষ হৃদয়ঙ্গম করেছিল। বলা বাহুল্য, একটা বছর স্বাবলম্বী হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট সময় নয়। তা ছাড়া ভারতের প্রতি প্রাকৃতিক বিরূপতাও সঠিক টাঙানো আছে। কিন্তু একটা বছর একচেটিয়া বাজারের খপ্পর থেকে নিজেকে মুক্ত করার পক্ষে যথেষ্ট সময় ছিল। খাদ্যের যোগানের ক্ষেত্রে মার্কিন গমের ওপর আমরা একান্ত নির্ভর-শীল হওয়ার দরুণই সে দেশ আমাদের প্রতি একচেটিয়া ব্যবসাদারের মতো চাপ সৃষ্টির সুযোগ ভোগ করে আসছে। খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে মার্কিন মুলুক ছাড়াও অনত্র বাজার সন্ধানের একান্ত প্রয়োজন তাই আছে। ইতিমধ্যে সে চেষ্টা কিছুটা সুরু করে দেখাও গেছে যে, ফল তাতে খারাপ হয় নি। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা উভয়েই ভারতে খাদ্য যোগানের ব্যাপারে সাধ্য মত চেষ্টা করতে অসম্মত নয়।

ভারতের ভিয়েতনাম নীতি যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সুখের বিষয় নয়, এটা সরল ব্যাপার। দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ত্রিশীর্ষ সম্মেলনে ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ বন্ধের দাবি মার্কিনী কৃতকর্মেরই পরোক্ষ সমালোচনা। এমত অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র ভারতের প্রতি রুষ্ট হবে এতে সন্দেহের কারণ নাও থাকতে পারে। ভিয়েতনামে মার্কিন নীতি

বিহারের খরাক্রান্ত পালামৌ জেলার একটি গ্রাম্য মহিলা ক্ষুধার জ্বালায় [illegible] বীজ সংগ্রহ করছেন

মার্কিন সরকারেরই নীতি। কিন্তু মানবতার প্রশ্নে এই নীতির সঙ্গে শুধু ভারতই নয়, সমগ্র পৃথিবীর জনমত সর্বাংশে একমত হতে অক্ষম। কিন্তু তারই প্রত্যুত্তর স্বরূপ যদি ভারতে প্রেরিতব্য গমের রপ্তানী প্রেসিডেন্ট জনসন স্থগিত রাখার চিন্তা করে থাকেন, তবে ভারতকেও আজ দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করতে হবে যে, গমের বদল ভারত তার স্বাধীন আন্ত-র্জাতিক নীতিকে দালালির স্তরে নামিয়ে আনতে নারাজ।

আমেরিকার 'ওয়াশিংটন পোস্টে' স্পষ্টতই বলা হয়েছে, দিল্লী ত্রিশীর্ষ সম্মেলনের ফলেই যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের সম্ভাবনা সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। সুতরাং খাদ্যশস্য বন্ধের বা স্থগিত রাখার এই মার্কিনী চিন্তার মূলে কূট রাজনীতিই যে ক্রিয়াশীল এ সম্পর্কে অভিজ্ঞ মহলে মতদ্বৈধ নেই, থাকার কথাও নয়। এখন প্রশ্ন হল, 'Aid' আখ্যায় ভূষিত করে যে বাণিজ্যকে তার প্রাপ্য মর্যাদার বেশি দান করা হয়েছে; সেই মার্কিনী 'Aid' যদি ভিয়েতনাম নীতির প্রতি ভারতের মতো একটি নিরপেক্ষ-নীতিতে বিশ্বাসী দেশের সমর্থন আদায়ের টোপ মাত্র হয়ে থাকে, তবে ভারত তার স্বাধীন সার্বভৌম নীতির মর্যাদা রক্ষার জন্যই 'Aid'-এর ছদ্মনামে ভিন্ন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক চাপকে প্রত্যাখ্যান করতেই বাধ্য হবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ডিপ্লোম্যাসী ভারতের এই দুর্বলতার কথা অবগত আছে যে, ভারত মার্কিনী গমের ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল এবং সে হিসেবে আমেরিকা একচেটিয়া বাণিজ্যের সুবিধাভোগী। ভারত এই চাপের খপ্পর

থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য এক বছর আগেই তার চেষ্টাকে যদি পুরোদমে কাজে লাগাত, তবে আজ নতুন করে মার্কিণ চাপ তার সম্মুখে বিপর্যয়ের বিভীষিকা প্রদর্শন করতে সাহসী হত কিনা সন্দেহ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতের রাজনীতিকেও যাঁরা বর্তমানে নিয়ন্ত্রিত করছেন, তাঁদের মধ্যে কতিপয়ের চেষ্টা, ভারতের ওপর মার্কিন প্রভাবকে কার্যত চূড়ান্ত করে তোলা। এতাদৃশ মার্কিন প্রেমের অত্যুগ্রতার প্রতি সাধারণের বিরাগ ও উষ্মা ভারতে কত তীব্র, গত বছর পি এল ৪৮০-র প্রশ্নে তা বোধ হয় ভারতে নিযুক্ত মার্কিন কূটনৈতিক দপ্তরও সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন। উপলব্ধির ধার ধারেন না বলে মার্কিন প্রেমে মশগুল একশ্রেণী তা কিন্তু বুঝেও যথার্থ গণনা করেন নি। ভারতকে স্বাবলম্বী করে তোলার পথের কাঁটা এঁরাই।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি এ ব্যাপারে ভারতবাসীর মনে শ্রদ্ধার উনিশ-বিশ যা ঘটবে, তারও থেকে বিরাগ জন্ম নেবে তাঁদের প্রতি যাঁরা মার্কিন মার্কেট ছাড়া অন্যত্র বাজার করতে যেতে বিশেষ কারণে নারাজ। সুখের বিষয়, এই উপদলীয় চাপ থেকে ভারত সরকার সাবধানে তাঁদের বহু ঘোষিত ন্যায় ও নিরপেক্ষতাবাদের নীতিকে আজও পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছেন। কিন্তু বার বার তিন বার বলে যে কথা আছে, মার্কিন চাপ সেই তিনবারে উপনীত হওয়ার আগেই, সরকারকে দৃঢ়ভাবে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে এমত চাপের সম্মুখীন তৃতীয় দফায় আর না হতে হয়। অর্থাৎ মার্কিনী সদিচ্ছায় আমরা যতই নিশ্চিন্ত থাকি না কেন, মার্কিনী ইচ্ছার হাতে নিজেকে সঁপে না দেওয়ার ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে হবে। এমন প্রস্তাব ১৯৬৫ সালেই উত্থিত হয়েছিল এবং প্রবল জনমতের দ্বারা তার স্বপক্ষে প্রভূত সমর্থনও ছিল। কিন্তু কাজ আশানুরূপ হয় নি।

যুক্তরাষ্ট্রীয় নির্দেশের জন্য

কিন্তু পাছে যুক্তরাষ্ট্রের বিরাগভাজন হতে হয় এই ভয়ে যদি কার্যকরী পন্থা গ্রহণে টালবাহানা ঘটে থাকে, তবে আজকের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সে মনোভাব আঁকড়ে থাকার আর কোনও কারণ নেই। যদি কোন কায়েমী স্বার্থ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আত্যন্তিক নির্ভরশীলতার নাগপাশে ভারতকে বেঁধে রাখার বাসনা পোষণ করে থাকে, তবে সে মনোভাবের ভরাডুবি হওয়ার সম্ভাবনাও সমীপবর্তী হয়ে এসেছে।

কেন না সম্প্রতি প্রকাশিত (পি টি আই পরিবেশিত) সংবাদে দেখা যাচ্ছে যে, কস্তুতই যুক্তরাষ্ট্র পি এল ৪৮০-র অনুদানকে কার্যত রূপায়ণে বেশ কিছু বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। এতদ্সংক্রান্ত ওয়াকিবহাল মার্কিন সরকারী মহলের মন্তব্যে গম-চুক্তি স্থগিত রাখার স্বপক্ষে কয়েকটি তদ্দেশীয় অসুবিধার উল্লেখ করা হয়েছে :

প্রকাশ (১) গত বছরে উদ্বৃত্ত মার্কিন গমের পরিমাণ বর্তমানে যথেষ্ট না থাকায় যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে অন্যত্র খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টা চালাতে পরামর্শ দান করে। কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স ও সোভিয়েট যুনিয়নের কাছে খাদ্য সংগ্রহের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতেও বলা হয়েছে। (২) কৃষি-উন্নয়নের দ্বারা ভারতের নিজেকে স্বাবলম্বী করে তোলা বা উৎপাদন বৃদ্ধির সর্বতোপ্রকার চেষ্টা করার পরামর্শও প্রদত্ত হয়েছে।

তাছাড়া 'শান্তির জন্য খাদ্য' আইন নামে একটি আইন যুক্তরাষ্ট্রে পয়লা জানুয়ারী থেকে বলবৎ হওয়ার কথা। এ জন্যও চুক্তি স্থগিত রাখার প্রয়োজন সেখানে দেখা দিয়েছে।

সুতরাং ব্যাপারটা মার্কিন দেশেও বেশ জটিলতার সৃষ্টি করেছে বলেই মনে হয়। তবে, ভারতে যখন কয়েকটি রাজ্য খরার দরুণ আজ প্রায় দুর্ভিক্ষাবস্থাগ্রস্ত, তখনই পূর্বতন গম-চুক্তি নিয়ে টালবাহানা ভারতের জনমনে অন্যতর প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করবে। এবং 'ওয়াশিংটন পোস্টে'র পর্যবেক্ষক-অভিমত যে মনে কিছু বিস্ময় ও বিরাগেরও কারণ হবে। মার্কিন সরকারী সংবাদ-উৎসগুলি অবশ্য এ ধারণা সম্পূর্ণ মুছে দিতে চেয়েছেন যে, ভারতের ভিয়েতনাম নীতি অথবা কৃষিনীতিতে পরিবর্তন সাধনের জন্যই খাদ্য প্রেরণের ব্যাপারটা স্থগিত রাখা হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট জনসনের প্রেস সেক্রেটারী শ্রীবিল মোয়ার্স জানিয়েছেন যে, ভারতের খরাজনিত অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য যে মার্কিন বিশেষজ্ঞগণকে ভারতে প্রেরণ করা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট তাঁদের অনুসন্ধানের ফলাফলপূর্ণ প্রতিবেদনের অপেক্ষা করছেন।

মার্কিন তরফের এই সুন্দর যুক্তিগুলি খুবই লাগসই বলে গ্রহণ করার পরও ভারতবাসীর মনে একটি প্রশ্ন জাগরূক হয়ে থাকবে : খাদ্য প্রেরণের ব্যাপারে ভারতের অনুরোধ যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিদপ্তর ও স্টেট ডিপার্টমেন্টের অনুমোদন লাভ করেছিল এবং যে অনুরোধ ভারত বিগত জুলাই মাসে প্রেরণ করে, অকস্মাৎ কোনও যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা না দিয়েই হোয়াইট হাউস তা স্থগিত রাখলেন কেন? আর যদি রাখলেনই তবে দিল্লীর ত্রিশীর্ষ সম্মেলন অবধি সে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অপেক্ষাই বা করতে হল কেন? এই কেনর জবাব যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারী মহল যে সুরেই দিন না, 'ওয়াশিংটন পোস্ট' অন্যতর অন্তর্নিহিত কারণ উদ্ঘাটিত করে দিয়ে ব্যাপারটাতে জটিলতা সৃষ্টি করেছে।

অনেকে এমন ধারণাও করছেন যে, রিপাবলিকান দলের শক্তিবৃদ্ধিতে প্রেসিডেন্ট জনসন সেনেটে প্রবলতর বিরোধিতার সম্মুখীন হবেন মনে করেই ভারতে খাদ্য প্রেরণের ব্যাপারটিকে স্থগিত রেখেছেন। অনেকে বলছেন, স্থগিতকরণের দ্বারা দেশের আবহাওয়াটা প্রেসিডেন্ট একবার খতিয়ে দেখে নিতে চান। এবং মার্কিণ অভিজ্ঞ মহলের কোন এক সূত্র থেকে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট সম্ভবত একটি নতুন দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি অনুমোদন করবেন। সে জন্য বর্তমান চুক্তি অনুসারে শেষ চালান পাঠানোর আগেই নতুন চালান ভারতে বন্দর-দ্বারে এসে ভিড়তে পারে। এ বিষয়ে জল অধিক ঘোলা করার এখনই কোন কারণ নেই।

কারণ থাক বা না থাক, বিগত পাক-ভারত সংঘর্ষের সময় ভারতের পেট মেরে চাপ সৃষ্টির মার্কিনী ডিপ্লোম্যাসির যে চিত্র ভারতীয় মনে অঙ্কিত হয়ে আছে, তাতে আশ্বাসে বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে ভারতীয়গণ মনে জোর পাচ্ছেন না।

তা ছাড়া ঠিক প্রয়োজনের চরম মুহূর্তে ভারতের প্রতি প্যাঁচ কষার এই কৌশলে ভারতবাসী বিশেষ চিন্তিত। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ভারত এবার সোভিয়েটের কাছেও খাদ্য ক্রয়ের চেষ্টা শুরু করবে। ভারতীয় মার্কিনপ্রেমীরাও মার্কিন নির্দেশকে রূপায়িত করার জন্য এবং (বস্তুতপক্ষে যদি ভারতে প্রতিশ্রুত খাদ্যশস্য প্রেরণে সে দেশ অসুবিধা বোধ করে) একাধারে ভারতের প্রাণ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মান বাঁচাতে সরকারী প্রচেষ্টার সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতাই করবেন বলে আশা রাখা যায় না কি! মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই ভারতকে অন্যত্র বাজার সংগ্রহের পরামর্শ দিচ্ছেন। মার্কিনপ্রেমীদের সুতরাং এখন নির্ভয়ে ভারত সরকারের দোসরা বাজার সন্ধানের উদ্দেশ্যকে সফল করে তোলায় যথোচিত সহায়তা করতে এগিয়ে আসা উচিত নয় কি? কিংবা আরও স্পষ্ট করে বললে, ভারত সরকারকে মার্কিন মুখাপেক্ষী করে রাখার জন্য তাঁদের যে নিরন্তর প্রচেষ্টা, সে সাধনায় বর্তমানে ছেদ পড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা মার্কিন নির্দেশে সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে না কি?

চেক-ভারত যুক্ত ইস্তাহার

শুধু ত্রিশীর্ষ সম্মেলনেই নয়, সম্প্রতি চেক-ভারত যুক্ত ইস্তাহারেও ভিয়েতনামে মার্কিন বোমাবর্ষণ অবিলম্বে বন্ধ করার আহ্বান সুস্পষ্টভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে। জেনেভা-চুক্তির ভিত্তিতেই যে ভিয়েতনাম সমস্যার সমাধান সম্ভব, যুক্ত বিবৃতিতে তার উল্লেখ আছে। ঘোষণা রাখা হয়েছে এই মর্মে যে, বহিঃশক্তির দ্বারা নয়, ভিয়েতনামবাসীর আপন ভাগ্য আপনি গড়ার অধিকার আছে।

অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রশ্নেও চেক-ভারত যুক্ত ইস্তাহার উদার মানবতাবাদী। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, পারমাণবিক অস্ত্রের প্রয়োগ নিরোধ, বর্ণবিদ্বেষ দূরীকরণ, সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ প্রতিহত করার ওপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে এবং ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি ও জার্মান সমস্যা সমাধানের কামনা রাখা হয়েছে।

ইস্তাহারে ভারতের কাশ্মীর নীতি সমর্থন

তাসখন্দ-চুক্তির প্রতি সমর্থন জানিয়ে চেক প্রেসিডেন্ট শ্রীনোভোৎনি ভারতের কাশ্মীর নীতির প্রতিও অকণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন। যুক্ত ইস্তাহারে কাশ্মীর নীতির উপরে সমর্থন ভারতের ক্ষেত্রে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

ভারতের মূল নীতিগুলির প্রতি সমর্থন জানিয়ে প্রেসিডেন্ট নোভোৎনি বলেছেন, মানবসমাজের প্রগতির ক্ষেত্রে যেগুলি মৌলিক বিষয়, আমাদের উভয় দেশের নীতি সেসব প্রশ্নে হয় একমত, নয় ঘনিষ্ঠ চিন্তার শরিক—

অন্তর্দেশে যাই হোক, বহির্জগতে ভারত বহুলাংশেই সমাজবাদী চিন্তাধারা ও প্রগতিশীল মানবহিতৈষী নীতিরই শরিক। তথাচ ভারতের পররাষ্ট্রনীতি নিরপেক্ষতাবাদের ধারক ও বাহক। এর দ্বারা ভারত নিজে সমাজবাদী সমাজ গঠন করতে না পারলেও সমাজতন্ত্রবাদী শিবিরের বন্ধুত্ব আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। বলা বাহুল্য, এর জন্য নেহরু-নীতি এবং নেহরু-নীতির শক্তিমান সমর্থক কৃষ্ণমেনন প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবর্গের পরিশ্রমই কার্যকরী হয়েছে। ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টি করে ভারতের এই মানবতাবাদী পররাষ্ট্রনীতিকে পর্যুদস্ত করার চেষ্টা কম হয় নি। কিন্তু ভারত সাবধানে তার ঘোষিত পররাষ্ট্রনীতির ওপর যতদিন শক্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে, বিশ্বের প্রগতিশীল শান্তিবাদী সমাজ ততকালই ভারত-বন্ধু। সমাজতান্ত্রিক চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট শ্রীনোভোৎনির ভারতের প্রতি উচ্ছ্বসিত ঐকান্তিকতার প্রকাশ তারই অন্যতম সাক্ষ্য।

গণতন্ত্র আটক আইন

গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে 'গণতন্ত্র আটক আইন' বলে কিছু আছে, এমন কথা বললে গালভরা 'গণতন্ত্র' শব্দটি বেফাঁস হয়ে যায়। অবশ্য প্রকৃত অর্থে যা 'গণতন্ত্র' গণতন্ত্রে তার স্থান নেই। কারণ গণতন্ত্র, জনগণের দ্বারা শাসনব্যবস্থাকে নির্দেশ করে। এদেশে তেত্রিশ কোটি দেবতার মতো তেত্রিশ দফা রাজনৈতিক দল এবং তার ওপর তদীয় উপদল আছে। দলেরা দল বাঁধেন, কাজ সাধেন কম। ফলত জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার হন এই মওকায় সংখ্যালঘিষ্ঠের সরকার। ভারতের কংগ্রেস শাসনও সংখ্যালঘিষ্ঠেরই শাসন। কেন না মোট ভোট তেত্রিশ দফা ভাগনের পর অপেক্ষাকৃত কম লঘিষ্ঠ দলকে মন্ত্রিসভা গঠন করতে আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে অপরাপর দলের সম্মিলিত সমর্থক সংখ্যাই জনসংখ্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। ওই 'গণতন্ত্র'ও বস্তুতক্ষেত্রে নেই, যা আছে তা হল

দিল্লীর লালকেল্লায় 'দেওয়ান-ই-আম'এ নোভোৎনী দম্পতির নাগরিক সম্বর্ধনা

সংখ্যালঘুদের তন্ত্র। সংখ্যালঘু যখন সংখ্যাগুরুকে শাসন করে, তখন তার হাতে এমন সব অস্ত্রের প্রয়োজন হয়, যার বলে এক এক ঘায়ে পাঁচশ' মাথা সহস্র হাতকে রোখা যায়। গণতন্ত্রে তেমন অস্ত্রই গণ-অধিকার হরণের তন্ত্র। এ তন্ত্র ভারতবর্ষে বিদেশী বৃটিশ চলে যাওয়ার পরও তাই টিকিয়ে রাখতে হয়েছে, না রাখলে সংখ্যালঘুদের তন্ত্রকে সাবধানে রাখা অসম্ভব। যেখানে সে ভয় আছে সেখানে 'গণতন্ত্র'কে আটক করার ব্যবস্থা করতে হয়।

অপরাধ নিবারণী আটক আইনের মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিলটি স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী শ্রীচ্যবন লোকসভায় উত্থাপন করলে, বিরোধীপক্ষ থেকে এ বিলের তীব্র সমালোচনা করা হয়।

প্রবীণ প্রাক্তন কংগ্রেসী শ্রী জে বি কৃপালনী আইনটি সম্বন্ধে বলেন, যে আইন গণতন্ত্রকে আটক করে তা নিষ্প্রয়োজন। শ্রী ইউ এম ত্রিবেদী আইনটিকে 'কালাকানুন' বলে অভিহিত করেন।

কালাকানুন 'রাওলাট আইনের চেয়ে জঘন্য' এই কথা বলে প্রায় সকল বিরোধী সদস্যই বিনা বিচারে এই আটক আইনটির মেয়াদ বৃদ্ধির বিরোধিতা করেন। তাঁদের বক্তব্য, দেশে বর্তমান দণ্ডবিধিগুলিই যথেষ্ট ; এবং কংগ্রেস সদস্য শ্রীকাকার আলি মির্জা এই বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, এই আইনে সরকার অভ্যস্ত হয়ে পড়ছেন, ব্যাপারটা অতীব আশঙ্কাজনক। আইনটি রাখতে হলে মেয়াদ ১৯৬৮ সালের মার্চ পর্যন্তই রাখা উচিত। কিন্তু শ্রীচ্যবন চান আরও তিন বছর যে কোন নাগরিককে বিনা বিচারে আটক করার ক্ষমতা মুঠিবন্ধ করে রাখতে।

তিনি অবশ্য এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় বদান্যতার কথাও উল্লেখ করতে ভোলেন নি। বলেছেন, রাজ্যস্তরে তো পাঁচ বছর মেয়াদবৃদ্ধির সুপারিশ আছে। কেন্দ্র মাত্র তিন বছরের পক্ষপাতী। আসলে কিন্তু আইনটা চলেই আসছে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের আমল থেকেই। শ্রীচ্যবন চাইছেন আরও তিন বছর। চাইছেন যখন তখন হবেও, কেন না, 'গণতন্ত্র' হলেও গণ-প্রতিনিধিদের বক্তব্য এখানে গণ্য নয় ; লোকসভার মেজরিটিই একমাত্র জোর। সেই জোরেই বিলটি পাশ হবে। কিন্তু আইনটা কেমন। না, কালাকানুন। আইনটা কী করেছে। না, সরকার-বিরোধী আন্দোলনের গলা টিপেছে।

কমিউনিস্ট সদস্য শ্রীইন্দ্রজিৎ গুপ্ত বলেনঃ এ আইন গণ-আন্দোলন দমনের আইন। এ কানুন গো-প্রেমিকদের উত্তেজনা দমনের জন্য ব্যবহৃত হয় নি। অর্থনৈতিক জগতে যারা নিয়ত অপরাধ করছে, এ আইন তাদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হওয়ার নয়। সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ায় যারা তারাও এ আইনের পাল্লায় পড়ে না। পড়েন তাঁরাই, যাঁরা গণতান্ত্রিক উপায়ে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে অংশ নেন। স্বতন্ত্র সদস্য শ্রীমাসানি বলেন, ১৯৫০-এ যার জন্ম, সে আইন আজও কংগ্রেস পার্টিকে জীইয়ে রাখার ব্যাপারে বেপরোয়াভাবে ব্যবহার হচ্ছে। একনায়কতন্ত্রী দেশ ছাড়া একমাত্র গণতান্ত্রিক ভারতেই বিনা বিচারে আটক রাখার আইন তৈরি করা হয়েছে। শ্রীমাসানি আরও বলেন, এক জঘন্য আইন সম্বল করে তাঁর জীবন শুরু করলেন নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

বিলটির সমর্থনে যুক্তি নিলাজ নিষ্কম্প। দেশের চতুর্দিকে হিংসাত্মক কার্যকলাপের বয়ান। বলা বাহুল্য, সে কার্যকলাপ যে আদৌ নিবারণমূলক আটক আইন বন্ধ করতে প্রযুক্ত হয় না, শ্রীইন্দ্রজিৎ গুপ্ত তার প্রমাণ দাখিল করেছেন উল্লিখিত বক্তব্যে।

কিন্তু কালা না শুনে ধর্মের কাহিনী। শোনার উপায় নেই। কেন? শ্রী এম আর মাসানি বলেছেন সেই কথা। শ্রীচ্যবনকে উদ্দেশ্য করে বলেছেনঃ আর কেন, এবার ক্রাচ ছেড়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করুন!

কিন্তু না, বিনা বিচারে নাগরিক আটকের স্বৈরতন্ত্রী ক্ষমতা না থাকলে, পাদমেকম চলার ক্ষমতা আগামী তিন বছর অর্জিত হবে বলে হয়ত শ্রীচ্যবনের বিশ্বাস নেই। তাঁর রাজ্য সরকারগুলি তাতেও অখুশি। কারণ অনেকে বিনা বিচারে আটক আইনের মেয়াদ আরও পাঁচ বছর জীইয়ে রাখতে চান।

বিরোধী দল-ভীত এ হেন শাসনে তবুও নাগরিকদের মৌলিক অধিকার বলেও একটা লিস্টি আছে। লিস্টি বানচালের জন্য নিবর্তনমূলক আটক আইনও আছে। এক হাতে বরাভয়, অন্য হাতে মারণ খড়্গ। অবশ্য নক্রুমার আগে গণতান্ত্রিক দেশ বলতে ভারত ছাড়া ঘানায়ও এমন রগড় ছিল বলে স্বতন্ত্র সদস্য শ্রীমাসানি উল্লেখ করেছেন।

জনপ্রতিনিধিত্বের অধিকার

মজুতদারী, মুনাফাখোরী ও ভেজাল ব্যবসায়ী হিসেবে অভিযুক্ত এবং এই খাতে কমপক্ষে ছয় মাসের দণ্ডভোগী ব্যক্তিরা কেন্দ্রে বা রাজ্য আইন সভায় সদস্যপদ লাভের যোগ্যতা হারাবে। এ সম্পর্কে জনপ্রতিনিধিত্ব বিষয়ক বিলটি লোকসভায় গৃহীত হয়েছে। বিলটি মহৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত সন্দেহ নেই। কিন্তু মহৎ উদ্দেশ্যের প্রয়োগ যে সব সময় সঠিক হবে এমন কথা বলা যায় না।

আমাদের অভিজ্ঞতা এবং প্রতিদিন সংবাদের ভিত্তিতে আমাদের যে ধারণা, তাতে দেখতে পাই, প্রকৃত সমাজবিরোধী ব্যক্তি অনায়াসেই আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে সমাজের মান্যগণ্য মহাজন হিসেবে তাকিয়া ঠেস দিয়ে সমাজের বুকের ওপর বসে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে এসব ব্যাপার 'ওপেন সিক্রেট' হলেও আইন এঁদের মুঠোর মধ্যে আনতে পারে না। জনপ্রতিনিধিত্বের ঢালাও অধিকার এঁদের ক্ষেত্রে বন্ধ করার কোনও উপায় নেই। অথচ যাঁদের কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে, জনপ্রতিনিধিত্বের অধিকারে উপরোক্ত বিলটি তাঁদেরই বঞ্চিত করতে উদ্যত। আইনের চোখে সবাই সমান। সুতরাং অন্যায় বিচার হয় না, একথা একশবার সত্য হলেও একথা অনস্বীকার্য যে, আইনও তার নিজের আইনে আবদ্ধ। সাজানো মামলায় নির্দোষ জেনেও বহু ক্ষেত্রে বিচারককে দণ্ড দিতে হয়। ভারতের দু-একজন মাননীয় আইনবিদ ও বিচারক ইতিমধ্যে এমন কথা বলেওছেন যে, সামাজিক কুটিলাবর্তে সব সময় এদেশে ন্যায়বিচার সম্ভবপর হয় না। সুতরাং যে আইন কেবলমাত্র রচিত এবং মুহুর্মুহু পরিবর্তিত আইনমালার দ্বারাই আবদ্ধ, সেই আইনের নিক্তিতে জনপ্রতিনিধিত্বের অধিকার কারও কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া কতদূর যুক্তিসঙ্গত এ প্রশ্ন স্বভাবতই উঠতে পারে।

এদেশ আজও ঘুষতন্ত্রী। ঘুষখোর প্রশাসনের হাত ফসকে কত শত অপরাধী প্রতিদিন জনারণ্যে মিলে মিশে দিব্যি সামাজিক প্রতিষ্ঠা ভোগ করছেন এবং ঘুষখোর প্রশাসনই কত ক্ষেত্রে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে কত শত নিরপরাধীকে কারাগারে নিক্ষেপ করছে তার বোধ করি ভুরি ভুরি প্রমাণ উদ্ধারের দরকার নেই। এদেশের এবং বিভিন্ন দেশের সাহিত্যই সেই কঠিন প্রশ্নের জবাব একাধিকবার চেয়েছে।

প্রকৃত অপরাধী অন্তরালে থেকে বৃত্তিভোগীকে অসৎকর্মের পরিচালক হিসেবে খাড়া করে দণ্ড তারই ঘাড় দিয়ে বইয়ে দেন, এমন দৃষ্টান্তেরও খুঁজলে অভাব নেই। সুতরাং দণ্ডিতের ওপরই দণ্ড প্রয়োগের এ হেন মহৎ উদ্দেশ্যটি বহুতর 'টেকনিক্যাল ডিফেক্টে'র দরুণ 'ডিফেক্টিভ' একথা বলতে হচ্ছে।

সমাজবিরোধীর সংজ্ঞাটিও ব্যাপক। এই সংজ্ঞার আওতায় কারুকে ফাঁসিয়ে বহুক্ষেত্রে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও সাধন করা যেতে পারে, তাও জোর করে অস্বীকার করার উপায় নেই। এককালে জমিদারশ্রেণী বিরাগভাজন প্রজা ও শত্রুকে

মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে আইনের অমোঘ দণ্ড তাদের ওপর নাচিয়েছেন; আজও শ্রমিকশ্রেণীর ওপর মালিকগোষ্ঠীর আক্রোশ চরিতার্থ করার জন্য এমত কেস তৈরি হয়ে থাকে। আইন সাজানো কেসকে সাক্ষ্যপ্রমাণ পেলে দণ্ডদানে বাধ্য।

এ সমস্ত কারণে, মনে হয়, কোন মানুষের যতক্ষণ নাগরিক অধিকার বর্তমান, কোনও অন্যতর প্যাঁচ প্রয়োগ করে ততক্ষণ তাকে সে অধিকার প্রয়োগে বঞ্চিত করার ভিন্নতর কোন উপায় আমাদের পক্ষে সন্ধান না করাই উচিত।

মজুতদারই বলুন, ভেজাল ব্যবসায়ীই বলুন, শুধু মুনাফাবাজই বলুন, সমাজে এই শ্রেণীর রুই-কাতলা কজন আদালতে দণ্ডিত হয়েছেন? কজনের বিরুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে মামলা দায়ের করা হয়েছে? এই সমাজের শিরোমণিরা কেমন প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকার ভোগ করছেন এ সমাজে? এ সমস্ত প্রশ্ন সামনে রেখে বর্তমান লেখক উপরোক্ত মন্তব্য ছাড়া এই বিলটিকে 'আহা মরি' বলে মেনে নিতে অক্ষম।

আসাম:

মোদের গরব মোদের আশা

আমার এই বাঙলা ভাষাকে পশ্চিমবঙ্গে আজও আমরা সরকারী ভাষারূপে চালু করতে (কার্যত) পারি নি। অথচ এই ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য বাঙালী তার ধনপ্রাণ সমর্পণ করেছে, বেয়নেটের মুখে পাকিস্তানে এবং বাঙালী খেদাও আন্দোলনের পাশবিক নখরাঘাতের কব্জায় আসামে। যে ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র আঞ্চলিক ভাষার মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়েছে, যে ভারতবর্ষে বাঙলা ভাষার স্থান আজও শিখরচূড়ায় দেদীপ্যমান, সেই ভাষাভাষীকে বলপূর্বক উচ্ছেদ করার জন্য আজ থেকে ছ' বছর আগে, ১৯৬০ সালে ভারতেরই পূর্ব সীমান্ত রাজ্য আসামে এক নৃশংস উন্মত্ততা শুরু হয়েছিল। সে উন্মাদ আক্রোশ দমনে আসাম সরকার পর্যন্ত অক্ষম কিংবা নিষ্ক্রিয় ছিলেন। কেন না আসামে বঙ্গভাষী উচ্ছেদ করার রাজনৈতিক কারণ ছিল। আসাম সরকারের অক্ষমতা আসামে প্রবাসী বঙ্গভাষাভাষীকে চরম অরাজক হত্যা ধর্ষণ ও অত্যাচারের শিকার হতে কার্যত সহায়তা করে।

লক্ষাধিক বাঙলা ভাষাভাষী সেদিন এই সর্বনাশা উন্মত্ততায় নতুনতম ভারতীয় ইহুদীতে পরিণত হয়। একমাত্র কামরূপের গোরেশ্বরেই ধন-প্রাণ-মান-ইজ্জত এবং সম্পত্তির ওপর যে আঘাত হানা হয়, তাতে সতের হাজার বঙ্গভাষাভাষী পরিবার আইন শৃঙ্খলাহীন শাসনের আশীর্বাদে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে।

এই ঘৃণিত অধ্যায়ের পুনরুন্মোচন, সেই ভয়াবহ স্মৃতির পুনর্জাগরণ আজ প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল ছিন্নমূল বঙ্গভাষাভাষীর প্রতি প্রদত্ত পুনর্বাসনের আশ্বাস বানচাল করে দেওয়ার অসমীয়া প্রচেষ্টার সংবাদ প্রকাশ হওয়ায়।

প্রকাশ, আসাম বিধানসভার তিনজন সদস্য সর্বশ্রী রথীন সেন, তারাপদ ভট্টাচার্য ও শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং নওগাঁ জেলার দুর্গত বঙ্গভাষাভাষীদের প্রতিনিধি সর্বশ্রী রমেশ দে, বীরেন তালুকদার ও রেবতী তালুকদার দিল্লী থেকে কলকাতা প্রত্যাবর্তন করে সাংবাদিকদের জানান যে, আসাম হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রীমেহরোত্রার তদন্ত-সাপেক্ষে প্রমাণিত নৃশংস এবং পূর্বকল্পিত বাঙালী ধ্বংসলীলার পর ছিন্নমূল বাঙালী পরিবারবর্গের পুনর্বাসনের যে সুপারিশ করা হয়, আজ দীর্ঘ ছ' বছর পরও সেই বিধ্বস্ত বাঙালী সমাজের জন্য আবেদন-নিবেদন করতে তাঁদের দিল্লী দরবার পর্যন্ত দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছে। করতে হচ্ছে কারণ, পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী খাতে যে অর্থ ঋণস্বরূপ প্রদত্ত হয়েছিল, আজ সেই ছিন্নমূল পরিবারবর্গের প্রকৃত পুনর্বাসন সম্ভব হয়েছে কিনা তার প্রতি সামান্যতম দৃকপাত না করেই আসাম সরকার সেই ঋণ আদায় করার জন্য বাঙালী পরিবারের ওপর যথেচ্ছ অত্যাচার আরম্ভ করেছেন।

প্রতিনিধিগণ এই অত্যাচার অবিলম্বে বন্ধ করার আবেদন নিয়েই দিল্লী গেছেলেন। প্রধানমন্ত্রী অর্থমন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের সঙ্গে কথাবার্তাও চালিয়েছেন এবং কিছু আশ্বাস এবং প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন বলেও জানা যাচ্ছে।

সরকারী অক্ষমতায় যে অসংখ্য বঙ্গভাষাভাষী পরিবার হীন ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন, তাঁদের পুনর্বাসিত করা সরকারেরই কর্তব্য। যে সরকার নাগরিকের ধনপ্রাণ রক্ষার দায়িত্বে অঙ্গীকারাবদ্ধ সে সরকার যখন সেই অঙ্গীকার পালনে ব্যর্থ হয়েছেন, তখন নাগরিকবৃন্দকে পুনর্বাসন বাবদ প্রদত্ত অর্থ কী হিসেবে ফেরৎ পাওয়ার জন্য পুনশ্চ অত্যাচার শুরু হতে পারে, তা হৃদয়ঙ্গম করা শক্ত। এই পুনর্বাসন পুরুষানুক্রমে অর্জিত এক-একটি জীবনধারাকে তার যথাস্থানে পুনর্বাসিত করার ক্ষমতা নিশ্চয় রাখে না। কোনরকমে পুনশ্চ জীবনযাত্রা শুরু করতে সাহায্য করে মাত্র। সেক্ষেত্রে নতুন করে জীবন শুরু করতে যে সাহায্য প্রদত্ত হয়েছে তা আদায় করার কোনও নৈতিক অধিকার থাকা অনুচিত। কেন না এ পাপের বোঝা যদি বহন করতেই হয়, তবে তা সংশ্লিষ্ট রাজ্য এবং সামগ্রিকভাবে ভারতকেই বইতে হবে।

দুর্গতদের সাহায্যে কোথাও ত্রুটি ঘটেছে দুর্গতদের সাহায্যে কোথায় ত্রুটি ঘটেছে আসাম সরকারের বরং সেদিকে নজর দেওয়াই সমধিক উচিত। ঋণ ফেরৎ নেওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করতে হবে। এ সমস্ত ব্যাপারে ঋণের প্রশ্ন কিভাবে উঠতে পারে তাই-ই অকল্পনীয়। বঙ্গভাষা মাতৃভাষা হওয়ার জন্য বাঙালী যদি কারও কাছে ঋণী থাকে, তবে সে ঋণ তার শ্যামলা স্নেহময়ী বঙ্গজননীর কাছেই, আর সে ঋণ অপরিশোধ্য। কেন্দ্রীয় সরকার বা আসাম সরকার নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষায় ব্যর্থতার দরুণ যে পুনর্বাসন ব্যবস্থা করার জন্য ন্যায়ত বাধ্য, সেই পুনর্বাসনের জন্য আসামের বঙ্গভাষাভাষী ছিন্নমূল জনসাধারণ মোটেই কোনও সরকারের কাছেই ঋণগ্রস্ত নন।

অবিলম্বে তাই দাবি ওঠা উচিত যে, ঋণের প্রশ্নই অবাস্তব এবং এই সাহায্যকে ঋণ আখ্যায় অভিহিত করার অর্থ সরকারের নিজ দায়িত্বকে অত্যাচারিতের স্কন্ধে চাপিয়ে দেওয়ার অন্যায় আবদার।

আসামে সুপরিকল্পিত বাঙালী নিধন অভিযানের যাঁরা শিকার হয়েছেন, তাঁদের ওপর 'ঋণ' নামক এই অবাস্তব বস্তুটি আদায় করার অজুহাতে যাতে পুনশ্চ বঙ্গভাষাভাষীদের ওপর অত্যাচার শুরু না হয়, সেদিকে সুতরাং সরকারী দৃকপাতের দাবি আমরা রাখছি।

সবিনয় নিবেদন

অনিবার্য কারণবশত এ সংখ্যায় কৃত্তিবাস ওঝার প্রবন্ধ 'প্রত্যাশার মৃত্যু ও একটি বিশ্বাসঘাতকতা' প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল না। —সম্পাদিকা

বন্-এ ব্র্যান্ড-এর সঙ্গে আলোচনারত কিসিংগার

পশ্চিম জার্মানী ঃ

পশ্চিম জার্মানীর রাজনৈতিক সংকটের এখনও অবসান হয় নি। প্রায় এক মাস পূর্বে এরিখ মেন্ডের নেতৃত্বে ফ্রি ডেমোক্রাট দল কর বৃদ্ধির প্রতিবাদে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক ইউনিয়ন ও ফ্রি ডেমোক্রাটিক পার্টির কোয়ালিশন ত্যাগ করার পর থেকেই এই সংকট চলছে।

এই সংকটের প্রথম বলি হয়েছেন চ্যান্সেলার লুডউইগ এরহার্ড। ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক ইউনিয়নের সভায় এরহার্ডকে চ্যান্সেলার পদ থেকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় কুর্ট জর্জ কিসিংগারকে চ্যান্সেলার করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। দলের সদস্যরা অনুভব করেন, বর্তমান অবস্থায় এরহার্ডের পক্ষে আর সব দিক সামলানো সম্ভব নয়। এক সময় যাঁকে জার্মানীর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের 'যাদুকর' মনে করা হত, আজ তাঁকেই অবাঞ্ছিত বলে গণ্য করা হচ্ছে।

নতুন নেতা কিসিংগার অবশ্য বিনা-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন নি। নেতৃত্বপদের জন্য ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি পেয়েছেন ১০৭ ভোট, আর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী এরহার্ড-মন্ত্রিসভার পররাষ্ট্র-মন্ত্রী গেরহার্ড স্রোয়েডার পেয়েছেন ৮১ ভোট এবং অপর প্রতিদ্বন্দ্বী আইনসভার ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক ইউনিয়নের নেতা রাইনার ব্রাজেল পেয়েছেন ২৬ ভোট। কিসিংগার পশ্চিম জার্মানীর দক্ষিণ-পশ্চিম রাজ্য ব্যাডেন-উরটেমবার্গের প্রধান। দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে 'বান্ডেস্টাগের' কোন সম্পর্ক নেই।

কিসিংগারের প্রথম কাজ একটি স্থায়ী সরকার গঠনের জন্য কোয়ালিশনের সহ-যোগীর সন্ধান। আইনসভায় ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক ইউনিয়নের একক সংখ্যা-গরিষ্ঠতা নেই। এতদিন তাঁরা ফ্রি ডেমোক্রাটদের সঙ্গে একযোগে সরকার চালাচ্ছিলেন। এরহার্ডের অর্থনৈতিক নীতির সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় তাঁরা কোয়ালিশন ত্যাগ করে গেছেন। এখন কি নতুন নেতা কিসিংগারের আহ্বানে আবার তাঁরা কোয়ালিশনে ফিরে আসবেন? না, দ্বিতীয় বৃহত্তর দল সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির সঙ্গে তাঁরা কোয়ালিশন গঠন করবেন, বার্লিনের মেয়র উইলি ব্র্যান্ডকে চ্যান্সেলারের পদে বসাবেন? ইতিমধ্যেই এরিখ মেন্ডের সঙ্গে উইলি ব্র্যান্ডের কয়েক দফা কথা-বার্তা হয়ে গেছে। এই দুই দলের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতৈক্যও রয়েছে।

স্থায়ী সরকার গঠনের জন্য কিসিংগার আপাতত দু-টি প্রস্তাব নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। তাঁর প্রথম প্রস্তাব, দেশের প্রধান তিনটি দল, অর্থাৎ, ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক ইউনিয়ন, সোস্যাল ডেমো-ক্রাটিক পার্টি ও ফ্রি ডেমোক্রাটিক পার্টিকে নিয়ে একটি 'গ্র্যান্ড কোয়ালিশন' গঠন করা হোক। এ হলে প্রায় সর্বদলীয় সরকার হবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পশ্চিম জার্মানীতে এমনটি আর হয় নি। কিসিংগার এই প্রস্তাব নিয়ে তাঁর দলের নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন, অন্য দু-টি দলের নেতার সঙ্গেও আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় প্রস্তাব ঃ আগেকার মত ফ্রি ডেমোক্রাটদের সঙ্গে কোয়ালিশন গঠন। শেষ পর্যন্ত কোনটা কার্যকরী হয় দেখা যাক। তবে সর্বদলীয় ঐক্য গঠন করা শক্ত।

ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, এবার যেভাবেই সরকার গঠন হোক না কেন, পশ্চিম জার্মানীর পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে গুরুতর পরিবর্তন আসন্ন। এতদিন ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাট ও ফ্রি ডেমোক্রাট কোয়ালিশন যেভাবে পূর্ব জার্মানীকে অগ্রাহ্য করে, কমিউনিস্ট জগতের দিকে মুখ ফিরিয়ে থেকেছে, এখন আর তা সম্ভব হবে না। ব্র্যান্ডের সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি ঘোষণা করেছে, পূর্ব জার্মানীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে—পূর্ব জার্মানীর বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটে সাহায্য প্রেরণ করতে হবে এবং, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও অন্যান্য পূর্ব য়ুরোপীয় দেশের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। ফ্রি ডেমোক্রাটিক পার্টিও প্রায় অনুরূপ নীতি ঘোষণা করেছে। অবস্থার চাপ এমন হয়েছে যে, কিসিংগারকেও বলতে হয়েছে ঃ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য তিনি চেষ্টা করবেন।

পশ্চিম জার্মানীর বর্তমান মন্ত্রিত্ব-সংকটের অবসান যেভাবেই হোক আর পররাষ্ট্রনীতির গতি যেদিকেই ঘুরুক, পশ্চিম জার্মানীর রাজনীতিতে সম্প্রতি যেভাবে নাৎসী প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে, তাতে বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ মাত্রেই বিচলিত বোধ করবেন। নাৎসী অত্যাচারের বিভীষিকা আজও মানুষকে শিহরিত করে তোলে। জার্মান জঙ্গীবাদের জন্য এই শতাব্দীতে দুই-দুইটি মহাযুদ্ধ হয়েছে। আবার যদি জার্মানীতে নাৎসীবাদের অভ্যুত্থান হয়, তাহলে মহাযুদ্ধের আশঙ্কাকে একেবারে দূর করা যায় না।

এত লোক থাকতে হঠাৎ চ্যান্সেলার হবার জন্য কিসিংগারের ডাক পড়ল কেন? এরহার্ডের পর তাঁর মন্ত্রিসভার আর কেউ চ্যান্সেলার হবেন, অথবা দলের কোন জাতীয় নেতা এই পদে অধিষ্ঠিত হবেন। কিন্তু মন্ত্রিসভা, কেন্দ্রীয় আইনসভা কিংবা দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কেউ নন, রাজধানী বন-এর রাজনীতির সঙ্গে দীর্ঘদিন সম্পর্করহিত রাজ্যস্তরের নেতা কিসিংগারকে বসানো হল এই পদে। এর আগে কখনও এরহার্ডের সম্ভাব্য উত্তরাধিকারী রূপে তাঁর নাম শোনা যায় নি। হিটলারের আমলে কিসিংগার নাৎসীদলের একজন বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন, এই কি তাঁর প্রধান যোগ্যতা? সন্দেহ করার কারণ আছে, ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক ইউনিয়নের সদস্যদের মধ্যে

যাঁরা নাৎসীবাদ ঘেঁষা তাঁদের চেষ্টাতেই কিসিংগার নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। কিসিংগার ১৯৩৩ সালে নাৎসী দলে যোগ দেন। এখন অবশ্য তিনি বলছেন, পরের বছর থেকেই তিনি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। কিন্তু তিনি দল ত্যাগ করেছিলেন, এমন কথা বলছেন না। যুদ্ধের সময় তিনি ভন রিবেনট্রপের অধীনে পররাষ্ট্রদপ্তরে দায়িত্বশীল পদে ছিলেন। বেতার প্রচারের কর্তৃত্ব তাঁর হাতে ছিল। এই সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিরোধ হয়। কিসিংগার নেতাজীর অনেকগুলি বেতারভাষণ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। রিবেনট্রপ ও গোয়েবলসের মধ্যে সংযোগরক্ষাকারীরূপেও তিনি কাজ করেছেন। আজ হঠাৎ এ কথা বললে হবে কেন, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে রিবেনট্রপ তাঁকে ব্যবহার করেছেন?

পশ্চিম জার্মানীর বিভিন্ন রাজ্যের সাম্প্রতিক নির্বাচনেও নাৎসীদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। নাৎসী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের দল হের থিনেজের নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক পার্টি ব্যাভেরিয়ায় ফ্রি ডেমোক্রাটদের পরাজিত করেছে। ন্যুরেমবার্গ ও মিউনিকেও তাঁরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছেন। হের স্ট্রস-এর নেতৃত্বে পরিচালিত চরম দক্ষিণপন্থী দল ক্রিশ্চিয়ান সোস্যাল ইউনিয়ন দলও ভাল ফল করেছে। হঠাৎ সর্বত্র নাৎসী ও দক্ষিণপন্থীদের প্রাধান্য বৃদ্ধি রীতিমত চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জার্মান রাজনীতিতে কিসিংগার, থিলেন, স্ট্রস প্রভৃতি নেতার আবির্ভাব এখন আর উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

বৃটেন ঃ

এবার পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আয়ুব খাঁর বৃটেন সফর মাঠে মারা গেল। একে তো যখন তিনি লণ্ডন এসে পোঁছেছেন, তখন বৃটেনের সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় বিশ্বসুন্দরী রীতা ফারিয়ার ছবি। আয়ুবের ছবিকে পাত্তা না দিয়ে এক ফচ্‌কে ভারতীয় মেয়েকে এভাবে প্রাধান্য দেওয়ায় ফিল্ড মার্শালের মিলিটারী মেজাজ তো একটু গরম হবেই। অন্য কোন দেশের মেয়ে হলেও বা কথা ছিল। এই রাগেই বোধ হয় আয়ুব খাঁ বেসামাল হয়ে হিন্দু ও হিন্দুধর্ম সম্পর্কে অনেকগুলি অশিষ্ট ও অশালীন উক্তি করেছেন। এককালে আয়ুবদোসর জুলফিকার আলি ভুট্টো নিরাপত্তা পরিষদে ভারতীয়দের কুকুর বলে কি বিপদে পড়েছিলেন, আয়ুব তা এত শীগ্‌গিরই ভুললেন কি করে?

পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতির এটা সরকারী সফর। সুতরাং, নিয়মমাফিক সরকারী সম্বর্ধনা ইত্যাদি হবেই। তার বাইরে কোন সম্বর্ধনা, কোন গুরুত্ব এবার তিনি লণ্ডনে পান নি। জনসাধারণ তাঁকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে, সংবাদপত্রে তাঁর সংবাদ বিশেষ প্রকাশিত হচ্ছে না, সাংবাদিকরা তাঁর দিকে এগুচ্ছেন না।

অবশ্য এর মধ্যেই সময় করে তিনি ভারতের বিরুদ্ধে গালাগাল দিয়ে যাচ্ছেন। কাশ্মীর প্রশ্ন উত্থাপনের চেষ্টাও করছেন।

সবচেয়ে বড়,
সবচেয়ে পুরনো,
সবচেয়ে ভাল ?
এগুলোর কোনটাতেই
আমাদের দাবী নেই।
কিন্তু আমাদের গর্ব
এই যে, আমরা
আপনার
ব্যাঙ্ক
আপনার শুভেচ্ছাই
আমাদের সবচেয়ে বড়
মূলধন। আমাদের সবচেয়ে
বড় পুরস্কার আপনার
সন্তুষ্টি।
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক
অব ইণ্ডিয়া লিঃ
রেজিষ্টার্ড অফিস ঃ
৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১
আমরা
সেবার সাথে
দিই
আরও কিছু
SSDG-13 B
পশ্চিমবঙ্গে ৮০টিরও অধিক শাখা আছে

জাপান ঃ

২৪শে নভেম্বর টোকিওতে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে জাপানের প্রধানমন্ত্রী এসাকু সাটো একশ' কোটি ডলার মূলধনের 'এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্কের' উদ্বোধন করেন।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় দীর্ঘদিনের একটা অভাব মিটল। এশিয়ার বৈষয়িক উন্নতিতে, বিশেষ করে অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে এই ব্যাঙ্ক বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারবে। ১৮টি এশীয় দেশ ও ১২টি অঞ্চল-বহির্ভূত দেশ এই ব্যাঙ্কের সদস্য-রাষ্ট্র রূপে যোগ দিয়েছে, এর মূলধন সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। সবচেয়ে বেশি মূলধন জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, ২০ কোটি ডলার করে। ভারতের মূলধনও কম নয়—৯ কোটি ডলার (ভারতীয় টাকার হিসাবে প্রায় ৭০ কোটি টাকা)। জাপানের তাকেশী ওয়াতানাবে ব্যাঙ্কের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। ভারতের শ্রী পি, ভি, আর, রাও ব্যাঙ্কের অন্যতম আঞ্চলিক ডিরেক্টর নির্বাচিত হয়েছেন। আর যাঁরা ডিরেক্টর হয়েছেন, তাঁরা হলেন এশিয়ার জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইনস ও দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিনিধি, আর অঞ্চল-বহির্ভূত দেশগুলির মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা ও পশ্চিম জার্মানী। আগামী ১৩ই ডিসেম্বর থেকে ম্যানিলায় এই ব্যাঙ্কের কাজ সুরু হবে।

ব্যাঙ্ক উদ্বোধন ছাড়াও টোকিওতে তিন দিন ধরে এশীয় উন্নয়ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জাপানের অর্থমন্ত্রী তাকিও ফুকুদা সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি-দলের নেতৃত্ব করেন কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থদপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীবলিরাম ভগত। এশিয়ার উন্নয়নের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সম্মেলনে বিস্তৃতভাবে আলোচনা হয়।

ক্যানাডা ঃ

রক্ষণশীল দলনেতা ডিফেন বেকারের নেতৃত্ব বোধ হয় এবার গেল। গত সপ্তাহে অটোয়ার 'স্যাটু লরিয়েতে' প্রোগ্রেসিভ কনজারভেটিভ পার্টির বার্ষিক সম্মেলনের বিবরণ দেখে সে কথাই মনে হয়।

ক্যানাডার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও বর্তমানে কমন্সসভার বিরোধী দলের নেতা ৭১ বছর বয়স্ক ডিফেন বেকারের বিরুদ্ধে আজ দলের বহু সদস্য। বিরোধীদের প্রধান হলেন দলের সভাপতি ডালটন ক্যাম্প স্বয়ং। বিরোধীদের বক্তব্য

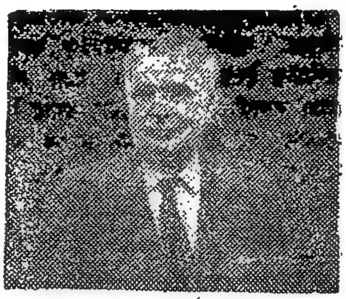

ডিফেন বেকার

ডিফেন বেকারের জন্যই তাঁরা পর পর দু'বার সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন। ডিফেন বেকারকে শহরাঞ্চলের লোক, ক্যাথলিক, কুইবেকের ফরাসীরা এবং সাধারণভাবে যুবকেরা পছন্দ করে না। সুতরাং, আগামী সাধারণ নির্বাচনে যদি জয়লাভ করতে হয়, তবে ডিফেন বেকারের পরিবর্তে নতুন নেতা চাই।

ডিফেন বেকার তাঁর সমালোচকদের সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত। এবারের সম্মেলনে তিনি এঁদের সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষায় নামার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি ভেবেছিলেন, এঁদের মাথা ক্যাম্পকে ধরাশায়ী করতে পারলেই আপাতত নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। তাই তিনি দলের সভাপতি পদের জন্য ক্যাম্পের বিরুদ্ধে তাঁর মনোনীত প্রার্থী আর্থার ম্যালনিকে দাঁড় করালেন। নামকরা বক্তা ডিফেন বেকার সম্মেলনে ম্যালনির পক্ষে জ্বালাময়ী ভাষণও দিলেন। কিন্তু ভোটের ফলে দেখা গেল, ৫৬৪-৫০২ ভোটে ক্যাম্প জয়লাভ করেছেন, ডিফেন বেকারের প্রার্থী পরাজিত হয়েছেন। এখানেই শেষ নয়। পরের দিন ক্যাম্পের উদ্যোগে সম্মেলনে প্রস্তাব পাশ হল, দলের নেতা পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন

বাউডেন

আছে কি না তা বিবেচনার জন্য ১৯৬৮ সালের আগেই একটি বিশেষ সম্মেলন আহ্বান করা হবে। এই সম্মেলনেই সম্ভবত ডিফেন বেকারকে সরিয়ে দেয়া হত, কিন্তু আগামী বছর ক্যানাডার স্বাধীনতাপ্রাপ্তির শতবর্ষ উৎসব। তার আগে পরিবর্তন করাটা শোভন মনে হয় নি ডিফেন বেকারের বিরোধীদের কাছেও। তবু ভোটের ফলে ডিফেন বেকার এত চটে গেলেন যে, সম্মেলনের সমাপ্তিভোজে তিনি তাঁর নির্ধারিত বক্তৃতা দিতে অস্বীকার করেন। ফলে ভোজসভার কর্মসূচী পরিত্যক্ত হয়।

ক্যানাডার রক্ষণশীল দলে তরুণদের সুস্পষ্ট প্রাধান্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ডিফেন বেকারের বয়স ৭১, আর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ক্যাম্পের বয়স মাত্র ৪৬।

দক্ষিণ রোডেশিয়া ঃ

বৃটেনের কমনওয়েলথ সচিব হারবার্ট বাউডেন আবার সলিসবেরী ছুটেছেন। উদ্দেশ্যঃ বৃটিশ সরকার স্বীকৃত দক্ষিণ রোডেশিয়ার গভর্নর স্যার হামফ্রে গিব্‌স্‌ ও বিদ্রোহী প্রধানমন্ত্রী আইয়ান স্মিথের সঙ্গে আলোচনা করা।

২৩শে নভেম্বর বৃটিশ কমন্সসভায় প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন বাউডেনের যাত্রার কথা ঘোষণা করে বলেন, অবস্থা খুবই গুরুতর। দক্ষিণ রোডেশিয়ার বিদ্রোহী শ্বেতাঙ্গ শাসকদের সঙ্গে বৃটিশ সরকারের মতৈক্য হচ্ছে না। তবু চেষ্টা করতে হবে।

২৬শে নভেম্বর বাউডেন সলিস্‌বেরীতে আইয়ান স্মিথের সঙ্গে আড়াই ঘন্টা ধরে আলোচনা করেছেন। আলোচনার ফলাফল এই প্রবন্ধ লিখবার সময় পর্যন্ত (২৭শে নভেম্বর) জানা যায় নি।

বৃটেনের আচরণ সকল সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে। আফ্রিকা একবাক্যে বলেছে, স্মিথদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। কমনওয়েলথের সেই কথা। রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাবেও বৃটেনকে চরম ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। অথচ, বৃটেন কেবল আলোচনাই চালিয়ে যাচ্ছে। বৃটেন নিজে যদি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারে তো নিরাপত্তা পরিষদের হাতে বিষয়টি ছেড়ে দিক। সে ব্যাপারেও উইলসন মনস্থির করতে পারছেন না। অবশ্য রক্ষণশীল দল শাসিয়ে রেখেছে, নিরাপত্তা পরিষদের দ্বারস্থ হওয়া তারা কোনক্রমেই সমর্থন করবে না।

আইয়ান স্মিথদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে বৃটেন যদি আরও দেরি করে তবে সমস্ত জিনিসটাই শেষ পর্যন্ত তার হাত-ছাড়া হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে।

জয়যাত্রী

মিহির পাল

দুটো ট্যাক্‌সী থেকে ওরা সবাই একে একে রাসবিহারী এভেনিউর 'পরে নেমে দাঁড়াল। এবং জয়োল্লাসের গর্বিত দৃষ্টি চারপাশে ছড়িয়ে ওরা নিজেদের নিয়ে মত্ত হয়ে পড়ল।

সমর সোরগোল তোলার মত কণ্ঠস্বরে বলল—কই হে, আমাদের ম্যানেজার কোথায়! ভাড়াটাড়া চুকিয়ে দাও। তারপর আমাদের পার্টিকে পথ দেখাও। বর-কনে কোথায় গেলে! তোমরা আমাদের মাঝখানে দাঁড়াও।

সুব্রত তখন ট্যাক্‌সীর মিটার দেখে নিয়ে প্যাণ্টের পকেট থেকে পার্স বার করে পয়সা মেটাচ্ছিল। আর বারবার অতীশ ও শমিতার দিকে তাকাচ্ছিল।

কিন্তু সবার মাঝে ওরা দুজনেই নিস্তরঙ্গ জলধির মত শান্ত ও স্থির।

অতীশ রাস্তার দিকে তাকিয়েছিল। ওর অন্যমনস্ক দৃষ্টি-সীমার মাঝ দিয়ে অনেক ট্রাম বাস ট্যাক্‌সী প্রচণ্ড গতিতে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

আর শমিতা উল্টোদিকের হাসপাতালটার গায়ে লুটিয়ে-পড়া হলুদ আলোর 'পরে চোখ রেখেছিল। একটা মাঝারি চেহারার কৃষ্ণচূড়া গাছের কাল ছায়া সেই হলুদ রোদের পিঠে ঠেস দিয়ে ঝিমোচ্ছিল।

ট্যাক্‌সী দুটোর মিটার ডাউন করার টুংটাং শব্দে বোধহয় অতীশ শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময় পৃথিবীতে পা রাখল। এবং সমরের চোখে চোখ পড়ায় অন্যমনস্কভাবে মৃদু হাসল।

ওরা তখন সবাই পুরোন বাড়িটার সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে উঠতে লাগল। সমর, সুব্রত, অমর জোরাল কণ্ঠে কথা বলছিল। আর সাথে ছবিও তার কলস্বর যুক্ত করছিল। পিছু পিছু কল্যাণ অতীশের কাঁধে হাত রেখে উঠছিল।

অনেক সম্মিলিত পদশব্দের মাঝে অতীশের পায়ের ছন্দ কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। তাই যেন বারবার তার মনে হচ্ছিল যে সে যেখানে পৌঁছতে যাচ্ছে সেখানে যেন মেঘের ছায়া, জলের ছপছপানি বা পাতার শপশপ আওয়াজের অস্তিত্ব কোনদিন খুঁজে পাওয়া যাবে না। জীবনে কবিতা নেই। কবিতাকে আসলে জীবনে উপলব্ধি করতে হয়। কারা যেন তার সেই অনুভূতির 'পরে অনবরত পাথর ভেঙে চলেছে। তার আর কবিতার কথা ভাবা হল না। কেমন একটা বিভ্রমে আর কষ্টে মাখামাখি হয়ে সে সিঁড়িগুলোর অনুশাসন মেনে চলছিল।

অতীশের পেছন পেছন শমিতা পথ ভাঙছিল। প্রাচীন সিঁড়ির ধাপগুলো,

ভাঙা পলেস্তরার গন্ধ কেমন করে তার স্মৃতির মূল ধরে নাড়া দিয়ে যাচ্ছিল। পাশাপাশি দীপ্তি উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করছিল—শমি, তোর চোখে জলের ছল-ছলানি কেন রে! আজকের স্মরণীয় দিনটিকে কেন—অশ্রুসিক্ত করছিস।

অশরীরী মানুষের কথা বলার মত প্রায় অশ্রুতস্বরে শমিতা বলল—না রে! তুই যা ভাবছিস—তা নয়। আমার আজ খুব মায়ের কথা মনে পড়ছে। আমার পনের বছর বয়সের সময় মা এই হাস-পাতালে মারা যান। তখন আমরা ভবানী-পুরে থাকতাম। সেও প্রায় আজ দশ বছর আগের কথা। ভাই-বোন সবার মাঝে মা আমাকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন। আজ মায়ের কথা কিছুতেই ভুলতে পারছি নে।

ততক্ষণে ওরা সবাই তিনতলায় রেজিস্ট্রারের ঘরের সামনে হাজির হয়েছিল। ওদের দেখে টুলের 'পরে গেঞ্জি হাফপ্যাণ্ট পরে বসে থাকা বাহাদুর উঠে দাঁড়িয়ে রেজিস্ট্রারের ঘরের কাটা দরজাটা খুলে ধরল। এবং বলল—আপনারা বসুন। আজ ছুটির দিন বলে সাহেব আসেন নি। আমি বাড়িতে ফোন করে দিচ্ছি।

টেবিলের এপাশে খানদশেক চেয়ারে ওরা ভাগাভাগি করে বসতে যাচ্ছিল। সুব্রত বাধা দিল—উঁহু, ওভাবে নয়। শমিতা, তুমি আমার কাছে এস। এখানে বস। আমিই তো আজ তোমায় সম্প্রদান করব। এখনই বরপক্ষের মাঝে গিয়ে বসাটা ঠিক হচ্ছে না।

ঘর মাতিয়ে সবাই হো হো করে হেসে উঠল। শমিতার মামাতোভাই সমর হাসির রেশ থেমে আসার সাথে সাথে কপট বিস্ময়ে বলে উঠল—বা রে! তুমি কি করে সম্প্রদান করবে। সে দায়িত্বভার তো আমার 'পরে ন্যস্ত। শমিতাই বলুক। আর তাছাড়া অতীশের প্রিয় বন্ধু হিসেবে তোমায় বরকর্তাই তো ভাল মানায়।

—শমিতা ও অতীশের কোন কথাই আজ গ্রাহ্য নয়। এটা ডেমোক্রেসীর যুগ। সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ ও মহিলাবৃন্দই বলুক। সুব্রত উঠে দাঁড়িয়েছে তখন। বক্তৃতা দেবার ঢঙে মুষ্টিবন্ধ হাত তুলে সে বলতে সুরু করল—আজ আপনাদের দরবারে যে আর্জি আমি পেশ করতে চাইছি—

সুব্রতর বক্তব্য ডুবিয়ে সবাই হাসির ফোয়ারা ছোটাল।—রেজিস্ট্রারের ছোট্ট কক্ষে সে হাসি একটা কোলাহলের সৃষ্টি করল। শমিতার বান্ধবী দীপ্তি হেসে চেয়ারে গড়িয়ে পড়তে পড়তে বলল—আপনি সাংঘাতিক লোক মশায়।

—যাক, আমার দাবি মঞ্জুর হয়েছে। সুব্রত শান্তমুখে বসে পড়ল। তারপর দরজার দিকে তাকিয়ে হাঁক দিল—কই হে, বাহাদুর। তোমাদের চক্রবর্তী সাহেবকে একটা ফোন কর। তার আগে এক গ্লাস জল খাওয়াও।

কল্যাণ বলল—এক গ্লাসে কুলোবে না বাহাদুর। তুমি বরং এক ঘটিই আন।

অমর ঠাট্টা জুড়ল—একেবারে এক ঘটি। কল্যাণ কি স্থানমাহাত্ম্যে নার্ভাস হয়ে পড়লে নাকি! ছবি তুমি ওকে সামলাও। জুৎসই একটা কথা বলার গর্বে অমর স্ফীত হয়ে চারদিকে তাকাল।

ছবি লজ্জা পেল।—কি যা তা বলছেন। থামুন তো!

সমর এতক্ষণের কৌতুক ও ছবির আরক্ত মুখ নীরবে উপভোগ করছিল। এবার রহস্যটাকে ঠেলে দিয়ে সোজা দাঁড় করাবার মানসে বলল—কল্যাণবাবু, আজ-কের মত আনন্দ পেতে আবার আমরা কবে সমবেত হচ্ছি।

কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে নিবিড় মনোযোগ দেবার মত সবাই কথাটাকে ঘিরে গুঞ্জনে রত হয়েছিল। মাঝে মাঝে এপাশ-ওপাশ থেকে হাসির তরঙ্গ উঠে সমস্ত ঘরখানাকে যেন প্লাবিত করছিল।

একঘর লোকের কথাবার্তা, হাসি, ঠাট্টা, রসিকতা, কণ্ঠস্বর—কিছুই যেন অতীশকে কস্তুর স্পর্শ করছিল না। সবার মধ্যে বসেও তার নিজেকে কেমন সম্পর্ক-চ্যুত বলে মনে হচ্ছিল। এবং বন্ধুদের আচার-আচরণের তরলতায় সে ভীষণ বিরক্তবোধ করছিল। স্নানান্তে গা বেয়ে বেয়ে তেল গড়িয়ে পড়ার মত ওদের উৎসাহ ও খুশির প্রাচুর্য তার কেমন রগরগে, স্থূল ও অমার্জিত লাগছিল। যেন ফুটবল মাঠে দাঁড়িয়ে, হাত-পা ছুঁড়ে, দেহ নাচিয়ে, ভ্রূভঙ্গি করে, রেফারীর উদ্দেশ্যে অশ্রাব্য বাক্যের শরক্ষেপ করতে করতে হঠাৎ গো-ও-ও-ল বলে চেঁচিয়ে ওঠা বা ছুটির দুপুরে সময়কে উজান ঠেলে পেরিয়ে যাবার তাগিদে বাহান্ন-খানা তাস নিয়ে হৈ-হুল্লোড়ে রত হওয়ার উল্লাসের সাথে আজকের সমবেত বন্ধুদের স্ফূর্তির কোন তারতম্য সে খুঁজে পাচ্ছিল না। সবার অঙ্গভঙ্গি, হাসি, তামাসা মিলেমিশে এমন একটা সন্তোষকেই যেন উজ্জ্বল রংয়ের ধ্বজা তুলে প্রকাশে রত যা শুধু বিজ্ঞাপিত করছিল যে এখানে শমিতা-অতীশকে নিয়ে পেঁছতে পারাটা এক পরম কর্তব্য সাধন, এক রমণীয় অচ্ছোদে অবগাহনের সামিল।

অতীশ কেমন অস্বস্তিবোধ করছিল। তার মাথায় একটা যন্ত্রণা চাপসৃষ্টি কর-ছিল। খানিকটা অব্যাহতি লাভের আকাঙ্ক্ষাতেই সে বাহাদুরের হাত হতে জলের গ্লাস নিয়ে অন্যমনস্কভাবে কিছুটা খেয়ে ফেলল।

জল দিতে দিতে বাহাদুর বলছিল—এই এক্ষুণি ফোন করে দিচ্ছি। আপনাদের জন্যেই আজ অফিস খোলা রেখেছি।

বাহাদুর এখানে কাজ করতে করতে খুবই চতুর হয়ে উঠেছে, দু-একটা মিষ্টি কথা হৃষ্টচিত্তে একটু ফাই-ফরমাস খাটলে দু-এক টাকা বকশিস হামেশাই মেলে। কখন-সখন পাঁচ-দশ টাকার নোট হাতে এসে পড়াটা বিচিত্র নয়।

এখন কেস কম আসছে। এই সময়টাতে কার্তিকমাসে কাজ একটু বরাবরই কম থাকে। রেজেস্ট্রি বিয়ে করলে হবে কি—লোকে সংস্কারকে ছাড়তে পারছে না। তাই অগ্রহায়ণ মাস হতে বিয়ের মরশুম সুরু হয়। তখন দিনে দিনে আট-দশটা কেস সাহেবকে করতে হয়। আর বিয়ের দিনগুলোতে তো কথাই নেই। তখন সাহেবের নাওয়া-খাওয়ারই সময় থাকে না।

শমিতা দেখছিল—বাহাদুর ডায়াল করে ফোনে সাহেবের সাথে কথা বলছে। বছর পঁচিশ বয়স হবে বাহাদুরের। পরি-চ্ছন্ন মুখ, আনন্দিত তৃপ্ত চেহারা। মুখে একটা সদাপ্রসন্ন ভাব। হয়তো বা বিবাহিত এবং দু-একটি সন্তানের জনক।

এমনি একটা প্রসন্ন চেহারা মানুষের কি করে হয়—শমিতা জানে না। তাদের দলের মধ্যে এমনি মুখশ্রী কারও নেই। যদিও টেরিলিনের সার্ট-প্যাণ্ট পরা গভর্নমেণ্ট অফিসর হতে প্রাইভেট ফার্মের মোটা মাইনের রোজগারী, মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ইত্যাদি এখানে উপস্থিত, তবুও এমনি এক সহজাত প্রসন্নতা হতে সবাই বঞ্চিত। সবাই কথা বলছে, হৈ-হৈ করছে, হাসছে, কিন্তু কেমন যেন আনন্দ বিবর্জিত রক্তশূন্যতা। কেমন এক কথার পিঠে কথা জুড়ে যাবার অস্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টা। জোর করে হাসির বলয়টাকে নিয়ে এপাশে-ওপাশে নিয়মমাফিক লোফালুফি।

শমিতা ঘরের মধ্য হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে হাসপাতালের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ান ধুলোয় ধোঁয়ায় মলিন গাছটার 'পরে চোখ রাখল। আসলে হাসপাতালটাই আজ তাকে বারে বারে আকর্ষণ করছে। সে এমনি শ্রান্তিবোধ করছে যেন হাস-পাতালের শান্ত শুভ্র শয্যায় আশ্রয় নিতে সক্ষম হলে সে বেঁচে যেত।

ফোনটা রেখে বাহাদুর জানাল—সাহেব দুটো-সোয়াদুটোর মধ্যেই এসে যাবেন। আপনারা ঘণ্টাখানেক বসে আরাম করুন, গল্প-স্বল্প করুন। আজ কেউ এসে আপনাদের বিরক্ত করবে না। বলেন তো চা এনে দিচ্ছি।

—হ্যাঁ, তাই নিয়ে এস। সুব্রত পার্স থেকে পয়সা বার করছিল।

—আট কাপ আনব তো? বাহাদুর জিজ্ঞেস করল।

অতীশ তাড়াতাড়িতে বলে উঠল—না, সাত কাপ আনতে দাও, সুব্রত। আমায় বাদ দাও। মাথাটায় কেমন যন্ত্রণা হচ্ছে, ধরেছে।

সমর সাথে সাথে বলল—তা তো কিছু ধরবেই ভাই, অতীশ। তোমার তো শুধু মাথা নিয়ে সমস্যা। আমার যে কি অবস্থা হয়েছিল। তোমরা তো সবাই মিলে হাসি-ঠাট্টা করছিলে। আমি তখন ভেতরে ভেতরে ঘামছিলাম। মাথায় যন্ত্রণা তো হচ্ছিলই—তা ছাড়াও আবার হৃৎকম্প। সব মিলিয়ে কেমন ঠান্ডা মেরে যাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল বিয়ের আগেই বুঝি হার্ট ফেল করব। বিগত যন্ত্রণার স্বাদ নতুন করে অনুভব করার কণ্ঠে সমর কথা শেষ করল।

সমরের কথা শুনে বাহাদুরও হেসে ফেলল। হাসতে হাসতেই টাকা নিয়ে সে বেরিয়ে গেল। আর ওরা সবাই সুব্রত অমর কল্যাণ দীপ্তি ছবি—সবাই হাসির তরঙ্গে লুটোপুটি খাচ্ছিল।

শমিতাই শুধু হাসছিল না। এদের হাসির ঢেউয়ে আছাড় খাওয়া দেখতে দেখতে একপলক সে অতীশের দিকে তাকাল। অতীশের একটু আগের যন্ত্রণাকাতর মুখের 'পরে এক টুকরো হাল্কা লজ্জার লাল মেঘ জমেছে।

ছলাৎ করে একটা বেদনার সুক্ষ্ম রেশ স্মৃতিস্তর ভেদ করে একটা অতীতের সময় সীমানায় শমিতাকে দাঁড় করিয়ে দিল। তখন অতীশ এ রকমই লজ্জায় ঘামত। বরাবর মেয়েদের মতই আরক্তিম হয়ে উঠত।

সেসব দিনের কথা অতীশের স্মরণ হতে নিশ্চয়ই ঝরে গেছে। পরিচয়ের প্রথম সঙ্কোচ-জড়িত দিনগুলো এখন শমিতার মনে ভাসছে।

বছর দুই আগে পুজোর পরে এক ছুটির দিনের বিকেলে কলেজ স্ট্রীটে সমরদার সাথে কিছু কেনাকাটার জন্যে বেরিয়ে শমিতার অতীশের সাথে দেখা।

সমরই প্রথম দেখেছিল—আরে অতীশ যে! কোথায় এসেছিলে!

বোধহয় সমরের পাশে একটি মেয়ের উপস্থিতিতে অতীশ দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে কোনমতে বলল—এই এসেছিলাম এদিকে—।

এসো, তোমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। সমর বলল।—এই আমার পিসতুতো বোন শমিতা মাইতি। নিউ সেক্রেটারীয়েটে কাজ করে। স্মল স্কেল ইনডাস্ট্রিজে। আর এ আমার কলেজের বন্ধু অতীশ গাঙ্গুলী। এ জি-তে আছে।

শমিতার যুক্ত করের বিনিময়ে কোন-মতে প্রতিনমস্কার করেছিল অতীশ। মুখে সরমের আভাস। শুধু অস্ফুটস্বরে বলেছিল—তবে তো আমরা প্রায় এক পাড়ারই বাসিন্দে। বলে ফেলেই কেমন এক লজ্জায় কাতর হয়ে পড়েছিল।

সমর অতীশের অবস্থা দেখে হাসছিল। তাই ওকে নিস্কৃতি দেবার জন্যে বলেছিল অতীশ, তুমি খুব ব্যস্ত মনে হচ্ছে।

সমরের ইঙ্গিতে অতীশ হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। মনে মনে সমরকে অজস্র ধন্যবাদ দিতে দিতে অতীশ জবাব দিল—হ্যাঁ, আমার এক বন্ধু ওয়াই, এম, সি, এ-তে থাকে। তুমি তো সুব্রতকে দেখেছ। ওর সাথে একটা এ্যাপয়েন্টমেন্ট রয়েছে। বলেই সে হাত ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখল। তারপর বলল—আচ্ছা চলি।

অতীশের পিঠের 'পরে সমর ফ্যাফ্যা করে হাসছিল। হাসতে হাসতেই বলল—এক নম্বরের ভীতু। উত্তাপে বরফ গলার মত মেয়েরা কাছে এসে দাঁড়ালেই ঘামতে সুরু করে। এ জি-তে এত মেয়ের ছড়াছড়ি। কারও সাথে আজ অবধি কথা বলতেই সাহস পেল না। সমর আবার হাসতে সুরু করেছিল।

উত্তরে শমিতা বলেছিল—এত হাসার কি হল। বাবা! আজকালকার ছেলে-গুলো যা হয়েছে। রাস্তাঘাটে পারলে যেন গিলে খায়। কি তাদের চাউনি! তবু তো একটা ওয়েসিসের সন্ধান পাওয়া গেল যেখানে মেয়েদের সমীহ করা হয়।

বক্র কটাক্ষে তাকিয়ে সমর ঠাট্টা করেছিল—দেখ বাবা, সাবধান।

আশ্চর্য! রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতার ঠাট্টাটা ফলে যাবার মত এ ঠাট্টাটাও সফল হবার সম্ভাবনা দেখা গেল। কেন না তার পরের দিনই জি পি ও-র সামনে তাদের সাক্ষাৎকার ঘটেছিল। অতীশ কেমন এক লজ্জা মেখে নিয়ে হাসছিল।

শমিতাই সেদিন উদ্যোগী হয়ে কথা বলেছিল।—ভাগ্যিস পৃথিবীটা গোল হয়েছিল। নইলে আমাদের সাক্ষাৎকার ঘটত কি করে!

কথাটার ধ্বনি দুজনের মাঝে বর্ষা পতনের শব্দের মত নিবিড় হয়ে মিশে যাচ্ছিল। এক সময় ওরা দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলেছিল। আর সেই হাসির শেষে দুজনেই কেমন করে অনুভব করেছিল যে তারা পরস্পরের সাথে অনেক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

অতীশ প্রস্তাব করেছিল—চলুন এক কাপ চা খাওয়া যাক। কোণের পাঞ্জাবী দোকানটায় চলুন।

—না, ওখানে নয়। বরং চলুন হাঁটতে হাঁটতে এসপ্লানেডে যাওয়া যাক। অজন্তায় বা কে সি দাশে বসা যাবে।

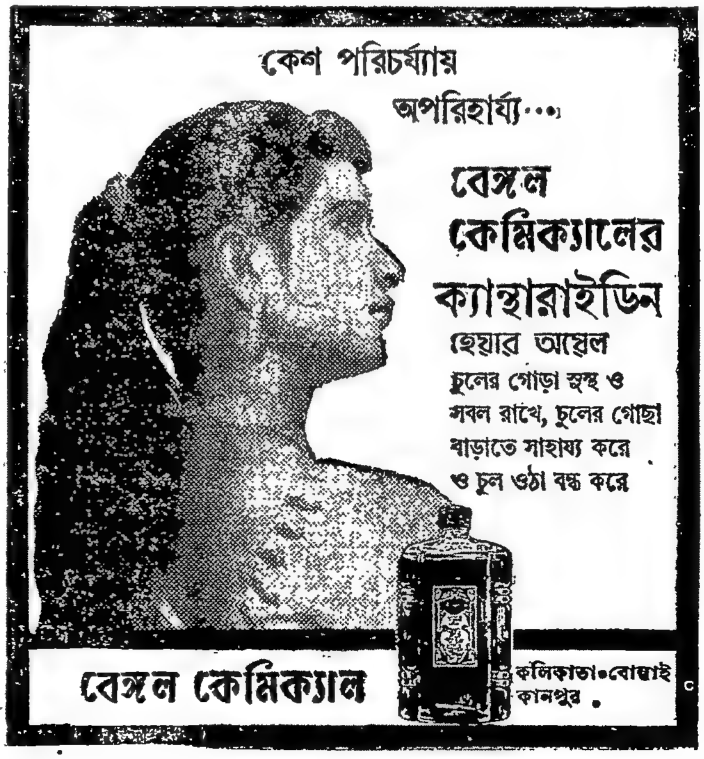

তারপর আলো-আঁধারির পথ বেয়ে এক সময় ওরা অজন্তায় পোঁছেছিল। পাশাপাশি পথ চলা ওদের সেখানেই সুরু।

তারপর দেড় বছর ধরে দুজনে নির্জনতার খোঁজে, চলমান পৃথিবীর আড়ালে গিয়ে দাঁড়াবার তাগিদে কলকাতা চষে ফেলেছে। আউটরাম ঘাটের গঙ্গার শান্ত কোল, ইডেন গার্ডেনের বৃক্ষছায়া, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগানের বিস্তৃতি, লেকের মায়াময় পরিবেশে কাল জলের পাশে ঘাসের গালিচা, টালা পার্কের স্তিমিত আলো, কত রেস্তোরাঁর কেবিনের অন্তরাল—ওরা শুধু চক্রবৎ ঘুরেছে আর ঘুরেছে।

সুব্রত বলত—অতীশ তোমার হল কি! আমার হোস্টেলে যাওয়া আজকাল ছেড়ে দিয়েছ—তা না হয় দাও। শুনছি তোমরা নাকি আজকাল ডায়মন্ডহারবার, ত্রিবেণী, কাকদ্বীপ অবধি ছুটছ। কলকাতা কি আজকাল খুবই স্টাফি মনে হচ্ছে!

অতীশ বলত—ভীষণ! কলকাতা বড্ড ছোট্ট, ক্ষুদ্র ও গন্ডিবদ্ধ। এখানে জীবিকার জন্যে পশুর মত লড়াই করা যায়, জীবন ধারণও করা সম্ভব। কিন্তু কলকাতায় মানুষ বাঁচতে পারে না। এখানে তার আত্মা ঘুলিয়ে ওঠে। তোমাদের কবি ভুল বলেছেন। কলকাতা কখনই কল্লোলিনী তিলোত্তমা হতে পারে না।

সুব্রত কপট গাম্ভীর্যে জবাব দিয়েছিল—বুঝেছি, তুমি গোল্লায় গেছ।

জবাবে অতীশ বাইরের সোনালী রোদের দিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে উঠেছিল।

কে এ জোরে হাসে? শমিতা চমকে উঠেছিল। হাসপাতালের আউটডোরের প্রাচীরে নিরুত্তাপ হলুদ রোদের চুনকাম। মাঝে মাঝে গাছের ছায়ায় কাল কাল ছোপ। সেখানে চোখ রেখে শমিতা দেয়ালের লিখন পড়ছিল।

ঘরের মাঝে চোখ ফিরিয়ে শমিতা দেখল সুব্রতর কি এক কথায় সমর হাসিতে ফেটে পড়েছে। অল্প বেশি শব্দ করে আর সবাই হাসছে।

একটু সামলে নিয়ে সমর বলল—হাসতে হাসতে গলা চিরে যাবে দেখছি। বাহাদুর চা আনতে এত দেরি করছে কেন? গলাটা একটু—

এমনি সময় বাহাদুর চায়ের কেটলী নিয়ে ঢুকল। ঘরের ডানপাশে একটা কাঁচের আলমারী হতে কাপ প্লেট বার করে ওদের চা ঢেলে দিতে লাগল।

চা খেতে খেতে শমিতা আবার জানালার বাইরে চোখ রেখেছিল। হাসপাতালের আউটডোরের ছাতের 'পরে বসান জলের ট্যাঙ্কের 'পরে চিত্রার্পিতের মত দুটো কাক বসে। এমনি স্টীল ফটোর মত অতীশের সাহচর্যমুখর দিনগুলো তার একে একে মনে পড়ছিল।

কিন্তু অতীশ ধীরে ধীরে তার কেমন অচেনা হয়ে যাচ্ছিল। অতীশকে সে বুঝে উঠতে পারছিল না।

ত্রিবেদী - ডায়মন্ডহারবার-কাকদ্বীপ-ফলতার গঙ্গার উদাস বিস্তৃতি, মাঠ-ঘাট পথ-প্রান্তরের উদাস বৈরাগ্য, রূপ-নারায়ণে-দীঘার সমুদ্রে সূর্যডোবা গোধূলি কেমন করে যেন অতীশের প্রকৃতিতে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটাচ্ছিল। পার্শ্বে উপবিষ্টা শমিতা যেন আলাদাভাবে অতীশের কাছে গুরুত্ব হারাচ্ছিল। সমগ্র প্রকৃতির রূপসৃষ্টির অঙ্গরূপে শুধু সে বিবেচিত হচ্ছিল।

শমিতা নিজেকে উপেক্ষিত বলে বোধ করছিল। তথচ অতীশের সেই অবহেলাটা এমনি অনিচ্ছাকৃত নিশ্বাস-প্রশ্বাস জল-বাতাসের মতই এত সহজ যে শমিতা আহত হতে ভুলে যেত।

অথবা হয়ত এও হতে পারে যে, শমিতার দেহ মন আত্মা কামনা বাসনা সাধ স্বপ্ন সব কিছু জানা হয়ে যাবার পর অতীশ শমিতাতে আকর্ষণ হারাচ্ছিল।

অথবা শমিতা হয়ত এমনি মেয়ে যে দেয় জিনিষ সরাসরি অর্পণ করে বসে। মেঘদর্শনে ময়ূরের বিচিত্র বর্ণের পক্ষ-বিস্তারের মত ছলাকলা ও নৈপুণ্যের পরিচয় ও প্রমাণ প্রদানে সে ব্যস্ত নয়। ফলে হয়ত অতীশ শমিতাতে দীর্ঘস্থায়ী আকর্ষণের সূত্র খুঁজে পাচ্ছিল না।

অথবা হয়ত অতীশের স্বভাবই এমনি যে, তার কাছে ভালবাসা, মেয়েদের আকর্ষণের সূত্র সহজেই ফিকে হয়ে আসে। অথবা হয়ত যে মাঝারি চেহারা ও অনুজ্জ্বল রংয়ের সমন্বয়ে শমিতার অস্তিত্ব, তা হয়ত অতীশ চিরকালীন সম্বন্ধসূত্রে বাঁধবার পক্ষে যথেষ্ট বিবেচনা করে নি।

তা যে কারণেই হোক না কেন—অতীশের কাছে তার প্রয়োজন যদি ফুরিয়েই থাকে ঃ শমিতা কেন আর অতীশের ছায়া হয়ে ঘুরবে! তাছাড়াও শমিতা জানে স্বকীয় ছায়ার প্রতি আকর্ষণ কোন মানুষেরই থাকার কথা নয়। দূরাগত আলোর প্রতিফলনে তা কখন-সখনও শুধু মানুষকে অন্যমনস্ক বা বিভ্রান্ত করে। কাজেই শমিতার পক্ষেও অতীশের অনুরাগ আশা করা আলেয়ার পেছনে ছোটার সমতুল।

শমিতা তাই অফিস শেষে বিকেলে নিত্য-নৈমিত্তিক দেখাশোনার পর্বটার 'পরে নিঃশব্দে যতি টেনেছিল। অতীশের ছায়া হয়ে অনুবর্তনে সে বিরত হয়েছিল।

পরদিন অতীশ শমিতাকে ফোন করেছিল—কাল আস নি কেন?

সংক্ষিপ্ত অভিযোগহীন কণ্ঠে শমিতা জবাব দিয়েছিল—বাড়িতে কাজ ছিল। তাই তাড়াতাড়ি চলে যেতে হয়েছিল।

এমনি বাড়ির প্রয়োজন ঘন ঘন এবং প্রায় প্রত্যহই শমিতাকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। আর অতীশও তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়াটা বাহুল্য বিবেচনা করে ক্ষান্তি দিয়েছিল।

ফলে দুজনের যৌথ অস্তিত্বের ধারা বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে এক আপাত শান্ত বিচ্ছিন্নতার মাঝে তারা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল।

বিষয়টিকে অতীশ স্বাভাবিক পরিণতি বলে গ্রহণ করলেও, শমিতার পক্ষে বিচ্ছেদটা অনেক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল।

শমিতা আসলে মেয়ে। এবং মেয়েরা বিশেষ করে এ সমস্ত বিষয়ে সহজে অতীতের বাঁধন কাটিয়ে মোহমুক্ত হয়ে উদাস বৈরাগ্যে বিধৃত হয়ে উঠতে পারে না। আর শমিতার মনের মাঝে, তার ক্রিয়াকলাপ কথাবার্তার ভেতর অনেক জট ও বিস্তারিত শিকড়ের অস্তিত্ব প্রত্যহ অনুভূত হতে লাগল। তার আশা ও আশাভঙ্গতা, বিশ্বাস ও বিশ্বাস-বিহীনতা। বাসনা ও তার বিচ্যুতির সংঘাত ডাকে অনবরত ভেতরে ভেতরে বিধ্বস্ত করছিল।

মা মারা যাবার পর যে বিধবা পিসীমা একমাত্র পুত্রসন্তানসহ গ্রাম হতে এসে দাদার সংসারের কান্ডারী হয়েছিলেন তিনি সাদাসিধে ও নির্বাক প্রকৃতির মানুষ। সংসারের আশা আনন্দ ও ঔজ্জ্বল্যের প্রতীক এক বড় মেয়েটিকে এমনি নিস্তেজ শান্ত ও বিগতস্পৃহ হয়ে পড়তে দেখে তিনি দুঃখিত ও বিষণ্ণ হচ্ছিলেন। কিন্তু এ যুগের বিশেষ করে কলকাতার মেয়েদের সুখদুঃখ আশা-নিরাশা বুঝে ওঠা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত শক্ত, প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল। তাই অতীশের সাথে বাহ্য বিরোধহীন বিচ্ছেদের অর্থ কখনই তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি।

ছোট ছোট ভাই-বোনগুলোও দিদির নিঃশব্দ ও একক কুলায়ে প্রত্যাবর্তন করতে দেখে বিচলিত বোধ করছিল।

সবচেয়ে বেশি আহত হয়েছিলেন শমিতার বাবা সদানন্দবাবু। তিনি তাঁর আশুকর্তব্য স্থিরীকৃত করে উঠতে পাচ্ছিলেন না। এ বিষয়ে মেয়েকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা তিনি শোভনীয় বলে বিবেচনা করছিলেন না। অবশেষে তিনি নিরুপায় হয়ে সমরকে ডেকে পাঠিয়ে

ছিলেন। সদানন্দবাবু বলছিলেন—দেখ সমর, এ সব ব্যাপারে আমার কৌতূহলী বা জিজ্ঞাসু হওয়া সাজে না। ওর মা যদি বেঁচে থাকত—আমার নিশ্চয়ই কিছু বলার প্রয়োজন ঘটত না। আমার কেবল মনে হচ্ছে কোথায় যেন একটা ভুলের গ্রন্থি পড়েছে। আমি যে কি করব—সদানন্দবাবু তাঁর ভাবনা অর্ধপথে স্থগিত রেখে সমরের দিকে প্রশ্নসঙ্কুল অসহায় দৃষ্টি তুলে ধরলেন।

সমর বলছিল—আপনি ব্যস্ত হবেন না পিসেমশাই। আমি খোঁজখবর নিচ্ছি। এর একটা যথারীতি ব্যবস্থা করব। আপনি নিশ্চিত থাকুন।

সমর তারপর দুজনের মাঝের যবনিকা পতনের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আহরণের জন্যে শমিতাকে পাকড়াও করেছিল।

কিন্তু শমিতা খালি 'যেতে দাও', 'ছেড়ে দাও', অতীতের ভূত টেনে লাভ নেই—এবম্বিত উক্তি করছিল।

সমরের কেমন ধারণা জন্মাল যে, তাদের মাঝের বিরোধের বীজ অনেক গভীরে প্রোথিত। হয়ত বা এর জন্যে শমিতার দায়িত্বই সর্বাধিক।

এদিকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া অতীশের সাথে তার ছেলেবেলাকার বন্ধুবান্ধবদের যোগাযোগ আস্তে আস্তে ঘটতে থাকল। অর্থাৎ অতীশই গিয়ে সুব্রত, সমর, কল্যাণ, অমর প্রভৃতি বন্ধুবান্ধবদের পুরোন দুনিয়ায় গিয়ে তার তরী নোঙর করছিল এমনি ভঙ্গিতে যেন মাঝখানে অন্য কোন জগতে ঘোরাফেরাজাত কোপ ক্লেশ ক্লেদ সঙ্কোচ জড়িমা বা গ্লানি তার কোন পাখায় আশ্রয় করে নি।

সুব্রত বা অমর টুকরো টুকরো কথায় কখনও-সখনও শমিতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে অতীশ অত্যন্ত কৌশলে না বলা কথার ভঙ্গি দিয়ে বা সংক্ষিপ্ত দুএকটি কথায় বিষয়টির এমনিভাবে পরিসমাপ্তি ঘটাত যেন গতকালের বোর্ডে একটাকা চল্লিশ পয়সা হারানর বেদনা তাকে বিষমভাবে আচ্ছন্ন করে রয়েছে।

সমর গিয়ে যখন শমিতা-অতীশের বিবরণ বিস্তারিতভাবে বন্ধুমহলে পেশ করল তখন সেখানে মহাসোরগোল পড়ে গেল। এ সমস্ত বিষয়গুলো এমনি মুখরোচক যে প্রত্যেকটি মানুষের বিবেককে সেখানে অত্যন্ত সংবেদনশীল হয়ে পড়তে দেখা যায়।

'অতীশটা কাওয়ার্ড', 'অতীশটা সেলফিস', 'তখনই ভেবেছিলাম গুরুতর কিছু ঘটেছে', 'এমনি সরল ভাবভঙ্গি যেন ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না', এবম্বিধ নানা উক্তির তপ্ত কটাহ খানিক থিতোলে 'পরে সুব্রত টেবিলের 'পরে ঘুসি মেরে বলেছিল—এর একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়ব। আঘাতে টেবিল বিপুল শব্দ করে নড়েচড়ে স্থির হয়েছিল। বোর্ডের তাসগুলো এদিক-ওদিক ছত্রাকার হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল।

সাথে সাথে আর সবাই 'হেস্তনেস্ত করতেই হবে' বলে সমুদ্র মন্থনের উল্লাসের আনন্দে মত্ত হয়েছিল।

তারপর অনেক বিতর্ক যুক্তি পরামর্শ অনেক নিস্পৃহতা, বিরোধ শাসানি ও কান্নার দ্বার ঠেলে ঠেলে যেন ক্লান্ত হয়েই ওরা আজ রাসবিহারী এভেনিউর ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের ঘরে সমবেত হয়েছিল।

সমস্ত ঘর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করে ওরা সবাই সিগারেট টানছিল। হাতঘড়ি দেখে নিয়ে সুব্রত বলল—এই শেষের অপেক্ষাটাই ভীষণ অস্বস্তিকর ঠেকছে। অতীশ বিয়ে করতে বসে আমাদের যা ভোগাল—তা অবর্ণনীয়। ভাবী মিসেস গাঙ্গুলীর কাছে এর জন্যে পারিশ্রমিক প্রার্থনা করা যাক।

তখন সবাই শমিতার দিকে তাকাল। শমিতার চোখ মুদ্রিত ও দেয়ালে মাথা হেলান। ছবি বলল—বেচারা ঘুমোচ্ছে, ওকে এখন ডাকবেন না।

এতক্ষণের কোন কথা, কোন আলোচনা শমিতার কানে যায় নি। শমিতা নিরঙ্কুশভাবে শুধু মায়ের কথাই ভাবছিল। আজ শুধু মায়ের কথাই তার মনে জাগছিল। হয়ত মায়ের শেষ স্মৃতি বিজড়িত হাসপাতালটার নিকট অবস্থিতিই মায়ের স্মৃতির প্রতি তার আকর্ষণ দুর্মর হয়ে উঠছিল। আজ মা বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই এমনি এক আনন্দহীন পরিণতিতে পৌঁছত না। জীবনের পরম লগ্ন এমনি প্রীতিহীন হয়ে উঠত না। মা, মা, মা আমার। একটা আবেগময় কণ্ঠে শমিতা মাকে বেষ্টন করে ধরতে চাইল। একটা প্রশান্তি ও স্নিগ্ধ আশ্রয়ের সন্ধানে দু' বাহু বাড়িয়ে সে মায়ের কণ্ঠলগ্ন হয়ে বুকে মুখ গুঁজতে চাইল। মায়ের হাতের ছোঁয়া, মায়ের পরশ পেতে শমিতার খুব ইচ্ছে হল।

দশ বছর আগের যে ব্লকটায় মা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিল—সেটির একটি খণ্ড অংশ এখান থেকে দেখা যাচ্ছিল। ব্লকটির পরে নিমগাছের ছায়া ঘন হয়ে ছড়ান, মায়ের কোলেও এমনি একটা শীতল ছায়া সবসময় শায়িত থাকত। মায়ের সেই স্নিগ্ধ কোলটিতে শুয়ে শমিতার ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছিল।

শমিতা শুয়ে রয়েছে হাঁটু দুটো ভেঙে মাকে জড়িয়ে ধরে। মায়ের সমস্ত সত্তা হতে উঠে আসা একটা কোমল স্নেহময় গন্ধ তাকে ঘিরে রয়েছে। মা নরম চাঁপাকলির মতন আঙুল দিয়ে তার চুলে কপালে আর কপোলে পরশ বোলাচ্ছিল। মা কতকাল পরে তোমার কাছে শুলাম। তুমি এতকাল কোথায় ছিলে। তুমি ভারি দুষ্টু হয়েছ মা। তুমি আমায় ফেলে আর যেতে পারবে না। তোমার নরম ছায়ায় আমায় চিরকাল শুয়ে থাকতে দাও।

বাহাদুর ঘরের কাটা দরজার ফাঁক দিয়ে তার পরিচ্ছন্ন মুখখানা বাড়িয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরিবেশন করার মত কণ্ঠে ঘোষণা করল—সাহেব এসে গেছেন।

ঘরের মাঝে সবাই সোজা হয়ে নড়েচড়ে বসল। আলস্য ও অবসাদ ত্যাগ করে সবাই যেন একটা কর্মের প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হয়ে উঠল। আর একটা কলরব ছড়াল। যাক্, এসে গেছেন, এসে গেছেন।

চেয়ার নড়াচড়ার শব্দে ও অস্ফুট কথাবার্তার ধ্বনিতে শমিতার আচ্ছন্নভাব খানিকটা কেটে গেল। চোখ মেলে তাকিয়ে হঠাৎ যেন তার কাছে প্রতিভাত হল—মা হাসপাতালের শেষ শয্যায় শুয়ে রয়েছে। সমস্ত শরীর ঘিরে একটা মৃত্যুর চাদর বিছানো। আর চারপাশে একরাশ ছায়ার মত শোকাহত আত্মীয়-স্বজন সবাই যেন অবনত মস্তকে একটা অন্তিম ভাবনাকে জড়িয়ে অপেক্ষমাণ।

বি. সি. মাইতি এণ্ড কোং
—ইলেকট্রো প্লেটিং সামগ্রী—
নিকেল ভ্যাট ও ব্যারেল * ডাইনামো * পলিশিং মেসিন এবং প্লেটিং করিবার জন্য যাবতীয় সামগ্রীর আদি সরবরাহক।
শো রুম ঃ—৯৪, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কলি-১২। ফোন ঃ ৩৪-৩১৭৩
৩, রাধামোহন পাল লেন, কলি-১২ ঃ অফিস-ফোন—৩৪-৪৪৪৬

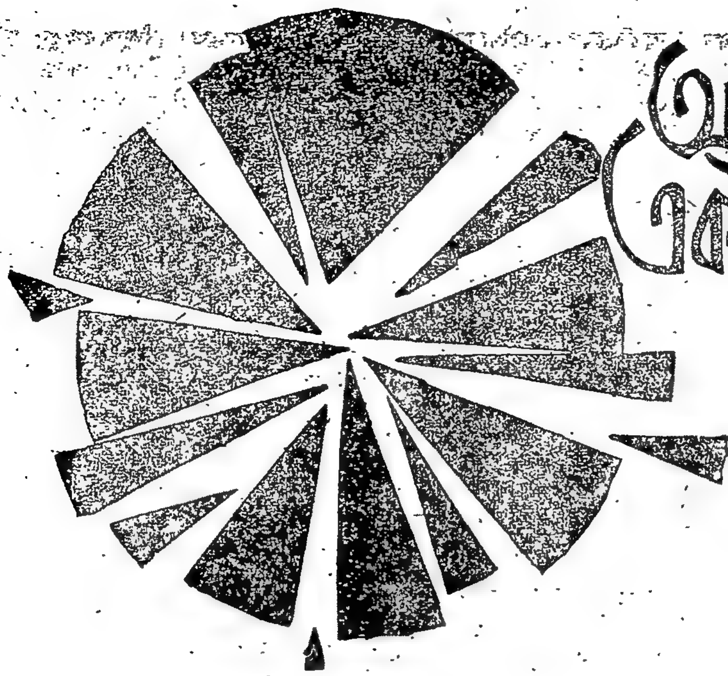

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

সন্ধিক্ষণে নির্ভুল নেতৃত্ব

বন্ধুবেশী বিশ্বাসঘাতককে চিনে ফেলেছিলাম বলে ডি, এস্, পি, মহাশয়কে বিভ্রান্ত করবার সুযোগ পেলাম। কিন্তু এটাই আমাদের শেষ পরীক্ষা ও কার্যকরী নেতৃত্বের চূড়ান্ত সফলতার ইতিহাস নয়।

আমাদের বিরুদ্ধে পুলিশের গুপ্ত-অভিসারের যেরূপ বর্ণনা এতক্ষণ দেওয়া হয়েছে তা' একেবারে ম্লান হয়ে পড়বে যখন জানা যাবে যে মাত্র সপ্তাহকাল আগে আমরা কি এক ভীষণ পুলিশী-চক্রান্তের সম্মুখীন হয়েছিলাম। এই বিশেষ তথ্যটি প্রকাশ করবার আগে মাস্টারদার সম্বন্ধে একটু বলে নেওয়া প্রয়োজন মনে করছি।

বসুমতীতে আমার লেখা পড়ে আমাদের সঙ্গে, চট্টগ্রামের পূর্ব পরিচয় দিয়ে, এক বন্ধু আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলেন যেন মাস্টারদার ভূমিকার যথাযথ প্রকাশ আমার লেখার মধ্যে থাকে। তিনি হাবভাবে জানালেন আমার লেখায় সেই অভাব আছে। পাছে অনুরূপ ধারণা আর কারও থাকে সেইজন্য এ বিষয়ে একটু বলা প্রয়োজন।

প্রায় দশ-এগারো মাস ধরে আমি বসুমতীতে লিখছি। ইতিমধ্যে অনেকে আমাকে চিঠি লিখেছেন, টেলিফোন করেছেন, সাক্ষাতেও বলেছেন। সবার কাছ থেকে উৎসাহ ও সমর্থন পেয়েছি। তবু সামান্যতম ত্রুটিও যদি আমার লেখার মধ্যে থাকে তবে তা' আমার অক্ষমতা বলেই মনে করব। সেইজন্য মাস্টারদার সম্বন্ধে অনেক বেশি জানবার আগ্রহে একজনের টেলিফোনের উত্তরে মাস্টারদার প্রকৃত ভূমিকা সম্বন্ধে একটু ইঙ্গিত দিচ্ছি।

যদি কেউ দেখতে চান মাস্টারদা চলন্ত মোটরের গতিরোধ বা মুষ্টিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ অথবা ইউনিফরম পরে সৈনিক বেশে অশ্বপৃষ্ঠে স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী পরিচালনা করছেন, তাহলে সত্যিই তাঁকে হতাশ হতে হবে। আবার চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহে মাস্টারদার অপরিহার্য ভূমিকার নিদর্শন হিসাবে যদি কেউ দেখতে চান যে তিনি রাজনৈতিক ডাকাতিতে ব্যক্তিগতভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন কি না বা দলের সভ্যদের অস্ত্রশিক্ষা তিনি দিতেন কি না অথবা স্মাগ্‌লার্‌দের কাছ থেকে গোপনে অস্ত্র কিনেছেন কি না তবে তাঁকেও আমার নিরাশ করতে হবে। মাস্টারদার প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে কাল্পনিক চোখে যদি তাঁর বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতার সক্রিয় বিকাশ—গুণ্ডাদমন বা রামকৃষ্ণ ও তারকেশ্বরকে অর্ধদগ্ধ অবস্থায় পুলিশের নাকের ডগার ওপর দিয়ে নিয়ে উধাও হওয়া বা পুলিশ কর্তাদের বাড়ি গিয়ে ধমকাধমকি করে আসার বিভিন্ন চমকপ্রদ 'ঔপন্যাসিক' ঘটনার মধ্যে পরিব্যাপ্ত আছে বলে কেউ মনে করেন তবে তা হবে নিতান্তই কল্পনাবিলাস।

ভ্রান্ত-কল্পনা বশত অনাড়ম্বর বাস্তবতার বৈপ্লবিক কষ্টিপাথরে চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের সন্ধিক্ষণে মাস্টারদার অপরিহার্য নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠত্ব যাঁরা আমার লেখার মধ্যে খুঁজে পান নি, আমার মনে হয় তাঁরা অজান্তে আমার প্রতি অবিচার করেছেন।

মাস্টারদার বৈপ্লবিক চরিত্রের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য আমরা দেখেছি—যখন তরুণ বিপ্লবীকে আকৃষ্ট করবার জন্য মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে সুস্পষ্টভাবে জানালেন—তিনি একটি পিস্তলও তাকে দিতে পারবেন না বা তিনি নিজে একটিও স্বদেশী ডাকাতি করেন নি। আমাদের সশস্ত্র প্রস্তুতির কাজে পেছিয়ে থাকার মূল কারণ কি—জুলুদার এই প্রশ্নের উত্তরে যখন মাস্টারদা তাঁর অন্তরের গভীর বাণী 'Want of realisation of our Goal !' —মাত্র এই ক'টি শব্দে প্রকাশ করেছিলেন, তখনই তাঁর যে বৈপ্লবিক শ্রেষ্ঠত্বের ভূমিকা প্রকাশ পেয়েছিল, তার সন্ধান যদি আমার লেখার মধ্যে কেউ না পেয়ে থাকেন, তবে সেই ত্রুটির জন্য হয়তো আমার প্রকাশের অক্ষমতাই দায়ী। অবশ্য একথাও সত্য যে আমাদের সকলের ওপরে মাস্টারদার যেখানে শ্রেষ্ঠত্ব, যেখানে তিনি natural leader সেটা বুঝতে হলে সহানুভূতিশীল মন এবং একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন।

নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন থেকেও মাস্টারদা, শুধুমাত্র নেতৃত্বের মোহে বিভোর না থেকে যখন তাঁরই একজন শিষ্যকে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে অনুরোধ করছেন তখন খাঁটি বৈপ্লবিক নেতৃত্বের যে বিরাটত্ব প্রকাশ পেয়েছিল সেইটি হৃদয়ঙ্গম করতে না পারলে আমরা মাস্টারদার অপরিহার্য ভূমিকা যে কি, তা' হারিয়ে ফেলব। চট্টগ্রাম জেলে প্রেমানন্দর কাছ থেকে অস্বাভাবিক চিঠি পেয়ে যখন বার বার স্বগতোক্তি করছিলেন—'আই, বি, ইনস্পেক্টর প্রফুল্ল

রায় কেন বা কিসের আশায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রেমানন্দর সঙ্গে আলাপ করত? ....তখন সেই সুদূরপ্রসারী দৃষ্টির গুরুত্ব যা' আবিষ্কার করা আমার বা অম্বিকাদার পক্ষে সম্ভব হয় নি, তার পরিপ্রেক্ষিতে মাস্টারদার সাংগঠনিক ভূমিকার শ্রেষ্ঠত্ব যদি আমার লেখা থেকে সন্ধান পাওয়া কারও পক্ষে কষ্টকর হয় তবে আমার অনিপুণ হাতের অক্ষমতাই দায়ী বলে আমাকে তাঁদের ক্ষমা করতে হবে। আমাদের আলোচনা যখন সামগ্রিক যুব-বিদ্রোহের রণ-নীতি—সীমিত শক্তির কারণবশত 'ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের' পরিবর্তে জেটির ও পাহাড়তলীর অস্ত্রাগার দু'টি দখল করা হোক—এই নিয়ে একটি অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তখন সেই সন্ধিক্ষণে যাঁর নির্দেশ সবার কাছে স্বীকৃত হ'ল, তিনিই মাস্টারদা—অনাড়ম্বর নীরব অথচ নির্ভীক দৃঢ় নেতৃত্বের জীবন্ত প্রতীক মাস্টারদা! তাঁর সেই শ্রেষ্ঠত্ব যদি রোমাঞ্চকর ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহে পাঠকমনে হারিয়ে যায় তবে তা' অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।

মাস্টারদাকে বুঝতে হলে তাঁর চার-পাশের আমাদের সকলকে নিয়েই তাঁকে বুঝতে হবে—জানতে হবে। আমাদের সকলের সমষ্টি—মাস্টারদা। চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের প্রাণকেন্দ্র—মাস্টারদা। বহুবিধ সক্রিয় প্রস্তুতির কাজে—অস্ত্র শিক্ষা, রণ-কৌশল শিক্ষা, প্রভৃতির মধ্যে, মাস্টারদার ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের আড়ম্বর-পূর্ণ কাহিনীর অভাব বলে যাঁরা ব্যথিত হয়েছেন তাঁদের কাছে আমার বক্তব্য হচ্ছে যদি তাঁরা দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করে মাস্টারদার অবিসংবাদী বৈপ্লবিক নেতৃত্বের গভীরতা, আমার লেখার মধ্যে অনুসন্ধান না করেন তবে হয়ত আমার প্রতি অনিচ্ছা-কৃত অবিচার করা হবে।

আমরা সবাই মাস্টারদাকে নেতা বলে নির্বাচিত করলাম কেন? এটা আমাদের লোক-দেখান আনুগত্য নয়। বিপ্লবী দলে চক্ষুলজ্জা বা সাময়িক মিলনের খাতিরে নেতা মনোনয়ন করা সম্ভব নয়। চট্টগ্রামের যুব-বিদ্রোহে নেতৃত্ব-পদে কাউকেই নির্বাচিত করা সম্ভব ছিল না—যদি তিনি একজন Natural Leader (নিজ-গুণে নেতা) হওয়ার বৈপ্লবিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী না হতেন। কেন অম্বিকাদাকে আমরা সেই পদে নির্বাচন করলাম না? গণেশ ঘোষকে নেতৃত্বপদে অভিষিক্ত করতে কেন আমা-দের দ্বিধা ছিল? নির্মলদাই বা কেন আমাদের সকলের বৈপ্লবিক আনুগত্য-লাভ করলেন না? আমাকেই বা কেন সকলে নেতা বলে মেনে নিতে রাজী হলেন না? এই বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে মাস্টারদার সূক্ষ্ম ও গভীর বৈপ্লবিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি, যা' আমাদের সকলকে আকৃষ্ট করেছিল। সন্ধিক্ষণে মাস্টারদার সিদ্ধান্ত ও বিভিন্ন নির্দেশ সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে ও বুঝতে হবে। আমার চেষ্টা ও লক্ষ্য সেই দিকে আছে যেন মাস্টারদার অপরিহার্য নেতৃত্বের ভূমিকা আমার লেখায় কোন প্রকারে বাদ পড়ে না যায়। মাস্টারদার সূক্ষ্ম ও গভীর বৈপ্লবিক চরিত্রের মাধুর্য, যা আমার কাছে প্রকট হয়ে উঠেছিল, সেই বিশেষ বিশেষ দিকের পরিচয় আরও অনেকে নিজ নিজ দৃষ্টি-ভঙ্গী দিয়ে যে দেখেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁরাই কিন্তু সেই সব লিখতে পারেন—সেইরূপ সূক্ষ্ম বিষয় ধার করে লেখা যায় না, তাতে লেখার মূল উদ্দেশ্যে পৌঁছান সম্ভব নয়।

চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের দিন দশ পূর্বে গণেশ আমার ও মাস্টারদার কাছে একটি প্রস্তাব করল—"আমার সঙ্গে প্রতুলবাবুর (শ্রীপ্রতুল ভট্টাচার্য) ব্যক্তিগতভাবে একরকম কথাই ছিল যে যদি আমরা কোন অ্যাক্-শনে নামি তাহলে তাঁকে আমরা সঙ্গে নেব। এই কারণে আমার ইচ্ছে লোক মারফৎ তাঁকে সংবাদ পাঠাই আমাদের সঙ্গে এসে দেখা করতে। তিনি যদি রাজী থাকেন তবে তাঁকে আমাদের সঙ্গে নিলে ভাল হয়। তাঁর সামরিক জ্ঞান আছে, ক্ষমতা আছে—অ্যাক্শনে নেতৃত্ব করবার উপযুক্ততা আছে।............।"

সঙ্গে সঙ্গে এই প্রস্তাবে আমার প্রতিক্রিয়া গণেশকে বললাম—"আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই যদি প্রতুলবাবু একেবারে একা আমাদের সঙ্গে অ্যাক্শনে (যুব-বিদ্রোহে) যোগ দেন। যদি তাঁদের সংগঠনের আর কারও সঙ্গে পরামর্শ করেন তবে তাঁর যোগ দেওয়ার কথা ওঠে না—আমার তাতে আপত্তি আছে।.....।"

আমি যখন কলকাতায় যুব-বিদ্রোহের চার-পাঁচ মাস আগে স্মাগ্লারদের কাছ থেকে রিভলভার পিস্তল কিনছি, তখন গণেশ প্রতুলবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। তাঁকে তখন আমার খুবই ভাল লেগেছে। গণেশের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব খুবই ঘনিষ্ঠ। তাই গণেশের কাছে যখন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনেছিলাম তখন আমার মন তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। তিনি কখনও কখনও আমার কাছ থেকে অস্ত্র কেনবার জন্য টাকা নিয়ে গেছেন এবং কেনা না হওয়ায় আবার টাকা ফেরৎ দেন। যদিও আমার সঙ্গে তাঁর সামান্যই চেনা তবু তারই মধ্যে যেটুকু ধারণা হয়েছিল তা'তে বিশ্বাস করেছি যে চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহে প্রতুলবাবু সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলে ভাল ছাড়া মন্দ হবে না। কিন্তু যেহেতু তাঁর সংগঠনের আর কারও সঙ্গে আমার ব্যক্তিগতভাবে তখনও বিশেষ পরিচয়ের সুযোগ হয় নি, তাই অ্যাক্শনে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে তিনি তাঁর সংগঠনের অন্য কারও সঙ্গে আলোচনা করুন, এটা আমি কখনও অনুমোদন করতে পারি নি—পাছে আমাদের যুব-বিদ্রোহের প্ল্যান আগে থেকে কোন ছিদ্র দিয়ে শত্রুর কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে।

গণেশ আমার যুক্তি অনুমোদন করল। তারও মত কেবল প্রতুলবাবুই আসবেন—এবং তিনি কারও সঙ্গে আলোচনা না করেই অ্যাক্শনে যোগ দেবেন। এইটি যদি সম্ভব হয় তবে প্রতুলবাবুকে নিশ্চয়ই আমরা আমাদের সঙ্গে অ্যাক্শনে যোগ দিতে অনুরোধ করব।

মাস্টারদা আমাদের দুজনের কথা শোনার পর বিশেষভাবে আমাকে লক্ষ্য করেই যেন আচমকা কথাটা পাড়লেন—"আচ্ছা, ভেবে দেখেছিস কি যদি আমাদের সংগঠনের বাইরের বিশেষ একজন যুব-বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করে তবে তার অর্থ কি? তা'তে কি বাংলার বিভিন্ন দলের প্রতিক্রিয়া এই হবে না যে, চট্টগ্রামে এই যুব-বিদ্রোহ পরিচালনা করবার উপযুক্ত আর কেউ ছিল না—তোরা কেউ-ই না এবং সেই জন্যই প্রতুলবাবুকে আনা হয়েছে?"

গণেশের বন্ধু প্রতুলবাবু, সে চায় তিনি যুব-বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করুন। মাস্টারদা নিজে কখনই ভাবেন নি যে তাঁর নেতৃত্বের বড়াই করবার কোন প্রয়োজন আছে। তাঁর নিজের বিশেষ ভূমিকা সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। নেতৃত্বের লোভ ছিল না বলেই তিনি Natural Leader, তাই ঐ প্রশ্নের প্রকৃত অর্থ কি তা' সঙ্গে সঙ্গেই বুঝেছিলাম। আমার কি পরে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া আসতে পারে—নেতৃত্বের লোভ কি যুদ্ধ-প্রাঙ্গণে আমাকে প্রতুলবাবুর প্রতিদ্বন্দ্বী করে তোলার কোন সম্ভাবনা আছে? আমি যতদূর মাস্টারদাকে জানতাম তা' থেকে বুঝেছিলাম যে, ভবিষ্যতের দূরদৃষ্টি তাঁকে ঐরূপ প্রশ্ন সামনে তুলে ধরতে প্ররোচিত করেছিল।

মাস্টারদার কথার উত্তর আমিই দিলাম—"মাস্টারদা, যুব-বিদ্রোহের সফলতাই আমার এখন একমাত্র কামনা। জয়যুক্ত হওয়ার জন্য শক্তি বৃদ্ধি আমাদের করতেই হবে। প্রতুলবাবুর মত উপযুক্ত বিপ্লবী নেতার অংশ গ্রহণ করাতে যদি বিপ্লবের ইতিহাসে আমার নাম মলিন হয়ে যায়, তবু তা'তে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। মৃত্যুপণ করেছি—মরে যাব। তারপর, মরে যাওয়ার পর, কার নাম হ'ল কি না হ'ল তাতে কি আসে যায়? আমাদের যুব-

বিদ্রোহ সংযুক্ত হতেই হবে—এইটিই সর্ব-প্রধান ও একমাত্র লক্ষ্য। তার জন্য প্রতুল-বাবুকে নিশ্চয়ই খবর পাঠান হোক।"

দেবুকে (জালালাবাদের বীর, কালার পোল যুদ্ধের শহীদ—দেবপ্রসাদ গুপ্ত) প্রতুলবাবুর কাছে পাঠান হ'ল। গণেশ চিঠি দিল যেন পত্রপাঠ তিনি পরের ট্রেনেই চলে আসেন—খুব জরুরী। প্রতুলবাবু এলেন। আমরা তিনজনেই একমত ছিলাম যে, তাঁকে নিয়ে চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে মোটরে ঘুরে বেড়াব। অস্ত্রাগারগুলির অবস্থানও তাঁকে দেখাব, কিন্তু প্রকৃত সামগ্রিক প্ল্যানটি না বলে অনেক ভাবে তাঁর কাছে জানতে চাইব কয়েকদিনের মধ্যে ক্ষমতা অনুযায়ী একটা অ্যাক্‌শন করে ফেললে কি হয়—তিনি কি তাতে যোগ দিতে প্রস্তুত আছেন?

আমরা চারজন—মাস্টারদা, প্রতুলবাবু, আমি ও গণেশ, তিন-চার ঘণ্টা গাড়িতে ঘুরে ঘুরে সব স্থানগুলি পরিদর্শন করলাম। আগাগোড়া মাস্টারদা ও গণেশ তাঁর সঙ্গে কথা বলেছে। নানাভাবে তাঁরা বোঝাতে চেয়েছেন প্রতুলবাবু যেন আর ফিরে না যান এবং একটা প্ল্যান করে আমাদের সঙ্গে কাজে নেমে পড়েন। প্রতুলবাবু, তাঁর পক্ষে যা স্বাভাবিক তাই বললেন—সাংগঠনিক দায়িত্ব আছে। কাউকে না বলে এখনই এখানে প্ল্যান করে যদি কিছু করে ফেলি তবে সেটা ভাল হবে না। কয়েকজনের সঙ্গে অন্তত আলাপ করে আসতে হবে......।"

কাজেই শেষ পর্যন্ত আমরা চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের সময় প্রতুলবাবুর সঙ্গ পেলাম না বা আমাদের পক্ষে তা' পাওয়া সম্ভব হ'ল না।

এবার আমাদের শেষ পরীক্ষার দিন উপস্থিত। বোধ হয় তখন যুব বিদ্রোহের সাতদিন বাকি। এমন সময় আমাদেরই একজন "প্রবীণ দাদা", যাঁর সঙ্গে আমাদের ক' বছর ধরে কোন যোগাযোগই ছিল না, হঠাৎ চট্টগ্রামে বেড়াতে এলেন। বর্তমান ক'টি বছর 'তাঁর' সঙ্গে যোগসূত্র না থাকলেও অতীতের যে গভীর সাংগঠনিক সম্পর্ক ছিল, তা' আমরা কেউ ভুলি নি। চট্টগ্রামে 'তাঁর' আগমনবার্তা শুনে আমাদের সবার মনে হল এ যেন বৈপ্লবিক হৃদয়ের আকর্ষণ—intution ! ন'লে এমন সময় আমাদের যুব-বিদ্রোহের পূর্বাহ্ণে কেন 'তিনি' এলেন? 'তাঁর' এই শুভ আগমন আমাদের অন্তরে সত্যিই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল—দারুণ উৎসাহ ও প্রেরণা জাগিয়েছিল। সর্বপ্রথম নির্মলদা 'তাঁর' আগমন সংবাদ শুনে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। আমার কাছে নির্মলদা তাঁর সরল আবেগ-ভরা বিপ্লবী মন নিয়ে বলতে লাগলেন—অবশ্য সব সময় আমার সঙ্গে তিনি চট্টগ্রামের ভাষায় কথা বলতেন—চট্টগ্রামের ভাষায়—"বাইরে বাই" (অর্থাৎ ভাই রে ভাই) বলে আরম্ভ করলেন বলতে, যার শুদ্ধ পরিভাষা—"ভাই রে ভাই...দাদা এসেছেন। আমাদের সঙ্গে দেখা করেছেন। চল, আমরা সবাই 'তাঁকে' আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে বলি। 'তাঁর' সঙ্গে চল আমরা, রজত, মনা, টেগরা, ত্রিপুরা, নরেশ, বিধু—সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। আমাদের অস্ত্রশস্ত্র সব তাঁর command-এ (আধিপত্যে) দিয়ে দিই—আমাদের প্রস্তুতি ও সামগ্রিক প্ল্যানটিও তাঁর কাছে চল আমরা সব বলি। এত সব আয়োজন দেখে নিশ্চয়ই 'তিনি' আমাদের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারবেন না।"

নির্মলদা উৎসাহ ও আবেগের সঙ্গে এই সব কথা একনিশ্বাসে বলে গেলেন। সত্যি বলতে কি আমার অন্তরের আবেগ নির্মলদার চাইতে বেশি ছাড়া কম ছিল না। আমিও অনুভব করছিলাম যদি সমস্ত আয়োজন, সামগ্রিক প্ল্যান, আর সবল সুস্থ একদল দৃঢ়সঙ্কল্প যুবককে দেখতে পান, তবে নিশ্চয়ই 'তিনি' যুব-বিদ্রোহের পরিচালনার ভার গ্রহণ করবেন। যদি আমাদের সঙ্গে 'তাঁকে' সক্রিয়ভাবে পেতেই হয়, তবে স্পষ্টই বুঝেছিলাম যে, 'তাঁর' কাছে সব খুলে না বললে, সব না জানালে এবং মৃত্যুপণ করা যুবকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে না দিলে 'তাঁকে', এত বছর নিষ্ক্রিয় থাকার পর, আকর্ষণ করা সম্ভব হবে না।

গুপ্ত-সমিতির নীতি অনুযায়ী ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে এত বড় একটা ষড়যন্ত্রের প্ল্যান কাউকে পূর্বাহ্ণে জানান সম্পূর্ণ নীতি বহির্ভূত—এই উপলব্ধির ব্যতিক্রম আমার জীবনে এই ক্ষেত্রেই প্রথম হ'ল।

আমি নির্মলদাকে বললাম—"চলুন এক্ষুণি গণেশ ও অম্বিকাদাকে ডেকে নিয়ে মাস্টারদার কাছে যাই। তাঁদের কাছে আমরা দু'জনে প্রস্তাব করি—এমন শুভ-মুহূর্তে যখন 'তিনি' আমাদের কাছে এসেই পড়েছেন তখন আমাদের এর সুযোগ নেওয়া উচিত।"

আমরা দু'জনে তখন গণেশের কাছে যাই। তাকেও আমাদের মত জানাই। গণেশও উৎসাহভরে আমাদের সঙ্গে যোগ দিল—যে কোনমতে 'তাঁকে' আমাদের সঙ্গে পেতেই হবে এই উদ্দেশ্যে মাস্টারদার সঙ্গে তক্ষুণি দেখা করতে চলল। আস্কার খাঁ'র দীঘির পাড়ে কংগ্রেস অফিসে মাস্টারদা থাকতেন। আমরা সেখানে গেলাম। অম্বিকাদা সেখানেই উপস্থিত ছিলেন। আমাদের তিনজনকে একসঙ্গে দেখে মাস্টারদা ও অম্বিকাদা আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলেন—ভেবেছিলেন আমাদের কোন বিশেষ বক্তব্য আছে। একটু পরেই জানতে পারলেন আমাদের তিনজনের প্রস্তাব—আমাদের যে বন্ধুটি এসেছেন 'তাঁর' কাছে সব কিছু জানিয়ে দিয়ে আমাদের পরিচালনার ভার নিতে 'তাঁকে' অনুরোধ করব। অম্বিকাদাও একমত। আমাদের সবার দৃঢ় ধারণা যদি সব আয়োজনের কথা 'তাঁকে' বলা হয় তবে 'তিনি' উৎসাহিত হবেন এবং নিশ্চয়ই সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করবেন।

মাস্টারদা কিন্তু তখনও তাঁর নিজ মত জানান নি। আমরা সকলেই ধরে নিয়েছিলাম যে মাস্টারদা এই প্রস্তাবে কখনই ভিন্ন মত পোষণ করতে পারেন না। 'আগন্তুক দাদার' ওপরেই যুব-বিদ্রোহ পরিচালনার ভার ন্যস্ত হবে—এইটি যেন আমাদের মধ্যে ঠিকই হয়ে গেল এবং 'তাঁকে' এখানে বিকেলবেলা ডেকে আনা হবে তাও যেন একরকম স্থির করে ফেললাম। আমাদের কারও মনেই হয় নি যে মাস্টারদার এতে বিন্দুমাত্র আপত্তি থাকতে পারে। তাই সব একরকম ঠিকঠাক, নির্মলদা 'তাঁকে' নিয়ে বিকেলে আসবেন।

এমন সময় মাস্টারদা সবাইকে চমকে দিয়ে ধীর শান্তকণ্ঠে আমাদের উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন—

"আপনারা সবাই যেমন আগ্রহ করে 'তাঁকে' যুব-বিদ্রোহ পরিচালনার ভার দিতে চাইছেন, আমিও ঠিক আপনাদের মতই তাই চাই—যোগ্য ব্যক্তির ওপরই পরিচালনার ভার দেওয়া উচিত। তবে 'তাঁর' কাছে সব আয়োজনের বিষয় আগে প্রকাশ করে দিয়ে তারপর 'তাঁকে' আকৃষ্ট করার নিয়ম-বিরুদ্ধ পদ্ধতিতে আমার ঘোর আপত্তি আছে। বহু বছর 'তাঁর' অবর্তমানে কি কোন কাজ অসমাপ্ত আছে? তবে আজ যদি 'তাঁকে' পাওয়া যায় তবে আমাদের শক্তি বৃদ্ধি হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেইজন্য আমি বলি 'তাঁকে' আমাদের মধ্যে সক্রিয়ভাবে পাওয়ার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা হোক, গোপন আয়োজনের কথা বিন্দুমাত্রও প্রকাশ না করে। 'তাঁকে' আকৃষ্ট করবার জন্য ঐরূপ 'মারাত্মক পদ্ধতি'র আমি ঘোর বিরোধী। আমার প্রস্তাব—'তাঁকে' আমাদের মধ্যে ডেকে আনা হোক আজই বিকেলে। আমরা সবাই মিলে 'তাঁর' সঙ্গে কথা বলি, 'তাঁকে' বুঝতে চেষ্টা করি, 'তাঁর' কাছে আমাদের কোন একটি বিকল্প মিথ্যা প্ল্যানও বলা হোক—তবে আমরা যে সাংগঠনিকভাবে বর্তমানে সম্পূর্ণ প্রস্তুত তা' সযত্নে গোপন রাখতে হবে। 'তিনি' যদি আমাদের বিভিন্ন প্রস্তাব শোনার পর 'তাঁর' সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তবে স্তরে স্তরে পরীক্ষার মাধ্যমে 'তাঁকে' নিশ্চয়ই আমরা যুব-বিদ্রোহের পরিচালন-ভার দেব।

এই দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন থাকার পর আজ 'তাঁকে' আমাদের পরখ করে নিতে হবে। 'তাঁকে' আমাদের মধ্যে পাওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ sentiment বা emotion (ভাবপ্রবণতা) না থাকা উচিত। ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে ধীর স্থির ভাবে চিন্তার প্রয়োজন—কি পদ্ধতিতে 'তাঁকে' প্রকৃত-ভাবে পরখ ও যাচাই করে দেখা সম্ভব। সেই হেতু আমার বক্তব্য—তাঁকে আনা হোক; গোপন প্রস্তুতির কোন কথা বলা হবে না; অন্যান্য কথার মাধ্যমে 'তাঁকে' বুঝতে হবে 'তিনি' প্রস্তুত কি না; তারপর ধীরে ধীরে 'তাঁকে' সব বলা হবে—যদি মরণ-পণ করে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে 'তিনি' প্রস্তুত থাকেন।"

মাস্টারদার এই প্রস্তাব না মানার কারও কোন যুক্তি ছিল না। সবাই আমরা মাস্টারদার প্রস্তাবটি মেনে নিলাম।

আজ বলতে বাধা নেই—মাস্টারদার এই সিদ্ধান্ত আমার নিজ অন্তরের কথা। তবু কেন এই বিশেষ ক্ষেত্রে আমার চরিত্রের ব্যতিক্রম ঘটল? আমি যে পরখ না করে কারোকেই বিশ্বাস করতে পারি না! বন্ধু প্রেমানন্দ আমাকে যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সাহায্য করেছিল তা' বাস্তব ক্ষেত্রে কোন কাজেই লাগল না! পুলিশের বিরুদ্ধে অত পাল্টা গোয়েন্দাগিরির ব্যবস্থা সবই পণ্ড হতে চলেছিল! আমাদের দলে পুলিশের বন্ধুবেশে অনুপ্রবেশ চেষ্টা ব্যর্থ করা সত্ত্বেও আমার এই পরিণতি?

মানুষের মনস্তত্ত্ব কত যে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতম কারণে বিপথে পরিচালিত হয় তার ঠিক নেই। আমি 'তাঁকে' আমাদের মধ্যে নিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার মনের গভীরে কখনও চাই নি 'তাঁর' কাছে সর্বকিছু প্রকাশ করতে। সেই সময় আমার মধ্যে এক অন্তর্দ্বন্দ্ব চলেছিল—'আমি 'তাঁকে' সব বলে দিতে চাইছি না কেন?' গুপ্ত-সমিতির নীতি অনুযায়ী 'না বলা প্রয়োজন', সত্যিই কি সেইজন্যই আমার মনে বাধা, না কি 'সব বললে' 'তিনি' পাছে আকৃষ্ট হয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বসেন আর পরিচালনার ভার তাঁরই ওপর ন্যস্ত হয়? আমার তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুপ্ত অহংকার কি আমাকে বাধা দিচ্ছে তাঁকে সব না বলার জন্য? 'তাঁকে' বিরত করবার অভিপ্রায় কি আমার মনকে প্রভাবান্বিত করছে 'তাঁকে' বাস্তব প্ল্যান সম্বন্ধে কিছু না জানাবার জন্য? এই 'অহংকার'—নেতৃত্বের লোভ থেকে আমাকে বাঁচতে হবে! আমি চাই সুনিশ্চিত জয়। কে নেতৃত্ব দেবে, কার নাম হবে—এ সব ভাববার আমার অধিকার কোথায়? হায় রে! কি অদ্ভুত! পাছে আমি অহঙ্কারের ক্রীতদাস হয়ে পড়ি—তাই অহঙ্কারের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক হিসেবে নির্মলদার সঙ্গে একমত হয়ে সেই বন্ধুটিকে সব আগে বলে আকৃষ্ট করবার মারাত্মক পদ্ধতি অনুসরণ করতে রাজী হলাম!

আজ আমি খুব ধীর মস্তিষ্কে চিন্তা করে জানাচ্ছি যদি তাঁকে আমরা আমাদের প্ল্যান এবং পূর্ণ প্রস্তুতির কথা জানাতাম তবে ভারতের ইতিহাসে চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের ইতিহাসের উল্লেখ পাওয়া যেত না। এ আমার একার কথা নয়। বহু তথ্যের বিশ্লেষণ করে আমাদের এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে।

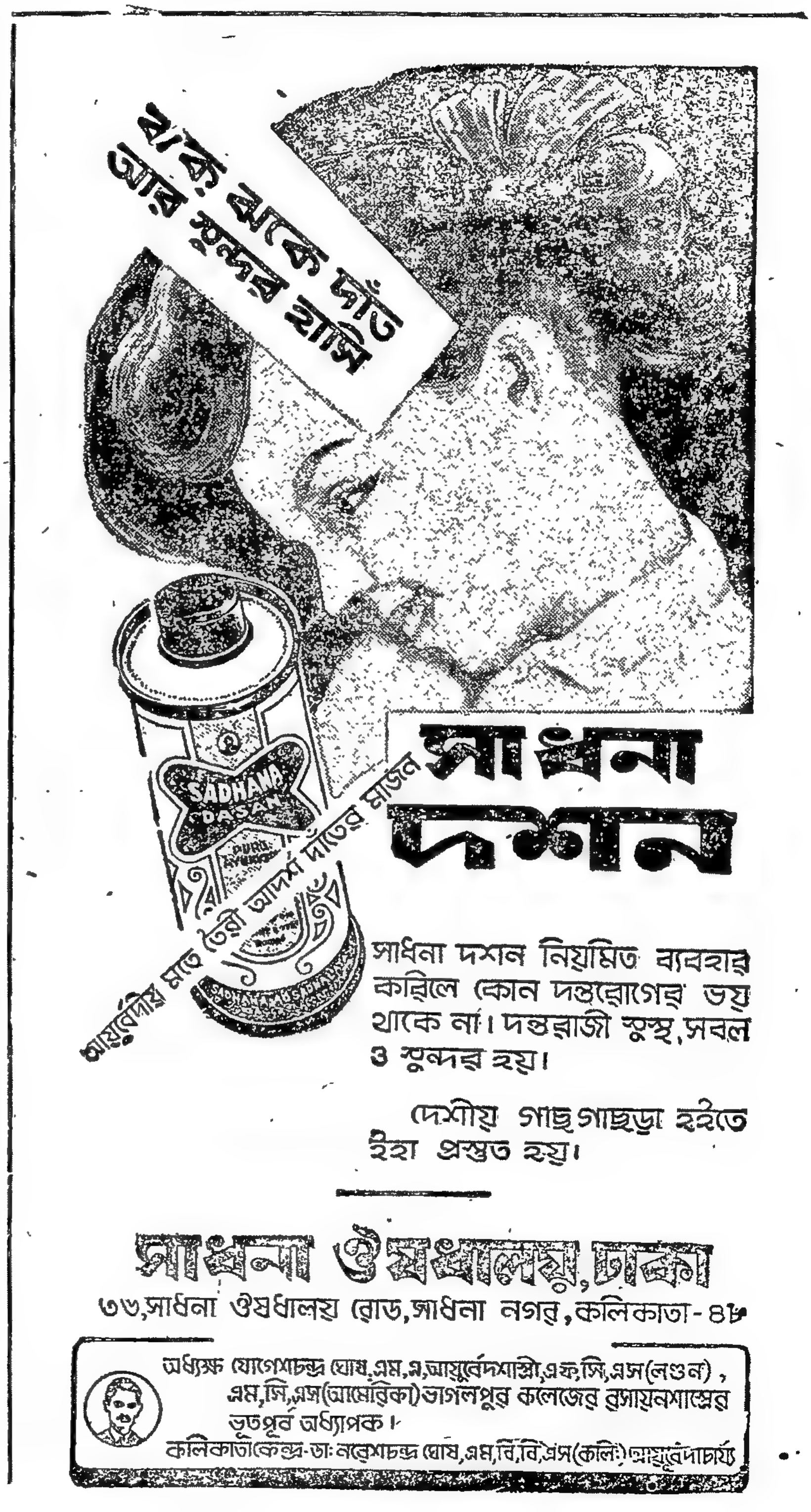

সেইদিন বিকেলবেলা মাস্টারদার ওখানে আমরা (অম্বিকাদা, নির্মলদা, আমি, মাস্টারদা ও গণেশ) 'তাঁর' সংগে একত্রে আলোচনায় বসলাম। আমরা সবাই নানাভাবে—কেউ আবেগভরে, কেউ যুক্তি দেখিয়ে, কেউ বা উদাহরণ স্বরূপ কোন পরিকল্পনার উল্লেখ করে, অথবা গান্ধীজীর অহিংসা আন্দোলন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী নিষ্পেষণে ধ্বংস হওয়ার পর সশস্ত্র খণ্ড খণ্ড অভিযান যদি আমরা সারা বাংলায় অন্তত চালাতে না পারি তবে তরুণদের কাছে বাংলার বিপ্লবী দলের কোন উত্তরই থাকবে না,—প্রভৃতি বলে এবং মাস্টারদা সম্পূর্ণ প্ল্যানটি ও বাস্তব আয়োজনের কথা গোপন রেখে 'তাঁর' মত পাওয়ার জন্য খুব স্পষ্টভাবে 'তাঁর' কাছে বক্তব্য পেশ করলেন।

'তাঁর' মোটামুটি বক্তব্য ছিল—"আপনাদের সুভাষের নেতৃত্বে বাংলার যুগান্তর দলের সংগে শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসে কাজ করা উচিত। গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের ব্যর্থতা প্রমাণ হওয়ার পর যুগান্তর দলের সংগে মিলে মিশে আপনাদের কার্যকরী বৈপ্লবিক প্রোগ্রাম নিতে হবে। এলোমেলোভাবে, যে যার নিজের মত, অ্যাকশন করার যুগ আর নেই..." ইত্যাদি ইত্যাদি 'তিনি' বললেন।

স্বভাবতই 'তাঁকে' আমাদের সংগে পাওয়া গেল না। যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় যে 'তাঁর' কাছ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার কোন সম্ভাবনাই ছিল না তবু সব আয়োজন ও প্ল্যানটি 'তাঁর' কাছে ব্যক্ত করলে কি 'তাঁকে' আমাদের সংগে পাওয়া যেত? বৈপ্লবিক কোন দলের সংগেই বহু বছর ধরে কোন সম্পর্ক না রেখে যিনি এতদিন চলেছেন—ঘোর সংসারী হয়ে, 'তাঁকে' কোন কারণেই মৃত্যু-পণ করে আমাদের সংগে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য পাওয়া যেত না। এই সামান্য জ্ঞানও আমাদের ছিল না। ভাবপ্রবণতা দিয়ে কর্তব্য স্থির করা যায় না।

গুপ্তচরবৃত্তির অভিসন্ধি নিয়ে যদিও পুলিশ 'তাঁকে' আমাদের সাংগঠনিক কর্মতৎপরতার খোঁজখবর নিতে পাঠিয়ে ছিল তবু 'তিনি' জানতেন 'গায়ে পড়ে' এত বছর পর সেইরূপ অনুসন্ধিৎসা 'তাঁর' কাছ থেকে প্রকাশ পেলে আমরা 'তাঁকেই' সন্দেহ করে বসব। 'তিনি' নিশ্চয়ই আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার জানার খুব আশা করেন নি। যদি গোয়েন্দাগিরি করবার জন্যই 'তাঁর' শুভাগমন হয়েছিল তবে কেন 'তিনি' আমাদের প্রস্তাবে সায় দিলেন না? আভ্যন্তরীণ ব্যাপার জানতে 'তিনি' আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হলেন না? না; তা' করা 'তাঁর' পক্ষে সম্ভব ছিল না—কারণ বহু বছর পরে হঠাৎ এসে দলে যোগ দিয়ে পুলিশের কাছে অল্প সময়ের মধ্যে সব ধরিয়ে দিলে 'তাঁর' আসল রূপ যে আমাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়বে তা 'তাঁর' মত প্রাক্তন বিপ্লবী 'দাদার' পক্ষে বোঝা খুবই সহজ ছিল।

'তিনি' Commissioned হয়ে চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন আমাদের ভাবগতিক বুঝতে ও আমাদের শান্ত করতে যেন আমরা এ-সময়ে বৈপ্লবিক অ্যাকশন না করে বসি। এইটুকু mission-ই 'তাঁর' ছিল। কিন্তু সমস্ত তথ্যের অধিকারী যদি 'তিনি' হতেন, তবে সেই তথ্য সরবরাহের বিনিময়ে যে লোভনীয় ব্যক্তিগত সুবিধার সুযোগ ছিল তা' উপেক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হোত না বলেই আমাদের ধারণা হ'ল।

আমাদের আড়ম্বরপূর্ণ কার্যকলাপের মূল্য নিশ্চয়ই স্বীকার্য, কিন্তু অনাড়ম্বরপূর্ণ এই সন্ধিক্ষণে মাস্টারদার নির্ভুল নির্দেশ, যদি আমাদের সংগঠনকে পরিচালনা না করত, তবে চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের ভরা জাহাজ তীরে পৌঁছবার আগেই সাগরের অতল গহ্বরে চিরকালের মত তলিয়ে যেত। আমাদের সমস্ত শিক্ষা, পাল্টা গোয়েন্দাগিরি, অস্ত্রশস্ত্র যোগাড়, বোমা তৈরি, মবিলিজেশন চার্ট, সমস্ত আয়োজন ও বহু চমকপ্রদ অ্যাকশন—সব কিছুই ফুৎকারে উড়ে যেত যদি 'তাঁকে' 'পরখ' না করে নেওয়ার বিরুদ্ধে মাস্টারদা ধীর শান্ত সিদ্ধান্ত দৃঢ়ভাবে ঘোষণা না করতেন। চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের সফলতার জন্য মাস্টারদার নেতৃত্বের এইটি হ'ল সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।

বাকি দু'টি কাজ

সমর-বিজ্ঞান অপরিহার্যভাবে সময়ের—ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেণ্ডের, গুরুত্ব অর্পণ করে থাকে। কয়েক মিনিটের ব্যবধানে বড় বড় যুদ্ধের ফলাফলও অনুকূলে বা প্রতিকূলে যেতে পারে—অতি সামান্য সময়ের তারতম্যে রিজার্ভ ফোর্স এসে না পৌঁছানতে ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়ানের শোচনীয় পরাজয় ঘটেছিল। আমাদের সংগঠনে প্রথম থেকেই 'সময়ানুবর্তিতা' খুব কঠোরতার সংগে পালন করা হোত। আমাদের একজন যুবক সাথী, যার প্রতি আমাদের সকলেরই আস্থা ছিল, তার সময়জ্ঞান শেষ পর্যন্ত আর হ'লই না। এই একটি প্রধান দোষের জন্য তাকে যুব-বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া হয় নি। সময় মত সে কোনদিনও কোন কাজে বা গোপন সভায় হাজির হতে পারত না। তাকে সময়ের গুরুত্ব বুঝিয়েছি, তবু সে তা' হৃদয়ঙ্গম করতে পারে নি। সে বলত—"দেখবেন, কাজের দিন আমি ঠিক সময়েই উপস্থিত হব।" দুঃখের বিষয় সে কোনমতেই বুঝতে পারত না যে তাকে আগে থেকে 'কোন্ দিনটি কাজের' তা' জানানো সম্ভব হবে না। তা' ছাড়া যে কোনদিনই সময়মত হাজির হতে পারে না, সে কাজের দিনটিতেই যে নিশ্চিত নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হবেই—তার স্থিরতা কোথায়? কাজেই বাধ্য হয়ে বলিষ্ঠ, শক্তিশালী, প্রায় পাঁচফুট দশ ইঞ্চি লম্বা, প্রশস্ত বুক, দৃঢ়চেতা যুবক সাথীকে আমাদের খুব দুঃখের সংগে বাদ দিতে হ'ল।

দিন ঘনিয়ে এল। মাত্র চার-পাঁচ দিন বাকি—আমাদের ঝটিকা বেগে আক্রমণ করে সমস্ত চট্টগ্রাম শহর দখল করতে হবে। সমস্ত কাজ ঠিক সময় মত—clock-like precision-এ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সময় রাখবার শিক্ষা ও পরীক্ষা আমাদের আগে হয়ে গেছে। এখন প্রয়োজন ১৭ই এপ্রিল, রাত আটটা থেকে ১৮ই এপ্রিল রাত আটটা পর্যন্ত প্রত্যেকটি কাজ প্রত্যেকে এবং প্রতিটি দলে ঠিক ঠিক সময়ে করে যাবে। তার জন্য প্রত্যেকের কাছে আমাদের ঘড়ি দেওয়ার একান্ত প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমরা সকলকে ঘড়ি সরবরাহ করতে পারি নি। তবে প্রত্যেকটি ছোট ছোট দলে অন্তত দু'টি করে ঘড়ি যেন থাকে তার ব্যবস্থা করেছি। কেবল ঘড়ির ব্যবস্থা করে আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি নি। ঘড়ি যদি বেঠিক চলে তবে ঘড়ি থাকলেই বিপদ বেশি—সে-ক্ষেত্রে ঘড়ি না থাকাই অনেক ভাল। কিন্তু আসল প্রশ্ন হ'ল ঘড়ি না থাকলেও চলবে না, আবার বেঠিক টাইম দিলেও আমাদের কাজে লাগবে না—অতএব কি করা যায়?

এ প্রশ্নের সমাধান সাংগঠনিকভাবে আমাদের করতে হয়েছিল। সংগঠনে যাদের ঘড়ি ছিল তাদের টাইম মিলিয়ে ঠিক করে নিতে বললেই তারা তাই করত। কিন্তু সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য আমরা চার-পাঁচ দিন আগে সবার কাছ থেকে ঘড়িগুলি সংগ্রহ করে নিই। ত্রিপুরা সেনকে ভার দেওয়া হয়েছিল সে সব ঘড়িগুলিতে টাইম মত চাবি দেবে এবং খুব নিখুঁতভাবে রেগুলেট্ করবে। সব ক'টার টাইম লিখে লিখে মিলিয়ে দেখবে। যদি কোন ঘড়ি অচল বলে মনে হয়, তবে সেটিকে বাতিল করবে। গণেশের বাড়িতে সব ঘড়িগুলি আনা হ'ল এবং ত্রিপুরা সেন ঘড়িগুলিকে regulate করবার ভার নিল।

আমাদের মামলার মুদ্রিত রায়ের ১২৩ পৃষ্ঠায় লেখা আছে—

"In M II we have a list of

watches of various makes with notes against each of the number of minutes. They were fast or slow on Wednesday 7-35 p.m., Thursday 6-15 p.m. and Friday 8 a.m. The prosecution suggest that the object of this meticulous comparison was to ensure that the raids should be simultaneous.

"One watch with the words 'Indian Time' on the dial was found on Amarendra Nandi and 'Indian Time' is one of the watches mentioned in M II."

জজ্ সাহেব লিখছেন যে, M II মার্কা মারা স্লিপ কাগজে বিভিন্ন কোম্পানীর ঘড়ির একটি লিস্ট দেখা যায় এবং তাতে প্রত্যেক ঘড়ির সাথে সাথে কত মিনিট ব্যতিক্রম তাও লেখা ছিল। বুধবার সন্ধ্যে ৭-৩৫ মিনিট, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যে ৬-১৫ মিনিট ও শুক্রবার সকাল ৮টার সময় ঘড়িগুলি fast বা slow যাচ্ছে তা' নোট করা ছিল। যেরূপ সতর্কতার সঙ্গে ও নির্ভুলভাবে ঘড়িগুলির টাইম পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়েছে তা' থেকে সরকারী পক্ষের যুক্তি হচ্ছে—নিশ্চিতভাবে একই সঙ্গে যুগপৎ আক্রমণ করবার জন্যই আমরা এই ব্যবস্থা করেছি।

ঘড়ির ডায়ালের ওপরে Indian Time লেখা একটি ঘড়ি অমরেন্দ্র নন্দীর সঙ্গে পাওয়া গেছে। (অমরেন্দ্র নন্দী যুব-বিদ্রোহের ছয় দিন পরে, ২৪-৪-৩০ তারিখে, চট্টগ্রাম শহরের ফিরিঙ্গি বাজার এলাকায় পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ দেয়)। এই তথ্যের থেকে জজ্ সাহেব বলতে চাইছেন, যে-সব ঘড়ি গণেশের বাড়িতে রেগুলেট্ করা হয়েছে সেই ঘড়িগুলিই আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিকেরা ব্যবহার করেছে।

সত্যিই আমরা ঘড়িগুলি খুব ভালভাবে রেগুলেট্ করার পর প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে অন্তত দু'টি করে ঘড়ি দিয়েছিলাম।

আমাদের শেষ কাজটি হ'ল গণতন্ত্র বাহিনীর সভ্যদের ১৭ই তারিখ রাত ৮টা থেকে ১৮ই তারিখ রাত ৮টা পর্যন্ত —অর্থাৎ আক্রমণের ঠিক আগের মুহূর্ত অবধি—ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় প্রত্যেকের গতিবিধি ও যার যেটুকু নির্ধারিত কাজ তা' নিয়ন্ত্রিত করা। আগের দিন রাত্রে, অর্থাৎ ১৭ই তারিখ রাত্রে ৮টার সময় প্রত্যেকে বাড়ি ফিরবে। ৯টার সময় রাত্রের খাওয়া খেয়ে ১০টার সময় বিছানায় ঘুমোতে যাবে। ভোর ছ'টায় ঘুম থেকে বা বিছানা ছেড়ে উঠবে। তারপর কখন কি খাবে, কখন কতক্ষণ বিশ্রাম করবে, কোথায় কোথায় যাবে, কিভাবে বা কোন্ রাস্তা ব্যবহার করবে, কি কি কাজ করবে, কাকে কি বলবে, কোন্ বন্দুক বা পিস্তল কখন নেবে ইত্যাদি ইত্যাদি প্রত্যেকের জন্য আলাদাভাবে Direction (নির্দেশ) দেওয়া ছিল। গ্রুপ নেতারা প্রত্যেকের সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তার ব্যক্তিগত ও দলের কাজের তালিকা অনুযায়ী রিহার্সাল দিয়েছে এবং কে কোথায় কোন্ সময় থাকবে তার সঠিক অবস্থানের বিষয় জেনে রেখেছে। কাউকে যেন চোখের বাইরে যেতে দেওয়া না হয় তার জন্য কঠিন ব্যবস্থা ছিল। এই সমস্ত ব্যবস্থার ভার গ্রুপ নেতাদের দেওয়া হয়েছিল এবং আমরা ঘুরে ঘুরে প্রয়োজন মত check-up করেছি।

১৭ই এপ্রিল রাত ৮টায় সবাই ভাল ছেলের মত বাড়ি ফিরেছে। সুবোধ বালকের দল সেদিন খাওয়া-দাওয়া সেরে রাত ১০টার সময় নিজ নিজ বিছানায় শুতে গেছে। এই নির্দেশ আমাদের প্রতিও প্রযোজ্য ছিল। আমিও নির্দেশ মত ১০টায় শুতে গেলাম। তার পরদিন ৬টায় উঠব। ১৮ই এপ্রিল, ১৯৩০ সাল, রাত্রি আটটার সময় যুগপৎ আক্রমণ করব। ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় রাত ৮টার সময় আক্রমণ। [ক্রমশঃ]

অমৃতসমান

বেদব্যাস

নির্বাচনী ঐক্য

'বামপন্থী ঐক্য জিন্দাবাদ—'

কান ঝালাপালা হয়ে গিয়েছিল সুধার। শুধু সুধার নাকি, বাড়িসুদ্ধ লোকের। পাড়ার অনেকেও বিরক্ত হয়ে উঠেছিল ওদের অত্যাচারে। দিন নেই, রাত নেই, সময় নেই, লগন নেই কেবল গলাবাজি করা হচ্ছে। সকাল-দুপুর-সন্ধ্যে এমন কি কোনো কোনো দিন নিশুতি রাতেও পাড়া কেঁপে ওঠে ওদের গলা-চেরা চেঁচানিতে। চেল্লাচেল্লি করবি তো যা না; ময়দান তো ফাঁকা পড়ে রয়েছে, সুধা ওর দেওরকে বলে, যদি রাইটার্স-অ্যাসেম্বলির দেয়ালে চিড় ধরে তবে বুঝবো গলায় তোমাদের জোর আছে: তা না, অন্দরমহলে এসে কেবল বীরত্ব ফলানো—'

—'কিন্তু বৌদি, পাড়ার লোককেও তো জাগানো দরকার—' উৎপল যুক্তি দেখাতে চেষ্টা করেছিল।

—'পাড়ার লোক জেগেই আছে, তোমাদের আর কষ্ট করে জাগাতে হবে না...যখন যা চাঁদা-সাহায্য চাইছো তাই তো পাচ্ছো, না কি পাচ্ছো না—'

—'হ্যাঁ পাচ্ছি বৌদি, কিন্তু ওই চ্যাঁচামেচি করেছিলাম বলেই তো ডি-আই-আর-এর বন্দীদের মুক্ত করে আনতে পেরেছি—তুমি যেতে পারো নি কিটুর অসুখ ছিলো বলে, কিন্তু পাড়া থেকে প্রায় তিরিশজন বৌ-ঝি গিয়েছিলো ময়দানের মিটিঙে—আর গিয়েছিলো বলেই তো—'

—'কিন্তু বামপন্থী ঐক্য, বামপন্থী ঐক্য বলে যে চ্যাঁচাচ্ছো ও-ঐক্য করার মালিক কি আমরা ঠাকুরপো—'

'নিশ্চয়ই, তোমরা বৈকি, তোমরা যদি ঐক্যবন্ধ হয়ে দাবি জানাও লীডাররা সাহস করতে পারবে সে-ঐক্য ভাঙতে—'

বাজারেও দেখলাম সেই একই চিত্র। ধীরেনবাবু মাছ কিনতে পারেন নি, আট টাকা কিলোর মাছ কিনে খাবার মতো রেস্ত তাঁর নেই, সাহস করবেন কার ভরসায়? কিন্তু রাসবিহারীবাবু দেখলাম তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, 'উনিশটা বছর পেরেছেন, আর ক'টা মাস সবুর করতে পারছেন না মশাই. বলছি না বিকল্প সরকার এবার হবেই—'

একটি-দুটি করে ছোট-খাট একটা ভিড় হয়ে গিয়েছিলো রাসবিহারীবাবুকে ঘিরে। ওই ভিড়ের মধ্য থেকে একটা সন্দিগ্ধ কণ্ঠ উঠলো ঃ 'কিন্তু সে অলটারনেটিভ গভর্নমেন্ট ক'দিন টিকবে, প্রেসিডেন্টস রুল হয়ে যাবে যে ছ'মাস না যেতেই—'

—'কেরালার দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন তো', জবাব আসে ভিড়ের মধ্য থেকেই—'কেরালায় কিন্তু তেরোটা পার্টি এক হতে পারে নি, কমিউনিস্টরা আয়সোলেটেড, নির্বান্ধব হয়ে গিয়েছিল...কিন্তু বাংলাদেশের ঘটনা একেবারে আলাদা—'

এক উৎসাহী ছোকরা তো বাজারের থলেটি পাশের ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে এ-পকেট ও-পকেট খুঁজে একটা কাগজই বার করে ফেললো, কি না শ্যাডো ক্যাবিনেট বা ছায়ামন্ত্রিসভার তালিকা। তা নামগুলি শুনে কিন্তু উপস্থিত জনতার কেউ আপত্তি করতে পারে নি, মোটামুটি ব্যালান্সড বলেই স্বীকার করলো সবাই একবাক্যে।

কিন্তু পরিতোষ হালদারের কথা শুনেই প্রথম মনে হলো, বলা যত সহজ করা ততটা নয়, লোকে চাইলেই বা। পরিতোষবাবুর সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিয়েছি পুজোর আগেই, 'চাঁদা অভিযান' প্রসঙ্গে। বলেছিলাম পরিতোষ বামপন্থী কমিউনিস্ট এবং রাজনীতি ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে আলোচনায় তিনি কোন আগ্রহ দেখান না। তাই ট্রামে দেখা হতে ওঁকে জিজ্ঞেস করে বসেছিলাম, 'কি হলো মশাই আপনাদের অলটারনেটিভ গভর্নমেন্টের, কদ্দুর এগুলো অ্যালায়েন্স আলোচনা—'

তা পরিতোষবাবু যেন ওই ট্রামের মধ্যেই আমায় তেড়ে এলেন—'কিসের অলটারনেটিভ গভর্নমেন্ট, ক্ষেপেছেন নাকি মশাই—'

—'কিন্তু আপনারা শ্লোগান দিয়েছিলেন যে বাংলাদেশে বিকল্প সরকার গঠনের'—সবিস্ময়ে শুধিয়েছিলেন।

—'আমরা শ্লোগান দিয়েছিলাম, নেভার, কক্ষণো না।'

—'কিন্তু এবার একটা চান্স ছিলো পরিতোষবাবু, এ-সুযোগ সহসা আর না-ও আসতে পারে—'

—'রাখুন মশাই, পলিটিক্স সম্পর্কে আপনার আইডিয়া আছে কচু—' এক ট্রাম লোকের সামনেই আমাকে অপমান করতে তাঁর মোটেই বাধলো না—'রিপোর্টারি করেন না তো, আপনারা সব দালালি করেন, জানা আছে সব বুর্জোয়া কাগজের রোল—'

—'কিন্তু পিপল, মানে সাধারণ লোক চাইছে যে বামপন্থী দলগুলির নির্বাচনী আঁতাত গড়ে উঠুক—' এক অচেনা যাত্রী বলেন।

—'পিপল আপনি কাকে বলছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, রিভিসনিস্ট মানে শোধনবাদীদের মিন করছেন না তো—' পরিতোষ অম্লানবদনে মিসাইল নিক্ষেপ করে অচেনা ভদ্রলোকটির দিকে। কিন্তু সীট ছেড়ে উঠে পড়লেন আরেক ভদ্রলোক, সীটের আরাম যেন হারাম ও'র কাছে ঃ

'মশাই আমরা রিভিসনিজমও বুঝি না রেভল্যুশনও বুঝি না, এটুকু বুঝি যে বাংলাদেশের মানুষ একটা চেঞ্জ চায়, এবং এর জন্যে তারা মূল্য কিছু কম দেয় নি—'

—'সরকারী হিসেবেই পঞ্চাশটি তাজা প্রাণ—' বলে ওঠে এক কলেজ-ফেরতা ছাত্র-যাত্রী।

—'সো হোয়াট, তাতে কি হয়েছে, বিপ্লব করতে গেলে আরো অনেক রক্ত দিতে হবে......কিন্তু তাই বলে ডাঙ্গেপন্থীদের সঙ্গে তো আর অ্যালায়েন্স হতে পারে না—'

—'আবার সেই ডাঙ্গেপন্থী পিকিংপন্থীদের প্রশ্ন তুলছেন—সাধারণ লোক তো আপনাদের ওসব থিয়োরীর পলেটিক্স-এ ইনটারেস্টেড নয়—'

গন্তব্যস্থল এসে গিয়েছিল, তর্কের মীমাংসা কী হলো জানার জন্যে আরো দু' স্টপেজ বাড়তি যাবার বাসনা আমার ছিলো না, বিশেষত হাতাহাতি হবার আশঙ্কা যেখানে পুরোমাত্রায় রয়েছে, সেখানে আমি কেন বারোয়ারী চাঁটি খাবার জন্যে নিজের মাথাটি পেতে দিই!

অবশ্য জগদীশ চাটুজ্যেদের সঙ্গে দেখা হতে পরিতোষের বক্তব্য আরো পরিষ্কার হলো। প্রতি রবিবারে শ্যামবাজারের এই রেস্তোরাঁয় আমায় ডিউটি দিতেই হয়, নইলে আনসোশ্যাল সোশ্যালিস্ট অপবাদ গায়ে মাখার ভয় থাকে। রেস্তোরাঁটি সর্বধর্ম সম্মেলনের মতো সর্বদল তীর্থস্থান। তর্ক-বিতর্ক দিয়ে সুরু, গালাগালি হাতাহাতি দিয়েই আড্ডার সমাপ্তি ঘটে প্রায় রোজই. কিন্তু আশ্চর্য, ঘটে না সমাধি তার। পরের দিনই যে মার খেয়েছে সে মারনে-ওয়ালা ভদ্রলোককে বলে, 'এক কাপ চায়ের অর্ডার কি দিচ্ছেন, দু'কাপ বলুন, কমরেড!' বলা বাহুল্য মাত্র, আলোচ্য দিনেও তার কোনো ব্যতিক্রম চোখে পড়ে নি।

সুব্রত বলছিলো, 'কিন্তু আমাদের সিটিং সীট দেবেন না কেন?' সুব্রত দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট. প্রশ্নটা ছিলো

তার বামপন্থী কমিউনিস্ট ; জ্যোতিষকে লক্ষ্য করে।

—'সিটিং নয়, চীটিং বলুন।' জ্যোতিষ দেখলাম গম্ভীর হয়েও রসিকতা করতে পারে। 'ও কোনো বেসিসই হতে পারে না, দেখতে হবে কার কী সংগঠন আছে—তা'ছাড়া পার্টি তখন ইউনাইটেড ছিলো, এম-এল-এ' এম-পি'র সঙ্গে ক্যাডারদেরও আপনারা ক্লেম করতে পারেন না—'

—তা' আপনারা কি মাণিকতলায় সংগঠন নেই বলতে চান কমরেড—'

—'খবরদার, আপনি আমাকে কমরেড বলে এ্যাড্রেস করবেন না, ইউ হ্যাভ লস্ট দ্যাট রাইট ইভ্‌ন টু বি এ্যাড্রেসড সো—'

—'সে কি!' যেন আর্তনাদ করে ওঠে সুব্রত।

—'নিশ্চয়ই' এক পা কংগ্রেস ভবনে আরেক পা বৌবাজার স্ট্রীটে রেখে কমরেড হবার সখ কেন আপনাদের—'

বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল না হাওয়া গরম হয়ে উঠেছে, শেষ অবধি তাত থেকে নিজেকে বাঁচানো কষ্টকর জেনে উঠে পড়তে চাইছিলাম, কিন্তু জগদীশই হাত ধরে বসিয়ে দিলো আবার। জগদীশ সারাক্ষণ প্রায় চুপচাপ বসেই আছে, মাঝে-মধ্যে প্রায় অস্ফুটস্বরে জ্যোতিষের কথায় সায় দিচ্ছে, যেন ওর মোসাহেব। জগদীশ আর-এস-পি'র সমর্থক।

অবাক করেছিলো অজিত গাঙ্গুলী। সেদিন প্রায় ভোর-না-হতেই শ্রীমান অজিত বাড়ি এসে হাজির। কুশল জিজ্ঞেস করার সময় দেয় নি অজিত, হাত থেকে আমার খবরের কাগজটি টি-পয়ে নিক্ষেপ করে অজিত বললো—'বাসুদা, বাঁচাও ভাই আমায়।' স্বভাবতই চিন্তিত হতে হলো ওর জীবনাশঙ্কা কে করলো ভেবে। মুখে তবুও অগ্রজের কর্তব্য সারতে হলো, অভয়বাণী শোনাতে হলো আমায়, চায়ের কথা বলতে হলো চাকরকে ডেকে। কিন্তু সে-প্রস্তাব অজিতের মোটেই মনঃপূত হলো না, নাওয়া-খাওয়া নাকি ওর তিন দিন থেকে ঘুচেছে। ও নাকি হন্যে হয়ে লোক খুঁজে বেড়াচ্ছে, আমার কাছে আসার কারণও ওই লোকের সন্ধানে।

—'তা বিশ্বস্ত লোক পাওয়া শক্ত বৈকি,' আমাকে ওর দুশ্চিন্তার ভাগ নিতেই হয় 'একটু—কে জানে, হয়তো ভৃত্যাভাবে স্ত্রীর সঙ্গে ওর খিটিমিটি বাধছে, ফ্যামিলী পীস ডিসটার্বড হচ্ছে ওর—'তা কত মাইনে-টাইনে দেবে বলো, সন্ধান নেওয়া যাবে জানাশুনো দু-চার জায়গায়, টাকা ফেললে চাকর তো একেবারে অমিল হয় নি এখনো—'

—'তুমি বুঝছো এই এটা'—বলে শ্রীমান অজিত তার ডান হাতের সুঠাম বুড়ো আঙুলটি দেখিয়ে দিলো আমার নাকের গোড়ায় এনে। তারপর আবার সুরু করলো—'রিপোর্টারি করো না কি শুধু টো-টো করে ঘুরেই মরো তুমি—দ্যাখো নি লেফট কমিউনিস্টরা লিস্ট বার করেছে—'

তা' দেখবো না কেন, কিন্তু তার সঙ্গে অজিতের ভৃত্য-সঙ্কটের সম্পর্ক কোথায়? কিন্তু সে-প্রশ্ন আর আমায় মুখ ফুটে বলতে হলো না, উত্তেজিত অজিতই বলে চললো: 'দ্যাখো নি আমাদের এক গাদা সীট দিয়েছে ওরা, সীট যেন পাকা কলার ছড়া শুধু ছড়িয়ে যাওয়াই বা—কিন্তু এত লোক আমাদের কোথায় বলতে পারো?'

এতক্ষণে মনে পড়লো শ্রীমান অজিত পি-এস-পি ছেড়ে সম্প্রতি এস-এস-পি'তে যোগ দিয়েছিলো। তা নাটক মন্দ জমে নি, কেউ মাথা কুটেও সীট পাচ্ছে না, আর কারোর ভাগ্যে মেঘ না চাইতেই জল জুটছে! অজিত সকালবেলা আমার বাড়ি চড়াও হয়েছে এজন্যে যদি আমার কোন জানাশুনো বন্ধুকে নির্বাচনপ্রার্থী হবার জন্যে সুপারিশ করতে পারি।

আর দেখেছি হেমেন ঘোষকে। ভদ্রলোক সেদিন কপাল চাপড়াচ্ছিলেন যখন ওঁর কাছে গিয়েছিলাম খবরাখবর নিতে। 'কোনোদিন ভাবতে পারি নি বেদব্যাসবাবু, কমিউনিস্টদের সঙ্গে এক পাতে খাবো, এ আবার এক কাঠি সরেস। কি না বামপন্থী। ওদের কথাতেই এখন উঠছি-বসছি, বোধ হয় পরিবারের সঙ্গে কথা বলার জন্যেও ওদের অনুমতি চেয়ে নিতে হবে। হে ঈশ্বর, তুমি কোথায়!'

হেমেনবাবু সম্প্রতি কংগ্রেস ছেড়ে বাংলা কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন, পুরোনো দেশনেতা হিসেবে গ্ল্যামারও যথেষ্ট আছে ভদ্রলোকের। কিন্তু আজ এ করুণ অবস্থা দেখে কষ্টই হলো আমার। ভদ্রতার খাতিরে উৎসাহই দিতে হলো—'ভেঙে পড়লে চলবে কেন হেমেনবাবু, আপনারা লীডাররা ভেঙে পড়লে সাধারণ লোকের অবস্থা কী হবে—'

—'কী বলছেন, ভেঙে পড়বো না, দাঁড়াবার মতো শক্তি আমাদের বাকী রেখেছে কোথায়, মাজা ভেঙে দিয়েছে না? আমরা নাকি কালকের হওয়া শিশু, কাজেই শিশুর হাতে লক্ষ লক্ষ লোকের ভবিষ্যৎ ওঁরা সঁপে দিতে পারেন না। আচ্ছা বলুন তো, এ কি শ্রদ্ধা-শিষ্টাচারের কথা হলো না দায়িত্বজ্ঞানহীনের। আর এ-ধরণের মনোভাব নিয়ে সার্বিক নির্বাচনী ঐক্যই বা হবে কী করে—'

কী রকম এ্যামব্যারাসিং, অস্বস্তিকর লাগছিলো ভদ্রলোকের কাতরানি দেখে। কাজের অজুহাত দেখিয়ে উঠেই পড়লাম। ট্রামরাস্তায় পড়বার মুখেই দেখলাম মোড়ে ভিড় জমিয়ে পথ-সভার আয়োজন করা হয়েছে, না গো-রক্ষা নয়, গণ-রক্ষা, অর্থাৎ সেই নির্বাচনী ঐক্য। যতদূর দৃষ্টি যায় ট্রামের চিহ্ন নেই. উধাও বাসও।

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ

প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেজওয়াড়া - শ্রীনগর - গৌহাটী

কাজেই স্টেপেজে দাঁড়িয়ে শুনতে হলো পথ-ভাষণ। কোন পার্টি বোঝ গেলো না, কিন্তু বক্তৃতায় ঝাঁঝ ছিলো ঃ 'কোথায় ছিলেন ওঁরা পুলিশের রাইফেলের সামনে আমরা যখন বুক পেতে দিয়েছিলাম, যখন এক এক করে নুরুল, আনন্দ, অলোক কচি কচি সব ভাইকে বলি দিয়েছিলাম? ওঁদের জেল থেকে খালাস করে এনেছিলো কে? আজ নেতা সেজে গোঁফে তা দিচ্ছেন, ডিক্টেট মেনে চলার কথা যাঁদের, তাঁরাই এখন ডিক্টেট করছেন টার্মস, আর বামপন্থী ঐক্যকে পেছন থেকে ছুরি মারছেন—'

—'পেছন থেকে নয় দাদা,' শ্রোতাদের মধ্য থেকে কে যেন বলে উঠলো, 'সামনে দাঁড়িয়েই বুকে ছুরি বসিয়ে দিচ্ছে—'

—'হ্যাঁ দিচ্ছে,' বক্তা আবার জের টেনে বলতে থাকেন, 'কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ এ-প্রবঞ্চনা মেনে নেবে না, আমরা বহুবার আমাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তির পরিচয় দিয়েছি, বারাসাত বসিরহাটের ইতিহাস ওঁদের নির্দেশে রচিত হয় নি। আমরা ধর্মঘট করেছি, ঘেরাও আন্দোলন করেছি, আটচল্লিশ ঘণ্টার জন্যে বাংলাদেশের য়্যাডমিনিস্ট্রেশন কোলাপ্স করে দিয়েছি—সে কেবল ওই বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ ডাকেই—'

একটা ট্রাম ছেড়েছি ইতিমধ্যে, আর ছেড়ে দেওয়াটা নিতান্ত মূর্খামি হবে জেনে চলতি ট্রামে উঠে পড়লাম। কিন্তু বামপন্থী ঐক্যের ব্যাপারটা খোলসা হলো না আমার এখনো। চীফ রিপোর্টার ঠিকই বলেন বোধ হয়, মাথায় আমার কিছুই নেই কেবল কলমের জোরে করে খাচ্ছি!

প্রবোধবাবুকেও সেদিন কপালের জোরেই পেয়ে গিয়েছিলাম পার্ক সার্কাসের কাছে। গোড়ায় ভদ্রলোক অনেক ধানাই-পানাই করলেন, ঝানু পলিটিশিয়ান তো—বামপন্থী ঐক্য দরকার, দায়িত্ব নেওয়া প্রয়োজন। তারপর যখন রাস্তা ফাঁকা হলো কিছুটা, তখন বললেন—'কিন্তু রিভিসনিস্টদের বাদ দিয়ে। কারণ ওদের ওয়াইপ আউট করার সুযোগ আর আমরা পাবো না।......মুখ্য উদ্দেশ্য......হ্যাঁ তা আপনারা বলতে পারেন কিন্তু......আরে না মশাই, কোথায় আছেন...কংগ্রেসকে হটানো অত সহজ নয়, এ কোকাকোলার বোতল নয় যে স্ট্র ডুবিয়ে চোঁ চোঁ করে শুষে নিলেই হয়ে গেলো—হুঁ, তাই তো, ঠিকই তো করেছি, কেন দোবো অতুল্যবাবুর বিরুদ্ধে ক্যান্ডিডেট, আমাদের কান্ডজ্ঞান তো এখনো সম্পূর্ণ লোপ পায় নি ওদের মতো—'

দিন চলে যাচ্ছে পায়ে রকেট বেঁধে সাঁই-সাঁই করে, কিন্তু তবুও সমস্ত ব্যাপারটা এখনো আমার কাছে ধোঁয়াটেই রয়ে গেল।

—'কেন, এ তো সোজা হিসেব,' পরের রবিবার সেই শ্যামবাজারের রেস্তোরাঁই আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের চেষ্টা করে, বক্তার মুখটি নতুন ঠেকলো, তবে সপ্রতিভ দেখা গেল ঃ 'দুয়ে আর দুয়ে তো মশাই আর পাঁচ হয় না, চারই হয়......কার সঙ্গে কার গোপন বোঝাপড়া হয়েছে শিবের বাপ তা টের না পেতে পারেন, আমরা কি আর বুঝি না? কাজেই ঘাটে নৌকো এনে তাকে ডোবাতে তো হবেই......য়্যালায়েন্স আর হবে কোত্থেকে......'

সবাই এ ওর (এবং আমি সকলেই দিকে) মুখের দিকে চাইলো বটে কিন্তু কোনো জবাব দিলো না কেউ।

জ্যোতিষ সেদিন রেস্তোরাঁয় ছিলো না।

দাম্পত্য কলহে চৈব—

বিপ্লবী প্রচেষ্টার একটি বিস্মৃত অধ্যায়

—সত্যেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়

॥ যতীন্দ্রনাথ ও বিপিনবিহারীর শেষ মিলন ও আগড়পাড়ার ডাকাতি ॥

অন্যত্র দেখা গেছে ১৯১৫ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে বালেশ্বরে যাওয়ার পথে বাগনান হাই স্কুলের হেড মাস্টার শ্রদ্ধেয় অতুল সেনের আশ্রয়ে যতীন্দ্রনাথ কয়েকদিন অবস্থান করেছিলেন। এই সময়ে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর সঙ্গে তাঁর আর একবার দেখাও হয়েছিল। এই সূত্রে একথা আন্দাজ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, যে যতীন্দ্রনাথের বাংলা ত্যাগের আগে উক্ত মিলন ছিল একটা সুচিন্তিত অভিপ্রায় প্রসূত। অতঃপর পরাধীন জাতির দুটি শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নায়কের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা সম্বন্ধে চূড়ান্ত আলোচনা সম্পূর্ণ হলে যতীন্দ্রনাথ বালেশ্বরের দিকে রওনা হয়ে যান, আর বিপিনবিহারী কলকাতায় ফিরে এসে, যতটা জানা যায়, প্রথমে ওঠেন খিদিরপুর সেন্টারে। অল্প কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করে, পরে চলে যান আলমবাজারে পার্বতী মুখার্জী প্রমুখ বিপ্লবীদের আশ্রয়ে। পার্বতী মুখার্জী ছিলেন আসলে হাওড়ার অধিবাসী। বরাহনগরের এক মিলে তিনি কাজ করতেন। বিপিনবিহারী প্রমুখ বিপ্লবীদের প্রচেষ্টায় এই সমস্ত লোকের সহানুভূতি ও নিষ্ক্রিয় সহযোগিতা প্রণিধান যোগ্য। পার্বতীবাবু আজ আর ইহধামে নেই। তিনি শেষের দিকে মহানির্বাণ মঠে অবস্থান করে কয়েক বছর আগে দেহ ত্যাগ করেছেন। কাজেই বিপিনদার এই সময়কার নীরব ও গুপ্ত বিপ্লব প্রচেষ্টার কথা আজ সঠিক জানবার উপায় নেই। পার্বতীবাবুর আশ্রয়ে অবস্থানের সময় বিপিনদা আবার পাঞ্জাবীর বেশ পরিগ্রহ করেছিলেন।

ঐ সময়কার পরিকল্পিত বিপ্লবের জন্যে টাকার অভাবের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ডাকাতির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ ছাড়া তখন আর উপায় ছিল না। এই উদ্দেশ্যে এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করে তিনটি মোটর ডাকাতির কথাও অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে। (সাপ্তাহিক বসুমতী, ১৩ ১ ৬৬) আলোচ্য সময় পর্যন্ত পূর্বোক্ত তিনটি ডাকাতির মধ্যে গার্ডেনরিচ ও বেলিয়াঘাটার ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিপিনদা বরাহনগরে থাকার সময় ২৪ পরগনা জেলায় আগড়পাড়া অঞ্চলে আরো দুটি ডাকাতি সংঘটিত হয়। একটি ১৬ই এপ্রিল ১৯১৫ সাল ও অপরটি ২রা আগস্ট ১৯১৫ সাল। শেষোক্ত ডাকাতির কথা বলতে গিয়ে রাওলাট সাহেব লিখেছিলেন—"এক সংকেতধ্বনি ওঠার পরে প্ররোচনায় বিপিন গাঙ্গুলী একটি রিভলবার সমেত ধরা পড়েন"। (সিডিসন কমিটি রিপোর্ট—১৯১৮, প্যারা ৭২)। এই কথা ঠিক নয়। জজ সাহেব এই তথ্য সংগ্রহে সত্যই অকৃতকার্য হয়েছিলেন। এইটেই স্বাভাবিক—কেন না যে কোন বিষয়েই হোক একটা বিচার ব্যবস্থা বিচারপতির খাস কামরার রুদ্ধদ্বারে, পুলিশের দ্বারায় সংগৃহীত একতরফা সরকারী নথিপত্রের সাহায্যে যে কোন বিচার ব্যবস্থার ফল বিচার প্রহসনেই পর্যবসিত হয়। অন্যত্র এই আলোচনা করা হয়েছে। (সাপ্তাহিক বসুমতী ২২।৯।৬৬)।

১৯১৫ সালের ২রা আগস্টের ডাকাতিতে বিপিনবিহারী যে ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন না, সেটা অবধারিত সত্য। তবে সহকর্মীদের ফিরে আসতে দেরি হওয়ায় তাঁর মন অত্যন্ত চঞ্চল ও উতলা হয়ে উঠেছিল এবং পাঞ্জাবীর বেশে সজ্জিত হয়ে বিশ্বাসী বন্ধু পার্বতীবাবুকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়েছিলেন সেই বিপ্লবী ভাইয়েদের খোঁজ করতে। এই ভাবে যাত্রা করার আগে অভ্যাসমত তিনি একটি রিভলবারও পকেটে নিয়েছিলেন, কিন্তু সেটি লোডেড ছিল কিনা সেই বিষয়ে নিশ্চয় হতে ভুলে যান। বিপিনদার এই ভোলা মনের কথা, তাঁর সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন, তাঁদের অনেকেরই জানা আছে। তথাপি এই ব্যাপারটির কথা ভাবতে গেলে আজ মনে হয়, ভাগ্যলক্ষ্মী সেদিন বিপ্লবীদের প্রতি বোধ হয় বিরূপই হয়েছিলেন। কারণ এই ঘটনার অল্প কিছুদিন পরেই দেখা যায় যতীন্দ্রনাথেরও হয়েছিল ঐ একই অবস্থা বালেশ্বরের যুদ্ধের সময়। অপরদিকে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে সেদিন কিছুক্ষণ আগেই পরিকল্পিত লুণ্ঠনের কাজ শেষ হয়েছিল আর ঐ অঞ্চল তখন ছদ্মবেশী পুলিশে ছেয়ে ফেলেছিল। কাজেই উক্ত আবহাওয়ার মধ্যে দাড়ি গোঁফে সুশোভিত পাঞ্জাবী বেশে যুবক বিপিনদার সেই স্থানে আবির্ভাব, তখন লোকের মনে সন্দেহ জাগান অস্বাভাবিক নয়। হয়েও ছিল তাই। তাঁকে দেখা মাত্র রাস্তার লোকে—"ডাকু হ্যায়, ডাকু হ্যায়, পাকড়ো পাকড়ো" বলে চিৎকার করে বিপিনদাকে তাড়া করে। উপায়ন্তর না দেখে তিনি তাঁর রিভলবারটি বার করতেই, পুলিশ ও জনতা প্রথমটাতে থমকে যায়। কিন্তু রিভলবার থেকে গুলী যখন আর বার হোল না, বিপিনবিহারী তখন বিরক্ত হয়ে সেই শূন্য রিভলবারটি ছুঁড়ে মারেন অনুসরণকারী পুলিশ ও জনতার ওপরে। জনতা তাতে আরো ক্ষিপ্ত হয়ে, তাঁকে ডাকাত জ্ঞানে নিশ্চয় করে নেয়, আর সেই কল্পিত-ডাকাতকে ধরবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে। এদিকে সন্ধ্যা তখন ঘনিয়ে এসেছিল, ক্ষীণ আলো ও আঁধারের মধ্যে চতুর্দিক অস্পষ্ট হয়ে পড়েছিল, মাঠ-ঘাট সবই আবছা। এই অবস্থার ভেতরে ছুটতে ছুটতে বিপিনদা গিয়ে পড়েন এক ডোবার মধ্যে। ডোবাটিকে লোকে বলতো 'মুরারি পুকুর'। আর বিপিনদা যাবেন কোথায়—ক্ষিপ্ত জনতাও ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বিপিনবিহারীর ওপরে তাঁকে ধরবার জন্যে। স্পেশাল কমিশনারের রায়েতে অবশ্য লেখা আছে—'মুরারি পুকুরের কাছে অনুধাবনকারীদের সাথে অপরাধীর এক বিরোধের সৃষ্টি হয় ও শেষে সংঘর্ষের ফলে অপরাধীর সঙ্গে একজন বাগদী পুকুরের মধ্যে পড়ে যায়'। (এ বি পত্রিকা, ২০।২।১৯১৫)। প্রকাশ, এই সময়ে নিজের দেশের লোকের হাতেই বিপিনদা সেদিন প্রহৃত হয়েছিলেন গুরুতর ভাবে, মিথ্যা ডাকাত জ্ঞানে। এই সম্পর্কে মনে পড়ে কবির গান—

"তোরে হেথায় করবে সবাই মানা।
হঠাৎ আলো দেখবে যখন
ভাববে এ কী বিষম কাণ্ডখানা।
সংঘাতে তোর উঠবে ওরা রেগে
শয়ন ছেড়ে আসবে ছুটে বেগে
সেই সুযোগে ঘুমের থেকে জেগে
লাগবে লড়াই মিথ্যা এবং সাঁচায়।"

(১৫ই বৈশাখ ১৩২১ সালে রচিত ১নং কবিতা—বলাকা)।

তারপরে ডাকাত হিসাবে গ্রেপ্তার করে পুলিশ ও জনতা যখন তাঁকে বেলঘরিয়ার থানায় নিয়ে হাজির করে, তখন সেই জনতার মধ্যে মুরারিমোহন মিত্র নামে একটি মানুষ উপস্থিত ছিলেন। এই মুরারিবাবুটি তখন একজন পেনসেন প্রাপ্ত-সরকারী কর্মচারী, আর আগড়পাড়া মিউনিসিপালিটির কমিশনার। স্বভাব সুলভ আগ্রহাতিশয্যে, হয়তো একটা রায় সাহেব খেতাব জোগাড় করার লোভও হবে, মুরারিবাবু বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে নানারূপ খবর সরবরাহে লিপ্ত থাকতেন। শোনা যায় বিপিনদাকেও তিনি চিনতেন। প্রকাশ, গুরুতরভাবে প্রহৃত বিপিনদা সেদিন থানা মধ্যে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় সেই মুরারিবাবুর কাছে একটু জল পান করার জন্যে ইচ্ছে প্রকাশ করেন। সরকারী তাঁবেদার উত্তেজিত মুরারিমোহন সেদিন পানীয় জলের বদলে বিপিনদার প্রতি এক কুৎসিত ভাষা প্রয়োগ করেন। থানায় উপস্থিত জনতার মধ্যে বরাহনগরের বহু বিপ্লবী যুবকেরাও তখন হাজির ছিলেন, যাঁদের অন্তরে বিপিনদার আসন ছিল অনেক ঊর্ধ্বে। কাজেই বিপিনদার প্রতি

নভেম্বরের ডাক

দিনেশ দাস

আকাশ কাঁপে দারুণ ঝড়ে
বৈশাখী ঝড় নভেম্বরে
আগুন ঝরে—
লালচে আকাশ—ঝড়ের আকাশ দিগন্তরে॥

আজকে দেখি লড়াইয়ের নীল নেকড়েগুলো ছড়িয়ে পড়ে
ছড়িয়ে পড়ে প্রান্ত হ'তে তেপান্তরে,
নখরে তার আকাশটাকে ভিন্ন করে
জিহ্বা দিয়ে বহ্নি ছিটোয় দুরান্তরে।

জীবন জবলে, জীবন গলে সাগর পারে
নতুন জীবন নতুন জগৎ অঙ্গীকারে,
তুচ্ছ ক'রে এই সাময়িক ব্যর্থতারে
আবার সে কোন্ নতুন আকাশ আকাশ-পারে!

আজ আমাদের নভেম্বরে
কলঙ্কিত কলের ধোঁয়া দিগম্বরেঃ
কবে সে কোন্ ঘূর্ণীঝড়ে
ছিটকে দেবে সীমান্তকে সীমান্তরে।

জানি ঝড়ের ঘূর্ণীপাকে
ব্রুর মত ভাঙবে আমায় আমার মত হাজার লাখে
তাহার ফাঁকে
উপড়ে দেবে সতেজ শত পরগাছাকে।

আগাছাদের দিন তো গণা
উড়ছে ঝড়ে অগ্নিকণা—
বজ্রফণা
ভস্ম হবে অনেক দিনের আবর্জনা

বৈশাখী ঝড় নভেম্বরে
তাইতো আকাশ ধূলোর মত গুঁড়িয়ে পড়েঃ
সেই পুরোনো নভেম্বরে
আবার সে কোন আবীর-আকাশ দিগন্তরেঃ

(১৯৪১)

ঐ অভদ্রোচিত রূঢ় ব্যবহারের জন্যে মুরারিমোহনকেও ফলভোগ করতে হয়েছিল নিজের জীবন দিয়ে। আলিপুরের স্পেশাল কমিশনার বিচারে লিখেছিলেন—"এই সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য যে মুরারিমোহন মিত্র, যিনি পুলিশকে যথেষ্ট সাহায্য করছিলেন, আর যাঁর ছেলে প্রভাত মিত্র সেদিন রাজসাক্ষী হয়েছিলেন, তাঁকে গুলী করে মারা হয়েছিল"। (এ বি পত্রিকা ২০।৯।১৯১৫)। অবশ্য এই ব্যাপারে বিপ্লবীদের কেউই ধরা পড়েন নি। তবে পুলিশ যাঁদের প্রতি উক্ত ব্যাপারে গভীর সন্দেহ পোষণ করেছিল তাঁদের নাম প্রসঙ্গত উল্লেখ করা হোল মাত্র।

—অধিক সন্দেহ জনক—

গিরীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী
খগেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী
সতীশচন্দ্র দে
মাখন ঘোষ
ভূপেন মিত্র
অনুকূল মুখার্জী
পার্বতী মুখার্জী
শ্রীশ পাল
শ্যামা সেন

—সন্দেহ জনক—

নরেন্দ্রনাথ ঘোষচৌধুরী
প্রভাষচন্দ্র দে
বরদা দত্ত (ঘোষ?)
বিমান ঘোষ
কালি মুখার্জী
আশুতোষ প্রামাণিক
বঙ্কিম রায়
হরিশ সিকদার----
(কনফিডেনশাল রিপোর্ট, মিস্টার জে সি নিকসন, আই, সি, এস—টেবল 'কে')—॥

শোনা যায় প্রখ্যাত বিপ্লবী শ্রীশ পালের দ্বারাই এই কাজ সমাধা হয়েছিল, যদিও অন্য নামও অনেকে করে থাকেন। এই সম্পর্কে রাওলাট সাহেব লিখেছেন, "জনৈক বাঙালী যে তদন্তের ব্যাপারে পুলিশকে প্রচুর কার্যকর সাহায্য করেছিল, সে নিজ বাড়ির দরজার সামনে কয়েকজন বাঙালী যুবকের গুলীতে নিহত হয়। একাধিক গুলী তার ওপরে নিক্ষিপ্ত হয় আর মশার টোটার খোল মাটিতে বেশ কিছু পড়েছিল'। (সিডিসন কমিটি রিপোর্ট, ১৯১৮, প্যারা ৭২, পৃঃ ৪৮)।

প্রকাশ, ১৯১৫ সালের বিপ্লব আয়োজনের সন্ধিক্ষণে বিপিনদার গ্রেপ্তারের খবর বিপ্লবীদের সেদিন এতই বিচলিত করেছিল যে, তাঁরা তাঁদের প্রাণাধিক প্রিয় মানুষটিকে জেল ভেঙে মুক্ত করারও সংকল্প নিয়েছিলেন। কিন্তু এই খবর কোনক্রমে কর্তৃপক্ষের কানে পোঁছে যাওয়ায় তাঁরা প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করেন, আর সেই কারণেই ঐ পরিকল্পনা কাজে পরিণত করা সম্ভব হয় নি। পুলিশ এই বিষয়ে যাঁদের সন্দেহ করেছিল তাঁদের নামের তালিকাও নিচে দেওয়া গেল।—

"রাখাল ব্যানার্জী, খগেন চ্যাটার্জী, গিরিজা চৌধুরী (চ্যাটার্জী?), প্রভাস দে, বরদা ঘোষ (দত্ত), সত্যচরণ ঘোষ, তুলসী ঘোষ, অনুকূল মুখার্জী, পার্বতী মুখার্জী, শ্রীশ পাল, আশু রায়, হরিশ শিকদার"। (কনফিডেনশাল রিপোর্ট, মিস্টার জে, সি, নিকসন, আই, সি, এস—টেবল 'কে')।

অতঃপর এইভাবে স্থিরীকৃত ডাকাত বিপিনদার বিচার সুরু হয় আলিপুরের স্পেশাল কমিশনার—

মিস্টার এ জে ছোটজানার, মিস্টার সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক ও মিস্টার গঙ্গানারায়ণ রায়ের এজলাসে—আর বিচারের ফল স্বরূপ হুকুম হয়েছিল বিপিনদার পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড। (এ বি পত্রিকা ২০ ৯ ১৯১৫)। নিজ মুখ থেকে শোনা—এই ভাবে দণ্ডিত হয়ে তিনি তখন দিল্লীর জেলে কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন এমন সময় ১৯১৮ সালের ১১ই নভেম্বর এসে উপস্থিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে বিখ্যাত 'আর্মিসটিস—ডে'। এই দিনে সরকার পক্ষ থেকে কয়েদীদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করার ব্যবস্থা হয়। সেই মিষ্টি নিয়ে বিপিনদাকে দিতে এলে, তিনি তা কর্তৃপক্ষের সামনেই নিজের পায়ে পিশে উক্ত অনুষ্ঠানের উত্তর দিয়েছিলেন। এটা হচ্ছে সেদিনকার বিপ্লব-চিত্তের একটা উল্কার প্রকাশ মাত্র। কবির ছন্দে তাই আজ তাঁদের সম্বন্ধে বলা হয়—

"আগুন আছে ঊর্ধ্বে শিখা জেবলে
তোমার সে যে কবি।
সূর্য তোমার মুখে নয়ন মেলে
দেখে আপন ছবি।" (৪-চৈত্র, ১৩২২ সালে রচিত ৪৪নং কবিতা—'বলাকা')।

মনুমেন্ট ময়দানে শিক্ষক-শ্রমিক-কর্মচারীদের সমাবেশ

পাকা ধানে মই

..এ চলতি ছড়া আছে—'যদি বর্ষে আগনে, রাজা যান মাগনে'। অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে বৃষ্টি হলে রাজাকেও ভিক্ষায় বার হতে হয়। এই ক'দিন একনাগাড়ে যে বর্ষণ হল তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই কথা বলতে হচ্ছে।

এবারে যে রকম প্রচণ্ড খরা গেছে তাতে গতবারের তুলনায় অর্ধেক ফসল হলেও ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। এবারে ধান বোনার সময় বৃষ্টি হয়েছিল যৎসামান্য, ধান রুইবার সময়ও পর্যাপ্ত বৃষ্টি হয় নি। কত চারা যে শীষ ওঠার আগেই শুকিয়ে গেল আর ইয়ত্তা নেই। পুজোর আগে কিছুটা বৃষ্টি হয়েছিল বটে, কিন্তু তাও প্রয়োজনের তুলনায় এমন কিছুই নয়। পশ্চিমবঙ্গের চারটি জেলায় এই খরার প্রকোপ যে সর্বাধিক, সেই সব জায়গায় যে শতকরা আশী ভাগ ধান নষ্ট হয়ে গেছে, এ কথা সরকারই স্বীকার করেছেন। তবুও, এত ধাক্কা সহ্য করার পরেও, যে ক'টি গাছে ধান ফলেছিল তাও বুঝি আর বাঁচল না এই ক'দিনের একটানা টিপ টিপ বৃষ্টির জন্য। বহু ক্ষেত্রেই ধান পেকে গিয়েছিল যেগুলি বৃষ্টির আঘাতে ঝরে পড়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে সেই সব ক্ষেতে যেখানে তাইচুং ধানের চাষ করা হয়েছে।

তবে সরকারী ভাষ্য অনুযায়ী এই বৃষ্টি নাকি আলুর পক্ষে উপযোগী হয়েছে। হতেও বা পারে।

তেরই সেপ্টেম্বরের প্রতিহিংসা

হয়ত অনেকেই তেরই সেপ্টেম্বর তারিখটির কথা ভুলে গেছেন, ওই দিনে সরকারী কর্মচারীরা গণছুটি নিয়েছিলেন নিজেদের দাবি-দাওয়া সম্বন্ধে সরকারকে অবহিত করার জন্য। এ খবর প্রচুর পুরোনো, অনেকেই ভুলে গেছেন।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভোলবার পাত্র নন। তাঁরা ওই একদিন অনুপস্থিতির বেতন তো কর্তন করেই ছিলেন, উপরন্তু এমাস থেকে যাঁদের ইনক্রিমেন্ট পাবার কথা, তাঁদের তা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

সরকার যদি মনে করেন যে, প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে সরকারী কর্মচারীদের সায়েস্তা করবেন, তাহলে তাঁরা একান্তই ভুল ভেবেছেন। সরকারী কর্মচারীরা যে কতদূর সংঘবদ্ধ তার প্রমাণ সেদিনই হয়েছে। আশা করি সরকার অনাবশ্যক তিক্ততা আর না বাড়িয়ে প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকবেন এবং তাঁদের ন্যায়সঙ্গত দাবি-দাওয়াগুলির দিকে দৃষ্টি দেবেন।

মূল্যায়ন কমিটি

আমরা পূর্বে যা আশঙ্কা করেছিলাম সেটাই অবশেষে সত্য হতে চলেছে। রাষ্ট্রীয় পরিবহনের প্রতি সরকারের মনোভাবের যা আভাস পাওয়া গেছে তাতে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগসমূহকে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত করার এটাই বুঝি প্রথম ধাপ।

আমাদের অনুমান যে মিথ্যা নয় তার প্রমাণ অল্প কিছুদিন পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থদপ্তরের একটা মূল্যায়ন কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটির প্রথম বৈঠকেই পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী পরোক্ষে জানিয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রায়ত্ত এবং আধা-রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে বেসরকারী পরিচালনায় ছেড়ে দেওয়া হবে। কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন যে, সরকারের পরিচালনাধীন ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থা নাকি রীতিমত ভয়াবহ। জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে এবং অর্থকরী হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করতে উক্ত সংস্থাগুলি চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে এবং সেই জন্যই মাথা কেটে মাথাব্যথা সারাবার প্রয়োজন পড়েছে।

এই মূল্যায়ন কমিটির হাতে প্রথম শহীদ হতে চলেছে রাষ্ট্রীয় পরিবহন। রাষ্ট্রীয় পরিবহন লিকুইডেশনে যাবার পর পালাক্রমে শহীদ হবে দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিঃ, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যৎ ইত্যাদি প্রায় চল্লিশটি ছোট-বড় সংস্থা।

এবারে বোধ হয় অতঃপর ভারতীয় সোস্যালিজমের নতুন শ্লোগান হবে, রাষ্ট্রীয়

উদ্যোগ প্রত্যাহার কর। পশ্চিমবঙ্গে সেই লক্ষণই দেখা যাচ্ছে।

হাউস সার্জনদের সমস্যা

টেকনিক্যাল ভাষায় যাঁদের বলা হয় পি, আর, সি, এ (প্রি-রেজিস্ট্রেশন ক্লিনিকাল অ্যাসিস্টেণ্ট), যাঁদের চলতি ভাষায় বলে হাউস সার্জন বা হাউস-ফিজিসিয়ান, তাঁদের নিশ্চয়ই সকলে চেনেন। ডাক্তারী পাশ করার পর এঁরা একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কলকাতার বড় বড় হাসপাতালগুলিতে কাজ করতে বাধ্য থাকেন। প্রকৃতপক্ষে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এঁরাই হাসপাতাল চালান, রোগীদের দেখাশোনা করেন, আরও খুলে বলতে গেলে হাসপাতালগুলির সমুদয় চিকিৎসা ব্যবস্থা এঁদেরই উপর নির্ভরশীল। বড় বড় ডাক্তারেরা কিছুক্ষণের জন্য হাসপাতাল ভিজিট করে যান এই মাত্র, বাকি সময়টা তাঁরা নিজেদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসের তালে থাকেন। (অবশ্য দু-একটি যে ব্যতিক্রম নেই তা নয়)।

এই যে নবীন ডাক্তাররা শিক্ষানবীশ হিসাবে উদয়াস্ত পরিশ্রম করেন এঁদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান— অভিভাবকের হাড়-জল-করা পয়সা ছয় বছর ধরে জলবৎ ব্যয় করে এঁদের ডাক্তারী পাশ করতে হয় এবং পাশ করার পরেও এঁদের রেহাই নেই, প্রথম ছয় মাস বিনামূল্যে এঁরা হাসপাতালকে নিজেদের শ্রমদান করতে বাধ্য। তারপরে এঁরা হন জুনিয়ার হাউস স্টাফ (বেতন ১৩০ টাকা) এবং অবশেষে সিনিয়ার হাউস স্টাফ (বেতন ২০০ টাকা, কলকাতায় মাথা গোঁজার অন্য স্থান থাকলে ১৫০ টাকা)। এই অত্যল্প বেতনে তাঁদের নিজেদেরই ব্যয় সংকুলান করা অসম্ভব হয়ে ওঠে, কেন না হোস্টেলে থাকতে গেলে খাওয়া এবং থাকার খরচেই সব টাকাটা চলে যায়।

এর পরে আছে পরিশ্রমের কথা। বলা হয় যে, এই শিক্ষানবীশ থাকাকালীন নাকি তাঁদের হাতেকলমে আসল শিক্ষাটা হয়। কিন্তু তাঁরা বলেন যে, সবটাই নাকি ভাঁওতা। বস্তুত ইনডোর রোগীদের সকল দায়িত্বই বহন করতে হয় এই হাউস স্টাফদের,, জরুরী কেসগুলির দেখাশোনার দায়িত্ব তাঁদেরই, রোগীর চিন্তাকুল আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে তাঁদেরই মোকাবিলা করতে হয়। তদুপরি নার্স ও অপরাপর কর্মচারীদের কাজের পরিদর্শনের দায়িত্বও এই হাউস স্টাফদের। এঁরা সংখ্যায় খুব বেশি নন বলে অত্যধিক রোগীর চাপও এঁদের সহ্য করতে হয়।

এঁদের থাকা-খাওয়ারও বিশেষ কোন সুব্যবস্থা নেই। এঁদের কোয়ার্টারের প্রতিটি কামরায় বাসিন্দা চার থেকে বারজন। খাদ্যের যোগানও যথাযথ নয়। ঘরদোর অত্যন্ত নোংরা, সেগুলিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার কোন ব্যবস্থাই নেই। পরিবেশ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর।

অপরাপর রাজ্যে স্নাতকোত্তর শিক্ষালাভের যে সুযোগ আছে পশ্চিমবঙ্গে তার শোচনীয় অভাব। স্কলারশিপের সংখ্যা অত্যন্ত কম। নিজের পয়সায় পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট শিক্ষালাভ অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়।

এই পরিবেশের অবসান কবে হবে?

বিশ্ববিদ্যালয় কি লক-আউট হবে?

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার জানিয়েছেন যে, স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া যেতে পারে। এতদিন অবরুদ্ধ হয়ে থাকার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ও শিক্ষাদান ক্ষেত্রে যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়েছে। এম-এসসি সহ কয়েকটি পরীক্ষা স্থগিত রাখা হয়েছে। যে কয়টি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করার কথা ছিল তা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। ১৯৬৭ সালের বিভিন্ন নন-কলেজিয়েট ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় বসবার অনুমতিপত্র পাঠানো হয় নি। বর্তমান অচলাবস্থার ফলে এক লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১৯৬৭ সালের নির্ধারিত পরীক্ষাগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হতে চলেছে। শিক্ষক গবেষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্মচারী মিলিয়ে প্রায় দুই হাজার ব্যক্তি আগামী ১লা ডিসেম্বর বেতনলাভে বঞ্চিত থাকবেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে এই নৈরাজ্য কতদিন থাকবে? ঘটনাচক্রের গতিপ্রকৃতি দেখে যা মনে হচ্ছে, অপ্রিয় হলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি, সমগ্র ব্যাপারটির পিছনে একটা সূক্ষ্ম কোল্ড ওয়ার চলছে এবং বিষয়টি এখন রাজনীতির খেলোয়াড়দের হাতে চলে গেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে কবে যে রাহুমুক্তি হবে বলা দুষ্কর।

সরকারী সাহায্যের দুর্বলতম দিক

ত্রাণখাতে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৬-৬৭ সালের জন্য বরাদ্দ ছিল পাঁচ কোটি টাকা, অথচ সংবাদপত্রের বিবরণ অনুযায়ী গত ১লা এপ্রিল থেকে ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে আট কোটি টাকা ব্যয় হয়ে গেছে।

সার্বিকভাবে খরাক্লিষ্ট অঞ্চলগুলিকে রক্ষা করার জন্য আরও বেশি অর্থের প্রয়োজন। সরকার অর্থব্যয়ে যে কার্পণ্য করছেন তা নয়, কেন্দ্রের নিকটেও অধিকতর অর্থের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার চাপ দিয়েছেন বলে প্রকাশ।

কিন্তু এত টাকা যেভাবে ব্যয় করা হচ্ছে সেটা অত্যন্ত আপত্তিকর। বর্তমানে ত্রাণখাতে ব্যয়ের পরিকল্পনা প্রণয়ন করে পঞ্চায়েত সংস্থাসমূহ। সরকার টাকা দিয়েই খালাস। পঞ্চায়েতসমূহের পরিকল্পনা অনুসারেই অর্থ বরাদ্দ হয়ে থাকে।

কিন্তু কাজে পঞ্চায়েতসমূহই বা কতদূর নির্ভরযোগ্য? পঞ্চায়েতকে সার্থক ভাবে গড়ে তুলতে গেলে যে পরিমাণ সামাজিক সচেতনতা ও মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন এদেশে তার কোনটাই নেই। পঞ্চায়েতগুলি দলীয় স্বার্থকবলিত, এবং প্রায় সকল ক্ষেত্রেই গ্রাম্য ধনিকশ্রেণীর কবলিত। প্রকৃত কার্যকরী কোন পরিকল্পনা প্রণয়নের মত দূরদৃষ্টি অন্তত পশ্চিমবঙ্গের কোন পঞ্চায়েত সংস্থার নেই। প্রতিটি পঞ্চায়েতই গ্রামাঞ্চলে দলীয় রাজনীতির অনুপ্রবেশের ভিত্তিভূমি হিসাবেই কাজ করে।

এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মারফৎ ত্রাণকার্যের জন্য বরাদ্দ অর্থ ব্যয়িত হলে সে ব্যয় যে যথাযোগ্য হয় না এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সরকার ত্রাণকার্যে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছেন বটে কিন্তু সে ব্যয় সম্পূর্ণ নিরর্থক হচ্ছে। কাজেই ত্রাণকার্যের পদ্ধতি সম্বন্ধে সরকারকে নতুন করে চিন্তা করতে হবে। এত টাকার ব্যয় যাতে অপব্যয় না হয়ে খরাপ্রপীড়িত মানুষের প্রকৃত প্রয়োজনে লাগে, সেজন্য একটি উন্নত ধরণের পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে।

শিক্ষক-শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতিবাদ দিবস

গত বুধবার ২৩শে নভেম্বর মনুমেণ্ট ময়দানে শিক্ষক-শ্রমিক-কর্মচারীদের সারা বাংলা সম্মিলিত প্রতিবাদ দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ন্যূনতম বেতন ও মহার্ঘভাতা প্রদান, ছাঁটাই ও অটোমেশন রোধ, ট্রেড ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা প্রভৃতির দাবি পূরণে সরকারী অস্বীকৃতির প্রতিবাদ জানানো হয়। তাঁদের দাবিগুলি মোটেই অযৌক্তিক নয়, একথা সকলেই অনুভব করছেন, শুধু সরকার ছাড়া। যেভাবে মূল্যান্তর দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে, সেই তুলনায় যদি মহার্ঘভাতার বৃদ্ধি না হয় তাহলে জীবনযাত্রা অচল হয়ে পড়ে তা জেনেও সরকার এঁদের দাবি-দাওয়ায় প্রতি কর্ণপাত করেন না এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে। অটোমেশন ও র‍্যাশানালাইজেসন সর্বস্তরে ব্যাপক ছাঁটাই-এর সূচনা করছে যা কর্মীদের কাছে একটা আতঙ্কের বস্তু হয়ে রয়েছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সর্বস্তরের কর্মীদের আজও ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার বৈধ অধিকার

বলে স্বীকৃতি লাভ করে নি। শিক্ষক—সরকারী কর্মচারী ও শ্রমিকদের দাবি-দাওয়ার প্রতি সরকারী ঔদাসীন্য একটা বিপজ্জনক স্তরে উপনীত হয়েছে। সরকার কি পুনরায় এ'দের আন্দোলনে বাধ্য করতে চান?

খরা অঞ্চলে খাজনা মকুফ

পশ্চিমবঙ্গের দশটি জেলার খরা-প্রপীড়িত অঞ্চলে বর্তমান বছরের সমস্ত খাজনা মকুফ করার সিদ্ধান্ত পশ্চিম-বঙ্গ সরকার গ্রহণ করেছেন। চব্বিশ পরগনা, হুগলী, বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরু-লিয়া, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, নদীয়া, বীরভূম ও মেদিনীপুর জেলার যে সমস্ত অঞ্চলে খরায় অথবা বন্যার—প্রধান শস্যের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে সেই সব এলাকায় খাজনা মকুফের নির্দেশ বলবৎ হবে। জেলার অফিসারগণ ফসলের অবস্থা দেখে মকুফ করার নির্দেশ দেবেন। সরকারী মতে এবারে নাকি আমন ধানের উৎপাদন গত বছরের তুলনায় ৬০ ভাগ কম। খাজনা মকুফের এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে সুবিবেচনার পরিচায়ক। তবে কেউ কেউ এই খাজনা মকুফের ব্যাপারটাকে ইলেক-সান স্টান্ট বলে অভিহিত করছেন, কেন না গতবারের নির্বাচনের মুখেও ঠিক এইরকম খাজনা মকুফ করা হয়েছিল।

পুলিশী অপদার্থতার চূড়ান্ত নজীর

কিছুকাল আগে কণ্ঠদর্শনে বেল-ঘরিয়া প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা বলেছিলাম যে অপরাধীদের সঙ্গে পুলিশের কোন স্বার্থের যোগাযোগ না থাকলে বেলঘরিয়ার মত একটা ছোট্ট এলাকায় একাদিক্রমে দিনের পর দিন ধরে সকলের চোখের সামনে হত্যা, রাহাজানি ও অপরাপর অসামাজিক কর্মকলাপ ঘটে যেতে পারে না।

শুধু বেলঘরিয়াতেই নয়, বহু স্থান থেকেই এইরকম অভিযোগ আসছে যে পুলিশের ইচ্ছাকৃত ঔদাসীন্যের জন্য অপরাধী শাস্তি পাওয়া দূরে থাক, তারা সমাজের মধ্যে বুক ফুলিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। এই বিষয়ে পুলিশের নিষ্ক্রি-য়তা যে বিনা স্বার্থে নয় এই রকম অভিযোগ একেবারে ঠেলে ফেলার বস্তু নয়। বরং এগুলিকে সত্য মনে করার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে।

এই বিষয় নিয়ে একটি চিঠি সম্প্রতি আমাদের কাছে এসেছে, লিখেছেন শ্রীমৃণালকান্তি চট্টোপাধ্যায়, তুষারকান্তি আদক, ইন্দুভূষণ দাস, সুহৃদ রায়চৌধুরী প্রমুখ। এ'রা সকলেই খিদিরপুরের অধিবাসী। এ'দের বক্তব্য হল গত ২৫শে এপ্রিল (১৯৬৬) খিদিরপুরে ওয়াটগঞ্জ থানার ঠিক বিপরীত দিকে মাত্র ১০০ হাত ব্যবধানে প্রকাশ্য দিবালোকে (সকাল ৮½টা নাগাদ) এক নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বলি হয়েছিলেন ওই অঞ্চলের বিখ্যাত সমাজসেবী শ্রীহরিনারায়ণ বাগচী। ওয়াটগঞ্জ পুলিশের চোখের সামনেই এই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে পত্রলেখকগণ জানিয়েছেন।

তাঁরা আরও জানাচ্ছেন যে, হত্যা-কারীদের নাম ও সমস্ত তথ্য অবহিত হওয়া সত্ত্বেও পুলিশ সমস্ত চাপা দেবার চেষ্টা করে, শুধু তাই নয় উক্ত মৃত ব্যক্তির পরিবারের লোকদের ভীতি প্রদর্শন করে। পত্রলেখকগণ খোলাখুলি অভিযোগ করেছেন যে জনৈক পুলিশ কর্মচারী এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত, এবং মূলত তাঁরই চেষ্টায় সমগ্র বিষয়টিকে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা চলেছে।

আমরা পূর্বে বহুবার বলেছি যে পুলিশের প্রত্যক্ষ যোগসাজস না থাকলে সমাজবিরোধীরা কখনোই এতটা সক্রিয় হয়ে উঠত না। অপরাধীদের সঙ্গে পুলি-শের যোগাযোগের এই রকম আরও কয়েকটি ঘটনা হুগলী জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে আমাদের হাতে এসেছে। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হচ্ছে এই যে, পুলিশের কর্মদক্ষতার উপর জনসাধারণের আস্থা দিনের পর দিন কমে আসছে, যেটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক।

আমলাতান্ত্রিক খামখেয়াল

কথায় বলে নেই কাজ তো খই ভাজ, আমাদের সরকারী কর্তা তথা বড় বড় আমলাদের সেই হয়েছে অবস্থা। বর্তমান অবস্থার পরিবর্তনই সমগ্র দেশের আজ একমাত্র চাহিদা, কিন্তু এ চাহিদা মেটাবার মত দূরদৃষ্টি, চিন্তাশক্তি ও কর্মক্ষমতা আমাদের শাসন কর্তাদের নেই। তাঁরা মনে করেন যে, শ্যামের জায়গায় রামকে এবং রামের জায়গায় শ্যামকে বসালেই বোধ হয় দারুণ প্রগতিশীল কাজ করা হল।

পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি বিশিষ্ট আম-লার মস্তকে এক নতুন ধরণের ভূত চেপেছে, তাঁরা বেলগাছিয়াস্থ ভেটারনারী কলেজ ও হাসপাতালটিকে হঠাৎ কল্যাণীতে চালান করতে চান। এতে করে কি লাভ হচ্ছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, তবে দুর্ভোগ, হয়রানি ও অর্থদণ্ড ভিন্ন লাভের কোন কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

নীতিগতভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহকে শহরের গণ্ডগোলের বাইরে রাখাই ভাল, কিন্তু দিনের পর দিন ধরে সমস্ত কিছুর কেন্দ্রীকরণ কলকাতায় হবার ফলে সেই-ভাবেই পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের মানসিকতা গড়ে উঠেছে। শুধু মানসিকতার দিক থেকেই নয়, বাস্তবেও কলকাতার সুবিধা প্রচুর। বনগাঁ থেকে নিত্য কলকাতায় যাওয়া-আসা করা যায়, কিন্তু কল্যাণীতে যাওয়া-আসা করা যায় না, আর বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রীই আজকের দিনে ডেলি-প্যাসেঞ্জারী করেন। তাছাড়া দীর্ঘকাল একটি বিশেষ স্থানে অবস্থিত থাকার দরুণ যে সকল স্থানীয় সুযোগ-সুবিধা এই প্রতিষ্ঠান ভোগ করে, কলকাতার বাইরে সেটা সম্ভবপর নয়।

যদি এমন কোন গ্যারান্টি পাওয়া যেত যে ভেটারনারী কলেজ কল্যাণীতে স্থানা-ন্তরিত করলে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচুর উন্নতি হবে এবং যদি এটাও প্রমাণ করা যেত যে সেই উন্নতি বেলগাছিয়ায় সম্ভব-পর নয়, তাহলেও এই স্থানান্তর-করণের একটা মানে খুঁজে পাওয়া যেত। বর্তমানে সমগ্র বিষয়টিকে মনে হচ্ছে দিল্লী থেকে দেবগিরিতে রাজধানী পরি-বর্তনের যেন এক তোগলকী খেয়াল সরকারী কর্তাদের মাথায় চেপে বসেছে।

গম ও গমজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি

চালের দাম আগেই বাড়ানো হয়েছিল, এখন গমের পালা, শুধু গম নয়, গমজাত ময়দা, সুজি সমস্ত কিছুরই।

কেন্দ্রীয় সরকার নাকি কিলো পিছু ৭ পয়সা বাড়াবার সুপারিশ করে-ছিলেন, কিন্তু সদাশয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোমল প্রাণ এতটা সহ্য করতে পারল না, ৭-এর জায়গায় ৪ পয়সাই বহাল রইল। এতেও যদি পশ্চিমবঙ্গ-বাসী ঊর্ধ্ববাহু হয়ে নৃত্য না করে তাহলে সরকার নাচার।

এ ধরণের ফরমান জারী করে পকেট কাটার যে কি তাৎপর্য থাকতে পারে জনসাধারণ তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারছেন না। এবং সরকারকে এ কথাও জানিয়ে দেবার প্রয়োজন আছে যে অযথা এই মূল্য বৃদ্ধির কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। শেষ পর্যন্ত সরকারও কি বাজারের ব্যাপারী হয়ে গেলেন?

চিত্রাঙ্কন শিখিবার বই
কে আর্টস
ড্রইং বুক
বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত
অ্যাপোলো পাবলিশার্স

গ্রন্থমেলা

জয়শ্রী—সম্পাদিকা : লীলা রায়। ৩১২, গাঙ্গুলী বাগান, নাকতলা, কলিকাতা-৪৭ দাম : দু' টাকা।

'জয়শ্রী'র শারদীয় সংখ্যাটি যেমন রুচি-সম্পন্ন, তেমনি বিদগ্ধ পাঠকের মনের খোরাক যোগাতে সক্ষম হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা উচিত, এই পত্রিকাটি দীর্ঘ একত্রিশ বছর ধরে দেশের ও দশের কল্যাণ করে এসেছে। বর্তমান আলোচ্য শারদীয় সংখ্যাটির সম্পাদকীয়তে সমস্যাসঙ্কটে পীড়িত বাংলার জনসমাজের ছবি তুলে ধরা হয়েছে, সেই সঙ্গে আছে সমস্যা সমাধানের পথনির্দেশ। এই সংখ্যায় শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'নেতাজীর জাগরণ' প্রবন্ধটিতে জি, ও, সি, নেতাজীকে সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন। অন্যান্য রচনার মধ্যে জেনারেল কাওয়াবে-এর নেতাজীর বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা, ইতিহাসনিষ্ঠ রচনা 'জিন্না ও গান্ধী', পবিত্রকুমার ঘোষের ধারাবাহিক 'সুভাষচন্দ্র' বিশেষ উল্লেখ্য। এছাড়া আছে বাংলাদেশের এক এক জন বিশেষজ্ঞ রচিত অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক প্রবন্ধ। অন্নদাশঙ্কর রায় চীন ও ভারত সমস্যার ওপর কিছুটা আলোকপাত করেছেন। শারদীয় জয়শ্রীতে বাংলাদেশের প্রবীণ ও নবীন লেখকেরাই গল্প-কবিতা লিখেছেন। লেখকদের মধ্যে আছেন আশাপূর্ণা দেবী, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, দুর্গাদাস সরকার, সুনন্দা দাশ-গুপ্ত, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অপরাজিতা গোপ্পী প্রমুখ। খালেদ চৌধুরী অঙ্কিত প্রচ্ছদপটটি নয়নলোভন।

ইণ্ডিয়ান স্পোর্টস ফ্লাশব্যাক—শ্রী জে সি মৈত্র। প্রকাশ ভবন :—'বি' ব্লক তামারিণ্ড হাউস, তামারিণ্ড লেন, ফোর্ট, বোম্বাই—এ, মূল্য : আট টাকা।

ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে শ্রী জে সি মৈত্র বিশেষ সুপরিচিত। বোম্বাইয়ের ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, এ্যাথলেট, টেনিস প্রভৃতি বিভিন্ন খেলাধুলার আসরে শ্রীমৈত্রের অবদান নিঃসন্দেহে সর্বাধিক। এই সব ক্রীড়া আসরে প্রধানত তিনি কর্মকর্তার ভূমিকা গ্রহণ করেন, কিন্তু একদিকে কর্ম-কর্তার ভূমিকা গ্রহণ করে খেলাধুলার উন্নতির জন্য তিনি যেমন সচেষ্ট হন—অপরদিকে ক্রীড়া আসর যাতে দুর্নীতি-মুক্ত হয় তার জন্য তিনি সাংবাদিক হিসাবে আজীবন সংগ্রাম করেছেন। খেলার ক্ষেত্রে রাজনীতির কোন স্থান নেই এবং যাঁরা এই ক্রীড়াক্ষেত্রে রাজনীতির প্রবেশ ঘটাবার চেষ্টা করেছেন, তিনি বজ্রমুষ্টিতে তাঁর লেখার মারফৎ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আলোচ্য বইটিতে ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন ক্রীড়াক্ষেত্রের বিভিন্ন ঘটনাবলী এমনভাবে পর পর লিপিবদ্ধ আছে যে সময় সময় মনে হয় আমরা ক্রীড়াক্ষেত্রে কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী পাঠ করছি। ভারতীয় ক্রিকেট দলের 'ভি জি'-র অধি-

---

জয়ন্তী সেন

নায়ক নির্বাচন। ক্রীড়াক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা, ব্রাবো স্টেডিয়াম প্রভৃতি কয়েকটি অধ্যায় সুখপাঠ্য।

সাত্ত্বিক—সম্পাদনা : বরুণ মজুমদার। ১২০।১, রামকৃষ্ণপুর লেন, শিবপুর, হাওড়া। মূল্য : ৫০ পয়সা।

'সাত্ত্বিক' কবিতা পত্রিকা হিসেবেই প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি নিয়ে নেমেছিল। এখন তার বুকে গল্পের ছাপ। যা হোক এখন এই পত্রিকাটি গল্প ও কবিতার উভয়জাতীয় পাঠককেই তৃপ্তি দিতে পারবে। সাত্ত্বিকের শারদীয় সংখ্যায় গল্প চারটি ও কবিতা সতেরোটি প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধ ও ছবি উপরি পাওনা।—এর আগেও তা ছিল। বর্তমান সংখ্যায় লেখকদের মধ্যে উল্লেখ্য হচ্ছেন গোপাল ভৌমিক, সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, শিপ্রা পাল, মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, সুনীল হাজরা, গৌরাঙ্গ ভৌমিক প্রমুখ।

শাশ্বতী—সম্পাদক : গৌরাঙ্গ বন। ১১, ব্রজনাথ মিত্র লেন, কলিকাতা-৯ দাম : ৩০ পয়সা।

আধুনিক বাংলা কবিতার এই দ্বিমাসিক পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় ভালো কবিতার পাশাপাশি কিছু অ-কবিতাও প্রকাশিত হয়েছে। এই সংখ্যায় লিখেছেন রাম বসু, অপর্ণা সান্যাল প্রমুখ কবি। 'জীবনানন্দ ও আধুনিক কবিতা প্রসঙ্গে' প্রবন্ধটি খণ্ডাংশ হওয়ায় আলোচনা করা সম্ভব হলো না।

দ্যুতি—মৃণাল বসুচৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত। ৬৮।৪ সি, পূর্ণদাস রোড, কলিকাতা-২৯। মূল্য : ৫০ পয়সা।

এটি পঞ্চম সংকলন। কবিতাই একমাত্র উপজীব্য। 'দ্যুতি সম্পর্কে' নিবেদনটি একালের পাশ্চাত্যপতাকাবাহী এংরিকবিদের সম্পূর্ণ বিপরীত। অথচ 'দ্যুতি'র অনেক কবিই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর রেখেছেন। বর্তমান সংকলনে সুকুমার ঘোষ, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, পরেশ মণ্ডল ও মৃণাল বসু-চৌধুরী প্রত্যেকেই একাধিক কবিতার মাধ্যমে চিন্তাভাবনার পরিচয় দিয়েছেন।

বলাকা—সম্পাদক : প্রকাশ রায়। দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে ক্রেমস অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাব, ১, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা—১। দাম : ২৫ পয়সা।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে একদিক দিয়ে বিশেষ গৌরব করতে পারেন, কারণ এখানের অনেক কৃতী সাহিত্যিক, খেলোয়াড়কে আমরা গুণিসমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখেছি। কর্তৃপক্ষের রাজনৈতিক চাপের পরিবর্তে আশানুরূপ সহায়তা ও সহানুভূতিতে হয়তো আরো অনেকেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন। স্বাধীন ভারতে এটাই কাম্য। আমরা আশা করবো 'বলাকা'র সাংস্কৃতিকগোষ্ঠী যথাযথ সহায়তালাভ করবেন। শারদীয় বলাকার প্রধান উপজীব্য হচ্ছে প্রবন্ধ গল্প ও কবিতা। কোনো কোনো রচনায় দক্ষতার ছাপ লক্ষণীয়। বিশেষত বলিষ্ঠ চিন্তাই রচনাগুলিকে মনোগ্রাহী করে তুলেছে। অবশ্য দু-একটি ধর্মাবতারের ওপর রচিত দু-একটি লেখাও অঙ্গীভূত হয়েছে। এই সংখ্যায় বিপিনচন্দ্র পালের উদ্ধৃত প্রবন্ধটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া লিখেছেন বিমল মিত্র, জরাসন্ধ, ভবানী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মোট একুশ জন লেখক। পত্রিকাটির দীর্ঘায়ু কামনা করি।

সূর্য শপথ—সম্পাদক : প্রদীপ আলোক বন্দ্যোপাধ্যায়, তীর্থঙ্কর ভবন চুপী, বর্ধমান।

ক্ষুদ্রায়তন এই শারদ সংকলনটিতে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ লিখেছেন উৎপল দত্ত। একটি মাত্র ছোট গল্প লিখেছেন ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়। কয়েকটি সুলিখিত কবিতা এই পত্রিকার বিশেষ আকর্ষণ।

আমি যাঁদের দেখেছি

পরিমল গোস্বামী

(১৪) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
১৮৯১—১৯৫২
সজনীকান্ত দাস, ১৯০০—১৯৬২

কবিতার মধ্যে ভিন্ন সজনীকান্তকে আমি প্রায় যূথভ্রষ্ট অবস্থায় দেখি নি। সঙ্গে সব সময় বন্ধুদের দল। আর ব্রজেন্দ্রনাথকে প্রায় সব সময়েই দেখেছি একা, একমাত্র শনিবার দিন দল খুঁজে বেড়াতেন।

সজনীকান্তের সঙ্গে, সজনীকেন্দ্রিক-ভাবে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের প্রায় সবার কথা আমি স্মৃতিচিত্রণে এবং অন্যত্র বলেছি। তাই আমার এবারের রচনাটি একত্রে মাত্র দুজনকে নিয়ে, যে দুজন মিলিত-ভাবে আজীবন সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রে মূল্যবান কাজ করে গেছেন।

সজনীকান্তের সঙ্গে পূর্ব পরিচয় খুবই সামান্য ছিল। উপাসনা যখন রূপা-ন্তরিত হয়ে বঙ্গশ্রীতে পরিণত হতে চলেছে সে সময় একখানা বার্ষিকপত্র সম্পাদনাকালে তাঁর সংস্রবে আসতে হয়ে-ছিল এবং উপাসনার দলের সঙ্গে আমি ১৯২০ থেকে পরিচিত ছিলাম, সেজন্য উপাসনার খোলস চিরে যখন বঙ্গশ্রী নামক রঙীন প্রজাপতিটি বেরিয়ে এলো, সে সময়ে আমি সেখানে প্রায় সময় উপস্থিত থাকাতে সজনীকান্তের সঙ্গে একটা সান্নিধ্য মাত্র ঘটেছিল। উপাসনার সহকারী সম্পাদক কিরণকুমার রায় এই সময়ে উপাসনা থেকে বঙ্গশ্রীর দিকে এক পা বাড়াতেই সজনী-কান্ত তাকে টেনে নিলেন নিজের দিকে। কিরণ আমার পূর্ব পরিচিত ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সম্পাদনা কাজে তার মতো এমন নিবিড় নিষ্ঠা আমি আর দেখি নি এবং সে কথা সজনীকান্তের কানে এসে থাকবে। তাই সাবিত্রীপ্রসন্ন এবং অন্যান্য বিস্মৃত হলেন বঙ্গশ্রীতে, শুধু কিরণ রয়ে গেল।

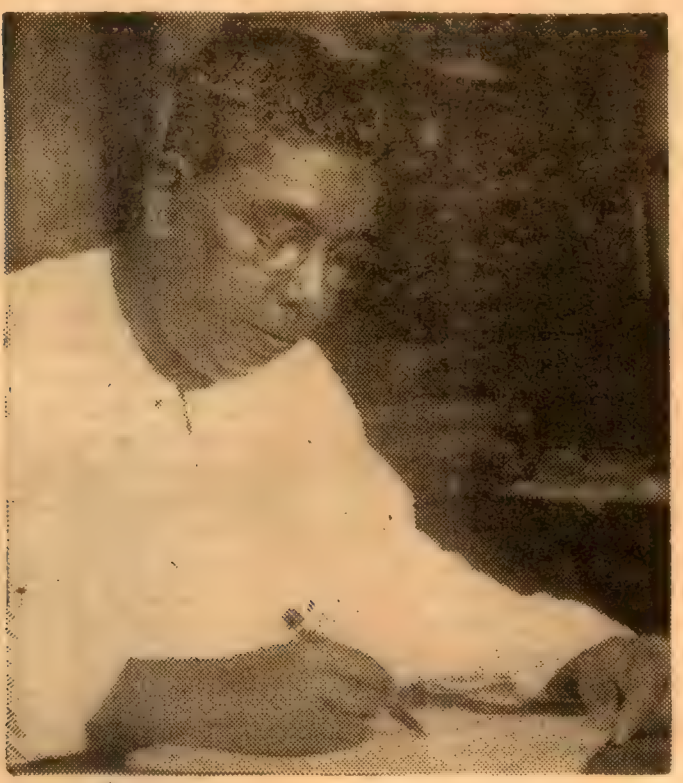

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ফোটো : লেখক ১৯৩৮

এমনি অবস্থায় ১৯৩২-এর নভেম্বরের মাঝামাঝি অথবা শেষ দিকে বঙ্গশ্রী অফিসে তখনকার অল্প পরিচিত আমাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে অকস্মাৎ শনিবারের চিঠির স্বত্বাধিকার এবং সম্পাদনার ভার দিয়ে আমাকে অবাক করলেন। এমন আচমকা প্রস্তাবের পিছনে কার হাত ছিল জানি না, কিংবা তখনকার দিনের বেপরোয়া প্রাণোচ্ছল অথচ সূক্ষ্ম শিল্প-বোধসম্পন্ন সজনী নিজের ঝোঁক থেকেই এ কাজ করে থাকবেন। আমাকে ভাবতে সময় দেন নি। তাঁর ছিল প্রবল ব্যক্তিত্ব, কাজেই না করবার শক্তি ছিল না। তিনি বললেন সম্প্রদান করলাম, আমি বললাম গ্রহণ করলাম। মাত্র এক মিনিট লাগল সম্প্রদানে।

আমাকে তিনি শনিবারের চিঠির মালিক এবং সম্পাদকরূপে সবার কাছে পরিচিত করাতে লাগলেন এবং এ ব্যাপারটা বেশি-দূর না গড়ায়, সেজন্য আমি মালিক হওয়া বিষয়ে ঘোর আপত্তি জানালাম। বললাম তা হলে আমি ডুবব। আমি ব্যবসা জানি না। অতএব মালিকানা তাঁকেই ফিরিয়ে দিলাম। সম্প্রদানের সময় কোনো সাক্ষী ছিল না, এ সময়েও কেউ সাক্ষী ছিল না।

সজনীকান্তের সাহিত্য ও শিল্পবোধ এমনই সহজাত ছিল যে, অতি দ্রুত ভাল-মন্দ বিচার করতে পারতেন। এ জিনিসটা আমি কিছুকাল লক্ষ করে তবে বুঝতে পেরেছিলাম। এ শিক্ষা বাইরে থেকে পাওয়া নয়, নিজের একান্ত গরজে, বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও, বাল্যকাল

থেকে অবিরাম সাহিত্য নিয়ে মেতে থাকার ফলে জন্মেছিল।

সজনীকান্তের চালচলন কথাবার্তা সব কিছুর মধ্যে জীবন জগতের একটা অস্থিরতা ছিল, এক জাতীয় আনন্দ-মাত্রা ছিল এবং এটি ছিল তাঁর চরিত্রের একটি প্রধান আকর্ষণ। দুর্দান্ত প্রাণশক্তিতে ভরপুর অশান্ত সজনী, বিখ্যাত শিল্পপতি সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্যের সদ্যক্রীত প্রেসের ম্যানেজার এবং বঙ্গশ্রী কাগজের সম্পাদক। মস্ত বড় বাড়ি, বহু কর্মী, প্রকাণ্ড আড্ডা। এমন motley crowd সম্ভবত আজ পর্যন্ত এ দেশে কোনো সম্পাদকের ঘরে দেখা যায় নি। এত বড় সম্পাদকীয় ঘরও অন্যত্র দেখা যাবে না। সহকারীদের উপর এমন সম্পাদকীয় অত্যাচারই বা কোথায় দেখা যাবে? কাজ করতে দেবেন না। বেশি কাজ করলে চাকরি খেয়ে দেব—এমন চাপ। সহকারী সম্পাদককে কাজ ফেলে আড্ডা জমাতে হবে, অফিস ছেড়ে সবাই বাইরে গিয়ে হৈ হৈ করতে হবে।

এ সময়ের সমস্ত ঘটনা অদ্ভুত মনে হয়। সবই ঝোঁকের মাথায় ঘটত। হ্যামলেটের ছিল ম্যাডনেসের মধ্যে মেথড, আর আমি দেখেছি সজনীকান্তের মেথডের মধ্যে ম্যাডনেস। কাজ ঠিকই করতেন এবং এক পয়সার হিসাবও না মিললে চলবে না, কিন্তু সব কর্তব্যের বাইরে ছিল একটা উন্মত্ততার আবরণ। চরম অস্থির, চরম ইম্‌পালসিভ, অথচ নিজের শক্তি বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন।

সংবাদপত্রে সেকালের কথা প্রকাশের পরেও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সজনীকান্তের মনে মনে কিছু বিরোধিতা ছিল। সেটি প্রথম আবিষ্কার করি ঐ বইয়ের সমালোচনা উপলক্ষে। আমি সংবাদপত্রে সেকালের কথাকে অভিনন্দন জানিয়ে ছোট্ট একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। সেটি শনিবারের চিঠির প্রথম প্রবন্ধরূপে ছাপা হচ্ছে সে-কথা সজনীকান্তকে বলেছিলাম। শনিবারের চিঠিতে কি ছাপা হচ্ছে না হচ্ছে সে বিষয়ে আমাদের আলোচনার কোনো প্রয়োজনই হত না, কেননা আমার উপর সমস্ত ভার ছিল এবং যা ছাপা হত তাই খুব ভাল হচ্ছে, এ ভিন্ন তাঁর আর কথা ছিল না। কিন্তু এই প্রথম তিনি বললেন, ও বইয়ের জন্য এতটা করবার দরকার ছিল না। ব্রজেন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব কিছু বিরূপ, সেই প্রথম সে কথা জানতে পারলাম। সজনীকান্ত বললেন, ব্রজেন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি 'কেচ্ছা' লিখেছি, বলে এক দীর্ঘ কবিতা এনে দেখালেন এবং অনেক কথাই বললেন। সম্ভবত সেটি এখনো [illegible] আছে।

কিন্তু—একদা কি করিয়া মিলন হল দোঁহে, কি ছিল বিধাতার মনে! ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন দুর্ধর্ষ একরোখা মানুষ। তাঁর একজন জনের দরকার ছিল এবং সজনীকান্ত দেখলেন গবেষণামূলক কাজ নিজ হাতে না করলে সম্পাদকীয় শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে না। তাই দুদিকের গরজে দুজনের মিলন ঘটল খুব সহজেই এবং এ-মিলন দুজনের আমরণ অক্ষুণ্ণ ছিল।

সজনীকান্ত-চরিত্রে অনেক পরস্পর-বিরোধিতা ছিল। আমাকে যে ব্যক্তি সম্বন্ধে বারবার সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, তাকে বেশি প্রশ্রয় দেবেন না, পরে দেখি সেই ব্যক্তি অত্যধিক প্রশ্রয় প্রাপ্ত হচ্ছে তাঁর নিজেরই কাছে। বনফুলকে যখন প্রথম পরিচয় করাই সজনীকান্তের সঙ্গে, তখনও তিনি বনফুলের সঙ্গে কিঞ্চিৎ দূরত্ব রেখে চলতেন। বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে অনেক পরে।

ব্রজেন্দ্রনাথের কর্মনিষ্ঠা অতুলনীয়। গবেষণা কাজ তিনি একক শক্তিতে আপন গরজে চালিয়ে বহু বিস্মৃত জিনিস শুধু উদ্ধার করেছেন তাই নয়, তাদের কালানুক্রমিকভাবে বিন্যাস করেছেন এবং ভবিষ্যৎ গবেষকদের কাছে তা অতিশয় মূল্যবান করে তুলেছেন। গবেষণার বিষয় ভিন্ন তাঁর অন্য আলাপ বেশি ছিল না। এর মধ্যে তিনি যে আনন্দ পেতেন, তার কথা সবাইকে শোনাতেন। গাড়ি টানা ঘোড়ার চোখের দু' পাশে ব্লিংকার লাগিয়ে দেওয়া হয় যাতে দু' পাশের দৃশ্য তাকে বিচলিত না করতে পারে, এবং যাতে সে শুধু সম্মুখের পথটিই দেখতে পায়। তেমনি গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথের দু' চোখের দু' পাশে অদৃশ্য ব্লিংকার লাগানো ছিল। তাঁর পথ একটিই ছিল। ভীষণ জেদী এবং একরোখা মানুষ। কিঞ্চিৎ খর্বকায়, ঠোঁট দুটি পুরু, মস্তকের দু' পাশে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত। রাউন্ডহেডদের মতো চুল খাটো করে ছাঁটা। ব্রজেন্দ্রনাথ প্রবাসীর সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করতেন।

যোগেশচন্দ্র বাগলও ঐ একই কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁরও কাজ ছিল গবেষণা। দুজনেই একদিক দিয়ে ঊনবিংশ শতকে বাস করতেন। সজনীকান্তের ঊনবিংশ শতকে প্রবেশ আরও পরে।

ব্রজেন্দ্রনাথ ও যোগেশবাবুর মধ্যে ভিতরে ভিতরে একটা একই বিষয়ের গবেষক-সুলভ ঈর্ষার ভাব ছিল। কোনো বিষয়ের তথ্য যদি যোগেশবাবু আগে আবিষ্কার করতেন, তাহলে ব্রজেন্দ্রনাথ একেবারে ক্ষেপে যেতেন। প্রথম আবিষ্কারের কৃতিত্ব তাঁর সহকারী কর্মী তাঁর কাছ থেকে যেন কেড়ে নিচ্ছেন, এই রকম ভাব। তখন এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটত। ব্রজেন্দ্রনাথ উত্তেজিত হলে সাধুভাষা ভিন্ন সাধারণ চলতি ভাষায় কথা বলতে পারতেন না। যোগেশবাবুর উপর এই কারণে রেগে গেলে তিনি সাধু ভাষায় এইভাবে একদিন তাঁকে তিরস্কার করেছিলেন—"আপনাকে আমি বারংবার বলিয়াছি ঐ বিষয়ে আমি গবেষণা আরম্ভ করিব, আপনি কেন তাহা দূরে করিয়া আগেই সব প্রকাশ করিলেন? আপনি অন্যায় করিয়াছেন। এমন কাজ ভবিষ্যতে আর করিবেন না।" ফলে যোগেশবাবুর অনেকদূর এগিয়ে যাওয়া গবেষণার কাজটি ব্রজেন্দ্রনাথের হাতে সমর্পণ করতে হয়েছে। এই সব কারণে দুজনের মধ্যে একটা যেন বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল মনের দিক থেকে। গবেষণার রেস্ খেলার ফলে স্বাভাবিক রেশারেশি। এইভাবে দৌড় পাল্লায় কে প্রথম হবেন, তা নিয়ে প্রতিযোগিতা জমে ওঠে এবং ফলে পুরনো লাইব্রেরিতে যিনিই প্রথম কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য পেয়েছেন, তিনিই, প্রতিদ্বন্দ্বী যাতে তার আভাস টের না পান, সেই উদ্দেশ্যে এমন উপায় অবলম্বন করতেন, যাতে সে বস্তু আর কেউ সেখানে আর আবিষ্কার করতে পারতেন না। ভবিষ্যৎ উই ও ইঁদুরকে বঞ্চিত করতে এঁরা দ্বিধা করেন নি।

ব্রজেন্দ্রনাথের গবেষণা কাজে যে মনোবৃত্তি দরকার তা মোটামুটি নিরপেক্ষ ছিল। তবে কখনো কোনো গবেষক হয় তো নিজস্ব অনুমানকে আগেই এত বিশ্বাস করে বসেন যার ফলে সাক্ষ্য প্রমাণ যাতে সেই অনুমানকে সমর্থন করতে পারে, সেই ভাবেই সমর্থক প্রমাণসমূহে সংগ্রহ করার কাজে অগ্রসর হন। কোনো কোনো বিজ্ঞানী এইভাবে ভুল পথে এগিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। ব্রজেন্দ্রনাথও একবার রামমোহন রায় সংক্রান্ত একটি গবেষণায় এই জাতীয় ভুল করে বসেছিলেন। প্রবাসীতে (এবং যতদূর মনে পড়ে মডার্ন রিভিউতেও কিছু পরিমাণ) রমাপ্রসাদ চন্দের সঙ্গে বহু বাদ-প্রতিবাদ চলেছিল কিছুদিন ধরে। শেষ পর্যন্ত ব্রজেন্দ্রনাথকে হার স্বীকার করতে হয়েছিল। যে অনুমান প্রমাণের আগেই প্রিয় হয়ে ওঠে, তাকে সব সময় সত্য রূপে প্রতিষ্ঠা করা যায় না, এ রকম ক্ষেত্রে গবেষকের নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হয়।

কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথের কৃতিত্বের দিকটা এত ভারী যে, তার তুলনায় এ জাতীয় দু-একটি ক্ষণিক দুর্বলতা সম্পূর্ণ তুচ্ছ।

প্রাচীন রোমক কবি ওভিডের একটি বিখ্যাত কথা আছে, Tempus edax rerum, যার বাংলা অর্থ, "কাল সর্ব-বস্তু ভুক"। বিখ্যাত ইংরেজ লেখক এইচ, জি ওয়েলস্ এই কথাটির বিষয়ে আলোচনা করেছেন তাঁর 'দি কনকোয়েস্ট অফ টাইম' নামক বইতে। তিনি বলেছেন, এ যুগে আর ও কথা সত্য নয়। কাল সব বস্তু হজম করতে পারেনি। অনেক কিছুই

তাকে এখন উদ্গিরণ করতে হচ্ছে। আগে যা কিছু কালের পেটে গিয়েছিল মনে করা হয়েছে, এখন গবেষকদের পাল্লায় পড়ে কাল তা পাকস্থলী থেকে বার করে দিচ্ছে। বিশ্ব সৃষ্টির রহস্যও মানুষ অতীত কালের জঠর থেকে ধীরে ধীরে আলোয় এনে ফেলেছে। এবং সব রকম অতীত কালের গবেষকদের পক্ষেই এ-কথা সত্য। ব্রজেন্দ্রনাথের কথা বলতে গিয়ে এই প্রসঙ্গটা মনে এলো। কারণ, ব্রজেন্দ্রনাথও তাঁর নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে অনেক তথ্য কালের জঠর থেকে বাইরের আলোয় প্রকাশিত করেছেন। তাঁর সাহিত্য সাধক চরিতমালা তাঁর অন্যতম কীর্তি। তাঁর সংবাদপত্রে সেকালের কথা, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, দেশীয় সাময়িকপত্রের ইতিহাস প্রভৃতি এ পথের গবেষকদের আকর গ্রন্থ হিসাবে অসামান্য। একক চেষ্টায় বহুদূর এগিয়ে আসবার পর সজনীকান্তের সহযোগিতায় সম্মিলিতভাবে আরও অনেক তথ্য উদ্ঘাটন করেছেন, যার মূল্য চিরদিন স্বীকৃতি পাবে বাংলা সাহিত্যের ছাত্রদের কাছে।

ব্রজেন্দ্রনাথের পড়াশোনা এনট্রান্স দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত। স্কুল ছাড়তে হল আর্থিক প্রতিকূলতার জন্য (১৯০৭)। তারপর শর্টহ্যান্ড ও টাইপরাইটিং শিখে ১৯০৮ থেকে ১৯২৮ পর্যন্ত বিভিন্ন অফিসে স্টেনোর কাজ। তারপর ১৯২৯ থেকে প্রবাসীতে। জাহ্নবী মাসিকের সম্পাদক নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ব্রজেন্দ্রনাথকে এই সময় লেখক বানাবার চেষ্টা করেন এবং তার ফলে ব্রজেন্দ্রনাথ এককালে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ গল্প এমন কি কবিতাও লিখেছেন, নানা স্থানে তা ছাপাও হয়েছে। তারপর অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের সংস্পর্শে এসে ইতিহাসের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ইতিহাস রচনার পদ্ধতি শেখেন যদুনাথ সরকারের প্রেরণায়। তারপর ১৯৩০ সালে শোভাবাজার রাজবাড়িতে প্রাচীনতম বাংলা সংবাদপত্র সমাচার দর্পণের সংখ্যাগুলি আবিষ্কার করেন। তাঁর রচিত ও সঙ্কলিত গ্রন্থ সংখ্যা ৩১ খানা। সম্পাদিত গ্রন্থ ১২ খানা। সজনীকান্তের সহযোগে ১৯ খানা। তাঁর কীর্তি যথাযোগ্য পুরস্কার লাভে গুণীজনের স্বীকৃতি পেয়েছে। তিনি ১৯৫১-৫২ সালের রবীন্দ্র স্মারক পুরস্কার (৫০০০ টাকা) লাভ করেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ আমাদের সবার ব্রজেনদা ছিলেন। প্রবাসী অফিসে হোক বা অন্যত্র হোক, তাঁর সঙ্গে দেখা হলেই মুখে শুধু গবেষণার কথা। সাহিত্য পরিষৎ ছিল তাঁর প্রাণস্বরূপ। ব্রজেন্দ্রনাথ সজনীকান্ত ও আমরা একত্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের

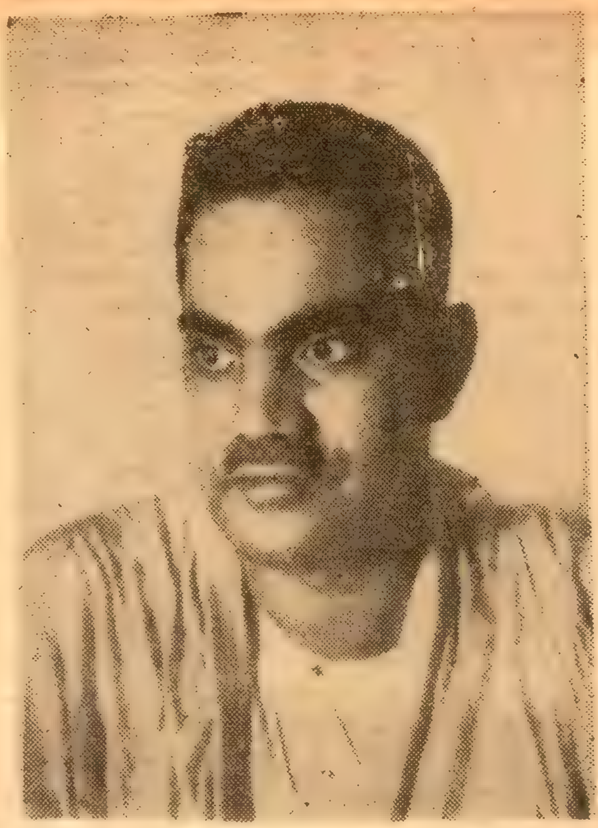

সজনীকান্ত দাস

ফোটো : লেখক ১৯৪০

সঙ্গে যেভাবে যুক্ত হয়েছিলাম তাতে আমাদের অন্তরঙ্গতা আরও বেড়ে গিয়েছিল। বছর কয়েক বাদে আমাকে সাহিত্য পরিষদের সম্পর্ক ছাড়তে হয়েছিল, কিন্তু আমার প্রতি ব্রজেন্দ্রনাথের প্রীতির কখনো অন্যথাভাব ঘটেনি।

যোগেশচন্দ্র বাগলের কথা আগে বলেছি। দু'জনে প্রবাসী অফিসে এক টেবিলেরই দুই বিপরীত দিকে বসতেন। যোগেশবাবু গবেষণা কাজে সম্পূর্ণ ডুবে গিয়েছিলেন, কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ সপ্তাহে অন্তত একদিন বেশ রসালাপে আসর জমিয়ে তুলতেন। আমাদের শনিবারের চিঠির আসরে (মোহনবাগান রো-তে) প্রবাসী অফিস থেকে শনিবারের দিন কিছু আগে বেরিয়েই চলে আসতেন এবং আমাকে উদ্দেশ করে হেসে বলতেন, পরিমলদা, আজ শনিবার, আজ একটুখানি অন্য আলাপ। তিনি আমার চেয়ে সাত বছরের বড় ছিলেন, কিন্তু সজনীকান্তের অনুকরণে তিনি আমাকে পরিমলদা বলতেন। চিঠিতেও ঐ সম্বোধন।

রসিক ছিলেন তার আর এক প্রমাণ আমরা একবার রেডিওতে (১৯৩৪) বৈকুণ্ঠের খাতা অভিনয় করেছিলাম, তাতে ব্রজেন্দ্রনাথ বিপিনের ভূমিকায় খুব জমিয়ে তুলেছিলেন। বই বাজাতে বাজাতে "ভাবতে পারি নে পরের ভাবনা" সুর করে গাইতে আরম্ভ করলেন তখন চেহারায় ঊনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্য-ইতিহাস নিয়ে দুর্ধর্ষ গবেষণার কোনো চিহ্ন ছিল না। সে দৃশ্য (আমরা বেতার স্টুডিও ঘরের একমাত্র দর্শক) আমি কখনো ভুলব না। তারপর একত্র পাটনা যাওয়ার দিনগুলি আজও মনে এলে রোমাঞ্চ জাগে। সজনী-ব্রজেন্দ্রনাথ-বিভূতি বন্দ্যো-নীরদ চৌধুরী ও আমি, এই পাঁচ জনের ১৯৩৭ সালের জানুয়ারির শেষে দুর্দান্ত শীতে কাঁপতে কাঁপতে যাওয়া এবং আসার স্মৃতিও আজ অম্লান আছে মনের মধ্যে।

বন্ধুপ্রীতি তাঁর ছিল আন্তরিক। নিরহঙ্কার ছিলেন সব বিষয়ে, শুধু গবেষণার ব্যাপারে তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল অতি প্রবল এবং তা তাঁর কৃতি স্মরণ করলে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত বোধ হবে। তারিখের পারম্পর্য বিষয়ে অন্য কেউ গণ্ডগোল করলে কিংবা তা নিয়ে অন্য কেউ তর্ক করতে এলে তাঁর মতো প্রবল যোদ্ধার শক্তিটি বেশ ভালভাবেই বোঝা যেত।

সজনীকান্তকে শরৎচন্দ্র পণ্ডিত বলতেন, সজনী নিপাতনে সিদ্ধ। এই ব্যাকরণের ভাষাটি তিনি খুব প্রশংসাযোগ্যভাবেই সজনীকান্তের বিশেষণরূপে ব্যবহার করেছিলেন। নিপাতনে সিদ্ধ অর্থাৎ অন্যের নিপাতকার্যে সিদ্ধ। অবশ্য সজনীকান্তের এই পরিচয়ই সাধারণ পাঠকের জানা, এবং এর জন্য দায়ী সজনীকান্ত নিজেই। কারণ তিনি যে কবিও, একথাটা তিনি নিজেই প্রায় চেপে রেখেছেন। এর কারণ আমি যা অনুমান করি তা হচ্ছে, তাঁর ব্যঙ্গবিদ্রূপ এবং আক্রমণের ভাষা এমনই উপভোগ্য ছিল এবং তার উপর পাঠকদের দাবিও এমন প্রবল ছিল যে, তিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এবং নিপাতন ব্যাপারটিকে কর্তব্য হিসাবে নিতে গিয়ে এতেই অধিকাংশ সময় মেতে থেকেছেন। অথচ আক্রমণের প্রাথমিক উদ্দেশ্য আক্রান্তের সংস্কার সাধন, তা যতটা হোক না হোক, কৌতুক সৃষ্টিটা তার চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে। এবং যে-ব্যঙ্গ উচ্চ সাহিত্য কখনো হবে না, সেই জাতীয় ব্যঙ্গ বেশি লিখেছেন পাঠকদের প্রতি দুর্বলতাবশত। অথচ যা তাঁর প্রাণের জিনিস, কাব্যসৃষ্টি, তা শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রায় নীরব সাধনার গণ্ডিতে আটকা পড়ে গেছে। তার আরও হয় তো কারণ এই যে, রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকতেই কাব্যের ক্ষেত্রে একটা নতুন আঙ্গিক এবং কাব্যের বিষয়বস্তুর বদল ঘটতে আরম্ভ করেছিল, এবং যদিও কাব্য হিসাবে এই নবযুগের নতুন পরীক্ষা কতখানি সফল হয়েছে সেকথা সমালোচকেরা আলোচনা করবেন। কারণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছন্দে লিখে তার মধ্যে মাঝে মাঝে স্বেচ্ছায় ছন্দঃপতন ঘটানোও এই আঙ্গিকের একটি বৈশিষ্ট্য। এবং যেহেতু এলিয়ট বলেছিলেন— "in the poet's experience there was no reason why the smell of cooking bacon (or was it steak), the reading of Dante and the experience of falling in love should not co-exist?" (ফ্রান্সিস স্কার্ফ, 'দি লিবারেশন অভ পোয়েট্রি'), সেই হেতু বাংলাদেশের অনেক আধুনিক কবিও কাব্যকে সংস্কারের হাত থেকে মুক্তি দিতে উঠে পড়ে লাগলেন। এবং কাব্যকে ভাবের জটিলতার মধ্যে এনে 'মুক্তি' দিলেন। এই নতুন স্বাদের কাব্য, যার মধ্যে কেবলই বিচিত্র কল্পনার ছবি সব এলোমেলো এবং ভাঙা অবস্থায় সহ-অবস্থান শুরু করে দিল, তার প্রাবল্যে রবীন্দ্রনাথও দূরে সরে গেলেন। ভঙ্গিসর্বস্বতা উদ্ধত হয়ে উঠতে লাগল ক্রমশই। এবং এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রকৃত কবিরও দেখা মিলতে লাগল ধীরে ধীরে। সুতরাং এমন যুগে ভাবের ইউনিটিকে কাব্য এবং যে কাব্যের আবেদন সরল এবং অব্যবহিতভাবে মর্মে গিয়ে পৌঁছয়, তা বাতিল বলে গণ্য হতে লাগল। এলিয়ট বলেছেন, 'Genuine poetry can communicate before it is understood'—এবং এ কথা এমনই সত্য যে, এর বিরুদ্ধে কিছু বলা মূর্খতা। কিন্তু একই সঙ্গে বুঝতে পারা এবং মর্মে গ্রহণ করতে পারা যে কবিতা নয়, এ কথা একেবারেই ঠিক নয়। তবু নতুনত্বের কড়া ঝাঁজে পূর্বগামীরা অবহেলিত হতে লাগলেন।

কিন্তু আমাদের পূর্ব যুগের পাঠকদের হল কিছু অসুবিধা। আমরা নতুনকে স্বাগতম্ জানালাম, নতুন কাব্যে অর্থাৎ কবিদের এই "পোয়েটিক শর্টহ্যাণ্ডে" বিস্ময় বোধ করলাম, কিন্তু ভালবাসলাম আমাদের যুগের কাব্যকেই, সমস্ত হৃদয় দিয়ে। তাই আধুনিক যুগ যাঁদের কবি বলে স্বীকার করে না, অথচ যাঁরা কবি, তাঁদের ভুলি কি করে? তা ভিন্ন এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা মাত্র বলব। সেটি একটি প্রশ্ন, যার উত্তর আজও পাই নি। সে হচ্ছে 'গান' যেমন সুরে-তালে গাওয়ার শর্তে গান। কাব্যও তেমনি ছন্দের মাত্রার দোলাযুক্ত হলেই তবে তা কাব্য—মিল থাক বা না থাক। গান যেমন সুর তাল বাদ দিলে আর গান থাকে না, গদ্য-গান নামক কোনো বস্তু হয় না, কিংবা এলোমেলো ছন্দে গান হয় না, বিশিষ্ট রীতি মান্য করে গাওয়ার শর্তেই গান হয়, কাব্যের বেলায় তার ব্যতিক্রম হল কি করে? গানের কোনো নবযুগেও কি সুর বাদ চলে যাবে? তালমাত্রা বাদ চলে যাবে?

কিন্তু এ প্রসঙ্গ থাক, মূল বিষয় থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি। সজনীকান্তের কাব্য রচনার শক্তিতে কারো সন্দেহ করবার কারণ নেই, কিন্তু কাব্যকে জীবনে প্রধান করে তাইতে ডুবে থাকার মতো মনোভাব ও অবস্থা সজনীকান্তের ছিল না। গবেষণা কাজ ও অন্যান্য বাইরের নানা কাজে তিনি নিজেকে অতিমাত্রায় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। নিজের প্রতি দুর্বলতা একটু বেশি মাত্রাতেই ছিল তাঁর, সেজন্য নিজের ধর্ম বজায় রাখা সম্ভব হয় নি তাঁর পক্ষে। বৈষয়িক ব্যাপারে তাঁর কোনো রকম ঔদাসীন্য ছিল না এবং সব দিক থেকে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রবল ঝোঁক তাঁকে বার বার পথভ্রষ্ট করেছে। যেমন, আমি মনে করি "কংগ্রেস সাহিত্য" নামক এক অদ্ভুত প্রচার-সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর যোগ দেওয়া উচিত হয় নি। এটি বিশুদ্ধ পাবলিসিটির কাজ। যেমন হিন্দু মহাসভা সাহিত্য হয় না, ফরওয়ার্ড ব্লক-সাহিত্য হয় না, কিংবা জনসঙ্ঘ-সাহিত্য হয় না, তেমনি কংগ্রেস সাহিত্যও সাহিত্য নয়। এক দলে যোগ দিয়ে অন্য দলকে আক্রমণ করা অবশ্য দিনকতক বাংলাদেশের অনেক সাহিত্যিকের একমাত্র কাজ হয়ে উঠেছিল। তাঁদের সৃজনমূলক রচনাতেও এই দলাদলির কথা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে সজনীকান্ত দলের ঊর্ধ্বে উঠেছিলেন, তার প্রমাণ দেখা যাবে তাঁর 'মারীচ' নামক গল্পে। (১৩৬৭ সালের ভাদ্র সংখ্যা শনিবারের চিঠি দ্রষ্টব্য)। মোহমুক্তি অনেকেরই ঘটেছিল অতঃপর।

নিপাতনে সিদ্ধ সজনীকান্ত আসলে কাউকে নিপাত করেন নি। [illegible] রচনার পরিমাণ তাঁর খুব বেশি নয়। কিন্তু কৌতুক সাহিত্য অজস্র এবং শনিবারের চিঠিতে যে সংবাদ-সাহিত্য রচনায় অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, তার অনেকখানিই সংযত এবং তারও বেশি কৌতুক। নিপাতনের জন্য আক্রমণও আছে, কিন্তু তার পরিমাণ সামান্য, কারণ ব্যক্তিগত কোনো স্থায়ী বিদ্বেষ তাঁর ছিল না বিপক্ষের প্রতি। আসলে কোনো বিষয়ে মতিস্থির ছিল না। যাঁর নিপাতন মানসে কলম ধরেছেন, পরক্ষণেই তাঁর সঙ্গে গলায় গলায়। আর একটা ব্যাপার আমি খুব ভাল করেই জানি এবং তাতে বিস্ময় বোধ করেছি—তাঁকে যে যেভাবেই গাল দিক, তিনি সম্পূর্ণ নির্বিকার থাকতে পারতেন। বিরুদ্ধ আক্রমণে কোনো রকম চঞ্চলতার লেশমাত্র দেখি নি তাঁর মধ্যে।

সংবাদ-সাহিত্যে কৌতুকটাই প্রধান। আমি একটি সংখ্যা থেকে (১৯৩৭, ফেব্রুয়ারি) দুটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

"সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকা বর্তমানে কে পরিচালনা করিতেছেন জানি না, বর্তমান সংখ্যা 'দেশ' পড়িয়া আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, তাঁহার রীতিমত রসবোধ আছে। না থাকিলে, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় লিখিত বসন্তের ঠিক পরেই উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখিত মৃতের মুণ্ড-কঙ্কাল রক্ষা নামক সচিত্র প্রবন্ধটি সন্নিবিষ্ট করিতে পারিতেন না। একটি নিঃসন্দেহে অপরটির পরিপূরক!...বিজয়বাবুর প্রবন্ধটি...আংশিক উদ্ধৃত করিয়াই আমাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হইতেছে।"—

'......আজ পল্লীর আকাশ ভরে উঠেছে বিচিত্র গানের ঝঙ্কারে। আমের মুকুল খেয়ে কোকিল ডাকে আনন্দে... টুনটুনির সঙ্গীতের আর বিরাম নেই। হায়! এখানে শুধু ট্রামের ঘর্ঘর, বাসের হুঙ্কার আর মানুষের কলরব। আজ বনের পথে পথে প্রজাপতিরা উড়ে বেড়ায়...ক্লান্তি আসে মনে, ভাল লাগে না টেবিল আর চেয়ার, সোফা আর পালঙ্ক, রেডিও আর গ্রামোফোন।'

"চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই শহরের উপর

সজনীকান্তই চটিয়াছেন দেখিতেছি, কিন্তু আমরা গরীবেরা কোন রকমে এখানে ছাপাখানার প্রুফ দেখিয়া দিন গুজরান করিতেছি, পল্লীর কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তিনি আমাদের প্রাণে দাগা দেন কেন? কোকিলের মত আমের মুকুল খাইয়া, প্রজাপতির মত উড়িয়া বেড়াইলে আমাদের চলে কই? ভাগ্যিস তিনি রেডিও গ্রামোফোনের উপর দিয়াই গিয়াছেন—রোটারি, ডবল ক্রাউন মেশিনের উল্লেখ করিলে আমরা তো মারা যাইতাম!......ভবিষ্যতে বিজয়বাবু যদি দয়া করিয়া এমন সকল কান্না-জাগানো প্রবন্ধ না লিখিয়া সেই অবসরে দুই চারি আনা খরচ করিয়া বেলঘরে অথবা মাঝেরহাটের টিকিট কাটিয়া কোকিলের অথবা টুনটুনির সঙ্গীত শুনিয়া আসেন তাহা হইলে আমরা এই শহরের ধূলিমলিন আবহাওয়ার মধ্যেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিব।......"

দ্বিতীয় উদ্ধৃতি—কবিতা মাসিকে প্রকাশিত এক কবিতায় কবি "এই হতভাগ্য শহরকে প্রশ্ন করিয়াছেন—

হে সহর হে ধূসর সহর
কালিঘাটের ব্রিজের উপরে
কখনো কি শুনতে পাও
লম্পটের পদধ্বনি

"ধূসর শহরের উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা থাকিলে বলিত—

শুনতে পাই বন্ধু,
কিন্তু কালীঘাট ব্রিজের ওপর নয়,
মাঝেরহাট ব্রিজের ওপর
লম্পটের গুষ্টির পদধ্বনি
শুনতে পাই।"

বেতারে বৈকুণ্ঠের খাতা—১৯৩৪
সামনে—বীরেন্দ্রকৃষ্ণ, ব্রজেন্দ্রনাথ, লেখক
পিছনে—মনোজ, সজনী, শরদিন্দু, প্রমথ
ফোটো : কমল পালিত

এই জাতীয় টিপ্পনি, এ কি ব্যঙ্গ? ব্যঙ্গ বলতে যে কঠোর আক্রমণ বোঝায় এর মধ্যে তো নেই। যে পড়বে সেই কৌতুক অনুভব করবে এবং হাসবে। অতএব এ জাতীয় মন্তব্য প্রথমত কৌতুক, এর মধ্যে ম্যালিস্ নেই। আমার নিজের বিশ্বাস নিপাতনে সিদ্ধের চেয়েও সজনীকান্ত কৌতুক-মাতনে বেশি সিদ্ধ এবং এ জাতীয় সমালোচনায় মাঝে মাঝে সুরেশ সমাজপতির সুরটিও যেন কিছু বেজে ওঠে।

এই সঙ্গে গবেষণার কাজ, সরস সাহিত্য রচনা এবং আত্মগতভাবে কাব্যের সেবা করা—লেখকরূপে সজনীকান্ত মোটামুটি এই তিন ভাগে বিভক্ত ছিলেন। সরস সাহিত্য, যাকে স্যাটায়ার বলা যায় না, অথচ যা শুদ্ধ হিউমারও নয়, সে রকম রচনা অনেক লিখেছেন সজনীকান্ত। তাঁর রচনার এই বিভাগের আর একটি উপবিভাগ আছে, সেটি, যাকে বলে দুষ্টোমি বুদ্ধি, তাই থেকে সেগুলি লেখা।

এই দুষ্টোমি বুদ্ধিতে আক্রান্ত হলে সজনীকান্তের প্রতিভা খোলে ভাল। সংবাদ-সাহিত্যে এর অনেক প্রমাণ আছে। দুটি দৃষ্টান্ত দেখিয়েছি এবং এর চরম দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে 'মাইকেল-বধ' কাব্য উপলক্ষে লেখা অনুকৃতিগুলিতে। এতে ছন্দের উপর এবং কবিদের বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গি ও মেজাজের সবখানি আত্মস্থ করার যে অনুপম দৃষ্টান্ত আছে, উইট-এর ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় এর জুড়ি নেই। মাইকেল-বধ কাব্য 'ভাব ও ছন্দ' নামক বইয়ের শেষাংশ এবং এর সমস্ত রচনাই দুষ্টোমি বুদ্ধিজাত।

কিন্তু এই রচনা সম্পর্কে আলোচনা করবার আগে সজনীকান্তের শিক্ষার কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তিনি বি-এসসি পাস, কলেজী শিক্ষার দিক থেকে। কিন্তু বাল্যকাল থেকেই কাব্যের প্রতি ঝোঁকবশত রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত কাব্য খাতায় নকল করে নিয়ে পড়ে পড়ে আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন। বিজ্ঞানের অপেক্ষা সাহিত্যের দিকে ছিল তাঁর প্রাণের টান। বহু বিষয় পড়া থাকায় (কলেজী শিক্ষার বাইরে) নিজের ক্ষমতার প্রতি একটা শ্রদ্ধা জেগেছে। বিচারের ক্ষমতা জন্মেছে। কাব্য পাঠ করে এবং লিখে ছন্দের উপর দখল এসেছে। নিজের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার উন্মেষে এই জাতীয় সনিষ্ঠ সাহিত্য অনুশীলন সাহায্য করেছে। তারপর ব্রজেন্দ্রনাথের সহযোগে যখন গবেষণা কাজে হাত দিলেন, তখন আরও অনেক বেশি ক্ষমতা নিজের আয়ত্তে এসে গেল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের দিক এবং সৃজনের দিক—এই দু' দিকেরই বিষয়ে কথা বলবার অধিকার আরও বাড়ল।

কিন্তু ঐ যে কাব্যের প্রতি ঝোঁক এবং নানা ছন্দের পরীক্ষা করে হাত পাকানো, তার ফল যে শেষ পর্যন্ত এমন এক ব্যাপক ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করতে পারবে এমন কল্পনা সজনীকান্তের পক্ষেও অসম্ভব ছিল। এর প্রথম প্রেরণা যোগান শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং

এর একটা পর্ব ইতিহাস আছে যা মনোহর। ১৯২৯ খৃস্টাব্দে এর আরম্ভ। তখন মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের আরম্ভের কয়েকটি লাইন আধুনিক ছন্দে রূপান্তরিত হয়েছিল। তার পাঁচ বছর পরে রবীন্দ্রনাথ 'উদয়ন' নামক মাসিকে মাইকেলের ঐ কয়েক ছত্র চলতি ছন্দে রূপান্তরিত করে বলেছিলেন, এভাবে লিখলে মাইকেল অবশ্যই অপাঠ্য হতেন না। বরং সহজপাঠ্য হতেন। ঠিক কি কথাগুলি বলেছিলেন, তা এখন আমার মনে নেই। এই রচনা পড়ে (১৯৩৪) মোহিতলাল মজুমদার ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এবং তিনি কোনো বিষয়ে উত্তেজিত হলে সজনীকান্তের মনেও তার কিছু সঞ্চারিত করতেন। তাই ১৯২৯-এর রূপান্তর যা ছিল অন্য উদ্দেশ্যে, ১৯৩৪-এর রূপান্তর ঘটল রবীন্দ্রনাথের রূপান্তরিত ছত্রগুলিকে ব্যঙ্গের উদ্দেশ্যে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

যুদ্ধ যখন সাঙ্গ হল
বীরবাহু বীর যবে
বিপুল বীর্য দেখিয়ে শেষে
গেলেন মৃত্যুপুরে
যৌবনকাল পার না হতেই।
কও মা সরস্বতী,
অমৃতময় বাক্য তোমার
সেনাধ্যক্ষ পদে
কোন্ বীরকে বরণ করে
পাঠিয়ে দিলেন রণে
রঘুকুলের শত্রু যিনি,
রক্ষকুলের নিধি?

রবীন্দ্রনাথের এই রূপান্তরিত ছত্রগুলিকে ব্যঙ্গ করে সজনীকান্ত লিখলেন—

লড়াই যখন ফতে হল
বীরবাহু বীর যখন
কেরামতি দেখিয়ে অনেক
তুলল পটল, আহা,
জোয়ান বয়স না ফুরতেই।
কও দুগ্‌গোর বেটী,
গুড়ের মতন জবান তোমার,
সেপাই-মোড়ল ক'রে
কোন্ বীরকে করতে লড়াই
পাঠিয়ে দিল তখন
রঘুয়াদের সেই দুশমন,
মানুষ-খেকোর রাজা।

এ তো অনেক দিনের কথা। এ পর্ব শেষ হয়ে গিয়েছিল তখনই। আরম্ভে যার উদ্দেশ্য ছিল ব্যঙ্গ, পনেরো-ষোল বছর পরে তার পরিণতি হল এক বিশেষ মূল্যবান সাহিত্যে। এ সাহিত্যে, বাংলা দেশের একেবারে আদি যুগ থেকে আরম্ভ করে সর্বাধুনিক যুগ পর্যন্ত কাব্যের ভাষা, ছন্দ ও ভাবের যে ক্রমোন্মেষ ঘটেছে, সজনীকান্ত নিজে সেই সব যুগের সমস্ত ভাষা, ভঙ্গি আঙ্গিক এবং ছন্দ সম্পূর্ণে আত্মস্থ করে মাইকেল-বধ কাব্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে স্বভাবরসিক এবং ছন্দোরসিক নলিনীকান্ত সরকারের সহযোগিতা পেয়েছেন। বাংলার চারটি বিভিন্ন আঙ্গিকের কাব্যে এবং সংস্কৃতের প্রধান ছন্দগুলির প্রকাশে। এই রচনাগুলির নাম হল মাইকেল-বধ কাব্য। কবি শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর নিজের একটি কবিতার ভঙ্গিতে মাইকেলের ঐ ছত্রগুলির রূপান্তর ঘটিয়ে দিয়েছেন এর মধ্যে।

সজনীকান্তের এটি এক অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় এবং এই 'মাইকেল-বধ' কাব্য গ্রন্থখানি হয়ে উঠেছে বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসের দর্পণ স্বরূপ, এত অল্প পরিসরে আচম্বিত কৌতুকের আঘাতে জর্জরিত হতে হতে চর্যাপদ থেকে সমর সেন পর্যন্ত প্রায় নয় শত বৎসরের মধ্যকার বিভিন্ন যুগ এবং যুগের কবি প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরিচিত হতে পারা একটি আশাতীত লাভের ব্যাপার।

কয়েকটির দৃষ্টান্ত না দিলে ঠিক বোঝানো যাবে না। এর মধ্যে কয়েকটির সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি ও আর কয়েকটির আংশিক উদ্ধৃতি দিচ্ছি। আংশিক উদ্ধৃতিও সবগুলির নয়। সংস্কৃত ছন্দের রূপান্তর কয়েকটি শ্রীনলিনীকান্ত সরকার সম্পর্কিত রচনায় ইতিপূর্বে দিয়েছি।

চর্যাপদঃ

বিরবাহু বীরা জখন মঈলা
রাবণ-মণ্ডল সঅল ভাগীলা॥
অমিঅ-বঅনি দেই পুছমো তোরে'
পুণু দলবই করি আহব যোরে'॥..

চণ্ডীদাসঃ

সই কি বা সে কঠিন পরিণাম
নিদারুণ রণমাঝেঃ
অকালে মরিল গো,
বীরবাহু গেল বীর ধাম॥
না জানিয়ে কত মধু
ও বীণায় আছে গো
বীণাপাণি শুনাও মধুরে।
সেনার নায়ক করি
ভেজিল কাহারে গো
রণথলে রাঘবারি শূরে॥...

বিদ্যাপতিঃ

ভারতি, বহুত মিনতি করি তোয়।
অমিয় বচন তুয়া
শুনইতে কাতর
দয়া জানি শুনাওবি মোয়॥...

কৃত্তিবাস, রমাই পণ্ডিত, গোবিন্দ দাস ইত্যাদি। তারপর ভবানীদাস আব্দুল সুকুর প্রভৃতি। এই শেষের কবিদের অনুকরণে (মাণিকচন্দ্র, ময়নামতী গোপীচাঁদ ইত্যাদি)ঃ

না যাইও না যাইও বীর
না যাইও লোকান্তর
কার লাগিয়ে বান্ধিলাম পুত্র
শীতল মন্দির ঘর॥...

এ সবই আংশিক উদ্ধৃত। এরপর আছে মীরা, দাদু, কবীর। তারপর কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। একটুখানি নমুনা দিই—

সম্মুখ সমরে পড়ে
বীরবাহু বীরবরে
হা কান্দ কান্দনে সবে কান্দে।
দুঃখ কর অবধান
দুঃখ কর অবধান
রাবণ উঠিয়া বুক বান্ধে॥...

এরপর কৃষ্ণদাস কবিরাজ, কাশীরাম দাস, সৈয়েদ আলাওয়াল শাহ মরশুম, মানো-এল-দা-আসুসুম্পসাউ, ভারতচন্দ্র (বিদ্যাসুন্দর ও রসমঞ্জরী), হরু ঠাকুর, রাম বসু, গোজলা গুই প্রভৃতি। তারপর রামনিধি গুপ্ত (টপ্পা)।

রামনিধির নমুনাঃ

তারে ভুলিব কেমনে।
অকালে মরিল বীরবাহু
সে কাল রণে॥....

রামমোহন রায়ঃ

মনে কর শেষের সে
দিন ভয়ঙ্কর
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু
বীরবাহু নিরুত্তর॥.....

এই জাতীয় উদ্ধৃতি শুধু একটুখানি সুর ধরিয়ে দেওয়া, এতে সমগ্রের সৌন্দর্য কিছুই প্রকাশ হল না। তবু স্থানাভাবে সবগুলিরও অংশ উদ্ধৃত করা অসম্ভব। আরও অল্প কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃত করব। ভাটিয়াল সুরের একটি এইভাবে আরম্ভঃ

ওগো বন্ধু আমার মন কেন
উদাসী হইতে চায়।
এগো ডাক শোনে না বীরবাহু গো
সাত সাগরে চইলা যায়॥...

তারপর ঈশ্বর গুপ্তঃ

কোথা রইলে মা.
বিক্টোরিয়া মা গো মা
কাঁদে তোমার প্রজা খাস।
তোমার ভারতকন্যার তলায় লঙ্কা
তার ঘটে কি সর্বনাশ।...

মধুসূদন দত্তের নিজস্ব ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দেরও অনুকরণ আছে এর পর। একটিতে আছে—রেখো মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে, চটুল ছন্দের সাধ, ঘটাবে কি পরমাদ—বাঁধিতে চাহিছে প্রাণ

কাব্য মেঘনাদ-বধ্যো"...... হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরেও বেশ জমেছে—

আর ঘুমাইও না দেখ চক্ষু মেল
চেয়ে দেখ কাঁদে রাক্ষসমণ্ডলী—
অমর কটক শোনে কুতূহলী
বীরবাহু তবু ঘুমায়ে রয়।...

ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলিবাবা'-
"ছি ছি এত্তা জঞ্জাল
এত্তা বড় গুষ্টি এসুমে
এত্তা জঞ্জাল;
একঠো একঠো মরতা তব্‌ভি
কমতা নাহি পাল।
মর গিয়া বীরবাহু বেড়কা জোয়ান
অব্‌ চোরি বাপ কিয়া ক্যা
বেটাকো যায় জান।
অহে ভারতী,
কিসকো কিয়া দল্‌পতি-
রাবণ রাজা বনা বাজা
একদম বেচাল
রাম লছমন জিতা রহ
উন্‌কা নাজেহাল।"

এই ছত্রগুলির সবটাই উধৃত করা গেল। এরপর দেবেন সেন। রবীন্দ্রনাথের 'মরণ', 'বলাকা' এবং 'তাজমহল'-এর ছন্দেও আছে। যতীন্দ্র বাগচী আছেন, অক্ষয় বড়াল আছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় আছেন। সতোন দত্তের অনুকরণে আছে "লঙ্কা! লঙ্কা! সুন্দরী লঙ্কা! মিত্রের আশ্রয় শত্রুর শঙ্কা!......হলে রাম-অস্ত্রে বীরবাহু ঠাণ্ডা, বাগ্‌দেবী বল কোন্‌ রাক্ষসে পাণ্ডা —করছে রাক্ষস-রাজ স্বহস্তে, প্রৌঢ় প্রারম্ভে অন্তিমে পস্তে—কিষ্কিন্ধ্যা দলে লাঞ্ছিত ডঙ্কা, লঙ্কা!"

তারপর মৈমনসিংহ গীতিকা—

অকালে মরিল বন্ধু মইরা হইল ভূত।
সুন্দর বীরবাহু বন্ধু রাবণ রাজার
পুত॥
রাবণ রাজার নারী শুইনা
ধীরে ধীরে বলে।
আগে আমি যাইবাম মইরা
মুরতেক না দেখিলে॥
তোমার পাপে সোয়ামী আমি
যাইবাম দেশান্তরি।
বিশ খাইয়া মরবাম কিম্বা
গলায় দিবাম দড়ি॥.....

যতীন্দ্র সেনগুপ্ত, মোহিতলাল, 'এরা ওরা এবং আরও অনেকে।' এত আছে যে, সব নামের তালিকা দেওয়াও এখানে সম্ভব নয় এবং যে-টুকু নমুনা দিয়েছি, সে রকম সংক্ষিপ্ত নমুনা উধৃত করারও স্থানাভাব। চারটি বাংলা কবির ভঙ্গির রূপান্তর ও আঠারোটি সংস্কৃত ছন্দের রূপান্তর করে দিয়েছেন নলিনীকান্ত সরকার, সে কথা আগে বলেছি। তিনি প্যারডী নিয়ে আর যে তিনটি করেছেন, সে হচ্ছে কুমুদরঞ্জন মল্লিক (মাঝি তরী হেথা বাঁধব না কো আজকের সাঁঝে), কালিদাস রায় (স্পন্দ বিনা বন্ধ নাড়ী সন্ধ্যা ঘন অন্ধকার, রণে আহত বীরবাহু তো রাহু যে রামচন্দ্র তার।...), মোহিতলাল (নভোনীল বেদনায় গূঢ় রক্ত হরিত-শ্যামল...) এবং অতুলপ্রসাদের সুরে ও ছন্দে (কে আবার বাজায় বাঁশী এ ভাঙা কুঞ্জবনে, কাঁপল বীরবাহু সে মরণের সেই বন্ধন...)। এইগুলি নলিনীকান্তের। এরপর নজরুল থেকে আধুনিক কবিদের সবাই আছেন।

এর কোনোটাই ঠিক অনুকৃতি নয়। বিভিন্ন কবির ছন্দ ভাষা ভঙ্গি এবং মেজাজ হজম করার ব্যাপার। সমান্তরাল নতুন রচনা। একে পারিসরে বাংলা কাব্য জগতের এতগুলি ভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়—এটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মাঝে মাঝে যে উদ্দাম কৌতুক এবং দুষ্টামি বুদ্ধির পরিচয় আছে তা অনন্যসাধারণ। আধুনিককালে এসে দু-এক স্থলে দুর্বলতা আছে, কিন্তু তাতে কিছু দুঃখ বোধ নেই। আমার মনে হয় সজনীকান্ত কাব্যরূপে প্রকাশিত হওয়ার আগে যে-ভাবে পূর্ব কবিদের ভাব ও ভঙ্গি আয়ত্ত করেছিলেন তা শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। গ্রহণ করে আত্মীকরণের ক্ষমতা তাঁর ছিল অসাধারণ।

ব্রজেন্দ্রনাথের রচনা ও গ্রন্থ তাঁর বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচয় বহন করছে। ব্রজেন্দ্রনাথের সহযোগে অথবা এককভাবে তিনি এই বিভাগে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তার তালিকা অতি দীর্ঘ।

কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই—ব্রজেন্দ্র-সজনীর যোগাযোগ না ঘটলে আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে আরও অনেক অধ্যায় অনাবিষ্কৃত থেকে যেত। সজনীকান্তের বিজ্ঞান শিক্ষা অবশেষে গবেষণার কাজে সার্থকতা খুঁজে পেয়েছিল।

এঁদের দুজনেই অকালমৃত্যু বরণ করেছেন, এবং হিসাব করলে একটি ব্যাপার লক্ষ করা যায়,—এই দুই সহযাত্রীর আয়ুষ্কাল প্রায় সমান।

সদ্য প্রকাশিত

ডেটিনিউ

স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছিলেন ডেটিনিউরা। প্রাক্তন ডেটিনিউ অমলেন্দু দাশগুপ্তর এই ডেটিনিউ বইটি একদা পাঠকসমাজে অভিনন্দিত হয়েছিল। আমরা বইটির তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করলাম। শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত বর্তমান মুদ্রণে ডেটিনিউদের রাজনৈতিক ভূমিকার কথা লিখেছেন ও স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারায় ডেটিনিউদের স্থান নির্দেশের প্রয়াস পেয়েছেন। গ্রন্থকার পরিচিতি লিখেছেন শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী। এঁরা দুজনেই প্রাক্তন ডেটিনিউ। গ্রন্থকার অমলেন্দুর ছিল একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি যা সর্বকালীন হয়েও সমকালকে তুচ্ছ করতে দেয় নি। তাই গ্রন্থটি ডেটিনিউদের ইতিহাস শুধু নয়, হয়ে উঠেছে ডেটিনিউদের জীবনের মর্মকথা। [৩·০০]

ঠাকুরবাড়ীর কথা

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক দ্বারকানাথ থেকে রবীন্দ্রনাথের উত্তরপুরুষ পর্যন্ত তথ্যবহুল ইতিহাস। সুন্দর প্রচ্ছদ, শোভন সংস্করণ। [১২·০০]

সাহিত্য সংসদ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড :: কলিকাতা-৯

আশাপূর্ণা দেবী

ধারাবাহিক উপন্যাস

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

অনেকগুলো বছর জেলের ভাত খেয়ে অবশেষে একদিন বাড়ি ফিরলো অম্বিকা। কালো রংটা আরও একটু কালো হয়ে গেছে, পাকসিটে চেহারাটা যেন আরো পাকসিটে আর জীর্ণ হয়ে গেছে, চুলের গোড়ায় গোড়ায় বিবর্ণ সাদাটে ছাপ। যেন পাকতে সুরু করে নি বটে, কিন্তু একসঙ্গে সবাই পাকবে বলে নোটিশ দিয়েছে।

তবু মোটামুটি যেন তেমন কিছু বদল হয় নি। মনে করা যায় এতগুলো বছর পরে সেই অম্বিকাই ফিরে এল।

ফিরে এল অম্বিকা তার দাদা-বৌদির কাছেই। বলতে গেলে সুবালার কাছেই।

সুবালার চেহারায় অবশ্য অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সুবালার চুলগুলো বেশ পেকেছে, ঠিক সামনের দুটো দাঁত পড়ে গেছে আর রংটা জ্বলে-পুড়ে গেছে। কারণ দারিদ্র্যকে যে কেন অনলের সঙ্গে তুলনা করা হয় সেটা অনুভব করা যাবে।

তথাপি সুবালার প্রকৃতিতে খুব একটা পরিবর্তন হয় নি। সুবালা অম্বিকাকে দেখেই প্রথমে আহ্লাদে কেঁদে ফেললো। তারপর সুবালা শাশুড়ীর নাম করে কাঁদলো, কাঁদলো অম্বিকার বাড়িতে চোর পড়ে যথাসর্বস্ব নিয়ে গেছে বলে, আর অভাবের জ্বালায় যে, সেই চোর অধ্যুষিত বাড়িটার ভাঙা পাঁচিল আর ভাঙা জানলা মেরামত করে রাখতে পারে নি সুবালারা, তা' নিয়ে কাঁদলো, এবং সর্বশেষে কাঁদলো অম্বিকাকে আর বিপদের পথে পা না বাড়াতে মাথার দিব্যি দিয়ে।

শেষ কথাটার শেষে অম্বিকা একটু ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বলে, 'আর বিপদ কোথা? দেশ তো বেশ ঠাণ্ডা মেরে গেছে। 'বিপদ' যারা বাধাচ্ছিল, তাদের শায়েস্তা করা হয়েছে, এখন দেশের কেষ্ট-বিষ্টু নেতারা কথার জাল ফেলে ফেলে স্বাধীনতারূপ বোয়াল মাছটি টেনে তোলবার তাল করছেন। এর মধ্যে আর আমরা কোথায় পা বাড়াতে যাব? আমরা এখন দাবার আড্ডায় বসে ক্ষুদিরাম কানাইলাল প্রফুল্ল চাকী বাঘা যতীনের আলোচনায় উদ্দীপ্ত হবো আর বসে বসে দিন গুণবো কবে কখন সেই 'স্বাধীনতা' নামের রসালো ফলটি গাছ থেকে টুপ করে খসে পড়ে।'

তা' অম্বিকার যে একেবারেই পরিবর্তন হয় নি, তা' বলা যায় না। আগে অম্বিকা ব্যঙ্গের সুরে কথা বলতে জানত না, এখন সেটা শিখেছে।

কিন্তু সুবালা এসব প্রসঙ্গের ধারে-কাছে আসতে চায় না, কারণ সুবালা অত বোঝে না। হয়তো বা বুঝতে চায়ও না।

তাই সুবালা তাড়াতাড়ি বলে, 'যাক গে বাবা ওসব কথা। আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে দরকার কি! আমার কথা হচ্ছে—এবার তোমার বিয়ে দেব!'

হ্যাঁ এই সংকল্পই স্থির করেছে এখন সুবালা, ওই বাউণ্ডুলে ছেলেটার বিয়ে দেবে। বয়েস একটু বেশি হয়ে গেছে, তা' যাক দোজবরে তো নয়। কত কত দোজবরে তেজবরে যে ওর ডবল বয়সী হয়েও বিয়ে করতে ছোটে।

মেয়ের অভাব হবে না।

বাংলা দেশে আর যে কিছুরই অভাব থাক না কেন, কনের অভাব নেই। আর সুবালার মতে বিয়ে না করে বুড়িয়ে যাওয়ার মত দুঃখের আর কিছু নেই।

সুবালা ইতিমধ্যে তার দুই ছেলের বিয়ে দিয়ে কাজ সেরেছে। যদিও সংসারের অবস্থা সুবিধের নয়, কিন্তু সংসারের 'অবস্থা' বিয়ের প্রতিকূল হবে কেন, এ তর্ক করেছে সুবালা। আর শেষ অবধি তর্কে সেই জিতেছে। তাই এখনও বললো 'বিয়ে দেব।' জানে জিতবে।

কিন্তু অম্বিকা ছিটকে উঠলো, বললো—'বিয়ে!

অম্বিকা হেসে ফেলল।

কিন্তু আগের মত সেই হো হো হাসির প্রাণখোলা সুরটা যেন অনুপস্থিত রইল সে হাসিতে। এ হাসি কেমন একরকম নিরুত্তাপ হাসি।

তবু হাসি।

হেসেই উত্তর।

'বিয়ে! নাঃ আপনি দেখছি চুলগুলোই মিছিমিছি পাকিয়েছেন, বয়েসে সামনে না হেঁটে পিছনে হাটছেন।'

সুবালা অবাক হয়ে বলে, 'তার মানে?'

অমূল্য এতক্ষণ মিটিমিটি হাসছিল

বসে বসে। এবার বলে, 'মানে আর কি, অম্বিকার মতে তোমার শুধু চুলই পেকেছে বুদ্ধি পাকে নি।'

'কেন? কাঁচা বুদ্ধির কি দেখলে শুনি?'

অম্বিকা হাসে, 'পুরোপুরিই দেখলাম। এখনো আপনার দ্যাওরের বিয়ে দেওয়ার শখ!'

হ্যাঁ এই রকম করেই বলে অম্বিকা।

হেঁ-হেঁ করে বলে ওঠে মা, 'কাঁচা বুদ্ধি নয়? শুধু বিয়ের মতলবটি এঁটেই বসে আছেন, কুই কনে রেডি করে রাখেন নি? টোপর চেলি ঠিক করে রাখেন নি? কে বলতে পারে আবার কখন শ্রীঘর থেকে ডাক পড়ে।'

আগেকার অম্বিকা হলে এই রকমই বলতো!

এখনকার অম্বিকা বলে, 'এখনো আপনার দ্যাওরের বিয়ে দেওয়ার শখ!'

সুবালা ভাঙা দাঁতের হাস্যকর হাসি হেসে বলে, 'তা' কখন আর শখ করবার সুবিধা পেলাম শুনি? তুমি তো বসে আছ শ্রীঘরে। এদিকে কত ঘটনাই ঘটে গেল, ঘটে চলেছে। তোমার চার-চারটে ভাইপো-ভাইঝির তো বিয়ে হয়ে গেছে ইতিমধ্যে!'

চার-চারটে ভাইপো-ভাইঝি!

অম্বিকা অথই জলে পড়ে।

এতগুলো ছেলে-মেয়ে বিয়ের যোগ্য হয়েছিল অমূল্যর? তা'ছাড়া বিয়ের যোগ্যতা? ওর মধ্যে কোনটা মেয়ে, কোনটা বা ছেলে? হঠাৎ কারো নাম মনে পড়ছে না কেন? বড় বড় ছেলে দুটোর নাম রাসু আর বঙ্কু ছিল না? রাসবিহারী বঙ্কুবিহারী কিন্তু তারপর? সারি সারি অনেকগুলো ছিল যে।

কী আশ্চর্য!

এমন স্মৃতিভ্রংশ হল অম্বিকার?

দাদার ছেলে-মেয়েগুলোর নাম ভুলে গেল? ভুলে গেল কোনটা কত বয়সের ছিল। মুখই বা মনে পড়ছে কই তেমন করে?

পড়ছে আস্তে আস্তে।

নামও......ভাবতে ভাবতে ভেসে উঠেছে, রাসু বঙ্কু টিঙ্কু কুলু নেড়ু টেঁপু ......আরো কি কি যেন! একটা দল হিসেবেই তাদের দেখেছে অম্বিকা খুব স্বতন্ত্র আলাদা করে নয়।

দাদার ছেলে-মেয়েরা!

এই অনুভবের মধ্যে ছিল তারা।

কিন্তু সেই বালখিল্যের দল এত সায়েক হয়ে উঠল এর মধ্যে?

উঠল।

তার মানে সময়ের সেই বিরাট অংশটা হারিয়ে ফেলেছে অম্বিকা তার জীবন থেকে! অম্বিকা বুড়ো হয়ে গেছে!

কিন্তু 'জীবনের' ওপর কবে মোহ ছিল অম্বিকার? কবে ছিল লোভ? তাই হারিয়ে ফেলেছে বলে মনটা 'হায় হায়' করে উঠল?

হয়তো এমনিই হয়। শুধু অম্বিকার মত পাগলাদের নয় সকলেরই!

যে মায়া-হরিণের পিছনে ছুটতে ছুটতে সময়ের জ্ঞান হারিয়ে ফেলে মানুষ, সেই হরিণটা যখন একটা 'দুয়ো' দিয়ে দিগন্তের ধূসরতায় মিলিয়ে যায়, তখন মনটা এমনি 'হায় হায়' করেই ওঠে। মনে হয় এতগুলো দিন-রাত্রি হারিয়ে গেল! কি করলাম? কি বা পেলাম?

হ্যাঁ সেটাই হাহাকারের সুর।

'কী পেলাম! কী পেলাম!'

যেন কে কোথায় অঙ্গীকার করে রেখেছিল পাইয়ে দেবে অনেক কিছু।

যেন বলে রেখেছিল—'তোমার ওই দিন-রাত্রিগুলো আমার কারবারে ফেল, তার বিনিময়ে পাওনার পাহাড় জমবে তোমার।'

কেউ দিয়েছিল সেই আশ্বাস?

কেউ করেছিল সেই অঙ্গীকার?

কেউ তেমন একখানা মূল্য নির্ধারণ করে রেখেছিল আমার এই দিন-রাত্রিতে গড়া জীবনের?

জানি না।

দেখি নি তেমন কাউকে।

তবু ওই 'প্রাপ্তির' ধারণাটা আছে বদ্ধমূল। নিশ্চিত হয়ে আছি এই যে আমার সোনার দিনগুলো বিকোচ্ছি বসে বসে, তার বদলে জমা হচ্ছে স্বর্গের সোনা। খানিকটা এগিয়ে গেলেই সেই স্বর্গীয় সোনার তালটাকে ধরে নেব খপ্ করে, ভরে নেব মুঠোর মধ্যে।

কিন্তু সে 'সোনা'র আশ্বাস মায়া-হরিণের মতই অনেক ছুটিয়ে মেরে অকস্মাৎ কখন এক সময় দিগন্তের ধূসরতায় মিলিয়ে যায়, তখন ক্ষুব্ধ নিঃশ্বাস মর্মরিত হয়ে ওঠে, 'পেলাম না, আমি আমার যথার্থ মূল্য পেলাম না। আমি ঠকে গেলাম। আমি কত দিলাম, কী বা পেলাম! যেন আমার মনিব আমায় সারা মাস খাটিয়ে নিয়ে—মাসের শেষে মাইনে দিল না।

আশ্চর্য!

কে বলেছে আমার এই জীবনটা ভারী এক দামী জিনিস? কে বলেছে আমার এই দিন-রাত্রিগুলো সোনার দরের?

নিজেই নিজের দাম কষছি, মোটা অঙ্কের টিকিট মারছি তার গায়ে, ভেবে দেখছি না কেন তা করছি! করছি 'হায় হায়!' ভেবে দেখছি না আমি কেউ না, আমি এই নিখিল বিশ্বের অনাহত লীলার একটা অবিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র। বাড়তি কিছু পাওনা নেই আমার।

কেউ ভাবি না, কেউ ভাবে না।

অম্বিকাও তা ভাবল না।

অম্বিকা ভাবলো 'এতগুলো 'দিন' হারিয়ে ফেললাম!' ভাবলো 'কী বা পেলাম তার বিনিময়ে।'

তাই কেমন যেন দিশেহারার মত বলে উঠলো, 'কাদের বিয়ে হয়ে গেল?'

'কেন রাসু, বঙ্কু, টেঁপি আর নিভার! নিভাটার অবিশ্যি একটু সকাল সকালই হয়ে গেল, ভাল পাত্তর পেয়ে যাওয়া গেল। আর দিতেই তো হবে। চারটের হিল্লে হয়েছে, বাকি ছ'টার হয়ে গেলেই আমাদের ছুটি। তারপর বুড়োবুড়ি কাশীবাস করবো।'

বাকি ছ'টার হয়ে গেলেই—

অম্বিকা ওই দুঃসাহসী আশার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে। তারপর ভাবে 'হয়তো সেই অসাধ্য সাধন করেই ফেলবে ওরা, হয়তো সত্যিই শেষ অবধি নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী তীর্থবাস করতেও যাবে। আর সমস্ত কর্তব্য সমাধা করার যে একটা আত্মতৃপ্তি, সেটুকু রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করবে।'

অম্বিকা অন্তত তাই ভাবলো!

তাই অম্বিকা সহসা ওদের জীবনটাকে হিংসে করে বসলো।

অনেক দিন জেলের ভাত খেয়ে খেয়ে এ উন্নতিটুকু তা' হলে হয়েছে অম্বিকার। অম্বিকা তার 'স্বপ্ন' থেকে স্খলিত হয়ে 'তুচ্ছ জীবনের' দিকে তৃষ্ণার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।

অম্বিকা তাই কাঁচা বুদ্ধি সুবালার কাঁচামিটাকেই দীর্ঘ বিলম্বিত করে দেখতে চাইছে।

অতএব অম্বিকা বলে উঠছে, 'আরে ব্যস, সব ব্যবস্থা কমপ্লীট? তা' আমিও তো তা'হলে দিব্যি একখানি 'শ্বশুর' হয়ে বসে আছি! আমাকে নিয়ে তবে আবার ডাংগুলি খেলবার বাসনা কেন?'

সুবালা এ পরিহাসটুকুর অর্থ বোঝে।

সুবালা তাই হেসে উঠে বলে, 'তুমি যাতে আর ডাংগুলি খেলে বেড়াতে না পারো তার জন্যে। শক্ত শেকল এনে বাঁধতে হবে তোমায়। করছি তার জোগাড়।'

'কেন, আমার অপরাধ?'

'এই তো অপরাধ। জীবনটা মিছিমিছি বিকিয়ে দিলে।'

অম্বিকা সুবালার এই আক্ষেপে 'অবোধ' বলে অনুকম্পার হাসি হাসল না। অম্বিকা চমকে উঠল। অম্বিকা ভাবলো, 'আমি কি এই কথাই ভাবছিলাম না?'

তারপর অম্বিকা বললো, 'আপনি তো শেকল জোগাড়ে লাগবেন, বলি শেকল তো আর ভুঁইফোঁড় নয়? মা-বাপ থাকলেই

তার কে এই জেলখাটা আসামীকে মেয়ে দেবে শুনি?'

'শোনো কথা!' সুবালা গালে হাত দেয়। 'এ কী চুরি-জোচ্চুরী খুন-জখমের আসামী?' লোকে যে তোমাদের এই 'স্বদেশী' জেল খাটা'দের পায়ে ফুল-চন্দন দেয় গো।'

অম্বিকা এবার যেন পুরনো ধরণে হেসে ওঠে। বলে; 'পায়ে ফুল-চন্দন দেয় বলেই যে হাতে মেয়ে দেবে, তার কোনো মানে নেই!'

'দেবে না?'

সুবালাই এবার অনুকম্পার হাসি হাসে. সুবালা যেন তার মূল্যবান দ্যাওরটির মূল্য সম্পর্কে আরো বেশি অবহিত হয়। বলে; 'আচ্ছা দেয় কি না দেয় সে আমি বুঝবো! ব্যাটাছেলে বিয়ে করতে চাইলে আবার মেয়ের ভাবনা?'

এবার অম্বিকা অমূল্য দুজনেই হেসে ওঠে। অমূল্য বলে, 'আহা এ আশ্বাস যদি কিছুদিন আগে পেতাম তো আর একবার 'চেয়ে' দেখতাম।

'এখনও দেখ না।' সুবালা হাসে তারপর গ্রামের কোন কোন ঘরে এমন কটা বুড়ো গিন্নী থাকতেও দিব্যি আর একটা বিয়ে করে মজায় আছে তার আলোচনা এসে পড়ে।

অম্বিকা নিথর হয়ে গিয়ে বলে, 'বল কি দাদা? দত্ত জ্যাঠামশাই?'

অমূল্য হাসে, 'সেই তো সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে অসহ্য। গিয়েছিলেন ভাগ্নীর ছেলের জন্যে কনে দেখতে—'

'দেখে আর চোখ ফেরাতে পারলেন না, নাতির হাতে তুলে দিতে বুক ফাটলো—' সুবালা হেসে হেসে বলে, 'সম্পর্কটা অবিশ্যি খারাপ হল না। নাতবৌ হতো, বৌ হলো। বারো আর বাষট্টি।'

অম্বিকা হাসে না, অম্বিকা হঠাৎ রূঢ় গলায় বলে ওঠে, 'লোকটাকে ধরে একদিন হাটতলায় দাঁড় করিয়ে চাবকাতে পারলে না কেউ?'

এরা চমকে উঠলো।

সুবালা আর অমূল্য।

অম্বিকার গলায় কখনো এমন রূঢ় স্বর শোনে নি ওরা আগে। তাছাড়া যতই হোক দত্ত জ্যাঠামশাই গুরুজন!

অম্বিকা সেটা বুঝতে পারলো।

অম্বিকা নিজেকে সামলে নিল, অপ্রতিভ গলায় বললো, 'জেলের ভাতের এই গুণ ধরেছে, রাগ চাপতে পারি না। অসভ্যতা দেখলেই মেজাজে আগুন জ্বলে ওঠে। বাস্তবিক এদের শাস্তি হওয়া উচিত কি না তোমরাই বল?'

'উচিত তো! কিন্তু শাস্তিটা দিচ্ছে কে?'

'আমি তুমি; এরা ওরা সবাই।' অম্বিকা দৃঢ় গলায় বলে; 'কিছুদিন স্রেফ ধোলাই চালালেই এ ধরণের পাজীরা শায়েস্তা হয়ে যাবে।'

সুবালা যেন অবাক হয়ে অম্বিকার মুখের দিকে তাকায়। বলে; 'ধোলাই মানে?'

অম্বিকা আর একবার অপ্রতিভ হয়। বলে, 'ওই তো। সঙ্গগুণের সুফল! যত সব চাষাড়ে কথার চাষের মধ্যে তো বাস ছিল। ধোলাই মানে ধরে ঠ্যাঙানো! দু-পাঁচজন মার-ধোর খাচ্ছে দেখলেই আর পাঁচজন সামলে যাবে।'

অমূল্য ক্ষুব্ধ হাসি হাসে, 'তোর ওই 'ধোলাই' তা হলে পাত্তরকে না দিয়ে পাত্রীর বাপকেই দেওয়া উচিত। তারা মেয়ে দেয় কেন?'

সুবালা বলে ওঠে, 'দেয়, ভাল ঘরে-বরে দিয়ে উঠতে পারে না বলে। নচেৎ টাকা-কড়ির লোভে, এই তো তোমাদের দত্ত জ্যাঠামশাইয়ের ব্যাপারই তাই। মেয়ের বয়েস বেশি হয়ে গেছে জাত যাবার ভয়ে কাতর বাপ হাতের সামনে একটা বড়লোক বুড়ো পেয়ে—'

'জাত! জাত যাবার ভয়! আশ্চর্য, এত অনাচারে জাত যাচ্ছে না, জাত যাবে শুধু মেয়েকে সাত-সকালে বিয়ে না দিলে!' ...অম্বিকা বলে; 'এ পাপের ফল একদিন পাবেই সমাজ!...তা' দত্তজ্যেঠিমা কোথায়?

'কোথায় আবার?' সুবালা বলে, 'ঘর-সংসার ছেড়ে যাবেন কোথায়? আছেন। প্রথম প্রথম খুব গাল-মন্দ করেছিলেন; সতীনটাকে ঝাঁটা মারতে যেতেন, ক্রমশ সয়ে গেছে। এখন তাকে রেঁধে ভাতও দিচ্ছেন। সেও মহা দুষ্টু মেয়ে; সংসারের কিছু করে না কেবল সাজে-গোজে আর কর্তার তামাক সাজে।'

'হুঁ। ওটাকেই আশ্রয় ভেবেছে। বুড়ো মরলে তখন? ছেলেরা কে কোথায়?'

'বড় তো রাগ করে বাপের সঙ্গে পৃথক অন্ন হয়ে গেছে। আর সবাই আছে।'

'তা যিনি পৃথক অন্ন হলেন, মাকে ভাইদের নিয়ে হতে পারলেন না?'

'কি যে বল, তার কি ক্ষমতা? বাপ তো তাকে তেজ্যপুত্তুর করেছেন। আসল কথা পয়সাওলা লোকেদের সব দরজা খোলা, বুঝলে ঠাকুরপো মরণ শুধু গরীবদের। পৃথিবী জুড়েই এই।'

অম্বিকা বলে, 'হয়তো এর শাস্তিও আসবে একদিন পৃথিবীতে। তবে আমার মতে কবে কি হবে না ভেবে এখনই একটা বৌ বেঁচে থাকতে আর একটা বিয়ে করা আইন করে বন্ধ করে দেওয়া উচিত।'

অমূল্য হাসে, 'আইনটা কে করবে শুনি?'

'করবো আমরা, তোমরা সবাই। চিরদিন ধরে ভয়ঙ্কর একটা পাপ চলতে পারে না।'

সুবালার এসব কথায় অস্বস্তি।

সুবালা এবার প্রসঙ্গকে অন্য পথে পরিচালিত করে। সুবালা তার ছেলের বৌদের আর জামাইদের কথা তোলে, তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়, বলে, 'আমার ভাগ্যে বাবা সবই খুব ভালো জুটেছে—'

অম্বিকা হেসে ফেলে।

অম্বিকা বলে, 'আপনার ভাগ্যে 'মন্দ' হবার জো কি? আপনি কি কাউকে ভালো ছাড়া মন্দ দেখবেন?'

সুবালা লজ্জিত গলায় বলে, 'আহা!' বলে, 'নাও বাপু বল এখন কি খাবে? কতকাল বাড়ির রান্না খাও নি—'

বলে, তবে মনে ভাবে, 'কিই বা জোটাতে পারবো! আহা বেচারা এতদিন পরে এল! সজনে ডাঁটাটা ভালবাসে, মৌরলা মাছটাও খুব ভালবাসতো। আর অড়র ডাল। দেখি যাই—'

সুবালা চলে যায় রান্নার জোগাড়ে এরা দুই ভাই কথা বলে, গ্রামের কথা, পড়শীর কথা।

আর এর মাঝখানেই হঠাৎ এক সময় প্রশ্ন করে ওঠে অম্বিকা, 'তোমার শ্বশুরবাড়ির খবর কি?'

'আমার শ্বশুরবাড়ির!'

'হ্যাঁ তোমার সেই ইয়ে মেজবৌদি, তাঁর ছেলে-মেয়েরা—আর শ্রীযুক্তবাবু মেজদা?'

একটু ভয়ে-ভয়েই বলে।

মনকে প্রস্তুত করে দু-একটা দুঃসংবাদ শোনবার জন্যে।

কিন্তু আশ্চর্য, শুনতে হলো না তা।

বরং ভালো ভালো খবর।

মেজদার আরো আয় উন্নতি হয়েছে, ছেলেরা ভাল ভাল পাস করেছে, নতুন বাড়ি করেছে নিজস্ব, দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। মোটের মাথায় হতাশার খবর নয়।

অথচ আশ্চর্য, অম্বিকা যেন খুব একটা হতাশ হয়।

অম্বিকা যেন এসব খবর শোনবার জন্যে প্রস্তুত ছিল না।

কিন্তু কী শোনবার আশাতেই বা ছিল তবে সে? অমূল্যর শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে খুব একটা দুঃসংবাদ? কে জানে কি! তার মনের কথা সেই জানে। তবু— মনে হলো, অম্বিকা যেন ওই খুশির খবর-গুলোয় খুশি হল না।

তবু অম্বিকা সুবর্ণর নতুন বাড়ির ঠিকানা জানতে চাইল। বলল, যাবো তো

কাল-পরশু কলকাতায়। একবার দেখা করে এলে ত হয়। অবশ্য চিনতে পারবেন কি না জানি না।'

'শোনো কথা।' সুবালা হাসে,—'তোমায় পারবে না চিনতে? পছন্দ হয়েছিল তার। আমি তো ভাবছিলাম—'

হেসে চুপ করে যায় সুবালা।

'কী ভাবছিলেন?'

সুবালা মিটিমিটি হেসে বলে, 'ভাবছিলাম তোমাকে তারই জামাই করে দিই! মেয়েটা তো বেশ বড় হয়ে উঠেছে—'

'আমাকে—জামাই—'

অম্বিকা এবার নিজস্ব ভঙ্গীতে হেসে ওঠে সেই আগের মত। 'চমৎকার! এটা ঠিক আপনার উপযুক্ত কথা হয়েছে! বাঃ! বাঃ! বাঃ! তাহলে বৃথা আশ্বাস দিচ্ছিলেন না, কনে রেডি? কি যেন হলাম আমি মেয়েটির? মামা?'

'আহা মামা আবার কি?' সুবালা তেজে বলে, 'কিছুই নয়। জানো না, আমার শালা পিসের ভাই, তার সঙ্গে সম্পর্ক নাই!' তুমি হচ্ছো পিসের ভাই—'

'ব্যস! ব্যস! শাস্ত্রবচনও মজুৎ।' অম্বিকা বলে, 'কিন্তু এত সব ছেলে-মেয়ের বিয়ে হল, তাঁর মেয়েরই বা হয় নি কেন?'

সুবালা সন্দেহের গলায় বলে, 'তার কোন মেয়েটার কথা বলছো তুমি?'

'আহা সেই তো সেই যে তোমার এখানে আসে নি। নবদ্বীপে না কোথায় যেন গিয়েছিল।'

আশ্চর্য যে এটা ভুলে যায় নি অম্বিকা।

অথচ অম্বিকা তার দাদার ছেলে-মেয়েদের নাম ভুলে যাচ্ছিল।

কিন্তু সে কথা তুলে হাসে না সুবালা। হাসে অম্বিকার অজ্ঞানতায়।

'সেই মেয়ে? সেই মেয়ে এখনো বসে আছে, এই ভাবছো তুমি? হায় হায়! চাঁপা? তার কবে বিয়ে হয়ে গেছে, মেজ মেয়ে চন্ননেরও হয়েছে। এ হচ্ছে সেই পারুল! সব সময় যে ছোট্ট চুপচাপ থাকতো—'

'পারুল! মানে সেই যে, দোলাই গায়ে জড়িয়ে মাঠে বাগানে ঘুরে বেড়াতো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। এই তো মনে পড়েছে বাপু! সেই মেয়েটাই তো সব চেয়ে ফর্সা মেজবৌয়ের—'

অম্বিকা আবার বলে, 'চমৎকার! দত্ত জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে একটু ইতর বিশেষ এই যা!'

'শোনো কথা, তার সঙ্গে কিসের তুলনা? আমি বাপু ওর কথাই ভাবছিলাম—'

'আপনার ভাবনার দাঁড়িটা একটু খাটো করুন বৌদি, বড্ড লম্বা হয়ে যাচ্ছে!'

অম্বিকা আবার হাসতে থাকে হা হা করে।

সুবালা একসময় অমূল্যকে চুপিচুপি বলে, 'ঠাকুরপো কিন্তু ঠিক তেমনটিই আছে, একটুও বদলায় নি।'

অমূল্য আস্তে বলে, 'কে বললে, বদলায় নি? বদলেছে বৈকি। অনেক বদলেছে।'

তা' বদলাবে এ আর বিচিত্র কি?

পৃথিবীর খেলাই তো তাই।

না যদি বদলাতো অম্বিকা, সেটাই হতো অস্বাভাবিক।

বদলায় না শুধু অল্পবুদ্ধিরা।

বুদ্ধির চাকার অভাবে, ওরা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। সুবালা তাদের দলের, তাই সুবালা সুখী। সুবালার সুখ কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। সুবালা যদি দুঃসহ কোনো শোক পায় সুবালা কেঁদে বলবে, 'ভগবান নিয়েছেন—'

অতএব সুবালা সুখী হবে।

যারা কার্য-কারণের বিচার নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে বসে, যারা জগতের যত অনাচার অবিচার অত্যাচার, সব কিছুর বিরুদ্ধে তীব্র প্রশ্ন তুলতে বসে, তারাই জানে না সুখের সন্ধান।

কিন্তু সন্ধান কি তারা রাখতেই চায়? সুখকে কি তারা আরাধনা করে?

সুখেতে যে তাদের ঘৃণা!

নইলে সুবর্ণলতা—

হ্যাঁ নইলে সুবর্ণলতার তো উচিত ছিল তার স্বামীর অবিবেচনা আর পত্নী-প্রেমের পরিচয়ে আহ্লাদে ডগমগ হওয়া।

স্ত্রীকে আকস্মিক আনন্দ দেবার রোমাঞ্চময় পরিকল্পনায় সে যে তার স্ত্রীর বাপের চতুর্থী উপলক্ষে মস্ত একটা যজ্ঞির আয়োজন করে ফেলেছে চুপিচুপি—নিঃশব্দে, এটা কি কম কথা নাকি? কম সুখের কথা।

কিন্তু সুবর্ণলতা হচ্ছে বিধাতার সেই অদ্ভুত সৃষ্টি, সুখে যার বিতৃষ্ণা, সুখে যার ঘৃণা।

তাই কর্মবীর জগু যখন অকস্মাৎ গোটা দুন্তিন মুটের মাথায় রাশীকৃত বাজার ফলমূল কলাপাতার বোঝা, মাটির খুরি গ্লাস ইত্যাদি নিয়ে তার পিসতুতো ছোট ভাইয়ের বাড়িতে এসে ঢুকে হাঁক পাড়লো, 'কই রে কে কোথায় আছিস? এ সব কোথায় নামাবে দেখিয়ে দে—'

তখন সুবর্ণলতা পাথরের মত মুখে এসে দাঁড়িয়ে একটা ধাতব গলায় বলে ওঠে, 'এ সব কি? এর মানে?'

দোভাষীর প্রয়োজন হয় না।

গলা স্পষ্ট পরিষ্কার।

আর জগুও অত নীতি নিয়মের ধার ধারে না। তাই বলে ওঠে, 'এই মরেছে! এযে সেই—যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই!' বলি তোমার বাপের ছেরাদ্দ, আর তুমি আকাশ থেকে পড়ছো? চতুর্থীর জোগাড়, দ্বাদশ ব্রাহ্মণের ভোজের রসদ, আর তোমার গিয়ে আত্মকুটুম্বও কোন না ষাট-সত্তরজন হবে, একা আমার পিসির ডালপালাই তো—' জগু একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলে, 'তাদের একটু ভালোমন্দ খ্যাঁটের জোগাড়—' হঠাৎ থেমে যায় জগু।

ভাদ্রবৌয়ের মুখের দিকে তাকানো অশাস্ত্রীয়-এটা জানা থাকলেও বোধ করি হঠাৎই তাকিয়ে ফেলেছিল সে। অথবা ভয়ঙ্কর একটা নীরবতা অনুভব করে তাকিয়ে ছিল কে জানে। তবে থেমে যাবার হেতুটা তাই। ওই মুখ।

মুখ দেখে ভয়ে প্রাণ উড়ে যায় ওই বাজখাঁই লোকটার। তাড়াতাড়ি ডাক দেয়, 'পারু, পারু, দেখতো তোর মার শরীর-টরীর খারাপ হল নাকি!'

মুটেগুলি এতক্ষণ অপেক্ষান্তে রাগ-ভরে নিজেরাই স্থান নির্বাচন করে জিনিস-গুলো নামাতে সুরু করে, এবং সারাও করে আনে। ইতিমধ্যে পারু এসে দাঁড়ায়,

গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৩, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট
কলিকাতা-১
ফোন: ২২-৬৫৮০

সমস্ত দৃশ্যটার ওপর একবার দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিয়ে সেও অবাক গলায় বলে, 'এসব কি বড় জ্যাঠা?'

এবার বিস্ময় প্রশ্নের পালা জগুর।

'তোদের কথার আর আমি কি উত্তর দেব রে পারু, আমিই যে তাজ্জব বনে যাচ্ছি। বলি তোদের বাবা কি আমার সঙ্গে ন্যাকরা করে এল? তোদের বাড়িতে কোনো কাজকর্ম নেই? দাদা-মশাই দিদিমা মরে নি তোদের? সব ভুল?'

পারু আস্তে বলে, 'ভুল নয়। তবে তার জন্যে এসব—' গলাটা একটু নামায়, আস্তে বলে, 'জানি একটা মরণকে উপলক্ষ করে মানুষ এমন ঘটা লাগায়, কিন্তু জানেনই তো মাকে? মা এ সব একেবারেই ইয়ে করেন না। তা' ছাড়া—'

পারুর কথা থেমে যায়।

সহসা পারুর মায়ের কণ্ঠ কথা কয়ে ওঠে, 'পারু ভাসুরঠাকুরকে বল যেন আমার অপরাধ না নেন। লোকে যা করে আমার তার সঙ্গে মেলে না। আমি আমার জ্যান্ত মা বাপকে কখনো এক ঘটি জল এগিয়ে দিই নি, আজ মরার পর আর তাঁদের ওপর খাঁড়ার ঘা দিয়ে অপমান করতে পারব না। আমি—'

সহসা একটা অভাবিত ব্যাপার ঘটে।

অন্তত পারুর তাই মনে হয়।

মায়ের চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল ঝরে পড়তে কবে দেখেছে পারু? সে চোখে তো শুধু আগুনই দেখে এসেছে জ্ঞানাবধি।

কিন্তু বেশিক্ষণ সে দৃশ্য দেখবার সুযোগ দেয় না পারুর মা, দ্রুতপায়ে চলে যায়। চলে যায় শুধু পারুকেই নয়, আরও একটা মানুষকে পাথর করে দিয়ে।

পাগল ছাগল জগু আরও একবার শাস্ত্রীয়বিধি বিস্মৃত হয়ে ভাদ্রবৌয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ফেলেছিল, এবং বলা বাহুল্য সে মুখে অবগুণ্ঠনের খুব একটা বাড়াবাড়ি ছিল না। কাজেই দেখায় অসম্পূর্ণতা ছিল না।

পাগল ছাগল বলেই কি হঠাৎ এত শক্ খেল জগু? নাকি এ রকম একখানা ভয়ংকর দুঃখ হতাশা গ্লানি ক্ষোভ বেদনা বিদ্রোহের সম্মিলিত ছবি সে জীবনে আর দেখে নি বলেই?

স্তব্ধ হয়ে দু'এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকেই দ্রুতকণ্ঠে, 'আমি এসব কিছু জানি না পারু, আমি এতসব কিছু জানি না। আমায় তোর বাবা গুচ্ছির টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে বলে এল 'তোমার বৌমার খুব ইচ্ছে', তাই আমি—' বলেই কোঁচার খুঁটে চোখ চেপে একরকম ছুটে বেরিয়ে যায়। বাড়ির সদর চৌকাঠ পার হয়ে। কে বলবে, তার দু'চোখেও সহসা জলের ধারা ঠেলে আসে কেন?

মুটে কটা এতক্ষণে ঝাঁকা খালি করে ক্লান্তি অপনোদন করছিল, 'খাবু' ভাগলবা দেখে তারাও ছুট দেয়, পারু তেমনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পারু সহসা যেন আর এক জগতের দরজায় এসে দাঁড়ায়।

জ্ঞানাবধি শুধু মা'র তীব্রতা আর রুক্ষতাই দেখে এসেছে পারু, মা'র জীবনের প্রচ্ছন্ন বেদনার দিকটা দেখে নি। আজ হঠাৎ মনে হল তার, মাকে তারা শুধু অবিচারই করে এসেছে।

কোনোদিনই সেই 'অকারণ' তীব্রতার কারণ অন্বেষণ করবার কথা ভাবে নি।

একথা ঠিক বাবাকেও তারা ভাই-বোনেরা কেউই একতিলও শ্রদ্ধা করে না, তবু কদাচ কখনো একটু করুণা করে, অনুকম্পা করে, কিন্তু মাকে?

মা'র জন্যে কিসের নৈবেদ্য রাখা আছে তাদের অন্তরে?

ভাবলো সেকথা পারু।

কারণ সহসা পারু তার মা'র একটা নির্জন ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো! যে ঘরের সন্ধান সে কখনো জানতো না, যে ঘরের দরজা কখনো খোলা দেখে নি!... অসতর্ক একটা বাতাসে একটিবার খুলে খুলে পড়েছে সে দরজা, তাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে পারুল।

এই জনহীন শূন্য ঘরটা ছিল চিরকাল?

অথচ ওরা—

'ন'দি', বকুল এসে দাঁড়ালো, বললো, 'দাদা বললো, তোকে যে কামিজটা বোতাম বসিয়ে রাখতে বলেছিল, সেটা কোথায়?'

পারুল চোখে অন্ধকার দেখলো।

পারুলের গলা শুকিয়ে এল।

আস্তে বললো, 'বোতাম বসানো হয় নি, ভুলে গেছি।'

'ভুলে গেছিস? সর্বনাশ! কোথায় সেটা?'

'মা'র ঘরে ট্রাঙ্কের ওপর।'

'সেরেছে, দাদা তো সেখানেই বসে।'

বকুলেরও যেন হাত পা ছেড়ে যায়।

হ্যাঁ এমনি ভয়ই করে তারা দাদাদের।

অথবা ভয় করে আত্মসম্মান হানির। জানে যে এতটুকু ত্রুটি পেলেই খিঁচিয়ে উঠবে তারা, ঘৃণা ধিক্কার আর শ্লেষ দিয়ে বলবে, 'এটুকুও পার নি? সারাদিন কি রাজকার্য কর? নভেল পড়া, আর বাবার অন্নজল ধ্বংসানো ছাড়া আর কোনো মহৎকর্ম তো করতে দেখি না।'

যেন অন্য অনেক 'মহৎকর্মে'র দরজা চিনিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের। যেন দাদাদের জামায় বোতাম বসানো কি ঘর গোছানো, তাদের জুতো ঝেড়ে রাখা কি ফতুয়া গেঞ্জি সাবান কেচে রাখাই ভারী একটা মহৎকর্ম।

ওরা কি ওদের মহৎ পুরুষ জীবনের শুল্ক আদায় করে নেবার পদ্ধতিটা রপ্ত করে রাখছে এই মেয়ে দুটোর ওপর দিয়ে?

একথা ভাবে পারুল।

তবু প্রতিবাদ করবার কথা ওঠে না।

প্রতিবাদের সুর শুনলে খিঁচুনি বাড়বে বৈ তো দমবে না।

কিন্তু আজ পারুল কঠিন হল।

বললো, 'অত ভয় পাবার কি আছে? বল গে যা হয় নি, ভুলে গেছি।'

'ওবাবা আমি পারবো না।'

'ঠিক আছে আমি যাচ্ছি—'

যাচ্ছিল যাওয়া হল না, প্রবোধ এসে ঢুকলো বাইরে থেকে এক বোতল ক্যাওড়ার জল হাতে করে।

প্রবোধের মুখ রাগে থমথমে।

এসেই কড়া গলায় বলে ওঠে, 'জগুদাকে কে কি বলেছে?'

বলেছে।

বলবে আবার কে কি!

পারুল বকুল দুজনেই অবাক হয়ে তাকায়। প্রবোধ আরো চড়া গলায় বলে, 'নিশ্চয়ই কিছু বলা হয়েছে। নইলে বুড়ো মন্দ একটা লোক চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে যেত না। আমাকে বলে গেল, 'আমার দ্বারা কিছু হবে না, আমি তোর বামুন ভোজন যজ্ঞিশালায় নেই—'...শুধু শুধু এমন কথাটা বলবে অমন পরোপকারী মানুষটা? বলেছে, তোমরাই কেউ কিছু বলেছ। মায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছ তো সবাই, গুরুলঘু জ্ঞান করতে জানো না, গুরুজনদের মান অপমানের ধার ধার না, উদ্ধত অবিনয়ী এক একটি রত্ন তৈরি হয়েছ তো।'

বকুল এর বিন্দুবিসর্গও জানে না, তাই বকুল হাঁ করে চেয়ে থাকে। তবে পারুলও উত্তর দেয় না কিছু। কারণ পারুল জানে এসব কথার লক্ষ্যস্থল পারুল বকুল নয়, তাদের দাদারা।

এই স্বভাব বাবার, মুখোমুখি কিছু বলবার সাহস হয় না ছেলেদের, তাই এমন শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ!

ওরাও তাই শিখেছে।

'জবাব' দেয় না, ঠেস দিয়ে কথা বলে দেওয়ালকে শুনিয়ে।

ছেলে বলেই অবশ্য এতটা সাহস তাদের। মাকে (বোধ করি তুচ্ছ মেয়ে-মানুষ জাতটার একটা অংশ হিসেবে) তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কটু-কাটব্য করে, আর বাপকে অবজ্ঞা করে।

কিন্তু ওদেরই বা দোষ কি?

খুনীর ভূমিকা : উনিশ শো ছেষট্টি

নারায়ণ পাত্র

ভেতরে অর্গলবন্ধ। দরজায় সশব্দ করাঘাত;
আশ্বিনের বিষণ্ণ সকালে কোনো সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের
ভূমিকায় আততায়ী নিরুত্তাপ-বিকেন্দ্রিক মনে
বিকল্প ঈশ্বর-লক্ষ্যে ক্ষমাপ্রার্থী ঊর্ধ্ববাহু মেলে।

রাজপথ জনশূন্য। ফুলের বাগানে কিন্তু—
ঘাতকের ভিড়। নিষ্পাপ নিরীহ গোলাপেরা
চাপচাপ রক্ত মেখে অনিবার্য নৃশংস-আঘাতে—
ধূলি-ধূসরিত দেহে অভিশাপে শতধা-বিদীর্ণ!

জীবন-যাত্রায় তবু ছেদ নেই। নেই ব্যতিক্রম;
যেমন চলছে গাড়ি স্বনিয়মে কলের চাকায়
ঠিকই চলছে সব আকর্ষণ-বিকর্ষণে, টানা-দোটানায়!
তবুও রয়েছে কোথা ফাঁক, থেকে গেছে বহু জমা পাপ!

এবং আশ্চর্য এই পাপের-নাটকে কোনো খুনীর ভূমিকা,
ভয়ের বদলে কিন্ত হাসির খোরাকই আনে আজকের দিনে!

রূপ রঙ তুলি

রবিয়ুল হোসেন খান

কী সুন্দর ফিটফাট আকাশ!
কী আনন্দেই না দোলে
কাঁচা বাঁশবনের মধ্যে রেখাঙ্কিত বাতাস
কী অপূর্ব কাঁচা বাতাবি লেবুর মত ভোরের
পৃথিবী......।

তুমি কবি—তুমি ছবি আঁক
ছবি আঁক আর মুহূর্তকে ধরো
দৃষ্টির প্রেরণা দিয়ে......।

বল তো কে বড় : জড় জগৎ? না জীবন?

তিনের বিভিন্নতা দিয়ে সৃষ্টির
গভীরে তুমি মিলে-মিশে একাকার......
কিন্তু, তিনের মিলনে জীবনকে 'এক-রঙা ফুল'
রঙাতে পারো...?

বল তো—কে বড় : রূপ! রঙ!! তুলি!!!

ওরা ওদের মা বাপের মধ্যে শ্রদ্ধাযোগ্য কি দেখতে পাচ্ছে?

হয়তো শুধু 'মা বাপ' এই হিসেবেই করতো ভয় ভক্তি, যদি ওদের দৃষ্টিটা আচ্ছন্ন থাকতো অন্য অনেকের মত। কিন্তু তা' হয় নি, সুবর্ণলতা অন্য পাঁচজনের থেকে পৃথক করে মানুষ করতে চেয়েছিল তার সন্তানদের। তাদের 'খোলা চোখে' দেখতে শেখাবার চেষ্টা করেছিল, ওরা সে চেষ্টা সফল করেছে। ওরা শুধু 'মা বাপ' বলেই ভক্তি শ্রদ্ধা করবে এমন নির্বোধের ভূমিকা অভিনয়ে রাজী নয়।

না করুক, সমতলেও নেমে আসুক?

প্রবোধ অন্তত তা' চায়।

প্রবোধ 'ইচ্ছে' করে ছেলে-মেয়েরা তার মুখে মুখে চোটপাট জবাব করুক, সেও তার সমুচিত জবাব দেবার সুযোগ পাক। কিন্তু তা' হয় না। ছেলেরা তো দূরের কথা মেয়েরা পর্যন্ত যেন কেমন অবজ্ঞার চোখে তাকায়।

সে দৃষ্টিতে আগুন জ্বলে উঠবে না মাথার মধ্যে?

তাই এখনও আগুন জ্বালা কণ্ঠে চীৎকার করে প্রবোধ, 'কেউ কিছু বলে নি বললেই মানবো আমি? ওই অবোধ-অজ্ঞান মানুষটা কখনো মান অভিমানের ধার ধারে না, সে হঠাৎ এতটা অভিমান করে—'

বাপের কণ্ঠ-মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে ভানু কানু মানু তিন ভাই-ই এসে দাঁড়ালো, থমকে বলে উঠলো, 'কি ব্যাপার। বাড়িতে ভোজটোজ নাকি? পারুর বিয়ে বুঝি?'

পারুর বিয়ে।

হতবাক প্রবোধ বলে, 'পারুর বিয়ে? তোমরা জানবে না সেটা?'

'বাঃ এই তো জানছি।'

বললো ভানু।

তার সেজকাকার ভঙ্গীতে।

প্রবোধ অসহায়ের মত এদিক ওদিক তাকালো। বললো, 'এইভাবে জানবে? বাঃ। যেন আর কোনো ঘটনা ঘটে নি সংসারে? তোমাদের মা'র চতুর্থীর বামুন ভোজন—'

'তাই নাকি? ওঃ!'

ভানু ভুরু কোঁচকায়।

ভানুর সেই ভুরুতে ব্যঙ্গের হাসি ছায়া ফেলে।

প্রবোধ হঠাৎ সেইদিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'তা এতে হাসবার কি হল? হাসবার কি হল? যে মানুষটা তোমাদের সংসারে প্রাণপাত করছে, তার একটা পাওনা নেই সংসারের কাছ থেকে?'

কি উত্তর ভানু দিত কে জানে।

সহসা কোন ঘর থেকে যেন বেরিয়ে এল তার মা। খুব শান্ত আর স্থির গলায় বললো, 'তোমাদের এই সংসার থেকে আমার যা প্রাপ্য পাওনা, সেটা তাহলে শোধ হচ্ছে? অনেক ধন্যবাদ যে শোধের কথাটা তবু মনে পড়েছে তোমার। কিন্তু ওতে আমার রুচি নেই, সেই কথাটাই জানিয়ে দিতে এলাম তোমায়। এসব আয়োজন করার দরকার নেই, করা হবে না।'

করা হবে না।

প্রবোধ যন্ত্রচালিতের মত বল্লে, 'আজ হবে না?'

'না। আজ না, কোনদিনও না।'

এরপরও যদি রেগে না ওঠে প্রবোধ, কিসে আর তবে রেগে উঠবে।

অতএব রেগেই বলে, 'হবে না বললেই হলো? রাজ্যিসুদ্ধ লোকজনকে নেমন্তন্ন করে এলাম—'

'নেমন্তন্ন করে এলে?' সুবর্ণলতা স্তব্ধ হয়ে তাকায়। কিন্তু প্রবোধ ভয় পায় না, প্রবোধ এমন স্তব্ধতা অনেক দেখেছে। তাই প্রবোধ বলে, 'এলাম তো। বিরাজ বলেছে সে সক্কলের আগে চলে আসবে—আর ওবাড়ির সবাই একটু দেরি করবে কারণ—'

'থাক কারণ শুনতে চাই না। লোকজন আসে ভালই, তোমরা থাকবে। আমি দু'দিন অন্য কোথাও গিয়ে থাকবো!'

'তুমি অন্য কোথাও গিয়ে থাকবে?'

প্রবোধ আর পারে না, খিঁচিয়ে উঠে বলে, 'বাপের ছেরাদ্দটা তাহলে আমিই করবো?'

হঠাৎ সুবর্ণ ঘুরে দাঁড়ায়। কাতর গলায় বলে, 'আমায় এবার তুমি ছুটি দাও। আর—মন্দ কথা বলিও না আমায়। আর পারছি না আমি।'

চলে যাচ্ছিল দ্রুতপায়ে, ঠিক এই মহামুহূর্তে ঝি এসে খবর দেয়, 'বাবুর বোনের দেশ থেকে অম্বিকেবাবু না কে একজন এসেছে, খবর দিতে বললো।'

(ক্রমশঃ)

এইচ. জি. ওয়েলস-এর গল্প

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

অষ্টম অধ্যায়ঃ প্রেম ও জীবন

বলেছি আগেই, কথার মালা গেঁথে হাসির হাট গড়েছেন ওয়েলস্। সে হাটে গিয়ে সবাই সুখী হয়েছি আমরা। কিন্তু তবু বলবো, সুখ-সৃষ্টির হাল্কা আয়োজনটাই জীবনের সব নয়। দুঃখের 'সিরিয়াস' ভূমিকাও সেখানে বিরাট। সুখ-দুঃখ মেঘ ও রৌদ্রের মতো, আলো ও আঁধারের মতো জগৎ-সংসারের নিত্য-সঙ্গী। তাই সংসারের সত্য-চিত্র সেখানেই খুঁজে পাবো হাসির সঙ্গে কান্না আছে যেখানে; বেখানে বাঁধা আছে আনন্দ ও বিষাদের গাঁটছড়া। আবার সংসার-নদীতে জোয়ার-ভাঁটার খেলায় প্রেমের ভূমিকা গভীর ও ব্যাপক। তাই জীবন ও সংসারের কথা বলতে গেলে প্রেমের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। প্রেম নিয়ে অতি সুন্দর সব গল্প লিখেছেন ওয়েলস্। এদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 'দি কোন'। বিশ্বাসঘাতকতাকে কেন্দ্র করে জীবনের গরল নির্মমভাবে নিঃসৃত হয়েছে এখানে। প্রেমের ক্ষেত্রে বঞ্চনার হাহাকার চরম প্রতিশোধের মধ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করেছে। প্রতিশোধ নিয়েছে বন্ধু হোরোক্স্। এক বন্ধুর দ্বারাই বঞ্চিত হয়েছিল সে। অভিন্নহৃদয় মিঃ রাউট তাকে ছলনা করেছিল। তারই স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ-প্রেমের সম্বন্ধ পাতিয়েছিল।

হোরোক্স্ সেই পরস্ত্রীলোলুপ বিশ্বাসঘাতককে ক্ষমা করে নি; চরম দণ্ড দিয়েছিল; কেমন করে দিয়েছিল, এই গল্পে তা' অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের সঙ্গে বর্ণিত। গল্পটি শেষ হয়েছে এক মর্মস্পর্শী নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে। অবশ্য নাটকীয় একটা কিছু যে ঘটবে, এ সম্বন্ধে পাঠক অনেক আগে থাকতেই সচেতন হয়। দম-বন্ধ হয়ে-আসা এক অস্বস্তিকর পরিবেশ গল্পটির গোড়া থেকেই সবাইকে ভাবিয়ে তোলে। গ্রীষ্মের গুমোট সন্ধ্যা, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, স্তব্ধ-হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা গাছপালা এবং সর্বোপরি নিভৃত এক বাড়িতে জানালার কাছে বসে দুটি নর-নারীর ফিস ফিস করে কথোপকথন—এই সব কিছু মিলে গল্পের আবহাওয়া সুরু থেকেই থমথমে ও গম্ভীর। সুরু থেকেই কেমন যেন সন্দিগ্ধ ও কৌতূহলী হয়ে উঠি আমরা। লক্ষ্য করি, প্রায়ান্ধকার ঘরে বসে একটি পুরুষ ও একটি নারী। হাওয়া পাবার আশায় জানালার কাছে এগিয়ে এসেছে ওরা। ওদের ঠিক সামনেই গাঢ় আঁধারে ঢাকা বাগান। খানিকটা দূরে রাস্তা। গ্যাসের একটি আলো জ্বলছে সেখানে। আরও খানিকটা দূরে রেলওয়ে সিগ্ন্যালের তিনটি আলো চোখে পড়ছে। মনে হচ্ছে, চারিদিকের সব কিছুই রহস্যময় ও বিষণ্ণ।

কথা বলতে গিয়ে পুরুষটি আঁৎকে উঠছে এক-একবার। নারীটিকে শুধোচ্ছে, হোরোক্স্ ওদের সন্দেহ করে না তো?

স্বামী হোরোক্স্ সম্বন্ধে আদৌ শ্রদ্ধা নেই ওই নারীর। সে এসব প্রশ্নকে মোটে আমলই দিতে চায় না। বিরক্ত হয়ে বলে, 'না না। সে কাজকর্ম আর জ্বালানীর দরদাম ছাড়া অন্য কিছু ভাবে না। কল্পনাশক্তি নেই তার। এতটুকু রসকষ নেই।'

এদিকে রস যে এ দুটি নরনারীর মধ্যে বেশ গাঢ় হয়ে উঠেছে, তা স্পষ্টই অনুভব করি।

দেখতে পাই, নিষিদ্ধ প্রেমের জোয়ারে ওরা ভেসে চলেছে। আবেগে-উল্লাসে হৃদয় ওদের ভরোভরো। বাইরের জগৎ সম্বন্ধে দুজনেই বেহুঁস। তাই কখন যে হোরোক্স্ এসে ঘরের দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে, তা' ওদের কেউই জানতে পারে নি।

গল্পটির এই অংশে বাঁধভাঙা প্রেমের এক জীবন্ত চিত্র এঁকেছেন ওয়েলস্। দেখিয়েছেন, স্বার্থান্বেষী প্রেমের অভিঘাতে মানুষের মনের দরজা যখন বন্ধ হয়ে যায়, ঘরের দরজা খোলার শব্দ তখন কানে আসে না। নিজেকে নিয়েই মানুষ যখন মেতে ওঠে, বাইরের কোনো মাতামাতি তখন সেই আত্মকেন্দ্রিকের মোহমুক্তি ঘটাতে পারে না। রাউট এবং রাউটের প্রেয়সীও নিজ নিজ প্রেমের জগতে নির্বাসিত। তাই হোরোক্স্-এর পদ-ধ্বনি ওদের কানে আসে নি।

হোরোক্স্ কিন্তু নিষিদ্ধ প্রেমনাট্যের আস্ত একটা অঙ্ক দেখেছে। রঙ্গমঞ্চের সামনে বসে থাকা নীরব দর্শকের মতোই পাত্র-পাত্রীর কথাবার্তা স্পষ্ট শুনেছে। তবে শেষ অবধি সে নীরব থাকতে পারে নি। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেছে রঙ্গ-মঞ্চের অভিমুখে। গাম্ভীর্যে ও মহিমায় আমাদের মতো অন্য সব দর্শকদের স্তম্ভিত করে দিয়ে অদ্ভুত দৃঢ়তা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু ততক্ষণে অভিনয় এগিয়ে গেছে অনেক-দূর। অবাঞ্ছিতের আবির্ভাবে পাত্র-পাত্রীরা তাই বিস্মিত হয়েছে। অপরিসীম আতঙ্কে কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে রাউটের প্রতিটি মাংসপেশী। ভেবে পায় নি সে, আগন্তুক কেমন করে এল? দরজা খুলল কখন?

অথচ আমরা পাঠকরা সবাই জানি, সত্যি এসেছে আগন্তুক। হঠাৎ ক্লিক করে শব্দ হয়েছে একটা; এবং তারপর দরজাটা বন্ধ হয়ে গেছে। পরমুহূর্তেই ঘরের অন্ধকার কোণে এসে দাঁড়িয়েছে হোরোক্স্। ছায়ামূর্তির মতো মনে হয়েছে তাকে। প্রথমটায় সে নির্বাক ছিল। স্তব্ধ ছিল স্থাণুর মতো। তারপরেই মূর্তিমান ধ্বংস ও মৃত্যুর রূপ ধরে গলিত লাভাস্রোতের মতো এগিয়ে গেছে সে। তার সেই উত্তাপের কিছুটা পাত্র-পাত্রীদের গায়ে লেগেছে ঠিক; কিন্তু সরাসরি ওদের স্পর্শ করে নি বলে ওরা নিজেদের সামলে নেবার চেষ্টা করেছে।

এদিকে হোরোক্স্-এর উচ্চারিত প্রতিটি শব্দের মধ্য দিয়ে ঠিকরে বেরিয়েছে জ্বলন্ত ঘৃণা ও বিদ্বেষ। বেশি কথা বলে নি সে; কিন্তু যা' কিছু বলেছে, তার আলোকে রাউটকে মনে হয়েছে যূপ-কাষ্ঠের সামনে দাঁড়ান অসহায় পশুর মতো। হোরোক্স্-এর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দ্বিধা ও সংশয়ে বার বার কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠেছে তার। অপ্রতিরোধ্য এক আতঙ্ক এসে তার টুঁটি টিপে ধরেছে।

মিসেস হোরোক্স্-এর হাবভাবে অতটা দ্বিধা জড়ান ছিল না। কেন না স্বামীকে নির্বোধ ভাবত সে। মিঃ হোরোক্স্-এর প্রশ্রয়কে মনে করত

দুর্বলতা। এই দিক থেকে বিচার করলে দেখি, তার আচার-আচরণের যে চিত্র ওয়েল্‌স এঁকেছেন, তা' মনোবিজ্ঞানসম্মত। অপরদিকে রাউটের আচরণেও অসঙ্গতি খুঁজে পাই নে আমরা। আমাদের মনে হয়, আপন অন্যায় সম্বন্ধে সচেতন বিশ্বাসঘাতক কোনো ব্যক্তির পক্ষে তার বন্ধুর সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়ান যথার্থই কঠিন। আর বন্ধুর পক্ষে এর চেয়েও কঠিন সেই ব্যক্তিটিকে ক্ষমা করা।

ক্ষমা করতে হোরোক্‌স্‌ও পারে নি। অপরাধীকে ধীরে ধীরে বধ্যভূমির দিকে নিয়ে গেছে সে। তার সেই মর্মান্তিক বিচার আইনের ছক-বাঁধা পথ ধরে হয়তো চলে নি, কিন্তু প্রতারিত হৃদয়ের যে ক্ষোভ ও আক্রোশকে প্রকাশ করেছে, তার পরিণতি ভয়ঙ্কর হলেও অস্বাভাবিক কিছু নয়।

ভয়ঙ্কর সেই দণ্ডাদেশের কথা বলা যাক এবার। গল্পটি যে অবধি বলেছিলাম, ঠিক তার পর থেকে সুরু করা যাক।

অপরাধী হাতে হাতে ধরা পড়েছে। স্ত্রী ও বন্ধুর প্রণয়-নিবেদনের মাঝখানে ধূমকেতুর মতো এসে দাঁড়িয়েছে হোরোক্‌স্‌। হঠাৎ চেয়ারে বসে পড়ে সে। শান্ত ও স্তব্ধ হয়েই বসে। কিন্তু অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও তার বলিষ্ঠ হাত দু'টি মুষ্টিবদ্ধ হয় এক-একবার। চোখ দু'টি জ্বলে ওঠে। ঘন ঘন নিশ্বাস নেয় সে। স্ত্রীর দিকে তাকায়। যে স্ত্রীকে সে বিশ্বাস করেছিল, তা'কে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে। পরক্ষণেই বন্ধু রাউটের দিকে চোখ পড়ে তার। এতকালের বিশ্বস্ত বন্ধুটির উদ্দেশ্যে সে অগ্নিদৃষ্টি হানে। তার পরেই স্ত্রীকে নিরীক্ষণ করে আবার। মনে হয়, এরা তিনজনেই একে অপরের মনের অর্ধেকটা করে অংশ পড়ে ফেলেছে। কিন্তু তবু কথা বলে না কেউ। দেখতে দেখতে সমস্ত আবহাওয়াটা অস্বাভাবিক রকম নীরব হয়ে ওঠে। শেষ অবধি নীরবতা ভাঙে হোরোক্‌স্‌। রাউটের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ বুঝি'?

রাউট মিথ্যে জবাব দেয়, 'হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে।......সেই যে তুমি কথা দিয়েছিলে, ধোঁয়া ও চাঁদের আলোতে মিলে গড়ে ওঠা সুন্দর সব দৃশ্যের কিছু আমাকে দেখাবে'।

হোরোক্‌স্‌ ভাবলেশহীন কণ্ঠে জবাব দিল; 'হ্যাঁ, কথা দিয়েছিলাম। ধোঁয়া ও চাঁদের আলোতে মিলে গড়ে ওঠা সুন্দর সব দৃশ্যের কিছু তোমাকে দেখাবো।......প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যন্ত্রপাতিগুলো নিজ নিজ নাটকীয় পরিবেশে থাকা অবস্থায় দেখাবো তোমায়। অথচ কী অন্যায়, একথা আমি ভুলতে বসেছিলাম'।

বাজে কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে রাউট দ্বিধাগ্রস্ত হল বারবার। একবার বলল, 'তোমাকে হয়তো কষ্ট দিচ্ছি'।

কথা শুনে হঠাৎ জ্বলে উঠল হোরোক্‌স্‌-এর বিষণ্ণ ও অন্ধকার চোখ দু'টি। তার পরেই আবার সুরু করল সে, 'না না, কষ্ট মোটেই নয়'।

এদিকে বিরক্তি ও বিদ্বেষে মিসেস হোরোক্‌স্‌ দিশাহারা। স্বামীর উদ্দেশ্যে হঠাৎ বাক্যবাণ ছুঁড়ল সে। বললো, 'ছায়াতে ও আগুনের শিখাতে মিলে যে সব প্রতিক্রিয়া হয়, তুমি বোধ করি মিঃ রাউটকে তা' নিয়ে বলেছ। ওগুলোকে তুমি আবার খুব অপরূপ মনে করো কি না। সেই যে তোমার এক অদ্ভুত ধারণা যে যন্ত্র সুন্দর এবং জগতের অন্য সব কিছুই কুৎসিত। আমি জানতাম মিঃ রাউট, সেও তোমাকে রেহাই দেবে না। এ হল ওর একটা বিরাট সিদ্ধান্ত। কলাবিদ্যার জগতে এক অদ্বিতীয় আবিষ্কার'।

—'আবিষ্কারের ব্যাপারে আমি বড় মন্থর,'—মিসেস হোরোক্‌স্‌কে দমিয়ে দিয়ে গম্ভীরভাবে জবাব দিল মিঃ হোরোক্‌স্‌। 'কিন্তু যা' আমি আবিষ্কার করি......' বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল সে।

গল্পটির পরবর্তী পর্বে দেখি, রাউটকে নিয়ে বাইরে যাবার উদ্যোগ করছে হোরোক্‌স্‌। অগ্নিশিখা, জ্যোৎস্না ও ধোঁয়ার প্রতিক্রিয়া দেখাবার আয়োজন চলছে। রাউট হ্যাঁ-না কিছুই বলছে না। যন্ত্রচালিতের মতো হোরোক্‌স্‌-এর নির্দেশ পালন করছে। কিন্তু মিসেস হোরোক্‌স্‌ ভয়ঙ্কর একটা কিছুর আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়েছে। রাউটকে নিষেধ করেছে বাইরে যেতে। অবশ্য শেষ অবধি কোনো ওজর-আপত্তিই কাজে আসে নি। বন্ধুর নির্দেশে রাউট মিসেস হোরোক্‌স্‌-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে। বলেছে, 'গুড্‌ ইভ্‌নিং'।

এ বিদায় যে শেষ বিদায় রাউট ছাড়া উপস্থিত অপর দু'জনের তা' জানা ছিল। পাঠকদেরও বুঝতে কষ্ট হয় না যে, বিচারক হোরোক্‌স্‌ আসামীকে এখানে তার প্রেয়সীর কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় নিতে বাধ্য করেছে।

তারপর বিচিত্র এক পথ ধরে এগিয়েছে বিচার। নিয়তি ফরিয়াদী ও আসামীকে সর্বনাশের দিকে টেনে নিয়ে গেছে। হোরোক্‌স্‌ সাড়ম্বরে দরজা খুলেছে। অনুরোধ করেছে রাউটকে বাইরে বেরিয়ে আসতে।

এ ঘটনার ঠিক পরবর্তী অংশের বর্ণনা মিসেস হোরোক্‌স্‌-এর চিন্তা ও অভিজ্ঞতার আলোকে উজ্জ্বল। অপসৃয়মাণ স্বামী ও বন্ধুর দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। স্পষ্ট শুনল, বাড়ির সামনেকার উঠোনটি পেরিয়ে গেল ওরা। সদর দরজাটা খুব জোরে বন্ধ হল।

ধীরে ধীরে জানালার কাছে এগোল মিসেস হোরোক্‌স্‌। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। দেখল, দু'টি লোক সামনের পথ ধরে এগোচ্ছে। মুহূর্তের জন্যে পথের আলো এসে পড়ল ওদের চোখে-মুখে। কেমন যেন পাণ্ডুর দেখাল দু'জনকেই। আশ্চর্য এই বর্ণনা। মিসেস হোরোক্‌স্‌-এর চোখ দিয়ে দেখান হয়েছে বলেই বর্ণনাটি এত সুন্দর ও জীবন্ত। পথের আলো এখানে কাহিনীর মধ্যে অদ্ভুত এক বিষণ্ণ সুর ছড়িয়ে দিয়েছে। সেই বিষণ্ণতা আরও গাঢ় হয়েছে দূরের ফার্নেস থেকে বেরিয়ে আসা লাল আলোর উল্লেখে।

গল্পটির পরবর্তী অংশে মিসেস হোরোক্‌স্‌ নেই আর। আছে দুই বন্ধুর পথ-চলার কাহিনী।

সেখানে দেখি, পাশাপাশি চলেছে ওরা। নিঃশব্দে চলেছে। সন্ধ্যার স্তব্ধতা ভারী হয়ে উঠছে ক্রমেই। চারিদিকের থমথমে পরিবেশ রাউটকে কেমন যেন অস্থির করে তুলছে। পথে আলো চোখে পড়ছে কদাচিৎ। কদাচিৎ জগৎ-সংসারের জীবনস্পন্দনকে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। দূর থেকে ভেসে আসছে বটে রেল-ইঞ্জিনের শব্দ, ধারে-কাছেই চোখে পড়ছে কারখানার চিমনি ও ব্লাস্ট-ফার্নেস—কিন্তু এরা পরিবেশের গাম্ভীর্যকে বাড়িয়েছে বৈ কমায় নি। জ্রেড্‌ডা কোম্পানীর লোহার কারখানা, হোরোক্‌স্‌ যে কারখানার ম্যানেজার, তা' যেন শেষ অবধি মৃত্যুর ভয়াবহতা নিয়ে দেখা দিয়েছে। সেখানকার ব্লাস্ট-ফার্নেস থেকে বেরিয়ে আসা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখে থেকে থেকে শিহরিত হয়েছি আমরা। কারখানার যন্ত্রপাতির শব্দকে ভয়াবহ আর্তনাদ বলে ভেবেছি। তারপর দেখেছি, ফার্নেস থেকে বেরিয়ে আসা আগুনের রক্তজিহ্বা ও ধোঁয়াতে মিলে যে বিচিত্র রঙের সৃষ্টি করে, হোরোক্‌স্‌ রাউটকে তা' পরম আগ্রহ নিয়ে দেখাচ্ছে।

দেখতে দেখতে রহস্যময় হয়ে উঠেছে হোরোক্‌স্‌-এর আচার-ব্যবহার। রাউটের হাত চেপে ধরেছে সে। এগিয়ে গেছে রেল-লাইনের দিকে। বিস্মিত হয়েছে রাউট। হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ছাড়িয়ে নিতে সে পারে নি, যতক্ষণ না হোরোক্‌স্‌ স্বেচ্ছায় তাকে মুক্তি দিয়েছে। রেল-লাইনের ডিস্‌ট্যাণ্ট্‌

সিগন্যাল অদ্ভুত এক মায়াজাল বিস্তার করেছে ওদের সামনে। হোরোক্স্ সেই আলোকে কেন্দ্র করে রঙের বৈচিত্র্য দেখিয়েছে রাউটকে। আর দেখিয়েছে ব্লাক্‌সে কতকগুলো ফার্নেস। বলেছে,

"আমার ওই ফার্নেসগুলোর দিকে তাকাও। দ্যাখ, পাহাড় থেকে যত নামছি আমরা, ততই ওরা যেন আমাদের উপরে উঠে আসছে। ডান দিকের ফার্নেসটি আমার বড় প্রিয়। ৭০ ফুট উঁচু সেটি। আমি নিজে গড়েছি ওকে। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে সানন্দে সে তার ভিতরে লোহা গলাচ্ছে। ওর প্রতি বিশেষ এক আকর্ষণ আছে আমার।"

ফার্নেস ও কারখানার কথা বলতে গিয়ে হোরোক্স্ বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরেছে রাউট-এর হাত। কখনও বা জোর করে টেনেছে তাকে। রাউট বিস্মিত হয়েছে। বন্ধুর এই ব্যবহার বিসদৃশ লেগেছে তার। কিন্তু আমরা এতে বিস্মিত হই নি। চাপা আক্রোশ ও বিদ্বেষের জ্বালায় জর্জরিত হোরোক্স্-এর এই আচরণ আমাদের কাছে বরং স্বাভাবিক মনে হয়েছে।

অবশেষে রাউট সাময়িকভাবে মুক্তি পেল। হোরোক্স্ তার হাত ছেড়ে দিল। এদিকে এতক্ষণে ওরা এক পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে গেছে। ওদের ঠিক সামনেই রেল-লাইন। বেড়া দেওয়া আছে সেখানে। বেড়ার গায়ে একটা নোটিশ-বোর্ড ঝুলছে। বোর্ডে লেখা,—'ট্রেন, সাবধান'।

—'বড় সুন্দর পরিবেশ', হাত তুলে বলে উঠল হোরোক্স্। আরও বলল, ওই যে, ট্রেন আসছে একটা। ওর কুন্ডলী-পাকান ধোঁয়া, কমলাবর্ণ আভা, ওর সামনেকার গোল আলোর প্রভা আর ওর সুরেলা ঘর্ঘরধ্বনি—এই সব কিছু মিলে পরিবেশটি বড় সুন্দর মনে হচ্ছে। কিন্তু আমার ওই ফার্নেসগুলো, আরও সুন্দর ছিল। গ্যাস বাঁচাবো বলে তখনও অবশ্যি ওদের গলায় আমরা 'কৌন' লাগাই নি'।

রাউট বলল, 'কৌন', সে আবার কি'?

হোরোক্স্ বুঝিয়ে দিল,—'কৌন, আরে বন্ধু, কৌন। সামনে নিয়ে গিয়ে ওদের একটি তোমায় দেখাব। আগুনের শিখা ওদের উন্মুক্ত গলা বেয়ে অনেক দূর অবধি উঠত। সেই যে, কী যেন বলে, দিনের বেলায় মেঘের স্তম্ভের মতো মনে হ'ত। লাল আর কালো ধোঁয়া বেরিয়ে আসত ওদের থেকে। আর রাত্তিরে বেরোত আগুনের সম্ভস্তম্ভ। কিন্তু এখন সেই আগুন আর ধোঁয়াকে আমরা পাইপ দিয়ে ধরে রাখি; হ্যাপরের তেজ বাড়াবার কাজে লাগাই। ওদের শীর্ষদেশ 'কৌন' দিয়ে আটকান হয়েছে এখন। ওই 'কৌন' সম্বন্ধে তোমার কৌতূহল হতে পারে'।

কৌতূহল রাউটের যে একেবারেই ছিল না, তা' নয়। একবার বলেও ছিল সে, 'কিন্তু প্রায়ই দেখি, ওদের থেকে আগুনের ঝলক ও ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে'।

হোরোক্স্ বুঝিয়ে দিয়েছিল, 'কৌনগুলো নিশ্চল হয়ে নেই; লিভার থেকে বেরিয়ে আসা শিকলে ঝোলান আছে। এমনভাবে আছে যা'তে ভারসাম্য বজায় থাকে। আরও কাছে গেলে তুমি এটা দেখতে পাবে। অবশ্য এই ব্যবস্থা না করলে ওখানে জ্বালানী দেবার উপায় থাকত না। কিছুক্ষণ পর পরই কৌন নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ে; আর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে গনগনে আগুন'।

'কৌন' সম্বন্ধে এই বিস্তৃত বর্ণনাটুকুর প্রয়োজন ছিল। কেন না 'কৌন' বা শঙ্কু আকারের একটি ঢাকনাকে কেন্দ্র করেই এ গল্পের সমস্ত রহস্য, রোমাঞ্চ ও আবেদন দানা বেঁধে উঠেছে। গল্পটি ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছেছে 'কৌন'কে ঘিরেই।

যাক সে কথা। ক্লাইম্যাক্সের প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে। তার আগে প্রাসঙ্গিক অন্য দু-একটি কথা বলা দরকার। জানিয়ে রাখা ভাল যে, রেল-লাইনের কাছে দুই বন্ধু যখন দাঁড়িয়েছিল ঠিক তখনই বিদ্যুদ্বেগে ছুটে এল একটা ট্রেন। মুহূর্তের মধ্যে হোরোক্স্ রাউট-এর ঘাড় চেপে ধরল। তাকে ঠেলে দিল 'রেলওয়ে ক্রসিং'-এর দিকে। তার পরেই হোরোক্স্ আসামীকে মৃত্যুদন্ড দিতে গিয়ে মুক্তি দিল। রেল-লাইন থেকে বাইরে বের করে আনল বন্ধুকে।

রাউট ঠিক বুঝতে পারল না হোরোক্স্কে। ভেবে পেল না, কেন সে এমন সব আচরণ করছে। একবার মনে হল তার, হোরোক্স্ নিজেও হয়তো ট্রেন আসবার কথা বুঝতে পারে নি। হয়তো সে-ও ঠিক তার মতোই অসাবধান ছিল। পরক্ষণেই দারুণ এক আশঙ্কা ঘিরে ধরল তাকে। সন্দেহ হল, তবে কি হোরোক্স্ তাকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিতে চেয়েছিল? কিন্তু তা' কেমন ক'রে হবে! হোরোক্স্ই তাকে রক্ষা করেছে। এদিকে সাবধানী পাঠকদের দৃষ্টিপথ থেকে আসল সত্যটি এড়িয়ে যাবার কথা নয়। স্পষ্টই অনুভব করে তারা যে, হোরোক্স্ রাউটকে খুন করতে গিয়েও আপাতত ক্ষমা করল। কেন না, ঠিক ট্রেন আসবার মুহূর্তেই 'কৌন'-এর দিকে চোখ পড়েছিল তার। আর চোখ-পড়া মাত্রই কি এক দুর্নিবার আকর্ষণে নিজেকে সে সামলে নিয়েছিল।

গল্পটির পরবর্তী অংশে দেখি, 'কৌন'-এর দিকে এগোচ্ছে দুই বন্ধু। কারখানার যত কাছে আসছে ওরা, যন্ত্রপাতির গর্জনও তত স্পষ্ট হচ্ছে। থেকে থেকে কুলি-কামারদের কোলাহল ভেসে আসছে। এগোতে মন চাইছে না রাউটের। কিন্তু তবু ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে যেতে হচ্ছে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো হোরোক্স্কে অনুসরণ করছে সে।

একবার তিনজন কুলি ওদের পাশ দিয়ে চলে গেল। যাবার সময় টুপি খুলে হোরোক্স্কে সম্মান দেখাল ওরা। কিন্তু রাউট ওদের ঠিক স্পষ্ট করে দেখতে পেল না। আলো-আঁধারির মধ্যে ওদের মুখগুলো কেমন যেন অস্পষ্ট মনে হল। তবু একবার ইচ্ছে হল রাউটের, ওদের চীৎকার করে ডাকে। কিন্তু কিছু বলবার আগেই অন্ধকারের মধ্যে ওরা অদৃশ্য হল।

এদিকে দুই বন্ধু এক প্রশস্ত নালার কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। যন্ত্রপাতির তপ্ত অংশকে শীতল করছে যে জল, তা' এখানে এসে পড়ছে। এর ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে ফার্নেস। জলের গায়ে তার রক্তরাঙা প্রতিবিম্ব। জায়গাটাকে বড় বিষণ্ণ মনে হচ্ছে। উষ্ণ জলবাহী নালাটিকেও কেমন যেন ভয়ংকর দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে, যেন জল ফুটছে ওখানে; আর সেই ফুটন্ত জলপ্রবাহ থেকে রাশি রাশি ধোঁয়া কুন্ডলীকৃত মেঘের আকারে বেরিয়ে আসছে। সব কিছু মিলিয়ে ওখানকার পরিবেশ কেমন যেন কুয়াশাচ্ছন্ন ও রহস্যময়।

কুয়াশার জাল ভেদ করে খানিকটা দূরেই দাঁড়িয়ে আছে সবচেয়ে বড় ব্লাস্ট্-ফার্নেসটি। তার কালো গম্বুজটাকে ভয়াবহ দেখাচ্ছে। প্রচন্ড শব্দ ভেসে আসছে সেখান থেকে। মনে হচ্ছে, যেন সে আর্তনাদ করছে।

কেমন যেন ভয় হল রাউটের। সে জলের ধার থেকে সরে দাঁড়াল। কিন্তু হোরোক্স্ নির্বিকার। জলস্রোতের খুব কাছাকাছি এগিয়ে গেল সে। অগ্নিস্রাবী ফার্নেসের প্রতিবিম্ব পড়েছে তার ঠিক সামনেকার গরম জলে। মনে হচ্ছে, যেন রক্তিম বাষ্প উঠছে সেখান থেকে। সেদিকে তাকিয়ে হোরোক্স্ বলল, 'এই রক্তরাঙা বাষ্প পাপের মতোই উষ্ণ ও লাল'।

একটু দূরেই শ্বেতশুভ্র ধোঁয়া উঠছিল জলের গা বেয়ে। ফার্নেসের প্রতিবিম্ব সেখানে ছিল না। ছিল চাঁদের স্নিগ্ধ আলো। সেদিকে তাকিয়ে হোরোক্স্ বলে উঠলো, 'দূরের ওইখানটা...মৃত্যুর মতোই সাদা'।

কথা শুনে একবার আঁৎকে উঠল রাউট। ভাবল, পাপের মতো লাল, মৃত্যুর মতো সাদা,—এসব কথা কেন বলছে

হোরোক্‌স্? কি বলতে চায় সে? পরক্ষণেই মনে হল তার, হয়তো কিছুই নয়। হয়তো এমনি এসব কথা সে বলছে।

অথচ এমনি যে নয়, এ কথাগুলোর যে গূঢ় তাৎপর্য আছে, রসিক পাঠকের তা' বুঝে নিতে কষ্ট হয় না। স্পষ্টই অনুভব করে ওরা যে রাউটের পাপকে ব্যঞ্জিত করা হয়েছে এখানে। আর বলা হয়েছে, সেই পাপের বেতন মৃত্যু।

এদিকে অতি দ্রুত এগিয়ে চলেছে রাউট ও হোরোক্‌স্। দেখতে দেখতে ঢালাই কারখানা পেরিয়ে গেল ওরা। অতিকায় সব যন্ত্রদানবের গা ঘেঁষে ব্লাস্ট্-ফার্নেসের দিকে এগোল। হোরোক্‌স্ রাউটকে কানে কানে বলল একবার, 'চলে এসো'।

চলল দু'জনেই। ব্লাস্ট্-ফার্নেসে একবার উঁকি মেরে দেখল, আগুনের মহোৎসব চলেছে সেখানে।

তারপর ধীরে ধীরে ওরা লিফ্‌টের কাছে গেল। ওই লিফ্‌ট্ দিয়ে ব্লাস্ট-ফার্নেসের চূড়ায় জ্বালানী ওঠান হয়। ধীরে ধীরে ওপরে উঠল ওরা। লিফ্‌ট্ ওদের ব্লাস্ট-ফার্নেসের প্রায় শীর্ষে পৌঁছে দিল।

ঠিক সেই মুহূর্তে, দারুণ এক সন্দেহ ঘিরে ধরল রাউটকে। সে ভাবল, এখানে থাকা উচিত হচ্ছে কি? হোরোক্‌স্ যদি সব কিছু জেনে থাকে?

বিস্ময়ে আতঙ্কে কাঁপতে লাগল রাউট। কিন্তু তখন সে বড় বিপজ্জনক জায়গায় দাঁড়িয়ে। ৭০ ফুট উঁচুতে উঠে এসেছে সে। তার ঠিক সামনেই ঐতো 'কোন'।

—'এই হল 'কোন'; এর কথাই আমি তোমাকে বলেছিলাম', চীৎকার করে জানাল হোরোক্‌স্। আরও জানাল, 'এর নিচে ৬০ ফুট জায়গা জুড়ে রয়েছে আগুন ও গলিত ধাতু। সেখানে বিস্ফোরণ চলছে অহরহ। বাতাস ফেনিল হয়ে উঠছে। সোডা-ওয়াটার থেকে গ্যাস বেরিয়ে আসছে যেন'।

কথা শুনে ভয় পেল রাউট। লিফ্‌টের ধারে লাগান কার্নিশ চেপে ধরল। কাঁপতে কাঁপতে তাকাল সেই 'কোন'-এর দিকে। প্রচন্ড গরম সেখানে। সর্বক্ষণ দুঃসহ আর্তনাদ। রাউট শিউরে উঠল।

হোরোক্‌স্ অস্বাভাবিক গম্ভীর তখন। তখন হঠাৎ আবার তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।—'এর ভিতরে উষ্ণতা প্রায় হাজার ডিগ্রী। যদি তোমাকে এর মধ্যে ফেলে দেওয়া হ'ত তবে তুমি অগ্নিশিখার মতো দপ করে জ্বলে উঠতে; সামান্য একটু বাতাসের স্পর্শে যেমন করে প্রদীপ জ্বলে ঠিক তেমনি জ্বলে উঠতে তুমি।...এ ফার্নেসের উপরের অংশের উষ্ণতা তিনশো ডিগ্রী'।

ফার্নেসের এই ভয়াবহ উষ্ণতার কথা রাউটকে বারবার বুঝিয়ে দিল হোরোক্‌স্। বলল, তাপাঙ্ক ওখানে তিনশো ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। ওইখানটায় দাঁড়ালে দেহ থেকে রক্ত ফুটে বেরিয়ে আসে।

এইবার আতঙ্কে দিশাহারা হল রাউট। বলল, 'আমাকে যেতে দাও। হাত ছাড়ে দাও আমার'।

অবশেষে হাত ছাড়িয়েও নিল সে। দু' হাত দিয়ে চেপে ধরল লিফ্‌টের কার্নিশ। এমন সময় হোরোক্‌স্ তাকে প্রচন্ড এক ঝাঁকুনি দিল। কার্নিশ থেকে হাত সরে গেল রাউটের। হোরোক্‌স্ তাকে শূন্যে তুলে ধরল। তারপরেই ঠেলে দিল 'কোন'-এর দিকে। হোরোক্‌স্‌কে জাপটে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করল রাউট। কিন্তু পারল না। মুহূর্ত পরেই অনুভব করল সে 'কোন'-এর গা ঘেঁষে রয়েছে। ফার্নেসের গরম হলকা এসে তার গায়ে লাগছে।

মরীয়া হয়ে একটি শিকল জড়িয়ে ধরল সে। ওই শিকলকে আশ্রয় করেই 'কোন'টি ঝুলছিল। এদিকে শিকলে টান পড়ায় 'কোন'টি একটু যেন ভিতরের দিকে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গেই রক্তিম এক আভা ছড়িয়ে পড়ল রাউটের চারিদিকে। ফার্নেসের ভিতর থেকে আগুনের রক্ত-জিহ্বা লক-লক করে উঠল। হাতে, হাঁটুতে প্রচন্ড এক বেদনা অনুভব করল রাউট। শিকল বেয়ে ওপরে ওঠবার আপ্রাণ চেষ্টা করল। এমন সময় হঠাৎ কিসের এক আঘাত লাগল তার মাথায়। সে ওপরের দিকে তাকাল। দেখল, হোরোক্‌স্। চাঁদের আলোকে উজ্জ্বল ও সাদা দেখাচ্ছিল তাকে। সে চীৎকার করছিল, 'নির্বোধ! ব্যর্থ হলি তুই! ওরে পরস্ত্রীলোলুপ, তুই ব্যর্থ! ওরে উত্তেজিত নরাধম! তুই ওখানে দগ্ধ হয়ে মর। দগ্ধ হ তুই! দগ্ধ হ!'

এর পরেই হোরোক্‌স্ খন্ড খন্ড কয়লা হাতে নিল। রাউটকে তাক করে পর পর আঘাত হানল সে।

অসহায় রাউট যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠল। শিকল ধরে ঝুলে থাকবার চেষ্টা করল সে। অগ্নিশিখার স্পর্শ থেকে নিজেকে বাঁচাতে চাইল। আপ্রাণ চেষ্টা করল বাইরে বেরিয়ে আসতে। কিন্তু ওই মৃত্যুগহ্বর থেকে বেরোতে সে পারল না। হোরোক্‌স্ ওপর থেকে বারবার আঘাত করল তাকে। তার জামা-কাপড় পুড়ে গেল; রক্তিম আভা বেরিয়ে এল ওদের থেকে; এবং সে যখন মুক্তির জন্যে সংগ্রাম করছিল তখন শিকলে টান পড়ায় 'কোন'টি হঠাৎ আলগা হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই দম-বন্ধ-করা দারুণ গরম একঝলক গ্যাস ঘড়-ঘড় শব্দ তুলে বাইরে বেরিয়ে এল। আগুনের শিখা চারিদিক থেকে গ্রাস করল তাকে।

এরপরেই রাউটের অবস্থার যে বর্ণনা দিয়েছেন ওয়েলস্, তা' ভয়ঙ্কর ও মর্মস্পর্শী। বলেছেন, তার মধ্য থেকে মানুষের আদল অবলুপ্ত হল। মুহূর্তের ওই রক্তাভ অগ্নিঝলক পেরিয়ে যাবার পর হোরোক্‌স্ দেখল, একটা পুড়ে যাওয়া কালো মূর্তি; সে মূর্তির মাথায় এখানে-সেখানে রক্ত। তখনও শিকলটিকে ধরে ঝুলে থাকবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে সে। দারুণ যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে। ওকে দেখে মনে হচ্ছে, মনুষ্যেতর দানবীয় কোনো পশু বলে। পশুটা সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে, কিন্তু ভস্মীভূত হয় নি। তখনও থেকে থেকে কেঁপে উঠছে সে। ক্ষণে ক্ষণে তার আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে।

অদ্ভুত জীবন্ত এই বর্ণনা। এ যেন বিভীষিকাময় দৃশ্যটিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এর চেয়েও জীবন্ত ও হৃদয়স্পর্শী গল্পটির পরবর্তী অংশ, যেখানে অনুশোচনা ঘিরে ধরে হোরোক্‌স্‌কে, যেখানে ঘটনার শোচনীয়তা তার ক্রোধকে ধুয়ে মুছে দেয়। ওয়েল্‌স লিখেছেন,

> "হঠাৎ ওই দৃশ্য দেখে লৌহ-কারখানার কর্মকর্তার সমস্ত রাগ উবে গেল। দারুণ এক দুর্বলতা আচ্ছন্ন করল তাকে। মাংস-পোড়ার ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ তার নাকে এল। তার মধ্যে আবার সদ্‌বুদ্ধি জাগ্রত হল। চীৎকার করে উঠল সে, ঈশ্বর আমায় করুণা করো। হায় ঈশ্বর এ আমি কি করলাম?"
>
> "সে বুঝল, তার নিচের ওই বস্তুটি এখনও নড়ছে-চড়ছে বটে, এখনও অনুভব করছে, কিন্তু এরই মধ্যে মৃত্যু হয়েছে তার। ওই হতভাগ্যের শিরায় শিরায় নিশ্চয় এখন রক্ত টগবগ করে ফুটছে। সেই মৃত্যু-যন্ত্রণার নিদারুণ অনুভূতি মনে এল তার এবং মনের অন্য সমস্ত ভাবনা আচ্ছন্ন হয়ে গেল।"

তারপর শিকলে টান দিয়ে 'কোন'টিকে কেমন করে আলগা করে দিল সে এবং কেমন করে বিশ্বাসঘাতক বন্ধুকে ব্লাস্ট্-ফার্নেসের মধ্যে ফেলে দিয়ে মৃত্যু-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিল, গল্পটির পরবর্তী অংশে তা' বলা হয়েছে। আর বলা হয়েছে অনুশোচনাকাতর হোরোক্‌স্-এর হৃদয় বেদনার কথা। সেখানে দেখি, ৭০ ফুট উঁচু মৃত্যু-গহ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপছে হোরোক্‌স্। লিফ্‌টের

কার্নিশ ধরে কোনোরকমে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। ঠোঁট কাঁপছে তার। কিন্তু কোনো কথা বেরিয়ে আসছে না।

ওদিকে নিচে লোহার কারখানায় যথারীতি কাজ চলেছে। কোলাহল ভেসে আসছে সেখান থেকে।

নারকীয় এক মৃত্যু-কাহিনী শোনবার পর জীবনের এই সহজ-স্পন্দন যখন কানে পেঁছয় তখন রাউটের ট্র্যাজেডী পাঠকদের যেন আরও পেয়ে বসে। এ ছাড়া পাঠকরা বেদনা অনুভব করে হোরোক্‌স্‌-এর জন্যে যে এককালের প্রিয় বন্ধুকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে মৃত্যুর চেয়েও মর্মান্তিক অনুশোচনার ভাগী হল। এখানেই লেখকের কৃতিত্ব। বেদনা-বিদ্বেষ ও স্নেহ-প্রেমকে তিনি এখানে এক মহিমময় জীবনরসে পরিমণ্ডিত করেছেন।

সব দিক মিলিয়ে বিচার করলে সন্দেহ থাকে না যে, 'দি কোন' ওয়েল্‌স-এর লেখা সবচেয়ে সুন্দর গল্পগুলোর মধ্যে একটি।

অপর এক প্রেমের গল্প 'দি জিল্‌টিং অব জেইন' সেরা রচনার পর্যায়ে হয়তো পড়ে না; কিন্তু এরও একটা গভীর আবেদন আছে। এ গল্পটি হল এক প্রত্যাখ্যাতা নারী জেইনকে ঘিরে। জেইন এ গল্পের 'আমি' জর্জ-এর বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করত। আনন্দে-গানে অনুক্ষণ মেতে থাকত সে। হঠাৎ তার জীবনে প্রেম এল। উইলিয়াম নামে একটি যুবককে সে ভালবাসল। উইলিয়াম কুলির কাজ করত। রোজগার করত সামান্য। ধীরে ধীরে রোজগার বাড়ল তার। উইলিয়াম-এর পদোন্নতি হল। এদিকে জেইনকে অনেক আগেই সে বাগ্‌দান করেছিল। কিন্তু পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তার অদ্ভুত পরিবর্তন হল। সে ধনী ও সম্ভ্রান্ত ঘরের একটি মহিলাকে ভালবাসল। শেষ অবধি বিয়েও করল তাকে।

এ ঘটনার সব কিছুই ঘটল জেইনের চোখের সামনে। কিন্তু তা' সত্ত্বেও কিছুই করবার ছিল না তার। সামান্য যা' কিছু প্রতিবাদ সে করেছিল, তা' তার দুঃখ ও ক্ষোভকে বাড়িয়ে দিল মাত্র। এরপর থেকে অদ্ভুত শান্ত হয়ে গেল জেইন। তার গান গাওয়া বন্ধ হল। দিনের পর দিন নীরবে ঘরের কাজ করে চলল সে।

এই কাহিনীসূত্র থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, গল্পটি মামুলী ধরণের। তবে স্বল্প-পরিসরের মধ্যে জেইনের আঁধার-আলো-ঘেরা ক্ষুদ্র জীবনটুকু এখানে প্রদীপ্ত। ব্যর্থ প্রেমের যে জ্বালা তাকে নিরন্তর দগ্ধ করেছে, তার তাপ শুধু জর্জ ও তার স্ত্রী ইউফেমিয়াকেই স্পর্শ করে নি, পাঠকদেরও করেছে। পাঠকদেরও অনেকেই হয়তো এই প্রত্যাখ্যাতা নারীটির প্রতি করুণা অনুভব করবেন। তার সুখস্বপ্নকে বালির বাঁধের মতো ভেঙে পড়তে দেখে বেদনা বোধ করবেন অনেকেই।

'দি ডায়মণ্ড মেইকার' গল্পে এই বেদনা অন্য এক মূর্তি নিয়ে আচ্ছন্ন করে আমাদের। বেদনা এখানে প্রেমের নয়, জীবনসংগ্রামে ব্যর্থতার চিত্রটি মর্মান্তিক-ভাবে তুলে ধরে। এ গল্পটি হতভাগ্য এক হীরক-নির্মাতার জীবনকে কেন্দ্র করে লেখা। চরম দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিনের সাধনার পর কেমন করে সে কৃত্রিম উপায়ে হীরক-উৎপাদন করল এবং পরিশেষে তা' থেকে নিজের বিপদ ডেকে আনল, তারই মর্মস্পর্শী কাহিনী এখানে বলা হয়েছে। গল্প-বলার টেকনিকটি বড় সুন্দর। হীরক-নির্মাতা নিজেই তার জীবনকাহিনী বর্ণনা করেছে। কর্মব্যস্ত শহর লণ্ডনের স্তব্ধ নদী-তীরে বসে অপরিচিত এক ব্যক্তির কাছে সে তার জীবনের গোপনতম কথাটি বলেছে। বলেছে, কেমন করে ব্যর্থতার সোপান বেয়ে, দারিদ্র্যের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে শেষ অবধি সে কৃত্রিম হীরক প্রস্তুত করল এবং এর ফলে সম্পদের পরিবর্তে বিপদ এবং আনন্দের পরিবর্তে আতঙ্ক কেমন করে ঘিরে ধরল তাকে। অপরিচিত কোনো ব্যক্তির কাছে একখণ্ড হীরক বিক্রি করতে চেয়েছিল সে; কিন্তু বিক্রি করতে যখন পারল না, তখন নিজের অজানতেই যেন সে তার আশা-নিরাশায় ম্লান জীবনচিত্রটি তুলে ধরল। অপরিচিত ব্যক্তিটিকে বোঝাতে চাইল, যে হীরকটি তার হাতে রয়েছে, সেটি কোনো তুচ্ছ বস্তু নয়, মহা-মূল্যবান পদার্থ। ব্যক্তিটি অর্ধেক বিশ্বাস করেছে তার কথা; আর অর্ধেক করে নি। অপরিচিতের এই মনোভাব আমরা মূল গল্প থেকে স্পষ্টই জানতে পারি। কেন না গল্পটি আমরা তার কাছ থেকেই শুনেছি। শুনে আমাদের মনে হয়েছে, এ সংসারে হীরক-নির্মাতার মতো হতভাগ্য থাকলেও থাকতে পারে। সম্পদের মোহে আলেয়ার পিছনে ছুটছে যারা, যারা শ্যামল মরূদ্যানে আশ্রয় পাবে বলে মরুভূমির তপ্ত বালির উপর দিয়ে পথ চলছে, তাদের মতো লোকের অস্তিত্ব পৃথিবীতে বিরল নয়।

সব দিক মিলিয়ে দেখলে বলা চলে যে, এটি একটি সার্থক জীবনধর্মী গল্প।

জীবনের সত্য-চিত্র 'দি বিউটিফুল সুট'-এও দুর্লভ নয়। দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ গল্পটি লেখা। তবে এর নিগূঢ় বক্তব্য আছে একটি। বক্তব্যটি হল এই যে, সঞ্চয়ের নেশা আদিমকাল থেকে আছে মানুষের; কিন্তু তাই বলে জীবনের সুন্দরকে বিসর্জন দিয়ে সব সময়ই সঞ্চয় করতে চায় না সে। সব কিছুকে ভবিষ্যতের জন্যে জমা রেখে বর্তমানের আনন্দকে অনেক সময়েই সে উপেক্ষা করতে পারে না। এমন মুহূর্ত তার জীবনে নিশ্চয়ই আসতে পারে, বিশ্বজগৎ যখন সমস্ত রূপরস নিয়ে তাকে আহ্বান জানাবে। সেই মুহূর্তে সে আর নিজেকে গুটিয়ে রাখতে পারবে না এই গল্পের নায়কও পারে নি। মা তাকে অনেক কষ্টে খুব সুন্দর আর দামী একটা সুট কিনে দিয়েছিল। সে সুট সে বড় একটা পরত না। মা তাকে পরতে দিত না। ওটা সঞ্চিত ছিল ভবিষ্যতের কোনো শুভদিনের জন্যে। খুব যত্নে ভাঁজ করে রাখা ছিল সে বস্তুটি। তার বোতামে বা কলারে যা'তে একটুকু ময়লা না জমে সেদিকে মা ও ছেলের বরাবরই লক্ষ্য ছিল। কিন্তু একদিন এক জ্যোৎস্নাভরা সুন্দর রাত্রে সব কিছু ওলট-পালট হয়ে গেল। নিখিলের সৌন্দর্য হাতছানি দিয়ে ডাকল ওই যুবকটিকে। সে তার এতকালের সঞ্চিত সুন্দর সুট্‌টি গায়ে দিয়ে রাত্রির অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ল। তার কাছে আনন্দের রুদ্ধ-দুয়ার খুলে গেল সেদিন। সুট্‌টিকে ধুলো-বালি ও জল-কাদার হাত থেকে বাঁচাবার কোনো চেষ্টা সে করল না। নিবিড় এক প্রেমানুভূতি, অদ্ভুত এক সৌন্দর্যের নেশা তাকে পেয়ে বসল। ঝোপ-ঝাড় ও ডোবা-নালার উপর দিয়ে উন্মত্তের মত এগিয়ে গেল সে। সুট্‌ যে জল-কাদায় আর ধুলোয়-বালিতে নষ্ট হচ্ছে, সেদিকে তার কোনো ভ্রূক্ষেপই রইল না। পরদিন দেখা গেল, একটি পাথুরে গর্তের মধ্যে তার মৃতদেহটি পড়ে আছে।

যুবকটির প্রেম ও আনন্দকে বিশ্বলোকে উৎসারিত করে দেবার যে চিত্র ওয়েল্‌স এখানে এঁকেছেন, তা' আমাদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। এ ছাড়া গল্পের গোড়ার দিকে সুট্‌টিকে যক্ষের ধনের মতো আগলে রাখার বর্ণনাও একান্ত বাস্তব-ধর্মী। কিন্তু কাহিনীর একেবারে শেষদিকে যুবকের মৃত্যুর কথা না বললেই বোধ করি ভাল হ'ত। পাঠক অপ্রস্তুত হ'ত না তা' হলে; আর গল্পটিও পূর্বাপর সামঞ্জস্যের সূত্রে গ্রথিত হ'ত।

'এ স্লিপ্‌ আণ্ডার দি মাইক্রোসকোপ' গল্পে সামঞ্জস্য আগাগোড়া বজায় আছে। ওয়েল্‌স এই গল্পে মানবমনের গভীরে ডুব দিয়ে মনোজগতের দুর্জ্ঞেয় কিছু রহস্য আহরণ করতে চেয়েছেন। জীব-বিজ্ঞানের ক্লাশ-রুম ও পরীক্ষাগার এ গল্পের পটভূমি। কিন্তু বিজ্ঞানের কোনো রহস্যকাহিনী এখানে নেই।

আছে মানব-মনোলোকের কাহিনী,—যা হিংসা-দ্বন্দ্ব, আকর্ষণ-বিকর্ষণ এবং ত্যাগ ও স্বার্থচেতনার সমন্বয়ে বিচিত্র। এই বৈচিত্র্য রূপময় হয়ে উঠেছে তিনজন বিদ্যার্থী হিল, ওয়েড্ডারবার্ন ও মিস হেস্ম্যানকে ঘিরে। এদের মধ্যে হিলের চরিত্রটি আমাদের মনকে সবচেয়ে বেশি স্পর্শ করে। তার দুঃখ-কষ্ট, ত্যাগ-তিতিক্ষা, লোভ-ক্ষোভ আমাদের কাছে জীবন্ত বলে মনে হয়। যে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের বিভ্রাট গল্পটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, হিল জ্ঞাতসারেই নিজেকে তার সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ফেলেছে। এ ছাড়া অধ্যাপক ও প্রদর্শকের ('ডেমনস্ট্রেটর') চরিত্রও বাস্তবধর্মী।

এই বাস্তবধর্মিতার পরিচয় 'এ ডিল্ ইন্ অস্ট্রিচেস' গল্পেও দুর্লভ নয়। এটি নেহাৎই একটি হাল্কা-রসের গল্প। তবে লোককে ঠকিয়ে পয়সা উপায় করার কথা 'সিরিয়াস্লি' বলা হয়েছে বলেই একে ঠিক নির্মল হাসির গল্পের পর্যায়ে ফেলা যায় না।

এক বাঙালী হিন্দু ও এক ইহুদী কয়েকটি উটপাখিকে কেন্দ্র করে এ গল্পের রস জমিয়ে তুলেছে। পরস্পরের মধ্যে যোগসাজস করে এরা কেমন করে প্রচার করল যে, উটপাখিদের মধ্যে একটি এক টুকরো হীরক গিলে ফেলেছে এবং কেমন করে পাখিগুলোকে চড়া দামে নীলাম করে ওরা বেশ কিছু অর্থ উপার্জন করল, এ গল্পে তার কৌতুকপ্রদ বিবরণ আছে।

অপরদিকে কৌতুক নয়, জীবনের মর্মান্তিক ট্যাজেডী প্রাধান্য পেয়েছে 'দি ওরিট্যারেইটেড্ ম্যান' গল্পে। জীবন-ভিত্তিক এক সুন্দর ছোট গল্প এটি। এক সুস্থ ও স্বাভাবিক যুবক নাট্য-সমালোচক হবার পর থেকে কেমন করে পরিবর্তিত হল, কেমন করে তার আচার-আচরণে অস্বাভাবিকতা ও কৃত্রিমতা প্রকাশ পেল, এবং এর পরিণতি যুবকটিকে কোথায় নিয়ে গেল, এই গল্পে তা' বলা হয়েছে। বলার মধ্যে অতিকথন কিছু থাকলেও গল্পটি যে সব মিলিয়ে আকর্ষণীয়, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সন্দেহ নেই যে, এ গল্পের নায়ক কামিন্স্-এর হৃদয়-বেদনা আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করে। আমরা সেই হতভাগ্য যুবকটিকে দেখতে পাই যেন; যেন স্পষ্ট অনুভব করি তার অসহায় অবস্থা। নিজের ব্যবহারে নাটুক ভাব-ভঙ্গি প্রকাশ পাচ্ছে, এ সম্বন্ধে সে সচেতন, পূর্বের অন্তরঙ্গরা ক্রমেই তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, এ কথাও মনেপ্রাণে উপলব্ধি করছে সে, কিন্তু নিজেকে শোধরাবার মতো কিছুই করতে পারছে না; অভিনয়-জগতের কৃত্রিমতা বিসর্জন দিয়ে কোনোমতেই আর আগেকার স্বাভাবিক জগতে ফিরে আসতে পারছে না। সে নিরুপায়ভাবে এগিয়ে চলেছে স্রোতের জলে ভেসে-চলা কুটোর মতো। গল্পের মধ্যে একটি প্রেম-কাহিনী থাকায় এই ভেসে-চলার চিত্রটি আরও মর্মস্পর্শী হয়েছে। ডেলিয়া নামে একটি তরুণীকে ভালবাসত কামিন্স্। সে নাট্য-সমালোচক হবার আগে অবধি ডেলিয়াও তার প্রতি অনুরক্ত ছিল। কিন্তু যখন থেকে নাটকের দোষগুণ বিচার করতে শিখল কামিন্স্, যখন থেকে তার ব্যবহারে অভিনয়-সুলভ কৃত্রিমতা প্রকাশ পেতে লাগল, তখন থেকেই প্রেয়সীর সংগে তার ব্যবধান বেড়ে চলল। ডেলিয়া বিরক্ত হল তার আচরণে। বিস্মিত হল এই ভেবে যে, নাট্য-সমালোচক হবার পর থেকে কামিন্স্ একেবারে বদলে গেছে। যেন পূর্বেকার সেই সহজ-সরল মানুষটির অস্তিত্ব চিরকালের মতো মুছে গেছে এই পৃথিবী থেকে। চলনে-বলনে মঞ্চের কায়দা-কানুন রপ্ত করেছে সে। এমন অস্বাভাবিক ও অদ্ভুত হয়ে উঠেছে যে আর তাকে ভালবাসা যায় না। অবশেষে কামিন্স্কে প্রত্যাখ্যান করল ডেলিয়া। কামিন্স্ তার অসহায় অবস্থার কথা বারবার বোঝাতে চাইল। কিন্তু ডেলিয়া কোনো কথায়ই কান দিল না। এইভাবে ক্রমেই পূর্বেকার চেনা ও অন্তরঙ্গ মানুষগুলো কামিন্স্-এর কাছ থেকে দূরে সরে গেল। তাই বাধ্য হয়েই সে সান্ত্বনা খুঁজল অভিনয়-জগতের কৃত্রিম পরিবেশের মধ্যে। কিন্তু সান্ত্বনা কিছুতেই সে পেল না। শেষ অবধি নাট্য-সমালোচকের কাজে ইস্তফা দিতে চাইল সে। কিন্তু কর্মকর্তা নানা ফন্দিফিকির করে তাকে ওই অস্বস্তিকর জগতের মধ্যেই আটকে রাখল। টাইপ-চরিত্র হিসেবে নাট্যজগতের এক কর্মকর্তা বার্নাবীর স্বরূপটিও এখানে খুব সুন্দর ফুটেছে। কিন্তু সবচেয়ে সুন্দর ফুটেছে কামিন্স্-এর চরিত্র; জেনেশুনেই কৃত্রিম-তার পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে আছে সে; সে ফিরে আসতে চাইছে মুক্ত ও স্বাভাবিক জগতে, কিন্তু রঙ্গমঞ্চের অক্টোপাশের বাঁধন থেকে কোনোমতেই সে মুক্তি পাচ্ছে না। বঞ্চনা অহরহ দগ্ধ করছে তাকে।

'দি লস্ট ইন্হেরিট্যান্স্' গল্পে এই বঞ্চনার ছবিটি অন্য এক রূপে প্রতি-ফলিত। এটি হল এক ব্যর্থ উত্তরাধিকারীকে নিয়ে লেখা একটি বিষাদ-মধুর গল্প।

ব্যর্থতার জন্যে উত্তরাধিকারী নিজেই দায়ী। এ কারণেই গল্পটির বিষণ্ণতা আমাদের মনকে স্পর্শ করে।

এ কাহিনীর নায়ক টেডের মাতুল ছিলেন অগাধ সম্পত্তির অধিকারী। উত্তরাধিকার-সূত্রে সে সম্পত্তি টেডেরই পাবার কথা। এজন্যে খেয়ালী মাতুলকে খুশি রাখবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করত সে। তোষামোদ করতেও কসুর করত না। মাতুলের বাতিক ছিল বই লেখা; এমন সব যা' কেউ কোনোদিন পড়ত না। কিন্তু মাতুল দমবার পাত্র নন। একের পর এক বই লিখতেন তিনি আর সেগুলো নিজেই ছাপাতেন। তাঁর ধারণা ছিল, বিভিন্ন রচনায় সমাজ ও জাতিকে গুরুগম্ভীর নীতি-উপদেশ দিয়ে তিনি মহৎ কিছু করছেন। টেড মাতুলের লেখাকে আমল দেয় নি কোনোদিন। কখনও সে ওর লেখা পড়ে নি। মাতুল তাকে নিজের লেখা বই দিতেন। আর টেড সেগুলো না পড়েই ফেলে রাখতো। বিপদ ঘটল মাতুল সবশেষে যে বইটি দিয়েছিলেন তা' নিয়ে। যথারীতি না পড়েই টেড সে বইটির প্রশংসা করল। মাতুলকে বললো, এমন উচ্চাঙ্গের বই তিনি আর কখনও লেখেন নি। এ ঘটনার অল্পকালের মধ্যেই মাতুলের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর দেখা গেল, তার সম্পত্তি পেয়েছে দূর সম্পর্কের এক ছোকরা, যা'কে তিনি দু'চোখে দেখতে পারতেন না। সেই ছোকরা আট-দশ বছরের মধ্যেই সমস্ত সম্পত্তি উড়িয়ে দিল। এদিকে টেডের রিক্ততা বেড়ে চলল দিনের পর দিন। তারপর হঠাৎ একদিন কেমন করে মাতুলের দেওয়া শেষ বইটির মধ্য থেকে উইল বেরিয়ে পড়ল এবং দেখা গেল যে, সমস্ত সম্পত্তি টেডকেই দেওয়া হয়েছিল, গল্পটির শেষদিকে তা'র মর্মস্পর্শী বর্ণনা আছে।

গল্পটি অভিনব কিছু একটা নয়। কিন্তু তা' সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা চলে না যে এটি একান্তভাবেই একটি জীবনধর্মী রচনা। লেখক তা তিনি যত ব্যর্থই হোন না কেন, নিজের লেখা সম্বন্ধে তার দুর্বলতা থাকা স্বাভাবিক। লেখার আদর-অনাদরের সংগে তার মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত। সেই মর্যাদায় আঘাত লাগলে লেখক-সত্তার দম্ভও আহত হয়। লেখক-মাতুল বইয়ের মধ্যে উইল গুঁজে দিয়ে যাচাই করতে চেয়ে-ছিলেন, টেড তার বই সত্যই পড়ে কি না। শেষ অবধি তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে টেড পড়ে না। কিন্তু তিনি মুখে কিছু বলেন নি। আর এই না-বলার মধ্য দিয়েই তাঁর আত্ম-সচেতনতা ও দম্ভ যেন আরও নির্মমভাবে ফুটে উঠেছে। এ ছাড়া এ গল্পের আর একটি বক্তব্য আছে। আমরা একে অপরের সংগে

মশবার সময় বাইরেটাকেই শুধু দেখি। ভিতরের দিকে তাকাবার অবকাশ পাই না। সে কারণেই আমাদের একে অপরকে চিনতে পারি না। টেডও চিনতে পারে নি তার মাতুলকে।

তবে শুধুমাত্র এই বক্তব্যই নয়, টেডের জীবন-কাহিনীর বিষণ্ণতা এবং মাতুলের টাইপ চরিত্রটিও এ গল্পে খুব সুন্দর ফুটেছে। মৃত্যুর কিছু পূর্বে মাতুল যখন তাঁর সারা জীবনব্যাপী সাহিত্য-সৃষ্টির ব্যর্থতা স্বীকার করেন, যখন আত্ম-সমালোচনায় মেতে ওঠেন তিনি, তখন মুগ্ধ হই আমরা। আর মুগ্ধ হই গল্পটির একেবারে শেষপর্বে এসে। সেখানে দেখি: পারস্পরিক বোঝাবুঝির ক্ষেত্রে মানুষের দৈন্যের কথা টেড মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করছে।

'দি লস্ট্ ইন্হেরিট্যান্স্' গল্পে আঘাত এসেছে ভিতর থেকে। কিন্তু বাইরের আঘাতের ফলে মানুষের প্রতিক্রিয়ার কথা 'এ ক্যাটাস্ট্রফি' গল্পে সুন্দরভাবে চিত্রিত। 'ক্যাটাস্ট্রফি' বলতে বুঝি 'বিপর্যয়'। জীবনযুদ্ধক্ষেত্রের আঘাত-সংঘাত, বেদনা-ব্যর্থতা ও শোক-তাপকে ঘিরে লেখা এটি একটি সুন্দর ছোট গল্প। এই গল্পের একটি বক্তব্য রয়েছে। তা' হল এই যে, জীবনে ছোট-খাট আঘাত সইতে হয় অনেককেই ব্যর্থতা ও গ্লানির বোঝাও অনেককেই বইতে হয়। অনেকেই জীবনযুদ্ধে পরাজিত হয়েছে ভেবে অসহিষ্ণু ও হতাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু বৃহত্তর কোনো বিপর্যয় আসে যখন, মানুষ যখন চরম সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়ায়, ছোট-খাট আঘাতগুলোকে তখন আর বড় বলে মনে হয় না তার। পরাজিতের মনোবৃত্তি ত্যাগ করে মানুষ তখন নতুন করে বাঁচবার আশায় বুক বাঁধে। আলোচ্য গল্পের নায়ক-নায়িকার মধ্য দিয়ে এই সত্যটি সার্থকভাবে পরিস্ফুট।

নায়ক উইন্স্লো ব্যবসা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। দেনার দায়ে তার দোকান বন্ধ হয় হয়। খদ্দের নেই সেখানে। জিনিসপত্রও অপ্রচুর। তাই মন ভাল থাকে না উইন্স্লোর। হতোদ্যম হয়ে যখন-তখন বসে থাকে সে; আকাশ-পাতাল ভাবে। কখনও আবার নিরীহ স্ত্রী মিন্নীর উপর অকারণেই ক্ষেপে ওঠে।

বিপদে ওদের একমাত্র আশ্রয় ছিল এক কাকা। একদিন খবর এল, দুর্ঘটনায় তিনি সপরিবারে নিহত হয়েছেন। উইন্স্লো ও মিন্নীর কাছে এর চেয়ে মর্মান্তিক সংবাদ আর কিছুই হতে পারে না। অথচ আশ্চর্য! এই বিপর্যয় ওদের যেন নতুন আলোকের সন্ধান দিল। শোক-তাপ ও আঘাত-সংঘাতকে বুকে নিয়ে আবার নতুন করে বাঁচবার জন্যে বদ্ধপরিকর হল ওরা। ব্যবসা যে ডুবতে বসেছে, সে কথা ভুলে গেল উইন্স্লো। চরম বিপর্যয়ের আঘাতে জীবনের প্রতি বিশ্বাসকে সে নতুন করে খুঁজে পেল।। মিন্নীকেও দেখা গেল নতুন এক রূপে। চরম শোক-তাপের মধ্যে দাঁড়িয়ে জীবনের সত্যকে স্বীকার করে নিল সে। বাঁচবার আশায় আবার বুক বাঁধল।

একটি বিপর্যয়কে কেন্দ্র করে আলো-আঁধারিতে ঘেরা মানব-প্রাণের অপরাজিত মনোভাবটি এ গল্পে সুন্দর ফুটেছে। উইন্স্লো এখানে সাধারণ মানুষের দোষগুণ নিয়ে জীবন্ত। আর সবচেয়ে জীবন্ত সেই সংগ্রামী মানুষ, চরম পরাজয়ের মধ্যে দাঁড়িয়েও যে বলে, আবার নতুন করে বাঁচবো আমি। দুঃখ-দৈন্যের কাঁটায় ঘেরা পথ ধরেও আবার আমি এগোব। এ গল্পের উপসংহারে এই এগিয়ে চলার কথাই ওয়েল্স বলেছেন। সেখানে পাই,

> “ক্ষতি যত বড়ই হোক না কেন, পৃথিবীর কাজ তবু আমাদের জন্যে প্রতীক্ষা করে থাকে। উইন্স্লো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল একটা। ধীরে ধীরে সামনেকার দরজার দিকে এগিয়ে গেল। যে মুহূর্তে দরজা খুলল সে ঠিক তখনই সূর্যালোকের বন্যায় বন্ধ দোকানের আঁধার ও ছায়াচ্ছন্ন অংশগুলো আলোকোদ্ভাসিত হয়ে উঠল।”

এই আলোক যে নব-জীবনের প্রতীক, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না আমাদের।

কিন্তু জীবন যেখানে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, নতুনের সেখানে প্রবেশ-নিষেধ; এই মর্মান্তিক সত্যটি 'দি লর্ড অব দি ডাইনামোজ' গল্পে পরিস্ফুট।

'ডায়নামোদের দেবতা' অজ্ঞ মানুষের ভ্রান্তিকে নিয়ে লেখা একটি বাস্তবধর্মী গল্প। অশিক্ষিত মানুষের ধর্মান্ধতা অনেক সময় কিভাবে তাকে উন্মত্ত করে তোলে, এখানে তা' দেখান হয়েছে। বলা হয়েছে, আজুমা-জী নামে এক সরলপ্রাণ নির্বোধের কাহিনী, সত্যবুদ্ধি ও শিক্ষার অভাবে অন্ধ বিশ্বাসকেই যে বড় করে দেখল।

গল্প-বলার ভঙ্গিটি আমাদের বিশেষ-ভাবে মুগ্ধ করে। ডায়নামোর প্রধান পরিচালক জেম্স্ হল্রয়েড্ এবং তার পরিচালনাধীন তিনটি ডায়নামো প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমাদের। ডায়নামো তিনটির মধ্যে দু'টি ছোট এবং একটি আকারে ও কর্মক্ষমতায় অনেক বড়। হল্রয়েডের প্রাচ্যদেশীয় পরিচারক আজুমা-জীর মনে ধরল এই বৃহদাকার শক্তিশালী ডায়নামোটিকে। অবাক বিস্ময়ে সে ওই যন্ত্রটির দিকে তাকিয়ে থাকত। ভাবত, এরই মধ্যে আছে ডায়নামোদের দেবতা। দেবতার কাছে প্রায়ই নালিশ জানাত সে। হল্রয়েড্ ওকে মারধোর ও গালিগালাজ করলে সে ওখানে গিয়ে তার অভিযোগ নিবেদন করত। ডায়নামোকে দেবতার আসনে বসাতে গিয়ে পরিশেষে সে উন্মত্তের ন্যায় কাজ করল। ভাবল আহুতি চাইছে এই দেবতা। মানুষ পেতে চাইছে। এই ভাবনা থেকেই সে হল্রয়েড্কে ডায়নামোর মধ্যে ঠেলে ফেলে দিল। শোচনীয়ভাবে মৃত্যু হল হল্রয়েডের এবং শেষ অবধি সে নিজেও ডায়নামোর যন্ত্রপাতির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মাহুতি দিল।

অন্ধ কুসংস্কার এবং হল্রয়েডের নির্মম ব্যবহারে জর্জরিত আজুমা-জীর জীবনকাহিনীটি এখানে সুন্দর ফুটেছে। এ ছাড়া ডায়নামো চলার সঙ্গে পার্শ্ববর্তী ইলেকট্রিক ট্রেনের যোগসূত্রটি দেখাবার ফলে সমস্ত কাহিনীটিকে বাস্তবধর্মী ও বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়। আজুমা-জীর আচরণ অস্বাভাবিক হলেও অবিশ্বাস্য মোটেই নয়।

অবিশ্বাস্য নয় প্রেম ও জীবন নিয়ে লেখা ওয়েল্স-এর অধিকাংশ গল্প। প্রায় সর্বত্রই জীবনের সত্য-চিত্র খুঁজে পাই আমরা। পতন-উত্থান ও সুখ-দুঃখে ভরা মানুষের এক বিরাট মিছিলকে প্রত্যক্ষ করি।

৩ মাসের জন্য বিনামূল্যে উপহার

স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য, কাশ্মীর আর্ট শাড়ী। সর্বাধুনিক মনোরম ডিজাইন এবং রং লইয়া মরশুমের নূতন নূতন মাল আসিয়াছে। আমাদের কাছে কেবলমাত্র বড় সাইজের কাপড় পাওয়া যায়। ১টি ডিল্যাক্স শাড়ীর মূল্য ১১ টাকা; ২টি ২০ টাকা; ৩টি ২৮ টাকা; ৪টি ৩৬ টাকা। দুইটি বা তদধিক শাড়ীর অর্ডারের সহিত বিনামূল্যে ব্লাউস পীস। পোষ্ট পার্শেলযোগে অর্ডারের মাল পাঠান হয়।

Arvind Agencies (WBM-22)
Post Box 1408, Delhi-6.

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

দীপালি

"বিষয়-বস্তু সম্পর্কিত ব্যাপারে আংশিক চেতনাবিশিষ্ট লোকই আমরা বেশি পরিমাণে দেখিতে পাই; কিন্তু শিশিরকুমার ছিলেন প্রত্যেক ব্যাপারে সামগ্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ।

চরিত্রস্ফুটনের জন্য শিশিরকুমার নাট্যোল্লিখিত প্রত্যেকটি চরিত্রকে। বিশেষ করিয়া প্রধান চরিত্রগুলিকে, একটি স্বকীয়ত্বে মণ্ডিত করিয়া তুলিতেন। নাট্যকার যাহা চাহিয়াছিলেন এবং হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপারগ হইয়াছিলেন, শিশিরকুমার চরিত্রগুলিকে তদনুযায়ী বিশিষ্ট করিয়া তুলিতেন। প্রয়োজনবোধে ছোটখাটো চরিত্রগুলিকেও বিশিষ্ট করিতেন চরিত্রের মুখ দিয়া নাট্যকার হয়তো অনেক সময় এমন সব উক্তি করাইয়াছেন, যাহা ঐ চরিত্রের পক্ষে ঠিক হয় নাই। নাটকের মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের পক্ষেও হয়তো এইরূপ উক্তি ব্যবহার উপযুক্ত হয় নাই। শিশিরকুমার এই সব ক্ষেত্রে নিজের চিন্তাধারাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতেন, এবং হয় ঐ রকম উক্তি তুলিয়া দিতেন, নয়তো অন্য কোনো চরিত্রদের দিয়া বলাইতেন। রূপসজ্জা এবং নাট্যোল্লিখিত চরিত্রদের ব্যক্তিগত 'ম্যানারিজম্' বা ব্যবহার-বৈচিত্র্যকেও তিনি আবশ্যকমতো পরিবর্তন করিতেন। আলমগীর নাটকে উদিপুরী বেগম নিজ পুত্র কামবক্সকে দারার মতো সজ্জন এবং কবি-প্রকৃতির বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে; কিন্তু স্টেজে আমরা দেখিয়াছি যে, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এই কামবক্সের চরিত্রে প্রেমিক এবং দার্শনিকরূপে অভিনয় করিয়াছেন।

"পোশাক-পরিচ্ছদ এবং রূপসজ্জা ছাড়া সহযোগী অভিনেতৃদের শিশিরকুমার কথা বলার ভঙ্গী এবং উচ্চারণের সুরেও এমন বৈশিষ্ট্য দিয়াছিলেন যে, ইহার ফলে উচ্চারিত বাক্যের অর্থ এবং অনেক ক্ষেত্রে ঐ চরিত্রের মূল রূপও পরিবর্তিত হইয়া যাইত।

"'শাজাহান' নাটকে জিহান খাঁ, আলমগীরে এরাদৎ খাঁ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সীতা নাটকের বাল্মীকি ও লব চরিত্রগুলি শিশিরকুমারের হাতে নবরূপ ধারণ করিয়াছিল।

"মঞ্চের উপর দৈব-ব্যাপার প্রদর্শনের দিন অতীত হইয়া গিয়াছে। শিশিরকুমার নাট্যোল্লিখিত দৈব-ঘটনাগুলিকে হয় বাদ দিয়াছেন, নতুবা মানবীয় পরিবেশে দেখাইয়াছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রযোজকের স্বাধীনতা বিশেষ নাই; নূতন কিছু সৃষ্টি না করিতে পারিলে দৈব-ঘটনা অপ্রাকৃত পরিবেশেই দেখাইতে হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও লক্ষ্য রাখিতে হয়, যেন নাটকের রস বা ধারাবাহিকতা নষ্ট না হয়। 'নরনারায়ণ' নাটকের শ্রীকৃষ্ণ, 'সীতা' নাটকের রাম এবং 'জনা'র শ্রীকৃষ্ণ—সবাই মানুষ। এ যুগের ভাষায় বলা যায় যে, তাঁহারা সবাই অতি মানুষ, কিন্তু দেবতা নহেন। শিশিরকুমারই এই চরিত্রগুলিতে মানবীয় রীতিনীতির প্রয়োগ করিয়াছেন।

"নাটকে সাহিত্যিক প্রতিভার প্রদর্শন অভিনয়ের পক্ষে মারাত্মক। নাটকের 'স্বাভাবিকত্ব' ইহাতে নষ্ট হয়। কিন্তু তার জন্য নাটকের সাহিত্য ঔৎকর্ষও উপেক্ষণীয় নয়। নাটকও সাহিত্যের একটি অঙ্গ এবং শিশিরকুমার তৎসম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন।

"নাটকে আধিদৈবিক ইঙ্গিতের প্রয়োগ শিশিরকুমারের অন্যতম সার্থক কীর্তি। গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকে বৃন্দাবন-যাত্রার প্রাক্কালে উমাসুন্দরী পারিবারিক লক্ষ্মীর ঝাঁপিটি পুত্রবধূ জ্ঞানদার হাতে দিয়া যান। এইরূপ উল্লেখ আছে। নাটকটি মঞ্চস্থ করিবার সময় শিশিরকুমার জ্ঞানদার হাত হইতে হঠাৎ ঝাঁপিটি মাটিতে পড়িয়া গেল দেখাইলেন। হিন্দু নারীদের নিকট এই ঘটনা অত্যন্ত দুর্লক্ষণের ইঙ্গিত বলিয়া ধারণা হইয়া থাকে। শিশিরকুমার এইভাবে আধিদৈব ঘটনার প্রয়োগ করিয়া ভাবী অমঙ্গলের ইঙ্গিত দেখাইলেন। 'জনা' নাটকে যুদ্ধযাত্রার পূর্বে প্রবীর যখন তাহার স্ত্রীর নিকট বিদায় নিতেছে, তখন অকস্মাৎ তাহার গলার পুষ্পমাল্য ছিঁড়িয়া প্রবীরের স্ত্রীর অন্ধকার ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিয়া গেল।

"নাটকের প্লট যাহাতে স্বচ্ছন্দে বিকশিত হইতে পারে, তজ্জন্য নিপুণতার সহিত লেখনী ধরিতে হয়। প্লটের আকস্মিক পরিবর্তন বা অভীপ্সিত পথে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে মনস্তাত্ত্বিক কারণ থাকা চাই। এই পরিবর্তন বা পরিণতির গতি স্বাভাবিক করিবার জন্য নাট্যকারকে সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হয়। এ রকম ঘটনার সমাবেশ দেখা যায়, যেখানে নাট্যকার নাটকের গতির মোড় অকস্মাৎ ঘুরাইয়া দিয়াছেন, কোনরূপ যুক্তিসংগত কারণ না থাকা সত্ত্বেও। প্রযোজককে এই সব আকস্মিক গতি পরিবর্তনের একটা সুসংহত কারণ বা ভাষ্য উপস্থিত করিতে হয়। সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের সাহায্যে প্রযোজককে এই সব ক্ষেত্রে স্বাভাবিক পরিবেশের সমাবেশ করিয়া তুলিতে হয়। মনস্তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া শিশিরকুমার এই সব ক্ষেত্রে অসামান্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

"দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে চন্দ্রগুপ্ত মাতা মুরার নিকট নন্দের জন্য অনুনয় করিতেছিল। এই দৃশ্যটি নাটকীয় পরিবেশে এত তীব্র যে, যে-কোনো মুহূর্তে মুরা চন্দ্রগুপ্তের অনুনয়ে বিচলিত হইয়া পড়িতে পারে। এইরূপ নাটকীয় পরিবেশে শিশিরকুমার অকস্মাৎ চাণক্যকে দিয়া চন্দ্রগুপ্তকে সম্বোধন করাইলেন, এবং পরমুহূর্তেই চন্দ্রগুপ্তকে আগের কথায় ফিরিয়া যাইতে বলিলেন; কিন্তু যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ মানসিক দুর্বলতার দুর্লভ ক্ষণটি অতীত হইয়া গিয়াছে। এখন আর শত চেষ্টাতেও মুরার মন দ্রবীভূত হইবার নয়। সাধারণ দর্শকের চক্ষে চাণক্যকে দিয়া চন্দ্রগুপ্তের অনুনয়ের বাধাদানের মূল্য ধরা পড়িবে না, কিন্তু একজন মনস্তত্ত্বের অনুশীলনকারীর কাছে এই সামান্য ব্যাপারটির অসামান্য মূল্য প্রতিভাত হইবে।

"সু-উচ্চারিত পাট বলা শুধু একটি আর্ট নহে, নাটকের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবনের পক্ষে উহা অপরিহার্য। শ্রুতিমধুর হওয়াই শেষ কথা নহে, নাটকটির গল্প এবং সংলাপ ও প্লটটি যাহাতে দর্শকের নিকট সহজে বোধগম্য হয়, প্রযোজককে সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে হয়। সমসাময়িক অভিনেতাদের তুলনায় শিশিরকুমার উচ্চারণ বিষয়ে যে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন, এ তাঁহার নিকৃষ্টতম শত্রুও স্বীকার করিবে। উচ্চারণে সাফল্যলাভের কারণ এই ছিল যে, শিশিরকুমার মাত্রা, লয়, মান ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন।

"অভিনেতাদের ব্যক্তিগত চেহারা, ব্যবহার, চলাফেরা, স্বর ইত্যাদি বিচার করিয়া শিশিরকুমার তাঁহাদের পার্ট নির্দিষ্ট করিতেন। এই রীতির ব্যতিক্রম করার অর্থই হইতেছে শিল্পের মূল সংজ্ঞাকে অস্বীকার করা। যথাযথ অভিনেতৃ নির্বাচনে শিশিরকুমারের দক্ষতা অনস্বীকার্য।

"পোশাক-পরিচ্ছদ নির্বাচনে, পশ্চাৎপট এবং আলোকসম্পাত বিষয়ে শিশিরকুমারের দৃষ্টি প্রখর ছিল। 'রঘুবীর' নাটকে দুইটি মনস্তাত্ত্বিক প্রবাহ বিদ্যমান, এবং নাটকের শেষ দৃশ্যে ভিতরের ধারাটি পরিণতি লাভ করিয়াছে। সমগ্র নাটকটি

ন।।ত-প্রোজ্জ্বল আলোকের দ্বারা উদ্ভাসিত করা হইয়াছে। আলোক-সম্পাতের এই আধুনিক টেক্‌নিক্ দর্শকদের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। ‘শাজাহান’ নাটকের একটি দৃশ্যে, যেখানে সপরিবার দারা মরুভূমির ভিতর দিয়া চলিয়াছে, সেখানে সমগ্র দৃশ্যে একটি কথাও নাই ; পরবর্তী দৃশ্যে তাহারা নীরবতা ভঙ্গ করিয়াছে। এই নিঃশব্দ যাত্রা অভিনয়ের ঔৎকর্ষের সাক্ষ্য দেয় এবং দর্শকরা অভিভূত হইয়া পড়ে। ‘সীতা’ নাটকে নেপথ্য সঙ্গীতের দ্বারা অতীত দুঃখের পরিবেশ সৃষ্টি করা হইয়াছে।

“মূক অভিব্যক্তি বিষয়ে আমার জ্ঞান যাহা, তাহাতে আমি বলিতে পারি যে, শিশিরকুমারের জ্ঞান এই বিষয়ে গভীর ছিল। তাঁহার কয়েকটি অভিব্যক্তি খুবই বৈজ্ঞানিক-সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিতে পারি। ‘আলমগীর’ নাটকে দিলীর খাঁ যখন দুর্গাদাসের প্রশস্তি করিতেছিল তখন শিশিরকুমারের অঙ্গুলিসঞ্চালন আলমগীরের অসহিষ্ণুতা যেরূপ প্রকাশ করিয়াছে তাহার তুলনা নাই।

“‘ষোড়শী’ নাটকে ষোড়শী যখন কাগজপত্র জীবানন্দের হাতে তুলিয়া দিল, তখন ঐ কাগজগুলিকে শিশিরকুমার দাঁত দিয়া কামড়াইয়াছেন। অন্তরের দ্বন্দ্ব হইতে পরিত্রাণ-প্রয়াসের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অভিব্যক্তি আর কি হইতে পারে জানি না।

“অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ দক্ষতা এবং সুরুচির পরিচয় দিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রত্যেকটি অভিব্যক্তিই বৈজ্ঞানিক-সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। অনেকের কাছে শুনিয়াছি, ‘শিশিরবাবু অমুক অমুক অভিব্যক্তি প্রায় করেন, এটা তাঁর মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়েছে।’ হায়, বন্ধুরা অভিব্যক্তি কতোটুকুই বা জানেন! কীই বা তাঁহারা বোঝেন বা বোঝাইতে পারেন!

“প্রযোজকরূপে শিশিরকুমারের স্থান অদ্যাবধি অদ্বিতীয় হইয়া আছে, একথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে।”

নাটকের পাত্রপাত্রীর সাজ-সজ্জা বিষয়ে শিশিরকুমারের সূক্ষ্ম দৃষ্টির কথা রাখাল-দাসবাবু উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে ‘তপতী’র উল্লেখ করা যেতে পারে—শিশিরবাবু এ নাটকটি মঞ্চস্থ করার অল্প কিছুদিন আগেই রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোতে এ নাটকের অভিনয় করান। ঠাকুরবাড়ির প্রোডাকসনে জলন্ধরের অধিবাসী এবং কাশ্মীরীদের ভেতর সাজ-সজ্জার তারতম্য বিশেষ লক্ষ্য করা যায় নি—কিন্তু যাঁরা উভয় প্রোডাকসনই দেখেছেন, তাঁদের মতে নাট্যমন্দিরের প্রোডাকসনে কাশ্মীরীদের সাজসজ্জায় শিশিরকুমার তাদের দেশের বৈশিষ্ট্য রাখবার চেষ্টা করেছিলেন।

আর একটি কথাঃ ম্যাথু আর্নল্ড তাঁর ‘কালচার এবং এনার্কি’ বইতে একটি সার কথা বলেছেন—Culture is retaining what you have and progressing. শিশিরবাবু এই সার-তত্ত্বটি অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতেন—তাই গিরিশ-অর্ধেন্দু প্রদর্শিত পথেই তিনি বাংলার নাটক অভিনয়কে এগিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন এবং এ বিষয়ে সাফল্য হয়েছিল গগনচুম্বী। পূর্ব-সূরীদের প্রতি তিনি যে শ্রদ্ধা দেখিয়ে গেছেন তার তুলনা হয় না। দানীবাবুর কণ্ঠস্বরের কথা বলতে গিয়ে সব সময়েই মন্তব্য করতেন—‘এমন অদ্ভুত গলা যদি আমি পেতাম!’ এমন কি অমর দত্ত মহাশয়ের বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আমাকে একদিন বলেছিলেন যে, ওরকম গলার টিম্বার আজকাল পাওয়া যায় না। আর গিরিশচন্দ্র এবং অর্ধেন্দুশেখর সম্বন্ধে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বহু সময়েই শিশিরকুমার নানাভাবে অন্তরের শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। শ্রীরঙ্গমের শেষ অবস্থায় কয়েকটি নাটকে তিনকড়িবাবুকে নিয়ে শিশিরকুমার অভিনয় করেছিলেন। প্রচারপত্রে সব সময়েই শিশিরকুমারের আগে তিনকড়িবাবুর নাম থাকতো। আমি এ নিয়ে প্রশ্ন করাতে শিশিরকুমার আমাকে বলেছিলেন যে, তিনকড়িবাবু বয়োজ্যেষ্ঠ এবং সে সম্মান তাঁকে দেখানো তাঁর কর্তব্য।

আর আধুনিক যুগের কোন নাট্যাচার্যকে দেখেছি শিশিরকুমারের প্রতি কোনরকম শ্লেষ প্রকাশ করতেই তাঁর বাধে নি। শিশিরকুমার নাকি এসেছিলেন কিছুটা ফিউড্যাল আবহাওয়া নিয়ে। মার্ক্সবাদের বদহজম যে এদেশের একশ্রেণীর লোককে কি পথে পরিচালিত করে চলেছে তা এ থেকেই বোঝা যায়। এই নাট্যাচার্যটি সাহিত্যসম্রাট শরৎচন্দ্রকেও ‘স্টার লেখক’ বলে শ্লেষের সঙ্গে তাঁর বইতে উল্লেখ করেছেন। প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়—‘মশায়, স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশের যুবশক্তিকে গড়ে তুলতে “পথের দাবী”র অবদানের কথাটা কি বিস্মৃত হয়েছেন?’

তবে সব বড় প্রতিভাকেই বোধহয় কুচক্রীদের কাছ থেকে কিছু না কিছু দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছে—আমাদের দেশে মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এ থেকে বাদ পড়েন নি? হেনরী আর্ভিং—যাঁকে বলা হয় ‘ফাদার অভ দি ইংলিশ স্টেজ’—এত বিশ্রীভাবে ক্ষুদ্রচেতা সমালোচকদের দ্বারা সময়ে সময়ে আক্রান্ত হয়েছেন যে গর্ডন ক্রেগ একবার এ বিষয়ে আর্ভিং-এর মৃত্যুর পর আর্ভিং-এর সমর্থনে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং তার নামকরণ করেছিলেন, ‘How they killed Carsar.’

শিশিরোত্তর যুগে একমাত্র প্রতিভাবান প্রডিউসার উৎপল দত্তকেও কম দুর্ভোগ সইতে হচ্ছে না। তাঁর ‘কল্লোল’ নাটকটি সারা কলকাতায় একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে—অথচ বেশ কিছুদিনের জন্য সংবাদপত্রগুলির তরফ থেকে এ নাটকের বিজ্ঞাপন নেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হোল। অপরাধ? না এ নাটকে কমিউনিজম প্রচার করা হচ্ছে—এতে হিস্ট্রীকে ডিস্টর্ট করা হয়েছে। অথচ মনোযোগ দিয়ে নাটকটি দেখলেই বোঝা যেত যে এতে আসলে দেশপ্রেমেরই প্রচার করা হয়েছে এবং ইতিহাসকে কোনো জায়গায় বিকৃত করা হয় নি। যাক দিল্লীর সংগীত নাটক আকাডেমী নাটকটিকে বৎসরের সেরা প্রডাকসন বলে পুরস্কৃত করে উৎপল দত্তের বিরুদ্ধবাদীদের মুখর ভাষণ নিস্তব্ধ করে দিয়েছেন। এখানকার ফিরিঙ্গী কাগজের সমালোচকটি এখন কি বলেন? তিনি তো কল্লোলকে ম্যাজিক এবং তামাসার পর্যায়ে নিয়ে ফেলেছিলেন। ভাল ভাল কাগজ থেকে এ শ্রেণীর নাট্য ক্রিটিকের দল যতদিন না অপসারিত হবে, ততদিন আমাদের দেশের নাট্যমঞ্চের কোন উন্নতির আশা নেই। এদিকে আমি কাগজের মালিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ম্যানেজ-মেণ্ট যদি সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে দেন যে, নাট্যাভিনয়ের সমালোচনা করতে হলে honest criticism করতে হবে এবং দলাদলির ভাবটা ভুলে যেতে হবে—তাহলেই আমাদের দেশের কাগজের নাট্য-সমালোচনা অনেকটা উচ্চ পর্যায়ে উঠতে পারবে। অবান্তর মন্তব্য করা চলবে না—যেমন করেছিলেন ঐ ফিরিঙ্গী পত্রিকার সমা-লোচকটি আশ্রমিক সঙ্ঘের ‘মায়ার খেলার’ মঞ্চ রূপায়ণের—অভিনয়ে ভুল-ত্রুটি হয়েছিল এবং সেকথা তিনি লিখেছিলেন তাতে কারও আপত্তি থাকতে পারে না—কিন্তু অযথা রবীন্দ্রনাথের মিউজিক্যালস্ সম্বন্ধে কতকগুলো অবান্তর কথা বলার অধিকার তাঁকে কে দিল?

[ক্রমশঃ]

রূপজগতে

শিশুদের চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাগৃহ

এক সংবাদে প্রকাশ, চতুর্থ পরিকল্পনায় বিভিন্ন রাজ্যে চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কোন কোন রাজ্য সরকার এবং সমবায় সংস্থা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের ব্যাপারে ঋণ দানের জন্য জীবনবীমা কর্পোরেশনের কাছে আবেদন করার কথাও সংবাদে প্রকাশ পেয়েছে।

দেশে আরো অধিক সংখ্যক প্রেক্ষাগৃহের দরকার আছে। রাজ্য সরকার এবং সমবায় সংস্থা যদি এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করে তবে প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে। প্রেক্ষাগৃহগুলিতে দর্শকদের যেরূপ লাইন থাকে এবং প্রেক্ষাগৃহের অভাবে আঞ্চলিক ছবি মুক্তিলাভ করতে পারে না। এ-ক্ষেত্রে আরো অধিক সংখ্যক প্রেক্ষাগৃহ নির্মিত হলে আনন্দ উপভোগের ব্যাপারটা আরো সহজ হবে। জামা-কাপড় ছিঁড়ে টিকেট কেনা এবং টিকেটের চোরাবাজার থেকে দর্শকরা রেহাই পাবে।

ইতিপূর্বে বিভিন্ন মহল থেকে চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণে আরো অনুমতি দানের কথা সরকারকে বলা হয়েছিল। বাংলা ছবির মুক্তিলাভে আজ যে অসুবিধা দেখা দিয়েছে এবং একদল মুনাফাবাজ প্রেক্ষাগৃহ মালিক চলচ্চিত্র ব্যবসাকে যেভাবে কুক্ষিগত করে রেখেছে, এই অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে রাজ্য সরকারগুলির প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণে উদ্যোগী হওয়া উচিত। আমাদের মতে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের পরিবর্তে সমবায় সংস্থাগুলিকে সুযোগ দেওয়া দরকার। সিনেমা কর্মচারী সমবায়, টেকনিশিয়ান সমবায়, অভিনেতা সমবায়সমূহকে এই ব্যাপারে জীবনবীমা কর্পোরেশন এবং রাজ্য সরকার যদি সাহায্য করে তবেই সমবায় ভিত্তিতে অধিক প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ সম্ভব। সমবায় ভিত্তিতে সিনেমা নির্মিত হলে ব্যক্তিগত মালিকদের প্রাধান্য ও মুনাফা-লালসা কিছুটা রোধ করা যাবে। নতুন প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের ব্যাপারে এমন শর্ত রাখা দরকার যে, বছরে অন্তত নয়মাস কেবলমাত্র বাংলা ছবি দেখান বাধ্যতামূলক। বাংলা ছবি দেখাবার ক্ষেত্র যদি সম্প্রসারিত করা না হয়, তবে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। বিশেষ করে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতার নামে একদল বাঙালী যেভাবে হিন্দী ছবি নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছেন, তার গতিরুদ্ধ করা এবং ওদের মুখোস উন্মোচন না হলে অদূরভবিষ্যতে বাংলা ছবির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকবে কিনা সন্দেহ। এই অবস্থায় রাজ্য সরকারকে বাংলা ছবির স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে। রাজ্য সরকার যদি চতুর্থ পরিকল্পনায় প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা বৃদ্ধির কথা ভাবেন তবে সমবায় ভিত্তিতে তা' করার কথাই ভাবা উচিত।

এই প্রসঙ্গে শিশু চলচ্চিত্রের কথা এসে যায়। ভারতে কোথাও শিশুদের জন্য স্বতন্ত্র সিনেমা এখনো নির্মিত হয় নি। দেশে শিশু চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে, শিশুদের নাটক-অভিনীত হচ্ছে, পাপেট তৈরি হচ্ছে, কিন্তু শিশুদের উপযোগী কোন প্রেক্ষাগৃহ নির্মিত হয় নি। কলকাতার মত শহরে এরূপ একটি প্রেক্ষাগৃহের খুবই প্রয়োজন। যেখানে শিশুদের জন্য তাদের উপযোগী ছবি দেখাবার ব্যবস্থা থাকবে। এরূপ প্রেক্ষাগৃহ কেবলমাত্র শিশুদের আনন্দ বিধান নয়, শিক্ষার দিক থেকেও সহায়ক হবে। শিশু চলচ্চিত্র পর্ষৎ, শিশু-রঙমহল, দি পাপেটস্ এবং শিশুদের আনন্দ বিধানের জন্য গঠিত অন্যান্য সংস্থার সহযোগে রাজ্য সরকার এ রকম ব্যাপারে উদ্যোগী হতে পারেন।

—সুজন।

'দি প্রাইজ' ছবির নায়িকা এলকে সোমার

চিত্র আলোচনা

ফোর ডেজ ইন নভেম্বর

প্রেসিডেন্ট কেনেডি হত্যার তৃতীয় বর্ষান্তেও আমেরিকায় এ নিয়ে কানাঘুষার শেষ হয় নি। যেভাবে সংবাদপত্রে সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে—অর্থাৎ অসওয়াল্ড নামক যুবক কেনেডিকে হত্যা করেছে—একথা মার্কিন জনসাধারণ একেবারে হজম করে নিতে পারছে না। অসওয়াল্ড আসলে খুনী কিনা এ ব্যাপারে আমেরিকায় কিছু মানুষের সন্দেহ আছে। সম্প্রতি অসওয়াল্ডের মা এক বিবৃতি প্রকাশ করেছেন। তাঁর ছেলে যে হত্যাকারী একথা তিনি মেনে নিতে পারছেন না, তিনি মনে করেন ঠিক তদন্ত হয় নি। সম্প্রতি এ ধরণের আরো বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে। এতে বোঝা যায় কেনেডি হত্যার প্রকৃত রহস্য এখনো উদ্‌ঘাটিত হয় নি।

এই পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'ফোর ডেজ ইন নভেম্বর' নামক একটি তথ্য চিত্র নির্মিত হয়েছে, এবং ছবি কলকাতায় নিউ এম্পায়ারে মুক্তিলাভ করেছে। ছবিটিতে কেনেডির সস্ত্রীক টেক্সাসে আগমন থেকে হত্যা এবং নিউইয়র্কে শেষ-কৃত্য পর্যন্ত দেখান হয়েছে। ছবিটিকে হৃদয়গ্রাহী করার মত দৃশ্য যোজনাও রয়েছে। কিন্তু ছবিটি দেখে অসওয়াল্ড যে প্রকৃত হত্যাকারী তা প্রমাণ করা যায় না বরং প্রশ্ন আসে সাংবাদিক সম্মেলনে জ্যাক রুবী অসওয়াল্ডকে হত্যা করল কেন? তাতো ক্রুদ্ধ জনতার ক্রোধ নয়। এক ব্যক্তি অতি চতুরতার সঙ্গে হত্যা করল। তা কি হত্যারহস্যকে গোপন করার পরিকল্পিত ব্যাপার? কমেন্টারী শুনে এবং ছবি দেখে মনে হয় মার্কিন সরকার কেনেডি হত্যার ব্যাপার নিয়ে এখনো বিব্রত আছে।

ফিল্ম

এই পত্রিকাটি চলচ্চিত্র উৎসাহী মহলে ইতিমধ্যে স্থান করে নিয়েছে। ফিল্ম-এর শারদ সংকলন সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক প্রমুখের রচনা, জাঁ লুক গদার এবং 'নায়ক'-এর চিত্রনাট্য এই সংখ্যার আকর্ষণ। যাঁরা চলচ্চিত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে চান তাঁরা এই পত্রিকাটি পড়তে উৎসাহ বোধ করবেন। এই সংকলনে কেবল মাত্র

'দুষ্টু প্রজাপতি' ছবিতে পদ্মা দেবী ও তনুজা

ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনের চলচ্চিত্র নিয়ে আলোচনা আছে। কিন্তু বর্তমান জগৎ দু-ভাগে বিভক্ত, এক ভাগে চলচ্চিত্রের অবলম্বন ব্যক্তি-কেন্দ্রিক জীবন ও নানা বিকৃতি, আর অন্যদিকে সামগ্রিকতা ও সমাজজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে ছবির কাহিনী ও আঙ্গিক সৃষ্টি হয়। সেই সমাজতান্ত্রিক জগতের ছবি সম্পর্কে ধনতান্ত্রিক জগতের চলচ্চিত্র পত্রিকাগুলি কিছুটা নীরব থাকে। কারণ সস্তায় যৌন আকর্ষক ও তারকাপ্রথার চাকচিক্য সেখানে না থাকায় সম্পাদকরা ব্যবসা দৃষ্টিকোণ থেকে তেমন সুবিধা করতে পারেন না। আলোচ্য পত্রিকায়ও সমাজতান্ত্রিক জগতের ছবির আলোচনা নেই। আজকের দিনে যাঁরা সুস্থচিন্তার ছবিতে বিশ্বাসী এবং চলচ্চিত্রকে মুনাফাবাজদের কবল থেকে মুক্ত রাখতে চান তাঁদের উচিত সমাজতান্ত্রিক দেশের ছবির আলোচনায় উৎসাহ দেওয়া। শারদ সংকলনে সত্যজিৎ রায়ের 'আমি ও আমার ছবি' পাঠক মহলে বিতর্ক সৃষ্টি করবে। এই মূল্যবান লেখাটিতে সরলভাবে সত্যজিৎবাবুর আত্মপরিচয় পাওয়া গেছে। প্রমথেশ বড়ুয়াকে 'প্রিন্স' বলে উল্লেখ করাতে অনেকে ক্ষুণ্ণ হবেন। ছবির ভাল-মন্দ লাগা সম্পর্কে শ্রীরায়ের নিজস্ব মত থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রমথেশ বড়ুয়াকে জনসাধারণ প্রিন্স বলে জানত না, জানত শক্তিশালী পরিচালক হিসাবে।

আলোচ্য সংকলনে যেমন ভাল লেখা আছে তেমন মৃণাল সেন প্রমুখের ফাঁকির লেখাও আছে।

নাটকের কথা

'দাবী' নাটকের শতরজনী স্মারক উৎসব

স্টার থিয়েটারের 'দাবী' নাটকের শতরজনী অভিনয়ের স্মারক উৎসব গত ২৩শে নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। প্রধান অতিথি ছিলেন সাহিত্যিক শ্রীমনোজ বসু।

সোভিয়েট ছবি 'ওয়ার এ্যান্ড পীস'-এ বরোদীন যুদ্ধের দৃশ্যঃ ছবিটির পরিচালক এস, বন্দরচুক

নাট্যকার শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত রচিত ও পরিচালিত 'দাবী' নাটকটি স্টার থিয়েটারে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছে। এই নাটকে সমাজের নিচু ও উঁচুস্তরের মানুষের মানসিকতা ও তাদের মানসিক বৈষম্য তুলে ধরা হয়েছে।

স্মারক উৎসবে নাটকে অংশ গ্রহণকারী শিল্পী ও নেপথ্য কলাকুশলীদের স্টার থিয়েটার কর্তৃপক্ষ পুরস্কার দান করেন। সভাপতি স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ নাট্যকারকে আশীর্বাদ করে নাট্যকার শ্রীগুপ্ত ও স্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শ্রীসলিল মিত্রকে তাঁর লেখা একখানি বই উপহার দান করেন। অনুষ্ঠানান্তে পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে 'দাবী' নাটকের ১৩৩তম অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়।

ডাইভোর্স

কুমারডুবি (পটারী) বাণীমন্দির ক্লাব কর্তৃক গত ১৯শে নভেম্বর শনিবার ৭-৩০ ঘটিকায় শৈলেশ গুহনিয়োগী রচিত "ডাইভোর্স" নাটকটি অভিনীত হয়। নাটক পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন বাণীমন্দির ক্লাবের সেক্রেটারী শ্রীবিমলেন্দু কবিরাজ। বিভিন্ন চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেন অরূপ সিকদার, পার্থসারথী মিত্র, বাবলী ব্যানার্জী, আনন্দ ব্যানার্জী, আনন্দ মজুমদার, নারাণ আইচ, সলিল চৌধুরী এবং মহুয়ার চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন মঞ্জু মিত্র।

বিচিত্রানুষ্ঠান

গত ২০শে নভেম্বর বাউরিয়া প্লোস্টার কেবলস রিক্রিয়েশন ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় ক্লাবপ্রাঙ্গণে বিরাট বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে নৃত্যবিদ্ নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের নৃত্যের ব্যবস্থা হয়। কৃষ্ণা রায়ের ভারতনাট্যম, অনুপশঙ্কর ও শ্রীমতী উমা দত্তের পাঞ্জাবী ভাঙ্‌রা, পাপড়ি বোস ও কৃষ্ণা রায়ের রাজস্থানী লোকনৃত্য, চৈতালী সেন ও অনুপশঙ্করের জেলে-জেলেনী নৃত্য দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ করে। নৃত্য সুরযোজনা করেন—অরবিন্দ মিত্র, অনিল ঘোষ, শঙ্করপাণ্ডিত, কালাচাঁদ চ্যাটার্জী। কণ্ঠসংগীতে—সংগীতবিশারদ রমেন দে, কালিদাস চ্যাটার্জী, শঙ্কর চ্যাটার্জী, অমল মুখার্জী প্রমুখ আনন্দ দান করেন। শ্রীরবীন পাল ও তাঁর সম্প্রদায় যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করেন। ইহা ছাড়া হরবোলা ও মাউথ অর্গানের শিল্পিবৃন্দও অংশ গ্রহণ করেন। বিচিত্রানুষ্ঠানের শেষে ক্লাবের সভ্যবৃন্দ কর্তৃক সৌমেন চট্টোপাধ্যায়ের 'বোবা-কান্না' সুঅভিনীত হয়।

'তিসরি কসম' ছবির নায়িকা ওয়াহিদা রহমান

সারা বাংলা শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষার্থী সম্মেলন

উত্তরী সঙ্গীত সমাজ আয়োজিত ২য় বার্ষিক 'সারা বাংলা শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্মেলন' আগামী ৩রা ও ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৬৬ বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী হলে (২ সি, কে, সি, বোস রোড, শ্যামবাজার) প্রত্যহ সন্ধ্যা পাঁচটায় অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলনে বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিভাবান সঙ্গীত শিক্ষার্থীরা অংশ গ্রহণ করবেন।

মুকুলবীথির বিজয়া সম্মিলনী

গত ১৯শে নভেম্বর মুকুলবীথির শিশুরা তাদের বাবা-মা অভিভাবক ও শিক্ষিকাদের সঙ্গে একটি সভায় মিলিত হয়ে 'বিজয়া উৎসব পালন করেছে। শিশু ভবনের মণ্ডপে নাচ-গান আবৃত্তি ও ম্যাজিক দেখিয়ে শিশুরা বড়দের সকলকে আনন্দ দিয়েছে। কয়েকজন অভিভাবক এবং মায়েরাও ছোটদের উপযোগী সুন্দর গান ক'রে শিশুদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছেন। যন্ত্রসঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেছেন মুকুলবীথির গীটার ক্লাশের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। উৎসবে পৌরোহিত্য করেন শ্রী এন কে ঘোষ, এম-এল-সি।

এই উপলক্ষে আয়োজিত মুকুলবীথির "মুকুল"দের হস্তশিল্প প্রদর্শনীটি খুব সুন্দর হয়েছে।

শিশু রংমহল

শৌভনিক-এর সহযোগিতায় মুক্ত-

আর্টুরো উই-এর ভূমিকায় এক্কেহার্ট শাল্, অভিনেত্রী হচ্ছেন রুথ ড্রেকসেল

অংগন রঙ্গালয়ের উন্নয়নকল্পে প্রখ্যাত শিশু সংস্থা "শিশু রংমহল" (সি, এল, টি) মুক্তঅংগনে পর পর কয়েকটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন।

এই পরিকল্পনার প্রথম প্রদর্শনী রবিবার ৪ঠা ডিসেম্বর বেলা ৩-৩০টায় মুক্তঅংগনে 'পাপেট শো' 'বোম্বিং মাউস' অনুষ্ঠিত হবে।

রবীন্দ্রকাননে সংগীতানুষ্ঠান

রবীন্দ্রকানন সার্বজনীন দুর্গোৎসব ও জাতীয় প্রদর্শনীর পূজাংগনে সম্প্রতি বিজয়া সম্মিলনী উপলক্ষে সংগীতানুষ্ঠান ও অভিনয় হয়েছে। সংগীতে অংশ গ্রহণ করেন হৈমন্তী শুক্লা, মাঃ তিলক, কানাই ঘোষাল, দীপক সরদার প্রমুখ। সংগীতানুষ্ঠানের পর রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউটের প্রযোজনায় বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের "গণ্শার বিয়ে" নাটকটি মঞ্চস্থ হয় অমল সরকারের নির্দেশনায়। হাস্যরসাশ্রিত এই নাটকে সুঅভিনয় করেন, অমল সরকার (গণেশ), অসীম সরকার (গোরাচাঁদ), দেবু ঘোষ (ঘোৎনা), স্বপন রুদ্র (রাজেন), অজিত বসাক (ত্রিলোচন), অরুণ ঘোষ (কে, গুপ্ত), অঞ্জলিকা গাঙ্গুলী (পুটু) ও সঞ্জিত ঘোষ (নাপিত)। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেন, বিমল মাঝি, পণ্টু সেন, দুলাল দে, নিত্য ব্যানার্জী, অমর চ্যাটার্জী, স্বপন পাল, জয়দেব দে, দিলীপ সেন প্রমুখ। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন অজিত শীল ও হীরেন সেন।

অভিনেতা এক্কেহার্ড শাল্

এক্কেহার্ড শাল্-এর জন্ম ১৯৩০ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন শেষ হয়, তখনো তিনি স্কুলের ছাত্র। সে সময়ে মাগডেবুর্কে থিয়েটারে অভিনয় শুরু করেন। অভিনয়ে শিক্ষাও পান। কয়েক বছর কাটে ছোটখাট কয়েকটি মঞ্চে কাজ করে। বার্লিনেয়ার অ্যাসেম্বল থেকেই তাঁর শিল্পিজীবন শুরু বলা চলে।

এখানে তাঁর প্রথম অভিনয় ব্রেখটের 'জেনোরা কারারের রাইফেল' নাটকে ইওজের ভূমিকায়। পরে 'মাদার কারেজ' নাটকে আইলিফের ভূমিকায়। পরবর্তী কালে তাঁর ওপরে অনেকগুলি শিল্পগত দায়িত্ব এসে পড়ে। নানা ভূমিকায় নামতে হয় তাঁকে। যেমন সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে লেখা স্ট্রিট মার্টের 'কাৎস গ্রাবেন' নাটকে তরুণ চাষী, 'ককেশিয়ান চক সার্কেল'-এ আইডে সালভা, সীনগের 'দি প্লেবয় অব দি ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড'-এ শন কেওগ, 'লাইফ অব গ্যালিলিও' নাটকে আন্দ্রিয়া ইত্যাদি।

অভিনেতা-সুলভ চমক তাঁর চেহারায় একেবারে নেই। বেঁটেখাটো শক্ত সমর্থ গড়ন, মাথায় টাক পড়ে আসছে, ছোট ছোট ধারালো দুটি চোখ। সাধারণ বিচারে সুপুরুষ কোন দিক থেকেই নয়। প্রথম দর্শনে মনেই হয় না যে মানুষটির মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু আছে। কিন্তু আশ্চর্য, মঞ্চে যখন অবতীর্ণ হন তখন একেবারেই অন্য মানুষ! হয়ত শরীরের অল্প একটু ঝাঁকুনি, হয়ত গলার স্বরের অল্প একটু পরিবর্তন, তারই মধ্য দিয়ে ঘটে একটি চরিত্রের নির্মম উদ্ঘাটন, সৃষ্টি হয় মনোমুগ্ধকর একটি পরিমন্ডল। তবে সর্বক্ষেত্রেই এমনটি ঘটেছে তা বলা চলে না। বার্লিনেয়ার অ্যাসেম্বলে এই তরুণ

মুকুলবীথির বিজয়া সম্মিলনীতে নৃত্য পরিবেশন করছে কাকলী বসু, রীতা ঘোষ, রিংকু মুখার্জী, ও শম্পা মিত্র।

অভিনেতার কোন কোন চরিত্র রূপায়ণ অগ্রাহ্য হয়েছে। যেমন 'স্বাদার কারেজ'-এ যখন তিনি আইলিফের চরিত্র অভিনয় করতে শুরু করেন বা 'ভিনটের শালখট্'-এ ইওহানেস হোর্ডার-এর, তখন গোড়ার দিকে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। যদিও অধিকাংশ দর্শক স্বীকার করেছিলেন যে তাঁর মধ্যে শিল্পগত দক্ষতা কিছু আছে, তা সত্ত্বেও অভিনেতা হিসেবে কেউ তাঁকে উচ্চস্থান দিতে পারে নি। কেন না তিনি হাত নাড়াতেন ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে, তাঁর অভিনয়-রীতি বার্লিনেয়ার অ্যাসেম্বলের ঐতিহ্যের সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খেত না। তবে এমন লোকও কিছু ছিলেন যাঁদের ধারণা হয়েছিল যে তিনি অসাধারণ প্রতিভাবান। এই অবিমিশ্র অনুরাগীদেরই একজন ছিলেন ব্রেখট। ব্রেখট চাইতেন যে শাল্ তাঁর নিজস্ব ধরণে অভিনয় করে চলুক, নিজের পছন্দ-অপছন্দকে এক্ষেত্রে তিনি প্রাধান্য দিতেন না। ব্রেখট জানতেন অভিনেতা হিসাবে শাল্ অসাধারণ প্রতিভাবান। এই প্রতিভার যাতে স্ফূরণ ঘটে সেজন্যে এই তরুণ অভিনেতাকে তিনি নিজস্ব ধরণে অভিনয় করতে দিতেন।

তাঁকে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয় নি। খুব বেশি করেও যদি ধরা হয় আর্টুরো-উই-এর ভূমিকায় অভিনয় পর্যন্ত। তারপরে আর কোন সন্দেহ থাকল না যে এক্কেহার্ড শাল্ হচ্ছেন ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। প্যারিসে বার্লিনেয়ার অ্যাসেম্বল-এর অভিনয়ের পরে সমালোচকরা লিখলেন যে—ভাবভঙ্গিমায় সমৃদ্ধ অভিনয়ের জন্য চ্যাপলিনের পরেই যদি কারও নাম করতে হয় তো তিনি হচ্ছেন এক্কেহার্ড শাল্। ১৯৬৫ সালে বার্লিনেয়ার অ্যাসেম্বল-এর ইউরোপ সফরের সময়ে শেক্সপীয়রের 'কোরিওলেনাস'-এর ব্রেখটীয় ভাষ্যের অভিনয় যে উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছে তার মূলে নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ অভিনেতার অবদান বড় কম নয়।

শাল্-এর অভিনয়ে চরিত্রের ভিতরটি যেন বেরিয়ে পড়ে, শল্যচিকিৎসকের ছুরি চালানোর মত। তখন বোঝা যায়, অভিনীত চরিত্রে কোন কোন লক্ষণ আছে যা ঠিক মানবিক নয়, তার ব্যক্তিত্বের কোন বিশেষ দিকটি পরিবর্তিত করা চলে, কোন কোন ভুলের প্রতিকার সম্ভব।

'আর্টুরো উই' চরিত্রে অভিনয়ের সময়ে তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন হিটলার নামক একজন ব্যক্তিকে নিয়ে যে উপকথা সৃষ্টি হয়েছে তা পুরোপুরি ধ্বংস করতে। যে হিটলার 'দুর্বোধ্য মোহ' বিস্তার করে একটি জাতিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পেরেছিল। এই 'প্রতিরোধ্য উত্থান'-এর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিটি যেমন তিনি তাঁর অভিনয়ে মূর্ত করে তুলেছিলেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে অজস্র সংবাদচিত্র ও দলিলচিত্র দেখে দেখে এই লোকটির হাত-পা নাড়ার প্রতিটি বিশেষ ভঙ্গি ও প্রতিটি মুদ্রাদোষ হুবহু অনুকরণ করার ক্ষমতা আয়ত্ত করেছিলেন। একজন রাজনৈতিক মোহসৃষ্টিকারীর চটকদার অবয়বটিকে তিনি ধূলায় মিশিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর সস্তা ও খেলো কৌশলের কাঠামোটিকে চোখের সামনে তুলে ধরে। শিল্পগত কারুকার্য গঠনে অক্লান্তকর্মী শাল্ এই চরিত্রটির মধ্যেই যেন অমূল্য এক সম্পদের সন্ধান পেয়েছেন। তাঁর অভিনয়ে চরিত্রটি সর্বাধিক মাত্রায় আতিশয্যমণ্ডিত, ফলে চরিত্রটিকে প্রায় হাস্যকর মনে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই মানবরূপী দানবের ভয়ংকরত্ব বিন্দুমাত্র লাঘব হয় না।

কোরিওলেনাস চরিত্রের অভিনয়ে প্রকাশ পেয়েছে একজন মানুষের ক্রোধ, ক্ষমতার অপব্যবহারে যে ক্রোধ উদ্দীপ্ত। কিন্তু এই ক্রোধেই শেষ নয়। কোরিওলেনাস প্রথমে ছিল রোমের রক্ষক, পরে বিপজ্জনক শত্রু। শাল্-এর অভিনয়ে বোঝা যায় ঠিক পথে চললে এই মানুষটি কি হতে পারত।

স্টুডিও খবর

মেরা ভাই : মণিহার-এর হিন্দীরূপ

বাংলা 'মণিহার' ছবিটি শীঘ্রই হিন্দীতে রূপান্তরিত হচ্ছে। শ্রীঅরূপ প্রোডাকসন্সের প্রযোজনায় 'মণিহার'-এর হিন্দীরূপের নাম হবে 'মেরা ভাই'। চিত্রগ্রহণের অধিকাংশ কাজ পশ্চিমবঙ্গে হবে। এই ছবিটিও পরিচালনা করবেন—মণিহার-এর পরিচালক সলিল সেন। প্রধান দু-টি চরিত্রে অভিনয় করবেন উত্তমকুমার ও দেব

বিশ্বসুন্দরী রীতা ফারিয়ার

'অবকুন' ছবিতে অনিতা গুহ, শঙ্কর নারায়ণ, মাঃ শঙ্কর ও সুশোভন

মুখার্জী (বোম্বাই)। সুর সংযোজনা করবেন শচীনদেব বর্মণ, সংলাপ লিখছেন রাজেন্দ্র সিংহবেদী।

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায়ণ

মূল্য ঃ দুই টাকা

"অমূল্য গ্রন্থ হয়েছে।"
—স্বামী অপূর্বানন্দ।

"বইখানি নতুন ধরণেরই হয়েছে।"
—স্বামী সদাত্মানন্দ।

"বইখানি দেখিতে সুন্দর, বিষয়বস্তু অমল ও অতুলনীয়। একখানি গ্রন্থে এত মহামূল্য রত্নের সন্নিবেশ পূর্বে আর হয় নাই।"
—স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী।

মহাকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বৃত্র-সংহার কাব্য

দাম ঃ ২·৫০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

বিবর

শ্যামল মিত্র তাঁর 'বিবর'-এর কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছেন। আগামী বছরের প্রথমেই ছবিটির স্যুটিং আরম্ভ হবে। সমরেশ বসুর এই উপন্যাসটি বহু- বিতর্কিত। একে চলচ্চিত্রে রূপ দেবার সার্থকতা আছে কি না সে সম্পর্কেও প্রশ্ন আছে। 'পাড়ি'র পরিচালক জগন্নাথ চক্রবর্তী 'বিবর' পরিচালনা করবেন। উত্তমকুমার থাকবেন প্রধান ভূমিকায়।

আলোয় ফেরা

শ্রীগুরুচিত্রমের প্রথম ছবি মণিলাল শ্রীবাস্তব প্রযোজিত 'আলোয় ফেরা'র প্রথম চিত্রগ্রহণের কাজ ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে সম্পন্ন হয়েছে। এই ছবির প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করছেন মাধবী মুখার্জী, সৌমিত্র চ্যাটার্জী, ললিতা চ্যাটার্জী, বিকাশ রায়, কালী ব্যানার্জী, বিনতা রায়, জহর গাঙ্গুলী। ছবিটি পরিচালনা করছেন জ্যোতির্ময় রায়।

দিলনে পুকারা

পরিচালক মোহন 'দিলনে পুকারা'র বহির্দৃশ্যের কাজ করে সম্প্রতি কাশ্মীর থেকে ফিরেছেন। তিনি কাশ্মীরে পঁচিশ দিন চিত্রগ্রহণ করেছেন। ছবিটি হবে ইস্টম্যান কালারে। অভিনয়ে আছেন রাজশ্রী, সঞ্জয়, মেহমুদ, হেলেন, শশী কাপুর, অচলা সচদেব প্রমুখ।

মোহজাল প্রদর্শনে যাদুকর রঞ্জন

যাদুকর রঞ্জন প্রতিনিয়তই নূতন খেলা উদ্ভাবন করে তাঁর "মোহজাল" প্রদর্শনীতে অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন। এবারে "কাঁচের মধ্যে দিয়ে পক্ষীদের যাতায়াত, ভারতীয় রকেট, সাধারণ বেলুনের মধ্যে দিয়ে লৌহ শলাকা প্রবেশ করানো ও ব্রহ্মসূতিকা" প্রভৃতি নতুন খেলার সমন্বয়ে তাঁর প্রদর্শনী বাংলার ব্রতচারী সমিতি, ও সমাজকর্মী সম্মেলন কর্তৃক বিজয়া সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ছাত্রকল্যাণ আবাসে, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া (বড়বাজার) স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় বিজয়া সম্মেলনে ও কৃষ্ণ গ্লাস ফ্যাক্টরী কর্মিবৃন্দ কর্তৃক তাঁদের নিজস্ব প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই প্রভূত দর্শক সমাবেশে রঞ্জনের "মোহজাল" যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দ দান করে।

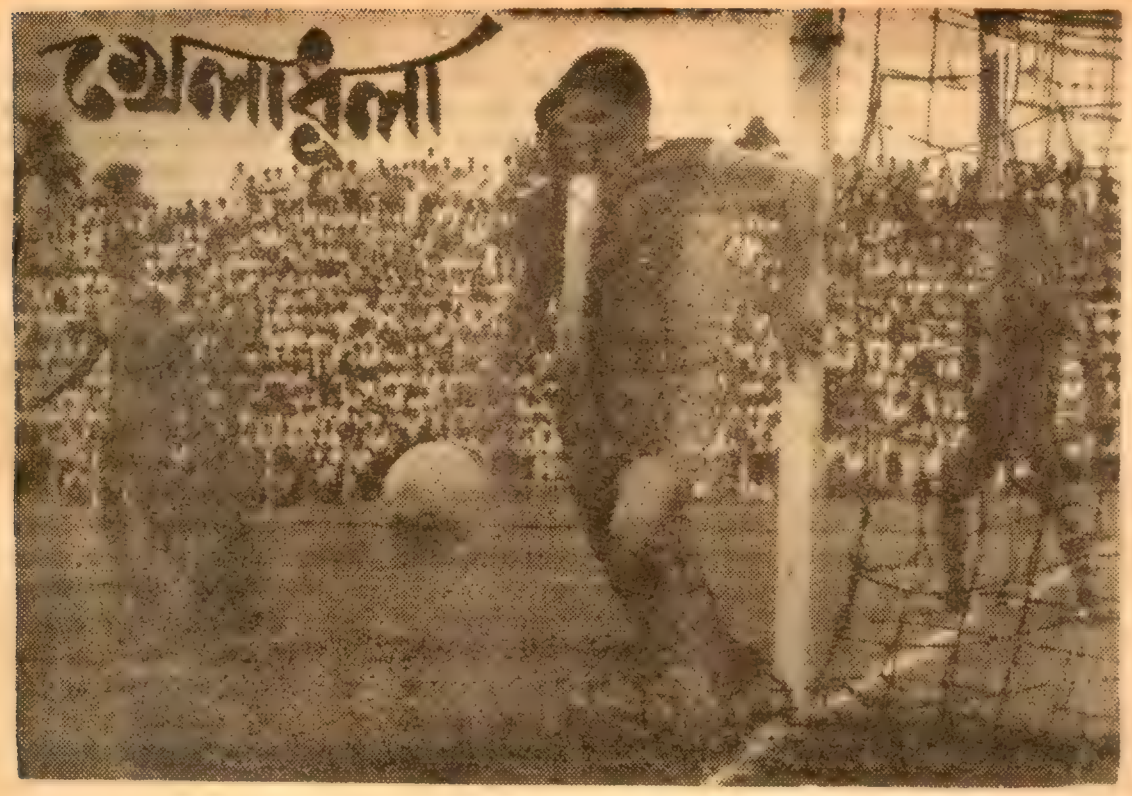

রবীন্দ্র সরোবরে অনুষ্ঠিত সার্ভিসেস একাদশ এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় একটি নিশ্চিত গোল রক্ষা করছেন রামবাহাদুর।

ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেট দল

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের নির্বাচকমণ্ডলী প্রথম টেস্টে ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করেছেন। বোম্বাইয়ের অজিত ওয়াদেকার এতদিন পরে টেস্ট দলে স্থান পেয়েছেন, আর দল থেকে বাদ পড়েছেন হনুমন্ত সিং। হনুমন্ত সিং সম্বন্ধে ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক গ্যারফিল্ড সোবার্স প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ইতিপূর্বে ভারতে প্রদর্শনী খেলায় অংশগ্রহণ করতে এসে সোবার্স বলেছেন যে, ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান হনুমন্ত সিংয়ের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এমন কি ইংলন্ডের খ্যাতনামা ক্রিকেট শিক্ষক এ্যালফ গোভার পর্যন্ত হনুমন্তের খেলা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। গোভার বলেছেন যে, জাত ক্রিকেট খেলোয়াড়ের প্রতিটি গুণ বর্তমান হনুমন্তের মধ্যে এবং ভবিষ্যতে হনুমন্ত বিশ্ব ক্রিকেটের প্রথম সারির খেলোয়াড়দের মধ্যে স্থান পেতে পারেন। এ বছর হনুমন্ত তেমন কোন উল্লেখযোগ্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে পারেন নি বলে বোধ হয় বোম্বাইয়ের প্রথম টেস্টে তাঁকে স্থান দেন নি।

ক্রিকেট-রসিকদের প্রিয় খেলোয়াড় আব্বাস আলি বেগ আবার টেস্ট দলে ফিরে এসেছেন। স্ট্রোক মাস্টার আব্বাস আবার তাঁর পুরাতন খেলার জৌলুস ফিরে পেয়েছেন। ফারুক ইঞ্জিনিয়ারের পরিবর্তে কুন্দরন ফিরে এসেছেন ভারতীয় দলের উইকেট রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে। ইঞ্জিনিয়ার এবং কুন্দরনের মধ্যে এ বছর ব্যাটে উল্লেখযোগ্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন কুন্দরন।

চন্দ্রশেখর এবং ভেঙ্কট রাঘবনের ওপর ভারতীয় দলের অনেক কিছুই নির্ভর করছে। এ'দের দুজনের সঙ্গে সাহায্য

শ্রীঅমিতাভ

করার জন্য থাকবেন মেড়েন বিশারদ নাদকার্নী এবং সেলিম দুরানী। চান্দু বোরদে অবশ্য এখন পূর্বের মত বল করতে পারবেন কিনা সন্দেহ। বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম টেস্ট শুরু হচ্ছে আগামী ১৩ই ডিসেম্বর। ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের নাম নিম্নে দেওয়া হলঃ

পতৌদির নবাব (অধিনায়ক), চান্দু বোরদে, বাপু নাদকার্নী, জয়সীমা, আব্বাস আলি বেগ, সেলিম দুরানী, কুন্দরন, সরদেশাই, চন্দ্রশেখর, ভেঙ্কট রাঘবন, অজিত ওয়াদেকার।

দ্বাদশ ব্যক্তি—রুসি সুর্তী।

অতিরিক্ত—হনুমন্ত সিং, সুব্রহ্মণিয়ম, ফারুক ইঞ্জিনিয়ার।

প্রদর্শনী ফুটবল

রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হল দুটি প্রদর্শনী ফুটবল খেলা: একটিতে মোহনবাগান অবতীর্ণ হয় অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশান একাদশের বিপক্ষে এবং দ্বিতীয় খেলায় ইস্টবেঙ্গল মিলিত হয় সার্ভিসেস একাদশের সঙ্গে। প্রথম দিনের খেলাটি ১-১ গোলের ফলাফলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয় এবং দ্বিতীয় দিনের খেলায় সার্ভিসেস দল ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে পরাজিত করে ২-১ গোলে।

মোহনবাগান-এ, আই, এফ, এফ, এ'র খেলাটি দর্শকদের মন ভরাতে পারে নি। বলতে গেলে খেলাটি একেবারে সাধারণ স্তরের হয়েছে। খেলার উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল দুটি গোল এবং বিশেষত মোহনবাগানের পরিশোধমূলক গোলটি; অসীম মৌলিক দর্শনীয় সটে গোলটি করেন। এইদিন প্রথমার্ধের পর এ. আই

এফ, এফ, দলে পাঁচজন বদলি খেলোয়াড় মাঠে নামেন, কিন্তু মোহনবাগান ক্লাবের পক্ষে দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি সময়ে বদলি খেলোয়াড় হিসাবে চায়না পালকে মাঠে নামানো হয়। জার্সি পরিয়ে কয়েকজন খেলোয়াড়কে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সাইড লাইনে বসিয়ে বদলি খেলোয়াড় হিসাবে মাঠে নামার সুযোগ দিলে বোধহয় মোহনবাগান ক্লাব ভাল করত। প্রদর্শনী খেলাটিকে অবশ্য খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছিলেন হয়ত তাঁরা! এ, আই, এফ, এফ, দলের পক্ষে গোল দেন বীরবাহাদুর এবং মোহনবাগানের পক্ষে অসীম মৌলিক।

দ্বিতীয় দিনের প্রদর্শনী খেলায় ভাল খেলে সার্ভিসেস দল জয়ী হয়েছে, অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গল দল তাদের স্বাভাবিক ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করতে পারে নি। খেলাটি অবশ্য দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে। এইদিনের মাঠের সেরা খেলোয়াড় ছিলেন সার্ভিসেস দলের এথিরাজ। এথিরাজ একবার দলের আক্রমণধারা রচনা করেছেন, আবার প্রয়োজনে দলের রক্ষণভাগকে সাহায্য করার জন্য ছুটে এসেছেন। খেলার প্রথমার্ধে তেইশ মিনিটের মধ্যেই দু' গোলে অগ্রগামী হয় সার্ভিসেস দল; গোল করেন রঞ্জিৎ সিং থাপা এবং বীরবাহাদুর। ইস্টবেঙ্গল দলের পক্ষে একটি গোল পরিশোধ করেন সুকুমার সমাজপতি।

পৃথ্বীপাল সমস্যা

পেনাল্টি বুলি বিশারদ অলিম্পিক-খ্যাত হকি খেলোয়াড় পৃথ্বীপাল সিংকে নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন ভারতীয় হকি ফেডারেশন। ব্যাঙ্ককের এশিয়ান গেমসের জন্য নির্বাচিত ভারতীয় দলের অন্যতম সদস্য হলেন পৃথ্বীপাল সিং। তেত্রিশ বৎসর বয়স্ক পৃথ্বীপাল বহু আন্তর্জাতিক খেলায় ভারতের পক্ষে কৃতিত্বের সঙ্গে ব্যাকে খেলেছেন। জলন্ধরে অনুষ্ঠিত ট্রায়ালে তিনি অংশগ্রহণ করেন। ভারতীয় দল নির্বাচিত হবার পর একটি প্রদর্শনী খেলায় তিনি সেখানে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু তারপর পৃথ্বীপাল সিং ভারতীয় হকি ফেডারেশনের কর্তাব্যক্তিদের কোনরূপ সংবাদ না দিয়েই জলন্ধর ত্যাগ করেছেন। শোনা যাচ্ছে, তিনি জলন্ধর থেকে হিসার অভিমুখে যাত্রা করেছেন।

পৃথ্বীপাল সিং বর্তমানে হিসার কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি ডাইরেক্টার। শোনা যাচ্ছে, পৃথ্বীপাল সিং ভারতীয় হকি দলের সঙ্গে ব্যাঙ্ককে এশিয়ান গেমসে যোগদান করবেন না। অবশ্য তাঁর এই অনিচ্ছার কারণ জানা যায় নি। ভারতীয় হকি ফেডারেশন অবশ্য ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহের জন্য হিসারে একজন লোককে প্রেরণ করেছে।

মেকিফ বনাম সিম্পসন

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ববি সিম্পসনের লিখিত "ক্যাপ্টেনস স্টোরি" চারদিকে বেশ জল ঘোলা করে তুলেছে। ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ক্রিকেট সম্বন্ধে বইয়ে সিম্পসনের মন্তব্য ভীষণ প্রতিবাদের ধ্বনি তুলেছিল ক্রিকেট জগতে। সিম্পসন অশালীন মন্তব্য করেছিলেন ক্রিকেটের অমর চরিত্র স্যার ফ্র্যাঙ্ক ওরেল সম্বন্ধে। ওরেল কোন প্রতিবাদ করেন নি, শুধু একটু হেসেছিলেন সিম্পসনের ছেলেমানুষী দেখে।

অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড় আয়ান মেকিফ কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে সিম্পসনের বইয়ে অন্যায় মন্তব্যের জন্য একেবারে আদালতে মামলা ঠুকে দিয়েছেন সিম্পসনের বিরুদ্ধে। সিম্পসন বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকা সফর করছেন।

আয়ান মেকিফ রিচি বেনোর নেতৃত্বে ভারত সফরকারী অস্ট্রেলিয়া দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন ১৯৫৯-৬০ সালে। পরে আয়ান মেকিফের বল করার ভঙ্গি সম্বন্ধে বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং অনেক বাক্-বিতণ্ডা তর্ক-বিতর্কের পর বল থ্রো করেন বলে আয়ান মেকিফকে ক্রিকেটের আসর থেকে বিদায় নিতে হয়।

ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে দলীপ ট্রফির ফাইনাল খেলা দেখছেন ভারতের টেস্ট অধিনায়ক পতৌদি এবং তাঁর ভাবী বধূ চিত্রতারকা শর্মিলা ঠাকুর।

মেক্সিকো সুপ্রীম কোর্টে সিম্পসন এবং সিম্পসনের বইয়ের প্রকাশকের বিরুদ্ধে খেসারতের জন্য মামলা শুরু করেছেন। সিম্পসন আদালতে আবেদনপত্রে বলেছেন

সুব্রহ্মণ্যম

যে, তাঁর চরিত্র এবং সুনামের ওপর অযথা কলঙ্ক আরোপিত করা হয়েছে।

দক্ষিণাঞ্চল দলীপ ট্রফি বিজয়ী

দক্ষিণাঞ্চল উপর্যুপরি দ্বিতীয়বার দলীপ ট্রফি জয়ের গৌরব অর্জন করল পশ্চিমাঞ্চলকে প্রথম ইনিংসের ফলাফলে পরাজিত করে। দলীপ ট্রফির এই খেলাটি বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণাঞ্চল প্রথম ইনিংসে ৬৮ রানে পশ্চিমাঞ্চলের সংগৃহীত রান থেকে অগ্রগামী থাকে।

দক্ষিণাঞ্চল প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ লাভ করে প্রথম ইনিংসে সংগ্রহ করে মোট ৪৭০ রান। জয়সীমা এবং সুব্রহ্মণিয়ম সেঞ্চুরী করার কৃতিত্ব অর্জন করেন। জয়সীমার ব্যক্তিগত রান হয় ১৭১ এবং সুব্রহ্মণিয়মের ১২৩ রান। এ ছাড়া কুন্দরনের ৬৭ রানও উল্লেখযোগ্য। দেশাই এবং মোহন যথাক্রমে তিনটি করে উইকেট সংগ্রহ করেন।

পশ্চিমাঞ্চল প্রথম ইনিংসের খেলা শুরু করে ব্যাটিং বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। অজিত ওয়াদেকার এবং ভোঁসলের দৃঢ়তার জন্য এই প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠে পশ্চিমাঞ্চল। অজিত ওয়াদেকার সেঞ্চুরী করেন এবং ১০৩ রান সংগ্রহ করে বিদায় নেন। ভোঁসলের ব্যক্তিগত সংগ্রহ হয় ৮৮ রান। শেষের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে রুসি সুতী এবং নবাগত মিডিয়াম পেস বোলার ফার্নান্ডেজ যথাক্রমে ৪৮ রান এবং ৫৬ রান সংগ্রহ করে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। পশ্চিমাঞ্চল দক্ষিণাঞ্চলের রান-সংখ্যার ৬৮ রান পশ্চাতে থেকে ইনিংস শেষ করে ৪০২ রানে। ভেঙ্কট রাঘবন ৯৫ রানে ৫টি উইকেট লাভ করেন। চন্দ্রশেখর এবং সুব্রহ্মণিয়ম প্রত্যেকে দু'টি করে উইকেট দখল করেন।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের প্রাক্তন সভাপতি বরোদার মহারাজা বিজয়ী দক্ষিণাঞ্চলকে দলীপ ট্রফি প্রদান করেন।

সমাচার দর্পণ

জাপানের দু'জন জিমন্যাস্টিক শিক্ষক কাজুডো আবে ও মাৎসুহিকো ইকেদা সম্প্রতি কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ ভলিবল ফেডারেশনের মাঠে এক আকর্ষণীয় জিমন্যাস্টিক প্রদর্শন করেন। এঁরা ভারতীয় জিমন্যাস্টিক ফেডারেশনের আমন্ত্রণে ভারতে এসেছেন।

* * *

ইংলন্ডের বিশ্বকাপ বিজয়ী দলের খেলোয়াড় নবি স্টাইলস খেলার মাঠে অশালীন আচরণের জন্য দণ্ডিত হয়েছেন। ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত একটি ফুটবল খেলায় স্টাইলস্ মাঠের মধ্যে অখেলোয়াড়ী আচরণ করেন। ইংলন্ড ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের ডিসিপ্লিনারী কমিটি এক সভায় তাঁর এই আচরণের জন্য পঞ্চাশ পাউন্ড জরিমানা ধার্য করেন।

* * *

প্রাক্তন উইম্বলডেন চ্যাম্পিয়ান এবং অস্ট্রেলিয়ার ডেভিস কাপ খেলোয়াড় রয়

ভেঙ্কট রাঘবন

এমার্সন পেশাদারত্ব গ্রহণের জন্য পঞ্চাশ হাজার অস্ট্রেলীয় ডলারের এক লোভনীয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। এই অর্থের ভারতীয় সমমূল্য প্রায় চার লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা। প্রফেশনাল প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জে আর হক এমার্সনের কাছে প্রস্তাবটি পেশ করেন।

অজিত ওয়াদেকার

পরলোকে সোন্ধী

ভারতীয় ক্রীড়াজগতের অন্যতম কর্ণধার এবং এশিয়ান গেমস ফেডারেশনের প্রবীণ সহ-সভাপতি শ্রী জি ডি সোন্ধী ১৯শে নভেম্বর রাত্রে সিমলায় পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বৎসর।

১৯৫১ সালে শ্রীসোন্ধীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এশিয়ান গেমসের সূচনা হয়। এশিয়ান গেমস এবং ভারতের অলিম্পিক দলের অগ্রগতির জন্য সারা জীবন তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। ক্রীড়াঙ্গন রাজনীতির প্রভাবমুক্ত রাখার জন্য শ্রীসোন্ধীর বলিষ্ঠ প্রচেষ্টার কথা কোনমতেই বিস্মৃত হওয়া যায় না। ১৯৬২ সালে জাকার্তার এশিয়ান গেমসের আসরে নোংরা রাজনীতির অন্যায় অনুপ্রবেশের তীব্র প্রতিবাদ করেন শ্রীসোন্ধী এবং জাকার্তায় তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। ন্যায়নীতি থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত না হয়ে লড়াই করে যাওয়ার জন্য তিনি একাংশের অপ্রিয়ভাজন হন।

ব্যাঙ্ককের পঞ্চম এশিয়ান গেমসের ভাগ্যাকাশে অনেক অনিশ্চয়তার মেঘ জমেছিল, কিন্তু শ্রীসোন্ধীর মত সত্যাশ্রয়ের কয়েকজন ক্রীড়াদরদী পরিচালকের প্রচেষ্টায় সে সমস্যার সমাধানের পথ সুগম হয়েছিল। দুঃখ শুধু ব্যাঙ্ককের এশিয়ান গেমসের সাফল্য দেখে যেতে পারলেন না শ্রীসোন্ধী। আমরা শ্রীসোন্ধীর স্বর্গত আত্মার শান্তি কামনা করছি।

বাংলার টেস্ট সম্ভাবনা

বেশি দিন আগেকার কথা নয়, গত ক্রিকেট মরশুমের শেষ দিকে বাংলার রঞ্জী ট্রফির ক্রিকেটদল বোম্বাই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে রঞ্জী ট্রফির সেমিফাইন্যাল খেলা বাংলা এবং বোম্বাইয়ের মধ্যে। তরুণ একজন বোলার বাংলাদলে স্থান পেয়েছেন এবং বাংলাদলে তিনি তখন নবাগত মুখ। মাত্র উনিশ বৎসর বয়স্ক খেলোয়াড়টি কলেজের ছাত্র, আর সামনেই কলেজের পরীক্ষা। একদিকে পরীক্ষার বাধা অন্যদিকে খেলার রাজা ক্রিকেটের দুর্বার আকর্ষণ। এই তরুণ বয়সে ভারতীয় ক্রিকেটের মক্কা ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে টেস্ট তারকাখচিত বোম্বাইয়ের বিপক্ষে খেলার সুযোগ। খেলোয়াড়টি ভীষণ সমস্যায় পড়লেন। একদিকে ক্রিকেটের হাতছানি রঙীন স্বর্গের স্বপ্ন, আর অন্যদিকে পরীক্ষার দুঃস্বপ্ন। শেষ পর্যন্ত ভাগ্যে একটা অভাবনীয় সুযোগ ঘটল। ঠিক হল খেলোয়াড়টি খেলার আগের দিন কলকাতা থেকে প্লেনে বোম্বাই যাবেন এবং খেলার শেষে আবার প্লেনেই কলকাতায় ফিরবেন। কয়েকটা দিন আর কিছু অমূল্য সময়ের সাশ্রয় হবে। যখন বোম্বাইয়ের পথে পাড়ি দিচ্ছেন ছেলেটির মনে সংশয়ের একরাশ ঢেউ মনকে ওলটপালট করে দিচ্ছে; ভাগ্যলক্ষ্মীর আশীষ লাভ করবেন সাফল্যের মধুর পরশে অথবা ব্যর্থতার কালো ছায়া ম্লান করে দেবে ভবিষ্যতের পথকে।

বাংলা বোম্বাইয়ের কাছে পরাজিত হল বটে, কিন্তু সকলকে চমকে দিলেন বাংলার এই তরুণ বোলারটি। ব্রাবোর্নের উইকেটে জ্বালা ধরিয়ে দিলেন বোলারটি, দুরন্ত গতি আর সুইংয়ের ছোঁয়ায় ব্যাটসম্যানদের অবস্থা কাহিল করে দিলেন। এক এক করে উইকেট দিয়ে প্যাভেলিয়ানের পথে পা বাড়াতে লাগলেন বোম্বাইয়ের টেস্ট খ্যাত ব্যাটসম্যানেরা। বোম্বাইয়ের শিবিরে বিরাট ত্রাসের সৃষ্টি হল, গেল বুঝি সব মান সম্ভ্রম। রঞ্জী ট্রফির একচ্ছত্র অধিপতিদের অবস্থা তখন বেসামাল। ১০০ রানে ছটি উইকেট খতম। বোম্বাইয়ের ইনিংসের শেষে দেখা গেল তরুণ বোলারটি একাই ৭টি উইকেট দখল করেছেন মাত্র ৫৯ রানের বিনিময়ে। এতক্ষণ খেলোয়াড়টির নামই বলা হয় নি, খেলোয়াড়টি হলেন বাংলার টেস্ট সম্ভাবনা সুব্রত গুহ। বড় ক্রিকেটের আসরে সুব্রতর আবির্ভাব মাত্র গত বছর। প্রথম সুযোগেই সুব্রত দলীপ ট্রফির খেলায় পূর্বাঞ্চলের পক্ষে ইডেন উদ্যানে আত্মপ্রকাশ করেন মধ্যাঞ্চলের বিপক্ষে। সবচেয়ে মজার কথা যে তখনও কিন্তু সুব্রত রঞ্জী ট্রফি খেলার সুযোগ পায় নি। মধ্যাঞ্চলের বিপক্ষে উইকেট সুব্রত উল্লেখযোগ্য পান নি বটে, কিন্তু ব্যাটে যথেষ্ট দক্ষতা প্রদর্শন করেন। ক্রিকেটের সমজদারেরা প্রত্যেকে স্বীকার করে যে বোলার হিসাবে সুব্রত ভবিষ্যতের সম্ভাবনা।

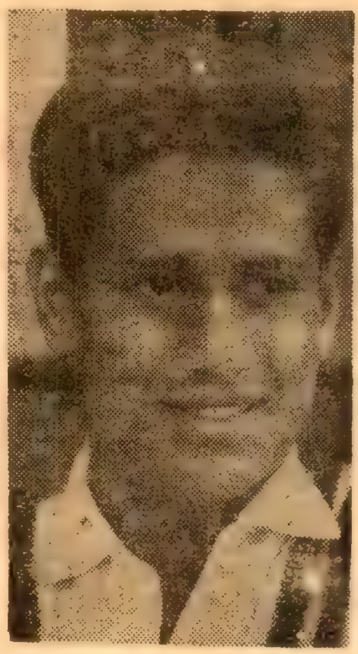

সুব্রত গুহ

সুব্রতর মধ্যে যে সত্যই সম্ভাবনার বীজ অঙ্কুরিত আছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন বোম্বাইয়ের মাঠে সাফল্যের পর সমালোচনার মৃদু গুঞ্জন ওঠে তাঁর বোলিংকে কেন্দ্র করে।

এ বছর হায়দ্রাবাদের মৈনুদ্দৌলা ট্রফিতে সুব্রত ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক একাদশের পক্ষে খেলার সুযোগ পান। উইকেট তাঁর বোলিংয়ের অনুকূলে না থাকায় তাঁর পক্ষে ভাল ফলাফল প্রদর্শন [illegible] নি। ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক দল সেমিফাইন্যালে জয়ী হয়ে ফাইন্যালে উন্নীত হয়। কিন্তু ফাইন্যালে সুব্রতর পক্ষে স্টেট ব্যাংককে সাহায্য করা সম্ভব হয় নি। সেমিফাইন্যাল খেলার শেষেই সুব্রতকে হায়দ্রাবাদ থেকে দিল্লী রওনা দিতে হয় দলীপ ট্রফিতে পূর্বাঞ্চলের পক্ষে অংশগ্রহণের জন্য। দিল্লীর মাঠে উত্তরাঞ্চলদলের বিপক্ষে ভাল বোলিং করেও দুর্ভাগ্যবশত সুব্রতর পক্ষে বেশি উইকেট পাওয়া সম্ভব হয় নি। কারণ পূর্বাঞ্চলের ফিল্ডাররা অনবরত ক্যাচ ফেলেছে। আর উইকেটও খুব যে ভাল ছিল তাও নয়। বল ওঠানো ছিল প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

সুব্রত বর্তমানে ইরানী ট্রফিতে বোম্বাইয়ের বিপক্ষে সম্মিলিত ভারতীয় একাদশের পক্ষে ইডেন উদ্যানে প্রদর্শনী ক্রিকেটে অংশগ্রহণ করছেন। এই লেখা যখন প্রস্তুত করছি তখন শুধু মাত্র একদিনের খেলা হয়েছে। সুব্রত গুহ ৮ ওভার বল করে ৫ ওভার মেড়েনে ৭ রান দিয়ে সংগ্রহ করেছেন একটি উইকেট। সুব্রতর বল প্রথম দিকে খুবই ভাল হচ্ছিল। সরদেশাই এবং অধিকারী সুব্রতর বলে খেলতে যথেষ্ট বেগ পাচ্ছিলেন। সুব্রত আর একটি খেলায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাবেন এবং এই খেলায় যদি তিনি উল্লেখযোগ্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে পারেন তবে তাঁর টেস্টের অঙ্গনে প্রবেশের পথ সুগম হবে। ইরানী ট্রফিতে অংশগ্রহণ করার ফলে সুব্রত হায়দ্রাবাদে সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় একাদশের ট্রায়ালে উপস্থিত হতে পারলেন না। তবে বিশ্বস্তসূত্রে প্রাপ্ত এক খবরে প্রকাশ যে, সুব্রত গুহ সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয়দলে সরাসরি স্থান পেয়েছেন। ইরানী ট্রফি শেষ হবার পর তবে তিনি হায়দ্রাবাদ অভিমুখে যাত্রা করবেন।

ইরানী ট্রফির খেলার ধারা দেখে মনে হচ্ছে সুব্রত দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর বোলিং নৈপুণ্য প্রদর্শনের আর একটি সুযোগ লাভ করবেন। হায়দ্রাবাদে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এবং সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় একাদশের খেলায় সুব্রতকে ভাল ফলাফল প্রদর্শন করতে হবে। কারণ বর্তমানে সুব্রতর নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন পশ্চিমাঞ্চলের মিডিয়াম পেস বোলার ফার্নাণ্ডেজ এবং স্টেট খেলোয়াড়দ্বয় দেশাই এবং রঞ্জনে।

—সুদর্শন

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

...day, 1st December, 1966 SAPTAHIK BASUMATI Regd. No. C 71
Price : 25 Paise Gram : "BASUMATI" PHONE : 34-7771, 72, 73

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের

অমূল্য গ্রন্থরাজি

2 DEC 1966

কালিসিংহ মহাভারত	— ১ম	— বোর্ড বাঁধাই (যন্ত্রস্থ)	
			—১২-০০
,, ,,	— ২য়	— ,,	—১০-০০
,, ,,	— ৩য়	— ,,	—১০-০০
,, ,,	— ৪র্থ	— ,,	—৬-০০
,, ,,	— ৫ম	— ,,	—৬-০০
বাল্মীকি রামায়ণ	— ১ম	— বোর্ড বাঁধাই	—৮-০০
,, ,,	— ২য়	— ,,	—৮-০০
কৃত্তিবাসী রামায়ণ		,,	—৮-০০
শ্রীরামচরিত মানস	— ১ম	— লি ু বাঁধাই	—২-০০
,,	— ২য়	— ,,	—২-০০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী — উপন্যাস	— ১ম	— ,,	—৩-০০
,, — ,,	— ২য়	— ,,	—৩-০০
,, — ,,	— ৩য়	— ,,	—৩-০০
,, — সাহিত্য	— ১ম	— ,,	—৩-০০
,, — ,,	— ২য়	— ,,	—৩-০০
,, — ,,	— ৩য়	— ,,	—৩-০০
রাজভাষা — উর্দু-ইংরাজী			—৩-০০
,, — বাংলা-ইংরাজী		বোর্ড ॅাধাই	—৩-৫০
দীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলী	— ১ম	—	—২-০০
,, ,,	— ২য়	—	—২-০০
মানিক গ্রন্থাবলী	— ১ম	—	—২-০০
,,	— ২য়	—	—২-০০
মাইকেল গ্রন্থাবলী	— ১ম	— বোর্ডবাঁধাই	—৩০০
,,	— ২য়	— ,,	—৩-৫০
দীনেন্দ্র গ্রন্থাবলী	— ১ম	— ,,	—৩-৫০
,,	— ২য়	— ,,	—৩-৫০
যোগেন্দ্র গ্রন্থাবলী	— -।-	— ,,	—২-৫০
নৃপেন্দ্র গ্রন্থাবলী	— -।-	— ,,	—৩-৫০
হেমেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী	— -।-	— ,,	—৩-০০
রমাপদ গ্রন্থাবলী	— -।-	— ,,	—৩-০০
রামনাথ গ্রন্থাবলী	— -।-	— ,,	—৩-০০
শিবরাম গ্রন্থাবলী	— -।-	— ,,	—২-৫০
বিভূতি মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাবলী	— -।-	— ,,	—৩-৫০
প্রভাবতী দেবী গ্রন্থাবলী	— -।-	— ,,	—৩-৫০
শ্রীমদ্ভাগবত (পয়ার)	— -।-	— ,,	—৫-০০
মীমাংসাদর্শন (দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ)		প্রতি খণ্ড	—৮-০০

আমার দেখা মেয়েরা	— -।-	— (বোর্ড ॅাধাই)	—৪-০০
নেপোলিয়ান	— -।-	— ,,	—৪-৫০
কবিকঙ্কণ চণ্ডী	— -।-	— ,,	—৪-৫০
ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী	৪র্থ হইতে ৮ম	— প্রতি খণ্ড	—২-০০
দৃশ্যকাব্য পরিচয়		— (বোর্ড ॅাধাই)	—১০-০
বিদগ্ধ মাধব			—৩-০০
জ্যোতিষ রত্নাকর			—২-৫০
পরলোক			—২-০০
পরলোক ও প্রেততত্ত্ব			—১-৫০
পরলোকরহস্য			—১-০০
প্রতাপাদিত্য		(বোর্ড বাঁধাই	—২-০০
মহারাজা নন্দকুমার		,,	—২-০০
ছত্রপতি শিবাজী		,,	—২-০০
সেক্সপীয়র গ্রন্থাবলী	— ১ম	— ,,	—৩-৫০
,, ,,	— ২য়	— ,,	—৩-৫০
অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী		— ,,	—৩-০০
ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী			—৩-০০
কালিদাস গ্রন্থাবলী	— ১ম	— (বোর্ড ॅাধাই)	—৪-৫০
,, ,,	— ২য়	— ,, যন্ত্রস্থ	—৫-০০
,, ,,	— ৩য়	— ,,	—৬-৫০
যৌনমনোদর্শন	— ২য়	— ,,	—৪-০০
,,	— ৩য়	— ,,	—৪-০০
,,	— ৪	— ,,	—৪-০০
,,	— ৫ম	— ,,	—৪-৫০
,,	— ৬	— ,,	—৪-০০
মরুর বুকে মেঘনা		— ,,	—৩-০০
কুট্টনীমত		— ,,	—৪-০০
ক্রিয়াকাণ্ড বারিধি	— ১ম	—	—৮-০০
শ্রীকৃষ্ণ		— বোর্ড ॅাধাই	—১৫-০০
চৈতন্যভাগবত			—৩-০০
ভক্তমাল গ্রন্থঃ			—৩-০০
যোগশাস্ত্র		— বো´ বাঁধাই	—৩-০০
আত্মানুসন্ধান			—২-৫০
অ ্তলাল গ্রন্থাবলী	— ১ম	—	—২-৫০
,, ,,	— ২য়	—	—২-৫০
,,	— ৩য়	—	—২-৫০
বৃহৎজ্যোতিষার্ণবঃ	—	— বোর্ড বাঁধাই	—১৫-০০

দি বসুমতী প্রাইভেট, লিঃ

১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সাপ্তাহিক বসুমতী

রাজ্যপাল সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি

র্ষ : ২৬শ সংখ্যা. বৃহস্পতিবার. ২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ * 8th Dec., 1966 * Vol. 71

ফেমিলা স্নো

একালের রূপ-কথায় শেষ কথা

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		১৬০৩
আজকের মানুষ		১৬০৪
ভারতদর্শন		১৬০৫
আন্তর্জাতিক		১৬১০
প্রত্যাশার মৃত্যু ও দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা	কৃত্তিবাস ওঝা	১৬১৩
অবক্তব্য	চন্দ্রগুপ্ত	১৬১৬
সুবর্ণলতা (ধারাবাহিক উপন্যাস)	আশাপূর্ণা দেবী	১৬১৮
পরবাসী, এখানে (কবিতা)	সরিৎ শর্মা	১৬২০
এক আকাশ অন্ধকার (কবিতা)	মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	১৬২০
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	অনন্ত সিংহ	১৬২১
কাঙ্ক্ষিত (কবিতা)	ভজন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬২৫

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল এম, এস, সি প্রণীত

আমার দেখা মেয়েরা

(রহস্য রোমাঞ্চের স্বর্ণখনি)

'রক্তনদীর ধারা', 'অপরাধ বিজ্ঞান' ও 'বিখ্যাত বিচার কাহিনী' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলির লেখকের সত্যঘটনামূলক রূপদান। মেয়েদের মন আর মতি স্বয়ং দেবাঃ ন জানন্তি। বিভিন্ন ও বিচিত্র নারী-চরিত্রের রহস্য উদ্ঘাটন ও যথাযথ অভিজ্ঞ ও দক্ষ লেখকের রচনার বৈশিষ্ট্যে বাংলা দেশের নারী-সমাজের এক অজানা অংশ সাধারণের চোখে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে। পড়তে পড়তে বই শেষ না করে ওঠা যায় না। বইয়ের আদ্যোপান্ত রুদ্ধশ্বাস উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা। উপন্যাসের চেয়েও সুখপাঠ্য।

মূল্য চার টাকা

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগ ঃ—মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, পদ্মাবতী নাটক, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা? (বোর্ড বাঁধাই)—সাড়ে চার টাকা।

দ্বিতীয় ভাগ ঃ—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্মিষ্ঠা নাটক, তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য, মায়া কানন, হেক্‌টর বধ। (বোর্ড বাঁধাই) সাড়ে তিন টাকা

সাহিত্য-জগতের গৌরবপ্রভা—হাস্যরসাবতার—নাট্যসাহিত্যের প্রবর্তক—রস-সাহিত্যের স্রষ্টা—রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের

দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—জীবনী ও কবির সমালোচনা, নীলদর্পণ, জামাই বারিক, বিয়ে পাগলা বুড়ো, নবীন তপস্বিনী, কমলে কামিনী।

২য় ভাগে—সধবার একাদশী, যমালয়ে জীবন্ত মানুষ, পোড়ামহেশ্বর, কুঁড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ, লীলাবতী, সুরধনী কাব্য, দ্বাদশ কবিতা, পদ্য সংগ্রহ।

প্রতি ভাগ দুই টাকা

ডঃ মতিলাল দাশ প্রণীত

মতিলাল গ্রন্থাবলী

মূল্য—দুই টাকা

—ইহাতে আছে—

১। চলার পথে (উপন্যাস)
২। মনীষা (উপন্যাস)
৩। বিদ্যুৎশিখা (১১ খানি গল্প সমষ্টি)
৪। দীপশিখা (কবিতা সঙ্কলন)
৫। চার্বাক (নাটক)

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
গ্রন্থমেলা		১৬২৬
বঙ্গদর্শন		১৬২৭
গ্রামবাংলার কথা	পারুল ভট্টাচার্য	১৬৩১
নগন নির্জন মনে (গল্প)	শচীন রায়	১৬৩৫
বিশ্বসাহিত্যের আদিপর্ব	ডঃ নরেন ভট্টাচার্য	১৬৩৯
হলডেনের বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প	আশিসকুমার সিংহ	১৬৪৩
দিল্লী থেকে	বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য	১৬৪৭
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	শিলাদিত্য	১৬৫০
রঙ্গজগৎ		১৬৫৫
পাঠকমন		১৬৫৯
খেলাধূলা	শ্রীঅমিতাভ	১৬৬১

বৈষ্ণব-সাহিত্যের অমূল্য অবদান

ভক্তিজগতের কৌস্তুভরত্ন, ভগদ্ভক্তগণের সাধনার ধন, ভক্তের তুলসী-মালা সদৃশ মহাপবিত্র ভক্তিশাস্ত্র সমন্বয়।

বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপ ও শিক্ষাষ্টক

শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীকৃষ্ণলাভের জন্য যে উৎকণ্ঠা, এই 'প্রলাপে' তাহা অভিব্যক্ত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত 'শিক্ষাষ্টক শ্লোকই' তাঁহার একমাত্র রচনা। শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামীর সুললিত পদ্যানুবাদে এই অমিয় মাধুরী লীলায়িত।

নরোত্তম বিলাস

বৈষ্ণবগণের পরম উপভোগ্য উপজীব্য ভক্তিচরিতামৃত।

দুর্লভসার

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা শ্রীল লোচনদাস বিরচিত, বৈষ্ণবগণের সংপূজিত।

আত্মতত্ত্ব

বৈষ্ণব দর্শনের সূক্ষ্মতম অনুসরণ।

মনঃশিক্ষা

শ্রীপ্রেমানন্দ দাস ঠাকুর বিরচিত। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত সাধন-ভজনের নিগূঢ় মর্মসমাহিত।

শ্রীচমৎকার চন্দ্রিকা

পরম পণ্ডিত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য পরম বৈষ্ণব শ্রীল কৃষ্ণদাসের সুললিত পদ্যানুবাদ।

পাষণ্ড-দলন

মূর্তিমান বৈরাগ্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বিরচিত প্রেমভক্তির লহর-লীলা।

ভক্তিতত্ত্বসার

হাটপত্তন, শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা, নামসংকীর্তন, চৌত্রিশ পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম, নরোত্তম দাসের প্রার্থনা, প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। সুলভে নামমাত্র মূল্যে বিতরিত।

মূল্য ঃ ৩, টাকা।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

মোহন মেলা

মূল্য এক টাকা

কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রধান কথা-শিল্পীর রস-সাহিত্য-সম্ভার ছাড়াও গল্পে ভরপুর।

—ইহাতে আছে—

গল্প—বোনির দিনে, বুদ্ধদেবের বুদ্ধি, কাঠুরের কপাল, হাঙর মানুষের চোখের জল, ভুলুর ভুল, মুর্গী চাচা, বুদ্ধদেবের গল্প, একটার বদলে দুটো, নতুন সিনেমার ছবি, দাদুর গল্প, ইঁদুরের কীর্তিকাহিনী, বাঁদরের মেটুলিচচ্চড়ি।

ছড়া—হট্টমালার যজ্ঞবাড়ী, হোহোহো বৃষ্টি ঝরে, পালোয়ান প্যালারাম, উলটো বাজির দেশে, আজব দেশ, বাঁকা শ্যামের ব্যায়রাম, হাবুবাবুর মনের কথা, আদ্দিকালের বদ্দি বুড়ি।

প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী সূর্য রায় কর্তৃক সুচিত্রিত

উপহার দিবার মত বই।

হংসেশ্বর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

মঞ্জুষা

২৷৷০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

৭১ বর্ষ ঃ ২৬শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পয়সা | বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত | Price : 25 Paise
বৃহস্পতিবার, ২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ | সাপ্তাহিক পত্রিকা | Thursday, 8th December, 1966

রাজ্যকর্মচারীদের বিরুদ্ধে অর্ডিন্যান্স ??

অতঃপর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোপের খড়্গ প্রস্তুত। এই খড়্গ কেবল শাণিত হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে। তারপর এই রাজ্যের সরকারী কর্মচারীদের শাণিত খড়্গের তলে চাকরি করতে হবে বৈকি! গণতান্ত্রিক ভারতে যেখানে সংবিধানে নাগরিকদের, সরকারী কর্মচারীদের ন্যায্য অধিকার দান করা হয়েছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধস্তন কর্মী হওয়ার জন্যে সেই অধিকার বিসর্জন দিয়ে কেরানী-পিওনরূপে বলির পাঁঠার মতো দিনযাপন করা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই—তার প্রমাণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি সংবাদ। সংবাদটি শুনলে প্রথমে অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু অকাজের বেলায় সরকারী তৎপরতা দেখে মনে হয়—সংবাদটি হয়তো মিথ্যা নয়।

সংবাদে বলা হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি অর্ডিন্যান্স জারি করতে চলেছেন। এই অর্ডিন্যান্সের বলে রাষ্ট্রীয় পরিবহন কর্পোরেশনের কর্মীসহ পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কর্মচারীদের বিক্ষোভ-সভা, শোভাযাত্রা, ধর্মঘট প্রভৃতি নিষিদ্ধ করাই সরকারের উদ্দেশ্য। কারণ, রাজ্য সরকারের সমস্ত কর্মচারীর কাজ-কর্ম 'অত্যাবশ্যক কাজ' বলে গণ্য করা হবে।

রাজ্য সরকার কর্তৃক অর্ডিন্যান্স জারি করার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ক'টি প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। প্রথম হচ্ছে এই যে, সরকার দেশের স্বাভাবিক সময়ে সাধারণ স্তরের কর্মীদের সীমিত অধিকার অর্ডিন্যান্স বলে খর্ব করতে পারেন কি না? দ্বিতীয়ত অর্ডিন্যান্স যদি জারি করাই হয়, তাহলে তা সংবিধান-বিরোধী হবে কি না? তৃতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্মচারীদের অধিকার হরণ করলেও কেন্দ্রীয় সরকার বা ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলি কর্মীদের অধিকার হরণ করতে চলেছেন বলে এযাবৎকাল শোনা যায় নি। একথা যদি সত্য হয়, তাহলে কর্মী হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারীরা এমন জরুরি কি কাজ করে থাকেন যে, তাঁদের অধিকার হরণ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার এতোই বেপরোয়া হয়ে পড়েছেন—যার জন্যে তাড়িঘড়ি অর্ডিন্যান্স জারি করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

আমাদের মনে হয়, কর্মচারীদের মানবিক দিকটি বিচার না করেই আগুন নিয়ে খেলা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইচ্ছুক। এই রাজ্যের কর্মচারীরা বর্তমান মূল্য বৃদ্ধির দিনে তাঁদের দাবি দাওয়া সংক্রান্ত ব্যাপারে মিটিং মিছিল প্রভৃতি করেছেন। তাঁদের দাবিগুলি যে অন্যায় নয়—তা যে কোনো নিরপেক্ষ ব্যক্তি স্বীকার করবেন। তাঁরা তাঁদের ন্যায্য দাবি নিয়ে যথারীতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েই সভা-সমিতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এবং তাতে ব্যর্থ হয়েও গণছুটির আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁদের এই গণছুটির মূলে উদ্দেশ্য অবশ্য ব্যর্থ হয় নি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্মীদের ঐক্য ও সংহতি দেখে যে ভীত হয়ে পড়েছেন—তার প্রমাণ হচ্ছে উপর্যুক্ত অর্ডিন্যান্স।

কিন্তু এই ভীতাবস্থা থেকে রক্ষার উপায়স্বরূপ কবচ কোনো অর্ডিন্যান্স বা অধিকারহরণকারী আদেশ-নির্দেশ নয়। কারণ বিরাট সরকারী শাসনযন্ত্রটি চালনার ক্ষেত্রে মন্ত্রিদের এবং তাঁদের আশেপাশে সচিবদের দেখা গেলেও যন্ত্রটি যেমন তেল ছাড়া অচল, তেমনি নিজেদের রক্ত দিয়ে যে সব কেরানী-পিওন সেই যন্ত্রে তেল ঢালছেন এবং সমগ্র শাসন ব্যবস্থাকে চালু রেখেছেন তাঁদের দাবি-দাওয়া অগ্রাহ্য করার অভিপ্রায়ে কোনো অর্ডিন্যান্স জারি করা কখনো উচিত নয়।

সংবিধান অনুযায়ী ভারত একটি কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র। নিশ্চয়ই এই রাজ্যও কল্যাণব্রতী। রাজ্য সরকার যদি এমন মনে করে থাকেন যে, জনতার কল্যাণেই তাঁরা অর্ডিন্যান্স জারি করতে চান, তাহলে আমরা বলতে বাধ্য যে, কর্মচারীরাও তাঁদের পরিবারবর্গসহ জনতার এক বিরাট অংশ। ঐ কর্মচারীদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করার অর্থই জনতার কল্যাণে হস্তক্ষেপ। আর যে কোনো সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে, কর্মীদের অসন্তোষের মূল নির্ণয় করা। অসন্তোষের মূলোচ্ছেদ কি অর্ডিন্যান্স জারি করার ফলে সম্ভব হবে? বরং অর্ডিন্যান্সের বলে অসন্তোষ যদি ক্রমাগত বন্দীবদ্ধ অবস্থায় স্তূপীকৃত হতে থাকে—তাহলে তা থেকেই যে একদিন বিস্ফোরণ ঘটবে একথা বলাই বাহুল্য।

মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে, সাধারণ সরকারী কর্মী ছাড়া সরকারের কাজ-কর্ম চালনা যখন সম্ভব নয়, তখন এঁদের অসন্তোষ দূর করার জন্যে সহানুভূতির সঙ্গে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। একেই ত' বর্তমান সময়ে মধ্যবিত্ত জীবন বিরাট সঙ্কটের সম্মুখীন; এরপর রাজ্য সরকার যদি এঁদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগেন, তাহলে দেশের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে আশঙ্কিত হতে হয়। আশা করি, রাজ্য সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় হবে এবং অর্ডিন্যান্স জারি করার সিদ্ধান্ত থেকে তাঁরা নিরস্ত হবেন।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

সাহিত্য ও সাংবাদিকতার মধ্যে ব্যবধান মাত্র একটা সরু সুতোর; তাই ভালো হাতে পড়লে সংবাদও সাহিত্য হয়ে ওঠে, অপটু হাত সাহিত্যকে করে তুলতে চায় সংবাদ। কিন্তু পরিমিতি বোধ যাঁর আছে তাঁর কলমে অপরূপের ছবি ওঠে ফুটে। জন স্টেইনবেক সেই দুর্লভ বস্তু অর্জন করেছেন; তাই তাঁর সাহিত্য এবং সংবাদ পড়তে সমান আগ্রহ। দীর্ঘ দিন সাহিত্যজগতে রাজত্ব করার পর স্টেইনবেক ফিরে এলেন আবার সংবাদপত্র-জগতে। বিখ্যাত এক আমেরিকান পত্রিকার ওয়ার করেসপন্ডেন্ট-এর দায়িত্ব নিয়ে তিনি চললেন অগ্নিগর্ভ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, রক্তঝরা ভিয়েৎনামে।

সাংবাদিকতার, বিশেষ করে রণক্ষেত্রের সংবাদদাতা হবার হক্ স্টেইনবেকের অবশ্যই আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দৌলতে ইয়োরোপ যখন পুড়ছে, জ্বলছে আফ্রিকা, হিটলার যখন একটির পর একটি দেশ গ্রাস করছেন, নাৎসীরা যখন নিরীহ নিরপরাধ এবং নিরস্ত্র মানুষগুলির ওপর, নারীশিশুবৃদ্ধের ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালাচ্ছে তখন মানব-প্রেমিক স্টেইনবেক শান্ত থাকতে পারেন নি, কেবল গল্প-উপন্যাস লিখে তাঁর শক্তি নিঃশেষ করতে পারেন নি, তিনি জাগাতে চাইলেন, উদ্বুদ্ধ করতে চাইলেন মানবিকতাকে, বিবেকবুদ্ধিকে। তিনি অতলান্তিক পেরিয়ে গেলেন ইংল্যান্ড, গেলেন ইতালী, সিসিলি, গেলেন উত্তর আফ্রিকাও। যুদ্ধের ধ্বংসলীলা, তার বীভৎসরূপ তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গীতে তুলে ধরলেন স্টেইনবেক, জয়গান গাইলেন তিনি শান্তির।

ক্যালিফোর্নিয়ার স্যালিনাসে স্টেইনবেকের জন্ম ১৯০২ সনে। প্রশান্ত মহাসাগর থেকে স্যালিনাসের দূরত্ব মাত্র তিরিশ মাইল। স্যালিনাসের অপূর্ব প্রাকৃতিক শোভা, তার ক্ষুদে পাহাড় পর্বত, সাগরের ঢেউ, তুলো ক্ষেত, খামার—আর এখানকার খেটে-খাওয়া, বঞ্চনা-বিদ্ধ জেলে, কৃষিজীবী, জন-মজুর—সব মিলিয়ে স্টেইনবেকের কাছে এক নতুন জগৎ খুলে গিয়েছিলো, তারই হাতছানিতে তিনি অধীর চঞ্চল হয়ে উঠতেন, কলম তাঁর এগিয়ে আসতো। নিয়মশৃঙ্খলার কঠিন বাঁধনে তিনি নিজেকে ধরা দেন নি, আপন মনে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন পথে-প্রান্তরে, ক্ষেতে-খামারে।

স্থানীয় কাউন্টি ট্রেজারারের সন্তান, মা তাঁর স্কুল শিক্ষিকা, লেখাপড়া স্টেইনবেককে করতে হয়েছিলো বৈকি, ঝোঁকও ছিলো প্রচন্ড, কিন্তু মাস্টারের নির্দেশ-নিয়মে নয়, নিজের রুচিতে। ১৯১৮ সালে হাই স্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়ে বেরুলেন, বছরখানেক এদিক-ওদিক যা-পাওয়া যায় তাই কাজ করলেন; তারপর ঢুকলেন স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু ওই ঢোকাই সার, রুটিন-মাফিক ক্লাশ করতে তাঁর বয়ে গিয়েছে, স্টেইনবেক যে সাবজেক্ট ভালো লাগে তারই ক্লাশ করলেন, বাকী সময়ে ক্লাশ পালিয়ে টো টো করে বেড়ালেন। ফলও পেলেন উচিত

জন স্টেইনবেক

মতো, কোনো ডিগ্রি না নিয়েই তাঁকে লেখাপড়ার পাট চুকোতে হলো, বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়তে হলো।

১৯২৫ সালে লেখক হবার সাধ নিয়ে স্টেইনবেক নিউ ইয়র্কে পাড়ি দিয়েছিলেন, সে সাধ অপূর্ণ রেখে ক্ষুব্ধচিত্তে ফিরতে হলো তাঁকে—না হলো সাংবাদিকতা না সাহিত্য। সম্পাদক রিপোর্টিং-এর নামে সাহিত্য বরদাস্ত করবেন না, পাঠক নামগোত্রহীন লেখকের উপন্যাস গ্রহণ করবেন না, কাজেই ক্যালিফোর্নিয়া ফিরে স্টেইনবেক এক ধনীর গ্রীষ্মকালীন বাসভবনে প্রহরীর কাজ নিলেন। এখানে ঘর গরম করার জন্যে রোজ কাঠ চেরাই-ফাড়াই করেন আর অবসর পেলে লেখেন—আশ্চর্য নেশা বটে। সে নেশার ফসল 'কাপ অফ গোল্ড'—প্রকাশক যার পেতে কষ্ট হয় নি, কিন্তু খদ্দের জোটে নি বিশেষ।

এর পরে স্টেইনবেক বিয়ে করলেন ১৯৩০ সনে, উনি তখন এক ল্যাবরেটরিতে কাজ করেন মাইনে মাসে ২৫ ডলার মাত্র। দুজনে মাছ-ধরা স্টীমলঞ্চে করে মাছ ধরলেন—তাজা মাছ কেনার পয়সা তাঁর কোথায়! আর লিখে গেলেন বই একটির পর একটি। তাঁর 'প্যাশিচউরস অফ হেভেন' এবং 'টু এ গড আননোন' এ সময়কারই রচনা। কিন্তু তখনো বিশেষ খদ্দের জোটে নি তাঁর বইয়ের বরং তাঁর দুটো প্রকাশক কোম্পানীই উঠে গেলো দেউলে হয়ে! কিন্তু 'প্যাশিচউরস' অন্তত একজন প্রকাশকের ভালো লেগেছিল প্যাসকাল কভিচির যিনি ১৯৩৮ সন থেকে স্টেইনবেকের অনেকগুলি বই প্রকাশ করেন। 'টর্টিলা ফ্ল্যাট' কিম্বা 'অফ মাইস এ্যান্ড মেন' কভিচির প্রচারগুণে প্রসিদ্ধিলাভ করে এবং চিত্রে রূপায়িত হয়। এর পরে ১৯৪০ সনে যখন 'পুলিৎজার' পুরস্কার পেলেন তখন স্টেইনবেককে আর পায় কে! কিন্তু তাঁর খ্যাতি ও যশ চরম মুহূর্তে লাভ করেছিল তখন যখন ১৯৪২ সনে সাহিত্যের জন্যে স্টেইনবেক নোবেল পুরস্কার পেলেন!

বঞ্চিত, অবহেলিত, পতিতদের জীবন-কথাই স্টেইনবেক লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর সাহিত্যে। তাঁর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ধনী ও শোষকসমাজ। বস্তুত স্টেইনবেক ছিলেন আমেরিকার প্রগতিশীল আন্দোলনের পুরোধা, তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি 'গ্রেপস অফ র‍্যাথ' সেই বঞ্চনা, শোষণ ও লাঞ্ছনার বিরুদ্ধেই এক বিদ্রোহমশাল। তাই মার্কিন সরকার তার নগ্নতার খোলস উন্মোচন হতে দেখে বইটিকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন আন-আমেরিকান হওয়ার অপরাধে।

স্টেইনবেক কি একটু ঝিমিয়ে পড়েছেন? মধ্যাহ্ন-সূর্য কি ঢলে পড়েছে, আগুন কি নিস্তেজ হয়েছে? 'গ্রেপস অফ র‍্যাথ'-এর পরে 'দি ওয়েওয়ার্ড বাস', 'দি পার্ল', 'সুইট থার্সডে', 'ক্যানারি রো', 'বার্নিং ব্রাইট' 'রাশিয়ান জার্নাল' ইত্যাদি অনেক উপন্যাস নাটকই তিনি লিখেছেন, পত্র-পত্রিকায়ও কম লেখেন নি। কিন্তু তাঁর 'ইস্ট অফ ইডেন'-এ যেন অন্য সুরের ধ্বনি শোনা গেল, যেন ক্লান্তি, অবসাদ আচ্ছন্ন করেছে তাঁকে। ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকার ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর মতামতও পরিষ্কার নয়, কিম্বা একটু আগের প্রগতিশীল চিন্তাধারার তুলনায় বেসুরো। দেখা যাক, ঘটনাস্থল থেকে তাঁর বিবরণী কী বলে।

ভারত দর্শন

ইন্দিরা-কামরাজ-মিশ্র আলোচনা (কৃষ্ণমেননের মনোনয়ন সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব মুহূর্তে)

রাজ্যপাল সম্মেলন

সমস্যাসংকুল ভারতবর্ষে রাজ্যপাল সম্মেলন স্বভাবতই ডাকা হয় সমস্যার ভবিষ্যৎ মোকাবিলা করার জন্য সলা-পরামর্শ করতে। সুতরাং রাজ্যপাল সম্মেলন শুনে একথা আমরা কখনই ভাবতে পারলাম না যে, রাজ্যের জন-জীবনের উন্নতির জন্যও এমনতর সম্মেলন ডাকা হতে পারে। অন্যভাবে বললে, রাজ্যপাল সম্মেলন শব্দ দুটি আমাদের সামনে, রাজ্যের উজ্জ্বলতর কোন বিষয়ের আলোচনার জন্য সম্মেলন, এমনতর কোন চিত্র স্থাপন করে না। আর বোধ করি, এই কারণও যথেষ্ট, যা আমাদের প্রারম্ভেই বলতে বাধ্য করবে যে, এ দেশের শাসনসংকট এমনই ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় প্রোথিত যাতে রাজ্যপাল সম্মেলনের অর্থ বেসামাল অবস্থার কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাবটিরই দ্যোতনা করে।

এবারের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত পনের রাজ্যের রাজ্যপাল ও দিল্লী হিমাচলপ্রদেশ এবং পণ্ডিচেরীর লেঃ গভর্নর সম্মেলনেও আমাদের উপরোক্ত ধারণার ব্যত্যয় ঘটে নি।

এবারেও রাজ্যপালরা তাঁদের প্রথাবদ্ধ মুখস্থ বুলি আওড়েছেন। বলেছেন, তাঁরা রাজ্যব্যাপী হিংসাত্মক কার্যকলাপে বিব্রত। নিন্দা করেছেন, স্বদল ছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে যাঁরা (রাজ্যপালদের আত্মতৃপ্ত ধারণায়) ছাত্রদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছেন।

বলা বাহুল্য এসব কথা ঢের শোনা হয়ে গেছে এবং সেই চর্বিতচর্বণের জন্যে রাজকোষে ব্যয় বৃদ্ধি করে রাজ্যপালদের রাজধানী বেড়াতে যাওয়ার সঠিক প্রয়োজন উপলব্ধি করা কঠিন। এর বেশি চিন্তা করার ক্ষমতা বা আগ্রহ যদি না থাকে তবে সম্মেলনের প্রয়োজন কেন হয় কে জানে। অন্তত রাজ্যপাল সম্মেলনে কোন রাজ্যপালের বক্তব্যকে যত্ন করে রিপোর্ট করার প্রয়োজনও যে সাংবাদিকরা অনুভব করেন না, একারণেও এ সম্মেলনের সার্থকতায় সমূহ সন্দেহ জাগে।

এই সম্মেলনে পৃথিবীর অন্যতম জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধেয় ডঃ রাধাকৃষ্ণণের উক্তি ভারতবাসীকে আজকের সংকট মুহূর্তে নতুন পথের সন্ধান দিতে পারত। অন্তত এমত আশা করা অন্যায় নয়। কিন্তু অতীব দুঃখের কথা, ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ মহাশয় যেহেতু রাষ্ট্রপতি সেজন্য তাঁকেও বাঁধা বক্তব্যের পাতাতেই আবদ্ধ থাকতে হয়েছে। নতুন কোন পথনির্দেশ সেখানেও মেলে নি। ভয় হয়, যতকাল রাজনীতি পরস্পর দোষারোপের মোহে বিভ্রান্ত থাকবে ততকাল এ পোড়া দেশ উপযুক্ত নেতার মুখে জাতির অতি সংকটপূর্ণ মুহূর্তেও উপযুক্ত নির্দেশলাভে ধন্য হবে না।

চাতুর্যের দ্বারা মহৎ কার্য অসম্ভব

জ্ঞানীরা বলে থাকেন কেবলমাত্র চাতুর্যের দ্বারা মহৎ কার্য অসম্ভব। বলা বাহুল্য এখানে চাতুর্য শব্দটির বিশেষ অর্থ আছে। প্রকৃত চাতুর্য কখনও মহৎ কাজও সম্পাদন করে থাকে, কিন্তু চাতুর্যের ভান কেবলমাত্র অশ্ব-ডিম্ব প্রসবেই সক্ষম। রাজধানীতে রাজ্যপালদের রাজকীয় সম্মেলনে কিছু চাতুর্যের ভান করা হয়েছে, যাকে, অপরাধ গ্রহণ করা না হলে, বলতে ইচ্ছে করে, ভাঁড়ামি। রাজ্যপালরা পাখি-পড়া ভাবে 'ভায়লেন্স' কথাটা বহুকালের বদ অভ্যাসবশত মুখস্থ করতে করতে গেছলেন এবং সমস্বরে উদ্গার করেছেন।

কিন্তু এই দায়িত্বহীন উক্তি পরিবেশনের মুহূর্তে একবার পিছন ফিরে দেশীয় ঘটনাবলীর দিকে দৃকপাত করেন নি। করলে দেখতেন, যাকে 'ভায়লেন্স' মনে করে তাঁরা ভয় পেয়েছেন, তা আসলে হিংসাত্মক কার্যকলাপ নয়, খোঁচা-খাওয়া বদ্ধ জীবের দাঁতখিঁচুনি মাত্র। অথচ আশ্চর্যের কথা—এই যে, প্রতিটি 'ভায়লেন্সে'র পরে যে সরকারী অনুসন্ধান কমিটি বসে, তাঁরা সাফা কথায় এ সত্য বারবার প্রকাশ করেছেন, আর তাঁদের সেইসব প্রতিবেদন রাজ্যপালদের ছাড়পত্র নিয়ে আমাদের কাছে পৌঁছাতে অনেক বিলম্বও হচ্ছে। অর্থাৎ আমরা যা বিলম্বে পেয়ে তাৎক্ষণিক বিচারে বুঝছি, রাজ্যের পালকবর্গ তা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে, তথ্যফাঁস যুক্তিপ্রধান সেসব বক্তব্য অনেক বিবেচনা করে ছাড়ছেন। সুতরাং এসব বক্তব্য সাধারণের চেয়ে ভালভাবেই এবং গুরুত্বপূর্ণভাবেই বিশ্লেষ করছেন তাঁরা। ফলত বেশ টের পাচ্ছেন যে, সাধারণের আবেদন অভিযোগকে নিতান্ত অবহেলায় প্রতিনিয়ত পায়ে ঠেলার অনিবার্য ফলশ্রুতিই হল 'ভায়লেন্স'; যাকে আমরা বলব, অসহায় বদ্ধ মানুষের বিশৃঙ্খল প্রতিবাদ। এ যে কেন প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটবে না, তাও বুঝি না আমার দালানে ঝোলানো খাঁচার টিয়াকে অনবরত খুঁচিয়ে দেখেছি সে-ও ঠোকরাতে এসেছে; বুঝেছি 'অপদার্থে'র চোট সাংঘাতিক হয়েছে। এখন প্রতিবাদ স্বাভাবিক; রাজ্যের পালক প্রভুরাও বেশ বুঝছেন, সাধারণের ওপর তাঁদের মন্ত্রিসভা অহর্নিশ যে খোঁচা চালাচ্ছেন তাতে সাধারণের খেঁচুনীই স্বাভাবিক; তত্রাচ না বোঝার ভান করছেন। ব্যাপারটা যদি রীতিমত কূট রাজনীতির চাল হ'ত, তবে পালকশ্রেষ্ঠরা না বোঝার ভান করলে বুঝতুম, ভানটা চাতুর্য বটে। তাতে মহৎ কিছু না হোক, রাজনীতি হবেও বা। কিন্তু যে অপচালের অতিপ্রয়োগে খাঁচার টিয়াও ঠোকরাতে আসে সে চালের কেরামতি শিশুবোধ্য। এ জিনিস যাঁরা বুঝেও বোঝেন না, তাঁরা আর যাই হোন, চতুর নন; এবং তাঁদের ভাঁড় বললেও উপযুক্ত বিশেষণের ভাঁড়ার নিঃশেষ হয় না। কিন্তু ভাঁড়ার উজাড় করে বিশেষণ প্রয়োগের ভাঁড়ামি আমরা করতে পারি না।

এসব কারণেই রাজ্যপালদের

উপস্থিতি দেশের বাস্তব অবস্থার কিছু-মাত্র হেরফেরে সাহায্য করতে পারে না। করেও নি। এ নিয়ে বাক্যব্যয় পণ্ডশ্রম মাত্র। এমন কি এঁদের বক্তব্য আলোচনা করেই যাঁরা এখনো বুদ্ধিজীবী, ক্রমশ তাঁদের বুদ্ধি-বিদ্যেও লোপ পাবে। দুই-এ দুই-এ পাঁচ মেলানোর একই ভুল অংক রোজ প্রমাণ করতে গেলে বুদ্ধির রেডে মরচে পড়বে। দেশের পক্ষে সেটাও কম বড় সংকট নয়। মোদ্দা কথা, অন্ধ হলেও যে প্রলয় বন্ধ থাকে না। ছদ্মবেশী অন্ধকে সে বিষয় জ্ঞান দিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। আমরা সেই বিড়ম্বনার সংকটেও পড়েছি।

আমরা বর্তমানে 'ভায়লেন্স'-'ভায়লেন্স' খেলছি। খেলার নেশায় এ খেলার পরিণাম রমণীয় নয়, এ বোধও ক্রমশ হারিয়ে ফেলছি। সংকট যদি এখনো সত্যিই না এসে থাকে, তবে তা ভবিষ্যতে আসবে। রাখালের পালে একদিনই বাঘ পড়েছিল।

আপনি পথনির্দেশ দিন।

আমাদের পরম সৌভাগ্য, আমাদের শ্রদ্ধেয় বর্তমান রাষ্ট্রপতি গুণীশ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। উপরের বক্তব্যের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে সবিনয়ে তাঁর কাছে এই আবেদন কি অজ্ঞান-অভাজনে রাখতে পারে: হে মহাত্মন, আপনিও চতুর্দিকের এই বিভ্রান্তিকে প্রশ্রয় দান করবেন না! কেন না আপনার দার্শনিক প্রতীতিতে আমরা একান্ত শ্রদ্ধাশীল। আপনার বক্তব্যকে আমরা মূল্যবান বাণী-রত্ন বলে জ্ঞান করি। আজ ভারতের সত্যিই ঘোর দুর্দিন। সত্যিই বিশৃংখলা নৈরাশ্য এবং নৈরাজ্য চতুর্দিক হা-হা করে গ্রাস করতে ছুটেছে। এ সময় আপনার বলিষ্ঠ নির্দেশ আমাদের হয়ত দিশাহারা পংগুত্ব থেকে মুক্তি দিতে পারে। আপনি কুরাজনীতিতে কর্ণপাত করবেন না। আপনি পক্ষপাতহীন চিন্তাগর্ভ আদেশ করুন, কোটি প্রস্তুত যুবক সে আদেশ শিরোধার্য করে নিমজ্জমান বিদ্বেষ-বিক্ষুব্ধ হতাশাতাড়িত মুষ্টিমেয়-পদদলিত লাঞ্ছিত বুভুক্ষু ভারতকে আশা-উজ্জ্বল দিবালোকের দ্বারদেশে নিশ্চয় সমুত্তীর্ণ করবে। আপনি আদেশ করুন! অথবা আপনি পথনির্দেশ দিন!

আমাদের একান্ত দুর্ভাগ্য, স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালীন বাণীতে শ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রপতির নিকট থেকে ভারতবাসী যে সহানুভূতিপূর্ণ বাণী শুনেছে, আজ (নির্বাচনের প্রাক্কালে) সেই তুল্যমূল্য সহানুভূতিরও স্পর্শ সে পায় নি রাজ্যপাল সম্মেলনে সংকট পর্যালোচনাকালীন রাষ্ট্রপতির ভাষণে।

ছাত্র অসন্তোষ

ছাত্র অসন্তোষের ওপর রাষ্ট্রপতির ভাষণে আমরা খুঁজে পেলাম না সমস্যার মূলে ধরে নাড়া দেওয়ার অভিপ্রায়। চকিত কর্তব্যের খাতিরে তিনি একবার বললেন অবশ্য, The fact that these out bursts so often originate from trivial causes 'suggests that there may be' a wider and deeper malaise. Economic difficulties and individual frustrations no doubt account for a good deal of restlessness among the young people, এবং তখনই যোগ করলেন, and certain political elements have not been slow to exploit this feeling for their own end.

অর্থাৎ তিনি স্বীকার করলেন, ছাত্র অসন্তোষের মূলে 'হয়ত বা' আর্থিক সংকট এবং ব্যক্তিগত নৈরাশ্য পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। আর তখনই বললেন, আর এই সুযোগের সদ্ব্যবহারে কতিপয় রাজনীতিওয়ালা কসুর করেন নি।

বলাবাহুল্য, এ হেন ব্যাখ্যা আমরা তাঁর কাছে আশা করি নি। যদি ছাত্র অসন্তোষের মূলগত কারণটা তাঁর মনে উঁকিই দিল, তবে বিষয়টি একটি 'হয়ত বা'র ধোঁকায় ধরে রেখে এতো দ্রুত অপরাধের বোঝা বিরোধী রাজনীতির ওপর স্কন্ধান্তর করলেন কেন। একথা আমরা প্রধানমন্ত্রীর মুখে শুনলে বিস্মিত হতাম না। কেন না কথার কারুকার্য, সাবধানে মূল সমস্যাকে ধরি মাছ না ছুঁই পানি করে পরিত্যাগকরণ ও যাবতীয় ব্যর্থতা প্রতিদ্বন্দ্বীর ঘাড়ে চাপানই আমাদের স্বদেশী শাসনপদ্ধতি; কিন্তু সমস্যার প্রতিবিধান নির্দেশে রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণও যখন বলেন, Increased facilities for recreation and extramural activities would also make them (the students) less liable to become involved in negative pursuits, তখন হতাশা ও লজ্জায় অধোবদন হয়।

স্কুল-কলেজে হাত-পা ছড়িয়ে অবসর-বিনোদনের সুযোগের অভাবেই কি ছাত্ররা দিকে দিকে ক্ষেপে উঠলেন। বড় তাজ্জব কথা। নিচু আকাশের নিচে প্রায়ান্ধকার পায়রার খোপে যাদের সমগ্র পরিজন ক্ষয়িষ্ণু দেহমনকে ধরে রাখবার জন্যে প্রতিমুহূর্তে ডাঙায়-তোলা-মাছের মতো ছটফট করছে, সেই ছাত্রসমাজ কিনা Increased facilities for recreation-এর জন্য প্রাণপণ মাতামাতি করল। আমাদের অবশ্য প্রজ্ঞা নেই, কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে, কোথাও একটা ভুল গণনা হয়েছে, 'হয়ত বা' 'recreation'-এর জায়গায় শুদ্ধ 'creation' হবে। অবসর বিনোদনের জন্য হয়ত নয়, লক্ষ্যভ্রষ্ট সৃষ্টিশর নিক্ষেপণের জন্যই বোধ হয় আজকের আকুলি-বিকুলি।

সমস্ত সমাজজীবনে একটা প্রচন্ড রন্ধ্যাত্ব এসেছে। আমাদের মানসলোক পর্যন্ত পংগুত্বে পর্যবসিত। সু-চিন্তার অমৃত মন্থন আর সম্ভব হচ্ছে না, কুচিন্তার গরলে আকণ্ঠ ডুবছি। অথচ নীলকণ্ঠ কেউ নেই। দিশা তাই হারিয়ে গেছে। বিক্ষোভ তাই প্রতিমুহূর্তে স্ফীতকায় হচ্ছে। পথ যদি বাতলাতেই হয়, এরই থেকে মুক্তির পথ বাতলানো দরকার। আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গিয়ে শুধু ভুলই জমিয়ে তোলা হবে। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ, কে জানে, আমাদেরই মতো তিনিও 'হয়ত বা' আজ বিভ্রান্ত।

জাতির সম্পদহানি

একথা অবশ্যই কেউ জোর গলায় উড়িয়ে দেবেন না যে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে গদী-আসীন দলের দুর্বলতা ও অক্ষমতার সুযোগ গ্রহণ করবে না বা করছে না। কিন্তু যেমন বলা হয়ে থাকে যে, যা কিছু সম্পদহানি, সবটুকু রাহাজানি বিরোধী নির্দেশে, তেমন করে ভাবনাকে ক্ষমতা-সীন দলের সুবিধামত বহিয়ে দিতে অনেকেই গররাজি।

বিগত খাদ্য আন্দোলন এবং ছাত্র আন্দোলন যে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই উৎসারিত হয়েছিল, একথা আজ বহু বিতর্কে এক রকম প্রমাণিত। বরং এসব ক্ষেত্রে বিরোধী রাজনীতি অনেকটা পরিস্থিতির ওপরই টেক্কা মেরে গেছে। আন্দোলন দানা বাঁধলে আসরে নেমে বাগাড়ম্বর করেছে, পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে নি। নেতৃত্বহীন আন্দোলন স্বভাবতই উষ্মা প্রকাশের পথকেই আলিঙ্গন করেছে তাই। এসব কথার উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি কেন যে ক্ষমতাসীন দলের নেতৃবৃন্দকে তিরস্কৃত করে বললেন না, আপনারাও তো জাতির নেতা বলে গর্ববোধ করে থাকেন আইন-সভার বাগযুদ্ধে; তবে জনতাকে শান্ত করতে আপনারাই বা আজ অক্ষম কেন? যদি আপনারাই জাতির প্রতিনিধি হিসেবে বহু ঢক্কানিনাদিত গণতন্ত্রের ধারকবাহক, তবে বিশৃংখল জনতার নেতৃত্বহীন উষ্মার সম্মুখীন হতে আপনাদের হৃৎকম্প হয় কেন? কেন আপনারা বাসস্থান ছেড়ে

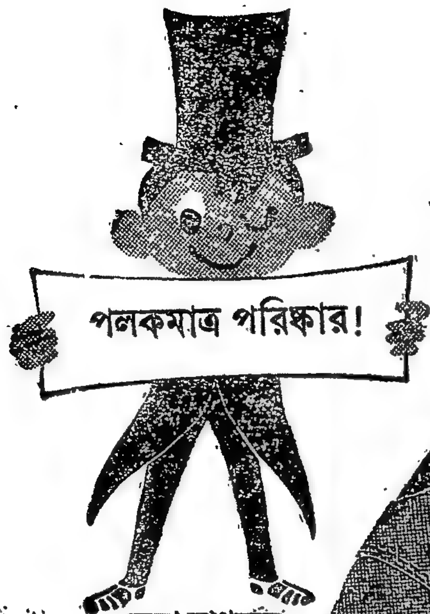

ভেজা কাপড়ের
এক ঝাপটায়
ময়লা দাগ
নিমেষে উধাও

বনবন্ধু
কালো আর বেইজ
সাইজ ৫ থেকে ৮ : ৬.৯৫
৯ থেকে ১২ : ৭.৯৫

দৌড়। ঝাঁপ। লাথি। লাফ। চিংপটাং। স্বাস্থ্যবান ছেলে-মেয়েদের সকল রকম ধকল সইবে এমন জুতো বাটা স্যানডাক্ কেমিলন—নতুন যুগের নতুন জুতো। আধুনিক নকশা আর চকমকি রঙদার—ছোটদের মন মাতাবে এমন জুতো স্যানডাক্। যেমন স্টাইল তেমন টেকসই। ফ্যাশান-মাফিক—তাই বলে ফ্যাশানসর্বস্ব নয়। আর, নিটোল ফিট্—দিনের পর দিন। এ-কথা ঠিক—এর চেয়ে মজবুত জুতো ছোটদের জন্য আর নেই। হাজার ব্যবহারেও আশ্চর্য অটুট এর গঠন। আর, যত ঝড়ই এর উপর দিয়ে যাকনা কেন, দেখতে থাকে চিরনতুন—যেন এখুনি কেনা। নতুন যুগের যন্ত্রবিজ্ঞানেই এ সম্ভব, আর কেমিলন—অপূর্ব এক রাসায়নিক মিশ্রণ, বহু বছর গবেষণার ফল।

আর, ধুলো-ময়লা-কাদা—স্যানডাক্ উপহাসে উপেক্ষা করে! মায়েদের কাছে এ সানন্দ সংবাদ। কলের জলের নিচেই হোক, বা ভেজা কাপড়ের এক ঝাপটায় ধুলো-কাদা যত ময়লা—ম্যাজিকের মতো—নিমেষে উধাও।

নতুন যুগের এই নতুন জুতো আপনার ছেলেমেয়েদের চমৎকার মানাবে। আজই নিয়ে আসুন বাটার দোকানে।

ছেলেমেয়েদের জন্য **Bata**

স্যানডাক্*

কেমিলন*

নতুন যুগের
নতুন জুতো

রাজা
লাল, নীল, বেইজ আর ট্যান
সাইজ ৫ থেকে ৮ : ৬.৯৫
৯ থেকে ১২ : ৭.৯৫

* রেজিস্টার্ড ট্রেড মার্কস। বাটা-অনুমোদিত-বিধি মতো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত

অনায় সম্পূর্ণভাবে পলায়ন করেন। তবে কি বুঝতে হবে, আপনাদের কণ্ঠস্বরে আজ আর সত্য এবং বিশ্বাসের সুর ধ্বনিত হয় না!

রাষ্ট্রপতি স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে এ প্রশ্নও উত্থাপন করতে পারতেন, প্রশাসনিক ব্যর্থতাকে আপনারা সংহত করতে ব্যর্থ হয়েছেন কেন? জনতাকে মৃত্যুর মুখোমুখি টেনে না নামিয়ে গণ অভিযোগে কর্ণপাত করতে আপনাদের মর্যাদাবোধ আহত হচ্ছে কেন? কিন্তু গণদাবিমাত্রকেই আপনারাই বা একটা দেনদার পাওনাদারি সম্পর্কের তিক্ততার মধ্যে নিক্ষেপ করছেন কেন? যদি আপনারাই জনপ্রতিনিধি তবে জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষা আপনাদের এজলাসে প্রারম্ভেই প্রত্যাখ্যাত হয় কেন? এ কেমনতর গণতন্ত্রের কথা? এ গণতন্ত্রের বুলি-সর্বস্বতায় কেমন করে মানুষকে সন্তুষ্ট পরিতৃপ্ত ও আশাদৃপ্ত করবেন আপনারা! এটা কি লজ্জার কথা নয় যে, আপনারা শুধু জনসাধারণের বিরুদ্ধে নালিশই রুজু করেন? কেন, জনগণ কি আপনাদেরও নেতা বলে স্বীকার করেন না! পাকিস্তানী হামলার সময় আপনারা ক্ষণিকের জন্য দেশের জনসাধারণের বদলে যখনই অন্যতর শত্রুর সন্ধান পেয়েছেন এবং জনগণের আকাঙ্ক্ষার সংগে নিজেদের কণ্ঠ মিলিয়ে আহ্বান জানিয়েছেন, সমগ্র দেশ আপনাদের নির্দেশের অপেক্ষায় সৈনিকের মতো সমবেত হয়েছে। তবে ওঁদের আপনারা ভয় করেন কেন? ওঁদের আপনারা বিরোধী রাজনীতির ক্রীড়নক বলে যতই দূরে ঠেলবেন, মানুষের, স্বভাবজ অভিমানবশত ওরাও ততই দূরে যেতে বাধ্য হবে। আসলে গণ-বিশ্বাস অর্জনে আজ আপনারা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ। একমাত্র ব্যর্থ শিক্ষকেরই ছুটতে হয় হেডমাস্টার মশায়ের কাছে আপন ছাত্রের বিরুদ্ধে নালিশ করতে। তখন সে শিক্ষক বেত ছাড়া অন্যকিছু ভাবতে পারেন না। কিন্তু বেতিয়ে শ্রদ্ধা আদায় করতে পেরেছেন এমন অবতার আজও ইতিহাস আমাদের কাছে উপস্থিত করতে পারে নি। ভেবে দেখুন, ওরা পথভ্রান্ত ভেবে যে পরিতোষ আপনাকে আরাম-কেদারায় আটক রেখেছে, সে পরিতোষ ভস্মাচ্ছাদিত আগুনকে কেবলমাত্র উস্কেই দেয়। এখনও ঢের সময় আছে, পরিস্থিতির সম্যক পর্যালোচনা করে আত্মশুদ্ধির আয়োজন করুন। অন্যথা বিপর্যয় আপনার মন্ত্রিসভা বিধান পরিষদে কেবলমাত্র ভোটবলে সামলাতে পারবেন এমন কথা নিশ্চয় করে বলা বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনও সংচিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব বলে মনে হয় না। দুর্বলতা আপনাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ করেছে। আপনাদের শাসন কেবলমাত্র বিরোধী দলকেই নয়, স্বদলের মধ্যে অমোঘ সত্য ভাষণের দ্বারা যাঁরা আজ জাতির প্রয়োজন কিছুমাত্র উপলব্ধি করতে প্রয়াস পাচ্ছেন, শত্রু বলে আজ তাঁরাও আপনাদের কাছে প্রতিভাত। হিসেবের ভুল সুতরাং ঠিক কোন স্তরে দাঁড়িয়ে আছে, আপনারা বিচক্ষণ, এসব কথাও আপনাদের ভাবতে হবে এবং অনুগামীদের ভাবাতে হবে। অন্যথা পথ তিমিরাভিসারী।

এসব কথা রাষ্ট্রপতি অবশ্য প্রকাশ্যে বলতে পারেন বলে মনে হয় না। কিন্তু পরিস্থিতি বিচারে আজ এগুলিই একমাত্র কথা, গায়ের জোরে তা অস্বীকার করা হলেও সেটা শুধু দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটাকেই রোখা হবে। বলা বাহুল্য, সত্য সেখানে বিতাড়িত অতিথি।

গরু-প্রেম এবং রাজনীতি

হাতের কাছেই জলজ্যান্ত প্রমাণ, গো-রক্ষা অভিযান। রাষ্ট্রপতি এ প্রসংগেরও উল্লেখ করেছেন। বলছেন, **We should not inflame the passions of the ordinary, people, which are difficult to control.** খুব খাঁটি কথা সন্দেহ নেই। সাধারণের উষ্মার ইন্ধন যুগিয়ে তাকে আত্মহননের পথে নিয়ে যাওয়া মারাত্মক অপরাধ। কিন্তু এই অপরাধকে 'আমরা' বিশেষণে ভূষিত করায় সমূহ আপত্তির কারণ আছে। এবং এই সাম্প্রদায়িক গরু-প্রেমে যাঁরা মজেছিলেন, তাঁদের ঢালাওভাবে সাধারণ মানুষ বললে, সাধারণ মানুষের সুবুদ্ধিকে অযথা আহত করা হয়। গত ৭ই নভেম্বর যাঁরা উন্মত্ততাকে হাতিয়ার করেছিলেন, প্রতিক্রিয়াশীল দল উপদল এবং কূপমণ্ডুকতাপ্রিয় মানুষ ছাড়া তাঁদের কেউ সমর্থন করে নি। এই সত্য জানার পরেও রাষ্ট্রপতির উপরে উদ্ধৃত বাণী আমাদের বিস্মিত বেদনাহত মূঢ় এবং বিভ্রান্ত করে।

নির্বাচন ও শান্তি

রাষ্ট্রপতি আগামী নির্বাচন যাতে ভালভাবে সমাপ্ত হতে পারে সেজন্য শান্তির আবেদন জানিয়েছেন। প্রত্যেক নাগরিক যাতে তাঁর ভোটাধিকার যথাযথ প্রয়োগ করতে পারেন, সেজন্য সত্যই নিরুদ্বেগ শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার প্রয়োজন। বস্তুত শান্তিপূর্ণ অবস্থা ছাড়া গণতন্ত্রের অস্তিত্ব রক্ষা সম্ভব নয়। কিন্তু এ প্রসংগে মনে রাখতে হবে যে, গণতন্ত্রের প্রয়োজনে যে শান্তি তা উভয়ত বজায় রাখার প্রয়োজন। আশা করা যায় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ব্যাস্ত জনগণ এবং দল রাষ্ট্রপতির এ আহ্বানে সাড়া দেবেন সরকারকেও এ সময় ধৈর্য ধারণ করতে হবে। অযথা জল যাতে ঘোলা না হয় তার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

অর্থনৈতিক সংকট এবং প্রতিকার

মুদ্রাস্ফীতি এবং মুদ্রামূল্য হ্রাস সম্পর্কেও তিনি তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। মুদ্রামূল্য হ্রাসজনিত অবস্থার সাংঘাতিক সুফল যে এক যুগের মধ্যেই ফলতে শুরু করবে এ বিশ্বাসও তাঁর আছে। মুদ্রাস্ফীতি রোধ প্রসংগে অন্যান্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের সময় রাষ্ট্রপতি সরকারী কর্মচারীদের জন্য প্রতিবছর মাগগীভাতা বৃদ্ধিতে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তিনি মনে করেন, এর ফলে ভোগ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে।

এই বক্তব্য সর্বান্তঃকরণে মেনে নেওয়া কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায় যখন বুঝতে পারি দেশের সামগ্রিক অর্থ বাজারটা সরকারী কর্মীদের মুখ চেয়ে ওঠানামা করে না। এই বিপুল ভারতবর্ষে মুষ্টিমেয় কিছু কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী বারান্বয়ে মাহিনাবৃদ্ধির সুযোগ লাভ করেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে প্রকৃত এবং অপ্রকৃত আয় কর্মীদের ক্ষেত্রে তারও থেকে বেশি বেড়েছে। রাজ্য সরকারী কর্মীরা এই আয় বৃদ্ধির কথা শুনছেন এবং আশঙ্কায় নীল হচ্ছেন। আয় বৃদ্ধির বহরটা কর্মীখাতে পাঁচ-দশ হলে, ব্যবসায়ীর মুনাফা তার শতগুণ হয়েছে। আর এই সমস্ত চাপটাই সমাজের অন্যতর বঞ্চিত এবং প্রবঞ্চিত সমাজের ঘাড়ে চাপছে। এসব প্রশ্নকে আমলে আনা হয় নি। পাকে প্রকারে বলা হয়েছে কেন্দ্রীয় কর্মীরা যদিবা দু-দশের সুযোগ পাচ্ছেন তাও বন্ধ হওয়া উচিত না হলেই ভোগ্যপণ্যের মূল্য বাড়বে। মুশকিল এই যে কোন অর্থনীতির ছাত্র এতো সরলভাবে মুদ্রাস্ফীতির কারণ বিশ্লেষ করতে গিয়ে নিশ্চয় হোঁচট খাবেন। আর বলবেন অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় এ চিন্তা কায়েমী স্বার্থের আশা-আকাঙ্ক্ষাকেই পরিপুষ্ট করবে মাত্র। এর দ্বারা দরিদ্রের দারিদ্র্যবৃদ্ধি সপক্ষেই যুক্তি খাড়া করা যায়।

দুর্ঘটনাদি

ভারতের পাতিল-প্রসাদ রেলদপ্তর খুব স্বল্পকালের মধ্যে দুর্ঘটনার ডায়রি ভরিয়ে তোলায় রাষ্ট্রপতি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, ব্যাপারটা সন্দেহজনক' নিশ্চয় এর পেছনে অধিকতর বুদ্ধিমান অপপ্রয়াস ক্রিয়াশীল আছে। থাকা অসম্ভব নয়। দুর্ঘটনার পৌনঃপুনিকতা

এবং সুপরিকল্পিত দুর্ঘটনা সংঘটনে সে বিশ্বাস আপনি জন্মাতে পারে। কিন্তু তাতেও রেলদপ্তরের প্রশাসনিক ব্যর্থতার অভিযোগ অস্বীকৃত হয় না। কিন্তু রাষ্ট্রপতি রেলদপ্তরের ব্যর্থতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করতে পারেন না। করেনও নি।

এবার নিয়ে একাধিকবার রাষ্ট্রপতি প্রশাসনিক ব্যয় হ্রাসের উপদেশ দিয়েছেন। কার্যকরী করা হয় নি। এখনও যে হবে এমন গ্যারান্টি নেই।

বৈদেশিক ঝঞ্ঝাট

প্রতিবেশী দুই রাষ্ট্র ভিন্ন আমাদের সংগে অপরাপর রাষ্ট্রের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণই, একথা ভারতে পেরে রাষ্ট্রপতি গভীর তৃপ্তি অনুভব করেন। সেই সংগে এ আশাও তিনি পরিত্যাগ করেন না যে, খুব শীঘ্রই তাসখন্দ ঘোষণানুসারে উভয় রাষ্ট্রের বৈঠক এবং বোঝাবুঝির মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হবে, যেমন দেরিতে হলেও লাল চীনের সংগে আমাদের মনোমালিন্যের অবসান ঘটবে।

সমগ্র ভারতবাসীর ন্যায় রাষ্ট্রপতিও আশাবাদী এবং বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারত অদ্ভুত সহনশীল। রাষ্ট্রপতির উপরোক্ত আশা সুতরাং তর্কাতীত বিশ্বাসের মতো আমাদের প্রত্যেকের মনকেই আশাকম্প্র করে রেখেছে।

বিদ্বেষকে জিইয়ে রেখে লাভ নেই; না ঘরে, না পরে। ঘরের বিদ্বেষভাব চড়-চাপাটি দিয়েও, বক্তৃতা জ্ঞান দিয়েও এড়ানো যায়। বাইরে বিদ্বেষ বাড়লে বিবিষ্ট দুই জাতিরই সমূহ ক্ষতি। শুধু উভয় রাষ্ট্রই নয়, বিদ্বেষ আন্তর্জাতিক বিপদকেও ঘনিয়ে তোলে। পূর্ব এশিয়ায় এশিয়ার মঙ্গলকামী মাত্রেই ভারত-চীন পাকিস্তানের ঠাণ্ডা লড়াই-এর অবসান কামনা করে। দুঃখের বিষয় এই আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গিতেও পাক চীন ভারত বিদ্বেষ সম্বরণ করে আলোচনার মাধ্যমে পারস্পরিক সৌহার্দ্য বর্ধনে খুব বেশি উৎসাহী এমন মনে করার কারণ কখনোই ঘটে উঠছে না।

ভারতের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাকামী সন্ত্রাসবাদীর হাত শক্ত করার এই দুই রাষ্ট্রের আজও চেষ্টার কসুর নেই। উপজাতি মনে অসন্তোষ সৃষ্টিতে, সংবাদ পাওয়া যায়, বৈদেশিক উস্কানি এমন কি অস্ত্র সাহায্য পর্যন্ত নিয়মিতভাবে চলছে।

আসামে আবার পাকিস্তানের অনুপ্রবেশকারীদের দর্শন মিলছে বলে শোনা যাচ্ছে। অতি সম্প্রতি বিলোনিয়ায় যে ঘটনা ঘটে গেছে সে ঘটনা অবশ্যই এই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে ভারত ও পাকিস্তানের জনগণ পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রেখেই চলতে চায় কিন্ত পাকিস্তানের জঙ্গী সরকার খুশিমত গুলীবর্ষণে তাসখন্দের পরও বিরত হন নি। বিলোনিয়ার অপর পারে পাক পরশুরামে প্রায় দশ হাজার পাক নাগরিক এক মহতী জনসভায় পাক সরকারের এই গুলীবর্ষণকে তীব্র নিন্দাবাদে আক্রমণ করেন। ফলত পাক সরকারকে গুলীবর্ষণ বন্ধ করতে হয়েছে। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, শাসকশ্রেণীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যাই থাক, জনগণের শুভেচ্ছা দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সম্প্রীতি বর্ধনে সাহায্য করতে পারে। এজন্য পাক-ভারত জনগণের মধ্যে পারস্পারিক শুভেচ্ছা সফরসূচী গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে।

কিন্তু সমূহ দুঃখের কথা এই যে আজ ভারত-পাক প্রশ্নের মধ্যেও একটি তৃতীয় এশীয় শক্তি তার নাসিকা প্রবিষ্ট করিয়েছে। পাক-ভারত হামলার সময় চীনের সরাসরি হুমকি ভারতবাসীকে বিশেষভাবে চীনবিরোধী মনোভাবে তিক্ত করে রেখেছে। তাছাড়া চীন-ভারত মতদ্বৈধ তো আছেই।

মেনন-পর্ব

শ্রী ভি কে কৃষ্ণমেননকে মন্ত্রিসভা থেকে যেদিন সরানো হয়েছিল, ভারতের মাটিতে আধা-সমাজতান্ত্রিক চিন্তার ধারক বাহক স্বর্গত জওহরলাল নেহরু সেদিন জাতির ভাগ্য নিয়ন্তারূপে বর্তমান ছিলেন। কিন্তু এই নেহরুজীকেই সেই দিনও তাঁর শুভ-ইচ্ছাগুলি রূপায়ণে বহু প্রতিক্রিয়াশীল কুচক্রীর বিরুদ্ধাচরণ সামলে চলতে হচ্ছিল। অনেকে মনে করেন নেহরু-বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীলদের হিংস্র আক্রমণ থেকে নেহরুজীকেই রক্ষা করেছিলেন শ্রীমেনন। শ্রীমেনন ১৯৬২-র নির্বাচনে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে বিপুল জনসমর্থনের জয়মাল্য নিয়ে লোকসভায় পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। এমন সাফল্য অন্য কোন কংগ্রেসী নেতার ভাগ্যে সে সময়ে জোটে নি। শ্রীমেননের পক্ষে এই অভূতপূর্ব জনসমর্থনই প্রমাণ করে গণমতের যথার্থ বাহক শ্রীমেননই ছিলেন।

কিন্তু আজকের কংগ্রেস জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণে যেমন অনাগ্রহী, কোন প্রগতিবাদী জননেতাকে স্বদলে রাখতেও তেমনি সন্ত্রস্ত। আজকের কংগ্রেস জাতির মন থেকে নেহরুর সমাজবাদের স্বপ্নকে মুছে দিতে চাইছে, যার প্রমাণ কংগ্রেস সম্মেলনে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট ফোরামের মুখ বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা। কোন সু-চিন্তাকে আর সহ্য করা যাচ্ছে না। সহ্য করা যায় নি প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দাকে, সরে যেতে হয়েছে টি টি কৃষ্ণমাচারীকে। কিন্তু এসবকেও টেক্কা দিয়ে গেছে উত্তর-পূর্ব বম্বে নির্বাচনী এলাকায় শ্রী ভি কে কৃষ্ণমেননের মনোনয়ন নিয়ে পাতিল-মোরারজী গোষ্ঠীর কাছে কংগ্রেস ইলেকসন কমিটি তথা কামরাজ-ইন্দিরা-চ্যবনের চূড়ান্ত পরাভব। ভি কে কৃষ্ণমেনন, যিনি এই নির্বাচনী এলাকারই সবথেকে জনপ্রিয় প্রতিনিধিরূপে লোকসভা আসন অলঙ্কৃত করে আসছেন, তাঁর প্রগতিবাদী সমাজতান্ত্রিক চিন্তাকে প্রতিক্রিয়াবাদী চিন্তার স্রোত গলাধাক্কা দিয়ে তাড়াতে চেয়েছে এবং অদ্ভুত উপদলীয় শক্তির দ্বারা সে বাসনা পূর্ণও করেছে।

যে নির্বাচনী এলাকা কৃষ্ণমেননকে দাবি করে কংগ্রেস হাই কমাণ্ড পর্যন্ত দরবার করেছে, যে এলাকার বিভিন্ন স্তরের নাগরিক লক্ষ লক্ষ স্বাক্ষর সংগ্রহ করে কৃষ্ণমেননকেই তাঁদের আন্তরিক সমর্থন জানিয়েছেন; যে নির্বাচনী এলাকা থেকে কৃষ্ণমেননকে উৎখাত করা ঘোরতর প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত বলে দেশের সর্বত্র সোচ্চার কণ্ঠস্বর শোনা গেছে। উপদলীয় শক্তি অম্লানবদনে অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে সেই এলাকায় মেননকে মনোনয়ন দিতে আপত্তি জানিয়েছে। আর এই অন্যায়, উন্মুক্ত প্রতিক্রিয়াবাদের কাছে পরাভব স্বীকার করে নিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যতম মহারাষ্ট্রীয় নেতা শ্রী ওয়াই বি চ্যবন। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আজ তার মুখোস টেনে খুলে ফেলল; আজ সে সরাসরি চ্যালেঞ্জে নামল। সুতরাং প্রগতিবাদী ভারতের আজকে সমঝে চলার দিন।

শ্রী ভি কে কৃষ্ণমেনন কিন্তু এখনো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি উত্তর-পূর্ব বোম্বাই ব্যতীত অন্যত্র যেখানেই কংগ্রেস মনোনয়ন পান তা গ্রহণ করবেন না।

শ্রীমেননকে যে অবমাননার সম্মুখীন হতে হ'ল (প্রকৃতপক্ষে এই অবমাননা উত্তর-পূর্ব বোম্বাই-এর নাগরিকবৃন্দের ওপরই অধিকতর বর্তেছে, তথা প্রগতিবাদী চিন্তায় যাঁরা আস্থাশীল, এ অবমাননা তাঁদের ওপর নেমে এসেছে), তার পর তাঁর কংগ্রেস মনোনয়ন নিয়ে অন্যত্র দাঁড়ানও সম্ভব নয়।

কিন্তু শ্রীমেনন কি অন্যরূপে জনতার আশাকে রূপদানের জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন? এ সম্পর্কে আজও তিনি নীরব কেন? জনতার ডাক তাঁর পক্ষে উপেক্ষা করা দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে গণ-আশার মুখে ছাই ছিটিয়ে দেওয়াই হবে। জনগণ এখন মেননের পরবর্তী কর্তব্য সম্পর্কে সবিশেষ কৌতূহলী।

সাংবাদিকদের প্রশ্নে জর্জরিত (সলিসবেরী-প্রত্যাগত) বাউডেন

স্পেন ঃ

জেনারেল ফ্র্যাঙ্কো গত সপ্তাহে স্পেনের জন্য একটি নতুন সংবিধানের কথা ঘোষণা করেছেন। প্রজাতন্ত্রের উচ্ছেদের পর ২৭ বছর ধরে জেনারেল ফ্র্যান্সিসকো ফ্র্যাঙ্কোর জবরদস্ত এক-নায়কতন্ত্রী শাসন চলছে স্পেনে। ৭৩ বছর বয়সে বার্ধক্যের প্রান্তসীমায় পৌঁছে ফ্র্যাঙ্কো বোধ হয় আজ ভাবছেন, তাঁর মৃত্যুর পর কি হবে? নতুন সংবিধানে তাই তিনি কিছুটা গণতন্ত্রের ব্যবস্থা করতে চেয়েছেন, স্পেনে আবার নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের প্রবর্তন তাঁর কাম্য।

স্পেনের আইনসভা 'কর্তেজে'র এক বিশেষ অধিবেশনে পঞ্চান্ন মিনিট ব্যাপী ভাষণে রাষ্ট্রপ্রধান 'কদিলো' ('Caudillo of Spain by the grace of God.') ফ্র্যাঙ্কো তাঁর নতুন সংবিধান প্রকাশ করেন। আগামী ১৪ই ডিসেম্বর দেশব্যাপী গণভোটের দ্বারা এই সংবিধানকে চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করা হবে। ২১ বছর বা তার বেশি বয়সের সবাই গণভোটে অংশ নিতে পারবে। ফ্র্যাঙ্কো-ঘোষিত এই সংবিধান যে বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এতদিন ফ্র্যাঙ্কোই একাধারে রাষ্ট্রের প্রধান ও সরকারের প্রধান, দুই-ই ছিলেন। নতুন সংবিধানে রাষ্ট্রপ্রধানের পদ 'কদিলো' ছাড়াও একজন প্রধান-মন্ত্রীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। 'কাউন্সিল অব দি রিয়লম' নামে একটি পরিষদ কর্তৃক বাছাই করা তিনজনের মধ্য থেকে 'কদিলো' একজনকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন। কাউন্সিলের মোট ১৭ জন সদস্যের ভেতর ১০ জন আইনসভা 'কর্তেজ' কর্তৃক নির্বাচিত এবং বাকি ৭ জন 'কদিলো'র মনোনীত হবেন। এছাড়া নতুন সংবিধানের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল ঃ (১) এই প্রথম 'কর্তেজে'র জন্য প্রত্যক্ষ নির্বাচন হবে। 'কর্তেজে'র মোট ৪০৩ জন সদস্যের মধ্যে ১০৮ জন ৫৪টি প্রদেশ থেকে জনসাধারণের দ্বারা প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। ২৫ জন 'কদিলো' কর্তৃক মনোনীত হবেন। আর বাকি ২৭০ জন বিভিন্ন গোষ্ঠী, সমিতি ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করবেন। (২) ভোটাধিকার সম্প্রসারিত করা হবে। এতদিন বিবাহিতা মহিলাদের মধ্যে কেবলমাত্র যারা পরিবারের প্রধান, তাদেরই ভোটাধিকার ছিল। কিন্তু এখন থেকে সবাই ভোট দিতে পারবে। (৩) ধর্মের স্বাধীনতাও স্বীকার করা হয়েছে। ক্যাথলিক ছাড়া অপর কেউ স্পেনে প্রকাশ্যে তাদের নিজেদের ধর্মাচরণ করতে পারে না। নতুন সংবিধান প্রবর্তনের পর দেশের ৩০ হাজার প্রোটেস্টান্ট ও ৬ হাজার ইহুদী স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্ম পালন করতে পারবে। (৪) স্পেনে সর্বপ্রকার ধর্মঘট নিষিদ্ধ। কিন্তু এবার থেকে ধর্মঘটের ওপর এই নিষেধাজ্ঞা অপসারিত হবে।

নতুন সংবিধান ঘোষণারত ফ্র্যাঙ্কো

ফ্র্যাঙ্কোর নতুন সংবিধানের সবচেয়ে বড় প্রস্তাব, পরবর্তী রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগের ব্যবস্থা। ফ্র্যাঙ্কো যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন যে তিনিই রাষ্ট্রপ্রধান থাকবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সংবিধানে নির্দেশিত সমর্থন তিনি অবশ্যই পাবেন। কিন্তু তার পরের ব্যবস্থাও তিনি ভেবেছেন। সংবিধানে বলা হয়েছে, 'কাউন্সিল অব দি রিয়লম' ও সরকার একমত হয়ে একজনের নাম প্রস্তাব করবে এবং এই নাম 'কর্তেজে'র সদস্য-দের তিন-পঞ্চমাংশের দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে। যদি 'কর্তেজ' কোন নাম অনুমোদন না করে, তবে সাময়িকভাবে একজন 'রিজেন্টের' হাতে শাসনভার দেয়া হবে। তারপর 'কর্তেজে'র অনুমোদনযোগ্য ব্যক্তির খোঁজ করতে হবে। এইভাবে যিনি রাষ্ট্রপ্রধান হবেন, তিনি হবেন স্পেনের রাজা। রাজার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রাজা হবেন। এইভাবে স্পেনে নতুন করে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের প্রবর্তন করা হবে। ফ্র্যাঙ্কোর পর কে প্রথম এই রাজার আসনে বসবেন, তা নিয়েও জল্পনা সুরু হয়েছে। স্পেনের প্রাক্তন রাজার পুত্র, বর্তমানে পর্তুগালে নির্বাসিত ৫৩ বছর বয়স্ক ডন জুয়ান দ্য বরবন ইয়া ব্যাটেনবার্গের নাম এই প্রসঙ্গে শোনা যাচ্ছে। ডন জুয়ানের ২৮ বছর বয়স্ক পুত্র জুয়ান কার্লো বর্তমানে মাদ্রিদে আছেন। কেউ কেউ তাঁর কথাও ভাবছেন।

ফ্র্যাঙ্কোর এই রাজনৈতিক সংস্কার প্রস্তাব নিশ্চয়ই দেশের অভ্যন্তরে জন-সাধারণের চাপের ফলেই হয়েছে। আধুনিক গণতন্ত্রের ধারণা অনুযায়ী এর

দ্বারা এখনই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে না স্পেনে। রাজনৈতিক দল গঠন এবং সরকার পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করার অধিকার আজও নাগরিকদের দেয়া হয় নি। আইনসভায় এখনও নির্বাচিত সদস্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবে না। তবু পরিবর্তনের হাওয়া বইতে সুরু হয়েছে। ফ্র্যাঙ্কোর মৃত্যুর পর যদি সত্যি আবার এখানে রাজতন্ত্র ফিরে আসে, তবু আর পুরোনো দিনের মত স্বৈরাচারী রাজ-শাসন সম্ভব হবে না। একনায়কতন্ত্রকেও আর বেশিদিন টিকিয়ে রাখা যাবে না। বৃদ্ধ ফ্র্যাঙ্কো যে ক'দিন বেঁচে আছেন হয়তো কঠোর হস্তে তিনি তাঁর একনায়কত্ব চালিয়ে যাবেন। তারপর গণতন্ত্রের পথেই অগ্রসর হতে হবে স্পেনকে।

দক্ষিণ রোডেশিয়া :

সলিসবেরী থেকে বৃটিশ কমনওয়েলথ সচিব হারবার্ট বাউডেন খালি হাতে লন্ডন ফিরেছেন, দক্ষিণ রোডেশিয়ার বিদ্রোহী শ্বেতাঙ্গ প্রধানমন্ত্রী আইয়ান স্মিথের সঙ্গে তাঁর আলোচনার কোন ফল হয় নি বলে যে সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল, দেখা যাচ্ছে তা ঠিক নয়। কারণ তার পরেই এক গুরুত্বপূর্ণ নাটকীয় ঘটনা ঘটেছে। জিব্রাল্টার বন্দরের অনতিদূরে সমুদ্রের ভেতর জাহাজের অন্তরালে গোপন আলোচনায় মিলিত হয়েছেন বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন ও আইয়ান স্মিথ।

২রা ডিসেম্বর ভোরে লন্ডন থেকে বিমানে জিব্রাল্টার এসে পৌঁছান উইলসন, স্মিথও এসে হাজির হন সলিসবেরী থেকে। বৃটিশ ক্রুজার 'টাইগারে' তাঁরা মিলিত হন রোডেশিয়া সমস্যা আলোচনার জন্য। উইলসনের সঙ্গে আছেন হারবার্ট বাউডেন, আর স্মিথের সঙ্গে তাঁর তথ্যমন্ত্রী জন হাউমান। অন্যান্য পরামর্শদাতারাও আছেন। রোডেশিয়া প্রশ্নে নতুন কি আপোষসূত্র পাওয়া গেছে, এবং কোন পথে আলোচনা চলছে, কিছুই জানা যায় নি। এই প্রবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত (৪ঠা ডিসেম্বর) উভয়ের মধ্যে আলোচনা চলছে।

তবে এই আলোচনার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে বিভিন্ন মহলে। আফ্রিকা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। জাম্বিয়ার রাষ্ট্রপতি কেনেথ কাউন্ডা এভাবে স্মিথের সঙ্গে আলোচনায় বসার জন্য উইলসনের সমালোচনা করেছেন। দক্ষিণ রোডেশিয়ার নিষিদ্ধ দল জিম্বাবোয়ে আফ্রিকান পিপলস ইউনিয়ন বা জাপুর নেতারা দার-এস-সালাম থেকে এই আলোচনার ব্যাপারকে বৃটেন কর্তৃক রোডেশিয়া তথা আফ্রিকার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে বর্ণনা করেছেন। বৃটেনেও শ্রমিক দলের বামপন্থী সদস্যরা ব্যাপারটাকে ভাল চোখে দেখছেন না। এভাবে স্মিথের খোসামুদী করা তাঁদের ভাল লাগছে না। আবার, সলিসবেরীতে স্মিথের শ্বেতাঙ্গ গোষ্ঠীর কোন কোন কঠোর মনোভাবাপন্ন নেতাও নাকি পছন্দ করছেন না স্মিথের এই আলোচনায় যোগদান।

বারবাডোজ :

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের অন্যতম বারবাডোজ বৃটিশ অধীনতা থেকে মুক্তিলাভ করে ৩০শে নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা অর্জন করেছে।

ক্যারিবিয়ান সাগরে অবস্থিত মাত্র ১৬৬ বর্গমাইলের এই দ্বীপের লোকসংখ্যা আড়াই লক্ষের মত। প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ এই দ্বীপটির আর্থিক

এরল ব্যারো

অবস্থা ভাল। দেশ ভ্রমণের আকর্ষণে বহু লোক এখানে আসে, তার থেকেও প্রচুর আয় হয়। দেশবাসীর শতকরা ৯৮ জন অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। শতকরা মাত্র ৮ জন শ্বেতাঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও বর্ণবিদ্বেষের ঝামেলা এখানে বিশেষ নেই। ইংরেজদের সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের সম্পর্ক বেশ ভাল। স্বাধীনতার পরও বৃটিশ বাণিজ্য স্বার্থ এখানে অক্ষুণ্ণ থাকবে। বারবাডোজ কমনওয়েলথের মধ্যেও থাকবে।

১৬২১ সাল থেকে বারবাডোজ বৃটেনের অধীন। তবে ১৬৩৯ সাল থেকেই এখানে একটি নির্বাচিত আইনসভা রয়েছে। ১৯৬১ সাল থেকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করছে এখানকার অধিবাসীরা। এখন পেল পূর্ণ স্বাধীনতা।

৩০শে নভেম্বর রাজধানী ব্রিজটাউনে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে বারবাডোজের নতুন নীল ও হলুদ রং-এর জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। রাণী এলিজাবেথের প্রতিনিধিরূপে কেন্টের ডিউক ও ডাচেস এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য দেশের পক্ষ থেকেও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা স্বাধীনতা ঘোষণার এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন।

৪৬ বছর বয়স্ক নিগ্রো নেতা এরল ব্যারো হয়েছেন স্বাধীন বারবাডোজের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। তাঁর দল ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টি গত নির্বাচনে প্রতিনিধি পরিষদের ২৪টি আসনের মধ্যে ১৪টি দখল করেছে। বাকি ১০টি আসনের মধ্যে বারবাডোজ লেবার পার্টি পেয়েছে ৮টি, আর বারবাডোজ ন্যাশন্যাল পার্টি পেয়েছে ২টি।

পশ্চিম জার্মানী :

জর্জ কুর্ট কিসিংগার ১লা ডিসেম্বর তারিখে পশ্চিম জার্মানীর তৃতীয় চ্যান্সেলাররূপে কার্যভার গ্রহণ করেছেন। পাঁচ সপ্তাহ পূর্বে ফ্রি ডেমোক্রাটিক পার্টি কর বৃদ্ধির প্রতিবাদে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক ইউনিয়ন ও ফ্রি ডেমোক্রাটিক পার্টির কোয়ালিশন সরকার থেকে বেরিয়ে আসার ফলে যে মন্ত্রিত্ব সংকট দেখা দিয়েছিল, তার অবসান হয়েছে। লুডউইগ এরহার্ড চ্যান্সেলার পদে ইস্তফা দিয়েছেন, তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন কিসিংগার।

নতুন সরকার গঠিত হল ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক ইউনিয়ন ও সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি, পশ্চিম জার্মানীর প্রধান এই দুটি দলের কোয়ালিশনের দ্বারা। ১৯ জনকে নিয়ে গঠিত মন্ত্রিসভায় ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক ইউনিয়নের ১০ জন, এবং সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির ৯ জন স্থান পেয়েছেন। সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির নেতা ও পশ্চিম বার্লিনের মেয়র উইলি ব্রান্ড হয়েছেন সহকারী প্রধানমন্ত্রী বা ভাইস-চ্যান্সেলার ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী। আইনসভা বান্ডেস্টাগে উভয় দলের মিলিত সদস্যের সংখ্যা হবে ৪৪৭, ফ্রি ডেমোক্রাটিক পার্টির ৪৯ জন সদস্য থাকবেন মাত্র বিরোধী পক্ষে।

সি-ডি-ইউ ও এস-ডি-পি'র কোয়ালিশন সরকারের আমলে পশ্চিম জার্মানীর শাসনে কিছু পরিবর্তন অবশ্যই দেখা দেবে। এস-ডি-পি আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কর বৃদ্ধির প্রস্তাব মেনে নিয়েছে। শোনা যাচ্ছে, ভোগ্যদ্রব্যের ওপর আরও বেশি করে কর বসানো হবে। বৈদেশিক নীতির ব্যাপারে সি-ডি-ইউ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, পূর্ব জার্মানী এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন তথা পূর্ব য়ুরোপের সঙ্গে

ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপনের জন্য তারা চেষ্টা করবে। গ্যলপন্থীদের প্রভাবে হয়তো ফ্রান্সের সংগেও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাবে।

এস-ডি-পি দলের সভায় সহজে এই কোয়ালিশনের প্রস্তাব পাশ করানো সম্ভব হয় নি। উইলি ব্র্যান্ড, হারবার্ট উইলার, হেলমুট সমিদত প্রমুখ নেতারা কোয়ালিশনের পক্ষে বলা সত্ত্বেও দলের সাধারণ সদস্যরা অনেকে এর বিরোধিতা করেছেন। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী কোন দলের পক্ষে দক্ষিণপন্থী ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটদের সংগে একত্র সরকার গঠনের তাঁরা বিরোধী। তাছাড়া কিসিং-গারের মত প্রাক্তন-নাৎসী নায়কের নেতৃত্ব মানায় তাঁদের আপত্তি। তবু শেষ পর্যন্ত কোয়ালিশন প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে।

অনেকেই বিস্মিত হয়ে ভাবছেন, উইলি ব্র্যান্ড ও সোস্যাল ডেমোক্রাটরা ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটদের সংগে একত্র মন্ত্রিসভা গঠন করলেন কেন? ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটদের অবস্থা এখন যা দাঁড়িয়েছে, তাতে আগামী নির্বাচনে তাদের প্রধান দল রূপে জয়লাভ করা শক্ত হবে। সুতরাং সোস্যাল ডেমোক্রাটরা যদি বিরোধী দলে থাকে, তবে পরবর্তী নির্বাচনে তারাই প্রধান দল হবে, এবং ব্র্যান্ড চ্যান্সেলার হবেন। তাছাড়া ব্র্যান্ড তো এখনই চ্যান্সেলার হতে পারেন, ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটদের বাদ দিয়ে সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি ও ফ্রি ডেমোক্রাটিক পার্টি কোয়ালিশন গঠন করলে। তাহলে তিনি চ্যান্সেলার হবার সুযোগ ছেড়ে ভাইস-চ্যান্সেলার হলেন কেন? কারণ, ফ্রি ডেমোক্রাটদের নেতা এরিখ মেন্ডে তাঁকে ভরসা দিতে পারেন নি, তাঁদের দুই দলের কোয়ালিশনে ফ্রি ডেমোক্রাটিক পার্টির ৪৯ জন সদস্যেরই সমর্থন পাওয়া যাবে। আর, দু' দলের মোট সদস্য সংখ্যা যোগ করলেও দেখা যায়, ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক ইউনিয়ন থেকে তাঁদের সম্মিলিত সদস্যদের সংখ্যা মাত্র ৬ বেশি। এর দ্বারা কোন স্থায়ী সরকার গঠন সম্ভব নয়।

বারে বারে নির্বাচনে হেরে সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির নেতাদের মধ্যে একটা হতাশার ভাব দেখা দিয়েছে। ক্ষমতালাভের জন্য আজ তাঁরা লালায়িত। তাই তাঁদের পক্ষে মন্ত্রিসভায় যোগদানের জন্য কিসিংগারের আহ্বান প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় নি। 'হাতের একটা পাখী বনের দুটির চেয়ে ভাল' এই নীতিতে বিশ্বাস করে এখন যা পাওয়া যায় তাতেই খুশি হয়ে ব্র্যান্ড ও তাঁর সহ-কর্মীরা কিসিংগারের অধীন মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছেন।

একটি দুরন্ত অভিযান—

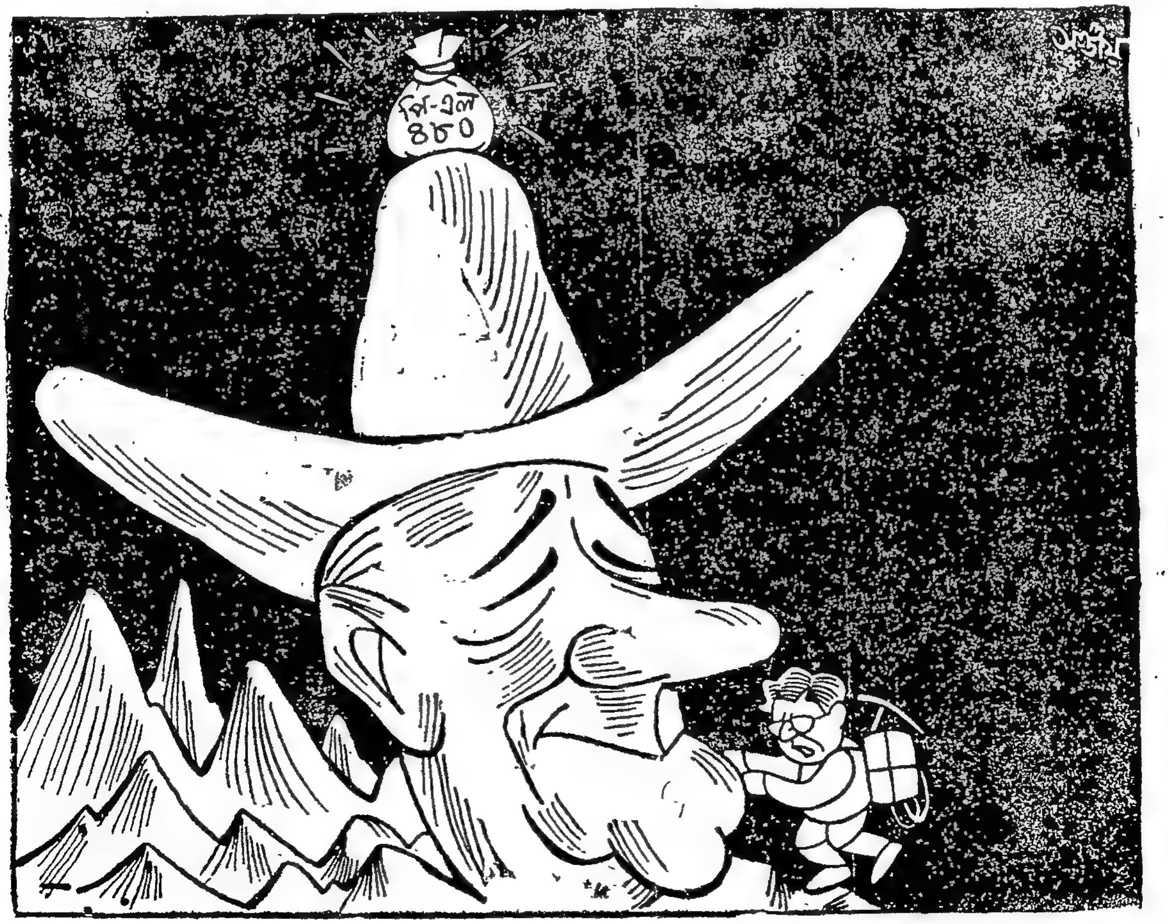

প্রত্যাশার মৃত্যু ও দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা

● কৃত্তিবাস ওঝা ●

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

নভেম্বর মাসের চতুর্থ সপ্তাহে পশ্চিম বাংলায় যতগুলি পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে অর্থাৎ দৈনিক ও সাপ্তাহিক—তার মধ্যে সম্ভবত দুটি কাগজ ছাড়া বেশির ভাগ পত্র-পত্রিকায় পশ্চিমবঙ্গে সার্বিক বামপন্থী ফ্রন্ট গঠনে সঙ্কট সৃষ্টির জন্য বামপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টিকে দায়ী করে নানাপ্রকার সংবাদ, সম্পাদকীয়, নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। শুধু পশ্চিম বাংলায় নয়, সর্বভারতীয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় একইভাবে পশ্চিম বাংলার বামপন্থী ফ্রন্ট গঠনের শোচনীয় ব্যর্থতার সংবাদ ফলাও করে প্রকাশ করা হয়েছে। কারণ পশ্চিম বাংলা সম্পর্কে শুধু বাংলাদেশের মানুষের নয় সারা ভারতের মানুষের বিপুল আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল। সহনশীলতা ও সহাবস্থান নীতি পশ্চিম-বাংলার বিভিন্ন মতাদর্শের দলগুলির মধ্যে কতখানি কার্যকরী রূপ গ্রহণ করে সেটাও রাজনৈতিকমহলে ঔৎসুক্য সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে অকল্পনীয়ভাবে বামপন্থী নির্বাচনী ফ্রন্ট গঠনের সম্ভাবনা লুপ্ত হবে ও কংগ্রেস বিপুল শক্তিতে ক্ষমতায় ফিরে আসবে এই ভবিষ্যৎচিন্তাই সকলের মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে বিগত সপ্তাহে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার লেখার উৎস সেইখানে।

যা হোক গত এক সপ্তাহের মধ্যে দুই কম্যুনিস্ট পার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লক, এস. এস. পি., এস. ইউ. সি.—বেসরকারীভাবে বাংলা কংগ্রেস, আর. এস. পি সহ প্রায় সকল দলেরই প্রার্থীতালিকা প্রকাশিত হয়েছে। এই তালিকাগুলি প্রকাশের সময় একটি বক্তব্য সকল দলের পক্ষ থেকে রাখা হয়েছে যে নিতান্তই বামপন্থী ফ্রন্টের স্বার্থে এবং কংগ্রেসকে পরাজিত করবার সুমহান দায়িত্বে তার দল মাত্র এই কয়টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, নচেৎ তার দল অনেকগুলি শক্ত ঘাঁটি ঐক্যের স্বার্থে অন্য দলকে দান করেছে। তবে ঐক্য যদি না হয় তার দল আরো অনেকগুলি বেশি আসনে লড়াই করবে। এই তালিকাগুলি প্রকাশের পর আর একটি সত্যও দিবা-লোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে আসনগত বিরোধ বাম কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে দক্ষিণ কম্যুনিস্ট পার্টি ছাড়া অন্য কোন দলের যথেষ্ট বেশি নেই। দক্ষিণ-পন্থী কম্যুনিস্ট, ফরোয়ার্ড ব্লক, আর. এস. পি. তাদের যে তালিকা প্রকাশ করেছে তাতে অন্য কোন দলের সঙ্গেই বড়রকম কোন বিরোধ চোখে পড়ে নি। কিন্তু বর্তমানে যে পরিস্থিতি অর্থাৎ পশ্চিম বাংলায় একটি বামপন্থী নির্বাচনী ফ্রন্ট না হওয়া তার মূলে কি শুধুমাত্র আসনগত বিরোধের প্রশ্নই বড়—না অন্য কোন প্রশ্ন আসল বিরোধের আড়ালে কাজ করছে। ইন্দ্র মালহোত্রের প্রবন্ধে এবং রিৎসদর্পণ বা অন্যান্য কাগজে যে সমস্ত তথ্য প্রকাশিত হয়েছে সেই তথ্য বাদ দিলেও বাম কম্যুনিস্ট পার্টির প্রার্থী-তালিকা প্রকাশ ও তদ্‌পরবর্তী বিভিন্ন বক্তব্য পশ্চিম বাংলায় নির্বাচনী ঐক্য গঠনে সহায়ক হয় নি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ পর্যন্ত দুই কম্যুনিস্ট পার্টির আসনগত বিরোধ মীমাংসার জন্য কোন চেষ্টাই অবশিষ্ট থাকে নি। কিন্তু সকলে যখন বাম কম্যুনিস্ট পার্টির 'দেহি পদপল্লব-মুদারমে' ব্যস্ত—তখন কিন্তু বাম কম্যুনিস্ট পার্টি একের পর এক কাজে সুদূর ভবিষ্যতের দিকে নজর রেখে কাজ এগিয়ে নিয়ে গেছে। সেই কাজ করবার মুখে দুটি ভূমিকা বাম কম্যুনিস্ট পার্টি জনসাধারণের সামনে রাখার চেষ্টা করেছে। সেই ভূমিকা হল তাদের দল ঐক্যের জন্য চরম ত্যাগ স্বীকার করেছে এবং যার পর আর কোন ত্যাগ স্বীকারের অবকাশ নেই। অপর ভূমিকা হল যাদের সংগে তাদের ঐক্য হচ্ছে না তারা শোধন-বাদী, কংগ্রেসের বিকল্প শক্তি এবং বাম কম্যুনিস্ট পার্টির বিপ্লবী শক্তি হরণ করাই লক্ষ্য। বাম কম্যুনিস্ট পার্টির বর্তমান প্রচার উপরের দুটি বক্তব্যকে ভিত্তি করেই বিভিন্ন শাখায় পল্লবিত হচ্ছে। সময়-সুযোগে আরও বিস্তারলাভ করবে। বাম কম্যুনিস্ট পার্টি সার্বিক ঐক্যের জন্য কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করেছে সে বিচার এই মুহূর্তে করার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ এমন একটা

১৯৬৭ সালে আপনার ভাগ্য

যে কোনও ফুলের নাম লিখিয়া পাঠান এবং টাকা ১·২৫ ভি,পি,পি, যোগে আগামী ১২ মাসের জন্য সম্পূর্ণ বিস্তারিতভাবে উত্থান পতন সহ আপনার ভাগ্যফল জানুন। পোস্টেজ স্বতন্ত্র।

Kashi Vigyan Mandir (9),
Beat No. 13, Aligarh.

সম্ভাবনার আলো এখনও জ্বলছে যেখানে কেউ কেউ আশা করেন সাধারণ মানুষের চাপে বাম কম্যুনিস্ট পার্টির মনোভাবের পরিবর্তন হবে। অন্যান্য প্রশ্নের কথা বাদ দিলেও প্রকৃত সত্য বাম কম্যুনিস্ট পার্টির তালিকাটির মধ্যে আছে। এই তালিকা প্রসঙ্গে বাম কম্যুনিস্ট পার্টির বক্তব্য তারা শক্তিমান নয় এমন একটি আসনও তারা দাবি করে নি—পরন্তু তারা শক্তিমান জেনেও অনেকগুলি আসন অন্যকে ছেড়ে দিয়েছে। এইবার বাস্তবে আসা যাক।

বাম কম্যুনিস্ট পার্টি ১২২টি আসনের মধ্যে বর্তমান বিধান সভার মোট ১২ জন সদস্যের আসন দাবি করেছে—লোকসভার ৭ জনের আসন দাবি করেছে। কংগ্রেসকে রাজ্যের সংখ্যালঘু শক্তিতে পরিণত করা অথবা কংগ্রেসকে পরাজিত করা যদি বিরোধীদের লক্ষ্য হয় তাহলে বাম কম্যুনিস্ট পার্টি সেই যুদ্ধযাত্রার আগেই বিরোধী দলের ১২ জন সদস্যকে প্রথমেই কোতল করলেন। শুধু এই-ই নয় কম্যুনিস্ট পার্টির নিজের দলেরও প্রায় পনেরোজন সদস্যকে আগামী নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন দেন নি। অর্থাৎ কম্যুনিস্ট পার্টির একক নির্দেশে তিরিশজন বর্তমান এম. এল. এ. আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী হবার সুযোগ পাবে না। যেখানে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের সঙ্গে বিরোধী দলের আসনগত তফাৎ পঞ্চাশের মধ্যে সেখানে তিরিশজন বর্তমান এম. এল.এ.-কেই যাত্রার সুরুতে বাদ দেওয়ার চেষ্টা কখনই সংখ্যাগুরু শক্তিতে পরিণত হবার সহায়ক নয়। নির্বাচনে একটি তথ্য তিনটি পরীক্ষায় প্রমাণিত যে কম্যুনিস্ট পার্টি যেমন সর্বাধিক আসনে লড়াই করে তেমনি তুলনামূলকভাবে কম আসন লাভ করেও কম্যুনিস্ট পার্টির বিপুলসংখ্যক এম. এল. এ.-কে কংগ্রেসের কাছে পরাজয় বরণ করতে হয়। ১৯৫৭ সালে আর. এস. পি. তেরটি আসনে লড়াই করে তিনটি আসন দখল করেছিল, ফরোয়ার্ড ব্লক ছাব্বিশটি আসনে লড়াই করে আটটি আসন দখল করেছিল, কম্যুনিস্ট পার্টি একশ' উনিশটি আসনে লড়াই করে ছেচল্লিশটি আসন পেয়েছিল। ১৯৬২ সালে আর. এস. পি. তেইশটি আসনে লড়াই করে সাতটি আসন পেয়েছিল, ফরোয়ার্ড ব্লক প'য়ত্রিশটি আসনে লড়াই করে তেরটি আসন পেয়েছিল আর কম্যুনিস্ট পার্টি একশো' প'য়তাল্লিশটি আসনে লড়াই করে উনপঞ্চাশটি আসন দখল করেছিল। কম্যুনিস্ট পার্টির এই সদস্যদের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট নির্দলীয় সদস্যও আছেন। কম্যুনিস্ট এম. এল. এ.-রা বেশি সংখ্যায় পরাজিত হন এবং কংগ্রেসের কম সংখ্যক আসন দখল করতে পারেন তার প্রমাণ পাওয়া যাবে সামান্য কয়েকটি তথ্যে। ১৯৬২ সালে কংগ্রেসের তিপ্পান্নজন তৎকালীন এম. এল. এ. বিরোধী দলের নিকট পরাজিত হন। এর মধ্যে কংগ্রেস সর্বাপেক্ষা বেশি আসন হারায় দুটি জেলাতে যেখানে কম্যুনিস্ট পার্টির বিশেষ কোন অবদান বা কৃতিত্ব নেই। কুচবিহার জেলায় ছ'জন এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় সাতজন তৎকালীন এম. এল. এ. পরাজিত হন। কম্যুনিস্ট পার্টির বাইশজন তৎকালীন এম. এল. এ. কংগ্রেসের নিকট পরাজিত হন। কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টি কয়েকজন বিশিষ্ট নির্দলীয় প্রভাবশালী ব্যক্তির সহায়তা নিয়েও (সিদ্ধার্থ রায়, বিজয় ব্যানার্জী প্রমুখ) কংগ্রেসের তৎকালীন কুড়িজন এম. এল. এ.-র পরাজয় ঘটিয়েছিল। কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টির তুলনায় অন্য ছোট দলগুলি যাদের কম্যুনিস্ট পার্টি কখনও করুণা কখনও অনুগ্রহের চোখে দেখে থাকেন অথবা এই দলগুলিকে একান্তভাবেই তাদের দলের অনুগৃহীত বলে মনে করেন সেইরকম দুইটি দল—অন্য অনেকের কথা বাদ দিলেও ফরোয়ার্ড ব্লক এবং আর. এস. পি.-র তুলনামূলক ভূমিকা কম্যুনিস্ট পার্টি অপেক্ষা অনেক বেশি উজ্জ্বল। ১৯৬২ সালের নির্বাচনে তৎকালীন দশজন কংগ্রেসী এম. এল. এ.-র পরাজয় ঘটে ফরোয়ার্ড ব্লকের কাছে আর ফরোয়ার্ড ব্লকের ছ'জন সদস্যের পরাজয় ঘটে কংগ্রেসের কাছে। আর. এস. পি.-র কাছে ছ'জন কংগ্রেসী এম. এল. এ. পরাজিত হন এবং কংগ্রেস তিনজন আর. এস. পি. সদস্যকে পরাজিত করেন।

উপরের এই তথ্যটি শুধুমাত্র এই কারণে উদ্ধৃত করা হল যে কম্যুনিস্ট পার্টি 'একাই সব'—অন্য ছোট দলগুলির ভূমিকা নিতান্তই নগণ্য আর কম্যুনিস্ট পার্টি নির্বাচনী ঐক্যের জন্য কতটা ত্যাগ স্বীকার করেছে তার প্রমাণ মিলবে। যেখানে লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল বিরোধী দলের দখলীকৃত আসনগুলি বজায় রেখে কংগ্রেসের আরো আসন দখল করা সেইখানে কম্যুনিস্ট পার্টি যাত্রা সুরুতেই কম করে তিরিশজন বর্তমান সদস্যের আসন বিপন্ন করে তুললেন। শুধু তাই নয়—যদি শক্তি থাকে তবে উচিত যে সদস্য যেখানে আছেন তাঁকে সেইখানে বর্তমান রেখে অন্য আসন বাড়তি দখলের চেষ্টা, কিন্তু গত তিনমাস দুই কম্যুনিস্ট পার্টির যে বিরোধ সে বিরোধ কিন্তু রাজ্যে কংগ্রেসকে পরাজিত করার লক্ষ্য নিয়েও নয়, কংগ্রেসের কত বেশি আসন দখল করা যাবে সেই সূত্র আবিষ্কারের জন্যও নয়—'এ ঝগড়া মাত্র ডান কম্যুনিস্ট পার্টির দখলের কয়েকটি আসন বাম কম্যুনিস্ট চায়' সেই বিরোধ ও দর-কষাকষিকে কেন্দ্র করে।

১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলা দেশের রাজনীতিতে মুসলিম লীগের ভূমিকা যাঁরা দেখেছেন তাঁরা যদি আজ পশ্চিম বাংলার এই বাম দলগুলির ফ্রন্ট গঠনের কর্মকাণ্ড দেখতেন—তাহলে দেখতে পেতেন দেশ ভাগ হলেও মুসলিম রাজনীতির মতান্ধতা ও ধর্মীয় জিগির নিয়ে নাজিমুদ্দিন-সোরাবর্দি-আক্রাম খাঁ এখনও আমাদের অনেকের মধ্যে বেঁচে আছেন। তবে মুসলিম লীগের ধর্মীয় জিগির আজ অন্য রূপ গ্রহণ করেছে, মতান্ধতা—তারও রূপ পাল্টেছে; কিন্তু চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য পাল্টায় নি। সেদিনও মুসলিম লীগের সবকিছুর মূলে একটিমাত্র সুযোগ ছিল—'কংগ্রেস, কৃষক মজদুর পার্টি, সোস্যালিস্ট পার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লক, হিন্দু মহাসভা যেই হও' যদি আমার কাছে আত্মসমর্পণ না কর, আমার দাবি না মেনে নাও তবে ইংরেজ আরো দীর্ঘদিন তোমাদের বুকের ওপর বসে থাকবে। কাজেই, ইংরেজ উৎখাত যদি তোমাদের প্রাথমিক কাম্য হয় তবে সর্বাগ্রে আমার চরণে শরণ লও। দিনের পরিবর্তনেও এখনো সেই একটিই চিত্র। দলবিশেষের জিগির 'যদি আমার সঙ্গে আপোষ কর, আমার কাছে আত্মসমর্পণ কর তবেই পশ্চিমবঙ্গ থেকে কংগ্রেসের পরাজয় সম্ভব, নচেৎ আমি আমার শক্তি নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে লড়াই করব, তোমরা তোমাদের শক্তি নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে লড়াই করবে। তবে আমি কংগ্রেসের সঙ্গে লড়াই করার সময় একই সঙ্গে তোমাদের বিরুদ্ধেও

আমার লড়াই চালাব।' বাম কম্যুনিস্ট পার্টির লক্ষ্য আজ কিছুটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। কারণ একলা চলার যে নীতি সেই নীতি আজ বাম কম্যুনিস্ট পার্টিকে বর্তমান জায়গায় নিয়ে এসেছে। কলকাতা কংগ্রেসে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল তার মর্মকথা ছিল তাদের ভারতে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং তার জন্য জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন। কিন্তু এই ফ্রন্ট গঠনের মূল সর্ত ছিল ফ্রন্টে কম্যুনিস্ট পার্টির একক নেতৃত্ব থাকবে এবং সেই নেতৃত্ব গ্রহণ করে যারা ফ্রন্টে আসবে তাদের নিয়ে ফ্রন্ট হবে কিন্তু বাম কম্যুনিস্ট পার্টির 'তেলানী' অধিবেশনে এই সম্পর্কে নীতির সম্ভবত কিছুটা পরিবর্তন হয়েছিল কিন্তু আবার জলন্ধরের পার্টি কংগ্রেসে এসে দেখা গেল বাম কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে আবার উগ্র বামপন্থা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। যদিও অনেকের মতে আলবেনিয়া ও নিউজীল্যাণ্ডের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক দলিল ভারতের বামপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টির মতের পরিবর্তন ঘটিয়েছে তবে সেকথা সর্বতোভাবে সঠিক বলে মনে হয় না। কারণ পশ্চিমবঙ্গে যে ঘটনা তার সঙ্গে রাজনীতি, উচ্চ আদর্শ কোন কিছুরই সম্পর্ক নেই। এর সঙ্গে রাজনীতি অপেক্ষা অরাজনীতি, দেশপ্রেম অপেক্ষা ব্যক্তিবিদ্বেষ, সামগ্রিক স্বার্থ অপেক্ষা পার্টির সীমাবদ্ধ স্বার্থরক্ষাই প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গে দুটি নির্বাচনী ফ্রন্ট তৈরি করতে বামপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি সম্ভবত সর্বাধিক আগ্রহী হবে কারণ, কংগ্রেস ও বামপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি আর মাঝের যদি একটি পার্টিকে রাখা হয় তাহলে রাজনৈতিক প্রচারযুদ্ধে বামপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি সর্বাধিক লাভবান হতে পারে। ১৯৫২ সালে এই এই একইভাবে ফ্রন্ট গঠন করে তৎকালীন কে. এম. পি. পি. দলকে ও অন্যান্য কয়েকটি দলকে ফ্রন্টের বাইরে রেখে যে প্রচার হয়েছিল তাতে ছিল 'আমরা' বামপন্থী আর দূরে কংগ্রেস এবং মাঝের সারিতে যারা চলেছে তারা কংগ্রেসের বি-টিম ছাড়া কিছু নয়। আগামী নির্বাচনেও পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি নিজেদের সাচ্চা বামপন্থী, মাঝের সারিতে কংগ্রেসের বি-টিম প্রচারে নামবে এখন শুধু সেই চেষ্টাই চলছে—কোন কোন দলকে বি-টিমে ফেলা যায়। একটি দলকে নিশ্চয় এই বি-টিমে রাখতে হবে—সেই দল দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট আর তাদের সঙ্গে যারা থাকবে তারাই কংগ্রেসের বি-টিম [ক্রমশঃ]

বেঙ্গল টিউবারকুলোসিস্ এসোসিয়েশনের চিলড্রেন্স্ চেস্ট্ ক্লিনিক

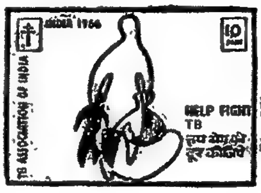

রোগীদের জন্য এক্স-রে, প্যাথোলজিক্যাল টেস্ট, ঔষধ ও অতিরিক্ত পুষ্টি দান করে—সবই বিনামূল্যে।

টিবি সীল অভিযানে আপনার চাঁদা হইতেই এই পৌনঃপুনিক খরচ চলে।

এই অভিযানে আপনার সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে সেবা ও প্রেমের শিখাকে সদা জাগ্রত রাখুন।

সীল প্রাপ্তব্য ঃ

বেঙ্গল টিউবারকুলোসিস্ এসোসিয়েশন

২১, সুন্দরীমোহন এভেন্যু, কলিকাতা—১৪

(টেলি, নং ৪৪-৩৩৩৪)

১৭শ টিবি সীল অভিযান

(নয়া দিল্লীস্থ টিউবারকুলোসিস্ এসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়া কর্তৃক অনুমোদিত)

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক অনুগ্রহপূর্বক স্থান প্রদত্ত।

অবক্তব্য

চন্দ্রগুপ্ত

কোথায় যাবো? এই তো বেশ আছি! পৌনে তিনশ' বছর বয়সের বেড়া-ডিঙোনো এই কালীক্ষেত্র ওরফে কলকাতায় বিস্তর দোষ, তবু তাকে ছেড়ে বাইরে যেতে মন চায় না। কারণ তার চাইতে আমার আপন শহর আর কোথাও নেই। সমাজবিজ্ঞানীরা যতই বলুন সব শহরের চরিত্রই মোটামুটি এক, আমি মানতে রাজী নই কলকাতা আর-দশটা শহরের মতো অবিশিষ্ট, বর্ণহীন। আমার চোখে, কলকাতার একটি চরিত্র আছে, সে চরিত্র স্পর্শসহ, প্রাণবন্ত। তার জন্মে আকস্মিকতা, তার লালনে-বর্ধনে যত্নের অভাব, হয়তো এ জন্যেই তার শক্ত শিরদাঁড়া, শত পীড়নেও সে মচকায় না।

এ কলকাতায় গ্রীষ্মের রাস্তা পীচ-গলা, বর্ষাকালে হাঁটুজল, বছরের বারো মাস ট্রামে-বাসে অগুন্তি যাত্রী মরণ-দোলায় ঝুলন খেলে, উৎসবে-পার্বণে জনসমুদ্রে জোয়ার নামে, অন্যের সামান্য দোষে নিরীহ ট্রাম-বাস আগুনে পোড়ে। এখানে প্রতিদিন ধর্মঘট, প্রতি বিকেলেই মিছিল, যানবাহন স্তব্ধগতি, কর্মক্লান্ত মানুষের অসহায় দীর্ঘশ্বাস। এখানে পোষ-মাঘের শীতে অসংখ্য শ্রোতা রাস্তায় বসেই সারারাত উচ্চাঙ্গসঙ্গীত শোনে, হিন্দী সিনেমার চিত্রতারকা-দর্শনের ব্যাকুল আগ্রহে গ্র্যান্ড-গ্রেট ইস্টার্নের দুয়ারেও জনতা জটিল হয়। শহরের রেস্তোরাঁ-কফি-হাউসগুলিতে সদ্য-নোবেল-প্রাইজ-পাওয়া বিদেশী লেখকের যোগ্যতা নিয়ে চায়ের বা কফির পেয়ালায় ঝড় বয়ে যায়, অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ অপঠিত, রামায়ণ-মহাভারত ইতিহাসের নামমাত্র।

দোষে-গুণে কলকাতা সত্যই অনন্যা, এমন শহরটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি। কবি নই। নইলে বলতাম, আমার কলকাতা শ্রীহীন ফর্সা নয়, লাবণ্যে টলটল কৃষ্ণকলি, কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক।

কলকাতার দুর্ভাগ্য, সে আজ সত্যিই গাঁয়ের লোকের হাতে গিয়ে পড়েছে। ফলে যে-কলকাতা এক সময় সারা ভারত-বর্ষের সাংস্কৃতিক রাজধানী ছিল, আজ তার অবস্থা টিমটিম বাতির মতো। শিল্প-জগতে আজ কলকাতা দিল্লী বোম্বাইয়ের পেছনে, সাহিত্য-জগতে মাদ্রাজ-পাঞ্জাব তাকে টেক্কা দেয়। এর অর্থ এই নয়, কলকাতায় তথা বাংলাদেশে প্রতিভার অভাব, বরং আত্মপ্রশংসা শোনালেও বলব, এখনও বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষমতাবান শিল্পী নগণ্য নয়। কিন্তু সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে পড়ছি, তার দুটি কারণ ঃ প্রথম, জাত হিসেবে আমরা বরাবরই অহংকৃত, নিজেদের গর্তকে দুনিয়া মনে ক'রে অন্যের সমস্ত কিছুর প্রতিই অশ্রদ্ধাসম্পন্ন; দ্বিতীয়, অন্য দেশের শিল্পীরা আমাদের আত্মতুষ্ট মনোভাবের, যার জন্ম অসীম অহংবোধে, সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়ে প্রচার-নৈপুণ্যে ইতিমধ্যেই বহু দূরে এগিয়ে গেছে। একটি দৃষ্টান্তই বোধ করি যথেষ্ট ঃ যে-কলকাতা নব্য ভারতীয় চিত্রকলায় পথিকৃতের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আজ তার স্থান কোথায়? বেন্দ্রে বা হোসেন, গাদে বা রাভালের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও বলতে হয়, তাঁদের তুল্য শিল্পী এখানে অনল্প নয়, অন্তত ক্ষমতার বিচারে। কিন্তু সেই ক্ষমতাবানদের কর্মকৃতিকে তুলে ধরার দায়িত্ব যাঁদের, তাঁদের একটি অংশ এখানে অকর্মক, সকর্মক অপর অংশটি দিল্লী-বোম্বাইতে গিয়ে ভুলেও বাঙালী শিল্পীদের নামোচ্চারণ করেন না, পাছে ও-সব জায়গার তথা ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক আকাশ থেকে তাঁদের জীবতারা খসে পড়ে।

বাঙালী শিল্পীদের এ খেদজনক অবস্থার অবসান ঘটানো কি ভাবে সম্ভব? প্রথম উপায় এবং কর্তব্য, তরুণ-অতরুণ দলমত নির্বিশেষে বাঙালী শিল্পীদের (শুধু চিত্রশিল্পী নয়) ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন; এবং তার আনুষঙ্গিক হিসাবে, একটি স্থায়ী প্রদর্শনশালা স্থাপন ও একটি ইংরেজি মুখপত্রের, ষাণ্মাসিক কিংবা বার্ষিক যাই হোক, নিয়মিত প্রকাশ। এ ব্যাপারে বোদ্‌ল্যেয়র বা আপলিনীয়ারের কথা মনে রেখে সাহিত্যিকরা যদি চিত্র-ও-ভাস্কর্য-শিল্পীদের সঙ্গে হাত মেলাতে এগিয়ে আসেন, অতি উত্তম। আপাতত না এগিয়ে এলেও ক্ষতি নেই। চিত্র ও ভাস্কর্যশিল্পীরাই কাজ শুরু করে দিন, হয়তো একদিন সাহিত্যিকরা তাঁদের সঙ্গে শরণ নেবেন।

কিছু না হোক, শিল্পীরা নিজেদের স্বার্থেই যেন একটি ইংরেজি মুখপত্র প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। 'রূপম্' বা 'ভিজোআ' ('জার্নাল অফ দি ইন্ডিয়ান

বক্তব্যের শ্রোতা অনেক, অবক্তব্যের নগণ্য। এই ভরসাতেই সংস্কৃতি-জগতের, বিশেষত সাম্প্রতিক স্বদেশের, ঘটনা ও দুর্ঘটনা সংক্রান্ত আলোচনায় বক্তব্য সন্ধিৎসুরা নিরুৎসাহ কিংবা নিরাশ হলে দুঃখিত হবো না। কারণ রচনার নামেই লেখকের আত্মপক্ষ সমর্থন। —চন্দ্রগুপ্ত

সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট")-এর আদর্শ পুনরুজ্জীবিত হোক, এই আমার শিল্পচেতন চিত্তের একান্ত কামনা।

আমি বিশ্বাস করি, আমার এই কামনা একদিন পূর্ণ হবেই। কারণ প্রচারের ঘনঘটা সত্ত্বেও বহির্বঙ্গের সাংস্কৃতিক কর্তাদের সিংহচর্ম মাঝে মাঝে কি উৎকটভাবেই না খসে পড়ে! তা না হলে দেশ-কাল-নন্দিত তাজমহলের সমাধি ঘটল কি করে?

সম্প্রতি আমার এক ভ্রমণ-বিলাসী কবি-বন্ধু সস্ত্রীক তাজমহল দর্শনে গিয়েছিলেন। এই তাঁর প্রথম এবং, তাঁর ভাষায়, শেষ তাজমহল পরিদর্শন। কারণ, তাঁর ভাষাতেই বলিঃ

'কেন্দ্রীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ ও উত্তর-প্রদেশ পুলিশ সম্মিলিতভাবে ওয়ান-ওয়ে ট্রাফিকের এক নিদারুণ ভয়াবহ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তাজমহলে। তাজমহলের উপরের বারান্দার পূবদিকের মর্মর-রেলিঙ ভেঙে দিয়ে তাঁরা কাঠের পাটাতন ও পাকা গাঁথনি দিয়ে একটি সিঁড়ি নামিয়ে দিয়েছেন নিচে। তা দেখতে যেমন কুৎসিত, তেমনি ভয়াবহ। সিঁড়ি তৈরি করতে গেলে মর্মর-রেলিঙ ভেঙে ফেলতে হবে, এ কেমন কথা?'

দুর্ঘটনার এখানেই শেষ নয়, দুর্ঘটনার পরে তদন্ত কমিশনের মতো প্রহসনও আছে। তাই জ্যোৎস্না-রাতে পথচারীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য দুটি বড় বড় ডে-লাইট জ্বালিয়ে রাখা হয়। যাতে, জ্যোৎস্না-স্নাত তাজমহলের সৌন্দর্যে-বিহ্বল দর্শকের পাছে পদস্খলন ঘটে।

এবং এখানেও শেষ নয়, আরও আছে। যমুনার দিকে অর্থাৎ তাজের পিছন দিকে বেশ কয়েক জায়গায় মর্মরপ্রস্তরখণ্ড সরিয়ে দিয়ে তারের ও কাঠের দরজা-জানলা বসিয়ে গুদামঘর তৈরি করা হয়েছে।'

অমন আনন্দে তাজমহলের সমাধি রচনা করার কৃতিত্ব যাঁদের, আগামী বছরে রাষ্ট্রীয় খেতাব-প্রাপ্তদের তালিকায় তাঁদের নাম যত বড় হরফেই বেরোক না, নিঃসন্দেহেই তাঁরা চিরকালের শিল্প-রসিকের গভীর ধিক্কারভাজন।

বন্ধুকে তাই বললাম ঃ এবার ভেবে দেখো, কলকাতা ছেড়ে কেন আমি অন্য কোথাও যাই না। কোনার্ক বা তাজ-মহলের মতো আমার নিকট আত্মীয়ের মৃতদেহ বা সমাধি স্বচক্ষে দেখার বেদনা এড়ানো কি বুদ্ধিমানের কাজ নয়?

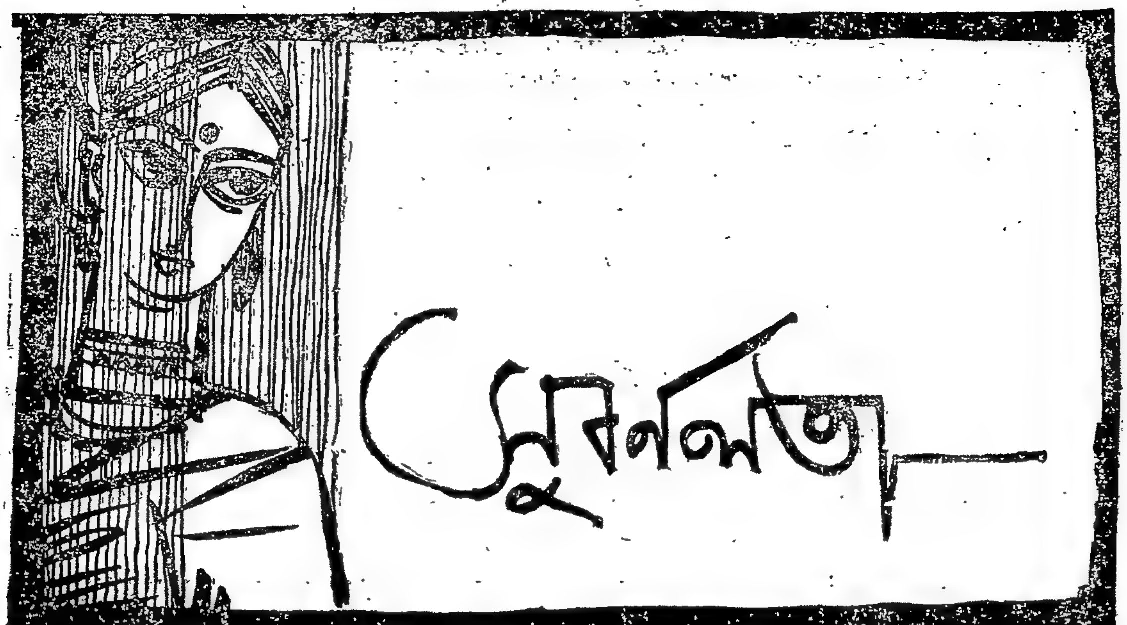

ধারাবাহিক উপন্যাস

আশাপূর্ণা দেবী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

তারপর? তারপর সুবর্ণলতা—

কিন্তু সুবর্ণলতা কী বা এমন মানুষ যে তার প্রতিদিনকার দিনলিপি বাঁধানো খাতায় তোলা থাকবে, আর পর পর মেলে ধরে দেখতে পাওয়া যাবে। আবাঁধা একখানা খাতার ঝুরো ঝুরো পাতা থেকে তো সুবর্ণলতাকে দেখতে পাওয়া।

সুবর্ণলতা যখন শেষ বিছানা নিয়েছিল, আর নিজেই হাতড়ে হাতড়ে খুঁজেছিল সেই ঝুরো খাতা প্রথম দিকের পৃষ্ঠাগুলো তখনই কি সবগুলোর সন্ধান মিলেছিল?

শুধু ওর মাথা কুটে মরার দিনগুলোই—

হ্যাঁ শাদাসিধে দিনগুলো যেন শাদা কালিতে লেখার মত কখন যেন বাতাস লেগে মিলিয়ে গেছে, আর পৃষ্ঠাগুলো ঝরে পড়েছে অদরকারী বলে, শুধু ওই মাথা কোটার দিনগুলোই গাঢ় কালিতে লেখা হয়ে—

কিন্তু মুশ্কিল এই—

কিসে যে সুবর্ণলতা মাথা কোটে বোঝা শক্ত।

কারো সঙ্গে মেলে না।

নইলে একটা জেলখাটা আসামী, কবে কোন দিনের একটু আলাপের সূত্র ধরে সুবর্ণলতার সঙ্গে দেখা করবার আবদার নিয়ে ওর বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে দেখে ওর স্বামী-পুত্তুর তাকে দরজা থেকেই বিদায় দিয়েছিল বলে মাথা কোটে ও?

বলে, 'ভগবান এ অপমানের মধ্যে আর কতদিন রাখবে আমায়। এবার ছুটি দাও ছুটি দাও।"

অথচ সত্যের মুখ চাইলে বলতে হয়, আসলে অপদস্থ যদি কেউ হয়ে থাকে তো সে সুবর্ণলতার স্বামী-পুত্রই হয়েছিল।

ওরা সাধারণ সংসারী মানুষ। অতএব একটা জেলখাটা আসামী সম্পর্কে সহসা হৃদয়দ্বার খুলে দিতে পারে না। ওরা জেরা করছিল। বলেছিল, কি দরকার, কাকে চান, কতদিন জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন, সুবর্ণলতার সঙ্গে খুব কোন জরুরী প্রয়োজন যদি না থাকে, এত কষ্ট করে এতদূর আসবার মানে কি, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাড়ির কর্তা হিসেবে প্রবোধই করছিল প্রশ্ন, তবে ভানুও ছিল দাঁড়িয়ে। তা' বাড়ির কর্তাকে বাড়ির নিরাপত্তা, পরিবারের সম্ভ্রম, এ সব দেখতে হবে না? তাই দেখছিল প্রবোধ। সহসা দেখল সুবর্ণলতা অন্তঃপুরের সভ্যতার গণ্ডি ভেঙে বাড়ির বাইরে সদর রাস্তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

ভাবা যায়? দেখেছে কেউ কখনো এমন দৃশ্য?

ওটা ওর স্বামীর পক্ষে লজ্জার নয়? অপমানের নয়?

তার উপর কি না, প্রবোধ যখন রক্তবর্ণ মুখে বলছে, 'তুমি বেরিয়ে এলে যে? এর মানে? ভানু তোর মাকে বল বাড়ির মধ্যে যেতে—'

তখন কি না—সুবর্ণলতা, তুমি, স্বামীর দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র না করে বলে উঠলে,

'কী সর্বনাশ! অম্বিকাঠাকুরপো, তুমি এখানে? পালাও পালাও! এ যে ভূতের বাড়ি! মেজবৌদির সঙ্গে দেখা করতে এসেছ? কী আশ্চর্য, কেউ তোমায় বলে দেয় নি সে কবে মরে ভূত হয়ে গেছে। এটা তার প্রেতাত্মার বাসভূমি।'

এতে অপদস্থ হ'ল না তোমার স্বামী-পুত্র?

পরে যদি তোমার ছেলে বলেই থাকে, "বাবা তুমি বৃথা রাগ করছো, মা তো বেশি কিছু করেন নি। যা চিরকালের স্বভাব, তাই শুধু করেছেন। অন্যকে অপদস্থ করা, গুরুজনকে অপমান করা, এটাই তো প্রকৃতি ওঁর, এতেই তো আনন্দ,' সেও কিছু অন্যায় বলে নি।

তার দৃষ্টিতে তো ওইটাই দেখেছে সে।

আর তুমি তো অম্বিকার সামনে শুধু ওইটুকু বলেই ক্ষান্ত হও নি? আরোও বলেছ। অম্বিকা যখন তৎসত্ত্বেও প্রেতাত্মাকেই হেঁট হয়ে প্রণাম করতে গিয়েছিল, তুমি শশব্যস্তে পা সরিয়ে নিয়ে বলেছ, 'ছি ছি ভাই, প্রণাম করে আর পাপ বাড়িও না—আমার, একেই তো পূর্বজন্মের কত মহাপাপে বাঙালীর মেয়ে হয়ে জন্মেছি, আর আরও কত শত মহাপাপে এই মহাপুরুষদের ঘরে পড়েছি। আর কেন? প্রণাম বরং

তোমাদেরই করা উচিত। তোমরা, যারা নিজের সুখ-দুঃখ তুচ্ছ করে দেশের গ্লানি ঘোচাতে চেষ্টা করেছ।'

কী এ? প্রবোধ যা বলেছে তাছাড়া আর কি?

নাটক ছাড়া আর কী?

পুরো নাটক!

কিন্তু এই ঘরগেরস্ত লোকেদের সংসারটা থিয়েটারের স্টেজ নয়। অথচ সারাজীবনে তুমি তা বুঝলে না। এখনও বুড়ো বয়সেও না।

তোমার কথায় যখন অম্বিকা ম্লান হেসে বলেছিল, 'চেষ্টাই হয়েছে, কাজ আর কী হলো? সবটাই ব্যর্থতা!' তখনও তুমি নাটকে ভাষাতেই উত্তর দিলে, 'কেন ব্যর্থতা জানো ঠাকুরপো, তোমাদের সমাজের আধখানা অঙ্গ পাঁকে পোঁতা বলে। আধখানা অঙ্গ নিয়ে কে কবে এগোতে পারে বল? এই অখদ্যে অবদ্যে—মেয়েমানুষ জাতটাকে যতদিন শুধু 'মানুষ' বলে স্বীকার করতে না পারবে, ততদিন তোমাদের মুক্তি নেই, মুক্তির আশা নেই। চাকরানীকে পাশে নিয়ে কি তোমরা রাজসিংহাসনে বসবে?'

বললে।

একবার ভাবলে না তোমার স্বামী-পুত্রের মাথাটা কতখানি হেঁট হলো রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে তোমার ওই নাটক করায়।

অগত্যাই ওদের কঠোর হতে হয়েছে। অগত্যাই ধমকে উঠে বলতে হয়েছে, 'পাগলামী করবার আর জায়গা পাও নি?' আর ওই পাগলামীর দর্শককেও কটু গলায় বলতে হয়েছে, 'আপনিও তো আচ্ছা মশাই, ভদ্রলোকের ঘরের মান-ইজ্জত বোঝেন না! দেখছেন—একটা মাথা খারাপ মানুষ ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে—'

এরপরেও অবশ্য কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

অন্তত অম্বিকার মত শান্ত সভ্য মার্জিত স্বভাব লোকে নিশ্চয়ই পারে না। মাথা হেঁট করে চলে গিয়েছিল সে।

তবু সুবর্ণলতা তুমি হেসে উঠে বলে উঠেছিল—'ঠিক হয়েছে! কেমন জব্দ! ভূতের বাড়ি আসার ফল পেলে তো?'

ভাব নি এরপরও তোমাকে তোমার স্বামী-পুত্রের সামনে মুখ দেখাতে হবে। পিছনের ওই চৌকাঠ পার হয়েই আবার ভিতরে ঢুকতে হবে।

কিন্তু ঢুকতে হলেই বা কি!

সুবর্ণলতার শরীরে কি লজ্জা আছে? কতবারই তো বেরিয়ে পড়েছে সুবর্ণলতা খিড়কির বাইরে, আবার এসে ঢোকে নি? ঢুকেছে। আবার ঢুকেছে, আবার দাপট করেছে। মরমে মরে গিয়ে চুপ হয়ে যায় নি। এদিনও তা গেল না। যখন প্রবোধ গর্জে উঠলো, আর ভানু উপযুক্ত ধিক্কার দেবার ভাষা খুঁজে না পেয়ে শুধু ঘৃণার দৃষ্টিতে দগ্ধ করা যায় কি না তার চেষ্টা করলো, তখন কি না সুবর্ণলতা বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে অনায়াসে বলে উঠলো, 'কী আশ্চর্য্যি! এতে তোমাদের মুখ পোড়ানো হল কোথায়? মুখ উজ্জ্বলই হল বরং। পাগল, পাগলের মতই আচরণ করলো, চুকে গেল ল্যাঠা! তোমার কথার মান বজায় রাখলাম, আর বলছো কি না মুখ পোড়ালাম?'

ঘৃণায় মুখ ফিরিয়েছিল সেদিন একা সুবর্ণলতার বড়ছেলেই নয় মেজ সেজও অগ্নিদৃষ্টি হেনে বলছিল চমৎকার। মা'র শোক হয়েছে ভেবে আর মমতা আসে নি ওদের। ছোটছেলে সুবলের কথাই শুধু বোঝা যায় না, সে বরাবরই মুখচোরা। সে যে কোথা থেকে তার এই চাপা স্বভাব পেয়েছে!

কিন্তু সুবর্ণলতার মেয়েরা!

যে মেয়ে দুটো এখনো পরের ঘরে যায় নি? পারুল আর বকুল?

তা ওদের কথাও বোঝা যায় নি।

মনে হচ্ছিল ওদের চোখে একটা দিশেহারা ভাব ফুটে উঠেছিল। যেন ওরা ঠিক করতে পারছিল না মায়ের উপরে বরাবর যে ঘৃণা আর বিরক্তি পোষণ করে এসেছে, সেটাই আরো পুষ্ট করবে, না নতুন চিন্তা করবে।

বকুল ছেলেমানুষ?

এত সব ভাববার বয়েস হয় নি?

কিন্তু তাই কি?

সুবর্ণলতার ছেলেমেয়েরা ছেলেমানুষ থাকবার অবকাশ পেল কবে? জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত তো ওরা শুধু ওদের মাকে বিশ্লেষণ করেছে, আর তিক্ততা অর্জন করেছে। এর মাঝখানে কখন আর অবকাশ পেল ওরা 'ছেলেমানুষ' থাকবার?

ওরা অনেক কিছু জেনে বুঝে পরিপক্ক।

বাপকে ওরা ঘৃণা করে না, করে অবহেলা। কিন্তু মাকে তা পারে না। মাকে অবহেলাও করতে পারে না, অস্বীকারও করতে পারে না, তাই ঘৃণা করে।

শুধু আজই যেন ওদের দৃষ্টিভঙ্গী বদলাচ্ছে। অম্বিকার ফিরে চলে যাওয়ার মধ্যে ওরা বুঝি সমস্ত মেয়েমানুষ জাতটার দুঃসহ অসহায়তা টের পেয়ে গেছে। তাই দিশেহারা হয়ে ভাবছে, 'গৃহিণী' শব্দটা কি তাহলে একটা ছেলেভোলানো শব্দ? না কি 'দাসী' শব্দেরই আর একটা পরিভাষা?

গৃহিণীর যদি তার গৃহের দরজায় এসে দাঁড়ানো একটা অতিথিকে 'এসো বসো' বলে ডাকবার অধিকারটুকু মাত্র না থাকে, তবে 'গৃহিণী' শব্দটা ধোঁকাবাজিই। ওই ধোঁকার ধোঁয়ায় দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে দিয়ে দাসত্ব করিয়ে নেওয়া।

সংসার করা মানে তা হলে শুধু সংসারের পরিচর্যা করা? আর কিছু না! আশ্চর্য, যেখানে এক কানাকড়াও অধিকার নেই, সেখানে কেন এই গালভরা নাম?

খুব স্পষ্ট করে মনে না পড়লেও মেজপিসির বাড়ি গিয়ে থাকার কথাটা পারুলের কিছু কিছু মনে আছে বৈকি, মনে আছে অম্বিকাকাকার নাম, তাছাড়া ছেলেবেলায় কতবারই না শুনেছে সে নাম মায়ের মুখে। কত শ্রদ্ধার সংগে কত প্রীতির সংগে, কত স্নেহের সংগে উচ্চারিত হয়েছে সে নাম। অথচ সেই মানুষটাকে 'দূর দূর' করে তাড়িয়ে দেওয়া হলো। আর হলো সুবর্ণলতারই সামনে।

গৃহিণীর সম্ভ্রম নিয়ে সুবর্ণলতার ক্ষমতা হল না তাকে ডেকে এনে ঘরে বসাবার।

পারুল দেখেছে সেই অক্ষমতা। হয়তো বকুলও দেখেছে। আর অনুভব করছে এ অক্ষমতা বুঝি একা সুবর্ণলতারই নয়!

তাই দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টাচ্ছে ওদের।

কিন্তু সুবর্ণলতার বাপ-মায়ের সেই 'চতুর্থী শ্রাদ্ধের' কি হল? খুব একটা

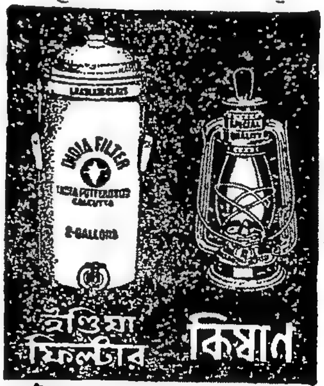

গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৩, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা-১
ফোন: ২২-৬৫৮০

পরবাসী, এখানে

সরিৎ শর্মা

এখানে শিউলি হাসে—তারপর ঝরে পড়ে
আশ্বিনের বৃন্ত থেকে ফুটন্ত সকাল...
রাত্রের শিশির মেখে ঘাসের সবুজ মখমল
মুক্তো-আঁকা নক্সী-কাঁথা, দীঘি-বিল-নদী-নালা-খাল
টল টল রৌদ্রের চাঁপা...গভীর : গভীর নীল আকাশ উতল!

এখানে দুপুর হাসে—তারপর ছুটি-ছুটি স্তব্ধতায় প্রচ্ছন্ন কখন
ঝরে পড়ে আশ্বিনের অপরাহ্নবেলা—
মুখর পথের ভিড়ে কলহাস্য, নীল হ্রদে
রৌদ্রের সাবান মাখে মাঠ-বন দূরের স্টেশন...
চিত্রার্পিত সন্ধ্যাগুলি মায়ের কোমল হাতে
শান্ত করে শিশুদের খেলা!

এখানে জ্যোৎস্না হাসে—প্লাবনে আকাশগঙ্গা উথাল-পাথাল...
ঘর-দোর-উঠান আঙিনা-পথ-বাগান ও নদী-মাঠ-বন
উধাও বকের পাঁতি, থরো থরো রাত্রির সকাল...
নামতা পড়ুয়া শিশু থেমে যায়—
গুঞ্জরিত যাত্রাগান মা-দুর্গো-অসুর কখন!

এখানে শিশির কাঁদে—চুপি চুপি ঘুমের শিয়রে—
'কি হবে, কি হবে' ক'রে রূপসী বাংলার মেয়ে জেগে কত কাল
প্রতিবার রাত্রিভোরে তুলে নেয় রিক্ত হাতে
বরণের ডালা থরে থরে—

যদি হাসে কোনোদিন আশ্বিনের বৃন্ত থেকে ফুটন্ত সকাল!

এক আকাশ অন্ধকার

মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

ধ্বনিময় শব্দগুলো সব একে একে বিষণ্ণ হাওয়ায় ছুঁড়ে ছুঁড়ে,
ক্লান্ত পায়ে পথ হেঁটে
দেবদূতের কাছে যাবো
সমস্ত ইচ্ছেরা যদি গুঁড়ো হয়, গুঁড়ো হয়ে যাক
তবু কিন্তু বিষণ্ণতা,
দাঁড়াবো না নতমুখে
আমরা কেউ দুদণ্ডও প্রার্থনা সভায় দাঁড়াবো না;
যদি কোনো বিহ্বল হাওয়ারা এসে উচ্চারিত শব্দ কেড়ে নিয়ে
সমর্পিত ঈশ্বরের গান স্তব্ধ করে
তাহলেও ঈশ্বর ঈশ্বর এই আর্তনাদ তুলে
আফশোষে ঠুকবো না বুক,
আমি কিন্তু ছায়া পিছে ফেলে
মুঠো মুঠো রৌদ্র আনবো
এক আকাশ অন্ধকার
কাছে টেনে গান গাইবো রৌদ্রকরটিতে।

এখন বিশ্বাস কাঁপছে
রবার-বলের মতো
কেঁপে উঠছে আমাদের সমস্ত বিশ্বাস—
হে আমার অনিদ্র বিষাদ, তবু কিন্তু দাঁড়াবো না নতমুখে,
আমরা কেউ দুদণ্ড প্রার্থনা সভায় দাঁড়াবো না।
যুদ্ধের প্রশান্ত মুখ ভীষণ ঘৃণায় কাঁপছে,
পাহাড়ে পর্বতে কিংবা অন্য কোনো শিলাখণ্ডে খোদিত
করবো না লিপি
আমরা সব বিষণ্ণতা বুকে করে কয়েক মাইল পথ হেঁটে যাবো।

সমারোহের আয়োজন করেছিল না তার স্বামী ওই উপলক্ষে। বলে বেড়াচ্ছিল, 'না বাবা, এ হল গিয়ে 'শ্বশুরশাশুড়ী দায়', পিতৃমাতৃদায়ের চতুর্গুণ!'

তা সেও একরকম ধাষ্টমো করেই হল বৈকি! সহজ সাধারণ কিছু হল না। হবে কোথা থেকে?

সহজে কিছু কি হতে দেয় সুবর্ণলতা? সব কিছুকেই তো বিকৃত করে ছাড়ে ও।

সুবর্ণলতা তাই বলে বসলো, 'আমি ওসব করবো না।'

'করবে না? ভুজ্যি উচ্ছুগ্যও করবে না তুমি মা-বাপের?'

না!

'না!'

শব্দজগতের চরমতম কঠোর শব্দ!

নিষ্ঠুর অমোঘ!

আশ্চর্য, আশ্চর্য!

অত সব আয়োজন তাহলে?

নষ্ট গেল!

আবার কি!

পুরোহিত এসে শুনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাছাড়া আর করবেন কি? প্রবোধ যদি বা বলছিল—'ওর তো আবার জ্বর হয়ে গেছে রাত থেকে—কাজ করা হবে কি? জ্বর গায়ে তো—' কিন্তু সুবর্ণলতা তো সে কথাকে দাঁড়াতে দেয় নি। বলে উঠেছিল, 'উনি ঠিক জানেন না ঠাকুরমশাই, জ্বর-টর কিছু হয় নি আমার—'

জ্বর-টর হয় নি? তবে?

'কিছু না! ইচ্ছে নেই সেটাই কথা!'

পুরোহিত একবার প্রবোধের আপাদ-মস্তক দেখে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন শালগ্রামশিলাকে উঠিয়ে নিয়ে।

'এ বাহাদুরিটুকুও কি না দেখালে চলতো না?' হেরে যাওয়া গলায় বলেছিল প্রবোধ, 'ও বাড়ির পুরুত উনি—'

সুবর্ণলতা চুপ করে তাকিয়ে ছিল।

প্রবোধ আবার বলেছিল, 'চিরকালের গুরুবংশের ছেলে—'

'জানি', সুবর্ণলতাও প্রায় তেমনি হেরে যাওয়া গলায় উত্তর দিয়েছিল, 'গুরুবংশের ছেলে, কুলপুরোহিতের কাজ করছেন, হাতে শালগ্রাম, তাঁর সঙ্গে আর জলজ্যান্ত মিথ্যে কথাটা কইতে ইচ্ছে হল না।'

হল না।

হল না তখন সে ইচ্ছে।

অথচ নিজেই সুবর্ণলতা ঘণ্টাকয়েক পরে 'শরীর খারাপ লাগছে, বোধ হয় জ্বর আসছে—' বলে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো গিয়ে।

মিছিমিছিই বলল বৈকি!

গা তো ঠাণ্ডা পাথর।

বললো কাদের? কেন যত সব আত্মীয় কুটুম্বদের। বাড়ি বাড়ি ঘুরে যাদের নেমন্তন্ন করে এসেছে প্রবোধ তার স্ত্রীর মা-বাপ মরার উপলক্ষে। তারা কি জানে?

তারা কি জানে সুবর্ণলতার পিতৃ-কার্য করতে ইচ্ছে হয় নি বলে পুরোহিতকে বিদায় দিয়েছে, আর আত্মীয়দের মুখ দেখতে ইচ্ছে হয় নি বলে চাদর ঢাকা দিয়ে পড়ে আছে!

তবে সুবর্ণলতার পড়ে থাকার জন্যে কি কিছু আটকে ছিল!

কিছু না!

কিছু না।

প্রবোধের গুষ্টির সবাই এল ভোজ খেলো, সুবর্ণলতার শুয়ে থাকার জন্যে হা-হুতাশ করলো, চলে গেল।

সুবর্ণলতাই শুধু চাদর মুড়ি দিয়ে গলদঘর্ম হতে থাকলো।

কিন্তু সুবর্ণলতার মায়ের সেই চিঠিটা?

সেটার কি হল?

[ক্রমশঃ]

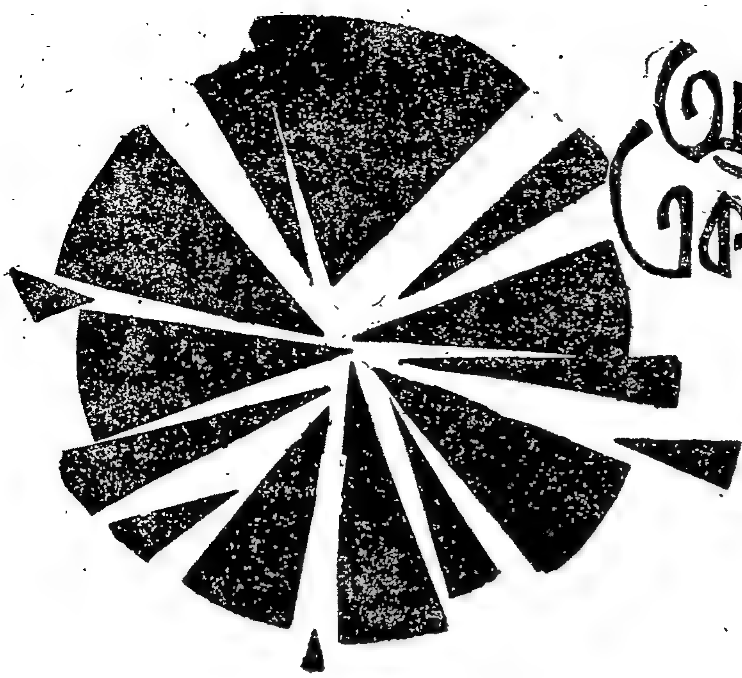

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥

মরণ অভিযান

১৮ই এপ্রিল—১৯৩০ সাল—ভোর সাড়ে পাঁচটা।

নির্দেশ অনুযায়ী (চৌষট্টিজন) ভারতের গণতন্ত্র বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার বিপ্লবী সৈন্য, শয্যাত্যাগ করে উঠে পড়ল। এখনও পূর্ব আকাশ লাল করে সূর্য ওঠে নি। আজ কেবল আকাশ লাল করেই সূর্য উঠবে না, চট্টগ্রামের মাটি বৃটিশ শত্রুর রক্তে রাঙা হয়ে উঠবে! বিপ্লবীরা আজ বুকের তাজা রক্তে দেশমাতৃকার পূজার অর্ঘ্য সাজাবে। তারা আজ নবারুণ ভাস্করের প্রতি প্রণিপাত জানিয়ে অন্তরে মৃত্যুপণ প্রতিজ্ঞার অমোঘ বাণী ধ্বনিত করে তুলবে।

দীপ্যমান ভাস্কর পূর্বাকাশ বিকশিত করে দেখা দিল। দৃঢ়সংকল্প চৌষট্টিজন নওজোয়ান আকাশের দিকে তাকিয়ে একই সময়ে নিভৃত ক্ষণে শপথ নিল—সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শত্রু, তোমার ক্ষমা নেই! পণ আমাদের মৃত্যু! দয়া নেই মায়া নেই আপোষ নেই! দুর্জয় প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠুক! জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যার প্রায়শ্চিত্ত আজ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী অনুচরদের বুকের রক্তে করতে হবে! আমাদের সাহস দাও শক্তি দাও, শত্রু নিধনে অজস্র বল দাও—দেশমাতৃকার চরণে প্রার্থনা জানালাম। চৌষট্টিজন দৃঢ়সংকল্প নওজোয়ানের দ্বি-চৌষট্টি সবল বাহু ঊর্ধ্বে উত্তোলিত হ'ল; চৌষট্টি জোড়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ চক্ষু প্রজ্বলিত হয়ে উঠল; চৌষট্টিটি বিপ্লবী হৃদয়ে এক তানে ধ্বনিত হ'ল—

"জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনাহীন।"

১৮ই এপ্রিল। মহানায়ক সূর্য সেন ও তাঁর তেষট্টিজন সৈনিক নতুন সূর্যকে অভিনন্দন জানালেন—জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে একযোগে অন্তরের নিভৃতে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন—

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।"

আজ যে আমাদের নিঃশেষে প্রাণ দান করবার দিন! সেই দিনটিকে স্বাগত জানিয়ে আজ আমরা প্রস্তুত মৃত্যুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে—আজ মৃত্যুপণ করে এগিয়ে যেতে হবে শত্রু-শিবির লক্ষ্য করে।

১৮ই এপ্রিলের সূর্যাস্তের পর আবার আকাশ রাঙিয়ে সূর্যোদয় হবে—কিন্তু সেই সূর্যকে স্বাগত জানাতে আমরা কি আগামীকাল বেঁচে থাকব? আমাদের পার্থিব জীবনে আজ রাত্রে আসবে চির অন্ধকার রাত্রি মৃত্যুর হাত ধরে। তবু জানি, সেই অন্ধকার নিরেট নিশ্ছিদ্র অন্ধকার নয়। চরম স্বার্থত্যাগ—দেশমাতৃকার পূজায় চরম আত্মত্যাগ মিথ্যা হবে না। স্বদেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত চিরভাস্বররূপে অন্ধকার ভেদ করে দেশবাসীর চোখের সামনে সুদূর দিগন্তে অরুণোদয়ের রেখা এঁকে দেবে।

আমার লেখা পড়ে মনে হবে কবিতা করছি—লেখার মাধুর্যের জন্যই যেন কবিত্বের প্রয়োজন—তাই এই 'কাব্য'। শুধু কাব্য কেন, জালালাবাদের বীরদের নিয়ে মহাকাব্য রচনাও অসম্ভব নয়। কিন্তু আমার শক্তি সীমাবদ্ধ—আমি সেই দায়িত্বের কথা ভাবতেও পারি না। আমার কবিত্ব করবার ইচ্ছেও নেই—কাব্য আমার আসে না। তবে বাস্তবকে প্রকৃতভাবে প্রকাশ করতে অনেক সময় প্রয়োজন হয় কাব্যের—মহাকাব্যের। ভবিষ্যতের আশায় থাকব—কেউ হয়ত সেই অভাব দূর করবেন। বর্তমানে আমার এই সামান্য লেখার মাধ্যমে মৃত্যুসংকল্পে অটল যুববিদ্রোহের সৈনিকদের মানসিক প্রতিক্রিয়া বোঝা খুবই কঠিন—আর মাত্র বারো-চোদ্দ ঘণ্টার মধ্যে যাদের মৃত্যু সুনিশ্চিত তাদের মানসিক অবস্থার সামান্য একটু আভাস মাত্র আমি দিতে চেষ্টা করেছি।

যাঁরা জীবনে সর্বপ্রথম সভা-মণ্ডপে বক্তৃতা দিতে উঠেছেন বা স্টেজে সর্বপ্রথম অভিনয় করতে নেমেছেন বা মুষ্টিযুদ্ধে প্রতিযোগিতা করেছেন, তাঁরাই জানেন ক'দিন আগে থেকেই, বিশেষ করে সেই দিন সকাল থেকে, কতবার তাঁরা অন্যমনস্ক হয়েছেন—কি একটা অজানা আশঙ্কায় থেকে থেকে বুকের ভেতর কাঁপুনি অনুভব করছেন। সারাটা দিন ধরে কণ্ঠের শুষ্কতা দূর করতে কতবার জল খেয়েছেন, শরীরের উত্তাপ কতখানি বেড়ে গিয়েছিল—যেন সারাক্ষণই জ্বরভাব; একটু চিন্তা করলেই পাঠকবর্গের পক্ষে, যাঁদের এই ধরণের অভিজ্ঞতা আছে, অনুভব করা কঠিন

হবে না যে, সুনিশ্চিত মৃত্যুর ক'টি ঘণ্টা আগে কি ভীষণ উৎকণ্ঠা ও নিদারুণ মানসিক প্রতিক্রিয়া তাঁদের দেখা দেয়।

যুদ্ধ-প্রাঙ্গণের বাস্তব চিত্র বহুদিন আগে থেকেই আমরা মানসপটে এঁকেছি। ভয় আমরা করব না—ভয় আমরা করি না—প্রাণ দেওয়া আমাদের কাছে অতি তুচ্ছ। তবু যেন কিসের একটা ভয়—কিসের একটা শিহরণ, কম্পন—কি একটা বাসনা—মরণ ওগো মরণ! তুমি যখন আসবেই তবে আর একটু দেরিতে এসো, আর সামান্য একটু বিলম্ব কর! অদ্ভুত মানসিক প্রতিক্রিয়া—না, অদ্ভুত নয়, অসামান্য বৈপ্লবিক চরিত্রেও এটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।

এই প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে মানসিক প্রস্তুতি প্রতি মুহূর্তে প্রয়োজন। যতই যুদ্ধের অন্তিম সময় এগিয়ে আসে ততই বিভিন্ন মানসিক প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হয়। খুব দামী অভিজ্ঞতার সাহায্যে জেনেছি শেষ মুহূর্তের বিরূপ প্রতিক্রিয়া অনেক ক্ষেত্রে সাহসের অভাব ঘটায়—মনোবল ভেঙে দেয়—মরণ-পাগল বিপ্লবীরও দেখেছি বাঁচবার জন্য কত আকাঙ্ক্ষা, কত চেষ্টা!

এই পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে—আমরা ১৮ই এপ্রিল ভোর থেকে বহুবার নিজ নিজ মনে শপথ গ্রহণ করেছি, কখনও বা একে অন্যের কাছে শ্লোগানের মত বৈপ্লবিক বাণী এবং উদ্দীপক ইংরজী ও বাংলা কবতা সরবে আবৃত্তি করেছি। মাঝে মাঝে দৃঢ়ভাবে হাত মুষ্টিবদ্ধ করেছি বা কোন সময়ে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকারের ধ্বংস, মেঝেতে পদাঘাত করে বন্ধুদের কাছে ঘোষণা করেছি। এই সব বাড়াবাড়ি মনে হলেও, নেহাৎ নাটকীয় ব্যাপার বলে প্রকাশ পেলেও, বাস্তব জীবনে মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পূর্বে আমরা নিজেদের মধ্যে 'অভিনয়' করেছি। স্টেজে অভিনয় দেখেও যদি ক্ষণিকের জন্য প্রেরণা অনুভব করা যায় তবে মৃত্যুপণ করার পর যে 'অভিনয়' করেছিলাম তার মধ্যে সত্য ছিল—সেই সত্য অভিনয় অন্তরে আগুন প্রজ্বলিত করতে সাহায্য করেছে, প্রেরণা দিয়েছে, সাহস যুগিয়েছে—বল দিয়েছে।

সেই দিন ভোরে ঘুম থেকে ওঠার পর কে কি ভেবেছিলেন তা ঠিক করে বলতে পারব না। মাস্টারদার মনে কি হচ্ছিল? অম্বিকাদা, নির্মলদা কি ভাবছিলেন? লোকনাথ ও অন্যান্য তরুণ সাথীরা কিসের চিন্তায় অভিভূত ছিলেন? গণেশ—সেও কি আমার মত মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে ছিল ও আজকের যুব-বিদ্রোহের সূচনা ও পরিণতির কথা একইভাবে অনুভব করতে চেষ্টা করছিল? প্রত্যেকের কথা বা চিন্তাধারা অপরে কি করে বলবে? আমি নিজেও কি নিজের কথা সবটুকু প্রকাশ করতে পারব—সূক্ষ্মতম সহস্র প্রতিক্রিয়ার কথা? তবে নিজের মন দিয়ে বিচার করে দু' বছরের ঘনিষ্ঠ বিপ্লবী সাথীদের মনের পরিচয় মোটামুটিভাবে দেওয়া খুব শক্ত নয় এবং তা নির্ভুল হওয়াই সম্ভব।

ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে ছ'টার মধ্যে নির্দেশ অনুসারে আমরা তৈরি হয়ে গেছি। অনেক কাজ—ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় তা করতে হবে। যার যে কাজ সে তা' করবে। আমি প্রস্তুত হয়ে ড্রয়ার খুলে আমার গুলীভরা পিস্তলটি কোমরে গুঁজে নিলাম। এই তো চার পাঁচ মাস ধরে চলছে, তবে আজ পিস্তলটি নেওয়ার সময় শিহরণ জাগল—আপনা থেকেই আমার হাত মুষ্টিবদ্ধ হল। আশ্চর্য! মনে মনে বললাম—"আর দেরি নেই; কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী দস্যু—সাবধান! ন্যায়ের দণ্ড নেমে আসছে তোমার মাথার ওপর। এবার আর রক্ষা নেই—তোমার ক্ষমা নেই!"

মোটর গ্যারেজের দিকে এগিয়ে গেলাম। প্রতি পদক্ষেপে চ্যালেঞ্জের ভাব। 'বেবী-অস্টিন'—২৪৪৪ নম্বরের সেই ঐতিহাসিক বেবী-অস্টিন, টিউন করে বার করলাম। চট্টগ্রাম শাখার গণতন্ত্র-বাহিনীর সুবিখ্যাত ২৪৪৪ নম্বরের বেবী-অস্টিন যুব-বিদ্রোহের শেষ দিন ও শেষ সময় পর্যন্ত বিপ্লবীদের একজন বিশ্বস্ত অনুচরের মত নিঃশব্দে সব কাজ করে গেছে। গণতন্ত্র বাহিনীর এই 'বেবী-অস্টিন' প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর যুদ্ধ-জাহাজ 'এমডেনের' মত শত্রুপক্ষকে বিব্রত করেছে—বিভ্রান্ত করেছে। তরুণ পাঠকেরা ১৯১৪—১৮ সালের জার্মান ক্রুজার—'এমডেনের' কথা হয়ত জানেন না। সেই সময় 'এমডেন' রূপকথার এক নায়ক। প্রতিদিন সংবাদপত্রে 'এমডেনের' চমকপ্রদ খবর পাওয়ার জন্য পাঠকবর্গ উদগ্রীব হয়ে থাকত। কোথা থেকে কোন অবস্থায় তার উদয় হবে আগে থেকে কেউ তা জানতে পারত না। বৃটিশ, আমেরিকা ও ফ্রান্সের সামুদ্রিক এলাকায় "বেশ পরিবর্তন" করে 'এমডেন' অবাধে বিচরণ করে ক্ষিপ্রগতিতে আক্রমণ চালিয়ে মিত্রপক্ষের সামরিক ঘাঁটি বা মালবাহী অথবা যুদ্ধজাহাজকে বিধ্বস্ত করে উধাও হোত। পাঁচ ছয় ঘণ্টার মধ্যে অনায়াসে চলন্ত অবস্থায় 'এমডেন' রং বদলাত। চোঙা (Funnel) স্থানচ্যুত করার ব্যবস্থা তাতে ছিল, তাই এখন একটা চোঙা দেখা যাচ্ছে আবার কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল দুটো বা তিনটে চোঙা। 'এমডেনের' রূপকথা ছেলেবেলায় আমাদের আকর্ষণ করেছিল। তাই ভবিষ্যৎ জীবনে আমাদের 'এমডেন'—২৪৪৪ নম্বরের বেবী-অস্টিনটি রং বদলে হুড পালটে, টায়ার বদলে বৃটিশ পুলিশের কড়া নজর এড়িয়ে তার গতিবিধি সযত্নে গোপন রেখেছিল। আজ সেই দিনের কথা বলতে গিয়ে চৌষট্টিজন প্রাণ-চঞ্চল বিদ্রোহী যুবকের সাথে পর-হস্ত-চালিত ঐ জড় পদার্থটি—বেবী-অস্টিনটির কথা, সমান গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করলাম; তা না করলে আমার ইতিহাস বর্ণনা ত্রুটি-পূর্ণ থাকত।

গাড়িটি নিয়ে একা বেরিয়ে পড়লাম। চট্টগ্রামের আঁকা-বাঁকা পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে সরু রাস্তা ধরে চলেছি। কমিশনার সাহেবের বাংলোর টিলার তলা দিয়ে ঘুরে ছোট্ট সরু গলিতে গিয়ে পড়লাম। এঁকে বেঁকে যেখানে গিয়ে গাড়িটা থামালাম, তার পাশে একটি খড়ের ঘর। গাড়ি থেকে নেমে দরজায় ঘা দিলাম—বার বার তিন বার। দরজায় খিল দেওয়া ছিল না, ভেতরে ঢুকলাম।

আমি তখন যেন অন্য জগতের লোক। আজ যে কাজ করতে যাচ্ছি তার উত্তেজনা আমার ভাবে ভঙ্গীতে, চোখের দৃষ্টিতে, প্রতিটি পদক্ষেপে যেন প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল—আজ আমি শুধু একজন মানুষ নই, সশস্ত্র যুব-বিদ্রোহের সৈনিক—মরণ-পণে আবদ্ধ।

দরজা খুলে সেইরূপ দৃপ্ত পদে ঘরে ঢুকলাম—নিজের বেপরোয়া সৈনিকোচিত মনোভাব গোপন করলাম না। নির্জন ঘরে খাটের ওপর প্রতিদিনকার অভ্যস্ত ভঙ্গীতে বসে আছেন মাস্টারদা—ধীর শান্ত গম্ভীর। তাঁর মুখের গভীর প্রশান্তি দেখে কে অনুমান করতে পারবে তাঁর অন্তরে আগ্নেয়গিরির জ্বালা? বিস্ফোরণের পূর্ব মুহূর্তে বারুদের স্তূপ যেমন শান্ত স্থির নিশ্চল হয়ে ঘুমিয়ে থাকে, ঝড়ের আগে সমস্ত পৃথিবী যেমন নিশ্চুপ হয়ে যায়—তেমনি ১৮ই এপ্রিলের প্রত্যূষে অতলস্পর্শী সমুদ্রের মত, গগনচুম্বী হিমাদ্রি শিখরের মত ধীর স্থির, ধীর, শান্ত, অচঞ্চল হয়ে বসেছিলেন মাস্টারদা—যুব বিদ্রোহের মহানায়ক সূর্য সেন।

আমাকে দেখে তাঁর চোখ মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সমস্ত মুখে প্রশান্ত হাসি নিয়ে আমাকে বসতে বললেন। আমার চোখে মুখে যে উত্তেজনার আভাস প্রকাশ পাচ্ছিল তা তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সহজেই ধরা পড়ল। একটু মৃদু হেসে বললেন—"মনে হচ্ছে

চ্যবনপ্রাশ

চ্যবনপ্রাশের মূল উপাদান আমলকী দেহের পুষ্টিসাধনে ও হৃতস্বাস্থ্যোদ্ধারে আমলকীর অত্যাশ্চর্য্য গুণাবলী সর্ব্বজন বিদিত। এতদ্ব্যতীত, বিশুদ্ধ গব্যঘৃত—কৃষ্ণতিল তৈল, মিছরী ও অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য ও বহু মূল্যবান ভেষজ সংমিশ্রণে ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসায়ন।

সর্দ্দি, কাশি ও স্বরভঙ্গের মহৌষধ

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম্, এ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ. সি. এস. (লণ্ডন) এম্. সি. এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র—ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম্. বি. বি. এস. (কলিঃ) আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য।

আজ তুই খুব উত্তেজিত।" সত্যি, আমাকে দেখে যে-কেউই বলবে আমি খুব উত্তেজিত। ইচ্ছে করেই আমি নিজেকে গোপন করছিলাম না। ভেবেছিলাম সবারই আজ আক্রমণের জন্য 'উত্তেজনাপূর্ণ মনোভাব' রাখা উচিত। কিন্তু মাস্টারদা কেন আমাকে ওই ভাবে ইঙ্গিত করলেন তা ঠিক আমি বুঝি নি। আমি উত্তর দিলাম—

"আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র বাকি। মনকে প্রস্তুত করে নিচ্ছি। আপনার তো অজানা নেই মাস্টারদা, শত উত্তেজনাতেও পিস্তলের ট্রিগারে আমার আঙুল স্থির হয়ে থাকে—তবু নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা বিনা প্রয়োজনে কখনো গুলী বেরোয় নি।"

মাস্টারদা আমাকে নিরুৎসাহ করেন নি। সেইদিন কিন্তু মাস্টারদা শারীরিক উৎকর্ষের চাইতে মানসিক শক্তির প্রাধান্যের কথা বলে পরিবেশ ভারাক্রান্ত করতে চাইলেন না। তিনি বুঝেছিলেন কর্মদক্ষতা ও শারীরিক শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন আজই সবচেয়ে বেশি। কেবল মানসিক শক্তির কাজ নয়—বিপ্লবী সৈনিককে আজ শত্রুর চাইতে অধিক শক্তি নিয়ে আক্রমণ করতে হবে—শত্রু-শিবির বিধ্বংস করতে হবে। তাই মাস্টারদা আমার এই "যুদ্ধং দেহি" ভাবের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখালেন না—উৎসাহ দিলেন।

তিনি আমার একটু কাছে এগিয়ে এলেন। একদৃষ্টিতে মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন—

"দ্যাখ, ১৯২২ সালে ৩রা ডিসেম্বর তুই দৃঢ়তা ও আত্ম-প্রত্যয় নিয়ে বলেছিলি রেল কোম্পানীর টাকা নিখুঁৎ ও সফলতার সঙ্গে ডাকাতি করে নিয়ে আসতে পারবি। সফলও হয়েছিলি। আজ আমি আবার জিজ্ঞাসা করছি—তুই বল, আজকের অভিযান সফল হবে তো?"

গত দুটি মাসে প্রস্তুতি চলাকালে মাস্টারদা এই একটি প্রশ্ন আমাকে কম পক্ষে দশবার জিজ্ঞাসা করেছেন। আজকে শেষ দিনে আবার সেই একই প্রশ্ন—'রেলের ডাকাতি যেরূপ সফল হয়েছিল আজও সেইরূপভাবে জয় সুনিশ্চিত কি না?' এক-একটি ঘন্টা অতিক্রান্ত হচ্ছে আর এই একটি প্রশ্ন ঘুরে ঘুরে আমাদের পাঁচজনের মনেই উঠছে—সামগ্রিক আক্রমণ সফল হবে তো? একই রকম উৎকণ্ঠা নিয়ে মাস্টারদা আমাকে আজও আবার সেই প্রশ্ন করলেন। আমি উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম। মাস্টারদা আমাকে বাধা দিয়ে বললেন যেন চট করে উত্তর না দিয়ে ভাল করে ভেবে তারপর প্রশ্নের জবাব দিই।

মাস্টারদার মনে যে কি ঝড় বইছে তা আমি বেশ অনুভব করতে পারছিলাম। ইণ্ডিয়ান রিপাবলিক আর্মির চট্টগ্রাম শাখার প্রেসিডেণ্ট—সশস্ত্র যুববিদ্রোহের প্রধান নায়ক সূর্য সেন, যাঁর নেতৃত্বে আজ নির্ভীক মরণজয়ী একদল যুবক প্রাণ দিতে চলেছে, আত্ম-বলিদানে উদ্যত, তাঁর গুরুদায়িত্ব অভ্যুত্থানের পূর্ব মুহূর্তে তাঁকে বিচলিত করেছে। তাই সৈনিকের কাছে তাঁর প্রশ্ন—সফল হবে তো?

প্রতিটি কথায় সাধ্যমত জোর দিয়ে উত্তর দিলাম—

"মাস্টারদা, সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলছি, শহর আমরা অধিকার করবই। আমাদের শক্তিকে বাধা দেবার সাধ্য কারও নেই। ঝটিকা-বাহিনীর তড়িৎ গতিতে আক্রমণের আঘাতে শত্রুর সব ঘাঁটিগুলি অধিকার করবই। আমাদের ছোট ভাইরাও সুশিক্ষিত, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও জয় সম্বন্ধে তারাও সুনিশ্চিত। মাস্টারদা আপনার সংশয়ের কোন কারণ নেই।"

মাস্টারদার সেই চিরদৃপ্ত চোখ দুটি একবার জ্বল জ্বল করে উঠল। তারপর আমার হাত চেপে ধরে অত্যন্ত মৃদু স্বরে যেন নিজের মনে মনেই প্রশ্ন করলেন—"যদি সব ফাঁস হয়ে যায়? যদি ভেতর থেকে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে? সেই আশঙ্কা কি নেই?" স্বগতোক্তি শেষ করে আমার মুখের দিকে তাকালেন—যেন এই কঠিন সমস্যা সম্বন্ধে আমার অভিমত শুনতে চাইছেন।

আক্রমণ চালাবার ঠিক পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের পাঁচজনের মনে এই একটি প্রশ্ন সারাক্ষণ ঘুরে বেড়িয়েছে—আমাদের বিচলিত করেছে—উৎকণ্ঠায় রেখেছে। বিপ্লবীদের অশুভ অতীত ইতিহাস বড়ই পরিতাপের। যতীন মুখার্জি বালেশ্বর সমুদ্র উপকূলে গেলেন সাথীদের সঙ্গে "মেভারিক", জাহাজ বোঝাই জার্মানীর অস্ত্র কূলে নামিয়ে নিতে। এল না "মেভারিক" পেলেন না অস্ত্র! দেখা পেলেন স্যার চার্লস টেগার্টের নেতৃত্বে বৃটিশ সৈন্যের! ১৯১৫ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী সারা ভারতব্যাপী বৈপ্লবিক উত্থানের দিন ধার্য ছিল। ঠিক ছিল সৈন্যদের নিয়ে বিদ্রোহ আরম্ভ হবে। রাসবিহারী বসু ও বিষ্ণু-গণেশ পিঙ্গলের নেতৃত্বে লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে বিদ্রোহ সুরু হওয়ার কথা। আগের দিন অর্থাৎ ২৩শে ফেব্রুয়ারী, গোপন সংবাদ পেয়ে পুলিশ ব্যারাকের মধ্যে পিঙ্গলেকে বোমা সমেত গ্রেপ্তার করল। পিঙ্গলের ফাঁসী হল। রাসবিহারী বসুর ভারতময় সৈন্যদের নিয়ে বিদ্রোহের আয়োজন এইভাবে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হল। কাজেই শেষ মুহূর্তে আমাদের কি হবে—শত সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও কোনও ছিদ্র দিয়ে পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যায় নি তো—পুলিশ শেষ মুহূর্তে আমাদের ফাঁদে ফেলবে না তো? এইরূপ চিন্তায় আমরা অস্থির ছিলাম।

মাস্টারদার প্রশ্নের উত্তর আমার ভেবে দিতে হবে। খুব ভেবেই উত্তর দিলাম—

"আমার মনে হয় গুপ্তচর বিভাগের চোখে আমরা ধুলো দিতে পেরেছি—তারা বিভ্রান্ত হয়ে অন্য পথে চলেছে। ওৎ পেতে আছে ২১শে তারিখের পরে রাজদ্রোহাত্মক বক্তৃতা দিলে আমাদের ধরবে।"

তবু মাস্টারদা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। খুব ধীরে ও অতি মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন—"তুই কি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিস আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যে কেউ পুলিশের গুপ্তচর নয়?" কি নিদারুণ প্রশ্ন! এইরূপ সাংঘাতিক প্রশ্ন মনে ওঠাই উচিত নয় বলে হয়ত কেউ উড়িয়ে দিতে চাইবেন। আমাদের পাঁচজনের বাইরে যদি কেউ পুলিশের চর হোত তবে সে কতটুকু অনিষ্ট করতে পারত? খুব বেশি হলেও সে বলতে পারত যে দু-তিনজনের সঙ্গে মিলে সে কোন একটি অ্যাকশনে যাবে। তার চেয়ে অধিক বলা কোন সাধারণ সভ্যের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই মাস্টারদার প্রধান চিন্তা, কেন্দ্রীয় কমিটির আমরা পাঁচজন ঠিক আছি কি না! হয়ত তিনি সেইরূপ প্রশ্ন করে আমাকেও যাচাই করে নিতে চেয়েছিলেন—দেখছিলেন আমার তাতে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। আমাদের পাঁচজনের মধ্যে পরস্পরের এত জানা-শোনা, এত দিন ধরে এক সঙ্গে প্রস্তুতির কাজ করেছি—কোন দিনই তো বিশ্বাসঘাতকতার কোন চিহ্ন দেখি নি। তবে এত পরীক্ষা, এত ঘনিষ্ঠতার পরও কি মাস্টারদার এইরূপ প্রশ্ন করার কোন বাস্তব যুক্তি ছিল? অতীত বিপ্লবী ইতিহাসের ধারাবাহিক তথ্যাদি নিয়ে আমরা গবেষণা করেছি বলে পার্টির সাধারণ সভ্যের চাইতে দলনেতাদের ওপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা আমরা আরও বেশি প্রয়োজন বলে মনে করতাম। আমাদের মধ্যে যদি কেউ জানত মাস্টারদা কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য সম্বন্ধেও ঐরূপ তীক্ষ্ম প্রশ্ন করেছেন তবু কেউ অসন্তুষ্ট হতো না। অবিশ্বাস করেই যে ঐরূপ প্রশ্ন করতে হবে তা নয়—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে উৎখাত করার জন্য ষড়যন্ত্রমূলক সংগঠনে নীতিগতভাবে দলের কোন সভ্য পুলিশের গুপ্তচর কি না

কাঙ্ক্ষিত

ভজন বন্দ্যোপাধ্যায়

বৈশাখের দগ্ধ দিনে গূঢ় প্রত্যাশায়
আমি একা ঘরের ভিতর ঃ
কোথায় সংগ্রামী সেই ঝড়
ডাক দেয় অজানিত কোন সীমানায়?
শ্রাবণের বৃষ্টির সংবাদে
মৌন প্রার্থনায়
কাটিয়েছি কতো কাল দীর্ঘ অন্ধ রাতে;

তবুও আসে নি সেই ঝড় নিদারুণ,
বজ্রগর্ভ আকাশে আগুন।
গুটি গুটি পায়ে গেল আশ্বিনের নীরব সকাল;
ফলিয়েছিলাম মাঠে মাঠে কবে ধান!
রোদে হাসে সেখানেই এখন কঙ্কাল।
তবু কই সেই ঝড়, আসে কই কঠিন তুফান?

এই প্রশ্নের দরবারে, সে যেই হোক না কেন, তাকে উপস্থিত হতেই হবে। তাই মাস্টারদা ঐইরূপ প্রশ্নের আলোচনা করা অন্যায় মনে করেন নি—প্রয়োজন মনে করেছিলেন।

আমরা সব সময় সতর্ক ছিলাম যাতে পুলিশের ফাঁদে ধরা পড়ে আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা হাস্যকর ব্যর্থতায় পর্যবসিত না হয়। তাই সেই দিনের আক্রমণের পূর্বাহ্ণে মাস্টারদার মনে এই প্রশ্নই বারে বারে আঘাত করেছে—নিজের মনে নিজেকেই প্রশ্ন করেছেন—"কেন্দ্রীয় কমিটির কারও দ্বারা কি বিশ্বাসভঙ্গের সম্ভাবনা আছে? পুলিশের জালে ধরা পড়ব না তো? সফল হবে তো সমস্ত আয়োজন?"

ভেবে আমাকে উত্তর দিতে হবে। চৌষট্টিজন নির্ভীক দৃঢ়চেতা বিপ্লবী যুবকের প্রত্যেকের মুখ আমার মনের আয়নায় খুঁজে দেখলাম। তারপর ধীরে ধীরে মাস্টারদাকে আমার অভিমত জানালাম—

না, এখন পর্যন্ত সন্দেহ করার মত কিছু নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের সংগঠনে গুপ্তচরের অনুপ্রবেশ সম্ভব হয় নি। কেন্দ্রীয় কমিটির ওপর আমার প্রখর দৃষ্টি আছে। আমার ওপরও তাদের দৃষ্টি রাখবার কথা। সব দিক বিবেচনা করে আমার বিশ্বাস পুলিশের কানে এখনও কিছু পৌঁছয় নি। আমরা সফল হব নিশ্চয়ই।"

মাস্টারদা আমার হাত ধরে আনন্দে খুব ঝাঁকানি দিলেন। তাঁর আনন্দ ও উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ মাত্র এইটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

এবার আমি বিদায় নেব। উঠে পড়লাম। আমার সঙ্গে সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এসে মাস্টারদা আবার প্রশ্ন করলেন—

—"নতুন গাড়িটা কখন ডেলিভারি দেবে?"

—"সকাল ন'টা নাগাদ। অম্বিকাদাকে নিয়ে গাড়িটা আনতে যাব।"

মৃদু হাসি বিনিময়ের পর আমি মাস্টারদার কাছ হতে বিদায় নিলাম। গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে গণেশের বাড়ির উদ্দেশ্যে ছুটলাম। ঠিক সাতটা নাগাদ গণেশের বাড়িতে এসে পৌঁছই। আমাকে দেখেই গণেশ উৎসাহের সঙ্গে "সম্ভাষণ" জানাল—"হ্যালো মার্শাল!" খুব হাসি ও আমোদের মধ্যে পরস্পরে 'সম্ভাষণ' ও 'অভিবাদন' বিনিময় করলাম।

তারপর আমরা দুজনে ঘরের ভেতরে চলে গেলাম। একটি টেবিল। দুপাশে দুটি চেয়ার। আমরা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। দুজনের মনেই ঝড় বইছে—একই চিন্তা দুজনের। তারপর হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করে বলে উঠলাম—"দু' বছরের এত আয়োজন, এত রিহার্সেল—আজ পর্দা উঠবে, নাটকের সুরু।"

আমার কথা টেনে নিয়ে শেষ করল গণেশ—"and let Nemesis retribute justice with wrath and retaliation!"—প্রতিহিংসা দেবী রুদ্রমূর্তিতে নেমে এসো আজ! তোমার রোষবহ্নিতে দিকমণ্ডল ছেয়ে যাক। বৃটিশ সরকারের সব দম্ভ, সব ঔদ্ধত্য বুদ্বুদের মত বাতাসে বিলীন হয়ে যাক।

আমাদের সামনে টেবিলের ওপর চট্টগ্রাম শহরের স্কেচ করা ম্যাপ ছিল। আক্রমণ করার ঘাঁটিগুলি বিশেষভাবে চিহ্নিত ছিল। আরও অনেক চিহ্ন দেওয়া ছিল—কিভাবে, কোন পথে, কারা কোন সময়ে যাবে, ইত্যাদি। দুজনের হাতে লাল-নীল পেন্সিল। ম্যাপ সামনে রেখে দুজনে আগাগোড়া আজকের আক্রমণ পরিচালনার রিহার্সেল এই শেষ বারের মত দিয়ে নিলাম। ম্যাপটি তারপর পুড়িয়ে ফেলা হল।

এখন ৭-৩০ মিনিট। 'জেনারেল বল' (লোকনাথ বল) এখন আসবে। পাঁচ মিনিট পর—ঠিক সময়, জেনারেল বল এলেন—গৌরবর্ণ, দৃঢ়সংকল্প, উন্নত বক্ষ সুগঠিত দেহ, সবল বাহু দুটি যে কোন আক্রমণ প্রতিরোধে প্রস্তুত—শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সর্বদাই উদ্যত।

হাসি মুখে ঘরে ঢুকলো লোকনাথ—আমরা আজই আমাদের মৃত্যুর দিন মনে করে পরস্পর অভিনন্দন জানালাম। এর পূর্বেও রোজই মিলতাম কিন্তু অভিনন্দন বা অভ্যর্থনার পালা কখনই চলতো না। আজ যে বিশেষ একটি দিন—আজ যে আমরা মরণ অভিসারে চলেছি—তাই 'অভ্যর্থনা', 'সম্ভাষণের' ধুম পড়ে গেছে আমাদের মধ্যে।

আদর্শ সৈনিক, আদর্শ সেনাপতি লোকনাথ বল। সৈনিকের আদর্শে যে বড়, সেই তো বড় সেনাপতি হবার যোগ্য। লোকনাথ বলের আদর্শ ছিল—

"There's not to make reply,
There's not to reason why,
There's but to do and die."

—সৈনিকের মনে 'কেন' এই প্রশ্নের উদয় হবে না, কোন তর্ক নয়, কোন দ্বিধা নয়, শুধু সেনাপতির আদেশ পালন আর প্রয়োজনে মৃত্যুবরণ!

লোকনাথের আদর্শ গ্রহণ করেছিল দলের ছোট ভাইয়েরা। দৃঢ় চিত্ত অনুগত মুষ্টিমেয় সৈন্য দল নিয়ে অগণিত বৃটিশ সৈন্যের সঙ্গে জালালাবাদে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল জেনারেল লোকনাথ বল।

লোকনাথ জানাল—"সব তৈরি। আমার দিকে সব ঠিক আছে। ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় কাজ হবে।" তারপর একটু হেসে বলল—"All for one and one for all!"

—সকলের জন্য আমরা প্রত্যেকে, প্রত্যেকের জন্য আমরা সকলে! লোকনাথের আত্মবিশ্বাস আমাদের উৎসাহকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে তুলল।

[ক্রমশঃ]

গ্রন্থমেলা

ঠাকুরবাড়ির কথা—শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ, ৩২ এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য ঃ বার টাকা মাত্র।

ভারতের জাতীয় ইতিহাসে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির অবদান সর্বাগ্রে স্বীকৃত হবে। দু' শতাব্দী ধরে সমাজ-সংস্কৃতি-শিক্ষা - সাহিত্য - বিজ্ঞান - রাজনীতি - ধর্ম—প্রায় প্রতি স্তরেই একসঙ্গে এমন প্রবল প্রগতিমূলক প্রকাশ ঠাকুরবাড়ি ছাড়া আর কোথায় বা লক্ষ্য করা গেছে?

বিচ্ছিন্নভাবে ঠাকুরবাড়ির জন্মকথা আমরা আগেই জেনেছি। হিরণ্ময়বাবু বিভিন্ন মতধারা থেকে সেই জন্মকথার একটি বিবরণ দিয়েছেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি রবীন্দ্রোত্তর কালে যে বেদনাময় অবস্থায় পৌঁছেছিল তার ইতিহাসও হিরণ্ময়বাবু উন্মোচন করেছেন। বর্তমান ঠাকুরবাড়ি কোন অবস্থায় সেই প্রসঙ্গও সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন তিনি। 'ভূমিকা'র এই অংশে "রবীন্দ্র-ভারতী"র জন্মকাহিনী আরো সংক্ষেপে বর্ণনা করাও সম্ভব ছিল। অবশ্য আগামী যুগে ঠাকুরবাড়ির জন্মকথার আদি থেকে একালের কথা জানার জন্যে আলোচ্য গ্রন্থটির উপর বহুলাংশে নির্ভর করা সম্ভব হবে।

হিরণ্ময়বাবুর ঠাকুরবাড়ির কথা গ্রন্থটি রচনার প্রধান কৃতিত্ব এই যে, যাঁদের সম্বন্ধে এবং যে সব বিষয়ের আলোচনা এর আগে বহু স্থানে বহু গ্রন্থে বহুভাবে হয়েছে—তাঁদের তিনি একটিমাত্র গ্রন্থে সীমাবদ্ধ করেছেন। যেমন দ্বারকানাথ সম্বন্ধে মৌলিক গ্রন্থ লিখেছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্রের ভ্রাতা কিশোরীচাঁদ মিত্র (দ্রষ্টব্য ডক্টর কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত সম্পাদিত ঐ গ্রন্থ), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে গবেষণামূলক গ্রন্থ লিখেছেন ডক্টর সুশীল রায়, এছাড়া রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনার অন্ত নেই।

দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাত্মা রামমোহন সহ ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে নবযুগের পত্তন করেছিলেন একথা এখন আর নতুন করে জানার দরকার হয় না, তবে সেকালের ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ নিয়ে এখনো হয়তো কোনো কোনো সমালোচক নিজেরাই ভুল করেন। ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর খানাপিনার খবর সেকালের কাগজে ফলাও করে প্রকাশিত হোত ঠিকই। এ সংবাদ হিরণ্ময়বাবুও দিয়েছেন উদ্ধৃতিসহ। তাছাড়া সেই খানাপিনা নিয়ে সেকালে ব্যঙ্গাত্মক ছড়াও রচিত হয়েছিল—যা অন্যত্র আমরা পাঠ করেছি ঃ

'বেলগাছিয়ার বাগানে হয় ছুরি
কাঁটার ঝনঝনি,
খানা খাওয়ার কত মজা,
আমরা তার কি জানি?
জানেন ঠাকুর কোম্পানী।'

কিন্তু এটাও সত্য যে, দ্বারকানাথের মতো প্রগতিবাদী স্বদেশমন্ত্রে উজ্জীবিত, আন্তর্জাতিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তি সেকালে রামমোহন ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। ইংরেজদের কাছে যে সম্মান তিনি লাভ করেছিলেন আজ পর্যন্ত অন্য কোনো ভারতীয় তা পেয়েছেন কি না তা বিচার্য বিষয়—তথাপি ইংরেজদের মহৎ-গুণগুলি স্বীকার করে নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধেই তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের যা ছিল ইংরেজ তার সবই নিয়েছে, আমাদের জীবন, স্বাধীনতা, ধন-সম্পত্তি, সমস্ত কিছুই আজ ওদের করুণার উপর নির্ভরশীল।' সাহেবদের ডেকে দ্বারকানাথ ভোজ দিতেন ঠিকই কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একথাও বলেছেন, 'আমাদের পিতামহ ইংরাজ রাজপুরুষদিগকে বেলগাছিয়ার বাগানে নিমন্ত্রণ করিয়া সর্বদা ভোজ দিতেন, একথা সকলেই জানেন। কিন্তু শুনিয়াছি, তিনি পিতাকে নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন যে, ইংরাজকে যেন খানা দেওয়া না হয়। তাহার পর হইতে ইংরাজের সহিত সংস্রব আর আমাদের নাই; এবং পিতামহের আমল হইতে আজ পর্যন্ত সরকারের নিকট হইতে খেতাবলোলুপতার উপসর্গ আমাদের পরিবারে দেখা দেয় নাই।' দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হিরণ্ময়বাবুর মতো মনস্বী ও ইতিহাসনিষ্ঠ লেখকের গ্রন্থে এই দিকটি অনালোচিত থেকে গেছে। দ্বারকানাথের সম্পূর্ণ পরিচয়লাভের জন্য এই উদ্ধৃতি অপরিহার্য। তাছাড়া এই উদ্ধৃতিই প্রমাণ করে যে পুত্রের কাছে পিতার মন্তব্য পরবর্তীকালে কিভাবে ঠাকুরবাড়ির উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই প্রভাবের ফলেই যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে সারা ভারতে সর্বপ্রথম স্বাদেশিকতার উদ্বোধন ঘটেছিল—এ সিদ্ধান্তেও উপনীত হওয়া যেতে পারে। মোট কথা, দ্বারকানাথের ব্যবসাবুদ্ধি যতো বড়ই হোক না কেন, হিরণ্ময়বাবু তাঁকে নব ভারত গঠনের সাধক-কর্মী প্রমাণ করতে গিয়েও শেষরক্ষা করতে পারেন নি। আমাদের মনে হয়, উপরি-উক্ত রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতিই শেষরক্ষার সহায়ক হতে পারে। দেবেন্দ্রনাথের উপর আলোচনায় হিরণ্ময়বাবু দেবেন্দ্রনাথের ধর্মবোধের উপর সুন্দর আলোকপাত করেছেন— দেবেন্দ্রনাথের পর ঠাকুরবাড়ির পরিবারের বহুজনের প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। বিশেষত দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী দেবীর আলোচনা সংক্ষিপ্ত হলেও অত্যন্ত তথ্যনিষ্ঠ। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, যেখানে দুইজন পূর্ববর্তী লেখকের মধ্যে মত পার্থক্য ঘটেছে সেখানে হিরণ্ময়বাবু কোনোরকম স্বকীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হন নি। তাই সংগীত সম্পর্কিত বাংলার সর্বপ্রথম পত্রিকা সম্বন্ধে ডঃ সুশীল রায় ও সংগীতাচার্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরস্পর বিরোধী দুটি মতামতই উপস্থাপিত করেছেন (পৃঃ ১৩৩)। ষষ্ঠ অধ্যায় ১৪৩ পৃঃ থেকে ২৪৫ পৃঃ রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিসত্তা, কবিসত্তা ও জীবন-সাধনার উপর আলোচনাটি তথ্যবহুল ও উপাদেয়। পরিবারের উত্তরপুরুষের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় স্থান পেয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ, ইন্দিরা দেবী, রথীন্দ্রনাথ প্রমুখ। পরিশিষ্ট-অংশে বংশলতা অসম্পূর্ণ ও অবৈজ্ঞানিক বলে মনে হয়েছে। যেমন, দ্বারকানাথের পাঁচ পুত্র। তিনজনের নাম দেওয়া অনুচিত। অন্য দু'জন নরেন্দ্রনাথ (২য় পুত্র), ভূপেন্দ্রনাথ (৪র্থ পুত্র)। যদিও স্বল্পজীবী হওয়ার জন্যে এরা সম্পত্তির ভাগীদার হতে পারে নি, তবু এরা দ্বারকানাথেরই সন্তান। ঠিক তেমনি রবীন্দ্রনাথের অনুজ ছিল বুধেন্দ্রনাথ, এটি অনুল্লিখিত এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পর পুণ্যেন্দ্রনাথ, তারপর সোমেন্দ্রনাথ। কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক ভুল, কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীর জন্মসাল দেখানো হয়েছে ১৮৭৬ (১৮৭৩) ও মাধুরীলতার জন্মসাল উল্লিখিত হয়েছে ১৮৮৬। অর্থাৎ মাতা ও কন্যার বয়সের ব্যবধান মাত্র দশ বছর! 'ঠাকুরবাড়ির কথা'র মতো এমন একটি মূল্যবান গ্রন্থে এই ধরণের ভুল মুদ্রণঘটিত বলে বিবেচিত হলেও একটি সংশোধনী পত্র থাকা উচিত ছিল। এতদসত্ত্বেও আমরা বলবো হিরণ্ময়বাবুর এই গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা ও আদর্শ আমাদের অত্যন্ত আনন্দ দান করেছে।

বঙ্গদর্শন

খাদ্য প্রসঙ্গ

কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ খাদ্যে কিঞ্চিৎ কাটছাঁট করার শুভসংকল্প ঘোষণা করেছেন এবং সেজন্য পশ্চিমবঙ্গবাসীকে কোমরে আরও কসে বেল্ট বাঁধতে হবে এই রকম একটা সংবাদ ২৮শে নভেম্বর তারিখে একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। ওইদিনই সন্ধ্যায় অবশ্য রেডিওতে সংবাদটির প্রতিবাদ করে জানানো হয়েছে যে এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রের কাছ থেকে অনুরূপ নির্দেশ পান নি, এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে পুনরায় ঘোষণা করা হয়েছে যে রেশনের বরাদ্দ আর কমানো হবে না, তথাপি বিশ্বাস করতে বড় একটা ভরসা হয় না। ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ডরায়। কেননা, মেয়েদের যেমন ক্ষেত্রবিশেষে না মানে হ্যাঁ, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারত সরকারের ভাবভঙ্গীও অনেকটা এই রকম। এই দেখুন না, দিনের পর দিন ধরে একটানা প্রচার করা হয়েছে যে টাকার মূল্যমান হ্রাস করা হবে না, হঠাৎ একদিন দেখা গেল যে সরকার একটি মহৎ ডিগবাজী দিয়ে বলে উঠলেন যে, এ ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। কাজেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার না বললেও, ভয়টা অবশ্য অত সহজে কাটবার নয়।

এবারে একটু কাজের কথায় আসা যাক। পূর্বঘোষিত নীতি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় ফুড কর্পোরেশনের মারফৎ এই নতুন মরশুম থেকে চাল সংগ্রহ করার পাকাপাকি আদেশ দিয়ে দিয়েছেন। আমরা এবিষয়ে গোড়া থেকেই আপত্তি তুলে এসেছি, কেননা আমরা মনে করেছি যে কেন্দ্রীয় ফুড কর্পোরেশনের হাতে চাল সংগ্রহের দায়িত্ব তুলে দিয়েই পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজের দায়িত্ব এড়াতে পারবেন না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্যদপ্তরের সঙ্গে ফুড কর্পোরেশনের সম্পর্ক কি রকম থাকবে তা স্পষ্ট জানানো হয় নি। ফুড কর্পোরেশনের অধিকারের সীমারেখা কতটুকু, পশ্চিমবঙ্গ থেকে সংগৃহীত ফসল পশ্চিমবঙ্গের জন্যই ব্যয়িত হবে কি না প্রয়োজনমত ফুড কর্পোরেশন ঠিকমত যোগান দিতে পারবে কি না, ফুড কর্পোরেশনের উপর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জোর কতটুকু খাটবে, কোন বিষয়ই এ পর্যন্ত পরিষ্কার হয় নি। এখন যখন সংগ্রহের দায়িত্ব কর্পোরেশন নিয়েই নিয়েছে তখন এই সকল প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামানো হয়ত অনেকেই নিরর্থক মনে করবেন, কিন্তু আমরা তা মনে করি না।

ফুড কর্পোরেশন সমবায় সমিতিগুলি মারফৎ চাল সংগ্রহের পরিকল্পনা নিয়েছেন। আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা খুব খারাপ বলে মনে হচ্ছে না। তবে এখানে একটি সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। সমবায় সমিতি মারফত যে চাল সংগ্রহ করা হবে তার জন্য পর্যাপ্ত মূলধন সমিতিগুলির নেই। অথচ এই মূলধন সমিতিগুলিকে যোগাবে কে তাই নিয়ে একটি বিরাট সমস্যার উদয় হয়েছে।

আগামী মরশুমে রেশন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা যাবে কিনা তা নিয়েও কিছুটা চিন্তার অবকাশ রয়েছে। সাম্প্রতিক একটি ঘোষণায় খাদ্যদপ্তর বলেছেন যে, আগামী মরশুমে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যশস্যের ঘাটতি দাঁড়াবে সাড়ে আটাশ লক্ষ টন। রাজ্যের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী এই ঘাটতির উল্লেখ করে এ বছর খাদ্যশস্য সংগ্রহ অভিযানকে সফল করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবার জন্য বলেছেন। পয়লা ডিসেম্বর থেকে কর্ডন ব্যবস্থাকে পুনরায় কঠোরতর করা হয়েছে। আগামী মরশুমে ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়াকে খাদ্য সংগ্রহ অভিযানে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন।

ফুড কর্পোরেশনের সঠিক চরিত্র সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে যে আশংকা প্রকাশ করেছিলাম, এবং এখানেও যা করেছি, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের মধ্যে কেউ কেউ ঠিক সেই কথাই বলেছেন। তাঁদের সন্দেহ নিরসন করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, ফুড কর্পোরেশন একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ধরণের সংস্থা এবং সেই হিসাবে তার কিছুটা স্বাধীনতা অবশ্যই থাকবে, যেমন ধান ক্রয় করার ক্ষেত্রে কর্পোরেশন যে কোন মূল্যে ধার্য করতে পারবে। অর্থাৎ ফুড কর্পোরেশনের উপর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সার্বিক অধিকার নেই।

অর্থাৎ আগামী মরশুমের খাদ্যনীতিতে একটা স্বৈরাজ্যবাদ বা ডায়ার্কির সৃষ্টি করা হয়েছে—ফুড কর্পোরেশনের হাতে একদিকে ন্যস্ত হচ্ছে দায়িত্বহীন কর্তব্য, অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঘাড়ে আসছে কর্তব্যহীন দায়িত্ব। কাজেই ভাগের মায়ের গঙ্গা পাবার আশা খুবই কম। এরপর অবস্থার অবনতি ঘটলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুষবেন ফুড কর্পোরেশনকে এবং কর্পোরেশন দুষবেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে।

হাস্কিং মেশিনের উপর খাদ্যদপ্তরের এত রাগের কারণ কি বোঝা যাচ্ছে না, সরকার ঘোষণা করেছেন যে, কর্ডন লাইনের পাঁচ মাইলের মধ্যে কোন হাস্কিং মেশিন থাকবে না। কিন্তু বড় বড় চালকলগুলি সম্বন্ধে সরকারের কোনই মাথাব্যথা নেই।

সব মিলিয়ে, এ বছরের মত আগামী বছরেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোন কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করতে পারছেন না। একথা আমরা বলছি না যে, পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যাভাব নেই, কিন্তু সংগ্রহ ও বণ্টন ব্যবস্থায় অজস্র গলদের সৃষ্টি করে সরকার নতুন করে হাজার সমস্যার সৃষ্টি

করে চলেছেন। তদ্ভিন্ন সাধারণ নির্বাচন ক্রমাগত। 'কুলাক' শ্রেণী ও ব্যবসাদারদের মুরুকার ঘাঁটাতে চাইছেন না।

কর্ডনিং ব্যবস্থাকে জোরাল করার ঘোষণা করে সরকার চোরাচালানকে বেশি করে সুযোগ দিতে চলেছেন। এই চোরাচালানকারীর ঝাড় আগামী নির্বাচনে অবশ্যই শাসকদলকে ভোট দেবে, কেননা কালো টাকা উপার্জনের এই যে সুযোগ সরকার করে দিচ্ছেন তার জন্য তাদের কৃতজ্ঞ না থেকে উপায় নেই। প্রত্যহ পাঁচ কে-জি করে চাল শহরাঞ্চলে আনতে পারলেই দশ টাকা সলিড লাভ। মাঝে মাঝে ধরা পড়ে গেলেও এমন কিছু দুশ্চিন্তার কারণ নেই। এক দিনের লোকসান ঊনত্রিশ দিনের লাভের তুলনায় কিছুই নয়।

খাদ্যদপ্তরের এই স্বৈরাজ্যবাদী নীতি জোতদার ও ধানকল মালিকদের পক্ষেও ষোল আনা লাভজনক হবে। শতকরা পঞ্চাশ ভাগের ছাড় যখন পাওয়াই গেছে, তখন ওই ফাঁক দিয়েই হাতী গলানো যাবে। নতুন খাদ্যনীতির বলি হবে ভূমিহীন কৃষক, ছোট জমির মালিক, এবং সমাজের সেই অংশ যারা নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও দারিদ্র বলে চিহ্নিত, তিন টাকা কিলো দরে ব্ল্যাক মার্কেটের চাল কেনার সামর্থ্য যাদের নেই, এবং যারা নীতিবোধ নামক এক আজব দুর্নীতিতে অভ্যস্ত।

আমরা পূর্বে বারবার বলেছি, এখনো আবার বলছি, খাদ্য সংগ্রহ ও বণ্টনের একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা ইচ্ছা থাকলে এই মুহূর্তে করা যায়। নিম্নলিখিত ব্যবস্থা-গুলি অবলম্বন করলেই তা সম্ভব হবে।

(১) যে সকল জায়গায় রেশনিং প্রথা চালু আছে সেখানে বরাদ্দ খাদ্যের পরিমাণ কিছুটা বাড়ানো হোক, যাতে সপ্তাহে সাত দিনই চলে, ব্ল্যাক মার্কেট থেকে যাতে কিনতে না হয়। তাহলেই চোরাচালান বন্ধ হবে। এত ঝামেলা করে কর্ডন ব্যবস্থাও রাখতে হবে না। এই মওকায় দুর্নীতির যে নতুন রাস্তা খুলেছে তাও বন্ধ হবে।

(২) অবিলম্বে ধানকলগুলির জাতীয়করণ করা হোক। তাহলেই দেশে মোট কত ধান উৎপন্ন হয়েছে তা জানা যাবে, কেননা ধান থেকেই চাল তৈরি করার জন্য ধানকলে ধান নিয়ে আসতেই হবে। বরং সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে জোরাল কর্ডন রাখা হোক, তাহলে ধান কেউ অন্য রাজ্যে পাচার করতে পারবে না।

(৩) সরকার ধান ও চালের জন্য যে দাম দিচ্ছেন তা কিছুটা বাড়ানো হোক, তাহলেই কৃষক সরকারকে ধান বেচতে উৎসাহ পাবে।

(৪) পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজের হাতে সংগ্রহ ও বণ্টনের দায়িত্ব গ্রহণ করুন এবং ফুড কর্পোরেশনকে বাতিল করুন, কেননা ব্যর্থতার দোষ লোকে সরকারকেই দেবে, কর্পোরেশনকে নয়।

খরাক্লিষ্ট পুরুলিয়ার শোচনীয় অবস্থা

বিহার ও উত্তরপ্রদেশের প্রচণ্ড খরা সারা ভারতেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে এবং তা সকলের কাছেই একটা দুশ্চিন্তার বিষয়বস্তু হয়ে আছে। কিন্তু খোদ পশ্চিমবঙ্গেই পুরুলিয়া জেলা খরার কবলে পড়ে যে দুর্দশা ভোগ করছে সে কথা বোধ হয় গোলমালে চাপা পড়ে ছিল। লোকসেবক সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ সম্প্রতি খরাক্লিষ্ট পুরুলিয়ার যে চিত্রটি তুলে ধরেছেন তা একান্তই মর্মস্পর্শী। সমগ্র জেলাটিই কার্যত একটি দুর্ভিক্ষ এলাকা হয়ে আছে। অনশনে মৃত্যুর সংখ্যাও বড় কম নয়। অনশনমৃত্যু কথাটি এদেশে বলা নিষিদ্ধ তাই ঘুরিয়ে বলছি যে, অনাহারজনিত অপুষ্টির ফলে বেশ কয়েকজন মানুষ মারা গেছেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিষয়টি সরকারের দৃষ্টি-গোচর হয়েছে এবং মুখ্যমন্ত্রী একটি খরাত্রাণ তহবিল খুলেছেন। বেশ ঘটা করে সংবাদপত্রে মুখ্যমন্ত্রীর দান গ্রহণের ছবি ছাপিয়ে পুরুলিয়ার খরাত্রাণের চেষ্টা চলছে। নিদারুণ প্রয়োজনের সময় এই জাতীয় ভড়ংয়ের কোন অর্থ হয় না। আমরা মানুষের দাক্ষিণ্যপ্রবৃত্তির প্রতি কটাক্ষ করছি না, তবে ইলেকশনের মুখে ব্যাপারটা বড়ই অশোভন লাগে। এই মুহূর্তে পুরুলিয়াকে বাঁচানোর মত অর্থ ও সামর্থ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আছে, কাজেই কালক্ষেপ না করে, এখানে-ওখানে ভিক্ষার তামাসা না দেখিয়ে সরকার সোজাসুজি পুরুলিয়ার দুর্গতি-মোচনে এগিয়ে আসুন।

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ

অবশেষে অনির্দিষ্টকালের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তালা পড়ছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে বোধ-হয় এই রকম ঘটনা এই প্রথম ঘটতে চলেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কার্যত অক্টোবরের ১২ তারিখ থেকেই বন্ধ আছে। ছাত্ররা জোর করেই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিয়েছিলেন। অবরুদ্ধ অবস্থাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পূজার ছুটি পড়ে যায় ১৭ই অক্টোবর থেকে। ১৯শে নভেম্বর পূজাবকাশের পর বিশ্ববিদ্যালয় খোলার কথা ছিল। কিন্তু পিকেটিং-এর জন্য তা করা সম্ভব হয় নি। তার পর থেকে দু' সপ্তাহ ধরে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধই রয়েছে এবং সাম্প্রতিক একটি ঘোষণায় সিন্ডিকেট অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে তালা মেরে দিলেন।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের এ অবস্থা হল কেন? এর উত্তরে পাঠকদের জানা বিষয়টিরই পুনরাবৃত্তি করতে হবে: প্রেসিডেন্সী ও অন্যান্য কয়েকটি কলেজের কয়েকজন ছাত্রকে বহিষ্কার করার ফলে, বহিষ্কৃত ছাত্রদের তরফ থেকে এই দাবি ওঠে যে তাঁদের কলেজে পুনরায় গ্রহণ করার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যেন সংশ্লিষ্ট কলেজগুলির উপরে চাপ দেন, যেহেতু কলেজগুলি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত।

ছাত্রদের এই দাবির জবাবে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার শ্রীগোলাপ রায়-চৌধুরী জানান যে, এ রকম কোন চাপ দেবার অধিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনত নেই। কোন প্রতিষ্ঠানের ঘরোয়া ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। তা করতে হলে প্রচলিত আইনকেই বদলাতে হয়।

রেজিস্ট্রার মহাশয় সোজা কথাই বলেছেন, যদিও তাঁর কথা ছাত্রদের মোটেই পছন্দ হয় নি। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ছাত্র বিতাড়ন ন্যায়সঙ্গত হয়েছে কি অন্যায় হয়েছে, সে প্রশ্ন আমরা আলোচনা করার কোন প্রয়োজন দেখি না, কেননা সেটা সংশ্লিষ্ট কলেজ ও সেই কলেজের ছাত্রদের ব্যাপার। যদি ছাত্ররা মনে করেন যে, বহিষ্কৃত ছাত্ররা কোন অন্যায় করেন নি, তাহলে তাঁরা সেই কলেজের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলন করুন। প্রয়োজন হলে তাঁরা সেই কলেজের অধ্যক্ষ ও গভর্নিং বডির সদস্যদের নামে কোর্টে মামলা করুন।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কি দোষ করল? বিশ্ববিদ্যালয়কে ছাত্ররা যে আইনভঙ্গ করতে অনুরোধ করছেন সেই অনুরোধ কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয় রাখতে পারেন? যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় আইনে স্পষ্ট বলা হচ্ছে যে কোন কলেজের ঘরোয়া ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় হস্তক্ষেপ করতে পারেন না, সেক্ষেত্রে সে আইন কি করে বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভঙ্গ করবেন? তা করতে গেলে আইনের শাসন কি থাকবে? আশা করি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কলেজ ইনস্পেক্টর আছেন, কিন্তু তাঁর কাজের ক্ষেত্রও স্পষ্ট করে উল্লেখ করা রয়েছে। কলেজ ডিসিপ্লিনারী অ্যাকশন হিসাবে যদি কোন ছাত্রের উপর কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে কি করার থাকতে পারে? তাহলে

প্রতিটি প্রতিষ্ঠান থেকেই ডিসিপ্লিনারী অ্যাকশন নামক বিষয়টিই তুলে দিতে হয়।

অথচ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে থাকার দরুণ শিক্ষাজগতে যে ক্ষতি হল তা পূরণ করা প্রায় দুঃসাধ্য। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে মেডিক্যাল ছাত্রদের। এম-এ, এম-এসসি, পরীক্ষা পিছিয়ে গেছে, কয়েকটি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ বাকি রয়েছে, ছাত্র ভর্তির কাজ বন্ধ, এক কথায় কয়েকজনের দাবির বদখেয়ালে পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম ছাত্রসমাজের একটি বছর সম্পূর্ণ নষ্ট করা হল। এ ভিন্ন কত শত লোক যে এই বন্ধের ফলে অহেতুক নাজেহাল হচ্ছেন তার ইয়ত্তা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীরা মাহিনা পাচ্ছেন না, স্কলাররা টাকা পাচ্ছেন না, পরীক্ষকরা খাতা দেখার ফী পাচ্ছেন না, কণ্ট্রাক্টররা এবং তাঁদের অধীনস্থ অসংখ্য কর্মী নিজেদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে আছেন।

কথাটা হয়ত অনেকেরই কাছে অপ্রিয় বলে মনে হবে, সমগ্র বিষয়টিতে এখন রাজনীতি প্রবেশ করেছে। রাজনৈতিক নেতারা নেপথ্য থেকে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছেন, সংবাদপত্রে ঘন ঘন বিবৃতি দিচ্ছেন। ছাত্ররা অস্বীকার করলেও একথা দিবালোকের ন্যায় সত্য যে, প্রতিটি ছাত্রসংগঠনই কোন কোন রাজনৈতিক দলের বেনামদার। (আমরাও একদা ছাত্র ছিলাম, এবং ছাত্রসংগঠনেও ছিলাম, এবং কোনটি কোন পার্টির বেনামদার একথা পৃথক করে বলে দেবার প্রয়োজনীয়তা নেই) আসল কথাটি হচ্ছে এই মওকায় ভবিষ্যৎ নির্বাচনরূপ রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে নিজেদের শক্তি সামর্থ্যের একটা ইভ্যালুয়েশন করছেন সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলি, এবং এই মুহূর্তে ছাত্রদের স্বাধীনভাবে কোন কিছু সিদ্ধান্ত নেবার উপায় নেই। তর্ক করে আমাদের এই কথাটাকে হয়ত এই মুহূর্তেই উড়িয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু মনে হয় ভুল বলছি না।

কলেজের ঘরোয়া ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তক্ষেপ করার অধিকার না থাকলেও, রেজিস্ট্রার জানিয়েছেন যে, যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্মকে স্বাভাবিকভাবে চলতে দেওয়া হয় তাহলে সিন্ডিকেট ছাত্রদের অভিযোগগুলি সহৃদয়তার সঙ্গে বিবেচনা করবেন। এই প্রস্তাবে, আমাদের ধারণায়, ছাত্রদের রাজী হওয়া উচিত ছিল। কোন একটা জায়গায় অবশ্যই তাঁদের থামতে হবে এ কথা নিশ্চয়ই ছাত্রবন্ধুরা বুঝতে পারেন। রেজিস্ট্রার তাঁদের সামনে মোটামুটি সম্মানজনক একটি সর্তই রেখেছিলেন বলে মনে হয়।

ভাবাবেগবর্জিত হয়ে বিষয়টিকে বোঝার জন্য একটি সাম্প্রতিক শ্রমবিরোধের উদাহরণ দিচ্ছি। কিছুকাল আগে পশ্চিমবঙ্গের একটি শিল্পনগরীতে এক শ্রমবিরোধকে কেন্দ্র করে ধর্মঘট ও নানাপ্রকার আন্দোলন চলছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে কর্তৃপক্ষ তথা সরকার কিছুটা ভয় পেয়েই মীমাংসার কয়েকটি উদার সর্ত দিয়েছিলেন যেগুলি গ্রহণ করলে উভয় পক্ষেরই একটা সম্মানজনক মীমাংসা ঘটত। কিন্তু একদল উগ্রপন্থীর প্ররোচনায় আন্দোলনকে আরও টেনে নিয়ে যাওয়া হল এবং শেষ পর্যন্ত শ্রমিকদের অত্যন্ত হীন সর্তে আত্মসমর্পণ করতে হল। কাজেই কোথায় থামতে হবে সেটুকু গোড়া থেকে খেয়াল করা দরকার।

আন্দোলনকারী ছাত্রদের আরও একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যে সকল ছাত্রসংগঠন এই আন্দোলন চালাচ্ছেন, তাঁদের বিরোধী ছাত্রসংগঠনও আছে, এবং একপক্ষ যতটা উগ্র হবেন অপর পক্ষের শক্তিও ততটা বাড়বে। বস্তুত আর একটি ছাত্রসংস্থা ইতিমধ্যেই কলেজ খোলার দাবিতে বিক্ষোভ জানাতে শুরু করেছেন, এবং এ পক্ষ যতই রিজিড থাকবেন ও পক্ষের শক্তিও তত বাড়বে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তক্ষেপ ব্যতীতই মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের বিরোধ মিটেছে, ওইভাবেই হয়ত অপরাপর ক্ষেত্রের বিরোধগুলি মিটবে। বিশ্ববিদ্যালয় একটা তৃতীয় পক্ষ এবং এই তৃতীয় পক্ষের নৈতিক চাপের কিছু মূল্য আছে বৈকি। সেই নৈতিক হস্তক্ষেপ যদি বিশ্ববিদ্যালয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে করেন সেটাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়কে তা করতে বাধ্য করার মনোবৃত্তি নিয়ে যদি ব্যাপারটাতে গোড়া থেকেই ইনভলভড করিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তার ফল কখনোই শুভকর হতে পারে না। আমরা আশা করব এই সমস্ত বিষয়গুলি আন্দোলনকারী ছাত্ররা বিবেচনা করে যথাকর্তব্য নির্ধারণ করবেন। আমরা আমাদের কোন সিদ্ধান্ত তাঁদের ঘাড়ে চাপাতে চাই না।

দুঃসংবাদ!

ফজলুর রহমান সাহেব হঠাৎ প্রতিজ্ঞা করে বসেছেন যে, কলকাতাবাসীদের প্রোটিন সেবন না করিয়ে ছাড়বেন না। তদনুযায়ী তিনি ঘোষণা করেছেন যে, প্রতিটি দুগ্ধ বিক্রয় কেন্দ্রে সরকারী ডিম থাকবে, এবং একটি নির্দিষ্টসংখ্যক ডিম কার্ডধারীরা প্রতি সপ্তাহে পাবেন।

কিন্তু আমাদের আশংকা অন্যরূপ। আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, সরকারী শ্রীহস্ত একটা এমন জিনিস যে তা যাকে স্পর্শ করে তাকেই বাজার থেকে অদৃশ্য করে দেয়। সরকার কলকাতাবাসীকে দুধ খাওয়াতে সারা দেশ থেকে মিষ্টান্ন উঠিয়ে দিলেন। এখন ডিম খাওয়াবার দায়িত্ব নেবার পর কি বাজার ডিমশূন্য করে ছাড়বেন? মুস্কিলটা হচ্ছে কি, যোগান দেবার ক্ষমতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ না হয়ে চাহিদার ক্ষেত্র বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। সরকার ঘি মাখনের কারবার করতে গিয়ে সে শিক্ষা হাতে হাতে পেয়েছেন। এ সব সাধারণ বিষয়ে মাতামাতি না করে রহমান সাহেব বরং তাঁর দপ্তরকে অধিকতর কর্মক্ষম করে তুলুন যাতে হাঁস-মুরগী পালনে উন্নততর প্রক্রিয়াসমূহ প্রযুক্ত হয়। এবং যাতে জনসাধারণের মধ্যে পোলট্রি করার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়। এ বিষয়ে তাঁর দপ্তর যে কিছু কাজ একেবারেই করে নি তা নয় তবে আরও অনেক কিছু করবার প্রয়োজন আছে।

কলকাতায় অধ্যাপক ঘেরম্যান সেরলভ

সোভিয়েট বিজ্ঞান আকাদেমির বিশ্ব অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিষদের সিনিয়র গবেষক এবং আন্তর্জাতিক সমস্যা বিষয়ে খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ঘেরম্যান সেরলভ সম্প্রতি কলকাতায় একটি সাংবাদিক সম্মেলনে সোভিয়েট ইউনিয়নের বৈদেশিক নীতির তাৎপর্য ও ভূমিকা বিশদভাবে আলোচনা করেন।

অধ্যাপক সেরলভ বিশেষভাবে সমাজতান্ত্রিক শক্তিসমূহের সংহতির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং খোলাখুলিভাবেই জানান যে, চীনের বর্তমান কার্যকলাপ সমাজতান্ত্রিক শক্তিসমূহের ঐক্যের পথে প্রবল অন্তরায়।

ইউরোপের পরিস্থিতি সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, শান্তির পথে যে পরিস্থিতি অন্যতম প্রধান বিপদ হিসাবে উপস্থিত হয়েছে, তা হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম জার্মানীর শাসকচক্রের মধ্যে ঘনায়মান দ্বিপাক্ষিক সামরিক চুক্তি।

ভিয়েতনাম প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন সৈন্যাপসারণ ভিন্ন এ সমস্যার কোন সমাধান নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যতই যুদ্ধের বিস্তৃতি ঘটাক না কেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন তার সমস্ত শক্তিসামর্থ্য নিয়ে ভিয়েতনামের পাশে দাঁড়াবে।

তাসখন্দের অনুরূপ কোন চুক্তি বর্তমানে ভারত ও চীনের মধ্যে হতে পারে কিনা, জনৈক সাংবাদিকের এই প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক সেরলভ বলেন যে, চীনের যা মতিগতি ক্রুসেডারী থেকে বিচার করলে বর্তমান অবস্থায় তা সম্ভব নয়।

অধ্যাপক ডঃ কুর্ট হুবার

আরও একজন বিশিষ্ট বৈদেশিক ব্যক্তি সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের একটি সাংস্কৃতিক মিশনের প্রতিনিধিদলের নেতা হিসাবে। ডঃ হুবার জার্মান-সাউথ-ইস্ট এশিয়ান সোসাইটির প্রেসিডেন্ট এবং তিনি হুমবোলডট বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সংক্রান্ত গবেষণা বিভাগের অধ্যক্ষ। দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলির সঙ্গে পূর্ব জার্মানীর সাংস্কৃতিক সম্পর্ক দৃঢ় করাই এই সোসাইটির উদ্দেশ্য।

ভারতের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক দৃঢ় করার জন্য এই সোসাইটির অবদান প্রচুর। এই সোসাইটির তৎপরতায় ভারত থেকে অনেক ছাত্র পূর্ব জার্মানীতে কারিগরী বিদ্যা অধ্যয়ন করার সুযোগ লাভ করছে। প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র প্রভৃতি মারফৎ ভারত-পূর্ব জার্মানীর মধ্যে অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য এই সোসাইটি অতিমাত্রায় সচেষ্ট।

ডঃ কুর্ট হুবার কলকাতার সাংবাদিকদের নিকট এই সোসাইটির ভবিষ্যৎ কার্যপদ্ধতি, ভারত-পূর্ব জার্মানী সম্পর্কের অধিকতর উন্নতির জন্য আরও কি কি পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে প্রভৃতি বিষয়ে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা করেন।

দুর্গাপুর সার কারখানা প্রসঙ্গ

কারখানা করার উদ্দেশ্যে যখন ব্যাপকভাবে জমি দখল করা হয় তখন সচরাচর এই নীতিই অবলম্বন করা হয় যে, যাদের জমি দখল করা হল, দখলীকৃত জমিতে কারখানা স্থাপিত হলে, সেখানে কর্মী নিয়োগের ব্যাপারে এই ভূমিহারাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

দুর্গাপুরের সার কারখানার জন্য যে জমি গ্রহণ করা হয়েছে তাতে কর্তৃপক্ষ বেসরকারীভাবে জানিয়েছিলেন যে, ভূমিহারা বেকারদের কর্মে নিয়োগ করা হবে। বলা বাহুল্য সেই প্রতিশ্রুতি পালিত হয় নি। যাঁদের জমি দখল করা হয়েছে তাঁদের এ পর্যন্ত এক পয়সা ক্ষতিপূরণও দেওয়া হয় নি।

আমাদের দেশে ভূমির সঙ্গে শিল্পের একটা অদৃশ্য বিরোধ চলছে, এবং এখানে রাষ্ট্রশক্তি শিল্পেরই স্বপক্ষে, কেন না সংবিধানসংগত উপায়েই শিল্পের প্রয়োজনে ভূমিসম্পদ্ মালিকানার বৈধ মৌলিক অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করা চলতে পারে। শিল্প অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রয়োজন বলে বিবেচিত হওয়ায় এদেশে শিল্পের দোহাই দিয়ে নামমাত্র ক্ষতিপূরণে সম্পত্তিরক্ষার মৌলিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করা যায়। এরই সুযোগ নিয়ে দেশের সর্বত্রই শিল্পের নামে ভূমিহরণ চলছে। কিন্তু যাদের জমি নেওয়া হচ্ছে, অথবা জাতীয় প্রয়োজনে স্বেচ্ছায় মালিকানা ছেড়ে দিচ্ছেন, তাঁদের যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণ করা হচ্ছে না। এমনও বিষয় জানা গেছে যে, জমির মালিককে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে ১৯৪৮ সালের দর অনুযায়ী যেখানে জমি দখল করা হয়েছে ১৯৬০ সালে।

এ ছাড়া আছে ভূমিচ্যুত মানুষগুলির সমস্যা, যারা স্বহস্তে চাষ করত বা যারা সেই জমিতে কাজ করত। নতুন শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে মানবতার স্বার্থেই এদের কর্মক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। দুঃখের বিষয় ভূমিনির্ভর সাধারণ গ্রামবাসীর তেমন খুঁটির জোর না থাকায় বাইরের লোক উড়ে এসে জুড়ে বসে, এবং যারা 'সন অফ দি সয়েল' তারাই বঞ্চিত হয়।

কাজেই সার কারখানা কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের বক্তব্য যে তাঁরা যেন মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র বিষয়টি বিবেচনা করেন এবং কর্মক্ষেত্রে এই ভূমিচ্যুত এবং একদা ভূমিনির্ভরশীল ব্যক্তিদের কর্মক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দান করেন।

জেলা সমাচারঃ মুর্শিদাবাদ

গত কয়েকদিনের অকালবর্ষণে মুর্শিদাবাদ জেলার কৃষিজীবীদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। রাঢ় অঞ্চলে কৃষিজীবীরা উদ্বিগ্ন কেননা এই বৃষ্টিতে পাকা ধানের সমূহ ক্ষতি হবার আশংকা রয়েছে। অপর দিকে যাঁদের জমিতে ধান নেই এবং যাঁরা রবিশস্য ফলাচ্ছেন তাঁরা খুবই খুশি কেননা এই সময়ের বৃষ্টি চৈতালী ফসলের পক্ষে সহায়ক।

বহরমপুর সদর হাসপাতালটি কেন যে এখনো স্টেশন সংলগ্ন নব-নির্মিত ভবনে স্থানান্তরিত হচ্ছে না তা নিয়ে জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হচ্ছেন। তা ছাড়া এত বড় হাসপাতালে মাত্র একজন অ্যানেসথেটিস্ট রয়েছেন যাঁর পক্ষে সারা সপ্তাহ সাতজন সার্জনকে সাহায্য করা অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ব্যাপার। এই কার্যে অন্তত আরও একজনকে প্রয়োজন, এ ছাড়া আউটডোরে ও ডিস্পেন্সারীতে আরও কর্মী নিয়োগ দরকার। শয্যাসংখ্যাও বৃদ্ধি করার বিশেষ প্রয়োজন।

সম্প্রতি এই জেলায় এনকেপেলাইটিস নামক একটি মারাত্মক রোগের আবির্ভাব হয়েছে, যার ফলে বহরমপুর সদর হাসপাতালে গত কয়েকদিনের মধ্যেই কয়েকজনের মৃত্যু ঘটেছে। হাসপাতালের চিকিৎসক মহলের অভিমত এই যে, গত কয়েক বছরের মধ্যে এই রোগে আক্রান্ত কোন রোগী তাঁরা দেখেন নি, এবং বর্তমানে এই রোগের যে রকম প্রকোপ দেখা যাচ্ছে তা বড়ই উদ্বেগজনক।

জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতাল

জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতাল সম্বন্ধে স্থানীয় জনসাধারণের অভিযোগ প্রচুর। এখানে, বিশেষ করে মেডিক্যাল ইউনিটে শয্যাসংখ্যা একান্ত অপ্রচুর। শয্যা অপেক্ষা মেঝেতে রোগীর সংখ্যা অনেক বেশি। মেঝেতে যাঁদের রাখা হয় তাঁদের মশারি দেওয়া হয় না, এবং যদিও ভর্তির পরে উপরে ও নীচে দুখানি করে কম্বল দেওয়া হয়, রোগীর সংখ্যা বেড়ে গেলে উপরের কম্বলখানি কেড়ে নেওয়া হয় অন্য রোগীর জন্য।

তাছাড়া সার্জিক্যাল ও মেডিক্যাল ওয়ার্ডে এত বেশি সংখ্যক রোগীকে মাটিতে রাখার পিছনে অদৃশ্য হস্তের খেলাও যে নেই তা নয়। এমন ঘটনা হরদম দেখা যায় যে, আগে যে রোগী ভর্তি হয়েছে তাকে কোন বেড দেওয়া হয় নি, অথচ পরের রোগী বেড পেয়েছে। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, একজন ডাক্তারের অধীনে যে বেডগুলি আছে তাতে অন্য ডাক্তারের রোগী ভর্তি চলবে না, তা সে রোগীর অবস্থা যতই গুরুতর হোক না কেন।

রোগীদের খাদ্যের ব্যবস্থা অতি জঘন্য। ঔষধের যোগানও পর্যাপ্ত নয়। অনেক ঔষধই রোগীদের বাইরে থেকে কিনে আনতে হয়। শুধু এই হাসপাতালের মেডিক্যাল ইউনিটই নয়, প্রসূতি বিভাগ, মহিলা বিভাগ, সার্জিক্যাল বিভাগ, টি-বি ওয়ার্ড প্রভৃতিতে যে ভাবে রোগী রাখা হয় তা চোখে দেখা যায় না। আউটডোরে রোগীর সংখ্যার অনুপাতে ডাক্তারের সংখ্যা এবং তাঁদের উপস্থিতিকাল এত কম যে, রোগীর অবস্থার বর্ণনা ভালভাবে শুনে ও ঠিকমত পরীক্ষা করে ব্যবস্থাদি দেওয়ার সময়ও ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারদের হয় না।

পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি সদর হাসপাতালের অবস্থা প্রায় একই রকম। এটা ভাবতেও লজ্জা লাগে যে, স্বাধীনতার উনিশবছর পরেও অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটল না। ৪।১২।৬।

গ্রাম বাংলার কথা

পাণ্ডুয়া

অনেক পুরানো কালেও প্রায় দশ হাজার লোকের বাস ছিল পাণ্ডুয়ায়। তারপর বর্ধমানের জ্বর বা ম্যালেরিয়া মহামারীতে তার প্রায় তিন ভাগ লোকই মারা পড়েন। বাদ বাকি যাঁরা ছিলেন তাঁদেরও বেশির ভাগই প্রাণভয়ে পলাতক হলেন কোলকাতা কিংবা সুবিধামতো আর কোন ব্যাধিমুক্ত স্থানের উদ্দেশ্যে। কোলাহলময় গণ্ড বসতি কিছুদিনের জন্য পরিণত হলো প্রায় পরিত্যক্ত জনপদে। সাপ-বাঘ-ভাম আর শিয়ালের আস্তানা। তারপর কালে কালে কাল গেলো। মহামারী দমন হলো বটে, কিন্তু ব্যাধিরূপে ম্যালেরিয়ার অস্তিত্ব দেশে টিকে রইলো আরও বহুকাল। ভিটে-মাটি দেশ-ঘর ছেড়ে আর কতকাল বা পরবাসী হয়ে থাকতে পারে মানুষ। একে-একে দুইয়ে-দুইয়ে আবার ফিরে আসতে লাগলো তারা। ধু-ধু নির্জনে আবার একটি একটি করে জ্বলতে লাগলো রাতের প্রদীপ। বাজতে লাগলো শিশুর কলস্বর। মানুষের আনা-গোনায় দিন যাপনে আবার পাওয়া যেতে লাগলো চঞ্চল জীবনের একটু আভাস।

তারও পরে ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা। দেশ বিভাগের বন্যায় দলে দলে ভেসে এলো ছন্নছাড়া ছিন্নমূল একদল মানুষ। তারা ঠাঁই-অঠাঁইয়ের পরোয়া করলো না, ভাল-মন্দ বাছলো না। যেখানেই পায়ের তলায় একটুকরো শক্ত মাটির আশ্বাস পেলো, আশ্রয় নিলো, শিকড় নামালো সেখানেই। তাদেরই নতুন আগমনে আর আবাস স্থাপনে আবারও তাই ফুলে ফেঁপে বড় হয়ে উঠলো পাণ্ডুয়া। আজকের পাণ্ডুয়া তাই নামে মাত্র গ্রাম এলাকা হলেও জনসংখ্যাধিক্যে পৌর এলাকা হবারই দাবি রাখে। অসংবদ্ধ বড়-বাড়ি, অপরিকল্পিত পথঘাট, আর অসুবিধার পল্লী দুরান্তই যার প্রতিবন্ধক।

১১০টি গ্রামসভা, ষোলটি অঞ্চল আর ১৫৮টি মৌজা নিয়ে বর্তমান পাণ্ডুয়া থানার সমগ্র এলাকা বর্তমানে প্রায় ১১০·৫৯ বর্গমাইল। জনসংখ্যা ১ লক্ষ ২৩ হাজারেরও কিছু বেশি। যার মধ্যে শতকরা প্রায় ৫৫ ভাগই ইসলাম ধর্মী এবং অপরার্ধেরও একটি বৃহৎ অংশই পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তু।

সারা পাণ্ডুয়ায় রাস্তা আছে মোট ১৩৪ মাইল। যার মধ্যে ১৩ মাইল গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড, ন্যাশনাল হাইওয়ে, এবং ৫ মাইল কালনা-পাণ্ডুয়া স্টেট হাইওয়ে। কুলটি রোড, জামগ্রাম-রুকমিনী, জামগ্রাম - মণ্ডলাই, জামগ্রাম - সোমড়াগাছি, বৈঁচী-দশঘরা, খন্যান-তাঁবা, এবং খন্যান-ইটাচুনা প্রভৃতি রাস্তা জেলা বোর্ডের এবং মোটামুটি ভালই আছে বলতে হবে। যদিও ছোটখাট খানা-খন্দের অভাব নেই, এবং মধ্যে মধ্যে পিচ কংক্রীটের শক্ত আবরণ ভেদ করেও মাথা তুলেছে তীক্ষ্ম-মুখ খোয়া, তথাপি—

এসব ছাড়া কাঁচা রাস্তা আছে সমগ্র এলাকায় প্রায় ৬৫ মাইল। কাঁচা রাস্তার

পারুল ভট্টাচার্য

অবস্থা সব দেশে সর্বকালেই একরকম বিশেষ করে হুগলী জেলার মতো। প্রধানত এঁটেল মাটি অধ্যুষিত জায়গায় আর হলে, বর্ষা যেখানে ভালই হয়। কিন্তু তথাপি তার মধ্যেও কয়েকটি অত্যন্ত দীর্ঘ এবং অতি দুর্গতিযুক্ত কাঁচা রাস্তা রয়েছে পাণ্ডুয়ায়। যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় বৈঁচী-হরালদাসপুর রাস্তা। দৈর্ঘ্যে সাড়ে সাত মাইল। পাণ্ডুয়া স্টেশন থেকে দশঘরা—চাঁদপুর হেল্থ সেণ্টার হয়ে যেটি বৈঁচী-দশঘরা রোডের সঙ্গে মিলেছে—প্রায় সাত মাইল, আর তিন্না জি· টি রোডের মোড় থেকে পাঁচড়া হয়ে বৈদ্যপুরের দিকে চলে যাচ্ছে যে রাস্তাটি। এই তিনটি পথেই স্বয়ং ভ্রমণ করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। অবস্থা অবর্ণনীয়। বর্ষার কাল বাদই দিলাম। শুকনোর কালেও হাঁটুভর গর্তে গরুর গাড়ির চাকা পড়লে আর উঠতে চায় না। আর গরুর গাড়ি ছাড়া অপর কোনো যানবাহনও নেই ও পথে। সবচেয়ে নিকটস্থ বাস স্টাণ্ড ৭ থেকে ৮ মাইল। সবচেয়ে কাছের রেল স্টেশনও ৮ থেকে ১০ মাইলের কম দূরত্ব নয়। হরালদাসপুরের স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং চাঁদপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি সভ্য জগৎ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে বললেও চলে। ডাক আসে ৩ দিনের ফারাকে। টেলিগ্রাম আসতেও ২৪ ঘণ্টা দেরির ধাক্কা। ছোটখাট খুচরো রাস্তা—ফিডার রোড এদিক-সেদিক হচ্ছে নিত্যই। অথচ অনেকগুলি করে মানুষের বাসস্থান এই সব এলাকাগুলি কেবল মাত্র উপযুক্ত পথ এবং পরিবহনের অভাবেই আজও পরিত্যক্ত, উন্নতি আটকে আছে গরুর গাড়ির চাকায়।

রোগীর তত্ত্বাবধান এবং সেবাযত্নে

পাণ্ডুয়ার মরণ ফাঁদ। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের এই বিপদজনক মোড়ে দুর্ঘটনা ঘটে নিয়তই। কিন্তু এর কোনও প্রতিকার নেই।

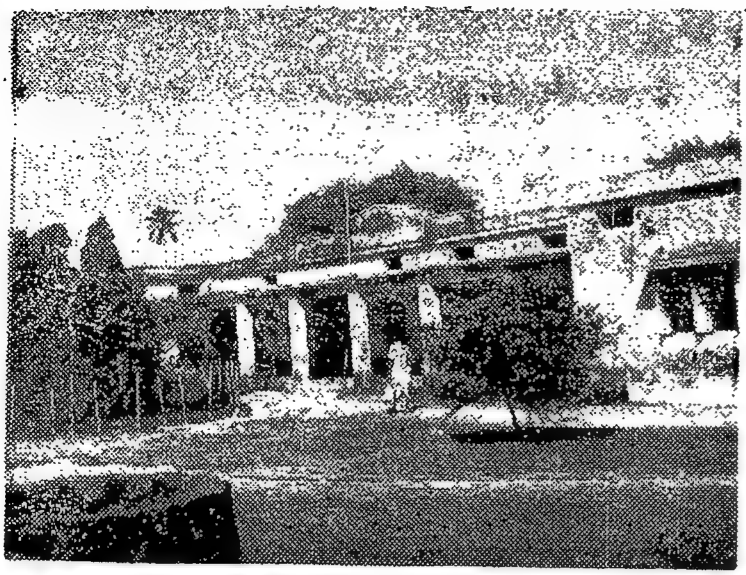

পান্ডুয়ার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঃ এটাই এখানকার একমাত্র চিকিৎসা কেন্দ্র

চাঁদপুর হেল্থ সেণ্টারের বেশ সুনাম এবং সুখ্যাতি আছে দেখা গেল। এত দুঃখের পথ চলেও সার বেঁধে হেঁটে চলেছে নরনারী শিশু-বৃদ্ধ। মাথার উপর চড়া সূর্য, কোল বেয়ে তার ছায়া পড়েছে। রোদের তাপে রুগ্নমুখ রাঙা, পথ চলার শ্রমে হাঁপাচ্ছে হাপরের মতো। তবু চলেছে। আশা—পীড়ার পীড়ন থেকে মুক্তি—নিরাময়।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে ৫টি। পান্ডুয়ায়—থানা প্রাইমারী, এবং বৈঁচীগ্রাম, ইটাচুনা, হাতনী (হরালদাসপুর) ও চাঁদপুর। দুঃখের বিষয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির চিকিৎসা কিংবা পরিচালন ব্যবস্থা কোনোটাই তেমন সুবিধার নয়। নিঃসন্দেহে যার মূল কারণই হচ্ছে স্বাস্থ্যদপ্তরের দুর্নীতি, গাফিলতি এবং রোগীকুলের প্রতি তাঁদের অন্তহীন অবহেলা। ঔষধপত্র বেশির ভাগই থাকে না। দামী ঔষধ তো দূরের কথা—সালফাডায়াজিন ট্যাবলেট নেই। এ. পি. সি পাউডারের অভাব ঘটেছে এমন অবস্থাও হয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। গ্রাম্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র তো পরের কথা—প্রখ্যাত একটি মহকুমা হাসপাতালে অপারেশানের রোগীকে অজ্ঞান করবার ইথার কিনে নিয়ে আসতে হয়েছে তবে অস্ত্রোপচার সম্ভব হয়েছে এমন ঘটনাও জানি আমি। বড় বড় নামকরা অভিজ্ঞ বা মস্ত ডিগ্রীধারী ডাক্তার বহাল রেখেও কোন লাভ নেই। ঔষধপত্র কিংবা সাজসরঞ্জাম-এর অভাবে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হয় তাঁদের। ভরসা ঃ লাল নীল জল—কোথাও কোথাও রোগীকুল যাকে "হাসপাতাল স্পেশালও" বলে থাকেন। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নামে এ এক মস্ত লোক ঠকানো প্রহসন হয়ে উঠছে দিন দিন। এবং এর পরেও সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের—অসদ্ব্যবহার। ডাক্তারের দম্ভ, মেজাজ ঔদ্ধত্যও যে নেই এমন কথাও বলা যাবে না একেবারে।

প্রাথমিক বিদ্যালয় শতখানেক। সুন্দর দর্শনমাত্র কয়েকটি হাতে গোণা যায়। বাদ বাকি সবই মেটে দেওয়াল টিনের চাল, ছিটেবেড়ায় টালির আচ্ছাদন, কোনটা ভাঙা, কোনটা হেলে পড়েছে, কারও বা বর্ষার জলে বন্যার্তদের অবস্থা। উঁকি মেরে দুটি-একটির ভিতরে দেখেছিলাম। মাস্টার মশাইরা কেমন করে পড়ান জানি না, বাচ্চারা কি পড়ে তাও জানি না। আমার তো মনে হলো আমাকে যদি কেউ জোর করে ঘণ্টা কয় ঐ বদ্ধ ভ্যাপসা টিন-টালীর গুমোট গরম আর অন্ধকারে আটকে রেখে দেয়, তাহলে এতকালের অর্জিত অক্ষরজ্ঞানই সম্ভবত ভুলে যাবো। ছাগল-ভেড়া বাস করবার মতো খোঁয়াড়োপম ঐ ঘরগুলিতে জাতির ভবিষ্যৎ তৈরি হচ্ছে ভেবে উৎসাহ পাওয়া যায় না একটুও। তথাপি দেশে বিদ্যালয় আছে। নতুন নতুন আরও হচ্ছে। ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে শিক্ষা এবং শিক্ষিতের হার। সন্দেহ কি—

গ্রন্থাগার আছে ২৮টি। উল্লেখ করা চলে ইনসুরা পাবলিক লাইব্রেরী, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত। ফ্রি রিডিংরুম আছে। গ্রন্থ সংখ্যা প্রায় ২,৫০০। সদস্য সংখ্যা আন্দাজ ৭০।

পান্ডুয়া ইউনিয়ন বোর্ড ভিলেজ হল লাইব্রেরী (রুর্যাল) সরকারী সাহায্য পেয়েছে। গ্রন্থ সংখ্যা এখানেই আড়াই হাজার। সদস্য দেড় শতাধিক।

খন্যান ব্রহ্মবান্ধব স্মৃতি পাঠাগার। গ্রন্থ সংখ্যা হাজার দুই। এটিও রুর্যাল লাইব্রেরী। বাড়িঘর সরকারের, সদস্য সংখ্যা ১ শতেরও উপর।

ইলসোবা কেশব সাধারণ পাঠাগার। গ্রন্থ সংখ্যা দু' হাজারের উপর। সদস্য প্রায় ৮০ জন। নিজস্ব ভবন আছে।

মন্ডলাই পাবলিক লাইব্রেরী—নিজস্ব ভবন আছে। গ্রন্থ সংখ্যা ১ হাজার, সদস্য ৫০-এর কিছু বেশি।

আরও যা আছে সব খুচরো। ছুটকো ক্লাব কিংবা জনসেবা সঙ্ঘের উদ্যোগে পঞ্চাশ একশো দুশো বই নিয়ে সাধারণ ভাবে আপন উদ্যমে গড়ে ওঠা। আকার ছোট—আয়তনও বড় নয়, তথাপি সেগুলির দান উল্লেখযোগ্য। দূর গ্রামাঞ্চলেও মানুষ পড়তে চায়, বুঝতে চায়, জানতে চায়—এককথায় খুঁজতে চায় জীবনের মানে, সমস্যার সমাধান। পালাতেও চায় বুঝি বা ক্লান্তি থেকে, গ্লানি থেকে, শুধু দিনযাপনের প্রাণধারণের অন্ধ হতাশা থেকে। পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিতে চায় মনোজগতে—যে জগৎ তার নয়, সম্পূর্ণভাবেই লেখকের। তবু তা তারও বটে। অপরের সৃষ্টিতে ডুব দিয়ে তা সে সৃষ্টি অলীক হোক কিংবা অবাস্তবই হোক—ভুলতে চায় যন্ত্রণা। গ্রামাঞ্চলের মানুষ গ্রন্থাগার মুখো হচ্ছে—সে কতটা তার জ্ঞানের পিপাসায়, জানবার অনুপ্রেরণায়—আর কতটা এই পলায়নের—আত্মগোপনের, আত্ম অবলোপের তাড়নায় তা নিয়ে ভাবনার অবকাশ আছে।

লম্বা-চওড়া এলাকা, ২০টি পোস্ট অফিস এখানে। স্কুল ফাইনাল বা হাইয়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষার কেন্দ্র মাত্র একটি—ইটাচুনায়। সুবিধেমতো অবস্থানে আর একটি কেন্দ্র হওয়া দরকার। দূর গ্রামাঞ্চলের ছেলেদের—বিশেষত ৫-৭-১০ মাইল যাদের পায়ে হেঁটে আসতে হয়, তাদের পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক যথা সময়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে উপস্থিত হওয়া। পান্ডুয়া বা ইটাচুনায় পরীক্ষার্থীদের দুই-এক রাত্রি বাস করবার মতো সুবিধাজনক কোনো হোস্টেল বা বোর্ডিংও নেই যখন। যদিও পান্ডুয়া একটি গঞ্জ, মস্ত হাট বাজার, গোটা ছয়েক কোল্ড স্টোরেজ, ধান-চালের ফলাও কারবার এবং সংরক্ষিত পুরাকীর্তি দেখবার উপলক্ষে বহু যাত্রী এবং বাইরের মানুষের আগমন ঘটে থাকে এখানে, কিন্তু রাত্রিবাসের কোনো উপায় নেই। সরাইখানা ডাকবাংলো কিংবা ধর্মশালা জাতীয় কোনো কিছুর অভাব প্রায়ই অনুভব করে থাকেন এখানকার মানুষ। পি, ডবলু, ডি'র

ডাকবাংলো অবশ্য আছে কিন্তু সাধারণ মানুষের তা নাগাল সাপেক্ষ নয়।

নলকূপ আছে প্রায় নয় শত। যার অর্ধেকেরও বেশি বারমাসই অচল হয়ে পড়ে থাকে। তার কতটা ঠিকাদারের ফাঁকিবাজির কৃপায়, আর কতটা অধিবাসী-দের বে-দরদী ব্যবহারের কল্যাণে, তা অবশ্য বলা যাবে না। আবাদী জমি ৫৪,৫০০ একর। প্রধান ফসল ধান, পাট, আলু। রবিশস্য কিছু হয়। সব্জীর মধ্যে পটল আর বেগুন। নামে মাত্র ক্যানেল এলাকা। মাত্র ১৫,০০০ হাজার একর জমি সেচের জল পায়। রবি ১৪,২৬৩ একর, খাড়ি ৭৫ একর। এ বছরে আউশ-আমন শতকরা ৫০ ভাগ মত ফলেছে। পাটের অবস্থা আরও খারাপ। টেনেটুনে ৩০ শতাংশ হবে কি না সন্দেহ। আবাদী জমির একটা বৃহৎ অংশই অনাবাদী পড়ে থাকে— প্রতি বৎসরই নিয়মিত জলাভাবে।

চাষের জমির আরও সর্বনাশ হচ্ছে। যত্র-তত্র খেয়ালখুশিমত বালি তোলার খাদ খুঁড়ে। মগরা তথা পাণ্ডুয়া এলাকার লৌহযুক্ত ঈষৎ লালচে বালি ঘর-বাড়ি নির্মাণের কাজের জন্য উৎকৃষ্টরূপে বিখ্যাত। এই বালিই হুগলী জেলার একমাত্র খনিজ সম্পদ। মাটির নিচে বালির আকর অবস্থিত হলে জমির মালিক—জমি ইজারা দিয়ে দেন ঠিকা-দারকে। ঠিকাদার আসে তার লোকজন, সাজ-সরঞ্জাম, গাঁইতি কোদাল নিয়ে। গর্ত করে, বালি তোলে। বালি ফুরলে ব্যবসা গুটিয়ে চলে যায় অন্যত্র। পড়ে থাকে বড় বড় খাদ। বর্ষার জলে ভরে যায়। মাছ চাষ কিছু হয় বটে। কিন্তু চাষের জমির ক্ষতি যা হয় তা অবর্ণনীয়। পাণ্ডুয়া এবং মগরার মাঠে মাঠে ঘুরলে মস্ত মস্ত হ্রদাকার জলাশয় দেখে দর্শক মাত্রেই বুঝতে পারবেন সে কথা।

সমস্যাটি কিঞ্চিৎ বক্র। চাষের জমি বাঁচাবার প্রয়োজনে বালি খোঁড়া বন্ধ কর এমন ফতোয়া জারি করা যাবে না অনায়াসে। প্রথমত এটি একটি চালু ব্যবসা। বহু লোকের অন্ন সংস্থান হয় এর থেকে। দ্বিতীয়ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি শীল, সভ্যতাও অগ্রসরমান। মানুষের বাসভবন থেকে বড় বড় কল-কারখানার ইতস্তত নির্মাণ হচ্ছে অহরহই। অকস্মাৎ বালি তোলা বন্ধ করলে এসব কাজে মহা বিঘ্ন উপস্থিত হবে এবং কিছু লোকের অন্নও যাবে। মাঝে এমনতর একটা গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল যে চাষ জমি খুঁড়ে বালি উদ্ধার সরকার বন্ধ করবেন শক্ত হাতে। তৎক্ষণাৎ ৪০ টাকা গাড়ি দরের বালির দাম এক লাফে উঠে গিয়েছিল ৮৫ টাকায়। কর্মহীনতার হাহাকার শুধু বালি শ্রমিক মহলেরই জাগে নি, রাজমিস্ত্রী তথা জোগাড়েকুলের চোখেও নেমেছিল অন্ধকার। বালি খনির গাঁইতি কোদালে বহুলোকের অন্ন বাঁধা।

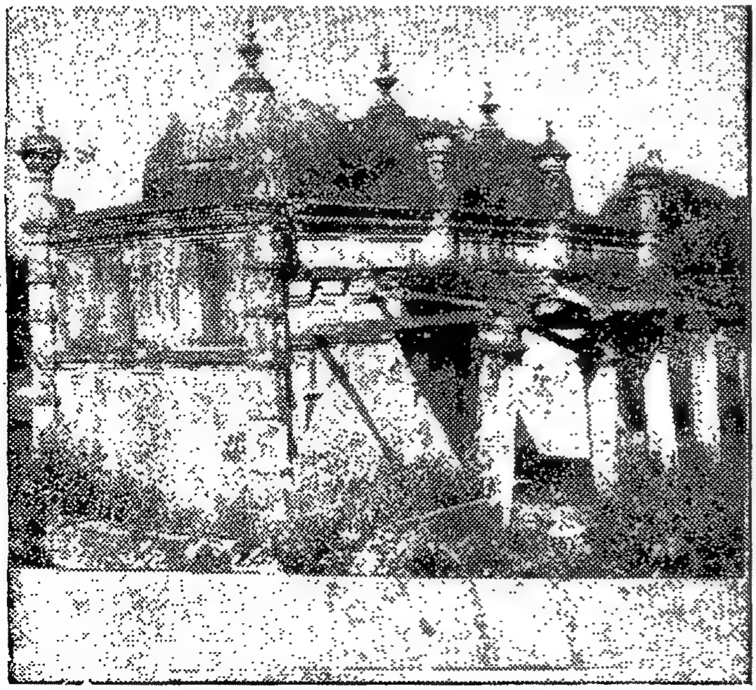

পাণ্ডুয়ার এক প্রাচীন গাবার পারের জরাজীর্ণ মসজিদ

পাণ্ডুয়া সমবায় আন্দোলন প্রায় গাঁ সফল হয়েছে বলা চলে। ছটি চাল কল চলে সবই সমবায় কর্মীদের হাতে। হুগলী জেলার মধ্যে লেভির ধান সংগ্রহে পাণ্ডুয়ার স্থান উচ্চতর।

যত চেষ্টা-যত্ন শ্রম অর্থ ব্যয়ই করা যাক না কেন, সমবায় আন্দোলন যে ভারত-বর্ষে যথাযথ সফল হতে পারছে না একথা অবিসম্বাদী সত্য। অথচ আজকের এই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের পটভূমিকায় সমবায়ী পদক্ষেপ অপরিহার্য। তাই বৃহত্তর ভারতবর্ষের ক্ষুদ্রতর একটি কোণেও সমবায় আন্দোলন একটুখানি সাফল্যের মুখ দেখতে পেয়েছে জেনে শুধু মামুলি আনন্দ নয়, বৃহত্তর এক আশার অঙ্কুরও দেখা দিল মনে। হয়তো বা এমন কাল আসবে আজকের এই উপেক্ষিত আন্দোলন জাতীয় আন্দো-লনরূপে একটি বিশেষ ভূমিকা নিতে পারবে জনতার জীবনে।

পাণ্ডুয়ার পশুহাট বিখ্যাত এবং প্রকাণ্ড সে কথা উল্লেখ করা হয়েছে আগে। কত প্রকাণ্ড তা অনুমান করা যাবে না—চোখে না দেখলে। মস্ত মস্ত পাটনাই হেলে এসেছে। প্রকাণ্ড শিং, তেল মাখানো। সাদা ধবধবে গায়ের রং, কেউ বা কালোয়-ধলায়। গলায় লাল-নীল পুঁতির সঙ্গে একটা-দুটো ঘুঙুর বাঁধা। যে কোন হলজীবীর স্বপ্নের সামগ্রী। দাম দেড় থেকে দু' হাজার টাকা জোড়া।

সংশয়ের কথা এমন হেলে কেনবার আগে খরিদ্দার ভেবে দেখবে—এর লাঙলের মুঠো ধরবার ক্ষমতা তার আছে কি না?

ধূসর কৃষ্ণ রং। প্রকাণ্ড বাঁকানো শিং। মস্ত পাহাড়ের মত গতর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি মহিষের দল। গাইও আছে এঁড়েও আছে। শরীরের তুলনায় ছোট ছোট আরক্ত রেখাঙ্কিত চোখের ঈষৎ ভীত কিন্তু প্রচণ্ড এক-গুঁয়ে দৃষ্টি ফুটিয়ে গোঁজ গলানে টান টান হয়ে অস্বস্তিতে সামনের পা দিয়ে মাটি খুঁড়ছে একটু একটু। জন্মের অজানা অচেনা খরিদ্দারের হাতে বিক্রি হয়ে যেতে একটুও রাজী নয় ওরা। দর কষাকষি চলছে। সবৎস একটি দুগ্ধবতী মহিষ ক্রেতা বলছে, বাইশ-শো—বিক্রেতা বলছে, পঁচিশ-শো।

ভেড়া আছে বেশ গোলগাল হৃষ্ট-পুষ্ট কোঁকড়ান ঘন লোমে গা ঢাকা। স্প্রিং-এর মত বাঁকানো শিং। লোমের মধ্যে আঙুল চালিয়ে খরিদ্দার পরখ করছেন—সত্যই হৃষ্ট-পুষ্ট, না রোঁয়ার আস্তরণে ঢেকে রাখা হয়েছে চর্বির দৈন্য। এছাড়াও ছাগল আছে, হাঁস আছে, মুরগী আছে, গোটা দু-চার কুকুরছানাও

পাণ্ডুয়ার পশুহাটের একাংশ

দেখলাম। নেহাৎ বাচ্চা। ঝোলা ঝোলা কান। গোল-গাল লোমে ভরা দেহ। অচেনা লোক কাছে এলে তারস্বরে কেঁউ কেঁউ করে জানাচ্ছে আপত্তি। কুকুর আমি চিনি নে। বুঝতে পারলাম না—সত্যই কোন ভাল পে ডিগ্রী—না অরিজিন্যাল নেড়ি কুত্তা।

৩ মাসের জন্য বিনামূল্যে উপহার

স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য, কাশ্মীর আর্ট শাড়ী। সর্বাধুনিক মনোরম ডিজাইন এবং রং লইয়া মরশুমের নূতন নূতন মাল আসিয়াছে। আমাদের কাছে কেবলমাত্র বড় সাইজের কাপড় পাওয়া যায়। ১টি ডিল্যাক্স শাড়ীর মূল্য ১১৲ টাকা; ২টি ২০৲ টাকা; ৩টি ২৮৲ টাকা; ৪টি ৩৬৲ টাকা। দুইটি বা তদধিক শাড়ীর অর্ডারের সহিত বিনামূল্যে ব্লাউস পীস। পোস্ট পার্শেলযোগে অর্ডারের মাল পাঠান হয়।

Arvind Agencies (WBM-22)
Post Box 1408, Delhi-6.

প্রকাণ্ড এলাকা। অগণিত সওদা। শুধু জানোয়ার নয়। মানুষের প্রয়োজনীয় নিত্যসামগ্রীও আছে। দূর দূর থেকে মানুষ এসেছে সওদা করতে। দেখা হচ্ছে কত আত্মীয় বন্ধু পরিচিত-স্বজনের সংগে। কলকল কথায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে অনেকদিনের অদর্শনের জমানো আবেগ। বাংলার হাটগুলি শুধু মাত্র কেনা-বেচার কেন্দ্র নয়, মানুষে-মানুষে মিলনের পৃষ্ঠভূমি। দূরের মানুষকে কাছে আনে, কাছের মানুষকে চোখের সামনে। আত্মীয়-বন্ধু পরিচিত তো বটেই, যাকে চেনা নেই তাকে চেনায়, যার সংগে পরিচয় ছিল না তাকে পরিচিত করায়। আজকের এই যন্ত্রযান-ঘর্ঘরিত যুগে মানুষ যখন দুই দণ্ডে চলে যাচ্ছে দু-দিনের পথ—তখন হয়তো এর আবেদন আর প্রয়োজন অতি সামান্য। কিন্তু অতীতে সেই সেদিন যখন যান বলতে ছিল গো-যান, আর মানুষের পদযান, আর বড় জোর পালকী কিংবা জলযান কিংবা অশ্বতর, সেদিন দূরের মানুষ এই হাট পানে চেয়ে থাকতো তৃষিত চোখ মেলে দেখা হবে, সাক্ষাৎ হবে, কুশল জানবার সুযোগ হবে।

সারাদিন দর জানা-জানি আর মাল চেনা-চেনি, দর কষাকষি, আর স্বার্থের সুতোয় পাক দিয়ে দিয়ে প্রাণপণ টানাটানি। তারপর সন্ধ্যা হয়। সূর্য পাটে বসে। নিঝুম শান্ত হাটতলা অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায়। ঝাঁপ তোলা একটি দুটি দোকানে হয়তো বা জ্বলে একটি দুটি টিম্‌টিমে বাতি। খালি ডাবের খোল, ছেঁড়া-খোঁড়া ফেলে দেওয়া নষ্ট পচা শাক-সব্জী, শালের পাতা খাবারের দোনা, আরও কত কি আবর্জনায় আকীর্ণ। সারাদিনের কলস্বর মুখরিত হাটতলায় নামে একটি অখণ্ড প্রশান্তি। ভিড়ে তাড়া খাওয়া ঠাঁই ছাড়া রোঁওয়া ওঠা নেড়ি কুকুরের দল ফিরে আসে একে একে। বেছে নেয় তাদের প্রিয় পরিচিত কোণটি। গোল পাকিয়ে শুয়ে পড়ে লেজে-মুখে এক হোয়ে। সারাদিন অনেক স্বার্থের সওদা এই মাটিতে বিকিয়েছে। এখন শান্তি। এখন অন্ধকার। এখন নিঃসীম আকাশে নিঃসঙ্গ তারাগুলি শুধু একলা চেয়ে রইল চোখ মেলে।*

[*আলোকচিত্র লেখিকা কর্তৃক গৃহীত ঃ পরের বারে দশঘরা।]

নয় নির্জন ঘরে

শচীন রায়

বাড়িতে খেতে খেতে রোজ রাত দশটা বেজে যায়। বীরেশ্বর সেই হিসেব করেই ঠিক করেছিল একটু দেরি করে যাবে।

তখন খিদেটা বেশ পুরোপুরি হবে—ভাল করে খাওয়া যাবে। আগে গেলে আগে আগেই বসতে হয়।

তাছাড়া ছেলেমেয়ের পরীক্ষা চলছে—ওদের একটু পড়ানোরও খুব দরকার।

তাই ভেবেছিল সাড়ে আটটা নাগাদ বেরোবে। মিনিট দশেকের রাস্তা। সঙ্গে সঙ্গেই ত' আর বসতে পাবে না—পরের ব্যাচে বসে খেতে খেতে সেই দশটাই প্রায় বেজে যাবে।

কিন্তু পড়াতে পড়াতে খেয়াল ছিল না। স্ত্রী মনোরমা যখন তাকে মনে করিয়ে দিল তখন ন'টা ছুঁই ছুঁই।

তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে কাপড়টা পরে নিয়ে গেঞ্জীর ওপরে চাপিয়ে নিল নস্যি রঙের সার্জের পাঞ্জাবীটা।

পাঞ্জাবীটা বিয়ের বছরে শীতের তত্ত্বে পাওয়া। তবে পনের বছরের মধ্যে ওকে একবার রঙ ফরাতে হয়েছে আর সামান্য সামান্য রিপুও করতে হয়েছে। তবে বিলিতী সার্জ। ওর মর্যাদা আলাদা বলে একটা গর্ব আছে তার।

কিন্তু চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে টের পেল—শীতটা বেশ বেশিই পড়েছে—সার্জের পাঞ্জাবীতে আটকাবে না। তাই পৈতৃক শালটার দিকে হাত বাড়াল। মেটে রঙের শালটার গায়েও কিছু কিছু রিপুর কাজ আছে। অবশ্য ওটার বয়েস নাকি একশ' পেরিয়েছে। বীরেশ্বর ওটাকে কদাচিৎ ব্যবহার করে। কাচতেও দেয় দু-চার বছর অন্তর, ময়লা হয়েছে বেশ। ইস্ত্রির বালাই নেই, তা ছাড়া দু-এক জায়গায় রিপু করার দরকার হয়ে পড়েছে আবার। তাই ঠিক করেছিল ওটার দিকে হাত বাড়াবে না। কিন্তু তা সম্ভব হলো না। সার্জের পাঞ্জাবী ভেদ করে ঠান্ডা তার হাড় ছোঁবে বলে মনে হতে লাগল। শালটি তুলে নিল কাঁধে। তারপর উপহারের সিঁদুর কৌটোটা জামার পকেটে চালান করল।

মনোরমা তখন ভাত বাড়ছিল ছোটদের। সে চেঁচিয়ে বলে দিল—শালটা যেন নিও—খুব ঠান্ডা পড়েছে।

বীরেশ্বর গলায় বিরক্তি মিশিয়ে বলে উঠল—নিলাম তো শালটা—কিন্তু ওটা না হয়েছে কাচানো, না আছে শেলাই করা। ভদ্দরলোকদের সামনে যে নিয়ে যাই কী করে।

মনোরমা কিছু বলল না। বীরেশ্বর এমনভাবে বলল যে, শালটা না কাচানো বা না রিপু করানোর দোষটা যেন মনোরমার। মনোরমা বুঝল—আসলে মনোরমা শালটা নেওয়ার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে বলেই তার নিজের ভাগ্যের ওপরে বোধ-করা রাগটা—মনোরমার ওপরে স্থানান্তরিত করল।

বড় রাস্তা থেকে মাটি আর খোয়া দিয়ে বাঁধানো রাস্তাটায় পড়েই শীতটার প্রাবল্য টের পেতে লাগল বীরেশ্বর। শালটা কাঁধ থেকে নামিয়ে গলায় এক পাক জড়িয়ে নিল।

এই রাস্তায় মিনিট চারেক হাঁটতে হয়। এদিকে বসতি ঘন নয়। গাছপালা আছে যথেষ্ট বেশি। এদিকটা এরই মধ্যে নিঝুম হয়ে গেছে। শুধু নেমন্তন্ন খেয়ে যারা ফিরছে—তাদের কথা-বার্তায় আর দূর থেকে আসা প্রবীরদের বাড়ির কোলাহলে—রাস্তাটা মুখর। ওপরে চমৎকার চাঁদের আলো।

একটা মোড় বেঁকতেই কয়েক জনাকে আসতে দেখা গেল। প্রত্যেকে অপরের কথা ছাপিয়ে নিজের কথা বলার চেষ্টায় ব্যস্ত। একটা গোলমাল যেন রাস্তা মাড়িয়ে যাচ্ছে। তাদের পেছনে ধুতি-পাঞ্জাবী আর শাড়ি-সায়ার খস-খসানি আওয়াজ তুলে মৃদু গলায় • খাওয়ার আলোচনা করতে করতে আসছিল কয়েকজনা। বীরেশ্বর কান পেতে শুনল। একজন বলল—দত্ত মিহিদানার বদলে সীতাভোগ করে একটা নতুন জিনিস করেছে। আরেকজন বলল—মিহিদানা আজকাল আর চলে না, দেখবে কেউ নিতে চায় না। এক মহিলা বললেন—দইটা কিন্তু খুব ভাল লাগল।

—মোল্লার চকের দই। আমি-ই বলতে গেলে বন্দোবস্ত করে দিয়েছি। আর এক-জন বলল।

বীরেশ্বরের জিভে জল এল।

—এই যে বীরুদা এত দেরি করে?

একদল মেয়ে-পুরুষের সঙ্গে প্রবীর আসছিল। জিজ্ঞেস করল সে—একটু ঠাহর করে দেখে নিয়ে।

—হেঁ হেঁ ভাই দেরি হয়ে গেল। ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা—তাই একটু দেখে দিচ্ছিলাম।

—দাঁড়ান আমিও ফিরব। সুবর্ণদা-বৌদি-পিসিমা—এবার তাহলে ফিরি। বুঝতেই তো পারছেন—দাদা একলা মানুষ।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাদের আর এগিয়ে দিতে হবে না।

—রাস্তাটা একটু দেখে শুনে যাবেন। এদিকের রাস্তায় আলোগুলো বড় দূরে দূরে—হোঁচট না খান যেন। সুবর্ণদা পিসি-মাকে একটু ধরে নিয়ে যান।

—ঠিক আছে—সে আর বলতে হবে না। একদিন আসব দুজনকে নেমন্তন্ন করতে।

—আচ্ছা।

দুজনেই চুপচাপ এগোল কয়েক পা। প্রবীরের গায়ে সার্জের পাঞ্জাবী, গলায় মাফলার।

প্রবীরের ঠান্ডা লাগার ভয় আছে। মনে মনে ভাবল বীরেশ্বর।

—বয়েসও তো হল বেশ। তা আমা-দেরই বয়সী তো। ম্যাট্রিক পাশটাই না হয় বছর তিনেক পরে করেছে। আমরা আগে চাকরীতে ঢুকেছি বলেই না হয় আমাদের দাদা বলে। বয়েস ত' আটত্রিশ হলো। ওর পারসোনাল ফাইল তো আমার কণ্ঠস্থ। লোকে ভাবে ওর ত্রিশ পেরোয় নি। আমরা বুড়ো হয়ে গেছি। কিন্তু প্রবীর! প্রবীর এই বুড়ো বয়সে বিয়ে করল। বলছিল—দাদার দুটি স্ত্রী-ই মারা যাওয়াতে সে বিয়ে করবে না বলেই ঠিক করেছিল—মা'র পীড়াপীড়িতেই নাকি এই বিয়েতে মত দিয়েছে।

—বেশ ঠান্ডা পড়েছে দেখেছেন?

বীরেশ্বরের ভাবনা আসল প্রবীরের কথায়। বলল—হ্যাঁ, আজ বোধ হয় ম্যাক্সিমাম্।

এতক্ষণ ঘেরা জায়গায় ছোটাছুটি করেছি—ঠিক টের পাই নি। এখন পাঞ্জাবী ফুঁড়ে শীত ঢুকছে।

—শীত পড়া ভাল।

—তা সত্যি কথা। অসুখ-বিসুখ তাহলে কিছু কম হয়।

আবার চুপচাপ হলো দুজনে। হঠাৎ একটা প্রসঙ্গ খুঁজে পেল বীরেশ্বর। জিজ্ঞেস করল।

—লগ্ন ক'টায় ছিল?

—আর বলবেন না দাদা—সেই ভোর চারটেয়। এই শীতের দিনে—খুব কষ্ট পেয়েছি।

—এই যে প্রবীর—তোমায় যে সব খোঁজাখুঁজি করছেন।

এগিয়ে আসা কয়েকজনার মধ্যে একজনা বলল।

—কেন? আচ্ছা, আমি এগোচ্ছি। বীরুদা আস্তে আস্তে আসুন।

বাড়ির সামনে আরেকটা ছোট্ট জটলার মধ্যে প্রবীরকে দেখতে পেল বীরেশ্বর। প্রবীর তাকে দেখতে পেয়ে বলল—আপনি সোজা প্যান্ডেলে চলে যান। এর পরের ব্যাচেই বসিয়ে দেব। এই সন্তোষ—দাদাকে সিগ্রেট দে।

একটি আঠার-উনিশ বছরের ছেলে—তার সামনে এসে সিজার্স সিগারেটের কৌটো খুলে ধরল। কৌটোয় অনেক সিগারেট। বীরেশ্বর সিগারেটের দিক থেকে মুখ তুলে দেখে নিল ছেলেটিকে। ছেলেটির রঙ কুচকুচে কালো—মুখেও একটা সারল্য। বীরেশ্বরের লোভ হয়েছিল কৌটোটা দেখেই। ছেছেটিকে বুঝে নিয়ে—লোভটাকে প্রশ্রয় দিল। চারটে সিগারেট তুলে নিতে গেল—উঠল তিনটে। দুটো বুক পকেটে রেখে দিল। একটা মুখে দিয়ে দেশলাই চাইল। ছেলেটি একটা নতুন দেশলাই বার করল। দেশলাইটা খুলেও কয়েকটা কাঠি পকেটে রেখে দিয়ে হেসে বলল—পরে কাজে লাগবে।

সিগারেটটা ধরিয়ে দেশলাইটা ফেরৎ দিয়ে বলল—থ্যাঙ্কস।

কয়েক পা তফাতে প্যাণ্ডেল। প্যাণ্ডেলের মধ্যে একপাশে একফালি জায়গা অপেক্ষমাণদের জন্যে। সেখানে দু' সারি চেয়ার পাতা। বেশ লম্বা লম্বা সারি দুটো। পাশের বিস্তৃত ঢাকা জায়গাতে খাওয়া-দাওয়া চলছে। রঙ করা চট দিয়ে পার্টিশান করা।

বীরেশ্বর বসার জায়গার দিকে এগোল। ভেতরে জনা-দুয়েক বসে। শেষের দিকটার আলো নেভানো। ওপাশটার আলো দরকার হবে না ভেবেই হয়তো নিভিয়ে দিয়েছে।

বীরেশ্বর বসল। চটের আড়াল ভেদ করে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাটা বেশ দেখা যায়। চেয়ার আর ডেকরেটারদের উঁচু বেঞ্চের ব্যবস্থা। এদিকে কোন কথাবার্তার আওয়াজ বিশেষ না থাকায়—পাশের খাওয়া-দাওয়ার কথাবার্তা বেশ শোনা যাচ্ছে। প্রবীরের দাদা দেখাশোনা করছেন—এই

মজুমদারকে পোলাও দাও, এই ব্যানার্জী-বাবুকে মাছের ল্যাজা দিয়েছিল যে রে! বড় বড় দুটো মাছ দিয়ে যা।

কে যেন বলল—এই দারুণ শীতে কেন করলেন দত্তবাবু? আমাকে আবার মাইল-খানেক হাঁটতে হবে—এই রাত্রে।

—ভাই আমি-ই ইচ্ছে করে মাঘ মাসে করলাম, তার কারণ, শীতের দিনে ভাই জিনিসপত্র তবু পাওয়া যায়—লোককে খাইয়ে আনন্দ পাওয়া যায়। লোককে নেমন্তন্ন করব—এদিকে বেশ তরিবৎ করে খাওয়াতে পারব না—সে ভাই আমার ভাল লাগে না। তা ছাড়া ঠান্ডার জন্যে জিনিস-পত্রও নষ্ট হয় না।

—বাঃ মাংসটা তো বেশ গরম! সুধীর তোমার এই কাজটি বাপু প্রশংসনীয়।

বলে কে যেন হাসলেন বেশ জোরে। প্রবীরের দাদা সুধীরবাবু বললেন—আগের ব্যাচে সব বলাবলি করছিল মাংসটা একটু গরম হলে ভাল হোত—তাই গরম করালাম। মাংস দেবে? নাও একটু নাও।

—না, না। এইগুলোই শেষ করি। সুন্দর রান্না হয়েছে।

জিভে জল আসে বীরেশ্বরের। সঙ্গে সঙ্গে একটা ক্ষোভও বুকের মধ্যে মাথা উঁচু করে। মনোরমা—পাপড়ি-খোকা ওরা যদি আসত, পেট ভরে খেতে পারত। কত-দিন নেমন্তন্ন খায় নি ওরা!

তার মনে পড়ল—কিছুদিন আগে অঘ্রান মাসে মনোরমার নিজের ছোট বোন ঝর্ণার বিয়েতে যেতে পারে নি। শ্বশুর-মশাই সকলকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বার বার করে লিখেছিলেন—কিন্তু এতজনের যাওয়া-আসার খরচ—তারপর একটা গয়না কি ভাল শাড়ির জন্যে কিছু টাকা—এত যোগাড় করতে পারবে না জেনেই দশটা টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে মনি-অর্ডার করে।

—এ কি সব যে চুপচাপ।

বসার জায়গায় প্রবীর ব্যস্তভাবে এল তদারক করতে। ইতিমধ্যে আস্তে আস্তে অনেক চেয়ারই ভর্তি হয়ে গেছে। সে ও-পাশের আলোটা জেবলে দিল। একজন বললেন—বেশ আছি ভাই—তোমাকে আর ব্যস্ত হতে হবে না। আমরা তো আর ছেলে-ছোকরা নই যে, হৈ-হল্লা করব।

প্রবীরের সামনে বসা দুটি ছেলে অবশ্য তাদের বয়েস কুড়ির ওপারে বলেই মনে হয়—তাকাল ভদ্রলোকের দিকে।

—সিগারেট নিয়েছেন?' যতীনদা হাতে ওটা কি নিয়ে ঘুরছেন? সিগারে-টের টিনটা ঘোরান না। আপনাকে সব কিছু বলে দিতে হবে? হাতে কি ওটা? কার উপহার বুঝি? বেশ ত' ভেতরে এসে ওটা একটা জায়গায় রেখে এ'দের আপ্যায়ন করুন—। বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে?

প্রবীর বাইরে বেরিয়ে কাকে যেন বলতে বলতে চলে গেল। কিছু পরে প্রবীরই ফিরল একটা গোল্ডফ্লেকের কৌটো নিয়ে। বীরেশ্বরের কাছে এসে বলল—দুটো কৌটো গোল্ডফ্লেক এনে-ছিলাম। এটা শেষ কৌটো—আলমারী থেকে বার করে আনলাম। আপনারা এসট্যাবলিশমেন্টের বড়বাবু—আপনাদের খাতির করতেই রাখা—।

বলে খুব হাসল প্রবীর। বীরেশ্বর লোভ আর চক্ষুলজ্জার উভয় সঙ্কটে পড়ে ইতস্তত করছিল খোলা টিনটার সামনে। প্রবীরই বলল—একসঙ্গে দুটো নিয়েই রাখুন—আমি ত' আর বার বার বাইরে আসতে পারছি না।

বীরেশ্বর দ্বিধা সরিয়ে দুটো সিগা-রেট তুলে নিল।

প্রবীর সকলের সামনে সিগারেটের টিনটা দেখিয়ে নিয়ে চলে গেল দ্রুত। বীরেশ্বর একটা সিগারেট ধরাবে ধরাবে মত করে রেখেছিল—প্রবীর চলে যেতে সেটা টুপ করে বুক পকেটে চালান দিল। মনে মনে হিসেব করল—চারটে সিগারেট হলো।

বীরেশ্বর ইদানীং দিনে দু' পয়সার বেশি বিড়ি খায় না। তাই থেকে অফিসের কাউকে খাওয়ালে—সে আবার কারোর কাছ থেকে ঠিক যোগাড় করে নেয়।

মনের মধ্যে কৃতজ্ঞতার ধূপ জবালিয়ে ভাবছিল—প্রবীররা খুব বিরাট আয়ো-জন করেছে। হয়ত' ভাল টাকাকড়ি পেয়েছে। তাছাড়া—দুই ভায়ের মাইনে আর ওভারটাইম মিলে রোজগারের অঙ্কটা ভালই হয়ে দাঁড়ায়। বোধহয় জমিয়ে জমিয়ে রাখত—এখন খরচা করছে।

—এই যে অবিনাশদা—এত দেরি করে? এই যে সান্যাল মরনিং সিফ্‌ট ত' এখন?

সুধীরবাবু সকলের সঙ্গে মিছু কিছু কথা কয়ে গেলেন। জবাব শোনার জন্যে অপেক্ষা করলেন না। যাবার সময় বললেন—দেখি যত তাড়াতাড়ি পারি আপনাদের বসিয়ে দিই। এর আগের বারে মিনিট পনের-কুড়ি আলো নিভে গিয়েই সময়ের গন্ডগোল করে দিয়েছে। না হলে আমরা শুরু করেছি অনেক তাড়াতাড়িই।

বীরেশ্বর আবার নিজের ভাবনায় ফিরল। কুকুরদের কামড়াকামড়ির চিৎকার আসছে অল্প দূর থেকে। ওপাশে খাওয়া শেষ হলো!

তার সামনে বসা দুটি ছেলের একটিকে বীরেশ্বর চেনে। স্কুলে পড়ায়। বীরেশ্বরের কানে লাগল তার একটা কথা—একই নামে দুই লেখকের দুটো বই! দোকানদারের ত' বলা উচিত ছিল। আমি জানি তারাশঙ্করের তাই বইটার শুধু নাম করে চোখ বুজে নিয়েছি। এখন তুমি খুললে তাই জানতে পারলাম। যাক্‌ লিখে দাও কিছু।

তার পাশের দুই ভদ্রলোক বলা-বলি করছিল—আর বলো না ভাই আমি মরে গেলাম। এই মাসে দুটো বিয়ে তারপর সরস্বতী পুজোর চাঁদা। ভাই পাগল করে তুলল।

—সেদিন কাগজে দেখছিলাম, এই নিয়ে খুব লেখালেখি হ'চ্ছে।

—ওই লেখালেখিই হবে। কাজের কাজ কিচ্ছু হবে না।

—তা যা বলেছেন—

একটা সিজার্সের খোলা টিন এক হাতে নিয়ে প্রবীরের সেই যতীনদা এসে দাঁড়াতে লাগলেন সকলের সামনে। বীরেশ্বরের সামনে এলে—বীরেশ্বর আবার দুটো সিগারেট তুলে নিল—সমস্ত দ্বিধা জয় করে।

সালফার
গায়েমাখা সাবান

গন্ধক চর্মরোগে বিশেষ উপকারী। সেজন্য এই সাবান নিত্য ব্যবহারে, বিশেষতঃ গরমের দিনে, খোস, ফোড়া, চুলকানি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্মরোগ নিবারণ করে।
বেঙ্গল কেমিক্যাল

তলা দিয়ে একটা ঠাণ্ডা বাতাস পা ছুঁয়ে যাচ্ছে। কান-নাকও ছুঁয়ে যাচ্ছে ওপর দিয়ে আসা আর একটা বাতাস। বীরেশ্বরের শীত করতে লাগল। ইচ্ছে করল শালটা খুলে গায়ে জড়িয়ে নেয়। কিন্তু আত্মসম্মানবোধটা বাধা দিল।

সুধীরবাবু এসে ডাক দিলেন সবাইকে। সবাই বেশ তাড়াতাড়িই উঠে পড়ল। একটা ব্যস্ততাকে চাপা দিয়ে যে এতক্ষণ সবাই বসেছিল—তা প্রকাশ হয়ে পড়ল।

দুটি সারি মাত্র ভর্তি হলো। আর লোক নেই। খোঁজাখুঁজি করে আরও কিছু আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদিদের বসানো হলো।

কে যেন বলে উঠলেন ভারিক্কী গলায়—আর অপেক্ষা করা যায় না। এব্যার শুরু করা যাক।

সকলে খাবারে হাত লাগাতে ব্যস্ত হলো।

—বাঃ ভাল ঘিয়ে লুচি ভেজেছে!

বীরেশ্বর লুচি মুখে তুলতে গিয়েই গন্ধটা পেল। ইদানীং বাড়িতে ভেজিটেবল ঘি ছাড়া কিছুই আসে না। আনতে পারে না। লুচির ঘিয়ের গন্ধটা—পুরোনো সম্পদকে হঠাৎ দেখতে পাওয়ার মত আনন্দ-ভেজা বিস্ময়ের সৃষ্টি করল তার মধ্যে।

সংগে সংগে মন কেমন করল—তার বউ ছেলে মেয়ের জন্যে।

পাশের এক ভদ্রলোক তার পার্শ্ববর্তীকে বলল—দেখছিলাম—প্রবীর কেবল বউয়ের কাছে ঘুর ঘুর করছে—।

—তা ত' করবেই। বেশি বয়সে বিয়ে করা বউ। তুই মনে করে দেখ দেখি তোর ফুলশয্যের দিনে কিরকম আনচান করছিলি?

কথাটা মনে লাগল বীরেশ্বরের।

—সত্যিই কি এরকম একটা দিন তার জীবনে এসেছিল?

অবাক হয়ে ভাবতে লাগল। মনে পড়তে দেরি হলো না। মনোরমার তখনকার মুখটা মনে করতে পারল না। বিয়ের পরে তোলা ফটোর মনোরমাকে মনের সামনে এনে—সেদিনকার মনোরমাকে মনে করার চেষ্টা করল।

প্রবীর তারই বয়সী। তার পারসোনাল ফাইল নিয়ে তাকে ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয়েছে অনেকবার, কিন্তু প্রবীর দেখতে অনেক ছেলেমানুষ। তার চেয়ে অনেক ছোটই দেখায়। প্রবীর নতুন করে পাবে একটি মেয়েকে?

মনোরমাকে কি সেও নতুন করে পেতে পারে না? আগের মত ভালবাসতে পারে না? আর একবার হিসেব করল—। এই উনিশ শ' ষাট সাল এটা, আর তার বিয়ে হয়েছে উনিশ শ' ছেচল্লিশ সালে।

—এই পোলাও দাও এদিকে। চক্ষু-লজ্জা সরিয়ে বীরেশ্বর চাইল।

বড় বড় দুটো মাছের টুকরো দিয়ে —মাছ পরিবেশনকারী পোলাও পরিবেশনকারীকে ডেকে বীরেশ্বরের পাতটা দেখিয়ে দিল।

পোলাওটা তার খুব ভাল লেগেছে। পোলাও দ্বিতীয়বার দিতে এলে আপত্তি জানাল না। তার আর একবার মনে পড়ল বাড়ির কথা।

—এই মাছটা রিপিট্ কর্ না।

সুধীর হাঁক দিল। সকলের পাতে মাছ দিতে বলে বলে—এগোতে লাগল। বীরেশ্বরের কাছে এসে চার টুকরো মাছ দিয়ে দিল।

এরকম পাকা মাছ সে কিনতে পারে না। বাজারে সাড়ে পাঁচ টাকা করে কিলো। বীরেশ্বর মাছের ছালগুলো বাদ দিয়ে দিয়ে শুধু মাছটা খেতে লাগল।

দইটা ক্ষীরের মত দু'বার দই নিয়েছে। চারটে সন্দেশ দিয়ে গেছে। দুটো নতুন গুড়ের দুটো চিনির—।

ঠিক এই সময় সব আলো নিভে গেল।

বীরেশ্বর কিছু না ভেবে চট করে সন্দেশ চারটে পকেটে পুরে দিল। যেন সে এইরকম একটা সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। একটু আনন্দ নিয়ে বাড়ির সকলের মুখ মনে করল।

লণ্ঠন কোথায়—হ্যাসাক কোথায় করতে লাগল। অন্ধকারে কিছুক্ষণ বসে থেকে থেকে—আস্তে আস্তে উঠে পড়তে লাগল—দু-চার জন করে।

বীরেশ্বর একটু অপেক্ষা করল সন্দেশটা আর একবার ঘুরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে।

সকলেই উঠে পড়ছে দেখে তাকেও উঠতে হলো। মনটা একটু খুঁত খুঁত করল—সন্দেশটা চাখতে না পাওয়ার জন্যে।

আঁচাবার জায়গায় একজন লণ্ঠন ধরে দাঁড়িয়ে আছে—আর সমস্ত প্যাণ্ডেলে অন্ধকার থই থই করছে। প্যাণ্ডেলের বাইরে চাঁদের আলোর তুষার-পাত।

আলো জ্বলল—একটু পরে। প্রবীরের দাদা মাপ চাইতে লাগলেন সকলের কাছে। দুটো কুকুর ভেতরে ঢুকে পড়েছিল—মার খেয়ে বুঝি চিৎকার করে পালালো।

পকেটের সন্দেশগুলো বাঁচাবার চেষ্টা করে উপহারের সিঁদুর কৌটোটা বার করে নিয়ে—ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল। প্রবীরের সংগে চোখাচোখি হ'লে—সিঁদুর কৌটোটা কোনরকমে নতুন বউয়ের হাতে গুঁজে দিল বীরেশ্বর। তারপর আবার প্রবীরের কাছ থেকে ইসারায় বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল।

বাইরের ঠাণ্ডাটা—আবার বেশ বেশি বোধ হ'তে লাগল। পানের ছোট্ট ঝুড়ি নিয়ে একটা ছোট ছেলে প্যাণ্ডেল থেকে আসছিল—বীরেশ্বর তাকে থামিয়ে গোটা চারেক পান একসংগে তুলে নিল। বাড়তি পানগুলো নিল মনোরমার মুখটা মনে ভাসিয়ে।

তুষারের মত ঠাণ্ডা চাঁদের আলোর নিচ দিয়ে—প্রায় নির্জন পথ দিয়ে যাচ্ছিল। সামনে প্রবীরের দুটি বন্ধু যাচ্ছে। বীরেশ্বরের কানে এল—তারা আলোচনা করছে—এই আটত্রিশ বছর বয়সে প্রবীরের বিয়ে করাটা ঠিব হ'চ্ছে কি না। আলোচনা করল—প্রবীর ঠিকমত ভালবাসতে পারবে কি না আর মেয়েটা এত বেশি বয়সে এসে এত পাকা মন নিয়ে—আরেকটা সংসারে মিশে যেতে পারবে কি না। আরেকটা হৃদয়ের কাছে নির্বিচারে হৃদয় সমর্পণ করতে পারবে কি না। কারণ বয়েস বাড়ার সংগে সংগে ত' বিচার করে পা বাড়ানোর প্রবণতা জাগে।

বীরেশ্বরের শুনতে ভাল লাগছিল। আর সে মনোরমার নতুন মূল্যায়ন করছিল। তার ছেলে-মেয়েদের ভুলে গিয়ে শুধু মনোরমাকে নিয়ে ভাবছিল। মনোরমার সংগে তার যে একটা ব্যক্তিগত —নিভৃত প্রেমসিক্ত ভাবপ্রবণ সম্বন্ধ ছিল সেটা প্রত্নতাত্ত্বিকের অনুসন্ধিৎসা নিয়ে খুঁজতে লাগল। সাংসারিক তুচ্ছতায় ভরা দৈনন্দিনতায় সিক্ত তাদের সমূহ সম্পর্কের মধ্যে সেই প্রেমময় ভাবপ্রবণ সম্বন্ধটা যেন কিছুতেই বার করতে পারল না।

হয়ত পাশের পকেটের সন্দেশগুলো আর বুক পকেটের সিগারেটগুলো তার মধ্যে একটা অনেক লাভ করার আনন্দ মাঝে মাঝে উছলে উঠছিল বলেই তার অনুসন্ধান কেবল ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে উঠছিল। তার আনন্দের প্রতিফলনে প্রসাধিত মনোরমার-মুখটাই মনে করতে ভাল লাগছিল।

বিশ্বসাহিত্যের আদিপর্ব

ডঃ নরেন ভট্টাচার্য

॥ ১২ ॥

প্রাচীন আরবীয় সাহিত্য

কোন কোন পণ্ডিতের মতে আরবই ছিল সেমিটিক গোষ্ঠীর আদি নিবাস, আরব থেকেই তারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই অনুমানটি অবশ্য মোটেই অসঙ্গত নয় কেন না আরব থেকে ব্যাবিলন বা প্যালেস্টাইন এমন কিছু দুর্গম পথ নয় যেখানে যাত্রা চলে না। সে যাই হোক উনিশ শতকে প্রাপ্ত অসংখ্য লেখমালার ভিত্তিতে পণ্ডিতেরা স্থির করেছেন যে খৃস্টের জন্মের এক হাজার বছর আগেও আরবে সভ্যতার উদয় হয়েছিল এবং খৃস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে আরবে কমপক্ষে চারটি শক্তিমান রাজ্য গড়ে উঠেছিল—মাইন (বাইবেল বর্ণিত মাওন), সাবা, হাদ্রামুৎ এবং কাতা বানু।

কিন্তু এত পুরাতন দেশ হওয়া সত্ত্বেও খৃস্টীয় পঞ্চম শতকের পূর্বে রচিত কোন সাহিত্যকর্মের নিদর্শন এখানে পাওয়া যায় নি। কোরাণ-পূর্ববর্তী আরবীয় সাহিত্য শুধুমাত্র কবিতা ও প্রবচনকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল। আদি আরবীয় কবিতা দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। প্রথম শ্রেণীটি ছিল গোলেমিক পর্যায়ের, নিজ গোষ্ঠীর প্রশংসা এবং শত্রু গোষ্ঠীর নিন্দা ছিল যেগুলির বিষয়বস্তু, এবং যেগুলি দুই থেকে কুড়ি লাইনের মধ্যে রচিত হত। এই জাতীয় কবিতা যাঁরা রচনা করতেন তাঁদের বলা হত শাহ্‌র। আদি আরবীয় কবিতার দ্বিতীয় শ্রেণীটি ছিল গীতিকবিতা। খৃস্টীয় পঞ্চম শতকের আরবীয় গীতিকবিদের মধ্যে জনৈক মহিলা কবি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যাঁর নাম খান-সা। এ ছাড়া বর্ণনামূলক কবিতারও উদ্ভব প্রাচীন আরবে হয়েছিল, এই শ্রেণীর কবিতাকে বলা হত **কাশিদা**। বর্ণনামূলক কবিতাগুলির প্রথমদিকের কয়েকটি লাইন ভূমিকা হিসাবে ব্যবহৃত হত। এই ভূমিকাগুলির নাম ছিল **নাসিব**।

প্রথমদিকে এই সমস্ত কবিতাগুলির কোন লিখিত রূপ ছিল না। পেশাদার গায়কেরা সেগুলি মুখে মুখে প্রচার করতেন। এঁদের বলা হত রাউই। এই সব পেশাদার গায়কদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে কবি হিসাবে বিখ্যাত হয়েছেন। কবিদের ব্যক্তিগত কবিতা সংগ্রহের নাম ছিল **দিওয়ান**। এতে বিভিন্ন পেশাদার গায়ক কর্তৃক সংগৃহীত কবিতাসমূহ স্থান পেয়েছে। এই সব পেশাদার গায়কদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন হাম্মাদ-আর-রাউইয়া এবং খালাফ-আল-আহমর।

মুআল্লাকাৎ, হমাশা ও মুফদ্দালিয়াৎ

উপরিউক্ত তিনটি নাম তিনটি কাব্য-সংকলনের। **আল্-মুআল্লাকাৎ** সাতটি প্রাক্-ইসলামীয় কবিতার সংকলন। যে সাতজন কবির কবিতা এই সংকলনে স্থান পেয়েছে তাঁরা হচ্ছেন আমরু-উল-কাইশ, তারাফা, জুহাইর, লাবিদ, আন্তারা-ইবন-সাদ্দাদ, আমর-ইবন-কলথুম এবং হারিথ-ইবন-হিল্লিজা। এ ছাড়া পরিশিষ্ট হিসাবে আরও তিনজন কবির তিনটি কবিতা আছে। সেই তিনজন হচ্ছেন নাবিখা, আ'শাহা এবং আবিদ-ইবন-আব্রাস। এই সকল কবিদের মধ্যে আমরু-উল-কাইশই সবচেয়ে বিখ্যাত। তিনি কিন্দা নামক একটি উপজাতির সর্দার ছিলেন। আবিদ-ইবন-আব্রাস ছিলেন তাঁরই সমসাময়িক এবং তাঁর শত্রু-গোষ্ঠীর একজন উপজাতীয় নেতা। এঁদের প্রত্যেকের রচনাই শত্রুগোষ্ঠীর বলহানি করার জন্য বাগাড়ম্বর ছাড়া আর কিছু নয়। কবি আ'শাহার কবিতাটিতে ধুকারের যুদ্ধের কাহিনী বলা হয়েছে যে যুদ্ধে পারসিক বাহিনী বাক্‌র নাম আরব উপজাতিদের হাতে পরাজিত হয়েছিল। আলোচ্য দশজন কবির মধ্যে লাবিদই একজন কবি যিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন, যদিও মুআল্লাকাতে সংকলিত তাঁর কবিতাটি পৌত্তলিকতার গুণগানে ভরপুর। তারাফা রচিত কবিতাটি শুরু হয়েছে তাঁর উটের এক দীর্ঘ বর্ণনা দিয়ে এবং তারই মধ্যে মরুভূমির পরিবেশকে আশ্চর্যভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আমরু এবং হারিথের কবিতায় আছে নিজ নিজ গোষ্ঠীর প্রশংসা। একমাত্র জুহাইরের কবিতাটিই ভাবসমৃদ্ধ, তবে চরিত্রের দিক থেকে তা উপদেশ-ধর্মী।

এরপর দ্বিতীয় সংকলনটির কথায় আসা যাক, যার নাম আল্-হমাশা। এটি ৮৩৬ খৃস্টাব্দে আবু তামাম কর্তৃক সংকলিত হয়েছিল। এই সংকলনটি দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত, মোট কবিতার সংখ্যা ৮৮৪। সর্বযুগেরই আরবীয় কবিতা এতে সংকলিত হয়েছে, তবে বিশেষভাবে প্রথম হিজিরা শতকের অর্থাৎ ৬২২ থেকে ৭১৯ খৃস্টাব্দের মধ্যকার কবিরাই। বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। আল্-হমাশার দশটি অধ্যায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে গঠিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়টির নাম 'বীরত্ব', এতে আছে ২৬১টি কবিতা। দ্বিতীয় অধ্যায়টি হচ্ছে 'শোকগীতি', এখানে আছে ১৬৯টি কবিতা। ৫৪টি কবিতা নিয়ে তৃতীয় অধ্যায়, নাম 'ব্যবহার'। চতুর্থ অধ্যায়টি নারীর সৌন্দর্য এবং প্রেম নিয়ে লিখিত ১৩৯টি কবিতার সংকলন। পঞ্চম অধ্যায়ে আছে ৮০টি ব্যঙ্গাত্মক কবিতা। ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু 'সৌজন্য', এখানে স্থান পেয়েছে ১৪৩টি কবিতা। বাকি অধ্যায়গুলির বিষয়বস্তু হচ্ছে 'বিবিধ বর্ণনা', 'ভ্রমণ', 'আমোদ' এবং 'নারীজাতির নিন্দা' এবং কবিতার সংখ্যা যথাক্রমে ৩, ৯, ৩৮ এবং ১৮। এই বিশাল সংকলনটি নিঃসন্দেহে আরবীয় কবিতাসমূহের প্রতিনিধি স্থানীয়।

তৃতীয় সংকলনটির নাম আল্ মুফদ্দালিয়াৎ, সংকলকের নাম মুফদ্দল-ইবন-ইয়ালা। মূলত প্রাচীনতর কবিদের

রচনাবলী সংকলন করাই ছিল ম্ফন্দলের উদ্দেশ্য। সেই দিক থেকে হমাশার সঙ্গে এই গ্রন্থের পার্থক্য মৌলিক। তদ্পরি সংকলক ও সংগ্রাহক হিসাবে ম্ফন্দল হাম্মাদ ও খালাফের চেয়ে অনেক উচ্চ স্তরের ছিলেন। মোট ১২৬টি কবিতা এই সংকলনে স্থান পেয়েছে যা ৬৮ জন কবির রচনা। প্রাক্-ইসলামীয় কবিতার এটাই হচ্ছে নিখ্ত সংকলন এবং এই গ্রন্থটির বিশেষ সম্পদ হচ্ছে পঞ্চম শতাব্দীর আরবীয় কবি ম্রাক্কিশের দশটি কবিতা যা ম্ফন্দল বহ্ পরিশ্রমে সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কোরাণ শরীফ

আরবীয় ভাষায় উচ্চারণ কুর-আন, অর্থ আবৃত্তি। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের নিকট কোরাণের কয়েকটি বিশেষ অংশ বাদ দিয়ে বাকি সবট্কুই ঈশ্বরের বাণী। যে অংশগ্লিতে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা আছে, অথবা যে সকল স্থানে মোহম্মদ নিজেই বক্তা সেই সমস্ত অংশগ্লিকে পৃথকভাবেই দেখা হয়। কথিত আছে, আসল যে কোরাণ তা স্বর্গে রক্ষিত ছিল এবং ক্রমে ক্রমে তা পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছে (২৫।৩৪) মোহম্মদের নিকট এক পবিত্র আত্মার দ্বারা (১৬।১০৪) যিনি কালক্রমে গ্যাব্রিয়েল নামে খ্যাত হয়েছিলেন (২।৯১, ৯২)। কোরাণের অধ্যায়গ্লি স্রা নামে খ্যাত।

কোরাণের বিষয়বস্তুর পরিধি বিশাল। ধর্মীয় অংশসমূহে ঈশ্বরের একত্ব, সর্বকর্তৃত্ব এবং ন্যায়পরায়ণতার দিকে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। পৌত্তলিকতা ও মানবের উপর দেবত্ব আরোপণের বিশেষ নিন্দা করা হয়েছে। স্বর্গের আনন্দ ও নরকের যন্ত্রণা বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং শেষ বিচারের দিন সম্বন্ধে বিশ্বাসীদের অবহিত করা হয়েছে। এ ছাড়া কোরাণে আছে অজস্র নৈতিক অন্শাসন ও ধর্মীয় আচার-অন্ষ্ঠানের, বিশেষ করে প্রার্থনা, উপবাস, ভিক্ষাদান, তীর্থযাত্রা প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ অন্শাসন, তদ্পরি আছে সামাজিক আইন-কান্ন।

মদিনায় থাকাকালীন মোহম্মদ হিব্র্ সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, সেই হিসাবে কোরাণের উপর ওল্ড টেস্টামেণ্ট তথা হিব্র্ তালম্দ ও মিদ্রাসের হাগ্গাদীয় অংশগ্লির প্রভাব পড়েছে। কোরাণের বহ্ স্থলেই ওল্ড টেস্টামেণ্ট বর্ণিত কাহিনীগ্লিকে অন্সরণ করা হয়েছে, যদিও উভয় ক্ষেত্রে কাহিনীগ্লি হ্বহ্ এক নয়। খৃস্টধর্মের সঙ্গে মোহম্মদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল এবং কোরাণের অন্তত দুটি স্থানে (৭।৪৮ এবং ৪৬।১৯) ল্ক বর্ণিত স্সমাচারের প্রভাব বর্তমান। বাইবেল বর্ণিত কয়েকজন প্রেরিত প্রুষও কোরাণে স্থান পেয়েছেন, এ ছাড়া দ্জন প্রাচীন আরবীয় ধর্মপ্রচারক সালিহ্ এবং হ্দ-এর উল্লেখ কোরাণে আছে (৭।৬৩, ৭।৭১, ১১।৫২)।

কোরাণের যে বর্তমান সংস্করণ আমরা দেখতে পাই তাতে ১১৪টি অধ্যায় আছে, প্রারম্ভিক অধ্যায়টির নাম ফতীহ্। প্রতিটি অধ্যায়েরই (স্রা) একটি করে নাম আছে এবং সেটির রচনাস্থল (মক্কা অথবা মদিনা) ও শ্লোক সংখ্যা (আয়াৎ) দেওয়া আছে। ধর্মীয় প্রয়োজনে সমগ্র কোরাণকে ৬০টি খণ্ডে (আহ্জব) অথবা ৩০টি বিভাগে (অজ্জ্) ভাগ করা হয়েছে, প্রতিটি খণ্ড বা বিভাগের আবার কয়েকটি করে উপবিভাগ (র্কা বা সজদা) আছে। সমগ্র কোরাণের মধ্যে কিছ্ কিছ্ প্রক্ষিপ্ত শ্লোকও আছে, যেগ্লির সংখ্যা, পণ্ডিতদের মতে, ৫ থেকে ৫০০।

লিখিত আকারে কোরাণকে প্রথম প্রতিষ্ঠিত করেন মোহম্মদের অন্রক্ত সেবক জাইদ ইবন থাবিট এবং আব্বকর যখন আরবের খলিফা তখন খণ্ড খণ্ড অংশগ্লিকে একটি গ্রন্থে রূপ দেওয়া হয়। আব্বকরের মৃত্যুর পর গ্রন্থটি আসে খলিফা ওমরের হাতে এবং ওমরের মৃত্যুর পর ম্ল কোরাণ ওমরের কন্যা, মোহম্মদের অন্যতমা পত্নী, হাফশার অধিকারে আসে। ইতিমধ্যে কোরাণের বহ্ জাল সংস্করণ বেরিয়ে যায় এবং খলিফা ওসমানের রাজত্বকালে জাইদকে সভাপতি করে কোরেশ বংশের তিনজন লোক নিয়ে একটি কমিশন বসানো হয় ম্ল কোরাণের অন্লিপি প্রস্তুত করার জন্য। খলিফার আদেশে, একমাত্র হাফশার কাছে রক্ষিত ম্ল গ্রন্থটি ছাড়া, বাজারে প্রচলিত সমস্ত জাল কোরাণ প্রড়িয়ে ফেলা হয়। বর্তমানে আমরা যে কোরাণ দেখি তা খলিফা ওসমানের আমলের সংস্করণ যা রচিত হয়েছে হাফজার কাছে রক্ষিত ম্ল গ্রন্থ থেকে।

কোরাণের ব্যাখ্যাম্লক গ্রন্থের সংখ্যা অজস্র, যেগ্লির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত হচ্ছে হাদিশ।

এবার কোরাণের বিষয়বস্তুর কিছ্টা পরিচয় দেওয়া যাক। কোরাণের প্রায় অর্ধাংশই আল্লাহর মহিমাকীর্তনে নিয়োজিত। আল্লাহ্ শব্দটির ঠিক কোন প্রতিশব্দ খ্ঁজে পাওয়া যায় না। কোরাণ অন্যায়ী সকল প্র্ণগ্ণের আধার, সকল ত্রটিবর্জিত, স্বয়ম্ভূ ও নিশ্চিত অস্তিত্ববান যে সত্তা, তারই নাম আল্লাহ্। উপনিষদ কথিত ব্রহ্মের সঙ্গেই আল্লাহের ভাবগত সাদৃশ্য খ্ঁজে পাওয়া যায়। কোরাণে আল্লার ৯৮টি গ্ণবাচক নাম আছে।

কোরাণের দ্বিতীয় স্রা বকরা নামে খ্যাত। এই স্রা বা অধ্যায়ে ইহ্দি জাতির পতনের কারণ বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেই দিক থেকে এই অধ্যায়টির রীতিমত ঐতিহাসিক গ্রত্ব আছে। আগেই উল্লেখ করেছি যে, কোরাণের বহ্স্থানেই ওল্ড টেস্টামেণ্ট বর্ণিত কাহিনীগ্লি বর্ণিত হয়েছে, অবশ্য বহ্ ক্ষেত্রেই পরিবর্তিত রূপে। আদি মানব-মানবী হিসাবে আদম ও ইভের (কোরাণে ইভের নাম হবা) স্বীকৃতি কোরাণেও আছে, নিষিদ্ধ ফলের উল্লেখ না থাকলেও নিষিদ্ধ বৃক্ষের কথা আছে এবং শয়তান (ইবলিশ) কর্তৃক উভয়ের পদস্খলনের কথা কোরাণে উল্লিখিত। তবে বাইবেলের কাহিনীর সঙ্গে কোরাণ বর্ণিত কাহিনীর পার্থক্য এই যে, বাইবেলের আদি মানব-মানবীকে যেখানে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণরূপ আদিম পাপের ঋণ বংশপরম্পরায় স্বীকার করে যেতে হয়েছে চরম দ্ঃখ ও দণ্ডভোগের ভেতর দিয়ে, কোরাণ কথিত আদম কিন্তু অল্পেই আল্লাহের ক্ষমা পেয়েছিলেন, কেন না আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল।

কোরাণের ভাষ্য অন্যায়ী আল্লাহে পরিপ্র্ণ বিশ্বাস স্থাপনের অভাবেই ইহ্দি জাতির পতন হয়েছিল এবং কোরাণে এ কথাও বারবার বলা হয়েছে যে, ইহ্দিরা যদি মোজেসের অন্শাসনগ্লি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করত তাহলে ঈশ্বরের রুদ্ররোষ তাদের উপর নেমে আসত না। কোরাণে খৃস্টেরও উল্লেখ রয়েছে মরিয়ম তনয় ইশা এই নামে। কিন্তু খৃস্টের জন্মসংক্রান্ত অলৌকিক কাহিনীগ্লি কোরাণ স্বীকার করে না।

এ ছাড়া কোরাণে আছে অজস্র সামাজিক ও নৈতিক অন্শাসন, উত্তরাধিকার, বিবাহ, বিধবা বিবাহ, খাদ্যাখাদ্য বিচার প্রভৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন বিধানসমূহ। একটি সমগ্র র্কু স্দ গ্রহণের বির্দ্ধে লিখিত হয়েছে। য্দ্ধ সংক্রান্ত বিষয়েও কোরাণের নানান নির্দেশ আছে। জেহাদ বা ধর্ময্দ্ধের প্রকৃত তাৎপর্য কোরাণে বর্ণিত হয়েছে। কোরাণে মানবসমাজকে যে সকল বিষয়ের শিক্ষাদান করা হয়েছে, সেগ্লিকে ম্লত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারেঃ (১) তত্ত্বজ্ঞান বা মারফাতে এলাহী, (২) পরকাল তত্ত্ব বা এলমুল মাআদ এবং (৩) অদৃষ্টবাদ ও কর্মবাদ।

কোরাণের মারফাতে এলাহী বা তত্ত্বজ্ঞানের ম্ল কথা হল আল্লাহ্কে পেতে গেলে প্রথমেই তাঁর নাম জপ করতে হবে, কোরাণীয় পরিভাষায় এই জপ করার নাম জেকের। নামের মধ্যে নিহিত ভাবের যথাসাধ্য ধারণা করার সঙ্গে ম্খে সেই নামের উচ্চারণ—মোটাম্টিভাবে এরই নাম জেকের। স্রা বকর-এ বলা হয়েছে, আল্লাহ্ বিশ্ববাসীদের ঘনিষ্ঠ বন্ধ্ ও

অভিভাবক, তাদের তিনি তমসা হইতে জ্যোতির্ময়তায় উন্নীত করেন। এই জ্যোতি বা আলোককে কোরাণে 'নূর' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। নিশ্চিত-সত্তা, সকল গুণের আকর, সকল ত্রুটি বর্জিত, মানুষের সর্বাপেক্ষা নিকট বন্ধু যে আল্লাহ্ তাঁর সম্বন্ধে সম্যক ধারণার জন্য সাধকের প্রথম যে অবলম্বন, তা হচ্ছে 'নাম জপ' বা জেকের। আল্লাহ্ স্বভাবতই প্রেমময়। সুরা মরয়ম-এর একটি আয়াতে (শ্লোক) বলা হয়েছে, যারা বিশ্বাসবান ও সৎকর্মশীল, আল্লাহ্ তাদের অবিলম্বে প্রেম দান করেন।

কোরাণের **এলমুল মাআদ** বা পরলোক-তত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে যে দেহের বিনাশের সঙ্গে আত্মার বিনাশ হয় না। মানুষ ইহজীবনে সৎ বা অসৎ যা কর্ম করে পরজীবনে তার অনুরূপ সুফল বা কুফল তাকে ভোগ করতে হবে। জন্মান্তরবাদ কোরাণে স্বীকৃত নয়, কিন্তু কোরাণে এ-কথা বলা হয়েছে যে, আল্লার আদেশে মানুষকে নিজ কর্মের ফলাফল ভোগ করতে হবে। আল্লার প্রতি, তাঁর সমস্ত সৃষ্টির প্রতি এবং নিজের প্রতি মানুষের যে কর্তব্য আছে, তা সম্পাদন করার নাম **আমল** বা **এবাদত**। এই এবাদত বা দাসরূপেই আল্লার নিকট আত্মসমর্পণই মানুষের কর্মজীবনের প্রধান সাধনা।

কোরাণে বলা হয়েছে যে, মানুষ ইচ্ছা ও শক্তিশূন্য অচেতন জড় পদার্থের ন্যায় সম্পূর্ণ অক্ষমও নয়, পক্ষান্তরে সে সর্বশক্তিমান ও সম্পূর্ণ স্বাধীনও নয়। তার শক্তি আছে কিন্তু তা সীমাবদ্ধ, জ্ঞান আছে কিন্তু তা মায়াপ্রপঞ্চে আচ্ছাদিত, ইচ্ছা আছে কিন্তু তা রিপু ও প্রবৃত্তির প্রভাবে আবিল। তাই তার শক্তি, জ্ঞান ও ইচ্ছা সার্থকতার জন্য একান্তভাবেই আল্লার উপর নির্ভরশীল।

মহম্মদোত্তর যুগের আরবীয় কাব্যসাহিত্য

মহম্মদের মৃত্যুর পরবর্তী শতকে, অর্থাৎ ওম্মীয় যুগে, আমরা চারজন কবির উল্লেখ পাই। তাঁরা হচ্ছেন যথাক্রমে আখতাল, ফরাজদক, জরীর এবং যুর-রুম্মা। এঁদের কবিতায় সেই পুরাতন আমলের আরব কবিদের মতই নিজ গোষ্ঠীর প্রশংসা ও শত্রুগোষ্ঠীর নিন্দা ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ তাঁদের কাব্যে গোষ্ঠীসচেতনতা আছে, কিন্তু কোন জাতীয় সাহিত্যের প্রতিফলন তাঁরা ঘটাতে পারেন নি। কিন্তু ইতিমধ্যে ইসলামধর্মের অনুপ্রেরণায় আরবে জাতীয়তাবাদের বিকাশ তথা জাতীয় সাহিত্যের সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠছিল। মক্কার ওমর-ইবন-আবি-রবিয়া এবং তাঁর শিষ্য জামিল দেহাতীত প্রেমকেই তাঁদের কবিতার উপজীব্য বিষয় করেছিলেন। এঁদের রচনাসমূহ স্বগোষ্ঠীকেন্দ্রিকপ্রবণতাসমূহকে অস্বীকার করতে সক্ষম হয়েছিল। এঁদের অনুসরণ করে একটি কবিগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মজনুন বনি আমীর এবং লাইলা। খলিফা প্রথম ইয়াজিদ (৬৮০-৬৮৩) এবং খলিফা ওয়ালিদও (৭৪৩-৪৪) নাম করা কবি ছিলেন।

আব্বাসীয় যুগে আরবীয় সংস্কৃতি পারসিক সংস্কৃতির দ্বারা প্রভূত প্রভাবিত হয়েছিল এবং কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রেও সেই প্রভাব সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিল। এই নতুন সাংস্কৃতিক ভাবধারার প্রতীক ছিলেন কবি আবু-নুওয়াস। তাঁকে কেন্দ্র করে একটি প্রগতিশীল রোমান্টিক কবিগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। এই নতুন গোষ্ঠী আরবীয় কবিতার আঙ্গিক সম্পূর্ণ পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অবশ্য প্রাচীনপন্থী কবিরাও সংখ্যায় বড় কম ছিলেন না, এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইবন ওয়ালিদ, আবু তাম্মান ও মুতান্নবী। অবশ্য এই সব কবিদের রচনাবলীর নিদর্শন নেই বললেই চলে। আব্বাসীয় যুগের শেষের দিকের কয়েকজন কবির রচনা অবশ্য পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে প্রথম উল্লেখ যোগ্য হচ্ছেন আবুল আতাহিয়া যিনি নীতিমূলক কবিতা রচনার জন্য বিখ্যাত হয়েছিলেন। ঐতিহাসিক কাব্য রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন ইবন্ আল মুতাজ। রোমান্টিক কবি আবুল আলাউল মাআরি রচিত লুজুমিয়াৎ সম্ভবত আরবীয় কাব্যসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। আব্বাসীয় যুগের অপরাপর কবিদের মধ্যে ছিলেন অতীন্দ্রিয়বাদী কবি ইবন আরাবী এবং ইবন ফরিদ।

আরবীয় কবিতা পরবর্তীকালে ইউরোপ মহাদেশেও একটি বিশিষ্ট স্থানলাভে সক্ষম হয়েছিল। স্পেনে সেভিলের ইবন হানি আরবীয় কবিতা জনপ্রিয় করেছিলেন। স্পেনে আরবীয় কবিতার একটি নতুন ছন্দ উদ্ভাবিত হয়েছিল যা **মুওয়াশশাহ** নামে বিখ্যাত। মূল আরব ভূখণ্ডের বাইরে যাঁরা আরবীয় কবিতাকে জনপ্রিয় করেছিলেন—তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন কাইরাওয়ানের ইবন রশিক, কর্ডোভার ইবন জাইদুন সেভিলের রাজা মুতামিদ এবং তাঁর মন্ত্রী ইবন আম্মর। এ ছাড়া ছিলেন সিসিলির বিখ্যাত আরব কবি ইবন হাম্দিস।

উপরে উল্লিখিত কবিগণ ছাড়াও আরও কয়েকজন পরবর্তীকালের কবির রচনা পাওয়া গেছে। এগুলি হচ্ছে ফালিবি রচিত **যতিমৎ-আদ-দহর**, খাগান রচিত **কালাইদ-আল-ইকিয়ান** এবং কাদির রচিত. **খিজানৎ-আল-আদাব**।

আরবীয় গদ্যসাহিত্য:

খৃস্টীয় অষ্টম ও নবম শতক থেকেই আরবীয় গদ্যসাহিত্যের বিকাশ আরম্ভ হয়। আরবীয় গদ্যসাহিত্য চরিত্রের দিক থেকে খুব মৌলিক নয়। আরবীয় গদ্যসাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ নিদর্শন হিসাবে প্রথমেই যে গ্রন্থটির কথা মনে উদিত হয় তা হচ্ছে **কালিলা-ওয়া-দিমনা**। এটি একটি অনুবাদগ্রন্থ, এই গ্রন্থের হিব্রু সংস্করণের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। কাহিনীমূলক গদ্যসাহিত্য হিসাবে সর্বপ্রথম তালুখী রচিত **ফরজ-বাদ-আশ-শিদ্দা** এবং **নিশওয়ার-আল-মুহাওরা** এই দুইটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করতে হয়, দুটি গ্রন্থই নবম শতকে রচিত।

রসরচনার ক্ষেত্রে আরবীয় সাহিত্যে যুগান্তর এনেছিলেন হামাধানি। তাঁর রচিত **মাকামাৎ** একটি অনবদ্য সৃষ্টি। এই গ্রন্থের নায়ক একটি ভ্যাগাবণ্ড যার কাজ বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তার দ্বারা প্রখ্যাত পণ্ডিত ও নামকরা ব্যক্তিদের ধরাশায়ী করা। পরবর্তীকালে এই শ্রেণীর সাহিত্য-রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন হারিরি। এইগুলি ছাড়াও ঈশপের গল্পগুলির আরবীয় অনুবাদ এবং বিখ্যাত 'এক সহস্র এক রজনী'-র কথা বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

মহাপুরুষ মোহম্মদের জীবনকথা অনেক লেখকেরই রচনার উপজীব্য বিষয় হয়েছিল। মোহম্মদের প্রথম জীবনীকার ছিলেন ইবন ইসাক। পরবর্তী জীবনীকারদের মধ্যে ইবন ওকবা এবং ওয়াকিদির নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। মক্কার ইতিহাস প্রথম লেখেন আজরাকি এবং ইবন মোকাফা পারসিক রাজন্যবর্গের কাহিনী আরবীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। আরবীয় ঐতিহাসিকের সংখ্যা প্রচুর, কিন্তু গ্রীক ও ল্যাটিন ঐতিহাসিকদের রচনায় যেমন ইতিহাস ও সাহিত্য একাকার হয়ে গেছল, আরব ঐতিহাসিকদের রচনায় তা হয় নি। এই কারণেই তাঁদের রচিত গ্রন্থাবলীর বিষয়বস্তুর উল্লেখ এখানে না করে, একটি পরিশিষ্টে সেগুলির তালিকা পেশ করবো। ভূগোল, বিজ্ঞান, গণিত ও অপরাপর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও আরবীদের অবদান যথেষ্ট। কিন্তু আগেই বলেছি, একমাত্র কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্র ছাড়া, জ্ঞানবিজ্ঞানের অপরাপর ক্ষেত্রে রচিত আরবীয় গ্রন্থাবলী অপরাপর দেশে রচিত গ্রন্থসমূহের অনুবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়।

অবশ্য এই অনুবাদ প্রবণতার জন্য আরবীয়দের দোষ দেওয়া যায় না। মোহম্মদের পূর্বে আরবজাতি বলে কিছুই ছিল না। ইসলাম ধর্মকে অবলম্বন

করার সঙ্গে সঙ্গেই নতুন যে আরবীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়, তার ফলে জগৎ ও জীবনকে প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করবার যে মনোভাব আরবীয়দের মধ্যে সৃষ্ট হয়েছিল তার চাহিদা মেটানোর জন্য অতীতকালের জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলিকে অনুবাদ করে নেওয়া ভিন্ন তাদের সামনে আর কোন পথ খোলা ছিল না। ভারতীয়, গ্রীক ও সিরীয় গ্রন্থগুলির আরবীয় ভাষায় অনুবাদ হওয়ায় তাদের জীবনে যে নতুনতর প্রেরণার সৃষ্টি হয়েছিল এ কথা অস্বীকার করা যায় না। আব্বাসীয় খলিফাগণ জ্ঞানবিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। খলিফা মামুন নিজের চারপাশে অনেক পণ্ডিতকে সমবেত করেছিলেন এবং আলোচনা, অনুবাদ ও সংকলনকার্যের জন্য একটি জ্ঞানসভা (বায়তুল হীকমাৎ) স্থাপন করেছিলেন।

গ্রীক ভাষা থেকে অনুবাদকারীদের মধ্যে ছিলেন অ্যারিস্টটল ও প্লেটোর রচনার আরবীয় অনুবাদক হুনাইন (৮০৯-৭৩ খৃস্টাব্দ) এবং তাঁর পুত্র ইশাক (৮৭০-৯১০ খৃস্টাব্দ)। অন্যান্য অনূদিত গ্রন্থগুলি ছিল ঃ আলেকজান্ডার, আফ্রোদিসিয়াস ও পরফিরিয়াসের টীকাসমূহ, এবং প্লটিনাসের এন্নিয়াডের কিছু অংশ। অপরাপর অনুবাদকদের মধ্যে ছিলেন, আল্ কিন্দী (মৃত্যু ৮৭৩ খৃস্টাব্দ), ফারাবী (মৃত্যু ৯৫০ খৃস্টাব্দ), ইখবান-আল-সফা (৯৭০ খৃস্টাব্দ, এঁরা একটি গোষ্ঠী ছিলেন), ইবন মসকওয়াইব (মৃত্যু ১০৩০ খৃস্টাব্দ) এবং ইবন সিনা (মৃত্যু ১০৩৭ খৃস্টাব্দ)। এঁরা ছিলেন প্রাচ্যদেশে মুসলিম দর্শনের ইতিহাসে খ্যাতনামা পুরুষ।

আরবীয়দের অনুবাদ-প্রবণতার ফলাফল জগদ্বাসীর নিকট মঙ্গলদায়ক হয়েছে একথা নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক মাত্রেই স্বীকার করবেন। মধ্যযুগের অন্ধকারময় ইউরোপে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ও পোপতান্ত্রিক খৃস্টধর্ম জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছিল। ইউরোপ ভুলে গেল তার প্রাক্-খৃস্টীয় অতীত, ভুলে গেছল তার গ্রীক ও ল্যাটিন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার, ভুলে গেছল হোমারের মত মহাকবিকে; প্লেটো, অ্যারিস্টটল, এপিকুরিয়াস, পারমেনিদেস, হেরাক্লাইটেসের মত দার্শনিকদের, ইউক্লিড, পিথাগোরাসের মত বৈজ্ঞানিকদের। খৃস্টধর্ম ইউরোপবাসীকে করে তুলেছিল জীবন-বিমুখ, জীবন বলতে তারা বুঝত 'মৃত্যুর ওপারে ঈশ্বরের রাজ্যে কণ্টকর তীর্থযাত্রা।' গ্রীস ও রোমের জীবন-কেন্দ্রিক ভাবধারার পুনর্জাগরণ হয়েছিল পঞ্চদশ শতকে, যে যুগটি ইউরোপের ইতিহাসে রেনেসাঁসের যুগ বলে চিহ্নিত, যে যুগে ঘটেছিল পোপতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রাচীন প্যাগান জীবনবাদের প্রথম সার্থক বিজয়। এই রেনেসাঁসের মূলে আরব মনীষারও কিছুটা অবদান ছিল। হারিয়ে যাওয়া গ্রীক দার্শনিকদের রচনার আরবীয় অনুবাদ আরব বণিকরাই ইউরোপে নিয়ে গেছলেন, এবং তাঁদেরই মারফৎ ইউরোপবাসী নতুন করে তাঁদের পুরাতন ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। এদিক থেকে বিচার করলে, যদিও আরব মনীষায় মৌলিকতার কিছুটা অভাব ছিল, তথাপি অনুবাদের মাধ্যমে তাঁরা যা করেছেন তার তুলনা নেই।

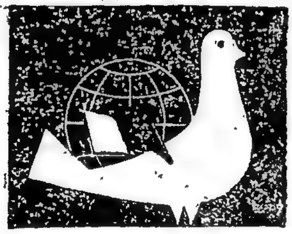

পড়ুন ও গ্রাহক হোন

সোভিয়েত দেশ

(সচিত্র পাক্ষিক পত্রিকা)

বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া, হিন্দী ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় এবং ইংরাজী ও নেপালী ভাষায় প্রকাশিত

ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর মুখপত্র সোভিয়েত জীবনের অপূর্ব প্রতিচ্ছবি

গোটা পরিবারেরই পড়বার উপযোগী

কনসেশন

হারের সুযোগ হারাবেন না

চাঁদার কনসেশন হার

	এক বছর	তিন বছর
(১) বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া, হিন্দী ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষা ও নেপালী	টা ৫·০০	টা ১০·০০
(২) ইংরাজী	টা ৬·০০	টা ১২·০০

নতুন গ্রাহকদের জন্য **বিনামূল্যে উপহার**

অনুগ্রহ করে তিন বছরের গ্রাহক হোন, তা হলে ১৯৬৭ সালের সচিত্র ১৩ পাতার ক্যালেণ্ডারের সঙ্গে ডাকযোগে প্লাস্টিকের কভার দেওয়া একটি পকেট ডায়েরীও পাবেন অতিরিক্ত উপহার হিসাবে। এক বৎসরের গ্রাহক মাত্র একটি ক্যালেণ্ডার পাবেন। কোন্ ভাষার কাগজ চান মনি অর্ডার কুপনে সে কথা লিখতে ভুলবেন না। আমাদের অনুমোদিত এজেণ্টকেই টাকা দিবেন। এজেণ্টের কাছে তাঁর ফটো সহ আমাদের অনুমোদন পত্র থাকবে। অনুমোদিত এজেণ্টের প্রতিনিধিকেও টাকা দিতে পারেন। রসিদে এজেণ্টের সহি আছে কিনা দেখে নিতে ভুলবেন না। অথবা সরাসরি আমাদের কাছে টাকা পাঠান এই ঠিকানায়ঃ

সোভিয়েত দেশ অফিস ১/১, উড স্ট্রীট, কলিকাতা—১৬।

INTERADS

হলডেনের বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প

আশিসকুমার সিংহ

সাধারণের কাছে জে বি এস হলডেনের প্রধান পরিচয় দুটি—প্রথমত তিনি এ-যুগের একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, আর দ্বিতীয়ত গবেষণাগারের বাইরে পরিব্যাপ্ত জনসমাজের কাছে বিজ্ঞানকে পৌঁছে দেওয়ার কাজে তিনি অন্যতম পথিকৃৎ। এই দ্বিতীয় ভূমিকায় তাঁকে আমরা দেখেছি প্রধানত প্রবন্ধকার হিসেবে। অজস্র প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্য, সমাজের সঙ্গে বিজ্ঞানচর্চা ও বিজ্ঞানদৃষ্টির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তথা বিজ্ঞানীর সামাজিক দায়িত্ব নিয়ে দ্ব্যর্থহীন মতামত জ্ঞাপন করেছেন এবং এই প্রবন্ধগুলিই এই বিজ্ঞানীর সমাজচেতনার প্রধান ফসল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু প্রধান হলেও এরা একমাত্র নয়। একই উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকটি বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পও রচনা করেছেন। সম্ভবত সংখ্যাল্পতার জন্য সেগুলি সাধারণ আলোচনায় উপেক্ষিত। কিন্তু এদের বাদ দিলে তাঁর কৃতিত্বের সামগ্রিক পরিচয় পূর্ণ হয় না। কেন না, বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পের মধ্যে এরা একটি বিশেষ চরিত্রমহিমায় উজ্জ্বল। তাই এইচ্ জি ওয়েল্সের জন্মশতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে এই গল্পগুলির একটি আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

পরিণত বয়সের পাঠকদের জন্য হলডেন একটিমাত্র গল্প রচনা করেছেন। "দি গোল্ড্ মেকার্স" নামে এই গল্পটি তাঁর "দি ইন্ইকোয়ালিটি অব্ ম্যান্" গ্রন্থের শেষে স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া ছোটদের জন্য গোটাছয়েক গল্পের একটি গ্রন্থও তাঁর এই পর্যায়ের রচনার অন্তর্ভুক্ত। "মাই ফ্রেন্ড্ মিঃ লিকি" নামক এই গ্রন্থটি "এক যে ছিল যাদুকর" নামে বাঙলায় অনূদিত হয়েছে (অনুঃ অশোক গুহ)। আমরা অবশ্য মূলত "দি গোল্ড্ মেকার্সে"ই আমাদের আলোচনা সীমিত রাখব। তবে আগে এই গল্পের কাহিনীটিকে সংক্ষেপে বলে নিলে সুবিধা হবে।

দি গোল্ড্ মেকার্স

প্রথমে কবুল করা ভালো যে পরবর্তী আলোচনার সুবিধা হবে বলেই কাহিনীটি এখানে সংক্ষেপে দেওয়া হচ্ছে। গল্পের মূল রস এভাবে দেওয়া অসম্ভব এবং সেটা আমাদের উদ্দেশ্যও নয়। গল্পটির কাহিনী এবং নির্মাণকৌশলের যথাসাধ্য পরিচয় দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। মূল রস যাঁরা চান, মূল গল্প তাঁদের পড়তেই হবে।

গল্পের নায়ক হলডেন নিজে। তিনি

জে বি এস হলডেন

মাঝে মাঝে প্যারিসে বৈজ্ঞানিক ভাষণ দিতে যান। ১৯৩০ সালের ২৮শে জুন এমন একটি ভাষণের পরে রাত ১১টায় একটি 'বার'-এ বসে তিনি খুব অল্প মদ্যপান করছিলেন এবং ছেলেমেয়েদের খেলা দেখছিলেন। এমন সময় ছিন্নবাস এক ব্যক্তি তাঁকে ধাক্কা দিয়ে চলে গেল; যাওয়ার সময় তাঁর হাতে একটা চিরকুট গুঁজে দিয়ে গেল সে। ল্যাম্পপোস্টের আলোয় হলডেন দেখলেন চিরকুটে লেখাঃ "যদি বিজ্ঞানকে ভালবাসেন তবে এটা পড়ুন, আর আরও জানতে চাইলে আমার পেছনে আসুন।" তার নিচে একটা ইকোয়েশন দেওয়া ছিল। লোকটা অল্প দূরে গিয়ে দাঁড়াল। হলডেন তার কাছে যেতেই সে রাত ১২টায় শহরের বাইরের দিকে একটা Bar-এ তাঁকে আসতে বলে চলে গেল।

হলডেন একটু ভয় পেলেন। তাঁর বন্ধু মার্টাউকে ফোন ক'রে তিনি যেখানে যাচ্ছেন জানালেন, আর বললেন, পরদিন বেলা দশটায় সে যদি তাঁকে তাঁর হোটেলে না পায়, যেন পুলিশে জানায়। তারপরে সেই Bar-এর দিকে রওনা হলেন।

রাত বারটার দু' মিনিট আগে তিনি সেই Bar-এ পৌঁছে দেখলেন লোকটা তখনও আসে নি। Barটি আর পাঁচটা Bar-এর মতই। ভিতরে এক লরি ড্রাইভার বসে অনর্গল বকে যাচ্ছে। তিনি কফির অর্ডার দিয়ে দরজার দিকে মুখ ক'রে বসলেন। ঠিক বারটায় লোকটা এল। তার জন্য আর একটা কফির অর্ডার দিয়ে তাকে বসতে বললেন

লোকটাকে দেখেই মনে হয় সে ভীত। কিন্তু এ-ভয় প্রথম গোলাবর্ষণের পরে নতুন সৈনিকের ভয় নয়; এ-ভয় আরও গভীর, ১৯১৮ সালের ভয় এ। যা হোক সে বসে যে-ঘটনাটা বলল সেটা এই রকম।

ইউজিন গ্যালইস্ নামে এক বড় বিজ্ঞানী, হলডেন তাঁকে চেনেন, রাষ্ট্রের আর্থিক নিয়ন্ত্রণ থেকে বিজ্ঞান গবেষণাকে মুক্ত করবার জন্যে সমুদ্রজল থেকে সোনা-নিষ্কাশনের এক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। গ্যালইস্, রিকিয়ার এবং এই লোকটির (এর নাম মার্টিন) সঙ্গে একত্রে তাঁর উদ্ভাবিত পথে সোনা নিষ্কাশন শুরুও করেন। অল্পদিনে তাঁদের হাতে প্রচুর অর্থ আসে। তখন তাঁরা মুশকিলে পড়েন। কারণ, আরও দ্রুত সোনা করলে সমাজের ভাল হবে না খারাপ হবে সেটা তাঁরা বুঝতে পারছিলেন না। কিভাবেই বা এ-টাকা বিজ্ঞানীদের ব্যবহারে আনা যায় তাও তাঁদের স্থির ছিল না। অবশেষে যখন টাকাটা লীগ্ অব নেশনসের হাতে দেওয়া সাব্যস্ত করলেন এমন সময় একদিন A. I. D. I. R. নামে এক ছদ্মবেশী প্রতিষ্ঠান তাঁদের চিঠি দিল যে, যেহেতু তাঁদের কাজে অচিরেই A. I. D. I. R. -এর অসুবিধা দেখা দেবে অতএব তাঁরা যেন কাজ বন্ধ করেন। বিনিময়ে তাঁদের প্রত্যেককে প্রতি বছর দু' লক্ষ ফ্রাঙ্ক করে দেওয়া হবে। চিঠিটা দ্বিতীয়বার পড়তে যেতেই গুঁড়ো হয়ে গেল।

এতে ভয় না পেয়ে তাঁরা তাঁদের সোনা

নিষ্কাশন অ...হত রাখলেন। তবে সাবধানতা বাড়িয়ে দিলেন আগের চেয়ে।। কিন্তু শত্রুকে এতে ঠেকান গেল না। ঘাড়ের একটা ফোঁড়ার চিকিৎসার জন্যে শহরে এসেছিলেন মার্টিন। ফিরে গিয়ে শুনলেন গ্যালইস রিকিয়ারকে টাকার লোভে খুন করেছেন। দু'জন সুইস্ যাত্রী আদালতে শপথ করল যে, তারা গ্যালইস্‌কে গুলী করতে দেখেছে; একজন বন্দুক ব্যবসায়ী বলল যে, যে-পিস্তলে গুলী ছোঁড়া হয়েছে সেটা গ্যালইস্ তার দোকান থেকে কিনেছিলেন। এদিকে ফার্নান্ডেজ নামে এক ব্রাজিলীয় ব্যবসায়ী জাল নথিপত্র দিয়ে বললেন যে, গ্যালইস্ সমুদ্রজল থেকে সোনা নিষ্কাশনের জন্যে তার কাছ থেকে টাকা ধার করেছে, কিন্তু শোধ করছে না। এই দুই অভিযোগে গ্যালইসের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। সেখানে তিনি সম্প্রতি মারা গেছেন।

গ্যালইসের উকিল পরে এমন নথিপত্র সংগ্রহ করেছিলেন যাতে প্রমাণ হয় ফার্নান্ডেজ এবং একজন সুইস্ এক সোনার খনির মালিকদের সঙ্গে জড়িত; কিন্তু...

গল্পটি এই পর্যন্ত এগিয়েছে ঠিক এই সময় হলডেন দেখলেন একটি বোমা বাতাসের মধ্য দিয়ে আসছে।' সেটা ঠিক তাঁর কফির কাপে এসে নামল। তিনি গত মহাযুদ্ধে ছিলেন হাতবোমার এক্সপার্ট। সঙ্গে সঙ্গে সেটা নিয়ে ছুটে গিয়ে ছুঁড়ে দিলেন বাইরে অপেক্ষমাণ একটি গাড়ির মধ্যে। গাড়িতে দুজন আরোহী ছিল। সেটা তখন জোরে স্টার্ট দিয়েছে। তা' থেকেই বোমাটা ছোঁড়া হয়েছিল। যে ছুঁড়েছিল সে তখনও দাঁড়িয়ে। তার আশা ছিল ওরা নিশ্চয়ই দৌড়ে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু হলডেন যে বোমা ফিরিয়ে দেবেন তা সে ভাবতে পারে নি। তাই হলডেনকে দেখেই সে গুলী করতে শুরু করে, কিন্তু হাতের টিপ ঠিক হয় না। একটা গুলী হলডেনের রেইনকোট ফুটো করে যায়, অন্যটা পেছনের কাউন্টারের মোটা ভদ্রমহিলাকে আহত করে। ইতিমধ্যে বোমাটা ফাটে। লোকটা লাফিয়ে গাড়ি থেকে নামে, কিন্তু ফুটপাতে পড়ে যায়; আর অন্য লোকটা গাড়িতেই শেষ হয়। হলডেন দৌড়ে চলে যান, যাওয়ার সময় ফুটপাতের লোকটির মাথায় সজোরে এক লাথি মেরে যান। তারপর হোটেলে ফেরেন, কফির দাম দেন নি বলে খারাপ লাগে, পরে ঘুম এবং পরদিন বেলা দশটায় জেগে ওঠেন।

জেগেই ঠিক করেন, ফ্রান্সে আর একদণ্ড নয়। বার্টাউকে ফোনে জানান তিনি ভাল আছেন। তাকে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করেন; তারপরে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে টিকিট কাটতে গিয়ে দেখেন একজন তাঁকে লক্ষ্য করছে। এরপর চলে অনুসরণের পালা। তিনি লাঞ্চের রেস্তোরাঁয় এসে বার্টাউ-এর কাছে বিদায় নিয়ে জার্মানীর দিকে যেতে থাকেন। সেখানেও তাঁকে অনুসরণ করা হয়। তারপরে ট্রেন এক জায়গায় স্টেশনের বাইরে অল্প সময় থামলে লাফিয়ে নামেন এবং দৌড়ে বড় রাস্তায় উঠে লেভেল ক্রসিং-এ অপেক্ষমাণ এক লরিতে ওঠেন। লরি চালককে তিনি বলেন যে, হত্যাকারীরা তাঁকে অনুসরণ করছে। তাকে টাকা দিয়ে Besancon পেঁছেন, রাতটা সেখানে কাটিয়ে পরদিন সেই লরিতে কিছুদূর গিয়ে নেমে পড়েন এই বলে যে, তিনি পায়ে হেঁটেই সুইজারল্যান্ড যাবেন। লরি থেকে নেমে ঘুর পথে তিনি আসলে ফ্রান্সের দিকে পা বাড়ান।

যেতে যেতে তিনি ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। তাঁর মনে হয় A. I. D. I. R. তাঁকে সম্ভবত এই জন্যে খুঁজছে যে, তারা মনে করেছে তিনি মার্টিনের কাছ থেকে সোনা নিষ্কাশনের পদ্ধতি জেনে নিয়েছেন। তিনি তাই সমুদ্রজল থেকে সোনা নিষ্কাশনের ব্যাপারে যা জানেন সবটাই প্রকাশ ক'রে দেবেন সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু সেটা কোন বিজ্ঞানপত্রে না দিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পের আকারে প্রকাশ করতে চান এই জন্যে যে, তাহলে লোকে প্রথমত এটাকে গল্প হিসাবেই নেবে। আর যদি তাঁর গ্যালইসের মত অবস্থা হয়, তবে অবশ্য এই গল্পই তাঁর পক্ষের একটা বড় প্রমাণ হিসেবে তিনি ব্যবহার করবেন। তাই এই গল্পটিকে তিনি বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পের পত্রিকায় পাঠাচ্ছেন। এটা প্রকাশ হয়ে গেলে তিনি তাঁর বন্ধুদের নিজের ঠিকানা জানিয়ে যোগাযোগ করতে ও টাকা পাঠাতে বলবেন। এর আগে সেটা করা যাচ্ছে না। কেন না A. I. D. I. R.-এর চর সর্বত্রই আছে। ইতিমধ্যে তাঁর টাকা ফুরিয়ে আসছে এবং তিনি রোজগার বাড়ানর চেষ্টা করছেন। গল্পটি প্রকাশের আগেই যদি টাকা ফুরিয়ে যায়, তবে তিনি পাসপোর্টহীন বিদেশী হিসেবে আত্মসমর্পণ ক'রে জেলে যাবেন। পাসপোর্ট তিনি পুড়িয়ে ফেলেছিলেন আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে। তারপরে গল্পটি প্রকাশিত হলে তিনি বন্ধুদের জানাবেন যে, তিনি মিঃ থোরগ্রিম ম্যাগনুসন নাম নিয়ে জেলে আছেন। বন্ধুরা এসে তাঁর পরিচয় দিয়ে তাঁকে উদ্ধার করবে।

খুব সংক্ষেপে এই হল কাহিনীর মূল কাঠামো। গল্পটির প্রসঙ্গে প্রথমেই যে-বিষয়টি চোখে পড়ে তা হল বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প বলতে সাধারণত যা আমরা বুঝে থাকি এই গল্পটি তাদের মত নয়। এর নায়ক-নায়িকার চরিত্রে অতি-প্রাকৃতের লেশমাত্র নেই, কাহিনীও আমাদের বাস্তব জগতকে কেন্দ্র করেই বিন্যস্ত। কিন্তু তা' হলেও একে বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পই বলতে হবে। কারণ, প্রকৃতির দিক দিয়ে এটি গল্প এবং এর ভিত্তি রচনা করছে একজন সমাজ-সচেতন বিজ্ঞানীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি। এই পার্থক্যের কথা স্মরণ করেই এবার এগোনো যাক।

গল্পের নামকরণ তথা বিষয়বস্তু নির্ধারণেই তাঁর সমাজ-চেতনার পরিচয় পরিস্ফুট। নামটা পড়লেই বিজ্ঞানের ইতিহাসের পাঠকের স্মৃতিতে জেগে ওঠে মধ্যযুগীয় অ্যালকেমিস্টদের ইতর ধাতুকে সোনা করবার ব্যর্থ প্রয়াসের ইতিহাস। এই স্মৃতিকে পটভূমি করে হলডেন তাঁর সমসাময়িক তিনজন বিজ্ঞানীর স্বর্ণ প্রস্তুতের গল্প বলেছেন। অ্যালকেমিস্টদের সময়ে বিজ্ঞানীর সমাজ-ধারণা আদৌ স্পষ্ট ছিল না। ফলে বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যও স্পষ্ট ছিল না তাঁদের কাছে। তাই তাঁদের সেই ব্যর্থ প্রয়াস তাৎপর্যহীন ছেলেমানুষির চিহ্ন হিসেবে আজও কৌতুকের স্মারক হয়ে আছে। গল্পটির রচনাকালের (১৯৩০ সাল) সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের সমাজ-চেতনা অ্যালকেমিস্টদের চেয়ে স্পষ্ট হলেও সেটা সমাজ-চেতনার শৈশবকাল। অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা তখন সমাজ সম্বন্ধে ভাবতে সবে শুরু করেছেন। তার ফলে সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট আন্তরিক হয়েও নির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাবে তাঁদের সমাজ-সচেতন কাজগুলি ছেলেমানুষিতে পর্যবসিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। যেমন অ্যালকেমিস্টদের ছেলেমানুষি কৌতুককর, ঠিক তেমনি এ'দের ছেলেমানুষিকে নিয়েও হলডেন সমান কৌতুকের সৃষ্টি করেছেন। সমুদ্রজল থেকে সোনা প্রস্তুতের দ্বারা অর্জিত অর্থ ব্যয় করার কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাবে ইউজিন গ্যালইস্ ও তাঁর সহকারিবৃন্দ কিভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছিলেন তা দেখে কোন পাঠকই না হেসে পারবেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁরা লীগ্ অব নেশনসের হাতে অর্জিত অর্থ দিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত করলেন। ১৯৩০ সালের বিজ্ঞানীরা মহাযুদ্ধের বিভীষিকা থেকে জেগে উঠে তখন বিশ্ব-সরকারের যে চিন্তা শুরু করেছিলেন তার প্রতি এই ইঙ্গিতও কৌতুককর।

কিন্তু কেবল কৌতুকই নয়, এই সরল ছেলেমানুষির প্রতি তাঁর সহানুভূতিও সমান প্রকাশ পেয়েছে। গল্পের শেষ অংশে বরং এই সহানুভূতিরই তীব্রতা। এর থেকেই যে একদিন মহৎ কিছু জন্ম নেবে এ-বিষয়ে এই ইতিহাস-চেতন এবং মানবদরদী বিজ্ঞানীর আস্থার অভাব ছিল না। ফলে স্বর্ণখনির যে মালিকদের দালালেরা নিরপরাধ বিজ্ঞানীত্রয়কে হত্যা করেছিল, গল্পের শেষভাগে তাদের সম্বন্ধে হলডেন বলেছেনঃ "গ্যালইস্ এবং তাঁর বন্ধুদের

যারা খুন করেছে তাদের আমি দেখে নিতে চাই" এবং শেষ করবার ঠিক আগে বিশ্ব-বিপ্লবের দ্বারা সমস্ত পৃথিবীতে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পুঁজিবাদী সভ্যতার বিলোপ ও গ্যালইসের স্বপ্ন যে একদিন সার্থক হবে সে ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ "রাশিয়াতে কিছু খুব ভাল পদার্থবিদ্ আছেন। তাঁরা যদি সমুদ্রজল থেকে সোনা তৈরির কৌশলটা আয়ত্ত করতে পারেন, তাহলে সোনার খনির শেয়ার বা ঐ ধরণের কোন কিছু কেনবার আর কোনই মানে থাকবে না। কেন না, তাহলে বিশ্ব-বিপ্লবের জন্য প্রতি বছর ১,০০০,০০০,০০০ পাউন্ড ক'রে পাওয়া যাবে।" বলা বাহুল্য, স্ট্যালিনীয় রাশিয়ার গোঁড়ামি সম্বন্ধে তখনও হলডেন মোহমুক্ত হন নি। এই অংশে তিনি বিজ্ঞানীদের সমবেত প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু এই যে সমাজচেতনার কথা বললাম, এটা বাইরের জিনিষ। আরও গভীরে তাকালে তাঁর গভীরতর সমাজচেতনার পরিচয় মিলবে। সমাজ এবং বিজ্ঞানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে সমস্ত অতি-প্রাকৃতের বাড়াবাড়ি-বর্জিত দৈনন্দিন ব্যক্তিমানুষ ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। হলডেনের গল্পের নায়ক সেই রকম চরিত্রেরই মানুষ। সাধারণত বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পের নায়ক সকলের'চেয়ে একটু আলাদা হয়ে থাকেন, হয় কোন দুঃসাহসী, না হলে পরিব্রাজক, না হয় তো এমন কোন ডাকসাইটে বিজ্ঞানী যিনি অনেকটা ম্যাজিকের মত চকিতে বড় বড় সমস্যার সমাধান ক'রে ফেলেন অথবা এমন কোন অলৌকিক ব্যাপার করেন, অন্তত প্রত্যক্ষ করেন, যা শুনে পাঠকের মত সাধারণ মানুষের হাঁ ক'রে বসে থাকা ছাড়া উপায় থাকে না। হলডেনকে যাঁরা চেনেন তাঁরা জানেন বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের এতটা অনাত্মীয় ক'রে দেখা তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তাই "দি গোল্ড মেকার্স"-র নায়ক একজন সাধারণ ইংরেজ প্রোফেসর; তাঁকে দেশের প্রচলিত সমস্ত আইন-কানুনই মেনে চলতে হয়, তিনি রেস্তোরাঁয় কফির দাম দেওয়ার মত ছোট-খাট বিষয়েও মাথা ঘামান এবং সুযোগ পেলেই আর পাঁচটা ইংরেজের মত জার্মান বা ফরাসীদের প্রতি রসালো উক্তি করতে ছাড়েন না। তফাৎ শুধু এই যে, প্রোফেসর যুক্তিবাদী এবং ফরাসীদের প্রতি রসালো উক্তি করলেও এ-কথা বলতে তিনি ভুলে যান না যে ফ্রান্সে মার্টিনকে ক্ষুধার্ত এবং ছিন্নবস্ত্র দেখে তিনি অবাক হয়েছিলেন; কেন না, সে-দেশে তখন প্রায় সকলেরই কর্মসংস্থান ছিল। আবার, বিজ্ঞানের তথ্য জানা থাকায় নায়ক চরম বিপদের মধ্যে তাঁর এই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছেন। এতে সুন্দর হাস্যরসেরও সৃষ্টি হয়েছে কয়েক জায়গায়। যেমন, Bar-এ আক্রান্ত হয়ে পালাবার সময় তিনি ফুটপাতে পড়ে যাওয়া আক্রমণকারীর মাথায় সজোরে লাথি মেরেছিলেন তার স্মৃতিনাশের উদ্দেশ্যে। আমাদের মস্তিষ্কের সামনের দিকের স্নায়ুকোষে স্মৃতি সঞ্চিত থাকে। ঐ স্নায়ুসমূহকে নষ্ট ক'রে দিতে পারলে স্মৃতিভ্রম ঘটে। প্রোফেসর এই তথ্যটির চূড়ান্ত ব্যবহার করেছেন এখানে। আবার, দুষ্কৃতিকারীরা যখন তাঁকে অনুসরণ করছে সে-সময় একটি রেল স্টেশনে পৌঁছে তিনি দেখলেন চারদিকে চারটা ভিন্ন লাইন চলে গেছে এবং সম্ভাবনাবাদের প্রয়োগ ক'রে বুঝে নিলেন যে তিনি পালানোর পরে অনুসরণকারী এসে নিশ্চয়ই ভুল ট্রেনটা বেছে নেবে। অথবা, লরিতে লুকিয়ে যাওয়ার সময় তিনি তাঁর একমাত্র অস্ত্র পেন্সিল কাটার ছুরিটা প্রস্তুত রেখেছিলেন আক্রান্ত হলে শত্রুর জুগুলার ভেন্ কেটে তাকে কাবু করবেন বলে।

তার মানে এই গল্পে এমন একজন সাধারণ মানুষের ছবি এঁকেছেন হলডেন যিনি কেবল প্রখর সাধারণ বুদ্ধি এবং বিজ্ঞানের জ্ঞানে বলীয়ান বলেই অপরাজেয়। আর কোন সঙ্গতি তাঁর নেই, সমাজের কাছে যেটুকু পরিচিতি ছিল, তাকে তিনি নিজেই গোপন করতে বাধ্য হয়েছেন আত্মরক্ষার জন্যে। কিন্তু তাতে তিনি দমেন নি একটুকু। বরং বিপদের মধ্যেও তাঁর স্বাভাবিক মন বার বার আত্মপ্রকাশ করেছে। অনুসরণকারীরা লরি থামালে যখন ফরাসী লরি চালক অবলীলাক্রমে অশ্লীল গালাগালি ক'রে শপথ করছে যে সে তাঁকে দেখে নি, তখনও তাঁর মনে হচ্ছেঃ "অশ্লীল গালিগালাজে ফরাসী জিভের আর জুড়ি নেই।" অথবা Besancon-এ পৌঁছে ফুটপাতেই বেশ এক ঘুমের পরে ভোরে লরি চালক তাঁকে উঠিয়ে দিতে তাকে তাঁর নিজের শোফার বলে মনে হচ্ছে এবং স্থানীয় ছবির গ্যালারীতে গোয়া'র "Scenes of Cannibalism" ছবিটি দেখে আসবার জন্যে তিনি অদম্য ইচ্ছা অনুভব করছেন। গল্পের শেষভাগে এই অপরাজেয় রূপটি আরও স্পষ্ট। সেখানে, পালানোর আগিদে কয়েকদিন দাড়ি কামানো না হওয়ায় বেড়ে-ওঠা দাড়ি দেখে তিনি খুশি হয়ে ভাবছেন পরে স্থায়িভাবে একটা দাড়ি রাখলে মন্দ হয় না। এখানে সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে জীবনকে তিনি মিলিয়েছেন। অথবা তাঁর টাকা ফুরিয়ে যাচ্ছে দেখে নানাভাবে পুঁজি বাড়ানোর চেষ্টা করছেন। যেমন, একদিন একজনের গাড়ি খারাপ হয়ে গেলে তার স্যুটকেসটি পাশের গ্রামে বয়ে দিয়ে তিনি পাঁচ ফ্রাঙ্ক রোজগার করলেন। শেষ অবধি পাসপোর্টহীন বিদেশী হিসেবে আত্মসমর্পণ ক'রে জেলে যাবেন স্থির করেছিলেন সে-কথা বলেছি। জেলে তিনি নিজেকে আইসল্যান্ডের অধিবাসী বলে পরিচয় দেবেন; ফলে ডেনমার্কের স্থানীয় রাষ্ট্রদূতের ডাক পড়বে, কারণ, আইসল্যান্ড তখন ডেনমার্কের উপনিবেশ। চুটিয়ে তাকে গালাগাল করবার জন্যে তিনি এই সময়েও প্রত্যহ দু' ঘণ্টা ডেনিশ-ইংরেজী অভিধান পড়ছেন শুধু জৈব-অস্তিত্বটাই টিকিয়ে রাখা নয়, সম্পূর্ণ বিরোধী পরিবেশেও মানুষের সমস্ত বোধবুদ্ধি নিয়ে বেঁচে থাকার এই চিত্র অনন্য। এবং কে না জানে, হাসি তার গভীরতায় গড়া এই অপরাজেয় সাধারণ মানুষটিই হলডেন নিজে!

এবার গল্পের নির্মাণদক্ষতার প্রসঙ্গে আসা যাক। মদ্যপানের পরে সামান্য নেশাগ্রস্ত মনের কল্পনা হিসেবে লেখক কাহিনীটিকে উপস্থিত করেছেন যদিও কোথাও এ-কথা সোজাসুজি বলে দেন নি। শুধু দেখিয়েছেন যে, প্রথমদিকে নেশা যখন গাঢ় তখনকার চেয়ে শেষদিকে নেশা কেটে আসার সময় তাঁর বিচারবুদ্ধি অনেক বেশি সতর্ক হয়েছে এবং কাহিনীটিকে কল্পনা বলে যেন তিনি বুঝতে পারছেন। নায়কের মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ রচনায় অসামান্য দক্ষতা গল্পটির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাস্তবে লেখক এমন ঘটনা এনেছেন যার প্রভাবে অল্প নেশাগ্রস্ত মনে এই কাহিনীটির উদয় হওয়া খুবই স্বাভাবিক। নেশা লাগা এবং কেটে যাওয়া দুটোই ধীরে ধীরে হয়েছে। মদ্যপানের পরেই তিনি বাস্তবে এমন খেলার দৃশ্য দেখছেন যা অক্সফোর্ডে হওয়া সম্ভব নয়। তার পরেই কল্পনায় রাস্তায় মার্টিনকে দেখছেন—ক্ষুধার্ত এবং ছিন্নবাস; দেখে অবাক হচ্ছেন, কারণ ফ্রান্সে তখন কেউ বেকার নেই। বলা বাহুল্য, ইংলন্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে তুলনা,—খেলার দৃশ্যে যার

'জুলাবি চা'

তাজা ও সেরা। একবার খেয়ে দেখুন।

৪৫নং ফ্রী স্কুল স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ (পার্ক স্ট্রীট থেকে মাত্র ৩ মিনিটের পথ)।

শুরু,—থেকেই তাঁর মত সমাজ-সচেতন মানুষের কল্পনায় মার্টিনের আবির্ভাব এবং ফ্রান্সে সে-সময় বিজ্ঞানীরা খুবই কম মাইনে পেতেন বলে মার্টিনকে অবচেতন মনের প্রেরণায় তিনি একজন বিজ্ঞানী বলেই স্থির করলেন—এমন একজন বিজ্ঞানী যে সমাজের উপকার করতে গেলেও যার উপরে সমাজ চূড়ান্ত অবিচার করেছে। এইভাবেই গল্পের সূত্রপাত। তারপরে মধ্যরাতে নির্দিষ্ট Bar-এ যাওয়ার আগে যখন একটু ভয় ভয় করছে তখন তাঁর মনে হল যে, জায়গাটি শহরের কসাইখানার কাছাকাছি। Bar-এ ঢুকেই কাউন্টারের মোটা ভদ্রমহিলাকে দেখেই তাঁর ভাল লাগে নি। পরে আক্রমণকারীর বুলেট সেই মহিলাকে আহত করেছে। Bar-এ আর যে একজন মাত্র নিরীহ চেহারার খরিদ্দার ছিল সে একজন লরি-চালক। অপরিচিত পরিবেশে একমাত্র এই লোকটিকেই তাঁর বন্ধু মনে হয়েছিল। পরে একেই তিনি আবার তাঁর জীবন-রক্ষকের ভূমিকায় দেখেছেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, অল্প নেশার পরে মনের সচেতন এবং অবচেতন উভয় স্তরই খুব সক্রিয় হয়ে ওঠে। এখানে হলডেন এই ঘটনাটির পূর্ণ সুযোগ নিয়েছেন। ফলে তাঁর কাহিনীতে অবাধ কল্পনার পাশাপাশি স্থান পেয়েছে চুলচেরা বাস্তবধর্মিতা। এমন কি বিচারে গ্যালইসের সাজা হওয়ার পরে ফার্নান্ডেজ এবং একজন বিরোধী সাক্ষী সোনার খনির মালিকদের সঙ্গে যুক্ত ছিল এমন নথিপত্রও যে গ্যালইসের উকিল সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন সে-কথা বলতেও লেখক ভোলেন নি। এই সময় বোমার আবির্ভাবই গল্পটিকে আকস্মিক সমাপ্তির হাত থেকে বাঁচায়। বাস্তবধর্মিতার এমনি আরো নিদর্শন গল্পটি জুড়ে ছড়িয়ে আছে। এই বাস্তবধর্মিতা ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের জন্য গল্পটি সাধারণ গল্প হিসেবেও রসোত্তীর্ণ হয়েছে।

এবার, ছোটদের জন্যে লেখা গল্পগুলির কথা বলি। সেগুলিতেও সাধারণ মানুষদের নিয়ে গল্প করেছেন হলডেন। যেমন "ইঁদুর ধরা কল" গল্পের শুরুতে বলছেনঃ

"এক যে ছিলো......

রাজা নয় কিন্তু, শাক-সবজিওয়ালা।"

তারপরে লিকির মত যাদুকর যে ইচ্ছা করলেই অদ্ভুত সব কাজে-কারবার করতে পারে সে-ও হলডেনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিন বাস চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়ে ভয় পেয়ে কাঁপছিল; হলডেনই তাকে ওভারকোটের কলার ধরে টেনে রেখে বাঁচান এবং বাড়ি পৌঁছে দেন। ছোটদের উপযোগী রসসৃষ্টির জন্য লিকিকে দিয়ে লেখক অনেক অদ্ভুত সব ব্যাপার করিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু কোথাও এমন পরিবেশের সৃষ্টি করেন নি যেখানে তাঁর ছোট্ট পাঠকটি তার বুদ্ধি-বিবেচনা হারিয়ে ফেলে সম্পূর্ণ অভিভূত হয়ে পড়তে পারে। এখানেও সেই সহজ বুদ্ধি আর সাধারণ মানুষের প্রধান ভূমিকা।

"আমার জীবনদর্শন" প্রবন্ধে হলডেন তাঁর জীবনকে একটি "সুন্দর - প্রদর্শনী (good show)" বলে অভিহিত করেছেন। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের মোকাবিলায় খুবই আন্তরিক হলেও যে-সহযোগী মানুষদের চোখের সামনে তাঁর জীবনের ঘটনাগুলি ক্রমে ঘটে যাচ্ছে প্রদর্শকের মত সর্বদা তিনি তাদের সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। সাধারণের জন্য বিজ্ঞান-প্রবন্ধ কেন এবং কিভাবে লিখবেন এ-সম্বন্ধে তাঁর ধারণা অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। এই প্রসঙ্গে "কি করে বিজ্ঞান-প্রবন্ধ লিখতে হয়" নামক প্রবন্ধে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প নিয়ে এত নির্দিষ্ট করে কোথাও তিনি বলেন নি। কিন্তু তা হলেও দু'-একটি বিচ্ছিন্ন মতামত থেকে বোঝা যায় এ-সম্বন্ধেও তাঁর ধারণা স্পষ্ট ছিল। যেমন, "আমি যাদুকর নই" প্রবন্ধের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রচলিত বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পের বিরুদ্ধে তিনি এই অভিযোগ করেছেন যে, সেগুলি বিজ্ঞানকে সাধারণের চোখে খানিকটা ম্যাজিক করে তুলেছে। বলা বাহুল্য যে, হলডেনের নিজের গল্প বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পের এই প্রচলিত ধারার উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। এই ব্যতিক্রমের ফলে কিন্তু গল্পগুলি গল্প ছেড়ে কিছু বিজ্ঞানতত্ত্বের যান্ত্রিক সঞ্চয়মাত্র হয়ে ওঠে নি। বরং "দি গোল্ড মেকার্স" বিজ্ঞানের তথ্যগত যাথার্থ্যের পাশাপাশি উঁচু জাতের এমন গল্পরসের আয়োজন আছে পরিণত মনের কাছে যার আবেদন অলৌকিক বা দুঃসাহসিক কাহিনীর আবেদনের চেয়ে অনেক বেশি। ছোটদের গল্পগুলিও তথ্যের দিক থেকে যথাযথ—যদিও গল্পের দিক দিয়ে কম নয়। আসলে, যে-বিশেষ মননশীলতার জন্যে হলডেন তাঁর বিজ্ঞান-প্রবন্ধগুলিতে গল্পের মেজাজ এনে দিতে সক্ষম হয়েছেন, সেই একই মননশীলতা তাঁর সার্থক গল্পগুলিকে সার্থকভাবেই বিজ্ঞানভিত্তিক করেছে। বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পের আসরে এ-ধরণের গল্প রচনায় নিঃসন্দেহে তাঁকে পথিকৃৎ বলা যায়।

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গৌহাটী

*হলডেনের মৃত্যুর দ্বিতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য।

দিল্লী থেকে—

শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

কাহারে জড়াতে চায় দুটি বাহুলতা?

প্রাসাদে নিজের গায়ে আগুন লাগার দিন থেকে জাহান্ আরা অধীর আগ্রহে কার পদধ্বনির প্রতীক্ষায় প্রহর গুণেছেন?

কোথায় দুলেরা?

হিন্দুস্থানের কোন্ নাগরিক জাহান্ আরা বেগমের এ অগ্নিদহনের খবরটুকু রাখেন না? তবে? তবে কেন এ অকারণ অবহেলা? মনে যে-জন আগুন ধরালো দেহের আগুন দেখবে না সে?

দরিয়া যেন মনের কথাটুকু মুখ দেখলেই ধরে ফেলে। বলি বলি করেও জাহান্ আরা তাকে মনের গোপন কথাটুকু বলতে পারেন না।

এদিকে দরিয়া, মরিয়ম শুকনো মুখে চারিদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। গুলরুখের মৃত্যু খবর জাহান্ আরাকে জানানো নিষেধ।

জাহান্ আরার কিছুই থাকে না অজানা। হিন্দুস্থানের শাহান্‌শা বাদশার কন্যা দরিয়া মরিয়মের মুখ দেখেই সব কিছু অনুমান করতে পারেন। এতটুকু বুদ্ধি মাথায় না রাখলে যমুনার তীরে এ দিল্লী প্রাসাদে তিনি স্থান পেতেন কখনও?

সব জানেন। সব বোঝেন। তবুও যেন কিছুই বুঝতে পারছেন না, কিছুই জানতে পারছেন না এই ভাব। তাতে জানা যায় আরও অনেক বেশি।

নারীমনের ঐটেই সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। গোপন কথাটুকুও লুকোনো চলে না। বেফাঁস অন্যমনস্ক অসতর্ক মুহূর্তে ঠিক সেটা সবার সামনে বেরিয়ে পড়বে।

মরিয়ম মরিয়া হয়ে জাহান্ আরার আরও কাছে এগিয়ে আসে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে নিল কারা আছেন চারিপাশে।

চুপি চুপি জাহান্ আরা প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করেন, 'আচ্ছা, মরিয়ম তুই ঠিক জানিস তিনি একটিবারও আমার খবর নিতে আসেন নি?

মরিয়ম নির্বাক।

তোদের কারু কাছেও তিনি আমার খবরাখবর নিতে এলেন না? তুই কি বলতে চাস আমার এ আগুনে পোড়ার ঘটনা তাঁর কানে এখনও পৌঁছোয় নি।

মরিয়ম শুধু মাথাটা নিচু করে দাঁড়ায়।

পুরুষমানুষেরা শুনেছি খুবই নিষ্ঠুর হয়। তবে এ তো তা নয়। এ যে শুধু পাষাণ।

দরিয়া পুরানো নাজীর। জাহান্ আরা তাকে সমানভাবে স্নেহ করেন, ভয় পান।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো সম্রাট-নন্দিনীর শয্যাপাশে। চোখে সেই মিনতিপূর্ণ দৃষ্টি। মায়া হয় দরিয়ার।

কিছু বলছিলেন বেগম সাহেবা?

না। কিছু না।

কণ্ঠস্বরে অভিমানের সুরটুকু ধরা পড়ে। কিংকরী হলেও দরিয়া নারী।

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

জাহান্ আরা দরিয়াকে জিজ্ঞাসা করেন, হ্যাঁ রে কিছু বলছিলি?

বলছিলুম কি বেগম সাহেবা, গুস্তাফি মাফ, আমরাও বুঝি এ সময়ে ছত্রশালের উচিত ছিল একবার তোমার খবর নেওয়া। তবে আসল কথাটাও ভেবে দেখো একবার। কোন্ সাহসে বাদশা বেগমের অন্তঃপুরে পুরুষমানুষ প্রবেশ করবে বলো। তাছাড়া আজকাল যে সাম্রাজ্যের সবাই জানে যে সম্রাট শাজাহান তাঁর রাজ কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। নামাজ পাঠ করছেন এই অন্তঃপুরে। চোখের ঘুমটুকুও কে কেড়ে নিয়েছে তাঁর? তিনি যে এই সপ্তাহ কটা কি করে কাটালেন তা তো তুমি জানো, জান্, বাদশা বেগম সাহেবা। তুমি তো জানো না তোমার জ্ঞানটুকু ফেরবার জন্য সম্রাট কতদিন সম্পূর্ণ উপবাস করে নতজানু হয়ে শুধু পরমেশ্বরের বন্দনায় প্রহর কাটিয়েছেন এই প্রাসাদে। এ প্রাসাদে ছত্রশাল প্রবেশ করবেন কি করে? একবার ভেবে দেখেছো এই প্রাসাদে ধরা পড়লে ছত্রশালের ভাগ্যে কি জুটবে? তিনি নিশ্চয়ই মহানুভব যুবরাজের কাছ থেকে সবটুকু খবর পাচ্ছেন বাদশা বেগম।

দরিয়াকে তাই এত ভাল লাগে জাহান্ আরার। এত সুন্দর গুছিয়ে কথা বলতে পারে মেয়েটা। তবুও তো একটা অতি সাধারণ কিংকরীমাত্র। একটা সম্পূর্ণ শহর সামলাবার শক্তি রাখে ঐ সুন্দরী দরিয়া। কে জানে কার হাতে পড়বে?

হাসি-পরিহাসেও রয়েছে প্রখরতা।

একদিন হাসির ছলে বেগম সাহেবা বলেছিলেন হ্যাঁ রে দরিয়া তোর একটা বিয়ে দিলে কেমন হয়?'

দরিয়া বলেছিল, হঠাৎ তোমার সেবায় কোনো গুনাহ্ করে ফেলেছি কি? হঠাৎ কি অপরাধ করলাম তোমার পায়ে? তুমি কি আমার ওপর অপ্রসন্ন হয়েছো?

হেসে জাহান্ আরা বলেছিলেন, না না না। তা বলছি না। একদিন যুবরাজ দারাই তো সিংহাসনে বসবেন। তখন তুইও জানিস আমি সংসার পাতবো কার অট্টালিকায়। তখন তুই কি করবি? চিরদিন কারুর সেবার জন্যই তো তোর জন্ম হয় নি।

হেসে বলেছিল দরিয়া, স্বামী যদি করি বেগম সাহেবা তাহলে ঐ একটা হাবশীকেই করবো। কোন্ দেশের কথা বলছিলে সেইদিন? যেখান থেকে ওদের আনা হয়েছে?

জাহান্ আরা স্মরণ করিয়ে দেন, আফ্রিকা।

জাহান্ আরা এবার ঠিক হেসে উড়িয়ে দিতে পারলেন না দরিয়াকে। প্রাসাদের ঐ একটা হাবশীর ওষুধেই নাকি তাঁর জীবনলাভ ঘটেছে। ঠিক যেন পুনরুজ্জীবন। আওরঙজেবই নাকি নিয়ে এসেছেন লোকটাকে দক্ষিণাবর্ত থেকে। যখন সাম্রাজ্যের হাকিম কবিরাজ সবাই জবাব দিয়ে গেলেন শাহানশা শাজাহানকে তখন কে যেন এসে এর কথা পেশ করলো সম্রাটের কানে। সম্রাট তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তাঁর কাছে তখন কিংকর প্রভু ভেদাভেদ নেই। সেই হাবশীর মলমেই সেরেছে জাহান্ আরার ক্ষত। যেন সম্রাট শাজাহানের পুনরুজ্জীবন। এতটা কাতর হতে কেউ কখনও দেখে নি তাঁকে। মমতাজ মহলের মৃত্যুতেও না। কে জানত হাবশীর ওষুধের এত শক্তি? আজ যে রাজধানীর ঘরে ঘরে তার নাম।

তবুও তাচ্ছিল্যের সুরে বলে দরিয়া, তবে জানেন বেগম সাহেবা ঐ আওরঙ্-জেবের গোলামটার সাথে নয়। ওর সাথে

শাদী হওয়ার আগে যেন আমার মরণ হয়।

হেসে জাহান্ আরা বলেছিলেন, কেন রে? ওর ওপর এত রাগ কেন? জানিস রাগ থেকেই আসে অনুরাগ?

ও যে লোকের গোলাম তার থেকে আমি সহস্র মাইল দূরে থাকতে চাই। এ কথা তুমি জানো।

আওরঙ্জেবকে যুবরাজ দারা ঘৃণা করেন।

সম্রাট শাজাহান তাঁকে দেখতে পারেন না।

জাহান্ আরা আওরঙ্জেবকে ঘৃণা করেন। দরিয়া যে শুধু জাহান্ আরার ছায়া মাত্র। তাই আওরঙ্জেবের কিংকরটিও তার ঘৃণার পাত্র।

দরিয়া পাশের হর্ম্যে চলে গেল। তারও যে বিশ্রামের দরকার। কদিন থেকে দরিয়া, মরিয়ম চিন্তায় ভাবনায়, পরিশ্রমে যেন জীবন্মৃত। জাহান্ আরার জীবনের ওপরই যে তাদের সম্পূর্ণ ভবিষ্যৎটুকু নির্ভরশীল। গুলরুখ এদের সবাইকে মসগুল রাখতো সর্বদা। এরা কি জাহান্ আরার কিংকরী মাত্র? এরা যে তার সখী—ক্রীড়াসঙ্গিনী।

মরিয়মের কোমল অঙ্গ কখন মখমলের শয্যাপরে এলিয়ে পড়েছে কেউ খেয়াল করে নি। জাহান্ আরার পদসেবা করতে করতে বেচারা সেখানেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

আবার নিরালা একাকীত্ব এসে ভূতের মতন চেপে ধরে জাহান্ আরাকে। জীবনে এই একাকীত্বকেই তাঁর সবচেয়ে বেশি ভয়। কোনো জায়গায় একা থাকলেই নানা দুশ্চিন্তা তাঁর চারিদিকে ঘিরে এসে দাঁড়ায়।

একটা নতুন চিন্তা এসে ভর করে জাহান্ আরাকে।

আচ্ছা এও তো হতে পারে যে, দুলেরা উদ্ভ্রান্ত হয়ে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু ভুলে ছুটে আসছিলেন তাঁকে দেখতে। আরক্ষী দল তাঁকে ঝারোখার এদিকে আসার অপরাধে অপমানিত করেছে। অথবা সম্রাট শাজাহান নিজে তাঁকে এ জেনানা প্রাসাদ-কোণে প্রবেশের অপরাধে কারারুদ্ধ করেছেন? অদূরে যমুনার কলতান কানে প্রবেশ করে। যেন প্রিয়তম দুলেরার সুধাকণ্ঠের সাথে তাল মিলিয়ে নেচে চলেছে নবযৌবনা যমুনা!

সেদিনের কথা মনে পড়ে।

দেওয়ান্ - ই - খাসের রাজসভায় সঙ্গীতে মুগ্ধ হয়ে জাহান্ আরা না দেখা দুলেরার প্রেমে আকৃষ্ট হবার কদিন পরের ঘটনা। জাহান্ আরারই নির্দেশে সম্রাট শাজাহান রাজসভায় কয়েকজন সভাসদকে পতাকা দান করেন। অশ্বারোহীর পদাতিক বাহিনী নিয়ে পতাকা উড়িয়ে প্রাসাদে প্রবেশ যে তার পক্ষে এক বিশেষ সম্মান। সম্রাট ঠিক বুঝতে পারেন নি, হঠাৎ গায়কের প্রতি বেগম সাহেবার এ অনুগ্রহ কেন?

কিন্তু বুঝেছিল নজবৎ খান। আর বুঝেছিল মহবৎ খান। নারীর হৃদয় নিয়ে খেলাই ছিল তার নেশা। হোক না কেন জাহাঙ্গীরের অন্যতম খ্যাতনামা সেনাপতি, কে না জানে মহবৎ খান দেশদ্রোহী, সে আপন ধর্মদ্রোহী। আজও রাজধানীর কোন্ লোকটির অজানা মহবৎ খানের প্রকৃত পরিচয়? সে যে রাণা প্রতাপের আপন ভ্রাতুষ্পুত্র। কে বিশ্বাস করবে? তবুও এটা সত্য।

মহবৎ খান গায়ক ছত্রশালকে দেখতে পারেন না কেন? আপন ধর্মাবলম্বী বলে? সম্রাটের প্রিয়পাত্র বলে? সম্রাট তাঁকে তার মধুর কণ্ঠস্বরের জন্য একদিন আপন বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন বলে? যুবরাজ দারা তাঁকে আপন সহোদরোপম স্নেহের ছায়ায় টেনে নিয়েছেন বলে?

না।

কখনও নয়।

মহবৎ জানে এসব স্নেহের অভিনয় তার জীবনেও একদিন এসেছিল। ধূর্ত মহবৎ জেনেছে এই গায়ক প্রাসাদের সর্ব-শ্রেষ্ঠ মণিহার হরণ করেছে। মহবৎ জানে এ গায়ক হিন্দুস্থানের বাদশা বেগমের হৃদয় হরণ করেছেন। তাই এ ঈর্ষা, এ বিদ্বেষ! মহবৎ খান একদিন দুলেরাকে অপমানিত করেছিল। তার প্রতি কটাক্ষ করেছিল। যে ধর্মদ্রোহী, যে দেশদ্রোহী সে কি না করতে পারে?

মহবৎ খান সেদিন আর পতাকা নিয়ে রাজধানীর লালকেল্লায় প্রবেশ করলেন না।

শাজাহান জিজ্ঞাসা করলেন, মহবৎ খান, তোমার পতাকা? পতাকা কোথায়?

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে ধূর্ত মহবৎ। তারপর ধীরে ধীরে বলে, কোনো দরকার নেই। জাঁহাপনা। পতাকার আর কোনো দাম নেই।

সে কি কথা? কেন বলো তো।

যে রাজদরবারে গায়ক পর্যন্ত পতাকা হস্তে প্রবেশের অধিকার পায় সেখানে আমীরের পতাকার আর কি প্রয়োজন?

অদূরে জাহান্ আরা শুনলেন সব। দেখলেন, রাগে, অপমানে, রাজসভায় তখন একটি অনুপম কান্তি যেন অসময়ে শুকোনো গোলাপের মতন হঠাৎ ম্লান হয়ে গেল। দুলেরা সম্রাটের উপস্থিতিতে সভা ত্যাগ করতে চাইলেন না।

সভার মৃদু গুঞ্জন যেন তাঁকে সহস্র বাণাহত করে ধরাশায়িনী করলো। ধূর্ত, কপট নজবৎ খানের বাঁকা হাসি যেন জাহান্ আরা বেগমের কোমল বুকে ধারালো তরোয়াল বসিয়ে দিল। জাহান্ আরা আর ভাবতে পারেন না।

সম্রাট শাজাহান বজ্রকণ্ঠে হুকুম দিলেন; তাহলে দরবারে আর গায়কের পতাকারও দরকার নেই!

না জেনে সম্রাট কোথায় আঘাত করলেন টের পেলেন না। জাহান্ আরা অন্তঃপুরে সেই ক্ষণে ফিরে এলেন।

দুলেরা তো নিজে চান নি এ রাজ অনুগ্রহ। দুলেরা নিজে কোনোদিন চান নি রাজসম্মান। পতাকা দিয়ে যে জাহান্ আরা নিজেই চেয়েছিলেন প্রিয়তমকে পেশ করতে জয়তিলক। তাঁর এ অকারণ লাঞ্ছনা কেন? কেন এ অশোভন আচরণ?

রাজনীতির পেষণে কেন তাঁর গোপন প্রেম আজ নিষ্পেষিত? তাঁর কি এতটুকু শক্তিও নেই? সম্রাট শাজাহান যে সম্পূর্ণ নিরপরাধ। তিনি কি করে জানবেন এ কপট শয়তানদের শঠতা? বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত পেলেই সম্রাট এ কপট শয়তান মহবৎ নজবৎদের দলকে অন্ধকার কারাগারে ফেলতে পারেন। তার কোনো প্রয়োজন নেই। লোকলাজ জাহান্ আরার সামনে একটা অস্পষ্ট পর্দা টেনে দিল। হিন্দুস্থানের ঘরে ঘরে আলোচিত হবে বেগম সাহেবা জাহান্ আরার প্রণয় কাহিনী? সরমরক্তরাগে নবযৌবনার মনে অকারণ চঞ্চলতার শিহরণ খেলে যায়। ভাবতেও মনটা কোন্ মেঘের সঙ্গী হয়ে দূর দূরান্তে ছুটে যায়—কবি জাহান্ আরা নিজের মনে আবৃত্তি করেন তিনি প্রণয়াসক্তা! কোথায় তাঁর শবনম্?

সেই অপমানের জবাব আজও দেওয়া হয় নি মহবৎ খানকে।

সম্রাট শাজাহানের নয়নমণি। তবুও এ কপটদের বিন্দুমাত্র শাস্তির অধিকার নেই। কে জানে যদি প্রিয়তম দুলেরার প্রাণই এরা নিয়ে নেয়?

একাকিনী জাহান্ আরা দেখে চলেন অশ্রুবন্যা। আপন অশ্রুবন্যা। যমুনায় আর ক'ফোঁটা জল? প্রণয়াসক্তা নারীর বিরহবেদনাঘন চোখের জলপ্লাবন দেখেছেন কেউ?

শয়তান নজবৎ শতবার কাঙালের মতন তাঁর কাছে প্রেমভিক্ষা করেছে। জাহান্ আরা জানেন নজবৎ কি চান। নারীচোখে পুরুষের প্রকৃত কামনাটুকু ঠিক ধরা পড়ে। নজবৎ জাহান্ আরা বেগমের হৃদয় চান না, তিনি চান শক্তি, অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিমান হবার বাসনা এই ধূর্তকে তিমিরাবৃত রজনীতে টেনে আনে-

জাহান্ আরার পদপ্রান্তে! তিনি জয়নেন। জাহান্ আরা নজবৎকে মনে প্রাণে ঘৃণা করেন। দুলেরার দিল্ উত্তুঙ্গ গিরি-শৃঙ্গ। এতদিনও জাহান্ আরা তার নাগাল পান নি। এরা সবাই মিলে সেই হিমালয়কে নিজেদের তৃণদলে টেনে নামাবার ব্যর্থ চেষ্টায় দিন কাটাচ্ছে।

অপরের কলঙ্ক নিয়েই যাদের কাজ নিজেদের দিকে ফিরে তাকাবার তাদের অবসরটুকু কোথায়? এই প্রাসাদে রটনা করা হয়েছে বুন্দীরাজ ছত্রশাল দুলেরা নর্তকীতনয়!.

কলঙ্ক দিয়ে কখনও চাঁদকে ঢাকা চলে? দুলেরার বংশপরিচয়ে তাঁর কোনো দরকার নেই। জাহান্ আরা বেগমের তিনি প্রিয়সখা। প্রিয়তম দুলেরার এইটেই সবচেয়ে বড় পরিচয় নয় কি?

নূতন!

মাথাধরা? সর্দি? ফ্লু?

অবেদন®

আশ্চর্য্যজনক 'অ্যাপেপ'যুক্ত দ্রুত, নিরাপদ, নিশ্চিত আরাম এনে দেয়

মাথাধরায়

সর্দিতে

ফ্লুতে

অবেদন নতুন—তাই পরীক্ষা ক'রে দেখুন। মাথাধরায়, দাঁতব্যথায়, পিঠের ব্যথায়, ও পেশীর বেদনায়, সর্দিতে ও ফ্লুতে এবং বিশেষ যন্ত্রণাদায়ক দিনগুলিতে দ্রুত কার্যকরী, দীর্ঘস্থায়ী আরাম এনে দেবার জন্য স্কুইবের এই আবিষ্কার, **অবেদন**।

অবেদন অতুলনীয়! এতে আছে আশ্চর্য্যজনক **'অ্যাপেপ'** ও সেইসঙ্গে নিরাপদ, দ্রুত ফলপ্রদায়ক ব্যথা-দূরকারী অন্যান্য উপাদান।

অবেদন ব্যথা দূর করবার জন্য বিশেষ ফলপ্রদ এবং অত্যন্ত সহজে গ্রহণযোগ্য। এতে ক্ষতিকারক কিছু নেই এবং অভ্যাসে পরিণত করে না।

SQUIBB® **অবেদন**® 'অ্যাপেপ'-যুক্ত
কয়েক মিনিটের মধ্যেই কাজ করে—
বহুক্ষণের জন্য আরাম দেয়!
সারাভাই কেমিক্যালস্

মাত্রা: ১–২ ট্যাবলেট

® ই. আর. স্কুইব এণ্ড সন্স ইনকর্পোরেটেডের. রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক ব্যবহারকারী লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিনিধি করম চাঁদ প্রেম চাঁদ প্রাইভেট লিমিটেড।

Shilpi SC-112A Ben

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

শিলালি

অনেকের ধারণা শিশিরকুমার আমেরিকাতে অভিনয় করতে গিয়ে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু কথাটা যে সত্যি নয় তা আমি পরে ওদেশের বিভিন্ন পত্রিকার সমালোচনার (শিশিরকুমারের পার্টির অভিনয় সম্বন্ধে) উদ্ধৃতি তুলে দিয়ে প্রমাণ করবো। আর তাছাড়া এ কথাও যদি সত্য হোত যে, আমেরিকাতে শিশিরবাবু সুবিধা করতে পারেন নি, তাহলেই কি প্রমাণিত হত যে শিশিরকুমার পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নট এবং প্রযোজক নন্?

অবশ্য শিশির-বিদ্বেষী এক প্রখ্যাত হাস্যরসিক এই ধরণের মতবাদে বিশ্বাসী এবং শিশিরকুমারের আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর কয়েকটি প্রবন্ধে নানা ধরণের কুৎসা করে লিখেছিলেন, শিশিরকুমারের বিরুদ্ধে। সাহিত্যসম্রাট শরৎচন্দ্রও এ'র হাত থেকে রেহাই পান নি—শিশিরকুমারের নিন্দা করতে করতে হঠাৎ লিখে বসলেন—"রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেলেন তাঁর রচনা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হল বলেই—কিন্তু শরৎ চাটুজ্যে বহুকাল মাথা ন্যাড়া করে বসে থেকেও সে বেল তাঁর মাথায় ভুলেও পড়ল না।" As if নোবেল প্রাইজ পান নি বলেই শরৎচন্দ্র জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের পর্যায় উঠতে পারেন নি। আর শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কি শালীনতাপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করেছেন এই বিখ্যাত হাস্যরসিক লেখকটি, দেখছেন তো? অথচ আমরা কিন্তু এ'র লেখার পানিং, উইট এবং হিউমারের বিরাট সমঝদার। ইনি যদি নিজে মনে করেন যেহেতু ইনি নিজেও নোবেল পুরস্কার পান নি সেই জন্য ইনি ইওরোপ-আমেরিকার হাস্যরসিকদের তুলনায় খাট, তাহলে আমরা কিছুতেই সে কথা মানবো না। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কি রসিকতাপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করেছেন বলুন তো? পড়ে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবার যোগাড় হয়। ইওরো-আমেরিকায় এ'র প্রতিভার এখন পর্যন্ত স্বীকৃতি হয় নি বটে, তবে আমরা একশ'বার বলব জেরোম কে জেরোম এ'র কাছে শিশু—শেক্সপীয়ারের পর এত ভাল পানিং আমি তো জগৎসাহিত্যে কারোর রচনায় দেখি নি। সুতরাং বিদেশে স্বীকৃতি পেলেই শিল্পীকে বড় প্রতিভা বলে জানব একথা আমরা মেনে নিতে রাজী নই। অতএব শরৎচন্দ্র এবং শিশিরবাবুর বিষয় ওসব কথা লেখবার আগে ভদ্রলোক যদি নিজের কেসটা একবার ভাবতেন তাহলে ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়াতো। অবশ্য এমনও হতে পারে যে, নিজে সত্যিকার বড় মনীষী বলেই নিজেকে ছোট করে দেখতেই তিনি ভালবাসেন। আর সেই কারণেই তিনি এই ভ্রান্ত মতবাদে উপনীত হয়েছেন।

এই বিরাট হাস্যরসিক ভদ্রলোকটির শরৎচন্দ্র এবং শিশিরকুমার সম্বন্ধে উষ্মার একটি বিশেষ কারণ আছে বলে শুনতে পাই। ইনি নাকি শরৎচন্দ্রের একটি উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন এবং সে নাটক অভিনয় করে শিশিরবাবু প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র ঐ নাট্যরূপায়ণটি স্রেফ নিজের নামে চালিয়ে দেন—এমন কি হাস্যরসিক ভদ্রলোকের কাছে এতটুকু কৃতজ্ঞতা পর্যন্ত স্বীকার করেন নি কোথাও। শরৎবাবুর ওপর ভদ্রলোকের রাগের কারণ না হয় বোঝা গেল—কিন্তু শিশিরকুমারের অপরাধ কোথায়? অপরাধ হয়েছে বই কি—তিনি কেন শরৎচন্দ্রের নামে প্রচলিত ঐ নাটকে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করতে গেলেন। চুরি যে করে সেও অপরাধী, আবার চোরকে যিনি প্রশ্রয় দেন তিনিও কম অপরাধী নন্। তবে ভদ্রলোককে সত্যিকার কোন দোষ দেওয়া যায় না—শরৎচন্দ্রের নামে প্রচলিত অথচ ঐ ভদ্রলোকের দ্বারা লিখিত নাটকটি সত্যিই এদেশের একটি প্রথম শ্রেণীর নাটক। এভাবে প্রথম যৌবনে শরৎবাবুর থেকে ঐ জাতীয় নির্মম ব্যবহার না পেলে তিনি নিশ্চয়

'রিচার্ড দি সেকেণ্ড' নাটকের নাম ভূমিকায় স্যার জন গিলগুড়

'শেপী' নাটকে স্যার রল্‌ফ্‌ রিচার্ডসন

এতদিনে আরও কত ভাল ভাল নাটক রচনা করতে পারতেন এবং বাংলা-সাহিত্যের একটি বড় অভাব পূরণ হয়ে যেত। চাই কি রবীন্দ্রনাথের পর আমাদের দেশ থেকে আর একজন সাহিত্যিক হয়তো নোবেল পুরস্কার লাভ করে দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারতেন। যাই হোক যদিও শরৎচন্দ্র এবং শিশিরকুমারের জন্য এত বড় একজন নাট্যকারকে আমরা হারালাম। কিন্তু তার বদলে সত্যিকার একজন প্রতিভাবান হাস্যরসিককে পেলাম—

জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা
শরৎচন্দ্র এবং শিশিরকুমার
যতই করুন অবহেলা।

যাক্‌ গে প্রতিভাবান হাস্যরসিকের কথা—আবার শিশিরকুমারের আমেরিকা ভ্রমণ প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

আমাদের দেশের থিয়েটারের কথা তো দূরে থাকুক ইওরোপ-আমেরিকাতেও এক দেশের থিয়েটার সম্বন্ধে অন্য দেশে কোন কৌতূহল বা আগ্রহ দেখা যায় না। অবশ্য পেছনে কোন রাজনীতিক কারণ থাকলে সে আলাদা কথা। বিখ্যাত ইংরাজ নাট্যকার, নট এবং প্রযোজক আইভর নোভেলো ছবিতে কাজ করতে ১৯৩১ সালে হলিউডে যান—এই সময় ওখানে নোভেলোর যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল সে বিষয়ে তাঁর জীবনীকার পিটার নোবল লিখেছেনঃ

Apart from the more cheerful social aspects of his stay, however, he learned something about himself. He began to see himself in perspective. In England the name of Ivor Novello was practically a household word. In London he knew everybody, everybody knew him, he went everywhere, was always treated as an important young man, and had—as he thought—achived quite a lot one way or another. In Hollywood, he discovered, he just did not mean a thing. There they hardly knew the names of the great stage stars of New York, let alone the names of the famous theatrical personalities in London.

* * *

It was not only Ivor Novello about whom Hollywood showed its ignorance. Once he happened to show a particularly beautiful photograph of Gladys Cooper to a well-known Hollywood executive.

'What a lovely girl', exclaimed the producer. 'Who is she ? She ought to come out to the Coast.'

'Why should she ?', replied Ivor. 'She is at the top of her profession—virtually the queen of the London stage.'

'Is that so', was the uninterested reply. The incident was typical.

ভূ-বিজয়ী নৃত্যবিদ শ্রীযুক্ত উদয়-শঙ্করের একটি লেখাতে তাঁর প্রথম জীবনের একটি অভিজ্ঞতার কথা পড়েছিলাম—তিনি প্যারিসের একটি হোটেলে দিন পনেরোর জন্য নৈশ আহারের সময় নৃত্য করবার জন্য নিযুক্ত হন। দু-তিন দিন বাদেই হোটেলের ম্যানেজার তাঁর টাকা চুকিয়ে দিয়ে তাঁকে জানিয়ে দিল আর তাঁকে নাচতে হবে না—কারণ ওখানে যাঁরা খেতে আসেন তাঁর নাচ দেখে তাঁরা বিরক্ত বোধ করছেন। আসল কথা উদয়-শঙ্করের নাচ বোঝবার ক্ষমতা তখন তাঁদের মধ্যে ছিল না।

আমেরিকানদের লণ্ডন স্টেজ সম্বন্ধে কি ধারণা. তা হেলেন হেইজের নিম্নোক্ত উক্তি থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। খবরটি ১৯৫৬ সালের বাইশে অগাস্টের টাইমস পত্রিকায় ঠিক এইভাবে ছাপা হয়েছিলঃ

U. S. Actress On Our "Slipshod" Acting. New York, Aug, 21—Miss Helen Hayes, the distinguished American

actress, returned here from a visit to Britain today to deliver a blistering attack on the British Theatre, its playwrights and its actors and actresses.

Miss Helen Hayes, who had been working on the production of the film Anastasia in London, was asked by reporters for her impressions of the British Theatre and said:

"We have pulled away from them so far you can't see us for dust. They have no playwrights to compare with us. I feel their acting standards have let down. The West End Theatre is no patch on ours.

"All the years I have been going to London, I have come away thinking how severe our critics are in comparison to theirs. But now I think it's a good thing."

Miss Hayes declared—"The acting is slipshod. They need a great deal more discipline. I have never been impolite before but I really feel this."

বার্লিনে ১৯৫৬ সালে এক শিল্প-সম্মিলনীতে লরেন্স অলিভিয়ারের 'রিচার্ড দি থার্ড' ছবিটি দেখানো হয়। কিছুক্ষণ বাদেই বিদগ্ধ দর্শকের দল হল ছেড়ে বেরিয়ে আসেন—কারণ তাঁদের মতে এরকম একটা ugly জিনিসকে চালাতে যাওয়ার প্রচেষ্টাটাই বাতুলতা। ছবির শেষ দৃশ্যে রিচার্ডের মৃত্যুদৃশ্যটা দেখে আমার নিজেরও আমাদের দেশের হিন্দুস্থানী ছবির কথাই বার বার মনে হচ্ছিল। অথচ ইংরাজদের বিশ্বাস সারা ভূ-ভারতে গিলগুড, অলিভিয়ার এবং রিচার্ডসনের মত অভিনেতা খুঁজে পাওয়া যাবে না। এঁরা সবাই প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, এদের দেশের লোকেরা এই সংকীর্ণতা কাটিয়ে উঠতে পারে না যে, ইংলন্ডের বাইরের অন্যান্য বহু দেশ আছে, যাদের রঙ্গমঞ্চ যথেষ্ট উন্নত এবং সেখানে গিলগুড, অলিভিয়ারের থেকেও বড় বড় অভিনেতা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে থাকেন। কন্টিনেন্টের থিয়েটার-রসিকদের সঙ্গে আলোচনা করুন, বেশ বুঝতে পারবেন তাঁরা ইংলন্ডের রঙ্গমঞ্চকে বেশ অবজ্ঞার চোখেই দেখেন।

১৯৫৭ সালে কভেন্ট গারডেনে আমেরিকান অভিনেতা টাইরন পাওয়ার বার্নার্ড শ'র 'ডেভিলস্ ডিসাইপল্' নাটকটি নিয়ে অভিনয় করতে আসেন। আমি সে নাটকের অভিনয় দেখেছিলাম এবং টাইরন পাওয়ারের রিচার্ড ডাজনের চরিত্র-রূপায়ণ অত্যন্ত প্রাণবন্ত লেগে-

রোমিওর ভূমিকায়
—স্যার লরেন্স অলিভিয়ার

ছিল—বেশ বোঝা যাচ্ছিল দর্শকদেরও বেশ ভাল লাগছে—কিন্তু প্রাণভরে অন্য দেশের অভিনেতার অভিনয়ের প্রশংসা করতে এদের বাধছিল—ইন্টারভেলের সময় দর্শকদের মন্তব্য হচ্ছিল অনেকটা এই ধরণের—হ্যাঁ, মন্দ নয়—তবে এসব রোলে গিলগুড বা অলিভিয়ার বা রিচার্ডসন নামলেই নাটকের রূপ বদলে যায়। অথচ ওয়েস্ট এন্ডে প্রথম শ্রেণীর ইংরাজ দলের দ্বারা অভিনীত 'ডক্টরস্ ডিলেমা' আমি দেখেছিলাম—এত নিকৃষ্ট এবং প্রাণহীন অভিনয় আমি খুব কমই দেখেছি।

বিখ্যাত আমেরিকান নৃত্যশিল্পী ইসাডোরা ডাঙ্কান যখন রাশিয়াতে প্রথম নৃত্যসফরে যান, প্রথম রাত্রির নাচের সময় দর্শকেরা মোটেই তাঁর নাচকে অন্তর থেকে গ্রহণ করতে পারছিল না—এবং হয়তো কিছুক্ষণ বাদেই হট্টগোল শুরু হোত। কিন্তু স্ট্যানিসলাভস্কি প্রমুখ শিল্প-বিশেষজ্ঞরা ব্যাপারটা আগেই আঁচ করতে পেরে প্রথম বিরামের সময় স্টেজের কাছাকাছি এগিয়ে গিয়ে করতালি ধ্বনির মাধ্যমে দর্শকদের বুঝিয়ে দিলেন যে, মিস ডাঙ্কান উচ্চশ্রেণীর নৃত্যরস পরিবেশন করছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দর্শকরাও শান্ত হয়ে গেল।

বিখ্যাত আমেরিকান অভিনেতা জন ব্যারিমোর নিউ ইয়র্কে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে 'হ্যামলেট' নাটকের অভিনয় করবার পর লন্ডনে আসেন ঐ নাটকের মঞ্চাভিনয় করতে। এজন্য বেশ কিছুদিন তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়—কারণ আমেরিকান এ্যাক্টর 'হ্যামলেটে'র ভূমিকায় অভিনয় করবেন বলে লন্ডনের স্টেজ ম্যানেজাররা মঞ্চ ভাড়া দিতে আপত্তি প্রকাশ করেন। শেষ পর্যন্ত হে মার্কেট থিয়েটারের সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়, দু-তিন সপ্তাহ তারা ব্যারিমোরকে 'হ্যামলেট' মঞ্চস্থ করতে দেবে—ঐ সময়টায় তাদের একটি নাটক শেষ হয়ে পরের নাটক তৈরি করার জন্য মহড়া চলছিল। তাও এই মাঝের সময়টা স্টেজ ভাড়া নিতে ব্যারিমোরকে অনেক কূটকৌশলের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। 'হ্যামলেট' এত সাফল্য অর্জন করেছিল যে, এর পর ব্যারিমোর পরের যে নাটক হবার কথা ছিল তাদের সম্পূর্ণ টাকা-কড়ি পে করে দিয়ে আরও কয়েক সপ্তাহের জন্য ঐ স্টেজে 'হ্যামলেটে'র অভিনয় চালিয়ে যান। বার্নার্ড শ, উইনস্টন চার্চিল প্রমুখ প্রথম রজনীতে ব্যারিমোরের 'হ্যামলেট' দেখতে যান এবং অভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। কিন্তু এ প্রশংসা তো হল বিদগ্ধ ব্যক্তিদের এপ্রিসিয়েশন। এই জাতীয় এপ্রিসিয়েশন শিশিরকুমারও অপর্যাপ্তভাবে লাভ করেছিলেন আমেরিকার বিদগ্ধ দর্শক এবং প্রেসের তরফ থেকে। কিন্তু যাঁরা তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন ওদেশে, তাঁদের আসল উদ্দেশ্য ছিল অন্যরকম—তাঁরা চেয়েছিলেন ভারতীয় দলটিকে নানাভাবে কলঙ্কলিপ্ত করতে—কিন্তু তাঁদের সে উদ্দেশ্য সফল হয় নি।

১৯৫৬ সালে ব্রেখট্ পার্টি লন্ডনে আসেন কয়েকটি নাটকের অভিনয় দেখাতে—প্যালেস থিয়েটার ভাড়া নিয়ে এঁরা অভিনয় করেছিলেন। ব্রেখটেরও আসবার কথা ছিল—কিন্তু কয়েকদিন আগে তিনি হঠাৎ হার্ট এ্যাটাকে মারা যান। বার্লিনার আসেম্বলের 'মাদার

কারেজ', 'ককেশিয়ান চক্ সারকল' প্রভৃতি বিখ্যাত নাটকের অভিনয় দেখলাম। ব্রেখটের স্ত্রীর অভিনয় দেখে আমার বার বার শ্রীমতী প্রভার অভিনয়ের কথাই স্মরণ হচ্ছিল। এর আগে ইংলন্ডে আমি ডেম সিবিল থর্নডাইক, ডেম ইডিথ ইভান্স, ডেম পেগী এ্যাসক্রাফ্‌ট্ প্রমুখের অভিনয় দেখেছি—কিন্তু শিশিরযুগের নামকরা অভিনেত্রীদের তুলনায় এঁদের অভিনয়ক্ষমতা আমার অনেক নিচের স্তরের বলে মনে হয়েছে। আর প্রভার ধারে কাছে আসবার মত অভিনেত্রী আমি ইংলন্ডের স্টেজে দেখতে পাই নি। কিন্তু মিসেস ব্রেখট্ দেখলাম প্রভার সমস্তরের অভিনেত্রী—'মাদার কারেজ'-এ তিনি যে অভিনয়প্রতিভা দেখিয়েছিলেন, ইউরোপের অন্য কোন স্টেজে তাঁর কাছাকাছি আসবার মত অভিনেত্রী আমার চোখে পড়ে নি। এই সময়টায় আমি ব্রেখটের নাটক এবং ব্রেখট্ সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ পড়েছিলাম। তাঁর পার্টির অভিনয় সব দিক দিয়েই অনবদ্য মনে হয়েছিল, কিন্তু প্রোডাকসনের টেকনিকের কিছু কিছু আমি ঠিকভাবে বুঝতে পারি নি।

এ সময় লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে ড্রামা বিষয়ক একটি এক্সটেনসন লেকচারের ব্যবস্থা হয়—আমি এই লেকচারগুলো এ্যাটেন্ড করেছিলাম—জন ফার্নাল্ড, পিটার হল, নর্মান মার্সাল প্রমুখ লন্ডনের নাট্যজগতের বিখ্যাত প্রডিউসাররা এই সব কোর্সে বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন। একদিন পিটার হল বক্তৃতার শেষে নানা বিষয় নিয়ে শ্রোতাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। আমি তাঁকে এ্যাকটিংয়ের ক্ষেত্রে ব্রেখট্ ঠিক কিভাবে এলিয়েনেশনের প্রয়োগ করেন সেটা বুঝিয়ে দিতে বলি—কারণ ব্রেখট্ পার্টির অভিনয় দেখে এই এলিয়েনেশনের ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয় নি। পিটার হল এ ব্যাপারটা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপই করলেন—বললেন, তিনিও ওদের অভিনয়ে এলিয়েনেশনের দিকটা কিছুই বুঝতে পারেন নি। এ ব্যাপারে যে পিটার হল খুব একটা ইন্টারেস্টেড তাও মনে হল না। আমার আসল বক্তব্য হল আসলে নিজেদের গন্ডীর বাইরের লোককে এঁরা খুব আমল দিতে চান না। তা ছাড়া এক দেশের লোকের অন্য দেশের শিল্পকে ঠিকভাবে বুঝতে হলে, সে দেশের শিল্প সম্বন্ধে খানিকটা জ্ঞান থাকা দরকার। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত উদয়শঙ্করের ভগ্নী এক সময়ের বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী কনকলতার একটি লেখা থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করছিঃ

"এই আজও (১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৩) স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকায় জেম্‌স্ কাওলে সাহেব তাঁর লন্ডন নোটবুকে এই সম্মেলনের (এডিনবার্-এর ম্যাকওয়েন হলে আন্তর্জাতিক সঙ্গীত সম্মেলন) বিশদ আলোচনা করেছেন। 'অতুলনীয় শিল্পীযুগল' পঃ রবিশঙ্কর ও উস্তাদ আলি আকবর খান এবং তাঁদের 'হৃষ্ট-পুষ্ট সহযোগী' 'তবলার যাদুকর' আল্লা-রাখার উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে, শ্রোতা ও সমালোচক উভয়েই এঁদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি লিখেছেন যে, 'গত বুধবারে ক্রেডেন্ স্ট্রীটে অবস্থিত ইণ্ডিয়া ক্লাবের যে টি-পার্টির আয়োজন হয়েছিল, সেখানে এঁরা সকলেই একমুখে স্বীকার করেছেন যে, এঁদের সঙ্গীত যে সকল শ্রোতার মর্ম এমন বিস্ময়করভাবে স্পর্শ করবে, এমন কল্পনাও তাঁরা করতে পারেন নি।' কাওলে সাহেব তারপরে সুব্বুলক্ষ্মীর নাম করে বলেছেন যে, চা-পান পর্ব শেষে সকলের অনুরোধক্রমে তিনি দুখানি গান করলেন। অনুচ্চকণ্ঠে গীত সেই সম্মোহক গান এখনও তাঁর স্মৃতি-পথে বার বার উদিত হচ্ছে। 'আশ্চর্য নয় যে, এই মহিলা শিল্পীর কণ্ঠসঙ্গীত মহাসম্মেলনে তাৎক্ষণিক সমাদর লাভ করেছিল।' কাওলে সাহেব অতঃপর পঃ রবিশঙ্কর প্রমুখ শিল্পিগণের সহিত অনুপমের ইংরাজ গীটারশিল্পী জুলিয়ান ব্রীমের হৃদ্যতার উল্লেখ করে বলেছেন যে, ব্রীম যখন ভারত সফরে গেছলেন, তখনই এ পরিচয়ের সূত্রপাত হয়। কাওলে সাহেব বলেছেন যে, এই দুই সাঙ্গীতিক প্রতিভার মিলনের কি পরিণাম হয় দেখার জন্য জগৎ উন্মুখ হয়ে আছে। পরিশেষে তিনি মন্তব্য করেছেন যে, য়েহুদি মেনুহিনের প্রচেষ্টাতেই আজ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এমনিভাবে পরস্পরের নিকটবর্তী হয়েছে। বিশ্বসঙ্গীতের ইতিহাস এই মহোদয়ের নিকট নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে।

* * *

"পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সঙ্গে যাঁদের অল্পবিস্তর পরিচয় আছে, তাঁরা সকলেই জানেন যে, ভারতীয় সঙ্গীত যেমন কণ্ঠ-সঙ্গীত-প্রধান, পাশ্চাত্য সঙ্গীতও তেমনি যন্ত্রসঙ্গীত প্রধান। সঙ্গীতজ্ঞ বলে পরিচয় দিলেই সাধারণত আমরা যেমন সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করিঃ 'আপনি কি গান?—ধ্রুপদ না খেয়াল, না অন্য কিছু?' পাশ্চাত্য প্রশ্নটি অন্যভাবে এসে পড়েঃ 'আপনি কি বাজান—পিয়ানো, না ভায়োলিন, না অর্গ্যান?' সুতরাং যে পাশ্চাত্য সঙ্গীতে যন্ত্রের এত আধিপত্য, সে সঙ্গীতের অনুশীলনকারী বা সমালোচক বা অনুগামী যে প্রাচ্য সঙ্গীতের এই বিশেষ দিকটিরই উপর অধিকতর দৃষ্টি দেবেন, এর আর আশ্চর্য কি! আজন্ম যন্ত্রসঙ্গীতে অভ্যস্ত পাশ্চাত্য কানে যন্ত্রসঙ্গীতের আবেদনই প্রাথমিকভাবে গ্রাহ্য। কেন না, এক তো যন্ত্রসঙ্গীতে কণ্ঠসঙ্গীত সম্যক উপলব্ধি করার পথে প্রচন্ড বাধা বিদেশী ভাষার কচকচি নেই, দ্বিতীয়ত সঙ্গীতের সকল রকম কলা-কৌশলের সঙ্গে তাঁরা কম অপরিচিত নন। এজন্যই পঃ রবিশঙ্কর প্রমুখ যন্ত্রশিল্পীর এত তারিফ হয়েছে।

"সুব্বুলক্ষ্মীর অদৃষ্টেও যে প্রশংসা-লাভ না জুটেছে তা নয়, তবে সেটুকু প্রশংসা কতখানি আন্তরিকতার সঙ্গে বর্ষিত হয়েছে সে বিষয়ে আমাদের ঘোরতর সন্দেহ আছে। সুব্বুলক্ষ্মী একে বিদেশিনী, তায় সুন্দরী, পাশ্চাত্য জগতে প্রশংসালাভের পক্ষে এই দুটিই যথেষ্ট।

শ্রীরামচরিত-মানস

ভক্তকবি তুলসীদাস

অধ্যাপক শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গানুবাদ

শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা-গানে ভারতবর্ষের বহু গুণী ও জ্ঞানীজন লেখনী ধারণ করিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। সেই সকল অমর লেখনীর প্রতিভা-নির্ঝরে ভারতবর্ষের মহাকাব্য পৃথিবীর সাহিত্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ভক্তকবি গোস্বামী তুলসীদাস তন্মধ্যে অন্যতম—যিনি সহজ সরল ভাষায় পতিতপাবন সীতা-রামের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন সুমধুর সঙ্গীতের মাধ্যমে। তুলসীদাসের জীবনসর্বস্ব মহামানব শ্রীরামচন্দ্রের সেই বন্দনা-গানের সুললিত বাংলা অনুবাদ এই প্রথম—বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের অপূর্ব কীর্তির নূতন এক পরিচয় এই শ্রীরামচরিত-মানস। বহু রঙীন চিত্রে সুশোভিত।

মূল্য—১ম খণ্ড দুই টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

তবে কথা হচ্ছে, পাশ্চাত্যবাসী এ সকল বিষয়ে গভীর জলের মাছ। যেখানে মনের আসল কথা 'বড়ই একঘেয়ে', সেখানে তিনি মুখে প্রকাশ করেন, 'বড়ই চিত্তাকর্ষক' বা ঐ জাতীয় কিছু।...... অমন যে ডাকসাইটে গুণী পঃ ওঙ্কারনাথ, তাঁকেও ১৯৩৩ সালে, ফ্লোরেন্সে আন্তর্জাতিক সঙ্গীত সম্মেলন সেরে দিগ্বিজয়ের পরিকল্পনা ত্যাগ করতে হয়েছিল। এখানে-ওখানে দু-একটি ছুটকো মাইফেল করে তাঁকে তাঁর অহঙ্কার গলধঃকরণ করতে হয়েছিল। দিগ্বিজয় তাঁর অদৃষ্টে জোটে নি এ যুগে পঃ রবিশঙ্কর বা ওস্তাদ আলি আকবরের মত। ওঙ্কারনাথজীর মত মহাগুণীর ভাগ্যেও যে সমস্ত ইউরোপ ঢুঁড়ে কয়েক সহস্র শ্রোতা জোটে নি, এ ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে এক দুরপনেয় কলঙ্করেখা।

"যে যুগের কথা বলছি, সে যুগে কেবল কণ্ঠসঙ্গীত কেন, যন্ত্রসঙ্গীতেরও এমনি দুর্দশা ছিল। তখনও মহামনীষী সিলভাঁ লেভী জীবিত আছেন। তাঁরই পৌরোহিত্যে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য ছাত্রসঙ্ঘের উদ্বোধন হয়। এবং উদ্বোধনপ্রসঙ্গে একটি ছোটখাট জলসারও সেখানে আয়োজন হয়েছিল। কিন্তু ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েরই এক ছাত্র, মিঃ মুখার্জি, যেই সুরবাহারে ইমন রাগে আলাপ শুরু করলেন, অমনি দেখা দিল শ্রোতৃমহলে চাঞ্চল্য। তিনি ৫।৭ মিনিট বাজাতে না বাজাতেই সেই চাঞ্চল্য পা-দাপাদাপিতে পরিণত হল। ব্যস্, তাঁর বাজনা বন্ধ হয়ে গেল। এমন যে দুর্ধর্ষ স্বরোদীয়া তিমিরবরণ, অন্তত যে যুগে তিনি দুর্ধর্ষই ছিলেন, তাঁর অদৃষ্টেও একবার এইরকম পা-দাপাপাপি ছাড়া অন্য কিছু জোটে নি, এ আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। সেটা ১৯৩২ কি ১৯৩৩ সালের কথা। সাল প্লেয়েল-এ উদয়শঙ্করের শো চলছে। দুটি নাচের অন্তর্বর্তীকালে তিমিরবরণ স্বরোদ নিয়ে বসলেন, সঙ্গে সঙ্গতকার বিষ্ণুদাস শিরালী। কিন্তু তিমিরবাবু বাজাবেন কি, পাঁচসাত মিনিটের মধ্যে অডিয়েন্সের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। শেষে তাঁদের অস্থিরতা এইরূপ পা-দাপাদাপিতে পর্যবসিত হল। বাধ্য হয়ে শ্রীযুক্ত উদয়শঙ্কর বেরিয়ে এলেন, এবং অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করলেন। গত ২৫।৩০ বৎসরের মধ্যে পাশ্চাত্যবাসীর এ অসহিষ্ণু আচরণ অনেকাংশে প্রশমিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে জাগরণ দেখা দিয়েছে, তাঁরা ভারতীয় যন্ত্রসঙ্গীতের মূল্য নিরূপণে যত্নবানও হয়েছেন। এজন্যই ইদানীং ভারতীয় যন্ত্রশিল্পীদের অদৃষ্টে পাশ্চাত্যদেশ সফরের আমন্ত্রণও মধ্যে মধ্যে জুটছে। পাশ্চাত্য শ্রুতিভঙ্গির কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে, নিশ্চয়ই বলতে হবে।

"কিন্তু এই পরিবর্তনের মূলে কে? মেনুহিনের পূর্বেও আরো একজন, যিনি এই ভারত মহামানবের এক উজ্জ্বলতম নিদর্শন, এই প্রাচ্য-প্রতীচ্য মিলনরূপী সেতুবন্ধের প্রথম পরিকল্পক, এই কার্যে অগ্রণী হয়েছিলেন। তিনি আমাদের পথিকৃৎ শ্রীযুক্ত উদয়শঙ্কর।

"এ্যানা প্যাভ্‌লোভার পার্টনাররূপে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় নৃত্য করবার সময়েই উদয়শঙ্করের মনে তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর প্ল্যানটি জেগে ওঠে। বহুকাল পাশ্চাত্যবাসের অভিজ্ঞতার ফলে তিনি

উদয়শঙ্কর

বুঝেছিলেন যে, পাশ্চাত্যসঙ্গীত ও ভারতীয় সঙ্গীতের মধ্যে যে মূলগত পার্থক্য বিদ্যমান, তাতে ভারত সম্বন্ধে পাশ্চাত্যবাসীকে সচেতন এবং আগ্রহান্বিত করতে হলে প্রয়োজন নৃত্যকলার মাধ্যমে শিক্ষাদান। এই দেশপ্রেমিক স্বয়ং ছিলেন এক প্রতিভাশালী চিত্রশিল্পী, ভারতীয় সঙ্গীতেও তাঁর দখল ছিল পর্যাপ্ত, মস্তিষ্কটিও ছিল উর্বর। তিনি মনে মনে তাঁর নৃত্য পরিবেশনের খসড়াটি এঁকে নিলেন। তারপরে শুরু করলেন নৃত্যকলার নবরূপ দান। যা কিছু ছিল অবান্তর, অমার্জিতরুচি, দীর্ঘসময়সাপেক্ষ, চক্ষুকর্ণের পীড়াদায়ক, সব ছাঁটাই করে ফেলে অন্ধ সংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করলেন। বহুমূল্য চমকদার বস্ত্রের সাজপোশাক তৈরি করালেন। নানা রঙের আলোর স্টেজ এফেক্ট নির্ণয় করলেন, নাচের সময় নির্দিষ্ট করলেন, নাচগুলির কো-অর্ডিনেশন বা সংহতি হল, অর্কেস্ট্রার জন্য বাছাই-করা আর্টিস্ট সংগ্রহ হল, নাচের পার্টনার ঠিক হল, সবই নিখুঁতভাবে ঢেলে সাজা হল, তারপরে সেই দল নিয়ে তিনি সাগরপারে দিলেন পাড়ি। ১৯৩১ সালে প্যারিসে যে ঔপনিবেশিক প্রদর্শনী উদ্ঘাটিত হয়, সেই প্রদর্শনীতে তিনি একাদিক্রমে ছ'মাস, সপ্তাহে দুটি করে শো দিয়ে, হাজার হাজার দর্শক বা শ্রোতাকে ভারতীয় সর্বাত্মক সঙ্গীতে দীক্ষিত করলেন। তাঁর সেই আন্তরিক নিবেদন যে ব্যর্থ হয় নি তার প্রমাণ এডিনবরার ফেস্টিভ্যালে ভারতীয় শিল্পীদের সাদর আমন্ত্রণ। শ্রীযুক্ত উদয়শঙ্কর ভারতীয় সঙ্গীতের বিদেশী কদরের জন্য যে পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, সেই পথই লক্ষ্য করে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রমুখ শিল্পিবৃন্দ আজ এগিয়ে চলেছেন। আশা করা যায় যে, আরও কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতীয় সঙ্গীতের প্রতি সচেতনতা পাশ্চাত্যবাসীকে উৎসাহিত করবে এদেশের বিশিষ্ট কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পিগণকে আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন সংঘটন ত্বরান্বিত করতে।"

শ্রীমতী কনকলতার লেখা থেকে বেশ স্পষ্টভাবেই ওদেশে আমাদের শিল্প এবং শিল্পীদের কিভাবে এ্যাপ্রিসিয়েট করা হয় তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আজকাল আমাদের বাদ্যযন্ত্র সম্বন্ধে ইউরো-আমেরিকায় যে আগ্রহ দেখানো হচ্ছে তারও মূলে যথেষ্ট হুজুগ আছে।

অনেকের ধারণা কোনরকম কন্ট্রাক্ট বা চুক্তি ইত্যাদির ব্যাপারে ইউরোপ বা আমেরিকার লোকেরা খুব সততা অবলম্বন করে চলে। এও কিন্তু একেবারে সম্পূর্ণ ভুল ধারণা—শিশিরবাবুকে নিউ ইয়র্কে নিয়ে গিয়েছিল যে পার্টি, তারা যখন দেখল, তিনি স্বদেশের পক্ষে অপমানকর তাঁদের সব প্রস্তাবকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে চলছেন, তখন তারা তাঁকে বিপদে ফেলে সরে দাঁড়ালো। শিশিরবাবু এদের বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের জন্য কেস করতে পারতেন—কিন্তু তার জন্য দরকার হত প্রচুর টাকার এবং ওদেশে দীর্ঘকাল অবস্থিতির। শিশিরবাবুর টাকাও ছিল না এবং বিনা টাকায় ওদেশে দীর্ঘকাল থাকা ও কেস চালানোও সম্ভব হয় নি। সুতরাং অন্য পার্টির সহায়তায় তাঁকে আমেরিকাতে প্লে করতে হয়েছিল—সেকথা পরে বলছি। ওদেশের honesty of integrity সম্বন্ধে আমারও নিজস্ব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা—ব্যাপারটা খুলেই লিখছি এই কারণে যে, ওদের সম্বন্ধে আমাদের অনেক ভুল ধারণা আছে এবং সে সব ধারণা থেকে আমাদের দেশের লোকেরা যত তাড়াতাড়ি মুক্ত হতে পারেন ততই ভাল। [ক্রমশঃ]

রঙ্গজগৎ

হোটেলে নাচগান

বড় বড় শহরের বড় বড় হোটেলে নাচগানের ব্যবস্থা থাকে। নাচগানের জন্য বিদেশ থেকে নর্তকী এবং গায়ক-গায়িকাদের আনা হয়। এ'রা বিদেশী নাচ এবং গান পরিবেশন করেন। এ'রা যে পারিশ্রমিক নেন তার অঙ্ক অবিশ্বাস্য রকমের বলা চলে। এতে বিদেশী মুদ্রার প্রশ্নও জড়িত রয়েছে। ...

সম্প্রতি জনৈক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন, হোটেলে বিদেশী নাচগানের পরিবর্তে ভারতীয় নাচগানের ব্যবস্থা হয় না কেন? তিনি আরও বলেছেন, এসব হোটেলে যাঁরা খানাপিনা করতে যান তাঁদের মধ্যে বিদেশী বেশী, বিদেশী পর্যটকরাও এখানে আসেন। নিজের দেশে তাঁরা যা দেখেন বা শোনেন এদেশে এসে তারই পুনরাবৃত্তি দেখেন। একই জিনিস দেখার মধ্যে আকর্ষণ থাকতে পারে না। ভারতীয় নাচগানের ব্যবস্থা থাকলে ওদের নতুন অভিজ্ঞতা হয়, চিত্তবিনোদনের দিক থেকেও তা ভাল। মন্ত্রিমহোদয় যে এ ব্যাপারে মুখ খুলে কথা বলেছেন, এটা প্রশংসনীয়। কিন্তু হোটেলগুলিকে বিদেশী নর্তকী আনার অনুমতি ও আর্থিক সুবিধা তাঁরাই দিয়ে থাকেন। তাঁদের সরকারের অনুগ্রহে স্বাধীনতার পরে এদেশে ক্যাবারে নাচের ব্যাপক প্রচলন হয়েছে। অসংখ্য নাইট ক্লাব, বার ও কাফে গড়ে উঠেছে এবং সেসব স্থানে যে নাচগান হয় তা এদেশীয় সংস্কৃতির অঙ্গ নয়। অধিকাংশ নাইট ক্লাবে বিদেশী গান ও নাচ পরিবেশন করা হয়ে থাকে। মন্ত্রিমহোদয়ের সরকারের অনিচ্ছা থাকলে এসব জিনিস রাতারাতি ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠতে পারত না। সরকার ইচ্ছা করলে বিশেষ ধরণের নাচ ও অঙ্গভঙ্গি-প্রদর্শক তথাকথিত নর্তকীদের অবাধ আমদানিও বন্ধ করতে পারেন। কিন্তু কার্যত দেখা গেছে বিপরীত। সুস্থ চিন্তার সমাজতান্ত্রিক দেশের ছবির আমদানি এদেশে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, অথচ নাইট ক্লাবের ছবি, সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপরাধচিত্র এদেশে অসংখ্য আসছে। সিনেমাগুলি সে ছবি লুফে নিচ্ছে। দর্শকরা দলে দলে দেখছে। কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রিমণ্ডলের মধ্যে কোন একজনেরও যদি এ ব্যপারে বিবেকদংশন থাকে, তবে তিনি এ ব্যাপারে মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যে আলোচনা করে, তারপরে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য বিবৃতি দিলে শোভন হত। নতুবা লোকে মনে করতে পারে—এসব নির্বাচনী ধাঁওতা।

এদেশের বড় বড় হোটেলগুলি একসময় বিদেশীদের দ্বারা পরিচালিত হত। সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খলারক্ষা করার জন্য যাঁরা এদেশে আসতেন তাঁদের চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে বিদেশী নাচগানের ব্যবস্থাও করা হত। দেশ স্বাধীন হবার পর হোটেলগুলির মালিকানার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। আরও বড় বড় হোটেল গড়ে উঠেছে। কিন্তু মালিকানা পরিবর্তনের পরও সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের তুষ্টির জন্য যে ধারায় চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা ছিল তার পরিবর্তন হয় নি। বরঞ্চ আরও বেশি করে পাশ্চাত্য ধরণের নাচগানের প্রচলন হয়েছে। দেশীয় 'সাহেব'রাও এসব স্থানে গিয়ে বিদেশী প্রভুদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। স্বাধীনতার পরে আত্মসচেতন হওয়ার পরিবর্তে হীনমন্যতার শিকার হয়ে এ'রা গড্ডালিকা স্রোতে গা ভাসিয়েছেন। হোটেল, নাইট ক্লাবগুলিতে এই হীনমন্যতার নিদর্শনই প্রতিরাত্রে দেখা যায়।

প্রমোদকরের চাপে আঞ্চলিক চলচ্চিত্র-শিল্পের প্রায় নাভিশ্বাস উঠেছে। নাচগানের জলসা প্রমোদকরমুক্ত নয়। অথচ হোটেল নাইট ক্লাবে নাচগানের উপর প্রমোদকর ধার্য হয় না। হোটেল মালিকরা নর্তক-নর্তকীদের নামে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে লোক আকর্ষণ করে। অথচ সেসব নাচগান প্রমোদকর মুক্ত। মন্ত্রিমহোদয় আক্ষেপ করলেও তাঁর সরকার এভাবে উৎসাহ যোগাচ্ছেন।

—সুজন।

'তিসরী কসম'-এর হীরামন—রাজকাপুর

চিত্র আলোচনা

তিসরী কসম

(পরিচালনা—বাসু ভট্টাচার্য)

হিন্দীছবির জগতে গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে ওটা, অথবা প্রচলিত ফর্মুলাকে উপেক্ষা করে ছবি তৈরি করা প্রায় অসম্ভব এমন কথা অনেকে বলে থাকেন। সেখানে নাকি সর্বভারতীয় দর্শকের প্রতি লক্ষ্য না রেখে ছবি করলে নিশ্চিত ডুবতে হয়। কথাটি যে সম্পূর্ণ সত্য নয় তার প্রমাণ সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত 'তিসরী কসম'।

এককালে হিন্দীতে এমন অনেক ছবি হয়েছে যা ভারতের চলচ্চিত্র জগতে সর্বকালে দেখার যোগ্য। সাম্প্রতিককালে প্রযোজকরা হলিউডের অনুকরণে ছবি করেছেন যার কোন জাতীয় পরিচয় নেই। ছবির নায়ক-নায়িকারা চেহারায় ভারতীয়, পোষাকে অভারতীয়, আচরণে বিদেশী, মানসিকতায় মার্কিন। এইরূপ নৈরাজ্যের জগতে বিমল রায়রা কয়েকজন মাত্র হিন্দী ছবির জগতে সুস্থ চিন্তাধারার ছবি করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। সেই ঐতিহ্য অনুসরণ করে বাসু ভট্টাচার্য 'তিসরী কসম' ছবিটি নির্মাণ করেছেন। এক সাধারণ গ্রামের মানুষ, নিজের গাড়ি চালিয়ে যে জীবিকা নির্বাহ করে। সৎ পথে থেকে নিজের পরিশ্রমে যে বাঁচতে চায়। যে লোক একবার নিজের অজ্ঞাতে চোরাই মাল নিয়ে যাওয়ার সময়, আর একবার চোরাই বাঁশ চালানোর সময় নিজের ভুল বুঝতে পেরে শপথ করেছে সেপথে আর না যাবার। এমন এক

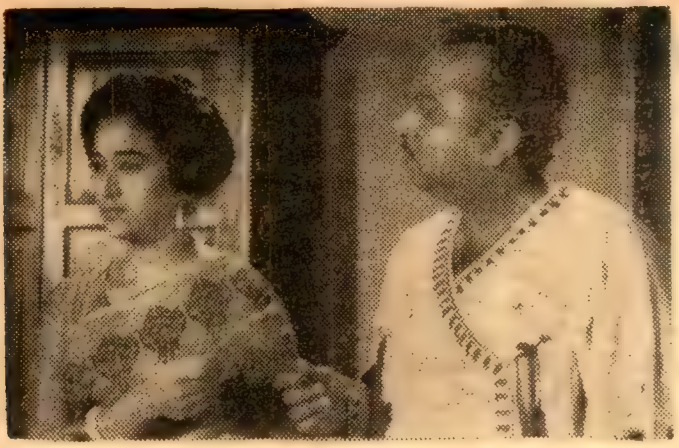

'ফিরে চলো'র একটি দৃশ্যে সবিতা বসু ও অশোক মিত্র

সাদাসিধা লোক হীরামন এ ছবির নায়ক। নায়িকা এক বাঈজী—হীরামতী। এ দু-জনের হৃদয়-বিনিময়ের ঘটনা নিয়ে ছবির কাহিনী গড়ে উঠেছে। দু-জনের পরিচয় হয়েছিল মেলার পথে। মেলার শেষে দু-জনের সম্পর্কের শেষ। দু-জনাই নিয়ে গেছে প্রেমের বেদনা। একজন বহুজনের সান্নিধ্যের মধ্যে একটি মাত্র হৃদয়কে দেখেছে, আর একজন জীবনে প্রথম প্রেমের পরশ পেয়েছে।

ছোট কাহিনীটি সুন্দর। আরো সুন্দর হয়ে উঠেছে সত্যজিৎ রায়ের ক্যামেরাম্যান সুব্রত মিত্রের পরিচালনায় চিত্র গ্রহণের কাজ। চিত্রগ্রহণের যে বৈশিষ্ট্য এখানে ফুটে উঠেছে তা দর্শকদের মুগ্ধ করবে। পরিচালকের দৃশ্য গঠনের কাজও চমৎকার।

প্রধান দুটি চরিত্রের রূপ দিয়েছেন রাজকাপুর ও ওয়াহিদা রহমান। দু-জনকেই এখানে ভাল লাগে। গ্রাম্য সরল যুবকরূপে রাজকাপুরের উঁচুস্বরে কথা বলা, তার বিস্ময়, একজন অপরিচিতা নারীর প্রতি শ্রদ্ধা এবং পরিচয়ের সঙ্গে ক্রমে ভালবাসা ইত্যাদি রাজকাপুর উপভোগ্য করে প্রকাশ করেছেন। ওয়াহিদা রহমানও একটা সরল মনের স্পর্শে নতুন করে জেগে-ওঠা বাঈজীর চরিত্রকে এমন রূপ দিয়েছেন যা দর্শকদের হৃদয় স্পর্শ করে। তার ওপর তাঁর নাচে এবং বহু গানে ছবিটি উপভোগ্য হয়েছে।

যদিও ছবিটিতে দেশী পরিচয় ও মেজাজ রয়েছে তবে বক্স অফিসের দিকে লক্ষ্য রেখে পরিচালক কিছুটা আতিশয্যের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। কথায় কথায় যেমন গান আছে, তেমন একজন বাঈজীর দীর্ঘপথ একা গরুরগাড়ীতে আসা ইত্যাদি অসঙ্গতির প্রশ্নও আছে। পরিচালক মেলার দৃশ্যটিকে আরো বাস্তব করে দেখাতে পারতেন। তাহলেও হিন্দী ছবির জগতে এই ছবিটি অভিনন্দনীয়।

শংকর জয়কিষণের দেওয়া লোকসঙ্গীতের সুরের গানগুলি হৃদয়গ্রাহী।

ফণীশ্বর নাথের লেখা কাহিনী অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন নবেন্দু ঘোষ। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন—দুলারী, ইফতেখার, অসিত সেন, দুবে, কিষাণ ধাওয়ান, সমর চ্যাটার্জী, রেখা, সবিতা, সবিনা প্রমুখ।

লবকুশ

এ, বি, এন প্রোডাকসন্স

পরিচালনা : অশোক চট্টোপাধ্যায়

রামায়ণ কাহিনী নিয়ে ভারতের বিভিন্ন ভাষায় বহু চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। রামায়ণ কাহিনীর আকর্ষণ ও আবেদন প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্তরে রয়েছে। যুগের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ধারণা ও চিন্তা পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে নাটক ও ছবিকে অগ্রসর হতে হয়। টেকনিক্যাল দিক থেকে আজ চলচ্চিত্র বিকাশের যে স্তরে পৌঁছেছে, এ সময়ে পুরানো দিনের শুধু চলমান ফটোগ্রাফি দিয়ে দর্শকের মন ভরানো অসম্ভব। রামায়ণের কাহিনী অংশকে চলচ্চিত্র রূপ দিতে হলে এমনভাবে দেওয়া উচিৎ যা আজকের দর্শকদের কাছে গ্রহণযোগ্য। কেবলমাত্র গ্রামাঞ্চলের দর্শক অথবা অশিক্ষিত মানুষের দিকে পরিচালকের লক্ষ্য থাকা উচিৎ নয়।

আলোচ্য ছবি 'লবকুশ' কাহিনীবিন্যাস, টেকনিক্যাল দিক অথবা অভিনয় কোন দিক থেকেই সন্তোষজনক হতে পারে নি। এত অল্প ব্যয়ে এরূপ কাহিনীচিত্র নির্মাণে প্রযোজকের উদ্যোগ গ্রহণ না করাই উচিৎ ছিল। দৃশ্য গঠন এত দুর্বল যে বনভূমি অথবা রাজ দরবারকে বিশ্বাস্যরূপে গ্রহণ করা কঠিন। অভিনয়ের জন্য যাঁদের নির্বাচন করা হয়েছে তাঁদের অনেককে গ্রহণ করা কষ্টকর, কারো কারো উচ্চারণে পূর্ববঙ্গীয় টান—শুনতে অসহ্য লেগেছে। শেষাংশে দশাবতারের যে রঙীন দৃশ্যগুলি সংযোজিত হয়েছে—মামুলী ধরণে—তারও কি প্রয়োজন ছিল। ছবিটি দেখে আমরা হতাশ হয়েছি।

ছবিতে অভিনয় করেছেন অসিতবরণ, অনিতা গুহ, শংকরনারায়ণ, মাঃ শংকর, মাঃ সুশোভন, মলিনা দেবী, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, জয়নারায়ণ মুখার্জী, প্রবীর কুমার, প্রমুখ।

ফরাসী ছবি প্রদর্শন

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি, সিনে সেন্ট্রাল ক্যালকাটা, সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটার উদ্যোগে তিনটি ফরাসী ছবি

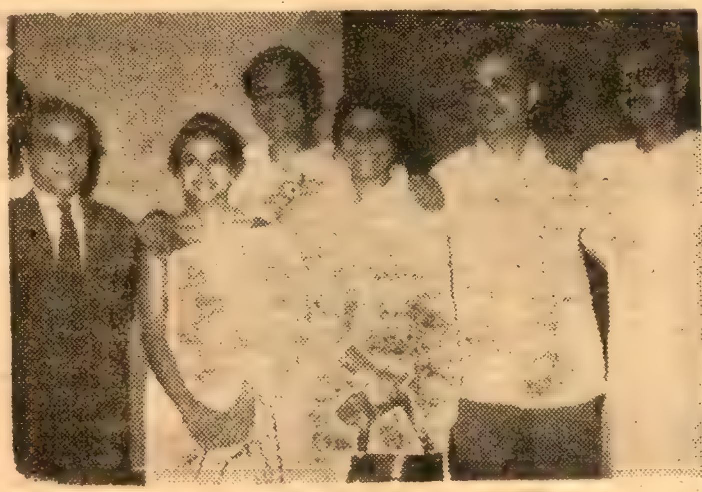

গুরু বাগচী পরিচালিত 'তীরভূমি'র মহরৎ-এ রবি ঘোষ, সন্ধ্যা রায়, বিকাশ রায়, রুমা গুহঠাকুরতা প্রমুখ।

প্রদর্শিত হয়েছে। এই তিনটি ছবির মধ্যে রয়েছে 'অরফী', 'লা-আটালানটে', 'গ্রেট হার্টেট ম্যান'। এই তিনটি ছবিই ফিল্ম সোসাইটি সমূহের সদস্যদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল।

ফিল্ম স্টাডি গ্রুপ

গত ২৭শে নভেম্বর ক্যালকাটা ইনফরমেশন সেন্টারে ফিল্ম স্টাডি গ্রুপের অধিবেশন হয়েছে। এই অধিবেশনে আলোচ্য বিষয় ছিল 'সিনারিও' বা চিত্রনাট্য। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন মৃণাল সেন। তাঁর চিত্রনাট্যের অংশসমূহ থেকে চিত্র প্রদর্শন করে তিনি বক্তব্য উপস্থিত করেছেন।

নাটকের কথা

গেরাসিম লেবেদফ দিবস

গত ২৭শে নভেম্বর মুক্ত অঙ্গনের প্রতিষ্ঠা দিবস ও গেরাসিম লেবেদফ দিবস পালিত হয়েছে শৌভনিকের উদ্যোগে। শৌভনিক নাট্যসংস্থা প্রতি বছর এই দিনে বাংলা নাট্যমঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা লেবেদফকে স্মরণ করে থাকেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই রুশ সন্তান প্রথম ভারত-রুশ সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন বেঙ্গলী থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গলী থিয়েটারে প্রথম পাশ্চাত্য ধরণের মঞ্চে দেশীয় আঙ্গিকে বাংলায় নাটক অভিনয় করে আধুনিক নাট্যমঞ্চ ও নাটকের ইতিহাসের সূচনা করেন। ১৭৯৫ সালে ২৫ নম্বর ডোমতলায় (বর্তমান এজরা স্ট্রীটে) জগন্নাথ গাঙ্গুলীর ভাড়াবাড়িতে ২৭শে নভেম্বর প্রথম 'দি ডিসগাইস' নাটকের বাংলা অনুবাদ অভিনয় করেন। ১৭৯৬ সালের ২৬শে তাঁর দ্বিতীয় নাটক অভিনীত হয়। সেই নাটক ছিল 'লাভ ইজ দি বেস্ট ডক্টর'। তাঁর এই প্রচেষ্টায় প্রধান সহযোগী ছিলেন পণ্ডিত গোলকনাথ দাশ। যাঁর কাছে তিনি সংস্কৃত, ব্যাকরণ এবং ভারতীয় দর্শন ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তিনিই লেবেদফকে বাঙালী অভিনেতা এবং অভিনেত্রী সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। সেদিনের অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মধ্যে ছিলেন দেবকীনন্দন ভট্টাচার্য, চন্দ্রমুখী প্রমুখ। লেবেদফের মঞ্চে বাঙালী অভিনেত্রীর প্রথম মঞ্চাবতরণ। এই থিয়েটার তৎকালীন বাঙালী শিক্ষিতদের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চার করে। এই উৎসাহে লেবেদফ একটি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ অভিনয় করার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। বেঙ্গলী থিয়েটারের এই সাফল্য দেখে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর থিয়েটার মালিকরা ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে তাঁর থিয়েটারে আগুন লাগিয়ে দেয়। কিন্তু বাঙালী কর্মচারীদের চেষ্টায় কিছুটা রক্ষা পায়। তারপরে চক্রান্ত করে ইংরাজরা লেবেদফকে ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য করে। কপর্দকশূন্য অবস্থায় তিনি ভারত ত্যাগ করেন। সঙ্গে নিয়ে যান কেবলমাত্র ভারতীয় বইপত্র, কিছু ভারতীয় কাপড়ের নমুনা ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত থিয়েটারের ইস্তাহার ও রসিদ বই। যাবার সময় তিনি পণ্ডিত গোলকনাথকে লিখে যানঃ

—'আমার বিশ্বস্ত বন্ধু গোলকনাথ দাশ, বিদায় অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আমার সঙ্গে আর কিছু নেই। আমার যথাসর্বস্ব রেখে গেলাম,— আমার থিয়েটার। কালের গর্ভে সব বিলীন হয়, জগতে সব কিছুই ভুলে যায়। আমার নাম, আমার দুঃখবরণ কিছুই কারো মনে থাকবে না, কিন্তু বাংলা থিয়েটার বেঁচে থাকবে।'

লেবেদফের বিশ্বাস মিথ্যা হয় নি। বাংলা থিয়েটার বেঁচে আছে। সারা ভারতে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা গেরাসিম লেবেদফকে বাঙালীরা ভোলে নি। বাঙালীর হয়ে শৌভনিক এই দিবসে লেবেদফকে স্মরণ করেছে। কিন্তু যাঁরা মঞ্চে 'লেবেদফ' নাটক অভিনয় করছেন, তাঁরা এই দিনটিতে বিশেষ কোন অনুষ্ঠান করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

'অন্ধকূপ'-এ সীতার ভূমিকায়—অনিতা গুহ

নীরেন তরফদার পরিচালিত 'আকাশদীপ' ছবির একটি দৃশ্যে সুপ্রিয়া দেবী, অনিল চ্যাটার্জী ও দিলীপ মুখার্জী।

সঙ্গীত কথা

নজরুল সন্ধ্যা

গত ২৬শে নভেম্বর সন্ধ্যায় বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ক্রিস্টোফার রোডস্থ বাসগৃহে এক মনোজ্ঞ

সংগীতানুষ্ঠান হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমি। অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য প্রতি মাসে স্মৃতি-বিস্মৃত কবিকে গান শোনানো। কবি আজও গান শুনতে ভালবাসেন এবং তাঁর প্রিয় গানগুলি শুদ্ধভাবে গাইলে তাঁর মধ্যে যেন কখনও খুশির ভাব, কখনও অস্থিরতা দেখা দেয়। সে অস্থিরতা যেন কিছু প্রকাশের ব্যগ্রতা। পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমি এই অনুষ্ঠানের নাম রেখেছে—নজরুল সন্ধ্যা।

এই সন্ধ্যায় প্রথমে সঙ্গীত পরিবেশন করেন সুপরিচিতা ক্ল্যাসিক্যাল সংগীত গায়িকা শ্রীমতী অপর্ণা চক্রবর্তী তিনি কাজী নজরুলের তিনটি রাগপ্রধান সংগীত গেয়ে শোনান। তারপরে একে একে পাঁচটি গান করেন সঙ্গীত-রত্নাকর শ্রীসিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত-শিল্পী শ্রীধীরেন বসু নজরুলের কয়েকটি পুরনো গান গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন।

অনুষ্ঠানে নজরুল সঙ্গীতের গায়কী সম্পর্কে সুন্দর এক আলোচনা করেন শ্রীধীরেন বসু। নজরুল সঙ্গীতকে সুরের বিকৃতি থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি একটি বোর্ড গঠনের প্রস্তাব করেন।

প্রতি মাসে এরূপ একটি অনুষ্ঠান হবে কবির ক্রিস্টোফার রোডের গৃহে। নজরুল সঙ্গীতশিল্পীরা কবিকে গান শোনাবেন। সঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনা হবে। অনুষ্ঠানে সকলের প্রবেশ অধিকার থাকবে। কবিপুত্র কাজী সব্যসাচী ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী উমা কাজী উপস্থিত সকলকে চা-পানে আপ্যায়ন করেন।

হিমাংশু স্মৃতিবাসর

সুরসাগর হিমাংশু সংগীত সম্মেলনের উদ্যোগে ২৪শে নভেম্বর ৩৭,

কাজী নজরুল ইসলাম

পরাশর রোডে প্রখ্যাত সুরকার হিমাংশু দত্তের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত সংগীতানুষ্ঠানে রথীন চৌধুরীর পরিচালনায় স্বর্গত সুরকারের কয়েকটি গান পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানের সবকটি গানই সুগীত। সঙ্গীতে অংশ নেন গৌতম বসু, তপন রায়চৌধুরী, পূরবী চট্টোপাধ্যায়, গৌরী দাশগুপ্ত, রমা ঘোষ, মিতা চক্রবর্তী, মধুছন্দা বসু, শ্যামলী দেসরকার, রঞ্জিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তনিমা মুখোপাধ্যায়, শ্রীপর্ণা ঘোষদস্তিদার, চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়, গোপা দেসরকার, সুলেখা সোম, মিনতি ঘোষ, পঙ্কজ চক্রবর্তী, দীপা দত্ত ও রথীন চৌধুরী।

মূকাভিনেতা যোগেশ দত্ত

অন্যতম মূকাভিনেতা শ্রীযোগেশ দত্ত সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যায় মূকাভিনয় প্রদর্শন করেন। শ্রীদত্ত এবার একটি নতুন মূকাভিনয় পরিবেশন করেন—গুরুদেবের "রাজপুত্র"। এ ছাড়া আরও কয়েকটি বিষয়ে মূকাভিনয় পরিবেশন করেন। সত্যিই কল্পলোকের সেই রাজপুত্রের আজ কর্মচঞ্চল বাস্তব কলকাতায় কি পরিণাম! এই মূকাভিনয়টি এবার সকলের কাছে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এসেছে। ভিলাইয়ে শ্রীদত্ত বিদেশী অতিথিদের নিকট হতে প্রচুর প্রশংসা লাভ করেন। উড়িষ্যায় 'বেকার যুবক' ও 'আমার ডায়েরির একটি পাতা' স্থানীয় যুবকদের মধ্যে এক নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ভারতবর্ষে মূকাভিনয়ের এই দ্রুত প্রসার খুবই আনন্দের বিষয়।

'দাবী' নাটকের শতরজনী স্মারক-উৎসবে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের কাছ থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন জ্যোৎস্না বিশ্বাস

পাঠক মন

সাপ্তাহিক বসুমতীর ১লা অগ্রহায়ণ সংখ্যায় শ্রীকামাখ্যাচরণ রায় লিখিত "'ইতিহাসের উপাদান' কি সত্যই ইতিহাস?" নামক লেখাটি পড়িয়া একান্ত ক্ষুব্ধ ও বিস্মিতবোধ করিতেছি। কামাখ্যাবাবু ও আমরা একই আন্দোলনে বিভিন্ন জেলায় প্রায় একই সময়ে কাজ করিয়াছি। সেই হিসাবে—কামাখ্যাবাবুর সঙ্গে আমার কখনও সাক্ষাৎ পরিচয় না হইয়া থাকিলেও—তাঁহার এবং তাঁহার মত অপরাপর সহযোগীদের প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল। "ইতিহাসের উপাদন" নামে প্রকাশিত শ্রদ্ধেয় শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত লিখিত পত্রগুলিতে যাহা বলা হইয়াছে সেগুলি সত্য নয় বা তাহা ভুল তথ্যপূর্ণ এমন কথা কামাখ্যাবাবু প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। একমাত্র কথা যাহা তিনি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন হয়ত তাহা এই যে বি. ভি. নামে একটি দল ১৯৩০-৩২ সালের পূর্বে বাংলার বিপ্লবক্ষেত্রে কাজ করিত। শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত যে বলিয়াছেন, এ নামে কোন গ্রুপ বাংলার বিপ্লবক্ষেত্রে ১৯৩০-৩২ সাল বা তৎপূর্বে কাজ করে নাই, এই নামে একটি গ্রুপের পরিচয় হয় ১৯৩০-৩৮ সালে জেলে অন্তরীণ ক্যাম্পে—কামাখ্যাবাবুর মতে হয়ত এ কথা সত্য নয়। কিন্তু তাঁহার এই বক্তব্য কোন 'তথ্যে'র ভিত্তিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে কি? ১৯৩০-৩২ সালের পূর্বে বি. ভি. পরিচয়ে নিরপেক্ষ—'যুগান্তর' দলের সহিত সংস্রবশূন্য বিপ্লবী সংগঠন কিভাবে কখন বিপ্লবক্ষেত্রে প্রবেশ করিল 'তথ্যে'র সাহায্যে কামাখ্যাবাবু যদি উহা প্রাসঙ্গিক হিসাবে, এখানে উল্লেখ করিতেন তবে একটি ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যাইত। কিন্তু তিনি সেদিকে না যাইয়া,—তাঁহার প্রতিপাদ্যর বিষয়টি কি তাহা অনির্দিষ্ট রাখিয়া তিনপৃষ্ঠাব্যাপী অনেক কিছুই বলিয়াছেন। তাঁহার উক্তিসমূহের নির্যাস হইল তিনি 'ইতিহাসের উপাদান' লেখক শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্তের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। সমালোচনা সর্বক্ষেত্রেই অভিপ্রেত। উহা সৃজন সহায়ক। কিন্তু ব্যক্তিগত আক্রমণটা যখন মুখ্য হইয়া উঠে তখন সমালোচনার গঠনমূলক শুভেচ্ছা সেখানে অনুপস্থিত থাকে। আমরা ভাবিয়া অবাক হইতেছি, সে যুগের একজন দীক্ষিত বিপ্লবকর্মী বাংলার বিপ্লব-প্রচেষ্টার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের পশ্চাতে যে সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গী ও সহযোগিতার উদ্যোগ ছিল সেদিকে সংকেত না করিয়া কেন যে কোন একটি "গ্রুপ"ই কোন কোন সার্থক 'অ্যাক্‌শনে'র দাবিদার তাহাই প্রমাণ করিতে তৎপর হইলেন! বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বাংলার বুকে যে সমস্ত কীর্তির রক্ত-স্বাক্ষর রহিয়াছে কামাখ্যাবাবু কি উহাদের কতগুলির জন্য একটি নির্দিষ্ট "গ্রুপ"ই গৌরববোধের অধিকারী 'যুগান্তর' দল নয় ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন? বস্তুত আমরা বলিতে চাই—ঐ প্রতিটি রক্তলিপিতে সে যুগের সামগ্রিক বিপ্লব-চেতনার দ্যোতনাই উদ্ভাসিত। যুগান্তরের তো বটেই।

ইতিপূর্বে ১৩৭২ সালের ১২ই ফাল্গুন সংখ্যা সাপ্তাহিক বসুমতীতে শ্রীকালিদাস ঘোষ প্রমুখ এগারজন শ্রদ্ধাস্পদ কর্মীর স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে আমরা পাই, শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়ের উল্লিখিত "মুক্তি সঙ্ঘ" নামটি কল্পিত ও অনৈতিহাসিক এবং একদল কর্মী "পরবর্তীকালে বি. ভি. নামে পরিচিত হন।" আমরাও ১৯৩০-৩২ সালে যাঁহারা কুমিল্লায় একযোগে কাজ করিতাম তাহারা "যুগান্তর" দল নামেই কাজ করিতাম। অনেক পরে জেলে বসিয়া শুনি, ঐ যুগের আমাদের কোন কোন সহকর্মী নিজেদের বি. ভি. নামে পরিচয় দিতে সুরু করিয়াছেন।"

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্তেরও এযাবৎ প্রকাশিত পত্রগুলির শেষ বক্তব্য এই যে, বাংলায় ও বাংলার বাহিরে বহু গ্রুপ বিভিন্ন সময়ে পৃথক পৃথকভাবে কাজ করিয়াছে; কিন্তু এক একটা স্তরে তাহারা একই প্রোগ্রামে যখন কাজ করিয়াছে তাহার সূচনাতে "যুগান্তর" দল নামেই যথাসম্ভব সহযোগিতায় কাজ সুরু করিয়াছে। ১৯৩০-৩২ সালেও ঠিক তাহাই হইয়াছে। লেখকের যে কয়টি পত্র হইতে কামাখ্যাবাবু বিশেষভাবে উদ্ধৃতি দিয়াছেন সেগুলি পুনরায় পড়িয়া দেখিলাম। সেখানে শ্রীদত্ত তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অবহিতির কথাই লিখিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন শান্ত, সংযত ও সশ্রদ্ধ ভাষায় তথ্যের পরে তথ্য সাজাইয়া। এই ধরণের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং বিপ্লব-কর্ম বেষ্টনীর সহযোগী ও বন্ধুদের পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে অর্জিত বিষয় যদি গুপ্তসমিতির ইতিহাসের উপাদান না হয়, তাহা হইলে ইতিহাসের উপাদান হিসাবে অধিকতর মূল্যবান কি হইতে পারে তাহা আমাদের বুঝিতে আসে না। স্থল বিশেষে একের অভিজ্ঞতা ও আহৃত তথ্য অন্যের পরিবেশিত তথ্যের সহিত বিভিন্ন হইতে পারে। সেক্ষেত্রে সত্যানুসন্ধানী দৃষ্টি লইয়া বিষয়টির বিশ্লেষণে উভয়েই উদ্যোগী হইবেন, উহাই সুস্থ পন্থা। তাহার পূর্বে একজনের লব্ধতথ্য "ইতিহাসের উপাদান" নয় বলিয়া বাতিল করা অসমীচীন নহে কি? ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সহিত বিভিন্ন কারাগৃহে মেজর সত্য গুপ্তের যে কথাবার্তার বিষয় শ্রীদত্ত তাঁহার নিবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন, ঐরূপ কথাবার্তার সত্যতা সম্পর্কে কামাখ্যাবাবু যে বিতর্ক উপস্থিত করিয়াছেন উহা খুবই বেদনাদায়ক। উহাতে একদিকে বিপ্লব যুগের অন্যতম নেতার সত্য ভাষণের দৃঢ়তার বিপক্ষে কটাক্ষ করা হইয়াছে এবং অপরদিকে ইতিহাস রচনার উপাদান সংগ্রহে অভূতপূর্ব এক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হইয়াছে। কামাখ্যাবাবু বলিতেছেন যে, মেজর সত্য গুপ্ত জীবিত নাই। "বাঁচিয়া থাকিলে ভূপেন্দ্রবাবু এ সব উক্তি প্রকাশ করিতেন কি না সন্দেহ। কারণ এ সবের কঠিন প্রত্যুত্তর তাঁহাকে পাইতে হইত।" কামাখ্যাবাবু এইরূপ একটি সিদ্ধান্ত পাকা করিয়াই ফেলিলেন। অথচ মেজর সত্য গুপ্তের সহিত যিনি বিভিন্ন কারাগৃহে কাটালেন তাঁহার প্রত্যক্ষ তথ্য মূল্যহীন হইয়া গেল। এইরূপ উপাদান যদি ইতিহাসবেত্তাগণ ধর্তব্য হিসাবে মনে না করেন এবং যদি ভাবেন যাঁহাদের বিষয় লিখিত হইবে তাঁহারা জীবিত থাকিলে লেখকদের নির্যাতিত হইতে হইত—তবে ইতিহাস রচনায় তাঁহারা সঙ্কোচবোধ করিতেন। তাঁহারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইতেন—অন্যথায় তাঁহাদিগকে গণৎকার হইতে হইত।

দল ও দলাদলি লইয়া যেখানে তিক্ততা জাগিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে সেই সব বিতর্কিত বিষয় লইয়া অগ্রসর হওয়া মানে বর্তমান এবং আগামী শতকে যাঁহারা বাংলার মরণবিজয়ী বিপ্লবী সন্তানদের উদ্দেশ্যে সগৌরবে সহর্ষ অভিবাদন জানাইতে উন্মুখ তাঁহাদের সম্মুখে অনুজ্জ্বল দৃশ্যের অবতারণা করা। এদিক হইতে বিচার করিলে দেখা যাইবে, বর্তমানে যাঁহারা বি. ভি. গ্রুপ নামে নিজেদের পরিচয় দেন তাঁহাদের দান ও চরিত্র সম্পর্কে অকুণ্ঠ ও আন্তরিক প্রশংসাই শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্তের পত্রগুলিতে প্রকাশ পাইয়াছে। প্রশংসা যে দুই-এক ক্ষেত্রে প্রাপ্য নয় শালীনতার প্রয়োজনে সেখানে নামের উল্লেখ নাই। এবং সেটি গ্রুপ নির্বিশেষে। পরিশেষে বক্তব্য যুগান্তরের বিভিন্ন স্তরের ও বিভিন্ন গ্রুপের ইতিহাস হইতে শুধু যে আমরা বিপ্লবক্ষেত্রের বিভিন্ন দিকের কর্মধারারই পরিচয় পাইয়াছি তাহা নয়; সত্য ও আদর্শনিষ্ঠা এবং সত্য ও আদর্শভিত্তিক

এক বিশিষ্ট কান্তি ও শালীনতাবোধও কয়েক যুগের বিপ্লব কর্মীদের গৌরবের ঐতিহ্য হইয়া আছে। কোথাও তাহা ক্ষুণ্ণ হইতে দেখিলে আমরা আজও গভীর ব্যথা বোধ করি।

শ্রীশান্তি দাশ এম, এল, এ

*　　*　　*

গত ২৯শে ভাদ্র তারিখের 'সাপ্তাহিক বসুমতী'তে শ্রীমতী পারুল ভট্টাচার্যের 'গ্রামবাংলার কথা'—শীর্ষক প্রবন্ধের এক-স্থানে (পৃঃ ৯২১) শ্রীমতী ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন—"১৭৭৩ খৃস্টাব্দেরই প্রথম দিকে ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসী হ্যালহেড-এর চালনায় ১১ জন হিন্দু পণ্ডিত এবং কয়েকজন মৌলভীর মুখপাত্র হয়ে এক দেওয়ানী গ্রন্থ রচনায় হাত দিয়েছিলেন ব্রহ্মানন্দ। ১৭৭৫ খৃস্টাব্দে শেষ হয় গ্রন্থ-খানি। হ্যালহেড্‌স্ জেন্টু ল (এ কোড অফ জেন্টু অন অর্ডিনেশন অফ পণ্ডিটস্ ইন ১৭৭৫) নামে ছেপে প্রকাশিত হয়।" এই তথ্য ইতিহাসসম্মত নহে। প্রকৃত তথ্য এই যে, ১৭৬৫ খৃস্টাব্দের অগস্ট মাসে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাদশাহ শাহ্ আলমের নিকট হইতে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী সনন্দ লাভ করেন। কোম্পানী মহম্মদ রেজা খাঁ ও রাজা সীতারাম রায়কে নায়েব দেওয়ান রাখিয়া বাংলা-বিহারের দেওয়ানী কাজ চালাইতে লাগিলেন। ১৭৭২ খৃস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস নায়েব দেওয়ানের পদ তুলিয়া দিলেন। ইহাতে একটি অসুবিধা দেখা দিল। মুসলমানদের দেওয়ানী আইন ছিল, হিন্দুদের বিধিবদ্ধ দেওয়ানী আইন ছিল না। মুসলমান আমলে হিন্দুদের দেওয়ানী বিচার করিতে হইলে দেওয়ানী আইনের বিধি জানিবার জন্য আদালত-প্রখ্যাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের নিকট প্রশ্ন লিখিয়া পাঠাইতেন। পণ্ডিতরা তাহার উত্তর ও ব্যবস্থা লিখিয়া দিতেন এবং দক্ষিণা পাইতেন। হেস্টিংসের এ ব্যবস্থা মনঃপূত হইল না। তিনি হিন্দুদের জন্য দেওয়ানী আইন বিধিবদ্ধ করিবার মনস্থ করিয়া ১৭৭৩ খৃস্টাব্দের মে মাসে ১১ জন প্রখ্যাত পণ্ডিতদের এই কার্যে নিযুক্ত করিলেন। এই পণ্ডিতগণের অগ্রগণ্য ছিলেন গুপ্তিপাড়ার পণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। বাণেশ্বর তাঁহার ১০ জন সহকর্মী পণ্ডিতদের লইয়া দুই বৎসরের পরিশ্রমে তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি—'বিবাদার্ণবসেতু' নামে সংস্কৃত হিন্দু আইনগ্রন্থ রচনা করেন। ১১৮১ সালের ফাল্গুন মাসে (ফেব্রুয়ারী ১৭৭৫ খৃঃ) এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। অতঃপর হেস্টিংস এক-জন [illegible]সংস্কৃতজ্ঞ মৌলভীকে দিয়া ফার্সি ভাষায় উহা অনুবাদ করান এবং এই ফার্সি অনুবাদ গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করার জন্য হ্যালহেড্‌কে (Nathaniel Brassey Halhed) ভার দেন। হ্যালহেডের ইংরাজী অনুবাদগ্রন্থ "A Code of Gentoo Laws on Ordination of the Pandits from a Persian Translation" নামে ১৭৭৬ খৃস্টাব্দে ইংলণ্ডে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হয়। অতএব এই হিন্দু আইন গ্রন্থ রচনার সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ দেসরকারের বা মৌলভীদের কোন সম্পর্ক ছিল না, হ্যালহেড্‌ও এই গ্রন্থ রচনা "চালনা" করেন নাই।

শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য
গুপ্তিপাড়া, হুগলী

*　　*　　*

শ্রীমতী পারুল ভট্টাচার্য লিখিত গত ১৫ই ও ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০শে অক্টোবর ও ১০ই নভেম্বর চারিটি পর্বে বর্ণিত 'নৈহাটির কথায়' কয়েকটি ভুল তথ্য পরিবেশন করা হইয়াছে।

(১) 'কুমার মহেন্দ্র হাই স্কুলের পুরানো বাড়ি বলিয়া একটি আলোকচিত্র লেখিকা দিয়াছেন এবং ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের প্রাথমিক অবস্থায় 'কুমার মহেন্দ্র হাই স্কুলে'র নিচের তলায় অধিবেশন হইত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু 'কুমার মহেন্দ্র হাই স্কুল' বলিয়া নৈহাটিতে কোন বিদ্যালয় নাই। বিদ্যালয়টির নাম 'নৈহাটি মহেন্দ্র হাই স্কুল'। 'কুমার' শব্দটির সংযোজনে নিশ্চয়ই ইতিহাস বিকৃতি লাভ করিয়াছে।

(২) তিনি লিখিয়াছেন, "আগে কাঁঠালপাড়া সহ সমগ্র এলাকাটির নাম ছিল শিবদাসপুর ইউনিয়ন বোর্ড।...... কাঁঠালপাড়া ঋষি বঙ্কিম অঞ্চল পঞ্চায়েতের অন্তর্গত।" কাঁঠালপাড়া কোন কালেই শিবদাসপুর ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত ছিল না এবং সমগ্র কাঁঠালপাড়া ঋষি বঙ্কিম অঞ্চলের অন্তর্গত নহে। নৈহাটি মিউনিসিপ্যালিটির রেকর্ড দেখিলেই জানা যায়।

(৩) মহেন্দ্র স্কুলের প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন, "শিক্ষককুলের মধ্যে সগৌরবে স্মরণযোগ্য হ'য়ে আছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম।" বিদ্যাসাগর কোনকালেই উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন না। বিদ্যালয়ের প্রাচীন শিক্ষক মহোদয়গণের সহিত আলোচনা করিয়াছি এবং সংশ্লিষ্ট ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিয়াছি, বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন—এইরূপ কোথাও পাই নাই।

(৪) "বিধান সভায় ডাঃ গোপাল বসু বিজয়ী হইয়াছেন এখান থেকে"—এইরূপ উক্তি করা হইয়াছে তাঁহার লেখায়। কিন্তু শ্রীগোপাল বসু ডাক্তার নন।

(৫) তিনি লিখিয়াছেন, "স্বাধীন দেশের পূর্তমন্ত্রী শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহের চেষ্টায় ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা স্থাপিত হইয়াছে।"

মাননীয় মন্ত্রীর প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু তাঁহার 'চেষ্টায়' শব্দটি প্রয়োগ করা কতখানি যুক্তিযুক্ত তাহা বিবেচ্য। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানাটি একদা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ নৈহাটি শাখার কার্যালয় ছিল, ক্রমাগত গৃহটি সংস্কারের অভাবে ধ্বংসোন্মুখ হয়, উহাকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ নৈহাটি শাখার পক্ষ হইতে শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন রাজ্য সরকারের নিকট অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া পত্র লেখেন। অতুল্যবাবু নৈহাটি হইতে প্রায় প্রত্যেক দিনই নিজের অর্থে পথ-খরচ বহন করিয়া এই বিষয়ে তদ্বির-তদারক করিতে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে আসিতেন।

শুধু তাহাই নহে, অতুল্যবাবুই স্বর্গত সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হইতে এবং অন্যান্য স্থান হইতে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, এবং তাঁহার পরিবারস্থিত আলোকচিত্রাদি, পাণ্ডুলিপি (যাহা উক্ত সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত) প্রভৃতি সংগ্রহ করেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় মন্ত্রীর 'চেষ্টায়' সংগ্রহশালা স্থাপিত হইয়াছে বলা হইল, অথচ যে অতুল্যবাবু নিজের শরীরের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া দিনের পর দিন নিরলস পরিশ্রম ও অটুট ধৈর্যের সঙ্গে চেষ্টা করিলেন, তাঁহার বিষয়ে লেখিকা বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না।

(৬) তিনি লিখিয়াছেন, "গার্লস স্কুল আছে দুটি। দুটিতেই মেয়েদের জন্য প্রাতঃকালীন ব্যবস্থা। দুপুরে ছেলেদের পড়ানো হয়।" কিন্তু নৈহাটি মিউনিসিপ্যাল গার্লস স্কুলে সকালে ও দুপুরে মেয়েদের পড়ার ব্যবস্থা আছে। মিউনিসিপ্যাল গার্লস স্কুলে ছেলেদের পড়ানো হয় না।

(৭) তিনি লিখিয়াছেন, "শোনা যায় আপন ভাষণদানকালে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ কণ্ঠে নাকি বলেছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—নটীর হাট তো? অধিবাসীদের চালচলনেও তাই নট-নটীসুলভ এমন নির্লজ্জতা।" এইরূপ গল্পকথা তিনি কোথা হইতে পাইলেন, বুঝিলাম না। অনৈতিহাসিক ও অপ্রমাণিত ভাষণ উল্লেখ করিয়া লেখিকা মহান ব্যক্তির পূতচরিত্রের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছেন। লেখিকা এইরূপ ইতিহাস-অসম্মত উক্তি উল্লেখ করিয়া নৈহাটি বাসিন্দার আত্মাভিমানকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন।

ডাঃ শচীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়
গরিফা, চব্বিশ পরগনা।

ইরানী ট্রফি

পূর্বে নির্ধারিত ইরানী ট্রফির খেলা চার দিনের পরিবর্তে শেষে তিন দিনে এসে ঠেকল, বৃষ্টির জন্য পিচ খেলার অনুপযুক্ত বিবেচনা করে দুই দলের অধিনায়ক প্রথম দিন অর্থাৎ ২৫শে নভেম্বর মাঠে নামলেন না। ২৬শে নভেম্বর খেলা সুরু হল, অবশিষ্ট ভারতীয় একাদশের অধিনায়ক পতৌদির নবাব টসে জয়ী হয়ে উইকেটের অবস্থা দেখে প্রথমে বোম্বাইকে ব্যাট করতে পাঠালেন।

দিলীপ সরদেশাই এবং অধিকারী মাঠে নামলেন ব্যাট করতে। অবশিষ্ট ভারতীয় একাদশের বোলিং আক্রমণ সুরু করলেন বাংলার তরুণ বোলার সুব্রত গুহ এবং জয়সীমা। স্পিনারদের অনুকূল পরিবেশ একথা উপলব্ধি করে পতৌদি খেলার প্রায় সুরু থেকেই স্পিনারদের সাহায্য গ্রহণ করেন। জয়সীমার প্রথম ওভারের পর, প্রসন্ন তাঁর স্থানে আসেন এবং দলীয় এক রানে সরদেশাইয়ের উইকেটটি দখল করেন। এর পর অপর প্রান্ত থেকে সুব্রত গুহ অধিকারীকে সরাসরি বোল্ড আউট করেন দলীয় রান সংখ্যা তখন বোম্বাইয়ের মাত্র সাত। পতৌদি বোলিংয়ে প্রসন্ন এবং চন্দ্রশেখরের সাহায্যই বেশি গ্রহণ করেছেন। বোম্বাই দলের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে একা খেলেছেন অজিত ওয়াদেকার। দলীয় ১১৩ রানের মধ্যে অজিত ওয়াদেকারের সংগৃহীত ব্যক্তিগত রানই ৫৬। প্রসন্ন সংগ্রহ করেন ২৭ রানে ৪টি উইকেট এবং ৪৪ রানে ৪টি উইকেট।

অবশিষ্ট ভারতীয় একাদশের ব্যাটসম্যানেরাও খেলার সুরুতে দেশাইয়ের বলে বেশ কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হয়। টেস্ট খ্যাত ব্যাটসম্যানেরা সকলেই ব্যর্থ হন একমাত্র অধিনায়ক পতৌদি এবং বাংলার তরুণ ব্যাটসম্যান অম্বর রায় দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন। পতৌদি সংগ্রহ করেন ৪২ রান এবং অম্বর রায় ৫০ রানে আউট হয়ে প্যাভেলিয়ানে ফেরেন। অবশিষ্ট ভারতীয় একাদশের ইনিংস শেষ হয় ১৩৪ রানে। দেশাই এবং সিভালকার তিনটি করে উইকেট দখল করেন।

বোম্বাই একাদশের দ্বিতীয় ইনিংসেও ব্যাটসম্যানেরা ব্যর্থ হন। বেশ খেলেছিলেন অজিত ওয়াদেকার, কিন্তু ব্যক্তিগত ২৭ রান সংগ্রহ করে তিনি প্যাভেলিয়ানে ফেরেন, তাঁর আউটটি সম্বন্ধে তিনি নিজে এবং অনেকেই সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। বোম্বাই দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করে মাত্র ৯১ রানে, খেলার শেষ দিনের সুরুতেই।

অবশিষ্ট একাদশ ব্যাট করতে মাঠে নামে এবং জয়ের জন্য তাদের প্রয়োজন ছিল মাত্র ৭১ রান। ৪টি উইকেট হারিয়ে অবশিষ্ট একাদশ ৮১ রান সংগ্রহ করে বোম্বাই দলকে ৬ উইকেটে পরাজিত করে সর্বপ্রথম ইরানী ট্রফি জয়ের গৌরব অর্জন করে।

কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারত বনাম রাশিয়ার ষষ্ঠ ভলিবল টেস্ট খেলার দৃশ্য

শ্রীঅমিতাভ

ভারত-রাশিয়া ভলিবল টেস্ট

কলকাতায় রাজ্য ভলিবল ফেডারেশনের মাঠে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ এবং শেষ ভলিবল টেস্টে রাশিয়া ভারতকে পরাজিত করে ১৫—১৩, ১৫—১১ এবং ১৫—১২ পয়েন্টে। রাশিয়া তাদের এবারের ভারত সফরে দুটি টেস্টে জয়ী হয়েছে।

রাশিয়ান দলের খেলোয়াড়

গেলে সর্বদিকেই শ্রেষ্ঠ। তাদের অধিকাংশ খেলোয়াড়ের উচ্চতা গড়ে ছয় ফুট, দেহও সুগঠিত। কলকাতার শেষ টেস্টে অবশ্য রাশিয়ান দলের জয়লাভের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়, কারণ ভারতীয় দলের খেলোয়াড়েরা এখানে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এক ঘণ্টা দু' মিনিটের এই খেলাটি দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছে।

ভারতীয় দলের পক্ষে এই দিন উচ্চাঙ্গের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করেন টি জোশেফ। বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য হল জোশেফের কয়েকটি দর্শনীয় চাপ। অপর পক্ষে রাশিয়ান দলের নেটে সেরা খেলোয়াড় ছিলেন এডওয়ার্ড।

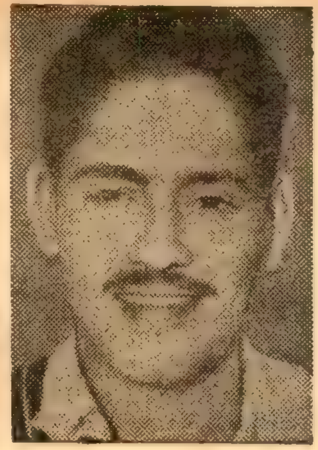

চন্দ্রশেখর

অর্জুন পুরস্কার

ইডেন উদ্যানের এন, সি, সি প্যাভেলিয়ানে অনুষ্ঠিত এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে আই, এফ-এ'র পক্ষ থেকে অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত ফুটবল খেলোয়াড়দ্বয় চুনী গোস্বামী এবং প্রদীপ ব্যানার্জীকে অর্জুন ট্রফি প্রদান করা হয়। চুনী গোস্বামী ১৯৬৩ সালে এবং প্রদীপ ব্যানার্জী ১৯৬১ সালে অর্জুন পুরস্কার লাভ করেন কিন্তু তাঁরা রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণের হাত থেকে এই পুরস্কার নিতে পারেন নি। দিল্লী থেকে এই ট্রফি আই, এফ, এ-কে পাঠিয়ে দেওয়া হয় খেলোয়াড়দ্বয়কে প্রদানের জন্য। এখানে উল্লেখযোগ্য যে আজ পর্যন্ত যে ক'জন ফুটবল খেলোয়াড় এই অর্জুন পুরস্কার লাভ করেছেন সকলেই হলেন কলকাতা ময়দানের খেলোয়াড়। ১৯৬২ সালে বলরাম, ১৯৬৪ সালে জার্নেল সিং এবং ১৯৬৫ সালে তরুণ ঘোষ এই অর্জুন পুরস্কার লাভ করেন।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অনুষ্ঠান

২৯শে নভেম্বর একটি সুন্দর শীতের সন্ধ্যায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাদের ১৯৬৬ সালের লীগ এবং আই, এফ, এ শীল্ড বিজয়ী ফুটবল দলকে সম্বর্ধনা জানাল। বিকাল সাড়ে চারটের সময় অনুষ্ঠান সুরু হয় এবং শেষ হয় রাত সাড়ে আটটায়। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে ক্লাবটিকে এবং ক্লাবের মাঠের একাংশ সুন্দরভাবে সাজান হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন জেনারেল নায়ার। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষ থেকে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনকে তাঁর মুখ্যমন্ত্রী সাহায্য তহবিলের ৫০১ টাকা এবং জোয়ানদের সাহায্য তহবিলের জন্য শ্রীনায়ারের হস্তে ৫০১ টাকা অর্পণ করা হয়। লীগ এবং শীল্ড বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ফুটবল খেলোয়াড়দের মাল্যভূষিত করা হয় এবং উপহার প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠান উপলক্ষে খ্যাতনামা কয়েকজন শিল্পী কণ্ঠসঙ্গীত এবং যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন। সবশেষে ১৯৬২ সালের বিশ্বকাপের খেলার ছবি প্রদর্শন করা হয়। সমবেত দর্শকরা এই ছবিটি খুবই উপভোগ করেন।

সাউথ ক্লাবের লনে অনুশীলন করে ফিরছেন ভারতের ডেভিস কাপের খেলোয়াড়বৃন্দ

মান-অভিমানের পালা

ব্যাঙ্ককের এশিয়ান গেমসে ভারতের যোগদান সম্বন্ধে এখনও কোন কিছু নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। ভারতীয় অর্থদপ্তরের অনমনীয় মনোভাবের ফলে এবং মাত্র ৮১ জনের ভারতীয় দলের জন্য শুধু বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুর করার ফলে, ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার সভাপতি ভালিন্দার সিং নাটকীয়ভাবে ভারতীয় দলের নাম প্রত্যাহার করেন এশিয়ান গেমস থেকে। তাঁর মতে অন্তত ১০৫ জনের একটি দল পাঠাবার জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুর করতে হবে। অবশেষে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর হস্তক্ষেপের পর শেষ মুহূর্তে অর্থদপ্তর ১০৫ জনের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা দিতে রাজী হয়েছেন। এক খবরে প্রকাশ যে, রাজা ভালিন্দার সিং অর্থদপ্তরের এই পরিবর্তিত সিদ্ধান্তের পর সেইদিন রাত্রিতে বলেছেন যে, এত দেরিতে এশীয় ক্রীড়ায় যোগদান করা ভারতের পক্ষে অসম্ভব। এই লেখা যখন প্রস্তুত করা হচ্ছে তখন পর্যন্ত নিশ্চিত কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি।

অর্জুন ট্রফিসহ প্রদীপ ব্যানার্জী এবং চুনী গোস্বামী

সমাচার দর্পণ

খড়গপুরের সেরা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত একটি প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় বি, এন, রেলদল ২—০ গোলে এ, আই, এফ, এফ একাদশকে পরাজিত করে। বি, এন, রেলদলের পক্ষে গোল দু'টি করেন সুনীল দাস এবং পীর আলি।

অম্বর রায়

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একাদশের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের এস, পি গাইকোয়াদ। হায়দ্রাবাদে ৩রা ডিসেম্বর তিনদিনব্যাপী এক প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলায় ওয়েস্ট-ইন্ডিজ ক্রিকেট দলের বিপক্ষে খেলবে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একাদশ। এই খেলাটিই ওয়েস্ট-ইন্ডিজ দলের সফরের প্রথম খেলা। নিম্নলিখিত খেলোয়াড়েরা এই খেলায় অংশ গ্রহণ করবেন বিশ্ববিদ্যালয় একাদশের পক্ষে। এস, পি, গাইকোয়াদ (বরোদা), অশোক মানকড় (বোম্বাই), এস পারসে (বোম্বাই), ফার্নাণ্ডেজ (বরোদা), সুব্রত গুহ (কলিকাতা), অশোক যোশী (গুজরাত), বেদী (পাঞ্জাব), দেব মুখার্জী (কলিকাতা), ওয়াহিদ খান (ওসমানিয়া), মাইকেল দালভি (দিল্লী), নাগভূষণম (মহীশূর)। দ্বাদশ ব্যক্তি—আর নাগদেব (বোম্বাই)।

রোমাঞ্চ-রহস্য গ্রন্থ

রক্তনদীর ধারা

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল

রক্তনদীর ধারা মাসিক বসুমতীর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। রোমান্স ও রোমাঞ্চের সত্য ঘটনায় বইটির আদ্যোপান্ত পরিপূর্ণ। রক্তনদীর ধারা জীবনের অভিজ্ঞতা নয়; জীবনপথের দিক-নির্দেশ। তাই প্রবঞ্চনা, ছলনা ও প্রেমের লীলায় চাঞ্চল্যকর বইটি চাঞ্চল্য তুলেছে সকল সমাজেই।

লোমহর্ষক সামাজিক কাহিনী।

মূল্য ঃ চার টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

ব্রেজিলের ডেভিস কাপ বাহিনী

ম্যান্ডারিনো

অনেকেরই মনে প্রশ্ন পঞ্চমবার কি ভারতের প্রতি জয়লক্ষ্মী প্রসন্না হবেন। ইতিপূর্বে চারবার ভারত ডেভিস কাপের শেষ প্রবেশ পথে এসেও হোঁচট খেয়ে পড়ে গেছে। এবার কিন্তু ভারতের সম্মুখে বিরাট সুযোগ: ব্রেজিলকে অতিক্রম করতে পারলেই বহুদিনের রঙীন স্বপ্ন সফল হবে ভারতের। ভারত মূল ফাইন্যালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খেলার সুযোগ পাবে।

ভারত কিন্তু ব্রেজিলকে তেমন গুরুত্ব না দিলে খুবই ভুল করবে। অবশ্য একথা সত্য যে, এ বছর ডেভিস কাপের পূর্ববর্তী ধাপগুলি ভারত অতি সহজে সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রম করেছে। কিন্তু এই জোনাল ফাইন্যালে উপস্থিত হতে ব্রেজিলকেও কম দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হয় নি। আঞ্চলিক সেমি-ফাইন্যালে ব্রেজিল বহু বিশেষজ্ঞর মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছেন, অনেক ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ প্রমাণিত করেছেন—শক্তিশালী আমেরিকার ডেভিস কাপ বাহিনীকে ব্রেজিল ৩—২ খেলায় পরাজিত করে।

কলকাতায় ব্রেজিলের ডেভিস কাপ দলের পক্ষে এসেছেন ফার্নান্ডেজ নন প্লেয়িং অধিনায়ক এবং টমাস কক এবং ম্যান্ডারিনো। ফার্নান্ডেজ ভারতে নবাগত নন, ইতিপূর্বে ১৯৬০ সালে এশিয়ান লন টেনিস প্রতিযোগিতায় ফার্নান্ডেজ ফাইন্যালে উন্নীত হন এবং কৃষ্ণানের কাছে পরাজিত হন। ফার্নান্ডেজ কিন্তু ১৯৬১ সালে ভারতের মাটিতে জয়দীপ মুখার্জীকে দুবার পরাজিত করেন। ফার্নান্ডেজ কিন্তু বেলজিয়ামের লা জুতে একবার কৃষ্ণানকে পরাজিত করেন ১৯৬৩ সালে।

ব্রেজিলের পয়লা নম্বর খেলোয়াড় হলেন টমাস কক, মাত্র একুশ বছর বয়স্ক ককই হলেন ব্রেজিলের প্রধান ভরসা। ১৯৬৩ সালে তরুণ কক ইউ এস চ্যাম্পিয়ানশীপের ফাইন্যালে উন্নীত হন এবং এই বছরই উইমবলডেন বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ার রয় এমার্সনকে পরাজিত করেন কক। এ ছাড়া ন্যাটা টেনিস খেলোয়াড় কক একবার ফরেস্ট হিলের কোয়ার্টার ফাইন্যালে এবং উইমবলডেনের দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে বিদায় নিতে বাধ্য করেন আমেরিকার প্রাক্তন উইমবলডেন চ্যাম্পিয়ান চাক ম্যাকিনলেকে। ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে রমানাথন কৃষ্ণানকে কক পরাজিত করেছেন একবার এবং পরাজিত হয়েছেন দুবার, কিন্তু কব জয়দীপের বিপক্ষে বিজয়ী হয়েছেন দুবার। এ ছাড়া ফ্রেড স্টোলে, মেব্রে-ভেলী পিয়ের বার্থেসের মত খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের পরাজিত করার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন টমাস কক।

ম্যান্ডারিনো হলেন ব্রেজিলের দু নম্বর খেলোয়াড়, বয়স মাত্র পঁচিশ বছর। ব্রেজিলের ডাবলস জুটির স্তম্ভ হলেন ম্যান্ডারিনো। গত উইমবলডেন বিজয়ী ডাবলস জুটি নিউকোম্ব এবং রোচেকে ১৯৬৪ সালে ইতালিয়ান চ্যাম্পিয়ানশীপে পরাজিত করেন এই ম্যান্ডারিনো এবং ফার্নান্ডেজ। এ বছর ম্যান্ডারিনো ককের সঙ্গে খেলে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছেন।

ব্রেজিলের খ্যাতনামা খেলোয়াড় বার্থেস ভারতের বিপক্ষে দলভুক্ত হওয়ায় একদিক থেকে ভারতের সুবিধাই হয়েছে। বার্থেস ব্রেজিল দলের টেনিস কোচের কঠোর নিয়ম-কানুন পালনে অসম্মত হওয়ায় তাঁকে আর ব্রেজিল দল খেলাতে রাজী হন নি। বার্থেস কিন্তু ককের সঙ্গে ডাবলস জুটিতে বর্তমানে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছিলেন। এখন দেখা যাক ভারত এই ব্রেজিলের ডেভিস কাপ বাহিনীর বিপক্ষে কলকাতার সাউথ ক্লাবের লনে কি ফলাফল প্রদর্শন করে।

—মানবেন্দ্র পালচৌধুরী

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

... December, 1966 SAPTAHIK BASUMATI Regd. No. C 11
Price : 25 Paise. Gram : "BASUMATI" PHONE : 34-7771, 72, 73

টায়েরা ল্যানোলিন লোশন শ্যাম্পু

আপনার চুলে চমক জাগিয়ে তুলবে

এই অতি বিশেষধরণের শ্যাম্পু বিশ্ববিখ্যাত হেলেন কার্টিস্ (ইউ. এস্ এ.)—এর ■ সাধারণ শ্যাম্পুতে যে একান্ত প্রয়োজনীয় তেলগুলি নষ্ট হয়ে যায়, ল্যানোলিন আবার এনে দিয়ে আপনার চুলকে পুষ্ট রাখে ■ সরের মত প্রচুর ফেনায় অতি তাড়াতাড়ি ধুয়ে সাফ করে দেয় ■ প্রথমবার ব্যবহারের পরই আপনার চুলে প্রাণের ...তা এনে সুন্দর চমক জাগিয়ে তুলবে ■ আজ থেকে টায়েরা ল্যানোলিন লোশন শ্যাম্পু ব্যবহার করা সুরু করে দিন—এই বিশেষ জিনিসটি একান্তভাবেই আপনাকে আরো অপরূপ ক'রে তুলবে !

Helene Curtis
...re beautiful young ideas begin

...প্রস্তুতকারক : জে. কে. হেলেন কার্টিস্ লিমিটেড, বোম্বাই—১

...কে. হেলেন কার্টিসের সহযোগীতাই আয়োজিত ফেমিনার ... ইণ্ডিয়া ১৯৬৭ প্রতীযোগীতাই যোগ দিন।

23 DEC 1966

সাপ্তাহিক বসুমতী

ডেভিস কাপ চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে ভারত

অধিনায়ক কৃষ্ণানের অনবদ্য ভূমিকা

বর্ষ ঃ ২৭শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ • 15th Dec. 1966 * Vol. 71, N

সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		১৬৬৭
আজকের মানুষ		১৬৬৮
ভারতদর্শন		১৬৬৯
আন্তর্জাতিক		১৬৭০
বেদব্যাস-এর রস-রচনা ঃ অমৃতসমান		১৬৭৫
প্রেম (কবিতা)	মনোরমা সিংহরায়	১৬৭৬
গ্রন্থমেলা		১৬৭৭
রাখাল (গল্প)	অশোককুমার সেনগুপ্ত	১৬৭৮
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	অনন্ত সিংহ	১৬৮২
নির্ভয় (কবিতা)	অণিমা তালুকদার	১৬৮৫

শ্রীমদ্ভাগবত

প্রাচীন ভক্তদের রচিত সুললিত বাংলা পয়ারে

মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র

এই সুবৃহৎ গ্রন্থে আছে—শ্রীল সনাতন গোস্বামীর 'ভাগবতামৃত' গ্রন্থের কবিচন্দ্রের বঙ্গানুবাদ এবং শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়তম ভাগবতাচার্য্য রঘুনাথ পণ্ডিতের প্রেমতরঙ্গিনী।

ইহাতে আছে দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভাগবতামৃতের অনুবাদ

কবিচন্দ্রের

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত

এবং

ভাগবতাচার্যের বিশ্বপ্রসিদ্ধ

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী

সমগ্র ভারতে প্রথম বঙ্গানুবাদ

"...শুনিয়া তাহার ভক্তিযোগের পঠন।
আবিষ্ট হইল গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥"

ইহা কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারতের ন্যায় বাংলার প্রতি গৃহস্থের অবশ্যপাঠ্য হউক, এই নিবেদন। এই মূল্যবান গ্রন্থ বাংলার প্রতি ঘরে প্রতিষ্ঠিত করুক।

সাহিত্য-সম্রাট—বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের ঋষি

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

—উপন্যাস—

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ—দুর্গেশনন্দিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, ইন্দিরা, রাধারাণী, সীতারাম। মূল্য—তিন টাকা

তৃতীয় খণ্ডঃ—আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা, দেবী চৌধুরাণী। [সচিত্র] মূল্য—৩, টাকা।

—সাহিত্য—

প্রথম খণ্ড ঃ—কৃষ্ণচরিত্র, লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ (১ম)। মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ—(১ম ভাগ অনুশীলন), মুচিরাম গুড়, বিবিধ প্রবন্ধ (২য়), বিজ্ঞান রহস্য। মূল্য—তিন টাকা

তৃতীয় খণ্ড ঃ—শ্রীমদ্ভগবদগীতা, কমলাকান্ত, সাম্য, সাহিত্য-প্রসঙ্গ, মানস, ললিতা। মূল্য—তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সুবর্ণলতা (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— আশাপূর্ণা দেবী	১৬৮৬
জগদর্শন		১৬৯০
বিশ্বসাহিত্যের আদিপর্ব	— ডঃ নরেন ভট্টাচার্য	১৬৯৫
চোমংলামার চোখে উত্তরবঙ্গ		১৬৯৯
এইচ, জি, ওয়েলস-এর গল্প	— ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	১৭০২
প্রত্যাশার মৃত্যু ও দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা	— কৃত্তিবাস ওঝা	১৭০৭
ঋষি শ্রীঅরবিন্দ	— শ্রীদিলীপকুমার রায়	১৭১১
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	— শিলালি	১৭১৫
রঙ্গজগৎ		১৭১৯
খেলাধূলা	— শ্রীঅমিতাভ	১৭২৫

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল এম, এস, সি প্রণীত

আমার দেখা মেয়েরা

(রহস্য রোমাঞ্চের স্বর্ণখনি)

'রক্তনদীর ধারা', 'অপরাধ বিজ্ঞান' ও 'বিখ্যাত বিচার কাহিনী' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলির লেখকের সত্যঘটনামূলক বিভিন্ন ও বিচিত্র নারী-চরিত্রের রহস্য উদ্ঘাটন ও যথাযথ রূপদান। মেয়েদের মন আর মতি স্বয়ং দেবাঃ ন জানন্তি। অভিজ্ঞ ও দক্ষ লেখকের রচনার বৈশিষ্ট্যে বাংলা দেশের নারী-সমাজের এক অজানা অংশ সাধারণের চোখে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে। পড়তে পড়তে বই শেষ না করে ওঠা যায় না। বইয়ের আদ্যোপান্ত রুদ্ধশ্বাস উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা। উপন্যাসের চেয়েও সুখপাঠ্য।

মূল্য চার টাকা

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগ :—মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, পদ্মাবতী নাটক, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ. একেই কি বলে সভ্যতা? (বোর্ড বাঁধাই)—সাড়ে চার টাকা।

দ্বিতীয় ভাগ :—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্মিষ্ঠা নাটক, তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য, মায়া কানন, হেক্টর বধ। (বোর্ড বাঁধাই) সাড়ে তিন টাকা

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

রবীন্দ্রনাথ বলেন—"আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সঙ্গীত এরূপ সহস্রধারে উৎসের মত কোথাও প্রোৎসারিত হয় নাই। এমন সুন্দর ভাবের আবেগ, কথার সহিত এমন সুরের মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না।"

বাঙ্গালার নব গীতিকবিতার প্রবর্তক, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির কাব্যগুরু ঋষি কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর রচনার সমাবেশ।

কবির জীবনী, সুবিস্তৃত সমালোচনা সহ সুবৃহৎ গ্রন্থ

মূল্য তিন টাকা

ডঃ মতিলাল দাশ প্রণীত

মতিলাল গ্রন্থাবলী

মূল্য—দুই টাকা

—ইহাতে আছে—

১। চলার পথে (উপন্যাস)
২। মনীষা (উপন্যাস)
৩। বিদ্যুৎশিখা (১১ খানি গল্প সমষ্টি)
৪। দীপশিখা (কবিতা সঙ্কলন)
৫। চার্বাক (নাটক)

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

৭১ বর্ষ ঃ ২৭শ সংখ্যা—মূল্য ·২৫ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

Price : 25 Paise
Thursday, 15th December, 1966

শিক্ষা-জগতে নৈরাজ্য

আমাদের জাতীয় ইতিহাসের গৌরবস্থল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, সৌভাগ্যবশত আমরা এমন সব ছাত্রদের মনীষী যোদ্ধা ও সংগ্রামী হিসেবে লাভ করেছিলাম—যাঁরা ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। একশত দশ বছরের সেই বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র কতিপয় ছাত্রের গুন্ডামির জন্য বন্ধ হয়ে গেল—এর চাইতে দুর্ভাগ্যের কি থাকতে পারে? আমরা শুধু ভাবছি দেশ থেকে আইন-শৃঙ্খলা ও সদাচার সম্পূর্ণ লোপাট না হলে—এমন ঘটনা কিভাবে ঘটতে পারে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গত দশই অক্টোবর থেকে নামমাত্র চালু ছিল। এবং বিশ্ববিদ্যালয়টিকে কর্তৃপক্ষ যে শেষ পর্যন্ত বন্ধ করতে বাধ্য হবেন—এ আশঙ্কা আমরা করেছিলাম তখনই—যখন সরকারের পক্ষ থেকে সমস্যা সমাধানের জন্য কোনো আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় নি, শিক্ষাবিদদেরও এই ব্যাপারে আহ্বান করা হয় নি এবং জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বোস প্রমুখ প্রদত্ত বিবৃতিকেও আমল দেওয়া হয় নি।

৮ই ডিসেম্বর থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখন প্রশ্ন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা আর খুলবে কি না? যদি কিছু ছাত্রের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিতে হয়, তা'হলে এরা যদি সারা বাংলা দেশকে অচল করে দিতে চায়—সরকার তাতে কি সায় দেবেন? শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয়, কিন্তু যেখানে জাতীয় মর্যাদা ও ভবিষ্যৎ ভালো-মন্দের প্রশ্ন জড়িত সেখানে সরকারের নিস্পৃহতা কোনোমতেই সমর্থনীয় নয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর অন্তর্গত কলেজগুলির কি হাল হবে—সে সম্পর্কে কোনোরকম ভবিষ্যদ্বাণী করার প্রয়োজন হয় না। তবে প্রেসিডেন্সি কলেজের মতো সেরা কলেজের কি হাল হোলো? অবশ্য সমগ্র ঘটনার ইতিবৃত্ত যাঁরা জানেন, তাঁদের কাছে পুনরাবৃত্তি করা নিষ্প্রয়োজন যে, প্রেসিডেন্সি কলেজের মুষ্টিমেয় ছাত্রকে কেন্দ্র করেই বর্তমান গন্ডগোলের সৃষ্টি।

প্রেসিডেন্সি কলেজের এই ছাত্র-বিক্ষোভ এমন আকার ধারণ করেছে যে—সেখানে অধ্যক্ষ পদে পদে অপদস্থ হয়েছেন। শেষ পর্যন্ত সেখানে এমন কান্ড ঘটেছে—যার কলঙ্ক ছাত্র-সমাজকেই বহন করতে হবে। ছাত্রদের নিজেদের জন্যেই যে মূল্যবান ল্যাবরেটরী—তাও তারা চুরমার করে দিয়েছে! এছাড়া আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও জগদীশচন্দ্র বসুর মতো মনীষীদের মূর্তি ভেঙে ফেলার দ্বারা প্রমাণিত হয়—এ সব ছাত্র কতোখানি আদর্শহীন। যা হোক, শিক্ষা-সচিবের নির্দেশে কলেজ অধ্যক্ষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের পরদিনই প্রেসিডেন্সি কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছেন।

কিন্তু এই যে চরম অবস্থা—এর জন্য কে কতোখানি দায়ী তার মূল্যানুসন্ধান করা দরকার। মাত্র কয়েকজন ছাত্রের অস্বাভাবিক আচরণের জন্য এক বিরাট সংখ্যক ছাত্রের ক্ষতি—কোনোমতেই সমর্থনীয় নয়—শুধু মুখে এই কথা বলার সময় এখন আর নেই। অথচ এই ক্ষতি দূর করার জন্যে আজ কেই বা এগিয়ে আসতে রাজী হবেন? কারণ কতিপয় ছাত্রের অস্বাভাবিক আচরণ ও অন্যায় জিদ এখন কোনোরকম সমাধান-সূত্র বিবেচনা করতে রাজী হবে বলে মনে হয় না। সেই সঙ্গে সরকার এমনই নিস্পৃহ যে, আইন-শৃঙ্খলা যদি একেবারেই ভেঙে যায়—তবুও তাঁরা না দেখারই ভান করবেন। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার জগতে এখন যেমন নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি সাধারণ মানুষও কম চিন্তান্বিত নয়। চিন্তার কারণ এই যে, ছাত্ররা আন্দোলনের নামে যে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি করেছে—তার সমাপ্তি ত্বরায় যদি না ঘটে—তাহলে তা আরো মারাত্মক আকার ধারণ করবেই।

মূলত যে সমস্যা ছিল মাত্র ইডেন হিন্দু হোস্টেলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ—তা কর্তৃপক্ষের অদূরদর্শিতার অভাবে তৎক্ষণাৎ নিবারিত না হওয়ার ফলেই—জল অনেকদূর গড়িয়েছে। শুধু ভাবনা হয় এই সংক্রামক জল—আরো কতদূর গড়াবে।

এই কারণে আমরা এখনো মনে করি যে, সমস্ত ব্যাপারটি অনুসন্ধানের জন্যে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন বসানো হোক। এবং এই কমিশনের সদস্য হিসেবে শিক্ষাবিদদেরই স্থান হওয়া উচিত। কিন্তু আপাত-অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, কমিশন বসাবার জন্যে এগিয়ে আসবেন কে? সরকার যদি এই ব্যাপারে মৌন অবলম্বন করেন তাহলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলারের হস্তক্ষেপ কি এক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয় নয়?

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

প্রাণের ভয় কম-বেশি কার না আছে, দানীর মৃত্যু-ভয়ে ভীত হবার সঙ্গত কারণও রয়েছে। একই অপরাধে ব্যর্থ অক্টোবর অভ্যুত্থানে সহায়তা করার দরুণ ইন্দোনেশিয়ার প্রাক্তন ডেপুটী প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ সুবন্দ্রিয়ো মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুণছেন; সামরিক আদালত তাঁর মৃত্যুদণ্ড দিলে তিনি প্রেসিডেন্ট সোয়েকার্ণোর কাছে প্রাণ ভিক্ষা করেছেন। কিন্তু সোয়েকার্ণো-বিরোধীরা অভিযোগ তুলেছেন ডঃ সোয়েকার্ণো নিজে সে-অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, অতএব তাঁরও বিচার হওয়া দরকার সামরিক আদালতে। কাজেই প্রেসিডেন্টের নিজের অবস্থা যখন সঙ্গীন, তিনি অন্য লোককে ভরসা দেবেন কী করে, ডুবন্ত নৌকো কি লোক উদ্ধার করতে পারে? এ-ধারণা ওমর দানীর মনে উঁকি দিতে পারে ডঃ সুবন্দ্রিয়োর ব্যাপারে। তাই হয়তো তিনি ডঃ সোয়েকার্ণোর কাঁধে ভর দিয়ে পার পেতে চাইছেন, কিম্বা হয়তো অভ্যুত্থানের পেছনে সত্যি ডঃ সোয়েকার্ণোর গোপন হস্ত ছিল, ছিল আশীর্বাদ।

১৯৬৫ সালের ১লা অক্টোবর ইন্দোনেশিয়ার সেনাবাহিনীর একাংশ সামরিক অভ্যুত্থান ঘটায়, যার ফলে এখানকার ছ' জন জেনারেল অভ্যুত্থানকারীদের হাতে নৃশংসভাবে নিহত হন। অভ্যুত্থান অবশ্য ব্যর্থ হয়, অনেকেই ধরা পড়েছেন, কেউ কেউ পালিয়ে গিয়েছেন। সে নিষ্ফলা অভ্যুত্থানের পর ইন্দোনেশীয় রাজনীতির পট-পরিবর্তন হয়েছে, প্রেসিডেন্ট সোয়েকার্ণো কার্যত ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন, দেশের সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করেছেন জেনারেল সুহার্তো। কমিউনিস্ট বিরোধী এবং প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমান ইন্দোনেশীয়র অভিযোগ ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিই সে অভ্যুত্থান পরিচালনা করেছিল, তাঁরা প্রেসিডেন্ট সোয়েকার্ণো, তাঁর এক সহধর্মিণী, ডঃ সুবন্দ্রিয়ো, এয়ার ভাইস-মার্শাল দানী প্রভৃতির বিচারের দাবি করেন এ-যুক্তিবলে যে, এঁরা সকলেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ওই ব্যর্থ অভ্যুত্থানের সহায়তা করেছেন। ডঃ সুবন্দ্রিয়োর পর পালা পড়েছে ওমর দানীর।

এয়ার ভাইস মার্শালকে সন্দেহের কোপে পড়তে হলো কেন? ওমর দানী বরাবরই একটু উচ্চাকাঙ্ক্ষী। সেনাবাহিনী এবং কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে যখন ক্ষমতার দ্বন্দ্ব সুরু হয়েছিল তলে তলে, তখন দানীর সামনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল কোন পক্ষ নেবেন তিনি, সেনাবাহিনীর না কমিউনিস্ট পার্টির? দানী দেখেছিলেন ক্ষমতাবান প্রেসিডেন্ট সোয়েকার্ণোর ঝোঁক কমিউনিস্ট পার্টি পি-কে-আই য়ের দিকেই, সিদ্ধান্ত নিতে বেগ পেতে হলো না দানীর, ইঙ্গিত পেয়ে গিয়েছেন যখন তখন কমিউনিস্ট পার্টির দিকে ঝুঁকতে আর দ্বিধা করলেন না দানী। সেদিক

ওমর দানী

দিয়ে পি-কে-আই বা ব্যর্থ অভ্যুত্থানের সঙ্গে যদি দানীর কোনো যোগাযোগ থেকেও থাকে, সেটা খানিকটা আকস্মিক বলা যেতে পারে, নিজের স্বার্থ সিদ্ধ করার জন্যেই তিনি প্রভাবশালী পি-কে-আইকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, সহায়তা চেয়েছিলেন দলের।

শুধু তাই বা কেন? ওমর দানীর ক্ষমতার উঁচু ডালটি ধরার পেছনেও কি আকস্মিকতা ছিল না? বৃটেনের রয়্যাল এয়ার ফোর্স স্টাফ কলেজ থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসে দানী বিমান বাহিনীর অপারেশন শাখার গ্রুপ কম্যান্ডার হলেন। বছর খানেকের মধ্যেই তাঁর পদোন্নতি ঘটলো, পদ পেলেন একই বিভাগের ডেপুটী এয়ার অফিসার কম্যান্ডিং-ইন-চীফ-এর। তারপর এলো সেই আকস্মিকতা যা ওমর দানীকে সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছিলো। পশ্চিম ইরিয়ানকে ওলন্দাজমুক্ত করার কার্যক্রম নেওয়া হলে বিপ্লবী নেতারা অনুভব করলেন যে, অপারেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির হাতে দায়িত্ব না দিলে মুক্তি সংগ্রাম সফল হবে না। তাই কম্যান্ডার-ইন-চীফ-এর পদ থেকে অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধ সূর্য ধর্মকে অপসারণ করে সে-পদ দেওয়া হলো ওমর দানীকে। ক্ষমতায় যাঁরা সেদিন অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁদেরও একান্ত প্রয়োজন ছিল এমনি একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী, উদ্যোগী তরুণের যাঁর বুদ্ধিমত্তা ও বিমান পরিচালনার ক্ষেত্রে টেকনিক্যাল জ্ঞানকে কাজে লাগানো যাবে। প্রাক্-অভ্যুত্থান পর্বে ওমর দানীকে নাকি দেখা গিয়েছিলো শিক্ষকের ভূমিকায়, কম্যুনিস্ট পার্টির স্বেচ্ছাসেবকদের ট্রেনিং দেবার ভার পড়েছিল তাঁর ওপর।

জেনারেল সুহার্তো ক্ষমতায় আসার আগে পি-কে-আই সম্পর্কে বহির্বিশ্বে একটি রঙীন ধারণা ছিলো অকম্যুনিস্ট দেশগুলির মধ্যে পি-কে-আই পৃথিবীর বৃহত্তম কম্যুনিস্ট পার্টি। এ-পার্টি ছিলো আবার চীন-ঘেঁষা, প্রেসিডেন্ট সোয়েকার্ণো হয়তো তাই এ-দলকে শুধু সমীহ নয় একটু ভয় করেই চলতেন। আর প্রভুকে খুশি করার জন্যে দানী যদি তাদের সঙ্গে দহরম-মহরম করেও থাকেন, তাতে বিস্ময়ের কীই বা আছে?

অভ্যুত্থানের ব্যাপারে ওমর দানীর প্রত্যক্ষ ভূমিকা কী ছিলো তা আজো প্রকাশ পায় নি, কিন্তু জেনারেল সুহার্তো ক্ষমতা দখল করে তাঁকে এয়ার ভাইস মার্শালের পদ থেকে সরিয়ে নেদারল্যান্ড পাঠিয়েছিলেন ভ্রমণরত রাষ্ট্রদূত করে। ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে সফর করতে করতে দানী একদিন নিপাত্তা হয়ে গেলেন। পরে তাঁর আবির্ভাব ঘটে কাম্বোডিয়ায়। কাম্বোডিয়া থেকে ইন্দোনেশিয়ায় দানী কি করে এলেন—সে কাহিনী এখনো রহস্যাবৃত, কিন্তু মিলিটারী ট্রাইবুনালের মুখে যখন তিনি পড়েছেন, তখন অনেক অবিশ্বাস্য গোপন-তথ্য যে এবার ফাঁস হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

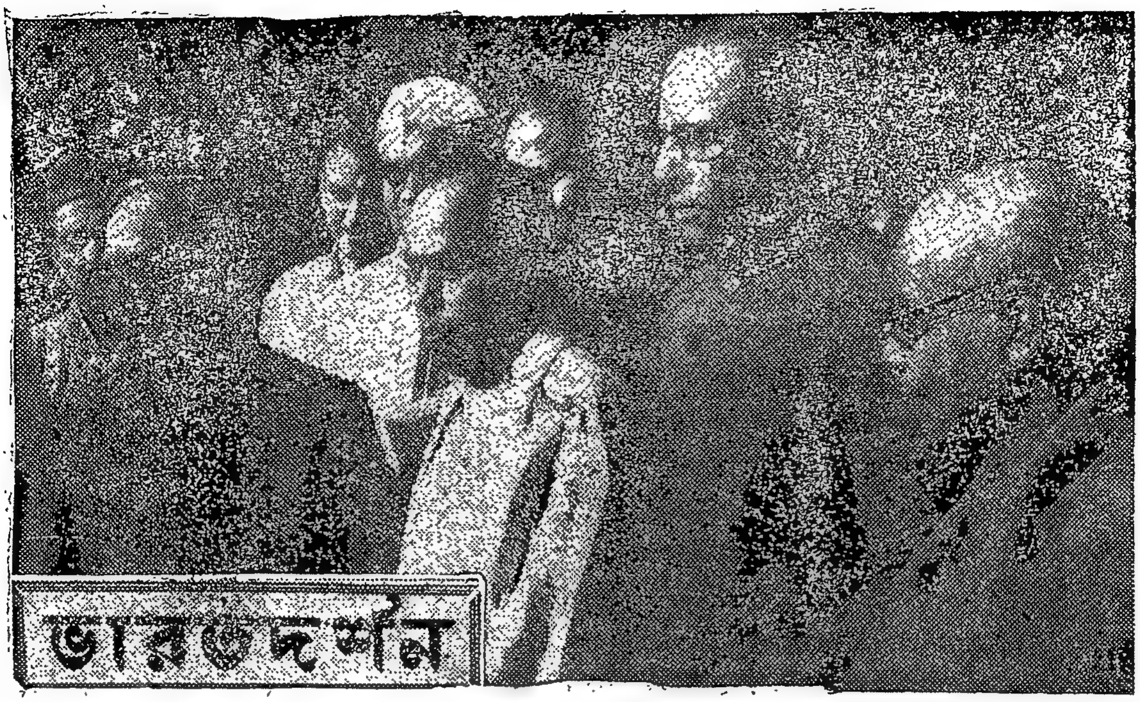

'জন কংগ্রেস'-এর নেতৃ-সমাবেশ

জন কংগ্রেস ঃ

সুগ্রীব দোসর

আমাদের রামরাজ্যে কংগ্রেসকে যদি স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রের ভূমিকায় গণনা করা যায় তবে সম্প্রতি গতিশীল 'জন কংগ্রেস'কে সুগ্রীব দোসর বলতে পারি কি?

প্রথমেই প্রশ্নবাচক বাক্য না সাজিয়ে গত্যন্তর দেখলাম না। কংগ্রেস যে প্রদীপ প্রজ্বলিত করেছিল, অধুনা তার থেকে দীপ্তির বদলে ধূম্র উদ্‌গির্ণ হতেই দেখা যাচ্ছে। বহুতর শপথবাক্য আজ শুধু ধোঁয়ায় পর্যবসিত। 'জন কংগ্রেস' গঠন করার 'মহৎ অভীপ্সা' নিয়ে সম্প্রতি কয়েকজন প্রাক্তন কংগ্রেসী নেতা বিভিন্ন রাজ্য থেকে একত্র সমবেত হয়েছেন বন্ধপ্রকোষ্ঠে আলোচনায়। এই সমাবেশে যে কটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে সে প্রস্তাবগুলিও ধোঁয়াটে বোধ হওয়ায় 'জন কংগ্রেস' 'সুগ্রীব দোসর' রূপেই প্রতিভাত হতে পারে দেশবাসীর মনে। কিন্তু সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

আপাতত সমবেত নেতৃবৃন্দ ঠিক করেছেন, আগামী নির্বাচনের পর 'জন কংগ্রেসে'র সাংগঠনিক কার্যকলাপ শুরু হবে। দলের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য ইতিমধ্যে সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি কাজও শুরু করেছেন। কমিটিতে পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, আসাম, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং কেরালার প্রতিনিধি থাকছেন। আপাতত কংগ্রেস-পরিত্যক্ত বিভিন্ন রাজ্যের প্রাক্তন কংগ্রেসীরা তাঁদের বর্তমান রাজ্যদলের নাম নিয়েই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এবং এই ব্যপদেশে কেন্দ্রীয় জন কংগ্রেসের কোন নির্দেশ কার্যকরী হবে না। উক্ত সাত সদস্যের অন্যতম শ্রীহুমায়ুন কবীর (পঃ বঃ) জন কংগ্রেস গঠনের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, **'জন কংগ্রেস' দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তির জন্মদান করবে না।**

নেতৃসমাবেশে জন কংগ্রেসের নীতি ব্যাখ্যা করে নিম্নোদ্ধৃত ভাবানুযায়ী প্রস্তাব গৃহীত হয়েছেঃ

মহাত্মাজীর আদর্শ থেকে কংগ্রেস উত্তরোত্তর বিচ্যুত হওয়ায় সমাজজীবনে অধোগতির লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। মহাত্মাজীর সমাজোন্নয়ন এবং ধনী-দরিদ্রের ফারাক পূরণের নীতি বিসর্জিত হয়েছে। কংগ্রেস নেতৃত্বে এবং দলে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা সুস্পষ্ট। এমতাবস্থায় দেশ একটি নতুন সংগঠনের প্রয়োজন অনুভব করে। এই সংগঠন গত কুড়ি বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে স্বাধীনতাপূর্ব যুগের কংগ্রেসের মৌল আদর্শগুলিকে ঢেলে সাজাতে বদ্ধপরিকর।

জন কংগ্রেস কল্যাণ ও সামাজিক ন্যায় এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তি-উদ্যোগকে প্রতিষ্ঠা দেবে।

জন কংগ্রেসের উপরোক্ত প্রস্তাব রাজনৈতিক আকাশে কিছুমাত্র ধূম্র অপসারণের দায়িত্ব পালন করেছে বা করতে চায়, এমত আশা রাখা সম্ভব হল না।

মহাত্মাজী আজ আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তাঁকে ভাঙিয়ে আমরা অচল টাকা বহুকাল সচল বলেই চালিয়ে আসছিলাম। কংগ্রেস শেষ দিকে নেহরুজীকেও কর্মক্ষেত্রে ক্যাশ করে নি। কিন্তু আজ সে রাম সে রামরাজত্ব দুইই গেছে, পড়ে আছে শ্রীরামচন্দ্রের পোশাকটি। বর্তমানে তাও কংগ্রেস তাকে প্রায় পরিত্যাগ করেছে, জন কংগ্রেস সেই পরিত্যক্ত শোভা মস্তকে ধারণ করতে সাগ্রহী। শ্রীভরত খড়ম এনেছিলেন, তাঁর সততায় রামায়ণ-কার সন্দেহ প্রকাশ করেন নি। কংগ্রেস ও জন কংগ্রেস উভয়তই শিরোটোপ ধারণে সন্তুষ্ট। বলা বাহুল্য, টুপি জাতীয় বস্তু পোশাকমাত্র, খড়মের ন্যায় প্রয়োজনীয় নয়। অর্থাৎ নীতি নিয়ে হাঁটার জন্য যদি খড়ম প্রয়োজনীয়, নীতি নিয়ে মতলব আঁটার জন্য তবে টুপি চমৎকার প্রদর্শনীয় বস্তু। 'জন কংগ্রেস' কতটা হাঁটবেন, কতটা বা মৎলব আঁটবেন, আজ সে চিন্তার অবকাশ আছে। কেন না ইতিমধ্যেই স্বতন্ত্র পার্টি গজিয়েছে, (শোনা যাচ্ছে, ব্যবসায়ীরাও নাকি দল গড়বেন, রাজা-মহারাজারাও স্বতন্ত্র ছাড়াও স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজন অনুভব করছেন; এ ছাড়া তেত্রিশ কোটির তেত্রিশ পার্টি তো আছেই) আবার পার্টি শুনলেই হৃৎকম্প হয়। হয়ত এমন সময়ও আসবে যখন আমি আপনি প্রত্যেকেই এক-একটা পার্টি।

তা সে দুর্ভাগ্যে পৌঁছাবার আগেই জন কংগ্রেস একটা আশ্বাস রেখেছে ঃ 'ব্যক্তি স্বাধীনতা' এবং 'ব্যক্তি উদ্যোগ' অবাধ করার প্রতিশ্রুতি আছে। স্বতন্ত্রের

স্বাতন্ত্রীবাদের মতলবেও এসব ছিল। তবু কেন নতুন পার্টির প্রয়োজন হয়? এতো মত ও এতো পথ আছে যে, বাছতে বাছতে যে কেউ একটা না একটা পার্টির মধ্যে আপন অভীষ্ট সিদ্ধির বেশ একটা মোটা অংশই পেয়ে যেতে পারেন। কিন্তু তাতে পার্টি করার বাঞ্ছা পূর্ণ হয় না। আমাদের জীবনে সর্বত্রই ফ্র্যাগমেণ্টেশন, পার্টির ক্ষেত্রেও তা দিনকে দিন আরও বিশ্লিষ্ট হবে বৈ কি।

জন কংগ্রেসের বয়ানে সাবধানে নেহরুজী কিম্বা তাঁর আধা সমাজতন্ত্রের কথা পরিহার করা হয়েছে। সমাজতন্ত্রের তো বালাই-ই নেই। ধনী-দরিদ্রের ফারাকটা এ নীতি আবার কোন প্যাঁচে বুজিয়ে দেবে কে জানে। মহাত্মাজীর কথা টানা হয়েছে। খুব শ্রদ্ধেয় স্মৃতি। কিন্তু পরিবর্তিত অবস্থায় খাপ-খাওয়ানোর কথাও আছে। অবস্থায় হাওয়া এখনো এলো-মেলো, সুতরাং সুস্পষ্ট কিছুই বোধগম্য হয় না। এটুকু শুধু বোঝা যাচ্ছে, জন কংগ্রেসেও কংগ্রেসের মতই বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধক চরিত্রের ভিড় জমবে।

কিন্তু বলিষ্ঠ রাজনীতিতে একই দলে বহু উদ্দেশ্য বহু বাঞ্ছার সম্মেলন ভরাডুবিরই কারণ হয়ে থাকে।

কেবলমাত্র গো-প্রেমিকদের জন্য

কেন্দ্রীয় সরকার শত্রুর হাতে চোট খেয়ে কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে চোট বেশ হজম করতে পারেন। কে বলে সরকার অনমনীয়!

গো-রক্ষকগণ শুনে খুশি হয়েছেন যে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজ্যগুলির ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় গোধন নিধন বন্ধ করার জন্য সাংবিধানিক নির্দেশ কঠোরভাবে প্রয়োগ করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। বলা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার গো-হত্যা নিবারণের দাবি গ্রহণ করেছেন "নীতি-গতভাবে।"

কংগ্রেস সংসদীয় দলের সম্পাদক শ্রীরঘুনাথ সিং সন্ন্যাসীবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আলোচনা করেন। সংসদীয় দল গো-হত্যা বন্ধের জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করবেন। কার্যনির্বাহক কমিটি গো-হত্যা বন্ধের দাবির পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।

বর্তমানে এর দ্বারা সন্ন্যাসী তুষ্ট করা গেছে। তাঁরা বলেছেন, বিরোধ মীমাংসার কথা তাঁরা অবশ্যই বিবেচনা করবেন সরকার যদি তাঁদের দাবি নীতিগতভাবে মেনে নেন। সুতরাং গো-প্রেম অতিরেক-জনিত আপদ আপাতত তাকে তোলা হল. মনে করা যেতে পারে। তবে এ বিষয়ে সংবিধান সংশোধনের কোন প্রস্তাব সরকার এখনো বিবেচনায় আনেন নি, একথাও জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মনিয়ম। গো-হত্যা নিবারণ সম্পর্কে গণভোট গ্রহণের এক প্রস্তাব ছিল; বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে এ প্রস্তাব একেবারে ফালতু বলে উড়িয়ে না দেওয়া গেলেও খাদ্যমন্ত্রী তা সরাসরি অগ্রাহ্যই করেছেন।

অর্থনীতিবিদ সম্মেলন

বহু বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ একটি আলোচনাচক্রে মিলিত হয়ে দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতির যে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ করেন রাজধানী দিল্লীতে তদ্রূপ সম্মেলন এই প্রথম।

প্রায় সকল বিশিষ্ট আলোচকই এক-বাক্যে একথা স্বীকার করেন যে, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যাবলী আর্থিক উন্নয়নে যথেষ্ট সহায়ক তো হয়ই নি, পরন্তু দেশে অস্থৈর্য এবং অগ্নিগর্ভ অবস্থারই সৃষ্টি করেছে।

আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক গাঙ্গুলী বলেন ঃ জনগণের কল্যাণ অথবা সমাজ-তন্ত্রের দিকে অগ্রসর হওয়ার কোন লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে নি। বাড়-বাড়ন্ত দেখা যাচ্ছে বরং পুঁজিবাদের। তবে এই ধনতন্ত্রবাদী অগ্রগতিও এসেছে এলোমেলোভাবে। আজকের বিক্ষোভও তারই প্রতিফলন মাত্র।

ডঃ গ্যাডগিল মনে করেন ঃ সমাজতন্ত্র-বাদ কেউ চান বা নাই চান, একটি সুস্থির অর্থনৈতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে হলে কায়েমী স্বার্থকে কোণঠাসা করতেই হবে, আয়ের পথ সংযত এবং ধনিক সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে সংহত করাতেই হবে।

ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা নিয়ন্ত্রণ, বিশেষত অত্যাবশ্যক নয় এমন পণ্যের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে দেশের অতি-প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনের দিকে লক্ষ্য রাখবার জন্য আহ্বান জানান অধ্যাপক দাণ্ডেকার।

বৈদেশিক সাহায্যের প্রশ্নে সাধারণভাবে আলোচকবৃন্দ স্বীকার করেন যে, আরও সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন খতম করবে এমন যুক্তিতে কোনও সারবত্তা নেই।

ইত্যাকার আলোচনা থেকে এই অনন্য-পূর্ব অর্থনীতিবিদ সম্মেলন ভারতের একটি অন্ধকার ছবিই তুলে ধরেছেন।

এয়ার ইণ্ডিয়া

এয়ার ইণ্ডিয়ার সেই বিখ্যাত মহারাজা, যিনি ঈষৎ নুব্জ বিনয়ে গদ্গদ হয়ে আতিথ্য জানাচ্ছেন অর্থঋদ্ধ সমাজের সেই শ্রেণীর যাত্রিবৃন্দকে যাঁরা সম্ভব হলে এবাড়ি থেকে ওবাড়ি যেতেও মাটির মানুষের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যেতেই ভালবাসেন। সেই বিখ্যাত মহারাজাকে নিয়ে এতোকাল কোন দুশ্চিন্তার কারণ ঘটে নি। পুতুলটির সৌন্দর্য বরং মুগ্ধ করেছে। শিল্পীর কৃতিত্বকে অভিনন্দন জানিয়েছি মনে মনে। কিন্তু একবারও মনে হয় নি যে এই পুতুল রাজার মধ্যেই প্রাণ-সঞ্চারের একটা প্রবল প্রচেষ্টা সুরু হয়ে যাবে ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে। মানুষকে গলা ধাক্কা দিয়ে পুতুলে উদ্দীপনা সৃষ্টির চেষ্টা করবেন আমাদের সেই জাতীয় কংগ্রেস যে জাতীয় কংগ্রেসে রাজাধিরাজদের প্রতি এতোদূর প্রেম-প্রীতি তলে তলে বর্তমান ছিল দেশের বিশ্বাসী জনগণ তা ধারণাও করতে পারেন নি। কিন্তু আজ কি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসেও এয়ার ইণ্ডিয়ার এয়ার স্পর্শ বুলিয়ে যাচ্ছে! কংগ্রেস এলাহিভাবে রাজা-মহারাজাদের আগামী নির্বাচনে প্রার্থীরূপে মনোনয়ন দিতে উদ্গ্রীব। রাজারা আবার তাঁদের বিচ্যুত পাগড়ি বাঁধতে বাঁধতে শাসনকার্যে নাক গলাতে আসছেন। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় প্রবেশোন্মুখ হয়েছে রাজতান্ত্রিক উচ্চাশা। শুধু বৃত্তিভোগী রাজারাই নয়, অনেক জায়গায় তাঁদের রাজ এলাকার চৌহদ্দিতে তাঁদেরই মনোনীত প্রার্থীরা পাচ্ছেন কংগ্রেসী পরিপোষণ।

মহারাজা মারতান্দ সিং রেওয়ার তেইশটি আসনের জন্য কংগ্রেস প্রার্থী বাছাই করেছেন বলে অভিযোগ। পাঞ্জাবে নাকি কতিপয় কংগ্রেসী ক্ষমতাবান পুরুষ মহারাজা অব পাতিয়ালাকেই মুখ্যমন্ত্রী পদে বরণের জন্য সলা-পরামর্শ করছেন। গুজরাটে প্রিন্স অব বরোদার আশা-ভরসাও কংগ্রেসই যোগান দিচ্ছে।

পাতিয়ালার প্রাক্তন শাসক যাদবিন্দ্র সিং কংগ্রেসী ছাড়পত্র নিয়ে পাতিয়ালা থেকে লোকসভার জন্য প্রার্থী হিসেবে অবতীর্ণ হবেন বলে আশ্বাস পেয়েছেন।

কিন্তু কে এই পাতিয়ালা? ইনিই তো ভারতের স্বাধীনতা দিবসের প্রভাত-কাল পর্যন্ত বৃটিশ সরকারের সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতায় রত ছিলেন না? এঁকেই তো নেহরুজী সাবধানে প্রতিরোধ করে গেছেন পাঞ্জাব রাজনীতিতে এঁর উচ্চাশা চরিতার্থের বিপক্ষে! কিন্তু এই পাতি-য়ালা এবার আসর জমাবেন। মদত দিচ্ছেন রাজ্যের একাংশ কংগ্রেসী শক্তি।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁর An Autobiography-তে লিখে-ছিলেনঃ

....there remain people amongst us who desire to stick to the servants'-halls.

আমাদের মধ্যকার সেই দাসসুলভ মনোবৃত্তির সমস্যা নেহরুজী মনে করতেন ঃ

....is one of changing the colour of the administration....They never think in terms of a new State.

বস্তুত এঁরা চেয়েছেন স্বাধীনতা বলতে স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধি করতে। একটি নতুন রাষ্ট্রের কদর এঁদের কাছে তত নয়, একটি নতুন প্রশাসন যতটা, যেখানে শাসকরূপে নিজেকে টিকিয়ে রাখাই হবে একমাত্র উদ্দেশ্য এবং যার নাম হবে স্বাধীনতা।

নেহরুজী লিখছেন ঃ For them Sawraj means that everything continues as before, only with a darker shade.

তাঁরা সেই ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেন ....in which they, or people like them, will play the principal role..in which there are the same types of services, government departments, legislatures, trade, industry—with the I.C.S. at their jobs ;

অর্থাৎ আই সি এস কন্টকিত সেই একই শাসনব্যবস্থা, সেই একই কানুন, একই বাণিজ্যনীতি। তফাৎ শুধু লালমুখের বদলে শাসকরূপে তাঁরা নিজেদের বা নিজের দলীয়দেরই প্রতিষ্ঠিত দেখতে চান। নেহরুজী আরও লিখেছেন ঃ তাঁরা চান the princes in their palaces,....; the landlords claiming special protection..; the money lender, with their money-bags, harrassing..; the lawyer with his fees ; and God in His heaven.

(An Autobiography,
chapt. LII)

নেহরুজী এই স্বার্থসন্ধানী গোষ্ঠীর আপন স্বার্থপুষ্ট স্বরাজ চান নি। তিনি চান নি, রাজন্যবর্গ আগের মত প্রাসাদ চূড়ায় তাঁদের ঝকমকে পোষাক পরে বিলাস-প্রমত্ত হয়ে ঘুরে বেড়ান, ভূস্বামীরা পেতে থাকুন সবরকম সংরক্ষণের সুবিধা, মহাজন অত্যাচার করুন খাতকের ওপর, আইন এমন হোক যাতে উকিলবাড়িতেই সম্পত্তি তুলে রেখে আসতে হয় এবং ধর্মের সংস্কার মানুষকে অদৃষ্টবাদের ফাঁসে জড়িয়ে রাখুক। কিন্তু স্বরাজ লাভের পর নেহরু প্রতিরোধের ফাঁক দিয়েও এসবই যথাযথ থেকে গেছল। আজ উনিশ বছর পার করে দিয়ে ভারতবর্ষ গালে হাত রেখে ভাবছে, তাই ত', কী পেলাম? নতুন রাষ্ট্রীয় চেতনা না কি নতুন শাসক, যার চামড়ার রঙেই শুধু ফারাক। সেই তো আই সি এস অধ্যুষিত মন্ত্রিসভা। বিরোধী নেতাকে যে জন্য প্রশ্ন করতে হয় মন্ত্রী মহাশয়কে, নন্দা সাহেব তো হটলেন, এবার আপনার সেক্রেটারী (বলা বাহুল্য আই সি এস নিদেনপক্ষে ভারতীয় আই এ এস) আপনাকে কবে অপসারিত করছেন! সেই তো রাজন্যবর্গের জয়জয়কার। সেই তো মজুতদার ভূমিমালিকের হাতে নিগ্রহ। সেই তো মহাজনের গদিতে ধনপ্রাণ বাঁধা। সেই তো মকদ্দমায় সর্বস্বান্ত অবস্থা আর সেই তো ধর্মের মৌতাতে চারিদিক মো মো করছে।

আমরা তবে কী পেলাম!

তফাৎ কি শুধু এই যে, এবার রাজার যে হস্ত দস্যুর মতো প্রকাশ্যে কাঙালের সমস্ত ধন চুরি করত, সেই হস্ত নির্বাচন প্রার্থীরূপে এয়ার ইণ্ডিয়ার কেতায় কিছু ভব্য হয়েছে!

একচেটিয়া কারবার

মনোপলি তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন সম্পর্কে বিতর্ককালে বিরোধিগণ এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, কংগ্রেসী আশীর্বাদে দেশের মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ীরাই দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভুত্ব করছেন।

উত্তরে আইনমন্ত্রী বলেন ঃ বর্তমান আইন বস্তুতই একচেটিয়া কারবার রোধের পক্ষে যথেষ্ট নয়, এজন্য এই বিষবৃক্ষের গোড়া অশক্ত করার জন্য অন্যান্য দেশে কেমনতর আইন আছে সরকার তা পর্যালোচনা করে দেখবেন। এই বিষয়ে একটি স্থায়ী মনোপলি কমিশনও গঠন করা হবে যাঁরা স্বাধীনভাবে নিজেদের কাজ চালাতে পারবেন।

পি এস পি সদস্য শ্রীবাঁকাবিহারী দাস বিতর্কে যোগদান করে অভিযোগ করেন যে, পনের বছরের শাসনে কংগ্রেস শুধু পুঁজিপতিদের আনুকূল্যই করে এসেছেন, সমাজতন্ত্র ফাঁকা বুলি মাত্র।

পুঁজিপতিরা অর্থনীতির শাসক তো ছিলেনই এখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলেরও চেষ্টা করছেন। শ্রীদাস অভিযোগ করেন যে, বর্তমান সরকার আসলে হিসাব বহির্ভূত অর্থের মালিকদেরই ছায়া সরকার মাত্র।

কংগ্রেসী সদস্য শ্রীঅর্জুন অরোরা বললেন, সরকারের আর্থিক নীতিই একচেটিয়া কারবার সংরক্ষণের জন্য দায়ী। শ্রীঅরোরা চতুর্থ খসড়া পরিকল্পনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আরও বলেছেন পরিকল্পনায় একচেটিয়া কারবার রোধের বিষয়ে বিস্তৃত কর্মসূচী নেই।

শ্রীভূপেশ গুপ্তের অভিযোগ ঃ বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীকে লাইসেন্স মঞ্জুরের সরকারী নীতি এই অবস্থাকে জিইয়ে রেখেছে। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ এবং বিদেশী একচেটিয়া কারবার বন্ধ করে এর প্রতিকার করতে হবে।

শ্রীশীলভদ্র যাজী (কং) চান, সরকার তাঁর মিশ্র অর্থনীতি পরিত্যাগ করে সমস্ত ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্য সংস্থা জাতীয়করণ করুন অন্যথা, সমাজতন্ত্র বুলি মাত্রেই অবসিত হবে।

কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীপাঠক অবশ্য ভারতে এতদ্‌বিষয়ে এক যুগান্তকারী আইন তৈরির আশ্বাস দিয়েছেন।

এই আশ্বাসবাক্য কেমন করে কার্যকরী করা হব তাই-ই এখন দেখবার বিষয়।

পাঞ্জাব ঃ

অনশন রাজনীতি

যে ভারতবর্ষে প্রায় মানুষই অর্ধভুক্ত এবং যদিও অনশন মৃত্যুর সংবাদ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রয়োজন না হলে সংবাদপত্রে সংবাদ হিসেবে গণ্য হয় না (অল্পাহারে ক্রমমৃত্যুও তো অনশন মৃত্যুই আর তা দেশের সর্বত্র, শহরের ফুটপাথে নিত্য দৃশ্য বিষয়), অথচ এ দেশেই কথায় কথায় 'আমি খাব না' বলে ভয় দেখানো একটা চমৎকার রাজনৈতিক ট্যাকটিশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গো-রক্ষার দাবিতে অনশন করতে গিয়ে ব্রহ্মচারী মশায় মারা গেলেন। শঙ্করাচার্য দুর্বল হয়ে পড়েছেন। হুজুগ উঠলেই অনশন হুজুগও ওঠে। আর তা শুধু যে সরকারের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হচ্ছে এমন নয়, বিরোধীপক্ষকেও অনশনের ফ্যাসাদ সামলাতে হয়েছে। বিগত আটচল্লিশ ঘণ্টা বাংলা বন্ধের ডাক শুনে জনৈক সাহেব মানুষ রাজ্যের বিরোধী নেতার সন্নিকটে বন্ধ আহ্বানের প্রতিবাদে অনশন শুরু করেছিলেন। তা ছাড়া আকছার অনশনের হুজুগ তো লেগেই আছে।

বর্তমান খরার প্রকোপে বিহার উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গেও অনাহার মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গেছে। সেগুলি অনশন মৃত্যু নয় কেন না, খরার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে কেউ প্রাণ দেন নি। হা অন্ন করে মৃত্যুর সঙ্গে যুঝে মরেছেন। এজন্য এসব মৃত্যুর বিশেষ মূল্য নেই। কিন্তু যাঁরা খেতে পান অথচ খাব না বলে রাগ করে শুয়ে থাকেন তাঁদের নিয়ে

কী ভীষণ আলোড়নই না হয়। আর এর নামই অনশন রাজনীতি। যার পথ-প্রদর্শক মহাত্মা গান্ধী।

অধুনা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা আরও এক নয়া ট্যাকটিশ দেখিয়েছেন, সরাসরি আত্মাহুতি। আগুন জেলে পুড়ে মরা। না খেতে পেয়ে মরা আর পরের জন্য বা গোজাতির জন্য শহীদ হওয়ায় আকাশ-পাতাল তফাৎ। প্রথমটি রোজ মোটা হারেই হচ্ছে, দ্বিতীয়টি সংবাদপত্র আলোড়িত করে ক্বচিৎ কখনো হয়। তবে ইদানীং তাও হামেশা হচ্ছে।

সম্প্রতি পাঞ্জাবের আকালী নেতা সন্ত ফতে সিং অনশন ও আত্ম বিসর্জনের হুমকী দিয়েছেন। মাত্র সাতদিনের আলটিমেটাম। হয় দাবি মানো নয় ১৭ই থেকে ২৭শের মধ্যে অনশন এবং আত্ম-হনন কমপ্লিট।

সন্তজীর দাবি সরকার ইতিপূর্বে মেনেছেন। পাঞ্জাব দু' টুকরো হয়েছে। এখন দুই ভিন্ন রাজ্যে দুই মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু সন্তজী খুশি নন। তাঁর এখন চণ্ডীগড় চাই, চাই হরিয়ানার মধ্যে থেকে যাওয়া আর পাঁচটি পাঞ্জাবীভাষী এলাকা। হরিয়ানার গায়ে গা দিয়ে রাজকার্য চালাতেও অনিচ্ছা। সব অলগ্ অলগ্ চাই।

আকালী নেতার দাবি শুনে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভগবৎ দয়াল প্রথমটা একটা সৎ প্রস্তাব রেখেছিলেন। বলেছিলেন আকালীদের যে সমস্ত অঞ্চলে দাবি, হরিয়ানার সে সমস্ত অঞ্চলে গণভোট গ্রহণ করে ব্যাপারটার মীমাংসা হোক। যদি গণভোটের রায়ে অঞ্চলগুলি পাঞ্জাব পাড়ি দিতে ইচ্ছুক থাকে। তবে হরিয়ানা তাতে আপত্তি করবে না। কিন্তু গণতন্ত্রে গণভোটের প্রস্তাব কেউ মানতে চান না। সন্তজীও গণতান্ত্রিক তিনিই বা কেন তা মানবেন। বলেছেন, না, যা চেয়েছি তাই দাও, অন্যথা অনশন ও আত্মহননের হুমকী বহাল রইল। সম্প্রতি গো-রক্ষা সম্পর্কে গণভোটের দাবিও বাতিল হয়েছে।

শুনে শ্রীদয়ালও এবার রুখে উঠেছেন।

বলেছেন, তবে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়ব না।

সরকার বিষম টাইট কর্নারে। কেন না সেই বিচ্ছিন্নতাবাদী শিখিস্তানের দাবিদার মাস্টার তারা সিংও এবার প্রচণ্ড উৎসাহে নারদ নারদ বলে লেগে পড়েছেন। সন্তজীকে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হতে দুহাত তুলে উৎসাহ দিয়েছেন আর সন্তজীও প্রত্যুত্তরে তাঁর নেতৃত্বে ঈর্ষা-ভাজন তারা সিং-এর উৎসাহে প্রফুল্ল হয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

অথচ সন্তজীর অনুগামীদের মধ্যেই আবার অনেকে সন্তজীর এই চূড়ান্ত পন্থা গ্রহণে অখুশি। এঁরা যথার্থই মনে করেন, দাবি আদায়ের এহেন পথ মোটেই সুবুদ্ধিসঞ্জাত নয়। চীনের আলটিমেটামের সঙ্গে মোকাবিলা করা যায়। কিন্তু দেশের একজন জনপ্রিয় নেতা অকস্মাৎ খাব না বলে বায়না ধরে প্রাণত্যাগের জন্য আলটিমেটাম ছাড়লে কী দুঃসহ অবস্থা। দাবির পক্ষে যুক্তি থাকতে পারে; কিন্তু যুক্তিমাত্রেই এক-পক্ষের যুক্তি, যুক্তি অপরপক্ষেও থাকে। অথচ মৃত্যুর হুমকীকে যুক্তির লড়াই-এ কাবু করা যায় না। তিনি বিরক্ত হয়ে অবশেষে দিল্লীর জনদুই জাঁদরেল আকালী নেতা সন্তজীর দল থেকে পদত্যাগ করেছেন। দেশের সুবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষ সন্তজীকে এই সর্বনাশা পথ থেকে নিবৃত্ত হওয়ার জন্য বহু অনুরোধ জানাচ্ছেন।

ভারতের দুই শাখা কম্যুনিস্টরা সন্তজীর দাবির যৌক্তিকতা মানলেও দাবি আদায়ের পন্থা বে-যৌক্তিক বলে রায় দিয়েছেন। অথচ সন্তজী প্রতিজ্ঞায় অটল। বিগত পাক-ভারত সংঘর্ষের সময় সন্তজী শান্তভাবে সমগ্র দেশের স্বার্থে তাঁর লড়াই থামিয়েছিলেন। এখন একে-বারেই বেঁকে বসেছেন। বলছেন, আগের মতই সরকার বিনা বাক্যব্যয়ে ২৭শে ডিসেম্বরের মধ্যেই বা তারও আগে তাঁর দাবি মেনে নিন। না হলে তিনি আত্ম-হননের দ্বারা মারাত্মক অবস্থা সৃষ্টি করে যাবেন।

প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উভয়েই সন্তজীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন, এপথ ত্যাগ করার জন্য। প্রধানমন্ত্রী আলোচনায় বসতে রাজী। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন; যেহেতু উচ্চ পর্যায়ের ক্ষমতা-সম্পন্ন নিরপেক্ষ কমিশনের সুপারিশে সীমানা নির্ধারিত হয়েছে সে জন্য সংশ্লিষ্ট দুপক্ষ সম্মত না হলে তা বদল করা যায় না। বাস্তবিক, ভারতের শাসন-তন্ত্র এবং মানচিত্র যে কারও খেয়াল-খুশির ফলে মুহুর্মুহু রদবদল হতে পারে না এ ধারণা আমাদের ক্রমশ পাল্টে যাচ্ছে। মানচিত্র বদলের জন্য দশ দিন এবং শাসনতন্ত্র সংশোধনের জন্য উপযুক্ত ভোটই যথেষ্ট জ্ঞান করি আমরা। এমত জ্ঞানীদের হাতে দেশের অবস্থা বেসামাল হয়ে পড়েছে। এ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে।

আকালীদের সব কিছু অলগ্ অলগ্ ব্যবস্থা করতেও প্রধানমন্ত্রী রাজী হয়ে-ছেন। জানিয়েছেন, চাইলেই সাধারণ যোগসূত্ররূপ হাইকোর্ট এবং রাজ্যপাল পদ পৃথক করা যেতে পারে।

কিন্তু সন্তজী প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীর আবেদন সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে অবস্থাকে খুবই জটিল করে তুলেছেন।

অন্ধ্র:

এ কি প্রাদেশিকতা?

ভারতের বুকে কয়েকটি রাজ্যে খরার প্রকোপে যখন মানুষ অনাহারে মৃত্যুর সম্মুখীন, যখন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জনসন সাহেব খাদ্য নিয়ে কী রাজনীতি করলেন তাই নিয়ে উচ্চকিত নিন্দাবাদে আমরা মুখর তখন এই ভারতবাসীই নির্লজ্জের মতো খাদ্য নিয়ে যে রাজ-নৈতিক প্যাঁচ কষছে তা ভাবলে নিজের প্রতি ঘৃণায় কলমের ডগা শুকিয়ে আসে।

খরাপীড়িত অঞ্চলের জন্য ভারত সরকার অন্ধ্র রাজ্যের উদ্বৃত্ত খাদ্যের কিছু অংশ দিয়েছিলেন, প্রত্যুত্তরে অন্ধ্র-এর মুখ্যমন্ত্রী একটি প্রচণ্ড 'না' কারে দেশ-বাসীকে স্তম্ভিত করে দিয়েছেন। অন্ধ্রে ইস্পাত কারখানা স্থাপনের পক্ষে কেন্দ্রীয় প্রতিজ্ঞা না পেলে অন্ধ্র এক কণা খাদ্য-শস্য ছাড়তে রাজী নয়। বিশাখাপত্তনমে ইস্পাত কারখানা পত্তনের আশ্বাস আদায়ের জন্য ভগ্নীসমা রাজ্যের মানুষ-গুলিকে যাঁরা অনাহারে মরতে দেখে দাঁত বার করে হাসতে পারবেন, সেই দেশের মানুষ পি এল ৪৮০-র সমালোচক, একথা ভাবতেই ঘেন্না করে। ঘেন্না করে যখন বিহার রিলিফ কমিটির সভাপতি জয়প্রকাশ নারায়ণ জানান যে, পাঞ্জাব বিহারকে আরও কিছু খাদ্যশস্য দিতে গররাজী কেন না সেখানে উদ্বৃত্ত খাদ্য চলাচল রাজ্যের মূল্যান্তর বৃদ্ধি পেতে পারে মনে করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

অন্ধ্র শুধু আজকেই নয়, গত বছরও দেশের চরম দুর্দিনে খাদ্য সাহায্যের আহ্বানকে নির্দয়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে-ছিল। অথচ অন্ধ্রের নিজের হিসাব মতই এ রাজ্য অনায়াসে কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার টন চাল তার গুদাম থেকে ছেড়ে দিতে পারত। আজ আরও অনেক বেশি, প্রায় আড়াই লক্ষ টন খাদ্যশস্য খরাপীড়িত অঞ্চলকে দিলেও তার নিজের খাদ্যে কিছুমাত্র টান পড়বে না।

অন্ধ্র ইস্পাত কারখানা নিয়ে তার গুদাম যখের ধনের মত আগলে থাক। খাদ্য নিয়ে নির্লজ্জ রাজনীতি করুক, আমরা ভারতের অন্যান্য রাজ্যে দুমুঠি অন্নের জন্য দুহাত বাড়িয়ে পৃথিবীর সর্বত্র ভিক্ষা করে মরি।

আহা, কী আহামরি ভারত সাধারণ-তন্ত্র!

রোডেশিয়া ঃ

যাঁরা মনে ভেবেছিলেন, বৃটেন এশিয়া-আফ্রিকার চাপে পড়ে তার দুর্বল রোডেশিয়া নীতির পরিবর্তন করবে, তাঁদের আরেকবার হতাশ হতে হয়েছে। তাঁদের দেখতে হয়েছে যে, নগণ্য একটা রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী একটা শক্তিশালী দেশের গালে কেমন সজোরে চপেটাঘাতটি করলেন।

প্রধানমন্ত্রী উইলসন ঢঙ এ-বাবদে নেহাৎ কম করলেন না। প্রথমে তিনি রোডেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিঃ আয়ান স্মিথের মুখই দর্শন করতে রাজী হলেন না, আলোচনা তো দূরের কথা। তারপর প্রায় কাক-পক্ষীকে জানতে না দিয়ে হাজির হলেন সুদূর জিব্রাল্টারে—টাইগার ক্রুজারে বসে সেই স্মিথের সঙ্গেই নিভৃত আলাপনে কখন দুদিন দুরাত্তির কাটিয়ে দিলেন। লণ্ডনে ফিরে তিনি পরম বিশ্বাসভরে ঘোষণা করেছিলেন যে, মিঃ স্মিথের কাছে তিনি যে ছ'দফা দাবি-সম্বলিত নতুন কাজ-চলাগোছের নতুন প্রস্তাব দিয়েছেন তা ওই বিদ্রোহী প্রধান-মন্ত্রী গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন। কিন্তু ওই বিশ্বাসই সার, নির্ধারিত সময়ে যখন স্মিথের জবাব এলো তখন দেখা গেলো যে, বিদ্রোহী তাঁর ঝাণ্ডা এক ইঞ্চিও অবনমন করেন নি, বরং তিনি ঘৃণাভরে মিঃ উইলসনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন এই বলে যে, ওই প্রস্তাব গ্রহণ করার অর্থ বৃটেনের কাছে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করা—যা রোডেশিয়া কখনই করবে না।

মিঃ উইলসন বিশ্ববাসীকে শুনিয়ে দিয়েছিলেন যে, যদি মিঃ স্মিথ বৃটিশ প্রস্তাব মানতে আপত্তি করেন তবে, তাঁর কপালে চরম দুর্ভোগ নেমে আসবে, ফল খুবই খারাপ হবে। কিন্তু খারাপটা কি? বৃটেন রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন দাবি করে আবেদন জানিয়েছে যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘ যেন রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ করে। স্বভাবতই এ-নিরিমিষ পন্থায় ক্ষুণ্ণ হলো আফ্রিকা-এশিয়ার রাষ্ট্রগুলি যারা বৃটেনের কাছে কঠোর কোন নীতি আশা করেছিল। এ-দেশগুলি আরো আরো ক্ষুব্ধ হয়েছে, এজন্য যে বৃটেন একদিন শক্তি-প্রয়োগ করে রোডেশিয়ার বেয়াড়াপনা সারাবে বলে শাসিয়েছিল।

অর্থনৈতিক অবরোধ নিতান্ত নিরিমিষ এক ব্যবস্থা বলা হচ্ছে এ কারণে যে বৃটেন যে ধরণের অবরোধের কথা বলেছে তাতে সাপ তো মরবেই না, বরং লাঠিটারই দুর্গতি হবে। কারণ অবরোধ করতে গিয়ে রোডেশিয়া যাতে বিপদে না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখার আবেদন

হ্যারল্ড উইলসন

জানিয়েছে বৃটেন। অর্থাৎ কোন কোন জিনিস রোডেশিয়ায় পাঠানো চলবে না, তার একটা লিস্টি দিয়েছে বৃটেন এবং সে-লিস্টির মধ্যে প্রথমেই রয়েছে পেট্রল। অথচ রোডেশিয়াকে যদি কাবু করতেই হয় তবে প্রথমেই তাকে পেট্রল সরবরাহ বন্ধ করা দরকার। বৃটেনের বক্তব্য ঃ অবরোধ মানে রোডেশিয়াকে বিপদে ফেলা নয়। দোকানদারের জাত ইংরেজ, ব্যবসাটা সে বোঝে ভালো। কাজেই দক্ষিণ আফ্রিকা বা রোডেশিয়ায় তার ব্যবসার ক্ষতি হোক—এটা সে মনে-প্রাণে চায় না। সেই জন্যেই সে নিরাপত্তা পরিষদকে সজাগ থাকতে বলেছে যাতে অবরোধ করতে গিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে তার বাণিজ্যসম্পর্ক ব্যাহত না হয়। কেবল অনুরোধ নয়, এ-উদ্দেশ্য সাধনে বৃটেন হুমকী দিতেও ছাড়ে নি, বলেছে যে, যদি অবরোধ ব্যবস্থা তার মনোমত না হয়, তবে নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তকে সে ভেটো দিয়ে অচল করে দেবে।

বৃটেনের হাজারো হুমকী চোখ-রাঙানীকে অগ্রাহ্য করে মিঃ স্মিথ রোডেশিয়াকে একতরফাভাবে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেছিলেন। রোডেশিয়ায় সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গদের অবাধ রাজত্ব, সংখ্যাগুরু কৃষ্ণাঙ্গ এখানে অস্পৃশ্য-অশুচি। এমন বিচিত্র সংবিধান এখানে চাপানো হয়েছে, যাতে কৃষ্ণাঙ্গদের ভোটাধিকারের বিধান নেই, বিরোধী দলের কার্যত অস্তিত্ব অস্বীকৃত। বিরোধী নেতারা কারাগারে নিক্ষিপ্ত, সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলন স্তব্ধ। বৃটেন তখন মিঃ স্মিথকে সংখ্যাগুরু কৃষ্ণাঙ্গদের দাবি অনুযায়ী এ-সংবিধান বর্জনের জন্যে, শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ নির্বিশেষে one man one vote বা প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার দাবি করেছিল। কিন্তু দেখা গেল মিঃ স্মিথ বৃটেনকে

চিনতে ভুল করে নি, বৃটিশ সিংহের বপুখানাই যা, আসলে সেটি নখদন্তহীন পাথর-প্রতিমা! তা নইলে একতরফাভাবে স্বাধীনতা সে কী করে ঘোষণা করে, বৃটেনের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ঘুচিয়ে রিপাব্লিক-এর পথে এগুবার সাহস পায় কী করে?

অর্থনৈতিক অবরোধ নেবার হুমকীকেও তাচ্ছিল্য করেছেন মিঃ স্মিথ, বলেছেন, তা যদি বৃটেন সত্যি করে তবে, সে কাজের দ্বারা স্বাধীন রোডেশিয়াকেই কার্যত স্বীকার করে নেবে এবং তখন নিজেকে রিপাবলিক ঘোষণা করার পথেও রোডেশিয়ার একটা বিরাট বাধা আপনি সরে যাবে। মিঃ স্মিথ রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাছে রোডেশিয়ার পক্ষ সমর্থন করার জন্যেও একজন প্রতিনিধি গ্রহণের আবেদন জানাবেন—অর্থাৎ যেহেতু সে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য নয় সেহেতু বৃটেনের দৌলতে তখন সে প্রায় আধা-সদস্যের মর্যাদা লাভ করবে।

বৃটেনের এ-ধরণের দায়িত্ব এড়ানোর নীতিকে এশিয়া-আফ্রিকার কোনো দেশই সমর্থন করতে পারে নি—একমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকা ফেডারেশন ও পর্তুগীজ অ্যাঙ্গোলা ছাড়া রোডেশিয়ার সুহৃদ আর কেউ নেই। কিন্তু শত্রুর মুখোস পরে বৃটেন নিজে যে তার প্রতি দরাজ-দিল এ-তথ্য আর কারো কাছে গোপন রইলো না। আফ্রিকা-এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির পক্ষ থেকে বৃটেনের এই সীমাবদ্ধ অর্থনৈতিক অবরোধ নীতির তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে। ভারতের পক্ষ থেকে পররাষ্ট্র-মন্ত্রী শ্রী এম সি চাগলাও বলেছেন যে, শক্তিপ্রয়োগ ছাড়া মিঃ স্মিথকে কাবু করা যাবে না। কিন্তু বৃটেন কি সে-ঝুঁকি নেবে—ব্যবসা হারানোর ঝুঁকি? তা যদি না নেয় তবে, অন্তত কমনওয়েলথভুক্ত, জোট-নিরপেক্ষ এবং প্রগতিশীল রাষ্ট্র যদি একজোট হয়ে দরকার হলে বৃটেনকে বাদ দিয়ে রোডেশিয়াকে কোণঠাসা করে, তবে তার ফল কি খারাপ হবে? রোডেশিয়ার ৪০ লক্ষ বঞ্চিত কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রো-এশিয়ার কাছে এটাই প্রত্যাশা করে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ:

দশটি কমিউনিস্ট রাষ্ট্র ও চারটি জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদের সম্মুখে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে। এই প্রস্তাবের বক্তব্য: ছয় মাসের মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া থেকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সকল সৈন্য সরিয়ে আনতে হবে। দক্ষিণ কোরিয়ায় বর্তমানে রাষ্ট্রসঙ্ঘের পক্ষ থেকে কয়েক সহস্র মার্কিন সৈন্য আছে—অন্য কয়েকটি দেশের সৈন্যও আছে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন, বাইলোরাশিয়া, ইউক্রেন, বুলগারিয়া, কিউবা, চেকোস্লোভিয়া, হাঙ্গেরী, মঙ্গোলিয়া, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া এবং কম্বোডিয়া, কঙ্গো (ব্রাজাভিল), মালি ও সিরিয়া এই প্রস্তাবের উত্থাপক।

দক্ষিণ কোরিয়া থেকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সৈন্য অপসারণের দাবি জানানো ছাড়াও, প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছে, ভবিষ্যতে কখনও আর কোরিয়ার বিষয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘে আলোচনা করা চলবে না। কোরিয়া ঐক্যসাধনের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের কমিটির বিলোপসাধন করতে হবে। ১৯৫০ সালে কোরিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করলে পরিষদ অন্যায় কাজ করেছে, প্রস্তাবে এই অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে।

১৯৫০ সালে উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করলে রাষ্ট্রসঙ্ঘ হস্তক্ষেপ করে। এই বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে কোন মতৈক্য হয় নি—সোভিয়েট ইউনিয়ন রাষ্ট্রসঙ্ঘের হস্তক্ষেপ ও সৈন্য প্রেরণের তীব্র বিরোধিতা করে। তখন সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

কোরিয়ার যুদ্ধ থেমেছে, কিন্তু কোরিয়া সমস্যার সমাধান হয় নি। কোরিয়া বিভক্ত। কোরিয়ার ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘ দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, কিন্তু এ বিষয়ে কোন অগ্রগতি হয় নি।

আজ তাই সোভিয়েট ইউনিয়নের উদ্যোগে বলা হচ্ছে, কোরিয়া থেকে রাষ্ট্রসঙ্ঘকে হাত গোটাতে হবে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের নামে সেখানে মার্কিন সৈন্য থাকার ফলে জাতীয় রাজনীতিতে বৈদেশিক হস্তক্ষেপ হচ্ছে। এর অবসান চাই।

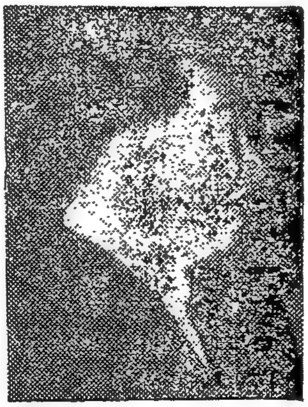

নরোদম সিহানুক

কম্বোডিয়া:

অক্টোবর মাসে সাধারণ নির্বাচনের পর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লন্ নোল নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু এক মাস যেতে না যেতেই মন্ত্রিসভার অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কারণ, কম্বোডিয়ার একমাত্র রাজনৈতিক দল 'সাংকুম' সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, মন্ত্রিসভা বহির্ভূত সদস্যদের মধ্য থেকে একটি কমিটি গঠন করা হবে, যা 'পাল্টা সরকারের' মত কাজ করবে। অথচ এই 'সাংকুমের' সদস্যদের ভোটেই লন্ নোল প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন।

প্রস্তাবিত 'পাল্টা সরকার' সরকারের সকল কাজের সমালোচনা করবে, এবং সরকারের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে।

প্রশ্ন উঠেছে, কম্বোডিয়ার একচ্ছত্র নায়ক প্রিন্স নরোদম সিহানুক কি তাহলে লন্ নোলকে সমর্থন করছেন না? তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা, লন্ নোলকে সরাবার জন্য নয়, গণতন্ত্রের প্রসারের জন্যই সিহানুক এই ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন।

গণতন্ত্র প্রসারের জন্য সিহানুক কিছুদিন ধরেই চেষ্টা করছেন। এবারের নির্বাচনে 'সাংকুম' দল কাউকে মনোনয়ন দেয় নি। সকলেই ইচ্ছামত দাঁড়াতে পেরেছেন। বহু কেন্দ্রে 'সাংকুমে'র দু' তিন জন পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রী বাছাই-এর ব্যাপারেও 'সাংকুম' কোন নির্দেশ দেয় নি। সিহানুক নিজেও কাউকেও সমর্থন করেন নি। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নরোদম কান্তন, বিশিষ্ট কূটনীতিক সিম ভার ও লন্ নোলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এবং লন্ নোল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেন। মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারেও সিহানুক কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন নি। নতুন মন্ত্রিসভার নীতি আগের চেয়ে অনেক নরম হবে বলে মনে হয়। কমিউনিস্ট প্রভাবও সম্ভবত হ্রাস পাবে। বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা চৌ সেনের মন্ত্রিসভা থেকে বিদায় গ্রহণ তারই প্রমাণ।

সিহানুকের বক্তব্য, কম্বোডিয়ার মত একদলীয় শাসনের দেশে দলের ভেতরেই সরকারের সমালোচনার জন্য পাল্টা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যেই 'পাল্টা সরকার' গঠন করা হয়েছে। তাছাড়া রয়েছে, 'পিপলস কংগ্রেস' বা গণসম্মেলন। গণসম্মেলনের অধিবেশনে যে-কোন নাগরিক উপস্থিত হয়ে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারে।

অমৃতসমান

।। বেদব্যাস ।।

রাইটার্স বিল্ডিংস-এর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ভারি মজার।

ছেলেবেলায় যখন প্রথম কলকাতা আসি তখন রবিবারের ছুটির দিনগুলিতে আমার এক মাতুল আমাকে শহরের দর্শনীয় বস্তুগুলি দেখিয়ে বেড়াতেন। তেমনি এক রবিবার এক পেল্লায় লাল বাড়ির সামনে নিয়ে গিয়ে মামা আমায় বলেছিলেন ঃ 'পেন্নাম কর বাসু, এই হলো রাজ-সিংহাসন।' শুনে আমি কেমন একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলাম, মনে আছে। তবু সাহস করে শুধিয়েছিলাম ঃ 'এটা কি থানা নাকি মামা, এত পুলিশ কেন গেটে?'

—'থানা কেন হতে যাবে রে স্টুপিড, এটা হলো গিয়ে বৃটিশ গভমেন্টের প্রাণ ।....হুঁ হুঁ, যে-সে এখানে কাজ করতে পারে না, দেশের সেরা ছাত্ররাই এখানে চাকরী পায়...সাহেবরা একেবারে ছেঁকে ক্ষীরটুকু নেয় কি না...তা তুই তো নাকি ক্লাসের ফার্স্ট বয়, ফাইন্যালে সে-রকম ভালো রেজাল্ট করতে পারলে জামাইবাবুকে বলে আমি তোকে এখানেই...'

রাইটার্সে কাজ আমি পাই নি, বোধ হয় পরীক্ষায় সে-রকম ভালো রেজাল্ট করতে পারি নি বলেই। কিন্তু আজ রাইটার্স দেখে মনে হলো ৩৫ বছর আগেই আমি রাইটার্স-এর আসল চরিত্র চিনে নিয়েছিলাম; থানা ছাড়া আর কি ওটি!

সেক্রেটারীমশাই সেদিন তাঁর ডিপার্টমেন্টের বড়বাবুকে ডেকে বলছিলেনঃ 'দেখুন মশাই, দেশে এখনো গভমেন্ট আছে, একেবারে মগের মুল্লুক হয়ে যায় নি বাংলাদেশ, বুঝলেন......'

—তা তো দেখতেই পাচ্ছি স্যর, মগের মুল্লুক...কিন্তু আমি বুঝে কী করবো, করছে তো ওই ইউ-ডি, এল-ডি, মানে ননগেজেটেডরাই...

—হ্যা হ্যা, ওদের কথাই বলছি। এই নিন, পড়ুন সার্কুলার, দেবেন ওই প্রভুদের। বলবেন, এখানে মানে কোনো সরকারী অফিসে মিটিং-ফিটিং চলবে না... চাকরীটি যাবে...জেল হয়ে যাবে...

সেদিন জয়েন্ট সেক্রেটারী মিঃ কাঞ্জিলাল সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়েই থমকে দাঁড়ালেন। দেয়ালের দিকে তাকিয়েই—'এ্যা, আবার দিয়েছে' বলে এমনি ভঙ্গী করলেন যেন ও'র দামী স্যুটে কেউ থুতু ছিটিয়ে দিয়েছে। তারপর বেয়ারা ডেকে, নিচের প্রোটেকশন পুলিশকে খবর দিয়ে এক এক করে পোস্টারগুলি সব দেয়াল থেকে টেনে নামালেন।

বড়বাবুকে কালো ব্যাজ পরাতে গিয়েছিল সুনীল, পরেশ, কেষ্ট চক্কোত্তিরা। তাই দেখে তো গৌরবাবু এমন আঁৎকে উঠলেন যে মনে হলো যেন উনি দিন-দুপুরে ভূত দেখছেন। 'মাপ করো ভাই, কী লেখা আছে দেখি ব্যাজে... আপত্তিকর কিছু থাকা চলবে না কিন্তু ...কি আমরা ক্ষুধার্ত?...না, তাও চলবে না ব্রাদার, ক্ষুধার্ত তোমরা নও এ্যাকরডিং টু গভমেন্ট রুলস্ তোমরা...কি, কিছু লেখা নেই...ব্ল্যাংক...ওরে বাবা সে তো আরো ভয়ানক কথা...বলার চেয়ে না-বলার বিপদ আরো বেশি জানো না......

যতই সার্কুলার জারী করুন, ডেপুটি সেক্রেটারী কিন্তু ভরসা করতে পারেন নি, গণছুটির দিন তিনি অফিসে এসে এক গেলাস জল খেতে পান নি বেয়ারা-চাপরাশির অভাবে। সেদিনও তাঁর ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীরা এসে ধরলেন ...তাঁর ভাষায়, ঘেরাও করলো তখন তিনি না ঘাবড়ে পারেন নি, কিন্তু অতি চতুর ব্যক্তি বলে চামড়া বাঁচাতে পেরেছিলেন। অধীর এসে বলেছিলো ঃ স্যর পারমিশন দিন, মিটিং করবো—

—তা হ্যাঁ, দেবো বৈকি...নিশ্চয়ই... কিন্তু কোথায় করবেন...এখানে মানে কোনো খোলা জায়গায় বা হলে তো মিটিং করা যাবে না ভাই, চীফ সেক্রেটারী বলে দিয়েছেন.....

—আমরা মানি নে সে-সার্কুলার... ক্যান্টিনে মিটিং করবো...

—কিন্তু ক্যান্টিনও তো একটা হল্......

—মোটেই না, ওটা ইটিং প্লেস, খোলা নয়, চার দেয়ালে মোড়া......

কী মারটাই না পুলিশ মারলো ছোকরাটিকে ধরে। বয়সে তরুণ এক কর্মচারী করিডর দিয়ে যেতে যেতে চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'ইনকিলাব-জিন্দাবাদ' বলে, আর সঙ্গে সঙ্গে এক পালোয়ান-গোছের পুলিশ গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো তার ওপর। তারপর সুরু হলো কিল, ঘুষি আর লাথি। দেখে মনে পড়ে গেলো আবার পুরোনো দিনের কথা। ঠিক এমনি করে এক এ্যাংলো পুলিশ সার্জেন্টকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখেছিলাম একটা স্কুল ছাত্রের ওপর।

—উল্লু, কাঁহাকা, বোণ্ডে মাটরম বোল না মানা হ্যায় না......

ছেলেটি পিঠে গুঁতো খেয়ে বলেছিলো 'গান্ধীজিকি জয়...' আর সঙ্গে সঙ্গে তার চুলের মুঠি ধরে সাহেব বলেছিলোঃ গাঁটি টোমার পিটা আছে...

ছেলেটি ক'কাতে ক'কাতে জবাব দিয়েছিলো, 'আমার পিতা নয় সাহেব, জাতির পিতা, স্বাধীনতা সংগ্রামের..'

'চোপরও' বলে ছেলেটির টুঁটি চেপে ধরেছিলো সার্জেন্টটি তখন।

কর্মচারীরা প্রতিবাদ জানাতে গিয়েছিল পুলিশের কাজের বিরুদ্ধে। শুনে সেক্রেটারী মশাই অ্যাশট্রেতে আধ-পোড়া সিগারেটটা গুজতে গুজতে বললেন ঃ কি দরকার মশাই ওসব শ্লোগান দিয়ে, গভমেন্ট যখন আপত্তি করছেন...'

—আমরা কি নিজেদের বাঁচার কথা বলতে পারবো না?

—নাই বা বললেন...মানে...অন্যভাবেও তো সেকথা এক্সপ্রেস করতে পারেন... মানে এই ধরুন...'

—রিতা ফারিয়া জিন্দাবাদ বললে তো আর আমাদের ডি-এ বাড়াবেন না বা সাসপেনসন 'অর্ডার উইথড্র করবেন না...

চিত্রাঙ্কন শিখিবার বই
কে আর্টস ড্রইং বুক
বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত
অঞ্জেলো পাবলিশার্স

প্রেম

মনোরমা সিংহরায়

এ হৃদয় বীতরাগ হয় নি এখনো। এই কথা
মনে করে হাজার বছর ধরে পথ হেঁটে হেঁটে
তুমি এসে দাঁড়ালে এখানে। আজ যদি তোমাকেই
করি অভিযোগ, কী বলার আছে যদি বলি, তুমি
কেন এতোদিন প্রতীক্ষায় রেখে শুধু বসন্তের
দিনগুলি শেষ করে দিলে ব্যর্থতায়. এতোদিন
পরে এ হৃদয় বীতরাগ হবে না এখনো, এই
আশা কে দিলো তোমায়! জানি তুমি বলবে না কিছু।
শান্ত হেসে একবার তাকাবে শুধুই। আর আমি
নতমুখে ফিরে যাবো আপন অন্দরে॥

-রিতা ফারিয়া...আঃ দ্যাটস ফাইন ...সি ইজ এ বি...আই মীন...ভেরি ইনটেলিজেন্ট, নাকি বলেন মিঃ চৌধুরী ...বলে তাঁর পি-এ'র সমর্থন আদায় করতে চান সেক্রেটারী সাহেব।

—তা তো বটেই, নইলে আর আমেরিকান ট্রুপসদের সঙ্গে ট্যুইস্ট নাচতে যাচ্ছে কেন...

—ট্যুইস্ট...তা মশাই যাই বলেন আমি অনেক নাচ দেখেছি কিন্তু ট্যুইস্টের মতো অমন থ্রিলিং এ্যান্ড...

কর্মচারীদের তখন বুঝতে বাকী রইলো না যে ধানাই-পানাই করে সেক্রেটারী মূল বিষয়টি ঘুলিয়ে দিতে চান। কর্মচারীরাও তখন তাদের নতুন দাওয়াই প্রয়োগ করলো, ঘেরাও করে পুলিশের হাত থেকে বন্দী চারজন সহকর্মীকে ছিনিয়ে নিলো, তাঁদের কাঁধে করে ট্যুইস্ট নাচলো!

—'মশাই, অত তড়পাবেন না, মনে করবেন না গভমেন্ট বসে বসে ঘাস খাচ্ছে ...' ফিনান্সের অবনীবাবু হেলথ ডিপার্টমেন্টের কিশোরীবাবুকে বলছিলেন, এবে তো পুলিশ ব্যারাক হতে দেখেছেন, এবার মিলিটারী ব্যারাকস হবে রাইটার্স এই বলে দিলাম...দেখে নেবেন...

সারা অফিস থমথম করছে পরের দিন। সেক্রেটারী-ডেপুটি সেক্রেটারীরা ব্যস্ত...হেড এ্যাসিস্ট্যান্টরা নামের লিস্ট দিতে পারছেন না...মিটিঙে যারা ছিল তাদের কাউকে নাকি তাঁরা চেনেন না... মামদোবাজী আর কি...

—'তবে কি ওরা' সব বাইরের লোক বলতে চান...'

—কি করে বলবো, দেখি নি তো কখনো আগে...

—তা দেখবেন কেন...পঞ্চান্ন বছর ধরে দেখেছেন তো কেবল বৌয়ের মুখটি ...সেক্রেটারী সাহেব মুখের প্রতীক হিসেবে দুহাতের চেটো জোড়া করেন।

সেদিক দিয়ে কাশীনাথবাবুকে লয়্যাল বলতে হবে, কেমন টাইপ করে সুন্দর ঝকঝকে এক লিস্ট পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু মিঃ সেন যখন এক এক করে ডাকালেন কৈফিয়ৎ চাইবার জন্যে তখন বিশেষ কারুর সাড়া পাওয়া গেলো না। বাধ্য হয়ে 'উল্টে সেক্রেটারী সাহেবই গেলেন ডিপার্টমেন্টে। সামনেই পেয়েছিলেন হরিহর দত্তকে। 'আরে মশাই, আপনি গণছুটির দিন অফিসে এসে সব্বাইকে তাজ্জব করে দিয়েছিলেন, আর আজ কিনা বে-আইনী মিটিঙে বক্তিমে দিয়ে ফেললেন—

—কী করবো স্যর, আপনারা বলেছিলেন গণছুটির দিন অফিসে হাজিরা দিলে সুপারসীড করতে দেবেন, তা তো আর করেন নিকো—

—হুঁ...তাহলে আপনি বুঝে-শুনেই ডিসিপ্লিন ব্রেক করেছেন, না কি বলেন...

দেখলাম অতীন, শ্যামল, সুধীর চাটুজ্যে—এরা কেউ ঘাবড়ায় নি সাসপেন্ড অর্ডার, চার্জশীট কিম্বা শো কজ নোটিশ পেয়ে, 'বাঞ্ছিত বস্তুটি পেয়েছি' সকলের ভাবখানা যেন তাই।

—এ আর কী দেখছেন, এ তো মোটে চৌষট্টি জন...সেদিন আসছে যেদিন গভমেন্টকে তার দু'লাখ কর্মচারী সাসপেন্ড করতে হবে...

—সেকি মশাই, তাহলে গভমেন্ট চলবে কী করে?—বলেছিলাম প্রেস কনফারেন্সে।

—চলবে না, বুঝতেই পারছেন...

ইমোশন না এ্যাডভেঞ্চারিজম বুঝলাম না...কিন্তু মুখে-চোখে তাদের দৃঢ়তার ছাপ আমার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারে নি।

—আপনারা জেনে রাখুন, ওই চার জনকে যেমন করে আমরা ছিনিয়ে এনেছি, পুলিশকে নাকে খৎ দিইয়ে রাইটার্সে রেকর্ড করেছি. তেমনি সাসপেন্সন অর্ডারও উইথড্র করিয়ে ছাড়বো...

এ-ধরণের কথা অবশ্যি বলতে হয় নেতাদের, নইলে র‍্যাঙ্ক এ্যান্ড ফাইলের ম্যোরেল থাকে না, মনোবল ভেঙে যায়। কিন্তু রথীন সরকার সেদিন যা বললো তাতে সত্যি ভাবিত হলাম। রথীন আর তার দুই বন্ধু তাদের সেক্রেটারীর কাছে গিয়েছিল এক সভায় তাঁকে প্রধান অতিথি করার প্রস্তাব নিয়ে। শুনে নাকি সেক্রেটারী মহোদয় প্রথমে গদগদ হলেন, তারপর চেয়ারে বসিয়ে চা খাইয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন : কিসের মিটিং ভাই আপনাদের, কোনো পলিটিক্যাল মিটিং নয় তো?

—না, স্যর, আমাদের ক্লাবের এ্যানুয়াল ফাংশন, এই আপনার কালচারাল প্রোগ্রাম—

—কালচারাল...তা বেশ...আমিও মশাই আপনাদের বয়সে এসব মেলা করেছি... কাগজে আমার লেখা ছাপাও হয়েছে বিস্তর...বিলেতের ইন্ডিয়া লীগেও আমার ইম্পরট্যান্ট রোল ছিল, আপনারা হয়তো জানেন না—সে যাক, তা কি প্রোগ্রাম আপনাদের, শুনি

—প্রথমে স্যর রবীন্দ্রসঙ্গীত তারপরে—

—রবীন্দ্রসঙ্গীত! সেক্রেটারী মশাই কেন জানি না উত্তেজিত হয়ে উঠলেন... কেন মশাই আপনারা আর লোক পেলেন না, ওই দাড়িয়ালা ছাড়া দেশে...কেন জানি নে মশাই ওই লোকটিকে আমি মোটেই স্ট্যান্ড করতে পারি নে...সমস্ত সিডিশাস গান ওঁর...উঃ বৃটিশ এটা যা একটা কাঁচা কাজ করে গেছে এই পেরেন্নিয়াল রেবেলটাকে প্রডিউস করে...

—কী বলছেন স্যর—

—ঠিকই বলছি ভাই, আপনারা এখনো ইয়ং, রক্ত সব সময় টগবগ করছে তাই বুঝতে পারছেন না কাকে মাথায় করে নাচছেন...কিন্তু আমি এই বলে দিচ্ছি গান্ধী জওহরলাল পলিটিক্যাল ফিল্ডে যা কখনো পারেন নি, রবি ঠাকুর সেই বিপ্লবের বীজটি পুঁতে দিয়ে গিয়েছেন...আর ব্রিটিশার্সরা এতই অপরিণামদর্শী যে সেই ট্রাবলশুটারকেই দিয়েছে নোবেল প্রাইজ, নাইট্‌হুড...হুঁ—

শুনে কী মন্তব্য করবো ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলাম না, খেই ধরিয়ে দিলো গৌতম বিশ্বাস। ধীরে ধীরে সিগারেটের জ্বলন্ত ডগা থেকে তর্জনী দিয়ে ছাই সরাতে সরাতে গৌতম বলছিলো : এর রেজাল্ট কী হবে জানেন বেদব্যাসবাবু? ভয়ংকর দিন আসছে...মনে করুন আজ সভা বন্ধ, কাল মুখ বন্ধ হবে...আজ অফিসে ঢুকতে আইডেনটিটি কার্ড লাগছে, কাল এ-ডিপার্টমেন্ট থেকে ও-ডিপার্টমেন্টে যেতেও লাগবে... এডুকেশনের লোক ফিনান্সের লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারবে না...স্বাভাবিক পথ না পেলে ফোঁড়া অস্বাভাবিকভাবেই ফাটে...ইসারায় কথা বলবে তখন...মানে আন্ডারগ্রাউন্ড মুভমেন্ট...পুলিশী নির্যাতনের চূড়ান্ত হবে ...ফ্যাসিজম বলতে পারেন...আর ফ্যাসিজমের ইতিহাস. তার পরিণাম আপনার জানাই তো আছে বাসুবাবু...

গ্রন্থমেলা

বাউল রাজা—রণজিৎকুমার সেন। মোহন লাইব্রেরী; ৩৫এ, মির্জাপুর স্ট্রীট, কলিঃ-৯ মূল্য ঃ সাড়ে তিন টাকা।

এতোদিন যাঁর গান বাংলা সাহিত্যের ও সংগীতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল—তাঁর জীবনকথা উপন্যাসের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন ঔপন্যাসিক রণজিৎকুমার সেন। বাউল রাজা হচ্ছেন লালন ফকির। রণজিৎকুমার সেন বহু তথ্যানুসন্ধান, স্থানীয় জনশ্রুতি ও অনেক বাউলের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করার পর লালনকে নিয়ে রচনা করেছেন উপন্যাস। বলা বাহুল্য, উপন্যাস পুরোপুরি বাস্তবানুগ হবার দায়িত্ব গ্রহণ করে না, দ্বিতীয়ত মনের মানুষের খোঁজে যাঁরা বাউল—তাঁদের জীবনচর্চা সাধারণ মানুষের কাছে সব সময় সম্পূর্ণ জ্ঞাত নয়, তৃতীয়ত এদেশে গুণীদের আদর যদি তেমন থাকতো, তাহলে মৃত্যুর আগেও লালনকে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে বের হতে হতো না; সুতরাং এই সব অনাদৃত জীবনের কথা পরে জনসাধারণের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করলেও সমসাময়িক সমাজে তুচ্ছ। সুতরাং এই সব বিচার করার পরও বলবো, শ্রীসেন লালন ফকিরের জীবনকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন—যে জীবনকথা শুনলে মানুষের আত্মিক উন্নতি হয়, বাংলার নিজস্ব সংগীত-সম্পদ সম্পর্কে ধারণা জন্মে এবং হিন্দু-মুসলমানের মিলন সম্ভব বলে মনে হয়। তবে শ্রীসেনকে আমরা এই বলে ধন্যবাদ জানাবো যে, একশ' ষোল বছর যিনি বেঁচেছিলেন তাঁকে নিয়ে অনেক কিছুই জল্পনা-কল্পনা করাই সম্ভব ছিল। তা থেকে তিনি বিরত হয়েছেন। সেই কারণে উপন্যাসটি সুখপাঠ্য, হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। উপন্যাসটিতে লালনের জীবনকাহিনী দুটি পর্বে বিভক্ত হতে পারতোঃ যেমন প্রথম জীবনে মা পদ্মাবতী, স্ত্রী দয়াকে নিয়ে লালনের সংসার বন্ধন, তারই মধ্যে তাঁর গান রচনার সুরু। তারপর তীর্থে গিয়ে বসন্তে আক্রান্ত হলে লালনকে মৃত ভেবে শুদ্ধ মুখাগ্নি করে ফেলে চলে আসে তাঁর সঙ্গীরা। তারপর সহৃদয়া এক মুসলমান জোলা রমণীর জন্যে সে যাত্রা তিনি প্রাণ পান। তখন সেই সন্তানহীনা জোলা রমণী হয় তাঁর মা, তার স্বামী হয় তাঁর পিতা। এই দুই-জনের আর্তি যেমন সত্যি, হৃদয়ও তেমনি মহৎ। এঁরা নমস্য। পাঠকরা মুগ্ধ হবেন। যা হোক লালনের সঙ্গীরা এসে খবর দিল যে লালন মারা গেছে। এমন সময় একদিন লালন এসে গ্রামে হাজির। কিন্ত গ্রামের লোকের অত্যাচারে জননী ও স্ত্রীকে রেখে বাড়ি ত্যাগ করতে হলো লালনকে এবার। সে হলো সত্যিকারের সাধক বাউল। আখড়ায় এল ভোলা, শীতল, আরো অনেক শিষ্য-শিষ্যা। আর সাকিনা হলো জীবনসঙ্গিনী কিন্তু নামেই জীবনসঙ্গিনী আসলে ভৈরবী, বৈষ্ণবী, ফকিরাণী। এই নারী মহীয়সী, কিন্তু এঁর জীবনবেদনা বড়ই মর্মস্পর্শী।

রণজিৎকুমার সেন গল্পরস ছাড়াও যা দিয়েছেন এই উপন্যাসে তা হচ্ছে ভিন্নধর্মী কয়েকটি গ্রাম্য চরিত্র, প্রায় শত বছরের সমাজ-পরিচয় হিন্দু মুসলিম ঐক্য, তন্ত্র-সাধনার নিগূঢ় পরিচয় ও লালনের মাতৃভক্তি, তাঁর ভালবাসা, তাঁর গীতি। সেই সংগে সিরাজ সাঁই ও কবীন্দ্র রবীন্দ্রের সংগে লালনের ব্যক্তিগত পরিচয়ও উল্লেখ করেছেন। পুনরায় জানাই লালন জন্মেছেন ১৭৭৪-এ—যে সালে জন্মেছিলেন রামমোহন। আর লালনের জীবনকাহিনী শুনলাম ১৯৬৬-এ। এই ধরণের উপন্যাসকে চলচ্চিত্রে রূপ দেওয়া সম্ভব হলে জনসাধারণ উপকৃত হবেন।

সেবিকা নিবেদিতা (নাটক)—অমল সরকার। জ্ঞান ভবন। ১৮সি, টেমার লেন। কলিকাতা-৯। দাম—দুই টাকা।

রাজা রামমোহন থেকে উনবিংশ শতাব্দীর যে সব মনীষী ও সাধক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সেতুবন্ধন প্রচেষ্টা করে এসেছেন—তাঁদের মধ্যে মনীষিণী নিবেদিতার নাম অনন্য মহিমায় সমুজ্জ্বল। তাঁর ভারত পরিক্রমা এবং ইউরোপ পরিক্রমায় কখন অজ্ঞাতসারে বিপরীত দুই কোটির জীবনাদর্শ এক অপূর্ব সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের সম্মুখীন হয়েছে।

নিবেদিতার কর্মময় জীবন যে নাট্যরূপে দেওয়া দুরূহ কাজ। তাঁর জীবনে এত লোক এসেছেন যে, তাঁদের প্রত্যেককে স্থান দিতে গেলে নাটকের ধর্ম-বিচ্যুতি হবে সেটা নিঃসন্দেহ। তাছাড়া নিবেদিতার জীবনে আছে কাজ, আছে বক্তৃতা, আছে সেবা, কিন্তু তাতে নেই কোন নাটকীয় সংঘাত। তাই নাটকটি হয়েছে একঘেয়ে। তবে নিবেদিতার জীবনের যাবতীয় তথ্য এতে রয়েছে। তাই অল্পপরিসরের মধ্যে নিবেদিতার জীবনের সকল তথ্য পাঠকরা এই বইটিতে পাবেন।

নবজীবন বিদ্যাপীঠ—পঙ্কজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—অপরূপা প্রকাশনী। ৫এ অক্ষয় বোস লেন। কলিকাতা-৪।

নবজীবন বিদ্যাপীঠ, পঙ্কজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম গ্রন্থ। আয়তনে হ্রস্ব, কিন্তু একেবারে অভিনব। সাধারণ উপন্যাসের মত প্রেম একেবারে এখানে বর্জিত। আদর্শ শিক্ষকের জীবন কাহিনীকে কেন্দ্র করেই এই গ্রন্থ রচিত।

গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত শিক্ষিত যুবক তাঁর নিজস্ব পরিবেশকে অস্বীকার করে জাতি গঠনের কঠোর দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন। তাঁর পিতা ছিলেন দুর্দান্ত পুলিশ অফিসার। স্বদেশীওয়ালাদের প্রধান শত্রু। কিন্তু পুত্র গান্ধীজীর মন্ত্রশিষ্য। জ্ঞানের আলোয়, সত্যের প্রখর দ্যুতিতে গ্রামের অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও নিরক্ষরতা দূর করতে সচেষ্ট। হর্ষবর্ধনবাবুর মতন শিক্ষক ও দুর্জয় সিংহরায়ের মতন স্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন তাঁর কাজের বাধাস্বরূপ। নবজীবন ছাত্রদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। যাতে তারা মনের বল ও দেহের শক্তি অর্জন করতে পারে এবং মাতৃভূমিকে প্রকৃত ভালবাসতে পারে। তাঁর প্রিয় মেধাবী ছাত্র কমল গান্ধীজীর আহ্বানে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নিজের জীবন করল উৎসর্গীকৃত। নিজেও শেষ পর্যন্ত দেশের জন্য প্রাণ দিল।

এই গ্রন্থটির মধ্যে লেখকের তীক্ষ্ণ মননশক্তি এবং নিপুণ বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় আছে। হর্ষবর্ধনবাবু এবং সিংহরায়ের উদ্ধত ব্যবহার লেখক সংযত লেখনীর দ্বারা পাঠক-সমাজের সমনে তুলে ধরেছেন। কিন্তু গ্রন্থের কাহিনীর মধ্যে লেখক অনেক জায়গায় ঘটনার পারম্পর্য রক্ষা করতে পারেন নি। চক্রশোভিত ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা আমাদের রাষ্ট্রীয় পতাকা। ১৯৪২ আন্দোলনের সময় এই পতাকার অস্তিত্ব ছিল না। তবে লেখকের স্টাইল ঋজু ও ভাষা স্বচ্ছ।

কোমরের গামছাটাকে মাথায় পাগড়ির মত জড়িয়ে ফেলল শম্ভু। এক-চিলতে ছেঁড়া কাপড়ের উপর মোটা দড়ির ফাঁসের মত লাল গামছার ফাঁস সরে যেতে কোমরটাকে নেড়া নেড়া দেখাতে লাগল। সেদিকে চেয়ে কাপড়টাকে টান টান করে কষে আবার বাঁধল সে। তারপর প্রথমে মাথা ক্রমশ কালো পিঠটাকে অশ্বত্থগাছের গুঁড়িতে হেলান খাইয়ে হাতের লাঠিটাকে ঠুকতে ঠুকতে ছড়া কাটল, 'ব্যাঙ পড়েছে ডুবায়, খালি লাফায় ঝাঁপায়'

কিন্তু ছড়া শোনার তখন চেষ্টা নেই পাশের তিনটি কিশোরের। তারা তখন দমকা হাসিতে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ছে। কোমরে থাকা একচিলতে করে কাপড় খুলে খুলে যাচ্ছে। ঘাসের উপর শরীরটা বেঁকে বেঁকে শুয়ে পড়তে চাইছে।

বিমলা তো শুয়েই পড়েছে ঘাসের উপর। হাতের লাঠিটা ছিটকে দূরে সরে গিয়েছে। পটলা কেবল দুলছে হাসির জোয়ারে। মুখে চোখে অবশ্য তার চাপা হাসি। লেটোদলের নাচনী পটলা। ভাবভঙ্গীও তাই মেয়েমানুষের মত। এমন কি চলাফেরা, চোখ-ঘোরানো, হাত দুলিয়ে মাথা দুলিয়ে কথা বলতেও সে মেয়েমানুষকে টেক্কা দেয়। হাসিটা তাই মেয়েমানুষের লজ্জা মেশান হাসির মতই তাকে দুলুচ্ছে। মালি শুধু হাতের লাঠিটাকে ঘাসের উপর বাড়ি মারছে। আর বসে বসেই হাসির চোটে কুঁজো হয়ে যাচ্ছে।

তার মধ্যেই শম্ভু বিরক্তি মেশান সুরে বলল, 'মলো যা। এই ছুকরারা তা অতেক হাসির কি বটেক? আর একট কি বললম শুনলি?' এবার নিজেই হেসে উঠল শম্ভু। বলল, 'ব্যাঙ পড়েছে ডুবায়, খালি লাফায় ঝাঁপায়।'

আঠার বছরের ছোকরা পটলা তার তেল চকচকে লম্বা লম্বা চুলে-ভর্তি মাথাটাকে নাড়া দিয়ে মেয়েমানুষের ঢঙে বলল, 'থাম্মা বাবু, তুর ছড়া কাটা। অ কত যেন বিদোন মানুষ এসেছিস! লারব তুর ছড়া শুনতে!'

'লাচলে পারবি?' শম্ভু দাঁত বেঁকাল।

'হ্যাঁ পারবই তো! দেখবি?' পটলা উঠে দাঁড়াল। রাগ রাগ চোখমুখ নয় বরঞ্চ খুশির চোখ। বেচারা আজ মাঠে নাচতে পারে নি। এদিকে বেলা বাড়ছে কিছুক্ষণ পরই গরুকে ঘরে ঢোকাতে হবে। আর মাঠে থাকবে না। সুতরাং এই সময়টুকুর মধ্যে সে একবার কোমর ঘুরিয়ে নাচটা দেখিয়ে দিতে পারে। আর অশ্বত্থতলায় বসে সে ভেবেও ছিল একবার নাচটা নেচে নেবে। কিন্তু শম্ভু তা হতে দিল না। আরম্ভ করেছিল মজার মজার ছড়া। যে ছড়ায় হাসি পেটের মধ্যে থেকে ভক ভক করে বেরিয়ে আসে।

'নাচ বাঁদরি নাচরে। নাচ বাঁদরি নাচরে।' শম্ভু মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বিদ্রূপ করল। যেন তার ছড়া না শোনার রাগটা মিটিয়ে নিল।

মুহূর্তেই পটলা নাচের কথা ভুলে গেল। ঝাঁপিয়ে পড়ল শম্ভুর উপর। তার-পর গলা চেপে ধরে ফেলল, 'তুর বাড়া বাড় হুন-ছেক।'

'কি হল রে? কি হল রে?' বিমলা হাসি ভুলে ঝগড়ার মধ্যস্থতা করতে এল। তবে ছাড়াল না। পটলার গলা চেপে ধরার দিকে চেয়ে রইল। আর কথায় উদ্বেগ থাকলেও, চোখে খুশি। হে ভগমান ঝগড়াট ভাল করে লাগা!

মালি কিন্তু মুখে কিছু বলল না। পটলাকে শম্ভুর পাশ থেকে সরাল। বলল, 'হুন-ছে কি?'

শম্ভু মাথার পাগড়ি খুলে কোমরে বাঁধল।

পটলা বলল, 'আমাকে বাঁদরি বলেছেক।'

'তা বলে তু মেরে দিবি?'

'মারব না।' পটলা লাল চোখ তুলল। তারপর বিড় বিড় করে এতক্ষণের জমে থাকা অশ্রাব্য গালিগালাজ সুরু করে দিল।

শম্ভু কিছুই বলল না। মালিই বলল, 'হ্যারে পটলা, তুর ত ভারি দিমাক হনছে। মানুষজন মানামানি নাই। উ তুর বাপের বয়সী, উর সঙ্গে ঝগড়া করছিস।'

বাপের বয়সী শুনেই বোধকরি পটলা গালাগালি বন্ধ করল। ঠাণ্ডাও হল। তবু সেই কথার রেশ টেনেই বলল, 'বাপের বয়সী মানুষ হয়ে আমাদের পিছাতে লাগে কেনে? লাজ লাগে না?'

বিমলা এতক্ষণ কথা বলে নি। এবার বলল। বলল, 'তা বাবু ই একট কথার কথা বটেক। বাপের বয়সী মানুষ হয়ে উর লাগা ত' ঠিক লয়।'

মালি শম্ভুকে নিয়ে পড়ল। বলল, 'তুমার লাজ নাই। বুড়ো বয়সে গরু-বাগালি করছ, আবার ছটু ছেলেদের পিছাতে লাগা!'

শম্ভু আর সহ্য করতে পারল না। বলল, 'বুড়ো বয়সে গরুবাগালি করছি ত' তুর কি?'

'অ আবার রাগ দেখ।'

'রাগ হবেক না? আমাকে ঠাঁটা করছিস কেনে? আমার ইচ্ছে তাই গরুবাগালি করি। ইতে তুদের বলার এক্তিয়ার নাই।' শম্ভু অশ্বত্থতলা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর এমনভাবে এগিয়ে গেল দ্রুত পায়ে যে, সে যেন আর এখানে থাকবে না, রেগে ঘরে ফিরে যাচ্ছে।

কিন্তু বেশিদূর এগিয়ে গেল না। অশ্বত্থগাছের বিরাট ছায়াটার প্রান্তে বসে পড়ল। রাগে আগুনের মত গসগস করতে থাকল তার শরীর। মালির কথাটা তার মধ্যে ত্রিশূলের মত বক্ষোদেশ বিদীর্ণ করে যে বের হয়ে গিয়েছে, তাতে রক্তপাত হওয়াও অনুভব করল।

শম্ভুর বুকের ঐটাই বড় দুর্বল জায়গা। কিছুতেই ও বরদাস্ত করতে পারে না ঐ কথাটা। অথচ ওর চেয়ে সত্যি কথা আর নেই। আর বরদাস্ত করুক চাই না নাই করুক মানুষ ঐ সত্যি কথাটাই বলে। কাজের কথাটা উল্লেখ করে বারবার বয়সের খোঁটা দেয়।

আর বৌ? বৌ কি ছেড়ে দেয়? বৌ কি দিনরাত অনুযোগ করে না? করে বৈকি! বৌ কপাল চাপড়ায় ছেঁড়া ময়লা লাল পেড়ে শাড়ির আঁচলে মুখ ঢাকে, কাঁদে, বলে, 'ই কি কপাল গো আমার। মদ্দ মানুষট গরু চড়িন-বেড়ায়। চাষ করে না!'

শম্ভু অবশ্য 'ধুৎ তেরি' বলে বেরিয়ে পড়ে। বৌয়ের কথা শোনে না। তবে সব সময় তো আর বেরিয়ে যাওয়া চলে না। আর বেরিয়ে যাওয়া চলে না বলেই কথা বলতে হয়। পৌরুষ দেখাতে ধমকাতে হয়, বুক ফুলিয়ে বলতে হয়, 'তুর কি খাবার অভাব হচ্ছেক? আঁ!'

'আর খাওয়ার কথা বলবে নাই। যা দিছ, তা বলার লয়।' বৌ ধমকায় না। বরঞ্চ উত্তর পেয়ে রাগ চড়া সুর ধরে।

শম্ভুও দমবার পাত্র নয়। বলে, 'খাবি-দাবি ঘরে থাকবি। অত কথা কিসের তুর?'

'গরুবাগাল।' মুখ বেঁকিয়ে বৌ যেন গাল দেয়।

'বটিই ত'। আমি ত' গরুবাগালই বটি। জানিস কেষ্টঠাকুরও তুদের গরুবাগাল ছিল। মাঠে গরু চড়াতে নিন-যেত।' শম্ভু উদাহরণ তুলে ধরে গালটা যেন প্রশংসায় রূপান্তরিত করতে চায়। আর তারপরও জমিদারবাবুর কথাটা তুলে ধরে। বলে, 'কত্তাবাবু কি বলেছে জানিস? বলেছে, ওহে শম্ভু তুমার লাঠির ঢেক দাম। তুমার লাঠির লেগেই আমার গরুপাল দিন দিন বাড়ছেক। তুমি খাঁটি বাগাল বট।'

'থাক। থাক। ঢেকে রাখ তোমার সুখ্যাতি। শুনে শুনে উই কথাট, আমার কান পচে গেইছে।' বৌ মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

শম্ভু অবশ্য থতমত খায়। কেন না বৌয়ের কথাটা সত্যি। লক্ষবার ইতিমধ্যে তার জমিদারবাবুর ওই কথাটা বৌকে শোনান হয়ে গিয়েছে। যখনই বুকের মধ্যে সুখের ঢেউ উঠেছে, আনন্দ হয়েছে, তখনই ওই কথাটা বলেছে বৌকে। আর তাতে যে বৌ সুখী হয় নি, তা নয়। হয়েছে। জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করেছে, কর্তা-বাবু আর কি কি কথা বলেছে। তাছাড়া শম্ভু জানে রাগের মাথায় ওই কথাটা বৌকে শোনালে রাগ থাকলেও বৌয়ের সুর নরম হয়।

কিন্তু তাহলেও বৌ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সেই সবার কথাতে এসেই দাঁড়ায়। বলে, 'কিন্তুক তুমার ত বাগালি করার বয়েস লয়। তুমি চাষ কর। দখিন-পাড়ার মুখুজ্জেরা বিঘে আন্টেক জমি চাষ করার লেগে বলছিল। উটতেই লেগে যাও।'

শম্ভু তখন অবশ্য চুপ করে থাকে। যেন কথার খেই হারিয়ে ফেলে। বৌকে বোঝাতে পারে না চাষ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে পারবে না। এতটা বয়স হল, সে শুধু গরু চরিয়েই বেড়িয়েছে। চাষ করবে কি করে? অবশ্য মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। চেষ্টা করলে সব হয়। কিন্তু চেষ্টাই যে তার মনে নেই। কিছুতেই যে ইচ্ছে করে না সকালে গরুর পাল নিয়ে মাঠ-ঘাট-প্রান্তর দিয়ে সবুজ সতেজ ঘাসের সন্ধান করতে করতে দুপুর কাটিয়ে বাড়ি ফেরার সেই আনন্দকে বিসর্জন দিতে। কিছুতেই যে ইচ্ছে করে না এ বয়সেও ওই কিশোর-গুলোর সঙ্গে দুপুরে গাছের ছায়ায় বসে লেটোগানের সুর ভাঁজা বন্দ করতে। কিছুতেই যে ইচ্ছে করে না তপ্ত রোদে ভরা দুপুরের নির্জনতায় পাখির শব্দ, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিচিত্র রঙের গরু বাছুরের হাম্বা হাম্বা শব্দকে নীরব করে দিতে।

শম্ভু তাই কান পেতে শুধু শোনে সবার কথা। তারপর নিজের অজান্তেই সেই শোনা কথাকে আবার বাতাসে ভাসিয়ে দেয়।

এখন কিন্তু বাতাসে ভাসিয়ে দিতে পারল না শম্ভু। রাগে পুড়তে থাকা শরীর নিয়ে তার শুধু মনে হল সবার কথাই সে মেনে নিক। ভুলে যাক নিজের আনন্দের কথা, সুখের কথা, গরুকে ঘাস খাইয়ে বেড়ানর কথা। সে চাষ করবে। করবেই।

মালি বলল, 'চুপ করে বসে রইছ যে। গরুকে জল দিখাবে না?'

শম্ভু চোখ তুলল। তারপরই মনে পড়ল আজ তার পালা। আজ পুকুরের ধারে গরুর পালকে নিয়ে যেতে হবে তাকে। বাড়ি নিয়ে যাওয়ার আগে গোয়ালে ঢোকানোর আগে তাকে দাঁড়-করাতে হবে পুকুরের জলের ধারে। কাল বিমলা নিয়ে গিয়েছিল। পরশু নিয়ে গিয়েছিল পটলা।

কিন্তু গরুকে জল খাওয়ানর আজ যে তার পালা তা মনে পড়া সত্ত্বেও, মালির তাকে মনে পড়িয়ে দেওয়া সত্ত্বেও সে উঠে দাঁড়াল না। এমনভাবে চেয়ে রইল যেন এখনও তার রাগ পড়ে নি।

মালি আবার হুঁশ করিয়ে দিল। বলল—'কি হল?'

'আমি জল দিখাতে লারব।'

'আজ যে তুর পালা।'

'নিকুচি করেছে পালার। দেখছি দাঁড়া।' শম্ভু রাগে জ্বলতে জ্বলতে বলতে চাইল। কিন্তু বলল না। বলল, 'সি জানি।'

'তবে?'

'বলছি ত' লারব?' শম্ভু যেন গর্জে উঠল।

'অ, খালি রাগ! আর কুছু নাই।' মালি অন্য দিকে চেয়ে বলল। তারপর দেখল চারদিকের গরুর পালকে। এ সময়

তার পশ্চিমের কোলে মুখ লুকুতে চাওয়া সূর্যকেও চোখে পড়ল। কেমন যেন ফুরিয়ে আসছে তার দীপ্ততা। কিছুক্ষণের মধ্যেই পশ্চিমের কোলে মুখটা গুঁজে দেবে। নাঃ আর সময় নেই। জল দেখিয়েই ঘরের পথ তাদের ধরতে হবে। যত জ্বালা যেন তার। শম্ভু তো ওদিকে রেগে কাঁই। পটলার পালা নয়, তার উপর ঝগড়া করেছে, সুতরাং ও তো যাবে না। আর বিমলা? না, বিমলাকে মালি চেনে। একগুঁয়ে ঝগড়াটে মানুষ বিমলা। এক করতে আর এক করবে। ওকে বললেই এক্ষুণি আবার একটা ঝগড়া বাধিয়ে বসবে। তার চেয়ে ওরা যেমন গরুর পালের মধ্যে লাঠি হাতে চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে আছে, সেই রকমই দাঁড়িয়ে থাকুক। ওদের আর কথা বলে কাজ নেই। সেই-ই যে যাবে।

মালি গজ গজ করতে করতে বলল, 'যত জ্বালা হচ্ছে আমার।' তারপর লাঠি হাতে গরুর পালের দিকে 'হেট হেট' করে পুকুরের পাড়ের উপর তুলতে চাইল।

সন্ধ্যেবেলায় প্রদীপের ম্লান হলদেটে আলোয় ভরে থাকা ঘরের মধ্যে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে বৌয়ের যেন বিশ্বাস হল না মানুষটার মুখ থেকে বের হল ওই কথা। তবু ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম জানাল। মনে বলল, হে ভগমান কথাটি যেন সত্যি হয়। মানুষটার মনটা যেন পালটায়। আহা কতদিনের আমার সাধ গো। কতদিনের সাধ সোয়ামী চাষ করবেক। সে মাঠে যাবেক। ধান পুঁতবেক। ঘরে চাষ করা ধান উঠবেক। হোক গো পরের জমি। কিন্তুক তাথেও কি কম সুখ বটেক!' ভাবতে ভাবতে মনে মনে বলতে বলতে বৌ যেন সেই সুখের শিহরণ অনুভব করল। আবার বলল তাই। বলল—'হ্যাঁ গো, তুমি কি কথা বলছ!'

শম্ভু মাথা নিচু করে ভাত খাচ্ছিল। কথাটা বলে যে স্বস্তি পেয়েছে তা নয়। তবু বলেছে। বলেছে, 'আমি চাষ করব। মুখুজ্জে দিকে বল গা। গরুবাগালি আর করব নাই।' কিন্তু বললেও ক্ষণিকের মধ্যে আবার বাধার প্রাচীর তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আবার মনে হয়েছে সে পারবে না। রাগের জ্বালায় হয়ত এখন তার মনে হচ্ছে পারবে। কিন্তু কাজের সময় দেখবে হাত উঠছে না তার। তাই যেন শম্ভু ভাতের মুঠো তুলে এক মনে খেয়ে চলেছে। অথচ কথাটা বলার উদ্যোগ সে সেই বিকেল থেকে করছে। গরু-ঘরে ঢুকিয়েছে, খেতে দিয়েছে খড়, দরজা বন্ধ করেছে, তারপর পুকুরে চান করে ঘরের পথ ধরেছে। আর সারাটা সময়ই মনের মধ্যে গুঞ্জরিত হয়েছে ওই একটা কথা।

বৌ আবার বলল, 'কথা বলছ না যে গো।'

'বললাম ত'।'

'কি?'

'গরুবাগালি আর করব নাই।'

আহ্লাদে বৌয়ের মন বুক মুখ ভরে উঠলেও সেটা প্রকাশ করল না। কে জানে মানুষটা কখন মত বদলাবে। কখন আবার গররাজি হবে। বলল, 'হ্যাঁ গরু-বাগালি করে কাজ নাই।'

'মুখুজ্জেরা রাখবেক?'

'উদের লুক ঠিক হন-গেইছে।'

'তাহালে?' শম্ভু এবার মুখ তুলল। আঃ দম বন্ধ করা অবস্থা থেকে সে যেন নিষ্কৃতি পেল। যাক বেঁচে গেল। বেঁচে গেল সে। নাঃ গরুবাগালিই ভাল। আহা কত পুণ্যি গো, গরুবাগালিতে তুমরা জানবে নাই। চাষ করতে মানুষ অবলা জীবকে খাটিন-খাটিন মারেক। কিন্তুক গরুবাগাল খাটায় না গো। অবলা জীবকে গরুবাগাল খালি খেতে দেয়। ঘাস খুঁজে খুঁজে মুখে তুলে দেয়।

বৌ বলল, 'সি তুমার ভাবনা নাই। কুমোররা রাখবেক। আমি কালকে গেই-ছিলম যে। শুনে এলম।'

'অ।' মুহূর্তেই যেন নিভে গেল শম্ভু। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'কত্তাবাবু বলত......।'

বৌ বলল—'রাখ তুমার কত্তাবাবুর কথা।'

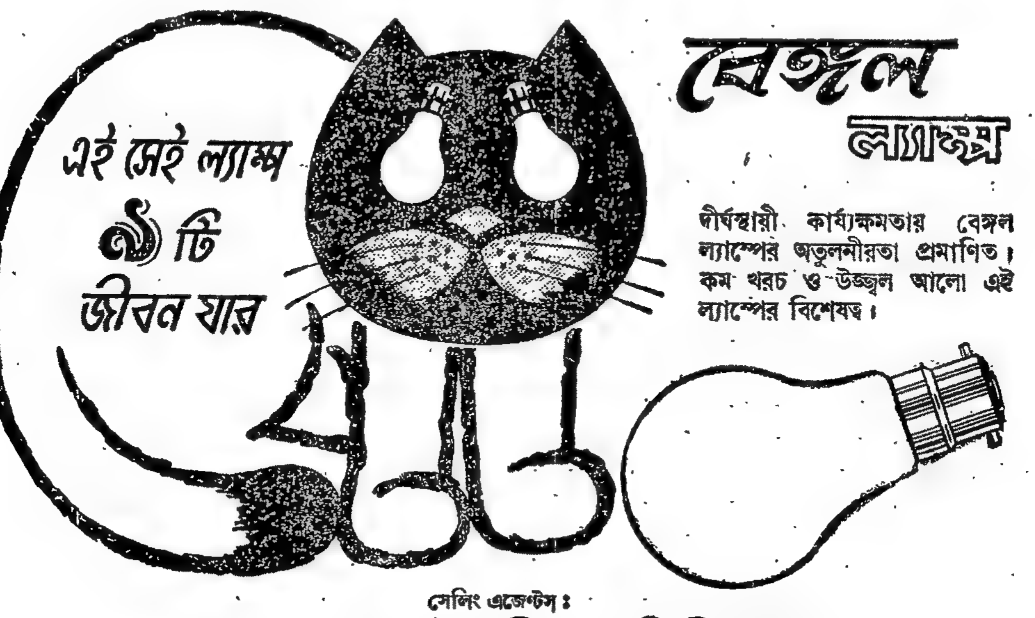

বেঙ্গল ল্যাম্প

দীর্ঘস্থায়ী কার্য্যক্ষমতায় বেঙ্গল ল্যাম্পের অতুলনীয়তা প্রমাণিত। কম খরচ ও উজ্জ্বল আলো এই ল্যাম্পের বিশেষত্ব।

সেলিং এজেন্টস:
বেলরেকস্‌ ইণ্ডিয়া লিমিটেড
কলিকাতা • দিল্লী • আমেদাবাদ
হেড অফিস: ১০, প্রিন্সেপ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

'কিন্তুক বৌ!'

কি?

'তুমি আর কথা বলবে না গো!' বৌ যেন শম্ভুর দুর্বলতাকে অনুভব করেই সুর পাল্টাল। যেন ধমক দিল। যেন মনের সব দ্বিধাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইল। বলল, 'তুমি চাষ করলে আমার বাড়া সুখ হবেক গো। বাড়া সুখ হবেক।'

কিন্তুক বৌ!

কি?

'আমি যে রাখাল!' শম্ভু ভাল মানুষের মত মুখ করল। তারপর রাখালত্ব হারানর বিষাদ মুখে জড়িয়ে বলল, 'কত্তাবাবু বলত......!'

গ্রীষ্মের খরতাপের কাল পার হয়ে আকাশ মেঘ নিয়ে নিজেকে সাজাল। কালবৈশাখীর ঝড়ের সঙ্গে প্রথম বর্ষণ উত্তপ্ত ভূমিকে শীতল করতে আকাশ থেকে ঝরল। মাঠ-ঘাট প্রান্তর গাছ-গাছালি সে বর্ষণে সিক্ত হয়ে যেন শান্তির শ্বাস ফেলল।

আর মাঠে মাঠে নেমে পড়ল কৃষক। লাঙল জুড়ে ভুঁই চষতে সুরু করল। মেঘ রোদ্দুরের খেলার মধ্যে বর্ষণ আর উষ্ণতার ছোট-ছুটির মধ্যে ধানচাষের মরশুম সুরু হয়ে গেল।

না, গরুবাগালি নিয়ে পড়ে রইল না শম্ভু। তাকে ছাড়তেই হল। বৌই ছাড়াল। আশ্চর্য! শম্ভু আর কোন প্রতিবাদ করতে পারল না। সেই ঝগড়ার রেশটা মিটে যাওয়া সত্ত্বেও বাগাল বলে কেউ গালাগালি না দেওয়া সত্ত্বেও কেন জানে না যে তার মন, তার মনের দ্বিধার খেলা, মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়ানর সুখ সব যেন সমর্পণ করে দিল বৌয়ের হাতে। ঘাড় গোজ করে শুধু বলল—'তু ভাল যা বুঝিস—তাই কর বৌ।'

বৌ অবশ্য ভালই করল। কুমোর-ঘরেই শম্ভুকে চাষে লাগাল। বড়লোক ঘর। জমিও বিঘে পঞ্চাশ। আট বিঘের মত জমি শম্ভুর হাতে তারা তুলে দিল। গরু লাঙল সবই দিল। বর্ষার খাওয়ার জন্যে দিল বিঘে দশেক ধান।

ঘরে ধান এনে খুশিতে ডগমগ হয়ে বৌ বলল, 'দেখ দেখ বাগালি করে এতেক ধান তুমি কুনুদিন পেতে?'

শম্ভু কথা বলল না।

বৌ সেই সুখে সেই গর্বে অবশ্য স্বামীর কথা শোনার চেষ্টাও করল না। বলল, 'ই ত' গেল। ইরপর আগুন মাসে যখন ধান উঠবেক, তখুন ভাগ দিবেক।'

শম্ভু শুধু বলল, 'হুঁ।'

তারপর প্রথম বর্ষা নেমে আসতেই তার এল লাঙল দেওয়ার পালা।

বৌ বলল, 'ওগো লক্ষ্মীঠাকুরণকে পেন্নাম করে মাঠে নামবে!'

শম্ভু এবারও বলল, 'হুঁ।'

বৌ বলল, 'আহা চাষের পারা কি কুছুতে সুখ আছে গো? গরুবাগালি ছুটু ছেলেরা করবেক।'

শম্ভু কিসের সুখ ভেব পেল না। বৌয়ের কথা মেনে নিতেই যেন বলল, 'হুঁ।'

ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যেই প্রথম লাঙল চষতে বের হল শম্ভু। এক জোড়া সাদা গরু নিয়ে ধানক্ষেতে এসে দাঁড়াল। আশ্চর্য যেন যন্ত্রের মত সে কাজ করে যাচ্ছে। কেমন যেন অনিচ্ছা তার মনের ভেতর পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। মনে হচ্ছে না তার হাত উঠবে। মনে হচ্ছে না সে লাঙলের বোঁটা ধরে চকচকে ফলাটাকে মাটিতে গেঁথে ঝুর-ঝুরে মাটি তুলতে পারবে।

শম্ভু চুপচাপ দাঁড়াল। গরু দুটো তখন আলের ঘাস খেতে সুরু করে দিয়েছে। আহা! খাক। খাক। শম্ভু ভাবল। মমতা-মাখান দৃষ্টি নিয়ে গরুজোড়াকে দেখল। তারপর আকাশের দিকে তাকাল। সারা আকাশ মেঘে ঢাকা। কে জানে বেলা কত হল। কে জানে সূর্য কোথায় উঠে বসেছে! ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে শম্ভু দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

অকস্মাৎ চমকে উঠল শম্ভু। আশ্চর্য! ওই যে অশ্বত্থতলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে বিমলা। ওই যে কোমরে হাত দিয়ে ঘুরে ঘুরে নাচছে পটলা! আহা বড় সুন্দর নাচে পটলা! যাবে কি শম্ভু ওখানে? গিয়ে কি ও গান ধরবে? পা যেন ছটফট করতে থাকল শম্ভুর। মনে হল এক্ষুণি ছুটে পালিয়ে যায়।

কিন্তু পারল না। কেন না এক পা বাড়াতেই একটা গরু ডেকে উঠল।

শম্ভু বিস্মিত হয়ে দেখল, ঘাস থেকে মুখ তুলে একটা গরু তার দিকে চেয়ে আছে।

শম্ভু দ্রুত গিয়ে লাঙলের বোঁটা ধরল। তারপর গেঁথে দিল ফলাটাকে মাটিতে। ঈষৎ ভেজা ঝুরঝুরে মাটি ফলার গা বেয়ে পড়তে থাকল। আঃ শম্ভু দারুণ উৎসাহে সুরু করে দিল লাঙল-চষা। অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ফলার দিকে, মাটির দিকে। যেন ঐ ফলা ঐ মাটি ছাড়িয়ে সে স্পষ্ট চোখে দেখতে পাচ্ছে সবুজ ধানের গুচ্ছকে। দেখতে পাচ্ছে সবুজ ধানের রঙ বদলানকে। দেখতে পাচ্ছে সোনা রঙের ধানে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে সারাটা মাঠ। আঃ চোখ ঝলসান কি রূপ! আঃ তার নিজের হাতে সৃষ্টি করা কি জীবন্ত এই সোনা সোনা ধান! শম্ভু বিপুল সুখে সেই দিকে চেয়ে থাকল অনিমেষ নেত্রে। যেন তার কৈশোরের সীমারেখা তাকে নির্মম প্রাচীর দিয়ে এতকাল আটকে রেখেছিল। সে সেই সীমারেখা টপকে এসেছে। এক সুখ থেকে এসে দাঁড়িয়েছে অন্য এক বিপুল সুখের দরজায়।

কখন যেন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে বিমলা আর পটলা। সে দেখে নি। পটলার হাসি শুনে চমকে উঠল।

পটলা হাসিতে সারা মুখ ভরিয়ে মেয়েমানুষের ঢঙে বলল, 'ই বাবা সত্যি তুমি যে চাষা হলে গো!'

'হুঁ।'

পটলা মুখে গামছা দিয়ে হাসতে থাকল।

সদ্য কৈশোরের সীমারেখা পার হওয়া, রাখালত্ব থেকে চাষের আনন্দে ডুবে থাকা শম্ভু বয়স্ক মানুষের মত ভারিক্কি চালে বলল, 'যা যা গরু চড়গা তুরা। গরু ছেড়ে ইখানে কেনে? হুঁ! ছেলে-ছুকরারা বাড়া বদমাস হন-ছেক আজকাল।'

তারপর ওদের অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করেই সে গরুর পিঠের উপর চাপড় মেরে বলল, 'হেট। হেট। তাড়াতাড়ি চল। মাটি শেষ করতে হবেক আজকে।'

রোমাঞ্চ-রহস্য গ্রন্থ

রক্তনদীর ধারা

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল

রক্তনদীর ধারা মাসিক বসুমতীর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। রোমান্স ও রোমাঞ্চের সত্য ঘটনায় বইটির আদ্যোপান্ত পরিপূর্ণ। রক্তনদীর ধারা জীবনের অভিজ্ঞতা নয়; জীবনপথের দিক-নির্দেশ। তাই প্রবঞ্চনা, ছলনা ও প্রেমের লীলায় চাঞ্চল্যকর বইটি চাঞ্চল্য তুলেছে সকল সমাজেই।

লোমহর্ষক সামাজিক কাহিনী।

মূল্য ঃ চার টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

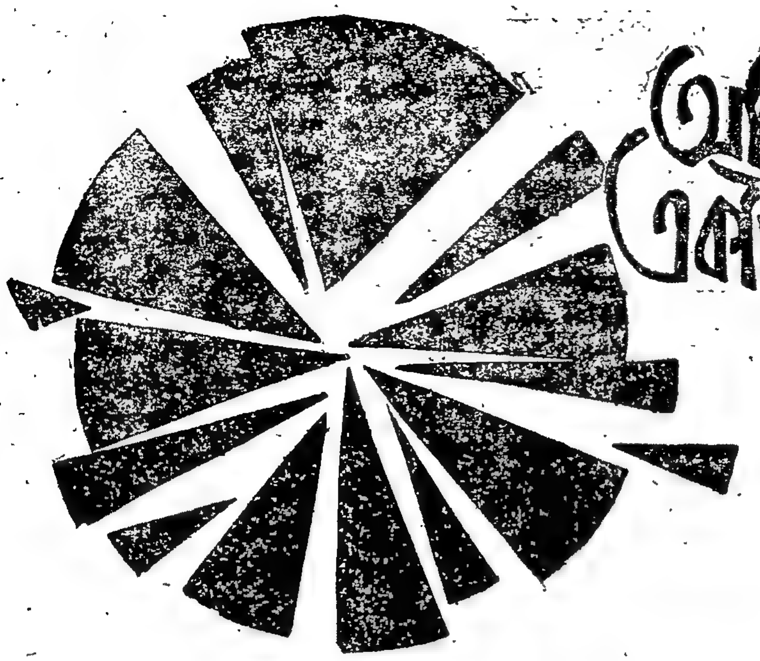

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

বিদ্রোহী রণহুঙ্কার

১৮ই এপ্রিল সকালে গণেশ ও লোকনাথের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার মোটরে স্টার্ট দিলাম। পরবর্তী রুটিন অনুসরণ করতে চলেছি। গাড়িতে আমি একা। লোকনাথের সেই কটি কথা—'All for one : one for all.—ঘুরে ঘুরে আমার মনে উঠছিল, আর মাঝে মাঝে আমার অন্তরের সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে আঘাত করে শিহরণ জাগছিল। এই একই কথা কতদিন কতজনের কাছে শুনেছি। আমি নিজেও কতদিন তা' বন্ধুদের কাছে বলেছি—তবে আজ কেন লোকনাথের কথা— All for one : and one for all :—অন্তরে এইভাবে তরঙ্গ সৃষ্টি করেছে? বহুদিন আগে জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর, গণেশের কাছ থেকে যখন প্রথম যুব-বিদ্রোহের সামগ্রিক প্ল্যানটা শুনি তখন 'All for one : and one for all ! —আমাদের সংগঠনের এই মূল মন্ত্রটি আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করে—কি সুন্দর! একসঙ্গে বিপ্লবী দলে এসেছি, একসঙ্গে যুদ্ধ করব, সমবেত চেষ্টায় সাময়িক গণতন্ত্রী বিপ্লবী সরকার গঠিত হবে, তারপর আমরা একসঙ্গে নিজ নিজ পোস্টে দাঁড়িয়ে মরব—অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ঘাত-প্রতিঘাতে বিক্ষিপ্ত হয়ে বিপথে পরিচালিত হওয়ার আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকব! তাই লোকনাথের মুখে যখন ১৮ই এপ্রিল সকালে প্রতিধ্বনিত হ'ল— All for one : and one for all !—তখন মনে মনে নতুন করে শপথ নিলাম—সকলের জন্য আমরা প্রত্যেকে, প্রত্যেকের জন্য আমরা সকলে!

আমার গাড়ি ছুটে চলেছে নিজাম পল্টনের দিকে। একটা বাড়ির সামনে গিয়ে গাড়ি থামালাম। এখানে এসে আমাকে বিশেষ সাবধান হতে হ'ল। পাশাপাশি বাড়িগুলির মাঝখান দিয়ে সরু পায়ে চলা পথ গিয়েছে—সেই রাস্তা দিয়ে এঁকে বেঁকে আমাকে আমার গন্তব্যস্থানে পৌঁছাতে হবে। সেইজন্য সাবধানতার বিশেষ প্রয়োজন—কারণ, যদি আমার সন্ধানে পুলিশ ঘাপটি মেরে বসে থাকে তবে হঠাৎ কোন একটি ঘর বা দু'টি বাড়ির মাঝখানের ছোট পথ দিয়ে অনায়াসে এসে আমাকে আক্রমণ করতে পারে। আমার ভাবতেই খুব কষ্ট হোত যে পুলিশ সশস্ত্র অবস্থায় আমাকে চমকে দিয়ে হঠাৎ বন্দী করবে। তাই পিস্তলটি বেল্ট থেকে একটু আল্গা করে নিলাম এবং খুব প্রস্তুত হয়ে গাড়ি থেকে নেমে সন্তর্পণে হাঁটতে লাগলাম। কোন বিপদ হ'ল না।

ছোট্ট একটি ঘর—বাঁশ ও খড়ে তৈরি। এখানে নির্মলদা থাকেন একা। ঘরে ঢুকে দেখি নির্মলদা একাই বসে আছেন—আমার আসবার অপেক্ষায় ছিলেন।

নির্মলদার চেহারা, ব্যক্তিত্ব ও আত্মপ্রত্যয়ে ভরা—কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য নির্মলদার চোখ দু'টি। কি সুন্দর উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি! একবার দেখলে আর ভোলা যায় না! হঠাৎ দেখলে প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে নির্মলদা কঠোর, নিষ্ঠুর, নির্মম যোদ্ধা—কিন্তু যারা তাঁর সঙ্গে মিশেছে তারা জানে ঐ আকর্ষণীয় চোখ দু'টির অন্তরালে স্নেহ-মমতা ঝরে পড়ছে। অত্যন্ত কোমল ভাবপ্রবণ লোক নির্মলদা। আমাদের সকলের ভালবাসার পাত্র।

অন্তরীণ অবস্থা থেকে ছাড়া পাবার পর ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিলের দিনটি পর্যন্ত নির্মলদার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের আকার ধারণ করেছিল এবং তা' সম্ভব হয়েছিল নির্মলদার আন্তরিক ব্যবহারে। যদিও তাঁকে আমি দাদা বলে ডাকতাম, বড় ভাইয়ের মত শ্রদ্ধা করতাম, তবু যখন তাঁর কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখেছি তখন যে কত তীক্ষ্ম ভাষায় কঠোর সমালোচনা করেছি নির্মলদাকে তা' অনেকের পক্ষে ভাবাও সম্ভব নয়। আমার এই খোলাখুলি সমালোচনা নির্মলদা কেবল যে শুনতে পছন্দ করতেন তা' নয় খুব ভালবাসতেন। আমাকে বলবার জন্য তিনি সব সময় উৎসাহিত করতেন। আমার সব কথা ধৈর্য ধরে মনোযোগের সঙ্গে শুনতেন ও মৃদু মৃদু হাসতেন। কতখানি আত্মবিশ্বাস থাকলে কঠোর সমালোচনা শুনেও রাগ না করে হাসা সম্ভব? নির্মলদা বিন্দুমাত্র রুষ্ট না হয়ে হাসিমুখে আমার সর্বপ্রকার সমালোচনা সহ্য করেছেন—এটা একমাত্র স্নেহশীল আত্মবিশ্বাসী বিপ্লবীর পক্ষেই সম্ভব।

আজ মনে পড়ে জীবনের কত শত খুঁটিনাটি ব্যক্তিগত ঘটনা নিয়ে সমবয়সী বন্ধুর মত আলোচনা করেছি নির্মলদার সঙ্গে! কখনো মনে হয় নি বা তিনি আমাকে মনে করবার সুযোগ দেন নি যে আমার পক্ষে ঐ সব ব্যক্তিগত বিষয়ে সমালোচনা করার অধিকার নেই। সামান্য দু'টি কথায় তাঁকে বোঝান যাবে না, কি

মহৎ প্রাণ লুকিয়ে ছিল ঐ কঠোর চেহারার অন্তরালে!

তিনি সেই দিন সকালে আমাকে দেখেই উৎসাহভরে ডেকে বসালেন। আমি হাসতে হাসতে বললাম—"কি নির্মলদা আজও কি Late Latif হওয়ার কোন chance আছে—ঠিক সময় আসবেন তো?" আমরা সবাই জানতাম নির্মলদা তাঁর ঐরূপ সময় ঠিক না রাখার ত্রুটির জন্য কতখানি সচেতন ছিলেন। দলের নবীন সদস্যাদের Punctuality (সময়নিষ্ঠা) সম্বন্ধে নির্মলদা তাঁর নিজ জীবনের মহামূল্যবান অভিজ্ঞতা দিয়ে শেখাতেন—যেন সময়নিষ্ঠা তাদের চরিত্রগত অভ্যাসে পরিণত হয়। সময়-নিষ্ঠার প্রতি নির্মলদার একনিষ্ঠ অনুশীলন আমাদের সবার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। তবু হাসির ছলে ১৮ই এপ্রিলের সকালে ঐরূপে নির্মলদার সময়নিষ্ঠার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছিলাম। মনে মনে বিশ্বাস ছিল নির্মলদার পুনরায় সময় সম্বন্ধে ঐরূপ ভুল হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই—তবু ১৮ই এপ্রিলের যুব-বিদ্রোহের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ভেবেছিলাম, যদি আর একবার অতীতের ভুল মনে করিয়ে দিই তা'তে দোষের কিছু নেই। অতীত ভুলের পুনরাবৃত্তি আজকের ক্ষেত্রে যেন কোনমতে না ঘটে তার জন্য অতিরিক্ত বলা হলেও আমি হাসির ছলে নির্মলদাকে সজাগ করে দিই—কারণ আজকের অ্যাক্‌সন একটার সঙ্গে অন্যটার খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল—কাঁটায় কাঁটায় নির্ধারিত সময়ে প্রত্যেকটি অ্যাক্‌সন্ ঘটা চাই, নইলে এক মুহূর্তের দেরিও সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে।

নির্মলদা আজকের গুরুত্ব সম্বন্ধে কারও থেকে কম সচেতন ছিলেন না এবং প্রত্যেকের স্বাভাবিক উৎকণ্ঠা কতখানি থাকা সম্ভব তার বাস্তব উপলব্ধি ছিল বলেই আমার অভিব্যক্তি তাঁকে একটুও ক্ষুণ্ণ করে নি। তাঁর সদাপ্রসন্ন মুখে বিন্দুমাত্র বিরক্তির ছাপ দেখা গেল না। তিনি অতীতের অ্যাক্‌সনে উপস্থিত হতে না পারার ত্রুটির জন্য ক্ষমা চেয়ে বসলেন। আমি একেবারে অপ্রস্তুত! তারপর তিনি বললেন—"না, ভাই না। দেখো এবার আর দেরি হবে না। ঠিক সময়েই পোস্টে উপস্থিত থাকব।"

শিশুর মত সরল ছিলেন নির্মলদা। অতীতের ত্রুটির কথা মনে করে তাঁর চোখে জল এল। বার বার বলতে লাগলেন—"এবার আমার ভুল হবে না। আমি ঠিক সময়ে পোস্টে উপস্থিত থাকব।" একবার নয়, বার বার এই কথা বলতে লাগলেন।—আমি হাসির ছলে বলে নির্মলদাকে যে এতখানি বিচলিত করব, আর নিজেও এত অপ্রস্তুত হব তা' ভাবি নি। নির্মলদা যে আমাকে কতখানি ভালবাসতেন ও আমার ওপর নির্ভর করতেন তা' আমি বুঝতাম। আমি বয়সে ছোট হলেও দলের মধ্যে আমার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটিকে স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যে তাঁর যে অসীম শ্রেষ্ঠত্ব ছিল তা' আমি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছি। আমার সেই অন্তরের সন্ধান রাখতেন বলেই নির্মলদা আমাকে অত ভালবেসেছেন।

আজকের বিশেষ বিশেষ প্রোগ্রাম আর একবার নির্মলদার সঙ্গে ঠিক করে নিয়ে বিদায় নিলাম। দরজার কাছে দু'জনে করমর্দন করে—অর্থাৎ দৃঢ়ভাবে পরস্পরের হাত ধরে চোখে চোখে তাকালাম। চোখের নির্বাক ভাষায় আজকের অভিযানে 'মৃত্যু-সংকল্প' ঘোষিত হ'ল। নির্মলদা বললেন—"ভুল না যুবকদের প্রতি তোমার নিজ আহ্বান বাণী—Organisation, audacity and Death!"

আমি তাঁর সাথে যোগ দিয়ে বললাম—Be daring, be still more daring, be daring always!" চাই সাহস, বিক্রম—সিংহবিক্রম! নির্মলদার সংস্পর্শে এসে আর একবার অন্তরের আগুন প্রজ্বলিত করে নিলাম।

আবার গণেশের বাড়ি ছুটলাম। সেই দিন সকালে আমরা কেউই বসেছিলাম না। প্রত্যেকেরই অনেক কাজ ছিল। সাধারণ সভ্য ও নেতাদের morale (মনোবল) কিরূপ আছে সকাল থেকে রাত আটটা পর্যন্ত গ্রুপে ও ব্যক্তিগতভাবে পরস্পর check-up করা ও কিছুক্ষণ পর পরই পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে উৎসাহ ও উদ্দীপনার কথা বলা আমাদের সাধারণ প্রোগ্রামের অঙ্গ ছিল। আমরা পরস্পরে মিশেছি technical কাজের কর্মসূচী ফাইন্যাল অ্যাক্‌সনের আগে রিহার্সেল দিয়ে নেওয়ার জন্য ও morale অটুট ও উঁচু রাখবার উদ্দেশ্যে।

বহু মূল্যের বিনিময়ে যে অতীত-অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তা' অতি নিদারুণ ও রূঢ় সত্য। পরোইকোরা ডাকাতির আগে আমাদের মধ্যে যে "বীর বিপ্লবী" সবচেয়ে বৃহদাকার ও বলিষ্ঠ, তিনি অ্যাক্‌সনের আগে এলেনই না। পরে সমর্থক হিসেবে হয়ত ছিলেন কিন্তু রক্তাক্ত বিপ্লবের চিন্তা থেকে চিরতরে বিদায় নিলেন। সামান্য ট্রেনিং-এর জন্য যখন দলের দু'জনকে বলেছি তারা একত্রে মাত্র একজন পথিককে ছোরা হাতে নির্জন স্থানে ভয় দেখিয়ে টাকা-পয়সা অপহরণ করবার অভিনয় করবে, তখন তাদের মধ্যে একজন বাস্তব অবস্থার বিভীষিকার সম্মুখীন হয়ে বিপ্লবী দল থেকে বিদায় নিয়ে নিস্তার পেলেন। এরূপ আরও অনেক ঘটনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল—ঠিক বিপদের আগে অনেকের morale ভেঙে গেছে এবং তারা ভয়ে পালিয়েছে। এই নিদারুণ অভিজ্ঞতা সামনে রেখে আমরা সবাই একসাথে শিক্ষা নিয়েছি এবং subjectively মনকে তৈরি করেছি। যুব-বিদ্রোহে যাদের অংশ গ্রহণ করবার জন্য বাছাই করে ছিলাম তাদের সম্বন্ধে প্রায় নিশ্চিন্ত ছিলাম যে সেই বৃহদাকার বলিষ্ঠ বীর-পুঙ্গবের মত ভয়ে পালাবে না। কিন্তু তা'হলেও ১৮ই এপ্রিলের যুব-বিদ্রোহের দায়িত্ব যাঁদের ওপর ছিল তাঁরা শেষ-মুহূর্ত পর্যন্ত বিপ্লবী সৈন্যের morale সম্বন্ধে সজাগ থাকা একান্ত প্রয়োজন মনে করেছিলেন। সেই জন্য জ্বালাময়ী কথা, শ্লোগান প্রভৃতি আমরা ইচ্ছে করে ব্যবহার করেছি যেন অন্তরের আগুন আজ শত-সহস্রগুণে প্রখরতার সঙ্গে প্রজ্বলিত হয়।

গণেশের বাড়ি এসে অম্বিকাদার সঙ্গে ঠিক সময় দেখা হ'ল। তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ১৮ই এপ্রিল, যুব-বিদ্রোহের দিন সকালবেলা একটা খুব বড় কাজ সম্পন্ন করবার ছিল। আমার এখন ঠিক মনে নেই—হয় মহেন্দ্র চৌধুরী বা নিতাই, দু-তিন দিন আগে প্রায় বারো শ' অথবা চোদ্দ শ' টাকা বাড়ি থেকে নিয়ে আসে। দু'জনেই যে প্রায় সেই অনুপাতে টাকা বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছে, তা' আমার মনে আছে। যুব-বিদ্রোহের ঠিক দু-একদিন আগে এ'দের মধ্যে কে টাকা এনেছিলেন তা' আমার ঠিক মনে পড়ছে না। এটাও স্পষ্ট মনে আছে আমরা শেষ সময়ে টাকার অভাব অনুভব করেছিলাম। হঠাৎ একটা সুযোগ পেয়ে, যুব-বিদ্রোহের দু'দিন আগে, যখন ঐ দু'জনের একজন আমাদের হাতে টাকা এনে দিল তখন অপ্রত্যাশিতভাবে এই টাকা পেয়ে আমরা Hire Purchase-এ একটা মোটর গাড়ি কিনব স্থির করি।

আজকের দিনের তরুণ পাঠক-পাঠিকা শুনে অনেকটা অবাক হবেন, ১৯৩০ সালে 'শেভ্রোলে' মোটর (টুরার) গাড়ির দাম মাত্র দু' হাজার আট শ' টাকার বেশি ছিল না—যার আজকের দাম অন্ততঃ ষাট-সত্তর হাজার টাকা। তাই মাত্র তের-চোদ্দ শ' টাকা হাতে পেয়ে নতুন শেভ্রোলে গাড়ি কেনা সাব্যস্ত করেছিলাম।

তখনকার দিনে অত সস্তায় পাওয়া সম্ভব ছিল বলেই যে একটা নতুন গাড়ি কিনে ফেললাম তা' নয়। সকালবেলা নতুন গাড়ি একটা খরিদ করে সন্ধ্যার সময় সেটাকে যদি বিসর্জন দিতে হয়, বা সেদিনের পরও দু-তিন দিন আরও বেঁচে থেকে যদি গাড়িটাকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হই তাহলে আজ সকালে গাড়িটি কেনার অর্থ কি?

কোন একটা গাড়ির ড্রাইভারকে তিন-চার ঘণ্টা অনিশ্চয়তার মধ্যে বেঁধে রেখে অ্যাক্সনে যাওয়া খুব একটা বুদ্ধির কাজ বলে আমরা মনে করি নি। ড্রাইভারকে জোর করে বাঁধা ও তেমন কোন জায়গায় লুকিয়ে রাখার মধ্যে যে অনেক অবাঞ্ছনীয় দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকতে পারে তা' আমাদের সাধারণ বুদ্ধি দিয়েও অনুমান করেছিলাম। যুব-বিদ্রোহের তিন-চার ঘণ্টা আগে থেকে জোর-জবরদস্তি করে আমাদের আয়ত্তে গাড়ি এনে তারপর তা' নিয়ে শহরের মধ্যে ঘোরা, ষড়যন্ত্রের মূল-নীতি বিরুদ্ধ বলে আমাদের কাছে বিবেচিত হয়েছিল। এই কারণেই একটি নতুন গাড়ির প্রয়োজন ভীষণভাবে অনুভব করি। টেলিগ্রাফ্ ও টেলিফোন অফিস ধ্বংস করতে যে গ্রুপটি অম্বিকাদার নেতৃত্বে যাবে তাদের যেন ড্রাইভারকে বেঁধে রেখে গাড়ি জোগাড় করার ঝামেলা পোহাতে না হয়।

জে, এন, রায়চৌধুরী এন্ড কোং-এর শেভ্রোলে গাড়ির শো-রুম, গণেশের কাপড়ের দোকানের খুব নিকটেই ছিল। গণেশের প্রয়োজনে বেবী-অস্টিন্ গাড়িটি রেখে আমি ও অম্বিকাদা হেঁটেই সেই শো-রুমে গেলাম। আগের দিন সেই মোটর গাড়ি কোম্পানীর মালিকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সব ঠিক করা ছিল যে আজ সকালে গাড়িটি ডেলিভারি নেব। শ্রীবীরেশ্বরবাবু (ভট্টাচার্য)—জানি না এখন তিনি বেঁচে আছেন কি না—অম্বিকাদার বিশেষ বন্ধু বা আত্মীয়। চট্টগ্রামের জজ্ ও সেসন্স্ আদালতে তিনি ওকালতি করতেন—বীরেশ্বরবাবু চট্টগ্রাম আদালতে তখনকার দিনে একজন উদীয়মান উকিল। তাঁকেই সঙ্গে এনেছিলাম গাড়িটা Hire Purchase করার জন্য তিনি যেন জামিনদার হন। বীরেশ্বরবাবু জামিন থাকবেন বলে রাজী হয়েই এসেছিলেন। গাড়ি কেনা হ'ল অম্বিকাদার নামে। পনেরো মিনিটের মধ্যে গাড়ি কেনা হয়ে গেল। বীরেশ্বরবাবুকে নতুন গাড়ি করে বাড়ি পোঁছে দিয়ে আমি ও অম্বিকাদা সোজা ছুটলাম নিজাম পল্টনের দিকে। একবার গাড়িটা চালিয়ে দেখে নেবার উদ্দেশ্যে কখনও খুব আস্তে কখনও বা খুব বেগে মোড় ঘুরে ও ভাঙাচোরা রাস্তার ওপর দিয়ে ড্রাইভ করলাম।

এবারে চলেছি সোজা পীচঢালা রাস্তা দিয়ে পাহাড়তলীর দিকে, পাশে অম্বিকাদা। নিজামপল্টনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় গাড়িটি একবার থামালাম। সামনে দেখা যাচ্ছে A.F.I.-এর অস্ত্রাগার। বন্দুক কাঁধে পাহারা দিচ্ছে পাঠান সাস্ত্রী। ঐ অস্ত্রাগার আজ রাত্রে আমাদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হবে। আমাদের দু'জনের সঙ্গে গুলীভরা পিস্তল আছে। তখন সকাল ন'টার বেশি হবে না। এতক্ষণ আমাদের মধ্যে কোন কথা হয় নি বললেই চলে। কি কথা বলব? আজকে রাত্রের 'প্রলয়ের' ভয়ঙ্কর মূর্তি, অস্ত্রের সংঘাত ও বিভীষিকা বুকের ভেতর গুমরে গুমরে শিহরণ জাগাচ্ছে। এতক্ষণ গাড়ি চলছিল তাই বোধহয় চুপ করে ছিলাম। এখন গাড়িটি একটু থামিয়ে বসেছি তাই হয়ত অন্তরের ঝড়ের প্রতিক্রিয়া মুখে প্রকাশ পেল—

"অম্বিকাদা! বৃটিশ আর্মির একটা অস্ত্রসজ্জিত গাড়ি বা ট্যাঙ্কের সমকক্ষ আমাদের এই নতুন গাড়িটি!"

উত্তরে অম্বিকাদা শুধু বললেন—"আর বৃটিশ সৈন্যের মেশিন-গান ও কামানের সামনে প্রতিদ্বন্দ্বী আমাদের চোদ্দটি পিস্তল ও রিভলভার আর মাত্র এক ডজন •১২ বোরের বন্দুক!"

দু'জনেই হেসে উঠলাম। একটু পরে বললাম—"অম্বিকাদা, বৃটিশ জেলের মধ্যে বিশ্বাসহন্তা নরেন গোঁসাইকে হত্যা করে হাসতে হাসতে ফাঁসির দড়ি গলায় পরেছিলেন কানাইলাল—তাঁর সাহস, তাঁর আত্মত্যাগ বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দিল সারা দেশময়। আর আজ রাত্রে মাত্র এক ডজন রিভলভার ও এক ডজন বন্দুক সম্বল করে চট্টগ্রামের বিপ্লবী যুবকেরা অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে শহর অধিকার করার এক নতুন ইতিহাস রচনা করবে—ভারতের যুব-বিদ্রোহকে আর একধাপ এগিয়ে দেবে!"

অম্বিকাদা মনের আবেগে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলতে লাগলেন—"এই আশা নিয়েই তো আজ মরব! সমস্ত শহরের শাসন-ব্যবস্থা আমাদের সমবেত আক্রমণে নিশ্চল হয়ে পড়বে। ইংরেজ শাসকবর্গ জানবে, ভারতবাসী জানবে, ভারতের স্বাধীনতাকামী যুবকদল জানবে—সামান্য অস্ত্র সম্বল করে অল্পসংখ্যক দৃঢ়চিত্ত যুবকের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা বৃটিশের যে কোন অভেদ্য দুর্গকে ধূলিসাৎ করে দিতে পারে!"

তারপর দু'জনের মনেই এক চিন্তা—"এতদিন ধরে যে স্বপ্ন দেখে এসেছি আজ তা' বাস্তবে পরিণত হবে কি? শেষ পর্যন্ত পারব তো সফলতা অর্জন করতে? আমাদের শ্রমের বিনিময়ে, রক্তের প্রতিদানে পারব কি যুব-সমাজের সামনে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে? ব্যক্তিগত সন্ত্রাস সৃষ্টির পথে বৃটিশ শাসকের মনে ত্রাস সঞ্চার করেছি এতদিন এবং যুব-সমাজ উদ্বুদ্ধ হয়েছে কানাইলাল, ক্ষুদিরামের ব্যক্তিগত সাহস ও চরম আত্মত্যাগের আদর্শে; আর আজ যদি জয়ী হই, তবে কি মুষ্টিমেয় বিপ্লবীর "সংঘবদ্ধ আক্রমণ" দ্বারা সমস্ত শহরও যে অধিকার করা যায়—এই দৃষ্টান্ত কি যুব-সমাজের মধ্যে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গীর বাস্তব পরিবর্তন এনে দেবে না?"

গণেশ ও নির্মলদা প্রত্যেক গ্রুপের সঙ্গে দেখা করেছেন নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে। প্রত্যেকের মানসিক বল অটুট আছে কি না, তারা শারীরিক সুস্থ কি না, তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এবং মোটর গাড়ির সব ব্যবস্থা প্ল্যান অনুযায়ী ঠিক আছে কি না—এই সব তাঁরা check-up করছিলেন। সেই দিনের সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত clock-like-precisian -এ সমস্ত ব্যবস্থার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছিল। বিভিন্ন গ্রুপ-কমান্ডার গণেশের সঙ্গে প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় যোগাযোগ রাখছে—তাদের প্রত্যেকের final report গণেশের কাছে দেওয়ার কথা ছিল—কারও কোন ব্যতিক্রম সঙ্গে সঙ্গে report করার কথা। সেই নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী তারা তাদের রিপোর্ট দিয়েছে। এই বিষয়ে আমার বিশেষ কিছু করবার ছিল না—প্রত্যেকের ওপরেই আগে থেকে পরীক্ষা করে দেখেছ কি? সব ঠিক নিশ্চিত?"

নতুন শেভ্রোলে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে শহরের দিকে চললাম। কংগ্রেস অফিসে অম্বিকাদাকে নামিয়ে দিয়ে তক্ষুণি আবার গণেশের বাড়ির দিকে যাচ্ছি। তেমনি সময়ে নরেশকে দেখতে পেয়ে সামান্য দু'টি প্রশ্ন করলাম—

"সব ঠিক আছে তো নরেশ? যেখানে যত অস্ত্র আছে সব তুমি নিজ হাতে পরীক্ষা করে দেখেছো কি? সব ঠিক আছে?"

নরেশ খুব স্থিরভাবে উত্তর দিল—"হ্যাঁ, সব ঠিক আছে।"

আবার প্রশ্ন করলাম—"তুমি বলছ কোন সন্দেহ নেই? আক্রমণের মুহূর্তে একটিও fail করবে না—তুমি নিশ্চিত?"

—"হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত।"

—"তোমার দলের ও প্রত্যেকের মনোবল কেমন আছে?"

—"খুব ভাল, চমৎকার! তাদের মধ্যে

নির্ভয়

অণিমা তালুকদার

এই আলো এই ছায়ার রঙ্গ
নটিনী নদীর দেহ-বিভঙ্গ
শব্দ রূপের নানা প্রসঙ্গ
হৃদয় কাড়ে!

পৃথিবীকে বুকে পাবার ইচ্ছে
পূরণ না হ'তে তাগিদ দিচ্ছে—
কে যেন আয়ুর হিসেব নিচ্ছে
অন্ধকারে।

ভয়কে মাড়িয়ে তবু অনন্য
আমি আনন্দ নেবো অগণ্য,
আমার জন্ম আমার জন্য
অহংকারে!

প্রতিযোগিতা চলেছে—'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান......'।"

নরেশ ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করবে। সেইজন্য তার নেতৃত্বে আজ রাত্রে বাছা বাছা যুবকদের নিয়ে সুগঠিত একটি দল বাছাই করা অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। নরেশকে বলবার হয়ত আমার কিছুই ছিল না। তবু তাকে বলে নিজেই জোর পাব, এই ভেবে মনের ভেতরে যা' এতক্ষণ গর্জন করে চলেছিল তাই বললাম—

"মনে রেখো নরেশ আমাদের প্রাণদান কখনই ব্যর্থ হবে না। এতদিনের অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে চলেছি আজ—শক্তি চাই, সাহস চাই,—আর চাই অদম্য মনোবল। দেখ নরেশ, শেষমূহূর্তে যেন একজনও ভেঙে না পড়ে। তাদের গিয়ে বল—দয়া নয় মায়া নয়, বিন্দুমাত্র করুণা নয়! প্রতিশোধ চাই—শুধু চাই নির্মম প্রতিশোধ!—ক্ষুদিরাম, কানাইলালের ফাঁসির প্রতিশোধ—জালিয়ানওয়ালাবাগের শিশু ও নারী-হত্যার প্রতিশোধ।"

নরেশের চোখ দুটো জ্বলে উঠল—যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীকে পুড়িয়ে শেষ করে দেবে। নরেশ নিজের মনকে প্রস্তুত করে নিয়েছে। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শত্রুরা ভারতবাসীকে এতদিন ক্রীতদাসের মত ব্যবহার করেছে, কুকুরের মত হত্যা করতে তাদের এতটুকু মমতা হয় নি। নরেশ আজ প্রস্তুত—এতদিনের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবে। খুব দৃঢ়তার সঙ্গে সে আমাকে বলল—

"ইংরেজ শাসকবর্গ আজ বুঝবে অত্যাচার করার একচেটিয়া অধিকার কেবল সাম্রজ্যবাদী শত্রুরই নেই। তারা দেখবে আমরা কতখানি নিষ্ঠুর হতে পারি—কত নির্দয়, কত কঠিন, কত নিষ্করুণ আমরা! এতদিনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত বুকের রক্তে আজ তাদের করতে হবে। মানবত্রাতা যীশুর আদেশ যারা অবহেলা করেছে, ঈশ্বর তাদের আজ ক্ষমা করবে না! আজকে যে মৃত্যু বিভীষিকা সৃষ্টি করব তা' ইংরেজ শাসকবর্গকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে দেবে যে তাদের অন্যায় অত্যাচারের পরিণতি আরও অশুভ আরও অমঙ্গলজনক হবে!"

আমাদের দুটি বছর প্রস্তুতিপর্ব চলেছিল। কতরকম শিক্ষা—তার মধ্যে এইরূপ মানসিক প্রস্তুতির অনুশীলন সব সময় আমরা করেছি। তখন আমরা কি বা বই পড়েছি—বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কোন বই পড়ি নি; সমাজ বিপ্লব ও রাজনৈতিক বিপ্লব সম্বন্ধেও কোন গ্রন্থ বুঝে পড়া হয় নি। আমাদের আলোচনাচক্রে বিষয়-বস্তু খুব সামান্যই থাকত। গণসংগঠনের কর্মসূচী নিয়ে আমরা কখনও আলোচনা করি নি। প্রোগ্রাম ছিল, ইংরেজের মনে বিভীষিকা সৃষ্টি করব। নিজে মরে বিপ্লবী সমাজে আদর্শ সৃষ্টি করব। তাই আলোচনা যা হোত তা' দিনের পর দিন মাসের পর মাস এইরূপ ভাবপ্রবণ বৈপ্লবিক কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। একই কথা হয়ত বার বার বলেছি—কেউ কেউ ভাববেন তা' কি করে সম্ভব হ'ল? মরণ পাগল ক্ষ্যাপার দলের পক্ষে তাই সম্ভব ছিল। একই কথা বার বার বলতে গিয়ে কেউ আমরা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ি নি। Subjective mind-কে তেমনিভাবে অন্তরের প্রেরণা দিয়ে তৈরি করতে না পারলে লড়াই করা সম্ভব নয়। কারও হয়ত মনে হবে—নরেশ কি সেইরূপভাবে আমাকে কিছু বলেছিল? না কি ভাবের বশে এখন আমি মনগড়া কথা সব লিখছি বসে বসে? কয়েক ঘন্টা পর সুনিশ্চিত মৃত্যু-মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ব। মানসিক প্রতিক্রিয়া কি ভীষণগতিতে ছুটে চলেছিল সেই দিনটিতে তার মাত্র সামান্যই প্রকাশ পাচ্ছে নরেশের ঐ ক'টি কথায়। আমাদের প্রত্যেক গ্রুপের মধ্যে সেই দিন এর চেয়ে অনেক বেশি ভাবপ্রবণ বৈপ্লবিক উত্তেজনাপূর্ণ কথা হয়েছে।

বেলা এগারোটার সময় আনন্দের বাড়ি গেলাম। এখানে একটি গ্রুপ আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমি যে নতুন শেভ্রোলে গাড়ি কিনতে যাচ্ছি তা' তারা জানত এবং কথা ছিল সেই গাড়িটিকে নিয়ে এখানে আসব। তারপর আনন্দ এই গাড়িটি ট্রায়েল দিয়ে দেখবে, কারণ রাত্রে টেলিফোন অফিস ধ্বংস করার জন্য অম্বিকাদার গ্রুপটিকে নিয়ে আনন্দ এই গাড়িটি চালাবে।

এখানে মিনিট পাঁচ আগে জড়ো হয়েছে একটি দল—মাখন, রজত, টেগ্‌রা, আনন্দ, হিমাংশু ও বিধু। নতুন শেভ্রোলে গাড়িটি দেখে লাফিয়ে উঠল ওরা—নিজস্ব একখানা গাড়ি,—আজকের বিপ্লবের সঙ্গী, আর একটি প্রধান হাতিয়ার! এক মুহূর্তেই গাড়িটাকে ভালবেসে ফেললো তারা, কেউ গায়ে আলতোভাবে হাত বোলাচ্ছে, কেউ ভেতরে গিয়ে বসেছে—কেউ বা যন্ত্রপাতি নেড়ে-চেড়ে দেখছে।

এই শেভ্রোলে গাড়িখানা পেয়ে বিপ্লবী তরুণদের মুখে যে আনন্দের দীপ্তি ফুটে উঠল তার মূল্য অসামান্য। ১৯১৬ সালে কমব্রাই অঞ্চলে জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রথম ট্যাঙ্ক ব্যবহার করে কি বৃটিশ সৈন্য-বাহিনী এর চেয়ে বেশি গৌরব অনুভব করেছিল? জানি না হিট্‌লারের ফ্যাসিস্ট সৈন্যদল "অপ্রতিদ্বন্দী" টাইগার ট্যাঙ্ক চালাবার সময় কতখানি গর্ববোধ করেছিল! অথবা বলতে পারি না অপরাজিত লাল-ফৌজবাহিনী তাদের শক্তিশালী K V ট্যাঙ্কের দুর্বার ক্ষমতায় কতখানি উৎসাহিত হয়েছিল! চট্টগ্রামের তরুণ বিপ্লবীরা আজকের মরণপণ যুদ্ধের সাথী এই শেভ্রোলে গাড়িটি পেয়ে নিশ্চয়ই তার চেয়ে কম গর্ব ও গৌরব অনুভব করে নি। এও আমার ভাবের কথা নয়—বাস্তব সত্য।

বিপ্লবীর হাতে সামান্য মাস্কেট ইংরেজের মেসিনগান কামানকে স্তব্ধ করেছে—বিরাট সৈন্যদলকে পরাস্ত করেছে। বিপ্লবী ভিয়েতকংরা প্রচন্ড শক্তিশালী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীর আধুনিক মারাত্মক অস্ত্রের বিরুদ্ধে কিভাবে তাদের সামান্য অস্ত্রবল নিয়ে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে—তাদের পরাস্ত করতে পারে, তা' যদি হৃদয়ঙ্গম করা যায় তবেই বোঝা যাবে সামান্য শেভ্রোলে গাড়িটি পেয়ে আমাদের সেদিন কতখানি সাহস ও ভরসা বেড়ে গিয়েছিল। [ক্রমশঃ]

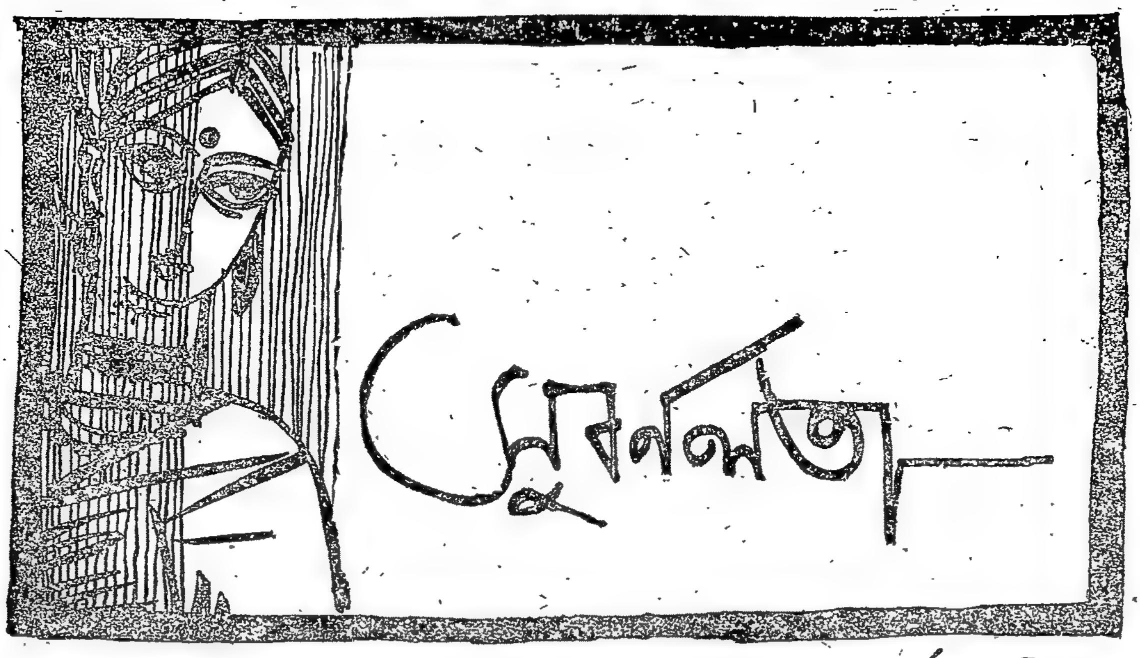

ধারাবাহিক উপন্যাস

আশাপূর্ণা দেবী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সে চিঠি কি খুললো না—সুবর্ণলতা? কবরের নিচে চিরঘুমন্ত করে রেখে দিল তার মায়ের অন্তিম বাণী?

এত অভিমান সুবর্ণলতার?

এত তেজ?

এত কাঠিন্য?

তা' প্রথমটা তাই ছিল বটে। কতদিন যেন সেই খাম মুখবন্ধ হয়ে পড়ে রইল সুবর্ণলতার ট্রাঙ্কের নিচে, সব কাপড়-চোপড়ের তলায়।

কিন্তু সেই গভীর অন্তরাল থেকে যে সেই অবরুদ্ধবাণী অনুক্ষণ সুবর্ণলতার সমগ্র চেতনাকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে বলেছে, 'সুবর্ণ তুমি কি পাগল? সুবর্ণ এ তুমি কী করছো?" আর তারপর হতাশ হতাশ গলায় বলেছে, 'সুবর্ণ, তোমার এই অভিমানের মর্ম কে বুঝবে? কে দেবে তার মূল্য?'

অবশেষে একদিন এই ধাক্কা অসহ্য হলো। সুবর্ণ ট্রাঙ্কের তলা থেকে ওর মায়ের সেই অন্তিমবাণী টেনে বার করলো!

দিনটা ছিল একটা রবিবারের দুপুর।

কার্তিকের শীত শীত মেঘলা দুপুর। আকাশটা যেন ভারাক্রান্ত মন নিয়ে কোনো রকমে 'দিন সই' করেই সন্ধ্যার কুলায় আশ্রয় নেবো নেবো করে। বাড়ি থেকে কারো বেরোবার কথা নয়, তবু আকস্মিক একটা যোগাযোগে আশ্চর্য রকমের নির্জন ছিল বাড়িটা।

গিরিবালার সাবিত্রী ব্রতের উদ্‌যাপন সেদিন। সেই উপলক্ষে ব্রাহ্মণভোজনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মজন ভোজনেরও ব্যবস্থা করেছিল সে, তাই ভাসুরের বাড়ির সবাইকে নেমন্তন্ন করে পাঠিয়েছিল ছেলেকে দিয়ে।

কবে যেন ব্রতটা ধরেছিল গিরিবালা?

সুবর্ণ ও বাড়িতে থাকতেই না?

উদ্‌যাপনের খবরে মনে পড়েছিল বটে সুবর্ণর। কারণ ওই ব্রতটাকে উপলক্ষ করে অজস্রবারের মধ্যে আরো একবার কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল সুবর্ণকে।

মুক্তকেশী বলেছিলেন, 'বড়বৌমার কথা বাদ দিই, ওর না হয় ক্ষ্যামতা নেই, কিন্তু তোমার সোয়ামীর পয়সা তো ওর সোয়ামীর চেয়ে কম নয় মেজবৌমা, 'খরচে বস্তুটায়' সেজবৌমা ব্রতী হলো, আর তুমি অক্ষমের মতন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখবে?'

হয়তো ইদানীং গিরিবালার স্বাধীনতাও ভাল লাগছিল না মুক্তকেশীর, তাই এক প্রতিপক্ষকে দিয়ে আর এক প্রতিপক্ষকে খর্ব করবার বাসনাতেই এ উস্কানি দিচ্ছিলেন। কিন্তু সুবর্ণলতা তাঁর ইচ্ছে সফল করে নি, সে অম্লানবদনে বলেছিল, 'ও ধাষ্টমোতে আমার রুচি নেই।'

ধাষ্টমো!

সাবিত্রীব্রত ধাষ্টমো! মুক্তকেশী স্তম্ভিত দৃষ্টি ফেলে বোবা হয়ে তাকিয়ে ছিলেন।

গিরিবালাও মুখ লাল করে বলে উঠেছিল, 'এ কথার মানে কি মেজদি?'

মেজদি আরো অম্লানবদনে বলেছিল, 'মানে খুব সোজা। যার সবটাই ফাঁকা, তা' নিয়ে আড়ম্বর করাটা ফাঁকি ছাড়া আর কি? অন্যকে ধোঁকা দেওয়া, আর নিজেকে ফাঁকি দেওয়া, এই তো? সেটাই ধাষ্টমো!'

'স্বামীভক্তিটা তা'হলে হাসির বস্তু?'

সুবর্ণলতা হেসে উঠে বলেছিল, 'ক্ষেত্র বিশেষে নিশ্চয় হাসির। ফুল চন্দন নিয়ে স্বামীর 'পা' পুজো করতে বসেছি আমরা এ কথা ভাবতে গিয়েই যে হাসি উথলে উঠছে আমার!'

'নিজের দিয়ে সবাইকে বিচার কোরো না মেজদি, ভক্তি যার আছে—'

মেজদি এ ধিক্কারকে নস্যাৎ করে দিয়ে আরো হেসে বলেছিল, 'ভক্তি? ওই ভেবে মনকে চোখ ঠারা, এর মধ্যে ভক্তিও নেই, মুক্তিও নেই সেজবৌ। আছে শুধু শখ আর অহমিকা।'

সেই অকথ্য উক্তির পর বাড়িতে কোর্ট-কাছারি বসে গিয়েছিল, যে দ্যাওর ডেকে কথা আর কইত না ইদানীং, সেও এসে ডেকে বলেছিল, 'বিষটা নিজের মধ্যে থাকলেই তো ভাল ছিল মেজবৌ, অন্যের সরল মনে গরল ঢেলে দেবার দরকার কি? স্বামীকে সত্যবান হতে হবে তবে স্ত্রীরা সাবিত্রী হবে, নচেৎ নয়, এমন মেয়েলি কথার চাষ আর নাই বা করলে বাড়িতে!'

আর প্রবোধ বাড়ি ফিরে ঘটনা শুনে দেয়ালে মাথা ঠুকতে গিয়েছিল, বলেছিল, 'হবে বিদেয় হতেই হবে আমার এ বাড়ি থেকে। এভাবে আর—'

সুবর্ণলতা বলেছিল, 'আহা এ সুমতি

হবে তোমার? তাহলে পায়ে না হোক মুখে ফুল চন্দন পড়ুক তোমার!'

অবশ্য বিষমন্তর দেওয়া সত্ত্বেও ব্রত নেওয়া বন্ধ থাকে নি গিরিবালার।—এবং দেখা যাচ্ছে চোদ্দ বছর ধরে নিষ্ঠা সহকারে পতিপূজা করে এখন সগৌরবে সে ব্রত উদ্‌যাপন করতে বসেছে সে।

সুবর্ণলতা কি ওর সুখী হবার ক্ষমতাকে ঈর্ষা করবে?

না সুবর্ণলতা শুধু হাসবে?

তা' এখন আর হেসে ওঠে নি সুবর্ণ, শুধু ছেলেটাকে বলেছিল, 'যেতে পারবো না বাবা সুশীল, মাকে বলিস মেজজ্যেঠির শরীর ভাল নেই। আর সবাই যাবে।'

সেই উৎসবে যোগ দিতে চলে গেছে সুবর্ণর স্বামী, সন্তানেরা। অবশ্য পারুল বাদে। পারুলের থেকে বয়সে ছোট খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো-বোনেদের বিয়ে হয়ে গেছে। পারুর হয় নি, এই অপরাধে প্রবোধ বলেছিল, 'ওর যাওয়ার দরকার নেই।'

পারু মনে মনে বলেছে, 'বাঁচলাম।'

কে জানে বাড়ির কোন কোণে একখানা বই নিয়ে পড়ে আছে পারুল, হয়তো বা তার কবিতার খাতাটা নিয়েও বসতে পারে এই অকস্মাৎ পেয়ে যাওয়া একখণ্ড অবসরের সুযোগে। সুবর্ণ জানে পারু তার নির্জনতায় ব্যাঘাত ঘটাবে না।

কিন্তু তখন কি ভেবেছিল সুবর্ণ ওরা চলে গেলে মায়ের চিঠিখানা খুলবো আমি?

তা' ভাবে নি।

শুধু অনেকটা কলকোলাহলের পর হঠাৎ বাড়িটা ঠান্ডা মেরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভয়ানক একটা মন উচাটন ভাব হয়েছিল সুবর্ণর।

আর তখনই মনে হয়েছিল ওর, 'আমি কি সেজবৌয়ের সুখী হওয়ার ক্ষমতাকে হিংসে করছি?...তা' নয়তো কেন আজই এত করে মনে আসছে সারাজীবন আমি কি করলাম!'

অবিশ্রান্ত একটা প্রাণপণ যুদ্ধ ছাড়া আর কোনোখানে যেন কিছু চোখে পড়ে না। কোথাও যে একটু সুশীতল ছায়া আছে। কোনোখানে যে একবিন্দু তৃষ্ণার জল মিলেছিল, সে কথা যেন ভুলেই যাচ্ছে সুবর্ণ। সুবর্ণ দেখতে পাচ্ছে অবিরত সে শুধু আক্রমণ ঠেকাচ্ছে, তবু এগিয়ে যাবার চেষ্টায় নিজেকে ছিন্নভিন্ন করছে।

নিজের উপর করুণায় আর মমতায় চোখে জল এসে গেল সুবর্ণর, ভিতরটা যেন হাহাকার করে উঠলো, আর তখনই মনে হলো, দেখব আজ আমি দেখব—ভগবান আমাকে শেষ কি উপহার পাঠিয়েছেন।

খাম ছিঁড়তে হাত কাঁপছিল সুবর্ণর, আর বুকের মধ্যে খুব কষ্ট হচ্ছিল। যেন—ওটা ছেঁড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মস্ত একটা কিছু ফুরিয়ে যাবে ওর।

কি সে?

পরম একটা আশা?

না কি ওই বন্ধ খামটার মধ্যে ওর মা এখনও জীবন্ত রয়েছে, খোলার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ নিশ্বাস ফেলবে?

তা' তেমনি একটা কষ্টের মধ্যেই খামটা খুললো সুবর্ণলতা। আর তারপরই একটা জলের পর্দা যেন ঢেকে দিল সমস্ত বিশ্ব চরাচর।...ঝাপসা হয়ে গেল কালো কালো অক্ষরের সারি, ঝাপসা হয়ে গেল বুঝি নিজের ওই কাগজ ধরা হাতখানাও। পর্দাটা পড়ে যাবার আগে শুধু একটা শব্দ ঝলসে উঠেছিল—সেই শব্দটাই বাজতে লাগলো মাথার মধ্যে।

....

'কল্যাণীয়াসু

সুবর্ণ—'

কল্যাণীয়াসু...সুবর্ণ!

এ নাম তা' হলে এখনো পর্যন্ত মনে রেখেছিল সুবর্ণর মা?

আজো কেউ তা' হলে সুবর্ণ নামে ডাকে তাকে?

না না কোনোদিন ডাকে নি, কোনোদিনও আর ডাকবে না?...নামটা মনে রেখেছিল, অথচ একদিনের জন্যে সেই মনে রাখার প্রমাণ দেয় নি মা।

....

জলের পর্দাটা মুছে ফেলবার কথা মনে পড়ে নি, সুবর্ণর, যতক্ষণে বাতাসে শুকিয়ে গেল, বুঝি বা বেশিই শুকিয়ে গেল, ততক্ষণে ওই কল্যাণ সম্বোধনের পরবর্তী কথাগুলো চোখে পড়লো।

কল্যাণীয়াসু,

সুবর্ণ,

বহুদিন পূর্বে মরিয়া যাওয়া কোনও লোক চিতার তল হইতে উঠিয়া আসিয়া কথা কহিতেছে দেখিলে যেরূপ বিস্ময় হয়, বোধহয় সেইরূপে বিস্ময়বোধ করিতেছ! আর নিশ্চয় ভাবিতেছ 'কেন আর? কি দরকার ছিল!'

কথাটা সত্য আমিও সে কথা ভাবিতেছি। শুধু আজ নয়, দীর্ঘদিন ধরিয়া ভাবিতেছি। যেদিন তোমাকে ভাগ্যের কোলে সমর্পণ করিয়া চলিয়া আসিয়াছি, সেইদিন হইতেই এই পত্র লেখার কথা ভাবিয়াছি, এবং দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছি। ভাবিয়াছি কেন আর। আমি তো তাহার আর কোনো উপকারে লাগিব না! (জলের পর্দাটা আবার দুলে উঠছে, সেই সঙ্গে সুবর্ণর ব্যাকুল আবেগ।...মা, মা, সেটাই তো পরম উপকার হতো! তোমার হাতের অক্ষর, তোমার স্নেহ সম্বোধন তোমার 'সুবর্ণ' নামে ডেকে ওঠা, হয়তো জীবনের গতি বদলে দিতো তোমার সুবর্ণর!) তথাপি বরাবর ইচ্ছা হইত তোমায় একটি পত্র দিই। তবু দেওয়া হয় নাই। কেন হয় নাই সেটা—এখন বুঝিতে পারি, দেওয়া হয় নাই কেবলমাত্র লজ্জায়। তোমার কাছে আমার অপরিসীম লজ্জা, তোমার কাছে আমার অপরাধের সীমা নাই। সে অপরাধের ক্ষমা নাই।

জীবনের এই শেষপ্রান্তে আসিয়া পৌঁছাইয়া মনের সঙ্গে যে শেষ বোঝাপড়া করিতেছি। তাহাতেই আজ এই সত্য নির্ধারণ করিতেছি, তোমাকে অমন করিয়া নিষ্ঠুর ভাগ্যের মুখে ফেলিয়া আসা আমার উচিত হয় নাই। হয়তো তোমার জন্য আমার কিছু করার ছিল।

তবু—ভগবানের দয়ায় তুমি হয়তো ভালই আছো, তোমার ছোড়দার কাছে জানিয়াছিলাম তোমার কয়েকটি সন্তান হইয়াছে ও খাইয়া পরিয়া একরকম সুখেই আছো। তবু এমনই আশ্চর্য চিরদিনই মনে হইয়াছে তুমি বোধহয় সুখে নাই।...(মা মা, তুমি কি অন্তর্যামী? সত্যই দুঃখী, দুঃখী, তোমার সুবর্ণ চিরদুঃখী!) এই অদ্ভুত চিন্তা বোধকরি মাতৃহৃদয়ের চিররহস্য। যদিও—মাতৃহৃদয়ের গৌরব করা আমার শোভা পায় না।...কিন্তু সুবর্ণ ভাবিতেছি তুমি কি আমার এই দুরূহ ভাষা বুঝিতে পারিতেছ? জানি না তোমার জীবন কোন পথে প্রবাহিত হইয়াছে, জানি না

গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৩, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা-১
ফোন: ২২-৬৫৮০

তুমি সে জীবনে শিক্ষা-দীক্ষার কোনো সুযোগ পাইয়াছ কি না, আজ তুমিও আমার অপরিচিত, আমিও তোমার অপরিচিত।

কিন্তু সত্যই কি তাই?

সত্যই কি আমরা অপরিচিত?

তবে কেন সর্বদাই মনে হয় সুবর্ণ ভাঙিয়া পড়ে নাই, সুবর্ণ ভাঙিয়া পড়িতে পারে না; সে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থায় সংগে যুদ্ধ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে পারিবে। তোমার মধ্যে সে অঙ্কুর ছিল। যে কয়টি দিন তোমাকে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি তাহাতে উক্ত ধারণাই বদ্ধমূল ছিল।

তাই মনে হয় তুমি হয়তো তোমার এই হৃদয়হীন মাকে কতকটা বুঝিতে পারো। হয়তো অবিরত ধিক্কার দিবার পরিবর্তে একবার একটু ভালবাসার মন নিয়া চিন্তা করো!

একদা সংসারের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া সংসার হইতে চলিয়া আসিয়াছিলাম, তুমি জানো, তোমাকে উপলক্ষ করিয়াই সেই ঝড়ের সৃষ্টি। বেশি বিশদ করিয়া সে সব কথা লিখিতে চাহি না। তবে এই সুদীর্ঘকাল সংসার হইতে দূরে থাকিয়া অবিরত মানুষকে বিশ্লেষণ করিতে করিতে এইটা বুঝিয়াছি এ সংসারে যাহাদের 'অন্যায়কারী' বলিয়া চিহ্নিত করা হয়, তাহারা সকলেই হয়তো শাস্তির যোগ্য নয়। তাহারা যা কিছু করে, তার সবটাই দুষ্টবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া করে না। অধিকাংশই করে না বুঝিয়া। তাহাদের বুদ্ধিহীনতাই তাহাদের অঘটন ঘটাইবার কারণ! কাজেই—তাহারা ক্রোধের যোগ্যও নয়। তাহারা বড়জোর বিরক্তির পাত্র, এবং করুণার পাত্র।

কিন্তু যখন ওই বুদ্ধিহীনতার সংগে একটা জীবনমরণের প্রশ্নের সঙ্ঘর্ষ লাগে, তখন মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া বিচার করা সহজ নয়। আর এও জানি সেদিন আমার পক্ষে এছাড়া আর কিছু সম্ভব ছিল না।... তোমার পিতা ও ভ্রাতারা আমাকে ফিরাইয়া লইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, পত্রে কোন কাজ না হওয়ায়, কাশীতে আসিয়াও অনুরোধ উপরোধ ও তিরস্কার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যাহা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি তাহা আর হাতে তুলিয়া লওয়া চলে না! সেই ফেলিয়া আসা সংসার-জীবনের সহিত, আবার নিজেকে খাপ খাওয়ানোও অসম্ভব! তুমি জানো—হয়তো তোমার দাদামহাশয় তখন কাশীবাসী, তাঁহার কাছে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া তদানীন্তন বহু কাশীবাসী পণ্ডিতের নিকট নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সন্ধান করিয়াছি হিন্দু বিবাহের মূল তাৎপর্য কি, মূল লক্ষ্য কি, এ বন্ধন যথার্থই জন্ম-জন্মান্তরের কি না! কিন্তু যখনই প্রশ্ন তুলিয়াছি এই বন্ধনের দৃঢ়তা পুরুষ ও নারীর পক্ষে সমান নয় কেন, পুরুষের পক্ষে 'বিবাহ' একটি ঘটনা মাত্র, অথচ নারীর পক্ষে চির-অলঙ্ঘ্য কেন, সদুত্তর পাই নাই। উপরন্তু এই প্রশ্নের অপরাধে অনেক স্নেহশীল পণ্ডিতের স্নেহ হারাইয়াছি। ক্রমশ বুঝিয়াছি এর উত্তর ভবিষ্যৎকালই দিবে। কারণ কোনো একটি সম্পত্তিতে ভোগ-দখলকারী ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সহজে দানপত্র লিখিয়া দেয় না।... স্ত্রীলোকের যাহা কিছুতে অনধিকার, তাহার অধিকার অর্জন করিতে হইবে স্ত্রীজাতিকেই।

কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন ধৈর্যের।

ইহাই সার কথা, ধৈর্য ব্যতিরেকে কোনো কাজই সফল হয় না। এই কথাটি বুঝিতে আমার সমগ্র জীবনটি লাগিয়াছে, আর এই কথাই মনে হইয়াছে একথা বলিয়া যাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু কে কান দিবে? তোমাকে বলিবার ইচ্ছা হইয়াছে, সঙ্কোচে কুণ্ঠায় নীরব থাকিয়াছি। তাছাড়া এ ভয়ও ছিল হয়তো আমার পত্র তোমার সাংসারিক জীবনে অশান্তির সৃষ্টি করিবে। তাই ইহা আমার মৃত্যুর 'পর তোমার হাতে পৌঁছাইবার নির্দেশ দিয়াছি। হয়তো তখন তোমার এই সংসারত্যাগিনী মাকে, তোমার স্বামীর সংসার একটু সদয়চিত্তে বিচার করিবে। হয়তো ভাবিবে আর কি ক্ষতির সম্ভাবনা।

তোমাকে এত কথা লিখিতেছি, কারণ বুদ্ধি ও যুক্তির দ্বারা বুঝি তুমি এখন একটি বয়স্থা গৃহিণী, কিন্তু মা সুবর্ণ, তোকে যখন দেখিতে চেষ্টা করি তখন একটি ক্ষুদ্র বালিকা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না। পরনে ঘাগরা, মাথার চুল বেণী করিয়া বাঁধা, হাতে বই-খাতা শ্লেট, একটি স্কুল পথযাত্রিণী বালিকা!

তোর এই মূর্তিটি ভিন্ন আর কোনো মূর্তিটি ছাড়া আর কোনো মূর্তিই আমার সুবর্ণ! সেই যে তোকে তোর স্কুলের গ্রীষ্মের ছুটির সময় দেশের বাড়িতে তোর ঠাকুরমার নিকট পাঠাইয়া দিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম, সেই দেখাই তো শেষ দেখা!

কিন্তু তেমন ইচ্ছা করিলে কি আমি তোমায় আর একবার দেখিতে পাইতাম না। আর তেমন ইচ্ছা হওয়াই তো উচিত ছিল। কিন্তু সত্য কথা বলি, তোমার সেই মূর্তিটি ছাড়া আর কোনো মূর্তিই আমার দেখিতে ইচ্ছা ছিল না।...তোমাকে লইয়া আমার অনেক আশা ছিল, অনেক সাধ-স্বপ্ন ছিল, কিন্তু সব আশাই চূর্ণ হইয়া গিয়াছেল, তবু ওই মূর্তিটি আর চূর্ণ করিতে ইচ্ছা হয় নাই।...তুমি হয়তো ভাবিতেছ এসব কথা এখন আর লিখিবার অর্থ কি? হয়তো কিছুই অর্থ নাই, তবু মানুষের সব চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষাই তো কেহ তাহাকে যথার্থ করিয়া বুঝুক!... আমাকে কেহ বুঝিল না! এর বড়ো আক্ষেপ বোধহয় আর কিছুই নাই। পুরুষ মানুষের একটা কর্মজীবন আছে, সেখানে তাহার গুণ কর্ম রুচি প্রকৃতির বিচার আছে। সেখানেই তাহার জীবনের সার্থকতা অসার্থকতা। মেয়েমানুষের তো সে জীবন নাই, তাই তাহার একান্ত ইচ্ছা হয় আর কেহ না বুঝুক, তাহার সন্তান যেন তাহাকে বুঝে, যেন তাহার জন্য একটু শ্রদ্ধা রাখে একটু মমতার নিশ্বাস ফেলে সেইটুকুই তার জীবনের যথার্থ সার্থকতা। হয়তো মৃত্যুর পরেও এ ইচ্ছা মরে না, তাই এই পত্র।

হয়তো তুমি চিরদিনই তোমার মমতাহীনা মাকে ধিক্কার দিয়াছ, কিন্তু মৃত্যুর পরও যদি সে ভাবের পরিবর্তন হয়, বুঝি বা আত্মা কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিবে। তাই মৃত্যুর দ্বারে আসিয়া এই পত্র।

সুবর্ণ তুমি আমাকে ভুল বুঝিও না।

তোমার ছোড়দাদা মোগলসরাইতে কাজ করে, মাঝে মাঝে আসে। নিষেধ শোনে না। মনে হয় সে হয়তো আমাকে কিছুটা বোঝে, তাই কখনো তোমার দাদার মত মায়ের অপরাধের বিচার করিতে বসে না। এখানে আসিয়াই আমি যে মেয়ে স্কুলটি গড়িয়াছিলাম। তাহার পরিসর এখন যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে, তোমার ছোড়দা স্বেচ্ছায় মাঝে মাঝে তাহার দেখাশুনা করে, মনে হয়, আমার মৃত্যুর পর স্কুলটি টিকিয়া থাকিতেও পারে। প্রথম প্রথম বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া ছাত্রী সংগ্রহ করিতে হইত। ক্রমশ অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে, পিতামাতারা স্বেচ্ছায় আগাইয়া আসিতেছেন, এবং অনুধাবন করিতেছেন, দেশে স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজন আছে।

আশা হয় এইভাবেই 'কালের' চেহারার পরিবর্তন হইবে। মানুষের বুদ্ধি বা শুভবুদ্ধি সহজে যাহা করিয়া তুলিতে সক্ষম না হইবে, 'প্রয়োজন' আর ঘটনাপ্রবাহই তাহাকে সম্ভব করিয়া তুলিবে।

কেবলমাত্র পুঁথিপত্রে বা কাব্যে-গানে নহে, ভবিষ্যতে জগতের সবক্ষেত্রেই পুরুষমানুষকে একথা স্বীকার করিতেই হইবে মেয়েমানুষও মানুষ! বিধাতা তাহাদেরও সেই মানুষের অধিকার দিয়াই পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন, একপক্ষের সুবিধা সম্পাদনের জন্যই তাহাদের সৃষ্টি নয়।

মহাকালই পুরুষ জাতিকে এ শিক্ষা দিবে।

তবে এই কথাই বলি—এর জন্য মেয়েদেরও তপস্যা চাই! ধৈর্যের, সহ্যের, ত্যাগের, ক্ষমার তপস্যা।

মনে করিও না উপদেশ দিতে বসিয়াছি।

সময়ে যাহা দিই নাই, এখন এই অসময়ে আর তাহা দিতে বসিব না। শুধু নিজের সমগ্র জীবন দিয়া যাহা উপলব্ধি করিয়াছি, সেই কথাটি কাহাকেও বলিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু তোমাকে ছাড়া আর কাহাকে বলিব? আর কেই বা কান দিয়া শুনিবে। স্ত্রীলোকেরা তো আজও অজ্ঞতার অহংকার ও 'মিথ্যা স্বর্গের' মোহে তমসাচ্ছন্ন। তাহারা যেন বিচার বুদ্ধির ধার ধারিতেই চাহে না। ভাবনা হয়—সহসা যেদিন তাহাদের চোখ ফুটিবে, যেদিন বুঝিতে শিখিবে ওই 'স্বর্গের' স্বরূপ কি, সেদিন কি হইবে! বোধকরি সেদিনের পথ-নির্ণয় আরো শতগুণ কঠিন।

তবু এখানে বহু তীর্থবাসিনী ও নানান অবস্থার স্ত্রীলোকদের সংস্পর্শে আসিয়া, এবং আপন জীবন পর্যালোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, যদি সংসারের মধ্যে থাকিয়াই জীবনের সর্ববিধ উৎকর্ষ সাধন করিয়া পূর্ণতা অর্জন সম্ভব হয়, তাহাই প্রকৃত পূর্ণতা।

কিন্তু তেমন 'সম্ভব' কয়জনের পক্ষেই বা সম্ভব। প্রতিকূল সংসার তো প্রতিনিয়তই আঘাত হানিয়া হানিয়া সে পূর্ণতার শক্তিকে খর্ব করিতে বদ্ধপরিকর।...'মেয়েমানুষ মমতার বন্ধনে বন্দী',...'মায়ের বাড়া নিরুপায় প্রাণী আর নাই', এ তথ্য বুঝিয়া ফেলিয়াই না পুরুষের গড়া সমাজ এতো সুবিধা নেয়, এতো অত্যাচার করিতে সাহসী হয়। তবে এ বিশ্বাস রাখি একদিন এ দিনের অবসান হইবেই। দেশের পরাধীনতা দূর হইবে, স্ত্রীজাতির পরাধীনতা দূর হইবেই।

শুধু আশা করিতে ইচ্ছা হয় ভবিষ্যৎকালের সেই আলকোজ্জ্বল দিনের মেয়েরা—আজকের এই অন্ধকার দিনের মেয়েদের অবস্থা চিন্তা করিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে, আজকের দিনের মায়েদের মর্মজ্বালা অনুভব করিয়া একবিন্দু অশ্রু বিসর্জন করিতেছে, আজ যাহারা যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণপাত করিল, তাহাদের দিকে একটু সশ্রদ্ধ দৃষ্টিপাত করিতেছে।

মা সুবর্ণ, এসব কথা না লিখিয়া যদি লিখিতাম 'সুবর্ণ এযাবৎকাল আমি তোমার জন্য কাঁদিয়াছি—' হয়তো তুমি আমার হৃদয়টা শীঘ্র বুঝিতে। কিন্তু সুবর্ণ, আমি যে শুধু আমার সুবর্ণর জন্যই কাঁদি নাই, দেশের সহস্র সহস্র সুবর্ণলতার জন্য কাঁদিয়াছি। তাই এই সব কথা।

তাছাড়া অবিরত শুষ্কজ্ঞানের চর্চায় কাটাইতে কাটাইতে ভাষাও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তাই মাঝে মাঝেই মনে হইতেছে, তুমি কি এত কথা বুঝিতে পারিতেছ। ন'বছর বয়স হইতেই তো তোমার বিদ্যা শিক্ষায় ইতি হইয়াছে। আবার দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে, তুমিও নিশ্চয়ই এসব কথা ভাবো, তুমিও কেবলমাত্র নিজের কথাই নয়, আরো সহস্র মেয়ের কথা চিন্তা করো।

অধিক আর কি লিখিব, আমার শতকোটি আশীর্বাদ গ্রহণ করো। তোমার পরিজনবর্গকেও জানাইও। আর যদি সম্ভব হয়, তোমার এই চিরনিষ্ঠুর মাকে—অন্তত তার মৃত্যুর পরও ক্ষমা করিও।

ইতি

তোমার নিত্য আঃ মা

অনেকবার অনেক ঝলক জল গালের উপর গড়িয়ে পড়েছে, অনেকবার সে জল শুকিয়েছে, এখন শুধু গালটায় লোণাজল শুকিয়ে যাওয়ার একটা অস্বস্তির অনুভূতি।

না কি শুধু গালেই নয় অসাড় অসাড় অনুভূতি দেহমনের সর্বত্র।

স্তব্ধ, মৃত্যুর মত স্তব্ধ।

যেন এ স্তব্ধতা আর ভাঙবে না কোনোদিন। শুধু এই স্তব্ধতার অন্তরালে বহে চলবে অন্তহীন একটা হাহাকার।

সুবর্ণর মা নিজেকে জানিয়ে গেল, সুবর্ণকে জেনে গেল না।

সুবর্ণর মা সন্দেহ করে গেল সুবর্ণ এত সব কথা নিয়ে ভাবে কি না।

[ক্রমশঃ]

মাঢ়ী সুস্থ ও সবল রাখতে
এবং মুখের গন্ধ দূর করতে
নিম অদ্বিতীয়
নিমের উপকারিতা হাজার হাজার বছরের পরীক্ষিত সত্য

ভারতীয়দের সুদৃঢ় ও ঝকঝকে দাঁত বিদেশীদের বিস্ময় ও প্রশংসার বিষয়। এই প্রশংসনীয় দাঁতের মূলে ছিল নিমের দাঁতনের নিয়মিত ব্যবহার। অবশ্য নিম দাঁতনের স্থান এখন বহুলাংশে গ্রহণ করেছে নিম টুথ পেস্ট। কারণ, নিম টুথ পেস্টে নিমের সক্রিয় উপাদান ছাড়াও আছে ফ্লুরাইড এবং দাঁতের পক্ষে উপকারী অধুনা-আবিষ্কৃত অন্যান্য উপকরণাদি যা দাঁত ও মাঢ়ী সুদৃঢ় করে, পাইওরিয়া ও দন্তক্ষয় নিবারণে সাহায্য করে, মুখের দুর্গন্ধ দূর ক'রে শ্বাসপ্রশ্বাস সুরভিত এবং দাঁত ঝকঝকে করে তোলে।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল
CMF-1803-66

আটক অবস্থায় অধ্যক্ষ সনৎ বসু

রেশন সমাচার

মনস্তাত্ত্বিক রাজনীতি বোধ হয় ব্যবহারিক রাজনীতির একটা অঙ্গ, এবং যে কোন বুদ্ধিমান সরকারই বোধ হয় জনসাধারণের দৌড়টা কতদূর হতে পারে এটা হিসাব করেই বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ করে।

ফেব্রুয়ারী-মার্চের খাদ্য আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রীতিমত ভয় পেয়ে গেছলেন। তারপর আলোচনা টেবিলে যখন বন্দীমুক্তির প্রশ্নটাই মুখ্য হয়ে উঠল তখন মুখ্যমন্ত্রীমশাই-এর ঠোঁটের কোণে একটি সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল, বুঝেছিলেন এদের দ্বারা কিছু হবে না।

তারপর থেকেই সরকারের তরফ থেকে একের পর এক পীড়নমূলক নির্দেশ জনসাধারণের উপর নেমে এসেছে, এবং মোটের উপর জনসাধারণ সেগুলি সহ্য করতে বাধ্য হয়েছেন। না করেই বা উপায় কি? বাম-দাদাদের উপর বড় একটা ভরসা করা যায় না, গত দু-মাসে ধরে বামপন্থী ঐক্যের হালচাল দেখে জনসাধারণ একথাই বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছেন। ফলে বিগত ফেব্রুয়ারী মার্চ থেকে দেশজোড়া যে একটা আশাবাদের সৃষ্টি হয়েছিল তা' নভেম্বর-ডিসেম্বরে একেবারেই বিনষ্ট হয়েছে।

এরই ফলে জনসাধারণের ভিতর যে মনস্তাত্ত্বিক নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার পুরোপুরি সুযোগ নিচ্ছেন। **তিন সপ্তাহও পার হয় নি, সরকার গমের দাম বাড়িয়েছেন, কোন প্রতিবাদ ওঠে নি। সম্প্রতি সরকার রেশন দোকানে চালের সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছেন। দু-বেলা রুটি সহ্য করার মত পেট এখনো বাঙালীর গড়ে ওঠে নি, তবুও কোন প্রতিবাদ নেই।**

এদিকে কালোবাজারে চাল গা ঢাকা দিয়েছে। কর্ডন প্রথা নমনীয় করে দেবার দরুন কালোবাজারে চালের দাম রীতিমত পড়ে গেছল। তাদের মুরুব্বিদের প্রভাবে পড়ে কি সরকার কালোবাজার পুনরায় তেজী করবার জন্যই কি হঠাৎ রেশনে চালের যোগান বন্ধ করলেন?

পশ্চিমবঙ্গে তো এ সময় চালের অভাব হবার কথা নয়। বেশ কিছুকাল আগে থেকেই তো ধান কাটা শুরু হয়েছে। মাত্র তিন-চার বছর আগেও এ সময়টায় নতুন চালে বাজার ভরে উঠত। ধান কাটার পালা যাঁদের সাঙ্গ হয়েছে তাঁরা আপাতত তা আগলে বসে আছেন, এবারকার সরকারী সংগ্রহনীতিটা কিভাবে প্রযুক্ত হয় তা দেখার অপেক্ষায়। মাস দেড়েক আগে কর্ডনিং-এর চাপ কিছুটা নরম হওয়ায় কালোবাজারে যে চালের দাম পড়ে গেছল তারই ফলে চোরাচালানের গতিপথের পরিবর্তন হয়েছে। লালগোলার একজন অধিবাসী সেদিন জানালেন যে ওই অঞ্চলের সমস্ত চাল বিহারে চলে যাচ্ছে। বস্তুত গ্রামের বাজারেই এখন চাল দু-টাকা কিলো দরে বিক্রি হচ্ছে।

এবারের সংগ্রহনীতি যে কি রকম হবে রেশন ব্যবস্থা আদৌ বলবৎ থাকবে কি না তার কোনই মাথামুণ্ডু প্রচুর চিন্তা করেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। গত সংখ্যার বঙ্গদর্শনে লিখেছিলাম যে একদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অপরদিকে ফুড কর্পোরেশন এই দুই মত্তহস্তীর দাপাদাপিতে মাঠের ফসল মাঠেই নষ্ট হবে, ঘরে উঠবে না। হুগলী জেলার খন্যান থেকে ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গত ৭ই ডিসেম্বরের দৈনিক বসুমতীতে একটি চিঠিতে লিখেছেন যে পাণ্ডুয়া থানার একটি বিরাট অংশ আজ এক শোচনীয় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। সরকার এক নির্দেশে কর্ডনের সীমানা থেকে পাঁচ মাইলের মধ্যে যত ধানকল আছে তা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছেন। ফলে এই ধান ওঠার সময়ে এই অঞ্চলে প্রায় কারও ঘরেই চাল নেই। সমস্ত মাঠ জুড়ে ধান, কিন্তু তা কাটা বা তোলার জন্য জনমজুরদের কেউ কাজে লাগাতে পারছেন না। কারণ মজুরীর জন্য যে চাল দেওয়ার কথা (মাথা পিছু পাঁচ পোয়া) তা কোন চাষীর ঘরেই নেই। তাই মাঠের ধান মাঠেই পড়ে আছে। এই অজন্মার বছরে যে দু-মুঠো ধান তাঁদের হয়েছে, তাও আস্তে আস্তে মাঠে ঝরে পড়ছে বা বিভিন্ন উপায়ে নষ্ট হচ্ছে।

একটা সুস্থ খাদ্যনীতি অনুসরণ করার জন্য আমরা সরকারকে বারবার অনুরোধ করেছি। আমরা এও দেখিয়ে দিয়েছি যে কায়েমী স্বার্থের বশীভূত না হলে তা একদণ্ডেই করা সম্ভব। কিন্তু সরকার যেখানে সেই স্বার্থের কবলিত, যেখানে খোদ কেন্দ্রীয় সরকারেই খাদ্যনীতি উৎপাদন ও বন্টনব্যবস্থার উপর জোর না দিয়ে বিদেশ থেকে আমদানীর উপর আশ্রয় করেছে, সেখানে উপদেশ দেওয়া বৃথা।

রেঙ্গুনের চাল গঙ্গার মোহনায় এসেছে, সংবাদপত্রের দৌলতে মুখ্যমন্ত্রীর এই আশ্বাসবাণী পশ্চিমবঙ্গবাসী শুনেছেন, এখন দেখা যাক সে চাল কবে রেশন দোকানে আসে!

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী

তেরই সেপ্টেম্বরের গণছুটির ব্যাপারটা সরকার কিছুতে ভদ্রভাবে হজম করতে পারছেন না, এবং সেই কারণেই সরকারী কর্মচারীদের শায়েস্তা করবার জন্য একের-পর-এক অগণতান্ত্রিক নীতির আশ্রয় নিয়ে চলছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সরকারী কর্মচারীদের জন্য নতুন করে যে আচরণবিধি প্রণয়ন করতে চলছেন তাতে সরকারী কর্মচারীদের সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি হরণ করা হয়েছে, এমন কি তাঁদের একত্র সমবেত হবার বা শোভাযাত্রা করারও অধিকার দেওয়া হয় নি। তাঁদের সংগঠনগুলির বৈধ অধিকারসমূহও স্বীকৃত হয় নি।

অবশ্য সরকারী কর্মচারীরাও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই দমননীতিতে বিচলিত হন নি। গত ৬ই ডিসেম্বর মনুমেণ্ট ময়দানে সরকারী কর্মচারীদের এক বিরাট সমাবেশে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে যে এই বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই যদি—সরকার রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের

দাবি-দাওয়ায় অস্বীকৃত হন তাহলে আগামী ৫ই জানুয়ারী সারা ভারতের লক্ষ লক্ষ সরকারী কর্মচারী একযোগে কর্মবিরতি পালন করে—দেশজোড়া প্রশাসনযন্ত্রকে অন্তত একদিনের জন্যও অচল করে দেবেন।

পরদিন রাত্রে ভারত সভা হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে তাঁদের ন্যায়সংগত দাবি-দাওয়ার প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তীব্র নিন্দা করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

অপর দিকে সরকারও একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন যার ফলে বৃহস্পতিবার ৮ই ডিসেম্বর তারিখে রাইটার্স বিল্ডিং-এ এক অভূতপূর্ব ঘটনার উদ্ভব হল। ওই দিন টিফিনের সময় নন-গেজেটেড কর্মচারিগণ পূর্ব নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুসারে পাঁচ মিনিটকাল বিক্ষোভ ধ্বনি করবার পর চারজন কর্মচারীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলে, কর্মচারিগণ সমবেতভাবে প্রায় দু' ঘণ্টাকাল আটক কর্মীদের মুক্তির দাবিতে তাঁদের ঘেরাও করে বসে থাকলে সমগ্র রাইটার্স বিল্ডিং-এর কাজকর্ম অচল হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত সরকারকে কিছুটা নরম হতে হয় এবং বেলা চারটের সময় আটক ব্যক্তিদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

বস্তুত সরকারী নির্দেশনামাই কর্মচারীদের অনমনীয় সংকল্পে আবদ্ধ করছে। এই দিনটি ছিল রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বিক্ষোভ সপ্তাহের চতুর্থ দিন, কর্মসূচী ছিল কালো ব্যাজ পরে টিফিনের আধ ঘণ্টাকাল ক্যান্টিন হলের পাশের করিডরগুলিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন। এদিকে চীফ সেক্রেটারী মহোদয় একটি সার্কুলার জারী করেছেন যে শেলাগান দেওয়া, কালো ব্যাজ পরা প্রভৃতি দণ্ডনীয় বলে গণ্য হবে।

বস্তুত গণতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিবাদ জানানোর বৈধ পন্থাগুলিকে অস্বীকার করে সরকারপক্ষই জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিতে চলেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার বোধ হয় তাঁর কর্মচারীদের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ভাবছেন। আজকে একথা খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে এই দুর্মূল্যের বাজারে যেখানে প্রত্যহ প্রতিটি পণ্যের দাম পূর্বের দিনের তুলনায় বেশি হচ্ছে সেখানে সরকারী কর্মচারীদের যে বেতন দেওয়া হচ্ছে প্রয়োজনের তুলনায় তা যে কত অল্প তা নতুন করে বলার কোন প্রয়োজন নেই। সরকারও যে তা অস্বীকার করেন তা-ও নয়। অথচ কর্মচারীদের আর্থিক প্রয়োজন না

রাইটার্স বিল্ডিংসে আটক কর্মীদের মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ

মিটিয়ে যদি শুধু কর্তব্যনিষ্ঠার গালভরা উপদেশই দেন তাতে পেট ভরবে না, বিক্ষোভ বাড়বে। সরকারী কর্মচারীরা আকাশের চাঁদও দাবি করছেন না, চাইছেন শুধু পরিবারের মুখে দু'মুঠো অন্ন তুলে দেওয়ার সংস্থান।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁর পেটোয়া পুলিশের জন্য জলের দরে যেখানে ফাইন চাল সরবরাহ করছেন, সেখানে তাঁদেরই কর্মচারীদের প্রতি এই দমননীতি শুধু যে অমানবিক তাই নয়, নিছক দুর্বুদ্ধিপ্রসূত এ কথা না বলে পারা গেল না।

নৈরাজ্যবাদ

শিক্ষারাজ্যে পর পর যে ঘটনাগুলি দিনের পর দিন ঘটে যাচ্ছে তাতে নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে থাকা ভিন্ন আর কারো কি কোন কাজ নেই? বিগত ৮ই ডিসেম্বর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় তালা পড়ে গেল। ওই দিনই সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্ররা যে রকম আচরণ করল তা দেখে মনে হচ্ছে যে শিক্ষাজগতে যেন গুণ্ডাতন্ত্রের আবির্ভাব হয়েছে। গত দু'মাস ধরে শিক্ষাজগতে যে ভূতের নৃত্য চলছে তাতে সব পক্ষই সমান নির্বিকার। প্রত্যেক পক্ষই নিজ দায়িত্ব অস্বীকার করে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মহোদয় এখন অন্য কাজে লিপ্ত, এদিকে তাঁর দৃষ্টি দেবার কোন অবকাশই নেই. যদিও তিনি চ্যান্সেলর। ভাইস-চ্যান্সেলর সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দুর্যোগের দিনে দিব্যি গা-ঢাকা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পার্বত্য সম্মেলনে বাণী পাঠাতে তাঁর সময়ের কোন অভাব হয় না, কিন্তু এতবড় একটা বিষয়ে তিনি যে কিভাবে নির্বিকার হয়ে বসে আছেন সেটা ভাবতেও অবাক লাগে। খুব দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে ত্রিগুণা সেনের মত লোক ভাইস-চ্যান্সেলর থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়কে এতখানি দুর্যোগের ঝড় পোহাতে হত না। রেজিস্ট্রার মশাই তো হাতে আইনের বই নিয়েই বসে আছেন, অবশ্য তিনি তো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী নন। তা সত্ত্বেও তাঁর ভূমিকাটা হয়েছে নিষ্ক্রিয় দর্শকের মতই, তাঁর কাছ থেকে আরও কিছুটা দক্ষতা আশা করা গেছল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগের মুখে রা-টি নেই, তাঁরা একেবারে কুলুপ এঁটে বসে আছেন, শিক্ষামন্ত্রী মশাই বোধ হয় নিজের নির্বাচন কেন্দ্র নিয়ে ব্যস্ত। মুখ্যমন্ত্রী অনাবশ্যক কলেজের মাস্টারমশাইদের গালগাল দেওয়া ভিন্ন আর কিছুই করেন নি। তিনি যদি অধ্যাপক হতেন তো গাছতলাতেই ক্লাশ নিতেন এই মহাবাণীটি ছাড়া তাঁর মুখ থেকে একটি কথাও খসানো যায় নি। এদিকে না হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীদের মাসিক বেতনলাভ (অবশ্য শোনা গেছে কেউ কেউ পেয়েছেন), না পেয়েছে কন্ট্রাক্টারেরা তাদের পাওনা, না পেয়েছে বৃত্তিভোগী ছাত্র তার স্কলারশিপ, পরীক্ষক তাঁর খাতা দেখার টাকা। লোকসান যদি শুধুমাত্র অর্থমূল্যেই হত তাহলে কিছু বলবার ছিল না। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের যে একটি পুরো বছর ক্ষতির খাতায় চলে গেল তার হিসাব কে রাখে। এম. এ. এম. এসসি· পরীক্ষা অনির্দিষ্টকাল স্থগিত রইল, এর ফলাফলটা যে কী রকম মারাত্মক তা কি কেউ উপলব্ধি করেছেন? ডাক্তারী ছাত্রদের

ক্ষতি হল অসাধারণ। কত পরীক্ষার ফল প্রকাশ রইল আটকে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির পথ হয়ে গেল রুদ্ধ। নানাভাবে দিনের পর দিন ধরে এই যে ক্ষতি হতে দেওয়া হল সেটা কিভাবে পূরণ হবে? আসলে দেশে আজ সত্যিকারের ব্যক্তিত্বের অভাব হয়েছে, প্রত্যেকেই সুবিধাবাদী, দায়িত্ব এড়াতে পারলেই বাঁচেন। এখানে নেতৃত্বে প্রশাসনযন্ত্রে সর্বত্রই যে ঘুণ ধরেছে তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ শিক্ষাজগতে আজকের এই নৈরাজ্যবাদ।

পরিশেষে ছাত্র-বন্ধুদের নিকট আমাদের জিজ্ঞাস্য : এ জাতীয় সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে তাঁরা কি তাঁদের অভীষ্ট সিদ্ধি করতে পারবেন? অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে তাঁদের কোন অভিযোগ থাকলেও, তাঁকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে রেখে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ দিয়েই কি তাঁরা জনসমর্থন পাবেন আশা করেন? দেশের সমগ্র ছাত্রসমাজ কি তাঁদের পিছনে আছেন বলে তাঁরা মনে করেন? তা যদি হত তাঁদের এই দীর্ঘ আন্দোলনে অন্যান্য কলেজসমূহে নিশ্চিন্তে পড়াশোনা চলতে পারত না। আন্দোলনকারী ছাত্রদের প্রতি যেটুকুও বা সমর্থন জনসাধারণের মধ্যে জেগেছিল, ৮ই ডিসেম্বর বেলেল্লাপনায় তাঁরা কি তা নষ্ট করলেন না?

পার্বত্য জাতি সম্মেলন

গত সপ্তাহে কলকাতায় উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য জনগণের যে সম্মেলন হয়ে গেল—নানা দিক দিয়েই তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বিভিন্ন পার্বত্য জাতির তরফ থেকে শতাধিক প্রতিনিধি এবং বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গ এই বিশেষ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

এতদিন যাঁরা নৃতত্ত্ববিদদের গবেষণার সামগ্রী হয়েছিলেন, আজ তাঁদেরই মুখ থেকে তাঁদের জীবনের নানা সমস্যার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ দেশবাসীরা পেলেন।

এই প্রথম এইরকম সম্মেলন এদেশে অনুষ্ঠিত হল। এই সম্মেলনের চরিত্র ছিল অরাজনৈতিক, এই কারণেই তা এতখানি সার্থকভাবে আমাদের চিন্তাকে নাড়া দিতে সক্ষম হয়েছে।

গত শতক থেকে নৃবিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় উত্তর-পূর্ব ভারতের পশ্চাদপদ পার্বত্য উপজাতিসমূহের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির পরিচয় কিছু কিছু কৌতূহলী ব্যক্তির নিকট আকর্ষণীয় হয়েছে, কিন্তু শিক্ষিত জনসমাজের নিকটেও এই সকল উপজাতি সম্পর্কিত বহু তথ্যই উদ্ঘাটিত হতে পারে নি, তার কারণ ভারতবর্ষের দেশীয় ভাষাগুলিতে এই সকল পার্বত্য-জাতিদের জীবনযাত্রা সংক্রান্ত কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। তদুপরি গার্ডন, প্লেফেয়ার, হাডসন প্রমুখ নৃবিজ্ঞানীদের গ্রন্থাবলীই আজও পর্যন্ত এই সকল উপজাতিদের জীবনযাত্রা সংক্রান্ত তথ্যাবলী জানার একমাত্র উপায়, কিন্তু এই সব লেখকের গ্রন্থই রচিত হয়েছিল আজ থেকে অর্ধ শতাব্দী পূর্বে। এই অর্ধ শতাব্দীর অবসরে সারা দেশব্যাপী অজস্র পরিবর্তন ঘটে গেছে, এবং সেই পরিবর্তনের প্রভাব এই সকল পার্বত্য জাতিদের জীবনেও পড়েছে। তাদের সনাতন জীবনযাত্রার মধ্যেও অনেক পরিবর্তন এসেছে, কিন্তু এই পরিবর্তনকে তাঁরা কিভাবে গ্রহণ করছেন তার সঠিক কোন পরিচয় আমাদের জানা ছিল না, যা এবারে জানা গেল আমাদের আলোচ্য সম্মেলনে তাঁদের প্রতিনিধিদের কথায়।

পার্বত্য জাতিদের প্রতিনিধিরা একবাক্যে বলেছেন যে, তাঁরা স্বাভাবিকভাবে পরিবর্তনসমূহকে গ্রহণ করতে চান, এবং এই কারণেই তাঁরা চান দেশের অপরাপর অংশের অধিবাসীদের সঙ্গে সমমর্যাদা, তাঁরা যাদুঘরের দর্শনীয় বস্তু হয়ে থাকতে চান না। তাঁরা ট্রাইব বা ট্রাইবাল শব্দটিও পছন্দ করেন না কেন না এই শব্দের দ্বারা যেন এটাই বোঝান হয় যে এখনো তাঁরা বন্য বর্বর জীবন যাপন করছেন। এটা অবশ্য কিছুটা সেন্টিমেন্টের কথা, কেন না আমরা সমতলবাসীরাও ট্রাইবাল পর্যায় থেকে খুব বেশি ধাপ অগ্রসর হই নি, শিক্ষা ও যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রভাবে তাঁরাও সে কটি ধাপ খুব সহজেই অতিক্রম করবেন, এ নিয়ে অনাবশ্যক খেদ করার কিছু নেই, বিশেষ করে যখন তাঁরা স্বেচ্ছায় তাঁদের পুরাতন গণ্ডীকে অতিক্রম করার ঐতিহাসিক দায়িত্ব নিজেরাই গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু তাঁদের বক্তব্যগুলি আমাদেরও কিছুটা নতুন চিন্তার খোরাক দিয়েছে। সরকারেরও এ দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। তাঁদের তরফ থেকে তাঁরা ভারতবর্ষের অবশিষ্ট অংশের মানুষদের সঙ্গে সমমর্যাদা দাবি করলেও সেই রকম কোন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় ভারত সরকার এতাবৎকাল দিয়েছেন কি? নিজেদের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ যাতে রাখা যায় সেই উদ্দেশ্যে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের যে সুযোগ ভারতবাসীরা পেয়েছেন সে রকম কোন সুযোগ উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য জাতিদের দেওয়া হয় নি, এই অভিযোগ পার্বত্য সম্মেলনের প্রতিনিধিবর্গ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, তাঁরা ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যেই পৃথক পার্বত্য রাজ্য গঠন করতে চান এবং আশা করেন যে ভারত সরকার বর্তমান নীতি পরিত্যাগ করে পৃথক পার্বত্যরাজ্য সৃষ্টির দ্বারা পার্বত্য জাতিসমূহকে ভারতীয় গণতন্ত্রের সমান অংশীদার ও সমমর্যাদাসম্পন্ন নাগরিক বলে গ্রহণ করবেন।

কলকাতা মেডিকেল কলেজের নার্সদের নিরাপত্তার অভাব

এঁরা সবাই ফ্লোরেন্স নাইটিংগল না হতে পারেন, কিন্তু মানুষের সেবায় এঁরাও আছেন। রোগীর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এঁদের নাড়ী-নক্ষত্রে, অথচ এমনই আশ্চর্য, এঁদের দিকটাই আজ পর্যন্ত অবহেলিত। আমরা ভুলে যাই এঁদেরও রোগ বালাই, ক্ষুৎ-পিপাসা, ঘর-সংসার আছে, নিরাপত্তার প্রয়োজন আছে এঁদেরও। সব ভয়-ভাবনার দায়িত্ব থেকে মুক্ত না করে একমাত্র সেবিকা নাম দিয়ে এঁদের কাছ থেকে সেবা আদায় করাই যেন উদ্দেশ্য। অথচ এঁদের ঘরে কারো রুগ্ন পিতা, কারো রুগ্ন মাতা, কারো বা নিজেরই অসুখ-বিসুখ—তবু আহার নেই, নিদ্রা নেই সাদা অ্যাপরন পরিহিতা নার্সরা নীরবে কাজ করে চলেছেন। ঠিক সময়ে রোগীর পাশে দেখা যাবে থার্মোমিটার হাতে দাঁড়িয়ে কিংবা ওষুধের শিশি থেকে ওষুধ ঢালতে এক মিনিট সময়ও নষ্ট করেন নি।

হাসপাতালের কঠিন কর্মের মধ্যে যাঁরা রোগীর যাবতীয় খবর রাখেন, এবং রোগীরাও যাঁদের কল্যাণস্পর্শকে নিরাপদ আশ্রয় বলে মনে করেন—তাঁদের জন্য সমাজের সহানুভূতি কতোখানি, কিংবা সরকার তাঁদের জন্য স্বাধীনোত্তর ভারতে কী করতে পেরেছেন—এ সব প্রশ্ন অবান্তর নয়। এবং সেই উদ্দেশ্যেই আমরা ইতোপূর্বে হাসপাতালের সেবিকাদের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী তুলে ধরেছিলাম ভেবেছিলাম সেখানেই শেষ হবে। কিন্তু সেবিকারা আজ নিজেরাই এগিয়ে এসেছেন তাঁদের চরম লাঞ্ছনা ও দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী জানাতে। তাঁদের কথা আমরা জানাতে চাই। কারণ হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ ও সরকার এঁদের কথা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করুন—এই আমাদের অভিপ্রায়।

দিন কয়েক আগে কলকাতার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নার্স কোয়ার্টারে চুরি হয়েছে। চুরি যা হবার হয়েছে, চোরও পলাতক, কিন্তু ঘটনার ইতিবৃত্ত জনৈক নার্সের বিবৃতি থেকে পাঠ করলে, তাজ্জব বনে যেতে হয়। কারণ সারাদিন বা সারারাতের খাটুনির পর যেখানে তাঁরা থাকেন সেই আবাসস্থল-

টুকুও হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের কৃতিত্বে নিরাপদ নয়। নিরাপদ না হওয়ার কারণ হয়তো এই যে, তাঁদের কর্তব্যপূর্ণ জীবনের মূল্য ধর্তব্যের মধ্যেই নয়! রাতের আলোকে বা অন্ধকারে চোর, ছেঁচড় বা যেই ঢুকুক—তাতে কারই বা কি এসে যায়!!

ধরুন ৭০ নম্বর রুমে এই কিছুদিন আগে চুরি হয়ে গেল—তার জন্যে মাথা ব্যথাই বা কার? কিন্তু সেই ঘরের দু' জনের একজন নাইট ডিউটিতে গেলে পর অন্য জন যদি চারতলায় না ঘুমাতে যেতেন তাহলে কী অঘটনই না ঘটতে পারতো—তা ভাবতেও ভয় হয়। ৭০ নম্বর রুমের মুখোমুখি রুম হচ্ছে ৮১ নম্বর। সেই ৮১ নং রুম থেকে রাত তিনটে নাগাদ একজন নার্স দরজা খুলে বাথরুমে যেতেই দেখেন ৭০ নম্বর রুমের তালা ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে। ঘরের জিনিসপত্র বাক্স প্রভৃতিও ছড়ানো। স্বভাবতই তিনি পাশের ঘরের মেয়েদের ডেকে তোলেন।

এইবার শুনুন একজন সেবিকার লিখিত বিবরণঃ—

উপরের **"এই ঘটনা ঘটবার অনুমান আধ ঘণ্টা খানেক আগে, স্টাফ নার্সদের ফ্ল্যাট-এ লোক দেখতে পাওয়া যায়।...... স্টাফ নার্সরা তখন চীৎকার করে। ফলে লোকটি প্রথম বাথরুমে ঢুকে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। ইতিমধ্যে সম্ভবত সে জানলা দিয়ে পাইপ বেয়ে পালায়। এটা ঘটে তিন তলায় স্টাফ নার্সদের ফ্ল্যাট-এ। দোতলায় থাকে সিস্টার টিউটররা এবং এ্যাসিস্ট্যান্ট মেট্রন। স্টাফ নার্সরা সিস্টার টিউটরদের খবর দেয়।**

"ইতিমধ্যে নার্স কোয়ার্টারের দারোয়ান রাউন্ডে গিয়ে সিস্টার টিউটরদের ফ্ল্যাটের নিচের কোলাপসিবল গেটের তালা ভাঙা অবস্থায় দেখতে পায়। ঐ দারোয়ান তখন হোম সিস্টারকে খবর দেয়।

"এরপর তিন তলার মেয়েরা গিয়ে সিস্টারদের খবর দেয় যে ৭০ নং রুমে চুরি হয়েছে। এ্যাসিস্ট্যান্ট মেট্রন, হোম সিস্টার, ও সিস্টার টিউটর ঘরটি দেখতে আসেন।"

এই ঘটনায় নার্সরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেও কা কস্য পরিবেদনা। তিন তলায় ৬২ নং রুম। সেখানে দুজন স্টুডেন্ট নার্সের মধ্যে একজন নাইট ডিউটিতে গেছেন ও অন্যজন ৬৩ নং রুমে ঘুমোতে গেছেন। সুতরাং ৬২ নং রুমটি ফাঁকা ছিল। আর চোর যখন নার্সদের নাইট ডিউটির সুযোগে আসবেই তখন ৬২ নং রুমটিকেই বা কোন সর্তে বাদ দিয়ে যাবে?

"...পাশের একটি মেয়ে হোম সিস্টারকে খবরটা দেয় যে, এই ঘরেও চুরি হয়েছে। কিন্তু প্রথমবার ডাকায় তাঁরা কেউই ঘরটি দেখতে আসেন নি। যখন দেখা গেল চুরি হয়ে যাওয়া জিনিসপত্রের মধ্যে অপারেশন থিয়েটারের চাবিগুলিও (শিশুনিবাস ও, টি) হারিয়েছে (ছোট্ট একটি রিং-এ তিনটি চাবি ছিল) তখন হোম সিস্টার একবার মাত্র দেখতে আসেন। তাঁর উক্তিটি হুবহু উদ্ধৃত করছিঃ

'আমি যখন খবর পেলাম তখন প্রথমেই চালের গুদামটা দেখে নিলাম এবং তারপর কিচেন-এ গেলাম—যদিও প্রাণটি আমি হাতে করে নিয়ে বেরিয়েছিলাম। কেননা শত হলেও আমি মেয়ে তো।'

"এই মন্তব্যটি প্রকাশ করে তিনি চলে গেলেন। যে মেয়েটির যাবতীয় জিনিসপত্র সব চুরি হয়ে গেল তার কাছে একবার জিজ্ঞাসা করাও প্রয়োজন মনে করলেন না।

"এ্যাসিস্ট্যান্ট মেট্রন যখন নার্স কোয়ার্টারের চুরির সংবাদ মেট্রনের কাছে টেলিফোনে সংলাপ করেন তখন মেট্রন নির্দেশ দেন ওয়ার্ড মাস্টারকে জানাতে। হোম সিস্টার পি, ডব্লিউ, এইচ-এর দরোয়ানকে ডাকতে যান এবং ওখানে অবস্থানরত জমাদার ও ওয়ার্ড বয়দের ডাকেন; কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই উঠে আসতে রাজী না হলে হোম সিস্টার নার্স কোয়ার্টারের দারোয়ানকে নিয়ে পি, ডব্লিউ-এর লোককে ডেকে নিয়ে আসেন। তারপর অথরিটির মধ্যে কেউ একজন পুলিশকে খবর দেন।

"আশ্চর্যের বিষয়, ৬২ নং রুমে চুরির খবর পেয়েও এ্যাসিস্ট্যান্ট মেট্রন বা দায়িত্বপূর্ণ অন্য কেউই আসেন নি। এস, এন, এস—ও, টি, স্টাফ নার্স চুরির খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি বেয়ারাকে পাঠিয়ে দেয় ও, টি, চাবির খোঁজ করতে। অর্থাৎ অন্যান্য চাবিগুলিও চুরি গেছে কি না। ও, টি-র উপরোক্ত নার্স স্টুডেন্ট নার্সকে (যে ৬২ নং রুমের বাসিন্দা এবং ৬৩ নং রুমে সে রাত্রে ঘুমাচ্ছিলেন) এই মর্মে জানিয়ে দেয় যে, চাবি চুরির ব্যাপারে সমস্ত দায়িত্ব তার।

"যাক শেষ পর্যন্ত—যে ব্যাপার ঘটলো রাত তিনটেয় তার তদারক করতে এলেন বেলা ন' টায়। এলেন মেট্রন, এ্যাসিস্ট্যান্ট মেট্রন, হোম সিস্টার ও পুলিশের লোক। তবে চুরির বিষয়ে তারা আগ্রহশীল নয় সেটাও বোঝা গেল। কারণ, কি কি ক্ষতি হয়েছে তা জিজ্ঞেস করে দু-খানা ঘর দর্শন করে মিনিট দশেকের মধ্যেই চলে গেলেন। এমত অবস্থাতেও আমরা কর্তৃপক্ষ ছাড়া আর কা'কে অবলম্বন হিসেবে ভাবতে পারি?"

জনৈকা সেবিকার এটা নিয়মমাফিক কোনো জবানবন্দী নয় বা পুলিশ ফাঁড়িতে ডাইরি পেশ করাও নয়। বিবৃতিটি পড়লে বোঝা যায়—হাসপাতালের নার্সরা কতো অসহায়!! ন্যায্যত আশ্রয় পেয়েও তারা কতো নিরাশ্রয়।

আরো কিছু তথ্য আমরা সেবিকাদের কাছ থেকেই পেয়েছি—যে ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ নার্সদের নিরাপত্তার খাতিরেই সুব্যবস্থা গ্রহণ করুন। শুধু চোর নয়, ছেঁচড়দের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার এছাড়া আর অন্য কি উপায় আছে? মনে রাখা দরকার, নার্সদের নিরাপত্তা রোগীদের জন্যই প্রয়োজন। কারণ নিরাপত্তাহীন অবস্থায় সেবা বা শুশ্রূষা—কোনো কাজটাই পুরোপুরি হয় না। তাদের অস্বস্তি বা উদ্বিগ্নতার ফলে রোগীর জীবন-সংশয় পর্যন্ত ঘটতে পারে। তার জন্যে তখন দায়ী কে হবে?

একজন সেবিকা জানান, **"আমাদের সমস্ত সেবিকাদের তরফ থেকে জোর আপত্তি যে, মেয়েদের হোস্টেলে পুরুষ ভিজিটর 'এলাউ' করা হয় কেন?—যদিও এসব ঘটে থাকে নার্সদের যারা কর্তৃপক্ষ তাদেরই ফ্ল্যাটে। তাছাড়া ভিজিটর আওয়ার্স হচ্ছে বিকেল চারটে থেকে আটটা পর্যন্ত এবং রাত সাড়ে ন'টায় নার্স কোয়ার্টারের সব গেটগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কারো কারো ভিজিটর রাত সাড়ে ন'টার পর কোয়ার্টার থেকে বের হয়। অবশ্য এসব দেখা যায় নার্সদের ভাগ্য বিধাত্রীদের বেলাতেই।"**

আরেকজন সেবিকার বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ ঃ **"কোনো কোনো ঘরের দরজায় ছিটকিনি ভাঙা অবস্থায় দিনের পর দিন মাসের পর মাস পড়ে থাকে। এসবের তত্ত্বাবধান করেন হোম সিস্টার। তাঁকে জানানো সত্ত্বেও মেরামতের কোনো ব্যবস্থা হয় না—যার ফলে কেউ কেউ নিজের ঘর খালি রেখে বাধ্য হয়ে অন্য ঘরে শুতে যায়।"**

বেয়ারাদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ করেন একজন ঃ **"লেডিজ হোস্টেলে বেয়ারারা সব কাজকর্ম করে। কিন্তু দেখা যায় যে, তাদের ডিউটি শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও রাত আটটা-নটা অবধি ফ্ল্যাটে তারা ঘুরে বেড়ায়। উপরন্তু মদ্যপ অবস্থায় অনেক সময় এব্‌নরম্যাল কাজ তারা চোখের সামনেই করে। এসব ব্যাপারে নার্সদের কর্তৃপক্ষকে অহরহই জানানো হয়, কিন্তু কোনো প্রতিকার করা তাঁরা প্রয়োজন মনে করেন না।"**

যতদূর খবর সংগ্রহ করতে পেরেছি—তাতে জেনেছি যে, নার্সদের তত্ত্বাবধানের জন্য আছেন একজন মেট্রন ও দু-জন হোম সিস্টার। দুঃখের ব্যাপার, তাঁরা না কি কোনো সময়ই কোয়ার্টারে রাউন্ড দিয়ে

সুবিধা বা অসুবিধা কিছুই দেখেন না। দিনের বেলায় তাঁরা যা দেখেন তা হচ্ছে তা কি ঘষা-মাজা ঠিক হচ্ছে কি না। কিন্তু যে নিরাপত্তা নার্সদের প্রাথমিক এবং সর্বোচ্চ প্রয়োজন সে বিষয়ে তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন। একজন তো সরাসরি এই অভিযোগ করলেন যে, "কোনো সময়ের জন্যও রাউন্ড দিয়ে দেখেন না—রাতে কোনো দুষ্টু অভিসন্ধিপরায়ণ জমাদার বা বেয়ারা কোয়ার্টারের কোথাও থেকে গেল কি না।"

নার্সদের সবচেয়ে মারাত্মক অভিযোগ এই যে, শুধু কোয়ার্টারেই নয়, ওয়ার্ডে ডিউটি আওয়ার্সেও তাদের জীবনের কোনো রকম নিরাপত্তা নেই। কর্মব্যস্ত একজন নার্স খেদের সংগে এক কথায় বললেন ঃ 'সব সমান'।

আর একজনের লিখিত বিবৃতিটি পড়লে মনে হবে; একান্ত বাধ্য না হলে এরকম দুঃসাহসের সংগে কে বলতে পারে—"ওয়ার্ড ও ডাক্তার থেকে আরম্ভ করে জমাদার পর্যন্ত ড্রিংক করে' অশোভন কাজ করে থাকে। কোনো কোনো মেয়ে প্রতিবাদ করে কর্তৃপক্ষকে জানালেও তাঁরা গ্রাহ্য করেন না। অতএব যেখানে শত শত সেবিকার জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই সেখানে কি করে তাঁরা বাস করবেন আর কি করেই বা সুষ্ঠুভাবে কাজ করবেন?"

কলকাতা মেডিকেল কলেজের হাসপাতালের নার্সদের যদি এই অবস্থা হয়—তাহলে এই সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে আর কেই বা সাহস করবে? এই সব নার্সরা আমাদের ঘরেরই মেয়ে। তাদের দারিদ্র্যজ্বালা থাকতে পারে, কিন্তু তাদের সেই জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার আছে কার? আমাদের রাজ্য স্বাস্থ্যমন্ত্রীও কি এদের কথা বিবেচনা করবেন না বা এদের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য এগিয়ে আসবেন না?

অবশ্য উপরের যে ঘটনা তা কোনো একটি বিশেষ হাসপাতালে ঘটলেও—এই ইতিহাস সর্বত্র। আমরা চাই সে ইতিহাসের অবসান হোক।

কংসাবতী পরিকল্পনা

বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও হুগলী জেলার আট লক্ষ একর জমিতে জলসেচের উদ্দেশ্যে কংসাবতী পরিকল্পনাটি শুরু হয়েছিল ১৯৫৯ সালে, অর্থাৎ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শুরুতে। এই পরিকল্পনা শেষ হবার কথা ছিল ১৯৬৮ সালের মধ্যে। কিন্তু সেচ দপ্তরের কাজের যে নমুনা দেখা যাচ্ছে তাতে এ বিষয়ে আশা করার বিশেষ কিছু নেই। যতদূর মনে হয় ১৯৭৫ সালের পূর্বে এ প্রকল্প পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণের কোন সম্ভাবনা নেই।" কংসাবতী পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান অঙ্গ হল সেচের খাল। দু' হাজার মাইল খাল কাটার কথা ছিল, কিন্তু এ পর্যন্ত ৪২৫ মাইলের বেশি খনন করা সম্ভব হয় নি। যে পরিকল্পনায় আট লক্ষ একর জমিতে জল দেবার কথা সেখানে ১৯৬৫ সালে মাত্র ৭২ হাজার একর জমিতে জল দেওয়া সম্ভব হয়েছে, এই বছরেও এক লক্ষ কুড়ি হাজার একরের বেশি জমিতে জল দেওয়া সম্ভব হবে না। অথচ এই পরিকল্পনার জন্য ব্যয় বড় কম হচ্ছে না। প্রায় ১৫ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই ব্যয় হয়ে গেছে। অবিশ্বাস্যরকম শম্বুক গতিতে এই পরিকল্পনার অগ্রগতির জন্য নিঃসন্দেহে—এর প্রশাসনিক ব্যবস্থাই দায়ী। এই অমার্জনীয় বিলম্বের জন্য পূর্ণ তদন্ত করার আশু প্রয়োজনীয়তা বর্তমান।

হাওড়া ঃ

ক্ষুদ্র শিল্পের সঙ্কট

যখন ভারতে ইস্পাত-নগরীসমূহের সৃষ্টি হয় নি, যখন বৃহদায়তন ইস্পাত ফ্যাক্টরী বলতে একমাত্র টাটা কোম্পানীকেই বোঝাত, তারও আগের যুগ থেকে হাওড়ায় অজস্র ছোট ছোট লৌহশিল্পের কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল, আর তখন থেকে একইভাবে, নানা ঘাত-প্রতিঘাত অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়ে আজও পর্যন্ত এই ক্ষুদ্র শিল্পগুলি জাতির প্রয়োজনে নিযুক্ত রয়েছে। বেশির ক্ষেত্রেই অল্প মূলধন, অত্যল্প শ্রমিক নিয়েই এই কারখানাগুলি চালু রয়েছে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাহিদার যোগান দেওয়াই এই শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির কাজ, খোদ হাওড়া শহরেই এই জাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহশিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কয়েক শত। অনেক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের মালিক নিজেও একজন শ্রমিক। বৃহদায়তন স্টীল-প্লান্টের যুগেও যে এই ক্ষুদ্র-শিল্পগুলি টিকে আছে তা শুধু একমাত্র দক্ষতার মূল্যেই। কিন্তু মোটের উপর এই শিল্পগুলির বাজার ইতিমধ্যেই অনেক সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে, তাই দীর্ঘকাল ধরেই এই প্রতিষ্ঠানগুলির ভিতরকার অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। কিন্তু সম্প্রতি এই শিল্পগুলির চরম দুঃসময় উপস্থিত হয়েছে। মূলত এই প্রতিষ্ঠানগুলি বর্তমানে ইস্টার্ন ও সাউথ-ইস্টার্ন রেলের অর্ডার সরবরাহ করেই কোন গতিকে আত্মরক্ষায় সমর্থ হচ্ছিল। কিন্তু কিছুকাল হল রেল কর্তৃপক্ষ এদের কাছে অর্ডার দেওয়া বন্ধ করেছেন, ফলে বাজারের অভাবে এই ক্ষুদ্র শিল্পগুলির নাভিশ্বাস ওঠার অবস্থা হয়েছে। কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের দরজায় ইতিমধ্যেই তালা পড়েছে, আরও অনেকগুলি হয়ত শীঘ্রই উঠে যাবে। বেকার সমস্যাসংকুল এই রাজ্যে নতুন করে আরও কয়েক সহস্র বেকারের সৃষ্টি হবে এবং অসংখ্য পরিবার পথে বসবে। ভারতের লৌহশিল্পের জননীস্বরূপ এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহশিল্পগুলির প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কি কিছুই করণীয় নেই?

দেবজ্যোতি বর্মণ স্মরণে

প্রখ্যাত সাংবাদিক ও শিক্ষাব্রতী শ্রীদেবজ্যোতি বর্মণের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ পশ্চিমবঙ্গের যে কোন লোকের কাছে রীতিমত বেদনাদায়ক। সাংবাদিক হিসাবে তাঁর নির্ভীকতার বহু পরিচয় তাঁর সম্পাদিত 'যুগবাণী' পত্রিকা তাঁর নির্ভীকচিত্ত স্বাধীন মতামতের পরিচয় বহন করে। অনাচার ও দুর্নীতির তিনি ছিলেন আজন্ম শত্রু, সরকারের প্রশাসনিক দুর্নীতির অজস্র তথ্যাবলী তিনি দিনের পর দিন তাঁর সাপ্তাহিকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর রচিত 'বিড়লা বাড়ির রহস্য' একদা সারা দেশে বিপুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। প্রথম যৌবনে তিনি ইংরাজের কারাগারে দীর্ঘকাল ছিলেন। কারাগারে থাকাকালীনই তিনি স্নাতক হয়েছিলেন এবং পরবর্তী জীবনে তিনি দশটি বিষয়ে এম. এ. পাশ করে বাংলা দেশে একটি রেকর্ড স্থাপন করেন। তিনি প্রবাসী, মডার্ন রিভিয়ু প্রভৃতি পত্রিকার সংগে দীর্ঘকাল-সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং সেই সূত্রেই তিনি সাংবাদিকতায় দীক্ষিত হন। শিক্ষাব্রতী হিসাবেও তিনি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, শেষ জীবনে তিনি আনন্দমোহন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি কলকাতা পৌরসভার সদস্য এবং সেই সংগে কিছুকাল ইউ-সি-সি দলের নেতাও ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য হিসাবে তিনি এককভাবে ত্রিবার্ষিক ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তনের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। সব মিলিয়ে তিনি ছিলেন সেই ধরণের লোক যাঁরা চিরদিন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে সংগ্রাম করেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশ একজন প্রকৃত শিক্ষাব্রতী ও নির্ভীক সাংবাদিককে হারাল। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি ও তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিজনদের সান্ত্বনা জানাই।

৯-১২-৬৬

বিশ্বসাহিত্যের আদিপর্ব

ডঃ নরেন ভট্টাচার্য

॥ ১৩ ॥

আদি আর্মেনীয় সাহিত্য

আর্মেনীয়গণের বর্তমান নিবাস সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত আর্মেনীয় রিপাব্লিকে এবং বহু আর্মেনীয় তাঁদের নিজস্ব রাষ্ট্র ছাড়াও বহু জায়গায় ছড়িয়ে আছেন। এমন কি ভারতবর্ষেও আর্মেনীয়দের সংখ্যা বড় কম নয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন আর্মেনীয় ভাষা ও সাহিত্যশিক্ষার সুযোগ আছে, এটাও প্রসঙ্গক্রমে জানিয়ে রাখা ভাল।

জাতি হিসাবে আর্মেনীয়গণ মিশ্রজাতি হলেও তাঁদের আদি ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত এবং সেই হিসাবে সংস্কৃত, আদি ইরানীয়, গ্রীক, ল্যাটিন, সেল্ট, শ্লাভ প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে আর্মেনীয় ভাষা আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ।

আর্মেনীয় সাহিত্যের আদিতম নিদর্শন, অপরাপর দেশের মতই, লোকসাহিত্যের মধ্যেই পাওয়া যায়। আর্মেনীয় লোকসাহিত্যের পরিধি বিশাল এবং কালানুক্রমের দিক থেকেও তা বিশেষ প্রাচীন। আদি আর্মেনীয় ধর্ম, যা প্রাক-ইন্দো-ইউরোপীয় আর্মেনীয় সংস্কৃতির মধ্যে বিকশিত হয়েছিল, প্রাচীন সুমেরীয় ও ব্যাবিলনীয় ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল, এবং সেই ধর্মকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছিল আদি মাতৃদেবী ও তাঁর প্রণয়ী দুমুজিকে ঘিরে কথা ও কাহিনীর একটি বিশাল চক্র, যেমন গড়ে উঠেছিল প্রাচীন ব্যাবিলনে দেবী ইস্তার ও তাঁর প্রণয়ী তম্মুজকে নিয়ে অজস্র কথা ও কাহিনী। পরবর্তী যুগে কিছু কিছু গ্রীক ও রোমক প্রভাব আর্মেনীয় সংস্কৃতির উপর পড়েছিল, কিন্তু সর্বাধিক প্রভাব, বিশেষ করে ধর্মের ক্ষেত্রে পড়েছিল ইরানের। ইরানীয় দেবতা অহুর মজদা আর্মেনিয়ায় হয়েছেন আরামজাদ, দেবী অনাহিত হয়েছেন অনাহিত, দেবতা ভেরেথ্রঘ্ন হয়েছেন ভহগন এই সব দেব-দেবীকে নিয়ে কল্পিত হয়েছে অজস্র পৌরাণিক কাহিনী।

আর্মেনীয় বীরগাথা ঃ হাইক ও আরা

শুধু দেব-দেবীর কাহিনীই নয়, হিরো লিজেণ্ডস বা বীরগাথা ও আদি আর্মেনীয় সাহিত্যের অনেকটা অংশ জুড়ে আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে আর্মেনীয়গণ ছিলেন বীরের জাত, দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করতে হয়েছে। আদিকাল থেকেই ক্রমান্বয়ে, আসিরীয়গণ, ইরানীয়গণ পারদ বা পার্থীয়গণ, গ্রীক ও রোমকগণ, বাইজানটাইন যুগের গ্রীকগণ, আরব ও কুর্দগণ, ফরাসী ক্রুসেডারগণ এবং পরিশেষে মোগল ও তুর্কগণ আর্মেনিয়া আক্রমণ করেছে, এবং যুগের পর যুগ ধরে আর্মেনীয়দের এই আক্রমণের মোকাবিলা করতে হয়েছে। এই কারণেই আর্মেনীয় সাহিত্যে অনেক জাতীয় বীরের পরিচয় পাওয়া যায়।

বীর হাইকের কাহিনী একটি অতি প্রাচীন আর্মেনীয় বীরগাথা। হাইক কথাটির অর্থ প্রভু এবং এই নামটি থেকেই বোঝা যায় যে তিনি জাতির একজন মুক্তিদাতা হিসাবেই বিবেচিত হতেন। হাইকের কাহিনী বাইবেলের একটি কাহিনীর সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা হয়েছে। তিনি যুদ্ধ করেছিলেন বেল বা বেলাসের সঙ্গে, যিনি ওল্ড টেস্টামেন্টের জেনেসিস খণ্ডে বর্ণিত নিমরোদ। হাইক বেলকে অপরাজিত ও নিহত করে আর্মেনীয়দের সেমিটিক আক্রমণকারীদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং তা থেকে হাইক সংক্রান্ত উপকথাচক্রের উদ্ভব।

আরও একটি পুরাতন আর্মেনীয় কাহিনী হচ্ছে নাহাপেভ। এই কাহিনীর নায়ক হচ্ছেন আরা, যাঁর তুল্য রূপবান কেউ ছিল না। আরার কাহিনীর সঙ্গে ব্যাবিলনীয় গিলগামেশ মহাকাব্যের কাহিনীর সাদৃশ্য আছে। দেবী ইস্তার যেমন গিলগামেশকে ভালবেসেছিলেন, তেমনি রাণী শামিরম ভালবেসেছিলেন আরাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, রাণী শামিরমকে আসিরীয় রাণী সেমিরামিসের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখা হয় যদিও শামিরমের চরিত্রের সঙ্গে সেমিরামিসের চেয়ে দেবী ইস্তারের সাদৃশ্যই বেশি। সে যাই হোক রাণী শামিরম চাইলেন আরাকে তাঁর প্রেমিকরূপে, কিন্তু আরা তাঁর নিজ পত্নী নোভার্টকে ত্যাগ করতে রাজী হলেন না। প্রত্যাখ্যাত রাণী তখন আরার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন এবং আরা নিহত হলেন। আরার মৃতদেহ যখন রাণী শামিরমের কাছে নিয়ে আসা হল, তখন কিন্তু রাণী শোকে ভেঙে পড়লেন এবং আরার দেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বিলাপ করতে লাগলেন, যেমন বিলাপ করেছিলেন ইস্তার তম্মুজের মৃতদেহ দেখে অথবা ভেনাস অ্যাডোনিসের মৃতদেহ দেখে।

প্রথম জাতীয় মহাকাব্য ঃ আর্তাশেষ ও সাথেনিক

আর্মেনিয়ার ইতিহাসে আর্তাশেষ ছিলেন দুজন, এবং এই কাহিনীর নায়ক সম্ভবত প্রথম আর্তাশেষ যিনি খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক ছিলেন। আর্মেনিয়ার প্রথম জাতীয় মহাকাব্যের নায়ক আর্তাশেষ ছিলেন আর্মেনীয় ইতিহাসের একজন বীর, এবং তাঁকে কেন্দ্র করে রচিত কাহিনীচক্র যুগের পর যুগ ধরে লোকমুখে গীত হত, একথা বলেছেন প্রাচীন 'আর্মেনীয়' ঐতিহাসিক ঘোরেনের মোজেস এবং তিনি নিজেও আর্তাশেষ সম্পর্কিত কিছু কিছু গাথা তাঁর রচনায় উদ্ধৃত করেছেন।

সানাতরুক ছিলেন আর্মেনিয়ার ন্যায়সঙ্গত রাজা। একদা শিকার করতে গিয়ে তিনি এক দুর্ঘটনায় নিহত হন। তাঁর

মৃত্যুর পর রাজ্যে বিশৃংখলার সুযোগে রোমকদের (?) সহায়তায় এরভাণ্ট আর্মেনিয়ার রাজা হন। (এখানে একটু তথ্যগত ভুল আছে কেন না আর্মেনীয় দৃশ্যপটে রোমকদের আবির্ভাব হয়েছিল কয়েক শতাব্দীর পর, কাজেই এরভাণ্টের সাহায্যকারীরা অবশ্যই পারদ বা ইরানীয় হবে) এরভাণ্ট ক্ষমতা পেয়ে সানাতরুকের সকল সন্তানকে হত্যা করেন, শুধু একটি সন্তান, আমাদের কাহিনীর নায়ক আর্তাশেষ, তার ধাত্রী কর্তৃক রক্ষিত হয়। সেই ধাত্রী আর্তাশেষের বেঁচে থাকার সংবাদ দেয় সেম্বাত নামক একজন দায়িত্বশীল রাজপুরুষকে, যাঁর বংশের একমাত্র অধিকার ছিল আর্মেনিয়ার রাজাদের আনুষ্ঠানিক অভিষিক্ত করার। সেম্বাত শিশু আর্তাশেষকে গ্রহণ করেন এবং তাকে মেষপালকদের মধ্যে মানুষ করেন।

আর্তাশেষ বড় হয়ে সেম্বাতের সঙ্গে আর্মেনিয়ায় আসেন এবং একদল পারদ সৈন্যের সহায়তায় কুচক্রী এরভাণ্টকে পরাজিত করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন। অল্পকালের মধ্যেই শক্তিমান শাসক হিসাবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। তাঁর রাজত্বকালে উত্তরাঞ্চলের অ্যালান জাতি আর্মেনিয়া আক্রমণ করে, এবং আর্তাশেষ তাদের পরাজিত করেন। তখন তারা সন্ধি প্রার্থনা করে তাদের রাজকন্যা সাথেনিককে তাঁর রাজসভায় প্রেরণ করে।

সাথেনিক আর্তাশেষের সম্মুখে তাঁর বীরত্বের প্রশংসা করে সন্ধির জন্য আকুল প্রার্থনা জানালেন। এদিকে সেই সুন্দরী রাজকন্যাকে দেখে আর্তাশেষ মুগ্ধ হলেন, এবং প্রস্তাব করলেন যে তাঁর সঙ্গে সাথেনিকের বিবাহ দিলে দুই পক্ষের মধ্যে একটা পাকাপাকি সন্ধি হতে পারে। কিন্তু সাথেনিকের পিতা ভাবলেন যে কন্যাপণ দেবার মত প্রচুর অর্থ আর্তাশেষের নেই, কাজেই তিনি বিবাহ ব্যাপারে গড়িমসি করতে লাগলেন। তখন ধৈর্যচ্যুত হয়ে রাজা আর্তাশেষ বলপূর্বক সাথেনিককে হরণ করে বিবাহ করলেন। সাথেনিকের গর্ভে আর্তাশেষের তিনটি পুত্র জন্মাল, বড়টির নাম আর্তাবজাদ।

আর্তাশেষ এবং সাথেনিকের বিবাহিত জীবন সুখের হয় নি, কেন না ট্রয়ের হেলেনের মতই সাথেনিক বিশ্বাসঘাতিনী হয়েছিলেন। তিনি আর্গাভান নামক একজন মিদীয়ের সঙ্গে গোপন ব্যভিচারে লিপ্ত ছিলেন, এবং সেই কথা জানতে পেরে আর্তাশেষ তাঁর পুত্রদের দিয়ে আর্গাভানকে হত্যা করান। খোরেনের মোজেসের বর্ণনা অনুযায়ী এই ঘটনার পরেও সাথেনিক স্ত্রীর দুষ্প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত হন নি।

এর পরের ঘটনাগুলি হারিয়ে গেছে এবং গিলগামেশ মহাকাব্যের ঘটনাধারার মতই এখানেও মিসিং-লিংক পূরণ করার কোন উপায় নেই। একাদশ শতকের আর্মেনীয় লেখক গ্রীগর ম্যাজিস্ট্রোস আর্তাশেষ মহাকাব্যে শেষ দিককার কিছু ঘটনার উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত আর্তাশেষকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছিল। আর্তাশেষকে যখন কফিনে শোয়ান হয় তখন তাঁর অনুগামী বহু লোক আত্মহত্যা করে। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে আর্তাশেষের পুত্র আর্তাবজাদ মৃতের উদ্দেশ্যে বলেন, "আপনি আপনার দেশবাসীদের আপনার সঙ্গেই কবরে নিয়ে যাচ্ছেন, আমি কি ধ্বংসস্তূপের উপর "রাজত্ব করব?" এতে মৃত আর্তাশেষ বিরক্ত হয়ে পুত্রকে অভিশাপ দেন যে সে অপঘাতে মারা যাবে। এবং কার্যত তাই হয়েছিল। এ থেকেই বোঝা যায় যে পিতা-পুত্রের বিরোধের কোন গভীরতর কারণ ছিল, এবং সেই কারণ যে কি তার ঘটনাবলী এখনো জানা যায় নি।

অপরাপর বীরগাথা

উপরি-উক্ত কাহিনীগুলি ছাড়াও আরও অনেক বীরগাথা আর্মেনীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। এগুলির মধ্যে প্রথম উল্লেখ করতে হয় রাজা টেরডাট এবং সার্ব গ্রিগোর-এর কাহিনী যার লেখকত্ব সন্ন্যাসী আগাথানগেলসের উপর আরোপিত হয়েছে। এতে বর্ণিত হয়েছে রাজা টেরডাটের (তৃতীয় টিরিডাটেস) সার্ব গ্রিগোর লুসাভোরিচের বা সাধু গ্রেগরীর নিকট থেকে খৃস্টধর্মে দীক্ষাগ্রহণের কাহিনী যা থেকে খৃস্টধর্ম সমগ্র আর্মেনিয়ার জাতীয় ধর্মে পরিণত হয়েছিল। এই রচনাটি গ্রীক, জর্জীয় ও আরবীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছিল।

এর পরেই উল্লেখ করতে হয় রাজা আরশাকের বিখ্যাত কাহিনী যা ফাভস্টোস বিজান্দের রচনা বলে কল্পিত। এতে বর্ণিত হয়েছে রাজা দ্বিতীয় আরশাকের (৩৫০—৩৬৭) নাটকীয় জীবনকথা, যখন আর্মেনিয়া ছিল রোমক ও শাসানীয় সম্রাটদের সাম্রাজ্যবাদী শিকারের লক্ষ্যবস্তু। রাজা আরশাকের জীবনে সুখ ছিল না, রোমকরা তাঁকে শাসানীয়দের বিপক্ষে সাহায্য করে নি। তবুও তিনি তাঁর বীর সেনাপতি ভাসক ম্যামিকোনিয়ান শাসানীয়দের বিরুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেন, এবং শেষ পর্যন্ত তিনি শাসানীয় রাজা শাহ্-ফুরের নিকট বন্দী হন। এই মূল কাহিনীর কাঠামোর মধ্যে আছে অজস্র উপকাহিনী। পারসিকদের বিরুদ্ধে আর্মেনীয়দের যুদ্ধের কাহিনী পঞ্চম শতকে এলিশি ভার্দাপেত এবং ফার্প-এর লাজার রচিত গাথাসমূহের মধ্যেও বর্তমান।

শাসুনৎসি দাভিথ

কিন্তু আর্মেনীয়দের প্রকৃত জাতীয় মহাকাব্য হচ্ছে শাসুনৎসি দাভিথ, বা শাসুনের ডেভিডের মহাকাব্য। এই মহাকাব্যটির কোন লিখিত রূপ কোনকালেই ছিল না, আদিকাল থেকেই চারণদের দ্বারা দেশের সর্বত্র গীত হত। ১৮৭৪ খৃস্টাব্দে বিশপ গারেকিন সারভানাৎসিয়ানৎস প্রথম বিভিন্ন স্থান থেকে, বিভিন্ন লোকের মুখ থেকে এই গাথাগুলি সংকলন করেন। ১৮৮৬ খৃস্টাব্দে তদানীন্তন আর্মেনীয় লোকসাহিত্যবিশারদ মালুক আবেসিয়ান ডেভিডগাথাসমূহের আর একটি সংকলন বার করেন। আর্মেনীয় কবি হোভান্নেস থুমানিয়ান (১৮৬৯—১৯২৪) ডেভিডগাথাগুলিকে নিজস্ব কবিতায় রূপান্তরিত করেন। ১৯১৪ খৃস্টাব্দে প্রায় কুড়িটি ধরণের ডেভিড-গাথা নতুন করে সংগৃহীত হয় এবং বহু গবেষক এই বিষয়ে নিরন্তর কাজ করে চলেন। ১৯৩৯ সালে আর্মেনিয়ার সর্বত্র অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে ডেভিডের সহস্রবার্ষিকী প্রতিপালন করা হয়। সেই উপলক্ষে আর্মেনীয় পণ্ডিতগণ শাসুৎনি দাভিয়েথের পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ আধুনিক আর্মেনীয় ভাষায় প্রস্তুত করেন। ১৯৫৮ সালে বিখ্যাত আর্মেনীয় ভাস্কর সুরেন ঘোচার নির্মিত ডেভিডের ব্রোঞ্জমূর্তি সোভিয়েট আর্মেনিয়ার রাজধানী এরেভানে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই মহাকাব্যের সর্বাধুনিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬০ সালে।

আর্মেনিয়ার এই জাতীয় মহাকাব্যের নায়ক শাসুনের ডেভিড, এর বিষয়বস্তু অন্যান্য আর্মেনীয় মহাকাব্যের মতই বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে নায়কের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম। মূল ঘটনাটি গড়ে উঠেছে আরবদের সঙ্গে আর্মেনীয়দের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে। সপ্তম থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত সমগ্র ককেশীয় অঞ্চলই আরবগণ কর্তৃক উপদ্রুত হচ্ছিল। ডেভিড সেই অজস্র আর্মেনীয় বীরপুরুষের প্রতীক যাঁরা জীবনপণ করে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। তদুপরি আরবদের সঙ্গে আর্মেনীয়দের যুদ্ধ ছিল এক অর্থে ইসলামের সঙ্গে খৃস্টধর্মের আদর্শগত সংঘাত, সেদিক থেকে বিচার করলে ডেভিড সম্পর্কিত গাথাগুলি আর্মেনীয় জীবনে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

শাসুনৎসি দাভিথ মহাকাব্যটি চারটি শাখায় বিভক্ত চার পুরুষের কাহিনী।

এই মহাকাব্যের প্রথম অংশে আছে দুই ভাইয়ের অলৌকিক জন্ম ও কীর্তিকলাপের কাহিনী। কাহিনীটির উদ্ভব এইরূপ ঃ আর্মেনিয়ার রাজা গাজিক কার্যত বাগ্দাদের আরব খলিফার অধীন ছিলেন। তাঁর একটি সুন্দরী কন্যা ছিল যার নাম ৎসোভিনার বা লুসিক। খলিফা সেই কন্যাকে বিবাহ করতে চাইল, কিন্তু খলিফাকে কন্যাদান করতে রাজা গাজিক রাজী হলেন না। তখন খলিফা একটি বিরাট বাহিনী পাঠিয়ে হয় যুদ্ধ না হয় কন্যা দাবি করল। রাজকন্যা তখন রাজ্যের বিপদ এড়ানোর জন্য খলিফার হারেমে যাওয়াই শ্রেয় বোধ করল।

কিন্তু ইতিমধ্যে সেই রাজকন্যা এক বিচিত্র উপায়ে গর্ভধারণ করেছিল। কুমারী অবস্থায় একদা সে যাদুশক্তি-সম্পন্ন ঝর্ণার জল পান করেছিল এবং তারই ফলে তার ওই অবস্থা হয়েছিল। খলিফা যখন জানতে পারল যে তার নব-পরিণীতা পত্নী পূর্ব থেকেই গর্ভবতী তখন সে তাকে হত্যার আদেশ দিল, কিন্তু যে কারণেই হোক সে আদেশ কার্যকরী হয় নি। যথাসময়ে রাজকন্যার যমজ সন্তান জন্মাল, যাদের নাম যথাক্রমে সানাসার ও পালটাসার।

খলিফার কিন্তু ইচ্ছা এই দুটি ছেলে বড় হলে তার উপাস্য দেবতার নিকট এদের বলি দেওয়া। (মনে হয় সে যুগে আর্মেনীয়দের ইসলাম সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না; তাদের চোখে আরবীয়গণ পূর্বকালের মত পৌত্তলিক হিসাবেই প্রতিভাত হত) এটা বুঝতে পেরে তাদের মা, সেই রাজকন্যা, তাদের দূর দেশে পাঠিয়ে দিল। একদিন ভ্রমণ করতে করতে দুই ভাই একটি গোপন ঝর্ণা আবিষ্কার করে, এবং সেই ঝর্ণার জল পান করে তারা অমিত শক্তিধর হয়ে ওঠে।

এরপর দুই ভাই পুনরায় বাগদাদে ফিরে আসে। খলিফা তখন দাবি করে যে এদের তার উপাস্য দেবতার ভক্ত হতে হবে। তখন তারা জানায় যে তারা উপাসনার কোন রীতিনীতি জানে না। তখন কি করে উপাসনা করতে হয় তা দেখাবার জন্য খলিফা হাঁটু গেড়ে বসে। সেই অবসরে এরা ধারাল তরবারি দিয়ে খলিফার শিরশ্ছেদ করে। এখানে বেতাল পঞ্চবিংশতি-র মূল কাহিনীটি অবশ্যই স্মর্তব্য।

দুই ভাই, সানাসার ও পালটাসারের আরও বহু অ্যাডভেঞ্চার আছে। ডেভিড গাথাসমূহের অন্যান্য সংগ্রহে সেগুলি পাওয়া যায়। আলোচ্য মহাকাব্যের দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত হয়েছে সানাসারের পুত্র আরুৎশ-মেহের বা সিংহ মেহেরের কাহিনী। একটি সিংহ বধ করে মেহের এই উপাধি পেয়েছিল। সানাসারের মৃত্যুর পর মেহের আর্মেনিয়ার রাজা হলে মিশরের আরব রাজা মেশরা-মেলিক (মিশর-মালিক) আর্মেনিয়া আক্রমণ করে মেহেরের হাতে পরাজিত হয়ে সন্ধি প্রার্থনা করে। মেহের সে প্রার্থনা মঞ্জুর করে এবং কালক্রমে মেশরা-মেলিকের সঙ্গে তার নিবিড় বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। উভয়ের মধ্যে একটা চুক্তি হয় যে, দুই বন্ধুর মধ্যে যে আগে মারা যাবে, অপরজন তার স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদের দেখাশোনা করবে। মেশরা-মালিক আগেই মারা যায়, এবং চুক্তি অনুযায়ী তার বিধবা স্ত্রী ইসমাইল খাতুন মেহেরকে মিশরে আহ্বান করে। মেহের মিশরে উপস্থিত হলে ইসমাইল খাতুন তাকে যাদুশক্তিবিশিষ্ট মদ্যপান করায় যার ফলে মেহের তার সমস্ত পূর্বস্মৃতি হারিয়ে ইসমাইল খাতুনের স্বামী হিসাবে দীর্ঘ সাত বৎসর মিশরে বাস করে। সাত বছর পরে একদিন মেহের শুনতে পেল যে ইসমাইল খাতুন তার পুত্রকে আর্মেনিয়া আক্রমণ ও শাসুন দুর্গ ধ্বংস করার জন্য বলছে। এই কথা শুনেই মেহেরের পূর্বস্মৃতি ফিরে এল, এবং কালবিলম্ব না করে সে আর্মেনিয়ায় ফিরে এল। মেহের ফিরে আসার পর তার আর্মেনীয় স্ত্রী আরমালানের গর্ভে তার একটি পুত্র জন্মায়, যে হচ্ছে আমাদের মহাকাব্যের নায়ক শাসুনের ডেভিড। ডেভিডের জন্মের পরই তার পিতা-মাতার মৃত্যু হয়।

এর পর আরম্ভ হচ্ছে আমাদের আলোচ্য মহাকাব্যের তৃতীয় বা মূল অংশ। মেহেরের মৃত্যুর পর আর্মেনিয়া দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং মিশরের আরব রাজার লুব্ধদৃষ্টি আর্মেনিয়ার উপর ছিল। বালক ডেভিডকে জানানো হয় নি সে কার পুত্র এবং তাকে মানুষ করা হয়েছিল মেষপালকদের মধ্যে। বালক বয়সেই সে পাকা শিকারী হয়ে উঠেছিল এবং একবার সে একাই চল্লিশজন ডাকাতকে হত্যা করেছিল।

যৌবনে পদার্পণ করার পর ডেভিড তার আসল পরিচয় জানতে পারল এবং উপলব্ধি করল যে, বিদেশী শত্রুদের একেবারে খতম না করলে আর্মেনিয়াকে চিরদিনই ভীত ও দুর্বল হয়ে টিকে থাকতে হবে। আর্মেনিয়ার সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল মিশর। পূর্বেকার মিশররাজ ডেভিডের পিতার বন্ধু ছিল, কিন্তু তার বিধবা স্ত্রী ও পুত্রের মনোভাব অন্যরকম। কাজেই ডেভিড নিজেকে শক্তিমান করে তুলল। তারপর ইতস্তত আক্রমণ করে সে দলে দলে মিশরের সৈন্যদের নিহত করতে লাগল। তখন একজন বৃদ্ধ মিশরীয়, যে ডেভিডের পিতার বন্ধু ছিল, তাকে অযথা লোকহত্যা করতে নিষেধ করে অনুরোধ করল যে, মিশররাজের

ভারতের
আদিতম
রসায়ন
চ্যবনপ্রাশ
আয়ুর্বেদোক্ত বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত

চ্যবনপ্রাশ নূতন ও পুরাতন সর্দি কাশি,
স্বরভঙ্গ ও শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় বিশেষ উপকারী।
টনিক হিসাবে নিয়মিত ব্যবহারে দেহের
দৌর্বল্য ও রুগ্নতা দূর করে ও শরীরের পুষ্টি
সাধন করিয়া স্বাস্থ্যশ্রীর পুনরুদ্ধার করে।
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা বোম্বাই কানপুর

সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধে সে ব্যাপারটার মীমাংসা করে নিক।

মিশররাজ ছিল অমিত শক্তিধর, কিন্তু প্রকৃতিতে একেবারে কুম্ভকর্ণের ভাই, সে একটানা চল্লিশ দিন ঘুমাত! যাই হোক স্থির হল যে উভয় উভয়কে তিনবার করে তরবারির আঘাত করার সুযোগ পাবে। প্রথম সুযোগ মিশররাজই পেল। সে পর পর তিনবার ডেভিডের দিকে তার তরবারি নিক্ষেপ করল, কিন্তু তিন-বারই আশ্চর্য দ্রুততার সঙ্গে ডেভিড সরে গিয়ে সেই আক্রমণ এড়িয়ে গেল। এইবার ডেভিডের পালা। সে যখন প্রথমবার তরবারি নিক্ষেপ করতে যাবে তখন তার সামনে এসে দাঁড়াল মিশররাজের মা, কাজেই তার প্রথম নিক্ষেপ ব্যর্থ হল। দ্বিতীয় নিক্ষেপের সময় এগিয়ে এল মিশর রাজের বোন, অতএব সে নিক্ষেপও ব্যর্থ। বাকি রইল শেষবারের নিক্ষেপের সুযোগ। যদিও মিশররাজের বর্মের উপর পাথরের যাঁতা আটকানো ছিল, তবুও তা ভেদ করে ডেভিডের তরবারি মিশররাজের বক্ষে আমূল বিদ্ধ হল। সমবেত জনতা ডেভিডের জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল : ফর'খ হল'তকন শাসুনংগস দাভিথিন।

ডেভিড বিবাহ করেছিল পার্শ্ববর্তী রাজ্যের রাজকন্যা খান্দুৎ-কে। ডেভিডের প্রেমপ্রসঙ্গ নিয়ে মহাকাব্যের অনেকটা অংশ ব্যয়িত হয়েছে। বিবাহের ফলে তাদের যে সন্তান জন্মায় তার নাম ফোক্র মেহের বা কনিষ্ঠ মেহের। এর পর ডেভিড গিউর্জিস্তান বা জর্জিয়া জয় করার জন্য যাত্রা করে। দীর্ঘ সাত বছর তার কোন সন্ধান না পাওয়ায় তার পুত্র মেহের এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে পিতার অনুসন্ধানে যাত্রা করে। অবশেষে একদিন উভয়ের সাক্ষাৎকার হয়, কিন্তু পিতাপুত্র পরস্পরের অপরিচিত। পারসিক সোহ্‌রাব-রুস্তম অথবা গেলীয় কুচুলাইন-কাহিনীর মত পিতাপুত্রে তুমুল যুদ্ধ বাধে, অবশ্য শেষ পর্যন্ত পরিচয়টা ফাঁস হয়ে যাবার পর যুদ্ধবিরতি ঘটেছিল। পর্যাপ্ত খোঁজ-খবর না নিয়ে যুদ্ধ করার জন্য ডেভিড পুত্রের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে অভিশাপ দেয় যে তার কোন দিন মৃত্যু হবে না এবং সে চিরকাল অপুত্রক থাকবে।

বাইজানটাইনরাজ চেমেসিকের কন্যার ষড়যন্ত্রে ডেভিডের মৃত্যু ঘটে। ডেভিডকে সে ভালবেসেছিল এবং তার ব্যর্থপ্রেমই তাকে ডেভিডের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তোলে। ডেভিডের পুত্র মেহের তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিয়েছিল বাইজান-টাইনরাজ চেমেসিককে নিহত করে।

এরপর আমরা আসছি ডেভিড মহাকাব্যের শেষ অংশে যেখানে ডেভিডের পুত্র মেহেরের জীবনকথা বর্ণিত হয়েছে। পিতামাতার মৃত্যুর পর মেহের সারা জগৎ পর্যটন করেছিল। সর্বত্রই সে ছিল দুর্বল ও উৎপীড়িতের বন্ধু। আর্মেনিয়ার শত্রু-রাজ্য বাগদাদ সে বিধ্বস্ত করেছিল। তার স্ত্রী পাজিকের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুর পর সে বৈরাগ্য অবলম্বন করে। দুর্বহ অমর জীবনে শান্তিলাভের উদ্দেশ্যে সে পিতার সমাধিতে প্রার্থনা করেছিল এবং ডেভিডের আত্মা তাকে নির্দেশ দিয়েছিল ভ্যান হ্রদের তীরে একটি নির্জন গুহায় গিয়ে বাস করতে। আর্মেনীয়রা বিশ্বাস করে মেহের আবার ফিরে আসবে সেদিন, যেদিন গমের দানাগুলি হবে কালজামের মত বৃহৎ, যেদিন আর্মেনিয়াতে আসবে চিরন্তন সুখ, শান্তি এবং সমৃদ্ধি।

আর্মেনীয় সাহিত্য

৪০০ খৃস্টাব্দের পূর্বে রচিত আর্মেনীয় সাহিত্যের কোন চিহ্ন অবশিষ্ট নেই, খৃস্টানদের দ্বারা সমুদয় বিনষ্ট হয়েছিল। খোরেনের মোজেসের ইতিহাস-গ্রন্থে পূর্ব যুগের সাহিত্যের নিদর্শন গোটা কুড়ি লাইনের বেশি নেই।

পরবর্তীকালে অবশ্য খৃস্টান সাধু-দের অনুপ্রেরণায় নতুন পর্যায়ে আবার আর্মেনিয়ায় সাহিত্য রচনার প্রচেষ্টা দেখা দেয়। এই নতুন পর্যায়ে সাহিত্যসৃষ্টির মূলে যিনি প্রেরণা যুগিয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন মেসরব মাস্টোটস, যিনি আর্মেনীয় লিপির উদ্ভাবক। গ্রীক বর্ণমালার অনুকরণে আর্মেনীয় জিভের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি যে বর্ণমালার প্রচলন করেছিলেন তা দীর্ঘকাল ধরেই আর্মেনীয় সাহিত্য রচনায় ব্যবহৃত হয়েছে।

আর্মেনীয় ভাষায় বাইবেলের তর্জমা হয়েছিল খৃস্টীয় পঞ্চম শতকে। অনুবাদ হয়েছিল যুগ্মপ্রচেষ্টায়, তাঁরা ছিলেন পূর্বোল্লিখিত মেসরব মাস্টোটস এবং শাহক পার্থেব (পার্থিয়ার ইশাক বা আইজ্যাক)। পঞ্চম শতকের আর্মেনীয় সাহিত্য ছিল প্রধানত অনুবাদ-নির্ভর। মূলত সিরিয়াক এবং গ্রীক থেকেই আর্মেনীয় অনুবাদ সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছিল। সিরিয়াক থেকে অনূদিত হয়েছিল নিউ টেস্টামেন্ট, ইউসেবিয়াস রচিত ইতিহাস ও সম্রাট কনস্টান্টাইনের জীবনী, গ্রিরিয়াস এবং সামানার আইন-সমূহ এবং আফ্রাতেস ও এফ্রেম সাইরাসের রচনাবলী। গ্রীক থেকে অনূদিত হয়ে-ছিল ইউসেবিয়াসের ক্রনিকল এবং জোসেফাসের রচনাসমূহ।

পঞ্চম থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত আর্মেনীয় রচনাকারদের মৌলিকত্ব ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ ছিল। বাইজানসিয়ামের ফাউস্টাস ৩৪৪ থেকে ৩৯২ পর্যন্ত ঘটনাবলী নথিভুক্ত করেছিলেন। পঞ্চম শতকেই গ্লাকের জেনোবিয়াস টারোনের ইতিহাস রচনা করেন। তাঁর রচনায় অবশ্য পৌরাণিক ও অলৌকিক বিষয়ের ছড়াছড়ি, পূর্বো-ল্লিখিত সাধু গ্রেগরীর রচনাসমূহই ছিল তাঁর মূল অবলম্বন। এলিসাউস ভার্ডাপেট ভার্ডেনের ইতিহাস লিখে-ছিলেন যাতে বর্ণিত হয়েছে আর্মেনীয়-দের সঙ্গে শাসানীয়দের যুদ্ধের কাহিনী। ফার্পের লাজারের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এরপরে আসে খোরেনের মোজেসের বিখ্যাত ইতিহাসের কথা। এজ্‌নিক ছিলেন আর্মেনিয়ার বিশিষ্ট চিন্তানায়ক যিনি তদানীন্তন যুগের সমস্ত ধর্মমত যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করে-ছিলেন। সপ্তম শতক পর্যন্ত আর্মেনীয় সাহিত্য বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে নি। শিরকের আনানিহা রচিত জ্যোতিষ-শাস্ত্র, বিশপ সেবিওস রচিত এশিয়া মাইনরে মুসলিম অধিকারের ইতিহাস, কালাংকাতুয়েৎসজি রচিত আলবেনিয়ার ইতিহাস এবং ওস্‌ত্রয়ানসেরের আইবেরীয় উপদ্বীপের ইতিহাসের অনুবাদ ছাড়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন গ্রন্থ এ যুগে রচিত হয় নি।

শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত

বিদগ্ধ-মাধব

(বিশ্বনাথ চক্রবর্তীকৃত টীকাসহ)

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেম-লীলার স্বরূপ প্রকাশ করিবার জন্যই শ্রীরূপ গোস্বামীর দ্বারা শ্রীবিদগ্ধ-মাধব নাটক রচনা করাইয়াছিলেন। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"মধুর প্রসন্ন ইঁহার কাব্য সালঙ্কার।
ঐছে কবিত্ব বিনা নহে রসের প্রচার॥"

মূল্য : তিন টাকা।

সোনার আনারস

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

মূল্য : দুই টাকা

কিশোর-কিশোরীদের উপযুক্ত রোমাঞ্চ-কর উপন্যাস। ছাপা, বাঁধাই চমৎকার।

উপহার দিবার মত বই

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

চোমেংলামার চোখে উত্তরবঙ্গ

॥ মালদহ জেলা ॥

মালদহের নদী, ভূ-প্রকৃতি ও জনপদ—

মালদহ জেলার অভ্যন্তরভাগ দিয়ে যে সমস্ত প্রধান নদী প্রবাহিত—তার সবগুলির উৎপত্তিস্থল হিমালয়ে, এবং যে সমস্ত শাখানদীর পলিমাটির দাক্ষিণ্যে এই জেলার কৃষিসম্পদ, তার মধ্যে মোটামুটিভাবে অর্ধেক পরিমাণ জেলার অভ্যন্তরভাগের নদীর থেকে স্রোতমুখের পরিবর্তনের ফলে ধরা যেতে পারে এবং বাকী অর্ধেক বহিরাগত। নদীগুলি সর্বদাই দক্ষিণমুখী এবং শাখানদীগুলির অবস্থান ও গতিপথ সম্পর্কে সঠিক কোন ধারা অনুসরণ করা না গেলেও দুইটি বৃহৎ নদীর সংযোজন বা অববাহিকা সৃষ্টির প্রয়োজনে সর্পিল এবং বিভিন্নমুখী স্রোতসম্পন্ন। প্রধান নদী গঙ্গা জেলার পশ্চিম অংশের দুই-তৃতীয়াংশ অঞ্চল সীমানাচিহ্ন নির্ধারণ করে প্রবাহিতা। গাঙ্গেয় উপত্যকা এবং দুই কূল দিয়ে জেলার যে পলিমাটিযুক্ত কৃষি অঞ্চল—প্রধানত সেক্ষেত্রে ধান এবং রবিশস্যের উৎপাদন বেশি। জেলার একেবারে দক্ষিণ অংশে গঙ্গার তীরবর্তী কৃষিভূমিতে বরঞ্চ রবিশস্যের ফলনই বেশি বলে ধরে নেওয়া যায়। গঙ্গা এখানে নাব্য।

গঙ্গার পরই জেলার প্রধান নদী হিসাবে মহানন্দার নাম করা যেতে পারে। মহানন্দা উত্তর থেকে দক্ষিণে তির্যক গতিতে বয়ে এসেছে। মহানন্দার উভয় তীর দিয়ে বিস্তীর্ণ ভূভাগকে বরেন্দ্রভূমি বলে। মহানন্দার মাটি লাল এবং তীরবর্তী অঞ্চলের বহু স্থানেই লাল মাটিযুক্ত কৃষিভূমি। প্রাচীন বরেন্দ্রভূমি বা 'বারিন্দের' মধ্যে পাল ও সেন বংশের রাজধানী এবং মুসলমান আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল।

বর্তমান বছরের এক কৃষি সমীক্ষার ফলে জানা যায় মহানন্দা নদীর তীরবর্তী ভূভাগের অন্তর্গত মালদহের বিখ্যাত আমবাগানগুলি অবস্থিত। এর কারণ অনুসন্ধান নিশ্চয়ই কৃষিবিভাগ কর্তৃক করা হয়েছে এবং গবেষণার বিষয় যাই হোক না কেন, জেলার অভ্যন্তরভাগ দিয়ে ঘনসন্নিবিষ্ট এই বাগানগুলি এক নয়নাভিরাম দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে। আমের মরশুম সুরু হওয়ার সাথে সাথেই পাইকার ব্যবসায়ীরা এসে মুকুল কিংবা গুটি অবস্থাতেই এক-একটি বাগান খরিদ করে রাখে। অনেকটা ভাগ্যের উপর নির্ভর করে ব্যবসায়ে নামার মত। কেন না ঝড় বা অতিরিক্ত কুয়াশার ফলে আমের ফলন নাও হতে পারে। তারপর গাছ থেকে আম সংগ্রহ করা চালান দেওয়া প্রভৃতি কাজে এই অঞ্চল এত ব্যস্ত থাকে যে—তা এক রীতিমত বিস্ময়ের ব্যাপার। মালদহের সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ মাত্রেরই এক বা একাধিক আমবাগান আছে। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে—মালদহের অর্থনীতিতে আমের ব্যবসা একটা উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে। কাজেই এই বিখ্যাত আমকে যদি প্রধানত মহানন্দার দান হিসাবে উল্লেখ করা যায়—তাহলে অত্যুক্তি হবে না।

জেলার অন্যতম প্রধান নদী কালিন্দীর উৎপত্তি স্থল সিকিমের অন্তর্গত কোনও দুরধিগম্য হিমপ্রবাহ। সিকিমের অংশের যে জলধারা কালিন্দীর জলপ্রবাহের উৎস সেই নদীর নাম হল—'পোনার'। আবার মতান্তরে (বুকানন হ্যামিল্টনের জিওলজিক্যাল সার্ভে রিপোর্ট—১৮১০) কালিন্দী গঙ্গারই একটি শাখা ছাড়া অন্য কিছু নয়। যাই হোক কালিন্দীর সঙ্গে ছোট ছোট প্রশাখার দ্বারা গঙ্গার সঙ্গে সর্বদাই যোগাযোগ আছে। ফলে মালদহের নদীর বন্যাগুলিতে কালিন্দীর ধ্বংসলীলা জেলার পক্ষে সবিশেষ আতঙ্কের কারণ ঘটে।

এর পরেই মালদহের উল্লেখযোগ্য নদী হল টাঙ্গন এবং পুনর্ভবা। দুটি নদী দিনাজপুর থেকে প্রবাহিত হয়ে মালদহে প্রবেশ করেছে। যদিও নদী দুটি স্বল্প পরিধি যুক্ত—তথাপি জেলার কৃষি এবং আবহাওয়াতে এই নদী দুটিরও কিছুটা অবদান আছে বইকি। টাঙ্গন সময়ে সময়েই তার গতিপথ পরিবর্তন করে। শোনা যায়—বিগত শতাব্দীতেই টাঙ্গন প্রায় সাত মাইল দূরে ছিল।

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে মালদহ জেলা হিসাবে প্রাচীন সভ্যতার এবং সম্পদের ঐতিহ্যবহনকারী। এই জেলার জনপদ ও জীবনধারা গড়ে ওঠার পিছনে কয়েক শত বছরের প্রাচীন ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস যেমন বিচিত্র তেমনি বিস্ময়কর। মালদহের গ্রামে, গঞ্জে, নাগরে বন্দরে এখনও সেই সব ইতিহাসের নিদর্শন রয়ে গেছে। কাজেই জেলার বিস্তৃত ইতিহাস লিখতে গেলে কয়েকশ' বছর পিছনে ফিরে যেতে হয়। এই নিবন্ধে আধুনিককালের জনপদ এবং তার অধুনাতন পরিচয় দেওয়া হল মাত্র।

বড় দারগা ঃ ১৩৪১ খৃস্টাব্দে পীর জালালউদ্দীন মকবুল শাহের স্মৃতি রাখার জন্য আলি মুবারক কর্তৃক নির্মিত

বড় মন্দির : আন্দাজ ১৪৪২ খৃস্টাব্দে লতিফ খান নামে জনৈক আমীর কর্তৃক নির্মিত। গঠনভঙ্গীতে মোগল নিদর্শন সুস্পষ্ট।

অবশ্য পরিচয়গুলি জেলার প্রধান প্রধান গ্রাম শহর ও নগর বন্দরগুলি সম্পর্কে।

আমানীগঞ্জ—ভাগীরথী নদীর তীরে রেশম কেনা-বেচার বন্দর হিসাবেই সাধারণত আমানীগঞ্জ বিখ্যাত। দেশ বিভাগের পূর্বে এখানে রাজসাহী ও পাবনার ব্যবসায়ীরা এসে রেশমের কেনা-বেচা করত। দেশ বিভাগের পরে একমাত্র মুর্শিদাবাদের ব্যবসায়ীরাই আসছে। পূর্বে এখানে জনবসতি ছিল না বললেই চলে। দেশ বিভাগের পরে পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তুরা এখানে কিছু কিছু জনপদ সৃষ্টি করেছে। ভবিষ্যতে স্থানটি আরও উন্নত হবে বলে অনুমান করা যায়। জায়গাটিকে উন্নত করবার জন্য কয়েকটি সরকারী পরিকল্পনাও চোখে পড়ল।

আইহো—এটিও একটি প্রাচীন বাণিজ্য কেন্দ্র। টাঙ্গন ও মহানন্দার সংগমস্থলে একটি নাতিবৃহৎ বাজার এখনও বিদ্যমান।

আড়াইডাঙা—কালিন্দী নদীর পূর্ব-তীরে রাতুয়া থানার অন্তর্গত একটি বৃহৎ গ্রাম হল আড়াইডাঙা। যদিও গ্রাম বলা হল—তবুও ভবিষ্যতে যে এটা একটা আধুনিক জীবনযাত্রা পদ্ধতি সম্পন্ন উন্নত জনপদে পরিণত হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এখানে প্রাচীন মৈথিলী বংশধারার একটি আবর্তিত সম্প্রদায়ের সন্ধান পাওয়া যায়—এবং বেশির ভাগই তাদের মধ্যে 'আহির' বা গোয়ালা শ্রেণী-ভুক্ত। তাছাড়াও অন্যান্য বৃত্তিজীবীরাও রয়েছেন। নতুন এসেছেন পূর্ব বাংলার নানা সম্প্রদায়ের মানুষ।

বামনগোলা—গাঁজোল থেকে দশ মাইল পূর্বে বামনগোলাও একটি উন্নত জনপদ। এখানে পুলিশ হেড কোয়ার্টার রয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান চোখে পড়ল। গাঁজোল ও বামনগোলার মধ্যে একটি সুন্দর ন্যাশনাল হাইওয়ে তৈরি হয়েছে সম্প্রতি। এই অঞ্চলে কতক-গুলি প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত পুকুর ও পরিখার সন্ধান পাওয়া যায়।

ভালুকা—হরিশচন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত এবং থানা থেকে সাত মাইল পশ্চিম দিকে অবস্থিত। ভালুকা রোড রেল স্টেশন থেকে মাত্র পাঁচ মাইল। ভালুকাতে একটি সাপ্তাহিক হাট আছে। দৈনন্দিন বাজার এবং সেখানে প্রধান পণ্য হিসাবে পাট ও আমের কারবার চলে আসছে বহুদিন থেকে। ভালুকাকে পার্শ্ববর্তী কয়েকটি ছোটখাটো হাট ও গ্রামের মধ্যে বেশ উন্নত ও সমৃদ্ধ জনপদ বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। ভালুকা এবং এই অঞ্চলগুলি কালিন্দী এবং কঙ্কর নদীর সংগমস্থলে অবস্থিত বলে প্রধানত এই অঞ্চল ব্যবসাকেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছে। মিয়াঘাট-মশালদহ-জালাল-পুর প্রভৃতি ছোট ছোট গ্রাম এবং হাটের মধ্যে ভালুকাই সংযোগ রক্ষাকারী এবং কেন্দ্রীয় জনপদ হিসাবে গড়ে উঠেছে।

চাঁচোল—খরবা থানার অন্তর্গত সামসি থেকে নয় মাইল উত্তরে চাঁচোল একটি প্রাচীন জনপদ। এখানে রাজা উপাধি-ধারী প্রাচীন জমিদার বংশ এখনও বিদ্যমান। একদা চাঁচোলের জমিদারগণের বদান্যতা ও খ্যাতির বিষয় সর্বভারতেই বিদিত ছিল। এছাড়াও চাঁচোলের বৈশিষ্ট্য হল—সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে—সংযোগকারী রাস্তার জন্য। বহু রাস্তা চাঁচোলে এসে মিশেছে। এর মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে—রাতুয়া-সামসি-চাঁচোল রোড, হরিশচন্দ্রপুর-তুলসীহাটা-চাঁচোল রোড, চাঁচোল-গাঁজোল-বামনগোলা রোড-গুলি বিখ্যাত।

এনায়েতপুর—মাণিকচক থানার দুই মাইল পূর্বে এনায়েতপুর গ্রাম। এখানে প্রাচীনকালে আগত মৈথিলী অধিবাসীদের সাক্ষাৎ মেলে। এছাড়াও যে সমস্ত মুসলমান অধিবাসী আছে—তারা নিজেদের বাদশাহী আমলের বাসিন্দা বলে দাবি করেন। স্থানটি মালদহের বিখ্যাত আম উৎপাদনের একটি প্রধান কেন্দ্র বলে গণ্য করা যায়। মাটি দো-আঁশ।

ইংলিশ বাজার বা ইংরেজবাদ—মহা-নন্দা নদীর দক্ষিণ তীরে একটি প্রাচীন জনপদ এবং জেলার হেড কোয়ার্টারও বটে। প্রাচীন পাল বা সেন আমলে এই স্থানটির কোনও গুরুত্ব ছিল না। মোগল আমলে এখানে প্রথম কিছু দরবেশ ও ফকীরের আস্তানা ছিল অনেকের অনুমান। সপ্তদশ শতকে এখানে প্রথমে ডাচ্ এবং পরে ফরাসী উপনিবেশ গড়ে ওঠে। অবশ্যই বিদেশীদের লক্ষ্য ছিল রেশমের উৎপাদন ও ব্যবসা। ফরাসীরা এখানে রেশমের কারখানা তৈরি করেছিল।

এরপরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে আসে সুবে বাংলার শাসনভার। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা এখানে রেশমের কারখানা তৈরি করেছিল। এখনও সেই কারখানা এবং তার কিছু নিদর্শন রয়ে গেছে। ইংরেজবাদের পার্শ্ববর্তী 'লকুড়ীখানা', 'মুর্গখানা' প্রভৃতি নামের স্থানগুলি ইংরেজ বসতির সাক্ষ্য দেয়। অবশ্য ইংরেজবাদ নামটিই এই পরিচয়ের জন্য যথেষ্ট।

যাই হোক বর্তমানে ইংলিশ বাজারকে আধুনিকীকরণের কাজ সুরু হয়েছে প্রায় স্বাধীনতার পরবর্তীকাল থেকেই। ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত পৌরসভাটি আজও বিদ্যমান—তবে শহরের এলাকা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে তো বটেই—এই দীর্ঘদিনের মধ্যেই দু-দুবার মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধিত হওয়ার ফলে ইংলিশ বাজারের পৌরসভার দায়িত্ব বেড়ে গেছে অনেকখানি।

গাঁজোল—গাঁজোল একটি পুলিশ হেড কোয়ার্টার। সপ্তম শতক থেকেই গাঁজোলের ইতিহাসের সূত্রপাত। মুসল-মান আমলে গাঁজোলের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লেও—বর্তমানে এটা একটা মধ্যম শ্রেণীর জনপদ। যদিও স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে উন্নয়ন চলছে কিছু পরিমাণে।

হরিশচন্দ্রপুর—হরিশচন্দ্রপুর পুরাতন জমিদারদের আবাসভূমি। যদিও হরিশ-চন্দ্রপুরকে এখনও গ্রাম পর্যায়ে ফেলা চলে। অবশ্য এখানে একটি কো-অপারেটিভ

ব্যাংক, পঞ্চাশ শয্যাবিশিষ্ট একটি হাসপাতাল রয়েছে। এছাড়া বাজার, সার্কেল অফিসারের দপ্তর প্রভৃতিও আছে। হরিশচন্দ্রপুরের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে প্রবাহিতা কালিন্দী নদী। হরিশচন্দ্রপুরের সন্নিকটেই রয়েছে মালদহের 'তল' জমি এবং বিল।

কালিয়াচক—পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গা নদীর উপকূলে অবস্থিত কালিয়াচক থানা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য থানা হিসাবে পরিগণিত। দক্ষিণ-পূর্ব সীমানায় প্যাকিস্তান সীমান্ত। পশ্চিমবঙ্গে কৃষির দিক দিয়ে যতগুলি উন্নত স্থান আছে কালিয়াচক তার মধ্যে অবশ্যই অন্যতম। জনসংখ্যার অধিকাংশ সংখ্যা মুসলমান। সাধারণত এই মুসলমান অধিবাসীদের 'শীর্ষ বাদিয়া' মুসলমান বলে, এবং এই সম্প্রদায় মূলত মুর্শিদাবাদ থেকে এসে বসবাস করছে। থানার অন্তর্গত কয়েকটি উন্নত ও বিপুল জনসমষ্টি সম্পন্ন গ্রাম হল —কাঁকড়িবান্দা-ঝাউবোনা, বাহির্জেলা থেকে আগত ব্যাপারীদের দ্বারা অধ্যুষিত বাজারসহ পঞ্চানন্দপুর-দোগাছিয়া-বৈষ্ণব-নগর, গোলাপগঞ্জ, সাহাবাজপুর, জালুয়াবান্ধাই, জালালপুর, দলুগ্রাম, সুজাপুর, মন্দাই, মোথাবাড়ি প্রভৃতি। শাখানদী পাগলা থানার ঠিক মধ্যভাগ দিয়ে পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিতা হয়ে ভাগীরথীতে গিয়ে মিশেছে।

কালিগ্রাম—খরবা থানার অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। প্রাচীনকাল থেকেই এখানে বস্ত্র বয়ন এবং কেনা-বেচার কেন্দ্র রয়েছে। কালিগ্রামের প্রত্যেকটি গৃহস্থ বাড়িই পুরাতন গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ থেকে সংগৃহীত ইট ও পাথর দিয়ে তৈরি। কালিগ্রাম গোস্বামী উপাধিধারী প্রাচীন পণ্ডিতবংশের জন্মভূমি এবং বাংলাদেশের বিখ্যাত পণ্ডিত পুরুষোত্তর গোস্বামী এখানেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

কাঁড়িয়ালি—মশালদহ॥ প্রাচীনকাল থেকেই একটি ব্যবসাকেন্দ্র হিসাবে পরিচিত। এখনও এখানে পাট, গুড় প্রভৃতির রপ্তানী কেন্দ্র।

মালদহ বা পুরনো মালদা—শহর মালদা মহানন্দা নদীর বামতীরে অবস্থিত। ইতিহাসবিদগণের অভিমতে মালদহ বা পুরনো মালদা পাণ্ডুয়ার একাংশ। অষ্ট-দশ শতাব্দীব্যাপী এখানে-ওখানে ডাচ্ ও ফরাসীদের সিল্ক এবং কার্পাসের বস্ত্র উৎপাদন কারখানা ছিল। ইংরাজ আমলে ইংরাজরাও প্রথমে এখানে বস্ত্র ব্যবসায়ের ও উৎপাদনের কারখানা হিসাবে প্রাধান্য দিলেও—পরে শহরের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রশাসনিককেন্দ্র হিসাবে গঠনের কথা চিন্তা করে। কাটিহার, গোদাগাড়ি, লাইনের একটি উল্লেখযোগ্য রেল স্টেশন হিসাবে পুরনো মালদার গুরুত্ব প্রচুর। ফলে এখান থেকে রেশম ও পাট রপ্তানীর কেন্দ্র হিসাবে এখানে বাণিজ্যব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। পুরনো মালদা ছাড়াও শহরের সন্নিকটে বালিয়া নবাবগঞ্জও একটি বৃহৎ সাপ্তাহিক রপ্তানী কেন্দ্র।

শহর এখনও পর্যন্ত অবিন্যস্ত। রাস্তাগুলি অপ্রশস্ত গরুর গাড়ি চলাচলের যোগ্যমাত্র। পূর্ববংগাগত উদ্বাস্তু এবং আধুনিক বসতি গড়ে উঠেছে শহরের বহির্ভাগ দিয়ে। শহরের ভিতরে প্রাচীন জুমা মসজিদ, কুটি মসজিদ প্রভৃতি দ্রষ্টব্যস্থান।

আলোকচিত্র : পূর্ণেন্দু পালচৌধুরী

এইচ. জি. ওয়েলস-এর গল্প

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

নবম অধ্যায় ঃ দি টাইম মেসিন

গল্পকার ওয়েলসকে নানা রূপে পাই আমরা। কিন্তু সবচেয়ে বিশিষ্টরূপে পাই বৈজ্ঞানিক রহস্য-কাহিনীকার হিসেবে। বিজ্ঞান-নির্ভর কাহিনী রচনায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এ ব্যাপারে সাহিত্য-জীবনের সুরু থেকেই জয়মাল্য পেয়েছেন তিনি। পেয়েছেন অজস্র অনুরাগীর অকুণ্ঠিত সাধুবাদ। অথচ কে না জানে, দক্ষ কারিগরও প্রথম প্রয়াসে সেরা যন্ত্র গড়ে না। গড়তে পারে না। কিন্তু ওয়েলস এদিক থেকে ব্যতিক্রম। বিজ্ঞানভিত্তিক তাঁর প্রথম কাহিনীটিও শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা পেয়েছে। 'দি টাইম মেসিন' মেসিন হিসেবেই শুধু নিখুঁত নয়, গল্প হিসেবেও সেরা। কেননা এ গল্প পড়তে বসে সময়-পর্যটক বা 'টাইম ট্র্যাভলারের' মতো আমরাও ভবিষ্যতের বুকে অভিযান করি। খুশি হই অনাস্বাদিতপূর্ব রসের সন্ধান পেয়ে; অনাগত কাল সম্বন্ধে এক বিচিত্র অনুভূতি আমাদের ঘিরে ধরে।

এ কাহিনীর মূল ভিত্তিটি যদি বৈজ্ঞানিক অনুমানের ওপর না হত, তবে হয়তো এতটা খুশি আমরা হতাম না। আমাদের অনুভূতি রঙ-রসের ইন্দ্রধনু তবে ছাড়াত না। বৈজ্ঞানিক ধারণাকে আশ্রয় করে আছে বলেই অসম্ভব হওয়া সত্ত্বেও কাহিনীটিকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বরং মনে হয়, জীবনধর্মী কোনো গল্পের অভিযাত্রী যেমন, এ গল্পের টাইম ট্র্যাভলারও তেমনি জীবন্ত। টাইম মেসিন আছে তার। সে মেসিন নিয়ে সত্যই সে অজানা ভবিষ্যতের দিকে পাড়ি দিয়েছে।

বন্ধুরা এসেছে তার ঘরে। গল্প শুনেছে টাইম ট্র্যাভলিং বা সময়-পর্যটনের। অবশ্য গল্প সরাসরি শোনে নি কেউ। গৌরচন্দ্রিকায় সময়-পর্যটক তার বৈজ্ঞানিক ধারণার কথা ব্যাখ্যা করেছে। বলেছে, আমাদের জ্যামিতি ভুল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। যে সরলরেখার স্থূলত্ব নেই কিছু, তার অস্তিত্বও নেই,—জ্যামিতির এই সিদ্ধান্তকে মেনে নেওয়া যায় না। আর মেনে নিলে প্রশ্ন ওঠে, দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতাবিশিষ্ট কোনো পদার্থ যা এক মুহূর্তের জন্যেও কোনোদিন কোথাও স্থায়ী হয় না, তার কি সত্যিকারের কোনো অস্তিত্ব আছে? এ প্রশ্নের উত্তর হল, না নেই। কেননা যে কোনো সত্য বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা ছাড়াও স্থায়িত্ব থাকা চাই। স্থায়িত্ব যার আছে এবং সেই সঙ্গে যার আছে এই তিনটি ধর্ম, তাকে আমরা সত্য বস্তু বলে স্বীকার করবো। আমরা বলবো, যে কোনো স্থিতিশীল পদার্থমাত্রই চারমাত্রিক বা 'ফোর ডিমেনসানাল'। তাই পূর্বোক্ত সরলরেখাকেও সত্য বলে স্বীকার করবো আমরা। অথচ স্বীকার করতে যে আমরা ভুলে যাই, তার কারণ, সময়ের কথা মনে থাকে না আমাদের। আমরা শুধুমাত্র আয়তনের তিনটি উপাদান দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার কথাই মনে রাখি। এদের এই তিনটিকে সময় থেকে আলাদা করে দেখি সবাই। কেননা সকলেরই চেতনা জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি সময়ের পথ ধরে একদিকে প্রবাহিত হয়। সময়-বরাবর এই যে চেতনার প্রবাহ, এরই মধ্যে আছে 'ফোর্থ ডিমেনসন'। আসলে 'স্পেস' বা আয়তনের যে তিনটি ডিমেনসনের কথা বলা হল, তাদের সঙ্গে সময় নামক ডিমেনসনের পার্থক্য কিছু নেই। শুধুমাত্র মনে রাখতে হবে, আমাদের চেতনা এই সময় ধরে এগিয়ে চলে. এবং চলে বলেই যদি ইচ্ছে করি আমরা তবে সমতল কোনো বস্তুর ওপর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতাবিশিষ্ট কোনো পদার্থের ছবি আঁকি যেমন, ঠিক তেমনি কোনো দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতাবিশিষ্ট বস্তু দিয়েও চারমাত্রিক বা 'ফোর ডিমেনসানাল' পদার্থকে প্রকাশ করতে পারি।

এই যে চারমাত্রিক জ্যামিতি, এ নিয়েই সময়-পর্যটকের গবেষণা। তার বক্তব্য হল, সময় এক ধরনের 'স্পেস' বা আয়তন ছাড়া অন্য কিছু নয়। কিন্তু অনেকে প্রশ্ন তোলেন, সময় বরাবর ঘুরে বেড়াতে পারি নে আমরা, যেমন পারি দৈর্ঘ্য. প্রস্থ বা উচ্চতা বরাবর বেড়াতে। সময়-পর্যটক বলতে চান, আমাদের এ ধারণা ভুল। প্রতি মুহূর্তেই ঘুরে বেড়াচ্ছি আমরা। এক মুহূর্ত থেকে অন্য এক মুহূর্তে সরে আসছি। আমাদের মানসিক সব অস্তিত্ব যারা অবস্তু এবং আকার-আয়তনবিহীন, তারা সবই সময় নামক ডিমেনসন বরাবর নির্দিষ্ট গতিতে এগোচ্ছে। এই গতিপথ ধরে চললেই সময়-পর্যটন করতে পারি আমরা। ভবিষ্যতের দিকে যেতে পারি; আবার পেছোতে পারি অতীতের দিকেও। কল্পনায় অতীত বা ভবিষ্যতের দিকে প্রায়ই পিছিয়ে পড়ি বা এগিয়ে আসি আমরা। কিন্তু 'টাইম মেসিন' যথার্থই আমাদের বিগত যুগে অথবা অনাগত কালে নিয়ে যেতে পারে।

সময়-পর্যটকে এই সব গবেষণা ও সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ করে ওয়েলস মূল কাহিনীটিকে বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তির ওপর স্থাপন করবার চেষ্টা করেছেন; এবং তাঁর এই চেষ্টা যে অনেকখানি সফল হয়েছে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই আমাদের। কেননা ঠিক এর পরেই টাইম মেসিনের ছোট্ট মডেলটিকে সকলের চোখের সামনে অদৃশ্য হতে দেখে আমরা অবাক হলেও ঠিক অবিশ্বাস করতে পারি না। আমাদের মনে হয়, সময়-পর্যটকের গবেষণা ও আবিষ্কারের সঙ্গে এ ঘটনার একটা নিকট যোগসূত্র আছে। এ ছাড়া সুরুতেই টাইম মেসিনের মডেলের কথা থাকায় প্রস্তুত হয়ে নেবার অবকাশ পাই আমরা। ভাবি, পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে ওয়েলস আমাদের অসম্ভবের দেশে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন।

সময়-পর্যটকের বন্ধুরা প্রথমে তার কথায় আমল দেয় নি। বিরুদ্ধ মতবাদকে প্রতিফলিত করেছে, এবং আমরাও অবিশ্বাসীদের ধারণাকে বিরাট একটি জিজ্ঞাসার আকারে ভেসে উঠতে দেখেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলবো, এ কাহিনীর পরবর্তী পর্বে যা ঘটে, জিজ্ঞাসার অবকাশ সেখানে অল্প। সেখানে বিস্মিত পাঠকদের বিশ্বাস-স্থাপনের পালা।

টাইম মেসিনের মডেলটি প্রথমেই

কৌতূহল উদ্রিক্ত করে আমাদের। আমরা দেখতে পাই যেন, ছোট্ট ও ঝকঝকে একটি ধাতব যন্ত্র। যন্ত্রটি ছোটখাটো একটি ঘড়ির চেয়ে বড় নয়। বড় নিখুঁতভাবে গড়া হয়েছে সেটি। তার মধ্যে আছে স্বচ্ছ ও স্ফটিক জাতীয় কি সব পদার্থ। চালকের ইচ্ছা অনুযায়ী সেই যন্ত্রটিকে অতীত বা বর্তমানের দিকে পাঠানো যায়।

কাহিনীর পরবর্তী পর্বে মূল টাইম মেসিনটিকে উপস্থাপিত করা হয়েছে আমাদের সামনে। আমরা লক্ষ্য করেছি, সময়-পর্যটক যথেষ্ট আস্থার সঙ্গে যন্ত্রটির গুণাগুণ ব্যাখ্যা করছে। এরপর সরাসরি গল্প বলা হয় নি আর। ফ্ল্যাশ-ব্যাকে বলা হয়েছে। সময়-পর্যটক তার পর্যটন শেষ করে বন্ধুদের সামনে এসেছে। এবং তারপর ভবিষ্যতের সমস্ত অভিজ্ঞতার কথা সে নিজেই বর্ণনা করেছে। বন্ধুরা অবাক হয়েছে তার ক্লান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত ও ঈষৎ বিকৃত চেহারা দেখে।

কাহিনীর এই অংশে লেখকের কৃতিত্ব এই যে, বন্ধুদের বিস্ময় ও উৎকণ্ঠা পাঠকচিত্তে তিনি সাফল্যের সঙ্গেই সংক্রামিত করেছেন। অতি সংযমী পাঠকও একসঙ্গে হাজার প্রশ্ন করার জন্যে প্রস্তুত হয় এখানে। এবং তারপর সাগ্রহে লক্ষ্য করে, সময়-পর্যটক জিরিয়ে নিচ্ছে একটু। সামান্য কিছু খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে সুস্থ হবার চেষ্টা করছে।

সন্দেহ নেই, সময়-পর্যটকের এই অপরিসীম ক্লান্ত ও অবসন্ন চিত্রটির মধ্য দিয়ে তার নিদারুণ অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে লেখক আমাদের সচেতন করে তোলেন। আমরা রূপকথার গল্প শোনার জন্যে উতলা শিশুদের মতোই চঞ্চল হয়ে উঠি। সময়-পর্যটকের কাছ থেকে আশ্চর্য এক গল্প শুনি সবাই। দূর-ভবিষ্যতের বুকে পাড়ি জমাবার এক আশ্চর্য গল্প।

বন্ধুরা রয়েছে সামনে। সময়-পর্যটক ধীর ও শান্ত-কণ্ঠে তার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছে। বলেছে, টাইম মেসিনে বিশেষ এক মুহূর্তে উঠে বসেছিল সে। লিভারে চাপ দিয়েছিল; এবং তারপরেই ভবিষ্যতের বুক চিরে অভিযান সুরু হয়েছিল তার। বড় বিচিত্র ও রহস্যময় সে অভিযান। নিজের ল্যাবরেটরী থেকেই তাঁর যাত্রা সুরু। যাত্রার মুহূর্তে ভয়-ডর তাঁকে ঘিরে ধরে নি, এমন নয়। একবার তাঁর মনে হয়েছিল, যেন সে আত্মহত্যা করতে চলেছে। রিভলবার উঁচিয়ে ধরেছে নিজের মাথা বরাবর। বলে রাখা ভালো, এইখানে সময়-পর্যটকের মানসিক অবস্থার ছবিটি সুন্দর ফুটেছে। তবে এ ধরনের ছবি 'দি টাইম মেসিন' প্রসঙ্গে বড় কথা নয়। বড় কথা ভবিষ্যতের জগৎটি। সে জগতে ওয়েলস ধীরে ধীরে আমাদের পৌঁছে দিয়েছেন। সময়-পর্যটকের বর্ণনার মধ্য দিয়ে তার যাত্রা-পথটি মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় হল এই যে, সময়-বরাবর পথ-পরিক্রমার ইতিবৃত্ত বিভিন্ন সময়-নির্দেশক উপাদানের সাহায্যেই পরিস্ফুট। দিন-রাত্রি অতি দ্রুত পেরিয়েছে প্রথমে। তারপর পেরিয়েছে ঋতু। ক্রমে সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন মুহূর্তের মধ্যে পরিসমাপ্ত হয়েছে। অবশেষে টাইম মেসিনের বেগ যত বেড়েছে, বৎসরগুলিও ততই নিমেষের মধ্যে হারিয়ে গেছে। দিন-রাত্রির তারতম্য বা ঋতুর পরিবর্তন লক্ষ্য করবার অবকাশ তখন আর থাকে নি। এদিকে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ায় ল্যাবরেটরীও ধ্বংস হয়েছে। খোলা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে সময়-পর্যটক। আট শো দু' হাজার সাত শো এক খ্রীস্টাব্দে এসে পৌঁছেছে সে। টাইম মেসিন থামতেই অবাক বিস্ময়ে সে লক্ষ্য করেছে, নতুন এক জগৎ তার সামনে। হাজার হাজার বছর আগেকার পৃথিবীর সঙ্গে অনেক দিক দিয়েই তার মিল নেই। মানুষের আকৃতি-প্রকৃতিও বদলে গেছে।

ভবিষ্যতের জগতে প্রায় চার ফুট উঁচু খর্বকায় এক প্রকার জীবকে দেখা গেল। মানুষের মতোই চেহারা ওদের। কিন্তু অদ্ভুত শান্ত আর হাসিখুশি ওরা। জীবনে ওদের চাহিদা খুব সামান্য। সহজেই ওরা উল্লসিত হয়ে ওঠে। জীবন-ধারণ করে ফলমূল খেয়ে।

সময়-পর্যটককে ওদের কয়েকজন দেখল। দেখে কেউ এতটুকু বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হয়েছে বলে মনে হল না। বরং মনে হল, সবাই খুব খুশি। দু' একজন যুব কাছে এগিয়ে এল সময়-পর্যটকের। হাত দিয়ে তার মুখ-চোখ পরীক্ষা করল। কিন্তু সে পরীক্ষার মধ্যে কৌতূহল ও আনন্দ ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। অজানা অতিথিটি আভাসে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল একবার যে বজ্রপাতের সময় আকাশ থেকে সে নেমে এসেছে। এই কথা জেনে ভবিষ্যতের প্রায়-মানুষরা আনন্দে আত্মহারা। সঙ্গে সঙ্গেই রাশি রাশি ফুল নিয়ে এল ওরা; অতিথিকে উপহার দিল। সরলপ্রাণ ওই প্রায়-মানুষের নাম হল ইলয়।

ইলয়রা বড় সাদাসিদে প্রকৃতির। যখন-তখন নাচত ওরা। গান গাইত। থাকত সবাই মিলে দল বেঁধে। সময়-পর্যটক অবাক হল ওদের দেখে। ভাবল, মানুষের অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে তবে। চরম উন্নতির পর নামতে নামতে মানব-বুদ্ধি শিশুর স্তরে এসে পৌঁছেছে।

দেখতে দেখতে ইলয়দের সঙ্গে সময়-পর্যটকের বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। ওরা অভ্যর্থনা করল তাকে। আদরে-আহ্লাদে অস্থির করে তুলল। সময়-পর্যটক বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করল, ইলয়রা জীবন সম্বন্ধে বড় বেশি নিরুদ্বিগ্ন। একটি দুর্ঘটনার দৃশ্য দেখে এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হল তার। সে দেখল, ইলয়রা নদীতে নেমে স্নান করছিল। এমন সময় হঠাৎ একটি মেয়ে স্রোতের টানে ভেসে চলল। অথচ কেউ এগোল না মেয়েটিকে উদ্ধার করতে। সবাই বেশ নিশ্চিন্ত মনেই নেচে-হেসে মাতামাতি করতে লাগল। এই দৃশ্য দেখে অভিভূত হল সময়-পর্যটক। সঙ্গে সঙ্গেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে এবং শেষ অবধি মেয়েটিকে উদ্ধার করল।

মেয়েটির নাম উইনা। বড় শান্ত ও নম্র স্বভাবের ছিল সে। তার চালচলন ছিল শিশুর মতো। কিন্তু তবু সে এটুকু অন্তত বুঝল যে সময়-পর্যটক

বি, সি, মাইতি এণ্ড কোং

—ইলেকট্রো প্লেটিং সামগ্রী—

নিকেল ভ্যাট ও ব্যারেল * ডাইনামো * পলিশিং মেসিন এবং প্লেটিং করিবার জন্য যাবতীয় সামগ্রীর আদি সরবরাহক *

শো রুম ঃ—৯৪, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কলি-১২ । ফোন ঃ ৩৪-৩১৭৩

৩, রাধামোহন পাল লেন, কলি-১২ ঃ অফিস-ফোন—৩৪-৪৮৪৬

তাকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। তাই পরিত্রাতার প্রতি স্নেহ, মমতা ও কৃতজ্ঞতার অবাধ রইল না তার। ছায়ার মতো সে সময়-পর্যটককে অনুসরণ করল। ফুল এনে দিল কখনও। কখনও আবার হাততালি দিয়ে নাচল। আনন্দ প্রকাশ করল যখন-তখন। সময়-পর্যটকেরও ভাল লাগল উইনাকে। শিশুর মতো সরলপ্রাণ এই বন্ধুটি অনুক্ষণ তাকে সঙ্গ দিল। সে স্থির করল, ফিরবার সময় ভবিষ্যতের এই রত্নটিকে সঙ্গে নেবে। কিন্তু ফিরবার পথে বাধা দেখা দিল। টাইম মেসিনটি উধাও হল হঠাৎ। সময়-পর্যটক প্রথমে ভেবে পেল না, এই সর্বনাশ কে করেছে। তবে ইলয়দের মুহূর্তের জন্যেও সন্দেহ করে নি সে। সন্দেহ করল অন্য এক প্রকার জীবদের। দেখতে ওরা ধবধবে সাদা। আকারে ইঁদুরের চেয়ে কিছু বড়। সময়-পর্যটক অন্ধকারের মধ্যে দেখল ওদের একটিকে। লক্ষ্য করল, জীবটি অদ্ভুত চটপটে ও শয়তান প্রকৃতির। আরও লক্ষ্য করল, ইলয়রা অন্ধকারকে ভয় পায়।

এদিকে ইলয় ছাড়াও অন্য এক প্রকার জীবের এই অস্তিত্ব সময়-পর্যটককে চিন্তিত করে তুলল। অনুক্ষণ সে ওই জীবদের সন্ধান করতে লাগল। উইনা সব সময় সঙ্গে থাকে তার। অভাবনীয়কে খুঁজে পাবার আশায় সর্বক্ষণ সে অভিযানের পথ খোঁজে।

এদিকে ভবিষ্যতের দেশে অতিকায় অনেক কূপ দেখেছিল সময়-পর্যটক। আর দেখেছিল অনেক উঁচু উঁচু অনেক হাওয়া-কল জাতীয় পদার্থ। এদের দেখে প্রথমটায় সে কিছু ঠাওর করতে পারে নি। কিন্তু দারুণ এক উৎকণ্ঠা ক্রমেই ঘিরে ধরছিল তাকে।

এক সন্ধ্যায় উইনাকে নিয়ে সে একটি কূপের কাছে গেল। কি যেন একটি বস্তু ছুঁড়ল কূপ বরাবর। কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করল, বস্তুটি কূপের মধ্যে বেশি দূর গেল না। মাঝপথে কে যেন সেটিকে আত্মসাৎ করল।

এই ঘটনায় স্তম্ভিত হল সময়-পর্যটক। স্থির করল, কূপের ভিতরে একবার নেমে দেখবে সে। নামতে গিয়ে দেখে, খুদে খুদে সব সিঁড়ি জাতীয় কি যেন রয়েছে। সিঁড়িগুলো কূপ বরাবর নেমে গেছে।

সময়-পর্যটককে কূপ বেয়ে নামতে দেখে উইনা আঁতকে উঠেছিল। সঙ্গীকে বার বার নিষেধ করেছিল সে। কিন্তু সঙ্গী শেষ অবধি কোনো নিষেধ শোনে নি। দুঃসাহসের নেশায় পাতালের দিকে নেমেছে। উইনা কূপের পাশে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছে। তারপর ধীরে ধীরে ফিরে গেছে সে। ওদিকে নীচে হিংস্র প্রায়-মানুষ জাতীয় জীবদের মুখোমুখি হয়েছে সময়-পর্যটক। কূপ বেয়ে খানিকটা দূর নামবার পর সুড়ঙ্গ পথ ধরে এগোতে গিয়ে মরলখদের রাজ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। অনুপ্রবেশকারীকে প্রায় ঘিরে ফেলেছিল মরলখরা। তবে সময়মতো দেশলাই জ্বালানর ফলেই ওরা খুব কাছে এসেও সুবিধা করতে পারে নি। সময়-পর্যটক বুঝেছিল, আলোক সহ্য করতে পারে না মরলখরা। তাই ওরা মাটির তলায় বিচিত্র এক জগৎ গড়ে তুলেছে। অন্ধকারে ওরা ওপরে উঠে আসে। আক্রমণ করে ইলয়দের; এবং সে কারণেই ইলয়রা অন্ধকারকে ভয় পায়।

এদিকে সময়-পর্যটকও মরলখদের কবলে পড়ে ভয়ে-বিস্ময়ে দিশাহারা। অবশেষে দেশলাইয়ের শেষ কাঠিটি পর্যন্ত জেবলে যমদূত-ঘেরা ওই মৃত্যুপুরী থেকে কেমন করে উদ্ধার পেল সে, ওয়েলস তার এক চমকপ্রদ বিবরণ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। বিবরণটি আতঙ্ককর হয়ে উঠেছে মরলখ-রাজ্যের মধ্যে রক্তাক্ত মাংসের উল্লেখে। তা ছাড়া এই মাংস যে নিরীহ ইলয়দের, ওয়েলস আভাসে-ইঙ্গিতে সে কথা বলেছেন। ফলে স্বল্প কথার মধ্য দিয়ে মরলখদের বর্বর ও নিষ্ঠুর স্বভাব এখানে নগ্নভাবে পরিস্ফুট।

অবশ্য মরলখদের বর্বরতার চিত্র এ কাহিনীর অন্যত্রও দুর্লভ নয়। রাতের আঁধারে উইনা সহ টাইম মেসিন খুঁজতে বেরিয়ে বিপদ ডেকে এনেছে সময়-পর্যটক। মরলখরা চারিদিক থেকে তাকে ঘিরে ধরেছে। সে সামান্য একটু ঘুমিয়ে পড়বার ফাঁকে আক্রমণ করেছে ওরা। অনেক কষ্টে সে এই বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছে বটে; কিন্তু উইনাকে রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। দারুণ আতঙ্কে প্রথমে সংজ্ঞাহীন হয়েছে সে; এবং তারপর আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি তার। উইনা যে শেষ অবধি মরলখদের হাতে পড়েছে, সে বিষয়ে পাঠকদের কোনো সন্দেহ থাকে না; এবং যখন দেখা যায়, উইনা সম্বন্ধে লেখক অস্বাভাবিক রকম মিতবাক তখন দুর্দান্তের হাতে-পড়া এই নিরীহ প্রাণীটির অবশ্যম্ভাবী পরিণতির কথা ভেবে পাঠক-মাত্রেই শিউরে ওঠা স্বাভাবিক। কারণ, উইনা তার সৌন্দর্য ও শিশুসুলভ সারল্য দিয়ে এ কাহিনীর মধুরতম অংশটিকে রূপায়িত করেছে। নাচ-গান এবং আনন্দ-উল্লাসের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের জগতে নির্মল ঝর্ণাধারার মতো প্রবাহিত হয়েছে সে। সামান্য উপকরণেই খুশিতে ভরে উঠেছে তার হৃদয়। সময়-পর্যটককে দেশলাই জ্বালাতে দেখলেই নাচন সুরু হয়েছে তার। পর্যটকের সঙ্গে নানা জায়গায় সে ঘুরে বেড়িয়েছে। প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া মিউজিয়ামে গিয়েছে একদিন; এবং মিউজিয়ামের ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকেই দেশলাই উদ্ধার করা সম্ভবপর হয়েছে।

এইখানে বলে রাখা প্রয়োজন, ভবিষ্যতের পৃথিবীতে অজস্র ধ্বংসস্তূপ ও অতিকায় সব প্রাসাদের চিত্র এঁকেছেন ওয়েলস। এরা যে অতীত যুগের সভ্য ও উন্নত পৃথিবীর স্মৃতিচিহ্ন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সন্দেহ থেকে যায় শুধু পৃথিবীর সেই পরিণতি সম্বন্ধে। হয়তো জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত মানুষ নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ করে পৃথিবীকে সেই বিচিত্র অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছে। মানুষ নিজের সর্বনাশ নিজেই ডেকে এনেছে হয়তো চরম উন্নতিই শেষ পর্যন্ত তার কাল হয়েছে। সময়-পর্যটকের উক্তির মধ্য দিয়ে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন ওয়েলস। পর্যটককে দিয়ে বলিয়েছেন,

> "মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি লাভের স্বপ্ন যে কত ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল, তা ভেবে আমার দুঃখ হল। মানব-সভ্যতা আত্মহত্যা করেছিল। আরাম ও সুবিধার দিকেই গা ভাসিয়েছিল মানুষ। নিরাপত্তা ও স্থায়িত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে সুসমঞ্জস সমাজ গঠনের কথা ওরা ভেবেছিল। শেষ অবধি আশা পূর্ণ হয়েছিল ওদের; এবং সেই পূর্ণতারই ফলশ্রুতি ওই অবস্থা। এককালে জীবন ও ধন-সম্পত্তি একেবারে সম্পূর্ণ নিরাপদ অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল নিশ্চয়। ধনী তার সম্পদ ও আরাম সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিল। শ্রমিক নিশ্চিন্ত ছিল তার জীবন ও জীবিকা সম্বন্ধে। সেই নিখুঁত পৃথিবীতে নিশ্চয়ই কোনো বেকার-সমস্যা ছিল না। সামাজিক কোনো সমস্যার সমাধানও বাকী ছিল না; এবং বিরাট এক শান্তি নেমে এসেছিল তারপর।
>
> এদিকে প্রকৃতির একটি নিয়ম সম্বন্ধে আমরা অবহিত নই। আমরা লক্ষ্য করি না যে, বহুমুখী কর্মক্ষমতাবিশিষ্ট বুদ্ধি হল পরিবর্তন, বিপদ ও উপদ্রবজনিত ক্ষতির পরিপূরক। যে জীব তার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে পুরোপুরি সমন্বয় রেখে চলছে তার গঠন-প্রকৃতি একেবারেই নিখুঁত। অভ্যাস ও সংস্কার অকেজো না হয়ে উঠলে

প্রকৃতি কখনও বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারস্থ হয় না। যেখানে কোনো পরিবর্তন নেই অথবা পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন নেই, সেখানে বুদ্ধিবৃত্তিও অনুপস্থিত। শুধুমাত্র সেই সব প্রাণীরাই বুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে থাকে, যাদের বহুবিধ প্রয়োজন মেটাতে হয়; সম্মুখীন হতে হয় বহু বিচিত্র বিপদ-আপদের।"

সময়-পর্যটক তার এই সিদ্ধান্তের আলোকেই ইলয় ও মরলখদের আবির্ভাব এবং জীবনযাত্রা ব্যাখ্যা করেছে। বলেছে, পরিপূর্ণতা থেকেই কালক্রমে মানব-সভ্যতার সর্বনাশ ঘনিয়ে এল। শেষ অবধি দু শ্রেণীতে বিভক্ত হল মানবসমাজ। একটি শ্রেণী পৃথিবীর উপরি-ভাগে একল। এরা শান্ত ও সরল প্রকৃতির এবং অল্পেতেই খুশি। প্রয়োজন সহজেই মেটে বলে বুদ্ধি এদের ভোঁতা। ইলয়রা এই দলের।

অপর দলের মানুষরা মাটির তলায় আশ্রয় নিল। প্রতিনিয়ত জীবন সংগ্রাম চালাতে হয় বলে শাণিত বুদ্ধির অধিকারী হল ওরা। যন্ত্রবিজ্ঞানেও হল বিশেষ পারদর্শী। ছলে-বলে-কৌশলে উদ্দেশ্য কেমন করে সিদ্ধ করতে হয় তা, জানা থাকল ওদের। এবং মরলখরা হল ওদেরই প্রতিনিধি। ওরা মাটির তলায় কৃত্রিম উপায়ে হাওয়া সঞ্চালনের ব্যবস্থা করল এবং প্রয়োজনের তাগিদেই হয়ে উঠল হিংস্র ও ভয়ঙ্কর।

এই হিংস্রতা মরলখদের আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সময়-পর্যটকের সঙ্গে সংঘাতে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে ওরা। সুন্দর ইলয়-দের যখন-তখন ওরা ভোজ্য পশুর মতো ব্যবহার করেছে। অতএব মরলখদের হাতে পড়ে উইনার শেষ অবধি কী দশা হয়েছে, তা কল্পনা করে নিতে আমাদের কষ্ট হয় না। কষ্ট হয় না মরলখদের কবল থেকে সময়-পর্যটকের মুক্তির ইতিবৃত্তটুকু বুঝে নিতেও। ওখানে সকৌতুকে লক্ষ্য করি আমরা যে, পর্যটক তার টাইম মেসিনটিকে খুঁজে পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। খুঁজতে খুঁজতে মরলখদের আড্ডায় সে হানা দিয়েছে এবং শেষ অবধি প্রাণান্তকর সংগ্রামের পর মেসিনটিকে উদ্ধার করেছে। টাইম মেসিনকে খুব বেশি দূরে নিয়ে যেতে পারে নি শত্রুরা। কাছেই একটি বেদীর উপর রেখেছিল। সময়-পর্যটক বুঝেছিল, মেসিনটিকে দেবতা ভেবে ভক্তি করেছে মরলখরা। তেল দিয়ে ওর যন্ত্রপাতিগুলো পরিষ্কারও করে রেখেছে। ফলে পর্যটকের সুবিধেই হল। প্রত্যাবর্তনের কালে মেসিনটাকে আবার চালু করতে খুব একটা বেগ পেতে হল না।

কাহিনীর পরবর্তী অংশে সময়-পর্যটকের ঘরে-ফেরার কথা বর্ণিত। অভাবনীয় ও অদৃষ্টপূর্বের স্পর্শে সে বর্ণনাও যে জীবন্ত ও রহস্যময় একথা অকুণ্ঠচিত্তেই বলা চলে। তবে 'দি টাইম মেসিন'-এর কাহিনী সবচেয়ে মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে তখন, যখন দেখি, সময়-পর্যটক তার অভিজ্ঞতার কথা বলতে বলতে দুটো শুকনো ফুল পকেট থেকে বের করে টেবিলের ওপর রাখে এবং জানায় যে, ওই ফুল দুটো উইনা তাকে দিয়েছে। এ ছাড়া টাইম মেসিনের যাত্রাস্থল ও প্রত্যাবর্তন স্থানের মধ্যে যে দূরত্ব দেখান হয়েছে, তাও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই দূরত্বের সঙ্গে মরলখদের সরানো দূরত্বের হিসেব সম্পূর্ণ মিলে যায়। অর্থাৎ, মরলখরা মেসিনটিকে যতটা দূরে সরিয়েছিল, যাত্রাস্থল থেকে ঠিক ততটা দূরেই মেসিনটি ফিরে এসেছে। বলা বাহুল্য, দূরত্বের এই হিসেবটুকু মূল কাহিনীকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার কাজে সহায়ক হয়েছে। কিন্তু তবু বলবো, এ কাহিনীর প্রতি বিশ্বাস উদ্রিক্ত করাবার জন্যে অস্বাভাবিক কোনো আগ্রহ দেখায় নি সময়-পর্যটক। বরং সে তার বন্ধুদের উপলক্ষ্য করে বলেছে,

"না। আমি আশা করি না যে তোমরা এ কাহিনী বিশ্বাস করবে। একে মিথ্যে হিসেবে গ্রহণ করো। অথবা গ্রহণ করো ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে। ধরে নাও, আমি যন্ত্রপাতির ঘরে বসে স্বপ্ন দেখেছি। মনে করো আমি আমাদের মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করতে করতে এই রহস্য-গল্পটি উদ্ভাবন করেছি। এক সত্য হিসেবে উপস্থাপিত করার প্রয়াসকে নেহাৎই কারুকলা বলে ধরে নাও। ধরে নাও এ কাহিনীর প্রতি আগ্রহ বাড়াবার জন্যে ঠিক এমনটি করেছি আমি।"

বন্ধুদের উপলক্ষ্য করে সময়-পর্যটকের এই উক্তিটিকে পাঠকদের লক্ষ্য করে ওয়েলস-এর উক্তি বলে ধরে নিলে নিশ্চয় অন্যায় হবে না। আসলে এ কাহিনীটি রচনার সময় ওয়েলস-এর নিজের দিক থেকেই কিছুটা সংশয় ছিল। যেন আশঙ্কা করেছিলেন তিনি যে পাঠকরা তাঁর এ কাহিনী আদৌ বিশ্বাস করবেন না। তাই বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে তাঁর একটা দোলাচল ও কুণ্ঠিত মনোভাব এ কাহিনীর অনেক জায়গাতেই উঁকি মেরেছে।

উপরে যে অংশটি উদ্ধৃত করা হল, সেখানে অবিশ্বাসের প্রশ্নই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু এর ঠিক পরবর্তী বর্ণনাতেই দি টাইম মেসিন-এর কাহিনীকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার প্রয়াস দেখা যায়। আমরা লক্ষ্য করি, সময়-পর্যটক তাঁর গল্প-বলা শেষ করেছে। উপস্থিত বন্ধুরা বিস্মিত হয়েছে তার গল্প শুনে; কিন্তু তাকে পুরোপুরি

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর
বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গোহাটী

...বাস করে নি। বিশ্বাস করল তখন, যখন দেখল, সময়-পর্যটক ওদের চোখের সামনেই অদৃশ্য হয়েছে। টাইম মেসিনটি ওদের খুব কাছেই ছিল। সময়-পর্যটক গিয়ে বসল তার ওপর; লিভারে চাপ দিল; এবং তারপরেই ঘটল সেই রহস্য-ময় ঘটনা। ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে এল সে। খানিক পরেই তাকে আর দেখা গেল না। বোধ করি সময়ের পথ ধরে আবার অভিযান সুরু হল তার। বন্ধুরা অপেক্ষা করল অনেকক্ষণ। ঘণ্টা পেরিয়ে গেল, দিন অতিবাহিত হল, দেখতে দেখতে বছর ঘুরে এল। কিন্তু সময়-পর্যটকের সাক্ষাৎ মিলল না আর। দীর্ঘ তিন বছর পরেও মিলল না। পর্যটকের এই নিরুদ্দেশ-যাত্রার বর্ণনা দিয়ে লেখক যে টাইম্ মেসিনটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলবার চেষ্টা করেছেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

উপসংহারে বিরাট এক জিজ্ঞাসা উপস্থাপিত করেছেন লেখক। প্রশ্ন তুলেছেন, টাইম্ মেসিনটি শেষ অবধি কোথায় গেল? সুদূর অতীতে, না অনাগত ভবিষ্যতে? এ প্রশ্নের কোনো জবাব দেওয়া হয় নি এখানে এবং সময়-পর্যটকের কাছ থেকে শোনা গল্পটির প্রতিই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। উইনার কাছ থেকে পাওয়া সেই ফুল দু'টির কথা বলা হয়েছে আবার। আত্মঘাতী সভ্যতার দারুণ অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়েও লেখক আবার আমাদের আশ্বস্ত করতে চেয়েছেন এই বলে যে, শক্তি ও বুদ্ধি মানুষের মধ্য থেকে বিদায় নেবার পরেও হয়তো কৃতজ্ঞতা ও করুণার বিনিময় অব্যাহত থাকবে।

কিন্তু তবু বলবো, আশ্বস্ত আমরা হই নি। মরলখদের বিভীষিকা সুন্দর ইলয়দের স্মৃতিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। রাত্রির অন্ধকারে প্রায়-মানুষ জাতীয় বর্বরদের সঙ্গে সময়-পর্যটকের সংগ্রাম দুঃস্বপ্নের মতো আচ্ছন্ন করেছে আমাদের। আমাদের মনে হয়েছে, ভবিষ্যতের দেশে যত কিছু সুন্দর ফুল, নয়নাভিরাম প্রাসাদ ও অপরূপ অট্টালিকা দেখছি, তাদের সবকিছুর পিছনেই এক সর্বনাশা শয়তানের দল ওৎ পেতে বসে আছে। আলোককে ভয় পায় ওরা; সুন্দরকে গ্রাস করতে চায়। ইলয়দের সঙ্গে ওদের খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। রাত্রির অন্ধকারে মাটির তলা থেকে ওরা উঠে আসে। তারপর পা টিপে টিপে অতি সন্তর্পণে শিকারের দিকে এগিয়ে যায়। প্রতিপক্ষের উপর আক্রমণ চালায় সংঘ-বদ্ধভাবে। ঠিক এই রকম এক আক্রমণ হয়েছিল সময়-পর্যটকের উপর। ঘনান্ধ-কার নিস্তব্ধ রাত্রি। থমথমে আরণ্যক পরিবেশ। উইনাকে সঙ্গে নিয়ে সময়-পর্যটক চলেছে। মর্মরধ্বনি ভেসে আসছে থেকে থেকে। লতাগুল্মের উপর পা পড়ায় অদ্ভুত একটা খস খস শব্দ উঠছে। ঠিক এমন সময়, পর্যটক বলেছে,

"এমন সময় যেন আমার আশেপাশে দুপ্‌দাপ্ করে চলার শব্দ শুনতে পেলাম। কঠোর হয়ে উঠলাম আমি। এগিয়ে চললাম। চলার শব্দ স্পষ্ট-তর হল। আমার কানে এল সেই বিচিত্র শব্দ ও কণ্ঠস্বরগুলো। মনে পড়ল, ঠিক এইরকম শব্দই মাটির তলাকার পৃথিবীতেও আমি শুনেছি। স্পষ্টতই সেখানে ছিল কিছু সংখ্যক মরলখ। ওরা ঘিরে ধরছিল আমাকে। মিনিটখানেক পরেই আমার কোটে টান পড়ছে বলে মনে হল। আর হাতে কিসের যেন স্পর্শ অনুভব করলাম। উইনা ভীষণভাবে কাঁপতে লাগল এবং তারপরেই অদ্ভুতরকম স্থির হয়ে গেল।

"দেশলাই জ্বালাবার সময় হয়েছিল এবার। কিন্তু তা' করতে গেলে উইনাকে নামিয়ে রাখতে হবে। ওকে নামালাম আমি এবং যখন পকেট হাতড়াতে লাগলাম তখন অন্ধকারের মধ্যে আমার হাঁটুর কাছাকাছি জায়গায় একটা সংঘর্ষ শুরু হল। উইনা একেবারেই শান্ত ছিল। আর মরলখদের কাছ থেকে ভেসে আসছিল সেই একই রকমের অদ্ভুত কু-কু ধ্বনি। ছোট ছোট নরম হাত আমার কোট বেয়ে এবং পিছন দিক বরাবর উঠে আসছিল। আমার ঘাড় পর্যন্ত স্পর্শ করছিল যেন। তার-পর কাঠি ঘষে দেশলাই ধরালাম আমি এবং দেখলাম, বনের মধ্যে পলায়নরত মরলখদের সাদা পিঠ-গুলো।"

এই ঘটনার কিছুক্ষণ পর সময়-পর্যটকের পকেট থেকে দেশলাই সরিয়ে নিল মরলখরা। এবং তারপর; পর্যটকের ভাষায়,—

"তারপর ওরা আবার আমাকে আঁকড়ে ধরল। ঘিরে দাঁড়াল আবার। মুহূর্তের মধ্যেই আমি অনুমান করে নিলাম যে, কি ঘটেছে। আমি ঘুমিয়েছিলাম একটু। কর্পূর দিয়ে যে আগুন আমি জ্বেলেছিলাম, তা' নিভে গিয়েছিল। তাই তখন মৃত্যুর এক ভয়াবহ ভাবনা আমার সমস্ত আত্মাকে আচ্ছন্ন করল। অরণ্য পোড়া কাঠের গন্ধে পরিপূর্ণ ব'লে মনে হল। মরলখরা আমার ঘাড়, চুল এবং হাত ধরে রাখল। টেনে ফেলে দিল আমাকে এবং অন্ধকারের মধ্যে ঐ নরম প্রাণীরা আমার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে দেখে আমি বর্ণনাতীত এক বিভীষিকা অনুভব করলাম। মনে হল, যেন এক দানবীয় মাকড়সার জালে আবদ্ধ হয়ে আছি।

"শক্তির পরীক্ষায় পেরে উঠলাম না আমি। পড়ে গেলাম। মনে হল, ছোট ছোট দাঁত আমার ঘাড় কামড়ে ধরেছে।"

এই আতঙ্ককর পরিস্থিতি থেকে সময়-পর্যটক শেষ অবধি কেমন করে রক্ষা পেল, ওয়েল্‌স তা'র এক চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু তা' সত্ত্বেও বলবো, বর্ণনা নয়, 'দি টাইম্ মেসিন'-এর বক্তব্যই আমাদের ভাবিয়ে তোলে। লেখকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমরাও প্রশ্ন করি, সমাজ ও সভ্যতাকে নিখুঁত করতে গিয়েই কি শেষ অবধি মানুষ আত্মহত্যা করবে? অমৃতকে সকলের হাতের মুঠোর মধ্যে আনতে গিয়ে পুরস্কার লাভ করবে মৃত্যু? প্রকৃতির আশীর্বাদ লুণ্ঠন করবার অপরি-মিত লোভে বিকৃতির সর্বনাশা অভিশাপ কুড়োবে?

রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা

৪র্থ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা

সম্পাদক ঃ ধীরেন্দ্র দেবনাথ

এ সংখ্যার লেখকসূচী ঃ—

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য, ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত, সমীরণচন্দ্র চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ লাহিড়ী, বাসন্তী চক্রবর্তী এবং সুধাকান্ত রায়চৌধুরী প্রভৃতি।

হাতে বা ডাকে—চার টাকা, রেজিস্ট্রীযোগে সাত টাকা। খুচরা প্রতি সংখ্যা এক টাকা। পরিবেশক ঃ পত্রিকা সিন্ডিকেট (প্রা) লিঃ, ১২/১, লিন্ডসে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৬

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭

প্রত্যাশার মৃত্যু ও দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা

কৃত্তিবাস ওঝা

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

'কংগ্রেসের বি-টীম'—এই প্রচারে ফল দেয় তার প্রমাণ স্বর্গত ডাঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ভোগ করে গেছেন আর ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, শ্রীদাশরথি তা, শ্রীদেবেন সেন এখনও বুঝেছেন। কে, এম, পি, দল সৃষ্টির পর যে গ্ল্যামার সৃষ্টি হয়েছিল সেই গ্ল্যামার নষ্ট হয়েছিল একমাত্র কংগ্রেসের বি-টীম প্রচারে। কিন্তু কালের বিচারে দেখা গেছে যাদের কংগ্রেসের বি-টীম বলা হয়েছে তারা কেউই কোন অবস্থায় কংগ্রেসে ফিরে যায় নি। **পরন্তু যে কম্যুনিস্ট পার্টি সর্বদা অন্যকে কংগ্রেসের অনুচর বলে এসেছিল তাদের দল থেকেই সম্ভবত সর্বাপেক্ষা বেশি সদস্য বেড়া টপ্‌কে কংগ্রেসে গেছেন। ১৯৬২ সালের নির্বাচনের পরও কম্যুনিস্ট পার্টির অতি প্রিয় সদস্য জনাব খলিল সঈদের মত সদস্য চরম সংকট সময়ে কংগ্রেসে ভিড়েছেন।** নদীয়ার অতি বিপ্লবী একজন কম্যুনিস্ট এম, এল, এ, এবার মনোনয়ন চান নি বা পান নি কেন তার সব দলিলই নদীয়ার শ্রীঅমৃতেন্দু মুখার্জীর কাছে আছে। আর কিছু কিছু কংগ্রেস নেতা শ্রীবীজেশ সেনের কাছেও থাকতে পারে। শুধু বিধানসভা সদস্য কেন, আগামী নির্বাচনে শ্রীঅসীম ঘোষ সারা বর্ধমান জেলায় বাম কম্যুনিস্ট দলের অনেকের চোখের ঘুম যে কেড়ে নেবেন সেকথা শ্রীবিনয় চৌধুরী আর শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার টের পেয়েছেন নিশ্চয়ই।

জলকরহীন নদীতে জেলেরা যেমন অনেককে পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়ে বেড়াজাল ফেলে মাছের ঝাঁক আটকাতে চায় চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে বাম কম্যুনিস্ট পার্টি একইভাবে শুধু এগিয়ে গিয়ে জাল ফেলবার চেষ্টা করছে। ঐক্যের সলতে যখন পুড়ে প্রায় শেষ তখন রাজ্যের চারজন বর্ষীয়ান নেতা যেদিন বাম কম্যুনিস্ট নেতাদের শরণাপন্ন হবেন ঠিক করছেন তার আগের দিন অর্থাৎ ১০ই নভেম্বর আড়কাঠির মাধ্যমে বাঙলা কংগ্রেস ও দক্ষিণ কম্যুনিস্ট পার্টিকে বাদ দিয়ে একটি সভা বাম কম্যুনিস্টরা নিজেদের দপ্তরে ডাকলেন। সেই সভাতেই সরকারীভাবে প্রথম স্বীকৃতি দেওয়া হল পশ্চিমবঙ্গে সর্বদলীয় বাম ঐক্য হচ্ছে না। বামপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টির প্রস্তাব এই দুই দলকে বাদ দিয়েই একটা ফ্রন্ট করা হোক। সভায় উপস্থিত দপ্তর—পতাকা, —সদস্যহীন একটি দল ছাড়া অন্য কেউ সেই প্রস্তাবে সাড়া দিতে পারেন নি। সেই দিন কথা হল ১৩ তারিখের আগেই সকলে তাদের বক্তব্য জানিয়ে দেবে কারণ ১৪ তারিখ থেকে বাম কম্যুনিস্ট পার্টির রাজ্য কমিটির বৈঠক হবে। কিন্তু ১৩ তারিখ কেন—তার বহু পর পর্যন্ত অনেক দলই তাঁদের কোন মতামত জানান নি। এবং উল্টো সংবাদই কিছু কিছু পাওয়া যেতে লাগল। আর, এস, পি তার রাজ্য কমিটিতে প্রস্তাব নিল এক্ষুণি তারা কোন ফ্রন্টে যেতে রাজী নয়। ফরওয়ার্ড ব্লক প্রস্তাব নেন এখনও সার্বিক ঐক্যের চেষ্টা করতে হবে আর বাম কম্যুনিস্ট পার্টি নির্বাচনে ফ্রন্ট গঠনের ব্যাপারে যথেষ্ট উদারতা না দেখিয়ে বামফ্রন্ট গঠনে বিঘ্ন করেছেন। বাম কম্যুনিস্ট পার্টির রাজ্য কমিটির সভাতে তিনজন সদস্য এই একই অভিযোগ নিজ দলনেতাদের বিরুদ্ধে এনেছিলেন। আঠারই নভেম্বর রাত্রে এস, এস, পি নেতা মধু লিমায়ে কলকাতা আসছেন—দুই কম্যুনিস্ট পার্টির বিরোধ মীমাংসায় সহায়তা করতে। কিন্তু লিমায়ে দমদম বিমানবন্দরে নামবার কয়েক ঘন্টা আগে বাম কম্যুনিস্ট পার্টি তাদের প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত করে দিল। প্রতিবারই আগ বাড়িয়ে এই যে জাল ফেলা এর সম্ভবত একটিমাত্র কারণ—যদি কোন মধ্যস্থের মাধ্যমে নিজেদের নির্দিষ্ট পথ থেকে একটু সরে আসতে হয় যদি সকলকে নিয়ে নির্বাচনী ফ্রন্ট গঠন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

কাগজে বাঘের গর্জন বাম কম্যুনিস্ট পার্টি পশ্চিমবঙ্গে যে কবার শুনিয়েছেন ময়দানের সভা সম্ভবত অন্যতম প্রধান তার মাধ্যম হয়েছিল ২৭শে নভেম্বর সন্ধ্যায়। ঘরের কেচ্ছা ময়দানে দাঁড়িয়ে বলে নতুন কৃতিত্ব অর্জন করেছে বাম কম্যুনিস্ট পার্টি। ২০শে নভেম্বর এই ময়দানে দাঁড়িয়ে যদিও বাম কম্যুনিস্টদের উদ্দেশ্যে কিছু খেউড় গেয়েছিলেন শ্রীপাদ-অমৃত ডাঙ্গে। কিন্তু সেই খেউড়ে বাম কম্যুনিস্ট ছাড়া অন্য কোন দলের প্রতি আক্রমণ ছিল না। ময়দানে লক্ষ মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গে সর্বদলীয় বামপন্থী ঐক্য হল না তার জন্য লজ্জা বা দুঃখ প্রকাশ করা দূরে থাক অজয় মুখার্জী আর হেমন্ত বসুর কাপড় ধরে টানাটানি (যদি ধরেও নেয়া যায় যেহেতু শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী, শ্রীজ্যোতি বসু ও শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের ২০।৩০ বছরের সহকর্মী বন্ধু, তাই লাহিড়ী সম্পর্কে বসু-দাশগুপ্তের যে কোন কথা বলার অধিকার আছে) —আর যে উদ্দেশ্যে হোক, পশ্চিমবঙ্গবাসীর মঙ্গল বা কংগ্রেসবিরোধী শক্তিকে শক্তিশালী করার সমলীন চেষ্টায় নয় নিশ্চয়ই। অজয় মুখার্জী ও হেমন্ত বসু বাম কম্যুনিস্ট দলের উদ্দেশ্যে আজ পর্যন্ত রাজ্যের কংগ্রেসকে পরাজিত করার আকুল আগ্রহে তৈলমর্দন ছাড়া কোন বিরূপ মন্তব্য আজ পর্যন্ত উচ্চারণ করেন নি তবে ময়দানের সভার পর একটি দৈনিক পত্রিকার রাজ-

নৈতিক সংবাদদাতা অধ্যাপক শ্রীনির্মল বসু ও শ্রীগোপাল ব্যানার্জীর জবানীতে যে কথাটি উপহার দিয়েছিলেন সেটি বড়ই উপভোগ্য। তাঁরা বলেছেন বাম কম্যুনিস্ট পার্টি ঢাকুরিয়াতে "সোমনাথ লাহিড়ীর জামানত বাজেয়াপ্তের চেষ্টা করুক আর আমরা বরাহনগরে জ্যোতি বসুর জয় ও কংগ্রেসের জামানত বাজেয়াপ্তের চেষ্টা করব।" লজ্জা সেই পায় যার লজ্জা আছে। কিন্তু যার লজ্জা নেই! নৈলে ঢাকুরিয়াতে সোমনাথ লাহিড়ীর জামানত জব্দ হবে কি হবে না সেটা ভবিষ্যতের প্রশ্ন কিন্তু মাত্র কদিন আগে ঐ ঢাকুরিয়া এলাকায় পৌরসভার নির্বাচনে যাদের জামানত জব্দ হয়েছে তারা কি বাম কম্যুনিস্টদলের সদস্য নয়? তবে লজ্জার ছিছু কিছু কারণ লজ্জাহীনেরও ঘটে। এক্ষেত্রেও কিছুটা তাই ঘটেছে। ভেদপন্থার কালো বেড়াল প্রথম ধরা পড়ে গত ১২ই অক্টোবর বাম কম্যুনিস্ট পার্টির আসন বন্টনের তালিকা থেকে। এই তালিকায় আর. এস. পি.-কে ১৪টি আসন দেওয়া হয়েছিল অথচ আর. এস. পি.-র বর্তমান বিধানসভার সদস্যসংখ্যা ৭ জন। ফরওয়ার্ড ব্লককে দেওয়া হল ২০টি আসন—অথচ বিধানসভায় তাঁদের সদস্যসংখ্যা ১৩। বাংলা কংগ্রেসকে দেওয়া হল ৩৫টি আসন অথচ বাংলা কংগ্রেসের সদস্য-সংখ্যা তখন পর্যন্ত ছিল ১৫। কিন্তু এস. এস. পি.-কে দেওয়া হল ২৪—যার বিধানসভার সদস্যসংখ্যা ৩, আর. এস. ইউ. সি.-কে দেওয়া হল ৭—যার বিধান-সভায় কোন সদস্যই নেই। এই ভেদ-পন্থার বিড়ালকে নানাভাবে সাজাবার চেষ্টা করা হয়েছে যাতে সহজে কেউ চিনতে না পারে। আর নাম-কে-ওয়াস্তে একটি ফ্রন্ট করার চেষ্টাও এই একই কারণে। বাম কম্যুনিস্ট পার্টির নির্বাচনী ফ্রন্ট গঠনে যদি প্রধান বাধা কেউ হয়ে ছিল তবে সে আর. এস. পি.। বাম কম্যুনিস্ট পার্টি আর। এস. পি.-কে কলকাতায় মাত্র ১টি আসন তাদের তালিকায় দিয়েছিল অথচ বাংলা কংগ্রেস তার তালিকায় দিয়েছিল ২টি আসন। দলের স্বার্থে বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গেই মিতালী আর. এস. পি.-র সহজে হতে পারত—কিন্তু নীতি বলেও কিছু কথা তো আছে। তাই আর. এস. পি.-কে ক্রমাগত কালক্ষেপ করে যেতে হচ্ছে বামের সঙ্গে ফ্রন্ট গঠনের প্রশ্নে। আর. এস. পি.-র এই মনোভাব অন্যান্য দলের উপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করায় ২৭শে নভেম্বর ময়-দানের সভার আগে পর্যন্ত কোন দলই বাম কম্যুনিস্টদের সঙ্গে ফ্রন্ট করবার জন্যে এগিয়ে আসে নি। সম্ভবত এই কারণেই বাম কম্যুনিস্ট পার্টিকে ময়দানের সভায় কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ করে তোলে। ময়দানের সভায় শ্রীজ্যোতি বসু ও প্রমোদ দাশগুপ্ত একনাগাড়ে বাংলা কংগ্রেস ও দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের নামেও যুগান্তরের ভাষায় 'জিগির', বসুমতীর ভাষায় 'বিষোদ্গার' করেছেন।

দক্ষিণ কম্যুনিস্ট পার্টির সম্পর্কে বামেদের বা বাম সম্পর্কে দক্ষিণপন্থীদের অকথ্য কিছু নেই, থাকবে না জানা কথা। তাই যদি শত্রু হয় সে হয় 'বিভীষণ', হিন্দু যদি মুসলমান হয় তবে সে হয় 'আক্রাম খাঁ'। এক্ষেত্রেও দুই কম্যুনিস্ট পার্টির সম্পর্কের

শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী

আরো অবনতি হবে সন্দেহ নেই। আর ফরওয়ার্ড ব্লক—তাদের কথাও না বলা ভাল। কারণ ঐ দলের জন্মের পর থেকেই আজ পর্যন্ত কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে বহু দফায় 'উৎকট বিরহ বিকট মিলনের' দৃশ্য দেখা গেছে। ঐ দুই পার্টি একে অপরকে যে কোন সময়ে ছুরি মারতে পারে, আবার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে বসতেও পারে। কিন্তু বিপদ হল বাংলা কংগ্রেসকে নিয়ে। বাংলা কংগ্রেস নতুন দল— নানা স্বার্থের সংঘাতে অথবা আদর্শের প্রেরণায় কিছু লোক একটি দল গড়বার জন্য সবেমাত্র একত্রিত হয়েছে। বাম রাজনীতির আটঘাট অথবা ঘোরপ্যাঁচ এখনও সবটা বুঝতে পারে নি। অথচ বাম কম্যুনিস্টদের জেহাদ তাদের বিরুদ্ধেই সবচেয়ে বেশি। বৃদ্ধ শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় কতবার সাতসকালে উঠে সকলের অজ্ঞাতে হিন্দুস্থান পার্কে শ্রীজ্যোতি বসুর বাড়িতে উপস্থিত হয়েছেন—ভালোমন্দ পরামর্শ নিতে। তিনিও হলেন ময়দানের মিটিংয়ের অন্যতম শিকার। অজয়বাবুর বিরুদ্ধে প্রার্থী না দিয়ে বাম কম্যুনিস্ট পার্টি 'অনুগ্রহ করছেন'—একথা বলেছেন শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত।

শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত অজয়বাবুকে নিশ্চয়ই অনুগ্রহ করেছেন তমলুক আসনটি দাবি না করে তবে তিনি ছাড়া প্রার্থী হওয়ার মত বাড়তি লোক কি আর তাঁর দলে আছে? পরমাত্মীয় শ্রীকেষ্ট ঘোষ থেকে সুরু করে 'সরোজদা' (মুখার্জী) পর্যন্ত কাউকে তো প্রার্থী করতে বাকি রাখেন নি। তাঁর দলের সর্বসময়ের তিনজন পার্টি কর্মী নাই এমন একটি আসনও কি তিনি অন্য দলকে ছেড়েছেন? ময়না, কুসমুণ্ডি, গঙ্গারামপুর প্রভৃতি কেন্দ্রে দলের শক্তি কত নিশ্চয়ই পরীক্ষা হবে যদি রাজ্যে শেষ পর্যন্ত ত্রিমুখী লড়াই হয়।

বাংলা কংগ্রেস সম্পর্কে বাম কম্যুনিস্ট পার্টির দুটি বক্তব্য বড় সুন্দর করে বাংলা দেশের মানুষের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। এই দুটি বক্তব্য হল বাংলা কংগ্রেস সবেমাত্র সৃষ্টি হয়েছে আর গণ-সংগ্রামের সঙ্গে তার সম্পর্ক পরীক্ষিত হয় নি। কিন্তু আমার মত কম বুদ্ধির লোকেরা যদি এই একই প্রশ্ন বাম কম্যুনিস্টদের সম্পর্কে করে তার জবাবটা কি হবে? বর্তমান বাম কম্যুনিস্ট পার্টি যে আদি—অকৃত্রিম কম্যুনিস্ট পার্টি নয় সেটা তাদের দলের নতুন নাম 'ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি (মার্ক্সিস্ট)' আর নির্বাচনে 'কাস্তে-ধানের শীষ' প্রতীকের পরিবর্তে 'কাস্তে হাতুড়ি' প্রতীক গ্রহণেই বোঝা যায়। কম্যুনিস্ট পার্টির ঐতি-হ্যের সবটুকুর অধিকারী যদি কম্যুনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) পেয়েও থাকেন তবে বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে তার বয়সের তফাৎ ৩০০ দিনের বেশি নয়। ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী)-র জন্ম যদি শুক্রবার ৩১শে অক্টোবর ১৯৬৪ সালে দক্ষিণ কলকাতার ত্যাগ-রাজ হলে হয়ে থাকে তবে তার থেকে মাত্র ৩০০ দিন পরে আর এক শুক্রবার ৬ই ফেব্রুয়ারী উত্তর কলকাতার শ্যাম স্কোয়ারে জন্ম হয়েছে বাংলা কংগ্রেসের। আর যদি বলা যায় রাজনৈতিক ঐতিহ্যের কথা—তবে বাম কম্যুনিস্ট দলের প্রধান প্রধান নেতা শ্রীজ্যোতি বসু, শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত, শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার, শ্রীগণেশ ঘোষের অনেক ঐতিহ্য আছে তবে বাংলা কংগ্রেসের শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়, শ্রীসতীশ

সামন্ত, শ্রীবসন্ত দাস, শ্রীরামনলিনী চক্রবর্তী, শ্রীকমলকৃষ্ণ রায়, শ্রীনৃসিংহ-প্রসাদ সরকার, শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য, শ্রীহুমায়ুন কবীর প্রমুখের জীবনও একেবারে রাজনৈতিক ঐতিহ্যহীন নয়। দেশের মুক্তি-সংগ্রামে এই ব্যক্তিগণ যে কৌলীন্য অর্জন করেছেন সে কৌলীন্য হয়তো মার্ক্সবাদী তত্ত্বে ক্ষুরধার নয়, কিন্তু একেবারে ভোঁতা সেকথা বললেও দেশের লোক শুনবে কেন?

পরের প্রশ্ন সংগ্রামের। গত দুই বৎসরে বাম কম্যুনিস্ট পার্টি কলকাতার ময়দানে তিনটি 'বৃহৎ-বিপুল-বিশাল জনসমাবেশ করে কলকাতার রাস্তা ও ময়দান এলাকার ট্রাফিক জ্যাম করা ছাড়া কী আন্দোলন করেছেন সেটা অনেকের জানা নেই। বরং জানা আছে '৬৪ সালের পর থেকে এই '৬৬ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে মাত্র দুইটি আন্দোলন হয়েছে এবং দুইটি আন্দোলনেই অংশ গ্রহণের দাবিদার হিসাবে বাম কম্যুনিস্ট পার্টির ভূমিকা সর্বাপেক্ষা দুর্বল। '৬৫ সালে ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিরোধে জুলাই-আগস্ট মাসে ১৭ দিন ব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন ও প্রতিরোধ আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। আন্দোলন সুরুর দ্বিতীয় দিন শ্রীজ্যোতি বসু দমদম বিমান বন্দরে অবতরণ করলেই পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। অবশ্য পুলিশ বাম কম্যুনিস্ট পার্টির অনেককে এবং অন্যান্য দলের অনেককে ভারতরক্ষা আইনে পূর্বাহ্নেই আটক করেছিল। কিন্তু ১৭ দিন ব্যাপী প্রকৃত আন্দোলনে অর্থাৎ আইন অমান্য কারাবরণে কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা ছিল সর্বাপেক্ষা কম। এমন কি যে ছাত্র-সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়েছিল তাদের পরিচালনায় আইন অমান্য আন্দোলনে বাম কম্যুনিস্ট ছাত্র-ফেডারেশনের সদস্য সংখ্যা ছিল সর্বাপেক্ষা কম। সেই হিসাব এখনও ৩০নং মির্জাপুর স্ট্রীটে ছাত্রনেতা প্রণব মুখার্জীর কাছে জমা আছে।

দ্বিতীয় আন্দোলন—গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী থেকে ৭ই এপ্রিল পর্যন্ত খাদ্য আন্দোলন। এই আন্দোলনে কোন রাজনৈতিক দলের সক্রিয় নেতৃত্ব ছিল না, শুধুমাত্র হরতাল সংগঠন করা ছাড়া। কাজেই বাম কম্যুনিস্ট পার্টিরও অংশ গ্রহণের প্রশ্নও ছিল না। আর যেসব এলাকায় এই খাদ্য আন্দোলন সর্বাধিক সংগ্রামী রূপ ধারণ করেছিল সেই সব জমিতে প্রকৃত প্রভাব যদি কোন দলের থেকে থাকে তবে সে দল হ'ল এস. এস. পি. ও দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট।

তাই ময়দানের বড় সভা যদি বিপ্লব ও সংগ্রামের একমাত্র প্রতীক হয় তবে সবসময় সেই সভা ও সমাবেশ যে জাতির পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয় তার প্রমাণ গত ৭ই নভেম্বর দিল্লীতে পাওয়া গেছে। আর একটা কথাও সত্য—টাকা খরচ করলে কলকাতার ময়দানে বড় সভা করা যে কারও পক্ষে অসম্ভব নয় তার প্রমাণ তো গত ২৮শে আগস্ট রাজ্যের নিতান্ত ছোট দল ফরোয়ার্ড ব্লকই দেখিয়ে দিয়েছে।

তাই বাংলা কংগ্রেস সম্পর্কে এত-দিন পরে আন্দোলনের প্রশ্ন, নীতির প্রশ্ন ও অন্যান্য ভূমিকার প্রশ্ন তুলে হয়তো বেড়ালের ফাঁসি দেওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া রাজ-

Full Food with a flair . . .

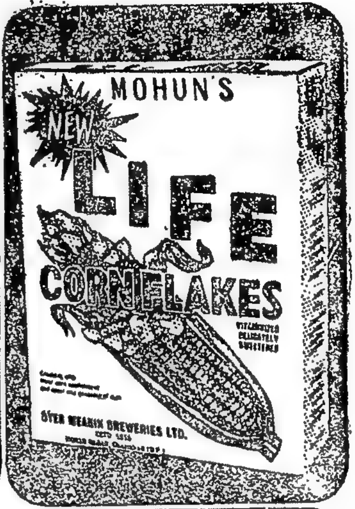

মোহনের
নিউ লাইফ
কর্ণ ফ্লেক্স

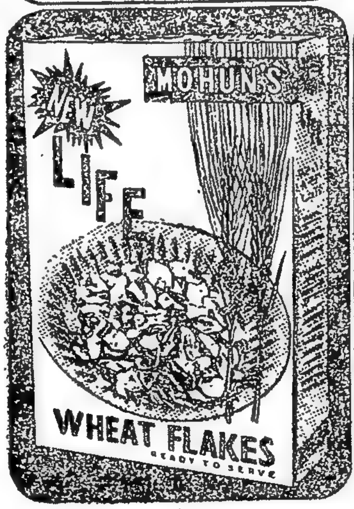

মোহনের
নিউ লাইফ
হুইট ফ্লেক্স

মোহনের "নিউ লাইফ" প্রাতঃকালীন খাদ্য সারা পরিবারের পক্ষে পূর্ণ পুষ্টিকর। এইগুলি প্রাত্যাহিক অত্যাবশ্যকীয় ও অপরিহার্য প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, মিনারাল সল্ট এবং ভিটামিনের সারবান উৎস। এইগুলি খাইতে ভাল।

আমাদের জিনিষগুলি ১১০ বৎসরেরও বেশী কালের অভিজ্ঞতাপুষ্ট

ডায়ার মীকিন ব্রুয়ারীজ লিঃ, স্থাপিত—১৮৫৫

মোহন নগর (গাজিয়াবাদ) ইউ, পি,

সোলান ব্রুয়ারী - লক্ষ্ণৌ ডিস্টিলারী - কশৌলী ডিস্টিলারী

DMB-NF-818

নীতি কি ঢাকা যাবে? একথা আজ আর শত চেষ্টাতেও ঢেকে রাখা সম্ভব নয় দুই কম্যুনিস্ট পার্টির শরিকী বিবাদ রাজ্যে বামপন্থী ফ্রন্ট গঠনে প্রধান বাধা হয়েছিল আর বাম কম্যুনিস্ট পার্টি পশ্চিমবঙ্গ থেকে তার শরিককে নির্বংশ করার সুপরিকল্পিত চক্রান্তে অন্যান্য বামপন্থী দলের দেশপ্রেমিক ভূমিকাও ম্লান করে দেয়। ময়দানের সভায় ওয়ার্কার্স পার্টি, আর, সি, পি, আই, ও মার্ক্সবাদী ফরোয়ার্ড ব্লককে দেখিয়ে বলা হয়েছিল তিন বিপ্লবী বন্ধু তাদের পাশে এসে গেছেন—অন্যরাও এলেন বলে। কিন্তু ১০ই নভেম্বর থেকে ২৭শে নভেম্বর পর্যন্ত অন্য কোন দলকেই বাম কম্যুনিস্ট পার্টি নিজেদের কাছে আনতে পারেন নি। কিন্তু আর. এস. পি. ও এস. এস. পি.-কে পাশে আনবার জন্যে কোন চেষ্টারই ত্রুটি রাখে নি। ক্ষোভ, ধমক, শাসানির আওয়াজও নিচের তলার ক্যাডার থেকে গুরু করে অনেক লীডার পর্যন্ত একসুরে প্রকাশ করেছেন। গত ৮ই নভেম্বর শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত শ্রীমাখন পালকে যে কথাগুলি বলেছিলেন সেই কথাগুলি ছিল অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বাম কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে শেষ কথা বলার লোক যদি কেউ থাকে তবে তিনি শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত ছাড়া আর কেউ নন। শ্রীদাশগুপ্ত শ্রীপালকে বলেছিলেন, "জলন্ধরে ১২২টি আসন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় আমিই ছিলাম সভার সভাপতি, কাজেই আপনি যদি ভেবে থাকেন............।" এই একান্ত দুজনের ভিতরের আলোচনা পেশ করা সংগত নয় জেনেও দু-একটি শব্দ উদ্ধৃত করলাম শুধু এই কারণে যে শ্রীপাল ও শ্রীদাশগুপ্ত উভয়েরই জেনে রাখা ভালো যে রাজনীতির যে কোন কথা দেশের স্বার্থে যুক্ত থাকলে সেকথা প্রকাশ হয়ে পড়েই। যেমন গত ১৯শে রাত আটটায় শ্রীমধু লিমায়ে পশ্চিমবঙ্গের এস. এস. পি নেতা শ্রীনরেন দাসকে যে কথাগুলি বলে গেছেন বহুবাজার স্ট্রীটে সেটাও আর গোপন নেই। শ্রীলিমায়ে শ্রীদাসকে স্পষ্ট ভাষায় বলে গিয়েছিলেন শুধুমাত্র বাম কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে কোন সমঝোতা যেন না হয়। তাই ২৭শে নভেম্বরের ময়দানের সভায় বাম কম্যুনিস্ট পার্টি তাদের ৩৭ শত টাকা ব্যয়ে নির্মিত মঞ্চে পশ্চিমবঙ্গের কোন বৃহৎ দলের রথী-মহারথীকে আনতে পারেন নি। এই ব্যর্থতা ও হতাশা সম্ভবত সেইদিনের সভায় এত বেশি উদ্গিরণ ও জেহাদ ঘোষণার উৎসমুখ খুলে দিয়েছিল এবং এই উদ্গিরণ ও জেহাদই রাজ্যে বাম ঐক্যের মৃত্যু ঘটিয়েছে ও ঘটাবে।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ভ্রান্তিমুক্তচিত্তে বিশ বছরের একদলীয় অপশাসন থেকে মুক্তির জন্য কংগ্রেসের পরাজয় কামনা করেছিল এবং কংগ্রেসবিরোধী শক্তির ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠা চেয়েছিল। কংগ্রেসবিরোধী শক্তি কোন দলবিশেষ নয় আর একক দল হিসাবে রাজ্যের কোন দলই কংগ্রেসের এক-চতুর্থাংশ শক্তির মোকাবিলায় ক্ষমতাশালী নয়, জেনে বুঝে বিশ বৎসরের অভিজ্ঞতাপুষ্ট মনে কংগ্রেস-বিরোধী শক্তির ঐক্য কামনা করেছিল। সেই প্রত্যাশার মৃত্যু যারা ঘটিয়েছে তারা আরও পাঁচ বছরের জন্য কংগ্রেসকে ক্ষমতায় ফিরে আসবার প্রধান সহায়তা

শ্রীমাখন পাল

করে দেশের মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এই প্রত্যাশার মৃত্যু ও বিশ্বাসঘাতকতার প্রধান প্রধান ঘটনা ও দিনের অনুলিপি শেষ করার মুহূর্তে দুইটি বিশেষ মুহূর্ত চোখের উপর ভাসছে।

সেদিন ৮ই নভেম্বর অপরাহ্ণ বেলায় বাম কম্যুনিস্ট পার্টির লোয়ার সার্কুলার রোডের বাড়িতে বসে যখন তাঁদের ১২২টি আসনের প্রার্থীতালিকা সাংবাদিকদের কাছে পেশ করা হচ্ছিল ঠিক সেইদিন সেই একই সময়ে উত্তর কলকাতা বাগবাজার স্ট্রীট থেকে একটি মৃতদেহ অজস্র মালায় ঢাকা পড়ে কেওড়াতলা শ্মশানের পথে এগিয়ে চলছিল। মৃতদেহের উপর যাঁদের দেওয়া মালা ছিল তার মধ্যে ছিলেন অমর বসু, হেমন্ত বসু, মাখন পাল, আব্দুলরেজাক খাঁ, প্রমোদ দাশগুপ্ত প্রমুখ ব্যক্তিগণ। এই মৃতব্যক্তি একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন যিনি পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী মৈত্রীর ঐক্যের প্রতীকরূপে গত বিশ বৎসরের [illegible] একবারের জন্য বামপন্থীদের দাবির নিকট রাজ্যের কংগ্রেস সরকারের পরাজয় ঘটিয়েছিলেন। গত বিশ বৎসরে মাত্র একবারই সরকারের জনমতের কাছে পরাজয় হয়েছে। সে হল ১৯৫৬ সালের বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি-বিরোধী আন্দোলনে।

উত্তর-পূর্ব কলকাতা উপনির্বাচনে শ্রীমোহিত মৈত্র রাজ্যের বামপন্থী ঐক্যের প্রতীকরূপে কংগ্রেসকে পরাজিত করেছিলেন আর এই মৃতদেহ সেই শ্রীমোহিত মৈত্রের। মোহিত মৈত্রের মৃতদেহ এগিয়ে চলেছে শ্মশানের পথে যে সময়ে—সেই সময়ে শ্রীজ্যোতি বসু, শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত তাঁদের একক দলের প্রার্থীতালিকা পড়ে চলেছিলেন।

বিগত কয়েক মাসে রাজ্যের ১৩টি বামপন্থী দলের নির্বাচনী ফ্রন্ট ও সমঝোতার জন্য বৈঠক বসেছে বহুবার আর এই বহুবারের বৈঠকে শ্রীজ্যোতি বসু শ্রীনিরঞ্জন সেন ও শ্রীসরোজ মুখার্জী দলের বৈঠকের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত কম্যুনিস্ট পার্টির সম্পাদক—তিনি কিন্তু মাত্র একদিনের জন্য এই ফ্রন্টের সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। তিন ঘণ্টা সভা চলেছিল বহুবাজার স্ট্রীটে ইউ. টি. ইউ. সি. হলে। সেদিন ১৬ই অক্টোবর। শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত তিন ঘণ্টা সভা চলাকালে সভায় একটি কথাও উচ্চারণ করেন নি। শুধুমাত্র একটা দেশলাই চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, "দেশলাইটা দিন তো।" সেদিন ১৬ই অক্টোবর বামপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টির ও বাংলা কংগ্রেসের আসন ভাগের দুইটি তালিকা পাশাপাশি রয়েছে। তুলকালাম কাণ্ড—বামপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টির একান্ত গোপন তালিকা কাগজে বেরিয়ে গেছে। এ্যারিস্টোক্র্যাট পলিটিশিয়ান শ্রীজ্যোতি বসু, যাঁর প্রতিটি কথা ওজনে ও মাপে সর্বদা ভারসাম্য রক্ষণ করে (অবশ্য আইনসভায় কখনও-সখনও কোন কোন মন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বা আক্রমণকারী কংগ্রেস সদস্যের উদ্দেশ্যে 'বাস্টার, সোয়াইন' বলে থাকেন) তিনিও সেদিন কয়েকজন সাংবাদিককে পর্যন্ত অনেকগুলি অপ্রত্যাশিত কথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই দিনই ধরা পড়ল বামপন্থী ঐক্যের দেহ সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এইদিনই সর্বপ্রথম ও সর্বশেষভাবে শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত দলের প্রতিনিধিরূপে সভায় এসেছিলেন। মুখের চুরুট নিভে গিয়েছিল। তাই তিনি চুরুট ধরাতে পার্শ্ববর্তী কারও দিকে হাত বাড়িয়ে বলেছিলেন, "দেশলাইটা দিন তো।"

(আগামীবারে সমাপ্য)

ঋষি শ্রীঅরবিন্দ

শ্রী দিলীপকুমার রায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সাবিত্রী কিন্তু শুধু প্রতীকাবিলাসই নয়—নেপথ্যবিলাসীও বটে। ইংরাজিতে এর বিশেষণ occult ঃ আমাদের চারদিকে নানা অদৃশ্য রাজ্য আছে—তাদের আভাষ পাওয়া যায় নানা গভীর ও মনোজ্ঞ ধ্যানের মাধ্যমে। তাই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেনঃ

The earth alone is not our
teacher and nurse;
The powers of all the
worlds have entrance there (2.5)

(নয় শুধু ধরা গুরু ধাত্রী আমাদের—অগণন
সূক্ষ্ম জগতের শক্তি করে আসা-যাওয়া পৃথিবীতে।)

অশ্বপতি ও সাবিত্রীর নানা জগতের উপলব্ধির বা দর্শনের বর্ণনা শ্রীঅরবিন্দ করেছেন এ-মহাকাব্যে। যাঁদের সে-সব জগতের সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতাই নেই তাঁদের মনে হবেই হবে এসব বর্ণনা নিছক হেঁয়ালিবিলাস। কিন্তু যাঁরা জানেন—প্রাজ্ঞ—তাঁরা এসব বর্ণনায় ও আভাষে আনন্দরসে আপ্লুত না হয়ে পারবেন না। শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন যে, প্রকৃতি মানুষের অন্তর্লোকের চারটি দিক খুলে দিতে চান ধীরে ধীরে ঃ ধর্মানুভূতি (religion) নেপথ্যতত্ত্ব (Occultism), অধ্যাত্ম চিন্তা (Spiritual thought) ও অধ্যাত্ম উপলব্ধি (Spiritual realisation, experience)* আমরা—মানে ইদানীন্তনেরা খবর রাখি প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থটির কেবল দ্বিতীয়টির সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না—দু-চারটি ভৌতিক আবির্ভাব ছাড়া। কিন্তু জগতের অনেক কিছুই বোঝা যায় না এই সব মধ্য জগতের গূঢ় খবর না পেলে। রোখালো ঝাঁঝালো বুদ্ধিবাদী এ-ধরণের কথা হেসে উড়িয়ে দিলেও যাঁরা গভীরদর্শী তাঁরা ক্রমশই মানতে বাধ্য হয়েছেন এ যুগে যে, আমরা বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় দিয়ে এমন অনেক শক্তিরই খবর পাই না যারা নিত্যই আমাদের চালায়, বা অলক্ষ্য থেকে আমাদের প্রাণ-মনকে রাঙিয়ে তোলে। বিখ্যাত বুদ্ধিবাদী পলভ্যালেরি লিখেছেন তাঁর একটি বইয়েঃ

"Mous sommes les jouets des choses absentes"—অর্থাৎ আমরা নানা অদৃশ্য শক্তির হাতের খেলার পুতুল। গুহ্য বা নেপথ্য তথ্য জানলে আমরা মুক্তি পেতে পারি এদের নানা চাতুরীর কারসাজি থেকে। সাবিত্রীর নানা স্থলেই শ্রীঅরবিন্দ খবর দিয়েছেন এসব জগতের। সে সংবাদ সচরাচর গদ্যে দেওয়া হয়ে থাকে তথ্যকে সরবরাহ করতে। কবিতায় এসব খবর তথ্য-পরিবেষণ করে গৌণত মুখ্যত জোগান দেয় রসের—তাই কবিতায় গুহ্য বা নেপথ্যতত্ত্ব এক অভিনব সুষমায় মণ্ডিত হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু সে অন্য কথা। সাবিত্রীর শিখর মহিমা এ-নেপথ্যরাজ্যের বর্ণনায় মূর্ত হয়ে ওঠে নি মূর্ত হয়ে উঠেছে চতুর্থ সাধনায় অধ্যাত্ম উপলব্ধিতে যাকে শ্রীঅরবিন্দ সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বরণ করেছেন এই বলে যে the first three are approaches the last is the decisive avenue of entry.*

সাবিত্রীর অশ্বপতির ও নারদের নানা গভীর ভাষণের মধ্যে দিয়েই আমরা পাই এই পরম রাজপথের সংবাদ—আনন্দ-বেদনার আলোছায়ায় মণ্ডিত কাব্যসুষমায়। সে সব বর্ণনা করা সম্ভব নয়। সাবিত্রীতে শ্রীঅরবিন্দ প্রায় ২৪০০০ লাইনে যা যা বলেছেন একটি প্রবন্ধে তার সূচীপত্র দেওয়াও সম্ভব নয়। তাই আমি এবার সাবিত্রীর কাব্যরূপের সম্বন্ধে আরো কিছু বলেই সমাপ্তি টানব। চেষ্টা করব সংক্ষেপেই বলতে। তবে সাবিত্রীর কাব্যের বর্ণনা করতে সুরু করলে এত কথা এসে যায় ভিড় করে যে অনেক সময়েই কোনটা ছেড়ে কোনটা বলব ভেবে পাই না।

বলেছি, সাবিত্রীর জন্মের পরে তার চলন-বলনের মধ্যে ফুটে উঠত এমন এক দৈবী দীপ্তি যে, তার সঙ্গী সাথী প্রিয় পরিজন সবাই তাকে সমীহ ক'রে চ'লত—ইংরাজীতে যাকে বলে awe : কিন্তু ঐ সঙ্গে আর একটি অঘটন মতন ঘটল, যার খবর কেউ রাখত নাঃ সাবিত্রীর সহজাত চেতনার মধ্যে জেগে উঠল এই আত্মজ্যোতি যে, তার জন্ম নিয়তির চাকা ঘুরিয়ে দিতে, সহজাত দীপ্তি ও দুরাশার যোগবলেঃ ফলে কী ঘটল? না,

Her head she bowed not to the stark decree
Baring her helpless heart to destiny's stroke..
A work she had to do, a word to speak..

(করিল না শিরোধার্য সে বিধান ঘোর নিয়তির,
পাতিল না অসহায় বক্ষ তার সহিতে আঘাত......
ছিল তার করণীয়, ছিল এক বাণী ঘোষিবার।)

শ্রীঅরবিন্দ নানা ছন্দেই এই কথা ঘুরিয়ে বলেছেনঃ যে প্রকৃতির অমোঘ বিধান (iron law) সবাইকে কালচক্রের মতন নিষ্পিষ্ট করলেও থেকে থেকে ভগবানের এমন বিভূতি অবতার জন্মগ্রহণ করেন, যাঁরা ঈশ্বরের বিধান লঙ্ঘন ক'রেই ঐশ্বরিক করুণার প্রবর্তন করেন। সাবিত্রী ছিল এই আবির্ভাবেরই প্রতীক।

এ-অসম্ভব সাবিত্রী কেমন ক'রে সম্ভব করল তার আভাষ দিয়েছেন ভগবান শেষ পর্বে—যখন তিনি সাবিত্রীকে বললেনঃ

Thou art the force by which I made the worlds,
Thou art my vision and my will and voice.
(II. 1)

(যে-শক্তির বলে আমি গড়েছি অগণ্য বিশ্ব—তুমি
সেই শক্তি—আমার প্রমূর্ত স্বপ্ন, ইচ্ছা, স্বর, বাণী)

* The Evolution of the Spiriual Man—24th chapterfflThe Life Divine

* অর্থাৎ প্রথম তিনটি পথে লক্ষ্যের কাছে পৌঁছানো যায় শেষেরটিই হল চরম রাজপথ—ছাত্রপত্র। (Life Divine 24th chapter

কিন্তু সাবিত্রী জানত না কীভাবে তাকে সাধনায় লাভ করতে হবে এই মহাসিদ্ধি, কোন পথে কাঁটাবনকে রূপান্তরিত করতে হবে পুষ্পকুঞ্জে। শ্রীঅরবিন্দ মহাভারতের পুরাকথা থেকে এই পথের আভাষকে চয়ন করে ফলিয়ে তুলেছেন এক মহাকাব্য জীবন ও প্রতীকের সমন্বয়ে। ফলে যে-কাহিনী গড়ে উঠেছে সে এইঃ

সাবিত্রী স্বয়ম্বরা হ'য়ে চলল তার জীবন-সঙ্গী স্বপ্ন-সাথীকে খুঁজতে। কারণ সে অন্তরে পেয়েছিল এই বাণী যে, যে-সাধনায় তাকে দীক্ষিত হ'তে হবে তাতে সিদ্ধিলাভ হ'তে পারে না শিবশক্তি (ওরফে প্রকৃতি পুরুষের) মিলন বিনা। শ্রীঅরবিন্দ প্রথম স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ে এ-যুগল সাধনার কথা বলেছেন বিশদ ক'রে, আমি শুধু শিবশক্তি সংযোগের আভাষটুকু দিয়েই ক্ষান্ত হব (বস্তুত এ-মিলন হ'ল গুহ্যতত্ত্বের একটি বিধান)ঃ

This is the knot that ties together the stars:
The two who are one are the secret
of all powers.

(এ-গূঢ় গ্রন্থিতে বাঁধা লক্ষ তারা নীহারিকা গতিঃ
যুগল-মিলন মন্ত্র সর্বশক্তি-মূলে উপ্ত রাজে।)

এ-মিলন হ'লে তবেই সত্যিকার মুক্তি—জীবমুক্তি। এ-জগৎ থেকে প্রস্থান ক'রে পরলোকে সুখাসীন হ'য়ে নয়, ইহলোকেই আনন্দসিদ্ধি। এ-রহস্যের আভাষ আপ্তবাক্যে পাই যে, প্রকৃতি বিনা পুরুষ ওরফে শক্তি বিনা শিব সৃষ্টি-ব্রতী হ'তে পারেন না। বৃহদারণ্যকে আছে ঃ "স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে... স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চা ভবতাং...ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত"—অর্থাৎ একাকী থেকে ব্রহ্ম আনন্দ পেলেন না তাই নিজেকে দুভাগ করলেন পতি ও পত্নী—তখন থেকে সৃষ্টি শুরু হ'ল। তন্ত্র এ সত্যকে অকুতোভয়ে অঙ্গীকার করেছে, শিব পার্বতীকে বলছেনঃ "শক্তিজ্ঞানং বিনা দেবি মুক্তিঃ হাস্যায় কল্পতে"—অর্থাৎ "শক্তিকে না জেনে মুক্তি চাওয়া হাসির কথা হ'য়ে দাঁড়ায়"—যার ইংরাজী অভিধা—ridiculous!

লীলাবাদী হ'লে নারীকে বাদ দিয়ে নরের সার্থকতাকে অঙ্গীকার করা চলে না। শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন লীলাবাদী, চেয়েছিলেন জীবনের বহুবিচিত্র সমৃদ্ধ মুক্তি, কিন্তু এ মুক্তি চাইতে হবে বাসনা থেকে, আসক্তি থেকে—প্রেম থেকে, কর্ম থেকে, কি জীবসেবা থেকে নয়। তাই শিব-শক্তিবাদ তাঁর মন টেনেছিলঃ শিব নির্গুণ—শক্তি সগুণা; শিব অচল সাক্ষী—শক্তি গতিময়ী সৃষ্টিশীলাঃ

He leaves to her the cosmic management
And watches all, the witness of her scene.
He leans on her for all he does and is.
In a thousand ways he serves her royal needs.
Makes all reflect her whims; all is their play:
This whole wide world is only he and she.
(I. 4)

(বিশ্বের নিয়ন্ত্রী শক্তি; তার পরে বিশ্বপালনের
গুরুভার দেয় শিবঃ দ্রষ্টা সাক্ষী—দেখে শুধু চেয়ে।......
প্রতি কর্ম তরে, আপনার সত্তা তরে করে শিব
নির্ভর শক্তির 'পরে......লক্ষ ছন্দে সেবক সম্রাট
করে সেবা সম্রাজ্ঞীর......জীবন সাধনা তার শুধু
পালিতে শক্তির আজ্ঞা; সৃষ্টি—যুগলের প্রাণলীলা।
ব্যাপ্ত এ-নিখিলে শুধু রাজে দুইজনঃ শক্তি, শিব।)

সাবিত্রী সত্যবানের মধ্যে নিবিড় দাম্পত্য প্রণয়ের ছবি শ্রীঅরবিন্দ তাঁর অপরূপ কবিত্বের তুলি দিয়ে অকুণ্ঠেই এঁকেছেন, কারণ, তিনি সে প্রেমের উৎসরূপে বরণ করেছিলেন এই শিব-শক্তিবাদকে। তাই অন্তিম অধ্যায়ে সত্যবান মৃত্যুর কবল থেকে মুক্ত হ'য়ে সাবিত্রীর কাছে ফিরে আসার পরে সাবিত্রীকে বললেন:

Thou art the earthly keeper of my soul..
I have consented for thy sake to be (Epilogue)

(আমার অন্তরাত্মার ধারয়িত্রী তুমিই ধরায়......
করেছি স্বীকার আমি এ-জীবন শুধু তব তরে)

শিবশক্তির এ-সম্বন্ধ অন্যোন্য (mutual)—একে দুই, দুইয়ে এক—তাই সাবিত্রীও সত্যবানের অঙ্গীকারের সাড়া দিলেন এ অঙ্গীকারেঃ

Heaven's touch fulfils but cancels
not our earth:
All that I was before, I am to thee still,
Close comrade of thy thoughts and hopes
and toils
I am thy kingdom even as thou art mine.

The sovereign and the slave of thy desire
And mother of thy wants;
thou art my world
The world I inhabit and the god I adore (ঐ)

(অমর্ত্য মর্ত্যকে ক'রে পূর্ণ স্পর্শে, করে না বিনাশ!
যা ছিলাম আমি পূর্বে আজো তাই আছি তব পাশেঃ
তোমার সাধনা চিন্তা দুরাশার নিত্য সাথী সখী,
তোমার সাম্রাজ্য আমি, যথা তুমি সাম্রাজ্য আমার.
সম্রাজ্ঞী সেবিকা তব কামনার—মাতা হ'য়ে তব
ক্ষুধা তৃষ্ণা মিটাই নিয়ত, আর তুমি হে আমার
বিশ্ব যেথা করি বাস, দেবতা আমার পূজনীয়।)

কিন্তু সাধনার পথে এ-শিবশক্তি তত্ত্ব গুহ্য—occult—তাই তন্ত্রে শক্তি সাধনাকে ঐকান্তিক তান্ত্রিকেরা সাধ্যমত গোপন রেখেছেন। তাঁদের দর্শন এই যে, এ-সাধনা সকলের জন্য নয়—শুধু অধিকারীই এ-সাধনায় সিদ্ধ হ'তে পারে, অনধিকারীর স্খলন হবেই হবে—যার অন্য নাম যোগভ্রষ্ট। তাই শ্রীঅরবিন্দও এ-সর্গটির শিরোনামা দিয়েছেন secret knowledge, গুহ্য বিদ্যা। কারণ এর নিহিতার্থ "নিহিতং গুহায়াম্"। অর্থাৎ মন্ত্রগুপ্তি চাই যতদিন না কাল পূর্ণ হয়। কাল পূর্ণ হ'লে তখন—

The voice ill-heard shall speak, the soul obey,
A power into mind's inner chamber steal,
A charm and sweetness open life's closed door
And beauty conquer the resisting world,
The truth-light capture Nature by surprise,
A stealth of God compel the heart to bliss
And earth grow unexpectedly divine.
In matter shall be lit the spirit's glow
In body and body kindled the sacred birth
Night shall awake to the anthem of the stars
The days become a happy pilgrim march,
Our will a force of the Eternal's power,
And thought the rays of spiritual sun.
A few shall see what none yet understands;
God shall grow up while the wise men
talk and sleep,
For man shall not know the coming till its hour
And belief shall be not till the work is done.
(I. 4)

শ্রুত হবে অস্ফুটের কণ্ঠ—যাকে মানিবে অন্তর,
অন্তরের অন্তঃপুরে নবশক্তি পশিবে গোপনে,
লাবণ্য মাধুর্য দেবে খুলে জীবনের রুদ্ধদ্বার,
নাস্তিক বিমুখ বিশ্বে সৌন্দর্যের মন্দ্র জয়ধ্বনি
সত্যজ্যোতি আচম্বিতে প্রকৃতিকে আনিবে স্ববশে,
অলক্ষ্য চরণে বিভু মহানন্দে জিনিবে অন্তর,
চকিত চমকে ধরা লভিবে সালোক্য অধরার।
মৃন্ময়ের ক্লিন্নপুরে ঝলকিবে চিন্ময় চাহনি,
জ্বালি' পুণ্য জাতকের নবপ্রভা দেহে দেহান্তরে।
জাগিবে জাগিবে রাত্রি শুনি' নীহারিকার কীর্তন
হবে হবে দিনযাত্রা ধ্রুব-তীর্থ সুখ-অভিযান,
প্রাণের সংকল্প হবে শাশ্বতের শক্তির বিহার,
চিন্তার জল্পনা হবে চিন্তামণি—রবি রশ্মি জাল।
লভিবে এ-ধ্যান সত্য শুধু কতিপয় ঋষি কবি
তোষে যাঁকে পায় নাই আজো কেহ। স্বয়ম্ভু অরূপ
দিনে দিনে অভিনব রূপায়ণে হবে বিকশিত
সুবিজ্ঞের গবেষণা অঘোর নিদ্রার অন্তরালে।
সে-আবির্ভাবের লগ্ন না আসিলে জানিবে না কেহ
প্রত্যয় হবে না মূর্ত সাধনার সংসিদ্ধি না হ'লে।)

* * * *

অতঃপর সাবিত্রীর মনে আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠল এক অব্ছা তৃষ্ণা জিজ্ঞাসা। সকলের মধ্যে থেকে সে একা...... সবাইকে সে আশ্রয় দিতে চায় অথচ কেউ তার অন্তরঙ্গ হ'তে পারে না...... "A single lamp lit in perfection's house (৪, ২) সে নিজে জ্বলে উঠল একটিমাত্র দীপিকা অনিন্দনীয়ের অন্তঃপুরে......এই-ই কি সব? আরো কি কিছু চাই না? কী সে-বস্তু, জানে না. সাবিত্রী; অথচ না জেনেও জানে। এমন সময় অশ্বপতি তাকে বললেন (৪, ৩)ঃ "Thy Spirit came not down a star alone"—তুমি একটি মাত্র তারা হয়ে জ্বলবে এ জন্যে তো তুমি অবতীর্ণা হও নি মা, তোমাকে খুঁজে পেতে হবে "The Second Self for whom thy nature asks."

সাবিত্রী চম্‌কে উঠলঃ তাই তো! তার তো আর বসে থাকা চলে না. খুঁজতে হবে আত্মার পরমাত্মীয়কে। স্বয়ম্বরার অন্তরে বেজে উঠল সন্ধানের শঙ্খ। রাজরথে শুরু হ'ল অভিযান।

পঞ্চম স্কন্ধে পাই সন্ধানের ফল—আবিষ্কার। সাবিত্রী এক সুন্দর অরণ্যে দেখা পেল পরম বাঞ্ছিতের, যার স্পর্শে তার স্বপ্ন মূর্তি নেবে জাগরণে—যে-মঞ্জরণের জন্যে তার জন্ম। এ স্কন্ধের নাম দিয়েছেন শ্রীঅরবিন্দ The Book of Love. মাত্র তিনটি সর্গ, কিন্তু কী অফুরন্ত কবিত্ব! উদ্ধৃতি দেওয়া সম্ভব নয়। কেবল সত্যবানের বর্ণনার একটু আভাষ দেওয়া চাইঃ

His figure led the splendour of the morn,
His look was a wide day break of the Gods,
His head was a youthful Rishis
touched with light.
A foster-child of beauty and solitude

(দেহ তার প্রভাতের মহিমোজ্জ্বল আলোকায়া.....
চাহনি দেবতাদের ব্যাপ্ত নবারুণের ঝলক,
দীপ্ত শির ঋষি কুমারের—অপরূপ আভাময়.....
নিথর বিজনতার সৌন্দর্যের বাঞ্ছিত দুলাল)

তারপর? আর কি? একটি বিখ্যাত কীর্তনে আছেঃ

দোঁহে দোঁহা দরশনে উপজিল প্রেমঃ
দারিদ্র্য লভিল যেন ঘটভরা হেম।

মার্লোও বলেন নি কিঃ "Who ever loved that loved not at first sight?" সাবিত্রী পরমানন্দে সত্যবানকে প্রণাম করলঃ

She bowed and touched his feet
with worshipping hands,
She made her life his world for him
to tread..
He gathered all Savitri into his clasp..
She felt her being flow into him as in waves
A river pours into a mighty sea.

(নমি' পূজারিণী সম পরশি চরণ বল্লভের
দয়িতা বিছায়ে দিল জীবন প্রিয়ের পদতলে।.....
সত্যবান বাহুপাশে বাঁধিল যখন সাবিত্রীরে
মনে হ'ল সাবিত্রীর—সত্তাখানি তার প্রিয় মাঝে
লীন হ'ল নদী যথা মহাসিন্ধু বুকে হয় লীন।)

সাবিত্রী ফিরে গেল পিতার অনুমতি নিতে, বলল সত্যবানকে যে, অচিরেই ফিরে আসবে কিন্তু তার দেহ দূরে থাকলেও—

My heart will stay here on the forest verge
(হৃদয় আমার রবে এ-কানন-নিলয়ে আসীন)

এরপরে কাব্য মোড় নিল ড্রামার দিকে ষষ্ঠ স্কন্ধে—Book Of Fate-এ। অর্থাৎ যা না হয়েই উপায় ছিল না সেই ভবিতব্যকে তপঃশক্তির তেজে দাহন করতে, প্রেমবন্যার প্লাবনে বিচূর্ণ করতে।

সাবিত্রী ফিরে যখন রাজসভায় অভ্যুদিত হ'ল তখন দেবর্ষি নারদ গান করছেন রাজা-রাণীর সামনেঃ

He sang to them of the lotus-heart of love
With all its thousand luminous buds of truth.
(৬, ১)

(গায় ঋষি সত্যের অযুত দীপ্ত অঙ্কুর কোমল
প্রেমের নলিনকান্তি প্রাণের কীর্তন সমুচ্ছলি'।)

সাবিত্রী পিতাকে নিবেদন করল সত্যবানকে তার বাক্‌দানের কথা। নারদ চম্‌কে উঠে বললেনঃ "সত্যবানের মৃত্যু আসন্ন—এক বৎসর পরে—যার কাটান নেই।"

শুনে রাজরাণী মালবী কন্যাকে বললেনঃ

"Plead not thy choice,
for death has made it vain."
(কোরো না মা অনুরোধ—মৃত্যু যবে হ'ল অন্তরায়)

তখন তেজস্বিনী সাবিত্রীর নিজমূর্তি প্রকাশ হ'লঃ সে ঘোষণা করল প্রদীপ্ত আত্মপ্রত্যয়ে—"আমার শক্তি মৃত্যুর চেয়েও প্রবল, নিয়তির চেয়েও দুর্বার। আমার অমর প্রেমের কাছে মরণ হার মানবেই মানবে।"

মা উৎকণ্ঠায় অনেক অনুরোধ করলেন. অভিশাপ দিলেন নিয়তির নিষ্ঠুরতাকে। অবিশ্বাসের কথা বললেন গভীর বেদনায়ঃ এ-ভবিতব্য যে হৃদয়হীন ভগবান মঞ্জুর করলেন তাঁকে কেমন ক'রে দয়াল ব'লে মানব? ইত্যাদি। সাবিত্রী বললেনঃ আমার শক্তি দৈবী শক্তি। আমি জানিঃ আজ কেন আমি এসেছিঃ

For I know now why my spirit
came on earth
And who I am and who he is I love.
(জেনেছি যে আমি আজ—কে আমি, কেন এ-ধরণীতে
এসেছে আমার আত্মা, জানি—কে সে দয়িত আমার।)

অশ্বপতি দোমনা হ'য়ে শুধালেন নারদকেঃ "আমি মনে করেছিলাম যে, সাবিত্রী মহাশক্তি নিয়ে জন্মেছে। সে-শক্তি কি নিয়তির প্রতিস্পর্ধী নয়? ভবিতব্যের কি কাটান নেই?"

নারদ উত্তরে যা বললেন, প্রজ্ঞা ভাব বিশ্লেষণ প্রকাশ সব জড়িয়ে—সে এক অতুলনীয় কাব্যদর্শন। শেষে বললেন যে, সাবিত্রী মহিমময়ী আত্মশক্তিতে অনন্যা—তাকে একলাই দাঁড়াতে হবে নিয়তির সামনে, এই-ই তার নিয়তিঃ সাবিত্রী যে মহীয়সী তাইঃ

The great who came to save the
suffering world
And rescue out of Time's shadow
and the Law
Must pass beneath the yoke of grief and pain

(মহাপ্রাণ যারা আসে তরঙ্গের সম এ ধরায়
কালের বিধান মৃত্যুনিয়তিরে করিতে বারণ,
তাদের বরিতে হবে দুঃখ বেদনার অধীনতা,
বহন করিতে হবে মানবের অদৃষ্টের ভার।)

নারদের উক্তি পরম প্রজ্ঞার—তার উপর ছত্রে ছত্রে কবিত্বের সোনার আলোর রঞ্জিত—মনে গৌরব হয় ভাবতে যে, কাব্যে এ-প্রজ্ঞার কথা বলেছে কেবল ভারতের কবি মনীষী, ঋষি মুনি। অন্য দেশে জীবনের অপরূপ দীপ্ত কাব্য মেলে—প্রেম, অন্তর্দ্বন্দ্ব, ঈর্ষা, হিংসা, সৌন্দর্য, কুটিলতা—স্বপ্ন, অভীপ্সাও মেলে। কিন্তু পরম প্রজ্ঞার বাণী আবহমানকাল ভারতের মহাকাব্যে যেভাবে ঝিকমিকিয়ে উঠেছে অজস্র অম্লান স্বর্ণপ্রভায় তেমন আর কোনো দেশের কাব্যে মেলে নি আজ পর্যন্ত।

কথাটা আর একটু খুলে বলি, কারণ—বিশেষ ক'রে বাংলা-দেশে—চিন্তা সমৃদ্ধিকে অনেকে কাব্যের পরধর্ম বলে মনে করেন, বলেন চিন্তা বা জ্ঞান দর্শনেরই সগোত্র কাব্যের নয়।

এ নিয়ে বাগাড়ম্বর ক'রে লাভ নেই, কারণ যে-কোনো সমস্যা নিয়েই আজকাল তর্ক চালানো যায়। অবশ্য এ-কথা মানতে বাধা নেই যে, যে চিন্তা আবেগস্নিগ্ধ নয়, সে জ্ঞানের গুরুভারে মন্থরগতি হ'য়ে পড়ে ব'লে কাব্যের কলস্রোতে উধাও হতে বাধা পায়। কিন্তু বিশেষ ক'রে সংস্কৃতে, এমন অনেক গভীর চিন্তার দেখা পাই যারা কাব্যরসের সঙ্গে সহজেই মিশ খায়। হৃদয়ের উত্তাপে দ্রবীভূত হওয়ার দরুণ। তাই এ-কথা বললে ভুল বলা হবে না যে, এ প্রশ্নের চরম উত্তর থিওরিতে নয়, সিদ্ধিতে। অর্থাৎ যে-চিন্তায় জ্ঞানে শুধু মন সাড়া দেয় তাকে বলা যেতে পারে দর্শনের অতিথি আর যে-চিন্তায় মনের তৃপ্তির সঙ্গে প্রাণ ও হৃদয় নেচে ওঠে, তাকে বলা যেতে পারে রসাল, অতএব কাব্যপাংক্তেয়—যেহেতু রসই হ'ল কাব্যের তথা শিল্পের চরম ও পরম সম্পদ তথা অভিজ্ঞান। (ক্রমশঃ)

আলাদীন ও আশ্চর্য প্রদীপ—

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

শিলালি

ওদেশী অনেস্টি এবং ইন্টিগ্রিটি সম্বন্ধে যে কথা বলছিলাম এবার তার বিশদ বর্ণনা দিচ্ছি। ১৯৫৭ সালের ২৩শে নভেম্বর, শনিবার, আমার দ্বারা বাংলায় অনূদিত এবং পরিচালিত স্যামুয়েল বেকেটের 'ওয়েটিং ফর গোডো' নাটকটির মঞ্চ-রূপায়ণ হয়—"দি ভারত স্কাউট ও গাইডস প্যাভেলিয়ন। নর্দার্ন পার্ক, রাজেন্দ্র রোড, কলিকাতা" মঞ্চে। নাটকটি অভিনয় করেন, ভবানীপুরের সন্ধ্যানীড় সংস্থা। এরপর সন্ধ্যানীড় সংস্থা ১০ই আগস্ট ১৯৫৮ সালে আবার 'ওয়েটিং ফর গোডো'র অভিনয় করেন ভবানীপুরের থিয়েটার সেন্টার হলে আমার পরিচালনায়। আনন্দবাজার পত্রিকায় ২২-৮-৫৮ তারিখে এ অভিনয়ের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। গোডোর বাংলা রূপায়ণে মঞ্চরূপের জনপ্রিয়তা দেখে ১৩ই ও ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৫৮ আমরা আবার এ নাটক দুদিনের জন্য ভবানীপুরের থিয়েটার সেন্টার হলে মঞ্চস্থ করি। Statesman পত্রিকায় ১৫-১২-৫৮-তে এ অভিনয়ের বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশিত হয়।

এরপর আমি 'ওয়েটিং ফর গোডো'র বাংলা অনুবাদের কপিরাইট কিনব বলে ঠিক করি। নাটকটির ইংরাজী অনুবাদ যাঁদের কাছে আছে তাঁরা হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন এ বইতে 'Note' হেডিং-এর তলায় লেখা আছে—

The play is copyright in 1955.

All application for performing rights should be addressed to :

Curtis Brown Ltd.
6, Henrietta Street
London, W. C. 2.

The first performance in Great Britain of Waiting for Godat was given at the Arts Theatre, London, on 3rd August 1955. It was directed by Peter Hall, and the decor was by Peter Snow. The cast was as follows :

Estragon	Peter Woow Thrope
Vladimir	Paul Daneman
Lucky	Timothy Bateson
Pozzo	Peter Ball
A Boy	Micharl Walker

আমাদের ১৯৫৭ সালের গোডোর প্রডাকসনের কাস্ট ছিল এইরকমঃ

ভ্যাডিমার	চিত্তরঞ্জন ব্যানার্জী
এস্ট্রাগন	অমরজিৎ সেন
পোজো	অশোক সেনগুপ্ত
লাকি	অনাথ চ্যাটার্জী
বয়	দীপঙ্কর সেন

১৯৫৮ সালের এ নাটকের প্রডাকশনে কাস্ট এইভাবে করা হয়েছিলঃ

ভ্যাডিমার	চিত্তরঞ্জন ব্যানার্জী
এস্ট্রাগন	অমরজিৎ সেন
পোজো	অশোক সেনগুপ্ত
লাকি	শঙ্কর চক্রবর্তী
বয়	পার্থপ্রতিম চৌধুরী

Statesman-এ অভিনয়ের সমালোচনায় লিখেছিলঃ

Theatre Centre, Calcutta's link with the International Theatre Institute and the focus of theatre enthusiasts in the South of the city, stayed on Saturday night the Bengali translations of two European plays. Both plays were performed by Sandhyaneerh, were translated and directed by....

(এখানে স্টেটসম্যান পত্রিকা একটা ভুল করেছিল—আমাদের সন্ধ্যানীড় সংস্থার থিয়েটার সেন্টারের সঙ্গে কোনই সম্পর্ক ছিল না—আমরা শুধু শনিবার এবং রবিবার, অর্থাৎ ১৩ই ও ১৪ই ডিসেম্বর থিয়েটার সেন্টার হল ভাড়া নিয়ে গোডো মঞ্চস্থ করেছিলাম)

Waiting for Godot is one of the most controversial plays performed in Europe and America in recent years. ..Chittaranjan Banerjee and Amorjit Sen played the two tramps thoughtfully but without anguish.....Asoke Sen-Gupta played Pozzo with a delighted sadism and Sankar Chakravarty delivered Luckys single speech with a frenzy which was approprite but which had little effect upon the other actors.....

The Statesman, Calcutta.
15th December, 1958.

সন্ধ্যানীড় সংস্থা ছাড়াও দক্ষিণ কলকাতার আনন্দ ভারতী সংস্থা—এ'দের পরিচালক শ্রীমান কুন্তল মজুমদার আমার অনুজ প্রতিম—আমার অনুমতি সহকারে আমার ওয়েটিং ফর গোডোর বাংলা অনুবাদটি বহুবার সাফল্যের সংগে মঞ্চস্থ করেছেন।

যখন দেখলাম আমার বাংলা ভার্সনটির মঞ্চরূপ অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে—তখন আমি ঠিক করলাম এর বাংলা অনুবাদের কপিরাইট নিয়ে নাটকটি প্রকাশ করব। এই উদ্দেশ্যে *Curtis* Brown Ltd., 6 Henrietta Street, London W. C. 2-কে চিঠি লিখলাম। উত্তর পেলাম Dr. Jan Van Loewen, Ltd. এর কাছ থেকে—তাদের চিঠির প্রতিলিপি থেকেই ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝা যাবেঃ

Dr. Jan Van Loewen, Ltd.
International Copyright Agency
81-83 Shaftesbury Avenue
London, W. I.

21st April, 1959

Dear Mr. ..,

Waiting for Godot.

Thank you for your letter of 30th March, which has been forwarded to us by Messrs. Curtis Brown Limited.

We could authorise an amateur production in your own Bengali translation, subject to your acceptance of a performing fee of £5.5.0d for the first performance and £4.4.0d for each subsequent one, the total royalty payable in advance.

Please let us know the dates on which you hope to put the play on, and let us have your cheque for the total fee in due course.

Yours sincerely
Sd. Betty Judkins
p.p. Dr. Jan Van Loewen Ltd.

২৭শে এপ্রিল ১৯৫৯-এ আমি এদের লিখলামঃ

Dear Miss Judkins,

Re: Wating for Godot.

Please permit me to translate the above play into Bengali. I wish to get this translation published and I

সীতা নাটকে } রাম—শিশির কুমার
সীতা—কঙ্কাবতী

hope for this I should not have to pay any fees. I should like to undertake this venture in order to popularise Mr. Beckett in India. Translated foreign plays have a very limited market in our country.

Please let me have your comments.

Yours Sincerely
Sd.—

Dr. Jan Van Loewen, Ltd. কোম্পানীর যে উত্তর এল সে চিঠির তারিখ ছিল ৩০শে এপ্রিল, ১৯৫৯—তাতে লেখা হয়েছিলঃ

Dear Mr.....,

Waiting for Godot :
Samuel Beckett.

Thank you for your letter of 27th April.

With regard to your desire to publish this work in translation, although I fully appreciate what a restricted market there is in your country for this kind of reading, I do feel you should pay the author a token fee for the use of his work in this way. I realise that it would probably not be practicable to charge a royalty on the published price, so perhaps a small outright fee would be more suitable. I should think £30 would be within your means in this respect, and look forward to your confirmation that this suggestion is acceptable.

Yours Sincerely
Sd. Betty Judkins
p.p. Dr. Jan Van Loeven Ltd.

এরপর আমি রিসার্ভ ব্যাঙ্কের পারমিশান নিয়ে Dr. Jan Van Loewen Ltd. কে তিরিশ পাউণ্ডের ডিমাণ্ড ড্রাফট পাঠিয়ে এইভাবে চিঠি দিলাম ঃ

3-6-1959

Re : Waiting for Godot
Samuel Beckett

Ref : Your letter no, BJ, dt. 30th April, 1959.

Dear Sirs,

I hope you have received the demand draft No. 001441 dated, Calcutta 27th May, 1959 issued by Mercantile Bank Ltd. on the Bank of England for £30|-.

Please acknowledge receipt and send me your formal permission for the exclusive translation right.

Yours faithfully

ওরা ওদের ১৯শে জুন, ১৯৫৯ তারিখের চিঠিতে জবাব দিলঃ

Dear Mr.

Waiting for Godot :
Beckett

Thank you for your letter of 3rd June. This will confirm that we received your cheque to the value of £30. in payment of translation and publication rights in Bengali, and that this payment establishes your exclusive right to translate and publish the play in that language.

Yours sincerely
Sd. Betty Judkins.

এরপর আমার 'ওয়েটিং ফর গোডো'র বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হোল এ মুখার্জি এ্যান্ড কোম্পানী থেকে। আমাদের সন্ধ্যানীড় সংস্থা এবং শ্রীকুন্তল মজুমদারের 'আনন্দ-ভারতী' আরও কয়েকবার নাটকটির অভিনয় করলো যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে।

১৯৬৪ সালে আমার কানে এল যে সাম্প্রতিক নামে একটি নাট্যসংস্থা 'ওয়েটিং ফর গোডো' মাঝে মাঝে মঞ্চস্থ করছেন এবং এর বাংলা রূপায়ণ করেছেন শ্রীকৌশিক সান্যাল বলে এক ভদ্রলোক। এরপর এদের সংস্থার একজন সভ্য আমাকে নিমন্ত্রণ করতে এলেন এ'দের শো দেখবার জন্য। আমি ভদ্রলোককে জানালাম যে এ

নাটকের বাংলা অনুবাদের **exclusive right** আমি পেয়েছি International Copyright Agency Dr. Jan Van Loewen Ltd.-এর কাছ থেকে। সেক্ষেত্রে ওঁরা নিজস্ব অনুবাদ মঞ্চস্থ করছেন কি করে? ঐ সভ্যটি আমাকে বললেন যে ওঁরা M/S Curtis Brown Ltd.-এর কাছ থেকে অনুবাদের অনুমতি লাভ করেছেন। খুবই আশ্চর্য হলাম—কারণ তখন পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল যে ইংলন্ডের Copyright Agency গুলোর সততা (Honesty) সম্পর্কে সন্দেহের প্রশ্ন কখনও উঠতে পারে না। যাই হোক ৬-৭-৬৪ তারিখে আমি এ বিষয়ে Dr. Jan Van Loewen Ltd.-কে এইভাবে চিঠি দিলাম :

Re : *Bengali translation of Waiting for Godot—Beckett.*

Dear Sirs,

In your letter No. Bd, dated 9th June, 1959 you wrote to me —"This will confirm that we have received your cheque to the value of £30 in payment of translation and publication rights in Bengali, and that this payment establishes your exclusive right to translate and publish the play in that language." Inspite of the fact that my translated version of Godot in Bengali has been published and is in the market, a Dramatic Association called "Sampratik" is staging this play with another translation in Bengali by one Mr. Kausik Sanyal. On being asked as to their authority to do so, one of the members of the Association Sampratik told me that they procured this permission from m/s Curtis Brown Ltd. Will you please enquire into the matter and let me know the actual facts ? I am sending a copy of this letter to "Sampratik" which please note.

I look forward to an early reply from you.

Thanking you,

Yours faithfully

. . . .

Dr. Jan Van Loewen Ltd.,
International Copyright

তখৎ-ই-তাউসে—জাহান্দর শা—শিশিরকুমার

Agency এ চিঠির উত্তরে ১০ই জুলাই ১৯৬৪-তে আমাকে লিখলেন :

Dear Mr....,

Waiting For Godot-Beckett.

Thank you for your letter of 6th July.

I am afraid that this muddle has arisen from the fact that Samuel Beckett's rights have always been a matter of confusion, both to him and to his agents. It appears that Curtis Brown, who should not, in fact, have licensed any translation of the play into a foreign language without our knowledge (and who had been apprised of our agreement with you for your translation and publication and collected the relevant part of the fee therefor) authorised this small amateur production without payment of any kind.

It is unfortunate that your translation was not called to the attention of this amateur group, but I feel that no real harm can have been done, since your work must now be in circulation.

Yours sincerely

Sd. Betty Judkins.

এই ঘটনা থেকেই বুঝতে পারবেন ইংলণ্ডে—অর্থাৎ—ব্যবসার ব্যাপারে যাদের যথেষ্ট সুনাম আছে—পর্যন্ত fairness in business translations বলে কিছুই নেই। অথচ বৃটিশ ইন্টিগ্রিটি এবং অনেস্টির খ্যাতি সর্বত্র। .আমার থেকে **exclusive copyright** বাবদ টাকা

নেবার পরও অন্যকে অনুবাদ করবার অনুমতি দিতে এদের এতটুকু বাধল না—এমন কি Curtis Brown Ltd. আমার প্রথম আবেদনপত্র পাঠিয়ে দিলেন Jan Van Loewen Ltd.-এর কাছে এবং তাদের দ্বারা এ বিষয়ের ডেভেলপ-মেন্টস্ সম্বন্ধে পোস্টেড হওয়া সত্ত্বেও আবার 'সাম্প্রতিককে' অনুবাদের অনুমতি দিতে এদের বাধল না। এর পর এই দুই প্রতিষ্ঠানকে যে সব চিঠি আমি লিখেছি তার আর উত্তর পাই নি। কি অদ্ভুত ভদ্রতাবোধ দেখুন তো!

কিছুদিন আগে আর একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। শ্রীরুদ্রপ্রসাদ সেন-গুপ্ত বলে এক ভদ্রলোক মাঝে মাঝে পত্রিকাদিতে বিদেশী নাটক সম্বন্ধে লেখেন। ইনি সেদিন একটি রচনাতে 'ওয়েটিং ফর গোডো'র আলোচনা প্রসঙ্গে দেখলাম অনুগ্রহ করে উল্লেখ করেছেন যে আমার অনূদিত গোডোর একটি বাংলা ভার্সন আছে। তবে 'সাম্প্রতিক' সংস্থা কৌশিক সান্যালের ওয়েটিং ফর গোডোর অনুবাদের মঞ্চাভিনয় করেছেন এবং আর কেউ এ নাটকের মঞ্চাভিনয় করেছেন বলে সেনগুপ্ত মশায়ের জানা নেই। কিন্তু সত্যিই কি তাই? ভদ্রলোক আমার অনু-বাদের কথার যখন উল্লেখ করছেন এবং absurd plays সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে গোডোর কথাও বার বার বলেছেন, তখন আর একটু অনুগ্রহ করে আমার বইটি খুললেই দেখতে পেতেন বইয়ের ফ্ল্যাপে স্টেটসম্যানের ১৯৫৮ সালের রিভিউ-এর অংশবিশেষ তুলে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া ১৯৫৭ সাল থেকে বহু দৈনিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্ধ্যানীড় এবং আনন্দ ভারতীর গোডো অভিনয়ের কথা নানাসময়ে রিভিউড্ হয়েছে। রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত মশায়ের কি এসব লেখা চোখে পড়ে নি? নিশ্চয় পড়েছে, তবে এসব চেপে যেতে পারাটাই তিনি ভাল মনে করেছেন—কারণ সেক্ষেত্রে পরিচিত 'সাম্প্রতিক গোষ্ঠী' এবং তাঁদের গোডোর অনুবাদক শ্রীকৌশিক সান্যালকে তুলে ধরা যাবে। আমার গোডোর অনুবাদের প্রথম পৃষ্ঠা এবং শেষ পৃষ্ঠায় সম্ধ্যানীড়ের প্রডাক্সনের দুটি ছবিও দেওয়া আছে। সে দুটি ছবিও কি রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত মশায়ের চোখে পড়ে নি? তিনি আধুনিক ইংলণ্ডের নাটক এবং এ্যাবসার্ড নাটক সম্বন্ধে বাংলায় এত তত্ত্ব এবং তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধমালা লিখছেন, আমার গোডোর বাংলার অনুবাদের কথা পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন, অথচ বইটি একবার স্বচক্ষে দেখবার চেষ্টা পর্যন্ত করেন নি, একথা কি বিশ্বাসযোগ্য?

কোন বিষয়ে লিখতে গেলে লেখকের তরফ থেকে খানিকটা নিরপেক্ষতা অব-লম্বন করাটা সব দিক থেকে ভাল নয় কি? 'সাম্প্রতিকের' গোডো আমি দেখি নি—কিন্তু 'আনন্দ ভারতী' সংস্থার শ্রীকুন্তল মজুমদার দেখেছিলেন এবং আমাকে বলেছিলেন যে আমার অনুবাদের সংলাপের কথাগুলো একটু ওলটপালট করেই এঁরা নিজেদের অনুবাদটি তৈরি করেছেন। অবশ্য এ ধরণের অভিজ্ঞতা আমার আগেও হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটক সম্বন্ধে আমিই প্রথম বিশদভাবে আলোচনা করে 'রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় পর্ব' বলে একটি বই লিখি ১৯৫০ সালে। রবীন্দ্র সাহিত্যের সমা-লোচকদের ভেতর বরাবর এই অনেস্টি লক্ষ্য করেছি যে, যে লেখক অন্য লেখকের সাহায্য নেন বিনা দ্বিধায় তিনি তাঁর নামোল্লেখ করে নিজের ঋণ স্বীকার করেন। স্বীকার করেন না এক বৃদ্ধ রবীন্দ্র সমালোচক মশাই—ইনি বেমালুম আমার বই থেকে পাতাকে পাতা তুলে—অবশ্য একটু ভাষা বদলিয়ে দিয়ে—নিজের বই লিখেছেন। আর সবচেয়ে মজা হয়েছে এই বইতে আমি অনেক জায়গাতেই ইয়েট্সের On the Ideas of Good & Evil বইটি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি। এই সমালোচক মশায়ের ইয়েট্সের মূল বইটিও খুলে দেখবার অবসর হয় নি—ঠিক আমি যে যে কোটেশন দিয়েছি তাই ইনি তুলে দিয়েছেন। এই ভদ্রলোকের এই "বড় বিদ্যা" ধরে দেবার জন্য আমি রবীন্দ্র-নাথ সম্বন্ধে যে নতুন বই লিখছি অর্থাৎ 'রবীন্দ্রনাট্যে অভিব্যক্তিবাদ' তাতে যে সব বইয়ের রেফারেন্স দিচ্ছি তা ঠিক স্পষ্ট-ভাবে বলে দিচ্ছি না। এবার ঐ সমা-লোচক মশায় 'বড় বিদ্যা' দেখাতে গেলেই ধরা পড়ে যাবেন। আগেই সাবধান করে দিলাম। Dr. Jan Van Loewen Ltd., International Copyright Agency'র চিঠিপত্র থেকে কন্ট্র্যাক্ট ব্যাপারে বৃটিশ অনেস্টির খানিকটা পরিচয় পেলেন। এদের এককাঠি ওপরে যায় মার্কিন অনেস্টি—আর শিশিরকুমার হাড়ে হাড়ে যে কথা উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর মার্কিন সফরের সময়। আর বর্তমান ডিভ্যালুয়েশনের পর জাতি হিসাবেই তো আমরা আজ হাড়ে হাড়ে বুঝছি মার্কিনীদের কথার মূল্য কতোটা।

কেউ কেউ আমাকে বলেছেন, যে সব অভিনেতাদের নিয়ে শিশিরকুমার আমেরিকা সফরে গেছিলেন তাঁদের ভেতরও কেউ কেউ নিজেদের পার্টির অযোগ্যতা সম্বন্ধে লিখেছেন দেশে ফিরে—এর কারণটাও অতি স্পষ্ট। যাঁরা এসব কথা লিখেছেন একটু খোঁজ করলেই দেখা যায়, দেশে ফিরে, সামান্য অতিরিক্ত বেতনের জন্য তাঁরা শিশিরকুমারের দল ছেড়ে অন্য দলে গিয়ে যোগ দিয়েছেন এবং নিজেদের অন্যায়কে চাপা দেবার জন্য শিশিরকুমারের কুৎসা করে বেড়িয়েছেন সর্বত্র। এঁদের ভেতর একজন অভিনেতা ছিলেন দেখেছি যিনি বেকার হলেই এসে শিশিরবাবুর কাছে হাজির হতেন এবং শত অসুবিধা সত্ত্বেও শিশিরকুমার তাঁকে নিজের দলে অভিনয়ে লাগিয়ে দিতেন যাতে এঁর দু' পয়সা রোজগার হয়। অথচ শিশিরকুমারের কাছ থেকে চলে গেলেই ইনি আবার নাট্যাচার্যের অল্পস্বল্প নিন্দা করতেন—সে কথা শিশিরবাবুর কানেও উঠতো, কিন্তু এ ধরণের ব্যাপারকে তিনি চিরকালই অগ্রাহ্য করে এসেছেন।

[ক্রমশঃ]

শ্রীরামচরিত-মানস

ভক্তকবি তুলসীদাস

অধ্যাপক শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গানুবাদ

শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা-গানে ভারতবর্ষের বহু গুণী ও জ্ঞানীজন লেখনী ধারণ করিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। সেই সকল অমর লেখনীর প্রতিভা-নির্ঝরে ভারতবর্ষের মহাকাব্য পৃথিবীর সাহিত্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ভক্তকবি গোস্বামী তুলসীদাস তন্মধ্যে অন্যতম—যিনি সহজ সরল ভাষায় পতিতপাবন সীতা-রামের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন সুমধুর সংগীতের মাধ্যমে। তুলসীদাসের জীবনসর্বস্ব মহামানব শ্রীরাম-চন্দ্রের সেই বন্দনা-গানের সুললিত বাংলা অনুবাদ এই প্রথম—বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের অপূর্ব কীর্তির নূতন এক পরিচয় এই শ্রীরামচরিত-মানস। বহু রঙীন চিত্র সুশোভিত।

মূল্য—১ম খণ্ড দুই টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

রঙ্গজগৎ

সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার অন্তরালে

বিশ্বসুন্দরী রীতা ফারিয়া ভারত সরকারকে বড় বিপদে ফেলেছে। বিশ্বসুন্দরী হবার মধ্যে যে এত বিপদ থাকতে পারে কে জানত। প্রথমে যা কুসুম মনে করা গেছল এখন দেখা যাচ্ছে সেই কুসুমে কীট লুকিয়ে আছে। আশা করা গেছল রীতা ভালোয় ভালোয় দেশে ফিরবে কয়েক লক্ষ টাকা নিয়ে, যৎকিঞ্চিৎ বিদেশী মুদ্রা। আমেরিকা-ইউরোপের চিত্তবিনোদন করে যদি বিদেশী মুদ্রার অঙ্ক বাড়ে তাতে আরো লাভ। আমাদের বিদেশী মুদ্রার সঞ্চয় যখন কম তখন সুন্দরী কন্যাদের পাঠিয়ে কিছু মুদ্রা আয় করা মন্দ কি! সম্মান-অসম্মানের কথা যাঁরা চিন্তা করেন তাঁদের মুখচাপা দেবার জন্য প্রচারের ঢাক বেশি করে বাজালেই হবে। কাগজগুলিতে মাথামোটা কিছু লোক ত' আছে; রেডিও সিনেমা একেবারে নিজস্ব। সুতরাং জোর সুন্দরী বন্দনা সুরু হল। কেউ কেউ ত' রীতা ভারতের গৌরববৃদ্ধি করেছে এমন কথাও লিখে ফেলল। ছবিতে ছবিতে কাগজগুলির অঙ্গ সৌন্দর্য বৃদ্ধি হল।

কিন্তু সুন্দরী রীতা আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের হাঁড়ি ভেঙে দিতে চাইছে। আমাদের নিরপেক্ষতার মর্যাদা নিয়ে টানাটানি পড়েছে। মার্কিন অভিনেতা ববহোপের হাত ধরে রীতা যেতে চাইছে ভিয়েতনামে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদী সৈন্যদের চিত্তবিনোদন করতে। ভিয়েতনামের জনসাধারণের উপর অত্যাচার করে, ভিয়েতনামীদের স্বাধীনতার উপর হামলা চালিয়ে ক্লান্ত মার্কিন সৈন্যদের ক্লান্তি দূর করতে যেতে চাইছে সদ্য স্বাধীন দেশের মেয়ে। ভারতের কর্তাব্যক্তিরা তাই রীতাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। প্রধানমন্ত্রী তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বিশ্বসুন্দরী হওয়ার জন্য। যদিও এ ধরণের সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন জানাবার কথা নয়। কিন্তু এই অভিনন্দনেও রীতার উপর প্রভাব সৃষ্টি করে নি। শ্রীচাগলা থেকে ভারতীয় যুব সমিতি কারো কথায় রীতা মত পরিবর্তন করতে চাইছে না। কারণ রীতার খুঁটির জোর বড় বেশি। মার্কিন ববহোপ তার সঙ্গী। মার্কিনরা ডলার দিয়ে জগৎকে বশীভূত করছে, আমাদের মাথা কিনতে চাইছে আর রীতার মত সুন্দরীকে হাত করবে এতে বেশি কি? কিন্তু মার্কিনরা বড় অবুঝ। আমরা যে মার্কিন আর সোভিয়েট দুই শিবিরে যাতায়াত করতে চাই। এ সময়ে আমাদের ইজ্জৎ রক্ষার জন্য আর একবার মধ্য এশিয়া হাত বাড়িয়েছে; ববহোপসহ রীতাকে ওরা ভিয়েতনামের পরিবর্তে কায়রো যেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা নিয়ে সম্প্রতি ভারতে বড় বেশি মাতামাতি চলেছে। আমরা সব দিক থেকে সেন্টিমেন্টাল হতে চলেছি। প্রত্যেক দেশের সৌন্দর্য সম্পর্কে নিজস্ব রীতি-নীতি ও বিচারের মাপকাঠি আছে। ভারত কখনো কেবল দেহ সর্বস্বতাকে সৌন্দর্য জ্ঞান করে নি। শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং মনের সম্পর্ক দেহের সঙ্গে রয়েছে। তাই পদ্মিনী ইতিহাস প্রসিদ্ধা, সৌন্দর্যের প্রতীক। কিন্তু হাল আমলে বিদেশী প্রসাধন ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে ভারতে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা হচ্ছে, তরুণীদের বক্ষ, কটিদেশ ও উরু প্রভৃতির ইঞ্চি মেপে। এই সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার পেছনে রয়েছে কুৎসিত অর্থ লালসা ও অভিসন্ধি। সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার জৌলুসের মধ্যে তাদের প্রসাধনী দ্রব্যের প্রচার চলে।— ১৯৬৬ সালের সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা শেষ হতেই এক প্রসাধনী দ্রব্য প্রস্তুতকারক ১৯৬৭ সালের প্রতিযোগিতার বিজ্ঞাপন দিতে সুরু করেছে তাদের প্রস্তুত মালের সঙ্গে। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে এবার প্রসাধনী প্রস্তুতকারক মনোপলি ক্যাপিট্যাল বা একচেটিয়া কারবারীদের অংশ। দেশী মনোপলি ক্যাপিট্যালিস্টরা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ ব্যবসা চালাচ্ছে। তাই এই সৌন্দর্য প্রতিযোগিতাকে নির্ভেজাল সৌন্দর্য প্রীতি মনে করা ভুল। ব্যবসায়ীদের এই সৌন্দর্য প্রীতির আড়ালে রয়েছে অতি কুৎসিত এক মনোবৃত্তি, যা ভারতের সম্মান ও ঐতিহ্যবিরোধী। সুতরাং ব্যবসায়ীদের অনুগ্রহে অনুষ্ঠিত সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা নিয়ে যারা মাতামাতি করে, দেশের গৌরব বলে অভিনন্দন জানায় তারা আহাম্মকের স্বর্গলোকে বাস করছে। —সুজন

বিশ্বরূপায় 'জাগো' নাটকে সুস্মিতা সান্যাল

চিত্র আলোচনা

জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার

(পরিচালনা অজিত লাহিড়ী)

'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' প্রমথনাথ বিশী রচিত এক ইতিহাস-ভিত্তিক বিখ্যাত উপন্যাস। এই উপন্যাসের চলচ্চিত্র রূপ দিয়েছে স্যাডো প্রোডাকসন্স। প্রকাশ, স্যাডো প্রোডাকসন্সের নেপথ্যে রয়েছেন স্টুডিও কর্মিগণের সমবায় উদ্যোগ। এদিক থেকে নির্মাণকাল থেকে প্রযোজনা সংস্থা শিল্পী ও টেকনিসিয়ানদের আন্তরিক সহযোগিতা লাভ করেছে।

'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' বাংলার জমিদারদের পরিচয় এবং তাদের মূঢ়তা ও অহংকারের অন্ধকারে কিভাবে সাম্রাজ্যবাদী শাসন কায়েম হয়ে বসেছিল তারই এক লজ্জাজনক কাহিনী। যারা জমিদারীর দাপটে, সমাজের মাথার উপর থেকে আভিজাত্যের গর্ব করেছে তাদের পেছনের ইতিহাস ডাকাতি ও লুণ্ঠন। পরবর্তীকালে প্রজা শোষণ। দেশ ও মানুষের সর্বাত্মক স্বার্থের কথা তারা কোনদিন ভাবে নি, মানুষকে ব্যবহার করেছে নিজেদের স্বার্থ ও পারিবারিক দম্ভ রক্ষার জন্য। এমনই এক জমিদার জোড়াদীঘির চৌধুরীরা। সেই চৌধুরী পরিবারের উত্তরাধিকারী তরুণ দর্পনারায়ণ রক্তদহের জমিদারদের সঙ্গে চিরদিনের বিবাদ শেষ করতে চেয়েছিল সেই পরিবারের একমাত্র কন্যা ইন্দ্রাণীকে বিয়ে করে

'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' ছবিতে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

মানুষ হিসাবেও সে স্বতন্ত্র ছিল—পলাশীতে বাঙালীর পরাজয়ের গ্লানি সে বুঝেতে পেরেছিল। পলাশী প্রান্তরে পরিভ্রমণে গিয়ে তেমাথার লম্পট জমিদারের কবল থেকে সে উদ্ধার করে ব্রাহ্মণ তরুণী বনমালাকে। এবং বনমালাকে সমাজে প্রতিষ্ঠা দেবার উদ্দেশ্যে তাকে বিয়ে করে। তার সংবেদনশীল মনের এই সিদ্ধান্তে একদিকে ইন্দ্রাণীর মনে দেখা দেয় অপমানের জ্বালা আর একদিকে তেমাথার লম্পট জমিদার প্রতিশোধের সুযোগ খোঁজে। প্রতিশোধের সুযোগ গ্রহণ করবার জন্য তেমাথার জমিদার ইন্দ্রাণীকে বিয়ে করে ঘরজামাই হয়ে জোড়াদীঘির সঙ্গে রক্তদহের বিবাদকে চরমে নিয়ে পৌঁছায়। পরিণতিতে দু-পক্ষের প্রচণ্ড সংঘর্ষ। অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য দর্পনারায়ণ রক্তদহ আক্রমণ করে। ইন্দ্রাণী বীরত্বের সঙ্গে এই আক্রমণের মুখে দাঁড়ায় এবং যুদ্ধ করে প্রাণ দেয়। অন্তিমকালে সে জেনে যায় দর্পনারায়ণ তাকে তখনো ভালবাসে; এবং কি পরিস্থিতিতে এক অসহায়কে রক্ষা করার জন্য সে বনমালাকে বিয়ে করেছে। দু-টি মনের এভাবে বোঝাপড়ার সময়ে রাতের অন্ধকারে ইন্দ্রাণীর লম্পট স্বামী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শিবিরে গিয়ে বিদেশীদের ডেকে আনে; এভাবে তার প্রতিশোধ গ্রহণ হয় কিন্তু চিরদিনের জন্য জোড়াদীঘির পতনের সঙ্গে, বাংলায় সাম্রাজ্যবাদী শাসন কায়েম হয়ে বসে।

ইতিহাসের শিক্ষায়, জনসাধারণের বীরত্বে উজ্জ্বলতায় এবং রোমান্টিকতায় এই কাহিনী চিত্তাকর্ষক। কাহিনী বিচারে ছবিটিতে দর্শকদের ভাল লাগার মত উপাদান যথেষ্ট রয়েছে। প্রণয়, বীরত্ব, মানবতা; সংগীত-নৃত্য প্রাকৃতিক দৃশ্য-বৈচিত্র্যে ছবিটি দর্শকদের মুগ্ধ করবে। ছবিটিতে কলাকৌশলের দিক থেকে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য জনতার দৃশ্য সৃষ্টি। রাত্রির অন্ধকারে মশাল হাতে আক্রমণমুখী জনতার যে দৃশ্যগুলি সৃষ্টি করা হয়েছে, এবং যে জঙ্গী পরিবেশ রচিত হয়েছে সেই দৃশ্যগুলির তুলনা হয় না। এই দৃশ্যগুলিতে যেমন রয়েছে চমক, তেমন উত্তেজনা। জনতার বীরত্বে দৃশ্যগুলি দর্শকহৃদয়ে সাড়া জাগায়। সমগ্র ছবির মধ্যে এই অংশগুলিতে পরিচালকের বিশেষ দক্ষতার পরিচয় রয়েছে। এই দৃশ্যগুলিতে ক্যামেরাম্যান বিজয় দে এবং সম্পাদক গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকবে। এ সকল দৃশ্যের তুলনায় অন্যান্য কম্পোজিশন দুর্বল, গল্পের ফটোগ্রাফী ছাড়া পরিচালকের কল্পনাশক্তির আরও তেমন নিদর্শন পাওয়া যায় না। ইংরেজদের কাছে জোড়াদীঘির পতনের পরবর্তী দৃশ্যগুলি অনায়াসে ছবি থেকে বাদ যাওয়ার যোগ্য। শৃঙ্খলিত দর্পনারায়ণকে দেখালে, অথবা ইউনিয়ন জ্যাক ওড়ালে যে তাৎপর্য এবং কাহিনীর শিক্ষা প্রকাশ করত, সেক্ষেত্রে বনমালাকে স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাতে ইংরেজদের অনুমতি দানের দৃশ্য অপ্রয়োজনীয় সহৃদয়তা দেখান, এবং আলিবর্দীকে নিয়ে জমিদারবধূ [illegible] একাকী বসে থাকা যাত্রাপালার আঙ্গিক ছাড়া কি হতে পারে! তারজন্য অবশ্য চিত্রনাট্যকারই দায়ী। চিত্রনাট্যকার মৃণাল সেন ও পরিচালক অজিত লাহিড়ী দু-জনাই রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন বলেই সকলের জানা আছে। কিন্তু ছবির শেষাংশে তাঁদের সেই সচেতনতার পরিবর্তে গতানুগতিক যাত্রাপালাধর্মিতা প্রকাশ পেয়েছে। এতে ছবিটি দুর্বল হয়েছে।

ছবির চরিত্রগুলির মধ্যে আলিবর্দী, ইন্দ্রাণী এবং দর্পনারায়ণ দর্শকমনে বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করতে পেরেছে। আলিবর্দী যদিও জমিদারের স্বার্থে লড়াই করেছে কিন্তু তার বীরত্ব ও সততায় সে উপকাহিনীর বীরের রূপ লাভ করেছে। এই চরিত্রে রূপদান করেছেন শেখর চট্টোপাধ্যায়। বাচনভঙ্গী ও অভিব্যক্তিতে তাঁর এই চরিত্রসৃষ্টি বিশেষ প্রশংসনীয়। ইন্দ্রাণীর চরিত্রে মাধবী মুখার্জী সার্থক। বিশেষ করে শেষাংশের অভিনয়ে তিনি নতুন ধরণের চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। দর্পনারায়ণরূপে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় পলাশীর পরবর্তীকালে এক সংবেদনশীল যুবক অথচ পারিবারিক দম্ভে অন্ধ জমিদার চরিত্রকে যথাযোগ্যভাবে রূপদান করেছেন। এছাড়া লম্পট জমিদাররূপে তরুণকুমার এবং বৃদ্ধ উদয়নারায়ণ রূপে কালী ব্যানার্জীর সার্থক অভিনয়। অন্যান্য চরিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতা, বিকাশ রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতবরণ, দিলীপ রায়, দীপিকা দাস, কমল মিত্র, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতালি রায়, ভারতী রায়, প্রমুখ যথাযথ চরিত্র উপস্থিত করেছেন।

ছবির সঙ্গীতের কাজ যথার্থভাবে সম্পাদন করেছেন কালীপদ সেন। প্রণব রায়ের লেখা গানগুলি গতানুগতিক সিনেমা সঙ্গীতের ঊর্ধ্বে। শ্রাবণী বসুর নৃত্যটি উপভোগ্য। তবে ক্যামেরার সাহচর্য তিনি আরো পেতে পারতেন। একটা ত্রুটি আমাদের পীড়িত করেছে। অষ্টাদশ শতকের বজরায় ইংরেজীতে সিনে-টেকনিশিয়ানের ব্যানার জড়ানো থাকা পরিচালক এবং সম্পাদকের দৃষ্টিগোচর না হওয়া আশ্চর্যের কথা! পরিচালকের প্রথম প্রচেষ্টা এই ছবি। ছবিতে দুর্বলতা ও ত্রুটি সত্ত্বেও প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে তিনি সাফল্যলাভ করেছেন; বিশেষত জনতার দৃশ্য সৃষ্টিতে তাঁর কৃতিত্ব অভিনন্দনযোগ্য।

'ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা' ছবিতে শিবাজী গণেশন ও সাবিত্রী গণেশন

নাটকের কথা

[illegible]

রঙমহলে 'অতএব' নাটক অভিনীত হচ্ছে। নাটকটি লিখেছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। পরিচালনা করেছেন অভিনেতা হরিধন মুখোপাধ্যায় ও জহর রায়। নাটকের নাম এবং পরিচালকদ্বয়ের নাম থেকে অনুমান করা যাচ্ছে—এটি হাসির নাটক। রঙমহল থিয়েটারে নিয়মিতভাবে হাসির নাটকই অভিনীত হচ্ছে।

আলোচ্য নাটকে দোলগোবিন্দ নামক প্রবীণ ব্যক্তি শেষবয়সে বিয়ের স্থির করেছেন এবং পাত্রী স্থির করেছেন এক ষোড়শী তরুণীকে। বিয়ের উদ্যোগ আয়োজন চলছে। তরুণীর অভিভাবিকা হেমাঙ্গিনী দেবী আগ্রহের সঙ্গে একাজ করছেন—এতে তাঁরও কিছু প্রাপ্তিযোগ আছে। আর একদিকে এই তরুণীর সঙ্গে মন দেয়ানেয়া চলছে দোলগোবিন্দর ভ্রাতুষ্পুত্র সৌমিত্রের। সৌমিত্র আর তার বন্ধু কালাচাঁদ দোলগোবিন্দকে হত্যা করার চক্রান্ত করে শেষ পর্যন্ত ফেঁসে যায়। অবশেষে প্রকাশ পায় দোলগোবিন্দ তার ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্যই এই পাত্রী স্থির করেছিলেন। সৌমিত্র ইতিপূর্বে কয়েকটি বিয়ের ব্যবস্থা ভেঙে দেওয়ায় তিনি এই শেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

হাসির নাটকের নাকি অনেক স্বাধীনতা থাকে। এই নাটকের ক্ষেত্রে নাট্যকার যথেচ্ছ স্বাধীনতা নিয়েছেন। সঙ্গতির কোন প্রশ্নই এখানে নেই। পরিচালকদ্বয়ও একই গতিতে অগ্রসর হয়েছেন। এ কালের ছেলেরা প্রেম করতেও জানে না, মরতেও জানে না। এ ছাড়া নাটকে কোন বক্তব্য নেই। তবে অফুরন্ত হাসি আছে। কথায় ও ভাবভঙ্গিতে দর্শকরা প্রচুর হাসেন। সরযূ দেবী এবং সাবিত্রী চ্যাটার্জির মত অভিনেত্রী এখানে দর্শকদের প্রচুর হাসিয়েছেন। জহর রায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়ের ত কথাই নেই। তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন দীপিকা দাস, অজয় গাঙ্গুলী, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, কার্তিক সরকার, মিন্টু চক্রবর্তী, লক্ষ্মীজনার্দন মুখোপাধ্যায়, সমরজিৎ গুহ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

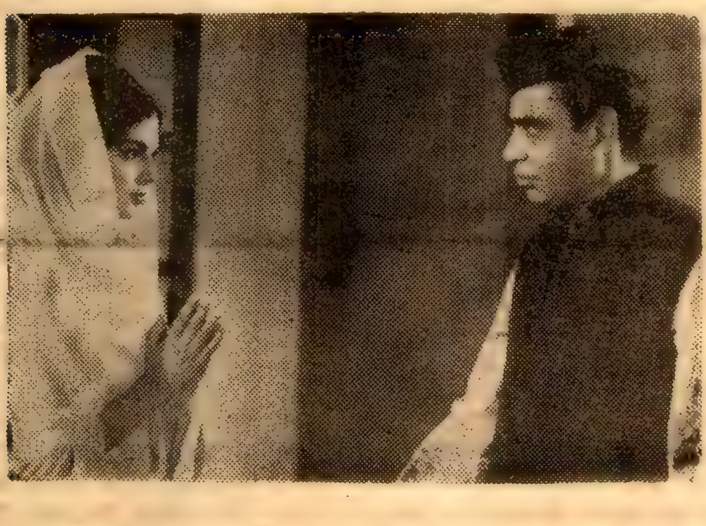

'অমরকানন' ছবির একটি দৃশ্যে সোনিয়া সাহানী ও আই, এস, জোহর

বালসেবিকা শিক্ষণ প্রকল্প

গত ২৬শে নভেম্বর ১৯৬৬ বালসেবিকা শিক্ষণ প্রকল্পের ছাত্রীবৃন্দ

মহিলা শিল্পীমহল-এর 'কবি'র ভূমিকায় শিপ্রা দেবী। মঞ্চাবতরণের পূর্বে কানন দেবী তাঁর রূপসজ্জা তদারক করছেন। ... ... ফটো—অজিত রায়

কলিকাতা তথ্য কেন্দ্রে পশ্চিমবঙ্গ শিশু কল্যাণ আয়োজিত শিশু উৎসবের দ্বিতীয় দিনে বিচিত্রানুষ্ঠান ও লক্ষ্মীর পরীক্ষা নাটক মঞ্চস্থ করেন। রবীন্দ্রনাথের 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'য় শিল্পিবৃন্দ বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দেন। দর্শকবৃন্দ বালসেবিকাদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

মূকাভিনেতা অরুণাভ মজুমদার

দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ-যোগ্য অনুষ্ঠান করে বিখ্যাত মূকাভিনেতা অরুণাভ মজুমদার উত্তর-পূর্ব ভারতে তাঁর অভিনয়কলা পরিবেশন করে প্রশংসা করে ফিরেছেন। এই পর্যায়ের শিল্পীর শেষ অনুষ্ঠান ছিল আসামের শিলচরে ও করিমগঞ্জে। এখানেও তাঁর নিজস্ব অভিনয় কলা পরিবেশন করে প্রশংসা অর্জন করেন।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অরুণাভই প্রথম শিল্পী—যিনি আসামকে মূকাভিনয় উপহার দিলেন। ইতিপূর্বে বাইরে বিভিন্ন স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত এই শিল্পী তাঁর নিজস্ব অভিনয়কলা উপহার দিয়ে এসেছেন।

বাংলা নাটকের ইংরাজী রূপায়ণ

এ বছর চলচ্চিত্রে ইতালীয় বৃত্তিপ্রাপ্ত চারজন সদস্য শচী কাপুর (বম্বে), রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সুমন্ত্র চট্টো-পাধ্যায় (উত্তরপাড়া), বেঞ্জামিন ইলোরা (বাঙ্গালোর), ও মানিলা খাতুনকে (দিল্লী), সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন বম্বে ক্রিশ্চান ক্লাব, ৭ই নভেম্বর। এই উপলক্ষে শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের পরিচালিত "একটি স্টীল"-এর অন্তর্গত শ্রীসুমন্ত্রম রচিত 'আগত ঐ' দেশাত্মবোধক নাটিকাটিকে 'সরোজিনী স্মৃতি' পুরস্কারে ভূষিত করেন সি, আর. প্যাটেল (অনু-ষ্ঠানের উদ্যোক্তা ও সভাপতি)।

অনুষ্ঠানে "আগত ঐ"-এর অংশ বিশেষ, ও দিগিন্দু বন্দ্যোঃ রচিত 'সীমান্তের ডাক' ও 'আলো আলো' (শ্রীসুমন্ত্রম রচিত), নাটিকাদ্বয়ের ইংরেজী রূপ অভিনীত হয়। অনুবাদ করেন এ বছর আমেরিকার রয়েল অ্যাকাডেমির নাট্যোত্তীর্ণা কুমারী মিলি মনরো।

১২ই নভেম্বর বিজয়া সম্মেলন উৎসবে ম্যাজি মিত্র প্যালেসে 'উত্তর কুলের' প্রযোজনায় ও শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের পরি-চালনায় 'সীমান্তের ডাক' ও 'আলো আলো' নাট্যের বেতার রূপ পরিবেশিত হয়। মূকাভিনয়ের পূর্বে মাইক্রোফোন নাট-কের প্রচলনের এ নব প্রচেষ্টার সার্থকতায় বিশেষভাবে শুভেচ্ছা জানান বেতার তথ্য-মন্ত্রী শ্রীরায়বাহাদুর; বীণা রায়, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।

দুদিনের অভিনয়ে উল্লেখযোগ্য শিল্পী হলেন—রিটা সোনিয়া, ডঃ রমা রুদ্র, ফির্মিন সেক্স, সোমক রায়, হেলেন, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, মিলি মনরো ও সুমন্ত্র চট্টোপাধ্যায়। নাটকগুলির পরিচালনায় শ্রীচট্টোপাধ্যায় এবং সিমফনি পদ্ধতিতে সংগীত পরিচালনায় ছিলেন মিলি মনরো। আলোক নিয়ন্ত্রণে ছিলেন, বোম্বাই চিত্রের উদীয়মান সহকারী ক্যামেরাম্যান বংশী শেঠ।

'কবি' ও 'মিশরকুমারী'

দুঃস্থা শিল্পীদের জন্য মহিলা শিল্পীদের প্রচেষ্টা

মহিলা শিল্পীমহলের উদ্যোগে গত ৫ই ও ৬ই ডিসেম্বর মহাজাতিসদনে উপভোগ্য নাটক অভিনয় হয়েছে। সোমবার অভিনীত হয়েছে 'কবি', মঙ্গলবার 'মিশরকুমারী'। এই অভিনয় অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য বৃদ্ধা ও দুস্থা শিল্পীদের জন্য বার্ধক্যের আবাসস্থান নির্মাণ। বলা বাহুল্য এই মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি জন-সাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন রয়েছে। যাঁরা মহিলা শিল্পীদের উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতি জানাবার জন্য টিকেট কিনে অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন তাঁরা অভি-নয় দেখে পরম তৃপ্তির সঙ্গে ফিরে এসেছেন। মহিলা শিল্পীমহল দর্শকদের নিরাশ করেন নি, বরঞ্চ আনন্দময় অভিনয় রজনীর কথা তাঁরা অনেকদিন স্মরণে রাখবেন। প্রথম রজনীতে 'কবি' অভিনয় দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়ে-ছিল। সাহিত্যিক তারাশঙ্করের 'কবি' দীর্ঘদিন মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। এই উপন্যাসের চলচ্চিত্র রূপও হয়েছে। অসংখ্য দর্শকের তা দেখার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু মহিলা শিল্পীমহল যে অভিনয় করলেন তা রীতিমত বিস্ময়ের। 'কবি' অভিনয়ে মলিনা দেবী, কানন দেবী, শিপ্রা মিত্র, রেণুকা রায়, গীতশ্রী দেবী, কেতকী দত্ত, মিতা চ্যাটার্জী, বাসবী নন্দী প্রমুখ বহু অভিনেত্রী অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে পুরুষ চরিত্রগুলি অভিনয় করেছেন। স্ত্রী-চরিত্রে ছন্দা দেবী,

নীলিমা দাস, মমতা ব্যানার্জী প্রমুখ অভিনয় করেছেন। পদ্মবালিভঙ্গি, পদক্ষেপ, হাত নাড়া ইত্যাদি দেখে শিল্পীদের অসাধারণ অভিনয়ক্ষমতার জন্য অকুণ্ঠ প্রশংসা জানাতে হয়। তাঁদের রূপসজ্জাতেও কোন ত্রুটি ছিল না। এত পরিচিতা শিল্পীদেরও চেনা যায় নি। কেবলমাত্র তাঁদের কণ্ঠস্বরে অনুমান করা গেছে কে কোন চরিত্রে অভিনয় করছেন। স্মারক পুস্তিকা না পাওয়ায় আমরা অভিনয়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক অভিনেত্রীর নাম জানাতে পারলাম না। ভবিষ্যতে মহিলা শিল্পীমহলের অভিনয় দেখার সুযোগ হলে নাট্যামোদিগণ বিনা দ্বিধায় সে সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। অভিনয় দেখে যেমন আনন্দ পাবেন, সেই সঙ্গে এক মহৎ উদ্দেশ্যকে সমর্থন জানান হবে। মহিলা শিল্পীমহল এই সমর্থন প্রত্যেকের কাছে আশা করতে পারেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, পাঁচ-ছয় বছর যাবৎ মহিলা শিল্পীমহল দুঃস্থা শিল্পীদের আবাস নির্মাণের কার্যসূচী সম্পূর্ণ করার জন্য প্রচেষ্টা করছেন। ইতিপূর্বে বহুবার তাঁরা নাটক অভিনয় করে অর্থ সংগ্রহ করেছেন। মহিলা শিল্পীমহলের সম্পাদিকা শ্রীমতী সাধনা রায়চৌধুরীর কাছ থেকে জানা গেল, সংগৃহীত অর্থে বালিগঞ্জ প্লেসের নিকট একাশি হাজার টাকায় তাঁরা জমি কিনেছেন। বাড়ি নির্মাণের কাজ তাঁরা শীঘ্র আরম্ভ করতে চান।

সুমন্ত চট্টোপাধ্যায়

স্টুডিও খবর

নলদময়ন্তী

জে, এস, প্রোডাকসন্সের প্রথম উদ্যোগ 'নলদময়ন্তী'র শুভ মহরৎ অনুষ্ঠান গত ৯ই ডিসেম্বর ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে সম্পন্ন হয়েছে। সংগীত পরিচালক কালীপদ সেনের সংগীত গ্রহণে এই কাজ সম্পন্ন হয়।

গুপী গায়েন বাঘা বায়েন

আর, ডি, বনশাল প্রযোজিত সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন'-এর সাতটি সংগীত গ্রহণের কাজ ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে হয়েছে। সত্যজিৎ রায় ক্যামেরাম্যান সৌমেন্দু রায় এবং আর, ডি, বি-র সেক্রেটারী বিমল দে-কে সঙ্গে নিয়ে ১০ই ডিসেম্বর রাজস্থানে গেছেন বহির্দৃশ্যের জন্য স্থান নির্বাচন করতে। তাঁরা ভরতপুর, কোটা, বুন্দি, লাখনৌ, চুনার এবং অন্যান্য স্থান পরিদর্শন করবেন। এই ছবিতে জহর রায় এবং সন্তোষ দত্তকেও দুটি চরিত্রে অভিনয়ের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে।

অসামাজিক

পীযূষ বসুর পরিচালনায় 'অসামাজিক' ছবির কাজ ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওয় অগ্রসর হচ্ছে। ছবির সুর সৃষ্টি করছেন ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ। সম্প্রতি পরিচালক তাঁর দল নিয়ে বহির্দৃশ্য গ্রহণে গেছেন বাংলা-বিহার সীমান্তে। বিশ দিন পর্যন্ত তাঁরা চিত্র গ্রহণ করবেন। ছবির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন অরুণ মুখার্জী, শমিতা বিশ্বাস, আরতি দাস, সত্য ব্যানার্জী প্রমুখ।

মিলি মনরো

'যে দশটি দিন পৃথিবীকে কাঁপিয়ে তুলেছিল

'টেন ডেজ দ্যাট সুক দি ওয়ার্ল্ড' জন রীডের লেখা এই বইটি আমাদের দেশের বহুজনের পড়া আছে। বিশেষ করে ত্রিশ দশকে যাঁরা সমাজতন্ত্রী রাজনীতির প্রতি উৎসুক হয়েছেন তাঁদের মধ্যে এমন কেউ নেই যিনি এই বই পড়েন নি। এই বই থেকে পৃথিবীর মানুষ প্রত্যক্ষ বিবরণ জানতে পারে ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে রাশিয়ায় কি ঘটেছিল। জন রীড একজন মার্কিন সাংবাদিক। ধনতান্ত্রিক মার্কিনরা যখন নবজাত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে গলা টিপে মারবার চেষ্টা করছিল, মার্কিন জনসাধারণের পক্ষ থেকে জন রীড নবজাত রাষ্ট্রকে অভিনন্দন জানিয়ে বিশ্বের মানুষের কাছে বাস্তব ও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ তুলে ধরেন। এই বিপ্লবের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন মানবজাতির ভবিষ্যৎ। এই বইটি অবলম্বনে বিশ্ববিখ্যাত পরিচালক আইজেনস্টাইন চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন বহুদিন আগে। সম্প্রতি মস্কো আর্ট থিয়েটার এই বইটির ভিত্তিতে রচিত একটি নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। নাটকটি দর্শকদের অভিভূত করেছে।

নাট্যশালার প্রবেশ পথেই দর্শক শুনতে পাবে রেডিওয় ভেসে আসা বিপ্লবীদের মার্চের সুর। প্রেক্ষাগৃহের প্রবেশদ্বারে ১৯১৭ সালের লালরক্ষী আর সৈনিকের পোশাক পরা লোকেরা টিকেটগুলি নিয়ে বেয়নেটে গেঁথে রাখছে। থিয়েটারের অলিন্দে চারদিকে বিপ্লবের স্লোগান লেখা ফলক দিয়ে সাজানো। দর্শককে মনে করিয়ে দিচ্ছে পৃথিবীকে

বালসেবিকা শিক্ষণ প্রকল্পের 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'য় রাণী ও ক্ষীরো

ফাঁপানো সেই দিনগুলির কথা। রঙ্গশালার অলিন্দে অভিনেতা-সৈনিক আর নাবিকের দল দর্শকদের সঙ্গে মিশে গিয়ে গিটার বাজাচ্ছে,—সেই সময়ের জনপ্রিয় গান।

সমগ্র অভিনয়ের রোমাণ্টিক অনুপ্রেরণা, লেনিনের দিনগুলির সেই গৌরব মহিমাকে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তোলার মধ্য দিয়ে তার দার্শনিক উপলব্ধি প্রকাশ আর পুরোনো দুনিয়া সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতা এই সবই প্রযোজনাটিকে একই সঙ্গে রাজনীতির দিক থেকে সুতীক্ষ্ণ, সময়োপযোগী আর রোমাণ্টিক করে তুলেছে।

জন রীডের বইটিকে নাট্যরূপ দিতে গিয়ে প্রযোজক ও নাট্যকার ওয়াই, লুবিমোফ যে যুক্তিসঙ্গত মনোভাব-দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছেন সেটাই হল আসলে এই নাটকের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। বইতে যেভাবে ঘটনাপর্যায় বর্ণিত হয়েছে ঠিক সেভাবে ক্রমপর্যায়ে তিনি ঘটনাগুলিকে দেখাবার চেষ্টা করেন নি। সমগ্র প্রযোজনাটির উদ্ভব হয়েছে বইটির মূল বিষয়বস্তুর মধ্য থেকে। পাঠকের মনে বইটি যে চিন্তা ও স্মৃতির অনুষঙ্গ জাগায় তারই মধ্য থেকে।

প্রযোজনার সবচেয়ে বড় লক্ষ্যটি হল সেই সময়টিকে চিত্রিত করা, যে দুনিয়া পিছু হটে যেতে যেতেও প্রাণপণে বাধা দিচ্ছে সেই পুরোনো দুনিয়ার নির্মম স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা, বিপ্লবের সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা। প্রতীকের ব্যবহার, রোমাণ্টিকতা, সভা আর পোস্টারগুলির পরিবেশ হল এর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ। মঞ্চে এটাকে এমনভাবে উপস্থিত করা হয়েছে যার ফলে সেই বিরাট বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর এক আধুনিক ভাষ্য ফুটে উঠেছে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। সংলাপ, ভাবকল্প আর লেনিনের প্রতিমূর্তির মধ্য দিয়ে সেই কালটিকে উপলব্ধি করা হয়েছে।

মঞ্চে আবির্ভূত চরিত্রগুলির মধ্যে লেনিনকে আনা হয় নি। প্রেক্ষাগৃহের পাশের দেওয়ালগুলির গায়ে তাঁর বিরাট বিরাট ফটোগ্রাফ টাঙানো। দর্শক তাঁর কথা শুনতে পায়। এম, শ্ট্রাউখ অতি সুন্দরভাবে লেনিনের উচ্চারণভঙ্গীতে ও কণ্ঠস্বরে এই কথাগুলি বলেছেন। দর্শকদের কাছে নাটকটি উপস্থিত করেছে আবেগের দিক থেকে অত্যন্ত তীব্র আর বিদ্যুৎ-ঝলকের মত ক্ষণস্থায়ী কতগুলি খণ্ড-ঘটনা। অতীতের ছায়া দৃশ্যটির কথা বলা যায়। এই দৃশ্যটির সুরু হচ্ছে একটা সাদা পর্দায় টহলদার লালরক্ষীর বিরাট দৈত্যদের পায়ের কাছে নড়াচড়া করছে 'ডুমা'-র প্রতিনিধিরা; নৈরাজ্যবাদীরা, বিপ্লবের দ্বারা নিক্ষিপ্ত ইতিহাসের সেই জঞ্জালস্তূপ। ছায়া ফুটে হাসের সেই জঞ্জালস্তূপ। ছায়া ফুটে সেনারা গোটা রঙ্গভূমি ছেয়ে ফেলেছে বলে মনে হয়।

নাটকটিতে গণনাট্যের সমস্ত মূল উপাদান উপস্থিত। মায়াকোভস্কির প্রয়োগরীতি এখানে উপস্থিত। এই অভিনয়ের মৌল বৈশিষ্ট্য হল—সংগীতে ভরা ছন্দোময়তা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে দেখানো বিপ্লবের ফলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় কিম্ভূতকিমাকার সব মনুষ্য মূর্তিগুলি। পুতুল আর ভাঁড়দের জগৎকে উপহাস করা হয়েছে এই নাটকে। যে দশটি দিন পৃথিবীকে কাঁপিয়ে তুলেছিল সোভিয়েট রঙ্গমঞ্চে একালের একটি সার্থক নাটক।

গীত বিতান-এর রজতজয়ন্তী উৎসব

কলকাতার বিশিষ্ট রবীন্দ্র সংস্কৃতি সংস্থা গীত বিতান-এর ২০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে গত ৮ই ডিসেম্বর হতে এক আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান হচ্ছে রবীন্দ্রসদনে। ৮ই তারিখ সকালে মঙ্গল স্তোত্র ইত্যাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানান্তে উৎসব উদ্বোধন হয়। এই অনুষ্ঠানে গীত বিতান-এর ২০ বছরের কথা বলেছেন শ্রীনীহাররিঞ্জন সেন। সন্ধ্যায় গীত বিতান-এর শিশু শিল্পীদের 'কাল মৃগয়া' নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ হয়। এই উপলক্ষে 'শাপমোচন', 'তাসের দেশ', 'মায়ার খেলা' প্রভৃতি মঞ্চস্থ হবে এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত ও রাগ সঙ্গীতের আসরের আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পিগণ এবং পণ্ডিত রবিশঙ্কর প্রমুখ অংশগ্রহণ করবেন।

১৯৬৭ সালে আপনার ভাগ্য

যে কোনও ফুলের নাম লিখিয়া পাঠান এবং টাকা ১·২৫ ভি, পি, পি, যোগে আগামী ১২ মাসের জন্য সম্পূর্ণ বিস্তারিতভাবে উত্থান পতন সহ আপনার ভাগ্যফল জানুন। পোস্টেজ স্বতন্ত্র।

Kashi Vigyan Mandir (9),
Beat No. 13, Aligarh.

ডেভিড কাপের আঞ্চলিক ফাইন্যালে ডাবলস খেলার দৃশ্য

উডবার্ন পার্কের অলৌকিক কাহিনী

শ্রীঅমিতাভ

পলকের নিস্তব্ধতা! তারপর সেই নিস্তব্ধতাকে চূর্ণ করে দিল প্রায় সাত সহস্র দর্শকের উল্লাসধ্বনি। উডবার্ন পার্কের সাউথ ক্লাবের টেনিস লনে প্রত্যক্ষ করলাম এক অবিশ্বাস্য টেনিস। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না; এ কি স্বপ্ন না সত্যি! শুধু দেখলাম কৃষ্ণানের হাতের র‍্যাকেট শূন্যে উৎক্ষিপ্ত, আর আকস্মিক আনন্দের বন্যা-প্লাবিত করেছে সাউথ ক্লাবকে। এতদিন জানতাম অনিশ্চয়তায় ভরা ক্রিকেট, কিন্তু রমানাথন কৃষ্ণান প্রমাণ করলেন টেনিসও 'অনিশ্চয়তার' পরশমুক্ত নয়।

পরাজয়ের একেবারে মুখগহ্বর থেকে ফিরে এসেছেন কৃষ্ণান, আর নিজের এই অলৌকিক বিজয়ের সঙ্গে ভারতীয় টেনিসকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এক দুর্লভ আসনে। এই ঐতিহাসিক বিজয় এনেছে এক অনাঘ্রাত সম্মান ভারতের, ইতিপূর্বে চারবার ভারতের মুখের কাছ থেকে এই সম্মানের ভরা পানপাত্র ফস্কে পড়ে গিয়েছে। ভারত এই সর্বপ্রথম চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে ডেভিস কাপের সম্মানের জন্য লড়বে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে। বর্তমানে ডেভিস কাপ অস্ট্রেলিয়ার ঘরে।

• ডেভিস কাপের আন্তঃআঞ্চলিক ফাইন্যাল খেলায় এবার ভারত ব্রেজিলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করল কলকাতায়। গতবার ভারত স্পেনের বার্সিলোনায় স্পেনের কাছে এই আন্তঃআঞ্চলিক ফাইন্যালে পরাজিত হয়। সময় মত খেলা শেষ না হবার ফলে শেষ ফাইন্যাল খেলার অসমাপ্ত অংশ চতুর্থদিন অনুষ্ঠিত হয়। আর এই চতুর্থ দিন, ১৯৬৬ সালের ৬ই ডিসেম্বর এক ইতিহাস সৃষ্টি হল উডবার্ন পার্কের সবুজ ঘাসের বুকে, নায়ক ভারতের টেনিস সেনাপতি রমানাথন কৃষ্ণান।

চতুর্থ দিন মাঠে নামলেন কৃষ্ণান এবং টমাস কচ্; অসমাপ্ত খেলাটুকুর ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে। খেলার সুরুতে, মানে চতুর্থ সেটের প্রারম্ভে এগিয়ে যেতে লাগলেন টমাস কচ্ অনায়াসে। চতুর্থ সেটে ৫-২ গেমে অগ্রগামী কচ্, প্রয়োজন তাঁর শুধু একটি মাত্র গেম তাহলেই ব্যস সব খতম হয়ে যায়। কিন্তু এই সময় থেকেই সুরু করলেন কৃষ্ণান, রুদ্ধশ্বাসে দর্শকরা প্রত্যক্ষ করল সেই অবিশ্বাস্য টেনিস।

নিজের সার্ভিস গেম লাভ করলেন কৃষ্ণান, ফলাফল ৩-৫। এইবার কচের সার্ভিস গেম কৃষ্ণান ছিনিয়ে নিলেন ৪-৫ ফলাফল এবং এরপর আবার নিজের সার্ভিস গেম লাভ করে কৃষ্ণান-কচ সমান হলেন ৫-৫ গেমে। উত্তেজনা চরমে উঠল যখন কচের সার্ভিস গেম আবার কেড়ে কৃষ্ণান ৬-৫ গেমে এগিয়ে গেলেন। এরপর অনুপ্রাণিত কৃষ্ণানের পক্ষে এতটুকু অসুবিধা হল না নিজের সার্ভিস গেম লাভ করার। চতুর্থ সেট কৃষ্ণান লাভ করলেন ৭-৫ গেমে।

পঞ্চম সেটে কৃষ্ণান দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হতে লাগলেন, তরুণ টমাস কচ স্নায়ুর যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাস্ত। কৃষ্ণান অগ্রগামী ৪-১ গেমে। এই সেট কৃষ্ণান লাভ করলেন ৬-২ গেমে। শেষ পর্যন্ত এই শেষ সিঙ্গলসের ফলাফল হল ৩-৬, ৬-৪, ১০-১২, ৭-৫ এবং ৬-২ কৃষ্ণানের পক্ষে।

প্রথম দিনের প্রথম সিঙ্গলসে কচ অনায়াসে স্ট্রেট সেটে ৬-২, ৬-২, ৬-৩ ফলাফলে পরাজিত করেন জয়দীপ মুখার্জীকে। জয়দীপ এদিন তাঁর সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারেন নি, অবশ্য ব্রেজিলের সেরা ন্যাটা খেলোয়াড় টমাস কচ সর্বাংশে ছিলেন শ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয় সিঙ্গলসে কৃষ্ণান প্রথম সেটে পেছিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত মান্ডারিনোকে ৫-৭, ৬-২, ৬-৩, ৬-২ সেটে পরাজিত করেন। কৃষ্ণানের চাতুর্যের কাছে মান্ডারিনো পরাভূত হন যদিও ব্রেজিলের এই পরিশ্রমী খেলোয়াড়

প্রথম সেটে ৭-৫ গেমে জয়ী হন। প্রথম দিনের শেষে ফলাফল হয় ১-১ খেলা।

দ্বিতীয় দিন ডাবলসে ভারতের কৃষ্ণান-প্রেমজিৎ জুটি এবং ব্রেজিলের মান্ডারিনো-কচ জুটির খেলার কথা ছিল। কিন্তু শেষ সময়ে খেলার ঠিক কিছুক্ষণ পূর্বে প্রেমজিতের স্থানে জয়দীপকে নেওয়া হল কৃষ্ণানের ইচ্ছানুযায়ী। কৃষ্ণানের পরিকল্পনা সফল হল। জয়দীপের আক্রমণাত্মক ভূমিকা এবং কৃষ্ণানের সূক্ষ্ম কলাকৌশলের ক্রীড়াচাতুর্য ব্রেজিল জুটিকে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন করল। প্রথম সেট ভারত লাভ করল ৭-৫ গেমে। ভারতীয় জুটির খেলা সত্যই এদিন সুন্দর হয়েছিল এবং ব্রেজিল জুটির সমানভাবে যুদ্ধং দেহি ভাব ডাবলস চরম আকর্ষণীয় পর্যায়ে উন্নীত করে। প্রথম সেটটি ৭—৫ গেমে ভারত দখল করায় কৃষ্ণান-জয়দীপ জুটি অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে। পরবর্তী চারটি সেটে একবার জয়লক্ষ্মী কৃপা বর্ষণ করেছেন ভারতকে একবার ব্রেজিলকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভারত ৭—৫, ৩—৬, ৬—৩, ৩—৬, ৬—৩ সেটে জয়ী হয়ে ২—১ খেলায় অগ্রগামী থাকল।

তৃতীয় দিন ফিরতি সিঙ্গলসে মান্ডারিনো জয়দীপকে ৯—৭, ৩—৬, ৬—৪, ৩—৬, ৭—৫ সেটে পরাজিত করায় ফলাফল দাঁড়াল ২—২। সমস্ত কিছু নির্ভর করছিল তখন কৃষ্ণান-কচের সিঙ্গলসের ওপর। মান্ডারিনোর বিপক্ষে জয়দীপ আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, কিন্তু মাঝে মাঝে কয়েকটি মারাত্মক ত্রুটি করেই তিনি নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছেন। বিশেষত নেটে খেলতে গিয়ে জয়দীপ একেবারে ব্যর্থ হয়েছেন।

তৃতীয় দিনে কৃষ্ণান-কচের শেষ সিঙ্গলস খেলাটি সময়ের অভাবে তিনটি সেট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। কচ তৃতীয় দিনের শেষে অগ্রগামী থাকে ৬—৩, ৩—৬, ১২—১০ সেটে।

রামানাথন কৃষ্ণান

ভারত চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে মেলবোর্নে, খেলা সুরু হচ্ছে আগামী ২৬শে ডিসেম্বর। অস্ট্রেলিয়ার ডেভিস কাপ দলে আছেন রয় এমার্সন, ফ্রেড, স্টোলে, নিউকোম্ব, রোচে, বিল বাউরী এবং ডেভিডসন।

প্রথম খেলায় ড্র

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল তাদের সফরের প্রথম খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করল সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় একাদশের বিপক্ষে। সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় একাদশের তরুণ খেলোয়াড়েরা যে অসামান্য ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করেছে তা' সত্যই প্রশংসনীয়। ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ দলের ম্যানেজার এবং খেলোয়াড়েরা এই খেলার শেষে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এই তরুণ খেলোয়াড়দের।

হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত এই তিন দিনের খেলার প্রথমদিন বৃষ্টির জন্য ভেসে গেল। মাঠের এমন অবস্থা হয়েছিল যে পাম্প করে মাঠ থেকে জল বার করতে হয়। খেলা অনুষ্ঠিত হয় শেষ দু'দিন। প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পায় ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ। কিন্তু সুরুতেই বিপর্যয় ৬ রানে দু'টি উইকেটের পতন ঘটে। একটি উইকেট লাভ করেন বাংলার সুব্রত গুহ এবং একটি ফার্নাণ্ডেজ। ধীরে ধীরে ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের খেলোয়াড়েরা বিপদ কাটিয়ে উঠে। খেলাতে অবশ্য যোশী এবং অশোক মানকড়ের স্পিন বলে ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের খেলোয়াড়েরা বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হয়। ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ দল ৮ উইকেটে ২৪৫ রান সংগ্রহ করে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। সেমুর নার্স সংগ্রহ করেন ৪৭ রান। নার্স মিডিয়াম পেস বোলার সুব্রত গুহর বল পিটিয়ে খেলতে থাকেন, কিন্তু সুব্রত সুন্দর একটি সুইং বলে নার্সের উইকেটটি নিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগত সংগ্রহ হল সোবার্সের ৪১ রান, বুচারের ৪০ রান এবং হলফোর্ডের ৪৬ রান। সুব্রত গুহ ৬২ রানে ৩টি উইকেট এবং অশোক মানকড় ৫১ রানে ৩টি উইকেট দখল করে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

প্রত্যুত্তরে সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় একাদশ ৯ উইকেটে ২৪১ রান সংগ্রহ করে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। অধিনায়ক এস, পি, গাইকোয়াড় ৬২ রান এবং অশোক মানকড় ৫৪ রান প্রদর্শন করে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। বিশ্ববিদ্যালয় একাদশের তরুণ খেলোয়াড়েরা

ওয়েস্ট-ইন্ডিজের বোলিং আক্রমণকে সমীহ না করে পিটিয়ে খেলে যথেষ্ট ফল লাভ করেন। গ্যারফিল্ড সোবার্স ৮৩ রানে ৬টি উইকেট সংগ্রহ করেন।

অবশিষ্ট সময়ে ওয়েস্ট-ইন্ডিজ ১৭১ রান সংগ্রহ করেন ২টি উইকেটের বিনিময়ে। সুরুতেই কিন্তু ওয়েস্ট-ইন্ডিজের দুটি উইকেটের পতন ঘটে মাত্র ২৫ রানে। উইকেট দুটি সংগ্রহ করেন মিডিয়াম পেস বোলার সুব্রত গুহ মাত্র ১৮ রানের বিনিময়ে। কিন্তু বাইনো এবং বুচারের দৃঢ়তায় পরবর্তী সময়ে আর কোন উইকেটের পতন ঘটে নি। মাত্র ৬ রানের জন্য সেঞ্চুরী থেকে বঞ্চিত হন বাইনো। বাইনো অপরাজিত থাকেন ৯৪ রানে এবং বুচার অপরাজিত থাকেন ৫৭ রানে।

ইতিপূর্বে ভারত সফরকারী বিদেশী দলগুলির সঙ্গে খেলায় মাত্র দুবার সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় একাদশ পরাজিত হয়েছেন। ১৯৫৬ সালে নিউজিল্যান্ড দলের বিপক্ষে প্রথমবার এবং ১৯৫৮ সালে ওয়েস্ট-ইন্ডিজের বিপক্ষে দ্বিতীয়বার।

ব্যাঙ্ককের ক্রীড়াঙ্গনে

শেষ পর্যন্ত ভারতীয় ক্রীড়া প্রতিনিধিদল উপনীত হয়েছেন ব্যাঙ্ককের পঞ্চম এশিয়ান গেমসের আসরে। খেলাধুলোর ব্যাপারে ভারতীয় অর্থদপ্তরের এই উদাসীন আচরণ বিরাট ক্ষতি করেছে ভারতীয় ক্রীড়াজগতের। একথা অবশ্যই সত্য যে দেশ আমাদের বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্কটের মধ্যে, কিন্তু তাই বলে অর্থদপ্তরের এই বজ্র আঁটুনী ফস্কা গেরো নীতি কোনমতেই সমর্থন করা যায় না। কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে অর্থদপ্তর খেলাধুলোর জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা দিতে অস্বীকার করে এক গোঁ ধরে বসে থাকছেন, শেষ পর্যন্ত কিন্তু সেই গোঁ তাদের ছাড়তে হচ্ছে আর খুলে দিতে হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রার থলি। মাঝখান থেকে ব্যাপারটা একটা লোক হাসান পর্যায়ে পড়ে যাচ্ছে। ওয়েস্ট-ইন্ডিজ দলের ভারত সফরের ব্যাপার নিয়ে কি ব্যাপারটাই না হয়েছিল।

ব্যাঙ্ককে এশিয়ান গেমসে দল পাঠানোর ব্যাপারে কিন্তু যে ব্যাপারটা ঘটে গেল তা অত্যন্ত দুঃখের। অর্থদপ্তর একেবারে অন্তিম সময়ে জানাল যে মাত্র ৮১ জনের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুর করা হবে। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন ক্রীড়া পরিচালকের দল, অনেক তদ্বির-তদারক সুরু হল, কিন্তু অর্থদপ্তর অনড়-অচল। এই অবস্থায় নাটকীয়ভাবে ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার সভাপতি রাজা ভালিন্দর সিং ঘোষণা করলেন যে ব্যাঙ্ককে এশিয়ান গেমসের আসরে ভারতীয় দল এবার প্রেরণ করা হবে না। ক্রীড়া-পরিচালক এবং অর্থদপ্তরের কর্তাদের এই মান-অভিমানের পালার মাঝখানে বিরাট সঙ্কটে পড়লেন বেচারা খেলোয়াড়েরা। এশিয়ান গেমসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ভারত যোগদান করছে না শুনে বিভিন্ন প্রতিযোগী দেশরা যথেষ্ট দুঃখ প্রকাশ করলেন। ওদিকে অর্থদপ্তরের কর্তৃপক্ষরা আশা করতে পারেন নি যে, রাজা ভালিন্দর একেবারে এই কাণ্ড করে বসবেন। এই চরম আঘাত হেনে রাজা ভালিন্দর সিং চলে গেলেন দেরাদুনে, সুর পাল্টে শেষ পর্যন্ত একটা ছুতো দিয়ে কোনরকমে নিজেদের মান বাঁচিয়ে

ব্যাঙ্ককের এশিয়ান গেমস উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্যানার হাতে থাই সুন্দরী

ব্যাঙ্ককের পথে ভারতীয় এ্যাথলেট দল

অর্থদপ্তর একেবারে শেষ মুহূর্তে ১০৫ জনের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা দিতে রাজী হলেন।

এর মধ্যে কিন্তু খেলোয়াড়দের যে যার ঘরে ফিরে যেতে বলা হল। ঠিক পরের দিন জানা গেল যে অর্থদপ্তর মত পরিবর্তন করেছেন ব্যাঙ্ককে দল যাবে। আবার তাড়াহুড়ো করে খেলোয়াড়দের একত্রিত করা হল। এর মধ্যে খেলোয়াড়রা এক মনে অনুশীলন করতে পারেন নি, অবশ্য পারবেন কি করে যখন ব্যাঙ্ককে যাওয়া অনিশ্চিত। এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় দলের খেলোয়াড় যদি তাদের স্বাভাবিক ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করতে না পারে তবে তাদের খুব বেশি দোষ দেওয়া যাবে কি?

ভারতীয় হকি দলকে এবার এশিয়ান গেমসে স্বর্ণপদক লাভ করতেই হবে। কারণ ১৯৫৮ সালের টোকিও এশিয়ান গেমসে স্বর্ণপদক ভারতের হাতছাড়া হয়েছে। এবারের খেলার তালিকা অনুযায়ী ভারতকে সেমিফাইন্যাল পর্যন্ত উন্নীত হতে খুব বেশি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে বলে মনে হয় না। ভারতীয় দলের বর্তমান মান দেখে মনে শঙ্কা জাগে; আর একথাও অস্বীকার করা চলে না যে এশিয়ার কয়েকটি অন্যান্য দেশ ইতিমধ্যে হকিতে যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে।

ভারতীয় ফুটবল দল জাকার্তায় প্রাপ্ত স্বর্ণপদক, ব্যাঙ্ককের আসরেও নিজেদের আয়ত্তে রাখতে পারবে কি-না এও হল প্রশ্ন? ১৯৫১ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রথম এশিয়ান গেমসে ভারত ফুটবল এশিয়ান চ্যাম্পিয়ান হবার গৌরব অর্জন করে ফাইন্যালে ১—০ গোলে ইরানকে পরাজিত করে। ১৯৬২ সালে জাকার্তার চতুর্থ এশিয়ান গেমসে ভারত প্রথম খেলায় পরাজিত হলেও নাটকীয়ভাবে অসামান্য ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করে স্বর্ণপদক লাভ করে শেষ পর্যন্ত।

এবার ব্যাঙ্ককের এশিয়ান গেমসে প্রথম টেনিসকে ক্রীড়ানুষ্ঠানের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। টেনিসের স্বর্ণপদক ভারতের দখলে থাকা উচিত। অবশ্য ভারতের সেরা খেলোয়াড়দ্বয় কৃষ্ণান, প্রেমজিৎ, জয়দীপ ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে অস্ট্রেলিয়ার পথে, সেইজন্য তরুণ বাহিনী শিব মিশ্র, বিনয় ধাওয়াল এবং ভেঙ্কটেশনকে ব্যাঙ্ককে প্রেরণ করা হচ্ছে।

ব্যাঙ্ককে সন্তরণ দলের প্রতিনিধিত্ব করছেন ষোড়শী সন্তরণপটীয়সী রীমা দত্ত। এবারের জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় রীমা দত্ত বিভিন্ন বিষয়ে বেশ কয়েকটি নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আশা করা যাচ্ছে ব্যাঙ্ককে রীমা দত্ত উল্লেখযোগ্য ফলাফল প্রদর্শন করতে সক্ষম হবেন। তরুণ এ্যাথলেট পরভিনকুমার নিশ্চয়ই একটি পদক লাভ করবেন আশা করা যাচ্ছে, কারণ গত কমনওয়েলথ গেমসে তিনি রৌপ্যপদক লাভ করেন। ভারোত্তোলনকারী মোহনলাল ঘোষ গত কিংসটন কমনওয়েলথ গেমসে রৌপ্যপদক লাভ করেন, আশা করা যাচ্ছে ব্যাঙ্ককের আসরে তিনি ভারতের জন্য একটি স্বর্ণপদক অর্জন করতে সক্ষম হবেন।

এ্যাথলেট দল এবার অনেক ছোট, কিন্তু বাছাই করে পাঠান এই দলটির ওপর ভরসা রাখে ভারত, কারণ এশিয়ান গেমসের আসরে এ্যাথলেটিকসে ভারতের পূর্বের সাফল্য উপেক্ষা করার মত নয়।

—স্বপন গাঙ্গুলী

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট্স্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের

ম হা ভা র ত

প্রথম খণ্ড বোর্ড বাঁধাই (যন্ত্রস্থ) ঃ মূল্য—বার টাকা
দ্বিতীয় খণ্ড „ „ ঃ মূল্য—দশ টাকা
তৃতীয় খণ্ড „ „ ঃ মূল্য—দশ টাকা

চতুর্থ খণ্ডঃ মূল্য—ছয় টাকা

পঞ্চম খণ্ডঃ মূল্য—(বোর্ড বাঁধাই) আট টাকা

অন্ন-সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা

চাকরীর উমেদারী না করিয়া বিজ্ঞানবলে
বলীয়ান হউন

বাণিজ্যে লক্ষ্মী লাভ

করিয়া সৌভাগ্যবান হউন

হাজার জিনিষ

সহস্র পণ্য প্রস্তুত করিবার সহজ ও সরল উপায়

প্রতি ভাগ এক টাকা

—প্রথম ভাগে আছে—

রন্ধন-প্রক্রিয়া ১৫৬ রকমের। ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ ৩৪১ প্রকারের। চমকপ্রদ যাদু-বিজ্ঞান ৮৫ প্রকারের। মনোহারী আতসবাজী ৪১ প্রকারের—এতদ্ভিন্ন

বস্ত্ররঞ্জন—ধাতুরঞ্জন
কাষ্ঠরঞ্জন—ধাতুশিল্প
পেন্ট ও বার্ণিশ—প্রভৃতির
ব্যবহারিক উপদেশ সহ বিস্তৃত ব্যবহারিক প্রস্তুতপ্রণালী।

—দ্বিতীয় ভাগে আছে—

প্রসাধন সুরভি ১৩২ রকমের; বিস্তৃত সাবান প্রস্তুত প্রণালী; সিরাপ প্রস্তুত প্রণালী; মোমবাতী প্রস্তুত প্রণালী; ফলপ্রদ গৃহ-চিকিৎসা—হেকিমী ও হোমিওপ্যাথি; মন্ত্র-তন্ত্র; ভাগ্যফল; বুননির প্যাটার্ণ। সংসারযাত্রার যে কিছু, যত কিছু, যাহা কিছু আবশ্যক তাহা শিখিবার ও শিখাইবার একমাত্র পুস্তক।

জনসাধারণের বর্ত্তমান অসচ্ছলতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নামমাত্র মূল্য নির্দ্ধারিত।

বিশ্ব-সাহিত্যে বসুমতীর অমর অবদা

শ্রীঅরবিন্দের

ANANDAMATH

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অমর আনন্দমঠের অমর ইংরাজী অ

o আনন্দমঠে—স্বাধীনতার সক্রিয় সংগ্রামের প
o আনন্দমঠে—'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের পূত-প্রকাশ।
o আনন্দমঠে—ঋষি বঙ্কিম ও ঋষি অরবিন্দের আদর্শ

আনন্দমঠের এই মহামন্ত্রের অর্দ্ধশতাব্দীর সাধনে
স্বাধীনতা অর্জিত

ভারতের প্রতি গৃহে এই পবিত্র গ্রন্থ শোভা পাউ

মূল্য—তিন টাকা

গীতিনাট্য-সম্রাট
পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের

ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী

৪র্থ ভাগে—রঞ্জাবতী, নারায়ণী, দুর্গা, ফুলশয্যা, আ জয়শ্রী, ফুলী।

৫ম ভাগে—আলিবাবা, রামানুজ, বাদশাজাদি, পু বৃন্দাবনবিলাস, রূপের ডালি।

৬ষ্ঠ ভাগে—আলমগীর, অশোক, চাঁদবিবি, বাসন্তী, খাঁজাহান, বিরাটকুঞ্জ, রাধাকৃষ্ণ।

৭ম ভাগে—রঘুবীর, জুলিয়া, বেদৌরা, কুমারী, কবিকাননিকা, রত্নেশ্বরের মন্দিরে।

৮ম ভাগে—আহেরিয়া, উলুপী, দৌলতে দুনিয়া, প্রেমাঞ্জলি, মন্দাকিনী, গুহামধ্যে, প সিন্ধি, ধ্রুব। মূল্য প্রতি খণ্ড ২৸০ টাকা

ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বেকার, চাকুরীপ্রার্থী ও
রাগীদের ভাষা শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য একমাত্র

॥ বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সহায়

* * স্বল্পশ্রমে পর্য্যাপ্ত ফল অবশ্যম্ভাবী *

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

রা জ ভা ষা

(ইংরাজী ভাষা সহজে শিক্ষার অদ্বিতীয় সাহায্য

এক আধারে ঃ ভাষা - ব্যাকরণ - শব্দার্থ

ইংরাজী হইতে বাঙলা—(বোর্ড বাঁধাই) ৩·৫০

ইংরাজী হইতে উর্দু—৩·০০

23 DEC 1966
"ভারি খুশি
হলুম শুনে যে
কাল রাত্তিরে
খুব তৃপ্তি ক'রে
খেয়েছ—
সব কিছুই আমি
কুসুম বনস্পতিতে
রেঁধেছিলাম।"
"বলতে চাও লুচি, তরকারি···সব কিছুই ?"
"হ্যাঁ ভাই, এমন কি মিষ্টি খাবারগুলোও। দেখ্ মালা, রাঁধবার পক্ষে কুসুম সত্যিই খুব ভালো। যেমন টাটকা, তেমনি খাঁটি। ২-কেজি ৪-কেজির সীল-করা টিনে পাওয়া যায়। আনতে-নিতেও খুব সুবিধে।"
"শুনে আমার লোভ হচ্ছে। কুসুম কিনে দেখতে হবে তো!"
"দেখিস। তোর রান্নার স্বাদ দেখবি আগের চেয়ে আরও ভাল হয়ে গেছে।"
কুসুম বনস্পতি 'এ' আর 'ডি' ভিটামিনে সমৃদ্ধ। এর উৎকর্ষ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, কারণ কুসুম বনস্পতি উৎপাদনের প্রত্যেকটি স্তরে ল্যাবোরেটোরীতে পরীক্ষিত। স্বাস্থ্যসম্মত রীতিতে টিনে ভ'রে কারখানায় সীল করা হয়। সব জায়গায় টাটকা পাবেন।
খাঁটি স্বাদ পেতে হ'লে
কুসুম
বনস্পতি দিয়ে রাঁধুন
KUSUM
VANASPATI
ENRICHED WITH VITAMINS A & D
2
Kg. Nett
KUSUM PRODUCTS LIMITED
CALCUTTA
কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড,
কলিকাতা-১
JWTKPK 2964A

বসুমতী

বিক্ষোভ ও ব্যর্থতা, পীড়ন ও পশ্বাচারে জর্জরিত মহানগরীর বিগত সপ্তাহের একটি চিত্রপট

র্ষ ঃ ২৮শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৬ই পৌষ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ • 22nd Dec., 1966 * Vol. 71, N

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	১৭৩১
আজকের মানুষ	...	১৭৩২
ছাত্রসমাজ ও শিক্ষাসমস্যা প্রসঙ্গে	— অন্নদাশঙ্কর রায়	১৭৩৩
আমি যাঁদের দেখেছি	— পরিমল গোস্বামী	১৭৩৪
কেবল আড্ডাটাকে জমিয়ে রাখবার জন্যেই (কবিতা)	— অঞ্জন কর	১৭৩৭
ভারতদর্শন	...	১৭৩৮
আন্তর্জাতিক	...	১৭৪২
সুবর্ণলতা (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— আশাপূর্ণা দেবী	১৭৪৩
প্রত্যাশার মৃত্যু ও দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা	— কৃত্তিবাস ওঝা	১৭৪৮
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	১৭৫১
বঙ্গদর্শন	...	১৭৫৭
বিজ্ঞানের ঘাড়ে দ্বিত্ববাদী দৈত্য	— আশিসকুমার সিংহ	১৭৬১

শ্রীমদ্ভাগবত

প্রাচীন ভক্তদের রচিত সুললিত বাংলা পয়ারে

মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র

এই সুবৃহৎ গ্রন্থে আছে—শ্রীল সনাতন গোস্বামীর 'ভাগবতামৃত' গ্রন্থের কবিচন্দ্রের বঙ্গানুবাদ এবং শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়তম ভাগবতাচার্য্য রঘুনাথ পণ্ডিতের প্রেমতরঙ্গিনী।

ইহাতে আছে দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভাগবতামৃতের অনুবাদ

কবিচন্দ্রের

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত

এবং

ভাগবতাচার্যের বিশ্বপ্রসিদ্ধ

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী

সমগ্র ভারতে প্রথম বঙ্গানুবাদ

"...শুনিয়া তাহার ভক্তিযোগের পঠন।
আবিষ্ট হইল গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥"

ইহা কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারতের ন্যায় বাংলার প্রতি গৃহস্থের অবশ্যপাঠ্য হউক, এই নিবেদন। এই মূল্যবান গ্রন্থ বাংলার প্রতি ঘরে প্রতিষ্ঠিত করুক।

সাহিত্য-সম্রাট—বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের ঋষি

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

—উপন্যাস—

দ্বিতীয় খণ্ড :—দুর্গেশনন্দিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, ইন্দিরা, রাধারাণী, সীতারাম। মূল্য—তিন টাকা

তৃতীয় খণ্ড :—আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা, দেবী চৌধুরাণী। [সচিত্র] মূল্য—৩, টাকা।

—সাহিত্য—

প্রথম খণ্ড :—কৃষ্ণচরিত্র, লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ (১ম)। মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড :—(১ম ভাগ অনুশীলন), মুচিরাম গুড়, বিবিধ প্রবন্ধ (২য়), বিজ্ঞান রহস্য। মূল্য—তিন টাকা

তৃতীয় খণ্ড :—শ্রীমদ্ভগবদগীতা, কমলাকান্ত, সাম্য, সাহিত্য-প্রসঙ্গ, মানস, ললিতা। মূল্য—তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
একটি অসম্পূর্ণ মন (কবিতা)	— করুণারঞ্জন ভট্টাচার্য	১৭৬৩
আমার নায়ক (গল্প)	— রেবন্ত বসু	১৭৬৪
ক্ষমার প্রার্থনা (কবিতা)	— স্বদেশরঞ্জন দত্ত	১৭৬৬
প্রতীক্ষায় (কবিতা)	— অসীম বসু	১৭৬৬
এইচ. জি. ওয়েলস-এর গল্প	— ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	১৭৬৭
গ্রামবাংলার কথা	— পারুল ভট্টাচার্য	১৭৭১
দিল্লী থেকে	— বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য	১৭৭৫
অবরুদ্ধ	— চন্দ্রগুপ্ত	১৭৭৮
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	— শিল্পামি	১৭৮০
রঙ্গজগৎ		১৭৮৩
গ্রন্থমেলা		১৭৮৮
খেলাধূলা	— শ্রীঅমিতাভ	১৭৮৯

বৈষ্ণব-সাহিত্যের অমূল্য অবদান
ভক্তিজগতের কৌস্তুভরত্ন, ভগবদ্ভক্তগণের সাধনার ধন, ভক্তের তুলসী-মালা সদৃশ মহাপবিত্র ভক্তিশাস্ত্র সমন্বয়।

বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপ ও শিক্ষাষ্টক

শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীকৃষ্ণলাভের জন্য যে উৎকণ্ঠা, এই 'প্রলাপে' তাহা অভিব্যক্ত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত 'শিক্ষাষ্টক শ্লোকই' তাঁহার একমাত্র রচনা। শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামীর সুললিত পদ্যানুবাদে এই অমিয় মাধুরী লীলায়িত।

নরোত্তম বিলাস

বৈষ্ণবগণের পরম উপভোগ্য উপজীব্য ভক্তিচরিতামৃত।

দুর্লভসার

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা শ্রীল লোচনদাস বিরচিত, বৈষ্ণবগণের সংপূজিত।

আত্মতত্ত্ব

বৈষ্ণব দর্শনের সূক্ষ্মতম অনুসরণ।

মনঃশিক্ষা

শ্রীপ্রেমানন্দ দাস ঠাকুর বিরচিত। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত সাধন-ভজনের নিগূঢ় মর্মসমাহিত।

শ্রীচমৎকার চন্দ্রিকা

পরম পণ্ডিত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য পরম বৈষ্ণব শ্রীল কৃষ্ণদাসের সুললিত পদ্যানুবাদ।

পাষণ্ড-দলন

মূর্তিমান বৈরাগ্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বিরচিত প্রেমভক্তির লহর-লীলা।

ভক্তিতত্ত্বসার

হাটপত্তন, শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা, নাম-সংকীর্তন, চৌত্রিশ পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম, নরোত্তম দাসের প্রার্থনা, প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। সুলভে নামমাত্র মূল্যে বিতরিত।

মূল্য : ৩, টাকা।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

মোহন মেলা

মূল্য এক টাকা

কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রধান কথা-শিল্পীর রস-সাহিত্য-সম্ভার ছাড়াও গল্পে ভরপুর।

—ইহাতে আছে—

গল্প—বৌদির দিনে, বুদ্ধদেবের বুদ্ধি, কাঠুরের কপাল, হাঙর মানুষের চোখের জল, ভুলের ভুল, মুর্গী চাচা, বুদ্ধদেবের গল্প, একটার বদলে দুটো, নতুন সিনেমার ছবি, দাদুর গল্প, ইঁদুরের কীর্তিকাহিনী, বাঁদরের সেটুলিচচ্চড়ি।

ছড়া—হযবরলর যজ্ঞবাড়ী, হোহোহো বৃষ্টি ঝরে, পালোয়ান প্যালারাম, উলটো বাজির দেশে, আজব দেশ, বাঁকা শ্যামের ব্যায়রাম, হাবুবাবুর মনের কথা, আদ্দি কালের বদ্যি বুড়ি।

প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী সূর্য রায় কর্তৃক সুচিত্রিত

উপহার দিবার মত বই।

হংসেশ্বর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

মঞ্জুষা

২॥০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

৭১ বর্ষ : ২৮শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পয়সা | বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত | Price : 25 Paise
বৃহস্পতিবার, ৬ই পৌষ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ | সাপ্তাহিক পত্রিকা | Thursday, 22nd December, 1966

ফিরে আসে পুরোনো শতক !

আমরা বিশ শতকের মানুষ। স্বপ্ন আমাদের অনেক। সেই স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করাই একালের মানুষের ইচ্ছা।

আকাশে যখন রকেট ছোটে, মহাকাশ ভেদ করে মহাব্যোমযান যখন চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করে—তখন আমরা সহর্ষে বলি, আর বেশি দেরি নেই, আমরাও গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে পাড়ি দিতে শুরু করছি। বিশেষত যে হারে লোকসংখ্যা বাড়তে শুরু করেছে—তাতে পৃথিবীতে বাস করতে চায় বা কোন অরসিক?

সত্যি কথা বলতে কি—লোকসংখ্যা কমাবার মতো ভেষজ যাঁদের হাতে নেই অথচ যাঁরা এবেলা ওবেলা গ্রহে পাড়ি দিতে চান—তাঁদের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির তারিফ করতে হয়।

আমরা বিশ শতকে বাস করছি—এ তো অকাট্য সত্য। তেমনি সত্য শান্তির নামে নরবধের মাল-মশলা ব্যবহার করা।

তবে বিজ্ঞানের এসব ব্যাপারে আমরা ভারতীয়রা বড় একটা কান না দিলেই ভালো কথা। আর তা দিচ্ছেই বা কে? তবে এদেশের কেউ কেউ মনে করছেন, আমরা আবার পুরোনো শতকে ফিরে চলেছি। অবশ্য কেউ কেউ আদিম যুগে ফিরে যাবার পক্ষপাতী। কিন্তু তাতে সকলের সায় নেই। প্রথম কথা, মধ্যযুগ ফিরে আসবে প্রথমে, তারপর আসবে আদিম যুগ। সে এখনো অনেক দেরি। একটা প্রাণে বেঁচে থেকে তা দেখার উপায় নেই। তাছাড়া আবার সেই অরণ্যবাস, কাঁচা মাংস-ভক্ষণ, আদুল দেহ। কিন্তু এ সবের কিছু কিছু পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে একালেও সম্ভবপর হচ্ছে—কিন্তু আদিম যুগের মানুষের মানসপ্রকৃতির ও সারল্যের মধ্যে এমন একটি গুণ ছিল—যা একালে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। সুতরাং পণ্ডিত যেমন অর্ধাংশ ত্যাগ করেন—তেমনি একালের পণ্ডিতমন্যরা সব কিছুই আধা-আধি রক্ষা করে পুরোনো শতকে ফিরে যাবার পক্ষপাতী। সে শতকটা মধ্যযুগ কি না জানি না; তবে এমন শতক কোথাও খুঁজে পাবে নাক আর।

ভিয়েৎনামে আমরা ক' হাজার ট্রাক পাঠিয়েছি—এবং গ্যাস থেকে পেট্রোল পর্যন্ত রপ্তানী করেছি কি না—দুষ্ট-লোকের সে সব কথা নিয়ে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। তবে কলকাতার মতো শহরে ট্রাম-বাস ধর্মঘটের ফলে এমন একটি কাণ্ড ঘটেছে যা আজগুবি মনে হলেও আজগুবি নয়। সেই ঘটনাটি শুনলে বোঝা যাবে বিশ শতকের সঙ্গে কী চমৎকারভাবে পুরোনো শতকের জোড়াতালি দেওয়া হয়েছে! অর্থাৎ কি না, ঘোড়ায় টেনেছে টেম্পো। সেকালের মানুষ আজো যদি দু-একজন থাকেন—এ সংবাদে তাঁরা কিছুটা তৃপ্তিবোধ করবেন। কারণ তাঁরাই দেখেছেন ঘোড়ায় টানা ট্রামগাড়ি। আহা একবার তারা যদি শুভ্র ভ্রুযুগলের মধ্যে থেকে প্রাচীন দুটি চক্ষু মেলে দেখতে পেতেন ঘোড়ায় টানা টেম্পো। (আমরাও ভাবছি, ঘোড়া জুড়ে অচল ট্রাম কি সচল করা যেত না?)

টেম্পো যদি বিকল হয়, তাহলে তখন তার চলার ভার ঘোড়ার উপর না দিয়ে উপায় নেই। কারণ এ সময় যাত্রী-আরোহীদের এমন ধৈর্য নেই—যদ্দ্বারা টেম্পোকে কারখানায় নিয়ে গিয়ে তার মেরামতী কাজ করানো সম্ভবপর হয়।

এই টেম্পো ত' যন্ত্রচালিত একটা যান। কিন্তু আমাদের জান-মান এখন এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে, তাদেরও আর আর কোনোরকম মেরামত বুঝি সম্ভব নয়। তাই নতুন কোনো ঝুঁকি না নিয়ে আমরা নতুন মতে পুরোনো দাবি হাজির করছি। আপনি বৈদান্তিক, বৈষ্ণব বা শাক্ত—যাই হোন না কেন, প্রাণী হিংসা সম্বন্ধে আপনার ধর্ম কি বলে তার বিচার আপনিই করুন। মধ্যযুগের কোনো কোনো ধর্মমতাবলম্বীর মতো আপনিও অন্যধর্মীকে এ যুগে যখন আপনার মতটাই গ্রহণ করতে বাধ্য করেন—তখন সেটা নিশ্চয়ই আপনি আধুনিক যুগ-মতে করেন না। সেই কারণে আমার যেটা অভিপ্রেত তা আমি ধর্মের নামে বধ করবো এবং প্রয়োজন হলে ধর্মের নামেই তা বন্ধ করবো।

কিছুদিন আগেই একটা অসমর্থিত সংবাদ শোনা গিয়েছিল। সংবাটি নতুন নয়। কিন্তু ঐ বহুশ্রুত পুরোনো সংবাদটি নতুন করে শোনাবার মতো। সংবাদটিতে বলা হয়েছিল যে, বাঁকুড়া জেলার কোন এক অখ্যাত পল্লীতে সতী-দাহের পুরোপুরি ব্যবস্থা হচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক'জন অরসিকের বাহাদুরীতে তা ভেস্তে যায়।

এমন একটা ঘটনা যা ঘটা উচিত ছিল এবং যার সঙ্গে পুরোনো শতক ফিরে আসছিল—তার অকালমৃত্যুতে কেউ কেউ ক্ষোভ করতে পারেন। তবে সংবাদ অসত্য নয়, এবং তাদের ক্ষোভ ও খেদ মিথ্যা নয়। এখন সান্ত্বনা এই যে, গঙ্গাসাগর মেলার আর বেশি দেরি নেই। এবং সে যাত্রায় কেউ যে তার মানতের সন্তানকে বিসর্জন দিয়ে আসবে না—সে কথাই বা কে বলতে পারে? সুতরাং পুরোনো শতকের যাঁরা পক্ষপাতী—তাঁরা আশ্বস্ত হতে পারেন। আর এযুগে সেটাই হবে তাঁদের জন্যে সান্ত্বনা এবং পুরস্কার।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

জামার কলার ধরে যাঁকে ঘর থেকে টেনে বার করে "বিচারকদের" সামনে নিক্ষেপ করা হয়, এবং স্কুলের ছেলেদের নিয়ে গঠিত "বিচারকমণ্ডলী" যাঁর বিচার করে তাঁর অপমানের আর বাকি থাকে কী? অথচ ব্যক্তিটি সামান্য চুনোপুঁটি নন যে ঘটনাটিকে কেউ তাচ্ছিল্য করবেন বা হেসে উড়িয়ে দেওয়া যাবে। রামা-শ্যামা তো নন, পেঙ চেন ছিলেন একটা শহরের পৌরপ্রধান, তা-ও আবার যে-সে শহর নয়, চীনের রাজধানী পিকিঙের মেয়র ছিলেন একদিন প্রবীণ নেতা পেঙ চেন।

রাজনীতি অবশ্য শত্রুকেও শয্যাসঙ্গী করে, কিন্তু চীনে আজ যা চলছে তাকে কি রাজনীতি বলা চলে, না উগ্র চণ্ডনীতি বলে? মাও-এর চিন্তাধারার সঙ্গে যাঁর মতের এতটুকু গরমিল হচ্ছে তাঁকেই নির্মমভাবে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তা সে উনি যে পদেই থাকুন না কেন, বা পেশা তাঁর যাই হোক না কেন। সাহিত্যিক, শিল্পী, অধ্যাপক, সাংবাদিক—আক্রমণ থেকে বাদ যাচ্ছেন না কেউ। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের স্রোত বইছে চীনে, সে-স্রোতে যিনি গা ভাসাতে রাজী হলেন না তাঁরই পিঠে ছাপ মেরে দেওয়া হলো 'সংশোধনবাদী', 'বুর্জোয়া' 'বিপ্লব-বিরোধী' অপবাদের। 'মাওবাদে' যাঁরা বিশ্বাসী নন, তাঁরাই বিপ্লবের শত্রু, খতম করো তাঁদের—এই হলো সাংস্কৃতিক বিপ্লবের স্লোগান। জানে খতম অবশ্যি কাউকে করা হয় নি যেমন স্ট্যালিন করেছিলেন সোভিয়েট রাশিয়ায়, কিন্তু চীনের স্ট্যালিনপন্থীরা অন্য শিক্ষা মেনে চলে 'গুরুভক্তি' দেখিয়েছেন—সে-শিক্ষা পার্জিং বা অপসারণের। পেঙ চেন, চীনা সৈন্যদলের চীফ অফ দি স্টাফ লো জুই চিং, সাংবাদিক তেং তো, পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট লু পিঙ, পিকিঙের ভাইস মেয়র উ হান, নাট্যকার চৌ সিন-ফাঙ, সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী লু তিং ঈ—ইত্যাদিকে তো সেই কারণেই পার্টি থেকে অপসারণ করা হয়েছে।

কিন্তু চীনে কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার আগে থেকে কিম্বা পরেও দেশ গঠনে এঁদের অবদান বা ত্যাগ কি কারো চেয়ে কম? লালরক্ষীরা চীনের ইতিহাস কিভাবে লিখবে জানি না কিন্তু নিরপেক্ষ ইতিহাস পেঙ চেনকে উপেক্ষা করতে পারবে না।

আজকের চীন ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অনেক নেতার মতোই পেঙ চেন তাঁর রাজনৈতিক জীবন সুরু করেছিলেন কুয়োমিন্টাং দলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে। কমিউনিস্ট পার্টিতে অবশ্য তিনি অনেক পরে যোগদান করেন, কিন্তু যোগ দেবার পর তাঁর উন্নতি হয়েছিলো দ্রুত লয়ে। রাজনৈতিক শিক্ষাদান কমিউনিস্ট পার্টির একটা জরুরী বা গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম, শিক্ষিত, শান্ত স্বভাবের পেঙ চেন শিক্ষকের ভূমিকাই নিলেন। ক্রমে ইয়েনান প্রদেশের পার্টি স্কুলের ডাইরেক্টরের দায়িত্ব অর্পিত হলো তাঁর ওপর। পেঙ চেনের বোঝবার ক্ষমতা ও কৌশল, তাঁর যুক্তি পার্টি নেতৃত্ব সাগ্রহে লক্ষ্য করছিলো, এর পরে বৃহত্তর ক্ষেত্রের জন্যে

পেঙ চেন

নির্বাচিত হলেন তিনি : মাঞ্চুরিয়াস্থ মুক্তিফৌজের পলিটিক্যাল কমিসার।

পেঙ চেনের যোগ্যতা, তাঁর আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা অস্বীকার করার উপায় ছিলো না, পার্টি তাঁকে নেতার আসন ছেড়ে দিলো; পার্টির সাধারণ সদস্য থেকে তিনি সর্বোচ্চ নেতৃত্ব পলিটব্যুরোর সদস্যপদ পেলেন। পার্টি নেতৃত্বে ক্ষমতা একদিন তাঁর এতখানি ছিলো যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী চেন ঈ'র ওপরে পেঙ চেনের স্থান নির্দিষ্ট ছিলো। অবশ্য একদিন কট্টর ক্রুশ্চেভ-বিরোধী ছিলেন বলে, কড়া ভাষায় ক্রুশ্চেভমার্কা সংশোধনবাদের নিন্দা করেছিলেন বলেই তিনি ক্ষমতার উঁচু মগডালটি সেদিন ধরতে পেরেছিলেন।

দীর্ঘদিন পিকিঙের মেয়রের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করে থাকা সহজ কথা নয়, কিন্তু পেঙ চেনের সে কর্মক্ষমতা, সে-যোগ্যতা বা তাঁর ওপর পার্টির ততটা আস্থা ছিলো বলেই এটা সম্ভব হয়েছিলো। শুধু মেয়রই নয়, মাও সে-তুঙের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা দেখে অনেকে ভেবেছিলেন যে পেঙ চেনই মাও-এর স্থলাভিষিক্ত হবেন। কিন্তু হায়, কোথা থেকে কী হয়ে গেলো, মেয়রের পদ থেকে অপসারিত হলেন পেঙ চেন, উপহাসিত হলেন তিনি।

কিন্তু এখানেই তাঁর অবমাননার শেষ হয় নি, তাঁর দুঃখের পেয়ালা তখনো পূর্ণ হয় নি। জুন মাসে ক্ষমতা হারাবার পর পেঙ চেন নির্জন জীবনযাপন করছিলেন, হয়তো স্বপ্ন দেখছিলেন, আশায় ছিলেন, এদিন যাবে, রবে না। দিন স্থির থাকেনি ঠিকই, সময় পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়েছে প্রকৃতির আপন নিয়মে, কিন্তু নিয়ে এসেছে দেশে তাণ্ডব—লালরক্ষীর তাণ্ডব! হাইস্কুলের এমন কি নার্সারির দুগ্ধপোষ্য ছাত্রেরা হয়ে উঠেছে চীনের ভাগ্যনিয়ন্তা, 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব' ঘটাবে তারা দেশে। সে-বিপ্লব ঘটাতে গেলে বিপ্লবের যারা শত্রু তাদের আগে ধ্বংস সাধন করা দরকার, তাই খোঁজ পড়লো বিপ্লব-বিরোধীদের। সংজ্ঞা নির্ণয় করতে দেরি হয় নি এই নব-প্রতিভাদের, যাঁরাই মাওবাদ-বিরোধী তাঁরাই বিপ্লবের শত্রু। ব্যাখ্যা করার মালিক ত' ওই ডিগ্রীহীন স্কুল-ছাত্ররা, কার কোন কাজ বা কথার দ্বারা পান থেকে চুণ খসেছে, সে-বিচারের ভার লালরক্ষীদেরই, আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন প্রশ্নই ওঠে না কারণ যুক্তি বা ব্যাখ্যা একটিই হতে পারে এবং সে-ব্যাখ্যা অনিবার্যভাবে লালরক্ষীদের কাছ থেকেই আসতে পারে!

পেঙ চেনকে তাঁর নির্জন কুটির থেকে টেনে আনা হলো রাজপথে, দশ হাজার লালরক্ষী ছাত্র মিছিল-শোভাযাত্রা করে প্রকাশ্যে পেঙ চেনকে গালি-গালাজ করলো, নিন্দাবাণ বর্ষণ করলো এই বর্ষীয়ান নেতার ওপর অম্লানবদনে। কিন্তু এর শেষ কোথায়? পেঙ চেনের লাঞ্ছনার এখানেই কি পরিসমাপ্তি ঘটেছে?

ছাত্র ও শিক্ষাসমস্যা প্রসঙ্গে

শান্তিনিকেতন,
১০ই ডিসেম্বর ১৯৬৬.

কল্যাণীয়াসু,

ছাত্র ও শিক্ষাসমস্যা প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য জানতে চেয়েছ। আমি ছাত্রও নই, শিক্ষাব্রতীও নই। আমার পক্ষে এটা অনধিকারচর্চা। নিজের চরকায় তেল না দিয়ে যখনি আমি পরের চরকায় তেল দিতে গেছি তখনি বন্ধু হারিয়েছি। শত্রু সৃষ্টি করেছি।

ছাত্র যাদের বলা হচ্ছে তারা সেইসঙ্গে নাগরিক, সাবালক হয়ে থাকলে দেশশাসন-সংক্রান্ত নির্বাচনের ভোটার, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তাদের স্থান তাদের অধ্যাপকদের তুলনায় খাটো নয়। কিন্তু গণতন্ত্রে বিশ্বাস থাকলে তো? গণতন্ত্রে বিশ্বাস থাকলে একই সময়ে কেউ বৈপ্লবিক পন্থা অনুসরণ করে না। আর বৈপ্লবিক পন্থা অনুসরণের পর গণতন্ত্রের সুফল আশা করে না।

কেবল ছাত্রদের অনেকের আচরণ নয়, তাদের গুরুজনদের আচরণও গণতন্ত্র-বিরোধী। অথচ তারা গণতন্ত্রের কাছেই সুবিচার চায়। কথায় কথায় বলে, হাইকোর্টের জজ দিয়ে তদন্ত হোক। তাই যদি হলো তবে গণতন্ত্রের ভিত্তি আরো গভীর করে খোঁড়ো। তা না করে কবর খুঁড়ছ কেন? গণতন্ত্র বাঁচলে তুমিও বাঁচবে। গণতন্ত্র মরলে তুমিও মরবে।

এরা কেউ কিষাণ মজদুর নয়, সবাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। গণতন্ত্র গেলে এরাও থাকবে না। চীনদেশে কিছু মধ্যবিত্ত কোনো রকমে টিকেছিল। এবার রেড গার্ডদের দিয়ে তাদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে। বিপ্লব ঘটলে এদেশের মধ্যবিত্তরা কোথায় দাঁড়াবে? গণতন্ত্রই এদের একমাত্র আশ্রয়। যাকে রাখো সেই রাখে।

গণতন্ত্রকে রক্ষা করা মানে দুর্নীতিকে বা অপশাসনকে রক্ষা করা নয়। গণতন্ত্রে বিরোধী দলেরও স্থান আছে। বিরোধিতা করাও প্রয়োজন। ছাত্ররাও ইচ্ছা করলে বিরোধিতা করতে পারে। কিন্তু তারও একটা গণতন্ত্রসম্মত রীতি আছে। সবাইকে যেমন ট্রাফিকের নিয়ম মানতে হয় ছাত্রদেরও তেমনি সংবিধানের নিয়ম মানতে হবে। নয়তো দেশ অরাজক হবে। শ্রমিক কৃষক যদি সত্যি সত্যি যে যার হাতে আইন নেয় তা হলে এই ছাত্রদের বাপ-খুড়োদের গ্রাম ছেড়ে শহরে পালিয়ে আসতে হবে, সেখান থেকেও পালাতে হবে কে জানে কোন্ নিরাপদ স্থানে। তখন এরাই হয়তো ফ্যাসিস্ট বনে যাবে। ইটালীতে ও জার্মানীতে এই বেড়ালই বনবেড়াল হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রেসিডেন্সী কলেজ বন্ধ হয়ে গেছে অনির্দিষ্টকালের জন্যে। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না এলে চিরকালের জন্যে। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনাই আপাতত প্রথম কাজ। ছেলেদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্তিপূর্ণ-ভাবেই এ কাজ করতে হবে। কিন্তু কোনো মতেই যদি তারা তাদের বৈপ্লবিক পদ্ধতি না ছাড়ে, তার বদলে যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি না ধরে, তা হলে কি তাদের কাছে হার মানতে হবে? কোনো কর্তৃপক্ষই এমন প্রস্তাবে রাজী হতে পারেন না।

ছাত্রদেরও কেউ হার মানতে বলছে না। তাদের সামনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিও রয়েছে। অন্যের উপরে জুলুম না করে তারা গণ-তান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন চালিয়ে যেতে পারে। বহিষ্কারের আদেশ যদি বে-আইনী হয়ে থাকে তবে হাইকোর্টে গেলেই হয়। আর যদি আইনসঙ্গত হয়ে থাকে তবে আইন বদলানোর জন্যে জনমত তৈরি করা ও ভোট সংগ্রহ করা দরকার। গণতন্ত্রের নিয়ম মেনে চললে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী বুঝে যদি কেউ প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যোগ দিয়ে থাকে তবে তাকে দয়া করে বোঝাতে হবে যে মেজরিটি মাইনরিটির কাছে হার মানবে না। হয় মাইনরিটিকে মেজরিটিতে পরিণত করতে হবে, নয় মেজরিটির সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে।

উত্তর ভারতের ছাত্র অশান্তির সময় আমি সিমলায় ছিলুম। সেই প্রসঙ্গে আলোচনাকালে এক স্বনামধন্য অধ্যাপক আমাকে বলেন, "সব ক'টা বিশ্ববিদ্যালয় দু'বছরের জন্যে বন্ধ করে দিতে হবে। তা হলেই ছেলেরা বুঝবে উচ্চশিক্ষার মূল্য কী। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন কী।"

শুনে আমি হাসি। কিন্তু সিমলা থেকে ফিরে দেখছি হাসির ব্যাপার নয়। তাঁর কথাই খাটল। অন্তত একটা বিশ্ববিদ্যালয় ও একটা কলেজ অনির্দিষ্ট-কালের জন্যে বন্ধ হয়ে গেল। যেসব ইস্যুতে এ বিরোধ চলেছে সেসব ইস্যু দু' পাঁচ বছরেও মেটবার নয়। যদি না এক পক্ষ আপনার ভুল বুঝতে পেরে পিছু হটে। অথবা যদি না ছাত্রদেরই একভাগ আরেকভাগকে নিরস্ত করে।

কলকাতার কোনো কোনো মহল আশা করেন যে ছাত্রদেরই একভাগ আরেকভাগকে শান্ত করতে উদ্যোগী হবে। এবং তাদের সে উদ্যোগ সফল হবে। কিন্তু তাদের চেষ্টা যদি বিফল হয় তারও কি আইন হাতে নেবে না? সে রকম একটা খবরও বেরিয়েছে। ছাত্রদের দুই ভাগের সংঘর্ষও বাঞ্ছনীয় নয়।

আমার কোনো কোনো বন্ধু জানতে চাইছেন, এদেশে সরকার বলে একটা কিছু আছে কিনা। সরকার থাকলে তার অথরিটিও থাকবে। মাঝে মাঝে তাকে তার অথরিটি খাটাতেও হবে। বিশ্ব-বিদ্যালয় বা কলেজ দু' তিনমাস অচল অবস্থায় থাকলে কেবল সিন্ডিকেটের বা গভর্নিং বডির নয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অথরিটি সম্বন্ধেও সংশয় জাগবে। যাঁদের অথরিটি নেই তাঁদের অস্তিত্বও কি থাকবে? যাঁরা অথরিটি খাটাতে পারবেন তাঁরাই আসবেন ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে চালু রাখবেন। তার জন্যে দরকার হলে পুলিশ ডাকবেন। কোনো অবস্থাতেই পুলিশ ডাকব না, এমন প্রতিশ্রুতি কেউ দেয় নি, দেবে না, দিতে পারে না। অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
অন্নদাশঙ্কর রায়

আমি যাঁদের দেখেছি

পরিমল গোস্বামী

(১৫) জ্যোতির্ময়ী দেবী (১৮৯৪)

আমি যাঁদের দেখেছি পর্যায়ের লেখাগুলি যাঁরা অনুধাবন করেছেন তাঁরা লক্ষ করে থাকবেন, আমার দেখা ব্যক্তিরা অনেকেই এখন আর জীবিত নেই, বরং এখনও যাঁরা জীবিত আছেন তাঁদের সবারই বয়স সত্তর পার হয়েছে। এর একমাত্র ব্যতিক্রম কাজি নজরুল ইসলাম। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে বয়সের প্রশ্ন অবান্তর।

আমার দেখা লেখিকাদের মধ্যে তাই একমাত্র শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী দেবী সম্পর্কেই আমি কিছু বলতে বসেছি তার কারণ অন্য যে সব প্রসিদ্ধ লেখিকার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, তাঁরা কেউ তাঁদের বয়স সত্তর পার হয়েছে বলে স্বীকার করছেন না। চেষ্টা করেও স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারি নি।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর বয়স এখন ৭৩, তাঁর জন্ম ১৮৯৪, জানুয়ারি। এবং একথা তিনি নিজে স্বীকার করাতে আমি কিছু বিস্ময় বোধ করেছি। পৃথিবীর সর্বত্রই যেখানে মহিলাদের বয়স কমিয়ে বলার অভ্যাস, সেখানে একা জ্যোতির্ময়ী নিজ মুখে বয়স স্বীকার করেছেন, এবং আমি সে কথা বিশ্বাস করেছি। (কেউ ভাববেন না যেন এটাও তাঁর প্রকৃত বয়স নয়!)

শুধু এই একটি মাত্র কারণেও তিনি শ্রদ্ধার পাত্রী। তা ভিন্ন তাঁর নিজের সম্পর্কে বিনয় তাঁর প্রায় দুর্ভেদ্য। জানতে চেয়েছিলাম পড়াশোনার খবর। লিখলেন, "বিদ্যাবুদ্ধি লেখাপড়া বিদ্যাসাগরী বোধোদয় কথামালা আখ্যানমঞ্জরী এবং প্যারীচরণ সরকারের ফার্স্টবুকের কয়েক পাতা।" (১৯-৭-৬৬, চিঠি)

কিন্তু কথাটা চমকপ্রদও নয়, অবিশ্বাস্যও নয়। সাহিত্যের সৃজনকার্যে স্কুলকলেজের নির্দিষ্ট পড়াশোনার প্রয়োজন খুব আছে কি? অথবা আদৌ আছে কি? সৃজনপ্রেরণার জন্য যে শিক্ষা প্রয়োজন, তার ক্ষেত্র অধিকাংশ স্থলেই নির্দিষ্ট পাঠের বাইরে বিস্তৃত। যাঁদের মন সৃজনধর্মী তাঁদের নিজের মনের থেকেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভের এমন এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে যখন বিশ্বপ্রকৃতি, মানুষের জীবন, এবং প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডার, সবার কাছ থেকেই শিক্ষাগ্রহণ না করে তাঁরা থাকতে পারেন না। জ্যোতির্ময়ী দেবীও তাই করেছেন, সাহিত্যস্রষ্টামাত্রেরই ঐ একই ইতিহাস। আমি তো বছর কুড়ি আগে এক গল্পে বলেছিলাম এ কথা। বিধাতাপুরুষকে এক তরুণ ও তরুণী হঠাৎ ধরে ফেলে পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছিল। বিধাতা সত্য পরিচয়ই দিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের তা বিশ্বাস না হওয়াতে তাঁকে নানাভাবে জেরা করতে লাগল। সাধারণ জ্ঞানের সব কথা। তিনি একটারও জবাব দিতে পারেন নি। শুধু বলেছিলেন, সব করেছি বটে, কিন্তু কেন করেছি তা বলতে পারব না। শেষে এ-প্লাস্-বি হোলস্কয়ারের পরিণাম কি, তাও যখন বলতে পারলেন না, তখন ওরা বুঝতে পারল বিধাতা ম্যাট্রিকুলেশন পাসও না। স্রষ্টা সৃষ্টি করেন অন্তরের তাগিদে, কিন্তু তা সব সময় নিজে ব্যাখ্যা করতে পারেন না। এবং ম্যাট্রিকুলেশন পাস না করেই সব করতে পারেন।

জ্যোতির্ময়ী দেবী আমাকে লিখলেন, "আমার কাছে এটা আলোর মতোই সত্য মেয়েরা কখনই 'বিরাট' কিছু হতে পারেন নি। কদাচ কেউ কেউ হয় তো 'বিশেষ' হয়েছেন। বিরাটে বিশেষের স্থান আছে, কিন্তু বিশেষে বিরাট ধরানো যায় না। পৃথিবীতে মেয়েদের বিধাতা-নির্দিষ্ট এইটেই কর্মফল—ভালবাসায়। সে ভালবাসাতে অহং থাকে না। যদিও কোন বিশেষ পণ্ডিতের উক্তি আছে যে তারা জীবনের ঋণশোধ করে দুঃখভোগের দ্বারা। দুঃখের আনন্দের দিকটা তাঁর মনে ছিল না?"...(চিঠি, ২৩-৮-৬৬)

আবার লিখলেন, "আমার বিশ্বাস মেয়েদের হাতে এ পর্যন্ত কিছু রসসৃষ্টি হয় নি। তাঁরা জীবধাত্রী হয়েই থাকবেন। তবে বিশেষ মেয়ে আমি মাত্র তিনচারজনকে মনে করি...আর সকলেই আমরা পুরুষের নকল নবীস। তবু কেন আমি লিখি? সেটাও আমার বড় দুঃখ। না লিখে না পড়ে পারি না, তাই কাগজকলমের শ্রাদ্ধ করি। কিন্তু আমি এই সত্যকে দেখতে পেয়েছি, এই আমার সম্পদ, এই আমার আনন্দ।"...

স্থিতধী জ্যোতির্ময়ী, মোহমুক্ত জ্যোতির্ময়ী। তাই তাঁর নিজের সম্পর্কে কোনো মমতা নেই। এমন মানুষ দেখেছিলাম একবার মাত্র—বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে।

জ্যোতির্ময়ী যে বছরে জন্মগ্রহণ করেছেন, সে বছর স্বর্ণকুমারী দেবী 'ফুলের মালা' উপন্যাস শেষ করেছেন, তেত্রিশ বছরের যুবক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সোনার তরী', 'ছোটগল্প', 'কথা চতুষ্টয়' ও 'বিচিত্র গল্প'—এই চারখানা গ্রন্থের লেখক হয়েছেন। (এবং জ্যোতির্ময়ী তার কোনো একখানাও হাতে পেলেই তার পাতা ছিঁড়ে মুখে পুরছেন।) তাঁর জন্মের ঠিক এক মাস আগে (২৭-১২-৯৩) দাদাভাই নৌরজির সভাপতিত্বে লাহোরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সমাপ্ত হয়েছে। আরো কিছুদিন আগে স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোয় পার্লামেন্ট অভ রিলিজিয়নস-এ বক্তৃতা দিয়ে দেশময় আনন্দের সাড়া জাগিয়ে তুলেছেন। এই বছরে এদেশে লর্ড ল্যানসডাউনের শাসন শেষ হয়ে লর্ড এলগিনের শাসন আরম্ভ হল। আর বিলেতে তথাকার প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোন পদত্যাগ করলেন, জাপান চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল এবং ফরাসীদেশে ড্রেফুসকে অন্যায়ভাবে দেশদ্রোহিতার ফাঁদে ফেলা হল।—এই বছরে দেশে বিদেশে বহু ইতিহাস রচিত হয়েছে। এবং এই বছরে বাঙালিনী জ্যোতির্ময়ী রাজপুতানায় জন্মগ্রহণ করলেন।

পিতা অবিনাশচন্দ্র সেন জয়পুর-

রাজের দেওয়ান। পিতামহ সংসারচন্দ্র সেনও ঐ রাজের দেওয়ান ছিলেন। জয়পুর শহরও বাঙালী স্থপতির পরিকল্পিত। বাড়িতে যে ভাষায় জ্যোতির্ময়ী প্রথম কথা বলতে শিখলেন, বাড়ির বাইরে সে ভাষা অচল। বালিকা বয়সে এই দুই ভাষা-বৈপরীত্যের মাঝখানে মনকে চালনা করবার একটি মস্ত গবাক্ষ তিনি পেলেন গৃহগ্রন্থাগারের মধ্যে। অজস্র বাংলা বই আর সমসাময়িক যাবতীয় পত্রপত্রিকা। গ্রন্থজগতের দিকে লুব্ধ দৃষ্টি মেলে শুধু দেখতেন আর ভাবতেন কবে সব পড়তে পারবেন। দশ এগারো বছর বয়সে যতটা পড়া যায় তা তিনি পড়ে ফেললেন।

বাংলাদেশের সঙ্গে জ্যোতির্ময়ীর প্রথম পরিচয় এই সব বইয়ের ভিতর দিয়েই। দুচোখ মেলে চারদিকে দেখেছেন এক দেশ। বইয়ের ভিতর দিয়ে দেখেছেন আর এক দেশ। একটি বাইরের দেখা, অন্যটি অন্তরের দেখা। বাংলা হিন্দি দুটি ভাষাই ছোটবেলা থেকে আয়ত্ত হওয়াতে রাজপুতানার আকাশ বাতাস মানুষ এবং তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি যেমন রক্তে মিশল, তেমনি মনে জাগল ছবি—কল্পনার ছবি—কল্পনার বাংলাদেশ, মাতৃভূমি, পিতৃভূমি। তাই পরবর্তীকালে তিনি যে সব গল্প লিখলেন, রাজস্থানের মানুষদের নিয়ে সে সব গল্পে আরাবল্লী পর্বতশ্রেণীর স্বাদগন্ধ ফুটে উঠল তাঁর নিপুণ কলমে। অবাংলাদেশের গল্প রচিত হল বাংলা ভাষায়, দুটি রাজ্য যেন এক হল তাঁর কলমের মুখে।

মাত্র এগারো বছর বয়সে জ্যোতির্ময়ী পরলেন বধূর বেশ। সে যুগে এমন ঘটনার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। স্বামীগৃহ গুপ্তিপাড়ায়। কিন্তু বিবাহিত জীবনও বাংলাদেশে একটানা কাটাতে পারলেন না। স্বামী পাটনায় অ্যাডভোকেট, অতএব রাজপুতানী বাঙালিনী পুনরায় প্রবাসিনী হলেন।

মাত্র পঁচিশ বছরের বিবাহিত জীবন।

প্রবাসিনী রূপে প্রথম জীবনে জয়পুরে, বিবাহিত জীবনে গুপ্তিপাড়া ও পাটনায় ও পুনরায় জয়পুরে প্রত্যাবর্তন। দেশের যে বিস্তার পেলেন আপন অভিজ্ঞতার মধ্যে, সেই বিস্তারের মধ্যেই তিনি পেলেন পরবর্তী জীবনের সার্থকতা। নানা তীর্থে ঘুরলেন, দুর্গম পথের পথিক হলেন। বিবাহিত জীবনেই তিনি শিল্পীরূপে নিজেকে বিকশিত করে তুলেছেন। সুপ্ত শিল্পীর জাগরণ ঘটেছে। মনের উন্মেষ ঘটেছে। ১৯১৮ সালে স্বামীহারা। সেই বছরেই তাঁর স্মৃতি বুকে নিয়ে নিজের মনের কাছেই যে ভাষায় তিনি আত্মগতভাবে কয়েকটি কথা

শ্রীজ্যোতির্ময়ী দেবী

ফটোঃ লেখক (১৯৬৬)

উচ্চারণ করেছেন, বাংলা 'স্মরণ' কাব্যের জগতে তার চেয়ে মর্মস্পর্শী কবিতা আমি আর পড়েছি বলে মনে পড়ে না। এ কবিতাটি জ্যোতির্ময়ী তাঁর তীর্থপর্যটন কথার গ্রন্থ "সময় ও স্মৃতি"র (ডি-এম-লাইব্রেরি) প্রথমে উৎসর্গ রূপে নিবেদন করেছেন।

শ্রাবণ পূর্ণিমা তিথি। ঘন ঘোর মেঘে
ঝাপসা আকাশ। নিচে বসেছিল জেগে
ধরিত্রী মলিন মুখে। বায়ু এলোমেলো
সারারাত ঘরে মোর এলো আর গেল,
হাতখানি ধরে পাশে বসিয়া ছিলাম।
যদি কথা কও। যদি ডাক ধরে নাম।
যদি কিছু বল। চির বিচ্ছেদের ক্ষণ
ঘনায়ে আসিল তাহা নাই কি স্মরণ?
নিবিল রাতের দীপ। প্রভাতের আলো
অবশেষে দুজনারি নয়নে মিলালো।
বিমূঢ় অন্তর, মূক অশ্রুহীন শোক
সহসা হেরিল পাশে আরেক ভূলোক।
ভেঙেছে মাটির ঘর।
শুধু পথ চাজি।
তারি সঞ্চয়ের আজ এনেছি অঞ্জলি।
(৪ঠা ভাদ্র, ১৩২৫)

অল্প কথায়, সংযত প্রকাশে, এ কবিতাটি অতুলনীয়। কথা কম, কিন্তু এমন ঘনসন্নিবিষ্ট যে তার অন্তরালে যে বিরাট এক হিমশৈল নিমজ্জিত অবস্থায় আছে তা এর উপরিতলের অংশটি হৃদয়ে এসে ধাক্কা দেওয়ামাত্র বোঝা যায়। মনের কোন্ অবস্থায় এ কথাগুলি বলা, তা একবার কল্পনা করলে এর সমস্ত বেদনার সুরটি পাঠক মনে সঞ্চারিত হয়ে যায়।

পিতৃপিতামহ গৃহের বিরাট গ্রন্থসংগ্রহের কোনো বই বোধ হয় পড়তে বাকি ছিল না। ইংরেজীও শিখলেন নিজের গরজে। শিল্পীমন এইভাবেই মনের ভিতরেও একটি মুক্তির পথ খুঁজে নেয়। সমস্ত পাঠসাধনাই অন্তরের জরুরি তাগিদে। তাঁর শিল্পীসত্তা এইভাবেই নিজেকে নিজে পুষ্ট করেছিল। আগেই বলেছি শিল্পীমনের উন্মেষে স্কুলকলেজের নির্দিষ্ট পাঠ অপরিহার্য নয়। অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও এর বহু দৃষ্টান্ত আছে, এবং লেখিকাদের মধ্যেও আছে। কিন্তু অন্য কোনো বাঙালী লেখিকা প্রবাসজীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হয়ে সেই দেশের কথা মাতৃভাষায় এমন সুন্দর করে বোধ হয় ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। আদৌ কেউ পেরেছেন কি না আমার জানা নেই। সবরকম গল্পই তিনি লিখেছেন, কিন্তু প্রত্যেকটি জিনিসই তাঁর দেখা ও অভিজ্ঞতা থেকে। কল্পনা করে অভিজ্ঞতার বাইরের বিষয় নিয়ে তিনি কিছু লিখতে চেষ্টা করেন নি। অনেক প্রাচীন

কাহিনীও পুনর্গঠন করেছেন বটে, কিন্তু তার সমস্ত আবেষ্টনটা নিজের চোখে দেখে এবং মনে অনুভব করে তবে। তাঁর শিল্পসাধনা প্রধানতঃ বাস্তব সীমানাতেই আবদ্ধ। সার্থকতাও তাঁর এইখানে।

ব্যঙ্গদৃষ্টিও তিনি লাভ করেছেন অদ্ভুত। সমাজের বহু অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী আজও সক্রিয়।

সমাজসেবিকারূপে সর্বভারতীয় খ্যাতিসম্পন্না কন্যা শ্রীমতী অশোকা গুপ্ত আমাকে লিখছেন, "মার কথা অনেক লেখা যায়। তাঁর গল্প বলার শেষ এখনও হয় নাই। এত পড়াশুনা করিতে, ও এত অসুবিধা ও সকল রকম কষ্টের মধ্যেও লেখার চর্চা রাখিতে পারিয়াছেন এটা আশ্চর্য মনে হয়। আমরা যখন ছোট ছিলাম, নানারকম বই পড়িবার ও দেশ বেড়াইবার যে সুযোগ পাইয়াছিলাম সে মায়েরই জন্য। তাছাড়া আরও দেখিয়াছি নিজের কথা না ভাবিয়া অন্যের জন্য নিজেকে ক্ষয় করিতে।...কঠিন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে নির্লিপ্ত থাকিয়া সাহিত্য-সাধনা করা সম্ভব হইয়াছে বোধ হয় এই জন্য যে আনন্দ পাইবার ঐ একটিমাত্রই অবলম্বন তাঁর নিজের হাতে ছিল।"... (চিঠি, ২৬-১১-৬৬)

শ্রীমতী অশোকার প্রত্যেকটি কথা সত্য, এবং সে কথা আমি জ্যোতির্ময়ীর সংস্পর্শে এসে নিজেও অনুভব করেছি। তা না হলে তাঁকে এতখানি শ্রদ্ধার চোখে আমি দেখতে পারতাম না। একদিকে কঠোর কর্তব্যবোধ, অন্যদিকে স্নেহমমতায় হৃদয়খানি ভরা।

পড়াশোনার ব্যাপারে দেখেছি সমসাময়িক কোনো বই বা পত্রপত্রিকা তাঁর তালিকা থেকে বাদ পড়ে নি। ব্যাপকভাবে পড়েছেন এবং মনে রেখেছেন। তাই বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরেই আমি যুগান্তর সাময়িকীতে যে রচনাটি লিখেছিলাম, তা পড়ামাত্র বনবিহারী সম্পর্কে তাঁর ছোট্ট একটুখানি স্মৃতি আমাকে লিখে পাঠিয়েছিলেন, আমি তা আমার বনবিহারী মুখোপাধ্যায় সম্পর্কিত প্রবন্ধে (সাপ্তাহিক বসুমতী, ৮-৯-১৯৬৬) উদ্ধৃত করেছি। বনবিহারীর লেখা তিনি প্রত্যেকটি মনোযোগের সঙ্গে বঙ্গবাণী প্রভৃতি কাগজে পড়েছেন এবং তা যত্ন করে সংগ্রহ করে রেখেছেন। এবং তাঁরই সংগ্রহ থেকে অধুনা অপঠিত এবং বিস্মৃত "সিরাজির পেয়ালা" নামক অবিস্মরণীয় উপ-উপন্যাসটি সাপ্তাহিক বসুমতীতে (১৪-৪-৬৬) পুনর্মুদ্রণ সম্ভব হয়েছিল। বনবিহারীর দশচক্র, যোগভ্রষ্ট, সিরাজির পেয়ালা, প্রভৃতি উপন্যাস তাঁর মনকে কি পরিমাণ নাড়া দিয়েছিল এবং তিনি ঐ সব কাহিনীর অন্তর্নিহিত বাণীটি কিভাবে অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন তার আভাস আছে সেই উদ্ধৃত রচনাটিতে। আমাদের দেশের কোনো লেখিকা অন্যের লেখা সম্পর্কে এতখানি সশ্রদ্ধ মত প্রকাশ কোথাও করেছেন কি না আমার জানা নেই। আমি "অন্যের" অর্থে প্রকৃত শক্তিশালী অথচ অবজ্ঞাত লেখক সম্পর্কেই বলছি। অন্যের অনুকরণে প্রসিদ্ধ লেখককে প্রশংসার কথা বলছি না। অবশ্য এ কাজে লেখার মূল্য নিরূপণের সহজ ক্ষমতা এবং সে বিষয়ে মত প্রকাশের মতো সাহস থাকা চাই। এ সাহস আসে যখন নিজেরই প্রতি নিজের প্রকৃত শ্রদ্ধা জাগে। যখন নিজের একটি জীবনদর্শন রচিত হয়ে যায়।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর "সময় ও সংস্কৃতি" নামক নানা তীর্থ পর্যটনের কাহিনীগুলির মধ্যে পাওয়া যাবে তাঁর এই পরিপক্ব মনের পরিচয়, তাঁর জীবন-দর্শনের পরিচয়, তাঁর স্থিরবুদ্ধি এবং জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত মনের পরিচয়।

তাঁর রাজস্থানী জীবনচিত্রগুলির কথায় ফিরে যাই। বর্তমানকালে রাজ্যে রাজ্যে বন্ধুত্ব ও সংস্কৃতির আদানপ্রদান, জাতীয় জীবনের একটি অঙ্গ হতে চলেছে। সেদিক থেকে বিচার করলে জ্যোতির্ময়ী তাঁর অজ্ঞাতসারেই এ কাজ বহুদিন পূর্ব থেকে আরম্ভ করেছেন। তিনি রাজস্থানী সাহিত্য বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে বাঙালী পাঠককে ঐ রাজ্যের সঙ্গে পরিচিত করাতে চেষ্টা করেন নি। তিনি রাজস্থানী জীবনকেই বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন। তাঁর এ সব গল্পের মধ্যে রাজস্থানের বড় ঘর ছোট ঘর সবার ঘরের কথাই চিত্রিত হয়েছে। এ যেন কোনো রাজস্থানী লেখিকা বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষার মতো আয়ত্ত করে রাজস্থানী জীবনচিত্র এঁকে গেছেন। এবং এ কথা অনেকখানি সত্য বৈকি। জ্যোতির্ময়ী রাজস্থানী মেয়েই তো!

এখন ওদেশের আসল কোনো লেখক বা লেখিকা যদি এই গল্পগুলি তাঁদের ভাষায় অনুবাদ করেন, তবে তিনিই এগুলির মূল রচয়িতা বা রচয়িত্রীরূপে ভুল করে পরিচিত হয়ে যাবেন। কিন্তু ও রাজ্যে এমন কথাশিল্পী কেউ আছেন কি? জ্যোতির্ময়ীর আরাবল্লীর অন্তরালে বই পড়ে রাজশেখর বসু লিখেছিলেন (২-১০-৫৮) "কয়েক বৎসর আগে কোনও মাসিক পত্রিকায় আপনার ওমদা বাঈ-এর কথা পড়ে মনে হয়েছিল, বাঙলা সাহিত্যে একজন অসাধারণ শক্তিমতী লেখিকার আবির্ভাব হয়েছে। 'আরাবল্লীর অন্তরালে' বই-এ আপনার পূর্ণশক্তির পরিচয় পাওয়া গেল। টমাস হার্ডির স্নিগ্ধ পল্লীচিত্র, আরব্য উপন্যাসের রহস্য, আর কঠিন পাষাণের বেদনা আপনি একত্র সমাবেশিত করেছেন।"...

বিহারী-বাঙালী, রাজপুত-বাঙালিনীর সাহিত্য পড়ে মুগ্ধ!

রাজস্থানের পক্ষ থেকে জ্যোতির্ময়ীকে পৃথকভাবে সম্মানিত করা উচিত। এমন সহানুভূতির সঙ্গে, এমন শিল্পীর দৃষ্টিতে, ওদেশের মানুষকে ওদেশের কেউ দেখেছেন কি না আমার জানা নেই।

"আরাবল্লীর আড়ালে"র আরম্ভে লেখিকার একটি নিবেদন আছে, ওদেশের যে সব মানুষ তাঁর গল্পে স্থান পেয়েছে তাদের কিছু পরিচয় তাতে আছে। তার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজনীয় মনে করি। তিনি বলছেন (১৯৫৬)...

"ছোটবেলায় প্রায় ৪৫ বৎসর আগে রাজস্থানের একটি রাজ্যের অন্তঃপুরে আমাদের বাড়ির গৃহিণীদের আমন্ত্রণনিমন্ত্রণে যাতায়াত ছিল। মোগল হারেমের মতই সেই অন্তঃপুরের ব্যবস্থা ছিল। বাইরে প্রহরী ভিতরে প্রতিহারিণী দ্বারা রক্ষিত খোজাশাসিত সে অন্তঃপুরে।

"অসংখ্য সুন্দরী নারী নানা বিশেষণে, পাত্রী-পর্দায়েৎ-পাশোয়ান নামে অভিহিত তারা, রূপে অতুলনীয়, গানে নাচে বাজনায় অভিনয়ে সুপটু প্রায় সকলেই। মহারাণী ও রাণীদের তারা সখী, সঙ্গিনী, দাসী। বাপের বাড়ি থেকে যৌতুক পাওয়া কিনে আনা, খুঁজে আনা মেয়ে তারা। কখনো বা উপযাচক হয়ে দরিদ্র বাপ মাও দিয়ে গেছে সুন্দরী মেয়ে।—যদি কোনোদিন রাজনেত্রবর্তিনী হয়! নিজেও এসেছে কতজন ঐ আশায়। রাজপুতের মেয়ে প্রায়ই সুন্দরী হয়। রাজস্থানের অন্য বর্ণের মেয়েরাও কম সুন্দর নয়। ব্রাহ্মণ বৈশ্যদের (বামন বেনিয়া) মেয়েরাও রূপবতী।

"বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহের 'রূপনগরী'দের রূপের কথা, মোগল অন্তঃপুরের রূপসীদের কথা যে কত সত্য তা রাজোয়াড়ার অন্তঃপুরে যাঁরা গেছেন তাঁরা দেখেছেন। রাজস্থানের হাটে মাঠে-বাটেও উঁচু খোঁপা বা লম্বা বেণী ধারিণী গ্রাম্য ঘাগরা ও ওড়না (লুগড়ী)—কাঁচুলি পরিহিতা গ্রাম্য কন্যারাও কম সুশ্রী, সুন্দরী নয়।......সেকালের সেই অনতি-পরিণত মনে এবং মনের চোখে তাদের দেখেছিলাম। কখনো নানা অভিনয়-মুখর উৎসব জলসায়, কখনো শোক বিয়োগের সভায়। কোনো সময় শুধুই গূঢ় উদ্দেশ্যময় রাজনীতির আলাপ আলোচনাময় সভায়। অবশ্য পুরুষহীন! শুধু রাজা ও রাজপুত্র এবং তাঁর প্রেয়সীদের তনয় ছাড়া (লালজী সাহেবরা রাজার

কেবল আড্ডাটাকে জমিয়ে রাখবার জন্যেই

অঞ্জন কর

বিশ্বাসের ভিতগুলি জীবনে এখনো শক্ত সামর্থ্য ক'রে গড়াই হ'ল না,
কেবল আড্ডাটাকে জমিয়ে রাখবার জন্যেই এতসব শব্দের ব্যবহার, নঞর্থক
অভিনয় কৌশল।
কিন্তু একদিন এই সব গোপন সর্তাবলী কারচুপির মতই ফাঁস হয়ে পড়বে
তখন আমি তুমি কে কোথায় ছিটকে পড়ব, শুধু একটিমাত্র আঁচ করে নেওয়া ছাড়া
অন্যভাবে ভাবতে ভীষণ ভয় হয়
তখন হয়ত পায়ের নীচে আমাদের কারুর মাটিই থাকবে না
জমিনে জমিন হাঁ করা যে ফাটল এতাবৎকাল পুষে আসছে তার একটা উদ্ধারও তো
কোনমতে হতেই হবে
অন্ধকারে বিশ্বাসের অপমৃত্যু, এবং মৃত্যুর গলায় ফাঁস লটকিয়ে অন্যমৃত্যুতে উত্তরণ
তখন তুমি আমি কে কোথায় ছিটকে পড়ব, শুধু একটিমাত্র আঁচ করে নেওয়া ছাড়া
অন্যভাবে ভাবতে ভীষণ ভয় হয়।

মোটকথা, বিশ্বাসের ভিতগুলি জীবনে এখনো পর্যন্ত শক্ত সামর্থ্য করে গড়াই হল না
পায়ের নীচের মাটি আমাদের ঠিক আছে কি না সেটা ভালোভাবে পরখ করে নিয়ে
তবেই না চলবার নিয়ম
জ্যোৎস্নার ভিতরও তো বহুবিধ আত্মহত্যা হয়, অনেক যুবতী মেয়ে গলায়
দড়ি বেঁধে নক্ষত্রের দিকে ঝুলে থাকে
মোদ্দা কথা, আমরা কোনকালে তেমন তৎপরই ছিলাম না
ভালোবাসার পূর্ব মুহূর্তে যেমন তৎপর হ'তে হয়
কেবল আড্ডাটাকে জমিয়ে রাখবার জন্যেই এতসব শব্দের ব্যবহার, নঞর্থক
অভিনয় কৌশল।

[illegible] কিন্তু রাজপুত্র নয়) সেখানে আর কারো প্রবেশাধিকার ছিল না। একেবারে খোজাশাসিত অন্তঃপুর। রাণীদের মুখ ঢাকা। মহারাণী বাদে সকল রাণীই অবগুণ্ঠনবতী। সখীদের শুধু মাথায় ওড়না, মুখ ঢাকা নয়।

"কালে ধর্মে এখন বহু রাজ্যেই পর্দা ছিঁড়ে গেছে। সখীরা পাত্রীরা আর আছে কি না জানি না। কিন্তু সকল রাজ্য এখনো নতুন রীতি নেয় নি, এও জানি। তাদের জীবনের সুখদুঃখের লীলা বোধ হয় এই একইভাবে এক পুরুষকে (রাজাকে) কেন্দ্র করেই চলেছে। যারা কোনোদিন পত্নী জননীর পূর্ণ সম্মান পাবে না। সন্তানের মা হলেও। এবং বেশির ভাগ যাদের শুধু ঐ একমাত্র আশা নিয়ে বেঁচে থেকে একদিন মৃত্যু হবে।"...

বাংলাদেশের গল্পও অনেক আছে। রাজযোটক (রঞ্জন পাবলিশিং) বইখানিতে যে সব ছোট গল্প আছে, তার রচনা নৈপুণ্য মনকে মুগ্ধ করে। হাসি অশ্রু মিলিয়ে লেখা। এক একটি কাহিনী মনকে ধাক্কা মেরে যায়। ছোট গল্প যেমনটি হওয়া উচিত এগুলি তাই। অবান্তর কথা নেই, অত্যন্ত সংযত সমাপ্তি। "মনের অগোচরে" আর একখানি উল্লেখযোগ্য বই। এ ভিন্ন তিনি মেয়েদের নানাদিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আগের যুগে অনেক লেখা লিখেছেন।

প্রচারবিমুখ শক্তিমতী নীরব সাহিত্য-সেবিকা জ্যোতির্ময়ী দেবী সাহিত্যের ইতিহাসলেখকদের কাছে অপরিচিত। চল্লিশ বছরের উপরে লিখছেন, এবং বাংলার সকল প্রধান সাময়িক পত্রে তাঁর লেখা ছাপা হয়েছে। গ্রন্থরূপেও অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু তবু ইতিহাসলেখকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছেন তিনি। এ বিষয়ে তিনি বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের দলে।

কিন্তু জ্যোতির্ময়ী দেবীর মনের আভিজাত্য তাঁকে আত্মপ্রচারের হীনতায় নামতে দেয় নি। মনে হয় এ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত এবং কঠোরভাবে উদাসীন। তিনি মনের মধ্যে যে আলো লাভ করেছেন, বেদনাপথের পথিকরূপে জীবনভোর যে সাধনার পথে অক্লান্ত চরণে এগিয়ে চলেছেন, তার কাছে নিন্দাপ্রশংসার একই মূল্য। এবং তাই তো তিনি জোরের সঙ্গে আমাকে লিখতে পারলেন "সত্য কঠিন, তাকে ভালবাসতে পেরেছি (রবীন্দ্রনাথ), অসত্য প্রতিষ্ঠার বা খ্যাতির মোহ আমার নেই। ও বৃথা নাম আমি নেব না।" (চিঠি, ১৯-৯-৬৬)।

এই মহত্তর সত্যে প্রতিষ্ঠিত মহীয়সী নারীকে আমি মনে মনে প্রণাম জানিয়ে ধন্য বোধ করছি।

নির্দলীয় গণতান্ত্রিক সম্মেলনে ভাষণরত শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ

ত্রিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্মেলন

বিগত অক্টোবর মাসে দিল্লীতে যে ত্রিশীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাতেই স্থির হয়েছিল যে ত্রিরাষ্ট্রের বাণিজ্য মন্ত্রী একত্রিত হয়ে একটি অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতার বিষয় আলোচনা করবেন। বর্তমান মাসে যুগোশ্লাভিয়া থেকে ডঃ আলেকজান্দার গ্রিলিকভ, সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র থেকে শ্রীযুক্ত হাসান আব্বাস ও ভারতের পক্ষে শ্রীমানুভাই শাহ এই ত্রিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্মেলনের আলোচনা শুরু করেন। আলোচনা অন্তে যে যুক্ত ইস্তাহার প্রচারিত হয় তাতে ত্রিরাষ্ট্রই পরস্পরকে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও সুবিধাদানের অঙ্গীকার স্বাক্ষরবদ্ধ করেন।

কেবলমাত্র পারস্পরিক আমদানী-রপ্তানীর ক্ষেত্রে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতিই নয়, শান্তিপ্রিয় এবং সহাবস্থানে বিশ্বাসী এই রাষ্ট্রত্রয়ী উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও যথাসম্ভব পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করবে। প্রতিশ্রুতি অনুসারে কাজ চালানোর জন্য কয়েকটি কমিটি বেলগ্রেড কায়রো এবং দিল্লীতে কার্য পর্যালোচনা এবং পরামর্শদান করবেন। এই কমিটিতে তিন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ একত্র উপবেশন করবেন ও অধিকতর উন্নতির জন্য আলোচনা চালিয়ে যাবেন।

অনুন্নত কিম্বা আরও একটু মর্যাদা দান করে পশ্চিম এ্যাফ্রোশীয় দেশগুলির কোন কোনটিকে উন্নয়নশীল দেশ বলে চিহ্নিত করেছে এবং অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক সাহায্যের নামে সেসব দেশে নয়া উপনিবেশবাদ প্রসারে সক্রিয় হাত বাড়িয়ে ধরেছে। এমন অবস্থায় সমাজবাদী যুগোশ্লাভিয়া, সমাজতন্ত্রের আদর্শে গঠনশীল সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র এবং সমাজবাদের স্বপ্নসম্বল ভারত যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তিতে আবদ্ধ হল এটা পশ্চিমী দুনিয়া অবশ্য খোলা মনে গ্রহণ করতে পারবে না। কারণ পশ্চিম প্রকৃতপক্ষে এশিয়া-আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশগুলিকে যথার্থভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে দিতে চায় না। সে চায় এই সমস্ত দেশে তার বাজার সম্প্রসারণ করার জন্য প্রয়োজনীয় উন্নতি বিধানে সাহায্য দান করতে। ভারত আরব যুগোশ্লাভ মিতালি সেই পশ্চিমা বাণিজ্যের খপ্পর থেকে বাইরে আসতে পারলে এ্যাফ্রো-এশিয়ার জোটনিরপেক্ষ দেশগুলি তার দ্বারা লাভবান উৎসাহী এবং আশান্বিত হয়ে উঠবে।

এই বাবদে এই ত্রিপাক্ষিক মৈত্রী কেবলমাত্র তিনটি রাষ্ট্রের পক্ষেই নয়, সমগ্র এ্যাফ্রো-এশিয়ার জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির ক্ষেত্রেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

৭ই নভেম্বরের নেপথ্যে

৭ই নভেম্বর ১৯৬৬ সাল। ভারতের দিনপঞ্জীতে এই বিশেষ দিনটি কতিপয় দুরভিসন্ধিপূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল মানুষের চক্রান্তের বীভৎস রূপ দুঃস্বপ্নের মতো রাজধানী দিল্লীর ঘাড়ে চেপে বসেছিল। প্রতিক্রিয়াশীলরা একটি সুপরিকল্পিত তাণ্ডব নৃত্যের আয়োজন করেছিলেন। সবকিছু ভেঙে গুঁড়িয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করার মৎলব এঁটেছিলেন এবং গরুতে-গোঁড়া কিছু অরাজনৈতিক উগ্র মানুষকে লেলিয়ে দিয়েছিলেন এমন কিছু দুষ্কার্য সাধন করতে যার পেছনে চক্রান্তকারী প্রতিক্রিয়াশীলদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল সুস্পষ্ট। কিছু গোঁড়ামি-অন্ধ মানুষ এঁদের নেপথ্য নির্দেশে যে আক্রমণ পরিকল্পনাকে রূপদান করেছিল তার মধ্যে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজের গৃহ আক্রমণও বাদ পড়ে নি। সৌভাগ্যবশত শ্রীকামরাজ এঁদের হিংস্র আক্রমণের হাত থেকে কতিপয় সুবুদ্ধিসম্পন্ন শুভানুধ্যায়ীর দ্বারা রক্ষা পেয়েছিলেন।

আশ্চর্যের বিষয়, এই হিংসাত্মক আক্রমণের প্রভূত নিন্দাবাদ ও এই আক্রমণের বিষয়ে বিচার-বিভাগীয় তদন্তের অনুরোধ থাকা সত্ত্বেও এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষীয় তরফ থেকে একমাত্র প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দার অপসারণ ব্যতীত (যদিও এ সম্পর্কে কোন দাবি ছিল না) অন্য কোনরকম কার্যকরী পন্থা গৃহীত হয় নি। এতোবড় একটা ন্যক্কারজনক ঘটনা, যার জন্য মোটা টাকা এবং কূট চক্রান্তের এহেন সুপরিকল্পিত আয়োজন করা হয়েছিল, সে ঘটনা সম্পর্কে কোন তদন্তে কর্তৃপক্ষ যথার্থ উৎসাহ কেন বোধ করলেন না, সে বিষয়েও গবেষণা কম হয় নি এবং আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্য শ্রীকামরাজকে এ বিষয়ে বহুতর প্রশ্নবাদ করে ৭ই নভেম্বরের পরিস্থিতির ওপর তাঁর মতামত জানবার জন্য একাধিক সাগ্রহী ব্যক্তি চেষ্টার কসুর করেন নি। শ্রীকামরাজ নিজেকে এ বিষয়ে যথাসম্ভব নীরব রেখেছিলেন। পরিস্থিতির একান্ত বিচার না করে শ্রীকামরাজ কিছু বলতে রাজী হন নি। বর্তমানে তিনি সমস্ত

ধোঁয়া অপসারিত করে ৭ই নভেম্বরের ওপর তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন, যা যুগপৎ গভীর দুশ্চিন্তা ও ভবিষ্য-আশঙ্কার কারণ স্বরূপ সমুপস্থিত হয়েছে সমগ্র গণতন্ত্রী ভারতবাসীর সম্মুখে।

কামরাজ অপসারণ চেষ্টায় নোংরা হাত

মাদ্রাজে তাঁর নির্বাচনী সফরকালে কামরাজ অবশেষে ৭ই নভেম্বরের চক্রান্তকারীদের অন্তরালবর্তীদের সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন এবং সালেম জেলায় কতিপয় নির্বাচনী সভায় রীতিমত বিস্ময়ের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন। মাসাধিক-কাল কঠিন নীরবতার পর শ্রীকামরাজ জানিয়েছেন যে, শ্রীকামরাজের প্রাণহনন প্রচেষ্টায় সক্রিয় ছিলেন কতিপয় জাঁদরেল পুঁজিপতি। "তাঁরা এখনো আমার পেছনে" তাঁদের ষড়যন্ত্রের দাবা পরিচালনা করছেন, শ্রীকামরাজ এমত মন্তব্যে চতুর্দিক সচকিত করে দিয়েছেন। "আমাকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য মনে হয় তাঁরা বদ্ধ-পরিকর" একথা শ্রীকামরাজ যখন বলেন, তখন সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, তিনি বহু অনুসন্ধানের পর একটি স্থির এবং প্রামাণ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। না হলে, ৭ই নভেম্বরের ঘটনা নিয়ে দেশ-ব্যাপী যখন গুরুতর বিতর্কজালের সৃষ্টি হয়েছে, যখন শ্রীনন্দাকে হটানোর পশ্চাতে সমাজতন্ত্রবিরোধী পুঁজিবাদী উচ্চাশার সক্রিয় হাত আছে বলে দ্বিধাহীন মন্তব্য বিভিন্ন মহল থেকে উত্থাপিত হয়েছে, শ্রীকামরাজ তখনও কোন মন্তব্যে রাজী হন নি।

কিন্তু এতোদিন পর শ্রীকামরাজের এহেন অভিযোগকে অবহেলা করা সম্ভব নয়। তাছাড়া তিনি এমন এক পরি-স্থিতিতে জাঁদরেল পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন, যখন এই পুঁজিপতিচক্রের দুরভিসন্ধির নানারকম চিহ্ন ভারতের রাজনৈতিক আকাশে অশুভ অন্ধকারের ঘনঘটা সমাচ্ছন্ন করছে। এমন কি খোদ কংগ্রেসের মধ্যেই এ'দের প্রভাব যে ক্রমশ চক্রবৃদ্ধির হারে বাড়ছে, এ অভি-যোগ কেবলমাত্র দেশীয় তথ্যাভিজ্ঞ মহলেই নয়, বিদেশেও দুশ্চিন্তার ছায়াপাত করেছে। আরও একটি লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, শ্রীকামরাজসহ কংগ্রেসের কিছু উদারপন্থী নেতাকে দলীয় সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ক্রমশ কোণঠাসা করে ফেলা হচ্ছে, এমন নজীরও দু-একটি ইতিমধ্যেই সকলের সামনে আহত বিস্ময়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পরিস্থিতি যথেষ্ট গুরুতর এবং সংকটাপন্ন না হলে শ্রীকামরাজ রাজনৈতিক হত্যা বা অপসারণের মতো একটি গুরুতর প্রশ্ন নিশ্চয়ই উত্থাপন করতেন না। এমত অবস্থায়ও ৭ই নভেম্বরের ঘটনা সম্পর্কে কী করে একটি তদন্ত অনুষ্ঠানের প্রশ্ন চাপা পড়ে থাকতে পারে তা দুর্জ্ঞেয়। ক্ষমতাসীন দলের দলনেতা স্বমুখে যে চক্রান্তের কথা বলেছেন, তাতে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত অবশ্যই অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত।

দেশের সর্বত্র আজ যে অরাজকতা বিস্তৃতিলাভ করছে, আন্দোলনের নামে বহুক্ষেত্রে যে জঘন্য আক্রমণের ও বহ্ন্যুৎসবের প্রহেলিকা প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে এবং প্রত্যেকটি আক্রমণ যখন গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে টেক্কা মেরে ফ্যাসিস্ত গুণ্ডামীর করতলগত হয়ে পড়ছে, তখন একথা ধীরভাবে বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে যে, এক শ্রেণীর মদতদার এর পেছনে প্রচুর অর্থ এবং উস্কানী প্রয়োগ করে না গেলে, গণতান্ত্রিক আন্দোলন এমন মারমুখী বিদ্রোহের রূপ নিতে পারে না।

অনেক ক্ষেত্রেই আন্দোলনের সংগঠক দলগুলি হিংসাত্মক কার্যকলাপের শুধু নিন্দাই করেন নি, সাশ্চর্যে বলেছেন, হিংসার উন্মত্ততার জন্য তাঁরা আদৌ কোন কল্পনাই করতে পারেন নি। বস্তুত, প্রায় ক্ষেত্রেই প্রকৃত আন্দোলনকারীকেই ঘটনা-প্রবাহ থেকে অসহায়ভাবে সরে দাঁড়াতে হচ্ছে, যখন অজ্ঞাতপরিচয় গুণ্ডাশ্রেণীর হাতে সেই আন্দোলন বিকৃত রূপ পরিগ্রহ করছে।

আজকের আন্দোলনের স্বরূপ সম্পর্কে চিন্তা করলে দুটি কি তিনটি লক্ষণই দেখতে পাই ঃ

কর্মচারী বা শিক্ষক আন্দোলন, মাহিনা-বৃদ্ধির আন্দোলন, যাকে বলা যায়, ক্ষুধা-জনিত আন্দোলন। অসম্ভব অর্থনৈতিক অবস্থায় খাবি-খাওয়া মানুষের প্রাণরক্ষার আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ। এ আন্দোলন একান্ত স্বাভাবিক; মানুষ মাত্রেই তার রুটি সংগ্রহের চেষ্টা করবে। স্বাভাবিক পথ রুদ্ধ হয়ে গেলে, সরকারী ব্যর্থতা দ্রব্যমূল্য বাঁধতে না-পারলে, চব্বিশ ঘন্টায় আঠারো ঘণ্টা রুটির লড়াই করেও বাঁচবার মতো অবস্থা সৃষ্টি করতে না পারলে, আন্দো-লনের পথ সুস্থ মানুষ মাত্রকেই গ্রহণ করতে হবে। এ আন্দোলনকে কোন বিশেষ দলের উত্তেজনাকর পরিস্থিতি রচনার চক্রান্ত বলা যায় না। এবং যেহেতু এ আন্দোলন 'বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তের' মাহিনা বৃদ্ধির আন্দোলন মাত্র, সেজন্য অতি-উৎসাহীদের দ্বারা প্রচারিত এ আন্দোলনকে কোনক্রমেই উত্তেজনায় প্ররোচিত বলে গণ্য করা যেতে পারে না। মানুষের ইতিহাস বাঁচার লড়াই-এরই ইতিহাস। এ আন্দোলন 'ন্যূনতম অবস্থায় বাঁচতে দাও' বলে ভিক্ষা-পাত্র নিয়ে রাজপথে উপস্থিত হয়েছে। এ আন্দোলন অবশ্যম্ভাবী। এ আন্দোলনকে গলা টিপে হত্যা করা যায় না, ভয় দেখিয়ে ঠাণ্ডা করা যায় না, উপদেশ দিয়ে মন্ত্রশান্ত করা যায় না। সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধি-কারের বলেই এ আন্দোলন চলবে, যতক্ষণ না, মানুষ তার বাঁচার মতো অবস্থা অর্জন করছে।

দ্বিতীয় আর এক আন্দোলন দেশের টনক নড়িয়ে দিয়েছে, ছাত্র আন্দোলন, যাকে বলা যেতে পারে হতাশাজনিত আন্দোলন।

এ আন্দোলন অনেক ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব-হীন। ছাত্রসমাজের অন্ধকার ভবিষ্যৎ দুর্বিসহ বর্তমান অর্থনৈতিক পরিবেশ; শিক্ষাক্ষেত্রে স্বার্থসন্ধানীর ক্ষমতাচক্র; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনীতির অনুপ্রবেশ; দেশজোড়া আদর্শস্থানীয় নেতার অভাব; নেতৃবৃন্দের মধ্যে শৃঙ্খলাহীন আচরণ; দেশে সৃষ্টিশীল চিন্তার দৈন্য এবং স্বার্থসন্ধিৎসু সুবিধাবাদের প্রাদুর্ভাব; শিক্ষানীতিতে স্বাধীন চিন্তার গতিরোধ ও ছাত্র আন্দোলন দমনের জন্য সরকারী হস্তক্ষেপ কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য দূরী-করণের জন্য সরকারী নিশ্চেষ্টতা; বিশ্ব-বিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বার রুদ্ধ করে ছাত্রভবিষ্যৎকে অধিকতর তমিস্রাচ্ছাদিত করার অপচেষ্টা,—এ সমস্তই ছাত্রশ্রেণীকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হতবুদ্ধিকর পরিস্থিতির দিকে ক্রমশ ঠেলে দিচ্ছে। সরকারের পুলিশতন্ত্রের ওপর অত্যধিক আস্থা, ছাত্রসমাজে বিপুল অনাস্থার সৃষ্টি করেছে। ছাত্র সম্প্রদায়কে একথা ভাবতে দেওয়া হচ্ছে না যে, আজকের স্বাধীন ভারতে তাদেরও একটি গঠনশীল ভূমিকা আছে। বরং তাদের ভাবতে বাধ্য করা হচ্ছে যে, ক্ষমতার দ্বারা একটি আরোপিত সমাজব্যবস্থায় একটি আরোপিত শিক্ষা-ব্যবস্থাকে মেনে নিয়েই তাদের অন্ধের মতো অগ্রসর হতে হবে। প্রশ্ন করার অধিকার তাদের থাকবে না।

আমরা আজ স্বাধীনতার জন্মলগ্ন থেকে উনিশটা বছর পার হয়ে এসেছি। ছাত্রসমাজের মনেও স্বাধীন চিন্তার স্ফুরণ দেখা দিয়েছে। অথচ জীবনের এক-তৃতীয়াংশ পরশাসিত বৃদ্ধ রাজনীতি ভারতের এই পরিবর্তমান আশা-আকাঙ্ক্ষার আবহাওয়ায় নিজেকে খাপ খাওয়াতে অক্ষম। এমতাবস্থায় ছাত্র-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সংঘর্ষ অবধারিত। কিন্তু যেহেতু ছাত্রদের মধ্যেও সুস্থ নেতৃত্ব নয়া ভারতের স্বাধীন ইচ্ছাকে সঠিক উপস্থাপিত করতে এখনও অপারঙ্গম সেজন্য ছাত্র-অসন্তোষ বহু ক্ষেত্রে নেতৃত্বহীন ও উদ্দেশ্যবিহীন বিক্ষোভ প্রকাশের দ্বারা তার ইচ্ছার ভ্রূণকে বারম্বার হত্যা করছে মাত্র।

নিয়ে ভারতীয় গণতন্ত্রের ওপর অন্য দিকে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে এগিয়ে আসছে কিছু চক্রান্তকারী শক্তি। সংগুপ্তভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে একদল পরস্বাপহরণকারী পুঁজিবাদী শকুন। এরা চাইছে সর্বত্র গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বীভৎস হিংসাত্মক ফ্যাসিবাদের দ্বারা বিভ্রান্ত করতে। গণতান্ত্রিক আন্দোলন তাই প্রতিপদে দু-তরফে মার খাচ্ছে। এক, বৃদ্ধ প্রশাসন ভারতের পরিবর্তিত আশা-আকাঙ্ক্ষা উপলব্ধি করতে না পেরে ঔপনিবেশিক মালিকানা মনোভাবের দ্বারা নিগ্রহের পথকে বেছে নিচ্ছে; দুই, হিংসাত্মক অশুভ শক্তি গণতন্ত্রের গলায় পা দিয়ে দেশ থেকে গঠনমূলক চিন্তাকে অপসারিত করে বলপ্রয়োগের ভঙ্গুর পথকে অবলম্বন করতে উৎসাহী হয়ে পড়ছে।

এই উভয় অবস্থাই মারাত্মক এবং অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। যার থেকে আশু পরিত্রাণ সম্ভব না হলে, আমাদের সম্মুখে অন্ধকার ভবিষ্যৎ তার পক্ষ উত্তরোত্তর প্রসারিত করবে।

শ্রীকামরাজ যে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন, আমাদের প্রসঙ্গত আলোচনায় তার গুরুত্ব অধিকতরভাবে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পেলাম। শ্রীকামরাজ কংগ্রেস থেকে সমাজতান্ত্রিক চিন্তার অপসারণের নেপথ্যে ক্রিয়াশীল চক্রান্তের কথা জানিয়েছেন।

দেশের বর্তমান পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যাবে এই চক্রান্ত রাহুর মতো আমাদের সমাজজীবনের সর্বস্তরকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। সমস্ত সুস্থ আন্দোলনকে বিপথগামী করে এবং ক্ষমতাযন্ত্র কবলিত করে এরা এক গূঢ় ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করছেন, যার থেকে তিলমাত্র বিলম্ব না করে আমাদের প্রত্যেকেরই সাবধান থাকা কর্তব্য। অন্যথা এই বিভীষিকা আমাদেরই বুকে চেপে বসবে।

একটি গোয়ানিজ মহিলার কীর্তি

জনৈকা গোয়ানিজ তরুণী, তিনি শিক্ষিতা বলেও প্রকাশ, লন্ডনের এক 'দেহের মাপে সৌন্দর্য' বিচারের সভায় উপস্থিত হয়ে সুন্দরী খেতাবের একটা রবার স্ট্যাম্প পেয়ে গেছেন তাঁর সযত্ন লালিত শরীরের ওপরে। এই স্ট্যাম্প মেরে ছেড়ে দেওয়া হলে স্ট্যাম্পপ্রাপ্তা নারী বিলাসী দুনিয়ার দুয়ারে অবসর বিনোদনের পার্টিতে কিছু আমন্ত্রণ পেয়ে থাকেন। মায় স্ট্যাম্পপ্রাপ্তা নারী দু'পয়সা অক্লেশে রোজগারও করে নিতে পারেন। বিলাসী দুনিয়া তার বিলাসের বহুতর উপকরণ সৃষ্টি করেছে। প্রতিযোগিনী নারীর দেহ মেপে তার গায়ে একটা ছাপ মেরে বিলাসপ্রমত্ত অর্থবান সমাজের বিলাসী পার্টিতে ছেড়ে দিয়ে কিছুকাল কৌতুক উপভোগ করার জন্য তাঁরা সৌন্দর্য মাপার একটা সভাও তৈরি করেছেন। এখানে যাঁরা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে সৌন্দর্য মাপাতে আসেন তাঁরা যে বস্তুত সুন্দরী এমন মনে করার কারণ নেই। কেননা, পৃথিবীর ষোল-আনা সুন্দরী মহিলাই এমনতর রগুড়ে জায়গায় নিজেকে উপস্থিত করতে চিরকালই ঘৃণা বোধ করে থাকেন। এখানে যাঁরা আসেন, নিজেকে বিলাসী দুনিয়ার ড্যাব-ড্যাবে চোখের সামনে কৌতুককর বস্তুপিণ্ডে পরিণত করতেই আসেন, প্রতিদানে বিলাসী দুনিয়ার কিছু উচ্ছিষ্ট বিলাসোপকরণ তাঁদের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়। দর্শক মনোরঞ্জনের জন্য সার্কাসে অনেক ক্লাউন থাকেন; ব্যবসায়ীর মাল কাটানোর জন্য বহু সুন্দরীকে ব্যবহার করা হয়; ব্যোমপথে উড্ডীন পয়সাওয়ালা যাত্রীর সুখ-সুবিধা তদারকীর জন্য সুন্দরী নারী নিযুক্ত করা হয়ে থাকে সভ্য দুনিয়া রিশেপসানিস্ট নামক এক শ্রেণীর কেতাদুরস্ত সুন্দরীর পরিশ্রম ক্রয় করে, বিশ্বসুন্দরী স্ট্যাম্প মেরে কোনও নারীকে নিয়ে হুল্লোড় করাও এমনতর পুরুষপ্রধান আত্মসুখী সমাজের বিলাস। এই সাদা কথাটা যাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন, তাঁরা প্রাচুর্যের তখতে উপবিষ্ট বিলাসী পুরুষ প্রাধান্যকে বিকৃতি বলে পরিত্যাগ করে থাকেন। কিন্তু বিলাসী পুরুষপ্রধান সমাজে যে নারী আপনাকে ভোগ্যা হিসেবে গণনা করে ম্রিয়মাণ না হন (উপভোগ সূত্রে ব্যবহৃত হওয়াকেও 'ভোগ্যা' বলা অপরাধ মনে করি না), তিনি তাঁর শরীরে বিলাসপ্রমত্ত সমাজের পরিতোষের ছাপ আষ্টে-পৃষ্টে উল্কির মতো পরিধান করে নিজেকে ধন্যা ও গর্বিতা ভাবতে পারেন। অন্যদিকে প্রকৃত সৌন্দর্য, নারীত্ব ইত্যাদি মর্যাদাহানির লজ্জায় মুখ লুকিয়ে এই ন্যক্কারজনক প্রমোদকলাকে সাবধানে এড়িয়ে যায়।

সম্প্রতি স্ট্যাম্পপ্রাপ্তা গোয়ানিজ মহিলাটি এবম্বিধ কতিপয় প্রতিদ্বন্দ্বিনীর মধ্যে সেরা ছাপ পেয়ে গর্বে বেলুনের মতো ফুলে উঠেছেন। আর এই ফুলন্ত বেলুনটি উড়িয়ে কিছু লোক অদ্ভুত লাফালাফি সুরু করেছেন। তাঁদের ধারণা এই গ্যাসায়িত বেলুনটিকে ভিয়েতনাম পর্যন্ত উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারলে ভয়ঙ্কর একটা লাভ হতে পারে। কেননা দুর্ভাগ্যক্রমে যে-বেলুনকে খুশিমত ফোলানো গেছে তার জন্মস্থান ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষ এমন একটি ঐতিহ্য-সম্পন্ন সভ্যদেশ যেখানে সৌন্দর্যকে প্রকৃতির প্রসাদরূপে সমীহ করা হয়। যদিচ ভারতের এই গোয়ানিজ মহিলাটি যে ভারতললনার সৌন্দর্য-মাধুর্য, 'জিনিয়া' তিলোত্তমা হয়েছেন এমন নয়, কিন্তু হাতের কাছে পেয়ে এ'রই ওপর বিলাসী দুনিয়া তার স্ট্যাম্প মারার সুযোগ পেয়েছে। এই মহিলাটি নিজেকে কতিপয় মার্কিন ধনীর হাতে সমর্পণ করে সুখী হয়েছেন। ফলত মার্কিন হট্টগোল প্রিয় সমাজ এই সংবাদে ভারতের মহান ঐতিহ্যের ওপর একটা টেক্কা মেরেছে বলে আনন্দ-ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারে। এই ব্যাপারে আরও একটি নোংরা রাজনীতির দিক আছে। ভারত মানবতাবিরোধী কোন অভিযানকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহ্য করে না। ভিয়েতনামবাসীকে ভিয়েতনামের মাটিতে বিদেশী মার্কিন সেনা ক্ষত-বিক্ষত এবং নিহত করুক অবাধে এই অন্যায় অত্যাচার ভারত সমর্থন করতে পারে না। এখন বিদেশী হাটে ছাপ-পাওয়া গোয়ানিজ মহিলা রীতা ফারিয়াকে নিয়ে সেই ভিয়েতনামে উড়ে-এসে জুড়ে-বসা মার্কিন সেনাদের মনোরঞ্জনের কাজে ব্যবহার করা গেলে, কতিপয় মানুষ হয়ত এই ভেবে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারেন যে, ভারতের ভিয়েতনাম নীতির ওপরও এই সংবাদে তাঁরা একটা টেক্কা দিলেন ভারতীয় মহিলাটিকে ক্যাপিটাল করে।

একথা একরকম সকলেই হাহাকার করে ভাবতে বসেছে দেখে আরও বিস্ময় জাগছে এই ভেবে যে, বিলাসপ্রমত্ত দুনিয়ার হাতে রীতা ফারিয়ার মতো আমরা কি সবাই ক্লাউনে পরিণত হলাম! না হলে জনৈক সামান্যা নারী, যিনি সুন্দরী কিনা এই সত্য জানবার জন্য বিলাসী সমাজের রবার স্ট্যাম্প সংগ্রহ করতে যান, বিলাসের প্রলোভন তাঁকে কোন অন্ধকারে আকর্ষিত করছে তাই নিয়ে সমস্ত বুদ্ধিজীবীসমাজ এমন শীর্ষাসন সুরু করেছেন কেন?

রীতা ফারিয়াদের যত বেশি মূল্য ধরে দেওয়া হবে, পরস্বাপহরণকারী বিলাসী দুনিয়ার অভিসন্ধির খপ্পরে তত বেশিই আপনাকে সমর্পণ করা হবে। আর তেমনভাবে নিজেকে মূর্খ প্রমাণিত করার মতো হাস্যকর ব্যাপার আর কিছুই হতে পারে না।

রীতা ফারিয়ার মতো জনৈকা সামান্যাকে নিয়ে ফলাও স্টেটমেন্ট ছাপে তারাই, প্রকৃতির প্রসাদ যারা কতিপয়ের ভোগ্য এবং বিলাসোপকরণ বলে গণ্য করে। বলা বাহুল্য, তাদের দিন খতম হয়ে এসেছে, আর তাই তাদের নিয়ে উচ্চকিত এখনো পর্যন্ত তারাই হবে, অবক্ষয়ী সমাজের প্রহেলিকায় আজও যারা মুগ্ধ কিম্বা অন্ধ।

জয়প্রকাশজীর জল্পনা

ভারতের গণতন্ত্র গেল গেল রব তুলে কতিপয় কণ্ঠ ইতস্তত উচ্চকিত হয়ে উঠলে নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত একটি নির্দলীয় গণতান্ত্রিক সম্মেলনে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ উপস্থিত হয়েছিলেন এবং এক জল্পনাপূর্ণ ভাষণে রাজনৈতিক কল্পলোক সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছিলেন। জে, পির প্রস্তাব যেমত কল্পলোকের দিকেই হাত বাড়াক এই সম্মেলনে ভারতের প্রাক্তন এটর্নি জেনারেল প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব শ্রী এম, সি, শীতলবাদ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য ডঃ সি ডি দেশমুখ, শিক্ষা সম্মেলনের সদস্য ডঃ কে জি আঙ্গীদিন, ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রী বি, পি, সিন্‌হা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এই সভায় একবাক্যে দেশের বর্তমান বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি, মুদ্রামূল্য হ্রাস জনিত মূল্যস্তরের আত্যন্তিক স্ফীতি, প্রশাসনিক দুর্বলতা, হিংসাত্মক ক্রিয়া-কলাপ ও সার্বিক নৈরাজ্য এবং সঙ্কটে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরকারী ব্যর্থতা এবং সরকারের প্রতি সাধারণের আস্থাহীনতার কথাও গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়।

দেশের বর্তমান পরিস্থিতি যে নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক এবং বিগত উনিশ বছর ধরেও দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণে সরকারী ব্যর্থতাও যে আজ প্রায় তর্কাতীত, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

কিন্তু আজকের সেই বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে মুক্তির যে পথ জয়প্রকাশজী বাৎলেছেন তাতে বস্তুত পক্ষে চিন্তাশীল মানুষের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাওয়ার কথা।

জে, পি বলছেন, ভারতবর্ষ পশ্চিমী ধাঁচের গণতন্ত্র সইতে পারবে না। কোন বিশেষ দলের দ্বারা মন্ত্রিসভা গঠিত হলে ভারতীয় গণতন্ত্রকে মার খেতে হবে। কেননা বিরোধী দলগুলির মধ্যে ক্রমশ হতাশার সঞ্চার হয়েছে। ওদিকে কোন একটি দলের পক্ষে এতোবড় একটা দেশের সমস্যাবলী আয়ত্তে রাখাও সম্ভব নয়। সুতরাং, জে পির প্রস্তাব, পার্টি টিকেট নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হোক, পার্টির অস্তিত্ব অবলোপেরও কোনো কারণ নেই; তবে নির্বাচনের পরেই সদস্যবর্গ দলত্যাগ করে একটি নির্দলীয় সরকার গঠন করুন এবং তা বর্তমান শাসনতন্ত্রের প্রতি যথাযথ মর্যাদা প্রদর্শন করেই করুন। তা হলেই, জে, পির ধারণা, সব সমস্যার সমাধান হবে। প্রস্তাব উত্থাপনকালেই অবশ্য জয়প্রকাশজীর নিজেরই মনে হয়েছে যে, প্রস্তাবটি বহুজনের কাছেই 'অবাস্তব' বা 'ফ্যানটাসটিক' বলে বোধ হবে; কিন্তু নান্যঃ পন্থা।

জয়প্রকাশজী অকস্মাৎ কী কারণে ভারতের মাটিতে তথাকথিত গণতন্ত্র অসার্থক বলে মনে করলেন এবং কেনই বা তাঁর মনে হল যে, নির্দলীয় সরকারই ভারতবর্ষে ভালো রকম কাজ কারবার চালাতে পারবেন তা আমাদের অনুর্বর মস্তিষ্কে সঠিক বোধগম্য হল না। তিনি নিজেই বলেছেন, আমরা অত্যন্ত বেশি করে রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী (অবশ্য সেই সঙ্গে তিনি পাশ্চাত্য রাজনৈতিক দর্শনের উল্লেখ করেছেন)।

রাজনৈতিক দর্শন অবশ্যই ইতিহাসের গতিতে ভিন্নকালে ভিন্নভাবে তৈরি হয়ে থাকে। তিনি প্রতীচ্যের দর্শন বলে সুস্পষ্ট কিছু উল্লেখ করলেও পারতেন, আর সেটা তাঁর পক্ষে খুব সহজ ব্যাপার। তিনি নিজে বহুতর দর্শনের জন্মদান করবার চেষ্টা করেছেন, ব্যর্থ হলেও।

কিন্তু সে যাই হোক ভিন্ন রাজনৈতিক দর্শন অথবা তারই অভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই বিভিন্ন দল গঠিত হয়ে থাকে। আর যদি ভারতবর্ষ বিশেষ করে দর্শনপন্থী হয়ে থাকে তবে তো কথাই নেই। দল ভিন্ন উপায় নেই। জে, পি-ও বলছেন, দল থাক, দলের সরকার থাকবে না। ব্যাপারটা সোনার পাথর বাটির মতই অবাস্তব নয় কি?

যে দেশে একটা নির্বাচনী ঐক্য গঠিত হয় না, যেখানে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা ধোপে টেকে না, সেখানে নির্দলীয় সরকার কেমন বস্তু হবে! স্বয়ং জে, পিই জানেন পার্টি টিকিটে নির্বাচিত হয়ে পার্টি বাদ দিয়ে পাঁচ সদস্যে কোন বত্রিশভাজা সরকার গঠন করবেন! তার নীতিই বা নির্ধারিত হবে কোন নীতির ভিত্তিতে।

জে, পির আশঙ্কা কংগ্রেসকে কোন দলই কোনকালে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারবে না। জে, পির এহেন আতঙ্ক সাময়িকও হতে পারে, কিন্তু তাঁর প্রস্তাবটি সাময়িকভাবেও গ্রহণ করা হয়ত সম্ভব নয়।

উত্তর প্রদেশঃ

বেসামাল পরিস্থিতি

রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনীর অশেষ কৃপায় উত্তর প্রদেশে যে অহরহ নির্যাতন পর্ব অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে তাতে রাজ্যের স্বাভাবিক শাসনব্যবস্থা এখন বেসামাল পরিস্থিতিতে রীতিমত টাল খাচ্ছে।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রাজ্যপাল শ্রীবিশ্বনাথ দাসকে পত্রযোগে এই শোচনীয় পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টিপাত করতে অনুরোধ করেছেন যাকে রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ প্রার্থনারূপে গণ্য করা যায়। ইউ পি সি সির সহ-সভাপতি শ্রীআলগুরাই শাস্ত্রীও রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে অনুরোধ জানিয়েছেন। ক্ষমতাসীন দলের সহ-সভাপতির এ হেন অনুরোধ অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ। কয়েকজন বিশিষ্ট কংগ্রেসী নেতাও রাজ্য সরকারের কর্মচারী দাবির প্রতি নিষ্ঠুর একরোখা নীতিতে প্রকাশ্যেই বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। শ্রীআলগুরাই শাস্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, পরিস্থিতির মোকাবিলায় অক্ষম হলে রাজ্য-সরকারের পদত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু শ্রীমতী শাস্ত্রী আগামী নির্বাচনতক গদী কামড়েই শুধু পড়ে থাকবেন না, ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ কামড় প্রয়োগের এক্সপেরিমেন্ট করে দেখবেন, নয়া ভারতের শরীরে এ কামড় কতদূর দন্তস্ফুট করতে পারে।

কর্মচারিবৃন্দের প্রতি রাজ্য সরকার যে দমন-নীতির প্রবাহ চালিয়েছেন, তাতে উত্তর প্রদেশের প্রায় ২৫টি জেলায় প্রশাসনিক কাজকর্ম একেবারে অচল হয়ে পড়েছে। কর্মচারীদের অনেককে ফেরার হতে হয়েছে এবং কর্মচারীদের নেতা তেত্রিশ বছরের সমর্থ যুবক শ্রী পি এন সুকুল যেভাবে সভাপ্রাঙ্গণ থেকে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে গ্রেপ্তার এড়িয়ে গেছেন, তাতে অনেকে মনে করেন পুলিশের মধ্যেও ক্রমশ কর্মচারী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতির ফলশ্রুতিই শ্রীসুকুলের এই অনায়াস পলায়নের কারণ।

উত্তর প্রদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও অশান্তির হাওয়া বইছে। এলাহাবাদে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে রয়েছে।

সরকার কর্মচারীদের গ্রেপ্তার, ভীতিপ্রদর্শন, সাসপেণ্ড ও চাকরী খতম করে ঔপনিবেশিক শাসনরীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। পেটোয়া কর্মীদের ধর্মঘটী কর্মীর স্থলে প্রমোশন দিয়ে, সুপারিন্টেণ্ডেন্ট শ্রেণীর অফিস সর্দার পোস্টকে গেজেটেড পোস্ট করার প্রলোভন দেখিয়ে কর্মচারী আন্দোলনকে আঘাত করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। শিক্ষকদের 'সি' শ্রেণীর কয়েদীরূপে জেলে পুরে নির্যাতন করছেন। এই শাসনব্যবস্থা ভারতের মাটিতে এক কলঙ্কজনক অধ্যায় রচনা করল, যা কংগ্রেস ব্যতীত অন্য কোন দলের মন্ত্রিসভা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলে প্রেসিডেন্ট শাসনের দ্বারা সংস্কৃত হতে পারত।

আন্তর্জাতিক

পেঙ চেনের বাড়ির দিকে লালরক্ষীদের অভিযান

ফ্রান্স ঃ

অতিথি-অভ্যর্থনায় কোন ত্রুটি ছিল না, আদর-যত্ন, আথিতেয়তা সবই নিখুঁত। হবে নাই বা কেন, প্রেসিডেন্ট দ্য গল নিজে যখন গত জুনে সোভিয়েট য়ুনিয়নে গিয়েছিলেন সোভিয়েট জনসাধারণ কিম্বা তার সরকার কি প্রেসিডেণ্টকে কিছু কম সম্মান করেছিলেন। আজ প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিন ফ্রান্স এলে দ্য গল কেন তার প্রতিদান দেবেন না?

মিঃ কোসিগিন ন' দিনের ফ্রান্স সফর শেষ করে মস্কো ফিরেছেন। ফরাসী দেশে তাঁকে যে-সম্বর্ধনা দেওয়া হলো তাতে তিনি অভিভূত না হয়ে পারেন নি। তাঁর পদচারণার জন্যে লাল কার্পেট পেতে দেওয়া হয়েছিল, এ হক সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর অবশ্যই আছে। কিন্তু ১০১টি তোপধ্বনি কি কেবল রাষ্ট্রপ্রধানদেরই প্রাপ্য ছিল না? যাক, অধিকন্তু ন দোষায়, বেশিতে ক্ষতি নেই, কম হলেই কূটনৈতিক শিষ্টাচারে বাধতো। প্রেসিডেণ্ট দ্য গলও স্বয়ং বিমানবন্দরে উপস্থিত থেকে মাননীয় অতিথিকে স্বাগত জানালেন, নিয়মমাফিক এলিসি প্যালেসে অভ্যর্থনা করা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন।

মিঃ কোসিগিনের ন'টা দিন কেটে গিয়েছে লাঞ্চ-ডিনার-শিকার-গুরুত্বপূর্ণ স্থান দর্শন ও আলোচনার মধ্য দিয়ে। সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের কি হৃদ্যতা ক্রমে জমে উঠছে? ন্যাটোর মাধ্যমে ফ্রান্স একদিন সোভিয়েটের বিরুদ্ধে দুটি প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল, রাশিয়াকে সে যে গভীর সন্দেহের চোখে দেখতো এটাই তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ। কিন্তু সেই ন্যাটোর মধ্যেই আজ ফাটল ধরেছে, ফ্রান্স নিজেই ন্যাটো-শৃঙ্খল আলগা করে দিয়েছে, সে মার্কিন প্রভাবান্বিত ন্যাটো থেকে নিজেকে আস্তে আস্তে সরিয়ে নিচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেও ফ্রান্সের আগের সেই মধুর সম্পর্ক নেই, বরং সুযোগ পেলেই ফ্রান্স আমেরিকার সমালোচনা করতে ছাড়ে না। আমেরিকার সঙ্গে ফ্রান্সের সম্পর্কের মধ্যে চিড় ধরার জন্যেই কি ফ্রান্স এখন সোভিয়েটের দিকে ঝুঁকেছে? ইয়োরোপীয় প্রতিরক্ষার কথা ফ্রান্স অবশ্যই চিন্তা করে, কিন্তু সেই সঙ্গে সে এও মনে করে যে আমেরিকার নেতৃত্বে ইয়োরোপের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় হবে না. ইয়োরোপ আক্রান্ত হলে এবং আমেরিকা নিজে আক্রান্ত না হলে সে কখনোই মারণাস্ত্র নিয়ে ইয়োরোপের পাশে এসে দাঁড়াবে না। অর্থাৎ আমেরিকা সম্পর্কে ফ্রান্সের মনে গভীর সন্দেহ ও সংশয় রয়েছে, সেই জন্যেই সে ইয়োরোপীয় দেশ হিসাবে সোভিয়েট রাশিয়ার দিকেই ঝুঁকেছে। আর পশ্চিমী দুনিয়ার এই সম্ভাবনাপূর্ণ দেশটিকে মিত্র হিসেবে পেলে কমিউনিস্ট রাশিয়ার তাতে লাভ বৈ ক্ষতি কোথায়?

এই চিন্তাধারারই সমর্থন মেলে যখন দেখা যায় দুটো দেশের মধ্যে বাণিজ্য-সম্পর্কের দ্রুত উন্নতি ঘটছে। কিন্তু উভয় দেশই শুধু অর্থনীতির মধ্যে তাদের নতুন বন্ধুত্ব সীমাবদ্ধ রাখতে চায় না, চায় তাকে রাজনীতি এবং কূটনীতির মধ্যে প্রসারিত করতে।

আজকের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্রশ্নে সোভিয়েট-ফ্রান্স মতৈক্য রয়েছে, অন্য দিকে সোভিয়েট রাশিয়ার মতো ফ্রান্সও কয়েকটি মার্কিন নীতির কঠোর সমালোচক। মন থেকে সোভিয়েট-ভীতি ঝেড়ে ফেলে তাকে যদি বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা যায় তবে তাতে ইয়োরোপের বিপদ হবে না, কারণ শান্তির প্রতি সোভিয়েট আগ্রহ আন্তরিক বলেই ফ্রান্স বিশ্বাস করে। সেজন্যই ইয়োরোপের প্রতিরক্ষা বা তার অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা সমৃদ্ধি সম্পর্কে সোভিয়েট রাশিয়া যতটা আগ্রহী হবে ইয়োরোপীয় দেশ হিসেবে অতলান্তিক-পারের আমেরিকা ততটা হবে না বলেই ফ্রান্স মনে করে। এ ধারণাগুলির বশবর্তী হয়েই প্রেসিডেন্ট দ্য গল গত জুনে সোভিয়েট সফরে গিয়েছিলেন এবং একই কারণে পাল্টা সফরে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন এবং আসবেন সোভিয়েট রাষ্ট্রপ্রধান পদগর্নি এবং পার্টিপ্রধান ব্রেজনেভ।

প্রেসিডেণ্ট দ্য গল এবং প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন তাঁদের যুক্ত ইস্তাহারে ভিয়েতনামে মার্কিন ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন যে আমেরিকাই ভিয়েতনামে শান্তিপ্রতিষ্ঠার বড় বাধা; এবং ভিয়েতনাম সমস্যার ফলেই বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না। অর্থাৎ

বিশ্বশান্তি ব্যাহত করার জন্যে তাঁরা আমেরিকাকে দায়ী করেছেন। ইয়োরোপীয় প্রতিরক্ষার ব্যাপারে দুনেতা একটা ইয়োরোপীয় রাষ্ট্র সম্মেলন আহ্বানের কথা বলেছেন। এ-সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যে নিমন্ত্রণ জানানো হবে না সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই, অর্থাৎ আমেরিকাকে বাদ দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই প্রথম—প্রথম শ্রেণীর ইয়োরোপীয় রাষ্ট্র সম্মেলনের কথা বলা হলো। এটাও ঠিক হয়েছে যে ইয়োরোপের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ইয়োরোপীয় দেশগুলি ঘন ঘন বৈঠকে মিলিত হবে।

জার্মানীর নতুন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠাকে আক্রমণ করে মিঃ কোসিগিন বক্তৃতা করলেও এ-নিয়ে কোন মীমাংসায় এখনো পৌঁছনো যায় নি। বস্তুত জার্মানীর সমস্যা নিয়েই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে এখনো মতের বিরোধ রয়েছে। তবে চ্যান্সেলর কিসিংগার যদি তাঁর পূর্ববর্তী এরহার্ডের মতো মার্কিন-ঘেঁষা হন তবে তার সঙ্গে ফ্রান্সের বনিবনা যে হবে না সে আর কারুর বুঝতে কষ্ট হয় না। সে-ক্ষেত্রে জার্মানীর প্রশ্নেও তখন ফ্রান্স সোভিয়েট নীতির সমর্থন করতে পারে। তা যদি হয় তাহলে যে অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও মরিয়া হয়ে উঠবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ম্যাকাও ঃ

পক্ষব্যাপী ঝড় আপাতত শান্ত হয়েছে বলে বোধ হচ্ছে। গত ৩রা ডিসেম্বর থেকে এখানে আগুন জ্বলে উঠেছিল, সে-আগুনের বলি হয়েছে অন্তত আটজন, আর আগুনের তাতে আহত হয়েছে শতাধিক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা বোঝাপড়ায়, আপোষ রক্ষায় আসা সম্ভব হয়েছে, অবশ্যি নইলে ম্যাকাও রাজ্যটিতে হয়তো রাষ্ট্রবিপ্লব বা মান্ত্রিক পরিবর্তন ঘটে যেতো।

ক্যান্টন নদীর মুখে অর্থাৎ চীনের কোয়াংটুঙ প্রদেশের দ্বীপের মধ্যে ম্যাকাও একটা ছোট্ট উপদ্বীপ যার ভৌগোলিক আয়তন ১৬ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা পাঁচ লক্ষের বেশি নয়। মূল চীন ভূখণ্ডে হলেও ম্যাকাও-এর ওপর পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত এবং চীন একে স্বীকার করে নিয়েছে ১৮৮৭ সালের চুক্তিতেই। কমিউনিস্টরা চীনে ক্ষমতা পেলেও তার ভূখণ্ডে পর্তুগীজ উপনিবেশের কিন্তু কোন পরিবর্তন হয় নি, যদিও চীন দিবারাত্র সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করছে এমন কি ভারতের কাশ্মীর সম্পর্কেও সে বড় বড় বুলি কপচাচ্ছে। অর্থাৎ দুনিয়ার ঔপনিবেশিক শাসন সম্পর্কে কমিউনিস্ট চীন তীব্র ঘৃণা, রোষ ও প্রতিবাদ প্রকাশ করলেও তার উঠোনের উপনিবেশবাদের ক্ষতস্থানটিকে সে সযত্নে লালন-পালন করছিলো।

কিন্তু হঠাৎ ৩রা ডিসেম্বর দেখা গেলো চীন প্রচণ্ড ক্ষোভে-অভিমানে ফেটে পড়ছে, ম্যাকাও সরকারকে, খোদ পর্তুগালকে সে শাসাচ্ছে। কি, না ম্যাকাও সরকারের গুলীতে আটজন (চীনের হিসাবে শতাধিক) চীনা নিহত হয়েছেন এবং শতাধিক (চীনের মতে কয়েকশ') আহত হয়েছেন। চীন এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ৮-দফা দাবি পেশ করেছে ম্যাকাও সরকারের কাছে এবং একথাও বলে দিয়েছে যে দাবি পূরণ করা না হলে শোচনীয় পরিণামের জন্যে ম্যাকাওকে অপেক্ষা করতে হবে।

পর্তুগীজ উপনিবেশ হলেও ম্যাকাও অধিবাসীদের অধিকাংশই চীনা এবং এই প্রবাসী চীনাদের স্বার্থ চীন বরাবরই সংরক্ষণ করে আসছে এবং এ-চীনা-দরদ কেবল পীত বর্ণের জন্যে নয়, ম্যাকাও-এর চীনারা বেশির ভাগই হয় কমিউনিস্ট কিম্বা কমিউনিস্টপন্থী। গত নভেম্বরে চীনারা সরকারী আদেশ অগ্রাহ্য করে একটা স্কুলবাড়ি তৈরি করে। কিন্তু সরকার তাতে বাধা দিলে চীনাদের সঙ্গে সংঘর্ষ বেধে যায়। গত ৩রা ডিসেম্বর চীনের লালরক্ষীদের অনুকরণে ম্যাকাও-এর চীনারা সরকারী অফিস-দপ্তর আক্রমণ করলে ম্যাকাও পুলিশ ও সামরিকবাহিনী ঘটনাস্থলে এসে পড়ে এবং হাঙ্গামার মোকাবিলা করতে চায়। এই সংঘর্ষের ফলেই কিছু চীনা হতাহত হয় এবং চীনকে হস্তক্ষেপে প্ররোচনা দেয়।

চীনের পক্ষ থেকে ম্যাকাও সরকারের কাছে যে আট-দফা দাবি সম্বলিত চরমপত্র দেওয়া হয় তাতে ম্যাকাও থেকে পর্তুগীজ উপনিবেশবাদীকে হাত ওঠাবার দাবি করা হয় নি, তবে চীনের শক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আরো বলা হয়েছে যে ম্যাকাও-এর অস্তিত্বই চীনা দয়ার ওপর নির্ভর করছে। কথাটা অবশ্য সম্পূর্ণ সত্য, চীন ইচ্ছে করলে পলক না ফেলতেই ম্যাকাও দখল করে নিতে পারে। কিন্তু চীন হঠাৎ করুণার অবতারটি সাজলো কেন? সাজলো তার নিজের অস্তিত্বের জন্যে, যে-অস্তিত্ব প্রাথমিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক হলেও রাজনৈতিক স্বার্থও তার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে রয়েছে। ম্যাকাও সরকার নিহত ও আহত চীনাদের জন্য পাঁচ লক্ষ ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে এবং ওই আট-দফা দাবি মেনে নিতে রাজী হয়েছে।

কিন্তু না নিলেই বা কী হতো? ম্যাকাও গ্রাস করলে চীনের লাভের চেয়ে ক্ষতিই যে বেশি! কারণ ম্যাকাও হচ্ছে চীনের হংকং বন্দর। ম্যাকাও-এ কোন শিল্প-বাণিজ্য নেই, এমন কিছু কৃষি-সম্পদও তার নেই যে চীনের ক্ষুধার অন্নের যোগান দেবে। কিন্তু সে চমৎকার চীন-সেবা করছে তার সমুদ্র উপকূলবর্তিতার সুযোগ নিয়ে। কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, বিশ্বের বাজারেও চীন এক-ঘরে। কিন্তু তাকে যদি বাঁচতে হয়, কোটি কোটি বিক্ষুব্ধ চীনার কাছ থেকে যদি কাজ আদায় করতে হয় তবে তার অর্থনৈতিক বনিয়াদ শক্ত করতে হবে। যেসব দেশের সঙ্গে প্রকাশ্যে খোলাখুলিভাবে চীনের বাণিজ্যসম্পর্ক নেই সেসব দেশে চীনা পণ্য কি যাচ্ছে না, দক্ষিণ আফ্রিকা, রোডেশিয়া তবে চীনা পণ্যে ছেয়ে গেলো কী করে? চীন ম্যাকাও-এর মারফৎ তার ব্যবসা বিস্তার করে চলেছে। চীনের সঙ্গে বাণিজ্যসম্পর্ক না থাকলে কী হবে পর্তুগালের সঙ্গে তো রয়েছে। অন্যদিকে ম্যাকাও-এর নিজস্ব শিল্প বা কৃষি উৎপাদন না থাকলেও সে কেবল মধ্যবর্তীর কাজ করে বা দালালী করে চীনকেও রক্ষা করছে এবং দক্ষিণ আফ্রিকা, রোডেশিয়া, পর্তুগীজ এ্যাঙ্গোলাকেও বাঁচিয়ে রেখেছে। অথচ মুখে চীন দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেশিয়ার বর্ণবিদ্বেষনীতির বিরুদ্ধে অবিরাম শ্লোগান দিচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ পালনের কথা বলছে। এ অর্থনৈতিক স্বার্থের কারণেই চীন ঔপনিবেশিক উপদ্বীপ ম্যাকাও-এর ওপর হাত দিচ্ছে না, মুখে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে কমিউনিজমের বুলি কপচালেও সে-উপনিবেশবাদ যাতে অক্ষুন্ন, অক্ষত থাকে তার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। পর্তুগালেরও চীনা আবদার পূরণ করা ছাড়া উপায় কী আছে?

ভিয়েৎনাম ঃ

"Johnson is the man who can't make peace"—বলেছেন বিখ্যাত সংবাদপত্র নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর ওয়াশিংটন প্রতিনিধি। বাস্তবিক, প্রেসিডেন্ট জনসন এ পর্যন্ত চাল কম চাললেন না, কিন্তু ভিয়েৎনামে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারলেন কি? তাঁর ব্যর্থতার মূল কারণ যে সমস্যাটির প্রতি তাঁর ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী, ভ্রান্ত নীতি একথা বাকী দুনিয়ার লোক বুঝতে পারলেও তিনি নাচার।

বড়দিন উপলক্ষে দুদিন যুদ্ধ বন্ধ রাখার জন্য উভয় পক্ষই সম্মত হয়েছে, মহামান্য পোপ ষষ্ঠ পল সে শান্তিপর্ব আরো ৪৫ দিন বাড়িয়ে দেবার আবেদন

জানিয়েছেন। হোয়াইট হাউস প্রতিনিধি অবশ্য মুখে বলেছেন যে, এ ব্যাপারে হ্যানয়ের সঙ্গে আলোচনা করতে ওয়াশিংটন আগ্রহী।

কিন্তু মুখে যুদ্ধবিরতির কথা বললেও কাজে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উল্টোটি করে চলেছে। প্রেসিডেন্ট জনসন যে তাঁর কোন কথা বা কাজের দ্বারাই উত্তর ভিয়েৎনামের মনে এ বিশ্বাস জন্মাতে পারেন নি শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁর আগ্রহ আন্তরিক বলে তার কারণই হলো ওই কথা ও কাজের বিষম অসংগতি। এতদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর ভিয়েৎনামের সামরিক লক্ষ্যবস্তুর ওপরই বোমা নিক্ষেপ করছিলো এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো যে, অসামরিক নাগরিকরা কখনই মার্কিনী বোমার শিকার হবেন না। যদিও সারা বিশ্বে উত্তর ভিয়েৎনামে বোমাবর্ষণ করার জন্য আমেরিকা নিন্দিত-ধিক্কৃত হয়েছে তা সত্ত্বেও সে বোমাবর্ষণ বন্ধ করে নি। বরঞ্চ আর এক ধাপ এগিয়ে এখন অসামরিক অধিবাসী-অধ্যুষিত মু গিয়া গিরিপথে বোমাবর্ষণ করে শত শত উত্তর ভিয়েৎনামীকে নিহত করেছে। এ ঘটনাও অনিন্দিত থাকে নি, সোভিয়েট রাশিয়া এ বোমাবর্ষণকে genocide বা গণহত্যা বলে আখ্যা দিয়েছে, চীনও বলেছে ইঙ্গিত পাওয়া মাত্রই সে অস্ত্র নিয়ে হাজির হবে ভিয়েৎনামে।

প্রেসিডেন্ট জনসনের মুখে শান্তির বুলি, কিন্তু ভিয়েৎনামে মার্কিন সৈন্যের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৬৭ হাজার ৭ শ'য় পৌঁছেছে, এ যুদ্ধের বাজেটও তার আগের ১০ বিলিয়ন ছাড়িয়ে ২০ বিলিয়নে উঠেছে। মিঃ জনসন কেন এখনো বুঝে উঠতে পারছেন না যে, শক্তি প্রয়োগ করে এখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। মাত্র সেদিন ২০ হাজার লোক সভা করে প্রেসিডেন্ট জনসনের ভিয়েৎনাম নীতির তীব্র সমালোচনা করেছেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল ইউ থান্ট মার্কিন নীতির নিন্দা করে তাঁকে নতুন করে চিন্তা করতে আবেদন জানিয়েছেন। মিঃ জনসন যদি চুক্তি না মানেন, তিনি যদি একগুঁয়েমি করেন তার ফল কি তাঁর নির্বাচনের পক্ষেই ভালো হবে বলতে পারেন? মার্কিন সৈন্যরা ক্লান্ত তিতি-বিরক্ত, তারা অহেতুক রক্তপাত চায় না, যে-যুদ্ধে আমেরিকার কোন প্রত্যক্ষ স্বার্থ নেই সাত হাজার মাইল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সে যুদ্ধে তারা জীবন দিতে যাবে কেন?

চীনঃ

রেড গার্ড'স বা লালরক্ষীদের দৌরাত্ম্য শালীনতা সৌজন্যের সমস্ত সীমানা ছাড়িয়ে গিয়েছে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ধ্বজা ধরে তারা একটার পর একটা যেসব দুষ্কার্য করে চলেছে সাম্প্রতিক ইতিহাসে তার তুলনা নেই। বিপ্লব করবে কারা, ওই সংজ্ঞার সঙ্গে যাদের পরিচয় নেই, চীনের মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে যাদের কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ করার সুযোগ হয় নি, যারা ভূমিষ্ঠ হয়েছে এখানে কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পরে—সেইসব অর্বাচীনের দল কি? এই বিপ্লবের শিকার হয়েছেন লিউ শাও চি'র মতো প্রধান প্রথম সারির নেতা, হয়েছেন পিকিঙের প্রাক্তন মেয়র পেঙ চেন ('আজকের মানুষ' দেখুন), প্রাক্তন উপ-মন্ত্রী তিয়েন হান প্রমুখ রাজনৈতিক নেতা, সাহিত্যিক, শিল্পী, অধ্যাপক, সাংবাদিক ইত্যাদি। বুদ্ধিজীবী হিসেবে যাঁদের এতদিন গোটা চীন শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছে তাঁদের এখন বুদ্ধির পরীক্ষা দিতে হবে দুগ্ধপোষ্য স্কুল-ছাত্রদের কাছে।

কমিউনিস্ট পার্টির শুদ্ধিকরণের নামে চীনা নেতারা স্ট্যালিনের কায়দায় এখানে অবাঞ্ছিত নেতাদের পার্জ বা অপসারণ করছিলেন এবং ইতিমধ্যেই সমাজের সকল শ্রেণীর লোক—অধিকাংশই অবশ্য বুদ্ধি-জীবী—পার্টি থেকে অপসারিত হয়েছেন। এঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এঁরা বিপ্লব-বিরোধী, শোধনবাদের সহায়ক, মাওবাদে এঁদের আস্থা অবিচল নয়। হাজার হাজার ছাত্র—যাদের কারোর বয়সই কুড়ি পৌঁছয় নি—এবং যারা নিজেদের রেড গার্ড'স বা লালরক্ষী বলে দাবি করে—পিকিংসহ চীনের বিভিন্ন রাজধানী পরিক্রমা করেছে, মিছিল-বিক্ষোভ শোভাযাত্রা করে শোধন-বাদীদের বিরুদ্ধে তাদের ঘৃণা প্রকাশ করেছে। কিন্তু সর্বশেষ যে কীর্তিটি তারা করলো তার তুলনা নেই।

প্রাক্তন পিকিং মেয়র পেঙ চেনকে লালরক্ষীরা তাঁর ঘর থেকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে রাস্তায় নিক্ষেপ করেছে, যেখানে হাজার হাজার লালরক্ষীর জনতা অপেক্ষমাণ ছিল। শত্রুকে সামনে পেয়ে জনতা পৈশাচিক উল্লাসে মেতে উঠেছিল, তারা নাকি পেঙ চেনের "বিচার" করবে! লালরক্ষীরা আরো ঘোষণা করেছে যে, লিউ শাও চি নাকি তাদের পয়লা নম্বরের শত্রু! এদের মাথায় যখন যে খেয়াল চাপলো (কোন দেশের ছেলেরা অত ভেবে কাজ করে, ভাবাবেগে পরিচালিত হয় সকল দেশের তরুণরাই।), তাই করে বসে পরিণামের তোয়াক্কা করে ওরা থোড়াই। ফল হয়েছে এই যে, যখন যাকে খুশি তার বিরুদ্ধেই ওরা শ্লোগান তুলছে, তাঁর বাড়িতে গিয়ে হামলা করছে, প্রকাশ্যে তাঁকে অকথ্য ভাষায় অপমান করছে—তা তিনি যে পদের অধিকারীই হোন না কেন। লাল-রক্ষীরা সারা চীনে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যে, সকলেই ভয়ে তটস্থ হয়ে আছে, কখন কার ওপর গিয়ে দুর্বাসা মুনির রোষে গিয়ে পড়ে!

কিন্তু লালরক্ষীরাই কি সকল দণ্ডমুণ্ডের কর্তা? এর পেছনে কি শক্তিশালী হস্তের মদৎ নেই? আসলে চীনে সুরু হয়েছে ক্ষমতার লড়াই, After Mao--who? এ প্রশ্ন এখানেও জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে। এ শক্তি দ্বন্দ্বে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চৌ এন-লাই, চেন-ঈ, লিউ শাও চি প্রমুখ নেতারা পরাজিত, সর্বময় ক্ষমতা এখন কার্যত প্রতিরক্ষামন্ত্রী লিন পিয়াও-এরই হাতে। কিন্তু লিন পিয়াও জানতেন বুদ্ধির লড়াইয়ে তিনি পূর্বোক্ত কারোর সঙ্গেই যুঝতে পারবেন না, সেই জন্যে কৌশল অবলম্বন করলেন, দোহাই পাড়লেন স্বয়ং মাও সে-তুঙের। বললেনঃ যাঁরা মাওবাদে বিশ্বাসী নন, বা বিরোধিতা করবেন পার্টিতে তাঁদের কোন স্থান নেই। গণতন্ত্র চুলোয় গেল, আত্ম-সমালোচনা শিকেয় উঠলো, দেখা দিল অবতারবাদ! গণতন্ত্র, কালেকটিভ ডিসিশন বা যৌথ সিদ্ধান্ত থাকবে কোথায়, গত ১০ বছরের মধ্যে পার্টি কংগ্রেস ডাকা হয়েছে একবারও? সেন্ট্রাল কমিটির ১৭০ জন সদস্যের মধ্যে অধিকাংশই অথর্ব, নতুন রক্ত সেখানে সঞ্চার করা হয়েছে? পলিট-ব্যুরোকেও কার্যত অচল করে দেওয়া হয়েছে। মাও যা বলেন সেটাই পার্টির বক্তব্য—অবস্থা আজ চীনে এই পর্যায়ে নেমেছে। আর মাও তো আজকাল বলেন কম, তাঁর মুখপাত্র দাঁড়িয়েছেন লিন পিয়াও। সুচতুর লিন পিয়াও জানেন ডিক্টেটরী চালানো চীনে সহজ কর্ম নয়, তিনি একেবারে এক-ঘরে হয়ে যাবেন। সেই জন্যই তাঁর সেনাদের সহায়তা নিয়ে এবং পার্টির কয়েকজন অকর্মণ্যকে নিয়ে হাত করলেন লক্ষ লক্ষ স্কুল-ছাত্রদের যাদের বুদ্ধিবৃত্তি এখনো বিকাশ লাভ করে নি, যারা চমকদার শ্লোগান চায়, গঠনমূলক কাজে ভয় পায়। এরাই আজ লালরক্ষী—সমগ্র চীনের, কমিউনিস্ট দুনিয়ার কলঙ্ক!

কিন্তু লালরক্ষীরা যে বাড়াবাড়ি করে ফেলছে এ বোধ নেতাদের হয়েছে, তাই 'Halt' বা থামার নির্দেশ দিয়েছেন তাঁরা, বলেছেন গ্রামাঞ্চল এবং মফস্বল অঞ্চলগুলি থেকে ছাত্রেরা এসে শহরে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে তা বন্ধ করতে, তাদের নির্দেশ দিয়েছেন গ্রামে ফিরে যেতে। কিন্তু তা কি লালরক্ষীরা সহজে যেতে চাইবে? কারণ ওদের এগুবার মন্ত্রই শেখানো হয়েছে মনে হয়, পেছুবার নয়। সেক্ষেত্রে লিন পিয়াও কি করবেন? আত্মকলহ? লিন পিয়াও-এর হাতে অবশ্য সেনাদল রয়েছে। গতিক মোটেই সুবিধার নয়।

ধারাবাহিক উপন্যাস

আশাপূর্ণা দেবী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

'দেখলে পারুকে?'

সুবালা তার ভাঙা দাঁতের হাসি হেসে অভ্যস্ত ভংগীতে সকৌতুকে বলে, 'বল শুনি কেমন লাগলো।'

অম্বিকা অবাক হয়।

অম্বিকা যেন আর এক জগৎ থেকে এসে পড়ে।

'পারু মানে? পারু কে?'

'পারু কে কিগো? মেজদার মেয়ে না? এই সুবালাসুন্দরীর ভাইঝি! তোমার সামনে বেরোয় নি বুঝি? না বেরোনোই সম্ভব বড় হয়েছে তো। তা' মেজবৌ কিছু বললো?'

অম্বিকা বিচিত্র একটু হেসে বলে, 'বললেন।'

সুবালা আশ্বস্ত গলায় বলে 'যাক তা'হলে সেজদা আমার চিঠিটার মান রেখেছে। মেজদার নতুন বাড়ির ঠিকানাটা ঠিক জানি না তো, কি জানি পৌঁছায়-না-পৌঁছয়, তাই সেজদার 'কেয়ার অফে' মেজদাকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম তোমার কথা উল্লেখ করে। তা' এখন বল বাপু শুনি কি সব কথা-টথা হলো! আমার তো ইচ্ছে—এই মাসেই লাগিয়ে দিই।'

অম্বিকা একটু যেন গম্ভীর হয়। বলে ওঠে, 'কী মুস্কিল! আপনি এসব কী যা-তা আরম্ভ করলেন! এ-রকম চালালে কিন্তু ফের পালাবো!'

সুবালা শঙ্কিত হয়।

সুবালা বোঝে অবস্থাটা আশাপ্রদ নয়। মেজবৌ বোধহয় তেমন আগ্রহ দেখায় নি। তা' হতে পারে, মানুষটা তো আছে একটু উল্টো-পাল্টা! অম্বিকাকে যতই ভালবাসুক, মেয়ের সঙ্গে বয়সের তফাৎটা মনে গেঁথে রেখেছে। ঠাকুরপোর একটু অপমান বোধ হয়েছে তা' হলে। বলতে কি একটু আশায় আশায়ই তো গেল তাড়াতাড়ি! বিয়ের মন হয়েছে, সেটা বুঝতে পারছে সুবালা। ভাবে, যাক গে—পারু না হোক গে, আমি তোড়জোড় করছি কনের আবার অভাব! আবার ভাবে, তবে অত বয়সের মেয়ে সহসা পাওয়া যাবে না। মেজবৌ ডাকাবুকো তাই মেয়েকে অতখানি বড় করছে বসে বসে।

কিন্তু সুবালা চট করে কিছু বলে বসে না, আস্তে দ্যাওরের মন-মেজাজ বুঝতে বলে, 'শোনো কথা আমি আবার কী চালালাম?'

'এইসব বাজে বাজে কথা। বিয়ে-টিয়ের কথা সুরু করলেই কিন্তু জেনে রাখবেন আমি হাওয়া!'

সুবালা ভয়ে ভয়ে বলে, 'মেজদা—বুঝি—'

'দোহাই বৌদি আপনার ওই মেজদা-টির নাম আমার সামনে করবেন না।' বসেছিল, উঠে পড়লো! পায়চারি করতে করতে বললো, 'আপনার ওই মেজদা আর মেজবৌদিকে পাশাপাশি দেখলেই মনে হয় যেন বিধাতার একটি নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের জ্বলন্ত নমুনা!'

সুবালা অবাক গলায় বলে, 'কিসের নমুনা?'

'যাক গে ও আপনাকে বোঝানো যাবে না। তবে আপনার পূজনীয় মেজ-দার বাড়িতে ঢোকবার সৌভাগ্য আমার হয় নি এইটাই জেনে রাখুন।'

সুবালা হতভম্ব গলায় বলে, 'তবে যে বললে মেজবৌ কথা বলেছে—'

'হ্যাঁ বলেছেন,' অম্বিকা একটা জ্বালাভরা গলায় বলে, 'আর বেশি কিছু জিগ্যেস করবেন না আমায় বৌদি!'

'তার মানে মেজদা তোমায় অপমান করেছে—'

আস্তে বলে সুবালা, 'বুঝতে পারছি আসল কথা—'

অম্বিকা সহসা স্থির হয়। সামনে সরে আসে। বলে, 'আসল কথা বোঝবার ক্ষমতা আপনার ইহজীবনেও হবে না বৌদি! আপনি এতই ভালো যে, ওসব কথা আপনার মাথাতেই ঢুকবে না! শুধু বলে রাখি যদি হঠাৎ কোনোদিন শোনেন আপনার মেজবৌদি পাগল হয়ে গেছেন, অবাক হবেন না। হয়তো শীগ্গিরই শুনতে হবে'...আশ্চর্য, আপনার ওই মেজদার মত একটি শয়তানের কোনো শাস্তি হয় না! না দেয় সমাজ, না দেন তোমাদের ওই ভগবান!...কিছু মনে করবেন না বৌদি, না বলে পারলাম না। বড় যন্ত্রণা হল দেখে। ছেলেও তো দেখলাম বাপের মতন! আশ্চর্য!'

সরে গেল সামনে থেকে, পায়চারি করতে লাগলো, একটা জ্বালাভরা গলার আক্ষেপ শোনা গেল, 'এইভাবে জীবনের অপচয় ঘটে, এইভাবে এই হতভাগা দেশের কত মহৎ বস্তু ধ্বংস হয়! এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে একদিন সমাজকে।'

না অম্বিকাকে বিয়ে দিয়ে সংসারী করবার সাধ আর মিটলো না সুবালার!

অম্বিকা পায়ে হেঁটে ভারত ভ্রমণ করতে বেরোলো! সুবালা বুঝতে পারছে মুখে ও যতই বলুক 'এই ভারতবর্ষটাকে একবার দেখতে চাই। দেখতে চাই বাংলা দেশের মত হতভাগা দেশ আর কোথাও আছে কিনা!' তবু বুঝতে পারছে সুবালা দেখেশুনে ফিরে আর আসছে না। ছন্নছাড়া ভবঘুরেই হয়ে যাবে!

'ওর মা-বাপ থাকলে জীবনটাকে নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলতে পারতো না ও!

অমূল্যের কাছে কেঁদে পড়ে বলেছিল সুবালা!

অমূল্যের চোখটাও লালচে হয়ে উঠেছিল।

ভারী ভারী গলায় বলেছিল, 'ওটা তোমার ভুল ধারণা! ওর মা থাকলে যে তোমার থেকে বেশি ভালবাসতে পারতো, একথা আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু তা তো নয়, মায়ার বাঁধন সবাইকে বাঁধতে পারে না। বুদ্ধদেবের কি মা-বাপ ছিল না? এই জগতের অবিচার-অত্যেচার দুঃখু-দুর্দশা দেখে যাদের প্রাণ কাঁদে, তারা অন্য পাঁচজনের মতন খেয়ে শুয়ে দিন কাটাতে পারে না। ঘরে তিষ্ঠোনো দায় হয় তাদের। মা-বাপও বেঁধে রাখতে পারে না, স্ত্রী-পুত্রও বেঁধে রাখতে পারে না। তবু ভালই হল যে একটা পরের মেয়ে—গলায় গেঁথে দেওয়া হয় নি ওর!'

'দেশ দেশ, স্বাধীন পরাধীন' এই সব করেই এইটি হলো ওর—সুবালা চোখের জল মুছতে মুছতে বলে, এই গাঁয়েই জন্মালো, এই তোমাদের বংশেই বড় হলো, মানুষ হলো, কোথা থেকে যে ওসব চিন্তা মাথায় ঢুকলো, ভগবান জানেন।'

তা ছাড়া আর কি বলবে সুবালা?

মানুষের জানার সীমানা ছাড়ালেই বলে 'ভগবান জানেন।' একা সুবালা কেন, সবাই বলে। আর খুব যখন কষ্ট হয় তখন ভগবানের বিচারের দোষ দেয়।

সুবালাও দিল।

আর তার সঙ্গে সঙ্গেই চোখ মুছতে মুছতে ওই ছন্নছাড়ার থাত্রকোলে জোর করে সুঙে দিয়ে দিল একগাদা চিঁড়ের নাড়ু, তিল পাটালী নারকেলের গজা! এসব একদা অম্বিকার বড় প্রিয় ছিল।

অম্বিকা মুখে খুব উৎসাহ দেখায়। বলে, 'বাঃ বাঃ! চমৎকার! পথে পথে ঘুরবো, কোথায় কি জুটবে কে জানে, যেদিন কোথাও কিছু না জুটবে, ওইগুলি বার করবো, আর তোমার জয়গান করতে করতে খাবো!'

'থাক, আর আমার জয়গান করতে হবে না। আমার ওপর যে তোমার কত মায়া আছে তা' বোঝাই গেছে!'

'বুঝে ফেলেছেন তো? বাঁচা গেল!' অম্বিকা হাসে। তারপর বলে, 'রামকৃষ্ণ পরমহংসের সবচেয়ে বড় ভক্ত বিবেকানন্দের নাম শুনেছেন? একসময় তিনি ঘুরেছিলেন পথে পথে, হাতে এক কপর্দকও নেই, মনের জোর করে বললেন, 'দেখি আমার চেষ্টা ছাড়াই খাদ্য আসে কি না!' এসে গেল। আশ্চর্য উপায়ে এসে গেল! একটা মিষ্টির দোকানের দোকানী স্বপ্ন দেখলো অমুক জায়গায় এক সাধু এসে বসে আছেন উপবাসী আছেন—। কাজেই ঠিক করেছি তেমন অসুবিধেয় পড়লে সাধু বনে যাব!'

জোর করে টেনে টেনে হাসে।

সুবালা রেগে উঠে বলে, 'আহা সাধু বনে যাবে। তুমিই না বল 'দেশের ওই গেরুয়াধারীরাই হচ্ছে সর্বনাশের গোড়া। ওরাই 'জগৎ মিথ্যে' না কি বলে বলে দেশের লোকগুলোকে কুঁড়ের বাদশা করে রেখে দিয়েছে। সবাই পরকালের চিন্তাতেই ব্যস্ত, ইহকালের কথা ভাবে না।'

'বলি, বলবোও। তবে এক একজনকে দেখলে ধারণা পালটে যায়। যাক আপনি মন খারাপ করবেন না। আমাদের এই ধর্মের দেশে 'হরিবোল' বললেই অন্ন মেলে।'

'তাই তো ভিক্ষে মেগেই যে খাবে তুমি,' সুবালা রেগে বলে, 'তাই ভিটে জমি সর্বস্ব বিক্কিরী করে দিলে!'

ওই, ওইটাই হচ্ছে সবচেয়ে দুশ্চিন্তার। যে মানুষ ভিটে মাটি বেচে চলে যায়, সে কি আবার ফিরে আসে?

অথচ কটা টাকাই বা পেলো?

সুবালার যদি টাকা থাকতো, নিশ্চয় দিয়ে দিতো। বলতো, 'দেশ বেড়াবার জন্যে ভিটে বেচবে তুমি, আর তাই আমি দেখবো বসে বসে?......কিন্তু ভগবান মেরেছেন সুবালাকে!

অমূল্য সঙ্গে গেল, খানিকটা এগিয়ে দিতে।

সুবালাও এলো গরুর গাড়ির সঙ্গে যতটা যাওয়া যায়। তারপর দাঁড়িয়ে পড়ে দেখতে ল্যাগলো যতদূর পর্যন্ত দেখা যায়।

অনেকক্ষণ পরে, যখন উড়ন্ত ধুলোও নিথর হয়ে গেল তখন ফিরে এল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, আপনমনে বললো, 'বেটাছেলে, কোনো বন্ধন নেই! 'বিয়ে করবো না' তো করবো না! 'ঘর ছেড়ে চলে যাবো' তো চলে যাবো! ব্যস! নিন্দের কিছু নেই! পোড়া মেয়েমানুষের সকল পথ বন্ধ! আমাদের মেজবৌটা যদি বেটাছেলে হতো, সেও বোধহয় এইরকম হতো। বিয়ে করতো না, সংসারে থাকতো না!... মেয়েমানুষ, বন্দীজাত, খাঁচার মধ্যে ঝটপটানি সার!'

কিন্তু ঝটপটানি কি আছে আর?

সমস্ত ঝটপটানি থামিয়ে ফেলে একেবারে তো নিথর হয়ে গেছে সুবালার মেজবৌ! ও যেন এইবার সহসা পণ করেছে, এবার ও 'সাধারণ' হবে। যেমন সাধারণ তার আর দুটো জা, তার ননদেরা, পাড়াপড়শী আরো সবাই।

অপ্রতিবাদে 'কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম' মেনে নিয়ে।

আর ইচ্ছা যদি প্রকাশই করে তো সেটা হবে 'সাধারণে'র ইচ্ছা। তাই সুবর্ণ তার স্বামীকে তাক লাগিয়ে দিয়ে একদিন ইচ্ছে প্রকাশ করলো 'পারুলের জন্যে একটা পাত্র দেখো, এই শ্রাবণেই যাতে বিয়েটা হয়ে যায়। তারপর অঘ্রানে ভানু-কানু দুজনের এক সঙ্গে বিয়ে লাগিয়ে দেওয়া যাবে!'

প্রবোধ অবাক হয়ে তাকায়!

তারপর বলে, 'ভূতের মুখে রাম নাম! তোমার মুখে ছেলে-মেয়ের বিয়ের কথা?'

সুবর্ণ হাসে, 'তা ভূতও তো পরকালের চিন্তা করে!'

তারপর হাসি রেখে বলে, 'না ঠাট্টা নয়, এবার তাড়াতাড়ি করা দরকার!'

সুবর্ণ কি ওর মা'র উপর শোধ নিচ্ছে?

সুবর্ণ কি রাত্রির অন্ধকারে বিনিদ্র শয্যা ছেড়ে বারান্দায় বেরিয়ে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কোনো এক উজ্জ্বল নক্ষত্রকে উদ্দেশ করে বলে, 'ঠিক হচ্ছে তো? বল!' একেই 'পূর্ণতা' বলে? বেশ তাই হোক। বেশ তাই হোক। শুধু আমার সারাজীবনের অন্তর ইতিহাসের কথা লিখব আমি বসে বসে!...লিখেছি কখনো কখনো টুকরো টুকরো, বিচ্ছিন্ন। ...আস্ত করে ভাল করে লিখবো। যারা আমার শুধু বাইরেটাই দেখেছে, আর ধিক্কার দিয়েছে, এই আমার রোজনামচার ভিতর দিয়েই—না, মুখের কথায় কখনো কাউকে কিছু বোঝাতে পারি নি আমি, আমার অভিমান, আমার আবেগ, আমার অসহিষ্ণুতা, আমার চেষ্টাকে পন্ড করেছে। আমার খাতা কলম এবার সহায় হোক আমার!'

কে জানে বলে কি না, কি বলে আর না বলে।

'পাগল' মানুষটার কথা বাদ দাও! তবে দেখা গেল সুবর্ণলতার সেই গোলাপী-রঙা দোতলার ছাতে বারে বারে তিনবার হোগলা ছাওয়া হল, সুবর্ণলতাদের বাড়ির কাছাকাছি ডাস্টবীনে কলাপাতা আর মাটির গেলাস খুরির সমারোহ লাগল এক এক ক্ষেপে দু' তিন দিন ধরে।

তারপর আদি অন্তকাল যা হয়ে আসছে তারই পুনরভিনয় দেখা গেল ও বাড়ির দরজায়।

কনকাঞ্জলির একথালা চালে আজীবনের ভাত কাপড়ের ঋণ শোধ করে দিয়ে মেয়ে বিদায় হল আর এক সংসারের ভাত কাপড়ে পুষ্ট হতে, আর জলের ধারা

মাড়িয়ে দুধে আলতার পাথরে এসে বৌ দাঁড়ালো এ সংসারের অন্নজলে দাবি জানাতে।

দুটো দৃশ্যেই অবশ্য শাঁখ বাজলো, উলু পড়লো, বরণডালা সাজানো হলো, শুধু ভিতরের সুরের পার্থক্যটুকু ধরা পড়লো সানাইয়ের সুরে। সানাইওলারা জানে কখন আবাহনের সুর বাজাতে হয়, আর কখন বিসর্জনের।

তা সুবর্ণলতা তো এবারে একটু ছুটি পেতে পারে?

ছেলের বৌরা ধুলো-পায়ে ঘরবসত করে দু' মাস পরেই ঘরে এসে শ্বশুরঘর করতে লেগেছে। আর অবহেলিত বকুল কখন কোন ফাঁকে তার খেলাঘরের ধুলো ঝেড়ে নিঃশব্দে পারুলের জায়গায় ভর্তি হয়ে গেছে।

এখন সুবর্ণ না দেখলেও অনেক কাজ সুশৃঙ্খলে হয়ে যাচ্ছে। এখন বৌরা সব সময়ই বলছে, 'আপনি আবার কেন করতে এলেন মা, আমাদের বলুন না কি করতে হবে।'

অতএব সুবর্ণর তার খাতার পাতায় কলমের আঁকিবুকি কাটবার অবকাশ জুটেছে।

কিন্তু কোনখান থেকে সুরু হবে সেই রোজনামচা? কোন ধারায় প্রবাহিত হয়ে আসবে সুবর্ণলতার জীবনের সমাপ্তি সমুদ্রে?...

প্রথম যেদিন মুক্তকেশীর শক্ত বেড়ার মধ্যে এসে পড়লো সুবর্ণ নামের একটা সর্বহারা বালিকা মেয়ে, সেই দিনটাই কি রোজনামচার প্রথম পৃষ্ঠায় ঠাঁই পাবে?

কিন্তু প্রতিটি দিনের ইতিহাস কি লেখা যায়? প্রতিটি অনুভূতির?

তাছাড়া—

মুক্তকেশী যে সেই ক্রন্দনাকুল মেয়েটার একটা 'নড়া' ধরে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে যেতে বলেছিলেন, 'ঢের হয়েছে, আর ঠাট করে কাঁদতে হবে না, কান্না থামাও দিকি। মুখ চোখের চেহারা হয়েছে দেখ না, মা তো তোমার মরে নি বাছা এত ইয়ে কিসের?' এইটা দিয়েই সুরু করবে, না সেই যখন গিন্নীরা এদিক ওদিক সরে গেলে একটি প্রায় সমবয়সী বৌ পা টিপে টিপে এসে ফিস ফিস করে বলেছিল, 'আমি তোমার বড় জা হই বুঝলে? তোমার শাশুড়ীর ভাসুরপো বৌ। উঠোনের মাঝখানে যে পাঁচিল দেখছো তার ওদিকটা আমাদের। আসতে দেয় না, এই বিয়ে-বাড়ির ছুতোয় আসার হুকুম মিলেছে।' তা দেখ— বলে হদিস দিয়েছিল সিঁড়ির ঘুলঘুলি দিয়ে কি ভাবে দেখা হতে পারে—সেইখান থেকে।

ছাতের সিঁড়ির সেই ঘুলঘুলি পর্যন্ত চোখ পৌঁছত না তখন সুবর্ণর তাই ঠিক তার নীচেটায় দুখানা ইঁট এনে পেতেছিল। তার উপর দাঁড়িয়ে যার চোখের মিলন হতো। সেই ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে আদানপ্রদান হতো শুধু হৃদয়েরই নয়, রীতিমত সরানো বস্তুরও।

কুলের আচার, আমের মোরব্বা, মাখা তেঁতুল, কয়েৎবেল, ফুলুরি, রসবড়া, অনেক কিছুই। বলা বাহুল্য নিজের ভাগের থেকে এবং প্রায়শই খেতে খেতে তুলে রাখা সুপুরি মশলা পান।

সাবেকি বাড়ির সেই ভাঙা দেওয়ালের অন্তরালে যে বছরগুলো কাটিয়েছিল সুবর্ণ, তার মধ্যে মরুভূমিতে জলাশয়ের মত ছিল ওই সখীত্ব। আর একটু যখন বয়েস হয়েছে তখন আদানপ্রদানের মাধ্যমটা আর কুলের আচারের মধ্যেই সীমিত থাকে নি, ঘুলঘুলির মাঝখানের একখানা ইঁট সরিয়ে ফেলে, পথটাকে প্রশস্ত করে নিয়ে সেই পথে পাচার হতো বই।

না সুবর্ণর দিক থেকে কিছু দেবার ছিল না। ওর কাজ শুধু ফেরৎ দেওয়া।

জোগান দিত জয়াবতী।

মুক্তকেশীর ভাসুরপো বৌ।

তার বর মুক্তকেশীর ছেলেদের মত নয়। সে সভ্য, মার্জিত, উদার। তার বর বৌকে বই এনে এনে পড়াতো, যাতে 'চোখ কান একটু ফোটে।'

বলেছিল তাই জয়াবতী।

বলেছিল, 'দিনের বেলা সবাইয়ের সামনে তো পড়তে পারি না, লুকিয়ে রাত্তিরে। তুই বই পড়তে ভালবাসিস শুনে, ও তো আর একটা লাইবেরীতেই ভর্তি হয়ে গেছে। হেসে বলেছে, 'তোমাদের সেই ঘুলঘুলি পথেই পাচার কোরো।'

জয়াবতীর বয়েস বারো, জয়াবতীর বিয়ে হয়েছে দু বছর, তাই বরের গল্প আছে তার। আর সেই গল্পেই তার উৎসাহ।

জয়াবতীর মুখে বরের গল্প শুনে শুনে স্পন্দিত হতো সুবর্ণ, আর ভাবতো আশ্চর্য! এরা একই বাড়ির!

বিয়ের পর একটা বছর অবশ্য কড়া-কড়িতে রাখা হয়েছিল সুবর্ণকে, বৌকে নিজের কাছে নিয়ে শুতেন, বাপের বাড়ির বালাই তো নেই কাজেই ঘরবসতের প্রশ্নও নেই। নচেৎ একটা বছর তো সেখানেই থাকার কথা। কিন্তু এক বছর পরে যখন সুবর্ণ সেই 'পরম অধিকার পেল?...রাতের অধিকার!'

সুবর্ণ কি সেই পরম সৌভাগ্যকে পরম আনন্দে নিয়েছিল!

সে ইতিহাস কি লেখার?

লিখে প্রকাশ করবার?

কলম হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ভেবেছে সুবর্ণ, তারপর আস্তে কলম নামিয়ে রেখেছে।

তারপর জয়াবতীর কথা দিয়েই সুরু করেছে।

জয়াবতী বলতো, 'গোড়ায় গোড়ায় ভয় করে রে তারপর সয়ে যায়। আর দেখ এ সংসারে ওই লোকটা তো একমাত্র আপনার লোক, ওর জন্যেই তাই প্রাণটা পড়ে থাকে। দেখিস তোরও হবে।'

সুবর্ণ বলতো, 'আহা রে তোমার বরটির মতন কি না!'

সুবর্ণর সেই ছেলেমানুষ ভাসুরের উপর শ্রদ্ধা ছিল, ভালবাসা ছিল, সমীহ ছিল। জয়াবতীর সঙ্গে সখীত্বের সূত্রে ঠিক 'ভাসুর' ও ভাবত না যেন, বান্ধবীর বর হিসেবেই ভাবতো!

সুবর্ণরা যতদিন সেই পুরনো বাড়িতে ছিল জীবনের নীরেট দেওয়ালে এই একটা ঘুলঘুলি ছিল তার, কিন্তু সে ঘুলঘুলিও বন্ধ হয়ে গেল।

ভাসুরপো আর দ্যাওরদের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি মামলাবাজি করে শেষ পর্যন্ত বাড়ির অংশের টাকা ধরে নিয়ে আলাদা বাড়ি ফাঁদলেন।

জয়াবতীর সঙ্গে দেখা হওয়ার পথ বন্ধ হয়ে গেল।

অনেক অনেক দিন পরে আবার সে পথ খুলেছিল সুবর্ণলতা, কিন্তু তখন আর সেই আনন্দময়ী জয়াবতীর দেখা মেলে নি।

জয়াবতী তখন তার শাদা সিঁথিটার লজ্জায় মুখ তুলতো না, মুখ খুলতো না।

তবু আজীবন যোগসূত্র আছে। বাইরের না হোক হৃদয়ের।

তাই সুবর্ণলতার রোজনামচা সুরু হলো সেই 'ঘুলঘুলি' পথে আসা এক মুঠো আলোর কাহিনী নিয়ে। (ক্রমশঃ)

গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৩, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট
কলিকাতা-১
ফোন: ২২-৬৬৮০

প্রত্যাশার মৃত্যু ও দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা

● কৃত্তিবাস ওঝা ●

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

যে যে আগুন দীর্ঘকাল ধরে ধিকি ধিকি জ্বলে তামাকের আগুনের পরমায়ু তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশে এই আগুন নিয়ে যে দুজন ব্যক্তি রাজনীতি করেন তাঁরা হলেন শ্রীঅতুল্য ঘোষ ও শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত। চেহারায় দুজনার মধ্যে আসমান-জমীন ফারাক, আকৃতি-অবয়বে কোন মিল নেই, কিন্তু মিল মাত্র একটি স্থানে সেটা হল দুজনেই চুরুট খেতে ভালবাসেন, আর ভালবাসেন সম্ভবত একটিমাত্র কারণে যে, চুরুটের আগুন অনেকক্ষণ জ্বলে, অনেকক্ষণ তাপ দেয়।

২৭শে নভেম্বর ময়দানের সভার পর রাজ্যের বামপন্থী দলগুলির মধ্যে একটা স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হল তীব্রভাবে। রাজ্যে দুইটি বামপন্থী ফ্রন্ট গঠন দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে গেছে, দুই শিবিরে দাঁড়িয়ে রথীরা ভাবী মল্লযুদ্ধের জন্য আওয়াজ তুলতে শুরু করেছেন, এখন আর কোন ছলাকলা গোপন অভিসার নয়। প্রকাশ্যে চলে আসতে হবে যে-কোন শিবিরে। কিন্তু এই সময় দিল্লী থেকে একটা খবর আবার কলকাতার বাতাসে নতুন গুঞ্জন তুললো। সেই গুঞ্জন হল, দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীরাজেশ্বর রাও, শ্রী এস এ ডাঙ্গে, শ্রীভূপেশ গুপ্ত আবার কলকাতা আসছেন এবং তাঁরা আর একবার দুই কম্যুনিস্ট পার্টির বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করবেন। ৪ঠা ডিসেম্বর শ্রীরাজেশ্বর রাও আর শ্রীভূপেশ গুপ্ত কলকাতা এলেন আর ৫ই রাত্রে শ্রীডাঙ্গে কলকাতা এলেন। কিন্তু শুধু পাত্র বা শুধু পাত্রীতে তো বিবাহ হয় না, দুটি পক্ষের প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে এক পক্ষ যতই উদ্যোগী হোক না কেন আর এক পক্ষের উদ্যোগ চাই। ৬ই তারিখ সেই উদ্যোগ শুরু হল। শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীজ্যোতি বসুর সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে দুই কম্যুনিস্ট পার্টির নেতাদের যুক্ত বৈঠকের দৌত্য শুরু করলেন। ৬ই দুপুর তিনটা নাগাদ শ্রীজ্যোতি বসু বৈঠকে বসবার সম্মতি দিলেন, তবে বৈঠক হবে কোন দল-নিরপেক্ষ ব্যক্তির বাড়িতে। খোঁজ পড়ল দলনিরপেক্ষ ব্যক্তির এবং শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় মধ্য কলিকাতায় ডাঃ মণি বিশ্বাসের বাড়ি বৈঠকের স্থান হিসাবে নির্দিষ্ট করে শ্রীজ্যোতি বসুকে জানিয়ে দিলেন। বৈঠক হবে ৭ই বুধবার বেলা দশটায়।

ঠিক সেই একই খেলা আবার একই নাটক বার বার। রাজ্যের চার বর্ষীয়ান নেতার দৌত্যের আগে একদিন যেভাবে বাম কম্যুনিস্ট পার্টি, বাংলা কংগ্রেস আর দক্ষিণ কম্যুনিস্ট পার্টিকে বাদ দিয়ে ফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, যেমন মধু লিমায়ের দৌত্যের কয়েক ঘণ্টা আগে একক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে দিয়েছিল, ঠিক শ্রীডাঙ্গে ও শ্রীরাজেশ্বর রাওয়ের সহিত বৈঠকের ১৪ ঘণ্টা আগে বাম কম্যুনিস্ট পার্টির দপ্তরে বসে সাতটি বামপন্থী দলকে নিয়ে একটি ফ্রন্ট গঠনের গোপন চুক্তি সমাধা করলেন। গোপন চুক্তি এই কারণে যে, এই ফ্রন্ট গঠনের সংবাদটি প্রকাশের দিন স্থির হয়েছিল ৮ই ডিসেম্বর অর্থাৎ শ্রীডাঙ্গের সঙ্গে বৈঠকের পর দিন। কিন্তু যে গোপন বৈঠকে শ্রীডাঙ্গের পার্টিকে বাদ দিয়ে ফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত হল তার পর শ্রীডাঙ্গের সঙ্গে বৈঠকের কোন যুক্তি নিশ্চয়ই ছিল না কিন্তু যুক্তিহীন বহু কাজও বহু সময় করতে হয় কপট আবরণ রক্ষার জন্য। ৭ই সকাল দশটায় ডাঃ মণি বিশ্বাসের বাড়িতে বৈঠক বসল দুই কম্যুনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা ভারত নেতৃবৃন্দের। এই বৈঠকে শ্রীডাঙ্গে প্রকৃত পক্ষে কোন প্রস্তাব দ্বারাই পাথর গলাতে পারলেন না। শ্রীডাঙ্গের শেষ প্রস্তাব ছিল দুই কম্যুনিস্ট পার্টির বিরোধের আসনগুলি একটি নিরপেক্ষ সালিশীর হাতে দেওয়া হোক। কিন্তু সেই প্রস্তাব "অরাজনৈতিক ও বুর্জোয়া ধ্যানধারণাপ্রসূত" বলে প্রত্যাখ্যাত হল। পরে অবশ্য আরো অনেক কড়া ও কঠোর মন্তব্য দিয়ে শ্রীডাঙ্গেকে চিত্রিত করা হয় বাম কম্যুনিস্ট দলের ভাষ্যে ও লেখনীতে। শ্রীডাঙ্গে নাকি শ্রীহেমন্ত বসুর দেওয়া প্রাক্তন প্রস্তাবটি পেশ করে সংগ্রামী জনতার ঐক্যে ফাটল

শ্রী এস এ ডাঙ্গে

শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

ধরাতে বুর্জোয়া শক্তির বিশ্বস্ত এজেন্ট-রূপে কাজ করেছেন। বামপন্থী কম্যুনিস্ট দলের বক্তব্য, সালিশী কেন? শক্তি ও সংগঠনের পরীক্ষা তো হয়ে গিয়েছে ২৭শে ময়দানের সভায়। ১২ লক্ষ জনতা ময়দানে উপস্থিত থেকে বাম কম্যুনিস্ট পার্টির শক্তি ও সংগঠনের পরীক্ষা দিয়ে গেছে। বাম কম্যুনিস্ট পার্টির ভাষ্যে ময়দানে ২৭শে নভেম্বর ১২ লক্ষ লোক জমায়েত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে লেখক একটি হিসাব পেশের লোভ কোনক্রমেই সম্বরণ করতে পারছে না। কারণ কলকাতার ময়দান আর গর্ত নিয়ে বড়ই উৎপাত সৃষ্টি করছে গত কয়েক বৎসর। মাঝে মধ্যেই ময়দানে বড় সভা হলে যে লোকসংখ্যার হিসাব বের হয় তা দেখে বহু সময় ময়দানের গর্ত সম্পর্কে সন্দেহ হয়। এই গর্ত কি প্রয়োজনে বেড়ে যায়? নইলে কখনও ৩০ হাজার মানুষে ময়দান ভরে যায়, কখনও লক্ষ জনতায় ময়দান টৈ টম্বুর হয়, আবার পাঁচ লক্ষ দশ লক্ষ জনতা ময়দানের গর্ভে স্থান পায় কিভাবে। তাই ময়দানের বর্গফুটের হিসাবে একবার দেখা যাক ময়দানে কত লোক ধরে। একটি লোকের বসতে দরকার হয় চার বর্গফুটের আর দাঁড়াতে দুই বর্গফুটের। কিন্তু ময়দানে সব লোক বসে না আবার সব লোক দাঁড়িয়ে থাকে না, তাই অর্ধেক বসে অর্ধেক দাঁড়িয়ে যদি হিসাব করা যায় তবে মাথাপিছু তিন বর্গফুট জায়গা রাখা যাক। এইবার আসুন ময়দানকে যতদূর সম্ভব ধ্যান নিয়ে মেপে ফেলি। এইভাবে এক-দিকে খেলার মাঠ। একদিকে ময়দানের হকার্স কর্নার একদিকে রাণী রাসমণি রোড; আর একদিকে প্রেস ক্লাবের তাঁবু এই সবটা মাপলে হবে ২,৬০,০০০ বর্গ-ফুট। এই বর্গফুটকে তিন দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হবে ৮৭ হাজার। অর্থাৎ ময়দানে যদি একজনের কাছে তিনজন না দাঁড়ায় তবে ময়দানে যত বেশি লোকই ধরুক না কেন সেই সংখ্যা ৮৭ হাজারের বেশি হবে না। এর পরে যারা ময়দানে পাঁচ, দশ, বিশ লক্ষ মানুষ জমায়েত করেন তাঁরা নিশ্চয়ই গত বিশ্বযুদ্ধে গোয়েবোলস-এর কাছে প্রচারের তালিম পেয়েছেন, সাধারণ তালিমে এই জিনিস হয় না। না, সত্যি গোয়েবলস সাহেব মরেন নি এবং তিনি এখনও অনেকের মধ্যেই একাকার হয়ে বেঁচে আছেন। নইলে গোয়েবোলস-এর অমর সূত্র—"একটি মিথ্যা বার বার বলে যাও সেই মিথ্যা দেখবে একদা সত্য হবে" এই তথ্য এত সুন্দরভাবে সেই সুদূর জার্মানী থেকে চালান হয়ে পশ্চিমবঙ্গে এত সজীব ও সত্য হয়ে উঠল কিভাবে। এই প্রচার ঢং-এর শিকার হল শ্রীডাঙ্গের প্রচেষ্টা। শ্রীডাঙ্গে নাকি পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী ঐক্যে ফাটল ধরাতে, সপ্তবামের মোর্চা বানচাল করতে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন। শ্রীডাঙ্গে দৌত্য ব্যর্থ হল আর ৮ই ডিসেম্বর কম্যুনিস্ট পার্টির দপ্তরে বসে সাত বাম পার্টি একটি ফ্রন্ট ঘোষণা করলেন। এই ফ্রন্ট প্রথম কিস্তিতে ১৯০টি বিধান সভা আর ২৯টি লোক-সভায় প্রার্থী দিলেন। এই সপ্ত বামের ফ্রন্টে শরিক হলেন বাম কম্যুনিস্ট পার্টি, আর-এস-পি, এস-এস-পি, আর-সি-পি-আই, ওয়ার্কার্স পার্টি, এস-ইউ-সি ও মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক। এই ফ্রন্টের বাইরে পড়ে থাকা দলগুলির মধ্যে বাংলা কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট পার্টি ও ফরোয়ার্ড ব্লক ১০ই ডিসেম্বর এক বৈঠকে মিলিত হয়ে আর একটি ফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং ১২ই ডিসেম্বর বলশেভিক পার্টিকে সঙ্গে নিয়ে এই ফ্রন্ট তাদের ১৮০টি আসনের তালিকা প্রকাশ করে দিল। অর্থাৎ কয়েক মাসের সর্ব-প্রকার প্রচেষ্টার সমাধির উপর পশ্চিমবঙ্গে দুটি বামপন্থী ফ্রন্ট গড়ে উঠল এবং আত্মপ্রকাশ করলো। বামপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টির ফ্রন্টের নাম সম্মিলিত বামপন্থী ফ্রন্ট আর অপর ফ্রন্টের নাম সংযুক্ত বাম-পন্থী গণফ্রন্ট। দুই জনেই সংযুক্ত দুই জনেই ফ্রন্ট—কিন্তু আর! কার জন্য এই সংকল্প আর কার জন্য এই ফ্রন্ট।

দুই ফ্রন্টের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা আর নির্বাচনী অভিযান শুরু হয়েছে। উভয় ফ্রন্ট দেশের লোকের কাছে নিজেদের একমাত্র সতী ও দেশপ্রেমের সার্থক প্রতি-নিধিরূপে প্রমাণের আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করেছেন কিন্তু দেশবাসী শুধুমাত্র এখন দর্শকরূপে দেখে চলেছেন—তাঁরা কি চেয়েছিলেন আর কি পেলেন! নির্বাচনী প্রচারের মুখেই দেখা যাচ্ছে গত ১০ই ডিসেম্বর থেকে ২০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাম কম্যুনিস্ট পার্টির পলিট ব্যুরোর সভা উপলক্ষে কলকাতায় আগত সদস্যদের বক্তৃতা বাংলাদেশের মানুষ শুনতে পেয়ে-ছেন। অবশ্য আগামী দুই মাসে আরো অনেক কথাই শুনতে পাবেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত ডাঙ্গেপন্থী, বাংলা কংগ্রেস ও ফরোয়ার্ড ব্লকের উদ্দেশ্যে খিস্তি-খেউড় ছাড়া কাজের কথা কিছু শুনতে পাচ্ছেন না।

দুই ফ্রন্টের তালিকায় ১৩০টি আসন বিরোধমুক্ত আছে এবং এই আসনের সংখ্যা একটু চেষ্টা করলে ১৮০ করা যায়। কিন্তু সেই চেষ্টার পরিবর্তে বরং নতুন এক চেষ্টা শুরু হয়েছে যে, কিভাবে আরো বেশি প্রার্থী দিয়ে আরো বেশি ত্রিপক্ষীয় লড়াই করা যায়। পশ্চিমবঙ্গে ১৩০টি আসনে যদি কংগ্রেসের সঙ্গে সরাসরি লড়াই হত এবং অন্য আসনে লড়াইতে বামপন্থীরা যদি জনতার দ্বারে উপস্থিত হয়ে বলত—আমরা ঐক্য করতে পারি নি, আমরা নিজের যোগ্যতা ও শক্তির মাপ করতে পারি নি, জনগণ রায় দিয়ে আমাদের মধ্যে কে যোগ্য, কে শক্তিশালী বিচার করে দিন; তবে ১৩০টি আসনে এবং অপর ৯৫০ আসনে লড়াই করে যে ফল পেত হয়ত সেই ফল চরম সর্বনাশ থেকে দেশকে কিছুটা হলেও রক্ষা করতে পারতো। কিন্তু বাম কম্যুনিস্ট পার্টি সম্ভবত তাদের গাজনের নাচ ঐ সীমাবদ্ধ এলাকাতেই নাচতে প্রস্তুত নয়। তাই আওয়াজ উঠেছে শ্রীহেমন্ত বসুর বিরুদ্ধে প্রার্থী দাও, শ্রীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শ্রীহেমন্ত বসু

শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত

বিরুদ্ধে প্রার্থী দাও, শ্রীহীরেন মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রার্থী দাও।

শেষ খেলা শুরু। এই শেষ খেলা হল শেষ করার খেলা। বামপন্থী ঐক্যের শেষ হয়েছে কিন্তু এখনও অনেকগুলি শক্তি আছে যাদের শেষ করার মহান দায়িত্ব রয়েছে বাম কম্যুনিস্ট পার্টির। ডাঙ্গেপন্থীদের শেষ করতে হবে, মধ্যপন্থী বলে যারা আছে অর্থাৎ কম্যুনিস্ট ইউনিটি কমিটি, তাদের শেষ করতে হবে আর শেষ করতে হবে নিজের দলে এখনও যেসব অশুভ শক্তি বেঁচে আছে তাদের। বাম কম্যুনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে এখনও দু-চারজন আছেন যেমন শ্রীজ্যোতি বসু, শ্রীনিরঞ্জন সেন, শ্রীসরোজ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅমৃতেন্দু মুখার্জী, শ্রীসুবোধ চৌধুরী শ্রীবিনয় চৌধুরী প্রমুখ। এঁদের শেষ করার মহান লক্ষ্যও এই কর্মসূচীতে আছে। বাংলাদেশে আজ যদি সর্বদলীয় বামপন্থী ঐক্য হত তবে সেই ঐক্যবদ্ধ দলের নেতা নিশ্চয়ই হতেন শ্রীজ্যোতি বসু। কিন্তু আজ এই ঐক্যের মৃত্যুর সঙ্গে শ্রীজ্যোতি বসুর রাজনৈতিক মৃত্যুও সমাধা করা হয়েছে তাই অনৈক্যের শ্মশানে আগামী দিনে যাঁরা জয়যুক্ত হবেন তাঁদের নেতা আর যেই হোন না কেন, শ্রীজ্যোতি বসু হবেন না। শ্রীবসু ইতিমধ্যে শোধনবাদী বলে নরম সুরে চিহ্নিত হচ্ছেন, আগামী দিনে শুধুমাত্র নৈবেদ্যের কলারূপে তাঁকে রাখলেও কলার নিচে প্রতিটি চালই হবে শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের বশংবদ। প্রমোদবাবু নির্বাচনের প্রার্থী বাছাই সেইভাবেই করেছেন। অনেককে লোকসভায় পাঠানো আর অনেককে কেন্দ্র পালটে দাঁড় করানো—তার মধ্যে এই চিত্র আছে। শুধু নিজের দলই নয় এই ফ্রন্টের মধ্যে অন্য দল যারা আছে তাদেরও শেষ করবার সব ব্যবস্থাই রাখা হয়েছে সুন্দরভাবে। এস-এস-পি দল বাম ফ্রন্টের বড় শরিক কিন্তু সেই দলে আজ এমন অবস্থা যে, যে কোনদিন দল ভেঙে দু' টুকরো হতে পারে। শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র যে বিদ্রোহের নিশান উড়িয়েছেন তার জের সহজে মেটবার নয়। আর-এস-পি দলের ঘরেও সুখ নেই, ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আর মণি চক্রবর্তী কড়া নজরে পার্টির লাগাম ধরবার চেষ্টা করছেন।

কিন্তু যে যত শক্তিশালী ভাবেই লাগাম ধরুন না কেন বামপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি আর লক্ষ্যে সকলকে নিয়ে যাবেই। এই লক্ষ্য হল—ঐক্যের মধ্যে হোক আর ঐক্যের বাইরে হোক অন্য দলকে শেষ কর, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস আগামী পাঁচ বৎসর ক্ষমতায় থাক কিন্তু কট্টর বাম ছাড়া অন্য সকলে এই মধ্যবর্তীকালে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক। যে বাম কম্যুনিস্ট পার্টি বাংলা কংগ্রেস সম্পর্কে এত বিষোদ্গার করছেন সেই বাম কম্যুনিস্ট পার্টি কিন্তু ত্রিপুরায় সদ্য কংগ্রেসত্যাগী ত্রিপুরার প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীসুখময় সেনগুপ্তের দলের সঙ্গে ত্রিপুরাতে নির্বাচনী মিতালী করেছেন। কিন্তু বাংলায় করা সম্ভব হল না শুধুমাত্র একটি কারণে যে, আজ বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে মিতালী করলে পশ্চিমবঙ্গে যদি বাংলা কংগ্রেস আরো সজীব হয়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গে বাম কম্যুনিস্ট পার্টি বিনা যুদ্ধে ডান কম্যুনিস্টকে সূচাগ্র মেদিনী দিতে রাজী নয়, কিন্তু বিহারে ডানের এক পঞ্চমাংশ আসন নিয়ে ভাল ছেলে হয়ে মিতালী করেছে। যা হোক, বামপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি নির্দিষ্ট দর্শন ও লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসকে ক্ষমতায় ফিরে আসবার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে। **কারণ বামপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি রাজ্যের শক্তিশালী বড় পার্টি, কম হলেও কংগ্রেসের বিকল্প শক্তি, তার চক্রান্ত শুধু কংগ্রেসকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনছে না—আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি শহর ও গ্রাম হবে "বেলঘরিয়া"।** সরকারী বাসের ধর্মঘট ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু আগামী দিনগুলি শুধু ধর্মঘট-আন্দোলনের ব্যর্থতার দিন হবে না, সরকারবিরোধী সকল গণতান্ত্রিক বামপন্থী শক্তির গলা টিপে মারার দিন হয়ে দাঁড়াবে। হাজার হাজার শিক্ষক-শ্রমিক-সরকারী কর্মচারী, যুব-ছাত্র, ট্রেড

শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র

ইউনিয়ন নেতা বেপরোয়া সরকারী আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যাবেন। পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী ঐক্যের মৃত্যু আগামী দিনে সারা দেশের লক্ষ লক্ষ সংগ্রামী মানুষের মুখে মৃত্যুর ছায়া ফেলবে। সেইদিন বিচার হবে না কে বাম, কে দক্ষিণ কম্যুনিস্ট, কে বাংলা কংগ্রেস, কে ফরোয়ার্ড ব্লক। **সেইদিন দেখা যাবে বাম কম্যুনিস্ট দলের "পোলারাইজেশন" থিওরী ব্যর্থ হয়ে গেছে। শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের সৃষ্ট ফ্রাঙ্কেনস্টাইন শুধু তাঁকে নয় সারা দেশের মানুষের রক্ত চুষে খাচ্ছে।**

সাধু)

আত্ম-জীবনী

স্বর্গীয় অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

মূল্য—দুই টাকা

"এই আত্মজীবনী পাঠ করিয়া বাঙালী পাঠক একসঙ্গে শিক্ষা ও আনন্দলাভ করিবেন"—

—সুপ্রসিদ্ধ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—প্রবাসী

"একাধারে ব্যবহারজীবী, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও কর্মী সচরাচর দেখা যায় না। কাজেই তাঁহার আত্মজীবনী অত্যন্ত সুখপাঠ্য গ্রন্থ হইয়াছে।"

—রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র

সঙ্গীত-নায়ক

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস

প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ

প্রতি ভাগ—৫৲।

হারমোনিয়াম শিক্ষা

মূল্য—৩৲

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,

কলিকাতা—১২

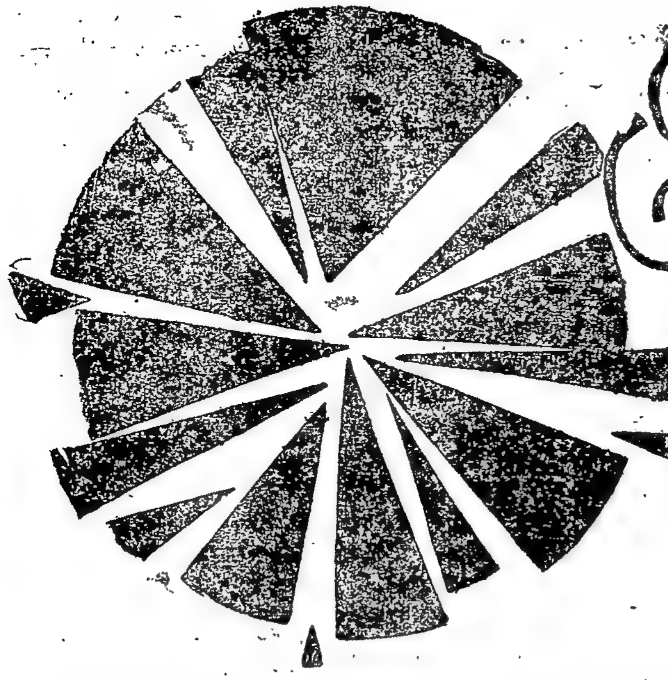

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

আহত অভিমান

শেভ্রোলে গাড়িটা ঘিরে গর্বের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে মাখন, রজত, টেগ্‌রা, আনন্দ, হিমাংশু ও বিধু। ভাল করে আনন্দদের গ্রুপের প্রত্যেকের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যেন এক একটি জ্বলন্ত উল্কা-পিন্ড—উৎসাহে, উদ্দীপনায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। তাদের morale দেখে আমার মনের সমস্ত দ্বিধা-সংশয় দূর হ'ল—অন্তরে অসাধারণ প্রেরণা পেলাম। মানসচক্ষে স্পষ্ট দেখলাম, দিগন্তরেখায় এক-খন্ড ঘন কালো মেঘ থমকে আছে—আর কয়েক ঘণ্টা পরেই সমস্ত আকাশ ছেয়ে প্রচন্ড ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রপাতের সূচনা করবে—তার আড়ালে ঢাকা পড়বে বৃটিশ-সূর্য—কেঁপে উঠবে বৃটিশ রাজশক্তি—আর অবিশ্রান্ত গোলাগুলীর বিনিময়ে মৃত্যু ও ধ্বংসের বিভীষিকা যে ভয়ঙ্কর রূপ নেবে তার করাল ছায়া গ্রাস করবে সাম্রাজ্যবাদী শত্রুদের। এই তরুণ বিপ্লবীদের মুখের প্রতিটি রেখায় প্রতিফলিত হচ্ছে মৃত্যুপণ; আর ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা জ্বলছে তাদের চোখে।

সবাইকে আমার বিপ্লবী অভিনন্দন জানাই। যুদ্ধক্ষেত্রে যারা প্রথম অ্যাক্‌সনের সময় মারা যাবে না তাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে এই আশা নিয়ে বিদায় নিলাম। কেবল আনন্দকে সঙ্গে নিয়ে নতুন গাড়ি করে বেরিয়ে পড়লাম। আনন্দ নতুন গাড়িটি প্রায় আধ ঘণ্টা চালিয়ে দেখে নিল।

ত্রিপুরা প্রত্যেক গ্রুপ কমান্ডারকে ও প্রত্যেক দলে অন্তত দুটি করে ঘড়ি দিয়ে এসেছে—সব ঘড়িগুলির টাইমও চেক্ করেছে।

শৈলেশ্বরকে প্রচারপত্র বিলি করার দায়িত্ব দেওয়া ছিল। প্রচারপত্রগুলি যে নির্দিষ্ট স্থানে ছিল তার অস্তিত্ব মাত্র শৈলেশ্বরই জানত। প্রচারপত্রের বিষয়বস্তু শৈলেশ্বরকে বলা হয় নি। যে দলটি শৈলেশ্বরের নির্দেশে প্রচারপত্রগুলি নিয়ে আসবে, তারা আগে থেকে জানত না সেই স্থানটি এবং বিন্দুবিসর্গও অনুমান করতে পারে নি প্রচারপত্রে কি লেখা আছে। প্রচারপত্রগুলি বিলি করার দলটির morale অক্ষুণ্ণ আছে কি না এবং তাদের সব ব্যবস্থা নির্বিবাদে সম্পন্ন হওয়ার মধ্যে কোন বাধা বা ত্রুটি ঘটবার সম্ভাবনা আছে কি না তা খোঁজ করে জানবার পর আমি দুপুরে বাড়ি ফিরলাম।

প্রায় একটা বেজেছে। গত কয়েক মাস ধরে আমিও অন্যান্যদের মত খুব অনিয়মে চলেছি। স্নান, আহার ও নিদ্রার কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। বাড়ির লোকেরাও এতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরে একশ'টি পিস্তলের কার্তুজভরা একটি থলে বৌদিকে দিয়ে বললাম রোদে দিয়ে সেগুলিকে গরম করে রাখতে। অন্তত মাসে একবার বৌদির ওপর এই ভারটি আমার দিতেই হোত। বৌদিকে কার্তুজগুলি রোদে গরম করতে দেওয়ার পর দাদাকে দিলাম আমার পিস্তলটি যেন তেল-টেল দিয়ে পরিষ্কার ও ভাল করে চালু করে দেন—আমি স্নান-খাওয়ার পর তক্ষুণি আবার বেরিয়ে যাব।

এসব আমার বাড়িতে নতুন কিছুই নয়। মা-বাবা নদীর তীরে ডবলমুরিং জেটির কাছে একটি বাড়িতে মাস কয়েক ধরে থাকতেন। ডাক্তারেরা মায়ের স্বাস্থ্যের জন্য নদীর ধারে থাকতে অভিমত দিয়েছিলেন। যখন বাবা-মা বাড়ি থাকতেন তখনও বোমা-পিস্তল তাঁদের সামনেই দাদা, বৌদি ও দিদিকে কখনও কখনও রোদে দিতে বা রাখতে দিয়েছি, এইসব আমার বাড়িতে দৈনন্দিন ব্যাপার। আর আমার মা?—তিনিও এই কাজ থেকে বাদ পড়তেন না। বাড়ি ফিরে সামনে যাঁকে পেতাম তাঁরই কাছে আমার পিস্তল বা রিভলভার জিম্মা করে দিতাম। এটাই আমার রোজকার নিয়ম। এই নিয়মের ব্যতিক্রম তখনই শুধু করেছি যখন বিশেষ কাজে এক মুহূর্তের জন্যও পিস্তল হাত-ছাড়া করার সময় পাই নি বা কোন অশুভ আশঙ্কার কারণ বুঝেছি।

আজ অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে পিস্তল রাখার বেশি প্রয়োজন। তাই বলে "অকেজো পিস্তল" রাখার কোন মানে হয় না। সেইজন্যই প্রয়োজন ছিল পিস্তলটি তেল দিয়ে আক্রমণের কয়েক ঘণ্টা পূর্বে ঠিকঠাক করে নেওয়া; আর বলাই বাহুল্য যে কার্তুজগুলি গরম করে রাখা এই জন্য, যেন কোন একটিও ট্রিগার টেপার সময় ব্যর্থ না হয়। ট্রিগার টেপার পর এক সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যেই ফলাফল জানা যায়—আমাদের গুলী ব্যর্থ হলে পাহারারত সান্ত্রীদের গুলী আমাদের বিদ্ধ করবে। এইরূপ অনিশ্চয়তার গুরুত্ব যত অনুভব করেছি তত বেশি করে খুঁটিনাটি অনেক বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করেছি। অতি সামান্য গাফি-লতির জন্য মস্ত বড় সামগ্রিক প্ল্যানও বানচাল হয়ে যায়—এইরূপ প্রমাণ আগেও পেয়েছি এবং পরেও দেখেছি শত সাব-ধান হয়েও ত্রুটির হাত থেকে রেহাই পাই নি এবং অনেক ক্ষেত্রে সেইরূপ ভুলের জন্য বহু মূল্য দিতে হয়েছে আমাদের।

দাদা বৌদিকে পিস্তল ও কার্তুজ জিম্মা করে দিয়ে আমি চট্ করে স্নান করে নিলাম। আমার আজকের ব্যস্ততা দেখেও তাঁরা নিশ্চয়ই তেমন কিছু অনুমান করতে পারতেন না যদি চলাফেরা ভাবভঙ্গী ও মুখের গাম্ভীর্য দিয়ে আমি বোঝাতে চেষ্টা না করতাম যে আজ আমরা কোন অ্যাক্‌সন্ করব। দাদা কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। বৌদি কখনও কোন প্রশ্ন করতেন না—কারণ জানতেন উত্তর পাবেন না।

স্নান করে খাওয়ার ঘরে গেলাম। দিদি বাড়ি ছিলেন—তিনি আমাকে থালা সাজিয়ে খেতে দিলেন। আমার হাবভাব দিদি খুব লক্ষ্য করে দেখছিলেন। খেতে বসে একটু পরে দিদিকে বললাম—

—"দিদি আমরা এবার তৈরি হয়েছি।"

—"কি বলছিস্? খুলে বল—কিসের জন্য তৈরি?"

—"চট্টগ্রামে বৃটিশ রাজত্বের শেষ দিন ঘনিয়ে এসেছে—আজ তাদের সমাধি রচনা হবে। গণতন্ত্রবাহিনীর সৈন্য আজ শহর দখল করবে!"

দিদি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এও কি সম্ভব! "সন্ত্রাসবাদী" কার্যকলাপের বিরুদ্ধে পুলিশ আর গোয়েন্দা বিভাগ তাদের কর্মতৎপরতা ক্রমশ বাড়িয়ে চলেছে। বৃটিশশক্তির বিরুদ্ধে তখন পর্যন্ত এমন কি বঙ্গদেশেও বিপ্লবীরা কোন সক্রিয় পন্থা গ্রহণ করে নি। তখন পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ কংগ্রেস আন্দোলনে গা ভাসিয়ে চলেছি। আর আমাদের যা' কিছু বৈশিষ্ট্য এতদিন দিদি দেখেছেন তা' হচ্ছে ব্যায়াম কেন্দ্রে শরীরচর্চা আর ইউনিফর্ম-পরা ভলান্টিয়ার বাহিনীর খালি হাতে কুচকাওয়াজ। গত কয়েক মাস ধরে ব্যায়ামচর্চা ও কুচকাওয়াজ করার মধ্যে আমাদের শিথিলতা দিদির চোখেও পড়েছে। তা' ছাড়া আমাদের বিরুদ্ধে নানা কুৎসা দিদির এবং বাড়ির অন্যান্য সকলের কানেও কিছু কিছু পৌঁছেছে—আমরা স্নো-পাউডার মেখে ঘুরে বেড়াই, ছেলেরা লেখাপড়া ছেড়েছে, অবাধ্য হয়েছে, রেস্টুরেন্টে ও সিনেমায় পয়সা নষ্ট করছে, রাত্রেও তারা বাড়ি থাকে না? দিদির মুখ দেখে বুঝলাম তাঁর মনে প্রশ্ন আছে—আমার কথায় তাঁর সন্দেহ হচ্ছে—বিশ্বাস যেন তিনি করতে পারছেন না।

দিদির মনের সন্দেহ দূর করবার জন্য বললাম—

"দিদি বিশ্বাস করা কঠিন, তবু বলছি আজ রাত্রে এটা ঘটবে। ইউনিয়ন জ্যাকের পরিবর্তে স্বাধীনতার পতাকা আজ চট্টগ্রামের বুকে প্রতিষ্ঠা করব।"

আমার মুখে দিদি কখনও বাজে কথা শোনেন নি। দিদি আমার কথার ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করে বুঝতে পারলেন আমি যা' বলছি সত্যি—তাঁর মনে সংশয় আর রইল না। দিদির মনে প্রথম আমার কথা শুনে সন্দেহ জাগা অস্বাভাবিক কিছুই ছিল না। তিনি বাড়িতে থেকে আমাকে, গণেশকে ও আমাদের সবাইকে দিনে-রাতে দেখেছেন তবু এই বিরাট আয়োজনের কথা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেন নি। তাই আমার কথা শুনে তাঁর বিশ্বাস হয় নি। এই জন্য আমি আবার বলছি পুলিশ গুণতে জানে না। দলের সভ্য—বিশেষ করে নেতৃস্থানীয় যাঁরা, তাঁদের মধ্যে কেউ যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে পুলিশকে সংবাদ না দেয় তাহলে বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের খবর পুলিশ পেতে পারে না। দিদির চোখ দু'টি উৎসাহে জ্বলে উঠল। তিনি অধীর হয়ে আমাকে বললেন—

—"আমিও যাব তোদের সঙ্গে। আমাকে কেন বাদ দিলি তোরা? আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল্।"

—"না, তা হয় না দিদি। আমরা এবার বোনেদের সঙ্গে নিচ্ছি না। প্রথমবারের জন্য এটা ভাইদের কাজ। বোনেরা আসবে পরে।"

আমার কথা শুনে দিদি একেবারে ক্ষেপে উঠলেন। তিনি খুব রেগে ও অভিমানভরে বলতে লাগলেন—

"কেন? বোনেরা পিছিয়ে থাকবে কেন? বেশ তুই নিতে না চাস্ আমি এক্ষুণি গিয়ে মাস্টারদাকে বলছি—আমিও যাব।"

দিদি মনে করলেন আমিই যেন দিদিকে বাদ দিয়েছি—তাই তাঁর এত অভিমান, এত রাগ। আমাদের দলের সঙ্গে দিদির সংযোগ ছিল একেবারে প্রথম থেকেই। তিনি মাস্টারদা এবং দলের অন্যান্য নেতাদের সবাইকে চিনতেন ও তাঁদের অনেকের সঙ্গে পরিচয়ও ছিল। দিদি বোধ হয় ভেবেছিলেন, মাস্টারদাকে বলে কয়ে রাজী করাতে পারবেন। কিন্তু যখন আমি জানালাম যে মাস্টারদার দেখা পাওয়া আজ সম্ভব নয়, তখন তিনি একেবারে দমে গেলেন।

পরক্ষণেই অবশ্য তাঁর মনে একটু আশার সঞ্চার হল, কারণ আমি বললাম—"মাস্টারদা তোমার জন্য নির্দেশ পাঠিয়েছেন—একটা চিঠি দিয়েছেন।" তক্ষুণি সেটা পড়বার জন্য দিদি অস্থির হয়ে উঠলেন। আমার খাওয়া তখনও শেষ হয় নি। দিদির তখন সেদিকে লক্ষ্য দেওয়ার সময় ছিল না। মাস্টারদার চিঠি! মাস্টারদার নির্দেশ! দিদি চিঠির জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন। আমি তাঁকে বললাম যে চিঠি আমার "মনিব্যাগে" আছে—ছোট এক টুকরো কাগজ। দিদি চট্ করে চিঠিটা বার করে নিয়ে পড়তে লাগলেন—

"দিদি

আজ রাত্রে আমরা চলিয়া যাইতেছি। আজ আমাদের মৃত্যুর দিন। হয়ত আর দেখা হইবে না। বিপ্লবের পথে আমাদের পদযাত্রা আজ হইতে নূতন পথ অবলম্বন করিবে। যে পতাকা আমরা পিছনে তোমাদের হাতে দিয়া যাইতেছি তোমরা তাহা বহন করিও—বিপ্লবের আগুনে যে মশাল আজ জ্বালাইয়া রাখিয়া যাইব তাহা যেন কোনদিন নিভিয়া না যায়।

বৈপ্লবিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

—মাস্টারদা।"

মাস্টারদার এই শেষ চিঠি। হয়ত আর দেখা হবে না। দিদি আজ অভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পেলেন না। আহত অভিমানে চোখের ধারা বইতে লাগল। মনের আবেগ সংযত করে বলতে লাগলেন—

"অনন্ত, মাস্টারদাকে জিজ্ঞেস করিস্ তাঁর প্রিয় ভাইদের চাইতে কোনদিকে আমি পিছিয়ে আছি? শারীরিক শক্তিতে? কেন, মাস্টারদা কি জানেন না আমি চট্টগ্রামের ফিজিক্যাল ক্লাবের বালিকা বিদ্যালয়ের ট্রেনার? মুষ্টিযুদ্ধ, ছোরার ব্যবহার, জাপানী কুস্তী—কোনদিকে আমি ভাইদের চাইতে কম ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছি? আমি মোটর চালাতে জানি না? বন্দুক ধরতে শিখি নি? পিস্তল রিভলভার ব্যবহার কি আমাকে শেখানো হয় নি? মাস্টারদা তো খুব ভাল করেই জানেন আমার গুলী কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। তবে, শুধু মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলেই এত অবিচার?"

বাংলাদেশের সব বিপ্লবী বোনদের হয়ত এই একই অভিযোগ ছিল যে, শুধু মেয়ে বলেই আমরা দিদির মত আরও অন্যান্য বোনদের—প্রীতি, কল্পনা, প্রমুখ সবাইকে বাদ দিয়েছি। এই বিশেষ অধ্যায় আমি শারদীয় সংখ্যা সাপ্তাহিক বসুমতীতে লিখেছি। এখানে পুনরাবৃত্তি করা হবে বলে তা বাদ দিলাম।

দিদির চোখের জল আর অভিযোগ অনুযোগে আমি অস্বস্তিবোধ করছিলাম। তখন যদি একথা বলতাম যে, 'একেবারে যুদ্ধের প্রথম সারিতে অংশ গ্রহণ করার মত উপযুক্ত করে বোনেদের আমরা শিক্ষা দিই নি এবং তা' যে দেওয়া হবে না সে সিদ্ধান্ত আমরা গোড়ার দিকেই নিয়েছিলাম'—তাহলে হয়ত তিনি আরও আঘাত পেতেন, তাই শুধু সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বললাম—

"দিদি আজকের আক্রমণের জন্য যাদের বেছে নেওয়া হয়েছে তাদের বহু

দিন ধরে গোপনে অস্ত্রশিক্ষা ও আক্রমণ পদ্ধতি সম্বন্ধে ট্রেনিং দিয়েছি। তোমাদের শক্তি যে কোনদিকেই কম নয় তা' জানি —তবু এবার তো তোমাকে সঙ্গে নিতে পারব না। জানি না ভুল করেছি কি ঠিক করেছি—আগামী দিনের বোনেরা এ সংশয়ের সমাধান করবে। তবে এবারকার মত এটাই আমাদের সিদ্ধান্ত—এর আর নড়চড় হবে না।"

এখানে এ কথা বললে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, সত্যিই চট্টগ্রামের ও বাংলাদেশের বোনেরা অদূর ভবিষ্যতে এ প্রশ্নের উপযুক্ত জবাব দিয়েছে। পাহাড়তলী সাহেবদের ক্লাব আক্রমণকারী দলকে সফলতার সঙ্গে পরিচালিত করে মৃত্যুবরণ করেছিল প্রীতিলতা (ওয়াদ্দাদার)। মাস্টারদা ও তাঁর অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁদের কাজের সমান অংশীদার হয়ে পথে-ঘাটে, বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্বতে ও শত্রুর ফায়ারিং লাইনে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়িয়েছিল চট্টগ্রামের মেয়ে —প্রীতি ও কল্পনা। বাংলার অন্যত্রও মেয়েরা পিছিয়ে থাকে নি। পিস্তল হাতে নির্ভয়ে এগিয়ে এসেছেন শান্তি, সুনীতি, বীণা—অত্যাচারীর দম্ভের উপযুক্ত জবাব দিতে।

আমার কথায় দিদি বুঝলেন সত্যিই শেষ মুহূর্তে আমাদের সিদ্ধান্ত কোন মতে বদলান যাবে না—তাঁর কোন আবেদনই কাজে লাগবে না। তাই দিদি আর কিছু না বলে খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর উঠে গিয়ে মাস্টারদার চিঠির উত্তর লিখে আমার হাতে দিলেন—

"মাস্টারদা,—

আমার বৈপ্লবিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আহত অন্তরের অভিযোগ জানিয়ে শেষ মুহূর্তে আপনাকে বিরক্ত করিব না। আপনার আদেশ শিরোধার্য করিলাম। আশীর্বাদ করুন যেন যে দায়িত্ব দিয়াছেন তাহা পালনের উপযুক্ত হইতে পারি।

আপনার দীর্ঘজীবন-কামনা করি।

-দিদি।"

চিঠিটা দিয়ে দিদি নিজের ঘরে চলে গেলেন। তাঁর অন্তরের বেদনা আমি নিজের অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পারছিলাম। কিন্তু কি করব—আমি নিরুপায়!

বৌদিকে আর একবার আমার কার্তুজগুলির কথা মনে করিয়ে দিলাম। তারপর দাদার কাছ থেকে পিস্তলটি নিয়ে বেরিয়ে এলাম। ২-৩০ মিনিটের সময় হেড-কোয়ার্টারে মিটিং।

যে কোন মূল্যে শহর অধিকার করা চাই

ঠিক সময়ে আমি হেডকোয়ার্টারে হাজির হলাম। গণেশও বেবী অস্টিনে এসে হাজির। নির্মলদা, অম্বিকাদা ও মাস্টারদা আগে থেকেই কংগ্রেস অফিসে (মাস্টারদার বাসা) উপস্থিত ছিলেন। খুব সামান্য একটু তরল কথাবার্তা ও হাসি-ঠাট্টার পর আমরা সবাই গাম্ভীর্যপূর্ণ আবহাওয়ায় আলোচনা সুরু করলাম।

সমস্ত প্ল্যান ও আক্রমণের কর্মসূচীটি আমরা মুখে মুখে রিহার্সেল দিলাম—মুখে মুখে আলোচনা করে শেষবারের মত পরীক্ষা করে দেখলাম সব ব্যবস্থা ঠিক আছে কি না। কোন সময় কা'কে কোথায় হাজির হতে হবে, কোন কোন ঘাঁটি আক্রমণ করতে হবে, ঠিক মত অস্ত্র-শস্ত্র বিলি করার ব্যবস্থা, কোন কোন পথ ব্যবহার করা নিরাপদ, বিভিন্ন নেতা বিভিন্ন দলের মধ্যে সংযোগ রক্ষার উপায়—সংকেত, সংকেত বাক্য, বিশেষ শ্লোগান, ইত্যাদি —সব কিছু বার বার খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হল।

তারপর মাস্টারদা কয়েকটি প্রশ্ন করলেন, আমরা সেগুলির উত্তর দিলাম—

মাস্টারদা :—আমাদের বেবী অস্টিন সব অস্ত্রশস্ত্র ও বোমা নিয়ে ক্লাব আক্রমণ-কারী দলের সঙ্গে যাচ্ছে। গাড়িটি ঠিক আছে কি? কে প্রথম চালাচ্ছে? যদি সে আহত হয় বা তার মৃত্যু হয়, তবে কে সেই গাড়ি চালাচ্ছে?

গণেশ :—এই সুদক্ষ দলটি প্ল্যান অনুযায়ী নরেশের পরিচালনায় থাকবে। তাদের সব ব্যবস্থা পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী ঠিক আছে। বেবী অস্টিনটি ঠিক আছে। প্রথম নরেশ চালাবে, তারপর ত্রিপুরা, তারপর মনোরঞ্জন—ওদের জন্য কোন ভাবনার কারণ নেই।

মাস্টারদা :—নতুন বড় গাড়িটি আনন্দ ঠিক মত চালাতে পারবে তো? গাড়িটির ট্রায়েল নিয়ে তার কি মনে হল? সে চালায় ভাল তাতে সন্দেহ নেই— তবু গাড়িটির অনুপাতে সে যে খুব ছোট। শেষ মুহূর্তেও যদি আমাদের বিন্দুমাত্রও সন্দেহ মনে থাকে, তবে তার বদলে অন্য কাউকে বড় নতুন গাড়িটি চালাবার ভার দেওয়া হোক্। অম্বিকাবাবুর মতটা চাই, তিনি কি আনন্দ গাড়ি চালালে নির্ভর করতে পারেন? টেলিফোন ভবন আক্রমণ-কারী দলটিকে যদি আনন্দ গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যায় তাতে অম্বিকাবাবু ভরসা রাখতে পারছেন কি?

অনন্ত সিং:—আমি তার ট্রায়াল নিয়েছি। আনন্দের মোটরগাড়ি চালাবার পারদর্শিতা সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। বড় গাড়ি হলেও গাড়িটির ওপর আনন্দের পুরো দখল আছে। আমার মনে হয় অম্বিকাদা নিঃসন্দেহে তাঁর দলটিকে নিয়ে আনন্দর গাড়ি করে টেলিফোন ভবন ধ্বংস করতে যেতে পারেন।

অম্বিকাদা :—অনন্ত বলেছে, ভাল করেছে। তার অভিমত শুনে আমরা সবাই আশ্বস্ত হয়েছি। কিন্তু যদি অনন্তের মত নাও শুনতাম তবু আনন্দর গাড়ি চালাবার দক্ষতা সম্বন্ধে আমার মনে কোন প্রশ্ন উঠত না।"

এই দু'টি মোটর গাড়ির deployment সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য জানবার পর আমাদের আলোচনা হয়েছে অন্তত আর দু'টি গাড়ির ব্যবস্থা করা সম্বন্ধে। A.F.I. আর্মারী আক্রমণকারী দলের সঙ্গে অন্তত একখানা গাড়ি থাকা চাই। সেইজন্য বহু পূর্বেই পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবস্থা ছিল। নির্মলদা ও লোকনাথের সঙ্গে যে দলটি এই অস্ত্রাগার দখল করতে যাবে, তাদের সঙ্গে ছয় সিলিন্ডারযুক্ত একটি ডজ্ গাড়ি থাকবে। সেই উদ্দেশ্যে একটি ডজ্ গাড়ির ট্যাক্সি ড্রাইভারকে কিছু আগাম টাকা দিয়ে বন্দোবস্ত করে রাখা হয়েছিল। কথা ছিল এই ট্যাক্সির ড্রাইভার এলে তাকে জোর করে বেঁধে রেখে লোকনাথরা প্রায় ঘন্টা তিন আগে থেকে গাড়িটি নিজে-দের আয়ত্তে রাখবে। এই জন্যে সবরকম কার্যকরী বন্দোবস্ত বহু পূর্বে থেকেই করা ছিল—কখন, কোথায়, কারা, কিভাবে ড্রাইভারকে কোনরূপ জখম না করে হাত পা বেঁধে ক্লোরোফর্মের সাহায্যে অজ্ঞান করে রাখবে তার বিস্তারিত প্ল্যান করা ছিল। শেষবারের মত আলোচনা করে নিশ্চিন্ত হলাম যে, A.F.I. আর্মারী আক্রমণকারী দল সুষ্ঠুভাবে এই গাড়িটি যোগাড় করবেই।

এখানে ক্লোরোফর্ম করার ব্যাপার নিয়ে একটু বলি। ডিটেকটিভ উপন্যাসে খুব ছোটবেলায় পড়েছি, আর যুব-বিদ্রোহের কিছুদিন পূর্বে আমাদের তরুণ-বন্ধুরাও হয়ত সেইরূপ বই পড়ে জ্ঞান অর্জন করেছেন যে, ক্লোরোফর্ম নাকে চেপে ধরলেই একজন অজ্ঞান হয়ে যায়। বড় বা ছোট অস্ত্রোপচারের সময় সবাই ক্লোরোফর্ম করার পদ্ধতি দেখবার সুযোগ পায় না। আমাদের মধ্যে শহীদ নরেশ রায় ও শহীদ বিধু ভট্টাচার্য দুজনেই মেডিকেল স্কুলের পাশ করা কৃতী ডাক্তার এবং দুজনেই খুব ভালভাবে পাশ করে Gold Medalist হয়ে খ্যাতি লাভ করেছিল। যখনই আমাদের প্ল্যানের

অপরিহার্য অংশ হিসেবে দেখা গেল যে, অনেককেই অজ্ঞান করবার প্রয়োজন হবে তখনই আমরা অক্ষত অবস্থায় কি করে একজনকে ক্লোরোফর্ম প্রয়োগে অজ্ঞান করা যায় তার প্রকৃত ট্রেনিং নেওয়ার ব্যবস্থা করি। গণেশের তত্ত্বাবধানে, গণেশেরই বাড়িতে নরেশ ও বিধু ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করে অজ্ঞান করবার সাধারণ পদ্ধতি মাখন, ত্রিপুরা, দেবু, মনা ও আরও কয়েকজনকে শিক্ষা দিল। একদিন সাত-আটজন যুবকবন্ধু নিজেরাই স্বেচ্ছায় এগিয়ে এল তাদের অজ্ঞান করে প্র্যাকটিস করার জন্য। তাদের অজ্ঞান করা হল। দু' তিন ঘণ্টা করে এক একজন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। অজ্ঞান অবস্থায় তাদের নানারূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে—গোঙানি, হাত-পা ছোঁড়া, বমি করা প্রভৃতি। এই বাস্তব অভিজ্ঞতার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল—অজ্ঞান করে যেখানে সেখানে ফেলে আসা যায় না। তার গোঙানি শুনে লোক জড়ো হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি—যদি না কি ফেলে আসবার সেইরূপ উপযুক্ত স্থান বেছে নেওয়া না যায়।

তাই আমরা শেষ মুহূর্তে আবার একবার আলোচনা করে বুঝতে চাইলাম আমাদের ব্যবস্থা নিখুঁত আছে কি না—অক্ষরে অক্ষরে নির্দেশ প্রতিপালিত হবে কি না। নির্মলদা A.F.I. আর্মারী আক্রমণকারী দলটিকে লোকনাথের সঙ্গে পরিচালনা করবেন এবং তাঁরাই ড্রাইভারকে শারীরিক শক্তিতে বশীভূত করে অন্তত আক্রমণের তিন ঘণ্টা আগে থেকে গাড়িটি নিজেদের কর্তৃত্বে রাখবেন। নির্মলদা খুব জোরের সঙ্গে বলে আমাদের নিশ্চিন্ত করলেন—

"চিন্তার কোন কারণ নেই। আমরা স্থির জানি প্ল্যান অনুযায়ী আমাদের কাজ সম্পন্ন হবেই। বহু rehearsal দিয়েছি—ড্রাইভারকে কে কিভাবে command করব, কে কোথায় দাঁড়াব, কিভাবে দূর থেকে পিস্তল লক্ষ্য করে তাকে ভয় দেখাব, কি করে cross-fire হতে নিজেদের রক্ষা করব, হঠাৎ ড্রাইভার যেন কিছু না করে বসে তার জন্য প্রস্তুত থাকা, ইত্যাদি, ইত্যাদি অনেক বিষয় আমরা এতদিন ধরে প্র্যাকটিস্ করেছি—গতকালও rehearsal দিয়েছি। আমার মনে হয় মোটরগাড়ি আমরা সফলতার সঙ্গে হস্তগত করতে পারবই এবং অ্যাক্সনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত নির্ধারিত নিরাপদ রাস্তা ও স্থানে নির্বিঘ্নে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করা সম্ভব হবে।"

A.F.I. আর্মারী দখল করার জন্য এই ডজ্ গাড়িটি পূর্বাহ্ণেই দখল করে নেওয়া সম্বন্ধে আমরা সকলেই আশ্বস্ত হলাম। কিন্তু আমরা সকলেই আমাদের প্রধান দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলাম। যদি একটা গাড়ি কোন রকমে অকেজো হয়ে পড়ে, তবে সেই ক্ষেত্রে কি হবে? এই জন্যই প্রত্যেক প্রধান প্রধান আক্রমণকারী দলের সঙ্গে অন্তত দুটো গাড়ি থাকা উচিত। প্রথম শ্রেণীর লোকবলের limitation-এর জন্য এবং গোপনে ড্রাইভারকে নিরাপদে বেঁধে রাখবার পর্যাপ্ত স্থান ছিল না বলেই জোর জবরদস্তি করে গাড়ি নেওয়ার পথ পরিহার করতে বাধ্য হই। দ্বিতীয় গাড়ি—আর একটি ডজ্, আমাদের দরদী বন্ধু হেরম্ব বলের নিজস্ব গাড়ি। এই গাড়িটি মাঝে মাঝে আমরা চালাতাম—তার কাছ থেকে যখন তখন নিয়েও আসতে পারতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই গাড়িটি সেইদিন কারখানায় ছিল—মেরামত হচ্ছিল। ঘণ্টায় ঘণ্টায় আমরা খোঁজ রাখছিলাম সন্ধ্যের মধ্যে গাড়িটির সারানোর কাজ সমাপ্ত হয় কি না। check-up করবার সময় পর্যন্ত জানি যে, এই দ্বিতীয় গাড়িটি পাওয়া সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা যাচ্ছে না, তবে পাওয়ার আশা আছে।

এই কারণে আমাদের স্বাভাবিক উৎকণ্ঠা ছিল—যদি শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় গাড়িটি না পাই এবং কোন কারণে আমাদের একমাত্র গাড়িটিও খারাপ হয়ে যায়, তবে কি হবে? অন্ধকারে বা গাছের আবছা ছায়ার ফাঁকে ফাঁকে এবং রেল লাইন ও নিজাম পল্টনের মাঠ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতে হলেও আমরা অতর্কিতে A.F.I. আর্মারী আক্রমণ করতে পারব এবং প্রতিকূল অবস্থায় যদি পড়ি তবে যে তাই-ই করব, তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। তবু একটি মস্ত বড় প্রশ্ন আমাদের মনকে আলোড়িত করছিল—যদি ডজ্ বা অনুরূপ কোন ছয় সিলিণ্ডারের গাড়ি আমাদের সঙ্গে না থাকে তবে, আর্মারী দখল করে নেওয়ার পরও A.F.I. অস্ত্রাগারের দরজা ভাঙাবার বা খোলবার সহজ ও সুনিশ্চিত পন্থা থেকে আমরা বঞ্চিত হব। জাহাজ বাঁধবার দড়ি নীরেট লোহার দরজার হাতলের সঙ্গে ও মোটরের পেছনে বেঁধে চলন্ত মোটরের হ্যাঁচ্কা টানে দরজাটি ভাঙবার সহজ ও সম্ভাব্য কৌশলটি প্রয়োগ করতে না পারলে অন্যান্য অপেক্ষাকৃত অনিশ্চিত ও কষ্টসাধ্য পন্থায় দরজা খোলার চেষ্টা করবার ব্যবস্থা অবশ্য ছিল। এ বিষয়ে আমি আগেই লিখেছি।

আমাদের ব্যাপক পরিকল্পনার মধ্যে এইটি ছিল যে, পাঁচ মিনিট আগে টেলিফোন ভবন ধ্বংস করা হবে, এবং ঠিক পাঁচ মিনিট পর একসঙ্গে দুটি প্রধান শত্রুঘাঁটি—A.F.I. ও পুলিশ লাইন আক্রমণ ও দখল করা চাই-ই। তা'ছাড়া সেই সঙ্গে ইউরোপীয়ান ক্লাবটিকে যুগপৎ আক্রমণ করে সরকারী উচ্চপদস্থ ইউরোপীয়ানদেরও হত্যা না করলেই নয়।

ক্লাব-গৃহটি আক্রমণ করা[illegible]জন্য সশস্ত্র বিপ্লবী দলটির নানাভাবে ও নানা [illegible] পায়ে হেঁটে ক্লাবটির খুব কাছে মাঠের মধ্যে গাছের আড়ালে 'পজিসন' নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। তাদের নিজেদের সঙ্গে যা যা অস্ত্র গোপনে নেওয়া সম্ভব ছিল তা'ছাড়া তরবারি, কুড়ুল, ভোজালী, ব্রীচ্-লোডার বন্দুক, হাত-বোমা, পেট্রোলের টিন, প্রভৃতি বেবী অস্টিনে করে আক্রমণের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে তাদের কাছে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সমস্ত ব্যবস্থাই ঠিক ছিল—কোন যে ব্যতিক্রম ঘটে নি তা' মাস্টারদাকে জানান হল।

পুলিশ লাইন আক্রমণকারী দলের সঙ্গে গণেশ ও আমার থাকবার কথা—সেই দায়িত্ব আমাদের ওপর ছিল। পুলিশ লাইন আক্রমণ করতে যাওয়ার জন্য আমাদের-সঙ্গেও অন্তত একটি গাড়ি থাকা চাই। আমাদের প্ল্যান ছিল ড্রাইভারকে বাঁধাবাঁধির মধ্যে না গিয়ে আমরা মাখনদের, অর্থাৎ মাখন ঘোষালের বাবা—যশোদা ঘোষালের ছয় সিলিণ্ডারযুক্ত প্রায় নতুন "এসাস্ক" মোটরগাড়িটি নিয়ে পুলিশ লাইন আক্রমণ করতে যাব। এই গাড়িটিও অন্নেরা প্রায়ই ব্যবহার করতাম। তারক ও অর্ধেন্দু যখন সাংঘাতিকভাবে বিস্ফোরণে দগ্ধ হয়, তখন তাদের শুশ্রূষার জন্য সুবিধাজনক নিরাপদ বাড়ি খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত এই "এসাস্ক" গাড়িটি করেই তাদের নিয়ে নিরাপদ ও নির্জন রাস্তায় রাস্তায় আট ঘণ্টা ধরে ঘুরে বেড়িয়েছি। কাজেই ১৮ই এপ্রিল রাত্রে পুলিশ লাইন আক্রমণের জন্য এই গাড়িটি যে আমরা নিশ্চয়ই নিতে পারব সে বিষয়ে আমাদের মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক হয় নি। কিন্তু সব বাধাবিপত্তি যেন একসঙ্গে চক্রান্ত করেছে আমাদের বিরুদ্ধে! এই "এসাস্ক" গাড়িটিও কারখানায় ছিল। যখন আমাদের হেড্-কোয়ার্টারে বিকেল আড়াইটা থেকে চারটা পর্যন্ত আমাদের শেষ সভা বসে, তখনও নিশ্চিত খবর পাই নি যে, "এসাস্ক" গাড়িটি আমরা সন্ধ্যা ছ'টা বা সাড়ে ছ'টার সময় পাব কি না।

এই জন্য সকলের দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না—যদি শেষ পর্যন্ত এই গাড়িটি পাওয়া না যায়! সবাই গম্ভীর, সকলেই আকাশ-পাতাল ভাবছেন, মাস্টারদা বার বার আমার ও গণেশের মুখের দিকে তাকাচ্ছেন—শুনতে চাইছিলেন আমরা এই সম্বন্ধে কি ভাবছি—কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যায়? গণেশ বলল—"এই ব্যাপারটা আমাদের ওপর ছেড়ে দিন। হেরম্ব বলের 'ডজ্' আর

মাখনদের 'এসাক্ক' যদি শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রবঞ্চনা করে তবুও ভাববার কিছু নেই। আমরা একটি ট্যাক্সি-চালককে পরাভূত করে অনায়াসে গাড়ির সমস্যা দূর করব।" গণেশের কথা শেষ হতে না হতেই মাস্টারদা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন —"তুই কি বলিস?" আমি মাস্টারদাকে গণেশের মত ভরসা দিয়ে বললাম— "শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আমরা যে কোন উপায়ে মোটরগাড়ি যোগাড় করে নেবই।" এ কথায় সকলেই আশ্বস্ত হলেন বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সবার মনেই যে একটা অনিশ্চয়তার ভর ছিল, তা' সহজেই অনুমান করা যায়।

সামগ্রিক প্ল্যান অনুযায়ী এটা ঠিক ছিল যে, টেলিফোন অফিস ধ্বংস করার পর অম্বিকাদা তাঁর দলটিকে নিয়ে, নতুন শেভ্রোলে গাড়িতে, পূর্ব নির্ধারিত পথে এসে পুলিশ লাইনে আমাদের সঙ্গে মিলিত হবেন। এটা ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, ইতিমধ্যে পুলিশ লাইন ভারতীয় গণতন্ত্রবাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার আক্রমণে বিধ্বস্ত হবে ও আত্মসমর্পণ করবে। প্ল্যান অনুসারে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণকারী দলও তাদের নিদারুণ হত্যাকান্ড সমাপ্ত করে বিদ্রোহীবাহিনীর হেডকোয়ার্টারে, এই পুলিশ লাইনে, এসে যোগ দেবে—এই নির্দেশই ছিল। আর নির্দেশ ছিল A.F.I. আর্মারী আক্রমণকারী দলটি অস্ত্রাগার দখল করার পর সেখানেই অবস্থান করবে। হেডকোয়ার্টার থেকে, অর্থাৎ, আমাদের অধিকৃত পুলিশ লাইন থেকে A.F.I. আক্রমণকারী দলের সঙ্গে আমরা সংযোগ স্থাপন করব এবং অবস্থা অনুযায়ী নির্দেশ পাঠাব।

মোটরের হ্যাঁচকা টানে A.F.I. আর্মারীর দরজা ভাঙবার বিকল্প ব্যবস্থা এইভাবে করে রেখেছিলাম যে, টেলিফোন অফিস ধ্বংস করার পর 'শেভ্রোলে' গাড়িটি পুলিশ লাইনে যদি অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসে, তখন সেই গাড়ি করেই পুলিশ লাইন থেকে একটি ছোট দল A.F.I. আর্মারী দখলকারী দলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে যাবে, এবং যদি গাড়ির অভাবে আর্মারীর দরজা তখনও ভাঙা না হয়ে থাকে তবে, শেভ্রোলে গাড়ির সাহায্যে সেটি ভাঙবার চেষ্টা করা হবে।

হেডকোয়ার্টারের এই শেষ সভায় এইরূপ বিস্তারিত আলোচনার পর বিভিন্ন বিকল্প ব্যবস্থার বিষয় ভালভাবে check-up করে নেওয়া হল। পুলিশ লাইন আক্রমণকারী দলের সঙ্গে মোটরগাড়ির ব্যবস্থা কিভাবে করা যায়—এই একটিমাত্র 'ট্যাকটিক্যাল' বিষয় আলোচনা করা সত্ত্বেও "বিকল্প ব্যবস্থা" কিছু তখনও ঠিক করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। গণেশ ও আমাদের কথার ওপর ভরসা করা ছাড়া অন্যান্যদের আর কোন উপায় ছিল না।

এই মারাত্মক দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও আমরা ১৮ই এপ্রিল দিনটি পিছিয়ে দিতে চাই নি। রেল লাইন উপড়ে ফেলে শত্রুর রেলপথে চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ করবার জন্য দু'টি দল আগের দিন, ১৭ই এপ্রিল, রওনা হয়ে গেছে। প্রচারপত্র বিলি করার জন্য ছোট ছোট দল নির্দেশ মত স্থানে স্থানে চলে যাওয়ার কথা। আরও তিনটি ছোট দল টেলিফোন, বিশেষ করে টেলিগ্রাফের তার কাটার জন্য ইতিমধ্যে বেরিয়ে পড়েছে।

এই সব ট্যাকটিক্যাল বিষয়ে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া হয়েছে বলেই যে আর একদিন পেছনো যেত না, তা' নয়—ইচ্ছা করলেই তখনও একদিন স্থগিত করা সম্ভব ছিল। কারণ, তখনমাত্র বিকেল তিনটে বেজেছে।

আমাদের যুব-বিদ্রোহের দিনটি আর পরিবর্তন করতে চাই নি, এই জন্যে যে যদিও গাড়ির তখন পর্যন্ত সঠিক ব্যবস্থা না থাকা একটা "মারাত্মক" সাংগঠনিক দুর্বলতা, তবু চার ঘণ্টার মধ্যে কোন একটি ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে কাবু করে গাড়ি যোগাড় করে আমরা প্রস্তুত হতে পারব না —এটা একেবারেই অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল। প্ল্যান এবং আয়োজন যেমন আগাগোড়া নিখুঁতভাবে সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অ্যাকসন সুরু না করাই বিবেচনা-প্রসূত মিলিটারী স্ট্র্যাটেজী, ঠিক আবার বাস্তব অবস্থার সঠিক মূল্যায়ন না করেই অ্যাকসন বিলম্ব করার 'অজুহাত' খুঁজে বেড়ান ততোধিক মিলিটারী স্ট্র্যাটেজীর প্রতিকূল রণ-নীতি।

একদিন বিলম্বের জন্য কত কি ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল! এতগুলি দলকে নির্দেশ দিয়ে তাদের নিজ নিজ দায়িত্বে আক্রমণ চালানোর জন্য deploy করেছি (ছড়িয়ে দিয়েছি)। তারা প্রত্যেকে যদিও যুব-বিদ্রোহের সামগ্রিক প্ল্যানটি জানতো না তবু তাদের নিজের নিজের অ্যাক্সন সম্বন্ধে অবহিত ছিল আর অন্তত আন্দাজ করতে পারছিল যে সেই দিনটিতে আরও অ্যাক্সন হবে। এইরূপ ক্ষেত্রে এতজনের মধ্যে যদি কেউ একজনও ভয়ে পালায়, অসুস্থ হয়ে পড়ে, বা বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে সার্বিক প্ল্যানের কার্যকারিতার ওপরে আরও অধিক ব্যাঘাত আসবার আশঙ্কা আছে—এই ভেবে আমরা ১৮ই এপ্রিল অভ্যুত্থানের দিনটি পরিবর্তন করি নি।

তাছাড়া মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে বিবেচনা করে আমরা কোনমতেই একটি দিনও স্থগিত করা সমীচীন মনে করি নি। আজ সবার morale খুব উচ্চস্তরে আছে—কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সবাই আমরা আক্রমণ করতে যাব। এখন যদি একটি দিন পিছিয়ে দিই তবে সবার মনে অবসাদ আসবে। এই সময় অবসাদ আসবার যেখানে একটুও সম্ভাবনা আছে সেখানে কোনপ্রকার বিলম্ব করবার নীতি বর্জন করাই আমরা সর্বতোভাবে শ্রেয় মনে করেছি। সৈন্যদের morale আক্রমণের জন্য সব সময় উচ্চস্তরে তৈরি থাকে না—তা' থাকা সম্ভব নয়। বিশেষ করে সেইজন্য একটি গাড়ির পাকাপাকি বন্দোবস্ত না থাকার কারণে যুব-বিদ্রোহের দিনটি আরও একদিন স্থগিত রেখে বেশি প্রস্তুত হওয়ার অজুহাত অযৌক্তিক মনে হয়েছিল।

এই যুক্তি সমর্থনের জন্য তখনও লেনিনের (Lenin)-এর লেখা কিছু পড়ি নি। বাস্তবক্ষেত্রে বাস্তবতার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সেইদিন মুষ্টিমেয় বিপ্লবীরা সূর্য সেনের নেতৃত্বে একদিনও যুব-বিদ্রোহের দিন পিছিয়ে দেওয়া অযৌক্তিক মনে করে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল তার যৌক্তিকতা যখন আন্দামান জেলে মহান বিপ্লবী নেতা লেনিনের লেখায় পড়লাম তখন আমার মনে খুব আনন্দ হয়েছিল। লেনিন লিখছেন ঃ—

"To this we reply : speaking abstractly, it can not be denied, of course, that a militant organisation may thoughtlessly commence a battle, which may end in defeat, which might have been avoided under other circumstances. But we can not confine ourselves to abstract reasoning on such a question because every battle bears within itself the abstract possibility of defeat and there is no other way of reducing this possibility than by organised preparation for battle." (What is to be done ? Under heading— " 'Conspirative', Organisation 'Democracy' "—Lenin).

বাংলা অর্থ এইরূপ—এই সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য ঃ অবাস্তব কল্পনায় অবশ্য অস্বীকার করা যায় না যে, কোন একটি সংগ্রামী সংগঠন বিচার-বিবেচনা না করে হয়তো কোন সংগ্রাম আরম্ভ করে দিতে পারে যা পরাজয়েই পরিণতি লাভ করবে, যদিও ভিন্ন পরিস্থিতিতে হয়তো এই পরাজয় পরিহার করা সম্ভব হোত। কিন্তু এইরূপ প্রশ্নের সমাধানের জন্য আমরা কখনও অবাস্তব কাল্পনিক যুক্তির

মধ্যে আমাদের সীমাবদ্ধ রাখতে পারি না; কারণ, প্রত্যেক যুদ্ধের মধ্যেই পরাজয়ের কাল্পনিক সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকবে এবং সেইরূপ সম্ভাবনাকে লাঘব করার জন্য সংগ্রামের সুসংবদ্ধ প্রস্তুতি ছাড়া আর কোন কার্যকরী পন্থা নেই।

পুলিশ লাইনের জন্য গাড়ি যোগাড় করে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব গণেশ ও আমার ওপর ছেড়ে দেওয়া হ'ল। তারপর আর একটি বিষয় খুব সংক্ষেপে আলোচনা হ'ল। সমস্ত শহর দখল করার পর আমাদের পরবর্তী প্রোগ্রাম—বন্দুকের দোকান, Imperial Bank ও জেল আক্রমণ করা। কখন কিভাবে তা' পরিচালনা করা হবে তা পরিস্থিতি অনুযায়ী ঠিক করে নেব—এমনও হতে পারে চোঙা মুখে চীৎকার করে বললে খুব সম্ভবত তারা বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করবে। আক্রমণ ও অধিকার করে নেওয়ার পর প্রথম অধ্যায় শেষ হবে। দ্বিতীয় অধ্যায় সুরু করার আগে আমরা সবাই রাত্রের খাওয়া খেয়ে নেব—বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে।

খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল মকলেশ্বর রহমানের রেস্তোরাঁতে। রেস্তোরাঁটি গণেশের দোকানের খুব নিকটে। মকলেশ্বরের সংগে আমাদের খুব ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। তার রেস্তোরাঁটিকে আমরা সব সময় পৃষ্ঠপোষকতা করেছি। সেইদিন রাত্রে আমরা তার দোকানে চৌষট্টিজনের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে বলেছিলাম। বোধহয় কিছু আগাম টাকাও দিয়েছিলাম। মকলেশ্বর সাহেবকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে সরকারী পক্ষ আমাদের criminal association প্রমাণ করবার জন্য বহু প্রশ্ন করেছে। মকলেশ্বর সাহেব সব প্রশ্নই এড়িয়ে গেছেন। আজ হয়ত তিনি বেঁচে নেই। তিনি আমাদের বন্ধু ছিলেন। আমার অন্তরের নীরব শ্রদ্ধা তাঁর প্রতি অটুট ছিল। আমাদের সকলের শ্রদ্ধা তাঁর প্রতি চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকবে।

এবার আমাদের মিটিং শেষ হ'ল। সকলে উঠে দাঁড়ালাম। এর পরে দেখা হবে রণসাজে—অভিযানের পূর্বমুহূর্তে। তারপরও কি আবার দেখা হবে?—হয়ত এ' জীবনে আর হবে না!

সকলে উঠে পড়বার পর দিদির চিঠিটা মাস্টারদাকে দিলাম। চিঠিটা পড়ে মাস্টারদা একটু হাসলেন। তারপর আমার কাছে এসে নিম্নস্বরে বললেন—

"দিদি সত্যিই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কিন্তু কি করব? ভবিষ্যতের ইতিহাস লিখবে যারা, তারা আমাদের বিচার করবে। হয়ত এমন দিন আসবে, যেদিন বোনেরাই এগিয়ে যাবে ভাইদের পেছনে ফেলে।" একটু থেমে তারপর আবার বললেন—

"দিদিকে গিয়ে বলো......"—কি বলেছেন পরে বলছি।

যাবার সময় মাস্টারদা সবাইকে ডাকলেন। তাঁর গম্ভীর, ধীর-স্থির কণ্ঠস্বর শেষবারের মত মৃত্যুপথযাত্রী সৈনিকদের কানে নব-জীবনের মন্ত্রে ধ্বনিত হ'ল—

"মাতৃভূমির নামে তুচ্ছ প্রাণ উৎসর্গ করে বীরের মত ঝাঁপিয়ে পড়ব—শত্রুর দুর্গ অধিকার করে বিজয় পতাকা আকাশে ওড়াবো। শহর আমাদের চাই—যে কোন উপায়ে যে কোন মূল্যে।" (ক্রমশঃ)

আর একটি "গোঁ রক্ষা আন্দোলন"—

বঙ্গদর্শন

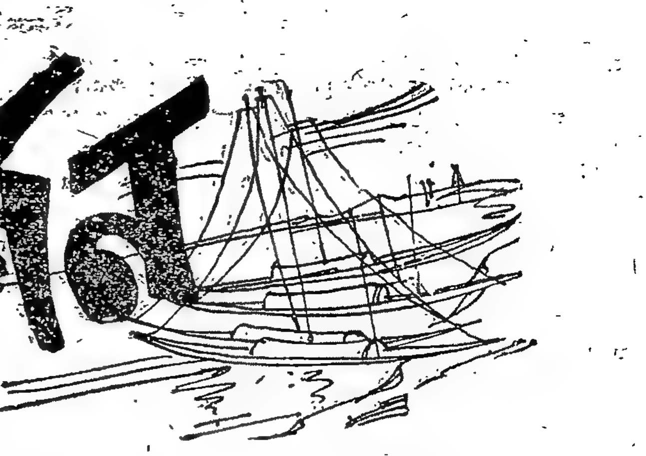

বিগত সপ্তাহটি অনেকগুলি ঘটনার ভারে ভারাক্রান্ত এবং সেই ঘটনাগুলির জের আরও কয়েক সপ্তাহ ধরে চলবে বলে মনে হয়। বস্তুত পশ্চিমবঙ্গের জীবনযাত্রা কার্যত অচল হয়ে রয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার দরুণ শিক্ষা-ক্ষেত্রে এক নৈরাজ্যবাদের সৃষ্টি হয়েছে। প্রেসিডেন্সি কলেজের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা-বলীর পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাক্ষেত্রে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তার যে কোন একটা সহজ সমাধান হবে তা মনে হয় না। সাম্প্রতিক পরিবহন ধর্মঘটে কলকাতার যানবাহনের ক্ষেত্রে যে বিপর্যয় ঘটেছে, স্টেট বাস ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হওয়াতেও তা সম্পূর্ণ রাহুমুক্ত হয় নি। আজ ১৬ই ডিসেম্বর বঙ্গদর্শন লেখার সময় পর্যন্ত ট্রাম ধর্মঘটের অবস্থা অপরিবর্তিতই আছে। কলকাতা কর্পোরেশনের কর্মীরা ধর্মঘটের নোটিশ দিয়েছেন, নাগরিক-জীবনে তার পরিণাম যে কতদূর শোচনীয় হবে তা বোধ হয় অনুধাবন করতে অনেকেই ভয় পাচ্ছেন। সরকারী নীতির জন্য সরকারী কর্মচারীরা উত্তপ্ত হয়ে রয়েছেন। গ্রামগুলিতেও স্বস্তি নেই। সরকারী খাদ্যনীতি কি রকম দাঁড়াবে সেই আশংকায় কৃষককুল চিন্তিত। তদুপরি কর্ডন এলাকার পাঁচ মাইলের ত্রিসীমানায় ধান ভাঙা চলবে না, এই ঘোষণায় অনেকেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন। সংবাদপত্রগুলির পৃষ্ঠায় এমন কোন সংবাদ কোনদিনই পাওয়া যায় না, যাতে কিছুটা মনে আশার সঞ্চার হয়। অবশ্য সেজন্য দুঃখ করাটা বাতুলতামাত্র, কেন না যেখানে আমাদের সমগ্র যুগটাই বিক্ষোভ আর যন্ত্রণায় চিহ্নিত, সেই যুগের মানুষ হয়ে প্রত্যাশার সরসীতে মুখ দেখার বিলাস সে-ও বোধ করি অসহ্য। অতএব এই সব অ্যাবস্ট্রাক্ট কথাবার্তা বাদ দিয়ে এবার মূল বিষয়গুলিতে আসা যাক।

ব্যর্থ ধর্মঘটের ফলশ্রুতি

আমাদের দেশে সাফল্য দিয়েই কোন কাজের যথার্থতা বিচার করার যে রীতি গড়ে উঠেছে তা অনুযায়ী স্টেটবাস কর্মী-দের ধর্মঘট ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতার জন্য অবশ্যই সংশ্লিষ্ট কর্মীদের সাংগঠনিক ত্রুটি বহুলাংশে দায়ী, কিন্তু তার জন্য এ সিদ্ধান্ত অবশ্যই করা যায় না যে তাঁদের ধর্মঘট করার পিছনে কোন সত্যকার গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল না, বা ধর্মঘট ব্যর্থ হয়েছে বলেই স্টেটবাস কর্মীদের দাবিগুলি ভিত্তিহীন। মনে রাখতে হবে সরকারী তরফ থেকে এই ধর্মঘটকে পরিবহন শ্রমিকদের সঙ্গে সরকারের মর্যাদার লড়াই বলে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং এই ধর্মঘটকে বানচাল করার চেষ্টারও ত্রুটি হয় নি। তাছাড়া পরিবহন ব্যবসায়ে নিযুক্ত প্রাইভেট ক্যাপিটাল (কয়েক শত বেসরকারী বাস কলকাতায় ধর্মঘটকালীন চলেছিল, এবং এখন ধর্ম-ঘট মিটে গেলেও সেগুলি যে যথাস্থানে ফিরে যাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই) পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে মদত যোগাতে এগিয়ে এসেছিল, জনসাধারণও পর্যাপ্ত-ভাবে এই ধর্মঘটীদের সমর্থন করেন নি।

কিন্তু সমস্যাটা কেবল এই স্টেটবাস ধর্মঘটের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। আমরা যা বলতে চাইছি তা হচ্ছে এই যে অতিরিক্ত ব্যবহারে অস্ত্র ভোঁতা হয়ে যায়, এবং ধর্মঘট ইত্যাদির এত যে প্রাবল্য ইদানীং দেখা গেছে তাতে অস্ত্রটির ধার কিছুটা কমে গেছে এতেও কোন সন্দেহ নেই, যদিও রাষ্ট্রীয় পরিবহনের শ্রমিকরা এইরকম বিরতিহীন ধর্মঘটে এই প্রথম নেমেছেন। ধর্মঘট অস্ত্র হিসাবে সর্বশেষ অস্ত্র এটা সকলের মত ধর্মঘটীরাও বোঝেন। এ একটা কঠিন স্নায়ুযুদ্ধ যেখানে পরাজিত হবার সম্ভাবনা নেহাৎ কম নয়, তা ছাড়া অনিশ্চয়তা, দুশ্চিন্তা এবং সর্বোপরি কর্মচ্যুতির আশঙ্কা ডেমোক্রেসের তরবারির মতই মাথার ওপর ঝোলে। সব জেনেশুনেও কেন তবে এই পথের দিকে শ্রমিকরা আসতে বাধ্য হন? তার একটিমাত্রই কারণ বর্তমান, এবং সেই কারণটির কথা আমরা এই বঙ্গদর্শনে বারবার লিখেছি। যে দেশে আইনের শাসন চলে না, যে দেশের আইনসভায় জন-সাধারণের মনের কথা উত্থাপিত হলে তা কোন পাত্তা পায় না, সে দেশে আন্দোলন তো আইনসভার বাইরেই হবে। যুক্তি-শীল আলোচনার মাধ্যমে ন্যায়সংগত পথে কথা বলতে সরকার চান না, অপরাপর সংস্থাসমূহের মাতব্বরেরাও সেই একই অহংবোধের অধিকারী, সরকার মনে করেন যে তাঁর অধীনস্থ কর্মচারী থেকে শুরু করে আমার জনসাধারণ যদি কখনো নিজেদের কথা বলেন, নিজেদের অধি-কারের কথা তোলেন, অথবা নিজেদের দাবি-দাওয়ার কথা বলেন, তখনই সরকারের সার্বভৌম অধিকারকে যেন চ্যালেঞ্জ করা হয়। যেখানে সমস্ত বিষয়ে সরকারের এইরকম দৃষ্টিভঙ্গী সেখানে সর্বশেষ অস্ত্রই প্রয়োগ করা ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। শিক্ষক বা সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে সরকারের যে রকম মনোভাব দেখেছি, এবং বর্তমান স্টেটবাস ধর্মঘট উপলক্ষে যা দেখা গেছে তাতে ওই একটা কথাই প্রমাণ হয় যে আমাদের শাসন-তন্ত্রটা নামেমাত্র গণতান্ত্রিক হলেও শাসকদের মধ্যে সেই পুরাতন সামন্ত-তান্ত্রিক মনোভাব এমন বদ্ধমূল হয়ে আছে যে প্রকৃত গণতন্ত্রী হতে গেলে যে রাজা-বাদশাসুলভ মনোভাব দেখালে চলে না এটা উপলব্ধি করার মত শিক্ষা সরকার ও তার আমলাবর্গ পান নি।

সংবাদপত্রসমূহকে মোটা টাকার বিজ্ঞাপন দিয়ে সরকার এ কথাটা বোঝাতে চেয়েছিলেন যে স্টেটবাস শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির বিষয়টা যেহেতু ট্রাইবুনালে গেছে, সেই হেতু সেই বিচারের ফলাফলটার জন্য অপেক্ষা না করে ধর্মঘট করা শ্রমিকদের পক্ষে অনুচিত হয়েছে। কিন্তু কবে ট্রাইবুনালের রায় বেরুবে, বিশেষ করে যে দেশে একটা মামলার পরিসমাপ্তি ঘটতে অনন্তকাল লেগে যায়, তার আশায় অপেক্ষা করার মত অবস্থা সত্যই কি এদেশে আছে? বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ট্রাইবুনালের দোহাই দিয়ে পরিবহন কর্মীদের ধর্মঘট থেকে নিরস্ত হবার

উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যদি দ্রুত মামলা মেটাবার ঐতিহ্য এদেশে থাকত, ট্রাইব্যুনালে বিষয়টি পাঠাবার পর যদি একটা যুক্তিসংগত অল্প সময়ের মধ্যে তা নিষ্পত্তি হবার কোন সম্ভাবনা দেখা যেত, তাহলে হয়ত পরিবহন কর্মীদের এ বিষয়ে উপদেশ দেবার সার্থকতা থাকত। আগেই বলেছি, ধর্মঘট শেষ অস্ত্র এবং তা প্রয়োগে অনেক ঝুঁকির দায়িত্ব নিতে হয়। পরিবহন কর্মীরা এদিকে যথেষ্ট চিন্তা না করে নিশ্চয়ই এরকম সিদ্ধান্ত নেন নি। তদুপরি গত উনিশ বছরে এদেশে বিচারালয়ের স্বাতন্ত্র্য ও নিরপেক্ষ বিচারের ঐতিহ্য গড়ে ওঠে নি, আইন-প্রণেতাগণ ওরফে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হাইকোর্টের বিচারপতিকেও কোমরে দড়ি বেঁধে তাঁদের কাছে টেনে আনতে পারেন, এরকম একটি ঘটনাও উত্তর প্রদেশে ঘটেছে।

তা ছাড়া ট্রাইব্যুনাল বিশুদ্ধ শ্রমবিরোধ সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে নিজের এক্তিয়ারে রাখেন, কিন্তু রাষ্ট্রীয় পরিবহন কর্মীদের ধর্মঘট শুধুমাত্র শ্রমবিরোধেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তাঁরা আরও কতকগুলি বিষয়ের জন্য সংগ্রাম করেছেন। আমরা ইতিপূর্বে প্রায় প্রতিটি সংখ্যার বঙ্গদর্শনে বার বার লিখেছি যে পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থাকে বিলুপ্ত করার জন্য একটি অপচেষ্টা দীর্ঘকাল ধরেই কোন কোন সরকারী মহলে দিনের পর দিন প্রশ্রয় পাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ টাকার স্পেয়ার পার্টস সরকারী গুদামে পচলেও সেগুলি দিয়ে অচল বাসগুলিকে মেরামত করা হয় না। এগার শত বাসের অর্ধেকই প্রায় দিনের পর দিন ধরে অচল হয়ে পড়ে আছে, এবং ইচ্ছা করেই সেগুলিকে অচল করে ফেলে রাখা হয়েছে, যাতে অসীম বিপত্তির সম্মুখীন হয়ে রাষ্ট্রীয় পরিবহন কর্পোরেশন মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়। পরিবহনের ক্ষেত্রে বেসরকারী মূলধনের স্বার্থে সরকার যে মরীয়া হয়ে উঠেছেন সে কথা সরকারী আচরণের দ্বারাই প্রমাণিত হয়। নইলে কোন লজ্জায় সরকার কন্ডাক্টারদের ঘাড়ে রাষ্ট্রীয় পরিবহন কর্পোরেশনের লোকসানের দায়িত্ব নির্দ্বিধায় চাপিয়ে দেন!

পাঠকবর্গ বিচার করে দেখুন, ট্রাম ও স্টেটবাস, এই দুটি প্রতিষ্ঠান পাশাপাশি রয়েছে, প্রথমটিতে প্রতি বছরেই লাভ হয়, এবং দ্বিতীয়টিতে প্রতি বছরেই লোকসান। অথচ এ কথা প্রমাণ করা যাবে না যে ট্রামের কন্ডাক্টাররা স্টেটবাসের কন্ডাক্টারদের চেয়ে বেশি দক্ষ। একথাটাও প্রমাণ করা যায় না যে যাত্রীরা স্টেটবাসের ভাড়া ফাঁকি দেয়, ট্রামের ক্ষেত্রে ফাঁকি দেয় না। অথচ বিদেশী ট্রাম কোম্পানী ওই মন্থরগতি যানের মারফত প্রতি বছর যে মুনাফা লোটে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাধের রাষ্ট্রীয় পরিবহন কর্পোরেশন সেখানে ফী বছরেই লোকসানের লবণসমুদ্রে হাবুডুবু খান। তাহলে পাশাপাশি এই দুটি উদাহরণ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে ট্রাম কোম্পানীর ম্যানেজমেন্ট দক্ষ এই কারণে সেখানে লাভ হয়, আর স্টেটবাস কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ অকর্মণ্য, যে কারণে প্রতি বছরেই লোকসানের অঙ্ক স্ফীত হয়।

প্রসঙ্গত আর একটি কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ না করলে নয়। বর্তমানের পরিবহন ধর্মঘট দেখে আমাদের দেশের শ্রমিক-আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছুটা ভীত হবার কারণ আছে। এক স্থানের পরিবহন কর্মীরা ধর্মঘট করেছে, সেই ধর্মঘট ভাঙার কাজে অন্য জায়গার পরিবহন কর্মীরা স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছে, এই বিভেদ কখনোই এদেশের শ্রমিক-আন্দোলনকে জোরদার করতে পারবে না। এখানে বিশেষ করে আমরা প্রাইভেট বাসের ড্রাইভার ও কন্ডাক্টারদের কথা বলছি। বিলেতে একবার পরিবহন ধর্মঘটের সময় পেট্রল পাম্পগুলি পর্যন্ত সহানুভূতি জানিয়ে ধর্মঘট করেছিল।

এই অসহযোগিতার কারণ হচ্ছে আমাদের দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের করায়ত্ত। ফলে "ক" দলের প্রভাবান্বিত কোন ইউনিয়ন যদি ধর্মঘট আহ্বান করে তাহলে "খ" দলের প্রভাবিত ইউনিয়নের শ্রমিকেরা তা বানচাল করার জন্য এগিয়ে আসবে। ফলে সামগ্রিকভাবে শ্রমিকস্বার্থ ক্ষতিগ্রস্তই হচ্ছে। আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধি যা বলে, অদূর-ভবিষ্যতে এদেশে বিশুদ্ধ শ্রমিকরাষ্ট্র হবার কোন সম্ভাবনা নেই। তদুপরি যে কটি শ্রমিক সংগঠন বর্তমানে এদেশে রয়েছে তাদের মধ্যে যে কোন একটির পক্ষে অপর সংগঠনগুলির প্রভাবমুক্ত করে দেশের সমগ্র শ্রমিকবাহিনীকে অন্তর্ভুক্ত করা একেবারেই অসম্ভব। দলীয় রাজনীতির অবসান হবার কোন সম্ভাবনাই আপাতত নেই, এবং যতদিন শ্রমিক সংগঠনসমূহ রাজনৈতিক দলগুলির তাঁবেদার হয়ে থাকবে ততদিন দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থে শ্রমিকস্বার্থের বলি হবে। একটি কারখানায় একাধিক ট্রেড ইউনিয়ন থাকলেই তা মালিকপক্ষেরই আনন্দের কারণ হয়, কেন না এক পক্ষ ধর্মঘটের ডাক দিলেই অপর পক্ষ তা বানচাল করার জন্য ছুটে আসে। এই কারণেই আজ শ্রমিক সংগঠনসমূহকে রাজনৈতিক স্বার্থের আওতা থেকে বাইরে নিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা আছে বলেই মনে হয়।

রাষ্ট্রীয় পরিবহন কোন পথে?

ধর্মঘটের ব্যর্থ সমাপ্তি ঘটার পর মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা থেকে যা জানা গেল তাতে আমাদের আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হতে চলেছে। আমরা একথা পূর্বে বহুবার বলেছি যে রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থাকে লাটে তোলার ব্যবস্থা ভিতরে ভিতরে বহুদিন চলেছে। অবশেষে কথাটা মুখ্যমন্ত্রী কবুল করলেন।

মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য তিক্ত বটিকা অনেকখানি মধু সহকারে সেবন করিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য এভাবে লোকসান দিয়ে স্টেটবাস আর দীর্ঘকাল রাস্তায় বার করা যাবে না। কাজেই স্টেটবাসগুলি চালানো হবে সমবায়ের ভিত্তিতে। কুড়ি-পঁচিশখানি করে বাস এক একটি সমবায় সমিতির হাতে তুলে দেওয়া হবে, এবং রাষ্ট্রীয় পরিবহনের কর্মীরাই হবে সেই সমবায়সমূহের অংশীদার। তখন তারা কর্মী ও সেইসঙ্গে মালিকও হবে। শ্রমের জন্য তারা মজুরী পাবে এবং মূলধনের জন্য তারা ডিভিডেন্ড পাবে, কাজেই নিজেরা মালিক হলে তারা যেরকম মনোযোগ দিয়ে পরিশ্রম করবে তাতে তারা নিজেরাও লাভবান এবং সামগ্রিকভাবে পরিবহন ব্যবস্থারও উন্নতি হবে।

আপাতদৃষ্টিতে এর চেয়ে নির্দোষ প্রস্তাব আর কি হতে পারে? কিন্তু গভীরভাবে দেখতে গেলে এর মধ্যে প্রাইভেট সেক্টরের হাতে পরিবহন ব্যবস্থাকে তুলে দেবার একটি পরিকল্পনা ছাড়া আর কিছুই নেই! এদেশের সমবায় সমিতিগুলি সম্বন্ধে যাঁদের একটু প্রাথমিক ধারণামাত্র আছে তাঁরা আমাদের এই বক্তব্যের সংগে একমত হবেন। কুড়ি-পঁচিশটি করে বাস নিয়ে এক একদল কর্মী যদি সমবায়ের ভিত্তিতে ব্যবসা চালাতে যায় তার জন্য যে মূলধন লাগবে সেটা কোথা থেকে আসবে? সেই মূলধনের কিছুটা অংশ সরকার হয়ত ধার দেবেন; কিন্তু তা সর্বক্ষেত্রে সর্ব-অবস্থায় দেওয়া হবে কি? মূলধনের কতটা অংশ সরকার ঋণ দেবেন? যদি এই রকম সমিতি পঞ্চাশটি হয় সরকার হয়ত পাঁচটির ক্ষেত্রে ঋণ মঞ্জুর করে বাকি পঁয়তাল্লিশটি ক্ষেত্রে যে না-মঞ্জুর করবেন না তার গ্যারান্টি কোথায়?

বস্তুত কার্যক্ষেত্রে তা-ই হবে। সেক্ষেত্রে বাকি পঁয়তাল্লিশটির বেলায় বেসরকারী মূলধন এগিয়ে আসবে, এবং সমবায়ের ক্ষেত্রে বেসরকারী মূলধন আসতে কোনই বাধা নেই। ঝানু কারবারীরা অতঃপর ক্রমশ অধিকাংশ শেয়ারগুলির মালিক হয়ে উঠবে এবং পরিচালনার দায়িত্ব পরিবহন কর্মীদের হাত থেকে ক্রমশ

প্রাইভেট ক্যাপিটালের রাঘববোয়ালদের হাতে গিয়ে পড়বে। অন্যান্য সমবায়-গুলির ক্ষেত্রে এইরকম ঘটনা কি হামেশাই ঘটছে না?

কাজেই মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার মধ্যে আদর্শবাদের আড়ালে যা কাজ করছে তা বাস্তবে কিন্তু অন্য রূপ নেবে একথা হলফ করেই বলা যায়। আদর্শ হিসাবে যা অতি উত্তম বাস্তবে তা কিন্তু বহু-ক্ষেত্রেই সর্বনাশা ফল প্রসব করে। আসলে সমবায়ের প্রকৃত আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেবার পিছনে যতক্ষণ পর্যন্ত না তদনুরূপ মানসিকতার সৃষ্টি হচ্ছে ততক্ষণ তা করতে যাওয়া মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

এ প্রসঙ্গে একটি অতি সাধারণ প্রস্তাব আমরা রাখতে চাই। যদি রাষ্ট্রীয় পরি-বহন সংস্থাকে জাহান্নমে পাঠানোর আন্তরিক ইচ্ছা সরকারের না থাকে, তাহলে আমাদের এই সহজ প্রস্তাবটিতে কাজ হবে বলেই বিশ্বাস। সরকার বাসগুলিকে ভাগে দিন না কেন? প্রতিটি বাসের জন্য এক-একটি স্টাফ ইউনিট তৈরি করে দিন—একজন ড্রাইভার, দুজন কণ্ডাক্টার; একজন ক্লীনার। সেইভাবে তাদের সরকার বলে দিন যে "তোমরা আমাকে প্রত্যহ এত টাকা করে দেবে।" আরও সহজভাবে বলতে গেলে যেভাবে ট্যাকসির মালিকেরা আগে ট্যাকসি ভাড়া খাটাত সেইভাবে। তাহলে সরকারও প্রত্যহ বিনা মেহনতে প্রতিটি বাস পিছু একটা করে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা পাবেন, এত স্টাফ পুষতে হবে না, অফিসার পুষতে হবে না, শুধু দুজন খাজাঞ্চি রাখলেই কাজ চলবে। প্রস্তাবটি বোধ হয় অবাস্তব নয়।

পুলিশ ও দলীয় রাজনীতি

জনৈক ডি. আই. জির বিরুদ্ধে তাঁরই অধস্তন সহকর্মী আই. পি. এস অফিসারদের প্রকাশ্য অভিযোগের কথা উল্লেখ করে যে সংবাদ কিছুদিন আগে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে যেরকম আলোচনার প্রয়োজন ছিল তার বিস্ময়কর অভাব এত বেশি চোখে পড়ছে যে সন্দেহ হয়—গণতান্ত্রিক দেশের সংবাদপত্রগুলিতেও একনায়কতন্ত্রী এবং কর্তাভজা মনোভাব অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে।

উক্ত ডি. আই. জি.-র বিরুদ্ধে তাঁরই অধস্তন কর্মীরা প্রকাশ্যে অভিযোগ করেছেন যে উক্ত ডি. আই. জি. অত্যন্ত অশোভনভাবে শাসক দলের নেতাদের সঙ্গে এমন মেলামেশা করছেন যে তা পুলিশী আচরণবিধির সীমা চূড়ান্তভাবে লঙ্ঘন করেছে। এই প্রসঙ্গে একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে অধস্তন কর্মচারীদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এইরকম অভিযোগ করার অধিকার আছে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে এবং সর্বশেষে ব্যাপারটির গুরুত্ব চেপে যাওয়ার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পুলিশের সঙ্গে রাজনীতির নেতাদের অশোভন মিলন ঘটলে তা কালক্রমে গণতন্ত্রের সমাধির কারণ হয়ে দাঁড়ায় আশা করি এ কথা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। তা ঘটলে আইনের শাসন থাকে না। এবং আইনের শাসন না থাকার অর্থই হচ্ছে গণতন্ত্রের অপমৃত্যু। পুলিশের আচরণ যদি পক্ষ-পাতিত্বমূলক হয়, পুলিশ যদি একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের তাঁবেদার হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে ভারতীয় সংবিধানের মুখবন্ধ ও মৌলিক অধিকারের পাতা দুটি ছিঁড়ে ফেলা ভিন্ন আর কোন গতি থাকে না।

অবশ্য ডি-ফ্যাক্টো বা কার্যত পুলিশ সর্বদাই এদেশে শাসকদলের তাঁবেদার এবং দলীয় রাজনীতির সঙ্গে পুলিশী কর্তা-দের রীতিমত সম্পর্ক আছে, একথা আমরা বঙ্গদর্শনে বার বার বলে এসেছি। তবে অনেক বিষয় থাকে যা প্রমাণ করা যায় না, যে বিষয় সকলেই জানেন তাও কাগজ-কলমে প্রমাণ করা বহুক্ষেত্রেই সম্ভব নয়। কাজেই শাসকদলের সঙ্গে পুলিশকর্তাদের দহরম-মহরম সম্বন্ধের বিষয় যদিও উনিশ বছর ধরে ভারতবাসী অবগত আছে, তথাপি বর্তমানের ঘটনাটি একটি নিশ্চিত প্রমাণ যার উপর ভিত্তি করে বলা যায় পুলিশ চরিত্রভ্রষ্ট হয়েছে। বস্তুত ডি. আই. জি.-র অধস্তন কর্মীরা তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছেন তা নিয়ে সারা দেশে চাঞ্চল্য জাগা উচিত।

রাজনৈতিক দলের নেতাদের যাবতীয় কার্যকলাপ নিশ্চয়ই দলীয় স্বার্থের মুখ চেয়ে ঘটে, এবং পুলিশের সঙ্গে তাদের অশুভ সংযোগ ঘটলে পুলিশ সেক্ষেত্রে একটি বিশেষ দলের স্বপক্ষে অপরাপর মত ও পথের মানুষকে মৌলিক অধিকারসমূহ থেকে বঞ্চিত করে। ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রগুলির কথা আমরা জানি যেখানে পুলিশ শুধুমাত্র শাসকদলের তল্পীবাহক। ভারতবর্ষেও কি সেই অবস্থা আসছে?

আলোচ্য ডি. আই. জি. সাহেবের বিরুদ্ধে যাঁরা অভিযোগ করেছেন, তাঁরাও আই. পি. এস. অফিসার এবং ডি, আই, জি. মহোদয়ের রাজনীতিপ্রীতিটা সহ্যের মাত্রা ছাড়িয়ে না গেলে তাঁরা ঝুঁকি নিয়ে এ-জাতীয় অভিযোগ করতে সাহস পেতেন না। বিষয়টির জন্য একটি বেসরকারী তদন্ত কমিশন এই মুহূর্তে বসানো হোক।

বিলম্বিত সুবুদ্ধি

শেষ পর্যন্ত আন্দোলনরত ছাত্ররা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিকেটিং প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়ে সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। দু সপ্তাহ আগে আমরা বঙ্গদর্শনে লিখে-ছিলাম যে কোন আন্দোলন চালাতে গেলে কোথায় থামা উচিত সেটা আগে জানতে হবে। তখনই আমরা বলেছিলাম যে, রেজিস্ট্রার যখন বলেছেন যে, ছাত্ররা পিকেটিং প্রত্যাহার করে নিলে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কাজকর্ম স্বাভাবিকভাবে চলতে দিলে তাঁরা সহৃদয়তার সঙ্গে ছাত্রদের বিষয়টি বিবেচনা করবেন, তখনই তাঁদের সেই প্রস্তাবে রাজী হওয়া উচিত ছিল, এবং সেটা উভয় তরফের পক্ষেই মর্যাদাকর হত। আমরা সেই প্রসঙ্গে দুর্গাপুরের শ্রমবিরোধের কাহিনীটাও উল্লেখ করে দেখিয়েছিলাম যে, বেশি বাড়াবাড়ি করলে শেষ পর্যন্ত নিজেদের তরফ থেকেই অনেক হীনসর্তে আত্ম-সমর্পণ করতে হয়। বর্তমান ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে, এত ডংকানিনাদের পর একরকম বিনাসর্তেই ছাত্ররা আত্মসমর্পণ করেছেন।

ছাত্র আন্দোলনের শেষে পর্যায়ে আন্দোলনকারী ছাত্ররা মানসিক ফ্রাস্ট্রেশনে ভুগছিলেন, এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের ল্যাবরেটরী ধ্বংসই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। জগদীশচন্দ্র বা প্রফুল্লচন্দ্রের মূর্তি ভাঙার পিছনেও সেই একই মনস্তত্ত্বের প্রকাশ। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁরা যে বিপর্যয়ের সূত্রপাত করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত ছাত্র-সমাজের অধিকাংশই তা হজম করতে পারেন নি; বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে তাঁরা নিজেরাই তৃতীয় পক্ষের শুভপ্রভাবের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন; শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষকে নয় ঘণ্টা আটকে রেখে যেসব অধ্যাপকও তাঁদের দাবি সমর্থন করতেন, তাঁদেরও সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। কোন তরফ থেকেই তাঁরা তাঁদের জন্য নৈতিক সমর্থন পান নি। সেই ব্যর্থতাজনিত মানসিক ক্ষোভই তাঁদের ধ্বংসমূলক কাজে প্ররোচিত করেছিল, প্রেসিডেন্সি কলেজের হতভাগ্য ল্যাবরেটরী সেই ক্ষোভেরই শিকার হয়ে-ছিল।

সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হচ্ছে একদল রাজনীতিবিদ্ ছাত্রদের বিপথে পরিচালিত করেছিলেন, এবং দলীয় রাজনীতির শিকার হয়ে ছাত্ররা যে কতদূর কাণ্ডজ্ঞান-হীন হয়েছিলেন তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ বসুমতী অফিসে ছাত্রদের হামলা। একথা কে অস্বীকার করতে পারেন, একমাত্র বসুমতীই ছাত্রদের যে রকম সমর্থন জানিয়েছিলেন, সে রকম সমর্থন ইতিপূর্বে

বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর ছাত্রীরা ক্লাশে যোগদান করতে যাচ্ছে

কোন আন্দোলন কোন সংবাদপত্রের কাছ থেকে পায় নি, পেতে পারে না? শুধু ছাত্র আন্দোলনই নয়; যে কোন গণ-আন্দোলন চিরকালই বসুমতীর দ্বিধাহীন সমর্থন পেয়ে এসেছে, এমনকি শিক্ষক আন্দোলন যখন লস্ট গেম-এ পরিণত হয়েছে, একমাত্র বসুমতীই, সাপ্তাহিক ও দৈনিক, সেই আন্দোলনের স্পিরিটকে অব্যাহত রেখেছিল। বিগত ফেব্রুয়ারী মাস থেকে জনসাধারণের বর্তমান সরকার বিরোধী স্পিরিটকে বসুমতীই অব্যাহত রেখেছে, যা বামপন্থী রাজনীতিবিদরা পারেন নি।

ছাত্রদের এমন অকুণ্ঠ সমর্থনের পরেও ছাত্ররা কেন বসুমতী অফিসে হামলা করলেন?—এর উত্তর খুবই সহজ, এবং খোলাখুলি না বলার কোন কারণ নেই। বাম কমিউনিস্টদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একদল ছাত্র এই কাজ করেছেন। বাম কমিউনিস্টরা বসুমতীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে তার কারণ বসুমতী বিশ্বাস করে যে, যদি এবার বামপন্থী ঐক্য ঘটত তাহলে সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে পরাজিত হত, এবং সংগত কারণেই বসুমতী মনে করে যে বামপন্থী অনৈক্যের জন্য বাম কমিউনিস্টরাই দায়ী। কাজেই বাম কমিউনিস্ট নেতারা বসুমতী পোড়াচ্ছেন, প্রকাশ্য জনসভায় বসুমতীর শ্রাদ্ধ করছেন। বসুমতীর অসীম জনপ্রিয়তা এবং মতামতের বলিষ্ঠতা তাঁদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে দিচ্ছে এবং জনসাধারণের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে বামপন্থী ঐক্যের পথে বাধা সৃষ্টি করে কারা এদেশে জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে। কাজেই বাম কমিউনিস্টদের কাছে বসুমতী দুঃসহ। কাজেই তারা শ্লোগান দিচ্ছে—'আমাদের সংগ্রাম বসুমতীর বিরুদ্ধে।' এবং তাদের এই অপপ্রয়াসে তারা ছাত্রদের টেনেছে। নতুবা ছাত্রদের দিয়ে বসুমতী ভবন আক্রমণ করানো হলো কেন?

সেদিন যে সব বীরপুরুষেরা বসুমতী অফিসের উপর চড়াও হয়ে অশ্রাব্য গালিগালাজের দ্বারা বিশ্ব বিপ্লবের মহড়া দিচ্ছিলেন, তাঁদের সেদিন যাঁরা দূরে দাঁড়িয়ে থেকে পরিচালনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বাম কমিউনিস্ট নেতাকে দেখা গিয়েছিল। ছাত্রদের নিকট জিজ্ঞাস্য, একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের অনুপ্রেরণায় চালিত হয়েছেন বলেই কি তাঁরা ভদ্রতা, শ্লীলতা, সুরুচি প্রভৃতিকে জলাঞ্জলি দিয়েছেন? বসুমতীর যদি কোন বক্তব্যের প্রতি তাঁদের আপত্তি থাকত, তবে তাঁরা লিখিতভাবে তার প্রতিবাদ করতে পারতেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে ছাত্রসংগঠনসমূহে দলীয় রাজনীতির প্রভাব এমনভাবে পড়েছে যে তার ফলে আন্দোলনের মূল বিষয় যে ছাত্রস্বার্থ তাই চাপা পড়ে যাচ্ছে এবং দলীয় রাজনীতির স্বার্থ অনুযায়ী আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে। এবারকার ছাত্র আন্দোলনে তারই মারাত্মক পরিণতি দেখা গেল। যে সব রাজনীতির নেতারা পিছন থেকে কলকাঠি নাড়ছিলেন, তাঁদের স্বপ্ন সার্থক হ'ল না, ছাত্র আন্দোলন থেকে তাঁরা গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে পারলেন না। সে ক্ষমতা তাঁদের যে ছিল না অন্তত বাইশে তেইশে সেপ্টেম্বরের পর তাঁদের তা বোঝা উচিত ছিল।

পরিশেষে ছাত্রদের এই বলে ধন্যবাধ দেব যে, বিলম্বে হলেও শেষ পর্যন্ত তাঁরা তিক্ত সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন। আন্দোলনকারী সংগঠনগুলির মধ্যে কয়েকটি সংগঠন বেশ কিছুদিন ধরেই আস্তে আস্তে সমগ্র বিষয়টি অনুধাবন করতে শুরু করেছিলেন। কাজেই অতি-বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁদের মনোভাবের পার্থক্য ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। সর্বশেষে রাষ্ট্রীয় পরিবহণ ধর্মঘটের শোচনীয় ফলাফল দেখে তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁরা যে পথে চলেছেন সেপথে চললে নিশ্চিত ভরাডুবির মুখে তাঁদের পড়তে হবে, কেননা রাষ্ট্রীয় পরিবহণ ধর্মঘট বাইরের কোন শক্তির প্রভাবে ব্যর্থ হয় নি, সে ধর্মঘটকে সাবোটাজ করা হয়েছে ভিতর থেকে। তিক্ত হলেও একথাটা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, যে বামপন্থী নেতা পরিবহন ধর্মঘটের ব্যর্থতাকে 'বামপন্থী অনৈক্যের প্রথম বলি' বলে আখ্যা দিয়েছেন, এ-বিষয়ে সেই নেতা এবং তাঁর 'বিগ ব্রাদার' বাম কমিউনিস্ট নেতা ও তাঁর দলের দায়িত্ব কতখানি তা চেপে গেছেন।

যাই হোক এখন ভালয় ভালয় বিশ্ববিদ্যালয় চললেই আপাতত বাঁচা যায়।

বিজ্ঞানের ঘাড়ে সিন্দবাদী দৈত্য

আশিসকুমার সিংহ

প্রায় চল্লিশ বছর আগে ম্যান্‌ন্‌ এবং তাঁর সহকারিবৃন্দ ইতর প্রাণীর লিভার কেটে প্রমাণ করেছিলেন যে এই অতিপ্রয়োজনীয় দেহযন্ত্রটির অভাবে শরীরে জন্ডিস্‌ রোগের আক্রমণ ঘটে। বাংলায় পাণ্ডু বা ন্যাবা নামে পরিচিত। এই রাগের সুরুতে চোখের সাদা অংশটি হলুদ বর্ণ ধারণ করে, তারপরে গুরুতর অবস্থায় সমস্ত শরীর হল্‌দে হয়ে যায়। রোগটি বিপজ্জনক, সময়মত চিকিৎসার অভাবে এতে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

লিভারের অভাব বা অক্ষমতা ছাড়া অন্য কারণেও জন্ডিস্‌ হয়—কিন্তু সে-কারণগুলি আজকের আলোচনার জন্যে নিষ্প্রয়োজন। কেন না, সম্প্রতি ক্যানিং-এর কোন কোন অঞ্চলে জন্ডিসের যে-প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল (রাজ্যের সরকারী স্বাস্থ্যদপ্তর এ-বিষয়ে কতটা ওয়াকিবহাল জানি না) তার পেছনে সম্ভবত খাদ্যের ভেজালজনিত লিভারের অসুস্থতাই দায়ী। এবং, যে-আশ্চর্য অভিজ্ঞতাটি বর্তমানে আপনাদের কাছে বিবৃত করতে যাচ্ছি সেটা দেখবার ঠিক আগে, আমার বাড়ি ঐ আক্রান্ত অঞ্চলে বলে, উক্ত কারণটি আমার অবচেতন মনের ঠিক উপরিতলেই ভেসে ছিল।

এই রকম মানসিক অবস্থায় অর্থাৎ যখন আমার সচেতন মন পরিবেশের ঘটনাবলী সম্বন্ধে সক্রিয় এবং অবচেতনে এই তথ্যটি জেগে আছে যে ভেজালের ফলে চোখের রঙ পালটে যেতে পারে সেই সময় আমি এইচ, জি, ওয়েল্‌সের জন্মশতবর্ষে তাঁর "দি রিমার্কেব্‌ল্‌ কেস্‌ অব্‌ ডেভিড্‌সন্‌স্‌ আইজ্‌" নামক গল্পটি পড়ছিলাম। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। পশ্চিমের আকাশ থেকে একটা টানা রোদ্দুর এসে পড়েছে সামনের গাছপালা এবং আমাদের হোটেলের ছাদে। কিছুদিন আগেও এ-সময়টায় শিয়ালদহ স্টেশন থেকে অনেকটা ধোঁয়া এবং বাষ্পীয় রেল-ইঞ্জিনের তীক্ষ্ন সিটি আমাদের এদিকটায় ঠিকরে এসে বৈকালিক আকাশ-বাতাসকে খুব ভারি করে তুলতো। কিন্তু এখন সব লাইনেই বৈদ্যুতিক গাড়ির প্রচলন হওয়ায় দৌরাত্ম্যটা কমেছে। প্রায়ই শঙ্খের মত বৈদ্যুতিক রেল-হাঞ্জনের গম্ভীর আওয়াজ আজকাল আমরা শুনতে পাই। তবে তার পাশাপাশি কিছু থেকে-যাওয়া বাষ্পীয় ইঞ্জিন মিহিসুরেরও যোগান দেয় মাঝে মাঝে।

গল্পটা যখন সামান্য কিছু এগিয়েছে, মানে এক বিরাট বৈদ্যুতিক চুম্বকের আকস্মিক প্রভাবে বেচারী ডেভিড্‌সনের দৃষ্টি যখন তার দেহ ছেড়ে প্রায় আট হাজার মাইল দূরের সেই অ্যান্টিপোড্‌ দ্বীপে গিয়ে পৌঁছেছে যার দক্ষিণদিক থেকে পেঙ্গুইনের ডিমের খোঁজে ফুলমার নামে একটি জাহাজ ছাড়ছিল, ঠিক তখনই, যেন সেই জাহাজ থেকেই, একটা ভারি গম্ভীর ভেঁপু আমাকে হঠাৎ একেবারে চমকে দিলে। আমিও কি তবে......? কিছু বুঝতে না বুঝতে পরক্ষণেই আর একটা মিহিসুরে একেবারে দিশাহারা হয়ে গেলাম আমি। স্পষ্ট দেখলাম কিছু বিরাট পিঁপড়ে ও মাকড়সা আকাশ থেকে নেমে এসে চারপাশে কিলবিল করতে করতে চলে গেল। তারপরে যা যা দেখলাম পরপর বিবৃত ক'রে যাচ্ছি।

প্রথম পর্যায় ঃ সময়-যন্ত্র

দেখলাম বিরাট এক সমুদ্র, আর তার মাঝখানে একটি অতিকায় কাঠের নৌকা। চারপাশে ভেঁপু বাজছে। কোনদিকে কূলের কিনারাও নেই, শুধু একপাশে দূরে, বহুদূরে একটি নিঃসঙ্গ জলপাই গাছ দূরবীণের চোখে ধরা দিচ্ছে। কিন্তু তার দিকে যাওয়ার কোন উপায় নেই, কেন না নৌকাটি কোনদিকে এগুচ্ছে না! অতিকায় পেন্ডুলামের মত একটি মধ্য-বিন্দুর এপাশে ওপাশে টক্‌ টক্‌ করে সেটি কেবল নড়ে চলেছে। কোথায় তার সুতো তা কেউ জানে না। কে তাকে নড়িয়ে দিয়েছে বোঝা যাচ্ছে না তাও। পাটাতন থেকে অনেক উঁচুতে; মাস্তুলের শীর্ষদেশের পাশাপাশি একটা চেয়ারে দূরবীণ চোখে আমি বসে আছি, পাশে ব্যাগ এবং তাতে একশিশি......কুন্তল-কেশরী!

(পাঠক নিশ্চয় বুঝেছেন) নৌকাটি স্থান ধরে চলছিল না, চলছিল সময় ধরে। একে ঘিরে কোন একটা হাল্‌কা ধাতুর পাত জলে ভাসছিল। ম্যাগনেটিক্‌ স্ক্রীনিং-এর ভিতরের কৌশল যাঁরা জানেন তাঁরা হয়ত এই ভাসমান পাতটার তাৎপর্য ধরতে পারবেন। চুম্বকের কাছাকাছি চৌম্বক পদার্থের (অর্থাৎ এমন পদার্থ যা চুম্বকের দ্বারা প্রভাবিত হয়) কোন আংটি রাখলে ঐ আংটির মধ্যবর্তী স্থান চুম্বকের প্রভাবমুক্ত হয়ে পড়ে। আপনার ঘড়িকে এভাবেই অ্যান্টি-ম্যাগনেটিক করা হয়েছে। তেমনি এই ভাসমান পাতটার বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে এর মধ্যবর্তী স্থান অভি-কর্ষের প্রভাব থেকে মুক্ত। অতএব, এরই সাহায্যে চারপাশের সমস্ত স্থূল তুচ্ছ বাস্তব ও তাৎক্ষণিকের মায়া কাটিয়ে আমাদের নৌকা সময় ধরে এগিয়ে চলেছিল বেশ।

এবং এইজন্যেই নৌকার অন্যান্য অধিবাসীদের সম্বন্ধে নির্দিষ্ট ক'রে আপনাদের কিছু বলা যাচ্ছে না। কেন না, তারা পালটে যাচ্ছিল অনবরত। যেমন ধরুন একদিন আমার কাঁধ বরাবর একটা ডাইনোসরের মুখ জেগে উঠতে না উঠতেই আমি তাকে নিঃশেষে উধাও হতে দেখলাম। প্রায় পাঁচ লক্ষ বছরে বিবর্তনের এক একটা পরিবর্তন ধরা পড়ার মত স্পষ্ট হয়। নৌকা এমন বেগে চলছিল যাতে প্রায় একমাসে আমরা পাঁচ লক্ষ বছরের দূরত্ব যেতে পারি।

কেবল নৌকার যেখানে কলকাঠি সেই ইঞ্জিন ঘরের অধিবাসীদের প্রকৃতিগত কোন পরিবর্তন হচ্ছিল না। সেখানে দুটি ভূত এবং একটি প্রেতিনী এমনভাবে অবস্থান করছিল যে তাদের প্রত্যেককে সরলরেখা দ্বারা অপরের সঙ্গে যোগ করলে একটি চিরন্তন ত্রিভুজ পাওয়া যায়। অনবরত তারা ঘুরছিল—ঘড়ির কাঁটা যে-দিকে ঘোরে সেই দিকে। ফলে ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুগুলিতে লোক বদল হচ্ছিল বারবার। অনেক বিজ্ঞানের গল্পেও এদের ভারি তেজী জীব হিসাবে দেখানো হয়। বোধ হয় সেই সার্টিফিকেটের জোরেই এরা অনেকটা তেজস্ক্রিয় পদার্থের মত আচরণ করছিল এখানে। বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ ফুড়ুৎ ক'রে কেউ কেউ কোন্‌ ভূতুড়ে রাজ্যের দিকে হানা দিচ্ছিল বলতে পারি না। তবে স্থান খালি থাকছিল না।

সঙ্গে সঙ্গে আর একজন এসে শূন্যস্থান দখল করছিল।

প্রস্তর যুগে এসে নৌকার গতি কমে গেল অনেক। ইতিহাসের রূপরেখাগুলি প্রত্যক্ষ করলাম। তারপরে গতি খুবই কমিয়ে যখন খৃস্টীয় বিংশ শতাব্দীতে ঢুকতে যাচ্ছি এমন সময় সেই অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটল যার ফলে এই উপভোগ্য যাত্রাটি পরিত্যাগ ক'রে আমি একটি নির্জন দ্বীপে গিয়ে উঠতে বাধ্য হলাম।

বলা বাহুল্য যে ইতিমধ্যে নৌকার মধ্যে মানব-সভ্যতা অনেকদূর এগিয়েছে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন হয়েছে এবং তাতে দোলায়মান নৌকার অদৃশ্য সুতো এবং যিনি দুলিয়েছেন তাঁর সম্বন্ধে প্রচুর প্রথম শ্রেণীর গবেষণা ও উপাধি বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। হেগেল, মার্ক্স, ডারউইন পরলোক গমন করেছেন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। এমন সময় একদিন সন্ধ্যায় আকাশে একটি নতুন জ্যোতিষ্কের দেখা পেলাম।

নৌকার পাটাতন থেকে চীৎকার শুনে বুঝলাম আমার অনুমান নির্ভুল, জ্যোতিষ্কটি সত্যই নতুন। আমার "মেটা-ফিজিক্যাল্ ইলেক্ট্রনিক অ্যাপারেটাস্"টা কানে লাগিয়ে নৌকার অধিবাসীদের মধ্যে কে ঐ জ্যোতিষ্কটি প্রথম দেখেছে সবে শুনতে যাচ্ছি এমন সময় অতীতের এক বাদুড়জাতীয় অতিকায় পাখী আমাকে আক্রমণ করল। এ কি অলক্ষণ! তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছি, এমন সময় সেই জ্যোতিষ্কটি উল্কার বেগে পৃথিবীর দিকেই ছুটে আসতে লাগল। কয়েকদিনের মধ্যে নেপচুন ও প্লুটোকে ধ্বংস ক'রে বৃহস্পতিকে যেন ইচ্ছা করেই পাশ কাটিয়ে সে সোজা আমাদের দিকেই আসতে লাগল। ভূতের ঘর থেকে শুনলাম হেগেল "সাতে-স্কে সাত, সাত দুগুণে চোদ্দ, তিন সাত্তে একুশ" ব'লে নামতা পড়ছেন। ইহলোকে ইনি একবার সাত এই সংখ্যাটির মাহাত্ম্য কীর্তন করতে গিয়ে তখনও পর্যন্ত সূর্যের মাত্র সাতটি গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছিল ব'লে ঠিক সাতটি গ্রহ থাকারও একটা আধ্যাত্মিক যুক্তি খাড়া করেছিলেন। পরে নেপচুন ও প্লুটোর আবিষ্কারে মতামতটা দারুণ মার খায়। সম্ভবত সুযোগ পেয়ে আজ আবার তিনি সাত-এর মাহাত্ম্য ঘোষণা করছেন। এবং এবার গোড়া থেকেই ম্যাথেমেটিক্স্টা আয়ত্ত করার চেষ্টা করছেন; দিনে দিনে দর্শনশাস্ত্র যেভাবে গণিতনির্ভর হয়ে পড়ছে বোধ হয় সেই কথা ভেবেই।

কিন্তু এ-পথে বেশিদূর যাওয়ার আগেই যা ঘটল তা আরও চমকপ্রদ। জেম্স্ জীন্স্ ও এডিংটন এ-কাহিনী শুনলে নিশ্চয়ই সুখী হতেন। কক্ষত্যাগী নক্ষত্রের দেখা পাওয়ার পরেও আমাদের নৌকা তার পথ থেকে বিচলিত হয় নি, কিন্তু নক্ষত্রটি যখন স্বাধীন ইচ্ছায় বৃহস্পতিকে পাশ কাটিয়ে মানুষের "ভব-ভয়-ভীতি ভাবনা-প্রভৃতি"র চাহিদা অনুযায়ী শুধু পৃথিবীকেই আক্রমণ করতে এল তখন সে আ-া-র স্থির থাকতে পারল না। তারও কি স্বাধীন ইচ্ছা নেই? ধাঁ ক'রে সে সময়ের পথ বদলে স্থানের পথ ধরে দৌড় সুরু করল।

আমার "মেটাফিজিক্যাল ইলেক্ট্রনিক অ্যাপারেটাসে" শুনতে পেলাম হেগেল আনন্দে আত্মহারা হয়ে চীৎকার করছেন, "একেই বলে ডায়ালেক্টিক্যাল্ স্পিরিচুয়ালিজ্ম্। স্পিরিটের তাড়া খেয়ে কিভাবে অগ্রগতি হয় সেটা একবার দেখুন সকলে। গরীবের কথা বাসি হলে...... ইত্যাদি।" চীৎকার বাসি হবার আগেই দেখি সামনে কোথা থেকে এক বিরাট প্রাচীরের আবির্ভাব হয়েছে, তার মাঝখানে একটি মাত্র দরজা—সেটি বন্ধ। আমাদের নৌকা প্রাণভয়ে দরজাটা খুলতে যখন আঘাত করল দ্বন্দ্বটা কিন্তু স্পিরিচুয়াল হল না; বরং একটা বস্তুবাদী দ্বন্দ্বই অনুভব করলাম আমরা; এবং ফলে নৌকাটা একটু নড়বড়ে হয়ে গেল।

কিন্তু ভিতরে ঢুকে দেখি সে এক আশ্চর্য দেশে এসে পৌঁছেছি। চারদিকে ফুল, পাখী, দেবদূত আর পরীদের রাজত্ব। তারই মাঝখানে কোথা থেকে কে যেন চীৎকার করে কাকে যেন বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের কথা শোনাচ্ছে; আর "আবোল-তাবোলে"র প্রচ্ছদপটের সেই বুড়োটা চমৎকার নীল আকাশের গায়ে তুলি দিয়ে লিখে দিচ্ছে—না, "আবোল-তাবোল" নয়—"সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ।"

তখন নৌকার ইঞ্জিন ঘরে হেগেল এবং মার্ক্স বসে বসে ঘুঘু চরাচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে দুজনের মধ্যে ঘুঘুর কম্পিটিশন হচ্ছিল। দুজনে একটি ক'রে ঘুঘু সেই জলপাই গাছের দিকে উড়িয়ে দিচ্ছিলেন, যার ঘুঘু পাতা আনতে পারবে জয় তারই। কিন্তু একটিও ঘুঘু এতে সফল না হওয়ায় কারণ-অনুসন্ধান চলছিল। ঘুঘু এবং পায়রা যে মোটেই এক জাতের জীব নয় এবং সম্ভবত সেইটাই যে এই অক্ষমতার মূল কারণ, ভূতুড়ে রাজ্য থেকে ডারউইন একবার গলা বাড়িয়ে একথাটা বলতে এসেছিলেন। কিন্তু হেগেল ও মার্ক্স তাঁর উপরে "সারভাইভাল্ অব্ দি ফিটেস্ট্" নীতি প্রয়োগের ভয় দেখানোতে তিনি সেই যে চুপ করেছেন আর রা কাড়েন নি।

কিন্তু এত সুখ বেশিদিন সইল না। হঠাৎ সব যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। সামনে জেগে উঠল আবার একটি প্রাচীর এবং তার মধ্যবর্তী দরজা। সেটা পেরোতে গিয়ে নৌকা এবার ঘায়েল হল বেশ। তবে দ্বিতীয় জগতে গিয়ে আমরা আরো আশ্চর্য ঘটনার দেখা পেলাম। দেখলাম, আবার কোত্থেকে "আবোল-তাবোলে"র সেই বুড়োটাই এসে জুটেছে; আর, অসামান্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে উপর থেকে নিচের দিকে ইঁট গেঁথে গেঁথে এমন একটা প্রকাণ্ড বাড়ি তৈরি করছে যার ভিত-টিত বলে কোন পদার্থই নেই।

স্বচ্ছন্দে তার তলা দিয়ে গলে যাবার পরে আমাদের নৌকার আর কি ঘটল সেটা আমার মনে পড়ছে না। খুব সম্ভব, তৃতীয় একটি প্রাচীর এবং দরজার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে নৌকাটা একেবারে চুরমার হয়ে যায়। আমরা চারদিকে ছিটকে পড়ি

আপনাদের অনাবৃষ্টিক্লিষ্ট দেশবাসীকে সাহায্য করুন

নগদ টাকা বা অন্যান্য জিনিষের সাহায্য নিম্ন ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

প্রধানমন্ত্রীর অনাবৃষ্টি সাহায্য-তহবিল
ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েট, রাষ্ট্রপতি ভবন
নূতন দিল্লী—৪

একটি অসম্পূর্ণ মন

করুণারঞ্জন ভট্টাচার্য

বিস্মৃত বন্দর থেকে আঁখিজলে ছুটে আসে
সম্মোহিত স্মৃতির জাহাজ,
মনের অথৈ জলে সুরের কুহকে ভাসে
প্রেমের আকুল গন্ধরাজ।

পুলক শিথিল মনে নিরীক্ষায় ছন্দের ঈশ্বর
হৃদয়কে তরঙ্গে মোছেন,
আমার প্রত্যয় যেন জলের চূড়ায় সুখকর
অলৌকিক নীলিমা সফেন।

বিস্মৃত বন্দর থেকে অসম্পূর্ণ ফিরে আসে
মধুকর স্মৃতির জাহাজ,
সপ্তডিঙা ঢেউ দিলে মাছের অক্ষরে ভাসে
মনের জলীয় কারুকাজ।

দ্বীপের সমুদ্র থেকে রোদের আবির ভ'রে
অকূল ডিঙিতে একা জেলে,
বিস্মিত ঝিনুক থেকে অমল মুক্তাকে ধ'রে
আয়ুর সোনালি জাল ফেলে।

এবং তারপর ভাসতে ভাসতে আমি কোথায় গিয়ে উঠি সে-কথা দ্বিতীয় পর্যায়ে বিবৃত করছি।

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ নির্জন দ্বীপে

হঠাৎ দেখলাম একটা বালিয়াড়ীতে চুপচাপ শুয়ে আছি। উঠলাম, চারদিক ঘুরে এলাম; দেখে মনে হল একটা জনশূন্য দ্বীপে এসে উঠেছি। তারপরে যেখানে শুয়েছিলাম সেখানে পৌঁছেই চমকে উঠলাম ঃ আরে! এযে দেখি বিরাট একটা ডিম। এটাকেই এতক্ষণ বালিশ ক'রে শুয়েছিলাম যে। ভিতরে ভিতরে খিদে পেয়েছিল, ডিম দেখে সেটা মাথা চাড়া দিল। ভাবলাম, ভেঙে এটার সদ্গতি করা যাক। একটু দ্বিধাও যে না হল, তা নয়। এত বড় ডিমের খেতে পারব খুব সামান্যই, এবং প্রায় সবটাই অপচয় হবে। তাছাড়া কাঁচা ডিম খাওয়া শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। কারণ, কাঁচা ডিমের সাদা জলীয় অংশে অ্যাভিডিন্ নামে একটি পদার্থ থাকে যা শরীরে বায়োটিন নামক একটি ভিটামিনের কাজে বাধা দেয়। গরম করলে অ্যাভিডিন যায় নষ্ট হয়ে। কিন্তু এত বড় ডিমকে গরম করার কথা চিন্তা করাও অসম্ভব। অতএব, প্রচন্ড খিদেয় কাঁচা খাওয়াই সাব্যস্ত করলাম। কিন্তু ঠিক তখনই মনে হল চারপাশে যেন ঝড় বইছে। উপরে তাকিয়ে দেখি বিরাট এক পাখী ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে নেমে আসছে। আমি ভয়ে ভয়ে ভাবলাম এ-নিশ্চয়ই সেই অ্যাপইয়রনিস্ পাখী, এবার আমাকে ঠোকরাতে সুরু করবে। কিন্তু তা না ক'রে সে নেমে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে দেখল আমাকে; আর তারপরে বলে উঠল, "ও কে ও? সিন্ধবাদ বটে। তোমার গল্প কত শুনেছি ঠাকুমা'র মুখে। চল তাড়াতাড়ি, তোমাকে কিছু দেশ দেখিয়ে আনি। আমার আবার খিদে পেয়েছে।" এই বলে আমাকে ঠোঁটে ক'রে নিয়ে সে সোজা ডানা মেলল আকাশে।

তৃতীয় পর্যায় ঃ বোতল-বৃত্তান্ত

এবারেও কিভাবে শেষরক্ষা হল মনে পড়ছে না। আবার ডিম চুরি যাওয়ার ভয়ে সম্ভবত সেই অতিকায় পাখী আমাকে অহিংস উপায়ে দূরের কোন স্থানে নিয়ে নামিয়ে দেয়।

তৃতীয় দৃশ্যের সুরুতে দেখলাম একটা জাল কাঁধে নিয়ে চলেছি। স্থান ঃ নোয়াখালির সমুদ্রতীর। আমি কখনও নোয়াখালি যাই নি। তবু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ওটা নোয়াখালি ছাড়া আর কোন স্থানই নয়। খুব খিদে পেয়েছে। মাছের আশায় সমুদ্রে জাল ফেললাম। উঠল একটা বোতল।

গাঁয়ের দিকে পুকুরের তলায় বোতল বা ফাঁপা বাঁশের নল নামিয়ে দিলে তাতে মাছ ঢুকে বসে থাকে। তারপরে ডুব দিয়ে বোতলের বা নলের মুখ হাত দিয়ে বন্ধ ক'রে উপরে এনে সেই মাছ ধরা যায়। আমি এই কথা ভেবে খুব আনন্দে (বোতলের মুখটা যে ছিপি আঁটা আছে সেটা ভাল ক'রে না দেখেই) ছিপিটা খুলে ফেললাম। আর যায় কোথা? ভিতর থেকে প্রচুর ধোঁয়া বেরিয়ে এল। সব ধোঁয়া বেরিয়ে এলে সেই ধূম্ররাশির মধ্য থেকে কেউ একজন আমাকে বলল, "আদিদেবের গাঁজার ধোঁয়া আমরা। বিশ্বসংসারের যত কিছু সমস্যা তার রেডিমেড্ উত্তর সদাসর্বদা আমাদের কাছে মজুত পাবেন। এখন বলুন আপনার প্রশ্নটা কি? না হলে বিরক্ত করার জন্য শাস্তি দেব। কেন না, আমাদের খুব খিদে পেয়েছে।" আমি ভয়ে ভয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে বর্ণিত গল্পগুলি তাদের বলে তার তাৎপর্য জানতে চাইলাম। হঠাৎ তারা কেমন যেন মিইয়ে গেল। সেই প্রচুর ধোঁয়ার আয়তন অদ্ভুতভাবে কমে আসতে লাগল। "লাফাস্ নে, লাফাস্ নে, Zinতি পার না, Zinতি পার না" বলতে বলতে ধোঁয়ার রাশি ছোট হয়ে যেই না বোতলে ঢুকেছে তখনই—উঁহু আমি নয়—সেই ছিপিটা নিজেই কোত্থেকে এসে লেগে গেল বোতলের মুখে, আর বোতলটা গড়াতে গড়াতে পুনরায় সলিল সমাধিলাভ করল।

আমি প্রাণভয়ে পিছনে ফিরে ছুটতে গিয়েই প্রচন্ড হোঁচট খেলাম।

* * *

কিভাবে নোয়াখালির সমুদ্রতীর থেকে শিয়ালদহের উপকণ্ঠে আমার হোটেলের ঘরটিতে এসে পৌঁছলাম জানি না; কিন্তু রাত প্রায় দশটা নাগাদ যখন আবার সুস্থ হলাম প্রচন্ড খিদেয় নাড়িভুঁড়ি চোঁ চোঁ করছে। তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে শুয়ে পড়লাম এবং এই অদ্ভুত ব্যাপারটি নিয়ে ভাবতে লাগলাম।

অনেক রাত অবধি চোখে ঘুম এল না। একরাশ প্রশ্ন ভিড় করে এল মনে। এ-কোন্ অভিজ্ঞতা আমি আজ ঠিক সন্ধ্যাবেলায় লাভ করলাম? একি স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম? একি সচেতন মনের কাজ, না অবচেতনের? যদি সচেতন মনের কাজ হয় তবে এমন অভিজ্ঞতা পৃথিবীতে আর কেউ যে লাভ করে নি সে বিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চয়। আর যদি অবচেতনের কাজ হয়, তবে এমন হওয়ার কারণ কি? একি সায়েন্স ফিক্সান বেশি পড়ার ফল? কিন্তু সব সায়েন্স ফিক্সান ত' ভূতুড়ে নয়! আজকাল এমন অনেক সায়েন্স ফিক্সানও লেখা হচ্ছে যাতে অলৌকিক রসের বাড়াবাড়ি নেই, বরং বাস্তব বিজ্ঞানকে সাধারণের কাছে এনে দেওয়ার আয়োজন আছে, আছে অলৌকিকতার বিরোধিতাও। এমন কি, সমাজ ও বিজ্ঞানের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়েও ত' সায়েন্স্ ফিক্সান লেখা হয় আজকাল! অভিজ্ঞতাটির পেছনে অবচেতনে এই আধুনিক সায়েন্স্ ফিক্সানেরও কি প্রভাব আছে? না কি শুধুই ভূতুড়ে ফিক্সানের প্রভাব? জগদীশচন্দ্রের "পলাতক তুফান"-খ্যাত কুন্তল-কেশরীই বা এখানে কেন এল?

এইসব সমস্যার কোন সমাধান এখনও করতে পারি নি। দু-একজন মনস্তত্ত্ববিদ্‌কে বলেছিলাম। তাঁরা ত' এটাকে সত্যি বলে বিশ্বাস করতেই চান না। শেষ পর্যন্ত তাই আপনাদের দ্বারস্থ হচ্ছি। দেখুন ত' সাদা চোখে কোন সমাধান মেলে কি না।

আমার নায়ক

রেবন্ত বসু

জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতেও যতীন লক্ষ্য করল সূর্যের আলো একেবারে মুছে যাবার আগেই চাঁদ-মুখ দেখা দিয়েছে আকাশে। সেই চাঁদের গন্ধ যেন মেসের এই ভাঙা ঘরটিকে হঠাৎ স্বপ্নপুরী করে দিল। বালি-খসা দেয়ালে পাল তুলে চলেছে একটি নৌকো, চুল এলিয়ে বিরহিণী বসে আছে প্রিয়-প্রতীক্ষায়। জেগে জেগে স্বপ্ন দেখল যতীন এক মিনিট, তারপর ঘরে তালা দিয়ে শরতের এই প্রসন্ন-প্রদোষে সে টিউশনী করতে বেরলো। হ্যারিসন রোডেও সুন্দর বাতাস আর মাথার ওপর নির্মল আকাশ। পূর্ণতার ঋতু। আকাশ সুষমায় ভরা, গাছগুলি মহাখুশি আর বাতাস যেন সুখী মানুষের নিশ্বাস। আর পূর্ণ ট্রাম আর বাস। শরৎ বলে নয়, ছটা বাজল যতীনের হাত-ঘড়িতে।

কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে এসে তার জীবনের পনেরটি মিনিটের অপব্যয় হয়ে গেল। তারপর ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই শুনেও সে অবাধ্য শিশুর মতো লাফিয়ে উঠল একটি বাসে। সেখানে চির-গ্রীষ্ম। একটি চলন্ত অন্ধকূপ। তবু বাসের ভেতরে খানিক পরে ঢুকতে পেরে যতীন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। তার গন্তব্যস্থান সেই পাঁচমাথা—এই সুযোগে যতীনের পরিচয় দিই। অবশ্য কি-ই বা দেব! নাম তো বলেইছি, পদবী সেন, ধাম মুর্শিদাবাদ (সেখানে বাবা-মা-ভাই-বোন, গরম আর পুজোর ছুটিতে নিজে), বর্তমানে হ্যারিসন রোডের একটি মেস, পেশা (হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন) শিক্ষকতা, নেশা—সিগারেট (চার্মিনার), বয়স সাতাশ, অবিবাহিত। ছোটবেলা কেটেছে দেশে, বড় হয়ে কলকাতার কলেজে পড়তে আসে, প্রিয়পাত্রীকে বিয়ে করার মতো সাধারণ যতীন ইতিহাসকে ভালোবাসত বলে তাইতেই এম. এ.-টা পাশ করে নিল। ভালোবাসায় খাদ ছিল না, সমালোচকের নিরপেক্ষতা ছিল তার অন্তরে আর স্মৃতি-শক্তি ছিল প্রখর তাই ফল হলো ভালো। যে কলেজের ছাত্র ছিল তারই শিক্ষক হলো। বাবা বললেন, 'আই. এ. এস.-টা দে', যতীন বলল, 'নাঃ—ভালো লাগে না ওসব'; রাত্রে বৃদ্ধ স্বামী তাঁর স্ত্রীর কাছে অনুযোগ করলেন, 'মা-লক্ষ্মী আমায় কোনোদিনও দেখা দেবেন না।' লক্ষ্মী ছেলে কিন্তু যতীন, ঐ তো মাইনে, তাই থেকেই বাবাকে পাঠায়। টিউশনী করলে কিছু আয় বাড়ে—এই তো আর কমিনিটের পথ—কিন্তু ইতিহাসের টিউশনী কি আর সবসময় মেলে?

এই হলো সাতাশ বছরের যতীনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। তবে ঈশ্বর আছেন, আছেন; তাই যতীন যাকে পড়াতে যাচ্ছে তার নাম জ্যোৎস্না, নম্র সুশ্রী ঊনিশ বছরের একটি মেয়ে। আর মাত্র ছ-মাস তাকে পড়াতে পাবে যতীন. ছটা মাস শুনলে সত্যিই অল্প সময় মনে হয়, তবে আধ-বছর শুনলে একটু বেশি-বেশি ঠেকে। আপাতত যতীন চায় ঐ ছ-মাস যেন কখনো না ফুরোয়—অর্থলোভ তো আছেই, তাছাড়া......এই তো বাস এসে গেল, আসুন আমরাও যতীনের সঙ্গে সেই চির-নতুন প্রেমের রাজ্যে প্রবেশ করি।

বেশ বড় তিনতলা বাড়ি জ্যোৎস্নাদের; গ্যারাজটা এম্পটি শো নয়। বড় রাস্তা থেকে সামান্য দূরে; বাড়ির সামনের ফুটপাথের বুক ফুঁড়ে একটি সবুজ গাছের সমারোহ। কলিং বেল বাজাতেই ভৃত্য হাজির, সঙ্গে করে নিয়ে গেল একতলার কোণের সুদৃশ্য পড়বার ঘরটিতে। দুটো কাঁচের আলমারিতে ঠাসা দেশ-বিদেশের বই, দেয়ালে মনীষীদের ছবি, গদীমোড়া দুটো চেয়ারের মাঝে শ্বেতপাথরের টেবিল। এক কোণে একটি অ্যাকোয়ারিয়াম। বাইরে থেকে নারীকণ্ঠে ধ্বনিত হলো: 'জ্যোৎস্না, মাস্টারমশাই এসেছেন।' যতীন এদের সবাইকে পছন্দ করে কারণ মার্জিত এদের ব্যবহার। তার মনে হয় এরা নিশ্চয়ই মাস-মাইনের খাতায় ধোপা-নাপিত-গয়লা-চাকর-জমাদারের আগে মাস্টারমশাই-এর নামই লেখে। এখানে বলে রাখি, জ্যোৎস্না তাকে মুখে বলে, 'মাস্টারমশাই', মনে মনে বলে 'যতীনদা'। যতীনের যতীনত্বে সে মুগ্ধ। যতীন পড়বার ঘরে ঢুকে অস্থির পায়ে এগিয়ে গেল অ্যাকোয়ারিয়ামের দিকে, দেখল সোর্ড-টেল, ব্ল্যাক মনি, এঞ্জেল—তাদের কেঁচো খাওয়া; তারপরে জানালার ধারে গিয়ে একখণ্ড আকাশ যেখানে তখন জ্যোৎস্নার মতো নম্র একটি চাঁদ উঠেছে। তারপর পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে জীবন্ত চাঁদটিকে দেখে তার রুক্ষ দৃষ্টিটাকে সে আরও একটু

ভিজিয়ে নিল। জ্যোৎস্নার দীঘল দেহ, রঙ্ ফর্সা, ঘাড়ে পাউডার, পিঠে মস্ত সুগন্ধী বেণী, মুখ তার শ্রাবস্তীর ইত্যাদি। হাতের বইগুলো সে টেবিলে নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইল মাথা নিচু করে; যতীন বসার পর বসল। কথাবার্তা যতীন বেশি কখনো বলতে পারে না, মানে বাজে কথা, মানে কাজের কথা। তবু পড়ানোর আগে একবার বলল ঃ 'কি করছিলে এখন?'

প্রথমে কিছুই জবাব পেল না; তারপর ঃ 'ভাবছিলাম এত দেরি হচ্ছে কেন।'

যতীন দেখল কাঁপা আঙুল, নরম চিবুক; চোখ ফিরিয়ে অ্যাকোয়ারিয়ামে রাখল ঃ এঞ্জেলটাকে দূর থেকে কেমন প্রজাপতির মতো দেখতে। আর জ্যোৎস্না দোষ আর লজ্জা খণ্ডাবার জন্যে বলল ঃ 'বাসে খুব ভিড়—না?'

তারপর পড়া শুরু হলো। জ্যোৎস্নার বিয়ের সম্বন্ধ আসছে বড় বড় ঘর থেকে, বাবার তার মস্ত ব্যবসা, তবু আজকের এই সন্ধ্যায় যতীনদাকেই সে ভালোবাসে; যতীনের বড়দিদির এখনো বিয়ে হয় নি, বাবা কদিন পরেই হবেন দি সুপার অ্যানুয়েটেড ম্যান, তবু সে জ্যোৎস্নাকে এখন ভালোবাসে। জ্যোৎস্নাকে ভালোবাসে আর ইতিহাসকে ভালোবাসে। চা এল—চুমুক দিয়ে গলা ভিজিয়ে নিল যতীন—সিপাই বিদ্রোহের কারণ বোঝাতে হবে। 'এই লাইনগুলো খুব ইম্পর্ট্যান্ট'—শুনে জ্যোৎস্না ঝুঁকে দেখতে লাগল—তার চুলের গন্ধ এল যতীনের নাকে আর যতীন এক মুহূর্তে লক্ষ বার বলল—'আমি তোমাকে চাই'। বাইরে গাড়ি দাঁড়ানোর শব্দ, খটখট জুতোর আওয়াজ, জ্যোৎস্নার মায়ের রিনরিনে হাসি, কাট-লেটের গন্ধ ঃ জ্যোৎস্নার চেয়ারে আর সে নেই, আছে একটি প্রজাপতির ছবি আঁকা লাল চিঠি। একটু পরেই অবশ্য সানাই-এর শব্দ ডুবে গেল শত শত সিপাই-এর চিৎকারে, অন্যায় তারা মানবে না, দিকে দিকে জ্বালল তারা বিদ্রোহের মশাল, মরবার আগে মারবে, যতীনও মাছেদের খোরাক ঐ কেঁচো নয়, সেও একজন সিপাই, তারও কণ্ঠে ধ্বনিত হলো সুবিচারের দাবি মঙ্গল পাণ্ডের মতো, তাঁতিয়া টোপীর মতো, নানা সাহেবের মতো।......পাশের ঘরের চটুল বিলিতি বাজনা যতীনকে হঠাৎ চাবুক মারল, আকাশের দিকে মুখ-বাড়ানো তেজী ঘোড়াটাকে আবার বাস্তবের গাড়িতে জুতে দিল। ধীরকণ্ঠে সে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল। বাজনা অবশ্য তক্ষুণি থামল কিন্তু সিপাইদের দল আর জাগল না।... পড়া শেষ হলে লেখা-পড়া। যতীন ভালো বলল, কিছু বলল না, ভুল দেখাল। এমনি করে আটটা বাজল।

'অনার্স পাব তো?' পৃথিবীর মেয়েটি বলল।

'নিশ্চয়ই। তবে আরও ক্রিটিকাল করতে হবে দৃষ্টিভঙ্গীকে। যেমন ধরো, কোনো দেশের বা রাজার শাসনব্যবস্থা বর্ণনা করতে দিল—শুধু বিবরণ দিলেই চলবে না, তার দোষগুণ সব তোমায় দেখাতে হবে। পরবর্তীকালের ওপর তার প্রভাবের কথা বলতে হবে। এই-রকম আর কি।'

'আমাদের দেশের শাসনব্যবস্থা কিরকম?' যতীনের ছাত্রী জানতে চাইল।

বিনামূল্যে

কেলি-ক্লথ

রুমাল

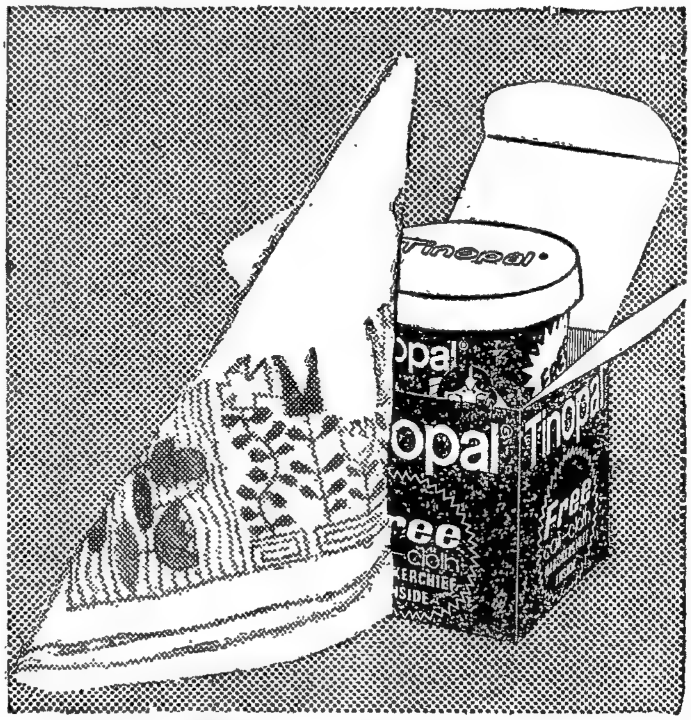

টিনোপালের

এই গিফ্‌ট-প্যাকের সঙ্গে

সিকি চামচ পরিমাণ টিনোপাল পুরো এক বালতি
জামাকাপড় ধবধবে সাদা করে

টিনোপাল রেজিস্টার্ড ট্রেড মার্কের অধিকারী জে আর গায়গী
এস এ, বাল, সুইজারল্যাণ্ড
সুহৃদ গায়গী লিমিটেড, পোঃ আঃ বক্স ৯৬৫ বোম্বাই-১ বি আর

Shilpi SG. 20 BEN

ক্ষমার প্রার্থনা

স্বদেশরঞ্জন দত্ত

যন্ত্রণায় কি করে যে নীল হয়ে যায়
সব রক্ত-মাংস, ঘরবাড়ি,
বৃষ্টি ভিজে ভিজে সব নীল হয়ে যায়।
বৃষ্টিতে ছড়ায় শুধু অপার যন্ত্রণা।

সব নীল নিয়ে তুমি যখন দাঁড়ালে
হয়তো বুঝিনি তুমি কি বলেছ,
হয়তো পারি নি দিতে যা চেয়েছ,
হয়তো পারি নি নিতে যা দিয়েছ,
হয়তো পারি নি নীলকণ্ঠ হয়ে যেতে,
সারারাত তাই
ক্ষমার প্রার্থনা ভিন্ন কিছু আর হয় নি সম্ভব।

প্রতীক্ষায়

অসীম বসু

কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আসে নিহত বেলায়,
প্রচন্ড শব্দের সাথে পদধ্বনি শোনা যায় তবু—
রক্তের ভিতরে শব্দ
ঘুমের ভিতরে শব্দ
চতুর্দিক ধ্বনিগুলি একান্ত নিবিড় হয়ে আসে।
অবিশ্রাম এই ধ্বনি স্রোত
পৃথিবীর ধূসর প্রান্তিকে
আনে বুঝি সবুজের গান?

কতকাল প্রতীক্ষায় আছি
নিরুত্তাপ সময়ের পায়ে পায়ে হেঁটে
এই ধ্বনি শুনে যাব বলে।

ইতস্তত না করে জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে যতীন শান্তকণ্ঠে বলল : 'আমার দিকে তাকিয়ে তার কিছুটা জবাব পাবে।'

জ্যোৎস্না যতীনের চোখে চোখ রাখল। তার দৃষ্টিতে সহানুভূতি, মায়া, ভালোবাসা। সেই মুহূর্তটি অনন্ত হবার প্রার্থনা জানিয়েই মরে গেল কারণ যতীন অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে তাকে হত্যা করল। তারপর সে খাতা বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল : 'বুধবার আসব।' তারপর ঘরের বাইরে পা বাড়াল। জ্যোৎস্না চলল এগিয়ে দিতে। আসার সময় ড্রইং রুমের আলো ছিল নেবানো এখন সেখানে নিওন লাইটের চমক আর পাখার তলায় চারটি নরনারীর তাস খেলা চলেছে। পায়ের শব্দে গৃহকর্তা চোখ তুলে তাকালেন, কর্ত্রীও। একজন বললেন—'কেমন, ভালো-তো' আর একজন—'চললেন?' একবার ঘাড় নেড়েই যতীন দুজনের উত্তর একসঙ্গে দিল তারপর করজোড়ে বিদায় নিল। নিওন লাইট আর পাইপের গন্ধ আর রঙিন তাস দিয়ে তৈরি ঐ পরিবেশে তার কেমন ভয় ভয় করে। বাইরের চাতালে এসে সে বুক ভরে নিশ্বাস নিল। আশ্চর্য, এ'রা এত ভদ্র তবু তার এত ভয় করে কেন—নিজেকে এত অপর লাগে কেন? এই বাড়িতেই তো জ্যোৎস্না বলে একটি মেয়ে থাকে। জ্যোৎস্না যেন এ বাড়ির হয়েও আলাদা, সে ইতিহাস ভালোবাসে, সে এখনো বাস্তবের কিছুই জানে না। তাই তো সে কাঁপা গলায় বলল : 'বুধবার কখন!'

যতীন বলল, তারপর সিগারেট ধরাল, তারপর রাস্তায় পা দিল। জ্যোৎস্না জ্যোৎস্নায় মিশে রইল।

বাইরে বেরোতেই আর ইতিহাস নয়, বর্তমান। চলমান জীবন। বোকা যতীন উঁচুতে চোখ তুলে আরও বোকা একজনকে দেখতে পেল। জ্যোৎস্নাদের ড্রয়িং রুমে যতীন আর কলকাতায় চাঁদ সমান বেমানান। পাঁচমাথার মোড়ে অনেক গাড়ি লালবাতি দেখে থেমে আছে; আর তাই পারে হাঁটা মানুষগুলো চলতে পারছে স্বচ্ছন্দে। যতীনও রাস্তা পার হচ্ছিল—হঠাৎ—'আরে যতীন না!' থেমে থাকা গাড়ি থেকে একজন পিছু ডাকল।

যতীনকে ফিরে তাকাতে হলো।—'কি খবর বিকাশ?'

'কোথায় চললি রে হন হন করে—কতদিন পরে দেখা বলতো!'

'হ্যাঁ, অনেকদিন।'

'তারপর কেমন আছিস? কি করছিস?' স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে বিকাশ জিজ্ঞেস করল। জবাব শুনে 'ভেরি গুড্' বলে যতীনের হাত ধরে একটা ঝাঁকুনি দিল। তারপর পাশে-বসা স্ত্রীকে বলল : 'এই আমার কলেজের বন্ধু যতীন', আর যতীনকে : 'এ আমার স্ত্রী মিতা।'

যতীন হাত জোড় করে নমস্কার করল, নমস্কার পেল।

লাল আলোয় চোখ রেখে বিকাশ বলল, 'তোরাই তো দেশের ভরসা রে। ভবিষ্যৎ সব নাগরিকদের মানুষ করবার ব্রত নিয়েছিস। দি মোস্ট নোবল্ প্রফেশন। আমার বাড়ি তো চিনিস—একদিন আয় না!'

'যাব।' এখন এখন যাবার জন্যে যতীনকে বলতে হলো।

'এই কার্ডটা রাখ্।'

আবছা আলোয় যতীন কার্ডে চোখ বোলালো : 'পাবলিসিটি অফিসার? তুই না সুগার এঞ্জিনীয়ারিং পড়তে বিলেত গিয়েছিলি?'

গাড়িতে স্টার্ট দিল বিকাশ : 'সে অনেক কথা—আসিস বলব।' রক্তচক্ষু অগ্রাহ্য করেই সে কিছুটা এগিয়ে গেল।

যতীন এসে দাঁড়াল মাঝের আইল্যান্ডে। এদিকে জ্যোৎস্নার বাড়ি, ওদিকে বিকাশের গাড়ি, ওদিকে তার মেস, ঐদিকে তার কলেজ আর ঐ ওদিকে গণিকাগৃহ। যতীন তার মেস আর কলেজের রাস্তাদুটির মিলনক্ষেত্রে এসে দাঁড়াল। বেরসিক, যতীন বেরসিক। জ্যোৎস্না বলেছে 'বুধবার কখন?' আর সে কিনা ভাবছে বাবাকে পাঠিয়ে আর মেস-খরচা দিয়ে যে টাকা তার থাকে তাতে জ্যোৎস্নার জন্যে একজোড়া কালো জুতোই কেবল কেনা যায়; বিকাশ বসে গেল : 'দি মোস্ট নোবল্ প্রফেশন' আর সে ভাবছে একনিষ্ঠ হওয়ার কত জ্বালা, ইতিহাসকে ভালোবাসা অপরাধ, জ্যোৎস্নাকে ভালোবাসা অপরাধ। যতীন বড় বেরসিক। আশপাশে কত কথার আর আলোর ফুলঝুরি, কত মানুষ সুখী হয়ে ফুটপাথে পা ছুঁয়ে উড়ছে—আর সে কি না কত লোকে আর আলোকে ভরা এই রাস্তাকে ভাবছে ধু ধু মরুপথ! ফুলওয়ালা বলছে : 'বাবু ফুল নিয়ে যান', খদ্দের বলছে 'কত করে?' আর যতীন কেবলই শুনছে 'কত করে?' 'কত করে?' 'কত করে?' যতীনের দৃষ্টিটাও কেমন যেন রুক্ষ—তাই তারাগুলো দেখে তার মনে হলো যেন ভিখিরিটা দিনান্তে নয়া পয়সাগুলো ছড়িয়ে ভাবছে; আর বোকা চাঁদটাকে তার মনে হলো যেন ভীষণ চালাক—ওটা যেন একটা রুপোর টাকা তার নাগালের বাইরে দাঁড়িয়ে হাসছে।

আমার মনটা একটু নরম; তাই আমি আজো মানুষের তিলে তিলে মরাটা দেখতে পারি না। তাই যতীনের পাশে গিয়ে চুপিচুপি বললাম, 'ঐ যে বাস আসছে ওর তলায় শুয়ে পড়ো তুমি—এ বাঁচার সার্থকতা কোথায়?'

যতীন লাফ দিয়ে সেই বাসে উঠল, বলে গেল : 'কেন, তুমি তো আমায় তোমার গল্পের নায়ক করলে!'

এইচ. জি. ওয়েলস-এর গল্প

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

দশম অধ্যায় ঃ ডক্টর মোরোর দ্বীপ

বিনা টিকিটে রেল-ভ্রমণ করলে জরিমানা দিতে হয়। বড় রকমের জাহাজ-ভ্রমণেও ঝক্কি-ঝামেলা অনেক। কিন্তু ওয়েল্‌স্‌-এর 'দি আইল্যান্ড অব্‌ ডক্টর মোরো' পড়তে বসে টিকিট না কেটেই ভ্রমণের সুখ উপভোগ করি আমরা। এতটুকু ঝামেলা সহ্য না করেও দুর্গম প্রশান্ত মহাসাগরে পাড়ি জমাই। দেখতে দেখতে চলে আসি এক রহস্যময় দ্বীপে। ডক্টর মোরোর দ্বীপ সেটি; সে-ই হল 'দি আইল্যান্ড অব্‌ ডক্টর মোরো'।

মজার কথা এই যে, সেখানে যেতে যে যানটিতে চাপি আমরা, তা' বাষ্প-তাড়িত বা বিদ্যুৎ-চালিত নয়; তা'র প্রতিটি অংশই কথা দিয়ে গড়া। কথা শুনতে শুনতে গল্প পড়তে পড়তে আমরা মোরোর দ্বীপে অভিযান করি। বিস্মিত হই এই ভেবে যে, ওয়েল্‌স্‌-এর গড়া রহস্য-রাজ্যে ভ্রমণ করবার বেলায় পাশ-পোর্টের কড়াকড়ি নেই।

কেন নেই, তা' এড্‌ওয়ার্ড প্রেনডিক-এর জীবনকাহিনীর একটা অধ্যায় বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে। কেন না এই প্রেনডিকই একমাত্র প্রাণী যে ডক্টর মোরোর অদ্ভুত ও বিচিত্র কার্যকলাপের সঙ্গে পরিচিত হবার পরেও জীবন নিয়ে ফিরেছে।

ভাগ্য খারাপ প্রেনডিক-এর। ক্যালেও বন্দর থেকে ফিরবার পথে জাহাজ-ডুবিতে পড়ে সে। তারপর ছোট্ট এক খোলা নৌকোয় ভেসে চলে নিরুদ্দেশের পথে। দেখতে দেখতে শোচনীয় হয়ে ওঠে তার অবস্থা। চারিদিকে থৈ থৈ করছে জল। দুরন্ত মহাসমুদ্র তাকে গ্রাস করতে চাইছে প্রতি মুহূর্তে। এদিকে নৌকোয় খাদ্য নেই। পানীয় জল নেই একফোঁটা। প্রেনডিক-এর সঙ্গীরা জীবনের আশায় নিজেদের মধ্যে সংগ্রাম করতে গিয়ে মরণকে ডেকে আনল। বেঁচে রইল শুধু প্রেনডিক। শেষ অবধি 'ইপিক্যাকুয়ানা' নামে একটি একটি জাহাজ কেমন করে তাকে উদ্ধার করল তার এক রোমাঞ্চকর বর্ণনা ওয়েল্‌স্‌ দিয়েছেন। বলেছেন, কেমন করে ওই জাহাজেরই এক আরোহী মন্ট্‌গোমারীর চেষ্টায় প্রেনডিক সে যাত্রায় রক্ষা পেল।

ইপিক্যাকুয়ানা জাহাজে চেপে মন্ট্‌গোমারী যাচ্ছিলেন ডক্টর মোরোর দ্বীপে। তাঁর সঙ্গে ছিল কিছু জন্তু-জানোয়ার। স্থির ছিল, নির্দিষ্ট দ্বীপের কাছাকাছি এলেই জাহাজ থেকে মন্ট্‌গোমারী নেমে পড়বেন।

শেষ অবধি নামলেন তিনি। সঙ্গে নামল প্রেনডিকও। মন্ট্‌গোমারী প্রথমটায় প্রেনডিককে সঙ্গে নিতে চান নি। মোরোর দ্বীপের রহস্যকে অপরিচিতের কাছ থেকে আড়াল করে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ অবধি নিরুপায় হয়ে ওই সহায়-সম্বলহীন মানুষটিকে তিনি সঙ্গে নিলেন। কাহিনীর এই অংশে মন্ট্‌গোমারীর অতি-সতর্কতার মধ্য দিয়ে মোরোর দ্বীপের রহস্য জমাট হয়ে উঠেছে। অজানা মহাসমুদ্রের নির্জন এক দ্বীপ সম্বন্ধে কৌতূহল অনুভব করেছি আমরা। তা' ছাড়া 'ইপিক্যাকুয়ানা' জাহাজে অদ্ভুত-দর্শন মানুষ ও জীবজন্তুর চিৎকারও রহস্যকে ঘনীভূত করেছে।

তবে প্রথমটায় লেখক মোরোর দ্বীপ সম্বন্ধে স্পষ্ট করে কিছু বলেন নি। যা' কিছু বলেছেন, তাদের সবই আভাসে-ইঙ্গিতে। ফলে, কাহিনীর সূচনাতেই পাঠকরা বিরাট এক জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হয়। সকলেই প্রশ্ন করে, কে এই মন্ট্‌গোমারী? জন্তু-জানোয়ার নিয়ে কেন চলেছেন তিনি? দূরের এই জন-পরিত্যক্ত দ্বীপের সঙ্গে কি সম্পর্ক তাঁর?

দ্বীপটির কাছে আসা মাত্রই সম্পর্কের সূত্রটি একটু যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বেশ বোঝা যায়, ওই দ্বীপে মোটেই আগন্তুক নন তিনি। ওখানকার অদ্ভুত-দর্শন বাসিন্দারা তাঁকে আগে থাকতেই জানে। কিন্তু কেন জানে? কোন্‌ সূত্রে জানে? কি ওই বাসিন্দাদের পরিচয়?—এই সব প্রশ্ন অতি সাধারণ পাঠকেরও মনে আসা স্বাভাবিক; এবং এজন্যেই গল্পটির প্রতি প্রথম থেকেই দুরতিক্রম্য এক আকর্ষণ অনুভব করা ওদের পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু নয়। অতএব এইখানে অকুণ্ঠিত-চিত্তে বলা যেতে পারে যে ওয়েল্‌স্‌ মূল কাহিনীটিকে প্রথম থেকেই জমিয়ে তুলেছেন; এবং সে কারণেই কাহিনীর পরবর্তী পর্বে ডক্টর মোরোর আবির্ভাব ঘটে যখন গল্প তখন জমজমাট। তখন সবিস্ময়ে উপলব্ধি করি আমরা যে রহস্যের অন্দর-মহলে অনুপ্রবেশ করেছি।

আশ্চর্য এক বিজ্ঞানী ডক্টর মোরো। প্রাণিবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করেন তিনি। জীব-ব্যবচ্ছেদ করে পশুকে মানুষে রূপান্তরের সাধনা করেন। তাঁর বিশ্বাস, অস্ত্রোপচার করে জীব-জন্তুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রূপান্তর ঘটানো সম্ভব। এক জীবের অঙ্গ অন্য এক জীবের দেহে সন্নিবিষ্ট করা যেতে পারে। জীবদেহের রক্তসঞ্চালন-পদ্ধতির এবং মস্তিষ্কের ক্রিয়াকর্মের পরিবর্তন ঘটানও অসম্ভব কিছু নয়। একনিষ্ঠ বিজ্ঞান-সাধক ডক্টর মোরোর এই ধারণা শেষ অবধি প্রায় সত্য প্রমাণিত হয়েছে। পশুকে মানুষে রূপান্তর করার কাজে অনেক দূর এগিয়েছেন তিনি। দিনের পর দিন ধরে তন্ময়চিত্তে সাধনা করেছেন। গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছেন এমন একটি স্থান যা' সভ্য-জগৎ থেকে শত-সহস্র মাইল দূরে। চেনা-জানা পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রহস্যময় এক দ্বীপ হল তাঁর কর্মকেন্দ্র। সেখানে বিভিন্ন পশুর অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ করছেন ডক্টর মোরো। ইতর জীবের আকৃতি ও প্রকৃতির মধ্যে মানুষের লক্ষণ ফুটিয়ে তুলছেন।

এ কাহিনীতে আমাদের সঙ্গে যখন ডক্টর মোরোর প্রথম পরিচয় হল তখন তাঁর গবেষণার দীর্ঘ বিশ বছর পেরিয়ে গেছে। অনেকগুলো জীবকে আচার-আচরণ ও চেহারার দিক দিয়ে প্রায়-মানুষে রূপায়িত করেছেন তিনি। মন্ট্‌গোমারী এ কাজে তাঁকে সাহায্য সাহায্য করেছেন। তাঁর একমাত্র বিশ্বস্ত সহকারী হিসেবে দিনের পর দিন ধরে তাঁকে সঙ্গ দিয়েছেন। বিস্ময়ের কথা এই যে, ডক্টর মোরোর সঙ্গীদের আর কেউই মানুষ নয়; মানুষেতর জীব। অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের ফলে আকারে-প্রকারে মানুষের কিছু ধর্ম ওদের মধ্যে জেগে উঠেছে বটে; কিন্তু তা' থেকে এমন কথা বলা যায় না যে ওরা পুরোপুরি মানুষ। বরং বলা যায়, মানুষের মূর্তিমান বিদ্রূপ ওরা; জলজ্যান্ত প্যারডী। কদাকার ওদের চেহারা; কুৎসিত চলন-বলন। সে কারণেই ওদের অনেকেই ভয়ঙ্করের প্রতিমূর্তি। ওদের আবির্ভাব

প্রতি মুহূর্তে আমাদের সচকিত করে তোলে।

আলোচ্য কাহিনীতে রহস্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে লেখক প্রায়-মানুষদের খুব ভালভাবেই কাজে লাগিয়েছেন। ওদের প্রতিটি আচার-আচরণের মধ্যে বিস্ময়-রসকে অতি নিপুণভাবে সঞ্চারিত করেছেন। তবে সরাসরি বলেন নি কারও কথাই। বিস্ময়ের যবনিকাটিকে ধীরে ধীরে উন্মোচিত করেছেন। মোরোর অদ্ভুতদর্শন ভৃত্যটি প্রথম থেকেই বিরাট এক জিজ্ঞাসা নিয়ে আমাদের সামনে আবির্ভূত হয়েছে। আমরা ভেবে পাই নি, কেমনতর মানুষ সে! আমাদের ভাবনা বারবার সংশয় ও আতঙ্কের সমুদ্রে অবগাহন করেছে। কারণ, সব কিছুই আমরা দেখেছি ডক্টর মোরোর দ্বীপে নবাগত প্রেনডিক-এর চোখ দিয়ে।

প্রেনডিক তার অভিজ্ঞতার কথা ডায়েরীতে লিখে রেখেছে; এবং সন্দেহ নেই যে সে ডায়েরীর প্রতিটি অক্ষর মূর্তিমান বিভীষিকার রূপ ধরে আমাদের ভয়ে-বিস্ময়ে দিশাহারা করে। কাহিনীটি অস্বাভাবিক ও অদ্ভুত বলেই লেখক নিজে বলেন নি কোনো কথা। ডায়েরী-লেখকের এক ভাইপোকে দিয়ে সব কিছু বলিয়েছেন। ফলে অসম্ভবের কৈফিয়ৎ দেবার দায়িত্বটা ডায়েরী-লেখক প্রেনডিক ও তার ভাইপোর ওপর গিয়ে পড়েছে; এবং কাহিনীকার এইচ, জি, ওয়েল্স্ তৃতীয় ব্যক্তির ভূমিকা গ্রহণ করে অনেকটা দূরে দাঁড়াবার এবং কিছুটা দায়িত্ব-মুক্ত হবার অবকাশ পেয়েছেন।

অবশ্য এই অবকাশটুকু না থাকলেও লেখককে কোনোমতেই আমরা দোষী করতে পারতাম না। কেন না অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিটিকে তিনি যথাসম্ভব বিশ্বাসযোগ্য করেই আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। প্রেনডিক-এর বহু-বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই বিশ্বাস ক্রমে ক্রমে পাঠকদের মনে বদ্ধমূল হয়েছে নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই প্রেনডিক-এর অভিজ্ঞতা এবং বিশেষ করে নিভৃত আরণ্যক পরিবেশে রাতের আঁধারে তার অভিযান সমস্ত কাহিনীর মধ্যে এক বাস্তবের সুর অনুরণিত করেছে। তবে ডক্টর মোরো কখনই যেন ঠিক সাধারণ মানুষের পর্যায়ে নেমে আসেন নি; আগাগোড়া কিছুটা যেন অসাধারণ এবং দুর্জ্ঞেয়ই থেকে গেছেন। ফলে প্রায়-মানুষদের মতো তাঁকেও আমাদের কিছুটা সুদূরের জীব বলে মনে হয়েছে। সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছি আমরা যে জীব-জন্তুর অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের সময় তিনি এত বেশি আত্মসমাহিত যে জন্তুদের বুকফাটা আর্তনাদও তাঁকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করে না। আপনজন বলতে কেউ নেই তাঁর। বাইরের জগৎ সম্বন্ধে তাঁর কোনোপ্রকার কৌতূহল নেই। গবেষণাকে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে দেওয়াই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। তাই একটি পুমার অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের সময় প্রেনডিক-এর আগমনের কথা তিনি প্রথমটায় জানতেই পারেন নি। যখন জানলেন, তখন বড় দেরি হয়ে গেছে। প্রেনডিক রহস্য-রঙ্গমঞ্চের একটা অংশ দেখে নিয়েছেন ততক্ষণে।

এইখানে বলে রাখা দরকার, প্রেনডিক-এর এই চকিত-দর্শনের মধ্য দিয়ে মোরোর দ্বীপ ধীরে ধীরে আমাদের সামনে জীবন্ত হয়ে ওঠে। আমরা যেন ভয়ার্ত ও মুমূর্ষু পশুদের আর্তনাদ শুনতে পাই ক্ষণে ক্ষণে। স্পষ্টই উপলব্ধি করি প্রেনডিক-এর অসহায় অবস্থা। মেনে নিতে প্রস্তুত হই যে প্রতিকূল পরিবেশে রহস্য চারিদিক থেকে তাকে গ্রাস করতে চাইছে। মোরোর ওই দুঃস্বপ্ন-ঘেরা দ্বীপ থেকে এক একবার মুক্তির পথ খুঁজছে সে। কিন্তু মুক্তি কিছুতেই মিলছে না। উপরন্তু সে যেন মাকড়সার জালে পোকার মতো তিলে তিলে জড়িয়ে পড়ছে। দ্বীপে ঘুরতে বেরিয়ে অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতা অর্জন করছে প্রেনডিক। বর্বর প্রায়-মানুষদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে ধীরে ধীরে ওয়াকিবহাল হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে এক অপরাহ্নের ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রেনডিক মোরোর দ্বীপের অরণ্য দেখতে বেরিয়েছে। দ্বীপটি সম্বন্ধে কী এক দুরতিক্রম্য আকর্ষণে সে মোরোর চত্বর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। দেখতে দেখতে অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতা অর্জন করল প্রেনডিক। অরণ্য-পথ ধরে খানিকদূর এগোতেই একটা নদী চোখে পড়ল তার। বিশ্রাম নেবে বলে সে গিয়ে নদীটির তীরে বসল। এমন সময় আশ্চর্য এক দৃশ্য দেখে শিহরিত হল সে। প্রথমে বনে খস খস শব্দ উঠল একটা। তারপরেই দেখা গেল, অদ্ভুত-দর্শন একটা প্রাণী চার পায়ের উপর ভর দিয়ে নদী-বরাবর এগোচ্ছে। প্রাণীটি নদীতে নেমে এল খানিক পরেই; শুষে জল পান করতে লাগল। প্রেনডিক বিস্মিত হল ওকে দেখে। এমন অদ্ভুত-দর্শন প্রাণী জীবনে সে কোনোদিন দেখে নি। ওকে মানুষ বললে ভুল হয়। আবার পশু আখ্যা দিলেও অন্যায় করা হয়। প্রাণীটা এক-একবার দু'পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াচ্ছিল। ওর থুতনি ছিল না বললেই হয়। চোখ দু'টো ছিল অস্বাভাবিক রকম জ্বলজ্বলে। ওর পা সমগ্র দেহের তুলনায় অস্বাভাবিক ছোট। হাত দু'টোও অসম্ভব সরু সরু। অথচ পরনে মানুষের পোষাক ছিল ওর। পশুর মতো জল শুষে খাবার পর মানুষের মতোই ও কাপড় দিয়ে মুখ মুছল।

প্রেনডিক ভয়ে বিস্ময়ে দিশাহারা হল। প্রাণীটার সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় হতেই স্তম্ভিত হল সে। সে ভেবে পেল না, মানুষ কেমন করে এত বিকৃত ও বীভৎস হতে পারে। এদিকে প্রেনডিক-এর দিকে চোখ পড়ার খানিক পরেই প্রাণীটা সরে পড়ল। একবার মনে হল, নিশ্চয় কোথাও আত্মগোপন করেছে সে। সুযোগ বুঝে শত্রুর উপর লাফিয়ে পড়ার সুযোগ খুঁজছে।

এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার পর প্রেনডিক আর চুপচাপ বসে থাকতে পারল না। দারুণ আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে উঠে পড়ল। আবার নির্জন বনপথ ধরে এগোতে লাগল সে এবং এবার যে অভিজ্ঞতা অর্জন করল তা' আরও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। অরণ্যের এক জায়গায় জমাট-বাঁধা রক্ত চোখে পড়ল প্রেনডিক-এর। আর চোখে পড়ল একটি মরা খরগোস। কোনো অস্ত্র দিয়ে নয়, ধড় ছিঁড়ে জীবটিকে কে যেন নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। আততায়ীর সন্ধানে চারিপাশ বেশ ভাল করে দেখে নিল প্রেনডিক এবং একটু পরেই তার চোখে পড়ল আর এক অদ্ভুত দৃশ্য। সে অবাক হয়ে লক্ষ্য করল, একটি গাছের গুঁড়িতে তিনটি অর্ধ-পশু জাতীয় জীব বসে আছে। প্রথম দৃষ্টিতে ওদের মানুষ বলে ভ্রম হয়। কিন্তু ভাল করে তাকালেই বোঝা যায়, শুয়োরের সাথেই যেন ওদের বেশি মিল। প্রেনডিক দেখল, আপন মনে কী যেন বিড় বিড় করছে ওরা। কখনও বা উঠে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত সব অঙ্গভঙ্গী করছে।

ওই দানবদের মুখোমুখি হতেই প্রেনডিক আঁৎকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই স্থির করল সে, এবার ঘরে ফিরবে।

কিন্তু কোথায় ঘর! বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছে প্রেনডিক। মোরোর কুটিরের চত্বর থেকে সে অনেক দূরে চলে এসেছে। এদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে ক্রমেই। রাত্রির কালিমা ধীরে ধীরে অরণ্যকে আরও রহস্যময় করে তুলেছে।

প্রেনডিক অতি দ্রুত এগোল। অজানা আতঙ্কে এক-একবার থর থর কেঁপে উঠল সে। তার মনে হল, বিভীষিকা প্রতি মুহূর্তে তাকে গ্রাস করতে চাইছে। কিন্তু তবু হার মানল না প্রেনডিক্। সাহসে বুক বেঁধে পথ চলল। একবার মনে হল তার, কে যেন সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। কয়েক গজ মাত্র দূরে থেকে কে যেন অনুসরণ করছে তাকে। ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে থাকায় অনুসরণকারীর পা ছাড়া অন্য সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভালভাবে

দেখা যাচ্ছে না; কিন্তু এটুকু বেশ বোঝা যাচ্ছে, প্রেনডিক-এর পিছু পিছু চলবে বলে সে বদ্ধপরিকর। প্রেনডিক থামলে সে-ও থামে। প্রেনডিক চললে তারও চলা সুরু হয়।

এদিকে বনে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। ক্রমেই শোচনীয় হয়ে উঠল প্রেনডিক-এর অবস্থা। স্পষ্টই বুঝল সে, অর্ধ-পশুর মারাত্মক কোনো অভিসন্ধি আছে। হয়তো যে কোন মুহূর্তে সে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে জিঘাংসা চরিতার্থ করবে।

এবার মরীয়া হয়ে উঠল প্রেনডিক। পথ খুঁজে না পেয়ে সে সমুদ্রের দিকে এগোল। সঙ্গে সঙ্গে অর্ধ-পশুটিও পিছু নিল তার। প্রেনডিক বেলাভূমি ধরে মোরোর চত্বরের দিকে যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু বাধা এল অপর কয়েকটি অর্ধ-পশুর কাছ থেকে। সবাই তার পথ রোধ করে দাঁড়াল। ফল শুষে খাচ্ছিল যে অর্ধপশুটি, সে বরাবরই প্রেনডিক-এর পিছু পিছু আসছিল। এখন তার সঙ্গী হল অপর কয়েকটি অর্ধ-পশু। ওরাই খানিক আগে গুঁড়ির ওপর বসে জটলা করছিল।

ঢিল ছুঁড়ে এবং একটি অর্ধ-পশুর আঘাত সহ্য করে প্রেনডিক শেষ অবধি কেমন করে এই দারুণ বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করল, ওয়েল্‌স্ তার এক চাঞ্চল্যকর বিবরণ দিয়েছেন। ডক্টর মোরোর দ্বীপ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ প্রেনডিক-এর চোখ দিয়ে দেখবার ফলেই সমগ্র বিবরণটি মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। অর্ধ-পশুদের আচার-আচরণ সরাসরি বর্ণনা করলে মূল কাহিনী এতখানি জমে উঠত না।

কাহিনীর পরবর্তী পর্বে মোরোর দ্বীপের বিভীষিকাকে অন্য এক রূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। প্রেনডিক-এর একটি ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করে রহস্যকে জমিয়ে তোলা হয়েছে ওখানে। ধারণাটি হ'ল এই যে, ডক্টর মোরো শুধুমাত্র পশুকে মানুষে রূপান্তরের সাধনা করেন না; মানুষকেও পশুতে রূপান্তর করেন।

প্রেনডিক-এর এইরকম ধারণার যুক্তিসঙ্গত কারণ অবশ্য লেখক তুলে ধরেছেন। দেখিয়েছেন, ঘরে বসে মানুষের আর্তনাদ সে স্পষ্ট শুনেছে। গবেষণাগারে গিয়ে স্পষ্ট দেখেছে সে, ডক্টর মোরোর রক্তাপ্লুত হাত। দেখেছে, একটি পাত্রের মধ্যে তাজা লাল রক্ত আর ডক্টর মোরো দাঁড়িয়ে আছেন আচ্ছাদিত একটি দেহের সামনে। এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে নি তার যে ডক্টর মোরো মানুষের অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ করে পশুতে রূপান্তরিত করেন। মোরো ও মণ্টগোমারী বাধা দেওয়ায় এবং স্পষ্ট করে কোনো কিছু না বলায় এই সন্দেহ ক্রমেই তার মনে বদ্ধমূল হয়েছে। শেষ অবধি ধরে নিয়েছে সে যে মোরো তাকেও তার গবেষণার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করবেন। তিলে তিলে অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ করবেন তার; এবং শেষ অবধি তারও অবস্থা হবে ওই বিকৃত অর্ধ-পশুদের মতো।

এ সব কিছু ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল প্রেনডিক। স্থির করল, যেমন করে হোক এই সর্বনাশা যন্ত্রণাপুরী থেকে পালাতে হবে।

শেষ অবধি মোরোর আস্তানা ছেড়ে পালাল সে। নিরুপায় হয়ে গিয়ে আশ্রয় নিল ওই অর্ধ-পশুদেরই কুটিরে। সেখানে সাময়িকভাবে প্রেনডিক যে বর্বর জীবন-যাপন করল, ওয়েল্‌স্ তার এক শ্বাসরুদ্ধকর বর্ণনা দিয়েছেন। বলেছেন, পশুদের সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত কিছু আইন মুখস্থ করল সে; কথা কইল ওদের সঙ্গে। এইখানে বলে রাখা দরকার, ডক্টর মোরোর গবেষণা সম্বন্ধে প্রেনডিক-এর ভুল ধারণা সৃষ্টি না হলে এ চিত্রটি আমরা পেতাম না। যদি গোড়া থেকেই জানতাম আমরা যে মোরো শুধুমাত্র পশুকেই মানুষে রূপান্তরের সাধনা করেন, তবে কাহিনীর এ অংশ আমাদের কাছে এতটা আকর্ষণীয় হয়ে উঠত না। মোরোর গবেষণার ইতিকথা পরে জেনেছি আমরা। তাঁর কাছ থেকেই আমরা শুনেছি, মানুষের নয়, পশুর অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ করেন তিনি বিভিন্ন প্রকার পশুকে মানুষে রূপদানের সাধনা করেন। যাক সে কথা। মোরোর সাধনার প্রসঙ্গে পরে আসছি। আগে প্রেনডিক-এর পলায়ন-পর্বের কথা বলে রাখি।

প্রেনডিককে পালাতে দেখে চিন্তিত হলেন মোরো। মণ্টগোমারীরও দুশ্চিন্তার অবধি রইল না। সঙ্গে সঙ্গেই ছুটলেন ওঁরা। দুর্গম বনভূমি বরাবর এগোলেন। অবশেষে অনেক খোঁজাখুঁজির পর সন্ধান পাওয়া গেল প্রেনডিক-এর। কিন্তু প্রেনডিক তখন অন্য মানুষ। তার স্থির বিশ্বাস হয়ে গেছে যে মোরো ও মণ্টগোমারী ছলে-বলে-কৌশলে তাকে বন্দী করতে চান। অগত্যা অর্ধ-পশুদের সাহায্য নিলেন মোরো। অনেক কষ্টে প্রেনডিক-কে শান্ত করলেন।

কিন্তু অশান্ত হয়ে উঠল অর্ধ-পশুর দল। বন্য প্রকৃতি ওদের মধ্যে ফিরে আসতে লাগল। মণ্টগোমারীর আনা খরগোসগুলোকে নির্বিকারে হত্যা করতে লাগল ওরা। ওরা রক্তের স্বাদ পেল: এবং এর ফল দাঁড়াল ভয়াবহ। বিদ্রোহী হয়ে উঠল অর্ধ-পশুদের অনেকেই। মোরোর শাসন সম্বন্ধে ওদের যে ভয় ছিল তা ক্রমেই অবলুপ্ত হল। এমন কি যন্ত্রণা-ঘর, যে ঘরে মোরো পশুদের অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ করতেন, তার বিভীষিকা সম্বন্ধেও উদাসীন দেখা গেল অনেককেই। এক কথায় সমগ্র দ্বীপ জুড়ে মোরোর একাধিপত্য ক্রমেই সংকুচিত হয়ে এল এবং শেষ অবধি নিজের হাতে গড়া অর্ধ-মানুষদের কাছেই প্রাণ দিতে হল মোরোকে।

মোরোর পতনের মধ্য দিয়ে ওয়েল্‌স্ এক গূঢ় বক্তব্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বলে মনে হয়। মনে হয়, তিনি দেখাতে চেয়েছেন, মানুষ

দেশ সেবায় নিয়োজিত,
এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড
কলিকাতা—৫০
নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী
—ব্রাঞ্চ সমূহ—
বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর
বেজওয়াড়া শ্রীনগর গোহাটী

কোনোদিনই ভগবানের আসনে বসতে পারবে না। খুশিমাফিক জীবের আকৃতি ও প্রকৃতি বদল করার ক্ষমতা কোনোদিনই মানুষের হবে না।

মোরো দীর্ঘদিন ধরে কঠোর পরিশ্রম করেছেন। আত্মীয়-পরিজন থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ নির্বাসিত করেছেন জনপরিত্যক্ত নির্জন এক দ্বীপে। বছরের পর বছর ধরে তদ্গতচিত্তে সাধনা করেছেন। ব্যর্থতার সোপান বেয়ে ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে এগিয়েছেন। বার বার বিফল হয়েও অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের গবেষণায় হার মানেন নি তিনি। কৃত্রিম মানুষদের মধ্যে কিছুদিন পর পরই পশুর আকৃতি-প্রকৃতি ফিরে এসেছে; কিন্তু তবু তিনি পরাজয় স্বীকার করেন নি; নতুন আশায় বুক বেঁধে আবার গবেষণায় নেমেছেন। অথচ এত করেও শেষ অবধি সাধনায় সিদ্ধি হল না তাঁর। চরম ব্যর্থতা ও পরাজয়ের মধ্য দিয়ে তাঁকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হল। মোরোর এই পতন মানব-বুদ্ধির সীমানার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় আমাদের, খেয়াল অনুযায়ী জীব-সৃষ্টির পরিকল্পনা নগ্ন ঔদ্ধত্য ছাড়া কিছু নয়। খোদার ওপর খবরদারি করতে এসে মানুষ নিজের অপরিণামদর্শিতাকেই প্রমাণ করে। জীবন নিয়ে ভাঙা-গড়ার খেলা খেলতে গিয়ে চরম সর্বনাশকেই ডেকে আনে মানুষ। মোরোর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানুষের এই সর্বনাশের চিত্রটিই উদ্ঘাটিত।

নিজের গড়া প্রায়-মানুষদের হাতেই শেষ অবধি নিহত হলেন মোরো। কেমন করে হলেন, সে কথা বলি এবার। কেন না মোরোর মৃত্যুর মধ্যেই এ গ্রন্থের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডী সংগুপ্ত।

মৃত্যুর পথে ধীরে ধীরে পা বাড়ালেন ওই বিজ্ঞানী। প্রথমে নেকড়ে-মানুষ বিদ্রোহী হল। মরীয়া হয়ে সে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল মোরোর উপর। তার পরেই মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হল। মোরো ছাড়া সেখানে উপস্থিত ছিল মণ্টগোমারী, প্রেনডিক ও মোরোর অর্ধ-পশু-ভৃত্য ম্লিং। ওরা সকলেই এই দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হল। সবাই মিলে নেকড়ে-মানুষকে অনুসরণ করল তৎক্ষণাৎ। শেষ অবধি তার সন্ধানও পেল। কিন্তু নেকড়ে-মানুষ তখন মোরোর শাস্তির ভয়ে দিশাহারা। সে জানত, প্রভুর অবাধ্য হলে যন্ত্রণা-ঘরে যেতে হয়। কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হয় দিনের পর দিন ধরে। প্রেনডিক তাকে এই যন্ত্রণার হাত থেকে নাটকীয়ভাবে মুক্তি দিল। সে হঠাৎ গুলী করে হত্যা করল নেকড়ে-মানুষটিকে।

এদিকে সহবাসীর এই মৃত্যু আরণ্যক অর্ধ-পশুদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করল। দেখতে দেখতে ক্ষেপে উঠল ওদের অনেকেই। হায়েনা-শুয়োরের দৃষ্টিতে আদিম হিংস্রতা ফুটে বেরোল। বানর-মানুষ প্রতিশোধ নেবার ফিকির খুঁজতে লাগল; আর গবেষণাগার থেকে হঠাৎ ছিটকে বেরিয়ে এল সেই পুমা—যা'র অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের কাজ তখনও অবধি অর্ধসমাপ্ত। পুমার অতর্কিত আঘাতে হাত ভাঙল প্রেনডিক-এর। কিন্তু মোরো তখনও সদা-সতর্ক। রিভলভার হাতে নিয়ে আততায়ীর অনুসরণ করলেন তিনি। গহন অরণ্যের মধ্যে দানবের সঙ্গে একাকী সংগ্রাম করলেন। শেষ অবধি পুমার মৃতদেহের খুব কাছেই তাঁর অসাড় দেহটাকে পাওয়া গেল। প্রেনডিক স্পষ্টই বুঝল, নিজের গড়া বিভীষিকার জাল দিয়েই তিনি মৃত্যুকে ডেকে এনেছেন।

এদিকে ডক্টর মোরোর মৃত্যুর পর মণ্টগোমারীর অদ্ভুত এক পরিবর্তন দেখা গেল। জীবন সম্বন্ধে একেবারেই হতাশ হয়ে পড়লেন তিনি। ভেবে পেলেন না, নির্জন এই দ্বীপ ছেড়ে কোলাহল-মুখর পৃথিবীর সঙ্গে কীভাবে নতুন করে যোগসূত্র গড়ে তুলবেন।

মণ্টগোমারীর এই মানসিক অবস্থা সম্পূর্ণ মনোবিজ্ঞানসম্মত। দীর্ঘকাল ধরে মোরোর একমাত্র সহকারী ছিলেন তিনি। জীবনের একটা বিরাট অংশ মোরোর সঙ্গে তিনি কাটিয়েছেন। আশা-নিরাশায় কম্পমান তাঁর কত শত দিন প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে গড়ে-ওঠা ওই নিভৃত দ্বীপে স্বপ্নের মতো পেরিয়ে গেছে। এ ছাড়া ডক্টর মোরো তো শুধু-মাত্র তাঁরই প্রভু ছিলেন না; ছিলেন সমগ্র দ্বীপটিরও প্রভু। মোরোর দ্বীপের অধিনায়ক মোরোই। সেখানে জন্তু-জানোয়ার থেকে সুরু করে সব কিছুর ওপরেই একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল তাঁর। অর্ধ-পশুরা তাঁরই সৃষ্টি। তাঁরই নির্দেশে দ্বীপটির নিয়ম-শৃঙ্খলা ও আইন-কানুন গড়ে উঠেছিল। অর্ধ-পশুরা শুধুমাত্র তাঁকেই সমীহ করত। অতএব তাঁর অবর্তমানে যে দ্বীপটিতে অরাজকতা দেখা দেবে, একথা বুঝে নেওয়া মণ্টগোমারীর মতো বুদ্ধিমানের পক্ষে মোটেই কঠিন কাজ নয়। তাই মোরোর মৃত্যুর পর যখন এই মানুষটিকে উন্মাদের মতো মদ খেতে দেখি তখন আমরা বেদনা অনুভব করি বটে; কিন্তু বিস্মিত হই না। আমাদের মনে হয়, মদের স্রোতে তিনি যে নিরুদ্দেশের পথে ভেসে চলেছেন, সেখান থেকে ফিরে আসাটাই অস্বাভাবিক।

অবশ্য ফিরে তিনি আসেনও নি। একদিন নিজে আকণ্ঠ মদ খেয়েছেন; এবং তার পর মদ বিলিয়েছেন অর্ধ-পশুদের মধ্যে। মাতাল হয়ে বর্বরের দল আদিম পশুপ্রবৃত্তি খুঁজে পেয়েছে: আর শেষ অবধি এর পরিণতি দাঁড়িয়েছে ভয়ানক। নিজেদের মধ্যে মারামারি সুরু করেছে ওরা; মরেছে শেষ পর্যন্ত; এবং মণ্টগোমারীকেও মেরেছে।

ভয়ঙ্কর ওই মারণ-যজ্ঞের মধ্য থেকে বেঁচেছে শুধু প্রেনডিকই। মোরোর দ্বীপের বিভীষিকাকে দিনের পর দিন ধরে সে প্রত্যক্ষ করেছে। মণ্টগোমারীর মৃত্যুর পর বাধ্য হয়েই অর্ধ-পশুদের সঙ্গে কয়েকমাস ঘরও করেছে সে। মোরো-বিহীন মোরোর দ্বীপে প্রেনডিক-এর সেই জীবনযাত্রার এক মর্মস্পর্শী চিত্র তুলে ধরেছেন ওয়েল্স্। দেখিয়েছেন, বাঁচার জন্যে প্রতিটি মুহূর্ত কী নিদারুণ মূল্য দিয়ে তাকে উপার্জন করতে হচ্ছে। হিংস্র অর্ধ-পশুদের নির্মমভাবে হত্যা করেছে প্রেনডিক। কিন্তু কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারে নি। কেন না যারা বেঁচেছিল, তাদের মধ্যেও অতি দ্রুত ফিরে আসছিল পশুদের প্রবৃত্তি। এ ছাড়া তাদের চেহারার মধ্য দিয়েও পাশবিক লক্ষণ প্রকট হয়ে উঠছিল। অবশেষে ওই হিংস্র অর্ধ-পশুদের নাগপাশ থেকে কেমন করে প্রেনডিক মুক্তি পেল, তার এক চমকপ্রদ বিবরণ দিয়েছেন ওয়েল্স্। বলেছেন, নিরুদ্দিষ্ট জাহাজ 'ইপিক্যাকুয়ানা'র লাইফ-বোটে করে একদিন সমুদ্রের বুকে ভেসে পড়ল সে। তারপর এক স্যানফ্রানসিস্কো-যাত্রী জাহাজ তাকে উদ্ধার করল।

কিন্তু উদ্ধারের পর কেউ বিশ্বাস করল না প্রেনডিক-এর কথা। আর প্রেনডিকও আগের চেনা-জানা পৃথিবীকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। প্রতি মুহূর্তে মনে হ'ত তার, যে মানুষরা তার চোখের সামনে ঘোরাঘুরি করছে, যে কোনো দিন ওদের মধ্যে পশুপ্রবৃত্তি জেগে উঠতে পারে। মোরোর দ্বীপের অর্ধ-পশুদের মতোই ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে ওরা। সংক্ষিপ্ত হলেও প্রেনডিক-এর এই চিত্তবিকারের অধ্যায়টি আমাদের মুগ্ধ করে। আমাদের মনে হয়, যে দুঃস্বপ্ন সে মোরোর দ্বীপে দেখেছে, তা' ভুলে যাওয়া সত্যই কঠিন।

দ্বীপটিকে ভোলা কঠিন আমাদের পক্ষেও। আমরা 'দি আইল্যাণ্ড অব্ ডক্টর মোরো' পড়তে পড়তে ভাবি, আশ্চর্য এক দেশ এটি। অদ্ভুত সব জীবজন্তুর বাস এখানে। ঠিক মানুষ নয় ওরা; অথচ মানুষের ঢঙ্-এ ওরা কথা কয়। দেখতে দেখতে আদিম হিংস্রতা জেগে ওঠে ওদের মধ্যে। পশুর প্রবৃত্তি ক্রমেই ওদের বর্বর করে তোলে। বর্বররা নির্মূল হয় শেষ অবধি। কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায়, প্রাগৈতিহাসিক পশুপ্রবৃত্তিকে বিসর্জন দিয়ে মানুষ সত্যি কি কোনোদিন দেবতা হয়ে উঠবে? না কি পাশবিক জিঘাংসাই আবার অঙ্কুরিত হবে ওদের মধ্যে?

গ্রাম বাঙলার কথা

■ দশঘরা
আদিকথা ■

এক যে ছিল রাজা। তার হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, ভান্ডারে মণি-মাণিক্য অমূল্য রতন। তারপরে একদিন এক রাতে কোথা থেকে এল রাক্ষসের দল। রাজপুরীশুদ্ধ সবাইকে মেরে কেটে খেয়ে-দেয়ে রেখে গেল শুধু রক্ত, হাড় আর কঙ্কালের স্তূপ। সকালবেলা উঠে রাজ্যের লোক দেখলো— ফুল আর ফোটে না, পাখী আর ডাকে না, রাজপুরীতে জন নেই, মনিষ্যি নেই, সব শূন্য, নিঝুম খাঁ-খাঁ—

রূপকথার গল্প। কিন্তু দশঘরায় পাল রাজবংশ সম্বন্ধে যে আবছা ইতিহাসের আভাষটুকু পাওয়া যায়, প্রমাণহীন, দলিলহীন পূর্বাপর সূত্রবিহীন সে কাহিনীও প্রায় এই রকম এক রূপকথারই পর্যায়ে গিয়ে পৌঁচেছে আজ। সে কাহিনী এইরকম—

রাজা আদিশূরের আমন্ত্রণে কৌলিন্য প্রথা প্রতিষ্ঠাকল্পে কান্যকুব্জ থেকে বাংলায় এসেছিলেন যাঁরা, আব পাল বা আরব পালও তাঁদেরই অন্যতম। ভাগীরথীর ওপারে দেবগ্রামে তাঁর বসবাস ছিল।

আব পালের দুই পুত্র—দেবন ও নারায়ণ। দেবন দেবগ্রামে এবং নারায়ণ তন্দ্রশালে রাজত্ব করতেন। নারায়ণের এক পুত্রের নাম শ্রীকৃষ্ণ।

বক্তিয়ার খিলিজীর বাংলা অধিকারের পর অত্যাচারের একটি স্রোত বইতে থাকে সারা বাংলা দেশে। দেবগ্রাম ধ্বংস হয়, শ্রীকৃষ্ণ তন্দ্রশাল ছেড়ে চলে আসেন জোড়গ্রামে এবং উপযুক্ত বোধে

পারুল ভট্টাচার্য

দশঘরাতে স্থাপিত করেন তাঁর নতুন রাজধানী। আগে এর নাম ছিল শ্রীপুর। নিজ নামে শ্রীকৃষ্ণ নামাঙ্কিত করেন শ্রীকৃষ্ণপুর। সেই স্মৃতি বহন করে শ্রীকৃষ্ণপুর নামে একটি মৌজা আজও বর্তমান রয়েছে দশঘরায়। দশঘরা অনেক আধুনিককালের নামকরণ।

তারপরের ইতিবৃত্ত আবার অস্পষ্ট। ছেঁড়া সুতো জোড়া লাগানো যায় শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র বিদ্যাধরের কালে। এই সব এলাকায় তখন বিশৃঙ্খলা ছিল। জলদস্যু আর হামলাদারদের উৎপাত ছিল। অরণ্য এবং অকর্ষিত জমির পরিমাণও ছিল অনেক। বিদ্যাধর শাসনকার্যে দক্ষতা দেখালেন। বন কাটালেন, বসত বাড়ালেন, শ্বাপদ আর সরীসৃপ অধ্যুষিত অরণ্যময় অঞ্চলগুলিকে উদ্ধার করে মানুষের বাসোপযোগী করে তুললেন। বিমলা ও জলাঙ্গী (বর্তমান কানা দামোদর ও কানা নদীর মজা খাল) থেকে পরিখা কেটে সুরক্ষিত করলেন শ্রীকৃষ্ণপুর এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যা করলেন, তা হলো—দেশের যত হাড়ী, বাউরী, বাগদী, ডোম প্রভৃতি ব্রাত্য সম্প্রদায়কে একত্র করে তাদের যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়ে সংহত ঐক্যবন্ধ শক্তিশালী একটি সৈন্যদলে পরিণত করে তুললেন দীর্ঘদিনের অক্লান্ত চেষ্টায়।

বাংলার শাসনভার তখন নাসিরুদ্দীনের হাতে। তিনি এই উদ্যোগী ও অক্লান্তকর্মী যুবকের দক্ষতার পরিচয় পেয়ে প্রীত হলেন। এবং নবাব দরবার থেকে "চৌধুরীরাজা" উপাধি, বহু জায়গীর ও চারশত পাঠান ফৌজ রাখবার অনুমতি দিয়ে সম্মানিত করলেন বিদ্যাধরকে। পাল বংশ এই সময় থেকে পুরোপুরি রাজা

বিশ্বাসবাড়ির গোপীনাথ জিউর রাসমঞ্চ

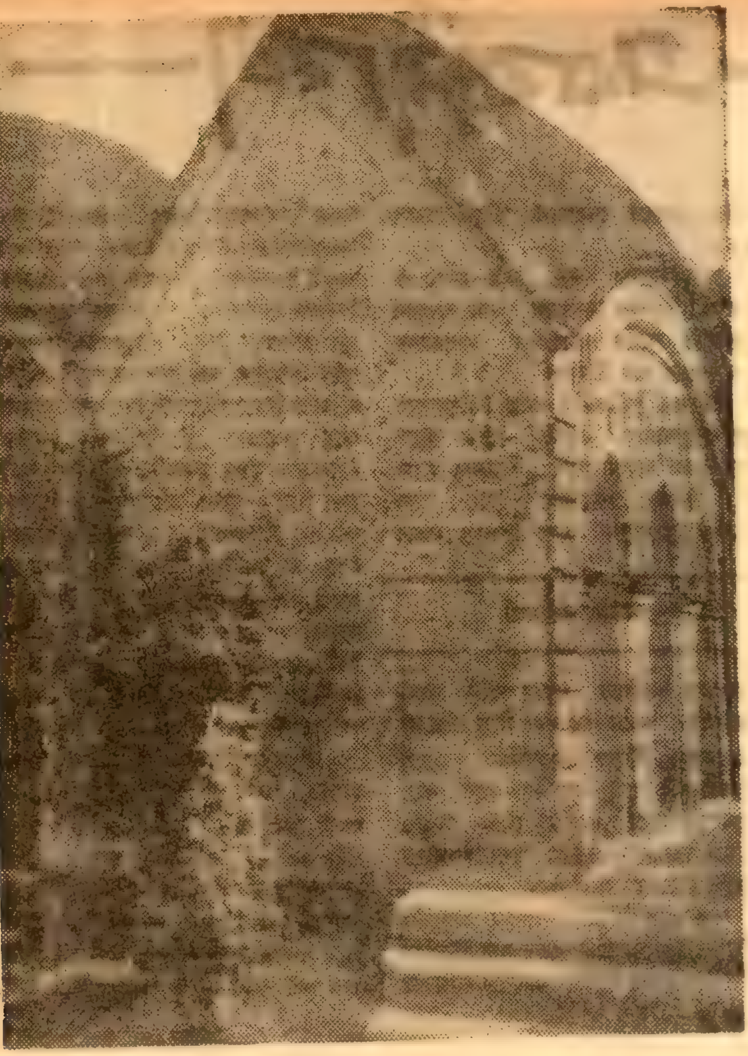

পালচৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠিতা বিশালাক্ষী দেবীর জোড়বাংলা মন্দির ও সংলগ্ন শিবমন্দিরের একাংশ।

হলেন এবং 'সেঙ্গাই-বেঙ্গাই' রাজা নামে পরিচিত হলেন সারা বাংলা দেশে, দ্বারদুয়ারীর রাজা বলেও খ্যাতি ছিল এ'দের।

কয়েক পুরুষ পর্যন্ত পাল বংশ শ্রীকৃষ্ণপুরে নবাবের ঘাঁটিরক্ষক সামন্ত-রূপেই স্বীকৃত ছিলেন। কিন্তু বিদ্যাধরের নবম পুরুষে সীতারাম পালচৌধুরীর পুত্র দয়ারাম পালচৌধুরী নবাব মুর্শিদ-কুলী খাঁর দরবারে দেওয়ানের পদ গ্রহণ করেন। পাল বংশে চাকুরিবৃত্তির এই শুরু। দয়ারাম পালচৌধুরী খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। তৎকালীন বাংলার সমাজ সমীকরণ প্রসঙ্গে বিশ্বকোষ এবং শব্দ-কল্পদ্রুমে এক দয়ারাম পালের নাম পাওয়া যায়। সম্ভবত তিনিই ইনি। শব্দকল্পদ্রুমে আছে—"ততঃ ষোড়শ পর্যায়ে দাসজাল কুলিনালীমান দয়ারাম পাল..."। বিশ্বকোষে আছে ১৬শ পর্যায়ে দয়ারাম পাল, ১৭শ পর্যায়ে তৎপুত্র রামভদ্র পাল ও ১৮শ পর্যায়ে তৎপুত্র ও সামাজিক ইতিহাসে ১৮শ পর্যায়ে তৎপুত্র স্থানে কিংকর সেন।"

দয়ারামের পুত্র রামভদ্র. রামভদ্রের পুত্র লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ সপ্ত-গ্রামের নবাব সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। এই সময় আকস্মিক কোন এক বহিরাক্রমণে দশঘরার উপর দিয়ে এক মহা সংকটের স্রোত বয়ে যায়। অতর্কিত আক্রমণে লক্ষ্মণ নিহত হন। আসন্নপ্রসবা রাজপত্নীকে নিয়ে কনিষ্ঠ নারায়ণ পালিয়ে গেলেন বিমলার ওপারে বুড়ো হজরতের আস্তানায়। সেখান থেকে মেদিনীপুর জেলার ধারেন্দা গ্রামে। ধারেন্দাতেই তিনি স্থিতিশীল হন। নবাব আলিবর্দীর প্রসাদে কিছু জায়গীর ও রাজা উপাধিও লাভ করেন। নিজ নামে নারায়ণপুর এবং ভ্রাতুষ্পুত্র মহেশ্বরের নামে মহেশপুর গ্রামও স্থাপনা করেন বলে জানা যায়।

মেদিনীপুর জেলার ধারেন্দা গ্রামে দশঘরার 'সেঙ্গাই-বেঙ্গাই' রাজকুলের অস্তিত্ব মেদিনীপুরের ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু স্বীকার করেছেন। তাঁর বিবরণ অনুযায়ী মুসলমান রাজ-কর্মচারীদের অত্যাচারেই নারায়ণ দশঘরা ত্যাগ করেছিলেন।

আক্রমণ একটা হয়েছিল। অত্যাচারও যে হয় নি এমন নয়। কিন্তু আশ্চর্য এই—যে কারাই বা এই আক্রমণকারী এবং আক্রমণের কারণই বা কী—সে সম্বন্ধে সন্তোষজনক বিবরণ তো দূরের কথা আবছা আভাষও কিছু পাওয়া যায় না। একে মুসলমান আক্রমণ বলা যাবে না। কারণ কোন দেবমন্দির ধ্বংস হয় নি বা ধর্মান্তরিতকরণও হয় নি। রাজকর্মচারী-দের অত্যাচার বলতেও অসুবিধা আছে। কারণ দশঘরার পালেরা নবাবেরই আশ্রিত অনুগৃহীত ও বংশপরম্পরায় অনুগত সামন্ত পরিবার।

শোভা সিংহের অত্যাচার হতে পারে। মেদিনীপুরের বিদ্রোহী জমিদার শোভা সিংহ এবং তাঁর মৃত্যুর পর ভ্রাতা হিম্মৎ সিংহের উন্মত্ত রক্ততাণ্ডবের কথা ইতিহাসে বিদিত। দশঘরার মত ছোট জনপদ সে তাণ্ডবের মুখে পড়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়।

বর্গীর হাঙ্গামাও হওয়া অসম্ভব নয়। যদিও সৈয়দ মুতাক্ষরীণে-এর কোনও উল্লেখ নেই; তথাপি ভাস্কর পণ্ডিতের পরবর্তী বর্গী দল-নায়ক রঘুজী ভোঁসলের পুত্র জ্ঞানজী মেদিনী-পুর থেকে এই পথেই কাটোয়া গিয়েছিলেন। এবং যাবার সময়—পথে দু'ধারে হত্যা, রক্ত আর মৃত্যুর বিভীষিকা ছড়াতে ছড়াতে যাওয়া বর্গীদের প্রায় অভ্যাসই ছিল বলতে হবে।

আকস্মিক আক্রমণে বিমূঢ় দশঘরা-বাসী দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন সেই সময়। ২৪ পরগনার দেউলি গ্রামের পাল বংশের আদিপুরুষ জগন্নাথ পালের এক লিখিত বিবরণীতে জানা যায় বর্গী হাঙ্গামাতেই তিনি দশঘরা ছেড়ে দেউলিতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাই মানতে হলে সোজাসুজি বর্গী আক্রমণের কথা মেনে নেওয়াই ভাল।

এই হল কাহিনী। এতে ইতিহাসের গন্ধ আছে। আবছা একটা আস্বাদও পাওয়া যায়। কিন্তু শক্ত করে পা রেখে দাঁড়াবার মত জমি কিছু নেই। প্রমাণযোগ্য ইতিহাস যা পাওয়া যাচ্ছে সে রাজা রামনারায়ণের কাল থেকে। সেঙ্গাই-বেঙ্গাই পরিচয় অন্তর্হিত হয়েছে তখন। এ'রা তখন বারদুয়ারী রাজা। শ্রীকৃষ্ণপুরও ততদিনে পরিণত হয়েছে দশঘরায়। শ্রীকৃষ্ণপুর, জাড়গ্রাম, দিঘীর,

আগলাপুর, শ্রীরামপুর, ইছাপুর, গোপী-নগর, গণেশনগর, পাড়াম্বো আর নলখোবা—এই দশখানি গ্রাম নিয়ে দশ-ঘরা।

দশঘরায় বিশ্বাস এবং বসু বংশের আগমনকাল প্রায় সমসাময়িক। বিশ্বাসরা তাঁদের আগমনকাল পাঁচ শত বৎসর বলে থাকেন, কিন্তু মনে হয় এ হিসাব ঠিক নয়। কেন তা পরে বলছি।

রাজা রামনারায়ণ অপুত্রক ছিলেন। তিন কন্যা—গোপী, ইছামতী ও রাজলক্ষ্মী। গোপী ও ইছামতীর সঙ্গে যথাক্রমে মাহীনগর বসু সমাজের শ্রীরাঘবেন্দ্র মল্লিক, আর আন্দুলিয়া সমাজে শ্রীগোপীকান্তের বিবাহ হয়। এবং—গোপীনগর ও ইছাপুর গ্রাম যৌতুক-স্বরূপ দান করেন রাজা। রাজলক্ষ্মী সবচেয়ে ছোট এবং সবচেয়ে আদরেরও। তাঁর বিবাহ দিয়ে দশঘরাতেই বসত করালেন রাজা। বসু বংশের প্রথম পুরুষ দশরথ বসু। ঊনবিংশতম পুরুষ মথুরানাথ বসু। এই মথুরানাথের সঙ্গেই রাজলক্ষ্মীর বিবাহ হয়। এবং রাজসম্পত্তির ভাবী উত্তরাধিকারী হয়ে তালুকদার বসু পরিচয়ে দশঘরাতেই বাস করতে থাকেন মথুরানাথ।

বিশ্বাস বংশে শ্রীগরুড়নারায়ণদেব বিশ্বাস ত্রয়োদশ পুরুষ। এঁরা শাণ্ডিল্য গোত্রীয়। আদিবাস ছিল উড়িষ্যার স্বর্ণপুরে। রাজা রামনারায়ণের মন্ত্রী-পদ লাভ করে এই বংশের ঊনবিংশতম পুরুষ—শ্রীজগমোহন দেববিশ্বাস। আপন কুলপুরোহিত অধিকারী বংশসহ দশঘরায় আসেন। এই বিবরণ অনুযায়ী মথুরা-নাথ বসু এবং জগমোহন বিশ্বাস উভয়েরই আগমন রাজা রামনারায়ণেরই কালে। বসু বংশের বাইশতম পুরুষ অর্থাৎ মথুরানাথের পরবর্তী তৃতীয় পুরুষ শ্রীবাঞ্ছারাম বসুর স্বাক্ষরিত এক-খানি দলিল পাওয়া গেছে। দলিলখানির রচনাকাল বাংলা ১১৬১ সনের ১৭ই আশ্বিন। অর্থাৎ আজ থেকে ২১২ বছর আগেকার কথা। মথুরানাথের আরও তিন পুরুষ পূর্বে (অর্থাৎ আরও ১০০ বছর—মোট ৩১২ বছর) খুব বেশি করে ধরলেও ৩৫০ বছরের বেশি হয় না। ৫০০ বছরের কথা উপকাহিনী মাত্র।

এই তালুকদার বসু পরিবার আজও আছেন এবং দশঘরার সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক উঠে যায় নি।

রাজা রামনারায়ণের মৃত্যুর পর এই বসু বংশই দশঘরায় প্রধান এবং রাজ-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। কিন্তু রাজা উপাধি ধারণ করেন নি তাঁরা।

মন্ত্রী জগমোহন দেববিশ্বাসের পুত্র রামমোহন মন্ত্রীই ছিলেন। তারপরেই

দশঘরা বিপিনকৃষ্ণ রায়ের প্রাসাদ সংলগ্ন ঘড়ি-ঘর

পট পরিবর্তন। জমিদারীর মালিক বদল হল। রাজা রাজ্য হারালেন। (কেন—সে কারণ অজ্ঞাত)। এবং সেই সব মহল ও এলাকা বর্ধমান রাজার কাছ থেকে ইজারা নিতে লাগলেন রামমোহন পুত্র রামনারায়ণ। এমন ঘটনা ইতিহাসে বিরল নয়। দেওয়ান, নায়েব, মন্ত্রী শাস্ত্রী সেনাপতিদের ষড়যন্ত্র-কুটিলতা এবং আভ্যন্তরীণ চক্রান্তজাল বিস্তারের নজীর আছে বিস্তর। ছোটখাটো জমিদারীর হাতবদল হওয়া তো মামুলি কথা। রাজার রাজ্য চলে যায়, সম্রাটের সাম্রাজ্য টলমল করে এই সব ঘটনার ঘায়ে। তবে এক্ষেত্রে এরকম কিছু ঘটেছিল কি না বলা যাবে না। কারণ প্রমাণ কিছু নেই। কি কারণে রাজবংশের উত্তরাধিকারীরা রাজত্ব হারালেন তা আজও রহস্যাবৃত।

যাই হোক দশঘরায় পালচৌধুরী রাজবংশের অন্তগমনের পর দশঘরার ইতিহাস আর বারদুয়ারীর রাজাদের ইতি-হাস রইলো না। এখন থেকে সামগ্রিক-ভাবেই তা বিশ্বাসদের ইতিহাস, সে ইতিহাস ভালোয়-মন্দয় আলোয়-আঁধারে খচিত উজ্জ্বল বিচিত্র বর্ণাঢ্য। পাল-চৌধুরীদের কথা এখানেই শেষ। একটি অধ্যায়ের অবসান, একটি অনুচ্ছেদ-এর ইতি। এঁরা আমলাতান্ত্রিক বৃটিশ রাজের উপাধিভূষিত নামে মাত্র রাজা ছিলেন না। প্রকৃত রাজা, রাজা অর্থেই এঁরা রাজা ছিলেন। পরিত্যক্ত জঙ্গলাকীর্ণ ভূখণ্ডে নব জনপদ পত্তন, খণ্ডচ্ছিন্ন শক্তিশালীকে একত্রিত করে একটি সুদৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তোলা, বাহুবলে দুর্জন দমন, দুর্বলের বল বিধানের সঙ্গে সঙ্গে একটি সভ্যতার সৃষ্টি, একটি সমাজের পালনও এঁরা করেছেন। দশঘরার ঘোষ, বসু, রায়, বিশ্বাস, সিংহ, চৌধুরী প্রভৃতি বংশগুলিকে পালচৌধুরীরাই এনে বস-বাস করিয়েছিলেন। এঁরা শুধু ধনে আর মানে নয়, কুলে এবং শীলেও

উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন গ্রামখানিকে। বসু ও বিশ্বাস বংশের কথা বলেছি। রায় বংশে শ্রীবিপিনকৃষ্ণ রায় সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন। অসাধারণ ধনী এবং অপরিমিত দানশীল। ঘোষেরাও প্রাচীন ও প্রতিষ্ঠিত। আর এক বসুবংশের শ্রীকৈলাসচন্দ্র বসু তুলোট—অর্থাৎ তুলাদণ্ডের এক পাল্লায় নিজে বসে অপর পাল্লায় নিজ ওজনের সমপরিমাণ সোনা, রূপা, মণি-মাণিক্য দান করেছিলেন, সেই সঙ্গে উপযুক্ত মত হাতী, ঘোড়া উট, পাল্কী প্রভৃতি যান ও বাহন। তুলোট সম্বন্ধে কিংবদন্তী এই যে ব্যক্তি তুলোট করেন তিনি সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। বাংলাদেশে দুটি তুলোটের ইতিহাস তো অন্তত প্রবাদটিকে সর্বথা সমর্থন করে। একটি করিয়েছিলেন তারকেশ্বরের মোহান্ত মাধবগিরি। তাঁর ধ্বংসের ইতিহাস বিদিত। অপরটি এই কৈলাস বসু, ইনিও বিনষ্টই হয়ে গেছেন।

ব্যবসা-বাণিজ্যেও অবদান ছিল দশঘরার। আধুনিককালে শ্রীবিপিনকৃষ্ণ রায়ের নাম বলেছি। আরও আগে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলের কালে ধনপতি সওদাগরের পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে উজানিতে যতো সওদাগরের আগমন ঘটেছিল তার মধ্যে দশঘরার বাসুনা ও জাড়গ্রামের রঘু দত্তের নাম পাওয়া যায়।

রাজা নেই। রাজত্বও বিগত, শুধু স্মৃতি পড়ে আছে। দশঘরার বিখ্যাত পঞ্চানন শিব এই রাজবংশেরই কুলদেবতা। দেবী বিশালাক্ষী আর বুড়ো শিব তাঁদেরই প্রতিষ্ঠিত। আর আছে রূপকথার মতো কিছু কথা আর কাহিনী। মুখে মুখে প্রচারিত, কানে কানে শোনা। যার অনেকটাই হয়তো সত্য নয়। অনেকখানিই হয়তো মানুষের মানসে ফেনানো কল্পনার রঙিন স্তবক।

আর পড়ে আছে অভিশপ্ত মাধবপুরের পড়া, কেষ্টরামপুরের জলা, বারদুয়ারীর ভিটে, আর কানা দামোদরের ওপারে নলদহ-দিঘীড়ায় বুড়ো হজরতের আস্তানা। বিপদের রাতে অসহায় সদ্য বিধবা রাজমহিষীকে নিয়ে ওইখানেই আশ্রয় নিয়েছিলেন নারায়ণ।

বারদুয়ারীর ভিটে আজ আর ভিটে নেই। নূতন হাতের ছোঁওয়ায় আর হলের কর্ষণে, ফসলের সোনা স্বপ্ন হয়ে হাসছে সেখানে। মাধবপুরের পড়ায় মানুষ বসতি হয় নি আজও। এইখানেই রাজা লক্ষ্মণের পাঠান ফৌজের কুচকাওয়াজের স্থান ছিল শোনা যায়। আক্রমণকালে শত্রুসৈন্যের শিবিরও স্থাপিত হয়েছিল এখানেই। কেষ্টরামপুরের জলা অভিশপ্ত, গরু বাছুরও না কি চরতে চায় না এখানে। তবে সেটা কতটা অভিশাপভীতিতে, আর কতটাই বা জলজ জলবিহারী কেউটে সাপের ভয়ে তা বলা শক্ত। এই শেষা হেমন্তের গা-শিরশির শীতেও দুটি-একটি সর্পের সাক্ষাতের স্মৃতি স্মরণে থাকবে আমার।

বাংলা তথা ভারতবর্ষের এইসব অখ্যাত গ্রামগুলি শুধু মাত্র ছোট ছোট জনপদই নয়, এদের অতীত খুঁড়লে ইতিহাসের অনেক ছিন্নপত্রও আবিষ্কৃত হবে। আর সেই খণ্ড-ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অংশ জোড়া দিয়েই রচিত হবে ইতিহাস। ফরমায়েসী হুকুম দিয়ে লেখান নকল ইতিহাস নয়, দেশ তথা জাতির সত্যকারের ইতিহাস। অনেক আবর্তন বিবর্তন, পতন আর অভ্যুত্থানের বিচিত্র প্রমাণে যার ভিত্তি।

দশঘরার আশে-পাশে অনেক স্তূপ, অনেক ভিটে, অনেক পড়া দেখেছি। অনেক জলাশয় দেখে মনে হয়েছে এগুলি বোধ হয় কোনোকালে কোনো গড়খাইয়ের অংশ ছিল। ভিটেগুলি পুরনো, স্তূপগুলিতে কালজীর্ণ বিবর্ণতা। এইসব স্তূপ ভিটে পড়া আর আস্তনা নিয়ে খোঁজতল্লাস কিছু হয় নি, হয়তো হবেও না কোনোদিন। তাই ইতিহাস যদি কিছু থেকেও থাকে সমাধিস্থই হয়ে থাকবে জলে জলায় জঙ্গলে আর দিনে দিনে জমতে থাকা মাটির পুরু আস্তরণের তলায়। গজাবে গাছ, মাটি ফুঁড়ে ওঠা বন্য কণ্টকগুল্মে ফুটবে নাম না জানা ফুল। অচেনা পাখীর কিচিমিচি কলস্বরে, ভোরের উষার, আর সূর্যাস্তের রাঙা রংয়ে থর থর করে কাঁপবে একটি প্রাণস্পন্দন, নবতর জীবনের আহ্বানে।

তারপর কবে কোন প্রসন্ন প্রভাতে আসবে নূতন মানুষের দল। নবীন অভিযাত্রী। কুমারী মাটিতে কঠিন কোদালের কোপ বসিয়ে শুরু করবে নব ইতিহাসের। সে ইতিহাস আগামী কালের।*

ব্যাণ্ডেল চার্চ গেট

*পরের বারে দশঘরা উত্তরকথা।

(আলোকচিত্র লেখিকা কর্তৃক গৃহীত। প্রবন্ধ রচনায় নানা তথ্য সরবরাহ করে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন তালুকদার বসু পরিবারের শ্রী এস, বসু এবং দশঘরা উচ্চ বিদ্যালয় শতবর্ষ পত্রিকাগোষ্ঠী)।

দিল্লী থেকে

শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

দিল্লীর রাজ চিকিৎসক হকিম মুমিনা। দেশেবিদেশে তাঁর নাম। হিন্দুস্থানের ঘরে ঘরে তাঁর প্রতিপত্তি। যেন মর্তের অশ্বিনীকুমার। সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী।

তিন সপ্তাহ চিকিৎসার পরই তিনি সম্রাটকে জানিয়েছিলেন ভয়ে ভয়ে জাহান্ আরার জীবনরক্ষা তাঁর শক্তির বাইরে। এদিকে গুলরুখ মারা গেছে। কি উপায়?

শুনে সম্রাট মাথার মুকুট খুলে ফেলেছিলেন; মূর্ছা যান নি শুধু আপন মনঃশক্তির বলে। মাথার মুকুট খুলে, না দেখা খোদাতালার উদ্দেশ্যে শুধু জানাতে লাগলেন বাথ সেলাম। যেন সর্বত্যাগী যোগীবর। আপনমনেও হার মানান তপস্যার গভীরতায়। কি অকৃত্রিম সমর্পণ!

কদিন থেকেই সম্রাট আপন ভান্ডার থেকে দীন-দরিদ্রদের অর্থদানের আয়োজন করেছেন। মোল্লা-মৌলভীর দল পবিত্র কোর্ আন্ শরীফ আবৃত্তি করে চলেছেন সম্রাট-কন্যার জীবনরক্ষার আকুল প্রার্থনায়। ব্রাহ্মণরা করে চলেছেন অখণ্ড বেদপাঠ।

প্রতিটি দিন সম্রাট সহস্র স্বর্ণমুদ্রা রেখে দিচ্ছেন জাহান্ আরার মাথার নিচে। শুধু রাতটা কাটলেই প্রভাতে দরিদ্রদের ভিতর বিতরিত হবে এ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা।

কিছু চাই না। জীবনে বহু যুদ্ধে যে পরমেশ্বর তাঁকে করেছেন বিজয়ী, তাঁর কাছে শুধু একটি নিবেদন—প্রিয় দুহিতার প্রাণভিক্ষা।

নতুন হুকুম হয়েছে সম্রাটের।

রাজ্যে যত কারাগারে যে শত সহস্র অপরাধী রয়েছে সবার অবিলম্বে মুক্তি। তাদের কাছে শুধু একটি অনুরোধ। তারা যেন দীন দুনিয়ার মালিকের কাছে তাঁর দীন আর্জিটুকু পেশ করে দেয়। তারা যেন জাহান্ আরার নিরাময় প্রার্থনাটুকু জানায়।

কোথায় গেল সম্রাটের সেই ব্যাঘ্র-বিক্রম?

শাজাহানের এ ফকীর বেশ কেউ কখনও দেখে নি। একটা দুটো দিন নয়। দীর্ঘ চার মাস যেন তাঁর পবিত্র রমজানব্রত।

ভিখারীর দল প্রাণ ভরে আশীর্বাদ জানায় সম্রাট-নন্দিনীর জীবনকামনা। মন্দিরের কাঁসর ঘন্টাধ্বনির সাথে মিলিত হলো মসজিদের পূত আজান—একই প্রার্থনা।

জাহান্ আরা নির্বাক নয়নে এতক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন দরিয়া বেগমের দিকে। এ যেন স্বপ্ন। কেন তার জীবনের জন্য এ অকারণ আকুতি? কি প্রয়োজন এ জীবনে? যে দীর্ঘ জীবনপথে একটা জীবনসাথী নেবার শক্তিটুকুও নেই সে জীবনের তাৎপর্য কি? সে জীবনের মূল্য কতটুকু?

হকিম মুমিনা প্রতিদিন এসে দেখে যান জাহান্ আরাকে। হুকুম হয়েছে তাঁর ওপর। নিজে সারাতে না পারলেও যাঁরা এগিয়ে এসেছেন সারাতে তাঁদের তত্ত্বাবধান, তাঁদের দেখাশুনো, পরামর্শের ভার হকিমের ওপর।

সম্রাট তখনও প্রার্থনারত। সারাটি রজনী চোখের পলক পড়ে নি। শুধু প্রার্থনায় কেটেছে বিনিদ্র দীর্ঘ রজনী। ঊষার আজান সেরে নতজানু হয়ে দীর্ঘ আদাব পেশ করছিলেন খোদাতালাকে।

মরিয়ম, দরিয়া বেগম দাঁড়িয়েছিল জাহান্ আরার শয্যা পাশে।

হকিম মুমিনা সম্রাট-দুহিতার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। সরল শুভ্র সৌম্য কান্তি। প্রশান্ত নয়ন—যেন মেঘবিহীন স্নিগ্ধ নির্মল আকাশের নীলিমা। উপস্থিতিতেই স্নেহের ঝর্ণা-ধারা। হকিম যে শুধু হকিম নন। তিনি যে জ্ঞানবৃদ্ধ তাপস।

কোথায় সেই হকিম? নতুন হকিম? যে কদিন থেকে মরিয়মের সেবা করেছে?

বোর্খার অন্তরালে দরিয়া বেগম জবাব দেন, হুজুর, সে হকিম নয়। নাজীর। কিংকর। হাবশী। তার নাম আরিফ। কে জানে কি ওষুধ দিয়েছে সে মেহেরবান খোদাতালার অসীম কৃপায় গত রাত বাদশা বেগমের শান্তিপূর্ণ ঘুম হয়েছে বহু রাত পরে। মনে হচ্ছে যেন তিনি অনেকখানি সুস্থ।

হকিম মুমিনা বললেন, "সেই কথাটুকুই জাঁহাপনাকে পেশ করে যেতে চাই। সত্যি খোদাতালা অশেষ মেহেরবান। বেগমসাহেবার জীবন এখন বিপন্মুক্ত। জ্ঞান ফিরে এলে তাঁকে কবার শুধু 'বিসমিল্লা রহমান রহিম' মন্ত্র শুনিয়ে দিয়ো। একটু শক্তি পেলে তিনি নিজেই এ মন্ত্র আবৃত্তি করতে পারবেন। অসাধারণ বুদ্ধিমতী সম্রাট-দুহিতা নিজেই জানেন এ মন্ত্রের শক্তি অপরিসীম। কার ভাগ্যে এ জীবন ফিরে এলো জাঁহাপনা নিজেই অনুভব করবেন। আমি আজ সত্যিই নিশ্চিন্ত। একবার সেই বিদেশী হকিমটিকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। কি নাম বললে? আরিফ? নতুন হকিমের নাম" আরিফ?

দরিয়া মুমিনাকে সংশোধন করে বলে, "আজ্ঞে না হুজুর সে হকিম নয়। অতি সাধারণ হাবশী। কিংকর আরিফ।"

"তা হোক। সে আমাদের হার মানিয়েছে। আজ সে হিন্দুস্থানের শ্রেষ্ঠ হকিম। তার তুলনা শুধু সেই।"

ঘরে ঘরে আজ শুধু একই আলোচনা। আরিফকে সম্রাট এবার কি পুরস্কার দেবেন সেইটেই হবে একটা দেখবার জিনিস।

জাহান্ আরা বলে দিয়েছেন মরিয়ম, দরিয়াবেগমদের হাসতে হাসতে আরিফকে খুশি করতে তিনি বা সম্রাট কোনো কৃপণতা করবেন না। এমন কি হাসতে হাসতে এও বলেছেন জাহান্ আরা, "জানিস দরিয়া ও কি চাইবে?"

হেসে দরিয়া জিজ্ঞাসা করেছিল, "কি চাইবে ও বেগমসাহেবা? তুমি তো ওকে নিশ্চয়ই দিয়ে দেবে তাই। তাছাড়া দেওয়া উচিতও বটে। জীবনটাই যে ও বাঁচিয়ে দিল।"

—"সেই জন্যই তো বলছি দরিয়া, ও যা চাইবে আমি ওকে তাই দেব। তবে জানিস আমার ভারি ভয় হয় ও হাবশীটা তোদের দুজনের একজনকেই না চেয়ে বসে। যেমনি ভাবে তাকায় তোদের দিকে। তাছাড়া তোরও আশা পূর্ণ হবে। তুই না বলছিলি সেইদিন একটা হাবশীকে শাদী করার সাধ জেগেছে তোর প্রাণে!"

আকাশ থেকে পড়ে দরিয়া অবাক

নয়নে তাকিয়ে থাকে জাহান্ আরার দিকে।

—"খোদা কসম বেগমসাহেবা! আমি কবে বললাম, আমি আরিফকে শাদী করবো?"

—"না, না ; তুই আরিফের কথা বলিস নি। তুই বলছিলি শুধু একটা হাবশীর কথা। তাই তো? হিন্দুস্থানের ঘরে ঘরে আজ যার নাম, সম্রাট যার ওপর সব চেয়ে প্রসন্ন তার ভবিষ্যৎ তুই ভেবে দেখেছিল দরিয়া?"

এবার দরিয়া গম্ভীরভাবে তাকায় জাহান্ আরার দিকে।

"দোহাই বেগমসাহেবা আমায় তুমি ভুল বুঝো না। আমি নেহাৎ মজাক্ করে তোমায় হাবশীকে শাদীর কথা পেশ করেছিলাম। সেরকম মজাক্ করার গুস্তাকি যে তুমি চিরদিন মাপ করে এসেছো। তোমায় একটু খুশি করার জন্যই তো যখন যা মনে আসে তাই বলি। তুমি বিশ্বাস করো বেগমসাহেবা আমার দিল্ স্ফটিকের মতন স্বচ্ছ। আমি ওর ছায়াকেও মহব্বত করি না। তোমার কসম্ বেগমসাহেবা, ঐ লোকটার হাতে তুমি আমায় সঁপে বসো না। দোহাই হুজুর। তার চেয়ে বরং আমায় ফাঁসি দাও। সেও ভালো হবে।"

হেসে জাহান্ আরা বলেন, কেন রে? ওকে তোর এত অপছন্দ কেন?

—তোমাকে সারিয়ে দিয়েছে সে জন্য আমি ওর কাছে ঋণী। সম্রাট ওর কাছে ঋণী। সমগ্র হিন্দুস্থান ওর কাছে ঋণী। তবুও ওকে আমি ঘৃণা করি।

—কেন রে? দুদিন বাদে ও তোর খসম হবে। আর তুই ওকে এত ঘৃণা করিস?

এবার দরিয়া মরিয়া হয়ে কেঁদে ফেললো।

জাহান্ আরা এতখানি আশা করেন নি। আপন শয্যা 'পরে দরিয়াকে আদর করে বসালেন টেনে।

"বেশ তো। বেশ তো। তোর যদি ওকে নেহাৎ পছন্দ না হয়, তা হলে তুই অন্য কাউকে শাদী করিস। ধরে বেঁধে কেউ কখনও কারুর ঘাড়ে কাউকে চাপাতে পারে? কি বোকা মেয়েরে! তুই কাঁদছিস? সত্যি বল্ তো, ও কোনো-দিন তোকে বে-ইজ্জৎ করেছে? কোনো-দিন কিছু বলেছে? আমি তো অচৈতন্য হয়ে পড়ে থাকতুম। শুনেছি শুধু ওর ওষুধেই আমি সুস্থ হয়েছি। তাহলে নিশ্চয়ই এসেছে এখানে প্রতিদিন।"

—আজ্ঞে হ্যাঁ। রোজই এসেছে। আমারই হাতে রোজ ওষুধ দিয়ে গেছে। মলমটা ওর নিজের হাতের তৈরি। কোনো-দিন কিছু বলে নি। বরং মাটির দিকে তাকিয়েই কিভাবে প্রলেপ লাগাতে হবে তার নির্দেশ দিয়েছে।

—তবে? তবে ওকে বাঘের মতন অমন ভয় পাচ্ছিস কেন?

—ভয় ঠিক নয় বেগমসাহেবা। ওকে আমি মনে-প্রাণে ঘৃণা করি।

—কেন বল্ তো। একটা মানুষকে জানিস না, শুনিস না, তাকে এত ঘৃণা? কেন?

—তোমাকে তো আগেই বলেছি। ও আওরঙ্জেবসাহেবের গোলাম। ধূর্ত-লোকের গোলাম। ও কখনই ভালো লোক নয়। তোমাকেও সারিয়েছে সত্যি। দরকার হলে ও-ই হিন্দুস্থানের যে কোনো অমঙ্গল ঘটাতে পারে। খলের সাগরেদ কখনও জলের মতন অমলিন হতে পারে না। তুমি দেখে নিও ও নিশ্চয়ই কোনো মতলব নিয়ে এসেছে। তুমি বোধ হয় জানো না দক্ষিণাবর্ত থেকে আওরঙ্-জেবকে যুবরাজ দারার পরামর্শে সম্রাট সম্প্রতি বরখাস্ত করেছেন। তার অত্যাচার নাকি অসহ্য হয়ে উঠেছে। কদিন এখানে আসার চেষ্টা করেছিল। তুমি নিদ্রিতা বলে তাকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছি। আজ বোধ হয় তিন সপ্তাহ হলো। তোমার অসুস্থতা শুনেই ছুটে এসেছিল। এটা সত্যি।

জাহান্ আরা অবাকভাবে তাকান দরিয়ার দিকে। বুদ্ধিমতী কিংকরী। জাহান্ আরার হৃদয়টুকু পড়তে পারে। তাঁর মনের গহনে যেন রয়েছে এ সুন্দরীর অবাধ প্রবেশ।

—তুই সত্যি বলছিস্? আওরঙ্-জেবকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে দক্ষিণাবর্ত

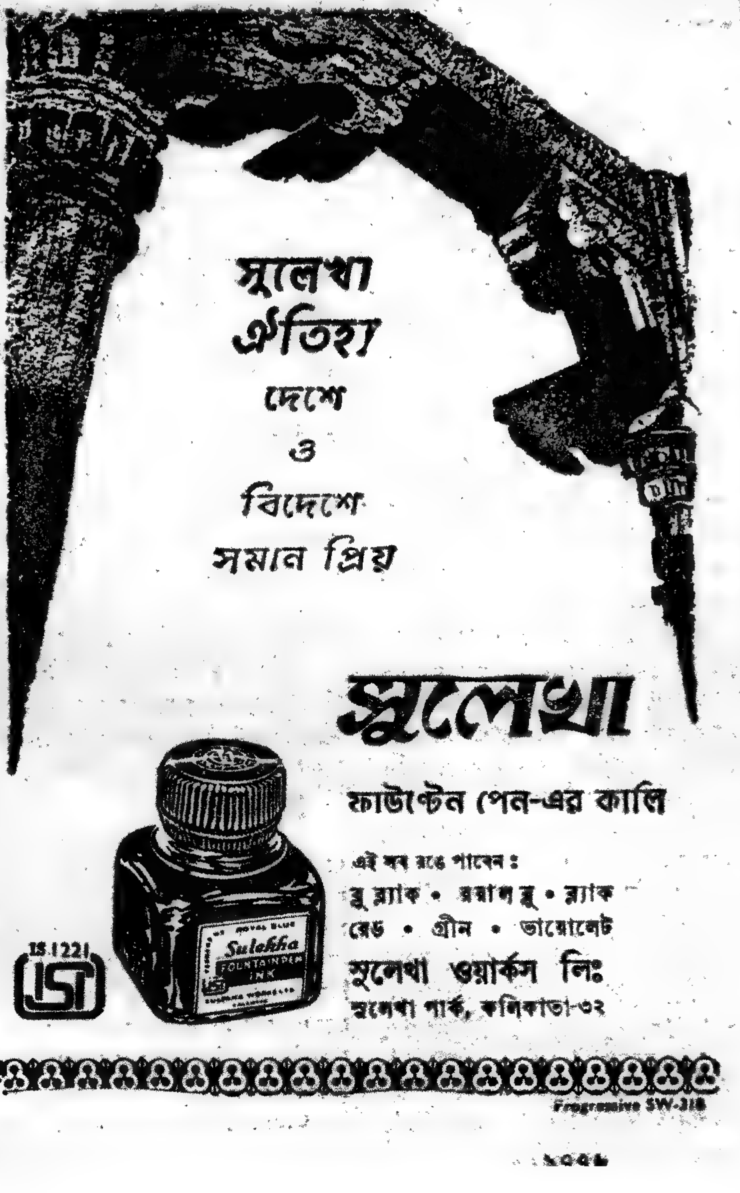

থেকে? কই আমাকে তো কেউ জানায় নি কিছু।

—কে তোমাকে জানাবে বেগমসাহেবা? সম্রাট নিজেই যে অন্তপ্রহর এই ঘরে বন্দীপ্রায়। তোমার অসুস্থতায় তিনি নিজে এত কাতর যে রাজকাজ যে তিনি একেবারে ভুলে গেছেন। এ কাজ করতে হয়েছে যুবরাজকে।

—তবুও। শ্বেতসর্পকে দক্ষিণাবর্তে পাঠাবার একটা বিশেষ কারণ ছিল দরিয়া। যুবরাজ দারা সেটা এত তাড়াতাড়ি কি করে ভুলে গেলেন?

দরিয়া বেগম নিস্তব্ধ। তার বলার কিছু নেই। সে জানে যতই প্রিয়পাত্র হোক জাহান আরা বেগম—রাজনৈতিক ব্যাপার আলোচনা করেন শুধু দুজনের সাথে। সম্রাট শাজাহান আর যুবরাজ দারা ছাড়া এ বিরাট হিন্দুস্থানে জাহান আরা বেগমের সাথে রাজনৈতিক আলোচনায় আর তৃতীয় লোকটির প্রবেশ নিষেধ। শুধু যে তারা করতে পারে না তাই নয়। তাদের কারুর সে সাহসটুকু নেই। রাজনীতি আলোচনাকালে জাহান আরা যেন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। তাঁকে যেন ঠিক চেনা যায় না। বজ্রকঠিন মুখমণ্ডলে কোত্থেকে এসে যায় এক অটল সংকল্প। না দেখলে সেটা কেউ ঠিক কল্পনা করতে পারবে না।

দরিয়া বেগম এ মুখ চেনে। সে তাই নীরব।

—হ্যাঁ রে দরিয়া, যুবরাজ এসেছিলেন? তেঁকে দেখি না বহুদিন।

—শুধু আসেন নি—তিনি যে বেগম রাণা দিলকে একরকম হুকুমই দিয়েছিলেন তোমার এই কামরায় অন্তপ্রহর দেখাশুনা করতে। তিনি নিজে প্রতিদিনই আসেন। খবর নিয়ে চলে যান। হিন্দুস্থানের সন্ত ফকীর কাউকে বাদ দেন নি। হিন্দুদের মন্দিরে হোমানল হচ্ছে। মসজিদে কোর-আন-শরীফ পাঠ। গুরুদ্বারায় গুরুগ্রন্থ আর ঈশাহীদের ঘরে বাইবেল পাঠ। প্রচুর অর্থ ঢালছেন দুহাতে শুধু তোমার জীবনভিক্ষা ছাড়া এসব ভজনাগারে আর যেন কোনো কিছু প্রার্থনা না হয় এই তাঁর হুকুম। মঞ্জিল-ই-নিগম বোধের আশেপাশে যমুনাতীরে যেন একটা সন্ত ফকীরের মেলা বসে গেছে। শুনছি যুবরাজের দানে আকৃষ্ট হয়ে রাজ্যের অনেক বেকার যুবক ফকীর বেশে সেই মেলায় গিয়ে হাজির হচ্ছে। যুবরাজকে দেখলে তুমি তাঁকে ঠিক চিনতে পারবে না বেগমসাহেবা। এ দুনিয়ায় তাঁর মতন লোক মেলে না। যেন জীবন্ত পীর। শাহ বুলন্দ একবালকে লাখ সেলাম! তাতো হবেই।

হিন্দু-মুসলিম-শিখ-ঈশাহীর মহামিলন যজ্ঞে এই দেবকন্যা জাহান আরার জীবন যে পরম কাম্য। দুটি ভাইবোন যেন মহান পরমাত্মার বন্দনার অঞ্জলি-ডালিতে রাখা একই বৃন্তের দুটি ফুল। এ যে দেব নির্মাল্য। দেবাশীষ। একটি ফুলের জীবনাবসানে অন্যটির অর্ঘ্য রইবে অসম্পূর্ণ! তাইতো যুবরাজ দারা এত বিচলিত বেগমসাহেবা।

দরিয়ার কথা শুনে জাহান আরার দু চোখ জলে ভরে গেল। সত্যি প্রাসাদের সবাই যুবরাজকে আপামর জনসাধারণ এত ভালবাসে, এত ভক্তি করে, এত আপনভাবে দেখে যে জাহান আরা বেগম ভাষায় তা ব্যক্ত করতে পারেন না। তবুও এই শ্বেতসর্প আওরঙজেব কেন যে তার সাথে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারছে না সেটা বোঝাই দায়। মাঝে মাঝে জাহান আরা নিজেই ভেবে ভেবে অবাক হয়েছেন যে এই আওরঙজেব দারাশিকোর সহোদর! তাঁরই আপন সহোদর। কতই না অমিল। চিন্তায়, ভাবনায়, প্রতিদিনের কাজে, আচারে, ব্যবহারে কতই না পার্থক্য এ'দের ভেতর। কি আশ্চর্য একই জমিতে একই গাছে ফোটা ফুলে কতই না অমিল। কে জানে শ্বেতসর্প কবে কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে ছোবল মেরে কাকে শেষ করে বসবে? সে দুর্দিনের কথা স্মরণ করলেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে জাহান আরার।

কাহানের ভবিষ্যাদ্বাণীর কথা ভাবতেও শরীর কেঁপে ওঠে। কাহান আওরঙজেবের ভবিষ্যৎ বিচার করে বলেছিল, এই বালকই হলো শ্বেতসর্প। সাম্রাজ্য ভাঙা-গড়ায় এর থাকবে এক বিশেষ অংশ। সাম্রাজ্য ধ্বংসের সূত্রপাত ঘটাবে এই বালক। সবাই হেসেছিল সেদিন।

দরিয়া জাহান আরার কেশবিন্যাস করছিল। কেশবিন্যাসে বেগমসাহেবা বিশেষ যত্ন নেন। হিন্দুস্থানের গুহা-গহ্বরে যেসব প্রাচীন সুন্দরী মূর্তির আলেখ্য তিনি দেখেছেন, বর্ণনায় যেসব সুন্দরীর প্রসাধনের সঙ্গে ঘটেছে তাঁর পরিচয়—জাহান আরার কেশবিন্যাস হয় তাঁদেরই অনুসরণে। অজন্তার গুহা-পীঠের অঙ্কন-শিল্পীর তিনি একজন বিশেষ গুণগ্রাহিণী।

কোন্ দূর গগনে চলে গেছে জাহান আরার মন। দক্ষিণাবর্ত থেকে আওরঙজেবের অপসারণের সংবাদটুকু পাবার পর থেকেই জাহান আরার মন বিশেষভাবে বিচলিত হয়েছে। এক অকারণ চঞ্চলতায় মন হয়েছে ভারি ভারাক্রান্ত। একটা ঘটনার কথা আজ বারবার মনে পড়ে জাহান আরার।

তখন সবাই শিশু। প্রাসাদে সবাই খেলায় ছিলেন ব্যস্ত। 'রাজা রাজা' খেলা। দারাশিকো চিরদিনই ছিলেন সবার প্রিয়পাত্র। সবাই মিলে তাঁকেই 'রাজা' সাজালেন। তাছাড়া, কে না জানতো দারাই বসবেন হিন্দুস্থানের তখৎ-ই-তাউসে?

পরম আনন্দিত মনে যুবরাজ দারা এদিক-ওদিক ঘুরে এসে বসলেন তাঁর খেলার সিংহাসনে। কে যেন ছুটে এসে তাঁর উজ্জ্বল উষ্ণীষে জড়িয়ে দিল একটা ময়ূরপুচ্ছ। ভারি সুন্দর মানিয়েছিল যুবরাজকে। জাহান আরা নিজে পরেছিলেন একখানা গোলাপী শাড়ি। রোশন্ আরার পরিধানে ছিল ঠিক তেমনই একখানা গোলাপী শাড়ি। প্রাসাদে তখন ঢাকাই মসলিনের এক বিশেষ শীর্ষ স্থান। সবাই এসে যুবরাজকে ঘিরে বসলো। যুবরাজের রাজা সাজায় সবাই খুবই খুশি। শুধু একটি শিশু ছাড়া।

অদূরে খেলার ছলে মালা হাতে বসে যুবরাজের দিকে তাকিয়ে হাসছিল ধূর্ত শয়তান শিশু আওরঙজেব—তাচ্ছিল্যের হাসি। শিশুর হাসিতে এত কপটতা না দেখলে বিশ্বাস করতেন না বেগম জাহান আরা। সেদিন সেই হাসি দেখে যুবরাজ দারাশিকো পর্যন্ত চমকে উঠেছিলেন।

সে আজ অনেকদিনের কথা। শিশুর দল দাঁড়িয়েছে পূর্ণবয়স্করূপে। চারাগাছগুলো দাঁড়িয়েছে মহীরুহে। তবুও আওরঙজেবের সেই ক্রূর হাসিটুকু যেন আজও মেলায় নি। চোখ বুজলেই যেন জাহান আরা দেখতে পান তার সেই ভণ্ডভাবে মালা হাতে বাঁকা ঠোঁটের হাসি।

কে জানে কাহনের কাহিনীর শেষ কোথায়?

১৯৬৭ সালে আপনার ভাগ্য

যে কোনও ফুলের নাম লিখিয়া পাঠান এবং টাকা ১·২৫ ভি,পি,পি, যোগে আগামী ১২ মাসের জন্য সম্পূর্ণ বিস্তারিতভাবে উত্থান পতন সহ আপনার ভাগ্যফল জানুন। পোস্টেজ স্বতন্ত্র।

Kashi Vigyan Mandir (9);
Beat No. 13, Aligarh.

অবক্তব্য

চন্দ্রগুপ্ত

সাম্প্রতিক ছাত্র-অসন্তোষ ও তার চণ্ড প্রকাশ নিয়ে বিশদ আলোচনা করার ক্ষমতা আমার অনায়ত্ত এবং সে আলোচনাতেও আমার প্রবল অনীহা। কারণ আমার সহজ বুদ্ধিতে আমার প্রতীতি, রাজনৈতিক হাঙরদের সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য তরুণ শিক্ষার্থী এবং সম্প্রতি বাংলার ছাত্রসমাজ অসহায়ভাবে রাজনীতির শতপাকে আবদ্ধ। এবং যে হেতু রাজনীতিতে আমি বরাবরই খর্ববুদ্ধি, রাজনীতিগন্ধী ছাত্র-আন্দোলন, ছাত্র-অসন্তোষ ইত্যাদি আলোচনায় তাই আমি আদৌ অবতীর্ণ হতে ইচ্ছুক নই।

কিন্তু স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে একটি প্রশ্ন আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের সামনে রাখতে চাই : প্রেসিডেন্সি কলেজের অত্যন্ত মূল্যবান ও বহু পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরি ধ্বংসে তাঁরা কোন্ জাতীয় প্রগতিশীলতার স্বাক্ষর রাখলেন?

জানি, মুষ্টিমেয় কিছু ছাত্র, যারা তাবৎ ছাত্রসমাজের গভীর কলঙ্ক, এই ধ্বংসের জন্য দায়ী, কিন্তু এই দুরপনেয় কলঙ্ক কি শেষ পর্যন্ত সমগ্র প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রসমাজকেই বহন করতে হবে না? প্রেসিডেন্সি কলেজের সুস্থবুদ্ধি অন্যান্য ছাত্ররা দুষ্কৃতিকারীদের আবিষ্কার করে কলেজ থেকে বিতাড়িত করলে তবেই এই কলঙ্ক অপনোদিত হতে পারে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে আমার এই দাবি বৃহৎ, এই আশাও দুরাশা। কারণ ভারতবর্ষে এখন সেই যুগ, আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা যাকে 'মাৎস্য-ন্যায়' বলে অভিহিত করেছেন। আমাদের বিবেক বিচার-বুদ্ধি অস্তগত, আমাদের শাসন-যন্ত্র দুর্বল, শাসকবর্গ আগামী নির্বাচনে নিজেদের ভাগ্য নিয়ে চিন্তা-ব্যাকুল। অতএব যেমন চলছে চলুক, জল যেমন গড়াচ্ছে গড়াক। ফেব্রুআরির আগে কিছুই হবে না।

কিন্ত ফেব্রুআরির পর কি কর্তৃপক্ষের সেই কর্মক্ষমতা অবশিষ্ট থাকবে, যে ক্ষমতায় সার্বিক অরাজকতা বন্ধ করা যায়? চিকিৎসাশাস্ত্রের বিধান, দুরারোগ্য কিংবা যে কোন ব্যাধির বীজাণুকেই সময় মতো নষ্ট না করে শক্তিশালী হবার সুযোগ দিলে পরে কোন ওষুধই তাকে দমন করতে পারে না। এক হাজার ছাত্র যদি দশজন ছাত্রের হাত থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজের গবেষণাগার বাঁচাতে না পারে, তবে বুঝতে হবে, সংগ্রামী ছাত্ররা আসলে 'সং' ছাড়া কিছুই নয়, রাজনৈতিক 'অধিকারী'রা যে তাদের চমৎকার 'সং' সাজিয়ে রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছেন এ বোধ তাদের নেই।

বস্তুত প্রেসিডেন্সি কলেজের গবেষণাগার ধ্বংসের মতো সাংস্কৃতিক দুর্ঘটনা বা প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে ছাত্রদের অভাবনীয় রকমের চরম দুর্ব্যবহারের কলঙ্কে প্রেসিডেন্সি কলেজের তথাকথিত অসাধারণ ছেলেদের মাথা অন্যান্য কলেজের সাধারণ ছেলেদের চরণধূলার তলে নত হলো, কয়েকটি ছেলের দুর্বুদ্ধির জন্য আর-সকলের অহংকার চোখের জলে লুটিয়ে গেল।

গত দু' মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজে যা যা ঘটেছে, একটি সাধারণ কলেজে তা ঘটা সম্ভব কি? আমার ধারণা, অসন্তোষ প্রকাশের এই চণ্ডতা অন্য সাধারণ কলেজে, এই দুর্যোগ-মুহূর্তেও, অসম্ভব। অন্যান্য কলেজেও ইতিপূর্বে ছাত্র-অসন্তোষ দেখা গেছে, অধ্যক্ষ ঘেরাও হয়েছে, কলেজ বন্ধ থেকেছে, কিন্তু সে-সব কলেজের ছাত্ররা প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিয়ে শীতের রাত্রে গাছতলায় গভীর রাত্রি পর্যন্ত অধ্যক্ষকে আটক করার মতো অতুলনীয় অমানবিকতার পরিচয় দেন নি। এ ধরনের প্রগতিশীলতার দৌড়ে সাধারণ কলেজের সাধারণ ছাত্রদের পেছিয়ে পড়ার কারণ, তারা নেহাতই সাধারণ, আর্থিক ও সাংস্কৃতিকভাবে : তাদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবার-ভুক্ত, তারা বাবাকে 'বাবা' মাকে 'মা' বলে, দেশের কিছু না জেনেই চীনের রাজনীতির সর্বশেষ খবর জানার মতো সাংঘাতিক 'ইন্টেলেক্ট' তাদের নেই, একই সঙ্গে রীতা ফারিয়া, সত্যজিৎ রায়, সালমা খান ও বের্টোল্ট ব্রেখট সম্পর্কে আলোচনা করার মতো তাদের মানসিক 'ডাইনামিজমে'র নিদারুণ অভাব। সংক্ষেপে 'ইনটেলেকচুয়াল' না হওয়ার দরুণ তাদের মধ্যে এখনো কিছু মানবিক মূল্যবোধ আছে, ফলে শত উত্তেজনা সত্ত্বেও তারা কখনো নিজেদের ল্যাবরেটরি নিজেদের হাতে ধ্বংস করে না, অধ্যক্ষ বা শিক্ষককে যদি বা কখনো আটক করে, তা তাঁদের ঘরেই করে, এবং বন্দী অবস্থায় তাঁদের প্রতি অকল্পনীয় রকমের বর্বর আচরণে তাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তাঁদের বাড়ির সামনে কখনও প্রগতিশীলের ভূমিকায় পথ-নাটিকা অভিনয় করার খবরও অদ্যাবধি শোনা যায় নি।

জানি, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধিকাংশ, হয়তো শতকরা আটানব্বই জন ছাত্রই, গত দু' মাস ধরে যা ঘটেছে তার জন্য দায়ী নয় এবং ঘটনাবলীর নায়ক ছাত্রদেরও তারা আদ্যন্ত বিরোধী। কিন্তু এই নায়ক-ছাত্ররা যা করেছে বা করছে তার বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ না জানানোও যে একটা অপরাধ এটা তারা অস্বীকার করতে পারে কি? যে ছাত্ররা ল্যাবরেটরি ধ্বংস করেছে, তাদের শাস্তিবিধান কার করা উচিত—সরকারের না সুস্থবুদ্ধি ছাত্রদের? সুতরাং দশজন ছাত্রের অপরাধ শেষ পর্যন্ত সমগ্র ছাত্রসমাজের উপরই বর্তায় না কি?

এতক্ষণ ছাত্রদের সমালোচনা করলাম। করলাম সেই ছাত্রদের যারা ছাত্র-আন্দোলনকে বিকৃত পথে নিয়ে গিয়ে পুলিশের হস্তক্ষেপ অনিবার্য করে তুলেছিল। পরিণামে এতে তাদের ক্ষতি ছাড়া কিছুই হয় নি, কারণ শুভবুদ্ধি স্থিরমতি শিক্ষিত নাগরিকদের সকলরকম সহানুভূতি থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে।

শুধু ছাত্রদের দোষ দিয়ে কি হবে, প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষকদেরও কি এই ছাত্র-আন্দোলনে কোন পরোক্ষ অংশ নেই? কিংবা আরও গভীরে গিয়ে বলতে হয়, শতাধিক বছরের এই পুরনো কলেজের 'ঐতিহ্যের' ভূতের উপদ্রবে ছাত্র-শিক্ষক সকলেই প্রাণস্পন্দহীন। কলেজের সর্বাঙ্গেই এক আশ্চর্য কৃত্রিমতা, যে কৃত্রিমতার ফলে কলেজে সুস্থ শিক্ষা-জীবন দূর অস্ত। অস্বীকার করার উপায় নেই প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে ব্যবধান মেরুপ্রমাণ। এই সম্পর্কের অভাবের জন্য ছাত্র-অসন্তোষ যদি কখনও চণ্ডমূর্তি গ্রহণ করে, তখন ছাত্রদের নিন্দা করা যায়, কিন্তু পরক্ষণেই শিক্ষকসমাজের আত্মবীক্ষণ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষকদের এই উন্নাসিকতা এবং ছাত্রদের প্রতি তাঁদের নিষ্করুণ উদাসীনতার কাহিনী প্রাচীন। আগেই বলেছি, এর মূলে আছে এক রহস্যময় 'প্রেসিডেন্সি কলেজীয় ঐতিহ্য'। এই কলেজীয় ঐতিহ্যের প্রভাবে চিংড়ি-পোতা কলেজের একদা-জনপ্রিয় শিক্ষকও প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদানের অল্প-কালের মধ্যেই ছাত্রবিমুখ উন্নাসিক অধ্যাপকে অপরূপান্তরিত হন। ছাত্র-

জীবনে অতি সাধারণ এবং শিক্ষক হিসাবে অসফল এমন কিছু অধ্যাপক গত কয়েক বছরের মধ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজে এসেছেন ছাত্রদের সঙ্গে যাঁদের ব্যবহার শিক্ষকোচিত নয় বলে শোনা যায়। এরই মধ্যে দু'চারজন শিক্ষক যদি তাঁদের শোভন ও আন্তরিক ব্যবহারে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন, তবে তা অন্য সহকর্মীদের বিব্রত করবে বই কি!

এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করতে হয়, প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষক সহকর্মীদের নিজেদের মধ্যেই সহমর্মিতার যথেষ্ট অভাব। এবং ছাত্ররা তাদের 'গুরুজনদের' মধ্যে এই সহৃদয় সম্পর্কের অভাবকে চমৎকার কাজে লাগিয়েছে। কত দূর সত্য বলতে পারব না, প্রেসিডেন্সি কলেজের 'প্রোফেসর', 'অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর' এবং 'লেকচারার' (যদিও লেকচারারের সংখ্যা নগণ্য) এই তিন শ্রেণীর শিক্ষকদের মধ্যে এক ধরণের ধনী-দরিদ্র সম্পর্ক বিদ্যমান। 'প্রোফেসর'রা নিজেদের স্বর্গ থেকে অন্যান্যদের যে চোখে দেখেন তা অসীম কৃপা ও করুণার। প্রশ্ন উঠতে পারে, তা যদি সত্য হয়, তবে ইডেন হিন্দু হস্টেলের সুপারিন্টেন্ডেন্টের ছাত্রদের হাতে নির্যাতনের পর প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষকবৃন্দ একযোগে ছাত্র-নিন্দায় মুখর হলেন কেন? ছাত্রদের নিন্দা এবং অপরাধী ছাত্রদের শাস্তিদানের সংকল্প গ্রহণ—শিক্ষক-সমিতির এই কাজের মূলে কি নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কাই ছিল না? অর্থাৎ, আজ হস্টেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট নির্যাতিত হয়েছেন, কাল যে-আমি নির্যাতিত হবো না, তারই বা নিশ্চয়তা কি—এই ধরনের ভয়েই যে বহু শিক্ষক কাতর হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ কি? প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ এবং সমগ্র শিক্ষকমণ্ডলীর কাছে দু'টি মোটা, যাকে বলে 'ব্লান্ট', প্রশ্ন রাখি ঃ প্রথম, ইডেন হিন্দু হস্টেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট যখন ছাত্রদের হাতে নির্যাতিত হচ্ছিলেন, তখন কলেজের অধ্যক্ষ কতখানি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছিলেন? দ্বিতীয়, সুপারিন্টেন্ডেন্ট মুক্তি পাবার পর তাঁর দুঃখে আকুল যে অধ্যাপকরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা রুদ্ধদ্বার কক্ষে সভা করলেন, সেই অধ্যাপকরা (যাঁদের সংখ্যা আনুমানিক দেড়শো) একটিবারও সমবেতভাবে হস্টেলের গেটে ছাত্রদের মুখোমুখি দাঁড়াবার মতো সাহস দেখাতে পারলেন না কেন? তাঁরা কি ছাত্রদের হাত থেকে তাঁদের বন্ধুকে উদ্ধার করতে পারতেন না?

রূঢ় শোনালেও বলতে বাধ্য হবো, ওপরের কথাগুলি বলার মতো যে সৎসাহস ও চরিত্রবল দরকার প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষকদের তা নেই, এবং তাঁরাও তাঁদের ছাত্রদের মতোই অতিমাত্রায় 'ইনটেলেকচুয়াল' হওয়ার জন্য মানবিক মূল্যবোধে পর্যাপ্ত সম্পন্ন নন। যে সমস্ত মূল্যবোধ শিক্ষককে 'শিক্ষক' এবং সর্বোপরি 'মানুষ' করে তোলে, তার পরিচয় তাঁরা দিলে আজ অঙ্গুলিগণ্য ছাত্র সমগ্র প্রেসিডেন্সি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে রাখতে পারত না, হাজার রাজনৈতিক প্ররোচনা সত্ত্বেও দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে তারা এমনভাবে পঙ্গু করে রাখতে অসমর্থ হতো এবং শুধু প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষকমণ্ডলী নয়, এক হিসাবে বাংলাদেশের তাবৎ শিক্ষকসমাজই আজকের এই সাংস্কৃতিক অরাজকতার জন্য বহুলাংশে দায়ী, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রসমাজের একটি বড় অংশ বড়লোকদের ছেলেদের নিয়ে গঠিত। 'শিল্পপতি' শুধু নয়, উচ্চপদস্থ সরকারী বা বেসরকারী কর্মচারী, হাইকোর্টের বিচারপতি, কৃতী ব্যারিস্টার ইত্যাদিও এই 'বড়লোকে'র অন্তর্ভুক্ত। এই উচ্চবিত্তদের সন্তানই প্রেসিডেন্সি কলেজে যাকে বলে 'প্রিভিলেজড ক্লাস' এবং যদিচ শিক্ষকের ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল ছাত্রের প্রতিই সমদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া উচিত, তবু প্রেসিডেন্সি কলেজের উন্নাসিক অধ্যাপকবর্গের যে-টুকু দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে, তা পারে এই 'প্রিভিলেজড' ছাত্ররাই। অর্থাৎ ছাত্রের 'পেডিগ্রী' এবং 'ইকনমিক সাউণ্ডনেস' প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষকের কাছে প্রধান বিচার্য বিষয়। প্রেসিডেন্সি কলেজে তথাকথিত সাম্যবাদী শিক্ষকেরও অভাব নেই, কারণ 'সাম্যবাদ বিশ্বাস করি' না বললে 'ইনটেলেকচুয়াল'-সমাজে অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা থাকে না। এমন দুজন সাম্যবাদী শিক্ষকের আচরণ চন্দ্রগুপ্ত তার স্মৃতি থেকে তুলে ধরছে। প্রসঙ্গত বলাই বাহুল্য, চন্দ্রগুপ্ত প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন ছাত্র।

সে প্রায় এক যুগ আগেকার ঘটনা। আমরা তখন অনার্সের ছাত্র। অনার্স ক্লাস মাসখানেক হলো শুরু হয়েছে। মুখ্যত বইপত্র-কেনাকাটা সংক্রান্ত আলোচনার জন্যই আমি এবং আমার দুই বন্ধু জনৈক শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করতে গেছি। কেনা যেতে পারে এমন কিছু বইর মধ্যে একটির দাম ছিল, যত দূর মনে পড়ে, চল্লিশ টাকা। আমার এক বন্ধু, তার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না, শিক্ষক মহাশয়কে কিঞ্চিৎ সঙ্কোচের সঙ্গে বলল ঃ স্যার, ও বইটা না কিনলে হবে না? লাইব্রেরি থেকে নিয়ে যদি পড়ি—। অবিশ্বাস্য শোনালেও বলি, কারণ আজও চন্দ্রগুপ্তের কানে কথাগুলি রূঢ়ভাবে বাজে, শিক্ষক মহাশয় আমাদের দুজনের সামনে নির্মমভাবে তাকে বলেছিলেন ঃ প্রেসিডেন্সি কলেজ ইজ নট ফর পুওর বয়েজ। বই কেনার ক্ষমতা না থাকলে অন্য কলেজে যাওয়া উচিত ছিল।

উক্ত সাম্যবাদী অধ্যাপককে চন্দ্রগুপ্ত যদি কখনও শ্রদ্ধা না করতে পারে, তবে সে দোষ কি চন্দ্রগুপ্তের?

আর-একটি ঘটনা ঃ অনার্সের টেস্ট পরীক্ষার তিন মাস আগে আমার আর-এক বন্ধু, সেও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান, কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর লিখে তার এক অধ্যাপককে দেখতে দেয়। সাম্যবাদী ইনটেলেকচুয়াল হিসাবে উক্ত অধ্যাপক খ্যাতিমান এবং ততোধিক খ্যাতি শিক্ষকতার সাফল্যের জন্য। অধ্যাপকপ্রবর কারও কারও প্রশ্নের উত্তর সংশোধন করে দেন। সেই ভরসাতেই আমার এই দরিদ্র বন্ধু তাঁর শরণাপন্ন হয়েছিল। অধ্যাপকপ্রবর বন্ধুর খাতা গ্রহণ করেন সত্য, কিন্তু অনেক তাগিদ দিয়ে পরীক্ষার পনেরো দিন আগে যখন খাতা ফেরত পেল, তখন সে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল, একটি আঁচড়ও তার খাতায় নেই, অথচ কিছু উত্তরের মানোন্নয়নের অবকাশ সে তার সাম্প্রতিক জ্ঞানবৃদ্ধিতেই খুঁজে পেল। এবং কিছু ভুলও সে নিজেই সংশোধন করে নিল।

আমার বন্ধুটি শ্রদ্ধাবশেই লক্ষ্য করে নি, উক্ত সাম্যবাদী অধ্যাপক যাদের প্রশ্নোত্তর সংশোধন করে দিতেন, তারা সকলেই ধনাঢ্য কিংবা উচ্চবিত্তের সন্তান এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'পেডিগ্রী' সম্পন্ন। বলাই বাহুল্য, শত খ্যাতিমান হওয়া সত্ত্বেও এই অধ্যাপককে চন্দ্রগুপ্ত শ্রদ্ধা করতে অপারগ।

এই দুই ঘটনা থেকে একটিই সিদ্ধান্ত ঃ প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষকদের সাম্যবাদ-প্রবণতা একটি ছদ্মবেশ, 'কেরিয়ার' তৈরি করবার একটি নির্ভরযোগ্য সোপান মাত্র।

অন্যত্র যেমন, প্রেসিডেন্সি কলেজেও শিক্ষকদের মধ্যে ব্যতিক্রম আছেন। তাঁরা অবশ্যই নমস্য। তেমন-কিছু অধ্যাপকের কাছে পাঠগ্রহণের সুযোগ চন্দ্রগুপ্তের ঘটেছে, এ কথা সে আনন্দিত চিত্তে প্রায়শই স্মরণ করে।

অভিশাপ কখনও কখনও আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয়। বর্তমান ছাত্র-আন্দোলনের উৎস-কেন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজ আলোচ্য কলেজের অধ্যাপকদের তথা সমগ্র শিক্ষকসমাজকে আত্মবীক্ষণের স্বর্ণ-সুযোগ এনে দিয়েছে। এই তথ্যের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করার জন্যই প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন ছাত্র চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক নাতিদীর্ঘ এই নিবন্ধের অবতারণা।

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

শিলালি

১৯৩০ সালের শেষ দিকে শিশিরবাবু পার্টি নিয়ে আমেরিকায় গেলেন। চুক্তিটা হয়েছিল আমেরিকার মিস মার্বারীর সঙ্গে—মাঝে মধ্যস্থ ছিলেন এরিক এলিয়ট, একজন স্কচ যুবক। এরিক এক ভ্রাম্যমাণ নাটুকে দলের ডিরেক্টর—পার্টি নিয়ে তিনি নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে অভিনয় করতেন। পরে আমি কলকাতার নিউ এম্পায়ার মঞ্চে এরিকের দলের— কয়েকটি শেক্সপীয়ারের নাটক এবং শ'র ক্যাপ্টেন ব্র্যাসবাউন্ড দেখেছিলাম—এদের অভিনয় অত্যন্ত সাধারণ শ্রেণীর। আমেরিকায় গিয়ে অবধিই শিশিরকুমারের সঙ্গে মিস মার্বারীর গোলমাল বাধল। কারণ রিহার্সাল দেখে মিস মার্বারী বুঝতে পারলেন তাঁদের আসল উদ্দেশ্য সফল হবে না—অর্থাৎ ভারতীয় দলকে শিল্পের ক্ষেত্রে ঠিক অসভ্য বর্বর করে প্রতিপন্ন করা সম্ভব হবে না। সুতরাং মিস মার্বারী অন্য পথ নিলেন—ড্রেস রিহার্সালের সময় কিছুটা দেখে মিস মার্বারী এবং তাঁর দলবল উঠে গেলেন। পরে তাঁরা জানালেন এ ধরণের থিয়েটার চলবে না এবং তাঁরা আর টাকা দেবেন না। চুক্তি করে সুদূর ভারত থেকে একটি দলকে নিয়ে গিয়ে এভাবে চুক্তিভঙ্গ করে বিপদে ফেলা এ বোধ হয় মার্কিনীদের পক্ষেই সম্ভব।

এই জাতটির এ ধরণের মনোবৃত্তি যে আজও বদলায় নি সে কথা তো বর্তমানেও আমরা বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারছি। আমাদের বর্তমান অর্থমূল্য হ্রাস করবার পেছনে মার্কিনী অর্থসাহায্য যথেষ্ট বৃদ্ধি করবার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল আমেরিকান গভর্নমেন্টের তরফ থেকে—সেই স্তোকে ভুলে ভারত সরকার টাকার মূল্য কমিয়ে দিলেন—কিন্তু মার্কিনী অর্থসাহায্য এল না। এটা তো সরকারী স্তরের ব্যাপার এবং এক স্বাধীন দেশের সরকারের সঙ্গে আর এক স্বাধীন দেশের সরকারের কথাবার্তার ভেতর দিয়ে অলিখিত চুক্তি। আর তখনকার দিনের কথা মনে করুন—এক পরাধীন দেশের থিয়েটার পার্টির ডিরেক্টরের সঙ্গে একটা ব্যবসায়িক চুক্তি। অবশ্য চুক্তিটি লিখিত ছিল এবং শিশিরকুমার ব্যাপারটা আদালতে তুললে অন্যরকম দাঁড়াতো। কিন্তু আদালতে কেস করবার মত টাকা তাঁর কোথায়—তা ছাড়া কেস উঠলে তাঁকে আরও অনেকদিন আমেরিকায় থাকতে হোত—সে খরচই বা তাঁর আসতো কোথা থেকে।

যাই হোক মন্দের ভাল এক জন ভদ্রলোক নতুন মুরুব্বি জুটলেন—ইনি রিহার্সাল দেখে খুশি হলেন এবং ভ্যাণ্ডারবিল্ট থিয়েটারে কয়েক রাত্রি সীতার অভিনয় হল—অভিনয় যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছিল। প্রমাণ স্বরূপ আমি আমেরিকান পত্রপত্রিকার রিভিউজ তুলে দিচ্ছি:

The New York Sun—

The Hindu players made a very good impression. Their acting compares favourably with the acting of any foreign troupe I can think of, excepting of course, the Moscow Art Theatre players, who, to me at least, are the best actors in the world. The Hindu players are so graceful in their movements that their many gestures are never awkward. They speak their lines clearly and distinctly, even if one does not know what they are saying. And the star, Mr. Bhaduri, who plays Rama, is on emotional actor of considerable power.

There is a certain nobility inherent in this play, and this nobility even pervaded the acting. Doubtless this was because the love theme is on such a high plane. One had the feeling that the love of Rama and Sita would persist through all eternity.

একথা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে—যে নিউইয়র্ক সানের সমালোচকের 'সীতার' অভিনয় খুবই ভাল লেগেছিল—কারণ তা না হলে অন্যান্য বিদেশী অভিনয়ের পার্টির তুলনায়—মস্কো আর্ট থিয়েটারের অভিনেতাদের বাদ দিয়ে—শিশিরবাবুর দলকে এত উচ্চস্থান দিতেন না। আর একথাও সত্যি শিশিরকুমার যদি নরেশবাবু, রাধিকাবাবু, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমেন রায়, রবি রায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে প্রভৃতিকে নিয়ে যেতে পারতেন তাহলে এ দলের অভিনয় মস্কো আর্টের থেকে ভাল ছাড়া খারাপ হোত না। নিউইয়র্ক সানের সমালোচক হিন্দু অভিনেতাদের সুসমঞ্জস মুভমেন্ট, স্বাভাবিক জেসচারস, স্পষ্ট বাচনভঙ্গীর বিশেষ প্রশংসা করেছেন। নাট্যাচার্যকে তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী ইমোশ্যনাল এ্যাক্টর হিসাবে অভিহিত করেছেন।

এই সমালোচকটির মতে—সীতা নাটকের ভেতর এমন একটা মহত্ত্ব আছে যেটা অভিনয়ের ভেতরও পরিস্ফুট হয়েছে। এ মন্তব্যের ভেতর দিয়ে সমালোচক শিশিরবাবুদের অভিনয়কে কতটা তুলে ধরেছেন সে সম্বন্ধে কারো কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

সমালোচকের শেষ লাইনটি পড়লে আরও বিস্মিত হতে হয়। ভাষার দুরতিক্রম্য বাধা সত্ত্বেও নাটকের মূল কথা তিনি ধরতে পেরেছেন —the love of Rama and Sita would persist through all eternity.

যে প্রতিকূল পরিবেশের ভেতর শিশিরকুমার ভ্যাণ্ডারবিল্ট থিয়েটারে 'সীতার' অভিনয় করেছিলেন, তারপর এই ধরণের কাগজের মন্তব্য থেকে প্রযোজক এবং অভিনেতা হিসাবে তাঁর বিরাট সাফল্যের কথাই জানতে পারা যায়—ব্যবসার দিক থেকে তাঁর আমেরিকা-সফর বিফল হয়েছিল এ কথাটা খুব বড় কথা নয়।

The New York American লিখেছিলেন:

Novelty came to the current theatrical season at the Vanderbilt theatre last night in perhaps the most ancient play that has ever been shown on Brodway.

.. .. ..

This company of Hindu actors, speaking in a language so distinctly foreign to American ears, succeeded in vitalizing this story to such an extent that scarcely a person left before the final curtain. After all, beauty and anguish know no tongue. There is a universal language, and art their sole medium of expression. The beauty of the poetry, the anguish of the King Rama and his queen were too real to escape transmission over the footlights on the wings of an artistry rare to this country.

Sisir Kumar Bhaduri is an actor of the finest rank. Last night's play kept him in two contrasting moods—lyric and emotion. He seemed to excel in the latter, investing some of his scenes with a poignancy that strongly moved his audience. The supporting cast was almost equally strong, the women particularly.

Of course there were few in the audience who understood the language of the visitors. But that mattered little. So superb was their pantomime, so illustrative was a shrug of the shoulders, a flash of the eye, and a lifting of the hands or arms, that one could follow the story with little trouble.

.. .. ..

It was a treat to watch Sisir Kumar Bhaduri as Rama. His voice was bell-like; his pantomime, which told the story as clearly to the audience which understood not a single word, was so perfect that the words, anyway would have been unnecessary. Excellent too was Sreemati Prova as Sita, the Queen. All the others in the cast were interesting.

.. .. ..

It might not harm many, who give the stage as their profession to drop into the Vanderbilt to see how strangers in a strange land, speaking a strange language to their patrons, can, through their pantomime, interpret a story so that, as pointed out, the verbal picture is unnecessary.

অর্থাৎ, হিন্দু অভিনেতারা—যদিও তাঁরা যে ভাষায় কথা বলছিলেন তা আমেরিকান অভিনেতাদের পক্ষে দুর্বোধ্য—নাটকের কাহিনীকে এমন প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন যে, শ্রোতারা ফাইনেল কার্টেনের আগে হল ছেড়ে যান নি। আর যাবেনই বা কেন—বেদনা এবং সৌন্দর্য তো শুধু ভাষার মাধ্যমেই প্রকাশিত হয় না।

তাছাড়া শিল্পের ভাষা হচ্ছে সার্বজনীন। কাব্যের সৌন্দর্য, রামচন্দ্রের জীবনের বিরাট হাহাকার, সীতার দুঃখের কাহিনী এত বাস্তব হয়ে উঠেছিল এই অভিনয়ে যে পাদপ্রদীপের সীমা লঙ্ঘন করে তা গিয়ে সঞ্চারিত হয়েছিল শ্রোতাদের মাঝে। এই জাতীয় শিল্পকৌশলসম্মত অভিনয় আমেরিকাতে খুব কমই দেখা যায়। শিশিরকুমার সেরা জাতের অভিনেতা—তাঁর অভিনয়ে দুটি দিক দেখা যায়—কাব্যিকতা এবং আবেগপূর্ণতা। অন্যান্য শিল্পীরাও যথেষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন, বিশেষত মহিলা শিল্পীর দল।

সমালোচক একটি বড় ভাল কথা বলেছেন—ভাল অভিনয়ের সময় ভাষার অজ্ঞানতা একটা বিরাট বাধা হয়ে দেখা দেয় না। ব্রেখটের বার্লিনার আসেম্বল পার্টির অভিনয়ের সময় এ ব্যাপারটা আমি লক্ষ্য করেছি। মোটামুটি কাহিনীর কাঠামো জানা থাকলে বেশ সহজভাবেই অভিনয় অনুধাবন করা যায়।

চেরকাশভ এবং পুডোভকিন যখন কলকাতায় এসে শিশিরকুমারের ষোড়শী নাটকের অভিনয় দেখেছিলেন, তাঁদেরও এ নাটক বুঝতে বিশেষ কষ্ট হয় নি বলে জানিয়েছিলেন। নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় তাঁরা বেশ ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন একথা তাঁদের মন্তব্য থেকেই পরিষ্কারভাবে বোঝা গিয়েছিল। নাচের বেলা ব্যাপারটা আরও সহজ হয়ে পড়ে। কারণ নাচের ভাষা সবদেশেই এক—অর্থাৎ রিদম্ এবং মুভমেন্ট।

এই বিদেশী ভাষার বাধাটা যে দুরতিক্রম্য নয় এরই উপর জোর দিয়ে লিখলেন The Evening World-এর সমালোচকঃ

বেঙ্গল কেমিক্যালের
পারফেক্টেড্
কোল্ড ক্রীম অব রোজেস
ল্যানোলিন সংযুক্ত
সকল ঋতুতে ত্বক অম্লান ও নিরাপদ রাখে

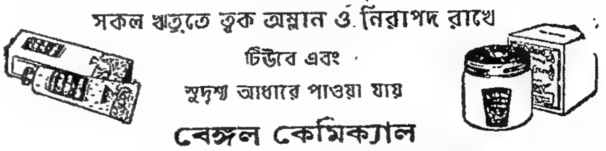

টিউবে এবং
সুদৃশ্য আধারে পাওয়া যায়
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা ∘ বোম্বাই ∘ কানপুর ∘ দিল্লী
Progressive/BC

You will enjoy 'Sita' as something unique.

শিশিরকুমারের কণ্ঠস্বরেরও উচ্চ প্রশংসা করলেন সমালোচক। মূকাভিনয় নাকি এত সুন্দর হয়েছিল নাট্যাচার্যের যে, তিনি যদি একটিও শব্দোচ্চারণ নাও করতেন তাহলেও তাঁর বক্তব্য বুঝতে দর্শকদের এতটুকু কষ্ট হোত না। শ্রীমতী প্রভা সম্বন্ধেও উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছে এবং অন্যান্যদেরও ভাল লেগেছে। সর্বদিক থেকেই 'সীতা' যে অনন্য একথাও সমালোচক বলেছেন।

বুঝে পাই না মার্কিন বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে এত প্রশংসা পেয়েও শিশিরকুমার দেশে ফেরবার পর এই সব কাগজের সমালোচনা আমাদের দেশের কাগজের মাধ্যমে প্রকাশ করেন নি কেন? তাঁর শত্রুর দলের বিরাট উল্লাস, যে তিনি আমেরিকায় failure হয়ে এসেছেন, তাহলে তো সহজেই থেমে যেত। কমার্শিয়াল সাকসেস আর আর্টিস্টিক সাকসেস তো এক জিনিস নয়। সমালোচকেরা বলেছেন যে, ভাষার অজ্ঞানতাটা শিশিরকুমারের অভিনয়ের ব্যাপারে একটা বিশেষ বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে নি। কিন্তু সাধারণ লোকে সে কথা বোঝে না। সুতরাং বিদেশী ভাষায় অভিনয়ের কথা ভেবে দর্শক হয়তো ভিড় জমায় নি—তার জন্য তিনি যে ফেলিওর হয়েছেন সে কথা তো সত্যি নয়। এই সেদিনও দেখলাম মিনার্ভা থিয়েটার জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকের সহায়তায় 'মাদার কারেজ' ছবিটির প্রদর্শনী করলেন আকাডেমী অভ ফাইন আর্টস মঞ্চে। অথচ দর্শক সংখ্যা ছিল অতি সামান্য—ভাষার দুর্বোধ্যতার জন্যই ছবি দেখতে বেশি লোক আসেন নি। সে জন্য একথা কি বলা চলে ছবিটি সাফল্য লাভ করে নি।

শিল্পরুচিসম্মত দর্শক সেদিন যাঁরা ছিলেন ঐ হলে, জার্মান ভাষার সঙ্গে পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও তাঁরা ঐ ছবির শিল্পরস যথেষ্ট উপভোগ করেছিলেন।

এরপর The Daily News New York-এর সমালোচনা তুলে দিচ্ছিঃ

The players reveal themselves as handsome and graceful in their bright robes and spangles, and their language is a mellifluous one. Spoken as it was last night, it often has the quality of a song—a melody of more variety and depth than, for instance, the sing-song of China's Me-Lan-Fang.

As actors Bhaduri and his company are more easily understood than were the Chinese and Japanese last season. Their gestures and vocal inflections are readily divined, and the performances are generally emotional.

এখানে তো প্রথমত আমাদের ভাষাকে বিরাট কম্‌প্লিমেন্ট দেওয়া হয়েছে—এমন কি চাইনিজ ভাষার সঙ্গে তুলনায় বাংলা ভাষার মিউজিক এই সমালোচকের অনেক বেশি ভাল লেগেছে।

এর আগের বছর চীনা এবং জাপানী অভিনেতারা আমেরিকাতে যে অভিনয় দেখিয়েছিলেন, তার তুলনায় শিশিরবাবুর দলের অভিনয় অনেক বেশি স্পষ্ট বলে সমালোচক স্বীকার করেছেন। বেশ বোঝা যাচ্ছে ভারতীয় অভিনয়কে এঁরা অন্তর থেকে গ্রহণ করেছেন।

The Evening Graphic New York লেখেনঃ

..The star of this company is undoubtedly an actor of great ability and his supporting company seem to take their work very seriously, portraying each role, large or small, with great emphasis, conviction and many gestures. Then, too there is something quite musical and pleasant about the sound of the language. The native songs and dances were particularly interesting.

"Sita" further arouses one's curiosity about India and at least presents a picture of what goes on in Sisir Bhaduri's Theatre in Calcutta.

শিশিরকুমার এবং দলের প্রত্যেকের অভিনয়ের প্রশংসা করা হয়েছে। বাংলা ভাষার শব্দঝংকারে যে সংগীতের সৃষ্টি হয়, তারও ইংগিত রয়েছে এই সমালোচনায়। আর এ অভিনয় দেখে কলকাতায় শিশির ভাদুড়ীর থিয়েটারে অভিনয় কিভাবে রূপ পরিগ্রহ করে সে বিষয়ে সমালোচকের কৌতূহল জাগ্রত হয়েছে।

এই সমালোচনা পড়ার পর এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে শিশিরবাবু আমেরিকা গিয়েছিলেন তা সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছিল। বিদেশে ট্রুপ নিয়ে গিয়ে পয়সা করে আসা তো সহজ কথা নয়—ওদেশে যাওয়া, আসা, থাকা, প্রডাকসন করা, পাবলিসিটির খরচ এতো সামান্য টাকায় হতে পারে না। সুতরাং অর্থ আনতে পারেন নি বলেই শিশিরকুমার আমেরিকায় গিয়ে কিছু করতে পারেন নি এ কথা বলা ভুল।

আমাদের সেই হাস্যরসিক ভদ্রলোকটি অবশ্য এসব কথা কানে তুলবেন না। তিনি সব কিছুকে টাকা, আনা, পাইয়ের মাপকাঠিতে বিচার করেন। শরৎবাবু নোবেল প্রাইজ পান নি—সুতরাং তিনি বাজে লেখক। শিশিরকুমার আমেরিকা থেকে অভিনয় করে বিরাট অংকের ডলার অর্জন করতে পারেন নি—সুতরাং তিনি বাজে অভিনেতা। শরৎ-শিশির বিদ্বেষী এই ভদ্রলোক লোককে কাতুকুতু দিয়ে হাসান—অতএব হাস্যরসিক হিসাবে চার্লস ল্যাম্বের পাশেই এঁর স্থান। আর তিনি নিজে কত শক্তিশালী লেখক দেখুন তো. মলিয়ের কখনও হ্যামলেটের মত ট্র্যাজেডী লিখতে পারতেন? অথচ এই হাস্যরসিক ভদ্রলোকটি শরৎচন্দ্রের একটি মিলনাত্মক উপন্যাসকে কি অদ্ভুত বিষাদাত্মক নাটকে রূপায়িত করেছিলেন—কেন যে শরৎবাবুর বিশ্বাসঘাতকতায় ক্ষুব্ধ হয়ে আর কোন নাটক লিখলেন না—লিখলে কার সাধ্য ছিল তাঁর অগ্রগতি রুদ্ধ করবার। বাংলাদেশে কি করে যে একই সময়ে এঁর মত মহাত্মা এবং শরৎচন্দ্র ও শিশিরকুমারের মত দুরাত্মা দেখা দিয়েছিল ভাবতে গেলে আশ্চর্য লাগে।

"সত্য সেলুকস! কি বিচিত্র এই দেশ।"

(ক্রমশঃ)

রোমাঞ্চ-রহস্য গ্রন্থ

রক্তনদীর ধারা

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল

রক্তনদীর ধারা মাসিক বসুমতীর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। রোমান্স ও রোমাঞ্চের সত্য ঘটনায় বইটির আদ্যোপান্ত পরিপূর্ণ। রক্তনদীর ধারা জীবনের অভিজ্ঞতা নয়; জীবনপথের দিক-নির্দেশ। তাই প্রবঞ্চনা, ছলনা ও প্রেমের লীলায় চাঞ্চল্যকর বইটি চাঞ্চল্য তুলেছে সকল সমাজেই।

লোমহর্ষক সামাজিক কাহিনী।

মূল্য ঃ চার টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

রূপজগৎ

প্রাচীরচিত্রের সেন্সর রীতি

চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপনচিত্র, প্রাচীরচিত্র ইত্যাদির সেন্সর পদ্ধতি সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের তথ্য ও প্রচারমন্ত্রী শ্রীবিজয়সিং নাহার কলকাতা ইনফরমেশন সেন্টারে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলেন গত ১৩ই ডিসেম্বর। সিনেমার বিজ্ঞাপন ও প্রাচীরচিত্র নাগরিক রুচিকে যেন আঘাত না করে সেই উদ্দেশ্যে সেন্সরের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। ১৯৫৯ সন থেকে সিনেমার প্রাচীরচিত্র, হোটেলের ক্যাবারে প্রদর্শনী ফটো ইত্যাদি সেন্সর করার ব্যবস্থা হয়েছে। শ্রীনাহার বললেন, সেন্সর-ব্যবস্থার ব্যাপারে স্থানীয় চলচ্চিত্র ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির পূর্ণ সহযোগিতা রয়েছে। সেই সহযোগিতার বলেই সেন্সর অফিসারের নির্দেশ সকল ক্ষেত্রে নির্বিবাদে অনুসৃত হয়ে থাকে। সেন্সর অফিসারের নির্দেশ সম্পর্কে আপত্তি থাকলে সংশ্লিষ্ট-পক্ষ অ্যাডভাইজারি কমিটির নিকট আবেদন করতে পারেন। এই কমিটির সদস্যসংখ্যা নয়। এ'দের মধ্যে বিভিন্ন চলচ্চিত্র ব্যবসায় সংস্থার প্রতিনিধি ছয়জন, হোটেল সংস্থার প্রতিনিধি একজন। এ ছাড়া আছেন সরকারের পক্ষে সেন্সর অফিসার ও ডিরেক্টর অব পাবলিসিটি ডিপার্টমেণ্ট। কমিটির নির্দেশই এই ব্যাপারে শেষ কথা। মন্ত্রীমহোদয় আরো বললেন, যদিও এই ব্যবস্থার পিছনে আইনের শক্তি নেই, তবু পারস্পরিক সহযোগিতার দরুণ সেন্সরশিপের এই রীতি সফল দিয়েছে। তিনি আরো জানালেন, কাজ যাতে ভাল হয় তার জন্য অ্যাডভাইজারি কমিটিতে সাংবাদিকদের একজন প্রতিনিধি গ্রহণ করার কথা ভাবা হয়েছে।

আমাদের সরকারের সব ব্যবস্থা এভাবে খাতাপত্রে ও সিদ্ধান্তে ঠিক আছে। কিন্তু জনসাধারণের অভিজ্ঞতার কথা ভাবা হলে তখন দেখা যাবে খাতাপত্রে যা আছে কাজে তা নেই। মন্ত্রীমহোদয় যা বলেছেন, জনসাধারণের অভিজ্ঞতায় তা নেই। কয়েকমাস পূর্বেও আমাদের মন্তব্য করতে হয়েছিল—কয়েকটি প্রাচীরচিত্র সম্পর্কে। যে প্রাচীরচিত্রগুলি সেন্সর ব্যবস্থাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে সারা শহরের পথে পথে টাঙানো হয়েছিল। এসব প্রাচীরচিত্র সম্পর্কে কেবল সাপ্তাহিক বসুমতী নয়—আরো কয়েকটি পত্রিকা সরকারের ও পৌরসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তারপরে দেখা গেল এক নগ্ন নারীমূর্তির উপর একটা জালের চিত্র এ'কে দিয়ে, কোথাও বা কালির মোটা রেখা দিয়ে চিত্রটিকে আরো কুৎসিত করা হয়েছে। পথে চলতে সেন্সর ব্যবস্থার দরুণ ছবির উপর এরকম কালির লেপন প্রায়ই চোখে পড়বে। অশালীন প্রাচীরচিত্রগুলির দৌরাত্ম্যে নাগরিকরা অনেক সময় ছেলেমেয়ে নিয়ে মাথা উঁচু করে হাটতে পারেন না। মন্ত্রীমহোদয়ের এই অভিজ্ঞতা হয়ত নেই। কারণ তাঁরা ব্যস্ত মানুষ। ব্যস্ততার মধ্যে গাড়িতে তাঁদের চলতে হয়। পথে দৃষ্টি দেবার সময় হয় না। তাই সাংবাদিকদের কাছে সেন্সর ব্যবস্থার কথা তিনি বিবৃত করে মন্তব্য করতে পেরেছেন 'সেন্সরশিপের ব্যাপারে স্থানীয় চলচ্চিত্র ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট সংস্থাদের পূর্ণ সহযোগিতা আছে।' সহযোগিতা সত্যিই যদি থেকে থাকে, তবে সংবাদপত্রসমূহে মাঝে মাঝে অশালীন প্রাচীরচিত্রের বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশিত হয় কেন; কেনই বা মন্ত্রীমহোদয়কে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে এ সম্পর্কে বিবৃতি দিতে হয়। এ থেকে বোঝা যায়, সেন্সর ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণ সন্তুষ্ট নয়, এবং সিনেমা সংস্থাগুলি সেন্সর ব্যবস্থার সঙ্গে বাইরে সহযোগিতা করেও নানাভাবে ফাঁকি দেবার সুযোগ গ্রহণ করে থাকে। সেন্সর সম্পর্কে আরো কড়াকড়ি না করলে আশালীন প্রাচীরচিত্রের নোংরামি থেকে নাগরিকরা রেহাই পাবে না।

—সুজন

মাধবী মুখার্জী
'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার'-এর নায়িকা।

চিত্র আলোচনা

এ সোলজার্স ফাদার
(নোভেক্সপোর্ট ফিল্মস)

এলিট সিনেমায় সোভিয়েট ইউনিয়নের একটি জর্জিয়ান ছবি 'এ সোলজার্স ফাদার' মুক্তিলাভ করেছে। কলকাতার বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে যখন মার্কিন গোয়েন্দা ছবির হিড়িক পড়েছে; রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক আন্তর্জাতিক পটভূমিকায় গোয়েন্দা ছবি দেখিয়ে দর্শকদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে সে সময় সুস্থচিন্তা ও মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ এই ছবিটি অভিনন্দনীয়। এই ছবির প্রধান অভিনেতা সের্গো জাকারিয়াজে মস্কো চতুর্থ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে অভিনয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মান লাভ করেছেন। তাঁকে সোভিয়েট রাষ্ট্র লেনিন পুরস্কার দিয়েছে এই ছবিতে অভিনয়ের জন্য। ছবিটি ইংরেজীতে ডাবিং করে দেখান হচ্ছে। এই ছবির আরেক খণ্ড হিন্দীতে ডাবিং করা হয়েছে এবং তার নাম দেওয়া হয়েছে 'মেরা বেটা'।

জর্জার পাহাড় অঞ্চলের এক প্রবীণ কৃষক রাশিয়ার কোন শহরে যাচ্ছেন ছেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তখন যুদ্ধের কাল, তাঁর ছেলে ফ্যাসিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশরক্ষার সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছে। তিনি চিঠি পেয়েছেন ছেলে আহত হয়ে হাসপাতালে আছে। গ্রামবাসীর শুভেচ্ছা ও অনেক উপহার নিয়ে তিনি রওনা হলেন, কিন্তু হাসপাতালে পেঁছে জানলেন ছেলে সুস্থ হয়ে আবার ফ্রন্টে চলে গেছে।

সমস্ত উপহার তিনি অসুস্থ সৈনিকদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে রওনা হলেন ফ্রন্টের দিকে যদি ছেলের সাক্ষাৎ পান। নানা বাধা বিপত্তির মধ্যে চলতে চলতে নিজেই তিনি দেশরক্ষার সৈনিক হয়ে গেলেন। যুদ্ধ করতে করতে এক শহর পুনরুদ্ধার করবার পর তিনি ছেলের সন্ধান পেলেন। তবে সে তখন জীবিত নয়, শত্রুর বুলেটে তার মৃত্যু ঘটেছে।

ছবিটি অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী এবং মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ। একজন পিতার নিজের পুত্রের প্রতি কেবল অন্ধ স্নেহের কথা এখানে বলা হয় নি, সেই পিতা প্রত্যেক দেশের দেশরক্ষার জন্য সংগ্রামী সৈনিকদের পিতৃহৃদয়ের প্রতীক। এই পিতা যেমন নিজ সন্তানের জন্য, তেমন তার সহযোদ্ধাদের জন্য, আবার মাটির জন্য একই রকম মমতা পোষণ করেন। এই জর্জিয়ান চাষীকে দেখা গেল সযত্নে বর্ধিত আঙুরলতাগুলিকে যত্ন করতে। আঙুরলতাগুলিকে বিধ্বস্ত করার জন্য সোভিয়েট ট্যাঙ্ক চালকের সংগে বিবাদ করতে। সৃষ্টিকে রক্ষার জন্য তার কি আকুলতা। ছেলেকে যুদ্ধে পাঠিয়েছে, নিজেও বন্দুক ধরেছে, কিন্তু সে ধ্বংস চায় না, চায় সৃষ্টিকে বাঁচাতে। আর এক সময় দেখা গেল মাটির প্রতি তার কি গভীর মমতাবোধ। যুদ্ধের ভয়াবহতার মধ্যেও মাটি দেখে তার মন আকুল হয়ে উঠেছে, এই মাটিতে সোনা ফলত। সংলাপে, ব্যবহারে, ঘটনার বিকাশে ছবিটি পিতৃহৃদয়ের গভীরতাকে

'৮০তে আসিও না' ছবির একটি দৃশ্যে রুমা গুহঠাকুরতা, অমর মল্লিক, রবি ঘোষ, ননী মজুমদার ও গঙ্গাপদ বসু।

ব্যক্ত করেছে। মানুষের মনের শান্তির আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করেছে। ছবিটি বাঙালী দর্শকদের খুবই ভাল লাগবে, এবং সপরিবারে দর্শনযোগ্য।

ছবিতে পিতার ভূমিকায় সের্গো জাকারিয়াজে অতুলনীয় উচ্চাঙ্গের অভিনয় করেছেন। প্রথম দর্শনেই তাঁর মধ্যে সমগ্র সোভিয়েট জনগণের উদ্বেগ ও বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। তারই সংগে রয়েছে চাষীর সরলতা, সাহস ও মাটির প্রতি টান। এক সাধারণ মানুষের সাধারণ চরিত্রকে অভিনেতা মহৎ করে তুলেছেন। এই চরিত্রটিকে এত ভাল লাগে যে ছবির পর বার বার তার কথা মনে হয়। ছবিতে ক্যামেরার কাজে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখা যায়।

'এ সোলজার্স ফাদার'-এর পরিচালক রেজো ছেইদ্জে।

'পংকরে চল' ছবির একটি দৃশ্যে অনুপকুমার ও সবিতা বসু।

শোক-সংবাদ

ওয়াল্ট ডিজনে

বিশ্ববিখ্যাত চিত্র প্রযোজক ও পরিচালক ওয়াল্ট ডিজনে গত ১৪ই ডিসেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। ডিজনের ছবি কেবলমাত্র ছোটদের নয়, বড়দের কাছেও বিশেষ আকর্ষণের জিনিষ। ডিজনে বিরাট এক স্টুডিও নির্মাণ করেছিলেন। সেখানে তাঁর ছবি গ্রহণের উপযোগী জীবজন্তু থেকে রূপকথার নকল প্রাসাদ, ছোটদের রেল পর্যন্ত সবই আছে। এই স্টুডিও ডিজনেল্যাণ্ড নামে খ্যাত।

পরদেশী'র পরিচালক

সোভিয়েট চলচ্চিত্র পরিচালক ভাসিলি প্রোনিস ৬১ বছর বয়সে মারা গেছেন। তিনি রুশ-ভারত যুক্ত উদ্যোগে নির্মিত প্রথম ছবি 'পরদেশী' পরিচালনা করেছিলেন। ত্রিশ বছর পূর্বে তিনি চলচ্চিত্র শিল্পে যোগদান করেন।

শৈলেন্দ্র

বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্র শিল্পে সুপরিচিত গীতিকার শৈলেন্দ্রের নার্সিং হোমে জীবনাবসান হয়েছে। 'তিসরি কসম' ছবিটির তিনি প্রযোজক।

স্টুডিও খবর

৪০-তে আসিও না

রুদ্রাণী ফিল্মসের প্রথম ছবি '৪০তে আসিও না' জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের দিকে মুক্তিলাভ করবে আশা করা যায়। গৌর শী রচিত কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেছেন জয়দ্রথ। ছবির প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে আছেন রমা দেবী, রবি ঘোষ, জহর রায়, কমল মিত্র, অসিতবরণ, তরুণকুমার, সুব্রতা চ্যাটার্জী, রেণুকা রায়, শান্তা দেবী, গঙ্গাপদ বসু, অমর মল্লিক প্রমুখ। শ্রীবিষ্ণু পিকচার্সের পরিবেশনায় ছবিটি মুক্তিলাভ করবে।

বিশ্বরূপা থিয়েটারে 'জাগো' নাটকে অসিতবরণ।

'আয়ে দিন বাহারকে' ছবির চরিত্রে আশা পারেখ

জীবনমৃত্যু

উত্তমকুমার এবং সুপ্রিয়া দেবী অভিনীত 'জীবনমৃত্যু' ছবির কাজ ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। পরিচালনা করছেন হীরেন নাগ। এই ছবিতে অভিনয় করছেন কমল মিত্র, ছায়া দেবী, তরুণকুমার, সুব্রতা চ্যাটার্জী, অপর্ণা দেবী, প্রশান্তকুমার, এন. বিশ্বনাথন, সুমিতা বিশ্বাস প্রমুখ।

'কখনো মেঘ'-এর মহরৎ

গত ৯ই ডিসেম্বর রাধা ফিল্মস স্টুডিওতে চলচ্চিত্র ভারতীর প্রথম প্রয়াস 'কখনো মেঘ' ছবির মহরৎ অনুষ্ঠান হয়েছে। ছবিটি পরিচালনা করবেন অগ্রদূত। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করবেন উত্তমকুমার ও অঞ্জনা ভৌমিক। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন সুধীন দাশগুপ্ত।

'এ সোলজার্স ফাদার' ছবির একটি দৃশ্যে

সংবাদ বর্ণনা

জোলিও কুরির সম্পর্কে প্রামাণ্য চিত্র

বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী জোলিও কুরির জীবন অবলম্বনে সোভিয়েট ইউনিয়নে একটি প্রামাণিক চিত্র নির্মিত হয়েছে। ছবিতে দেখা যাবে ত্রিশ বছর বয়স্ক ফ্রেডারিক জোলিও মস্কোর পারমাণবিক বিজ্ঞান সম্মেলনে বক্তৃতা দিচ্ছেন। তার দু-বছর পর তিনি ও ফরাসী বিজ্ঞানী আইরিন কুরি রেডিও এ্যাকটিভিটি আবিষ্কার করেন। আইরিন এবং জোলিও কুরির বহু ছবি এই ফিল্মে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ছবিতে দেখান হয়েছে জোলিও কুরি ছিলেন সোভিয়েট সাহিত্যিক ইলিয়া ইরেনবুর্গের বন্ধু। ছবিতে ইলিয়া ইরেনবুর্গ বলেছেন, একজন মানুষ, বিজ্ঞানী ও সহৃদয় বন্ধু জোলিও কুরি সম্পর্কে।

গুরুত্বপূর্ণ দলিল চিত্র

ভলগা শহরের এক গৃহে এক মূল্যবান দলিল চিত্র পাওয়া গেছে। একটি কাঠের বাক্সের মধ্যে এই দলিল চিত্রটি সংরক্ষিত ছিল। অনেক বছর আগে এই বাড়িটি ছিল টুলিনভ নামক এক সিনেমা মালিকের। বাক্সের মধ্যে যে চিত্র পাওয়া গেছে সেটি ১৪৫ মিটার দৈর্ঘ্যের 'কাউন্ট লিও টলস্টয়'-এর জীবনচিত্র। তাঁর ৮০ বছর বয়সে ছবিটি গৃহীত হয়েছিল। ছবিটির নির্মাণকাল ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৮ সাল। পরিচালনা করেছেন আলেকজান্দার দ্রানকভ। ছবিটিতে টলস্টয়ের কন্যা, স্ত্রী এবং অনেক কৃষক ছেলেমেয়েসহ টলস্টয়কে দেখা যায়।

এস, এফ, সিনে ক্লাবের বর্ষশেষ

সায়েন্স ফিকশন সিনে ক্লাবের প্রথম বর্ষশেষ উপলক্ষে গত ৪ঠা ডিসেম্বর প্রিয়া সিনেমায় টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্সের সিনেমাস্কোপ রঙিন ছবি 'দি লস্ট ওয়ার্ল্ড' দেখান হয়েছে। গত ২৬শে জানুয়ারী এই ক্লাবের উদ্বোধন হয়। তিনমাস কালের মধ্যে এই ক্লাবের সহস্রাধিক সদস্য হয়েছে। এতদিন সদস্য গ্রহণ বন্ধ ছিল—বর্তমানে কিছু সংখ্যক সদস্য গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

সঙ্গীত কথা

গীত বিতান-এর রজতজয়ন্তী উৎসব

বিখ্যাত রবীন্দ্র সংস্কৃতি সংস্থা গীত বিতান-এর রজতজয়ন্তী উৎসব গত ৮ই হতে ১৪ই ডিসেম্বর সাড়ম্বরে রবীন্দ্র সদনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উৎসব উদ্বোধন করেছেন জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে 'আমাদের কথা' প্রসঙ্গে শ্রীশচীন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'গীত বিতানের পুরনো দিনের কথা' প্রসঙ্গে শ্রীনীহারবিন্দু সেন একটি ছোট প্রতিষ্ঠান থেকে গীত বিতান কি করে বড় হল সে কথা বর্ণনা করেন। ১৯৪১ সালের ৮ই ডিসেম্বর শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীর সভানেত্রীত্বে মাত্র কয়েকজন ছাত্রী ও তিনজন শিক্ষক নিয়ে যে প্রতিষ্ঠানের জন্ম, আজ ২৫ বছর পরে সেই প্রতিষ্ঠানে ৮০ জন শিক্ষক নিযুক্ত আছেন বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষাদানের জন্য; এবং ২২০০ ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা গ্রহণ করছেন। গীত বিতান যে এতবড় প্রতিষ্ঠান হয়েছে তাদের সাংগঠনিক রিপোর্ট না পেলে তা অনেকের পক্ষে জানা সম্ভব হত না। শহরে রবীন্দ্রসঙ্গীত নৃত্য ও সংস্কৃতি চর্চার এক প্রধান প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে এই গীত বিতান।

প্রথমদিন সন্ধ্যায় গীত বিতানের শিশুশিল্পীদের দ্বারা 'কালমৃগয়া' নৃত্যনাট্য প্রদর্শিত হয়। এই নৃত্যনাট্য পরিচালনা করেছেন অজিত দাস। ১০ই

দণ্ডকারণ্যে কোরাপুটে বিজয়া সম্মেলনে পুরস্কার বিতরণ করছেন সাপ্তাহিক বসুমতীর সম্পাদিকা শ্রীমতী জয়ন্তী সেন।

ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় 'শাপমোচন' নৃত্য-নাট্য। এই নৃত্যনাট্যের পরিকল্পনা ও পরিচালনা করেছেন অজিত চট্টোপাধ্যায়। সংগীত উপদেশনায় ছিলেন কনক বিশ্বাস ও নীহারবিন্দু সেন।

'শাপমোচন'-এর নৃত্য পরিকল্পনায় রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের রীতি অনুসারে ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যের বিভিন্ন ধারার মিশ্রণ হয়েছে। তার সঙ্গে লোকনৃত্য এবং পাশ্চাত্য ব্যালে বা সিংহলী নৃত্যের কিছুটা সংমিশ্রণ দেখা যায়। বিভিন্ন নৃত্য রীতির এই সম্মেলক নৃত্য—নৃত্য-নাট্যের বিষয়কে প্রকাশ করতে সাহায্য করেছে। বিশেষ করে যখন সমবেত নৃত্যের প্রয়োজন ঘটেছে তখন এই আঙ্গিক অপরূপ হয়ে উঠেছে। নৃত্যাংশে অরু-ণেশ্বর ও কমলিকার ভূমিকায় যথাক্রমে অসিত চট্টোপাধ্যায় ও গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায় নৈপুণ্যের সাথে রূপদান করেছেন। তাঁদের সহযোগী ছিলেন জয়শ্রী লাহিড়ী, অনিন্দ্যা রায়চৌধুরী, রণজিৎ সিংহ, শ্রীপর্ণা বন্দ্যো-পাধ্যায় প্রমুখ। পরবর্তী দিনগুলিতে 'তাসের দেশ' এবং 'মায়ার খেলা' নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়েছে। এই চারটি নৃত্য-নাট্যের মধ্যে 'শাপমোচন' সর্বাধিক সার্থক।

এই চারটি নৃত্যনাট্যের সঙ্গে সংগীতাংশে গীত বিতানের শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সুকণ্ঠের সার্থক সংগীতে অনুষ্ঠান সার্থক হয়েছে। শিল্পীদের মধ্যে অদিতি সেনগুপ্ত, চিত্রা সেনগুপ্ত, বেলা ভট্টাচার্য, অরূপ রায়, সুপর্ণা লাহিড়ী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। 'কালমৃগয়া'য় শিশুশিল্পী সর্বাণী সেনের কণ্ঠ সকলের ভাল লেগেছে।

এই চারটি নৃত্যনাট্য ছাড়া এবার এক-দিন রবীন্দ্রসংগীত ও দু-দিন ধ্রুপদী সংগীতের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। রবীন্দ্র-সংগীতের আসরে ছিলেন, অমিয়া ঠাকুর, সুচিত্রা মিত্র, ঋতু গুহ, নীতা সেন, দেবব্রত বিশ্বাস, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেন, অদিতি সেন-গুপ্তা, কমলা বসু প্রমুখ।

'জীবনমৃত্যু' ছবির একটি দৃশ্যে উত্তমকুমার

ধ্রুপদী গানের সংগীতের অংশ গ্রহণ করেছেন সেতারে নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কণ্ঠসংগীতে ওস্তাদ আমির খান। তাদের সঙ্গে তবলাসংগতে ছিলেন কানাই দত্ত ও শ্যামল বসু। শেষদিনে কণ্ঠসংগীতে তারাপদ চক্রবর্তী এবং সেতারে রবিশঙ্কর। তবলাসংগতে ছিলেন শঙ্খকুমার চট্টো-পাধ্যায় ও কানাই দত্ত।

গীত বিতান এবারের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসংগীত এবং ধ্রুপদী সংগীতের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করে সংগীত রসিকজনের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

আরো উল্লেখযোগ্য যে প্রতিদিন অনু-ষ্ঠানের প্রারম্ভে বিশিষ্ট অতিথির ভাষণের ব্যবস্থা ছিল। অতিথিবর্গের মধ্যে ছিলেন স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, প্রভাতকুমার মুখো-পাধ্যায়, ফাদার পি, ফাঁলো, কেন্দ্রীয়মন্ত্রী রাজবাহাদুর, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণিভূষণ চক্রবর্তী।

শাস্ত্রীয় সংগীত শিক্ষার্থী সম্মেলন

গত ৩রা ও ৪ঠা ডিসেম্বর উত্তরী সংগীত সমাজ কর্তৃক আয়োজিত দ্বিতীয় বার্ষিক শাস্ত্রীয় সংগীত শিক্ষার্থী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় উত্তর কলকাতার বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরি হলে। 'সুরছন্দা' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীনীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মেলন উদ্বোধন করেন। প্রধান অতিথি ছিলেন প্রখ্যাত ধ্রুপদীয়া শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন শ্রীহীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

দুইদিনব্যাপী এই সম্মেলনে বাংলা-দেশের বিভিন্ন জেলার এবং কলকাতার সংগীত শিক্ষার্থীরা অংশ গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ধ্রুপদে সাধনা মুখো-পাধ্যায় ও ভবানী ভার্গব; খেয়ালে গীতা বসু, বুলবুল চট্টোপাধ্যায়, শিখা বন্দ্যো-পাধ্যায়, গীতা সাহা, মায়া মিত্র, নীরা সরকার ও কিশলয় সেনগুপ্ত; ঠুংরিতে স্বরাজ রায়; তবলা লহরায় অভিজিৎ চক্রবর্তী; স্বরাজ ভট্টাচার্য ও স্বপন ঘোষ; সেতারে বিমল দাস, অমরেন্দ্রনাথ ভড় ও বন্দনা বসু; স্বরোদে সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভারতনাট্যম্ নৃত্যে রত্না চট্টোপাধ্যায়।

সম্মেলনে অতিথি শিল্পী হিসাবে শ্রীমতী ইরা সরকার প্রথমদিনের অধি-বেশনে খেয়াল পরিবেশন করেন। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে শ্রীবেঞ্জামিন গোমেশ সেতার বাজান।

অপারেশন বেইরুট গোয়েন্দা ছবিতে রিচার্ড হ্যারিসন ও ডোমেনিক বসেরো

গ্রন্থমেলা

বিপ্রলব্ধ—বিনয় চৌধুরী। পরিবেশক : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা-৯ দাম : দশ টাকা।

বিপ্রলব্ধ এপিকধর্মী উপন্যাস—কারণ সংসার ও সমাজজীবন থেকে যে সব জীবন ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন—তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-বেদনা-ব্যর্থতা এবং ভালবাসা চিরকালের। প্রতিটি জীবন খণ্ডবোধের মধ্যে সীমিত হলেও সমগ্র মানবসত্তার সঙ্গে তাদের জীবন-সত্য বিধৃত। ব্যাঙ্কে চাকরি করে পুষ্কর, ভবেশ প্রভৃতি বিংশ যুগের মানুষ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সংবাদে তাদের চিত্তেও চাঞ্চল্য জাগে। পুষ্কর স্বপ্ন দেখে নতুন এক সমাজ ব্যবস্থার। মূলত পুষ্কর ভাবপ্রবণ, কবি। সে গল্প লেখক। তার গল্পগ্রন্থ অভিনন্দিত। চিত্তে তার নেই প্রবঞ্চনা করার অভীপ্সা; মিথ্যার বিরুদ্ধে তার জেহাদ এ যুগে আশ্চর্যজনক মনে হলেও—সেটাই তার জীবনসত্য। তেমনি সত্য তার ভালবাসা—যে ভালবাসা সে দিয়েছিল সুভদ্রাকে। সুভদ্রাও ভালবেসেছিল পুষ্করকে। কিন্তু দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করা পুরুষের পক্ষে যতোখানি সহজ—নারীর পক্ষে ততোখানি নয়। কারণ সুভদ্রার সমাজ ছাড়া আর যা আছে—তা হচ্ছে বৈবাহিক বন্ধন। সেই বন্ধন ত্যাগ করা শেষ পর্যন্ত তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। কিন্তু ভালবাসার জ্বালায় পুড়ে পুড়ে দগ্ধ হয়েছে পুষ্কর। যুবরাজের ঔদ্ধত্যে চাকরি সে হারিয়েছে। আর চাকরি হারানোটাই এমন কিছু বড় নয়। কিন্তু যে মহৎ প্রেমের সে অধিকারী—তারি মধ্যে তার নির্বাসন—দেখে কোন পাঠকের হৃদয় না কেঁদে ওঠে। আমাদের মনে হয় ঔপন্যাসিক গ্রন্থের নায়ক পুষ্করকে এমনভাবে গড়েছেন—যে বাস্তবভূমিতে দুই পা রেখে দাঁড়িয়েও এক কল্পলোকের মানুষ। এবং এমন মানুষই হতে পারে শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের নায়ক।। তাই বিপ্রলব্ধ উপন্যাসটিকে শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের অন্যতম একটি—বলতে কোনো দ্বিধা নেই। যে হাহাকার যে জীবন-যন্ত্রণা পুষ্করের মধ্যে লক্ষ্য করেছি—তা কোনো গতানুগতিক পথে সীমাবদ্ধ নয়। মেসে থেকে পুষ্কর ব্যাঙ্কে চাকরি করলেও সাধারণের মধ্যে অসাধারণ: তাই তার মধ্যে অপূর্ব মিলন ঘটেছে কাব্যজিজ্ঞাসার সংগে সমাজচেতনার, সমাজচেতনার ভিত্তিভূমিতে ঐতিহাসিক বোধের—সর্বোপরি এমন একটি দর্শনের সে অধিকারী—যা ঔপন্যাসিকের মননজাত চিন্তার ফলেই একমাত্র সম্ভব হয়েছে। সেই কারণে মনে হয় এই উপন্যাস রচনায় শ্রীবিনয় চৌধুরী অভিজ্ঞতা, কল্পনা, আন্তরিকতা বা জীবনজিজ্ঞাসাকেই শুধু প্রতিফলিত করেন নি তাঁর সুগভীর জীবনদর্শনও প্রতিমুহূর্তে এক একজনের মধ্যে সঞ্জীবিত করে তুলেছেন। বিরাট উপন্যাসের মধ্যে প্রয়োজন অখণ্ড জীবন-বিন্যাস—যা দেশোত্তীর্ণ ও যুগোত্তীর্ণ, সেই জীবনবিন্যাস বিপ্রলব্ধের প্রতিটি পঙক্তিতে মূর্ছিত। নায়িকার কাছে শুধু পুষ্করই প্রতিহত নয়, বঞ্চিত হয়েছে সংসারী ভবেশ গুপ্ত পর্যন্ত তার স্ত্রীর কাছে। ভবেশ জজের ছেলে। ব্যাঙ্কের ল অফিসার। তবু তাকে বলতে হয়, 'আই অ্যাম বুইন্ড অ্যাজ এ হাসব্যান্ড, অ্যাজ এ ফাদার, অ্যাজ এ জেন্টলম্যান। আমার স্ত্রী ছেড়ে চলে গেছে আমাকে।' অথচ তার কি ছিল না। কন্যা জামাই, ছেলে। সংসারে থেকেও শান্তি কোথায়। অথচ সংসারে আবদ্ধ না থেকেও পুষ্কর ভালবাসতে গিয়ে পেল না শান্তি। শান্তনুর জীবনও কি অভিশপ্ত? সে লিখছে—'টিয়ার্স! অনেকদিন কাঁদি নি। স্ত্রীর মৃত্যুর রাত্রিতে কান্নাকে টুঁটি চেপে মেরে ফেলার পর—'

এই সুবৃহৎ উপন্যাসের আলোচনা স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। তবে এই জীবনধর্মী উপন্যাস বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করলো—এ কথা বলতে পেরে আমরা আনন্দিত। লেখকের উপন্যাস রচনার পরিকল্পনার সঙ্গে বর্ণনার এমন মেলবন্ধন ঘটেছে যে এতোবড় উপন্যাসের গতি কোথাও ব্যাহত হয় নি। বরং তা আরো সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে এতো ভিন্ন চরিত্রের সংগে লেখক আমাদের পরিচয় ঘটিয়েছেন—যে কারণে আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। সুজাতা—যে গুরুর কাছে গিয়েও লালসামুগ্ধ, কিংবা কাশীশ্বর—যে স্ত্রীকে বশংবদ করে রাখতে চায়—কিংবা ন্যাশনাল প্রতিষ্ঠানের নাম করে যে নিজের স্বার্থই দেখে—সেই যুবরাজ লেখকের নিপুণ সৃষ্টি পুষ্কর ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছিল—"কোথায় যেন শুধু আলোয় আলো ...আর ফুলের মালায় মালায় ছয়লাপ..." এই স্বপ্ন-কথা ভাবতে গিয়ে চোখের সম্মুখে জ্বল জ্বল করে ওঠে ত্রিশঙ্কু ও দেবযানী। ওরা লাভার। ওদের আত্মদর্শন শেষ পর্যন্ত মিথ্যা হয় নি।

আশা করি, উপন্যাসটি বহুল প্রচারিত হবে, এবং এ নিঃসন্দেহ যে এটি পাঠকদের গভীর তৃপ্তি দান করতে পারবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা—সম্পাদনা ডাঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—তপতী পাবলিশার্স, ৫।১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯ মূল্য—তিন টাকা।

ডাঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা উপন্যাসখানি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলীর সম্পাদিত সংস্করণের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ও অভিনব সংস্করণ। বাংলাদেশে অনেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাস সম্পাদনা করেছেন। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পাঠ্য হওয়ার জন্য কপালকুণ্ডলা, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল প্রভৃতি অনেকের দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে। এর মধ্যে ডাঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কপালকুণ্ডলাখানি কয়েকটি কারণে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। সম্পাদক ভূমিকায় ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণ, উপন্যাসের স্বরূপবিচার কপালকুণ্ডলার পরিবেশ রচনা, প্রকৃতিতত্ত্ব চিন্তা, উপন্যাসখানির নাটকীয়তা ও কাব্যধর্ম, রোমান্সের স্বরূপ, ট্র্যাজেডিতত্ত্ব ও উপন্যাসখানির ট্র্যাজেডি লক্ষণ; তার অতিপ্রাকৃত লক্ষণ ও সাংকেতিকতা, গঠনকৌশল, নামকরণ ও রসবিচার, চরিত্রবিচার প্রভৃতি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। কপালকুণ্ডলা নারীধর্ম সম্বন্ধে কতখানি সচেতন ছিল—সে সম্বন্ধে আলোচনাটি—অন্য গ্রন্থে তেমন পাওয়া যায় না। সম্পাদক মহাশয় বঙ্কিম-আলোচনা বিষয়ক বিভিন্ন মূল্যবান গ্রন্থ তাঁর সম্পাদনাকার্যে সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন। ডাঃ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত গ্রন্থখানি ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ উপকারে আসবে। আমরা গ্রন্থখানির বহুলপ্রচার কামনা করি।

মাঠে ময়দানে

শীতের মরশুমে দক্ষিণ কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কের মধ্যে প্রবেশ করলে দেখতে পাবেন, পার্কের উত্তরদিকে নেট লাগিয়ে একদল খেলোয়াড় একমনে ক্রিকেট অনুশীলন করে চলেছে। দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে অনুশীলনের দিকে দৃষ্টি দিলে বুঝতে পারবেন উপেক্ষা করার মত নন এ'রা। অবশ্য হবেই বা কি করে ক্রিকেট এ্যাসো-সিয়েশন অফ বেঙ্গলের প্রথম ডিভিশনের সদস্য মিলন সমিতির খেলোয়াড়েরা অনুশীলন করছে। দক্ষিণ কলকাতার ক্রীড়ানুরাগী এবং ক্রীড়ামোদীদের কাছে মিলন সমিতি নামটি শুধু পরিচিতই নয় প্রিয়ও বটে। কারণ দক্ষিণ কলকাতার তরুণ ক্রিকেট খেলোয়াড়দের পরিণত হবার পশ্চাতে এই মিলন সমিতির এক বিরাট ভূমিকা।

১৯২৭ সালে কয়েকজন ক্রীড়ানুরাগীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় জন্ম হয় মিলন সমিতি ক্লাবের। মিলন সমিতির প্রধান খেলাধুলো হল খেলার রাজা ক্রিকেট। সি, এ, বি ক্রিকেট লীগের জন্মকাল থেকেই মিলন সমিতি প্রথম বিভাগের নিয়মিত সদস্য। বিরাট কোন বিজয়ের বা রেকর্ডের সঞ্চয় হয়ত মিলন সমিতির সংগ্রহে নেই, কিন্তু ঐতিহ্যের পরশ আছে মিলন সমিতির এই ফেলে আসা দিন-গুলির মাঝে।

মিলন সমিতির শ্রীরঞ্জিত চ্যাটার্জী এবং শ্রী ডি পি রায়ের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে জানলাম যে প্রাক-স্বাধীনতা যুগে মিলন সমিতি কলকাতার বাইরে অনেকবার খেলে এসেছে। এই সফরের মধ্যে স্মরণীয় হল ১৯৩৯-৪০ সালের খুলনা সফর এবং ১৯৪৪-৪৫ সালে ঢাকায় জ্যাকসন কাপে অংশগ্রহণ।

১৯৫৮-৫৯ সালে বি, এন, আর এবং কালীঘাটকে পরাজিত করে মিলন সমিতি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হয়, কিন্তু মূল নক-আউটে মিলন সমিতিকে বিদায় নিতে হয় মোহনবাগানের কাছে পরাজিত হয়ে। ১৯৬৪-৬৫ সালে মিলন সমিতি আর একবার চ্যাম্পিয়নশীপের মূল খেলায় সুযোগ পায়।

মিলন-সমিতি বাংলা ক্রিকেটকে বহু খ্যাতনামা খেলোয়াড় উপহার দিয়েছে। ভারতীয় ফুটবল তারকা চুনী গোস্বামীর ক্রিকেটের হাতেখড়ি এই মিলন সমিতির নেটেই। সর্বভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন খেলোয়াড় প্রকাশ পোদ্দার এই মিলন সমিতি ক্লাবেই খেলা সুরু করেন। এ ছাড়া মিলন সমিতির একদিনের সদস্য এস রায়, ভাস্কর গুপ্ত, সুনীল বোস, অজিত দাশগুপ্ত এবং অবনী ঘোষ পরবর্তীকালে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। মিলন সমিতি ক্লাব সি, এ, বি লীগে একটি

ব্যাংককের এশিয়ান গেমসে সটপাট নিক্ষেপে বিজয়ী ভারতের যোগীন্দার সিং স্বর্ণ-পদক গ্রহণ করছেন।

কৃতিত্বপূর্ণ রেকর্ডের অধিকারী। লীগে সর্বনিম্ন রানে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার কৃতিত্ব এখনও মিলন সমিতির রেকর্ডের খাতায়, সুবার্বনকে মিলন সমিতি মাত্র ১৫ রানে অল আউট করে।

এ বছর মিলন সমিতির সভাপতি

শ্রীঅমিতাভ

শ্রীঅমর ঘোষ; সাধারণ সম্পাদক শ্রী বি, সি সরকার; ক্রিকেট সম্পাদক শ্রী আর কে সরকার। মিলন সমিতি থেকে ক্রিকেট এ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের কার্যকরী সমিতির সদস্য হলেন শ্রী ডি পি রায়।

এই মরশুমে মিলন সমিতির ক্রিকেট বাহিনীর সদস্যদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করছি।

অশোক দে (অধিনায়ক):—মিলন সমিতির ক্রিকেট দলের গত তিন মরশুমের অধিনায়ক অশোক দে প্রথম ক্রিকেট খেলা সুরু করেন দক্ষিণ কলকাতা সংসদে। এর পর তিনি এসে যোগ দেন মিলন সমিতি দলে এবং দীর্ঘ দু' বছর তিনি এই ক্লাবের ক্রিকেট দলকে যোগ্যতার সঙ্গে সাহায্য করছেন। অশোক দে ডান হাতের লেগ স্পিন বোলার, ব্যাটেও যথেষ্ট দক্ষ তিনি। বর্তমানে তিনি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার কর্মী এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ক্রিকেট দলের অধিনায়ক। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে

ভাল এ্যাথলেট হিসাবে অশোকের যথেষ্ট সুনাম আছে।

এ, পি, রায় (সহ অধিনায়ক) :— এ, পি, রায় প্রথম ক্রিকেট খেলা সুরু করেন এই মিলন সমিতি ক্লাবেই। দলের তিনি হলেন নির্ভরযোগ্য ওপনিং ব্যাটসম্যান। গত মরশুমে এ, পি, রায় মোহনবাগানের বিপক্ষে ১০১ রানে অপরাজিত থেকে সেঞ্চুরী করার কৃতিত্ব অর্জন করেন। জলপাইগুড়ি জেলা একাদশের পক্ষে ফুটবল এবং ক্রিকেট খেলার গৌরব তিনি অর্জন করেছেন। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের প্রাক্তন ছাত্র এ, পি, রায় কলেজজীবনে ক্রিকেট এবং ফুটবলে কলেজ দলকে শুধু সাহায্যই করেন নি, অধিনায়কত্বের ভারও গ্রহণ করেছিলেন।

এস, পোদ্দার :— মিলন সমিতির এই তরুণ ব্যাটসম্যানটি বর্তমানে যথেষ্ট পরিচিতি লাভ করেছেন ক্রীড়ামোদী মহলে। আশুতোষ কলেজের ছাত্র পোদ্দার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট দলের বর্তমানে নিয়মিত সদস্য। এস, পোদ্দার খেলোয়াড়ী জীবনের সুরু করেন এই মিলন সমিতি ক্লাবেই। মিলন সমিতির ওপনিং ব্যাটসম্যান তিনি।

সুবীর গাঙ্গুলী :— প্রথম হোয়াইট বর্ডারে ক্রিকেট খেলা সুরু করেন সুবীর গাঙ্গুলী এবং গত বছর তিনি মিলন সমিতিতে যোগদান করেন। সুইং বোলার এবং ব্যাটসম্যান সুবীর মিলন সমিতি ক্লাবের একজন নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়। গত বছর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট দলে স্থান লাভ করেন এবং আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় খেলায় একটি সেঞ্চুরী করার কৃতিত্ব অর্জন করেন। গত বছর লীগ খেলায় টালীগঞ্জ অগ্রগামীর বিপক্ষে ৯২ রান করার কৃতিত্ব অর্জন করেন।

অচিন্ত্য মুখার্জী :— ওপনিং বোলার এবং ব্যাটসম্যান অচিন্ত্য স্কুল ক্রিকেটে যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। অচিন্ত্য

অশোক দে

বাংলা স্কুল এবং পূর্বাঞ্চল স্কুলদলের পক্ষে খেলার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। সর্বভারতীয় স্কুল ক্রিকেটের শ্রেষ্ঠ সম্মান কুচবিহার কাপ বিজয়ী পূর্বাঞ্চল স্কুলদলের সদস্য ছিলেন তিনি। অচিন্ত্য প্রথম খেলা সুরু করেন মিলন সমিতি ক্লাবে। এরপর তিনি দল পরিবর্তন করে হোয়াইট বর্ডার এবং দক্ষিণ কলকাতা দলে খেলেন। ১৯৬৩-৬৪ ক্রিকেট মরশুমে পুনরায় মিলন সমিতি ক্লাবে প্রত্যাবর্তন করেন।

রঞ্জিত বোস :— রঞ্জিত বোস ১৯৬২-৬৩ সালে মিলন সমিতি ক্লাবে এসে যোগ দেন, পূর্বে তিনি সদস্য ছিলেন ভবানীপুর ক্রিকেট ক্লাবের। ব্যাটসম্যান এবং ভাল স্লিপ ফিল্ডার হিসেবে দলে তিনি খ্যাত। এ পর্যন্ত মিলন সমিতির পক্ষে তিনটি সেঞ্চুরী করেছেন কুমারটুলী, পুলিশ এবং রাজস্থানের বিপক্ষে।

জি, বোস :— এ বছর এরিয়ান্স ক্লাব থেকে এসে মিলন সমিতিতে যোগদান করেছেন। ডান হাতের অফ স্পিন বোলার গণপতি বোস গত বছর রঞ্জী ট্রফিতে উড়িষ্যার বিপক্ষে বাংলা দলের পক্ষে অংশগ্রহণ করেছেন। এ বছর তাঁর বোলিং সাফল্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আলিপুরদুয়ারের বিপক্ষে হ্যাট্রিক সহ চার রানে পাঁচটি উইকেট এবং মোহনবাগানের বিপক্ষে ৬১ রানে ৬টি উইকেট।

কে পারেখ :— প্রথম খেলা সুরু করেন বালক সংঘে এবং পরে যোগদান করেন মিলন সমিতি ক্লাবে। গত চার বছর তিনি মিলন সমিতির নিয়মিত সদস্য। ডান হাতের অফ স্পিনার পারেখ দলের পক্ষে প্রতি খেলায় উইকেট সংগ্রহ করেন এবং মিলন সমিতি দলের বোলিং আক্রমণের তিনি একজন নির্ভরযোগ্য সহায়ক।

দুর্গা চক্রবর্তী :— দলের নিয়মিত উইকেট রক্ষক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট দলে খেলার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। গত তিন বছর তিনি মিলন সমিতি দলকে সাহায্য করছেন। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার কর্মী দুর্গা চক্রবর্তী গত বছর কলকাতা স্টেট ব্যাঙ্ক দলের অধিনায়ক ছিলেন।

অতীতের খ্যাতনামা দুই প্রবীণ খেলোয়াড় প্রাক্তন রঞ্জী ট্রফি খেলোয়াড় অজিত দাশগুপ্ত এবং মণি গাঙ্গুলী বর্তমানে মিলন সমিতি ক্রিকেট দলকে সাহায্য করছেন।

এ ছাড়া মিলন সমিতি ক্রিকেট দলে আছেন দেবকুমার দত্ত; অরুণ সার্দা; এস ব্যানার্জী; জে শা; বি মুখার্জী; সমীর

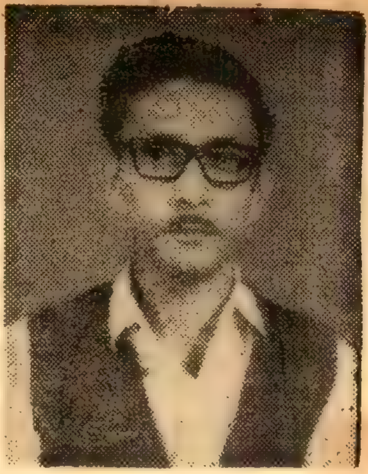

এ পি রায়

চক্রবর্তী (উইকেট রক্ষক) এবং আলোক সরকার।

এবারের ক্রিকেট মরশুমের সুরুতে মিলন সমিতির ক্রিকেট দল উত্তরবঙ্গ সফর করে এল। এবারের সফরের সমস্ত ব্যবস্থা করেছেন শ্রী ডি, পি রায় এবং সফরের সময় তিনি দলের সঙ্গে ছিলেন। উত্তরবঙ্গে তিনটি খেলায় মিলন সমিতি অংশ গ্রহণ করে। ১১ই নভেম্বর জলপাইগুড়িতে প্রথম খেলায় মিলন সমিতি অবতীর্ণ হয় জলপাইগুড়ি জেলা একাদশের বিপক্ষে। মিলন সমিতি ৫ উইকেটে ২৩১ রান সংগ্রহ করে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। অবনী ঘোষ শত রান সংগ্রহ করে অবসর গ্রহণ করেন, এস পোদ্দার ৭৭ রানে অপরাজিত থাকেন। আর, পি, রায় ৩৪ রানে ৪টি উইকেট দখল করেন। জলপাইগুড়ি জেলা দল ১০৭ রানে ইনিংস শেষ করে। এস বোস ৫৫ রান সংগ্রহ করেন; মিলন সমিতির এ সার্দা ৩০ রানে ৪টি উইকেট দখল করেন। মিলন সমিতি ১২৪ রানে জয়ী হয়।

১৩ই নভেম্বর কুচবিহারে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় খেলায় মিলন সমিতি ১৬৬ রানে জয়ী হয় কুচবিহার জেলা একাদশের বিপক্ষে। মিলন সমিতি ৫ উইকেটে ২৩৫ রানে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। সেঞ্চুরী করেন এ, পি, রায় এবং ১০১ রান সংগ্রহ করে তিনি অবসর গ্রহণ করেন, অচিন্ত্য মুখার্জী ৩৮ রান এবং অশোক দে ৩৬ রান সংগ্রহ করেন। কুচবিহার একাদশ মাত্র ৬৯ রানে ইনিংস শেষ করে। অরুণ সার্দা ২১ রানে ৪টি উইকেট সংগ্রহ করেন।

সফরের শেষ খেলা অনুষ্ঠিত হয় ১৪ই নভেম্বর আলিপুরদুয়ারে। মিলন সমিতি ৯ উইকেটে সংগ্রহ করে ১৭৫ রান। সুবীর গাঙ্গুলী ৫০ রান এবং এস ব্যানার্জী ৪১ রান করেন আলিপুরদুয়ার স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশন ৭৯ রানে ইনিংস শেষ করায় মিলন সমিতি ৯৬ রানে জয়ী

হয়। জি বোস চার রানে ৫টি উইকেট দখল করেন।

মিলন সমিতি ক্লাবের একজন নিরলস এবং একনিষ্ঠ কর্মী হলেন শ্রীরঞ্জিত চ্যাটার্জী। রঞ্জিত চ্যাটার্জীর সঙ্গে বর্তমানে আর একজন ক্রীড়ানুরাগী এগিয়ে এসেছেন তিনি হলেন শ্রী ডি, পি, রায়। আশা করি ভবিষ্যতে মিলন সমিতি ক্লাব আরও ভাল ফলাফল প্রদর্শন করবে এবং বাংলার ক্রিকেটের অঙ্গনে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে।

ব্রাবোর্নের প্রথম টেস্ট

ক্রিকেটের রাজকুমার গ্যারী আর নবাব ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন পিচের দিকে। বোম্বাইয়ে ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে ভারত-ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের প্রথম টেস্ট ম্যাচ। টস করলেন ভারতের এবং ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের দলপতি পতৌদির নবাব আর গ্যারী সোবার্স; পতৌদিই মুদ্রাক্ষেপণে জয়ী হয়ে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ গ্রহণ করলেন।

সরদেশাই আর জয়সীমা এলেন ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংসের সূচনা করতে। ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের দলপতি সোবার্স নতুন বল হাতে তুলে দিলেন হলের আর অন্যদিকের ভার দিলেন গ্রীফিথের ওপর। হলের প্রথম বলেই সরদেশাই করলেন দু' রান আর গ্রীফিথের প্রথম বলই জয়সীমা পাঠালেন বাউণ্ডারী। স্কোরবোর্ডে মাত্র দশ রান, হলের একটি বলের প্রচণ্ড গতির কাছে পরাস্ত হলেন সরদেশাই ব্যাট তোলারই সময় পেলেন না—সরাসরি বোল্ড আউট হয়ে ফিরে গেলেন। বোম্বাই মাঠের অতিপ্রিয় সুদর্শন আব্বাস আলি বেগ উইকেটে এসে দাঁড়ালেন। কুড়ি মিনিট উইকেটে অবস্থান করে, অধৈর্য বেগ হলের একটি ওভার পিচ বল সজোরে মারতে গিয়ে ভাঙা উইকেট পেছনে ফেলে শূন্য হাতে প্যাভেলিয়নের পথে পা বাড়ালেন; স্কোরবোর্ডের রান তখনও দশ। এবার এলেন বহু ম্যাচের ত্রাণকর্তা চান্দু বোরদে, কিন্তু বিদায় নিলেন জয়সীমা। গ্রীফিথের একটা ফুলটস বল আত্মরক্ষাত্মক ভঙ্গিমায় খেলতে গিয়ে ক্যাচ তুললেন উইকেটের পেছনে। মাটির কয়েক ইঞ্চি ওপর থেকে সেই দুরূহ ক্যাচ ধরলেন ঝাঁপিয়ে পড়ে উইকেটরক্ষক হেনড্রিকস্। অধিনায়ক পতৌদি এলেন হাল ধরতে, ভারতের অবস্থা খুবই সঙ্গীন চোদ্দ রানে তিনটি উইকেট খতম।

সুরু হল এক নতুন অধ্যায়, ভেঙে পড়া শক্তিকে আবার জাগিয়ে তুলতে লাগলেন বোরদে-পতৌদি জুটি, সতর্কতার সঙ্গে খেলে ধীরে ধীরে রান তুলে। ব্যক্তিগত ৪৪ রানে হলফোর্ডের বলে সরাসরি বোল্ড আউট হলেন পতৌদি। বোরদে তখন দুরন্ত, তাঁর সহায়ক হলেন সেলিম দুরানী। দুজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রানের গতি গেল বেড়ে। দু-শো কুড়ি মিনিট উইকেটে অবস্থান করে বোরদে

এস পোন্দার

বহু আকাঙ্ক্ষিত সেঞ্চুরী করলেন। সেলিম দুরানীও ঝড়ের গতিতে রান তুলে পঞ্চাশ অতিক্রম করলেন। গ্রীফিথের বলে একটা ওভার বাউণ্ডারী মারলেন দুরানী, কিন্তু পরের ওভারে সোবার্সকে ওভার বাউণ্ডারী মারার চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যক্তিগত ৫৫ রানে সরাসরি বোল্ড আউট হলেন। ইতিমধ্যে পতৌদির পর উইকেটে এসে নবাগত টেস্ট খেলোয়াড় অজিত ওয়াদেকার মাত্র আট রান করে প্যাভেলিয়ানে ফিরে গিয়েছেন; সুরু করেছিলেন ভাল কিন্তু সোবার্সের ফুলটস বলে গিবসের হাতে ধরা দিলেন। নাদকার্নী যখন উইকেটে এলেন প্রথম দিনের খেলা প্রায় শেষ হয়েছে; প্রথম দিনের শেষে ভারত ৬ উইকেট হারিয়ে সংগ্রহ করল ২৪১ রান বোরদে ১২০ রানে আর নাদকার্নী ছয় রানে অপরাজিত।

দ্বিতীয় দিনের সুরুতে মাত্র আর এক রান সংগ্রহ করে ভারতীয় দলের হীরো ব্যাটসম্যান চান্দু বোরদে ফিরে গেলেন। এরপর নাদকার্নী এবং কুন্দেরণও বেশিক্ষণ উইকেটে অবস্থান করতে পারলেন না। খেলা দেখালেন বটে বোলার ভেঙ্কট রাঘবন, একেবারে ওপনিং ব্যাটসম্যানের মত খেলতে লাগলেন। ব্যক্তিগত ৩৬ রান সংগ্রহ করে সোবার্সের বলে গিবসের হাতে আউট হলেন, শেষ হল ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস ২৯৬ রানে।

কনরাড হাণ্ট এবং বাইলো সুরু করলেন ইনিংস। পতৌদি এক ওভার পর থেকে স্পিনারদের সাহায্য গ্রহণ করলেন। বারো রানের সময় চন্দ্রশেখর নিলেন বাইলোর উইকেটে। রোহান কানহাই এলেন কিন্তু ২৪ রান সংগ্রহ করে চন্দ্রশেখরের বলে বেগের হাতে ক্যাচ তুলে বিদায় নিলেন। এলেন বুচার কিন্তু চন্দ্রশেখর তাঁকেও সরাসরি বোল্ড আউট করে ফেরৎ পাঠালেন, বোর্ডে রানসংখ্যা তখন ৮২। এলেন নবাগত লয়েড, খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন মারের চোটে, দ্রুতগতিতে রান তুলতে লাগলেন, সেঞ্চুরীর প্রায় মুখোমুখি এমন সময় তাঁর ব্যক্তিগত ৮২ রানে চন্দ্রশেখরের বলে উইকেটরক্ষক কুন্দেরাণের হাতে ধরা দিলেন। এলেন সোবার্স; তিনি এবং হাণ্ট দিনের শেষে ২ রানে এবং ৭৯ রানে অপরাজিত থাকলেন। ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ ৪ উইকেটে তুলল ২০৮ রান।

চতুর্থ দিন খেলা সুরু করে সেঞ্চুরী করেন হাণ্ট, কিন্তু ব্যক্তিগত ১০১ রানে হাণ্ট দুরানীর বলে বোল্ড আউট হয়ে ফিরে যান। সোবার্স এবং হলফোর্ড খেলতে থাকেন। দলীয় ২৯৫ রানে ভেঙ্কট রাঘবন বোল্ড আউট করেন সোবার্সকে ব্যক্তিগত ৫০ রানে। এরপর তিনটি উইকেট লাভ করেন চন্দ্রশেখর এবং তিনজনকেই তিনি সরাসরি বোল্ড আউট করেন। হলফোর্ড ৮০ রানে, হেনড্রিকস্ ৪৮ রানে, গ্রীফিথ ১৩ রানে চন্দ্রশেখরের হাতে আউট হন। ভেঙ্কটরাঘবনের বলে এল, বি, ডবলিউ হন হল। ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ ৪২১ রানে তাদের প্রথম ইনিংস শেষ করে এবং ভারতের থেকে অগ্রগামী হয় ১২৫ রানে। ভারতীয় দলের পক্ষে অসামান্য বোলিং নৈপুণ্যের পরিচয় দেন চন্দ্রশেখর একাই সাতটি উইকেট দখল করে।

দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা সুরু করে ভারতের দুই ব্যাটসম্যান সরদেশাই এবং জয়সীমা দৃঢ়তার সঙ্গে খেলা সুরু করেন। এই দু'জন ব্যাটসম্যান ৪২ মিনিটে ৪৪ রান সংগ্রহ করেন। জয়সীমা ২৬ রানে এবং সরদেশাই ১৬ রানে দিনের শেষে অপরাজিত থাকেন; বিনা উইকেটে ভারত সংগ্রহ করে ৪৪ রান।

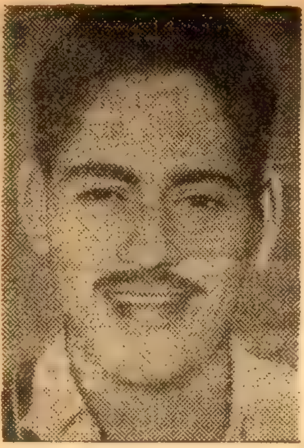

চন্দ্রশেখর

এই লেখা যখন প্রস্তুত করছি তখন তিন দিনের খেলা শেষ হয়েছে বাকি এখনও দুটো দিন। অবশ্য খেলার গতি দেখে মনে হচ্ছে ভারতের পক্ষে বর্তমানে জয়ের আশা করা অসম্ভব; খেলা ড্র করতে গেলেও ভারতের পঞ্চম দিন মধ্যাহ্ন-ভোজন পর্যন্ত ব্যাট করতে হবে। তবে এই অবস্থায় জয়ের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ। অনিশ্চয়তায় ভরা শেষ দুটি দিন কোন বিস্ময় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে কিনা কে জানে?

এশিয়ান গেমসে আলো-ছায়া

ব্যাংককের এশিয়ান গেমসের আসরে প্রথম বলি হলেন থাইল্যাণ্ড রয়াল এয়ার ফোর্সের একজন অফিসার। ফুটবল মাঠের প্রবেশ পথে দর্শকদের পায়ের চাপে পদদলিত হয়ে অফিসারটি মারা যান। ব্যাংককের ফুটবল মাঠে সুরু থেকেই চলেছে গণ্ডগোল। দর্শকদের উচ্ছৃংখলতা এবং খেলোয়াড়দের হাতাহাতি হবার পর, শেষে ঘটে গেল এই শোচনীয় দুর্ঘটনা। সাতজন দর্শক মারাত্মকভাবে আহত হল।

গত এশিয়ান গেমসের ফুটবল চ্যাম্পিয়ান ভারতীয় ফুটবল দুটি খেলায় পরাজিত হয়ে শোচনীয় ব্যর্থতা প্রদর্শন করে বিদায় গ্রহণ করেছে। আমাদের স্বর্গত কোচ রহিম সাহেবের মৃত্যুর পর আর ভাল কোচ পাওয়া গেল না। হাতুড়ে ডাক্তারের মত কোচ দিয়ে কি আর একটা জাতীয় দলকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আসরে নামান যায়? ভারত গ্রুপের খেলায় জাপানের কাছে ২—১ গোলে এবং ইরানের কাছে ৪—১ গোলে পরাজিত হয় এবং মালয়েশিয়াকে পরাজিত করে ২—১ গোলে।

বর্তমানে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান ভারতীয় হকিদল গ্রুপের খেলায় অপরাজিত অবস্থায় বিজয়ী হয়ে শেষ পর্যন্ত ফাইন্যালে পাকিস্তানের সম্মুখীন হল। ভারত জাকার্তায় পাকিস্তানের কাছে পরাজিত হয় ২—০ গোলে। ভারত প্রথম ১৯৫৮ সালে টোকিও এশিয়ান গেমসে হকির সম্মান হারায়, আশা করা যায় যে, এবার এশিয়ান গেমসে হৃত গৌরব ভারত পুনরুদ্ধার করতে পারবে।

ব্যাংককের এশিয়ান গেমসের আসরে ভারত প্রথম স্বর্ণপদক লাভ করে হাই-জাম্পে। হাইজাম্পে ভারতের ভীম সিং প্রথম স্থান লাভ করেন। ৮০০ মিটারে ভারতের প্রতিযোগী বড়ুয়া ১ মিনিট ৪৯·৪ সেকেণ্ডে নতুন এশিয়ান রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত করে স্বর্ণপদক লাভ করেন। সটপাটে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক পান ভারতের যোগীন্দার সিং। যোগীন্দার সিং ৫৩ ফুট ২½ ইঞ্চি দূরত্বে সটপাট নিক্ষেপ করে নতুন এশিয়ান রেকর্ড স্থাপন করেন। ভারতের আর

ডি পি রায়

একটি স্বর্ণপদক লাভ হয় ৪০০ মিটার দৌড়ে, এই বিষয়ে আজমীঢ় সিং প্রথম স্থান অধিকার করেন।

ভারতের ঊনিশ বৎসর বয়স্ক তরুণ এ্যাথলেট পরভীন কুমার উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব অর্জন করেন। পাঞ্জাবের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পরভীন কুমার গত কিংসটনের এশিয়ান গেমসেও স্বর্ণপদক

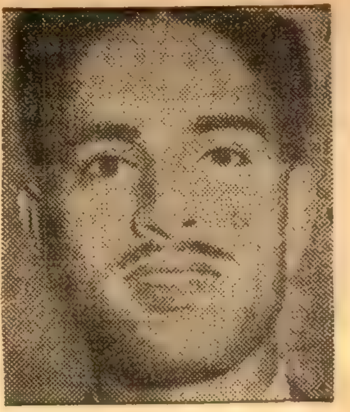

চান্দু বোরদে

লাভ করেন। ছয় ফুট সাত ইঞ্চি লম্বা পরভীন কুমারও ডিসকাস নিক্ষেপে নতুন এশিয়ান রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ৪৯·৬০ মিটার দূরে ডিসকাস নিক্ষেপ করে স্বর্ণপদক লাভ করেন।

ভারতের তরুণ টেনিস বাহিনী ব্যাংককে ব্যর্থতা প্রদর্শন করেছেন। ডাবলসে মিত্র-ধাওয়ান জুটি জাপানের ইশিগুরো-ওয়াটানাবে জুটির কাছে ৬—০, ৬—৪, ৬—২ সেটে পরাজিত হয়। অস্ট্রেলিয়ার ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলতে যাবার পথে একদিন ব্যাংককে অবস্থানরত কৃষ্ণান-জয়দীপ এই খেলা প্রত্যক্ষ করেন।

ভারতের ভলিবলদল কিন্তু প্রশংসনীয় ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করেছে ব্যাংককে। নিজেদের গ্রুপে ভারত অপরাজিত অবস্থায় চ্যাম্পিয়ান হয়। মূল প্রতিযোগিতায় ভারত প্রথম খেলায় পরাজিত হয় জাপানের কাছে। কিন্তু দ্বিতীয় খেলায় ভারত পরাজিত করেছে ইরান দলকে। আশা করা যাচ্ছে ভারতের ভলিবলদল অন্তত ভারতের পদক তালিকায় আর একটি পদক যোগ করবে। ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এশিয়ান গেমসের ফলাফল পর্যবেক্ষণের পর এই লেখা প্রস্তুত করা হয়েছে। আগামী সংখ্যায় পরবর্তী বিবরণ দেওয়া হবে। ১৭।১২।৬৬

সমাচার দর্পণ

আজ (২২শে ডিসেম্বর) বিবেকানন্দ বালিকা বিদ্যালয়ের (৩এ নবকুমার রাহা লেন, কলিকাতা-৪) বার্ষিক স্পোর্টস দেশবন্ধু মহিলা পার্কে অনুষ্ঠিত হবে।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসদ্কুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

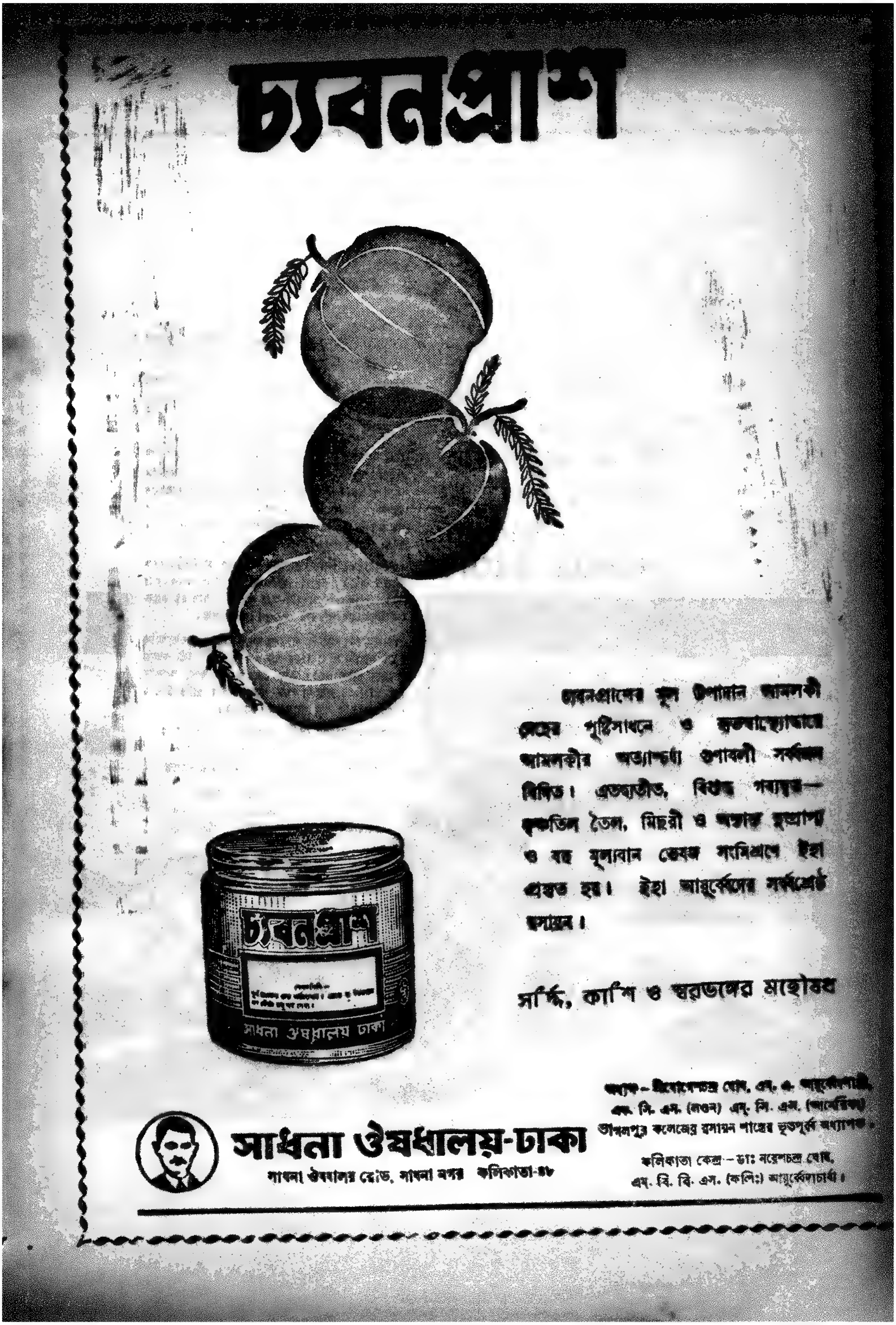
চ্যবনপ্রাশ
চ্যবনপ্রাশের মূল উপাদান আমলকী দেহের পুষ্টিসাধনে ও ভগ্নস্বাস্থ্যোদ্ধারে আমলকীর অত্যাশ্চর্য্য গুণাবলী সর্বজন বিদিত। এতদ্ব্যতীত, বিশুদ্ধ গব্যঘৃত— কৃষ্ণতিল তৈল, মিছরী ও অন্যান্য দ্রব্যাদি ও বহু মূল্যবান ভেষজ সংমিশ্রণে ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা আয়ুর্বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ রসায়ন।
সর্দ্দি, কাশি ও স্বরভঙ্গের মহৌষধ
সাধনা ঔষধালয় ঢাকা
অধ্যক্ষ— শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ. আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ. সি. এস. (লণ্ডন) এম. সি. এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর কলিকাতা-৪৮
কলিকাতা কেন্দ্র— ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম. বি. বি. এস. (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য্য।

23 DEC 1966

মাত্র ৩ টাকায় আপনি আপনার কম্পোস্টের খাদ* থেকে ৩,০০০ কিলো বাড়তি সার পাবেন প্রতি বছরে.... ...এনক্যাপ ব্যবহার করলে।

আপনার কম্পোস্টের খাদে এনক্যাপ ছিটিয়ে নিজেই যাচাই করে দেখুন।

এসো-র এই নতুন জিনিসটি কম্পোস্টের খাদের ওপর আগাগোড়া একটা কালো সর ফেলে দিয়ে সূর্যের উত্তাপ টেনে নিয়ে অধিকক্ষণ তা ধরে রাখতে সাহায্য করে এবং আবর্জনায় তাড়াতাড়ি পচন ধরিয়ে তোলে।

এনক্যাপ সময় বাঁচিয়ে দেয়। এনক্যাপ কম্পোস্ট তৈরীর সময়কে দেড়গুণ তাড়াতাড়ি ক'রে তোলে, আপনি বছরে দু'বারের জায়গায় তিনবার খাদের ব্যবহার করতে পারেন। ৩ মিটার × ১.৫ মিটার × ০.৯ মিটার মাপের খাদে এনক্যাপ ব্যবহার করলে সার পাওয়া যায় ৯ টন—আর তা না করলে পাওয়া যায় মাত্র ৬ টন।

এনক্যাপ নিশ্চিতভাবে সারকে নাইট্রোজেন-সমৃদ্ধ ক'রে তোলে। হাতে-নাতে পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে, এনক্যাপ ব্যবহার-করা খাদে যে সার হয় তাতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ দেড়গুণ বেশী থাকে।

এনক্যাপ অর্থের সাশ্রয় করে। এনক্যাপ ব্যবহার ক'রে আপনি সারা বছরে অনেক বেশী সার তৈরী করতে পারবেন খাদগুলিতে। তার চেয়েও বড় কথা, আপনি এনক্যাপ-এর জন্য যা খরচ করবেন তার প্রতি টাকায় আপনি বাড়তি সার পাবেন ৫০ টাকার।

এনক্যাপ : আরও বেশী নাইট্রোজেন-সমৃদ্ধ সার পাবার নতুন অল্প-খরচের উপায়।

* ৩ মিটার × ১.৫ মিটার × ০.৯ মিটার মাপের

এসো স্ট্যাণ্ডার্ড ইস্টার্ন ইনক.
(সীমিত দায়িত্ব সহ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সমিতিভুক্ত)
বোম্বাই কলিকাতা মাদ্রাজ নিউ দিল্লী

ESSO CHEMICALS

CME-9 BN

সাপ্তাহিক বসুমতী

সন্ত ফতে সিং-এর আত্মাহুতির সঙ্কল্প ত্যাগ

শেষ মুহূর্তে মীমাংসা

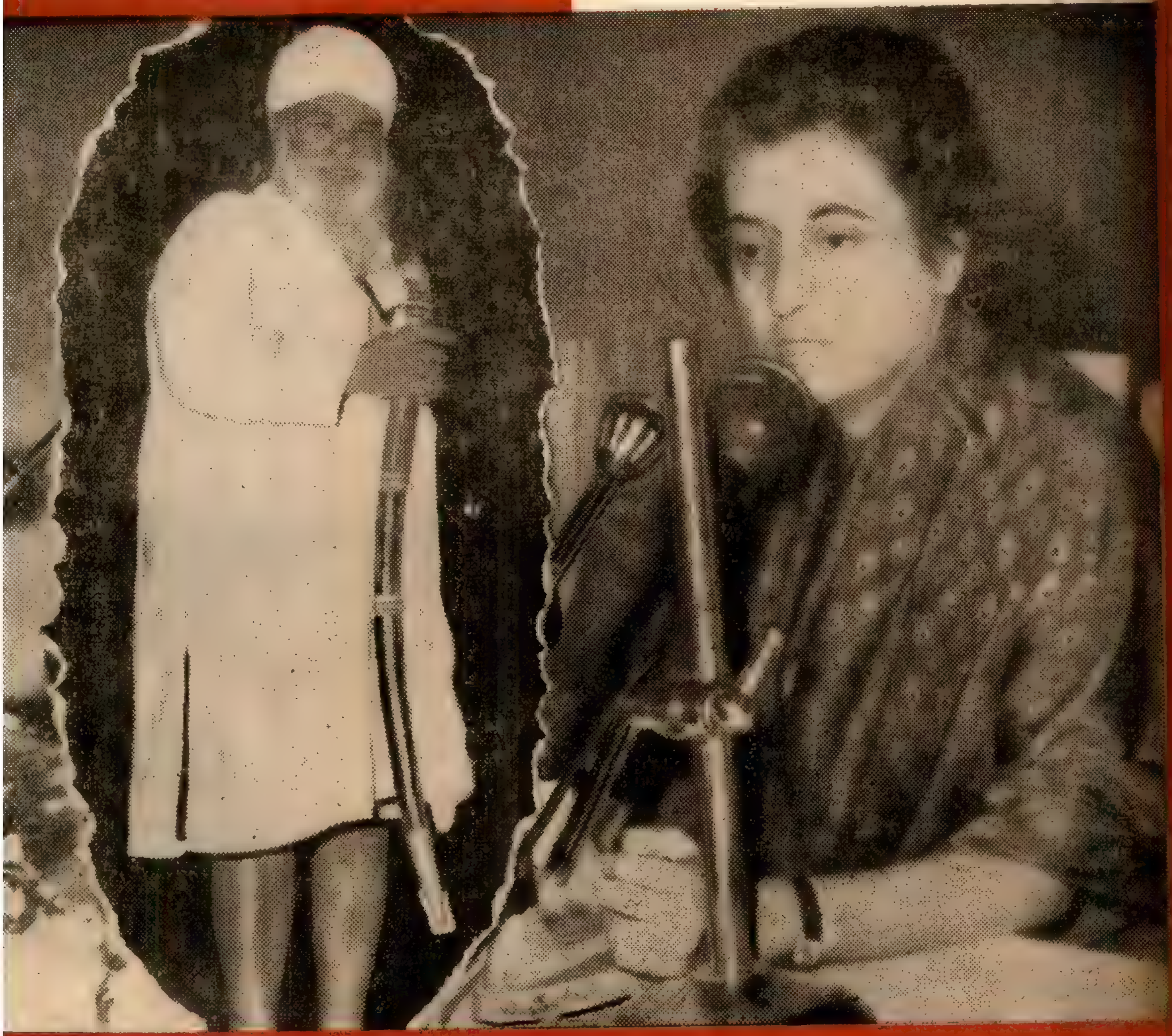

ঃ ২৯শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৩ই পৌষ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ • 29th Dec., 1966 * Vol. 71 N

সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		১৭৯৫
আজকের মানুষ		১৭৯৬
ভারতদর্শন		১৭৯৭
আন্তর্জাতিক		১৮০১
এইচ, জি, ওয়েলস-এর গল্প	— ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	১৮০৪
ভাড়াটে শববাহীরা (কবিতা)	— অমিয়কুমার হাটি	১৮১০
রমণীয় পৃথিবীর মোহে (কবিতা)	— বরুণ মজুমদার	১৮১০
বিশ্বসাহিত্যের আদিপর্ব	— ডঃ নরেন ভট্টাচার্য	১৮১১
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	১৮১৫
দুরাদস্পন্দকে (কবিতা)	— সুদীপা ভাদুড়ী	১৮২০

পৃথিবীর তরুণ-সমাজের হৃদয়জয়ী

সার ওয়াল্টার স্কটের গ্রন্থাবলী

দ্বিতীয় ভাগ
শরৎচন্দ্র মিত্র অনুদিত
আইভ্যানহো, হাইল্যান্ড উইডো, ফেয়ার মেড অফ পার্থ, সার্জনস্ ডটার
মূল্য—৩.০০

তৃতীয় ভাগ
সরোজনাথ ঘোষ অনুদিত
দি ব্রাইড অব ল্যামারমুর, লিজেন্ডস অব মনট্রোজ, দি এ্যান্টিকোয়ারি
মূল্য ১॥০ টাকা।

সাহিত্য-জগতের গৌরবপ্রভা—হাস্যরসাবতার—
নাট্যসাহিত্যের প্রবর্তক—রস-সাহিত্যের স্রষ্টা—
রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের

দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—জীবনী ও কবির সমালোচনা, নীলদর্পণ, জামাই বারিক, বিয়ে পাগলা বুড়ো, নবীন তপস্বিনী, কমলে কামিনী।

২য় ভাগে—সধবার একাদশী, যমালয়ে জীবন্ত মানুষ, পোড়ামহেশ্বর, কুঁড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ, লীলাবতী, সুরধুনী কাব্য, দ্বাদশ কবিতা, পদ্য সংগ্রহ।

প্রতি ভাগ দুই টাকা

সাহিত্য-সম্রাট—বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের ঋষি

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

—উপন্যাস—

দ্বিতীয় খণ্ড :—দুর্গেশনন্দিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, ইন্দিরা, রাধারাণী, সীতারাম। মূল্য—তিন টাকা

তৃতীয় খণ্ড:—আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা, দেবী চৌধুরাণী। [সচিত্র] মূল্য—৩, টাকা।

—সাহিত্য—

প্রথম খণ্ড :—কৃষ্ণচরিত্র, লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ (১ম)। মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড :—(১ম ভাগ অনুশীলন), মুচিরাম গুড়, বিবিধ প্রবন্ধ (২য়), বিজ্ঞান রহস্য। মূল্য—তিন টাকা

তৃতীয় খণ্ড :—শ্রীমদ্ভগবদগীতা, কমলাকান্ত, সাম্য, সাহিত্য-প্রসঙ্গ, মানস, ললিতা। মূল্য—তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বঙ্গদর্শন		১৮২১
আমি যাঁদের দেখেছি	পরিমল গোস্বামী	১৮২৫
সুবর্ণলতা (ধারাবাহিক উপন্যাস)	আশাপূর্ণা দেবী	১৮৩২
চিতাগ্নি (গল্প)	পারিজাত মজুমদার	১৮৩৫
'চোমংলামা'র চোখে উত্তরবঙ্গ		১৮৪০
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	শিলাদিত্য	১৮৪৩
রঙ্গজগৎ		১৮৪৭
গ্রন্থমেলা		১৮৫১
প্যাঠকমন		১৮৫২
খেলাধুলা	শ্রীঅমিতাভ	১৮৫৩

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল এম, এস, সি প্রণীত

আমার দেখা মেয়েরা

(রহস্য রোমাঞ্চের স্বর্ণখনি)

'রক্তনদীর ধারা', 'অপরাধ বিজ্ঞান' ও 'বিখ্যাত বিচার কাহিনী' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলির লেখকের সত্যঘটনামূলক রূপদান। মেয়েদের মন আর মতি স্বয়ং দেবাঃ ন জানন্তি। বিভিন্ন ও বিচিত্র নারী-চরিত্রের রহস্য উদ্ঘাটন ও যথাযথ অভিজ্ঞ ও দক্ষ লেখকের রচনার বৈশিষ্ট্যে বাংলা দেশের নারী-সমাজের এক অজানা অংশ সাধারণের চোখে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে। পড়তে পড়তে বই শেষ না করে ওঠা যায় না। বইয়ের আদ্যোপান্ত রুদ্ধশ্বাস উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা। উপন্যাসের চেয়েও সুখপাঠ্য।

মূল্য চার টাকা

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগ :—মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, পদ্মাবতী নাটক, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ. একেই কি বলে সভ্যতা? (বোর্ড বাঁধাই)—সাড়ে চার টাকা।

দ্বিতীয় ভাগ :—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্মিষ্ঠা নাটক, তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য, মায়া কানন. হেক্টর বধ। (বোর্ড বাঁধাই) সাড়ে তিন টাকা

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

রবীন্দ্রনাথ বলেন—"আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সংগীত এরূপ সহস্রধারে উৎসের মত কোথাও প্রোৎসারিত হয় নাই। এমন সুন্দর ভাবের আবেগ, কথার সহিত এমন সুরের মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না।"

বাঙ্গালার নব গীতিকবিতার প্রবর্তক, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির কাব্যগুরু ঋষি কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর রচনার সমাবেশ।

কবির জীবনী, সুবিস্তৃত সমালোচনা সহ সুবৃহৎ গ্রন্থ

মূল্য তিন টাকা

ডঃ মতিলাল দাশ প্রণীত

মতিলাল গ্রন্থাবলী

মূল্য—দুই টাকা

—ইহাতে আছে—

১। চলার পথে (উপন্যাস)
২। মনীষা (উপন্যাস)
৩। বিদ্যুৎশিখা (১১ খানি গল্প সমষ্টি)
৪। দীপশিখা (কবিতা সংকলন)
৫। চার্বাক (নাটক)

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

৭১ বর্ষ : ২৯শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পয়সা | বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত | Price : 25 Paise
বৃহস্পতিবার, ১৩ই পৌষ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ | সাপ্তাহিক পত্রিকা | Thursday, 29th December, 1966

রেশনের বরাদ্দ খাদ্যশস্য

মাসটা পৌষ। এ মাসের মাঠের ধান গোলায় তোলা প্রায় শেষ। এ মাসেই ধান-চালের দর হয় সস্তা। প্রচুর ব্যয়ে পর পর তিনটি যোজনায় বিস্তর বাঁধ নির্মাণ ও সেচ খাল তৈরি হলেও অনাবৃষ্টির ছুতোয় দেশে পৌষ মাসেও খাদ্যাভাবজনিত রেশনিং চলছে। তবে স্বাধীন ভারতের ভাগ্যের পরিহাস এমনই যে, এ মাসেই বিধিবদ্ধ রেশন এলাকায় একমাত্র যাঁরা ভারি পরিশ্রম করেন তাঁদের ছাড়া প্রতিটি বয়স্ক ব্যক্তির সাপ্তাহিক বরাদ্দ রেশনের খাদ্যশস্য দু' কিলোগ্রাম থেকে নামিয়ে ১·৭৫ কিলোগ্রাম করার নির্দেশ জারী করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। কলমের কালি এখনও শুকোয় নি বলেই প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী এই সেদিন ঘোষণা করলেন যে, ভারতে একজনকেও অনাহারে মরতে দেওয়া হবে না। আমাদের মনে হয়, কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীর মতে, রেশনের খাদ্যশস্যের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমিয়ে দেওয়ার পর আস্তে আস্তে শুকিয়ে মারাটা অনাহারে মৃত্যুর তালিকায় পড়ে না!

যা হোক কেন্দ্রের নির্দেশে খাদ্যশস্য কমিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের রাজ্য সরকার কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তা লক্ষণীয়। কারণ, রমজান উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন হোটেল-রেস্তরাঁয় কড়াকড়ি সরকারী নিয়মকানুন অনেকটা শিথিল করে দিয়েছেন। অন্নভোজীরাও কিছুটা খুশি। তারপর অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতোই কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ রাজ্য সরকারের কাছেও কি নিদারুণ দুঃসংবাদের এতো নয়?

অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশের অনেক রকম কারণ থাকতে পারে। যেমন খরা এবং বিদেশ থেকে সময় মতো সাহায্য না পাওয়া ইত্যাদি।

আমরা খরার কবলে কেন? এবং একটি বিশেষ সময়ের অন্তে বা পূর্বে আমরা খরায় কেন পড়ি বা বন্যায় কেন প্লাবিত হই—তার জন্যে প্রকৃতির কাছে অভিযোগ জানানো নিরর্থক। মোট কথা যাদের ভুল-ত্রুটিতে এ দুই-এর দ্বারা আক্রান্ত হই—তার মীমাংসা আজও সম্ভব হল না। আপাতত যে নতুন কথা শুনেছি—তাও গরিবদের হজম করতে হবে।

খরা নিয়ে এই যে হৈ-হট্টগোল, অথচ যা কঠোর সত্য—সংবাদপত্রে সেই খরার আগমন সংবাদ খুব বেশিদিনের নয়। বড়জোর ছ'-সাত মাস। তবু বিধির অলঙ্ঘ্য নিয়মের মতোই সমস্ত জিনিসপত্রের দাম নাকি খরার জন্যই বেড়েছে—মুদ্রার মূল্যহ্রাসের জন্য নয়। একথা আর কেউ বললে অগ্রাহ্য করা যেত; কিন্তু একথা বলেছেন সাংবাদিক সম্মেলনে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী।

বাজারে যাঁরা নিয়মিত যান বা তার খোঁজখবর রাখেন তাঁরা জানেন যে, খরার সংবাদ বের হবার পর থেকেই জিনিসের দর ওঠা শুরু হয় নি। পর পর দুবার মুদ্রামূল্য হ্রাস, কালোবাজার, বে-আইনী মজুত প্রভৃতি দাম বাড়ার পেছনে ক্রিয়া করছে। একথা বিশেষভাবেই বলা যায় যে, সমাজবিরোধী মজুতদার ও কালো টাকার পেছনে সরকার যদি ধাওয়া করতে পারতেন তাহলে জনসাধারণকে স্বাধীন ভারতে আজ এতো দুর্ভোগ ভোগ করতে হোত না এবং বিদেশী সাহায্যের জন্য হাত পাততে হোত না।

দুর্ভোগ এখন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে বললেও অত্যুক্তি করা হয় না।' বলা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন যে, শহরের মধ্যে ও তার আশেপাশের চাকচিক্যময় কয়েকটি লোক দর্শন করেই সারা ভারতের বিচার করা যায় না। আমরা স্বচক্ষে দেখা গ্রাম বাংলার কথা বলতে পারি। সেখানে স্বাধীন মানুষের আনন্দ বা উদ্যম কোনোটাই কম নয়, দুর্ভাগ্যের ব্যাপার আর্থিক শক্তি তাদের অত্যন্ত কম। তাই, কৃষি ব্যবস্থায় সরকারের নতুন উদ্যোগ উদ্দীপনার অভাবেই এককালের শস্য-শ্যামলা বাংলা আজ মৃতবৎসাতুল্যা। এবং যা কিছু বা হয়—তাও ফড়িয়াদের হাতে গিয়ে পৌঁছায়। এই কারণে এ সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকার ধান ও চাল সংগ্রহের ব্যাপারে যে নীতি অকস্মাৎ গ্রহণ করেছিলেন—তাতে সার্থক হওয়ার আশা সুদূরপরাহত। তা ছাড়া ফড়িয়াদের চরমতম নিষ্ঠুরতার জন্যই এই শীতকালে শাক-বেগুন-মুলো-টম্যাটো ও কপির দর আকাশচুম্বী।

শীতকালে রেশনে খাদ্যশস্যের বরাদ্দ কমে যাওয়ার ফলে তার পরিবর্ত খাবার হিসেবে লোকে কি খাবে? সরকার কর্তৃক বহুকথিত আলু ও কাঁচকলা বাজারে থাকলেও তার দাম এতো বেশি যে, সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে।

এ অবস্থায় রাজ্য সরকার খাদ্যশস্য যদি কমিয়েও দেন—তাতেও বিস্মিত হবার কোনো কারণ নেই, কেন না ক্ষীণকণ্ঠ প্রতিবাদ কেই বা শোনে?

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

দাবি আদায়ের হাজারো রকমফের। খেলনা পেতে হলে শিশুকে কেঁদে ভাসাতে হয়, শক্তিমান গায়ের জোরে সে-দাবি আদায় করে। রাজনৈতিক দল ঝাণ্ডা নেয় কাঁধে, গরম বক্তৃতা দেয়, শ্লোগান উচ্চারণ করে, চরমপন্থাও নিচ্ছে আজকাল ঘেরা ডালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এগুলি সবই সাংসারিক ক্রিয়াকর্ম, কিন্তু সংসারের যাঁরা বাইরে, তাঁদের যদি কোন পার্থিব দাবি থাকে তা আদায় করবেন কোন্ পন্থায়? গান্ধীজী এ সংসারের লোক হয়েও, স্বয়ং রাজনৈতিক নেতা হয়েও, আশ্রমজীবন যাপন করতেন। তাই উনি বিধান দিয়েছিলেন, অনশন সত্যাগ্রহের, যার নাম দিয়েছিলেন তিনি আত্মশুদ্ধি। তাতে ফল ফলে নি এমন নয়, প্রবল পরাক্রমশালী ইংরেজ সরকারকেও নত হতে হয়েছিল, দাবি তাঁর স্বীকার করে নিতে হয়েছিল। জগৎগুরু শঙ্করাচার্য গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই অনশনব্রত নিলেন? রাজনৈতিক নেতা অবশ্যি তিনি নন, তিনি সন্ন্যাসী, পুরীর গোবর্ধনপীঠের প্রধান যদিও রাজনৈতিক কারণেই তিনি অনির্দিষ্টকাল অনশন পালনের সঙ্কল্প নিয়েছেন, গো-হত্যা নিষিদ্ধ করতে হবে।

গো-হত্যা নিষিদ্ধকরণ আন্দোলন ভারতভূমিকে প্রকম্পিত করেছে, গত ৭ই নভেম্বর দিল্লীর রাজপথ সাতটি মানুষের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় গুরুত্বপূর্ণ রদ-বদল হয়ে গিয়েছে। সর্বদলীয় গো-রক্ষা কমিটি গঠিত হয়েছে যদিও অংশগ্রহণকারী নেতৃপদে বেশির ভাগই ধর্মীয় নেতাদেরই অধিষ্ঠান। কেন্দ্রীয় সরকার আইন করে গো-হত্যা নিষিদ্ধ করতে চান না যদিও গো-রক্ষা করতে তাঁদের আগ্রহ কারো চেয়ে কম নয়। আন্দোলনকারীদের মতে গরুমাত্রেই পূজ্য, তারা অবধ্য, সরকার গরুর শ্রেণী বিভাগ করেছেন, তাঁদের চোখে সকল গরু সমান নয়, যে গরু আর্থিক লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি করে তাকে রাখতে সরকারের কোন মাথাব্যথা নেই।

গত ২০শে নভেম্বর থেকে জগৎগুরু অনসন সুরু করেছেন, তাঁর একমাত্র পানীয় হরিদ্বার থেকে আনা পবিত্র গঙ্গা জল। তাও ইতিমধ্যে সরকারের মতের কোন পরিবর্তন না হলে ৩১শে ডিসেম্বর থেকে (গঙ্গা) জল স্পর্শও করবেন না। সারা ভারতে শঙ্করাচার্যের লক্ষ লক্ষ শিষ্য ছড়িয়ে রয়েছেন, গুরুর এ কৃচ্ছ্রতায় স্বভাবত তাঁরাও নীরব, নির্লিপ্ত থাকতে পারেন নি, বারাণসী, এলাহাবাদ, কানপুর, জম্মুর হাজার হাজার ভক্ত, সর্ব দলীয় গো-রক্ষা কমিটির সভাপতি শ্রীমান্ সুশীলকুমার, শম্ভু মহারাজ বিভিন্ন সময়ে অনশন পালন করে জগৎগুরুর কাজের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন।

অঘটনের ভয়ে সরকার জগৎগুরুকে পুরী থেকে গ্রেপ্তার করে পণ্ডিচেরীতে স্থানান্তরিত করেছিলেন, অর্থাৎ আগুনে হাত দিয়েছিলেন সরকার।

জগৎগুরু শঙ্করাচার্য

কারণ সঙ্গে সঙ্গে দেশব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় উঠলো, উত্তেজনায় ফেটে পড়লো পার্লামেন্টও। জগৎগুরুকে পুরীতে তাঁর মঠে ফিরিয়া আনা হলো, অনশন অব্যাহত রাখলেন তিনি। চেষ্টার কোন ত্রুটি হয় নি শঙ্করাচার্যকে আত্মপীড়ন থেকে নিবৃত্ত করতে, সরকার সমগ্র বিষয়টি বিবেচনা করার প্রতিশ্রুতি দিলেন, সাধু-সন্তরা গুরুদেবের মতি ফেরাবার চেষ্টা করলেন, বেসরকারী তরফ থেকে আবেদন জানানো হলো, আচার্যদেব অচল, অটল।

জাগতিক বিষয়ে যাঁর স্পৃহা নেই তিনি কেন রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লেন? প্রথমত বিষয়টিকে শঙ্করাচার্য ধর্মীয় ব্যাপার বলেই মনে করেন, দ্বিতীয়ত রাজনীতিতে তাঁর আগ্রহ আজ নতুন নয়, বরং তাঁর মধ্যে ধর্মের ও রাজনীতির দ্বৈত সত্তা পাশাপাশি বিরাজ করছে। বস্তুত জগৎগুরুর জীবনটাই বৈচিত্র্যপূর্ণ। শিক্ষকতা অধ্যাপনা দিয়ে তাঁর কর্মজীবন সুরু, ধর্মীয় জীবনযাপন করতে এসেই তিনি স্বাদ লাভ করেন রাজনীতির!

মঠাধ্যক্ষের আসন লাভ করা চাট্টিখানি কথা নয়, পরম সম্মানীয় পদ তো। এর ঐতিহ্যই যে বিরাট। ভারতে অদ্বৈতবাদের প্রবর্তন করেছিলেন শঙ্করাচার্যই, তিনিই ভারতের চতুঃসীমা, উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে চারটি অদ্বৈত মঠ স্থাপন করেছিলেন, পরে দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চিতে পঞ্চম মঠের প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর শিষ্যেরা। এই মঠগুলির প্রধান পদে যিনি আসীন হন পূর্ব ঐতিহ্য অনুযায়ী তাঁকেই জগৎগুরু শঙ্করাচার্য বলা হয়, পূর্ব ভারতের মঠটির অবস্থান পুরীতে। পুরীর জগৎগুরু শঙ্করাচার্যের আশ্রমিক নাম স্বামী নিরঞ্জন দেবতীর্থ। পুরীর গোবর্ধনপীঠের প্রধান বা জগৎগুরু শঙ্করাচার্য হবার গৌরব তিনি লাভ করেন মাত্র দু বছর আগে, ১৯৬৪ সালে।

কিন্তু সন্ন্যাসী-জীবনের আগে তাঁর রাজনৈতিক জীবনও ছিলো। তিনি রামরাজ্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদকের পদও এককালে অলঙ্কৃত করেছিলেন এবং সে সুবাদে প্রত্যক্ষ রাজনীতিও করেছিলেন। হিন্দু কোড বিলের বিরুদ্ধে তিনি জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু সেই রাজনীতির ব্যস্ত জীবন থেকে আশ্রমের শান্ত জীবনে কী করে তিনি গেলেন?

ধর্মের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছেলেবেলা থেকেই। রাজস্থানের ভায়াভার গ্রামে তাঁর জন্ম, বাবা গণেশলাল দ্বিবেদী সংস্কৃত সাহিত্যে খ্যাতিমান পণ্ডিত। বালক চন্দ্রশেখরও সংস্কৃত পড়ার জন্যে কাশী গিয়েছিলেন, অল্পদিনের মধ্যেই চন্দ্রশেখর ন্যায়, সাংখ্য, বেদান্ত, পুরাণ, উপনিষদে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন, বিভিন্ন পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্যে পুরস্কৃতও হন। অধ্যয়নের শেষে অধ্যাপনা।

ভারতের বহু সংস্কৃত কলেজ বা টোলের সঙ্গে চন্দ্রশেখর দ্বিবেদীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো, নিজের হাতে গড়েছেনও কয়েকটি বিদ্যাপীঠ। গুজরাটের নারায়ণী সংস্কৃত কলেজের তিনি অধ্যক্ষ ছিলেন, জয়পুরের মহারাজা সংস্কৃত কলেজেরও। কাশীর সঙ্ঘ ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের বেদান্ত বিভাগের তিনিই ছিলেন প্রধান, হরিদ্বারে ঋষিকুল ব্রহ্মচর্য আশ্রমেও তিনি বহুকাল অধ্যাপনা করেছেন। শঙ্করাচার্য দলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ করপাত্রিজীর প্রভাবে।

সাধারণ লোকের ওপর জগৎগুরুর প্রভাব অসামান্য, কিন্তু তিনি কি সর্বত্যাগী হয়েও সংসারীর মতো চাপ দিয়ে দাবি আদায় করবেন?

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী

এবারকার সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে যে সমস্ত প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, দেশের খাদ্য পরিস্থিতি সংক্রান্ত প্রশ্নটি স্বভাবতই সেখানে মুখ্য স্থান অধিকার করে।

খাদ্য দিয়ে মার্কিন মহল থেকে ভারত সরকারের ওপর সরাসরি কোন চাপ সৃষ্টি করা হয় নি বলে শ্রীমতী গান্ধী তাঁর পূর্ববর্তী সমার্থক বক্তব্য প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। যদিও তাঁকে বলতেই হয়েছে যে, জানুয়ারী মাসের পর যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে খাদ্য সাহায্য পাঠাবে কি না, তা সঠিক বলা যায় না। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মনে এই অনিশ্চিতির উৎস সন্ধানে অভিজ্ঞ মহল, সুতরাং এই ধারণা পাল্টাতে পারেন নি যে, খাদ্য নিয়ে চাপ সৃষ্টির চেষ্টায় যুক্তরাষ্ট্র বিরত হয় নি। নয়া বৎসর থেকে আমেরিকা নতুন যে শর্তাদি আরোপ করতে চায় তার অন্যতম হ'ল, সাহায্যগ্রহণকারী উন্নয়নশীল দেশে কতিপয় ক্ষেত্রে ব্যক্তিমালিকানায় পরিচালিত শিল্পের বিশেষ উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা করতে হবে। স্বভাবতই এ জাতীয় শর্ত আরোপের মূলে সাহায্যপ্রাপ্ত দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো নির্ধারণে খবরদারি করার প্রয়াসই পরিলক্ষিত হয়। প্রধানমন্ত্রী এসব প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন।

সোভিয়েট সাহায্য

সোভিয়েট দুনিয়ার কাছে সাহায্যের জন্য হাত পাতা হয়েছে কিনা, এ প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী সংগে সংগে বলেছেন, রাশিয়া নিজেই খাদ্য আমদানীকারী দেশ, সাহায্য সেখান থেকে কেমন করে মিলবে। কিন্তু সাংবাদিকরা নাছোড়বান্দা। তখনই পাল্টা প্রশ্ন ছোঁড়া হয়েছে ঃ কিন্তু, অস্ট্রেলিয়া তো খাদ্য বেচতে চায়; তা খাদ্য ক্রয়ের ব্যাপারে সোভিয়েট সাহায্য চাওয়া হয়েছে কি? প্রধানমন্ত্রীকে তখনও সরাসরি জবাব এড়িয়ে যেতে হয়েছে। বলেছেন, ভারতের অসুবিধার কথা অবশ্যই জানানো হয়েছে। আর তা যে সাধারণভাবেই করা হয়েছে, তাও বোঝা যাচ্ছে উত্তরের বয়ান থেকেই। তিনি জানিয়েছেন, সকল মিত্ররাষ্ট্রের কাছে যেমন, সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছেও তেমনি ভারতের অসুবিধাজনক খাদ্য পরিস্থিতির সংবাদ পাঠানো হয়েছে। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে, সেখান থেকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কোন সাহায্যই চাওয়া হয় নি। তথাচ শুক্রবারের সংবাদপত্র খুলতেই দেখা গেল. সোভিয়েট রাশিয়া খরাপীড়িত ভারতের জন্য নিঃশর্ত সাহায্য হিসেবে পাঠাচ্ছেন দু' লক্ষ টন গম।

প্রধানমন্ত্রীর সাংবাদিক সম্মেলন

এই গম পরিবহনের খরচও সোভিয়েট সরকারই বহন করবেন।

পাতিল দর্শন

নেহরুজীর পর নয়া রাজনৈতিক দর্শনের জন্মদান করার ব্যাপারে একনিষ্ঠ সাধক হিসেবে এদেশে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ নামডাক করবার চেষ্টায় অক্লান্ত আছেন বলেই সাধারণে জানতেন। সম্প্রতি ভারতবাসীর তো বটেই, তামাম দুনিয়ার পিলে চমকিয়ে দেওয়ার মতো এক রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে হাজির হয়েছেন স্বনামধন্য শ্রীযুত এস কে পাতিল মহাশয়। পাতিল মহাশয় পাক্কা সাহেবী (এদেশে 'সাহেব' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত) মেজাজের লোক। তাই তাঁর মহা মূল্যবান দর্শন হাজির করার সময় তিনি আদর্শবান মনুষ্যসমাজকে সরাসরি 'স্টুপিড' আখ্যায় বিভূষিত করে তাঁর উদ্ভট দর্শন হাজির করেছেন। স্বতন্ত্র পার্টির প্রবক্তারাও পাতিল দর্শনে তাজ্জব বনে যাবেন, হয়ত হাতও কামড়াবেন এই ভেবে যে, পাতিল সাহেবের এই মূল্যবান দর্শনটির তোপ দাগার আগেভাগে তাঁরাই কেন মহড়া নেন নি। কিন্তু কি আর করা যাবে। পাতিল সাহেবের দোসরা নাম একসিডেন্ট মিনিস্টার। পাতিল দর্শনও রাজনৈতিক দর্শনের লাইনে একটা প্রচন্ড দুর্ঘটনা।

পাতিল দর্শনের মোদ্দা কথা ঃ পুঁজিপতিরা যখন প্রকান্ড সব কলকারখানায় মূলধন বিনিয়োগ করছেন এবং সেই মূলধন বিনিয়োগের ফলেই যেহেতু অসংখ্য লোক প্রতিপালিত হচ্ছে, তখন পুঁজিপতিদের ক্যাপিটালিস্ট বলা যায় কী করে। তাঁরা তো সমাজ হিতৈষণায়ই সমর্পিত প্রাণ। আর কার্ল মার্ক্স নামক ভদ্রলোকটি ১১৮ বছর আগেকার এক দার্শনিক। কালের অমোঘ নিয়মে তাঁর দর্শন পুরোনো হয়ে দরকচা পড়ে গেছে। আজকের পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থায় মার্ক্সীয় ক্যাপিটালিজমের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য কারও মাথাব্যথা নেই (কী করেই বা থাকবে, শ্রীপাতিলের মতো ক্যাপিটাল-সমব্যথী আর কজন আছেন?)। অথচ মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা অনুধাবন করলে, পুঁজিবাদী তাঁরা নন, যাঁরা কোটি কোটি মুদ্রার মালিক এবং সেই মুদ্রা সমুদয় হাজার হাজার মানুষের ভাগ্যের সংগে জড়িত উৎপাদনব্যবস্থায় নিয়োজিত করে থাকেন। এখন, এই সহজ তত্ত্বটা মার্ক্সবাদীদের গোবর-পোরা?) মস্তিষ্কে অনুপ্রবিষ্ট হয় না! অথচ এই সত্যটা বুঝলেই এটাও বোঝা সম্ভব হত যে, ভারতে কেন, ভূভারতে কোথাও কোন ক্যাপিটালিস্টের অস্তিত্বই নেই, আর সেজন্যই সহজ ডিডাক্টিভ লজিক অনুসারে পাতিল সাহেবও কোন ক্যাপিটালিস্টের মিতা নন। হায় রে! কে ভেবেছিল, মাত্র বিশ শতকের শেষ পাদে এসে পাতিল সাহেবের মত জনৈক দার্শনিক মার্ক্সীয় চিন্তাকে এমন যুক্তিপূর্ণভাবে চিতায় তুলে যাবেন। পাতিল সাহেব বলেছেন, "আসলে 'ইজম' ব্যাপারটারই গোড়ায় গলদ।" একমাত্র বুদ্ধুরাই মনে করে যে, মানুষমাত্রেরই একটা (ইজম বা) ইডিয়লজি থাকতেই হবে।" পাতিল সাহেবকে অতঃপর কী বলা যাবে, শোধনবাদী নিশ্চয় নয়। তবে? তারও ওপর বিশেষরূপে সংশোধনবাদী? কিন্তু তাও বলা গেল না, তিনি স্বয়ং বাদাবাদীর প্রতিবাদী। তাঁর প্রচন্ড অর্থনীতির জ্ঞান দেখে প্রসঙ্গত একটি কথা মনে পড়ছে, সর্বশাস্ত্রে সুপন্ডিত জনৈক বর্ষীয়ান ব্যক্তি একটি ব্যাপারে প্রচন্ড ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন। তিনি কম্যুনিস্ট সমর্থিত প্রার্থীর বাক্সে ভোটপত্র দিয়ে এসে বলতেনঃ একটা কথা তোমরা কিছুতেই বুঝবে না যে, দেশে যদি পয়সাওয়ালা ধনী না থাকে

তবে অসময়ে টাকা যোগাবে কে? এই যে এতো ধর্মশালা, গরমে জলদানের ব্যবস্থা এসব কতকগুলো লোকের হাতে পয়সা আছে বলেই তো হচ্ছে। না হলে কোথায় পেতে। কল-কারখানায় কে দিত চাকরি? দেশে এতো বড় বড় কারখানা কে তৈরি করত? টাকাটা আসত কোত্থেকে।

তিনি কিছুতেই বুঝতেন না যে, টাকা জিনিসটার নিজস্ব কোন মূল্য নেই, ওটা বিনিময়ের সুবিধের জন্য একটি তৈরি-করা বিনিময় পরিমাপক প্রতীকমাত্র।

কিন্তু তিনি এটুকু বুঝতেন যে, হাজার হাজার লোককে শোষণ না করলে একজনের হাতে টাকার পাহাড় জমে না। তবুও একটি বিশ্বাস তাঁকে কিছুতেই পরিত্যাগ করে নি যে, জনৈকের হাতে অগাধ মূলধন না থাকলে সহস্রের উপকার সাধন সম্ভব নয়।

শ্রীপাতিলেরও সম্ভবত সেই "ম্যাল-অবজারভেশন" রোগে ধরেছে। তিনি ভাবতে শুরু করে দিয়েছেন যে, অগাধ টাকাওয়ালা লোকে উৎপাদনের কাজে অগাধ টাকা বিনিয়োগ করছেন বলেই তো অজস্র লোকের প্রভূত উপকার তথা সমাজ-কল্যাণের কাজ চড় চড় করে এগোচ্ছে। পাতিল সাহেবের এহেন বোধই তাঁকে "অপর সকল প্রগতিশীল চিন্তাবিদ্ নির্বোধ", এমন কথা ভাবাচ্ছে।

ভারতীয় এঞ্জিনীয়র সম্মেলনে (পশ্চিমাঞ্চলীয়) ভাষণদানকালে রেলমন্ত্রী শ্রীপাতিল এই উদ্ভট দর্শন উত্থাপন করে বলেছেন যে, কংগ্রেস ও সরকার 'গণ-তান্ত্রিক সমাজবাদ' দ্বারাই মার্ক্সীয় পচা দর্শনের "প্র্যাগম্যাটিক" বা বাস্তবধর্মী প্রয়োগে উদ্যোগী হয়েছেন।

পাতিল সাহেব পুঁজিপতির হাতে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার হাল দিয়ে সমাজে স্বর্গরাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখতে চান। এ-ও অবশ্য নতুন দর্শন নয়; মার্ক্স এঙ্গেলস এই 'ইউটোপিয়ান' বা কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদকে খণ্ডন করেই এগিয়ে-ছিলেন। কিন্তু শ্রীপাতিল সেই অষ্টাদশ শতকের শেষ ও ঊনিশ শতকের কাছা-কাছি যুগে প্রত্যাবর্তন করতেও ইতস্তত করবেন, কেন না কাল্পনিক সমাজতন্ত্র-বাদের খসড়াতেও মারাত্মক বক্তব্য ছিলঃ বিশ্বাস ছিল, কোন মহানুভব ধনী (বা ক্ষমতাশালী কর্তাব্যক্তি) যদি আদর্শ সমাজ পত্তনের জন্য মূলধন বিনিয়োগ করেন, তবেই আদর্শ সমাজের সৃষ্টি হবে।

পাতিলের মিত্রমহল আদর্শ সমাজ পত্তনের জন্য ভারতবর্ষে কোথাও অদ্যাপি মূলধন বিনিয়োগ করেছেন বলে জানা যায় নি। কিন্তু শ্রীপাতিল মনে করেন, ভারতে ক্যাপিটালিস্টই নেই। জানা ছিল না, শ্রীপাতিলও স্বপ্নবিলাসী ছিলেন; (কিংবা আসন্ন নির্বাচনের এফেক্ট?) তবে এক হিসেবে হয়ত শ্রীপাতিল আংশিক সত্য কথন করেছেন। অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে ভারত এখনও পুরোপুরি ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতেই উপনীত হতে পারে নি, সামন্ততান্ত্রিক আবহাওয়া আজও মাঠে-ময়দানে অবাধে বইছে। সুতরাং ক্যাপি-টালিজমের মক্কা মার্কিন দেশের মতো ক্যাপিটালিস্টের জন্ম ভারতে এখনও সম্ভব হয় নি। ভারতে এখন ক্যাপিটালিজমের ভ্রূণাবস্থা চলছে মাত্র।

শ্রীপাতিল কি ভারতীয় ক্যাপিটালি-জমের গর্ভকোষে নয়া অভিমন্যু! তর্ক-ব্যূহ ভেদ করার ধোঁয়াটে শিক্ষা গ্রহণ করছেন?

লোহিয়া প্রয়োগ প্রকল্প

পাতিল সাহেব চিরাচরিত ধনতান্ত্রিক রীতিতে দর্শনের গোড়ায় ধোঁয়া দিয়ে "প্র্যাগম্যাটিক এ্যাপ্রোচ" বা বাস্তব প্রযুক্তির প্রলাপ বকেছেন; একই দিনে দিল্লী প্রেস ক্লাবে ভারতের বিভিন্ন সমস্যাবলীর ওপর উত্তরদান প্রসঙ্গে ডঃ রামমনোহর লোহিয়া এখনই কিছু বাস্তব প্রযুক্তির সন্ধান দিয়েছেন। সমাজকল্যাণে মূলধন বিনি-য়োগ কেমন করে করা যেতে পারে, ডঃ লোহিয়ার তার জন্য একটি বিশেষ প্রয়োগ প্রকল্প আছে।

এস-এস-পি নেতা ডঃ লোহিয়া প্রধান-মন্ত্রী হলে কী করবেন, এমন প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আগেই তিনি ব্যক্তিগত আয়ের সর্বোচ্চ সীমাকে হাজার পাঁচশত টাকায় বেঁধে দেবেন। আর সঙ্গে সঙ্গে বাজার দরও বাঁধবেন। খুলে দেবেন সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার সমান সুযোগের পথ; তুলে দেবেন ভূমি-রাজস্ব আদায়ের প্রথা। আর উঠিয়ে দেবেন ইংরেজী ভাষার মালিকানা।

ডঃ লোহিয়া মনে করেন, দেড় হাজার টাকা সর্বোচ্চ আয় সীমিত হলে সমাজোন্নয়নে দেড় হাজার কোটি টাকার মূলধন সংগৃহীত হবে।

ডঃ লোহিয়া জানেন, ৫০ কোটি লোকের ৪৯ কোটিই ভারতে জন্তুর মতো জীবনধারণ করে।

ডঃ লোহিয়া কম্যুনিস্ট নন। কিন্তু তিনিও পাতিল সাহেবের মতো ধোঁয়ার আড়ালে ধনিক সম্প্রদায়কে আশ্রয় দিতেও চান না। মহানুভব ধনীর হাতে মূলধন তুলে দিয়ে সমাজোন্নয়নের অলীক কল্পনার সুযোগ যে আর নেই, এ চেতনার নাস্তিতেই পাতিল সাহেবের মনে কাল্পনিক সদিচ্ছা আশ্রয় গ্রহণ করছে। তা করুক। অমন ফেনায়িত মনোরাজ্যে অনেকেই বসবাস করছেন, কিন্তু পাতিল সাহেব মূর্খ বাছাই করতে গিয়েই গোল বাধিয়ে বসেছেন।

এমনিই হয়, চোখ বন্ধ করলেই যে 'কলিসন' এড়ানো যায় না, (বিরোধী খেতাব) "দুর্ঘটনা মন্ত্রী" শ্রীপাতিলের এ বোধ যতকাল না হচ্ছে, ততদিন তাঁর হাতে রেল দপ্তরের দুর্ঘটনাও ঘটতেই থাকবে।

নয় লক্ষ টন মার্কিন খাদ্য

পি-এল ৪৮০ অনুসারে ফেব্রুয়ারী-মার্চে যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে অতিরিক্ত নয় লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য প্রেরণ করছেন। এই মর্মে এক চুক্তি নয়াদিল্লীতে স্বাক্ষরিত হয়েছে ২৩শে ডিসেম্বর। স্বাক্ষরের পর মার্কিন রাষ্ট্রদূত শ্রীযুত চেস্টার বোলজ জানিয়েছেন যে, ভারতে খাদ্য প্রেরণ সম্পর্কে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্র সরকার বর্তমানে বিবেচনাধীন রেখেছেন।

বর্তমান চুক্তি অনুসারে যে খাদ্য আসছে তার অর্ধেক গম ও বাকি অর্ধেক মাইলোতে দেওয়া হবে।

আবার মূল্যবৃদ্ধি

ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে খুব শীঘ্রই চিনি এবং কয়লার মূল্যবৃদ্ধি হতে চলেছে।

কয়লার মূল্যবৃদ্ধির পক্ষে সরকারী সম্মতি দেওয়া হয়েছে শ্রী এ বি গাঙ্গুলী কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে। এই প্রতিবেদন যেহেতু বাংলা ও বিহারের কয়লাখনি অঞ্চল সম্পর্কেই তথ্য গবেষণার ফলশ্রুতি সেজন্য এতদঞ্চলেই মাত্র সাময়িক-ভাবে মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে। বলা বাহুল্য, কয়লার মূল্যবৃদ্ধি সর্বস্তরের উৎপাদিত দ্রব্যের ওপরও চাপবে এবং তার বোঝা সর্বস্তরের মানুষকেই বইতে হবে। তা ছাড়া মূল্যবৃদ্ধির ব্যাপারটা কাগজে-কলমে সাময়িক হলেও পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে, বাজার একবার চড়লে তা আর নামে না। এদেশে ব্যবসায়ী সমাজ ঊর্ধ্বমুখী। সুতরাং সাময়িক কথাটায় নিশ্চিন্ত হওয়ার কোনও কারণ নেই। কারণ নেই এই কারণেই যে, দর নামিয়ে বাঁধবার ক্ষমতা এদেশী প্রশাসন অদ্যাবধি অর্জন করে নি।

বিদায় নেহরুঃ বিদায় মেনন

ক্ষমতালাভের পর গান্ধীজীর ছবিতে মালা পরিয়ে, পিতামহদের যেমনভাবে আমরা ড্রইংরুমে রক্ষা করি, তাঁর স্মৃতি-রক্ষাও তেমনিভাবেই করেছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। নেহরুজীর পরলোক-গমনের পর নেহরুতত্ত্ব নিয়ে উচ্ছ্বাসের বন্যায় সেই সমস্ত বন্ধ্যা কংগ্রেসী নেতারা

ভাসমান হয়েছিলেন, নিজের ব্যক্তিত্বে নেতা হওয়ার যোগ্যতা যাঁদের নেই। কেবলমাত্র এঁদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল, তেজস্বী এবং আদর্শনিষ্ঠ, (যেমন শ্রী ভি কে কৃষ্ণমেনন) নেহরু-শূন্যতার যুগে তাঁরা নেহরু-চিন্তাকে উচ্ছ্বাসের বদলে কর্মে রূপায়িত করার প্রয়াস থেকে বিরত হতে পারেন নি। কিন্তু কংগ্রেসের দুর্বল দক্ষিণপন্থী শক্তি নেহরুর জীবদ্দশার শেষ পাদেই গান্ধী টুপী মাথায় চাপিয়ে, পঞ্চশীলের নামাবলী পরে, আধা সমাজতন্ত্রের শ্রীহরি পাদ-পদ্মের উল্কি ধারণ করে যজ্ঞাবলীর তান্ত্রিক সাধনায় তৎপর হয়ে ওঠেন। দলের অভ্যন্তরে তাঁদের খড়্গাঘাত শুরু হয়ে যায়। এসব দেখেশুনে শেষ জীবনে নেহরুজী নিজেই হতাশ হয়ে পড়েছিলেন এবং এঁদেরই নেপথ্য চাপে নেহরুনীতিতে শ্রদ্ধাশীল শ্রীমেননকে তাঁর মন্ত্রিসভা থেকে বিদায় দিতে হয়েছে। শ্রীমেননের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল। কিন্তু কংগ্রেস দলে সেটা কি একটা মারাত্মক ব্যাপার! আজ অনেক সাংঘাতিক অভিযোগও ধামা চাপা দিয়ে কি কেউ কেউ দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছেন না। কিন্তু মেননকে চালিয়ে যেতে দেওয়ার কোন প্রশ্নই ছিল না। মেনন নেহরুজীর আধা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। কংগ্রেস আধা কেন দু-আনা সমাজতন্ত্রের ঘেঁষও আর সইতে পারছে না। আর আজ সেটা প্রকাশ্যেই মুখ বাড়িয়েছে।

শ্রীমেননকে উত্তর বোম্বাই থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দিতে যাঁর প্রবল আপত্তি ছিল, সেই শ্রী এস কে পাতিল সম্প্রতি বে-পরোয়াভাবে বর্তমান কংগ্রেসের নয়া দর্শন হাজির করেছেন। (আলোচনা উপরে দ্রঃ)। শ্রীপাতিলের বিরুদ্ধাচরণে কংগ্রেস সভাপতি কামরাজ, নেহরু-কন্যা ইন্দিরা গান্ধীও টুঁ শব্দটি করতে পারেন নি। পাতিলীয় যজ্ঞে মেনন-বলি অবশেষে সমাধা হয়েছে। শ্রী ভি কে কৃষ্ণমেননকে কংগ্রেস ত্যাগ করে বেরিয়ে আসতে হয়েছে নীরবেই। কংগ্রেস সম্পর্কে কটূক্তি করতে তাঁর বেধেছে। শুধু বলেছেন, কংগ্রেসের ভেতরে থেকে কাজ করা আর সম্ভব নয়।

কোন প্রগতিশীল চিন্তা অবলম্বন করে কংগ্রেসে থেকে কাজ করব এ আশা আজ কেউই পোষণ করেন না। কংগ্রেস তাই ভেঙে টুকরো টুকরো হচ্ছে। পরোয়া নেই দক্ষিণপন্থী শক্তির। কেন না, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রকৃত শক্তিশালী কোন দল আজও মাথা তুলতে পারল না। অথচ এই নির্বাচনে কংগ্রেসবিরোধী শক্তির গুছিয়ে নেওয়ার একটা অভূতপূর্ব সুযোগ এসেছিল।

সমগ্র দেশব্যাপী কংগ্রেসবিরোধী মনোভাব সে সুযোগের সদ্ব্যবহারে সহায়তাও করত। কিন্তু দেখা গেল ফন্দিবাজি এবং ক্ষমতাদ্বন্দ্বে ভারতের পঞ্চাশ কোটি মানুষের স্বার্থপরের প্রতি-নিধিত্ব করেন এমন দলও কম যাচ্ছেন না। কংগ্রেসী দক্ষিণী শক্তি তাই বেপরোয়া-ভাবে বাম বিতাড়নে তৎপর হয়ে উঠলেন। নেতৃস্থানীয় কেউ কেউ পরম নিশ্চিন্তে বললেন, এ আর এমন কি একটা ঘটনা, কংগ্রেস ভেঙে ভেঙেই তো ব্যাঙের

শ্রীপাতিল

ছাতার মতো বিভিন্ন পার্টি গজিয়ে আসছে। যাঁরা যেতে চান যান না। এই ঔদার্য দেখেই কৃষ্ণমেননদের মতো কিছু নেতা জোর করে কংগ্রেসের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাকে ধরে রাখবার জন্য সর্বশেষ চেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন। কিন্তু তাও বুঝি আর সম্ভব নয়। মেনন বলেছেন, না, সম্ভব নয়। আরও অনেকেই বলছেন, সম্ভব নয়। প্রকৃত অবস্থা, সত্যই সম্ভব নয়। এখন কংগ্রেসে মনোনয়ন পাচ্ছেন রাজারাজড়া, ধনকুবেররা। বিশ বছরে সমাজতন্ত্রের চিন্তা বিশ বাঁও জলের তলায় তলিয়েছে, চাকা ঘুরেছে।

কিন্তু কৃষ্ণমেননরাই বা এখন কী করবেন? কৃষ্ণমেনন নিজে কি করবেন এখনও ঠিক করে উঠতে পারেন নি। তাঁর নির্বাচনী এলাকা, যে এলাকায় তিনি জে বি কৃপালনীর বিপক্ষে রেকর্ড ভোট সংগ্রহ করেছিলেন, যেখানে বিপুল নাগরিক সংখ্যা তাঁকে নির্বাচন প্রার্থী-রূপে চাইছেন। তাঁকে উত্তর-পূর্ব বোম্বাই থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অনুমতি না দিয়ে পাতিল গ্রুপ নিজেদের জনগণের সামনে আরও উন্মুক্ত করে মেলে ধরেছেন। জনগণও তার প্রত্যুত্তর দিয়েছেন কংগ্রেস ত্যাগের ও কংগ্রেস ত্যাগের পূর্বে কৃষ্ণমেননকে বিপুলভাবে সমর্থন জানিয়ে।

বৃহত্তর বোম্বাই-এর দুটি জেলার কংগ্রেস কমিটির তিনজন কর্ম-কর্তাসহ ছয়শতের ওপর কংগ্রেস কর্মী কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেছেন। মেনন-কেন্দ্রিক এতো শত ব্যাপারের পর শ্রী ভি কে কৃষ্ণমেননের পক্ষে রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ সম্ভব নয়। তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই হবে; কেমন করে দাঁড়াবেন সেটাই তাঁর বর্তমানের চিন্তা।

সন্ত ফতে সিং এবং নয়া বিভীষিকা

আকালী নেতা সন্ত ফতে সিং পাঞ্জাব পরিস্থিতিকে অপ্রত্যাশিতভাবে ঘোরালো করে তুলেছেন। তিনি অনশন ও আত্ম-বলির যে রকম পন্থা গ্রহণ করেছেন তার প্রথমটি এদেশে অপরিচিত না-হলেও আত্মবলির পথ অভূতপূর্ব। শুধু তাই নয়, ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী আত্ম-বলির পথ যে অনুমোদিত নয় সন্তজীকে ধর্মোপদেষ্টাগণ সেকথাও জানিয়েছেন।

সরকার এবং রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্ণধার স্বয়ং রাষ্ট্রপতি সন্তজীকে আত্মহননের এই মারাত্মক পথ পরিত্যাগ করার জন্য বারান্বয়ে অনুরোধ জ্ঞাপন করেছেন। রাষ্ট্রপতি স্বয়ং সন্তজীর দাবি বিবেচনার এবং যাতে কোন রাজ্যের ওপর অবিচার না হয় তারও আশ্বাস দান করেছিলেন; প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, পাঞ্জাব ও হরিয়ানার জন্য পৃথক হাইকোর্ট রাজ্যপাল ইত্যাদি ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করা হবে। কিন্তু সন্তজী পাঞ্জাবের জন্য জমি আদায় না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হবেন না বলে কঠোর সিদ্ধান্তে সমস্ত রকম আবেদন-অনুরোধকেই প্রত্যাখ্যান করেছেন।

সম্প্রতি লোকসভার স্পীকার হুকুম সিংও ব্যর্থ হয়ে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হয়ে-ছেন। সন্তজীর সঙ্গে আলোচনায় বিশেষ ফল হয় নি এই সংবাদ চরম হতাশার সঙ্গে সংগ্রহ করে সাংবাদিকগণ আপন-আপন কার্যালয়ে ফিরে এসেছেন।

অদ্য (২৫শে ডিসেম্বর) দিল্লীর একটি দৈনিক "প্যাট্রিয়ট" জানাচ্ছেন, শ্রীহুকুম সিং-এর নিকট থেকে তাঁদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানতে পেরেছেন যে, অধ্যক্ষ হুকুম সিং তত্রাচ সম্পূর্ণভাবে হতাশ হন নি। তিনি পুনরায় সন্তজীর সঙ্গে সাক্ষাতের আশা রাখেন এবং "যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ" এই প্রবাদেও বর্তমান পরিস্থিতিতেও তিনি আশ্বাসহত নন। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে, আজ থেকে দুদিন বাদে ভারতের এক সীমান্ত রাজ্যে যে ভয়াবহ পরিস্থিতি অনুষ্ঠিত হবে বলে দিবারাত্রের বিভীষিকায় কাল গণনা করতে হচ্ছে, সেই বিভীষিকার করালমূর্তি প্রকাশ

হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে হয়ত বা কিছু আশার আলোক প্রদীপ্ত হয়ে উঠতে পারে।

ভারতদর্শন যেদিন পাঠকের হাতে, সেদিন সন্তজীর আত্মবলি মারাত্মক তারিখটি অতিক্রান্ত হয়েছে। সুতরাং সেই তারিখে ভারতবর্ষকে কোন বিভীষিকাময়ী দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে হল না এই কামনাই রাখছি। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে সে সম্পর্কে কোনও পূর্ণ আশ্বাস নেই।

অনশন এবং আত্মবলির মারাত্মক পন্থা যে রাজনীতির প্যাঁচ কষে তার হাতে সরকার পুলিশ, মানুষের শুভেচ্ছা অনুরোধ সবই অক্ষম। সন্তজী সেই প্যাঁচই কষেছেন আর কষেছেন এমন একটি জটিল বিষয়কে কেন্দ্র করে যে বিষয়ে কেবলমাত্র নবগঠিত পাঞ্জাবের স্বার্থই নয়, হিন্দীভাষী হরিয়ানার স্বার্থও বিজড়িত। পাঞ্জাব ও হরিয়ানার সৃষ্টি মুহূর্তে সন্তজী তাঁর দাবি নিয়ে চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য টালবাহানা করতে পারতেন। তিনি তা করেন নি। আজ নতুন করে তিনি দাবি উত্থাপন করেছেন চণ্ডীগড় ও হরিয়ানা হিমাচল প্রদেশের অন্তর্গত কিছু পাঞ্জাবী ভাষাভাষী অঞ্চলের ওপর।

সর্বশেষ প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, যদি কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশ্যে চণ্ডীগড়কে পাঞ্জাবের অন্তর্ভুক্ত করতে এবং দাবিকৃত পাঞ্জাবী ভাষাভাষী অঞ্চলগুলি সম্পর্কে একটি কমিশন বসাতে রাজী বলে আশ্বাস দেন, সন্তজী তাহলে আত্মবলির বিভীষিকাময়ী পথ পরিত্যাগের কথা চিন্তা করতে রাজী আছেন। কমিশন সম্পর্কে আরও একটি দাবি এই যে, কমিশন কেমনভাবে গঠিত হবে আকালী নেতাদের সে বিষয়েও কেন্দ্রীয় সরকারকে অবহিত করতে হবে। বলা বাহুল্য, দাবি আদায়ের জন্য সরকারের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন এক জিনিষ; বিক্ষোভ প্রদর্শনের দ্বারা জনমত সৃষ্টি করে সরকারকে একটি প্রশ্নের ওপর গণদাবির সংহতি সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এক জিনিষ; আর সরকারকে ভয় দেখিয়ে, দেশে অনর্থের সৃষ্টি করার হুমকি দিয়ে, সরকারকে কোন তরফের একতরফা একটা সিদ্ধান্তে বাধ্য করা আর এক জিনিষ। শেষোক্ত পথ গৃহীত হলে কোনও সরকারের পক্ষে একাড সুসিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এমন অবস্থায় সরকারকে ব্যক্তি বা দলবিশেষের ইচ্ছায় পরিচালিত হতে হবে। এমন অবস্থা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়।

কিন্তু সন্তজী একজন বিচক্ষণ ও প্রশ্নের নেতা হয়েও এই অসম্ভব একটি পথকে গ্রহণ করেছেন দেখে দেশের জনগণ বিস্ময়ে এবং হতাশায় বিমূঢ়। সন্তজী আত্মদানের দ্বারা ভারতের সীমান্ত রাজ্যে কি অনর্থ সৃষ্টি করে যাবেন এ প্রশ্নের চেয়েও গুরুতর প্রশ্ন হল, সন্তজীর মতো এক প্রবীণ ও বিচক্ষণ নেতা এ হেন পথের পথিক হলে সেই মহাজন প্রদর্শিত পথ একটি মারাত্মক নজির সৃষ্টি করে যাবে, ভবিষ্যতে যা অনুসৃত হতে থাকলে নৈরাজ্যের আর অবশেষ থাকবে না।

ভারতদর্শনে "অনশন ও আত্মবলীর রাজনীতিকে কয়েক সংখ্যা আগে আমরা মারাত্মক পথ বলে আলোচনা করেছিলাম। পুনর্বার বলতে হচ্ছে, এ পথ সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক পথ। এই পথকে জবরদস্তি মূলক যুক্তিহীন অনর্থসৃষ্টিকারী পথ ক নিন্দা না করে উপায় নেই।

বিবর্তন—

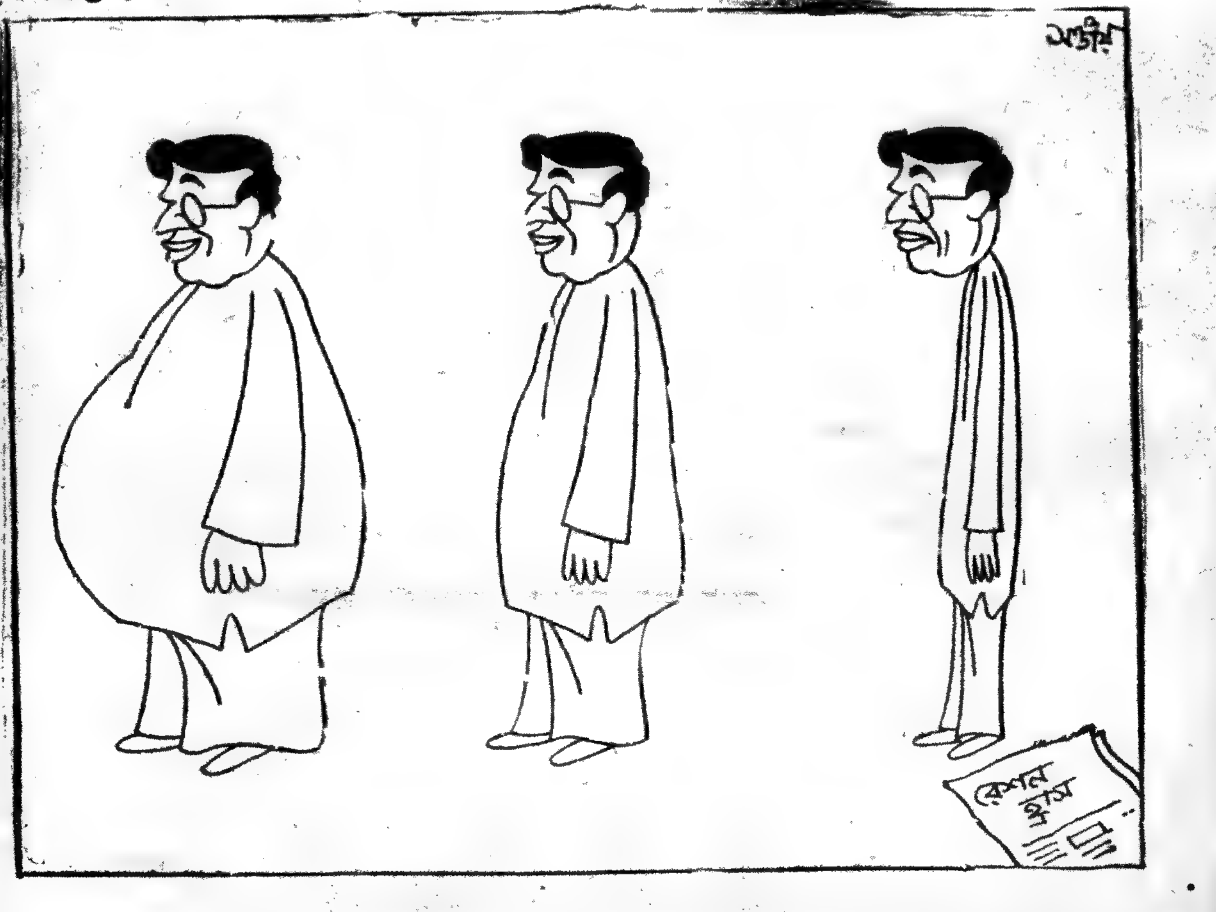

সামরিক আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় ওমর ধানী

যা অনিবার্য, অবধারিত ছিলো তাই হয়েছে, এয়ার ভাইস মার্শাল ওমর ধানীকে এখানকার সামরিক আদালত মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। ধানীর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ ছিলো, গত বছরের ব্যর্থ অক্টোবর অভ্যুত্থানের সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন।

কিন্তু ধানীকে শাস্তি দেওয়াই কি কর্তৃপক্ষের বা বিচারের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো? আমেরিকার প্রখ্যাত সংবাদ-সাপ্তাহিক 'নিউজউইক' এ-প্রসঙ্গে বলেছেন যেঃ

"The real purpose of the trial, however, was clearly to allow Dhani to shed some additional light on the suspicious role that Sukarno himself played in the Oct. 1 plot". সে-উদ্দেশ্য খানিকটা সফল হয়েছে, কিন্তু এখানকার জেনারেলেরা কিম্বা উগ্র সোয়েকার্নো-বিরোধীরা যতটা আশা করেছিলেন ততটা নয়। কারণ, গোড়ার দিকে ধানী তাঁর দোষ ঢাকতে চেষ্টা করেছিলেন, বলেছিলেন যে, তিনি যা কিছু করেছেন সবই প্রেসিডেণ্ট সোয়েকার্নোর জ্ঞাতসারেই বা অনুমোদন নিয়েই করেছেন। এখানকার চীনঘেঁষা কমিউনিস্ট পার্টি এ অভ্যুত্থান ষড়যন্ত্রের সঙ্গে লিপ্ত ছিলো বলেও ওমর ধানী তাঁর জবানবন্দীতে বলেছিলেন। তাঁর বিবৃতি পড়ে অনেকের মনেই এ-ধারণা হয়েছিলো যে, মৃত্যুভয়ে ভীত এয়ার কম্যাণ্ডার নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যেই সমস্ত দোষ সোয়েকার্নোর ঘাড়ে স্থানান্তর করতে চাইছেন।

কিন্তু শেষের দিকে, বোধ হয় মৃত্যুদণ্ড এড়ানো যাবে না এবং করুণার জন্যে সেই সোয়েকার্নোর কাছেই প্রাণভিক্ষা করতে হবে বুঝতে পেরে ওমর ধানী সামরিক আদালতকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ১লা অক্টোবরের অভ্যুত্থানে তিনি যে ভূমিকা নিয়েছিলেন তা জেনে-শুনেই নিয়েছিলেন সমস্ত দায়িত্বই তাঁরঃ

"I am not a child who likes to avoid responsibility by throwing it on others"—বলেছিলেন ধানী। তিনি ঘটনার আরো অভ্যন্তরে গিয়ে বলেছিলেন যে, তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেনাবাহিনীর একটি জেনারেল পরিষদ প্রেসিডেণ্ট সোয়েকার্নোকে সরাবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এবং এ-ষড়যন্ত্র মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তর সি-আই-এ'র নির্দেশে রচিত, তাই বিমানবাহিনী এগিয়ে এসেছিলো সে-ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে —এবং বিমানবাহিনী নিজেকে জড়ানোর সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার—লিখেছিলেন ওমর ধানী প্রেসিডেণ্ট সোয়েকার্নোকে যখন দেশে সোয়েকার্নো-বিরোধী আন্দোলনের ঢেউ উঠেছিলো।

ওমর ধানী যে আসলে যথেষ্ট সাহস রাখেন তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে তাঁর দেশে প্রত্যাবর্তনে। তিনি নেদারল্যাণ্ডে ছিলেন সেখান থেকে ইয়োরোপের বিভিন্ন রাজধানীতে, তারপর কাম্বোডিয়া। দেশে ফিরলে তিনি যে বন্দী হবেন বা তাঁর যে বিচার হবে এবং মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে একথা তিনি ভালো করেই বুঝতেন। কিন্তু তবুও তিনি বলেছেনঃ

"I came to Jakarta because I wanted to give an account of what I had done."

এর পরে কি প্রেসিডেণ্ট সোয়েকার্নোকেও আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে? দেশের বিভিন্ন অংশে "সোয়েকার্নোর বিচার চাই" দাবি উঠেছে। কিন্তু জেনারেল সুহর্তোকে বার বার বিষয়টি বিবেচনা করতে হচ্ছে, হচ্ছে এজন্যে যে জাকার্তা বা কয়েকটি অঞ্চলে সোয়েকার্নো-বিরোধিতা প্রবল হলেও সামগ্রিক ভাবে সোয়েকার্নোর জনপ্রিয়তা একটুও হ্রাস পায় নি, সাধারণ লোকের কাছে সোয়েকার্নো এখনো "রাজা" যে-রাজা কোন অন্যায় করতে পারেন না। এদিকে সোয়েকার্নো নিজেও সুযোগ পেলেই বলতে ছাড়েন না যে, তাঁর ক্ষমতা একটুও হ্রাস পায় নি, তিনিই দেশের সর্বময় কর্তা এবং কর্তা হিসেবেই তিনি যুগোশ্লাভিয়া ও মিশর সফরে যাবেন ভিয়েতনাম সমস্যা আলোচনা করতে!

পশ্চিম জার্মানীঃ

ডঃ কিসিংগার আস্তে আস্তে নতুন পদে নিজেকে মানিয়ে নিচ্ছেন, অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন। তিনি অর্থনৈতিক বিষয়ে পূর্বতন এরহার্ড সরকারের ব্যর্থতার কথা উচ্চারণ করতে দ্বিধা করেন নি। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রেও তিনি পুরানো সরকারের নীতি পরিবর্তন ঘটাতে পারেন বলে মনে হচ্ছে।

কিন্তু ব্যাভেরিয়াতে সম্প্রতি দক্ষিণ-পন্থী ফ্যাসিস্ট মার্কা স্ট্রসের ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সাফল্যের ফলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলি আশংকিত না হয়ে পারে নি। এ-প্রসঙ্গে কয়েকটি চেকোশ্লোভাক সংবাদপত্রের উদ্ধৃতি উল্লেখ-যোগ্য। রুদে প্রাভো বলেছেন ঃ শুধু বন সঙ্কটের সমাধানই নয়, ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সাফল্যের ফলে পশ্চিম জার্মানীর অন্য রাজনৈতিক দলগুলিকেও নতুন করে তাদের নীতি ও কার্যক্রমের কথা ভাবতে হবে। সমস্ত রকমের হুঁশিয়ারী সত্ত্বেও যদি বন এ-নীতি চালিয়ে যায়, তবে তার দ্বারা উগ্র দক্ষিণপন্থীদের হাতই শক্ত করা হবে। স্মাভা ক্রস্টা বলেছেন ঃ জাতীয়তাবাদের ঢেউ ইতিমধ্যেই সরকারী অনুমোদন লাভ করেছে, নব-নাৎসীবাদের উত্থানের ঘটনা অত্যন্ত অস্বস্তিকর এবং বিপজ্জনক। বন তো ওয়েমার নয়, ওয়েমার রিপাবলিকের ঘটনার যেন পুনরাবৃত্তি না হতে পারে সেজন্যই সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। একটি ব্রাতিশাভা দৈনিক বলছে যে, সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট পার্টির ওপর নতুন যে দায়িত্ব এসে পড়েছে তা যদি তারা পালন না করে তবে, পশ্চিম জার্মানীর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎই অন্যরকম হয়ে পড়বে। জাতীয়তাবাদের গোঁড়ামীকে যদি তারা সুস্থ ও সবল নীতি ও কাজের দ্বারা বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়, তবে তাদের

দলের ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। নব-নাৎসীদের 'বামপন্থীদের পেটাও' শ্লোগান যদি শক্তি সঞ্চয় করতে পারে, তবে, পশ্চিম জার্মানীতে ফ্যাসিজমেরই পুনরভ্যুদয় হবে বলে এ'রা আশংকা করেন। এই শ্লোগান নিয়েই এ্যাডলফ একদিন জার্মানীতে যুদ্ধে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন, আজ সেই এ্যাডলফের ভূমিকা যেন কাউকে নিতে না দেওয়া হয়। লিখেছে স্মেনা।

ডঃ কিসিংগার অবশ্য সোভিয়েট ইউনিয়নসহ পূর্ব ইয়োরোপের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তোলার কথা বলেছেন। বহু-নিন্দিত হলস্টেন থিয়োরী (যার দ্বারা পশ্চিম জার্মানী সেই সব দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক রাখতো না যারা সোভিয়েট ব্লক বা পূর্ব জার্মানীকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিয়েছে) বরবাদ করার কথা বলেছেন। সীমানা নিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ডের সঙ্গেও বিরোধ মীমাংসার কথা তিনি বলেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সুচতুর চ্যান্সেলর একথাও বলতে ভোলেন নি যে, একমাত্র যুক্ত জার্মানীই এ সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারবে। অর্থাৎ কবে সাত মণ তেল পুড়বে, তবে রাধা নাচবেন! মুশকিল হচ্ছে পশ্চিম জার্মানীকে এখনো বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না কেউ, আমেরিকাও পুরোপুরিভাবে নয়। এই যখন অবস্থা তখন তার আন্তরিকতা দেখানোর জন্যে সে যদি সোভিয়েট ব্লক ও ফ্রান্স-বৃটেনের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় করে তবেই কি তা মঙ্গলজনক হবে না?

ভিয়েতনাম :

ভিয়েতনামে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। সেক্রেটারী-জেনারেল মিঃ ইউ থান্টকে একটি ১৪-দফা প্রস্তাব সম্বলিত পত্র দিয়েছেন রাষ্ট্রসংঘের মার্কিন প্রতিনিধি মিঃ আর্থার গোল্ডবার্গ। চিঠিতে মিঃ ইউ থান্টকে এ ব্যাপারে "অবাধ ক্ষমতা" দেবার কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে সেক্রেটারী-জেনারেল যা যা ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন মনে করেন তিনি তাই গ্রহণ করতে পারেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাঁর সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

বড়দিন উপলক্ষে ভিয়েতনামে দু-দিন যুদ্ধবিরতির কথা বিবদমান পক্ষের মধ্যে আগেই স্বীকৃত হয়েছিল, মহামান্য পোপ ষষ্ঠ পল দু-দিনের যুদ্ধবিরতিকে আরো বাড়িয়ে অন্তত ৪৫ দিন করার আবেদন করেছিলেন (সাপ্তাহিক বসুমতী ২২-১২-৬৬)। মিঃ গোল্ডবার্গের প্রস্তাব পোপের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই রচিত বলে দাবি করা হয়েছে। অবশ্য ভিয়েতকংরা তাদের ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসবে মিলিত হয়ে আরো কঠোর সংগ্রামের সংকল্প গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তুত হবার ফলেও একটা পশ্চাৎ-ভূমি রচিত হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবে বলা হয়েছিলো :

১। ১৯৫৪ ও ১৯৬২-র জেনিভা চুক্তিই দঃ পূঃ এশিয়ায় শান্তির ভিত্তি হতে পারে।

২। দঃ পূঃ এশিয়া সম্পর্কে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হোক।

৩। পূর্ব শর্ত ছাড়াই শান্তি আলোচনায় আমেরিকা রাজী।

৪। বিনাশর্তে সাধারণভাবে এ বিষয়ে সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেও আমেরিকার আপত্তি নেই।

ইউ থান্ট

৫। অস্ত্র সংবরণ হবে সম্মেলনের দিকে বা প্রাথমিক আলোচনার দিকে প্রথম পদক্ষেপ।

৬। অন্যদের তাবৎ প্রস্তাবের সঙ্গে হানয়ের চার দফা প্রস্তাব আলোচনায় আমেরিকা প্রস্তুত।

৭। আমেরিকা দঃ পূঃ এশিয়ায় কোন ঘাঁটি চায় না।

৮। ভিয়েতনামে শান্তির পর সেখানে সৈন্য রাখার ইচ্ছা আমেরিকার নেই।

৯। দক্ষিণ ভিয়েতনামীরা যাতে নিজেদের পছন্দমত সরকার গড়তে পারেন সেজন্য সেখানে অবাধ নির্বাচন আমেরিকার কাম্য।

১০। ভিয়েতনামীরা দেশের সংযুক্তি সম্পর্কে নিজেরা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন।

১১। দঃ পূঃ এশিয়ার যে-কোন দেশ ইচ্ছা করলে নিরপেক্ষ থাকতে পারবে।

১২। দঃ পূঃ এশিয়ায় যুদ্ধের চেয়ে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে সম্পদ নিয়োগই আমেরিকার কাম্য।

১৩। হানয় আক্রমণ বন্ধ করলে আলোচনায় ভিয়েতকং উপস্থিতিতে বাধা থাকবে না।

১৪। শান্তির জন্য বোমা বন্ধে আমেরিকার যে-কোন আপত্তি নেই তা বার বার বলা হয়েছে, কিন্তু আমেরিকা তা বন্ধ করলে অন্যপক্ষের কী করা উচিত তা নিয়ে কেউ একটি কথাও বলেন নি।

বলা বাহুল্য মার্কিন প্রস্তাব আগেকার সমস্ত প্রস্তাব থেকে উদার হলেও একেবারে ত্রুটিমুক্ত নয়, এবং নয় বলেই মিঃ ইউ থান্ট তিনটি প্রস্তাব রেখেছেন এই মর্মে যে, উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ এখনি বন্ধ করতে হবে; দুপক্ষকেই পর্যায়ক্রমে সামরিক কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে এবং শান্তি আলোচনায় ভিয়েতকং সহ সকল পক্ষকেই অংশ গ্রহণ করতে দিতে হবে।

ভিয়েতনামে বা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মিঃ ইউ থান্টের আন্তরিক আগ্রহের কথা কারো অজানা নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে তাকে এ-বিষয়ে উদ্যোগী হতে বলেছেন তাতে সানন্দ সম্মতিই জানিয়েছেন, কিন্তু সমস্ত আলাপ-আলোচনার জন্য কি একটা সর্বনিম্ন ভিত্তির প্রয়োজন নেই? মার্কিন প্রস্তাবে উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণের কোনো উল্লেখ নেই অথচ আলোচনা আরম্ভ করতে গেলে এটা আগে দরকার; কারণ মিঃ ইউ থান্ট জানেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ শর্ত আগে মেনে না নিলে উত্তর ভিয়েতনামকে আলোচনা টেবিলে আনাই যাবে না। কাজেই ইউ থান্টের সমস্ত উদ্যোগই ব্যর্থ হবে যদি আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তিনি উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ থেকে নিবৃত্ত করতে পারেন।

কিন্তু এ শর্ত মানতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাজী হচ্ছে না কেন? সর্বশেষ প্রস্তাবেও সে বলেছে যে শান্তির জন্যে বোমাবর্ষণ বন্ধ করায় আমেরিকার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু তার ভয় বোমা বন্ধের সুযোগ নিয়ে উত্তর ভিয়েতনাম বা ভিয়েতকংরা তাদের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সৈন্যদের সমাবেশ করতে সক্ষম হবে। দ্বিতীয়ত একতরফাভাবে বোমাবর্ষণ বন্ধ করলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আমেরিকা-নির্ভর দেশগুলির মনোবল ভেঙে যাবে, তারা একে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরাজয় বলে মনে করবে। সেক্ষেত্রে তারা আমেরিকার নেতৃত্বে আস্থা হারিয়ে ফেলবে।

এবং তাদের মুরুব্বি পাল্টাবে বলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আশঙ্কা করে। সেটি হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরাট পরাজয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তার জুড়ে বসার সাধও সেক্ষেত্রে অপূর্ণ থেকে যাবে। এসব কারণেই আমেরিকা নীতি নিয়েছে এই যে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে এবং তা প্রয়োগ করেই উত্তর ভিয়েতনাম কিম্বা ভিয়েতকংদের কাবু করতে হবে। আলোচনার মাধ্যমে যদি শান্তিস্থাপন করতেও হয়, সে আলোচনা চালাতে হবে, সে-শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে আমেরিকার শর্তেই।

অবশ্য অস্ত্রের জোরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারবে কি-না এ বিষয়ে তার নিজের মনেই সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কারণ ১৯৬৪ সালে ২২ হাজার মার্কিন সৈন্য নিয়ে সে ভিয়েতনামের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো, তার আশা ছিলো দুদিনেই সে ভিয়েতকংদের আত্মসমর্পণে সক্ষম হবে। কিন্তু তারপর যত দিন গিয়েছে দক্ষিণ ভিয়েতনামের সরকারী সেনাদের হাত থেকে একটির পর একটি শহর ও জনপদ ভিয়েতকংদের হাতে চলে গিয়েছে; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শুধু সে-পরাজয়ের সাক্ষী হয়েছে। ইতিমধ্যে তার সৈন্যসংখ্যা বাড়িয়ে ৩,৬০,০০০ করা হয়েছে, উত্তর ভিয়েতনামের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ছাড়াও বেসামরিক অঞ্চলে বোমাবর্ষণ সুরু করেছে, হাইফং শহর বোমায় বোমায় ঝাঁঝরা করে দিয়েছে—এর পরেও উত্তর ভিয়েতনাম কী করে আমেরিকার শান্তির বুলিতে চট্ করে বিশ্বাস করতে পারে? ইউ থান্টকে যে উদ্যোগ নিতে বলা হয়েছে তাতেও তিনি বেশিদূর অগ্রসর হতে পারবেন বলে মনে হয় না যদি আমেরিকা তার শর্ত তিনটি আগেই মেনে নেয়। বড়দিন উপলক্ষে দুদিনের যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়েছিলো দুপক্ষে, কিন্তু তাকে বাড়ানো দূরে থাক, সেই স্বল্প শান্তিও তো বিঘ্নিত হয়েছে কামানের গোলা বর্ষণে, সুপারসোনিক বিমানের বোমা-নিক্ষেপে। ইউ থান্ট শান্তির জন্যে লড়বেন কী দিয়ে?

ফ্রান্স :

১৭ বছর আগে ১৯৪৯ সালে ন্যাটোর জন্ম হয়েছিলো, খুব জাঁকজমক করে এবং ঢাকঢোল পিটিয়ে প্যারিসে তার হেড কোয়ার্টার্স স্থাপন করা হয়েছিলো, কিন্তু সেই প্যারিস থেকেই পাততাড়ি গুটোতে হলো, ন্যাটোর ভাঙন অপ্রতিরোধ্য হয়ে দাঁড়ালো। অবশ্য যে-ভীতি একদিন ন্যাটোর জন্ম দিয়েছিলো সেটিই যখন অপসারিত বলে সদস্যেরা মনে করতে পারছেন, নিজেদের নিরাপদ মনে করছেন তখন আর জাতীয় বাজেট থেকে কোটি কোটি টাকা ঢেলে ও-হাতীর-চেয়ে-বেশি সংস্থাটি পোষার কিবা প্রয়োজন!

১৫-সদস্যাবিশিষ্ট ন্যাটো পরিষদের শেষ সম্মেলন হয়ে গেলো প্যারিসে, প্যারিস আর এ সংস্থার সম্মেলন-ভূমি হবে না। প্রেসিডেন্ট দ্য গল নোটিশ দিয়েছেন এখান থেকে ন্যাটোর সদর দপ্তর তুলে নিয়ে যেতে, এবং আগামী এপ্রিলের মধ্যে ফরাসী মাটিতে যেন ন্যাটোভুক্ত একটি সৈন্যও না দেখা যায়। ফ্রান্স নিজে ন্যাটো থেকে তার সামরিক বাহিনীকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে, ন্যাটোর সঙ্গে সে আস্তে আস্তে সমস্ত সম্পর্কই ছেদ করছিলো।

দুদিনের সম্মেলনে অবশ্য জাঁকের অভাব ছিলো না। বৃটেন থেকে এসেছিলেন পররাষ্ট্রসচিব জর্জ ব্রাউন, ডেনিস হিলে,

দ্য গল

জিম কালাঘান, পশ্চিম জার্মানী থেকে নতুন পররাষ্ট্রসচিব উইলি ব্রান্ড্ট, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পররাষ্ট্রসচিব ডীন রাস্ক, ফ্রান্স থেকে ছিলেন ক্যুভ দ্য মরভিল। অন্যসহযোগী রাষ্ট্রগুলি থেকেও তাদের প্রথম সারির নেতারা এসে সম্মেলনের শোভা বৃদ্ধি করেছিলেন।

সম্মেলন কি কাজ বা প্রস্তাব গ্রহণ করলো? পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে যৌথ ইস্তাহার রচনা করতে হয়েছে ন্যাটোকে, ফ্রান্স যে আর সংস্থায় নেই এ কথা রাষ্ট্রনায়কদের মনে রাখতে হয়েছে। অর্থাৎ ১৪টি রাষ্ট্রকে নতুন করে প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজতে হয়েছে প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা কমিটি গঠনের মাধ্যমে। একটা নতুন সাত সদস্যবিশিষ্ট নিউক্লিয়ার প্ল্যানিং গ্রুপ জন্ম নিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, পশ্চিম জার্মানী এবং ইতালী যার স্থায়ী সদস্য। এ-গ্রুপের উদ্দেশ্য হবে লক্ষ্য ঠিক করা এবং প্রয়োজন হলে ৭,০০০ পারমাণবিক অস্ত্রশক্তি পাঠানো ও প্রয়োগ করা। কিন্তু এখানেও অস্ত্রগুলির এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার মালিকানা থাকবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। পশ্চিম জার্মানীকে স্থায়ী সদস্য করার ফলে সে তার পারমাণবিক অস্ত্রের ক্ষুধা না মিটুক কিছুটা সান্ত্বনা যে সে পাবে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কিন্তু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে ফ্রান্সই ঠিক, প্রেসিডেন্ট দ্য গল-এর দৃষ্টি এ-বুড়ো বয়সেও অত্যন্ত স্বচ্ছ। ন্যাটো-কর্তাদের ধন্যবাদ, তাঁরা দেরিতে হলেও দ্য গলের যুক্তির সারবত্তাকে মেনে নিয়েছেন, তাঁদের কর্মসূচী পাল্টেছেন। সোভিয়েট-ভীতি থেকেই ন্যাটোর উদ্ভব হয়েছিলো ১৭ বছর আগে, কিন্তু এখন যে সে-ভীতি আর নেই, সোভিয়েট য়ুনিয়ন যে ইয়োরোপ আক্রমণ করবে না বা অন্য যে কোন ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রের চেয়ে শান্তির প্রতি তার আগ্রহ একটুও কম নয়—একথাই চার্লস দ্য গল বার বার বলে আসছেন। ফ্রান্স নিজে সোভিয়েট য়ুনিয়ন এবং পূর্ব ইয়োরোপের দেশগুলির সঙ্গে দ্রুতগতিতে বাণিজ্য সম্পর্ক থেকে সুরু করে মৈত্রী ও রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে চলেছে। কিন্তু ফ্রান্সের মোহমুক্তি ঘটলেও পশ্চিম ইয়োরোপ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ সত্য এতদিন উপলব্ধি করতে পারে নি। কিন্তু এখন প্যারিসে তাঁদের শেষ সম্মেলনে তাঁরা দ্য গল-এর নীতিকেই কার্যত অক্ষরে অক্ষরে মেনে নিয়ে যৌথ ইস্তাহার রচনা করেছেন।

ইস্তাহারে বলা হয়েছে যে, বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক মৈত্রী সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করা হবে। সোভিয়েট য়ুনিয়ন এবং পূর্ব ইয়োরোপের দেশগুলির সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপনের জন্যেও ন্যাটোর সদস্যেরা শপথ গ্রহণ করেন। বাস্তবিক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে পারস্পরিক সন্দেহ ও বিদ্বেষের বশে যে স্নায়ুযুদ্ধের সুরু হয়েছিলো পূর্ব ও পশ্চিম ইয়োরোপের মধ্যে তার আর কোন সঙ্গত কারণ আজ যখন নেই তখন শুধু একই ইয়োরোপের মধ্যে কাল্পনিক বিরোধের প্রাচীর তুলে লাভ কী? বিভিন্ন রাষ্ট্রকে প্রতিরক্ষাখাতে যে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করতে হয়েছে সেটিও অপচয় ছাড়া আর কি? রাষ্ট্রসঙ্ঘ যেখানে বর্তমান রয়েছে সেখানে আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বাহুল্য ছাড়া আর কী?

এইচ. জি. ওয়েলস্-এর গল্প

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

একাদশ অধ্যায়ঃ

দুই পৃথিবীর যুদ্ধ

যুদ্ধের গল্প আদ্যিকাল থেকে শুনেছে মানুষ। শুনেছে, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় দেশে দেশে যুদ্ধ হয়, যুদ্ধ হয় জাতির সঙ্গে জাতির। কিন্তু দুটি পৃথিবীর মধ্যে যে যুদ্ধ হতে পারে, তা ওয়েল্স্-এর কাছেই সবাই প্রথম শুনল। 'দি ওআর অব দি ওঅ্যার্লড্স্' পড়ে সবাই জানল, যুদ্ধের সম্ভাবনা শুধুমাত্র পৃথিবীর ভিতর থেকেই নেই, বাইরে থেকেও রয়েছে; প্রতিবেশী গ্রহ মঙ্গলের অধিবাসীরা আক্রমণ করেছে পৃথিবীকে।

সর্বনাশা সেই আক্রমণ। তার মুখে পৃথিবীর মানুষরা একেবারেই অসহায়। মানুষের কাছে পিঁপড়ে যেমন, মঙ্গলের প্রাণীদের কাছে ওদের অবস্থাও ঠিক তেমনি। ওরা মরছে দলে দলে। শত্রুর মারাত্মক আঘাত প্রতি মুহূর্তে ওদের ধ্বংসকে ডেকে আনছে। এ ছাড়া প্রতিরোধের নামে যা কিছু গড়ছে ওরা, স্রোতের মুখে খড়কুটোর মতোই তা' ভেসে যাচ্ছে। সেই ভেসে যাওয়া, সেই অবলুপ্তি হতে উন্মুখ মানবসভ্যতা শেষ অবধি কেমন করে রক্ষা পেল, আলোচ্য কাহিনীতে আশ্চর্য বিচক্ষণতার সঙ্গে তা' বলা হয়েছে; এবং বলার মধ্যে অভিনবত্ব হল এই যে, লেখক সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য এক ঘটনাকে পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। কাহিনীটি পড়তে বসে আমরা যেন দেখতে পেয়েছি মঙ্গলগ্রহের সেই ভয়ঙ্করদের। দেখেছি, অতিকায় সিলিন্ডারে করে গ্রহান্তর থেকে আসছে ওরা; সিলিন্ডারটি শীতল হবার পরেই তা' থেকে মূর্তিমান বিভীষিকার মতো বেরিয়ে আসছে। প্রথম সিলিন্ডারটি নেমেছে ইংল্যান্ডের ওঅকিং-এর কাছে। গোড়াতে স্থানীয় লোকেরা ঠাওর করতে পারে নি ঠিক। ভেবেছিল, এ উল্কা জাতীয় কিছু একটা হবে হয়তো দেখতে দেখতে কৌতূহলী জনতা ঘিরে দাঁড়িয়েছিল সিলিন্ডারটিকে। কিন্তু তারপর সিলিন্ডার থেকে যখন মঙ্গলগ্রহের যমদূতেরা বেরিয়ে এল, যখন মারাত্মক তাপরশ্মির সাহায্যে মারণ-যজ্ঞ শুরু করল ওরা তখন ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা অসহায় দুর্বল মানুষের দল আত্মরক্ষার এতটুকু অবকাশ পেল না। আগুনে জ্বলেপুড়ে মরল সবাই। ওঅকিং জ্বলল এবং তারপর আগুনের রক্তজিহ্বা আশেপাশের আরও বহু জায়গাকে গ্রাস করল। লন্ডন শহরেও ঘনিয়ে এল ত্রাসের রাজত্ব। দেখতে দেখতে কর্মব্যস্ত মহানগরী শ্মশানের রূপ ধরল। অপার্থিব ভয়ঙ্করেরা একাধিপত্য স্থাপন করল ওখানে। দেখতে ওরা ছিল কিম্ভূতকিমাকার। ওদের মাথার ব্যাস চার ফুট; দেহ গোলাকার। সব কিছু মিলিয়ে বিরাট ওদের আকৃতি। আর প্রকৃতি ওদের এত সাংঘাতিক রকমের হিংস্র যার কথা শুনে সমগ্র পৃথিবী বিস্ময়ে আতঙ্কে দিশাহারা হল। দু'রকমের মারাত্মক অস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল ওরা,—হ্যান্ডলিং মেশিন আর ফাইটিং মেশিন। ওরা তাপরশ্মির সাহায্যে ছারখার করে দিল ইংল্যান্ডের এক বিরাট অংশ। বিষবাষ্পের সাহায্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করল। সীমাহীন ধ্বংস ও ক্ষতির মুখোমুখি দাঁড়াল পৃথিবী। মনে হল, পৃথিবীর মানুষ ওদের সামনে নেহাৎই পঙ্গু ও দুর্বল। আর মনে হল, অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে পৃথিবীর। মঙ্গলগ্রহের বুদ্ধিদীপ্ত নির্মম জীবরা পৃথিবীকে গ্রাস করছে। অবশেষে এই চরম সর্বনাশের কবল থেকে আমাদের আবাসগ্রহটি কেমন করে মুক্ত হল, আলোচ্য গ্রন্থের শেষদিকে তার এক চমকপ্রদ বিবরণ দিয়েছেন ওয়েল্স। চরম দুর্দৈবের দুঃসহ চিন্তা থেকে পাঠকদের মুক্তি দিয়ে শান্তির অভয়-মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন। স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছে পাঠকেরা। নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে দম বন্ধ হয়ে আসা এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির অবসান হয়েছে।

এই নাটকীয় ঘটনাটির কথা পরে বলা যাবে। আগে বরং দুই পৃথিবীর যুদ্ধের ভূমিকাটুকুর কথা বলে নেওয়া যাক। মঙ্গলবাসীরা কেন এল পৃথিবীতে, এসে কি কি করল, তা জেনে রাখা যাক। কেননা প্রতিবেশী গ্রহ থেকে আগত দুর্দান্ত আগন্তুকদের কার্যকলাপের মধ্য দিয়েই এ গ্রন্থের কাহিনীটি জমে উঠেছে।

কাহিনীর গোড়াতেই মঙ্গলগ্রহবাসীদের পৃথিবী অভিযানের একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ তুলে ধরেছেন ওয়েল্স। সংক্ষেপে মঙ্গলের ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ুর পরিচয় দিয়ে দেখিয়েছেন, ওখানে জীব আছে এবং দারুণ শীতের জন্যে ওরা বিপর্যয়ের সম্মুখীন। তাই পৃথিবীতে আসতে চায় ওরা। ওদের এই কাছের গ্রহটিতে আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে এই সব জল্পনা-কল্পনার কথা বিভিন্ন যুগের বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণাকে কেন্দ্র করে বলা হয়েছে; এবং সে কারণেই কথাগুলোর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কাহিনীর শুরু থেকেই কম-বেশি পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত। এ ছাড়া এ গ্রন্থের আমি চরিত্রটিও বিজ্ঞান-সচেতন। মঙ্গলগ্রহের বৈশিষ্ট্য নিয়ে যা' কিছু বলেছে সে তাদের কোনোটিকেই একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তার কাছ থেকেই জেনেছি আমরা, মঙ্গলগ্রহ গড়ে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ মাইল দূরে থেকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। সূর্য থেকে যে আলো ও উত্তাপ পায় ওই গ্রহ, পরিমাণে তা' পৃথিবীর অর্ধেক। ওর আয়তন পৃথিবীর এক সপ্তমাংশ। একদিকে আয়তনের এই ক্ষুদ্রতার জন্যে এবং অপরদিকে পৃথিবীর তুলনায় সূর্য থেকে দূরে থাকার দরুণ গ্রহটি শীতল হবার সুযোগ পেয়েছে অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি; এবং জীবের আবির্ভাবও ওখানে ঘটেছে পৃথিবীর তুলনায় অনেক আগে। এ ছাড়া জল ও বাতাস আছে মঙ্গলগ্রহে। আর আছে জীবনধারণের উপযোগী লতাগুল্ম ও গাছপালা। অতএব ওখানে জীবের অস্তিত্ব অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু অসম্ভব হয়ে উঠেছে ওখানে বসবাস করা। দারুণ শীত ওই গ্রহটিকে ক্রমেই গ্রাস করতে চাইছে। মঙ্গলগ্রহের নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিনদুপুরেও এত শীত যা' পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন শীতকেও হার মানায়। সমুদ্র জমে গেছে ওখানে এবং গ্রহটির এক-তৃতীয়াংশ জায়গা দখল করেছে। এ ছাড়া অতিকায় সব বরফের স্তূপে মঙ্গলগ্রহের দুই মেরুপ্রদেশ আচ্ছাদিত। ঋতুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ওই বরফ গলতে

সুরু করে এবং তারপরেই দেখা দেয় মারাত্মক বন্যা। গ্রহটির অপেক্ষাকৃত উষ্ণ অঞ্চলগুলো সেই বন্যার দাপটে প্লাবিত হয়। আর এই প্লাবনই হল মঙ্গলের অধিবাসীদের সবচেয়ে বড় সমস্যা। জীবন-ধারণের জন্যে প্রতিনিয়ত প্রবল সংগ্রাম করছে ওরা, এবং এ কারণেই ওদের বুদ্ধি উন্নত হয়েছে, শক্তি বেড়েছে এবং হৃদয় হয়ে উঠেছে নির্মম। শেষ অবধি বাঁচবার তাগিদেই পৃথিবীর দিকে ওরা তাকিয়েছে। দেখেছে, ওদের খুব কাছেই আশ্চর্য সুন্দর এক গ্রহ। অপেক্ষাকৃত উষ্ণ সেটি এবং জায়গায় জায়গায় একেবারে ঘন সবুজ। রাশি রাশি গাছপালা ওখানে। স্বচ্ছ টলটলে জল ওখানে আশীর্বাদ ছড়াচ্ছে। এ ছাড়া কত মেঘ ঘিরে আছে ওই গ্রহকে। প্রমাণ দিচ্ছে, নিশ্চয় ওখান-কার ভূমি উর্বর। গ্রহটির জনাকীর্ণ দেশ-গুলোকে অপরূপ মনে হয়েছে। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছে, দেশ-দেশান্তরে জলযান পাঠিয়ে সুখে বসবাস করছে ওখানকার অধিবাসীরা।

অতএব সংগত কারণেই মঙ্গলের জীবরা পৃথিবীর দিকে তাকাল। ওরা ভেবে দেখল, সূর্য থেকে অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী কোনো গ্রহে পাড়ি না দিলে আশু বিপদ-মুক্তির আর কোনো সম্ভা-বনা নেই।

মঙ্গলগ্রহে জীবের অস্তিত্ব স্বীকার করে এবং পৃথিবীর প্রতি যে ওই জীবদের লোলুপদৃষ্টি পড়েছে সেকথা বলে নিয়ে ওয়েলস গোড়া থেকেই কাহিনীটি আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। দুই পৃথিবীর দ্বন্দ্বের ভূমিকা প্রস্তুত করেছেন নিখুঁত-ভাবে এবং দেখিয়েছেন যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।

কাহিনীর পরবর্তী পর্বে দেখি, এক পক্ষের দিক থেকে যুদ্ধের উদ্যোগ-আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে। মঙ্গলগ্রহের অধিবাসীরা অভিযান সুরু করেছে পৃথিবীর অভিমুখে। এই অভিযানের বর্ণনাটি ওয়েলস যথাসম্ভব বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পাঠকদের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ভিতর দিয়ে দেখা কয়েকজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে তিনি দেখিয়ে-ছেন, মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠদেশে এক একবার অদৃষ্টপূর্ব ধূম ও বাষ্প নজরে পড়ছে। ওই ধূম্রজাল যেন তীরের ফলকের মতো গ্রহটি থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসছে; এবং আসছে পৃথিবীর অভিমুখে। আশ্চর্য এই বর্ণনা। এ থেকে পৃথিবীর ঘনায়মান বিপদের কথা কল্পনা করে নিতে অতি সাধারণ পাঠকেরও কোনো কষ্ট হয় না; এবং বস্তুত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ওগিলভির পর্যবেক্ষণের বিশ্লেষণ লেখক সাধারণের দিকে তাকিয়েই করেছেন। এই পর্যবেক্ষণ বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে, আরও বহু জন বিজ্ঞানীর লব্ধ অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে যাওয়ায়। কিন্তু তবু ভুলে গেলে চলবে না যে আসল কাহিনী এখানে নয়। বিরাটকায় সিলিন্ডারে করে মঙ্গলবাসীরা যখন পৃথিবীতে নেমে এল, কাহিনীটি জমে উঠল ঠিক তখনই। অবশ্য প্রথমে মঙ্গলবাসীদের আবির্ভাবের কথা পৃথিবীর কেউই ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি। এমন কি জ্যোতির্বিজ্ঞানী ওগিলভি ও স্টেন্ট্ এবং সাংবাদিক হেন্ডারসনও বুঝতে ভুল করেছিলেন। মঙ্গলগ্রহ থেকে আগত সিলিন্ডারকে সবাই ভেবেছিলেন উল্কা বলে।

কাহিনীটি সংক্ষেপভাবে পর্যালোচনা করলে মনে হয়, এই ভাবনা অস্বাভাবিক কিছু হয় নি। মঙ্গলগ্রহ থেকে নির্গত যন্ত্রযানটি যেভাবে পৃথিবীর দিকে ধেয়ে এসেছিল, তা' উল্কার কথাই মনে পড়ায়; এবং আমাদের মনে হয়, অসম্ভবের প্রতি-মূর্তিকে প্রথমে এইভাবে সম্ভবের কোঠায় টেনে এনে ওয়েল্স বাস্তবধর্মিতারই পরিচয় দিয়েছেন। এ পরিচয় আরও মর্ম-স্পর্শী হয়ে উঠেছে কাহিনীর পরবর্তী অংশে। সেখানে দেখি, মঙ্গলগ্রহের যন্ত্রযানটি পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে। ইংল্যান্ডের ওআকিং অঞ্চলে নেমে এসেছে সেটি। প্রথমে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ওগিলভি এবং তারপর স্থানীয় লোকজনেরা সেটি দেখবার জন্যে ভিড় করেছে। এ কাহিনীর 'আমি' চরিত্রটিও বাদ যায় নি; এবং প্রধানত এই চরিত্রকে কেন্দ্র করেই যন্ত্র-যানটির স্বরূপ আমাদের কাছে ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হয়েছে। সবিস্ময়ে জেনেছি আমরা যে, ওতে আছে মঙ্গলগ্রহের প্রাণী। কিন্তু সে প্রাণীরা জীবিত কী মৃত তা' বোঝবার অবকাশ প্রথমে ছিল না। অবকাশ হল তখনই, যখন আমরা দেখলাম, ওই যন্ত্র-যানটি থেকে বেরিয়ে আসছে অদ্ভুত এক জীব। জীবটির সঙ্গে পৃথিবীর মানুষের প্রথম পরিচয়-কাহিনী চিত্রিত করবার কালে ওয়েল্স আশ্চর্য এক রোমাঞ্চকর পরিবেশ গড়ে তুলেছেন। দেখিয়েছেন নিষিদ্ধ রহস্যপুরীর রুদ্ধদুয়ার ক্রমে ক্রমে কেমন করে অর্গলমুক্ত হল: অজানার আঁধার-জগৎ ধীরে ধীরে দিবালোকে ঝলমলিয়ে উঠল কেমন করে। বলেছেন, সিলিন্ডারটি এসে পড়েছিল বালির উপর এবং তার বেশির ভাগ অংশই ভূপ্রোথিত হয়েছিল। দেখতে বিরাট আকারের ছিল সেটি। তার ব্যাস ছিল প্রায় ত্রিশ গজ। কৌতূহলবশে ওগিলভি সিলিন্ডারটির খুব কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছিলেন। চারিদিক স্তব্ধ ছিল তখন। বাতাস যেন থমকে দাঁড়িয়েছিল। ভোর হওয়া সত্ত্বেও পাখির কলকাকলী পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল না। শুধু শোনা যাচ্ছিল অস্পষ্ট এক অপার্থিব শব্দ। ওগিলভির মনে হচ্ছিল, সিলিন্ডারটির মধ্যে কী যেন নড়ছে। তার পরেই দম বন্ধ হয়ে-আসা এক দৃশ্য নজরে পড়েছিল তাঁর। তিনি দেখেছিলেন, সিলিন্ডারটির বৃত্তাকার প্রান্তদেশ থেকে শক্ত ইঁট জাতীয় কী যেন খসে খসে পড়ছে। এই দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে আতঙ্কে দিশাহারা হলেন ওগিলভি। ভাবলেন, খুব কাছে গিয়ে ঘটনাটা তলিয়ে দেখা যাক। কিন্তু কাছে যেতে তিনি পারলেন না। কারণ, তখনও দারুণ উত্তপ্ত ছিল সিলিন্ডারটি। অগত্যা তাই তিনি খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখতে লাগলেন। এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়ল তাঁর, সিলিন্ডারের বৃত্তাকার শীর্ষদেশটি যেন ধীরে ধীরে ঘুরছে। এছাড়া সিলিন্ডারটি কৃত্রিম এবং ফাঁপা। একটি স্ক্রু দিয়ে তার উপরের দিককার অংশটা কে যেন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুলবার চেষ্টা করছে।

কাহিনীর পরবর্তী অংশে দেখি, ধীরে ধীরে আলগা হয়ে আসছে সিলিন্ডারের প্রান্তভাগ। প্রায় ছ' ফুট লম্বা ঝকঝকে স্ক্রু চোখে পড়ছে; এবং তারপরেই বেরিয়ে আসছে অদ্ভুত এক জীব। জীবটার রঙ ধূসর, চেহারা গোলাকার। খুব ধীরে ধীরে এবং অতি কষ্টে সিলিন্ডার থেকে বেরিয়ে আসছে সে। বেরোবার পর তার দেহে সূর্যের আলো পড়তেই অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, ভিজে কোনো চামড়া যেন; থেকে থেকে তা চকমক করছে। চোখ আছে জীবটার। সে তাকাচ্ছে কটমট করে। তার চোখের ঠিক নীচেই আছে কিম্ভূতকিমাকার মুখ। লালা গড়িয়ে পড়ছে তা' থেকে। এছাড়া জীবটার আছে বিরাট দুটি শুঁড়। একটি দিয়ে সিলিন্ডারের প্রান্তদেশ জড়িয়ে ধরেছে সে। অপরটি শূন্যে দোলাচ্ছে। দোলায়মান ওই শুঁড়টিকে দেখে মনে হয়, ধূসর রঙের অতিকায় কোনো সাপ যেন। তা' দিয়ে যে কোনো মুহূর্তে মানুষকে জড়িয়ে ধরে পিষে মেরে ফেলা যায়।

এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে আঁৎকে উঠল সকলেই। কিন্তু তখনও কারও এমন কথা মনে হল না যে মঙ্গলগ্রহের প্রাণীরা হিংস্র কোনো আক্রমণ চালাবে। তাই সন্ধির চেষ্টা হল প্রথমে। একটি প্রতিনিধি দল সাদা পতাকা সামনে নিয়ে সিলিন্ডারটির দিকে এগোল। সেই দলে অন্যান্যদের সঙ্গে ছিলেন ওগিলভি, স্টেট ও হেন্ডারসন।

ততক্ষণে মঙ্গলগ্রহের জীবদের আরও দু' একটি বেরিয়ে এসেছে। সকলেরই মনে আশা জাগছে, পারস্পরিক বোঝাবুঝির পথ এইবার হয়তো প্রশস্ত হবে। প্রতিনিধি

দলকে সন্ধির প্রস্তাব করতে দেখে আশ্বস্ত হবে আগন্তুকরা।

কিন্তু ট্র্যাজেডী এই যে, আশ্বস্ত কেউ হল না। বরং আগুন জ্বলে উঠল। মঙ্গলবাসীদের সর্বনাশা আক্রমণের ছারখার হল প্রতিনিধি দল। ভয়ঙ্কর তাপরশ্মিতে জ্বলেপুড়ে সবাই ছাই হল। আগুন জ্বলল সামনের পাইন বনে। ওকিং-এর বিরাট এক অংশে ত্রাসের রাজত্ব ঘনিয়ে এল।

এইখানে বলে রাখা দরকার, মঙ্গলবাসীদের প্রথম আক্রমণের ছবিটি ওয়েল্‌স বেশ নিপুণভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন; এবং এ ছবিতে যা' কিছু নিষ্ঠুরতার পরিচয় আছে, কাহিনীকে গতিশীল করবার তাগিদেই তার প্রয়োজন ছিল। কেন না এর পর থেকেই মঙ্গলবাসীদের অপরিমিত শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠি আমরা। আমাদের মনে হয়, প্রতিবেশী গ্রহ থেকে আগত ওই আগন্তুকরা দুর্বার, হিংস্র ও ভয়াবহ। বিজ্ঞানবুদ্ধিতে অনেকদূর এগিয়ে গেছে ওরা। যে তাপরশ্মি ওরা উদ্ভাবন করেছে তা' দিয়ে সমগ্র পৃথিবীকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায়। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এইরকম একটা আশংকা আমাদের ঘিরে ধরে বলেই কাহিনীটি এর পর থেকে জমে উঠেছে। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে মঙ্গলবাসীদের প্রতিটি কার্যকলাপের দিকে তাকিয়েছি আমরা। ভেবেছি, ওরা যে কোনো মুহূর্তে যা' খুশি করতে পারে। আমরা ওদের হাতে পুতুলের মতো।

কাহিনীর পরবর্তী পর্বে দেখি, আমাদের আশংকা অনেকখানি সত্য প্রমাণিত হয়েছে। ভয়ঙ্কর এক মারণ-যজ্ঞে মেতে উঠেছে মঙ্গলবাসীরা। ওকিং-এর আশেপাশের অনেক গ্রাম ও জনপদ ওরা ধ্বংস করেছে। শত-সহস্র লোককে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। ওদের প্রতিরোধ করবার জন্যে সৈন্যবাহিনীকে তলব করা হয়েছে। কিন্তু সৈন্যদের প্রতিরোধ ওদের আক্রমণের সামনে বালির বাঁধের মতো ভেসে গেছে।

সাধারণ মানুষদের অবস্থা হয়ে উঠেছে আরও শোচনীয়। প্রাণভয়ে পালিয়েছে ওদের অনেকে। অনেকে আবার ধ্বংস-পুরীর মধ্যে বসে প্রতি মুহূর্তে দুঃস্বপ্ন দেখেছে। অবশ্য আক্রমণ সুরু হবার চব্বিশ ঘণ্টা পরেও পৃথিবীর মানুষ খুব একটা সচকিত হয় নি। কেন না ঘটনা-স্থলের সঙ্গে যথাযথ যোগাযোগের অভাবে সংবাদপত্রগুলো এ সম্পর্কে কিছুটা নীরব ছিল। এছাড়া সাধারণ মানুষদের অনেকেই এ ধরনের অভাবনীয় ঘটনার কথা তখনও কল্পনায় আনতে পারে নি। দুই পৃথিবীর যুদ্ধের প্রথম পর্বে দূরের এবং কাছের মানুষদের এই প্রতিক্রিয়ার কথা বলতে গিয়ে ওয়েল্‌স আশ্চর্য বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। এ ছাড়া ঘটনার অধিকাংশই প্রত্যক্ষদর্শী বলেছে বলে কাহিনীটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। অবশ্য আকর্ষণ সৃষ্টির আর একটি অভিনব উপকরণ এ গ্রন্থে আমরা পেয়ে থাকি। উপকরণটি হল এক নারী-চরিত্র। প্রত্যক্ষ-দর্শীর স্ত্রী তিনি; 'আমি'-চরিত্রের প্রেয়সী। চরম বিপদের মুহূর্তে আকস্মিক-ভাবেই স্বামীর সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটেছে। স্বামী মঙ্গলবাসীদের দৌরাত্ম্যে ঝড়ের মুখে উড়া চলা শুকনো পাতার মতো এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছে। একবার মঙ্গলবাসীদের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে সে। ভয়ংকরের মুখোমুখি হয়ে দারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটিয়েছে কয়েকটি দিন। বারবার সে বিপদের মুখে ফেলে-আসা স্ত্রীর কথা ভেবে আকুল হয়েছে। কিন্তু যথার্থ জীবন-ধর্মিতার অভাবে এই আকুলতা আমাদের স্পর্শ করে না। আমাদের মনে হয়, কাহিনীর আকর্ষণটুকু আগাগোড়া জীইয়ে রাখা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার জন্যে ওয়েল্‌স এই কৃত্রিমতার আশ্রয় নিয়েছেন। অথচ এটুকু না করলে কোনো ক্ষতি হত বলে মনে হয় না। মনে হয় না, নারী-চরিত্রটির অনুপস্থিতি কাহিনীর আকর্ষণকে কমাত। কাহিনীর একেবারে শেষ-পর্বে নারীটি তার স্বামীকে খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু এ পাওয়া সৎ-পাঠকদের মনে কোনো রেখাপাত করবে বলে মনে হয় না। বরং মনে হবে, কাহিনীটিকে মিলনান্তক করবার জন্যে লেখক এখানে অস্বাভাবিক বেশি পরিমাণে সজাগ হয়ে উঠেছেন।

ইতোপূর্বে ওয়েল্‌স-এর যে কয়েকটি বৈজ্ঞানিক রহস্য-কাহিনী নিয়ে আলোচনা করেছি, তাদের কোনোটিতেই নারী-চরিত্রকে এভাবে কাজে লাগান হয় নি। নায়ক-নায়িকার বিরহ-মিলন সম্পর্কেও এ ধরনের স্থূল চিত্র অন্যত্র দেখি নি। অবশ্য এখানেও অভিযোগ করার মতো কিছু থাকত না, যদি আমরা নারী-চরিত্রটিকে রক্ত-মাংসের মানুষ হিসাবে পেতাম। কিন্তু তা' তো আমরা পাই নি। তাকে আমরা পেয়েছি অপরিণত ও অস্পষ্ট এক বিরক্তি-কর চরিত্র হিসেবে। যাক সে কথা। মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক আবার। পরাভূত সৈন্যদের কথা বলছিলাম। আর বলছিলাম 'আমি'-চরিত্রটির চোখ দিয়ে দেখান ধ্বংস ও তাণ্ডবের কাহিনী। সে কাহিনী পড়তে বসে অসহায় মানুষকে দর্শকের ভূমিকায় দেখি আমরা। আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করি, উন্নত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নিয়ে মঙ্গলবাসীরা পৃথিবীর একটি অংশের উপর একাধিপত্য বিস্তার করেছে। আগন্তুকদের যন্ত্রপাতিগুলো কেমন, তার এক রোমাঞ্চকর বিবরণ দিয়েছে প্রত্যক্ষ-দর্শী। দুর্গম পার্বত্যভূমিতে কোনো এক ঝড়ের রাত্রির অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছে,

"প্রথমে আমি আমার সামনেকার পথটি ছাড়া আর বিশেষ কিছু ঠাওর করতে পারি নি; এবং তারপরেই হঠাৎ আমার নজরে পড়ল, মেবারি পাহাড়ের উল্টো-দিকের ঢাল বেয়ে কী যেন অতি দ্রুত নিচে নেমে আসছে। প্রথমটায় আমি ভাবলাম, এ কোনো বাড়ির ভিজে ছাদ হবে। কিন্তু পরের পর আলোর ঝলক এসে দেখিয়ে দিল, এটা গড় গড় করে দ্রুত চলছে। ভাবলাম, ছলনাময় কোন স্বপ্ন বুঝি—আঁধারে বিমূঢ় করে দেওয়া কোনো মুহূর্ত, এবং তার পরেই দিবালোকের মতো স্পষ্ট আলোর ঝলকে পাহাড়ের চূড়ার কাছাকাছি অনাথাশ্রমের দলবদ্ধ লাল ঘর-বাড়িগুলোকে নজরে পড়ল। নজরে পড়ল সবুজ পাইন-শীর্ষগুলোকে; দেখা গেল, ওই বিভ্রান্তিকর বস্তুটি স্পষ্ট, শাণিত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

এবং তার পরেই আমি দেখলাম সেই জিনিসটি! কেমন করে আমি তা'কে বোঝাব? দেখলাম, তিন পায়ে ভর দিয়ে চলা এক দৈত্য। দৈত্যটা লম্বা লম্বা পা ফেলে পুষ্ট পাইন গাছগুলোর ওপর দিয়ে দ্রুত চলছে। চলতে চলতে চুরমার করে এক পাশে ফেলে দিচ্ছে গাছগুলোকে। মনে হল, ওটা যেন ঝকঝকে ধাতু দিয়ে গড়া এক চলমান যন্ত্রদানব। এইবার সে লতাগুল্মের ওপর দিয়ে আড়াআড়ি-ভাবে চলেছে। তা'র থেকে গ্রন্থিবন্ধ ইস্পাতের রজ্জু ঝুলে আছে। এবং তার চলার সময় ক্রমাগত ঠন্ ঠন্ শব্দের দারুণ কোলাহল বিদ্যুৎ-গর্জনের সঙ্গে মিলে-মিশে এক হচ্ছে। তার পরেই আলোর ঝলক একটা; এবং সে ঝলকে সে একেবারে স্পষ্ট হয়ে উঠল। মনে হল, গোড়ালির ওপর ভর করে সে যেন দাঁড়িয়েছে; তার দু'টো পা শূন্যে। তার পরেই আঁধারে অদৃশ্য হল সে এবং পর-বর্তী আলোর ঝলকের সঙ্গে সঙ্গেই আবার দেখা দিল। এদিকে মুহূর্তের মধ্যে একশো গজ এগিয়ে এসেছে সে।........কাছ থেকে দেখে মনে হল, জিনিসটা অবিশ্বাস্য রকমের অদ্ভুত। কেন না এটা শুধু

সাহায্য তহবিলে মুক্তহস্তে দান করুন প্রধানমন্ত্রীর অনাবৃষ্টি সাহায্য তহবিলে মুক্তহস্তে দান করুন

এটা কোন সাধারণ আবেদন নয়...

"পর পর দুই বছর অতি ভীষণ খরার ফলে আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর মঙ্গলামঙ্গল এমন কি তাঁদের জীবন পর্যন্ত অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়েছে···

"অনাবৃষ্টি এবং খাদ্যাভাবক্লিষ্ট অঞ্চলগুলিতে বসবাসকারী আমাদের দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেশবাসীকে সাহায্য করার জন্য আমি প্রত্যেকের কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে তাঁরা বিপুল সংখ্যায় এগিয়ে আসুন।

"প্রধানমন্ত্রীর অনাবৃষ্টি সাহায্য তহবিল, ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েট, রাষ্ট্রপতি ভবন, নূতন দিল্লী ৪, এই ঠিকানায় চেক বা নগদ টাকা অথবা অন্যান্য সাহায্য পাঠান।"

ইন্দিরা গান্ধী
প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রীর অনাবৃষ্টি সাহায্য তহবিলে মুক্তহস্তে দান করুন

DA 66/F2

প্রধানমন্ত্রীর অনাবৃষ্টি সাহায্য তহবিলে মুক্তহস্তে দান করুন প্রধানমন্ত্রীর অনাবৃষ্টি সাহায্য তহবিলে মুক্তহস্তে দান করুন

নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে চলা নিষ্প্রাণ কোনো বস্তু ছিল না। অবশ্য যন্ত্র একে নিশ্চয়ই বলবো; এর চলন-পর্বটা ধাতব শব্দে মুখরিত। এর থেকে বেরিয়ে এসেছিল লম্বা, নমনীয় ও ঝকঝকে শুঁড় জাতীয় পদার্থ। শুঁড়দের একটি বলিষ্ঠ এক পাইন গাছকে আঁকড়ে ধরেছিল। অপরাপর শুঁড়গুলো সেই অদ্ভুত যন্ত্রদেহ থেকে বেরিয়ে এসে দুলছিল এবং ঘর্ঘর শব্দ করছিল। দ্রুত এগিয়ে চলবার সময় নিজের পথ নিজেই করে নিচ্ছিল ওই যন্ত্রদানব, এবং তার শীর্ষদেশে পিতলের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট যে আবরণটি ছিল, তা' এদিক-ওদিক নড়ছিল। মনে হচ্ছিল, নিশ্চয় কোন মাথা এর থেকে চারিদিকে লক্ষ্য রাখছে। মূলে যন্ত্রদেহটার পিছনে ছিল সাদা ধাতুতে গড়া এক বিরাট পদার্থ। জেলেদের অতিকায় কোনো ঝুড়ির মতো দেখাচ্ছিল ওখানটা; এবং যন্ত্রদানবটা যখন আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল তখন তার সন্ধি-স্থলগুলো থেকে কুণ্ডলীকৃত সবুজ রঙের ধোঁয়া বেরিয়ে আসছিল।"

এই যে চিত্র, এ যেন বর্ণনার গুণে আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস উদ্রিক্ত করে। আমরা মনে ভাবি, মঙ্গলের অধিবাসীরা ছলে, বলে, কৌশলে পৃথিবীর ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে বদ্ধপরিকর।

কাহিনীর পরবর্তী পর্বটি আগন্তুকটির দুর্জয় শক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ওই অংশের বিভিন্ন ঘটনাজাল স্পষ্টই প্রতিপন্ন করে যে, মঙ্গলবাসীদের অপ্রতিহত অভিযানকে প্রতিরোধ করার সামান্যতম ক্ষমতাও মানুষের নেই। বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিয়ে এবং তাপরশ্মির সাহায্যে সামনের সব কিছু ধ্বংস করে দুর্দান্ত বেগে এগিয়ে আসছে ওরা। ওআকিং অঞ্চলের ধ্বংসলীলা শেষ করে ওয়েব্রিজ্ ও সেপারটন অঞ্চলে তাণ্ডব সৃষ্টি করছে। নিরুপায় হয়ে মানুষ গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে জলে।

ওদিকে আকাশে-বাতাসে মহাপ্রলয় ঘনিয়ে এল। মঙ্গলবাসীদের কলকোলাহল ও যন্ত্রের আর্তনাদ বাতাসকে ভারী করে তুলল। ঘরবাড়ি তাসের ঘরের মতো মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। অগণিত গাছ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। আগুনের আকাশ-ছোঁয়া রক্তজিহ্বা সাক্ষাৎ মৃত্যুর মতো লক্ লক্ করতে লাগল। আর ভয়াবহ সব বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে এল আগুনের কুণ্ড থেকে। অসহায় মানুষ তাই নদীর দিকে ছুটল। কিন্তু নদীতে নেমেও নিস্তার নেই। ঘন কালো ধোঁয়া পুঞ্জীভূত হল সেখানে। নদী থেকে নির্গত জলীয় বাষ্পের সঙ্গে মিশে তা' এক নারকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করল। এ ছাড়া প্রাণঘাতী তাপরশ্মি ছড়িয়ে পড়ল এখানে-সেখানে। আর তা' থেকে বেরিয়ে এল ধবধবে সাদা আলোর ঝলক।

এদিকে দেখতে দেখতে নদীর জল গরম হয়ে উঠল। ওখানে আশ্রয় নিয়েছিল যারা তাদের অবস্থা হয়ে দাঁড়াল প্রাণভয়ে ভীত ব্যাঙের মতো; এবং তারপরেই তাপরশ্মির শ্বেতশুভ্র প্রভা নদীর জলের দিকে এগিয়ে এল। সে রশ্মির কবলে পড়ে আশেপাশের বাড়িগুলো মুহূর্তের মধ্যে গলে গেল। জল থেকে উঠে পালাবার চেষ্টা করছিল যারা, তারা এর লেহনে পলকের মধ্যে ভস্মীভূত হল। 'আমি'-চরিত্রটি নদীর যে অংশে ছিল তার পঞ্চাশ গজের মধ্যে তাপরশ্মি এসে পৌঁছুল। দারুণ গরমে জল ফুটতে লাগল। তারপর বিরাট এক তরঙ্গের আঘাতে সে কেমন করে মঙ্গলবাসীদের একেবারে সামনে গিয়ে পড়ল এবং ভাগ্যক্রমে শেষ অবধি রক্ষা পেল কেমন করে, তার এক রোমহর্ষক বিবরণ ওয়েল্‌স দিয়েছেন।

কাহিনীর পরবর্তী পর্বে 'আমি'-চরিত্রের অভিজ্ঞতা নতুন খাত ধরে প্রবাহিত। গীর্জার অধস্তন এক যাজকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তার এবং বিপদ বলেই দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে খুব তাড়াতাড়ি। সন্দেহ নেই, এই যাজকটিকে এনে ওয়েল্‌স মূলে কাহিনীর মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। তার ভীতু, স্বার্থপর ও দুর্বল প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে ক্ষণে ক্ষণে কৌতুক অনুভব করেছি আমরা। তবে সে কৌতুক-প্রসঙ্গ থাক এখন। এখন বরং মূল ঘটনা-সূত্রকে অনুসরণ করে লণ্ডন শহরের প্রসঙ্গে আসা যাক।

লণ্ডনের ধ্বংসলীলার যে বর্ণনা দিয়েছেন ওয়েল্‌স, তা' জীবন্ত, সন্দেহ নেই। কিন্তু তার চেয়েও জীবন্ত ওই শহর থেকে পলায়নরত নর-নারীদের চিত্র। কেমন করে লণ্ডনে ক্রমে ক্রমে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল, কেমন করে রিচ্‌মণ্ড, কিংস্টন ও উইম্‌বল্‌ডন ধ্বংস করে, মঙ্গলবাসীরা রাজধানীর দিকে এগোল, সে সব কিছুর এক মর্মস্পর্শী বিবরণ লেখক তুলে ধরেছেন। দেখিয়েছেন, প্রাণের খাতিরেই প্রাণান্তকর সংগ্রাম করে মানুষ। চরম সর্বনাশের মুহূর্তেও মানুষ বাঁচবার আশা ছাড়ে না। আর তা' ছাড়া মানুষের প্রকৃতি যে কত বিচিত্র, কত যে অদ্ভুত মানুষ আছে এই দুনিয়ায়, লণ্ডন থেকে ছুটে-চলা নর-নারীদের আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে তার একটা অংশবিশেষ অভিব্যক্ত। ডাকাতের দল, অন্ধ মানুষটি, ছোট্ট মেয়েটি এবং সর্বোপরি সেই প্রধান বিচারপতি—সকলেই নিজ নিজ বিশিষ্টতা নিয়ে এখানে জীবন্ত।

তবে দুই পৃথিবীর যুদ্ধের এখানেই শেষ নয়। যুদ্ধের চিত্রটি ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছেছে তখন যখন দেখি, 'আমি'-চরিত্রটি মঙ্গলবাসীদের প্রায় মুঠোর মধ্যে গিয়ে পড়েছে। মঙ্গল থেকে আগত একটি সিলিণ্ডারের আঘাতে পরিত্যক্ত এক বাড়ি সহ ভূপ্রোথিত হয়েছে সে এবং সেখান থেকে আগন্তুকদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেছে। আগন্তুকরা এক একবার প্রায় ধরে ফেলেছে তাকে এবং আমাদের মনে হয়েছে, এইবার বুঝি তার আত্মরক্ষার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল। কাহিনীটির এই অংশে ওয়েল্‌স দূরের গ্রহের রহস্যকে একেবারে আমাদের ঘরের সামনে এনে হাজির করেন। 'আমি'-চরিত্রটির মতো আমরাও যেন ঘর থেকে উঁকি মারলেই দেখতে পাই মঙ্গলগ্রহের সেই ভয়ঙ্করদের। দেখতে পাই, বিরাট মুখ ওদের। বিরাট ওদের গোলাকার দেহ। নাক নেই মঙ্গলবাসীদের। ওরা ঘ্রাণ নিতে পারে বলে মনে হয় না। কিন্তু ওদের আছে খুব বড় বড় দু'টি করে চোখ এবং চোখের ঠিক নিচেই আছে এক ধরনের মাংসল চঞ্চু। মুখের চারিদিকে ষোলটি করে শুঁড় আছে ওদের। হাত বলা যেতে পারে সেগুলোকে। সেই শুঁড়গুলোর ওপর ভর দিয়ে ওরা দাঁড়াবার চেষ্টা করে। দাঁড়াতে কষ্ট হয় ওদের কেন না পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ মঙ্গলগ্রহের তুলনায় বেশি।

এ ছাড়া পরিপাক-যন্ত্র নেই মঙ্গলবাসীদের। ওরা খায় না। তার বদলে জীবিত প্রাণীর টাটকা রক্ত নিজেদের নাড়ীর মধ্যে পুরে দেয়। ঘুময় না ওরা। কখনও ওরা ক্লান্তি অনুভব করে না। আর এর চেয়েও বিস্ময়ের কথা, মঙ্গলবাসীদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের ভেদ নেই। ওদের দেহের একটা অংশ বাইরে নিক্ষিপ্ত হয় এবং তা' থেকেই সৃষ্টি হয় নতুন প্রাণী। এক কথায় যৌন-বোধ নেই ওদের এবং ওরা ওদের সমস্ত শক্তিকেই বুদ্ধি-বৃত্তির উন্নতির কাজে লাগিয়েছে। এ ছাড়া আর একটা বিষয়ে আমাদের দেহ-যন্ত্রের সঙ্গে ওদের পার্থক্য আছে। আমরা অসংখ্য জীবাণুর সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করে বেঁচে থাকি। কিন্তু ওদের তা' করতে হয় না। কারণ, হয় জীবাণু কোনোদিনই মঙ্গলগ্রহে আবির্ভূত হয় নি; আর না হয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে এত উন্নত ওরা যে জীবাণু ওদের দেশ থেকে চিরতরে নির্মূল হয়েছে।

এ ছাড়া মঙ্গলবাসীদের আচার-আচরণের আরও অনেক চমকপ্রদ বর্ণনা ওয়েল্‌স দিয়েছেন। বলেছেন, কথা কয়

না ওরা; শুঁড় নেড়ে এবং নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী করে মনের ভাব প্রকাশ করে। ওরা কোনো কিছু পরিধান করে না। অথচ উত্তাপের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে ওরা শুধুমাত্র স্নায়ুময় মস্তিষ্কে পরিণত হয়েছে। প্রয়োজন অনুযায়ী সেই মস্তিষ্কটিকে বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রের মধ্যে পুরে নেয় ওরা এবং তারপর কাজে নামে। আমাদের যেমন পোশাক-পরিচ্ছদ, ওদের তেমনি যন্ত্র।

আশ্চর্য মঙ্গলবাসীদের এই স্বভাব-প্রকৃতির বর্ণনা। অসম্ভবকে কেন্দ্র করেও কল্পনাকে কতখানি পল্লবিত ও আকর্ষণীয় করা যায়, তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ মেলে এখানে। কাহিনীটির পরবর্তী অংশে দুই পৃথিবীর যুদ্ধের এক নারকীয় চিত্র নির্মমভাবে উদ্ঘাটিত। সেখানে দেখি, মঙ্গলবাসীদের খুব কাছেই আত্মগোপন করে আছে মূল ইতিবৃত্তের কথক। প্রতি মুহূর্তেই মৃত্যুর উৎকণ্ঠা তাকে উন্মাদ করে তুলছে। এমন সময় হঠাৎ সে মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। তারপর ভাল করে তাকাতে দেখল, অদূরেই রয়েছে একটি 'হ্যান্ডলিং মেসিন'। মেসিনটির ঢাকা-দেওয়া অংশে একজন মঙ্গলবাসীকে স্পষ্ট নজরে পড়ল তার। পরমুহূর্তেই মানুষের আর্তনাদ কানে এল। সে দেখল, বিরাট একটা শুঁড় মেসিনটির ঘাড়-বরাবর এগিয়ে আসছে। সেখানে আছে খাঁচার মতো একটা বস্তু আর সেই খাঁচায় রয়েছে একজন মানুষ। শুঁড়টি তাকে আঁকড়ে ধরা মাত্রই সে আত্মরক্ষার জন্য মরীয়া হয়ে উঠল। কিন্তু সমস্ত প্রতিরোধ ব্যর্থ হল তার। মঙ্গলগ্রহের আগন্তুক শুঁড়ের সাহায্যে তাকে শূন্যে উঠিয়ে ধীরে ধীরে নিচে নামিয়ে আনল। এবার মুহূর্তের জন্যে স্পষ্ট দেখা গেল মানুষটিকে। বোঝা গেল, সে একজন উত্তম সাজ-পোশাক পরা মধ্যবয়সী বলিষ্ঠ লোক; দারুণ আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে আছে তার চোখ দুটি। দেখতে দেখতে পাথরের ঢিবির পেছনে অদৃশ্য হল সে এবং তারপর কিছুক্ষণ ধরে আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। সাড়াশব্দ পাওয়া গেল কয়েক মিনিট পর। মঙ্গলবাসীদের কাছ থেকে উল্লাস ও হুল্লোড়ের ধ্বনি স্পষ্ট ভেসে এল।

কেন এই উল্লাস, তা' বুঝে নিতে এতটুকু অসুবিধে হয় না আমাদের। আমরা স্পষ্টই কল্পনা করতে পারি, হতভাগ্য ওই মানুষটির দেহ থেকে রক্ত শুষে নিয়েছে মঙ্গলবাসীরা এবং যে মানুষটি তিন দিন আগেও পৃথিবীর বুকে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াত তার নির্জীব ও বিকৃত দেহটা হিংস্র আগন্তুকদের সামনে জড়-পদার্থের মতো পড়ে আছে। এখানে আভাসে-ইঙ্গিতে মঙ্গলবাসীদের পৈশাচিক ক্ষুন্নিবৃত্তির পরিচয় দিয়ে ওয়েল্‌স ভালোই করেছেন; অনুমান করার সুযোগ দিয়েছেন পাঠকদের এবং পাঠকরাও লেখকের না-বলা অংশটির মধ্যে ভাববার উপকরণ খুঁজে পেয়েছে।

কিন্তু একেবারেই ভাববার অবকাশ নেই সেখানে, যেখানে শমন একেবারে শিয়রে দাঁড়িয়ে শিকারের দিকে হাত বাড়াচ্ছে, তা' হল কাহিনীর পরবর্তী অংশটি। সেখানে দেখি, প্রায় ভূপ্রোথিত একটি ঘর। এ কাহিনীর বর্ণনাকার সে ঘরে বন্দী। সেখানে তার সঙ্গী একটি মাত্র প্রাণী। সে হল ওই অধস্তন ধর্ম-যাজক। এরা উভয়ে মঙ্গলবাসীদের দ্বারা বেষ্টিত। বেরোবার পথ নেই ওদের। জোরে কথা বলবার উপায় নেই। উঁকি মেরে আগন্তুকদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করে ওরা। ফিস ফিস করে কথা বলে। এদিকে খাদ্য ফুরিয়ে আসছে। জলের অভাব শোচনীয় হয়ে উঠেছে। যাজকটি ক্রমেই অধৈর্য হয়ে উঠল। থেকে থেকে শিশুর মতো ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে। এমন সব কাজ করতে লাগল, যাদের দিকে মঙ্গলবাসীদের চোখ পড়লে মৃত্যু অবধারিত। সঙ্গীটি বারবার তাকে সাবধান করে দিল। কিন্তু মরীয়া হয়ে উঠেছিল বলেই সে ও সব কিছুতে ভ্রূক্ষেপ করল না। শেষ অবধি খাদ্য নিয়ে সঙ্গীর সঙ্গে তার সংঘর্ষ বাঁধল এবং প্রকারান্তরে সঙ্গীর হাতেই মৃত্যু হল তার। কাহিনীর এই অংশে মৃত্যুর সামনে দাঁড়ান অসহায় মানুষের চিত্রটি ওয়েল্‌স জীবন্ত করে তুলেছেন। কিন্তু এর চেয়েও জীবন্ত হয়ে উঠেছে মঙ্গলবাসীদের শিকার-সন্ধানের চিত্রটি। সেখানে লক্ষ্য করি, হ্যান্ডলিং মেসিন-এর সাহায্যে জঞ্জাল সরিয়ে বন্দী-ঘরের এক প্রান্তে ওরা আবির্ভূত হয়েছে। ঘরের দেওয়ালের এক ভাঙা অংশ দিয়ে উঁকি মারছে ওদের একজন। এ কাহিনীর বর্ণনাকার ওর রাক্ষুসে চোখ দুটি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে তার সমস্ত শরীর; এবং তার পরেই সে দেখেছে, ধাতুতে গড়া শুঁড় জাতীয় একটা দীর্ঘ পদার্থ তার দিকে এগিয়ে আসছে। সাক্ষাৎ মৃত্যুর এই পদসঞ্চার মুহূর্তে দিশাহারা করেছে প্রত্যক্ষদর্শীকে। সে পালাবার চেষ্টা করেছে; কিন্তু পালাতে পারে নি। হোঁচট খেয়ে পড়েছে ধর্মযাজকের ওপর। তারপর উঠেছে ধীরে ধীরে। রান্নাঘরের পাশের ঘরটির দিকে এগিয়েছে। আগন্তুকের শুঁড়টি তখন তার থেকে মাত্র দু' তিন গজ দূরে। এঁকিয়ে বেঁকিয়ে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ঘরটিকে যেন পর্যবেক্ষণ করছিল ওটা। এবং তারপর, প্রত্যক্ষদর্শী বলেছে,

> "তারপর সেই ধীরে এগিয়ে আসা, থেকে থেকে অগ্রসরমান বস্তুটির দিকে তাকিয়ে আমি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার গলা থেকে কর্কশ ও অস্পষ্ট একটা চীৎকার বেরিয়ে এল। রান্নাঘরের পাশের ঘরটির ওপর দিয়ে নিজেকে আমি যেন জোর করে ঠেলে নিয়ে গেলাম। ভীষণভাবে কাঁপতে লাগলাম আমি। অনেক কষ্টে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। ভূগর্ভস্থ কয়লা-ঘরের দরজা খুলে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়ালাম গিয়ে। অস্পষ্ট আলোকময় সে পথটি রান্নাঘরের দরজা বরাবর গেছে, তাকিয়ে রইলাম সেদিকে। কান পতলাম কিছু শুনবো বলে। মঙ্গলবাসী আমাকে দেখছে কি? এখন কি করছে সে?"

ঘটনার পরবর্তী বিবরণে দেখি, সে তখন খুব কাছেই ছিল। কখনও দেওয়াল ঠুকে ঠুকে পরীক্ষা করছিল সে। কখনও আবার তার থেকে যান্ত্রিক ঘর্ঘর শব্দ ভেসে আসছিল। তারপরেই রান্নাঘরের মেঝের ওপর দিয়ে একটা ভারী দেহ টেনে নিয়ে যাবার শব্দ শোনা গেল। দুই পৃথিবীর যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী দেখল, দেহটি ধর্মযাজকের; টেনে কাছে নিয়ে যাবার পরেই মঙ্গলগ্রহের আগন্তুক তার মাথা পরীক্ষা করছে। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে আতঙ্কিত হল সে। ভাবল, মঙ্গলবাসীরা এখনই হয়তো যাজকটির দেহে আঘাতের চিহ্ন আবিষ্কার করবে এবং বুঝে ফেলবে, ধারে-কাছে অন্য লোক আছে। প্রত্যক্ষদর্শী বলেছে,

> "হামাগুড়ি দিয়ে আবার ভূগর্ভস্থ কয়লা-ঘরে গেলাম আমি। দরজা বন্ধ করে দিলাম। অন্ধকারের মধ্যে যতটা নিঃশব্দে সম্ভব নিজেকে ওখানকার জ্বালানি কাঠ ও কয়লা দিয়ে ঢেকে ফেলতে লাগলাম। যখন-তখন নিথর হয়ে দাঁড়ালাম আমি। বুঝবার চেষ্টা করলাম, মঙ্গলবাসী ছিদ্রপথ দিয়ে আবার তার শুঁড় ঢুকিয়ে দিয়েছে কি না।
>
> তারপরেই সেই যান্ত্রিক ঘর্ঘর শব্দটা আবার শোনা গেল। আমার মনে হল, ওটা যেন রান্নাঘরের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। এবার শব্দটা আরও অনেক কাছে শুনতে পেলাম আমি। মনে হল, ভূগর্ভস্থ ঘরের মধ্য থেকে সেটা আসছে।......এবং তারপর অন্ধকারের মধ্যে কোনোরকমে সেই বস্তুটাকে দেখলাম। অন্য কিছুর চেয়ে ওকে

ভাড়াটে শববাহীরা

অমিয়কুমার হাটি

আমার মৃতদেহ যেন বয়ে নিয়ে যায়
ভাড়াটে শববাহীরা—যারা রাস্তায়
বিকট চিৎকার ক'রে 'বলহরি হরিবল' রবে
কাঁপায় মুমূর্ষুদের। উদ্ভট-উৎসবে
গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্তে অদ্ভুত উল্লাসে
ওরা মৃত্যুর মিছিল পরিচালনা করে। হাসে
অপার্থিব হাসি। শ্মশান-সন্ধ্যায় ওরা উদাস হয় না—
শোকে আকাশের পানে কিম্বা নদীর বুকে চেয়ে রয় না—
চিতার জ্বলন্ত কাঠ দিয়ে আছড়ে মারে
মৃতদেহ। যেন ওদের ঘাড়ে
হতাশা বেদনা ব্যর্থতা বিক্ষোভ নিয়ে
ভর করেছে পৃথিবীর সমস্ত প্রেতাত্মা—যারা বিষিয়ে
দিয়েছে বিষণ্ণ আকাশ পূতিগন্ধে।
সমস্তই আমাদের আক্রোশ—রোমরন্ধ্রে
লুকানো যা ছিল। তাই ওদের জন্যে যেন থাকে
অন্তত এক বোতল মদের দাম। কারণ অর্বাচীন সভ্যতাকে
নিমতলাঘাটে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব ওদেরি।
ওরা যে ঐশ্বর্য অতি—তার কত দেরি!

রমণীয় পৃথিবীর মোহে

বরুণ মজুমদার

সেদিনের কোন কথা মনে নেই, শুধু মনে আছে
বাগানের ফুল তুলে মাঝরাতে তোমাকে দিলাম উপহার,
ভোরবেলা সে ফুলের সমস্ত পাপড়ি গেল ঝরে,
আমার গোপন প্রেম, আমার গোপন ভালবাসা
আহত হয়েছে তাই ডানা-ভাঙা পাখির মতন।

কাগজের ফুল দিয়ে অনায়াসে উপহার দেওয়া যেতে পারে
কাগজের ফুল জানি অন্তত কিছুটা সময় তাজা থাকে
দিনশেষে সকল পাপড়ি তার যায় নাকো ঝরে।
তবুও একটি কথা মাঝে মাঝে ব্যথা দেয় স্মৃতির কোঠায়—
সে ফুল যাবে না দেওয়া উপহার।
কেন না সে ফুলে নেই আসল ফুলের মত সুগন্ধ তেমন।

ভালবাসা তাহলে কি বাগানের ফুটন্ত গোলাপ;
তার বুকে ক্ষতচিহ্ন আঁকিবে কি নিষ্ঠুর সময়?
যত ব্যথা আছে আমি তার দান মাথা পেতে নেবো—
একদিন রমণীয় হতে পারে মানব সংসার।

হাতীর শুঁড়ের মতো মনে হল। শুঁড়টা আমার দিকে এগিয়ে এসে দুলছিল এবং দেওয়াল, কয়লা, কাঠ এবং ছাদ স্পর্শ করে করে পরীক্ষা করছিল।......

একবার এমনকি সে আমার জুতোর গোড়ালী স্পর্শ করল। আর একটু হলেই আর্তনাদ করে উঠেছিলাম। নিজের হাত কামড়ে ধরেছিলাম আমি। কিছুক্ষণের জন্য ওটা চুপচাপ থাকল। আমি ভেবে নিতে পারলাম যে সে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। কিন্তু তারপরেই হঠাৎ একটা শব্দ করে কী যেন আঁকড়ে ধরল সে। মনে হল, আমাকে ধরল এবং ভূগর্ভস্থ ঘর থেকে বাইরে বেরোতে লাগল যেন। মিনিট খানিকের জন্যে আমি অনিশ্চিত ছিলাম। তারপরেই মনে হল, পরীক্ষা করবে বলে সে এক খণ্ড কয়লা নিয়ে গেছে।"

অদ্ভুত এই বর্ণনা। এ পড়তে পড়তে আমরা ভয়ঙ্করের মুখোমুখি দাঁড়াই যেন। সর্বনাশকে একেবারে সামনে থেকে প্রত্যক্ষ করি। ভয়ে দুরু দুরু বক্ষে লক্ষ্য করি, অতি অল্পের জন্যে প্রত্যক্ষদর্শী রক্ষা পেয়েছে। তারপর মঙ্গলবাসীরা তার কাছ থেকে হঠাৎ সরে গেল কেমন করে এবং কেমন করেই বা লন্ডন শহরে ফিরে গিয়ে সে তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হল, কাহিনীর পরবর্তী পর্বে সে সব কথা বলা হয়েছে। পথে এক গোলন্দাজ সৈনিকের সঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাৎ কাহিনীটির মধ্যে বৈচিত্র্য সঞ্চারিত করেছে। মঙ্গলবাসী-দের আক্রমণকে প্রতিরোধ করতে সৈনিকটি বদ্ধপরিকর। সে তার দুর্জয় সংকল্পের কথা অকপটে ঘোষণা করেছে। তার এই সংকল্প ও ঘোষণার মধ্য দিয়ে মানব-মনোলোকের সংগ্রামী ও অপরাজিত মনোভাবটি সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত।

কিন্তু এর চেয়েও সুন্দর কাহিনীর শেষাংশটি। মঙ্গলবাসীদের পশ্চাদপসরণের ইতিকথা বর্ণনা করতে গিয়ে ওয়েল্‌স সত্যিকারের মুনশীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। বলেছেন, জীবাণুর আক্রমণেই শেষ অবধি দমে গেল ওরা। ওরা মরতে বাধ্য হল।

মঙ্গলগ্রহে জীবাণুর অস্তিত্ব নেই, এ সম্পর্কে আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ওয়েল্‌স। বলেছিলেন, জীবাণুর আক্রমণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল ওখানকার অধিবাসীরা। তাই জীবাণু-অধ্যুষিত পৃথিবীতে এসে শেষ অবধি টিকে থাকা ওদের পক্ষে অসম্ভব হল। পৃথিবীর অধিবাসীরা যে জীবাণুর মধ্যে থেকেও বেঁচে আছে তার কারণ, দীর্ঘ দিনের অভ্যাসে স্বাভাবিকভাবেই প্রতিরোধ-ক্ষমতা গড়ে উঠেছে ওদের। অপরদিকে জীবাণুর মধ্যে থাকতে অনভ্যস্ত বলেই এই ক্ষমতা প্রতিবেশী গ্রহের অধিবাসীদের মধ্যে থাকবার কথা নয়।

কাহিনীর শেষাংশে মুমূর্ষু মঙ্গল-বাসীদের চিত্র এঁকেছেন ওয়েল্‌স। দেখিয়েছেন, লন্ডনের ধ্বংসপুরীর মধ্যে দাঁড়িয়ে কেমন করে ওরা ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

পরিশেষে লেখক বলেছেন, শত্রুদের পতনের পর বিপদ সাময়িকভাবে কেটে গেছে। শহরবাসীরা ফিরে এসেছে লন্ডনে। কিন্তু ভবিষ্যতে প্রতিবেশী গ্রহ মঙ্গল থেকে আবার আক্রমণ হতে পারে। গ্রহান্তরের জীবরা আবার আঘাত হানতে পারে পৃথিবীকে। আপাতত ওরা শুক্র গ্রহের দিকে এগিয়েছে। অবতরণ করেছে ওখানে। কিন্তু সুন্দর পৃথিবীর কথা নিশ্চয় ওরা ভুলে যায় নি।

দুই পৃথিবীর যুদ্ধের উপসংহার হিসেবে এই মন্তব্য অসমীচীন কিছু নয়। কিন্তু তবু বলবো, এর চেয়ে প্রত্যক্ষদর্শীর প্রতিক্রিয়াই আমাদের বেশি মুগ্ধ করে। সেখানে দেখি, যুদ্ধ থেমে যাওয়ার অনেক পরেও মাঝ-রাত্রিতে কখনও কখনও ঘুম ভেঙে যায় তার। সে যেন স্পষ্ট দেখতে পায় মঙ্গলগ্রহের হিংস্র আগন্তুকদের; বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিয়ে, তাপরশ্মিতে সব কিছু ধ্বংস করে মূর্তিমান বিভীষিকার মতো এগিয়ে আসে ওরা। ওরা দেখতে দেখতে দুঃস্বপ্নের এক মায়া-মরীচিকার মধ্যে ওকে নিক্ষেপ করে।

প্রত্যক্ষদর্শীর এই প্রতিক্রিয়া সহজেই স্পর্শ করে আমাদের এবং সেই সঙ্গে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, দুই পৃথিবীর যুদ্ধের পাঠকদেরও কেউ কেউ এই প্রতিক্রিয়ার শিকার হবেন না তো?

বিশ্বসাহিত্যের আদিপর্ব

ডঃ নরেন ভট্টাচার্য

॥ ১৪ ॥

প্রাচীন ইরানীয় সাহিত্য

পারসিক ভাষার সঙ্গে ভারতবাসীর যোগাযোগ বহুদিনের। মোগল যুগে পারসিক ভাষা ভারতের রাষ্ট্রভাষা থাকার দরুন ভারতবাসীর নিকট পারসিক ভাষার চর্চা একদা সাধারণ শিক্ষাসূচীর মধ্যেই ছিল। বহু হিন্দু পারসিক ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেছেন। বুলবুল-ই-হিন্দুস্থান চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ ভারতের বিখ্যাত পারসিক ভাষার কবি ছিলেন। ভীম সেন, সুজন রায় ভান্ডারী এবং ঈশ্বর দাশ মোগল যুগে পারসিক ভাষায় ইতিহাস লিখে যশস্বী হয়েছেন। আমাদের বাংলা দেশের সঙ্গেও পারসিক সাহিত্যের এক বিশেষ সম্বন্ধ রয়েছে। বাংলা ভাষায় পারসিক শব্দ প্রচুর। বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যের সঙ্গে পারস্যের সুফী সাহিত্যের আন্তরিক যোগসূত্র রয়েছে। পারস্যের অনেক কবিই বাংলা দেশের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁরা বাংলা দেশের যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। বাঙালীদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, মুনসী রামতারণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি হিন্দুগণ পারসিক ভাষার চর্চা করে পারসিক সাহিত্যের ভাবধারার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। একজন বাঙালীও বিশাল পারসিক সাহিত্যের ইতিহাস বাংলা ভাষায় রচনা করে বাংলা সাহিত্যের একটি বড় অভাব পূরণ করেছেন, তিনি হচ্ছেন শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল।

অবশ্য যে পারসিক ভাষার সঙ্গে ভারতীয় জনসাধারণ প্রাক-ইংরাজ আমলে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন তা হচ্ছে নব্য ইরানী বা ফারসী। এই নব্য ইরানী ভাষার দুটি স্তর—পুরাতন ফারসী, আনুমানিক ৭০০ খৃস্টাব্দ থেকে ১৮৫০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত; আধুনিক ফারসী, ১৮৫০ খৃস্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত। অতএব আমাদের বিশ্বসাহিত্যের আদিপর্বের বিষয়বস্তু তা হতে পারে না। এখানে আমরা শুধুমাত্র প্রাচীন ইরানীয় (১০০০ খৃস্টপূর্বাব্দ থেকে ৩০০ খৃস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত) এবং মধ্য ইরানীয় (৩০০ খৃস্টপূর্বাব্দ থেকে ৭০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত) ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের মধ্যেই সীমাবধ্ধ রাখব।

অসুর সভ্যতা

বেদে ও পুরাণে দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের সংঘর্ষের কথা বার বার বলা হয়েছে। অসুর কথাটি কালক্রমে নিন্দাসূচক শব্দ হিসাবে পরিগণিত হলেও, আদিতে মোটেই তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হত না। অনেক বৈদিক দেবতাই অসুর আখ্যায় ভূষিত ছিলেন, এবং বৈদিক যুগের অনেক রাজাই নিজেদের অসুর বলে পরিচয় দিয়ে গর্ববোধ করতেন। অসুররাও দেবতাদের মত ব্রহ্মার পুত্র, এবং তারা দেবতাদের বড় ভাই, এবং তারা অধিকতর সুসভ্য নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত ছিল একথা বৈদিক সাহিত্যে বারবার বলা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন কারা এই অসুর ছিল? এ বিষয়ে অনেক পণ্ডিত অনেক রকম কথা বলেছেন। তবে এ বিষয়ে মোটামুটি যুক্তিসহ মত হচ্ছে এই যে অসুর বলতে ইরানীয় আর্যদের বোঝাত। যে সকল জাতি আর্যভাষায় কথা বলত তাদের আদি নিবাস ছিল কিরঘিজ স্টেপভূমিতে। তাদের মধ্যে একদল নিজেদের আদি নিবাস ত্যাগ করে বর্তমান রুশীয় তুর্কীস্থানে চলে আসে। সেখান থেকে তাদের একদল যায় ইরানে আর বাকি সকলে আরও কিছুটা এগিয়ে চলে আসে ভারতবর্ষে।

এই কথার প্রমাণ হিসাবে আমরা বলতে চাই যে বৈদিক আর্যগণ এবং ইরানীয় আর্যগণ আদিতে একই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত ছিল। খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ অব্দের প্রাচীন ইরানীয় লেখমালার ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার সাদৃশ্য এত বেশি যে একটু সাধারণ বুদ্ধির প্রয়োগে প্রাচীন ইরানীয় ভাষাকে সংস্কৃতে রূপান্তরিত করা সম্ভব। এখানে সম্রাট জারেকসেসের একটি অনুশাসনের মূল ভাষা ও তার সংস্কৃতে রূপান্তরিত অবস্থার উল্লেখ করছি: **তুবম** (ত্বম) **কা-হ্য** (কা-স্য) **অপর** (অপরঃ) **যদি মনিয়াহইয়** (যদি মন্যাসে) **শিয়াত্ত অহনি** (চ্যাতঃ অসানি) **জীব উতা মৃত্ত** (জীবঃ উত মৃতঃ) **ঋতবা অহনি** (ঋতবা অসানি) **অবনা দাতা** (অনেন হিতা) **পরীদিয়্ ত্য** (পরীহি ত্যৎ) **অহুরমজদা** (অসুর মেধাঃ) **নিয়শ্তায়** (ন্যস্থাপয়ৎ) **অহুরমজদাম** (অসুর মেধাম্) **যদইশা** (যজেঃ) **ঋতা চা** (ঋতা চ) **ব্রজমনিয়** (ব্রহ্মানি)। অথবা দারায়ুসের বেহিস্তান লিপির ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের সাদৃশ্য লক্ষ্য করুন: **অদম দারয়বোষ** (অহং ধারয়দ্বসু) **খ্ষায়থিয় খ্ষায়থিয়ানাম** (ক্ষায়থ ক্ষায়থানামঃ সংস্কৃতে অবশ্য ক্ষায়থ বলে কোন কথা নেই কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারী, কথাটির অর্থ রাজাদের রাজা, নাম বিভক্তির যোগে ষষ্ঠীর বহুবচন হয়েছে)......**অর্ষামহ্য নপা** (ঋষামস্য নপ্তা) **বিষ্তস্পহ্য পুস্স** (বিস্তস্পস্য পুত্রঃ) **হখামণীসীয়** (শাখামণীদঃ)।

অসুর কথাটি সম্ভবত আদি ইরানীয়গণ আসিরীয়া থেকে গ্রহণ করেছিল, কেন না আসিরীয়াবাসীগণও নিজেদের অসুর বলত। ইরানীয়গণ তাদের প্রধান দেবতা বরুণকে অসুর আখ্যায় ভূষিত করেছিল, যিনি ছিলেন অসুর মেধাঃ বা অহুরমজদা। সম্ভবত ইরানীয় আর্যগণের সঙ্গে বৈদিক আর্যদের ধর্মবিষয়ক কোন মতভেদ ঘটেছিল, যে কারণে, পরস্পরের জ্ঞাতি হওয়া সত্ত্বেও তারা একে অপরের দিকে পিছন ফিরে ছিল। প্রাচীন আর্যধর্ম **দৈব** হিসাবে পরিগণিত হত; দেবতাবাচক “দেব” শব্দটি অতি প্রাচীন যুগ থেকেই প্রচলিত ছিল; সংস্কৃতে দেব, ল্যাটিনে দিউস, কেলটিকে দেবোস, লিথুয়ানীয় দিবোস, স্ক্যান্ডিনেভীয় তিবর। সম্ভবত পশ্চিমে অধিকতর সুসভ্য অসুর সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত

হয়ে, ইরানীয়গণ অসুরায়িত হয়েছিল, যার ফলে প্রাচীন "দৈব" মতে বিশ্বাসী বৈদিক আর্যগণের সঙ্গে তাদের সংঘাত লেগেছিল। সেই বোধহয় দেবাসুর যুদ্ধের সূচনা।

অন্তত ১৪০০ খৃস্টপূর্বাব্দেও দেবাসুরের হাঁড়ি আলাদা হয় নি কেন না ওই সময়কার বোখাজ-কোই শিলালিপিতে দৈব দেবতা ইন্দ্র ও নাসত্য অসুর দেবতা বরুণ ও মিত্রের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহবাস্থান করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ব্যাপারটা অন্যরকম ঘটল। যেহেতু অসুর কুলদেবতা বরুণ বোখাজ-কোই লিপিতে দেবরাজ ইন্দ্রের কুসঙ্গে ছিলেন সেই-হেতু খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের ইরানীয় ধর্মগুরু জরথুস্ত্র (সংস্কৃত ঃ জরদ্-উষ্ট্র) ইন্দ্রকে তো অপদেবতা আখ্যায় ভূষিত করে জাহান্নামে পাঠালেনই, উপরন্তু বরুণের নামটাকেও বদলে করে দিলেন অসুর বা অহুর। এ বিষয়ে সুকুমার সেন মশাই বড় ভাল কথা লিখেছেন ঃ "জরথুস্ত্র প্রবর্তিত নীতিমূলক ধর্ম অবলম্বন করিবার পূর্বে ইরানীয় আর্যরা ভারতীয় আর্যদের মতই যজ্ঞপরায়ণ ও দেবোপাসক ছিল। আবেস্তার মধ্যে এই প্রাচীন ধর্মের চিহ্ন কিছু কিছু রহিয়া গিয়াছে। জরথুস্ত্রীয় ধর্মগ্রহণের ফলে ইরানীয়রা দেব-বিদ্বেষী হইয়া পড়িল, এবং দেব শব্দের অর্থ দাঁড়াইল অপদেবতা। ফলে আর্যদের অনেক প্রাচীন দেবতা (যেমন নাসত্য ইন্দ্র, ইত্যাদি) অপদেবতা হইয়া গেল। তবে দুই-একটি দেবতা (যেমন মিত্র, অর্যমা এবং সোম) তাঁহাদের আসন অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন। আবেস্তায় 'দেব' শব্দের যেমন অর্থাবনতি ঘটিয়াছে, আশ্চর্যের বিষয় সংস্কৃত সাহিত্যেও ঠিক অনুরূপভাবে 'অসুর' শব্দের অর্থ বিপর্যয় ঘটিয়াছে। ঋগ্বেদের প্রাচীন অংশে আমরা 'অসুর' শব্দ পাইতেছি বরুণ প্রভৃতি প্রধান দেবতার বিশেষণ হিসাবে। আবেস্তাতেও দেখিতেছি ঈশ্বরের নাম হইয়াছে অহুর মজদা অর্থাৎ অসুর মেধা 'মহৎ জ্ঞান স্বরূপ'। কিন্তু অর্বাচীন বৈদিক সাহিত্যে ও সংস্কৃত সাহিত্যে 'অসুর' শব্দের অর্থ হইল 'দেববিরোধী, ব্রাহ্মণদ্বেষী।' সম্ভবত 'দেব' ও 'অসুর' শব্দের এই অর্থবিপর্যয়ের মধ্যে ইরানীয় ও ভারতীয় আর্যদের মধ্যে প্রচণ্ড ধর্মবিরোধের ইতিহাস লুক্কায়িত রহিয়াছে।"

জেন্দ অবেস্তা

ইরানীয় সাহিত্যের আদিতম নিদর্শনসমূহ যে গ্রন্থে পাওয়া যায় তার নাম অবেস্তা লেখমালাসমূহে উৎকীর্ণ প্রাচীন পারসিক ভাষার সঙ্গে অবেস্তার ভাষায় কিছু পার্থক্য আছে। মূল অবেস্তা রচিত হয়েছিল খৃস্টপূর্ব ১০০০ অব্দ থেকে ৬০০ অব্দের মধ্যে, কিন্তু বর্তমানে যে অবেস্তা পাওয়া যায় তাতে মূলের খুব সামান্য অংশই রক্ষিত আছে। কেন না অবেস্তার বর্তমান যে রূপ আমরা দেখি তা সংকলিত হয়েছিল সাসানীয় সম্রাটদের আমলে, অর্থাৎ খৃস্টীয় তৃতীয় থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে। অর্থাৎ মূল গ্রন্থের রচনাকাল ও তার সংকলনকালের মধ্যে সর্বনিম্ন সময়ের পার্থক্য হচ্ছে ৮০০ বছর। কাজেই এই অবস্থায় আসল অবেস্তা সাহিত্যের সামান্য অংশকেই ধরে রাখা সম্ভবপর হয়েছে। জরথুস্ত্রের গাথাসমূহ মূল অবেস্তা গ্রন্থের সবচেয়ে অর্বাচীন অংশ, কিন্তু সংকলিত অবেস্তায় সেটাই সবচেয়ে প্রাচীন। পহ্লবী ভাষায় সংকলিত অবেস্তার নাম আপিস্তক-উ-জেন্দ। 'আপিস্তক' শব্দটির অর্থ 'মূল গ্রন্থ' এবং 'জেন্দ' কথাটির অর্থ 'টীকা'। সংকলিত অবেস্তা চারভাগে বিভক্ত—**য়শন, বিস্পরদ, যশৎ এবং বেন্দিদাদ।**

য়শন-এর (য়-জণ, অজ-ন, যজ্ঞ) গ্রন্থের অনেকটা অংশ জুড়ে আছে জরথুস্ত্র রচিত গাথাসমূহ। জরথুস্ত্র হচ্ছেন আমাদের বুদ্ধের মত, উভয়ে একই যুগে (খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক) আবির্ভূত হয়েছিলেন, উভয়েই যজ্ঞ ও পশুবলিমূলক প্রাচীন ধর্মকে অস্বীকার করেছিলেন এবং নিজস্ব ধর্মমত প্রচার করেছিলেন। জরথুস্ত্র তেত্রিশ কোটি দেবতাকে বরবাদ করে একমাত্র বরুণকেই (অহুর মজদা) পরমেশ্বরের পর্যায়ে উন্নীত করার চেষ্টা করেছিলেন। (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য তেত্রিশ কোটির কোটিটা বোধহয় অলংকার, বেদ এবং অবেস্তা উভয় স্থানেই দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ, উভয় ক্ষেত্রেই দেবতারা দেখতে-শুনতে খাসা)। অবশ্য অহুরমজদাই জরথুস্ত্রীয় মতবাদে একমাত্র সত্ত্বা নন, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে আহ্রিমন, অন্ধকার, পাপ ও অসুন্দরের প্রতীক। এই দুই দেবতার সংঘাত অনন্তকাল ধরে চলেছে, আহ্রিমনকে পরাজিত করে অহুরমজদাকে; অর্থাৎ সত্য-শিব-সুন্দরকে, প্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, অনুরূপ চিন্তাধারা হিব্রু, খৃস্টীয় ও ইসলাম ধর্মেও বর্তমান। অ্যাভণ্ট বা ইবলিশের কল্পনার মূলে আহ্রিমন তথা প্রাচীন ইরানীয় প্রভাব বর্তমান।

জরথুস্ত্র রচিত গাথাগুলিই এতাবৎকাল বর্তমান অবেস্তার প্রাচীনতম অংশ হিসাবে বিবেচিত হয়ে এসেছিল, কিন্তু একালের কোন কোন পণ্ডিতের মতে অবেস্তার য়শৎ (সং. যজত) খণ্ডের কোন কোন অংশ জরথুস্ত্রের গাথাগুলির চেয়ে বেশি প্রাচীন। য়শৎ-এর বিষয়বস্তুর বেশ কিছুটা অংশই প্রাক-জরথুস্ত্র ইরানীয় ধর্মমতের পরিচায়ক, এবং সেই ধর্ম বৈদিক ধর্মের সঙ্গেই একান্তই সাদৃশ্যযুক্ত। উদাহরণস্বরূপ আমরা প্রথমেই হওম-যজ্ঞের কথা উল্লেখ করতে পারি—যা

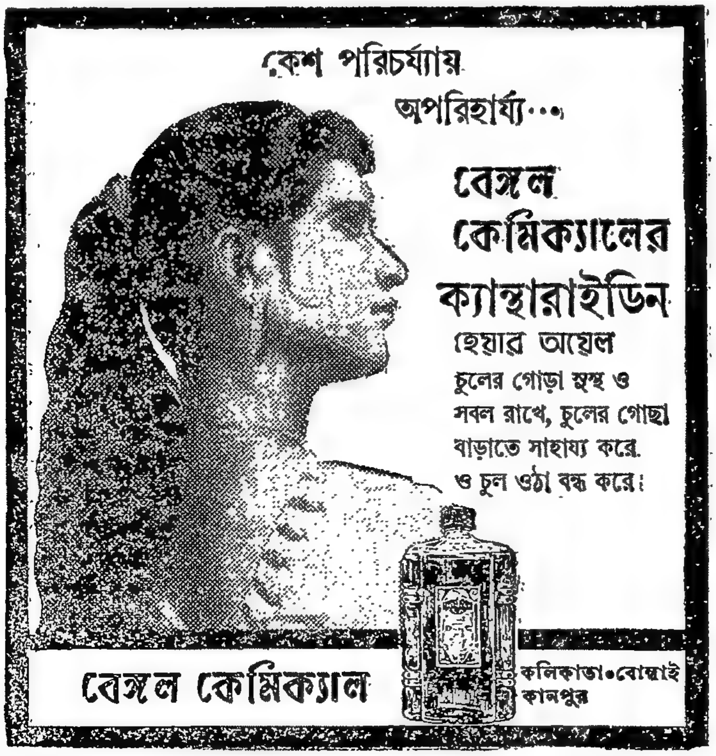

বৈদিক সোম-যজ্ঞের সঙ্গে অভিন্ন। ধর্ম-সংক্রান্ত পরিভাষাগুলি উভয় ক্ষেত্রেই এক, যেমন হওম (সোম), জওতর (হোতৃ), অথ্রবন (অথর্বন), মনথ্র (মন্ত্র), য়জত (যজত), যশন (যজ্ঞ), আজুইতি (আহুতি), ইত্যাদি।

অবেস্তার অপর অংশ বিস্পরদ্ বিভিন্ন দেবতাদের উদ্দেশ্যে কতকগুলি প্রার্থনার সমষ্টি। আগেই বলেছি, বৈদিক ধর্ম ও আদি ইরানীয় ধর্ম চরিত্রের দিক থেকে অবিকল এক। আদি ইরানীয় ধর্মের প্রধান দেবতা বরুণ যেমন বৈদিক ধর্মের প্রধান দেবতা ইন্দ্র। এই বরুণের সহায়-কারী দেবতা হচ্ছেন মিথ্র যিনি বেদে মিত্র নামে পরিচিত। এখানে ইন্দ্রও আছেন কিন্তু তিনি অপদেবতায় রূপান্তরিত. এবং একই দুর্ভাগ্য ঘটেছে নাসত্যের কপালে। বৈদিক দেবতা অপাং-নপাত ওই একই নামে এখানে আছেন, বেদের গন্ধর্ব এখানে হয়েছেন গন্ধ রেওয়া, কৃশানু হয়েছেন কেরেশানি। বেদে

নূতন!

মাথাধরা ? সর্দি ? ফ্লু ?

অবেদন®

আশ্চর্য্যজনক 'অ্যাপেপ'-যুক্ত দ্রুত, নিরাপদ, নিশ্চিত আরাম এনে দেয়

মাথাধরায়

সর্দিতে

ফ্লুতে

অবেদন নতুন—তাই পরীক্ষা ক'রে দেখুন। মাথাধরায়, দাঁতব্যথায়, পিঠের ব্যথায়, ও পেশীর বেদনায়, সর্দিতে ও ফ্লুতে এবং বিশেষ যন্ত্রণাদায়ক দিনগুলিতে দ্রুত কার্যকরী, দীর্ঘস্থায়ী আরাম এনে দেবার জন্য স্কুইবের এই আবিষ্কার, অবেদন।

অবেদন অতুলনীয়! এতে আছে আশ্চর্যজনক 'অ্যাপেপ' ও সেইসঙ্গে নিরাপদ, দ্রুত ফলদায়ক ব্যথা-দূরকারী অন্যান্য উপাদান।

অবেদন ব্যথা দূর করবার জন্য বিশেষ ফলপ্রদ এবং অত্যন্ত সহজে গ্রহণযোগ্য। এতে ক্ষতিকারক কিছু নেই এবং অভ্যাসে পরিণত করে না।

SQUIBB® অবেদন® 'অ্যাপেপ'-যুক্ত
কয়েক মিনিটের মধ্যেই কাজ করে—বহুক্ষণের জন্য আরাম দেয়!
সারাভাই কেমিক্যালস্

মাত্রা: ১–২ ট্যাবলেট

® ই. আর. স্কুইব এণ্ড সন্স ইনকর্পোরেটেডের রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক ব্যবহারকারী লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিনিধি করম চাঁদ প্রেম চাঁদ প্রাইভেট লিমিটেড।

Shilpi

বিবস্বতের পুত্র যম পরলোকের অধিপতি, এখানে বিবনহন্তের পুত্র যিম স্বর্গের রাজা। জরথুস্ত্র কাঁচি চালিয়ে সকল দেবতাকে বরবাদ করতে পারেন নি।

বেন্দিদাদে সংগৃহীত হয়েছে প্রাচীন ইরানীয় আইনকানুনসমূহ। **বেন্দিদাদ** শব্দটি বি-দয়েব-দাত (সংস্কৃত, বি-দেব-হিত) শব্দের অপভ্রংশ, অর্থ হচ্ছে দৈবদের (আগেই বলেছি দৈবরা ছিল অসুরদের পয়লা নম্বরের শত্রু) প্রতিকূলে প্রবর্তিত আইনসমূহ। অবেস্তার চারটি খণ্ডের মধ্যে বেন্দিদাদের গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি, কেন না ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকাণ্ড, এবং অন্যান্য ধর্মীয় তথা সামাজিক আইনকানুন, রীতিনীতি ও বিধিনিষেধের সংগ্রহ হিসাবে এই গ্রন্থের গুরুত্ব যথেষ্ট। সমগ্র বেন্দিদাদ বাইশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায়গুলিকে বলা হয় **ফারগার্দ**। গ্রন্থের শুরু হয়েছে সৃষ্টিরহস্য দিয়ে। তারপরে আছে স্বর্গের অধিপতি যিম বা যমের কাহিনী। অতঃপর বর্ণিত হয়েছে স্বর্গের আনন্দ এবং নরকের যন্ত্রণা। এর পর থেকে শুরু হচ্ছে আইনকানুন, ক্রিয়াকর্ম ও নানাপ্রকার বিধিনিষেধ। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে বেন্দিদাদে বর্ণিত অপরাধসমূহের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক অপরাধ হচ্ছে একাকী শব বহন করা; এর কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই।

পহ্লবী বা মধ্য ইরানীয় ভাষা

পূর্বে আমরা প্রাচীন পারসিক ভাষার সংগে অবেস্তার ভাষার পার্থক্যের উল্লেখ করেছি। প্রাচীন পারসিক ভাষা আকিমিনিড বা হখামণীসীয় বা শাখামণীদ রাজাদের রাষ্ট্রীয় ভাষা ছিল এবং সেই ভাষাতেই দরায়ুস (দারয়বৌষ বা ধারয়স্বসু), জারেকসেস (খ্ষয়র্ষ) প্রভৃতি সম্রাটগণ তাঁদের নাম, গোষ্ঠী কার্যকলাপ, রাজত্বের নিয়মকানুন প্রভৃতির লেখমালা প্রস্তুত করাতেন। বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত এই সব লেখমালা কিউনিফর্ম অর্থাৎ বানমুখ হরফে লিপিবদ্ধ হয়েছিল।

খৃস্টপূর্ব ৩৩১ অব্দে আলেকজান্ডারের আক্রমণে হখামণীসীয় বংশের পতন হয়। আলেকজান্ডারের আক্রমণে বিখ্যাত পার্সিপোলিশ নগর (স্থানীয় নাম ইস্তখর) পুড়ে ছাই হয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে বিনষ্ট হয় হখামণীসীয় যুগের সমুদয় সাহিত্যসৃষ্টি। কাজেই প্রস্তরগাত্রে উৎকীর্ণ ওই লেখমালাগুলি ভিন্ন প্রাচীন পারসিক ভাষার সাহিত্যকীর্তি বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। কাজেই সে সম্বন্ধে কোন খবর দিতে আমরা বর্তমানে অক্ষম।

আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর সেনাপতিরা তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য ভাগ করে নিয়েছিলেন। ইরান পড়েছিল তাঁর অন্যতম সেনাপতি সেলুকাসের ভাগ্যে। খৃস্টপূর্ব ১৪০ অব্দে আশ্কানী বা আর্সেকিদ বংশের রাজা মিথ্রিদাতেস সেলুকাসের বংশধরদের পরাস্ত করে প্রথমে পার্থিয়া এবং পরে সমগ্র ইরানই দখল করে নেন। এই নতুন রাজবংশের আমলে পূর্বতন হখামণীসীয় সম্রাটদের ভাষার নতুন করে প্রচার শুরু হয়। অবশ্য নতুন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে সেই ভাষার অনেকগুলি দিকের পরিবর্তনও ঘটেছিল। কালক্রমে এই ভাষাই পহ্লবী বা মধ্য ইরানীয় ভাষারূপে পরিচিত হয়েছিল।

আর্সেকিদ আমলের বিশেষ কিছু সাহিত্যগত নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় না। ২২৬ খৃস্টাব্দে এই বংশের শেষ রাজাকে পরাজিত করে সাসানীয় বংশের আতাজারেকসেস (অর্তখ্ষত্র, আর্তক্ষত্র) সমগ্র ইরানে আধিপত্য বিস্তার করেন। এই সাসানীয় সম্রাটদের আমলে পহ্লবী ভাষা ও সাহিত্যের চরম উন্নতি ঘটে। পহ্লবী ভাষার কোন নির্দিষ্ট হরফ ছিল না। সাসানীয় আমলের প্রথম যুগে প্রাচীন সেমিটিক হরফেই তা লেখা হত, কিন্তু পড়া হত পহ্লবী উচ্চারণে। এ বিষয়ে হরেন্দ্রবাবু একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন। লেখবার সময় লেখা হল 'মলকান্ মল্কা' কিন্তু পড়বার সময় তার উচ্চারণ 'শাহন্শাহ'। অবশ্য সাসানীয় আমলের শেষ দিকে সেমিটিক লিপির ব্যবহার উঠে যায়।

তবে পহ্লবী ভাষা মধ্য ইরানীয় ভাষার একমাত্র প্রতিনিধি নয়। পহ্লবী ছাড়া পূর্ব ইরানে আরও একটি উপভাষা ছিল। এ ছাড়া সোগদীয়, কুষাণ, শক ও প্রাচীন খোটানা ভাষাও মধ্য ইরানীয় ভাষার আওতায় পড়ে। পূর্ব ইরানীয় ভাষা থেকে সৃষ্টি হয়েছে পশ্তো, এবং নব্য পারসিক বা ফারসী, যাকে ইংরেজীতে বলে ক্লাসিকাল পার্সিয়ান, যা ৭৫০ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল, উদ্ভূত হয়েছিল পহ্লবী ভাষা থেকে। সামগ্রিকভাবে মধ্য ইরানীয় ভাষা থেকে, পশ্তো এবং ফারসী ছাড়া, সৃষ্ট হয়েছিল খলচা, কুর্দী, বলোচী, ওসুসেতি প্রভৃতি উপভাষা।

পহ্লবী সাহিত্য

আমরা একথা আগেই বলেছি যে সাসানীয় যুগেই অবেস্তার নতুন করে সংকলন হয়েছিল। এরপর যে গ্রন্থটির কথা উল্লেখ করতে হয় সেটির নাম **দিনকরৎ**। ওলড টেস্টামেন্টের যেমন **তালমুদ**, কোরানের যেমন **হাদিস**, অবেস্তার তেমনি **দিনকরৎ**। এতে আছে সামগ্রিকভাবে জরথুস্ত্রীয় ধর্মের ব্যাখ্যা সেই ধর্মের বিধিনিষেধ, অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি, উপদেশাবলী এবং জরথুস্ত্র সংক্রান্ত নানান কাহিনী।

দিনকরৎ-এর পর যে গ্রন্থটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সেটির নাম **বুনদ হীশন**। এই গ্রন্থটিতে জরথুস্ত্র মত অনুযায়ী সৃষ্টি রহস্য বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ করে অহুরমজদা ও আহির্মনের বিরোধ এই গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে। এ ছাড়া ধর্ম-সংক্রান্ত আরো অনেক পহ্লবী পুস্তক পাওয়া গেছে যেমন—**মইনিও খরদ** বা জ্ঞানের জীবনীশক্তি, **শায়াস্ত-লা-শায়াস্ত** বা পহ্লবী **রিবায়ৎ** বা সামাজিক ধর্ম-সংক্রান্ত কিম্বদন্তী।

এরপরে সেই গ্রন্থগুলির কথা আসে যেগুলি ধর্মের সংগে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট নয়। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় **কারনামকী—অর্তশীর পাপকান** যাতে সম্রাট আতাজারেকসেস ও শাহ্পুরের জীবনের নানারকম কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। **ইয়াৎকারী জরীরান** নামক গ্রন্থে জরথুস্ত্র ধর্মাবলম্বী গোসতাস্প ও জরথুস্ত্র বিরোধী অরজাস্পের যুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে। এই গ্রন্থটির উল্লেখ ফেরদৌসী তাঁর শাহ-নামা গ্রন্থে করেছেন। অপর আর একটি গ্রন্থের নাম **খসরু-গাবাতন-ব-ঘোলামস**। এতে আছে গবাদের পুত্র নৌশীরবাম ও তাঁর ভৃত্যের কথোপকথন।

সাসানীয় আমলে কাব্যসাহিত্যেরও বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। সাসানীয় রাজসভার বিখ্যাত কবি ছিলেন বারবুদ। হাজী আবাদ নামক স্থানে প্রস্তরগাত্রে খোদিত কয়েকটি পহ্লবী কবিতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। তুর্কীস্থানের তুরফান শহরে প্রাপ্ত মানী ধর্মাবলম্বীদের লিখিত একটি কবিতা হরেন্দ্র পাল তাঁর গ্রন্থে পুরোপুরি উদ্ধৃত করেছেন।

পরবর্তীকালে ফারসী ও আরবী গ্রন্থাবলীর মধ্যে অনেক পহ্লবী গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু সেই গ্রন্থগুলি অবশ্য এখনো পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। এই সকল পুস্তকের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গ্রন্থাদিরও উল্লেখ পাওয়া যায় সম্ভবত যেগুলি সম্রাট খসরু—অনিশিরবানের সময় লিখিত হয়েছিল। গ্রীক ও সংস্কৃত সাহিত্য থেকেও অনেক গ্রন্থ পহ্লবীতে অনূদিত হয়েছিল। ৬৯১ খৃস্টাব্দে সাসানীয় বংশের রাজা তৃতীয় ইয়জদ্গিরদ্ আরবদের হাতে নহাবন্দের যুদ্ধে পরাজিত হবার পর ইরান ক্রমশ আরবদের অধিকারে চলে আসে, এবং সেই সঙ্গে পহ্লবী সাহিত্যের গৌরবময় যুগেরও অবসান হয়।

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

মাতৃনাম অক্ষয় কবচ বুকে

হেড কোয়ার্টারের সভা হওয়ার পর প্রায় সাড়ে পাঁচটা ছ'টার সময় বাড়ি গেলাম। দুপুর দু'টো নাগাদ যখন বাড়ি থেকে দিদির চিঠি নিয়ে বেরিয়ে আসি তখন দিদি ও দাদাকে বলে এসেছিলাম—"মা-বাবা তো ডবলমুড়িং-এর বাড়িতে আছেন; তোমরা যদি পার আজই মা ও বাবাকে নিয়ে শহর ছেড়ে কোন গ্রামে চলে যাও। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শত্রু প্রথম পরাজয়ের পর হিংস্র জন্তুর মত আমাদের কয়েকজনের বাড়ি আক্রমণ করবে। আমাদের অবর্তমানে তা'রা তোমাদের ওপরেই নির্মম পাশবিক অত্যাচার করে তাদের জিঘাংসা চরিতার্থ করবে। মাস্টারদারও এই একই মত। তোমরা পারলে কোথাও চলে যেও।"

দিদির চোখমুখ মুহূর্তে লাল হয়ে উঠল। তাঁর মধ্যে খুব একটা উত্তেজনা দেখতে পেলাম। তিনি নিজেকে খুব অসহায় মনে করছিলেন। তাঁকে আজকের অ্যাক্‌সনে নেওয়া হ'ল না, এর ওপরে আরও দায়িত্ব দিলাম মা-বাবা, দাদা ও বৌদিকে কোথাও শহর থেকে দূরে নিয়ে যেতে। তিনি এরকম কিছুর জন্য কখনও প্রস্তুত ছিলেন না। তবু দিদিকে দু' কথায় যে বলেছিলাম—'আজ রাত্রে তোমরা শহর থেকে দূরে কোন গ্রামে চলে যেতে পারলে তাই যেও!' এর বেশি দিদির সঙ্গে আমার কথা হয় নি—প্রয়োজনও ছিল না। আমার ঐটুকু কথার অর্থ ব্যাখ্যা করে না বোঝালেও দিদি যে অবস্থার গুরুত্ব অনুভব করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কারও হয়ত মনে হতে পারে অভ্যুত্থানের ঠিক পূর্বে অত গোপন প্ল্যান বাড়ির সবার কাছে বলে দেওয়া কি আমার ন্যায়সংগত কাজ হয়েছে? যাঁরা আপাতদৃষ্টিতে দেখবেন তাঁদের তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। মাস্টারদার নেতৃত্বে সেই যুগে যখন যুক্তিবাদের ওপর ভাবপ্রবণতার প্রাধান্য ছিল অনেক বেশি, তখনও আমরা Rational হতে শিখেছি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমাদের সিদ্ধান্ত ভাবপ্রবণতার প্রভাব মুক্ত ছিল। আমার সহপাঠী বন্ধু—কেদারেশ্বর ও সুধাংশু, পরোইকোরা রাজনৈতিক ডাকাতিতে অংশগ্রহণ করার পর দল ত্যাগ করে। সেই সময় ভাবপ্রবণতার বশবর্তী হয়ে তক্ষুণি তাদের প্রতি মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করি নি আমরা। বিচার-বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করেছি—তাদের পক্ষে পুলিশের প্রভাবে আসক্ত হওয়া সম্ভব, না কি তারা আমাদের সহানুভূতি লাভ করলে দলের বিপক্ষে শত্রুতা না করে বরং সাহায্য করবে? শেষ পর্যন্ত তাদের মৃত্যুদণ্ড দিই নি। ভবিষ্যৎ প্রমাণ করেছে, তাদের প্রতি আমাদের সেই সিদ্ধান্ত নির্ভুল ছিল। আবার আর এক ক্ষেত্রে যখন বিশ্বাসঘাতক, পুলিশের চর বলে বিশেষ একজনকে আমাদের জানতে বাকি ছিল না তখনও ভাবপ্রবণতার ঊর্ধ্বে থেকে তাকে আমরা পুলিশেরই বিরুদ্ধে সার্থকতার সঙ্গে ব্যবহার করেছি। মাস্টারদার নেতৃত্বে এইরূপ বহু Rational সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি।

আমাদের বাড়ির সবাইকে যুববিদ্রোহের মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে "কোন একটি" সাংঘাতিক অ্যাক্‌সনের জন্য যে যাচ্ছি তার ইঙ্গিত অবশ্য দিয়েছিলাম। আমাদের অভ্যুত্থানের প্রথম শ্রেণীর অংশগ্রহণকারী প্রায় আশি জন যুবক আজ যে একটা ঘটনা ঘটবে, সেইরূপ ধারণা পোষণ করেছে। কিন্তু তাদের কারও পক্ষে সার্বিক প্ল্যান জানা বা অনুমান করা সম্ভব ছিল না। আমাদের মধ্যে অল্প কয়জন বাদে, অন্য কর্মীদের প্রায় সবাই বিপ্লবী সংগঠনে এসেছে মাত্র কয়েক বছর পূর্বে—দু-তিন বছর, কেউ কেউ বা মাত্র বছরখানেক পূর্বে আমাদের বৈপ্লবিক সংগঠনে সভ্যপদ লাভ করেছে। অথচ আমাদের বাড়িটি প্রথম থেকেই মাস্টারদার নেতৃত্বে চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের একটি সম্পদ হিসেবে গড়ে উঠেছিল এবং আমাদের সকলেরই গর্বের বিষয় ছিল। মা, বাবা, দাদা, বৌদি—সকলেই আমাদের সমর্থক ও অনেকভাবে সক্রিয় সাহায্য করেছেন বিগত দশ বছর ধরে ১৯২৩ সালে, গৌরবময় "নাগরখানা" খণ্ডযুদ্ধের পর, বাড়ি থেকে টাকা "অপহরণ" করার সময় থেকে আমার প্রতি বাবার যে বিরূপ মনোভাব ছিল তা' একেবারে তাঁর মন থেকে মুছে যায়। টাকা আমি "অপহরণ" করেছিলাম কি না তাও অবশ্য বিবেচ্য; কারণ দিদিই আমাকে চাবি দিয়েছিলেন ও কোথায় কি থাকে তা' দেখিয়ে দেন। দাদা আমাকে গোপনে খবর পাঠালেন প্রেমানন্দকে নিয়ে যেন সেই ট্রেনে না যাই, কারণ, গণেশের সঙ্গে আমার পিসেমশাই যাচ্ছেন আমাকে "পাকড়াও" করতে! বাড়িতে সব সময় বোমা-পিস্তল আনছি, রাখছি—সকলেই জানেন। তাঁরাই সব অস্ত্র যত্ন করে লুকিয়ে রাখতেন। ১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসে অর্ডিন্যান্সের সাহায্যে যখন আমাকে পুলিশ গ্রেফ্‌তার করতে এল তখন একটি বোমা, দু'টি রিভলভার মা ও আমার পিসতুত বোনেরা তাঁদের গাত্রাবরণের মধ্যে লুকিয়ে রাখলেন। ১৯২৮-৩০ সালে আমাদের প্রতিটি বিষয় তাঁরা বাইরে থেকে লক্ষ্য করেছেন এবং প্রায় সময়েই দেখেছেন আমরা হাতবোমা ও বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র বাড়িতে এনে রাখছি এবং অনেক সময় অনেককে ঐ সবের সাধারণ ব্যবহারপদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছি। তা'ছাড়া আমি বাড়িরই একজন বলে তাঁদের প্রতি সদাসর্বদা দৃষ্টি রাখা ও তাঁদের সহানুভূতিশীল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা আমার পক্ষে খুব স্বাভাবিক ছিল। সব চাইতে বড় কথা তাঁরা দশ বছর ধরে নানাভাবে বিপদের সময় পরীক্ষিত হয়েছেন—তাঁদের প্রতি আমার সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না। সেইজন্য যুব-বিদ্রোহের মাত্র কয়েক ঘণ্টা পূর্বে তাঁদের শহর ছেড়ে দূর গ্রামাঞ্চলে

চলে যাওয়ার সুযোগ থাকলে সেখানে যাওয়াই সমীচীন বলে মনে করেছিলাম। তাও মাস্টারদাকে জিজ্ঞাসা না করে ও তাঁর অনুমতি না নিয়ে আমি তাঁদের সেইরূপ পরামর্শ দিই নি। তাঁদের সে কথা বলতে মাস্টারদা একটুও দ্বিধাবোধ করেন নি। মাস্টারদার এই সিদ্ধান্ত যে নির্ভুল ছিল তা' পরে প্রমাণিত হয়েছে—এই বাড়ির প্রত্যেকেই তাঁদের জীবন বিপন্ন করে আমাদের আরও কতভাবে সাহায্য করেছেন!

আমি যখন হেড কোয়ার্টারের মিটিং সেরে বাড়ি ফিরলাম তখন দেখি বাড়িতে এক 'বিপ্লব'। মা-বাবা ডবলমুড়িং-এর বাসা থেকে নিজ বাড়িতে ফিরে এসেছেন। বাড়ির সকলে দেশভ্রমণে যাবেন, এই অজুহাতে চাকর দু'জনকে ইতিমধ্যে বাড়ি যেতে ছুটি দেওয়া হয়েছে। হোল্ডঅলে দু-একটি বিছানা বাঁধা হয়েছে দেখলাম। দু-তিনটি ট্রাঙ্কও ঘরের মেঝেয় এনে রাখা হয়েছে। দাদা, দিদি ও বৌদি ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে আরও কি কি বাঁধাছাঁদা করছিলেন। মা ও বাবাকে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে দেখতে পেলাম। বাড়ির আবহাওয়া থম্‌থমে—কোথায় যেন একটা বিষাদ নেমে এসেছে। সকলেই বিষণ্ণ—দাদা, দিদি, বৌদি, মা, বাবা সবাই।

আমাকে দেখামাত্র মা ও বাবা ব্যাকুল হয়ে উঠলেন—সহস্র প্রশ্ন তাঁদের মনে ভিড় করে আছে। বাবা বোধহয় আমাকে কি একটা বলতে চাইছিলেন কিন্তু বলতে গিয়েও যেন বলতে পারলেন না। মনে ঝড় বইছে—তাঁর মুখের কথা মুখেই আটকে গেল। বিষাদভরা ঘরের ভারী আবহাওয়াকে তরল করে দেবার জন্য সহজভাবে বললাম—

"কি বৌদি, আমার জিনিসগুলি ঠিক করে রেখেছ তো? তাড়াতাড়ি দাও, আর সময় নেই"—বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই সাজসজ্জা করবার জন্য নিজের ঘরে চলে গেলাম। বৌদির সঙ্গে সঙ্গে দাও এলেন, মায়ের পেছনে এলেন বাবা।

জীবনে সকলেই হয়ত সিনেমা ও স্টেজে নাটকের অভিনয় দেখেছেন—আমিও দেখেছি। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত নিজে অভিনয় করেওছেন. আমি নিজে কখনও যে খুব ভাল অভিনয় করতাম তা' বলতে পারি না। তবে স্কুলে কয়েকবার ড্রামাতে অংশগ্রহণ করেছি—দু-একবার হয়ত পুরস্কারও পেয়েছি। অভিনয় ভাল করেছি বলে পুরস্কার পেয়েছি নাকি আমার উৎসাহ দেখে মাস্টারমশাইরা আমাকে consolation prize দিয়েছিলেন তা' কে জানে? গণেশ স্কুলের ড্রামায় খুব ভাল অভিনয় করত—বছরে দুটো ফাংশনে তার অংশগ্রহণ করতেই হোত। আন্দামান জেলে রাজনৈতিক বন্দীরা যখন নাটক মঞ্চস্থ করতেন তখন একবার শরৎবাবুর কোন একটি বই নাটকস্থ করা হয়েছিল এবং তাতেও "নায়কের" ভূমিকায় গণেশ অভিনয় করে আমাদের কাছ থেকে যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করেছে। নাটক যাও-বা করেছি গান সম্বন্ধে আমি বোধহয় অদ্বিতীয়। চার-পাঁচ বছর আগে কোন এক ছুটির দিনে Mobility Pr. Ltd—মোটর কারখানার সুন্দর একটি অফিসে বসে আমার বিশেষ বন্ধু কারখানার মালিক কমল দে-র সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলাম। সেই সময়ে অন্যান্য বন্ধুরাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সবাই বিভিন্ন গায়ক ও গান সম্বন্ধে বেশ জমিয়ে আলোচনায় রত। তাঁদের বিভিন্ন মত বিনিময়ের মাধ্যমে যখন আসর খুব জমে উঠেছে তখন আমি একটু হাসির খোরাক যোগালাম। এখানে এই পরিবেশে এতক্ষণ ধরে আমার নীরস উপস্থিতির পর কি একটা কথার জবাবে তাঁদের বললাম—"গান? তা' আমি খুব ভালই জানি! তবে কোরাসে সকলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান আমার আসে না—আমি একেবারে solo (একা) গান গাইতে পারি।" প্রথমটা তাঁরা বুঝতে পারলেন না আমি কি বলতে চাইছি। তারপর যখন আমার solo গানের রহস্য উদ্ঘাটন করলাম তখন তাঁরা হেসেই বাঁচেন না। দশম শ্রেণীতে পড়বার সময় গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিই। প্রতিদিনই সভা, মিছিল লেগে আছে। মিছিলে একসঙ্গে পা ফেলে হাঁটবার সময় প্রায়ই marchin gsong কোরাসে গাওয়া হোত। 'ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল, নিম্নে উতলা ধরণীতল'—কোরাসে গান হচ্ছে। সবার সঙ্গে উৎসাহে আমিও গান ধরলাম। সবার গান এক সুরে মিলে চলেছে একদিকে, আর আমার গান চলেছে অন্যদিকে—কারও সঙ্গে তার মিল নেই, কোন সুরের বালাই নেই। আমার পাশে যাঁরা ছিলেন তাঁরা বিরক্ত হলেন—জোর করে আমার কোরাসে গাওয়া বন্ধ করে দিলেন। বললেন—"না ভাই, না—তোমার আর গান গাওয়ার দরকার নেই!" আমার গানের এই দক্ষতা সম্বন্ধে জানতে পারলে কে না হাসবে! কাজেই গানের চেষ্টা আমার জীবনে আর হ'ল না।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। আজকে যেমন ঘরে ঘরে Radio, চট্টগ্রামে সেই সময় গ্রামোফোনেরও তেমন আমদানী হয় নি। আমাদের পাড়ায়, বোধহয় তখন পিসেমশায়েরই একটিমাত্র His Master's Voice গ্রামোফোন ছিল। গানের রেকর্ড বাজলে আমি শুনতে চাইতাম না, সব গানই একরকম মনে হোত। নাটকজাতীয় রেকর্ড যখন বাজত আমি মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। সেইসব রেকর্ডের কথোপকথন সব সময় শুনে শুনে আমার প্রায় মুখস্থ ছিল। একটি রেকর্ড আমি প্রায় হাজারবার বাজিয়েছি—"জনা ও প্রবীর"—কি অপূর্ব লাগত! মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে প্রবীর যুদ্ধে চলেছে—মা'র প্রাণভরা আশীর্বাদ প্রবীরের বুকে যেন অক্ষয় কবচ!

১৮ই এপ্রিলের সন্ধ্যায় আমাদের বাড়িতে যে একটি বাস্তব "নাটকাভিনয়" হয়ে গেল, সেই নাটকের প্রধান নায়ক বোধহয় আমিই ছিলাম, আর সেই "নাটকের" চরিত্রায়নে অংশগ্রহণ করেছেন আমার দিদি, দাদা, বৌদি এবং মা ও বাবা। আজ বাবা-মা বেঁচে নেই—আছি আমরা ভাইবোন তিনজন ও বৌদি। জীবনের বাস্তব নাটকের যে একটি চিত্র এখন দিচ্ছি, তা' পড়ে মনে হবে যেন সিনেমা বা থিয়েটারের জন্য রং চড়িয়ে মনোগ্রাহী করে লেখা একটি চিত্রনাট্য। কিন্তু সেইদিন নিজ জীবনে বাস্তব সত্য যা' ঘটেছিল সেই দৃশ্য সিনেমা বা থিয়েটারের স্টেজে পাওয়া সম্ভব নয়।

মা ও বাবা, বৌদির সঙ্গে আমার ঘরে এলেন। মায়ের মন তখন অনাগত বিপদের আশঙ্কায় অধীর হয়ে উঠেছে—পুত্রস্নেহে ব্যাকুল হৃদয় বার বার প্রশ্ন করছে—

"কি হবে আজ? কি করতে চলেছিস্ তোরা?" পৃথিবীর লোকে কি জানবে তা' জানবার জন্য মায়ের আগ্রহ নেই—তিনি জানতে চান তাঁর পুত্রের ভবিষ্যৎ, তাঁর পুত্রের জীবনের নিশ্চয়তা। মা উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রশ্ন করে চলেছেন—"বল বাবা, আমাকে খুলে বল? কোথায় যাচ্ছিস্ এমন করে? কি তোরা করতে চাস্? কি হবে আজ রাতে?"—অনুভব করেছি তাঁর উৎকণ্ঠা। বুঝতে পারছিলাম মায়ের অশান্ত, অস্থির, উদ্বেলিত অন্তরের কথা। হৃদয়ঙ্গম করেছি পুত্রের অশুভ চিন্তায় তাঁর ব্যথিত হৃদয়ের করুণ আর্তনাদ! কি বলে মাকে বোঝাব? সোজা উত্তর দিলাম না। বললাম—"অস্থির হোয়ো না, মা! জানতে পাবে, সবাই জানবে। আর কয়েক ঘণ্টা সময় দাও—সারা পৃথিবী জানবে কি করতে যাচ্ছি আমরা!"

মা একেবারে অস্থির হয়ে উঠলেন। মনের আসল কথাটি আর চেপে রাখতে পারলেন না। আবেগভরে বললেন—"সারা পৃথিবী যা খুশি জানুক! আগে বল্ তোর কি হবে? কি করতে চলেছিস্ তুই? বল্ আমাকে—সত্যি করে বল্।"

এবার মাকে মিথ্যা সান্ত্বনা দেওয়াই

চেষ্টা না করে বাস্তব সত্য যেন তিনি উপলব্ধি করতে পারেন, তারই জন্য বললাম—"এত ভাবছ কেন মা? লক্ষ্মী মা আমার, শান্ত হও। কি আবার হবে আমার? কলেরা, প্লেগ কিম্বা যক্ষ্মা হলে যা হতে পারত, তার চেয়ে বেশি তো আর কিছু হবে না।"

সত্যিই মৃত্যুর চেয়ে বেশি আর কি হবে? তাও গৌরবের মৃত্যু। বিছানায় শুয়ে রোগে ভুগে ভুগে যন্ত্রণাকাতর মৃত্যু নয়—হাসিমুখে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে করতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা—বিপ্লবী সৈনিকের কাছে এর চেয়ে বেশি আর কি কাম্য হতে পারে?

আমি অল্পক্ষণের জন্যও তাঁদের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলবার সময় পাই নি। ছোট একটি ঘরে তাঁরা তিনজন দাঁড়িয়ে, আর আমি সর্বক্ষণ ঘুরে ঘুরে এটা-ওটা নিচ্ছি, সব গোছ-গাছ করছি সাজসজ্জা করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়বার জন্য। হয়ত তাঁরা খুব

বছর শেষ হয়ে এল ঃ
আজ আমাদের অসংখ্য
পৃষ্ঠপোষক ও শুভানুধ্যায়ীদের
আন্তরিক প্রীতি সম্ভাষণ
জানাচ্ছি ঃ আগামী বছরে
এবং বছরের পর বছর
তাঁদের তথা আরও অনেক
নতুন নতুন পৃষ্ঠপোষকদের
সেবায়
সমভাবে নিযুক্ত থাকার
আশা রাখি ঃ

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক
অব ইণ্ডিয়া লিঃ

ইউবিআই

রেজিঃ অফিসঃ
৪, ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট
কলিকাতা-১

পশ্চিমবঙ্গে ৮০টিরও অধিক শাখা আছে

মনঃক্ষুণ্ণ হচ্ছিলেন। কিন্তু তা' আমার ভেবে দেখার তখন সময় ছিল না। আমার গোছগাছ করবার কাজের মধ্যে মাকে আমি মাঝে মাঝে ঐসব বলে চলেছিলাম।

মা যখন বাস্তব সত্য বুঝতে পারলেন—আমার মৃত্যুর বিভীষিকা যখন তাঁর মন আলোড়িত করল তখন চাপা কান্নায় ভেঙে পড়লেন মা। কিছুই আর বুঝতে বাকি রইল না তাঁর। মা রুদ্ধনিশ্বাস বুকে চেপে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

পোশাকের সরঞ্জামগুলি গুছিয়ে নিয়ে অন্য ঘরে চললাম। বাবা আর একবার কিছু বলবার চেষ্টা করলেন—"দেখ, আমি বলছিলাম কি—বলছিলাম.........।" তাঁর এবারও বলা হ'ল না। আবেগে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

চামড়ার ক্রস্‌বেল্ট, পিস্তল রাখবার চামড়ার খাপ, হেলমেট্, বুট, পট্টি ও চামড়ার লেগিং নিয়ে আমি অন্য ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলাম। বাবা, মা, বৌদি অসহায়ের মত হতবুদ্ধি হয়ে সেখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। প্রায় পনের মিনিট পর আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। বৃটিশ আর্মি জেনারেলের অনুকরণে খাকি পোশাকে সেজেছিলাম। দুই কাঁধের ওপর ঝক্‌ঝকে পেতলের ছোট ছোট তারকা, ভারতবর্ষ, আড়াআড়িভাবে রাখা তরবারি প্রভৃতি প্রতীক পোশাকের শোভাবর্ধন করছিল। কাঁধ থেকে দুই বাহুর ওপর ঝোলানো ঝল্‌মলে বিভিন্ন কারুকার্য করা ঝালর পোশাকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছে। কোটের কলারে ও বুকের ওপর নানা ধরণের ঝক্‌মকে চিহ্ন ও পদকাদি ইউনিফর্মের সঙ্গে ব্যবহার করেছি। পায়ে বুট, পট্টি ও তার ওপর চামড়ার লেগিং, কোমরে ও বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে ক্রস্‌বেল্ট আঁটা, মাথায় উজ্জ্বল সোনালী চিহ্নযুক্ত হেলমেট্ ও হেলমেটের একপাশে পালক গোঁজা। অপূর্ব রণ-বেশে মা-বাবার কাছে এসে দাঁড়ালাম। এর আগে বহুবারই ইউনিফর্ম পরা অবস্থায় আমাদের তাঁরা দেখেছেন। কোন কোন সময় জাতীয় ফাংশনে যখন ইউনিফর্মে সজ্জিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সমাবেশ হোত, তখনও আমরা এইরূপ বৃটিশ আর্মির পোশাক পরেছি। আজকে যদি কাউকে সেই বেশে দেখি, তবে মনে হবে থিয়েটারের নকল জেনারেল সেজেছে। কিন্তু সেইদিন যদিও নকল পোশাক পরেছিলাম, তবু নকল জেনারেল বলে মনে হওয়ার কোন অবকাশ হয় নি। যুব-বিদ্রোহের যে থিয়েটার-প্রাঙ্গণে অভিনয় করতে চলেছি, তার বাস্তবতা আমাকে এমনভাবে সচেতন করেছে, আমার পক্ষে ভাবা সম্ভবই ছিল না যে, আমি নকল পোশাক পরেছি।

মা ও বাবা জানতেন তাঁদের পুত্র স্টেজে অভিনয় করবে না—যুদ্ধ-প্রাঙ্গণে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে মোকাবিলা করবে আজ। বিস্ফারিত নয়নে দু'জনে আমার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। তাঁরা মুহূর্তের জন্য নির্বাক, নিস্পন্দ ও স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। পরক্ষণেই তাঁদের দীপ্ত উদ্ভাসিত চোখমুখ দেখে মনে হ'ল পুত্রের যুদ্ধযাত্রা ও প্রস্তুতি দেখে বাবা-মা শত অশুভ চিন্তা-ভাবনার মধ্যেও গর্ব অনুভব করছেন। বেশ বুঝতে পারছিলাম দুই ধারায় তাঁদের চিন্তা প্রবাহিত হচ্ছে—একই সঙ্গে গর্ব অনুভব আবার পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় বিচলিত হচ্ছেন; স্বাধীনতা সংগ্রামে আমার আত্মবলির প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন, আবার যেন কি একটা অনাহূত মৃত্যু-বিভীষিকা তাঁদের কোমল হৃদয়কে পুত্রস্নেহে চঞ্চল করে তুলেছে; আমার রণসাজ দেখে সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধকে অন্তরে অন্তরে স্বাগত জানালেন, আবার পরমুহূর্তেই আজ রাতের রণপ্রাঙ্গণের মৃত্যুর করালছায়া তাঁদের হৃদয়কে যেন ব্যথিত নিপীড়িত ও আলোড়িত করে তুললো।

আমার আজকের পরিহিত ইউনিফর্মে শুধু দু'টি ব্যতিক্রম ছিল। ডানদিকে বেল্টের সঙ্গে পিস্তল রাখবার চামড়ার একটি খালি হোলস্টার বাঁধা আছে। বাড়িতে এসে হাতমুখ যখন ধুতে যাই তখন পিস্তলটি দিদিকে রাখতে দিই। তাই এই সময় হোলস্টারটি খালিই ছিল। আমি আগে কখনও হোলস্টার বেল্টের সঙ্গে নিতাম না। আর একটি বিশেষ নতুনত্ব আজকের ইউনিফর্মের অঙ্গ হিসেবে ভারতীয় গণতন্ত্র বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার সৈনিকদের ব্যবহার করতে হয়েছিল। প্রায় রুমালের সাইজের কালো ভেলভেটের ওপর দুটো জাতীয় পতাকার নিদর্শন, তার চারপাশে উজ্জ্বল রুপালী জরীর কাজ করা, দূর থেকে সহজে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ার মত এইরকম দুটি ব্যাজ আমার বুক ও পিঠ জুড়ে আঁটা ছিল। ভুল করে নিজেদের মধ্যে যাতে গুলী বিনিময় না হয়, সেই আশঙ্কায় বৃটিশ মিলিটারী ও পুলিশের খাকি পরিধানের সঙ্গে আমাদের ইউনিফর্মের এই ব্যবধান রাখা প্রয়োজন মনে করি। ইউনিফর্ম পরে যখন ঘর থেকে আমাকে বেরিয়ে আসতে দেখলেন, তখন এক মুহূর্তে শতসহস্র চিন্তায় মা ও বাবার মন আলোড়িত হয়ে উঠলো। তারপর মা আর থাকতে পারলেন না। ধীরে ধীরে আমার কাছে এলেন। আমার বুকে ভেলভেটের ওপর জরীর কাজ করা তাঁরই হাতের তৈরি ব্যাজ খুব ভাল করে দেখতে লাগলেন। দুদিন আগে গণেশ মাকে দিয়ে এই ব্যাজগুলি তৈরি করিয়েছিল। সীতাকুণ্ডের মেলায় ভলান্টিয়ার বাহিনী এইরূপ ব্যাজ পরবে বলে মাকে অজুহাত দেওয়া হয়েছিল। আজ মা বুঝতে পারলেন সেই ব্যাজের মূল উদ্দেশ্য। আমার বুকের ওপর তাঁর স্নেহমাখা কোমল হাতটি বোলাতে লাগলেন। কত মঙ্গল কামনা! কত আশীর্বাদ! কত বুকভরা মাতৃস্নেহ! রুদ্ধনিশ্বাসে জলভরা দু'টি চোখে মা প্রাণপণে তখনও নিজেকে সংবরণ করছেন। আর যেন পারছিলেন না—থর থর করে অধরদু'টি কাঁপছে। মা'র মুখে কথা নেই। তাঁর স্নেহমাখা কোমল হাতের স্পর্শ আমার সারা শরীরে শিহরণ জাগিয়েছে। আবেগে আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। অন্তরে অন্তরে মাকে প্রণিপাত জানাই।

কী এক অপূর্ব দৃশ্য! ভারত-রমণীরা নিজ হাতে পুত্রকে, ভ্রাতাকে, স্বামীকে রণসাজে সাজিয়ে যুদ্ধে পাঠাতেন। বীর মাতা জনা বীর পুত্র প্রবীরকে সমর সাজে রণাঙ্গনে পাঠালেন! আজ যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার আগে পুত্র এসে দাঁড়িয়েছে পিতা-মাতার সম্মুখে তাঁদের আশীর্বাদ কামনা করে—ভাই এসেছে ভাইয়ের কাছে, বোনের কাছে সহানুভূতি উৎসাহ ও প্রেরণা ভিক্ষা করে! স্টেজে অভিনীত নাটক নয়—জীবন-রঙ্গমঞ্চের বাস্তব নাটকের একটি দৃশ্য!

আজ স্বর্গাদপি গরীয়সী জননীর নিজের হাতে গড়া অক্ষয় কবচ ধারণ করে আমি চলেছি স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির বন্ধনমোচন মন্ত্র সার্থক করার উদ্দেশ্যে! মায়ের কোমল স্পর্শ আমার সর্বাঙ্গে অনুভব করলাম। মায়ের চোখের জল আমাকে দুর্বল করে দিচ্ছিল—জোর করে সংযত করতে হ'ল নিজেকে।

সকলেরই মন তখন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। বাবা এতক্ষণ চুপ করে নির্বাক দর্শকের মত সব দেখছিলেন। অনেক কষ্টে আবেগ সংযত করে এতক্ষণে বললেন—

"দেখ, আমি বলছিলাম, তোমরা কি খুব তাড়াতাড়ি একটা কিছু করে ফেলছ না? দেশ কি প্রস্তুত আছে? ভাল করে ভেবে দেখেছ, এখন এ রকম একটা কাজ করা কি ঠিক হবে?"

প্লাবনের যে প্রবাহে আমাদের তরুণ হৃদয় আজ উদ্বেলিত—বৃটিশ সাম্রাজ্য

বাদী শত্রুকে সশস্ত্র আঘাত হানতে আজ আমাদের যে খড়্গ উদ্যত হয়ে আছে, তাকে প্রতিরোধ করা কারও শক্তি নেই—তাঁর কোন কথা, কোন নীতিবাক্যই আজ আর কোন কাজে আসবে না—এই অবশ্যম্ভাবী সত্য বাবার জানা থাকা সত্ত্বেও অহেতুক মনের নিষ্ফল বাসনা অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

বাবাকে তাঁর কথার কি আর জবাব দেব? মনে স্বাভাবিকভাবেই বাবার কথার প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া হ'ল। কবির ভাষায় মন আমার গর্জন করে উঠল—

"আজকে যে যা বলে বলুক তোরে
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ করে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা
আয় দুরন্ত, আয় রে আমার কাঁচা।"

এই কবিতাটি সে যুগে আমাদের সবার মুখে মুখে ছিল।

বাবার মনে কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছে আমার ছিল না। তিনি নিজ স্বার্থে—তাঁর পুত্রের স্বার্থে অভিভূত হয়েই তা' বলেছেন। ঐ কবিতাটি আমাদের সংগঠনে যদিও তরুণেরা প্রবীণদের বিরুদ্ধে প্রায়ই ব্যবহার করত, তবু বাবাকে সেইটি শুনিয়ে আঘাত দেওয়া উচিত মনে করি নি। নিজেকে খুব সংযত করে নিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে বাবাকে বললাম—

"দু'শো বছর ধরে পরাধীনতার ভার যারা বহন করেছে, শেকল ভাঙবার চেষ্টা করার সময় তাদের আর কবে আসবে? আমাকে আশীর্বাদ কর বাবা! তোমার পুত্র মাতৃভূমির জন্য আজ মৃত্যুবরণ করবে—একথা ভেবে দুঃখ ভুলে গর্ববোধ কর!"

বাবা একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লেন। ছেলে আজ রাত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেবে—স্বাধীনতার বেদীমূলে বুকের রক্তে আজ নিশীথে পূজার অর্ঘ্য সাজাবে! আসন্ন মৃত্যু, স্নেহ, গর্ব, আশীর্বাদ কত কি বাবার মনে এক মুহূর্তে উদিত হ'ল। আবেগভরে তিনি বললেন—

"তোমার জন্য, তোমাদের সকলের জন্য আমার প্রাণভরা আশীর্বাদ রইল। মৃত্যু নয়—জয়ী হয়ে ফিরে এসো তোমরা!"

বাবার আশীষবাণী আমাকে শক্তি দিল, সাহস দিল, আমার যুদ্ধযাত্রা আরও সজীব, আরও প্রাণবন্ত করে তুলল। বাবার পায়ের ধুলো নিলাম। মায়ের প্রাণ এবার আর্তনাদ করে উঠল—

"আমি যে ভাবতেই পারি না, তুই এই অসময়ে চলে যাবি! চিরকালের মত তোকে আজ আমায় হারাতে হবে? এ যে অতি নিদারুণ! তোকে ছেড়ে আমি থাকব কি করে?"

মা আর বলতে পারছিলেন না। কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। ছেলের যুদ্ধযাত্রা মায়ের চোখের জলে পাছে অমঙ্গল সূচনা করে, তাই শত কান্না বুকে চেপে রেখেও মা প্রাণপণে চোখের জল সংবরণ করছিলেন।

মাকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম—"মা, তুমি ভেবো না। তুমি এমনি করে ভেঙে পড়লে আমার সান্ত্বনা কোথায়? আমাকে তুমি অভয় দাও, উৎসাহ দাও—সাহস দাও। তুমি তো আমাদের বৈপ্লবিক কাজে সব সময় সাহায্য করেছ। তবে আজ চূড়ান্ত পরীক্ষার দিনে তোমার দ্বিধা কেন মা? মা, তুমি হাস! হেসে আমাকে একবার বল—'যা, ছুটে যা, শত্রুর শিবির বিধ্বস্ত করে ফেল্। Do or die শপথ নিয়ে শত্রু ঘাঁটি লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়!"

মা'র মুখে একটু হাসি দেখলাম। একটুখানি যেন মানসিক বল ফিরে পেলেন। আমি বাড়ির বিষণ্ণ আবহাওয়ার পরিবর্তন আনবার জন্য দাদাকে ডেকে বললাম—

"দাদা, আমার তরবারিটি দাও! তরবারি জেনারেলদের ইউনিফর্মের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। দাদা আমার হাতে খাপ সমেত কিরীচটি দিলেন। বাম কটিদেশে বেল্টের সঙ্গে তরবারি বেঁধে ফেললাম। তারপর পায়চারি করতে করতে বৌদিকে সম্বোধন করে বললাম—"কই বৌদি, আমাকে পিস্তলের কার্তুজগুলি এখনও দিলে না? শীগ্‌গির দাও, দেরি হয়ে যাচ্ছে।" বৌদির হাতেই কাপড়ের থলেতে ভর্তি কার্তুজগুলি ছিল। আমি দুপুরে খাওয়ার সময় এসেই বৌদিকে কার্তুজগুলি রোদ্রে গরম করে রাখতে বলেছিলাম এবং সন্ধ্যায় এসে নিয়ে যাব, তাও তিনি জানতেন। তাই কার্তুজের থলে হাতে নিয়েই এতক্ষণ তিনি আমাদের সাথে সাথে ঘুরছিলেন—আমাকে দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছিলেন না। আমি বলামাত্র বৌদি আমাকে থলেভর্তি পিস্তলের কার্তুজগুলি দিলেন। সেগুলি ঠিকঠাক করে রাখতে রাখতে দিদিকে বললাম—"দিদি, এবার তুমি আমার পিস্তলটি দাও।"

গুলীভরা পিস্তলটি আমার হাতে তুলে দিয়ে দিদি বললেন—"এগিয়ে যাবি! একটি গুলীও যেন ব্যর্থ না হয়।" পিস্তলটা হোলস্টারে রেখে দিদির কানে কানে বললাম মাস্টারদার শেষ বাণী—

"তোমাদের বাড়ির ব্রীচলোডার বন্দুকটি তোমার জন্য রইল। প্রয়োজন হ'লে বিনা দ্বিধায় ব্যবহার কোরো। জানি, তোমার গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না।"

দিদির চোখদুটি উৎসাহে একবার জ্বলে উঠল। নিজ অধর দংশন করে মনে মনে যেন কি একটা প্রতিজ্ঞা করে নিলেন। তারপর খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন—"বুঝেছি, আর বলতে হবে না। মাস্টারদাকে বলিস্, আমার কাজ আমি ঠিকই করব।"

বাবা-মা বুঝতে পারছিলেন, আর বেশি সময় নেই। নাটকের শেষ অঙ্ক অভিনীত হচ্ছে। আমার বিদায়ের পালা—এখনি আমি চিরকালের জন্য তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাব। মৃত্যুপণ করে চলেছি—জীবনে আর তাঁদের সঙ্গে আমার দেখা হবে না!

দিদিকে প্রণাম করে আশীর্বাদ চাইলাম। দিদি অকুণ্ঠচিত্তে আশীর্বাদ করে বললেন—"দেশের মুক্তিযুদ্ধে তোদের প্রাণ দান কখনও নিষ্ফল হবে না!"

দাদা-বৌদিকে প্রণাম করে আশীর্বাদ নিলাম। বাবার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বিদায় নিলাম। বাবা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বুঝতে পারছিলাম অতি কষ্টে আমার মুখ চেয়ে তিনি নিজেকে সংযত রেখেছেন। তাঁর অন্তরের তুমুল ঝড়ের বহিঃপ্রকাশ নেই। কেবলমাত্র একটি দীর্ঘশ্বাস পড়তে শুনলাম। আমার মাথায় হাত রেখে তিনি আশীর্বাদ করলেন।

এবার মা'র দিকে এগিয়ে গেলাম। এতক্ষণ বহু কষ্টে যতদূর সম্ভব মা নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করেছেন। বার বার তাঁর চোখ ঝাপ্‌সা হয়েছে, তবু সামনে নিয়েছেন—কান্না রোধ করেছেন। আমি তাঁকে শেষবারের মত প্রণাম করে বিদায় নিতে যাচ্ছিলাম। মা আর নিজেকে সংবরণ করতে পারলেন না। আমাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

সময় সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে। আর দেরি করলে চলবে না। মা'র পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে যাত্রা করলাম। উঠোন পার হবার সময় আর একবার হাত নেড়ে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। করুণ দৃষ্টিতে তাঁরা আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। কি যে করবেন তা' যেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। আমি উঠোন পেরিয়ে যখন বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করব, তখন মা-বাবা সকলেই আমাকে অনুসরণ করলেন শেষবারের মত দেখবার জন্য। আমার বুকের মধ্যে ঝড় বইছিল। মায়ের কাতর কণ্ঠস্বর আমার কানে বাজছিল। তাঁর অশ্রুজল আমার হৃদয় মথিত করে তুলছিল। আমার অন্তরের কান্না আমি শুনতে পাচ্ছিলাম। মা-বাবা সাময়িক কষ্ট

দূরাদয়শ্চক্রে

সুদীপা ভাদুড়ী

ঘটায় কাটায় রাত বারোটায়
বাজে সাইরেন, দারুণ শব্দ।
আসছে আসছে নতুন তারিখ,
নতুন বছর, নতুন অব্দ।
জাহাজে জাহাজে কী যে হুল্লোড়,
ডিঙি-মাঝি দূরাদয়শ্চক্রে
চোখ মেলে দেখে—পৃথিবী আলোয়
তেমনিই ঠিক সোজা ও বক্রে।
দেহের মধ্যে থেকেই যেমন হচ্ছে মনটা ব্যতিক্রম,
তেমনি সময়, তেমনি জীবন, সত্য-মিথ্যা, সকল ভ্রম
নিয়েই বসবে সেই কমিশন, সেই বৈঠক, মুলতবী সভা,
জবাই হবেই যা হবার, কালী গঙ্গার জলে ভাসাবেই জবা
খাড়া করা হবে ঊর্ধ্বে খড়্গ
হয়তো কেবল নতুন নামে,
রাইফেল নয়, বন্দুক নয়,
নতুন অস্ত্র পুরানো দামে।

মিহিপাড় সেই পুরাতন ধুতি
অথবা লুঙিটা না হোক ছিন্ন,
তবু সাজবেশ বিদেশী ঢঙেই
কেন না চলে না কিছু এ-ভিন্ন।
যা কিছু সত্য ঃ নতুন বেশের
মধ্যেই তবু বয়স বাড়ছে;
কে যেন কোথায় লুকিয়ে লুকিয়ে
সময় কাড়ছে
জীবন কাড়ছে
আয়ুও কাড়ছে।
ডিঙিটা ডুবছে, কখনো ভাসছে,
মনটা হাসছে হঠাৎ হি হি।
মন কি কাঁদতো পৌঁছানো যেত
যদি গতকাল মরণডিহি!

পেলেও স্বাধীনতা যুদ্ধে আমার প্রাণ-দানের জন্য পরে নিশ্চয়ই গর্ব অনুভব করবেন—এই ভেবে মনকে সান্ত্বনা দিয়েছি।

আমি গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় মা বৈঠকখানা ঘরের সিঁড়ির ওপর থেকে বেশ জোরে জোরে চীৎকার করে বলছিলেন—"না, না, তা' হয় না—হতে পারে না। আমার আশীর্বাদ রইল তোর সংগে। মৃত্যু কাছে আসতে পারবে না, জয়ী হয়ে ফিরে আসবি তুই। আমার বুক থেকে তোকে ছিনিয়ে নিতে কেউ পারবে না—কেউ না, কেউ না—"

নতুন শেভ্রোলে গাড়িটি বাড়ির কম্পাউন্ডে রাস্তার দিকে মুখ করে রেখে বাড়ির অন্দরমহলে গিয়েছিলাম প্রস্তুত হয়ে আসতে। গাড়িতে স্টার্ট দিলাম। শেষবারের মত মাথা ঘুরিয়ে পেছনে তাকালাম। মা সিঁড়ির ওপর তখনও দাঁড়িয়ে। আমার মুখ দেখতে পেয়ে দু' হাত সোজা আকাশের দিকে তুলে জোরে জোরে কান্নামিশ্রিত কণ্ঠে বললেন—

'আমার আশীর্বাদ—কেউ তোকে স্পর্শ করতে পারবে না......।" বিগলিত ধারায় অশ্রু বইছে। তখনও মা দু' হাত তুলে আছেন—কতই না আশীর্বাদ করছিলেন!

আর অপেক্ষা করলাম না। ধীরে ধীরে আমার গাড়ি এগিয়ে চলল। গাড়ির মধ্যে ভাবাবেশে রেকর্ডের 'জনা ও প্রবীর' নাটকে আমার প্রিয় কটি লাইন উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করতে লাগলাম—

"অক্ষয় কিরীট শিরে তব পদধূলি,
তুলিনাম অক্ষয় কবচ বুকে
সম্মুখ সমরে বিমুখ কে করে
মোরে?"

আমার গাড়ি গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়ল। একা গাড়ি চালাচ্ছি। বাড়িতে এত করুণ একটি নাটক শেষ করে এসেছি। তার রেশ তখনও কিছুটা অনুভব করছিলাম। বাবা ও মা'র জন্য কষ্ট হচ্ছিল। আসবার সময় তাঁদের একবারও জিজ্ঞেস করি নি তাঁরা কোথায় যাচ্ছেন, আর তাঁরাও আমাকে কিছু বলে আমার মন ভারাক্রান্ত করতে চান নি। তাঁরা কোথায় যাবেন বা কি করবেন—এইরূপ কোন ভাবনাই তখন আমার মনে আসে নি। দিদি আছেন—দাদা উপস্থিত, তবে ভাববার কি আছে?

বাড়ি ছেড়ে এতক্ষণে আমি অনেক দূরে চলে এসেছি। বিপ্লবী দলে যোগ দেওয়ার পর থেকে শিখেছি আনন্দমঠের স্বদেশপ্রেমের বাণী—'আমাদের ঘর নেই, বাড়ি নেই, মা নেই, বাপ নেই—আমরা শুধু জানি জন্মভূমিই আমাদের জননী!' আজ, ১৮ই এপ্রিল ১৯৩০ সাল, সন্ধ্যের সময় যখন চিরকালের জন্য ঘরবাড়ি সব ছেড়ে চলে এলাম, তখন আমি আর বলতে পারলাম না—'মা নেই, বাপ নেই।' আমার অন্তর বলছিল—মা আছেন, বাবা আছেন—আছে তাঁদের স্নেহ আশীর্বাদ। ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধে—জননী জন্মভূমির মুক্তিযুদ্ধে মা-বাবার আশীর্বাদ এক মহান্ ইতিহাস রচনা করেছে।

আমার এই লেখাটি একটুও অতিরঞ্জিত নয়—এর একটি অক্ষরও মিথ্যে নয়। এর সবটুকু বাস্তব সত্য। আরও অনেক সূক্ষ্ম নাটকীয় ঘটনা সেই সময় পর পর দ্রুত ঘটে যায়। আমি সবটুকু লিখে পাঠকবর্গের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই নি। সেই অবস্থার মাত্র একটুখানি বাস্তব চিত্র না দিলে বোঝা সম্ভব হবে না বাংলা ও ভারতের বিপ্লবী ইতিহাসে এইরূপ কত ঘটনা আছে। আমার জীবনে মাত্র যে ক'টি এই ধরণের ঘটনার সংগে পরিচয় ছিল তারই বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব। পরের কাছে শোনা ঘটনা আমার যা জানা আছে তাও অবশ্য উল্লেখ করব। নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বা নিজে অংশগ্রহণ করে যা উপলব্ধি করা যায়, তার বিবরণ পরিবেশন করা যতদূর নিজের সসীম ক্ষমতার মধ্যে সম্ভব তা' শোনা কথার ভিত্তিতে করা যায় না। তাই শোনা কথা আমি ভাল করে ও বিশদভাবে লিখতে না পারার জন্য যদি কেউ মনে করেন যে, কেবল নিজের কথাই লিখছি তবে আমার প্রতি অবিচার করা হবে। বাড়ির সবাই সশস্ত্র বিপ্লবের সহায়ক না হলে আমার বাড়িতেও এইরূপ একটা ঘটনা ঘটা সম্ভব ছিল না। যতীন মুখার্জী, কানাইলাল, ক্ষুদিরাম, সূর্য সেন, নির্মলদা, লোকনাথ, গণেশ ও অন্যান্যদের নিজ জীবনের এইরূপ ধরণের হয়ত অনেক ঘটনা আছে। সেই সব জীবনস্মৃতি কে লিখবে?

কত করুণ—কত হৃদয়গ্রাহী কাহিনী! ভারতের বিপ্লবী ইতিহাসের পাতায় পাতায় কত বিস্ময়কর ঘটনা! আমার পক্ষে সে সমস্ত জানা সম্ভব নয়। তা' ছাড়া আমার অক্ষম লেখনীতে তার প্রকৃত বর্ণনা দেওয়াও সম্ভব নয়। শক্তিশালী কোন সাহিত্যিকের লেখনী যদি সেই যুগের স্মৃতি বহন করে এ কাহিনী লিখতে পারত, তবেই অতীত ইতিহাসের প্রতি সুবিচার করা সম্ভব হোত।

(ক্রমশঃ)

শান্তিনিকেতনে প্রতিমা দেবীর সঙ্গে একটি অন্তরঙ্গ মুহূর্তে ইন্দিরাজী

প্রতিবারেই খাদ্যসমাচার দিয়ে বঙ্গ-দর্শন শুরু করা হয়, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে তার ব্যতিক্রম ঘটে। এবারে ব্যতিক্রম ঘটার কোন কারণ নেই।

আমরা বারবার আগামী বছরে সরকারের খাদ্যনীতি কি রকম দাঁড়াবে তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছি। বঙ্গদর্শনের পাঠকমাত্রেই এ কথা জানেন। গত বছরে অন্তত মুখ্যমন্ত্রীর কথাবার্তা ও বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত বক্তৃতা শুনে মনে হয়েছিল যে, সরকার যেন-তেন-প্রকারেণ রেশন ব্যবস্থা চালু করবেন এবং প্রয়োজনীয় ধান-চাল গ্রাম থেকে সংগ্রহ করবেন। সাড়ম্বরে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, ধান-কলগুলির উপর একশো শতাংশই লেভি করা হবে। সরকার অবলম্বিত পথটা ঠিক হোক আর নাই হোক, হাবভাব দেখে মনে হয়েছিল বোধহয় সরকার কিছু করবেন, আর মোটামুটি সরকারের খাদ্যনীতিটা কি রকম তারও একটা আঁচ পাওয়া গেছল।

কিন্তু এবারে বড় মুস্কিল হয়েছে। এ বছরটা আবার ইলেকশানের বছর। সরকার ইলেকশানের মুখে জোতদারদের চটাতে নারাজ। কাজেই গোড়াতেই ফতোয়া দেওয়া হয়েছে যে, ধানকলগুলির কাছ থেকে এবার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ লেভি নেওয়া হবে, আর বাকি পঞ্চাশ ভাগ; তারা যে কোন দামে বেচতে পারবে। এখানে যে আইনের ফাঁকটা করে দেওয়া হল, তাতে হলফ করে বলা যায় শতকরা নব্বই ভাগ চালই পঞ্চাশ ভাগের দোহাই দিয়ে চোরাপথে বেরিয়ে যাবে, আর বাকি দশ ভাগ, যদি কলওয়ালারা দয়া করে তো সরকারের গুদামে আসলেও আসতে পারে। তদুপরি অজন্মার বছর এই বলে মিল-ওয়ালারা অনায়াসেই সরকারকে ফাঁকি দেবে। হাজার মণ চাল চোরাপথে বেচে দিয়ে বিনীত হেসে সরকারকে জানাবে যে "এই অজন্মার বছরে মোটে একশো মণ চাল আমার ভাঁড়ারে এসেছে, তা থেকে আপনারা নিন পঞ্চাশ মণ, আর আমার থাক পঞ্চাশ মণ।"

এর পরে কথা হচ্ছে শহরবাসীকে রেশন যোগাবার জন্য সরকার কিভাবে চাল সংগ্রহ করবেন? গতবারের কায়দায় করতে এলে এবারে হিতে বিপরীত হবে এটা সরকার বেশ ভাল করেই বুঝেছেন। তদুপরি বছরটা বেজায় খারাপ, ইলেকশানের বছর। আর গ্রামই তো কংগ্রেসের ভরসা। অনেক ভেবেচিন্তেই মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন এবারে সরকারী খাদ্যদপ্তরকে আসরে নামাচ্ছেন না। তার জায়গায় আনা হয়েছে ফুড কর্পোরেশন নামক একটি সংস্থাকে।

এই ফুড কর্পোরেশন ব্যাপারটা কি একথা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটরা মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করেছিলেন। উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী যা জানিয়েছিলেন তার মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, ফুড কর্পোরেশন একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা, যার উপর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশেষ কোন অধিকার নেই। এখান থেকে চাল সংগ্রহ করে ফুড কর্পোরেশন সে চাল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গুদামে জমা দিতে না-ও পারে। বাংলার চাল দিয়ে ইচ্ছে করলে ফুড কর্পোরেশন বিহারকেও খাওয়াতে পারে। তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ফুড কর্পোরেশনের শুভবুদ্ধির উপরেই নির্ভর করছেন।

ফুড কর্পোরেশন চাল সংগ্রহ করবে কিভাবে? সমবায় সমিতি সমূহের মারফতে। হয় রাতারাতি সরকারের অনুগ্রহপ্রত্যাশী একগাদা ধান্য ক্রেতা সমবায় গজিয়ে উঠবে, আর না হয় সরকারের অনুগ্রহভাজন কয়েকটি সমবায় সমিতি ধান বা চাল কেনার অনুমতি পাবে (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মহাজন বা জোত-দারদের সমবায় সমিতি খুলতে কোন আইনগত বাধা নেই, আর তারা যে তা খোলে নি তাই বা কি করে বুঝব।) এই সমবায়গুলি মূলধন পাবে কোথা থেকে? সরকার ধার দেবেন।

এই রকম ঢাল-তরোয়াল নিয়ে নিধি-রাম সর্দার যখন মাঠে নামবেন তখন দেখবেন যে কোথাও একদানা চালও নেই। বস্তুত ধান-চালের কারবারীরা, পাইকারী মহাজনেরা ইতিমধ্যেই আসরে নেমে গেছে এবং তারা অনেকটা বেশি দাম দিয়েই যতটা পাচ্ছে ততটাই কিনে নিচ্ছে, পারে তো সবই নেয়। মহাজনদের চাল কেনায় কোন আইনসম্মত বাধা নেই, আর রেশন এলাকাটা বাদ দিয়ে চালের খোলাবাজার তো বেআইনী নয়। কাজেই ফুড কর্পোরেশন নিয়োজিত সমবায়গুলি মাঠে নেবে দেখবে মাঠ ফাঁকা। তবে রসিকতা করার জন্য কেউ কেউ হয়ত দু-এক মণ বেচতে পারে। তদুপরি সতের, আঠারো, উনিশ টাকা মণ দরে কেউ ধান দেবে না, সবাই জানে রেশন এলাকায় চাল দু'টাকা। আড়াই টাকা কিলো।

তাহলে এই সংগ্রহনীতির উপর ভরসা করে সরকার কিভাবে রেশন ব্যবস্থাকে বলবৎ রাখবেন? রাখা যে যাবে না সে কথা মুখ্যমন্ত্রী মশাই খুব ভাল করেই বোঝেন। এবং রাখবার যে খুব একটা আগ্রহও তাঁর আছে তা-ও নয়। তিনি শুধু ইলেকশানটুকু ভালোয় ভালোয় পার করতে চান। বাম দাদাদের যা হাল দেখা যাচ্ছে তাতে মুখ্যমন্ত্রীমশাই-এর অবশ্য আশংকা কিছু নেই, তবে যদি শ্রীভগবান বিরূপ হন? সেই আশংকায় মুখ্যমন্ত্রীমশাই জোতদার-মজুতদারদের শ্রীঅঙ্গে আঙুলটুকু ছোঁয়াতে নারাজ।

নির্বাচনের পরে আবার যদি মুখ্য-মন্ত্রী গদীতে ফিরে আসতে পারেন তাহলে খাদ্যনীতি নিয়ে তাঁর মাথাব্যথার কোন কারণ থাকবে না। রেশন ব্যবস্থা ভেঙে পড়লেও তাঁর কিছু আসে যাবে না, চালের দাম পাঁচ টাকা কিলো হোক আর দশ টাকা কিলোই হোক তিনি নির্বিকার থাকবেন। লোকে না খেয়ে মরলেও কোন ক্ষতি নেই। তখন তিনি বুক ফুলিয়ে বলবেন "জন-সাধারণের ভোটেই আমরা এসেছি, এবং আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে মৃত্যু ছাড়া আর কেউ আমাদের গদী থেকে হটাতে পারবে না। তোমারা যতই গণ-আন্দোলন কর না **কেন, আমাদের বীরের হৃদয় ও ভয়ে কম্পিত হবে না।** যদি পুলিশ গুলী চালাতে অস্বীকার করে, তাতেও কোন ক্ষতি নেই। আমাদের ঝুলিতে অন্য অস্ত্রও আছে। তোমাদের আন্দোলনের

সময় তোমাদের মুখপাত্র হয়ে যারা আমাদের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসবে তোমাদের আন্দোলনকে পথে বসাবার পক্ষে তারাই যথেষ্ট। ১৯৬৬-র খাদ্য আন্দোলনেই সেটার প্রমাণ হয়ে গেছে।"

পশ্চিমবঙ্গ ও যোজনা কমিশন

পরিকল্পনা কমিশন ও রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে ইতিমধ্যে একদফা বৈঠক হয়ে গেল। কিন্তু পরিকল্পনা কমিশন সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গের বক্তব্যসমূহ বিশেষ কানে তোলেন নি বলেই অনেকের ধারণা। এই বৈঠকে উভয়পক্ষের মধ্যে কোন সমঝোতা হয় নি। যোজনা কমিশন আর পশ্চিমবঙ্গে আসবেন না। দিল্লীতে বসেই পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ তাঁরা দেবেন। তবে যতদূর মনে হয় চতুর্থ পরিকল্পনাতেও পশ্চিমবঙ্গকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাবলীর প্রতি কোন সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী পরিকল্পনা কমিশনের নেই। পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাসমূহ উপলব্ধি করতে তাঁরা আদৌ সচেষ্ট নন। কলকাতার সমস্যা যে সর্বভারতীয় সমস্যা এটাও তাঁরা উপলব্ধি করেন নি এবং শেষ পর্যন্ত কলকাতার উন্নয়নের জন্য কিছু বরাদ্দ হলেও যেহেতু তা পর্যাপ্ত নয়, সেহেতু সে বরাদ্দে কোন সুফল হবারও বিশেষ আশা নেই। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির চোট বোধহয় পশ্চিমবঙ্গকেই সবচেয়ে বেশি সহ্য করতে হচ্ছে, এবং তারই ফলে জনসাধারণের মধ্যে যে বিক্ষোভ দেখা যাচ্ছে তা কিঞ্চিৎ শান্ত করার জন্য রাজ্য সরকার সরকারী কর্মচারী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মীদের জন্য যে কিছু বেতন বৃদ্ধি করেছেন তার জন্য অতিরিক্ত যে ৪২ কোটি টাকার বোঝা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্কন্ধে চেপেছে, তার কিঞ্চিৎ ভার বহন করতেও পরিকল্পনা কমিশন বোধহয় রাজী নন। সব মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি পরিকল্পনা কমিশনের বিমাতাসুলভ আচরণই কেন্দ্রের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সম্পর্ককে যে ক্রমাগত তিক্ত থেকে তিক্ততর করবেই তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান অশোক মেহতার বিরূপ মনোভাবে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তাঁকে লিখিত একটি পত্রে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, মহীশূর, অন্ধ্র, গুজরাট ও মাদ্রাজ—এমন কি, উদ্বৃত্ত রাজ্য মহারাষ্ট্রের পরিকল্পনা সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশন যে দরদ দেখিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ঠিক বিপরীত মনোভাব নেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পনার আকার ৫৪৪ কোটি টাকা থেকে ছেঁটে ৫২২ কোটি টাকাতে আনা হয়েছে। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ অনেক আগেই স্থির করেছিলেন যে কেন্দ্রীয় সাহায্যের ৭০ শতাংশ বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বন্টিত হবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে, বাকি ৩০ শতাংশ দেওয়া হবে বিশেষ প্রয়োজন ও সমস্যার দিকে তাকিয়ে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই স্বীকৃত নীতিকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে অস্বীকার করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর চিঠিতে আরও জানিয়েছেন যে চতুর্থ পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের জন্য যা বরাদ্দ করা হয়েছে তার উপর আরো ২৯০ কোটি টাকা না দিলে পশ্চিমবঙ্গে সমূহ দুর্যোগ দেখা দেবে। পরিকল্পনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার আগে কর বসিয়ে ৬২ কোটি টাকা দিতে সম্মত ছিলেন, পরে মুখ্যমন্ত্রী ৯৩ কোটি টাকা তুলতে সম্মত হয়েছেন। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, এর অতিরিক্ত টাকা কর বসিয়ে তোলা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে সম্ভব নয়। ৪৭ কোটি টাকার বেশি ঋণ সংগ্রহ করাও পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে অসম্ভব।

কথার উপর ট্যাক্স বসানো দরকার

যেহেতু বক্তৃতা দিতে কোন ট্যাক্স লাগে না, সেহেতু এদেশে যার মনে যা ইচ্ছা হয় সে তাই বলে যায় এবং সেই সব বচনামৃত সংবাদপত্রের পাতায় স্থানলাভও করে।

সম্প্রতি কলিকাতা অ্যাডভার্টাইজিং ক্লাব আয়োজিত একটি ভোজসভায় একজন নামকরা শিল্পপতি শ্রীঅরবিন্দ মফতলাল বক্তৃতাদানকালে এমন কতকগুলি কথা বলেছেন যা শুনে উপরিউক্ত মন্তব্য না করে থাকতে পারা গেল না।

ভারতবর্ষে প্রতিনিয়ত যে প্রত্যেকটি জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে, তার দায়িত্ব শ্রীমফতলাল অক্লেশে খুচরা ব্যবসায়ীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। খুচরা ব্যবসায়ীরাই নাকি জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দেয়, তারা নাকি লাভের জন্য সততাবিরোধী কাজ করে ইত্যাদি। এবং শ্রীমফতলালের ভাষ্য অনুযায়ী পাইকারী ব্যবসায়ীরা এবং উৎপাদকেরা একেবারেই ধোয়া তুলসীপাতা।

এই জাতীয় দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্যের প্রতিবাদ এই মুহূর্তেই হওয়া প্রয়োজন। খুচরা ব্যবসায়ীরা যে সুযোগ পেলে অন্যায় লাভ করার চেষ্টা করে না, বা তারা যে প্রত্যেকে মহাত্মা গান্ধীর মন্ত্রশিষ্য তা নয়, কিন্তু দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি ঘটানোর আসল দায়িত্বটা তাদের নয়, বিশেষ করে যখন ক্রেতাদের সঙ্গে তাদেরই একমাত্র প্রত্যক্ষ যোগাযোগ, যেখানে বেশি দাম নিলে ক্ষেত্রবিশেষে মার খাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে।

আমরা পূর্বে বঙ্গদর্শনে দেখিয়েছি যে প্রতিটি ক্ষেত্রেই পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে উৎপাদকের কারসাজিতে। এ বিষয়ে আমরা বনস্পতি, সাবান ও কাপড়ের মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গে অঙ্ক কষে দেখিয়ে দিয়েছিলাম যে, সংশ্লিষ্ট পণ্যসমূহের কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি না পাওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে উৎপাদকেরাই দাম বাড়িয়েছে, খুচরা ব্যবসায়ীদের সেক্ষেত্রে কোন হাতই ছিল না। লোকসভায় ও বিধানসভায় বাজেট পেশ হওয়ার আগেই কোন কোন সামগ্রীর উপর ট্যাক্স বসছে তা জানার কোন উপায়ই খুচরা ব্যবসায়ীদের নেই, একমাত্র বড় বড় উৎপাদক ও পাইকারী কারবারীদের পক্ষেই তা জানা সম্ভব। ডিভ্যালুয়েশনের পর বড় বড় উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলিই সংবাদপত্রে বড় বড় বিজ্ঞাপন দিয়ে তাদের পণ্যের বর্ধিত মূল্য সাড়ম্বরে ঘোষণা করেছিল।

সব জেনেশুনেও যদি মফতলালদের মত লোকেরা এই রকম আজে বাজে বিভ্রান্তিকর কথা জনসমক্ষে প্রচার করে তাহলেই তাদের মতলব সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। যাদের অতিলাভের জন্যই আজ দেশের এই দুর্গতি হয়েছে তাদের মুখ থেকে নিজেদের সাফাই গাওয়া ও অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেবার ভণ্ডামী সহ্য হয় না।

অপ্রিয় সত্য

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতিকে আমরা জানতাম একটি অরাজনৈতিক সংস্থা হিসাবে। আজও পর্যন্ত নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি প্রায় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক-সমাজের প্রতিনিধি স্থানীয়, এবং তার যে আরও দু-একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থা আছে সেগুলির প্রভাবের পরিসর অতি সীমাবদ্ধ।

অবশ্য অনেক মহল থেকে বরাবরই অভিযোগ করা হয়ে এসেছে যে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি বাম কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবিত সংস্থা, এবং সম্প্রতি, অর্থাৎ ১৯৬২ সালের পর থেকে, তা বাম কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রভাবান্বিত হয়েছে। তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে তাঁরা এই যুক্তি দিয়েছিলেন যে এ বি টি এ-র নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনেক ছাপ মারা বাম কমিউনিস্ট রয়েছেন, এবং সর্বোচ্চ নেতা শ্রীসত্যপ্রিয় রায় মশায়-এরও আনুগত্য ওই দলের প্রতি।

আমরা কিন্তু এতকাল এই সমস্ত কথা বিশ্বাস করতে রাজী ছিলাম না, তার কারণ যে কোন ব্যক্তিরই বিশেষ কোন রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাস রাখার অধিকার অবশ্যই আছে, এবং বিশেষ কোন রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তি যদি

কোন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হন তাহলে সেই প্রতিষ্ঠান যে তাঁর মতবাদ, বা তিনি যে রাজনৈতিক দলের সদস্য সেই দলের অনুগত হয়ে পড়বে তার কোন কথা নেই, যদি সেই ব্যক্তি সেই প্রতিষ্ঠানকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে নিজের দলীয় স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্র না করে তোলেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে এরূপ একটি বিপজ্জনক সম্ভাবনা বর্তমান এ বি টি এ-র ক্ষেত্রে দেখা গেছে, এবং কতিপয় শিক্ষক আমাদের কাছে লিখিতভাবে এই অভিযোগ জানিয়েছেন যে এ বি টি এ-র কাজকর্ম যতটা শিক্ষকের স্বার্থে না হয়, তার চেয়ে বেশি হয়, একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের স্বার্থে। এঁরা অভিযোগ করছেন যে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির নেতা সম্পূর্ণ দলীয় স্বার্থে, এবং তাঁর রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য শিক্ষকদের প্ল্যাটফর্ম হিসাবে ব্যবহার করছেন।

অবশ্য এ রকম অভিযোগ পূর্বেও আমাদের কাছে বহু এসেছে, কিন্তু সেগুলির উপর বিশেষ কোন গুরুত্ব আরোপ করার প্রয়োজন উপলব্ধি করি নি। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে অভিযোগকারীরা ইতিপূর্বে যা বলেছেন তা মোটেই মিথ্যা নয়, এবং সমগ্র শিক্ষকদের স্বার্থে যে প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, সেই প্রতিষ্ঠান কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হবে এটা মোটেই কাম্য নয়। বস্তুত শিক্ষকদের একটি বিরাট অংশই একথা উপলব্ধি করছেন যে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ নেতা যখন একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সমর্থিত প্রার্থী হয়ে লোকসভায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত করেছেন তখনই বোঝা যাচ্ছে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির নামে পূর্বে যে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগ ছিল তা ভিত্তিহীন নয়।

তবে এর উত্তরে কেউ কেউ বলবেন যে ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী যে কোন ব্যক্তিই নির্বাচনে প্রার্থী হবার অধিকারী, এবং যে কোন রাজনৈতিক দলের তরফ থেকে, বা তাদের সমর্থিত হয়ে নির্বাচনপ্রার্থী হতে যদি আইনসংগত কোন বাধা না থাকে তাহলে শ্রীসত্যপ্রিয় রায় অপরাধটা করলেন কোথায়। ব্যক্তিগতভাবে শ্রীরায় যে কোন দলের তরফ থেকেই দাঁড়ান, তাতে আমাদের আপত্তির কোন কারণ নেই, কিন্তু তিনি যখন প্রার্থী হচ্ছেন একটি সর্ববঙ্গীয় শিক্ষক সংস্থার সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় এবং তাঁকে সমর্থন করছে যখন, একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল, তখন শিক্ষকদের মধ্য থেকে এই প্রশ্নই স্বাভাবিকভাবে আসবে যে দেশের সকল শিক্ষকই কি ওই বিশেষ রাজনৈতিক দলটির অন্তর্ভুক্ত? নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি বা এই শিক্ষক সংস্থার সকল সদস্যই নিশ্চয়ই একটি বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শের অনুগামী নন। অথচ প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্যের খাতিরে আগামী নির্বাচনে শিক্ষকদের একটি বিশেষ দলের স্বার্থে পরোক্ষভাবে টেনে আনা যে অত্যন্ত অন্যায় হচ্ছে এ অভিযোগ আজ শিক্ষকমহলে সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

শ্রীরায় যদি কোন রাজনৈতিক দলের তরফ থেকে বা সমর্থনে নির্বাচনপ্রার্থী হন তাহলে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি বা সর্বভারতীয় শিক্ষক ফেডারেশনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তা করলেই ন্যায়সংগত হয়। অথবা যদি শিক্ষক সমাজের তরফ থেকেই নির্বাচনপ্রার্থী হন তাহলে সেই আঙিনায় বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলের অভিসার বন্ধ করতে হবে। শিক্ষকসমাজের অধিকাংশই বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই এই অভিমত প্রকাশ করছেন, এবং যে পথে শ্রীরায় চলেছেন তা থেকে যদি তিনি বিরত না হন তাহলে তাঁর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হবেই।

বস্তুত নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি বা সর্বভারতীয় শিক্ষক ফেডারেশনের তরফ থেকে সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করারও বিশেষ কি যৌক্তিকতা আছে সে কথাও শিক্ষকসমাজের অনেকে বুঝতে পারছেন না। শিক্ষকরা কি সরকারের প্রতিদ্বন্দ্বী একটি রাজনৈতিক দল হতে চান? শিক্ষকদের স্বার্থ দেখার জন্য তো বিধান পরিষদে ও রাজ্যসভায় শিক্ষক সদস্যের স্থান রয়েছে। শিক্ষক ফেডারেশনের যুক্তি হচ্ছে এই যে যেহেতু সরকারী শিক্ষানীতি শিক্ষকসমাজের অনুকূল নয় সেই হেতু তাঁরা লোকসভায় ও বিধানসভায় প্রতিনিধি পাঠিয়ে নিজেদের স্বার্থরক্ষা করবেন। এই জাতীয় সেক্টারিয়ান মনোভাব নিয়ে যদি সাধারণ নির্বাচনে অবতীর্ণ হওয়া যায় তাহলে জনসাধারণ কোন যুক্তিতে তাঁদের সমর্থন করবেন একথা শিক্ষকসমাজের অধিকাংশ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না।

ট্রাম ধর্মঘট প্রসঙ্গে

প্রায় পক্ষকাল ধরে ট্রামের চাকা অচল হয়ে থাকার দরুণ কলকাতার পরিবহন ক্ষেত্রে যে সংকটের সৃষ্টি হয়েছে এবং জনজীবনে যে দুর্ভোগ দেখা গেছে, তা থেকে আপাতত মুক্তির উপায় যে কি তা মোটেই ভেবে পাওয়া যাচ্ছে না।

এখানে পক্ষ তিনটি—শ্রমিক, কোম্পানীর মালিকগোষ্ঠী এবং সরকার। আরও একটি পক্ষ অবশ্য আছে, তা হচ্ছে কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান। কিন্তু যাঁরা যাত্রী তাঁরা বর্তমানে এই কটি পক্ষেরই হাতের তাস, তাঁদের দিকটিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হচ্ছে।

ট্রামের চাকা বন্ধ হবার বিষয়টি ঠিক সাধারণ শ্রমবিরোধের ব্যাপার নয়। তা হলে আমরা বিশেষ কিছু মতামত এ বিষয়ে প্রকাশ করতাম না। ট্রাম শ্রমিকেরা তাঁদের বেতন বৃদ্ধির জন্য ধর্মঘট করছেন, এতে আমাদের বলার কিছু নেই, বরং যদি আমরা দেখি যে, কেউ দাবি আদায়ের জন্য সংগ্রামের পথ অবলম্বন করছেন, সম্পূর্ণ মানবিক কারণে আমরা তা সমর্থন করি।

কিন্তু সমস্যাটা ভিন্ন ধরণের। বিভিন্ন সংবাদপত্রের রিপোর্টে যা প্রকাশ, ট্রাম কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া মেটাতে অনাগ্রহী নয়, তবে সেই ঘাটতিটা এবং আরও কিছু বেশি, তাঁরা টিকেটের দাম বাড়িয়ে জনসাধারণের কাছ থেকে তুলে নিতে চান। এতে তাঁদের বেশ বাড়তি দু-পয়সা আসবে এবং শ্রমিকদেরও কিছুটা সুরাহা হবে, আর যা কিছু লোকসান যাবে, তা জনসাধারণের। অর্থাৎ, সোজা কথায়, কোম্পানী পরমদণ্ডে ফলার খেতে চান এবং শ্রমিকদেরও কিছু ভাগ-বখরা দিতে চান।

আর একটি সংবাদপত্র আবার বিষয়টিকে অন্যভাবে দেখছে। সেখানে বলা হচ্ছে যে, ট্রাম কোম্পানী যখনই ভাড়া বাড়ানোর সিদ্ধান্ত করে তখনই একটা বেতনবৃদ্ধির জন্য শ্রমিক ধর্মঘট করিয়ে দেওয়া হয়। গত কয়েকবারের ট্রাম ধর্মঘটের নজীর দেখিয়ে উক্ত পত্রিকাতে এই কথাই বলা হয়েছে যে, আসলে এ ধর্মঘটের পিছনে আছে ভাড়া বৃদ্ধির চক্রান্ত। ব্যাপারটা কতদূর ঠিক তা বলা যায় না, কিন্তু একেবারে অসম্ভবও নয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সোজাসুজি বলছেন যে, শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির দোহাই দিয়ে ট্রামের ভাড়া বাড়ানো চলবে না, এবং যদি এ বিষয়ে ট্রাম কোম্পানী বাড়াবাড়ি করে তা হলে তাঁরা কোম্পানীকে পাততাড়ি গোটাতে বাধ্য করবেন। কলকাতার পৌর প্রতিষ্ঠান তো ইতিমধ্যেই খোঁজ-খবর করতে আরম্ভ করেছেন যে, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ট্রাম কোম্পানী কর্পোরেশনের আইন লঙ্ঘন করেছে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলতে আরম্ভ করেছেন যে, ট্রামের লাইসেন্স বাতিল না করে তাঁরা ছাড়বেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার যতটা গর্জন ততটা বর্ষণ না। তদুপরি দেশবাসীর চেয়েও বিদেশী ট্রাম কোম্পানীর স্বার্থ চিরকালই

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে অধিকতর প্রিয়, এবং সেই হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মুখে যাই বলুন না কেন, কার্য-ক্ষেত্রে এমন কিছু করবেন না, যা ট্রাম কোম্পানীর স্বার্থের প্রতিকূল। কাজেই যা মনে হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত জনসাধারণেরই পকেট কাটা যাবে, অর্থাৎ ভাড়াবৃদ্ধি ঘটবে, তা থেকে কোম্পানী মোটা মুনাফা লুঠবেন এবং মোট লুঠের ভাগ শ্রমিকরাও হয়ত কিছু পাবেন। আর পশ্চিমবঙ্গ সরকার শুধুমাত্র হুমকি দেওয়া ভিন্ন আর কোন কিছুই করবেন না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার মুখে বলছেন যে, ট্রাম কোম্পানী তুলে দেবেন এবং তার স্বপক্ষে এই যুক্তি দেখাচ্ছেন যে, ট্রাম লাইন রাস্তার অনেকটা অংশই অবরোধ করে রাখে, ফলে সমগ্র ট্রাফিক ব্যবস্থাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তদুপরি এই মন্থরগতি-যান বর্তমান গতিশীল যুগের পক্ষে একান্তই অচল। ট্রাম উঠে গেলে আরও বেশি বাস চালানো সম্ভবপর হবে এবং সামগ্রিকভাবে কলকাতার পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি হবে।

তর্কচ্ছলে যদি ধরে নেওয়া যায় যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার যা বলছেন তা সত্য, তাহলেও কতকগুলি প্রশ্ন মনে জাগে। প্রথমত, ট্রাম তুলে দিয়ে সেই জায়গায় হাজারখানেক বাস চালানো বর্তমান অবস্থায় সম্ভব কি? অত বাস পাওয়া যাবে কোথায়? সেই বাস কে বা কারা চালাবে? রাষ্ট্রীয় পরিবহন তো ইতি-মধ্যেই লালবাতি জ্বালাতে চলেছে। তদুপরি পরিবহনের ক্ষেত্রে ট্রাম যে সার্ভিস দেয়, তার গুরুত্ব এই গতির যুগেও অস্বীকার করা যায় না, হোক তা মন্থরগতি। নিরীহ নির্বিবাদী লোকেরা, যারা লাফালাফি করে টার্জেনের নব্য সংস্করণ হয়ে বাসে উঠতে পারে না, তাদের, বা শিশু, বৃদ্ধ, মহিলার পক্ষে আজও পর্যন্ত ট্রামই একমাত্র অবলম্বন। কাজেই ট্রাম তুললে পরিবহন ক্ষেত্রে যে সংকটের সৃষ্টি হবে তা এখন এই মুহূর্তে বসে কল্পনাও করা যায় না। ধারণা এবং বাস্তবে কদাচিৎ মিল হয়।

একমাত্র কার্যকর উপায় হচ্ছে, ট্রাম জাতীয়করণ করা। ট্রাম একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী কর্তৃপক্ষ যদি দক্ষ হন তা হলে ট্রাম থেকে প্রচুর লাভ তুলতে পারবেন। এ কথা তো বলা যাবে না যে, বেসরকারী মালিকানায় কন্ডাক্টররা ফাঁকি দেবে না এবং সরকারী মালিকানায় ফাঁকি দেবে। আসলে প্রশাসনিক দক্ষতার উপরেই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের সাফল্য-অসাফল্য নির্ভর করে। আর রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ সর্বদাই অলাভজনক হয় না, প্রমাণ রেলওয়ে।

এই কারণেই বিভিন্ন মহল থেকে ট্রাম কোম্পানীর জাতীয়করণের দাবি ওঠা উচিত।

বিশ্বভারতী সমাচার

বিশ্বভারতীর ঋতুচক্রে বোধহয় শীত-কালটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কেননা পৌষ আসার সঙ্গে সঙ্গে শান্তি-নিকেতনে আসে উৎসবের পক্ষ, পৌষ মেলা। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তনও হয় প্রতিবারেই এই সময়।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীই বিশ্বভারতীর আচার্য এবং সেই হিসাবে প্রতি বছর তাঁর সমাবর্তনে ভাষণ বর্তমানে একটা কনভেনশনে দাঁড়িয়ে গেছে, যা শুরু হয়েছিল স্বর্গত পণ্ডিত নেহরুর আমল থেকে। গত বছরেও বিশ্বভারতীর সমা-বর্তনে স্বর্গত লালবাহাদুর শাস্ত্রী ভাষণ দিয়ে গিয়েছিলেন। এবারে এসেছেন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী 'ইন্দু' বর্তমানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

অবশ্য এ বছরটা ইলেকশানের বছর, এবং সেইহেতু প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী একই সঙ্গে রথদেখা ও কলাবেচা দুই-ই সেরেছেন। বোলপুরে তিনি খুব জম-জমাট ইলেকশান মিটিং করেছেন।

এবারে সমাবর্তনে 'দেশিকোত্তম' উপাধি পেলেন বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র ও উপাচার্য সর্বজনপ্রিয় 'সুধীদা' শ্রীসুধীরঞ্জন দাস, জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও দার্শনিক অধ্যাপক আলেকজান্দার মুর।

অঙ্কুর মুখোপাধ্যায় স্মরণে

দৈনিক বসুমতীর সহকারী সম্পাদক, বিখ্যাত সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও দেশ-কর্মী শ্রীঅঙ্কুর মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু-সংবাদে আমরা আত্মীয় বিয়োগ ব্যথা অনুভব করছি। তাঁর মৃত্যুতে আমরা একজন অকৃত্রিম সুহৃদকে হারালাম, যে অভাব আমাদের নিকটে সহজে পূরণ হবার নয়। প্রথম যৌবনেই তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন উত্তরপাড়ার প্রখ্যাত বিপ্লবী স্বর্গত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রেরণায়। সেই অবস্থায় বহু নির্যাতন এবং কারাবরণ তাঁর অদৃষ্টে ঘটে। পরবর্তীকালে তিনি ভারতের প্রখ্যাত বিপ্লবী ও চিন্তানায়ক মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর কর্ম-দক্ষতা ও ধীশক্তির জন্য অচিরেই মানবেন্দ্রনাথের অন্যতম প্রধান সহকারী-রূপে পরিগণিত হন। সাংবাদিক হিসাবে পরবর্তীকালে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এদেশের প্রায় সকল প্রধান ইংরাজী এবং বাংলা দৈনিকের সঙ্গে তিনি সম্পর্কিত ছিলেন। তাঁর সাংবাদিক জীবনের শেষ অধ্যায়টি কাটে বসুমতীতে। তাঁর অকাল পরলোকগমনে আমরা সকলেই খুব মর্মাহত। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিজনদের সমবেদনা জানাই।

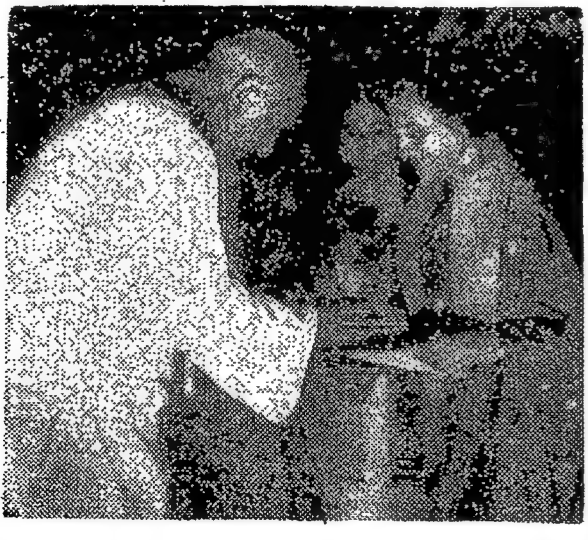

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস 'দেশিকোত্তম' উপাধি গ্রহণ করেছেন।

আমি যাঁদের দেখেছি

পরিমল গোস্বামী

(১৬) মোহিতলাল মজুমদার

(১৮৮৮—১৯৫২

নীরদচন্দ্র চৌধুরী (১৮৯৭)

মোহিতলাল ও নীরদচন্দ্র, দুজনের চরিত্রে কিছু মিল আছে। দুজনেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে অন্য সবার মধ্যে থেকেও পৃথক। দুজনেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ উপাধিধারী। দুজনেই চারিত্র-দৃঢ়তায়, আপন মতবাদের বিশ্বাসে, অনমনীয়। আবার দুজনের মধ্যে অমিলও তেমনি স্পষ্ট। মোহিতলাল ভাবপ্রবণ, নীরদচন্দ্র প্রধানতঃ বুদ্ধিবৃত্ত।

কিন্তু তুলনা বেশিদূর টেনে লাভ নেই।

মোহিতলাল সাহিত্য বিষয়ে নিজের একটি বিশেষ মত গঠন করেছিলেন এবং তা তাঁর সমস্ত সত্তার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। সাহিত্য বিষয়ে তাঁর চিন্তার গভীরতা স্তরের পর স্তর বিস্তার লাভ করেছে, এবং তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি সাহিত্যের যে মূল্য নির্ধারণ করেছেন, তার রূপ অতুলনীয়। সাহিত্য বিশ্লেষণে যে ভাব-গম্ভীর অথচ সুখপাঠ্য ভাষা ব্যবহার করেছেন, সে রকম ভাষা সাহিত্য সমালোচকের ঈর্ষার বস্তু। এবং মোহিতলাল কবি ছিলেন বলেই তাঁর ভাষা স্বভাবতই কিছু ভাবাবেগপূর্ণ, কিন্তু তবু তাঁর বিশ্লেষণ তাতে ক্ষুণ্ন হয় নি। তিনি বাংলা ভাষা, বাঙালী, ও বাংলা দেশ সম্পর্কে ব্যাপকভাবে চিন্তা করেছেন, এবং নিজের মনে এই তিনকে আশ্রয় করে যে আদর্শ, যে ছবি, গড়ে তুলেছেন, তা দুর্গের মতো দৃঢ়। সেখানে কারো সঙ্গে তাঁর কোনো রফার প্রশ্ন নেই। তিনি সাহিত্য সমালোচকরূপে নিজেকে অপরাজেয় মনে করেছেন, কারণ বাংলা কথা-সাহিত্য অথবা কাব্য-সাহিত্য কতখানি বাঙালীর জীবনের সঙ্গে (অথবা ভারতীয় ভাবের সঙ্গে) যুক্ত এবং তাকে ভিত্তি করে কতখানি কল্পনার দিকে প্রসারিত, অথবা প্রেমের চিত্র কতখানি দেহ সম্পর্কিত এবং কতখানি দেহ সম্পর্ক বজায় রেখে দেহাতীত, তার অনুপাত প্রায় ঠিক করে নিয়েছিলেন। ব্যক্তিমানুষ ছেড়ে অ্যাবস্ট্র্যাক্ট মানবতা অথবা অ্যাবস্ট্রাক্ট প্রেম, তাঁর মতে সাহিত্যের ধ্যানের [illegible] থেকে তাঁর যুক্তিতে কোনো ভুল ছিল না। কারণ তিনি যে বিচারের মান স্থির করেছিলেন, তা থেকে তাঁর সিদ্ধান্ত অনিবার্যরূপেই এসে পড়ে।

তিনি কবি ছিলেন, প্রবন্ধ লেখক ছিলেন, সমালোচক ছিলেন, শিক্ষক ছিলেন, এবং প্রতিপক্ষের প্রতি অসহিষ্ণু ছিলেন। চট করে রেগে যাওয়ার অভ্যাস ছিল তাঁর। ব্যক্তিগতভাবে এই অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেত তাঁর কথায়। প্রতিপক্ষকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করতেন। সজনীকান্তকে নানা বিষয়ে উত্তেজিত করার মূলে ছিলেন তিনি (যদিও একা তিনি নন)। শনিবারের চিঠির যে পূর্ব গোষ্ঠী রবীন্দ্রবিরোধিতার মূলে, সে গোষ্ঠীর পূর্ণ বৈঠকের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। আমি যখন এঁদের সঙ্গে পরিচিত হই (১৯৩২), তখন শনিবারের চিঠির গোষ্ঠী ভেঙে গেছে।

রবীন্দ্রবিরোধিতার যে আভাস বা পরিচয় এঁদের কাছাকাছি এসে অনুভব করলাম, তার দুটি দিক। একটি দিকে নীতিগত বিরোধ, আর একটি ব্যক্তিগত আক্রমণ, যা বেশির ভাগ মুখেই উচ্চারিত হয়েছে, ছাপার অক্ষরেও মাঝে মাঝে বেরিয়েছে। অথচ রবীন্দ্রনাথকে গভীর শ্রদ্ধা সহকারে, তাঁর কাব্যে বা জীবনদর্শনে কতখানি ভারতীয়ত্ব আছে, তা মোহিত-

মোহিতলাল মজুমদার

ফোটো : লেখক (১৯৪০)

লালকে তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় বিশ্লেষণ করে তাঁর প্রতি প্রাণের সমস্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করতেও দেখেছি। এমন সুন্দর ভাষায় রবীন্দ্রপ্রশস্তি আর কেউ করেছেন কি না আমার জানা নেই। (দ্রষ্টব্য, "বাংলার নবযুগ : পরিশিষ্ট—রবীন্দ্রনাথ", শনিবারের চিঠি, মাঘ ১৩৫১)।

মোহিতলালের প্রতি আমি নানা বিষয়ে কৃতজ্ঞ। আমার সম্পাদনা কালে শনিবারের চিঠির পূর্বতন লেখকদের সহযোগিতা পেয়েছি প্রচুর, কিন্তু মোহিতলাল অনেকবার আমাকে স্নেহের সঙ্গে অগ্রজের মতো উপদেশ দিয়েছেন। এবং তাঁর স্মরগরল যখন প্রথম (১৯৩৬) প্রকাশিত হয়, তখন তার একখন্ড আমাকে উপহার দেবার সময় (১৪ই পৌষ, ১৩৪৩) তিনি নিজ হাতে যা লিখলেন, তাতে আমি কিছু বিব্রত বোধই করেছি। তিনি আমার নামের আগে "শ্রদ্ধেয় বন্ধু" বিশেষণ প্রয়োগ করলেন। তাঁর চেয়ে আমি প্রায় দশ বছরের ছোট, এবং তাঁর শ্রদ্ধা আকর্ষণের মতো কিছু করেছি কি না তা ভেবে পাই নি। এটি তাঁর চরিত্রের উদারতার দিক।

ভাষা বিষয়েও মোহিতলালের নিষ্ঠা ছিল অপরিসীম। তিনি "সাথে" শব্দটি বাংলা গদ্যে অতি সঙ্গতভাবেই পরিত্যাজ্য মনে করেছেন। ওটি বিশেষভাবে কবিতায় ব্যবহার্য। "সাথে" গদ্যে পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত হয়। শব্দটি 'সহিত' থেকে এলেও বাংলা গদ্য সাহিত্যে ওটির ব্যবহার হয় না। কেউ গদ্যে 'সাথে' ব্যবহার করলে হঠাৎ সে রচনা সমালোচকের চোখে নিচুস্তরে নেমে যায়। সেজন্য তিনি গদ্যে 'সাথে' ব্যবহারে ভীষণ রুষ্ট হতেন। বলতেন "সাথে"-সাহিত্য ভালগার। ভাষার বিশুদ্ধতা বজায় রাখার দিকে তাঁর এমনই ঝোঁক ছিল যে এটিকে তিনি ধর্ম বলে মানতেন। (অথচ ভাগ্যের পরিহাস, তাঁর এমন সুন্দর কাগজে ও অক্ষরে ছাপা স্মর-গরল বইতে 'হৃদপিন্ড' ছাপা হয়েছে।)

শনিবারের চিঠির, আমার সম্পাদনাকাল ২২ মাস অতিক্রান্ত হলে, মোহিতলাল সালতামামি লিখলেন (কার্তিক, ১৩৪১), প্রথম প্রবন্ধরূপে ছাপা হল সেটি। তাতে শনিবারের চিঠির তৎকালীন অবস্থা কিছু জানা যাবে। মোহিতলাল লিখলেন, "...গত কিছুকাল যাবৎ 'চিঠি'র সম্পাদন ও পরিচালনভার যিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রধান কৃতিত্ব এই যে, তিনি পত্রখানিকে বহু পরিশ্রমে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন।... চিঠির লেখকগোষ্ঠী এখন আর কোনও coterie নহে—যেখানে যে কেহ সত্যসন্ধ শক্তিমান লেখক আছেন তাঁহারই সুচিন্তিত সারবান রচনা...প্রকাশিত হইতেছে ও হইবে।"

সাহিত্যজগৎ ভিন্ন অন্য কোনো জগতে তিনি শান্তিতে বাস করতেন কি না সন্দেহ। তাই তিনি নিজে যা রচনা করতেন তা সর্বদা অন্যকে পড়ে শোনাতেন। অথবা অন্যকে দিয়ে পড়িয়ে নিজে শুনতেন। আমিও তাঁর অনুরোধে এ কার্য করেছি অনেক বার। এই একটি বিষয়ে, মনে হয়েছে, তাঁর মাত্রাজ্ঞানের কিছু অভাব ছিল। কিন্তু তাঁর লেখা শোনবার সময় তিনি তার ধ্বনি ও ব্যঞ্জনার মধ্যে এমনভাবে ডুবে যেতেন যে, তখন তাঁর যেন বাইরের কোনো চেতনা থাকত না। চোখ মুখ এক অপূর্ব আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠত। চেহারায় কণ্ঠস্বরে এবং অনমনীয় মেরুদণ্ডের জোরালো ভঙ্গির চালচলনে তিনি যেখানেই উপস্থিত থাকতেন, সেখানেই তিনি সবার কেন্দ্র হয়ে উঠতেন। তাঁর চতুষ্পার্শ্বস্থ অন্য সবার মনোযোগ তিনি তাঁর দিকেই আকর্ষণ করে রাখতেন। তার আরো কারণ হয় তো এই যে, তিনি আবেগপ্রবণ ছিলেন বলে, তাঁর মনে কারো আঘাত দিতে সঙ্কোচ হত। এবং দেবার ক্ষমতাও সবার ছিল না। তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল খুব প্রচন্ড, যদিও এ বিষয়েও দু-এক ক্ষেত্রে তাঁর মনকে দ্বিধাবিভক্ত হতে দেখেছি। তাঁর সাহিত্য বিচারের সীমা ছিল নির্দিষ্ট, কিন্তু সঙ্কীর্ণ নয়। সেই সীমার মধ্যে তিনি ছিলেন প্রায় অপরাজেয়। বিশ্বাসের অবিশ্বাসের জোর প্রবল, ভাষায় শিথিলতা নেই, চিন্তাধারা স্বচ্ছ, এবং তা বহু স্তর পর্যন্ত গভীরে বিস্তৃত, তাঁর গদ্যভঙ্গি এবং কাব্যের বাঁধন মূলতঃ ক্ল্যাসিক্যাল, এবং অন্যের রচনাতেও এ সবের অভাব তাঁকে কিছু পীড়া দিত। অথচ মনের আর একটা দিক ছিল উদার, নবাগত অনেককেই তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে স্বাগতম্ জানিয়েছেন, তাঁদের ভবিষ্যৎ বিষয়ে আশান্বিত হয়ে উঠেছেন। আবার, সজনীকান্তকে যথেষ্ট ভালবাসা সত্ত্বেও তাঁকে তিনি কবিরূপে কদাচিৎ স্বীকৃতি দিয়েছেন। মাত্র একবার সজনীকান্তের পঞ্চাশত্তম বার্ষিক জন্মদিন উপলক্ষে ঢাকা থেকে যে ছয় ছত্রের আশীর্বাদ (৭-ভাদ্র ১৩৫০) পাঠিয়েছেন, সেইটি দেখেছি। তাতে লিখেছিলেন, "সম্পাদক, সাহিত্যিক ও কবি সজনীকান্ত।" অন্যত্র কোথাও বলেছেন কি না আমার জানা নেই।

ঐ জন্মদিনের কথাতেই মনে পড়ল, এর আগের এক জন্মদিন (বৎসর মনে পড়ছে না, সম্ভবতঃ ১৯৪৪ সালের জন্মদিন উৎসব) সম্পর্কে ধর্মতলার এক প্রকাশকের ঘরে বসে তিনি বহুক্ষণ ধরে আমার কাছে অনেক কথাই বলেছিলেন। (যে সব কথা আরও বিস্তারিতভাবে তিনি প্রবন্ধাকারে লিখে রেখেছিলেন, এবং যা তাঁর মৃত্যুর পরে একখানা মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।) সে দুঃখের কথা, বেদনার কথা। তাঁর মোট বক্তব্য ছিল এই যে, বয়স্কদের সম্মাননার কথা ভুলে কনিষ্ঠদের সম্মান কুড়নোর ইচ্ছা তাঁর ভাল লাগছে না। তিনি যে শনিবারের চিঠিকে এত কাল কিভাবে সেবা করেছেন, কোনো কিছুর লাভে নয়, শুধু ভালবাসার জন্য, বাংলাদেশের মঙ্গলের জন্য, সে কথা সজনীকান্ত আর স্মরণ করেন না কেন। আজ তিনি অবহেলিত। এ কথাগুলো এভাবে লিখলে স্বভাবতঃই শুনতে খারাপ লাগবে, তবু সসঙ্কোচে লিখলাম। মোহিতলাল যেভাবে বলেছিলেন তার মধ্যে একটা সৌন্দর্য ছিল, যার স্মৃতিমাত্র লিখতে গেলে তা আর বজায় থাকবে না, তাই শুধু খবরটাই লিখলাম। তিনি নিজে লিখেও সেই ভাষা বজায় রাখতে পারেন নি। কারণ মুখে যা বলেছিলেন তার পুনর্গঠন করা সম্ভব নয়, কারণ তা ছিল তরল ভাবসর্বস্ব এবং ইঙ্গিতধর্মী।

আমার নিজের তখন যা মনে হয়েছিল তা এই যে, সজনীকান্তের জন্মোৎসবে তাঁর আন্তরিকভাবে আনন্দ প্রকাশ করাই উচিত ছিল, কারণ সজনীকান্তের সাহিত্য বিষয়ক মতবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মোহিতলালের প্রভাবে ঘটেছে, এবং সজনীকান্তও যে তাঁকে যথেষ্ট মান্য করে চলতেন, তার লিখিত প্রমাণ নানাস্থানে আছে। গুরু বলে স্বীকার করতেন। মোহিতলাল শনিবারের চিঠির একটি প্রধান স্তম্ভ ছিলেন, এবং 'চিঠি'র প্রতি আকর্ষণ আমার আমলেও সমান ছিল। কিন্তু পরে কি কারণে দুজনের মধ্যে মৌখিক সম্পর্ক থাকলেও আন্তরিক প্রীতির কিছু অভাব ঘটেছিল, তা জানি না। সজনীকান্তের নিজের প্রতি দুর্বলতা ছিল একটু বেশি পরিমাণেই, কিন্তু তাঁর গুরুরও এ বিষয়ে ব্যতিক্রম ছিল না, যদিও দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য ছিল অনেকখানি।

মোহিতলাল কবি, তাই তিনি ভাবপ্রবণ ছিলেন, এবং তিনি সমালোচক, অতএব যাতে তিনি আনন্দ পেয়েছেন, তার কথা প্রাণখুলে স্বীকার করেছেন। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। এটি একটি সনেট, শিশিরকুমার ভাদুড়ির 'সীতা' দর্শনান্তে লেখা। এখানে শিশিরকুমারকে তিনি কবিরূপে স্বীকার করেছেন। কবিতাটির শিরোনামা "নট-কবি শিশিরকুমারের উদ্দেশে"—

"বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে তোমা হেরিনু যেদিন,
প্রত্যাসন্ন প্রভাতের শিশির-মুকুর!
চমকি চাহিনু ঊর্ধ্বে—নিশার চিকুর
দিগন্তের অন্তরালে হয় যে বিলীন!
হেরিলাম কলালক্ষ্মী আজি এ নবীন
নেপথ্য-লীলায় ধরি' নবতন সুর,

নয়নমোহন কাব্যে নিপুণ নূপুর
বাজাইতে বঙ্গে আর নহে উদাসীন।
ছন্দ হেথা শরীরী যে! বাক্য হতমান।
শব্দ অর্থ প্রাণ পায় মূর্ত রসরাগে।
হৃদয়ের রসাতলে যার অধিষ্ঠান—
নরকণ্ঠস্বরে তার কি আকুতি জাগে।
প্রতি অঙ্গ কথা কয় রসনা সমান
শ্রোত্র চেয়ে নেত্র যেন কাব্যসুধা মাগে!"

এই কবিতাটি ১৯২৫ সনে (৩রা মাঘ, ১৩৩১,৩৪শ সংখ্যায়) নাচঘর পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল শিশির সুহৃৎ শ্রীঅমল মিত্রের সৌজন্যে এটি আমার হস্তগত হয়েছে।

বাংলা গদ্যে ক্ল্যাসিক্যাল ভঙ্গির অনুসরণ মোহিতলালে এসে শেষ হয়েছে। এখন বাংলায় যে গদ্যরীতি চলছে, এবং আমরা যে চলতি ভাষায় লিখছি তা আসরে বসে আলাপের ভাষা। অনেকের হাতে এর ব্যবহারও প্রশংসাযোগ্য হয়েছে, এবং ভবিষ্যতেও অবশ্যই হবে, যদি চিন্তার ক্ষেত্রে এবং তারও গোড়ার কথা—শিক্ষার ক্ষেত্রে, ফাঁকি না থাকে। মোহিতলালকে স্মরণ করতে গেলে বার বার তাঁর গদ্যরীতির কথা মনে পড়ে।

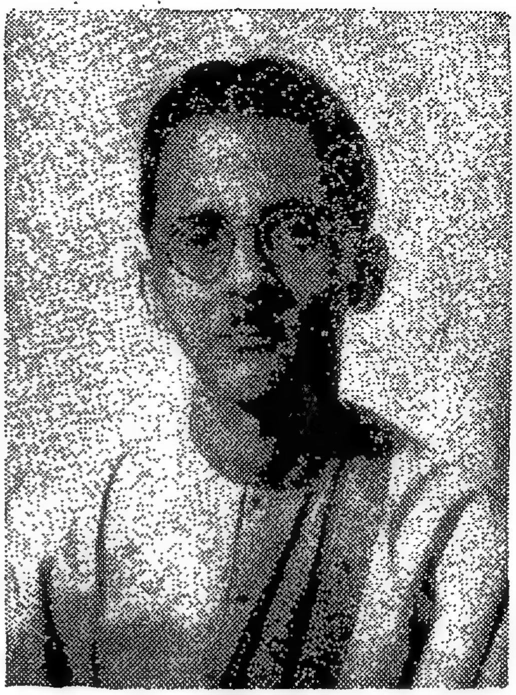

নীরদচন্দ্র চৌধুরী

ফোটো : লেখক (১৯৪০)

নীরদচন্দ্র চৌধুরীকে আমি প্রায় ২৫ বছর দেখি নি। কিন্তু তাঁর নানা লেখার ভিতর দিয়ে তাঁকে আমি বেশি করে দেখি এখন। চিঠির মাধ্যমেও কিছু যোগসূত্র আছে। যখন প্রায় প্রতিদিন দেখা হত (১৯৩২-৪০) তখন তাঁর আচরণের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। ব্যক্তিগত ব্যবহারে কোনোদিন কোনো সময়ের জন্য তাঁকে অনাকর্ষক মনে হয় নি, বরং তাঁর সান্নিধ্য আমার দিক থেকে সব সময়েই ভাল লাগত। এবং নিকট দৃষ্টিতে তাঁর যে পরিচয় আমার কাছে উদ্ঘাটিত হয়েছে তা এমনই বিস্ময়কর যে তা প্রকাশ করলে অতিবাদের মতো শোনাবে। আমার মনে হয় বাইরের লোক হিসাবে আমি তাঁকে যেভাবে বুঝতে পারি, অন্য কেউ করলে অতিবাদের মতো শোনাবে। আমার মনে হয় বাইরের লোক হিসাবে আমি তাঁকে যেভাবে বুঝতে পারি, অন্য কেউ ঠিক তেমন পারেন না। সেজন্য বহুজনেই তাঁকে ভুল বোঝেন, এবং তাঁর লিখনভঙ্গি এবং পাণ্ডিত্যের পরিধিও অনেকে সহ্য করতে পারেন না, মনে করেন ওটা দাম্ভিকতা। অথচ আমি জানি দাম্ভিকতা তাঁর নেই। ভুল বোঝার কারণ আরও একটুখানি বিস্তারিত বলি। তিনি সত্য কথা জোরের সঙ্গে বলেন, এবং অনেক সময় মূঢ়তার বিরুদ্ধে কলম ধরলে বেশ একটু আঘাত দিতেও চান পাঠককে। তারও কারণ স্পষ্ট। বহু বিষয়ে মত প্রকাশের অধিকার নীরদবাবুর আছে, কারণ বহু বিষয় তাঁর জানা। জ্ঞানের নানা বিভাগে তাঁর অনায়াস বিচরণ। বর্তমান যুগে সাহিত্য বিজ্ঞান শিল্প ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় যে পরস্পর সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন নয়, এটি ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এ জন্য যিনি জ্ঞানের এই চারটি দিক আয়ত্ত করেছেন, তিনি কোনো একটি বিশেষ সত্যকে বৃহত্তর পটভূমিতে দেখতে পান, তাই তাঁর চোখে সে সত্যের চেহারা, যিনি এর কোনো একটি বিভাগে বসে আছেন, তাঁর দেখা থেকে স্বভাবতঃই স্বতন্ত্র হবে।

নীরদবাবুর দিক থেকে এই দৃষ্টি পার্থক্য প্রচারের অধিকার আছে, কারণ এই একটি ব্যক্তি বহু বিষয় শুধু জেনেছেন তাই নয়, এই জ্ঞান তাঁর মনীষাকে অন্য স্তরে উন্নীত করেছে। ছাত্রজীবন থেকে তিনি স্বাধীন মত গঠন ও প্রচার করে আসছেন। এবং দিনের পর দিন যত বেশি বেশি বিষয় আয়ত্তে এসেছে, ততই তিনি বেশি বেশি বিচারশক্তিও লাভ করেছেন। এবং তাঁর যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ ঘটেছে তাতে তিনি যথাসম্ভব নিরপেক্ষ থাকবার চেষ্টা করেছেন, যদিও যান্ত্রিক নিরপেক্ষতা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় বলেই আমি মনে করি।

নীরদবাবুর প্রখর পছন্দ অপছন্দ আছে, বিশেষ বিশেষ বিষয়ের দিকে ঝোঁক আছে. রুচির স্বাতন্ত্র্য আছে. ক্রোধ আছে, প্যাশান আছে, হৃদয়াবেগ আছে, শৌখিনতা আছে, অতএব তিনি যন্ত্র নন। অটোম্যাটন নন। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় গুণ যা আমি তাঁর সান্নিধ্যে এসে অনুভব করেছি, এবং তাঁর লিখিত বিবিধ গ্রন্থের ভিতর দিয়ে এবং নানা সাময়িক পত্রের অথবা ব্যক্তিগত পত্রের ভিতর দিয়ে, সে হচ্ছে তাঁর হৃদয়ের ব্যাপ্তি ও আন্তরিকতা। তাঁর মধ্যে একজন জাত শিক্ষকের স্থায়ী বাস আছে, প্রকৃত জিজ্ঞাসুর কাছে সেই শিক্ষকের কোনো ক্লান্তি নেই। আমি তাঁর কাছে অনেকবার অনেক জিজ্ঞাসা নিয়ে গিয়েছি, তিনি আন্তরিকভাবে সব ব্যাখ্যা করেছেন, বুঝিয়ে দিয়েছেন, এবং সে কথা আজও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।

নীরদবাবুর মতো বহুমুখী প্রতিভা বাঙালীর মধ্যে শুধু নয়, অন্যান্য দেশেও কটা আছে জানি না। একই সঙ্গে ইংরেজি, ফরাসী, জারমান ভাষায় পাণ্ডিত্য (বাংলা ভাষাও, এবং একথা বলতে হল, অনেকের জানা নেই যে বাংলা ভাষাতেও তাঁর সমান অধিকার), পৃথিবীর ইতিহাস, ভূগোল, পূর্ণ সামরিক বিজ্ঞান, পাশ্চাত্য ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীতের সকল তথ্য, বিশ্বসাহিত্যের সকল তথ্য, বিশ্ব রাষ্ট্রনীতি, নৃবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ভাষা বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব, ইউরোপীয় ও ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল ভাষাতেও দখল, এবং চিত্রশিল্প বিষয়ে পাণ্ডিত্য ও নানা যান্ত্রিক

তথ্য তাঁর ভাল জানা আছে। সাহিত্যরস-বোধ এবং সাহিত্যের মূল্য নিরূপণের প্রথম দৃষ্টান্ত বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালি। তিনিই ঐ বইয়ের প্রথম শ্রোতা, গুণগ্রাহী এবং প্রচারক। তারপর পথের পাঁচালি বিচিত্রায় প্রকাশিত হতে থাকে, এবং ১৯২৯ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এ সব কথা বিভূতিবাবুর কাছ থেকে আমি নিজে শুনেছি।

কোনো একটি বিষয়ের বিশেষজ্ঞের চোখে দেখা, আর যাঁর জ্ঞানের পটভূমি এত বিস্তৃত তাঁর চোখে দেখায়, স্বভাবতঃই কিছু পার্থক্য থাকবেই। যতগুলি বিষয়ের উল্লেখ করলাম, আপাতদৃষ্টিতে সেগুলি পরস্পর সম্পর্কহীন মনে হলেও, শুধু শিক্ষিত মনের দিক থেকেই নয়, বস্তুগত-ভাবেও তারা যথার্থ সম্পর্কযুক্ত। এই জন্যই নীরদবাবুর দেখাকে তাঁর দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে চেষ্টা না করলে অন্যের সঙ্গে সহজেই বিরোধ বেধে ওঠে। এ জন্য তাঁর সমালোচকের সংখ্যা বেশি। এ বিষয়ে নীরদবাবুও ভালই জানেন। তিনি এ বিষয়ে একখানা চিঠিতে (২-৮-৫৮) লিখেছিলেন "আমার সম্বন্ধে [স্মৃতিচিত্রণে] লেখা দেখিয়া আমার বন্ধুরা (যাঁহারা এখনও বাংলা পড়েন)—দেখাইয়াছেন। তাঁহারা এই বলিয়াই মহোৎসাহে আমাকে দেখাইতে আনেন যে, "একজন অন্তত নিন্দা না করিয়া আপনার প্রশংসা করিয়াছেন।"

অর্থাৎ নীরদবাবুকে আমার প্রশংসা তাঁদের কাছে একটি বিশেষ দুর্লভ সংবাদ, এই হিসাবে তাঁরা আমার লেখা তাঁকে দেখাতে নিয়ে এসেছিলেন।

তিনি অনেকখানি বেশি দেখেন বলে প্রতিপক্ষের দেখাটা বুঝতে পারেন, কিন্তু প্রতিপক্ষ তাঁর দেখাটা বুঝতে পারে না। তাই তাঁদের সমালোচনা নীরদবাবুর কাছে আগে কিছু কৌতুক সৃষ্টি করলেও এখন তিনি এ বিষয়ে উদাসীন থাকেন। আমাকে লিখছেন (২২-৬-৬৫) "আমার লেখার বিরুদ্ধে এখন যাহা বাহির হয় তাহা এখন আমি পড়াও ছাড়িয়া দিয়াছি।"

আমার কাছে, যেমন আগে বলেছি, নীরদবাবুর চরিত্রের সবচেয়ে বড় গুণ তাঁর আন্তরিকতা (এবং তার সঙ্গে যোগ করি, বন্ধুবাৎসল্য)। তিনি জীবনে কতগুলি নীতি স্থির করে নিয়েছেন এবং সেই নীতিগুলি থেকে যাতে ভ্রষ্ট না হন, তার জন্য তাঁর সময়ের সঙ্গে লড়াই চালাতে হয় অবিরাম। তিনি যে নীতিতে বিশ্বাস করেন, জীবনকে তিনি ঠিক সেই-ভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। এইখানে তিনি চরমপন্থী। এক ক্ষীণদেহ বাঙালী গ্র্যাজুয়েটের ভারতীয় চিন্তাজড়তা থেকে আশ্চর্য মুক্তিলাভ। এ শুধু আপন নীতিকে জীবনে প্রয়োগ করবেন পণ করেছেন বলেই সম্ভব হয়েছে। এর জন্য যে প্রচণ্ড মনোবল দরকার, যে নির্ভীকতা এবং পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সংগ্রাম দরকার, তা তাঁর মধ্যে আশ্চর্যভাবে প্রকট। এই সংগ্রামের ক্ষমতা আছে বলেই তিনি "আননোন ইণ্ডিয়ান" থেকে একজন "ভেরি মাচ্ নোন ইণ্ডিয়ান" হতে পেরে-ছেন। আমাদের এই 'কনটিনেন্ট অভ সার্সি'তে বসেও তিনি সার্সির জাদুপ্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে পেরেছেন শুধু সেই জন্যই। (The Continent of Circe দ্রষ্টব্য।)

নীরদবাবু এবং আমার জন্ম বৎসর একই। অনেক বিষয়ে দুজনের মানস গঠনও এক, কিন্তু পাণ্ডিত্যের এবং মনো-বলের দিক থেকে দুজনের মধ্যে দুই মেরুর ব্যবধান। নীরদবাবুর অদম্য উৎসাহ এবং বন্ধুপ্রীতি আমাকে মুগ্ধ করে। যে-কোনো বিষয়ে তিনি অনেক-খানি সময় কি করে দিতে পারেন ভেবে বিস্ময়বোধ হয়। তিনি আমার স্মৃতি-চিত্রণ পড়ে লিখেছিলেন (২২-৮-৫৮)

.."The whole family

১৯৩৬ সালে মোহিতলালের ব্যারাকপুরের বাড়িতে গিয়ে এই ফোটোগ্রাফ তোলা হয়। গঙ্গার ধারে, শীত-কালে লেখক কর্তৃক গৃহীত। (ট্রাইপডে দাঁড় করিয়ে সেলফ—টাইমার যুক্ত ক্যামেরায় তোলা।)
বাঁদার থেকে—সুবল বন্দ্যো, ব্রজেন্দ্র বন্দ্যো, মোহিতলাল, সজনীকান্ত, মনোজ বসু, লেখক

read it with great enjoyment. My eldest son who has only heard of the life in Bengali society as it was lived in our young days, finds it a most informative and interesting documentation. I was most interested in seeing in what way your development and career have been similar to or different from mine, and I would certainly say that you have been more Bengali while I have broken out of that mould. Perhaps I no longer belong to contemporary India even, at least not to the dominant order. Apart from it I found your straightforwardness and sincerity very attractive"..

এই চিঠিতে আমাদের দুজনের মধ্যে যে পার্থক্য (বন্ধুত্বের নয়) গড়ে উঠেছে, তার কারণ কি, সে কথা আগে বলেছি। অর্থাৎ সাহস ও মনোবলের দিক থেকে পার্থক্য বেশি। এবং সে সাহস ও মনোবল তিনি লাভ করেছেন, কারণ প্রতিকূলতার সংগে লড়াই করবার অস্ত্র তাঁর বহু। দেশের পারিপার্শ্বিকের মধ্যে যে আদর্শের মধ্যে (বা আদর্শের অভাবের মধ্যে) বাস করতে বাধ্য হচ্ছি তা থেকে মাঝে মাঝে নীরদবাবুর মতোই মুক্ত হতে মন ছটফট করে, কিন্তু তখনই মনে হয়, সে সামর্থ্য আমার নেই, সে কঠিন মনোবল আমার নেই, সেই আদর্শের সংগে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার দুর্দান্ত সাহস আমার নেই। আন্তরিকতার জন্য যেখানে অবহেলা অনিবার্য, সেখানে কৃত্রিম উপায়ে নানা ফন্দিফিকিরে শান্তভাবে স্বতন্ত্র হয়ে থাকা ভিন্ন অন্য উপায় নেই। তাই নীরব ইনস্যুলার জীবন। সার্সের বলিরূপে বাস। জীবনের ন্যূনতম নিরাপত্তা বোধ যেখানে দুর্লভ, সেখানে মনুষ্যত্ব কতখানি বজায় রাখা যায় এ প্রশ্নের উত্তর সবারই জানা আছে।

নীরদবাবুর সাহিত্য রসবোধ এবং উচ্চসাহিত্য রচনার ক্ষমতা ইংরেজীভাষীর দেশে সবিস্ময়ে স্বীকৃত। বাংলা সাহিত্যও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। ঐ চিঠিতেই অন্য একখানা স্মৃতিমূলক বই সম্পর্কে বলেছেন—

.."A strangely uneven book, in style and sentiment. The prose is at times very clearly rhetorical and the mood sentimental to the point of being maudlin, in the other passages the one is straightforward and the other very hard-boiled and cynical. The two do not go together and there is a jarring impression. Besides I have a feeling that the stories are invented and not true reminiscences. I know a little of Bengali villages, and even of their corrupt life. But I do not think they can be quite as bad as—Babu has made them."

সাধনা দশন নিয়মিত ব্যবহার করিলে কোন দন্তরোগের ভয় থাকে না। দন্তরাজী সুস্থ, সবল ও সুন্দর হয়।

দেশীয় গাছগাছড়া হইতে ইহা প্রস্তুত হয়।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা
৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর, কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম,এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস (লণ্ডন), এম,সি,এস (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।
কলিকাতা কেন্দ্র-ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম,বি,বি,এস (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য্য

আরও অনেক বিশ্লেষণ আছে, অন্য একখানা পত্রিকার বিষয়েও ঐ চিঠিতে মন্তব্য করা আছে, কিন্তু উদ্ধৃতি থেকে বিরত রইলাম। আমি শুধু দেখাতে চাই একখানা চিঠিও তিনি কত দীর্ঘ লেখেন, এবং তা কত আন্তরিক। এই একই প্রীতির স্পর্শ তাঁর কাছাকাছি প্রায় দশ বছর বাস করে পেয়েছি। দেশে বিদেশে তাঁকে বহু পত্রপত্রিকায় লিখতে হয়, গ্রন্থ রচনায় ডুবে থাকতে হয়, এর মধ্যেও এত সময় পান কি করে সে বিষয়ে আমার কৌতূহল মিটিয়েছে তাঁর চিঠি। তিনি লিখেছেন (৩০-৪-৬৫) "আপনি সময়ের কথা লিখিয়াছেন। আমার সময়ের অভাব হওয়া দূরের কথা, অবস্থা উল্টা হইয়াছে। এত অবকাশ যে, সময় যেন কাটিতেই চায় না। মাঝে মাঝে bored বোধ করি। আমার রিক্রিয়েশন যথেষ্ট—গান, পড়াশুনো ইত্যাদি ছাড়া কুকুর আছে, বাগান আছে। সবেরই সেবা নিজ হাতে করি।"

আর একখানা চিঠিতে (২২-৬-৬৫) "...কি খাইতে পারি, কি খাইতে পারি না, এবং কি খাইলে শরীরের উন্নতি বোধ করি, তাহার বেশ একটা স্পষ্ট ধারণা হইয়া গেল। তাহা ছাড়া ঘুমানো, পরিশ্রম ও রিক্রিয়েশনেরও একটা নিয়ম করিলাম। শুনিয়া সুখী হইবেন, ইহার ফলে ৬৮ বৎসর বয়সে যে শারীরিক এফিশেন্সি অনুভব করি, তাহা জীবনে কখনও অনুভব হয় নাই। এমন কি [ইহা] আজকালকার যুবকদেরও নাই। ছাতে একটি বাগান আছে। তাহাতে প্রায় ৩০০।৪০০ গাছ আছে। ৩০।৪০ বালতি জল ট্যাঙ্ক হইতে নিতে কষ্ট বোধ করি না। তবে শারীরিক শ্রম কি করিতে পারি তাহার মাত্রা সম্পূর্ণ জানি, কখনও অতিরিক্ত করি না। আপনার পক্ষে একেবারে এই 'রেজিমেন' করা সম্ভব হইবে না। তবে ধীরে ধীরে জীবনযাত্রার ধরন একটু পরিবর্তন করিবেন। আপনার জন্য আমি একটি প্রেসক্রিপশন দিতেছি"......

জীবন নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছি আগে, সেটি যে দেহসমেত নিয়ন্ত্রণ তার আভাস পাওয়া যাবে এই চিঠিতে। নীরদবাবুর সমস্তই exact হওয়া চাই। এই তাঁর সাফল্যের ভিত্তি। তাঁর সমস্ত শিক্ষা এবং পাণ্ডিত্য এর উপর দাঁড়িয়ে আছে।

আমি অ্যাটমিকের বাংলা যাঁরা আণবিক বা আণব করেন, তাঁদের মূঢ়তার বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম আনন্দবাজার পত্রিকায় (১৬-৫-৬৫)। এই সম্পর্কে নীরদবাবু আমাকে লিখছেন (৪-৬-৬৫) "আপনার আণবিক প্রবন্ধ পড়িলাম। Inexactitude আমাদের মজ্জাগত, বৈজ্ঞানিক হইলেও নিষ্কৃতি নাই।"......

আমার পূর্ব কথা এই একটি উদ্ধৃতি সমর্থন করছে। অর্থাৎ নীরদবাবু সর্ব-বিষয়ে যথাযথ না হলে তাঁর ব্যক্তিত্বই যে মূল্যহীন হয়ে পড়বে। তাই মূঢ়তার বিরুদ্ধে তাঁর সমস্ত জীবন অতি কঠিন সংগ্রাম। এখনও ইংরেজী সাপ্তাহিকে তাঁর প্রায় নিয়মিত লেখায় তাঁর স্বধর্ম প্রবলভাবেই প্রকট।

নীরদবাবুর নিন্দুকের সংখ্যা বেশি কেন, সে কথা আগে বলেছি। তিনি আরও নিন্দুকের সংখ্যা বাড়িয়েছেন তাঁর শেষ বইএর সাহায্যে। 'দি কনটিনেন্ট অভ সার্সি' ভীষণ আলোড়ন জাগিয়েছে। এ বই আমি পড়ি নি, কিন্তু এর সংক্ষিপ্তসার কয়েকটি প্রবন্ধে নীরদবাবু স্টেটসম্যানে প্রকাশ করেছিলেন, তা পড়েছি। তাঁর দুখানা বই আমি পড়েছি The Autobiography of an Unknown Indian, এবং A Passage to England. শেষেরখানি দুবার পড়েছি। এর কথা পরে বলছি।

দি কনটিনেন্ট অভ সার্সি বই হিসাবে ছাপা হওয়ার আগে নীরদবাবু আমাকে তার একটি সূচিপত্র পাঠিয়েছিলেন। তা পড়ে, তারপর স্টেটসম্যানে প্রকাশিত সারাংশগুলি পড়ে এবং হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে সরোজ আচার্যের লেখা সমালোচনা পড়ে এ বই সম্পর্কে আমার মোটামুটি একটা ধারণা হয়েছে।

নীরদবাবু আমাকে চিঠিতে যা জানিয়েছিলেন তা এই—"আমার নূতন বইটি বড়। সুতরাং উহার পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব না। জুলাই (১৯৬৫) মাসের মধ্যে বাহির হইবে, তখন দেখিবেন। ইহাতে হিন্দু কালেকটিভ সাইকোলজি লইয়া যে আলোচনা করিয়াছি উহা সম্পূর্ণ নূতন। প্রাচ্যে বা পাশ্চাত্যে কেহ এই সব কথা বলে নাই। ...আমাদের গতানুগতিক তুচ্ছ ও মিথ্যা রোম্যান্সের জায়গায় আমি একটা বড় ট্র্যাজিক রোম্যান্স খাড়া করিয়াছি। আমি আমার পাশ্চাত্য বন্ধুদের বলি—এই বই পড়িয়া আপনারা প্রথমে হিন্দুদের শ্রদ্ধা করিতে শিখিবেন। হিন্দুর জাতীয় জীবন যে এত বড় ট্র্যাজিডি, আমারও আগে এই ধারণা ছিল না। (৩০-৪-৬৫)

এই বইতে নীরদবাবু ভারতীয় চরিত্রকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে তার অ্যানাটমি শুধু নয়, তার ফিজিওলজি প্যাথোলজি, সবই উদ্ঘাটিত করেছেন। যাই হোক এ বিষয়ে আর বেশি বলা বোধ হয় উচিত হবে না, কারণ নীরদবাবুকে যাঁরা ভুল বোঝেন, তাঁদের সে ভ্রান্তি আমার কথায় যাবে না, আমি সে চেষ্টাও করব না। ভ্রান্তি ঘোচার বড় পথই খোলা আছে, অর্থাৎ সোজাসুজি তাঁর বই পড়া। এবং তাঁকে বুঝতে চেষ্টা করা।

১৯৩৭ সালে পাটনায় প্রভাতী সঙ্ঘের উদ্যোগে যে একটি অধিবেশন বসে তার সভাপতি হয়েছিলেন নীরদবাবু। কলকাতা থেকে নীরদবাবু, ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোঃ, বিভূতি বন্দ্যোঃ, সজনীকান্ত ও আমি, (এবং ভাগলপুর থেকে বনফুল) সেখানে যাই। নীরদবাবু তাঁর ভাষণে যা বলেছিলেন তার সংক্ষিপ্তসার স্মৃতি-চিত্রণে দেওয়া আছে। তাঁর সম্পর্কে ৬ ফেব্রুয়ারি (১৯৩৭) বেহার হেরালডে যা বলা হয়েছিল তার অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি—

"The first day's meeting began with the president Mr. Nirad C. Chaudhuri's address on the present state of culture in India. It need scarcely he said that Mr. Chaudhuri who is himself one of the most cultured men in India delivered a most illuminating address. It is a tribute to Mr. Chaudhuri's powers of expression and delivery that inspite of his subject being a difficult one, it was heard with rapt attention."....

প্রায় ত্রিশ বছর আগের সংবাদ এটি। সেদিন নীরদবাবুর নামের সঙ্গে সংবাদ-দাতা যে এপিথেট বা বিশেষণ প্রয়োগ করেছিলেন, আমি এই প্রবন্ধের গোড়াতে সেই বিশেষণই বিস্তার করেছি।

ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সম্পর্কে এত বলা যায়, যাতে প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ হয়ে পড়বার আশঙ্কা। সেজন্য আমি সংক্ষেপে মাত্র দু'একটি বিষয় বলব। তাঁর 'এ প্যাসেজ টু ইংল্যাণ্ড' (ম্যাকমিলান, ১৯৫৯) বইখানির সম্পর্কে আমার অনেক কথা বলতে ইচ্ছা করে, এত ভাল লেগেছে তাঁর এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাগুলি। কিন্তু তার আগে একটি মজার কাহিনী বিবৃত করা একান্ত প্রয়োজনীয় মনে হচ্ছে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবাসী সম্পাদনকালে কয়েক বছর প্রবাসী মাসিকের লেখকরূপে গ্রন্থসমালোচনার ভারও পেতাম মাঝে মাঝে। ১৯৩৬ সালে ইউরোপ ভ্রমণ সংক্রান্ত একখানা বই আমি ঐ মাসিকে সমালোচনা করি। আমি সেই বই পড়তে গিয়ে অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করি. কারণ সেরকম বই লিখতে ইউরোপ ভ্রমণের দরকার ছিল না। গ্রন্থকার আমার সমালোচনায় ক্রুদ্ধ হ'

প্রবাসী সম্পাদককে এক চিঠি লেখেন, তাতে বলা হয় দায়িত্বহীন সমালোচককে কেন ও বই দেওয়া হয়েছিল? রামানন্দবাবু আমাকে সেই চিঠিখানা পাঠিয়ে দেন। আমি তখন নীরদবাবুকে সেই বইখানা দিয়ে ঐ চিঠিখানা দেখালাম।

নীরদবাবু বই পড়ে মহা উত্তেজিত। আগাগোড়া ভুল তথ্য এবং রুচিহীনতায় ভরা বইখানি নিয়ে তিনি বন্ধুদের দেখালেন এবং আমোদ উপভোগ করলেন প্রচুর। তারপর ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানের বিবরণে এবং ইতিহাসে যত অজ্ঞতা ছিল সব তাঁর কথামতো তালিকাভুক্ত করে রামানন্দবাবুকে পাঠিয়ে দিলাম। তারপর সব চুপচাপ।

কিন্তু নীরদবাবু চুপ করে রইলেন না। তিনি ঐ বই উপলক্ষে একটি রচনা তৈরি করলেন। সেটি শনিবারের চিঠি (বৈশাখ ১৩৪৪)-তে প্রসঙ্গ কথা শিরোনামায় ছাপা হল। তার ভূমিকাটি এই—

পশ্চিম প্রবাসের ফল

"একটি সত্য ঘটনার কথা বলিতেছি। কলিকাতার একটি আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানের একজন ছোটকর্তা, শিক্ষিত, উগ্র রকমের স্বদেশী; তাঁহার নিকট একটি শিক্ষিত বেকার যুবক উমেদার হিসাবে উপস্থিত। যুবক বুদ্ধিমান এবং ছাত্র হিসাবে উচ্চসম্মানধারী হইলেও। চুলে মুখে ও পোষাকে দেশী ছাপ দূর করিতে পারে নাই। সুতরাং কর্তা মহাশয় তাহার দিকে মুখ প্রায় না তুলিয়াই বলিলেন, "আপনার চাকরি হবার কোনো সম্ভাবনা নেই, আপনার চেয়ে ঢের কোয়ালিফায়েড লোক রয়েছে।" যুবক একটু হাসিয়া উত্তর দিল, "আমার চেয়ে কোয়ালিফায়েড লোক নেই বলছি না, কিন্তু আপনি এখনও তো আমার কোয়ালিফিকেশন কি জিজ্ঞেস করেন নি?" "কর্তার মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া হুকুম করিলেন, "বলুন, আপনার কোয়ালিফিকেশন কি বলুন।" যুবক বলিল আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ইত্যাদি। আর যায় কোথা! কর্তা মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "জানেন, এই পোস্টের জন্য ইউরোপীয়ান ডিগ্রীওয়ালা কজন ক্যান্ডিডেট আছেন?" যুবকের বোধ হয় ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল। সে বলিয়া বসিল, "বাপ কিংবা শ্বশুরের পয়সা থাকলে আমার পক্ষেও কি ইউরোপীয়ান ডিগ্রী জোগাড় করা সম্ভব হত না?"—বলা বাহুল্য যুবকের চাকরি হয় নাই।

"ইউরোপীয়ান ডিগ্রীর প্রতি যে সমাজে এইরূপ অবিচল ভক্তি, সে সমাজে ইউরোপীয়ান ডিগ্রীর অভাবে ইউরোপে প্রবাস মাত্রও যে, শিক্ষাদাতা গুরু ও উপদেষ্টা বনিয়া যাইবার অধিকার দান করিবে তাহা বিচিত্র নয়, কারণ সমুদ্রপারগম হওয়ার দরুন নিজদিগকে সকল শাস্ত্রপারঙ্গম বলিয়া বিশ্বাস করা খুবই স্বাভাবিক। এই অধিকার সম্প্রতি অগণিত সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় অগণিত পিতা ও শ্বশুরের পয়সা সম্পন্ন ব্যক্তি জাহির করিতেছেন।... শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় বলিয়াছেন, তিনি "অনেকদিন থেকে 'ভারতবর্ষে' ভ্রমণবৃত্তান্ত যোগান দিয়ে আসছেন।" সংবাদপত্রসেবী মহলে একটা কথা প্রচলিত আছে—All is grist that comes to the mill. সুতরাং জ্ঞানপাপী সম্পাদকদের অনেক জিনিসকেই...স্থান দিতে হয়। কিন্তু বিপদ হয় সরলমতি লেখকদের লইয়া। তাঁরা সাময়িকপত্রে স্থান পাইয়া ভাবেন, মহাকালের দরবারে কায়েম হইবার মত কিছু করিয়া বসিয়াছেন।"...

এই হল নীরদবাবুর সেই লেখার ভূমিকা। আমি এ সম্পর্কে এতটা আলোচনা করছি এজন্য যে, ভবিষ্যতে নীরদবাবুকেও যে বিদেশে যেতে হবে, এবং মাত্র আট সপ্তাহ লন্ডন প্যারিস ও রোমে বাস করে একখানা বই লিখতে হবে তা তখন তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল অবশ্যই। (তবে তিনি শ্বশুরের বা পিতার টাকায় ভ্রমণ করেন নি,) এবং অল্পদিনের দেখায় ২২৯ পৃষ্ঠার যে বইখানি লিখেছেন (A Passage to England), তার প্রথম থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এমন এক আশ্চর্য সুন্দর শিক্ষিত এবং সংস্কৃতিবান দর্শকসুলভ দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ আছে, তা যেমন শিক্ষাপ্রদ, তেমনি উপভোগ্য পাঠ্য। মোহিতলাল সম্পর্কে সাহিত্যচিন্তার এবং আদর্শের যে সীমা টেনেছিলাম, এখানে সাহিত্য শিল্প সংগীত ইতিহাস—কোথাও কোনো সীমা নেই। এমন উদার দৃষ্টিতে, উদার উন্মুক্ত মনে এবং চোখে, কোনো নতুন দেশ মানুষ ও তার সমাজকে দেখা, উচ্চস্তরের শিক্ষাপ্রদ ঘটনা। সমস্ত দেখা ও অভিজ্ঞতা, তাঁর মতো প্রথম শ্রেণীর শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান লোকের পক্ষেই এমন অকপটে, এমন অতুলনীয় ভাষাভঙ্গিতে, প্রকাশ করা সম্ভব। তাঁর নিজের শিক্ষার যতগুলি স্তর আছে, তাঁর দৃষ্টিতে নতুন দেশের ইতিহাস ও ভূগোল ততগুলি স্তর একের পর এক পার হয়ে গভীরে বিস্তার লাভ করেছে। প্রতিটি দেখা যেন একটি উচ্চ রুচিবান দৃষ্টির আলো-স্নাত হয়ে তাঁর এই বইতে ঝলমল করে উঠেছে। কিন্তু তবু আমি যত রকম ভাবেই এ বইয়ের বর্ণনা করি না কেন, এ বইখানি একবার পড়লে এর যে পরিচয় পাওয়া যাবে, আমার বর্ণনায় তা পাওয়া যাবে না।

এ বই ছাপা হওয়ার আগে আমাকে যে চিঠি লেখেন (২-৮-৫৮) তাতে, ঐ যে ইউরোপ ভ্রমণের বই পড়ে তিনি একবার উত্তেজিত হয়েছিলেন, তার একুশ বছর পরেও সে কথা মনে পড়েছে। তিনি লিখছেন..."আমি সম্প্রতি আর একখানা বই [এ প্যাসেজ টু ইংল্যান্ড] লিখিয়াছি। লন্ডনের ম্যাকমিলানই বাহির করিতেছে। বোধ করি আগামী বৎসরের প্রথম দিকে। উহা আমার বিলাত দেখার বৃত্তান্ত। হয়ত বা একেবারে '—' ক্লাসের নাও হইতে পারে। আপনারা বিচার করিবেন।"...

নামটি উহ্য রাখলাম।

নীরদবাবু জীবনে অনেক পথ ঘুরে এসে তবে নিজেকে সম্পূর্ণ লাভ করেছেন। শনিবারের চিঠিরও তিনি সম্পাদক ছিলেন। মডার্ন রিভিউ ও প্রবাসীর সহকারী সম্পাদক ছিলেন, এবং ইংরেজী ও বাংলায় অগণিত রচনা লিখেছেন। অনেকদিন পরে নতুন করে আবার বাংলা লেখা ধরেছেন দেখছি। 'নাউ' সাপ্তাহিকে তাঁর জ্ঞানগর্ভ নির্ভীক লেখাগুলি এখনও এক যুবকোচিত অতি জাগ্রত মনের পরিচয় বহন করছে।

তাঁর আর একটি পরিচয় দিয়ে এ রচনা শেষ করছি। তাঁর চিঠি (৩০-৪-৬৫) থেকে উদ্ধৃত করছি—"আমি গত কুড়ি বৎসরে একটি নূতন বিশ্বাসে উপনীত হইয়াছি। তাহাই আমাকে শক্তি দিতেছে। ইহার মূল কথা এই যে, বিশ্ব বা ইউনিভার্স ই তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি লইয়া আমার কাছে ভগবান। ভগবান বাহিরের সত্য ন'ন, immanent in the cosmos. সুতরাং বিশ্ব যে শুধু স্বয়ংসৃষ্ট তাই নয়, স্বয়ংপূর্ণ, স্বয়ংক্রিয়ও বটে। বিশ্বের শক্তিস্রোতের সংগে ব্যক্তিজীবনকে মিলাইয়া কাজ করাই সত্যকার সাধনা।"

নীরদবাবু আমার কাছে এক মহা বিস্ময়।

১৯৬৭ সালে আপনার ভাগ্য

যে কোনও ফুলের নাম লিখিয়া পাঠান এবং টাকা ১·২৫ ভি, পি, পি, যোগে আগামী ১২ মাসের জন্য সম্পূর্ণ বিস্তারিতভাবে উত্থান পতন সহ আপনার ভাগ্যফল জানুন। পোস্টেজ স্বতন্ত্র।

Kashi Vigyan Mandir (9),
Beat No. 13, Aligarh.

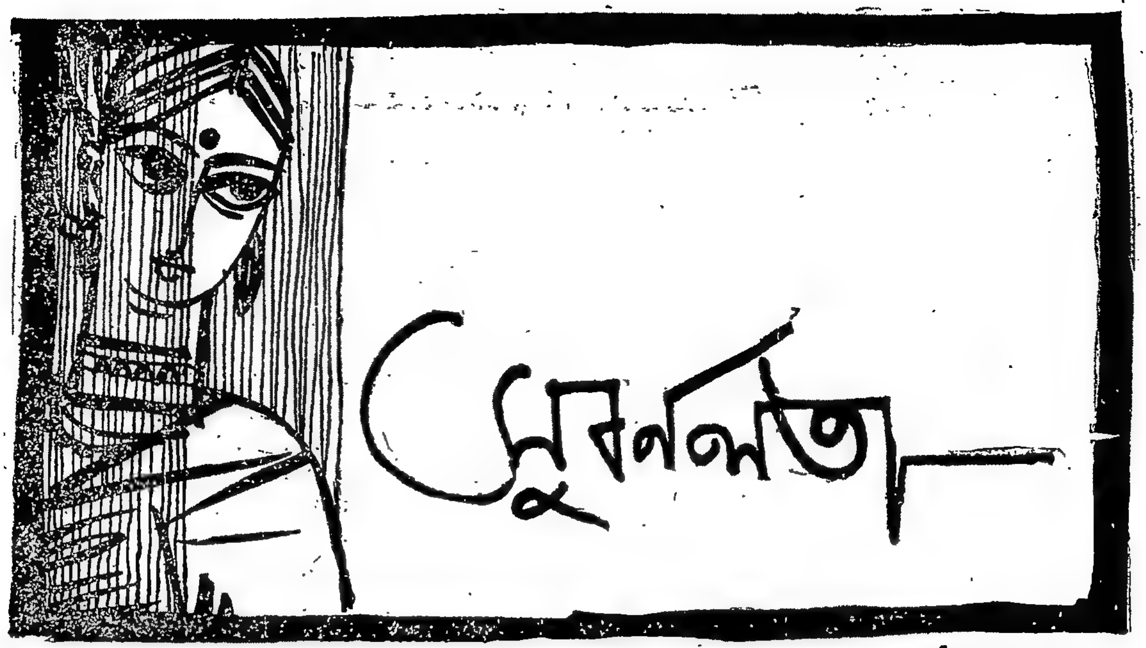

আশাপূর্ণা দেবী

ধারাবাহিক উপন্যাস

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

গিরি তাঁতিনী এসেছে তাঁতের শাড়ির বোঁচকা নিয়ে। ভালো ভালো সিমলে ফরাসডাঙার শাড়ি নিয়ে গেরস্তর বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ানো কাজ গিরির। উত্তর কলকাতা থেকে মধ্য কলকাতা পর্যন্ত সর্বত্র তার অবাধ গতি। সকলের অন্তঃপুরের খবর তার জানা।

দর্জিপাড়ার অনেক বাড়িতেই তার যাতায়াত। মুক্তকেশীর সংসারেও শাড়ি জুগিয়ে এসেছে বারবার বিয়েথাওয়ায় পুজোয়। গিরি যে বাজারের থেকে দাম বেশি নেয় সেকথা সকলের জানা, মুক্তকেশী তো মুখের উপরই বলেন, 'গলায় ছুরি দিচ্ছিস যে গিরি। কাপড়খানা বড্ড পছন্দ হয়েছে বুঝেই বুঝি মোচড় দিচ্ছিস?' তবু সেই বেশি দামেই নেনও। কারণ আরও এক কারণে সর্বত্রই গিরির প্রশ্রয় আছে।

আরও একটা ব্যবসা আছে গিরির।

সে হচ্ছে ঘটকীগিরি!

কাপড় জোগানোর সূত্রে গিরি বহু সংসারের নাড়ীনক্ষত্রের খবর রাখে বলেই কাজটা তার পক্ষে সহজ।

তবে ইদানীং যেন সে ব্যবসায় কিছু কিঞ্চিৎ ঢিমে পড়েছে।

ঘটকী দিয়ে বিয়ের সম্বন্ধ করতে কেউ আর তেমন গা করে না। সবাই স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে, নিজেরাই চেনাজানার সূত্র ধরে, কিম্বা কাজকর্মের বাড়িতে দেখাশোনার সুযোগ ধরে বিয়ের সম্বন্ধ গড়ে ফেলে। কারণ, ঘটকীরা না কি মিছে কথা কয়।

শোনো কথা!

মিছে কথা নইলে বিয়ে হয়?

হয়কে নয়, নয়কে হয়, রাতকে দিন, দিনকে রাত, কানাকে পদ্মলোচন, 'অদ্যভক্ষ্য'কে শাঁসালো আর আবলুশ কাঠকে চাঁপাফুল বলতে না পারলে আবার ঘটকালির মাহাত্ম্য কি?

কথায় বলে 'লাখ কথা' নইলে বিয়ে হয় না। তা' সেই লাখ কথার মধ্যে দশ-বিশ হাজার অন্তত মিছে কথা থাকবে না? যা সত্যি তাই যদি বলে যাবে, তা হলে ঘটক বিদায়টা কি মুখ দেখে দেবে লোকে? কিন্তু লোকে যেন আর বুঝছে না—সেকথা। কাজেই গিরির দ্বিতীয় ব্যবসা কিছু ঢিমে!

ঢিমে পড়েছে, তবু শাড়ির বস্তা নামিয়ে পা ছড়িয়ে বসে দোক্তার কৌটো খুলতে খুলতে গিরি বলে, 'সেজবৌদিদি ছেলের বিয়ে দেবে না না কি গো? তোমার বড় খোকার বয়েসে যে সেজবাবু দু' ছেলের বাপ হয়েছেলো গো!'

নামে নামে মিল আছে বলে, গিরিবালার সঙ্গে গিরি তাঁতিনীর যেন রঙ্গরস বেশি।

তাছাড়া ইচ্ছেমতন দু-পাঁচখানা শাড়ি কিনে ফেলার ক্ষমতা গিরিবালার যেমন আছে, ছোটবৌ বিন্দুর তেমন নেই, তাই গিরিবালার ঘরের সামনেই তাঁতিনী গিরির পা ছড়িয়ে বসার জায়গা!

বিন্দু যে এক-আধখানা নেয় না তা নয় তবে সেও তো সেই 'বাকিতে'।

গিরিবালার অনেকটাই নগদ!

অতএব গিরি তাঁতিনীর রসের কথা ফুটে তোলে বেশি।

সেজবাবুর অতীত ইতিহাস তোলার সঙ্গে এমন একটি মুখভঙ্গী করে গিরি যা নাকি নিতান্তই অর্থবহ।

গিরিবালাও তেমনি একটি অর্থবহ কটাক্ষ করে বলে, 'ওতে তো আর পয়সা লাগে না লো, হলেই হলো। একালে দিনকাল খারাপ, বৌ এসে কি খাবে সেটা আগে চিন্তা করতে হবে।'

'তা' হবে বৈ কি!' গিরি একটিপ্ দোক্তা মুখে ফেলে বলে, 'বৌয়ের শাউড়ী যখন সম্বন্ধ গ্রাস করে রেখেছে! তা' তুমিও বুঝি মেজবৌদিদির পাঠশালে পড়েছে? তিনিও তো ওই কথা বলে বলে এই অবধি ছেলে দুটোর বে তুলে রেখেছিল। কী সুমতি হলো জোড়া বেটার বে দিল।'

গিরিবালা সহাস্যে বলে, 'ঘটকী বিদেয় মোটা পেয়েছো তো?

গিরির ঘটকালিতে অবশ্য বিয়ে হয় নি, তবু বিয়ের বখশিস বাবদ বেশ কিছু বাগিয়েছে গিরি, তাই সেও সহাস্যে বলে, 'তা হক্ কথা বলবো, বাপু, মেজগিন্নীর হাতখানি দরাজ আছে।'

গিরিবালা সহসা প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলে ওঠে, 'তা বোঁচকার গিঁট খোলো? দেখি কি এনেছ! নতুন ধরণের কিছু আছে?'

'গিরি কবে নতুন ছাড়া পুরনো মাল এনে ঢুকেছে গো—' বলে সগর্ব ভঙ্গীতে বোঁচকা খোলে গিরি।

মুক্তকেশীর আমলে মোটা তাঁতের শাড়ির চাহিদাই বেশি ছিল, এখন সিমলে শান্তিপুরে ফরাসডাঙার চাহিদা।

কিন্তু মুক্তকেশী?

তিনি কি গত হয়েছেন? তাই তাঁর আমলও বিগত?

না, দেহগত হিসাবে গত হন নি অবশ্য মুক্তকেশী, তবে তাঁর আমলটা যে একেবারেই গত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নাস্তি।

গিরি ঢুকেই একবার চোখের ইসারায় জিগ্যেস করেছিল, 'বুড়ি কোথায়?'

গিরিবালা ভ্রূভঙ্গীর সাহায্যে, উত্তর দিয়েছিল, 'আছেন নিজের কোটরে।'

বোঁচকার গিঁট খোলে গিরি কিন্তু আবরণ উন্মোচন সহজে করে না। তাতে সস্তা হয়ে যেতে হয়।

হাই তুলে বলে, 'এক ঘটি জল খাওয়াও দিকি আগে। রোদে এসে শরীর জ্বলে যাচ্ছে।'

গিরিবালা তাড়াতাড়ি উঠে দালানের কুঁজো থেকে এক ঘটি জল গড়িয়ে দেয়।

গিরি এক নিশ্বাসে জলটা খেয়ে আঁচল দিয়ে বাতাস খেতে খেতে বলে, 'আম[illegible] হয়ে সেজবৌদিদি কেম্পন হয়ে [illegible] থেকে জল দিলে পান দিতে হয়, তা আর মনে নেই।'

গিরিবালা তাড়াতাড়ি মেয়েকে ডেকে পানের আদেশ দেয়, গিরি ধীরে সুস্থে বোঁচকা খোলে।

নয়নমনোহর শাড়ির গোছা—কল্কাপাড় তাবিজপাড় রেলপাড় এলোকেশী পাড়, সিঁথের সিঁদুর পাড়, পতিসোহাগপাড়, বসন্তবাহার পাড়। শাদা ছাড়া রঙিনের দিকেও আছে—কালাপানি বৌ-পাগলা ধূপছায়া ময়ূরকণ্ঠী। শুধু লাল আর কালো সুতোর টানাপোড়েনেই নানান বর্ণের বাহার।

দাম বেশি দিয়েও এসব শাড়ি নিতে হয়। দোকান থেকে কেনা মানেই তো পুরুষের পছন্দর ওপর নির্ভর? আর সে পছন্দ যে কেমন তা তো মেয়েমানুষরা হাড়ে হাড়ে জানে। তার ওপর আবার ফেরা-ঘোরার কথা বললেই মারমুখী হয়ে ওঠেন বাবুরা। তা'ছাড়া গিরি বাকিতে দেয় বলে লুকিয়েও কেনা যায় এক আধখানা। এসব কি কম সুবিধে? পরমুখাপেক্ষী জাতের জ্বালা যে কত দিকে।

তা গিরি এসব খুব বোঝে, তাই জায়গা বুঝে মোচড় দেয়, জায়গা বুঝে উদারতা দেখায়।

ও অনায়াসে বলে, 'ও কাপড়ের দাম তোমায় দিতে হবে না দিদিমণি, আমি তোমায় এমনি দিলাম।' বলে, 'বৌদিদির ফরসা রঙে জেল্লা যা খুলবে, এ কাপড় তোমায় একখানা না পরাতে পেলে আমার জেবনই মিথ্যে। দামের কথা ভেবো না বৌদিদি, তোমার শাউড়ীকে বোলো, গিরি আমায় অমনি দিয়ে গেছে।'...এইভাবেই গছায় সে।

গিরিবালা প্রসন্নমুখে বলে, 'কাপড় তো বেশ এনেছো এখন দর করো দিকি।'

'দর! তোমার সঙ্গে আবার দরাদরি কি গো সেজবৌদিদি, আজ নতুন হলে না কি?'

'না না ঠাকুরঝি, তুমি আমায় একটু আশ্বাস দাও। পছন্দ করতে ভরসা পাই।'

'শোনো কথা! তোমার আবার নির্ভরসা!' গিরি অবহেলায় বলে, 'বড়-মানুষের গিন্নী ট্যাকার গোছা ফেলো, কাপড়ের গোছা পছন্দ করো! সাত-হাতি আট-হাতি সবরকমই আছে, খুকীদের জন্যে ন্যাও দিকি দু-পাঁচখানা! কই গো খুকীরা—'

গিরিবালা তথাপি কাপড় নাড়তে নাড়তে দাম জিগ্যেস করে, এবং জবাব পাবার পর অপ্রসন্ন গলায় বলে, 'দেবে না তাই বল? দেবার ইচ্ছে থাকলে, এমন দর হাঁকতে না—। বলি ওবাড়ির তিন-তিনটে বিয়েতে তো বিস্তর লাভ করেছ। বড় মানুষের ব্যাপার—এই গরীবের সঙ্গে একটু দয়া-ধর্ম করে কাজ করো না।'

গিরি দরাজ গলায় বলে, 'তা' মিথ্যে বলবো না অনেক কাপড়-চোপড় নিয়েছে মেজবৌদিদি তবে মানুষটার প্রাণে যেন সুখ নেই!'

গিরিবালা ভিতরের কথার আশায় গলা নামিয়ে চুপিচুপি বলে, 'ওমা যাঁর এত সুখ সম্পত্তি, তাঁর আবার সুখের অভাব?'

গিরি বলে, 'তা' একো একো মানুষের অকারণ দুঃখ ডেকে আনা রোগ যে! মেজ-বৌদিদির তো সে রোগ আছেই। তাছাড়া —মনে হলো বৌরা সুবিধের হয় নি—'

গিরিবালা যেন জানে না এটাই গিরি তাঁতিনীর পদ্ধতি, অথবা কারো ঘরে বৌ 'সুবিধের' না হওয়াটা যেন অসম্ভব ঘটনা, তাই যেন আকাশ থেকে পড়লো।

'ওমা সে কি কথা! তবে যে শুনলাম খুব ভালো বৌ হয়েছে!'

'ওগো দেখতেই ভালো! ওপর ভালো —ভেতর কালো! তা নইলে ঘরুনী গিন্নী দস্যি মাগী এক্ষুণি বৌদের হাতে সংসার ছেড়ে দেয়?'

'ওমা বল কি? তাই বুঝি?'

'তাই তো—' গিরি দুই হাত উল্টে বলে, 'তবে আর বলছি কি! মাগী না কি এখন রাতদিন খাতা-কলম নিয়ে সেরেস্তার মতন লেখা লিখছে!'

'তা এসব কথা বললো কে তোমায়?'

'কে আর? মেজদাদাবাবুই রাস্তায় এল সঙ্গে সঙ্গে, নানান দুঃখের গাথা গাইল! বৌরা শ্বশুর বলে তেমন মান্যি-মান করছে না, শাউড়ীকে দেখে না, আরো একটা মেয়ে ডাগর হয়ে উঠলো এই সব!'

কথা ক্রমশই গভীর হয়ে আসে, গিরি-বালা ইত্যবসরে খানতিনেক শাড়ি পছন্দ করে ফেলে, এবং বাকির প্রশ্নও ওঠে না। তবে ও বাড়ির মেজবৌদিদির কাছেও যে ধারে কারবার করতে হয় না, সেই হুলটুকু ফুটিয়ে বোঁচকা গোটায় গিরি।

এই সময় ঘর থেকে মুক্তকেশীর ভাঙা ভাঙা কণ্ঠস্বর শোনা যায়, 'গিরি এসেছিস না কি? অ গিরি!...সেই থেকে গলা পাচ্ছি মনে হচ্ছে, এদিক পানে উঁকিও দিচ্ছিস না দেখছি!'

'ওই হলো জ্বালা—গিরি খাদের গলায় বিরক্তিটা প্রকাশ করে গলা তোলে, 'এই যাই গো খুড়ি, এখানে সেজবৌদিদি কাপড় কিনলো পাঁচখানা, তাই—'

'পাঁচখানা! পাঁচখানা কাপড় কিনলো সেজবৌমা! তা কিনবে বৈ কি! সোয়ামীর পয়সা হয়েছে—'

'মরণ বুড়ি!' বলে গিরি ওঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, আর তৎক্ষণাৎ তার কাংস্যকণ্ঠ ধ্বনিত হয়, 'কী সব্বোনাশ, এ কী হাল হয়েছে তোমার খুড়ি! এ্যাঁ, এযে মড়ি-পোড়ার ঘাটে যাবার চ্যাহারা! বলি কবরেজ বদ্যি দেখাচ্ছে বেটা বেটার বৌ?'

এই।

এই হচ্ছে গিরির স্টাইল। আর তাই সবাই গিরিকে ভয় করে।

গিরি যে অন্তঃপুরের বার্তা রাখে। তার বাড়া ভয়ঙ্কর আর কি আছে?

মুক্তকেশীর ছেলে ছেলের বৌরা যে তেমন দেখছে না, এখবর রটিয়ে বেড়াবে সে। তাই গিরিবালাও তাড়াতাড়ি শাশুড়ীর ঘরে এসে ঢোকে।

মুক্তকেশী নীচু গলায় কিছু একটা বলছিলেন, বৌকে ঢুকতে দেখে বেজার

মুখে চুপ করেন। শুধু চোখের ইসারায় কি যেন বুঝিয়ে বিদায় সম্ভাষণ করেন।

তা গিরি তাঁতিনী ইসারার মান রাখে। পরদিনই এ বাড়িতে এসে হাজির হয়।

এবং সাড়ম্বরে ঘোষণা করে, 'কাপড় গছাতে আসি নি গো মেজবৌদিদি, এসেছি একটা বাত্রা নিয়ে।'

সুবর্ণলতা বেরিয়ে আসে, প্রশ্ন করে না, শুধু সপ্রশ্নদৃষ্টিতে তাকায়।

গিরি বলে ওঠে, 'বলি বুড়ি শাউড়ীর খবর নাও নি কতদিন?'

সুবর্ণ অবাক গলায় বলে, 'কেন? ইনি তো মাঝে-মাঝেই—'

'হ্যাঁ তা শুনলাম!' গিরি টিপে টিপে বলে, 'মেজদাদাবাবু পেরায় পেরায় যায়। তবে বেটাছেলের চোখ কি তেমন টের পায়? বুড়ির তো দেখলাম শেষ অবস্থা।'

'তার মানে?'

'মানে আর কি রক্ত অতিসার!' গিরি যেন যুদ্ধজয়ের ভঙ্গী নেয়, 'ও আর বেশিদিন নয়। আর মরতে তো একদিন হবে গা? চারকাল কি থাকবে? বয়সের তো গাছ-পাথর নেই, কেন না চার কুড়ি পেরিয়েছে। তা' আমায় মিনতি করে বললে, 'মেজবৌমাকে একবার আসতে বলিস গিরি, আর আসবার সময় লুকিয়ে পাকা দেখে দুটো কাশীর প্যায়ারা আনতে বলিস!'

'পেয়ারা!' সুবর্ণ বলে, 'রক্ত অতিসার বললে না?'

'আরে বাবা হলো তো বয়েই গেল! বলি খাওয়ার সাবধান করে শাউড়ীকে আরো বাঁচিয়ে রাখতে সাধ? না তাই পারবে? মহাপ্রাণীর খেতে ইচ্ছে হয়েছে, দেওয়াই দরকার! বাঁচবার হলে ওতেও বেঁচে থাকবে।'

সুবর্ণ অবাক হয়ে তাকায়।

সুবর্ণ ভাবে এরা কত সহজে সমস্যার সমাধান করে ফেলতে সক্ষম! রাখে কেষ্ট আর মারে কেষ্টর তথ্যে এরাই প্রকৃত বিশ্বাসী!

সুবর্ণর ভাবার অবসরে গিরি আর একবার বলে, 'তা প্যায়ারা নে' যাও আর না যাও, যেও একবার! বুড়ি 'মেজবৌমা মেজবৌমা' করে হামলাচ্ছে!'

'যাবো কালই যাবো!'

গিরি হৃষ্টচিত্তে বলে, 'অবিশ্যি আজই একটা কিছু ঘটে যাবে, তা বলছি-না। তবে এযাত্রা যে আর উঠবে না বুড়ি, তা' মালুম হচ্ছে!'

গিরি চলে যায়, সুবর্ণ কেমন অপরাধীর মত বসে থাকে। বাস্তবিক বড় অন্যায় হয়ে গেছে। বহুদিন যাওয়া হয় নি বটে। সেই কতদিন যেন আগে নিজেই এসেছিলেন মুক্তকেশী, সেই শেষ দেখা!

মেজবৌমাকে দেখতে চেয়েছেন! মুক্তকেশী সে খবর জানিয়েছেন। জগতে কত অদ্ভুত ঘটনাই ঘটে!

মুক্তকেশী সুবর্ণলতার প্রতিপক্ষ।

মুক্তকেশী সুবর্ণলতাকে বহুবিধ যন্ত্রণার স্বাদ জুগিয়ে এসেছেন চিরদিন, তবু মুক্তকেশী সুবর্ণকে দেখতে চেয়েছেন শুনে যেন মনটা বিষণ্ণ বেদনাবিধুর হয়ে উঠলো!

হয়তো ব্যাপারটা হাস্যকর, তবু নির্ভেজাল।

শত্রু যদি শক্তিমান হয় তার জন্যেও বুঝি মনের কোনোখানে একটা বড় ঠাঁই থাকে। রাবণের মৃত্যুকালে রামের মনস্তত্ত্ব এ সাক্ষ্য দেয়।

বহুকাল হলো—এবাড়িতে আসে নি সুবর্ণ।

আগে মাঝে মাঝে ভাসুরঝি-দ্যাওরঝিদের বিয়ে উপলক্ষে আসা হতো, ইদানীং যেন বিয়ের হুল্লোড়টাও কমে গেছে। তাই আর হয় না।

কিন্তু এসে যে একেবারে প্রায় মৃত্যু-শয্যাই দেখতে হবে একথা কে ভেবেছিল। সংবাদদাত্রী তো আশ্বাস দিয়েছিলো। 'আজ-কালই আর কিছু হচ্ছে না।'

কিন্তু হঠাৎ গত রাত্রেই নাকি অকস্মাৎ কেমন বিকল হয়ে গেছেন মুক্তকেশী। মুখ দিয়ে ফেনা কাটছিল, গোঁ গোঁ শব্দ শুনে—মল্লিকা তাড়াতাড়ি সবাইকে ডেকেছে। রাত্রে তার হেফাজতেই তো থাকেন মুক্তকেশী।

ডাক শুনে সবাই এসেছে, ছেলেরা শত-সহস্রবার 'মা-মা' ডাক দিয়েছে, মুক্তকেশী শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছেন সাড়া দিতে পারেন নি। সকাল হয়েছে দুপুর গড়ালো একই অবস্থা, কবরেজ এসে দরাজ গলায় সুবোধকে বলে গেছেন, 'আর কি এবার কোমরে গামছা বাঁধুন!'

সুবর্ণ এসব জানতো না, সুবর্ণ এমনিই এসেছিল।

গাড়ি থেকে নেমে অনেকটা হেঁটে আসতে হাঁপাচ্ছিল সুবর্ণ, এসে বসতেই বিরাজ চোখ বড় বড় করে বলে উঠলো, 'ও মা এ কী তোমার এমন চেহারা হয়েছে কেন মেজবৌ?'

সুবর্ণলতা হাঁপ ছেড়ে ওর কথার উত্তর না দিয়ে প্রশ্ন করলো, 'মা কেমন আছেন?'

'আর থাকাথাকি—' বিরাজ আবার কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, 'কবরেজ তো বলে গেল রাত কাটে কিনা!'

'তা আমাদের ওখানে তো একটা খবরও—'

হঠাৎ গলাটা বুজে এল সুবর্ণর।

চুপ করে গেল।

ঘরে যারা ছিল তারা কি একবারও ভাবল না 'মাছের মায়ের পুত্রশোক!' অথবা 'মাছ মরেছে বেড়াল কাঁদে—'

তা' ভাবলে অসঙ্গতও হবে না!

তবে মুখে কেউ কিছু বলে না।

বিরাজই আবার বলে, 'দিত খবর, আমার তো দিয়েছে। কিন্তু মা'র না হয় যাবার বয়েস চার ছেলের কাঁধে চড়ে চলে যাবেন, বলি তোমারও যে যাবার দাখিল চেহারা। অসুখ-বিসুখ কিছু হয়েছে নাকি?'

'না অসুখ আর কি!'

বলে সুবর্ণ এগিয়ে যায় মুক্তকেশীর দিকে। খুব ধীরে বলে, 'মা আমায় ডেকেছিলেন?'

মুক্তকেশীর চোখ দিয়ে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো!

এই সময় হেমাঙ্গিনী এসে ঢুকলেন থরথর করতে করতে, চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'মুক্ত চললি? আমায় ফেলে রেখে চলে যাবি?'

মুক্তকেশী ফ্যালফেলিয়ে তাকালেন।

হেমাঙ্গিনীর কান্নায় উপস্থিত সকলেরও যেন কান্না উথলে এল।

এসময় শ্যামাসুন্দরী এলেন একটি পিতলের ঘটি হাতে। খুব কাছে এসে বললেন, 'চন্নামেত্তর খাও ঠাকুরঝি। মা কালীর চন্নামেত্তর!'

বোঝা গেল সবাইকেই খবর দেওয়া হয়েছে শুধু প্রবোধচন্দ্র বাদে।

সুবর্ণলতা নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকে।

বোধকরি মনকে মানাতে চেষ্টা করে এ অবহেলা তার প্রাপ্য পাওনা।

.. .. ..

মুক্তকেশীর ভিতরের জ্ঞান লুপ্ত হয় নি। চোখের ইসারায় বোঝালেন বুঝতে পেরেছেন, হাঁ করবার চেষ্টা করলেন পারলেন না।

সুবর্ণ আর একবার কাছে ঝুঁকে বললো, 'মা আমায় কেন ডেকেছিলেন?'

মুক্তকেশীর চোখ দিয়ে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো। চেয়ে রইলেন সুবর্ণলতার মুখের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে ডান হাতটা তুললেন, সুবর্ণলতার মাথা অবধি উঠল না হাতটা স্খলিত হয়ে পড়ে গেল তার কোলের উপর,......চোখটা বুজে গেল।

ছিয়াশী বছরে—তীক্ষ্ম তীব্র খোলা চোখ দুটো চিরদিনের জন্যে ছুটি পেলো।

কিন্তু ছুটি নেবার আগে কোন কথা জানিয়ে গেল তারা?

আশীর্বাদ? ক্ষমাপ্রার্থনা?

[ক্রমশঃ]

"দেখ দেখ রান্নাঘরে কি পুড়ছে বোধহয়, ভীষণ গন্ধ বেরোচ্ছে!" দাড়ি কামাতে কামাতে চেঁচিয়ে উঠ্ল অমলেন্দু।

ওদিক থেকে কোনো সাড়া এল না। টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে রুল-টানা খাতায় একমনে কি লিখছিল মনীষা, সেটাই লিখতে লাগল।

"বলি কথা কি কানে যাচ্ছে না? রান্নাঘরে কি পুড়ছে যে! উঃ, সংসার রসাতলে গেল! কি কুক্ষণেই যে—"

আর সহ্য করতে পারলো না মনীষা। সশব্দে খাতাটা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল রান্নাঘরে।

একটু আগেই উনুনে দুধ গরম করতে দিয়ে গিয়েছিল মনীষা। সেটাই এখন উথলে পড়ছিল আগুনের ওপর। ওথ্লানো দুধ পুড়ে গিয়ে বিশ্রী গন্ধ ছড়াচ্ছে চারদিকে!

প্যান্টা নামিয়ে রেখে আবার এঘরে ফিরে এল মনীষা—অসমাপ্ত কবিতাটা শেষ করবে বলে। কিন্তু খাতাটা খুলতে যেতেই বাধা পেল।

মুখ বিকৃত করে অমলেন্দু বলে উঠ্ল—"আবার খাতা হাতে নিচ্ছো? আজও কি আবার সেই আলুভাতে ভাত খেয়ে অফিস্ যেতে হবে? ঐসব ছাই-ভস্ম লিখে হবে কি? তবু যদি দুটো পয়সা ঘরে আসতো! যত সব অপদার্থ কুঁড়ে ভ্যাগাবন্ডস্—তারাই হয় কবি। একধার থেকে যদি সব সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে গুলী করা হয়, তবে ঢিট্ হয়!"

যে কথা লিখতে খাতা হাতে নিয়েছিল মনীষা, সেকথা লেখা হল না। অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির একটি পরম মুহূর্ত ভেঙে চুরমার হয়ে গেল কয়েকটি কর্কশ কথার রূঢ় কশাঘাতে।

ধরা গলায় মনীষা বললে—"একদিন তুমিও আমার কবিতা ভালোবাসতে, অমল! সেদিনের কথা মনে পড়ে?—যেদিন দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার ধারে বসে আমার কবিতা শুনে তুমি বলেছিলে—তুমি অনেক বড় হবে, মনীষা। অনেক অনেক বড়! তোমার প্রতিভাকে কোনোদিন আমি সংসারের চাকার তলায় পিষে যেতে দেবো না!......সেদিনের কথা তুমি ভুলে গেছ, কিন্তু আমি ভুলি নি!" বলতে বলতে মনীষার গলা বুজে এল।

"সেই পাপেরই তো প্রায়শ্চিত্ত করছি আজ!"—তিক্ত গলায় বলে অমলেন্দু—"বাবা-মা ভাই-বোন সবাই কত বারণ করেছিল! কিন্তু শুনি নি। শুনব কেন? ঘাড়ে যে তখন শনি চেপেছে! তোমার সুন্দর সুন্দর কথা শুনে জগৎ-সংসার ভুলে গেলুম! ভাবলুম, কি অপূর্ব রত্নই পেয়েছি! এখন সেই ভুলের মাশুল দিতে হবে সারাজীবন ধরে।"

ভুল! অমলেন্দু ভুল করেছিল! কিন্তু সত্যিই কি তাই? যদি মনীষার আসল প্রকৃতি না জেনে বিয়ে করতো অমলেন্দু, তবে আজ ওকথা সাজতো তার মুখে! ...মনীষার মনে আছে, নিজের স্বভাব-চরিত্র, ভালো-লাগা মন্দ-লাগা সে এতটুকুও লুকোয় নি অমলেন্দুর কাছে। সংসারের কাজে সে আনাড়ী, খাতা নিয়ে লিখতে বসলে কি কোনো জায়গায় বেড়াতে গেলে যে তার নাওয়া-খাওয়া জ্ঞান থাকে না, সমস্ত বহির্জগৎটাকেই সে ভুলে যায়—এসব কিছুই তো সে বলতে বাকী রাখে নি। আর তার এই বন্ধনহীন, খাপছাড়া স্বভাবটাই সেদিন অমলেন্দুকে টেনেছিল এক দুর্বার আকর্ষণে—আশ্চর্য! দূর আকাশের ধরা-না-দেয়া চঞ্চল বিহঙ্গকে

সেদিন একান্ত আপনার করে বুকের কাছটিতে পেতে চেয়েছিল অমলেন্দু—নিজের চাইতে অনেক বিত্তবান্ প্রতিষ্ঠিত পুরুষদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঝখান থেকে একটি মেয়েকে ছিনিয়ে জয় করে আনার তীব্র নেশায় সেদিন সংসারের আর সব-কিছুই তার কাছে মূল্যহীন হয়ে গিয়েছিল!......মনীষা কি করে জানবে এমন প্রবল চাওয়ার পিছনে লুকিয়ে আছে এতবড় না-চাওয়া? এমন প্রচণ্ড ফাঁক?...

কামানো শেষ করে বাথ্রুমে স্নান করতে গেলো অমলেন্দু, মনীষা গিয়ে ঢুকলো রান্নাঘরে।

সেই নিত্যকার দেখা, ক্লান্তিকর আনাজের ঝুড়িটা পড়ে আছে একপাশে—তার ওপর উপুড় করা একটা বঁটি। আরেক পাশে উনুনটা জ্বলছে গন্গন্ করে। উঃ, কি প্রচণ্ড আঁচ! চোখ ঝল্সে দেয় যেন। মনীষার মনে পড়ল, বাপের বাড়িতে থাকতে জীবনে কোনোদিন রান্নাঘরে ঢোকে নি সে—শুধুমাত্র এই উনুনের দৃশ্য সে সহ্য করতে পারতো না বলে। এমন কি তার নিজের পড়বার ঘরটিতে সে রেখেছিল একটি খুব মৃদু আলোর শাদা বাল্ব্। কড়া ইলেক্ট্রিকের আলো কোনোদিন তার চোখে সহ্য হত না। শুধু তাই নয়, কেউ জোরে কথা কইলে বা শব্দ করে দরজা বন্ধ করলেও সে সহ্য করতে পারতো না। ...সূর্যের প্রখর আলো তার কোনোদিন ভালো লাগতো না। তার ভালো লাগতো চাঁদের হিম আলো। রাত জেগে চাঁদের দিকে তারাদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকা ছিল তার বাতিক। এই অভ্যেস নিয়ে কেউ ঠাট্টা করলে মনীষা জবাব দিতো—"মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে; প্রকৃতি তখন কথা কয়। সে কথা কোলাহলমুখর দিনের আলোর শোনা যায় না।" ...সে সব দিন আর সে সব রাত কি চিরদিনের জন্যেই হারিয়ে গেল এই ক্লেদাক্ত, দেহসর্বস্ব জীবনের প্রাত্যহিক তুচ্ছতার নিচে? ...

অন্যমনস্কভাবে আনাজের ঝুড়িটা টেনে নিয়ে বঁটিতে ফুলকপি কুটতে বসলো মনীষা।

ক'দিন পরের কথা।

একটা লেখা হাতে নিয়ে কোনো পত্রিকা-অফিস্ থেকে বেরিয়ে এসে বাস্-স্টপে দাঁড়িয়েছিলো মনীষা।

ঝাঁঝাঁ করছে দুপুরের রোদ্। এই রোদের মধ্যে এখন বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে আধ ঘণ্টা, কি তারও বেশি। তারপর বাড়ি পৌঁছতে আরো এক ঘণ্টা। আজকের দিনটাই পণ্ড। সম্পাদক যদি লেখাটা নিতেন, তবু একটা সান্ত্বনা থাকতো। তিন ঘণ্টা সময় খরচ করে যাওয়া-আসা সার্থক হত। কিন্তু তা হল না। এখন বাড়ি গিয়ে একটু বিশ্রাম নেবারও সময় পাবে না মনীষা। সংসারের কাজে হাত লাগাতে হবে...

"শুনুন!"

হঠাৎ কার কণ্ঠস্বর বেজে উঠ্ল মনীষার ঠিক্ পিছন থেকে। ঐ অপরিচিত কণ্ঠ কি মনীষাকেই ডাকছে? না কি আর কারোকে? সন্দেহ থাকায় মনীষা সামনের দিকে চেয়েই দাঁড়িয়ে রইলো, মুখ ফেরালো না।

"শুনছেন? আপনাকে বলছি।"

এবার একেবারে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে অপরিচিত কণ্ঠের মালিকটি। মনীষাকেই ডাকছে ও; এতে আর কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কি দরকার?

এদিকে মুখ ফেরাতেই মনীষা দেখলো এক যুবক দাঁড়িয়ে আছে পাশে।

মনীষার বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে যুবকটি বললে—"আপনি অবাক্ হয়েছেন, না? আমার নাম কিরণ্ময় সান্যাল। 'তরণী'র এডিটরের সঙ্গে যখন আপনি কথা বলছিলেন, আমি সেখানে ছিলুম।... আপনি আমাদের কাগজে লিখবেন?"

"আপনাদের কাগজ মানে—"

"না, 'তরণী' নয়। আমি বলছি 'অনামিকা'র কথা—যেখানে আমি কাজ করি।"

"ভালো কাগজ?"

"বেশ ভালো। তবে নতুন বার হয়েছে বলে এখনো তেমন পাব্লিসিটি হয় নি। আপনার লেখা যদি ভালো হয়, আমাদের এডিটর্—"

যুবকটির কথার স্রোতে বাধা দিয়ে মনীষা বললে—"আপনাদের এডিটর্ কে?"

"পার্সি দত্তরায়।"

"পার্সি দত্তরায়? এমন অদ্ভুত নাম তো কখনো শুনেছি বলে মনে পড়ে না!"

"হ্যাঁ, ওঁর নামটা একটু অদ্ভুতই।"—হাসলো কিরণ্ময়—"ওঁর বাবা বাঙালী, মা ইংরেজ। নামটা হয়তো দিয়ে থাকবেন ওঁর মা। পদবীটা অবশ্য বাবারই পেয়েছেন।"

"ওঃ, তাই বলুন। কিন্তু—"

"কিন্তু কি?"

"ভাবছি, এধরণের মিশ্র সংস্কৃতিতে যাঁর জন্ম তাঁর কি বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে খুব একটা নিবিড় পরিচয় থাকবে?"

"আপনি একদম ভুল করছেন!"—হাসতে হাসতে বললো কিরণ্ময়—"বাংলা ভাষাকে উনি ভালোবাসেন প্রাণ দিয়ে। এমন কি নিজেও লেখেন বাংলায়। ওঁর চেহারাটাই যা একটু ইংরেজ্-ঘেঁষা, কিন্তু কথায়-বার্তায় হাবেভাবে একেবারে বাঙালী।...যাবেন আমাদের 'অনামিকা'র অফিসেই?" একটু থেকে বললো—"ইচ্ছে করলে আজই যেতে পারেন। যদি আপনার হাতে সময় থাকে—"

ছেলেটার এত আগ্রহ কেন? ও কি ঐ পত্রিকার এজেন্ট না কি? রাস্তা থেকে লেখক ধরে আনাই কি ওর কাজ?... কি ভেবে মনীষা বললো—"কতদূরে অফিস্টা? এখান থেকে যেতে কতক্ষণ লাগবে?"

"এই তো কলেজ স্ট্রীটের ওপরেই। যেতে কতক্ষণ আর লাগবে—এই মিনিট্ কুড়িক। চলুন না, ওদিকের বাস্-স্টপে গিয়ে দাঁড়াই।"

"চলুন।"

রাস্তা পার হবার জন্যে পা বাড়ালো মনীষা।

'অনামিকা'র অফিস্টি বেশ ছিম্ছাম। সচরাচর কাগজের অফিস্ যেমন হয় সেরকম নয়।

প্রথমেই যে ঘরখানায় মনীষাকে নিয়ে গেল কিরণ্ময় সেটা হল ওয়েটিং রুম্। বেশ বড়, পরিচ্ছন্ন ঘরখানা। ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা আবহাওয়া ঘরের। বাইরের রৌদ্রদগ্ধ পৃথিবীর খরতাপ এখানে পৌঁছতে পারে নি। মনীষা লক্ষ্য করে দেখলো, ঘরের জানলা-দরজায় ভারী খশ্ খশ্ দুলছে।

"বসুন। আমি এখনি আসছি।" বলে কিরণ্ময় গিয়ে ঢুকলো সামনের ঘরে স্যুইং ডোর্ ঠেলে।

স্যুইং ডোরের মাথায় কালো প্লেটের গায়ে বড় সাদা ইংরেজী হরফে লেখা—"এডিটর্"।...কিরণ্ময় নিশ্চয় এডিটরকে কিছু বলতে গেল তার সম্বন্ধে। কি বলবে কে জানে!...আশেপাশে আরো জনকয়েক লোক অপেক্ষা করছে। ওরা মনীষার আগে এসেছে। মনীষাকে তবে কি আবার ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করতে হবে নাকি এখানে?...

"আসুন।"

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকছে কিরণ্ময়।

যাক্! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো মনীষা। পরে এসেও আগে দেখা করার সুযোগ পাওয়া গেল।

এডিটরের ঘরে ঢুকতেই টেবিলের ওধারে চেয়ারে-বসা এক ভদ্রলোককে দেখতে পেলো মনীষা। মনে হল লোকটির বয়েস ত্রিশের কাছাকাছি হবে।

এই নিশ্চয় পার্সি দত্তরায়! নীল চোখে আর বাদামী চুলে লেখা রয়েছে সেই পরিচয়। গায়ের রঙ্ অবশ্য ফর্সা হলেও খড়িওঠা নয়। তবু সব মিলিয়ে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ লাগে।

ইংরেজীতেই সম্ভাষণ করবে নাকি

মনীষা? কিন্তু কিরণ্ময়ের কথাটা কানে বাজছে ঃ "হাবেভাবে কথায়বার্তায় একেবারে বাঙালী!" তাছাড়া, বাংলা কাগজের সম্পাদক। ইংরেজী সম্ভাষণ এখানে সমীচীন হবে না। পলকের মধ্যেই এত কথা ভেবে নিয়ে বাঙালীপ্রথায় নমস্কার করলো মনীষা।

পার্সি দত্তরায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। প্রতিনমস্কার করে স্মিতমুখে বললো—"বসুন।"

বাঃ, বেশ বিষয়ী তো! এই বিনয়টুকু ভালো লাগলো মনীষার। চেয়ারে বসে ভ্যানিটি ব্যাগটা খুলো সে, 'তরণী'র অফিস থেকে প্রত্যাখ্যাত সেই লেখাটা বার করে এগিয়ে দিলো এডিটরের দিকে।

একবার নয়, দু'বার সমস্ত কবিতাটা পড়লো পার্সি দত্তরায়। আশ্চর্য হল। কি যেন চিন্তা করলো। তারপরে চোখ তুলে তাকালো লেখিকার মুখের দিকে।

"আপনার মধ্যে প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ রয়েছে।"—মনীষার চোখের দিকে গভীর দৃষ্টি মেলে বললো পার্সি দত্তরায়—যদি সাধনা করেন, আমার মনে হয়—একদিন আপনি খুব বড় কবি হতে পারবেন।"

মনীষার হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল। এতদিনে—এতদিনে কি তবে একজন মানুষের কাছে মিললো তার প্রতিভার যথার্থ স্বীকৃতি?

"দাঁড়াও. দাঁড়াও মনীষা।"—নিজেই নিজেকে সাবধান করলো সে—"এখনো, এখনো পূর্ণ স্বীকৃতি পাও নি তুমি এর কাছে। ওর সাহিত্য-বিচারের মাপকাঠি কি—ওর প্রিয় সাহিত্যিক কারা—তুমি জানো না। হয়তো তোমার মতে যারা দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর কবি তাদেরই কেউ ওর মতে প্রথম শ্রেণীর প্রতিভা! তা যদি হয়, তবে ওর এই মূল্যায়নের দাম কি? অন্তত তোমার কাছে?......"

মনীষার চিন্তাপ্রবাহ যখন এই পথে চলছিল, তখন পার্সি দত্তরায় কি ভাবছিলো? সে ভাবছিলো—কি সাদাসিধে এই মেয়েটি! গয়না নয়, টিপ নয়, কাজল নয়, কোনো সাজসজ্জারই চিহ্ন নেই এর অঙ্গে! এমন কি চুলগুলো পর্যন্ত ভালো করে আঁচড়ানো নয়। আলুথালু চুলকে জড়িয়ে কোনোমতে একটা এলো খোঁপা করা হয়েছে মাত্র। হঠাৎ দেখলে একে কিছুতেই বিশেষ কেউ বলে মনে করা যাবে না! কিন্তু—

কিন্তু ওর চোখদুটি আশ্চর্য জীবন্ত। হ্যাঁ, ওর চোখ লক্ষ্য করলে অবশ্য মনে সবিস্ময় প্রশ্ন জাগে—"এ কে?" হাজার রূপসীর ভিড়েও ও-চোখ হারিয়ে যাবার নয়।...

"লেখাটা তাহলে—"

অসমাপ্ত বাক্যটা ছুঁড়ে দিলো মনীষা—চিন্তানিমগ্ন সম্পাদকের উদ্দেশে।

"হ্যাঁ, রেখে যান।"—চকিত হয়ে বলে উঠল পার্সি দত্তরায়—"দু-তিন সংখ্যার মধ্যেই বার করতে পারবো আশা করি।"

"ধন্যবাদ। নমস্কার।"

"নমস্কার।"

প্রসন্নমনে বাইরে বেরিয়ে এল মনীষা।

বিষণ্ণ শীতের বিকেল। রিম্‌ঝিম্‌ বৃষ্টি নেমেছে বাইরে। ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া বইছে দমকা। এমন সময় বেঁটে রঙীন লেডিজ ছাতাটা নিয়ে বাইরে বেরোবার আয়োজন করছিলো মনীষা।

"এই বাদলার মধ্যে আবার বেরোচ্ছো কোথায়?" বিরক্ত গলায় বলে উঠলো অমলেন্দু—খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে।

"বাঃ, টুইশন্‌ আছে না?"

"আজ তো রোববার। রোববারে তো কোনোদিন যাও না পড়াতে!"

"সামনে পরীক্ষা, তাই দু-এক দিন বেশি পড়াচ্ছি। যা অগা মারা মেয়ে!... ফেল করলে তো আর আমায় রাখবে না, অন্য মাস্টার রাখবে!" জুতোর বকলস লাগাতে লাগাতে জবাব দিলো মনীষা—স্বামীর দিকে না চেয়েই।

বাঃ, কি চট্‌পট্‌ মিথ্যে কথাগুলো এসে যাচ্ছে ঠোঁটের আগায়! নিজের অভিনয়-নৈপুণ্যে নিজেই মুগ্ধ হল মনীষা। অথচ এমন একদিন ছিল যখন একটা সামান্য মিথ্যে কথা তিনমাস ধরে মুখস্থ করার পরও ঠিকমত বলতে পারতো না! কি ছিল সে, আর কি হয়েছে! পরিবেশ মানুষকে কতদূর বদলে দিতে পারে, মনীষাকে তা জানতে হয়েছে জীবন দিয়ে......

বাড়ির বাইরে পা দিয়েই একটা

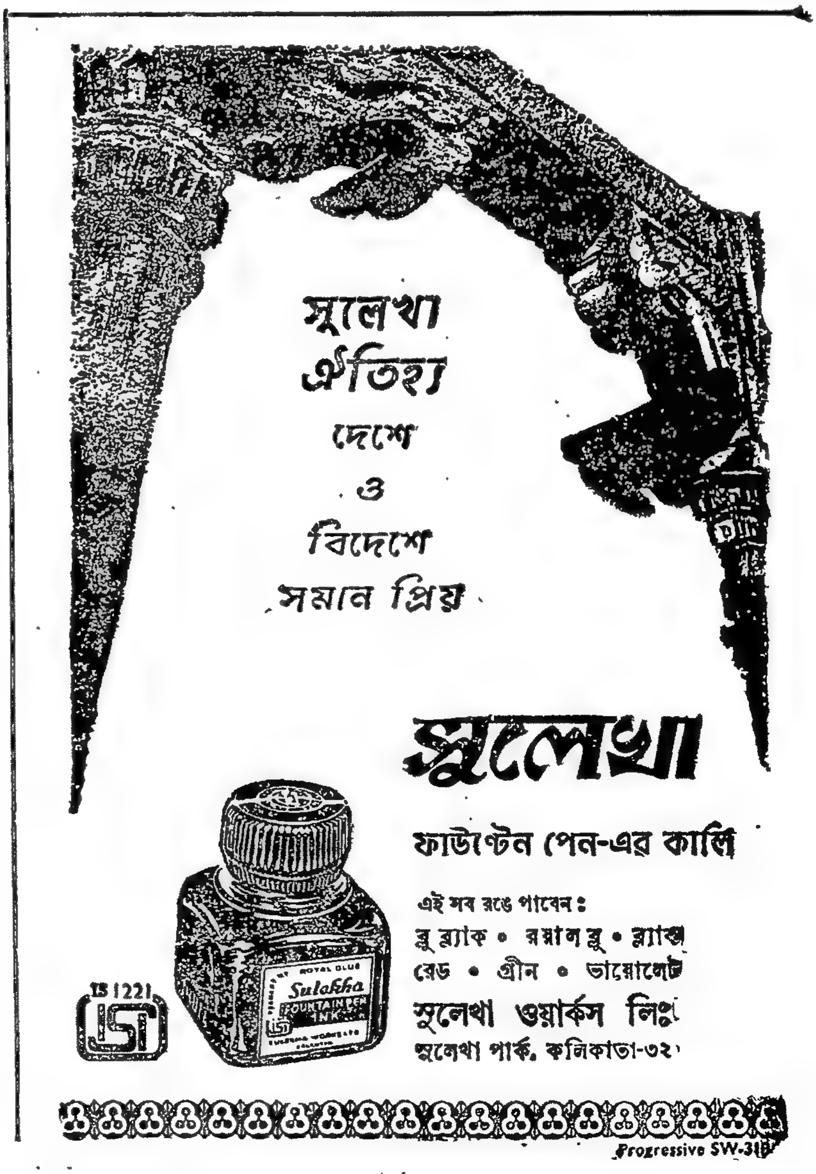

মুক্তির উল্লাস অনুভব করলো মনীষা। আঃ, মুক্তি! মুক্তি! ঘন্টা দুই-তিনের জন্যে অন্তত অমলেন্দুর কর্কশকণ্ঠ, সহানুভূতিহীন রূঢ় সঙ্গ, আর এই দারিদ্র্যক্লিষ্ট সংসারের কুশ্রী জেলখানাটা পড়ে রইলো পিছনে—পিছনে...ও জগতের সঙ্গে যেন মনীষার এখন আর কোনো সংযোগ নেই......

বাসে উঠে মনীষার সত্যিই মনে হতে লাগলো যেন সে অন্য এক দেশে পাড়ি দিয়েছে। বাস নয়, জাহাজে চড়ে যাচ্ছে সে। জানলার বাইরে যানবাহনভর্তি কলকাতার রাস্তা নয়—সমুদ্র—সমুদ্রের অনন্ত নীল ঊর্মিমালা...

হ্যাঁ, পার্সি দস্তরায়ের বাড়ি কবিতা শোনার নিমন্ত্রণ রাখতে তার আজকের এই যাওয়া প্রথম সমুদ্রযাত্রার মতই রোমাঞ্চময়, আশ্চর্য!...মাত্র মাসখানেকের আলাপ, তাও ঐ 'অনামিকা'র অফিসেই। এর মধ্যে ক'টা কথাই বা হয়েছে তার ঐ লোকটির সঙ্গে! তবু, তবু সেদিন যখন পার্সি দস্তরায় হঠাৎ তাকে বাড়িতে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে বসলো, সে 'না' বলতে পারলো না। সত্যি কথা বলতে কি, 'না' বলার কথা তার মনেই আসে নি। শুধু মনে হয়েছিল, রহস্যময় ঐ মানুষটির গভীর নীল চোখের অতলান্ত চাহনিই যেন তার অমোঘ নিয়তি! ঐ নিয়তি তাকে টানছে তেমনি করে, যেমনি করে রূপকথার চুম্বকদ্বীপ টানে বিশাল লোহার জাহাজকে দূর সমুদ্রবক্ষ থেকে...

এসপ্লানেডে এসে মনীষা যখন নামলো তখন সন্ধ্যে প্রায় ছ'টা হবে। বৃষ্টিটা থেমেছে, কিন্তু আকাশের চেহারা থমথমে, গম্ভীর। মনে হয় বর্ষণের এই বিরতি ক্ষণিক, এ শুধু আসন্ন আসারপাতের নীরব আয়োজন...

ছুটন্ত মানুষ, আলো, কোলাহল, চারদিকে কাদা ছিটিয়ে চলা লরী, মোটর, ট্রাম-বাস-টেম্পো আর রিক্সার ভিড় পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত মনীষা এসে পৌঁছলো তার গন্তব্যস্থলে। গেটের সামনেই ছোট্ট লন্—নরম সবুজ ঘাসে ঢাকা। তার দু'পাশ দিয়ে চলে গেছে ধূসর-লালচে কাঁকর বিছানো পথ—সেই দু'টি পথ গিয়ে মিলেছে ছোট, দোতলা বাড়ির সামনে। বাড়ির একপাশ দিয়ে উঠেছে লতানো পাতাবাহার ব্যালকনি পর্যন্ত—ঘোরানো লোহার সিঁড়ির গা বেয়ে। আরেক পাশ দিয়ে উঠেছে সিমেন্টের সিঁড়ি।

তারই পাশে কলিং বেল্‌টা খুঁজে বার করলো মনীষা।

চাকর-বাকর নয়, পার্সি দস্তরায় স্বয়ং এসে খুলে দিলো দরজা। হাসিমুখে বললো—"আসুন।"

অপরূপ মাধুর্য আর আনন্দ ঝরছে আজ ওর হাসিতে—মনে হল মনীষার। দেখতে সুপুরুষই, তবু যেন আজ ওর বেশবাসে একটু বিশেষ সুরুচির পরিচয় রয়েছে...

পার্সি দস্তরায়ের সঙ্গে সঙ্গে দোতলার ব্যালকনিতে পাতা বেতের চেয়ারে এসে বসলো মনীষা।

গোল বেতের টেবিলের ওপর শাদা পুষ্পাধারে রঙীন কাগজের ফুল সাজানো। পাশে একটা ক্রীম-রঙের অ্যাশট্রে পড়ে আছে। ফুলের পাশে পোড়া-সিগারেট-ভর্তি ছাইদানটা যেন চক্ষুপীড়ার মত মনে হয়...

মনীষার চোখ দেখে কি করে জানি ওর মনোভাবটা অনুধাবন করতে পারলো পার্সি দস্তরায়। অ্যাশট্রেটা তুলে নিয়ে রেখে এল ঘরের মধ্যে। তারপর হাসিমুখে বললে—"অনামিকার অফিসে যাকে দেখেছেন সে শুধু কাগজের সম্পাদক, তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু তার মধ্যে একটা কবিও আছে। আজ যদি তার সঙ্গে আপনার একটু পরিচয় করিয়ে দিই, বিরক্ত হবেন কি?"

"বিরক্ত? খুব আনন্দিত হব।"

"তাহলে শুনুন।"

একখানা খাতা নিয়ে নিজের লেখা কবিতা পড়তে সুরু করলো পার্সি দস্তরায়।

আবার বৃষ্টি সুরু হয়েছে বাইরে—বেশ জোরে। তবে হাওয়ার গতি অন্যমুখে বলে জলের ছাঁট আসছে না ব্যালকনির ভিতর পর্যন্ত। রঙীন পাতাবাহারের দলে নির্মম আঘাত হেনে ঝরা ঐ রমঝম বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে পার্সির কবিতা শুনতে শুনতে মনীষার মন চলে গেল দূরে—অনেক দূরে...

এই পৃথিবীতেই না বহুদিন আগে জন্মেছিল আরো এক কবি—যার নাম ছিল পার্সি—যার কণ্ঠে ছিল এমনি অপার্থিব সংগীত?...তারও কি ছিল এমনি বাদামী, ঘন ঢেউ-খেলানো চুল? তারও কি নীল চোখের ছায়ায় ঘনাতো অপ্রাপনীয়ের বেদনা এমনি অনির্বচনীয় আভাসে?...

পার্সি যখন থামলো, বাইরে তখনো বৃষ্টি ঝরছে অঝোরে। অনেকক্ষণ কেউই কোনো কথা বলতে পারলো না, শুধু মুখোমুখি বসে রইলো স্তব্ধ হয়ে।

পার্সির কবিতা পড়া থেমেছে দেখে এবার তার বাবুর্চি সামনে এসে দাঁড়ালো। বললো—"সাহেব, চায় দেগা?" ইতিমধ্যে সে চা নিয়ে এসে ঘুরে গেছে দু-তিন বার।

"জরুর। আভি লাও...।" হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলো পার্সি, মনীষার দিকে ফিরে বললে—"দেখুন তো, কি ভুলো মন! এতক্ষণ আপনাকে চা না খাইয়ে নিজের কবিতাই শোনাচ্ছি শুধু। ছি ছি!"

চা! হাসি পেলো মনীষার। চা তো সে রোজই খায়। কিন্তু আরেকজন কবির মুখোমুখি বসে কাব্যের অমৃতসিন্ধুতে ডুব দেবার সুযোগ জীবনে ক'বার আসে? ...কিন্তু এত কথা বললো না মনীষা। শুধু বললো—"আপনি কেন ব্যস্ত হচ্ছেন? চা আমার তেমন ভালো লাগে না।"

"তাতে আমার কর্তব্যের ত্রুটি ঢাকা পড়ে না!"—বললো পার্সি।

ও নিয়ে বাদানুবাদ করলো না মনীষা। একটু চুপ করে থেকে বললো—"আপনার কবিতা কিন্তু অপূর্ব লাগলো আমার।"

"কেন লজ্জা দিচ্ছেন? আমার কবিতা অপূর্ব নয়, আমি জানি। তবে আপনার ভালো লেগেছে, সে আমার সৌভাগ্য!"

"এ শুধু আপনার বিনয়, মিস্টার দস্তরায়।"

"মিস্টার দস্তরায়! বড্ড প্রোজেইক্, বড্ড নীরস শোনায় কানে! তার চাইতে কি অনেক মিষ্টি নয় 'পার্সি' নামটা?"

পার্সির ইঙ্গিতটা বুঝতে দেরি হল না মনীষার। ও চায় মনীষা ওকে নাম ধরে ডাকুক। কিন্তু এত অল্প পরিচয়ে কি নাম ধরে ডাকা যায়? তাছাড়া, ওর সঙ্গে একটু দূরত্বই রাখতে চায় মনীষা। পার্সির মধ্যে যে কবি আছে, সেই কবিকেই শুধু ভালোবাসে সে। সেই কবিকেই তার প্রয়োজন—তার আপন প্রতিভারই পূর্ণ স্ফুরণের জন্যে। কাঠে কাঠে ঘষলে তবেই তো আগুন জ্বলে...। অমলেন্দুর কথা মনে পড়ল। তার জায়গা যেখানে সেখানে পার্সির প্রবেশ নেই। আবার পার্সির স্থান যেখানে সেখানে অমলেন্দুর জায়গা নেই। অথচ অমলেন্দুর জায়গা সবখানেই হতে পারতো। কিন্তু সে তা চায় নি। সে চেয়েছে শুধু মনীষার দেহটাকে। তার আত্মাকে—তার অন্তরতর সত্তাকে—সে দাঁড় করিয়ে রেখেছে ঘরের বাইরে—বন্ধ দ্বারের সামনে...বহুদিনের ব্যর্থ প্রতীক্ষার পর সেই বুভুক্ষু আত্মা যদি আজ অন্য দুয়ারে ধাক্কা দেয়, তাতে অভিযোগ করার অধিকার অমলেন্দুর নেই...

বাবুর্চি ইতিমধ্যে চায়ের ট্রে এনে রেখেছে টেবিলের ওপর। চায়ের সঙ্গে কিছু স্যান্ডউইচ, কিছু কেক্ আর ক্রীম্-দেয়া বিস্কুট। সেদিকে চেয়ে পার্সি বললো—"নিন, সুরু করুন।" তারপর একটা বিস্কুট তুলে নিলো।

খেতে খেতে পার্সি বললে—"আমার কবিতাপ্রীতি কার কাছ থেকে পাওয়া জানেন? মা'র কাছ থেকে। মা অবশ্য লেখিকা হবার স্বপ্ন

দেখেন নি কোনোদিন, কিন্তু তাঁর ডায়েরি যদি দেখেন, অবাক্ হয়ে যাবেন। ঠিক একজন শিল্পীর চোখ দিয়ে তিনি দেখেছেন জীবনকে।"

"ঐ দু'টো বোধহয় আপনার মা'র ছবি?"—দেয়ালে টাঙানো দু'খানি ছবির দিকে ইঙ্গিত করলো মনীষা।

"হ্যাঁ। গাউন-পরা ঐ ছবিটা মা'র বিয়ের আগের ছবি, আর শাড়িপরা এই ছবিটা বিয়ের পরের।"

মনীষা উঠে গিয়ে দেখতে লাগলো ছবি দু'টো। বিয়ের আগের ছবিটাই বেশি সুন্দর মনে হল তার। তারুণ্য যেন উপচে পড়ছে মুখের হাসিতে। চোখ দু'টি স্বপ্নময়—অনেকটা পার্সি'র মত। বিয়ের পরের ছবিটিতে কিন্তু সে তারুণ্যের দীপ্তি নেই, কেমন যেন নির্জীব লাগছে। বিয়ের পর অবশ্য একটু নির্জীব হয়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক মেয়েদের পক্ষে। স্বামীরা যে কি ধরণের জীব তা তো মনীষার জানতে বাকী নেই...

"মা যেদিন মারা গেলেন, সেদিন যে কি নিঃসঙ্গ বোধ করেছিলুম তা' বলতে পারি না!"—পার্সি'র গলা শুনে চমকে ফিরে তাকালো মনীষা। সে যে কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, লক্ষ্য করে নি সে।

"মা'র সঙ্গে বাবার মিল ছিল না, তাই আমি ছিলুম মা'র জীবনের একমাত্র সঙ্গী। বাবা যে খারাপ লোক ছিলেন তা নয়। কিন্তু তিনি ছিলেন বড় সাধারণ। বিয়ের আগে বাবাকে ঘিরে মা'র যে স্বপ্নকল্পনা গড়ে উঠেছিল তা' ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল বিয়ের পর এদেশে এসে। বাবাও সুখী হন নি। আমিই তাঁর একমাত্র সন্তান বলে আমার ওপর টান ছিল, কিন্তু আমার নীল চোখ আর বাদামী চুল তাঁর মনে একটা বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করতো, তাঁর কথায় ব্যবহারে তা বুঝতে পারতুম। তাই এক ছাতের তলায় থেকেও আমি তাঁর থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলুম। তাঁকে ঠিক ভালোবাসতে কোনোদিনই পারে নি... তবু তিনি যখন মারা গেলেন, দুঃখ হয়েছিল। সেইসঙ্গে একটা অসহায়তাও অনুভব করেছিলুম। হয়তো বয়েস কম ছিল বলেই।"

"আপনার বাবা-মা দুজনেই খুব অল্প বয়েসে মারা গেছেন, না?"—জিজ্ঞেস করলো মনীষা।

"হ্যাঁ। হয় তো অসুখী দাম্পত্য-জীবনই তার কারণ। নইলে—বাবা-মা কারোরই স্বাস্থ্য খারাপ ছিল না। আর্থিক অভাবও তাঁদের জানতে হয় নি কোনোদিন।"

কথায় কথায় কখন যে রাত বেড়েছে, কখন যে বৃষ্টি থেমে গেছে, খেয়ালই ছিল না মনীষার। খেয়াল যখন হল তখন রাত প্রায় নটা বাজে। সর্বনাশ। এখন বাসে বাড়ি ফিরতে হলে তো প্রায় দেড়ঘন্টা।

"আপনি এত চিন্তা করছেন কেন?"—একটু অবাকই হল পার্সি—"আমি তো অনেক আগেই ভেবে রেখেছি আমিই আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেবো গাড়িতে।"

গাড়ি! পার্সি'র ঐ প্রকান্ড গাড়িখানার কি ব্যাখ্যা মনীষা দেবে অমলেন্দুর কাছে? তাকে তো বলে এসেছে সে পড়াতে যাচ্ছে!...

অগত্যা বাস-স্টপে এসে মনীষাকে বাসে তুলে দিলো পার্সি।

দু' নম্বর বাস। দেরি করে আসে। ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে চলে মনীষা যখন ওর গন্তব্যে এসে নামলো তখন রাত সাড়ে দশটা বাজে।

স্টপে নামতেই মনীষা দেখলো অমলেন্দু দাঁড়িয়ে আছে।

"কি ব্যাপার, তুমি এখানে?"—প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে সহজ হবার চেষ্টা করলো মনীষা।

কিন্তু সে প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে অমলেন্দু বললো—"তোমার ছাত্রী তো থাকে মাণিকতলায়। দু' নম্বর বাস কি আজকাল ঐ রুট দিয়েই যাতায়াত করছে?" কঠিন ব্যঙ্গ ঝরে পড়লো তার গলায়। মনীষা দেখতে পেল অমলেন্দুর চোখ আর ঠোঁটের কোণ কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে এক নির্মম বিদ্বেষে।

কোনো কৈফিয়ৎই এই মুহূর্তে এল না মনীষার গলায়। যন্ত্রের মত হাঁটতে লাগলো সে।

চলতে চলতে চাপা স্বরে অমলেন্দু আবার বললো—"এক সন্ধ্যেতেই বোধহয় সমস্ত বছরের পড়া পড়িয়ে এলে, তাই না?"

অমলেন্দুর পিছন পিছন প্রাণহীন পুতুলের মতন বাস-স্টপ থেকে বাসা পর্যন্ত পথটুকু পার হল মনীষা, সিঁড়ি বেয়ে উঠে নিজেদের ফ্ল্যাটের সামনে এসে দাঁড়ালো। চাবি ঘুরিয়ে তালা খুলল অমলেন্দু, ভিতরে ঢুকলো। তার পিছন পিছন মনীষাও এসে দাঁড়ালো ঘরের মধ্যে।

ভিতর থেকে দরজায় খিল তুলে দিয়েই মনীষার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো অমলেন্দু। জ্বলন্ত চোখে চেয়ে বললে—"হারামজাদী, কোথা ছিলি এত রাত পর্যন্ত বল্! সত্যি কথা না বললে তোর টুঁটি ছিঁড়ে ফেলবো এখনি!"

নরক! এইই নরক। সমস্ত শরীরের অণুপরমাণু দিয়ে অনুভব করলো মনীষা। প্রচন্ড ঘৃণায় তার কণ্ঠরোধ হল।

"চুপ করে পার পাবি মনে করছিস? বল্ বলছি এখুনি বল্।"

"আমি মিথ্যে বলেছি বটে, কিন্তু পাপ করি নি।" জ্বলতে লাগলো মনীষার চোখ—"শুনে নাও। 'অনামিকা'র সম্পাদকের বাড়ি গিয়েছিলুম—কবিতা শুনতে।"

"কবিতা!"—চিবিয়ে চিবিয়ে বললো অমলেন্দু—"আজ চিরকালের মত তোর কবিতায় আগুন দিয়ে দিচ্ছি!" ছুটে গিয়ে টেবিলের ড্রয়ার দু'টো টেনে খুলে ফেললো সে, তার ভিতর থেকে বার করলো একরাশ লেখা কাগজ, কয়েকটা পত্রিকা, আর খানদুয়েক মোটা খাতা।

সমস্ত কিছু মেঝেয় স্তূপীকৃত করলো অমলেন্দু, তারপর চার-পাঁচটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলো তাতে।

দুদ্দাড় করে আগুন উঠলো জ্বলে।

গত পাঁচটি বছরের সমস্ত সাধনা পুড়ছে—পুড়ছে ঐ রক্তরাঙা আগুনে...... পলকহীন চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগলো মনীষা। ঐ আগুন সামান্য দেশলাই-কাঠির আগুন নয়, অমলেন্দুর বহুদিনের পুঞ্জীভূত বিদ্বেষ আর জিঘাংসার আগুন......। মনীষাকে সারারাত্রি ধরে চাবকালেও এত শাস্তি দিতে পারতো না অমলেন্দু। অমলেন্দু তা জানে।

কতকগুলো শুকনো কাগজের নয়, মনীষারই চিতাগ্নি জ্বেলেছে অমলেন্দু। সেই চিতায় পুড়ছে মনীষা—না, মনীষা নয়, মনীষার মধ্যে থেকেও যা মনীষার চেয়ে শ্রেয়তর, যা শাশ্বত, যা জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার ধন তাই পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে ওখানে—ছাই, শুধু ছাই......

মানুষের ইতিহাসে এই তো প্রথম নয়। কতোবার—কতোবার মানুষকে জীবন্ত চিতায় তুলে দেয়া হয়েছে এমনি করে সত্যের কণ্ঠরোধ করতে......সেই হত্যার কোনো বিচার হয় নি সমাজের কাঠগড়ায়। আজও হবে না।......চিতাগ্নির আলোয় উজ্জ্বল রক্তাভ অমলেন্দুর মুখটা—জহ্লাদের ক্রূর উল্লাস কি আশ্চর্য নগ্নতায় জ্বলে উঠেছে ওখানে! খুন! খুন করছে ঐ লোকটা। ও খুনী। কিন্তু সমাজের কোনো দরবারে ওর বিচার নেই...

তাই বিচারের জন্যে চীৎকার করে উঠতে পারলো না মনীষা। অমলেন্দু তো একা নয়। ওর পিছনে লক্ষ লক্ষ মানুষের উল্লাস—অগণ্য জনতার জয়ধ্বনি......সেই জনতার, যারা সক্র্যাটিসকে দিয়েছিল হেমলক্, দান্তেকে দিয়েছিল নির্বাসন, গ্যালিলিওকে দিয়েছিল কারাগার......

পরদিন সকালে যখন ঘুম ভাঙলো অমলেন্দুর, তখন মনীষাকে কোথাও দেখতে পাওয়া গেলো না। ঘরে, বাইরে, সম্ভব অসম্ভব সমস্ত জায়গা খুঁজেও স্ত্রীর কোনো সন্ধান পেলো না অমলেন্দু। শুধু তার অবরুদ্ধ, নিষ্ফল রোষ আপন দেহের দেয়ালে মাথা কুটে মরতে লাগলো।

চোমংলামার চোখে উত্তরবঙ্গ

॥ মালদহের লোকসংস্কৃতি ॥

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে, পুরাকালে মালদহ জেলা বলতে শুধুমাত্র মহানন্দা ও পদ্মা নদীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ডকেই বোঝাতো। সে সময় মালদহকে গুরুত্ব দিয়ে কোনও ভৌগোলিক সীমারেখা টানা হয় নি। আর এই অঞ্চলে যে সব পরিশ্রমী এবং অনগ্রসর উপজাতিগুলি বসবাস করত—তারাও এই অঞ্চলের উন্নয়ন বা ভৌগোলিক গুরুত্ব সম্পর্কে আদৌ উৎসাহী ছিল না। মালদহের ইতিহাস-প্রণেতা স্বর্গীয় রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয়ের অভিমত অনুযায়ী—মালদহ জেলাকে তখন কোষকালীর দেশ বললেও অত্যুক্তি হত না। কেন না তখন একমাত্র 'কোষ' বা রেশম কীটের ব্যবসা ছাড়া এই অঞ্চলের কোনও উল্লেখযোগ্য অবদানও ছিল না। তখন বরেন্দ্র অঞ্চলের বেশিরভাগই স্থান ছিল জঙ্গলাকীর্ণ এবং বন্য জীব-জন্তুর আবাসভূমি।

পরবর্তীকালে (১৮১৩ খৃস্টাব্দে) পূর্ণিয়া, দিনাজপুর, রাজসাহী প্রভৃতি জেলার কিছু কিছু অংশ নিয়ে জেলার পুনর্গঠন করা হলেও—১৮৩২ সাল থেকে মালদহকে প্রকৃতপক্ষে স্বতন্ত্র জেলার মর্যাদা দিয়ে এর রাজস্ব আদায় এবং কালেক্টরীর পূর্ণাঙ্গ কাজ সুরু হয়। প্রাচীনকাল থেকে—সম্ভবত বাংলার রাজধানী যখন গৌড়ে স্থানান্তরিত হয় তখন থেকেই মালদহে বিভিন্ন বহিরাগত উপজাতির আগমন ঘটে। যেমন পূর্ণিয়া, দিনাজপুর থেকে, নাগর, ধানুক, চাঁই, রাজবংশী প্রভৃতি সম্প্রদায় এসে বসবাস সুরু করে। রাজমহল, ছোটনাগপুর থেকে আসে কোল, ওঁরাও, সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতি সম্প্রদায়। আর এরা জীবিকা হিসাবে বেছে নেয়—কৃষিকার্য, নৌকা চালনা, রেশমকীটের ব্যবসা বা পলুর চাষ প্রভৃতি।

বিহার এবং অন্যান্য শুষ্ক অঞ্চল থেকে যারা আসে তাদের মধ্যে মলহার, ভুঁইহার, তাঁতী, কুঞ্জরা, পাঝরা প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। কিন্তু অসুবিধা হল এই যে—একই বরেন্দ্রভূমির শ্যামল ছায়ায়, জল-বাতাস নদী, মাটিতে তাদের জীবনধারণের উপাদান খুঁজে নিলেও তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি এবং গোঁড়ামীকে কেউ সহজে ত্যাগ করতে চাইল না। তাছাড়াও সকলের মিলিত সংস্কৃতির ফলে যে একটা নতুন সংস্কৃতির রূপরেখা তৈরি হবে—তাও সম্ভব হয়ে উঠল না। কেন না—তখনকার দিনে, সেইসব সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার আলোক একেবারে পৌঁছায় নি—একমাত্র জীবিকাগত সাদৃশ্য ছাড়া—কোনও সম্প্রদায়ের সঙ্গে কোনও সম্প্রদায়ের আত্মিক যোগাযোগ ঘটে ওঠার সুযোগ ঘটল না। এর উপর ধর্মীয় অনুশাসনের বিভেদ তো রয়েই গেল। ফল হল এই যে মালদহ জেলার নিজস্ব কোন সংস্কৃতির রূপরেখা তৈরি হয় নি। যেটা হয়েছে—তা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন আচারিত সামাজিক আচার আচরণ, ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতি থেকে একটি ছাড়া ছাড়া সংস্কৃতি-চেতনা।

মালদহে মুসলমান আগমন ঘটতে সুরু করে সেন রাজত্বের পর থেকে। তাহলেও মুসলমানরা এই অঞ্চলে এসে কোনও সামাজিক বিপ্লবের সন্ধান পায় নি। কেন না হিন্দুধর্মকে সংস্কার করার নামে বল্লাল সেন ইতিপূর্বেই একটি ধর্মীয় বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিলেন দেশে এবং মিথিলা, কান্যকুব্জ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি কতকগুলি উচ্চবর্ণের হিন্দুদের এই অঞ্চলে আনিয়ে পুরাতন ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুজ্জীবন ঘটানোর চেষ্টা করেছিলেন। পরবর্তীকালে যে সব মুসলমান এই অঞ্চলে আসে তারা ইসলাম ধর্মের প্রচারের প্রতি দৃষ্টি দেয় নি কিংবা ধর্মীয় উত্থান ঘটানোর চেষ্টা করে নি। মুসলমানরা এসেছিল আধিপত্য ও ক্ষমতা বিস্তারের জন্য এবং মধ্যযুগে তারা তা সার্থকভাবেই করতে পেরেছিল বলে ঐতিহাসিকরা স্বীকার করে গিয়েছেন।

এদিকে ভারতবর্ষের উত্তরখণ্ডে তখন বারংবার বহিঃশত্রুর আগমন ঘটছে এবং বহিরাগতরা ভারতের উত্তরপ্রান্তে কোন কোনও অঞ্চলে প্রবেশ করে ভারতীয় স্থাপত্যগুলি নির্বিচারে ধ্বংসসাধন করে যাচ্ছে। গৌড়ে নবাগত মুসলমান সম্প্রদায়—উত্তরভারত সম্পর্কে আর কোনরূপ নিশ্চয়তা বোধ করতে না পেরে—পাল ও সেন আমলের কীর্তিসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ ও মুসলমান স্থাপত্য সৃষ্টিতে মনঃসংযোগ করল। কয়েক শতাব্দীর মধ্যে এমনি-ভাবেই গড়ে উঠল ইসলাম সংস্কৃতির কতকগুলি উৎকৃষ্ট নিদর্শন—আদিনা মসজিদ, চামকাটি মসজিদ, বড়সোনা মসজিদ, ছোটসোনা মসজিদ ইত্যাদি ইসলাম ধর্ম ও শাসনের মধ্যবর্তীকালেই মালদহ জেলা হিন্দু সংস্কৃত ও হিন্দু ধর্মচর্চারও একটি উল্লেখযোগ্য পীঠভূমি হয়ে ওঠে। কথিত আছে—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর মতবাদ ও দর্শন প্রচারের জন্য কয়েকবার এই জেলাতে আগমন করেন এবং মালদহের কয়েকটি 'শ্রীপাট' এখনও পর্যন্ত মহাপ্রভুর লীলাক্ষেত্রের নিদর্শন হিসাবে বর্তমান। এ ছাড়াও হলায়ুধ মিশ্র, রূপ, সনাতন, চক্রপাণি দত্ত, শ্রীজীব গোস্বামী, রঘুনন্দন, বীতশোক, রামাই পণ্ডিত গোলাম হোসেন প্রভৃতি জ্ঞানীগুণীর সমাবেশে এই জেলার প্রাচীন শিল্প, ললিত-কলা, ভাস্কর্য বিশেষভাবে পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে। পাল বংশের আমলে রাম পালের সমসাময়িক রাজকবি সন্ধ্যাকর নন্দী প্রণীত রামচরিত থেকে সুরু করে সেখ শুভদয়া প্রভৃতি অমূল্য রচনাবলীর মধ্যে, রামাই পণ্ডিতের গ্রন্থ প্রভৃতিতে এই জেলার যে প্রাচীন চিত্র পাওয়া যায়—তার মধ্যে এই জেলার সামগ্রিক রূপ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। অবশ্য কালের নিয়মে বহু পুরাকীর্তি ধ্বংস হয়ে গেছে, অনাদরে ও অবহেলায়—অনেক ইতিহাস এবং তার তথ্য অবলুপ্ত—তবুও—প্রায় ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে এই জেলার মধ্যভাগে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে—তা কালজয়ী।

তাহলে দেখা যাচ্ছে—পালবংশের সময়ে উত্তরভারত থেকে, সেন আমলে মিথিলা কান্যকুব্জ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে এবং সুহ্ম অঞ্চল (রাঢ় অঞ্চল?) থেকে এবং মুসলমান আমলে যে সব বহিরাগতরা এসে স্থায়ি-ভাবে বসবাস সুরু করে—তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা ও চিন্তাধারার মধ্যে কোনও যোগসূত্রই ছিল না। এখনও পর্যন্ত মৈথিলী সম্প্রদায় ব্যবহারিকভাবে বাংলা-ভাষার ব্যবহার করলেও—গৃহে বা অন্তরঙ্গ জনের সঙ্গে একধরণের হিন্দী বা উত্তর-ভারতীয় ভাষা ব্যবহার করেন। মালদহের নিজস্ব ভাষা বাংলাই এবং প্রাচীনকাল থেকে তা মালদহের অনগ্রসর শ্রেণীদের ভিতর থেকে বর্তমানে শিক্ষিত ও সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিস্তৃত হয়েছে। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের ভিতর থেকে এক সাধারণ সূত্রের সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা গড়ে ওঠে বলে—অনেকে অনুমান করেন। সম্ভবত নদী-মাতৃক, শস্যশ্যামলা বাংলাদেশের আবহাওয়া

এবং জীবিকা ও জীবনধারণ পদ্ধতি এই মিলনের সূত্র। বারো মাসে তের পার্বণ—যা বাংলাদেশের নিজস্ব সংস্কৃতির একটি অপরিহার্য রূপরেখা—তা ক্রমশ সকল সম্প্রদায়ই নির্বিচারে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। আর এইভাবেই, মনসাপূজা, পৌষপার্বণ নবান্ন উৎসব প্রভৃতির প্রচলন হয়। মালদহের উৎসব, অনুষ্ঠান, আচার-আচরণ প্রভৃতির মধ্যে নাচ, ও গানের প্রাবল্য অন্যান্য অঞ্চল থেকে কিছু কম নয়। মালদহের লোকসংস্কৃতির মাঝে, ঘুম পাড়ানী গান, পৌষপার্বণের ছড়া, বিবাহের গান, বৃষ্টি নামানো গান, নতুন ফসলের গানগুলির বৈশিষ্ট্য হল এই যে—এগুলি সাধারণত গায়কী—গানের মধ্যেই অনুষ্ঠানের প্রকাশভঙ্গী।

লৌকিক অনুষ্ঠানের মধ্যে ব্রত-উদ্‌যাপন, মঙ্গলচণ্ডী, সন্ধ্যা পূজা প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে।

এই ধরণের ব্রতগুলির কয়েকটির পরিচয় দেওয়া গেল। 'ভাজো' হলেন ফসলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ভাদ্র মাসে দশদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই ব্রতের উদ্‌যাপন। দশম দিবসে 'ভুট্টা' গাছের সঙ্গে 'কলাই'-এর বিবাহ অনুষ্ঠান। পূর্বেই বলা হয়েছে—মালদহের আদি অনগ্রসর অধিবাসীদের মধ্যেই লৌকিক অনুষ্ঠানগুলি বেশিরভাগ প্রচলিত। মালো, ভুঁইহার প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে 'ভাজো' উৎসব অধিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ফসলের বিবাহের (ভুট্টা পাত্র এবং কলাই কন্যা) রাতে মেয়েরা গান করে—

—ভাউজ দিদিয়ট, ডুলিত্
আইলাম তাড়াতাড়ি
কাঁঠালের পাত চিকন চিকন,
মাথাত্ লম্বা টেড়ি
বৈশাখ মাসে দেখতে যেমন
জলছত্রের হাঁড়ি
পুত্রু দিদিটে—ডুলিত্
আইলাম তাড়াতাড়ি।
—ইত্যাদি।

এছাড়াও মেয়েদের আরও বহুপ্রকারের ব্রতানুষ্ঠান আছে। আর এই ব্রতানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে সাধারণত দৈনন্দিন ও সামগ্রিক সমাজ-জীবনের প্রয়োজন অনুযায়ী। এমনি করেই বয়াই, নাইকোরী পাইকোরী প্রভৃতি অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

মুসলমানদের মধ্যে একমাত্র শরিয়ৎ সম্মত ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়া আঞ্চলিক কোনও অনুষ্ঠানের সন্ধান পাওয়া যায় না। তবুও সংস্কারবশতই হোক্ কিংবা কল্যাণ কামনা কিংবা দেবতার তুষ্টির জন্যই হোক—মনসাপূজা ও ফসলের দেবতার তুষ্টিবিধানের সময়ে মুসলমানরা অনেকেই নিজ ব্যয়ে পূজা উপকরণ কিনে দেন—এটা মালদহের কোন কোনও অঞ্চলে দেখা যায়। অবশ্য হিন্দুদের মধ্যেও—বিশেষ করে হিন্দু মাঝি ও জেলেদের মধ্যে নদীর উন্মত্ততা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সত্য-পীরের সিন্নি মানত করে।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে মুসলমানদের মধ্যে লৌকিক অনুষ্ঠানের ব্যাপার খুবই কম—যা সামান্য সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, তাও আঞ্চলিক বা সমাজজীবনের প্রভাবের ফলে। তবে মুসলমানদের মধ্যে 'আলকাপ্' নামে একধরণের সঙ্গীত অনুষ্ঠানের খবর পাওয়া যায়—যার মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মমত, আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতির নির্বিচার বর্ণনা থাকে। মালদহের প্রায় সমস্ত অঞ্চলেই 'আলকাপ্' গান সর্বসাধারণের মধ্যেই খুব প্রিয়। ছোট-খাটো সমসাময়িক ঘটনা, নানাতর রঙ্গ-ব্যঙ্গ ও কৌতুক এবং উপদেশাবলী দিয়ে আলকাপ গান মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে রচিত হয়ে থাকে। যদিও মুসলমানরাই এর রচয়িতা—তবুও আসরবন্দনা ও গানের ভিতরকার প্রয়োজনীয় অংশে হিন্দু দেব-দেবীর সাক্ষাৎ প্রায়শ ঘটে। এমনি একটি বন্দনা গানের মুখবন্ধ এই রকম—

—ওমা ভবেশ্বরী, তুমি মা ঈশ্বরী
দিয়ে চরণতরী ভবে করো পার,
এসো মা আসরে, ডাকি মা কাতরে
এ ভব সাগরে নাই পারাপার!

আবার এই 'আলকাপেরই' বৈঠকী গানগুলি যখন সাধারণ মুসলমান কথাকাররা রচনা করেন, তখন মনে হয় সেই রচনা ও প্রকাশভঙ্গী লক্ষ্য করে আধুনিক গান রচয়িতারা লজ্জা পেতে পারেন, যেমন—

এ মধু রাত—এ মায়া রাত
শুধু তোমার আমার
মায়াবী চাঁদের সনে—চামেলী জাগিছে বনে
ফাগুনে খুলিয়াছিল প্রাণের দুয়ার
(শ্রীতারাপদ লাহিড়ীর সৌজন্যে)

এর পরেই উল্লেখ করতে হয় মালদহের তথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখযোগ্য সংস্কৃতি গম্ভীরা। যদিও গম্ভীরা গানকে সমসাময়িককালে বৈঠকী এবং ফ্যাশন-দুরস্ত গানের রূপ দেওয়া হয়েছে—তথাপি গম্ভীরাও লৌকিক অনুষ্ঠানের অনুষঙ্গ মাত্র। চৈত্র উৎসব বা গাজনের সময়ে গম্ভীরা গান গীত হয়ে থাকে—এবং তাও পূজার আচারবিধি অনুযায়ী। কোন সুপ্রাচীন কাল থেকে গম্ভীরা গান চৈত্র উৎসবের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি-ভাবে যুক্ত হয়েছে, তার কোনও ইতিহাস আজও পর্যন্ত পাওয়া

পাল রাজাদের প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ—শিবালয়

আলোকচিত্র : পূর্ণেন্দু পালচৌধুরী

শ্রীপাট রামকেলী : এইখানে মহাপ্রভু ও রূপ-সনাতনের সাক্ষাৎ হয়

আলোকচিত্র : পূর্ণেন্দু পালচৌধুরী

যায় নি। মালদহ ছাড়াও রাঢ় ও পূর্ব-বঙ্গে গাজনের উৎসবে যে নৃত্য ও গীতের প্রচলন আছে—তার সঙ্গে গম্ভীরার কোনও সাদৃশ্য নেই। রাঢ় ও পূর্ববঙ্গের গান ও নৃত্যের মধ্যে কালানুক্রমিকতা নেই। কিন্তু গম্ভীরার মধ্যে রয়েছে। আর এই প্রসঙ্গেই অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার গম্ভীরা প্রসঙ্গে বলেছেন. "ভারতচন্দ্র, চণ্ডীদাস, জয়দেবের রচনা-কৌশল, বাক্য-বিন্যাস, ভাবুকতা এখনও গম্ভীরার গীতকর্তাদের মধ্যে অনেক সময় লক্ষিত হয়।" এর থেকেই প্রমাণ হয়—যে, মধ্য-যুগের বাংলাদেশে যখন একদা বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্যের প্রাবল্য লক্ষ্য করা গেছে এবং মধ্যযুগীয় বঙ্গসংস্কৃতির অন্যতম ধারক পদাবলীর মাধ্যমে বাঙালীর ভাবময় মানসিকতা ভগবল্লীলার বর্ণনা প্রসঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে. তেমনি তার থেকেও প্রাচীনকালে কোনও এক সময়ে হয়তো শৈবধর্মমত এবং সেই সময়ের বিচিত্র মানসিকতা গম্ভীরার মাধ্যমে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। অন্তত বঙ্গ-সংস্কৃতির অনুশীলনরত চিন্তাশীল মনীষীগণ এই-রূপ অভিমত ব্যক্ত করেন। বর্তমান সময়ে অবশ্য মালদহের গম্ভীরা আঞ্চলিকতার আবিলতায় আচ্ছন্ন—বাক্যবিন্যাস ও রচনা-কৌশলে শৈথিল্য দেখা দিয়েছে—কিন্তু গম্ভীরার প্রাণবস্তু আজও পর্যন্ত বাংলার লোকগীতিগুলির সমস্ত ধারার মধ্যেই প্রাচীন ও চিত্তবিমোহন।

'গম্ভীর' শব্দের দুই প্রকার অর্থ প্রচলিত রয়েছে। অনেকেব মতে শিব—আবার অনেকে নির্জন দেবগৃহ বা মন্দিরকেই গম্ভীর বা গম্ভীরা বলে। গোবিন্দদাসের রচনার মধ্যে অন্তত এই দুই প্রকারের অর্থের সন্ধানই পাওয়া যায়। 'দুই হাতে বান্ধি রাণী থুইল গম্ভীরে', কিংবা 'গম্ভীরে বসিয়া যোগী ধ্যানেতে জানিল' প্রভৃতি শব্দ-গঠনভঙ্গীর মধ্যে দ্ব্যর্থবোধক ভাবেরই প্রাবল্য।

কোন এক সময়ে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সোসাইটি গম্ভীরা গানের উৎপত্তির সূত্র অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছিলেন। ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়—তাঁর গৌড় রাজমালা ও গৌড় লেখমালা গ্রন্থের কয়েক জায়গায় এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। স্বর্গীয় মৈত্রেয় মহাশয়ের মতে পাল রাজত্ব কালেই বরেন্দ্রভূমির সংস্কৃতি ও ধর্মমতের উপর বৌদ্ধ প্রভাব অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছিল। একাদশ শতাব্দীতে গৌড়বঙ্গে বৌদ্ধ ও তন্ত্রসাধনার বিশেষ প্রসারলাভ হয়। এই সময় থেকেই মালদহের রামাই পণ্ডিত রচিত শূন্য পুরাণ ও ধর্মপূজা পদ্ধতি এবং বৌদ্ধ, জৈন, ও হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে এক বিচিত্রধরণের জটিলতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। বস্তুত রামাই পণ্ডিতের শূন্যবাদের প্রাবল্যেই গম্ভীরা বা শিব নিরাকার শক্তিরূপ থেকে সাকারত্ব প্রাপ্ত হন এবং গাজনের উৎসবে এবং অন্যান্য লৌকিক অনুষ্ঠানের মধ্যে অর্চিত হতে থাকে। আবার অনেকে বলেন—লামা তারানাথ তাঁর দিনপঞ্জীর মধ্যে গম্ভীরা বা কৈলাসে ধ্যাননিরত মহাদেবের নিশ্চল প্রতিমূর্তির কল্পনা অনুযায়ী গম্ভীরার হদিস প্রদান করেন। এই বিতর্কের কোনটি গ্রহণযোগ্য তা অনুশীলনকারীরাই বলতে পারেন—তবে মালদহের সাধারণ মানুষ আজও বিশ্বাস করে গম্ভীরা হলেন—মহাকাল এবং তাঁরই পূজাবিধি ও অনুষ্ঠানের মধ্যে গৌড়বঙ্গের জনসাধারণের জীবনবেদ সুপ্রাচীন কাল থেকে আবর্তিত হয়ে আসছে।

চৈত্রসংক্রান্তির দিন থেকে গম্ভীরা উৎসবের সুরু। প্রথম দিনে অধিবাস। এইদিন শুধুমাত্র ঘটস্থাপন করে পূজার আরম্ভ এবং চারদিনব্যাপী গম্ভীরা উৎসব চলে। দ্বিতীয় দিনে 'ছোটরঙ' গান অর্থাৎ ভক্তগণ বেতের ছড়ি হাতে কিংবা ত্রিশূল হাতে বন্দনাদি গান ও নাচের অনুষ্ঠান করে। তৃতীয় দিনে 'বড়রঙ' অর্থাৎ নানা-প্রকার শারীরিক কৌশলের দ্বারা বাণফোঁড়া, কাঁটাসমেত খেজুর গাছে উঠে খেজুরভাঙা কিংবা শ্মশান জাগা প্রভৃতি অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। চতুর্থ দিনে 'বালা' বা বোলাই গানের আসর তৎসহ নাচ। শিব-পার্বতীর বিবাহ কিংবা পার্বতীর শাঁখা পরিধান প্রভৃতি নানাতর বিষয় নিয়ে পালা গান সুরু হয়। এই গানের একাদি-ক্রমে কয়েকদিন ধরেও চলতে বাধা নেই। এবং শিব-পার্বতীর প্রসঙ্গ থেকে মালদহের 'পলু চাষ' কিংবা কুয়াশার প্রাবল্যে আমের ফলন না হওয়ার জন্য মালদহের জন-সাধারণের দুঃখের বর্ণনাতেও গানের বিষয়বস্তু বিস্তৃতি লাভ করে। এর মধ্যে ব্যক্তিগত কুৎসা-কাহিনী—কিংবা গোপন প্রেমের কাহিনীর সাড়ম্বর বর্ণনাও থাকতে পারে। কৌতুকের বিষয় বালা বা বোলাই গানের এই অংশ—যার মধ্যে সমসাময়িক ঘটনা ও বিষয়ের আধিক্য থাকে—তাকে বলা হয় 'এ্যানুয়াল রিপোর্ট'।

জাতীয় জীবনেও গম্ভীরার অবদান কিছু কম নয়। বিগত স্বদেশী আন্দো-লনের যুগে দেশের মধ্যে জাতীয়তাবোধ প্রচারে গম্ভীরা ছিল অন্যতম মাধ্যম। মালদহের কিছু উৎসাহী সংস্কৃতিসেবী গম্ভীরাকে আধুনিকীকরণের ভার নিয়ে ছিলেন এবং প্রধানত তাঁদেরই উদ্যোগে গম্ভীরা পরিষদ সৃষ্টি হয়েছে। সাম্প্রতিক-কালে গম্ভীরার বেতার রূপারোপ করা হয়েছে—সর্বজনীন ক্ষেত্রে গম্ভীরাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

রঙ্গমঞ্চে ওদেশে এবং এদেশে

শিলালি

আমেরিকা থেকে ফেরবার পর শিশিরকুমার হাওড়াতে কয়েক রাত্রি অভিনয় করেন—তারপর রঙমহলের মঞ্চে বিষ্ণুপ্রিয়া মঞ্চস্থ করেন। শিশিরকুমার নিমাই, প্রভা বিষ্ণুপ্রিয়া এবং কঙ্কাবতী শচীমাতার ভূমিকায় অভিনয় করেন। প্রযোজনায় শিশিরকুমার এবং আলোক-সম্পাতে সতু সেন যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। এরপর শিশিরবাবু দল নিয়ে রঙমহল থেকে চলে যান এবং নাট্যনিকেতনের দলের সংগে মিলিত হয়ে কয়েকটি অভিনয় করেন—এখানে "মহাপ্রস্থানে" নাটকে তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

১৯৩৩ সালের শেষদিকে স্টার থিয়েটারে শিশিরকুমার তাঁর নাট্যমন্দিরের হয়ে ২৯শে জানুয়ারী ১৯৩৪ অভি-মানিনী নাটকটি অভিনয় করেন। কয়েক সপ্তাহ পরে শ্রীনরেন্দ্র দেবকে দিবে রূপ-কথার ধাঁচে শিশুনাট্য 'ফুলের আয়না' লিখিয়ে নিয়ে অভিনয় করালেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এদেশে শিশিরকুমারই প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়ে শিশুনাট্যের অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। এদিকে তখন পূর্ণোদ্যমে শিশিরকুমারের বিরুদ্ধ-বাদীরা তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালিয়ে-ছেন—ইয়াংকি মহলের ব্যাপারটার একটা বিকৃত কাহিনী খাড়া করে নিয়ে শিশিরবাবুর শত্রুর দল চাইছিলেন তাঁকে পাবলিক স্টেজ থেকে আউট করে দিতে। কিন্তু আগুনকে কি ছাই চাপা দিয়ে রাখা যায়? ১৯৩৪ সালের এপ্রিলে স্টার রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমার তাঁর নূতন প্রতি-ষ্ঠান খুলে নাম দিলেন 'নব নাট্যমন্দির'। শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ বৌ' খোলা হোল ১৯৩৪ সালের ২৮শে জুলাই। কাস্ট ছিল এই রকম ঃ

নীলাম্বর—শিশিরকুমার
পীতাম্বর—অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়
বিরাজ—কঙ্কাবতী
মোহিনী—রাণীবালা
রাজেন—শৈলেন চৌধুরী

অদ্ভুত সংযমপূর্ণ অভিনয় করে-ছিলেন নীলাম্বররূপী শিশিরকুমার। কঙ্কাবতীর বিরাজ চরিত্র রূপায়ণও নিখুঁৎ হয়েছিল। ইংরাজীতে একটা কথা আছে The greatness of art lies in concealing art—এ কথার যথার্থতাই যেন প্রমাণ করে দিয়েছিলেন নাট্যাচার্য তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে। অভি-নয় করছেন বোঝাই যাচ্ছিল না—অথচ সত্যিকার শিল্পরসিক উপলব্ধি করতে পারছিল অভিনয়কলার কতোটা পার-দর্শিতা ছিল এ অভিনয়ের পেছনে।

শিশিরকুমার এবং কঙ্কাবতীর অভি-নয়ে এ নাটকের পেথোস যে কতটা রসঘন হয়ে উঠেছিল তা ঠিক বলে বোঝানো যায় না। শোনা যায় 'বিরাজ বৌয়ের' নাট্যরূপায়ণের সময় শরৎচন্দ্র এবং শিশিরকুমারের এই ধরণের কথা কাটাকাটি হয়েছিল—শরৎচন্দ্র নাকি বলে-ছিলেন ঃ আমার বই লোকে এত ভাল-বাসে যে কুকুরের গলাতে বেঁধে রাস্তায় ছেড়ে দিলেও লোকে তার গলা থেকে নিয়ে পড়বে এবং শিশিরকুমার মন্তব্য করেছিলেন—আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে অ-আ-ক-খ আবৃত্তি করলেও সবাই আমার আবৃত্তি শুনতে আসবে। দু-জনের কথাই সত্যি—আজকের নব-নাট্যাচার্য শিশিরকুমারকে যতই ফিউড্যালী যুগের এবং শরৎচন্দ্রকে স্টার নভেলিস্ট বলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করুন না কেন, এই দুই বিরাট প্রতিভার মিলন হয়েছিল 'বিরাজ বৌ' নাটকে এবং তার অদ্ভুত ফলাফল দর্শকেরা দেখতে পেয়েছিলেন ঐ নাটকের মঞ্চরূপায়ণে।

১৯৩৪ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর 'সরমা' মঞ্চস্থ হয়। সরমার ভূমিকালিপি ছিল ঃ

রাবণ—শিশিরকুমার
রামচন্দ্র—বিশ্বনাথ ভাদুড়ী
লক্ষ্মণ—সত্যেন গোস্বামী
তরণী সেন—মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়
বিভীষণ—শৈলেন চৌধুরী
মন্দোদরী—কঙ্কাবতী
সীতা—প্রভা
সরমা—রাণীবালা

অভিনয় সর্বাংগসুন্দর হলেও এ-ধরণের নিম্নশ্রেণীর নাটককে শিশিরবাবু জনপ্রিয় করে তুলতে পারেন নি। নাটকটিতে পাত্র-পাত্রীর সাইকলজি বোঝাবার চেষ্টা আছে বটে—কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তাছাড়া শিশিরকুমারকে 'রামরূপেই দর্শক ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল—ভাল অভিনয় হলেও কেউ তাঁকে রাবণরূপে অন্তর থেকে গ্রহণ করতে পারে নি। তাছাড়া ঐ সময়ের বাংলার রঙ্গমঞ্চে ঠিক নতুন মাইথলজিক্যাল নাটক দর্শকেরা ঠিক মন থেকে নিতে পারছিল না।

আলমগীর—শিশিরকুমার

বক্তিয়ার—শিশিরকুমার

২২শে ডিসেম্বর ‘বিজয়া’র শুভ উদ্বোধন হল। আমরা তখন বি-এ ক্লাশের ছাত্র—এখনও মনে আছে কি সেনসেশন ক্রিয়েট করেছিল ‘বিজয়া’ নাটক সে সময় সুধীসমাজে এবং ছাত্রমহলে। আমরা কয়েক বন্ধু পরপর কয়েক রাত্রি ‘বিজয়া’ দেখতে গিয়েছিলাম—অভিনয়ের কিছু আগে থেকেই দেখা যেত থিয়েটারের সমানে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে গাড়ির লাইন। এই সময়েই আমার শিশির-কুমারের সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়। অদ্ভুত পরিস্থিতিতে সেই অদ্ভুত আলাপের বিবরণ দিচ্ছি :

একদিন সকালে বিদ্যাসাগর কলেজে গিয়েছি এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে—দুজনে কলেজের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছি, এমন সময় একটি প্রাইভেট কার এসে থামল—গাড়ি থেকে নামলেন শিশিরকুমার। এর আগে এত সামনা-সামনি ভাদুড়ী মহাশয়কে কখনও দেখি নি—চমকে উঠলাম। গায়ে ছিল একটি গরম পাঞ্জাবী—একটু টিপসি অবস্থা—কিন্তু কথাবার্তা বা চাল-চলনে এতটুকু জড়তা ছিল না। আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম—আমাকে একটা অটোগ্রাফ দেবেন? উত্তরে বললেন—অটোগ্রাফ নিয়ে কি হয়? ইতিমধ্যে ছেলেরা এসে ভিড় করল এবং অফিসের বড়বাবু হরিবাবুও এসে গেলেন। এই কলেজেই শিশিরবাবু একনাগাড়ে আট বছর ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করেছেন—হঠাৎ কি খেয়াল হয়েছে ছাত্রদের দেখতে এসেছেন। হরি-বাবুর ইচ্ছা শিশিরকুমারকে ভেতরে নিয়ে যান—নাট্যাচার্য কিন্তু ছাত্রদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই গল্প করতে লাগলেন—ভেতরে গেলেন না। তারপর গাড়িতে ওঠবার আগে মন্তব্য করলেন—কে ভাই অটোগ্রাফ চেয়েছিলে! কোথায় গেলে! বাতাসে মিলিয়ে গেলে নাকি! তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে একটি বাঁধানো খাতা খুলে ধরলাম। আমার কাছে তখন আমার আসল অটোগ্রাফের খাতাটা ছিল না। আমাকে নাট্যাচার্য জিজ্ঞেস করলেন—ব্রাউনিং পড়েছ ভাই? বললাম—সাধারণভাবে পড়েছি। তাতে বললেন— ভাল করে ব্রাউনিং পড়ো—Men & Women—তারপর আমার খাতায় গোটা গোটা অক্ষরে লিখলেন :

“জীবন আমার স্বপনতরী
ভেসে চলেছি
কোথায় তোমায় মিলব প্রিয়
নাহি জেনেছি।”

চলে যাবার আগে বললেন—একদিন আমার থিয়েটারে এসে দেখা করো, তখন ঠিক করে লিখে দেব—বলেই গাড়িতে গিয়ে উঠলেন।

ঐ অবস্থায় যে ঐভাবে কেউ অমন সুন্দর দুটি লাইন লিখতে পারেন এ আমি কল্পনাও করতে পারতাম না নিজের চোখে না দেখলে।

এর কয়েকদিন পরে স্টার থিয়েটারে গিয়ে শিশিরবাবুর সঙ্গে দেখা করে লাইন দুটি আমার আসল অটোগ্রাফের খাতায় তুলে দিতে অনুরোধ করি। লেখাটি নিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন শিশির-কুমার—তারপর বললেন যে, দ্বিতীয় লাইনটি উইক এবং প্রথম লাইনটিই আমার অটোগ্রাফ খাতায় তুলে দিলেন। আমার এই অটোগ্রাফের খাতাটি আমার এক আত্মীয় কয়েকদিনের জন্য দেখতে নিয়ে যান—সেটি তাঁর কাছ থেকে চুরি হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র থেকে শুরু করে বহু রাজনীতিক নেতা, বহু সাহিত্যিক, শিল্পী প্রভৃতির লেখা এতে ছিল—কবিগুরু নিম্নোক্ত লাইন ক'টি লিখে দিয়েছিলেন :

“অটোগ্রাফের খাতাখানা খুলে
লিখতে তুমি আমায় কহ যে
সহজ কথা গিয়েছ যে ভুলে
যায় না লেখা এতই সহজে।”

বিজয়ার চরিত্রলিপি ছিল—

রাসবিহারী—শিশিরকুমার
নরেন—বিশ্বনাথ ভাদুড়ী
বিলাস—শৈলেন চৌধুরী
পরেশ—পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়

মাইকেল—শিশিরকুমার

দয়াল—শীতল পাল
বিজয়া—শ্রীমতী কঙ্কাবতী
নলিনী—রাণীবালা

অভিনয়ে কাকে ছেড়ে কার কথা বলবো! রাসবিহারী হিসাবে শিশিরকুমার অদ্ভুতভাবে নিজেকে প্রজেক্ট করতেন দর্শকদের মাঝে এর ফলে অভিনেতা এবং দর্শকদের ভেতর যে একটা পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদান হতো তার তুলনা হয় না। অর্থাৎ শিশিরকুমার নিজের চিন্তাধারাকে ইনস্যুলেটেড করে রাখতেন না—তাকে দর্শকদের মনে সঞ্চালিত করতেন। অভিনয়ের সময় তাঁর ভাব, অনুভূতি ইত্যাদি ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ওয়েভেসের মত ট্রান্সমিটেড হয়ে যেত দর্শকদের ভেতর। অভিনয়ের সময় এই ধরণের ভাব এবং অনুভূতির প্রক্ষেপণ করবার ক্ষমতা আমাদের দেশে এক শিশিরকুমারের ভেতরই ছিল। স্যার হেনরী আরভিংও নাকি এই ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। এই প্রক্ষেপণ করবার ক্ষমতা শিশিরকুমার বিশেষভাবে দেখিয়েছেন রাম, আলমগীর, জীবানন্দ, চাণক্য, সাজাহান, কর্ণ (নর-নারায়ণ), রাসবিহারী, নরেন, রমেশ (রমা) প্রভৃতি ভূমিকার অভিনয়ের সময়। অভিনয়শিল্পের চরম মার্গে উঠতে না পারলে এ ক্ষমতা আসে না। বিশ্বনাথবাবু একবার এই স্তরে উঠতে পেরেছিলেন—শরৎচন্দ্রের বিপ্রদাসে যখন তিনি নামভূমিকায় অভিনয় করেন। বিজয়ার নরেন চরিত্রটিও অত্যন্ত সু-অভিনীত হয়েছিল। নরেনের আত্মভোলা উদার ভাবটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছিল বিশ্বনাথ ভাদুড়ীর অভিনয়ে। শৈলেন চৌধুরী বিলাসকে একটি প্রাণবন্ত চরিত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন অভিনয়গুণে। কঙ্কাবতী বিজয়া

চাণক্য—শিশিরকুমার

চরিত্রের প্রত্যেকটি দিককে সুপরিস্ফুট করতে সমর্থ হয়েছিলেন। নলিনী হয়েছিল চলনসই—তাও সম্ভব হয়েছিল নাট্যাচার্যের অপূর্ব শিক্ষাগুণে—কারণ নলিনী চরিত্রে অভিনয় করবার মত মেণ্টাল মেক-আপ রাণীবালার ছিল না। পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় তখন বালক—এই নবাগত অভিনেতাটিকে দিয়ে শিশিরবাবু যেভাবে পরেশের পার্ট করিয়েছিলেন তার তুলনা হয় না। শিশিরকুমারের শিক্ষাকৌশলে পরেশের চোখে, মুখে, কথায়, বার্তায় যে একটা অদ্ভুত সারল্য ও ছেলেমানুষীর ভাব ফুটে উঠেছিল তা যাঁরা সে পার্ট না দেখেছেন তাঁদের ঠিক বুঝিয়ে বলা যাবে না।

কয়েকদিনের জন্য নবনাট্য মন্দিরে বিজয়াতে রাসবিহারী সেজেছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেন শিশিরবাবু এবং বিলাস ভূমেন রায়। বয়সের দিক দিয়ে না মানালেও শিশিরকুমার মাধুর্যের দিকটা আরও সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। ভূমেন রায়ের বিলাসও ভাল হয়েছিল। অহীন্দ্র চৌধুরীর রাসবিহারী হয়েছিল ক্রাউনিশ। শীতল পালের দয়াল সম্বন্ধে শিশিরকুমার বিশেষ উচ্চধারণা পোষণ করতেন। কিন্তু এই ভদ্রলোকের অভিনয়ে আমি যেন বরাবরই একটা পলিশের অভাব লক্ষ্য করেছি।

শ্রীরঙ্গমের যুগে বিজয়া রিভাইভ করা হয়েছিল ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, সরযূবালা প্রভৃতিকে নিয়ে। ছবি বিশ্বাসের অভিনয়ে নরেন চরিত্রের ভেতরকার রোবাস্ট পার্সন্যালিটির দিকটা ফুটে ওঠে নি। জহর গাঙ্গুলী এবং সরযূবালা এ-নাটকে সম্পূর্ণ মিসফিট হয়েছিলেন। দয়াল চরিত্রকে সুন্দরভাবে রূপায়িত করেছিলেন মনোরঞ্জনবাবু।

বিজয়া নরেনকে ভালবাসে—তবু সে বিলাসকে প্রত্যাখ্যান করতে পারছে না—কিন্তু কেন? এর কারণ রাসবিহারীর এমন একটা ব্যক্তিত্ব আছে যাকে সে সহজে অগ্রাহ্য করতে পারছে না। রাসবিহারী চরিত্রের এই বিরাট ব্যক্তিত্বের দিকটা সর্বক্ষণ দর্শকরা উপলব্ধি করতেন শিশিরকুমারের অভিনয়ের ভেতর দিয়ে। অদ্ভুত চোখের কাজও তিনি দেখিয়েছিলেন এই ভূমিকায়। রাসবিহারী শঠ এবং ধূর্ত, কিন্তু সে ইয়াগোর মত ব্যক্তিত্বহীন ছিলেন না—তাকে ভালভাবে বুঝেও তার কথাকে ঠিক উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই ভাবটাই প্রতিভাত হয়েছিল শিশিরকুমারের অভিনয়ে।

জীবানন্দ—শিশিরকুমার

এর পরের বছর মঞ্চস্থ হয় শচীন সেনগুপ্ত লিখিত দশের দাবী। অতি নিম্নস্তরের নাটক—অনেক সময় খারাপ নাটকে অভিনয় করবার স্কোপ থাকে, এ নাটকে কিন্তু তাও ছিল না। সাধারণত অন্য একটি বড় নাটকের সঙ্গে এটিকে জুড়ে দেওয়া হতো। দশের দাবীর পর সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের রচিত শ্যামা নাটকের অভিনয় হল—অভিনয় ভাল হলেও—নাটকটির সংলাপ এত খারাপ হয়েছিল যেজন্য নাটক চলে নি।

নবনাট্য মন্দিরে আবার বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হল জলধর চট্টোপাধ্যায় রচিত 'রীতিমত নাটকের' মঞ্চাভিনয়ের (১৩৪২-এর ২৫শে অগ্রহায়ণ) সঙ্গে সঙ্গে। এ নাটকটিকে শিশিরবাবু প্রায় ঢেলে সাজিয়েছিলেন—এই জন্যই লেখক হিসাবে জলধরবাবুর সঙ্গে তাঁরও নাম যুক্ত আছে। এ নাটকটি সম্বন্ধে অনেককে অনেক বিরূপ মন্তব্য করতে শুনেছি—শিশিরবাবু অভিনয় না করলে এ নাটক নাকি মঞ্চসাফল্য লাভ করতো না। কথাটা আংশিক সত্য—অর্থাৎ অধ্যাপক দিগম্বর চরিত্রে শিশিরকুমার ছাড়া আর কেউ সাফল্য অর্জন করতে পারতেন না সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। যেমন পি-ডবিউ ডি নাটকে দুর্গাদাসবাবুর মিঃ সেনের রোল—অহীন্দ্র চৌধুরী এ ভূমিকায় হাস্যকরভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন। যাই হোক, অত্যন্ত শক্তিশালী অভিনেতা না হলে জলধরবাবুর উপরিউক্ত নাটক দুটি মঞ্চসাফল্য লাভ করবে না এ কথা খুবই খাঁটি সত্য—কিন্তু বাংলা ভাষায় সাধারণত যে ধরণের নাটক রচিত এবং অভিনীত হয় তার তুলনায় জলধরবাবুর নাটক দুটি—তো আমার উচ্চশ্রেণীর বলেই মনে হয়।

দিগম্বরের ভূমিকায় শিশিরবাবুর অভিনয়ে যে বার্বলিং পারসন্যালিটির (ক্রেগের মতে অভিনেতার শ্রেষ্ঠ গুণ) পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল বাংলা রঙ্গমঞ্চে তা পূর্বে বা পরে কখনও দেখা যায় নি। অধ্যাপক শিশিরকুমারের পাণ্ডিত্য এবং ব্যক্তিত্ব প্রতিক্ষণে মঞ্চ থেকে প্রজেক্টেড হত অডিটোরিয়ামে এই নাটকের অভিনয়ের সময়। শেষ দৃশ্যে হাসিকান্না মেশানো যে ভাবের অভিব্যক্তি শিশিরকুমার দেখিয়েছিলেন তা শুধুমাত্র চার্লি চ্যাপলিনই করেছেন ছায়াছবিতে। সুহৃদ ডাক্তাররূপী বিশ্বনাথবাবুর অভিনয়ও হয়েছিল চমৎকার। ছবিতে যখন এ নাটকটি রূপায়িত হয় তখন অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয় এ চরিত্রের রূপায়ণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন। শুনেছি রাধিকানন্দবাবু কয়েক রাত্রি সুহৃদ ডাক্তারের ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন। কঙ্কাবতীর স্বাগতা এবং শৈলেন চৌধুরীর দিব্যেন্দুও প্রশংসা অর্জন করেছিল। বাড়িওলা নবকৃষ্ণের ভূমিকায় শান্তশীল গোস্বামী অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে চরিত্রটিকে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। রাণীবালার শান্তা হয়েছিল চলনসই। শীতলপালের দীননাথে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না। আর চমৎকার অভিনয় করেছিলেন গণপতি গণের ভূমিকায় পূর্ব যুগের বিখ্যাত অভিনেতা কার্তিকচন্দ্র দে। নাটকটি এত প্রশংসা অর্জন করেছিল যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এ অভিনয় দেখতে এসেছিলেন। সে রাত্রের অভিনয়ের কথা এখনও আমার মনে আছে—'এই করেছ ভাল নিঠুর' কবিতাটি আবৃত্তি করতে গিয়ে শিশিরকুমার হঠাৎ লাইন ভুলে গিয়ে একটু থমকিয়ে যান—তার পরেই সামলে নেবার জন্য একের পর এক রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করলেন—মনে হচ্ছিল কবিকে দর্শকের প্রথম সারিতে দেখে নাট্যাচার্য যেন ইন্সপায়ারড হয়ে সেদিন কবির রচনা রিসাইট করছিলেন।

নবনাট্য মন্দিরে এর পরের নতুন নাটক কবির 'যোগাযোগ'। মধুসূদনের ভূমিকায় শিশিরকুমার যেন নিজের সৃষ্ট জীবানন্দের ভূমিকাকেও ছাপিয়ে উঠেছিলেন। কি অদ্ভুতভাবে যে তিনি নিজের ব্যক্তিত্বকে উৎক্ষিপ্ত করেছিলেন তাঁর চলনে, বলনে এবং চোখের ভাষায় তা ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। কঙ্কাবতীর কুমুও বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছিল—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অভিনয় দেখতে এসে নাটকের এবং বিশেষভাবে কুমুর অভিনয়ের প্রশংসা করে যান। শৈলেন চৌধুরীর বিপ্রদাস রূপায়ণে ব্যক্তিত্বের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল। কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবীন এবং রাণীবালার ছোটবউও প্রশংসনীয় হয়েছিল।

নবনাট্য মন্দিরে এসব নতুন নাটক ছাড়াও বহু পুরানো নাটক, যথা—চন্দ্রগুপ্ত, আলমগীর, ষোড়শী, প্রফুল্ল, দিগ্বিজয়ী প্রভৃতির পুনরভিনয় হয়েছিল। সম্মিলিতভাবে গিরিশচন্দ্রের বলিদানও অভিনীত হয়—বলিদানে সবার অভিনয়কে ছাপিয়ে উঠেছিল রাধিকানন্দর দুলালচাঁদ, শিশিরকুমারের করুণাময় এবং সুশীলাসুন্দরীর করুণাময়ের স্ত্রীর চরিত্রের রূপায়ণ।

পরে কেউ কেউ প্রচেষ্টা করেছেন অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয়কে শিশিরকুমারের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দাঁড় করাতে—এ প্রচেষ্টা যে কতোটা হাস্যকর—অভিনয়-শিল্প সম্বন্ধে যাঁর সামান্য জ্ঞান আছে তিনিই বুঝবেন। বিদ্যা, জ্ঞান, অভিনয়ক্ষমতা, ব্যক্তিত্ব কোনো দিক থেকেই শিশিরকুমারের সামনা-সামনি আসবার ক্ষমতা বাংলার রঙ্গমঞ্চে গিরিশ-অর্ধেন্দুর পর আর কোন অভিনেতার ভেতর দেখা যায় নি। শিশিরকুমারের পরের সারিতে যেসব অভিনেতা স্থান পাবার যোগ্য তাঁরা হলেন রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, তিনকড়ি চক্রবর্তী, নরেশ মিত্র, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। অহীন্দ্র চৌধুরীর মত এ'রা বারবার বিভিন্ন চরিত্রে নিজেদের রিপিট করতেন না—প্রত্যেকটি চরিত্রকে বিভিন্নভাবে ফুটিয়ে তুলতেন।

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গৌহাটী

রঙ্গজগৎ

বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ

বছর শেষ হল। সারা বছরের মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবির কথা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে বাংলার চলচ্চিত্রশিল্পের আরো দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে। প্রমোদকর থেকে হাউস গ্যারাণ্টি ইত্যাদির চাপেও বাংলার প্রযোজকরা দিশাহারা হয়ে উঠেছে। বাংলা দেশে বাংলা ছবি মুক্তির জন্য প্রেক্ষাগৃহ পাওয়া যায় না ইত্যাদি পুরানো সমস্যা। হিন্দী ছবি এতকাল বাংলা ছবিকে ব্যবসার দিক থেকে কোণঠাসা করে তুলেছিল। এ বছর বাংলা ছবির আঙ্গিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে হিন্দী ছবির আঙ্গিক গ্রহণের জন্য বাংলার প্রযোজক ও পরিচালকদের মধ্যে আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। হিন্দী ছবির ছকে বাংলা ছবি নির্মিত হচ্ছে। মিলনান্তক প্লট, নাইট ক্লাবের দৃশ্য, টাইট পোষাকপরা ক্যাবারের নর্তকী, একটা পরিচিত ছকের মধ্যে সমগ্র কাহিনীর সীমাবদ্ধতা এবং সমাজের উচ্চশ্রেণীর মহানুভবতা ইত্যাদি বাংলা ছবিতে এসেছে। বাস্তব সমাজচিত্র থেকে বাংলা ছবি ক্রমে পিছিয়ে আসছে। এই হচ্ছে গড়পড়তা ছবির আঙ্গিক। ব্যতিক্রম যে নেই সে কথা বলা চলে না, তবে তার সংখ্যা বড় কম। এরূপভাবে বাংলা ছবিকে অধঃপাতে নেবার পেছনে কারণ রয়েছে, এক শ্রেণীর কালোবাজারী কালো টাকাকে সাদা করার জন্য ছবি নির্মাণে আসছে। এক শ্রেণীর আদর্শহীন এবং অর্ধশিক্ষিত লোক রাতারাতি পরিচালক হবার চেষ্টা করছে। এই শ্রেণীর প্রযোজক এবং পরিচালকরা হিন্দী ছবির আর্থিক সাফল্য দেখে অন্ধভাবে সেই ছবিগুলিকে অনুসরণ করে সেভাবে ক্যাবারে নাচ, গান, পোষাক ইত্যাদি যোগ করছে। কিন্তু ভুলে যাচ্ছে হিন্দী ছবিতে সর্বভারতীয় বিভিন্ন জাতির মিশ্রিত সংস্কৃতি ও জীবনের দর্শকের কাছে যা সুখকর মনে হবে বাংলার আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতায় তার সুযোগ কোথায়? বাংলা ছবি বাংলার আঞ্চলিক সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি। এখানে নাইট ক্লাব, ক্যাবারে নর্তকীর সঙ্গে যোগ ক'জনার। এই মানসিকতা থেকে বোম্বাইয়ের অভিনেত্রীদের বাংলা ছবিতে হিরোইন করার আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বৈজয়ন্তীমালাকে নাচে-গানে বৃহৎ পটভূমিকায় নায়িকা হিসাবে হিন্দীওয়ালারা যেভাবে ব্যবহার করতে পারে বাংলায় তার সুযোগ সেরকম থাকার কথা নয়। শুধুমাত্র 'তারকার আকর্ষণ সৃষ্টির জন্য এই চেষ্টা করা হচ্ছে। দু-একটা ছবি এভাবে হয়ত ভাল কিছু করতে পারে, কিন্তু পরবর্তী ছবিগুলি এই অনুসরণে মার খাবে।

একদল লোক এতকাল বাংলা ছবির জন্য আন্দোলন করেছিলেন। এখন দেখা যাচ্ছে তারাই অগ্রণী হয়ে হিন্দীর আঙ্গিকে বাংলা ছবি করে—তারপরে তাকে হিন্দীতে নতুন করে গঠন করছেন। যদি মাদ্রাজের মত একই ছবির তেলেগু বা তামিল এবং হিন্দীরূপ একসঙ্গে করা হত তবে সে প্রচেষ্টার একটা অর্থ বোঝা যেত। হিন্দীর আঙ্গিকে যদি বাংলা ছবি নির্মিত হয় তবে দর্শকরা পয়সা খরচ করে এই দুর্বল ছবিগুলি দেখবে কেন? তার চেয়ে হিন্দী ছবি দেখা তাঁরা ভাল বিবেচনা করবেন। এইভাবে বাংলায় হিন্দী ছবির দর্শক বাড়ছে, এবং বাংলা ছবির তথাকথিত বন্ধুরাই বাঙালীকে হিন্দী ছবি দেখতে উৎসাহিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। চলচ্চিত্র সম্পর্কিত পত্র-পত্রিকাগুলি স্বেচ্ছায় এই ব্যাপারে উৎসাহ জোগাচ্ছে। এই উৎসাহ জোগাবার প্রেরণা হয়ত বিজ্ঞাপন, এতে সামগ্রিকভাবে বাংলা ছবির দুর্দিন যে ঘনিয়ে আসছে সেকথা কে চিন্তা করছে।

বাংলা ছবি তার নিজস্বতা বা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের জন্য দর্শনীয় ছিল। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য সারা ভারতে বাংলা

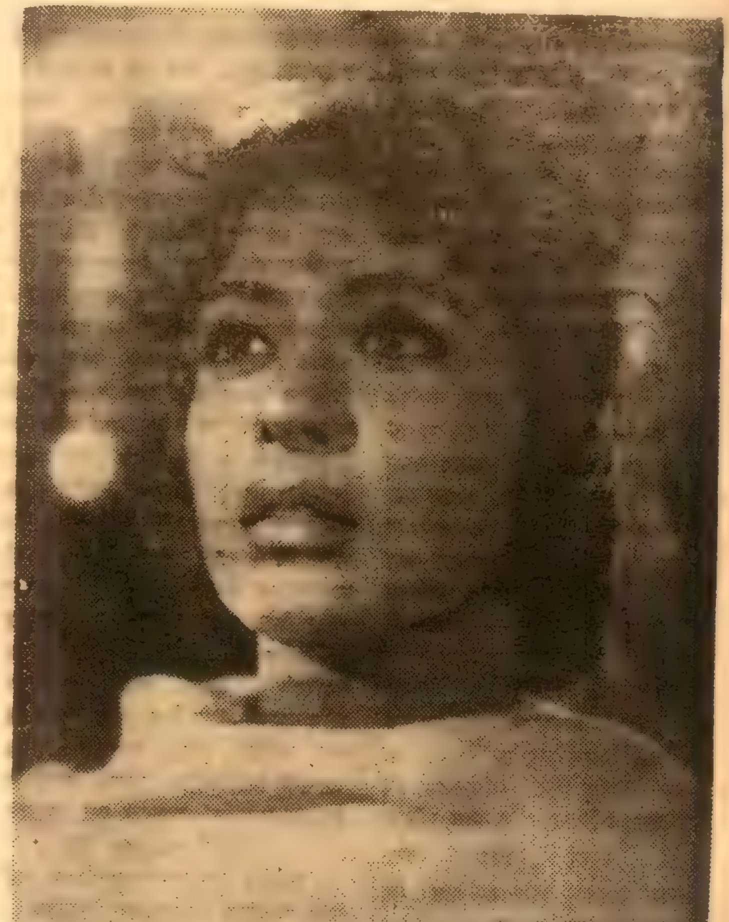

রাজেন তরফদারের 'আকাশছোঁয়া' ছবিতে সুপ্রিয়া দেবী

ছবির একটা সম্মান আছে। নিম্নমানের হিন্দী পণ্যচিত্রগুলির অন্ধ অনুকরণ করলে বাংলা ছবির কোন মর্যাদা থাকবে না। গত বছর যে ছবিগুলি মুক্তি পেয়েছে তার মধ্যে অধিকাংশ ছবি এরূপ নিম্নমানের। এরূপ নিম্নমানের পণ্যচিত্রের সংখ্যা বাড়তে থাকলে বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাবে। এই প্রবণতা বন্ধ হওয়া দরকার।

—সুজন।

শ্যাম চক্রবর্তী পরিচালিত 'দুষ্টু প্রজা পতি' ছবিতে তরুণকুমার ও কিশোরকুমার

চিত্র আলোচনা

ফিরে চল

(পরিচালনা : অতনুকুমার)

'ফিরে চল' ছবির চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক নবাগত। এই প্রথম তিনি নিজে দু'টি প্রধান দায়িত্ব গ্রহণ করে একটি ছবি উপস্থিত করলেন। চিত্রগ্রহণে তিনি অবশ্য রামানন্দ সেনগুপ্তের মত অভিজ্ঞ লোকের সহযোগিতা লাভ করেছেন। পরিচালক নবাগত—কিন্তু নতুন কোন ধ্যানধারণার মধ্যে না গিয়ে তিনি কাহিনী অবলম্বন ক'রেছেন সেই পুরাতন রীতির। এই কাহিনীর নায়িকা সুজাতা বিয়ের কয়েকদিন আগে এক উড়ো চিঠিতে জানতে পারে যার সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে সে দুশ্চরিত্র। সে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল। পথে তার পরিচয় হয়েছিল এক ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে। অবস্থার বিপাকে তার বাড়িতে সে আশ্রয় নিল, যদিও সে বাড়িতে এক চাকর ছাড়া আর কেউ ছিল না. সে চাকর তো সুজাতাকে দেখেই বৌদি সম্বন্ধ পাতিয়ে ফেলল এবং চাকরকে ফাঁকি দেবার জন্য তারা দু'জনা বাইরে এভাবে অভিনয় করল। হঠাৎ সে ভয় পেয়ে সুজাতাকে এক সিনেমায় ছেড়ে আসে। সুজাতা বাড়ি ফিরে গিয়ে পূর্বে স্থির করা বিয়েতে সম্মতি দেয়। ইতিমধ্যে সুজাতাকে খুঁজতে গিয়ে ইঞ্জিনীয়ার গৌতম গঙ্গার বুক থেকে উদ্ধার করে ললিতাকে. যে প্রতারিতা হয়ে জীবনের অবসান ঘটাতে চেয়েছিল। জানা গেল তার অনাকাঙ্ক্ষিত মাতৃত্বের জন্য যে দায়ী সে গৌতমের বন্ধু, এবং তারই সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে সুজাতার। গৌতম ও তার বন্ধুদের বুদ্ধিতে শেষ পর্যন্ত বিবাহবাসরে এক নাটকীয় পরিস্থিতি দেখা দেয়। ললিতাকে বিয়ে করতে বাধ্য হয় কুমারবাহাদুর, আর গৌতমের সাথে বিয়ে হয় সুজাতার।

এভাবে পরিকল্পনা মত সাজানো রীতিতে কাহিনীর শেষ হয়। এই কাহিনীকে রসাশ্রিত করার জন্য নাইট-ক্লাব এবং টাইট স্ল্যাকস পরিহিতা নর্তকী এবং সেরূপ পরিবেশের গান ইত্যাদির সঙ্গে দু'জন সখের গোয়েন্দা উপস্থিত করা হয়েছে। এ দু'জন জহর রায় এবং তরুণকুমার। তাঁরা দর্শকদের হাসাবার মত অনেক ব্যাপার করেছেন। তবে সবকিছু মিলিয়ে সঙ্গতি ও বাস্তববোধের প্রশ্ন কারো মনে উঠলে অনেক কথা এসে যাবে। চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক তাঁর প্রথম প্রচেষ্টায় এমন সাজানো একটি কাহিনী অবলম্বন ও গতানুগতিক রীতি অনুসরণ না করলেই ভাল করতেন। ছবির সঙ্গীতাংশ প্রশংসা পাবে। ভি. বালসারা পরিচালিত কণ্ঠসঙ্গীত শ্রুতি-সুখকর।

অভিনয়ে যথাযথভাবে অংশ গ্রহণ করেছেন সবিতা বসু, অতনুকুমার, অসিতবরণ. কমল মিত্র, তরুণকুমার. জহর রায়, আরতি দাস, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, অশোক মিত্র. শীলা পাল. শ্যাম লাহা, শৈলেন মুখার্জি. অজন্তা কর প্রমুখ।

দু'টি প্রামাণিক চিত্র

১৯৬৭ সালে আন্তর্জাতিক পর্যটক বছর পালনের আয়োজন চলেছে। এই উপলক্ষে গত ২২শে ডিসেম্বর সকালে মেট্রো সিনেমায় দু'টি প্রামাণিক চলচ্চিত্র দেখাবার ব্যবস্থা করেছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ট্যুরিজম বিভাগ। কেবলমাত্র আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের এই ছবি দু'টি দেখাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। যদিও সাপ্তাহিক বসুমতীকে ট্যুরিস্ট বিভাগ ছবি দেখতে আমন্ত্রণ জানায় নি, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ছবি দু'টি দেখার আমার সুযোগ হয়েছিল।

এই দু'টি ছবির প্রথমটি—'ক্যালকাটা'। লিটল সিনেমা এই ছবির নির্মাতা। কলকাতাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখান হয়েছে বিদেশী পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে। দ্বিতীয় ছবি সত্যজিৎ রায়ের 'ঝিলম্পসেস অব ওয়েস্ট বেঙ্গল'। এই ছবিতে কলকাতা থেকে সুরু করে উত্তরবঙ্গের চা-বাগান, বিষ্ণুপুরের মন্দির, পোড়ামাটির কাজ, শান্তিনিকেতন এবং দার্জিলিংয়ে শেষ হয়েছে। কলকাতার দৃশ্যে শ্রীরায়ের শিল্পদৃষ্টি ও কুশলী পরিচালনার চিহ্ন রয়েছে। গঙ্গাবক্ষ থেকে নোঙ্গর করা জাহাজ ও বন্দরের দৃশ্য অতিপরিচিত কলকাতাবাসীদের কাছেও নতুন ও মনোরম মনে হবে। শিল্পীর দৃষ্টিতে কলকাতা বড় সুন্দর, বড় আকর্ষণীয় হয়ে ক্যামেরায় ধরা দিয়েছে। তার পরেই ছবিটিতে বেশি দৃশ্য সংযোজন হয়েছে দার্জিলিং সম্পর্কে। এই দৃশ্যগুলি দেখে মনে হয় কিছু কিছু পুরোনো শট তিনি ভালভাবে কাজে লাগিয়েছেন। তবে নতুন বাংলার পরিচয় যেমন এখানে নেই, তেমন মুর্শিদাবাদ স্থান লাভ করে নি। অবশ্য সমগ্র বাংলার পরিচয় দেওয়া এই ছবির উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য বিদেশী পর্যটকদের আগ্রহী করে

তোলা। সেদিক থেকে ছবিটি পরম সার্থক। এই ছবিতে ক্যামেরার চমৎকার কাজ করেছেন সৌমেন্দু রায়, এই দু'টি ছবি রঙিন।

অপারেশন বেইরুট

ইতালীর এন, সি, ডেভন ফিল্ম এবং ফ্রান্সের র‍্যাডিয়াস প্রোডাকসন্সের উদ্যোগে যদিও 'অপারেশন বেইরুট' নির্মিত; তবে ছবি দেখার পর দর্শকরা অনুমান করতে পারবেন ছবির আসল নির্মাতা কে এবং প্রেরণা কোথায়! সম্প্রতি ভারতে আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা প্লটের ছবি খুবই দেখান হচ্ছে। ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং ক্রিমিন্যাল দলের অপরাধ প্লটের পরিবর্তে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে পারমাণবিক শক্তি নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে প্লট গঠিত হচ্ছে। বলা বাহুল্য এই ছবিগুলি পরোক্ষে রাজনৈতিক প্রচারমূলক।

'অপারেশন বেইরুট'-এ দু'জন বিজ্ঞানী রাশিয়া থেকে একটা মাইক্রো-ফিল্ম নিয়ে পালিয়ে আসে। সোভিয়েট গোয়েন্দাচক্র তাদের একজনকে খুন করলে আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থা সি আই এ তদন্ত করতে আসে। মাইক্রোফিল্মটি তখন বেইরুটের এক ধনীর কাছে গচ্ছিত রয়েছে। সোভিয়েট গোয়েন্দাচক্র তাকে পাকড়াও করে এবং পীড়নে তার মৃত্যু হয়। এদিকে এই ধনীর ভগিনী নিজ মার্কিন গোয়েন্দাদের প্রতি আসক্ত হয়ে ওঠে, তাকে বাঁচাবার জন্যে নিজ মাইক্রোফিল্মের সন্ধান দেয়। মাইক্রোফিল্মটি যখন সোভিয়েট গোয়েন্দার হাতে গেছে তৎক্ষণাৎ চীনা গোয়েন্দা (এতক্ষণ যে সোভিয়েটের সহযোগী ছিল) রিভলবার তাক করে সেটা কেড়ে নেয়। মার্কিন গোয়েন্দা হেলিকপ্টারে অনুসরণ করে তাকে পুড়িয়ে মারে এবং মাইক্রো-ফিল্মটি হস্তগত করে। তারপরে আবার সে সোভিয়েট গোয়েন্দার হাতে পড়েছিল কিন্তু দু'জনে হ্যান্ডশেক করে, এবং বলে এটা আসলে 'এ' বোমার ফর্মুলা, যা সোভিয়েট এবং আমেরিকার জানা, তৃতীয় পক্ষ চীনাদের আয়ত্তে যাতে না যায় তার জন্য তাদের এত পরিশ্রম। কিন্তু এই হ্যান্ডশেকের মধ্যে মার্কিন গোয়েন্দা মাইক্রোফিল্মটি নিয়ে সরে পড়ে। সঙ্গে অবশ্য নিজকে নিয়ে যেতে ভোলে ন।

'সন্দার রাজা' চিত্রের একটি দৃশ্যে লিলি চক্রবর্তী ও রত্না ঘোষাল

মার্কিন গোয়েন্দা এখানে প্রায় দৈব-শক্তির অধিকারী, অসাধারণ বুদ্ধি-সম্পন্ন এবং প্রায় অমর। আবার নারীদের কাছে পরম আকর্ষণীয়। এই বাহাদুর গোয়েন্দার নানা অবিশ্বাস্য ঘটনার মধ্যেও সাসপেন্স সৃষ্টি, উত্তেজনা, নাচ, গান এবং যৌন আকর্ষক দৃশ্যে ছবিটি ভোলানাথ দর্শক-দের টানতে পারবে।

অভিনয়ে আছেন রিচার্ড হ্যারিসন, ডোনিন, বোসেরো, ওয়ানডিসিয়া গাইডা, আন কালিনস্ প্রমুখ।

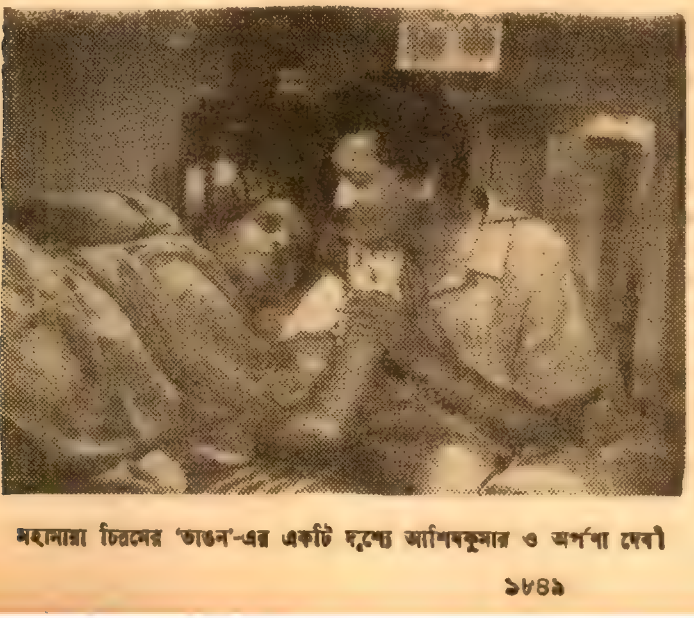

মহামায়া চিত্রমের 'তাণ্ডব'-এর একটি দৃশ্যে আশিষকুমার ও অর্পণা দেবী

স্টুডিও খবর

দিল নে পুকার

মহাবালেশ্বরে 'দিল নে পুকার'-এর সপ্তাহব্যাপী শ্যুটিং করে প্রযোজক পরি-চালক মোহন সম্প্রতি বোম্বাইয়ে ফিরেছেন। এখানে একটি গানের চিত্রায়ন ছাড়াও আরো কয়েকটি প্রয়োজনীয় দৃশ্য তোলা হয়। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন রাজশ্রী, সঞ্জয়, শশী কাপুর। এছাড়া মেহমুদ ও হেলেনকে নিয়ে কয়েকটি দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ করা হয় ফিল্মিস্তান স্টুডিওতে। 'দিল নে পুকার'-এর অন্যান্য ভূমিকায় যাঁরা অংশ গ্রহণ করছেন তাঁরা হলেন অচলা সচদেব, ইন্দিরা বনশল, টুনটুন, মনোমোহনকৃষ্ণ।

পান্না

চিত্র সংগঠন সংস্থার প্রথম প্রয়াস 'পান্না'-র চিত্রগ্রহণের কাজ অমিত মৈত্রের পরিচালনায় সমাপ্তির পথে। একটি কিশোর বালকের দুর্জয় সাহসের কাহিনী নিয়ে তৈরি এছবির চিত্রগ্রহণ করেছেন বিশু চক্রবর্তী। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন ভি, বালসারা।

ওয়াল্ট ডিজনে

সিনেমার পর্দায় ওয়াল্ট ডিজনের কার্টুন ছবি দেখেন নি এমন সিনেমা দর্শকের সংখ্যা খুব কম। ডিজনে কেবলমাত্র শিশুদের জগতে আকর্ষণের নাম ছিল না, বড়রা ডিজনের ছবি দেখার জন্য উৎসুক হয়ে থাকেন। ডিজনের কার্টুনগুলি দর্শকদের চোখে যাদুর মত বিস্ময় সৃষ্টি করে, আনন্দ দান করে। ওয়াল্ট ডিজনের মৃত্যুতে বিশ্বের চলচ্চিত্রজগৎ এক বিরাট প্রতিভাকে হারিয়েছে।

ওয়াল্ট ডিজনের আসল নাম ওয়াল্টার ইলিয়াস ডিজনে। ১৯০১ সালে শিকাগো শহরে তাঁর জন্ম। ডিজনের পিতামাতা মিসৌরির এক খামারে কাজ করতেন। মাত্র আট বছর বয়সে তিনি ছবি আঁকতে শেখেন। প্রাণীজগতের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল শৈশবকাল থেকে। ষোল বছর বয়স পর্যন্ত তিনি বিদ্যালয়ে পড়েন। তারপরে হন খবরের কাগজের হকার। এ সময় তিনি একটি সেলুনে সপ্তাহে একবার করে ছবি এঁকে দিতেন, বিনিময়ে পেতেন বিনা-পয়সায় চুল ছাঁটাই। এভাবে বছরখানেক কাটাবার পর আবার শিকাগো শহরে গিয়ে সেখানকার উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তি হন।

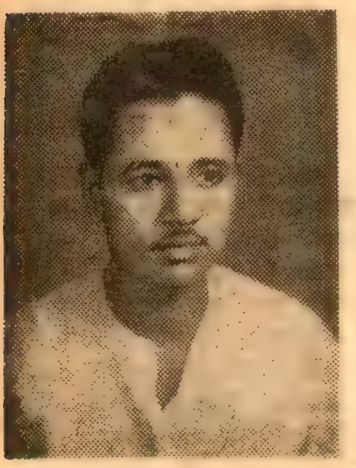

মিহির দাশগুপ্ত রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করে প্রশংসালাভ করেছেন।

প্রেমচাঁদ রচিত 'গবন' চিত্রের একটি দৃশ্যে সুনীল দত্ত ও সাধনা

সকালে বিদ্যালয়ে পড়তেন, বিকালে ছবি আঁকতেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ড্রাইভার হয়ে গিয়েছিলেন এম্বুলেন্স কোরে। যুদ্ধশান্তে ডিজনে দু-বছর কমার্শিয়াল আর্টিস্টরূপে কাজ করেন। এ সময় একটি ফিল্ম কোম্পানীর কাছ থেকে তাঁর কাছে অনুরোধ আসে কয়েকটি স্লাইড তৈরি করে দেবার। সেকাজ করতে গিয়েই ব্যঙ্গ-চিত্রকে জীবন্ত করে দেখাবার চিন্তা তাঁর মাথায় আসে। কিছুদিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার পর তাঁর ধারণা হয় হলিউডে গেলে তাঁর স্বপ্ন সফল হবে। ১৯২৩ সালে তিনি হলিউডে যান। তাঁর ভাই রয়-এর ছিল চলচ্চিত্র ব্যবসা। সেই ব্যবসায়ের সঙ্গে তিনি যুক্ত হলেন। মিকি মাউজের চিন্তা তাঁর মাথায় এল। কয়েকটি ছবি তিনি তুললেন। তারপরে সুরু হল সিনেমার পর্দায় ডিজনের কার্টুন-চিত্র।

১৯৩৪ সালে তিনি নির্মাণ করতে অগ্রসর হলেন প্রথম পূর্ণাঙ্গ চিত্র 'স্নো হোয়াইট এণ্ড দি সেভেনডোয়ার্ক'। এ ছবি অসামান্য সাফল্য লাভ করে। এ থেকে অর্জিত অর্থে তিনি খুললেন ডিজনে প্রোডাকসন্স। একে একে নির্মাণ করলেন 'ফার্দিনান্দ দি বুল', 'ফ্যান্টাসিয়া', 'ব্যাম্বি', 'সিণ্ডেরেলা'। ১৯৪৮ সালে সুরু করলেন লাইফ এ্যাডভেঞ্চার সিরিজ। এই সিরিজের প্রথম ছবি 'সী আয়ল্যাণ্ড'। ১৯৫০ সালে তুললেন 'ট্রেজার আয়ল্যাণ্ড'। তার পরে একে একে 'রীভারভ্যালি', 'নেচারাস হাফ একর', 'আফ্রিকান লায়ন' এবং আরো অনেক ছবি।

শিশুদের দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি গড়ে তুললেন ডিজনেল্যাণ্ড। সেখানে নানা খেলনা, জীবজন্তু এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে শিশুরা কল্পনার পাখা মেলে দেয়। বড়রাও আনন্দ পায়। ওয়াল্ট ডিজনে বহু চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন, তাঁকে ডক্টর উপাধিও দেওয়া হয়েছে।

গ্রন্থমেলা

আপিস কলকাতার সীমানায়—সুকুমার রায়। জ্ঞানতীর্থ, ১নং বিধান সরণি, কলিকাতা-১২ দামঃ চার টাকা।

শ্রীসুকুমার রায়ের এটিই হয়তো পূর্ণাঙ্গ দ্বিতীয় উপন্যাস। তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস 'নীল সবুজের নটী'র অভিনবত্ব স্বীকৃত হয়েছে। কারণ মণিপুরের জীবন, সমাজ সংস্কৃতির এমন রূপায়ণ বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে সম্ভব হয় নি। 'আপিস কলকাতার সীমানায়' উপন্যাসটির অভিনবত্ব ও গুরুত্ব নিঃসন্দেহে স্বীকৃত হবে। আপিসের অফিসার ও কেরানী শ্রেণীভুক্ত নরনারীর বিচিত্র কাহিনী এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। কোনো জীবনটাই তুচ্ছ নয়, সামান্য নয় তাদের জীবনের পূর্ব-ইতিহাস। আপিসের ফাইলের মধ্যে যারা আবদ্ধ, তাদেরও মন আছে, সেই মনেরই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন ঔপন্যাসিক শ্রীরায় গভীর দরদ ও আন্তরিকতা দিয়ে। তাই যে মানুষ ব্যর্থ, সে তার নিজের হা-হুতাশ নিয়েও সজীব। উপন্যাসের প্রথমাংশে ডেলি প্যাসেঞ্জার গৌরী মিত্রের চাকুরি লাভে ডেলি প্যাসেঞ্জার সুরেনের সার্থক প্রচেষ্টা, সঙ্গে সঙ্গে অসিত মুখুজ্জে কর্তৃক আর একজন প্রতিদ্বন্দ্বী হাজির করা প্রভৃতি ঘটনার মধ্য দিয়ে আপিসের নিখুঁত ছবি ধরা পড়েছে। অসিত যে কোনোকালেই আপিসের কোনো কাজ করে না এবং নানা ছলে উপরঅলার মন যুগিয়ে যা ইচ্ছে তাই করে—তাকে টাইপ চরিত্র বলে মনে হলেও—এর কায়দাকরণ এমনই বিচিত্র যে—সে মাঝে মাঝে ক্রোধের কারণ হলেও—আপিসের বৈচিত্র্যহীনতার মধ্যে এমন লোক কিছুটা বিচিত্রতার স্বাদ এনে দেয়। তা ছাড়া এই লোকের মাধ্যমেই আপিসের কর্তাব্যক্তিদের আসল চরিত্র জানা সম্ভব হয়। সেই কারণে মনে হয়, অসিতের চরিত্রাঙ্কন সার্থক হয়েছে। অসিতের সেই কথা বার বার মনে পড়ে, 'আমি প্রভুভক্ত কর্মচারী।' এমন লোক নইলে উপরমহল অনেক সময় অচল হয়। উপন্যাসটির মধ্যে ঔপন্যাসিক অন্যতম বৈশিষ্ট্য দান করেছেন মহিলা কর্মচারীদের জীবন-জিজ্ঞাসাকে প্রকাশ করে। এরা ছাড়া আপিস কলকাতার সীমানা অচল হয়ে পড়ে কিনা জানি না, তবে একালে এদেরই কেউ আপিসের সম্রাজ্ঞীতুল্য, কেউ বা ব্যর্থ জীবন-বেদনায় একেবারেই নির্বাক, আবার কেউ এক ধাপ যদি নামে হঠাৎ অদৃশ্য অঙ্গুলিহেলনে চার ধাপ ওপরে ওঠে। মিসেস সেন, মিসেস চৌধুরী, গৌরী প্রভৃতি চরিত্র সেই কারণে লেখকের অনবদ্য সৃষ্টি। প্রসঙ্গত এসে পড়ে শ্যামলী সেনের কথা। সোমেন সান্যাল কবি; শ্যামলী সেনকে নিয়ে সে অনেক কবিতা লিখেছে, সাহিত্যিক জীবনে তার কিছুটা সফলতাও এসেছে, তবু সব কিছু ওলটপালট হয়ে গেছে তখনই, যখন সোমেন আপিসের এক ধাপ উঁচুতে উঠতে পারে নি, অথচ চাকরি না করেও উপায় নেই এবং শ্যামলীর অধস্তন কর্মচারী হয়ে থাকতে হবে তাকে। শেষ পর্যন্ত শ্যামলীর বোন রাণুই হয় তার জীবনসঙ্গিনী। অবশ্য এর জন্য চমৎকার কার্যকারণ লেখক তুলে ধরেছেন। তবে আপিস সম্পর্কিত যে কথা একটি পংক্তিতে লেখক বলেছেন, সেটাই হচ্ছে যথার্থ দার্শনিক অভিমতঃ 'এখান থেকে পালিয়ে গিয়েও যেমন শান্তি, আবার এখানে এসেও স্বস্তি।' উপন্যাসটি ঘটনাকেন্দ্রিক নয়, চার দেওয়াল-বদ্ধ মানবজীবনের বিশ্লেষণই বড় কথা। সোমেন কবি—তাই সে মাঝে মধ্যে ছুটির নামে পালিয়ে বেড়ায়। উঠতি লেখকদের দুরবস্থার কথাও সোমেনের মধ্য দিয়ে শ্রীরায় সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। আমরা মনে করি, আপিসের যাঁরা বাইরের ঢংটাই দেখেছেন, তাঁরা তার অন্তর-রহস্য জানার জন্যেও এই উপন্যাস পাঠ করে খুশি হবেন।

শত শতাব্দীর মহাপথ—অশোককুমার সাহা। পরিবেশকঃ এম, সি, সরকার এ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ দাম ঃ সাড়ে তিন টাকা।

ঠিক তীর্থভ্রমণ করা লেখকের উদ্দেশ্য নয়, বলা যায় ভ্রমণ। তবু তীর্থে তিনি গেছেন। সে তীর্থের নাম কেদার-বদরী। তীর্থস্থানে এসে ইতিহাসের মৌন জিজ্ঞাসায় লেখক নিরুত্তর, তাই বিশ্বাসের কাছে আপন মনের হাল ছেড়ে দিয়েছেন। তবে প্রতিটি তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য সম্পর্কিত যে কিংবদন্তী আছে, প্রয়োজনমতো লেখক তার উল্লেখও করেছেন। সেই সঙ্গে আছে ইঞ্জিনীয়ার অসীম রায় ও তাঁর স্ত্রীর ব্যথা-বেদনার কাহিনী এবং অমলবাবু ও শীলার মিলন-পর্ব।

অবশ্য শত শতাব্দীর যে মহাপথ রয়েছে হিমালয়োপরি, সে পথ চলায় দুঃখের অন্ত নেই, তবু আনন্দও রয়েছে। সে আনন্দ হচ্ছে তুষারমৌলী হিমালয় দর্শনের আর তীর্থভ্রমণের। কিন্তু সে পথ এখন আর বিভীষিকাময় নয়। কারণ যন্ত্রযুগে তৈরি হচ্ছে নতুন পথ, চলছে যন্ত্রযান। তবু পায়ে হাঁটার যে আনন্দ—তারও যেন সমাপ্তি ঘটছে।

শ্রীসাহা কেদার-বদরীতে গেছেন একা নন, সঙ্গী ছিল প্রায় ৪৮ জন। হাওড়া থেকে ট্যুরিস্ট গাড়িতে যাত্রা শুরু। হরিদ্বার, দেরাদুন, মুসৌরী হয়ে আরো উপরে গিয়েছেন। তবে ছকে বাঁধা ভ্রমণ এই কারণে যে, রুটিনমাফিক হাঁটা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তাই হরিদ্বারের চণ্ডীপাহাড়, কিংবা মুসৌরীর কেম্পটি ফল্‌স্ দেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তবে বদরী পৌঁছানো পর্যন্ত প্রতিটি তীর্থস্থান ও চটির বর্ণনা সুন্দর ও গতিসম্পন্ন। তা ছাড়া যে সব ব্যক্তি লেখকের ভ্রমণসঙ্গী ছিলেন—তাঁদের বর্ণনাও সুন্দর। লেখকের এই ভ্রমণ-কাহিনী আরও সার্থক হোত যদি তিনি পার্বত্য মানুষগুলিকে তাদের দুঃখ, দুর্ভাগ্য ও আত্মসন্তুষ্টি সহ তুলে ধরতে পারতেন। কিন্তু ট্যুরিস্ট কোম্পানির সীমিত তালিকায় তা সম্ভব নয়। আশা করি সে পথের নতুন দিশারী কেউ হয়তো হবেন। প্রবোধকুমার সান্যাল লিখিত ভূমিকা এই গ্রন্থটির গৌরব বৃদ্ধি করেছে।

পাঠক মন

গত ২২শে অগ্রহায়ণ তারিখের সাপ্তাহিক বসুমতীর 'পাঠকমনে' শ্রীমতী শান্তি দাসের একটি চিঠি উক্ত কাগজের ১লা অগ্রহায়ণে প্রকাশিত শ্রীকামাখ্যা রায়ের একটি লেখার ('ইতিহাসের উপাদান' কি সত্যই ইতিহাস) উত্তরে প্রকাশিত হইয়াছে। লেখাটি দীর্ঘ তিন কলামব্যাপী হইলেও তাহাতে কামাখ্যাবাবুর বক্তব্যের বিরুদ্ধে কোন তথ্য পরিবেশিত হয় নাই। লেখার মূল বস্তু হইল 'ইতিহাসের উপাদান' প্রবন্ধের লেখক শ্রদ্ধেয় ভূপেন্দ্র দত্তের প্রতি অকুণ্ঠ ভক্তিপ্রকাশ এবং উক্ত লেখাটির কঠিন সমালোচনা পাঠে বেদনা-বোধ ও আক্ষেপ। আমরাও চাহি না যে গত যুগের বিপ্লব ইতিহাস আলোচনা করিতে যাইয়া কেহ এমন কিছু লেখেন যাহাতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় বা কোন ব্যক্তি অকারণ বেদনা পান। কিন্তু এক্ষেত্রে স্বয়ং ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার লেখায় তিনি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে যুগান্তরের কর্ম ও চিন্তার নায়কত্ব বলিতে তাঁহার নিজস্ব নায়কত্বই বোঝা যায়, এবং বিপ্লবী হিসাবে সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত ছিলেন তাঁহার কাছে তুচ্ছ। ভূপেন্দ্রবাবুর লেখাগুলি পড়িলে যে কেহ তাঁহার আত্মম্ভরিতার পরিচয় পাইবেন। এখানে এই সত্যকথাগুলি বলিতে যাইয়া আমরা কিন্তু বিন্দুমাত্র ক্রুদ্ধ হই নাই, অথবা কাহাকেও ব্যক্তিগত আক্রমণ করিতেছি না। কিন্তু শান্তি দেবী যদি ইহার অর্থ অন্যরূপ করেন তবে বলিবার কিছু নাই। শান্তি দেবী যদিও কামাখ্যাবাবুর বক্তব্যের বিরুদ্ধে কোন তথ্য স্থাপন করেন নাই তবু তাঁহার বক্তব্যের উত্তরে কয়েকটি কথা লিখিতেছি। (১) মেজর গুপ্তের তথাকথিত উক্তিগুলি ভূপেন্দ্রবাবু উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়াই উহা মানিতে হইবে, অথচ মেজর গুপ্তের কর্মধারা ও চরিত্রের সঙ্গে সেসব উক্তির কোনও সঙ্গতি থাকিবে না—ইহা শান্তি দেবীর কাছে গ্রাহ্য হইলেও কোন ঐতিহাসিকের দ্বারা অথবা দল নির্বিশেষে সত্যবাবুকে যাঁহারা বিশেষভাবে জানিতেন তাঁহাদের দ্বারা গৃহীত হইবে না। কামাখ্যাবাবু যুক্তি সহকারে এই কথাই তাঁহার নিবন্ধে ব্যক্ত করিয়াছেন। উহাতে বিন্দুমাত্র শালীনতা বর্জিত হয় নাই। কামাখ্যাবাবুর লেখা pointed নিশ্চয়ই হইয়াছে। রুচিজ্ঞানের যথার্থ ধারণা যাঁহাদের আছে তাঁহারা pointed লেখাকে 'অশালীন' বা 'ক্রোধান্বিত' রচনা বলিয়া ভুল করিবেন না। (২) 'বিভি'-র নামকরণ যে বার্জ-হত্যার আগে বা পরে কোনকালে পুলিশ কর্তৃক প্রদত্ত হয়, ইহা সর্বজনবিদিত।

কামাখ্যাবাবু-ও উহা জানেন, তিনি কখনো বলেন নাই যে দলের নাম পূর্ব হইতেই 'বিভি' ছিল। তিনিও লিখিয়াছেন যে 'যুগান্তর' নামটির মত 'বিভি' নামটিও পুলিশই দিয়াছে। কামাখ্যাবাবু লিখিয়াছেন যে 'যুগান্তর' ছিল, বহু গ্রুপের সমাবেশ—একটি ইউনিটারি পার্টি নয়; এবং ঠিক সেইভাবেই ভূপেন্দ্র দত্ত মহাশয়ও ছিলেন একটি গ্রুপেরই লোক এবং যুগান্তর তথা বহুদলসমাবেশের ও নেতৃস্থানীয়দের একজন। কিন্তু মেজর গুপ্তের জবানীতে দত্ত মহাশয় যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা বিশ্বাস করায় বাধা আছে। এই সম্পর্কে কামাখ্যাবাবুর উক্তিতে যুক্তির অভাব নাই। (৩) শ্রীমতী শান্তি দাস স্বর্গগত ললিত বর্মণের গ্রুপে ছিলেন বলিয়া জানি। ললিতবাবু যুগান্তরের সঙ্গে যেমন যুক্ত ছিলেন তেমনি পরে হেমচন্দ্রের দলের (উত্তরকালে যাহার নাম 'বিভি' হইয়াছিল) সঙ্গেও যুক্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে যুগান্তরের সঙ্গে কাহারো বিরোধ ঘটার প্রশ্ন ওঠে না। কারণ যুগান্তর যে দল-সমাবেশ! হেমচন্দ্রের দলের সঙ্গে ললিতবাবুদের কতদূর ঘনিষ্ঠতা ছিল তাহা শান্তি দেবীর অজ্ঞাত হইলেও তাঁহার তৎকালীন গ্রুপের সিনিয়র মেম্বরদের বিশেষভাবে জানা ছিল।

'বিভি' তথা হেমচন্দ্রের দলের সঙ্গে যুগান্তরের পরমাত্মীয়তার কথা অতি সত্য; এবং কামাখ্যাবাবু তাহা অস্বীকার করেন নাই। তিনি শুধু সেই সত্য যখন সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে ভূপেন্দ্রবাবুর বক্তব্যে, তখনই তাহার কঠিন সমালোচনা করিয়াছেন। (৪) প্রখ্যাত বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ, হরিদাস দত্ত প্রমুখের নেতৃত্বে সঙ্গোপনে 'মুক্তি সংঘ' নামক সিক্রেট পার্টি ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কিনা এবং হেমচন্দ্রের গড়া সেই দলই ১৯৩০ সালের পর পুলিশ কর্তৃক 'বিভি' নামে চিহ্নিত হইয়াছিল কিনা তাহা কালিদাস ঘোষ প্রমুখ এগারটি কর্মীর [যাঁহাদের অধিকাংশই তৎকালে (১৯০৫) জন্মগ্রহণ করেন নাই এবং যাঁহাদের সর্বাধিক অগ্রজের বয়সও তখন ছয়-সাত বৎসরের অধিক হইবে না] কথায় প্রভাবিত হইয়া যদি কেহ বিশ্বাসযোগ্য মনে না করেন তাহাতে ক্ষতি কিছু নাই। কারণ গোপন তথ্য উদ্ঘাটিত করিয়া বিপ্লব ইতিহাস বুঝিবার ইচ্ছা কাহারো না থাকিলে বলার কিছু আছে কি? তবে শান্তি দেবী যদি সত্যই এ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হইতে চান, তবে বেঙ্গল পাবলিশার্স লিঃ কর্তৃক প্রকাশিত 'সবার অলক্ষ্যে' নামক বিপ্লব ইতিহাসের (প্রথম পর্ব) ২৩৬ পৃঃ হইতে ২৪২ পৃঃ পড়িয়া দেখিতে পারেন। 'ডকুমেন্টারি এভিডেন্স' সহযোগে উক্ত বিষয়টি সেখানে আলোচিত হইয়াছে। (৫) আর একটি কথা। শান্তি দেবী কিন্তু সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে ভূপেন্দ্রবাবুর ধারণা ও উক্তির উপর কামাখ্যাবাবুর সমালোচনা প্রসঙ্গে নীরব রহিয়াছেন। কেন? হয়তো ভূপেন্দ্রবাবুর উক্তিতে তিনিও এই স্থানে ক্ষুব্ধ। আমার ধারণা মিথ্যাও হইতে পারে। তবে শান্তি দেবীকে আমি অনুরোধ করিব 'দেশ' নামক সাপ্তাহিকের ১০ই অগ্রহায়ণের সংখ্যার ৩৫০ পৃষ্ঠা হইতে ৩৫৩ পৃষ্ঠাব্যাপী শ্রদ্ধেয় ভূপেন্দ্র দত্তদের মহাত্মা গান্ধীকে লিখিত পত্রখানা পড়িয়া দেখিতে। দমদম সেন্ট্রাল জেল হইতে ১৭ই জানুয়ারী (১৯৪৬) তারিখে তাঁহারা গান্ধীজিকে লিখিতেছেন ঃ "এখন আমরা বিশ্বাস করি যে, একমাত্র আপনার নীতি ও কর্মসূচীই অভ্রান্ত, তাকেই আমাদের অনুসরণ করা উচিত।"

লিখিয়াছেন ঃ "এখানে (বাঙলাদেশে) কাজ করবার আগে কিছুদিন আপনার কাছে থাকতে চেষ্টা করব। আপনার পরামর্শ ও সাহায্য নিয়েই ভবিষ্যতে কাজ করব আমরা।" যুগান্তর দল লিকুইডেট করিয়া 'নিয়োভক্ত' তথা গান্ধীজির অহিংসা মন্ত্রের সাধক যাঁহারা হইলেন তাঁহাদের মধ্যে আর সশস্ত্র বিপ্লবীর সত্তা অনির্বাণ থাকিতে পারে কি? অথচ সেই ভূপেন্দ্রবাবুই আজ (১৯৬৬ সালে) সদম্ভে লিখিতে পারিলেন ঃ "আমরা সুভাষকে কখনো আমাদের বিপ্লবী দলের নেতা বলে মনে করি নি, এমনকি 'Primus Inter Pares' হিসাবেও দেখি নি।" (সাঃ বসুমতী, ১৫-৯-৬৬, পৃঃ ১৩০)

ইহার পরও শান্তি দেবী কি বলিতে চান যে, ভূপেন্দ্রবাবুকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করিয়া কামাখ্যাবাবু শালীনতা বর্জন দোষে দোষী হইয়াছেন? ভূপেন্দ্রবাবুকে কেহ আক্রমণ করে নাই, তাঁহার অবাঞ্ছিত ও অর্ধ-সত্য উক্তিগুলির সমালোচনা করা হইয়াছে মাত্র।

[illegible] সেন

২৫১।এ।৪৯, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস রোড, কলিকাতা-৪০

ব্রাবোর্নে ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ বিজয়ী

ব্রাবোর্নে ভারত-ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ প্রথম টেস্টে জয়মাল্য লাভ করল বিশ্বজয়ী ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল। ভারত পরাজিত হল ছয় উইকেটে; এ পরাজয়ের দুঃখ নেই, এ পরাজয়ে গৌরবের ছোঁয়া আছে। কারণ শেষ সময় পর্যন্ত ভারতীয় খেলোয়াড়েরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছে ম্যাচের ভাগ্যকে নিজেদের অনুকূলে আনার। দুদলের মধ্যে এই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ব্রাবোর্নের দর্শকদের দিয়েছে প্রচুর আনন্দ এবং খেলাটিকে করে তুলেছে আকর্ষণীয় পর্যায়ের। আর ব্যাটে বলের এই লড়াইয়ে যোগ্য দলই লাভ করেছে জয়লক্ষ্মীর অনুগ্রহ।

গত সংখ্যার অসমাপ্ত অংশ থেকেই এবার সুরু করছি। ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ দল তাদের প্রথম ইনিংসের খেলা সমাপ্ত করল ৪২১ রানে। ভারত সুরু করল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা। ভারতের অবস্থা কিন্তু তখন কোনমতেই অনুকূলে নয়। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যেই এক অনবদ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন বুধি কুন্দেরন। অবশ্য সেই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য হল জয়সীমা, আব্বাস আলি বেগ, অধিনায়ক পতৌদি এবং শেষপ্রান্তের ব্যাটসম্যান ভেঙ্কট রাঘবনের ভূমিকা। ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংসের হীরো বোরদে কিন্তু মাত্র ১২ রানে আউট হন, আর নবাগত খেলোয়াড় অজিত ওয়াদেকার মাত্র ৪ রান সংগ্রহ করে ব্যর্থতার পরিচয় দেন। নাদকার্নীর ভাগ্যে জোটে শূন্য।

চতুর্থ দিনের সুরুতেই দ্রুতগতিতে ৪৪ রান সংগ্রহ করে জয়সীমা বিদায় নেন। এরপর আব্বাস আলি বেগ এবং অধিনায়ক পতৌদি ভারতীয় দলকে বিপন্মুক্ত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বেগ সংগ্রহ করেন ৪২ রান, পতৌদি ৫১ রানে প্যাভেলিয়ানের পথে পা বাড়ান। ভারতীয় দলের অবস্থা খুবই সঙ্গীন। ১১০ রানে ৭ উইকেট, এরপর ২১৭ রানে ৮ উইকেট। কুন্দেরন এবং ভেঙ্কট রাঘবন এই অবস্থায় হাল ধরলেন, ত্রাণকর্তার ভূমিকা গ্রহণ করলেন কুন্দেরন। নিরাশার মাঝে দেখা গেল আশার আলো। রান উঠতে লাগল ধীরে ধীরে। কুন্দেরনের ব্যাট থেকে ছুটল রানের ফুলঝুরি। ব্যক্তিগত ৭৯ রানে গ্রীফিথের একটি ইন সুইং বলে বোল্ড আউট হলেন কুন্দেরন। দলীয় রান তখন ৩১২। এরপর শেষ উইকেটে চন্দ্রশেখরকে সঙ্গে নিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে খেলার চেষ্টা করলেন ভেঙ্কট রাঘবন। কিন্তু গীবসের বলে এল বি ডবলিউ হলেন ভেঙ্কট রাঘবন ২৬ রানে। ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হল ৩১৬ রানে। ভেঙ্কট রাঘবন দু ইনিংসেই খেলেছেন একজন পাকা ব্যাটসম্যানের মত। স্পিনার ল্যান্স গীবস দখল করলেন ৪টি উইকেট ৬৭ রানের বিনিময়ে এবং হলফোর্ড ৯৪ রানে ৩টি উইকেট আর সোবার্স পেলেন ২টি উইকেট।

দিল্লীর ফিরোজ শা কোটলায় অনুষ্ঠিত প্রধানমন্ত্রী একাদশ এবং ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ দলের খেলায় দুই দলের অধিনায়ক সোবার্স এবং চান্দু বোরদে।

ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ সুরু করল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা। জয়ের জন্য ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের প্রয়োজন ১৯২ রান—সময় হাতে একদিন। চতুর্থ দিনের শেষে অল্প সময়ের জন্য মাঠে নামল ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ। কিন্তু সূচনায় বিপর্যয়—১১ রানে প্রথম উইকেটের পতন এবং দ্বিতীয় উইকেটের পতন হল ২১ রানে। দুটি উইকেটই দখল করলেন ভারতীয় দলের স্পিনার চন্দ্রশেখর—বাইনো আউট হলেন মাত্র ৫

শ্রীঅমিতাভ

রানে এবং বুচার ১১ রানে। চতুর্থ দিনের শেষে খেলার অবস্থা দেখে মনে হল যে খেলার ভাগ্য নিশ্চিত নির্ধারিত হবে, তবে ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ দলের মুঠোর মধ্যে জয় থাকলেও, ভারতের পক্ষেও ক্ষীণ সম্ভাবনা বর্তমান।

পঞ্চম দিনের সুরুতে ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের খেলা সুরু করলেন হান্ট এবং ল্যান্স গীবস। গীবস বেশিক্ষণ টিকতে পারলেন না, ৫ রানে আউট হলেন। এরপর চতুর্থ উইকেটের পতন হল ৯০ রানে, বিদায় নিলেন হান্ট ৪০ রানে। নবাগত লয়েড এবং অধিনায়ক সোবার্স ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ দলকে জয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। জয়সূচক রান সংগ্রহ করলেন সোবার্স। ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ ৪ উইকেটের বিনিময়ে ১৯২ রান সংগ্রহ করার ফলে ভারত পরাজিত হল ৬ উইকেটে। দ্বিতীয় ইনিংসেও ভারতের চন্দ্রশেখর ৭৮ রানে দখল করলেন চারটি উইকেট। লয়েড ৭৮ রানে এবং সোবার্স ৫০ রানে অপরাজিত থাকলেন।

প্রথম টেস্টে জয়ী ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ কলকাতার দ্বিতীয় টেস্টে ইডেনে ভারতের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে ৩১শে ডিসেম্বর।

ব্যাঙ্ককের এশিয়ান গেমস

ব্যাঙ্ককের এশিয়ান গেমসে ভারত হকির হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে, এশিয়ান হকির এই গৌরব ভারত হারায় পাকিস্তানের কাছে ১৯৫৮ সালে টোকিও এশিয়ান গেমসে। সেবার ভারত পরাজিত হয় নি বটে কিন্তু গোলের গড়পড়তায় পাকিস্তান স্বর্ণপদক লাভ করে। ১৯৬২ সালে জাকার্তার এশিয়ান গেমসের ফাইন্যালে ভারত ২—০ গোলে পরাজিত হয় পাকিস্তানের কাছে। হকিতে বর্তমানে ভারত কিন্তু অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খেলাটি ছিল উত্তেজনায় ভরা। অতিরিক্ত সময়ের পাঁচ মিনিটে রেলওয়ের বলবীর সিং ভারতের পক্ষে বিজয়সূচক গোলটি করেন। রাইট ইন বলবীরের (পাঞ্জাব) কাছ থেকে একটি পাস পেয়ে রাইট আউট বলবীর (রেল) একক প্রচেষ্টায় এগিয়ে যান এবং দুরূহ কোণ থেকে পাকিস্তানের গোলরক্ষককে পরাজিত করেন।

পাকিস্তান দল তাদের চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী বেপরোয়া স্টিক চালিয়ে খেলে গেছেন। বলের পরিবর্তে ভারতীয়

দলের খেলোয়াড়দের প্রতিই বেশি লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানের লেঠেল খেলোয়াড়দের। প্রথমার্ধের ২৬ মিনিটে ভারতের রাইট ব্যাক গুরুবক্স সিং এবং পাকিস্তানের লেফট হাফ রহমানের সংঘর্ষ হয়। রহমান স্টিক উঁচু করে গুরুবক্সকে আক্রমণে উদ্যত হন। পাকিস্তানের আরও দু-এক-জন খেলোয়াড়ও মারমুখী হয়ে ওঠেন। পুলিশ ও কর্মকর্তারা মাঠে প্রবেশ করে অবস্থা আয়ত্তে আনেন। শুধু মাঠের মধ্যেই নয়, বাইরেও পাকিস্তানের সমর্থকেরা হাতাহাতি লাথালাথি করেছেন। ভারত বিজয়সূচক গোলটি দেবার পর দর্শকদের স্ট্যান্ডে পাকিস্তানের সমর্থকেরা মারামারি সুরু করে দেন।

এশিয়ান গেমসে হকি প্রতিযোগিতা সুরু হয় ১৯৫৮ সালে টোকিওর তৃতীয় এশিয়ান গেমসে। অলিম্পিক বিজয়ী বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান ভারত হকিতে কিন্তু এবারই প্রথম লাভ করল স্বর্ণপদক।

বাংলা ক্রিকেট দল নির্বাচন প্রসঙ্গে

বাংলা ক্রিকেটের রূপ পরিবর্তনের সময় এসেছে। গত বছর বাংলার খেলোয়াড়দের ক্রীড়াধারা দেখে মনে হয়েছিল যে, সত্যই বাংলা ক্রিকেটের দৈন্যদশার অবসান হবার দিন সমাগত। বাংলার ক্রিকেটের নির্বাচকমণ্ডলীর তরুণ খেলোয়াড়দের সুযোগ দেবার শুভ প্রচেষ্টা কার্যকরী হয়েছে কতকাংশে বলা চলে। বাংলা ক্রিকেট দলের খেলোয়াড় নির্বাচনের ব্যাপারে কিন্তু বাংলার ক্রিকেট পরিচালকদের একেবারেই সুনাম নেই। অতীতে বহু যোগ্য খেলোয়াড় উপেক্ষিত হয়ে এসেছেন এবং এখনও হচ্ছেন। ক্রীড়ামোদী মহলের একটি বিরাট অভিযোগ হল যে, কলকাতার গুটি তিনেক ক্লাব ছাড়া অন্য ক্লাবের খেলোয়াড়েরা বাংলা দলে স্থান পান না। ট্রায়ালে লোক দেখান ভাবে অন্যান্য দলের কয়েকজন খেলোয়াড়কে আহ্বান করা হয় বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত যবনিকার অন্তরালে অনুষ্ঠিত হয় অন্য চালের খেলা। অনেকেই সেই সব অন্তরালের নাটকের খবর জানেন না। কারণ এ বিষয়ে সাহসী হয়ে যবনিকা উত্তোলনের প্রচেষ্টা কেউই করেন নি।

বোম্বাই বা দিল্লীর ক্রীড়ামোদীরা মনে করে যে, বাংলার ছেলেরা ক্রিকেট খেলতে জানে না; বোম্বাই বা দিল্লীর বিপক্ষে বাংলার শোচনীয় ব্যর্থতা এই ধারণা জন্মানোর মূল কারণ। বাংলার ক্রিকেট পরিচালকেরা চিন্তা করে দেখুন যে ক্রিকেটে বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কি তাঁদের প্রচেষ্টা। তরুণ বা সম্ভাবনা-পূর্ণ খেলোয়াড়কে যদি সুযোগ দেওয়া না হয় তবে সে খেলোয়াড় পূর্ণ বিকাশ লাভের সুযোগ পাবে কিভাবে; ক্লাব ক্রিকেট খেলেই তাকে নিঃশেষিত হতে হবে। এই ধরনের ঘটনা কলকাতার মাঠে বিরল নয়।

সামান্য একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি আপনাদের সামনে। এবার ওয়েস্ট-ইন্ডিজ দলের বিপক্ষে পূর্বাঞ্চল এবং মধ্যাঞ্চলের সম্মিলিত একাদশের খেলায়

হনুমন্ত সিং

বাংলার চারজন খেলোয়াড় দলে স্থান পেয়েছেন। এই চারজনের মধ্যে অন্যতম হলেন ভারতীয় ফুটবল-তারকা চুনী গোস্বামী। কিন্তু উপেক্ষিত হলেন বাংলার আর একজন যোগ্য খেলোয়াড় শ্যামসুন্দর মিত্র। এবার বিহার দলের বিপক্ষে রঞ্জী ট্রফিতে সেঞ্চুরী লাভের পর এবং উড়িষ্যার বিপক্ষে অপরাজিত পঞ্চাশ রান সংগ্রহের পরও কি মনে হচ্ছে তিনি ওই দলে স্থান পাবার অযোগ্য, যেখানে চুনী গোস্বামী স্থান পেলেন। এই ধরনের দৃষ্টান্তের অভাব নেই আমাদের এই কলকাতার ক্রীড়াজগতে।

বাংলা দল গঠনের পূর্বে যে অনুশীলনের ব্যবস্থা হয় তা বলতে গেলে ছেলে খেলারই সামিল। কোচের সাক্ষাৎ কদাচিৎ মেলে। অবশ্য আমাদের বাংলাদেশে খুব ভাল ক্রিকেট কোচেরও অভাব। একটি রাজ্য দলের কোচের দায়িত্ব অনেক। কোচকে নিয়মিত উপস্থিত থাকতে হবে এবং দেখতে হবে যে সমস্ত খেলোয়াড় আসছে কি না? নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যরাও কিন্তু নেট প্র্যাকটিশের সময় ভুলেও পা মাড়ান না। নির্বাচকমণ্ডলীর এই ধরনের আচরণে মনে হয় দল বেশ পূর্বেই ঠিক করা থাকে। এবার আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি একজন নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যের আচরণ দেখে। বাংলা দলের নেট

দিল্লীর ফিরোজ শা কোটলায় প্রধানমন্ত্রী একাদশ ফিল্ডিং করতে যাচ্ছে বোরদের নেতৃত্বে

প্র্যাকটিশ চলছে একটি মাঠে, অন্য একটি মাঠে তখন অন্য একটি ক্লাবের নেট প্র্যাকটিশে উপস্থিত সেই ক্লাবের ক্রিকেট সম্পাদক যিনি বাংলা ক্রিকেট দলের একজন দায়িত্বশীল খেলোয়াড় নির্বাচক। আর ওই নেটে তখন উপস্থিত বাংলা দলের প্রায় অর্ধেক খেলোয়াড়। যে লোক একটি রাজ্যের সম্মানের পরিবর্তে নিজের ক্লাবের লাভ-লোকসানের অঙ্ক কষতে পারে সে লোককে কেন নির্বাচকমণ্ডলীতে স্থান দেওয়া হয়!

যোগ্য লোককে বাংলার ক্রিকেট পরিচালকেরা নির্বাচকমণ্ডলীতে স্থান দিতে কুণ্ঠিত কেন বুঝতে পারি না। অথচ দেখা যায় যে, যে লোকের একটি রাজ্য ক্রিকেট দলের নির্বাচক হবার যোগ্যতা নেই, সেই সব লোক বছরের পর বছর নির্বাচক হিসাবে গদি আঁকড়ে আছেন জোর দাপটে। বর্তমানে বাংলার ক্রিকেট নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্য হলেন দুজন প্রবীণ খেলোয়াড়। একজন খেলেছেন টেস্ট আর একজন রঞ্জী ট্রফিতে যোগ্যতার সংগে অনেক বছর খেলেছেন। আর একজন আছেন অতীতের ছুঁড়ে বল করা ক্রিকেটার। এই ভাগ্যবান নির্বাচক ভদ্রলোক আজ প্রায় ছয়-সাত বছর একটানা নির্বাচকমণ্ডলীর চেয়ার আঁকড়ে আছেন।

এবার বাংলা দলে দেখলাম একজন বোলারের নাম, যিনি ভারতীয় স্কুল দলে দলভুক্ত হয়েছেন। বাংলা দল যখন কলকাতায় বিহার এবং উড়িষ্যা দলের

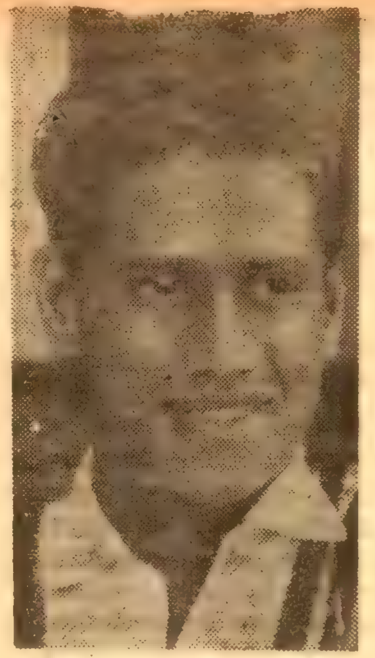

সুব্রত গুহ

বিপক্ষে অংশগ্রহণ করল তখন এই বোলারটি বাংলার বাইরে। নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যরা কি মনে করেন যে, বাংলাদেশে আর কোন বোলার নেই, যার জন্য ওই বোলারটি বাংলার বাইরে খেলায় ব্যস্ত থাকলেও দলভুক্ত হয়ে থাকলেন।

এবার কালীঘাট ক্লাবের ভাস্কর গুপ্ত এবং স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবের সুপ্রকাশ সোম এবং রীতেন বসু উপেক্ষিত হওয়াতে সত্যই আশ্চর্য লাগছে; আর সমান আশ্চর্য লাগছে মোহনবাগান ক্লাবের জলি সরকারকে বাংলা দলে স্থান দেওয়ায়। এ বছর লীগে এবং প্রদর্শনী খেলায় ভাস্কর গুপ্ত, রীতেন বসু যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছেন। কালীঘাটের ন্যাটা স্পিনার ভাস্কর গুপ্ত এ বছর লীগে এবং প্রদর্শনী খেলায় অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। প্রদর্শনী খেলায় ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে ৫৮ রানে ৫ উইকেট, ক্যালকাটার বিপক্ষে ৩২ রানে ৫ উইকেট, স্টুয়ার্টস এণ্ড লয়েডসের বিপক্ষে ৫৮ রানে ৬টি উইকেট এবং লীগে গ্রীয়ারের বিপক্ষে ৩৩ রানে ৪ উইকেট, পার্সীর বিপক্ষে ৪৫ রানে ৩ উইকেট এবং অরোরার বিপক্ষে ২৫ রানে ৩ উইকেট লাভ করেন তিনি। আশা করি আসামের বিপক্ষে ভাস্কর গুপ্তকে অন্তত দেখবেন নির্বাচকেরা।

ব্যাটসম্যানদের মধ্যে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সুজিত গুহ, স্পোর্টিং ইউনিয়নের শিবাজী রায় এবং কালীঘাটের কল্যাণ সেন, আর অলক মজুমদারের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। অলক মজুমদার এই মরশুমে একটি সেঞ্চুরী করেছেন রাজস্থানের বিপক্ষে, পুলিশের বিপক্ষে ৮০ নট আউট, লীগে গ্রীয়ারের বিপক্ষে করেছেন ৯০ রান। ক্যালকাটা জিমখানার বিপক্ষে একটি প্রদর্শনী খেলায় অলক মজুমদার ৭৭ রান করেন, সেইদিন জিমখানায় খেলেন বিহারের আনন্দ শুক্লা এবং রমেশ সাক্সেনা। কালীঘাটের তাপস রায় বাংলা দলে স্থান পেয়েছেন বটে কিন্তু তাঁর মত অভিজ্ঞ খেলোয়াড়কে অন্তত একাদশে সুযোগ দেওয়া উচিত। কল্যাণ সেনের দুর্ভাগ্য—ভাল ব্যাটসম্যান এবং একজন সুন্দর ফিল্ডার হওয়া সত্ত্বেও তিনি উপেক্ষিত হলেন। আশা করা যায় ভবিষ্যতে বাংলার নির্বাচকমণ্ডলী উপরোক্ত খেলোয়াড়দের প্রতি দৃষ্টি দেবেন।

—অভিজিৎ সিন্‌হা

বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট

পূর্বাঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা সুরু হয়েছে কটকের বরবাটি স্টেডিয়ামে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনায়ক মনোনীত হয়েছেন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের দেব মুখার্জী। কিন্তু প্রথম দুটি খেলায় দেব মুখার্জী বিশ্ববিদ্যালয় দলকে সাহায্য করতে পারবেন না; কারণ ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে পূর্বাঞ্চল-মধ্যাঞ্চল সম্মিলিত দলের পক্ষে অংশগ্রহন করার জন্য বর্তমানে ইন্দোরে আছেন। অধিনায়ক দেব মুখার্জীর অনুপস্থিতিতে কলকাতা দলের অধিনায়কত্ব করবেন আশুতোষ কলেজের কল্যাণ সেন। এবারের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলে আছেন : মুখার্জী (অধিনায়ক);

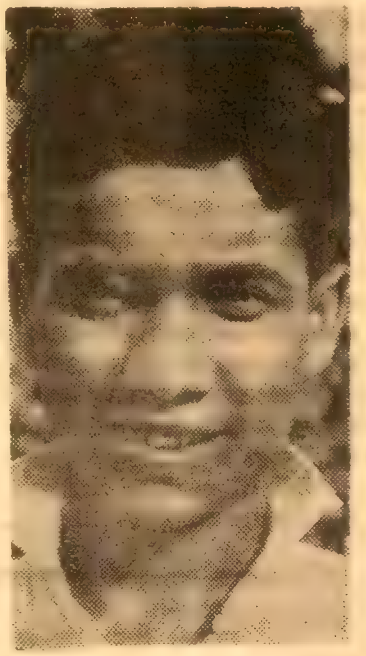

নবীন মুখার্জী

কল্যাণ সেন

কলকাতার দ্বিতীয় টেস্টে ভারতীয় দলে আছেন নিম্নলিখিত খেলোয়াড়রা। পতৌদি, জয়সীমা, বেগ, দুরানী, কুন্দেরন, সরদেশাই, ভেঙ্কট রাঘবন, বোরদে, সুব্রত গুহ, সুতী, হনুমন্ত, সুব্রহ্মাণিয়ম, ওয়াদেকার, ইঞ্জিনিয়ার এবং চন্দ্রশেখর।

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ এবং প্রধানমন্ত্রী একাদশে যোগদানকারী উত্তরাঞ্চলের তরুণ স্পিন বোলার অসামান্য বোলিং নৈপুণ্য প্রদর্শন করায় কলকাতায় টেস্ট দলের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ পেয়েছেন।

বাংলা দুটি খেলাতেই বিজয়ী

ইডেন উদ্যানে অনুষ্ঠিত রঞ্জী ট্রফির দুটি খেলায় বাংলা পরাজিত করল বিহার এবং উড়িষ্যাকে। বিহার পরাজিত হয় প্রথম ইনিংসের ফলাফলে এবং উড়িষ্যা এক ইনিংস ও ২১৬ রানে। বিহারের বিপক্ষে বাংলা প্রথম ইনিংসে করে ৩২৯ রান। বাংলা দলে নবাগত তরুণ খেলোয়াড় রবীন মুখার্জী বাংলার পক্ষে প্রথম আবির্ভাবে সেঞ্চুরী করেন। ইতি-পূর্বে রবীন মু[illegible] অবশ্য রঞ্জী ট্রফিতে খেলেছেন ভারতীয় [illegible] দলের পক্ষে,

ভাস্কর গুপ্ত

শ্যামসুন্দর মিত্রও সেঞ্চুরী করেন। রবীন করেন ১১১ রান এবং শ্যামসুন্দর মিত্র অপরাজিত ১০৬ রান। আনন্দ শুক্লা লাভ করেন ৫টি উইকেট। বিহার প্রথম ইনিংসে সংগ্রহ করে ২৫০ রান। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রাজেন সান্যালের ৬৫ রান এবং কল্যাণ মিত্রের ৫৪ রান। বাংলার পক্ষে সুব্রত গুহ দখল করেন তিনটি উইকেট এবং এস কুণ্ডু ৪টি উইকেট। অবশিষ্ট সময়ে বাংলা ছয় উইকেটে ১৫১ রান করে। সুব্রত গুহ সংগ্রহ করেন সর্বোচ্চ রান ৪৪।

দ্বিতীয় খেলায় উড়িষ্যার বিপক্ষে; উড়িষ্যা দল প্রথম ইনিংস সুরু করে, কিন্তু সুব্রত গুহর মারাত্মক বোলিংয়ে ব্যাটিং বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে ইনিংস শেষ করে মাত্র ৯৪ রানে। একমাত্র খেলেন উড়িষ্যার জেনা ৫৩ রানে অপরাজিত থেকে। সুব্রত গুহ ৩৬ রানে দখল করেন দুটি উইকেট। বাংলা দল ৪ উইকেটে ৪৫১ রানে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। বাংলার পক্ষে দুটি সেঞ্চুরী করেন পঙ্কজ রায় এবং অম্বর রায়। পঙ্কজ রায় করেন ১৩১ রান আর অম্বর ১১৬ রান; দেব মুখার্জী সংগ্রহ করেন ৬৭ রান এবং শ্যামসুন্দর মিত্র অপরাজিত থাকেন ৫০ রানে। উড়িষ্যা দল দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করে মাত্র ১৪১ রানে; আবার অশোক জেনা সংগ্রহ করে ৬১ রান। জলি সরকার ১৮ রানে দখল করেন ৪টি উইকেট।

শ্যামসুন্দর মিত্র

কল্যাণ সেন (সহ-অধিনায়ক), শঙ্কর বোস, রবীন মুখার্জী, কল্যাণ ঘোষ (উইকেট রক্ষক), সুব্রত গুহ, সুপ্রকাশ সোম, পি দাসগুপ্ত, ডি পাঠক, এস দোসী, এস দে, গোপাল বসু, সুজয় গাঙ্গুলী, আলোক ঘোষ, সুবীর গাঙ্গুলী।

দ্বিতীয় টেস্টে সুব্রত গুহ মনোনীত

আমাদের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে, বাংলার মিডিয়াম পেস বোলার সুব্রত গুহ কলকাতার দ্বিতীয় টেস্টে ভারতীয় দলে পনেরো জনের মধ্যে স্থান পেয়েছেন। প্রবীণ টেস্ট খেলোয়াড় বাপু নাদকার্নীর পরিবর্তে ভারতীয় টেস্ট দলে সুব্রত গুহকে স্থান দেওয়া হয়েছে। ইন্দোরে ওয়েস্ট-ইন্ডিজ এবং পূর্বাঞ্চল-মধ্যাঞ্চলের সম্মি-লিত একাদশের খেলায় সুব্রতর সাফল্যের উপর তাঁর ভবিষ্যতের অনেক কিছুই নির্ভর করছে। অবশ্য বিশেষজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ মহলের ধারণা যে, সুব্রত গুহকে কলকাতা টেস্টে খেলানোর সম্ভাবনা প্রবল। আশা করা যায় সুব্রত গুহ সুযোগ লাভ করলে ভাল ফলাফল প্রদর্শন করতে পারবেন। সুব্রত গুহর পেছনে আছে বাংলার প্রতিটি ক্রীড়ামোদীর আন্তরিক সমর্থন এবং শুভেচ্ছা।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের

অমূল্য গ্রন্থরাজ

কালিসিংহ মহাভারত		— ১ম	— বোর্ড বাঁধাই (যন্ত্রস্থ)	—১২-০০
,, ,,		— ২য়	— ,,	—১০-০০
,, ,,		— ৩য়	— ,,	—১০-০০
,, ,,		— ৪র্থ	— ,,	—৬-০০
,, ,,		— ৫ম	— ,,	—৬-০০
বাল্মীকি রামায়ণ		— ১ম	— বোর্ড বাঁধাই	—৮-০০
,, ,,		— ২য়	— ,,	—৮-০০
কৃত্তিবাসী রামায়ণ			,,	—৮-০০
শ্রীরামচরিত মানস		— ১ম	— রি বাঁধাই	—২-০০
,,		— ২য়	— ,,	—২-০০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী	— উপন্যাস	— ১ম	— ,, যন্ত্রস্থ	—৩-০০
,,	— ,,	— ২য়	— ,,	—৩-০০
,,	— ,,	— ৩য়	— ,,	—৩-০০
,,	— সাহিত্য	— ১ম	— ,,	—৩-০০
,,	— ,,	— ২য়	— ,,	—৩-০০
,,	— ,,	— ৩য়	— ,,	—৩-০০
বাক্‌ভাষা	— উর্দু-ইংরাজী			—৩-০০
,,	— বাংলা-ইংরাজী		বোর্ড বাঁধাই	—৩-৫০
দীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলী		— ১ম	—	—২-০০
,, ,,		— ২য়	—	—২-০০
মানিক গ্রন্থাবলী		— ১ম	—	—২-০০
,,		— ২য়	—	—২-০০
মাইকেল গ্রন্থাবলী		— ১ম	— বোর্ড বাঁধাই	—৪০০
,,		— ২য়	— ,,	—৩-০০
দীনেন্দ্র গ্রন্থাবলী		— ১ম	— ,,	—৩-৫০
,,		— ২য়	— ,,	—৩-৫০
প্রেমেন্দ্র গ্রন্থাবলী		— -৷-	— ,,	—২-৫০
নৃপেন্দ্র গ্রন্থাবলী		— -৷-	— ,,	—৩-৫০
রামপদ গ্রন্থাবলী		— -৷-	— ,,	—৩-০০
রামনাথ গ্রন্থাবলী		— -৷-	— ,,	—৩-০০
শিবরাম গ্রন্থাবলী		— -৷-	— ,,	—২-৫০
বিভূতি মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাবলী		— -৷-	— ,,	—৩-৫০
প্রভাবতী দেবী গ্রন্থাবলী		— -৷-	— ,,	—৩-৫০
শ্রীমদ্ভাগবত (পয়ার)		— -৷-	— ,,	—৫-০০
মীমাংসাদর্শন	(দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ)		প্রতি খণ্ড	—৮-০০

আমার দেখা মেয়েরা	— -৷-	— (বোর্ড বাঁধাই)	[illegible]
নেপোলিয়ান	— -৷-	— ,,	[illegible]
কবিকঙ্কণ চণ্ডী	— -৷-	— ,,	[illegible]
ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী	৪র্থ হইতে ৮ম	— প্রতি খণ্ড	[illegible]
শ্যাকাব্য পরিচয়		— (বোর্ড বাঁধাই)	[illegible]
বিদগ্ধ মাধব			[illegible]
জ্যোতিষ রত্নাকর			[illegible]
পরলোক			[illegible]
পরলোক ও প্রেততত্ত্ব			[illegible]
পরলোকরহস্য			[illegible]
প্রতাপাদিত্য		(বোর্ড বাঁধাই	[illegible]
মহারাজা নন্দকুমার		,,	[illegible]
ছত্রপতি শিবাজী		,,	[illegible]
সেক্সপীয়র গ্রন্থাবলী	— ১ম	—	[illegible]
,, ,,	— ২য়	— ,,	[illegible]
অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী		— ,,	[illegible]
ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী			[illegible]
কালিদাস গ্রন্থাবলী	— ১ম	— (বোর্ড বাঁধাই)	[illegible]
,, ,,	— ২য়	— ,, যন্ত্রস্থ	[illegible]
,, ,,	— ৩য়	— ,,	[illegible]
যৌনমনোদর্শন	— ২য়	— ,,	—৪-০০
,,	— ৩য়	— ,,	—৪-০০
,,	— ৪র্থ	— ,,	—৪-০০
,,	— ৫ম	— ,,	—৪-০০
,,	— ৬ষ্ঠ	— ,,	—৪-০০
মরুর বুকে মেঘনা		— ,,	—৩-০০
কুট্টনীমত		— ,,	—৪-০০
ক্রিয়াকাণ্ড বারিধি	— ১ম	—	[illegible]
চৈতন্যভাগবত			—৩-০০
ভক্তমাল গ্রন্থঃ			—৩-০০
যোগশাস্ত্র		— বোর্ড বাঁধাই	—৩-০০
আত্মানুসন্ধান			—২-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী	— ১ম	—	[illegible]
,, ,,	— ২য়	—	[illegible]
,, ,,	— ৩য়	—	[illegible]

দি বসুমতী প্রাইভেট, লিঃ

১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

...day, 28th December, 1966 SAPTAHIK BASUMATI Regd. No. C 71
Price : 25 Paise Gram : "BASUMATI" PHONE : 34-7771, 72, 73

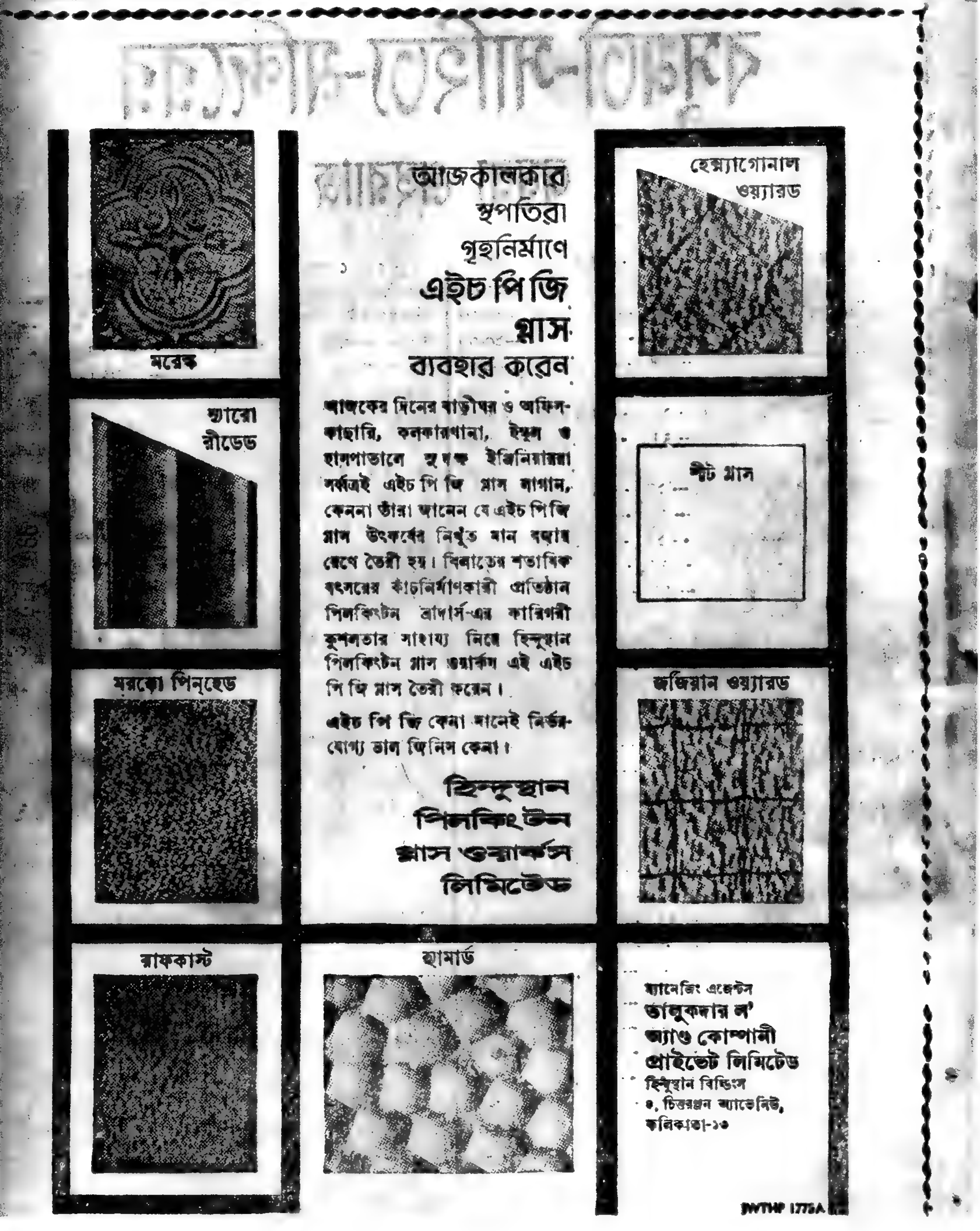

বসুমতী

পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন দলের নির্বাচনী অভিযান

বর্ষ ঃ ৩০শ সংখ্যা বৃহস্পতিবার, ২০শে পৌষ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ • 5th Jan., 1967 * Vol. 71, No.

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	১৮৫৯
আজকের মানুষ	...	১৮৬০
ভারতদর্শন	...	১৮৬১
আন্তর্জাতিক	...	১৮৬৫
অবক্তব্য	— চন্দ্রগুপ্ত	১৮৬৮
প্রত্যাশার মৃত্যু ও দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা	— কৃত্তিবাস ওঝা	১৮৬৯

সিল্ক ও তাঁত বস্ত্র
*
ছিট কাপড়

শৈলেলাল মনিলাল
বহুবাজার ১ শ্যামবাজার
ফোন ৩৪-২১২৬ ট্রামডিপোর দক্ষিণে

বিছানা
*
শাল ও আলোয়ান

বৈষ্ণব-সাহিত্যের অমূল্য অবদান

ভক্তিজগতের কৌস্তুভরত্ন, ভগদ্ভক্তগণের সাধনার ধন, ভক্তের তুলসী-মালা সদৃশ মহাপবিত্র ভক্তিশাস্ত্র সমন্বয়।

বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপ ও শিক্ষাষ্টক

শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীকৃষ্ণলাভের জন্য যে উৎকণ্ঠা, এই 'প্রলাপে' তাহা অভিব্যক্ত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত 'শিক্ষাষ্টক শ্লোকই' তাঁহার একমাত্র রচনা। শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামীর সুললিত পদ্যানুবাদে এই অমিয় মাধুরী লীলায়িত।

নরোত্তম বিলাস

বৈষ্ণবগণের পরম উপভোগ্য উপজীব্য ভক্তিচরিতামৃত।

দুর্লভসার

শ্রীচৈতন্যমংগল-রচয়িতা শ্রীল লোচনদাস বিরচিত, বৈষ্ণবগণের সংপূজিত।

আত্মতত্ত্ব

বৈষ্ণব দর্শনের সূক্ষ্যতম অনুসরণ।

মনঃশিক্ষা

শ্রীপ্রেমানন্দ দাস ঠাকুর বিরচিত। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত সাধন-ভজনের নিগূঢ় মর্মসমাহিত।

শ্রীচমৎকার চন্দ্রিকা

পরম পণ্ডিত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য পরম বৈষ্ণব শ্রীল কৃষ্ণদাসের সুললিত পদ্যানুবাদ।

পাষণ্ড-দলন

মূর্তিমান বৈরাগ্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বিরচিত প্রেমভক্তির লহর-লীলা।

ভক্তিতত্ত্বসার

হাটপত্তন, শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা, নাম-সংকীর্তন, চৌত্রিশ পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম, নরোত্তম দাসের প্রার্থনা, প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। সুলভে নামমাত্র মূল্যে বিতরিত।

মূল্য ঃ ৩ টাকা।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

মোহন মেলা

মূল্য এক টাকা

কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রধান কথা-শিল্পীর রস-সাহিত্য-সম্ভার ছাড়াও গল্পে ভরপুর।

—ইহাতে আছে—

গল্প—বৌদির দিনে, বুদ্ধদেবের বুদ্ধি, কাঠুরের কপাল, হাঙর মানুষের চোখের জল, ভুলুর ভুল, মুর্গী চাচা, বুদ্ধদেবের গল্প, একটার বদলে দুটো, নতুন সিনেমার ছবি, দাদুর গল্প, ইঁদুরের কীর্তিকাহিনী, বাঁদরের মেটুলিচচ্চড়ি।

ছড়া—হট্টমালার যজ্ঞবাড়ী, হোহোহো বৃষ্টি ঝরে, পালোয়ান প্যালারাম, উলটো বাজির দেশে, আজব দেশ, বাঁকা শ্যামের ব্যায়রাম, হাবুবাবুর মনের কথা, আদ্দি কালের বদ্দি বুড়ি।

প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী সূর্য রায় কর্তৃক সুচিত্রিত উপহার দিবার মত বই।

হংসেশ্বর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

মঞ্জুষা ২।০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ছাত্রবিক্ষোভ (প্রবন্ধ)	— বিনোদবিহারী দত্ত	১৮৭১
সাহিত্য সম্মেলন	— ...	১৮৭৭
বাজনা বাজে (কবিতা)	— শান্তনু দাস	১৮৭৯
সুবর্ণলতা (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— আশাপূর্ণা দেবী	১৮৮০
স্মৃতি (কবিতা)	— সন্তোষকুমার অধিকারী	১৮৮৩
আরো কতো সুনিবিড় (কবিতা)	— নীহারকান্তি ঘোষদস্তিদার	১৮৮৩
বঙ্গদর্শন	...	১৮৮৪
বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু (প্রবন্ধ)	— ডঃ ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক	১৮৮৯
একটি আদর্শ দাও (প্রবন্ধ)	— পান্নালাল দাশগুপ্ত	১৮৯৩
শয়তানের চাকা (গল্প)	— সৈয়দ মোস্তাফা সিরাজ	১৮৯৬
ছাত্র অশান্তির কারণ ও প্রতিকার (প্রবন্ধ)	— নারায়ণ চৌধুরী	১৯০০
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	১৯০৪
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	— শিলালি	১৯১১
রঙ্গজগৎ	...	১৯১৩
খেলাধূলা	— শ্রীঅমিতাভ	১৯১৮

শ্রীমদ্ভাগবত

প্রাচীন ভক্তদের রচিত সুললিত বাংলা পয়ারে

মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র

এই সুবৃহৎ গ্রন্থে আছে—শ্রীল সনাতন গোস্বামীর 'ভাগবতামৃত' গ্রন্থের কবিচন্দ্রের বঙ্গানুবাদ এবং শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়তম ভাগবতাচার্য্য রঘুনাথ পণ্ডিতের প্রেমতরঙ্গিনী।

ইহাতে আছে দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ
শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভাগবতামৃতের অনুবাদ
কবিচন্দ্রের
শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত
এবং
ভাগবতাচার্যের বিশ্বপ্রসিদ্ধ
শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী

সমগ্র ভারতে প্রথম বঙ্গানুবাদ

"...শুনিয়া তাহার ভক্তিযোগের পঠন।
আবিষ্ট হইল গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥"

ইহা কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারতের ন্যায় বাংলার প্রতি গৃহস্থের অবশ্যপাঠ্য হউক, এই নিবেদন। এই মূল্যবান গ্রন্থ বাংলার প্রতি ঘরে প্রতিষ্ঠিত করুক।

সাহিত্য-সম্রাট—বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের ঋষি

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

—উপন্যাস—

দ্বিতীয় খণ্ড :—দুর্গেশনন্দিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, ইন্দিরা, রাধারাণী, সীতারাম। মূল্য—তিন টাকা

তৃতীয় খণ্ড:—আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা, দেবী চৌধুরাণী। [সচিত্র] মূল্য—৩, টাকা।

—সাহিত্য—

প্রথম খণ্ড :—কৃষ্ণচরিত্র, লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ (১ম)। মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড :—(১ম ভাগ অনুশীলন), মুচিরাম গুড়, বিবিধ প্রবন্ধ (২য়), বিজ্ঞান রহস্য। মূল্য—তিন টাকা

তৃতীয় খণ্ড :—শ্রীমদ্ভগবদগীতা, কমলাকান্ত, সাম্য, সাহিত্য-প্রসঙ্গ, মানস, ললিতা। মূল্য—তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

৭১ বর্ষ : ৩০শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পয়সা | বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত | Price : 25 Paise
বৃহস্পতিবার, ২০শে পৌষ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ | সাপ্তাহিক পত্রিকা | Thursday, 5th January, 1967

ইডেন উদ্যানে নারকীয় পুলিশী তাণ্ডব

আমরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বাস করছি না, পুলিশী রাষ্ট্রে? গত রবিবার ক্রীড়ামোদী জনসাধারণের সমস্ত শুভেচ্ছাকে পদদলিত করে ইডেন উদ্যানে পুলিশবাহিনী যে উন্মত্ত আচরণ করেছে, তা আমাদের সে কথাই মনে করিয়ে দেয়।

এতোকাল এ কথাই প্রচার করা হোত যে, পুলিশবাহিনী আন্দোলনকারীদের উস্কানির ফলেই লাঠি চার্জ করে, কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে এবং জনতার ওপর গুলীবর্ষণ করে। কিন্তু ইডেন উদ্যানে দ্বিতীয় দিনের ক্রিকেট খেলার সূচনায় পুলিশ দর্শকদের ওপর বেপরোয়া লাঠি চালিয়ে এবং কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, অপর পক্ষের কোনরকম উস্কানি তাদের জন্যে দরকার হয় না। তাদের ইচ্ছা বা অভিপ্রায় হলেই অসহায় মানুষের ওপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। এবার পুলিশী তাণ্ডবের সম্মুখীন হয়েছে যারা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, তারা কেউই কোনো পেশাদার আন্দোলনকারী বা রাজনৈতিক দল নয়, বরং ক্রীড়ামোদীর অধিকাংশই বিত্তবান বা অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত। সুতরাং এ কথা এখন স্পষ্টত প্রমাণিত হোল যে, কলকাতার পুলিশবাহিনী জনসাধারণের কল্যাণের জন্য নিযুক্ত নয়। তাদের একমাত্র কাজ নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী সাধারণ মানুষের ওপর লাঠি চার্জ করা, কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়া এবং গুলী মারা। ইডেন উদ্যানে পুলিশ যে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে, তা গুণ্ডামিরই নামান্তর। আর এই পুলিশবাহিনীর পরিচালনায় যিনি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন—সেই পুলিশ কমিশনার সাহেবও নির্দোষ নয়। আন্তর্জাতিক এই খেলার মাঠে তাদের কুকীর্তির ফলে ভারতের সুনাম বৃদ্ধি পায় নি। গোটা ভারত আজ লজ্জায় অবনমিত। পুলিশের কলঙ্কজনক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে এ ককথাও আজ অনায়াসে বলা যায় যে, বিদেশ থেকে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন খেলোয়াড়রা হয়তো ভবিষ্যতে এখানে আসতে ভীত সন্ত্রস্ত হবেন। কারণ খেলার মাঠে পুলিশী তাণ্ডবের ফলে বিদেশী খেলোয়াড়দের জীবনও নিরাপদ নয়।

বিদেশীদের কাছে মুখরক্ষার জন্যে সরকার হয়তো মামুলি তদন্তের একটা প্রহসন করবেন। কিন্তু ক্রিকেট খেলা নিয়ে পুলিশী মারের সঙ্গে ক্রিকেট এসোসিয়েশন অব বেঙ্গল-এর যে কীর্তিকলাপ তার একটা ফয়সালা সে তদন্তের ফলাফলের মাধ্যমে সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। কারণ সি, এ, বি, কর্তৃক টিকিট বিক্রি সম্পর্কে প্রতি বছরই নানা অভিযোগ ওঠে। সি, এ, বি, ক্ষমতায় এমনই মদমত্ত যে জনসাধারণের কোনো অভিযোগে তারা কর্ণপাত করার প্রয়োজন মনে করে না। সে অভিযোগকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য জ্ঞান করার ফলে এ বছরের ক্রিকেট খেলার মাঠে তাদের অব্যবস্থাজনিত কুকীর্তি পাহাড়-প্রমাণ বলা যেতে পারে। ধরাকে সরা জ্ঞান করার জন্যেই এবং কোনো বন্দোবস্ত করতে অসমর্থ হওয়ায় পুলিশের ওপর সি, এ, বি দর্শক সামলাবার ক্ষমতা দিয়েছিলেন—তাই পুলিশ বিনা উস্কানিতেই দর্শকদের লাঠিপেটা করেছে।

সি, এ, বি, প্রতি বছর দর্শক সংখ্যার একটা হিসাব দেন। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীরা ভালোভাবেই জানেন যে, তাদের দেওয়া হিসেবের সঙ্গে খেলার মাঠে উপস্থিত দর্শকের সংখ্যার প্রায় আকাশ-পাতাল প্রভেদ। এই প্রভেদটা এবার সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার ফলেই সি, এ, বি দর্শকদের জন্য আসনের, এমন কি দাঁড়াবারও ব্যবস্থা করতে পারেন নি। যাঁদের দাঁড়াবার জন্যেও একটা ব্যবস্থা করা হয় নি, তাঁদের পুলিশ দিয়ে লাঠিপেটা করা—এক চমৎকার ব্যবস্থা! খেলার ইতিহাসে এই ধরণের বিনা কারণে লাঠিপেটার কথা কেই বা চিন্তা করেছিল? কোনো পক্ষের জয়-পরাজয়-এর ব্যাপার নয়, অথবা টিকিট ক্রয় সংক্রান্ত কোনো ঘটনা নয়, সি, এ, বি, কর্তৃপক্ষ আগেভাগে টিকিট বিক্রি করে দর্শকদের দাঁড়াবার ব্যবস্থা করতে অক্ষম হয়ে শেষ পর্যন্ত পুলিশ লেলিয়ে খেলার মাঠে অভিনব গৌরব সঞ্চার করেছেন!

আমাদের মনে হয় এইভাবে ক্রিকেট খেলার আর প্রয়োজন নেই। হয়তো টিকিটের দাম ফেরৎ (টিকিটের দাম যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ফেরৎ দেওয়া হলে অনেক কারচুপি হয়তো ধরা পড়বে) দেবার ভয়ে খেলা আবার সুরু করা হবে। নতুন বছরের প্রথম দিনে রক্তাক্ত মাঠের ওপর পুনরায় খেলা আরম্ভের ব্যবস্থা না করে বরং খেলা বন্ধ রেখে সরকার মূল্য ফেরৎ বাবদ টিকিটগুলি সঞ্চয় করুন। সেইভাবে টিকিট সংগ্রহ না হলে আসল রহস্য ধরা পড়া সম্ভব নয়, এবং তা সম্ভব না হলে তদন্তই প্রহসনে পরিণত হবে। তবে সর্বাগ্রে যা করা প্রয়োজন তা হচ্ছে এই যে সি, এ, বি-র বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা অবলম্বন করা। সি, এ, বি, যদি বহাল তবিয়তেই থাকে তাহলে তদন্তের নামে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি কেঁচে গণ্ডূষের ব্যবস্থা করবেন।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

"The longer this local war (in Vietnam) is carried on, the greater the danger. It may escalate into an atomic third world war." বলেছেন বিশ্ব-বিশ্রুত ঐতিহাসিক-দার্শনিক অধ্যাপক আর্নল্ড টয়েনবী। ইনি আরো বলেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেন উত্তর ভিয়েৎনামে বোমা বর্ষণ এখুনি বন্ধ করে এবং ভিয়েৎকং অধিকৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধারের দুশ্চেষ্টা থেকে বিরত হয়। ধ্বংসের হাত থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করার স্বার্থে আমেরিকার উচিত ভিয়েৎনামের যুদ্ধ শেষ করে দেওয়া এবং এ ব্যাপারে সোভিয়েট য়ুনিয়নের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করা। এই দুই রাষ্ট্র যদি বিশ্ব সরকার গঠন করে তবে যুদ্ধের আশংকা আর থাকে না বলে তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন টয়েনবী।

কথাগুলো বলার হক্ ডঃ টয়েনবীর অবশ্যই আছে, এবং ও'র মতামত, ভবিষ্যদ্বাণীর মূল্য অপরিসীম বলেই আমেরিকাকে চিন্তা করতে হবে তার ব্যর্থ ভিয়েৎনাম নীতি সে পাল্টাবে কিনা। কারণ ডঃ টয়েনবী প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি করেন না যে তিনি রাজনীতিবিদের দৃষ্টিকোণ থেকে ভিয়েৎনাম যুদ্ধের প্রশ্নটিকে বিচার করবেন, তিনি মূলত ইতিহাসবিদ, তাই বিচারধারা তাঁর নিরপেক্ষ, স্বার্থহীন এবং নিস্পৃহ। টয়েনবী প্রকৃত অর্থেই মানবপ্রেমিক, পারিবারিক সূত্রেই। যুদ্ধের ধ্বংসলীলা তিনি দেখেছেন শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষের রূপালী পর্দায় নয়, কিম্বা টেলিভিসন-সেটের কাঁচেও নয়, একেবারে কাছে গিয়ে। তুর্ক-গ্রীক যুদ্ধে তিনি সে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। দুটো বিশ্বযুদ্ধই তাঁর চোখের ওপর দিয়ে ঘটে গিয়েছে। আর যুদ্ধ-কাহিনী? কেবল দু'চারটে নয়, শত-সহস্র ছোট-বড় সংগ্রামের কাহিনীর সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত এবং শুধু মানুষের হিংস্র রূপটাই নয়, সমগ্র মানব সভ্যতা, তার সংস্কৃতি, তার বিকাশ, তার পতন-অভ্যুদয়ের হাজার হাজার কাহিনী ডঃ টয়েনবী নিজে লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ভিয়েৎনামের যুদ্ধ ও তার পরিণাম সম্পর্কে ডঃ টয়েনবী যতখানি জোর করে বলতে পারেন অতখানি বিদ্যের দৌড় এবং মনের জোর সারা দুনিয়ায় খুব কম পাণ্ডিতেরই আছে।

বলা চলে, পাণ্ডিত্যে টয়েনবীর জন্মগত অধিকার। বাবা ছিলেন সেদিনের নামকরা সমাজসেবী, মা ইংলন্ডের প্রথম ক'জন মহিলা গ্র্যাজুয়েটদের অন্যতমা। গোটা পরিবারটাই ছিলো বিদ্বানদের, মানবপ্রেমিকদের। ইতিহাস অধ্যয়নের প্রেরণা পান তিনি মা'র কাছেই, এক ঠাকুর্দার কাছে—যিনি আবার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন—দেশ-ভ্রমণের নেশায়। উইনচেস্টার আর অক্সফোর্ডের বেলিয়ল কলেজে ইতিহাস পড়লেন টয়েনবী, স্কলারশিপ পেয়েছিলেন দুটো কলেজেই। কিন্তু কেবল পুঁথি পড়ে মন ভরলো না তাঁর, বই পড়ে ঐতিহ্যমণ্ডিত গ্রীস-তুরস্ককে জানা শেষ হলো বলে মনে করতে পারলেন না তিনি, সীমাহীন আগ্রহ আর অনুসন্ধিৎসা নিয়ে তিনি ভূমধ্যসাগরাভিমুখে রওনা দিলেন। এক বছর ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন

আর্নল্ড টয়েনবী

গ্রীস, তুরস্ক। ভবিষ্যৎ জীবনের পুঁজি সঞ্চয় করলেন টয়েনবী।

ইংল্যান্ড ফিরে টয়েনবী অধ্যাপনা সুরু করলেন বেলিয়ল কলেজেই; বিষয়ঃ অবশ্যই প্রাচীন গ্রীস এবং তুরস্কের ইতিহাস! প্রাচীন ও আধুনিক তুরস্ক (কোন দেশই বা নয়?) সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান এত গভীর যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁকে লন্ডনের বৈদেশিক দপ্তরে তুরস্ক বিষয়ক বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দেওয়া হয়েছিলো। যুদ্ধের পর ১৯১৯ সনের প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে তাঁকে ব্রিটিশ প্রতিনিধিমণ্ডলীতে মধ্য-প্রাচ্য বিভাগের সদস্য করে পাঠানো হয়েছিলো। ফিরে এসে পেলেন তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইজাইন্টাইন ও আধুনিক গ্রীক সমীক্ষা বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের কাজ। কিন্তু স্থির হয়ে অধ্যাপনা করতে পারলেন না তিনি, তাঁকে ছুটতে হলো রণক্ষেত্রেঃ গ্রীক-তুর্ক যুদ্ধ। বিখ্যাত 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকা সেদিন টয়েনবী ছাড়া আর কারোর কথা ভাবতে পারে নি দুই জাতির লড়াইয়ের নির্ভরযোগ্য তথ্যসমৃদ্ধ সংবাদ পাঠানোর যোগ্যতার বিষয়ে। অধ্যাপক টয়েনবীর কাছেও এ যুদ্ধ বিরাট সুযোগ এনে দিয়েছিলোঃ এতদিন তিনি দুই জাতির প্রাচীন ঐতিহ্য, তার শান্ত ছবিই দেখেছেন, লড়াইয়ের ময়দানে তারা কেমন করে তা না দেখলে, না জানলে সে জাতি সম্পর্কে জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় কি?

ফিরে এসে টয়েনবী সদ্যপ্রতিষ্ঠিত রয়্যাল ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল এ্যাফেয়ার্স সংস্থায় যোগ দিলেন ১৯২৪ সালে, পরের বছর সমীক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর। সঙ্গে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক ইতিহাস বিভাগের রিসার্চ অধ্যাপকের পদও রাখলেন ১৯৫৫ সন পর্যন্ত। রয়্যাল ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সমীক্ষাগুলো অল্পদিনের মধ্যেই যে বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলো তার অনেকখানি গৌরবই অধ্যাপক টয়েনবীর প্রাপ্য।

প্রচুর বই লিখেছেন টয়েনবী, প্রধানত ইতিহাস সম্পর্কিত, কিন্তু সভ্যতা, সংস্কৃতি এমন কি ধর্ম বিষয়েও। ডঃ টয়েনবীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হলোঃ A Study of History; Greek Historical Thought; Civilisation on Trial; The World and the West; An Historian's Approach to Religion; East to West; A Journey Round the World; Hellenism: History of Civilisation ইত্যাদি। তাঁর কয়েকটি খেতাব হচ্ছেঃ ফেলো অফ দি ব্রিটিশ অ্যাকাডেমি; কম্পেনিয়ন অফ অনার ইত্যাদি।

পিতা হিসাবেও ডঃ টয়েনবীর গর্ব বোধ করার কারণ রয়েছে। তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রী রোসালিন্ড ছিলেন বিখ্যাত অধ্যাপক গিলবার্ট মারে'র কন্যা। প্রথম পক্ষের দুই ছেলের মধ্যে বড় ফিলিপ একজন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ও সাংবাদিক; ছোট লরেন্স শিল্পী ও শিল্পশিক্ষক। ভেরনিকা বুল্টার টয়েনবীর শুধু সহধর্মিণীই নন, সহমর্মিনী এবং সহকর্মিনীও বটেন—রয়্যাল ইনস্টিটিউটের বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজে স্বামী-স্ত্রীর যৌথ স্বাক্ষর রয়েছে।

লিখিত প্রতিশ্রুতি এবং প্রেস্টিজ

প্রধানমন্ত্রীর মধ্যস্থতা নয় সন্ত ফতে সিং জানিয়েছেন, তাঁকে আত্মাহুতির থেকে নিবৃত্ত করার জন্য লিখিত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তাঁর দাবি মেনে নেওয়া হবে বলে। অর্থাৎ চণ্ডীগড় এবং ভাকরা চলল পাঞ্জাবের দখলে। যদিও চণ্ডীগড়ের ওপর হরিয়ানার দাবিই স্বীকৃতিলাভ করেছিল। সন্তজী (আত্মাহুতির হুমকী দিয়ে) লিখিত প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছেন বলে দাবি করছেন, তবে প্রতিশ্রুতি কে বা কারা দিয়েছেন একথা স্পষ্ট করে ঘোষণা করেন নি। কিন্তু চণ্ডীগড় আদায় চূড়ান্ত না হলে সন্তজীর পক্ষে সঙ্কল্প ত্যাগ খুব সহজ হ'ত না। তিনি এবং তাঁর সহগামীরা অনশন ও আত্মাহুতির সংকল্পে ইস্তফা দিচ্ছেন শুনেই তো এক শ্রেণীর মানুষ 'না' 'না' করে চীৎকার করে উঠেছিল। সন্তজী নিজেই এদের সম্পর্কে বলেছেন যে, এরা দাবি আদায়ের থেকে জ্যান্ত মানুষ পুড়িয়ে মারার উত্তেজনাকে অনুভব করবার জন্য অধিকতরভাবে আগ্রহী ছিল। আশ্চর্য হওয়ার কারণ নেই, মানুষের মধ্যে রোমক বীভৎস মানসিকতা এখনও বর্তমান আছে। কুস্তি বক্সিং প্রতিযোগিতায় একজনের ওপর আর একজনের নির্দয় আক্রমণ দেখে দর্শক উত্তেজনায় লাফিয়ে ওঠে। সন্তজীর মতো বিচক্ষণ এবং সুবুদ্ধিসম্পন্ন নেতার অতঃপর এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা উচিত যে তাঁর আত্মাহুতির সংকল্প কী পরিমাণে মধ্যযুগীয় শোণিতলোভীদের চাঙ্গা করে তুলেছিল। দেশে এই শ্রেণীর বীভৎস মানসিকতা যাতে উত্তেজনার খোরাক না পায়, অতঃপর সেদিক চিন্তা করেও আজকের আন্দোলনে মধ্যযুগীয় বর্বর বীভৎসতাকে নিশ্চয় আর কোন ব্যক্তি বা দল টেনে আনবেন না।

সন্ত ফতে সিং-এর এমন একটি সংকল্প বা পথ না গ্রহণ করলেও চলত। এ পথ অবলম্বনের আসল উদ্দেশ্য ছিল সরকারকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে ফাঁকতালে এবং অবিলম্বে দাবি আদায় করে নেওয়া। সন্তজী যে লিখিত প্রতিশ্রুতির কথা বলেছেন তা যদি তেমন তেমন মহল থেকে এসে থাকে, তবে বলতেই হবে সন্তজী সরকারী কর্তৃপক্ষের মাথা ঘুরিয়েই দিয়েছেন। আর তার ফলে পাঞ্জাব রাজনীতিতে তাঁর নিজের আসন পাকা করে নির্বাচনে তুড়ি মেরে তাঁর দলবলকে পারে তুলতে পারবেন। সন্তজীর বিশ্বাস চণ্ডীগড় পাঞ্জাবে এসেই গেছে। বাকি যা মানা হয়েছে তা তো সরকারী তরফেরই প্রস্তাব আর নতুন কোন ব্যাপার নয়। হরিয়ানা পাঞ্জাবের সাধারণ (কমন) যোগসূত্র ছিন্ন করতে কেন্দ্রীয় সরকার আগেই রাজী ছিলেন। বিরোধীয় অঞ্চলগুলির জন্য কমিশন গঠনেও আপত্তি ছিল না। কিন্তু সন্তজী সে সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অতঃপর শেষ মুহূর্তে তাঁর অতি নাটকীয় পরিস্থিতিকে একেবারে এ্যান্টি ক্লাইম্যাক্সে পেড়ে ফেলার পেছনে একেবারেই যে শুধু মৃত্যুভয় কাজ করেছে এমন কথা না ভাবলেও চলে। বিশেষ সন্তজী যখন লিখিত প্রতিশ্রুতির ব্যাপারটা ফাঁসই করে দিয়েছেন।

সন্ত ফতে সিং অনশন ভঙ্গ করছেন

তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল: কোন লিখিত প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন?

: হ্যাঁ। সরাসরি জবাব দিয়েছেন সন্ত ফতে সিং।

কোন লিখিত প্রতিশ্রুতি নয়

কিন্তু গত বুধবার দিনই কেন্দ্রীয় সরকারী মুখপাত্র, পাঞ্জাব হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীদ্বয় এবং লোকসভার অধ্যক্ষ শ্রীহুকুম সিং একবাক্যে সন্তজীর দাবিকৃত লিখিত প্রতিশ্রুতির অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। রাজধানীর সরকারী মুখপাত্র আরও একধাপ ওপরে সুর তুলে বলেছেন, লিখিত দূরের কথা মৌখিক প্রতিশ্রুতিও কিছুমাত্র দেওয়া হয় নি।

সন্তজী তাহলে কার কাছে প্রতিশ্রুতি পেলেন? পরবর্তী পরিস্থিতিতে এ প্রশ্নের সরাসরি জবাব অবশ্য সন্ত ফতে সিং দিতে পারেন নি। সরকারীভাবে অস্বীকৃত সন্তজীর দাবিকে এই মুহূর্তে সন্তজীর পক্ষে প্রতিষ্ঠা দেওয়া খুব সুখের ব্যাপার নয়। সন্তজী যদিও এমন কোন প্রতিশ্রুতি পেয়ে থাকেন, প্রতিশ্রুতিপ্রদানকারী দুর্বলতার মুখ চেয়ে তা চেপে যাওয়াই তাঁর পক্ষে প্রথমাবধি উচিত ছিল। কিন্তু যে অতিনাটকীয় ব্যাপার তিনি সংঘটিত করে তুলেছিলেন, তাতে নিজের মুখরক্ষার জন্যও অন্তত সন্তজীকে চমকপ্রদ ঘটনাটির আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। এখন সন্তজী ব্যাপারটা স্রেফ চেপে যাচ্ছেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সরাসরি জবাব ভাঙেন নি। তবে এ বিষয়ে একটা ইঙ্গিত রাখার চেষ্টা করেছেন।

সন্তজী বলছেন, প্রথম দিকে সরকারী মুখপাত্র তো একথাও বলেছিলেন যে শ্রীহুকুম সিং-এর মধ্যস্থতার ব্যাপারে সরকার কোনও পক্ষ নন। কিন্তু ঘটনা যাই হোক, সন্তজীর বিশ্বাস, কেন্দ্রীয় সরকার সন্তজীর দাবি মেনেই নিয়েছেন। শ্রীহুকুম সিং আকাল তখন স্পর্শ করে যে প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছিলেন, সন্ত ফতে সিং তা আবৃত্তি করে শোনান। শ্রীহুকুম সিং বলেন: Standing on holy Akal Thakt, I say *of my own* that Chandigarh and Bhakra *are part of Punjab and will come to Punjab.* (বাঁকা হরফ আমাদের)।

শ্রীসিং-এর বয়ান লক্ষ্য করলে মনে হয় শ্রীসিং 'অব মাই ওন' শব্দত্রয়ের দ্বারা

নিজেকে কোনরকম সরকারী প্রতিশ্রুতির বাইরেই আনতে চেয়েছিলেন। চণ্ডীগড় ভাকরা পাঞ্জাবের অংশ এবং পাঞ্জাবেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। এ কথাগুলিও কথার মারপ্যাঁচে ধোঁকার সৃষ্টি করে। শ্রীহুকুম সিং-এর এ সবই নিজস্ব বিশ্বাস হতে পারে এবং তিনি যদি বলেন সেই বিশ্বাসই তিনি পবিত্র আকাল তখতে দাঁড়িয়ে প্রকাশ করে এসেছেন, তবে বলবার কিছু নেই। অন্তত সন্ত ফতে সিং যদি এইটুকুই শ্রীহুকুম সিং-এর তরফে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বয়ান বলে তুলে ধরতে চান, তবে বলতে হয়, এর দ্বারা কেবলমাত্র শ্রীহুকুম সিং-কেই তুলে ধরা যায়। বলা যায়, দেখ হে দেখ, স্বয়ং লোকসভার অধ্যক্ষেরও বিশ্বাস, চণ্ডীগড় ভাকরা পাঞ্জাবের।

ইতিপূর্বে, প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে সরকারের ওপর আস্থা আছে কি না এ প্রশ্নের জবাবে শ্রীফতে সিং বলেছিলেন ঃ প্রশ্নটা সরকারী প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস আছে কি নেই, তা নয়। প্রতিশ্রুতি এবং আশ্বাসের একটা অর্থ, একটা আলাদা মূল্য আছে।

এবং তার পরেই কথাটা ভেবেছিলেন, হ্যাঁ, লিখিত প্রতিশ্রুতিই তিনি পেয়েছেন। খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা। প্রধানমন্ত্রীকে মধ্যস্থ খাড়া করা হবে সেই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য যে প্রশ্নের ওপর ইতিমধ্যেই লিখিত প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হয়েছে! কিন্তু তাছাড়া সরকারের পক্ষে দ্বিতীয় কোন পথ খোলা ছিল না। ছয় শিষ্যসহ সন্ত ফতে সিং যদি বৈশ্বানর আলিঙ্গন করে বসতেন তবে না-জানি কী কাণ্ডই হ'ত। রাজধানী দিল্লী এ ধাক্কায় শেষ মুহূর্তে সত্যিই ভেঙে পড়েছিল। হুমকীর কাছে নত হব না, একথা তখন আর পুনরুচ্চারণের অবসর নেই। হুকুম সিংকে তাই ছুটতে হয়েছে স্বর্ণমন্দিরে। কথাও দিয়ে আসতে হয়েছে ঠিকই। কিন্তু এখন সমস্ত ব্যাপারটায় একটা গুলতানির আবরণ না টানলে সরকারের মুখরক্ষা হয় না। হরিয়ানা হিমাচল পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রিগণ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বসে কতদূর আর কথা কাটাকাটি করবেন। চণ্ডীগড় ভাকরাকে এখন একটা সাজানো প্রেস্টিজের মোড়কে পুরে সন্ত ফতে সিংকে উপহার দিতে হবে।

খেলাটা সুন্দরভাবেই শেষ হতে পারত যদি সন্তজী গোপন লিপির অস্তিত্ব প্রকাশ না করতেন। কিন্তু আগেই বলেছি, তিনিই বা কী করবেন। প্রেস্টিজের পোষাকটা তো তাঁর গায়েও জড়ানো চাই।

সরকার আন্দোলনের সঙ্গে বহু ক্ষেত্রে বহুবার প্রেস্টিজের লড়াই করেছেন। সন্ত ফতে সিং ভার্সেস সরকার যে প্রেস্টিজ গেম দেখালেন তা একটি চমৎকার নাটক সৃষ্টি করে জোর নাড়া দিয়ে গেল।

রাজস্থান ঃ

কালা বটে কালো নই

রাজস্থানে কংগ্রেসত্যাগী সদস্যগণ জনতা পার্টি গড়বার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চারজন দলত্যাগী এম এল এ কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন করেছেন বলে সংবাদ। তথাচ জনতা পার্টি গঠিত হয়েছে এবং জনতা পার্টি ইতিমধ্যেই বিরোধী দলগুলির সঙ্গে আসন ভাগাভাগির জন্য কথাবার্তা শুরু করে দিয়েছেন।

জনতা পার্টির লক্ষ্য কি, সাংবাদিক সম্মেলনে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হলে নতুন দলের সভাপতি শ্রীরামকরণ যোশী বলেছেন, কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁদের কোন নীতিগত বিরোধ নেই। তাঁরা কংগ্রেসীই তবে দুর্নীতিপরায়ণ কংগ্রেসী নন। রাজস্থানে দুর্নীতির পাণ্ডা হলেন, শ্রীযোশীর ব্যাখ্যায়, রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুখাদিয়া। সুতরাং শ্রীসুখাদিয়াকে হটানোই জনতা পার্টির মুখ্য লক্ষ্য। শ্রীযোশী বলেছেন, সুখাদিয়া ক্ষমতাচ্যুত হলে তারপর কে সরকার গঠন করলেন তা নিয়ে তাঁর নতুন দলের কোনই মাথাব্যথা নেই।

শ্রীসুখাদিয়া

এই অদ্ভুত নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত কোন একটি দল যে স্থায়ী রাজনৈতিক দল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠায় ব্যাকুল নয় তা প্রথমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শ্রীসুখাদিয়া যদি ক্ষমতাচ্যুত হ'ন তবে তার পরদিন থেকেই জনতা পার্টির আর কিছুই করণীয় থাকবে না। শ্রীযোশীর ভাষণে শ্রীসুখাদিয়ার প্রতি যে বিরাগ প্রকাশিত হয়েছে সেই বিরাগের উৎসমুখ দুটি (এক) তিনিই দুর্নীতির রক্ষক (দুই) তিনি শ্রীযোশী ও তাঁর সহগামীদের মনোমত প্রার্থী নির্বাচিত করেন নি। মূলত কংগ্রেস সম্পর্কে শ্রীযোশীর যেন কোনই বক্তব্য নেই। তিনি শুধু মেনন ও গুলজারিলাল নন্দার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলেছেন যে, এই দুই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির প্রতি ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের ব্যবহারেই কংগ্রেসের বর্তমান চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু এ বক্তব্যও নতুন পার্টি তৈরির স্বপক্ষে কোনও নীতির প্রশ্নকে উত্থাপন করে নি। তা ছাড়া শ্রীযোশী নিজেই বলেছেন তাঁর দলের নীতি কংগ্রেসেরই সম-মনোভাবাপন্ন নীতি।

সব শুনে এরপর স্বতই মনে প্রশ্ন জাগে, শ্রীসুখাদিয়া যদি ক্ষমতার বেদী থেকে নেমে দাঁড়ান, তখনই শ্রীযোশীর দলবল কি কংগ্রেসে ফিরে যাবেন। যদি তাই-ই হয় তবে তাঁর দলের সঙ্গে বিরোধী দলগুলির পক্ষে আসন ভাগাভাগির রিস্ক-এ নামা কি বিপদজনক নয়। অবশ্য স্বতন্ত্র ও জনসঙ্ঘের সঙ্গে আসন ভাগাভাগির ব্যাপার কোনরূপ চিন্তা না করেই হতে পারে, কিন্তু এস এস পি-র মতো বিশিষ্ট নীতিতে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলও কি নির্বাচনী মোর্চা গঠনে হাত মেলাতে পারবেন শ্রীযোশীর এই ক্ষণস্থায়ী দলের সঙ্গে?

আসাম ঃ

পার্বত্য অঞ্চলের নয়া প্রশাসন

সর্বদলীয় পার্বত্য নেতৃসম্মেলন পর্বতীয়াদের জন্য একটি পৃথক রাজ্যের দাবি জানিয়ে আসছেন। সম্প্রতি শিলং-এ সর্বদলীয় পার্বত্য নেতৃসম্মেলনের উদ্যোগে আহূত এক বিরাট জনসমাবেশে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই বলে পার্বত্য নেতাদের আশ্বাস দেন যে, সরকার যথাদ্রুত পার্বত্য অঞ্চলের প্রশাসন কাঠামোর পুনর্বিন্যাস করে অধিকতর স্বায়ত্তশাসন প্রদানের সাধ্যমত চেষ্টা করবেন। পার্বত্য নেতাদের দাবি পুনর্বিবেচনার জন্য নতুন বছরে নয়াদিল্লীতে তাঁদের আমন্ত্রণও জানিয়ে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী।

শ্রীমতী গান্ধী তাঁর ভাষণে বলেন, কাঠামো পরিবর্তনের সময় একটি সার্বিক ঐক্য বজায় রাখার বিষয়ও চিন্তা করতে হবে। বস্তুত রাজ্য পৃথকীকরণের হিড়িকে সমগ্র দেশের মধ্যে অসন্তোষ বিক্ষোভ এবং স্বাতন্ত্র্যবোধ দানা বেঁধে উঠছে যা ভারতীয় জাতীয় ঐক্যের ওপর ক্রমান্বয়ে আঘাত হানছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আজ এমন অনেকে আছেন, স্বাতন্ত্র্যের জিগিরকে যাঁরা জিইয়ে রাখতেই চান। পাঞ্জাবের মাস্টার তারা সিং নতুন করে আওয়াজ তোলবার চেষ্টায় আছেন এবং সন্ত ফতে সিং প্রধানমন্ত্রীর সালিশী মেনে নেওয়ায় ক্ষেপে উঠেছেন। পার্বত্যজাতির

ব্যাপারে অবশ্য এই উদাহরণ প্রাসঙ্গিক এই প্রশ্নে যে, সার্বিক ঐক্যের প্রতি বীতস্পৃহা যেন তাঁদের মনে এমনভাবে অক্ষয় হয়ে না থাকে।

শ্রীমতী গান্ধী আরও পরামর্শ দিয়েছেন যে, পার্বত্য নেতৃবৃন্দের আসাম সরকারের সংগে আলোচনায় বসা উচিত, তাতে ফল আরও ভাল হবে।

শ্রীমতী গান্ধী বলেন, পর্বতীয়াদের পৃথক রাজ্য দাবির মধ্যে তাঁদের সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক জীবনে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা লাভের বাসনা যথার্থই মূর্ত হয়ে উঠেছে এবং সেই বাসনার যাথার্থ্যও তিনি উপলব্ধি করেন। কিন্তু এ প্রশ্নেও একটি চিন্তার অবকাশ আছে। তা হ'ল, প্রশাসন কাঠামো পরিবর্তনে অন্যের স্বার্থও সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। সুতরাং চূড়ান্ত কিছু একটা করবার আগে এ সমস্ত প্রশ্নই সহমর্মিতার সঙ্গে ধীরভাবে বিবেচনার প্রয়োজন আছে।

ভারতবর্ষ আজ নানা সমস্যায় কবলিত। এই সমস্যা ব্যর্থ শাসনেরই ফলশ্রুতি। সুতরাং এই সমস্যার প্রশ্ন তুলে পর্বতীয়াদের দাবিকে অনন্তকাল ঠেকিয়ে রাখা যায় না। শাসন ব্যাপারে যতকাল ব্যর্থ অক্ষমতা আসন গেড়ে বসে থাকবে ভারতের স্থায়ী সমস্যাগুলিও ততকালই আপন অস্তিত্বে অটুট থাকবে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সমস্যাকণ্টকিত ভারতের পরিস্থিতি বিবেচনা করে অতীতে নির্জিত পর্বতীয়াগণের আরও ধৈর্য ধারণ করা উচিত। অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর আসল বক্তব্য, ঐক্যের খাতিরে যতটুকু করা উচিত তাঁরা যেন ততটুকুই করেন।

তাঁর ভাষণে প্রধানমন্ত্রী এই বলে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, দাবি আদায়ের জন্য সংগ্রামের পথ বিষয়টিকে জটিলই করে তুলবে। শান্তিপূর্ণ সমাধানের প্রতিই পর্বতীয়াগণের আগ্রহী হওয়া উচিত।

অন্যান্য কথা প্রধানমন্ত্রী একটিও উচ্চারণ করেন নি। কিন্তু কথাই সব নয়, নেহরু আমল থেকে পর্বতীয়া সমস্যা অমীমাংসিতভাবে টাঙানো আছে। এই সমস্যার দ্রুত সমাধানই বাঞ্ছনীয়। অন্যথা সর্বক্ষেত্রেই যা হয়ে থাকে, বিশৃংখলাকে আহবান করে এনে সরকার শেষ মুহূর্তে হয়ত এমন একটি সমাধানে উপনীত হবেন যা পূর্বাহ্নে করলে অনেক ভালো হতে পারত।

তবে শ্রীমতী গান্ধীর বক্তব্যে পর্বতীয়া সমস্যার প্রতি সহানুভূতির সুর লক্ষ্য করে আশা করা যেতে পারে, সরকার হয়ত সমস্যাটিকে এখন যথাযথ বিচার করে সমাধানে আসবার চেষ্টা করবেন।

বিহার ঃ

"আমরাই খাঁটি কংগ্রেসী"

উক্তিটি বিহার রাজ্য কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহের। বিহার রাজ্যে সম্প্রতি যে দেড় হাজার কংগ্রেসকর্মী পার্টি ত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছেন শ্রীসিংহ তাঁদেরই অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। শ্রীসিংহকে, অতএব, বিদ্রোহী কংগ্রেসী বলা যায় কিনা, সাংবাদিকগণ এ প্রশ্ন উত্থাপন করলে জবাবে তিনি বলেন, মোটেই তা নয়, "আমরাই খাঁটি কংগ্রেসী।" কেন না শ্রীসিংহ বহুতর সাধনায় অতঃপর উপলব্ধি করেছেন যে আজকের কংগ্রেস তার সমস্ত অতীত প্রতিশ্রুতি ভুলে দুর্নীতির ও ক্ষমতাদ্বন্দ্বের আড়তে পরিণত হয়েছে।

প্রসংগত জানা গেছে, শ্রীসিং নাকি বিহার কংগ্রেসের দুর্নীতি অপসারণের জন্য কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের সংগে একাধিকবার যোগাযোগ করে সম্পূর্ণ নিষ্ফল ও হতাশ হয়েছেন। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীই নাকি শ্রীসিংহকে বলেন যে, তাঁর অভিযোগের ব্যাপারে শ্রীমতী গান্ধীর

শ্রীকামরাজ

করণীয় কিছুই নেই, তিনি অসহায়। কারণ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ নিজে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোন কিছুই করছেন না।

শ্রীকামরাজ দুর্নীতি অপসারণে যে সমান অসহায় তা বারম্বার প্রমাণিত হয়েছে। কংগ্রেসে আজ সৎ চিন্তাকে কোণঠাসা করে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রভাব বিস্তারের ধাক্কায় গান্ধী-কামরাজ এবং তদীয় সমর্থকবৃন্দ কেউই খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পায়ের তলায় শক্ত মাটি পাচ্ছেন না। মেনন-বিতাড়ন পর্বে, নন্দা-হটাও জিগিরে, চাবনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রিত্ব লাভের ব্যাপারে, মুদ্রামূল্য হ্রাসের সিদ্ধান্তে কংগ্রেস সভাপতি ঘটনাবলীর দর্শকমাত্রে পরিণত হয়েছেন। সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশে লক্ষ্ণৌয়ের জাঁদরেল শিল্পপতি শ্রী ভি আর মোহনকে মনোনয়ন দেওয়া যেতে পারে কি না, এ বিষয়েও কামরাজকে শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের অনুমোদনের অপেক্ষা করতে হয়েছে। পাতিল সাহেবের মতামতের জন্য স্বরাষ্ট্র দপ্তর নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে বেশ বিচলিত হতে হয়েছিল। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণমেননকে কংগ্রেস ত্যাগের রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে পাতিল সাহেবের পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করতে হয়। এমতাবস্থায় শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহের বক্তব্যে যে বস্তু আছে এ বিষয়ে অনর্থক সন্দেহ প্রকাশের কারণ নেই।

মহামায়াপ্রসাদ, সুতরাং, দেড় হাজার পুরাতন কংগ্রেসীসহ কংগ্রেস ত্যাগে বাধ্য হয়েছেন এবং পাল্টা দল গড়ে নির্বাচনে ক্ষমতাসীন কংগ্রেসী সমাজের সংগে মোকাবিলা করতে প্রস্তুত হচ্ছেন। কংগ্রেসত্যাগী সদস্যদের মধ্যে চল্লিশ জন আইন সভার সদস্যও আছেন। সুতরাং ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের রাজ্যকে আর অবিসংবাদী কংগ্রেসী ঘাঁটি বলে ধরে নেওয়া যায় না। বিহারও অবশেষে বেঁকে বসল।

শ্রী ভি কে কৃষ্ণমেনন কংগ্রেস ত্যাগ করলে ক্ষমতাসীন কংগ্রেসী নেতাদের অনেকেই দুঃখ প্রকাশ করেছেন। শ্রীমেনন যে কংগ্রেসে এক অবিসংবাদী নেতারূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, ভারতের পররাষ্ট্রনীতিকে সজোরে প্রতিষ্ঠাদান করার ব্যাপারে কৃষ্ণমেননের কৃতিত্ব যে অস্বীকার করা যায় না, একথা প্রধানমন্ত্রীও স্বীকার করেছেন।

শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহও জানেন এবার তাঁর প্রতি কর্দম নিক্ষেপেও দেশের বশংবদ কাগজগুলি তৎপর হয়ে উঠবে। তিনি তাই আগেভাগেই সাংবাদিকদের বলে দিয়েছেন, কংগ্রেস মনোনয়নে বঞ্চিত হয়েছেন বলে তিনি এবং তাঁর সহগামীরা কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখিত নন। তাঁদের আসল বক্তব্য "ভালো লোক মনোনয়ন পান।"

দেশে এখন ভালোমন্দের তর্কযুদ্ধ শুরু হয়েছে। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। দেশের লোককে দেখবার কাজে কাজেই মানুষের অভাব।

কংগ্রেস যাঁরা ত্যাগ করলেন তাঁদের বর্তমান বক্তব্য দাঁড়াল, আমরাই খাঁটি কংগ্রেসী। কম্যুনিস্ট পার্টি যাঁরা ভেঙে বের হয়ে এলেন, তাঁরাও বলছেন, আমরাই খাঁটি মার্ক্সিস্ট।

কংগ্রেসেও দক্ষিণ-বাম; কম্যুনিস্টরাও

দক্ষিণ-বাম; সাংবাদিকতায়ও দক্ষিণ-বাম বাদ বাকি উত্তর এবং পূর্ব।

সাধারণের সামনে তাই এবারের নির্বাচন বেশ ঘোরালো সমস্যা এনে হাজির করেছে।

শুধুমাত্র বিহার নয়, কেরালা, পশ্চিম বাংলা, রাজস্থান, ত্রিপুরা, আসাম সর্বত্র কংগ্রেসের ঘর ভাঙছে। এমন পরিস্থিতি অভূতপূর্ব। তত্রাচ বিরোধীরা এমন একটা শক্ত ঘর গড়ে তুলতে পারলেন না, যেখানে অন্তত সাধারণ মানুষ হাওয়া পরিবর্তনের জন্যও একটা আশ্রয় পেতে পারতেন। দক্ষিণ-বাম স্রোতের দ্বিমুখী ধাক্কায় বিক্ষোভের তরঙ্গে শুধু অনাসৃষ্টি ঘটল, একটি নিটোল সুন্দর নীল ফণা-বিশিষ্ট তরঙ্গের জন্ম বোধহয় আর সম্ভব হল না।

কংগ্রেস ভেঙে যাঁরা আজ বেরিয়ে আসছেন তাঁদের প্রত্যেককেই মাথায় তুলে নেওয়ার কথা নয়। যদিও এ'দের দেখে অনেকে উৎসাহে ফেটে পড়ছেন। ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি (দক্ষিণ) দু-হাত ছড়িয়ে বসে আছেন এবং পাইকিরি হারে এ'দের প্রগতিশীল খেতাবে ভূষিত করছেন। এই দক্ষিণী কম্যুনিস্টরা এ'দের সঙ্গে ঘর বাঁধতেও হয়ত গররাজি হবেন না। বাংলা দেশের দক্ষিণী কম্যুনিস্টদের দৈনিক বুলেটিনের এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে তেমন পরোক্ষ আহ্বানও জানান হয়েছে। তাঁরা এই প্রগতিশীলদের নিয়ে শক্ত গণতন্ত্রের স্বপন দেখছেন।

কিন্তু নির্বাচনের এই মুহূর্তটি খুব সতর্কতার সঙ্গে বিচার্য। দক্ষিণীদের প্রসারিত বক্ষ দেখে সন্দেহ হয়, কংগ্রেসী প্রগতিশীল গোষ্ঠীর প্রেমে পড়ে অবশেষে তাঁদের নিজস্ব কম্যুনিস্ট কোর্তাই হয়ত ক্রমে লোপাট হয়ে যাবে।

বিহারের ভাঙনটা লক্ষ্য করলে দেখা যাচ্ছে, ভাঙা কংগ্রেসীদের অধিবেশন বসেছিল রামগড়রাজ শ্রীকামাখ্যানারায়ণ সিং-এর প্রাসাদে। শ্রীকামাখ্যানারায়ণ

শ্রীচন্দ্রভান গুপ্ত

বিহারের জনতা পার্টির নেতা। এই দলই বিহারের খাদ্য আন্দোলনে বিরোধী দলের শরিক হয়েছিল, আবার এই রাজাবাহাদুরই কংগ্রেসে ফিরে গেছেন। এসব দেখে-শুনে অনেকের মনেই সন্দেহভঞ্জন হয় না। তাঁরা সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্নও করেছেন রাজাবাহাদুরকে, অতীতে যেমন একাধিকবার কংগ্রেস ভেঙে কংগ্রেসে পুনঃপ্রবেশ করেছেন, নির্বাচনের পর আবারও তাই করবেন না তো!

রাজ্য দক্ষিণী সি পি আই নেতা শ্রীইন্দ্রদীপ সিং কিন্তু এসব নিয়ে ঘাঁটেন নি। তিনি অভিনন্দিত করেছেন দল-ত্যাগীদের এবং প্রগতিশীল বলে সাদর অভ্যর্থনাও জানিয়েছেন।

শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠী

উত্তরপ্রদেশ ঃ

ত্রিপাঠী দলের ওপর গুপ্ত গ্রুপের টেক্কা

উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলীয় নেতা শ্রী সি ভি গুপ্ত এবং শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠী উভয়েই অসন্তুষ্ট বলে সংবাদ। যদিও ইউ পির বিধানসভা আসনে গুপ্ত-সমর্থকদলের মনোনীত প্রার্থী-সংখ্যা শ্রীত্রিপাঠীর সমর্থকবৃন্দের ওপর বেশ মোটা রকমের সংখ্যাধিক্য লাভ করেছে। লোকসভার জন্য মনোনয়নদানের সময় অবশ্য দুই দলের মধ্যে সমান ভাগ বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস, প্রার্থী বাছাই-এর দায়িত্ব শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ওপর ন্যস্ত করেছিলেন। শ্রীমতী গান্ধী সাত পাঁচ প্যাঁচালো ব্যাপারে না গিয়ে লোকসভার ক্ষেত্রে বর্তমান ৫৮ জনকেই সুপারিশ করেন। কিন্তু সি ই সি ৪৭ জনের বেশি গ্রহণ করেন নি। নতুনদের মধ্যে বেশির ভাগকেই সেই সমস্ত কেন্দ্রে ঠেলে দেওয়া হয়েছে যেখানে ১৯৬২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস বিরসবদনে হার স্বীকার করে ফেরৎ এসেছিল। এখনো চল্লিশটি বিধানসভা এবং আটটি লোকসভা আসনের প্রার্থী মনোনয়নপর্ব অসমাপ্ত আছে।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী কৃপালনী উত্তরপ্রদেশের গদি ছাড়ছেন। তিনি এবার লোকসভার প্রার্থী।

উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেসী উপদলীয় কোন্দল সুবিদিত। এর ওপর শ্রীত্রিপাঠীর মনে দাগা দিয়ে বহু আলোচিত গুপ্ত-ফান্ড রক্ষক শক্ত মানুষ শ্রীচন্দ্রভান গুপ্তের দিকে কংগ্রেস নির্বাচনী কমিটি যে পাল্লা নামিয়ে দিলেন, তাতে বিবদমান উপদলের অসন্তোষকে জিইয়ে রাখাই হ'ল। শোনা যাচ্ছে, বেশ কিছু প্রবীণ কংগ্রেস সদস্য, যাঁদের দিকে পার্টি টিকেট বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তাঁরা নাকি সরে দাঁড়াবেন কি না এ বিষয়ে গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা চালিয়ে যাচ্ছেন এখনও। তাছাড়া অনেকক্ষেত্রে এমন অনেক প্রার্থীকে নাকি মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে যাঁরা আপন নির্বাচনী এলাকা সম্পর্কেই অনভিজ্ঞ, জনসংযোগ নেই বললেই চলে।

এই সমস্ত লক্ষণগুলির দিকে তাকিয়ে অভিজ্ঞমহলের ধারণা, ভারতের প্রধানমন্ত্রী রপ্তানীকারী এই বিপুল বৃহৎ রাজ্যটির প্রাক্-নির্বাচনী পরিস্থিতি কংগ্রেস তরফে সমূহ জটিলতা কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

সঙ্গীত-নায়ক
গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস
প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ
প্রতি ভাগ—৫৲।
হারমোনিয়াম শিক্ষা
মূল্য—৩৲
বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

সাংবাদিকদের সঙ্গে সুহার্তো ও সুকর্ণ

চীনঃ

পঞ্চম পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটানোর সংবাদ শুনে সারা দেশ যেন আনন্দে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু নতুন মারণাস্ত্র তৈরিতে মানবসভ্যতার, বিশ্ব-শান্তির কি লাভ হলো, না তার আশঙ্কা বাড়লো? পারমাণবিক অস্ত্রের ক্রম উন্নতি সাধনের জন্যে চীন যেন আজ মরীয়া হয়ে উঠেছে, সে কোন নিষেধ শুনছে না, বাধা মানছে না; লাগাম-ছাড়া ঘোড়ার মতো দুর্দম গতিতে এগিয়ে চলেছে। কে বলবে এ পাগলামীর শেষ কোথায়?

চীন নিজে অবশ্য তার সাফল্যের সংবাদ দিতে গিয়ে পঞ্চম পরমাণু বোমার কোনো শক্তি-পরিচয় দেয় নি। তবে আগের চারবারের মতো এবারেও বলতে ভোলে নি যে সে কখনই প্রথম পরমাণু বোমা ব্যবহার করবে না, তার বোমা নাকি বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের, ভিয়েৎনামের মুক্তি-সেনাদের রক্ষাকবচ। চীনের সরকারী সংবাদ সরবরাহ এজেন্সী একথাও বলেছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট য়ুনিয়ন যে আজ বিশ্বের বিপ্লবী সংগ্রামগুলির বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়েছে চীনের পারমাণবিক অস্ত্র সেই ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিতে সহায়তা করবে। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে কিছু বলতে হয়, অপরাধের কৈফিয়ৎ কিছু দিতে হয়, তাই দিয়েছে চীন। কিন্তু চীন যে দিনের পর দিন অত্যন্ত পরিকল্পনামাফিক তার সাম্রাজ্যলিপ্সা চরিতার্থ করতে চাইছে তাকে যে শক্তি-মদমত্ততায় পেয়ে বসেছে তা কি কারো বুঝতে বাকী আছে? তবে পাগল ক্ষেপানোর জন্যে দায়ী ব্যক্তিও রয়েছে। আমেরিকা যদি চীন সম্পর্কে তার এক-গুঁয়েমি রোগ থেকে মুক্ত হতে পারতো তাহলে চীনের রাশ টেনে ধরা বিশ্বের অন্য রাষ্ট্রগুলির পক্ষে খুব শক্ত হতো না।

পরমাণু বোমা নির্মাণের ক্ষেত্রে চীনের দ্রুতগতির ঘটনা বিস্বাদ লাগলেও অস্বীকার করতে পারে না কেউ। মাত্র দু'বছরের মধ্যে সে পাঁচ-পাঁচটি সফল বিস্ফোরণ ঘটালো—এবং এক বছরেই তিনটে! চীনা সূত্রে তার সর্বশেষ বোমার শক্তির কথা জানা না গেলেও মার্কিন পরমাণু শক্তি কমিশন মনে করেন যে, এর শক্তি কয়েকশ' কিলোটনের কম হবে না। যদিও গোড়ার দিকে পঞ্চম বোমার শক্তি তার তৃতীয় বোমার চেয়েও কম হবে, কিন্তু পরে বিজ্ঞানীরা এ সিদ্ধান্তে এসেছেন যে চীনের সর্বশেষ বোমাটিই তার সবচেয়ে শক্তিশালী পরমাণু বোমা। গত মে মাসে চীন যে তার তৃতীয় পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলো, মার্কিন পরমাণু শক্তি কমিশনের মতে তার শক্তি ছিলো ২০০,০০০ টি-এন-টি বা ২০০ কিলোটন, কিন্তু বর্তমান বোমাটি তার চেয়েও শক্তিশালী, হয়তো কয়েকশ' কিলোটন হবে।

চীন যে ক্রমেই পারমাণবিক স্তর ছাড়িয়ে হাইড্রোজেন স্তরের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে তার আরো নির্ভুল প্রমাণ পঞ্চম বোমার গঠনে পাওয়া গিয়েছে। মার্কিন পরমাণু শক্তি কমিশনই বলেছেন যে, তার তৃতীয় বোমার মতো পঞ্চম বোমাটিও হাইড্রোজেন উপাদান দিয়ে তৈরি করেছে। বোমাটিতে ইউরেনিয়াম-২৩৮ ও উন্নত ধরণের ইউ-২৩৫-এর সাহায্যে পরমাণু বিভাজন ঘটানো হয়েছে। এর শক্তি বোঝা যাবে যদি হিরোশিমায় প্রথম ব্যবহৃত পারমাণবিক বোমার সঙ্গে এর শক্তির তুলনা করা যায়। হিরোশিমায় নিক্ষিপ্ত বোমাটির শক্তি ছিলো ২০ কিলোটন সমান, কিন্তু তারই চোটে একটা গোটা শহর নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো, ১০ লক্ষ লোক মারা গিয়েছিলো, ৫০ লক্ষ লোক আহত বা চিরদিনের মতো পঙ্গু হয়ে গিয়েছিলো। আর চীনের পঞ্চম বোমাটি হলো তিনশো কিলোটনেরও বেশি শক্তি-সম্পন্ন। তাহলেই বুঝুন চীন কি অস্ত্র বানিয়েছে, মুখে অবশ্য তার কমিউ-নিজমের বুলি!

শান্তিকামী সমস্ত দেশই চীনের বোমা বিস্ফোরণের নিন্দা করেছে, বিশেষত চীনের যারা প্রতিবেশী রাষ্ট্র তাদের ভয়ের আশংকা বেশি বলে তারা এ কার্যের তীব্র প্রতিবাদ না করে পারে নি। দক্ষিণ কোরিয়ার একটা হিসেবে বলা হয়েছে যে চীনের পঞ্চম বোমা বিস্ফোরণের ফলে ওপরের আবহাওয়াস্তর ২০০ গুণ বেশি দূষিত বা বিষাক্ত হয়েছে এবং ধূলি-কণার মধ্যে বেতার তেজস্ক্রিয়তা বেড়েছে ৭০০ গুণ। জাপান চীনা বোমাকে সভ্যতার প্রতি চ্যালেঞ্জ বলে অভিহিত করেছে। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচাগলাও বলেছেন যে চীনা অস্ত্র নির্মাণ প্রচেষ্টা পৃথিবীকে ধ্বংসের পথেই ঠেলে নিয়ে চলেছে।

কিন্তু প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আতংক যতখানি দূরবর্তী বিশেষ করে পারমাণবিক অস্ত্র যাদের হাতে রয়েছে তারা অতটা শঙ্কিত নয়। আর নয় বলেই বোধ হয় চীনা দাপট বন্ধ করতে পারছে না। কিন্তু ১৯৬৩ সালে মস্কোয় আংশিক পারমাণবিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও চীন তাতে স্বাক্ষরও দেয় নি, একটার পর একটা পরমাণু বোমা বিস্ফোরণও করে চলেছে। এ কথা কি ঠিক নয় যে বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির প্রতি তার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই বলেই সে এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ করতে পারছে? আজ যদি চীনকে রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ দেওয়া হতো তাহলেও কি সে এমন সৃষ্টি-ছাড়া কাজ করতে সাহস পেতো? চীন তার শক্তির পাঁচটি প্রমাণ দিয়েছে, এখনো যদি তার শক্তির স্বীকৃতি দেওয়া না হয় তবে সারা বিশ্বকেই হয়তো একদিন আপশোষ করতে হবে। সোভিয়েট য়ুনিয়ন তার আদর্শগত বিরোধ থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রসংঘে চীনকে আসন দেবার পক্ষপাতী, সত্য ও বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের সঙ্গে শত্রুতা থাকা সত্ত্বেও সে চীনকে রাষ্ট্রসংঘে পেতে চায়। কিন্তু

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার কয়েকটি তাঁবেদার রাষ্ট্রই একগুঁয়েমির বশবর্তী হয়ে চীনকে অহেতুক বাড়িয়ে তুলেছে। কিন্তু এবার লাগাম টেনে ধরা দরকার।

ব্রিটেন ঃ

এবার পররাষ্ট্রসচিব মিঃ জর্জ ব্রাউন নেমেছেন আসরে। ভিয়েৎনামে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে মিঃ ব্রাউন প্রধানমন্ত্রী মিঃ উইলসনের অনুমোদন পেয়ে এক প্রস্তাব রেখেছেন। প্রস্তাবটিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ও উত্তর ভিয়েৎনাম সরকারের কাছে এক ত্রি-পাক্ষিক শান্তি বৈঠকের কথা বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে ব্রিটেন যে কতখানি আগ্রহী তার প্রমাণ দেবার জন্যে মিঃ ব্রাউন প্রস্তাবিত শান্তি বৈঠকের জন্যে হংকং কিম্বা কমনওয়েলথভুক্ত যে কোনো দেশের (যেমন সিংগাপুর) মাটি ছেড়ে দিতে রাজী আছেন যেখানে সুষ্ঠুভাবে আলোচনা হতে পারে।

কিন্তু মিঃ ব্রাউনের শান্তি প্রস্তাবটি হঠাৎ এসেছে মনে করলে ভুল করা হবে, বরং বলা যায় নিতান্ত মুখ বাঁচানোর জন্যে লেবার গভর্নমেন্টের কিছু একটা না করে উপায় ছিলো না। কারণ, পার্টির সাধারণ সদস্য থেকে সুরু করে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত বহু নেতাই ভিয়েৎনাম প্রশ্নে সরকারের মার্কিন নীতির সমর্থন পছন্দ করতে পারছেন না। বিশেষত হ্যানয়ের অসামরিক অধিবাসীদের ওপর যখন মার্কিন বিমান থেকে বোমাবর্ষণ করা হচ্ছে অথচ ব্রিটেন তার প্রতিবাদ করছে না—ব্রিটেনের এ ভূমিকা পার্টির সাধারণ সদস্যেরা মোটেই মেনে নিতে পারছেন না। তাঁর সমালোচনার

জর্জ ব্রাউন

সম্মুখীন হয়েই মিঃ ব্রাউন তাঁর নতুন প্রস্তাব নিয়ে পার্টি সদস্যদের মন ভেজাতে চাইছেন।

কিন্তু ব্রিটিশ প্রস্তাব কি সংশ্লিষ্ট পক্ষেরা গ্রহণ করবেন? মার্কিন প্রেসিডেন্ট মিঃ জনসন অবশ্য খুশি হয়েছেন নতুন শান্তি প্রস্তাব পেয়ে। আমেরিকার দেখাদেখি দক্ষিণ ভিয়েৎনামেরও এ প্রস্তাব মেনে নিতে বাধা থাকবে না—জানা কথা। কিন্তু উত্তর ভিয়েৎনাম যে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবে তাতে সন্দেহ নেই। সোভিয়েট রাশিয়াও এ প্রস্তাবে কোনো নতুনত্ব খুঁজে পায় নি। কারণ, কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলি ভিয়েৎনামের প্রশ্নে যে কথাগুলি, যে শর্তগুলি বার বার জানিয়ে আসছে তার কোনো উল্লেখ নতুন ব্রিটিশ শান্তি প্রস্তাবে নেই। এমন কি শান্তি আলোচনায় প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ভিয়েৎকংদের গ্রহণের কোন কথাও নেই। উত্তর ভিয়েৎনামে মার্কিন বোমাবর্ষণ বন্ধ করার আগে শান্তি আলোচনার ব্যাপারে হ্যানয় যে কোন আগ্রহই দেখাবে না সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নেই। এ অবস্থায় ব্রিটিশ প্রস্তাবটিও কি আরও কয়েক ডজন শান্তি প্রস্তাবের মতো হিম-ঘরে নিক্ষিপ্ত হবে না?

ইতিমধ্যে নতুন বছরের সূচনায় সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ ইউ থান্টও নতুন করে শান্তি প্রচেষ্টায় নিজেকে নিয়োগ করেছেন। তিনি এ আশা প্রকাশ করেছেন যে, আমেরিকা যদি বিনা শর্তে উত্তর ভিয়েৎনামে বোমাবর্ষণ বন্ধ করে তবে শান্তির একটা আবহাওয়া সৃষ্টি হবে এবং সেই বিন্দু থেকে স্থায়ী শান্তির পথে অগ্রসর হতে কষ্ট হবে না। কিন্তু প্রশ্ন হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি তার নীতি পরিবর্তনে রাজী হবে?

অথচ এই সর্বনাশা নীতি ত্যাগ করার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আবেদন করতে আর বিশ্বের শান্তিবাদী, বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী সাধারণ মানুষ কে-ই বা বাকী আছে? এতদিন মনীষী বার্ট্রান্ড রাসেল চেঁচিয়ে আসছিলেন, এবার মুখ খুলেছেন বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ আর্নল্ড টয়েনবী। ডঃ টয়েনবীর প্রতি শ্রদ্ধা-ভালোবাসা-ঋণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও নেহাৎ কম নয় ('আজকের মানুষ' দেখুন)। আমেরিকার বিখ্যাত 'ফ্যাক্ট' ম্যাগাজিনে এই ব্রিটিশ ঐতিহাসিক এক প্রবন্ধের মাধ্যমে আমেরিকার কাছে অবিলম্বে হ্যানয়ে বোমাবর্ষণ বন্ধ করার আবেদন জানিয়েছেন। ডঃ টয়েনবী আরো বলেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি সত্যকে স্বীকার করে না নেয়, যদি ভিয়েৎ কং অধিকৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধারের বৃথা চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে তবে তাতে ক্ষয়ের

জনসন

সম্ভাবনাই বেশি। তাঁর মতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি সোভিয়েট য়ুনিয়নের সঙ্গে একটা বিশ্বসরকার গঠন করে তবেই মানবজাতি চরম ধ্বংসের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে। ডঃ টয়েনবী তাঁর ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকোণ থেকে ভিয়েৎনাম যুদ্ধের প্রশ্নটি বিচার করে বলেছেন যে, এই স্থানীয় যুদ্ধ যদি আরো চালিয়ে যাওয়া হয় তবে তাতে বিপদ বাড়বে এবং শেষ পর্যন্ত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাবে যেখানে অনিবার্যভাবেই পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহৃত হবে।

ভিয়েৎনাম ঃ

আমেরিকার ভিয়েৎনাম নীতির ওপর আক্রমণ আসছে চারদিক থেকেই। হ্যানয়ের অসামরিক অধিবাসীদের ওপর বোমাবর্ষণের তীব্র নিন্দা ধ্বনিত হয়েছে পৃথিবীর সমস্ত রাজধানীতে। কিন্তু গোড়ার দিকে মার্কিন সরকার স্বীকারই করতে চান নি যে এমন কাজ তাঁরা করেছেন। কিন্তু আমেরিকার বিখ্যাত সংবাদপত্র নিউইয়র্ক টাইমস-এর বিশিষ্ট সাংবাদিক মিঃ হ্যারিসন স্যালিসবারী যখন হ্যানয় থেকে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে একটার পর একটা রিপোর্ট পাঠাতে লাগলেন এবং তাঁর সংবাদপত্রে তা প্রকাশিত হতে লাগলো তখন মার্কিন সরকারের মুখ কালি করতেই হলো। প্রেসিডেন্ট জনসনকেও তখন স্বীকার করতে হলো যদিও ওজর দিতে তিনি ভোলেন নি এই বলে যে সামরিক লক্ষ্যবস্তুর ওপর বোমাবর্ষণ করতে গিয়ে কিছু অসামরিক লোক মারা যেতে পারে বলে। কিন্তু মিঃ স্যালিসবারী তাঁর রিপোর্টে পরিষ্কার লিখেছেন যে, মার্কিন বিমানগুলোর লক্ষ্যবস্তু অসামরিক অঞ্চলও ছিলো যেখানে

সামরিক কোন উপকরণই নেই। এত সব কাণ্ডের পরও কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার নীতি পাল্টাবে?

বড়দিন উপলক্ষে যখন দুই বিবদমান পক্ষে দু-দিনের যুদ্ধবিরতির কথা স্থির হয় তখন মহামান্য পোপ ষষ্ঠ পল সে শান্তিকে দেড় মাস কাল স্থায়ী করার আবেদন করেছিলেন এ-আশায় যে তাতে দীর্ঘতর এমন কি স্থায়ী শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি হবে। কিন্তু দেড় মাস দূরে থাকুক, ওই যুদ্ধবিরতির স্বল্প সময়টুকুর মধ্যেই অন্তত ন'বার চুক্তি লঙ্ঘিত হয়েছে। শুনে পোপকে দুঃখের সংগে বলতে হয়েছে তাঁর আবেদনে কেউ কর্ণপাত করলো না বলে।

ইংরেজী নববর্ষ উপলক্ষেও দু-দিনের যুদ্ধবিরতির কথা ছিলো কিন্তু সে-দুদিনও নির্বিঘ্নে কাটে নি। ভিয়েৎনামে মার্কিন সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যান্ড এ প্রসংগে বলেছেন যে ভিয়েৎনামে যুদ্ধ করাটা একটা মহৎ খৃস্টানোচিত কর্তব্য। এর চোখা জবাব দিয়েছেন কাম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান প্রিন্স শিহানুক। এ যুদ্ধের সংগে ঈশ্বর বা ধর্মকে টেনে আনায় প্রিন্স শিহানুক প্রশ্ন করেছেন: "ঈশ্বর কি একজন সাদা আদমী? তিনি কি আমেরিকান? তিনি কি সারা বিশ্বে শাসন করার জন্যে আমেরিকানদেরই মনোনয়ন করেছেন? ঈশ্বর কি ভিয়েৎনামে আমেরিকার কার্যকলাপ অনুমোদন করবেন? তা যদি না করেন তো ভালো কথা, আর যদি অনুমোদন করেন, তবে একজন বৌদ্ধ হিসেবে আমি বলতে পারি, খৃস্টধর্ম নিরীশ্বরবাদী কমিউনিজমের চেয়েও মারাত্মক!"

সাধারণ, শান্তিকামী মানুষ ভাবছে, ভিয়েৎনাম যুদ্ধ চালাবার জন্যে আমেরিকা আর কত অজুহাত, ওজর যুক্তি-কূটনীতি হাজির করবে!

প্রিন্স শিহানুক

ইন্দোনেশিয়াঃ

প্রেসিডেন্ট সুকর্ণর পররাষ্ট্রসচিব ডঃ সুবান্দ্রিয়োর পর তাঁর বিমানবাহিনীর প্রধান ওমর দানিও মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছেন, এরপর পালা পড়েছে স্বয়ং কর্তার। গত ১৯৬৫ সালের ১লা অক্টোবরের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের সংগে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকার অপরাধে সামরিক আদালত কর্তৃক ডঃ সুবান্দ্রিয়ো মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন, ভাইস এয়ার মার্শাল ওমর দানিও। ডাক পড়েছে এবার প্রেসিডেন্ট সুকর্ণর।

অভ্যুত্থান সফল হলে তার চেহারা একরকম, কিন্তু ব্যর্থ হলে তা যে চরম আকার ধারণ করে ইতিহাসে তার বহু নজীর রয়েছে। অক্টোবর অভ্যুত্থান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবার পর ইন্দোনেশিয়ায় নতুন করে কমিউনিস্ট নিধন যজ্ঞ সুরু হয়েছে—লক্ষ লক্ষ কমিউনিস্ট নাকি নিহত হয়েছে সামরিকবাহিনী বা সামরিকবাহিনীর আশীর্বাদপুষ্ট দক্ষিণপন্থীদের হাতে। কারণ সামরিকবাহিনীর হাতে প্রমাণ রয়েছে যে ব্যর্থ অভ্যুত্থানটি আসলে এখানকার কমিউনিস্ট পার্টির (PKI) ক্ষমতা দখল করার-কার্যক্রমেরই অংগীভূত। সে অভ্যুত্থান প্রচেষ্টায় কমিউনিস্টদের সহায়তায় প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিমানবাহিনীর অধ্যক্ষসহ অনেকেই এগিয়ে এসেছিলেন বলে নাকি প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। এমন কি সমস্ত ষড়যন্ত্রের কথা প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের গোচরে আনা হয়েছিলো বলেও এখানকার বহু লোকই মনে করেন এমন কি বর্তমানে যাঁদের হাতে দেশের শাসনভার রয়েছে সেই সামরিক পরিষদের একাংশেরও স্থির বিশ্বাস যে প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ এ অভ্যুত্থানের সংগে জড়িত ছিলেন।

গোড়া থেকেই এখানকার ছাত্রেরা এবং দেশের একাংশ দাবি তুলেছিলেন প্রেসিডেন্টের বিচার চাই বলে। প্রেসিডেন্ট সুকর্ণর এক স্ত্রীর বিরুদ্ধেও জনমনে বিরূপ ধারণা রয়েছে যে তিনিও কমিউনিস্টদের প্রচুর অর্থ সাহায্য করতেন। দেশব্যাপী ছাত্রবিক্ষোভ রয়েছে সামরিক পরিষদ বা বর্তমান সর্বময় কর্তা জেনারেল সুহর্তো তা ভালো করেই জানেন। কিন্তু একথাও তাঁরা জানেন ও বোঝেন যে দেশের এক বৃহদংশের কাছে প্রেসিডেন্ট এখনো রাজার মতোই পূজ্য, এবং তাঁদের চোখে রাজা যেমন কোনো অন্যায় করতে পারেন না প্রেসিডেন্ট সুকর্ণও কোনো অন্যায় করেন নি। প্রেসিডেন্ট সুকর্ণর এ জনপ্রিয়তার জন্যেই এতদিন ছাত্ররা দাবি করলেও সামরিক পরিষদ তাঁকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে সাহস করে নি। এমন কি সামরিক পরিষদের সংগে প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের একটা বোঝাপড়াও হয়েছে বলে সংবাদ প্রচারিত হয়েছিলো। প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ যুগোশ্লাভিয়া, সংযুক্ত আরব এবং জাপান সফরে বেরুবেন এবং ভিয়েৎনাম যুদ্ধের অবসানকল্পে সচেষ্ট হবেন এ ধরণের কথাও শোনা গিয়েছিলো। কিন্তু এখন আবার শোনা যাচ্ছে যে, প্রেসিডেন্টের সংগে সামরিক পরিষদের ৬-৭ দফায় আলোচনা হলেও কোন ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এবং প্রেসিডেন্টের বিচার না করারও কোনো কারণ নাকি নেই।

সুবান্দ্রিয়ো

প্রেসিডেন্ট সুকর্ণর কাছেই সুবান্দ্রিয়ো-দানির প্রাণভিক্ষা চাইবার কথা, এখন সেই প্রেসিডেন্ট নিজেই সামরিক আদালতে চলেছেন নিজের প্রাণরক্ষার তাগিদে। তিনি নাকি রাজী হয়েছেন ব্যর্থ অভ্যুত্থান সম্পর্কে যেটুকু তিনি জানেন তা আদালতের কাছে জবানবন্দী দিতে। প্রেসিডেন্ট সুকর্ণর সমস্ত ক্ষমতা সেদিনই কেড়ে নেওয়া হয়েছিলো যেদিন জেনারেল সুহর্তো ক্ষমতা পেলেন, আজ আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর পর এই গর্বিত প্রেসিডেন্টের গর্ব করার মতো বাকি থাকলো কি?

অবক্তব্য

চন্দ্রগুপ্ত

'ছাত্রাণামধ্যয়নং তপঃ' যে-যুগের ভারতবর্ষে আদর্শ ছিল, সে-ভারতবর্ষ আজ ইতিহাসের পাতায় পর্যবসিত। সে-ভারতবর্ষের সঙ্গে আজকের 'স্বাধীন' ভারতবর্ষের ব্যবধান বোধ করি আমাদের প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাধারণ মানুষের দূরত্বের চাইতেও বেশি। রূঢ় সত্য এই, এদেশে এখন আদর্শ বলে কিছু নেই, এবং যে-ব্যক্তি কোন আদর্শ বা মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে বাঁচতে চান, তিনি ঘরে-বাইরে উপহসিত, অনেক সময় নির্যাতিত। অন্যায়কে মেনে নেওয়ার ক্ষমতা আমাদের অসীম, অন্যায়ের প্রতিবাদ করার দায়িত্ব পালনকে 'ঝামেলা' মনে করে অন্যায়কে চমৎকার সহ্য করে যাই।

আমাদের 'জাতীয় জীবনে' (আমরা 'জাতি', কোন্ রাষ্ট্রনৈতিক বা সাংস্কৃতিক অর্থে?) অহরহ অসংখ্য অন্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে। আমি রাজনীতি বুঝি না, শিক্ষায় আমার আগ্রহ। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে অন্যায় প্রসঙ্গেই আসা যাক। যে-শিক্ষক ক্লাসরুমে ছাত্রদের ফাঁকি দিয়ে পাইকারি হারে প্রাইভেট ট্যুইশন করেন, তিনি যতখানি অপরাধী, ঠিক ততখানিই অপরাধী সেই ছাত্ররা, যারা তাদের শিক্ষকদের তাদের কর্মস্থলে বা লাইব্রেরিতে প্রবেশ করার অধিকারে হস্তক্ষেপ করে। 'ছাত্র' নামধারী এই সব সমাজবিরোধীর (সুখের বিষয়, তারা এখনো সংখ্যায় নগণ্য) বিরুদ্ধে অন্য সুস্থবুদ্ধি ছাত্ররা নিষ্ক্রিয়ভাবে নিষ্প্রতিবাদ, কারণ তাদের বড়দের মতো তারাও আজ নিরাপদ বন্দরে আশ্রয়প্রার্থী, তাদের কাছে ক্ষুদিরাম-সুভাষচন্দ্র আজ নামমাত্র।

যে-ছাত্ররা দেশের ঘুণ-ধরা রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থাকে চুরমার করে নতুন জীবনের মজবুত বনিয়াদ গড়ে তোলার অসাধারণ শক্তি ধরে, কি হতভাগ্য, কি নিষ্করুণ চেহারাই না আজ সেই ছাত্র-সমাজের? তারা নিজেদের জিনিস নিজেদের হাতে ভাঙছে, স্বচ্ছন্দে অপমান করছে তাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের। কিন্তু এই ভয়াবহ শিক্ষা তারা পেল কোত্থেকে? 'তারা' অর্থে আবার বলছি, অঙ্গুলিগণ্য কিছু 'ছদ্ম'-ছাত্র, যাদের উদ্যত মুষ্টির সামনে বাকি ছাত্ররা শঙ্কা-কম্প্র। একথা আজ আর অবিদিত নেই, এই 'ছদ্ম'-ছাত্ররা আসলে রাজনৈতিক ব্যবসায়ীদের ব্রোকার এবং এজেন্ট। বাংলাদেশের, এবং অবশ্যই বহির্বঙ্গের বিভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা নিয়ত গোপনে অনুপ্রবেশ করে চলেছে। ফলত কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তথা শিক্ষাজীবন আজ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত।

অথচ শিক্ষকদের প্রথম পরিচয় 'শিক্ষক', এবং ছাত্রদের 'ছাত্র'। কিন্তু বাস্তবে কি দেখছি? অনেক ছাত্রই জেনে বা না জেনে রাজনীতিতে মত্ত, শিক্ষকদের একাংশও তাদের সঙ্গে সমানে তাল দিচ্ছেন। আমি এমন অনেক শিক্ষককে জানি, বইয়ের সঙ্গে যাঁদের সম্পর্ক বহু আগেই চুকে গেছে, কিন্তু স্বীয় পেশার মর্যাদা ভাঙিয়ে যাঁরা দিব্য, যাকে বলে, 'করে খাচ্ছেন', আর তাঁদের কেউ কেউ সমাজের 'কেষ্টবিষ্টু'ও হয়ে উঠেছেন। প্রশ্ন উঠবেঃ উচ্চাকাঙ্ক্ষা কি অপরাধ? বড় হতে চাওয়া কি দোষের? উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিশ্চয়ই দোষের নয়, কিন্তু সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য যদি কর্দমাক্ত দুর্গন্ধময় রাস্তা বাছাই করতে হয়, তবে সে-বাছাইয়ের নিন্দে করব না? অর্থাৎ সোজা কথায়, এম-পি বা এম-এল-এ হবার জন্য যখন কোন শিক্ষক পেশাদারী রাজনৈতিক দলে নাম লেখান, তখন তাঁকে শিক্ষাক্ষেত্রে 'বিপজ্জনক ব্যক্তি'রূপেই চিহ্নিত করা উচিত নয় কি?

আগেই বলেছি, আমি পেশাদারী রাজনৈতিক নই এবং রাজনীতিতে আমার প্রবল অনীহা। কিন্তু সামাজিক জীব হিসাবে বর্তমান অবস্থার পর্যালোচনাসূত্রে যদি কখনো রাজনীতির রাস্তায় এসে পড়ি, তবে আমি নিশ্চয়ই ক্ষমার যোগ্য। ইচ্ছে থাকলেই কি অবাঞ্ছিত প্রতিবেশীকে সব সময় এড়ানো যায়? আমি শিক্ষা-সংস্কৃতিতে উৎসাহী, আদ্যন্তই শিক্ষাগ্রহী. সুতরাং আমি যখন শিক্ষার পদ্মদীঘিতে রাজনৈতিক কুমীরের অনুপ্রবেশ দেখি, তখন স্বভাবতই আতঙ্কগ্রস্ত হই, এবং সহকর্মীদের সে আতঙ্কের কথা জানাতে বাধ্য হই।

বাংলাদেশের শিক্ষাজগৎ (অন্য প্রদেশের কথা ভালো জানি না) বেশ কিছুদিন থেকেই রাজনীতিতে সংক্রামিত, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় এ ধরণের একটি প্রতীতি যখন দৃঢ়মূল হচ্ছিল, তখন এলো সারা বাংলার বিদ্যালয়-শিক্ষকদের আন্দোলন। শিক্ষকদের দাবির সংখ্যা মনে নেই, কিন্তু তার কিছু যে ন্যায্য ছিল, তা মনে আছে। শিক্ষকরা তাঁদের দাবি পেশ করলেন সরকারের কাছে, সরকার স্বভাবমতো কোন প্রতিশ্রুতিই দিলেন না। অতঃপর শিক্ষকদের মিছিল, আইনভঙ্গ, কারাবরণ।

এই আন্দোলন-সূত্রেই একজনের নাম শুনলামঃ সত্যপ্রিয় রায়। আগে এঁর নাম বিশেষ শুনেছি বলে মনে পড়ছে না। সত্যপ্রিয় রায়ের পরিচয় জানলাম, তিনি বাংলাদেশের শিক্ষকসমাজের নেতা, A.B.T.A. অর্থাৎ All Bengal Teacher's Association-এর মাও সে-তুঙ্। তাঁর সংগঠনশক্তির কাহিনীও আমাকে কেউ কেউ বলে গেলেন। শিক্ষাগ্রহী হিসেবে আশান্বিত হলাম, ভাবলাম শিক্ষকদের জয় অনিবার্য।

এক দিন, দু দিন, সাত দিন, চার সপ্তাহ। সত্যপ্রিয় রায় আত্মসমর্পণ করলেন সরকারের কাছে। চার সপ্তাহের প্রশংসনীয় সংগ্রামে নৈতিক অর্থে মারা গেলেন হাজার হাজার সাধারণ শিক্ষক। মারা গেলেন দুঃখে, হতাশায়, গভীর নৈরাশ্যে। সত্যপ্রিয় রায় তাঁদের যথার্থই পথে বসালেন।

সেদিন দু'টি প্রশ্ন আমার অ-রাজনীতিক মনে জেগেছিলঃ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার মতো পর্যাপ্ত শক্তি সংগ্রহ না করে সত্যপ্রিয় রায় তাঁর শিক্ষক-সহকর্মীদের পথে নামালেন কেন? দুই, সত্যপ্রিয় রায়ের অকস্মাৎ আন্দোলন-বন্ধের ঘোষণার মূলে কি ছিল?—সরকারের সঙ্গে কোন বোঝাপড়া, না কি কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের নির্দেশ?

All Bengal Teacher's Association-এর সর্বময় কর্তা সত্যপ্রিয় রায়কে পার্লামেন্টে নির্বাচন-প্রার্থীরূপে অবতীর্ণ হতে দেখে তাই বিন্দুমাত্র আশ্চর্য হই নি। কারণ সত্যপ্রিয় রায় কর্তৃক শিক্ষক-আন্দোলনের শুরু এবং সমাপ্তি ঘোষণার মধ্যেই সেদিন আমার মতো নির্বোধজনও সত্যপ্রিয় রায়ের ভবিষ্যৎ রাস্তা খুঁজে পেয়েছিল। সত্যপ্রিয় রায় সত্যজিৎ রায়ের চাইতেও বেশি খ্যাতিমান হোন, আমার আপত্তি নেই। বাংলাদেশের রাজনৈতিক চলচ্চিত্রে তিনি বিশিষ্টতম পুরুষ হয়ে

প্রত্যাশার মৃত্যু ও দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা

● কৃত্তিবাস ওঝা ●

দ্বিতীয় অধ্যায়

"বিরক্তিকর রোগ চুলকানি। আর যখন বিপ্লবী বুলির চুলকানি লোককে পেয়ে বসে তখন সেটা চোখে দেখলেই অসহ্য কষ্ট লাগে। আলোচ্য ধরণের চুলকানিতে যে ভোগে সে পরিস্কার বোধগম্য স্বতঃসিদ্ধ এবং মেহনতী জনগণের যে কোন প্রতিনিধিদের কাছে তর্কাতীত সত্যগুলিকে বিকৃত করে তোলে। এই বিকৃতিটা প্রায়শই ঘটে সর্বোত্তম মহত্তম ও উন্নততম অনুভূতি থেকে নিতান্তই কতকগুলি তাত্ত্বিক সত্যের অপরিপাকবশত অথবা তাদের আনাড়ী ছেলেমি ছাত্রসুলভ দাসসুলভ অপ্রাসঙ্গিক পুনরাবৃত্তির ফলে, কিন্তু তাতে করে চুলকানির কদর্যতা থামে না।"

উপরের কথাগুলি প্রায় ৫০ বৎসর আগে ব্রেস্ত শান্তি চুক্তির প্রশ্নে বামপন্থী কম্যুনিস্টদের ভুল নিয়ে ১৯১৮ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী প্রাভদায় লিখেছিলেন মহান লেনিন। মহান লেনিন বামপন্থী কম্যুনিস্টদের সম্পর্কে আরো অনেক কথাই বলেছিলেন সেদিন। কিন্তু তার মধ্যে আরো দুই একটি কথা তুলে ধরে রাখতে চাই এই নিবন্ধের সুরুতে। কারণ, যাঁরা অহরহ নিজেদের নিখাদ মার্কসবাদী লেনিনবাদী বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন, তাঁদের যে চিত্র ও চরিত্র জনমনে স্পষ্ট রূপে ধরা পড়েছে, তাঁদের সম্পর্কে খোদ লেনিনের কয়েকটি উক্তি চোখের সামনে রাখা ভাল। কারণ বিপ্লবী বুলির চুলকানিতে পেয়ে বসা একদল লোককে আমাদের দিবারাত্র প্রত্যক্ষ করতে হচ্ছে মাঠে-ময়দানে, সভা-সমিতিতে। লেনিন বলেছিলেন, চুলকানি রোগটা শুধু বিরক্তিকর নয় সেটা আবার ছোঁয়াচে আর সেই রোগে যে ভোগে তার কষ্ট তো আছেই। কিন্তু যে দেখে তারও অসহ্য কষ্ট হয়। আর রোগীদের আর একটা লক্ষণ "তর্কাতীত সত্যগুলিকে বিকৃত করে তোলে"। সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের চরণে শত শত কোটি প্রণাম জানাতে হয় যে, কত সুন্দর ভাবেই না তাঁরা ভবিষ্যতের চিত্র দেখে সেই চিত্রকে চিত্রিত করে গেছেন।

আমরা পশ্চিমবঙ্গের মানুষেরা আজ যদি কোন সংকটে পড়ে থাকি, সেই সংকট হল চুলকানি রোগীর সংকট। লেনিন বর্ণিত চুলকানি রোগীরা তাদের সব রোগের লক্ষণ নিয়ে আমাদের সম্মুখে উঠুন, আমার তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু তার আগে তাঁকে কতকগুলি প্রশ্নের সরাসরি জবাব বাংলাদেশের শিক্ষিত-সমাজকে অবশ্যই দিতে হবেঃ

এক, এ-বি-টি-এ নামক গণ-প্রতিষ্ঠানটি যখন কোন রাজনৈতিক সংস্থা নয়, তখন আপনি কোন্ যুক্তিতে সরাসরি একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক দলের সদস্য হিসাবে পার্লামেন্টে নির্বাচন-প্রার্থী হন?

দুই, এ-বি-টি-এ শিক্ষকদের (শিক্ষকরা ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী হতে পারেন) সামগ্রিক স্বার্থ-রক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত সংস্থা; যেমন 'এশিয়াটিক সোসাইটি' বা 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' মূলত গবেষকদের সুযোগ-সুবিধাদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত। উক্ত গবেষণা-সংস্থাগুলিরও যথেষ্ট অভাব-অভিযোগ আছে, গবেষকরা সেখানে সবরকম সুযোগ-সুবিধাও সব সময় পান না। কিন্তু আজ পর্যন্ত 'এশিয়াটিক সোসাইটি' বা 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের' প্রেসিডেন্ট একই সঙ্গে 'সোসাইটি' বা 'পরিষদে'র নাম ভাঙিয়ে এবং রাজনৈতিক দলের নাম টাঙিয়ে নির্বাচনপ্রার্থী হয়েছেন কি?

তিন, যখন পার্লামেন্টে শিক্ষক-সমাজকে প্রতিনিধিত্ব দেওয়ার আবশ্যকতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলেন, তখন আপনি 'বিশুদ্ধ শিক্ষক' হিসাবেই কেন দাঁড়াতে ভরসা বা সাহস পেলেন না? তা হলে কি ধরে নিতে হবে, বাংলাদেশের স্কুল-শিক্ষকদের নেতা হিসাবে আপনি যে-আত্মপরিচয় এতাবৎকাল দিয়ে এসেছেন, তা প্রিয় অসত্য? কিংবা তারও মূলে আপনার আজকের রাজনৈতিক দলের গোপন সমর্থনের মতো অপ্রিয় সত্য?

চার, আপনি আপনার 'শিক্ষা ও সাহিত্য' নামক পত্রিকার (নামেই এ-বি-টি-এ-র মুখপত্র) পৌষ সংখ্যার এক জায়গায় (পৃঃ ৩৪৭) হুমায়ুন কবিরকে শ্লেষ করে লিখেছেনঃ 'সত্যই তো শ্রীকবীর তো রাজনীতি করেন না।' যে সংবাদের সূত্রে আপনার এই টিপ্পনী, তা হলোঃ শ্রীকবীরের নেতৃত্বে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক ছাত্র-সভায় নবজাত 'পশ্চিম-বঙ্গ ছাত্র সমিতি' বলেছে, কোনরকম রাজনীতির সঙ্গে তারা যুক্ত থাকবে না। আপনি কি মনে করেন, ছাত্র সংগঠন মাত্রেরই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকা উচিত? আর, আপনি কি আমাদের জানাবেন, শ্রীহুমায়ুন কবীর আপনার মতো একই সঙ্গে একটি শিক্ষাসংস্থার কর্ণধার এবং একটি রাজনৈতিক দলের সদস্যরূপে আমাদের ভোটপ্রার্থী?

এবং সবশেষে, আপনি বাংলাদেশের শিক্ষকসমাজের সঙ্গে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, তার সমর্থনে আপনার সুস্পষ্ট বক্তব্য কি?

এক চরম সংকটের সময় উপস্থিত হয়ে এক ভয়াবহ সংকটের আবর্তে দেশ ও জাতিকে ডুবিয়ে দিতে চলেছে। "বোধগম্য স্বতঃসিদ্ধ এবং মেহনতী জনগণের যে কোন প্রতিনিধিদের কাছে তর্কাতীত সত্যগুলিকে বিকৃত করে তোলার বিরতিহীন চেষ্টায় এই চুলকানি রোগীরা দিবারাত্র বাগাড়ম্বর আর কথার ফুলঝুরি দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে চলেছে। তাত্ত্বিক সত্যের অপরিপাক কত নিষ্ঠুর হতে পারে তার এত বড় দৃষ্টান্ত সম্ভবত মহান লেনিন কল্পনাও করতে পারেন নি। এই ধরণের অপরিপাকের দৃশ্য পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে বর্তমান প্রাক নির্বাচনী কালে পশ্চিমবঙ্গের কিছু রাজনীতিবিদ ঘটালেন। লেনিনের আর একটা মহৎ উক্তি "বিপ্লবী যুদ্ধের বিপ্লবী বুলিতে বিপ্লব ধ্বংস হতে পারে। বিপ্লবী বুলি অতি প্রায়শই বিপ্লবী পার্টির ব্যাধি হয়ে দাঁড়ায়। বিপ্লবী বুলি হল ঘটনার নির্দিষ্ট মোড়টিতে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ঘটনাচক্রের অবজেকটিভ পরিস্থিতির হিসাব না করে বিপ্লবী ধ্বনির পুনরাবৃত্তি। অপরূপ মনোহর মাতাল করা ধ্বনি—কিন্তু তলে তার জমি নেই, এই হল বিপ্লবী বুলির মূল কথা. পেটি বুর্জোয়ার যা চিহ্ন তার একটা অভিব্যক্তি বিপ্লবী বুলিতে মাতা।" এরপর কোন মন্তব্যের আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নিশ্চয়ই নেই। পশ্চিম বাংলার রাজনীতি সচেতন পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই মোহিত হয়ে গেছেন এই কথা ভেবে যে, লেনিন কিভাবে এত বৎসর আগে এত সুন্দরভাবে পশ্চিমবঙ্গের চিত্র দেখতে পেয়েছিলেন আর পশ্চিমবঙ্গের সংকটঘন মুহূর্তে কিছু লোক কিছু দলকে চিনবার জন্য স্বচ্ছ কাঁচের পর সেই ছবি এঁকে রেখেছিলেন। কারণ পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আজ যে পরাজয় আর হীনতার গহ্বরের অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে, সেই মুহূর্তে চিনে নেওয়া দরকার কারা দেশবাসীকে এই অন্ধকার কানাগলির পথে পথ ভুলিয়ে অন্ধকার গহ্বরে এনে ফেলেছে।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আশা করেছিল যে, গত কয়েক বৎসরে গণসংগ্রাম ও জনগণের অপরিমিত ত্যাগ ও দুঃখবরণের মধ্য দিয়ে রাজ্যে যে গণতান্ত্রিক শক্তি ও বামপন্থী সংহতি গড়ে উঠেছে, সেই সংহতিই সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতা দখলের জন্য প্রসারিত হোক। সাধারণ মানুষের এই মর্মবাণী উজ্জ্বল সম্ভাবনায় রূপও পেয়েছিল ধীরে ধীরে। কিন্তু বিপ্লবী বুলি আর অন্ধ বিদ্বেষ সেই মর্মবাণীকে, সেই উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করলো। দুই রাজনৈতিক শিবিরে বিভক্ত হয়ে রাজ্যে দুইটি বামপন্থী ফ্রন্ট গঠিত হল। কিন্তু এই ফ্রন্ট গঠনের ক্ষেত্রেও দেখা গেল, যে নীতিহীনতা কংগ্রেসকে আজ মানুষের স্বার্থরক্ষায় অক্ষম সংগঠনে পরিণত করেছে, সেই নীতিহীনতা আর সুবিধাবাদ বামপন্থী ফ্রন্টের কোন কোন শরিকের মধ্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কংগ্রেসের মধ্যে যেমন একক প্রভুত্ব, সুবিধাবাদ ও মতান্ধতা আজ সব নীতির উর্দ্ধে উঠেছে, বাম ফ্রন্টের কোন শরিকের মধ্যেও সেই একই রোগ। কংগ্রেস যেমন ছলে বলে কৌশলে দলীয় প্রভুত্ব কায়েম রাখতে যে কোন কাজ করতে প্রস্তুত—বাম ফ্রন্টের শরিকের সর্ববৃহৎ দেহেও সেই একই রোগের লক্ষণ প্রথম থেকেই প্রকাশ পেল। সাত দলের যে সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট গঠিত হল, সেই ফ্রন্টের বড় শরিক হলেন বামপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি—আর এই বামপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি প্রথম থেকেই ফ্রন্টের মধ্যে এই প্রভুত্ব কায়েমের নীতি গ্রহণ করলেন। ৬ই ডিসেম্বর সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট গঠিত হল আর ৮ই ডিসেম্বর প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করলো; কিন্তু জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত এই ফ্রন্টের পক্ষ থেকে দুইটি যুক্ত বিবৃতি আর ৩০শে ডিসেম্বর রাজ্য সরকারের খাদ্য দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন ছাড়া অন্য কোন কার্যসূচী গ্রহণ করা হ'ল না। কিন্তু বামপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি এই ১০ তারিখ হতে সুরু করে জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত সারা পশ্চিমবঙ্গে যে দলীয় নির্বাচনী প্রচারের রোলার চালালেন এবং সেই রোলার চলা জমিতে আর যে ফসলই ফলুক, কোন ঐক্যের ফসল ফলার সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকলো না। পক্ষকালব্যাপী নির্বাচনী সভাসমূহে বামপন্থী কম্যুনিস্ট দলের শ্রী বি টি রনদিভে, শ্রী বাসব পুন্নিয়া, শ্রী পি রামমূর্তি পশ্চিমবাংলার জেলায় জেলায় যেসব বক্তৃতা দিয়ে গেছেন, সেই বক্তৃতায় মানুষ শুধু একটি স্বাদ পেয়েছে, সেই স্বাদ হ'ল দক্ষিণ কম্যুনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে জেহাদ। দক্ষিণ কম্যুনিস্ট পার্টি অতি নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য পার্টি এবং মাত্র কয়েক দিন পরেই এই পার্টি লুপ্ত হয়ে যাবে ও কংগ্রেসে যোগ দেবে এই ছিল বক্তৃতাগুলির প্রধান ও একমাত্র কথা। অথচ মাত্র কয়েকদিন পূর্বে দক্ষিণ কম্যুনিস্টদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কংগ্রেস অপশাসনের অবসান ঘটানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গের বাম কম্যুনিস্ট নেতৃবৃন্দ রাজ্যের মানুষকে আশার বাণী শুনিয়েছেন, হৃদয়ে প্রত্যাশা জাগিয়েছেন এবং ৩১শে আগস্ট এক দলিলে সই করেছেন। শুধু তাই নয়, পশ্চিমবঙ্গে দক্ষিণ কম্যুনিস্টরা যেখানে কংগ্রেসের বি-টিম বলে বাম কম্যুনিস্ট দলের বিচারে অভিযুক্ত, ভারতের অন্য অনেক প্রদেশে কিন্তু আবার এই বাম কম্যুনিস্টদের কাছেই দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্টরা অধিক শক্তিতে কংগ্রেসকে পরাজিত করার প্রধান মাধ্যম হিসাবে বিপ্লবের অগ্রদূত। "চাঁচির ডালে জায়গায় জায়গায় ঝাল"। বাম কম্যুনিস্ট ডালে শুধু জায়গায় জায়গায় ঝাল নয় বিচিত্র আস্বাদ বহন করে। পশ্চিমবঙ্গে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় বাম কম্যুনিস্টদের কাছে যখন "কালকের যোগী", তখন অজয় মুখোপাধ্যায়ের ছোট ভাই ত্রিপুরা কংগ্রেসের নেতা শ্রীসুখময় সেনগুপ্তের সঙ্গে কিন্তু বাম কম্যুনিস্ট নেতাদের গলায় গলায় ভাব। শুধু ত্রিপুরায় নয়, বাম কম্যুনিস্ট পার্টির "হরেকরাকম্বা" মৈত্রী অনেক প্রদেশে অনেক ভাবেই হয়েছে, কিন্তু যে পশ্চিমবঙ্গে মৈত্রী দূরে থাক, সামান্য সমঝোতা হলে কংগ্রেস পরাজিত হ'ত; সেখানে সেই ঐতিহাসিক সম্ভাবনারও মৃত্যু ঘটানো হ'ল একের পর এক আঘাতে। এ সেই আঘাতের দিনলিপি—বড় করুণ, বড় নিষ্ঠুর।

(ক্রমশঃ)

সোনার আনারস

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

মূল্য : দুই টাকা

কিশোর-কিশোরীদের উপযুক্ত রোমাঞ্চকর উপন্যাস। ছাপা, বাঁধাই চমৎকার।

উপহার দিবার মত বই

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

ছাত্র বিক্ষোভ

শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত

আজকালকার অত্যন্ত ব্যাপক এবং ভয়াবহ ছাত্রবিক্ষোভে সুধীসমাজ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু এই বিক্ষোভকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করিলে অন্যায় হইবে। মনে রাখিতে হইবে, সারা বিশ্বে আজ যুবকেরা উত্তাল। এই দেশে ইহার বীজ উপ্ত হইয়াছে এই শতাব্দীর গোড়ায়; ইহার মূল অতি গভীরে। দেশের, বিশ্বের যে বাতাবরণে ছাত্রদের জন্ম, যে মতাবরণে তাহাদের বুদ্ধি, তাহারা তার ক্রীড়নক মাত্র। আলোচনার আগে কয়েকটি খণ্ড খণ্ড আখ্যান বর্ণনা করি।

১৯৪৭ সালের কথা। স্বাধীনতার পরে আমার কোন বন্ধু মন্ত্রী হন। তিনি আমাকে প্রশ্ন করেন, 'আজকাল ছাত্রেরা যে এত গণ্ডগোল করে, তাহাতে শিক্ষকদের কি কোন দোষ নাই?' জবাব দিয়াছিলাম, 'আপনারা না এই সমস্ত যুবকদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া নেতা হইয়াছেন, মন্ত্রী হইয়াছেন ? ১৯০৫ সাল হইতে যুবকদের ক্ষেপাইয়া তোলেন নাই ? স্কুল কলেজ গোলামখানা, বিশ্ববিদ্যালয় গোলামির কারখানা। পিতামাতা বা শিক্ষক প্রতিবাদ করিলে, তাঁহারা ইংরেজের দাস, দালাল; তাঁহাদের দাসমনোবৃত্তি হইয়াছে। তাঁহাদের কথা শুনিও না। এই তো ছিল আপনাদের বুলি। ইহার পরে আসিল আইন অমান্য আন্দোলন। কাজেই এখন যদি আইনের প্রতি, শাসনের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা না থাকে, আপনাদের কি বলিবার আছে ? এখন কি দেখিতেছেন ? আরও হইবে। উদ্বাস্তু স্রোতে, নব্য মতবাদের স্রোতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির, ব্যক্তিগত অধিকারের পবিত্রতা নষ্ট হইয়া যাইবে। তখন বহিবে ঊনপঞ্চাশ পবন।'

তখন ভারত ছিল পরাধীন। ঐ আওয়াজের সার্থকতা ছিল। তখন বাঙলাদেশে অসহযোগ আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতাও তাঁহার মুখপত্রের প্রথম মুখবন্ধে লিখিয়াছিলেন, 'Nothing is too mean to achieve our end. Nothing is too sacred for attainment of our object.' অর্থাৎ 'উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে অতি জঘন্য কাজও জঘন্য নহে, অতি পবিত্র বিষয়ও পবিত্র নহে।' তখন আমি 'Servant' পত্রিকায় কাজ করিতাম। পাড়িয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিলাম। শাসন আমাদের হাতে আসিলে এই মারণ-উচাটনের ফল কি হইবে ?

আবার বলি, তখন হয়ত ঐ অপরিণামদর্শী সাময়িক আওয়াজের উপযোগিতা ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পরেও কি আমরা সেই অস্ত্র সংবরণ করিয়াছি ? এখনও ঝুটো স্বাধীনতার ধুয়া তুলিয়া, গণ-স্বাধীনতা, কৃষক-মজদুর রাজের ধুয়া তুলিয়া সেই মারণ-উচাটন মন্ত্র সমানে চালাইতেছি না? তাহা না হইলে আমার নেতৃত্ব থাকে না। আমিই যে মুস্কিল আসান ইহা প্রমাণ করি কিরূপে ? আমাদের শাস্ত্রে বলে, অহঙ্কারের মত পাপ নাই। শাস্ত্র-কথা যাউক, আর কয়েকটা চিত্র দেখাই।

ষোল-সতেরো বছর আগেকার কথা। যাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমে, তমলুক কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়, তিনি ছিলেন আজীবন শিক্ষক, একজন সর্বজনমান্য সম্ভ্রান্ত বর্ষীয়ান্ সজ্জন। কলেজ হইবার দু-এক বছর পরেই সেইখানে ছাত্র-বিক্ষোভ সুরু হয়। বৃদ্ধ ভদ্রলোক দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'ডঃ দত্ত, কলেজের সঙ্গে সংস্রব রাখিবার আর ইচ্ছা নাই। সিটি কলেজ হইতে দুইটি ছেলে ট্রান্সফার নিয়া আমাদের কলেজে চালান দেওয়া হইয়াছে। পার্টি হইতে relay অর্থাৎ বিলিব্যবস্থা করিয়া পাঠান হইয়াছে। তাহার পর হইতে যত গণ্ডগোল।' বলিলাম, 'আজকালকার নব্য শাস্ত্র হলো, শাসন ক্ষমতা হাতে লইতে হইলে Permanent revolution অর্থাৎ অনির্বাণ বিদ্রোহ (যাঁকে বলে ইনকিলাব জিন্দাবাদ), Daily class-struggle অর্থাৎ সর্বক্ষণ শ্রেণী-সংগ্রাম চাই। ইন্দ্রনাথ ব্যানার্জির কথা মনে পড়ে? 'গোল পাকিয়ে দে মা লুঠে পুটে খাই।' ঐ সমস্ত বড় বড় কথার রহস্যার্থ সদ্‌গুরুবক্ত্রগম্য। আপনি চিরকাল গুরুগিরি করিয়াছেন, আপনি বুঝুন। আমি কলমপেষা কেরাণী, আমি কি জানি?' ইহারও বছর দুই পরে কলেজের সম্পাদকত্ব ত্যাগ করিয়া ভদ্রলোক নিষ্কৃতির দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন। অথচ তাঁহার সততা সম্বন্ধে কেহই সন্দেহ প্রকাশ করে নাই।

বছর পাঁচেক আগেকার কথা। কোন স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতির ভাষণে না বলিয়া পারিলাম না। 'এমন উপলক্ষে তোমাদের উপদেশ দেওয়াই রেওয়াজ। তোমাদের উপদেশ দেওয়ার মত মুখ কিন্তু আমার নাই। আমরা নেতারা, বুড়া বুড়া দেশোদ্ধারী সজ্জনেরা, কাউন্সিলে করপোরেশনে যাহা যাহা আচরণ করিতেছি, গালাগালি, হাতাহাতি, মারামারি নিত্য চালাইতেছি, তার পর তোমাদের ভাল হইতে, শিষ্ট হইতে বলা ভণ্ডামি। আমরা খাব ঘুষ, করিব চুরি, আর আওড়াইব বড় বড় লোক-ঠকানো বুলি, তারপর কোন্ মুখে বলিব, তোমরা সৎ হও। আমরা দিব আড্ডা, ভাল মন্দ কোন বই-ই ছুঁইব না, কোন সদালোচনা করিব না, করিব পরনিন্দা, পরচর্চা, আর তোমাদের লেলাইয়া দিব আমাদের নেতাগিরির চেলাচামুণ্ডার কাজে, আবার তোমাদের বলিব ভাল করিয়া পড়, আর বলাবলি করিব, আজ-কালকার ছেলেরা বড্ড অসৎ উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে, এত ঠকবাজী চালাইতে পারিব না।' আমার ভাগ্য ভাল, কেহ মারিতে আসিল না, বাধাও দিল না, সকলেই হাসিয়া উঠিল। আমার কিন্তু চোখে জল।

গত জুলাই-আগস্ট মাসের কথা। কলেজের কর্মচারীরা ধর্মঘট করিয়াছে, কাহাকেও কলেজে ঢুকিতে দেওয়া হইতেছে না। তখন ভর্তির সময়, ভর্তি চলিতেছে না। কোন কলেজের প্রিন্সিপাল অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া আক্ষেপ করিতেছিলেন। বলিলাম, 'আপনার আর্থিক ক্ষতি হইবে ঠিক। কিন্তু এর জন্য কলেজের পড়ার ক্ষতি বিশেষ হইবে না। এই বছর ছাত্র ভর্তি হইয়া কি হইবে? এই বছর পড়া হইবে না, হইতে দিবে না।'

প্রিন্সিপাল মহাশয় বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বন্ধ হইবার পর স্বীকার করিলেন, 'এত দূর যে হইবে ভাবি নাই।' ইহার আগেই দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, কলেজ চালান মুস্কিল হইয়াছে, কর্মচারীরা এখন কথা শুনে না।

আগস্ট মাসে দমদম মতিঝিল কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস। বড় দুঃখে সভাপতির ভাষণে মুখ দিয়া বাহির হইয়া

পড়িল, 'কেন এই কলেজের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা-উৎসব? আমি যখন কলেজ ইন্সপেক্টর, এমন কোন সাবডিভিশন নাই, যেইখানে কলেজ মঞ্জুর করি নাই। গ্রামেও কলেজ করিয়া দিয়াছি, সুন্দরবনেও দিয়াছি, গাছতলায়ও দিয়াছি। অন্তত চল্লিশটি কলেজের জন্ম আমার হাতে হইয়াছে। আমার পরে পরেও গ্রামে গ্রামে আরও কলেজ হইয়াছে—দশ বার মাইল, এমন কি তিন চার মাইল দূরে দূরে। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে বিনা পরিদর্শনে, বিনা রিপোর্টে-কি, হিন্দুস্থানে কি পাকিস্তানে Back date (পিছনের তারিখ) দিয়া, সিণ্ডিকেটের মঞ্জুরি না নিয়া, একদিনে প্রায় দেড়শত স্কুলের মঞ্জুরি দিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, আমার জন্ম, আমার জীবন সার্থক হইয়াছে। এখন আমার মনের এমন অধোগতি হইয়াছে যে, সন্দেহ হয়, পাপই করিয়াছিলাম কি না। কাহাদের জন্য এত স্কুল কলেজ করিলাম? তোমরা পড়িবে না; আমি বলিতেছি, অন্তত এই বছর পড়িবে না; কাহাকেও পড়িতে, কিছু করিতে, দিবে না। মাস্টার মহাশয়েরাও পড়াইবেন না। কেহ পড়াইতে চাহিলেও পড়াইতে দেওয়া হইবে না।, আমার কপাল ভাল, সভায় টুঁ শব্দও হইল না।

এই বছর মতিঝিল কলেজে একটি ছাত্র ভর্তি হইল। যেদিন সে প্রথম কলেজে গেল, সেইদিনই তার হাতে এক টুকরা কাগজ গুঁজিয়া দেওয়া হইল, লেখা—'বিপ্লবী ছাত্রদল।' এইরূপ দীক্ষা কেবল একজনকেই দিবার চেষ্টা হইয়াছিল, ইহা না ভাবাই যুক্তিযুক্ত।

গত শিক্ষক ধর্মঘটের সময় কোন অভিভাবক নিজের ছেলের পড়ার ক্ষতিতে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া জনৈক বিধান পরিষদের সদস্য বামপন্থী নেতার শরণাপন্ন হইলেন, বলিলেন, 'ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা বন্ধ করা কি ঠিক হচ্ছে?' উত্তর পাইলেন, 'এই সব পড়াশুনা করিয়া কি ছাই হইবে?' একনিঃশ্বাসে তিনি ছাত্রশিক্ষক দুইকেই নস্যাৎ করিয়া দিলেন।

এইবার কয়েক বছর আগেকার কথা বলি। বিখ্যাত ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ ডাক্তার বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের কথা। তাঁর দেশের বাড়ি সালারে দুর্গাপূজা। অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছেন। সেই সময়, এখনকার তুলনায়, ছাত্রগণ্ডগোল কিই বা ছিল? তবুও কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, 'আপনারা যদি মনে করিয়া থাকেন, বর্তমানে ছেলেদের পড়াশুনার সুযোগ সুবিধার বড় অভাব হইয়াছে, কাজেই ছেলেরা গণ্ডগোল করিতেছে, তাহা হইলে ভুল হইবে। আমরা গ্রামে মানুষ হইয়াছি। কাঁচা রাস্তায়, বর্ষার দিনে জলে কাদায়, অনেক দূর হাঁটিয়া স্কুলে যাইতে হইত —এক হাতে নেকড়ায় বাঁধা বই, অন্য হাতে সরু দড়িতে ঝুলান দোয়াত এবং হাঁসের পালকের কলম। তখন স্কুলঘরও পাকা ছিল না। লিখিবার কাগজও তেমন জোটে নাই। বি-এ পাশ শিক্ষকও বা কয়জন ছিল? বি-টি পাশের নাম গন্ধও ছিল না। কলেজের ক্যান্টিনের কথাও শুনি নাই, প্রয়োজনও বোধ করি নাই। লাইব্রেরী বলিতে কিই বা ছিল? লাইব্রেরীর বইও পড়িত কে? এখনও বা কয়জনে পড়ে? পাঠশালার শিক্ষকেরা মাহিনা পাইতেন মাসে দুই তিন টাকা, বড় জোর কেহ কেহ দশ বার টাকা; আর মাধ্যমিক স্কুলে বিশ টাকা হইতে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ টাকা, এক প্রধান শিক্ষক এবং দ্বিতীয় শিক্ষক পাইতেন কয়েক টাকা বেশি। কিন্তু প্রাইভেট টুইশন করিয়া দিবারাত্র টাকা রোজগারের ধাঁধায় তাঁহাদের ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখি নাই। তাঁহারা দরদ দিয়া পড়াইতেন। এখন স্কুলে বাড়ির পড়া দেওয়া হয় না, কারণ, সেগুলি শুদ্ধ করিবার সময় মাস্টারদের কোথায়? আমাদের সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে যাহা লেবোরেটরী ছিল। আজকাল অনেক কলেজেরই লেবোরেটরী তার চেয়ে ভাল ভিন্ন খারাপ নহে।'

আমাদের চাটগাঁয় দেখিয়াছি, উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষার সময় সমস্ত ছেলেদের সন্ধ্যাবেলা প্রধান শিক্ষকের বাড়ি যাইতে হইত। সারা সন্ধ্যাবেলা, পরদিন নয়টা পর্যন্ত ছেলেরা তাঁর বাড়িতে থাকিয়া পড়িত। প্রধান শিক্ষক মহাশয় পড়াশুনার তদারক করিতেন—একটি পয়সাও তিনি দাবি করেন নাই। ঐ-রকম প্রেসিডেন্সী কলেজে আচার্য জগদীশ বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মত মনীষী হইয়াছেন। তাঁহাদের স্মৃতিপূত বিজ্ঞানাগার আমরা আজ ধ্বংস করিলাম। Vandalism আর কাহাকে বলে?

শিক্ষার অসুবিধার কথা বিবেচনা করিতে গেলে, বর্তমানে এই দেশে শিক্ষা বিষয়ে কত উন্নতি হইয়াছে, তাহার একটি ধারণা থাকা দরকার। আমিও যে এই বিষয়ে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল, তাহা নহে। তবুও মোটামুটি যাহা জানি, তাহাই লিখি। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গায় সাড়ে সাতটি হইয়াছে। খড়্গপুরে Indian Institute of Technology-কে আধখানা ধরিলাম। কিন্তু পাশ্চাত্যের মানে উহা পুরা বিশ্ববিদ্যালয়। একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের জায়গায় পাঁচ ছয়টি হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও স্নাতকোত্তর বিভাগে Technology পড়ান হয়। আগে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাত্র দুইটি শাখায় পড়ান হইত। এখন Technology এবং Engineering-এর অনেক শাখায় পঠন পাঠনা হইতেছে। বহু ফ্যাক্টরীতে, খনিতে উচ্চস্তরের নানাবিধ ট্রেনিং-এর বন্দোবস্ত হইয়াছে। আগে পলিটেকনিক জাতীয় কোন ট্রেনিং স্কুল ছিল না, এখন হইয়াছে অন্তত ত্রিশটি। তার পর Social Welfare, Business Management, Ceramics, Pharmacy, প্রভৃতি কত বিষয়ের, যে শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার খবরও সব রাখি না। মেডিকেল কলেজ একটির জায়গায় হইয়াছে ছয় সাতটি, তাহাতে আবার অসংখ্য রকমের শাখা খোলা হইয়াছে। স্নাতকোত্তর শিক্ষারও বন্দোবস্ত হইয়াছে, এবং হইতেছে। কমার্স কলেজ, বি-টি কলেজ হইয়াছে বহু। Basic training, senior traning-এরও বন্দোবস্ত হইয়াছে বিস্তর। Physical training-এরও ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সমস্ত আগে নামমাত্র ছিল। অনেকগুলি মোটেই ছিল না। সরকারী ব্যয়ে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের দালান, সাজসরঞ্জাম, লেবোরেটরী যন্ত্রপাতি, লাইব্রেরী যাহা হইয়াছে, আগে অনেক কলেজেও তাহা ছিল না। প্রাথমিক শিক্ষা বার আনা অবৈতনিক হইয়াছে। বালিকা বিদ্যালয়, বালিকা কলেজের সংখ্যাও অনেক বাড়িয়াছে। কোন কোন শিক্ষায়তনে টিফিন, দুধ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই বাঙলা দেশের শিক্ষার ব্যয় চার কোটি হইতে এই আঠার-উনিশ বছরে চল্লিশ কোটি হইয়াছে। কাজেই প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের তুলনায় বর্তমানে শিক্ষার প্রসার নানা দিকে যে প্রচুর হইয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। তাহার উপর পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের পড়ার সাহায্য বাড়িয়াছে বহুগুণ। আগে পাঁচ শতাংশ ছেলেমেয়েদের free studentship দেওয়া হইত, অনেক স্কুলে হইত তাহারও কম। এখন প্রত্যেক সাহায্য-প্রাপ্ত স্কুলে দেওয়া হয় পনের শতাংশ। বৃত্তির সংখ্যা বাড়িয়াছে অনেক গুণ। আবার কলেজেও বৃত্তি পাইলে মাহিনা দিতে হয় না। তাহা ছাড়া মেধাবৃত্তি হইয়াছে—সারা পাঠ্য জীবনে ঐ বৃত্তি পাওয়া যায়। গবেষণাবৃত্তির সংখ্যা অগণিত—তাহাতে টাকার অংকও মাসে আড়াই শত হইতে চার শত টাকা। আগে একজন বৃদ্ধ অধ্যাপকও এত মাহিনা পাইত না। আগে কোন কোন স্কুল মাসে পঞ্চাশ টাকা হইতে সোয়াশত দেড়শত টাকা সাহায্য পাইত। এখন সরকারী সাহায্য মানে ছাত্র বেতন হইতে আয়ের অধিক যত ব্যয় পড়ে প্রায় তৎসমস্তই। তাহাতে এক-একটা স্কুলে মাসে প্রায়

হাজার টাকারও বেশি দিতে হয়। শিক্ষকদের মাহিনা বাড়িয়াছে আট দশ গুণ! সেই হিসাবে ছাত্র বেতন বাড়িয়াছে দুই-তিন গুণের বেশি নয়। অর্থাৎ চাল ডাল তরিতরকারীর দাম দিতেছি পনের বিশ গুণ কিন্তু শিক্ষার দাম দুই তিন গুণের বেশি দিতে চাহিতেছি না। অবশ্য পড়ার খরচ বাড়িয়াছে পাঁচ ছয় গুণ কিন্তু ছাত্র বেতনের জন্য নহে। সীট ভাড়া, খোরাকী, টিফিন, কাপড়চোপড়ের খরচ বাড়িয়াছে। তাহার উপর বাড়িয়াছে ক্যান্টিন, রেস্তোরাঁ, সিনেমা, সিগারেটের খরচ। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলের গায়ে উঠিয়াছে টেরেলিন। সিনেমাদির বাবদ খরচ হয় অন্তত মাসে পঁচিশ ত্রিশ টাকা। এমন শত শত ছেলেমেয়ে আছে।

শিক্ষার আর উন্নতির প্রয়োজন নাই, এইটি আমার বক্তব্য নহে। আমাদের যুগের চেয়ে বহুরকমে বহু গুণ উন্নতি হইয়াছে, এইটিই আমার কথা। ছাত্রদের নৈরাশ্যের কথাও ঠিক বুঝিতে পারি না। আমাদের পরে পরেও একজন বি-ই পাশ ইঞ্জিনিয়ার শত, সোয়াশত টাকার চাকরি যোগাড় করিতে হিমসিম খাইত। আট দশ বছর পর্যন্ত ঐ একই মাহিনার চাকরি করিয়াছে। এইরকম উদাহরণও বহু জানি। আর এখন পাশ করিলেই তিন চারিশত টাকা মাহিনার চাকরি। এম-বি মাসে পঞ্চাশ টাকা পায় নাই আর এখন সরকারী চাকরিও তাহারা গ্রহণ করিতে চায় না। কত দিকে কত রকমের কত শত শত টাকার চাকরির সুবিধা হইয়াছে, কত ব্যবসার সুবিধা হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। চাকরি না পাইলে ছয় সাত শত টাকা মাহিনার Pool officer করা হইতেছে তবুও ইহা যে প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নহে, তাহা জানি। আজ এই গণতন্ত্রের যুগে, সাম্যতন্ত্রের যুগে, দেশের কোটি কোটি লোকের আয়ের তুলনায় সমস্ত বিচার করিতে হইবে। এই কোটি কোটি দরিদ্র লোকেই চাকরি-ওয়ালাদের মাহিনা জোগায়। এই গরিব দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তুলনা করিলে দেখা যাইবে, বিদেশী এমন কি সোভিয়েত রাষ্ট্রনায়কেরা পর্যন্ত এই দেশে আসিয়া এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে আমাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি অতুলনীয় বলিয়া যে প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, তাহা কেবল সৌজন্যভাষণ নহে। রাশিয়ারই প্রথম বিশ বছরের ইতিহাস তো দুর্ভিক্ষ, অনাহার এবং তজ্জনিত মৃত্যুর কাহিনী। আর হাজার হাজার লোকের রক্তের স্রোতে ইয়াংসিকিয়াং নদী লাল করিয়া দেশকে উর্বর করিয়াছে চীন। তাহাতেও কি এই দুই দেশের অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের সমস্যা মিটিয়াছে? আমাদের দেশের মত সেইখানে কেহ টুঁ শব্দ করিতে পারে কি? হাটে মাঠে বাটে ঝান্ডা উড়াইয়া ঘুষি পাকাইয়া সরকারকে গালি দিতে পারে কি? এই ছাত্র বিক্ষোভ কেন, কোন বিক্ষোভই সেই সব দেশে চলে কি? কোনও সম্ভাও তো না।

আমাদের সময়েও কোন কোন প্রশ্নপত্র কঠিন হইত। সিলেবাসের বাহির হইতেও যে প্রশ্ন আসিত না, তাহা নহে। তাহার জন্য কেহ টুল বেঞ্চও ভাঙে নাই, হল ঘরের জানালা দরজাও ভাঙে নাই, মহাপুরুষগণের মূর্তিও চুরমার করে নাই, পরীক্ষাও পন্ড করে নাই, কন্ট্রোলার রেজিস্ট্রারকে মারিতে ধাওয়া করে নাই। কোন দুষ্কৃতির জন্য শাস্তি দিলে ছাত্রেরা ধর্মঘট করিত না। পিকেটিং করিয়া স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় অচল করিবার কথা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই, ভাবে নাই হেডমাস্টার প্রিন্সিপালকে ঘেরাও করার কথা। বাবা ছেলেমেয়েকে শাসন করিতে গেলে সঙ্গীরা আসিয়া বাপের জরিমানা করে, বাপকে ধরিয়া মারে, শুনিয়াছেন কি? সব ছেলেকে প্রমোশন না দিলে, এমন কি প্রমোশনের পরীক্ষা নিতে গেলে, ছেলেরা স্ট্রাইক করে কল্পনা করিয়াছেন কি? কোন শিক্ষক ঘন ঘন দেরিতে আসিলে, ক্লাসে পড়ানতে ফাঁকি দিলে, কিংবা পড়াইতে না পারিলে, তাঁর যদি কোন শাস্তি দেওয়া হয়, তাহা হইলে ছেলেরা ক্ষেপিয়া যায়। ক্লাসে কোর্স শেষ হয় না, কিংবা ভাল পড়ান হয় না। কিংবা ফাঁকি দেওয়া হয়, তার জন্য তো ছাত্র ধর্মঘট হইতে শুনি নাই। কিংবা কলেজে এক বছরেও অধ্যাপক নিযুক্ত হয় না। তার জন্য ছেলেদের মাথা ব্যথা হইতে দেখি না। ক্ষেপিয়া উঠে নকল ধরিতে গেলে; অবাধ্যতার শাস্তি দিলে, সব বিষয়ে ফেল করিলেও, পরীক্ষা না দিলেও প্রমোশন না দিলে, সেণ্ট-আপ না করিলে বাহিরের ধর্মঘটে ছেলেরা মাতিয়া যায়। তাছাড়া পড়ার জন্য পাগল হয় না: পাগল হয় ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচনে। যত রাজনৈতিক দল, ছাত্রদের মধ্যেও তত দল। ইউনিয়নের নির্বাচনে যে রকম মহামারি কান্ড ঘটে, সেই রকম উৎসাহ উত্তেজনা থাকিলে এই ছাত্ররাই চীন পাকিস্তানকে এক সঙ্গে হঠাইয়া দিতে পারিত।

ছাত্র বেতন কিংবা লেবোরেটরী চার্জ বাড়াইলে ছাত্রেরা ধর্মঘট করে, তাহা সত্য। তাহার কারণ, অভিভাবকদের উপর বেশি চাপ পড়িবে, এই জন্য নয়। নিজেদের হাত খরচের টাকা কিছু কম পড়িবে বলিয়া। যে স্কুলে ছাত্র বেতন যত বেশি, সেইখানেই ভর্তির ভিড় তত বেশি। এমন প্রাথমিক স্কুলও আছে; সেইখানে মাসে ২৫।৩০ টাকা ফি দিতে হয়। সেইখানে ছেলেমেয়ে দেওয়ার জন্য কত উমেদারি, তাম্বির। মাছের দোকানে যেমন যেইখানে মাছের দাম সর্বাপেক্ষা বেশি, সেইখানে লাইন দিয়াও ঠেলাঠেলি করিতে হয়। আজকাল অর্থের অভাব কোথায়? নাপিতও ট্রানজিস্টার হাতে নিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, চাষীও আইলের উপর ঐটি রাখিয়া চাষের কাজ করে। আর কলেজে স্থানাভাব? কথাটা যতটা সত্য, তার চেয়ে মিথ্যাও বেশি। মফস্বলের কলেজগুলি ছাত্রের জন্য হাহাকার করে। মফস্বল হইতে কলিকাতায় আসিয়া ছেলেমেয়েরা ভিড় করে। অথচ কলিকাতার দুই তিনটা কলেজ বাদ দিলে মফস্বলের অতি অভাগা কলেজও কলিকাতার নামজাদা বড় বড় কলেজ অপেক্ষা অনেক বেশি ভাল ফল করে। কলিকাতায়ও এমন কলেজ আছে, সেইখানে ফল ভাল হয়। কিন্তু সেইখানে ছেলেমেয়েরা যাইতে চায় না কারণ সেইখানে পড়া-পরীক্ষার সামান্য কড়াকড়ি বেশি। এতৎ সত্ত্বেও আমি বলিব, যতদিন শিল্প শিক্ষা কিংবা বৃত্তিক শিক্ষার আরও প্রসারণ না হয়, এবং সেইখান হইতে পাশ করিলেই চাকরি আরও সুলভ না হয়, ততদিন এই সমস্ত কলেজে ভিড় থাকিবেই। আরও বহু এই রকম স্কুল কলেজের প্রয়োজন আছে। মনে রাখা দরকার, বাঙালী একটি ইণ্ডাস্ট্রী (শিল্প) জানে, বোঝে। সেইটা হলো স্কুল কলেজে পড়া এবং পাশ করা। অন্য ব্যবসা বাঙালীর ধাতে সয় না।

এখন ছাত্রদের নৈরাশ্যের কথা আলোচনা করি। ইহা অর্থনৈতিক ব্যাপার, অর্থাৎ চাকরির বাজারে নৈরাশ্য। বাস্তবিক অবস্থা কি আগের চেয়ে খারাপ? আমার ধারণা তো আমাদের দিনের চেয়ে শতগুণে ভাল। কিছু মন্তব্য আগেই করিয়াছি। স্কুলের সপ্তম অষ্টম শ্রেণীর ফেল মারা ছেলে সামান্য ঝালাই-এর কাজ (welding) কিংবা মোটরের কাজ শিখিয়া, কিংবা টেলিগ্রামের বা ইলেকট্রিকের তারের কাজ শিখিয়া মাসে তো চার পাঁচ ছয় শত টাকা রোজগার করিতেছে দেখিতেছি। যে সামান্য draftsmanship শিখিয়াছে, সে পকেটে দুই তিন খানা চাকরি লইয়া চলে। একবার কোথাও ঢুকিয়া যে সত্যই কাজ করে, কাজ বন্ধের তালে থাকে না, কাজ ফাঁকির ফন্দিতে নাই, তার মাহিনা বৃদ্ধি বা প্রমোশন রোখে কে? তার মত দেশহিতৈষী বা কে? তাদের মত লোকের পরিশ্রমে যদি কোন ব্যবসায়

বা শিল্পের উন্নতি হয়, তাহা হইলে দেশের উন্নতি তো হয়ই, আরও দশজন লোকের চাকুরীর সুবিধা হয়। আর এখন দেখিতেছি উল্টা। স্ট্রাইকের জ্বালায় প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় উঠিয়া যাইতেছে, অন্য প্রদেশে সরানো হইতেছে, নূতন কোন ফ্যাক্টরী বাঙলা দেশে শিল্পপতি বা সরকার স্থাপন করিতে চাহিতেছে না। এই দেখো সরকারী ট্রান্সপোর্ট বিভাগ উঠিয়া যাইবে, অন্তত উঠিয়া যাওয়া উচিত। লাভের ব্যবসায়ে লক্ষ লক্ষ টাকা লোকসান দেওয়ার কোন অর্থ হয় কি? কৃষক মজুরেরাই তো বেশির ভাগ এই লোকসানের টাকা জোগায়। বাবুদের ফাঁকিদারির খরচ-খয়রাতি এই গরিবদেরই বহন করিতে হয়। নৈরাশ্যের অন্য কারণ আছে, সেইটা হলো আমাদের নেতাদের প্রপ্যাগেন্ডা। এই শিক্ষায় কি হইবে, ভাত মিলে না—এই হলো আমাদের সারবান্ কথা। এই শিক্ষা ছাড়া ছেলেমেয়েরা কি করিবে, সেই কথা তাঁহারা বলেন না। বিজ্ঞান শিক্ষা কিংবা শিল্প শিক্ষায় তো হুড়াহুড়ি। আর সেই দিকেই কি কুবেরের কোষাগার? মানবিক শিক্ষার ছেলেমেয়েগুলি সব উপোসে মরিতেছে? একবার চোখ বুজিয়া চোখ পাকাইয়া ভাবুন তো। আর মানবিক শিক্ষার নিন্দা করিয়া আমরা অমানব, দেশে দৈত্য-দানব সৃষ্টি করিতেছি। একটু খবর লইলেই জানিতে পারিবেন, ভাল ছেলেরাই স্কুলে বিজ্ঞান পড়ে আর তাহারাই অবিনীত বেশি। আমরা জানিতাম ভাল ছেলেরা সবদিকে ভাল।

এইবার আসল কারণ বলি। আগেই বলিয়াছি, মানুষ সামাজিক জীব। দেশের যে হাওয়ার মধ্যে তাহারা জন্মে, বাড়ে মানুষও সেইরকম হয়। আমাদের দেহে মনে ব্যাধি, সর্বাঙ্গে পুঁজ। ছেলেমেয়েরা অক্ষত সুস্থ মন নিয়া কিরূপে জন্মিবে। দেশে দেশে হানাহানি, ঠকাঠকি, ঠেলাঠেলি চলিতেছে; চলিতেছে মারণের তপস্যা। যে কোটি কোটি টাকা দেশবাসীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যয়িত হইতে পারিত, তাহা মিছামিছি মারণযজ্ঞে পোড়ান হইতেছে। দেশের মধ্যে দলে দলে গালাগালি, মারামারি চলিতেছে। প্রদেশে প্রদেশে ঠেলাঠেলি, রেষারেষি চলিতেছে। এই অভাগা দেশে আবার জাতে জাতে বজ্জাতি চলিতেছে। কায়স্থ, বৈদ্য, ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণে হানাহানি চলিতেছে। ভাষা নিয়া হাঙ্গামা আছে, খাদ্য নিয়া হাঙ্গামা আছে, শ্রমিক মালিক হাঙ্গামা আছে। লোক চাপা পড়িলে ট্রামবাস পোড়াইবার হাঙ্গামা আছে; ট্রেন দেরিতে আসিলে হাঙ্গামা আছে, বেচারা স্টেশনমাস্টারকে এমন কি তার হতভাগিনী স্ত্রীকে মারিবার বাহাদুরি আছে; জিনিসপত্রের দর নিয়া হাঙ্গামা আছে, বিনা ভাড়ার যাত্রীকে ধরিলে হাঙ্গামা আছে, চোরাচালানীদের ধরিতে গেলে হাঙ্গামা আছে, ভদ্রসভায় অভদ্রতার চূড়ান্ত আছে। আর এই সমস্ত হাঙ্গামা চালাইয়া রাখিবার বুদ্ধিদাতা আছে এবং হাঙ্গামাই একমাত্র ধর্ম, ইহা প্রচার করিবার শস্ত্রী-শাস্ত্রী আছে। আর সরকারও হাঙ্গামা ছাড়া কিছু বোঝে না। যতই ঘুষ খাই, জুচ্চুরি করি, কাজ পণ্ড করি, কিন্তু পরকে জোর গলায় ঘুষখোর বদমায়েস ডাকিয়া সাধু কবলাইবার গণতান্ত্রিক অধিকার আছে। এক কথায় ঘরে বাহিরে, পাহাড়ে পাহাড়ে, দেশে বিদেশে সর্বত্র সর্বক্ষণ হাঙ্গামা আছে। সাধুরাও হাঙ্গামায় নামিয়াছে অনশন করে। সকলেই নির্দোষ, দোষী কেবল পুলিশ, সরকার, যেন আমরা পুলিশও নহি, সরকারও নহি। মন্ত্রীরাই সরকার, তাঁরাই যত ঘুষ খায় আর আমরা সাঙ্গোপাঙ্গরা সব ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির! ভণ্ডামির ও সীমা আছে। মজার কথা, কেহ কোন দিন এই ষাট বছরে কোন হাঙ্গামাকে নিন্দা করিয়াছে? কোন নেতাও না, কোন খবরের কাগজও না। উল্টা উস্কানি আছে, প্রশংসা আছে, বড় বড় অক্ষরে খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় ফলাও করিয়া ছাপান আছে। পিকিং-এর সার্টিফিকেটও মিলে। ইহা নাকি 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব'। এর পরেও কি ছাত্রদের দোষ দেওয়া যায়? জাপানে, ইন্দোনেশিয়ায়, আরও অনেক দেশে যুবকেরা রাজামন্ত্রীকে গদিচ্যুত করিয়াছে, আরেকজনকে গদিতে বসাইয়াছে। এইরকম বিরাট কর্মের প্রলোভন কি কম? কেবল গাঁজা মদ খাইলেই নেশা হয়? টাকার নেশা, নেতৃত্বের নেশা, হাততালির নেশা, ক্ষমতার নেশা, শাসনের নেশা কি কম?

ছাত্রেরা যুবক; ভূয়োদর্শন নাই। চিন্তাশীলতা যৌবনের গরম রক্তে বেশি থাকিতে পারে না। কাজেই তাহারা অপরিপক্কবুদ্ধি, অপরিণামদর্শী হইবার কথা। সারা বিশ্বে যুবক-যুবতীরা শাসনের বাহির হইয়া পড়িয়াছে। পাশ্চাত্যের শাসক এবং মনীষীরা বিপন্ন বোধ করিতেছেন। যুবকদের সামনে আমরা কোন্ আদর্শ স্থাপন করিলাম? আমরা ধর্মভ্রষ্ট, নীতিভ্রষ্ট, দুর্নীতি আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। কাহারো উপর আমাদের শ্রদ্ধা নাই, বিশ্বাস নাই। মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করিতে পারে না মানুষের ইহার চেয়ে অধঃপতন আর কি হইতে পারে? খাদ্যে ভেজাল নহে, ভেজাল আমাদের মনে চিন্তায়। কাজেই ছাত্রেরা প্রধান শিক্ষক কিংবা অধ্যক্ষের মধ্যেও ভেজাল দেখে, অন্তত ভেজাল আবিষ্কার করে। সাধু কর্মচারী অফিসে, কারখানায় বেমানান। সহকর্মীদের হাতে তার নির্যাতন আছে, উপরিওয়ালার হাতে তার বিতাড়ন আছে। কোন শিশু অসৎ হইয়া জন্মায় না। পরিবেশ তাহাকে অসৎ করিয়া তোলে; অন্তত পরিবেশ তাহাকে ভালও করিতে পারে, মন্দও করিতে পারে। সাধারণত যুবকেরা আদর্শবাদী হয়। আদর্শে ধরিয়াছে ঘুণ। তাহাদের কাছে আমরা কি আশা করিতে পারি?

এক শ্রেণীর সমাজশাস্ত্রীর মতে সত্য, সততা, ধর্ম এইগুলি বুর্জোয়া বুলি, গরিবদের ভুলাইয়া শোষণ করিবার মন্ত্র। ভাগবতে আছে, ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ। অর্থাৎ ছলনা বর্জনই ধর্ম। আমরা বলি, দলের উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রয়োজনে কৈতবও বৈভব। অর্থ ভিন্ন অন্য কোন উপাস্য নাই, ভোগ ছাড়া অন্য কোন যোগ নাই। দলীয় স্বার্থ ছাড়া আর কোন পরমার্থ নাই; দল ছাড়া দেশ নাই। তাহাতে যদি মিথ্যা বলিতে হয়, হত্যাও করিতে হয়, প্রতারণাও করিতে হয়, তাহাতে পুণ্য বৈ পাপ নাই। নিজেদের স্বার্থে, দেশসেবার বেনামে, যুবকদের দিয়া যত দুষ্কর্ম করাইয়া নিজের নেতৃত্ব কায়েম রাখিবার চেষ্টা করিব, আর যুবকেরা বেয়াড়া হইবে না আশা করিব, এমন সোনার পাথরবাটি হয় কি?

(১) এই অবস্থার প্রতিবিধান ছাত্র, অভিভাবক, শিক্ষক, নেতা এবং সরকারের ঐক্যমতের উপর নির্ভর করে। আমরা যদি সৎ হই, যুবকেরা নিশ্চয় সৎ হইবে। শাসকদের দোষত্রুটি, কিংবা নেতাদের দোষত্রুটি ভদ্রভাবে বলিলেই হয়, গালাগালির দরকার কি? শাসকদের নীতির ভুল, কাজকর্মের দোষ দেখাইয়া দেওয়া সুশাসনের সহায়ক। গালাগালিতে টেবিল-চেয়ার নিয়া আক্রমণে শাসন শোধরান যায় না।

আমার মনে হয়, একটি নিয়ম করিলে বার আনা ঘুষ নেওয়া বন্ধ হইবে। যদি আইন হয়; অফিসে সকলকেই দিনের ফাইল দিনে শেষ করিয়া যাইতে হইবে, দিনের কাজ দিনে শেষ করিতে হইবে, না করিলে শাস্তি পাইবে, তাহা হইলে ঘুষের মূল উৎপাটিত হইবে। অন্যদিকে শাসকবর্গও সন্দেহাতীত নীতিমান্ হওয়া চাই। ভোটারেরাও দুর্নীতিপরায়ণ লোককে ভোট দিবে না।

ছাত্রদের সামনে শিক্ষকদের কিংবা অন্য গুরুজনদের নিন্দা করা চলিবে না। এই বিষয়ে সাম্যবাদীদের নীতি বরং ভাল। কেহই নেতাদের নিন্দা প্রকাশ্যে করিতে পারে না। নেতারাই শোধন

করে। প্রকাশ্যে কেহ কাহাকেও গালি দেয় বলিয়া জানি না।

(২) শিক্ষক এবং ছাত্র কেহই রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে না। ভোট দিতে পারিবে মাত্র। কারও জন্য ভোট ক্যানভাসিং করিতেও পারিবে না। গবেষকেরা গবেষণা ছাড়া কোন আন্দোলনে যোগ দিতে পারিবে না। ছেলেদের ইউনিয়ন, অন্তত কয়েক বছরের জন্য, বন্ধ করিয়া দিলে ভাল হয়। অধ্যক্ষ মহাশয় কয়েকজন ভাল ছেলেদের দিয়া ছোট একটা সমিতি গঠন করিবেন। এই সমিতির কাজ হইবে, নিজেদের অভাব-অভিযোগ অধ্যক্ষকে জানান, তাঁর শাসনের প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ নহে। তিনি তাহাদের অসুবিধা সত্বর দূর করিবেন। স্কুলের পরিচালক সমিতিতে নির্বাচন মহা গণ্ডগোলের কারণ হইয়াছে। স্থানীয় সৎ বিদ্যোৎসাহী শিক্ষিত লোক দিয়া পরিচালকমণ্ডলী গঠন করা বড কঠিন নহে। অবশ্য তাহাতে প্রধান শিক্ষক এবং অধ্যক্ষ ছাড়াও শিক্ষক প্রতিনিধি থাকিবে। শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইতে পারিবে। কোন সমিতির কাজ ভাল চলিলে উহা চলিতেই থাকিবে। নেহাৎ দরকার হইলে মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ উহার পরিবর্তন করিবে।

(৩) ছাত্রদের অভাব-অভিযোগের চূড়ান্ত বিচার-বিবেচনা পরিষদ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় করিবে। এই বিচারের বিরুদ্ধে কোন কোর্টে আপীল চলিবে না। মোকদ্দমায় বোর্ড কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার টাকা খরচ হয়। অন্যদিকে শৃঙ্খলা বজায় রাখা কঠিন হইয়া পড়ে। কোন শিক্ষক বা স্কুল, কলেজ যদি কোন দুষ্ট ছেলেকে পড়াইতে না চায়, তাহাকে পড়াইতে বাধ্য করা উচিতও নহে। এই না-পড়ানই হলো বহিষ্কার। ইহার উপর কি করিয়া হস্তক্ষেপ করা যায়, বুঝি না। বর্তমান ছাত্রগণ্ডগোল ইহার জন্যই হইতেছে। গণতন্ত্র মানে গণেশের শুঁড় দিয়া ডাল-পালা ভাঙা নহে। আজকাল গণপতিগণ লেখনী ছাড়িয়া মূষিকে চড়িয়া শুণ্ডাঘাতই করিতেছে।

(৪) পরীক্ষার হলে কিংবা ক্লাসে হাঙ্গামা বন্ধ করা অতি সহজ। মনু আড়াই হাজার বছর আগে তাহার উপায় দেখাইয়া গিয়াছেন। দুষ্ট ছেলেকে পড়াইবে না—ইহাই, মনুর মতে, মা সরস্বতীর বিনীত নিবেদন গুরুদেব কাছে। শিক্ষকেরা যদি এক জোট হইয়া মা সরস্বতীর এই প্রার্থনা মঞ্জুর করেন এবং হাঙ্গামাকারী ছেলেদের পরীক্ষার কাগজও তাঁহারা না দেখেন, তবে এই উপদ্রব একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। ফলে যাহারা পড়িতে চায় এবং পরীক্ষা দিতে চায়, তাহারাই দুষ্ট ছেলেদের সায়েস্তা করিয়া ফেলিবে। ভাল ছেলেরাই আমার বিশ্বাস, সংখ্যায় বেশি। তাহদের গণতান্ত্রিক অধিকার গণশুণ্ডীরা নষ্ট করিবে কেন? শিক্ষকেরা রাজনীতি ছাড়িলেই ইহা সম্ভবপর হইবে। দুষ্ট ছেলেরাই রাজনীতির সৈন্যবাহিনী হইয়া থাকে।

(৫) সকালে সন্ধ্যায় পাঠে অমনোযোগী ছাত্রেরা স্কুলে বা কলেজে আসিয়া পড়িবে। কোন শিক্ষকের উপর সেই সময়ে তদারকির ভার দিলেই হইবে। অবশ্য এই শিক্ষকগণকে পারিতোষিক দিতে হইবে। এই সমস্ত ছাত্রেরা স্কুল কলেজের বইও পড়িতে পাইবে। আরম্ভেই এই ছেলেদের ডন বৈঠক ব্যায়াম করিতেই হইবে। ব্যায়াম সকলের জন্য আবশ্যক করা উচিত।

ডাক্তারের সুপারিশ ছাড়া কেহ বাদ যাইবে না। জল খাবার খাইতে না পারিলেও ব্যায়ামে কোন ক্ষতি হয় না। এই লেখক তার প্রমাণ।

(৬) সরকারী স্কুল কলেজের শিক্ষকদের মত বেসরকারী বিদ্যায়তনের শিক্ষকদের মাহিনা হওয়া উচিত। ডেপুটি সাব-ডেপুটির বেতনের চেয়ে কম নহে। তাঁহারা কিন্তু বিনা অনুমতিতে কেহই গৃহশিক্ষকতা কিংবা অন্য কোন ব্যবসা করিতে পারিবে না। আমাদের দেশের এমন অবস্থা হয় নাই যে, পাশ্চাত্য দেশের মত টিউটোরিয়েলের ব্যবস্থা করা যায়। ছাত্রদের home-task দিতে হইবে, আদায় করিতে হইবে, শুদ্ধ করিতে হইবে। দরকার হইলে home-task শুদ্ধ করিবার জন্য আলাহিদা লোক নিযুক্ত করিতে হইবে। কলেজে home-task না করিলে উপস্থিতি নোট করা হইবে না। অনেক ছেলে স্কুলে আসিয়া পরে বাহির হইয়া যায়। ইহাও বন্ধ করা দরকার।

(৭) ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী কাহারো অনশন করা চলিবে না। কোন ছাত্র যদি ইহা করে, তার নাম আপনাআপনি কাটা যাইবে। এই ক্ষেত্রে অন্যদের চাকরি যাইবে। শান্ত পরিবেশ ছাড়া শিক্ষা হয় না।

(৮) অন্তত ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত, অষ্টম শ্রেণী হইলে ভাল হয়, শিক্ষা অবৈতনিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। স্নাতকোত্তর বিভাগ, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেডিকেল বিভাগে পড়া এখনই অবৈতনিক করিলে আর্থিক দায় বিশেষ বাড়িবে না। ছাত্র বেতন হইতে যাহা আদায় হয়, মোট ব্যয়ের তুলনায় তাহা একেবারে নগণ্য। আমার মতে, আমরা সব ব্যাপারে অন্তত আট দশগুণ বেশি খরচ করিতে পারি, শিক্ষার বর্ধিত বেতন বহন করিতে কাতর হইব কেন। বরং ছাত্রদের ফি দ্বিগুণ করিয়া Halffree - studentship, Full free-studentship শতকরা পঞ্চাশ ভাগ করিলেই হয়। আমাদের মধ্যে অনেকেই আগ্রহ সহকারে ইহার চেয়ে অনেক বেশি বেতন দিয়া ছেলেমেয়েদের মিশনারী স্কুল কলেজ কিংবা তজ্জাতীয় স্কুলে কলেজে দিতে পারিলে কৃতার্থ হয়।

(৯) শিক্ষকেরাও এমনভাবে পড়াইবেন, যাহাতে অন্তত নিম্নশ্রেণীতে, এমন কি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাড়িতে অন্যের সাহায্যের দরকার হয় না, বিশেষ পড়িতে হয় না। তাহাদের home-task করিতেও বেগ পাইতে হয় না। পড়াইবে কম, পড়াইবে ভাল। আজকাল পাঠ্য বিষয়ের সংখ্যা যেমন বাড়িয়াছে, বিষয়ের বিস্তৃতি এবং গভীরতাও তেমন বাড়ান হইয়াছে। অন্য দেশের সঙ্গে তুলনা করা অযৌক্তিক। হনুমানের অনুকরণে লম্ফ প্রদান করিলে দশ হাত নিচে পড়িয়া আমাদের মরিতেই হইবে। সবরকমে অন্য দেশের সমান হইলে তাহাদের অনু-

বি. সি. মাইতি এণ্ড কোং

—ইলেকট্রো প্লেটিং সামগ্রী—

নিকেল ভ্যাট ও ব্যারেল * ডাইনামো * পলিশিং মেসিন এবং প্লেটিং করিবার জন্য যাবতীয় সামগ্রীর আদি সরবরাহক।

শো রুম ঃ- ৯৪, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কলি-১২ । ফোন ঃ ৩৪-৩১৭৩

৩, রাধামোহন পাল লেন, কলি-১২ ঃ অফিস-ফোন—৩৪-৪৮৪৬

করণ করা যাইতে পারে। আমাদের দেশে গুরুপদ্ধতি উহার চেয়েও ভাল ছিল।

(১০) স্কুল, কলেজ এবং অন্যান্য বৃত্তিকরী শিক্ষালয় আরও বাড়ান দরকার। যে জেলা হইতে পাশ করিবে, সাধারণত, সে জেলারই উচ্চতর বিদ্যায়তনে পড়িবে। কলিকাতা আসিয়া ভিড় করিতে পারিবে না। এমন কি নিকটতম বিদ্যায়তনে পড়িতে হইবে। শিল্পে বাণিজ্যে গন্ডগোল না চালাইয়া সকলেই প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া, অর্থাৎ ধর্মঘট না করিয়া কর্মঘটের পূজা করিয়া শিল্পের বাণিজ্যের উন্নতি-প্রসার করিলে কর্মীদের যেমন সুবিধা হইবে ঐ সমস্ত শিক্ষায়তন হইতে পাশ-করা ছেলেরও কর্মসংস্থান হইবে। অন্নাভাবই বিপ্লব সৃষ্টি করে।

(১১) পরীক্ষার পর, কিংবা ছুটির সময় ছেলেমেয়েদের দিয়া গ্রামোন্নতির কাজ করিলে তাহাদের আনন্দ তো হইবেই, তাহাদের দৈহিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য ফিরিবে। জঙ্গল পরিষ্কার করা, পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করা, রাস্তা মেরামত করা—এইরকম কত কাজ তাহারা অল্প সময়ের মধ্যে করিতে পারে। সবচেয়ে বেশি লাভ হইবে শহর এবং গ্রামের অন্তরঙ্গ সংযোগে পল্লীবাসীর, কৃষকদের জীবনযাপনের অভিজ্ঞতালাভে। শহরের টাকা, আহার যোগায় পল্লীবাসীরা; শহরেরই কিছু টাকা পল্লীবাসীর হিতার্থে ব্যয়িত হইবে।

(১২) বিদেশী খেলায় খরচ হয় অতি বেশি। সেই খরচে চাঁদা দেয় শত শত ছেলেমেয়ে, কিন্তু খেলে অল্প কয়েকজন। দেশী খেলায় খরচ নাই, বহু ছেলে খেলিবারও কোন অসুবিধা হয় না। দেশী খেলার উৎসাহ দিলে মন্দ কি? তবে উন্মাদনা হইবে না। স্কুলে স্কুলে বইয়ের ব্যাঙ্ক খুলিলে ছেলেদের অনেক সুবিধা হয়।

(১৩) স্কুলে কলেজে ছাত্র-শিক্ষক মিলিয়া একটা moral code অর্থাৎ সন্নীতিবিধি রচনা করা ভাল। সেই সন্নীতি ভঙ্গ করিলে কি শাস্তি হইবে তাহাও লেখা থাকিবে। একটা ন্যায় সমিতি গঠিত হইবে, সেইখানে প্রত্যেক ক্লাসের সৎ মেধাবী ছেলে কিংবা মেয়ে অধ্যক্ষ নির্বাচিত করিবেন, একজন অধ্যাপকও থাকিবেন, আর থাকিবেন প্রধান শিক্ষক কিংবা অধ্যক্ষ। ইনিই হইবেন সভাপতি। এই সমিতিই নীতি-ভঙ্গের উক্ত সন্নীতিবিধি অনুসারে বিচার করিবে।

(১৪) ভর্তির সময় প্রত্যেক ছেলেকে এক কপি সন্নীতিবিধি দিতে হইবে। সে এবং তার অভিভাবক তাহা পড়িয়া সহি করিয়া দিবে। ভর্তির ফরমে পরিষ্কার লেখা থাকিবে বিদ্যায়তনের শৃঙ্খলা বা সন্নীতি ভঙ্গ করিলে যথাবিহিত শাস্তি পাইবে—ইহার প্রতিবাদ চলিবে না। অভিভাবকও ইহাতে সহি করিবেন।

(১৫) যে সব ছেলে দুষ্ট, কোন শিক্ষক তার ভার নিয়া তাহাকে শিক্ষাতিরিক্ত সৎকাজের (extra-academic work) ভার দিয়া বেশি খাটাইয়া লইবে। তাহাতেই তার স্বভাব শোধিত হইতে পারে। শোধনকার্যে অভিভাবকের সহযোগিতাও অত্যাবশ্যক।

(১৬) ছেলেদের সাপ্তাহিক পরীক্ষা নেওয়া ভাল। আমি চট্টগ্রাম কলেজে পড়িতাম। সেইখানে এই নিয়ম ছিল। সাপ্তাহিক পরীক্ষার জন্য প্রধান প্রধান প্রশ্ন আগে হইতেই শিক্ষক বলিয়া দিবেন। সেই প্রশ্ন হইতেই কয়েকটি বাছিয়া পরীক্ষায় দেওয়া হইবে। এই সব পরীক্ষায় পাসের নম্বর শতকরা ত্রিশ না করিয়া অন্তত চল্লিশ করা ভাল। সাপ্তাহিক পরীক্ষায় পাস না করিলে প্রমোশন হইবে না, শেষ পরীক্ষার জন্য পাঠানো হইবে না। প্রশ্নগুলির উত্তরের সঙ্কেতও শিক্ষক মহাশয় বলিয়া দিবেন। বার্ষিক পরীক্ষায় কিংবা টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্নও ঐগুলি হইতে আসিবে, বড় জোর দুই-একটি নূতন প্রশ্ন থাকিতে পারে। ইহাতে শিক্ষকের দায়িত্বও বাড়িবে।

(১৭) কলেজে টিউটোরিয়েল ক্লাস আরও জোরদার হওয়া দরকার। আমাদের দেশে পাশ্চাত্য দেশের অধ্যাপকের মত পড়াইলে চলিবে না—সেই দেশের টিউটরের মত পড়াইতে হইবে।

(১৮) বোর্ড কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ছেলে ঠকান প্রশ্ন থাকিতে পারিবে না। ছাত্রদের অবশ্য জ্ঞাতব্য প্রধান প্রধান বিষয়েই প্রশ্ন হইবে। প্রশ্ন দীর্ঘ হইবে না। বেশির ভাগ প্রশ্নই সহজ হইবে। কেবল মেধার পরীক্ষার জন্য অল্প কয়েকটি কঠিন প্রশ্ন থাকিতে পারে। প্রশ্নের সংখ্যা বেশি থাকিবে—যাহাতে কোন প্রশ্ন সিলেবাসবহির্ভূত হইলেও বাকি প্রশ্ন হইতে নির্দিষ্টসংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা যায়।

(১৯) ছাত্র-ছাত্রীগণের সস্তা দামের ইউনিফরম হওয়া দরকার। সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী তাহাই পরিয়া স্কুলে কলেজে আসিবে। ইহাতে ধনী-দরিদ্রের ছেলে-মেয়ের ভেদ থাকিবে না। ধনীর ছেলে-মেয়ের বিলাসিতা কমিবে।

(২০) শিক্ষায়তনে অল্পমূল্যের টিফিনের বন্দোবস্ত করিতে পারিলে ভাল হয়। তাহাতে দেশী শশা, কলা, পেয়ারা, টোম্যাটো প্রভৃতি ফল থাকিলে ভাল হয়। দুধ সরবরাহ করিতে পারিলে আরও ভাল হয়। ক্যান্টিনের দুষ্পাচ্য খাবার খাইয়া দেশের যুবক-যুবতীদের পেট একদম গেল। কেবল খরচান্ত, আর শরীরান্ত। খরচ ছাত্রেরাও বহন করিবে, গরিব ছেলের খরচ সরকার দিবে।

(২১) যাহা যুগ পড়িয়াছে, সমস্ত ছেলেমেয়ের রান্নার যাবতীয় কাজ শেখা এবং করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ঠাকুর-চাকরের যুগ চলিয়া যাইতেছে। হোটেলে খাওয়াও আমাদের ধাতে সহিবে না। কি করিয়া অত্যল্প সময়ের মধ্যে স্বল্প পরিশ্রমে রান্না করা যায়, তাহা সকলেরই জানা দরকার।

বলিলাম তো অনেক কথা। আশা তো করি অনেক। কিন্তু দেশের যাহা আবহাওয়া তাহাতে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা ছাড়া উপায় দেখি না। 'Father, forgive us, we know not what we do.' 'পিতঃ, আমাদের রক্ষা করো, আমরা কি করি, আমরাই জানি না।'

সাপ্তাহিক বসুমতীর

গ্রাহক হবার নিয়মাবলী

		টা, প,
বার্ষিক	চাঁদা (সডাক)	১৪·০০
ষাণ্মাসিক	" "	৭·০০
ত্রৈমাসিক	" "	৩·৫০

তিন মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক হতে হলে আপিসে অগ্রিম টাকা জমা দিতে অথবা মনিঅর্ডারে পাঠাতে হবে। কর্মাধ্যক্ষ

লেখা পাঠাবার নিয়মাবলী

লেখকদের কাছে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, অবশ্যই লেখার নকল রেখে তাঁরা সাপ্তাহিক বসুমতীতে লেখা পাঠাবেন। লেখা মনোনীত হলে পর সে-সংবাদ আমরাই যথাসময়ে পাঠিয়ে থাকি। নাম ঠিকানাসহ ডাকটিকিটযুক্ত খাম থাকলে একমাত্র অমনোনীত গল্প ফেরৎ পাঠাবার চেষ্টা করা হয়। কবিতা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। —সম্পাদিক

সাহিত্য সম্মেলন

সাহিত্যের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কালের সঙ্গে খাপ খাইয়ে ক্রমশই সম্প্রসারিত হচ্ছে। সেই সাহিত্য নিয়ে যে সম্মেলন, তার শাখা প্রশাখায় শহর থেকে মফস্বলে, প্রদেশ থেকে প্রদেশান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে সম্প্রসারণ ক্রমশই দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এই সম্মেলনে যে বার্তা ঘোষিত হয়, তাতে থাকে সমকালীন সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা। বলা বাহুল্য, এই আলোচনা জীবন, জাতি, দেশ, বিশ্ব ও যন্ত্রবিজ্ঞান নিরপেক্ষ নয়। বিশেষত এই ধরণের সম্মেলনে বেশি করে ঘোষিত হয় সংস্কৃতির আদান-প্রদানের দ্বারা পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের ও জাতীয় সংস্কৃতির কথা। অবশ্য অনেক সময় আলোচনা যাঁরা করেন বা যাঁরা শোনেন তাঁরা জানেন যে বক্তৃতার মধ্যেই নিহিত আছে আত্মপ্রবঞ্চনা বা প্রবঞ্চনা করার প্রলোভন। তবে এই প্রবঞ্চনার ব্যাপারটি অনেক সময় সাহিত্যিকের মুগ্ধ কলমের ডগায় এমনভাবে পরিস্ফুট হয় যে, তার আঁচড়টি প্রকাশ না পেলেও, আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় না। এই কথার প্রমাণ হয় তখনই, যখন এক ভাষা এক রাষ্ট্রের মাহাত্ম্যে কোনো ভাষা মোড়লী করতে গিয়ে অন্য ভাষার প্রতি মৌখিক করুণা প্রকাশ করে। ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে যে, এদের আবির্ভাবকাল খুব বেশি দিনের নয়, শুধু অযৌক্তিক সরকারী দাক্ষিণ্যবশতই এদের মোড়লী। দেশ যদি গণতান্ত্রিক, তাহলে এই ধরণের মনোভাব প্রশ্রয় পাবার কথা নয়। আর এই ধরণের মনোভাব প্রশ্রয় পেলে জাতীয় সংহতিও কোনোদিন সম্ভবপর বলে মনে হয় না। অবশ্য উপরিউক্ত মনোভাবের সৃষ্টি স্বাধীন ভারতেই সম্ভব হয়েছে বললে অত্যুক্তি হয় না; পরাধীন ভারতে এদের পাত্তাই ছিল না।

প্রসঙ্গত এসে পড়ে—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কথা। কাশীতে সাহিত্য সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেছিলেন, 'ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মিলন রাষ্ট্রীয় শাসন-সাম্য অথবা ভাষা-সাম্যের দ্বারা হবার নয়। প্রত্যেক প্রদেশ তার সাহিত্য-গঠনে মনোনিবেশ করলেই, তার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য বিকশিত হলেই বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে প্রকৃত অন্তরের মিলন সম্ভব হতে পারে।"

তদানীন্তন পরাধীন ভারতে যে কথা রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করেছিলেন, তার বহুকাল পরেও এমনকি আমাদের স্বাধীনতা লাভ ঊনিশ বছর হয়ে গেলেও ভারতের চোদ্দটি প্রধান ভাষার মধ্যে তেরটি ভাষাই সরকারী চক্ষে অবহেলিত। রাজ্য সরকারগুলিও ঐ সব ভাষার যথাযথ মর্যাদা দানের ব্যাপারেও উদাসীন। এই উদাসীনতা যখন স্ব রাজ্যেও লক্ষ্য করা যায়, তখন তার চেয়ে লজ্জার কি আর থাকতে পারে। এই বাংলা দেশেই ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষের মুখ্যমন্ত্রিত্বের কালে তদানীন্তন চীফ সেক্রেটারী সুকুমার সেন বাংলা ভাষাকে সরকারী মর্যাদাদানের জন্যে যদি বা কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন—একালে তাও অবহেলিত।

উপরিউক্ত কথাগুলি প্রাক-নির্বাচনী কোনো রকম ইস্তাহারের আলোচনা বা পর্যালোচনা নয়। এবার নাগপুরে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ৪২তম অধিবেশনে প্রার্থিত জাতীয় সংহতির আলোচনার সঙ্গে ভাষার মর্যাদা নিয়েও পর্যালোচনা হয়েছে। সেই কারণে ভারতীয় ভাষাগুলির মর্যাদার কথা উত্থাপিত হবেই।

নাগপুরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ৪২তম অধিবেশন উদ্বোধন করতে গিয়ে মহারাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী শ্রী এস কে বানখেড়ে বলেন, "আজ দেশে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে জাতীয় সংহতি। সাহিত্য এই ক্ষেত্রে বিরাট এক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। 'এক জাতি এক প্রাণ একতা'—এই মূল মন্ত্র সাহিত্যের লেখনী থেকে আজ যত বেশি বের হয় ততই মঙ্গল।"

শ্রীবানখেড়ে যা বলেছেন তা যথার্থই কিন্তু এই মূলমন্ত্র প্রকাশের জন্য ভারতীয় প্রধান ভাষাগুলির মর্যাদাই যদি সমভাবে স্বীকৃত না হয় তাহলে গণতন্ত্রও সংহতি কি ক্ষুণ্ণ হবে না?

সম্মেলনে সাহিত্য শাখার সভাপতি শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর অপূর্ব ভাষণে বলেছেন—"আমাদের বহু ভাষাভাষী এবং গণতন্ত্রবাদী ভারতবর্ষে এই সমস্যার আজও কোন চূড়ান্ত এবং সর্বজনগ্রাহ্য মীমাংসা হলো না। এই বিষয়ে সংক্ষেপে আমার বক্তব্য এই যে, ভারত রাষ্ট্রের যৌথ পরিবারে হিন্দী যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আসন দাবি করে, আমরা তা অস্বীকার করবো না। কিন্তু ভারতবর্ষের বাকী প্রধান মাতৃভাষাগুলিকেও সহোদর ভ্রাতার সম্মান ও সমান অধিকার দিতে হবে। অর্থাৎ ভারত সরকার কর্তৃক ১৪টি ভাষাকেই জাতীয় ভাষার অনুরূপ সমান মর্যাদা ও অধিকার দিয়ে মেনে নিতে হবে। অন্তত স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর মনোভাব তাই ছিল। অথচ পার্লামেণ্ট বা সংসদে কার্যত একমাত্র ইংরাজী কিম্বা একমাত্র হিন্দী ছাড়া আর কোন ভাষাই পাত্তা পাচ্ছে না। যদিও লোকসভার সদস্যপদের নির্বাচনের জন্য কোন ভাষাগত নিষেধবিধি নেই, তবু কোন সদস্যই বাস্তবক্ষেত্রে হিন্দী বা ইংরাজী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় বক্তৃতা দেওয়ার অধিকারী নন। গণতান্ত্রিক শাসনে এই ভাষাগত অবিচারের আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাই। আমরা চাই সংসদে ১৪টি প্রধান ভারতীয় ভাষারই ব্যবহার-অধিকার থাকবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদের জন্য দক্ষ দো-ভাষীর ব্যবস্থা থাকবে। আর সেই সঙ্গে ভারত সরকারের সমস্ত বক্তব্য, বিজ্ঞপ্তি এবং আইনের খসড়া ভারতীয় ১৪টি ভাষাতেই প্রকাশ ও প্রচার করতে হবে এবং সমস্ত ভাষার উন্নতির জন্যই সমান হারে আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে। এই ব্যবস্থাগুলির দ্বারা কেবল যে বিভিন্ন ভাষাভাষীর মধ্যে বিরোধ ও মনোমালিন্যের অবসান হবে, তাই নয়, এর দ্বারা সমস্ত ভাষাই উন্নতি ও অগ্রগতির সমান সুযোগ পাবে এবং ভারতীয় ভাষার রাজ্যে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে। এই গণতন্ত্রকে শক্তিশালী, সুস্থ ও জীবনপ্রদ করার জন্যই আজকের সাহিত্যিকদের সাধনা।" স্বীয় রাজ্যেও আজও মাতৃভাষা যেন শৃঙ্খলিতা!

নাগপুরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে মূল সভাপতি হিসেবে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "...আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রের মহাকরণ এবং দপ্তরের দিকে তাকিয়ে দেখুন। আজ ঊনিশ বৎসর বিগত। আজও আমাদের মা বঙ্গভারতী সরকারী এলাকার দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মানা। ঊনিশ বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। সেখানে কর্তৃত্বের আসনে বসে আছেন যিনি ছিলেন

তিনিই। উচ্চতম বিচারালয়েও অবস্থা তাই। সেখানেও তিনি মাত্র নিম্ন আদালতগুলিতে অধিকার পেয়েছেন। রাজবাড়িতে মূল ভাঁড়ারের সর্বেশ্বরী বিদেশিনী রাজকন্যার অধীনে বাড়িঘর ও গরীবগুনোদের সিধে দেবার ছোট ভান্ডারটি ভারপ্রাপ্ত মৃত গুরুর বিধবা কন্যার মত অবস্থা তাঁর। তার থেকে অধিক কিছু না।

মহা বিদ্যালয়গুলিতেও একই অবস্থা। সেখানেও ওই বিধবা গুরুকন্যার মত নিরামিষ রন্ধনশালায় বেড়ি হাতে তিনি বসে আছেন। তাঁর আওতায় শুধু বাংলা সাহিত্য অর্থাৎ বাংলা কাব্য, কথাসাহিত্য, নাটক ছাড়া আর কিছু দেওয়া হয় নি।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক মনীষী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রস্তাব উপেক্ষিত, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া সম্ভব বলে তিনি যে মত দিয়েছেন তা ইংরেজী পন্ডিতেরা মানতে প্রস্তুত ন'ন।

এই কারণেই দর্শন ইতিহাস বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বাংলা সাহিত্য দীনার মত একান্তভাবে লজ্জিতা। তাঁর ভান্ডারের দারিদ্র্য সেখানে সুপ্রকট।"

অবশ্য বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে এই আশার কথা শুনিয়েছেন যে, -"......বাংলা সাংবাদিকতা বাংলা সাহিত্যের মধ্যে গতিবেগ সঞ্চার করেছে, নিত্য নতুন শব্দসম্ভার সৃষ্টি করেছে এবং দেশের একমাত্র রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতিকেই নয়, সাহিত্য শিল্পকলা ও সংস্কৃতিকে বহু শাখা-প্রশাখায় প্রসারিত করে তুলেছে।"

বাংলা দেশের সংবাদপত্রে বাংলা সাহিত্যের গন্ডী সম্প্রসারিত—এ সম্বন্ধে দ্বিমত থাকার কোনো কারণ নেই, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির বাংলা ভাষার প্রতি নিস্পৃহতা দেখে লজ্জায় অধোবদন হতে হয়। মাতৃভাষাকে যদি নিজেরাই মর্যাদা দান করতে না পারি, তাহলে অপরের কাছ থেকে সেই মর্যাদা লাভের আশা অর্থহীন।

প্রসঙ্গতই এবারের সম্মেলনে এসে পড়েছে পাকিস্তান তথা পূর্ববঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ। তারাশঙ্কর অতীতে পূর্ববঙ্গের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে যে ভুল ধারণা পোষণ করেছিলেন, এবার তার প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। তিনি এবার বলেছেন, "কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীকে অসংখ্য ধন্যবাদ।......তাঁদের আমি এই মঞ্চের উপর থেকে ভাইয়ের শ্রদ্ধা ভাইয়ের প্রেম নিবেদন করছি।" বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ও তাঁর ভাষণে বলেছেন, "অবশ্য পাকিস্তানে এই (ভাষা) সমস্যার মীমাংসা হয়ে গেছে অনেকদিন আগেই। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালী ছাত্র ও যুবকেরা বাংলা ভাষাকে জাতীয় ভাষার মর্যাদা দানের জন্য যে সংগ্রাম করেছেন, তা অবিস্মরণীয়। বাঙালী ছেলেদের বুকের রক্তে বাংলা ভাষার জাতীয় মর্যাদা সেখানে স্বীকৃত হয়েছে।" ইত্যাদি।

অথচ পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষার মর্যাদা তদানীন্তন পরাধীন ভারতের চেয়ে বেশি ত নয়ই, বরং অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে বাধ্য হয়েই বলতে হচ্ছে যে, তখনই বাংলা ভাষা আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করেছিল। আর এখন বিদেশে বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষাগুলিকে প্রবেশাধিকার না দিয়ে সেখানে একমাত্র হিন্দীরই আধিপত্য দেখাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য যদি এই রকম হয় তাহলে জাতীয় সংহতির কথা শোনাবে শুধু মুখের বাঁধা বুলির মতো, তার বেশি কিছু নয়।

যা হোক, নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে বাংলা ভাষা সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়েছে তা নিরর্থক আলোচনা নয়, অন্ততপক্ষে জাতীয় নেতাদের কাছে তাঁদের আবেদন ব্যর্থ হবে না বলেই মনে হয়। সর্বভারতীয় কল্যাণের জন্যই তাঁদের বক্তব্য বিষয়ে জনসাধারণেরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

এবারের সম্মেলনে বর্তমান বাংলা সাহিত্য-সৃষ্টি সম্পর্কিত আলোচনাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়—এই দুইজনের আলোচনার মধ্যেই বর্তমানে রচিত বঙ্গ সাহিত্যের দীর্ঘশ্বাসটুকু শোনা গেলেও—তাঁরা যে কার্যকারণ নিয়ে আলোচনা করেছেন তা সাহিত্যিকরা নিশ্চয়ই বিবেচনা করে দেখবেন বলে আমাদের ধারণা।

তারাশঙ্কর বলেছেন, "রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এবং বিরোধী দল দলগত স্বার্থের কলহে উত্তপ্ত। সাধারণ মানুষেরা উভয় পক্ষের কাছেই গৌণ হিসাবে উপেক্ষিত।...আজ মানুষের রাজ্যে মানুষগুলির স্বার্থ মানুষদের প্রতিনিধিদের দ্বারা উপেক্ষিত হয়েও পাপ বা অপরাধ বলে গণ্য হয় না। ভোটাধিক্যে পাপকে পুণ্য করা যায়। ন্যায়কেও অন্যায় প্রতিপন্ন করা যায়।"

এই কারণেই "শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও লেখকের এই মহৎ দায়িত্ব রয়েছে তাঁদের নিজের দেশ ও শাসকগোষ্ঠীর উপর। মনুষ্যত্ব যেখানে অপমানিত, সুবিচার যেখানে প্রত্যাখ্যাত এবং জীবন যেখানে ধিক্কৃত সেখানেই শিল্পী এবং সাহিত্যিককে এগিয়ে আসতে হবে নির্মল বিবেক ও নির্ভয় চিত্তের বাণী নিয়ে। কিন্তু প্রশ্ন এই—রবীন্দ্রনাথের এই উত্তরাধিকার আমরা কি যথাযথ পালন করছি? স্বাধীনতা লাভ করতে গিয়ে পার্টিশনের দ্বারা ভারতবর্ষ রক্তে ও অশ্রুতে ভেসে গেল। বাঙালীর ভাগ্যে নেমে এলো কালো অভিশাপ, লক্ষ লক্ষ মানুষ একবস্ত্রে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে পথে এসে দাঁড়াতে বাধ্য হোল। আজও সেই ইতিহাস যেন বিভীষিকার বার্তা বহন করে আনে। আজ ছিন্নমূল বাঙালী যেন সতীদাহের মত খন্ড-বিখন্ড হয়ে ভারতবর্ষের অরণ্যে, মরুভূমিতে, পাহাড়ে ও দ্বীপান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু এগুলিকে কেন্দ্র করে নতুন নতুন মনুষ্যত্বের তীর্থ গড়ে ওঠে নি। এবং এগুলি যেন দীর্ঘশ্বাসে ভরা হতাশ্বাসের কলোনী মাত্র! কোন লেখক বা কোন শিল্পী জাতীয় জীবনের এই ভয়ঙ্কর ট্র্যাজেডীকে বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্যের রূপ দিয়েছেন?"—এই কথা উচ্চারণ করেছেন সাহিত্যিক-সাংবাদিক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। আমরাও আজ বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, 'হাংরি' ও 'এ্যাংরি ইয়ং ম্যান'-দের বিরোধিতা করার পরিবর্তে পোষকতাই করা হয়েছে। ফলে বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি কি ঘটেছে? অথবা বর্তমান যে জীবন তা কি সাহিত্যে পুরোপুরি রূপায়িত হয়ে উঠেছে? তা সম্ভব হয় নি, বলেই একালের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা করতে হচ্ছে।

অবশ্য একালের জীবনজিজ্ঞাসা ও বিজ্ঞানের প্রভাব সাহিত্যে চারিত হওয়া সম্ভব এবং সেই চারণের ফলে তা অনেক সময় দুর্বোধ্য হওয়া অসম্ভব নয়—একথা বলেছেন বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। বিজ্ঞানের সাহায্যে যে আলোক আমাদের চোখে উদ্ভাসিত তা যেমন সত্য, তেমনি তার মারণযন্ত্ররূপ ক্রিয়াকলাপে ভবিষ্যৎও অন্ধকারাচ্ছন্ন, সুতরাং সাহিত্যেও এর প্রতিফলন ঘটার ফলে যদি তা কিছুটা দুর্বোধ্য বলে মনে হয়, তাতে বিস্মিত হবার কারণ নেই।

কিন্তু সাহিত্য দেবে 'গোটা মানুষের সন্ধান'। তাহলেই সাহিত্য সার্থক। হোক না 'প্রকৃতি বড় নিষ্ঠুরা' (তারাশঙ্কর), কিম্বা 'আজকের সাহিত্য বা আধুনিক সাহিত্য জটিল যন্ত্রযুগের প্রতিক্রিয়া, হতাশা এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সাহিত্য' (বিবেকানন্দ)।

বর্তমান সাহিত্যের বিচার করে তাকে ভাল বলে আহা করার যুগ যেমন গেছে, তেমনি তা খারাপ হোলেও শুধু নাক সিঁটকিয়ে লাভ নেই। যা সাহিত্য নয়,

বাজনা বাজে

শান্তনু দাস

আকাশ জুড়ে মেঘ জমলে
বুকের মধ্যে বাজনা বাজে,
আদিম ইচ্ছে মেঘলা হাওয়ায় ভাসতে থাকে তুলোর মতো
অলংকৃত হৃদয়-প্রধান জানলা ভেঙে বাইরে আসে
মগ্ন মনে অন্তরঙ্গ শব্দ শুনি চতুষ্পার্শেঃ
যে দিকে চাই দুনিয়া জুড়ে
সেতার বাজে ব্যঞ্জনাময়,

সবাই যেন লুপ লাইনের অসংবৃত রেলের গাড়ি,
বৃষ্টি ধূসর ইস্টিশনে মুখ বাড়িয়ে কোন আনাড়ি
কাকেই খোঁজে মনের ভুলে শুভ্র নরম চালচিত্রেঃ
ভালো লাগে না...
ভালো লাগে না...
আকাশ জুড়ে মেঘ জমলে
বুকের মধ্যে বাজনা বাজে।

তাকে ঝাঁটা মেরে বিদায় করার দায়িত্ব আমাদেরই—সেকথা সম্মেলনে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় একটি অবিস্মরণীয় উক্তি করেছেন। তিনি বলেছেন, সমাজের যে কলুষ, যে বঞ্চনা ও যে আবর্জনা থেকে 'হাংরি' এবং 'এ্যাংরি ইয়ং ম্যান' জন্মগ্রহণ করে এবং বিট্‌লেমি ও যৌনতা রোমাঞ্চকর সাহিত্যের রূপ নিয়ে বিভ্রান্তি ও লালসার সৃষ্টি করে সেই কলুষ ও দুর্গতির বিরুদ্ধে আসুন আমরা লড়াই করি।"

জানি না, তাঁর এই আবেদন গৃহীত হবে কি না এবং আগামীবারের সম্মেলনেই হয়তো আমরা জানতে পারবো এই সব সাহিত্যিকদের বাণীকে আমরা কতোটা সত্যে পরিণত করতে পেরেছি। তা যদি সম্ভব না হয়, তা হলে আমরা জানবো সম্মেলনের ভাষণ—নিয়মমাফিক বাৎসরিক সম্ভাষণ ছাড়া আর কিছু নয়।

তবে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কাছে আমাদের কয়েকটি আবেদন আছে। এক একটি রাজ্যের সাহিত্যিকদের পারস্পরিক মত-বিনিময় এই সম্মেলনে সম্ভব হয়েছে। মহারাষ্ট্রের সংগে বাংলাদেশের নানাভাবেই যে ভাব-ঐক্য আছে—সেকথা সুন্দরভাবে বলেছেন মূল অধিবেশনে সম্মেলন সভাপতি শ্রীদেবেশ দাস। কিন্তু নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন আগামী অনুষ্ঠানগুলিতে পূর্ব বাংলার সাহিত্যিকদের সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানালে তাতে বিভক্ত বাংলার অবিভক্ত সাহিত্যের প্রাণ-প্রবাহ নতুন করে আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে উঠবে। এ ছাড়া প্রবাসী বাঙালীদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণামূলক একটি গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশের জন্যে ইতোপূর্বেই সুধীজন মতামত ব্যক্ত করেছেন। তৃতীয়ত এই সম্মেলনকে ছুঁৎমার্গের পথ পরিত্যাগ করে উদার মনোভাব গ্রহণ করতে হবে। এ করা সম্ভব হলে তরুণ সাহিত্যিকরাও আমন্ত্রিত হবেন, এবং তাঁদের মতামতও ব্যক্ত করতে পারবেন। অবশ্য এবার অনেক সাহিত্যিক সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন, তাদের বক্তব্যেও সত্য আছে, শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ বর্তমান বীভৎস সংস্কৃতির প্রভাব সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন, তা নিয়ে অবশ্যই আমাদের ভাবতে হবে, কিন্তু তারাশঙ্কর ও বিবেকানন্দ যা বলেছেন—তা শেষ পর্যন্ত অরণ্যে রোদন না, ফলপ্রসূ হবে তা অবশ্যই লক্ষণীয়। তাঁদের বক্তব্য কার্যে পরিণত হলে বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও বাঙালী জাতির কল্যাণ। পুনশ্চ স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, তাঁরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনায় মুখর হলেও ভারতের অন্যান্য ভাষা সম্পর্কে সমদৃষ্টিসম্পন্ন। অন্যকে বঞ্চনা, প্রতারণা করার অভিসন্ধি তাঁদের মধ্যে যেমন তিলমাত্র নেই, তেমনি ত্যাগ-ধর্ম অবলম্বন করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিসর্জন দিতেও তাঁরা ইচ্ছুক ন'ন পরদ্রব্য গ্রহণের অভিলাষ বা অহমিকাও তাদের নেই।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে সম্মেলনের অভাব নেই, সত্যিকারের অভাব যথার্থ শ্রোতার। যথার্থ শ্রোতা বলার কারণ এই যে, বক্তব্য বা প্রস্তাব যদি সংবাদপত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে—তাহলে সে সব বক্তব্য ও প্রস্তাব নিষ্ফল। তবে এ জিনিস এখন লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে সম্মেলন যেমন ভারতের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে বছর বছর অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তেমনি কলকাতা শহরেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত সম্মেলন বা সভা হামেশাই হয়। কিন্তু শহরের বাইরে কিম্বা গ্রামাঞ্চলে এ ধরণের অনুষ্ঠানের অত্যন্ত অভাব। এই ব্যাপারে গ্রামাঞ্চলে বা মফস্বলে শিক্ষা-দীক্ষার অপ্রতুলতার কথা ওঠা স্বাভাবিক। আমরাও তা স্বীকার করি। কিন্তু বাংলা দেশের গ্রামের বহু মানুষ নিরক্ষর হলেও অশিক্ষিত নয়। সুতরাং বাংলা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও সাহিত্য সম্মেলনের অনুষ্ঠান অনস্বীকার্য। যা হোক, বঙ্গীয় কবি পরিষদের তিন দিনের অধিবেশনে বাঙালীর সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। সম্মেলনের উদ্বোধনী দিবসের অধিবেশনের মূল সভাপতি শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় বলেন, "স্বাধীনোত্তর ভারতে সাহিত্যিক ও কবিদের উপর এক নতুন দায়িত্ব এসে পড়েছে, এই দায়িত্ব পালন করার জন্য আজ কবি ও সাহিত্যিকদের এগিয়ে আসতে হবে।" সংবাদ সাহিত্য শাখার সভাপতি প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী তাঁর চিন্তাপ্রধান ভাষণে বলেন, "সংবাদ সাহিত্যের শক্তি আজ স্বীকৃত হলেও সাহিত্যের দরবারে তার স্থান লাভের ইতিহাস দীর্ঘদিনের নয়।...আজকের দিনে সংবাদপত্রের গতি সর্বত্র। একথা অনস্বীকার্য যে, শুধু রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বা মন্ত্রী ও বিশেষ বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর কিংবা ব্যক্তিগত কেলেঙ্কারীর সংবাদের সীমা আমাদের দেশের সংবাদপত্র অনেকদিন হল অতিক্রম করেছে। আজকের দৈনিক সংবাদপত্রের সীমার মধ্যে বিজ্ঞান, ইতিহাস, শিল্পকলা সব কিছুই এসে পড়েছে। তাতে সংবাদ-সাহিত্য আরো বেশি করে সাহিত্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার সুযোগ পাচ্ছে। সাহিত্যের অন্যান্য দিকের রথী-মহারথিগণ নিজ নিজ ক্ষেত্রকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যেভাবে সাধনা করে যাচ্ছেন, শত বাধা-বিপত্তি সত্বেও সংবাদ সাহিত্যসেবীরা ঠিক সেই-ভাবে সাহিত্যের এই দিকেও সাধনা আর সংগ্রাম করছেন।" বৈষ্ণব সাহিত্য শাখার সভাপতি শ্রীবিষ্ণু সরস্বতীর ভাষণও তাৎপর্যমণ্ডিত। তিনি বলেছেন, "বর্তমানে বৈষ্ণব সাহিত্যের যদি কোনো বাণী থাকে, তবে তা মানুষকে মানুষের মর্যাদা দানের বাণী।" সাহিত্য বিভাগের সভাপতি বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য বর্তমান দেশের সংকট-জনক মুহূর্তে সাহিত্যিকগণকে সবল লেখনীর দ্বারা দেশ ও জাতিকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। সুধী সম্মেলনের সভাপতি শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—"দেশের এই চরম দুর্দিনে সাহিত্য রচনার একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে সাহিত্যিক ও কবিগণের এক সুরে লেখনী ধরা উচিত।" এই অধিবেশনে সংবাদ-সাহিত্য ও বৈষ্ণব শাখার সভাপতিদ্বয় ছাড়া সকলেই এক সুরে কথা বলেছেন বলতে আমরা বাধ্য হচ্ছি।

তবু সব মিলিয়ে একথা ঠিক যে, সাহিত্যিকদের সচেতন হতে হবে। কিন্তু আশেপাশের দুঃখ-দারিদ্র্য, সমাজ ও জীবন যদি তাদের সচেতন করে তুলতে না পারে—তাহলে সম্মেলন বা অধিবেশনের বক্তৃতার দ্বারা তাঁরা কি সচেতন হবেন?

—(বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত)

ধারাবাহিক উপন্যাস

আশাপূর্ণা দেবী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

'বৃষোৎসর্গ?' সুবোধচন্দ্র হাসলেন, 'অত বড় ফর্দ করে বসবেন না ভটচায মশাই। তেমন রেস্তওলা যজমান যে আপনার আমি নই, সে কথা আপনিও ভালই জানেন। আমার ওই ষোড়শ পর্যন্তই ব্যস!'

ভটচায ক্ষুণ্ণভাবে বলেন, 'বহু প্রাচীন হয়েছিলেন তিনি, চারকুড়ির ওপর বয়েস হয়েছিল তাই বলা! তা'ছাড়া তুমি তেমন উপায়ী না হলেও তাঁর আরও তিন ছেলে রয়েছে রোজগারী, নাতিরাও সব কৃতী হয়ে উঠেছে—'

সুবোধচন্দ্র বাধা দিলেন, 'ওর সবই আমি জানি ভটচায মশাই, তবু আমার যা ক্ষমতা, আমি সেই মতই চলবো।'

'আপনি জ্যেষ্ঠ, শ্রাদ্ধাধিকারী—'

'সে নিয়মকানুন তো সবই পালন করছি—'

'তা' জানি, তোমার নিষ্ঠাকাষ্ঠা সবই শুনলাম তোমার কন্যার কাছে, এ যুগে এতটা আবার সবাই পারে না!'

'ওকথা থাক ভটচায মশাই, আপনি ওই একটা ষোড়শের ফর্দ দিন?'

'একটা?' ভটচায আহত গলায় বলে ওঠেন, 'চার ভাই চারটে ষোড়শও করবেন না? আর নাতিরা এক একটা ভুজ্যি—'

'আমি আমার কথাই বলছি ভটচায মশাই আপনি বুঝতে পারছেন না কেন তাই আশ্চর্য!'

ভটচার্য তবু নাছোড়বন্দা গলায় বলেন, 'জানি তোমাদের হাঁড়ি ভিন্ন, তৎ সত্ত্বেও মাতৃশ্রাদ্ধের সময় একত্র হয়ে করাই শাস্ত্রীয় বিধি। যার যা সাধ্য, তুমি বড় তোমার হাতে তুলে দেবে, তুমি সৌষ্ঠব করে—'

সুবোধচন্দ্র এবার হেসে ওঠেন।

হেসেই বলেন, 'শাস্ত্রীয় বিধিটাই জানেন ভটচায মশাই, আর একথা জানেন না, 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না?' কেন আর বৃথা সময় নষ্ট করছেন? আমার ফর্দটা ঠিক করে দিন, সময় থাকতে—'

ভটচায বিদায় নিলে সুবল এসে দাঁড়ায়।

বলে, 'জ্যাঠামশাই, মা একটা কথা বলছেন!'

'মা!'

সুবোধচন্দ্র একটু নড়েচড়ে বসলেন। সুবলের মার আবার বক্তব্য কি!

'ঘাটকামান' না হওয়া পর্যন্ত প্রবোধকে আর সুবর্ণলতাকে এ বাড়িতেই থাকতে হয়েছে, পাড়া প্রতিবেশী জ্ঞাতি গোত্রের এই নির্দেশ!

তাই বকুলকে নিয়ে এ বাড়িতেই রয়েছে সুবর্ণ, ছেলেরা যাওয়া-আসা করছে। এদিকে তো চাঁপা এসেই গেছে, চন্নন পারুল ওরাও আসবে শ্রাদ্ধের দিন।

সে যাক ওসব ব্যবস্থাপনার মধ্যে সুবোধ নেই। সুবর্ণ যে রয়েছে এ বাড়িতে তা'ও ঠিকমত জানে কিনা সন্দেহ। কাজেই 'মা আপনাকে একটা কথা বলবেন', শুনে সন্দিগ্ধ গলায় বলেন, 'কি কথা?'

সুবল মাঝখানে শিখণ্ডিস্বরূপ থাকলেও সুবর্ণলতার কণ্ঠটাই স্পষ্ট শোনা গেল 'মার চার ছেলে বর্তমান, নাতিরাও অনেকেই কৃতী হয়ে উঠেছে, মার তো বৃষোৎসর্গ হওয়াই উচিত।'

সুবোধচন্দ্র অবশ্য তাঁদের বাড়ির মেজবৌকে কোনোদিনই লজ্জাশীলা মনে করেন না, কাজেই এই স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে খুব একটা অবাক হন না। তবে বোধকরি একটু বিচলিত হন। গম্ভীর গলায় আস্তে বলেন, 'উচিত, সে কথা জানি মেজবৌমা, কিন্তু ক্ষমতা বুঝে কথা! আমার ক্ষমতা কম!'

এবারে সুবলের মাধ্যমেই কথা হয়, 'মা বলছেন, 'তা' হোক আপনি এগোন, আপনার পেছনে সবাই আছে।'

'আমার পিছনে—' সুবোধচন্দ্রের গলাটা যেন কাঁপা কাঁপা আর ভাঙা ভাঙা শোনায়, 'আমার পিছনে কেউ নেই সুবল, শুধু সামনে ভগবান আছেন, এইটুকুই তোর মাকে বলে দে বাবা। গতকাল এসব আলোচনা হয়ে গেছে, আমার তিন ভাই-ই সাফ জবাব দিয়ে গেছে পঁচিশ টাকা করে দেবে, তার বেশি দিতে পারবে না। আমার অবস্থাও তো তদ্রূপ। কাজেই ও নিয়ে আর— তোর মাকে বাড়ির মধ্যে যেতে বল সুবল।'

এটা অবশ্যই বাক্যে যবনিকা পাতের ইসারা।

তত্রাচ সুবর্ণলতা যবনিকা পাত করতে দেয় না।

হয়তো প্রবোধের এই নীচতার খবরে এখনো নতুন করে বিস্ময়বোধ করে, তাই কথা বলতে একটু সময় যায়; আর বলে যখন, তখন গলার স্বরটা প্রায় বুজে

আসার মত লাগে, তবু বলে, 'সুবল বল জ্যাঠামশাই মার একটা মিনতি রাখতেই হবে!'

মিনতি।

রাখতেই হবে।

সুবোধচন্দ্র বিব্রত বোধ করেন।

চিরকেলে পাগলা মানুষটা কি না কি আবদার করে বসে।

কে জানে কি সঙ্কল্প নিয়ে এমন তোড়জোড় করে তাঁর দরবারে এসে হাজির হয়েছে। মুহূর্তের মধ্যেই অবশ্য এ সব চিন্তা খেলে যায়। পরমুহূর্তে সুবোধের কণ্ঠ থেকে প্রায় হাসির সঙ্গে উচ্চারিত হয়, 'রাখতেই হবে? তোর মার যে এটা সাদা কাগজে সই করিয়ে নেবার মত হচ্ছে রে সুবল? কি বল শুনি?'

মা নিজেই বলছেন—'

বলে সুবল সরে দাঁড়ায়।

গুণ্ঠনবতী সুবর্ণলতা তার পাশ দিয়ে এসে দাঁড়ায়, আর ছেলেকে এবং ভাসুরকে প্রায় তাজ্জব করে দিয়ে মৃদু চাপা স্বরে বলে ওঠে, 'সুবল তুই একটু অন্যত্র যা তো বাবা—'

সুবল তুই অন্যত্র যা!

তার মানে ভাসুরের সঙ্গে একা নির্জনে কথা বলতে চায়!

এর চাইতে অসম্ভব অসম-সাহসিকতা আর কি হতে পারে?

সুবোধচন্দ্র চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান, কি যেন বলতে যান, সুবল চলে যায় আস্তে আস্তে, আর সুবর্ণ এগিয়ে এসে ভাসুরের পায়ের কাছে কিছু জিনিস ফেলে দিয়ে মৃদু দৃঢ়স্বরে বলে, 'এগুলো নিতে হবে আপনাকে, এই মিনতি। আপনার নিজের বলে মনে করে বেচে দিয়ে ইচ্ছেমতভাবে খরচ করে মার কাজ করুন!'

সুবোধ যেন সাপের ছোবল খেয়েছেন।

সুবোধ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সেই উজ্জ্বল স্বর্ণখন্ডগুলির দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হাস্যে বলেন, 'এতো মিনতি নয় মেজবৌমা, হুকুম। কিন্তু সে হুকুম পালন করবার ক্ষমতা আমার নেই মা। তুমি আমায় মাপ কর!'

গলার মোটা হেলে হার!

হাতের চুড়ির গোছা!

সুবর্ণ সেই বস্তুগুলোর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে, 'এতো শুনেছি স্ত্রীধন এতে নাকি স্বামী-পুত্তুরের কোনো দাবি থাকে না। তবে কেন?'

সুবোধ এবার আরো ভারী গলায় বলেন, 'এ তুমি কি বলছো মেজবৌমা। তোমার গায়ের গয়না বেচে মাতৃশ্রাদ্ধ করবো আমি। গরীব বলে কি—'

মেজবৌমা মৃদুস্বরে বলেন, 'মায়ের কাজে ত্রুটি থেকে যাবে, আর মার বৌরা গায়ে সোনাদানা চড়িয়ে ঘুরে বেড়াবে এটাও তো অনিয়ম!'

অনিয়ম!

সুবোধচন্দ্র যেন একটু চমকাল, তারপর একটু হেসে বলেন, 'অনিয়ম' তো জগৎ জুড়ে মা, চন্দ্র-সূর্যের নিয়মটা আছে বলেই আজো পৃথিবীটা টিকে আছে। কিন্তু সেকথা থাক্ তুমি এগুলো উঠিয়ে নিয়ে যাও মা। তুমি যে দিতে এসেছিলে, এতেই তাঁর আত্মার তৃপ্তি হয়ে গেছে!'

'তাঁর হতে পারে, কিন্তু আমাদেরও তো তৃপ্তিশান্তি হওয়া চাই দাদা? আপনার পায়ে পড়ছি, এটুকু আপনাকে করতেই হবে। মনে করুন এ টাকা আপনার, তা হলেই তো সব চিন্তা মুছে যাবে মা'র কুপুত্র ছেলেরা টাকা হাতে থাকতেও, 'নেই' বলেছে, সে পাপের প্রায়শ্চিত্তরও তো দরকার। আমি যাচ্ছি এ আর আপনি অমত করবেন না, যদি অমত করেন, যদি না নেন, তাহলে বুঝবো আমি 'পতিত' তাই—' গলার স্বরটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় সুবর্ণর, 'আমি যাই' বলে নীচু হয়ে গলায় আঁচল জড়িয়ে একটি প্রণাম রেখে তাড়াতাড়ি উঠে চলে যায় সুবর্ণ, সুবোধকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে।

সুবোধ হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন।

সুবোধ এখন এই সোনার তালগুলোকে নিয়ে কি করবেন?

তা শেষ পর্যন্ত সেগুলো নিলেন সুবোধচন্দ্র।

সুবর্ণলতার ওই 'রুদ্ধকণ্ঠ' হয়ে চলে যাওয়ার মধ্যে তিনি একটা পরম সত্য উপলব্ধি করলেন যেন।

সেই সত্য সব দ্বিধা মুছে দিল বুঝি।

সমারোহ করেই বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ হলো মুক্তকেশীর।

কে জানে তাঁর আত্মা সত্যই পরিতৃপ্ত হল কি না। তবু সুবোধ মনে করলেন 'হল'। সুবোধের মুখে রইল সেই পরিতৃপ্তির ছাপ।

যদিও—

আড়ালে আবডালে সবাই বলাবলি করতে লাগলো, সুবোধ কিরকম 'ভেতর চাপা!' এই যে খরচটি করলো, টাকা তোলা ছিল, বলেই তো? অথচ কেউ বুঝতে পেরেছে?

সে কথা প্রবোধ এসেও মহোৎসাহে বলে, 'দেখলে তো? চিরটাকাল দেখিয়ে এসেছেন যেন হাতে কিছু নেই।'

সুবর্ণ একবার স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলে, 'বেশ তো হাতের টাকা তো মন্দ কাজে ব্যয় করেন নি, সদ্ব্যয়ই করেছেন! তা তোমার তো হাতে টাকার অভাব নেই, তুমি একটা সৎকাজ কর না? তোমার মায়ের একটা ইচ্ছে পালন কর না? অনেক কাঙালী খাওয়াও না? মার খুব ইচ্ছে ছিল।'

প্রবোধ সচকিত হয়ে বলে, 'এ ইচ্ছে আবার কখন তোমার কানে ধরে বলতে গেলেন মা? তুমি যখন গিয়ে পড়েছিলে, তখন তো বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছিল।'

ক্ষীণ একটু হাসলো সুবর্ণ!

বহুকাল পরে হাসলো।

বললো, 'না এ ইচ্ছে প্রকাশ তখন করেন নি। যখন পুরোদস্তুর বাক্যস্রোত ছিল এ তখনকার কথা। তোমাদের ওখানের জগন্নাথ দাস ঘোষের মা যখন মারা গেলেন, তখন দেদার কাঙালী খেয়েছিল মনে আছে? দেখে মা বলেছিলেন, 'আমি যখন মরবো, আমার ছেলেরা কি এমন করে কাঙালী ভোজন করাবে?'

'ওঃ এই কথা?' প্রবোধ ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়। বলে, 'জ্যান্ত থাকতে জন্মভোর অমন কত কথা বলে মানুষ! সেই সব ইচ্ছে পালন করতে গেলেই হয়েছে আর কি।'

'তা' বেশ! ধরো যদি আমারই ইচ্ছে হয়ে থাকে।'

প্রবোধ বিশ্বাস করে সেকথা। এটাই ঠিক কথা। তাই বলে, 'তোমার তো চিরদিনই এই রকম সব আজগুবি ইচ্ছে। শ্রাদ্ধ হয়ে গেল সেখানে, এখন কাঙালীভোজন হবে এখানে। ওসব ফ্যাচাং তুলো না। অত বাড়াবাড়ি করার দরকার নেই।'

'তবে থাক!' সুবর্ণ বলে, 'দরকার যখন নেই! ভালই হলো তোমার

গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৩, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা-১
ফোন: ২২-৬৫৮০

ছেলেদের, সুবিধে হলো। ভবিষ্যতে তাদেরও আর মেলাই বাজে খরচ করতে হবে না। মনে জানবে মা-বাপের শ্রাদ্ধয় বেশি বাড়াবাড়ির দরকার নেই।'

প্রবোধ এ ব্যঙ্গে জ্বলে উঠে বলে, 'ওঃ ভারী একেবারে! আমার মার মরণ-কালের ইচ্ছে নিয়ে আমি কাতর হলাম না, উনি হচ্ছেন। বলি—শাশুড়ীর ওপর এত ভক্তি উথলে উঠলো যে? এ ভক্তি ছিল কোথায়? চিরটাকাল তো মানুষটাকে হাড়ে-নাড়ে জ্বলিয়ে পুড়িয়ে খেয়েছ।'

সুবর্ণ এ অপমানে রেগে ওঠে না, বরং হঠাৎ হেসে উঠে বলে, 'সত্যি বটে! স্মরণশক্তিটা আমার বড্ড কম! মনে করিয়ে দিয়ে ভালই করলে!'

তারপর উঠে গেল।

সেই ওর ছাতের ঘরের কোটরে গিয়ে বসলো খাতাখানা নিয়ে।

কিন্তু খাতাখানা কি তবে সুবর্ণর শুধু অপচয়ের হিসেবের খাতা?

সুবর্ণলতার জীবনের খাতাখানার মতই?

নইলে সুবর্ণর সেই খাতাখানার পাতা উল্টোলেই এই সব কথা চোখে পড়ে কেন?...

...'মেয়েমানুষ হয়েও এমন বায়না কেন তোমার সুবর্ণ, তুমি সৎ হবে, সুন্দর হবে, মহৎ হবে! ভুলে যাও কেন মেয়েমানুষ হচ্ছে একটা হাত-পা বাঁধা প্রাণী! মানুষ নয় প্রাণী! হাত-পায়ের ওই বাঁধনটা যদি ছিঁড়তে যায় সে, তো হাত-পাগুলো কেটে বাদ দিয়ে দিয়ে ছিঁড়তে হবে সে বাঁধন।'...

কেন লেখা থাকে...'তবু বাঁধন ছেঁড়ার সাধনটা চালিয়ে যেতে হবে তাকে। কারণ তার বিধাতা ভারী কৌতুকপ্রিয়। তাই ওই হাত-পা বাঁধা প্রাণীমাত্রগুলোর মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ ঢুকিয়ে দিয়ে বসে থাকেন বুদ্ধি চেতনা, আত্মা।'

বহুদিন পরে এ বাড়িতে বেড়াতে এল সুবর্ণ।

বড় ছেলে ভানু সম্প্রতি একটা জুড়িগাড়ি কিনেছে, বড়বৌ বললো, 'আপনার ছেলে আসুন না মা, তখন বরং যাবেন—'

সুবর্ণ তবু ভাড়াটে গাড়ি করেই গেল। বললো, 'ও বাড়িতে বরাবর ভাড়াটে গাড়ি করেই গেছি বৌমা, জুড়ি-গাড়ি থাক্।'

বৌ বিড়বিড় করে বললো, 'যত্ন না নিলে আর কে দেবে।'

সুবর্ণ শুনতে পেল না।

সুবর্ণ গাড়িতে গিয়ে উঠলো।

শ্যামাসুন্দরী সমাদর করে ডাকলেন, 'এসো মা, এসো।'

বয়েস কম হয় নি, মুক্তকেশীর থেকে কম হলেও তাঁর দাদার স্ত্রী। তবু শক্ত আছেন দিব্যি। এখনো নিজে রেঁধে খাচ্ছেন, হেঁটে গঙ্গাস্নানে যাচ্ছেন।

অনেক দিন দেখে নি সুবর্ণ, দেখে আশ্চর্য হলো।

প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিল, হয়তো দু' অর্থে।

শ্যামাসুন্দরী কুশল প্রশ্ন করতে লাগলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

'ছেলেপুলেরা কেমন আছে? চাঁপা-চন্নন-পারুল সব ভাল আছে তো? সেই যা তোমার শাশুড়ীর কাজের সময় সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হল।'

এটা ওটা উত্তর দিতে দিতে হঠাৎ এক সময় বলে বসে সুবর্ণ, 'ভাসুর ঠাকুর বাড়ি আছেন?'

'কে জগা?' শ্যামাসুন্দরী মুখ বাঁকিয়ে বলেন, 'থাকবে না তো যাবে আর কোথায়? এখন তো সর্বক্ষণ বাড়িতেই স্থিতি।...আমার কানের মাথা খেতে যে বাড়ির মধ্যে এক ছাপা-খানা খুলে বসে আছেন।'

সুবর্ণলতা এ খবরে অবাক হয় না।

সুবর্ণলতা যেন এ খবর জানে।

শুধু সুবর্ণলতার মুখটা একটু উজ্জ্বল দেখায়।

বলে, 'বেশ চলছে ছাপাখানা? ভাল ছাপা হয়?'

'জানিনে বাছা,—' শ্যামাসুন্দরী অগ্রাহ্যভরে বলেন, 'রাতদিন শব্দ তো হচ্ছে। বলে না কি খুব লাভ হচ্ছে। বলে বয়েসকালে এ বুদ্ধি হলে লাল হয়ে যেতাম।...সাত জন্মে তো রোজগারের চেষ্টা দেখি নি, ওই ফোঁটা কাটতো আর মালা ঘুরোতো। তা ছাড়া পাড়ার লোকের জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে, রোগ, শোক, দুর্গোৎসব, এই সব নিয়েই ছিল, হঠাৎ এই খেয়াল। মাথায় ঢুকিয়েছে ওই নিতাই! নিজের আখের গোছাতেই বোধহয় এ প্ররোচনা দিয়েছে। বলে বাড়িখানা থেকে কিছু উসুল করি—তা' তোমার সঙ্গের ওই ঝিয়ের হাতে আবার অত সব কি বৌমা?'

সুবর্ণ কুণ্ঠিতভাবে বলে, 'কিছু না, চারটি ফল, আপনি একটু মুখে দেবেন, ভাসুর ঠাকুর একটু—ইয়ে আপনাকে আজ একটা কথা বলতে এসেছি মামীমা—'

শ্যামাসুন্দরী সুবর্ণর কুণ্ঠিত ভাব দেখে আশ্চর্য হন। বলেন, 'কি গো বাছা?'

'বলছিলাম কি— ইয়ে—'

থেমে যায় সুবর্ণ।

শ্যামাসুন্দরী সমধিক অবাক হন। সুবর্ণলতার এমন কুণ্ঠিত মূর্তি। ও তো সদাই সপ্রতিভ। তা ছাড়া—এ কুণ্ঠার মধ্যে কেমন যেন প্রার্থী প্রার্থী ভাব। টাকা ধার চাওয়ার ক্ষেত্রেই এমনটা দেখা যায়। কিন্তু সুবর্ণলতার ক্ষেত্রে তো সে আশঙ্কা ওঠে না।

তবে?

শ্যামাসুন্দরীর প্রশ্নমুখর দৃষ্টির সামনে একটু অপ্রতিভ হাসি হাসে সুবর্ণ। তারপর আঁচলের তলা থেকে এক-খানা মলাট বাঁধানো মোটা খাতা বার করে ফেলে বলে ফেলে, 'ভাসুর ঠাকুর ছাপা-খানা খুলেছেন শুনেছিলাম, তাই একটু শখ হয়েছে, সেই ইয়েতেই আসা। আমি তো আর নিজে মুখে বলতে পারবো না, আপনি যদি একটু বলে দেন।'

শ্যামাসুন্দরী বার্ধক্যের চোখে কৌতূহল ফুটিয়ে বলেন, 'কি জন্যে কি বলবো, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না বৌমা।'

সুবর্ণলতা মৃদু হাসে. 'বুঝতে পারবেনও না। তা' হলে বলি শুনুন, ছেলেবেলা থেকে আমার একটু লেখার শখ আছে, জীবনভোর? সকলের অসাক্ষাতে একটু আধটু লিখেছি, এই পদ্য-টদ্য আর কি। এদানীং গল্প-টল্পর ধরণে কিছু লেখা হয়েছে, তবে ছাপাবার কথা স্বপ্নেও ভাবি নি, ভাসুর ঠাকুর ছাপাখানা খুলেছেন শুনে অবধি মনে উদয় হয়েছে একখানা বই মতো করে যদি ছাপানো যায়। যা খরচা লাগে আমি দেব, শুধু কেউ যেন জানতে না পারে। একে-বারে বই হলে, জানবে দেখবে। তা আপনি একটু বলে দেখুন না মামীমা যদি একটু দেখেন এখন।'

প্রৌঢ়া সুবর্ণলতার চোখে যেন ভাবা-কুল অবোধ কিশোরীর দৃষ্টি।

যে সুবর্ণলতা সমুদ্রের স্বপ্ন দেখতো—সে সুবর্ণলতা কি আজও মরে নি? কোথাও কোনখানে এতটুকু প্রাণ আহরণ করে বেঁচে আছে?...কোথায় আছে সেই অফুরন্ত অগ্নি, যা' আজীবন বরফজল নিক্ষেপেও নিভে যায় না?

শ্যামাসুন্দরী তবুও বিস্মিত প্রশ্ন করেন। 'বই ছাপা হবে? কোথায় সেই বই?'

সুবর্ণ মৃদু হেসে বলে, 'বই তো পরে। ছাপা হবে এই খাতাটা। এইটা না হয় নিয়ে যান ভাসুর ঠাকুরের কাছে, উনি ঠিক বুঝতে পারবেন।'

খাতাখানা হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখে শ্যামাসুন্দরী হতভম্ব গলায় বলেন, 'এ সব লেখা তুমি লিখেছ? এই খাতা ভর্তি?'

'ওই তো পাগলামী—' হাসে সুবর্ণ!

'নিজের মন থেকে? না কিছু দেখে?'

সুবর্ণলতা ছেলেমানুষের মত শব্দ করে হেসে ওঠে, 'নাঃ দেখে লিখবো কি? তা' হলে আর নিজের লেখা হল কোথায়?'

শ্যামাসুন্দরীর বিস্ময় ভাঙে না

স্মৃতি

সন্তোষকুমার অধিকারী

যখনই নির্জন হই
তখনই সে আসে আচম্বিতে।
সহসা রক্তাক্ত মুখ, যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট সমাহত,
দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ, রোষে দীপ্ত চাহনি পরুষ,
সে আসে আঁধার হ'তে
চেতনার মূঢ় আলোকেতে

বার বার চেয়েছি বিস্মৃতি
কারণ অতীত শুধু স্মৃতিসিক্ত নিষ্ঠুর জিজ্ঞাসা;
বেদনার অন্ধকারে স্মৃতি এই জীবনের গাঢ় অবিশ্বাস।
কারণ প্রবহমান পৃথিবীর পথে
আমি চলমান মন-খুঁজে নিতে চাই দীপ্ত ভোর।

অথচ সে আসে নিত্য
বেদনার্ত ছায়ার শরীরে।
সূর্যের মতন এই প্রজ্বলন্ত জীবনের ভাষা
পলকে বিষাক্ত হয়,
সংকুচিত হয় এ' হৃদয়।
সে আসে ঘৃণায়,
সে আসে—
বিদীর্ণ এই জীবনের নিষ্ঠুর হতাশা।

আরো কতো সুনিবিড়

নীহারকান্তি ঘোষদস্তিদার

হাওয়ায় ছড়ানো কতো খুশি নিয়ে ঝিরিঝিরি পুকুরের জল,
অন্ধকারে কথা বলে। ফুটে ওঠে কামনার কতো শতদল
ঢেউ হ'য়ে। আমরা দুজনে। নেই কেউ।
হ'য়ে গিয়ে পুকুরের মতো ঠিক আমরাও হঠাৎ দুজনে হই ঢেউ।
ঢেউগুলো কেঁপে ওঠে তারার গোপন গায়। আকাশের সব ছায়া এসে
কথা হয়, মন হয় আমাদের দুজনের। হৃদয়ের মতো ভালোবেসে
কতো আরো সুনিবিড়, অনেক গভীর আশা। নিঃশ্বাস।
সুশীতল বুকে।
পুকুরের ঢেউ দেখে তাই আজ মনে হয় হাওয়ায় ছড়ানো
কতো সুখ।

কতো হাওয়া চারধারে। জোনাকি। ধূসর মাঠ। সবুজ। অসীম।
শব্দের ঝিকিমিকি মনে মনে আজ কতো। কতো রিম্‌ঝিম্‌
দুহাতে জড়িয়ে আছে ঘুঙুরের মতো হ'য়ে। স্তব্ধ। অতল।
আমরা এখন শুধু আর এক অবাক চোখে ঝিরিঝিরি ঢেউ-কাঁপা
দুপুরের জল।

ছড়ানো খুশির মতো। এলোমেলো পাতা, ফুল, সুরভি, হৃদয়।
একটি খুশির মতো, একটি পাখির মতো আজ সব.
আজ সব তাই মনে হয়।

বলেন, 'তা' হ্যাঁ গা মেজবৌমা এত কথা তোমার মনে মাথায় এলো কি করে?'

সুবর্ণলতার মুখে আসে, মনে মাথায় যত আসে, তা লিখতে পারলে এ রকম সহস্রখানা খাতাতেও কুলোতো না মামীমা! তবে, বলে না সেকথা।

শ্যামাসুন্দরী উঠে যান।

কিছুক্ষণ পরে প্রেস মালিক জগন্নাথ-চন্দ্র এসে অদূরে দাঁড়ান।

চেহারা প্রায় একই রকম আছে, তেমনি আট-সাঁট খাটমুগুরে গড়ন, তেমনি হুত্তেলের মত রং, বদলের মধ্যে কিছু চুল পেকেছে।

আগের মতই পরনে একটা লাল ছালটি, গলায় রুদ্রাক্ষ, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা।

তার মানে এই বেশেই ছাপাখানায় বসেন তিনি।

এসে দাঁড়িয়ে গলা খাঁকারি দিয়ে বলেন, 'মা জিগ্যেস করো তো বৌমাকে, এ হাতের লেখা কার?'

ইসারায় উত্তর পেয়ে শ্যামাসুন্দরী মহোৎসাহে বলেন, 'বললাম তো সবই বৌমার লেখা।'

'চমৎকার হাতের লেখা তো!'

সপ্রশংস দৃষ্টিতে খাতার পৃষ্ঠাগুলো উল্টোতে উল্টোতে 'জগু' বলেন, মেয়ে-ছেলেদের হাতের লেখা এমন পাকা! সচরাচর দেখা যায় না। কিসে থেকে নকল করেছেন?'

শ্যামাসুন্দরী বলে ওঠেন, 'এই দেখো ভূতুড়ে কথা! বললাম যে এ সমস্ত বৌমা নিজের মন থেকে বানিয়ে বানিয়ে লিখেছে। বই লিখিয়েরা যেমন লেখে আর কি।'

'বল কি? এই গদ্য-পদ্য সব?'

'সব।' এখন আবার শ্যামাসুন্দরী সানদায়ী:

জগন্নাথ মহোৎসাহে বলেন, 'তুমি যে তাজ্জব করে দিলে মা! এতকাল দেখছি, কই এসব তো শুনি নি।'

শ্যামাসুন্দরী বলেন, 'শুনবি কোথা থেকে? মেজবৌমা তো নিজের গুণ জাহির করে বেড়ানো মেয়ে নয়। তোর ছাপাখানার বাত্রা শুনে সাধ হয়েছে, তাই বলছে যা খরচা পড়বে দেবে, তুই শুধু দেখে শুনে—'

'খরচের কথা আসছে কোথা থেকে? খরচের কথা?' জগু হৈ চৈ করে ওঠেন, 'আমার প্রেসে আবার খরচ কি? রেখে দিয়ে যান বৌমা, কালই প্রেসে চড়িয়ে দেব। কিন্তু অবাক হয়ে যাচ্ছি বৌমার গুণ দেখে। নাঃ পিসির সংসারে এই মেজ-বৌমাটি এসেছিলেন, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী!... ভগবান দিয়েছেনও তাই ঢেলে মেপে। মনের গুণেই ধন। বহু ভাগ্যে এমন লক্ষ্মী পেয়েছিল পেবো।'

(ক্রমশঃ)

বঙ্গদর্শন

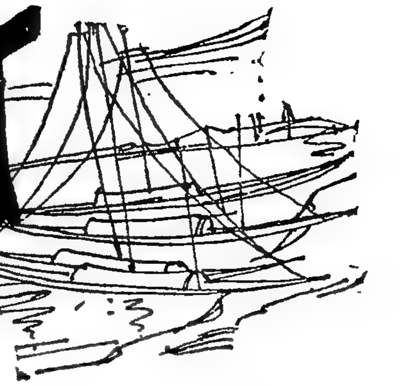

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে পশ্চিমবঙ্গে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির সংকট বিশেষ উগ্রভাবে দেখা দিয়েছে। অথচ এই মূল্যবৃদ্ধির কোন সংগত কারণ আছে বলে মনে হয় না। তরিতরকারির বাজারে আগুন লেগেছে। আলু, যা কোন শীতকালেই চল্লিশ পয়সার বেশি কিলো দরে বিক্রি হয় নি, আজ আশি-নব্বই পয়সা কিলোয় দাঁড়িয়েছে। অথচ এবারে যে আলুর ফলন কম হয়েছে তা নয়, বরং অন্যান্যবারের চেয়ে এবার আলুর ফলন অনেক বেশি। অন্যান্য তরিতরকারির অবস্থাও একইরকম—বেগুন এক টাকা কিলো, একটা ছোট সাইজের ফুলকপির দামও ষাট পয়সা; বাঁধাকপি এক টাকার কম নয়, টোমাটো এক টাকা, কড়াইশুঁটি দু' টাকার কাছাকাছি। সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত বাজারে গিয়ে চোখে অন্ধকার দেখছেন।

কিন্তু এই মূল্যবৃদ্ধির কোন সংগত কারণ নেই. আসলে দাম বাড়ানোর একটা হুজুগ পড়ে গেছে, যে যা পারছে দাম হাঁকছে, কেন না আজকের দিনে কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ জানানো বা প্রতিকার করার কেউ নেই একথা বাজারওয়ালারা বুঝে নিয়েছে।

স্বভাবতই এই মূল্যবৃদ্ধির ঠেলায় সাধারণ মানুষ ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়ছে, এবং প্রয়োজনের থেকে পরিমাণে কম জিনিস কিনে সাংসারিক বাজেট কোনগতিকে ম্যানেজ করছে। যার দৈনিক প্রয়োজন এক কিলো আলু সে মাত্র পাঁচশো বা আড়াইশো পরিমাণ কিনছে। ফলে যে সমস্ত পণ্য অবিক্রীত থেকে যাচ্ছে সেগুলিকে নষ্ট হতে দেওয়া হচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। আমি একটি মফস্বলের বাজারের কথা বিশেষভাবে জানি যেখানে এই নীতি আচরিত হচ্ছে, এবং তা সত্ত্বেও নাকি পাইকারী ও খুচরো বিক্রেতারা প্রচুর লাভ করছে। যদি গলাকাটা দামে কম জিনিস বিক্রি করলে আশাতিরিক্ত লাভ করতে পারা যায়, তাহলে বেশি জিনিস কম দামে বিক্রি করে সময় নষ্ট করা কেন?

বাংলাদেশের মানুষ আজ বেঁচে থেকেও মৃত। মরবার আগে শেষবারের মত একবার জ্বলে উঠেছিল গত ফেব্রুয়ারী-মার্চে। কিন্তু বর্তমানে আর জ্বলে ওঠার কোন সম্ভাবনা নেই। এদিকে রেশনের বরাদ্দ আরও কমেছে, তবুও বাঙালী নির্বিকার; রেশনে চাল দেওয়া বন্ধ হয়েছে। তাতেও কারো মুখে কোন কথা নেই। এদিকে মডিফায়েড রেশনিং এলাকায় আবার সেই চিরন্তন সংকট দেখা দিয়েছে। সেখানে খোলাবাজারে চাল নেই, কন্ট্রোলে চাল গম চিনি দেওয়া বন্ধ হয়েছে। শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে এইরকম মডিফায়েড রেশন এলাকারূপ 'বাফার স্টেট' তৈরি করে অসংখ্য মানুষকে যে প্রতিনিয়ত তিলে তিলে দগ্ধ করা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের একটি কণ্ঠও উত্থিত হচ্ছে না।

বলতে বোধ হয় একটু ভুল হল। সপ্তগ্রাম অবশ্য বর্তমান অবস্থার প্রতিবাদ একটি একটি বিবৃতি দিয়েছে, কিন্তু সে মার্জারধ্বনি সরকারের কানে পৌঁছাবার আগেই ইথারে মিলিয়ে যাবে, এটা তারাও বোঝে আর জনসাধারণ তো আগের থেকেই বুঝেছে।

আমরা বিগত কয়েক সংখ্যায় যা আশংকা করেছিলাম তা অবশেষে সত্য হতে চলেছে। আমরা বারবার বলেছিলাম যে, সরকারের ভ্রান্ত সংগ্রহনীতির জন্য এ বছর রেশনব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা যাবে না। বাস্তবেও ঠিক সেই অবস্থাই ঘটেছে। ফুড কর্পোরেশন এ পর্যন্ত যা চাল সংগ্রহ করেছেন তা কিছুই নয়। সরকার নির্ধারিত দামে একদানা চালও ফুড কর্পোরেশন সংগ্রহ করতে পারছেন না। এদিকে কেন্দ্রীয় সরকারও পশ্চিমবঙ্গকে পথে বসিয়েছেন। সব মিলিয়ে আগামী কয়েক মাসের যে চিত্রটি চোখের সামনে ভাসছে, সে অন্ধকার ভবিষ্যতের সামগ্রিক চিত্রটি কল্পনায় আসে, কিন্তু কালির আঁচড়ে সেটিকে ফুটিয়ে তুলতে বড় একটা ভরসা পাই না।

খাদ্যনীতির বদল হোক

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যখন এই রাজ্যে রেশনিং চালু করলেন তখন আমরা সরকারকে অভিনন্দিত করেছিলাম। তখন মনে করতাম, বা এখনো মনে করি, একটা সুষ্ঠু রেশনব্যবস্থাই পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যসমস্যার সমাধান করতে পারে। কি করে বর্তমান রেশনিং-এর ত্রুটিগুলি দূর করে একটি সার্থক ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়, সে সম্বন্ধে আমরা বঙ্গদর্শন মারফত সরকারকে অনেক পরামর্শ দিয়েছি। অবশ্য আমরা যা বলেছি, তা এমন কিছু নতুন কথা নয়, সে কথা সরকারও বোঝেন। কিন্তু যেখানে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী শুধুমাত্র রাজনীতিকেন্দ্রিক, সেখানে সরকারের নীতি নির্ধারিত হয় দলীয় স্বার্থের দৃষ্টিকোণে। কাজেই সুষ্ঠু রেশনব্যবস্থা, যা ইচ্ছা করলেই সরকার গড়ে তুলতে পারতেন, তা দলীয় রাজনীতির প্রভাবেই শিবের বদলে বাঁদরের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

গত দু-তিন মাস ধরেই আমরা লক্ষ্য করে আসছি যে, সার্থকভাবে রেশনিং ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সরকারের কোনই মাথাব্যথা নেই। সরকারের সংগ্রহনীতি পরিবর্তনের দ্বারাই সরকার তা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন। এ বছরটা ইলেকশানের বছর, কাজেই সরকার গ্রামবাসীদের তথা জোতদারদের চটাতে চান না, একটা লোক-দেখানো ফুড কর্পোরেশনের হাতে সংগ্রহের দায়িত্ব তুলে দিয়েই সরকার খালাস. এবং এখন যা জানা যাচ্ছে ফুড

কর্পোরেশন কিছুই সংগ্রহ করতে পারে নি।

রেশনব্যবস্থাটা কেবল লোক-দেখানো, সরকার যদি আন্তরিক হতেন তা হলে সবই হত, কিন্তু সরকার যেখানে আন্তরিক নন সেখানে কার্যকর কোন কিছুই হবার সম্ভাবনা নেই। পশ্চিমবঙ্গে রেশনব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, মৃত্যুর সমস্ত লক্ষণই তার দেহে ফুটে উঠেছে, বাকি শুধু গঙ্গাযাত্রা।

এই অবস্থায় আমরা সরকারকে শেষবারের মত আর একটি পরামর্শ দিই। যদিও আমাদের এই প্রেসক্রিপশনের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবার সুযোগ খুবই অল্প, তথাপি আমরা আমাদের কর্তব্যটুকু করে যাই। সরকার সকল প্রকার রেশনিং তুলে দিন। বিদেশ থেকে যে খাদ্যশস্য আসছে, এবং কেন্দ্রের কাছ থেকে যে সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে তাই দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটা বাফার স্টক গঠন করুন। রেশনিং উঠে গেলে বাজারে

হাতে টাকা থাকলেই খরচ হয়ে যায়

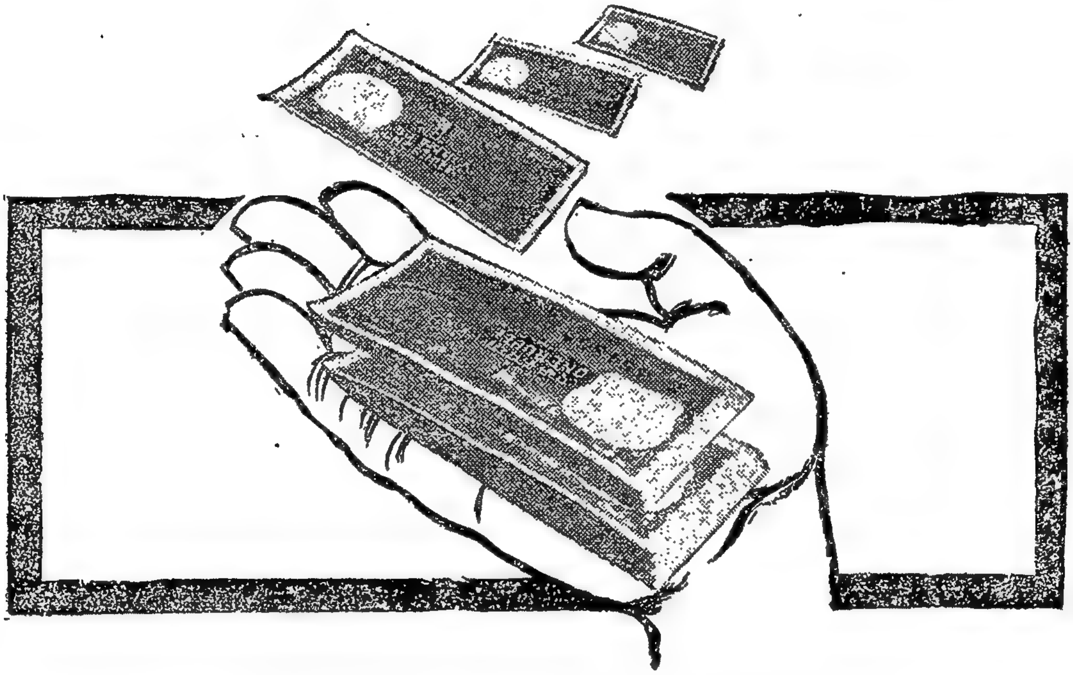

হিসেব ক'রে বাড়ীর খরচপত্র করা এবং অত্যন্ত বুঝেসুঝে খরচ করার প্রয়োজন বর্তমানে যত বেশী, তেমন আর কখনও হয় নি। হাতে যদি নগদ টাকা রেখে দেন তাহলে তা খরচ করার লোভ অনেক বেশী বেড়ে যায়। তার চাইতে বরং হাতের টাকাটা পোস্ট অফিসের পাশ বইতে রেখে দিন আর যখন প্রয়োজন হবে তখন তুলবেন।

আপনার কাছাকাছি কোন পোস্ট অফিসে অতি সহজেই আপনি সেভিংস ব্যাঙ্কের একটা হিসেব খুলতে পারেন। আজকাল পোস্ট অফিসে সেভিংস ব্যাঙ্কের চেকের মাধ্যমেও টাকা পয়সার লেনদেন করা যায় বলে আপনার বাড়ীর প্রয়োজন অনুযায়ী খরচ করা এবং সঞ্চয় করার জন্য পোস্ট অফিসের সেভিংস ব্যাঙ্ক অত্যন্ত সুবিধেজনক। তাছাড়াও পাশ বইতে যদি কিছু জমা থাকে তাহলে তা সুদে বাড়তে থাকে।

জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা

DA 66/519 Bengali

চালের দাম পড়ে যাবে, এবং যদি কোথাও হঠাৎ মূল্যবৃদ্ধি হয় সেখানে সরকার ন্যায্যমূল্যের দোকান বা কোঅপারেটিভ মারফত এই বাফার স্টকের শস্য বিক্রি করুন। তা ছাড়া এই বাফার স্টকের জন্য সরকার খোলাবাজার থেকেও চাল কিনতে পারেন, এবং সংকটের মাসগুলিতে তা ওইভাবেই জনসাধারণের মধ্যে অল্প দামে বণ্টন করতে পারেন। আপাতত এ ছাড়া আর কোন পথ আছে বলে মনে হয় না।

আমাদের এ কথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট সংগত কারণ আছে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইচ্ছা করেই নির্বাচনের মুখে সংগ্রহনীতির পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। সরকারের উদ্দেশ্যটি খুবই সরল। সারা দেশে, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে, পৌষ মাস থেকেই, অর্থাৎ নতুন ফসল ওঠার সময় থেকেই, হাহাকার উঠুক, এবং গ্রামের চাল চোরাপথে সর্বত্র পাচার হোক। তাতে অনেক গ্রামবাসী গলাকাটা মূল্যে চাল বেচে রাতারাতি অনেক কালো টাকা উপার্জন করতে পারবে, এবং তাদের ভোট কংগ্রেসেরই বাক্সে পড়বে। সংগ্রহের চাপ লাঘব করে দেওয়ায় বড় বড় জোতদাররাও খুশি হবে এবং তারা অনুগত দরিদ্র শ্রেণীকে দিয়ে চাল পাচার করাবে এবং তাতে দু' তরফের বেশ ভাল লাভ হবে। এই ভোটগুলিও শাসকদলের বাক্সে আসবে। আমাদের সমাজতন্ত্রের নীতিই হচ্ছে যে কোন উপায়েই হোক সমাজের একটা বড় অংশকে কালো টাকা রোজগারের সুযোগ করে দাও, তাহলেই গদি অক্ষুণ্ণ থাকবে। এবং কিছুসংখ্যক নীতিবাদী সততাবিলাসী লোকের ভোট যদি শাসকদলের বাক্সে না পড়ে তাতে কিছু আসে যাবে না। এই নব্য সমাজতন্ত্রের প্রথম পরীক্ষা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্যনীতির উপর দিয়েই হয়ে গেল, এবং যত দূর মনে হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই পরীক্ষায় প্রথম বিভাগেই পাশ করেছেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও দলীয় রাজনীতি

বিশ্বভারতীর সমাবর্তন উৎসবে ভারতের প্রাক্তন এটর্নি জেনারেল শ্রীশীতলবাদ এখন কতকগুলি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যা মোটেই শাসককুলের মনঃপূত হবে না। তাঁর বক্তব্যের মর্মার্থ হচ্ছে দলীয় রাজনীতি আজ দেশের শিক্ষাব্যবস্থার উপর এমনভাবে চেপে বসেছে যার ফলে সমগ্র শিক্ষাজগতেই আজ বিশৃংখলা ও বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছে। উপযুক্ত প্রস্তুতি অবলম্বন না করেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযুক্ত আর্থিক সামর্থ্য নেই, শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নেই, অধ্যাপকেরা যথাযোগ্য বেতন পান না, তদুপরি দলীয় রাজনীতির কুটিল খেলায় সমগ্র পরিবেশ এতই বিষাক্ত যে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা আজ কলুষতা ও অনাচারের একটি পূর্ণকুম্ভে পরিণত হয়েছে। সরকার নিজের রাজনৈতিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ব্যাপারে অযথা হস্তক্ষেপ করে থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থেকে আরম্ভ করে অধ্যাপকবর্গ পর্যন্ত রাজনৈতিক নেতাদের, বিশেষ করে শাসকদলের নেতাদের অভিরুচি মত হয়ে থাকে। কলেজের প্রিন্সিপাল ও অধ্যাপকগণও বহু ক্ষেত্রেই এইভাবেই নিযুক্ত হন। শাসকদল সমেত সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতারাই নিজেদের মতবাদ প্রচারের জন্য ছাত্রসমাজকে কাজে লাগাতে দ্বিধাবোধ করে না। এরই ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি রাজনৈতিক দলাদলির পীঠস্থান হয়ে ওঠে। অধ্যাপকদেরও নানাভাবে পৃষ্ঠপোষকতার লোভ দেখিয়ে দলীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণে প্ররোচিত করা হয়।

শ্রীশীতলবাদ

শ্রীশীতলবাদের প্রত্যেকটি কথাই একান্তভাবে সত্য। আমরাও একথা পূর্বে বহুবার বঙ্গদর্শনে উল্লেখ করেছি। পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ তো একজন মাত্র রাজনৈতিক নেতার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। সারা দেশে আজ আইনের শাসন ভেঙে পড়েছে। সহজ কথায় দেশ আজকে এমন একটা অবস্থায় উপনীত হয়েছে যে, বেআইনী পথে যার যা ইচ্ছা সে তাই করতে পারে এবং করছে, এবং তার দ্বারাই তার সামাজিক খ্যাতি, প্রতিপত্তি সবই জুটছে। অপরপক্ষে যারা ল-অ্যাবাইডিং, যারা জেনেশুনে বেআইনী পথে যেতে নারাজ, তাদেরই বরাতে জুটছে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও বিড়ম্বনা। উনিশ বছরের কংগ্রেসী রাজত্বে সমস্ত নৈতিক মূল্যবোধ নষ্ট হয়ে গেছে। আজ বিচারালয় পর্যন্ত তার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হারিয়েছে। খুঁটি অথবা রজতচক্রের জোরে যে কোন অপরাধ করেই রেহাই পাওয়া যায়। দেশে আইনের কোন মর্যাদা নেই, যারা আইন মেনে চলতে চায়, তারা আজ বৃহত্তর জনসমাজের কাছে উপহাসের পাত্র। যেখানে সারা দেশ জুড়ে এইরকম অবক্ষয়ের লক্ষণ একান্তভাবে প্রতিভাত, যেখানে দলীয় স্বার্থই দেশের চেয়ে বড়, যেখানে যে যত বেআইনী কর্ম করতে পারে সে তত গ্যালান্ট—স্বাধীন ভারতের এই যেখানে জীবনদর্শন সেখানে ছাত্রসমাজের মধ্যে যে হতাশা ও ব্যর্থতাবোধ, শ্রদ্ধাহীনতা ও নীতিবোধের প্রতি অবজ্ঞা, উচ্ছৃংখলতা ও বিক্ষোভ ছাড়া আর কি আশা করা যায়?

শ্রীশীতলবাদকে ধন্যবাদ, প্রধানমন্ত্রীর মত যিনি কথার জাল বোনেন নি। বস্তুত আজকের শিক্ষাজগতের এই শোচনীয় দুর্গতির মূলে সবচেয়ে বড় যে সত্যটি চাপা ছিল তা তিনি খোলাখুলিভাবেই ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু যাদের উদ্দেশ্যে এই কথাগুলি বলা সেই শাসককুলের চর্মভেদ কি এতে হবে?

কেন্দ্রীয় সরকারের পরিদর্শক

বঙ্গদর্শনের পাঠকরা বোধ হয় অবগত আছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন খরাক্লিষ্ট অঞ্চলে টেস্ট রিলিফ দেবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে হাত পেতেছিলেন। এ খবর অবশ্য অনেক দিনের পুরোনো খবর। এই হাত পাতার পরিণতি যে কি হয়েছে, তা অবশ্য আমরা জানতাম না। সম্প্রতি অবশ্য তা জানা গেছে। শেষ খবর হচ্ছে যে, এখনো পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে এই বাবদে একটি পয়সাও দেন নি। শুধু পাঠিয়েছেন একজন পরিদর্শক, যাঁর রিপোর্টের উপরেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি নির্ভর করে।

ভদ্রলোক এসেই খুব জ্ঞানগর্ভ কথা বলতে শুরু করেছেন। তাঁর বক্তব্য হল যে, যদি রাস্তা তৈরি করার কাজ না করিয়ে খরাক্লিষ্ট মানুষগুলিকে সেচের কাজে লাগানো যায়, তাহলেই ভাল হবে। এবং এদের সেচব্যবস্থায় লাগালে আগামী মরসুমে ফসল ভাল হবে, এমন কি অনাবৃষ্টি হলেও। তাছাড়া বর্তমান বছরেই রবিশস্যের ফলন ভাল হবে। এবং যদি

সাহায্য তহবিলে মুক্তহস্তে দান করুন প্রধানমন্ত্রীর অনাবৃষ্টি সাহায্য তহবিলে মুক্তহস্তে দান করুন

আপনাদের সাহায্য

এখনই

প্রয়োজন

"আমরা এক জাতি, একই দেশের অধিবাসী। বিহার, উত্তর প্রদেশ এবং দেশের অন্যান্য অনাবৃষ্টি-ক্লিষ্ট অঞ্চলগুলির দুঃখ দুর্দ্দশা ভারতেরই দুঃখ দুর্দ্দশা। খরার ফলে যে দুর্দ্দশা দেখা দিয়েছে তা দুর করবার জন্য আমাদের সমবেতভাবে চেষ্টা করতে হবে। আমাদের যা আছে তা আমরা সমান অংশে ভাগ ক'রে নেবো। আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে উন্নততর ভবিষ্যতের জন্য কাজ করতে হবে।"

ইন্দিরা গান্ধী
প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রীর অনাবৃষ্টি সাহায্য তহবিলে মুক্তহস্তে দান করুন

নগদ টাকা বা অন্যান্য সাহায্য অনুগ্রহ করে নিম্ন ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

প্রধানমন্ত্রীর অনাবৃষ্টি সাহায্য তহবিল
ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েট
রাষ্ট্রপতি ভবন, নূতন দিল্লী—৪

DA 66/F3

প্রধানমন্ত্রীর অনাবৃষ্টি সাহায্য তহবিলে মুক্তহস্তে দান করুন প্রধানমন্ত্রীর অনাবৃষ্টি সাহায্য তহবিলে মুক্তহস্তে দান করুন

সেই প্রয়োজনেই লোকগুলিকে লাগানো হয়, তবেই তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পশ্চিমবঙ্গকে টাকা দেবার সুপারিশ করবেন।

আপাতদৃষ্টিতে এই পরিদর্শক ভদ্রলোকের কথাগুলি শুনতে মন্দ লাগে না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তো নিজস্ব একটা সেচ দপ্তর আছে, এই দপ্তরটি এতকাল করছে কি? আর তাছাড়া জলসেচের সমস্যা সর্বভারতীয় সমস্যা, এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার তথা পরিকল্পনা কমিশন এ পর্যন্ত কি করেছেন? বিগত উনিশ বছরে যা হল না, তা কি এই ভদ্রলোকের কথা মত টেস্ট রিলিফ মারফতই হয়ে যাবে।

অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভদ্রলোকটিকে জানিয়েছেন যে, তাঁরা তাঁর কথা মত চলবেন না। কিন্তু তার জন্যও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ জানাবার কোন কারণ নেই। সত্যই তো পশ্চিমবঙ্গের সেচ দপ্তর এতকাল কি করেছে তার একটা হিসাব তো পাওয়া দরকার। আর ভদ্রলোকের কথাগুলিকে একেবারেই ঠেলে দেওয়া যায় না। এই লোকগুলিকে দিয়ে অনেকগুলি গভীর নলকূপ বসানো যায়, পুষ্করিণী সংস্কার করানো যায়, এবং কয়েকটি ছোটখাট খালও কাটানো যায়। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজনের তুলনায় এ হয়ত কিছুই নয়। কিন্তু এগুলি করতেই বা দোষ কোথায়?

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে ১৯৬২ সালে। প্রথম উপাচার্য রূপে যিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তিনি হচ্ছেন অধ্যাপক বি এন দাসগুপ্ত। ১৯৬২ সাল থেকেই এখানে অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, রসায়ন, অংকশাস্ত্র, জুলজি ও বোটানির স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যবস্থা হয়, এবং ১৯৬৩-৬৪ সালে ইতিহাস, বাংলা ও কমার্সের ক্লাস চালু হয়। শ্রীদাসগুপ্ত ১৯৬৬ সাল থেকে সংস্কৃত এবং দর্শনশাস্ত্রের স্নাতকোত্তর শিক্ষার পরিকল্পনা করেছিলেন।

১৯৬৬ সালে ৩১শে মে তারিখে শ্রীদাসগুপ্ত অবসর গ্রহণ করার পর যিনি নতুন উপাচার্য হয়ে এলেন, তিনি নাকি প্রথমেই এই নতুন দুটি বিভাগ খোলার প্রস্তাব বাতিল করেছেন বলে প্রকাশ। এ ছাড়া এই কয়েক মাসের মধ্যেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা সম্পর্কে অনেক অভিযোগ জমা হয়েছে।

পূর্বতন উপাচার্যের আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান বাড়িটি ছাড়াও, একডজনেরও বেশি বড় বড় বাড়ি এবং ওই একই সংখ্যক ছোট ছোট আবাসযোগ্য বাড়ি এবং তৎসহ দুটি বড় ছাত্রাবাস, একটি ছেলেদের ও একটি মেয়েদের, তৈরি হয়েছিল এবং আরও দুটি ছাত্রাবাস নির্মিত হচ্ছিল। নতুন উপাচার্য নাকি এই সমস্ত নির্মাণকার্য স্থগিত রেখেছেন এবং পরিবর্তে এমন কতকগুলি গৃহনির্মাণে হাত দেওয়া হয়েছে যেগুলির আপাতত কোন প্রয়োজন নেই বলেই অনেকে মনে করছেন। নির্মাণকার্যের খরচপত্র সম্বন্ধেও অনেক কথা উঠেছে।

পূর্বতন উপাচার্যের আমলে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দুটি রাস্তার সংযোগস্থলে রাজা রামমোহন রায়ের 'মূর্তি' স্থাপিত হয়েছিল যার উন্মোচন করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ। অভিযোগ এসেছে যে, সেই মূর্তি নাকি চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে। এখন সেখানে শুধু একটি স্তম্ভ পড়ে আছে।

অনার্স, এম-এ এবং বি-টি পরীক্ষা নিয়মিত হয়ে আসছিল, বর্তমানে নতুন পদ্ধতি অবলম্বিত হবার দরুণ সমগ্র পরীক্ষাব্যবস্থায় একটা দারুণ বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ বিশেষ ছাত্রদের নাকি প্রশ্ন আগের থেকে জানিয়ে দেওয়া, এবং অনেক ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন ছাত্রদের বিরুদ্ধে পিছন থেকে কলকাঠি নাড়বার অভিযোগও আছে। পরীক্ষার নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্বমূলক ব্যবহারের অভিযোগও উঠেছে।

আপিকালচারাল বিভাগটির কাজকর্ম বেশ ভালই চলছিল। অভিযোগ এসেছে যে, এই বিভাগটিকে কতিপয় ব্যক্তির কাছে নাকি বিশেষ লাভজনক করে তোলা হয়েছে।

সম্প্রতি ভূগোল বিভাগটিকে অ্যাপ্লায়েড জিওগ্রাফী নামক বিভাগে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এই অ্যাপ্লায়েড জিওগ্রাফী নামক বিষয়টি কোথাও পড়ানো হয় না। এই বিষয়ে পাশ করে বেরিয়ে কোন ইস্কুলে বা কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরী পাওয়া যাবে না। শোনা যাচ্ছে, একজন বিশেষ ব্যক্তির স্বার্থেই এই ব্যবস্থা হয়েছে এবং বর্তমানে যিনি ভূগোল-বিভাগের প্রধান তাঁকে তাড়াবার জন্যই নাকি এই ব্যবস্থা।

নতুন উপাচার্য যে ফিনান্স অফিসারকে নিয়োগ করেছেন, তিনি নাকি ৬৫ বছর বয়সের একজন পেন্সনভোগী বৃদ্ধ, যাঁর বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় নাকি সাধারণ বি-কম পর্যন্ত, অথচ তাঁকে বেতন দেওয়া হচ্ছে মাসিক হাজার টাকা।

যিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার তিনি নাকি একজন তৃতীয় শ্রেণীর এম-এ যাঁর নাকি না আছে শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা, না আছে পরিচালন বিভাগীয় অভিজ্ঞতা। তিনি এই সঙ্গে আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের প্রধানও বটে।

অভিযোগ এখানেই থামছে না। এম-এ ও এম-এসসি-তে ভর্তি হতে গেলে আজকাল বিভাগীয় প্রধানদের সুপারিশের প্রয়োজন হচ্ছে, যার ফলে নাকি এক নতুন ধরণের দুর্নীতির উৎস খুলে গেছে। কোন কোন বিভাগীয় প্রধানের সাময়িক অনুপস্থিতিতে অযোগ্য হাতে নতুন করে সিলেবাস তৈরি হচ্ছে, যেগুলিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ পড়ছে, এবং গুরুত্বহীন বিষয়গুলি স্থান পাচ্ছে। অনেক অধ্যাপককে কোন কারণ না দেখিয়ে ছাঁটাই করা হয়েছে।

যাঁরা নন-টিচিং-স্টাফ তাঁদের মধ্যে যাঁরা বর্তমান উপাচার্যের নিজের লোক বলে কথিত তাঁরা নাকি মাসিক ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা পর্যন্ত বেতন পাচ্ছেন। পক্ষান্তরে অনেক গ্র্যাজুয়েট ও এম-এ পাশ স্টাফের বেতন ১০০ থেকে ২০০-র মধ্যে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলকাতা অফিস অপ্রয়োজনীয় বোধে ১৯৬৪ সালে তুলে দেওয়া হয়েছিল। বর্তমান উপাচার্যের আমলে কলকাতা অফিস আবার চালু করা হয়েছে। এবং এই অফিসের ভাড়া লাগে নাকি মাসে ন্যূনাধিক ১০০০ টাকা। শোনা গেছে যে, উপাচার্য মহাশয়ের দু'জন আত্মীয় নাকি সেই বাড়িতে থাকেন।

বিগত সমাবর্তন উৎসবে, (যা ১০ই অক্টোবর ১৯৬৬ সালে হয়েছিল) বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষাধিক টাকা নাকি খরচ করা হয়েছিল, যার কোন সন্তোষজনক হিসাব নাকি পাওয়া যায় নি। বিশ্ববিদ্যালয় কতকগুলি অপ্রয়োজনীয় মামলায় জড়িয়ে পড়েছে, যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচুর আর্থিক ক্ষতি অকারণে হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা সম্পর্কে বিভিন্ন মহল থেকে যে সব অভিযোগ উঠেছে, জনস্বার্থের মুখ চেয়ে সেগুলি প্রকাশিত করা হল। আশা করি সরকার এ বিষয়ে অবগত হবেন এবং যথোপযুক্ত তদন্ত সহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু

ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক

বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু ইংরাজি নববর্ষের প্রথমদিনে আজ থেকে তিয়াত্তর বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৮৯৪ খৃস্টাব্দের ১লা জানুয়ারী পৃথিবীর মাটিতে প্রথম আলো দেখেছিলেন। এই শুভদিনকে স্মরণ করে আমরা প্রার্থনা জানাই ঃ তাঁর জীবনে শত শরতের উদয় হোক।

একদিন আইনস্টাইন-প্ল্যাঙ্ক-বোস তিনটি নাম এক সুরে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। তখন তাঁর বয়স ছিল অত্যন্ত অল্প। বোস-আইনস্টাইন থিয়োরী নিয়ে কিছু বলার মতো স্পর্ধা আমার নেই। এই নিবন্ধে মানুষ সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে দু-চার কথা বলার ইচ্ছে হচ্ছে, ভাগ্যগুণে মানুষ সত্যেন্দ্রনাথের বড়ো কাছাকাছি এসে গেছি।

ডিসেম্বর মাসের ন' তারিখ। সন্ধ্যা হয় হয়; বিজ্ঞানীর ঘরে টেলিফোন বেজে উঠলো। ওঁকে খবর দেওয়া হলো, প্রেসিডেন্সি কলেজের কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরির কিছু অংশ ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়েছে। যিনি ফোনে খবরটা দিলেন বিজ্ঞানী তাঁকে শুধু বললেন, 'এই ঘরে বসে মাস্টারমশায় (আচার্য পি সি রায়) কাজ করতেন।' ব্যস, আর কোন কথা নেই। নীরবতার যাদুতে ঘরখানা থম থম করছে। সত্যেন্দ্রনাথ স্বয়ং যে ওই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। বৃদ্ধ মনীষী বসে আছেন নীরবে। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর তাঁর ঘর থেকে পা টিপে বেরিয়ে এলাম। পরের দিন সকালে ওঁর বাড়ি গেলাম এই মনে করে যে, গতকালের বিমর্ষতা যদি কাটিয়ে উঠতে পেরে থাকেন তো বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে দু-চার কথা শুনবো। গিয়ে দেখি, রাস্তার দিকে বাড়ির যে ঘরে অধ্যাপক থাকেন তা শূন্য পড়ে আছে। শুনলাম যে, ওইদিন ভোরের ট্রেনে কাউকে বিশেষ কিছু না বলে একাকী হঠাৎ কলকাতা ত্যাগ করেছেন। বৃদ্ধ মানুষটি একলা চলে গেলেন কলকাতার বাইরে, শীতকাল অথচ গায়ের চাদরখানা পর্যন্ত ভুলে পেছনে ফেলে রেখে গেছেন। স্বর্গত বিজ্ঞানী আচার্য পি সি রায়ের সাধনার পীঠস্থানের প্রতি আমরা এতটুকু শ্রদ্ধা দেখাতে পারলাম না বলে কি তাঁর উত্তরসাধক বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ অভিমানে চাপা মনোবেদনা নিয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে সাময়িকভাবে দূরে সরে গেলেন! পিছনে পড়ে রইল সংস্কৃতির লীলাভূমি শহর কলকাতা। আজকের কলকাতার বিচিত্র রূপ মনে ভীতি জাগিয়ে তোলে নাকি?

মানবদরদী সত্যেন্দ্রনাথ একালের ঋষিতুল্য। সত্যেন্দ্রনাথ এযুগের এক বিস্ময়কর প্রতিভা। যে তাঁর সান্নিধ্যে এসেছে সেই জানে যে তাঁর প্রতিভার বহুমুখী স্ফুলিঙ্গ চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে—সত্যেন্দ্রনাথ কেবলমাত্র বিজ্ঞানের উপাসক নন তিনি ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, সমালোচক, ভাষাবিদ, সংগীতশাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞানের প্রায় সমস্ত অলিগলি তাঁর চেনা জানা। এই প্রসংগে মনে পড়ে যায় জার্মান পণ্ডিত ডঃ এ্যালবার্ট সোয়াইৎসরকে যিনি একাধারে চিকিৎসক, দার্শনিক এবং সংগীতজ্ঞ ছিলেন। তাঁকে একবার নাকি প্রশ্ন করা হয়েছিল কি করে এতে বিষয়ে অনুশীলন সম্ভবপর হলো? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'you can burn a candle at both ends if it is long enough'. সোয়াইৎসর, হলডেন, সত্যেন্দ্রনাথ এ'রা এমন এক শ্রেণীর পণ্ডিত যাঁদের সাক্ষাৎ প্রত্যহ মেলে না। কলকাতায় তাঁর

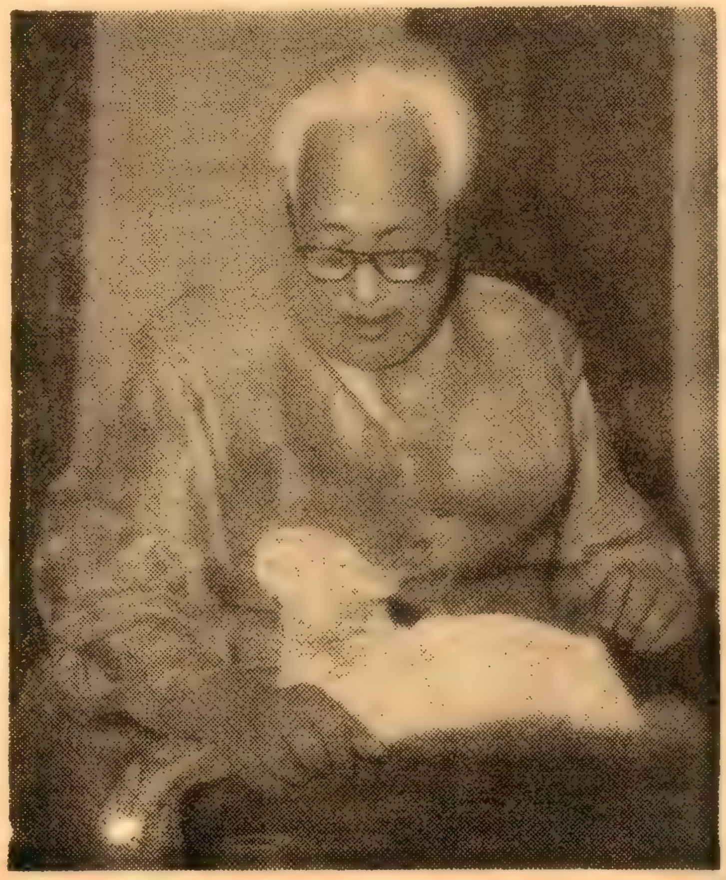

বাড়ির একটি পোষা বিড়ালকে আদর করছেন সত্যেন্দ্রনাথ

ঘরখানিতে এবং শহরের বাইরে অনেক সময়ে তাঁকে একান্তে পেয়েছি, নানাভাবে তাঁকে দেখবার সুযোগ হয়েছে। মানুষের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় ছোটখাটো ঘটনার ভেতর দিয়ে, এখানে ওঁর প্রাত্যহিক জীবনের কয়েকটা ঘটনা তুলে ধরতে চাই। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের টুকিটাকি ছবি আজকের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ দিনে হয়তো মানসিক শক্তিসঞ্চয়ে এবং ঔদার্যের দীক্ষা নিতে সাহায্য করলেও করতে পারে।

গত ২৫শে বৈশাখ সকালে রবীন্দ্র-স্মরণীর (বর্তমানে সদন) উদ্বোধন। জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় উদ্বোধন করেন। সদনে যাবার জন্যে একখানি ট্যাক্সিতে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে রওনা হয়েছি। ওখানে পৌঁছতে গেট থেকে অনেক দূরে ট্যাক্সিখানা থামিয়ে দিল। সদনের প্রাঙ্গণে নাকি শুধুমাত্র প্রাইভেট গাড়ি যেতে পারবে। সত্যেন্দ্রনাথ যদি যেতে চান তো অনেকখানি পথ তাঁকে হেঁটে ভেতরে প্রবেশ করতে হবে। একজন পুলিশ অফিসর তাঁর গাড়িখানা আটকালে অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে তাকে বললেন, 'বড়োলোক হলে গাড়ি ভিতরে যাবে, তাই না, আমি গরীব সেজন্যে আমার ট্যাক্সি আটকানো হবে?' ট্যাক্সির ড্রাইভারকে বললেন, 'গাড়ি ফেরাও, ফিরে চলো।' গাড়ির মুখ ঘোরালো, রবীন্দ্র সদনকে পিছনে রেখে চলেছি এমন সময়ে একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসর ছুটে এসে পুলিশী সেলাম ঠুকে ওঁকে সদনের মধ্যে ট্যাক্সিতে প্রবেশের জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। পাছে আবার কোন অসুবিধে হয় তাই অফিসরটি নিজে দৌড়তে দৌড়তে গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়ে থেকে গাড়ি ভেতরে প্রবেশের সুবিধে করে দিলেন। ট্যাক্সি প্রাইভেট গাড়ির লাইনে সদনের সিঁড়ির সামনে এসে থামলো। ঘটনা সামান্য তবু তাকে কেন্দ্র করে সেদিন তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ এবং তেজস্বিতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। এ হলো সাম্রাজ্যবাদ, ব্যুরোক্রেসির বিরুদ্ধে জ্ঞানবৃদ্ধ তাপসের যেন বজ্রনির্ঘোষ প্রতিবাদ। সেদিন এই প্রশ্ন মনে জেগেছিল, প্রাইভেট গাড়ির এবং ট্যাক্সির আরোহীদের মধ্যে সুযোগ সুবিধায় পার্থক্য টেনে এনে কেন এই ভেদনীতি? দরিদ্র দেশে একি জাতীয় কলঙ্ক নয়, গাড়ির যাঁরা মালিক তাঁরা সকলে প্রথম শ্রেণীর নাগরিক আর যাঁরা তা নন তাঁদের কোন মান থাকবে না, তা তাঁরা দেশের যত বড়ো পণ্ডিতই হোন না কেন। এই প্রসঙ্গে অতীতের আর এক পুরুষসিংহ স্যার আশুতোষের সদম্ভ প্রতিবাদ ওই রাস্তারই আশে পাশে কোথায় একদিন ফেটে পড়েছিল সে কথা মনে পড়ে গেল। মনে হলো, সবই তো ঠিক রয়ে গেছে।

আচার্য সুনীতিকুমার প্রদীপশিখা প্রজ্বলন করে রবীন্দ্র সদনের উদ্বোধন করলেন, ভাষণ দিলেন। শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রী অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা উদ্বোধন এবং সমাপ্তি সংগীত গাইলেন। এখানের সভা ভঙ্গ হলো।

সভা শেষে চলেছি আচার্য বসুর সঙ্গে ব্যারাকপুরের রাস্তা ধরে। কলকাতা থেকে মাইল কুড়ি দূরে একটি ছোট্ট স্কুল। প্রাইমারী স্কুল, উদ্বাস্তু পল্লীতে দরিদ্র পরিবেশের মধ্যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে গড়ে উঠেছে। টিনের চালা সামনে চাতাল, চাতালে আলপনা দেওয়া হয়েছে। কবির একখানি ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি দেওয়ালে ঝুলছে। একটি থালায় মালা চন্দন কুচো ফুল। স্কুলের কর্তৃপক্ষ সত্যেন্দ্রনাথকে তাদের উৎসবে পৌরোহিত্য করতে ধরেছিল আর তিনিও রাজী হয়ে গিয়েছিলেন। ওখানের সভায় হাজির হয়ে দেখা গেল সভা ডাকবার কোন তোড়-জোড় নেই। আমি তো এক রকম চাপ দিয়ে সভার কাজ সুরু করালাম। আবৃত্তি গান চলেছে তো চলেছে শেষ আর হতে চায় না। এদিকে বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে, অভুক্ত অসুস্থ শরীর তবু মুখে চোখে শুধু হাসি কোথাও এতটুকু বিরক্তির ছায়া পড়ে নি। এতো বড়ো পণ্ডিত অথচ এতো দরদী এতো ভদ্র। শিশুদের উৎসবে যেন আর একটি শিশু—তাদের কি আনন্দ, এতো বড়ো মানুষটাকে এতো কাছাকাছি পেয়ে গেছে। সভা শেষ হলো বেলা প্রায় দেড়টা। শরীরে ক্লান্তি ভর করেছে অথচ কোন উত্তেজনা নেই। উদ্বাস্তু পল্লীর ছেলে-মেয়েদের জড়িয়ে ধরে ঋষি বিজ্ঞানী ধীরে ধীরে গাড়িতে এসে উঠলেন। মহাকবির ১০৫তম জন্মদিনে দুটি সভায় পরপর উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হলো। ফিরতি-পথে বারে বারে মনে হয়েছিল, প্রেমে-প্রাণে-গানে পূর্ণ মানবসভ্যতা কোন্ সভা থেকে কি আহরণ করলো, সত্য মহত্ত্ব এবং মানবতার বাণী কোন পথে বিলিয়ে দেওয়া হলো।

১লা বৈশাখ নববর্ষের বিকেলে প্রণাম করতে গেলাম। দেখি, সিল্কের ধুতি মির্জাই পরে সুন্দর সাজে সেজে বসে আছেন। স্মিত হেসে বললেন, 'বেরুবো এখনি। তুই যাবি আমার সঙ্গে?' গেলাম সঙ্গে। বেলেঘাটার রাস্তা ধরে গাড়ি চলেছে, ভাবছি, নিশ্চয় নববর্ষের কোন এক জমকালো সভায় যাচ্ছি। বেলেঘাটার নিম্নবেতনভোগী সরকারী কর্মচারীদের কলোনিতে এসে হাজির হলাম। সত্যেন্দ্রনাথ একটি দোকানের সুমুখে গাড়ি থামাতে বললেন। ওটি হলো ওখানকার বাসিন্দাদের কোঅপারেটিভ স্টেশনারী দোকান। তাদের এক কর্মীর আমন্ত্রণে এসেছেন; দোকানের সামনে ফুটপাতে দু-তিনখানা চেয়ার পাতা ছিল তার একখানিতে ও'কে বসানো হলো। লোক নেই জন নেই একি সভা! আমার মনটা তো দমে গেল। মনে হয়েছিল, বড়ো-সড়ো ব্যাপার বিশেষ করে ও'র সাজ-সজ্জা তো ওই রকমের একটা কিছু ভাবতে সাহায্য করেছিল। বৈশাখের সন্ধ্যা লবণ হ্রদ থেকে ফুরফুরে বাতাস আসছে। কলোনির ছেলে-মেয়ে নারী-পুরুষ প্রণাম করে যাচ্ছে। তাদের সুখদুঃখের নানান্ খোঁজ খবর নেন। একজন তো ধরে বসলো তাদের ঘরে ওঁকে খেতে হবে। হাসিমুখে তাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। রাতের খাওয়া প্রসন্নমুখে খেয়ে নিলেন। ছোট শুকনো রুটি খানচারেক সঙ্গে কিছু তরকারী; খাওয়ার পর বললেন, 'নিয়ে এসো পান দোক্তা'। গৃহস্বামী এবং পল্লীবাসীদের আনন্দ আর ধরে না।

মানুষকে কখনো ছোট করে দেখতে ওঁকে দেখি নি, পণ্ডিত এবং মানবপ্রেমিক-রূপে তিনি আদর্শ পুরুষ। অনেক অন্যায় আব্দার তাঁকে সহ্য করতে হয়। ডাক্তাররা নিষেধ করেছে শরীর অসুস্থ হয়তো বা পারিবারিক বা কোন রকম অশান্তিতে জড়িয়ে আছেন তবু লোকের জেদ 'আপনাকে যেতে হবে'; 'না গেলেই চলবে না'। কারুর কথা শোনেন নি গেছেন, ফিরে এসে হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আবার একটু সুস্থ হওয়া মাত্র যে যেখানে ধরে নিয়ে যেতে চেয়েছে না করেন নি।

গ্রীষ্মের প্রখর তাপে ওঁর সঙ্গে চলেছি আসানসোল। পাছে কষ্ট হয় তাই একটি ঠান্ডা জলের ফ্লাস্ক নিয়েছেন আমার জন্যে। গাড়িতে ওঠা মাত্র ফ্লাস্কটি তুলে ধরলেন আমার হাতে। ফ্লাস্কটি একটু নতুন ধরণের কলকাতায় কখনো এ রকমের জিনিস চোখে পড়ে নি। প্রায় বছর দশেক পূর্বে বিজ্ঞানী যখন জাপানে গিয়েছিলেন সেদেশে তাঁর যৌবনের এক জাপানী বৈজ্ঞানিক বন্ধু বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে এটি তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। হয়তো বন্ধুত্বের স্মৃতির চিহ্ন বলেই ফ্লাস্কটির প্রতি তাঁর একটু বেশি মমতা লক্ষ্য করেছি। আসানসোল থেকে ফেরবার পথে ফ্লাস্কটি গাড়িতে ধাক্কা খেয়ে জখম হলো। তখন অবশ্য তার বিন্দুবিসর্গ টের পাই নি। পথের তৃষ্ণা দূর করতে ঘন ঘন জল খাচ্ছি। পরে শুনলাম যে, বিজ্ঞানীর বড়ো সাধের ফ্লাস্কটি ধাক্কায় ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। আমার তো ক্ষোভের অন্ত ছিল না; ও'কে বললাম, 'স্যার, ফ্লাস্কটা ভেঙে গেল, একটা সুন্দর জিনিস।' আমাকে শেষ করতে না দিয়ে বলে উঠলেন, 'তুমি কি

করে জানলে, তোমার তো জানবার কথা নয়। ঠিক আছে—ভাঙার জিনিস ভেঙেছে তোমাকে অতো ভাবতে হবে না।' সত্যেন্দ্রনাথকে যতই দেখি ততই বিস্ময় বেড়ে যায় আর মনে হয় এতোটা তো কখনো চোখে পড়ে নি এর আগে। শুধু মনে হয়, এমন দরদী মন একালে তিনি পেলেন কোথা থেকে! কি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে কি জ্ঞানে এই স্বাতন্ত্র্যবোধ তাঁর ব্যক্তিত্বকে পরিপূর্ণ করে তুলেছে। ব্যক্তিত্ব এই মনীষীকে 'A legend in his lifetime'-এর সম্মান দিয়েছে। একবার এক খ্যাতিমান পণ্ডিতকে উদ্দেশ করে তাঁকে বলতে শুনেছি, 'দেখ—আমার কাছে যখন কিছু বলতে চাইবে—কে কি বলেছে সে সব বলে যুক্তি খাড়া করো না। নিজের মতামত যা ইন্ডিপেন্ডেন্ট বলে মনে করবে তাই বলতে চেষ্টা করবে।' সব সময়ে তাঁর মত ও পথ ইন্ডিপেন্ডেন্ট রাস্তা ধরে চলে আসছে। তাঁর এই স্বাধীন মতামত অনেক সময়ে ঠিক মতো বোঝা যায় না বা ধৈর্য ধরে বোঝবার চেষ্টা করা হয় না. তাই নানা ভুল ধারণা ওঁর সম্পর্কে সময়ে সময়ে পোষণ করা বিচিত্র নয়। তখন হয়তো উনি মর্মান্তিক আহত হন। তবে সত্যেন্দ্রনাথ হলেন এমন এক মনীষী যিনি অতি সহজে সব কিছু ভুলতে পারেন। কারুর বিরুদ্ধে ওঁর রাগ বা অভিমান বেশিক্ষণ টিকে থাকে না। সামনে একবার দাঁড়িয়ে পড়তে পারলেই হলো—দু-হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নেবেন। আমরা চালের চলনে চলতে ভালবাসি, এমন করে বুকে টেনে নিতে কখনো কাউকে দেখি নি—যেন বহতা নদী ধূসর মরুকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

মমতাও যতো ভোলার ক্ষমতাও ততো। ছোট মেয়ে 'খুকু' ওঁর বড় আদরের. মেয়েটির বিয়ের পর অনেকের মনে হয়েছিল হয়তো বৃদ্ধ পিতা বিচ্ছেদ বেদনায় ভেঙে পড়বেন। দেখা গেল তাজ্জব ব্যাপার, মনে হয় না যে কিছু ঘটে গেছে, একটি দিনের জন্যে কেউ এতটুকু কাতর হতে দেখে নি। গল্পচ্ছলে শান্তিনিকেতনে পূজনীয়া প্রতিমা দেবীকে একথা বলায় তিনি ভারী সুন্দর উত্তর দেন, 'জিনিয়সদের ব্যাপারই এই এ'রা সহজে সব কিছু থেকে নিজেদের ডিটচ করে নিতে পারেন।'

কালীপুজার পর ডঃ সহারাম বসু এসেছেন দেখা করতে। বয়সে সহারামবাবু অধ্যাপক বসুর থেকে ক'বছরের বড়ো। অধ্যাপক বিছানার ওপর শুয়ে ছিলেন উঠে বসলেন, তারপর দাঁড়িয়ে উঠে এগিয়ে চললেন সহারামবাবুর দিকে। সত্যেন্দ্রনাথ সহারামবাবুর দুটি পায়ে দুটি হাত স্পর্শ করে বিজয়ার প্রণাম জানালেন। বয়োজ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানীকে কনিষ্ঠ এমনি করে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। ওঁর বৃদ্ধ বয়স এবং অপটু দেহের কথা কে না জানেন, হেঁট হতে যথেষ্ট কষ্ট হচ্ছিল, হাত তুলে প্রণাম করতে কোন বাধা ছিল না বিশেষ-করে সহারামবাবু যখন একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কারণে অকারণে প্রণাম করা পছন্দ হয় না। তবে বিজয়া উপলক্ষে কনিষ্ঠরা প্রণাম করলে কেন জানি না বেশ ভালো লাগে। একবার একদল ছাত্র-ছাত্রীকে কৌতুকচ্ছলে পরোক্ষভাবে এমন ইচ্ছা প্রকাশ করাতে তারা বলে বসলো, 'স্যার, কালীপুজোর পর তো আর প্রণাম করে না।' তাই এ দৃশ্য সেদিন আমাকে বিচলিত করেছিল। যাঁরা ঘন ঘন ওঁর কাছে আসেন তাঁরা জানেন ও'র ঘরটি শিক্ষার্থীদের কাছে একটি তীর্থক্ষেত্র।

এই মানুষটির নিবিড় সংস্পর্শে এসে এমন টুকিটাকি শত শত ঘটনা লক্ষ্য করেছি। সবগুলি একত্র করে একদিন দেশবাসীর হাতে তুলে দেবার ইচ্ছে আছে। ঘটনাগুলির একত্র সমাবেশ মানুষ সত্যেন্দ্রনাথকে আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরবে এবং তাঁর মানবীয় বৈশিষ্ট্য আমাদের জাতীয় চরিত্রগঠনে সাহায্য করবে।

মানবপ্রেমিক মানুষ স্বাভাবিক নিয়মে সংগীতপ্রিয় হয়ে থাকে। তাই কি সত্যেন্দ্রনাথ এতো সংগীতপ্রিয়? বিদেশে নিপুণ শিল্পীদের বাজনা বা অরকেস্ট্রা শোনার শখ ছিল প্রবল। স্বদেশে তাঁর কালের এমন কোন নামী শিল্পী নেই যাঁর গান বা বাজনা তাঁর শোনা হয় নি। তরুণ প্রবীণ বহু শিল্পীই বাড়িতে এসে ও'কে গান বা বাজনা শুনিয়ে গেছেন। ওঁকে শুনিয়ে আনন্দ দিতে পারা তাঁদের জীবনে এক পরম লগ্ন। অনেককে বলতে শুনেছি, 'বড়ো জলসায় বা মেলায় হাজার লোককে গান শোনানোর মধ্যে আছে উত্তেজনা আর অধ্যাপক বসুর মতো ঋষি-কল্প শ্রোতাকে আনন্দ দেওয়ার মধ্যে রয়েছে সৃষ্টির আনন্দ।' পাশ্চাত্য এবং ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা পরিমাপ করা সুকঠিন। ওঁর গুরু আইনস্টাইন বাজাতেন বেহালা আর উনি বাজান এসরাজ। বার্ধক্যের অপটতায় এসরাজখানি ইদানীং আর

এসরাজ বাজাচ্ছেন, বিজ্ঞানাচার্য

বাজাতে পারেন না। কাপড়-ঢাকা পড়ে আছে ঘরের একটি কোণে। বছর দুই আগেও ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগে নিয়মিত এসরাজের তারের পরে ছড়ির টানে রাগ-রাগিণীর ঝংকার শোনা যেত। দুবছর পূর্বের কথা তাঁর এক অতি ঘনিষ্ঠ ফরাসী বিজ্ঞানী বন্ধুর জন্মদিন, তাঁকে পাঠাতে হবে কিছু উপহার। কি পাঠানো হবে তাই ভাবছেন আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ। আমি বললাম, একটি টেপের একদিকে আপনার এসরাজ বাজনা এবং অপরাংশে কিছু বাংলা সংস্কৃত ফরাসী জার্মান পাঠ রেকর্ড করান যাতে করে বিদেশী বন্ধু প্রবাসে আপনার হাতের বাজনা এবং কণ্ঠস্বর শুনবেন—জন্মদিনে বন্ধুকে এর থেকে উৎকৃষ্ট উপহার আর কি দেওয়া যেতে পারে। বাজনা রেকর্ড করালেন আমাকে দিয়ে, গোয়েটের ফাউস্টের এবং কালিদাসের মেঘদূতের কিছু অংশ, সর্বশেষ রবীন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন' কবিতাটি আবৃত্তি করে শেষ করলেন। প্যাক হয়ে সাগর পারে চলে গেল। আচার্য বসুর কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত উপহার পেয়ে পরের ডাকে বিদেশী বন্ধুর কাছ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতাপূর্ণ আনন্দবার্তা এলো তাঁর ঘরে। আচার্যদেব সস্নেহে সেদিন আমাকে বলেছিলেন, 'ভক্তি, তোমার আইডিয়াগুলো বড়ো চমৎকার।' আইডিয়ার রাজার কাছ থেকে এতো বড়ো প্রশংসায় গর্বে আমার বুক ভরে গিয়েছিল সেদিন। শুনেছি, বিজ্ঞানী বন্ধুটি তাঁর ভারতীয় বন্ধুর কাছ থেকে পাওয়া অমূল্য উপহারটির একটি অনুলিপি ফরাসী জাতীয় সংগ্রহশালায় রক্ষণের ইচ্ছায় দান করেছেন।

বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথের এসরাজ বাজনা রেকর্ড করে রাখার মতো সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাঁকে অনুরোধ করলাম, 'আপনার এসরাজ বাজানোর ইতিহাস সম্পর্কে দু-চার কথা বলুন।' সে সম্পর্কে তিনি যা কিছু বলেছেন তা রেকর্ড করে রাখি। আজ বিজ্ঞানীর জন্মদিনে ওঁর নিজের কথাগুলি উদ্ধৃত করে শ্রদ্ধা জানিয়ে শেষ করতে চাই।

"ছেলেবেলায় গান শোনার প্রবল আগ্রহ ছিল। তাছাড়া বন্ধুদের মধ্যে মন্টু * তখন গানে একজন খুব মস্ত বড়ো পান্ডা। আমরা সব মন্টুর গান পছন্দ করি, ওর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াই। সুর এবং সুরের বিষয় অনেক আলোচনা হতো। বন্ধুবর ধূর্জটিপ্রসাদ (মুখোপাধ্যায়) ইত্যাদি নানা সমজদার লোকের সঙ্গে। বি-এসসি পরীক্ষার আগে মন্টুর সঙ্গে আলাপ। ধূর্জটির বাড়িতে গানের চর্চা ছিল। ওর মা সুগায়িকা ছিলেন, ধূর্জটির ছেলেও বর্তমানে সুগায়ক। গানের ব্যাপারে নিজের আমার কোন বর্ণপরিচয় ছিল না। একটা ছোট এসরাজ কিনে নিজে নিজে বাজাবার চেষ্টা করা হলো।

* শ্রীদিলীপকুমার রায়।

লেখকের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ

অবশ্য স্বরলিপি দেখে বাজাবার অভ্যাস করতে হয়েছিল। তাছাড়া বিজ্ঞানী লোক হিসেবে ইংরেজীতে যাকে বলে harmonics সে সবগুলো অনুসন্ধান করে তার দ্বারা কি করে এ বাজানো যায় এইসব নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা নানান রকমের করা যেত; এইভাবে এসরাজের সঙ্গে পরিচয়। তারপর সে হবে অনেকদিনের কথা আরম্ভ হয়েছিল বোধহয় বয়স যখন কুড়ি-একুশ হবে। কিছুদিন একটা ছোট এসরাজ বাজাবার পর ঢাকায় যেতে হল সেখানে আমার এক ছাত্র** ঢাকায় তৈরি বর্তমানের এসরাজটি সংগ্রহ করে দিলেন। তারপর থেকে মধ্যে মধ্যে বাজাই। ঢাকায় তখন গান-বাজনার খুব রেওয়াজ ছিল। রাসের সময়ে বৈষ্ণবদের বাড়িতে খুব গান-বাজনা হতো। আলাউদ্দীন খানের দাদা, ভগবান সেতারী, শ্যাম সেতারী এঁরা সকলে ওখানে প্রায় বাজাতেন। আমার নিজের কথা বলতে গেলে ধারাবাহিকভাবে কিছু করা হয় নি তবে বলতে গেলে অনেক বচ্ছরই বাজানো হচ্ছে ওতে যেটুকু হাত এসেছে ওই আর কি—।

** তিনি এখন জীবিত নেই। তিনি ছিলেন স্যার রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়ের জামাতার জামাতা।

"তখন অনেকে বলতেন যে, আমাদের হিন্দু রাগ-রাগিণী এমনভাবে সৃষ্টি হয়েছে যে, রাগ যেগুলো আমরা বলি তাছাড়া অন্য কিছু হওয়া সম্ভব নয়। আমার এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার পর হঠাৎ একদিন মনে হলো যে চেষ্টা করে দেখা যাক নতুন ধরণের কিছু করা যায় কি না। সেই সময়ে একটা স্বরলিপি করেছিলাম এবং সেটা অনেক সময়ে গান নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন তাঁদের শোনাই, তাঁদের মনে ধোঁকা দেবার জন্যে। শেষ অবধি সেই যে কাঠামো হয়েছিল তাতে আমার বন্ধুবর পশুপতি ভট্টাচার্য মশায় একটা গান যোজনা করেছিলেন এবং কিছুদিন সে গান আমাদের বন্ধু মহলে গাওয়া হতো, অনেককে শোনানো হয়েছিল। তবে যাঁরা আমাদের হিন্দী সংগীতের বৈয়াকরণ তাঁরা বললেন, ওই কানাড়ার ঘরের একটা কিছু হয়েছে। অবশ্য যা করা হয়েছিল তার বিস্তার খুব বেশিদূর হয় নি। বিস্তার করতে গেলে হয়ত একটা কারুর সঙ্গে মিলে যেতে পারতো। কিন্তু এমনি অনেককে শুনিয়ে তাঁদের অনেক সময়ে একটু মাথা চুলকাতে হতো যে, এটা কি।

"গুরুর বাজনা ? আইনস্টাইন সাহেবের বাজনা শুনি নি, যদিও অনেক সময়ে তাঁর ঘরে দেখেছি বেহালা রয়েছে। কখনো সাহস করে তাঁকে অনুরোধ করতে পারি নি যে, আমাকে একটু বাজনা শোনান।

"শুনেছিলাম তিনি যখন জাপানে গিয়েছিলেন তখন বেহালা-টেহালা নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানকার লোকেও তাঁর বাজনা শুনেছিল। বিজ্ঞানীরা অনেকে, বিশেষ করে জার্মান বিজ্ঞানীরা সংগীত ভালোবাসেন। আমি এক জার্মান বন্ধুকে বলি যে, আইনস্টাইন সাহেব বেহালা বাজান। তিনি খুব গম্ভীরভাবে বললেন, প্ল্যাঙ্ক সাহেব পিয়ানো বাজান। বেহালা কিম্বা পিয়ানো জার্মানীতে খুব আদৃত হত।

"এসরাজ বাজনা শুধু মনকে সন্তুষ্টি দেবার জন্যেই, তবে এবার স্নেহাস্পদ ভক্তিপ্রসাদ ধরে বসেছিলেন যে, আমার এসরাজ বাজানো তিনি তুলে নেবেন তাই কয়েক মিনিট বাজালাম এবং সেটা এখানেই রক্ষিত হল। যা কিছু এখানে রইল সে আর ভেবে-চিন্তে করা হল না শুধু কেবলমাত্র পরে একটা কিছু লেখা থাকবে সেজন্যে ভক্তির কথায় এই চেষ্টা।"

একটি আদর্শ দাও

পান্নালাল দাশগুপ্ত

সমস্ত এশিয়া ও আফ্রিকাতে ছাত্র-শক্তি বা 'ছাত্র বিদ্রোহ' বলে নতুন একটা ঘটনা বা Phenomenon লক্ষ্য করা যায়। এগুলি কোথাও কোথাও বিপ্লব পর্যন্ত সংঘটিত করে ছাড়ছে, কোথাও প্রতিবিপ্লবের হাতিয়ার হিসাবেও ব্যবহৃত হচ্ছে। একদা রাজনীতি-শাস্ত্রে বিপ্লবের শ্রেণীতাৎপর্য নির্ণয়ের ব্যাপারে যে সব শ্রেণীকে বিপ্লবের হোতা হিসাবে ধরা হতো তাতে ছাত্রদের কোন শ্রেণীগত ভূমিকা স্বীকৃত হতো না। শ্রমিক, কৃষক মধ্যবিত্ত এসব শ্রেণীদেরকেই বিপ্লবের বাহন হিসাবে ধরা হতো। ইদানীংকালে দেখা যাচ্ছে, শ্রমিক কৃষকের বৈপ্লবিক ভূমিকা, ছাত্রদের ভূমিকার কাছে যেন ম্লান হয়ে যাচ্ছে। অথচ ছাত্রদের শ্রেণীগত পর্যায়টা কি তাও নির্দিষ্ট করা শক্ত। সবশ্রেণী থেকে—নীচে থেকে, উপর থেকে—যে একটা সম্প্রদায় বিপুল প্রবাহে এসে একটা মহাকলরোল সৃষ্টি করছে তা হলো এই ছাত্র-সমাজ। এদের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি সমস্ত পুরানো রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মধারাকেই যেন তালগোল পাকিয়ে দিচ্ছে। এই ছাত্র অভ্যুত্থানের একটা সামগ্রিক বিচার করার প্রয়োজন হয়তো দেখা দিয়েছে। দেশে দেশে এই ছাত্র অভ্যুত্থানের কোথায় মিল আছে, আর কোথায় অমিল-জাত বৈশিষ্ট্য আছে—এবং কেন, এসব আজ বিচার করার দরকার হয়েছে।

বলা বাহুল্য এই ছাত্র বিদ্রোহ কোন স্পষ্ট মতবাদ সৃষ্টি করতে পারে নি। এদের বক্তব্য কী, এরা কী চায়, লক্ষ্য কী এসব একেবারেই পরিষ্কার নয়। কম্যুনিজম, সোস্যালিজম, গণতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, গান্ধীবাদ, নেহরুবাদ—কোন প্রচলিত চিন্তাধারার মধ্যেই এসব বিদ্রোহ বিক্ষোভকে আবদ্ধ করা যাচ্ছে না। হয়তো এর দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, এসব মতবাদ আজকের যুগের সমস্যাকে যথাযথ বিশ্লেষণ ও সুনির্দিষ্ট নেতৃত্ব দিতে অক্ষম। হয় এসব মতবাদকে আরো প্রসারিত (এমন কি সংশোধিত!) করে যাবতীয় ঘটনাবলীকে একটা সুষ্ঠু ধারায় প্রবাহিত করতে হবে, নয়তো কোন নতুন মতবাদের সৃষ্টি হতে হবে। আবার, কোন মতবাদেরই প্রয়োজন নেই—এমন ধরণের চিন্তাও কোন কোন মহলে দেখা যায়। Pragmatism-এর পথে দৈনন্দিন কাজে ঠেকা দিয়ে দিয়ে চললেও চলবে বলে কিছু লোকের ধারণা। আবার মতবাদের যুগ শেষ হয়ে গেল বলেও কেউ কেউ ঘোষণা করছেন! অবশ্য এজাতীয় ঘোষণার পিছনে কতটা বৈজ্ঞানিক যুক্তির সংগততা আছে, আর কতটা সুবিধাবাদের অনুপ্রবেশ সেটাও বিচার্য বিষয়।

মাত্র বিক্ষোভের বা বিদ্রোহের সঙ্গে মতবাদ বা দর্শনের সম্পর্ক কি এমন প্রশ্ন কেউ কেউ করতে পারেন, কেন না প্রচলিত মতবাদগুলির বিরুদ্ধে স্পষ্ট করে বিদ্রোহ করতে গিয়ে তো এই ছাত্র বিদ্রোহের জন্ম হয় নি। তা হয় নি বটে, এমন কি মতবাদগুলির প্রতি উদাসীনতাও ছাত্রদের মধ্যে দেখা যায় এবং নিজেরাও কোন নতুন মতবাদ সৃষ্টি করতে আগ্রহী নয়—এও দেখা যায়। কিন্তু পরোক্ষে এ সম্বন্ধ অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রচলিত মতবাদগুলিকে এরা চ্যালেঞ্জ করছে না বটে, তবু একথা তো ঠিক, এই অগ্রাহ্য করার ইন্ধন জুটছে—প্ররোচনা মিলছে—কোন প্রকার আদর্শগত বন্ধনের অভাব থেকেই তো? যুবশক্তি ও ছাত্রশক্তিকে প্রচলিত আদর্শগুলি আকৃষ্ট করতে পারছে না। অথচ অতীতে প্রতিটি যুগে যা নওজোয়ানদের ধরে রাখতো, কোন না কোন ধর্ম, বা কোন আদর্শ, বা কোন মতবাদ। সব যুবক-যুবতীরাই যে আদর্শনিষ্ঠ ছিল তা নয়, অনেকেই আদর্শকে গ্রহণ করার শক্তি রাখতো না, কিন্তু আদর্শ বা ধর্ম তাদেরকে সংযত রাখতে সাহায্য করতো, এবং নিজেরা আদর্শ চরিত্র না হলেও, আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাটা তাদের কম ছিল না, যার জন্য চোখের পর্দায় লজ্জা থাকতো এবং আদর্শবানদের শ্রদ্ধা করতো। আজ সেই শ্রদ্ধাটি নেই, আদর্শের প্রতিও শ্রদ্ধা নেই। আর মতাদর্শীদের প্রতি আছে অবজ্ঞা অথবা একটু করুণা।

এর অর্থ এই নয় যে, আজকের যুবকদের কোনই চক্ষুলজ্জা নেই, মান-অপমান জ্ঞান নেই, শালীনতাবোধ নেই। বস্তুত জীবন যতদিন আছে, ততদিন এগুলি মনুষ্যচরিত্রে থাকবেই থাকবে। যেটা নেই সেটা হলো বিশেষ কোনও সংগঠিত মতবাদ ও তার পথিকদের প্রতি শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধাকে হারিয়ে ফেলে ছেলে-মেয়েরা যে সুখী হয়েছে, ধর্ম ও নীতি-বোধের বালাই থেকে মুক্ত হয়ে সুখী হয়েছে, একথা ঠিক নয়। বস্তুত আজকের যুব-সমাজ বিদ্রোহী বটে, কিন্তু আত্ম-তৃপ্ত নয়, সুখী নয়। বরং কাউকেই এবং কিছুকেই এমন কি শেষ পর্যন্ত নিজেকেও শ্রদ্ধা করতে না পেরে, একটা ভিন্ন জাতের অসন্তোষ তাদের জীবনকে ও মনোজগৎকে অস্থির ও অসুখী করে তুলেছে। জীবনের মূল্যবোধ ফুরিয়ে গিয়ে জীবনকেই অর্থহীন করে তুলেছে, ফলে দেখা দিচ্ছে একটা অন্ধ ক্রোধ ও অন্ধ সংগ্রাম-চেতনা। বস্তুত আমাদের ছেলে-মেয়েরা আজ সুখী নয়। তাদের সুখী বা সন্তুষ্ট করতে পারছি না বলেই, এত রকমের উৎপাত সৃষ্টি হচ্ছে।

জীবনকে ভোগ করাই জীবনের শেষ কথা—এই তত্ত্ব নওজোয়ানদের সন্তুষ্ট করতে পারছে কি? তাহলে আমেরিকাতে কোন বিক্ষোভের কারণ থাকতো না। ঈশ্বর নেই, ধর্মের ধোকা চলবে না, ন্যায়নীতির ফাঁকি মানবো না, কম্যুনিজমের ঈশ্বর ন্যাংটা প্রমাণিত হয়েছে, গান্ধীবাদ একটা ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাস মাত্র ইত্যাদি ইত্যাদি "ঐতিহাসিক রায়" দিয়ে সব ছেলে-মেয়েরা যদি একমাত্র সুখের সন্ধানে লেগে যায়, তবু দেখা যায় সুখ স্বর্ণমৃগের মত কেবলই ভোলাচ্ছে বটে, কিন্তু তাতেও সুখ নেই। Not by bread alone—কেবল রুটিতেই মানুষের প্রাণ ভরে না, পেট ভরলেও প্রাণ ভরে না—এ আওয়াজ উঠেছে, কিন্তু এদিকে ঈশ্বর বর্জিত হয়েছে, আদর্শ বর্জিত হয়েছে, তবে প্রাণ ভরি কী দিয়ে? একটু circus দিয়ে? Bread and a little circus? দেখা যায় circus বা চিত্ত-বিনোদনের জন্য কিছু নাচগান—এতেও প্রাণ ভরে না। শূন্য প্রাণের অতৃপ্তি তখন পিপে পিপে মদ আর নানা ধরণের নেশা দিয়ে ভরবার আগ্রহ সৃষ্টি করে। সভ্যতা কেবলই নিত্য নতুন ভোগ্যবস্তু সৃষ্টি করছে না, সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি করছে ক্রম-বর্ধমান একঘেয়েমী বা boredom ও অর্থহীনতা।

আবার প্রশ্ন উঠবে, এসবের সঙ্গে ছাত্র বিক্ষোভের সম্বন্ধ কি? সম্বন্ধ অত্যন্ত স্পষ্ট, এমন কি অঙ্গাঙ্গিভূত। ছেলেদের শান্ত রাখার জন্য, সন্তুষ্ট রাখার জন্য যখন আমরা, অভিভাবকেরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারেরা, হোম ডিপার্ট-মেন্টের কর্মকর্তারা বলি, ছেলেদের জন্য আরো মাঠ দাও, আরো খেলা দাও, আরো সার্কাস দাও, আরো শিক্ষক দাও, আরো পুঁথিপত্র দাও, আরো telivision set দাও; আরও স্কলার-শিপ দাও, আরও সুবিধা দাও, টিফিন দাও—তখন একটা জিনিষ সে হলো 'একটা আদর্শ দাও'—এ দাবির অভাবটা। যদি আদর্শ না দিতে পারি, তবে বাকী সবগুলিতেও ছাত্রদের প্রাণ ভরবে না। আগের যুগের ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় উপরোক্ত খেলাধুলো, নাচগান, স্ফূর্তি, বইপত্র, শিক্ষক, শিক্ষাগার ইত্যাদি কি খুব কম পাচ্ছে আজকের দিনের শিক্ষার্থীরা? হিসাব না-ই বা দিতে গেলাম। তবু ছাত্রদের মনে এত ক্ষোভ, এত বিদ্রোহ, এত তাচ্ছিল্য, এত অশ্রদ্ধা এলো কোথা থেকে? সেই একটি অভাব থেকে—আদর্শের অভাব থেকে। The idea, what and where is that idea? Idealism বা Ideology নাই বা বললাম—কিন্তু অন্তত একটা আইডিয়া তো চাই—কেন বাঁচবো, কেন কষ্ট করবো, কেন মেহনৎ করবো, কীসের জন্য? সবই যদি বৃথা, সবই যদি দুদিনের খেলা মাত্র, সবই যদি অর্থহীন, তবে এত আবেগ, এত আশা-আকাঙ্ক্ষা কিসের জন্য?

শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থা নিয়েই ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন। শিক্ষা সংকট ও শিক্ষা-ব্যবস্থায় সংকট দেখা দিয়েছে। যুগ-সন্ধিক্ষণে অথবা যুগ পরিবর্তনের সময়ে অচলায়তন সমাজের সবচেয়ে যে-অংশটিতে প্রথম আঘাত ও প্রথম কম্পন লাগে সে হলো তার শিক্ষাক্ষেত্র। শিক্ষা-ক্ষেত্রে সংকট মানেই সভ্যতার সংকট। সভ্যতার সংকট শেষ পর্যন্ত আদর্শের সংকট—সে সংকট যা থেকেই সুরু হোক না কেন।

এই শিক্ষার সঙ্গে সভ্যতার সম্পর্কটা যদি খেয়াল থাকে, তবে বুঝতে কঠিন হয় না, আজ যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে, আসলে সেটা বাচ্চাদের ব্যাপার নয়, আসলে সেটা সভ্যতারই মর্মবেদনা। অল্পবয়স্কদের, শিশু-কিশোর-যুবকদের বয়সের দোষ এটা নয়, এটা যৌবনেরও সমস্যা নয়, এটা গোটা সভ্যতারই দোষ ও সমস্যা। যদি আমরা মনে করি যে, আমরা যারা বয়স্ক, তাদের এটা সমস্যা নয়, তবে নিজেদের মনকে ফাঁকি দেবার হাস্যকর চেষ্টা তাতে হয়। যারা বয়স্ক, যারা বৃদ্ধ তাদের বাকী দিনকটা কোনরকমে কেটে যেতে পারে—একটা মন্ত্রতন্ত্র নিয়ে পরা-জিত জীবনের গ্লানি ও মিথ্যাগুলিকে ঢেকে রাখার চেষ্টা চলতে পারে তাদের—কিন্তু কিশোর আর নওজোয়ানেরা তাতে ভুলবে কেন? ইদানীংকালে নানা ধরণের মঠ আর আশ্রম আর গুরুর সংখ্যা খুবই বেড়ে গেছে দেখা যায়, "এ সপ্তাহ কেমন যাবে" বলে রাশি-ফলের কলাম প্রতিটি কাগজেই বেশ ঠাঁই পায়, আর ভবিষ্যৎ-বক্তা বা গণৎকারের শ্রেণী ভি-আই-পি-আদর পেয়ে থাকে রাজধানীতেও। কিন্তু এসব কাদের জন্য? গতায়ু বয়স্ক ও বৃদ্ধদের জন্যই তো? অথচ এরা কি নতুন সভ্যতার বাহন, না ভবিষ্যৎ? সমাজের এই শ্রেণীর কর্ণ-ধারেরা যদি আজ যুবকদের আদর্শদীপ্ত করতে চান, তবে কি সেটা ঠাট্টার মত শোনায় না? এতে কি অশ্রদ্ধা বাড়ে না?

বি-টি পাশ না করলে আজকে কেউ আর শিক্ষক বা শিক্ষিকা হতে পারেন না। কলেজে কলেজে ডক্টরেট অধ্যাপকের ছড়াছড়ি, অভিভাবকেরা সন্তানদের জন্য প্রাইভেট টিউটার রাখেন, বাচ্চাদের অভিভাবকেরা স্কুলে পৌঁছে দেন, ছুটির পরে নিয়ে আসেন, মাতা-পিতার শিক্ষার্থী সন্তানদের জন্য উদ্বেগের অন্ত নেই—এতৎ সত্ত্বেও ছেলে-মেয়েদের মনো-যোগ সৃষ্টি করতে পারা যাচ্ছে না।

রাজনৈতিক দলগুলির পাল্লায় যে সব ছেলে-মেয়েরা আগের দিনে পড়তো, তাদের সাংসারিক দিক থেকে যত লোক-সানই হোক, সেই ছেলে-মেয়েগুলির চরিত্র অন্তত সাচ্চা হয়ে যেতো, নষ্ট হয়ে যাবার ভয় থাকতো না অভিভাবকদেরও। সেদিন বরং পুলিশই চেষ্টা করতো বিপ্লবী দলের ছেলে-মেয়েদের চরিত্র কিসে নষ্ট করা যায় তার জন্য। যে ছেলে সাধারণত লেখাপড়াতে মনোযোগী ছিল না, সেও যদি রাজনৈতিক দলের সংস্পর্শে আসতো, তবে তারও নতুন করে পড়া-শোনার আগ্রহ হতো—দেশ, সমাজ, ইতিহাস, দর্শন তাকে বুঝতে হতো। আজকের রাজনৈতিক দলগুলি আদর্শশূন্য হয়ে যাবার ফলে, তাদের সংস্পর্শে এসে ছেলেরা আর আদর্শবান হবার প্রেরণা পায় না। বরং দেখা যায়, প্রথমটায় একটা আদর্শবোধের প্রেরণায় দলে ঢোকে বটে, কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই বীতশ্রদ্ধ বা frustrated হয়ে পড়ে, এবং হয় শেষ পর্যন্ত দল ছেড়ে দেয়, নয়তো সুবিধাবাদী হয়, নয়তো দিনগত পাপক্ষয় করতে থাকে। তথা-কথিত গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে ক্যারিয়ার সৃষ্টি করার মোহ পেয়ে বসে—তাতে কিছুকাল দম থাকে। অতএব Source of inspiration আজ দলগুলিতেও সামান্যই আছে। এখানেও আদর্শের অভাব—বইপত্রের অভাব নয়, ইস্তা-হারেরও অভাব নয়। বাজেয়াপ্ত পুস্তক—রাজনৈতিক পুস্তক আজ আর বিশেষ কিছু নেই, সরকারের এখন কোন পুস্তকই বাজেয়াপ্ত করার দরকার করে না, কেন না বাজেয়াপ্ত করার দরকার নেই, কেউ পড়ে না। মার্ক্স এঙ্গেলসের বই এখন রাস্তায় রাস্তায় দু আনা চার আনায়ও বিক্রি হয় না। অথচ একদিন রাজনৈতিক পুস্তক পড়ার জন্য কত লুকোচুরিই না করতে হতো, পুলিশের হাতে কত ঠেঙানি না খেতে হতো।

যেদিন বিজ্ঞানাগার ছিল না, সেদিন এদেশে জগদীশচন্দ্র, সি-ভি-রমণ, রামানু-জম, পি-সি রায়েরা বিজ্ঞানসাধনা করে দিকপাল হতে পেরেছিলেন। যেদিন মাতৃভাষার কোন স্থান ছিল না, সেদিন রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদনেরা সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন। মেঘনাদ, সত্যেন্দ্রনাথেরা মস্ত মস্ত ল্যাবরেটরী পান নি। আজ দেশে এত বিজ্ঞানাগার, এত সাহিত্যসভা—আজকে একটাও বৈজ্ঞানিক বা সাহিত্যিক বের হয় না কেন? সে কি সুযোগ ও সুবিধা বা সমর্থনের অভাবে? সেকি মেধাবী প্রতিভার অভাবে? তা তো নয়। আজ দেশ তার পথ হারিয়ে ফেলেছে—আদর্শহীন ও লক্ষ্যহীন হয়ে গেছে।

আজ কি দেশে নেতার অভাব? এতো নেতা যে সবাইকে ঠাঁই দেওয়া যাচ্ছে না। ঠাঁই হচ্ছে না বলেই সংযুক্ত ফ্রন্ট করা চলছে না বামপন্থী-দের, কংগ্রেস থেকেও অনবরত ভাঙন হচ্ছে যেহেতু সেখানেও এতো নেতার ঠাঁই হচ্ছে না। অথচ দেশ আজ নেতৃত্বহীন—কোথাও একটা নেতা চোখে পড়ে না। মতবাদের অভাব নেই, অথচ সব যেন আলুনী। Salt has lost its salinity! এ লবণের স্বাদ নেই, নোনা নেই—যত নুনই দিই তা মিষ্টি হয় না। ছাত্র বিক্ষোভে, খাদ্য-আন্দোলনে শতে শতে লোক গুলীতে লাঠিতে মারা যায়, প্রতিদিন খবরের কাগজে দেখি কোথাও না কোথাও গুলী চলেছে, অথচ নেতৃত্ব নেই। অন্ধ সংগ্রাম চলেছে! নেতারা কোথাও সশরীরে ঝাঁপিয়ে পড়ে না। খবরের কাগজে বিবৃতি দিয়েই নেতৃত্বের দায় খালাস হয়। Revolution by proxy চলেছে—যেমন ছেলেদের attendence by proxy চলে। বিপ্লব চলেছে—অথচ কোথাও বিপ্লববাদী নেই। এই নামগোত্রহীন anonymous

বিপ্লবের জন্য কেউ দায়ী নয়। প্রতিপক্ষ whipping boy হিসাবে যাদের আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, ওরাই সব করছে বলে, তারা উত্তরে বলে তারা কিছুই করছে না, মিথ্যা করে তাদের জেলে পুরে রাখে!! কে কিসের জন্য দায়ী একথা মুখ ফুটে কেউ কিছু স্বীকার করতে রাজী নয়। ফলে যে ছেলের দলকে দেখা গেল এইমাত্র পুলিশের সংগে পেটাপিটি করছে, পরমুহূর্তে তাদের আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না, হয়তো দেখা যাবে সিনেমার টিকিট কিনতে লম্বা কিউ করে দাঁড়িয়ে ক্রিকেটের গল্প জুড়ে বসেছে। যারা এক্ষুণি বিপ্লব চাই বলে হুংকার দিচ্ছে, দেখা যায় তারা জীবনবীমা আর ব্যাংক ব্যালান্স রক্ষা করতেও কম উদ্বিগ্ন নয়! একূল ওকূল দুই কূল রক্ষা করেই চলা যাচ্ছে।

এই হচ্ছে বাতাবরণ বা environment, এর মধ্যে ঘুষ, জোচ্চুরি, দুর্নীতি ইত্যাদির প্রবাহ বয়ে চলেছে। সবটা মিলিয়ে কী বিচিত্র আবহাওয়াই না সৃষ্টি হয়েছে।

কিশোর-কিশোরী ছাত্র-ছাত্রী যুবক-যুবতী এরই মধ্যে "মানুষ" হচ্ছে তো? স্বাধীনতার পরে বেশ কয়েক বছর ছাত্র-ছাত্রীদের চাকুরী-বাকুরী পাবার একটা মরসুমী সুযোগ মিলেছিল। তারা রাজনীতি ও আদর্শকে এড়িয়ে ক্যারিয়ার সৃষ্টিতে মেতে গিয়েছিল। এখন সে সুযোগ বন্ধ হয়ে এসেছে, আর কারও জন্য দুয়ার খোলা নেই। এদিকে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের দল এগিয়ে আসছে। তাদের জন্য কোন স্থান নেই—ভবিষ্যৎ—স্বর্ণমৃগের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আর সমাজের চতুর্দিকে ব্যভিচার—অন্যায় আর দুর্নীতি। এই থেকে আজ চারিদিকে অসন্তোষ ফেটে পড়ছে। অথচ নতুন কোন আদর্শ সৃষ্টি হচ্ছে না। পুরানো আদর্শগুলি আত্মঘাতী সংগ্রামে বিধ্বস্ত। চারিদিকে অশ্রদ্ধা ছড়িয়ে পড়ছে। দেখা দিয়েছে এক অন্ধ বিক্ষোভ আর অন্ধ সংগ্রাম। এ অন্ধ সংগ্রামে চোখ দিবে কে, চোখ ফুটবে কিসে?

মামুলি শিক্ষা সংকট নয়। এটা সভ্যতার
এটা মামুলি ছাত্র বিক্ষোভ নয়,
সংকট। কেন মিছিমিছি ছাত্রদের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে আমরা বিজ্ঞ সাজতে চাই?

"বিন্দু বিন্দু জল একত্রে সমুদ্র, বালুকণারা একত্রে মরুভূমি সৃষ্টি করে। সেইরূপ মানুষের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাসমূহ একত্রে পরম শক্তিশালী শত্রু—টিউবারক্যুলোসিস্ দমনে এক শক্তিশালী সংস্থা গঠন করে। এটিই টি. বি. সীল বিক্রয় অভিযানের ইতিহাস ও নীতি।"

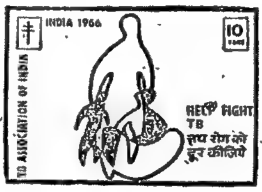

আপনার রাজ্য টি. বি. এসোসিয়েশনের দরিদ্র টি. বি. রোগীদের সাহায্যার্থে অর্থের প্রয়োজন। তাহাদের অনেক অভাব। তাহাদের গৃহেও তাহাদের যত্ন নেবার কেউ নেই। টি. বি. সীল কিনে আপনার যথাসাধ্য দান করুন। একটি টি. বি. সীলের দাম মাত্র ১০ পয়সা।

কলিকাতা ১৪, পোস্ট এণ্টালীর, ২১, ডাঃ সুন্দরীমোহন এভেন্যুতে বেঙ্গল টিউবারক্যুলোসিস্ এসোসিয়েশন এবং উহার বিভিন্ন অংশ হইতে সীল পাওয়া যাইবে।

ডিজাইন প্রয়োজন ঃ

১৮শ টি. বি. সীল বিক্রয় অভিযানের জন্য টি. বি. সীলের সাদাসিধা ও আকর্ষণীয় ডিজাইন আহ্বান করা হইতেছে। সর্বশ্রেষ্ঠ ডিজাইনের জন্য ৫০০৲ টাকার একটি পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন, সেক্রেটারী জেনারেল, টিউবারক্যুলোসিস এসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়া, ৩, রেডক্রশ রোড, নয়া দিল্লী—১।

১৭শ টি. বি. সীল বিক্রয় অভিযান
(নয়া দিল্লীর টি, বি, এসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়া কর্তৃক অনুমোদিত)।

কলিকাতাস্থ বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক স্থান প্রদত্ত।

No : TSC/20—S/66.

সৈয়দ মোস্তাফা সিরাজ

শয়তানের চাকা

গাঙ পেরোলেই শহর। এখানে দূরের পথ এসে হামাগুড়ি দিতে দিতে গাঙের বালিতে নেমে গেছে। হাত বাড়িয়ে জল ছুঁয়েছে। আশেপাশে কাশ-ঝোপ, করমচা, আকন্দগাছ সন্ন্যাসীর মত কৌপীন-পরা—প্রতি বর্ষার তোড়ে ওদের সংসারের ধ্বস ছেড়েছে ক্রমান্বয়ে। এখন লম্বা চিরোলচিরোল হলুদ বা ধূসর পা বাড়িয়ে দিয়েছে নীচে। খাদের দিকে। ঢালু পথটারও ওই দশা। ইটের টুকরো পাথরকুচি বেরিয়ে পড়েছে উদোম হয়ে। পিচের আবরণ ধুয়ে ভেসে গেছে কবে। তার সামনেই শীতের ঠান্ডা আর শান্ত জল। কিনারে পারাপারের খেয়া। তাই বাবুরালি ওরফে বাবরালির বড় কষ্ট হয় রিকশো টেনেটুনে আনতে। ছেড়ে দিলে তো অকাল গঙ্গা বিলক্ষণ; কিন্তু সওয়ারী রুগ্ন। হয়ত তাকেই পাঁজা-কোলা করে তুলে নৌকোর পাটাতনে রাখতে হবে। বাড়তি পয়সা দিক বা না দিক, মানুষোচিত অল্প খাটুনি—বাবুরালি আনন্দই পায়। হৃদয়ের কোনখানে ঠান্ডা-লাগা চিরকালের ঘা, সেখানটিতে বেশ জুত পায়।

অন্য অন্য সওয়ারীর বেলা অন্যরকম। ওই উঁচুতে ঘাটবাবুর আটচালার পাশেই রিকশোর 'খেল খতম।' বাবুরালিরই বুলি এটাঃ খেল খতম দাদা, আসুন। তার মানে, বেশ এতক্ষণ ক'মাইল পথ তো খেল দেখলেন—আসমানের খেল, জমিনের খেল; পথেও রকমারি রঙ-বেরঙের খেল কম্‌তি নেই। তার উপর হাড্ডিসার গতরে আর শামুকখোল পাখির মত দুটি ফাটাফুটি ছাইরঙা পায়ের ওঠাপড়া কসরত কম দেখা হল না দাদাদের। এবার আসুন।...তারপর নিষ্ঠাবান যাদুকরের মত রিকশোর ছাউনি ঝপ্‌ করে নামিয়ে নিজেই সওয়ারী কিছুক্ষণ।—এ কির্‌পাদাদা, মেহেরবানী করে জেরাসে চায় পিলায়ে দে...কৃপাময় বাবুরালিকে ভালবাসে। রানীরঘাট লাইনে এই প্যাডলারটি তার সমসাময়িক। রানীরঘাট যখন জন্মেছিল, তখন থেকেই যে যার নিজের লাইনে রয়েছে। আজ তো রানীরঘাট হাটের মাঝে শোভা মেলেছে। ঝলকে উঠছে সাতরঙা বসন-ভূষণের ছটা বেলায় বেলায়। কাছে-আসা দূরের পথে পিচ পড়েছে। অজস্র বাস-লরী রিকশোয় আড্ডা গুলজার। রানীর-ঘাটের সুখ কানায় কানায় উপচে পড়ছে।

সেই সুখেই সুখী বাবুরালি প্যাডলার শহরের সওয়ারী এপারের স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে, ফের স্টেশনের নতুন সওয়ারী নিয়ে কাঁহা কাঁহা মুল্লুক পাড়ি দিতে পারে। ওদিকে ন্যাশনাল হাইওয়ের পথে সাগরদীঘি, এদিকে জেলা বোর্ডের পুরনো লজঝড়্‌ পথে কান্দী—আরও বিশ-ত্রিশ মাইল যেতে বললেও অক্লেশে উড়ে যাবে। যেতে যত কষ্টই হোক, ফেরার পথে চেঁচিয়ে বলবে—চলো রানীরঘাট, রানীর ঘা-আ-আ-ট! রানীরঘাটে মনটি বাঁধা পড়ে আছে। তাই যেন গানের সুরে ডাকঃ রানীর ঘা-আ-আ-ট্‌! ধুয়োতে ফেরা ঘূর্ণিপাক তীব্রতর।

-তেমনি এক ফেরার পথেই পেয়ে গিয়ে-ছিল এই সওয়ারীকে। পাশে বটগাছ। তার ছায়ার বাইরে শীতের রোদপোহানো দুটি মেয়েমানুষ। একজন চুলে শনের পাক-ধরা, তোবাড়নো গাল, দড়ি-দড়ি মাস, —অন্যজন মুখের রঙ ফিকে হলুদ, বসা কালো কালো চোখ, লতানো রুক্ষ চুল, খড়ি-খড়ি মিহি হাতে দুগাছি লাল প্লাস্টিকের বালা। কিন্তু বাবুরালির বুঝতে দেরি হয় নি, অকালে ব্যাধির ক্ষয়

কী সর্বনাশ লিখে দেয় টাটকা গতরে। এই মেয়ে হতে পারত গমের শীষের মত ডাঁটালো, অল্পেতে অস্থির, মুখে কথার খৈ ফোটে ; তা নয় তো, দেখ, সব শুকিয়ে কাঠফাটা ঘোর খরায়। সব চুপচাপ। যেন চিতার চন্দন কাঠখানি আছে পথের পাশে।

থেমেছিল বাবুরালি। —এঃ হে হে, বিমারিতে ঘায়েল করেছে, বাসের ভিড়ে বেজায় পেরেসানী হবে মা। আসুন, লিয়ে যাই।

মেঘ না চাইতেই বৃষ্টির ফোঁটা যেন। ধড়বড় করে উঠেছে শণচুলো বুড়িমানুষ। হঠাৎ পেয়ে যাবার আনন্দ তো বটেই ; শহর থেকে দশ-বারো মাইল দূরে এমন উড়ন্ত সিংহাসন আচমকা মিলে যাওয়া। —অ মা সুরধুনী, কষ্ট করে গতরখান তোল এট্টু। চাপলেই সোয়াস্তি পাবি— কতক্ষণ থেকে ঠায় অপিক্ষেয় বসে আছি। শুকপোড়া বাসগুলার গিদেরে পা পড়ে না মাটিতে।...এই বলে বাবুরালির দিকে চেয়ে একটুখানি হাসি। —বাবা আমার ভগবানের দূত। ইচ্ছেমাত্তর এসে পড়েছে!

বাবুরালিও হাসছিল। —আপনাদের মরজি, আর ওপরওলার দোওয়া মাজান। এ লাইনে জিন্দেগী ফুরিয়ে দিলাম চাক্কা ঠেলে।

—অই, সুরি! অ সুরধুনী, শীগগির কর বাছা, বেলা বাড়ছে ইদিকে। বুড়ি হাত ধরে মেয়েকে ওঠানোর চেষ্টায়। মেয়ের যেন ভ্রূক্ষেপ নেই। কোনদিকে চোখ বোঝা যায় না। ঈশানকোণে চিনি-কলের চোঙ দেখে, না দূরের ঐ শঙ্খচিল—নাকি ফাঁকা মাঠে কয়েকটা অর্জুন গাছের সারি, উপচে-পড়া হলুদ ফসলের উপর তাদের ছায়ার মোটা কালো দাগগুলো।

শেষে অস্ফুটকণ্ঠে কী বলেছে। যাবে, না যাবে না, এইরকম অস্পষ্ট কী একটা। বুড়ির টানাহেঁচড়া সমানে চলছিল।—অই, ও কি কথা মেয়ের! সেই সাত সকালে জাড়ে কাঁপতে কাঁপতে গেরাম থেকে বেরিয়েছি। পাকা সড়কে আসতে জলখাবার বেলা কাবার। যাবিই বা কখন? উঁদিকে হাসপাতালের দুয়োরে আবার তালাকুলুপ না মেরে দেয়। ওঠ্ মা, ওঠ্!

সুরধুনীর রুগ্ন পাণ্ডুর মুখে অনিচ্ছার ছায়া দুলছে। চোখের তারা-দুটো নীলাভ—ধূসর পর্দার ভিতর থেকে আবছায়ার মত পৃথিবীকে যেন দেখছে। সংশয়ের কাঁপন ভেঙে ভেঙে জলের ফোঁটা গুটিকয়। এক কোণে তারা লুকিয়ে আছে—সহজে দেখতে পাওয়া কঠিন। তবু, বাবুরালি দেখছিল। দেখেই বলল, —কোন তকলিফ হবে না মা। ওখানে বড় বড় ডাক্তারবাবুরা আছেন। বেমারী তেনাদের গায়ের হাওয়া লাগলেই পালাবে। তখন শহরে বায়স্কোপের বাজী দেখে হাসতে হাসতে গাঙ পেরোও, ইচ্ছে হলে এই গোনাগার বান্দা বাবুরালির চাক্কায় চাপো, নয়তো ব্রেজোবাবুর ভ্যানগাড়িতে খুশিতে ঘরে ফেরো...

বুড়িও হাসিমুখে মাথা নেড়ে সায় দিচ্ছে। —চাই কি, তখন বিনোটিতে শ্যামচাঁদের মেলা দেখিয়েই নিয়ে আসব। কাল পুণ্নিমা গেল, আরেক পুণ্নিমা অব্দি ধুমধাম লেগে থাকবে। বাঘ-সিঙ্গি হাতী-ঘোড়ার সার্কেস, মেমসায়েব নাচবে, কত কাণ্ড সেখানে রে সুরি!

সুরির যেন কান নেই। কোনরকমে এতদূর নিয়ে আসা হয়েছে, আর এগোচ্ছে না, ও যতই লোভ দেখাও। সে তো কচি খুকীটি নয়, মোয়া দেখিয়ে কার্য-সিদ্ধি করবে!

বাবুরালি সেটা বুঝতে পারছিল। মেয়েটির সিঁথিতে সিঁদুরের চিহ্ন—অবহেলায় ঘষাঘষা হালকা ছোপ। হাস-পাতাল নিয়ে যাবে বলে বুঝি সাতসকালে চুলে চবচবে তেল মাখানো হয়েছে। খোঁপা বাঁধা হয়েছে। বেশ বোঝা যায়, নিজের হাতে চুলবাঁধার ব্যাপার নয়। বুড়ির কীর্তি। বোধ করি, সিঁদুরের দাগও পুরু ছিল—কখন যেন ইচ্ছে করে ঘষে ঘষে তুলেছে। কাপড়ের পাড়ে সেই দগদগে চিহ্ন। কিসের ক্ষোভ? সোয়ামীর উপর মান? তাই বটে। কিন্তু ও মেয়ে, তোমার সোয়ামী কোথা গো?...বলতে না পেরে বাবুরালি আমতা হাসছিল। সওয়রীর ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাতে নেই। এ লাইনের সব চাক্কাওলাই জানে, সওয়ারীর সঙ্গে বেশি গা ঘেঁষাঘেঁষি অর্থাৎ সুখ-দুঃখ বিনিময় মাত্রা ছাড়ালে ঠিকে ভাড়ারও কম পয়সা নিতে হবে শেষ অব্দি। এতখানি পথ যার সঙ্গে হৃদয়-সংযোগ ঘটেছে, সে পয়সা কমিয়ে হাতে দিলে প্রতিবাদের জোরটাও ফুরিয়ে যায়।

তবু একটা অদম্য ইচ্ছা বাবুরালিকে কাবু করল। বলেই ফেলল—'তা ওগো মাজান, তুমি বুড়োমানুষ, সঙ্গে রুগী আনলে। বরঞ্চ একজনা জোয়ান মানুষ থাকলেই ভালো হত। জামাই এল না কেন মাজান?...বলেই গা বাঁচাতে ফের মন্তব্য করল—তা তিনিই বা আসেন কী করে? গেরামের মানুষ, এখন আবার মাঠঘাটে ফসল উঠছে। বাবুরালি জোরে হাসতে লাগল। —বুঝি বৈকি মাজান, আমিও তো তোমার গে একসময় গেরামে ছিলাম। ক্ষেত ভি ছিল, লেড়কাবালা জরু...

যেন কট্ করে কামড়ের শব্দ ভিতরে—থামল বাবুরালি। —বহুত দের হয়ে যাচ্ছে, জলদি করো মা।

বুড়ি চেঁচিয়ে উঠল এতক্ষণে। —ন্যাকামি করবার জায়গা পেলি নে সুরি! দোব পটাপট চড় কষে! এখনও হুজ্জতী তোর?...তারপর আচমকা কান্না হাউমাউ করে। —কী পাপে তোকে গরভে ধরেছিলাম—আমার সারাটা কাল। যন্তণার কুলকিনার নাই। হাড়মাস জ্বালিয়ে কালি করে দিলি হারামজাদী! অই—অই জেদই তোর সব্বনাশ কল্লে, সোনার গতরে বেয়াধি ধরল, ফের সেই জেদ এখনও... নে, ওঠ! হাসপাতালে তোকে সঁপে দিয়ে তবে আমার ছুটি...

সুরিও তেমনি কেঁদে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে। আমি যাবো না, যাবো না আমি! গলা টিপে মেরে ফেলো, বিষ এনে দাও, খাই। আমি ওখানে থাকতে পারবো না। বাবুরালিকে সাক্ষী মানল বুড়ি। আঁচলের খুঁট থেকে একটা কাগজ বের করে বল্ল—এই দেখ বাবা, চিনাথ ডাক্তোর সব নেকে দিয়েছে। বলেছে—হাসপাতালে ওটা দেখালেই চোখ বুজে ভর্তি করে নেবে। কোন কষ্ট হবে না। বলো দিকি বাবা, হাসপাতালে কি মানুষ মরতে যায়, না বাঁচতে যায়? বলো, তুমিই বলো?

কী জবাব দেবে বাবুরালি? শহরের হাসপাতালে কেউ যায় মরতে, কেউ যায় বাঁচতে। অনেক দেখা হয়ে গেছে তার। এমনি রুগী অনেক গেছে সওয়ারী হয়ে। তারা কতজন ফিরেছে, কতজন ফেরে নি—সে খবর তো সে জানে না। বাঁচার আশা সকলেরই থাকে। বাঁচার কথাই ভাবতে হয়। বাবুরালি বলেছে—বেঁচেবাত্তে ফিরে এসো মাণিক, আমার চাক্কা হামেশা তৈয়ার রইল। সেই চাক্কা শহরফেরা নীরোগ স্বাস্থ্যকে ঘরে পেঁছে দিতে গানের সুরে বাজে। চাক্কার ঘুরনপাকে কত মরণ-বাঁচনের সমাচার, পুছ করে দেখ। চাক্কা সব বাত বলবে ঠিকঠিক। সওয়ারী চাপলেই চাক্কার বাত শুনে সব হালহকিকত টের পায় বাবুরালি। রুগী যখন বলে—ফিরে এলে দেখা হবে, বাবুরালি চাক্কাকে পুছ করে। তারপর চুপিচুপি হাসে।

এদিকে সুরির নাকিকান্না ক্রমশ বেড়েছে। কথাও বলছে পুটপুট করে—খৈ ফোটার মত। বাবুরালি কান খাড়া করে সমঝে নিচ্ছে। উত্তরের হাওয়া আসছে শহর থেকে গাঙ পেরিয়ে। ঐ হাওয়ায় শহরের গন্ধ যেন ভাসতে ভাসতে চলেছে দূরের পথে দূরতর দিকে। রানীর-ঘাটে এতক্ষণে কত সওয়ারীর ঘরে ফেরার সময় হল। গ্রামের চাষাভূষো জোয়ানেরা গত সন্ধ্যায় আড়তে চাল বেচে বায়স্কোপ দেখেছে। তারপর শীতের রাতটা আড়তেই কাটিয়ে দিয়েছে। তাদের ফেরার পালা শুরু। সকালে শহরের বাজারে অল্প-স্বল্প কেনাকাটা চুকেবুকে গেছে কখন।

ঘাটবাবু পারানির কড়ি গুণছে এতক্ষণ। রাস্তায় তাজা ফুলকপি, দু-চারখানা শীতের কাপড়, মনোহারী জিনিসপত্তর। অবিকল দেখতে পাচ্ছে বাবুরালি। স্বাস্থ্য নিয়ে যাওয়া, স্বাস্থ্য নিয়ে ফেরা। যেতে আসতে সমান আনন্দ। আর, এখানে এই সমিস্যে!

তো কী আর করা! অবুঝ যুবো-জোয়ান মেয়েমানুষ, মুখ খড়িখড়ি, ঠোঁট আমচুর। পাঁকাটি শরীর যেন পট পট করে ভাঙছে গভীর দুঃখে। দেখে কষ্ট লাগে। তবু বুরি বাত ভাবে না বাবুরালি। চাক্কার দিকে তাকায়। বাঁচিয়ে দেবার অস্থিরতায় মনের ভিতরটা আঁকুপাঁকু করছে। ফেলে-গেলে মনে হয়, বড় গোনাহর কাজ করা হবে।

আলবাৎ হবে। মনের ভিতর মৌলবী যেন হুঁসিয়ারি দিচ্ছে। বেচারী লড়কীটাকে সোয়ামী পোঁছে না; বিমারির হাল দেখে ছেঁড়া জুতোর মত ফেলে দিয়েছে ঘর থেকে। —তো দেখ মাজান, আদমী বড় নিমকহারাম দুনিয়ায়। যবতক তোমার দৌলত আছে, জওয়ানী আছে, তবতক তুমি একদম আরসির মাফিক রৌশনদার। দুবেলা চেকনাই মুখ দেখবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। আরসি কানা, তো হারামজাদা ভি কানা!...হেঁট হয়ে শুকনো ঘাস তুলে দাঁত খুঁটছে বাবুরালি। চাক্কার দিকে চোখ। সামনে শীতের হাওয়া ঝাঁপিয়ে আসছে। বুকটা কেমন শুকনো লাগছে। কোথাও হার হয়ে যাবে, এমনি মনে হয় বারবার। আর, মাথার ভিতর—খুবই ভিতর দিকে কী কথা ঘুরপাক খায় ঐ উড়ন্ত শঙ্খচিলের মত। সেই কথা কান্নার সুরে বাজে।

এতক্ষণ ক্ষিদের বোধটা ছিল। নাই-কুণ্ডলে যেন কুত্তার কাঁইকুঁই ডাক ছিল। কখন থেমেছে। পথের পাশে সমিস্যে—সমিস্যে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল কেমন করে।

বুড়ি ইতিমধ্যে অনেক এগিয়েছে। প্রায় টেনে ধরাশায়ী করে রিকশোর পা-দানির পাশে এনে ফেলেছে মেয়েকে। সুরি চুল ছিঁড়ে একাকার।—আমাকে যেন ফিরতে না হয় আর! হে মা গঙ্গা, আমাকে তোমার কোলে টেনে নিও মা......

তাজ্জব। বাবুরালি ভেবে পেল না, এত ডর কেন, কেনই বা এত কান্নাকাটি! বেমারি হলে মানুষের হুঁস-আক্কেল থাকে না সত্যি; কিন্তু এমন তো দেখা যায় না বাবা! আদিখ্যেতার চূড়ান্ত একেবারে। সে সীটে বসে সামনে ঝুঁকে প্যাডেল ঠেলল। ঠেলতে ঠেলতে বলল—ধ্বংস শালার চাক্কা!

খানিক এগিয়ে বাবুরালি বুঝতে পারল, চাক্কা রেজায় নারাজ। বেমারি ঐ সওয়ারীর মত ঘাড় বেঁকিয়ে গোঁ ধরেছে। আরে বাস্‌রে, তুই তো বেটা হাসপাতাল-যাওয়া রুগী নোস্‌, তুই কিনা তেজী টাট্টু। লে, কদমবাজী করে রানীরঘাটে হাজিরা দে দিকি; তারপর খানিক আরাম।...এইরকম বলতে বলতে সে দম আনছিল বুকে। ঝাঁপিয়ে পড়ার মত ঝুঁকে-ঝুঁকে প্যাডেল ঠেলছিল। সামনে বুকের উপর যেন দেয়াল তোলা হয়েছে ইতিমধ্যে। গুমগুম শব্দ ওঠে কোথায়। নাকি বুকের ভিতর? কানে ঝাপটানি দেয় ঠাণ্ডা হাওয়ার থাবা। ঠোঁট শুকিয়ে আরও কাঠ। জিভ দিয়ে চাটতে গেলে থুতুও মেলে না। গলা আঠা-আঠা। হঠাৎ কোনখানে তলে তলে ফুটো করা হয়েছে, আর চুপিচুপি ধ্বসে-পড়ার সুড়-সুড়ি—তাই হঠাৎ-হঠাৎ চমকে ওঠা ভয়ে-ডরে। এমন কেন হচ্ছে রে দাদা? এই বাবুরালি প্যাডলার অনেক শীত দেখেছে। অনেক হাওয়ার সঙ্গে লড়েছে। যখন নীল আসমান বরফের চাঁই হয়ে থেকেছে, মাঠের নগ্নতায় অজস্র নেকড়ের মত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া তোলপাড় করে ফিরেছে, সূর্যকে মনে হয়েছে পটের ছবির মত মিথ্যে, রোদ হয়েছে ফলের খোসার মত রঙসর্বস্ব, নীরস ঢাকনামাত্র, তখনও বাবুরালির চাক্কা চলেছে অকুতোভয়ে। জমাট রক্ত গলে গেছে সাহসের উষ্ণতায়। চলো রানীরঘাট, রানীর ঘা-আ-আ-ট্‌!... আজ যেন তামাম জিন্দেগী ঠাণ্ডা হয়ে এল। সামনের পথ সামনেই থেকে যাচ্ছে। রানীরঘাট দূর থেকে দূরতম হয়ে রইল। বাবুরালি দম টেনে বলতে চেষ্টা করল—চলো রানীরঘাট, রানীর ঘা-আ-আ-ট্‌! অথচ চাক্কা পায়ের সঙ্গে বেইমানি করে। পাশের শিরীষ-কৃষ্ণচূড়ার ধূলিমলিন পাতা কাঁপিয়ে উজান হাওয়া তার উপর লাফ দেয়। বাবুরালি কাতরস্বরে ডাকে—মাজান, পেরেসানী হচ্ছে না তো?

বুড়ি মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে। ছাউনি তুলবার চেষ্টা করেছে, পারে নি। হাওয়ার হিম থেকে বাঁচতে আড়াল দরকার। বুড়ি বলল—ঢাকনাটা তুলে দাও বাবা।

বাবুরালি পিছন ফিরল একবার—পেরেসানী আরও বাড়বে মা, চাক্কা গড়াবে না। গায়ে রোদ লাগাও বরঞ্চ, আরাম পাবে।

বুড়ি গজগজ করল।—আরামের মুখে ঝাঁটা! এমন কষ্ট জানলে রিকশোয় চাপতাম না!

তিন মাইল এগোলে দ্বারকানদীর ব্রীজ। দুস্তর চড়াই খানিক। তবে ব্রীজে উঠলে কিছুক্ষণ আরাম। ওপারে ঢালুতে পোয়াটাক রাস্তা বেশ যাওয়া যাবে। ব্রীজটা দূরে মস্তো সাদা শকুনের মত দেখা যাচ্ছে গাছপালার ফাঁকে। সেই সময় হঠাৎ ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল বাবুরালি। বলল—মাজান!

—কী হল?

চাক্কা চেপে ধরেছে শয়তান, বুঝলে মাজান? বাবুরালি হাসবার চেষ্টা করছিল। —মাঝে মাঝে শয়তান এসে ঐ রকম বদমাইসী করে।

বুড়ি ককিয়ে উঠেছে একেবারে। —সে কি বাবা?

—জী হাঁ। তবে ডর পাবেন না। এট্টু জিরিয়ে লিই। বিড়ি খেয়ে লিই।

আসলে চেন খসেছে। নেমে এসে পিছনে ঢুকে চেন লাগিয়ে নিল বাবুরালি। তারপর বিড়ি ধরাল। নিঃশব্দে টানতে লাগল। হাওয়াও কেমন বদমাইসী করে দেখ, এখন যেন তাড়া খাবার ভয়ে সরে গেছে। অথচ চাপালেই তখন হুড়মুড় করে ছুটে আসবে।

বুড়ি বলল—এট্টু তাড়াতাড়ি করো বাবা। অনেক দেরি হয়ে গেল।

গোঁফ মুছে হাসল বাবুরালি। — সবুর, সবুর। হাসপাতাল তো পালিয়ে যাচ্ছে না। ঠিকই পোঁছে দেব, ভেবো না মাজান। কাঁচাপাকা চুল ঠিকঠাক করে নিল সে। গামছা খুলে ফের জড়াল কানমাথা ঢেকে। ফের গোঁফ মুছে প্রায় লাফ দিয়ে উঠল সীটে। হাঁকল—চলো রানীরঘাট, রানীর ঘা-আ-আ-ট্‌!

সুরির কোন সাড়া নেই। বুড়ির কোলে উবুড় হয়ে আছে। বুড়ির চোখে-মুখে অস্বস্তি। রিকশোয় চেপে বড্ড ভুল করেছে। এত দেরি হচ্ছে, তাতে ঠাণ্ডা বাতাস, মেয়ের অসুখ আবার বাড়বে নির্ঘাৎ।

ফের চেন পড়েছে দ্বিতীয়বার। বাবুরালি গজগজ করছে—শয়তানটা আজ জ্বালাবে দেখছি।

ব্রীজে আসবার আগেই আরও বারকয় এমনি শয়তানী। বার বার থামা আর গালাগালি—শালা শয়তান, তোর একদিন কি, অমার একদিন...

হাঁফাচ্ছিল বাবুরালি। নামিয়ে দেবে সওয়ারী? এত পেরেসানী আজ—এত ঠাণ্ডা হাওয়া। অথচ চারপাশে রোদের দুনিয়া, আসমানে রৌশনাই, সামনের স্বপ্নের মত রানীরঘাট বাবুরালির জন্যে অপেক্ষা করে আছে। কিন্তু জেদ বেড়ে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। এই রুগ্ন যুব-জোয়ান মেয়েটিকে হাসপাতালে না পোঁছে দিয়ে ছুটি মিলবে না। পথের মাঝে ফেলে দিলে বড্ড হার হয়ে যাবে, মনে হয়। মনে হয়, মাথার ভিতর কে চুপি চুপি বলে—বাবুরালি, খবরদার! বেইমানি করিস না। সারা জিন্দেগী সওয়ারীর

সঙ্গে বেইমানি করিস নি, আজ কেন করবি?

দশ বছর আগে রানীরঘাটের একটি ছোট্ট ঘরে এক রুগ্না আউরত প্রতিদিনই তাকে বলত—আমাকে হাসপাতালে দিয়ে এসো, খোদার কসম লাগে...! সে বলত—একবারও সময় হল না তোমার, হা খোদা! ...সময় হয় নি বাবুরালির। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সওয়ারীর পথ চেয়ে ছুটোছুটি করেছে, ঘরের সওয়ারীকে গাঙ পেরিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে দেবার ফুরসৎ পায় নি। ঘরের সওয়ারী নিয়ে যায়। অত সময় কোথা? এদিকে রোজগার বন্ধ হলে দুনিয়া অন্ধকার। বাবুরালি ঘাটে দাঁড়িয়ে হেঁকেছে—আসুন, আসুন, লিয়ে যাই...সওয়ারী না পেলেও তাদের অপেক্ষায় সময় খরচ করেছে দরাজ হাতে। অথচ ঘরে বেমারি আউরত কাঁদে। ফিরে এসে বলেছে—আর একবেলা সবুর বিবিসাব, ওবেলা ঠিকই লিয়ে যাবো। ...যাওয়া হয় নি। দড় ভয়; পাছে মোটা মজুরীর সওয়ারী হাতছাড়া হয়ে যায়।

আসলে কী একটা অভাব ছিল কোথাও। মস্ত ফাঁক ছিল যেন। মুহব্বত-মমতার অভাব? ঘরে কি ফুটো ছিল সুখের পাত্রে?...কী ছিল কে জানে। শুধু মনে হয় আলসেমি করে জীবনের ধন হেলায় মানুষ খুইয়ে ফেলে। শয়তানের চাকায় নিশির টান তাকে ঘর থেকে পথের দিকে টেনেছিল। ঘরের কথা কোনদিনই ভাবে নি। পথের উপর প্যাডেল ঘুরিয়ে দ্রুত ধেয়ে চলাই তার কাছে পরম সুখ মনে হয়েছিল।

সেদিন যেন ঠিক এমনি করে শয়তান চাকা টেনে ধরেছিল।

কতকটা গোঙিয়ে উঠল বাবুরালি—খবর্দার, খবর্দার! যেন নিজেকে হুঁসিয়ারি দিল। ব্রীজ সামনে। চড়াই এসে গেল। বাবুরালি নামল সীট থেকে। হাঁফাতে হাঁফাতে হ্যান্ডেল ধরে টানতে লাগল ভারী রিকশোটা। কষ্ট দেখে বুড়ি বলল—আমরা খানিকটা নেমে গেলে ভালো হত বাবা। কিন্তু সঙ্গে কালের বোঝা...

বাবুরালি একবার পিছু ফিরল মাত্র। চোখদুটো লাল হয়ে উঠেছে। সব রক্ত জমেছে মুখে। ঝুঁকে-ঝুঁকে টানছে। যেন যুগ যুগ ধরে বাবুরালি এমনি করে তার সওয়ারীকে নিয়ে দুস্তর চড়াই-পথে চলেছে। সব স্মৃতি ঝাপসা হয়ে আসে। সব মুখ ধূসর হয়ে যায়। পারা-ওঠা আয়নার মত প্রতিবিম্ব অস্পষ্ট। অস্পষ্ট দু-পাশের বাবলা বন, পীচের পথ, ব্রীজের সাদা রেলিঙ। স্বপ্নের মত আবছায়া ভাসে চতুর্দিকে। বাবুরালি মুখ নামিয়ে ঠোঁটটা ঘষে নিতে চেষ্টা করছিল হ্যান্ডেলে। শয়তান এবার তার পা-দুটোকেও টানছে। চাকায় জড়িয়ে থেকে হাত বাড়িয়েছে পায়ের পেশীতে।

ব্রীজের উপর কিছু সমতল চত্বর। রিকশোটা একপাশে স্থির হয়ে দাঁড়াল। বাবুরালি দাঁড়িয়ে পড়েছে। হ্যান্ডেলের উপর মাথাটা রেখেছে।

বুড়ি ডাকল—থামলে কেন বাবা?

বাবুরালি নড়ে না।

—ও বাবা!

বাবুরালি চুপ করে আছে। যেন এখনই মাথা তুলে ব্যস্ত সওয়ারীকে ধমক দেবে—সবুর, সবুর!

বুড়ি একটু উঠে হাত দিয়ে পিঠটা ঠেলে দিল তার—ওগো ছেলে, শুনছ?

সাড়া নেই দেখে ধড়মড় করে উঠল এবার। সুরধুনীও উঠে ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে। বুড়ি বাবুরালির কাঁধ ধরে ধাক্কা দিল। —ওগো রিকশোওলা, কী হল তোমার?

সেইসময় ব্রজ ড্রাইভারের ভ্যান এসে গেছে পিছনে। ব্রেক কষে দাঁড়িয়েছে। চেঁচামেচি শুনে না দাঁড়িয়ে পার নেই। —ও বাবা ডেরাইভর, আমাদের এটু তুলে নাও/দিকি, মুখপোড়া রিকশোওলা ভিরমি খেয়ে বসে রইল। উদিকে হাসপাতালের দুয়োর বন্ধ হতে চলল...

ব্রজ পানখেকো মোটা মোটা লাল দাঁতে হাসছে। —বাবুরালি না? শালা মাতালের কান্ড! নেশায় উবুড় হয়ে গেছে বেটা। কই, ওঠ শীগগির!

মা-মেয়েকে তুলে নিয়ে ভ্যানটা চলে গেল। বাবুরালির যাওয়া হল কই? শয়তান চাকার সঙ্গে তাকে চিরকালের মত বেঁধে ফেলেছে।

বেঙ্গল কেমিক্যালের

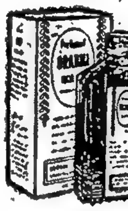

সুবাসিত ব্রাহ্মী

হেয়ার অয়েল

আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে

আয়ুর্বেদ-নির্দেশিত উপকরণে প্রস্তুত

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর • দিল্লী

ছাত্র অশান্তির কারণ ও প্রতিকার

নারায়ণ চৌধুরী

সারা ভারত জুড়ে আজ ছাত্র-বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। নানা জায়গায় ছাত্রদের নায়কতায় অশান্তি, উপদ্রব আর উচ্ছৃঙ্খলতার ঘটনা ঘটছে। প্রথমে উড়িষ্যায় ছাত্র-বিক্ষোভের প্রকাশ, তার পর একে একে উত্তরপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ রাজস্থান অন্ধ্র বিহার এবং সর্বশেষে পশ্চিমবঙ্গে এই অশান্তি ছড়িয়ে পড়েছে। কলকাতা শহর আজও ছাত্র-অশান্তির কবলে। গত দু'মাসে এখানে বহু কাণ্ড ঘটে গেছে। কবে যে এর শেষ হবে বলা মুশকিল।

ভারতীয় জনজীবনে ছাত্র-বিক্ষোভের এই আত্মপ্রকাশ খুব বেশি দিনের কথা নয়। যেরকম আকস্মিকতায় ও প্রচণ্ডতায় এ জিনিসটা হঠাৎ ফেটে পড়েছে তাতে একে একটি বিস্ফোরণের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। বাস্তবিক বিস্ফোরণের মতই এর অগ্ন্যুদ্গার ও প্রাবল্য। আর সে বিস্ফোরণ এমনই চোখ-ধাঁধানো যে, ওই অগ্ন্যুদ্গমের উৎক্ষিপ্ত ধূমরাশিতে দীর্ঘ-দিনের লালিত সংযম, শৃঙ্খলা ও নিয়ম আচ্ছন্নপ্রায়। রাষ্ট্রচালক, অধ্যাপক ও শিক্ষক সম্প্রদায়, অভিভাবক—সকলেই চিন্তিত কী করে এই ছাত্র-বিক্ষোভকে বাগ মানানো যায়। সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশপ্রধানেরা মিলিত হয়ে সমস্যার মোকাবিলার উপায় ঠাওরাচ্ছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যেরা বৈঠকে বসছেন, এমন কি অভিভাবকেরাও পেছিয়ে নেই; সভা ডেকে এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে মতামত প্রকাশ করে তাঁরা সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট।

কেন এমন হল যে ভারতের একটা বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে একই কালে ছাত্র-বিক্ষোভের মাতামাতি? কিছুদিন আগেও তো ছাত্রদের মধ্যে এমনতরো উপদ্রবের আভাস পাওয়া যায় নি? বরং ছাত্রদের ধরণধারণ দেখে এই রকমটাই মনে হয়েছিল যে, ভারতীয় ছাত্ররা বড্ড বেশি শান্ত অনুদ্বেজিত, আরাম ও স্বস্তিপ্রিয়: প্রচলিত অবস্থা-ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়ে নিরুপদ্রব জীবনযাপনেই যেন তারা সমধিক উৎসাহী। পাকিস্তানে ইন্দোনেশিয়ায় ও আরও কোনো কোনো দেশে যখন ছাত্ররা আন্দোলনের প্রচণ্ডতায় ফেটে পড়ছে, প্রতিবাদের মুখরতায় চারদিক কোলাহলময় করে তুলছে, তখনও ভারতীয় ছাত্রসম্প্রদায় দৃশ্যত নিস্তেজ, নিরুদ্যম, উদাসীন। অন্যায়-অবিচারের দৃষ্টান্তে তাদের যেন কিছু যায়-আসে না, সমাজের পুঞ্জীভূত দুর্নীতির নিরাকরণে তাদের যেন কোনো ভূমিকা নেই—এমনি একটা নিরুৎসুক, গা-ঢেলে-দেওয়া মনোভাবে ভারতীয় ছাত্রসম্প্রদায় অনেক দিন পর্যন্ত আবিষ্ট ছিল বলে মনে হয়। নতুন কালের মানুষদের তো কথাই নেই প্রবীণদের মধ্যেও কেউ কেউ তখন এই বলে আক্ষেপ প্রকাশ করতেন যে, ভারতীয় ছাত্রসম্প্রদায়ের জড়তা কি কোনো কালেই ঘুচবে না? তারা কি পরীক্ষায় পাশ-ফেলের চিন্তাকেই জীবনের সার বলে জেনেছে এবং পরীক্ষা-বৈতরণী কোনোমতে একবার উত্তীর্ণ হতে পারলে জীবিকাতেই তাদের সমস্ত প্রাণমন ঢেলে দেওয়ার কথা চিন্তা করছে? জাগতিক উন্নতি অর্থাৎ চাকরি-বাকরির মোটা মাহিনা ইত্যাদির দিকে চোখ রেখে পড়াশুনো চালিয়ে যাওয়া এবং পারিপার্শ্বিক প্রভাবের সম্পূর্ণ ছোঁয়া বাঁচিয়ে তাতেই তদ্গতচিত্ত হওয়া—এই কি ছাত্রজীবনের আদর্শ? হোক ছোটখাটো হোক সামান্য, ছাত্রদের তরফে দু-চারটি প্রতিবাদ দু-চারটি বিদ্রোহের ঘটনা প্রত্যক্ষ করবার জন্য তাঁরা যেন বড্ড ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন।

–যাঁদের এমনতরো অধীর প্রতীক্ষা, তাঁরাই আবার আজ ছাত্র-বিক্ষোভের প্রচণ্ডতা দেখে ভড়কে গেছেন। বার বার চোখ রগড়ে দৃষ্টি মেলে তাঁরা দেখছেন, তাঁরা ছাত্রদের কাছ থেকে যে পরিমাণ বিদ্রোহ আশা করেছিলেন ছাত্রদের সম্প্রতি-অনুষ্ঠিত বিদ্রোহে সেই সীমা বহুদূর ছাড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, ছাত্রদের ব্যাপক অরাজকতায় শিক্ষাজগতের সবকিছু লণ্ডভণ্ড হবার উপক্রম হয়েছে। শিক্ষায় শৃঙ্খলা বলে আর কিছু রইল না, ছাত্র-শিক্ষকের পুরাতন সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হবার উপক্রম; সব চেয়ে যেটা আশঙ্কার কথা, যে শ্রদ্ধাবোধ বিদ্যাচর্চার গোড়াকার কথা এবং যা না হলে বিদ্যার্জনের ভিত্ পর্যন্ত আলগা হয়ে যায় সেই শ্রদ্ধার সঞ্চয় একেবারেই তলায় এসে ঠেকল। শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের শ্রদ্ধা, অধ্যয়নের প্রতি ছাত্রের শ্রদ্ধা, অভিভাবকের প্রতি ছাত্রের শ্রদ্ধা—নতুন উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এর কোনোটিরই যেন কোনো মূল্য আর নেই। এ বড় ভয়ঙ্কর অবস্থা। এতে যে শুধু শিক্ষার লক্ষ্যই অন্তর্হিত হয়ে যায় তা-ই নয়, জীবনের লক্ষ্যই বিলুপ্ত হয়। ছাত্রসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের পথ বেয়ে যে আকস্মিক শক্তির স্ফুরণ হয়েছে তার অনেকটাই বিনাশধর্মী—এর ভিতর গঠনমূলকতার উপাদান বড়-একটা চোখে পড়ছে না। ছাত্র-বিক্ষোভের সংঘর্ষ থেকে প্রচুর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঝরছে কিন্তু এ আগুন শুধু পোড়াতেই জানে, প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থাকে অগ্নিশুদ্ধ করে তাকে খাঁটি ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করবার উপকরণ এর ভিতর নেই। সুতরাং ছাত্রদের নিজের স্বার্থেই—দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা না-হয় এই মুহূর্তে ছেড়েই দেওয়া গেল—এই আকস্মিক বিস্ফোরণ সংবৃত করবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

কিন্তু ছাত্রদের উপর এক-তরফা দোষারোপ করা বৃথা। পূর্বের প্রশ্ন পুনরায় উত্থাপন করছি ঃ কেন এমন হল যে ভারতের ছাত্রদের একটা মোটা অংশ হঠাৎ সকলে একযোগে অথরিটির বিরুদ্ধে বিদ্রোহে ফেটে পড়ল? এ প্রায় একটা অভ্যুত্থান—দীর্ঘদিনের তন্দ্রাঘোর ঝেড়ে ফেলে সহসা লাফিয়ে জেগে ওঠা। হোক বিনাশধর্মী হোক আত্মঘাতমুখী, তবুও অভ্যুত্থানের সমস্ত লক্ষণ এই ছাত্র-জাগরণের পিছনে নিহিত আছে। ছাত্ররা অকারণে মারমুখো হয় নি। তাদের আচরিত সংঘাত-সংঘর্ষের মূলে বহুবিধ কারণের পোষকতা। তার কতক অর্থনৈতিক কতক রাষ্ট্রিক কতক সামাজিক-তথা-পারিবারিক। ছাত্র-বিক্ষোভের স্থায়ী প্রতিকারের উপায় চিন্তা করবার আগে এই কারণগুলির উপরে এক-নজর চোখ বুলিয়ে নেওয়া মন্দ নয়।

আমাদের ভারতীয় ছাত্রসম্প্রদায় বরাবরই মূলত শান্তিপ্রিয়, গুরুজনের বাধ্য এবং পরিবারকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর

দ্বারা চালিত। লেখাপড়া শিখে চাকরি-বাকরি করা নয় তো ব্যবসা-বাণিজ্য করা এবং এতদুভয়ের কোনো-একটির সাহায্যে পরিবারের সাশ্রয় বিধান এবং সংসার প্রতিপালন—এই হল ভারতীয় ছাত্রের লক্ষ্য ও অভীষ্টের মোটামুটি ছক। এই কাজের অবসরেই তারা নিজের জন্য যাকে বলে 'কেরিয়ার' তা গড়ে তুলতে চায়, কিন্তু তাদের এই কেরিয়ার গড়বার ইচ্ছাটা আত্মসর্বস্বতা নয়। প্রায়শ তাদের এই ইচ্ছার মূলে থাকে উপার্জনের কামনা এবং এই উপার্জনের সাহায্যে পিতা-মাতা-ভাই-বোন-স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়-পরিজনের মুখে হাসি ফোটাবার তাগিদ। এ কথার ব্যতি-ক্রম-দৃষ্টান্ত অর্থাৎ আত্যন্তিক আত্ম-কেন্দ্রিকতার নজির নেই তা বলছি নে কিন্তু মোটামুটিভাবে ভারতীয় ছাত্রের দৃষ্টি পরিবারমুখী ও আত্মসুখান্বেষণ-প্রবৃত্তির বিরোধী। ইউরোপ ও আমেরিকার ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনের ছাঁচ থেকে এখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনের ছাঁচ কিছু আলাদা। ভারতীয় ছাত্র নিতান্ত বাধ্য না হলে কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে অভিভাবকতন্ত্রের বিরুদ্ধে স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চায় না। প্রচলিত শাসন-অনুশাসন মেনে চলার দিকেই তাদের চিত্তের সহজ প্রবণতা। একেবারে কোণঠাসা না হওয়া পর্যন্ত তাদের রুখে দাঁড়াবার অভ্যাস নেই।

আজ যে দিকে দিকে ছাত্রদের বিদ্রোহে ও প্রতিবাদে আলোড়িত হয়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে, তাদের কোনোমতেই বশে আনা যাচ্ছে না, অভিভাবক শিক্ষক রাষ্ট্রপরিচালক সকলেরই শুভবুদ্ধির আবেদন তাদের উপর বারে বারে ব্যর্থ হচ্ছে—এর ভিতরের কথাটা হল এই যে, ছাত্রদের আজ কোণঠাসা অবস্থা। চার-দিকের নানা প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে লড়াই করতে করতে তাদের আজ দেয়ালে পিঠ দিয়ে লড়াই করবার মত অবস্থা হয়েছে। কাজেই নিছক আত্মরক্ষার প্রবৃত্তির তাড়নাতেই তাদের ফুঁসে ওঠা, রুখে দাঁড়ানো—আর তা-ই তারা করছে। ছাত্রদের উপর একদেশদর্শী অভিশাপ বর্ষণ করবার আগে প্রকৃত অবস্থাটা, সুতরাং একবার পরখ করে নেওয়া ভাল।

আমাদের সমাজে আজ দুর্নীতি বহুব্যাপক। শুধু যে শাসন-কাঠামোর স্তরে স্তরেই দুর্নীতি তা-ই নয়, জন-জীবনের নানা স্তরেও দুর্নীতি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আমল থেকে নীতির মানাব-নতির শুরু; এখন তো সে প্রক্রিয়া অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এতটাই যে দুর্নীতি বিরাট এক অক্টোপাসের মত আজ সমগ্র সমাজদেহকে গ্রাস করবার উপক্রম করেছে। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক দুর্নীতির নিষ্পেষণে আজ সকলেই পিষ্ট। ছাত্রদের প্রসঙ্গে দুর্নীতির কথা উত্থাপন করবার উদ্দেশ্য হল এই যে, বর্তমান ছাত্র-অশান্তির পিছনে সমাজে যে বহুব্যাপক দুর্নীতির স্রোত চলছে তার পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে। আজ যে সকল ছাত্র কলেজে পড়ছে বা কলেজ থেকে সদ্য পাস করে ইউনিভার্সিটিতে প্রবেশ করছে তাদের প্রায় সকলেরই জন্ম দ্বিতীয় যুদ্ধ-মধ্যবর্তী বৎসরগুলিতে। জ্ঞান হওয়া অবধি তারা দেখছে সমাজ-মানসে নীতির মূল একান্ত শিথিল ঃ দুর্নীতির দুষ্ট-চক্রের আবর্তনে রাষ্ট্রিক ও আর্থিক জীবন-প্রবাহ সাংঘাতিকভাবে আলোড়িত, বিক্ষুব্ধ। পূর্ববর্তী প্রজন্মের ছাত্রদের জীবনে প্রাক্‌যুদ্ধকালীন যে আদর্শ ছিল তার শুভ প্রভাবের ছিঁটেফোঁটাও এ কালের ছাত্ররা পায় নি—তারও আগেকার যুগের নীতি ও আদর্শের কথা না-হয় না-ই তুললাম। এখনকার ছাত্রের কিছুটা চেতনা হতেই সে দেখছে বাপ বা দাদা আপিসে ঘুস নিতে দ্বিধা করে না, মাস্টারমশায়রা কাজ ফাঁকি দেয় ও চুটিয়ে রাজনীতি করে, স্কুলে কীভাবে বই পাঠ্য হয় তার রহস্যও তার জানা হয়ে গেছে, মাস্টার-মশায়দের ক্লাসে পড়ানোয় যত-না উৎসাহ তার চেয়ে অনেক বেশি উৎসাহ প্রাইভেট ট্যুইশনিতে ও নোট-বই লেখায়, নিজ নিজ প্রাইভেট-পড়ানো ছাত্রের অনুকূলে বিশেষ সুপারিশ ও বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করতে মাস্টারমশায়দের চক্ষু-লজ্জায় বাধে না।

ছাত্র যখন স্কুলের দেউড়ি পেরিয়ে কলেজে ঢোকে, দেখে যে অধ্যাপক মশাইরা দিব্যি বিলাসিতায় অভ্যস্ত এবং ফুল-বাবুটি হয়ে কলেজে না এলে তাঁদের অনেকেরই মন ওঠে না। ছাত্রকল্যাণের দিকে তাঁদের তেমন মন নেই যতটা মনো-যোগ আছে আপন-আপন প্রমোশন, মাহিনাবৃদ্ধি বদলী ইত্যাদি ব্যাপারের প্রতি। এ ছাড়া ঘোঁট, গোষ্ঠীবদ্ধতা, রাজনৈতিক দলাদলি এগুলি তো আছেই। সরকারী কলেজগুলিতে নিয়োগ, প্রমোশন ট্রান্সফার ইত্যাদি চাকুরিগত ব্যাপারগুলি প্রায়শ সরকারী দপ্তরের ওপরওয়ালাদের মর্জি মত নিষ্পন্ন হয়ে থাকে এবং এ নিষ্পত্তিতে সংশ্লিষ্ট অধ্যাপক মশাইদের তদ্বির-তদারক খোসামোদের একটি বড় ভূমিকা বর্তমান. অনেক সময় এখানেও রাজনীতি প্রভাব বিস্তার করে। সরকারী কর্তারা যে রাজনৈতিক দলের অনুগামী তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে কোনো কোনো অধ্যাপক মাত্রা ছাড়িয়ে যান। এটা যে আন্তরিক বিশ্বাসের বশবর্তিতার দৃষ্টান্ত মোটেই নয় পরন্তু নিজের অনুকূলে বিশেষ সুবিধা আদায়ের ফন্দি মাত্র তা এই-জাতীয় কিছু কিছু অধ্যাপক-শিক্ষকের মতিগতি বিশ্লেষণ করলেই ধরা পড়ে। [শোনা যায় প্রেসি-ডেন্সী কলেজের গণ্ডগোলের সূত্রপাতে এই রকমের একটা কারণ নিহিত ছিল. এ জনশ্রুতি কতটা সত্য জানি না তবে] একাধিক অধ্যাপকেরই যে কংগ্রেসী কর্তাদের সঙ্গে যোগসাজস আছে এবং

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেজওয়াড়া - শ্রীনগর - গৌহাটী

কারণে-অকারণে রাইটার্স বিল্ডিংসের সিঁড়িতে তাঁদের দেখা যায় এ তথ্যের সত্যতা অনেকেই মানবেন আশা করি।

ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতার সমর্থনে কিছু বলা আমার অভিপ্রায় নয়। বস্তুত যে-কোনো প্রকারের উচ্ছৃঙ্খলতা, অসংযম, ক্ষ্যাপামি শৃঙ্খলাপ্রিয় অন্তরকে পীড়িত করে। কিন্তু ছাত্ররা কেন উচ্ছৃঙ্খল হয় সেটা তো বুঝতে হবে। উঠতি বয়সে মানুষের মনস্তত্ত্ব এক বিশেষ ধারায় কাজ করে। তার মনে থাকে সহজাত শ্রদ্ধাবোধ, আশা ও উদ্দীপনা, বিশ্বাসপ্রবণতা। গুরুজনদের প্রতি থাকে তার সহজ নির্ভরতা। সেই বিশ্বাস ও নির্ভরতা যদি অভিভাবক ও গুরুজনদের অসংগত আচরণে ক্রমাগত পীড়িত হতে থাকে তা হলে ছাত্রদের মধ্যে হতাশাবোধ জাগবেই এবং সেই হতাশার রন্ধ্রপথে অশ্রদ্ধার কলি তাদের অন্তরে প্রবেশের ফাঁক খুঁজে পাবেই। ছাত্রদের এই বিভ্রান্তিকর শূন্য অবস্থাতেই রাজনৈতিক দলগুলি তাদের উপর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ লাভ ও কালক্রমে তাদের রাজনৈতিক দলাদলির শিকারে পরিণত করে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটা মোটেই উচিত নয়—তাতে লেখাপড়ার ভরাডুবি, জীবনসংগ্রামের আবশ্যকীয় প্রস্তুতিপর্বে বাধা, শৃঙ্খলা ও মনঃসংযোগের শিক্ষায় প্রতিবন্ধকতা—কিন্তু কেন ছাত্ররা রাজনীতির মধ্যে জড়িয়ে পড়ে তা হৃদয়ংগম করতে পারলে আর এই নিয়ে তাদের উপর সর্বদোষ চাপানোর যুক্তি থাকে না। ছাত্ররা বামপন্থী রাজনীতি করে শিক্ষা-ব্যবস্থা গোল্লায় দিচ্ছে বলে যাঁরা চীৎকারে-চেঁচামেচিতে পাড়া মাথায় করেন, খোঁজ নিলে দেখা যাবে তাঁদের মধ্যেও অনেকে বিলক্ষণ রাজনীতি করে থাকেন এবং প্রায়ই সেটা কংগ্রেসী রাজনীতি। পত্র-পত্রিকায় ছাত্রদের বিরুদ্ধে শিক্ষক-শিক্ষিকার যে-সকল অভিযোগ সম্বলিত চিঠি ছাপা হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারও মূলে আছে শাসকসম্প্রদায়ের প্ররোচনা।

আসল গলদ প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায়, শাসনপদ্ধতিতে, দেশের অভ্যন্তরে ক্রিয়াশীল পচন-ধরানো সর্বব্যাপক দুর্নীতিতে। জ্যেষ্ঠরা কেউ শ্রদ্ধার আদর্শ নন তো ছাত্ররা শ্রদ্ধাবোধের শিক্ষা পাবে কী করে? গুরুজন ও অভিভাবকদের সম্পর্কে তাদের প্রত্যাশা যদি প্রতি পদে ক্ষুণ্ণ হতে থাকে তো তাদের অন্তরে শূন্যতা ও বিক্ষোভের সঞ্চার হবে না তো কী হবে? পূর্বেই বলেছি এই শূন্যতার সুযোগেই দলীয় রাজনীতি ছাত্রমহলে আসর জাঁকায়। মাস্টার মশাইরা যদি আদর্শ-স্থানীয় হতেন, ছাত্রকল্যাণ যদি তাঁদের ধ্যেয় বিষয় হত, তাঁদের যাঁরা নিয়োগ করেন সেইসব সরকারী কর্তারা যদি তোষণ-তোষামোদ আত্মীয়ানুগ্রহ-স্বজন-পোষণ-প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে হতেন, সরকার যদি কেবলই দল রক্ষায় ব্যস্ত না হতেন; তা হলে দেখতে না দেখতে শিক্ষাজগতের চেহারা পাল্টে যেত। ছাত্রদের শোধরাবার আগে অভিভাবকতন্ত্রের—অভিভাবকতন্ত্র বলতে এখানে আমি অভিভাবক শিক্ষক রাষ্ট্রপরিচালক দেশনেতা সকলকে বোঝাচ্ছি—নিজেদের শোধরানোর চেষ্টা করা দরকার। তাঁরা নিজেরা আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন না অথচ ছাত্রদের কাছ থেকে পদে পদে আদর্শ আশা করবেন—এ অতি অবাস্তব আশা। আব্দার জিনিসটা সাধারণত ছেলে-ছোকরাদেরই মানায়, কিন্তু এ হল একরকমের বুড়োদের আব্দার। এ আব্দার মান্য করবার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।

ছেলেরা কলেজের সীমা পেরিয়ে ইউনিভার্সিটির গণ্ডীতে প্রবেশ করে দেখে, সেখানে যিনি উপাচার্য হয়ে বসে আছেন তাঁর সঙ্গে শিক্ষাজগতের বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই, তিনি সরকারী কর্তাদের প্রিয়পাত্র বিধায় এবং সরকারী কাজ থেকে অবসর গ্রহণের পর তাঁর নতুন করে একটা হিল্লে হওয়া দরকার এই প্রয়োজনবোধে তাঁকে এনে এই পদে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। কখনও কখনও রাজ্যপালের বা মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ পছন্দের লোক বলে তিনি নিযুক্ত হন। দু'টি-একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নয় ভারতের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ব্যাপার ঘটছে। ছাত্রদের উপর এর কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা চলে। নিযুক্ত উপাচার্যদের কার্যপরিচালনগত দক্ষতা থাকা সম্ভব আর সেই নজীরেই হয়তো তাঁদের নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কার্যপরিচালন-দক্ষতা থাকাই যথেষ্ট নয়, তার সঙ্গে শিক্ষাগত, আরও পরিষ্কার করে বললে শিক্ষকতাগত, অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। সেই অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকেই যদি দেখা যায় কেউ উপাচার্যের গদীতে সমারূঢ় হয়েছেন, বুঝতে হবে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় বনাম সরকারের সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রায়শ সরকারের কলকাঠি নাড়ার যন্ত্র হয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছেন। এককালে আমাদের দেশে আই. সি. এস. অফিসারদের সম্পর্কে একটা 'মাথ' বা কিম্বদন্তী প্রচলিত হয়েছিল যে, তাঁরা সর্বজ্ঞ ও সর্বকর্মপটু। ইংরেজ চলে যেতে এখন আই. সি. এস-দের সেই রবরবা ঘুচে গেছে কিন্তু তার জায়গায় আবির্ভূত হয়েছেন বিচারপতির দল—অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। এঁরাও সবজান্তা ও সর্বকর্মনিপুণ। এঁদের শ্রেণী থেকেই উপাচার্য নিয়োগ হতে আজকাল বেশি দেখা যাচ্ছে। এঁদের বিদ্যাবত্তা বা কর্মদক্ষতা সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই নে কারণ বিচারালয়ে কখনও যাওয়ার প্রয়োজন হয় নি বলে সে বিষয়ে আমার কোনো ধারণা নেই, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়-প্রশাসনের ক্ষেত্রে সারা ভারত জুড়ে এঁদের ক্রিয়াকলাপের যে নমুনা দেখতে পাচ্ছি তাতে নির্দ্বিধায় বলা যায় এঁদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ স্থিতাবস্থার পোষক, আধুনিক জগতের চিন্তাধারা ও হালচাল সম্পর্কে অজ্ঞ এবং প্রায়শ শাসক-সম্প্রদায়ের বশংবদ আজ্ঞাবহ। পুলিশের সঙ্গে এঁদের যেন প্রাণের যোগ, তাই ছাত্রদের শুভবুদ্ধির উপর নির্ভর না করে পুলিশের দণ্ডভীতির উপর নির্ভর করার দিকেই এঁদের বেশি ঝোঁক।

এইরকম সব ব্যক্তিদের ছাত্রদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়—তাতে জটিলতার সৃষ্টি হওয়া অনিবার্য আর তা হয়ও। নানা প্রতিকূল অবস্থার চাপে পড়ে দেশ থেকে শিক্ষার পাট উঠে যাবার দাখিল। ছাত্ররা তাদের চোখের সামনে কোনো সুস্থ আদর্শের দৃষ্টান্ত দেখতে না পেয়ে বিগড়ে যেতে বসেছে ও ধ্বংসাত্মক কাজে মেতে উঠেছে। ছাত্রসমাজের এই শক্তির অপচয় দেখলে দুঃখ হয়। কিন্তু পাছে আমাকে কেউ ভুল বোঝেন সেইজন্য পুনরুক্তির ঝুঁকি নিয়েও আবার বলছি, বর্তমানের বিমর্ষ অবস্থার জন্য ছাত্ররা যত-না দায়ী তার চেয়ে বেশি দায়ী তাদের মাথার উপর যাঁরা আছেন তাঁরা—অর্থাৎ অভিভাবক, শিক্ষক, রাষ্ট্রচালক ও দেশনেতার দল। কি সরকারী নেতা কি বিপক্ষবাদী রাজনৈতিক নেতা—এঁদের কারুরই কোনো আদর্শের বালাই নেই। কেবল সর্বক্ষণ এঁরা দলীয় ক্ষমতা সংরক্ষণ ও ক্ষমতা অধিকারের কোন্দলে লিপ্ত। দলাদলির খেয়োখেয়ি ছাড়া আর কিছু এঁরা জানেন না। দেশের স্বার্থের ঊর্ধ্বে দলের স্বার্থকে স্থাপন করতে এঁদের বিন্দুমাত্র আটকায় না আর ওই উদ্দেশ্য সাধনে নীতি বিসর্জনেও তাঁরা সদা প্রস্তুত। এই যেখানে অবস্থা সেখানে ছাত্রসম্প্রদায়ের স্বার্থের কথা তাঁরা চিন্তা করবেন এটা আমরা আশাই করতে পারি না। ছাত্রসমাজ তো দেশবাসী সমাজেরই একটা অংশমাত্র। দেশই যাঁদের চিন্তায় অনুপস্থিত ছাত্র তাঁদের চিন্তায় উপস্থিত থাকা সম্ভব নয়। কি দক্ষিণ কি বাম এই রাজনৈতিক নেতার দলই আবার প্রত্যক্ষে অথবা পরোক্ষে অভিভাবক ও মাস্টারমশাইদের চালনা করেন। সমাজের গড়নটাই এমন যে রাজনীতির ছোঁয়া কারও এড়িয়ে চলবার উপায় নেই—যেমন ছাত্ররা এড়িয়ে চলতে পারে না তেমনি তাদের

অভিভাবকেরাও পারেন না। এই সংস্পর্শ-সংঘাতে দেশে চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখা দিয়েছে। এর জন্য শুধু ছাত্রদের দোষী করা অনুচিত।

পরিশেষে ছাত্রদের উদ্দেশে একটি কথা। ছাত্ররা তো ধ্বংসাত্মক প্রেরণার তাড়নায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, ল্যাবরেটরী ভেঙেছে, আরও কত-কী করেছে ও করছে। দেশের সামগ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর এর ফল কত মারাত্মক হচ্ছে তা এদের ধীরচিত্তে ভেবে দেখা উচিত। শুধু জেদের মাথায় নিজেদের দিকটা ভাবলেই তো হল না,—রাজনীতি ও বিরোধের সঙ্গে অসংশ্লিষ্ট হাজার হাজার নিরীহ শিক্ষার্থী ও এইসব প্রতিষ্ঠানের উপর যাদের রুজিরোজগার নির্ভর করছে সেই সব কর্মীদের কথাও তো ভেবে দেখতে হবে। দিনের পর দিন যদি শিক্ষালয়ের দরজা বন্ধ থাকে তো শিক্ষার কী হাল হয় তা কল্পনা করার জন্য দৈবজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন হয় না। ছাত্রদের এ সকল কথা অনুত্তেজিতভাবে ভেবে দেখতে হবে। তাদের উপর পুলিশের যে অত্যাচার হয়েছে তার প্রতিবিধান অবশ্যই করতে হবে এবং পুলিশের শাস্তি হওয়াও দরকার, কিন্তু ছাত্র-পুলিশ-সরকারের এই ত্রিমুখী সংঘর্ষের ফেরে পড়ে যদি শিক্ষা দেশ থেকে উবে যাবার মত হয় তো তার চেয়ে শোচনীয় ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। যে-কোনো প্রকারেই হোক শিক্ষা বাঁচিয়ে রাখতে হবে। শিক্ষাকে অরাজকতার বলি হতে দেওয়া চলে না।

কথাটার ধার বহুল-ব্যবহারে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গেলেও আজও সর্বৈব সত্য যে, অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা। ছাত্রজীবনের বিস্তৃত অবসরে তথা অনুকূল পরিবেশে শিক্ষার্জনের যে সুযোগ মেলে কর্মজীবনের নানা বিক্ষেপ-ব্যস্ততার মধ্যে সে সুযোগ আর পাওয়া যায় না। কর্মের প্রকৃতিই তখন মানুষকে অধ্যয়নের জগৎ থেকে অল্প-বিস্তর বিযুক্ত করে ফেলে। আন্তরিক ইচ্ছা থাকলেও জীবিকাশ্রয়ী কর্মী মানুষের পক্ষে অধ্যয়নের সম্যক সুযোগ নেওয়া সম্ভব হয় না। সুতরাং অধ্যয়নের জন্য ছাত্রজীবনই সবচেয়ে প্রকৃষ্ট এবং তার সর্বাপেক্ষা সদুপযোগ এই অধ্যায়েই সম্ভব। যে সকল ছাত্রনেতা ছাত্র-আন্দোলনের পথে সমাজে প্রচণ্ড বিক্ষোভ-অশান্তির সৃষ্টি করেছেন, তাঁদের অন্য সব-কিছু ভাবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্যার এই দিকটিও ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। এই আলোড়ন-বিসম্বাদের ফলে বৃহত্তর ছাত্রসম্প্রদায়ের স্বার্থ তো ক্ষুণ্ণ হচ্ছেই তাঁদের নিজেদের স্বার্থও বড় কম ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না। লেখাপড়া না শিখে, নাগরিকতার শিক্ষা গ্রহণ না করে, নিছক বক্তৃতালব্ধ মেঠো নেতা হওয়া নিশ্চয়ই তাঁদের কাম্য নয়। আর যা-ই তাঁরা করুন শিক্ষাকে রাজনীতির দাবার ঘুঁটি করবেন না।

আসন্ন নির্বাচনী টেস্ট ম্যাচ—

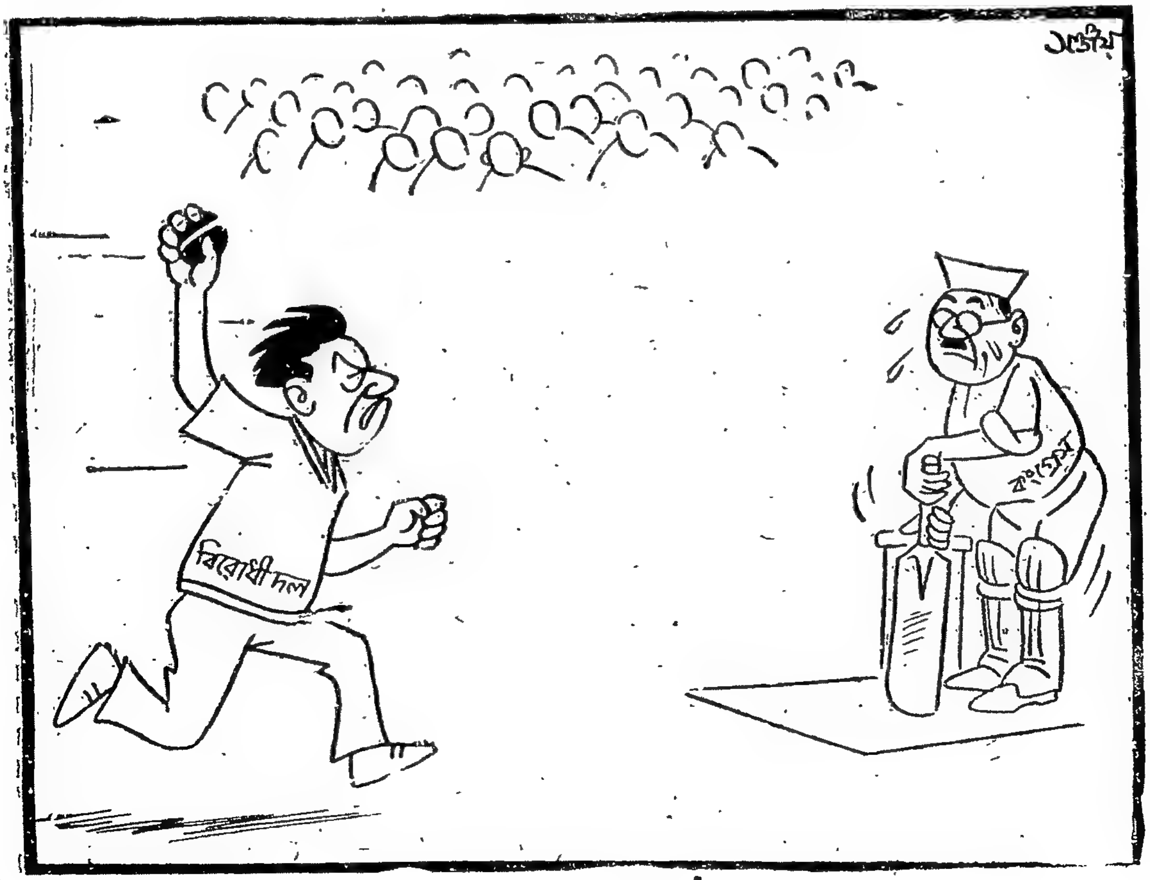

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

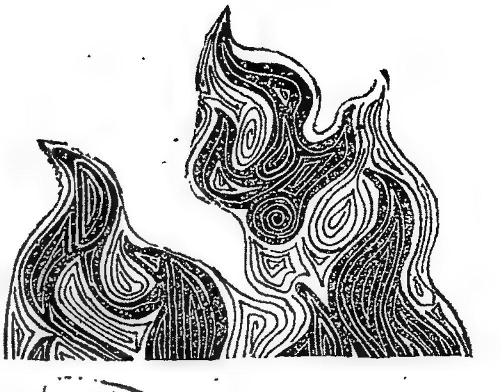

অনন্ত সিংহ

লঙ্ঘিতে হবে দুর্গমগিরি

সন্ধ্যা নেমে এসেছে। সাতটার সময় আমাদের ফাইনাল রিপোর্ট জানা প্রয়োজন—সব ঠিক আছে কিনা—সব দল আক্রমণ করবার জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুত কিনা!

স্থান—আসাম-বেঙ্গল রেল অফিসের পাশের রাস্তা। সময়—১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল, সন্ধ্যা সাতটা। নতুন শেভ্রোলে গাড়ি ও অপর দিক থেকে আমাদের "এমডেন"—২৪৪৪ নম্বরের গাড়ি এসে পাশাপাশি দাঁড়াল। দ্বিতীয় গাড়িটি থেকে গণেশের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"হ্যালো মার্শাল!"

গণেশও আমার মত জমকালো পোষাকে সেজেছিল। তবে তার ফিল্ড মার্শালের পোষাকে কিছুটা ব্যতিক্রম ছিল—কটিদেশে তরবারির পরিবর্তে তার হাতে ছিল ফিল্ড মার্শালের "বাট", অর্থাৎ ছোট যষ্টি। কি অপূর্ব মানিয়েছে! গণেশের তখন গোঁফ ছিল। উদ্ধতভাবে গোঁফে তা দিয়ে রাখত বলে মনে হ'ত যেন শত্রুকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান জানাচ্ছে।

গণেশ আমাকে বলল—"দুটো গাড়ির একটিও শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল না। কোনটারই মেরামত শেষ হয় নি। আমাদের বন্ধু দু'জন দু'টো কারখানাতেই সারাক্ষণ তদারক করেছে। প্রাণপণ চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত কোনমতেই মিস্ত্রীরা আজ গাড়ি দিতে পারল না।"

হেডকোয়ার্টারের সভায় আমরা এইরূপ একটা আশঙ্কা করেছিলাম। তবু মনে মনে ভরসা ছিল যে একটা গাড়ি অন্তত সময় মত পেয়ে যাব। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ছেলেরা এসে রিপোর্ট করেছে—আর কত কাজ বাকি আছে, কতক্ষণে গাড়ি পাওয়া যাবে, ইত্যাদি। তারপর শেষের দিকে পনেরো মিনিট অন্তর সাইকেল-যোগে গণেশকে ওয়াকিবহাল করেছে—মেরামতের কাজ আর কত বাকি।

কী নিদারুণ দুঃসংবাদ! কী ভয়ানক সমস্যা! এখন সাতটা বেজেছে। নির্মলদা ও লোকনাথের সঙ্গে আমাদের দেখা হওয়ার কথা সাড়ে সাতটার সময়। তারপর দেখা হবে অম্বিকাদাদের সঙ্গে। এই ফাইনাল চেকআপ হওয়ার পর টেলিফোন অফিস, অকজিলিয়ারি কোর্সের আর্মারি ও পুলিশ লাইন প্ল্যান অনুযায়ী একযোগে আক্রমণ করবার জন্য এই প্রধান তিনটি দল আক্রমণস্থলের নিকটে পজিসন নেবে এবং ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ধার্য সময়ে আক্রমণ করবে। শেষ মুহূর্তে যদি কোন বিভ্রাট হয় সেইরূপ অনিশ্চয়তার আশঙ্কা করেই আমরা বিশেষ প্রয়োজন বোধে আক্রমণের কিছুক্ষণ আগে প্রধান তিনটি দলের একবার সংযোগ স্থাপন ও ফাইনাল চেকআপের ব্যবস্থা রেখেছিলাম।

পুলিশ লাইন আক্রমণকারী দলের সঙ্গে যাওয়ার জন্য যে গাড়ির ব্যবস্থা করা ছিল তা যখন শেষ মুহূর্তে শত চেষ্টার পরেও পাওয়া গেল না তখন সমস্যাটি বাস্তবে দাঁড়াল এইরূপ—যে কোন উপায়ে হোক না কেন আমাদের একখানা গাড়ি কিছুক্ষণের মধ্যেই যোগাড় করতে হবে। কিন্তু এই আধ ঘণ্টার মধ্যে একটি ট্যাক্সি ভাড়া করে এনে চালককে বেঁধে রেখে গাড়িটি নিয়ে আমাদের সকলের পুলিশ লাইনে ঠিক জিরো আওয়ারে (Zerohour) আক্রমণ করতে গিয়ে পৌঁছান বাস্তবে সম্ভব নয়। অন্তত দু'টি ঘণ্টা সময় চাই—অর্থাৎ রাত আটটার সময় যুগপৎ আক্রমণ সুরু না করে আমাদের তা করতে হবে রাত দশটায়।

গণেশ ও আমার মধ্যে কোন মৌখিক আলোচনা হচ্ছিল না। দু'জনের মাথার মধ্যে যেন অবিরত মেশিনগানের গুলী-বর্ষণ হচ্ছে। ছোট বড় সব দলকে এইটুকু সময়ের মধ্যে খবর পাঠাতে হবে দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করবার জন্যে। শেষ মুহূর্তে এইরূপ আকস্মিক আক্রমণের সময়ের ব্যতিক্রম সকলের মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে? দু'ঘণ্টা দেরি করার অর্থ হল, চৌশট্টিজন যুবক বৃটিশ সামরিক পোষাকে সজ্জিত হয়ে সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আরও দুটি ঘণ্টা অপেক্ষা করবে। এর মধ্যে যে বিলক্ষণ অনিশ্চয়তা আছে! ট্যাক্সি চালককে বেঁধে রেখে হস্তগত করা ট্যাক্সি নিয়ে লোকনাথদের আরও দুটি ঘণ্টা শহরে অতিবাহিত করা ততোধিক বিপদের কথা। কি করে সব দলগুলিকে এই অল্প সময়ের মধ্যে খবর দেব? কি করেই বা এইটুকু সময়ের মধ্যে একটি গাড়ি যোগাড় করব?—এইসব প্রশ্ন আমাদের মন তোলপাড় করছিল।

এতক্ষণ ধরে যে সমস্যাগুলির কথা বললাম তা এক সেকেণ্ডের কম সময়ে মনের পর্দায় ছবির মত ভেসে উঠল। এরকম সঙ্কটমুহূর্তে বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে মাথা স্থির রেখে বিকল্প কর্মসূচী গ্রহণ করার সমর-কুশলতার প্রধান অঙ্গ। নিমেষে অবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করে আমাদের তখনি কার্যকরী ব্যবস্থার কথা চিন্তা করতে হল। এক মুহূর্তে প্ল্যান করে ফেললাম কি করে সব বিভক্ত বিস্তারিত দলগুলিকে দু'টি ঘণ্টা আক্রমণ বিলম্বিত করার খবর পাঠানো যায়।

আমরা দুজনে একই সঙ্গে আগে পিছে গাড়ি নিয়ে চলেছি। খুব কাছেই নরেশ রায় অপেক্ষা করছিল। গণেশ বেবী অস্টিনটি প্ল্যান অনুযায়ী নরেশের জিম্মায় দিয়ে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে জানিয়ে দিল—সময় পরিবর্তন করা হয়েছে, রাত আটটার পরিবর্তে রাত দশটায় আক্রমণ করতে হবে।

তারপর আমরা দুজনে শেভ্রোলে গাড়ি

আর্মারির আধ মাইলের মধ্যে একটি স্থানে লোকনাথদের সঙ্গে দেখা করতে। আসাম-বেংগল রেলের জেনারেল বিল্ডিং-এর রাস্তাটি দুটি পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে নেমে এসে নিজাম পল্টনের মাঠের গা ঘেঁষে ডান ও বাঁদিকে দুভাগ হয়ে চলে গেছে। এই মোড় থেকে একটু এগিয়ে বাঁদিকের রাস্তার ওপর একটি স্থান, রাত সাড়ে সাতটার সময় আমাদের উভয় দলের একবার সাক্ষাতের জন্য চিহ্নিত ছিল। তখন এই রাস্তার ওপর মিউনিসিপ্যালিটির কোন আলোর ব্যবস্থা ছিল না। রাস্তার ওপর সারি দেওয়া গাছের ছায়া এসে পড়েছে। রাস্তার অপর দিকে পাহাড়—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা। তার ওপর সাহেবদের বাংলো। এই নির্জন স্থানটিতে ঠিক সাড়ে সাতটার সময়, আক্রমণের আধ ঘণ্টা পূর্বে এই শেষবারের মত সাক্ষাৎ।

দু'দিক থেকে আমাদের দুটো গাড়ি পাশাপাশি এসে দাঁড়াল। একটি আমাদের শেভ্রোলে ও অপরটি বলপূর্বক হস্তগত করা ডজ গাড়ি। মোটরের আলোতে যখন লোকনাথের দলটিকে দেখলাম তখন আমার চোখ ঝলসে গেল। জেনারেলের সম্পূর্ণ পোষাকে লোকনাথ গাড়ির প্রথম সীটের বাঁদিকে ও তার ডানদিকে বসে স্টিয়ারিং হাতে মাখন ঘোষাল মোটর-গাড়ি চালাচ্ছে। মাখন ঘোষালও বৃটিশ অফিসারদের মত সামরিক খাকি পরিধানে নিখুঁতভাবে সেজেছিল। পেছনের সীটে নির্মলদা, রজত আর বোধহয় সুবোধ চৌধুরী বসা। প্রত্যেকেরই আমাদের দলের সামরিক পদ অনুযায়ী ইউনিফর্ম পরা ছিল। তাদের প্রত্যেকের মাথায় হেলমেট বিভিন্ন চিহ্নে সজ্জিত হয়ে শোভা বর্ধন করছিল। সোনালী ও রূপালী রং-এর নানা রকমের স্টারস ও ডেকরেশন এবং সর্বোপরি বুকে পিঠে আমাদের ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির বিশেষ ধরণের উজ্জ্বল ব্যাজ জ্যোতি বিকিরণ করছিল। এই চোখ ধাঁধানো দৃশ্যের বাস্তব রূপ প্রত্যক্ষ করলাম বিদ্যুৎ ঝলকানো পাঁচজোড়া চোখের চাহনিতে যারা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়ে আছে।

অন্ধকারে পাহাড়ের ধারে গাছের ছায়ায় ফিল্ড মার্শাল গণেশ ঘোষ ও আমি এসে উপস্থিত। আক্রমণের পূর্ব মুহূর্তে এই দুটি দলের ঐতিহাসিক মিলনের সাক্ষী মাত্র আমরা এই ক'জন। আর অন্ধকারে গোপনে আমাদের দেখেছে আকাশের রাশি রাশি নক্ষত্ররাজি। নির্মলদারা বলপূর্বক হস্তগত করেছে ডজ গাড়িটি। গাড়ির ড্রাইভারকে বেঁধে রেখে এসেছে। আক্রমণের প্রথম পদক্ষেপ তারাই ইতিমধ্যে সুরু করেছে। আমাদের কাছ থেকে তারা শুনবার জন্য উদগ্রীব হয়েছিল। "সব ঠিক আছে। আটটার সময় আক্রমণ করা চাই।"

ড্রাইভার ছাড়া ডজ গাড়িটি তাদের চালিয়ে আসতে দেখেই বুঝেছিলাম প্রাথমিক কাজ ইতিমধ্যে তারা নির্বিঘ্নে সেরে এসেছে। তবু জিজ্ঞাসা করলাম—"কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটে নি তো? ড্রাইভার অক্ষত আছে তো? কোনরূপ চেঁচামেচি, লোক জানাজানি হয় নি তো? আরও দু-তিন ঘণ্টার মধ্যে ড্রাইভার সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে পুলিশে খবর দিতে পারবে না তো?"

এক নিশ্বাসেই এই প্রশ্নগুলি করেছিলাম। আমাদের এইরূপ প্রশ্নের কারণ প্রথমটা ঠিক বুঝতে না পারলেও তারা বেশ অনুমান করেছিল যে বোধ হয় কোন ব্যবস্থা তখনও অসম্পূর্ণ আছে। লোকনাথ অস্থির হয়ে বলল—"প্রাথমিক কাজ যা করবার তা আমরা সুষ্ঠুভাবেই করেছি। এখন বলুন আপনাদের আর আর সব ব্যবস্থা ঠিক আছে কিনা?"

গণেশ উত্তর দিল—"সবই ঠিক আছে, তবে—" গণেশের কথা শেষ হবার আগেই লোকনাথ অস্থির হয়ে প্রশ্ন করে বসল—"তবে? তবে কি?"

গণেশ—'পুলিশ লাইনে নিয়ে যাবার জন্য যে ক'টি গাড়ি রাখা ছিল তার একটিও পাওয়া গেল না। সব ক'টি গাড়িই কারখানায়। সেইজন্য আমাদের আরও দু'ঘণ্টা সময় পেছুতে হবে।"

এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সবার মধ্যে একটা অস্বস্তির ভাব দেখা গেল। শেষ মুহূর্তে প্রস্তুতি ও প্ল্যানের এইরূপ ব্যতিক্রম ও ওলোট-পালট হওয়াটা সবার কাছে অবাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়েছিল। নির্মলদা খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এই সময়ে আরও দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করা যেন একেবারে ধৈর্যের সীমার বাইরে!

যাঁদের জীবনে অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা বুঝতে পারবেন অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম নিয়ে কোন অ্যাকশনে যাওয়ার আগে মনের অবস্থা কিরূপ থাকে—প্রতি মুহূর্তে আতঙ্ক, আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে দোল খেতে হয়। লোকনাথেরা ড্রাইভারকে কিছু আগে বেঁধে রেখে এসেছে। সঙ্গে তাদের নানা অস্ত্রশস্ত্র আছে। ছোট ছোট আরও কয়েকটি দল পায়ে হেঁটে নিজাম পল্টনের মাঠে এ. এফ. আই-এর আর্মারির কাছাকাছি এসে গোপনে অবস্থান করছে। তাদের সঙ্গে জাহাজ বাঁধার মোনিলা দড়ি, মই, গাঁইতি, পেট্রলের টিন প্রভৃতি সরঞ্জামও থাকবার কথা। বলাই বাহুল্য এই অবস্থায় আরও দু'টি ঘণ্টা অপেক্ষা করা কেউ বাঞ্ছনীয় মনে করছিল না। আমাদেরও তা' ঈপ্সিত ছিল না। কিন্তু অবস্থার বিপাকে পড়ে অনিবার্য কারণে দু'টি ঘণ্টা বিলম্ব করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ফিল্ড-মার্শাল গণেশ ঘোষ জানালেন—

"দু' ঘণ্টা আরও অপেক্ষা করব। দশটার সময় আক্রমণ করা চাই। ইতিমধ্যে গাড়ি একটি আমরা কোনমতে যোগাড় করে নেব। আর যদি কোনমতে গাড়ি যোগাড় করতে পাও পারি তবু পায়ে হেঁটে গিয়ে আমরা পুলিশ লাইন আক্রমণ করবই—এটাই ঠিক রইল। আমরা আক্রমণের পূর্বে আর সাক্ষাৎ করব না।"

সময় খুব সংক্ষেপ বলে আমরা তাড়াতাড়ি ছুটলাম সব দিকে সব দলগুলিকে খবর পাঠাতে—যেন সবাই দু'ঘণ্টা দেরি করে। কয়েকটি দলকে নতুন পরিস্থিতি জানাবার জন্য নির্মলদার ওপর ভার দেওয়া হ'ল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই top speed-এ ছুটে গেলাম গণেশের বাড়িতে। কয়েকজনকে সাইকেলে পাঠানো হ'ল কয়েকটি দলকে আক্রমণের পরিবর্তিত সময় জানাবার জন্যে। তারপর আমরা দু'জন তিন-চার মিনিটের মধ্যে ডাক্তার জগদা বিশ্বাসের বাড়ি গিয়ে পৌঁছালাম। আমাদের ইচ্ছা ছিল তাঁর গাড়িটি চেয়ে নেব। চেয়েছিলাম, কিন্তু পাওয়া গেল না। আবার গণেশের বাড়িতে পূর্ণবেগে গাড়ি চালিয়ে এলাম। ছোট শহর, তাই গন্তব্যস্থল সব আধ মাইল থেকে তিন মাইলের মধ্যেই ছিল। গণেশ নিজ বাড়িতে রইল। আগেই বলেছি গণেশের বাড়ি বা দোকান আমাদের ফিল্ড্ হেডকোয়ার্টার। তা'ছাড়া এখান থেকেই পুলিশ লাইন আক্রমণকারী দলটি প্রস্তুত হয়ে বেরোবার কথা। তাই এখানে গণেশের থাকা প্রয়োজন ছিল।

গণেশকে বাসায় নামিয়ে দিয়েই আমি ছুটলাম মাস্টারদার কাছে। যে সব ছোট ছোট দলের সঙ্গে মাস্টারদার এখান থেকে সংযোগ রাখার ব্যবস্থা ছিল তাদের আক্রমণের সময় পরিবর্তনের কথা জানাবার জন্য সাইকেলযোগে লোক পাঠানো হ'ল। বলা বাহুল্য মাস্টারদাকে প্রথমেই গাড়ির বিভ্রাট জানিয়েছি এবং দু' ঘণ্টা পরে আক্রমণের 'জিরো-আওয়ার' ধার্য করতে যে বাধ্য হয়েছি তাও বলেছি। মাস্টারদা খুব চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"এই দু'ঘণ্টার মধ্যে তোরা পুলিশ লাইন আক্রমণ করতে যাওয়ার জন্য গাড়ি যোগাড় করতে পারবি? এই দু'ঘণ্টার মধ্যে যে ড্রাইভার সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আছে তার জ্ঞান ফিরে এলে সে কোন বিভ্রাট ঘটাবে না তো? সৈনিকের খাকি

দৃঢ়তায় ও দ্রুত পদচালনায়
বাটার খেলার জুতোর তুলনা নেই কেন?
বাটার খেলার জুতো সক্রিয় পদচালনারই সহায়, গতিশক্তি সঞ্চারক। অক্লেশে দ্রুত পদক্ষেপ এই জুতোর একমাত্র সন্ধান। এই পার্থক্য আপনি পায়ে দিয়েই বুঝতে পারবেন, অনুপম অনুভূতি। কোনো বাধা নেই, বিঘ্ন নেই, আছে শুধু সাবলীল পদসঞ্চালনের স্বাধীনতা। পায়ের আরাম আর স্বচ্ছন্দ চলন—এই অভিপ্রায়ে বাটার জুতোর বৈশিষ্ট্যগুলি দেখুন : কুশন্ আর্চ আর ইনসোল আকস্মিক আঘাত থেকে রক্ষা করে। ঘনবুনোট ক্যাম্বিসের আপার—ক্ষয়শীল সন্ধিস্থলে টেকসই বন্ধনী। ভারী বামপার টোগার্ড। আপার আর জুতোর তলির অভেদ্য বন্ধন। ঢালাই সোল আর হিল এমন কৌশলে তৈরি যা পারতপক্ষে হড়কাবে না। সব মিলিয়ে, নির্মাণে আর উপকরণে এমন সমর্থ সমাবেশ আর দেখা যায় না।
নিউ স্পীডি ৫.৭৫
Bata
স্টার
সেণ্টার কোর্ট ১২.৯৫

পোষাকে আমরা এতজন সশস্ত্র হয়ে শহরের চারিদিকে ছড়িয়ে আছি— দু' ঘন্টা বিলম্বের জন্য কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই তো?"

প্রশ্ন তিনটিই অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের মাথায়ও তা' ছিল। মাস্টারদার প্রশ্নের উত্তরে বললাম—

"ড্রাইভারের জ্ঞান ফিরে এলেও তার কোন থানায় যাওয়া—প্রাথমিক রিপোর্ট করা, তারপর উপর মহলের পুলিশ কর্তারা সব শোনবার পর অ্যাক্‌শন নেওয়ার বহু পূর্বেই আমরা আক্রমণ করতে পারব। আমাদের মধ্যে পুলিশের চর নেই বলেই মনে হয়। তাই খাকি পোষাকে শহরের চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকায় নতুন কোন বিপদের কারণ আছে বলে মনে হয় না। চট্টগ্রামের পুলিশ আমাদের সৈনিকের খাকি পোষাকে দেখতে অভ্যস্ত। দু'ঘন্টার মধ্যে একটি গাড়ি যোগাড় করতে পারব বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস— যদি কোনমতেই তা সম্ভব না হয় অগত্যা পায়ে হেঁটে গিয়েই আমরা 'জিরো-আওয়ারে' পুলিশ লাইন আক্রমণ করে অধিকার করব।"

মনে হতে পারে পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী আটটায় আক্রমণ না করে দু'টি ঘন্টা স্থগিত রাখবার মধ্যে যখন এইরূপ সমস্যা ও অনিশ্চয়তার কারণ ছিল তখন পূর্ব-নির্ধারিত সময় পরিবর্তন না করলে কি হোত? যদি এই দু'ঘন্টার মধ্যে আমরা একখানা মোটর গাড়ি যোগাড় করতে না পারতাম তবে আমাদের পদব্রজে গিয়ে পুলিশ লাইন আক্রমণ করাই তো সাব্যস্ত হ'ল। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভাবলে এটাই কি অধিক শ্রেয় মনে হবে না যে, আশংকা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে আরও দু' ঘন্টা সময় অতিবাহিত না করে প্রথমেই স্থির করা উচিত ছিল যে পুলিশ লাইনের দলটি পদব্রজে আক্রমণ করতে যাবে এবং 'জিরো-আওয়ার' অপরিবর্তিত থাকবে?

ঝটিকাবেগে সব প্রধান শত্রুঘাঁটি গুলি একযোগে অধিকার করে নেওয়ার স্ট্রাটেজী অনুসারে পুলিশ লাইন দখল করা সর্বপ্রধান কাজ ছিল। কোন একটি প্রধান ঘাঁটি, বিশেষ করে পুলিশ লাইন, যদি প্রথম চোটেই নিমেষে অধিকার করা না যায় তবে সার্বিক জয়ের সম্ভাবনায় পুরোমাত্রায় অনিশ্চয়তা থাকে। পাহারায় নিযুক্ত প্রহরীদের কিছু বোঝা বা ভেবে ঠিক করবার আগেই তাদের খুব নিকটে গিয়ে surprise attack (বিস্মিত করে আক্রমণ) করা গেলে জয় সুনিশ্চিত বলে জানতাম। আক্রমণকারীদের সংগে একখানি মোটরগাড়ি থাকলে প্রহরীদের সন্দেহ উদ্রেক না করেই তাদের খুব কাছে রিভলভারের পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জের মধ্যে গিয়ে পেঁছান সম্ভব ছিল। এই সম্বন্ধে হিসেব করে স্পষ্ট বুঝেছিলাম যে দু' ঘন্টা বিলম্বে ততখানি আশংকা বা অনিশ্চয়তা নেই যতখানি অনিশ্চয়তা আছে যদি অনেক দূর থেকে আমাদের প্রতি প্রহরীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

দ্বিতীয়ত এই দু'টি ঘন্টার মধ্যে কোন অবাস্তব আশংকার প্রতিচ্ছবি আমাদের কাউকে সেইরূপভাবে বিচলিত করে নি। আমরা সুনিশ্চিতভাবে জানতাম যে যদি আমাদের মধ্যে পুলিশের চর থাকত তবে তা'রা ইতিমধ্যে আমাদের ধরবার চেষ্টা করত; আর না হলে সময়মত করবেই। তাই অহেতুক ভাবব কেন? মোট কথা পুলিশের চর না থাকলে কোন ভয় নেই—কারণ, পুলিশ আমাদের এইরূপ গতিবিধি ইতিপূর্বে বহু দেখেছে।

সংজ্ঞাহীন ড্রাইভার চেতনা ফিরে পেয়ে খবর দেওয়ার পর আমাদের বিরুদ্ধে পুলিশের অ্যাক্‌শন আরম্ভ করতে অনেক ঘন্টা অতিবাহিত হয়ে যাবে তার আগেই আমরা আক্রমণ সুরু করতে পারব, সেইরূপ বাস্তব ধারণা না থাকলে আমরা কখনও দু'ঘন্টা দেরি করবার সিদ্ধান্ত নিতাম না। আমাদের সেই ধারণা ও হিসেব যে ভুল ছিল না তা সরকারী পক্ষের সাক্ষীদের মুখের কথা থেকে জানা যায়। আমাদের মামলার মুদ্রিত জাজ্‌মেন্টের ৪২ ও ৪৩ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত করছি—

"Ahamadur Rahaman alias Ahamad (P. W. 18), taxi driver was employed at that time as driver of taxi No. 21929 . . . . . . Three of them (Loknath and others) got down, went to the roadside, remained there for a few minutes and then coming back to the car, two of them pointed pistols at him and ordered him to get down from the car. As he did not comply at once, one of them, a stout man with a fair complexion pulled him out of the car. They then dragged him into the paddy field close by and there some cotton was pressed over his month and nose and he became unconscious.. . . . That same night Tazu Mia (P. W. 29) was returning along the road from his father-in-law's house when between Faujdarhat and Fakirhat, he heard a sound as of some one groaning in the field by the roadside . . . . . he found Ahamadur Rahaman lying groaning beside a patch of jungle . . . . . His taxi was nowhere to be seen. Tazu Mia fetched a taxi from Idgaon and placing him in it drove to the General Hospital.......... About 3-45 a.m. the subdivisional officer (P. W. 142) came to the hospital and recorded his statement . . . ."

ওপরের বিবরণ থেকে জানা যায় ২১৯২৯ নম্বরের ট্যাক্সি ড্রাইভার আহমদুর রহমানকে অজ্ঞান করে তার ট্যাক্সি নিয়ে লোকনাথরা চলে এসেছে।........ আরোহী তিনজন নেমে রাস্তার ধারে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর আবার গাড়ির দিকে ফিরে আসেন। তাঁদের মধ্যে দু'জন তার (ড্রাইভারের) দিকে দুটি পিস্তল লক্ষ্য করে আদেশ দেয় গাড়ি থেকে নেমে আসতে। ড্রাইভার তক্ষুণি নামতে ইতস্তত করছিল বলে একজন গৌরবর্ণ বলিষ্ঠ ব্যক্তি তার হাত ধরে গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে আনে। তারপর ড্রাইভারকে ধানক্ষেতে নিয়ে গিয়ে তার নাকে-মুখে তুলো চেপে ধরে এবং তা'তে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে।........ সেইদিন রাত্রে জনাব তজু মিঞা সেই রাস্তা ধরে তাঁর শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরছিলেন। যখন তিনি ফৌজদারহাট ও ফকিরহাটের মধ্যে রাস্তা অতিক্রম করছিলেন তখন পথের ধারে ধানক্ষেতের মধ্যে একজন লোকের গোঁঙানি শুনতে পান। তিনি আহমদুর রহমানকে একটি জংগলা জায়গার আড়ালে পড়ে থেকে গোঁঙাতে দেখতে পান। .... তাঁর ট্যাক্সিটি অবশ্য কাছে-পিঠে কোথাও দেখতে পান নি।........ তজু মিঞা ঈদ্‌গাঁও থেকে ট্যাক্সি আনেন এবং তা'তে করে ড্রাইভার সাহেবকে জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসেন।........ ভোর রাত্রে ৩-৪৫ মিনিটের সময় S. D. O. এসে তাঁর (ড্রাইভারের)জবানবন্দী গ্রহণ করেন।

এই বিশেষ একটিমাত্র ড্রাইভারের ক্ষেত্রে বাস্তবে প্রমাণ হয়েছে যে, আমাদের হিসেবে ভুল হয় নি—ড্রাইভারের কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে দু'ঘন্টার মধ্যে আমাদের বিরুদ্ধে কোন অ্যাক্‌শন নেওয়া পুলিশের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ওপরের তথ্য থেকে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে—জোর করে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে

বেঁধে রেখে গাড়ি যোগাড় করতে কেন আমরা ইতস্তত করেছি। পথের ধারে গোঁঙানি শুনে একজন পথচারী সংজ্ঞা-হীন ড্রাইভারকে উদ্ধার করেছে। আক্রমণকারী ছোট্ট তিনটি দলের জন্য ইউ-রোপীয়ান ক্লাব, টেলিফোন-এক্সচেঞ্জ ও পুলিশ লাইন আক্রমণের ব্যাপারে যদি আরও তিনটি মোটরচালককে অজ্ঞান ও বন্দী করে রাখতে হোত তবে অনেক বেশি অনিশ্চয়তার মধ্যে যে আমরা থাকতাম তা'তে কোন সন্দেহ নেই। তা'ছাড়া আমাদের মধ্যে অনেকেই একেবারে অনভিজ্ঞ ছিল তাদের এই প্রথম হাতে-খড়ি, সেই-জন্য প্রাথমিক কাজ—একজন নিরীহ ড্রাই-ভারকে বেঁধে রাখার মধ্যেও যে অনেক অঘটন ঘটতে পারে তা' ভেবেই আমরা ১৮ই এপ্রিলের সকালে টেলিফোন অফিস আক্রমণকারীদের জন্য একখানা নতুন শেভ্রোলে গাড়ি কিনে ফেলি নিজেদের বেবী অস্টিনটি ক্লাব হাউস আক্রমণকারী-দের মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র বহন করার জন্য দেওয়া হ'ল এবং আক্রমণকারী প্রায় সবাই পায়ে হেঁটেই সেখানে যাবে স্থির হয়—তবু বলপূর্বক ট্যাক্সি না নেওয়াই যুক্তি-সঙ্গত মনে করি। এই একই কারণে পুলিশ লাইন দখল করতে যাওয়ার জন্যও জোর করে ট্যাক্সি হস্তগত করায় আমাদের আপত্তি ছিল।

যে ট্যাক্সিচালককে বেঁধে রেখে লোক-নাথ মোটরটি হস্তগত করেছিল, অনভিজ্ঞ-তার জন্য সেই ড্রাইভারটির জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হয়—"His legs were tied together, his hands were tied behind his back, and his face and head were wrapped in cloth, kept in position by rope tied round it. . . . . . There the Assistant Surgeon (P. W. 147) examined Ahamadur and found him suffering from facial injuries caused by some corrosive substance such as chloroform when used in quantity and concentrated form . . . ." (P. 43-Judgement in Armoury Raid Case No. I of 1930).

ড্রাইভারের হাত, পা ও মুখ বাঁধা ছিল, কাপড় দিয়ে মাথা সমেত সমস্ত মুখ ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। খুব ঘনীভূত ক্লোরোফরম ব্যবহার করা হয়েছিল বলে ড্রাইভারের মুখ জায়গায় জায়গায় পুড়ে গিয়েছিল।

ক্লোরোফরম করা যদি অত সহজ ব্যাপারই হয় তবে ডাক্তারি শাস্ত্রে anaesthetic সম্বন্ধে ছ'মাস বা এক বছরের শিক্ষণ ব্যবস্থা থাকত না। কারও ওপর জোর করে ক্লোরোফরম ব্যবহার করার পদ্ধতি সম্বন্ধে মাত্র দু'একদিন সামান্য শিক্ষা দেওয়ার আয়োজন আমরা করি। আমাদের অনভিজ্ঞতার জন্য বেচারী ড্রাইভার অনেক কষ্ট পেয়েছে— এমন কি তার জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হয়েছে। জনাব আহমদুর রহমান বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর চর নন—তিনি একজন নিরীহ গরীব ড্রাইভার। স্বাধীনতা যুদ্ধে কর্ত-ব্যের খাতিরে নিরীহ গরীব ড্রাইভারকেও আমাদের বেঁধে রাখতে হ'ল। জনাব আহমদুর রহমান স্বেচ্ছায় আমাদের সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগ দিতেন কিনা জানি না—তাঁকে সেই সুযোগ দিয়ে পরীক্ষা করা হয় নি। তবে আজ আমাদের অকপটে স্বীকার করতে হবে জনাব আহমদুর রহমান আমাদেরই একজন সাথী—স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁর পরোক্ষ দানকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। তাঁর কাছে কর্তব্যের খাতিরে আমরা অপরাধী। তিনি বাস্তব সত্য উপ-লব্ধি করে নিশ্চয়ই আমাদের ক্ষমা করে-ছেন। আহমদুর রহমানের স্বাধীনতা যুদ্ধে পরোক্ষ অবদানকে আমরা অস্বী-কার করব না— শ্রদ্ধার চোখে দেখব।

আমার লেখা পড়ে মনে হবে খাকি সামরিক পোষাকের ওপর আমাদের বেশ মোহ ছিল। ইউনিফর্মের প্রতি মোহ বা আসক্তি কতখানি ছিল তা' বলতে পারি না তবে আমাদের সামরিক বেশ পরতে খুব ভাল লাগত। আর শুধু এইটুকুই বলতে চাইছি—যুবকদের মধ্যে সামরিক খাকি পোষাকের প্রচলন ভাবী যুব-বিদ্রোহের প্রয়োজনে অপরিহার্য বলে আমরা মনে করেছিলাম। ১৯২৮ সালে জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের সময় বাংলার প্রবীণ বিপ্লবী নেতারা সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে কংগ্রেসের ইতিহাসে, বিশেষ করে গান্ধীজীর অহিংস কংগ্রেসের নেতৃত্বের প্রভাবের বিরুদ্ধে সেই প্রথম বৃটিশ সামরিক বেশে সুসজ্জিত স্বেচ্ছা-সেবক বাহিনী তৈরি করেন। ভারতের যুবকেরা সেই খাকি সামরিক পোষাক পরিহিত ভলান্টিয়ারদের দৃষ্টান্ত দেখে সুসংগঠিত ভারতীয় গণতন্ত্র বাহিনী গড়ে তুলুক—সুভাষচন্দ্র ও প্রবীণ বিপ্লবী নেতাদের সেই অভিলাষই ছিল। সূর্য সেনের নেতৃত্বে ভারতীয় গণতন্ত্র বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার যুবকেরা সামরিক কায়দায় ও পোষাকে সুসজ্জিত হয়ে গঠিত হয়। আমরা চেয়েছিলাম গণ-তন্ত্রী বাহিনী সারা ভারতে যেন আমাদের দৃষ্টান্তে গড়ে ওঠে এবং তাদের সামরিক পোষাক ও সামরিক শিক্ষার একটি অভিন্ন প্রোগ্রাম যেন সারা ভারতের যুবকদের মধ্যে প্রচলিত হয়।

কলকাতা কংগ্রেসের সময় সামরিক পোষাকে ও শিক্ষায় যে ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠিত হয়, যুবসমাজের মধ্যে তার একটা mass effect ছিল। কিন্তু সারা ভারতে যুবকদের মধ্যে সশস্ত্র সংগ্রামের চেতনা আনবার জন্য আমরা মনে করেছিলাম যে যুব-বিদ্রোহের জন্য কেবল সামরিক পোষাক নয় তার সঙ্গে একটি সশস্ত্র বাহিনী এবং সেই উদ্দেশ্যে সারা ভারতে সশস্ত্র গণতন্ত্র বাহিনী গঠন করার জন্য একটি বাস্তব দৃষ্টান্তের প্রয়োজন। কেবল প্রাণ দান করলেই সেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যাবে না। বৃটিশ সরকারের শাসন ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে সশস্ত্র গণতন্ত্র বাহিনী গড়ে তুলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সৈন্যের সঙ্গে যে যুদ্ধ করা যায়— সেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করার প্রয়ো-জন মহানায়ক সূর্য সেন সেই যুগে ভেবেছিলেন। কাজেই শুধু মোহ নয়— প্রয়োজনবোধেই সৈনিকের বেশে সজ্জিত হওয়া ও সেই বেশে সামরিক কায়দায় সংঘবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে মৃত্যু বরণ করা আমাদের কাম্য ছিল।

আর একটি বিষয়ও উপলব্ধি করে বুঝতে হবে, আক্রমণ করতে যাওয়ার আগে যদি সৈনিকের বেশে সজ্জিত হওয়া যায় তাতে নিজের মনেও জোর আসে। আজ আমি খুব নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, আমার বাবা-মা আমাকে সামরিক বেশে দেখতে পেয়েছিলেন বলে তাঁদের অন্তরে অত জোর পেয়েছিলেন—অনু-প্রাণিত হয়েছিলেন।

সমর-বিজ্ঞান বা বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের বিস্তারিত ইতিহাস আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায়, সার্বিক প্ল্যানের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন পরিবর্তন হয়েছে। সমর-বিজ্ঞানের এই শিক্ষা যে যত বেশি করে নিজের চিন্তা দিয়ে বুঝতে পারবে সঙ্কট মুহূর্তে সেই তত বেশি নেতৃত্ব দেওয়ার উপযুক্ত বলে গণ্য হবে। সমর-বিজ্ঞান বা বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের ইতিহাস যদি বাদও দিই তবু জীবনের সামান্য অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছিলাম সার্বিক প্ল্যানের কিছু না কিছু শেষ মুহূর্তে রদবদল হওয়া খুব স্বাভাবিক। পরোই-কোরাস্তাক্যাতি করতে যাওয়ার সময় আমাদের সম্বল ভরসাস্থল, সেই বৃহদাকার বলিষ্ঠ যুবক বন্ধু আর এলেন না। তারপর বাড়ির মধ্যে ঠিক ঢোকার মুখে প্রেমানন্দের পকেট থেকে পটকা মাটিতে পড়ে সশব্দে ফেটে গিয়ে সমস্ত গ্রামের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে/ও প্রেমানন্দ আহত হয়। রেল কোম্পানীর টাকা লুঠ করবার সময় নির্মলদা উপস্থিত হতে পারলেন

মা' যখন গাড়ি থামিয়ে অ্যাক্‌শন আরম্ভ করি তখনও প্ল্যান অনুযায়ী রাজেন দাস ও অবনী এসে পৌঁছায় নি। গাড়ি যখন বাঁক ঘুরে চলেছে তখন তারা লাফ দিয়ে চলন্ত গাড়িতে উঠল। এরকম যদি আলোচনা করি তবে দেখতে পাব প্রায় সব অ্যাক্‌শনই একেবারে নিখুঁতভাবে প্ল্যান অনুযায়ী হয় নি। এখন লিখতে গিয়ে আবার মনে পড়ছে যদি দেবেন দের (খোকার) পোষাকে আগুন লাগার জন্য গোপীনাথ ও আমার প্রতি তালতলার বাড়িতে ফিরে যাবার আদেশ দেওয়া না হোত তবে হয়ত বা স্যার্ চার্লস টেগার্ট বাংলার বিপ্লবীদের উপহাস করে বহাল তবিয়তে ইংলণ্ডে ফিরে যেতে পারতো না।

আমাদের সার্বিক প্ল্যানের বিপুল আয়োজনের তুলনায় একটি গাড়ি সময় মত না পাওয়া কতখানি গুরুতর সমস্যা তার মাত্রা নির্ভর করে কতখানি তৎপরতা সাহস ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে আমরা সংকট মুহূর্তে নির্দেশ দিতে পেরেছিলাম। পুলিশ-লাইনে যাওয়ার জন্য সময় মত গাড়ি না পাওয়া আমাদের পক্ষে অত্যন্ত আশঙ্কাজনক সমস্যা—কোনমতেই তা' হওয়া উচিত ছিল না। এইটি যেমন শিক্ষণীয় জিনিষ, এর চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষনীয়, যদি আমরা বুঝতে পারি সামরিক নেতৃত্ব দাবি করে যেন ভর না পেয়ে সমস্যার সমাধানের জন্য হাজার গুণ বেশি সক্রিয়ভাবে অনুপ্রাণিত হওয়া প্রয়োজন।

গুরুতর দায়িত্ব ফিল্ড্ মার্শাল গণেশ ঘোষ নিয়েছিলেন—সমস্ত দলগুলিকে জিরো-আওয়ারটি সময় মত অবগত করাবার আর এই সময়ের মধ্যে যে কোন উপায়ে একটি গাড়ি যোগাড় করবার। অন্তরের মধ্যে গর্জন করে উঠেছিল—Impossible is the word found in the Dictionary of fools. সব দলকে খবর পাঠানো হবেই। গাড়ি যোগাড় হবেই। কেউ আমাদের রুখতে পারবে না। সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে আমরা সংকট মুহূর্তের সম্মুখীন হয়েছি—বিপ্লবী নেতৃত্ব এই দাবিই করে।

মাস্টারদার সঙ্গে কংগ্রেস অফিসেও দু-তিন মিনিটের বেশি কথা হয় নি। যাকে যাকে বা যেসব গ্রুপকে দু'ঘণ্টা সময় পিছিয়ে দেবার সংবাদ পাঠাবার কথা ছিল মাস্টারদা তাদের সবার কাছে তড়িৎবেগে বিশেষ বিশেষ ছেলেদের পাঠালেন। গণেশ লোকনাথদের সঙ্গে ৭-৩০ মিনিটের সময় ফাইনাল চেক্‌আপ করার দু'মিনিট আগে ক্লাব আক্রমণকারী গ্রুপের হেপাজতে বেবী অস্টিনটি দিয়ে দেয়। দু' ঘণ্টা পর, দশটার সময় আমি আর গণেশ আক্রমণ করবার নির্দেশ জানিয়ে শেভ্রোলে গাড়ি করে লোকনাথদের সঙ্গে দেখা করতে যাই। লোকনাথদের নতুন পরিস্থিতি জানিয়ে অনুরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়—দশটার সময় আক্রমণ করবার জন্য। সেখান থেকে গণেশের বাড়ি আমরা ৭-৩৫ মিনিটে এসে পৌঁছাই। এক মিনিটের মধ্যে সাইকেল দিয়ে বার্তাবাহকদের ডেস্‌প্যাচ করা হয়। তারপর ডাক্তার জগদাবাবুর বাসায় গণেশ ও আমি প্রায় ৭-৪০ মিনিটের সময় তাঁর গাড়িটি পাওয়ার আশায় যাই। সেখানে গাড়ি না পেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে শেভ্রোলে নিয়ে ছুটলাম। গণেশকে বাড়িতে নামিয়ে মাস্টারদার ওখানে ৭-৪৫ মিনিটে গিয়ে পৌঁছাই। কথা ছিল শেভ্রোলে গাড়ি ও আমাদের পুলিশ-লাইন আক্রমণকারীদের আর একটি গাড়ি—হয় হেরম্ব বলের ডজ্ বা মাখনদের এসাক্স গাড়ি—আমাদের সঙ্গে থাকবে। পূর্ব নির্ধারিত আটটার পাঁচ মিনিট আগে অম্বিকাদারা টেলিফোন অফিস আক্রমণ করবে স্থির ছিল। সেইজন্য তাদের ৭-৫০ মিনিটের সময় শেভ্রোলে গাড়িটি আনন্দ গুপ্তের জিম্মায় ছেড়ে দিয়ে আমাদের দল ডজ্ গাড়ি করে পুলিশ-লাইনের দিকে অগ্রসর হবে—এইরূপ ব্যবস্থাই করে রাখি। আগে বহুবার আমরা রিহার্সেল দিয়ে মিলন স্থানগুলি ও বিশেষ বিশেষ গতিপথ চিহ্নিত করে রেখেছিলাম। সেই হিসেবে আনন্দের বাড়ি আমি শেভ্রোলে গাড়ি নিয়ে পৌঁছালাম। পূর্বের প্ল্যান অনুযায়ী পেছনে পেছনে ডজ্ বা এসাক্স গাড়ির থাকবার কথা। কিন্তু প্ল্যান পরিবর্তন হওয়ার জন্য আমি একা আনন্দকে শেভ্রোলে গাড়িটি দিতে ও জানাতে এসেছি ৯-৫৫ মিনিটের সময় তারা টেলিফোন অফিস ধ্বংস করবে।

অম্বিকাদারা বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও পেট্রোল প্রভৃতি নিয়ে টেলিফোন অফিসের পেছনে খুব কাছে গোপনে অপেক্ষা করছিলেন। আনন্দ তার বাড়িতেই ছিল। আমি গাড়ি নিয়ে গেলেই সে গোটা দুই স্লেজ্ হ্যামার নিয়ে গাড়িতে উঠবে। আনন্দ যখন আমাকে একা একটি গাড়িতে আসতে দেখল তখন সে অবাক হয়ে প্রশ্ন করে—"আপনি ফিরবেন কিভাবে?"

সময় অতি সংক্ষেপ, তাই খুব তাড়াতাড়ি আমাদের নতুন নির্দেশের কথা তাকে বললাম—তাদের টেলিফোন অফিস বিধ্বস্ত করতে হবে রাত ৯-৫৫ মিনিটের সময়। আনন্দ, তাদের পড়ার ঘর থেকে বড় বড় দুটি হাতুড়ি নিয়ে আসতে গেল। তাকে সাহায্য করতে আমিও একটু এগিয়ে গেলাম। আনন্দের বাড়ি একটি ছোট টিলার ওপর। এই টিলাটির ওপর ওঠার জন্য কয়েকটি বড় বড় ধাপে ছোট ছোট সিঁড়ি ছিল। আমি তাদের বাড়ির সর্ব উচ্চ ধাপের নিচে দাঁড়িয়েছিলাম—দশবারোটি সিঁড়ি উঠলে তবে তাদের বাড়ির বড় উঠানে আসা যায়।

অপ্রত্যাশিতভাবে মাসীমা ও দিদি (আনন্দের মা ও দিদি) আমাকে দেখে ফেললেন। মাসীমা ও দিদি যেন খুব অস্থির চঞ্চল হয়ে পায়চারী করছেন! দেখা মাত্রই মাসীমা আমাকে ডাকলেন। চিন্তা উৎকণ্ঠা ও আশংকা মেশানো তাঁর কণ্ঠস্বর। মনে হ'ল ইতিমধ্যে কিছু একটা ঘটেছে। 'কি তা' আমার অনুমান করবার আগেই মাসীমা আমাকে ডাকলেন—

"অনন্ত শীগ্‌গির ওপরে এসো।"

আমি কালবিলম্ব না করে উঠোনের দিকে গেলাম। মাসীমার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। দিদিও (জ্যোৎস্না দিদি—আনন্দের ছোট্‌দি) মাসীমার সঙ্গে সেখানে উপস্থিত। আমাকে ইতিপূর্বে অনেকবার তাঁরা খাকি পোশাকে দেখেছেন। আজকের পূর্ণ-জেনারেলের পোশাকে—কটিদেশে তরবারি নিয়ে দেখেছেন কিনা মনে নেই। ডানপাশে চামড়ার পিস্তল রাখবার হোল্‌স্টারে পিস্তল ছিল—তা' তাঁদের দৃষ্টি তখনও আকর্ষণ করেছিল কি না জানি না। আমার বুকের ওপর ইণ্ডিয়ান রিপাব্‌লিকান আর্মির আজকের বিশেষ চিহ্ন, সেই জরীর কাজ করা ভেলভেটের ব্যাজ, তাঁদের চোখে যে পড়েছে তাতে সন্দেহ নেই। ভীতি-বিহ্বল দৃষ্টিতে তাঁরা আমার দিকে তাকালেন। এই সময়ে এইরূপ পোশাকে আমাকে দেখে যেন তাঁরা আরও ত্রস্ত, আরও শঙ্কিত হলেন। কম্পিতকণ্ঠে মাসীমা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—

"অনন্ত, খোকা (শহীদ দেবপ্রসাদ গুপ্ত—আনন্দের বড় ভাই) আমাকে বলে গেল সে দিন সাতেকের জন্য বাইরে বেড়াতে যাচ্ছে। খাকি মিলিটারী পোশাক পরে সে বেরিয়ে গেল। কোথায় সে

'জুবিলি চা'

তাজা ও সেরা। একবার খেয়ে দেখুন।

৪৫নং ফ্রী স্কুল স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ (পার্ক স্ট্রীট থেকে মাত্র ৩ মিনিটের পথ)।

"গেল?" মায়ের মন তাঁর পুত্রের কোন অনিশ্চিত অমঙ্গল আশঙ্কায় অধীর চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আমার জবাব পাওয়ার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়েছেন—"বল, বল অনন্ত খোকা কোথায় গেছে?"

কঠিন প্রশ্ন! মাসীমাকে সরাসরি মিথ্যা বলতে পারছিলাম না। তবু নিজেকে সামলে নিয়ে উত্তরটি এইভাবে দিলাম—"তাই নাকি? দেবু তো আমাকে বলে নি সে কোথায় যাচ্ছে! তার সঙ্গে তো আজ সকালেও আমার দেখা হয়েছে।" মাসীমা ও দিদি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা শুনছিলেন। তাঁরা বেশ বুঝতে পারছিলেন যে আমি সত্যি বলছি না। আমার কথার এক বর্ণও তাঁরা বিশ্বাস করেন নি। মাসীমা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে আবার বললেন—"খোকা যাওয়ার সময় প্রণাম করে গেল! বলে গেল—'মা তুমি কিছু ভেবো না, ছোট্‌কোন্‌ তো রইল! অনন্ত, আমি বড় ব্যাকুল হয়েছি—বল খোকা কোথায় গেল?" ছোট্‌কোন্‌, আনন্দ ও দেবুর ছোট ভাই। তখন তার বয়স আট-নয় বছর হবে।

কি জবাব দেব! মাকে দিদিকে কি বলে সান্ত্বনা দেব? ভেবেছিলাম বলি—বীর জননী তুমি, তোমার পুত্রকে আশীর্বাদ কর, আমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাও—আমরা যেন ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হই! মাসীমার কাছে খুলে বলা চলে না—সহ্য করতে পারবেন না। তাঁদের প্রবোধ দেওয়ার জন্য আবার মিথ্যা বললাম—

"আপনাকে যখন বলেছে সাতদিনের মধ্যে ঘুরে আসবে তখন দেবু নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। ভাবছেন কেন? আমি খোঁজ নিয়ে আপনাকে কাল জানাব।" মাকে মিথ্যা বলে সান্ত্বনা দেবার এ আমার ব্যর্থ প্রয়াস! তাঁর মন কিছুতেই মানছিল না যে আমি সত্যি কথা বলছি। একটার পর একটা আশঙ্কার চিহ্ন তাঁর চোখে পড়েছে—দেবু হঠাৎ বলে সাতদিনের জন্য বিদায় নিয়ে চলে গেল। তারপর এই অসময়ে রণবেশে আমাকে দেখলেন। তার আগে থেকে আনন্দ সামরিক পোশাকে সজ্জিত হয়ে আমার অপেক্ষায় ছিল, বুঝতে পারলেন। এইরূপ অবস্থায় আমরা যে সবটাই তাঁদের কাছে গোপন করছি তা তাঁরা খুব সহজেই অনুমান করতে পারছিলেন। মাসীমা আমাকে আরও জটিল প্রশ্ন করলেন—

"টুনু (আনন্দ) যাচ্ছে কোথায়? সে কেন এই অসময়ে মিলিটারী পোশাক পরেছে? তুমিই বা কেন এই অসময়ে সামরিক পোশাকে এখানে এসেছ? টুনু কেন বল্‌ল্‌ যে আজ রাত্রে বাড়ি ফিরবে না? বল—আমাকে সত্যি করে বল। তোমাদের জীবনের কোন আশঙ্কা নেই তো?" বলতে বলতে মাসীমার কণ্ঠরোধ হয়ে আসছিল। আমার অবস্থা খুবই সঙ্গীন। মায়ের আকুল মন পুত্রের কুশল সংবাদ চাইছে—তাদের জীবনের কোন আশঙ্কা নেই তো? কি বলতে পারি? আমি স্থির অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ছোড়দি খুব উষ্মা ও অভিমান নিয়ে অভিযোগ জানালেন—"এ তোমাদের খুব অন্যায়। তোমরা বাড়ির দুটি ছেলেকেই এইভাবে কোথায় নিয়ে চলেছ? বাবা-মা'র মুখের দিকে একবারও চাইলে না?" এই তিরস্কারের কি উত্তর আমি দিতে পারি! আমরা একটি ভাইকেই চেয়েছিলাম। কিন্তু দুই ভাই-ই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে আমাদের জানিয়েছিল যে, তারা উভয়েই অ্যাক্‌শনে অংশ গ্রহণ করবে—তাদের কাউকে বাদ দেবার অধিকার আমাদের নেই। আমি চুপ করেছিলাম। জানতাম কোন সান্ত্বনাই কাজে আসবে না। ভাবছিলাম তাঁরা কতটুকু আন্দাজ করতে পারছেন—কি করে দিদি ঐসব কথা বললেন—দুই ভাইকে নেওয়া আমাদের উচিত হয় নি? লিখতে সময় লাগছে—এই সবটুকু ঘটেছে দু'মিনিটের মধ্যে। আমি যে এক অসহায় অবস্থার মধ্যে ছিলাম তা আনন্দ বুঝতে পারছিল। আমার পক্ষে আর দাঁড়ানো সম্ভব হচ্ছিল না। মাসীমা শেষবারের মত কাতরকণ্ঠে আমাকে আবেদন জানালেন, অনুনয় করলেন, ভিক্ষা চাইলেন—"অনন্ত, দুটি সন্তানকে আমার বুক থেকে কেড়ে নিও না! টুনু এখনও খুব ছোট—অন্তত তাকে আমার কাছে দিয়ে যাও'" মাসীমা আর বলতে পারলেন না। জলে দু'চোখ তাঁর ভরে গেল। নিজেকে আমি আর সংবরণ করতে পারছিলাম না। আমার বাবা মা দাদা দিদি ও বৌদিকে ঘণ্টা দুই আগে প্রণাম করে এসেছি—তাদের কাছ থেকে চিরকালের জন্য বিদায় নিয়ে এসেছি! আবার এখানে এমনি একটি অবস্থায় পড়ব তা' ভাবি নি। ভাবাবেগে আমার চোখেও জল এল। মনে মনে মাসীমা ও দিদির কাছে ক্ষমা চাইছিলাম। এমন সময় আমাকে রক্ষা করল আনন্দ। সে নিচে থেকে জোরে জোরে আমাকে ডাকতে লাগল—দেরি হচ্ছে, শিগ্‌গির আসুন।" সেই সুযোগে এই করুণ দৃশ্যের সমাপ্তি ঘটালাম। "মাসীমা, দিদি—তবে আসি"—এই বলে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলাম। মাসীমা করুণ আর্তনাদ করে বললেন—"অনন্ত, আমার দু'টি ছেলের মঙ্গলামঙ্গলের সব দায়িত্ব তোমার ওপর রইল। আশীর্বাদ করি তোমরা অক্ষত দেহে দীর্ঘজীবী হও!" দূর থেকে একবার বল্‌লাম—"মাসীমা আপনার আশীর্বাদ কখনও বিফল হবে না!"

আমি দ্রুত গিয়ে গাড়িতে উঠলাম। আমার পাশে আনন্দ। তখনও আমার চোখ ছল্‌ছল্‌ করছে। মুখে কোন কথা ছিল না—আমি তখনও মাসীমা ও দিদির করুণ আবেদনের কথা ভাবছিলাম—'অনন্ত একজনকে আমাদের কাছে রেখে যেও।'

আনন্দ তখন আমাকে তিরস্কার করে বলল—"কি! আপনার চোখে জল? দু'ঘণ্টার মধ্যে না আপনার গাড়ি যোগাড় করতে হবে? কত কাজ—এখন কি আপনার চোখে জল শোভা পায়?" আমাদের তরুণ সাথীরা এইরূপ দৃঢ়প্রকৃতির বিপ্লবী ছিল। আনন্দ প্রায়ই নজরুলের সেই বিখ্যাত কবিতাটি আবৃত্তি করত—এখন এই আবহাওয়ার পরিবর্তন করবার জন্য জোরে জোরে সেই কবিতাটি আবৃত্তি করে আমাকে শোনাতে লাগল—

> দুর্গম গিরি, কান্তার মরু দুস্তর পারাবার,
> লঙ্ঘিতে হ'বে রাত্রি নিশিথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার ... ...

আনন্দের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমার অন্তর গর্জন করে উঠল—"There shall be no Alps!"

(ক্রমশঃ)

চিত্রাঙ্কন শিখিবার বই
কে আর্টস
ড্রইং বুক
বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত
আজেলো পাবলিশার্স
১৪ নং রঘুনাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-১

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

দিলালি

আগেই বলেছি নবনাট্যমন্দিরের যুগেই আমার শিশিরকুমারের সঙ্গে আলাপ—ক্রমে সে আলাপ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। এ সময় থেকেই শিশিরবাবু পড়াশুনা বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট গাইড করেছেন। তাঁর নিজের পুস্তকাগার থেকে অনেক বই আমাকে পড়তে দিয়েছেন এবং আমার পড়া হয়ে গেলে সে সব বই নিয়ে আলোচনা করেছেন। ওঁরই লাইব্রেরী থেকে নিয়ে আমি জার্মান নাট্যকার হাউপ্টমানের এবং স্প্যানিশ নাট্যকার জাসিন্তো বেনাভেন্তোর নাটকগুলি পড়ি। কোরথোপের হিস্ট্রি অভ্ ইংলিশ পোয়েট্রির ভল্যুমগুলো শিশিরবাবুই আমাকে পড়তে বলেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী থেকে নিয়ে এ বইগুলো পড়বার সুযোগ আমার হয়। এই সময়েই পিরানদেল্লোর সিক্স ক্যারেকটার্স প্রভৃতি নাটকগুলোও শিশিরকুমার আমাকে ভালভাবে অধ্যয়ন করতে বলেন। রীতিমত নাটকে পিরানদেল্লোর টেকনিকের অনুকরণেই দর্শকদের সঙ্গে অভিনেতাদের ইণ্টিমেট হবার পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলেন নাট্যাচার্য। অবশ্য এর অনেক আগেও কবিগুরুর শেষরক্ষা নাটকে তিনি অভিনেতা এবং দর্শকদের একসঙ্গে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন শেষদৃশ্যে।।

নবনাট্যমন্দিরের আমলে শিশিরকুমার যে সব নতুন নাটক করেছিলেন তার ভেতর 'বিরাজ বৌ', 'বিজয়া', 'রীতিমত নাটক', 'যোগাযোগ' প্রভৃতি সত্যিকার মনোমুগ্ধকর নাটক। শিশিরকুমারের কাছ থেকেই শুনেছি যে চার্লস গার্ভিসের একটি উপন্যাস থেকেই দত্তার মূল কাহিনী নেওয়া হয়েছিল। তিনি আমাকে বলেছিলেন কবিগুরু ডাকঘরের সঙ্গে হাউপ্টমানের হানেল নাটকের কোথায় যেন একটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে যখন সাঙ্কেতিকতা সম্বন্ধে লিখতে শুরু করি তখন সত্যিকার সাহায্য এক নাট্যাচার্যের কাছ থেকেই পেয়েছিলাম। এ বিষয়ে আমার পরিচিত বিদগ্ধ ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করে বিশেষ কোন সুফল লাভ হয় নি। নাট্যাচার্যই আমাকে একদিন বলেছিলেন যে, ইয়েট্সের "অন্ দি আইডিয়াজ অভ্ গুড্ এণ্ড ইভিল" বইটি পড়লে আমি সাঙ্কেতিকতা সম্বন্ধে অনেক কিছু মাল-মশলা পাব। আমার বইটি প্রকাশিত হবার পর আর সবাই দেখেছি সাঙ্কেতিকতা সম্বন্ধে লিখতে গেলেই ইয়েট্সের ওই বইটির রেফারেন্স দিয়েছেন। কিন্তু বইটি সম্বন্ধে প্রথমে বলেছিলেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমারই। পাশ্চাত্য সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। শুধু নাটক নয়—কাব্য, উপন্যাস, প্রবন্ধ এবং নাটক বিষয়ে তাঁর গভীর পড়াশুনা ছিল।

যে নাটকের অভিনয় চলছে—সে নাটক নিয়েও তাঁকে অবসরের সন্ধ্যাগুলিতে যথেষ্ট রিহার্সাল দিতে দেখেছি। শিশিরকুমারের মুখেই শুনেছি—অর্ধেন্দুশেখরের মত তিনিও ক্রমান্বয়ে রিহার্সালে বিশ্বাসী। রিহার্সালের সময় প্রত্যেকটি সংলাপের অর্থ সুন্দর এবং সহজভাবে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বুঝিয়ে দিতেন। ভাল সংস্কৃতজ্ঞান থাকাতে, শব্দের রুট-মিনিং বলে এবং বিশুদ্ধ উচ্চারণ কিভাবে হওয়া উচিত তারও ব্যাখ্যা করতেন।

রিহার্সালের পরিচালনার সময় টুকরো টুকরোভাবে যে সব কথা বলতেন এখনও তার কিছু কিছু আমার স্মরণে আছে।

নাট্যাচার্য বলতেন—সুষ্ঠুভাবে কণ্ঠস্বরকে খেলাতে শিখবে—এর জন্য দরকার ঠিকভাবে প্রশ্বাস নেওয়া এবং নিঃশ্বাস ছেড়ে দেওয়া—দেহকে রিল্যাক্স করতে হবে। স্টেজে কিভাবে কথা বলা উচিত এ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে একদিন বলেছিলেন—এর জন্য একটা মধ্যপন্থা নেওয়া দরকার। বাস্তব জীবনে যেভাবে কথা বল তার থেকে উঁচু পর্দায় বলতে হবে। কিন্তু এক্সাজারেট করবে না। পিচ এবং পেসের ভেতরও বুঝেসুঝে তারতম্যের সৃষ্টি করতে হবে। শব্দে রঙের সৃষ্টি করতে হবে—ভাব সঞ্চালনেই রঙের অবতারণা করা যায়। চরিত্রচিত্রণে এবং নাট্যব্যাখ্যানে পিচ্ অভ্ ভয়েসের সাহায্যে অভিনেতা অনেক কিছু করতে পারেন—এই মত ছিল শিশিরকুমারের।

নাট্যাচার্য আরও বলতেন—কাব্যনাট্য বা গদ্যনাট্যে কোয়ানটিটি বলতে বোঝায় সংলাপ বাদনে যে সময়টা লাগে তাকে। কতটা সময় দিয়ে একটা শব্দ উচ্চারণ করতে হবে তার উপর নির্ভর করে শব্দের বর্ণসমাবেশ, বুনানি এবং পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষমতা।

সংলাপ বাদনে যেমন ইনফ্লেকসনের দরকার, এর অতিরিক্ত ব্যবহারে খারাপ ফল হবে—এই ছিল শিশিরবাবুর বিশ্বাস। স্পিচ রিদম বোঝাতে গিয়ে একদিন বলেছিলেনঃ "জীবনের সব কিছুই ঘটছে রিদমে—আমাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, সমুদ্রের জলের গতি, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি ঋতুর আবর্তন, সবই রিদম মেনে চলছে।"

যার কণ্ঠস্বরে যত মডুলেশন আছে, সে সেই অনুসারে অভিনয়ে সার্থকতা লাভ করে—কণ্ঠস্বরকে অসংখ্য পর্দায় খেলাতে না পারলে বড় অভিনেতা হওয়া যায় না—এই ছিল শিশিরকুমারের সুদৃঢ় মতবাদ। গলাকে নানা "কি"-তে মডুলেট করবার যে শক্তি শিশিরবাবুর ভেতর দেখেছি, তা এদেশে বা ওদেশের কোন অভিনেতার ভেতর লক্ষ্য করি নি।

ইমোশ্যন দিয়ে প্রথমে দর্শককে অভিভূত করে, তারপর তার কল্পনা-শক্তিকে উত্তেজিত করে জাগিয়ে তুলতে হবে—একদিন কথাচ্ছলে আমাদের কয়েকজনকে বলেছিলেন।

অভিনেতা আগে সংলাপ মুখস্থ করে তবে পার্ট তৈরি করবে কিনা, এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন এইভাবে—আগে চরিত্রটিকে ভালভাবে বিশ্লেষণ করে বুঝে নিয়ে তবে অভিনেতাকে পার্ট মুখস্থ করতে হবে—চরিত্র বুঝতে হলে প্রতিটি দৃশ্যে চরিত্রের ডেভেলপমেণ্ট খুঁটিয়ে দেখতে হবে, সমগ্র নাটকটি ভালভাবে বিশ্লেষণ করে পড়তে হবে—আগে না বুঝে সংলাপ মুখস্থ করলে চরিত্র রূপায়ণে ভুল জায়গায় এম্ফেসিস পড়বে এবং নাটকের ভাষ্য ঠিকমত দেওয়া হবে না। অভিনয় একটা আর্ট "সৃষ্টি"—অনুকরণ নয়। চরিত্রসৃষ্টি করতে হবে—মানে নিজের ব্যক্তিত্ব দিয়ে নাটকের চরিত্রকে প্রাণবন্ত করে তুলতে হবে। চরিত্রসৃষ্টির জন্য লাইফের প্রটোটাইপ্সের ওপর নির্ভর করতে হয়—এইজন্যই জীবনের সঙ্গে যোগ থাকা দরকার। কিছু কিছু চরিত্রের প্রটোটাইপস্ পাওয়া যায় না—যেমন হ্যামলেট। সেক্ষেত্রে সার্থক অভিনেতা হতে হলে বিরাট কল্পনাশক্তির প্রয়োজন—প্রচুর অধ্যয়নের (নানা বিষয়ে) সাহায্যেই এই কল্পনাশক্তিকে অর্জন করা যায়।

এই সত্যকে মনেপ্রাণে উপলব্ধি করতেন বলেই বোধহয় শিশিরকুমার দিনরাত বইয়ের ভেতর ডুবে থাকতেন। আর এই বিরাট পাণ্ডিত্যের ফলেই চরিত্র রূপায়ণে তাঁর তুল্য অভিনেতা সারা পৃথিবীতে খুব কমই দেখা গেছে।

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

শিল্যালি

আগেই বলেছি নবনাট্যমন্দিরের যুগেই আমার শিশিরকুমারের সঙ্গে আলাপ—ক্রমে সে আলাপ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। এ সময় থেকেই শিশিরবাবু পড়াশুনা বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট গাইড করেছেন। তাঁর নিজের পুস্তকাগার থেকে অনেক বই আমাকে পড়তে দিয়েছেন এবং আমার পড়া হয়ে গেলে সে সব বই নিয়ে আলোচনা করেছেন। ওঁরই লাইব্রেরী থেকে নিয়ে আমি জার্মান নাট্যকার হাউপ্টমানের এবং স্প্যানিশ নাট্যকার জাসিন্তো বেনাভেন্তোর নাটকগুলি পড়ি। কোরথোপের হিস্ট্রি অভ্ ইংলিশ পোয়েট্রির ভল্যুমগুলো শিশিরবাবুই আমাকে পড়তে বলেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী থেকে নিয়ে এ বইগুলো পড়বার সুযোগ আমার হয়। এই সময়েই পিরানদেল্লোর সিক্স ক্যারেকটার্স প্রভৃতি নাটকগুলোও শিশিরকুমার আমাকে ভালভাবে অধ্যয়ন করতে বলেন। রীতিমত নাটকে পিরানদেল্লোর টেকনিকের অনুকরণেই দর্শকদের সঙ্গে অভিনেতাদের ইণ্টিমেট হবার পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলেন নাট্যাচার্য। অবশ্য এর অনেক আগেও কবিগুরুর শেষরক্ষা নাটকে তিনি অভিনেতা এবং দর্শকদের একসঙ্গে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন শেষ-দৃশ্যে।।

নবনাট্যমন্দিরের আমলে শিশিরকুমার যে সব নতুন নাটক করেছিলেন তার ভেতর 'বিরাজ বৌ', 'বিজয়া', 'রীতিমত নাটক', 'যোগাযোগ' প্রভৃতি সত্যিকার মনোমুগ্ধকর নাটক। শিশিরকুমারের কাছ থেকেই শুনেছি যে চার্লস গারভিসের একটি উপন্যাস থেকেই দত্তার মূল কাহিনী নেওয়া হয়েছিল। তিনি আমাকে বলেছিলেন কবিগুরু ডাকঘরের সঙ্গে হাউপ্টমানের হ্যানেল নাটকের কোথায় যেন একটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে যখন সাঙ্কেতিকতা সম্বন্ধে লিখতে শুরু করি তখন সত্যিকার সাহায্য এক নাট্যাচার্যের কাছ থেকেই পেয়েছিলাম। এ বিষয়ে আমার পরিচিত বিদগ্ধ ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করে বিশেষ কোন সুফল লাভ হয় নি। নাট্যাচার্যই আমাকে একদিন বলেছিলেন যে, ইয়েট্সের "অন দি আইডিয়াজ অভ্ গুড্ এণ্ড ইভিল" বইটি পড়লে আমি সাঙ্কেতিকতা সম্বন্ধে অনেক কিছু মাল-মশলা পাব। আমার বইটি প্রকাশিত হবার পর আর সবাই দেখেছি সাঙ্কেতিকতা সম্বন্ধে লিখতে গেলেই ইয়েট্সের ওই বইটির রেফারেন্স দিয়েছেন। কিন্তু বইটি সম্বন্ধে প্রথমে বলেছিলেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমারই। পাশ্চাত্য সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। শুধু নাটক নয়—কাব্য, উপন্যাস, প্রবন্ধ এবং নাটক বিষয়ে তাঁর গভীর পড়াশুনো ছিল।

যে নাটকের অভিনয় চলছে—সে নাটক নিয়েও তাঁকে অবসরের মধ্যাগুলিতে যথেষ্ট রিহার্সাল দিতে দেখেছি। শিশিরকুমারের মুখেই শুনেছি—অর্ধেন্দুশেখরের মত তিনিও ক্রমান্বয়ে রিহার্সালে বিশ্বাসী। রিহার্সালের সময় প্রত্যেকটি সংলাপের অর্থ সুন্দর এবং সহজভাবে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বুঝিয়ে দিতেন। ভাল সংস্কৃতজ্ঞান থাকাতে শব্দের রুট-মিনিং বলে এবং বিশুদ্ধ উচ্চারণ কিভাবে হওয়া উচিত তারও ব্যাখ্যা করতেন।

রিহার্সালের পরিচালনার সময় টুকরো টুকরোভাবে যে সব কথা বলতেন এখনও তার কিছু কিছু আমার স্মরণে আছে।

নাট্যাচার্য বলতেন—সুষ্ঠুভাবে কণ্ঠস্বরকে খেলাতে শিখবে—এর জন্য দরকার ঠিকভাবে প্রশ্বাস নেওয়া এবং নিঃশ্বাস ছেড়ে দেওয়া—দেহকে রিল্যাক্স করতে হবে। স্টেজে কিভাবে কথা বলা উচিত এ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে একদিন বলেছিলেন—এর জন্য একটা মধ্যপন্থা নেওয়া দরকার। বাস্তব জীবনে যেভাবে কথা বল তার থেকে উঁচু পর্দায় বলতে হবে। কিন্তু এক্সাজারেট করবে না। পিচ এবং পেসের ভেতরও বুঝেসুঝে তারতম্যের সৃষ্টি করতে হবে। শব্দে রঙের সৃষ্টি করতে হবে—ভাব সঞ্চালনেই রঙের অবতারণা করা যায়। চরিত্রচিত্রণে এবং নাট্যব্যাখ্যানে পিচ্ অভ্ ভয়েসের সাহায্যে অভিনেতা অনেক কিছু করতে পারেন—এই মত ছিল শিশিরকুমারের।

নাট্যাচার্য আরও বলতেন—কাব্যনাট্য বা গদ্যনাট্যে কোয়ানটিটি বলতে বোঝায় সংলাপ বাদনে যে সময়টা লাগে তাকে। কতটা সময় দিয়ে একটা শব্দ উচ্চারণ করতে হবে তার উপর নির্ভর করে শব্দের বর্ণসমাবেশ, বুনানি এবং পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষমতা।

সংলাপ বাদনে যেমন ইনফ্লেকসনের দরকার, এর অতিরিক্ত ব্যবহারে খারাপ ফল হবে—এই ছিল শিশিরবাবুর একদিন বলেছিলেন: "জীবনের সব কিছুই ঘটছে রিদমে—আমাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, সমুদ্রের জলের গতি, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি ঋতুর আবর্তন, সবই রিদম মেনে চলছে।"

যার কণ্ঠস্বরে যত মডুলেশন আছে, সে সেই অনুসারে অভিনয়ে সার্থকতা লাভ করে—কণ্ঠস্বরকে অসংখ্য পর্দায় খেলাতে না পারলে বড় অভিনেতা হওয়া যায় না—এই ছিল শিশিরকুমারের সুদৃঢ় মতবাদ। গলাকে নানা "কি"-তে মডুলেট করবার যে শক্তি শিশিরবাবুর ভেতর দেখেছি, তা এদেশে বা ওদেশের কোন অভিনেতার ভেতর লক্ষ্য করি নি।

ইমোশান দিয়ে প্রথমে দর্শককে অভিভূত করে, তারপর তার কল্পনা-শক্তিকে উত্তেজিত করে জাগিয়ে তুলতে হবে—একদিন কথাচ্ছলে আমাদের কয়েকজনকে বলেছিলেন।

অভিনেতা আগে সংলাপ মুখস্থ করে তবে পার্ট তৈরি করবে কিনা, এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন এইভাবে—আগে চরিত্রটিকে ভালভাবে বিশ্লেষণ করে বুঝে নিয়ে তবে অভিনেতাকে পার্ট মুখস্থ করতে হবে—চরিত্র বুঝতে হলে প্রতিটি দৃশ্যে চরিত্রের ডেভলপমেণ্ট খুঁটিয়ে দেখতে হবে, সমগ্র নাটকটি ভালভাবে বিশ্লেষণ করে পড়তে হবে—আগে না বুঝে সংলাপ মুখস্থ করলে চরিত্র রূপায়ণে ভুল জায়গায় এমফেসিস পড়বে এবং নাটকের ভাষা ঠিকমত দেওয়া হবে না। অভিনয় একটা আর্ট "সৃষ্টি"—অনুকরণ নয়। চরিত্রসৃষ্টি করতে হবে—মানে নিজের ব্যক্তিত্ব দিয়ে নাটকের চরিত্রকে প্রাণবন্ত করে তুলতে হবে। চরিত্রসৃষ্টির জন্য লাইফের প্রটোটাইপ্সের ওপর নির্ভর করতে হয়—এইজন্যই জীবনের সঙ্গে যোগ থাকা দরকার। কিছু কিছু চরিত্রের প্রটোটাইপস্ পাওয়া যায় না—যেমন হ্যামলেট। সেক্ষেত্রে সার্থক অভিনেতা হতে হলে বিরাট কল্পনাশক্তির প্রয়োজন—প্রচুর অধ্যয়নের (নানা বিষয়ে) সাহায্যেই এই কল্পনাশক্তিকে অর্জন করা যায়।

এই সত্যকে মনেপ্রাণে উপলব্ধি করতেন বলেই বোধহয় শিশিরকুমার দিনরাত বইয়ের ভেতর ডুবে থাকতেন। আর এই বিরাট পাণ্ডিত্যের ফলেই চরিত্র রূপায়ণে তাঁর তুল্য অভিনেতা সারা পৃথিবীতে খুব কমই দেখা গেছে।

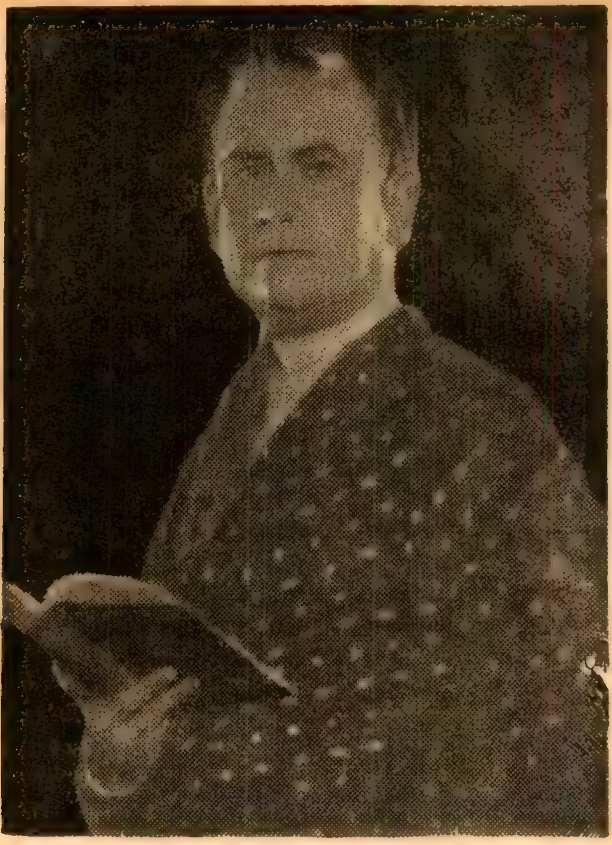

দিগম্বর—শিশিরবাবু

অনেক অভিনেতার ভেতর শিল্পী হিসাবে একটা অশিক্ষিত পটুত্ব লক্ষ্য করা যায়—ভাল অভিনেতা হিসাবে এ'রা যশ এবং খ্যাতিও লাভ করেন—কিন্তু গ্রেট্‌সদের দলে এ'রা কখনও উঠতে পারেন না।

অভিনয় শিক্ষক হিসাবেও শিশির-কুমার ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এমন কি শ্রীমতী তারাসুন্দরী—যিনি গিরিশচন্দ্র এবং শিশিরকুমার দুজনেরই শিক্ষণ-পদ্ধতি দেখেছেন, তাঁর মতে শিশির-কুমারই নাকি 'বেটার কোচ' ছিলেন। আর শিশিরযুগে এমন কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রী ছিলেন না, যিনি কোন না কোন সময় নাট্যাচার্যের কাছে অভিনয় শিক্ষা করেছেন এবং এই শিক্ষাগ্রহণের ফলে প্রভূতভাবে নিজের উন্নতি করতে পেরেছেন?

শিশিরকুমারের পর এই কোচ করবার শক্তি আরও দুজন বিখ্যাত অভিনেতার ভেতর ছিল—তাঁরা রাধিকানন্দ এবং নরেশচন্দ্র।

নবনাট্যমন্দিরে যখন অপ্রতিহতগতিতে শিশিরকুমার শরৎচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের নাট্যরূপ নিয়ে এগিয়ে চলে-ছেন, সে সময় রঙমহলেও নরেশচন্দ্রের পরিচালনায় বিরাট সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হচ্ছিল মহানিশা, বাংলার মেয়ে প্রভৃতি নাটক। রঙমহলে এই সময় বেশির ভাগ অভিনেতা ছিলেন পুরোনো নাট্যমন্দিরের দলের, যথা—যোগেশচন্দ্র, রবি রায়, ভূমেন রায় ইত্যাদি। মহা-নিশা বা বাংলার মেয়ে ভাল নাটক নয়—কিন্তু অভিনয় হয়েছিল অত্যন্ত উচ্চ-স্তরের। ভাল নাটক না হলেও আজকের দিনে পেশাদারী মঞ্চে যেসব নাটক অভি-নীত হয় তার তুলনায় মহানিশা, বাংলার মেয়ে বা কেদার রায়কে একশোর ভেতর একশো মার্ক দিতে হয়। এই সেদিন রঙমহলে এক হাসির নাটক 'অতএব' দেখতে গিয়েছিলাম। কোন দেশের স্টেজে যে এ ধরণের বাজে লেখা তথা-কথিত নাটক মঞ্চস্থ হতে পারে, এ ছিল [illegible] ধারণার অতীত। যেমন সংলাপ, তেমনি কাহিনী, তেমনি পরিচালনা! আরও আশ্চর্য হলাম নাট্যকার হিসাবে শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্যের নাম দেখে। যে বিধায়ক ভট্টাচার্য বিপ্রদাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন, যিনি কালিকায় অভিনীত খেলাঘর নাটকটি লিখেছিলেন (এ নাটক-টিতে অতি সুন্দরভাবে পিরানদেল্লোর সিক্স ক্যারেক্টার্সের প্রভাব ছিল)। তিনি 'অতএবে'র মত একটি নাটক লিখেছেন এ আমার এখনও বিশ্বাস হয় না। জানি না, কোন কারণে তিনি লেখক হিসাবে তাঁর নাম ব্যবহার করতে দিয়ে-ছেন কিনা। অভিনয়ের ক্ষেত্রে বলতে হয় হরিধনবাবু, জহর রায় এবং সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় মোটামুটি অভিনয় করেছেন। সরযূদেবী একেবারে অচল—ইনি চির-কালই মেলোড্রামাটিক অভিনয়ের জন্য বিখ্যাত—আলেয়া জাতীয় চরিত্রে ও'র অভিনয়ে এক জাতের দর্শক তুষ্ট হন—তাও সব দর্শক নয়। কিন্তু সম্ভ্রান্ত সমাজের মহিলার চরিত্রে সরযূদেবী একে-বারে অচল। নায়ক এবং নায়কের বন্ধু পাড়ার থিয়েটারের শৌখিন অভিনেতার [illegible]।

পরিচালকদ্বয় বেয়ারাকে দিয়ে টুইস্ট পর্যন্ত করিয়েছেন স্টেজের উপর। মনে হচ্ছিল যেন হিন্দী ছবি দেখছি। [illegible] কাগজগুলোতে দেখলাম 'অতএবে'র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে সমালোচনা করা হয়েছে। যাঁরা এ ধরণের সমালোচনা করেন, তাঁরা কি নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সব কিছু ভুলে গিয়ে এ সব সমালোচনা লিখতে বসেন? বাংলার রঙ্গমঞ্চের একটা ঐতিহ্য আছে। গিরিশ-চন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর প্রতিষ্ঠিত বঙ্গরঙ্গমঞ্চ—যে বঙ্গরঙ্গমঞ্চকে সাফল্যের চরমে তুলে ধরেছিলেন শিশিরকুমার, নরেশচন্দ্র, রাধিকানন্দ, দুর্গাদাস প্রমুখের আপ্রাণ পরিশ্রম এবং বিরাট প্রতিভা, সেই বঙ্গরঙ্গমঞ্চকে রসাতলে নিয়ে যাবার যাঁরা উদ্যোগ করছেন, এইসব দলের নিকৃষ্ট প্রচেষ্টাকে সমালোচকশ্রেণীর কোন কারণেই উৎসাহ দেওয়া তো উচিতই নয়, বরং চেষ্টা করা উচিত সর্বদিক থেকে বাধা দেবার। এ বিষয়ে আমি কাগজের সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

রূপজগৎ

গত বছরের চলচ্চিত্র সমীক্ষা

১৯৬৬ সাল বিদায় নিল। ১৯৬৭ সালকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। আশা ও আনন্দের সঙ্গে যেমন নতুন বছরকে বরণ করে নিচ্ছি, তেমনি পেছনের দিকে তাকিয়ে আমরা হিসাব করতে চাই—আমাদের চলার গতিবেগ কিরূপ। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রকে আমরা ভালবাসি। এদেশের ছবির জন্য আমাদের গর্ব আছে। তাই বছরের শেষে সারা বছরের ছবির হিসাব নিয়ে তার গতিপ্রকৃতি এবং সম্ভাবনার কথা মনে উদয় হয়'

প্রথম কথা—গত বছর মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির সংখ্যার কথা ভাবলে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়। গত বছর মাত্র ২৭টি বাংলা ছবি মুক্তি পেয়েছে মাদ্রাজে তৈরি বাংলা ডাব-করা 'পান্ডবের বনবাস'কে ধরলে হিসাবে ২৮টি হয়। বাংলাদেশে তৈরি ছবি নিয়েই আমরা হিসাব করতে চাই। এই সংখ্যা উদ্বেগজনক এ কারণে যে, বছর বছর বাংলাছবির সংখ্যা নীচের দিকে নেমে আসছে। ১৯৬৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবির সংখ্যা ছিল ৩১। এরূপ আশংকার কথা আমরা বহুদিন থেকে বলে আসছি। দশ বছরের মধ্যে সংখ্যার দিক থেকে প্রায় কুড়িটি কমে গেছে। এই কমার সঙ্গে শিল্পীদের আত্মনির্ভর-শীলতা, বহুজনের জীবিকা, টেকনিশিয়ানদের কাজ, চলচ্চিত্র শিল্পে টাকা খাটাবার মত সংলোকদের পেছনে সরে যাওয়া ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিয়েছে।

গত বছর মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলির মধ্যে রয়েছেঃ পান্ডবের বনবাস (মাদ্রাজে নির্মিত), সুশান্ত সা, মণিহার, গৃহ-সন্ধানে, দোলগোবিন্দের কড়চা, কাঁচকাটা হীরে, অংগীকার, রাজদ্রোহী, শুধু একটি বছর, রামধাক্কা, নায়ক, মায়াবিনী লেন, পাগল ঠাকুর, কলংকী রাত, সুভাষচন্দ্র, স্বপ্ন নিয়ে, হারানো প্রেম, পাড়ি, নতুন জীবন, শেষ তিনদিন, অশ্রু দিয়ে লেখা, গল্প হলেও সত্যি, শংখবেলা, উত্তরপুরুষ, লবকুশ, জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার, ফিরে চল, কাল তুমি আলেয়া। এই ছবিগুলির মধ্যে দুখানি পৌরাণিক, দুটি জীবনীমূলক চারটি প্রহসনধর্মী, বাকিগুলি সামাজিক।

বাংলাদেশে এখনো স্বতন্ত্র চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবি হয় না। কেবলমাত্র সত্যজিৎ রায় ও ঋত্বিক ঘটক এ কাজ করে থাকেন। তাই ছবি এখানে সাহিত্যের চিত্ররূপ। গত বছর যেসকল সাহিত্যিকের রচনা অবলম্বনে ছবি নির্মিত হয়েছে তাঁরা হলেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রমথ বিশী, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, জরাসন্ধ, গজেন্দ্রকুমার মিত্র প্রমুখ। সাহিত্য নির্ভরশীলতা চলচ্চিত্রের অগ্রগতির সহায়ক নয়। এতে সাহিত্যেরও উন্নতি হয় না।

গত বছর কয়েকজন নতুন পরিচালকের কাজ দেখেছি। তাঁরা হলেন পূর্ণেন্দু পত্রী, উত্তমকুমার, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, অমল দত্ত, শচীন মুখোপাধ্যায়, অশোক চট্টোপাধ্যায়, অতনুকুমার, চিত্রকর, সারথি, চিত্রতনু পরিচালকগোষ্ঠী এবং অজিত লাহিড়ী।

আঙ্গিকের ক্ষেত্রে বাংলা চলচ্চিত্রের মান উন্নতির দিকে। ফটোগ্রাফিতে দিলীপ মুখোপাধ্যায়, বিশু চক্রবর্তী, সুব্রত মিত্র, বিমল মুখোপাধ্যায়, দীনেন গুপ্ত, কৃষ্ণ চক্রবর্তী এবং রামানন্দ সেনগুপ্তের কাজ দর্শকদের প্রশংসা লাভ করেছে।

গত বছর চিত্রতারকাদের মধ্যে সর্বাধিক ছবিতে দেখা গেছে উত্তমকুমারকে। উত্তমকুমার অভিনীত ছবিগুলি হচ্ছে—নায়ক, শুধু একটি বছর, শংখবেলা, রাজদ্রোহী এবং কাল তুমি আলেয়া। এই পাঁচটির মধ্যে নায়ক, রাজদ্রোহী এবং শংখবেলায় তাঁর অভিনয় দর্শকদের প্রশংসা লাভ করেছে। ব্যবসার দিক থেকে ছবিগুলি হিট। বিশেষ করে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত নায়ক-এ অভিনয় উত্তমকুমারের অভিনয়জীবনে এক উল্লেখযোগ্য বিষয়। এই ছবিতে তাঁর অভিনয়ক্ষমতার সত্যিকার পরিচয় পাওয়া গেছে। অভিনয় ছাড়া গত বছর পরিচালক (শুধু একটি বছর) এবং সঙ্গীত পরিচালক (কাল তুমি আলেয়া) হিসাবেও উত্তমকুমারের পরিচয় পাওয়া গেছে। নায়ক-এর নায়ক হিসাবে তিনি বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবেও গিয়েছিলেন। এদিক থেকে বিবেচনা করলে গত বছরে বাংলা চলচ্চিত্র জগতের এক নম্বর ব্যক্তি উত্তমকুমার।

অভিনেত্রীদের মধ্যে গত বছরেও মাধবী মুখার্জীর প্র্যামার সর্বাধিক। এ ছাড়া বেশি ছবিতে দেখা গেছে সুপ্রিয়া চৌধুরী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়কে। শর্মিলা ঠাকুর হিন্দী ছবির জগতে 'হিরোইন' হয়েছেন, তবে 'নায়ক'-এ তাঁর অভিনয় এক ঝলক আলোর মত আনন্দ দিয়ে গেছে। যে অভিনয়ে বাংলার শর্মিলাকে অনুভব করা গেছে। গত বছর সুচিত্রা সেনকে কোন ছবিতে দেখা যায় নি। যদিও 'গৃহদাহ'-তে তিনি অভিনয় করছেন, তবু মনে হচ্ছে বাংলা ছবি থেকে তিনি ধীরে ধীরে বিদায় নিচ্ছেন।

মধু বসু

ব্যবসার দিক থেকে গত বছর সর্বাধিক সাফল্যলাভ করেছে 'মণিহার' (সলিল সেন)। এই ছবিটি ৭৫ সপ্তাহ কলকাতায় চলেছে। তারপরে যথাক্রমে 'রাজদ্রোহী' (নীরেন লাহিড়ী) ৪৯ সপ্তাহ ; 'নতুন জীবন' ৪১ সপ্তাহ ; 'নায়ক' ৩৮ সপ্তাহ ; 'পাড়ি' ৩৬ সপ্তাহ ; 'সুভাষচন্দ্র' ৩৩ সপ্তাহ; শুধু একটি বছর ৩৩ সপ্তাহ; 'শংখবেলা' ৩০ সপ্তাহ; 'কাঁচকাটা হীরে' ২৭ সপ্তাহ ; 'গল্প হলেও সত্যি' ২৫ সপ্তাহ।

এটা হল ব্যবসার দিক। শিল্পের বিচারে এই তালিকা অচল শুধু নয় ; বাংলা ছবির যথার্থ মর্যাদার পরিচয় নয়। শিল্পের বিচারে যথেষ্ট আলোচনার বিষয় হয়েছিল 'নায়ক'। বিষয়বস্তুর বলিষ্ঠতা ও আঙ্গিকে এটি বাংলা চলচ্চিত্রের একটি মর্যাদার ছবি। ছবিটি বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পরিচালনার জন্য পুরস্কার পেয়েছে। তারপরে উল্লেখ করা যেতে পারে কাঁচকাটা হীরে'-র নাম। যদিও ছবিটির চিত্রনাট্য বক্তব্যের দিক থেকে দুর্বল, কিন্তু পরিচালনা দক্ষতায়

চৌধুরী প্রোডাকসন্সের 'সোনার খাঁচা' ছবিতে জহর রায় ও মণি শ্রীমানী

প্রশংসনীয়। পূর্ণেন্দু পত্রীর 'স্বপ্ন নিয়ে' ছবিতে অনেক আশা ছিল, কিন্তু পরিচালকের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ এবং চিত্রভাষা দুর্বল। গত বছর মৃণাল সেন এবং ঋত্বিক ঘটকের ছবি দেখা যায় নি। চিত্রনাট্যকার হিসাবে এঁদের কাজ অবশ্য দেখা গেছে, তবে সে কাজ অনুল্লেখনীয়। সুবর্ণরেখার পরে ঋত্বিক ঘটকের আর একটি ছবির জন্য দর্শকরা আগ্রহী ছিল। গত বছর আন্তর্জাতিক উৎসবে আরো বাংলা ছবি প্রেরিত হয়েছিল, দুর্ভাগ্যের বিষয় 'নায়ক' ছাড়া কোন ছবি সম্মানলাভ করে নি।

গত বছরও বাংলা ছবিতে কয়েকজন অবাঙালী শিল্পীর অভিনয় দেখা গেছে। দিলীপকুমার, ধর্মেন্দ্র এবং পরভীন চৌধুরীকে বাংলা ছবিতে দেখা গেছে। বাংলা ছবিতে বোম্বাইয়ের শিল্পীদের অভিনয় করাবার একটা ঝোঁক ক্রমে বাড়ছে। আঙ্গিকের দিক থেকেও হিন্দী ছবিকে অনুসরণ করার আগ্রহ একশ্রেণীর পরিচালকের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। গত বছর কয়েকটি বাংলা ছবিতে হিন্দী অনুরূপ নাইট ক্লাব, ব্যাবারে নাচ-গান, টাইট ড্রেস পরা নারীদেহ প্রদর্শনী এবং সমাজ ও কাল পরিচয়বর্জিত পাঁচমেশালি রসাশ্রিত কাহিনী দেখা গেছে। সাধারণত নতুন পরিচালকরাই বোম্বাইয়ের উচ্ছিষ্টভোজী হবার মত অবিবেচনার পরিচয় দিচ্ছে বেশি। যত বেশি অর্ধশিক্ষিত, সমাজ ও রাজনীতি চেতনাহীন পরিচালক শিল্পে যোগদান করছে তত দ্রুত বাংলা ছবি নিম্নাভিমুখী হচ্ছে। গত বছর মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির মধ্যে কয়েকটিতে এরূপ অনুকরণ দেখা গেছে।

গত বছর কলকাতায় আরব যুক্তরাষ্ট্রের একটি চলচ্চিত্র উৎসব হয়েছে। এতে আরবের চলচ্চিত্র সম্পর্কে ধারণা করার সুযোগ আমাদের হয়েছে। এ ছাড়া সারা বছরব্যাপী ফিল্ম সোসাইটি ও ক্লাবগুলির উদ্যোগে নানা দেশের, অতীত ও বর্তমানের ছবি প্রদর্শিত হয়েছে। এসব ছবি দর্শকদের ফিল্ম সচেতন করতে সহায়ক। চলচ্চিত্রের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় ঘটিয়েছে।

গত বছর বাংলা চলচ্চিত্র-জগৎ সুনন্দা দেবী, বীরেশ্বর সেন, পান্নালাল ভট্টাচার্য, কালীপ্রসাদ ঘোষ, সুধীশ ঘটক, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (বড়) এবং বিমল রায়কে হারিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত।

বাংলা ছবির পাশে রয়েছে হিন্দী এবং বিদেশী চলচ্চিত্র। প্রকৃতপক্ষে প্রতিযোগিতায় বাংলা চলচ্চিত্র আজ কোণঠাসা। গত বছর এখানে হিন্দী ছবি মুক্তি পেয়েছে ৮১টি। বিদেশী ছবি মুক্তি পেয়েছে ১১৬। সব হিন্দী ছবি আমার দেখার সুযোগ হয় নি, কারণ হিন্দী ছবির পরিবেশক ও প্রচারকারীরা সুজনকে প্রেস শো-তে আমন্ত্রণ করেন না। তাঁরা সুজনের নিরপেক্ষ সমালোচনাকে ভয় করেন। বিদেশী ছবির মধ্যে বেশির ভাগ হলিউড এবং বৃটিশ ছবি, কয়েকটি ইতালীয় ছবিও মুক্তিলাভ করেছে। এসব ছবির মধ্যে আন্তর্জাতিক গোয়েন্দাগিরির রাজনৈতিক মতলবপূর্ণ ছবি ছিল কয়েকটি। এ ছবিগুলিকে ক্রাইম স্টোরি বলা চলে না, আসলে মার্কিন পেন্টাগনের প্রচারমূলক ছবি। এই ছবিগুলি সম্পর্কে দেশের সরকার এবং দর্শকদের সতর্ক থাকার কারণ আছে।—সুজন।

নাটকের কথা

দাগ

নবরূপার প্রযোজনায় প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে নিয়মিতভাবে 'দাগ' নাটক অভিনীত হচ্ছে। রাজাবাজার ট্রাম ডিপোর সম্মুখে এই ছোট প্রেক্ষাগৃহে নিয়মিত নাটকাভিনয় পূর্ব কলকাতার ও শহরতলীর নাট্যামোদীদের পক্ষে সুসংবাদ। 'দাগ' নাটকটি রচনা করেছেন জিতেন ঘোষ; পরিচালনা করছেন বিজয় মুখার্জী।

প্রযোজনা সংস্থার উদ্দেশ্য ব্যবসায়িক ভিত্তিতে নাটক অভিনয়। পেশাদারী দৃষ্টিভঙ্গীতে নাটক লিখিত এবং পরিচালিত। অভিনয়ের ব্যাপারেও শিল্পীদের কারো কারো মধ্যে পেশাদার মঞ্চাভিনেতাদের অনুকরণ করতে দেখা গেল। নাটকের কাহিনীতে একদিকে রয়েছে নিম্নমধ্যবিত্ত জীবন কেরানীর পরিবার, আর একদিকে ধনী প্রিয়নাথের পরিবার। দুয়ের মধ্যে গোপন যোগসূত্র হয়েছিল জীবনের কন্যা সর্বাণীকে কেন্দ্র করে। প্রিয়নাথের পুত্র প্রবীর সর্বাণীকে ভালবাসার নামে প্রতারণা করেছিল। সর্বাণী অবৈধ মাতৃত্ব বরণ করে আশ্রমে আশ্রয় পেয়েছিল। আর একদিকে প্রিয়নাথের বন্ধু মৃত্যুঞ্জয় প্রবীরের সাথে নিজের কন্যার বিয়ের পথ নিষ্কণ্টক করবার জন্য জীবনকে কর্মচ্যুত করে পথে বসায়। অনেক পরে প্রবীর নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়। প্রিয়নাথও ছেলের দুষ্কার্যের জন্য লজ্জিত হয় এবং দু-জনে মিলে সর্বাণীকে ফিরিয়ে আনতে যায়। এই বেদনাময় সুখের মুহূর্তে সর্বাণীর আকস্মিক মৃত্যু ঘটে।

নাট্যকার খুব দরদের সঙ্গে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনের অস্থিরতা দেখিয়েছেন। যারা আজ ভদ্রলোক বলে সমাজে পরিচয় দেয়, সামান্য এদিক-ওদিক হলে কাল তারা মজুরে পরিণত হয়। নাট্যকারের মতে মধ্যবিত্ত সমাজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাদের সর্বনাশের মূলে। বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে। উচ্চবিত্ত সমাজের প্রতি নাট্যকার তুলনায় বেশি সহানুভূতিশীল। প্রিয়নাথ রবীন্দ্র অনুরাগী কত ভালমানুষ; ছেলের ভুল তিনি কত সহজে স্বীকার করে নিলেন। প্রবীরের লাম্পট্যকেও নাট্যকার ক্ষমার দৃষ্টিতে সহানুভূতির যোগ্য করে তুলেছেন।

দৃষ্টিভঙ্গীতে নাট্যকার প্রগতিশীল

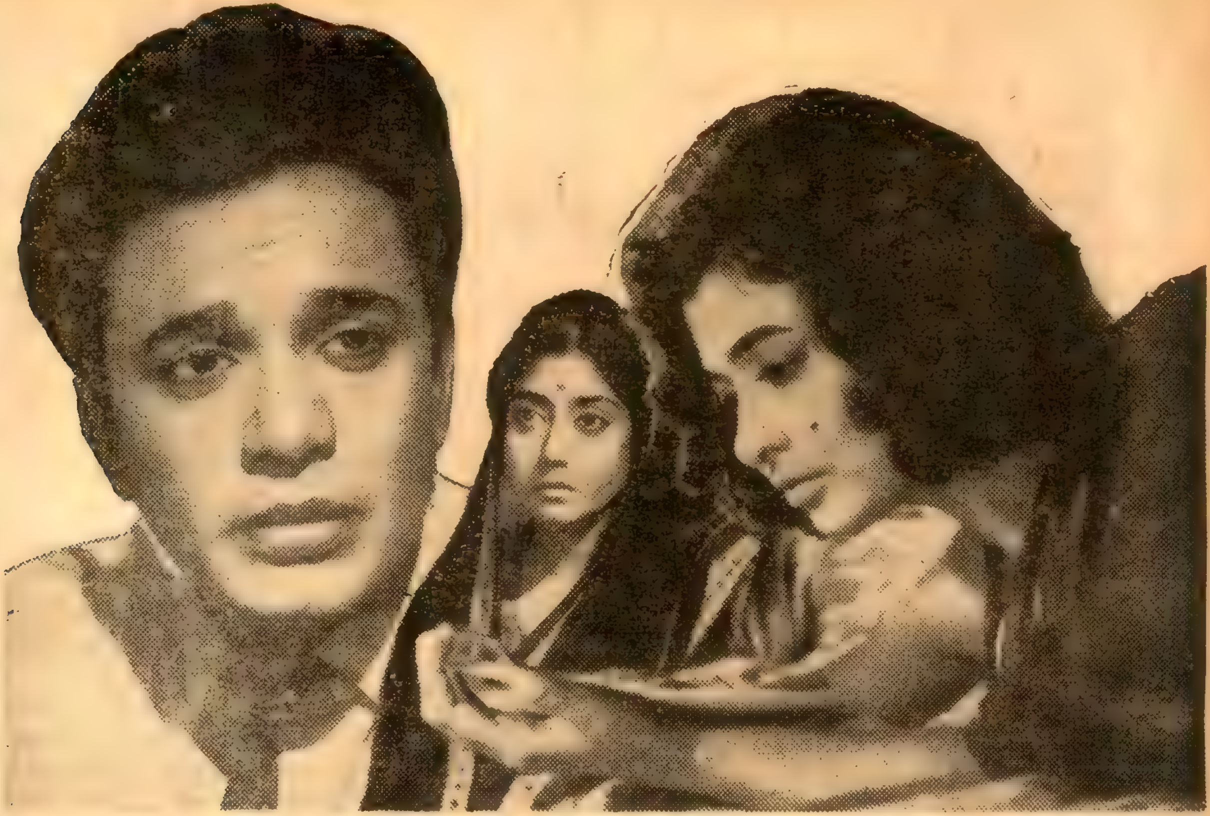

শচীন মুখার্জী পরিচালিত 'কাল তুমি আলেয়া' ছবিতে উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও সুপ্রিয়া দেবী

নন। সমাজের শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কেও তার দৃষ্টি খুব স্বচ্ছ নয়। একারণে বড়লোকের লাম্পট্যকে তিনি ক্ষমা করেছেন, আর নিম্নমধ্যবিত্ত মেয়েকে উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য মাশুল দিতে হয়েছে চরম। এখানেই নাটক দর্শকদের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় নাটকটির গতি এমন বাঁধা ছকে অগ্রসর হয়েছে যা পেশাদারী মঞ্চে ও সিনেমায় বেশ পুরনো ব্যাপার।

নাট্যকার এক দৃশ্যে ট্রেড ইউনিয়নের সেক্রেটারীকে উপস্থিত করে প্রকারান্তরে অফিস ইউনিয়নগুলিকে অপ্রয়োজনীয় বলার সুযোগ গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাপারে নাট্যকারের দৃষ্টি পরিষ্কার না হলেও কর্মচারী মাত্রই জানেন আজকের দিনে অফিস ইউনিয়নগুলির ভূমিকা কি। অফিস ইউনিয়নগুলি আছে বলেই সহজো অটোমেশন চালু করে কর্মচারী ছাঁটাই করতে পারছে না এবং আমলাতান্ত্রিক দাপট থেকে কর্মচারীরা কিছুটা রক্ষা পাচ্ছে। আদর্শবাদী প্রশান্ত চরিত্রটিকেও তিনি বিশেষ কাজে লাগাতে পারেন নি। যাকে দিয়ে নাটকের বলিষ্ঠ বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করা যেত।

অভিনয়ে দেবেন ব্যানার্জী, মঞ্জুলা মুখার্জী, লতিকা দাশগুপ্তা, তমাল লাহিড়ী, প্রবীরকুমার প্রশংসনীয়। অন্যান্য ভূমিকায় তৃপ্তি দাস, মণি শ্রীমানী, রমেশ রায়চৌধুরী, প্রণব চৌধুরী প্রমুখ যথাযথ। একটি হাসির চরিত্র জটিলেশ্বরের ভূমিকায় অমিয়কান্ত রঙমহলের অজিত চ্যাটার্জীর অনুকরণ। মঞ্চসজ্জা এবং সঙ্গীতের কাজ নাটকে পরিবেশনা গঠনোপযোগী।

মুক্তি প্রাসন্ন '৮০-তে আসিও না' ছবিতে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও রুমা দেবী

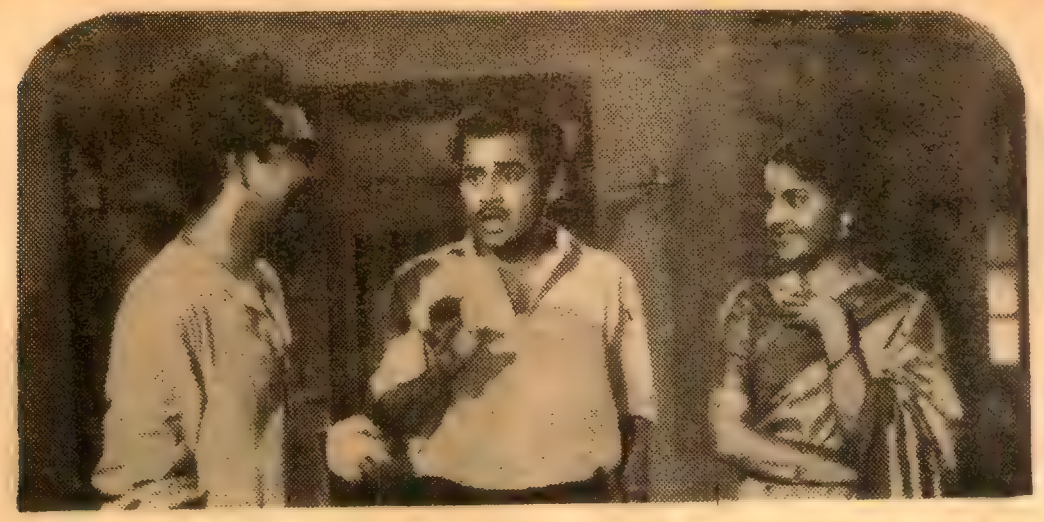

অসীম ব্যানার্জী পরিচালিত 'বিবাহ বিভ্রাট' ছবিতে অজয় গাঙ্গুলী, অনুপকুমার ও লিলি চক্রবর্তী

নবরূপার 'দাগ' নাটকে লতিকা দাশগুপ্তা।

আর্তনাদ

গত ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৬৬ সাল, রবিবার নারায়ণপল্লী কলকাতা ৪৯ স্থিত "শক্তি সঙ্ঘ" কর্তৃক আয়োজিত শ্রীমন্টু গঙ্গোপাধ্যায়ের "আর্তনাদ" নাটকখানি স্থানীয় যুবকবৃন্দের দ্বারা বিশেষ সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। এই সঙ্গে তরুণ যাদুকর সত্যরঞ্জনের ইন্দ্রজাল প্রদর্শনী দর্শকদের আনন্দ দান করে। পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হতে বহু দর্শকের সমাগম হয়েছিল।

মধু বোস ছায়াচিত্র উৎসব

আগামী ৫ই জানুয়ারী থেকে টাইগার সিনেমায় বিখ্যাত পরিচালক শ্রীমধু বোসের তোলা ছায়াচিত্রজগতের আলোড়ন সৃষ্টিকারী ছবি আলিবাবা, অভিনয়, রাজনর্তকী, মাইকেল মধুসূদন, শেষের কবিতা এবং মহাকবি গিরিশচন্দ্র দেখানো হবে এক সপ্তাহ ধরে। যাঁরা আগে এসব ছবি দেখেন নি তাঁদের পক্ষে এ এক সুবর্ণ সুযোগ।

বর্তমান বাংলায় ছায়াছবিকে দু' শ্রেণীতে ফেলা যায়—এক, হাই আর্টের ছবি—অবজেকটিভ্ বাস্তবঘেঁষা এবং এতে মাঝে মাঝে প্রতীক মিশিয়ে আর্টকে রসঘন করার প্রচেষ্টা হয়। উচ্চশ্রেণীর দু-একজন পরিচালকের হাতে পড়ে এ ধরণের ছবি বাংলা ছায়াচিত্রকে একদিকে যেমন বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছে, তেমনি আবার কয়েকটি অপদার্থ পরিচালক এই শ্রেণীর ছবি তুলতে গিয়ে বিরাট অঙ্কের অর্থের অপব্যয় এবং ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির প্রচুর ক্ষতি করেছেন। এ ধরণের ছবি কাহিনী-প্রধান বা অভিনয়-প্রধান নয়—এতে পরিচালকেরই সর্ব বিষয়ে প্রাধান্য।

আর এক ধরণের ছবি বাংলায় আজকাল তোলা হচ্ছে, এক কথায় যাকে বলা চলে হিন্দুস্থানী মার্কা ছবি। অর্থাৎ এ সব ছবিতে হিন্দী ছবির একটা বিরাট প্রভাব সহজেই লক্ষ্য করা যায়। আরও বিশেষভাবে বোঝাতে গেলে বলতে হয়—এসব চিত্রের কাহিনীর সঙ্গে বাস্তব জীবনের কোন মিল দেখা যায় না, সস্তা ধরণের নাচ-গান, প্রেম-ড্রয়িংরুমের দৃশ্য, বার, ক্যাবারে ইত্যাদি দিয়ে কাহিনী ঠাসা থাকে। আর অভিনয়? ভরতমুনি পর্যন্ত এ ধরণের অভিনয় দেখে চমকে উঠে স্বীকার করতেন তিনি অত্যন্ত ব্যাক্‌ডেটেড্ হয়ে পড়েছেন। এ ধরণের ছবির প্রভাব কলকাতার রঙ্গমঞ্চের উপরও এসে পড়েছে।

আজকালকার দর্শকদের আমরা বিশেষভাবে অনুরোধ করছি মধু বোস-সাধনা বোসের ছবিগুলো দেখে আসতে। এসব ছবিতে কাহিনী আছে, আছে অত্যন্ত উচ্চমানের অভিনয়, নৃত্যশিল্পী সাধনা বসুর অতুলনীয় নাচ ও অভিনয়। ছবিগুলো দেখে একথাও স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, টেক্‌নিক্ এবং আর্ট, দুটো দিকেই সমানভাবে দৃষ্টি রেখে পরিচালক মধু বোস তাঁর দায়িত্ব সমাপন করেছেন এ সব চিত্রে।

সখের ছবি

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ্যামেচার ফিল্ম বা সখের ছবি তৈরি করার ব্যাপারটা

এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে বড় বড় দেশে এ্যামেচার ফিল্ম সোসাইটি গঠিত হয়েছে। এমন কি এই সোসাইটিগুলির একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা পর্যন্ত গঠিত হয়েছে। এই সংস্থার নাম 'ইউনিকা'। এ বছর সোভিয়েট ইউনিয়নের এ্যামেচার ফিল্ম মেকার্স সংস্থা ইউনিকার সদস্য হচ্ছে। ইংল্যান্ড, জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক, আমেরিকা, রুমানিয়া, বুল-গারিয়া প্রভৃতি দেশে এ্যামেচার ফিল্ম মেকার্সদের শক্তিশালী সংস্থা রয়েছে।

এ্যামেচার ফিল্ম বা সখের চলচ্চিত্রের জন্ম হবি (Hobby) থেকে। এখন এই হবির ছবি দেশে দেশে বন্ধুত্বস্থাপন ও জ্ঞানের বিকাশের কাজে সহায়ক হয়েছে। যেমন কেউ নর্থপোলে গেলেন, কেউ গেলেন মধ্য এশিয়ার মরুভূমিতে, কেউ গেলেন সাইবেরিয়ার স্তেপ ভূমিতে, বন-ভূমিতে, মহাসাগরে বা মহাকাশে। এঁরা হয়ত বিজ্ঞানী, অভিযাত্রী, কর্মচারী বা শিক্ষার্থী। এমন কি স্কুলের ছাত্রছাত্রীও হতে পারেন। সঙ্গে তাঁদের মুভি ক্যামেরা। যা ভাল মনে করছেন তাঁরা ছবি তুলছেন। ফিরে এসে সেগুলির প্রয়োজনীয় রাসায়নিক কাজ ও সম্পাদনা করছেন। তখন দেখা যাবে তার মধ্যে এমন সব ছবি রয়েছে যা হবিতে জন্ম হলেও—জ্ঞানের বিকাশে অমূল্য দলিলে পরিণত হয়েছে। প্রথম মহাকাশযাত্রী গাগারিন এরকম একজন এ্যামেচার ফিল্ম মেকার। তিনিই প্রথম মহাকাশের ছবি তুলে এনেছেন. যে ছবি দেখে মানুষ মহাকাশ থেকে পৃথিবীকে দেখতে পেয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়নে সখের ছবি তুলিয়েরা যেসব ছবি তুলেছেন তার মধ্যে বৈকাল-হ্রদে শীতকালীন অভিযান, মাছের জীবন, পোকা-মাকড়ের জীবন, সমুদ্রের ঝড়, তুষার ঝড়, ক্যারাকুম মরুতে খাল খনন এবং মহাকাশের ছবি উল্লেখযোগ্য। সোভিয়েট প্রাচ্যের বিরোবিজান শহরের স্কুলের ছাত্ররা একটা মজার ছবি তুলেছে তাদের বিদ্যালয়কে অবলম্বন করে। এক-ঘেয়ে এবং উৎসাহহীন শিক্ষাজীবনকে তারা প্রকাশ করেছে এই ছবিতে। মাস্টার মশাইরা কেমন পড়ান, ক্লাশের পড়া তাদের কেমন লাগে সে কথা তারা এই ছবিতে জানিয়েছে। একজন তার রান্নাঘরকে কেন্দ্র করে তরি-তরকারী শাক-সব্জী দিয়ে একটা সুন্দর কার্টুন ছবি তৈরি করেছে। কয়েকজন ডাক্তার তাদের বড় বড় অপারেশন এবং জটিল রোগের

আমেরিকান লোকসংগীত গায়ক বিল ক্রোফৎ পাঁচ দিনের জন্য কলকাতা এসেছিলেন, ছবিতে তাঁকে নির্মলেন্দু চৌধুরীর সঙ্গে সংগীত অনুশীলনে দেখা যাচ্ছে।

কেসগুলি চলচ্চিত্রে ধরে রেখেছে। যা ডাক্তারী ছাত্রদের ক্ষেত্রে পুস্তকের চেয়েও মূল্যবান হয়েছে। এভাবে হবির ছবি জ্ঞানের প্রদীপ হয়েছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নে সখের ছবি-তোলার হাজার হাজার লোক রয়েছে। প্রায় সাড়ে তিন হাজার ছোটখাট স্টুডিও রয়েছে, যেখানে ডেভালাপমেণ্ট ও সম্পাদনার কাজ হয়। ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র সমিতি, যুব সমিতি, মহিলা সমিতি, যৌথ খামার, শিশুদের সংস্থা, ট্যুরিস্ট ক্লাব, ক্রীড়া সমিতি প্রভৃতির পরিচালনাধীন এ্যামে-চার ফিল্ম ইউনিট ও স্টুডিও রয়েছে। প্রতি বছর এসব ক্লাবের ছবির প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। প্রতিযোগিতায় পুরস্কার দেওয়া হয়। এরূপ এ্যামেচার ছবির কয়েকটি আন্তর্জাতিক এ্যামেচার ছবির প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করেছে। সখের ছবির মধ্যে থেকে বাছাই করে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছবি কিনে নেয়। এমন কি পেশাদার প্রতিষ্ঠানগুলিও ছবি কেনে। এই সখের ছবি নির্মাতাদের মধ্য থেকে অনেকে পেশাদার চলচ্চিত্র পরিচালক হয়েছেন।

চিত্র আলোচনা

ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিক

সম্প্রতি কলকাতার একটি বিখ্যাত সিনেমা হলে ভারতীয় ফিল্ম ডিভিসন কৃত 'ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিক' নামে প্রামাণিক চিত্র দেখলাম। ছবির টাইটেল পর্দায় দেখা দিতেই চোখ-কান সজাগ হয়ে উঠল, ভাল কিছু দেখাশোনার আগ্রহ মনে সৃষ্টি হল। ফিল্ম ডিভিসনের অধিকাংশ ছবি দেখার অযোগ্য। তার মধ্যেও দু-চারটি এমন ছবি দেখা যায়—যা বাস্তবিক প্রশংসনীয় এবং আন্তর্জাতিক দর্শকদের কাছে উপস্থিত করা চলে। এই আশায় ভারতীয় ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের এই প্রামাণ্য চিত্রটি দেখার বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু ছবি কিছুদূর অগ্র-সর হতেই আশা আর থাকল না। মনে হল কোন শিক্ষার্থীর হাতে তৈরি ছবি। শিক্ষার্থীর অপরিণত চিন্তার লক্ষণ ছবিটির সারা অঙ্গে। পরিচালক অত্যন্ত হাল্কাভাবে উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের তুলনা করে এমনভাবে সঙ্গীত পরিবেশন করলেন যে, দর্শকরা হট্টগোল শুরু করে দিল। এজন্য দর্শক-দের দোষারোপ করা চলে না, কারণ এই দর্শকরাই তো পয়সা খরচ করে ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত শোনে। পরিচালক তাঁর অপরিণত চিন্তার আরো পরিচয় দিয়েছেন মিঞা-কি মল্লার ও ভৈঁরোর সঙ্গে দৃশ্য রূপারিত করে। 'মিঞা-কি মল্লার'-এর সঙ্গে মেঘ, বৃষ্টি ও জলপ্রপাত, ভৈঁরোর সঙ্গে সূর্যোদয়ের দৃশ্য। ছবিটি রঙীন। অর্থব্যয় কম হয় নি। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে এই ছবি করার উদ্দেশ্য কি?

ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খেলছেন ভারতীয় জুটি কৃষ্ণান এবং জয়দীপ

বাংলার দুই নায়ক

ইন্দোরের নেহরু স্টেডিয়ামে ২৮শে ডিসেম্বর বাংলার সুব্রত গুহ একটি বল করলেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের কিং ফরোয়ার্ড খেলতে গিয়ে ক্যাচ তুললেন। বাংলার ফুটবল তারকা চুনী গোস্বামী ক্রিকেটেও যাঁর প্রতিভা উল্লেখযোগ্য, নির্ভুলভাবে ক্যাচটি ধরলেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ইনিংস পরাজয় ভারতীয় ক্রিকেটের মনোবলকে দিল এক নতুন প্রেরণা। বিশেষ করে কলকাতার দ্বিতীয় টেস্টের ঠিক পূর্বমুহূর্তে।

সম্মিলিত মধ্য ও পূর্বাঞ্চল দলের এই স্মরণীয় বিজয়ের পশ্চাতে রয়েছে বাংলার সুব্রত গুহ ও চুনী গোস্বামীর মারাত্মক বোলিং। সৌভাগ্যের কথা যে, সুব্রত গুহ কলকাতা টেস্টের নির্বাচিত খেলোয়াড় তালিকায় স্থান পেয়েছেন। ইন্দোরের কৃতিত্ব টেস্ট দলে তাঁর স্থানকে প্রায় সুনিশ্চিত করেছে। সুঁটে ব্যানার্জির পর এন চৌধুরী, মন্টু ব্যানার্জি প্রভৃতি দু-একজন বোলার সর্বভারতীয় ক্রিকেটে সুনাম অর্জন করেছিলেন। আশা করা যায়, সুব্রত গুহ টেস্ট ক্রিকেটে আসন পাকা করে নিতে পারবেন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল খেলার এই পরিণাম আশা করতে পারে নি। দল গঠনে তেমন সতর্কতা না নেওয়ার ফলে দলের ভাঙনকে রোখবার মত নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় কেউ ছিলেন না। হান্টের মত অভিজ্ঞ খেলোয়াড় এবং গিবস্ অথবা সোবার্সের মত প্রতিভাসম্পন্ন বোলার থাকলে খেলার ফলাফল এত শোচনীয় হত না। ইন্দোরের খেলার একটা বড় শিক্ষা যে, ভাল বোলিংয়ের সঙ্গে ভাল ফিল্ডিংয়ের সমন্বয় হলে

শ্রীঅমিতাভ

অনেক বড় বড় টিমকে ঘায়েল করা যায়।

সম্মিলিত মধ্য ও পূর্বাঞ্চলের খেলোয়াড়দের মধ্যে ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন হনুমন্ত সিং, রমেশ সাক্সেনা, সুব্রত গুহ ও চুনী গোস্বামী। তাঁরা যথাক্রমে রান করেছেন—৫২, ৪৯, ৪৬ ও ২৫। বোলিংয়ে প্রথম ইনিংসে সুব্রত অধিকার করেছেন ৬টি উইকেট ৪৯ রানে ও চুনী গোস্বামী ৩টি উইকেট ৫০ রানে। দ্বিতীয় ইনিংসে সুব্রত ৭টি উইকেট লাভ করেন ৪৯ রানে এবং চুনী গোস্বামী ৩টি উইকেট ৫০ রানে। মধ্য ও পূর্বাঞ্চলের ৯ উইকেটের বিনিময়ে ২৮৩ রানের বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল করেছে ২টি ইনিংসে যথাক্রমে ১৩৬ ও ১০৩। এক ইনিংস ও ৪৪ রানে পরাজয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেট মর্যাদায় একটা মস্ত বড় আঘাত।

ইডেনের সমাচার

কলকাতা এখন ক্রিকেট পাগল: চারিদিকে শুধু নাই নাই রব! সকলেই চায় শুধু একটি টিকিট। ক্রিকেটপিপাসু দর্শকরা মেটাতে চায় তাদের তৃষ্ণা, কারণ বিশ্বজয়ী ক্রিকেট দল ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলা দেখা সত্যই ভাগ্য। অন্তত বর্তমানে কলকাতায় টিকিটের হাহাকার দেখে মনে হয় চাহিদার কাছে নবনির্মিত স্টেডিয়াম নিতান্ত নগণ্য। মাত্র ষাট হাজার দর্শকের স্থান সঙ্কুলান হবে এই নবনির্মিত স্টেডিয়ামে এবং ভারতের আর কোন ক্রিকেট মাঠে এত বেশি দর্শকের স্থান সঙ্কুলান হতে পারে না।

গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দমদম বিমান বন্দর পূর্ণ ছিল কলকাতার ক্রিকেট অনুরাগীতে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই দর্শনার্থী দর্শকদের আশা পূর্ণ হল। সোবার্সের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল কলকাতার মাটিতে পদার্পণ করল, সঙ্গে ভারতীয় টেস্ট দলের সুব্রত গুহ এবং হনুমন্ত সিং ছিলেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় হলফোর্ড কলকাতায় আসতে পারেন নি। হলফোর্ড বর্তমানে অসুস্থ অবস্থায় দিল্লীর হাসপাতালে।

উৎসাহী দর্শকদের হাত থেকে কোনক্রমে খেলোয়াড়দের রক্ষা করে গাড়িতে তোলা হয়। সি-এ-বি-র দুই স্থানীয় ম্যানেজার শ্রীদিলীপ ঘোষ এবং শ্রীঅম্বিকা ব্যানার্জী অদ্ভুতভাবে দর্শনার্থীদের এড়িয়ে খেলোয়াড়দের গাড়িতে তোলেন।

গত শুক্রবার ইডেনে ভারতীয় এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের খেলোয়াড়দের অনুশীলন দেখার জন্য অগণিত দর্শক

সোবার্স

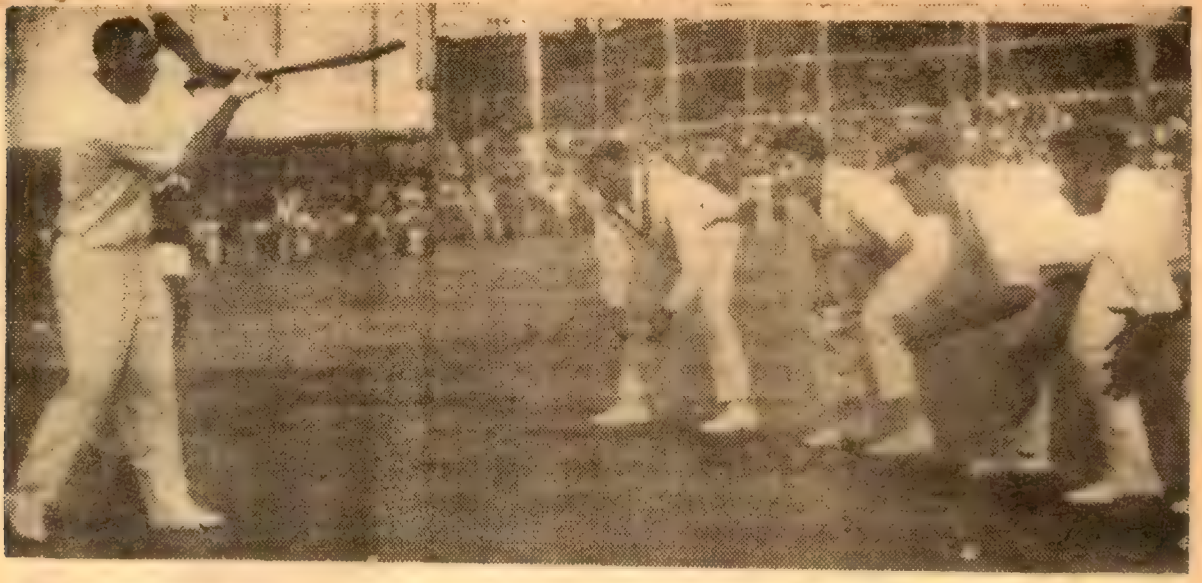

ইডেন উদ্যানে অনুশীলনরত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল

উপস্থিত ছিলেন ইডেনে। এমন কি খেলোয়াড়রা গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে আছেন বলে, হোটেলের সামনেও দর্শকের ভিড়ের কমতি নেই।

এবার পূর্বে সাধারণ দর্শকদের কাছে কোন টিকিট বিক্রয় করা হয় নি। খেলার দুদিন পূর্বে সি-এ-বি অফিস থেকে অল্পসংখ্যক সিজন টিকিট সাধারণ দর্শকদের দেওয়া হয়। ধৈর্য ধরে যাঁরা সেখানে অপেক্ষা করছিলেন, তাঁদের মধ্যে মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান সেই সিজন টিকিট লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

৩১।১২।৬৬

ভারত সফরে ওরেল

বিশ্বখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রাক্তন অধিনায়ক স্যার ফ্রাঙ্ক ওরেল ভারত সরকারের আমন্ত্রণে ছয় সপ্তাহের জন্য ভারত সফরে এসেছেন। আশা করা যাচ্ছে, কলকাতায় দ্বিতীয় টেস্টের সময় তিনি কলকাতার মাঠে উপস্থিত থাকবেন। মাদ্রাজের তৃতীয় টেস্ট খেলার সময়ও তিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সঙ্গে সেখানে যাবেন।

ফ্রেড স্টোর্লে

অস্ট্রেলিয়ার প্রাধান্য

অনেক আশায় পুঁজি নিয়ে ভারত অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েছিল ডেভিস কাপের শেষ মোকাবিলা করতে। অশ্বেতাঙ্গ দেশের পক্ষে ভারত প্রথম চ্যালেঞ্জ রাউন্ড-এ

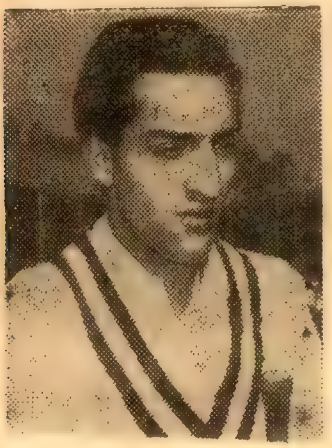

পতৌদি

ওঠবার গৌরব অর্জন করেছে। কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ভারতের এই অগ্রগতি। কিন্তু শেষরক্ষা হয় নি। প্রথম দিন ভারত ভাল খেলতে পারে নি। অস্ট্রেলিয়ার ক্রীড়া সমালোচকরা অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সংগে ভারতের ক্রীড়ামানের সমালোচনা করেন। অনেকে উপমা দেন দৈত্যের সংগে ক্ষুদে বামুনের লড়াই। কেউ কেউ মন্তব্য করেন এই ধরণের বিরুদ্ধপক্ষের দুর্বলতা ভবিষ্যতে ডেভিস কাপের খেলায় টিকিট বিক্রির প্রতিবন্ধক হবে। কেউ বা উপদেশ দেন, আমেরিকা থেকে ভাল খেলোয়াড় ধার করতে এবং তাকে পাগড়ী পরিয়ে ভারতীয় বলে চালাতে। ডেভিস কাপের শেষ খেলায় যারা বিরুদ্ধতা করছে, সেই দলের কাছ থেকে অস্ট্রেলিয়া আরও উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্য আশা করেছিল। কিন্তু ভারত প্রথম দিন তাদের নিরাশ করেছিল। প্রথম খেলায় স্টোলে কৃষ্ণানকে অতি সহজেই ৬-৩, ৬-২, ৬-৪ গেমে হারিয়ে দেন। দ্বিতীয় খেলায় জয়দীপ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সংগে এমার্সনকে বাধা দেন। প্রথম সেটের খেলা বেশ প্রাণবন্ত হয় এবং আশা হয়েছিল যে, তিনি সহজে পরাজিত হবেন না। কিন্তু অভিজ্ঞ খেলোয়াড় এমার্সন স্বদেশের কোর্টে তরুণ জয়দীপকে লড়াই চালানোর বিশেষ সুযোগ দিলেন না। খেলার ফলাফল হল ৭-৫, ৬-৪, ৬-২ গেম এমার্সনের পক্ষে।

২৬শে ডিসেম্বর প্রথম দিনের খেলার ফলাফল থেকে ভারতের আশার কোন চিহ্নই আর রইল না। ২৭শে ডিসেম্বরের ডাবলস খেলায় বোধ হয় ডেভিস কাপের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যাবে। বিশ্ব-বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ার জুটি নিউকোম্ব ও রোচ অজেয় বলেই স্বীকৃত। সুতরাং আশা করার কিছু নেই। অস্ট্রেলিয়ার টেনিস সমালোচকরা একবাক্যে বললেন, দ্বিতীয় দিনেই সব শেষ এবং খেলার ফলাফল হবে সিংগলস-এর চেয়েও শোচনীয়।

একটা হতাশ আবহাওয়ায় ডাবলস খেলা শুরু হল। নিউকোম্ব ও রোচের দাপট প্রথম থেকেই ভারতীয়দের কাবু করে ফেলল। প্রথম সেটেই ভারতীয় প্রতিরোধ অতি সহজেই চূর্ণ হল। অস্ট্রেলীয় জুটি ৪-৬ গেমে সেটটি করায়ত্ত করল। খেলার আকর্ষণ বেশি না থাকায় দর্শক সমাগমও খুব কম হয়েছিল। প্রথম সেটের ফলাফল দেখে তাও ধীরে ধীরে কমতে লাগল। কিন্তু দ্বিতীয় সেটে কৃষ্ণান ও জয়দীপ ধীরে ধীরে জেগে উঠল তাদের নৈরাশ্য থেকে। অস্ট্রেলীয় জুটি বেশ কিছু ভুল করতে লাগল। নিউকোম্ব তাঁর সার্ভিস গেম হারালেন। ভারতীয় দল এই সুযোগে দ্বিতীয় সেটটি জিতে নিল ৭-৫ গেমে। এর পর থেকে ভারতীয় আক্রমণের মুখে নিউকোম্ব বারে বারে ভুল করতে লাগলেন। হ্যারী হপম্যান, অস্ট্রেলিয়ার দলপতি নিউকোম্ব ও রোচকে নানাভাবে সলাপরামর্শ ও উৎসাহের বাণী দিয়ে চাঙ্গা করবার চেষ্টা করলেন। ভারত তৃতীয় সেটও অধিকার করল ৬-৪ গেমে। এই জয়ের বন্যা অস্ট্রেলীয় জুটিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। ভারত প্রথম সেট হারিয়ে শেষ তিনটি সেট জিতল ৭-৫, ৬-৪, ৬-৪ গেমে। ভারত ডাবলস খেলা জিতে প্রমাণ করল চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে খেলবার যোগ্যতা তার আছে।

২৮শে ডিসেম্বর শেষ দুটি সিংগলস খেলা হল। প্রথম খেলায় কৃষ্ণান এমার্সনের কাছে ৬-০, ৬-২, ১০-৮ গেমে হারলেন। এই খেলাটি জিতে অস্ট্রেলিয়া একুশবার ডেভিস কাপ জিতল। কৃষ্ণান প্রথম দুটি সেটে একটুও খেলতে পারেন নি। তা ছাড়া এমার্সনের খেলা ছিল নিখুঁত ও জোরালো। তৃতীয় সেটে কৃষ্ণান ভাল খেলেন কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারেন নি।

শেষ খেলায় জয়দীপ ভারতীয় টেনিসের একটি উজ্জ্বল পরিচ্ছেদ লিখে রাখলেন মেলবোর্নের কুয়াং স্টেডিয়ামে। ভারতীয় টেনিসের প্রতি তাচ্ছিল্য ও অবমাননার যোগ্য প্রত্যুত্তর তিনি দেন স্টোলের সংগে সমানভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

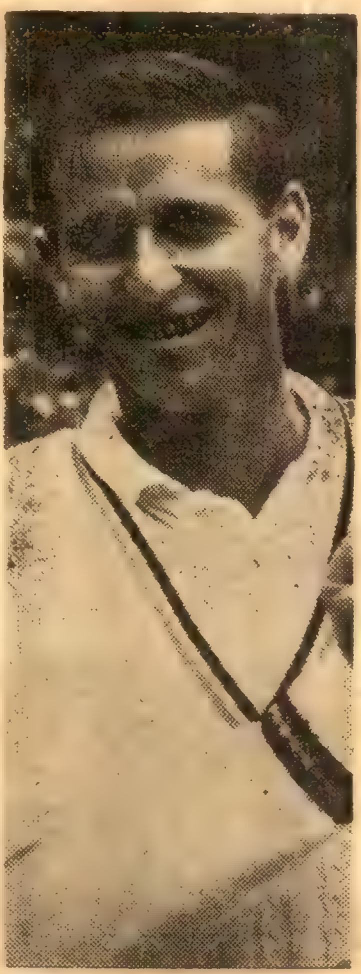

রয় এমার্সন

করে। তাঁর পরাজয় হলেও তিনি প্রমাণ করেন স্টোলের চেয়ে তিনি কোন অংশে কম নন। খেলাটির স্কোর ছিল ৫-৭, ৮-৬, ৩-৬, ৭-৫ ও ৭-৫।

—দেবাশীষ মজুমদার

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট্‌স্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

চ্যবনপ্রাশ

চ্যবনপ্রাশের মূল উপাদান আমলকী দেহের পুষ্টিসাধনে ও স্বাস্থ্যোদ্ধারে আমলকীর অত্যাশ্চর্য্য গুণাবলী সর্বজন বিদিত। এতদ্ব্যতীত, বিশুদ্ধ গব্যঘৃত—কৃষ্ণতিল তৈল, মিছরী ও অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য ও বহু মূল্যবান ভেষজ সংমিশ্রণে ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা আয়ুর্বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ রসায়ন।

সর্দ্দি, কাশি ও স্বরভঙ্গের মহৌষধ

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ. আয়ুর্বেদশাস্ত্রী
এফ. সি. এস. (লণ্ডন) এম. সি. এস. (আমেরিকা)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর কলিকাতা-৪৮

কলিকাতা কেন্দ্র—ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম. বি. বি. এস. (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য্য।

...ursday, 5th January, 1967 — SAPTAHIK BASUMATI Regd. No. C 71
Price : 25 Paise Gram : "BASUMATI" PHONE : 34-7771, 72, 73

6 JAN 1967

বসুমতী

এবার সোয়েকার্নো'র পালা

ছাত্রদের দাবিতে কৃতকর্মের কৈফিয়ৎ দানে সম্মত

র্ষ : ৩১শ সংখ্যা বৃহস্পতিবার, ২৭শে পৌষ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ • • • 12th Jan., 1967 * Vol. 71, No. 31

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		১৯২৩
আজকের মানুষ		১৯২৪
ভারতদর্শন		১৯২৫
আন্তর্জাতিক		১৯৩০
প্রত্যাশার মৃত্যু ও দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা	কৃত্তিবাস ওঝা	১৯৩৩
সুবর্ণলতা (ধারাবাহিক উপন্যাস)	আশাপূর্ণা দেবী	১৯৩৬
শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারে (প্রবন্ধ)	ফণীন্দ্রনাথ রায়	১৯৩৯
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	অনন্ত সিংহ	১৯৪১
বিদেশ বিচিত্রা	পরিচয় মিত্র	১৯৪৫
গ্রন্থমেলা		১৯৪৮
বঙ্গদর্শন		১৯৪৯
বিষাদসিন্ধুর পর (গল্প)	সমীর মুখোপাধ্যায়	১৯৫৩

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল এম. এস, সি প্রণীত

আমার দেখা মেয়েরা

(রহস্য রোমাঞ্চের স্বর্ণখনি)

'রক্তনদীর ধারা', 'অপরাধ বিজ্ঞান' ও 'বিখ্যাত বিচার রূপদান। মেয়েদের মন আর মতি স্বয়ং দেবাঃ ন জানন্তি। কাহিনী' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলির লেখকের সত্যঘটনামূলক বিভিন্ন ও বিচিত্র নারী-চরিত্রের রহস্য উদ্ঘাটন ও যথাযথ অভিজ্ঞ ও দক্ষ লেখকের রচনার বৈশিষ্ট্যে বাংলা দেশের নারী-সমাজের এক অজানা অংশ সাধারণের চোখে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে। পড়তে পড়তে বই শেষ না করে ওঠা যায় না। বইয়ের আদ্যোপান্ত রুদ্ধশ্বাস উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা। উপন্যাসের চেয়েও সুখপাঠ্য।

মূল্য চার টাকা

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগ ঃ—মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, পদ্মাবতী নাটক, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা? (বোর্ড বাঁধাই)—সাড়ে চার টাকা।

দ্বিতীয় ভাগ ঃ—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্মিষ্ঠা নাটক, তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য, মায়া কানন, হেক্টর বধ। (বোর্ড বাঁধাই) সাড়ে তিন টাকা

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

রবীন্দ্রনাথ বলেন—"আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সংগীত এরূপ সহস্রধারে উৎসের মত কোথাও প্রোৎসারিত হয় নাই। এমন সুন্দর ভাবের আবেগ, কথার সহিত এমন সুরের মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না।"

বাঙ্গালার নব গীতিকবিতার প্রবর্তক, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির কাব্যগুরু ঋষি কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর রচনার সমাবেশ।

কবির জীবনী, সুবিস্তৃত সমালোচনা সহ সুবৃহৎ গ্রন্থ

মূল্য তিন টাকা

ডঃ মতিলাল দাশ প্রণীত

মতিলাল গ্রন্থাবলী

মূল্য—দুই টাকা

-ইহাতে আছে-

১। চলার পথে (উপন্যাস)
২। মনীষা (উপন্যাস)
৩। বিদ্যুৎশিখা (১১ খানি গল্প সমষ্টি)
৪। দীপশিখা (কবিতা সংকলন)
৫। চার্বাক (নাটক)

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
এইচ, জি, ওয়েলস্-এর গল্প	ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	১৯৫৭
'চোমংলামা'র চোখে উত্তরবঙ্গ	—	১৯৬৩
পালাবদল (কবিতা)	তারক চক্রবর্তী	১৯৬৬
কাল মধ্যরাত্রে (কবিতা)	অজিতকুমার রায়	১৯৬৬
দিল্লী থেকে	বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য	১৯৬৭
বোকাটা (কবিতা)	প্রভাকর মাঝি	১৯৬৯
অদ্বিতীয় (কবিতা)	অঞ্জনা সেনগুপ্তা	১৯৬৯
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	শিলালি	১৯৭০
পাঠকমন	—	১৯৭৪
রঙ্গজগৎ	—	১৯৭৫
খেলাধুলা	শ্রীঅমিতাভ	১৯৮০

পৃথিবীর তরুণ-সমাজের হৃদয়জয়ী

সার ওয়াল্টার স্কটের গ্রন্থাবলী

দ্বিতীয় ভাগ
শরৎচন্দ্র মিত্র অনূদিত
আইভ্যানহো, হাইলেন্ড উইডো, ফেয়ার মেড অফ পার্থ সার্জ্জনস্ ডটার
মূল্য—৩·০০

তৃতীয় ভাগ
সরোজনাথ ঘোষ অনূদিত
দি ব্রাইড অব ল্যামারমুর, লিজেন্ডস অব মনট্রোজ, দি এ্যান্টিকোয়ারি
মূল্য ১॥০ টাকা।

সাহিত্য-জগতের গৌরবপ্রভা—হাস্যরসাবতার—নাট্যসাহিত্যের প্রবর্তক—রস-সাহিত্যের স্রষ্টা—রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের

দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—জীবনী ও কবির সমালোচনা, নীলদর্পণ, জামাই বারিক, বিয়ে পাগলা বুড়ো, নবীন তপস্বিনী, কমলে কামিনী।
২য় ভাগে—সধবার একাদশী, যমালয়ে জীবন্ত মানুষ, পোড়ামহেশ্বর, কুঁড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ, লীলাবতী, সুরধুনী কাব্য, দ্বাদশ কবিতা, পদ্য সংগ্রহ।
প্রতি ভাগ দুই টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত

প্রাচীন ভক্তদের রচিত সুললিত বাংলা পয়ারে
মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র

এই সুবৃহৎ গ্রন্থে আছে—শ্রীল সনাতন গোস্বামীর 'ভাগবতামৃত' গ্রন্থের কবিচন্দ্রের বঙ্গানুবাদ এবং শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়তম 'ভাগবতাচার্য' রঘুনাথ পণ্ডিতের প্রেমতরঙ্গিনী।
ইহাতে আছে দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ
শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভাগবতামৃতের অনুবাদ
কবিচন্দ্রের
শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত
এবং
ভাগবতাচার্যের বিশ্বপ্রসিদ্ধ
শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী
সমগ্র ভারতে প্রথম বঙ্গানুবাদ
"...শুনিয়া তাহার ভক্তিযোগের পঠন।
আবিষ্ট হইল গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥"
ইহা কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারতের ন্যায় বাংলার প্রতি গৃহস্থের অবশ্যপাঠ্য হউক, এই নিবেদন।
এই মূল্যবান গ্রন্থ বাংলার প্রতি ঘরে প্রতিষ্ঠিত করুক।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

৭১ বর্ষ ঃ ৩১শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ২৭শে পৌষ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

Price : 25 Paise
Thursday, 12th January, 1967

স্কুলের ছুটি হ্রাসের প্রস্তাব

কেন্দ্রীয় সরকার একটি নির্দেশ পাঠিয়েছেন আমাদের রাজ্য সরকারের কাছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণের জন্যেই নির্দেশটি পাঠানো হয়েছে। ঐ নির্দেশের ব্যাপারে রাজ্য সরকার কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন—আপাতত তা স্থিরীকৃত না হলেও, সিদ্ধান্ত জানাবার আগে রাজ্য সরকার সব দিক বিচার-বিবেচনা করবেন—বলেই আমাদের ধারণা। তাছাড়া বিচার-বিবেচনা যাঁরা করবেন তাঁরা যাতে শিক্ষাজগতের অভিজ্ঞ ব্যক্তি হ'ন—আশা করি সে ব্যাপারেও সরকার দৃষ্টি রাখবেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই নির্দেশে বলা হয়েছে যে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির ছুটির দিন কমিয়ে পড়াশুনার দিনের সংখ্যা ২২০ করতে হবে। শারদোৎসব ও গ্রীষ্মের দুটি লম্বা ছুটি হ্রাস করার ও শনিবার পুরো দিন বিদ্যালয় খোলা রাখার প্রস্তাবও কেন্দ্রীয় সরকার করেছেন। ছুটি হ্রাস করার জন্যে অন্য যে প্রস্তাব করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, বাৎসরিক পরীক্ষার পর নতুন বছরের আরম্ভের ক'টা দিন নামে মাত্র বিদ্যালয় খোলা না রেখে পঠন-পাঠনের কাজ পুরোদমে চালাতে হবে।

ছাত্রদের বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে প্রত্যেক অভিভাবক, শিক্ষক বা শিক্ষাবিদ চাইবেন যে, সেখানে তারা অন্তত কিছুটা শিক্ষা-লাভ করুক। কিন্তু ছুটি হ্রাস করার সিদ্ধান্ত নেবার আগে দেখতে হবে যে, বিদ্যালয়গুলি বছরে যে ক'য় মাস খোলা থাকে—সেই সময় ছাত্রদের পাঠ গ্রহণের পক্ষে যথোপযুক্ত কি না? আমাদের দেশে বর্তমানে শিক্ষাজগতে হঠাৎ এমন বিপর্যয়ের সৃষ্টি হচ্ছে যে, আসলে যে ক'দিন বিদ্যালয় খোলা থাকার কথা—সে ক'টা দিন ভালোভাবে ক্লাস হয় না। সেই সব ক্লাস ঠিকভাবে হলে এবং বিজ্ঞানসম্মত পাঠ্যসূচী নির্ধারিত হলে ছাত্রদের পড়াশুনায় বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে বলে আমরা মনে করি না। কিন্তু ছুটি হ্রাস করে বিদ্যালয় খোলা রাখার দিন বাড়িয়ে যদি অধিকতর বিপর্যয় সৃষ্টি করা হয়— তাহলে বর্তমানে যেটুকু পড়াশুনা হবার আশা, তাও তিরোহিত হবে। বিপর্যয় সৃষ্টি হবার কারণও রয়েছে অনেক। শিক্ষকদের স্বল্প বেতন এবং ছাত্রদের নানাবিধ সুযোগ-সুবিধার অভাব যতদিন থাকবে—ততদিন সমস্যার সৃষ্টি হতে কালবিলম্ব হবে না। সরকার তখন নিজেই হয়তো বিদ্যালয়ে 'লক আউট' ঘোষণা করবেন।

ছাত্রদের আর্থিক সুযোগ-সুবিধার অভাব ছাড়া অন্য যে অসুবিধা রয়েছে তা হচ্ছে অবৈজ্ঞানিক পাঠ্য তালিকা। দৈহিক ভার বহনে অক্ষম প্রাত্যহিক পুঁথির বোঝা তাদের জন্য নির্বাচিত করা হলেও সেই পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন করার জন্যে তাদের মেধা ও বুদ্ধি কতখানি—তার বিচার করা হয় না। সারা বছর বিদ্যালয় খুলে রাখা হলে আরো বেশি বই তাদের 'গুলে খেতে' দেবার মতো কবিরাজী ব্যবস্থা হয়তো পণ্ডিত মশাইরা করতে পারেন—কিন্তু তাতে কি কিছু ফলোদয় হবে? এ ছাড়া ছাত্ররা শিক্ষকদের কাছে যা যা শিক্ষা লাভ করে, তা পরিপাক করার জন্য তাদের সময় ও অবসরের প্রয়োজন।

ছাত্রদের হিতাহিতের সঙ্গে যাঁরা জড়িত তাঁরা ভালোভাবেই জানেন যে, বর্তমানে শিক্ষার জন্য প্রয়োজন যথার্থ পরিবেশ ও ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আর পুঁথির বিদ্যাই সব নয়—একথাও তাঁরা ভালোভাবে জানেন বলেই—অন্তত তাদের ছুটির সময়ে বহির্জগৎ সম্বন্ধে যাতে তাদের কিছুটা ধারণা জন্মে এদিকে লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দেন। বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালে আবদ্ধ থাকলেই বিদ্যা অর্জন করা যায় না। জীবনের নানা প্রান্ত থেকে বিদ্যাকে সংগ্রহ করতে হয়। দুঃখের ব্যাপার, স্বাধীন ভারতে তার কোনো ব্যবস্থাই নেই। ব্যবস্থা না থাকার কারণ, তাতে সরকারের খরচ বাড়তে পারে। অবৈজ্ঞানিক পাঠ্যসূচী সম্বন্ধেও সরকার নির্বাক, নিস্পৃহ। গ্রীষ্মকালে অধিকাংশ গ্রামের ছাত্রই বেশ কয়েক মাইল হেঁটে বিদ্যালয়ে যায়—তাও তাঁরা জানেন না, এবং শিক্ষকরা ইমার্জেন্সী ক্লাস ছাড়া প্রত্যহ ৬।৭টি পিরিয়ড একনাগাড়ে কাজ করে যান, তাও তাঁদের অজ্ঞাত, অধিকন্তু তাঁদেরও যে বিদ্যালয়ের স্তূপীকৃত পরীক্ষার খাতা দেখতে হয়, পড়াবার আগে তাঁদের নিজেদের প্রস্তুতি দরকার হয়—এত সব খবর কেন্দ্রীয় সরকার না-জানার ভান করেছেন বলেই শনিবারেও রেহাই নেই। পাশাপাশি ধনীদের বিদ্যালয়ে ছুটিও আছে, পড়াও হয়।

অবশ্য ছুটি হ্রাসজনিত নির্দেশের ব্যাপারে আমরা কিছুটা কিংকর্তব্যবিমূঢ়ও বোধ করছি। কারণ পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছুটির দিন মোট ১৪২ (৮৫ নানাবিধ ছুটি+৫ প্রধান শিক্ষকের ক্ষমতাবলে+৫২ রবিবার)। এখন কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে, যদি ছুটি হ্রাসেরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তাহলে আরো কিছু দিন ছুটি পাওনাই হয়। জানি না পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ব্যাপারে কি করবেন?

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

'নোংরা, জঘন্য রিপোর্ট', পচা গন্ধ বেরুচ্ছে যেন'—বলেছেন মার্কিন সরকারের একজন উঁচুতলার অফিসার। কার রিপোর্ট সম্পর্কে বলছিলেন। স্যালিসবারীর, আবার কার?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী সংবাদপত্র 'নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এর দুঁদে সাংবাদিক স্যালিসবারী হ্যানয় থেকে যে রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন, তাতে মার্কিন সরকারের কীর্তিকাহিনী ফাঁস হয়ে পড়ছে। মার্কিন কর্তৃপক্ষ গোড়ায় অস্বীকার করেছিলেন উত্তর ভিয়েতনাম সরকারের অভিযোগ, কিন্তু বোমাবর্ষণের মাত্র ১০০ গজের মধ্যে দাঁড়িয়ে স্যালিসবারী যে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছেন সে বিবরণ মার্কিন প্রশাসন উড়িয়ে দিতে পারে নি, প্রেসিডেন্ট জনসন স্বীকার করেছেন যে, মার্কিনী বোমাবর্ষণের ফলে হ্যানয়ের বহু অসামরিক অধিবাসী নিহত হয়েছে। হেঁজি-পেঁজি কোনো রিপোর্টারের ডেস্প্যাচ হলে কি করতেন জানি না, ইংলন্ডের জেমস ক্যামেরন কিম্বা ফ্রান্সের জাঁ রাফেলির সংবাদকে বিশেষ গুরুত্ব দেন নি মার্কিন প্রশাসন দপ্তর, কিন্তু তাই বলে হ্যারিসন স্যালিসবারীর সংবাদকে? উনি না 'নিউ ইয়র্ক টাইম্স'-এর মত কাগজের এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজিং এডিটর? তাঁর বস্তুনিষ্ঠ সংবাদকে না আমেরিকা সম্মানিত করেছে পুলিৎজার পুরস্কার দিয়ে?

সে ১৯৫৬ সালের কথা। 'লৌহ যবনিকা'র অন্তরাল-কাহিনী এর আগেও বহু লেখা হয়েছে। কিন্তু স্যালিসবারীর 'রাশিয়া রিভিউড্' কিম্বা 'এ্যামেরিকান ইন রাশিয়া'র মতো ঘনিষ্ঠ, তথ্যবহুল, বস্তুনিষ্ঠ, চিন্তা উদ্রেককারী অথচ প্রাঞ্জল রচনা আর কে লিখতে পেরেছেন? দীর্ঘ ছ' বছর যাঁর সোভিয়েট রাশিয়াতে অবস্থান করার সুযোগ ঘটেছে, উত্তর সোভিয়েট অঞ্চল ও সাইবেরিয়ার বারো হাজার মাইল দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করতে পেরেছেন, তাঁর রিপোর্ট বা সংবাদ কিম্বা মতামতের মূল্য হবে না তো হবে কার?

সাংবাদিকতাকে স্যালিসবারী আজ পেশা করেন নি, এবং শুধু পেশাই নয়, এ নেশা তাঁর তরুণ বয়স থেকে। ছাত্র-বয়স থেকেই স্যালিসবারী সাংবাদিক, ২৫ বছর ধরে তিনি সংবাদপত্রজগতে ডানা মেলে বিচরণ করছেন। স্যালিসবারী শুধু মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রই নন তখন, সেই সঙ্গে 'মিনিয়াপলিস জার্নাল'-এর রিপোর্টারও। দু'বছর এখানে কাজ করে স্যালিসবারী বিখ্যাত সংবাদ সরবরাহ এজেন্সি ইউনাইটেড প্রেস-এর সংবাদদাতার দায়িত্ব পেলেন ১৯৩০-এ, সে বছরেই মাত্র তিনি বি-এ পাশ করেছেন। মিনেসোটার মিনিয়াপলিস শহরে ১৯০৮ সনে হ্যারিসন ইভান্স স্যালিসবারীর জন্ম, মাত্র ২০ বছর বয়সে সংবাদপত্রজগতে প্রবেশের ছাড়পত্র পেয়েছিলেন এই বুদ্ধিমান, তুখোড় ছেলেটি।

সেই থেকে স্যালিসবারী যুক্ত রয়েছেন বিভিন্ন সংবাদপত্রের সঙ্গে, বিভিন্ন দায়িত্ব নিয়ে। বি-এ পাশ করার পর তিনি ইউনাইটেড প্রেস-এর সংবাদদাতা হিসেবে শিকাগো গেলেন, পরে ওয়াশিংটন এবং সবশেষে নিউ ইয়র্কে ইউ-পি'র বৈদেশিক সংবাদ দপ্তরে। স্যালিসবারীর লেখা, তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির ওপর তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য এবং মৌলিকত্ব কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে নি, তাঁরা সুযোগ দিলেন তাঁকে অতলান্তিক অতিক্রমের। লন্ডন তখন ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে হিটলারের বোমার ঘায়ে, ম্যানেজারের গুরুদায়িত্ব দিয়ে ইউ-পি স্যালিসবারীকে পাঠালেন তাঁদের লন্ডন অফিসে, সন সেটি ১৯৪৩। পরের বছর সমগ্র প্রতিষ্ঠানের বার্তা-সম্পাদক হিসেবে স্যালিসবারী ৫০ হাজার মাইল বিস্তৃত গোটা যুদ্ধ-এলাকা সফর করলেন, প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হলেন তিনি বাস্তব যুদ্ধের সঙ্গে। আলজেরিয়ায় গিয়েছিলেন তিনি সেই সুযোগেই, গিয়েছিলেন কায়রোতেও যখন বিখ্যাত তেহরান সম্মেলনের কথা হচ্ছে। মস্কোও গিয়েছিলেন স্যালিসবারী তখন একবার, যদিও মাত্র দেড় মাসের জন্যে। কিন্তু সেই স্বল্পকালীন সফর-অভিজ্ঞতার আলোকেই তিনি কয়েকটি মূল্যবান রচনা লিখেছিলেন এই কমিউনিস্ট রাষ্ট্র সম্পর্কে, পরে যা 'রাশিয়া অন দি ওয়ে' নাম নিয়ে পুস্তকাকারে বেরিয়ে প্রচুর খ্যাতি ও প্রশংসা অর্জন করেছিলো।

হ্যারিসন স্যালিসবারী

'নিউ ইয়র্ক টাইমস' এই রুশ-বিশেষজ্ঞ সাংবাদিককে টেনে নিলেন ১৯৪৯ সনে, মস্কোতেই স্যালিসবারীকে তাঁদের সংবাদদাতা করে পাঠালেন। মস্কো থেকে পাঠানো তাঁর পর্যায়ক্রমিক ডেস্প্যাচগুলো সেদিন সারা আমেরিকায় প্রভূত আগ্রহ সৃষ্টি করেছিলো, 'নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এ প্রকাশিত এই প্রবন্ধগুলোই তিনি ১৯৫৪ সালে আমেরিকা ফিরে বই-এর আকারে প্রকাশ করেন 'রাশিয়া রিভিউড্' নাম দিয়ে। প্রবন্ধগুলোর অপূর্ব জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করেই একই রুশ-পশ্চাৎভূমিকে সম্বল করে স্যালিসবারী লিখলেন 'এ্যামেরিকান ইন রাশিয়া'—গোটা আমেরিকা ঝাঁপিয়ে পড়লো বইটির একটা কপি সংগ্রহ করার জন্যে। বইটিকে পুলিৎজার পুরস্কার দেওয়া হলো ১৯৫৫ সালে। সোভিয়েট রাশিয়ার এত আন্তরিক অন্তরচিত্র আর কেউ আঁকে নি তো আগে।

দীর্ঘকাল সংবাদপত্রজগতে থাকার এবং বাস্তব পৃথিবীকে জানার ফলে স্যালিসবারীর দৃষ্টিভঙ্গী হয়েছে স্বচ্ছ, পক্ষপাতশূন্য। তিনি মনে করেন সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি সহাবস্থান সম্ভব, তাঁর স্থির বিশ্বাস, এ দুটি দেশকে হয় একযোগে চলতে হবে, নয়তো ধ্বংস অনিবার্য। দুই সরকারের সাহস ও সদিচ্ছা থাকলে দু' দেশের মৈত্রী কঠিন হবে না বলে তাঁর ধারণা।

হ্যানয় থেকে প্রেরিত স্যালিসবারীর সংবাদ সারা বিশ্বে অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে, সমালোচকেরা বলছেন বটে, তাঁর সমস্ত সংবাদ সেন্সর হয়ে আসছে, কিন্তু অগ্রাহ্য করতে পারছেন না, কেউ অসত্য বলে। মার্কিন কর্তৃপক্ষকেও ভয়ানক অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়তে হয়েছে। এমনি করেই সংবাদপত্র জনমত গঠন করে, সরকারকে ভ্রান্ত নীতি পরিহার করতে বাধ্য করে।

হায়দ্রাবাদে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী

তাসখন্দ এবং তুরুপ তাসের বছর উনিশ শ' ছেষট্টি

১৯৬৬-কে বিদায় দিয়ে একবার পিছন ফিরে তাকালে মনে হয়, একটি বেদনা, হতাশা এবং বিভীষিকার বছরকে ইতিহাসের ঘরে জমা করে দিয়ে এলাম আমরা, ভারতবাসীরা, সঞ্চয় যে কিছুই করি নি এমন নয়, সাফল্য যে নিতান্তই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার মতো তাও নয়' কিন্তু সাফল্য অঙ্গুলিমেয় আর বিচ্ছিন্ন। সে তুলনায় প্রাপ্তির চেয়ে ক্ষতির অঙ্ক ঢের বেশি। আশা অপেক্ষা হাতাশার দীর্ঘশ্বাসই যেন বুকজোড়া।

তাসখন্দ চুক্তির ফলে পাক-ভারতের সম্মুখ সংঘর্ষ থামানো গেল হয়ত, কিন্তু স্থায়ী সমাধানে আজও সমুত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হল না। ওদিকে ফাঁকি দিয়ে সেই ছোট্ট এবং তেজী পুরুষ আমাদের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর বিদায় নিলেন। লালবাহাদুর পর্যন্ত ভারতে নেতৃত্বের একটা ধারা চলে আসছিল যাকে মোটামুটিভাবে অবিসংবাদী এবং সর্বজনস্বীকৃত নেতৃত্বের ধারা বলা যেতে পারে। অন্তত আপন দলে প্রত্যক্ষ বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয় নি নেহরুজীর মতো শাস্ত্রীজীকেও। কিন্তু শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আমল সর্বপ্রথম নেতৃত্ব প্রার্থীর দ্বন্দ্ব-প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হল। অবশেষে শ্রীমতী গান্ধী প্রধানমন্ত্রীর গদীতে বসলেন বটে, কিন্তু সে গদী শক্ত বনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হল না। কেবল শ্রীমতী গান্ধীই নন, কংগ্রেস প্রধান শ্রীকামরাজও প্রতি মুহূর্তে উপদলীয় চাপের সম্মুখীন হলেন। কংগ্রেস ভাঙতে শুরু করল বিভিন্ন রাজ্যে। দক্ষিণী শক্তি জোট বেঁধে কংগ্রেসের নিভু নিভু প্রগতিবাদের সলতে ব্যক্তিত্ববাদী (ইনডিভিডুয়ালিস্ট) আকাঙ্ক্ষার রেড়ির তেলে ঠেলে ঠেলে চুবাতে চাইলেন। ভারতীয় জনগণের প্রতি প্রদত্ত তথাকথিত সমাজতন্ত্রের স্বপ্নকে এঁরা দুঃস্বপ্ন বলে দূরে ঠেললেন। স্বাধীনতার প্রথম চোটের ঔজ্জ্বল্যে যে রাজরাজড়া এবং ধনিকগোষ্ঠী নেপথ্যে আত্মগোপন করেছিলেন, তাঁরা গ্রীনরুম থেকে এবার নিজের নিজের ভূমিকা প্রত্যক্ষ রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শন করার জন্য আহূত হতে লাগলেন। আগেই 'স্বতন্ত্র পার্টি' জন্ম নিয়েছিল এবার মূলত স্বাতন্ত্র্যহীন কংগ্রেস স্বতন্ত্র সমতুল অবাধ ইচ্ছার মহোৎসবে মাতবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। ইতিহাসের গতি আর একবার বিমূঢ়ভাবে পথের মধ্যখানে শ্লথপদে বিমনা হ'ল। নেহরু-চিন্তার শেষ খুঁটি কৃষ্ণমেননকে নিয়ে নাটক জমল। বিদায় নিলেন মেনন। কাদের নেপথ্য হাত গোমাতাকে সামনে রেখে বর্বর উন্মত্ততায় রাজধানীর বুকে মধ্যযুগীয় তাণ্ডব নর্তন শুরু করল, এক কোপে ছাঁটাই হ'য়ে গেলেন শ্রী জি এল নন্দা। বিদায়ের মুহূর্তকাল আগে ভারতরক্ষা আইন প্রয়োগের যথেচ্ছাচারের অভিযোগ যাঁদের জন্য তাঁকে নিজের কাঁধে তুলে নিতে হয়েছিল, তাঁরা কেউই শ্রীনন্দাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলেন না। আর সাবধানে রক্ষা পেয়ে গেলেন তাঁরা, দেশে মুদ্রামূল্য হ্রাস করে মুদ্রাস্ফীতিকে তীব্রতর করার জন্য যাঁরা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কেন না জনস্বার্থের দাবিতে এঁদের পদত্যাগের জন্যই দেশজোড়া আওয়াজ উঠেছিল। বোঝা গেল দেশের লোক আকাঙ্ক্ষিত পথেই পদযাত্রায় অক্লান্ত ছিলেন, বিপথগামী হলেন কংগ্রেসের বর্তমান সেই নেতৃত্ব, স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁদের ভূমিকা ছিল নগণ্য। প্রকৃত দেশসেবী কংগ্রেসকর্মিগণের মনেও তখন একটা প্রচন্ড ধাক্কা আঘাত হেনেছে। বিস্ময়, বিমূঢ়তা, হতাশা এবং বেদনায় আর্দ্র হল খরাপীড়িতা, জঠরাগ্নিতে উত্তপ্তা ক্রন্দসী ভারতভূমি।

কাজে কাজেই উনিশ শ' ছেষট্টিকে হতে হয়েছে বিক্ষোভ এবং আন্দোলনের বছর। কতিপয় হঠাৎ-নেতার হাতে, (ভারতবর্ষ স্বাধীনতা আন্দোলনের সমকালে যাঁদের কোনদিন নেতৃত্বের আসনে সমারূঢ় করায় নি) ভারতবাসীর স্বাদ ও স্বপ্নকে প্রহৃত হতে দেখে গোটা ভারতবর্ষই বিক্ষোভের আগ্নেয়ভূমিতে পরিণত হল এই উনিশ শ' ছেষট্টি সালেই। লক্ষণীয় এই যে, এই বছর ভারতের যে সমুদয় প্রদেশ (রাজ্য) আন্দোলনের ইতিহাসে প্রায়শ উচ্চারিত (oft quoted) নয়, বিক্ষোভ আন্দোলনগুলি সেখানেই বিস্ফোরিত হতে থাকল। মৃতের মতো দর্শকের ভূমিকায় রইল অর্ধাঙ্গ বিচ্ছিন্ন বাংলা ও পাঞ্জাব। পাঞ্জাবের বিস্ফোরণ ছিল একান্ত আঞ্চলিক এবং কিছুটা সাম্প্রদায়িক। পাঞ্জাব ভাগের জন্য আন্দোলন। পশ্চিমবঙ্গের মার্চের খাদ্য আন্দোলন যদিও জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভেরই অভূতপূর্ব স্বাক্ষর, কিন্তু এই আন্দোলনেই প্রমাণিত হ'ল যে বাংলায় নেতৃত্বদানের মতো অবিকৃত এবং অবিক্রীত সংগ্রামী দলের একান্ত দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়েছে। আন্দোলন ভেঙে যুব বাংলার শিরদাঁড়া বাঁকিয়ে দেওয়ার জন্যই যেন প্রতিটি দল প্রস্তুত। প্রাক্‌-নির্বাচনী বাম মোর্চায় ভাঙনও তারই অন্যতর সাক্ষ্য। অথচ বাংলার একটা ঐতিহ্য ছিল। এ মাটিতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছিল সহজাত। আজ দুর্ভাগ্যের অন্ত নেই। গেল বছর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এবং স্যার জগদীশের মূর্তি ভেঙে পশ্চিম বাংলা নিজেকে অসংযমীরূপে নিজেই ব্যঙ্গ করেছে।

এ সব কিছুর মূলেই বোধ হয় নেতৃত্বহীনতার অসহায়তা ক্রন্দনরত। উনিশ শ' ছেষট্টি দেশব্যাপী যে বিক্ষোভ আন্দোলনে বিস্ফোরিত হয়েছে তার অধিকাংশই হতাশালাঞ্ছিত প্রবঞ্চিত মনের দীর্ঘশ্বাস। আর লক্ষণীয় হ'ল এ বছরের মত কখনো আন্দোলন এমন এমন মারমুখী এবং অগ্ন্যুৎপাদক হয়ে ওঠে নি। সুতরাং উনিশ শ' ছেষট্টি ভারতের অবদমিত অন্তর্জ্বালার তীব্র অভিপ্রকাশ। পূব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সর্বত্র বিক্ষোভ দানা বেঁধেছে এবং ফেটে পড়েছে। সারা ভারতের প্রশাসন নড়ে উঠেছে। আতঙ্কিত নেতৃত্ব করেছেন ঘন ঘন বৈঠক। ডিসিপ্লিন রক্ষার জন্য ভয়ার্ত আবেদন শোনা গেছে বর্ষীয়ানদের কণ্ঠে।

ছাত্র আন্দোলন, শিক্ষক আন্দোলন, কর্মচারী আন্দোলন স্বল্প প্রচেষ্টায় ভারতব্যাপী প্রসারতা লাভ করেছে। বরং বলা যায় কোন প্রচেষ্টারই প্রয়োজন হয় নি। যেন খরাপীড়িতা ভারতের মতই চিড় ফাট ধরেছে হৃদয়ে। খরা প্রাকৃতিক নিয়মে এবং প্রাকৃতিক সীমানায় আবদ্ধ।

বিক্ষোভ রাজনীতিক প্রেক্ষাপটে ধূমায়িত। কর্মচারী আন্দোলনের ইতিহাসে উত্তর প্রদেশ এক অভূতপূর্ব নজীরের সৃষ্টি করেছে। এ আন্দোলন আজও সমান প্রতিজ্ঞায় অটল অটুট। জানি না, ইতিহাসের কোন এক কোণে শম্ভুল নামক উত্তর প্রদেশ কর্মচারী আন্দোলনের নেতার নামটি স্থান পাবে কি না, তবে ভারতের কর্মচারী আন্দোলনের ইতিকথায় এই জোয়ান নেতা নিশ্চয়ই স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। উত্তর প্রদেশ গেজেটেড অফিসারদেরও টেনে নামিয়েছে। উত্তর প্রদেশ সাংগঠনিক অপূর্বতায় অনন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

এ বছরের আর একটি উল্লেখ্য ঘটনা হ'ল, বিপথচালিত দম্ভী শাসনযন্ত্রকে সংযত করার জন্য দেশের গণ্যমান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। ভারতরক্ষা বিধির মত এক ন্যক্কারজনক কালা কানুন রদ করা জাতীয় দায়িত্ব হিসেবে অনুভব করেছিলেন সবশ্রী শীতলবাদ, এস আর দাস, মেহেরচাঁদ মহাজন, বি পি সিংহ, সরযূপ্রসাদ, এন সি চ্যাটার্জী, সি ডি দেশমুখ, প্রাক্তন আইনমন্ত্রী অশোককুমার সেন প্রমুখ বিশিষ্ট আইনজ্ঞ, প্রাক্তন বিচারপতি ও উপাচার্যগণ। এবং তীব্র সমালোচক কংগ্রেসী সদস্য শ্রীমাথুরের মতো কয়েকজনের সঙ্গে সামগ্রিকভাবে বিরোধী সদস্যগণ এবং আপামর জনসাধারণ।

ক্ষুধার তাড়না জয়পুর কংগ্রেসে এক রোমহর্ষক দৃশ্য উপস্থিত করেছিল। বিক্ষুব্ধ সদস্যদের বিক্ষোভ প্রদর্শনের ফলে ডায়াসের ওপর কংগ্রেসী নেতৃবর্গ স্বদলেই বিদ্রোহের এক প্রচণ্ড চেহারা প্রত্যক্ষ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। দুর্বল নেতৃত্বের হাতে ভাঙন এবং হতাশা সর্বগ্রাসী হয়েছে।

বিরোধ দেখা দিয়েছে রাজ্য সীমানাকে কেন্দ্র করে। জাতীয় ঐক্যকে বিঘ্নিত করার জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ বহু ক্ষেত্রে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। মহীশূর-মহারাষ্ট্র সীমানা বিরোধ, বিশাখাপত্তনমে ইস্পাত কারখানার দাবিতে বিক্ষোভ, পাঞ্জাব হরিয়ানার দাবিতে উন্মাদনা এবং অবশেষে সন্ত ফতে সিং-এর আত্মাহুতির ভয়ঙ্কর সঙ্কল্প জাতীয় চেতনার ওপর রাজ্যস্বার্থকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে। অথচ এই সময়ই অর্ধভুক্ত পশ্চিমবঙ্গ সুযোগ দিয়েছে খরাপীড়িতা অঞ্চলের মানুষকে অবাধে কলকাতা প্রবেশে। ওদিকে বিশাখাপত্তনমের দাবিকে পেশ করার জন্য অন্ধ্র তার উদ্বৃত্ত শস্য ভারতের বুভুক্ষু ভাই-বোনদের সঙ্গে ভাগ করে খেতে গররাজী হয়েছেন প্রথম থেকে।

ব্যাপক ছাত্র আন্দোলনের ফলে ও সরকারী অবিমৃষ্যকারিতায় দেশব্যাপী শিক্ষাজগতে নেমে এসেছে চরম নৈরাজ্য। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটক বন্ধ হয়ে গেছে। পুলিশ ও সৈন্যদলের দাপাদাপিতে, অগ্ন্যুৎপাতে এবং জাতীয় সম্পত্তির ক্ষতিসাধনে রেকর্ড করেছে উনিশ শ' ছেষট্টি। আর বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে নাগা-মিজোরা, বস্তারে গুলীবিদ্ধ হয়েছেন আদিবাসীর আদর্শ পুরুষ বস্তার শাসক। 'বন্ধ' এবং ঐতিহাসিক মিছিলের অভূতপূর্ব সহজ সমাবেশ ১৯৬৬-র আগে আর হয় নি।

এরই মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বেড়িয়ে এসেছেন বহির্ভারতে। নয়াদিল্লীতে ত্রিশীর্ষ সম্মেলন সুফলপ্রসূ হয়েছে ভারত-যুগোশ্লাভিয়া এবং সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের মৈত্রীবন্ধনের গ্রন্থী দৃঢ়তর করে। আর তারই ফলশ্রুতিস্বরূপ ও ভারতের ভিয়েতনাম নীতির মধ্যে মানবহিতৈষণার লক্ষণকে আজও অনুজ্জ্ব দেখে বিমুখ হয়েছে পি এল চারশ আশির জন্মভূমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। খাদ্য নিয়ে টালবাহানায় খাদ্যমন্ত্রীর (অনেকে বলেন সংগ্রহমন্ত্রী) শিরঃপীড়ার উপক্রম হয়েছে। আর এ সমস্ত জেনে-বুঝেই এক ভারতীয় গোয়ানিজ মহিলা নিজেকে আন্তর্জাতিক খেতাবধারিণী ভেবে ("আমি আর ভারত-সুন্দরী নই, বিশ্বসুন্দরী"—রীতা ফারিয়া) বেলুনের মতো ফুলে-ফেঁপে মার্কিন অভিনেতা বব হোপের সঙ্গে ভিয়েতনামে নাচতে গেছেন। 'হোপলেস' এই ঘটনাও উনিশ শ' ছেষট্টিরই পর্দা। আর তারই উল্টো পিঠে বিশ্ববিশ্রুত সাঁতারু বাঙালী চিরতরুণ শ্রীমিহির সেন সন্তরণে বিশ্ববিজয় করে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

শাস্ত্রীজীর পর আমাদের হারাতে হয়েছে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক এইচ জে ভাবা এবং শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর মত দুই ভারতমাণিক্যকে।

বিক্ষুব্ধ ভারতের অগ্নিগর্ভ বছরটিতেই তুরুপের তাস মেরে অন্য দিকে অনেকে স্বীয় ক্ষেত্রে টিকে গেছেন। এ'দের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখ্য হলেন একাধিক রেল দুর্ঘটনাসহ অসংখ্য যাত্রী হতাহতের কারণ শিথিল রেল প্রশাসনের সর্বময় দায়িত্বের চূড়ামণি রেলমন্ত্রী শ্রী এস কে পাতিল। মুদ্রামূল্য হ্রাসের জন্য দায়ভাগী, ভারতের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদগণের দ্বারা নির্মমভাবে সমালোচিত পরিকল্পনার জন্য দায়ভাগী এবং খাদ্যাভাবজনিত পরিস্থিতিতে দেশের মর্যাদাকে পিঠকুঁজো করে রাখার জন্য দায়ভাগী নেতৃত্ব।

এখনো সুস্পষ্টভাবে বলা যায় না পাঞ্জাব পরিস্থিতিকে প্রকৃতপক্ষে তুরুপ করলেন কে : সন্ত সিং কিম্বা লোকসভা অধ্যক্ষ শ্রীহুকুম সিং। সন্ত ফতে সিং খেলা ভালই জমিয়েছিলেন। আবার হুকুম সিং কথায় কথায় চূড়ান্ত খেলার সময় উত্তীর্ণ করিয়ে দিয়ে সন্ত ফতে সিং সহ আরও ছয়জনের আত্মাহুতির সঙ্কল্প ভেস্তে দিয়ে এসেছেন। এখন দু'পক্ষে বাদানুবাদ চলছে। সন্তজী বলছেন লিখিত প্রতিশ্রুতি তিনি পেয়েছেন, সরকার বলছেন, সবই ভাঁওতা।

ইতিমধ্যে ১৯৬৭ সাল এসে পড়েছে সাধারণ নির্বাচনকে শিখণ্ডী করে। যতদূর বোঝা যাচ্ছে, শিখণ্ডী নড়িয়ে লক্ষ্যভেদের ক্ষমতা অন্য কোন দলের নেই। যেখানে বা সম্ভাবনা ছিল তাও গোপন ভাবভালবাসায় চাটি হয়ে যাচ্ছে।

বিক্ষুব্ধ উনিশ শ' ছেষট্টি চেয়েছিল স্থবির নেতৃত্বের হাত থেকে মুক্তি পেতে। তার সে আশা সফল হবে এমন লক্ষণ কোথাও সুস্পষ্ট নয়। ছেষট্টিতে ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাহীন দলের অনেকেই সাধারণের ইচ্ছের ওপর তুরুপের তাস মেরে নিয়ে গেলেন। জানি না, ১৯৬৭ কী ভাবে কার্ড শাফল্ করবে, কিম্বা আবার কোন খেলা জমিয়ে তোলা হবে পঞ্চাশ কোটি ভারতীয়ের ললাট বোর্ডে!

বিজ্ঞান কংগ্রেস

হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সপ্তাহব্যাপী অধিবেশন হয়ে গেল। বর্তমান অধিবেশনের বয়স ৫৪, অর্থাৎ এটি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের চুয়ান্নতম অধিবেশন।

দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিজ্ঞানীদের বিশেষ ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে পরিকল্পনার কাজে বিজ্ঞানীদের এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। তাঁর আহ্বানে কয়েকটি যথার্থ প্রশ্ন ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, দেশের মূল সমস্যা দারিদ্র্য আর তাই এদেশের রাজনীতিও দারিদ্র্যের রাজনীতি। দেশের ব্যাপক দারিদ্র্য বিমোচনে যে পরিকল্পনা তৈরির প্রয়োজন তাতে বিজ্ঞানীদের সক্রিয় সহযোগিতা অত্যাবশ্যক। গবেষণাগারের বিচ্ছিন্নতার মধ্যেই সকল বিজ্ঞানীর ধ্যানের স্বর্গ বর্তমান নয়। তাঁদের আসতে হবে জনতার সঙ্গে, মাঠে-ময়দানে, নদীতে-প্রান্তরে।

মূল্যবান বক্তব্য সন্দেহ নেই। বস্তুত বিজ্ঞানীমাত্রেই যে গবেষক বৈজ্ঞানিক এমন নয়, যেমন কলাবিদ্যার ছাত্রমাত্রেই শিল্পস্রষ্টা নন। বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে কার্যে রূপায়িত করতে হবে। সেই কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে সমাধা হয় সেজন্য বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এই কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে বিশেষ জ্ঞানপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিকদের।

অধিবেশনের সভাপতি রসায়নশাস্ত্রজ্ঞ অধ্যাপক শ্রী টি আর শেষাদ্রি তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেছেন যে, আগে ব্যাপকতর জ্ঞানার্জনে যে সমস্ত বিজ্ঞানের ছাত্র বিদেশে যেতেন তাঁরা দেশে প্রত্যাবর্তন করতেন দেশমাতৃকার সেবার জন্য। আজ তাঁরা বিদেশে চাকরী নিয়ে অনেকেই পাক্কা বিদেশী বনে যাচ্ছেন। অথচ বিদেশে এঁরা যে কেউকেটা হয়ে উঠছেন এমন নয়। বরং দেশে থাকলে তাঁরা উভয়তই লাভবান হতে পারতেন। দেশসেবার মহৎ সুযোগও পেতেন, সুনামও অর্জন করতেন। এজন্য তিনি একটি প্রস্তাবও পেশ করেছেন। বলছেন দু-তিন বছরের বেশি বিজ্ঞানীদের বিদেশে থাকতে দেওয়া অনুচিত।

বক্তৃতা হিসেবে যা শোনা যায় তাই চমৎকার লাগে। প্রধানমন্ত্রী এবং সভাপতি উভয়েই দেশহিতৈষী চিন্তার ফোয়ারা ছুটিয়েছেন। ভালো লাগল শুনে। কিন্তু বক্তৃতা এবং বাস্তবতায় বড় আসমান-জমিন তফাৎ।

যেমন পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানানর অর্থ এই নয় যে, উপযুক্ত প্রতিভাকে সাদরে সরকার গ্রহণ করে নেবেন। কার্যক্ষেত্রে উল্টোটাই দেখা যায়। প্রশাসনের কর্তা আই সি এস, আই এ এস বাহিনীকে বহুক্ষেত্রে স্বজনপোষণ এবং অনেকক্ষেত্রে উন্নাসিক ও ঈর্ষাপরায়ণ হতে দেখা গেছে। প্রকৃত সৃষ্টিমূলক চিন্তার মূল্যায়নে তাঁরা যে ব্যর্থ বা উদাসীন বিদেশে প্রবঞ্চিত ভৈরব ভট্টাচার্যের এ পর্যন্ত অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাসই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। এইভাবেই দ্বিতীয় সর্বজনস্মরণীয় একটি সমতুল নজীর হলেন শিল্পের ক্ষেত্রে সত্যজিৎ রায়। সত্যজিৎ উচ্চ পরিবারের সন্তান এবং নিজেও একজন প্রখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন; তাঁর পক্ষে উচ্চ দরবারে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল, না হলে তাঁর প্রচেষ্টা খতম হ'ত কি না কে বলতে পারে? এইভাবেই ভারতের বহু স্থানে উজ্জ্বল হীরকখন্ড উপযুক্ত সংস্কার এবং সুযোগের অভাবে অঙ্গার চাপা পড়ে থাকেন। এক সময় এঁদের উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং আশা হতাশার বেদনায় সমাচ্ছন্ন হয়ে যায়। সকলের মধ্যে ভৈরব ভট্টাচার্যের উদ্যম থাকে না কিন্তু প্রতিভা থাকতে পারে। ভারত না জানি প্রতি বছর এমন কতই প্রতিভাকে হারায়। সুতরাং সুযোগ কেন গ্রহণ করা হচ্ছে না, এসব ফালতু কথায় চিঁড়ে ভেজে না। সুযোগের দুয়ার কেন বন্ধ থাকে এ প্রশ্নের জবাবই বরং দেশপরিচালকদের দিতে হবে।

অধ্যাপক শেষাদ্রি সভাপতির উপযুক্ত ভাষণ খুঁজে নিয়েছেন। ডায়াস মাত্রই অসহায়কে সমালোচনা করার নিরাপদ জায়গা। তিনিও সে সুযোগ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ভুলে গেছেন, এ হতভাগ্য দেশ ডাক্তার, বিজ্ঞানী এবং অন্যান্য বিশেষ বিষয়ে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন মানুষের জন্য উপযুক্ত কর্ম সংস্থান ও ব্যবস্থা করে উঠতে পারে নি। বিদেশ তাই স্বদেশের চেয়ে উপায়ান্তর নাস্তিতে অনেকক্ষেত্রে আকর্ষণীয় হয়েছে। দেশপ্রেম মানুষের মধ্যে সহজাত নিশ্চয়ই, কিন্তু মহাজনের পথ অনুসরণের আকর্ষণও কম নয়। গোটা দেশ আজ আপন স্বার্থ-সংগ্রামের উন্মত্ত নেশায় ধাবমান হয়েছে। তাঁদের মুখে কৃচ্ছ্রসাধনের লম্বা-চওড়া বুলি শুনছি, যাঁরা রুটির বদল কেক খেতেই অভ্যস্ত। তাই মানুষের মনে অবিশ্বাস ও হতাশা পুঞ্জীভূত হচ্ছে। এমন অবস্থায় দেশপ্রেমে প্রত্যেকে হাবুডুবু খাবেন কি করে। আত্মপর নেতৃত্বের দেশে ডায়াসী দেশাত্মবোধের বক্তৃতা ব্যঙ্গের মতো শোনায়।

আসলে এদেশে বক্তৃতার বয়ান পাল্টানোর সময় এসেছে অন্যথা সব বক্তৃতাই বেনা বনে মুক্তো ছড়ানো হবে।

শেষাদ্রি বলতে পারতেন কেমন করে বিদেশের আকর্ষণ দেশে সৃষ্টি করা যেতে পারে। কিন্তু এদেশী চিন্তা এসব কথা বলতে ভয় পায়। তাহলেই বাস্তবের মুখোমুখি হতে হবে। বরং সব দায়িত্ব সাধারণ মানুষের কাঁধে চাপিয়ে হাততালি এবং মালা গ্রহণ অনেক নিরাপদ ব্যাপার। এদেশের বিজ্ঞানসাধক ডঃ জোসেফ আত্মহত্যা করেছিলেন, সে কার পাপে। শেষাদ্রি বা প্রধানমন্ত্রী সুতরাং শেষ কথায় যান নি। তাই আশাও রাখতে পারেন না তাঁদের সুভাষিতাবলী কানের ভিতর দিয়া কারও মর্ম স্পর্শ করবে।

কিন্তু নেতারা যদি বাস্তব সমস্যার কথা তুলে ধরে তারই মোকাবিলা করার উপায় সন্ধান করেন, তখন তাঁদের মুখ থেকে একথা নিশ্চয় সাধারণে তিনবার চিন্তা করবেন। তখন তাঁরা বলতে পারবেন বিদেশের অর্থনীতি ভারতের থেকে উন্নত পর্যায়ে আছে। সুতরাং আর্থিক উন্নতি চাইলে অবশ্যই বিদেশ লোভনীয়। কিন্তু আজকের তরুণ ভারত যদি সেদিকেই আকৃষ্ট হয় তবে দেশের আর্থিক উন্নতিই বা হবে কি করে আর তবে কি ভবিষ্যতও বিদেশমুখী থাকবে। এই নিদারুণ অবস্থার হাত থেকে ভারতের মুক্তি আজকের তরুণ ভারতই এনে দিতে পারে। এজন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার দ্বার খুলে দেওয়াই হবে সরকারের নীতি। ত্রুটি যেখানে ঘটবে, দেশের মান্যগণ্যরা এগিয়ে আসবেন তার প্রতিবাদ করতে। আর আমরা যাঁরা ভি আই পি দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকারে তাঁরাও আপনাদেরই সঙ্গে এগিয়ে আসতে প্রস্তুত হয়েছি। এমন কথা এই প্রকার বাস্তব সহযোগিতার অফার এলে, মনে হয়ে, তরুণ ভারত অল্পায়াসে অনুপ্রেরিত হবে।

সাংবাদিকদের সামনে প্রধানমন্ত্রী

হায়দ্রাবাদের এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী সোজাসুজি স্বীকার করেছেন যে, কংগ্রেসের ভেতরে এবং বাইরে এমন কিছু শক্তি ক্রিয়াশীল যার ফলে কংগ্রেস তার প্রতিশ্রুত আধা সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনে আজও সফল হতে পারে নি।

কংগ্রেসের বাইরের শক্তি বলতে তিনি সঠিক কাদের চিহ্নিত করেছেন তার উল্লেখ নেই বটে তবে অনায়াসেই অনুমান করা যায়, এঁরা হলেন কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধি। এঁদেরও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আছে এবং আইনসভায় আসন ও সমাজের অর্থনীতির মূল স্টিয়ারিং হুইলের ওপর অধিকার আছে। বস্তুত এ দলের চাপ কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ চাপের চেয়ে কোন অংশে কম তো নয়ই বরং বেশি। প্রধানমন্ত্রী একথা জানেন। তত্রাচ তিনি দেশব্যাপী খরা এবং পাক হাঙ্গামাকেও এই প্রশ্নের মধ্যে টেনে এনেছেন, যার আদৌ কোন প্রয়োজন ছিল না। যে প্রশ্ন একান্ত প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয় না। কারণ খরা সাময়িক প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং এ বিপর্যয়ের কবল থেকে আপনাকে রক্ষা করার মত বৈজ্ঞানিক উন্নতি পৃথিবীতে হয়েছে। ভারতে যে হয় নি, এর জন্য শাসকদলের অকৃতকার্যতাই দায়ী। আর পাক হাঙ্গামা স্বাধীন ভারত ভূমিষ্ঠ হওয়ার কাল থেকেই টাঙানো আছে। মাঝে তা সম্মুখ সমরে নেমে জোয়ান ভারতের হাতে প্রচন্ড থাপ্পড় খেয়ে মানে মানে আপন বিবরে প্রত্যাবর্তন করে গুপ্ত আঘাতের চেষ্টাকে চালিয়ে যাচ্ছে। এ সমস্যা থাকবেই এর সমাধান তাসখন্দেও সম্পূর্ণ হয় নি। তাই এ দুটি প্রশ্ন ফালতু। মোদ্দা অসুবিধার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে।

বর্তমানে আতঙ্কের কথা এই যে,

কংগ্রেসই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এই অসুবিধাকে বহুগুণিত করেছে। আগামী সাধারণ নির্বাচনে মধ্যযুগীয় রাজ-রাজড়া, মধ্যস্বত্বভোগী এবং পুঁজিপতি শ্রেণীকে ঢালাও মনোনয়ন দিয়ে। নীতির বিষয়ে যেমন প্রধানমন্ত্রী বাস্তব অবস্থাকে যথার্থ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন নি, দেশে আগামী সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস যে বেশ কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে যাচ্ছে, শ্রীমতী গান্ধী সেই বাস্তব পরিস্থিতির প্রতিও চোখ বুজে থাকতে চেয়েছেন।

তিনি বলেছেন, সাধারণভাবে নির্বাচনে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কেরালায় কংগ্রেসকে জোরদার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তবে উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের জয়-জয়কার হবেই। কিন্তু উত্তরপ্রদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এতোটা আশান্বিত তাঁর পক্ষে হওয়া উচিত কিনা তাতে সন্দেহের অবকাশ আছে।

উত্তরপ্রদেশ :

অবস্থা অগ্নিগর্ভ

ইউ পি সি সি-র সাধারণ সম্পাদক শ্রীগোবিন্দ সহায় মাত্র ৩১শে ডিসেম্বর এই বলে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন যে, সরকারী কর্মচারীদের দাবি সম্পর্কে সরকার যদি এই মুহূর্তে ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন, তবে আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসকে বেশ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে। তিনি বলেছেন, উত্তরপ্রদেশের প্রশাসন ভেঙে পড়েছে এবং সরকার বলতে কোন কিছুর অস্তিত্বই নেই। শ্রীসহায় মনে করেন, আইনভঙ্গের জন্য যদি কর্মচারীদের দায়ী করা হয়, তবে প্রশাসনিক অপদার্থতা এবং পুলিশরাজ সৃষ্টির জন্য দায়ী করতে হয় রাজ্যের শাসক ও রাজনৈতিক নেতাদের।

অভিজ্ঞমহল জানেন যে, অর্থের প্রশ্নে তত নয়, কংগ্রেসী উপদলীয় ক্ষমতা-দ্বন্দ্বেই উত্তরপ্রদেশের প্রশাসন ভেঙে পড়েছে। সেই চন্দ্রভান গুপ্তের গোপন হস্ত (এখন প্রকাশ্য) কর্মচারী ভবিষ্যৎ নিয়ে উত্তরপ্রদেশের দাবার ছকে কিস্তির চাল চালছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী কৃপালনী ব্যর্থ। ইচ্ছে থাকলেও কর্মচারীদের আংশিকভাবে দাবি পূরণের ক্ষমতাও তাঁর নেই। কেন না গুপ্তের বক্তব্য নির্বাচনের পর যারা ক্ষমতায় আসবে কর্মীদের খেয়ে পরে বাঁচতে দেওয়া হবে কিনা এ প্রশ্ন তাদেরই বিচার্য। সমগ্র রাজ্যের প্রশাসন ভেঙে পড়েছে বলে কারও চিন্তা নেই। জমিদারি কার হবে মাথা ব্যথা তাই নিয়ে। দিল্লীতেও সমান তালে কালনেমির লঙ্কা ভাগেই নেতৃবর্গ ব্যস্ত। রাজ্য কর্মচারী আন্দোলনের নেতা শ্রীশুকুল গম্ভীরভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, অবস্থা এইভাবে ঝুলিয়ে রাখলে কর্মীরা অতঃপর রাজনীতিতেই নামবেন, অর্থাৎ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্বাচনী প্রচার অভিযান শুরু করবেন। কিন্তু কে কার কথা কানে তোলে। বীর হনুমান ঘাড়ের ওপর এসে পড়ার আগে কালনেমি লঙ্কা ভাগেই মত্ত ছিল। চন্দ্রভানরাও তাই আছেন, শ্রীমতী গান্ধীও তাতেই সন্তুষ্ট আছেন। কিন্তু উত্তরপ্রদেশ কর্মীরা যে কী বিস্ময়কর সাংগঠনিক ক্ষমতা অর্জন করেছেন তার প্রতিদিনের পরিচয় পাওয়া সত্ত্বেও কালনেমির স্বপ্ন দর্শনে ছেদ পড়ে নি।

কর্মীরা কোন চালু অফিসের সামনে মিছিল নিয়ে গেলে কর্মরত অফিসে তালা পড়ছে। হুড় হুড় করে বেরিয়ে এসে যোগ দিচ্ছেন কর্মচারীরা বিক্ষোভ মিছিলে। রাস্তায় রাজ্য পরিবহনের বাস থামিয়ে নেমে আসছেন চালক কণ্ডাক্টরগণ পথের মধ্যেই। অফিসারকুলও ক্যাজুয়াল ছুটির দরখাস্তের তাগাড় সেক্রেটারীদের মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলেছেন। স্ট্রাইকের সঙ্গে এ ছুটির সম্পর্ক নেই এই মর্মে মুচলেকা চাওয়া হলে তা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। কেন্দ্রীয় কর্মচারীরাও সহানুভূতিসূচক সমর্থনে উত্তরপ্রদেশে এগিয়ে এসেছেন। ওদিকে বিহার, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, অন্ধ্র, কেরালা, মহীশূরে (পশ্চিমবঙ্গ স্বতন্ত্র সভার আয়োজন করেছে) ৫ই জানুয়ারী একযোগে লক্ষ লক্ষ কর্মচারী সমাবেশের মধ্যে কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের সঙ্গে সমহারে বেতন-ভাতার দাবিতে ও ট্রেড য়ুনিয়ন অধিকার লাভের দাবিতে সারা ভারত রাজ্য কর্মচারী ফেডারেশনের আহ্বানে প্রতীক ধর্মঘট করেছেন। উত্তরপ্রদেশে দশ হাজার কর্মচারী হাসতে হাসতে গ্রেপ্তার বরণ করেছেন। চন্দ্রভান গুপ্তরা তত্রাচ স্বার্থের চন্দ্রকলা বিস্তার করে থুবড়ো হয়ে বসে আছেন। মুখে কংগ্রেসই দেশের নেতৃত্ব দেবে বুলি, পেটে জমিদারির ক্ষুধা। অবস্থা শোচনীয় এবং সাংঘাতিক।

নির্বাচনী অবস্থা

উত্তরপ্রদেশের কর্মচারী বিক্ষোভের ফলে বিপর্যস্ত প্রশাসন ব্যবস্থার আওতায় নির্বাচনী প্রচার ও অগ্রগতি এ পর্যন্ত জমে উঠতে পথ পায় নি। তাছাড়া এবার কংগ্রেস তার প্রার্থী তালিকা এমনভাবে প্রণয়ন করেছে যাতে কংগ্রেসের মধ্যে ক্ষীণতম আশার আলো সাধারণের পক্ষে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। প্রার্থী পরিচয় শুনলে লোকে অবাক হয়ে ভাবছে যা স্বতন্ত্র পার্টির তালিকা হওয়া উচিত তাই ভুলক্রমে কংগ্রেসী ছাপ গ্রহণ করেছে কি না।

তালিকায় মুখ্যত জাঁদরেল ব্যবসায়ী এবং রাজন্যবর্গদেরই প্রাধান্য। মনোনয়ন পেয়েছেন, তেহ্‌রি গাড়ওয়ালের মহারাজা মানবেন্দ্রনাথ শাহ, রামপ্রসাদ নেওতিয়া, লেঃ কঃ ভি আর মোহন সদৃশ অ-সাধারণরা।

বাম কম্যুনিস্ট কীর্তি

কানপুর লোকসভা কেন্দ্রে শ্রী এস এম ব্যানার্জীর বিরুদ্ধে বাম কম্যুনিস্ট পার্টি প্রার্থী দেবেন বলে জানা গেছে। বাম কম্যুনিস্ট পার্টির এহেন আচরণে সকলেই বিস্মিত। মনে হয় বামেরা যেন বাছাই করা যোগ্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে কংগ্রেসকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চক্রান্ত ফেঁদেছেন। দক্ষিণ কম্যুনিস্ট প্রার্থীর বিরুদ্ধে তাঁরা যে প্রার্থী খাড়া করবেনই এটা আর কথার কথা নয়। কিন্তু এস এম ব্যানার্জীর মত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে ভোট ভাঙাবার তোড়জোড়টা খুবই দৃষ্টিকটু এবং অভিসন্ধিমূলক বলে ঠেকছে।

সম্প্রতি লক্ষ্ণৌ-এ সাংবাদিকগণ বাম কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীরণদিভেকে চেপে ধরেছিলেন সেই মোক্ষম প্রশ্নটির উত্তর দানের জন্য। প্রশ্ন করা হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গে শ্রীযুত রণদিভের কমরেডরা পশ্চিমবঙ্গের জনৈক কংগ্রেস নেতার সঙ্গে একটি গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন বলে যে সংবাদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে সে সংবাদ কি সত্য? বিস্ময়ের বিষয় এ প্রশ্নের সরাসরি জবাব শ্রীযুত রণদিভে দিতে পারেন নি। যথার্থ উত্তরে প্রবেশ না করে তিনি দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে জমা করা বাম অভিযোগের বুলি কপচেছেন। বলেছেন, তাঁর দল নয়, দক্ষিণীরাই কংগ্রেসের সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করেছে। নেতৃস্থানীয় লোকরা জেনে শুনে বোকা সাজলে পিত্তি চিড়চিড়িয়ে ওঠে। প্রশ্নটা বামেদের নিয়ে, শ্রীরণদিভেকে এর মধ্যে ডানপক্ষ টানতে কেউ অনুরোধ জানান নি। কিন্তু বাম নেতার তৈরি বুলি না থাকাতে তিনি অশ্বত্থমাকেই হত বলে জাহির করে ভাবলেন দেশবাসীর কাছে পেল্লাই জবাব দেওয়া হল। সর্বত্র নেতাদের মতিভ্রম হয়েছে দেখলে আমরা কী করব। শুনি না হাসিবে গৌড়জন?

বিহার :

মুজঃফরপুরের জের

মুজঃফরপুরে গুলীবর্ষণে অধ্যাপক কুমার এবং জনৈক ছাত্র (শাহী) প্রাণত্যাগ করেন। বিহারে সেই আক্রোশের আগুন

ধূমায়িত হতে থাকে। আর ডি এস কলেজের পাঁচ হাজার ছাত্র ও শিক্ষক একদিনের জন্য অনশন করেন। এর ফলে যে অর্থ উদ্বৃত্ত হবে তদ্দ্বারা নিহত ছাত্র ও শিক্ষকের স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনার সংকল্প হয়।

ওদিকে পাটনায় অনুগ্রহনারায়ণ সিংহ কলেজের ছাত্ররা মিছিল করে বেরিয়ে ছিলেন। জাতীয় সড়কের ওপর দুটো গাড়ি পেয়ে সে দুটোকে নষ্ট করলেন। পুলিশ এল, যুদ্ধও সুরু হল যথারীতি। পুলিশ ফিরে গেলে ছাত্ররা কলেজে প্রত্যাবর্তন করলেন। সেখান থেকে মিছিল গেল বারহ রেল স্টেশনে। পাটনা থেকে স্টেশনের দূরত্ব চল্লিশ মাইল। ছাত্ররা স্টেশন মাস্টারকে উত্তম-মধ্যম দিলেন। আর তারপর স্টেশনটাকেও ইচ্ছামত ক্ষতিগ্রস্ত করলেন। ছাত্রদের সংখ্যা ছিল দশ হাজারের ওপর। পুলিশ দু' রাউণ্ড গুলী চালাল সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করতে। সরকারী খবর, কেউ হতাহত হয় নি, কারণ পুলিশ শূন্যে গুলী চালিয়েছে। ঘটনার কাল ৪ঠা জানুয়ারী।

ওদিকে দ্বারভাঙ্গাও গরম হয়ে আছে। কোন এক বাস কণ্ডাক্টরের দুঃসাহস হল। সে কতিপয় ছাত্রকে বাসে উঠতে দিতে নারাজ। ছাত্ররা ভীষণ রেগে গেলেন। চারটে প্রাইভেট বাস তৎক্ষণাৎ পুড়িয়ে দেওয়া হল। আর পুলিশ চারজন ছাত্রকে ধরে নিয়ে গেল গ্রেপ্তার করে।

৫ই জানুয়ারীর ঘটনাঃ দুপুরের দিকে কয়েক হাজার ছাত্র মুজঃফরপুর, সমস্তিপুর এবং রাঁচীতে পুলিশী অতিরেকের প্রতিবাদে 'কালো পতাকা' সহ বিক্ষোভ প্রদর্শনে রার হয়েছিলেন। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলেই কালো পতাকা প্রদর্শন করার দিন ছিল আজ। পাটনার বিক্ষোভ মিছিল মুখ্যমন্ত্রী কে, বি, সহায়ের অট্টালিকার সামনে এসে দাঁড়াল। তিনি ছিলেন না। দুয়ার রক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি ছাত্রদের চলে যেতে বললেন। ছাত্ররা বেঁকে বসল। অমনি পুলিশ ৪৮ রাউণ্ড কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ল। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি হল। জনতা খণ্ডযুদ্ধে মাতল এবং মুখ্যমন্ত্রীর বাটির গৃহসংলগ্ন একটি গোচালায় আগুন দিয়ে দিল। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রমুখ কয়েকজন ইটপাটকেল হজম করলেন।

জনতার একাংশ তখন গেল পুলিশ সুপারের বাংলোর পাশে রাজ্য পরিবহনের ডিপো পোড়াতে। ডিপো পুড়ল। আর একদল আগুন দিলেন খাদি গ্রামোদ্যোগের দ্বিতল বাড়িতে। ভস্মীভূত হল বাড়িটা। অন্যদল চলল গান্ধী ময়দানের কাছে পুরানো পুলিশ লাইন ও ট্রেজারি আক্রমণ করতে। যুদ্ধ বেশ জাঁকিয়েই হল। তখন সৈন্যদলকে ডাকা হল। তারা সারা শহর টহলদারি সুরু করলেন এবং সন্ধ্যা-সকাল কারফিউ ঘোষণা করা হল। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী ভবনের ওপর স্প্রিন্টারের মত ইষ্টক বর্ষণ সমানে চলল।

আর আগুন জ্বলে উঠল একটা পেট্রল পাম্পে; টেলিফোন ও বিদ্যুৎবাহী তারের লাইনগুলোও ছিঁড়ে ফেলা হল। হতভাগ্য কতিপয় দোকানী ও হোটেলওয়ালার সারা জীবনের সঞ্চয়ও আগুনে পুড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সাড়ে চারটে নাগাদ কয়েকজন পুলিশ এবং অগ্নিনির্বাপক অফিসারকে ঘিরে ধরা হলে পুলিশ এক গুলীতে একজনকে সাবাড় করে জনা বারকে ধরাশায়ী করল।

এরপর পুলিশ খোঁজার পালা। পুলিশ হেডকোয়ার্টারে চড়াও হয়ে জনতা ধাওয়া করল পলায়নপর পুলিশের পেছনে। পুলিশ গুলী ছুঁড়ল। আর এগারজন নিহত হলেন।

এরপর আদেশ বার হল, মিছিল বন্ধ, হোস্টেল বন্ধ, কলেজ হোস্টেল থেকে ছাত্ররা যেন আদেশমাত্র বিছানা, বাক্স নিয়ে বেরিয়ে যায়।

বিহার শরিফে পুলিশ ফাঁড়ি আক্রান্ত হয় শ'চারেক ছাত্রের দ্বারা। পুলিশ লাঠি চালায় এবং গুলী ছোঁড়ে। একটা বাস-স্ট্যাণ্ডের কাছে একজন নিহত হলেন।

অস্ত্রাগার ও ট্রেজারি আক্রমণ বিহারে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। উপরের কাগজী রিপোর্ট থেকে ঘটনার বিবরণ পাঠ করে মনে হয় আমরা নিশ্চিতরূপে মানসিক রোগে ভুগছি। ইচ্ছেমত পোড়াচ্ছি, গুলী ছুঁড়ছি, মরছি, মারছি। কী ভীষণ অধৈর্য অবস্থা হলে এমন সব বিপৎপাত হয়। এই স্থৈর্যহীন অবস্থার শেষ কোথায় কেউ জানি না। তবে উৎস যে কোথায় এ নিয়ে দেশজোড়া বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়ে গেছে।

ভারতের আদিতম রসায়ন

চ্যবনপ্রাশ

আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত

চ্যবনপ্রাশ নূতন ও পুরাতন সর্দ্দি কাশি, স্বরভঙ্গ ও শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় বিশেষ উপকারী।

টনিক হিসাবে নিয়মিত ব্যবহারে দেহের দৌর্ব্বল্য ও রুগ্নতা দূর করে ও শরীরের পুষ্টি সাধন করিয়া স্বাস্থ্যশ্রীর পুনরুদ্ধার করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা বোম্বাই কানপুর

আন্তর্জাতিক

লাল রক্ষীবাহিনী

চীন ঃ

এখানে আজ হইতেছে কী? সর্ব হারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে যে কান্ডটি এখানে হইতেছে, বিপ্লবের যে বান ডাকিয়েছে এখানকার বিশ-অনুত্তীর্ণ ছোকরার লাল রক্ষীবাহিনী, সে বানের তোড়ে কি শেষ পর্যন্ত কর্তাবাবুই যাবেন ভেসে? পিকিং-এর রাস্তায় রাস্তায় অভূতপূর্ব, অভাবনীয় দৃশ্য দেখা দিয়েছে। বিরাট বিরাট পোস্টার এখানে আত্মপ্রকাশ করেছে যেখানে মাও সে-তুঙকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করা হয়েছে। পোস্টারে লেখা হয়েছে মাও হিটলারেরই মতো অত্যাচারী, তিনি চীনকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। একথাও পোস্টারের মাধ্যমে বলা হয়েছে যে, সাচ্চা দেশপ্রেমিকদের উচিত মাও-কে এই আত্মঘাতী পথ থেকে ফিরিয়ে আনা। পোস্টারগুলো কারা আনলো বা কোত্থেকে এলো তা এখনো জানা যায় নি, যদিও এর পেছনে লাল রক্ষীদের অতি-উৎসাহ থাকাটা আশ্চর্য নয়।

সারা বিশ্বের কাছে চীন আজ যে ধাঁধার সৃষ্টি করেছে, যে সমস্যা হাজির করেছে এমনটি সেই ১৯৪৮ সালেও দেখা যায় নি যখন কুয়োমিনটাং বাহিনীকে পরাস্ত করে কমিউনিস্ট চীনের পত্তন হয়েছিলো। এখানে সম্প্রতি যেসব কান্ড অতি দ্রুত লয়ে ঘটে যাচ্ছে তার সঙ্গে কেউ তাল রাখতে পারছে না। এতদিন চীনকে নিয়ে যে-সমস্যাটি ছিলো তার একটা পরিচিত ছিলো—যে-কোন কমিউনিস্ট রাষ্ট্রকে নিয়েই সমস্যা দেখা দিয়েছে এর আগেও। কিন্ত সাংস্কৃতিক বিপ্লব যেন কোন প্রচলিত ধারা মেনে চলে না, কিম্বা নিজস্ব কোন ধারাও তার নেই। মাও সে-তুঙ-এর পত্নী চিয়াং চিং এতদিন কোলাহলের বাইরে ছিলেন, এখন কি সংবাদপত্রেরও শিরোনাম হন নি তিনি বিশেষ। এখন বৃটেনের বিশিষ্ট বামপন্থী সাপ্তাহিক পত্র নিউ স্টেটসম্যান-এর চীন-বিশেষজ্ঞ সাংবাদিকের মতে মাদাম চিয়াং চিংই নাকি স্বামীর স্থলাভিষিক্ত হতে চলেছেন, চীনের প্রধান নেত্রী নাকি হবেন তিনিই। এতদিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লিন পিয়াও-এর নাম শোনা গিয়েছিলো চীনের ভবিষ্যৎ কর্ণধার হিসেবে, এখন আবার শোনা যাচ্ছে চিয়াং চিং-এর। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, মাদাম চিং-ই চীনের ক্লাসিক অপেরার বিরুদ্ধে সমালোচনা বা আক্রমণ করে এখানে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা করেন।

বস্তুত পরিবর্তন বা ওলোট-পালট এখানে সর্বস্তরেই চলেছে, চলেছে অবিরামগতিতে; তবে যেগুলো উচ্চ স্তরের সেগুলোই বহির্বিশ্ব জানতে পাচ্ছে, বাকীগুলো অজ্ঞাত-অখ্যাতই থেকে যাচ্ছে, অনেকক্ষেত্রে উল্লেখও করা হচ্ছে না। কোরিয়া যুদ্ধের নেতা, প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পেঙ তে-হুয়াই-এর বন্দী হবার সংবাদ গোপন রাখা যায় নি, লাল রক্ষীরা তাঁর বাড়ি চড়াও হয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে এনেছে পিকিঙে। কিন্তু লিউ শাও-চি'র অবস্থা সত্যি করুণ। লিউই ছিলেন মাও সে-তুঙের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ও বিশ্বস্ত বন্ধু, দীর্ঘদিন তাঁরা এক সঙ্গে ওঠা-বসা, আন্দোলন পরিচালনা, দেশ শাসন করেছেন। থিয়োরিটিশিয়ান হিসেবে লিউ ছিলেন দেশের সেরা, তাঁর লেখা বই অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে পঠিত হয় এখানে এবং সমস্ত কমিউনিস্ট দেশে, লিউর বই চীনের ঘরে-ঘরে। মাও সে-তুঙের স্থলাভিষিক্ত হবেন লিউ-ই, এ-বিষয়ে কারু মনে কোনো সন্দেহ ছিলো না, তিনিই ছিলেন চীনের দু' নম্বর নেতা। কিন্তু সাংস্কৃতিক বিপ্লবের থিয়োরী এমনই যে লিউর ভাষ্য সেখানে মিথ্যে প্রমাণিত হচ্ছে, দু-নম্বরের নেতা আজ চীনের পয়লা নম্বরের শত্রু বলে চিহ্নিত! লাল রক্ষীরা আজ শহর পরিক্রমা করছে বিরাট বিরাট পোস্টার ঘাড়ে করে, যেখানে লিউ শাও-চি'কে চীনের ক্রুশ্চেভ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আজকের চীনে এর চেয়ে ঘৃণ্য অপবাদ আর কিছু নেই। লিউ এখনো অবশ্য রাষ্ট্রপ্রধানের গদীতে রয়েছেন, কিন্তু লাল রক্ষীরা যখন একবার ধুয়া তুলেছে তাঁর অপসারণের জন্যে, তখন কতদিন আর তিনি সে-পদে বহাল থাকবেন তা বলার সাধ্যি কারু নেই।

মাও-এর এই ঘনিষ্ঠ সুহৃদের অপরাধ কি? চীনের রাজনীতিকে যিনি এতদিন নিয়ন্ত্রণ করেছেন, যিনি তত্ত্বের দিক দিয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন, যে-মাওবাদ লিউ শাও-চি'রই মস্তিষ্কপ্রসূত সেই তিনিই মাওবাদের বিরোধী বলে লাল রক্ষীরা রায় দিয়েছে। লিউ শাও-চি নাকি স্বীকারও করেছেন তাঁর অপরাধ, বলেছেন নাকি যে তিনি স্রোতের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারেন নি। অতএব......। শুধু লিউ-ই নন, তাঁর অন্যতম বন্ধু ও কমিউনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী তেঙ শিয়াও-পিঙকেও নেতৃপদ থেকে অপসারিত করা হয়েছে। আর স্বয়ং মাও সে-তুঙের আসনই যেখানে টলটলায়মান সেখানে লিউ শাও-চি বা তেঙ শিয়াও-পিঙ করবেন কি? প্রতিরক্ষামন্ত্রী লিন পিয়াও বাস্তব অর্থেই সামরিক পুরুষ, মাও-এর গদী পেতে হলে শত্রু নিধন তাঁর দরকার, কাজেই পথের কাঁটা সরাতে তিনি অহেতুক ভদ্রতা করতে যাবেন কেন? বিশেষ করে সেনাবাহিনী এবং লাল রক্ষীবাহিনীকে যখন পেছনে পেয়েছেন তখন তাঁকে আর আটকায় কে?

ইন্দোনেশিয়া ঃ

ডঃ সোয়েকার্নকে শেষ পর্যন্ত হার মানতেই হলো, চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে হলো তাঁকে। তিনি কবুল করেছেন যে, তাঁর কৃতকর্মের কৈফিয়ৎ তিনি দেবেন। গত বছরে তাঁর সরকারের কি কি ভ্রান্ত নীতির ফলে ব্যর্থ অভ্যুত্থান অনুষ্ঠিত হতে পেরেছিলো সে-সম্পর্কে তিনি একটি ব্যাখ্যা দাখিল করবেন পিপলস কনসালটেটিভ কংগ্রেসের কাছে।

এ-দাবি আজকের নয়, ছ' মাস ইন্দোনেশিয়ার সর্বোচ্চ পরিষদ পিপলস কনসালটেটিভ কংগ্রেস ডঃ সোয়েকার্নোকে আহবান জানিয়েছিলেন দেশের রাজ-

নৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির কারণ ব্যাখ্যা করার জন্যে। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট সোয়েকার্নো বার বার সে দাবি এড়িয়ে গিয়েছেন, তিনি বলতে চেয়েছেন, তিনিই এখনো দেশের সর্বময় কর্তা, কাজেই তাঁর কাজের জন্যে নিম্নতম পরিষদের কাছে কোনো কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নন। সেনাবাহিনীর সঙ্গে প্রেসিডেণ্ট সোয়েকার্নোর বিরোধ সেদিন থেকেই ১৮ মাস আগে যেদিন কমিউনিস্ট পার্টি প্রভাবান্বিত ব্যর্থ অভ্যুত্থানটি ঘটেছিলো। প্রেসিডেণ্ট সোয়েকার্নোর সমস্ত ক্ষমতা সেনাবাহিনী কেড়ে নিয়েছিলেন, রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব কার্যত জেনারেল সুহার্তো এবং সেনাবাহিনীর হাতে বর্তেছে; কিন্তু ডঃ সোয়েকার্নো সুযোগ পেলেই বিবৃতির মাধ্যমে কিম্বা ভাষণের মধ্য দিয়ে জানিয়ে দিতে চান যে, প্রেসিডেণ্টের পদে তিনি পুরোদস্তুর বহাল রয়েছেন, নীতি-নির্ধারণ করেন তিনিই!

সেনাবাহিনী প্রেসিডেণ্ট সোয়েকার্নোকে নাকাল করার জন্যে যে চাল চেলেছিলেন তা সাফল্যলাভ করেছে, এ-ব্যাপারে দেশের ছাত্রসমাজের এক অংশ

নূতন!

মাথাধরা? সর্দি? ফ্লু?

অবেদন®

আশ্চর্য্যজনক 'অ্যাপেপ' যুক্ত দ্রুত, নিরাপদ, নিশ্চিত আরাম এনে দেয়

মাথাধরায়

সর্দিতে

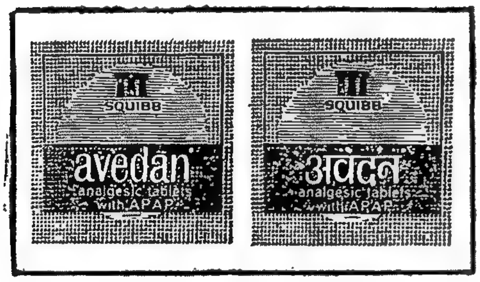

ফ্লুতে

অবেদন নতুন—তাই পরীক্ষা ক'রে দেখুন। মাথাধরায়, দাঁতব্যথায়, পিঠের ব্যথায়, ও পেশীর বেদনায়, সর্দিতে ও ফ্লুতে এবং বিশেষ যন্ত্রণাদায়ক দিনগুলিতে দ্রুত কার্য্যকরী, দীর্ঘস্থায়ী আরাম এনে দেবার জন্য স্কুইবের এই আবিষ্কার, **অবেদন**।

অবেদন অতুলনীয়! এতে আছে আশ্চর্য্যজনক **'অ্যাপেপ'** ও সেইসঙ্গে নিরাপদ, দ্রুত ফলদায়ক ব্যথা-দূরকারী অন্যান্য উপাদান।

অবেদন ব্যথা দূর করবার জন্য বিশেষ ফলপ্রদ এবং অত্যন্ত সহজে গ্রহণযোগ্য। এতে ক্ষতিকারক কিছু নেই এবং অভ্যাসে পরিণত করে না।

SQUIBB® **অবেদন®** 'অ্যাপেপ'-যুক্ত
কয়েক মিনিটের মধ্যেই কাজ করে—
বহুক্ষণের জন্য আরাম দেয়!
সারাভাই কেমিক্যালস্

মাত্রা: ১–২ ট্যাবলেট

® ই, আর, স্কুইব এণ্ড সন্স ইনকর্পোরেটেডের রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক ব্যবহারকারী লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিনিধি করম চাঁদ প্রেম চাঁদ প্রাইভেট লিমিটেড।

এবং মুসলিম নাগরিকরা সেনাবাহিনীর পরোক্ষে প্রভূত সহায়তা করেছে। ব্যর্থ অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে যাঁদের সন্দেহ করা হয়েছিলো তাঁদের সামরিক আদালতে বিচারের দাবি তুলেছিলেন ছাত্রসমাজ ও মুসলিম জনসাধারণ, সেনাবাহিনীও চেয়েছিলেন এভাবে প্রেসিডেন্টকে বেকায়দায় না ফেললে দেশবাসীর মন থেকে তাঁর 'ইমেজ' ক্ষুণ্ণ করা যাবে না। প্রেসিডেন্ট সোয়েকার্নো এতদিন দৃঢ় ছিলেন এ সংকল্পে যে বিচারের সম্মুখীন তিনি কিছুতেই হবেন না যদিও 'সাসপেক্টেড লিস্টে' তাঁর নামও রয়েছে। কিন্তু প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ সুবান্দ্রিয়ো প্রাক্তন কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং মন্ত্রী ইউসুফ দালাস এবং বিমান বাহিনীর প্রাক্তন অধ্যক্ষ ওমর দানির বিচারের ও মৃত্যুদণ্ডের হুকুমের পর আক্রমণ স্বভাবতই এগিয়ে এসেছে প্রেসিডেন্ট সোয়েকার্নোর ওপর।

সেনাবাহিনী চেয়েছিলেন ডঃ সোয়েকার্নোর ওপর সাঁড়াশীর চাপ হানতে। জনসাধারণ এবং ছাত্রদের একাংশ যখন প্রেসিডেন্ট সোয়েকার্নোর বিচার দাবি করেছিলেন তখন প্রেসিডেন্টের যুক্তি ছিলো ঃ সবাই তো আর বিচারের দাবি করছে না, প্রেসিডেন্টের সমর্থকও দেশে অনেক আছে। তা আছে ঠিকই, সেনাবাহিনীরও তা বুঝতে কষ্ট হয় নি, সেজন্যেই সরাসরি তাঁকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে সাহস করেন নি জেনারেল সুহার্তো। কিন্তু ওমর দানির জবানবন্দীর পর সে বাধা অনেকটা অপসারিত হয়েছে। গোড়ার দিকে প্রাক্তন বিমান অধ্যক্ষ তাঁর স্বীকৃতিতে বলেছিলেন যে প্রেসিডেন্ট সোয়েকার্নো অভ্যুত্থানের কথা সবই আগে থেকে জানতেন, তাঁর সম্মতি নিয়েই কমিউনিস্ট পার্টি অভ্যুত্থানের ঝুঁকি নিয়েছিলো। তাছাড়া প্রেসিডেন্ট সোয়েকার্নো যখন এখনো কমিউনিস্ট পার্টির কোন প্রকাশ্য নিন্দা করেন নি, বা পূর্বতন সরকারের ভ্রান্ত নীতির কথা স্বীকার করেন নি, তখন সন্দেহ তাঁর ওপর তো ঘনীভূত হবেই।

সামরিক পরিষদের পর দীর্ঘ আলোচনার পর প্রেসিডেন্ট সোয়েকার্নো রাজী হয়েছেন গত বছরের সরকারের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যা দাখিল করতে। না করে অবশ্য তাঁর উপায়ও ছিলো না। কারণ তাঁকে বলা হয়েছিলো হয় তাঁকে চিরতরে দেশত্যাগ করতে হবে, নইলে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। সে-কৈফিয়ৎ সত্যি কবে দিচ্ছেন তা এখনো জানা যায় নি, তবে, মুসলিম নববর্ষের (১১ই জানুয়ারী) আগে দেবার দাবি করা হয়েছে তাঁর কাছে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট সোয়েকার্নো দেশত্যাগের বিকল্প ব্যবস্থা নিলেন না কেন? এ ভরসাতেই কি যে সেনাবাহিনী আর যাই করুন তাঁকে প্রাণে মারবেন না?

ভিয়েৎনাম ঃ

শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আশার আলো দেখা গিয়াছে। উত্তর ভিয়েৎনাম এ-ব্যাপারে যে প্রস্তাব করেছে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন অনেকেই, ভারত সরকারও। দেখা যাক এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কী করেন, কারণ তাঁদের উপরেই তো নির্ভর করছে অনেকটা।

অবশ্য এ-পর্যন্ত উত্তর ভিয়েৎনামের প্রস্তাবটা বে-সরকারী স্তরেই রয়েছে। উত্তর ভিয়েৎনামের প্যারিসস্থ রাষ্ট্রদূত মিঃ মেই ভান বো'র কাছেই প্রথম প্রস্তাবটার কথা জানা যায়। প্যারিসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বো বলেছিলেন যে আমেরিকা যদি উত্তর ভিয়েৎনামে বোমাবর্ষণ বন্ধ করে তবে হ্যানয় সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্যে মার্কিন প্রস্তাব বিবেচনা করতে পারে। তার একদিন পরেই উত্তর ভিয়েৎনামের প্রধানমন্ত্রী মিঃ ফাম ভান ডঙ আরো পরিষ্কারভাবে উত্তর ভিয়েৎনামের মনোভাবটি প্রকাশ করেছেন। মিঃ ডঙ বলেছেন যে আমেরিকা যে-মুহূর্তে বোমাবর্ষণ বন্ধ করবে সে-মুহূর্তেই আমরা পরস্পরের প্রতি মর্যাদা দেখাবো, এবং প্রতিটি সমস্যারই সমাধান করবো। নিঃসন্দেহে এ-প্রস্তাব খুবই উদার, তাছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এতদিন উত্তর ভিয়েৎনামের কাছে যে প্রতিশ্রুতি চেয়েছিল তা-ও এখানে রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী ডঙ বলেছেন যে উত্তর ভিয়েৎনামে বা হ্যানয়ের অসামরিক অধিবাসীদের ওপর বোমাবর্ষণ করে আমেরিকা তার স্বার্থসিদ্ধ করতে পারে নি; উত্তর ভিয়েৎনামীদের মনোবল একটুও ভাঙে নি, কিম্বা তার অর্থনৈতিক বনিয়াদও ভেঙে পড়ে নি, বা সরকারের পতন ঘটে নি। যুদ্ধ যদি এখনো চলে উত্তর ভিয়েৎনামীরা অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত লড়ে যাবে। কাজেই এ-অবস্থায় আমেরিকা যদি সরকারীভাবে প্রস্তাব এলে তা গ্রহণ না করে তাহলে ভুল করবে।

কারণ আমেরিকার ভিয়েৎনাম নীতি আজ তীব্র আক্রমণের সম্মুখীন, শুধু বিদেশে নয়, স্বদেশেও। মহামান্য পোপ ষষ্ঠ পল তো শান্তির জন্যে আবেদন জানাচ্ছেনই, মনীষী বার্ট্রান্ড রাসেল ও বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ আর্নল্ড টয়েনবি এ-যুদ্ধের, এখুনি অবসান না ঘটালে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হয়ে যাবে বলে হুঁশিয়ারী দিয়েছেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল ইউ থান্ট ইতিপূর্বে যে শান্তির প্রস্তাব দিয়েছেন তার প্রথম দফাতেই আমেরিকাকে বিনা শর্তে বোমাবর্ষণ বন্ধ করতে বলা হয়েছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউ থান্টের সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এ অজুহাতে যে, আমেরিকা যদি উত্তর ভিয়েৎনামে বোমাবর্ষণ বন্ধও করে তবে উত্তর ভিয়েৎনাম কি অস্ত্র সংবরণে রাজী হবে। যদিও ইউ থান্ট সে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন এবং ভারত সরকারও বহু আগে সে বিশ্বাসের কথা জানিয়েছিলেন তা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এতদিন সে-কথায় কর্ণপাত করে নি। এখন উত্তর ভিয়েৎনামের প্রধানমন্ত্রীর মুখে কথাটা শোনা গেলো তখন আমেরিকা কি রাজী হবে?

প্রধানমন্ত্রী মিঃ ডঙ বিশিষ্ট মার্কিন সাংবাদিক মিঃ হ্যারিসন স্যালিসবারীর কাছে প্রস্তাবটি রেখেছিলেন, কিন্তু তাঁকে আমেরিকান জেনেই এবং এ প্রস্তাব আমেরিকার কাছে পৌঁছে দেবার জন্যেই তাঁর বলা। এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি উপযুক্ত সাড়া দেন তবেই শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি হতে পারে। কারণ মনে রাখতে হবে, এটা উত্তর ভিয়েৎনামের কোন শর্ত নয়, শান্তি আলোচনার একটা ভিত্তিমাত্র। দ্বিতীয়ত আগে যে শান্তি আলোচনার পক্ষে উত্তর ভিয়েৎনাম চার-দফা শর্ত রেখেছিল নতুন প্রস্তাবে তারও কোনো উল্লেখ নেই। কাজেই নতুন প্রস্তাব অনেক উদার কাজেই গ্রহণযোগ্যও।

প্রধানমন্ত্রীর অনাবৃষ্টি সাহায্য তহবিলে দান করুন

ডাকমাশুলে, রেল ও বিমানমাশুলে, আয়কর ও বহিঃশুল্কে রেহাই পাওয়া যায়।

প্রত্যাশার মৃত্যু ও দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা

কৃত্তিবাস ওঝা

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

"দুর্মতি মজিল আপনি মজাইলে লঙ্কাপুরে," আর পাপী মরে সাত ঘাট নিয়ে। পশ্চিমবঙ্গের মতিচ্ছন্নরা নিজেরা মজলো আর মজালো সারা দেশকে। এরা পাপীও বটে, তাই নিজেরা যখন মরল, তখন সাত ঘাট নিয়ে মরল। দেশের মানুষ তাদের সর্বস্বর বিনিময়ে রাজ্যের কংগ্রেস-বিরোধী ও বামপন্থী শক্তির ঐক্যবন্ধ রূপ রচনায় সহায়তা করেছিল। সাধারণ মানুষের চাহিদা পূরণে বাম দলেরা জনমতের কাছে নতি স্বীকারও করেছিল, কিন্তু তখন সম্ভবত কেউই অনুমান করতে পারে নি যে, এই সব মার্কস্-লেনিনবাদী তাত্ত্বিকরা 'ওয়ান স্টেপ্ ফরওয়ার্ড, টু স্টেপ্ ব্যাকওয়ার্ড' থিওরীতে কাজ করছে। এই ওয়ান স্টেপ্ ফরওয়ার্ড ছিল ৩১শে আগস্টের সনদ, যে সনদে পশ্চিমবঙ্গের তেরোটি বিরোধী দলের প্রতিনিধি আর ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষসহ কয়েকজন জননায়ক সই করেছিলেন আর ৯ই অক্টোবর গণ অনাস্থা দিবসে যুক্ত মিছিলে কলকাতার রাজপথ প্রকম্পিত করেছিলেন। স্মরণ করুন সেই ৯ই অক্টোবরের কথা যেদিন কলকাতায় ঐক্যবন্ধ মিছিলে নয়া ইতিহাস রচনা হয়েছিল। মহানগরীর হাজার হাজার মানুষ দুইটি বিশাল মিছিলের মধ্য দিয়ে প্রফুল্ল সেন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করেছিল। এইদিন ময়দান থেকে দুইটি মিছিল উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করে। উত্তর কলকাতার মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন সর্বশ্রী হেমন্ত বসু, দেবেন সেন, সোমনাথ লাহিড়ী, নিখিল দাস, সুহৃদ মল্লিক-চৌধুরী আর দক্ষিণের মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন সর্বশ্রী অজয় মুখোপাধ্যায়, জ্যোতি বসু, নরেন দাস, মাখন পাল, সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, নেপাল ভট্টাচার্য, সুধীন কুমার, জ্যোতি ভট্টাচার্য প্রমুখ। নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস! দু'মাস আগে যে নেতৃবৃন্দ দু'টি শোভাযাত্রায় রাজ্যের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশের জন্য উত্তর দক্ষিণে যাত্রা করেছিলেন, দুই মাস পরে সেই নেতৃবৃন্দকেই দেখা গেল দুই ফ্রণ্টে বিভক্ত হয়ে যাত্রা করেছেন দুই দিকে—এবার আর লক্ষ্য রাজ্যের কংগ্রেস সরকারের পরাজয় বা উচ্ছেদ নয়, এবার লক্ষ্য উত্তরে নিমতলা শ্মশান, দক্ষিণে কেওড়াতলা শ্মশান।

সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট ও সংযুক্ত বামপন্থী গণফ্রন্ট গঠিত ও উভয় দলের প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর দেখা গেল, বামপন্থী ফ্রন্ট মোট ১৯১টি আসনে এবং বামপন্থী গণফ্রন্ট ১৮০টি আসনে প্রার্থী দিয়েছেন। দুই ফ্রন্টের মধ্যে বিরোধ মুক্ত আসনের সংখ্যা ১৮১ আর বিরোধ যুক্ত আসনের সংখ্যা ৯৯টি। এই বিরোধের চিত্রে দেখা যাচ্ছে—দক্ষিণ কম্যুনিস্ট ও বাম কম্যুনিস্ট দলে ২৮টি আসনে, ফরওয়ার্ড ব্লক ও বাম কম্যুনিস্ট দলে ১৫টি আসনে, বাংলা কংগ্রেস ও বাম কম্যুনিস্ট দল ২০টি আসনে, ফরওয়ার্ড ব্লক ও এস-এস-পি দলে ৫টি আসনে, দক্ষিণ কম্যুনিস্ট ও এস-এস-পি দলে ১টি আসনে, বাংলা কংগ্রেস ও এস-ইউ-সি দলে ৩টি আসনে, আর-এস-পি ও দঃ কম্যুনিস্ট পার্টিতে ২টি আসনে, বাংলা কংগ্রেস ও আর-এস-পি দলে ৩টি আসনে, ফরওয়ার্ড ব্লক ও এস-ইউ-সি দলে ১টি আসনে এবং আর-সি-পি-আই ও ফরওয়ার্ড ব্লক দলে ১টি আসনে বিরোধ আছে।

আরও একটি বিরোধও এই তালিকার মধ্যে অতি গোপনে ছিল এবং সেটা প্রকাশ পায় পরে। সেটা হল এস-এস-পি দলের সঙ্গে খোদ বাম কম্যুনিস্ট দলের বিরোধ। বাম কম্যুনিস্ট দলের সঙ্গে এস-এস-পি দলের মোট আটটি আসনে বিরোধ ছিল, কিন্তু চোরের মায়ের কান্না সহজে শোনা যায় না বলে অনেক পরে এই বিরোধের চিত্র প্রকাশিত হয়। এই সম্পর্কে পরে বিস্তারিতভাবে হিসাব করা যাবে। দুই ফ্রন্ট লোকসভার জন্যও প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেন। এই তালিকায় বামপন্থী ফ্রণ্ট প্রার্থী দেন ২৫টি আসনে আর বামপন্থী গণফ্রণ্ট প্রার্থী দেন ২৭টি আসনে। লোকসভা আসনে দুই ফ্রন্টের মধ্যে বিরোধ ১৫টি আসনে আর কোন বিরোধ ছিল না ২৫টি আসনে। এই বিরোধ ছিল বাম ও দক্ষিণ কম্যুনিস্ট পার্টির ৭টি আসনে, ফরওয়ার্ড ব্লক ও বাম কম্যুনিস্ট পার্টির ২টি আসনে, এস-এস-পি ও দঃ কম্যুনিস্ট পার্টির ২টি আসনে, এস-এস-পি ও ফরওয়ার্ড ব্লকের ১টি আসনে, বাংলা কংগ্রেস ও এস-ইউ-সি-এর ১টি আসনে এবং বাংলা কংগ্রেস ও বাম কম্যুনিস্ট পার্টির ২টি আসনে। এই যে বিরোধ ও বিরোধ মুক্ত আসনের চিত্র রয়েছে তা দেখলে কিন্তু বোঝা যায় প্রকৃতপক্ষে বেশি বিরোধ বাম কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে অন্য দলের এবং দক্ষিণ কম্যুনিস্ট পার্টি বাংলা কংগ্রেস ও ফরওয়ার্ড ব্লক মোটামুটি-ভাবে বিরোধের অন্যতম প্রধান শরিক। এই বিরোধের চিত্রের সঙ্গে যদি সকলের আসন তালিকা চোখের সামনে রাখা যায় তবে সেই চিত্রের মধ্যেও কিন্তু লক্ষণীয় ঘটনা চোখে পড়ে। এই তালিকায় দেখা যায় মাত্র দুই কম্যুনিস্ট পার্টি নিজেদের আসন দাবির মধ্যে এমন একটা জট সৃষ্টি করেছেন যে জট কোনক্রমেই সহজে খোলবার নয়। এবং এই জট বৃদ্ধির মূলে আছে একদল কর্তৃক অপর দলের জমি দখলের চেষ্টা, কখনও একদলের ভূমিকা আক্রমণমুখী, অপর দলের ভূমিকা আত্মরক্ষামূলক। আর জটের মধ্যে আরো জট

সৃষ্টি করে ঐক্য আলোচনায় বসা। কারণ কোন ঐক্য আলোচনায় আদৌ যদি কেউ না বসতো তবে হয়তো দর কষাকষি করে জট বৃদ্ধির সুযোগ ঘটত না, কিন্তু কয়েক দিন ধরে ঐক্য আলোচনা জট ছাড়ানো অপেক্ষা জট আরো বাড়িয়ে দিল। তবে ঐক্য আলোচনায় কি কোন সুফল হতে পারতো না? নিশ্চয়ই পারতো যদি সেই ঐক্য আলোচনায় বাম কম্যুনিস্ট পার্টি নিজের দর্শনে দক্ষিণ দলকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্মূল করবার খোয়াবে মশগুল না হতো। শয়তানের কোলাকুলিতে বাম কম্যুনিস্ট পার্টি রাজ্যে সার্বিক বাম ঐক্য প্রতিষ্ঠায় শুধু ছুরি চালানো ছাড়া অন্য কোন ফলই প্রসব করতে পারে নি। প্রথম অধ্যায়ে কে কার কি আসন দখলের চেষ্টা করেছে সেই কথা বলা হলো। তবে তালিকা বের হবার পর যে চিত্র প্রকাশ হলো সেই চিত্রে দেখা গেল, বাম কম্যুনিস্ট পার্টি দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্টদের বিধানসভার বড়বানী, খড়্গপুর, বহরমপুর, চাঁপদানী, শাঁকরাইল, জোড়বাংলো, ময়ূরেশ্বরের বর্তমান সদস্যদের আসন দাবি করেছে; আর দক্ষিণ কম্যুনিস্ট পার্টি উত্তরপাড়া, আসানসোল, নওয়াপাড়া, নৈহাটী, বীজপুর, নবদ্বীপ কেন্দ্রে দাবি রেখেছে। দক্ষিণ কম্যুনিস্ট পার্টি পরে জোড়বাংলো কেন্দ্র থেকে তাদের প্রার্থীকে অন্যত্র সরিয়ে নেয় আর নবদ্বীপে কোন প্রার্থী রাখে নি। অবশ্য প্রার্থী প্রকাশের পর সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীসুকুমার গুপ্ত দক্ষিণ কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে বলেন যে, বামের মনোভাব ও তালিকা বিবেচনা করে পরে কয়েকটা আসনে তাঁরা প্রার্থী দিতে পারেন। লোকসভা আসনের চিত্রে দেখা যায় যুক্ত কম্যুনিস্ট পার্টির মোট আটটি বর্তমান আসনের মধ্যে চারটি বামকে ছেড়ে দিয়েছে আর চারটি নিজেদের দখলে রেখেছে; অপরপক্ষে বাম কম্যুনিস্ট পার্টি মাত্র একটি ছেড়ে দিয়ে সাতটি কেন্দ্রে প্রার্থী দিয়েছে। দক্ষিণ কম্যুনিস্ট পার্টির বর্তমান আসনে ছিল—বারাকপুর ঃ রেণু চক্রবর্তী, হাওড়া ঃ মহম্মদ ইলিয়াস, হুগলী ঃ প্রভাত কর, আলিপুর ঃ ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, কলিকাতা পূর্ব ঃ রণেন সেন ও কলিকাতা মধ্য ঃ হীরেন মুখোপাধ্যায়। এই আসনগুলির মধ্যে হুগলী ও কলিকাতা পূর্ব কেন্দ্রে দক্ষিণ কম্যুনিস্ট পার্টি ছেড়ে দিয়ে উক্ত দুই কেন্দ্রের প্রার্থী ডাঃ রণেন সেনকে বারাসাত কেন্দ্রে এবং শ্রীপ্রভাত করকে ঘাটাল কেন্দ্রে সরিয়ে নিয়ে গেছে। বাম কম্যুনিস্ট দলের নিজস্ব আসন ছিল শ্রীরামপুর ঃ শ্রীদিনেন ভট্টাচার্য ও বোলপুর ঃ শ্রীশরদীশ রায় এবং নূতন দুইটি কেন্দ্র বাম দক্ষিণের কাছ থেকে পেল—হুগলী ও কলিকাতা পূর্ব। দক্ষিণ কম্যুনিস্ট পার্টি এই দুইটি লোকসভা আসন ছেড়ে দিলেও কিন্তু শ্রীরামপুর কেন্দ্রে নিজেদের দাবি রাখে। বাম কম্যুনিস্ট পার্টি কিন্তু একমাত্র হীরেন মুখার্জীর কেন্দ্র ও বারাসাত কেন্দ্র ছাড়া সব কেন্দ্রেই প্রার্থী দেয়। এই অবস্থা হল দুই দলের তালিকা প্রকাশের পরের প্রাথমিক চিত্র।

১২ই ডিসেম্বর দুই দলের তালিকা প্রকাশের পর কয়েক দিন বেশ থমথমেভাবে কাটে, সকলেই নিজের নিজের হিসাব নিকাশ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। হয়ত এ সময়ে অনেকে আশা করছিল জনমতের চাপে বিরোধের এলাকা আর সম্প্রসারিত হবে না এবং ঘটনাস্রোতে উভয় দলের মধ্যে একটা সমঝোতার চেষ্টা হবে। কিন্তু ১২ তারিখের পাঁচ দিন পরে হঠাৎ দেখা গেল একটা মৃদু আওয়াজ উঠেছে এবং সেই আওয়াজটা ক্রমেই হুঙ্কারের রূপ নিচ্ছে। ১৭ই ডিসেম্বর বামপন্থী ফ্রন্টের এক সভা বসলো, যদিও এই সভা ছিল নির্বাচনী কর্মসূচী রচনার সভা কিন্তু দেখা গেল কর্মসূচীর কথা চাপা দিয়ে বামপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি সংঘর্ষের ক্ষেত্র প্রসারে অটল অবিচল। বাম কম্যুনিস্ট দলের পক্ষ থেকে সভায় জানিয়ে দেওয়া হল তাদের দল হেমন্ত বসু, হীরেন মুখার্জী, গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসনসহ ৯টি আসনে প্রার্থী দিতে চান। এই জিদের মধ্যে পড়ে সবচেয়ে বেশি প্রমাদ গুণলেন শ্রীমাখন পাল। শ্রীপাল এমন একজন ব্যক্তি যিনি অবস্থার নিকট নতি স্বীকার করলেও সর্বসময়ে চাইছিলেন উভয় ফ্রন্টই যেন তাদের দৃঢ়তা একে অপরের বিরুদ্ধে প্রয়োগ না করে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে। তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নম্রতায় বাম কম্যুনিস্ট দলকে বাগ মানাতে চেষ্টা করলেন। কথা হল আপাতত একটি বিবৃতি দিয়ে গণফ্রন্টকে বিরোধের ক্ষেত্র সম্প্রসারণের অভিযোগে অভিযুক্ত করা ছাড়া অন্য কিছু করা হবে না। সেই সঙ্গে তিনি এবং শ্রীনরেন দাস আর একটি দায়িত্বও গ্রহণ করলেন যে, তাঁরা দুই জন গণ বাম ফ্রন্টের সঙ্গেও একটু আলাপ করে দেখতে চান প্রকৃত অবস্থা কি এবং বিরোধ সীমিত রাখা যায় কিনা। এই একই সময়ে গণ বাম ফ্রন্টও এক সভায় মিলিত হয়ে সমস্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করলো। গণ বাম ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ দেখলেন তাঁদের অনাগ্রাসী ও নম্র ভূমিকার বিপরীত ফল ফলতে সুরু করেছে। সপ্ত বাম ফ্রন্ট বিবৃতি দিয়ে শাসিয়েছেন, গণ বাম ফ্রন্ট নাকি ত্রিশটি আসনে প্রার্থী দিয়ে বিরোধ বৃদ্ধি করেছে অথচ তাদের হিসাবে তারা একতরফাভাবে দুটি লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী সরিয়ে নিয়েছে এবং বাম কম্যুনিস্ট পার্টি ১২২টি আসনের

BI-COLATES
REGISTERED TRADE MARK
STEARNS

পিত্তরস প্রবাহ, পাকস্থলীর সুষ্ঠু ক্রিয়া ও কোষ্ঠকাঠিন্য নিয়ন্ত্রণে দীর্ঘদিনের প্রশংসাধন্য একটি অব্যর্থ ঔষধ।

MARTIN & HARRIS PRIVATE LTD.
MERCANTILE BUILDING, LALLBAZAR, CALCUTTA.

মধ্যে এমন ২২টি আসনে প্রার্থী দিয়েছেন যে সমস্ত আসনে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় কোন না কোন দলকে ছেড়ে দিয়েছিলেন অথবা আগে কখনও দাবি করেন নি। ময়না কেন্দ্র যেখানে ১২টা অঞ্চল পঞ্চায়েতের মধ্যে ৯টা দক্ষিণ দলের বা তাদের সহযোগীদের দখলে, যুক্ত পার্টির ৩০০ সদস্যের চারজন ছাড়া কেউ বাম দলে যায় নি, এবং যেখানে প্রার্থীরূপে নাম ছিল এই কেন্দ্রের প্রাক্তন এম, এল, এ শ্রীকানাই ভৌমিকের। গত বার যিনি মাত্র ৭৪০ ভোটে হেরেছিলেন। গড়বেতা পঃ, যেখান থেকে দুইবার নির্বাচিত হয়েছিলেন শ্রীসরোজ রায় এবং তিনিই এবার প্রার্থী। ১৯৬২ সালে আসনটি সংরক্ষিত আসন হয়ে যাওয়ায় তিনি প্রার্থী হন নি, এবার আবার সাধারণ আসন হওয়ায় প্রার্থী হয়েছেন। জলপাইগুড়িতে শ্রীনরেশ চক্রবর্তী যে একমাত্র যোগ্য প্রার্থী একথা যদি কেউ প্রথম স্বীকার করে থাকেন তবে তিনি হলেন শ্রীজ্যোতি বসু আর সেই কেন্দ্র বাম কম্যুনিস্টরা দাবি করেছে। বনগ্রাম—এই কেন্দ্রে শ্রীঅজিত গাঙ্গুলীর প্রার্থীপদের ব্যাপারে সর্বদলের ঐকমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই রকমভাবে, বিষ্ণুপুর, খড়্গপুর, অশোকনগর, গঙ্গারামপুর, ময়ূরেশ্বর প্রভৃতি কেন্দ্রে, যেখানে দক্ষিণ কম্যুনিস্ট পার্টির প্রার্থী থাকবে—যেটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ হয়েছিল—সেখানে বাম কম্যুনিস্ট পার্টি প্রার্থী দিয়ে দিয়েছে। আবার নতুন করে ৯টি কেন্দ্রে প্রার্থী দেবে বলে হুঙ্কার দিচ্ছে।

রাজ্যের সকল রাজনৈতিক দলের সর্বাপেক্ষা বড় দুর্বলতা সম্ভবত এই যে, এই দলগুলি বামপন্থী কম্যুনিস্ট দলের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, দর্শন—কোনটা সম্পর্কেই না অভিজ্ঞ না দূরদর্শী। এই দূরদর্শিতার অভাবে বাম কম্যুনিস্ট দলের আপাতমধুর কথায় ভুলেছেন গোড়া থেকে। নিজেরা মজেছেন অপরকেও মজিয়েছেন। বাম কম্যুনিস্ট পার্টি যখন ২৮০টি আসনের মধ্যে ১২২টি আসন দাবি করে তখন অনেকেরই বোঝা সম্ভব হয় নি—কেন বাম কম্যুনিস্টরা নির্দিষ্ট ১২২টি আসন দাবি করছে। প্রথমত এই ১২২টি আসন হ'ল সেই আসন যে আসনগুলিতে সামগ্রিক বাম প্রভাব এবং যে সব আসনে বামপন্থীরা নিশ্চিত জয়যুক্ত হবে। সব দলের সঙ্গে যখন ঐক্য আলোচনা চলছিল তখনকার খবর ছিল যে, ২১ আসনে কোন দলেরই প্রার্থী ছিল না আর ১৫টি আসনে প্রার্থী দিতে হয় তাই অনেকে দিতে চেয়েছিলেন। তাহলে ২১+১৫=৩৬টা আসন আর ১২২টি আসন বাম কম্যুনিস্ট নিয়েছিল অর্থাৎ ১৫৮টি আসন চলে গেল, অবশিষ্ট রইল ১৩২টি আসন। এই ১৩২ আসন নিয়ে সন্তুষ্ট হতে হবে রাজ্যের অবশিষ্ট ১৩টি দলকে, অর্থাৎ দক্ষিণ কম্যুনিস্ট, ফরওয়ার্ড ব্লক, বাংলা কংগ্রেস, আর-এস-পি, এস-এস-পি, সহ সকল ছোট-বড় দলকে ভাগ করে নিতে হবে এই সব আসন।

বামপন্থী কম্যুনিস্টরা এই আসন দাবির সময়ে সবচেয়ে বড় গলায় যে কথাটা প্রচার করেন সেই কথাটা হল তাদের দাবি যে ন্যায্য তা কেরালার বিগত নির্বাচনে প্রমাণিত হয়ে গেছে। বাম দলের নেতারা প্রচার করেন কেরালায় বাম আর দক্ষিণ কম্যুনিস্ট পার্টি পৃথক পৃথকভাবে লড়াই করে। বাম দলের প্রার্থীদের অনেকেই জয়যুক্ত হয় আর দক্ষিণপন্থীরা হেরে যায়। কথাটা হয়তো আংশিক সত্য, কিন্তু তার চেয়ে বড় সত্য কি এই নয় যে, ওই দুই দলের অনৈক্যের কারণেই কেরালায় আজ রাষ্ট্রপতি শাসন কায়েম হবার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে—। সেই দিন বাম কম্যুনিস্ট দলের দক্ষিণ কম্যুনিস্ট পার্টিকে শেষ করার নীতিতে কেরালায় যে ত্রিমুখী লড়াই হয়, তারই পরিণতিতে কেরালায় আজকের রাষ্ট্রপতি শাসন। সেইদিনের ত্রিমুখী লড়াইতে বাম কম্যুনিস্ট পার্টি প্রধান বিরোধী দলরূপে স্বীকৃতি পেয়েছে ঠিকই কিন্তু দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি কিন্তু শেষ হয়ে যায় নি। এবার কেরালায় যে যুক্ত ফ্রন্ট হয়েছে, সেই ফ্রন্টে বাম কম্যুনিস্টদের সঙ্গে দক্ষিণপন্থীরাও যোগ্য আসন পেয়েছেন। আর একটা সত্যও এই সঙ্গে আছে যে, কেরালায় বাম কম্যুনিস্ট দলের সঙ্কীর্ণ নীতি এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছে যে কারণে দলের (বাম কম্যুনিস্ট দলের) প্রায় ২৩ জন বড় বড় নেতাকে কন্ট্রোল কমিশনের শিকার হয়ে শাস্তি পেতে হচ্ছে এবং সমগ্র অবস্থা চাপা দেবার জন্য শ্রী ই-এম-এস নাম্বুদ্রিপাদকে নাস্তানাবুদ হতে হচ্ছে। কেরালায় সহযোগী নিধনে ব্যর্থ হয়ে এবার পশ্চিমবঙ্গে সেই ব্রত পালনের উদ্যোগ সুরু করেছিলেন বাম কম্যুনিস্ট পার্টি। তাই শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার ৩০শে ডিসেম্বর জলপাইগুড়িতে এবং আরো আগে রায়গঞ্জের জনসভায় কম্যুনিস্ট পার্টিকে মল-মূত্র পুঁজ-রক্তের সঙ্গে তুলনা করেন। মহম্মদ ইসমাইল বলেন—ডাঙ্গে পার্টির যত বড় নেতাই হোক না তাদের পরাজিত করতেই হবে। আর ২৫শে রায়পুরে শ্রী বি, টি, রণদিভে বলেন, মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি ডাঙ্গে পার্টিকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছেড়ে দেবে না। কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা শ্রীহীরেন মুখার্জী, শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী সংসদ সদস্য হিসাবে নাম করেছেন বলেই রেহাই পাবেন এমন সম্ভাবনা নেই। উপরোক্ত নীতি ও সিদ্ধান্ত যেখানে বাম কম্যুনিস্ট দলের অন্তরের বাণী সেখানে গত কয়েক মাসে যে ঐক্য আলোচনা হয়েছিল সেটা ছিল ছলনা মাত্র। বাম কম্যুনিস্ট পার্টি ঐক্য যতটা চেয়েছিল তার চেয়ে বেশি চেয়েছিল কতগুলি সাইনবোর্ড। অনেকগুলি সাইনবোর্ড যেন তার সঙ্গে থাকে। কারণ একা বাম কম্যুনিস্ট হিসাবে লড়াইতে নামলে লোকে বড় তাড়াতাড়ি চিনে ফেলবে তাই যদি সামনে আশেপাশে কিছু সাইনবোর্ড রাখা যায় তবে সেই সাইনবোর্ডের আড়ালে জনগণের সংগ্রামী মোর্চা বলে নিজেকে চালিয়ে নেওয়া যাবে। কপালগুণে সেই সাইনবোর্ড জুটেছিল এবং সেই সাইনবোর্ডগুলি একসঙ্গে করে সম্মিলিত বামপন্থী ফ্রন্টের নামের আড়ালে নিজেকে ঢাকবার সুযোগ হয়েছিল। কিন্তু অন্য দলগুলির মধ্যে একেবারে সাইনবোর্ড সর্বস্ব নয় এমন দুই-একটি দলও ছিল। যেমন এস-এস-পি আর-এস-পি। এই দলগুলি কিন্তু ধীরে ধীরে বুঝে ফেললো তারা কি ট্রাপে পড়েছে। এই ট্রাপে পড়ে এই দুই দলই আবিষ্কার করলো—বাম ঐক্যের নামে তাদের জাত মান দল সবই যেতে বসেছে। এস-এস-পি-এর অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে পশ্চিমবঙ্গে তাদের দল রাখাই কঠিন হয়ে পড়েছে। একদিকে বাম কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে আসনে মিটল না, আবার নিজের দলের মধ্যে প্রচণ্ড ভাঙন—দুই দিকের চাপে পড়ে এস-এস-পি দলই সর্বাগ্রে আবিষ্কার করলো কি ভয়ঙ্কর গর্তে তারা পড়েছে।

(ক্রমশঃ)

আশাপূর্ণা দেবী

ধারাবাহিক উপন্যাস

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

কান্নায় কান্নায় পূর্ণ মন নিয়ে বাড়ি ফিরলো সুবর্ণলতা।

ভাবতে লাগলো ভগবানের উপর অবিশ্বাস এসে গেলেই বুঝি তিনি এই-ভাবে আপন করুণা প্রকাশ করেন।

মানুষের উপর প্রত্যাশা হারালেই ভগবানের উপর আসে অবিশ্বাস। তবু কোথাও বুঝি কিছু একটু আশা ছিল, তাই দ্বিধাগ্রস্ত চিত্ত নিয়ে সেই আশার দরজায় একটুকু করাঘাত করতে গিয়েছিল সুবর্ণলতা, বন্ধ কপাট খোলে কি-না দেখতে। দেখলো দু'হাট হয়ে খুলে গেল। ভিতরের মালিক সহাস্য অভ্যর্থনায় বললো, 'এসো এসো! বোসো, জল খাও।'

হ্যাঁ, সেই কথাই মনে হয়েছিল সুবর্ণ-লতার।

একথা সেকথার পর আবার মামীমার মাধ্যমে ছাপার খরচার কথাটা তুলেছিল সুবর্ণ. সুবর্ণলতার জগু বটঠাকুর সে প্রস্তাব তুড়ি দিয়ে ওড়ালেন। বললেন, 'দূর! কাগজের আবার দাম! বস্তা বস্তা কাগজ কেনা আছে আমার! এই তো এখনই তো দু' হাজার বর্ণপরিচয় ছাপা হচ্ছে। বৌমা বই লিখেছেন, এটা কি কম আহ্লাদের কথা! ছেপে বার করে বুক ফুলিয়ে বলে বেড়াবো লোককে। কী গুণবতী বৌ আমাদের! বুকটা দশহাত হয়ে উঠবে।'

শুনে তখন সহসা ভূমিকম্পের মতো প্রবল একটা বাষ্পোচ্ছ্বাসে সুবর্ণলতার সমস্ত শরীর দুলে উঠেছিল। জীবনের তিন ভাগ কাটিয়ে এসে সুবর্ণলতা এই প্রথম শুনলো সে গুণবতী! শুনলো তার কোনো গুণ নিয়ে কেউ গৌরব করতে পারে।

অথচ এই গুণেই—

হ্যাঁ, এই গুণেই দোষ হয়েছে চিরকাল। আজীবনই তো একটু-আধটু লেখার সাধ ছিল! কিন্তু সে সাধ মেটাতে অনেক দাম দিতে হয়েছে। কত সঙ্গোপনে, কত সাবধানে হয়তো রাত্রে যখন ওদিকে তাসের আড্ডা জমজমাট, অথচ এদিকে ছেলেরা ঘুমিয়েছে, তখন বসেছে একটু খাতা-কলম নিয়ে, প্রবোধ কোনো কারণে ঘরে এসে পড়ে দেখে ফেললো, ব্যস্, সুরু হলো ব্যঙ্গ তিরস্কার।

আর তার জের চলতে লাগলো বেশ কিছুকাল! যে সংসারে মেয়েমানুষ 'বিদ্যে-বতী' হয়ে উঠে কলম নাড়ে, তাদের যে লক্ষ্মী ছেড়ে যাওয়া অনিবার্য এ-কথাও ওঠে। তা ছাড়া কলম ধরা হাত যে আর হাতাবেড়ি ধরতে চাইবে না, তাতে আর সন্দেহ কি।

অনেক সময় অনেক কটূক্তি হজম করেছে সুবর্ণলতা তার 'খাতা' নিয়ে। আর এখনই কি হয় না? কটূক্তি না হোক বক্রোক্তি?

কানে আসে বৈ কি?

আর সে উক্তি আজকাল অনেক সময়ই আসে ছেলেদের ঘর থেকে! সুবর্ণলতার রক্তে-মাংসে গঠিত ছেলেদের!

'ব্যাপারটা কি! কোনো 'থিসিস' টিসিস লেখা হচ্ছে না কি?'......'মা কি রান্না-ঘরটা একদম ছেড়ে দিলেন না কি রে বকুল? দেখতেই পাওয়া যায় না—...... সুবল তুইতো অনেক জানিস, মহাভারত লিখতে বেদব্যাসের কতদিন লেগেছিল জানিস সে খবর?'

অথবা প্রবোধের আক্ষেপ উক্তি শোনা যায়, 'কী রান্না-বান্না হচ্ছে আজকাল! বকুল, এ মাছের তরকারি রেঁধেছে কে? তুই বুঝি? মুখে করা যাচ্ছে না যে—'

জানে বকুল নয়, ছেলের বৌরা রেঁধেছে। তত্রাচ ওইভাবেই বলে। বোধ করি সেই চিরাচরিত মেয়েলি প্রথাটাই বজায় রাখে। ঝিকে মেরে বৌকে শেখায়।

আবার এ আক্ষেপও করে ওঠে, 'হবেই তো! বাড়ির গিন্নী যদি সংসার ভাসিয়ে দিয়ে খাতা-কলম নিয়ে পড়ে থাকে, হবেই নষ্ট অপচয়, অবিলি বে-বন্দোবস্ত?'

সুবর্ণর কানে আসে।

কিন্তু সুবর্ণ কানে নেয় না। সব কিছু কানে নেওয়া থেকে বিরত হয়েছে সুবর্ণ, অভিমানশূন্য হবার সাধনা করছে।

অতএব জবাব দেয় না।

সুবর্ণলতা তার সংসারের সব প্রশ্নের 'জবাব' তৈরি করছে বসে বসে শেষ আদালতে পেশ করার জন্যে। হয়তো সেই 'জবাবী বিবৃতির' মধ্য থেকে—সেই সংসার সুবর্ণলতাকে বুঝতে পারবে।

আর সেই বোঝা বুঝতে পারলেই, বুঝতে পারবে নিজের ভুল, নিজের বোকামি, নিজের নির্লজ্জতা!

সুবর্ণলতার 'স্মৃতিকথা' সুবর্ণলতার জবানবন্দী।

সেই জবানবন্দীকে মুক্তি দিতে পাচ্ছে সুবর্ণলতা, মুক্তি দিতে পাচ্ছে খাতার কারাগার থেকে আলোভরা রাজ রাস্তায়।

ঈশ্বরের করুণা নেমে এসেছে মানুষের মধ্য দিয়ে।

আজীবনের কল্পনা সফল হতে চললো এবার, আজীবনের স্বপ্ন সফল। এ যেন একটা অলৌকিক কাহিনী। যে কাহিনীতে মন্ত্রবলের মহিমা কীর্তিত হয়। নইলে চিরকালের বাউন্ডুলে জগু বট্‌ঠাকুরের হঠাৎ ছাপাখানা খোলার সখ হবে কেন?

ভগবানই সুবর্ণলতার জন্যে—

পৃথিবীটাকে হঠাৎ ভারি সুন্দর লাগে সুবর্ণর, ভারি উজ্জ্বল। খুশি ঝলমলে সকালের আলোয় এই বিবর্ণ হয়ে আসা গোলাপী-রঙা বাড়িটা যেন সোনালী হয়ে ওঠে। নিজের সংসারটাকেও যেন হঠাৎ ভাল লেগে যায়।

এই তো এই সমস্তই তো সুবর্ণলতার নিজের সৃষ্টি, এদের উপর কি বীতশ্রদ্ধ হওয়া যায়? এদের উপর বিরূপ হওয়া সাজে?

এরা যে সুবর্ণলতাকে ভালবাসে না, সে ধারণাটা ভুল ধারণা সুবর্ণলতার। বাসে বৈ কি, শুধু ওদের নিজেদের ধরণে বাসে। তা—তাই বাসুক! সুবর্ণলতাও চেষ্টা করবে ওদের বুঝতে।

হয়তো জীবনের এই শেষপ্রান্তে এসে জীবনের মানে খুঁজে পাবে সুবর্ণ, আর তার মধ্যেই খুঁজে পাবে জীবনের পূর্ণতা।

ক্রমশই যেন প্রত্যাশার দিগন্ত উদ্ভাসিত হতে থাকে নতুন সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষায়।

শুধুই বা ওই জবানবন্দী কেন?

আরও কিছু লিখতে পারবে না সুবর্ণলতা? যা শিল্প, যা সৃষ্টি!

যেখানে সুবর্ণলতা একক, যেখানে তার ওপর কোনো দাবিদার নেই। যেখানে রয়েছে—সুবর্ণলতার অস্তিত্বের সম্মান!

আঃ এ কল্পনায় কী অপূর্ব মাদকতা!

এ যেন কিশোরী মেয়ের প্রথম প্রেমে পড়ার অনুভূতি! অনুক্ষণ মনের মধ্যে মোহময় এক সুর গুঞ্জরণ করে ফেরে...... সে সুর রাত্রির তন্দ্রার মধ্যেও আনাগোনা করে।

নিত্য নূতন বই লেখা হচ্ছে, নিত্য নিত্য ছাপা হয়ে বেরোচ্ছে সেসব, অবাক হয়ে যাচ্ছে সবাই সুবর্ণলতার মহিমা দেখে, আর ভাবছে 'তাই তো!'

আশ্চর্য! আশ্চর্য! কী হাস্যকর ছেলেমানুষীই করে এসেছে এতদিন সুবর্ণ।

এই তুচ্ছ সংসারের বিরূপতা আর প্রসন্নতার মধ্যে নিজের মূল্য খুঁজে এসেছে! হিসেব কষেছে লাভ আর ক্ষতির।

অথচ সুবর্ণলতার নিজের মুঠোর মধ্যে রয়েছে রাজার ঐশ্বর্য!

সুবর্ণলতার ওই হলুদ পাঁচফোড়নের সংসারখানা নিক না যে খুশি, নিয়ে বরং রেহাই দিক সুবর্ণলতাকে। সুবর্ণলতার জন্যে থাক এক অনির্বচনীয় মাধুর্যলোক।

কী আনন্দ!

কী অনাস্বাদিত সুখস্বাদ।

সুবর্ণলতার জীবনখাতার এই পৃষ্ঠাখানি যেন জ্যোতির কণা দিয়ে লেখা!

সুবর্ণলতা রান্নাঘরে এসে বলে, 'ও বড়বৌমা, বল বাছা কী কুটনো হবে? কুটি বসে!'

বড়বৌমা শাশুড়ির এই আলো ঝলসানো মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে অবাক হয়। তবে প্রকাশ করে না সে বিস্ময়! নরম গলায় বলে, 'আমি আবার কি বলবো? আপনার যা ইচ্ছে—'

'বাঃ তা কেন? তুমি রাঁধবে—তোমার মনের মত রান্নাটি হওয়াই তো ভাল।' বলে বঁটিটা টেনে নেয় সুবর্ণ।

আবার হয়তো বা এ কথাও বলে, 'তোমরা তো রোজই খেটে সারা হচ্ছ বৌমা, আমার অভ্যাস খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কি রান্না হবে বল, আমি রাঁধি।'

বৌরা বলে, 'আপনার শরীর খারাপ—'

সুবর্ণ মিষ্টি হাসি হাসে: 'খারাপ আবার কি বাপু? খাচ্ছি দাচ্ছি, ঘুরছি ফিরছি! তোমাদের শাশুড়ি চালাক মেয়ে বুঝলে? কাজের বেলাতেই তার শরীর খারাপ!'

ওরা অবাক হয়।

ওরা শাশুড়ির এমন মধুর মূর্তি দেখে নি এসে পর্যন্ত। ওরা ভাবে ব্যাপারটা কি।

সুবর্ণ ওদের বিস্ময়টা ধরতে পারে না, সুবর্ণ আর এক জগৎ থেকে আহরণ করা আলোর কণিকা মুঠো মুঠো ছড়ায়।

'ভানু মাছের মুড়ো দিয়ে ছোলার ডাল ভালবাসে তাই বরং হোক আজ, কানুটা বড়া দিয়ে মোচার ঘণ্টর ভক্ত, হয় নি অনেক দিন, দুটো ডাল ভিজোও তো মেজবৌমা!......ওগো আজ- মোচা এনো তো—'

বাজার করার ভার প্রবোধের।

এই মহান কর্মভার অবশ্য সে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছে। ছেলেরা চক্ষুলজ্জার দায়ে কখনো কখনো বলে বটে, 'আমাদের বললেই পারেন! নিজে এত কষ্ট করার কি দরকার!' তবে সে কথা গায়ে মাখে না প্রবোধ।

কিন্ত সেই বাজার বেলায় সুবর্ণলতা তাকে ডেকে হেঁকে বিশেষ কোনো জিনিস আনতে হুকুম দিয়েছে, এ ঘটনা প্রায় অভূতপূর্ব। অন্তত বহুকালের মধ্যে মনে পড়ে না।

বোধ করি ছেলেমেয়েরা যখন ছোট ছোট তখন তাদের প্রয়োজনে বিস্কিট কি লজেন্স, বার্লি কি মেলিন্স ফুড ইত্যাদির অর্ডার দিতে এসেছে বেরোবার মুখে। কিন্তু মুখের রেখায় রেখায় ওই যে আহ্লাদের জ্যোতি?

এ বস্তু কি দেখা গিয়েছে কোনোদিন?

দেখা যেত, ওই আলোর আভা দেখা যেত কখনো কখনো সুবর্ণর মুখে, কিন্তু সে আভা আগুন হয়ে প্রবোধের গাত্রদাহ ঘটাতো!

স্বদেশী হুজুগের সময় যখনই কোনো বিদঘুটে খবর বেরোতো, তখনই সুবর্ণর মুখে আলো জ্বলতো! আলো জ্বলতো যখন নতুন কোনো বই হাতে পেত, আলো জ্বলতো যখন বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলোকে একত্রে বসিয়ে 'পাঠশালা পাঠশালা' খেলা ফেঁদে তারস্বরে তাদের দিয়ে পদ্য মুখস্থ করাতো, আলো জ্বলতো যদি কেউ কোনখান থেকে বেড়িয়ে বা তীর্থ করে এসে গল্প জুড়তো।

তা ছাড়া আর এক ধরণের আলো আর আবেগ দেখেছে ইংরেজ জার্মান যুদ্ধের সময়। সে এক ধরণ! যেন সুবর্ণলতারই জীবন-মরণ নিয়ে যুদ্ধ হচ্ছে। দেশের রাজা বৃটিশ, অথচ সুবর্ণর ইচ্ছে জার্মানরা জিতুক। তাই নিয়ে তর্ক-উত্তেজনা রাগারাগি। মেয়েমানুষ, তাও রোজ খবরের কাগজ না হলে ভাত হজম হবে না।

তা সে প্রকৃতিটা বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে।

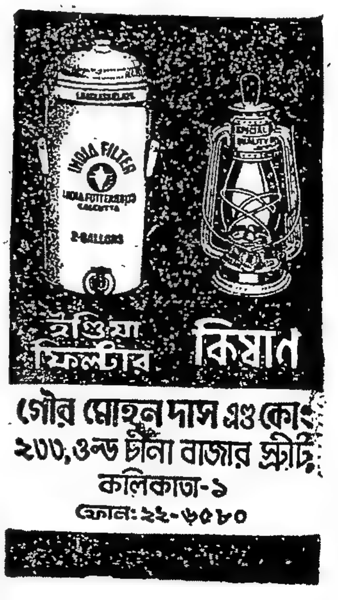

এই তো ইদানীং আবার যে 'স্বরাজ স্বরাজ' হুজুগ উঠেছে তাতে তো কোনো আগ্রহ দেখা যায় না। বরং যেন অগ্রাহ্য। বলে, 'অহিংসা' করে শত্রু তাড়ানো যাবে এ আমার বিশ্বাস হয় না।'......বলে, 'দেশসুদ্ধ লোক বসে বসে চরকা কাটলে 'স্বরাজ' আসবে? তাহলে আর পৃথিবীতে আদি অন্তকাল এত অস্ত্র-শস্ত্র তৈরি হতো না।'......

শক্তি সামর্থ্যটা কমে গেছে, ঝিমিয়ে গেছে।

তাই মুখের সেই ঔজ্জ্বল্যটাও বিদায় নিয়েছিল। বিশেষ করে সেই অদেখা মায়ের আর চকিতে দেখা বাপের মৃত্যুশোকের পর থেকে তো—

হঠাৎ যেন সেই ঝিমিয়ে পড়া ভাবটার খোলস ছেড়ে আবার 'নতুন' হয়ে ওঠার মত দেখাচ্ছে সুবর্ণকে।

—কেন?

মাথার দোষ টোষ হচ্ছে না তো?

পাগলরাই তো কখনো হাসে কখনো কাঁদে!

তা যাক, এখন যখন হাসছে, তাতেই কৃতার্থ হওয়া ভালো!

কৃতার্থই হয় প্রবোধ।

বিগলিত গলায় বলে, 'মোচা? মোচা আনা মানেই তো তোমার খাটুনী গো, ও-কি আর বৌমারা বাগিয়ে কুটতে ফুটতে পারবেন?'

সুবর্ণ বলে, 'শোনো কথা। সব করছে ওরা! কিসে হারছে? তবে আমারই ইচ্ছে হয়েছে, রান্না-বান্না ভুলে যাব শেষটা?'

কৃতার্থমন্য প্রবোধ ভাবতে ভাবতে বাজার ছোটে, 'আহা এমন দিনটি কি চিরদিন থাকে না?'

এই জীবনটাই তো কাম্য।

গিন্নী ফাই ফরমাস করবে, এটা আনো ওটা আনো বলবে, কর্তা সেইসব বরাতি বস্তু এনে সাতবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাবে বাহবা নেবে, গিন্নী গুছিয়ে গাছিয়ে রাঁধবে, বাড়বে বেলা গড়িয়ে পরিপাটি করে খাওয়া-দাওয়া হবে, আর অবসর কালে কর্তা-গিন্নী পানের বাটা নিয়ে বসে ছেলে বৌ বেয়াই বেয়ানের নিন্দাবাদ করবে, এ যুগের ফ্যাসান নিয়ে সমালোচনা করবে, এই তো এই বয়সের সংসারের ছবি। প্রবোধের সমসাময়িক বন্ধু বান্ধবরা তো এই ধরণের সুখেই নিমগ্ন।

প্রবোধের ভাগ্যেই ব্যতিক্রম। এই সামান্য সাধারণ সুখটুকুও ইহজীবনে জুটলো না।

গিন্নী যেন সিংহবাহিনী।

তাসের আড্ডাটা যাই আছে প্রবোধের, তাই টিকে আছে বেচারা।

তা এতদিনে কি ভগবান মুখ তুলে চাইছেন?

'পাগল ছাগল' হয়ে সহজ হয়ে যাচ্ছে সুবর্ণ?

না কি এতদিনে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে?

তা সে যে কারণে যাই হোক, সুবর্ণ যে সহজ প্রসন্নমুখে ডেকে বলেছে, 'ওগো বাজার যাচ্ছ, মোচা এনো তো' এই পরম সুখের সাগরে ভাসতে ভাসতে বাজারে যায় প্রবোধ, আর প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাছ তরকারি এনে জড়ো করে!

সুবর্ণ অনুমান করতে চেষ্টা করে তার ওই খাতাটা ছাপতে কতদিন লাগতে পারে, কতদিন লাগা সম্ভব। ধারণা অবশ্য নেই কিছুই, তবু, তবু—কতই আর হবে? বড়জোর একমাস! কমও হতে পারে। তারপর—

আচ্ছা জগু বটঠাকুর আমার নামটা জানেন তো? কে জানে! কিন্তু জানবেনই বা কোথা থেকে? কবে আর কে আমার নাম উচ্চারণ করেছে ওঁর সামনে?

তাহলে?

বিনা নামেই বই ছাপা হবে?

না কি মামীমার কাছ থেকে জেনে নেবেন উনি।

তা মামীমাই কি ঠিক জানেন?

'মেজবৌমা' ডাকটাতেই তো অভ্যস্ত।

হঠাৎ নিজমনে হেসে ওঠে সুবর্ণলতা।

কী আশ্চর্য! খাতাটার প্রথম পৃষ্ঠাতেই তো তার নাম রয়েছে। যে হাতের লেখার প্রশংসা করেছেন জগু বটঠাকুর, সেই হাতের লেখাটিকে আরো সযত্নে সুন্দর করে ধরে ধরে নামটি লেখেনি একবার সুবর্ণ?

হ্যাঁ, পরম যত্নে, পরম সোহাগে কল্যাণীয়া ... লিখে রেখেছিল সুবর্ণ শ্রীমতী সুবর্ণলতা দেবী।

সেই লেখা চোখ এড়িয়ে যাবে?

এড়িয়ে যাবে না।

চোখ এড়িয়ে যাবে না।

নামতা মুখস্থ করার মত বারবার মনে মনে একই কথা উচ্চারণ করতে থাকে সুবর্ণ, চোখ এড়িয়ে যাবে না। বইয়ের উপর লেখা থাকবে শ্রীমতী সুবর্ণলতা দেবী!

সুবর্ণলতার মা জেনে গেল না এ খবর।

এত আনন্দের মধ্যেও সেই বিষন্ন বিষাদের সুর যেন একটা অস্পষ্ট মূর্ছনায় আচ্ছন্ন করে রাখে।

মা থাকতে এই পরম আশ্চর্য ঘটনাটা ঘটলে, মাকে অন্তত একখণ্ড বই পার্শেল করে পাঠিয়ে দিত সুবর্ণ! এ বাড়ির কাউকে দিয়ে নয় অবশ্য, মামীমাকে দিয়ে ওই জগু বটঠাকুরকে বলেই করিয়ে নিতো কাজটা!

মা প্রথমটায় পার্শেল পেয়ে হকচকিয়ে যেত, ভাবতো, কী এ? তারপর বাঁধন খুলে দেখতো। দেখতো! দেখতো বইয়ের লেখিকা শ্রীমতী সুবর্ণলতা দেবী!

তারপর?

তারপর কি মার চোখ দিয়ে দু' ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়তো না?

সুবর্ণলতার মনটা যেন ইহলোক পরলোকের প্রাচীর ভেঙে দিতে চায়। যেন তার সেই অদেখা বইটা নিয়ে সেই ভাঙা প্রাচীরের ওধারে নিয়ে গিয়ে ধরে দিতে চায়। সুবর্ণ দেখতে পায় সুবর্ণর মা সুবর্ণর জবানবন্দী পড়ছেন!

পড়ার পর?

শুধুই কি সেই দু' ফোঁটা আনন্দাশ্রুই ঝরে পড়ে শুকিয়ে যাবে? সেই শুকনো রেখার উপর দিয়ে ঝরণাধারার মত ঝরে পড়বে না আরো অজস্র ফোঁটা? মা দেখতে পাচ্ছেন, কীভাবে কাঁটাবনের উপর দিয়ে রক্তাক্ত হতে হতে জীবনের এতটা পথ পার হয়ে এসেছে সুবর্ণ!

মা বুঝতে পারছেন সুবর্ণ অসার নয়।

কোন কোন অংশটা পড়তে পড়তে মা বিচলিত হতো, আর কোন কোন অংশটা পড়ে বিগলিত, ভাবতে চেষ্টা করে সুবর্ণ!

নিজের হাতের সেই লেখাগুলো যেন 'দৃশ্য' হয়ে হয়ে ভেসে ওঠে।

পরপর নয় এলোমেলো।

যেন দৃশ্যগুলো হুড়োহুড়ি করে সামনে আসতে চায়! যেন এক প্যাকেট তাসকে কে ছড়িয়ে দিয়েছে।

অনেক বয়সের অনেকগুলো সুবর্ণ ছড়িয়ে পড়ে সেই অসংখ্য দৃশ্যের মধ্যে। মাথায় খাটো পায়ে মল একগলা ঘোমটা বালিকা সুবর্ণ, হঠাৎ লম্বা হয়ে যাওয়া সদ্য কিশোরী সুবর্ণ, নতুন মা হয়ে ওঠা আবেশবিহ্বল সুবর্ণ, তারপর—

আচ্ছা ওই ঘোমটা দেওয়া ছোট মাপের সুবর্ণর ঘোমটাটা হঠাৎ খুলে গেল যে?

কি বলছে ও?

(ক্রমশঃ)

শ্রীযামিনীমোহন কর প্রণীত

কলা দেখিয়ে

মূল্য : এক টাকা

ছেলেদের জন্য আর একখানি রহস্যোপন্যাস। পাঠ আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না।

উপহার দিবার যোগ্য বই

প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী

শ্রীশৈল চক্রবর্তী দ্বারা সুচিত্রিত।

ছাপা ও বাঁধাই মুদ্ধকর।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারে

ফণীন্দ্রনাথ রায়

শান্তিনিকেতনের নতুন গ্রন্থাগারের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেছেন, কিছুদিন আগে, বিশ্বভারতীর আচার্য ইন্দিরা গান্ধী। ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা দু' চার কথায় স্মরণ করেছেন শান্তিনিকেতনের পুরাতন গ্রন্থাগার।

সেই গ্রন্থাগারের কী কাজ ও কর্তব্য ছিল—সে সম্বন্ধে বিদগ্ধজনের ঔৎসুক্য জাগা স্বাভাবিক এবং নতুন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হলে তার মহান ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখাও একান্ত প্রয়োজন। এই কথা স্মরণে রেখেই আমরা 'শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারে' রচনাটি প্রকাশ করলাম। —সম্পাদিকা

(১)

ত্রিশ বছর আগেকার কথা। ১৩৪৫ সালের শীতের সকালে পেঁাছেছি শান্তিনিকেতনে। রাঙা মাটির ঢেউ খেলে গিয়েছে দিকে দিগন্তে। তারি বুকে 'আম-জাম শিরীষ-শালের' ফাঁকে ফাঁকে এখানকার ঘরবাড়ি। সদর দিয়ে ঢুকতেই যাঁর সঙ্গে দেখা হল তিনি এখানকার 'গ্রন্থাগারিক'। সৌম্য, সুদর্শন, প্রসন্ন-মূর্তি। বললেন, আমাদের গ্রন্থাগার দেখবেন চলুন।

সুন্দর অনাড়ম্বর দ্বিতল গৃহ। এক-তলায় প্রথমে যে ঘরে গেলাম সেখানে একজন প্রবীণ অধ্যাপক দু'পাশে দু'জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে গভীর অধ্যাপনায় মগ্ন। আমরা ঘরে ঢুকেছি গ্রন্থাগারিক মহাশয়কে সামনে নিয়ে চার-পাঁচজন, সবাই শান্ত পরিবেশে অভ্যস্ত নয়। কিন্তু কি প্রগাঢ় সেই অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন! ছোট ঘরে এতগুলি লোকের সশব্দ প্রবেশেও তার প্রগাঢ়তা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হল না, শিক্ষক বা ছাত্র-ছাত্রী কেউ মুখ তুলে চাইলেন না এই অসংযত অতিথিদের দিকে। গ্রন্থাগারিক এগিয়ে গেলেন, সবাই আসন ছেড়ে উঠলেন, তাঁকে যোড়করে নমস্কার করলেন। তিনি অধ্যাপকের সঙ্গে অধ্যাপনার বিষয় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলে ফিরে এলেন আমাদের কাছে, ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম অন্য ঘরে।

বিদেশিনী মহিলা পড়াচ্ছেন এই দেশের মেয়েদের। গভীর আগ্রহ ও মনোযোগের চিহ্ন ফুটে উঠেছে ছাত্রীদের মুখে-চোখে। আমাদের উপস্থিতি সেখানে যেন নিতান্তই অবান্তর। কোনো কৌতূহলী দৃষ্টি উদ্যত হল না আমাদের দিকে। গ্রন্থাগারিক আগের মত এগিয়ে গেলেন, অধ্যাপিকা উঠে দাঁড়ালেন যুক্তকরে, ছাত্রীরাও তাই। গ্রন্থাগারিক জানতে চাইলেন অধ্যয়নে কোনো বিঘ্ন হচ্ছে কিনা, প্রয়োজনমত গ্রন্থাদি পাওয়া যাচ্ছে কিনা; সন্তোষজনক উত্তর পেয়ে ফিরে এলেন আমাদের কাছে। বেরিয়ে এলাম ওঘর থেকে; তার পূর্বেই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সূত্র পুনঃ-সংযোজিত হয়েছে, বাইরের এই উপদ্রবের কোনো প্রতিক্রিয়াই নেই সেখানে।

এমনি করে' নানা ঘরে ঘুরে ঢুকলাম প্রধান পুস্তকাগারে। প্রকান্ড ঘরে ঘন-সন্নিবিষ্ট লৌহ পুস্তকাধারের সারি, অসংখ্য থাকে অসংখ্য পুস্তক বৈজ্ঞানিক প্রথায় সাজানো। ছেলের মায়ের মত চেনেন গ্রন্থাগারিক প্রতিটি পুস্তককে; পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন মুখে মুখে, মাঝে-মাঝে দু'একখানি টেনে বের করে' দেখাচ্ছেন স্নেহমিশ্রিত গর্বভরে—ছেলের মায়ের মতই। তন্ময় হয়ে শুনছি অবাক হয়ে দেখছি, এমন সময় এল একটি ছেলে, দাঁড়াল যুক্তকরে নমস্কার করে'। গ্রন্থাগারিক প্রশ্ন করলেন, কি চাই? ছেলেটি অস্ফুটস্বরে যা বলল তাতে বোঝা গেল সে 'সাগা'-সাহিত্য সম্বন্ধে কোনো বই চায়। দ্বিধা না করে গ্রন্থাগারিক বলে গেলেন, অমুক সারির অমুক শেল্‌ফের অমুক থাকে অমুক বইতে এ সম্বন্ধে অনেক জিনিস পাবে।

এখানে বলে রাখি, এ পর্যন্ত যে-সব অধ্যাপক বা অধ্যাপিকা এই জ্ঞানভান্ডারের অধ্যক্ষটিকে স্বতঃস্ফূর্ত ও অকুণ্ঠ সম্মান দেখিয়েছেন তাঁরা সবাই দেশী বা বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-উপাধিধারী, কিন্তু—যতদূর মনে পড়ে—ইনি তখন পর্যন্ত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের জাঁকানো তকমা পান নি। সম্প্রতি বিশ্বভারতী এ'কে সর্বোচ্চ পদবী-সম্মান 'দেশিকোত্তম' উপাধি দিয়ে উপযুক্ত কাজ করেছেন।

(২)

দোতলায় উঠছি। সিঁড়ির ধারে ধারে দেওয়ালের গায়ে অজন্তার অনুসরণে রচিত অপূর্ব প্রাচীর-চিত্রশ্রেণী, এখানকার স্বনামখ্যাত প্রধানশিল্পীর সৃষ্টি।

দোতলার প্রথম ঘরের মেঝেয় বসে তিনজন মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত, গ্রন্থাগারিককে দেখেই যুক্তকরে উঠে দাঁড়ালেন। সংস্কৃত মহাভারতের একটি সর্বভারতীয় সংমিশ্রণ হচ্ছে, তারই পূর্বাঞ্চলীয় পাঠের সংকলনে এ'রা নিযুক্ত। অতি সম্প্রতি বোধহয় এই মহাগ্রন্থই পুণা ভান্ডারকর ইনস্টিট্যুট থেকে প্রকাশিত হয়েছে, রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণের উপস্থিতি ও নান্দী ভাষণের মধ্যে দিয়ে। এ'দের সাহায্য করছে চারিদিকের দেওয়াল জুড়ে সাজানো অগণিত গ্রন্থরাজি। এ'দের কাজের অগ্রগতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করে গ্রন্থাগারিক মহাশয় আমাদের নিয়ে গেলেন মাঝের ঘরে। সেখানে নিচু তক্তাপোষের উপর মাদুরে বসে পরিণত-বয়স্ক পণ্ডিত মহাশয় ঝুঁকে পড়ে নিবিষ্টমনে লিখে যাচ্ছেন। আমাদের উপস্থিতি এখানে একেবারেই হার মানল। গ্রন্থাগারিক অনেক চেষ্টায় তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করলেন এবং সেটা হওয়ামাত্রই তিনিও যোড়করে দণ্ডায়মান হলেন। তাঁর সম্পাদিত বিশ্বকোষের সংকলনে কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা, প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি ঠিকমত পাচ্ছেন কিনা প্রশ্ন করে গ্রন্থাগারিক আমাদের নিয়ে বিদায় নিলেন। পণ্ডিত মহাশয় কালবিলম্ব না করে তলিয়ে গেলেন আপন কাজে।

এর পরে যে ঘরে এলাম তার অধিকারীটি একজন সুদর্শন মুসলমান যুবক। এখনো মনে পড়ে তাঁর স্বপ্নমাখা চোখদুটি, কুঞ্চিত-কেশমণ্ডিত স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত সুকুমার মুখখানি। গ্রন্থাগারিককে অনুরূপ সম্মান দেখিয়ে ইনি তাঁকে জানালেন আপন গবেষণার অগ্রগতির কথা। এ'র নিজস্ব বিভাগ ফারসী

সাহিত্য। পারস্যের প্রাচীন বুলবুলদের কলকাকলি এ'র নবীন মনে যে ঝঙ্কার তুলেছে তার পরিচয় ফুটে উঠেছে তাঁর কথাবার্তায় চালচলনে। ফিরে এসে কিছু-দিন পর কাগজে দেখেছি এই তরুণ বিদ্যার্থীটির গবেষণা অকালে থেমে গিয়েছে, তাঁর ডাক পড়েছে তাঁর প্রিয় কবিদের মজলিশে।

এখানে দেখা হল শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর সঙ্গে। বিশ বছর আগে কলকাতায় তাঁর রাজাবাগান স্ট্রীটের বাড়িতে থাকার সময় সে বাড়ির দেওয়ালে তাঁর আঁকা গণেশ ও শিব-পার্বতীর ছবি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম জেনে খুশি হলেন। তখন তিনি ঊনত্রিশের কোঠায় পা দিয়েছেন; দাদার কাছে আসতেন বাড়ি ভাড়ার টাকার জন্য, আমি সতেরো বছরের কলেজের ছেলে ফাঁকে থেকে চেয়ে দেখতাম 'প্রবাসী'-তে দেখা অপূর্ব ছবিগুলির এই যুবক শিল্পীকে। এখন তিনি পঞ্চাশের কোঠার "কিশোর গুণী"—রবীন্দ্রনাথের কথায়। কিশোরের মতই লাজুক হাসি তাঁর মুখে-চোখে, অত বড় শিল্পীর পক্ষে মানানসই গাম্ভীর্যের ছাপ সেখানে পড়ে নি। এর ত্রিশ বছর পরে তাঁর বার্ধক্য-স্তিমিত চোখের দৃষ্টি কোন্ নব সৌন্দর্যলোকে নবীনতর কৈশোরের আনন্দ নিয়ে জেগে উঠেছে, কে জানে!

এখান থেকে গেলাম পাশের ঘরে। ফরাসে বসে কাজ করছেন পুষ্টদেহ মৌলবী সাহেব, আরবী সাহিত্যের গবেষণায় মগ্ন। শীর্ণকায় পন্ডিত মহাশয়ের মত তেমনি একাগ্রতা, তেমনি সংসার-ভোলা নিবিষ্টতা। গ্রন্থাগারিককে অভিবাদন জানালেন, জানালেন তাঁর আপন বিভাগের সংবাদ। তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে আমরা নেমে এলাম একতলায়।

(৩)

একটা বিচিত্র অনুভূতিতে হৃদয় ভরে উঠেছে। কি একটা পেলাম এখানে যা আর কোথাও পাই নি। সেই অনুভূতি হৃদয়ে বহন করে বিদায় নিলাম গ্রন্থাগারিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছ থেকে। এর পরে তাঁকে পেয়েছিলাম পাবনায় আমাদের পাঠাগারের অর্ধশত বার্ষিক উৎসবে।

এখান থেকে নতুন কলাভবনের দিকে যেতে মনের পটে ফুটে উঠল পনরো বছর আগে দেখা শান্তিনিকেতনের ছবি। সেবার সব দেখিয়েছিলেন চিত্রশিল্পী হরিপদ রায়। তখন কলাভবন ও লাইব্রেরী ('গ্রন্থাগার' নাম বোধহয় তখন হয় নি) একত্র একটি ছোট দোতলা বাড়িতে ছিল। তখন বড় বাড়ির মধ্যে বোধহয় ছিল শুধু অতিথিশালা ('গেস্ট-হাউস') ও রবীন্দ্রনাথের বাসগৃহ। ছেলেরা থাকত খড়ের ছাওয়া লম্বা লম্বা 'ডরসিটরি'-তে, পড়াশোনা হত আম্রকুঞ্জে। ইলেকট্রিসিটি ছিল না, চলাফেরা করতে হত 'পাখী-ডাকা ছায়ায় ঢাকা' পল্লীপথ দিয়ে। তখনকার শান্তিনিকেতনে ছিল প্রথম যুগের 'ব্রহ্মচর্যাশ্রমের' ছাপ। এখন সেখানে কত লোকজন। কত বড় বড় বাড়ি প্রশস্ত রাস্তা বৈদ্যুতিক আলো। সারা বিশ্ব এখন সেখানে 'এক নীড়ে' বাসা বেঁধেছে। তবু আগে-দেখা সেই 'শান্তিনিকেতনের' কথা বার বার মনে পড়তে লাগল।

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

কর্তব্যে কঠোর

আনন্দদের বাড়ির সেই করুণ দৃশ্য আমাকে অভিভূত করেছে দেখে আনন্দ ঠিকই বলেছিল—তখন ভাবপ্রবণতার সময় নয়, মাত্র দু'টি ঘণ্টা সময় আমাদের হাতে। একখানা মোটর গাড়ি এই সময়ের মধ্যে জোগাড় করতেই হবে। ঊর্ধ্বশ্বাসে শেভ্রোলে নিয়ে ছুটলাম গণেশের বাড়ির দিকে। পথে টেলিগ্রাফ্ অফিসের সন্নিকটে অম্বিকাদাদের সঙ্গে দেখা করে সময় পরিবর্তনের কথা জানালাম। অম্বিকাদা শুনেই সমস্যার গুরুত্ব অনুভব করলেন। তিনি একটুও বিচলিত না হয়ে বললেন—"কিছু ভাববার নেই—সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার বিশ্বাস তোমরা কোন একটি মোটর গাড়ি জোগাড় করতে পারবেই। সময় নেই ছুটে যাও—আমরা এখানে নিরাপদে অপেক্ষা করতে পারব।" আনন্দকে তিনি বললেন যে, আমাকে গণেশের বাড়িতে পৌঁছে দিয়েই সে যেন সেখানে ফিরে আসে। আমি ও আনন্দ যত স্পীডে পারি ছুটে চললাম। পথে একস্থান থেকে হিমাংশুকে তুলে নিলাম। চলন্ত শেভ্রোলে বসে হিমাংশু গাড়ি বিভ্রাটের কথা জানতে পারল এবং আক্রমণের সময় যে দু' ঘণ্টার জন্য পেছোনো হয়েছে তা'ও শুনলো। এই সংবাদ জানবার পর হিমাংশুকে বেশ একটু বিচলিত দেখলাম। সে বলল—"এত দিন ধরে কি সুন্দরভাবে কাজ গুছিয়ে নিয়ে এসেছেন আপনারা! এই শেষ-মুহূর্তে গাড়ি বিভ্রাট ও সময় পাল্টানো, আমার কোনটাই ভাল লাগছে না। মনে বড় অস্বস্তিবোধ করছি।"

আগেই বলেছি অনভিজ্ঞতার জন্য অপরিণত রণকুশলীরা হঠাৎ কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। তরুণ যুবক হিমাংশু সাহস ও বিক্রমে কম ছিল না। পুলিশ-লাইন আক্রমণকারী প্রথম পাঁচজনের দলে সে নির্বাচিত হয়েছিল এবং গণেশ ও আমার পাশে থেকে সে সাহসের সঙ্গে অ্যাক্‌শন্‌ করে গেছে। গুলীর মুখে দাঁড়াবার সাহস সবার থাকে না। সেইরূপ সাহসী যাঁরা —হাসতে হাসতে গুলীর মুখে প্রাণ দিতে পারেন তাঁরাও যে বিপদের সময় মাথা স্থির রাখতে পারবেন এবং হঠাৎ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে নৈরাশ্যে ভেঙে পড়বেন না তা' বলা যায় না। বিপ্লবে যাঁরা সাংগঠনিক ও সামরিক নেতৃত্ব দেবেন তাঁদের সাহস ও বিক্রমই যথেষ্ট নয়—যদি সমস্যা দেখা দেয় বীরত্বের সঙ্গে তার সম্মুখীন হওয়ার জন্য সব সময়ে তাঁদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

হিমাংশুর বিচলতা ও সাময়িক হতাশার ভাবকে দূর করবার জন্য আমি বললাম—"আশু, (হিমাংশুর ডাক নাম) দেখ, আমাদের পথ বিপদসঙ্কুল ও কণ্টকাকীর্ণ। Zigzag পথে—আঁকাবাঁকা পথে এগোতে হবে। সব সময় Smooth Sailing (শান্ত সমুদ্রপথ যাত্রা) হবে ভাবাটা মূর্খতা। রণকুশলের প্রধান শিক্ষা—যত কঠিন সমস্যা দেখা দিক না কেন তার সমাধান করা চাই-ই, ঘাবড়ে গেলে চলবে না। এটা অতি সামান্য সমস্যা—দু'ঘণ্টার মধ্যে ট্যাক্সিচালককে বেঁধে রেখে তার গাড়িটি দখল করা, আর এই দু'টি ঘণ্টা অপেক্ষা করবার জন্য সবার কাছে আটটার আগে খবর পাঠিয়ে দেওয়া। আমাদের সংগঠনে এতগুলি সাইকেল আছে, প্রত্যেকে সাইকেল চালাতে জানে, গাড়ি আছে, আমাদের সংগঠনটি অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত নূতন পরিস্থিতি অনুযায়ী খাপ খাইয়ে নিতে পারার শক্তিও রাখে। এই পরীক্ষা আমাদের হয়ে গেছে যখন রামকৃষ্ণ, তারক ও অর্ধেন্দুকে দগ্ধ অবস্থায় পুলিশের ব্যাপক তৎপরতা সত্ত্বেও আমরা নিরাপদে দ্রুত স্থানান্তরিত করে লুকিয়ে রাখতে পেরেছি। তা'ছাড়া যতদূর বুঝতে পারছি আমরা খুব সফলতার সঙ্গে একটিও পুলিশের চরকে আমাদের সংগঠনে প্রবেশ করতে দিই নি। সংগঠনের এইরূপ সার্বিক শক্তির অধিকারী যারা তাদের কি এই সামান্য একটি সমস্যার কাছে হার মানা শোভা পায়?...।"

আমি গাড়ি চালাতে চালাতে খুব জোরের সঙ্গে এই ধরণের কথা বলে চলেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল আশু আক্রমণের পূর্বে আমাদের মধ্যে একজনেরও morale শিথিল হলে চলবে না। তাই হিমাংশুর মনে জোর আনবার অভিপ্রায়ে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর যাতে উন্মেষ হয়, সেই জন্য আমাদের সাংগঠনিক শক্তির একটি জাজ্বল্যমান চিত্র তার চোখের সামনে ধরলাম। আমার কথাগুলি শুনে হিমাংশু নিমেষে বুঝেছিল সুদূরপ্রসারী দৃষ্টির অভাবেই সাময়িকভাবে সে অনিশ্চয়তার আশঙ্কায় প্রভাবিত হয়েছে। সে তার নিজের ত্রুটি বুঝবামাত্রই আমাকে বাধা দিয়ে বলল—

"আমার ভুল হয়েছে। বিপ্লবী সৈনিকের এই মূল গুণটি আমি সাময়িকভাবে হারিয়ে ফেলেছি। কেবল মৃত্যু তুচ্ছ করা সাহসই সব নয়—সমস্যা সমাধানের দৃঢ়তা অপরিহার্য। হ্যাঁ, হ্যাঁ-সবই হবে। একেবারে শেষ সময় সামান্য এই রদবদল হলে ভাবনার কি আছে? আমি আর ভাবছি না। বলুন এখন কি করতে হবে।" আমি খুশি হয়ে বলে উঠি—"এই তো চাই!" আনন্দও আমার সঙ্গে যোগ দিল—"এই না হলে কি আশু!"

এতক্ষণের মধ্যে আমরা গণেশের বাড়ি এসে পৌঁছালাম। আসবার সঙ্গে সঙ্গে গণেশের কাছে জানতে পারি—একটি ট্যাক্সিও পাওয়া যাচ্ছে না, সব ট্যাক্সিই নিখিল বঙ্গ মুসলিম কন্‌ফারেন্সে নিযুক্ত আছে। আনন্দ গাড়িটি নিয়ে তক্ষুণি ফিরে যাবে অম্বিকাদার কাছে। আমি হিমাংশুকে আনন্দর সঙ্গে যেতে বললাম। আনন্দ তাকে লালদীঘির কাছে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে নামিয়ে দিয়ে চলে যাবে। আমি হিমাংশুকে খুব গুরুত্বের সঙ্গে বললাম—

"যে কোন উপায়ে হোক্—যে কোন মূল্যের বিনিময়ে সম্ভব একটি ট্যাক্সি তোমাকে আনতেই হবে। তুমি ট্যাক্সি

নিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে, অন্তত সাড়ে ন'টার পরে নয়, নিশ্চয়ই এখানে (গণেশের বাড়িতে) চলে আসবে। মনে রেখো—Impossible is the word found in the dictionary of "fools!" এইসব proverb বা প্রবাদ বাক্য আমাদের মধ্যে খুব প্রচলিত ছিল। আমাদের মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষার জন্য আমি সকলকেই বলতাম—"দেখ, মাস্টারদা যদি বলেন—বাঘের দুধ চাই, যেখান থেকে পার নিয়ে এসো—তখন তা' আনতেই হবে। কোথায় বাঘ পাব, কোন জঙ্গলে খুঁজব, কি করে বাঘ ধরব, কি করে বাঘের দুধ নিতে হবে—এই সমস্ত বসে বসে মাস্টারদা আমাদের দেখাবেন না। আমাদের initiative নিয়ে বুদ্ধি ও দৃঢ়তার সঙ্গে বাঘ খুঁজে বার করতে হবে—দুধ আনতে হবে!"

আমি বুঝেছিলাম আমার কথার মর্ম হিমাংশু হৃদয়ঙ্গম করেছে। আমার কথা শেষ হতে না হতেই আনন্দ বললো—"ও নিশ্চয় একটি ট্যাক্সি আনবেই আনবে।" তারপর হিমাংশুর উদ্দেশ্যে বললো—"কি রে আশু, পারবি না—নিশ্চয়ই পারবি।" ইতিমধ্যে আমি গাড়ি থেকে নেমে গেলাম। আনন্দ স্টিয়ারিং-এ গিয়ে বসলো। হিমাংশু খুব দৃঢ়তার সঙ্গে আমাদের সবাইকে জানালো—যে কোন উপায়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সে একটি ট্যাক্সি যেখান থেকেই হোক্ না কেন নিয়ে আসবেই। আনন্দ গাড়ি ঘুরিয়ে সবেগে হিমাংশুকে নিয়ে লালদীঘির দিকে অগ্রসর হ'ল।

আমি গাড়ি থেকে নেমেই গণেশের বাড়িতে ঢুকলাম। রাস্তার দিকে মুখ করে চার-পাঁচটি দরজা জুড়ে লম্বা-লম্বিভাবে কাপড়ের দোকানটি। দোকানের এই শো-রুমটির পশ্চিম প্রান্তের দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢোকার একটি দরজা। আটটার পর আজকে স্বভাবতই দোকানের সব দরজা বন্ধ ছিল। মাত্র একটি দরজা ভেজানো। এই দরজা ও বাড়ির ভেতরে ঢোকার প্রবেশ দ্বারের মধ্যে আমাদের একজন সাথী প্রহরায় নিযুক্ত ছিল। গণেশ, বিধু ভট্টাচার্য, হরিপদ মহাজন, সরোজ গুহ এই বাড়িতে সামরিক পোষাক পরে পুলিশ-লাইন আক্রমণ করতে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমার এবং হিমাংশুর তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা। কিন্তু হিমাংশু ট্যাক্সি আনতে গেল, কাজেই আমি একাই বাড়ির ভিতরে গেলাম। আমি ঘরে ঢুকেই তাদের দিকে তাকিয়ে দেখি—ম্লান মুখে ও ক্ষুণ্ণ মনে তারা বসে আছে। আর দেখি বড় একটি খাটের ওপর পাঁচটি ডবল ব্যারেল ব্রীচ্-লোডার বন্দুক (দোনলা বন্দুক) ছড়ানো অবস্থায় পড়ে আছে। বন্দুকগুলির চারপাশে প্রায় দু'শ কার্তুজও ছড়ান আছে। একটু পরেই জানতে পারলাম এই পাঁচটি বন্দুকের একটিও কাজে লাগবে না। কোন একটাতেও কার্তুজ ঢুকছে না। সত্যিই দেখি একটি চেম্বারের মধ্যেও পুরোপুরিভাবে টোটা প্রবেশ করানো সম্ভব হচ্ছে না। কি আশ্চর্য—এ কি করে সম্ভব? ভাল ভাল পাঁচটি দোনলা বন্দুক আমরা একেবারে শেষ সময় এনেছিলাম। মধুসূদন দত্ত তাঁর পিতার বন্দুকটি পাথরঘাটার বাড়ি থেকে অন্যের দৃষ্টির অগোচরে নিয়ে আসে। মধুসূদন জালালাবাদ পাহাড়ে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণ দেয়। সে প্রায় আমাদের বয়সী। ১৯২০ সাল থেকেই সে আমাদের সঙ্গে ছিল। বহুদিন চট্টগ্রামের বাইরে ছিল—খুব সম্ভব রেঙ্গুনে। চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের মাত্র কয়েকমাস পূর্বে সে আসে এবং মাস্টারদার নেতৃত্বে যুব-বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে। এত দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন থেকেও তখনকার দিনে প্রথম শ্রেণীর বিপ্লবীর পর্যায়ে মনে-প্রাণে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা বোধ হয় এক মধুর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। সেই যুগে এত সুদীর্ঘ বছর দলের সংস্রব থেকে অনেক দূরে একা একা থাকবার পরও সক্রিয়ভাবে সশস্ত্র বিদ্রোহে যোগ দিয়ে শহীদের মরণ বরণ করার দৃষ্টান্ত আমাদের অন্তত আর জানা নেই। মধু এক ধনী জমিদারের ছেলে। সম্পদ ও প্রাচুর্যের কোন আকর্ষণই তাকে স্পর্শ করতে পারে নি। সে সাধারণের চাইতে অনেক উর্ধ্বে। মধু বাড়ি থেকে বন্দুক নিয়ে এল তা' কাজে লাগান গেল না।

কৃষ্ণকুমার চৌধুরী তার কাকা, জজ্-কোর্টের উকিল, মণীন্দ্রলাল চৌধুরীর আলমারীতে রাখা বন্দুকটি গোপনে সরিয়ে ফেলেছিল। আলমারী যেমনটি থাকার তাই ছিল। আলমারীর মধ্যে বন্দুকের বাক্স যেমন বন্ধ থাকে তার কোন ব্যতিক্রম ২২শে এপ্রিলের আগে বাড়ির কারও চোখে পড়ে নি। ২৩শে এপ্রিল মণীন্দ্রবাবু তাঁর বন্দুকের অপহরণ সংবাদ কোতওয়ালীতে জানান। কৃষ্ণকুমার চৌধুরীর সন্ধানও তাঁরা পাচ্ছিলেন না। কৃষ্ণকুমার চৌধুরী ১৮ই এপ্রিল যুব-বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে এবং ২২শে এপ্রিল জালালাবাদের যুদ্ধে মিলিটারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার গৌরব অর্জন করেছে। কৃষ্ণকুমার চৌধুরীর আনা বন্দুকটিরও সদ্ব্যবহার আর হ'ল না—গণেশের বাড়িতে পড়ে রইল।

রণধীর দাশগুপ্ত তার বাড়ি থেকে বন্দুক নিয়ে এল। সেটিও কাজে লাগল না, কারণ, টোটা বে-সাইজের—ফিট্ করছিল না। রণধীর যুব-বিদ্রোহের একজন বীর সৈনিক। বয়স তার খুব কম ছিল—মাত্র ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে। পাশের ফল জানতে পারল যখন আমাদের বিরুদ্ধে মামলা চলছে। রণধীর খুব ধনী পরিবারের ছেলে। সংসারের যতরকম চাক্-চিক্য ও আকর্ষণ একজনকে অভিভূত করার জন্য থাকা সম্ভব রণধীরের বাড়িতে তার সবই ছিল, সেই পরিবেশের মধ্যে থেকেও সে বৈপ্লবিক নিষ্ঠায় অচল, অটল ও দৃঢ় ছিল। ১৮ই ও ২২শে এপ্রিলের যুদ্ধের গৌরব তার ললাটে রক্ততিলক এঁকে দিয়েছে। রণধীরের আনা বন্দুকও আমরা কোনমতে কাজে লাগাতে পারলাম না—১২ বোরের টোটা তা'তে ঢোকানই গেল না।

ধীরেন্দ্রলাল দস্তিদার অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। লোকনাথের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত জানাশোনা ও বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। ধীরেন আমাদের সবাইকে খুব পছন্দ করত। তবু আমরা তা'কে কেউ দলে আনবার চেষ্টা করি নি। তাদের ছোট-খাটো একটা জমিদারী ছিল। তার বন্দুক নিয়ে লোকনাথরা প্রায়ই শিকারে যেত। ১৮ই এপ্রিল তার বাড়ির দু'টি তরবারি, stick-gun একটি ও একটি বন্দুক সে লোকনাথ ও গণেশকে ব্যবহার করতে দেয়। সে জানত না কেন আমরা সেই অস্ত্রগুলি তার কাছ থেকে চেয়ে নিলাম। সরল মনে বিশ্বাস করে সে সেইগুলি দিয়েছিল—ভেবেছিল আমরা হয়ত শিকারে যাব। তার stick-gunটি ও তরবারি দুটি কাজে লাগল, কিন্তু বন্দুকটি গণেশের বাড়িতে পড়ে রইল। ধীরেন দস্তিদারকে পুলিশ গ্রেফ্তার করে এবং সে বেচারা হাসিমুখে আমাদের সঙ্গে দু' বছর—মামলা চলার কালে, জেল-হাজতে ছিল। তারপর যদিও মামলার রায়েতে সে মুক্তি পেল তবু বহু বছর বিনা বিচারে ডেটিনিউ হয়ে জেল ভোগ করেছে। এক মুহূর্তের জন্যও তাকে আমাদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে দেখি নি। মুক্তি পাওয়ার পর সে রেঙ্গুনে ছিল। সেখানে সে শিখ ধর্ম গ্রহণ করে—তার নাম বর্তমানে রঞ্জিৎ সিং। এখনও সে আমাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করে এবং সবসময় বন্ধুত্ব বজায় রাখতে চেষ্টা করে।

মাখন ঘোষাল তার বাড়ি থেকে যে বন্দুকটি নিয়ে আসে সেটিও এখানে পড়ে রইল।

একে তো আমাদের অস্ত্রের স্বল্পতা—সবার হাতে আগ্নেয়াস্ত্র দিতে পারি নি। তার মধ্যে বহু কষ্টে নিজেদের বাড়ি থেকে সংগ্রহ করা পাঁচ পাঁচটি বন্দুক টোটা ফিট্ করছে না বলে পড়ে রইল—এ যেন অত্যন্ত মর্মান্তিক—একেবারে অসহ্য

কি করে বে-সাইজের টোটা বা বে-সাইজের বন্দুকের চেম্বার বা বোরওয়ালা বন্দুক আমাদের হাতে এসে জুটল? আমরা সব বন্দুকগুলিই আগে গোপনে এনে পরীক্ষা করে দেখি নি বা পরীক্ষার কথা ভাবিও নি, সেইগুলি কত বোরের বন্দুক। তা'ছাড়া পূর্বে সব বন্দুকগুলির ব্যবহারও হয় নি। কোনটার হয়ত ব্যবহার করার সুযোগ ছিল; তবু নিজ নিজ বাড়িতে বন্দুক নিয়ে কোন প্রশ্ন উঠুক তা' আমরা আমাদের ভবিষ্যতের প্ল্যান অনুযায়ী চাই নি—পাছে অভিভাবকেরা বন্দুক আরও নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে ফেলেন বা সুরক্ষিত করে রাখেন সেই জন্য সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তাঁদের বন্দুক আমরা ব্যবহার করি নি।

কার্তুজ ফিট্ না করার বিভ্রাটের কারণ বোধহয় বন্দুকগুলির বোর ·১২ না হয়ে ·১৬ ছিল। বন্দুকের ছিদ্রের মাপ ·১৬ ও ·১২-র মধ্যে দেখতে খুব একটা প্রভেদ মনে হয় না। আমাদের সবগুলি কার্তুজই ·১২ বোরের কেনা ছিল। টোটা ফিট্ না হওয়ার আরও একটি কারণ হতে পারে—কার্তুজগুলি অপেক্ষাকৃত লম্বা ছিল, লম্বা চেম্বারে ফিট্ করার জন্য। হয়ত এই ক'টি বন্দুকের চেম্বারের length অপেক্ষাকৃত কম ছিল। যা হোক বা যে কোন কারণেই হোক না কেন যখন আমাদের উপস্থিত সংগৃহীত টোটা এই পাঁচটা বন্দুকের কোনটাতেই খাপ খাচ্ছে না তখন নিরুপায় হয়ে ভাগ্যকে দোষারোপ করে নিশ্চেষ্ট হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

এই পাঁচটি বন্দুকের অভাবে আমাদের সামগ্রিক প্ল্যানের একবিন্দুও বিচ্যুতি ঘটে নি। আক্রমণ করে ঘাঁটিগুলি দখল করে নেওয়ার জন্য যে দলগুলিকে প্রস্তুত ক'রা হয় তাদের সবার জন্য আমাদের হাতে নিশ্চিতভাবে যা মজুদ করা অস্ত্র ছিল তাই সংরক্ষিত করে রাখা হ'ল। কা'দের বাড়িতে বন্দুক আছে এবং তাদের মধ্যে কে কে সবার দৃষ্টির অগোচরে বন্দুক নিয়ে আসতে পারবে তার প্ল্যান করেছিলাম বটে, তবু সব ক'টি বন্দুকই আমাদের সর্ত অনুযায়ী গৃহস্বামী ও অন্যান্যদের সম্পূর্ণ অগোচরে আমাদের কাছে এসে পৌঁছবেই সেইরূপ ধারণা করি নি—ব্যতিক্রম ঘটবেই তা' ভেবে রেখেছিলাম। মোটামুটি ১৪।১৫টি নিজেদের বাড়ির বন্দুকের হিসেব করেছিলাম—তার মধ্যে যে ক'টি আমাদের পাওয়া সম্ভব সেইগুলি in order of merit (উপযুক্ততা অনুযায়ী) যুবক-সৈনিকের হাতে দেওয়া হবে তাই স্থির করা ছিল। কাজেই ব্রীচ্‌লোডার বন্দুক পাঁচটি বেশি বা কম পাওয়া গেল তার ওপর প্রথম আক্রমণ করে শত্রুঘাঁটি অধিকার করা নির্ভর করছিল না। আগেই বলেছি ১৮ই এপ্রিল মুক্তিযুদ্ধের সৈনিক, যাঁরা যুব-বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেন, তাঁদের অধিকাংশকেই আক্রমণের প্রথম অবস্থায় আমরা আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ করতে পারি নি। তাদের হাতে তুলে দিয়েছিলাম মাত্র লোহার রড্, বড় বড় ছোরা, গুর্খাদের ভোজালি বা তরবারি। মরণ-পাগল মুক্তি-যুদ্ধের যুবক-সৈনিকেরা তাতেই খুশি। তাই পাঁচটি ব্রীচ্‌লোডার বন্দুক না থাকাতে আক্রমণ চালাবার প্ল্যানের কোনই ব্যাঘাত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। তবু এই অবস্থা আমাদের অসহ্য মনে হচ্ছিল—পাঁচটি বেশি আগ্নেয়াস্ত্র তো আমরা যুবক সৈনিকদের হাতে দিতে পারতাম—পেয়েও যে তা' ব্যবহার করতে পারলাম না!

সমস্ত বাধাবিঘ্ন চুরমার করে বিপদ-সাগরকে মথিত তাড়িত উদ্‌বেলিত করে পাড়ি দিতে যারা বদ্ধপরিকর, তাদের মনে বাড়ির করুণ দৃশ্য, মা-বোনের চোখের জল, অসহ্য মর্মান্তিক অক্ষমতার দীর্ঘশ্বাস কোনটাই বেশিক্ষণের জন্য স্থান পায় নি। প্রধানতম সমস্যা সম্বন্ধে গণেশের সঙ্গে আমার খুব সংক্ষিপ্ত আলোচনা হ'ল। আমাদের সংবাদ বিনিময়ের মাধ্যমে জানবার প্রয়োজন ছিল, সুনিশ্চিতভাবে দু' ঘণ্টা অপেক্ষা করার জন্য সমস্ত দলকে সময় থাকতে সংবাদ পাঠানো সম্ভব হয়েছে কি না। আগেই বলেছি প্রধান চারটি গ্রুপকে—টেলিফোন ভবন, এ, এফ, আই; অস্ত্রাগার, পুলিশ-লাইন ও ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণকারী দলগুলিকে দশ মিনিটের মধ্যেই আক্রমণের সময় পরিবর্তনের সংবাদ জানানো হয়েছে। কেবল এই চারটি দলকে দু' ঘণ্টা আক্রমণ স্থগিত রাখতে সংবাদ দেওয়াটা খুব একটা মুস্কিল ছিল না। খবর পাঠাবার অসুবিধা ছিল পুলিশ-লাইনের চারপাশ ঘিরে যে পাঁচ-ছ'টি গ্রুপ একে অন্যের অগোচরে বিভিন্ন পথে অগ্রসর হয়ে মিনিট দশ আগে স্থান গ্রহণ করবে তাদের। যে তিনটি গ্রুপ শহরের তিনটি নির্জন স্থানে রাত ৮-৫ মিনিটের সময় টেলিগ্রাফ তার ছিন্ন করার জন্য অনেক আগে যন্ত্রপাতি নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে তাদের কাছে দ্রুত খবর পাঠান খুব দুরূহ ব্যাপার ছিল। আর সব চাইতে বেশি ভাবনার বিষয় ছিল—কি উপায়ে সময় থাকতে থাকতে খবর পাঠিয়ে দু'টি ঘণ্টার জন্য প্রচারপত্র বিলি বন্ধ করা যায়। যদি প্রচারপত্র বিলি করা বন্ধ করতে না পারি এবং আগেই বিলি করা হয়ে যায় তবে আমাদের যুব-বিদ্রোহের সামগ্রিক ও ব্যাপক আয়োজন সম্বন্ধে শত্রুপক্ষ পূর্বেই ওয়াকিবহাল হয়ে পড়বে। সশস্ত্র সংঘাতের মত টেলিগ্রাফের তার কাটা, পুলিশ-লাইনের চারপাশে গোপনে অপেক্ষা করা ও প্রচারপত্র বিলি করার মধ্যে লোমহর্ষক, চাঞ্চল্যকর ও আড়ম্বরপূর্ণ বাহ্য দৃশ্য কিছুই নেই। তবে এইসব প্রত্যেকটি অংশের গুরুত্ব অনেক বেশি। সামগ্রিক প্ল্যানের জয় পরাজয় এইসব প্রত্যেকটি অংশের ওপর নির্ভর করছিল। এইসবের মধ্যে বিশেষ করে দু'টি ঘণ্টার জন্য প্রচারপত্রের বিলি বন্ধ করা অপরিহার্য বলে মনে করি। পুলিশ-লাইনের চারপাশে যদি ছ'টি দল দু' ঘণ্টা আগে থেকে অপেক্ষাও করে অথবা কোন কোন নির্জন স্থানে টেলিগ্রাফ্ তার ছিন্ন করাও হয়, তাতেও শত্রুপক্ষের আগে থেকে ব্যাপক আয়োজনের বিষয় জানা সম্ভব নয়। কিন্তু যদি একটি প্রচারপত্রও পুলিশের হাতে কোনমতে পড়ে তাতে আমাদের বিপদে পড়বার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। এই কারণে মাস্টারদা প্রচারপত্র বিলি দু' ঘণ্টার জন্য স্থগিত রাখার নির্দেশ পাঠান দু'জন খুব দায়িত্বশীল যুবক-সৈনিকের মারফৎ কালীকিঙ্কর দে ও ননী দেব—এই দু'জনকে মাস্টারদা অবস্থার বিশেষ গুরুত্ব বুঝিয়ে সাইকেল করে বিভিন্ন দলের কাছে খবর পাঠান। কালী ও ননী বুঝেছিল যদি প্রচারপত্র বিলি করা বিকল্প ব্যবস্থা অনুযায়ী বন্ধ করা না হয়, তবে আমাদের সমূহ বিপদ। বলা বাহুল্য তারা সফলতার সঙ্গে প্রচারপত্র বিলি করার দলগুলিকে মাস্টারদার নির্দেশ সময়মত পৌঁছে দিতে পেরেছিল। গণেশ ও আমি আলোচনা করে বুঝি যে খবর পাঠানো হয়েছে এবং সব দলগুলিই সময়মত খবর পেয়েছে।

হিমাংশু ট্যাক্সি আনতে গেছে প্রায় আধ ঘণ্টা হয়েছে। সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি কতক্ষণে ট্যাক্সি নিয়ে হিমাংশু ফিরে আসবে। প্রত্যেকটি মিনিট উৎকণ্ঠায় কাটছিল। সবার মধ্যেই অস্বস্তি—সবার মধ্যেই একপ্রকার অস্থিরতা—কতক্ষণে আসবে হিমাংশু? ট্যাক্সি পাবে তো? যদি ট্যাক্সি না পায়, ইত্যাদি স্বাভাবিক প্রশ্নগুলি উদ্বিগ্ন করে তুলেছে আমাদের। এমন সময় একটি অবাঞ্ছনীয় ঘটনা ঘটে গেল। কোথায় একটি ট্যাক্সি আসবে তা' না, এল কিনা এমন একজন যার উপস্থিতি আমরা তখন কেউ প্রত্যাশা করি নি। দরজায় পাহারায় নিযুক্ত ছিল হরিপদ মহাজন। অথচ বিনা অনুমতিতে, বিনা বাধায়, স্বদেশ রায় সটান ঘরের মধ্যে এসে ঢোকে কি করে? স্বদেশ আমাদের গুপ্ত সমিতির সভ্য নয়। তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল দেবপ্রসাদ গুপ্তের। কয়েকমাস আগে নরেশ আমাকে স্বদেশের সঙ্গে মিশে তাকে পরীক্ষা করে দেখতে বলেছিল। আমি সম্মত হই নি। অভ্যুত্থানের

ছয় মাস পূর্বে নতুন সভ্য সংগ্রহ আমরা নীতিগতভাবে বন্ধ করে দিয়েছি। তাই নরেশ স্বদেশ সম্বন্ধে উচ্চধারণা পোষণ করা সত্ত্বেও আমি তাকে পরীক্ষা করে দেখে সভ্য-পদ দেওয়ার অনুরোধ রাখতে পারি নি। নরেশকে বলেছিলাম সে নিজের দায়িত্বে স্বদেশকে দলে গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু নরেশ দায়িত্ব নিতে সাহস করে নি। স্বদেশকে দলে নেওয়া হ'ল না। আমি স্বদেশকে খুব চিনতাম—রোজই সে গণেশের বাড়িতে দেবু ও নরেশের সঙ্গে আসত। অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে স্বদেশের জানাশোনা ছিল। যদিও এই সময় তার হঠাৎ আবির্ভাব আমাদের কাছে ভাল লাগে নি—আর একেবারে ঘরের ভেতরে হাজির হয়েছে দেখে আমরা হতভম্ব হয়ে যাই। অবশ্য স্বদেশের এতে কোন দোষ ছিল না। সে গণেশের বাড়ি এইভাবে প্রায়ই এসেছে—বাড়ির অন্দরমহলেও সে যেত। গণেশ ছাড়া সেইসময় এই বাড়িতে আর কেউ থাকতো না। রোজের মত স্বদেশ আজও এসেছে—দরজা খোলা পেয়েছে—কেউ তাকে নিষেধও করে নি। তার দোষ কি? সে কি করে জানবে যে, আমরা আজ এই বিশেষ সময়ে তার উপস্থিতি অবাঞ্ছনীয় বলে মনে করছিলাম! স্বদেশ কোনমতে ঘরের মধ্যে প্রবেশের সুযোগই পেত না যদি হরিপদ মহাজন তার পোস্ট ছেড়ে এক মুহূর্তের জন্যও অন্যত্র না যেত। খুব সামান্য একটু ত্রুটি! খুব অল্পক্ষণের জন্য হরিপদ জল খেতে ভেতরে যায়! এরই মধ্যে এই অবাঞ্ছনীয় ঘটনা! সামান্য ত্রুটির জন্যও যে কী বিভ্রাট ঘটে যেতে পারে তা অনুধাবন করা প্রয়োজন। সামান্য ত্রুটির বিরুদ্ধে সংগঠনে আমরা রীতিমত অভিযান চালিয়েছি তবু ত্রুটির পর ত্রুটি আমাদের হয়েছে। কাজেই "ত্রুটিহীন হওয়া যায় না"—এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে, সংগঠনে ত্রুটি-বিচ্যুতি হবে ধরে নিয়ে হাল ছেড়ে দেওয়ার মনোবৃত্তি ষড়যন্ত্রমূলক সংগঠনের পরিপন্থী। আমাদের শিক্ষণীয় বস্তু—ত্রুটিহীন হতে হলে আরও কত সজাগ, কত তৎপর, কত নিষ্ঠা, কত একাগ্রতার প্রয়োজন তা' কেবল জানলেই চলবে না—হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি উপলব্ধির অভাব থাকলে চলবে না—আঘাত আসবে, ত্রুটি হবে, তাই বলে ঘাবড়ে যাওয়া মারাত্মক ভুল।

স্বদেশ ঘরের মধ্যে ঢুকে যা দেখল তাতে সে একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়েছে। আমাদের সকলের সৈনিকের পোষাক, প্রত্যেকের কোমরে রিভলবার বা পিস্তল ঝুলছে। খাটের ওপর পাঁচটি দোনলা বন্দুক ও কার্তুজ খোলা পড়ে আছে। নিমেষের মধ্যে অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে স্বদেশের দেরি হয় নি। আমরা যে তার উপস্থিতিতে একেবারে সন্তুষ্ট হই নি সে তা' উপলব্ধি করে নিজে খুব বিব্রত বোধ করছিল। সে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সকলের চোখ-মুখ বিরক্তিতে ভরে উঠল; গণেশ ও আমি পরস্পরের চোখের দিকে তাকালাম, রোষ-কষায়িত দৃষ্টিতে হরিপদর দিকে তাকিয়ে তাকে চোখে শত তিরস্কার করছিলাম। হরিপদ অপরাধীর মত নতশিরে দাঁড়িয়েছিল। কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। আমাদের কারও মুখে কোন কথা ছিল না—সবাই নির্বাক। ঘরটি একেবারে নিস্তব্ধ। স্বদেশ যেন আর দাঁড়াতে পারছিল না। সে অবাঞ্ছিত, সে অবহেলিত—বন্ধুদের দ্বারা আজ সে পরিত্যক্ত! ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে যেন যে ভেঙে পড়ছিল।

কিন্তু কিছুমাত্র করুণা তার প্রতি আমার হ'ল না। কর্তব্যে কঠোর ও আপোষহীন মনোভাব আমাদের। এখনই এর একটা বিহিত করা চাই—কে জানে স্বদেশ কে? সে যদি পুলিশের চর হয়? আমাদের ব্যবহার, আমাদের ভাবভঙ্গি যে স্বদেশকে নিদারুণভাবে অবজ্ঞা করছিল অপমান করছিল তা' না বোঝার মত কিছু ছিল না। স্বদেশ ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মুখ খুলল—"আমি এসে কি অন্যায় করলাম?" কেউ উত্তর দিল না। স্বদেশ আর একবার বলবার চেষ্টা করল—"আমি কি অন্যায় করেছি?" এই প্রশ্নেরও জবাব স্বদেশ পেল না। আমি দাঁতে দাঁত চেপে খুব চাপা কণ্ঠে গণেশকে ডাকলাম—"শোন, এদিকে এস।" আমরা দুজন ভিতরের বারান্দার একটি কোণে অন্ধকারে সবার দৃষ্টির বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। গণেশের মুখে কোন কথা ছিল না। সে আমার মনোভাব বুঝতে পারছিল। আমিও বুঝছিলাম সে এইরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে প্রস্তুত ছিল না। যদি স্বদেশ বন্ধুবেশী কোন পুলিশের চর হয় তবে সিদ্ধান্ত নেওয়া খুব সহজ। আর যদি তা' না হয়! প্রশ্ন ছিল অনেক। পুলিশের চর হোক্ আর না হোক্ তবু সে তো দলের সভ্য নয়। এতবড় যুব-বিদ্রোহের দায়িত্ব পালন করতে চলেছি। শেষ মুহূর্তে ঘাটে এসে নৌকো ডুববে না তো? আর যেন ভাবতে পারছিলাম না। গণেশকে চাপাকণ্ঠে এই ক'টি কথা বললাম—"না, ওকে যেতে দেওয়া উচিত নয়। বেঁধে রাখি।" গণেশ নির্বাক হয়ে রইল—'না' বলা খুব কঠিন। আমিও বা তার মতের অপেক্ষায় ছিলাম কেন? যদি আমি স্বদেশকে বেঁধে রাখতাম তবে কি গণেশ আমাকে নিষেধ করত? হয়ত ব্যাপারটা খুব দুঃখের হোত—হয়ত খুব অবাঞ্ছনীয় মনে করত সবাই তবু স্বদেশকে বেঁধে রাখার সিদ্ধান্ত যদি নিয়ে ফেলতাম তবে খুব শোচনীয় হলেও কেউ বাধা দিত বলে আমার মনে হয় না।

আমি আর একবার গণেশকে বলি—"দেরি করা ঠিক হবে না। বেঁধে রাখি।" দলের সভ্য নাই বা হ'ল স্বদেশ যে আমাদের একজন বন্ধু—আমাদের sympathiser. সভ্য না হলেও সমর্থক তো বটে! আজ সকালেও হয়ত তার সঙ্গে কত হাসি ঠাট্টা গল্পগুজব হয়েছে। এই কঠোর ব্যবস্থা গণেশের পক্ষে অনুমোদন করা খুব কঠিন ছিল। আর আমার পক্ষেও তা' খুব সহজ ছিল না। আগে অনেক ঘটনার মধ্যে বলেছি মাস্টারদার নেতৃত্বে আমরা তখনকার দিনেও অনেকটা Rational ছিলাম। তাই বার বার প্রশ্ন জাগছিল—যদি সে পুলিশের চর না হয়! স্বদেশ আমাদের ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করে শেষ পর্যন্ত বলল—"আমি ভুল করেছি। আচ্ছা, আমি আসি!" এক পা এক পা করে সে হাঁটতে লাগল। বেঁধে রাখবার প্রস্তাবই মাত্র আমি করেছি। গণেশ অনুমোদন করছিল না। একটি কথাও বলে নি। স্বদেশ চলে যাচ্ছে—যা করবার এখনই তা' করতে হবে। বিদ্যুতের মত আমার চিন্তাধারা বয়ে চলেছিল—স্বদেশ যদি বন্ধুবেশী পুলিশের চর হয় তবে সোজা গিয়ে কোতওয়ালীতে খবর দিতে পারে না; নিজের শঠতাকে গোপন রেখে তার গোপনে জানাতে হবে তেমন কোন আই, বি, পুলিশকে যার সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে; তা'তে সময় লাগবে; তারপর সেই পুলিশ অফিসার খবর দেবে পুলিশ কর্তাকে; পুলিশ কর্তা সব তথ্য জেনে নিয়ে কোতওয়ালী বা পুলিশ-লাইনে খবর দিয়ে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী নিয়ে তবে আসবে আমাদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে; সময় খুব কমপক্ষেও দু'তিন ঘন্টা লাগবে; এর অনেক আগেই আমরা আক্রমণ সুরু করব। তখন ৯-১৫ মিনিট বেজে গেছে। আর প'য়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে আমাদের আক্রমণ সুরু হবে। মনে মনে হিসেব করে বুঝলাম স্বদেশ যদি পুলিশের চরও হয় তবু তার কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে পুলিশ আসবার অনেক আগেই আমাদের অ্যাকশন আরম্ভ হবে। এই কথাগুলি লিখতে বা পড়তে যতক্ষণ লাগছে, ভাবতে তার চেয়ে অনেক কম সময় লেগেছে। চিন্তার গতিকে কোন দ্রুততম রকেটও পরাস্ত করতে পারে না। এক মুহূর্তেই আমি লণ্ডন, নিউইয়র্ক, মস্কো, পিকিং, চাঁদ, সূর্য, নক্ষত্র সব ভেবে নিতে পারি। এক নিমেষে আমার মনে ঐ সব চিন্তা হয়েছে এবং আমি ভাবতে ভাবতেই গভীর বেদনা ও অপমান নিয়ে স্বদেশ ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে চলে গেল। (ক্রমশঃ)

বিদেশ বিচিত্রা

পরিচয় মিত্র

খ্রীস্টমাস-মাতাল জর্মানীর ট্রুস-ট্রুসে-আঙুর চাষীরা এ বছর জর্মান খ্রীস্টমাসকে দ্রাক্ষারসে প্লাবিত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। আঙুরে ক্ষেত ছেয়ে গেছে। ঝুড়ি ঝুড়ি টাটকা আঙুর উঠেছে চাষী পরিবারের পরিশ্রম সার্থক করে। গত বছরের চেয়ে ফলন ভালো। এ'রা তাই আনন্দে উচ্ছ্বসিত। বরফ-শীতল দ্রাক্ষা মদের প্রাচুর্যও খ্রীস্টমাসকে অভিনন্দন জানাবার পক্ষে এক সার্থক উপহার। গোটা অক্টোবর এবং নভেম্বরের প্রথম পাদে আইস-ওয়াইনের তদারকির শুরু। কিছু আঙুর থোকায় থোকায় শাখা পল্লবে স্বচ্ছন্দে ঝুলতে পারে। উৎফুল্ল কৃষক রমণী এগুলি বৃন্তচ্যুত করেন না। শীতের হিমেল স্পর্শে আঙুর থোকা যখন বরফ থোকায় পরিণত হয়, তখন সেই শীতল রসস্থ আঙুর দোহন করে সুস্বাদু আইস-ওয়াইন নিষ্কাশন করে নেন কুশলী।

এও যেন খ্রীস্টমাস কল্পতরু দাদু সেণ্ট নিকোলাসের আর এক উপহার। স্বাদু পানীয় এখানে মদ্যপের বিলাস নয়, তরল শীতল দ্রাক্ষারস যেন দ্বিতীয় জীবনধারা। খ্রীস্টমাস, সেণ্ট নিকোলাসের আশীর্বাদী উপহারের, যীশু জন্মোৎসবের, প্রাণ-উদ্দাম মাতামাতির, বসুধৈব কুটুম্বকম বানাবার শেষ বাৎসরিক উৎসব। এ উৎসব নয়া বছরের, নব উদ্দীপনার উপক্রমণিকা যেন। অবাধ ফুর্তি, অফুরন্ত উচ্ছ্বাস প্রত্যেক জর্মান পরিবারকে নববর্ষ আবাহনে প্রস্তুত করে তুলবে। উপহারের ছড়াছড়ি, আনন্দ আদান-প্রদানের কাড়াকাড়ি সর্বত্র।

যে পাঠকবর্গের সঙ্গে এই জর্মানীর পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, তাঁরা আজ, পাল-পার্বণ, মেলা উৎসবকে কেমন এক যান্ত্রিকতায় যেন ক্রমশ ত্যাগ করতেই উন্মুখ হয়ে উঠছেন। এমন অনেককে দেখেছি, 'মেলায় যাব' একথা শুনলে উন্নাসিক চোখ তুলে তাকান। পাল-পার্বণের উৎসবের মেলামেশার অঙ্গকে ছাঁটাই করে নির্বুদ্ধিতা পরিত্যাগের অহমিকা বোধ করেন। বাংলা দেশে বিজয়া-উৎসবের দেখাশুনা মেলামেশা আলিঙ্গন সম্ভাষণও ক্রমে থিতিয়ে আসছে। অর্থাৎ এই সবকিছুই বড় বেশি দিশী আর মেটে ঠেকছে যেন এক শ্রেণীর চোখে। পুজোয় চাই নতুন জামা। সেই সোঁদ বছরের আকাঙ্ক্ষাও ম্যাড়মেড়ে হয়ে এসেছে, আসছে। যাঁদের ক্ষমতা আছে (সামান্য প্রাপ্তবয়স্কের ছাপ পড়লেই) তাঁরা নতুন পোষাক পরতে লজ্জা পান। দোকান বাজারে ভিড় অবশ্য থাকেই। বাণিজ্যও হয় প্রচুর। কিন্তু নতুন পোষাকে দেহ ঝলমলে করে জনস্রোতে নেমে আসতে লজ্জা পান এমন এক শ্রেণীর মানব-মানবীও তৈরি হয়ে উঠেছেন।

সমাজের আর্থিক অবস্থা বাধ সাধছে অবশ্য উৎসবে মাততে। কিন্তু যে শ্রেণী আলোচ্য, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা যে আর্থিক কারণেই উৎসবের প্রথাবদ্ধ উচ্ছ্বাসে অপারগ তা নয়। দিশী উৎসবে দিশী মতে গা এলিয়ে দিতে এ'দের বিচলিত বোধ করতে দেখেছি। অথচ খ্রীস্টমাস ইভ এদেশেরই শহুরে মানুষকে শহরের

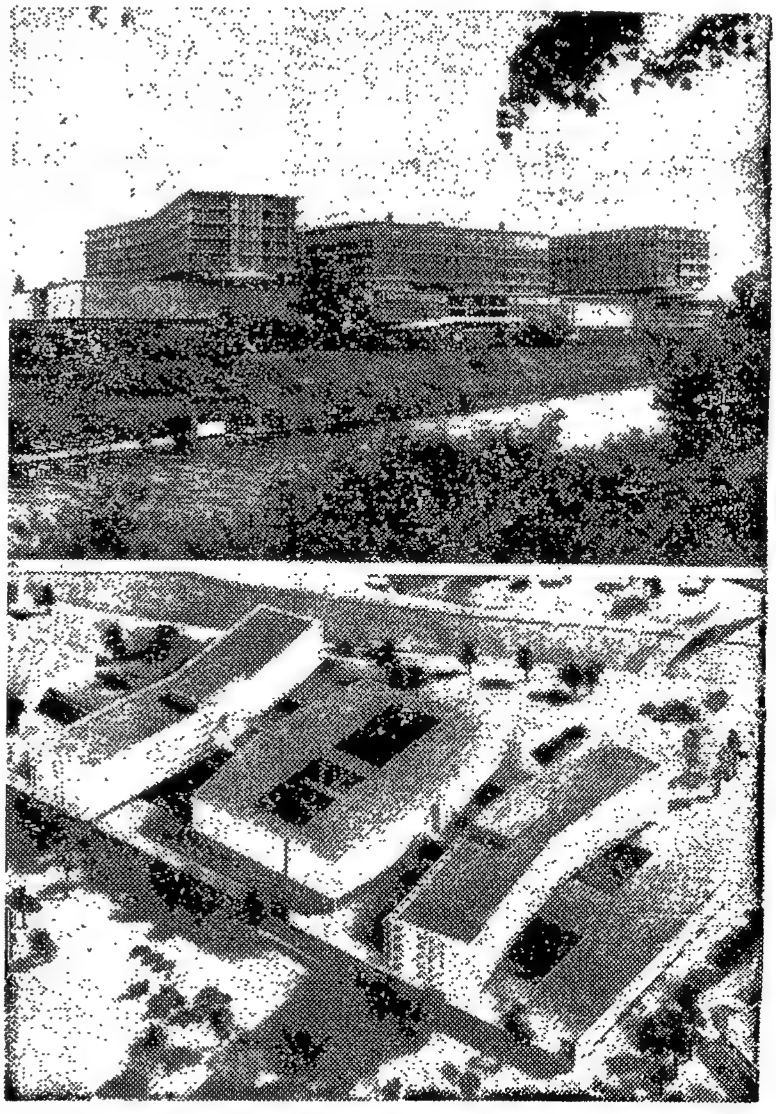

জর্মানীর মনোরম আরোগ্যনিকেতন

ফ্যাশন নিয়ে বিলাসব্যসনের অঢেল আয়োজন পশ্চিমী দেশে

প্রাণকেন্দ্রে এনে জড় করছে। অবাক লাগে, একটা তেত্রিশ কোটি উৎসবের দেশ নিজের উৎসবকে তাচ্ছিল্য করে কেমনভাবে বিদেশী প্রথায় কাগজের টুপী পরে ঘরে বেলুন তারা ঝুলিয়ে আটকাঠ বন্ধ স্যুট নেকটাই চাপিয়ে কেকের বুকে ছুরি বসিয়ে নিখুঁতভাবে খৃস্টমাস পালন করেন! অথচ নিজের নিজের উৎসবে কেবলই ভেজাল আমদানি হচ্ছে। এই স্বেচ্ছাকৃত দেউলিয়াপনায় এদেশ সম্পর্কে বিদেশী-মনে কী প্রতিক্রিয়া হয় একথা হয়ত কেউ একবার ভেবেও দেখেন না।

জর্মানীর প্রত্যেক পরিবারে শিশুবৃদ্ধ নির্বিশেষে খৃস্টমাস উৎসবে ঝাঁপিয়ে পড়েন। পিপে পিপে মদ উড়ে যায়; উপহার সামগ্রীর স্তূপ জমে ওঠে গৃহকোণে, নাচে গানে, প্রাণস্পন্দনে টাটকা হয়ে ওঠে প্রতিটি মন। আর এক বছরের সঞ্চয় নিয়ে নববর্ষের নয়া উদ্যম। সেণ্ট নিকোলাস সেই উদ্যমের উৎসাহেরই প্রতীক। উপহার আনেন একটি তাজা বছর। সামনে সুবিস্তৃত কর্মোদ্যম।

শুধু "ড্রোজেলগাসে"ই জর্মানী নয়। যদিও জর্মনরা এই "ড্রোজেলগাসে"কে পৃথিবীর সবচেয়ে আনন্দদায়ক গলি বলে গর্ব করতে পারেন। কেন না রাইন নদীর তীরে রাইডেশ্যাম শহরের বুকে "ড্রোজেল-গ্যাসে" গলিটির দৈর্ঘ্য ছয় শত ফুট এবং রাইনল্যাণ্ডের সেরা মদের সারিবন্ধ সরাইখানা প্রতি বছর দুনিয়ার বিভিন্ন প্রদেশ থেকে তিরিশ লক্ষ সোমরস-সেবীকে রাইডেশ্যামে আকর্ষণ করে আনে। যদিও, আগেই বলেছি, এই শীতপ্রধান দেশে মদ্যের একটা প্রয়োজনীয় আবশ্যিক দিক আছে। কিন্তু মদ শুনলেই আমাদের পাঠক যাকে 'বয়ে যাওয়া' ভাবছেন, মদ এসব দেশে সেই স্ফূর্তির অঙ্গ মাত্র নয়। নতুন জীবনীশক্তি সংগ্রহের উৎস বরং।

বস্তুত একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে য়ুরোপের এই সেরা রাঙা মানুষের দেশ কর্মশক্তিতে যেমনি প্রচণ্ড, বুদ্ধিমত্তায় তেমনি তীক্ষ্ণ। বিজ্ঞানকে ইচ্ছার রজ্জুতে বেঁধেছে জর্মানী। মারণাস্ত্রের সঙ্গে সঞ্জীবনীও সমান তালেই তৈরি করেছে। রোগ নিরাময়ের জন্য বিভিন্ন গবেষণায় প্রস্তুত অনেক সেরা ওষুধের উপহার ঐ জর্মানীই সাজিয়ে ধরেছে।

মাত্র কয়েক বছরের চেষ্টা।

জর্মানীর বার্লিন শহর দু-ভাগ হয়ে গেলে পূর্ব বার্লিনের দখলে হাসপাতাল চলে গেল। মার্কিন মুদ্রার সহায়তায় পশ্চিম বার্লিন তখন একটি সর্বাধুনিক ধাঁচের হাসপাতাল গড়ে তুলল। দেখতে শুনতে সুন্দর। একই ছাদের তলায় চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা। স্বাস্থ্যকর পরিচ্ছন্ন আরোগ্য নিকেতন দেখে রোগ আপনি পালায়।

রোগের অবস্থান নিরূপণের সব থেকে বড় উপায়ই তো জর্মানীর দান ঃ এক্স-রে। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর জর্মান বৈজ্ঞানিক নোবেল পুরস্কার বিজয়ী উইলহেলম কনরাড রঞ্জন এই অভিনব রশ্মির সন্ধান পান। বিশ্ববিজ্ঞানে রঞ্জন-রশ্মি যুগান্তর এনেছিল।

জর্মানী কায়মনোবাক্যে যা চেয়েছে, তা হ'ল স্পীড। জীবনের সর্বস্তরে প্রচণ্ড গতির দুর্ধর্ষ বেগ চাই। পেছনকে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার গতি চাই। এই গতির দাবিতেই একদিন রুডলফ ডিজেল তেমন এক এঞ্জিন আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন যা একাধারে দ্রুতগামিতায় এবং ব্যয় হ্রাসে সাহায্য করবে। এক্স-রে সন্ধানের এক বছর দশ মাস আগে জর্মানী বিশ্বজগৎকে উপহার দিয়েছিল ডিজেল এঞ্জিন। সম্প্রতি জর্মানী এক চাঞ্চল্যকর দ্রুতগামী রেসিং কার তৈরি করেছে যার

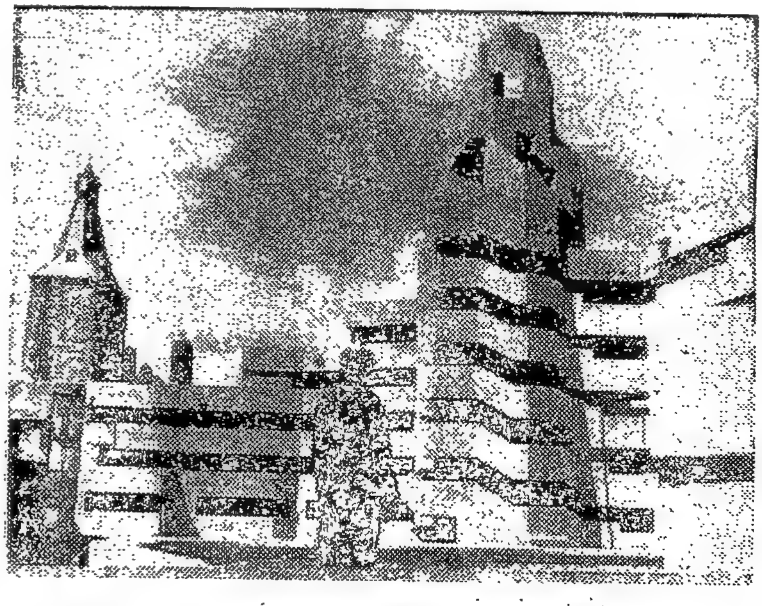

নগরপিতাদের জন্য বেনসবের্গ দুর্গ

সর্বমোট ওজন হ'ল নশ' চার পাউন্ড। নাম ব্লু হোয়াইট রকেট।

আর এই দ্রুততার সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলেছে নতুন সৃষ্টির প্রয়াস। উন্নয়নশীল দেশে জর্মানীর ব্যয়সাধ্য "মিনিডম" তৈরির চেষ্টা অবশ্য নিতান্ত বিলাস বলেও মনে হতে পারে। কিন্তু বিলাস হলেও তা মহৎ বিলাস, মহতী সৃষ্টি প্রয়াস।

পাক্কা সাতটি বছর ধরে বিভিন্ন কারিগর সমবায়ে জর্মানী এমন একটি চমৎপ্রদ শহর বানিয়েছে আজ যা বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের সুযোগ দেবে। এ শহরে বাসিন্দা থাকবেন না একজনও, কিন্তু প্রতি বছর বিশ-ত্রিশ লাখ লোক এসে "মিনিডম" শহরটি দেখে যেতে পারবেন। পৃথিবীর বিখ্যাত স্থাপত্যকলা এবং বাড়িঘরের মডেল দিয়ে রচনা করা হয়েছে এই মিনিয়েচার ভূলোক। এখানে দাঁড়িয়ে কেনেডি এয়ারপোর্ট, মিউনিখ গির্জা, ভূতবর্গ দুর্গ একই সঙ্গে অবলোকন করার সৌভাগ্য হবে। নিখুঁত মডেলে সাজানো হয়েছে ছোট্ট নকল পৃথিবী। বর্তমান আয়তন বিশ হাজার বর্গগজ।

ভাবুন তো কী কাণ্ড আর কেমন ধারা শখ। কিন্তু প্রচুর উপার্জন হবে বিদেশী মুদ্রার। দর্শনীর সংগৃহীত অর্থ

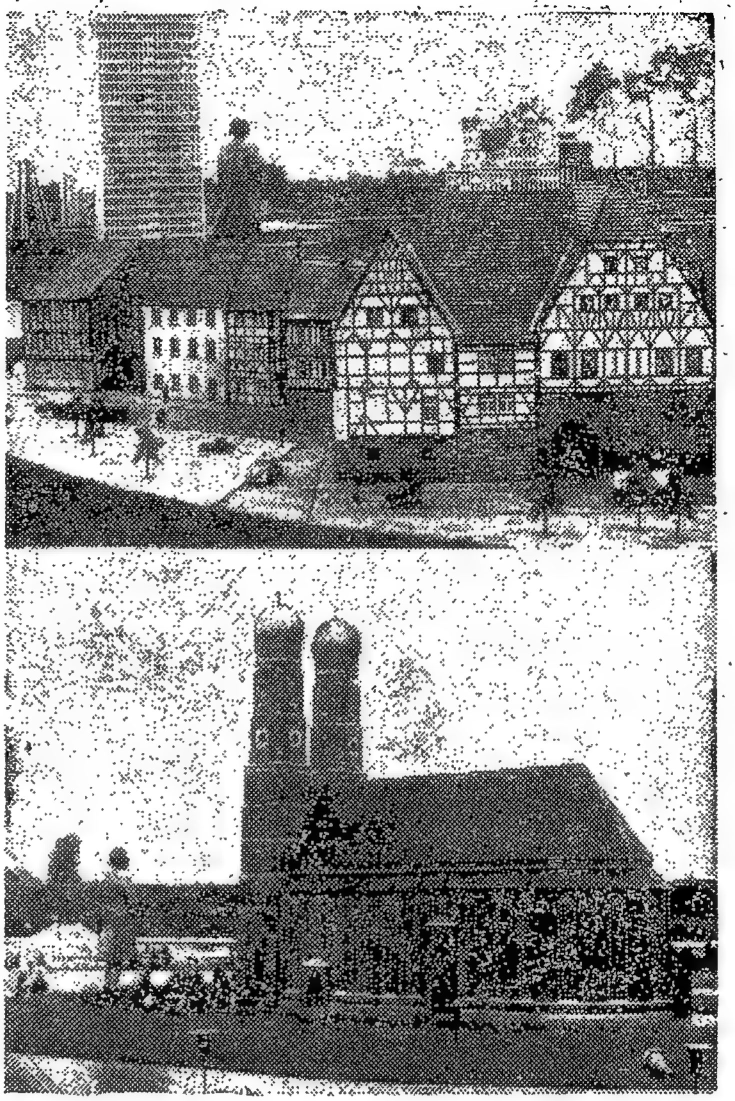

ছোট পৃথিবী মিনিডম

দিয়েই এ শহরকে আরও বৃহৎ করার ইচ্ছে আছে কর্তৃপক্ষের। তাই বলছিলাম, এমনধারা বিলাসও ভালো, যেমন ভালো তাজমহল। সেও এক আশ্চর্য শৈল্পিকতার নিদর্শন। এ-ও এক বিস্ময়কর প্রয়াস।

এমনি আরও এক খেয়াল, বেনসবের্গ শহরের মাঝখানে এক পাহাড়ের মাথায় ত্রয়োদশ শতকের বেনসবের্গ দুর্গের অক্ষত প্রাচীর ও স্তম্ভগুলিকে কাজে লাগিয়ে একটি নতুন দুর্গ তৈরি করা। নগরপিতাদের জন্য এই পরিকল্পনা। ফলত নগরপিতাদের এ শহরে দ্বিতীয় নাম, দুর্গাধিপতি। এই সিটিহলের স্থপতি হলেন, শিল্পী গটফ্রিট বোহম।

এমন যে বিচিত্র দেশ, সেখানে ফ্যাশন-পাগল য়ুরোপের ফ্যাশনের গতিকে ধরে ফেলবার প্রচেষ্টাও স্বাভাবিক। বার্লিনে আন্তর্জাতিক ফ্যাশন সম্মেলন আহূত হয়েছিল। সেখানে আগামী গরমের জন্য নারী-পুরুষের নয়া ফ্যাশনের পরিচ্ছদ কেমনতর হবে সেই নিয়েই গবেষণা হয়ে গেল। মেয়েদের জন্য জমকালো রঙ আর ঝলসানো সিল্কের টুপী মায় জুতো। স্টোন ও মুক্তোর বডিজ দিয়ে লেডিজ দেহ মোড়ার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। পুরুষের জন্য বড় বোতাম, থাড়া কলার এবং চওড়া বেল্ট।

এই সব নিয়েই ফেডারেল জর্মানী, বিভক্ত জর্মানী। আনন্দে উৎসবে, বিলাসে ব্যসনে, সৃষ্টিতে সৌন্দর্যে নিবিষ্ট জর্মানী।

সোনার আনারস
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত
মূল্য ঃ দুই টাকা
কিশোর-কিশোরীদের উপযুক্ত রোমাঞ্চকর উপন্যাস। ছাপা, বাঁধাই চমৎকার।
উপহার দিবার মত বই

সঙ্গীত-নায়ক
গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস
প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ
প্রতি ভাগ—৫৲।

হারমোনিয়াম শিক্ষা
মূল্য—৩৲
বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

গ্রন্থমেলা

শতদ্রু—সুশীল রায়। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ঃ তিন টাকা।

শ্রীসুশীল রায়ের উপন্যাসের বাস্তবতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকার ফলেই তাঁর কাব্যগ্রন্থ হাতে পেলে মনে হয় আমরা সোনার সিঁড়ি দিয়ে বিস্ময়কর জগতে চলেছি। বাস্তব জগৎ থেকে অন্তর্লোক যাত্রা করে কল্পনার জগতে। এ জগতেরও অনেক কিছুই হওয়া উচিত ছিল অথচ বাস্তব জগতের সঙ্গে কোন এক অদৃশ্য টানা-পোড়েনে তা সম্ভব হয় নি। তবে যে চিত্র, চরিত্র ও ভাবনার সম্মুখীন আমরা হই—তাতে মনে হয় আমরা সম্ভাবনার জগতেই বাস করছি। কবি তার রূপরেখা টেনেছেন, ইতিকর্তব্য একালের মানুষের। প্রসঙ্গত বলা দরকার 'কালান্তক' কাব্যনাট্যটি আমাদের মনকে বিশেষভাবে আচ্ছন্ন করেছে। কাব্যনাট্যটিতে আমরা প্রধান দুটি চরিত্র পাই ঃ (এক) কবি, (দুই) পথচারী। পথচারী—মানবসমাজের একজন; আর কবির উদ্দেশ্য কি?—

"ক্লান্তি শ্রান্তি কিছু নাই কিছু নাই।
আদিকাল হতে চলিয়া এসেছি, এখনো
চলিতে হবে।"

এই কাব্যনাট্যটি নানাগুণে দর্শক-শ্রোতাদের মুগ্ধ করতে পারবে। কাব্যের চরমোৎকর্ষের সঙ্গে নাটকীয় গুণের এমন সমাবেশ একালের কাব্যনাট্যগুলিতে খুবই অভাব। 'কালান্তক'-এর বক্তব্য যেমন জীবনধর্মী তেমনি এর আদ্যন্ত অত্যন্ত ব্যঞ্জনাময়। তাছাড়া ধ্বনিপ্রধান ছন্দের মাধ্যমে যে গতি সৃষ্টি হয়েছে—তা শ্রেষ্ঠ কাব্যনাট্যেরই উপযুক্ত। সুতরাং এর অভিনয় সাফল্য সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ।

'শতদ্রু'তে একটি উপরি-উক্ত কাব্যনাট্য ছাড়া প্রায় ৫৭টি ছোট বড় কবিতা সঙ্কলিত হয়েছে। সঙ্কলিত কবিতার অধিকাংশই আমরা ইতিপূর্বে পত্র-পত্রিকায় পড়েছি। তবে পরিচিত কবিতাগুলিকে এবার ভাবানুষঙ্গে সাজিয়ে দেওয়ার দরুণ প্রতিটি কবিতা গভীর অর্থবহ হয়ে উঠেছে, সেই সঙ্গে কবির দার্শনিক মন, সামাজিক চিন্তা, কোথাও বা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ-ভাব কবিতার খাঁজে খাঁজে মূর্ত হয়ে গেছে। অবশ্য শ্রীসুশীল রায়ের কবিতা সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলাই বাহুল্য, তবু একথা আমরা বলতে চাই, সংলাপ জাতীয় ছোট কবিতায় তিনি যে রস সৃষ্টি করেন, সেক্ষেত্রে বর্তমানে তিনি অদ্বিতীয়। 'মৌতাত', 'ইচ্ছা', 'জিজ্ঞাসা', 'বয়স' প্রভৃতি কবিতা পড়লেই বোঝা যায়—এখানে সুশীল রায়ের অভিনবত্ব ও স্বকীয়তা অনস্বীকার্য। সঙ্কলিত কবিতাগুলিতে জীবন, প্রকৃতি, সমাজ, মানবচরিত্র—তদুপরি কবির ধ্যানধারণার সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচয় হওয়ার সুযোগ ঘটেছে। অধিকন্তু 'টেলিগ্রাম' জাতীয় কবিতায় মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের অভিনন্দন ও উত্তর নতুন স্বাদের কবিতা। মধুসূদন, নজরুল, যতীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ ও শেক্সপীয়র-এর উপর লিখিত কবিতাগুলিতেও কবির নতুন চিন্তা-ভাবনা সমুপস্থিত। বলা বাহুল্য, কাব্যানুরাগী পাঠক শ্রীসুশীল রায়ের সর্বাধুনিক কাব্যগ্রন্থ 'শতদ্রু' পাঠ করে পরিতৃপ্ত ও আনন্দিত হবেন।

পরিচিত মুখগুলি—গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়। সাহিত্য, ১৮, পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা—২০। দাম ঃ তিন টাকা।

কবি গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় ধ্যান-মননের কবি হলেও পৃথিবীর পথ হাঁটতে হাঁটতে পরিচিত মুখগুলির বিচিত্র জীবনের রূপকার। শ্রীমুখোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রাজকন্যা'র সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, 'পরিচিত মুখগুলি'তে তাঁর চিন্তা-ভাবনা অনেকটা কল্পনার জগৎ থেকে বাস্তবতার পথেই বিচরণ করছে।

কাব্যগ্রন্থটির প্রথম কবিতা 'সূত্র' এমন একটি সুন্দর কবিতা যাতে কবি কাব্যসৃষ্টির মূল কারণ হিসেবে নিজের মনের কথাই ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন—

"বিকচ পদ্মের পাপড়ি ছিঁড়ি ঢের,
কোথাও মধু নেই। মধুকর
কী তবে করে পান? হাওয়ায় আনে
গান!
ওষ্ঠে রাখে মধু জাদুকর।"

কবি নিজেও তো পরমাশ্চর্য এক যাদুকর। তবু কবি অনুভব করেন—'সমগ্র সত্তায় কার বিষাক্ত, নিষ্ঠুর পদক্ষেপ?/জাতি আর সমাজের দেহে তারই নগ্ন আক্রমণ!' যদিও 'একই নারী আলো জ্বালে, অন্ধকারও আনে পৃথিবীর।' তবু কবি বলেন, 'বলেছি তোমার পরপারে যাবো আমি,/নিজেকে ছড়িয়ে দেবো অনেক সুদূর পৃথিবীতে।' অবশ্য ধরণীর মানুষ চীৎকার করে বলে ওঠে ঃ "ওখানে যেয়ো না শান্তিময়!/যে-আলোর পাখি ডাকছে, দ্যাখো ওর আগুনের পাখা।' তবু কবি বলেন, 'আলোর শিশুরা তোলে কলরব।' তাই 'খোঁজো পিতা, কোন মন্ত্র বিষাক্ত আকাশে।' আমরা কয়েকটি পঙক্তি উদ্ধৃতির সাহায্যে কবির যে জীবনদর্শন তুলে ধরলাম তা একালের অবক্ষয়ধর্মী নয় বরং বিশেষ বলিষ্ঠই বলা যায়। কাব্যগ্রন্থটিতে সঙ্কলিত ৬৪টি কবিতার মধ্যে অনেক কবিতায় প্রেম-বৈচিত্র্য ও প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ উত্তেজিত মনকে শান্ত করে। কয়েকটি দীর্ঘ কবিতা, যেমন, 'চৈত্র দিনের গান,' 'চিত্রলেখা তোমাকে', 'নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার'-এ নাটকীয় সমাবেশ লক্ষণীয়। 'পরিচিত মুখগুলি' কাব্য পাঠকেরা সানন্দে গ্রহণ করবেন—এ আমরা প্রত্যাশা করতে পারি।

মধুরা—অমিয়কুমার হাটি। ১১।১, বৈঠকখানা ফার্স্ট লেন, কলিকাতা—৯ থেকে সোমেন পাল কর্তৃক প্রকাশিত। দাম ঃ এক টাকা।

শ্রীঅমিয়কুমার হাটির কিছু কবিতা আমরা পত্র-পত্রিকায় পড়েছি। কিন্তু সে সব কবিতা থেকে আমাদের ধারণা হয়েছিল, বর্তমানকালের কবিদের মতোই তিনি একই পথে এক যন্ত্রণাময় যুগের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছেন। কিন্তু উপরি-উক্ত 'মধুরা' কাব্যগ্রন্থটির কয়েকটি কবিতা পড়ে আমাদের মনে হয়েছে এঁর চিন্তা-ভাবনার স্বকীয়তা, অভিনবত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষত তাঁর 'একটি প্রশ্ন' কবিতাটিতে যে বৈজ্ঞানিক চেতনা বিচ্ছুরিত বাংলা কবিতায় তার কদাচিৎ সাক্ষাৎ মেলে। তিনি বলেছেন—

'একটা আমার প্রশ্ন টিকটিকি তোমায়
তেষ্টা মেটাবার জল পাও তুমি
কোথায়?
... ...
শুধু কি রক্ত আর মাংস খেয়ে তেষ্টা
যাবে?'
ইত্যাদি।

অবশ্য, আবেগধর্মী কবিতা 'কান্নাধন', কিম্বা বলিষ্ঠ জীবনবাদে ভরপুর কবিতা 'গানের ঃ জন্ম' অথবা সুদীর্ঘ প্রেমের কবিতা 'শুচিস্মিতা' কবিতায় কবি মানুষের মনের মৌল ইচ্ছা, আশা ও আকাঙ্ক্ষাকেই সুন্দরভাবে রূপায়িত করে তুলেছেন। তিনটি অনুবাদসহ মোট ত্রিশটি কবিতার মধ্য দিয়ে কবির উপলব্ধি, বৈজ্ঞানিক চেতনার দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে পাঠকরা মুগ্ধ হবেন। একালের কোনো কবির প্রথম জীবন-জিজ্ঞাসার সঙ্গে এমন সাক্ষাৎ সহজে মেলে না বলেই এ কবিকে আমরা কাব্যজগতে সাদর অভিনন্দন জানাতে পেরে আনন্দিত।

সরকারী কর্মচারীদের বিক্ষোভ মিছিল

এবারের বঙ্গদর্শন শুরু করব একটি কাহিনী দিয়ে। কাহিনী ঠিক নয়, বরং ইতিহাস বলাই ভাল। যে সমস্যাটি আজ বাঙালীর জীবনে চরমতম পর্যায়ে পৌঁছেছে সেই খাদ্য সমস্যার বর্তমান স্বরূপটিকে ভাল করে অনুধাবন করতে গেলে, অন্তত এক বছরের পিছন দিককার ঘটনাবলীকে চোখের সামনে রাখা দরকার।

পশ্চিমবঙ্গে এমন একটা যুগ ছিল যখন চালের রেশন ছিল না। এটা বোধ হয় আজকে আমরা ভাবতে পারি না, কিন্তু মাত্র দু' বছর আগেও খোলাবাজারই ছিল, রেশন ছিল না।

সেটা ছিল বোধ হয় ১৯৬৫ সালের গোড়ার দিক, যখন হঠাৎ হু হু করে চালের দাম বাড়তে লাগল। তখনো চালের দর কিলো প্রতি এক টাকা হয় নি, তবুও দাম চড়ছে, জনসাধারণের উদ্বেগ বাড়ছে, সংবাদপত্রেও সে খবর প্রকাশিত হচ্ছে। জ্বর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেমন থার্মোমিটারের পারদাঙ্ক ধাপে ধাপে বেড়ে চলে সেইভাবে কিলো প্রতি পাঁচ, অথবা সাত অথবা দশ পয়সা এই হারে চালের দর প্রত্যহ বেড়ে চলছে।

এই রকম সময়ে মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিলেন যাতে বলা হল যে, চালের নাকি উৎপাদন সেবারে ভাল হয় নি, দেশের লোককে বিকল্পে আলু, কাঁচকলা ইত্যাদি খেতে হবে এবং সরকার এ বিষয়ে কিছু করার পথ চিন্তা করছেন। আর যায় কোথায়, রাতারাতি চালের দাম এক টাকার সীমা পেরিয়ে এক টাকা তিরিশ পয়সায় উপরে নিচে ওঠানামা করতে লাগল। দেশের মধ্যে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠল এবং চালের দর এক লাফে দাঁড়িয়ে গেল দেড় টাকা কিলো।

তারপর একদিন দুপুরে বেতারে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা শোনা গেল, চালের দাম বেঁধে দেওয়া হয়েছে। আর বলা কওয়া নেই সেই রাত্রি থেকেই চালেরা কাউকে না জানিয়েই আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে গেল। দেড় টাকা কিলো দরে যখন চাল বিক্রি হচ্ছিল তখন বাজারে যেন চালের বন্যা বয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু সরকারী ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই কোন যাদুমন্ত্রবলে সমস্তই অদৃশ্য হয়ে গেল।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঘোষণা করলেন যে, সমগ্র রাজ্যে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা হবে এবং তার জন্য চাল সংগ্রহের একটি টার্গেট নির্ধারিত হল, ঘোষণা করা হল যে, সরকার ধানকলগুলি থেকে শতকরা একশো ভাগ চালই লেভি করবেন। কৃষকদের কাছ থেকে সরকার সোজাসুজি ধান অথবা চাল কেনার ব্যবস্থা করলেন। ১৯৬৫-র শেষের দিকে মনে হচ্ছিল যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেন সত্যই একটা বৈপ্লবিক খাদ্যনীতি অনুসরণ করতে চলেছেন।

অন্যদিকে বণ্টনব্যবস্থা দেখে জনসাধারণের চক্ষু কপালে উঠল। বোঝা গেল সরকারের খাদ্যনীতি শুধু বৈপ্লবিকই নয়, এই নীতি অনুযায়ী কালোবাজারকে যে সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে তাও বৈপ্লবিক। বিধিবন্ধ রেশন এলাকায় মাথাপিছু চাল ও গমের যা ব্যবস্থা করা হল তাতে যে কোন পরিণতবয়স্ক লোকের চার দিনের খাদ্য হবে, আর বাকি তিন দিনের খাদ্যের জন্য সরকার সোজাসুজি কালোবাজারের পথ দেখিয়ে দিলেন।

সরকারের সংগ্রহনীতির দাপটে গ্রামবাসীদের চোখ কপালে উঠল, যে দামে সরকার কৃষকদের কাছ থেকে ধানচাল খরিদ করছিলেন, সে দামে তাদের পোষায় না। সংগ্রহের জন্য বড় বড় জোতদারদের গায়ে হাত দেওয়া হল না, লেভির নামে দরিদ্র কৃষকদের সারা বছরের খাবার চাল পর্যন্ত বার করে নেওয়া হল। গ্রামে গ্রামে শুরু হল বিক্ষোভ। এটা ১৯৬৬-র জানুয়ারী মাসের ঘটনা।

ওদিকে আরও একটি নতুন ব্যবসা শীঘ্রই আসরে জাঁকিয়ে বসল, সেটি হচ্ছে স্মাগলিং, বাংলায় চোরাচালান। জোতদারদের ঘরে সঞ্চিত অফুরন্ত চাল নানা পথে পাচারকারীদের দ্বারা বাহিত হয়ে শহরে ও শিল্পাঞ্চলে আসতে লাগল।

এনে ফেলতে পারলে ডবল ডবল লাভ। তারাও রাতারাতি অজস্র কালো টাকা উপাজনের যেমন রাস্তা পেয়ে গেল, তেমান পুলিশ ও হোমগার্ডদের সামনেও যেন রাতারাতি বড়লোক হবার স্বর্গ-রাজ্যের বন্ধদুয়ার খুলে গেল।

ফলে অবস্থা দাঁড়ালো এই যে, গ্রামের বাজার থেকেও চাল অদৃশ্য হল, কেন না গরীব চাষীদের সব চালই সরকার জবর-দখল করেছেন আর জোতদারদের সঞ্চিত চাল চোরাপথে গ্রামের বাইরে চলে যেতে লাগল। এ এক আজব অবস্থা। সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা হল সেই সব এলাকা-গুলিতে, যেগুলি মডিফায়েড রেশনিং এলাকা বলে পরিচিত। এখানে চালের খোলাবাজার কার্যত বন্ধ হয়ে গেল, অপরপক্ষে রেশনের চাল-গম-চিনিও এই সব এলাকার লোকেদের বরাতে জুটল না, কোন কোন স্থানে পরম করুণাময় সরকার ছোলার বরাদ্দ করলেন।

এই পটভূমিকায় ১৯৬৬-র ফেব্রুয়ারী থেকে শুরু হল সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ব্যাপক খাদ্য আন্দোলন, যার তীব্রতা পূর্ব-বর্তী সকল আন্দোলনকে যেন ম্লান করে দিয়েছিল। এই আন্দোলন সরকারকে প্রায় উচ্ছেদ করার অবস্থা করেছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার চূড়ান্ত ভীত হয়ে-ছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীমশাই তো প্রায় পদত্যাগ পত্র দাখিল করেই বসেছিলেন। পাক্কা দুটি মাস ধরে শাসকদলের নেতারা জনসমক্ষে হাজির হতে সাহস করেন নি, গা ঢাকা দিয়ে এখানে-ওখানে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন।

কিন্তু খাদ্য আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে কতিপয় বামপন্থী নেতা দলীয় প্রয়োজনের স্বার্থে আন্দোলনের মূল স্পিরিটটাকে নষ্ট করে দিলেন। (এটা অবশ্য বঙ্গদর্শন লেখকের নিজস্ব ধারণা) আলোচনার টেবিলে খাদ্যের চেয়ে বন্দী-মুক্তির প্রশ্নটাই বড় হয়ে উঠল। মুখ্য-মন্ত্রীমশাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

এদিকে সরকার চাল সংগ্রহের যে টার্গেট করেছিলেন তার অর্ধেকও এত ডংকানিনাদ সত্ত্বেও সংগ্রহ করতে পারলেন না। ফলে রেশনে চালের যোগান নিয়মিত দিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠল। পশ্চিম-বঙ্গ সরকার দিল্লীতে কেন্দ্রের কাছে ঘন ঘন এস, ও, এস পাঠাতে লাগলেন, চাল পাঠাও, চাল পাঠাও। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী বাণী দিলেন, চাল দিলেন না।

১৯৬৬-র আগস্ট-সেপ্টেম্বর থেকে অবস্থা চরমে উঠল। সরকারের ভান্ডার তখন প্রায় শূন্য হয়ে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রীর ক্রমাগত আবেদনে শেষ পর্যন্ত কেন্দ্র সামান্য কিছু চাল দিতে সম্মত হল। তাও বিদেশ থেকে আমদানী করা চাল। জাহাজ-ঘাটা থেকে চাল সোজা রেশন দোকানে আসতে আরম্ভ করল, যাকে বলে 'শিপ টু মাউথ' নীতি। থাইল্যান্ডের অখাদ্য চাল, যা কাপড় কলওয়ালারা আমদানী করত কাপড়ে মাড় দেবার প্রয়োজনে, তা-ই রাতা-রাতি খাদ্যগুণসম্পন্ন হয়ে উঠল।

কিন্তু এত করেও বোধ হয় শেষ রক্ষা করা গেল না। রেশনে শেষ পর্যন্ত চাল দেওয়া বন্ধ হল, কোথাও এক সপ্তাহের জন্য, কোথাও বা সপ্তাহের পর সপ্তাহ। তারপর হল বরাদ্দ কর্তনের পালা, যা শেষ পর্যন্ত সপ্তাহে মাথাপিছু তিন শো গ্রামে এসে দাঁড়িয়েছে।

এদিকে আবার রাজনৈতিক আকাশে ইলেকশানের সিঁদুরে মেঘ দেখা গেছে। ফেব্রুয়ারীর পর গদীতে কে থাকবে কে বলতে পারে? কাজেই পশ্চিমবঙ্গ সর-কারের কাছে জনসাধারণকে খাদ্য যোগা-নোর চেয়ে আগামী নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দলের গদীরক্ষার প্রশ্নটাই বড় হয়ে উঠল। অতএব খাদ্যনীতি বদলানোর প্রয়োজন নতুন করে দেখা গেল।

এই নতুন খাদ্যনীতির একমাত্র উদ্দেশ্য ভোটসংগ্রহ, কেন না গ্রামই কংগ্রেসকে চির-কাল বাঁচিয়ে রেখে এসেছে, গত বছরের মত গরীব কৃষকের গৃহের অন্ন অপহরণ করলে আগামী ভোটযুদ্ধে আর নিস্তার নেই। কাজেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঘোষণা করলেন যে, এবার সরকার আর নিজে থেকে চাল সংগ্রহ করবেন না, সংগ্রহ করার দায়িত্ব ফুড কর্পোরেশনের। এই কর্পো-রেশন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন নয়, তবে শুভেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সংগৃহীত চাল, পশ্চিমবঙ্গেই এরা রেখে দেবে (যদিও না দিলে কিছু করার নেই)। ফুড কর্পোরেশন সমবায় সমিতি মারফত চাল সংগ্রহ করবে। সরকার কোন ধান বা চাল কেনার বাঁধা দাম রাখছেন না, আর ধানকলগুলিকে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ লেভি দিলেই চলবে।

আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসের জয়লাভ করার পক্ষে, বিশেষ করে গ্রামের ভোট আদায় করার পক্ষে, এই সরকারী নীতি অব্যর্থ। (কে বলে সে নীতি নির্ধারণের বুদ্ধি সরকারের নেই!) প্রথমত এই নীতির দ্বারা সরকার এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করলেন যে, ফুড কর্পোরেশন এক দানা চালও সংগ্রহ করতে পারবে না, এবং এ পর্যন্ত পারেও নি। কেন না ধানকল-গুলিকে পঞ্চাশভাগ ছাড় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কলওয়ালারা কম ধান ভাঙার জন্য এসেছে এই দোহাই দিয়ে (খরার ওজর তো আছেই) শতকরা নিরানব্বই ভাগ ফাঁকি দেবে, অবশিষ্ট এক ভাগ দয়া করে যদি ফুড কর্পোরেশনকে দেয় তবে খুব বরাত জোর বলতে হবে। দ্বিতীয়ত, চালের দাম যে কি এটা গত এক বছরে কৃষকরা ভাল করেই বুঝেছে, কাজেই সতের-আঠার-উনিশ টাকা মণ দরে ধান বেচতে তারা আর রাজী নয়, ইতিমধ্যেই অধিকতর দাম দিয়ে মহাজনরা তাদের ধান কিনে নিয়েছে, এবং অধিকতর দাম পেয়ে কৃষকেরাও খুশি। আর যারা ওই মহাজন ও জোতদারদের চাল পাচার করে তারাও খুশি, কেন না এবার সরকারের ঘরে চাল নেই, রেশন অঞ্চলে চাল সোনার দরে বিকোবে। তাদের কোন ভয়ডরও নেই। বুক ফুলিয়ে তারা বলছে আমরা চাল নিয়ে যাচ্ছি বলেই শহরের লোক খেতে পাচ্ছে, আমাদের কাজে বাগড়া দিও না। দমদমে সেদিন পুলিশ ওদেরই হাতে মার খেয়েছে। সবচেয়ে মজা হচ্ছে আজ কল-কাতার বাজারে প্রকাশ্যে চাল বিক্রি হচ্ছে পুলিশের চোখের সামনে।

এই প্রশ্রয় সরকার ইচ্ছা করেই দিচ্ছেন কেন না সামনে নির্বাচন। মুখ্যমন্ত্রীর অভি-প্রায় হচ্ছে এই দুটি মাস, অর্থাৎ১৯৬৭-র জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী, কোন গতিকে কাটিয়ে দেওয়া। জোতদারদের শ্রীঅঙ্গে হাত দেওয়া হয় নি, তাদের ভোট অতএব শাসকদলের বাঁধা, তাদের প্রভাবের এলাকাও বড় কম নয়। দরিদ্র কৃষকদের তারা সহজেই বোঝাবে যে এই রাজত্ব আছে বলেই তোমরা চালের বেশি দাম পাচ্ছ, অতএব শাসকদলকে ভোট দাও (বর্তমান মরশুমে কিছুটা বেশি দর পাবার সুযোগ তাদের হয়েছে এ কথা অস্বীকার করা যায় না), আর চোরাপাচারকারীদের ভোট তো কংগ্রেসের বাক্সেই পড়বে, কেন না কালো টাকা উপায়ের এমন সুযোগ আর কোন রাজত্বে ঘটবে?

অতএব ভোটের স্বার্থে সরকারের বর্তমান খাদ্যনীতি একেবারে ছিদ্রহীন। এত করেও যদি শাসকদল পুনরায় গদী না পায়, তাহলেও খাদ্য নিয়ে তাদের আর কোন দায়িত্ব নেই। সেদিক থেকে মুখ্য-মন্ত্রী নিশ্চিন্ত। আর যদি পুনরায় বর্ত-মান মুখ্যমন্ত্রী গদীতে ফিরে আসতে পারেন, তাহলে আমরা পূর্বে যা বলেছি, খাদ্যনীতি নিয়ে তাঁর মাথাব্যথার কোন কারণ থাকবে না। রেশনব্যবস্থা ভেঙে পড়লেও তাঁর কিছু যাবে আসবে না। চালের দাম যাই হোক না কেন, তাঁর পক্ষে তখন নির্বিকার থাকা সম্ভব হবে, কেন না তখন তিনি সদ্য নির্বাচনে জয়লাভ করে ফিরে যাচ্ছেন।

ফলে ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যচিত্র যা দাঁড়াবে, এখন থেকে তা আঁচ করে নিতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হবার কথা নয়। তবু ১৯৬৬-তে পশ্চিমবঙ্গ সর-কারের হাতে কিছু চাল ছিল, ১৯৬৭-তে

সব চালই মহাজন-মজুতদারদের গুদামে। তা উদ্ধার করার সামর্থ্য সরকারের নেই। এদিকে ৪ঠা জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকারও রাজ্যগুলিতে খাদ্যের সরবরাহ হ্রাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যাকে বলে একেবারে সোনায় সোহাগা।

সর্বদিক বিচার করে দেখলে মনে হয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার শীঘ্রই রেশনিং ব্যবস্থা তুলে নিতে বাধ্য হবেন। কেন না এ অবস্থায় রেশনিং ব্যবস্থা চালু রাখা সম্ভব নয়। আমার ব্যক্তিগত যা অনুমান, আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই, নির্বাচনের দু-তিন সপ্তাহ পূর্বে রেশনিং ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। তার ফলে খোলা-বাজারে অন্তত কয়েক সপ্তাহ চাল পাওয়া যাবে। নির্বাচনের প্রাক্কালে এবং নির্বাচনের পর দু'-চার সপ্তাহের জন্য জনসাধারণ বিগত দু বছরের যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা থেকে রেহাই পাবেন।

কিন্তু তারপর? সেটা আর ভাবা যায় না। সম্রাট পঞ্চদশ লুই মৃত্যুর আগে বলেছিলেন, আফটার মি, দি ডেলিয়ুজ। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও বুঝি এর থেকে বেশি কিছু চিন্তা করা যায় না।

নব্য জালিয়ানওয়ালাবাগ

জালিয়ানওয়ালাবাগের কাহিনী আমরা শুনেছি, চোখে দেখি নি, কিন্তু তার যে আধুনিক সংস্করণের নমুনা নববর্ষের প্রথম দিনে ইডেন উদ্যানে পাওয়া গেল তা দেখে একটা প্রশ্নই মনে আসে, এ আমরা কোন মুল্লুকে বাস করছি? এটা আমাদের নিজেদের দেশ তো?

পয়লা জানুয়ারী ইডেন উদ্যানে যে ঘটনা ঘটেছিল তার বিস্তৃত বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। সংবাদপত্রে সমস্ত ব্যাপারই প্রকাশিত হয়েছে। কাজেই সে শোচনীয় চিত্রের পুনরায় অবতারণা না করে আমরা কতকগুলি সোজাসুজি প্রশ্ন তুলতে চাই।

প্রথমত, যাঁরা খেলা দেখতে সেদিন মাঠে হাজির ছিলেন, তাঁরা খেলা দেখতেই গেছলেন, দাঙ্গা করতে যান নি। দর্শকদের মধ্যে ছিলেন অসংখ্য নারী, শিশু ও বৃদ্ধ। এই বিশাল দর্শক-জনতা কার্যত অবরুদ্ধই ছিলেন, এবং সেই হিসাবে সর্বদাই ছিলেন নিয়ন্ত্রণসাধ্য। এঁদের কোন যুক্তিতে রাজপথের হাঙ্গামাকারীদের মত টিয়ার গ্যাসের শিকার হতে বাধ্য করা হল?

ভগবান এইটুকু রক্ষা করেছেন যে ওই বিশাল জনসমুদ্রের উপর অতগুলি টিয়ার গ্যাস সেল বিস্ফোরণ করার ফলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে কারো মৃত্যু হয় নি। বিশেষ করে যেখানে অসংখ্য নারী ও শিশু ছিল? যার মস্তিস্ক থেকে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য ওই পরিকল্পনার সৃষ্টি হয়েছিল সে কে? একটা আদেশ দেবার ফলাফল যে কতদূর কি হতে পারে সে বিষয়ে তার কোন ধারণা আছে কি? যে উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারীর নির্দেশে এইরকম সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানটুকুরও অভাব থাকে তাকে এই মুহূর্তে বরখাস্ত করা হবে না কেন?

সীতেশ রায়কে যে ডজনখানেক পুলিশ কর্মচারী পিটিয়ে প্রায় মেরে ফেলার জোগাড় করেছিল তাদের বিরুদ্ধে কেন এটেম্প্ট টু মার্ডারের চার্জ আনা হবে না? বিশেষ করে ছবি দেখে যখন তাদের সনাক্ত করা যায়, আর যখন সাক্ষী হিসাবে সারা মাঠশুদ্ধ দর্শক, খোদ দু'পক্ষের খেলোয়াড়রা পর্যন্ত রয়েছেন। কোন অপরাধে ওই ভদ্রলোককে অমন নির্মমভাবে লাঠিপেটা করা হল? আর তা ছাড়া ভদ্রলোক যদি আইনের চোখে কোন অপরাধ করেই থাকেন, তার জন্য আদালত ছিল, কোন মানুষের গায়ে হাত তোলার কি অধিকার পুলিশের আছে?

[illegible]র নামে ইটপাটকেল ছোড়ার মান্ধাতার আমলের সেই অভিযোগটা বোধ হয় এবার করা যাচ্ছে না, কেন না, প্রোভোকেশনটা যে পুলিশের তরফ থেকেই এসেছিল সেটা সীতেশবাবুই প্রমাণ করেছেন লক্ষাধিক ব্যক্তির চোখের সামনে। তারপর যখন জনতার রুদ্ররোষ দুর্বারগতিতে মাঠের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, তখনই এই পঞ্চাশ পয়সা কে-জি চাল ভক্ষণকারী প্রিভিলেজড ক্লাস, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাধের পুলিশবাহিনীর অদৃশ্য হতে বেশি সময় লাগল না। শেষ পর্যন্ত মিলিটারী তলব করতে হল।

এই ঘটনার, অর্থাৎ এই পুলিশী বর্বরতার, চূড়ান্ত দায়িত্ব গিয়ে পড়েছে শেষ পর্যন্ত পুলিশ কমিশনারের উপর, কেন না তাঁর উপস্থিত থাকাকালেই এই সব ঘটনাগুলি ঘটেছে। প্রহারকারীদের মধ্যে কয়েকজন ডেপুটি কমিশনারের চিত্রও দেখা গেছে। মোটের উপর ক্যামেরা তো আর মিথ্যা কথা বলে না।

স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত এই ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়েছেন এবং তিনি এই বিষয়ে ব্যাপক তদন্তের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলে প্রকাশ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হবে তো? না কালের কুটিল আবর্তে, নির্বাচনী রণডংকায়, তা শেষ পর্যন্ত ফাইল চাপা পড়ে যাবে?

এইবার আসছে সি, এ, বি-র সেই পাণ্ডাদের কথা যারা রাতারাতি কালো টাকা পেটবার ফিকিরে যতগুলি সীট আছে তার চার ডবল টিকিট বিক্রি করেছিল। এরাই হচ্ছে মূল অপকর্মের আসল হোতা। **পয়লা জানুয়ারীর সমস্ত অঘটনের জন্য একমাত্র সি, এ, বি দায়ী। এই প্রতিষ্ঠান যে এই মরশুমে টিকিটের কালোবাজারী কর্মে নিযুক্ত ছিল, এই মর্মে জনৈক** ভদ্রলোক ইতিমধ্যেই আদালতে একটি মামলা দায়ের করেছেন এবং সেই হিসাবে আদালত সি, এ, বি-র হিসাবের বই ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র আটক করার জন্য একটি তল্লাসী পরোয়ানা জারী করতে মনস্থ করেছেন।

সি, এ, বি-এর বর্তমান টিকিট বিক্রির কেলেঙ্কারীর সঙ্গে একটি রাজনৈতিক দলের বিশেষ যোগাযোগের অভিযোগ এনেছেন কেউ কেউ। অবশ্য এই সি, এ, বি নামক কেঁচোর গর্ত খুঁড়তে গেলে অনেক সাপ বেরোবার আশংকা আছে, আশা করি, এ কথাটি বুঝিয়ে বলতে হবে না। এ প্রতিষ্ঠানটি কোনকালেই সুনামের অধিকারী ছিল না।

এবারের খেলার জন্য শুধু যে সি, এ, বি নির্দিষ্ট আসনসংখ্যার চেয়েও চারগুণ বেশি টিকিট বিক্রি করেছিল, সেই হিসাবে এত দর্শকে প্রাথমিক প্রয়োজনটুকুর দিকেও দৃষ্টি দেয় নি। প্রাকৃতিক প্রয়োজনেও কারো পক্ষে সীট ছেড়ে বেরিয়ে আসা সম্ভব ছিল না। শুধুমাত্র খেলার প্রতি অনুরাগের জন্যই প্রথম দিন দর্শকেরা এত অব্যবস্থার মধ্যেও হাসিমুখে খেলা দেখেছিলেন। সর্বাপেক্ষা অধিক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে তাঁদের যাঁরা কম দামের সীজন টিকিট কেটেছিলেন। দৈনিক টিকিটধারীদের দুরবস্থাও কহতব্য ছিল না। টিকিট বিক্রি করে মাঠে ঢুকিয়ে যদি ক্রীড়ামোদীদের খেলা দেখা থেকে বঞ্চিত করা হয়, তাহলে তার চেয়ে অপরাধ আর কি থাকতে পারে? এভাবে ক্রীড়ামোদীদের টিকিট বিক্রি করে ডেকে এনে ধাপ্পা দেওয়ার জন্য কি সি, এ, বি-র কর্তাদের ভারতীয় দণ্ডবিধির চারশো কুড়ি ধারায় অভিযুক্ত করা যায় না?

নববর্ষের প্রথম দিনে ইডেন উদ্যানে যে ন্যক্কারজনক ঘটনার অভিনয় হল, সেই ঘটনার যারা নায়ক তাদের অবিলম্বে শাস্তির ব্যবস্থা যাতে হয় সেটারই এখন আশু প্রয়োজন দেখা গেছে।

বিষ নজর

বঙ্গদর্শনের পাঠকেরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন যে, প্রায় প্রতি সংখ্যার বঙ্গদর্শনেই পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রের অবিচারের একটি করে উদাহরণ থাকে। বর্তমান সংখ্যাতেও কেন্দ্রের অবিচারের আর একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

পূর্ববর্তী একটি সংখ্যার বঙ্গদর্শনে আমরা বলেছি যে, মহীশূর, অন্ধ্র, গুজ-

গাট ও মাদ্রাজ—এমন কি উদ্বৃত্ত রাজ্য মহারাষ্ট্রের পরিকল্পনা সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশন যে দরদ দেখিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ঠিক তার বিপরীত মনোভাব নেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ন্যূনতম প্রয়োজন ৫৪৪ কোটি টাকার দাবিকে এক কলমের খোঁচায় ছেঁটে প্রায় অর্ধেক করে দেওয়া হয়েছে। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ অনেক আগেই স্থির করেছিলেন যে, কেন্দ্রীয় সাহায্যের ৭০ শতাংশ বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বণ্টিত হবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাকি ৩০ শতাংশ দেওয়া হবে বিশেষ প্রয়োজন ও সমস্যার দিকে তাকিয়ে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই স্বীকৃত নীতিকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে অস্বীকার করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, পরিকল্পনা কমিশন চতুর্থ পরিকল্পনায় ৩,৫০০ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সাহায্যের সর্বোচ্চ সীমা বাড়িয়েছেন। এই অতিরিক্ত অর্থ বণ্টন করা হবে বিভিন্ন রাজ্যে, কিন্তু এ ক্ষেত্রেও পশ্চিম বাংলার বরাতে পড়ছে একটি বৃহৎ শূন্য। অনুন্নত রাজ্যের অজুহাত দিয়ে আসাম, কাশ্মীর ও নাগাল্যান্ডের জন্য অতিরিক্ত টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। কোন যুক্তি না দেখিয়েই মহারাষ্ট্রের মত শিল্পোন্নত রাজ্যের ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সাহায্য বেশি করে বরাদ্দ করা হয়েছে, অথচ পশ্চিমবঙ্গের মত সমস্যাসঙ্কুল রাজ্যের আইনসঙ্গত ও যুক্তিসম্মত চাহিদা পূরণে কমিশনের অটল মনোভাবের কোন কারণ উপলব্ধি করা দুষ্কর।

নিজ রাজ্যের দাবিদাওয়ার কথা তুললেই তা প্রাদেশিকতা বলে গণ্য হবার রীতি এদেশে প্রচলিত। কিন্তু যেখানে অবিচারের দৃষ্টান্ত অত্যন্ত নগ্ন ও বাস্তব, সেখানে এ সকল প্রসঙ্গ না তুললে চলে না। স্বাধীনতার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের মত ঝামেলা আর কোন রাজ্যকে পোহাতে হয় নি, দেশবিভাগের সমুদয় অভিসম্পাত এই রাজ্যকেই একা ভোগ করতে হয়েছে ও হচ্ছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাকে সর্বভারতীয় সমস্যারূপে দেখার কোন চেষ্টা তো এতাবৎকাল হয়ই নি, উপরন্তু পশ্চিমবঙ্গের ন্যায্য দাবিদাওয়াগুলি পর্যন্ত উপেক্ষিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রের এই যে মনোভাব তার পরিণাম অবশ্যই শেষ পর্যন্ত শুভকর হবে না।

ইস্কুলের নতুন সেসন

জানুয়ারী থেকে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি ইস্কুলেই নতুন সেসন চালু হল। ক্লাসে ওঠাওঠির পালা শেষ, যারা প্রমোশন পেয়েছে তাদের মুখে হাসি।

কিন্তু অভিভাবকদের কাছে এই জানুয়ারী মাসটি একটি রীতিমত সমস্যার মাস। প্রথম সমস্যা ছেলে বা মেয়েকে ভর্তি করার সমস্যা। একটা নামকরা ইস্কুলে সীট পেতে হলে এখন রীতিমত সাধনার প্রয়োজন। সর্বত্রই 'ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই, ছোট সে তরী।'

ছাত্রবৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ইস্কুলও অবশ্য বাড়ছে, কিন্তু সে বৃদ্ধির হার প্রয়োজনের তুলনায় তেমন নয়। মাধ্যমিক ও প্রাথমিক ইস্কুলের সংখ্যা আরও বেশি হওয়া প্রয়োজন। নামকরা ইস্কুলগুলি আজকাল বাছাই করা ছেলে ভিন্ন সাধারণ মেধার ছেলেদের ভর্তি করে না। সাধারণ মেধার ছেলেদের এই বিপুল বাহিনী যাবেই বা কোথা?

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও একই ধরণের সংকট। প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করার শ্লোগানের সঙ্গে গত উনিশ বছরের পরিচয় থাকলেও অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা অত্যন্ত কম। পাঠকদের হয়ত স্মরণে আছে যে, কিছুকাল আগে এই বঙ্গদর্শনেই আমরা দেখিয়েছিলাম যে, প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে পশ্চিমবঙ্গই সবচেয়ে অনগ্রসর।

এই মরশুমে ধনী ও স্বচ্ছল ঘরের ছেলেমেয়েদের জন্য অনেক হঠাৎ গজিয়ে ওঠা বিলাতী কায়দার ইস্কুলের রঙীন বিজ্ঞাপন এখানে-ওখানে দেখা যাচ্ছে। স্বাধীন ভারতে আর কিছু হোক বা না হোক বড়লোকের ছেলেমেয়েদের জন্য এই জাতীয় স্কুল অনেক গজিয়েছে।

এরপর আসছে বই-এর সমস্যা, সাধারণ অভিভাবকেরা যাতে একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসেন। আমাদের স্কুলজীবনে নতুন বই-এর মুখ আমরা অল্পই দেখেছি। তখন ঘন ঘন বই বদলানোর রীতি ছিল না, একই বই ক্রমাগত বছরের পর বছর চালু থাকত, কাজেই পুরানো বই সস্তায় পাওয়া যেত, নতুন বই কিনতে হত না। এখন জমানা বদলেছে, প্রতি বছরেই বই বদলায়, এবং এই বদলানোর মূলে অনেক স্বার্থের সম্পর্ক আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকল চোটটা গিয়ে পড়ে হতভাগ্য অভিভাবকদেরই উপর। এই বিষয়টি পরবর্তী সংখ্যার বঙ্গদর্শনে আমরা আরও বিশদভাবে বর্ণনা করব।

যেসকল বইগুলি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত, যেমন কিশলয় বা পীকক রীডার সেগুলিকে নিয়ে যে কি আন্দাজ কালোবাজার চলে তা ভুক্তভোগী মাত্রই অবগত আছেন। সরকারী ব্যবস্থাপনার কৃপায় যখন শেষ পর্যন্ত বইগুলি ছাত্রর হাতে গিয়ে পড়ে, তখন প্রায় অর্ধেক/বছর কাবার হয়ে যায়। অন্যথা এই বইগুলি বাইরের দোকান থেকে কিনতে হয়, হয় বেশি দামে, না অর্থপুস্তক সহ। কিশলয় কেলেঙ্কারী প্রতি বছরের সংবাদপত্রের একটা বড় খবর নয় কি? আমরা আশা করব যে এ বছর যেন সরকারের শিক্ষাবিভাগ প্রকাশিত পুস্তকাবলী সহজেই ছাত্রদের হস্তগত হয়ে পারে।

১৯৬৬ সালটা শিক্ষাজগতের একটা দুর্বৎসর হিসাবে কুখ্যাত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত কোনরকম পড়াশোনাই কিছু হয় নি। শিক্ষক ধর্মঘটের সময়ও পড়াশোনার যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটেছে, যদিও শিক্ষককর্মশাইরা পূজার ছুটি বর্জন করে তার কিছুটা পূরণ করার সৎ চেষ্টা করেছিলেন।

সরকারী কর্মচারীদের বিরাট সমাবেশ

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সমান হারে দুর্মূল্যে ভাতা ও অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার লাভের দাবিতে গত ৫ই জানুয়ারী তারিখে বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর, অন্ধ্র, কেরল, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যের সরকারী কর্মচারীরা যে প্রতীক ধর্মঘট পালন করেছিলেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে ওই দিন পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতির রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির উদ্যোগে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের এক বিরাট সমাবেশে কর্মীরা তাঁদের বেতন ও মহার্ঘ-ভাতা বৃদ্ধির দাবি ও সরকারের দমনমূলক নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। উক্ত সমাবেশে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এক প্রস্তাবে সরকারী কর্মচারীদের জন্য প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম বেতনের স্কেল নির্ধারণ, মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি বরখাস্ত কর্মীদের কাজে পুনর্বহাল, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার প্রদান, গত ১৩ই সেপ্টেম্বরের কর্তিত বেতন পুনঃপ্রদান, ছাটাই নিষিদ্ধকরণ প্রভৃতি দাবি জানানো হয়েছে। ভারতের অপরাপর অঞ্চলে সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে যে অগণতান্ত্রিক ও দমনমূলক নীতি গ্রহণ করা হয়েছে তার প্রতিবাদ এবং সরকারের নিকট অবিলম্বে খাদ্য সংকট সমাধানের কার্যকরী কর্মপন্থা গ্রহণ করা, রেশনের চালের পুরো কোটা দাবি ও স্টেট বাস কর্মচারীদের উপর থেকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহারেরও দাবি জানানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে কিছুকাল আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সরকারী কর্মচারীদের কিছু কিছু সুবিধা মঞ্জুর করেছেন, যার ফলভোগ তাঁরা করবেন আগামী ফেব্রুয়ারী থেকে। কর্মচারীদের উপর পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেটুকু সদয় হয়েছেন, তা অবশ্য কর্মচারীদের প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য।

বিষাদসিন্ধুর পর

সমীর মুখোপাধ্যায়

শোকমিছিল চলেছে। দুদিকে 'চান্দ', তারা নিশান। মধ্যে 'তাবুত'। তারপর মস্‌জিদ। দুলদুল। পাঞ্জা। তাজিয়া। একের পর এক। গায়ে মলমলের কালো জামা। সারে সারে মানুষ চলেছে। ছাতি পিটিয়ে তারা ইমাম সে বড়ে ইমাম 'হায় হোসেন হায় হোসেন' করছে। ইরানী মেয়েরাও চলেছে। জিঞ্জীরে মাতনে মেতেছে পিঠে জিঞ্জীর ছুঁড়ে ছুঁড়ে। এক-দল 'কাসিদা' ধরেছে মিঠে গলায়। আকবর যো চলে লড়নেকো—। অসহ্য একটা জ্বালাকে বুক থেকে তুলে এনে অন্যদল ছুঁড়ে দিচ্ছে বাতাসে। হায় লাল তেরে জিনেসে পরযায়ে হিলানে। সবুর আলীও মিছিলে চলেছেন। অভ্যস্ত নিয়মে 'হায় হোসেন হায় হোসেন' করছেন। 'কাসিদা'তেও মৃদুভাবে গলা মিলোচ্ছেন। মাঝে মাঝে অন্যমনস্কের মত দুলদুলটার দিকে তাকাচ্ছেন। এই সেই দুলদুল। দুলদুলের পিঠে কালও গদী ছিলো। রেকাব ছিলো। গদী থেকে ঝোলানো ছিলো কিংখাবে মোড়া তলোয়ার। আজ কিছু নেই। পিঠে চাপানো আজ সফেদা একটি চাদর। তাতে নকল রক্তের ছিটে। গায়ে বিঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে কয়েকটি ফাঁকির তীর। দুলদুলটার দিকে সবুর আলী আরেকবার তাকালেন। কতদিন থেকে, অন্ধ এক ইতিহাসের দিন থেকে তীর খাওয়া এই দুলদুল চলেছে। বহু দেশে, বহুকালে। কোথায় কুফার প্রান্তর আর কোথায় রূপনগরের চকবাজার। অদ্ভুত, অদ্ভুত। বিষাদসিন্ধুর তীর থেকে এর এই যে মহাযাত্রা, এ যাত্রার-শেষ হবে কবে? আবিষ্ট ভাবটা হঠাৎ কেটে গেল সবুর আলীর। অন্য একটি দল থেকে মকবুলের জ্বলন্ত, খুনী চোখ দুটি তাঁর দিকে মারমুখী ভংগিতে চেয়ে আছে। ঐ দুটি চোখ যেন ভীষণ খেলা চায়। কিন্তু সবুর আলীর অপরাধ কোথায়? আরে, ওটা কি হল? মোগলটুলীর হরি বাগ্‌দী দুলদুলটার পা দুধ দিয়ে ধুইয়ে দিয়ে সেই দুধ বোতলে পুরলো ছেলে, নাতির মাথায়, জিভে ঠেকাবে বলে! মহা-যাত্রার মানেটা এতক্ষণে স্পষ্ট হল সবুর আলীর কাছে? বিষাদসিন্ধুর দেশ কি কোন নির্দিষ্ট ভূগোলে আছে? নেই। পৃথিবীর প্রত্যেক কোণে আজ বিষাদ সিন্ধু পরিমাণ জমেছে। জমেছে সবুর আলীর বুকের মধ্যেও। তাই বুঝি দুলদুলটার চলার বিরাম নেই। কিন্তু মকবুলটা, অদ্ভুত এই মকবুলটা আবার ওরকম করে তাকাচ্ছে কেন? তার চোখে ছুরি কেন? ছুরিতে রক্তের ছিটে কেন? অদ্ভুত এক হাসি খেলে গেল সবুর আলীর মুখে। বছর-পাঁচেক আগে, হ্যাঁ, পাঁচ বছরই হবে, 'কাতল রাত'-এর দিন যখন রূপনগর ইমামবাড়ির মার্বেল, মেম্বর, জরী দালান রঙীন ফানুস আর রঙদার ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় হেসে উঠেছিলো, যখন 'মেম্বর'-এ উঠে খোৎবা পড়ছিলেন ইমামসাহেব উদাত্ত-স্বরে, লোবাং-এর সুগন্ধে রাত্রি যখন মদির তখন এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখেছিলেন সবুর আলী। 'হাউজ'-এর জলে ইলেকট্রিক আলোয় ধন্য লালমাছগুলির খেলা দেখ-ছিলো স্নিগ্ধ, আয়ত দুটি চোখ। এমন রূপ সবুর আলী কখনো দেখেন নি। তিনি ভুলে গেলেন তিনি রূপনগর ইমাম-বাড়ির অছি-কমিটির একজন মাননীয় সদস্য।

স্তব্ধবিস্ময়ে তিনি শুধু তার দুটি চোখের দিকে চেয়ে রইলেন।

অবশেষে শ্বেতপাথরে গড়া মোমিনা তাঁর দিকে তাকালো। সে তাকানো যেন এ পৃথিবীর নয়। মোমিনা আবছা একটু হাসলো। সে হাসিও যেন দূরকালের কোন পৃথিবীর। মোমিনা চলতে আরম্ভ করলো ঢেউ তুলে তুলে। অভিভূতের মত তাকে অনুসরণ করে চললেন সবুর আলী। 'পানিঘর'-এর পাশের সিঁড়ি বেয়ে ও প্রথমে উঠলো। তারপর তিনি। অন্ধকার আর ঘোরানো এমন সিঁড়ি যে একজন মানুষ কোনক্রমে উঠতে পারে। ঘুরে ঘুরে তাঁরা চলেছেন। খানিক পর পর জাফরি-কাটা ঘুলঘুলি। সেখান দিয়ে সামান্য আলো ছিটকে পড়েছে। আবার সব অন্ধকার। এইভাবে অন্ধকার, ঘোরানো সিঁড়ি আর জাফরি-কাটা ঘুলঘুলির কৃপণ আলো তাঁরা দুজন পার হয়ে অবশেষে একেবারে ইমাম-বাড়ির চূড়ায় যেখানে ঘড়িঘন্টা আছে সেই নির্জন, নিঃসংগতায় পৌঁছে গেলেন।

আশ্চর্য, ভারি আশ্চর্য, আলোতে যাকে মনে হয়েছিলো অপরিচিতা, অন্ধকারে, তরল অন্ধকারে তাকে চেনা চেনা লাগলো। জীবনের এই কুহকে আচ্ছন্ন হয়ে যে কথা সবচেয়ে শেষে বলতে হয়, সেই কথাটা সবচেয়ে আগে বললেন, আমি সামান্য কেরানী। আমার ঘরে চেরাগ জ্বালাবারও পয়সা নেই। তুমি কি—

মোমিনা সেই অন্ধকারে অদ্ভুত হেসে বলল, মকবুলকে তুমি ত' চেন। সে ফুফুকে বলেছে আমি তার ঘরে গেলে আমাকে সে হীরা জহরতে মুড়ে রাখবে। মকবুল, কোন মকবুল? রূপনগর ইমাম-বাড়ির ম্যানেজার মকবুল? সংগে সংগে কপালে কয়েকটা দুর্জ্ঞেয় রেখা ফুটেছিলো সবুর আলীর। সত্যি সে মস্ত ধনী আর তার ভীষণ জেদ। সে বড় কুটিল আর তার ভয়ানক রাগ। অসংখ্য হীরার কুচি ছড়ানো কালো মলমলের আকাশের নিচে, সেই নিস্তব্ধ, নিঃসংগ মিনারচূড়ায় দাঁড়িয়ে ছলছল চোখে সবুর আলী গাঢ়-স্বরে বলেছিলেন, আমার না আছে হীরা না জহরত। তোমাকে দিতে পারি শুধু 'বুদী'-র মালা। দাম দু-পয়সা।

মোমিনা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেল। তার চোখ, কান, বুক ভরে উঠলো। একটা বাঁশি বেজে উঠেছে হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। অমৃতের ধারা ক্ষরিত হয়ে পড়ছে। সবুর আলীর বুকে মাথা রেখে সোহাগে সুন্দরী মোমিনা বলেছিলো, তোমাকে দেখেছি মোগলটুলিতে অনেকদিন। শুধু আজই তোমার সংগে চেনা হল। কি সুন্দর চেনা, না?

অভিভূত সবুর আলী বললেন, আজ থেকে আমি তোমার বান্দা হলাম।

মোমিনা স্নিগ্ধস্বরে বলল, তুমি কেন তা' হবে গো। আমি তোমার কেনা বাঁদী হয়ে থাকবো চিরকাল। তারপর সবুর আলীর কম্পিত হাত থেকে 'বুদি'র মালা কেড়ে নিয়ে গলায় পরে মোমিনা গভীর আনন্দে বলেছিলো, কে বললে এর দাম দু-পয়সা? লাখো টাকা দিয়েও এমন মালা পাওয়া যায় না।

যেদিন থেকে মোমিনা সবুর আলীর ঘরে বিনা তেলে চেরাগ জ্বালাতে এলো সেদিন থেকে অবিশ্বাস্য শয়তানি জুড়েছে মকবুল। অনেক ভুলে গেছেন। ভুলতে দিয়েছেন। কিন্তু একটি দিনের ঘটনা আজো তার উত্তাপ, উষ্ণতা হারায় নি। গভীর রাত্রে যখন সমগ্র রূপনগর ঘুমে আচ্ছন্ন, পশুপক্ষী যখন নীরব, মোমিনা যখন তন্দ্রায় বেহুঁশ তখন কোন কোন দিন সবুর আলী জেগে থাকেন 'তাহাজ্জুদ' নমাজ পড়বার সময়। নমাজ শেষ করে আর অন্দরমহলে যান না। বাইরের দাওয়ায় একটা কিছু বিছানো থাকে। মশারি টাঙানো থাকে। তিনি সেই মশারির নিচে থাকেন। সেদিনও তাই করলেন। পাশ ফিরে শুতেই নরম মত কিছু একটা হাতে ঠেকে গেল। কে? অস্ফুটে চীৎকার করে উঠলেন। ততক্ষণে ফুলের পাপড়ির মত একটি কবোষ্ণ হাত তাঁর মুখ চেপে ধরেছে। এক অবাধ্য ঢেউয়ের মত সবুর আলীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এক উন্মত্ত নদী। রুমেলা বলল, আমি। রুমেলা? বদন রিক্সাঅলার কসবী বৌটা? ওর জন্যেই না বদন মদ গিলে নেশায় ভোর হয়ে থাকে? রুমেলা থাকে পাশের বাড়ি। অনেকদিন ধরেই সবুর আলী দেখেছেন রুমেলা তাঁর দিকে কারণে অকারণে নানা ভংগিতে চায়। শুনিয়ে শুনিয়ে নানা কথা বলে। ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াবে তা' অবশ্য তিনি জানতেন না। তীব্র ঘৃণায় তিনি দৃঢ় হাতে রুমেলাকে সরিয়ে দিলেন। রুমেলা খানিক থতমত খেয়ে দাঁড়ালো। তারপর সবুর আলীকে জড়িয়ে ধরে পাড়া মাথায় করা চীৎকার জুড়ে দিলো। মাঝ-রাত্রে অন্ধকারে সবুর আলীর দাওয়ায় পিলপিল করে লোক জুটতে লাগলো। রুমেলা কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমায় জোর করে, আমার নেশায় বেঁহোশ সোয়ামীর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে আমায় ফুর্ত্তি করতে চেয়েছিলো। আমি না চেঁচালে কি হত বল ত'? রুমেলাকে সবাই জানতো। তার কথা কেউ তাই তেমন আমল দিলো না। সবুর আলীকে সবাই চেনে। তাঁর সব কথাই যে সকলে অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করলো এমন নয়। তবে কেউ তাঁকে কিছু বলল না। তর্জনে গর্জনে বদন রিক্সাঅলার নেশা ছুটে গেল। সে দাওয়া থেকে নেবে এসে চুলের মুঠ ধরে রুমেলাকে নিয়ে গেলে ভিড় চলে গেল।

তখন সবুর আলী ধীরে ধীরে কাছে এলেন মোমিনার। মোমিনা বাঁশের খুঁটি ধরে মাথানিচু করে দাঁড়িয়েছিলো। কাঁধে হাত পড়তে চোখ দিয়ে অনর্গল ধারায় মুক্তাবিন্দু ঝরে পড়লো। কোন কথা আর বললেন না সবুর আলী। টলতে টলতে ভেতরে গিয়ে কম্পিত হাতে কোরান-শরীফ নিয়ে এলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, কোরান হাতে করে মিথ্যে বলবো না। রুমেলাকে ছাড়াবার জন্যে আমি শুধু ওর হাত দু'খানা ধরেছিলাম।

মোমিনা অদ্ভুত মেয়ে। কোরান ছুঁয়ে বললেও এ অবস্থায় কোন মেয়ে সহজে তার স্বামীকে বিশ্বাস করে না। মোমিনা চোখের জল মুছে ফেলেছিলো। কাছে এসে কাঁপা কাঁপা গলায় বলেছিলো, আমি তোমাকে জানি। তুমি কখনো ভুল করো না।

ইমামবাড়ি ঢোকবার মুখে মকবুলের সংগে দেখা। মকবুল কপালে হাত ঠেকিয়ে একটু হেসে জিগ্যেস করলো, কাল রাতে ঘুম হয়েছিলো সাহেব? ভালো করে তাকিয়ে দেখেছিলেন সবুর আলী মকবুলের মুখ। ভালো করে তাকিয়ে দেখেছিলেন তার হাসি। আর কিছু বুঝতে বাকী থাকে নি। এসব তাহলে মকবুলের কীর্তি। ওই টাকা খাইয়ে কসবী বৌটাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলো মশারির নিচে? ঈর্ষার জ্বালায় লোকটা একেবারে উন্মাদ হয়ে গেছে। মধুর প্রশান্তির সংগে সবুর আলী বলেছিলেন সেদিন, আল্লা আপনার মংগল করুন। কাল রাতের মত অতো সুখের রাত আমার কখনো আসে নি। সংগে সংগে মকবুলের মুখ কালো, কষ্টিপাথরের আকার ধারণ করেছিলো। আর বিদ্বেষশূন্য প্রাণখোলা হাসিতে তিনি ভেঙে পড়েছিলেন।

শোকমিছিল এবার বারোদুয়ারীর ভেতর দিয়ে চলেছে। কোথায় নবাব খাজা খান? আর কোথায় বারোদুয়ারীর প্রবেশদ্বার? বারোদুয়ারীর কোন দুয়ারই আজ আর অবশিষ্ট নেই। মিছিলটা আগের চেয়ে এত বড় হয়ে গেল কি করে? ঠিক চেনা যাচ্ছে না। ষণ্ডা ষণ্ডা ওরা কারা বুক চাপড়াতে চাপড়াতে চলেছে? ওরা আড়ে আড়ে একবার তাঁর দিকে একবার সোনার পাঞ্জাটার দিকে তাকাচ্ছে কেন? আবার মকবুলের সংগে তাঁর চোখাচোখি হল। দাঁতে ছুরি নিয়ে লোকটা হাসছে। ইতর, অতি ইতর। মোমিনাকে অসভ্যতার শুদ্ধি করিবার পর এখন ইমামবাড়িকে নিয়ে পড়েছে। ইমামবাড়ি। তাঁর সাধের, স্বপ্নের ইমামবাড়ি। এই ইমামবাড়িতে তিনি মোমিনাকে

পেয়েছিলেন। তারপর থেকে মোমিনার মতই ইমামবাড়িকেও ভালোবেসে ফেলেছেন। মোমিনার প্রতি ভালোবাসাই ইমামবাড়িকে তাঁকে চিনতে শিখিয়েছিলো। ফজরের নমাজের পর গংগায় স্নান সেরে যখন সবুর আলী ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতেন তখন ইমামবাড়ি তার সদ্য ঘুমভাঙা সুরমাটানা চোখে তাঁর দিকে তাকাতো। তিনি তার সেই গম্ভীর, বিশাল, মৌন রূপে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে যেতেন। রূপনগর ব্রিজের ওপর দিয়ে গুমগুম শব্দে ট্রেন চলে গেলে তবেই তাঁর তন্ময়তা ভাঙতো। গড়ান বেলায় কতদিন তিনি আর মোমিনা গংগায় কিস্তি ভাসিয়ে যেতে যেতে ইমামবাড়ির দিকে চেয়ে চেয়ে দেখেছেন। সূর্যের শেষ রাঙা আলো এসে পড়েছে দুটি মিনারচূড়ায়। মিনার শীর্ষে চাপানো তামার পাত দেওয়া সোনার জলের কাজ ধরানো কলসীগুলি হীরা জহরতের মত ঝকমক ঝকমক করছে। আর সেই শান্ত, উদাস, গম্ভীর ইমামবাড়ি সবহারানো, ঘরছাড়ানো দেওয়ানা সুরে ভেসে চলেছে অনাদি, অনন্তের উদ্দেশে। সাঁঝবেলায় অসংখ্য বাতিদানে বাতি জ্বলতো। যেন মশাল জ্বালিয়ে হাসানের কাসেম চলেছে বিয়ের পয়গাম নিয়ে সাধ্বী জয়নাবের কাছে। মধ্যরাত্রে কোন কোনদিন ইমামবাড়ির পেটাঘন্টায় ঘুম ভেঙে গেলে সবুর আলীর এই হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়া ভারি অদ্ভুত লাগতো। এই প্রতিদিনের চোখে দেখা রূপের সংগে মিশলো আরেক রূপচেতনা। কালেকটরীর লাইব্রেরীর পোকায় কাটা, জরাজীর্ণ, পুঁথিগুলি ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ কখন একদিন তিনি অজান্তে খানিকটা মণিমাণিক সবুর আলী ছুঁয়ে ফেললেন। কোন সুদূর অতীতে একজন পারসিক সওদাগর খানিকটা নিমক বেচতে এসে এই রূপনগর বন্দরে তাজিয়াখানা বানিয়ে ফেললেন। সেই সওদাগরের নওজোয়ানী বিধবা আওরত রূপের হাটে নিজেকে না বেচে এই তাজিয়াখানাকে বিশাল ইমারতে পরিণত করলেন। সেইসব কাহিনী পাঠ করতে করতে তিনি একেবারে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতেন। এই রূপচেতনা প্রখর হল অছি-কমিটির মেম্বর হিসেবে কাজ করতে নেবে সাধারণ অজ্ঞ, মূর্খ মানুষের সহজ বিশ্বাসের দৃঢ়তার পরিচয় পেয়ে। প্রতিদিনই দেখেন কত দূরদূরান্ত থেকে মেয়ে, পুরুষ এসে 'হাউজ'-এর জল বোতলে ভরে নেয়।

তাদের স্থিরবিশ্বাস এই পানি জিভে, মাথায় ঠেকালে নির্ঘাৎ পরমায়ু দশগুণ বেড়ে যাবে। তিনি এদের সংগে মিশে জেনেছেন এদের বদ্ধমূল ধারণা ইমামবাড়ির ঘড়ি একবারমাত্র কোন সুদূর অতীতে আল্লা বাজিয়ে দিয়েছেন। তারপর থেকে সেটা বেজেই চলেছে। এটা বাজবে রোজ কেয়ামতের দিন পর্যন্ত। তার জন্যে দম দিতে হবে না। মেরামত করতে হবে না। এই যে রূপনগর ইমামবাড়ি, এখানেই আছে হাসান-হোসেনের, হজরত আর ফাতেমার আসল ঘরবাড়ি। যারা বলে ওঁদের আসল ঘরবাড়ি মক্কামদিনায় তারা এদের স্থির, সনাতন বিশ্বাসের কোন খবরই রাখে না। ভুলগুলি প্রথম প্রথম তিনি নির্মম হেসে ভাঙতে চেয়েছেন। হাত থেকে বোতল কেড়ে নিয়েছেন। বলেছেন, বিষ, সাক্ষাৎ বিষ আছে ওতে। এভাবে পুণ্য অর্জন করা যায় না। প্রাণভরে খোদাতায়েলাকে ডাকো। তাতেই শান্তি। ওরা শোনে নি। না শুনুক। তিনি ওদের ভালোবাসতে বাসতে শেষ পর্যন্ত ওদের ভুলগুলিকে ভালবেসে ফেলেছেন।

আর সেই ইমামবাড়িতে ঢুকে একদিন তিনি তাজ্জব হয়ে গেলেন।

মিনারটার চূড়ায় বসানো সোনার জলের কাজ ধরানো অনেকগুলি কলসী তিনি দেখলেন উধাও হয়ে গেছে। বাইশটা ছিল। দশটা আছে। কাল পর্যন্ত ঠিক ছিল। আজ তারা গেল কোথায়? পারতপক্ষে সবুর আলী রূপনগর ইমামবাড়ির ম্যানেজার মকবুলের সংগে কথা বলতেন না। অদ্ভুত ঐ মানুষ। সোজাভাবে কখনো কথা বলতে পারে না। সহজ চোখে তাকাতে পারে না। টাকার দেমাকে ধরাকে সরা জ্ঞান করে। আর তাঁর ওপর যেন জাতক্রোধ। হাতের মুঠোয় পেলে যেন ছাল ছাড়িয়ে নেবে। কিন্তু এখন ত' মকবুলকে তলব করতেই হয়। কথাটা শুনে মকবুল প্রথমটায় ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেল। যেন আজগুবী গল্প শুনছে এমন মুখচোখের ভাব করলো। তারপর চারিদিকে ভালো করে চেয়ে নিয়ে গলা খাদে নাবিয়ে বলল, আপনি ঠিক বলেছেন সাহেব।

বারোটাই খোয়া গেছে। কিন্তু গেল কেমন করে বলুন ত'? সন্ধান দিতে পারেন? সন্ধান পাওয়ার জন্যেই ত' আপনাকে এত্তেলা দিলাম। সবুর আলী মকবুলের দিকে স্থির, প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাকালেন।

উসখুস উসখুস করে উঠলো মকবুল। মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, সন্ধানের জন্যে যখন তলব করেছেন তখন আমি যা' যা' জানি, সব বলতেই হয়। চুরি শুধু এর ওপর দিয়েই যায় নি।

মেহমানদের যেসব বাসনকোসন বাইরে কলাইগারের কাছে যায় সেগুলো শেষ পর্যন্ত সবই ফেরৎ আসে না।

সবুর আলীর মাথায় বজ্র ভেঙে পড়লো। হে আল্লা, হে খোদাতায়েলা, তুমি নূরের কিস্তি রক্ষা করেছো। ইব্রাহিমকে আগুন থেকে বাঁচিয়েছো। মুসাকে ফেরাউনের জুলুম থেকে উদ্ধার করেছো। আল্লা মেহেরবান। আমাকেও এসব হারাম থেকে বাঁচাও

আরো আছে। মকবুল মাথা চুলকে, চতুর হাসিটা গোপন করে বলল, আরো আছে সবুর সাহেব। এ পাপের এখানেই শেষ নয়। একদিন অন্ধকার রাত্রে ইমামবাড়িতে ঢুকে দেখি কানা এক ছুতোর-মিস্ত্রীকে। সে হাতে চাবির গোছা নিয়ে সোনাচাঁদির ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখে যেন ভূত দেখলো। চমকে উঠে বলল, সবুর সাহেব আমাকে পাঠিয়েছেন। সকালে আসতে বলেছিলেন। কাজ ছিল তখন তাই আসতে পারি নি। এখন এলাম। বার্নিস করতে হবে। বার্নিস করতে হবে? এত রাত্রে বার্নিস করতে হবে? আমি লাথি মেরে লোকটাকে ভাগিয়ে দিলাম।

এসব আপনি আগে বলেন নি কেন? গর্জন করে উঠলেন সবুর আলী। চতুর মকবুল ধূর্ত হেসে বলল, বললে আর কি হত বলুন? মোমিনাকে নিয়ে আপনি একেবারে মশগুল হয়ে আছেন। আপনার এসব ঝামেলা ভালো লাগবে না জেনেই নিজেই নিজের তকলিফ বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। আপনি চুপ করুন। চিৎকার করে উঠলেন সবুর আলী। ইবলিশের মুখে মোমিনার নাম? তিনি টেনে জিভ মকবুলের ছিঁড়ে ফেলবেন আর একবার যদি শয়তান মোমিনার নাম নেয় মুখে।

হয় আপনি বারোটা কলসীর হিসেব দাখিল করবেন নয়তো একাজ থেকে ডিসমিস হয়ে যাবেন। রাগে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলেন সবুর সাহেব কলার বাকলের মত। অতিশয় দুঃখিত হল মকবুল। একবার ফোঁস করে প্রকাণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। গলাটা কায়দামাফিক ভেঙে গেল। কাঁদো কাঁদো গলায় মকবুল বলল, ঠিক আছে সাহেব। দেখা যাচ্ছে আপনি আমায় সন্দেহ করছেন। আপনি যা' চান তাই হবে। কাল থেকে আমি আর ইমামবাড়িতে আসবো না।

মকবুল ডিসমিস হয়ে গেলে সোনাচাঁদির সিন্দুক খুলে পাওয়া গেল একটা সাদা, ইনভ্যালিড রেজিস্টার। তাতে আগেকার ম্যানেজারদের কোন স্বাক্ষর নেই। কয়েকটি ঝুটো জিনিসের ফিরিস্তি দিয়ে তার তলায় মকবুলের বড় নির্দোষ একটি স্বাক্ষর। সমস্ত ব্যাপারটাই জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল সবুর আলীর কাছে। তারপর থেকে যুদ্ধের নাকাড়া কখন বেজে উঠেছে। মামলা করেছেন সবুর আলী মকবুলকে চোর সাব্যস্ত করে। মকবুলও তাঁর নামে অদ্ভুত ক্ষিপ্র-

তায় কুড়িটা ফৌজদারী [illegible] ঝুলিয়ে দিয়েছে। এই সব মামলার হাতীর খোরাক মেটাতে তিনি ক্রমশ শেষ হয়ে যাচ্ছেন। ঘড় বড় দুটি বাগিচা তাঁকে জলের দরে বিক্রি করতে হয়েছে। তবু শির তিনি নত করেন নি। দৌলতের সামনে খাড়া রেখেছেন গর্দান।

যে ইমামবাড়ি তাঁকে মোমিনা দিয়েছে সেই সোনার ইমামবাড়িকে তিনি বেইজ্জৎ হবার জন্য শয়তানের হস্তে তুলে দেবেন না। মধ্যে কিছু লোক ইমামবাড়িতে ঢুকে পড়ে। তখন আশেপাশে লোকজন ছিলো না তেমন। তাঁর হাতে ছিল চাবির গোছা। চাবির গোছার ওপর এসে পড়লো জোরালো লাঠি। হাতটা অবশ হয়ে গেল সবুর আলীর। সেই অবস্থাতেও চাবির গোছা তিনি ছাড়েন নি। তিনি চেঁচিয়ে উঠতেই ভীরুরা পালাতে পথ পায় নি। সকলের সংগে তাঁরও অনুমান এ সব মকবুলেরই কীর্তি। সেই মদত দিচ্ছে পেছন থেকে। নানা রঙের শত্রুতা। তাঁর এস্টেটের অধীনে যে সব বাজার আছে, বাড়ি আছে তাদের কাছে তিনি যখন ভাড়া আদায়ের জন্যে লোক পাঠান, তখন তারা তাঁর লোকদের বলে, ভাড়া তো নিয়ে গেছে মকবুলের লোক। ইমামবাড়ির কোথায় কে বদল হল অত তারা জানে না। পাকা রসিদ দেখে তারা ভাড়া দিয়েছে।

পরবের কিছু আগে দেয়ালে প্লাস্টার ধরানোর জন্য মিস্ত্রীদের ডেকে পাঠালেন তিনি। তারা আজ নয় কাল বলে টাল-বাহানা করে পরব পার করে দেবার পর এলো। বিরক্ত হয়ে সবুর আলী তৎক্ষণে অন্য মিস্ত্রী লাগিয়েছেন। পরবে যারা যোগ দেবে তাদের চোখে তাঁর অযোগ্যতা সপ্রমাণ করবার জন্যে এ মকবুলেরই আরেক খেলা।

এ কি, শয়তানের দল এভাবে তাঁর ওপর চড়াও হতে চাইছে কেন? কিছু একটা মতলব আছে নাকি? হঠাৎ মকবুল তীরের মত দল থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো সবুর আলীর সামনে। চিৎকার করে বলল, চেল্লাতে চেল্লাতে মুখে ফেকো উড়ছে। একটু পানি, একটু সরবতের পর্যন্ত ব্যবস্থা নেই যত সব বাজে লোক ঢুকেছে ইমামবাড়িতে।

জন কুড়ি লোক হৈ-হৈ করে উঠলো। মারমুখী ভঙ্গীতে সামনে এগিয়ে এলো। আর কিছু লোক ঘন ঘন মসজিদের ওপর-কার সোনার পাঞ্জাটার দিকে তাকাতে লাগলো। সবুর আলী কিছু বললেন না। বললেন না, পানি, সরবতের বন্দোবস্ত অঢেল। ঝুটমুট যারা গোলমাল পাকাতে চায় তাদের জন্যে অবশ্য কোন বন্দোবস্ত নেই। কিন্তু সেসব কোন কথার ধার দিয়েও গেলেন না। ভেতরে ভেতরে একটা গভীর ষড়যন্ত্রের তিনি ঘ্রাণ পেলেন। কোনরকমে ভিড় কাটিয়ে তিনি শোক-মিছিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। মসজিদ নাবাও। হুকুম দিলেন তিনি মসজিদ নাবাতেই তিনি গামছায় বেঁধে ফেললেন পাঞ্জা। ব্যাপারটা সুবিধের লাগছে না মোটেই। এটাকে সোনাচাঁদির ঘরে নিয়ে যাওয়াই তিনি ঠিক করলেন। মকবুলের দল যখন দেখলো আসল মাল পাচার হচ্ছে তখন চোখে চোখে তাদের ইশারা খেলে গেল। পাঁচজনে পাঁচজনে তারা ভাগ হয়ে নানা রাস্তায় ছড়িয়ে পড়লো। যেদিকেই ছুটে ছুটে যান সবুর আলী সেদিকেই দেখেন তারা পাঁচজন। গোলমালে কিরকম বিভ্রান্ত হয়ে তিনি একেবারে খোদ কার-বালায় পেঁছে গেলেন।

দুলদুলটা কখন দলছাড়া হয়ে প্রান্তরের মাটিতে বসে পড়েছে। বুকটা হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠলো সবুর আলীর। হাজার হাজার বছর আগে কার যেন ঘোড়ার ক্ষুর মাটিতে দেবে গিয়েছিলো? দূরদূরান্ত থেকে 'হায় হোসেন হায় হোসেন' রব শুনতে পেলেন তিনি। একপাশে কাঁটাগাছের ঝোপ। অন্য পাশে ধু ধু, রোদে পোড়া, প্রকাণ্ড প্রান্তর।, বুকটা কেঁপে উঠলো সবুর আলীর। প্রভু মহম্মদের ভবিষ্যদ্বাণী মনে পড়লো। অদূরে দত্ত-পুকুর। ওর চারপাশে মেলা বসেছে। বহু মানুষ কলরব করছে। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। হঠাৎ মাথায় লাঠি পড়লো। আয় বাপ। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো। সবুর আলী ছিটকে মাটিতে পড়ে গেলেন। আবার পড়লো পিঠে। মাটিতে তিনি শুয়ে পড়লেন। দূর থেকে কাসিদা ভেসে এলো কানে। মিঠে গলায় কে গাইছে—

বে গোড় কাফন খাকসারে
চাঁদ পড়া হ্যয়
কেয়া জুলুম হুয়া হ্যয়.....

আস্তে আস্তে তিনি জ্ঞান হারালেন। জ্ঞান যখন ফিরে এলো তখন দেখেন চারিপাশে বন্ধু, আত্মীয় পরিজন দাঁড়িয়ে। আর সকলে মিলে ধরে রেখেছে সেই জালিম মকবুলকে। এ কি তার মাথায়, মুখে এত খুন কেন? তিনি তাকালেন মকবুলের দিকে। মকবুল মাথা নিচু করলো।

কে একজন মকবুলকে সজোরে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল—এ খুনী শালাকে নিয়ে কি করা যায় সবুর সাহেব? সকলে বলল, কি করবো বলুন!

বহুযুগের জমা করা এক অতৃপ্ত পিপাসা নিয়ে তিনি তাকালেন দত্ত-পুকুরের দিকে। দেখতে দেখতে ওটা হয়ে গেল দুরন্ত দুঃখে সুবিশাল হাজার বছরের পুরাতন ফোরাত নদী। মানুষের অজ্ঞতায় একদিন বড় বেশি হেসেছেন সবুর আলী। আজ এই অজ্ঞতা-আকীর্ণ কারবালাই তাঁর কাছে জীবন্ত, উজ্জ্বল আকাঙ্ক্ষার দাস্ত কারবালা হয়ে উঠেছে। বহুযুগের ওপার থেকে তীরবিদ্ধ, রক্তাক্ত দুলদুল তাঁর দিকে চেয়ে রয়েছে। আমি আমি কে? দুলদুলটার দিকে আরেকবার তিনি তাকালেন। তার রেকাব নেই। গদী নেই। কোমরে ঝোলানো তলোয়ার নেই। শুধু আছে খুন তার সর্বাঙ্গে। সে ইমাম গেলেন কোথায়? খুন মাখা হাতে বুক চাপড়ালেন তিনি। কে হোসেন? হোসেন কার নাম? তাঁর এখনো কি বুঝতে বাকী আছে এই মুহূর্তে তিনি কে? সমস্ত দেহ তাঁর আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। এত বড় আনন্দের সংবাদ কি আর কাউকে দেওয়া চলে। এ শুধু মুহূর্তের অনুভব। তা' হোক। কিন্তু এ মুহূর্তেই যে সারা জীবনের আনন্দ উপভোগ করা গেল। বিশ বছর ধরে এই পথে তিনি গেছেন। বিশ বছর ধরে তিনি ফের এই পথে যাবেন। কিন্তু এমন একটা গভীর মগ্নতা আর কোনদিন আসবে না।

এ আনন্দের পয়গাম যে বহন করে নিয়ে এলো তার হাতে ঘাতকের ছুরি ঝলসালেও সে ত' ইবলিশ নয়। সে এজরাইল। স্বর্গের দূত। রাজা আল্লাহো আনহু। খোদা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। আলায়হে রহমত। ক্ষয় আর অপচয়ের ভেতর থেকেও সবুর আলী স্নিগ্ধ ইচ্ছার কণ্ঠস্বরে বললেন, বেকসুর খালাস। মকবুলকে ছেড়ে দিন।

রোমাঞ্চ-রহস্য গ্রন্থ

রক্তনদীর ধারা

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল

রক্তনদীর ধারা মাসিক বসুমতীর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। রোমান্স ও রোমাঞ্চের সত্য ঘটনায় বইটির আদ্যোপান্ত পরিপূর্ণ। রক্তনদীর ধারা জীবনের অভিজ্ঞতা নয়; জীবনপথের দিক-নির্দেশ। তাই প্রবঞ্চনা, ছলনা ও প্রেমের লীলায় চাঞ্চল্যকর বইটি চাঞ্চল্য তুলেছে সকল সমাজেই।

লোমহর্ষক সামাজিক কাহিনী।

মূল্য ঃ চার টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

এইচ. জি. ওয়েলস-এর গল্প

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

দ্বাদশ অধ্যায় ঃ 'দি ইনভিজিবল ম্যান' (প্রথমার্ধ)

আপনার সাহসের দুর্গটি কি হিমালয়ের মতো আকাশস্পর্শী? ভয়-ডর ছায়া ফেলে না সেখানে? বাইরের কোনো প্রভাব সহজে তাকে কাবু করে না? না কি আপনি ভীতু ধরণের? একা ঘরে ঘুমোতে ভয় পান? নিরালা পথ ধরে চলতে বুক ঢিপ ঢিপ করে আপনার? যদি শেষেরটি সত্যি হয় তবে অনুগ্রহ করে একটি অনুরোধ রাখবেন; ওয়েলস-এর 'দি ইনভিজিবল ম্যান' পড়বেন না। কারণ, এ বই পড়লে ভয় আরও বাড়বার সম্ভাবনা। এর 'অদৃশ্য মানুষ'টি রাত দুপুরে আপনার শান্তি নষ্ট করতে পারে। নিশুতি রাতে হঠাৎ দরজায় করাঘাত হয় যদি অথবা যদি আপনার শোবার ঘরের জানালা হঠাৎ খুলে যায়, তবে হয়তো আপনি অশুভ ও অদৃশ্য কোনো কিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারেন। 'দি ইনভিজিবল ম্যান' এমন কি সারা জীবন ধরে আপনার কাছে এক দুর্ভাবনার বস্তু হতে পারে। কেন বলছি এ কথা, মূল কাহিনীটি শুনলেই তা' বুঝবেন। স্পষ্টই স্বীকার করবেন তখন যে ওয়েলস সম্পূর্ণ এক অবিশ্বাস্য ঘটনাকে এখানে পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। এবং সে কারণেই 'দি ইনভিজিবল ম্যান'-এর অস্তিত্বকে বিশ্বাস করার জন্যে আপনার দুর্বলতা যতটা দায়ী, ওয়েলস-এর কৃতিত্ব দায়ী তার চেয়ে অনেক বেশি। ওই কৃতিত্বের পরিমাপ করতে হলে সর্বাগ্রে মূল কাহিনীর অন্তত প্রথম পর্বটি জানা দরকার। সংক্ষেপে তা' এইরকম।

এক ফেব্রুয়ারীর দিন। তুষারপাত হচ্ছে চারদিকে। হাড়-কনকনে ঠান্ডা হাওয়া বইছে। ইংল্যান্ডের ইপিং অঞ্চলটি দারুণ শীতে জড়োসড়ো। এমন সময় ব্রেমবলহাস্ট রেল স্টেশন থেকে পায়ে হেঁটে এগিয়ে এল একটি লোক। ইপিং-এর এক সরাইখানা 'কোচ অ্যান্ড হর্সেস'-এর দিকে এগোল। লোকটি দেখতে অদ্ভুত। তার আপাদমস্তক জামা-কাপড়ে আচ্ছন্ন। তা' ছাড়া হাতে দস্তানা, মাথায় টুপি, মুখে ব্যান্ডেজ, চোখে গগ্‌লস্। একমাত্র নাকটি ছাড়া দেহের আর কোনো অংশই অনাবৃত নেই তার। সরাইখানায় পৌঁছেই আশ্রয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল সে। গরম হবে বলে আগুন চাইল।

সরাইখানার কর্ত্রী মিসেস হল সানন্দে অভ্যর্থনা করলেন তাকে। অসময়ে খদ্দের পেয়ে সাগ্রহে একটি ঘর ছেড়ে দিলেন। অনেক চেষ্টা করলেন আগন্তুককে খুশি করতে। কিন্তু কিছুতেই মন পেলেন না তার। বরং দেখলেন, খদ্দেরটি বড় বদমেজাজী আর বড় রহস্যময়। আগুনের কাছে থেকেও সমস্ত দেহ সে ঢেকে রাখে, তার মুখের এখানে-সেখানে ব্যান্ডেজ, আর ঠোঁট ও চোয়ালের সামনে ঝোলান গামছা বা সাদা কাপড়। কাপড় দিয়ে মুখে ঢেকেই কথা কয় সে। কখনও আবার হঠাৎ রেগে যায়। সর্বক্ষণই একা বসে থাকে আগন্তুক। নিজেকে দশজনের কাছ থেকে আড়াল করে রেখে অন্ধকারে একা থাকতেই তার বেশি পছন্দ।

এদিকে বিকেল চারটে নাগাদ ঘড়ির কারিগর মিঃ টেডি হেনফ্রি এল। সরাই-খানায় মদ খেতে এসেছিল সে। মিসেস হল তাকে একটি ঘড়ি সারিয়ে দেবার জন্যে ধরলেন। ঘড়িটি ছিল আগন্তুকের ঘরে। মিসেস হল ভাবলেন, সে ঘরে গিয়ে কাজকর্ম করার আগে আগন্তুকের অনুমতি নেওয়া দরকার। তাই তিনি একবার সেদিকে গেলেন। কিন্তু ঘরে ঢুকেই বিস্ময়ে হতবাক হলেন তিনি। মুহূর্তের জন্যে যেন তার মনে হল, আগন্তুকের মুখ-গহবরটি অদ্ভুত ও অতিকায়। যেন রাক্ষসে আকারের ওটা। মুখের তলার দিককার প্রায় সমস্তটা অংশই ওর মধ্যে ঢুকে আছে। পলকের মধ্যে এ দৃশ্য দেখলেন তিনি। যেন তার মনে হল, আগন্তুকের সাদা কাপড়ে ঢাকা মাথা ও বিরাট গগল্ পরা চোখের ঠিক তলাতেই ওই কিম্ভূত-কিমাকার মুখ।

খানিক পরে মিঃ টেডি হেনফ্রি এল আগন্তুকের হাব-ভাব ও পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে তারও বিস্ময়ের অবধি রইল না। লোকটির দেহে ব্যান্ডেজের বাহুল্য ও চোখে বিদ্ঘুটে গগল দেখে স্তম্ভিত হল সে। ভাবল, ওই অবাঞ্ছিতটির সঙ্গে আলাপ জমান যাক। এদিকে আলাপের ব্যাপারে অপরপক্ষের আগ্রহ ছিল না মোটেই। কিন্তু টেডি হেনফ্রি নাছোড়-বন্দা। ঘড়ি সারাতে অযথা দেরি করতে লাগল সে; এবং মাঝে মাঝে আগন্তুকের সঙ্গে কথা-বলার ফিকির খুঁজতে লাগল। আগন্তুক টেডিকে মোটেই আমল দিল না। বরং মিসেস হলের কাছে ব্যক্তিগত কিছু কথা বলল। বলল যে, সে একজন বিজ্ঞানী; পরীক্ষাসিদ্ধ পর্যবেক্ষণ করাই তার কাজ। তার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কিছু যন্ত্রপাতি স্টেশনে পড়ে আছে। খুব শীগ্‌গির সেগুলো এখানে পৌঁছুন দরকার। যন্ত্রপাতি-ভরা ওই লগেজ-গুলোর জন্যে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে আছে সে। আর সে চাইছে চুপচাপ থাকতে। কাজের মধ্যে কেউ এসে অসুবিধে সৃষ্টি করুক, এ তার মোটেই ইচ্ছে নয়।

এদিকে আগন্তুকের সঙ্গে কথা জমাতে না পেরে টেডি খুব বিরক্ত হল। আপন মনে গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গেল সে। তুষারে ঢাকা ইপিং-এর উপর দিয়ে এগোল। সিডডারব্রিজ স্টেশনের কাছে তার সঙ্গে মিঃ হল-এর দেখা।

এই হল মানুষটি বড় সন্দেহ-বাতিক-গ্রস্ত। কিছুকাল আগে মিসেস হলকে বিবাহ করেছে সে। তারপর ওরা দুজনে মিলে ইপিং-এর সরাইখানাটি গড়ে তুলেছে। মিঃ হলের কাছে আগন্তুক সম্বন্ধে অনেক কথা লাগাল টেডি। বলল যে, নূতন অতিথিটি সুবিধের নয় মোটেই। তার চালচলন, পোষাক-পরিচ্ছদ সব কিছুই বড় বেশি রহস্যময়।

একরাশ আশঙ্কা নিয়ে ঘরে ফিরল মিঃ হল। স্ত্রীকে নানারকম প্রশ্ন করল; এবং শেষ অবধি স্থির করল, আগন্তুকের উপর করা নজর রাখা দরকার।

পরদিন আগন্তুকের লাগেজ এসে গেল। তার মধ্যে ছিল দুটি ট্রাংক, এক বাক্স বই এবং বারো-চোদ্দটি বাক্স-ভর্তি কাঁচের বোতল, টেস্ট টিউব ইত্যাদি। মালপত্রগুলো আনা হল মিঃ ফিয়ারেনসাইড-এর গাড়িতে করে। সঙ্গে একটি কুকুর ছিল তার। কুকুরটি মালপত্র

ঘুমাবার অবসরে আগন্তুককে কামড়াতে গেল। ফিয়ারেনসাইড সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল তখন, আগন্তুকের হাত-পা ঠিক যেন নজরে পড়ছে না। একবার ভাবল সে, অতিথিটি অস্বাভাবিক কালো হয়তো। হয়তো সে কারণেই হাত-পায়ের অনাবৃত অংশগুলো চোখে পড়ল না।

ওদিকে আগন্তুক তার জিনিসপত্রের প্যাকিং খুলতে সুরু করেছে। নিজের ঘরে বোতল-ভর্তি বাক্সগুলোকে নিয়ে পড়েছে সে। মিঃ হল ভাবল, তার অতিথিকে কুকুরে কামড়েছে; কর্তব্যের খাতিরে একবার ওর খবর নেওয়া দরকার। কিন্তু অতিথির ঘরে গিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হল সে। দেখল, অতিথির একটা হাত যেন অদৃশ্য; এবং তার দিকে ওটা নেড়ে কী যেন বোঝাতে চাইছে সে। অতিথির মুখের দিকে চোখ পড়তেই বিস্ময়ের অবধি রইল না তার। মনে হল, ওর মুখটা যেন শূন্য; আর সেই শূন্যের মধ্যে তিনটি সাদা বিন্দু জ্বল জ্বল করছে। পর মুহূর্তেই কে যেন প্রচণ্ড জোরে হলকে আঘাত করল। তাকে জোর করে ঘর থেকে বের করে দিয়ে মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিল। সমস্ত ঘটনাটা ঘটল এত তাড়াতাড়ি যে হল ভালভাবে কোনো কিছু বোঝবার অবকাশ পেল না। কিন্তু আগন্তুক সম্বন্ধে তার সন্দেহ ও সংশয় ক্রমেই বেড়ে চলল। এই সন্দেহ আরও ঘনীভূত হল ব্যবসায়ী মিঃ হাকসটার ও মিঃ স্যাণ্ডি ওয়েজারস্-এর আবির্ভাবে। ওদিকে মিসেস হলও আগন্তুকের ঘরে ঢুকে বিভ্রান্ত হলেন। হঠাৎ মনে হল তার, আগন্তুকের চোখের কোটর দু'টি যেন অস্বাভাবিক গভীর।

মিসেস হলের এই বিভ্রান্তি অবশ্য মুহূর্তের মধ্যেই কেটে গেল; আগন্তুক গগল্ চোখে দিল আবার। কিন্তু কোচ্ অ্যান্ড হর্সেস'-এর মদের দোকানে সমাগত অনেকেই ভেবে পেল না, কে এই আগন্তুক? কি চায় সে?

দেখতে দেখতে দীর্ঘ দু' মাস সময় পেরিয়ে গেল। এর মধ্যে ইপিং গ্রামের সরাইখানার ওই রহস্যময় লোকটি সম্বন্ধে এর বেশি কিছু জানবার অবকাশ কারও হল না। নিজেকে সকলের কাছ থেকে আড়াল করে রাখল সে। দিনের বেলায় সে কদাচিৎ বাইরে যেত। কিন্তু সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলো-আঁধারিতে প্রতিদিন বাইরে থেকে একটু ঘুরে না এলে তার চলত না। গ্রামের সবচেয়ে নির্জন পথ ধরে বেড়াত সে। পথে কারও সঙ্গে কথা বলত না। অবশ্য কথা বলার আগ্রহ বাইরের কারও ছিল না। সবাই এড়িয়ে চলত তাকে। ছেলেমেয়েরা তাকে আদৌ পছন্দ করত না। তার মাফলারে ঢাকা, ব্যাণ্ডেজে আচ্ছন্ন কিম্ভূতকিমাকার চেহারা দেখে ভয় পেত। এ ছাড়া সরাইখানার মালিক মিঃ ও মিসেস হলও মোটেই খুশি ছিল না তার উপর। যখন-তখন রেগে যেত সে। ঘরের জিনিসপত্র তছনছ করত। বসে থাকত জানালার পর্দা টেনে দিয়ে। দরজা সর্বক্ষণ বন্ধ থাকত তার। অন্ধকারে নিরিবিলি থাকতেই তার ভাল লাগত। আর পৃথিবীতে কোথাও তার কোনো বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয় আছে বলে মনে হত না। এমন কি রোববারের উপাসনার সময়েও তাকে কেউ কোনদিন গীর্জায় দেখে নি।

মিঃ কুশ ছিলেন ইপিং গ্রামের এক চিকিৎসক। আগন্তুকের ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা অদ্ভুত চেহারা দেখে কৌতূহল হল তার। তিনি ঠিক করলেন, কোনো এক অজুহাতে ওই রহস্যময় লোকটির সঙ্গে একদিন কথা বলে আসবেন। কিন্তু কথা বলতে গিয়ে ভয়াবহ এক অভিজ্ঞতা হল তার। প্রসন্ন মুখ নিয়েই তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। অনুরোধ জানিয়েছিলেন গ্রামের এক নার্সের সাহায্য-তহবিলে চাঁদা দিতে। কিন্তু সেখান থেকে তিনি ফিরে এলেন মুখ কালি করে। এক অলৌকিক অভিজ্ঞতা তার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দিল। স্পষ্টই দেখলেন তিনি, আগন্তুক জামা পরে আছে বটে; কিন্তু তার ভিতরে হাত নেই। জামার হাতাটা মিঃ কুশের দিকে বাড়িয়ে দিল আগন্তুক। মিঃ কুশ দেখলেন, শুধুমাত্র একটা জামার হাতা তার দিকে এগিয়ে আসছে। তারপরেই আঙুল দিয়ে কে যেন তার নাক চেপে ধরেছে। অথচ কোথাও কোনো হাত বা আঙুল দেখতে পেলেন না তিনি। কিন্তু ওদের অস্তিত্ব অনুভব করলেন মর্মে মর্মে। এই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার পর আগন্তুকের ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলেন তিনি। ছুটে গেলেন গ্রামের ধর্মযাজক মিঃ বানটিভ-এর বাড়িতে। সব কথা খুলে বললেন তাকে। বানটিভ স্তম্ভিত হলেন।

কিন্তু ঠিক এর পরেই যা' ঘটল, তা' শুনে সমস্ত ইপিং-এর স্তম্ভিত হবার পালা। হঠাৎ এক ভোর-রাত্রিতে চুরি হল বানটিভের বাড়িতে। অদ্ভুত সেই চুরি। চোরের পদশব্দ শুনতে পেলেন মিসেস বানটিভ। স্পষ্ট বুঝলেন, বাড়িতে অবাঞ্ছিত কেউ অনুপ্রবেশ করেছে। সঙ্গে সঙ্গেই হুড়মুড় করে উঠে পড়লেন তিনি। মিঃ বানটিভের ঘুম ভাঙালেন অতি সাবধানে। তারপর সারা বাড়ি ঘুরে বেড়ালেন ওরা। স্পষ্ট বুঝলেন যে ওদের আশেপাশেই চোর রয়েছে। কিন্তু কিছুতেই তারের হদিস পেলেন না। দেখলেন, ড্রয়ার খোলা, আলো জ্বলছে ঘরে; কে যেন মোমবাতি জ্বালিয়েছে। ড্রয়ার থেকে সোনা ও অর্থ নিয়েছে চোর। একবার মনে হল বানটিভদের যে অবাঞ্ছিতটি পাশের ঘরেই আছে। হাঁচির শব্দ ভেসে আসছে সেখান থেকে। তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গেলেন ওরা। কিন্তু গিয়ে দেখলেন, কেউ নেই সেখানে। এদিকে সে ঘরে ওদের চোখের সামনেই একটি দরজা খুলল। আপনার থেকেই খুলল যেন। তারপর মনে হল, কে যেন দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কাউকে দেখা গেল না। এদিকে দরজাটা একটু পরেই প্রচণ্ড শব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

কয়েকদিন পর 'কোচ অ্যান্ড হর্সেস' সরাইখানায় যা ঘটল, তা' এর চেয়েও ভয়ঙ্কর। মিঃ ও মিসেস হল আগন্তুকের ঘরে ঢুকে দেখলেন, ঘর শূন্য। অথচ কোন্ এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে ফার্নিচারগুলো নড়ছে। বিছানায় জড়ো করা চাদর-বালিশগুলো নড়ে উঠল একবার। মনে হল, কে যেন ওদের ওপর হাত দিচ্ছে। তারপরেই দেখা গেল, ঘরের এখানে-সেখানে ছড়ান আগন্তুকের জামা-কাপড়গুলো ওঠান হচ্ছে। কে যেন হাতে করে তুলে নিচ্ছে ওদের। এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে মিঃ ও মিসেস হল আঁৎকে উঠলেন। মুহূর্তে কথা বলার ক্ষমতা হারালেন ও'রা। সবিস্ময়ে দেখলেন, যেন কোনো অদৃশ্য হাত ঘরের একটি চেয়ার তুলে ধরল। তাক করল মিসেস হলকে নিশানা করে; এবং তারপরেই চেয়ারটা ছুঁড়ে মারল। আঘাত পেলেন মিসেস হল; এবং সঙ্গে সঙ্গেই মিঃ হলকে সঙ্গে নিয়ে আগন্তুকের ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। এ ছাড়া সিঁড়িতে হাঁচির শব্দ শুনলেন ওঁরা। ও'দের চোখের সামনেই একটা দরজা খুলল এবং বন্ধ হল। কিন্তু কাউকে দেখা গেল না। মিসেস হলের বদ্ধমূল ধারণা হল, এই সব ঘটনার সঙ্গে নিশ্চয় কোনো অতিপ্রাকৃতের সম্বন্ধ আছে। নিশ্চয় আগন্তুকের হাত আছে এ সবের পিছনে। সঙ্গে সঙ্গেই ফার্নিচার-বিশেষজ্ঞ মিঃ ওয়েজারসকে খবর দেওয়া হল। খবর পেয়ে ছুটে এলেন তিনি। সেই সঙ্গে হল-পরিবারের সুহৃদ মিঃ হাকসটারও এলেন। কিন্তু সমস্যার সমাধান করা এ'দের কারও পক্ষেই সম্ভব হল না।

কাহিনীর এই অবধি অদৃশ্য মানুষের রহস্য উদ্ঘাটিত করা হয় নি। রহস্যকে বরং ধীরে ধীরে ঘনীভূত করা হয়েছে। অবশ্য সন্দেহ থাকে না যে এই অবধি যত কিছু অঘটন ঘটেছে তাদের সব কিছুর মূলে অদৃশ্য মানুষ। কিন্তু কেমন করে

সেগুলো ঘটছে, তা আমরা ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে ঠিক কার্যকারণ সম্বন্ধ খুঁজে পাই না। ফলে চাপা এক উত্তেজনা অনুভব করি সকলেই। দারুণ এক আশংকা সবাইকে ঘিরে ধরে। এবং সমস্ত উত্তেজনা ও আশঙ্কার কেন্দ্র হয়ে ওঠে সেই আগন্তুকটি, ইপিং-এর সরাইখানায় যার আবির্ভাব ও অবস্থান গভীর কালো রাত্রির মতোই রহস্যময়। কাহিনীর একেবারে সুরু থেকেই আগন্তুকের প্রতি সন্দেহ উদ্রিক্ত হয়। প্রবল তুষারপাতের মধ্যে তার নাটকীয় আগমন, তার অদ্ভুত বেশবাস, তার চলন-বলন ও আচার-ব্যবহার—সব কিছুই আমাদের কাছে কৌতূহলোদ্দীপক মনে হয়। তারপর তাকে ঘিরে মিঃ ও মিসেস হল, মিঃ টেডি হেনফ্রি, মিঃ ফিয়ারেনসাইড ও মিঃ কুশের বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমাদের কৌতূহলকে সন্দেহ-শঙ্কার রাজ্যে পেঁাছে দেয়। এ ছাড়া ধর্মযাজক মিঃ বানটিভের বাড়িতে চুরির কথা জেনেও বিস্মিত হই আমরা। স্পষ্টই অনুভব করি, ওয়েলস প্রথমে আভাসে-ইঙ্গিতে অদৃশ্য মানুষের কার্য-কলাপের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। এবং সে পরিচয় অস্পষ্টতার মধ্য দিয়ে হয় বলেই এ গল্পের নায়ক সম্বন্ধে দুর্নিবার এক আকর্ষণ অনুভব করি আমরা। স্বীকার না করে পারি না যে লেখক এ কাহিনীর রহস্যের ভিত্তিটি বেশ সুদৃঢ় করেই গেঁথেছেন। অভাবনীয়ের প্রতি আমাদের আকর্ষণকে গোড়া থেকেই উজ্জীবিত রেখেছেন।

কাহিনীর পরবর্তী পর্বে দেখি, অদৃশ্য মানুষের আবরণ উন্মোচন করা হয়েছে। ইপিং-এর সরাইখানায় আগত আগন্তুকটিই যে অদৃশ্য মানুষ, স্পষ্ট করে বলা হয়েছে সে কথা। বলার ভঙ্গীটি এত আকর্ষণীয়, যে মনে হয়, রহস্যের আগ্নেয়গিরি হঠাৎ অগ্ন্যুৎপাত সুরু করেছে এখানে। যে লাভা-কুণ্ড এতক্ষণ অবধি ছিল ধরণী-গর্ভে সংগুপ্ত, তা' যেন হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। আগন্তুক সকলের সামনে ঘোষণা করেছে যে, সে-ই হল অদৃশ্য মানুষ। দেহের আবরণ একটি একটি করে খুলে ফেলেছে সে। গগলস্, ব্যান্ডেজ, টুপি, জামা-কাপড় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ক্রমে ক্রমে সে অদৃশ্য হয়েছে। দেহের যে অংশ থেকেই আবরণ খসে পড়েছে, সেই অংশটি সকলের কাছে শূন্য ঠেকেছে। এই অভূতপূর্ব দৃশ্য থেকে আতঙ্কিত হয়েছে অনেকেই; কিন্তু অনেকেই আবার আত্মবিশ্বাসটুকু হারায় নি। এই প্রসঙ্গে সকলের আগে উল্লেখযোগ্য গ্রামের পুলিশ কনস্টেবল মিঃ জাফের-এর নাম। অদৃশ্য মানুষের প্রবল আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েও মরণপণ সংগ্রাম করেছেন তিনি। দুর্জয় সাহসকে সম্বল করে প্রতিপক্ষের সমস্ত আঘাতের মোকাবিলা করেছেন। স্বল্প-পরিসরের মধ্যে এই কর্তব্যপরায়ণ মানুষটির চরিত্র এখানে চমৎকার ফুটেছে। আর ফুটেছে মিসেস হলের অনমনীয়তা। অদৃশ্য মানুষের সঙ্গে প্রচণ্ড এক বাকযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন তিনি, এবং সে যুদ্ধে অদৃশ্য মানুষ যে হেরে গেছে, এ বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই।

তবে শেষ অবধি ইপিং-সরাইখানায় লোকজনেরা আগন্তুকের সঙ্গে পেরে ওঠে নি। মিঃ ও মিসেস হল, মিঃ হাকসটার এবং আরও অনেকের চোখেই ধুলো দিয়ে সে অন্তর্ধান করেছে। সকলের সামনেই অদৃশ্য হয়েছে সে। তার কথা শুনতে পেয়েছে সবাই। সবাই তার আঘাতে জর্জরিত হয়েছে; কিন্তু কেউ তাকে দেখতে পায় নি।

কাহিনীর এই অংশে অদৃশ্য মানুষের কার্যকলাপের যে বর্ণনা ওয়েলস দিয়েছেন, তা' রহস্যে-রোমাঞ্চে আমাদের অভিভূত করে। আমাদের মনে হয়, চেনা-জানা জগতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অজানার বিস্ময়-রস উপভোগ করছি। সম্ভবের একেবারে সদর দরবারে বসে অসম্ভবের অভিজ্ঞতা লাভ করছি।

এই অভিজ্ঞতার প্রকৃতি কাহিনীটির পরবর্তী অংশে আরও বিচিত্র হয়ে ওঠে। সেখানে দেখি; মিঃ গিবিনস নামে এক সৌখীন প্রকৃতিবিজ্ঞানী উন্মুক্ত জায়গায় বসে গবেষণা করছিলেন। তাঁর আশে-পাশে মাইল দুয়েকের মধ্যে কোনো লোকজন ছিল না। অথচ হঠাৎ কিসের যেন পদশব্দ শুনতে পেলেন তিনি। তাঁর মনে হল, কে যেন খুব কাছেই আছে। কখনও খুব জোরে জোরে কাশছে সে। কখনও আবার তার হাঁচির শব্দ শোনা যাচ্ছে। তারপরেই পদশব্দ খুব কাছে এগিয়ে এল যেন। মনে হল, কে যেন আপন মনে বিড় বিড় করে বকছে। বিস্মিত হলেন গিবিনস। বিস্ময়ের কারণ, সব কিছু শুনতে পাচ্ছেন তিনি। কিন্তু কাউকেই চোখে দেখতে পাচ্ছেন না। আগন্তুকটিকে খুঁজে পাবার আশায় বার বার চারিদিকে তাকালেন তিনি। কিন্তু শেষ অবধি কিছুই খুঁজে পেলেন না। তাঁর মনে হল, পদশব্দ ধীরে ধীরে যেন দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। হাঁচি এবং কাশির শব্দ অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে যেন।

এই অভূতপূর্ব ঘটনায় আতঙ্কে দিশাহারা হলেন গিবিনস। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরলেন তিনি। এইখানে বলে রাখা দরকার, মূল কাহিনীর সঙ্গে গিবিনস-এর এই অভিজ্ঞতার কোনো যোগ নেই। কিন্তু তবু, আমাদের মনে হয়, অদৃশ্য মানুষের পলায়ন-পথের বর্ণনাকে জীবন্ত করে তুলবার জন্যে এর প্রয়োজন ছিল।

কাহিনীর পরবর্তী অংশ মিঃ মারভেলকে কেন্দ্র করে বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। মিঃ গিবিনস-এর বেলায় যা' ছিল একতরফা বর্ণনা, এখানে তা' উত্তর-প্রত্যুত্তর ও ছোটখাট ঘটনাকে ঘিরে চমকপ্রদ।

মিঃ মারভেলের চরিত্রটি গোড়া থেকেই আমাদের মুগ্ধ করে। বিচিত্র এক ভবঘুরে সে। ইপিং থেকে মাইল দেড়েক দূরে নির্জন এক রাস্তার পাশে সে চুপচাপ বসেছিল। দু' জোড়া জুতো সামনে ছিল তার। জুতোর দোষ-গুণ নিয়ে সে আকাশ-পাতাল ভাবছিল। এমন সময় অদৃশ্য মানুষের সঙ্গে তার পরিচয়।

প্রথমটায় মিঃ মারভেল খেয়াল করে নি। আপন মনেই অদৃশ্য মানুষের প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাচ্ছিল। খেয়াল হল তখন যখন আশেপাশে তাকিয়ে সে দেখল, কেউ কোথাও নেই; অথচ কার যেন স্পষ্ট কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। সঙ্গে সঙ্গেই চিৎকার করে উঠল মিঃ মারভেল। শুধাল, কে তুমি? কোথায় আছ?

এ প্রশ্নের কোনো জবাব পাওয়া গেল না। অগত্যা নিজেকেই প্রশ্ন করল মিঃ মারভেল, 'আমি কি মাতাল হয়েছি? স্বপ্ন দেখছি কি? আপন মনেই কি কথা বলছি? না কি...'

একটি কণ্ঠস্বর বলে উঠল, 'ভয় পেয়ো না'। কিন্তু ভয় সত্যি পেয়েছিল মিঃ মারভেল। বার বার সে শুধিয়েছিল, 'কে তুমি? কোথায় আছ?'

একবার আর্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল তার, 'তুমি কি কবরের মধ্যে রয়েছ?'

এ প্রশ্নের কেউ কোনো জবাব দিল না। কিন্তু এরপর যা' ঘটল, তা' থেকে মিঃ মারভেলের বদ্ধমূল ধারণা হল যে সে কোনো অশরীরীর কবলে পড়েছে। ঘটনার খানিকটা অংশ এইখানে তুলে ধরছি,—

'বাঃ রে?' বলে উঠল মিঃ মারভেল। বুকে এক আঙুলের খোঁচা খেয়েছিল সে; এবং তা' থেকে জাত এক অদ্ভুত অনুভূতির পরেই এই কথা বলেছিল।

—'তুমি ভাবছ, আমি শুধু কল্পনা? শুধুই কল্পনা?'

—'এ ছাড়া আর কি হতে পারো তুমি?' ঘাড়ের পিছন দিকটা ঘষতে ঘষতে বলল মিঃ টমাস মারভেল।

—'বেশ তো', কণ্ঠস্বর বলল। আস্বস্তির সুরেই বলল সে।

—'তাহলে আমি তোমার দিকে ঢিল ছুঁড়ছি, যতক্ষণ অবধি না তুমি অন্য-রকম ভাবো।'

—'কিন্তু কোথায় তুমি?'

কণ্ঠস্বর কোনো জবাব দিল না। অপরদিকে মনে হল, যেন বাতাসের ভিতর থেকে এক টুকরো পাথর সাঁ সাঁ শব্দ তুলে এগিয়ে আসছে। পাথরটা এক চুলের জন্যে মিঃ মারভেলের ঘাড়ে এসে পড়ল না। মিঃ মারভেল ঘুরে তাকিয়ে দেখল, ঝুঁকি মেরে এক টুকরো পাথরকে বাতাসের ভিতর দিয়ে উঠিয়ে নেওয়া হচ্ছে। পাথরটা জটিল এক পথ ধরে উঠল, মুহূর্তের জন্যে শূন্যে ঝুলে থাকল যেন এবং তার-পরেই মিঃ মারভেলের পায়ে দুরন্ত বেগে আঘাত করল।

এইবার পালাবার চেষ্টা করল ভবঘুরেটি। প্রাণভয়ে ছুটতে লাগল সে। কিন্তু অদৃশ্য মানুষ তাকে রেহাই দিল না। ঢিল ছুঁড়ে মিঃ মারভেলকে আবার সে আঘাত করল। পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে এমন কি ভবঘুরেকে চরম দণ্ডদানের ভয় দেখাল।

কাহিনীর এই অংশে মিঃ মারভেলের অসহায় অবস্থাটি সুন্দর ফুটেছে। আর সেই সঙ্গে ফুটেছে অদৃশ্য মানুষের জেদ ও দম্ভ। অদৃশ্য রহস্যময়টি জানিয়েছে,

'আমি অদৃশ্য। এটাই বড় কথা। এবং তোমাকে আমি যা' বোঝাতে চাই তা' হল এই যে—'

—বাধা দিয়ে মিঃ মারভেল বলল, 'কিন্তু তোমার গতিবিধি?'

—'এই তো—তোমার সামনে মাত্র ছ' গজ দূরে।'

—'আঃ তুমি এসোই না! আমি অন্ধ নই। এরপরেই হয়তো আমাকে বলবে যে পাতলা বায়ু ছাড়া তুমি আর কিছু নও। মনে রেখো, আমি কিন্তু অজ্ঞ ভবঘুরেদের দলে নই—'

—'হ্যাঁ, আমি পাতলা বায়ুই বটে। তুমি আমার ভিতর দিয়ে দেখছ।'

—'কি বললে! তোমার মধ্যে কোনো পদার্থ নেই?...'

—'আমি সত্যি একজন মানুষ। ঠিক সেইরকম কঠিন। খাদ্যের এবং পানীয়ের প্রয়োজন হয় আমার। এবং সেই সঙ্গে আবরণেরও...কিন্তু আমি অদৃশ্য। বুঝলে তুমি? অদৃশ্য। সহজ কথা। অদৃশ্য।'

—'কিন্তু সত্যিকারের মানুষের মতো তুমি?'

—'হ্যাঁ, সত্যিকারের।'

—'তোমাকে আমার একটি হাত দিয়ে দেখতে দাও,' বলল মিঃ মারভেল।

এর পরেই অদৃশ্য মানুষের দিকে হাত বাড়াল সে। অদৃশ্যের হাত, আঙুল, মুখ বুক ইত্যাদির অস্তিত্ব স্পষ্ট অনুভব করল।

এইখানে ওয়েলস যেন অদৃশ্য মানুষের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। মিঃ মারভেলের মতোই এই অংশে ইচ্ছার বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও অসম্ভবকে মেনে নিয়েছি আমরা। এবং তারপর সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছি, অদৃশ্য মানুষটি কেমন যেন অসহায়। তার অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে। মিঃ মারভেল-এর সাহায্য চাইছে সে। তাকে দিয়ে বিভিন্ন কাজ করাতে চাইছে। মিঃ মারভেল অদৃশ্য মানুষটিকে এড়াতে চেয়েছে প্রথমে। কিন্তু শেষ অবধি নিরুপায় হয়ে সে আত্মসমর্পণ করেছে। অদৃশ্যের দৃঢ়তা, ব্যক্তিত্ব ও তর্জন-গর্জনের সামনে মাথা নোয়াতে সে বাধ্য হয়েছে। এইখানে মিঃ মারভেল-এর ব্যবহারে অতিশয়োক্তি কিছু নেই। বরং প্রবল ও বিচিত্র প্রতিপক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে তার আত্মনিবেদন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলেই মনে হয়।

কাহিনীর পরবর্তী পর্বে দেখি, মিঃ মারভেলকে কাজে লাগিয়েছে অদৃশ্য মানুষ। তাকে ইপিং পাঠিয়েছে। অদৃশ্য মানুষের উদ্দেশ্য ছিল, ইপিং-এর সরাই-খানা থেকে তার বই-পত্র ও জামাকাপড় উদ্ধার করে আনা। শেষ অবধি বই-গুলোকে উদ্ধার করেছে সে। নিজে অদৃশ্য থেকে ইপিং-এর লোকজনদের উপর নির্বিচারে আক্রমণ চালিয়েছে; এবং মারভেলকে সুযোগ দিয়েছে বই নিয়ে পালাবার। নোট-বইগুলোতে অদৃশ্য মানুষের গবেষণার কথা সাংকেতিক ভাষায় লিপিবদ্ধ ছিল; এবং ওরা পড়েছিল 'কোচ অ্যান্ড হর্সেস'-এ। তাই ওদের সংগ্রহ করার জন্যে 'অদৃশ্যের' দুশ্চিন্তার কারণ সহজেই উপলব্ধি করি আমরা। সেই সঙ্গে আর একটি সত্যও আমাদের উপলব্ধিতে ধরা দেয়। সে সত্যটি হল এই যে, ওয়েলস 'ইনভিজিবল ম্যান' লিখতে বসে রহস্যের সুরকে কোথাও নিচু পর্দায় নামতে দেন নি; সর্বত্রই সুরটিকে সপ্তমে চড়িয়ে রেখেছেন। ফলে, এ কাহিনী পড়বার কালে পাঠকরা ঝিমিয়ে নেবার অবকাশ পায় না কোথাও; সর্বক্ষণ ওদের উৎকর্ণ হয়ে বসে থাকবার পালা। আলোচ্য অংশেও রহস্যের পর রহস্যের ইন্দ্রজাল পাঠকদের স্তম্ভিত করে দেয়। উৎসবমুখর ইপিং গ্রামে মিঃ মারভেল-এর কুণ্ঠিত পদক্ষেপ কেমন যেন সন্দেহ-জনক মনে হয় আমাদের। সরাইখানার ঘরে চিকিৎসক মিঃ কুশ ও ধর্মযাজক মিঃ বান্‌টেভের সঙ্গে অদৃশ্য মানুষের সংগ্রামের চিত্রটিতেও রহস্যের স্বাদ পাই আমরা। এ ছাড়া পলায়নপর মিঃ মারভেলকে ধরতে গিয়ে মিঃ হাকসটার এবং আরও কয়েকজন যখন দারুণ বাধা পায়, রহস্য তখন নিবিড় হয়ে ওঠে। আমরা সাবিস্ময়ে লক্ষ্য করি, অদৃশ্য মানুষ সকলের অগোচরে থেকে প্রতি-পক্ষের উপর আঘাতের পর আঘাত হানছে। নোট-বই উদ্ধার করবার আশায় এবং সাহায্য ও আশ্রয়ের জন্যে মরীয়া হয়ে উঠেছে সে। ইপিং-বাসীদের উপর অদৃশ্য মানুষের এই আক্রোশ ওদের অপরাধের তুলনায় গুরুতর, সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রথম থেকেই 'অদৃশ্যের' রুক্ষ মেজাজের যে চিত্র লেখক এঁকেছেন তার সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করলে মনে হয়, মানুষটির এই হঠাৎ ক্ষেপে যাওয়া অস্বাভাবিক বা অসংগত কিছু হয় নি। অস্বাভাবিক হয় নি ভীত-সন্ত্রস্ত ইপিং-বাসীদের চিত্রও। অসম্ভবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে গ্রামের সাধারণ মানুষরা সঙ্গত কারণেই বিস্ময়ে-আতঙ্কে দিশাহারা হয়েছে। ভয়ে ছুটে পালিয়েছে ওরা। ঘরে ঢুকে তাড়াতাড়ি দরজা-জানালা বন্ধ করেছে।

দীর্ঘ দু' ঘন্টা ধরে ইপিং গ্রামের প্রায় কেউই ভয়ে বাইরে যেতে পারে নি। মিঃ মারভেল তখন গ্রামের এক নির্জন পথ ধরে ছুটছিল। তার সঙ্গে ছিল অদৃশ্য মানুষের তিনটি নোট-বই আর কিছু জিনিসপত্র। স্বয়ং 'অদৃশ্য'ও অনুসরণ করছিল তাকে। ক্ষণে ক্ষণে শাসাচ্ছিল। এদিকে দারুণ ক্লান্তি ও দুশ্চিন্তায় মিঃ মারভেল-এর অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে। তাই অদৃশ্য মানুষটির কাছ থেকে সে এবার মুক্তি চাইল। অনুনয় করে বলল, একেবারেই অপদার্থ সে। তাকে দিয়ে ওর সত্যিকারের কোনো কাজ হবে না। কিন্তু অদৃশ্য মানুষ কিছুতেই মুক্তি দিল না তাকে। বলল, অপদার্থ বলেই ওকে সে কাজে লাগাতে চায়। মারভেল নামক মূর্খটিকে সে চায় যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে। কাহিনীর এই অংশে একদিকে মিঃ মারভেল-এর অসহায় অবস্থা এবং অপরদিকে অদৃশ্য মানুষের বজ্রকঠিন দৃঢ়তা সুন্দরভাবে ফুটেছে।

পরবর্তী পর্বে স্টোয়ে বন্দরে মিঃ মারভেলকে দেখি আমরা। সকৌতুকে লক্ষ্য করি, একজন নাবিকের সঙ্গে অদৃশ্য মানুষ সম্বন্ধেই সে আলোচনা করছে। মারভেল নিজে অবশ্য বেশি কিছু বলছে না; কিন্তু নাবিক অনর্গল বকে চলেছে। অদৃশ্য মানুষ সম্বন্ধে অনেক কিছুই তার নখদর্পণে। সংবাদপত্র মারফৎ ইপিং

গ্রামের সমস্ত খবর সংগ্রহ করেছে সে। কিন্তু মারভেল-এর সঙ্গে আলোচনার সময় অদৃশ্য মানুষটি যে তার খুব কাছেই ছিল, তা' সে বুঝতে পারে নি। এখানে 'অদৃশ্যের' অর্থ-সংগ্রহের বিবরণ ওয়েলস আভাসে-ইঙ্গিতে দিয়েছেন। রহস্যের সুরেই বলেছেন তিনি, অর্থ পথ-বরাবর ও দেওয়ালের গায়ে ভেসে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে; কিন্তু অন্য কিছু চোখে পড়ছে না। টাকা-পয়সা কে যেন মারভেল-এর পকেটে গুঁজে দিচ্ছে।

বলা বাহুল্য, এই সব কিছুর পিছনে যে অদৃশ্য মানুষ তা' বুঝে নিতে আমাদের এতটুকু কষ্ট হয় না। কষ্ট হয় না নাবিকের চরিত্রটিকে বুঝতেও। সাধারণ মানুষের আবেগ-উত্তাপ ও ক্রোধ-কৌতূহল নিয়ে স্বল্পপরিসরের মধ্যে সে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

প্রসঙ্গত নোট-বইগুলোকেও আমরা ভুলতে পারি নে। মারভেল সর্বক্ষণ কাছে কাছে রাখছে সেগুলোকে। এবং রাখছে বলেই অদৃশ্য মানুষও তাকে ছাড়তে পারছে না। কিন্তু মারভেল মুক্তি খুঁজছে। প্রতি মুহূর্তে 'অদৃশ্যের' কবল থেকে পালাতে চাইছে সে।

একবার প্রাণপণে ছুটল মারভেল। 'অদৃশ্যের' হাত এড়িয়ে সে চাইল তার পূর্বেকার স্বাধীন জীবনে ফিরে যেতে। মারভেল-এর এই ছুটে পালাবার দৃশ্যটি আঁকতে গিয়ে ওয়েলস আশ্চর্য মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। সমস্ত ঘটনাটিকে তিনি দেখিয়েছেন ডঃ কেম্প নামে এক তরুণ বিজ্ঞানীর চোখ দিয়ে। ডঃ কেম্প তাঁর ঘরে বসে অনেক দূর দিয়ে ছুটে-চলা মিঃ মারভেলকে কেমন দেখলেন, তার এক অতি সুন্দর বর্ণনা এ কাহিনীতে আছে। কিন্তু সুন্দর ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে পরবর্তী অধ্যায়ে;—মারভেল যখন পাহাড়ের পাদদেশে গড়ে-ওঠা এবং ট্রাম-লাইনের পাশে-দাঁড়ান 'জলি ক্রিকেটারস-এ' আশ্রয় নিল।

অদৃশ্য মানুষ ছায়ার মত অনুসরণ করল মারভেলকে। 'জলি ক্রিকেটারস'-এ গিয়ে রহস্যজনকভাবে হানা দিল। একজন পুলিশ এবং এক 'বারম্যান' ও এক 'ক্যাবম্যান'-এর চেষ্টায় মারভেল সাময়িক-ভাবে রক্ষা পেল বটে: কিন্তু সমস্যা এখান থেকে আরও জট পাকিয়ে উঠছে। একদিকে অদৃশ্য মানুষকে দারুণ এক জিঘাংসা-পরায়ণ মনোবৃত্তি পেয়ে বসল; অপরদিকে খাদ্য ও আশ্রয়ের আশায় অস্থির হয়ে উঠল সে।

সন্দেহ নেই, মারভেল তার টাকা নিয়ে পালাতে চেয়েছিল: এবং ওই মানুষটিকে হাতের কাছে পেলে সে হয়তো খুন করে বসতো। কিন্তু খুন করতে যে সে পারে নি, এজন্যে 'জলি ক্রিকেটারস'-এ মারভেল-এর কয়েকজন শুভাকাঙ্ক্ষী দায়ী। শুভাকাঙ্ক্ষীদেরই একজন অদৃশ্য মানুষকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়েছিল। গুলী তার হাতে আঘাত করল বটে, কিন্তু তাকে ধরাশায়ী করতে পারল না। সে দারুণ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ওখান থেকে বেরিয়ে এল।

যখন বারডক শহরে 'জলি ক্রিকেটারস'-এ গুলী চলছিল, তখন শহর থেকে খানিকটা দূরে ডঃ কেম্প গবেষণায় নিমগ্ন। নিজ বাড়িতে বসে আপন মনে কাজ করছিলেন তিনি। হঠাৎ গুলীর শব্দে চমকে উঠলেন। কাজ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ডঃ কেম্প। জানালার পর্দা সরিয়ে দূরের শহরটার দিকে তাকালেন একবার। ভেবে পেলেন না, এত রাত্রে বারডক-এ গুলী ছুঁড়ছে কে!

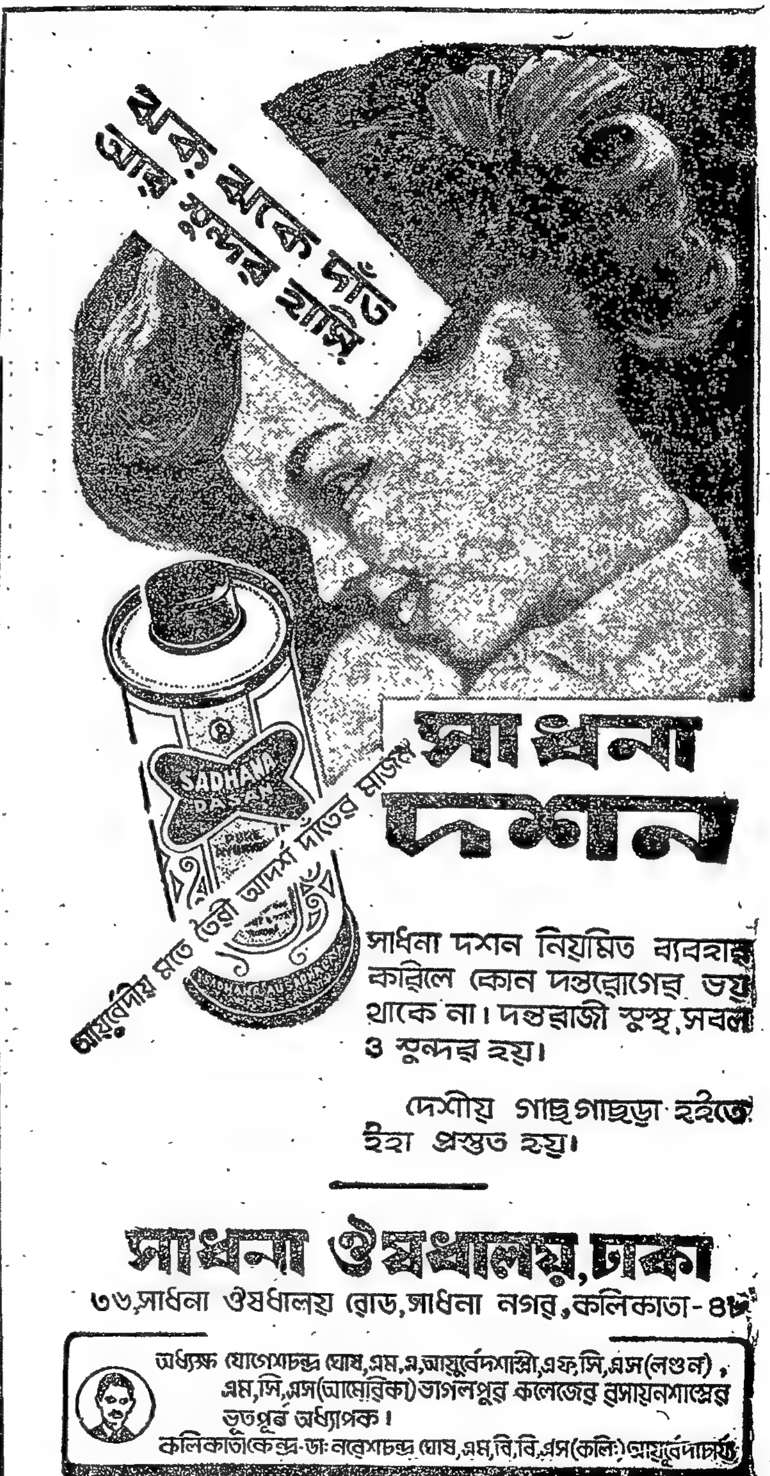

কাহিনীর এই অংশে 'জলি ক্রিকেটারস'-এর ঘটনার সঙ্গে ডঃ কেম্প-অধ্যায়ের যোগসূত্র অতি নিপুণভাবে গ্রথিত। সে কারণেই গল্পটি চলবার ঘন্টাখানেক পর ডঃ কেম্প-এর বাড়িতে যখন 'বেল' বেজে ওঠে, তখন আমরা অস্বস্তি বোধ করলেও অবাক হই না। বরং দারুণ এক আতঙ্ক ঘিরে ধরে আমাদের। আমরা অনুমান করি, এই ঘটনার পিছনে হয়তো বা অদৃশ্য মানুষের হাত আছে।

খানিকক্ষণের মধ্যেই এই অনুমান সত্য প্রমাণিত হয়। অদৃশ্য মানুষ সকলের অলক্ষ্যে ডঃ কেম্প-এর ঘরে ঢুকে পড়ে। অবশ্য তার আবির্ভাবকে কেন্দ্র করে ওয়েলস যে রহস্যজাল বিস্তার করেছেন, তা' বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সিঁড়িতে ও দরজার হাতলে রক্তের দাগ, খোলা-দরজা বন্ধ অবস্থায় থাকা এবং ডঃ কেম্প-এর বিছানার উপর রক্তবিন্দু—এই সব কিছুই আভাসে-ইঙ্গিতে অদৃশ্যের আগমনকে ব্যঞ্জিত করে। এছাড়া বেল বাজছে শুনে পরিচারিকার হঠাৎ দরজা খুলে দেওয়ার সুযোগেই যে সেই রহস্যময় ডঃ কেম্প-এর বাড়িতে অনুপ্রবেশ করেছে, একথাও বুঝে নিতে আমাদের কষ্ট হয় না। এইখানে মেনে নিতে বাধ্য হই আমরা যে ওয়েলস বিশ্লেষণ কম করে পাঠকদের ভাববার বেশি সুযোগ দিয়েছেন। ফলে অদৃশ্য মানুষের সঙ্গে ডঃ কেম্প-এর কথোপকথন সুরু থেকেই জমে উঠেছে।

'অদৃশ্যের' কণ্ঠস্বরে কেম্প বিস্মিত হয়েছেন প্রথমে। কিছুতেই তার অস্তিত্বকে মেনে নিতে চান নি। কিন্তু পরে শূন্যে ভাসমান ব্যাণ্ডেজ দেখে এবং 'অদৃশ্যের' স্পর্শ অনুভব করে সব কিছু মেনে নিয়েছেন। অদৃশ্য মানুষ সম্বন্ধে অনুসন্ধানী বৈজ্ঞানিক ডঃ কেম্প-এর এই মনোভাব অস্বাভাবিক কিছু নয়। বরং একদিকে দ্বিধা ও সংশয় এবং অপরদিকে সাহস ও দৃঢ়তা নিয়ে যেভাবে তিনি অসম্ভবের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন, তার মধ্য দিয়ে আমরা এক স্থিতধী তরুণ গবেষককেই খুঁজে পাই। আমাদের মনে হয়, অভাবনীয়ের মোকাবিলা তিনি করেছেন দুর্জয় মনোবল নিয়ে। আর মনে হয়, ওয়েলস তার চরিত্র-চিত্রণে বিস্ময়কর সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য লেখকের সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় অদৃশ্য মানুষের আচার-আচরণের বর্ণনা থেকেও ফুটে উঠেছে। সে চেয়ারে বসবার পর যে চেয়ারের বসবার জায়গার নরম অংশটুকু খানিকটা ভিতরের দিকে ঢুকে গেল, এ কথা জানাতেও লেখক ভোলেন নি। এ ছাড়া আরও নানা দিক দিয়ে অদৃশ্য মানুষের সঙ্গে ডঃ কেম্প-এর কথোপকথনের অধ্যায়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। 'অদৃশ্যের' নাম যে গ্রিফিন, সে যে ইউনিভার্সিটি কলেজ রসায়ন-বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র ছিল, এ সব কথা এখানেই প্রথম জানলাম আমরা। আরও জানলাম, ডঃ কেম্প-এর সমকালীন ছাত্র সে এবং কেম্প-এর কাছে সে এসেছে খাদ্য, আশ্রয় এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা-সংক্রান্ত সহযোগিতার আশায়।

কেম্প তাকে সাহায্য করেছেন বটে; খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় দিয়েছেন। কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও তার উপর বিশ্বাস রাখতে পারেন নি। গ্রিফিনকে তিনি ক্রোধ, অসংযম ও মত্ততার প্রতীক বলে ভেবেছেন। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই ভাবনা অন্যায় কিছু হয় নি; বরং তার ধীর, সংযত অথচ সন্দেহপ্রবণ চরিত্রেরই উপযোগী হয়েছে। অপরদিকে গ্রিফিন-এর অসহায় অবস্থাটিও বড় মর্মস্পর্শী। নিরুপায় হয়ে কেম্প-এর কাছে পরিধেয় চেয়েছে সে। বুভুক্ষুর মতো বার বার খেতে চেয়েছে। সামান্য একটু আশ্রয়ের জন্যে তার আকুলতা কেম্প-এর যেমন পাঠকদেরও তেমনি দৃষ্টি এড়ায় নি। এক কথায় ওয়েলস এখানে অদৃশ্য মানুষের ট্র্যাজিডীকে নির্মমভাবে তুলে ধরেছেন। পাঠকদের মনে হয়েছে, গ্রিফিন সহ্যশক্তির শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে। এইবার চরম একটা কিছু করবার জন্যে সে বদ্ধ-পরিকর।

কাহিনীর পরবর্তী পর্বে 'ইনভিজিবল ম্যান'-এর ঘটনাজাল অতি দ্রুত পরিণতির দিকে এগিয়েছে। কিন্তু তার আগে 'ফ্ল্যাস-ব্যাক'-এর সাহায্য নিয়েছেন লেখক। হারানো ঘটনার উপর আলোক-সম্পাত করে গ্রিফিন-এর জীবনকাহিনীটিকে সম্পূর্ণতা দান করেছেন।

মাঝখানে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিয়েছে গ্রিফিন; এবং সেই অবসরে ডঃ কেম্প অদৃশ্য মানুষের অস্তিত্ব নিয়ে আকাশ-পাতাল ভেবেছেন। গ্রিফিনকে তার শোবার ঘরে থাকতে দিয়ে নীচে নেমে এসেছেন তিনি; সংবাদপত্রে প্রকাশিত ইপিং গ্রামের বিচিত্র ঘটনাগুলোর পর্যালোচনা করেছেন। পুরানো খবরগুলো বার বার পড়েও স্বস্তি হয় নি তার। সমস্ত রাত্রি তিনি জেগে কাটিয়েছেন। অভাবনীয়ের প্রত্যক্ষদর্শী ডঃ কেম্প্-এর এই অনিদ্রা ও রাত্রি-জাগরণ আমাদের কাছে বিসদৃশ ঠেকে না। ঘুমুবার আগে নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে গ্রিফিন-এর অস্বাভাবিক উৎকণ্ঠারও কারণ উপলব্ধি করি আমরা; এবং এর চেয়েও বড় কথা, পরের দিনের সকালটি আমাদের কাছে এক অপরিসীম দুর্ভাবনার মূর্তি ধরে দেখা দেয়। আমরা সকৌতুকে লক্ষ্য করি, ঘুম থেকে উঠেই গ্রিফিন তার পূর্বের রুক্ষ স্বভাব ফিরে পেয়েছে। ঘরময় দাপাদাপি সুরু করেছে সে; টেবিল-চেয়ার ভাঙছে। কেম্প্‌কে দেখে অবশেষে আত্মস্থ হয়েছে গ্রিফিন। সমবয়সী বিজ্ঞানী-বন্ধুর কাছ থেকে সহযোগিতার আশায় আপন জীবন কথা অকপটে প্রকাশ করেছে।

গ্রিফিন-এর এই স্বীকারোক্তি থেকেই অদৃশ্য মানুষের রহস্য অবগত হই আমরা। আমরা জানতে পারি, কেমন করে একজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী নিজেকে অদৃশ্য করল এবং অদৃশ্য করার পর কি কি অভিজ্ঞতা অর্জন করল। গ্রিফিন-এর এই আত্মকথা এত রহস্যময় যে তা পড়তে বসে প্রতি মুহূর্তে শিহরিত হই আমরা। ঘটনার পর ঘটনা চুম্বকের মতো আমাদের আকর্ষণ করে। আমরা স্বীকার না করে পারি না যে, ওয়েল্‌স এখানে 'দি ইন্‌ভিজিবল ম্যান'-এর কাহিনীকে প্রায় বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। কাহিনীটি বিশ্বাসযোগ্য মনে হ'ত না, যদি না এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হ'ত বৈজ্ঞানিক সত্যের ওপর।

বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সবটুকুই আমরা গ্রিফিন-এর কাছ থেকে পাই। ডঃ কেম্প্‌-এর কাছে অদৃশ্য হবার মূল-তত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তুলে ধরেছে সে। তবে সরাসরি ধরে নি। প্রথমে বিস্তারিত ভূমিকা করে নিয়ে বলেছে, কেমন করে পদার্থবিজ্ঞানের অন্তর্গত আলোকশাস্ত্রের প্রতি তার কৌতূহল নিবদ্ধ হল, আলোক-রশ্মির ধাঁধাগুলো কেমন করে ভাবিয়ে তুলল তাকে। অদৃশ্য-তত্ত্বকে যথাসম্ভব বিশ্বাসযোগ্য করে তুলবার ক্ষেত্রে গ্রিফিন-এর এই ভূমিকাটুকুর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এইখান থেকেই জানতে পারি আমরা, যে তরুণ বয়সেই পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণাকে সে জীবনের মূলমন্ত্র হিসেবে বেছে নিয়েছে। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন গ্রিফিন। পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্যে সোনার মেডেল পুরস্কার পেয়েছে সে। তাই এহেন একজন কৃতবিদ্য যখন পদার্থ-বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছু বলে, তখন স্বভাবতই আমরা তার বক্তব্য শুনবো বলে উন্মুখ হই। প্রথমেই জানতে পারি আমরা যে আলো নিয়ে কয়েকমাস গবেষণা করার পরেই সে একটি জ্যামিতিক সূত্র আবিষ্কার করেছে। সূত্রটি চার ডিমেন্‌সন্‌কে ভিত্তি করে। অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ ছাড়া অতিরিক্ত একটি মাপের কথাও এর সঙ্গে জড়িত। এই যে সূত্র, প্রথমে এ ছিল একটা ধারণা। পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে এ থেকে নূতন কোনো একটা পথ পেলেও পাওয়া যেতে পারে, গ্রিফিন-এর এইরকম একটা বিশ্বাস ছিল। (ক্রমশঃ)

'চোমংলামার চোখে' উত্তরবঙ্গ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

যত বেলা বাড়াছিল, শরতের রোদের উজ্জ্বলতাও তত বাড়ছিল। সকালে খেজুরিয়া ঘাট পার হয়ে মালদহ শহরের দিকে রওনা হয়েছি। মালদহের যে অঞ্চলেই গিয়েছি—সর্বত্রই একটা জিনিষ লক্ষ্য করে মুগ্ধ না হয়ে পারি নি। সেটা হল—এই জেলায় ভূ-প্রকৃতি। রুক্ষ এবং কঠিন মাটি বলে মনে হবে আপাত-দৃষ্টিতে, অথচ, এই মাটির প্রতিটি স্তরেই যে এত প্রাণসম্পদ লুকিয়ে আছে তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

পল্লীপ্রান্তরের পাশ দিয়ে ডাঁড়া। গ্রাম্য ছেলেমেয়েরা অর্ধোলঙ্গ হয়ে ডাঁড়ার মধ্যে কাদায় মাথামাখি অবস্থায় মাছ ধরছে! মাছ যাই ধরুক না কেন, জল ও কাদায় দাপাদাপি করছে অনেক বেশি। তাদের আনন্দধ্বনির মধ্যে বাংলা ভাষার সঙ্গে মৈথিলী টান খুব স্পষ্ট। মাঝে মাঝে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। স্থানীয় লোকে বলে 'বরিন্দের মাঠ'। অর্থাৎ মধ্যযুগে এক সময়ে বরেন্দ্রভূমি বলতে শুধুমাত্র সীমাহীন মাঠকেই বোঝাতো। উঁচুনিচু ঢেউ খেলানো জমিতে ধান, এবং ছোলার চাষ হয়েছে সর্বাধিক। মাঠে কর্মরত একজন কৃষককে জিজ্ঞাসা করতে সে পরিষ্কার মৈথিলী টানে জানাল মালদহের 'খন্দে' ছোলার চাষ এই সময়েই হয়।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে মালদহের স্থান কোথায়—সেটা বিশেষভাবে বিবেচনার বিষয়। সমগ্র শহর এলাকা, গ্রাম অঞ্চল, আধা শহর ও বন্দরগুলি পরিক্রমা করে দেখেছি, এখনও পর্যন্ত লালফিতার ফাঁস লাগানো ফরাক্কা বাঁধ ছাড়া—মালদহের উপর উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনা রচিত হয় নি। না ভারী শিল্পের—না কারিগরী বিষয়ক বা অন্যকিছু।

কালিয়াচকের একজন দরিদ্র গ্রাম্য স্কুল মাস্টার এর কারণ বিশ্লেষণ করে-ছিলেন—এবং সেইটাই আমার কাছে যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়েছিল।

উক্ত স্কুল মাস্টার বলেছিলেন—মালদার ইতিহাস তো জানেনই। পার্শ্ব-বর্তী জেলা মুর্শিদাবাদ যখন ইংরেজ রাউনীতে ভরে উঠল—তখনও পর্যন্ত মালদহ জেলার উপর শতাব্দীর অন্ধকার ঘন হয়ে রয়েছে। তারপর বাংলাদেশের পটপরিবর্তন হল নিঃশব্দে যে সমস্ত অঞ্চলে সামন্ত রাজারা বসবাস করতেন—প্রকৃতপক্ষে বাংলার সেইসব অঞ্চলের অধি-বাসীদের মধ্যেই এই পটপরিবর্তনের সংবাদ কিছুটা গিয়ে পৌঁছেছিল। আর তখন মালদহের সাধারণ মানুষের চেতনা ভাগীরথী, টাঙ্গন, কালিন্দী, পুনর্ভবার জলে মাঝিমাল্লাদের ভাটিয়ালী সুরের গানে, মালদহের দেহাতী কৃষকদের লাঙলের মুখে, জৌনপুরী আর মৈথিলী আহিরদের গোচারণভূমিতে ঘুরপাক খাচ্ছে।

—অথচ কি আশ্চর্য দেখুন,

কালিয়াচকের সেই গ্রাম্য স্কুল মাস্টার, আদর্শবাদী যুবক আমাকে বলেছিল,

—এই জেলারই বুকের উপর একদা তিন তিনটি রাজশক্তির উত্থানপতন ঘটেছে। হিন্দু ক্ষাত্রশক্তির নিকট থেকে ইসলামের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে, অথচ পৌনে দু'শ বছর ধরে আমাদের দেশে যখন স্বাধীনতার সংগ্রাম চলেছে—তখন সেই সংগ্রামে মালদহ জেলার কোনও উল্লেখযোগ্য অবদান নেই।

কুণ্ঠিতভাবে জবাব দিয়েছিলাম—একেবারেই যে নেই—তাই বা কি করে বলি!

উত্তেজিত শিক্ষক মহাশয় বলে-ছিলেন—সে কথা আমিও বলি না। তবে কি জানেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস যখন লেখা হবে—তখন 'পরি-শিষ্টের সংযোজন' যোগ্য মালদহের কিছু অবদান হয়তো থাকলেও থাকতে পারে।

বলেছিলাম—এর সঙ্গে স্বাধীনোত্তর

মহাকাল মন্দির—রামকেলি
নীলাচলের পথে মহাপ্রভু এখানে অবস্থান করেন।

হাজিপীর মসজিদ—আদিনা
রাজা লক্ষ্মণ সেন কর্তৃক নির্মিত।

কালের উন্নয়নের কোনও সম্পর্ক আছে কি?

—নিশ্চয়ই আছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরই বিশ্লেষণ করুন অবস্থাটা। র‍্যাডক্লিফের রোয়েদাদে বাংলাদেশ কিন্তু দ্বিধাবিভক্ত হয় নি—হয়েছিল ত্রিধাবিভক্ত। অর্থাৎ সমগ্র উত্তরবঙ্গের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অংশের কোনও ভৌমিক যোগাযোগ ছিল না। বিগত ১৯৫৬ সালে এস আর সি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী এই অসঙ্গতিটা দায়সারাভাবে দূর করা হল বটে—তাতে সীমা হিসাবে উত্তরবঙ্গের কোনও গুরুত্ব বাড়ে নি। অবশ্য সে সব অতীতের কথা তুলে এখন আর কোনও লাভ নেই। তিনটি পরিকল্পনা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও আপনি উত্তরবঙ্গের কি চিত্র তুলে ধরতে পেরেছেন আপনার কাগজে!

প্রশ্নটা অবশ্যই ভাবিয়ে তোলার মত!

সম্প্রতি অবশ্য সংবাদপত্রগুলির ঢক্কানিনাদ শোনা যায়—উত্তরবঙ্গের প্রতি প্রশাসনিক দৃষ্টি বিশেষভাবে দেওয়া হয়েছে।

বিগত ১৯৬২ সালে চৈনিক আক্রমণের পরিস্থিতিতে উত্তরবঙ্গ সম্পর্কে বিশেষভাবে ভাবতে হয়েছিল ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে। সমস্ত আসাম, নেফা, মণিপুর এবং কয়েকটি বৈদেশিক রাজ্যের প্রবেশমুখ শিলিগুড়ি শহর সম্পর্কে সচেতন হলেন তাঁরা এবং তারই ফলে শিলিগুড়ি শহরকে পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর হিসাবে গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলা? বিশেষ করে চিরদিনের পশ্চাদ্‌পদ মালদহ এবং পশ্চিম দিনাজপুর জেলা?

মালদহের কৃষিপণ্য, মালদহের আম এবং রেশমকীটের ব্যবসা সম্পর্কে সরকার উৎসাহী। অতীতে মালদহের রেশম ভারতের বাইরে রপ্তানী করা হত। অথচ এই রেশম চাষের উন্নয়ন সম্পর্কে যথেষ্ট উৎসাহী হওয়া সত্ত্বেও উন্নয়ন কতটা হয়েছে—সেটা বিবেচনা করা প্রয়োজন। রাত্রে উক্ত শিক্ষক মহাশয়ের গৃহে নৈশ আহারে বসেছি।

পরিবেশন করছে শিক্ষক মহাশয়ের অনূঢ়া যুবতী ভগ্নী গৌরী। এইবার হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষা দেবে।

গৌরী বললে—গানের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়—

'এই মাটি মায়ের মতন,
ফুলে ফলে ভরাতে চায়
সোনার কামনা।'

কিন্তু জানেন এই জেলাতেই যদি অনাবৃষ্টি হয়—তবে এই নদীবহুল, বিল, ঝিল পরিপূর্ণ জেলাতেও জলসেচের কোনও বন্দোবস্ত নেই। অথচ দেশ বিভাগের ফলে 'বাংলার' লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বরিশালকে হারালেও আমরা আবার তা গড়ে নিতে পারতাম। কেননা আমাদের বীরভূম, বর্ধমান রয়েছে। রয়েছে মালদহ, দিনাজপুর। অথচ কি আশ্চর্য—এইসব জেলাতেও জলসেচের কোনও বন্দোবস্ত নেই।

আজ যখন বেতার ও সংবাদপত্র মারফৎ পশ্চিমবঙ্গের চারটি খরাক্লিষ্ট জেলার জন্য নেতৃবৃন্দের উদ্বেগ ও হাহাকার শুনতে পাই—এবং ওই চারটি জেলার মধ্যে মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরের নামও বারংবার উচ্চারিত হয়—তখন অকস্মাৎ শ্রীমতী গৌরীর কথা মনে হয়।

মনে মনে ভাবি—হায়ার সেকেন্ডারী পাঠরতা একটি গ্রাম্য বালিকা যা খুব সহজেই বোঝে—দেশের কর্ণধাররা তা বুঝতে এত দেরি করেন কেন?

মালদহ জেলার জলসম্পদে পরিপূর্ণ এই বিল, ঝিল, প্রাণ-প্রবাহিনী নদীগুলি দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে। কিন্তু দূরে দূরে পল্লীর চাষের মাঠে কোনও 'ক্যানাল' চোখে পড়ে নি। সামদার বিল দেখেছি। মালদহ শহর থেকে খুব বেশি দূরে নয়। শুনলাম এখানে বারমাসই জল থাকে। শরতের রোদে ঝলমল করছে বিলের জল। অসংখ্য শাপলা, শালুক, পদ্মফুল ফুটে বিলের শোভা হয়েছে মনোরম। ঝাঁকে ঝাঁকে বিলের জলে ভেসে আসছে পানকৌড়ি, কাদাখোঁচা স্নাইক জাতীয় পাখি।

আরও শুনলাম এই ধরণের বিল মালদহের প্রায় সর্বত্রই। তা সে ছোটই হোক আর বড়ই হোক।

আর আছে বাওড় এবং 'তল'। কোন কারণে নদী মরে গেলে—একটি বিস্তৃত অংশ জুড়ে নদীর জল আটক পড়ে 'বাওড়ের' সৃষ্টি করে। বর্ষার সময়ে বাওড় ভেসে নাব্য হয়ে ওঠে। আর এগুলি চাষের জমির পক্ষে একেবারেই অপরিহার্য।

আবার দেখেছি চাঁচোল, ইংরেজাবাদের কাছাকাছি গ্রামাঞ্চল মোল্লাহাটি, রসুলপুর, শাহজাহানপুর প্রভৃতি অঞ্চলে কৃষকেরা নিজেদের পরিশ্রমে ও উদ্যমে তালগাছের ডোঙা ও সেউতি দিয়ে গ্রাম্য প্রথায় জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করে নিয়েছে এবং তাতে তাদের মোটামুটি প্রয়োজন মিটে যায়।

জল তুলতে তুলতেই রসুলপুরের নজর আলি প্রখর রৌদ্রকে হাতের আড়াল দিয়ে কপালে হাত রেখে বলেছিল—

—বাবু যেন ভিনদেশী?

বলেছিলাম—হ্যাঁ। আমি ভিনদেশীই বটে।

—যাবেন কুথায়—তামুক খায়্যা যান্।

অর্থাৎ নজর আলির নিজেরই খানিকটা জিরিয়ে নেওয়ার দরকার।। পিটুলী গাছের ছায়ায় বসে পড়েছিলাম। নজর আলি তামাক সাজল। ঘরে তৈরি দা-কাটা তামাক।

নজর আলি বলেছিল—এই সময়ে কোনদিন মাঠে পানি দেওয়ার দরকার হয় না বাবু। তা দেখছেন না আসমানের ভাবখানা।

অর্থাৎ অনাবৃষ্টি। এই প্রথায় জলসেচকে মালদহের গ্রাম্য লোকেরা যা বলে —সেই সুন্দর শব্দটি স্মরণে এল না।

—কিন্তু মিঞা সাহেব। এইভাবে কতটা জমিতে সেচ করতে পারেন? আর তাতে কতটাই বা কাজ হয়।

নজর আলি টেনে টেনে তামাকের ধোঁয়া ছেড়ে বলেছিল—কাজ যে একেবারেই হয় না তা নয়। তবে কি জানেন পরিশ্রম বেশি আর সময়ও লাগে অনেক। শুনেছি সরকার এই ধরণের অঞ্চলগুলিতে পানির জন্য 'টিউকল' দেবে। তখন আর এত পরিশ্রম করতে হবে না পানির জন্য। কি বলেন। নজর আলির প্রত্যাশা পূর্ণ হবে বৈকি!

ছোট ছোট শহর ও বন্দরগুলি ঘিরে ভিড় করেছে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু মানুষ। বিশেষ করে পূর্ববাংলার কৃষিজীবী, মাঝি ও মৎস্যজীবীরাই মালদহের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছেন লক্ষ্য করলাম। মালদহের সাধারণ মানুষগুলির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছেন দেখলাম। এমন অনেকগুলি স্থান চোখে পড়ল—যেখানে বিভাগ পূর্বকালে স্থান হিসাবে কোন গুরুত্ব ছিল না কিন্তু উদ্বাস্তু আগমনের পরে ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়েই হোক্—কৃষির দিক দিয়েই হোক্—উন্নয়ন সুরু হয়েছে উদ্বাস্তু আগমনের পর থেকে। জেলার পূর্ব অংশে একটি গ্রাম্য পরিবেশে—যশোর থেকে আগত নমঃশূদ্র কৃষক সনাতন মণ্ডল আমাকে বলেছিল—তার আতার বীচির মত দু' পাটি দাঁত বের করে—এইহানে আমরা এট্টা নতুন জিনিস করিছি বাবু!

—কি জিনিস?

সনাতন বলে—পাটের চাষ!

দূর! সে আর নতুন কি। অল্প-স্বল্প হলেও মালদহে পাটের চাষ হত।

সনাতন বলে—তারে কি আপনি পাটের চাষ কও বাবু! পাটের চাষ অরা কেউ জানে না। পাটের 'জাক্' কারে কয় তাই ভালভাবে জানে না। জাক দিয়ে কোন-মতে মুগুর দিয়ে খাঁড় গুলান্রে ভাঙে আঁশ বার করে। আগে আমরাই শিখাইছি 'জাক' দিতি হয় কেমনভাবে, দুই হাতে দুই আঙুল দিয়ে আঁশ বার করতি হয় কিভাবে, তয় না অরা শিখিছে।

সনাতন বলে—তা বি-ডি-ও সাহেবও খুব তারিফ করিছে আমাদের এই কাজ-গুলান।

হবে হয়তো।

সনাতনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—এদের সংগে কোনরকম মনোমালিন্য হয় না কোন বিষয়ে?

—না তেমন কিছু হয় না। তয় পেরথম পেরথম বাঙাল বাঙাল করত। তা আমরা বাঙাল—তরাই বা কোন ইংরেজ। বলে সনাতন খ্যাল্খ্যাল করে হেসে উঠেছিল।

বড়সোনা মসজিদ—পাণ্ডুয়া। উপরে সাতটি সোনার গম্বুজ ছিল। ইংরাজ আমলে সেগুলি অপসারিত হয়েছে।

মালদহের শ্রমজীবী মানুষগুলির মধ্যে জাতিগত পার্থক্য যে কত প্রচুর—তা হিসাব করে বের করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। সাদৃশ্য শুধুমাত্র অন্নসংস্থানের ক্ষেত্রে। আর সংবাদ নিয়ে জানা গেল, এই জাতিপ্রথা বহু প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। মালদহে অন্ত্যজ শ্রেণীর সংখ্যা নেহাত কম নয়। এর মধ্যে রয়েছে সাঁওতাল, পলুয়া, আইহো বা আহির প্রভৃতি। সাঁও-তাল শ্রেণী ঠিক কোন সময় থেকে মাল-দহে এসে বসতি সুরু করেছিল সে বিষয়ে সঠিক কোন ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পাল আমলে কিংবা কৈবর্ত বিদ্রোহের সময়ে যে সব অন্ত্যজ শ্রেণী বিদ্রোহী নেতা দিব্বোকের সঙ্গে যোগদান করেছিল—তার মধ্যে সাঁও-তালের উল্লেখ নেই। বুকাননের মত অনু-যায়ী—ভারতে ব্রিটিশ আগমনের কিছু পূর্বে বিলাসপুর, রায়পুর, ছোটনাগপুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সাঁওতালরা মালদহে তথা সমগ্র উত্তরবঙ্গেই আসতে থাকে। সাঁওতাল শ্রেণীর মধ্যে আবার ওঁরাও, মুণ্ডা, কোরোয়া, গোড়, মালপাহাড়ী প্রভৃতি নানা শ্রেণী বিভাগ ছিল এবং এখনও মালদহের কোনও কোনও অঞ্চলে এই বিভক্ত সাঁওতালরা নানা শ্রেণীর উপ-জীবিকা নিয়ে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। লক্ষ্য করবার বিষয়—এই খণ্ডশ্রেণীগুলির ভাষাও এক নয়। অবশ্য লেখ্য ভাষা কোনও শ্রেণীরই নেই। মূল সাঁওতাল শ্রেণীর কথ্য ভাষা স্বতন্ত্র হলেও লিপি হিসাবে বাংলা অক্ষরমালা ব্যবহার করতে শিখেছে, কিন্তু খণ্ডশ্রেণীর সাঁওতালরা কেউ কেউ হিন্দী বর্ণমালা ব্যবহার করে।

হরিশচন্দ্রপুরে, এবং গঙ্গার বিপরীত তীরে যেসব বাঙালীশ্রেণীর মুসলমান এবং রাজপুত ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ বলে একশ্রেণী মানুষের বসতি চোখে পড়ল—যারা সর্ব-ক্ষেত্রে বাঙালী বলে পরিচয় দিয়ে এবং বাংলা ভাষাকেই মাতৃভাষা বলে স্বীকার করলেও পাঠশালা থেকেই শিক্ষার মাধ্যম হিন্দী—এবং বাংলা সেখানে তৃতীয় পত্র মাত্র। তালডাঙা গ্রামের পাঠশালায় শিক্ষক জনাব নূর উদ্দিন বললেন—এই অসঙ্গতি চলে আসছে—তার বাপ-ঠাকুর্দার আমল থেকে। যে সমস্ত শ্রেণীর মানুষ সাধা-রণত রেশমকীটের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত রয়েছে বংশানুক্রমে—মালদহে তারা পলুয়া বলে পরিচিত। রেশমের ব্যবসা বহুদিনের কাজেই কালের আবর্তনে পলুয়া শ্রেণীর মধ্যে উত্থানপতন, ভাঙাগড়া চলছে বহু-কাল ব্যাপী। সুতরাং পলুয়ারা নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে এখন বৃত্তিকেও বদল করে নিয়েছে কোনও কোনও ক্ষেত্রে। আর এই বৃত্তি পরিবর্তনের ফলে পলুয়াদেরও বিভক্ত শ্রেণীকে নানাতর নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন পলুয়াদের এক অংশ কালের গতি পরিবর্তনের সঙ্গে বৈষ্ণব-ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে এবং কণ্ঠি ও গেরুয়া ধারণ করে বৈষ্ণব হয়ে নাম সংকীর্তনই একমাত্র জীবন ধারণের উপায় বলে স্থির করে নিয়েছে। এই শ্রেণীকে মালদহের কোনও কোনও স্থানে 'সাধু পলুয়া' বলে। আবার সাধু পলুয়া বলে অন্য একশ্রেণীর দেখা পাওয়া গেল—যারা ধর্মে বৈষ্ণব নয় —সাধারণ গার্হস্থ্য জীবন যাপনই করছে —কিন্তু রেশমকীটের ব্যবসায়ে তারা লিপ্ত নেই।

পালাবদল

তারক চক্রবর্তী

অস্তসূর্যের এবার বোধ হয় পালাবদল
সূর্যপ্রণত মানুষগুলো কোথায় ভেসে যাবে
ধূমকেতু আসুক!
লক্ষ যোজনের ব্যবধানে বিরহ বড় করুণ
মিলনে যদি ধ্বংস হয় সেও ভাল
ধূমকেতু আরো জোরে ছুটে আসুক।
মৃত্যু পূর্ণতার প্রাথমিক সংকেত
অতএব তোমাকেও কোনদিন অমৃত হতে হবে
সুপর্ণা তুমি নিশ্চয় অমৃত হবে।

আজ সারা পৃথিবীতে অসংখ্য কাঁচারঙের আগুন
আপাতমধুর হলেও বিরোধ এবং সমন্বয় ক্রমাগত
মানুষ মারবার যন্ত্রগুলোর যেন বিরাম নেই
শতাব্দীর মুক্তির দাবি নিয়ে তারা রুদ্রমূর্তি
এবার যুগের পরিবর্তন শাশ্বত।
তোমার সিঁথিতে তাহা লাল রক্তের স্বাক্ষর
নন্দিনীর মত তুমিও একদিন অঘটন ঘটাবে।

কাল মধ্যরাত্রে

অজিতকুমার রায়

কাল মধ্যরাত্রে
আমি আত্মহত্যা করেছিলাম।

অথচ দেখ,
আমি একদিন তোমাদের
কত প্রিয়
কত আপনজন ছিলাম।

আমার মৃত্যুর পরের দিন সকালে
রাস্তায়
মানুষের সেই একই ভিড়।

এতটুকু দাগ কাটে নি
কারো মনেই।

কোন এক প্রেতাত্মা শুধু প্রশ্ন করল:
আত্মহত্যা করে কি লাভ হল?

রাজবংশী শ্রেণীর আদি বাসভূমি রংপুর ও কোচবিহার। জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিঙ জেলাকে রাজবংশীদের বিস্তৃত বাসভূমি বলে চিহ্নিত করলেও মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরে রাজবংশীদের প্রাধান্য নেই। আর এই জেলাগুলিতে এবং মালদহেও রাজবংশীরা তাদের নিজস্ব জীবনধারাকে স্বতন্ত্র রেখেই পুরুষানুক্রমে বসবাস করে আসছে। মালদহের যে বহুমুখী লোকসংস্কৃতি আছে—তার মধ্যে রাজবংশীদের অবদানও নেহাৎ কম নয়। অবশ্যই রাজবংশীরা এখানে কৃষিজীবী। মাছ ধরা, এবং কুটিরশিল্প, মাটির হাঁড়ি তৈরি ও লোহার কাজেও এখানে রাজবংশীরা নিজেদের জড়িয়ে নিয়েছে—যা সাধারণত জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও দার্জিলিঙ জেলায় চোখে পড়ে না।

শিবগঞ্জের একটি অখ্যাত পল্লীতে রাত্রিযাপনের দিনে স্থানীয় এক সম্পতিপন্ন রাজবংশী হারান বর্মণের বাড়িতে গান শোনার আমন্ত্রণ ছিল।

বরঞ্চ বিচিত্রানুষ্ঠান বললেই সঙ্গত হোত। কেন না সেখানে রাজবংশীদের গ্রাম্য গীতি, গম্ভীরার কিছু অংশ এবং নাচের ব্যবস্থা ছিল।

যদিও জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রি—তবুও হারান বর্মণ একটি পাম্পলাইটেরও ব্যবস্থা করেছিল।

গোবর নিকানো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন প্রাঙ্গণ। গানের আসরে সবই গ্রামের মানুষের জমায়েত। আর এর মধ্যে আমার উপস্থিতি যেন কেমন বেমানান।

এই আসরে বসেই গম্ভীরা এবং রাজবংশী পল্লীগীতির স্বাদ পেলাম।

হারান বর্মণের কাছে একটি রাজবংশী গান এবং একটি গম্ভীরা গানের প্রার্থনা জানানোতে হারান বর্মণ দুঃখ করে যা বলল—তার মর্মার্থ এই যে—দেশের মানুষের প্রাণে আর সে সুখ নেই বাবু! নতুন গান আর আসবে কোত্থেকে। তা সত্ত্বেও দুটি গান সংগ্রহ করে এনেছিলাম সেই আসর থেকে।

রাজবংশী ভাষায় রচিত গানটির মর্মার্থ খুবই সহজ। গ্রাম্য নারীর মধ্যে সভ্যতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনুপ্রবেশের একটি চিত্র।

"মোকে আনি দিবা গুলবাহার
ঢোকড়া মেখলি পরুম না মুই আর!
অংবিঅং এর চুড়ি হাতত্ দিয়া
মারমু বাহার!
বিবিয়ানা পেন্ধানি গায় দিয়া
সাদ্ হয়াছে সাজিব মুই
শহর্যা মাইয়া
কুটুমনা মুই চিড়া-মুড়ি,
দিব না ঢেঁকিৎ পাহার।

শুধু মালদহেই নয়—উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলির গ্রাম্য গীতির মধ্যে—নতুন কালের সঙ্গে পুরানো দিনের সংঘাতমূলক গানের সন্ধান পাওয়া যায়। গম্ভীরা গানের মধ্যে রাজনীতির সম্পর্কটাই বর্তমানে প্রকট হয়ে পড়েছে—বিশেষ করে প্রশাসনিক দুর্নীতি ও অব্যবস্থার অপ্রিয় ও সঠিক চিত্র পরিস্ফুট।

মালদহের সর্বত্রই ঘুরে দেখেছি—সাধারণশ্রেণীর মানুষের জীবনধারণ পদ্ধতি খুবই সহজ। আড়ম্বর বা বাহুল্য কোথায়ও নেই বললেই চলে। পূর্বেই বলা হয়েছে জেলার মধ্যে সার্বিক উন্নয়ন বা উল্লেখযোগ্য কোন পরিকল্পনা চোখে পড়ে নি। ফলে নাগরিক জীবনযাত্রার মানও খুব উন্নত হয়েছে বলে মনে হল না।

মালদহ শহর নতুন করে গড়া হচ্ছে। প্রাচীন ঐতিহ্যসম্মত সংস্কৃতি চর্চার নিদর্শন যথেষ্ট। আর তার সঙ্গে চলেছে নতুন দিনের ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী আধুনিক জীবনের মূল্যায়ন।

আগামী সংখ্যা থেকে পশ্চিম দিনাজপুর জেলা॥

আলোকচিত্র—পূর্ণেন্দু পালচৌধুরী

দিল্লী থেকে

শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

তিমির আঁধার কেটে এসেছে প্রভাতের স্নিগ্ধ নব অরুণের আভা। 'সারাটি রজনী জাহান্ আরা বেগমের এক পলক ঘুম হয় নি। দেহের জ্বালার চেয়েও মনের জ্বালার যন্ত্রণা অনেক বেশি।

নিশ্চয়ই গুলরুখ আর নেই। প্রাসাদের সবাই আপ্রাণ চেষ্টা করছে খবরটা তাঁর কাছ থেকে চেপে রাখতে। চেপে রাখার প্রয়োজন কি? কতদিন সত্য লুকোনো থাকে?

সত্যি গুলরুখের মুখখানা মনে পড়লেই বুকটা কেঁপে ওঠে অসহনীয় বেদনায়। মেয়েটার মনভর্তি ছিল আনন্দের ফোয়ারা। যখন তখন যেখানে সেখানে কারণে অকারণে ঝর্ণাধারার মতন কল কল খল্ খল্ করে হাসতে পারতো। যেখানে সেখানে যখন তখন প্রকৃতির তালে তাল মিলিয়ে নিজের দেহলতা এলিয়ে এক অপরূপ পরিপার্শ্ব তৈরি করতে পারতো। গুলরুখ ছিল যেন একটা নবনৃত্যচ্ছন্দের জীবন্ত প্রতীক, একটা অবর্ণনীয় সিম্বল!

মনে পড়ে সেই প্রথম সন্ধ্যার কথা। দরিয়া, মরিয়ম ছাড়া আরও কটা কিংকরী মিলে ধরে নিয়ে এসেছিল গুলরুখকে। নবযৌবনা নর্তকী। গোয়ালিয়রের মেয়ে। সেখানকার ওস্তাদদের হাতে গড়া নৃত্যচ্ছন্দের প্রতীক। চলনে চালে যেন একটা নবজীবনের উদ্দাম অপ্রতিহত বেগ। জীবনের আবেগ রূপায়িত তার নৃত্য ভাব ও লাস্যে। কথা বলছে, না, মেয়েটা নাচছে, ঠিক জানা না থাকলে বোঝা ভার।

জাহান্ আরার সামনে কুর্নিশ পেশ করে এসে দাঁড়ালো।

দরিয়াই বোধ হয় সব কিছু শিখিয়ে পড়িয়ে এনেছিল।

জাহান্ আরার সামনে দাঁড়িয়ে মেয়েটা সব কিছু ভুলে গিয়েছিল। সাধারণ নর্তকীজীবনে এত বৈভব, প্রতিপত্তি জীবন্ত সৌন্দর্যের সাথে কবে কোথায় পরিচয়? তাই হতবাকভাবে শুধু তাকিয়েছিল জাহান্ আরার মুখপানে।

কি অপরূপ রূপসী নারীমূর্তি! জাহান্ আরার এত রূপ! গুলরুখের মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুচ্ছিল না।

জাহান্ আরা গুলরুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন একটা সরলা, চপলা, নবযৌবনা। অনিন্দ্যসুন্দর সে মুখ। এ মুখের সাথে যেন তার কতযুগের পরিচয়। যেন খোদাতালার একটা জীবন্ত রুবাই—কবিতা!

জাহান্ আরা হেসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তোমার নাম কি?'

ঢোক গিলে গুলরুখ বলেছিল, 'গুলরুখ বেগম!'

অতি কষ্টে হাসি সম্বরণ করেছিলেন জাহান্ আরা।

দরিয়া, মরিয়ম আর হাসি চাপতে পারে নি। দরিয়া অনেকক্ষণ পাখী পড়ানোর মতন এই মেয়েকে রাজপ্রাসাদের কায়দা-কানুন শিখিয়ে এনেছিল। বলেছিল নাম জিজ্ঞাসা করলে বলবি, "বান্দা গোলাম নাজীরের নাম গুলরুখ। বেগম সাহেবার চরণের দাসী, কিংকরী। শুধু এইটুকু পরিচয়েই বেগমসাহেবাকে লাখ সেলাম।"

এখানে এসে মেয়েটা সবকিছু ভুলে গেল? শুধু তাই নয়, বেগমসাহেবার সামনে নিজের নামের সাথে আবার একটা বেগম জুড়ে দিয়েছে। গুলরুখ বেগম!

হাসি চেপে জাহান্ আরা গুলরুখের কথারই পুনরাবৃত্তি করল, 'বাঃ বেশ নাম তো। গুলরুখ বেগম!'

এবার সবাই খিল্ খিল্ করে হেসে ফেলে। অনেকক্ষণ হাসি চেপে রেখেছিল। আর কতক্ষণ চাপা যায়?

সবচেয়ে আশ্চর্য এই হাসির সাথে পূর্ণভাবে যোগদান করলো গুলরুখ বেগম!

জাহান্ আরা দেখলেন এই এতগুলো মুখের হাসির ভিতর নবাগতার হাসিটুকুই যেন সবচেয়ে মিষ্টি, সরল, অমলিন। অন্তরের আলোতে সমুদ্ভাসিত। প্রশ্ন করলেন, 'কোথায় দেশ তোমার?'

—'গোয়ালিয়র।'

অতিকষ্টে জবাব দেয় গুলরুখ।

দরিয়া এবার মরিয়া হয়ে ওঠে। এ কি বে-আদবী? কতক্ষণ বসে সে শিখিয়েছে বাদশা বেগম দেশের কথা জিজ্ঞাসা করলে সে যেন বলে বান্দা নাজীরের গরীবখানা বাদশা বেগমের এ বিরাট হিন্দুস্থানের এক প্রান্তভাগে দরিদ্র কুটীরে। সম্প্রতি সে বেগমসাহেবার চরণাশ্রয়ে তারই কিংকরীমাত্র।

এ কি আদব-কায়দা? যেন দিল্লীর রাজপথের সাধারণ পথচারীর সাথে কথোপকথন।

—'তুমি কি কি কাজ জানো?'

একগাল হেসে গুলরুখ বলেছিলো, 'নাচ, গান, বাজনা। সবই জানি।'

—'বাঃ সবই জানো। তবে আর কি?'

দরিয়া, মরিয়ম অন্যান্য সবাই ভেবেছিল এ বে-আদব মেয়েটার এ রাজপ্রাসাদে কোনো কাজ মেলা ভার। যদি বা কপালগুণে জুটে যায় তাহলে সেটা হবে হারেমের কোনো কোণে। দেশী-বিদেশী অতিথি-অভ্যাগতদের চিত্তবিনোদনের জন্য নৃত্যের কাজ।

তা হলো না।

জাহান্ আরা বেগম গুলরুখের হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন সম্রাট শাজাহানের বিশ্রামাগারে। গুলরুখকে দেখিয়ে জাহান্ আরা বলেছিলেন সম্রাটকে, 'জাঁহাপনা খোদাতালার গুল্‌বাগিচার খুশবাই গুল্‌দিস্তা হাতে এসেছে জীবন্ত গুলরুখ। হুকুম করুন একে আমার আপন কাজের ভার ন্যস্ত করি।'

অবাকভাবে তাকিয়েছিলেন সম্রাট শাজাহান।

কে এই ভাগ্যবতী সুন্দরী? মুখে বলেছেন, 'এ সাম্রাজ্যে তোমার শক্তি তুমি জানো। একজন সাধারণ নাজীর কেন? হিন্দুস্থানের ওয়াজির-ই-আজম পর্যন্ত তোমার হুকুমে আমি বদলে দিতে পারি, তুমি জানো প্রিয় কন্যা জাহান্ আরা।'

সেলাম করে ফিরে আসছিলেন জাহান্ আরা।

গুলরুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সরলা যুবতী সম্রাটের মণিমুক্তো খচিত অপরূপ সাজের দিকে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে রয়েছে।

তাড়াতাড়ি বললেন কানে কানে, 'হাঁ করে দেখছিস কি হতভাগী। কুর্নিশ কর সম্রাটকে। এক্ষুণি না হলে তোর ফাঁসি হয়ে যাবে জানিস? গর্দান যাবে। চাস তাই?'

পরমেশ্বরের আশীর্বাদ এ দুনিয়াতে নেয় বিভিন্ন রূপ। অরূপ যে অপরূপ রূপে দেন আপন স্পর্শের প্রমাণ। না

হলে পৃথিবীতে এত রূপের ছড়াছড়ি কেন?

জাহান্ আরা ভারি প্রসন্ন এ নবাগতা নাজীরের কাজে। যেমন তার নৃত্যছন্দ, তেমনই অপূর্ব তার সুধাকণ্ঠ। যেন অমিয়ঢালা। হাসিতে যেন শত ঝর্ণার আনন্দধারা। হীরের মত ঝক্‌ঝকে দাঁতগুলো হাসির সাথে সাথে যেন দেহবল্লরীর নৃত্যছন্দের তালে তালে নেচে ওঠে। জাহান্ আরা গুলরুখের উপস্থিতিতে পান এক অনির্বচনীয় অনাবিল আনন্দ অনুভূতি। শত কাজের ফাঁকেও তাই একবার গুলরুখের মুখটুকু না দেখলে যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে দিনটা।

এত সরল মেয়েটা যে বলার নয়। তাকে নিয়ে দরিয়া, মরিয়ম সর্বদা রয়েছে হাসি তামাসায় মসগুল্। যেন গ্রামের একটা অনাঘ্রাত গোলাপ। শহরের উদ্ধত কৃত্রিমতায় নিজেকে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারছে না।

মাঝে মাঝে জাহান্ আরা তাঁর স্বরচিত রুবাই দিতেন গুলরুখের মুখে। ভারি মিষ্টি গলা। অমৃতঢালা সুমধুর কণ্ঠে সে রুবাই যেন পেয়েছে নতুন প্রাণ। আত্মবিমোহিত জাহান্ আরা আপন সৃষ্টিতে হতেন বিভোর।

এই রুবাই তাঁর নিজের সৃষ্টি? তাই তো। এ যে শিল্পীর কণ্ঠে পেয়েছে নতুন জীবন। গুলরুখ আর কিংকরী নয়। সে আর নয় এ রাজপ্রাসাদের নাজীর। সে এখন জাহান্ আরা বেগমের পরম প্রিয় অভিন্নহৃদয় সখী। প্রাণের গোপন কথাটুকুও তাকে খুলে বলতে দ্বিধাবোধ করেন না বেগমসাহেবা। দরিয়া পুরনো নাজীর। প্রাণ দিয়ে সেবা করে জাহান্ আরার। প্রাণাধিক ভালবাসেন জাহান্ আরাকে। সমগ্র হিন্দুস্থানে বিচক্ষণা জাহান্ আরার ওপর একমাত্র তারই অধিকার সবচেয়ে বেশি। বুদ্ধিদীপ্তিতে সে চিরভাস্বর। জাহান্ আরার ওপর তার পুণ্য সমর্পণ সম্পূর্ণাঙ্গ। জাহান্ আরার জীবনের আনন্দ বেদনার সাথী দরিয়া বেগম। তাঁর সহচরী।

মরিয়ম মরমী সহচরী। জান্ কুরবানী করে সে জাহান্ আরার সেবা করতে তৈরি। জাহান্ আরা তা জানেন। জাহান্ আরার দৃষ্টি থেকে তার মনের অবস্থাটুকু অনুমান করতে শিখেছে মরিয়ম। একাকিনী জীবনে দরিয়া মরিয়ম না থাকলে জাহান্ আরার হয়তো বাঁচাটাই হতো সম্পূর্ণ আনন্দহীন। ভারাক্রান্ত।

এদের মাঝে গুলরুখ এসেছে যেন বেহেস্তু গুলজার করতে। যেন একটা জীবন্ত নার্গিস ফুল। দরিয়া হলো ক্ল্যাসিক্যাল গান। যেন ধ্রুপদ, খেয়াল। মরিয়ম দাদ্‌রা, ঠুংরি। গুলরুখ প্রেম সংগীতের জীবন্ত সিম্বল—টপ্পা, কাওয়ালী। সভা মাৎ করে দেয়।

নবযৌবনা গুলরুখ যেন মহাপ্রাণের সন্ধানে চলেছে জীবনের জয়গান গেয়ে—

'আমি ঢালিব করুণাধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণকারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল-পারা।'

প্রেমপাগলিনী জাহান্ আরার জীবনে এলো এক অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভূতি। গুলরুখের মতন তিনিও ছুটতে চেষ্টা করেন মহাপ্রাণের মহাসংগীতে মেলাতে আপন তান। 'কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া, রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া, রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া দিব রে পরাণ ঢালি।' কিন্তু পরাণ আর ঢালা হয় না। কোথায় তার গুলরুখের মতন স্বচ্ছ সরল মন? কোথায় সে পূর্ণ সমর্পিত নৃত্যছন্দ?

গুলরুখ প্রতিদিন সৃষ্টি করতো নব নৃত্যছন্দ শুধুমাত্র বেগমসাহেবার মনোরঞ্জনের জন্য। জাহান্ আরার বেদনাঘন দিনে মুখে একটুখানি হাসি ফোটাতে যে তিনটি সখী তাদের প্রাণপাত প্রয়াস করেছে গুলরুখই যে ছিল তাদের অগ্রদূত। একটুখানি হাসির পুরস্কার যেন সমগ্র হিন্দুস্থানে নব সূর্যালোক। তিমিরাবৃত রাজপ্রাসাদে যেন খেলে যেত নব যমুনাতরঙ্গ। গুলরুখই সে রাজপ্রাসাদের গোপন প্রেমদগ্ধ চিত্তে ঢেলে দিত অমৃতধারা। হেসে খলখল গেয়ে কলকল সে-ই যে তালে তালে দিত তালি। এই সমগ্র হিন্দুস্থানে কত নর-নারীর সান্নিধ্যেই তো এসেছেন বেগম জাহান্ আরা। তাঁদের ভিতর কেউ দিতে পেরেছেন জীবনে পরমানন্দের সন্ধান? যৌবন চঞ্চল গুলরুখই যেন না দেখা ঋষির মহারাণীর রূপায়ণ দিয়েছে আপন সাধারণ জীবনে। কে জানতো, একটা জীবনে 'এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে?' কে জানতো এই সাধারণ মানুষের জীবনে 'এত সুখ আছে, আছে এত সাধ?' কে জানতো?

সাধু ফকীর সন্ত্ যে প্রাণের আস্বাদন দিয়েছেন তার অনুভূতি বড়ই দুরূহ। শুনতে ভালো লাগে, করা শক্ত। দৈনন্দিন জীবনে তাদের রূপায়ণের শক্তি নেই সাধারণ নর-নারীর। তাই কবি শারমদ এত আপন হয়েও এত দূরে, বাবা ফকীরের রুবাই নাগালের বাইরে, মীরার ভজন্ শুধুই শ্রুতিমধুর। তার একটু বেশি নয়। গুলরুখের জীবনাদর্শই যে সাধারণ রমণীর দৈনন্দিন জীবনে নবদর্শন!

গান গেয়ে নব নৃত্যছন্দে যে জীবনটাকে সহজ সরলভাবে গ্রহণ করতে পেরেছে এ দুনিয়াতে তার আর কি চাই? সে যে হিন্দুস্থানের শাহানশা বাদশা শাজাহানের চেয়েও সুখী। তার মন যে হিন্দুস্থানের সবচেয়ে ধনী নারী সম্রাটনন্দিনী জাহান্ আরা বেগমের চেয়েও খুশিতে ভরপুর!

গুলরুখ তাই তো জাহান্ আরার এত প্রিয়পাত্রী, এত আপন, এত নিকটজন হতে পেরেছিল। তাইতো জাহান্ আরা প্রতিক্ষণ তার অনুপস্থিতিতে এত কাতরা।

গুলরুখ ছিল অত্যন্ত সংগীতপ্রিয়। যখন গাইতো অন্তর দিয়ে আবৃত্তি করতো রুবাই-এর শব্দগুলো। যেন প্রাণমন ঢেলে কোন্ অজানা জগতে চলে যেত গুলরুখ। শুধু নিজেই যেত না। শ্রোতাদেরও নিয়ে যেত সাথে সাথে। তার গান শুনলে পাথরেরও প্রাণ আসে? দরিয়া বেগমের একথা জাহান্ আরা পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতেন যেন।

সেদিন হঠাৎ একটা নতুন গুজরাতি আতর ওড়নায় মেখে চঞ্চলা বনহরিণীর মত নাচতে নাচতে ছুটে এসেছিল জাহান্ আরার ঘরে। ওড়নার ঝালরে ছিল রঙ-বেরঙের শতসহস্র চুমকী। সর্বাঙ্গ স্বর্ণালংকারে ঢেকেছিল গুলরুখ। যেন তৈরি হয়েই এসেছিল প্রিয়তমকে আলিঙ্গন করতে। সাথীবিহীন জীবনে মরণের চেয়ে প্রিয়তম আর কে?

আপন ইচ্ছানুযায়ী গুলরুখ স্বভাবসিদ্ধভাবে গুনগুন করে গান শুরু করলো আপন নৃত্যের তালে তালে—

সাপ্তাহিক বসুমতীর

গ্রাহক হবার নিয়মাবলী

		টা, প,
বার্ষিক	চাঁদা (সডাক)	১৪·০০
ষাণ্মাসিক	" "	৭·০০
ত্রৈমাসিক	" "	৩·৫০

তিন মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক হতে হলে আপিসে অগ্রিম টাকা জমা দিতে অথবা মনিঅর্ডারে পাঠাতে হবে। কর্মাধ্যক্ষ

লেখা পাঠাবার নিয়মাবলী

লেখকদের কাছে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, অবশ্যই লেখার নকল রেখে তাঁরা সাপ্তাহিক্ বসুমতীতে লেখা পাঠাবেন। লেখা মনোনীত হলে পর সে-সংবাদ আমরাই যথাসময়ে পাঠিয়ে থাকি। নাম ঠিকানাসহ ডাকটিকিটযুক্ত খাম থাকলে একমাত্র অমনোনীত গল্প ফেরৎ পাঠাবার চেষ্টা করা হয়। কবিতা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। —সম্পাদিকা

বোকাটা

প্রভাকর মাঝি

আকাশটা খিল খিল করে হাসছিল।
আহা, একটু রোদ আসুক।
ও জানালাটা খুলতে গিয়েছে—
আর অমনি কাঠ-পিঁপড়ে, কেন্নো, টিকটিকি,
মায় মাকড়সা আরসোলা পর্যন্ত
একযোগে রে রে করে উঠল ঃ
—কে হে বাপু, আমাদের চার পুরুষের
কায়েমী স্বত্বে হাত বাড়াও? তফাৎ যাও।
পৎ পৎ। পিন্ পিন্। ভন্ ভন্।
সে কী তুলকালাম কাণ্ড।
যুগপৎ সাঁড়াশী আক্রমণ।
ঠাণ্ডা নয়, রীতিমত গরম লড়াইয়ের মহড়া।
বোকাটার তখনও হুঁস হয় নি।
জংধরা পাল্লা ধরে টানছে তো টানছেই।

তারপর নাটকের শেষ দৃশ্য
তারপর নাটকের শেষ দৃশ্যে
(আগে থেকেই তৈরি-করা প্লট):
সংবিধান-বিরোধী এই দুষমণকে ঠেকাতে
শান্তি-রক্ষক সান্ত্রী এল ঃ
মাথায় লোহার হেলমেট, হাতে আত্মরক্ষী ঢাল।
বাপ রে, সে কি দমাদ্দম বেটনের পিটুনি।

বেডের অভাবে হাসপাতালের বারান্দায় শুয়ে
বোকাটা এখন এন্তার আকাশ দেখছে।

অদ্বিতীয়

অঞ্জনা সেনগুপ্তা

সেই বৃদ্ধ শাঁখারীর তৈরি সাদা শাঁখার,
আর আধুনিক ডিজাইনের কিঙ্কিণীর
মধ্যিখানে অনিবার্য লাল পলাটা
একটা রক্তের রেখার মতো সরু হাতটায় কুণ্ডলিত।
বারবার দেখতে ইচ্ছে হয়, আর মনে হয়,
হৃদয় থেকে রক্ত চুয়ে পড়া
কী আশ্চর্য একটা লাল-কুণ্ডল।

সেই লাল-কুণ্ডল দেখতে দেখতে—
যে-স্বপ্ন দেখতে ভুলে গেছিলাম—
সেই স্বপ্নে দেখেছি একটি পরিচিত মুখ।
সেই মুখে তখনো এক নীরব অহঙ্কার,
যে-অহঙ্কারের নাগাল পাই নি স্বপ্নের মধ্যেও।

হঠাৎ শব্দ উঠল কিঙ্কিণীতে।
অলস ঘুমের কিনারায় কে যেন ঘুম ভাঙাল।
কে যেন ঘুম পাড়াল আবার।
অন্ধকারে জেগে থাকল
কী আশ্চর্য একটা লাল-কুণ্ডল।

"ফুটেছিল আমার প্রাঙ্গণে
রজনীগন্ধা
ঝরেছিল সুবাসের নব
আলোকনন্দা।
প্রিয়তম, ভূস্বর্গের প্রাসাদে
চলে গেলে তুমি;
আকাশের মেঘ এসেছিল তব
চরণ চুমি।
লিপি পাঠায়েছি তোমারে,
আসে নি উত্তর,
তবু আশা মোর প্রাণে
জেগেছিল নিরন্তর।
আমার উদ্যানে ফুটেছে আজি
কত শত ফুল,
এখনও শয্যা মোর তব গন্ধে
রয়েছে আকুল।"

অপূর্ব নৃত্যলাস্য। অপূর্ব নয়ন দৃষ্টি। অপূর্ব দেহপল্লবের মৃদু কম্পন।

প্রাসাদে শয়নকক্ষে সম্রাট শাজাহান তখনও নিদ্রায় যান নি। প্রতি রাত জাহান্ আরা তাঁকে নৈশ অভিনন্দন না জানিয়ে নিদ্রায় যান না। সে রাতেও গেলেন সম্রাটকে জানাতে তাঁর প্রণতি।

চারিদিকে জ্বলছিল লাল, নীল অসংখ্য প্রদীপ। ঝাড়লণ্ঠন ছাড়াও অলিন্দে অলিন্দে রঙীন প্রদীপ রয়েছে জ্বালানো। হঠাৎ আপন কক্ষ থেকে তিনি যেন শুনতে পেলেন একটা চাপা অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি। কে যেন গুমরে কাঁদছে—যেন তাঁরই অশান্ত হৃদয়ের মর্মরধ্বনি। আপন ঘরে প্রবেশ করেন। জাহান্ আরার যেন নিজের চোখ দুটোকেও বিশ্বাস হয় না। ওড়না শুধু নয়, সম্পূর্ণ বেশে আগুন পরিবেষ্টিত হয়ে ক্রন্দনরতা নারী আর কেউ নয়। গুলরুখ।

কি বিপদ!

নবযৌবন রক্তপলাশ স্ফুলিঙ্গের মত লেলিহান অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আলিঙ্গন করেছে প্রিয়সখী গুলরুখকে। কখন কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে অগ্নিশিখা তাঁকেও ছুঁয়ে ফেলেছে জাহান্ আরা নিজেও তা খেয়াল করেন নি। গুলরুখকে বাঁচাতে গিয়ে তিনি আপন ঢাকাই মসলিন খুলে ছুঁড়ে দিলেন। গুলরুখ সে বস্ত্রাঞ্চল ধরে ওঠার আগেই অগ্নিশিখা সে ঢাকাই মসলিন ধরে ফেলল। বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইলো না এবার দুই প্রিয়বান্ধবীর জীবন্ত দহন অনিবার্য। প্রেমানলে এতদিন জ্বলেছে মন, এবার দাবানলে জ্বললো অঙ্গ।

এ বিরাট রাজপ্রাসাদের কিংকরীর নাজীরের দল তাড়াতাড়ি ছুটে সম্রাট শাজাহানকে খবর দিতে ছুটলো। দারিয়া, মরিয়ম চেতনা হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

চারিদিক থেকে শুধু একটা রবই জাহান্ আরার কানে প্রবেশ করলো—'হকিম মুমিনা। কোথায় তিনি? ডাকো। ডাকো। রাজদরবারের চিকিৎসক হকিম মুমিনাকে ডাকো।'

ধীরে ধীরে সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছিলেন বেগম জাহান্ আরা।

গুলরুখের কি হলো তিনি জেনেছিলেন ঠিক তিন সপ্তাহ পরে। যমুনার উপর আকাশে তখন দ্বিতীয়ার চাঁদ বড়ই ম্লান। গুলরুখ আর নাচবে না এ রাজপ্রাসাদ গুলজার করে। এরা না বললেও জাহান আরা জেনেছেন গুলরুখ আর নেই।

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

শিলালি

নবনাট্য মন্দির উঠে যাবার প্রায় পাঁচ বছর বাদে ১৯৪২ সালে নাট্যনিকেতন মঞ্চে শিশিরকুমার তাঁর শ্রীরঙ্গম থিয়েটার খুললেন নতুন নাট্যকার তারাকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'জীবনরঙ্গ' নাটক নিয়ে। নাটকটি ছিল সম্পূর্ণ তৃতীয় শ্রেণীর—কেউ কেউ এ নাটকের নাট্যাচার্য অমরেশের চরিত্রে শিশিরবাবুর জীবনের ছাপ আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন—কিন্তু আমার মনে হয় এটা অত্যন্ত far fetched ব্যাপার। আসলে জীবনরঙ্গকে নাটকই বলা চলে না—যেমন দুর্বল কাহিনী তেমনি স্ট্রাকচারের দিক থেকেও নাটকটি মোটেই ঠিকভাবে গঠিত হয় নি। যেসব নতুন অভিনেতা, অভিনেত্রী এ নাটকে নেমেছিলেন, তাঁদের ভেতর অভিনয় ক্ষমতাও তেমন ছিল না। নায়করূপী শচীন মিত্রের না ছিল এ্যাকটিং করবার দক্ষতা, না ছিল কোন ব্যক্তিত্ব। দুই নবাগতা অভিনেত্রী বন্দনা এবং সুকৃতিও তথৈবচ। এ নাটকে শুধু ভাল লাগত অমরেশরূপী শিশিরকুমারের কবিতার আবৃত্তি—রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা এবং কিছু ইংরাজী কবিতারও আবৃত্তি করতেন শিশিরবাবু এই নাটকে। এসব আবৃত্তিই দর্শক মুগ্ধ হয়ে শুনতো। নাটক কিছুই হয় নি—সুতরাং দর্শকও এই তথাকথিত নাটক গ্রহণ করে নি।

এরপর শ্রীরঙ্গমে 'উড়ো চিঠি', 'মায়া', 'মাইকেল', 'বিপ্রদাস', 'বিন্দুর ছেলে', 'পরিচয়', দুঃখীর ইমান', 'বন্দনার বিয়ে', 'দেশবন্ধু', 'প্রশ্ন', 'সিরাজদ্দৌল্লা', 'তখ্‌তে তাউস' প্রভৃতি নাটক অভিনয় হয়। 'মাইকেল', 'বিপ্রদাস', 'দুঃখীর ইমান', 'বিন্দুর ছেলে', 'দেশবন্ধু' 'তখ্‌তে তাউস'—এই কটি নাটক রঙ্গজগতে শিশিরকুমারের বিরাট প্রতিভার স্বাক্ষর এঁকে দিয়েছিল। কিন্তু বাকী নাটকগুলো সবই ছিল অত্যন্ত দুর্বল রচনা এবং সেইজন্যই জনপ্রিয়তা অর্জন করে নি। আমার মনে হয় যে, এইসব নাটকের মঞ্চরূপায়ণে শিশিরকুমারের প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল এবং সেই কারণেই শেষ পর্যন্ত তাঁকে শ্রীরঙ্গম উঠিয়ে দিতে হল বাধ্য হয়ে।

শ্রীরঙ্গমে 'দেশবন্ধু' মঞ্চস্থ হয় ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৪২ সালে। এটি অনুবাদ নাটক—এ্যাস্‌লে ডিউকসের 'সাচ্‌ মেন আর ডেঞ্জারাস' নাটকের অনুবাদ করেছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয়। কানু বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রথম সত্যিকার সিরিয়াস ভূমিকায়, অর্থাৎ এ নাটকের রাজার রোলে, ভাল অভিনয় করেছিলেন শিশিরকুমারের কোচিং-এর গুণে। নাট্যাচার্য অতুলনীয় দক্ষতার সঙ্গে দেশভক্ত রাজ অমাত্য কহুণের ভূমিকার রূপায়ণ করেছিলেন। শেষ-দৃশ্যে তিনি অভিনয়কে গ্রেট এ্যাকটিং-এর হাইটে তুলেছিলেন।

১৯৪৩ সালের ২৩শে এপ্রিল 'মাইকেল' মঞ্চস্থ হয়। এর কিছু আগে রঙমহলে কবি মধুসূদনের জীবনী নিয়ে একটি নাটক হয়েছিল এবং এখানে নাটকের নামভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয়। এ অভিনয় দেখবার দুর্ভাগ্য আমার হয়েছিল। অহীনবাবুর মাইকেল দেখে আমার মনে হচ্ছিল যেন, কংসকে মডার্ন ড্রেসে অভিনয় করতে দেখছি—এ ভদ্রলোকের যাত্রার ঢং-এর সংলাপবাদন এবং লম্ফঝম্প মহাকবি মাইকেলকে যেন চম্বলের দস্যুনায়কে পরিণত করেছিল—তারপর যখন তিনি জার্ক দিয়ে দিয়ে কবিতা আবৃত্তি শুরু করলেন—সে এক অপূর্ব হাস্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। অথচ এক শ্রেণীর দর্শকের কাছে অহীন্দ্রবাবু খুব জনপ্রিয় ছিলেন। কয়েকটি ভূমিকায় তিনি অভিনয়ও ভাল করতেন—যেমন চন্দ্রগুপ্তে সেলুকস্‌। সাজাহানে নামভূমিকায় এ্যাক্রোব্যাটিক্‌সের চরম রূপায়ণ দেখিয়ে অহীনবাবু বহু থিয়েটার অনুরাগীর উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছেন। সাজাহান তাঁর অমরকীর্তি—তাঁকে যশ, খ্যাতি, মান, সম্মান, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা সবই দিয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত তাঁর খ্যাতিতে মুগ্ধ হয়ে গিয়ে শিশিরবাবুর জীবিতকালে নাট্যাচার্যকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে এবং নরেশবাবু, মনোরঞ্জনবাবুকে উপেক্ষা দেখিয়ে নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী মশাইকেই গিরিশ লেক্‌চারার করেছিলেন। প্রকৃত গুণীর গুণ কখনও ছাই চাপা থাকতে পারে না। পরে সবাইকে হারিয়ে দিয়ে অহীনবাবুই রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ডীনের পোস্টে নিযুক্ত হন। মাঝে মাঝে একটা কথা ভেবে বড় আক্ষেপ হত। আজ বাংলার রঙ্গমঞ্চে সর্বত্র শিশিরকুমারের অভিনয়ের স্টাইল বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়—কিন্তু নটসূর্যের স্কুল অভ্‌ এ্যাকটিংকে কোথাও দেখা যেতো না। ভারি দুঃখ হোত এই ভেবে যে, অহীনবাবু মঞ্চ থেকে অবসর নেবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা রঙ্গমঞ্চ থেকে তাঁর অভিনয়ধারাও বুঝি চিরতরে অন্তর্হিত হোল। আমার সে আক্ষেপ কিন্তু দূর হোল থিয়েটার সেন্টারের তরুণ রায় মহাশয়ের অভিনয় দেখবার সুযোগ পাবার পর থেকে। অবশ্য এখনও অবধি অহীনবাবুর ম্যাচিওরিটি তরুণবাবুর ভেতর আসে নি—তবে সময় হলে সে অভাবও থাকবে না। তবে অনেক বিষয়ে তরুণবাবু শিশিরকুমার এবং অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয়কেও ছাড়িয়ে গেছেন। শিশিরবাবু প্রোডিউসার এবং অভিনেতা ছিলেন—কোন নাটক লেখবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তরুণবাবু নট, নাট্যকার এবং পরিচালক। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে গিরিশবাবুর পর এক তিনিই বোধ হয় এই তিন দিক নিয়ে কাজ করছেন। অহীনবাবু তো শুধুমাত্রই অভিনেতা ছিলেন। নাটক তিনি লেখেন নি এবং পরিচালক হিসাবেও তাঁর কোন খ্যাতি নেই। নাট্যরচয়িতা হিসাবে জীবনের বহু দিক নিয়েই তরুণবাবু নাট্যরচনা করেছেন। কখনও গরমা-গরম বামঘেঁষা লেখা, কখনও ধর্মমূলক উপন্যাসের নাট্যরূপায়ণ, রহস্য-রোমাঞ্চে ভরা কয়েকটি নাটক, দেশভক্তির নাটক, পিরানদেল্লোর আদ্যশ্রাদ্ধ, কিছু বাদ পড়ে নি। এঁর লেখা নিশাচর নাটকে দেখলাম শেক্সপীয়ার-ব্যবহৃত সেই রোমিও-জুলিয়েটের মধুবটি—অর্থাৎ যা খেয়ে জুলিয়েট মৃতবৎ হয়েছিলেন কয়েক ঘণ্টা—আবার চারশো বছর বাদে ব্যবহৃত হয়েছে। খুবই আশ্চর্য লাগল, এতদিন ঐ ঔষধটি লোকে কিভাবে বিস্মৃত হয়েছিল এই কথা ভেবে। তরুণবাবু সম্প্রতি তাঁর ভূতুড়ে নাটক 'বিদেহী' মঞ্চস্থ করেছেন—এ নাটক দেখবার সৌভাগ্য এখন পর্যন্ত আমার হয় নি। তবে অহীনবাবুর জনপ্রিয়তা তরুণ রায় মহাশয় পেলেন না কেন বুঝতে পারি না। এত নানা ধরণের নাটক ইনি দর্শক শ্রেণীকে উপহার দেবার চেষ্টা করেন—অথচ সে উপহার নেবার মত দর্শক উপস্থিত থাকে না তাঁর রঙ্গালয়ে। যাই হোক তিনি সরকারের প্রচুর কৃপাদৃষ্টি লাভ করেছেন—দিল্লীর সংগীত নাটক আকাডেমী নাকি তাঁকে প্রচুর বাৎসরিক অর্থসাহায্য দিয়ে তাঁর প্রতিভার কদর করছেন। আমরা দিনে দিনে তাঁর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করছি—আর সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের দুর্দশার কথা ভেবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছি। অতুলনীয় অভিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন শিশিরকুমার মাইকেলের ভূমিকায়। এ নাটকে তিনি এই সত্যকেই পরিস্ফুট করে তুলেছিলেন—মাইকেলের জীবনের ট্র্যাজেডী তাঁর দারিদ্র্যের জন্য নয়, অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের ফলে প্রতিভার সম্যক পরি-

স্ফুটনের অভাবে। অর্থাৎ মাইকেল যদি রবীন্দ্রনাথের মত disciplined life lead করতেন, তাহলে যা লিখেছেন তার দশগুণ বেশি রচনা করে যেতে পারতেন। মাইকেল চরিত্রের ইন্টালেকচুয়াল দিকটা, তাঁর বিরাট জ্ঞান, তাঁর সেন্স অফ হিউমার, তাঁর indisciplined nature অতি সুন্দরভাবে ফুটে- উঠেছিল শিশিরবাবুর চলনে-বলনে এবং চোখের কাজে। এতে তিনি মূল—কালিদাস, শেক্সপীয়ার এবং মধুসূদনের কবিতার যে আবৃত্তি করতেন তা দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধবৎ করে রাখতো। আরিয়েতের ভূমিকায় সুচারুদেবীর অভিনয়ও ভাল হয়েছিল। পরে রেবা এ রোলে চলনসই অভিনয় করেছিলেন। রাজনারায়ণ ও বিদ্যাসাগরের দ্বৈত ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরীর অভিনয়ও খুবই ভাল হয়েছিল।

বিপ্রদাসের উদ্বোধন রজনী ২৫শে নভেম্বর ১৯৪৩ সাল। শিশিরবাবু নামেন নি—পরিচালনা করেছিলেন। বিপ্রদাস খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। বিপ্রদাসের ভূমিকায় বিশ্বনাথ ভাদুড়ী তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয় দেখিয়েছিলেন। মলিনার বন্দনাও জনপ্রিয় হয়েছিল। পরে শিশিরবাবুও কয়েক রাত্রি বিপ্রদাসের রোলে নেমেছিলেন—তাঁর সঙ্গে বন্দনার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন হিন্দী থিয়েটারের বাঙালী অভিনেত্রী সীতাদেবী। সীতাদেবীর বন্দনাও ভালই হয়েছিল।

১৯৪৪ সালের ২০শে ডিসেম্বর 'বিন্দুর ছেলের' অভিনয়ের প্রথম রজনী। এ নাটকে শ্রীমতী প্রভা সবাইকে ছাপিয়ে উঠেছিলেন। অতি সাধারণ শ্রেণীর অভিনেত্রী সাবিত্রী শিশিরকুমারের শিক্ষাগুণে অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন বিন্দুর ভূমিকায়। মনোরঞ্জনবাবুর যাদবও ভাল হয়েছিল। পরে শিশিরবাবু কয়েক রাত্রি যাদবের ভূমিকায় নেমেছিলেন।

পরিচয় মঞ্চস্থ হয়েছিল ১৯৪৯ সালের ১০ই অগাস্ট। নাটক অতি সাধারণ শ্রেণীর—তবে প্রত্যেকেরই অভিনয় ভাল হয়েছিল। শিশিরবাবুর বায়বাহাদুরের তুলনা হয় না—ভবানী ভাদুড়ীর ডাক্তার আলিও খুব প্রশংসা অর্জন করেছিল। ১৯৫১ সালের ১০ই মে 'তখৎ-ই-তাউস' মঞ্চস্থ হয়। এটি ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে 'দিগ্বিজয়ীর' থেকে উচ্চতর শ্রেণীর—তবে দিগ্বিজয়ীতে melo-dramatic situations অনেক বেশি এবং সেই কারণেই সাধারণ দর্শক ঐ নাটকটিকে বেশি গ্রহণ করেছিল। শিশিরকুমার জাহান্দর শা'র চরিত্রকে অতি সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন পরিচ্ছন্ন অভিনয়কৌশলে। প্রশ্ন নাটকের পর আর কোন নতুন নাটকের অভিনয় হয় নি শ্রীরঙ্গমে। এ ধরণের একটি নিম্নশ্রেণীর নাটক শিশিরবাবু মঞ্চস্থ করেছিলেন কেন, বুঝতে পারি না। অনেক বিখ্যাত পুরানো নাটকও এখানে রি-ভাইভড হয়েছিল।

শ্রীরঙ্গমে শিশিরকুমার শেষ অভিনয় করেন প্রফুল্ল নাটক—২৪শে জানুয়ারী ১৯৫৬ সালে। ২৭শে জানুয়ারী এ মঞ্চ থেকে অবসর নিয়ে চলে এলেন—অবশ্য মনে আশা ছিল দু-এক বছরের ভেতরেই নতুন মঞ্চের আধিপত্য পাবেন—কিন্তু আর সে সুযোগ তাঁর জীবনে ঘটলো না। মানুষ হিসাবে শিশিরকুমার মহৎ, উদার এবং স্নেহশীল। একবার তাঁর কাছে যেতে আমার কিছুদিন দেরি হওয়াতে একজনকে পাঠিয়েছিলেন আমার খবর নিতে। আমার শরীরটা তখন ভাল ছিল না—চিঠিতে সে সংবাদ তাঁকে জানালাম। তিনি উত্তরে লিখলেন—

শ্রীরঙ্গম
কলিকাতা ৬

স্নেহের...........

তোমার চিঠি ঠিকসময়ে পেয়েছিলাম। নিজের নানা গোলমালের মধ্যে চঞ্চল ছিলাম। সময়মত উত্তর দিতে পারি নি।

শরীর খারাপ লিখেছো। এখন কেমন আছ? আশা করি নিরাময় হয়েছো। যদি সুস্থ থাকো আমার সঙ্গে শীঘ্র দেখা কোরো। এখনও যদি শরীর ভাল না হয়ে থাকে, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। একখানা চিঠি দিও। স্নেহাশীর্বাদ গ্রহণ কোরো।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
শিশিরকুমার ভাদুড়ি

এরপর শিশিরকুমারের আরও কয়েকটি চিঠি তুলে দিচ্ছি। এসব চিঠি থেকে তাঁর পাণ্ডিত্য, জ্ঞান, দেশানুরাগ, দেশ-বিদেশের নাটক সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায়।

১৯৫৬ সালে আমি ছিলাম লণ্ডনে—ওখানকার নানা খবর দিয়ে মাঝে মাঝে শিশিরবাবুকে চিঠি দিতাম। শিশিরকুমারও নিয়মিতভাবেই উত্তর দিতেন। এপ্রিল মাসে লেখা একটি চিঠিতে ছিল—

278. Barracknore Trunk Rd.
Calcltta—36
2. 4. 56.

আজ চার-পাঁচ দিন হোলো তোমার চিঠি পেয়েছি। নানা গোলমালে উত্তর দিবার সুবিধা হয় নি।—না, কোন, থিয়েটার পাওয়া এখন সম্ভব নয়। বোধ হয় আট-দশ মাসের মধ্যে সম্ভব হবে না।

তুমি আনন্দ পাচ্ছ শুনে খুসী হলাম। খুব দেখেশুনে বেড়াও। চোখ দুটি খোলা রাখবে। যেখানে ভাল দেখবে সেটা মনে গেঁথে নেবে। একটা কথা, বিদেশে নিজের দেশের বা নিজের দেশের লোকের নিন্দা কোরতে নেই। এই কথাটি মনে রেখো।

আমাদের দেশের সরকার আমাকে সাহায্য কোরবে—এ-ধারণা মন থেকে দূর কর।

আমার শরীর খুব খারাপ নয়। অবশ্য একটু-আধটু গোলমাল এ বয়সে থাকা স্বাভাবিক।

আশা করি ভালই আছ। ইতি—
চিরকল্যাণকামী
শিশিরকুমার ভাদুড়ি

এই সময় লন্ডনের থিয়েটার সংক্রান্ত সাপ্তাহিক দি স্টেজ (7th June 1956) পত্রিকায় আমার ভারতীয় স্টেজ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বের হয়। এ-পত্রিকাটি স্যার হেনরী আরভিং-এর সময় থেকে প্রকাশিত হচ্ছে—with the largest circulation in all branches of the Professional Stage. এই পত্রিকার একটি কপি শিশিরবাবুকে পাঠিয়েছিলাম। শিশিরবাবুর চিঠি পেলাম ১৮-৭-৫৬-তে—

তোমার দু'খানি চিঠি ও Stage কাগজ পেয়েছি। তোমার লেখায় দু'টো কথা বাদ পড়েছে। (১) বাংলায় drama-র tradition বহুদূর বিস্তৃত। যাত্রা আজ ছশো বছরের চেয়েও পুরাতন। শ্রীচৈতন্যদেব নিজে যাত্রায় রাধিকা সেজেছিলেন। (২) গিরিশবাবু খুব বড় অভিনেতা ছিলেন কিন্তু এক জায়গায় তাঁর চেয়ে বাংলার থিয়েটারে আমার স্থান বড়। বাংলায় Production আমিই প্রথম প্রবর্তনা করি। ওঁদের সময় art of production সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না।

এ-সম্বন্ধে অনেক কথা লিখবার আছে। কিন্তু আমার চোখ খারাপ, শরীর ও মন ভেঙে পড়েছে, সুতরাং দীর্ঘ চিঠি লিখবার ধৈর্য নেই।

দু'টি বিষয়ে তুমি আমাকে সাহায্য কোরতে পারলে ভাল হয়। (১) যদি RADA-র ঠিকানা সংগ্রহ করে তাদের একখানা Prospectus আমাকে পাঠাও বড় উপকার হয়। (২) Stage-এ আমি যদি বাংলা থিয়েটার সম্বন্ধে কিছু লিখি তারা কি রকম টাকা দিতে পারে? Statesman একটা article চাইছে। অতএব লিখতেই হবে। আশা করি ভাল আছ—

ইতি—মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
শিশিরকুমার ভাদুড়ি

এর পরের চিঠির তারিখ ১-৯-৫৬—শিশিরবাবু লিখেছেন—

তোমার পাঠানো Prospectus ও চিঠি পেয়েছি প্রায় এক মাস হোল। শারীরিক ও সাংসারিক অসুবিধা থাকাতে উত্তর দিতে দেরি হোল। চোখের অসুখও একটা কারণ। লিখতে বড়ই কষ্ট পাই।

তুমি এক বছরের মধ্যে শিখে নেবার যে বিপুল আয়োজন করেছো তা যদি খানিক অংশেও সফল করে তুলতে পারো, তাহলে দেশে ফিরে এলে দেশের নাট্যশালার অনেক উপকার কোরতে পার। Formগুলির দিকে বেশি নজর দিও না। ওগুলো চিন্তাবিলাসী রসিক জনের জন্য। নাটকগুলো শিক্ষকদের সাহায্যে পোড়ো।

Bertolot Brecht সম্প্রতি অল্প বয়সে মারা গেছেন। তাঁর বই এখানে পাওয়া যায় না। যদি দু' একখানা আনতে পারো সঙ্গে এনো। Three Penny Opera-র খুব নাম। Candel-এর ইংরাজী অনুবাদ আমি পাই নি। Tolstoi-এর চারিখানি বড় নাটক—তার মধ্যে একখানির শেষ অঙ্কের dialogue নেই, শুধু synopsis আছে—অমূল্য।

আর একটা কথাঃ—Foyles-এর দোকানে (119—125 Charing Cross) একবার খোঁজ নিতে পার যদি, খোঁজ নিও Gordon Craig-এর 'The art of the Theatre' ও 'Books and Theatre' out of print হয়েছে কি? পুরাতন কপি ওদের দোকানে পাওয়া গেলে দাম কত পড়বে?

আশা করি ভাল আছ।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—শিশিরকুমার ভাদুড়ি

কাঁথি

পি, টী, সার্ভে স্কুল

গভঃ রেজিস্টার

এই স্কুল ১৯০৯ সাল হইতে নিয়মিত চলিয়া আসিতেছে— শিক্ষা ও ভাবিফল সবই ভাল; বহু পাস করা ছাত্রগণ গভর্ণমেন্ট অফিসে, নানা প্রজেক্টে ও সেটেলমেণ্টে নিযুক্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন। জানুয়ারী সেসন জন্য ২৫।১।৬৭ তাং পর্যন্ত ছাত্র ভর্তি নেওয়া হইবে।

১৯৬৮ সালে পশ্চিম বাংলায় সেটেলমেণ্ট কার্য আরম্ভ হইবে।

১৫ পঃ খাম সহ লিখিলে, প্রসপেকটাস পাঠান হইবে।

হেডমাস্টার

পি, টী, সার্ভে স্কুল

পোঃ কাঁথি, মেদিনীপুর

পুঃ একটু সুস্থ হলে খুব বিস্তৃত চিঠি দিতে পারবো।

ইতি—শিঃ

আমি দেশে ফেরবার সময় নাট্যাচার্যের জন্য ব্রেখটের 'মাদার কারেজ' এবং 'ককেশিয়ান চক সারকল' নাটক দুটি নিয়ে এসেছিলাম। তখনও ব্রেখটের নাটক এদেশে পাওয়া যেত না। অবশ্য দু' এক বছর বাদে ব্রেখটের নাটক কলকাতায় আসতে সুরু করে এবং শিশিরকুমার খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ব্রেখটের নাটক পড়তে সুরু করেন। ব্রেখটের 'থ্রী পেনী ওপেরা' বৃটিশ কবি জন গে'র 'বেগারর্স ওপেরা'র নবরূপায়ণ ইউরোপে 'থ্রী পেনী ওপেরা' অত্যন্ত জনপ্রিয়। তবে বই পড়ে এই ওপেরাটির ঠিক রস গ্রহণ করা যায় না—মঞ্চরূপায়ণ দেখতে হয়। ক্লডেলের কয়েকটি নাটকের ইংরেজী অনুবাদ ব্রিটিশ ড্রামা লীগ লাইব্রেরীতে পড়ে আমার ভাল লেগেছিল—তাই শিশিরকুমারের মতামত জানতে চেয়েছিলাম। টলস্টয়ের নাট্য গ্রন্থাবলীর একটি পুরানো কপি পেয়েছিলাম ফয়েলসের দোকানে। সত্যিই এ-শ্রেণীর বাস্তববাদী নাটক সহসা চোখে পড়ে না—বিশেষভাবে আমাকে মুগ্ধ করেছিল টলস্টয়ের 'পাওয়ার অভ ডার্কনেস' নাটকটি।

গর্ডন ক্রেগের বইগুলি তখন সত্যিই আউট অব প্রিণ্ট ছিল—পুরোনো কপিরও খোঁজ পাই নি 'আর্ট অভ দি থিয়েটার' থেকে বিশদভাবে নোট নিয়ে এসেছিলাম। পরে অবশ্য বইটির নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল।

এর পরের চিঠিটির ডেট দেওয়া নেই—কিন্তু পোস্টমার্ক রয়েছে ১৯-১০-৫৬-র। আমার চিঠিতে লেক ডিস্ট্রিক্টে যাবার খবর পেয়ে, কিছুদিন বাদে শিশিরবাবু লিখেছিলেনঃ

এতদিনে Lake থেকে নিশ্চয় ফিরে এসেচো। ফিরবার পথে Switzerland হয়ে এসো। ইংরাজী সাহিত্যে Lake countryকে খুব glorify করা হয়েছে। Switzerland ও North Italy-র lake country দেখলে বুঝতে পারবে প্রকৃতি অনেক বেশি রমণীয়। আমাদের দেশের কাশ্মীর ইউরোপীয়দের কাছেই ভূস্বর্গ। যাক, আমার একটি কাজ কোরো—Sybil Thorndike একখানা, কাগজে নাম Plays and players তাদের World Tour সম্বন্ধে লিখচে। প্রবন্ধটির নাম 'Our World Tour'—তাতে তাঁদের ভারতবর্ষ, বিশেষত কলিকাতার থিয়েটার সম্বন্ধে কিছু যদি লিখে থাকে আমাকে জানিও। আমাদের রঙ্গমঞ্চ থেকে Sybil বলেছিলেন Irish Abbey Theatre ছাড়া আর কোথাও তিনি এমন সুচারু অভিনয় দেখেন নি। আরও অনেক বড় বড় কথা। আমার সন্দেহ ছিল এটা নিছক Complimentary কথা। আমাদের ভোলাবার জন্য। এখন ছাপার অক্ষরে কি বলেছেন জানতে কৌতূহল হয় June মাস থেকে বোধ হয় articleটা বেরুচ্ছে। সাদা চামড়ার লোক কাল আদমির প্রশংসা নিজের দেশে বড় একটা করে না। কবে ফিরবে। বিজয়ার স্নেহাশীর্বাদ গ্রহণ কোরো, ইতি—

নিয়ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

শিশিরকুমার ভাদুড়ি

শিশিরবাবুকে জানিয়েছিলাম যে, তাঁর ধারণাই ঠিক—দেশে ফিরে সিবিল থর্নডাইক স্বমূর্তি ধারণ করেছেন—কলকাতার থিয়েটার সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই লেখেন নি। একথাও জানিয়েছিলাম যে, ইউরোপ এবং আমেরিকাতে নিজের দেশের থিয়েটার ছাড়া অন্য দেশের থিয়েটার সম্বন্ধে জানবার বোঝবার বিশেষ কৌতূহলও নেই। আইভর নোভ্যালো যখন হলিউডে ছবিতে কাজ করতে যান তখন আমেরিকার থিয়েটারের লোকেদের কাছে ইংলণ্ডের তখনকার মঞ্চের যশস্বী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের (যথা গ্ল্যাডিস কুপার) নামোল্লেখ করে দেখেন যে, আমেরিকানরা তাদের ভাল করে চেনেনই না। ১৯৫৬ সালে আমেরিকান স্টেজ এ্যাকট্রেস হেলেন হেজ ইংলণ্ডের মঞ্চাভিনয় সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করে বলেন, এ ধরণের স্লিপসড এ্যাকটিং আমেরিকাতে দর্শকেরা বরদাস্ত করতো না। এ নিয়ে তুমুল ঝড় উঠেছিল লণ্ডনের থিয়েটার মহলে। ১৯৫৭ সালে আমেরিকান অভিনেতা টাইরন পাওয়ার এলেন লণ্ডনে বার্নার্ড শ'য়ের 'দি ডেভিলস ডিসাইপল' নাটকটির মঞ্চাভিনয় দেখাতে। দর্শকদের মন্তব্য শুনে বুঝলাম এসব বই গিলগুড, অলিভিয়ার করলে একটা মানে হোত। আমেরিকান এ্যাক্টর এসব নাটকে কি অভিনয় দেখাবে। নিজেদের ভেতরই যাদের এত গোলমাল তারা ভারতীয় অভিনেতাদের কিভাবে গ্রহণ করবে সহজেই অনুমান করা যায়। তবে রাজনীতিক কারণে ইংলণ্ড বা আমেরিকাতে রাম, শ্যাম, যদুর আগমনকেও বিরাটভাবে কাগজে ফ্ল্যাস করতে এদের বাধে না। আমার নিজের ধারণা রাশিয়ানরা এসব বিষয়ে অনেক অনেস্ট।

যাক, শিশিরকুমারের পরের চিঠির তারিখ ৬-১১-৫৬। লিখেছেন—

তোমার চিঠির উত্তর দিতে খুবই বিলম্ব হোলো। আজকাল অত্যন্ত দীর্ঘসূত্রী হয়ে পড়েছি। বিশেষ কাজ নেই, শরীরও ভাল নয়—মনের অবস্থা বড়ই apathetic তাইতে কলম ধরতে ইচ্ছা হয় না।

যাই হোক, তুমি London school of Journalism থেকে Diploma পেয়েছো শুনে খুশী হলাম। এখানে এসে Journalism career কোরবে বলে মনে হয়। সকল রকমে নিজেকে fit কোরেচো এও খুব সুখের বিষয়। এ দেশে drama ও থিয়েটারের critic নেই। উপযুক্ত লোকের future আছে সন্দেহ নেই। ভগবান তোমাকে জয়যুক্ত করুন।

ও দেশে রণ-দামামা বেজে উঠলো। ফিরবার সময় হয়তো তোমাকে অনেক কিছু না দেখেই চলে আসতে হবে। Egypt ও Hungary নিয়েই বোধহয় তৃতীয় world war সুরু হবে। ওখানে martial temparature কোন দিকে? উঠচে না পড়চে। এখানকার কাগজ পড়ে কিছু বোঝা যায় না।

—আমার এখন অজ্ঞাতবাসের অবস্থা। সামনে করবার কিছু নেই। কিছু লিখবার চেষ্টা করচি। কতখানি সফল হব জানি না।

Craig-এর বইখানি Henie-mauna কোম্পানী Reissue করেচে। ২৫ শিলিং দাম করেচে। একখানা order দিয়েছি। কবে পাবো জানি না। Suez তো বন্ধ। তুমি একখানা সংগ্রহ কোরো। যদি এদিক দিয়ে না পাই তোমার বইখানাই উলটে দেখবো। আজ ৬ই নভেম্বর, তুমি বোধ হয় জানুয়ারীর শেষে ফিরবে। হয়তো তত দিনে আমি একটা engagement পাবো।

এখানে.........থিয়েটার বাড়িটা Air condition কোরে modernise কোরেচে। তবে এদের যেমন commercial outlook তাতে auditorium-টাই শুধু উন্নত কোরবে। আসল জিনিস অর্থাৎ stage-এর উন্নতি কোরবার কোন প্রচেষ্টা নেই।

আশা করি, তুমি ভাল আছ।

তোমার ফিরে আসবার প্রতীক্ষায় রইলাম। আমার স্নেহাশীর্বাদ গ্রহণ করো।

সর্বদা মঙ্গলকামী
শিশিরকুমার ভাদুড়ি

উপরের চিঠিতে একটা জিনিস লক্ষণীয়—বই আর পড়াশুনাই ছিল নাট্যাচার্যের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য।

শিশিরকুমারের শেষ যে চিঠি পাই তার ডেট হচ্ছে ৭-১-৫৭, লিখেছেন—

তোমার শেষ চিঠিখানির উত্তর দেওয়া হয় নি। ৫ই তারিখে তোমার নভেম্বর মাসে ডাকে দেওয়া বড়দিনের শুভেচ্ছা পেলাম। ছবিখানি বড় ভাল লাগলো। নিশ্চয়ই ভাল আছ। দেশে ফিরচো কবে? আমার আন্তরিক শুভ ইচ্ছা গ্রহণ করো। আমার নতুন কিছু খবর নেই।

আশা করি, February মাসেই দেশে ফিরবে। ইতি—

নিত্যকল্যাণকামী
শিশিরকুমার ভাদুড়ি

শিশিরকুমারের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বহু বছর কাটিয়েছি—তাঁর মত উদার, স্নেহশীল, বিরাট ব্যক্তিত্ব এবং পাণ্ডিত্যসম্পন্ন লোক আমি খুব কমই দেখেছি। তাঁর সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে বসে ভেবেছিলাম অনেক কথাই পাঠকদের কাছে বলতে পারব—কিন্তু ক্রমশই প্রবন্ধের আকৃতি স্ফীত হচ্ছে দেখে এইখানেই আমাকে শেষ করতে হচ্ছে। ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে শিশিরকুমারের নানা দিক সম্বন্ধে আরও নানা কথা বসুমতীর পাঠকদের কাছে বলতে পারবো বলে আশা রাখি।

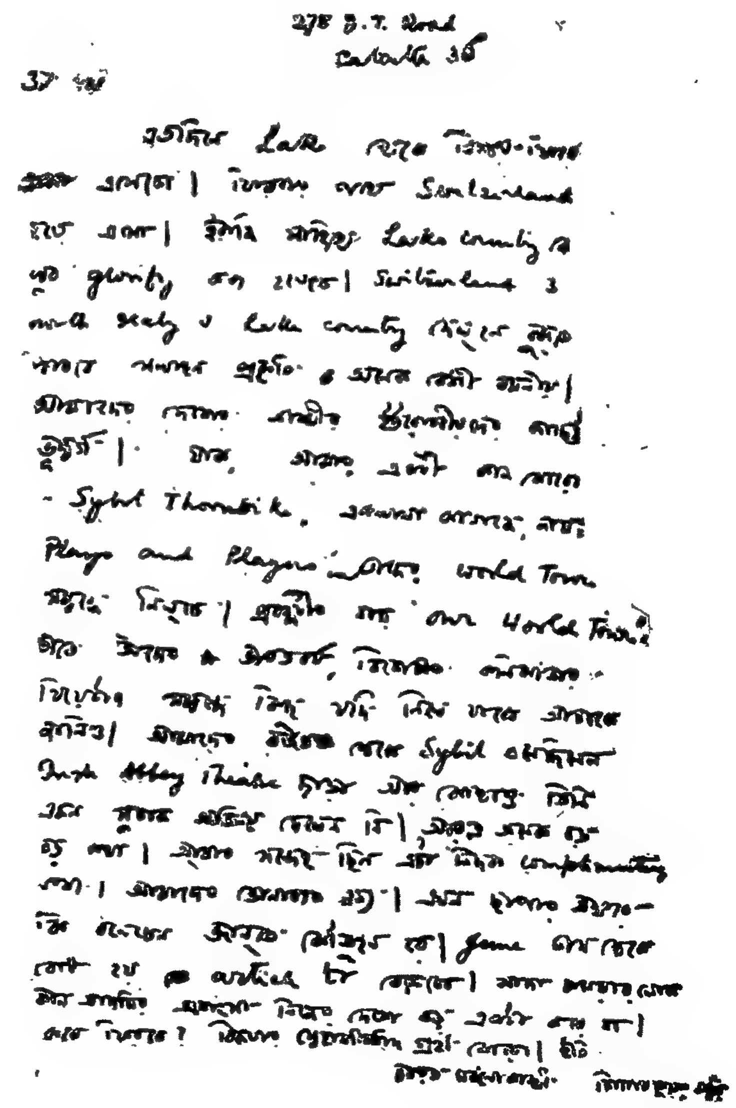
27B B.T. Road
Calcutta 35

নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের হস্তলিপি

পাঠক মন

২৯শে ডিসেম্বর তারিখের পত্রে শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী আমার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা পড়িয়া অভিভূত হইলাম। আমরা লেখকেরা নিজের বেলাতে যেমনই প্রশংসার কাঙাল, পরের বেলাতে তেমনই ভিক্ষাদাতার মত কৃপণ। পরিমলবাবুর উদারতা ও বন্ধুপ্রীতি অতুলনীয়। হয়ত বা আমার মত তিনিও মনে করেন, লেখকের ভদ্রলোক হইবার দায়িত্ব লেখক হইবার দায়িত্ব অপেক্ষা কম নয়।

কিন্তু আমার কথা বলিবার জন্য এই চিঠি লিখিতে বসি নাই। আমি মোহিতবাবু সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলিতে চাই। পরিমলবাবু মোহিতবাবুর সহিত আমাকে একই প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করিলেও আমাদের মধ্যে একটা বড় যোগসূত্রের উল্লেখ করেন নাই। হয়ত বা ব্যাপারটা তাঁহার জানা নাই। আমি শিক্ষায় মোহিতবাবুর ছাত্র, ও সাহিত্যসেবায় তাঁহার শিষ্য।

তিনি স্কুলে আমাকে বাংলা ও ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য পড়াইতেন। এই দুই ভাষায় আমার হাতে খড়ি তাঁহার কাছে না হইলেও, ইহাদের সাহিত্যিক প্রয়োগ তিনিই আমাকে শিখাইয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষাই আমার ভাষা ব্যবহার সম্বন্ধে বিবেকবুদ্ধির মূলে। আর আমার সাহিত্যিক দীক্ষাও তাঁহার কাছেই সমাপ্ত হইয়াছিল। আমার পিতা আমাকে নয় বৎসর বয়সে মাইকেল ও দশ বৎসর বয়সে সেক্সপীয়র পড়াইয়াছিলেন। মোহিতবাবুর কাছে সেই পড়া আরও অগ্রসর হয়। তিনি নবম শ্রেণীতে (তখনকার দ্বিতীয় শ্রেণীতে) আমাদের কীট্‌সের 'ওড টু এ নাইটিঙ্গেল' পড়াইয়াছিলেন। তাঁহার আবৃত্তি এখনও আমার কানে বাজে।

স্কুল ছাড়িবার এগার বৎসর পরে ১৯২৫ সনে আবার আমার তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা হয়। তখন আমি মিলিটারী একাউন্টস্‌ ডিপার্টমেন্টে কেরানী। অভ্যাসমত অফিস হইতে ফিরিবার পথে আনাতোল ফ্রান্সের একটি উপন্যাসের অত্যন্ত শোভন সংস্করণ হাতে ছিল। এইটি, আমার ফরাসী জ্ঞান, ও ছাপা সম্বন্ধে বাচালতা দেখিয়া তিনি একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তার পর প্রায়ই তিনি আমাদের বাড়িতে আসিতেন, ও সাহিত্যিক আলোচনা করিতেন। তাঁহার কবিতাও পড়িতেন এবং নূতন কবিতা শুনাইতেন।

এই সময়ে তিনি আমাকে কলিকাতার লেখক-সমাজে টানিয়া লইয়া—প্রায় জোর করিয়া—লিখিতে প্রবৃত্ত করেন। আমার প্রথম ইংরেজি রচনা—ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে—তিনিই শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়ের কাছে লইয়া গিয়া আমাকে দিয়া পড়ান। অশোকবাবুর মজা লাগিয়া থাকিবে। অন্ততপক্ষে লেখাটাতে চালবাজি ও ডেঁপোমি অনেক ছিল। কিন্তু তাহা লেখা পড়িবার সময়ে উচ্চারণে নয়। কেম্ব্রিজ-প্রত্যাগত অশোকবাবুর কাছে আমার অশুদ্ধ ইংরেজি উচ্চারণের তীব্র সমালোচনা মোহিতবাবু ফিরিয়া আসিয়া করিয়াছিলেন। তবে অশোকবাবু স্বাভাবিক উদারতা দেখাইয়া পিতার কাছে বলিয়া লেখাটি ১৯২৫ সনের নভেম্বর মাসের 'মডার্ন রিভিউ'-এ প্রকাশ করাইয়াছিলেন। এই আমার সাহিত্যক্ষেত্রে অবতরণ।

ইহার কিছুদিন আগে হইতেই মোহিতবাবু আমাকে সজনীবাবুর সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন, এবং মোহিতবাবুর জন্যেই আমি 'শনিবারের চিঠি'-তে ভিড়ি। তিনিই তখন 'শনিবারের চিঠি'র প্রাণ ছিলেন।

ইহার বহু বৎসর পরে আমি দিল্লী আসি। তাহাতে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আমার আত্মজীবনী প্রকাশিত হইবার অল্পপূর্বে তাঁহার কাছে একখানা চিঠি লিখি। ইহার উত্তরে তিনি দীর্ঘ চিঠি লেখেন। উহার প্রথম ছত্র ছিল ইংরেজিতে—"You have written not a day too soon!" তাঁহার জীবনের মর্মান্তিক কষ্ট ও নিষ্ঠুর সংগ্রামের পরিচয় ইহাতে এবং পরের চিঠিতে পাই। এটা ১৯৫১ সনের কথা, পর বৎসর তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর অল্পদিন আগে লেখা একখানা চিঠি আরও কষ্টকর। ইহা পড়িয়া আমার হার্ডির সৃষ্ট 'মেয়র অফ্‌ ক্যাস্টারব্রিজে'র কথা মনে পড়িয়াছিল।

লেখক হিসাবে মোহিতবাবুর কাছে আমার ঋণ পরিশোধ করিবার মত নয়। তাঁহার শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত আমাকে পরজীবনে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। যে সাহিত্যপ্রীতি আমার জীবনে উচ্ছলিত সুখ আনিয়া দিয়াছে, তাহার মূলে আমার পিতামাতা ভিন্ন আছেন মোহিতবাবু।

আমরা লেখকেরা যাঁহাদের কোলে মানুষ হইয়াছি, হাঁটিতে শিখিয়া তাঁহাদের কথা ভুলিয়া যাই। এই কু-প্রবৃত্তি যেন আমার কখনও না হয়।—ইতি—ভবদীয়

শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী

* * *

ঐতিহ্যমণ্ডিত, প্রগতিশীল সাপ্তাহিক বসুমতীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অনন্ত সিংহের "অগ্নিযুগের অধ্যায়" স্বাধীনতা সংগ্রামের লোমহর্ষক, রোমাঞ্চকর চিত্র বহন করছে। প্রকৃত স্বাধীনতার জন্যে ভারতবর্ষ বিশেষ করে বাংলাদেশ যেসব অবদান রেখে গেছে তারই খণ্ডচিত্র ফুটে উঠেছে এই "অগ্নিযুগের অধ্যায়ে"। গভীর নিশ্বাসে, ঘন-ঘন উদ্বেগের সঙ্গে এ রচনাটি পাঠ করতে হয়।

স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ আমাদের বাড়িতে গিয়েও লেগেছিল, আমাদের বাড়ির কয়েকজন বিপ্লবী দলে ছিলেন বলে শুনেছি মায়ের মুখে। সুতরাং সে সময়টায় আমাদের বাড়ির মহিলামহল বেশ উত্তেজনার আগুন পুইয়েছেন। আর যথেষ্ট অত্যাচার সহ্য করেছেন।

মাঝে মাঝে অতর্কিতে সশস্ত্র বাহিনী-সহ দারোগা-পুলিশের আবির্ভাব ঘটেছে আমাদের বাড়িতে। বিপ্লবীদের খোঁজে তারা গিয়ে সেখানে উপস্থিত হতো, আর যদি বিপ্লবীদের সন্ধান না মিলত, তাহলে এতবড় বিরাট বাড়িটার সমস্ত ঘরের জিনিষপত্র তছনছ করে দিয়ে আবার চলে যেত।

'অগ্নিযুগের অধ্যায়ের' লেখকের বর্ণনাগুলি আরো ভয়াবহ। তখন সমস্ত চট্টগ্রাম জুড়ে, একসাথে জোর বিদ্রোহ চালিয়ে যাচ্ছিল। সমগ্র চট্টগ্রাম আন্দোলনের অধিনায়ক ছিলেন প্রখ্যাত বিপ্লবী সূর্য সেন ওরফে মাস্টারদা। শ্রীঅনন্ত সিংহও সেই দলেরই একজন বিচক্ষণ বিপ্লবী ছিলেন। চট্টগ্রাম-আন্দোলন সম্বন্ধে আমার স্বল্প জানা আছে। পুস্তকে তার অতিসংক্ষিপ্ত পরিচয়ও পেয়েছি।

শ্রীঅনন্ত সিংহের "অগ্নিযুগের অধ্যায়" রচনায় আজ সে আন্দোলনের সামগ্রিক চিত্র পাচ্ছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে এ কাহিনী পাঠ করবার জন্যে সবিশেষ আগ্রহী ও উৎসুক। সাপ্তাহিক বসুমতী আমার কাছে বিশেষভাবে আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে ঐ রচনাটির জন্যে।

শ্রীঅনন্ত সিংহের "অগ্নিযুগের অধ্যায়" রচনার প্রকাশভঙ্গী, বাচনভঙ্গী সহজেই মনকে আকৃষ্ট করে, তাঁর সরল, সোজা বাংলায় সেযুগের আন্দোলনের চিত্রগুলি চোখের সামনে ভাসতে থাকে। পরিশেষে অনন্ত সিংহের এ রচনাটির জন্যে তাঁকে অপরিসীম শ্রদ্ধাসহ সাধুবাদ জানাই।

আমি আশা করব, ভবিষ্যতে আরো এ ধরণের জাতীয়তাবোধ সম্পন্ন রচনা আশাবাদী, প্রগতিশীল সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশ করে আমাদের যুবক-সম্প্রদায়কে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবেন এবং এই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দেশের জনসাধারণের যথেষ্ট কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন।

সুজয় রায়
টাউন বড়দোয়ালী
আগরতলা (ত্রিপুরা)

রূপজগৎ

একজন বাউলের সঙ্গে

আমার এক বন্ধু শান্তিনিকেতনে পৌষ মেলা থেকে ফিরে এসে কথাপ্রসঙ্গে তাঁর এক অভিজ্ঞতার কথা বললেন। তাঁর পৌষ মেলায় যাওয়ার প্রধান আকর্ষণ ছিল পল্লীসংগীতের রস গ্রহণ করা এবং মেলায় পল্লী বাংলার শ্রী ও সংস্কৃতি অনুভব করা। সেখানে অনেক বাউল গায়কের গান তিনি শুনেছেন। কারো কারো গান তাঁর খুব ভাল লেগেছে। কারো কারো গানে শ্রোতাদের মন পাবার চেষ্টা যে ছিল না এমন নয়। তাঁদের গানে সেই সহজিয়া ভাব, দরদী মনের আবেগ যেন অনুপস্থিত। ভক্তি-রস ও জ্ঞানতত্ত্বের স্বতঃস্ফূরিত আকুতি নেই। এই কৃত্রিমতা তাঁকে পীড়িত করেছে। তার মধ্যেও দু-একজনের গান তাঁর বড় ভাল লেগেছে। ভাল লাগায় তাঁদের একজনের সঙ্গে গায়ে পড়ে তিনি পরিচয় করলেন, তাঁর ঠিকানা জানতে চাইলেন। ইচ্ছা ছিল সুযোগ পেলে আখড়ায় যাবেন, মন ভরে গান শুনবেন, তাঁদের জীবনের পরিচয় লাভের চেষ্টা করবেন। ঠিকানার কথা উঠতেই বাবাজী তাঁর থলিয়া থেকে একটা ছাপানো কার্ড বার করে দিলেন। ইংরেজিতে নাম ধাম লেখা। বন্ধনীর মধ্যে লেখা পরিচয়—বাউল মিউজিশিয়ান। কার্ড হাতে পেয়ে তিনি ত অবাক! সাধনার সংগীত, অন্তরের আকুতি তা' হলে আজ ব্যবসার পণ্য হতে চলেছে!

পৌষ মেলার একজন বাউলকে কেবল এর জন্য দায়ী করলে ভুল হবে। শহরের তথাকথিত সংগীতরসিক এবং পল্লসংগীতের রক্ষকরা এর জন্য দায়ী। তাঁরা ঘটা করে সংগীতের জলসা করেন। সেখানে উপস্থিত করেন পল্লীগীতি গায়ক ও বাউলদের। সংবাদপত্রে তাঁদের ছবি ছাপাবার ব্যবস্থা করেন। পারিশ্রমিক নিয়ে দরাদরি করেন। থিয়েটার সিনেমায় মজুরী দিয়ে বাউলকে নিযুক্ত করেন। এভাবে তাঁদের সাধনার রাজ্য থেকে সরিয়ে নামের মোহে বিভ্রান্ত করে গানের মজুরী খাটান হচ্ছে। আর তারই যোগান দিতে গিয়ে শহুরে লোকের মনোরঞ্জনী সুরে তাঁরা গান করছেন। বাউল ও পল্লীসংগীতের সুর এভাবে বিকৃত হতে চলেছে। পল্লীসংগীতের মজুরী খেটে অনেকে এখন রেডিও ও জলসায় প্রচুর পয়সা রোজগার করছেন। এমন কি বিদেশী বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে পল্লীসংগীত শোনার দুর্ভাগ্যও আমাদের হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বাউল আর পল্লীগীতি গায়করা বিভ্রান্ত হতে পারেন। বিশেষত আমাদের দেশে পল্লীসংগীত ও বাউল শোনার লোক আছে কিন্তু সেই সংগীতের অবিকৃত রূপ রক্ষা করার মত কোন ব্যবস্থা নেই। পল্লীগীতি ও বাউল গায়কদের অর্থ সাহায্য দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার মত ব্যবস্থাও হয় নি। তাই ওরা অর্থের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়, ওরা সাধনলোক ছেড়ে বাণিজ্যিক লোকে আসে। সাধন সংগীতের বেচাকেনা করে। অন্তরের ভক্তিঢালা স্বতঃস্ফূরিত গানের পরিবর্তে শহুরে লোকের মন পাবার মত করে সুরের বিকৃতি করে থাকে। এভাবে গানের ব্যবসা চলতে থাকলে বাংলার অবিকৃত পল্লীগীতি, বাউল, ভাটিয়ালী ভবিষ্যতে শোনা যাবে কিনা সেটা চিন্তা করবার বিষয়। গ্রামের গানকে শহরে তুলে আনলে তা হয় শিকড়হীন বৃক্ষের মত। সেরূপ ভক্তিহীন সাধনতত্ত্বের গান প্রাণহীন।

—সুজন।

'মোমেণ্ট টু মোমেণ্ট' ছবিতে জীন সেবার্গ

চিত্র আলোচনা

কাল তুমি আলেয়া

(পরিচালনা : শচীন মুখোপাধ্যায়)

সাহিত্যিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়-এর উপন্যাস 'কাল তুমি আলেয়া'-র চিত্ররূপ দিয়েছে শ্রীলোকনাথ চিত্রম। প্রযোজনা করেছেন দেবেশ ঘোষ।

বহু মানুষের বিচিত্র জীবন অবলম্বনে এই ছবির চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে। এই মানুষগুলির মধ্যে একটি চরিত্র মুখ্য। তার আশে-পাশে অন্যরা ভিড় করেছে, আবার সেও ছুটে গেল বহু জীবনের মধ্যে। বিচিত্র সেই জীবনের স্বাদ সে গ্রহণ করেছে। এই মুখ্য চরিত্রটির নাম ধীরাপদ। নিজের জীবন সম্পর্কে সে খুব সিরিয়াস নয়। পরের কাজে লাগতে পারলে সে খুশি। আর মানুষের সঙ্গে ভাব করতেও পটু। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা নিয়েও এক কবিরাজের দোকানের বিজ্ঞাপন লিখে সে সন্তুষ্ট। তার জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিল চারুদি। এই চারুদি তাকে ছোটকাল থেকে স্নেহ করে আসছে। তার পরে অনেককাল তার কাছ থেকে হারিয়ে যায়। আজ চারুদি গাড়ি ও বাড়ির মালিক। চালচলনে বড়লোকী ভাব। তবুও পথে দেখে তাকে চিনতে পারল এবং বাড়ি ডেকে এনে একটা ভাল চাকরি দিল। এই চাকরিতে এসে সে জানতে পারল হিমাংশু মিত্র এবং তার ছেলে সিতাংশুকে এবং তাদের ধ্যানধারণা। হিমাংশু মিত্রের উপর চারুদির অসাধারণ প্রভাব। হিমাংশু মিত্রের ভাগনে অমিতাভ। তাদের ব্যবসার আর এক প্রাণ-শক্তি লাবণ্য সরকারকে নিয়ে সিতাংশু অভিলাষ এবং অমিতাভর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আর এক দিকে চারুদির পালিতা কন্যা পার্বতীর কাছে অমিতাভর গোপন অভিসার। এই একটা জগৎ, যেখানে সমাজের বিত্তশালীদের বিচরণ। সিতাংশু অমিতাভর রেষারেষিতে একদিন অমিতাভ যখন বিগড়ে বসল তখন জানা গেল এরা মুনাফার জন্য জাল জুয়াচুরি করে, ভেজাল ওষুধ চালায়। অথচ কর্মচারীদের বোনাস দিতে রাজী হয় না।

আর এক জগৎ সমাজের নিচের তলার মানুষের। যে জগতে এতদিন সে বাস করে এসেছে, আজও সম্পর্ক ছাড়ে নি। সেখানে আছে রমুর মত যুবক। অর্থাভাবে যার যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা হয় না। স্নেহশীলা আত্মসম্মানবোধে গর্বিতা সোনাবৌদি, লোভের পেছনে তাড়িত গনুদা, খবরের কাগজ পাগল একাদশী সিকদারের উৎকণ্ঠা, রমণী পণ্ডিতের কানভাঙানী, তার মেয়ে কুমুর

স্বপ্না প্রোডাকসন্সের 'বিবাহ বিভ্রাট' ছবিতে অনুপকুমার ও জিনি চক্রবর্তী

সর্বনাশের জাল পাতা, একটা সংসারকে বাঁচাবার জন্য কাঞ্চনের শোচনীয় জীবন ইত্যাদি।

উপর আর নিচের দুই সমাজের অভিজ্ঞতায় ধীরাপদ হঠাৎ আবিষ্কার করল তার ছন্নছাড়া জীবন সোনাবৌদির স্নেহের সঙ্গে আর একজনের প্রণয়রঙে রঙীন হয়ে উঠেছে। সে প্রেম লাবণ্য সরকারের।

ছবিটিতে বহু মানুষের ভিড় জমান হয়েছে—বিচিত্র তাদের জগৎ। বারবনিতার গৃহ থেকে বখাটে ছেলেদের সঙ্গে ভদ্রঘরের মেয়ের অভিসার, ওষুধের ভেজাল থেকে মেয়ে ফুসলানো অনেক কিছু। তার মধ্যে ক্ষীণ রশ্মিরেখার মত আত্মসম্মান-বোধ ও প্রেমের বিজয় দেখান হয়েছে। আসলে এই সমাজচিত্র মানুষের প্রতি অবিশ্বাসে ভরা। আধুনিক সাহিত্যিকরা যেমন সমাজের অধঃপতনের দিকটাকে বড় করে দেখিয়ে নানা বিকৃতি পরিবেশন করেন এবং বই-এর বাজারে মুনাফার ফিকির খোঁজেন, তেমন আধুনিক চলচ্চিত্র নির্মাতারা শূন্যতাকে বড় করে বহু জীবনের কোলাহলে 'হিট পিকচারের' ফর্মুলা অনুসরণ করেন। প্রকৃত জীবনকে প্রকাশ করা বা বলিষ্ঠ বাণীকে তুলে ধরা তাঁদের উদ্দেশ্য নয়। এই ছবিতে তাই বহু জীবন দেখা গেছে কিন্তু স্পষ্ট, বলিষ্ঠ বাণী উচ্চারিত হয় নি। ধীরাপদ এখানে বড়লোকের স্বার্থরক্ষক; গরীবের প্রতি সহানুভূতিশীল এক ভাল মানুষ-মাত্র। এই বিশৃঙ্খল ও পঙ্কিল জীবন থেকে উত্তরণের নায়ক নয়। পরিচালক নতুন। নতুন পরিচালকদের সাহস একটু বেশি—অন্তত আদিরসের ব্যাপারে। ছবিতে —তাই মোটরে বখাটে ছেলেদের প্রমোদ ভ্রমণের দীর্ঘ দৃশ্যটি সংযোজিত হয়েছে। যা আমাদের দৃষ্টিকে পীড়িত করেছে। ধীরাপদর লাবণ্যকে চুম্বনের দৃশ্যটিও আকস্মিক এবং ধীরাপদর চরিত্রের বিরোধী মনে হলেও পরিচালক উত্তম-সুপ্রিয়াকে পেয়ে এমন একটি ইঙ্গিতময় দৃশ্য যোজনার লোভ সামলাতে পারেন নি। এরূপ কাহিনীচিত্র পরিচালনার ব্যাপারে সমাজ-সচেতনতা প্রয়োজন। যাতে ছবিটিকে স্পষ্ট ও বক্তব্যপূর্ণ করতে পারত। অবশ্য দর্শক আকর্ষণে ছবিটি ব্যর্থ হবে না।

ছবিতে ধীরাপদর ভূমিকায় সংযত রূপদান করেছেন উত্তমকুমার। তাঁর সঙ্গে আবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সোনা-বৌদিরূপী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। উচ্চাভিলাষী, সরল অথচ প্রেমের ব্যাপারে উভয় সঙ্কটে পড়েছে এমন একটি চরিত্রে তরুণকুমারকে ভাল লাগবে। আর বুক ভাঙে তো মুখ খোলে না এমন একটি মেয়ে পার্বতীর চরিত্রে সুমিতা সান্যাল ভাল অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন। লাবণ্য সরকারের চরিত্রকে যথাযথ রূপ দিয়েছেন সুপ্রিয়া দেবী। অন্যান্য চরিত্রে আছেন কমল মিত্র, দীপ্তি রায়, অজয় গাঙ্গুলী, রবি ঘোষ, শিখা ভট্টাচার্য, ভানু ব্যানার্জী, শৈলেন মুখার্জী, জহর রায়, বঙ্কিম ঘোষ, নীলিমা দাস, শেখর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ যথাযথ রূপদান করেছেন। এ ছাড়া ছবিতে আছেন মীরা চক্রবর্তী, কঙ্কণা, প্রেমাংশু বসু, প্রমুখ। কানাই দের আলোকচিত্রের কাজ সন্তোষজনক। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন উত্তমকুমার। কণ্ঠ সঙ্গীতে সুগীত।

মোমেন্ট টু মোমেন্ট

ইউনিভার্সাল পিকচার্সের 'মোমেন্ট টু মোমেন্ট' মেট্রো সিনেমায় প্রদর্শিত হচ্ছে। এক ত্রিকোণ প্রেমের টানাটানিতে ছবির নাটকীয় পরিস্থিতি রচিত হয়েছে। প্রথম থেকে স্বন্দ্ব গভীর উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করেছে পরিণতি দেখার জন্য। এই কাহিনীর নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছে সুন্দরী জীন সেবার্গ। সেবার্গ এখানে স্বামীসঙ্গবিহীন জীবনযাপন করছে। স্বামী লন্ডনে থাকে কাজ উপলক্ষে। স্ত্রী ফ্রান্সের কোন শহরে ছেলেকে নিয়ে থাকে। কোনরকমে তার সময় কাটতে চায় না। নিঃসঙ্গতায় সে হাঁপিয়ে উঠেছে। নিঃসঙ্গতায় ক্লান্ত হয়ে স্বামীর কাছে সে টেলিফোন করে; স্বামী টেলিফোনে তাকে ভালবাসা জানায়। এমন নিঃসঙ্গতার মধ্যে এক আমেরিকান নাবিক উপস্থিত হল সেবার্গের বাড়িতে। আলাপ আলো-চনা ও সঙ্গদানে ক্রমে নাবিকের মনে সেবার্গের প্রতি প্রণয় সঞ্চার হল। সেবার্গ সতর্ক হল। দূরে সরে যেতে চাইল। কিন্তু পারল না। এক রাতে তার শরীরে ও মনে ঝড় বয়ে গেল। সে নাবিকের কাছে আত্মসমর্পণ করেও পর মুহূর্তে সম্বিৎ ফিরে পেল। নাবিককে ফিরে যেতে বলল। ব্যর্থ নাবিক আত্মহত্যার জন্য রিভলবারের ট্রিগার টিপল। সেবার্গ চেষ্টা করেও তাকে বাঁচাতে পারল না। নিজের সম্মান রক্ষার জন্যে বান্ধবীর সঙ্গে পরামর্শ করে মৃত নাবিককে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে এল।

একদিন তদন্তের জন্য পুলিশ এসে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করল। সে ভীত। এমন সময় বিদেশ থেকে স্বামী উপস্থিত। স্বামীর কাছে সব লুকোতে গিয়েও সে বুঝি শেষ রক্ষা করতে পারল না। কারণ পুলিশ সেই নাবিককে এনে উপস্থিত করেছে তার ডাক্তার স্বামীর চিকিৎসায়। নাবিক জীবিত কিন্তু স্মরণশক্তিহীন। ডাক্তারের মানসিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে সেবার্গের সঙ্গ পেয়ে সে স্মরণশক্তি ফিরে পেল। স্বামীর কাছেও কিছু গোপন থাকল না। স্ত্রীকে নিঃসঙ্গ রেখে উপেক্ষা করার শাস্তি হিসাবে স্বামী এই ঘটনাকে গ্রহণ করল।

নাবিকের চরিত্রে অভিনয় করেছে সীন গ্যারিসন, স্বামীর চরিত্রে আর্থার হিল। ছবিটি উপভোগ্য।

হেমেন গুপ্ত পরিচালিত 'অনামিকা' ছবিতে মাধবী মুখাজী

প্রতিরূপের নাটক প্রতিযোগিতা

প্রতিরূপ নাট্য সংস্থার উদ্যোগে পলতার শ্রীপল্লীতে এক নাটক প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়েছে। ৬ই জানুয়ারী এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হয়েছে। এই প্রতিযোগিতা ১৬ই জানুয়ারী পর্যন্ত চলবে। প্রতিযোগিতায় ২৩টি একাঙ্ক নাটক এবং ১৪টি পূর্ণাঙ্গ নাটক অভিনীত হবে।

বিস্ফোরিত বিবর

গত ৬ই জানুয়ারী মিনার্ভা থিয়েটার মঞ্চে শিল্পিমন সংস্থার দুটি নাটক অভিনীত হয়েছে। প্রথম নাটক—সিরাজ চৌধুরীর 'বিস্ফোরিত বিবর'। দ্বিতীয় নাটক—উৎপল দত্তের 'রক্তাক্ত ইন্দোনেশিয়া'।

'বিস্ফোরিত বিবর' সময়োপযোগী একটি নাটক। এই নাটকের মূল চরিত্র এমন একজন সাহিত্যিক যাঁর লেখার সম্প্রতি খুব চাহিদা হয়েছে এক শ্রেণীর বিকৃতরুচি ও সমাজবোধহীন পত্রিকার সহায়তায়। এই লেখক এক সময় ছিলেন মানবতাবোধসম্পন্ন সুস্থ চিন্তার অধিকারী। আয়াসে জীবনযাপন ও জীবনকে ভোগ করার দুরন্ত কামনা তাঁকে সরিয়ে এনেছে মানুষের কাছ থেকে। একদিন তাঁর গল্প লেখার মানুষ ছিল শ্রমজীবী জনসাধারণ। আজ তাঁর গল্পের অবলম্বন বিকৃতরুচি, অসুস্থ মানুষ। যারা নারী-দেহ চিন্তা আর ভোগকে জীবনের চরম

নাটকের কথা

কুড়িয়ে পাওয়া

গত ২২শে ডিসেম্বর মহারাষ্ট্রনিবাস হলে শিল্পী সংস্থার উদ্যোগে সুনীল ঘোষের লেখা সামাজিক নাটক 'কুড়িয়ে পাওয়া' অভিনীত হয়। নাটকটি পরিচালনা করেন নাট্যকার নিজে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাজারাও শ্রীধীরেন্দ্র-নারায়ণ রায় (লালগোলা), এবং প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।

নাটকে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন—আশিস চক্রবর্তী, দীপ্তি বড়ুয়া, রীতা ব্রহ্মচারী, দীপক রায়, মিনতি দাশগুপ্ত, সুনীল ঘোষ, পৃথ্বীশ ব্যানার্জী, নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী, সুধীর গাঙ্গুলী, পিনাকী মুখার্জী. বিকাশ ঘোষদস্তিদার।

দেশ সেবায় নিয়োজিত,
এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড
কলিকাতা—৫০
নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী
—ব্রাঞ্চ সমূহ—
বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর
বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গোহাটী

বিশ্বরূপায় 'জাগো' নাটকে গণেশ হালদারের চরিত্রে নির্মলকুমার।

ধরে নিয়েছে। যারা জাতি ও সমাজের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাহীন। সন্তানের জন্মকে যারা মনে করে মা-বাবার যৌন সুখ উপভোগের পরিণতি মাত্র। নর-নারীর সম্পর্কের মধ্যে যারা যৌনতা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। যারা ইচ্ছার দাস। এদের নিয়ে গল্প লিখে এই সাহিত্যিক আজ অর্থানুকূল্যলাভ করেছে, কিন্তু মনের জ্বালা বেড়েছে। সেই জ্বালা থেকে রেহাই পাবার জন্য তার ঘরে লুকোনো থাকে মদের বোতল।

এই সাহিত্যিক সমর বসু একদিন আত্মহত্যা করল। কেন সে আত্মহত্যা করল? সে কথা বলতে গিয়ে—তিনটি দৃশ্যে এই সাহিত্যিকের বৃত্তান্ত উপস্থিত করা হয়েছে। দেখা গেল সমাজ থেকে, মানুষ থেকে পালিয়ে গিয়েও রেহাই নেই। পলায়নী বৃত্তির পরিণতি আত্মহত্যা। তা যে অর্থেই হোক।

নাট্যকার সাম্প্রতিক বিবর সাহিত্য বা শূন্যতাবোধক সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের উপলক্ষ করে তীব্র কশাঘাত করেছেন। এই কশাঘাতের মধ্যে দর্শকদের সামনে এই সাহিত্যের স্বরূপ ও সাহিত্যিকদের মুখোস উন্মাটন করেছেন। এরূপ রিপু-তাড়িত সাহিত্য সমাজকে কোথায় নিয়ে যায়, সে কথা তিনি বলতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর পরিণতিতে পোঁছান বড় গোঁজামিলের মধ্যে, বড় আকস্মিক। এখানে সাহিত্যিকের আত্মহত্যা করার মত আরো ঘটনা বিন্যাসের প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয় দৃশ্যে ইচ্ছার দাস যে ধর্ষকাম যুবক তার ভোগ্যা নারীকে খুন করল শেষ দৃশ্যে দেখা গেল সেই সাহিত্যিককে জ্ঞান দিচ্ছে। যেন সৃষ্টি অভিযোগ করছে স্রষ্টাকে। জগতের ঘটনাবলীতে দেখা গেছে এ সব ধর্ষকাম মানুষেরা হয়েছে ফ্যাসিস্ট বাহিনীর বা প্রতিক্রিয়াশক্তির শরিক। টাইট ড্রেস, চোঙা প্যান্টরা একালের প্রতিক্রিয়াশীলতার সৃষ্টি—তাদের মুখে সমাজসচেতন বুলি ভূতের মুখে রাম নামের মত। এবং তা দর্শকদের কাছে জোর করে কথা গেলানোর মত মনে হয়। এক্ষেত্রে স্কুল মাস্টার কল্যাণকে দিয়ে বিবেকের ভূমিকা আগাগোড়া করালে সেটা গ্রহণীয় এবং শোভন হতো। নাটকে আলোচনাপ্রসঙ্গে যেভাবে মার্ক্সবাদের কথা বলা হয়েছে সেদিক থেকে কল্যাণের মুখেই কথাগুলি মানাত। নাট্যকার যদি মনে করেন যে এই ধর্ষকাম মানুষেরা নিজের যন্ত্রণায় একদিন মার্ক্সবাদের পক্ষে ফিরে দাঁড়াবে তাহলে তিনি ভুল করেছেন। ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছেন না। সংলাপে নাট্যকার পিরানদেল্লোর 'ছয়টি চরিত্রের সন্ধানে' মনে করিয়ে দিয়েছেন। বিশেষ করে দ্বিতীয় দৃশ্যে। পিরানদেল্লো ন্যাচারালিস্ট নাট্যকার। সিরাজ চৌধুরী সম্ভবত নিজেকে পিরানদেল্লোর অনুসারী মনে করেন না।

সাম্প্রতিক বিবর সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের স্বরূপ প্রকাশ করে যে নাটক রচনা ও অভিনয় করেছেন তা অবশ্য প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

নাটকে বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয় সার্থক। দৃশ্যসজ্জা প্রশংসনীয়।

সংবাদবন্যা

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি জানাচ্ছেন যে নতুন বছরের জন্য তাঁরা এক কার্যকরী কমিটি গঠন করেছেন। এই কমিটির কর্মকর্তা :

সভাপতি—শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ। সহ-সভাপতি—শ্রীহিরণকুমার সান্যাল, শ্রীসত্যজিৎ রায়, শ্রী এস, আর, হেমাদ। সম্পাদক—শ্রীপ্রদীপ্তশঙ্কর সেন। যুগ্ম সম্পাদক—শ্রীপ্রবোধকুমার মৈত্র, শ্রীমৃগাঙ্কশেখর রায়। কোষাধ্যক্ষ—ঈশানীপ্রসাদ বসু। গ্রন্থাগারিক—শ্রীঅমলেন্দু বসু। সদস্যগণ—সর্বশ্রী চিদানন্দ দাশগুপ্ত, মৃণাল সেন; ডি, প্রামানিক, ডাঃ বি, পি ব্যানার্জী, অমিয় গুপ্ত, অসীম সোম, অমিতাভ ঘোষ. সমীর রায়চৌধুরী, মিহির সেন।

সিনে সেন্ট্রাল

১২ই থেকে ১৬ই জানুয়ারী সন্ধ্যায় চেকোশ্লোভাক কনস্যুলেট প্রাঙ্গণে সিনে সেন্ট্রাল কলকাতার উদ্যোগে তিনটি চেক ছবি দেখান হবে। ছবি তিনটি : ক্রাইম এট এ গার্লস স্কুল, ফিয়ার, দি হাই ওয়াল।

ভারত সরকার নিয়ন্ত্রিত চলচ্চিত্র বহির্বাণিজ্যিক সংস্থা ইন্ডিয়ান মোশান পিকচার্স এক্সপোর্ট কর্পোরেশন, যার সংক্ষিপ্ত নাম 'ইমপেক' বিদেশে ভারতীয়

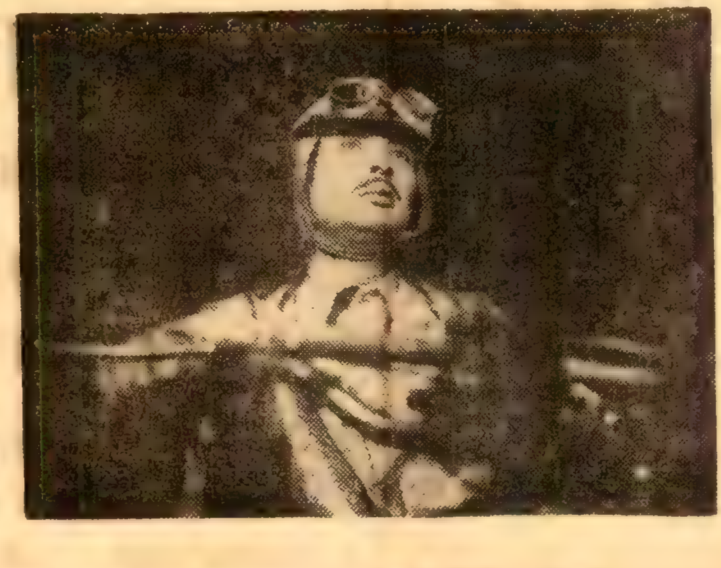

রাজেন তরফদার পরিচালিত 'আকাশছোঁয়া' ছবিতে দিলীপ মুখার্জী

চলচ্চিত্র রপ্তানী করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১৯৬৫ সালে এই লোকসানের পরিমাণ ১,৫৯,০১২ টাকা। ১৯৬৩ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৪ ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৭৯,৩২৩ টাকা। এই তথ্য পরিবেশন করেছেন বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীমানুভাই শা।

সঙ্গীতকথা

নজরুল সন্ধ্যা

গত ৩১শে ডিসেম্বর নজরুল সন্ধ্যার দ্বিতীয় অধিবেশন কাজী নজরুল ইসলামের বাসগৃহে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই মনোজ্ঞ ঘরোয়া অনুষ্ঠানে কবির সম্মুখে গান গেয়ে শোনালেন প্রখ্যাতা গায়িকা শ্রীমতী রাধারাণী দেবী। তিনি প্রথমে গাইলেন 'শোন গো সন্ধ্যা মালতী'; তার পরে 'বঁধু তোমার আমার এই যে বিরহ এক জনমের নহে।' দরদী কণ্ঠের এ দুটি গানে স্মৃতি বিস্মৃত কবিও যেন কি এক অব্যক্ত বেদনায় অস্থির হয়ে উঠলেন। শ্রোতারা গায়িকার সুললিত কণ্ঠের সুরের মায়ায় বিমোহিত। ভক্ত-লের অনুরোধে আবার তিনি গান গাইলেন—'কি তব পরিচয় কি হবে জানিয়া' এবং শেষ করলেন একটি স্মৃতিজড়িত অতীতদিনের গান গেয়ে। সেই গানটি—'ওগো প্রিয়তম এত প্রেম দিও নাকো—সহিতে পারি না আর।' প্রবীণ শ্রোতাদের মনে করিয়ে দিল ত্রিশ দশকের সঙ্গীতস্মৃতি। তখন এই গান শুনে সবাই বিস্ময়মুগ্ধ। বার বার শুনেও তরুণ-তরুণীদের যে গান শোনার আশা মিটত না। অপূর্ব সেই রচনা, কি মধুময় সুর, তেমনি গায়িকার দরদী কণ্ঠ। সেদিনের অনুষ্ঠানে নবীনদের কাছে এই গানটি হয়েছিল সর্বাধিক আকর্ষণীয়।

শ্রীমতী রাধারাণী দেবী বললেন, গানটি তাঁকে কবি শিখিয়েছিলেন রেকর্ড করার জন্য। কিন্তু সেকালের জনপ্রিয় গায়ক সায়গল আগ্রহ করলেন যে তিনিই গানটি গাইবেন। সায়গলের আগ্রহ দেখে কবি রাজী হলেও তাঁর মনের কথা তিনি গোপন করলেন না এবং যত্ন করেই রাধারাণী দেবীকে শেখালেন। রাধারাণী দেবী কবির শেখানো সেই স্মৃতি-সঙ্গীত আজো তাঁর গলায় তেমনি মধুময় করে ধরে রেখেছেন।

শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর পরে এই সন্ধ্যায় গাইলেন শ্রীমতী মাধুরী রায় ও শ্রীরতন রায়। তাঁদের সম্মিলিত কণ্ঠে 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' অনুষ্ঠানে

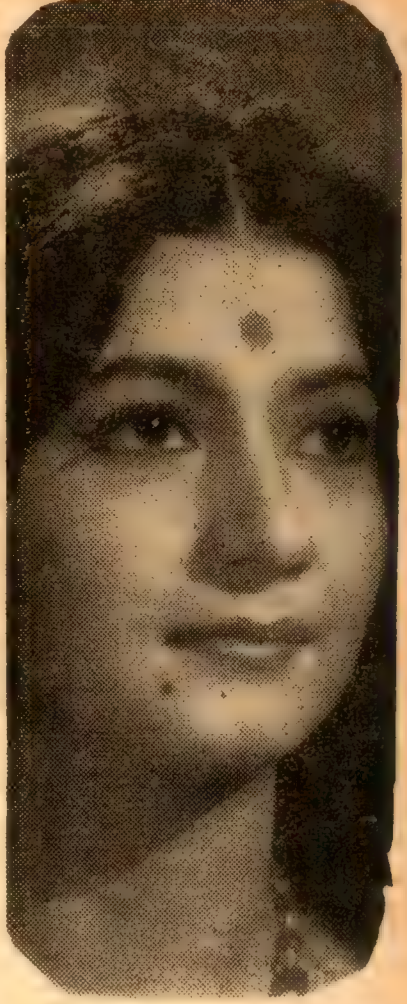

'দেবীতীর্থ কামরূপ কামাখ্যা' ছবিতে শমিতা বিশ্বাস।

উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। শ্রীমতী ভারতী রায় ও শ্রীমতী আরতি দাসও গান করেন। ছোট্ট মেয়ে সুমিতা দাস তার বাবার সঙ্গে এসেছিল অনেক দূর থেকে। কবির সামনে দাঁড়িয়ে সে কবিকে দুটি আবৃত্তি শোনাল: 'খাঁদু দাদু' আর 'কাঠবেড়ালী'। তার উচ্চারণ আর আবৃত্তি অপূর্ব সুন্দর। উপস্থিত সকলে তার আবৃত্তি শুনে মুগ্ধ।

পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমি এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা। প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে একাডেমি নজরুল সন্ধ্যার আয়োজন করে কবিকে গান শোনাবার ব্যবস্থা করেন। স্মৃতি বিস্মৃত কবি গান শোনেন শিশুর মত সরল সহজ আনন্দে।

একাডেমির কোষাধ্যক্ষ বিচারপতি শ্রী এস, এ, মাসুদ শিল্পীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

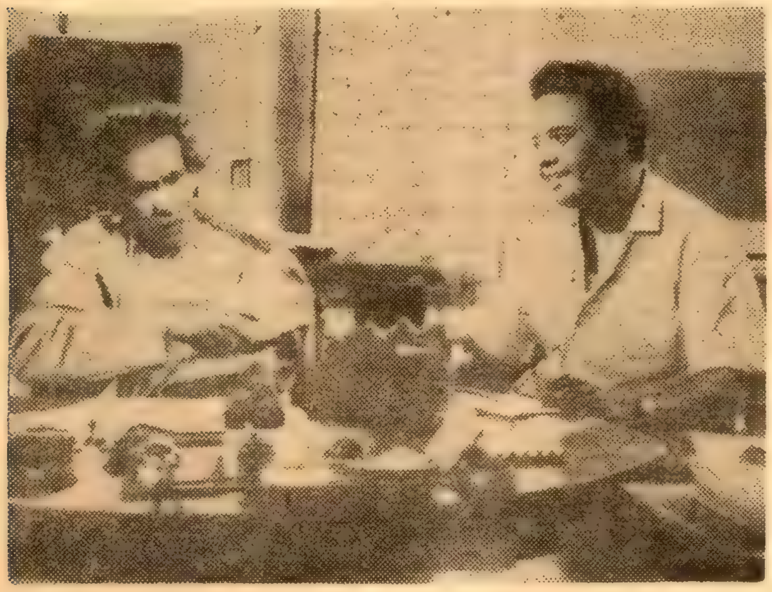

শ্রীজয়দ্রথ পরিচালিত '৮০তে আসিও না' ছবির একটি দৃশ্যে তরুণকুমার ও গৌর শী

খেলাধুলা

অসহায় দর্শক সীতেশ রায়কে সংঘবদ্ধভাবে একদল পুলিশ নির্মমভাবে প্রহার করছে

শ্রীঅমিতাভ

ইডেনের সেই অশুভ দিনটি

ইডেন উদ্যানে পয়লা জানুয়ারীর ঘটনা। ইডেনের অঙ্গনে যে আগুন দপ্ করে জ্বলে উঠেছিল সে আগুন আবার দপ্ করেই নিভে গেল। বাধাপ্রাপ্ত টেস্ট খেলা অবশেষে শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে শেষ হলো।

পঁচিশ টাকার টিকিটের দর্শকদের মাঠে প্রবেশ করার ব্যাপারকে কেন্দ্র করে ইডেনের মাঠে যে নারকীয় ঘটনা ঘটে গেল, তার জন্য বিশ্বের ক্রীড়াজগতে ভারতের মর্যাদা ও ঐতিহ্য ভূলুণ্ঠিত হলেও ক্রিকেট এ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল-এর কর্মকর্তাদের মধ্যে কিন্তু এমন কোন উদ্বেগ ও চাঞ্চল্যের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বরং খানিকটা বেপরোয়া ভাবই ফুটে উঠছে তাদের চাল-চলনে।

কলকাতার ক্রীড়ামোদীদের অসীম সৌভাগ্য যে সেদিন ইডেনে কোন চরম দুর্ঘটনা ঘটে নি। খেলার মাঠে এই ধরণের ঘটনায় পায়ের চাপে লোকের মৃত্যু হবার ঘটনা বিশ্ব ক্রীড়ার ইতিহাসে বিরল নয়। যে মাঠে ষাট হাজার লোকের স্থান সঙ্কুলান করা যায় সেখানে এক লক্ষ লোককে প্রবেশ করালে কি পরিণাম ঘটতে পারে তা কি সি, এ, বি-র কর্মকর্তারা একবারও চিন্তা করেছিলেন?

ক্রিকেট মাঠে গাঁটের পয়সা খরচ করে যে দর্শকরা সিজন টিকিট কেটে খেলা দেখতে গিয়েছিলেন, তাঁরা কি সাধ করে পুলিশের লাঠি আর টিয়ার গ্যাস খেতে গিয়েছিলেন? সি, এ, বি কি একথা অস্বীকার করতে পারেন যে তাঁরা স্থানের তুলনায় অতিরিক্ত টিকিট বাজারে ছেড়েছেন? সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার ঘটিয়েছে ৪৫ টাকার সিজন টিকিটের গ্যালারীতে। এক নম্বরের দুটো টিকিট ইস্যু করার ঘটনা অনেকগুলি ঘটেছে। প্রথমদিন আর একটি ঘটনা ৪৫ টাকার গ্যালারীতে দেখা গিয়েছে, প্রায় পাঁচ শ' টিকিটের কোন নাম্বার পড়ে নি গ্যালারীতে। এই ফাঁক দিয়ে বেশ কিছু বাড়তি টিকিট সি, এ, বি বার করে দিয়েছেন বলে মনে হয়।

ক্রিকেট মাঠে সবচেয়ে বেশি উপেক্ষিত হলেন পঁচিশ টাকার সিজন টিকিটের দর্শকেরা। সত্যকারের ক্রিকেট অনুরাগী বলতে গেলে এই দর্শকেরা। এবারের ইডেনের ওই ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটল এই পঁচিশ টাকার দর্শকদের উপলক্ষ্য করেই। সি, এ, বি বলেছেন এ বছর পঁচিশ টাকার সিজন টিকিট তাঁরা মাত্র ষোল হাজার বিতরণ করেছেন কিন্তু বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা খুব কম করে পঁচিশ হাজার লোক ছিলেন ওই পঁচিশ টাকার সিজন টিকিটের ব্লকে। এবার শেষ তিন দিন সি, এ, বি পনেরো টাকা এবং ছ' টাকার দৈনিক টিকিট বিক্রয় বন্ধ রেখে সেই স্থানে পঁচিশ টাকার সিজন টিকিটের দর্শকদের বসার ব্যবস্থা করেছেন। এই ব্যবস্থার পরও কিন্তু স্টেডিয়ামে অথবা গ্যালারীতে এক তিলও স্থান ছিল না। তবে একথা সত্য যে, এই কম মূল্যের সিজন টিকিটের দর্শকরা বহুদিন পর একটু আরামে খেলা দেখতে পেরেছেন। বিগত কয়েক-বছরের টেস্ট ম্যাচে ইডেনের রূপটি মনে করলে দেখা যাবে যে কম মূল্যের ওই সিজন টিকিটের ব্লকটি পূর্ণ হয়ে মাঠের বাউণ্ডারী লাইন পর্যন্ত উপচে পড়ত। সি, এ, বি কি এই অনুমানে পঁচিশ টাকার সিজন টিকিট বিক্রয় করেছেন যে একজন লোক এক ইঞ্চি পরিমাণ স্থান লাভ করবে। একথা বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, সি, এ, বি সমস্ত বিষয় জেনে শুনে সীমাহীন লোভের বশবর্তী হয়ে এই কাজ করেছেন।

একথা কি সি, এ, বি অস্বীকার করবেন যে ভেণ্ডারদের কার্ড হিসাবে প্রায় পাঁচ হাজার কার্ড তাঁরা ছাড়েন নি। এই ভেণ্ডার কার্ড বেশ উচ্চ মূল্যে দুষ্টলোকে

নাকি বিক্রয়ও করেছেন, আর ভেন্ডার কার্ডধারীরা দর্শক হয়ে খেলা দেখেছেন।

এখন রবিবারের সেই লঙ্কাকাণ্ডের ঘটনা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। টেস্ট খেলার দ্বিতীয় দিন ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের ব্যাট দেখার জন্য মাঠে তিল ধারণের স্থান নেই. পঁচিশ টাকার সিজন টিকিটের ব্লক কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উপচে পড়তে চাইছে মাঠের মধ্যে। প্রথম দিন মাঠে দর্শকরা বসার ফলে কিছুক্ষণ খেলা বন্ধ রাখতে হয়। সেইজন্য দ্বিতীয় দিন খেলা সুরুর আগে পঁচিশ টাকার দর্শকরা মাঠে প্রবেশ করতে চাইলে পুলিশ বাধা দিতে থাকে। অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য এই সময় পুলিশ নির্মমভাবে লাঠি চার্জ করতে সুরু করে। পুলিশের উদ্দেশ্যে ইট-পাটকেল বর্ষিত হতে থাকে গ্যালারী থেকে। এর পর সার বেঁধে একদল পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস নিয়ে মাঠে প্রবেশ করে কাঁদুনে গ্যাস ছুড়তে থাকে দর্শকপূর্ণ গ্যালারী লক্ষ্য করে। এরই মাঝে প্রতিবাদ জানাতে এসে একজন দর্শক সীতেশ রায় একদল পুলিশের সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণে অমানুষিকভাবে প্রহৃত হন। সমবেত দর্শকরা শিউরে ওঠে এই দৃশ্য দেখে। ক্ষুব্ধ দর্শকরা এই সময় পুলিশী অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে মাঠে প্রবেশ করে। পুলিশ গুলী চালনার আদেশ না পেয়ে মাঠ পরিত্যাগ করে। উন্মত্ত কিছু দর্শক গ্যালারীর চাঁদোয়ায় আগুন লাগায়। মাঠের বাইরেও এই আগুন ছড়িয়ে পড়ে; ময়দানের একটি ক্লাবের তাঁবু এবং পাঁচটি বাস, জীপ এবং পুলিশের মোটর সাইকেল ভস্মীভূত হয়। অবশ্য কিছু ক্ষণের মধ্যেই অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে আসে।

আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে মাঠে নামার চেষ্টাই কি ওই সিজন টিকিটের দর্শকদের অপরাধ যার জন্য তাঁদের ভাগ্যে জুটেল পুলিশের লাঠি এবং ফলে ইডেনের অঙ্গনে ঘটল ওই তাণ্ডবনৃত্য—ক্রিকেটের ইতিহাসে সৃষ্টি হল এক কলঙ্কিত ঘটনা। পঁচিশ টাকার সিজন টিকিটের দর্শকদের অপরাধ কি? তাঁরা কি কোন আইন ভঙ্গ করেছিলেন? তাঁরা কি মাঠে লুঠতরাজ করার জন্য বা অগ্নিসংযোগ করার জন্য মাঠে নামার চেষ্টা করেছিলেন? কোন দর্শককেই ঐ সকল অভিযোগে অভিযুক্ত করা চলে না। বেষ্টনী অতিক্রম করে মাঠে নামাকে যদি অপরাধজনক বলে মনে করা হয় তা' হলে পরোক্ষভাবে এর জন্য দায়ী সি, এ, বি। পুলিশের একথা নিশ্চয় বোঝা উচিত ছিল যে এসপ্ল্যানেড অথবা রাজভবনের সম্মুখে অথবা রাজপথের শোভাযাত্রা এক জিনিস এবং খেলার মাঠে সমবেত জনতা আর এক জিনিস।

কলকাতার দ্বিতীয় টেস্টে টস করতে মাঠে নামছেন দুই দলের অধিনায়ক সোবার্স এবং পতৌদি।

জাতি, ধর্ম, বর্ণ এবং দল নির্বিশেষে ক্রীড়ানুরাগী দর্শকরা মাঠে আসে খেলা দেখার জন্য, মাঠে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে অথবা ১৪৪ ধারা অমান্য করতে অথবা হামলা করতে নয়। এই পার্থক্যটুকু বোঝার মত বুদ্ধি ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারের নিশ্চয় ছিল।

খেলার মাঠে দর্শকদের শান্ত করার জন্য কিছুরই প্রয়োজন ছিল না। প্রয়োজন ছিল হৃদয় নামক একটি বস্তুর যার দ্বারা অবস্থাকে অতি সহজেই আয়ত্তে আনা সম্ভব হত। কলঙ্কিত হত না কলকাতা ক্রীড়াজগতের ইতিহাসের গৌরবময়

ভারতের শোচনীয় পরাজয়

ইডেনে ভারত-ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ দলের দ্বিতীয় টেস্ট খেলা দেখে মন ভরল না। যদিও মাত্র তিনদিন এবং এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ ভারতকে এক ইনিংস পঁয়তাল্লিশ রানে পরাজিত করে রাবার বিজয়ী হয়। ১৯৫৮-৫৯ সালে ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ ইডেন উদ্যানের টেস্টে ইনিংসে বিজয়ী হয়। ভারতীয় দল এই দ্বিতীয় টেস্টে যে হতাশাব্যঞ্জক ক্রীড়াধারার পরিচয় দিয়েছে তা ভাবতে গেলেও লজ্জা লাগে। টেস্ট দল নির্বাচনে ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের নির্বাচকমণ্ডলী নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে।

টসে জয়ী হয়ে ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ দলপতি গ্যারফিল্ড সোবার্স প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বাইনো এবং কনরাড হাণ্ট ব্যাট করতে মাঠে নামেন!

পঁচিশ টাকার সিজন টিকিটের দর্শকদের ওপর পুলিশের লাঠি চার্জের দৃশ্য

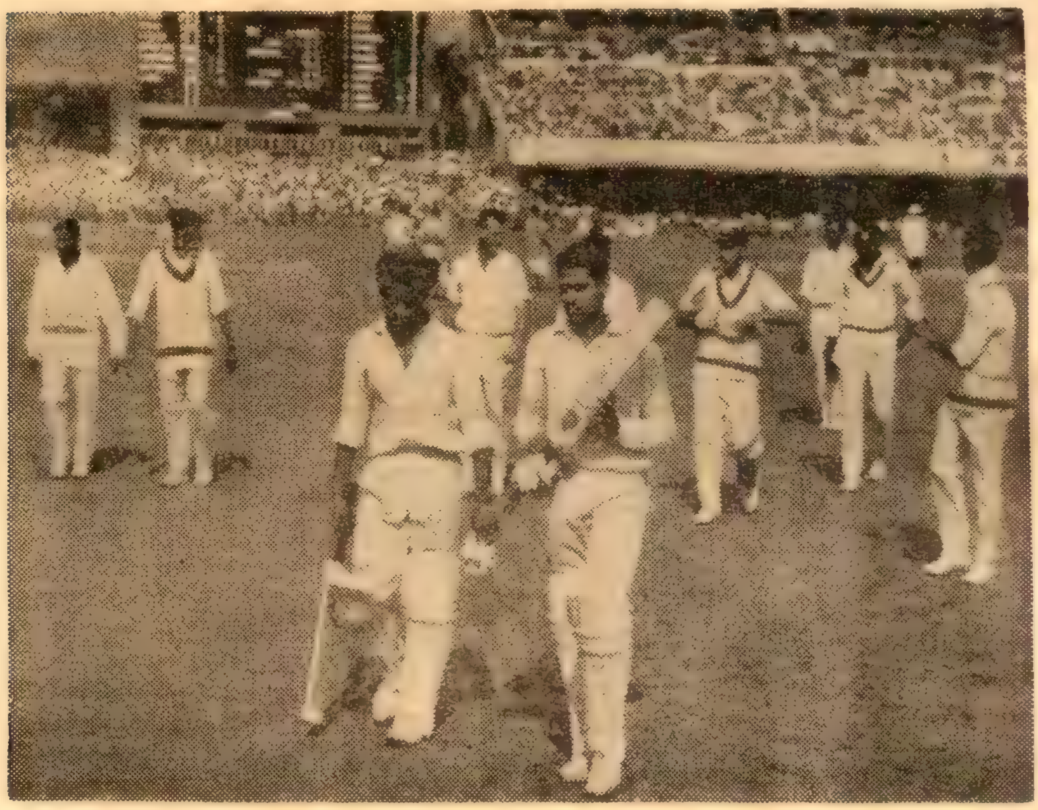

দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শেষ হবার পর মাঠ থেকে ফিরছেন ভারতের শেষ দুই ব্যাটসম্যান—চন্দ্রশেখর এবং বেদী।

ভারতীয় দলের বোলিং সূচনা করেন সুর্তি এবং সুব্রাহ্মণ্যম। ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ দলের প্রথম দুটি উইকেট পড়ে রান আউটের ফলে। হাণ্ট সংগ্রহ করেন ৪০ রান এবং বুচার ৩৫ রান। ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ দলের ব্যাটিং কিন্তু খেলাকে খুব আকর্ষণীয় পর্যায়ে উন্নীত করতে পারে নি। অন্তত ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের বিশ্বখ্যাত খেলোয়াড়দের কাছ থেকে এই ধরণের ধীর গতির ব্যাটিং আশা করা যায় নি। ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ দলে নবাগত খেলোয়াড় অল্পক্ষণের জন্য উইকেটে অবস্থান করে মাত্র পাঁচ রান করেন বটে, কিন্তু ওই অল্প সময়ে তাঁর ব্যাট চালনা দর্শকদের মন জয় করেছে। দর্শকরা মাঠের মধ্যে বসে পড়ার ফলে খেলার বেশকিছু সময় নষ্ট হয়। প্রথম দিন ভারতীয় খেলোয়াড় কয়েকটি সহজ ক্যাচ ফেলে দেবার ফলে ভারত খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কানহাইয়ের দুটি সহজ ক্যাচ ভূপতিত হয়। ভারতীয় দলে নবাগত স্পিনার বেদী সুন্দর বল করে প্রথম দিনের দুটি উইকেটই দখল করেন। ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ প্রথম দিনের শেষে চার উইকেটের বিনিময়ে ২১২ রান সংগ্রহ করে।

দ্বিতীয় দিনের কথা আর এখানে আবার লিখব না। সেই ভয়াবহ দিনটির কথা পৃথকভাবে এবং বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। তবে দ্বিতীয় দিনের বিষয়ে এখানে কয়েকটি কথা বলব। ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ দলের খেলোয়াড়দের নিরাপত্তার এবং নিরাপদে হোটেলে পৌঁছে দেবার কথা ভীর[illegible]এ-বি কর্মকর্তাদের তখন মনে ছিল না। দমদম বিমানবন্দর থেকে হোটেলে ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ দলকে আনার ব্যাপারে যে দু'জন স্থানীয় ম্যানেজার খুব বাহবা কুড়িয়েছিলেন, এই গণ্ডগোলের সময় বিদেশী অতিথিদের দেখার জন্য তাঁদের আর দেখা যায় নি। খবরে প্রকাশ, কর্মকর্তারা পিঠ বাঁচানোর জন্য পিঠটান দিয়েছিলেন। নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত এক খবরে প্রকাশ, এখানকার সি-এ-বি'র সব কর্মকাণ্ডের নাটের গুরু এবং ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের অন্যতম সর্বময় কর্তা সেদিন গণ্ডগোলের সময় ভারতীয় খেলোয়াড়দের ভ্যানে ভারতীয় খেলোয়াড়দের পায়ের নিচে বেঞ্চের কোণে কাঁপতে কাঁপতে হোটেলে পালান কোনক্রমে। ওয়েস্ট-ইন্ডিজ খেলোয়াড়দের নিরাপদে হোটেলে পৌঁছে দেবার কাজে ক্রীড়ামোদীরা যথেষ্ট সাহায্য করেন।

দ্বিতীয় দিনের এই ঘটনার পর অনেক চেষ্টায় এবং মূলত ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের ম্যানেজার, দলপতি এবং খেলোয়াড়দের সৌজন্যে শেষ তিনদিনের জন্য পরিবর্তিত দিনে খেলা অনুষ্ঠিত করা সম্ভব হয়।

খেলার তৃতীয় দিন মঙ্গলবার ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ দলের অসমাপ্ত খেলা সুরু করলেন রোহান কানহাই এবং সেমুর নার্স। কানহাই ৯০ রানে আউট হলেন। এই কানহাই ১৯৫৮-৫৯ সালে কলকাতা টেস্টে ডাবল সেঞ্চুরি করে গিয়েছেন কিন্তু কানহাইয়ের এবারের খেলা দেখে মনে হল তা অতীতের ছায়ামাত্র। বেশ বোঝা যাচ্ছে কানহাই তাঁর খেলোয়াড়ী জীবনের প্রান্ত সীমায়, ক্রিকেট মাঠের ক্রীজ থেকে বিদায় নেবার দিন তাঁর হয়ে এসেছে। সোবার্সের মন-মাতানো ব্যাটিং সকলকে প্রচুর আনন্দ দিয়েছে। সোবার্স অল্পক্ষণ উইকেটে অবস্থান করেছেন কিন্তু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় খেলে ৭০ রান সংগ্রহ করেন। হল সংগ্রহ করেন ৩৫ রান। হল প্রথম বলেই একটি ক্যাচ তুললে বেদী সেই ক্যাচ ধরতে অসমর্থ হন। ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ

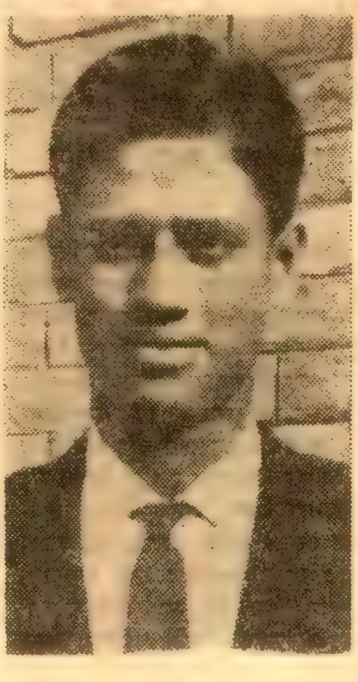

সুব্রত গুহ

দল তাঁদের প্রথম ইনিংস শেষ করে ৩৯০ রানে। চন্দ্রশেখর দখল করেন তিনটি উইকেট এবং বেদী ও সুর্তি দুটি করে উইকেট সংগ্রহ করেন। ভারতীয় দলের ফিল্ডাররা সহজ ক্যাচগুলি ধরতে পারলে ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ দল এত বেশি রান সংগ্রহ করতে পারতেন না।

ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসের খেলা সুরু করে এবং দিনের শেষে ফলাফল ছিল এক উইকেটে ৮৯ রান। কুন্দেরন ৩৯ রান করে হলের বলে বোল্ড আউট হন। জয়সীমা এবং সুর্তি যথাক্রমে ৩৪ রানে এবং ১০ রানে অপরাজিত ছিলেন।

চতুর্থদিন খেলার মোড় ঘুরে গেল ল্যান্স গিবসের স্পিন বোলিং মারাত্মক হয়ে উঠল সঙ্গে গ্যারি সোবার্সও যথেষ্ট পরিমাণে বল ঘোরাতে লাগলেন। ভারতীয় দল এক এক করে উইকেট খোয়াতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত ইনিংস শেষ করল ১৬৭ রানে। ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে একমাত্র কৃতিত্বের সঙ্গে গিবসের বলে খেলেছেন ভেঙ্কটরাঘবন। গিবস দখল করলেন ৫টি উইকেট এবং সোবার্স ৩টি উইকেট। ফলো অনের সম্মুখীন হয়ে ভারত সুরু করল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা। চতুর্থ দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত হারাল ১৩৩ রানে পাঁচটি উইকেট। জয়সীমা ৩১ রান, সুর্তি ৩১ রান এবং বোরদে ২৮ রান করলেন। অধিনায়ক পতৌদি দুই ইনিংসেই শোচনীয় ব্যর্থতা প্রদর্শন করলেন। প্রথম ইনিংসে এক রানে এবং দ্বিতীয় ইনিংসে দু' রানে আউট হয়ে।

খেলার পঞ্চম ও শেষ দিন মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে ভারতীয় দলের অবশিষ্ট পাঁচটি উইকেটের পতন ঘটল এবং ভারত খেলা শেষ করল ১৭৮ রানে। ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ জয়ী হল এক ইনিংস ৪৫ রানে। সোবার্স দখল করলেন ৪টি উইকেট এবং গিবস ও লয়েড দুটি করে উইকেট।

ভারতের এই কলকাতার টেস্টে পরাজয়ের জন্য দায়ী ভারতের খেলোয়াড়রা এবং নির্বাচকমণ্ডলীর ভুল দল নির্বাচন। ভারতের নির্ভরযোগ্য কয়েকজন খেলোয়াড়ের ব্যর্থতার কারণ তাঁদের নিজেদের আচার-আচরণ এবং দায়িত্বহীনতা।

ডুরাণ্ড কাপ

দিল্লীর মাঠে ডুরাণ্ড কাপের আসরে অঘটন ঘটে গেল। ১৯৬৬ সালের কলকাতা লীগ এবং আই-এফ-এ শীল্ড বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ডুরাণ্ডের আসর থেকে পরাজিত হয়ে বিদায় গ্রহণ করল ১—০ গোলে সেকেন্দ্রাবাদের ই-এম-ই সেণ্টারের কাছে পরাজিত হয়ে। কলকাতার আর একটি দল মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ৪—০ গোলে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় গুর্খা ব্রিগেডের কাছে কোয়ার্টার ফাইন্যালের খেলায়। কলকাতার একমাত্র দল ডুরাণ্ডের খেলায় অস্তিত্ব বজায় রেখেছে এখনও গতবারের ডুরাণ্ড বিজয়ী মোহনবাগান ক্লাব। মোহনবাগান ক্লাব কোয়ার্টার ফাইন্যালে মফৎলালকে ২—১ গোলে পরাজিত করে সেমিফাইন্যালে পৌঁছেছে। এই খেলায় প্রথমে এক গোলে অগ্রগামী ছিল মফৎলাল, কিন্তু মোহনবাগানের পক্ষে পরে দুটি গোল দেন অরুময় এবং অসীম মৌলিক।

মাঠে ব্যাট করতে নামার পূর্বে প্যাড্ পরে প্যাভেলিয়ানে অপেক্ষা করছেন রোহান কানহাই।

আমাদের গলদ কোথায়

ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের নির্বাচকমণ্ডলী মাদ্রাজের তৃতীয় এবং শেষ টেস্টের জন্য ষোলজন ভারতীয় খেলোয়াড়ের নাম ঘোষণা করেছেন। কলকাতার দ্বিতীয় টেস্টে দল থেকে বাদ পড়েন বাপু নাদকার্ণী। এবার মাদ্রাজ টেস্টের পূর্বে দল থেকে বাদ পড়লেন আব্বাস আলি বেগ এবং সেলিম দুরানী। আব্বাস আলি বেগ বর্তমানে অসুস্থ বলে তাঁকে বাদ দেওয়া হয়েছে এই কথা নির্বাচকমণ্ডলীর সভাপতি জানান। এই দু'জন খেলোয়াড়ের পরিবর্তে বিহারের রমেশ সাক্সেনা এবং মহীশূরের প্রসন্নকে দলভুক্ত করা হয়েছে। বিহারের রমেশ সাক্সেনা ব্যাটসম্যান এবং মহীশূরের প্রসন্ন হলেন স্পিন বোলার। দিল্লীতে ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের বিপক্ষে প্রদর্শনী খেলায় রমেশ সাক্সেনা অপূর্ব ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ দলপতি গ্যারি সোবার্স রমেশ সাক্সেনার অপূর্ব ব্যাটিং-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। দিল্লীর মাঠে স্পিন বোলিংয়ে অসামান্য সাফল্য অর্জন করায় বেদীকে কলকাতায় টেস্টদলে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান হয়। শেষ পর্যন্ত তরুণ বোলার বেদীকে কলকাতা টেস্টে খেলতেও দেখা যায়। ইডেনের মাঠে বেদী বল ভালই করেছেন এবং মনে হচ্ছে তাঁর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। বেদীর নিম্নমানের ফিল্ডিং-এর অবশ্য অনেক বিরূপ সমালোচনা হয়েছে কিন্তু নবাগত এই তরুণ খেলোয়াড়কে ফিল্ডিং-এর জন্য এত বদনাম করা উচিত নয়; সময় এবং সুযোগ পেলে এই দোষ তিনি কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

কলকাতার মাঠে বাংলার তরুণ মিডিয়াম পেস বোলার সুব্রত গুহকে খেলান উচিত ছিল। সুব্রতকে কলকাতার দ্বিতীয় টেস্টে খেলার সুযোগ দিলে ভারতীয় দলের উপকার হত এবং নিশ্চয়ই তিনি ভাল ফলাফল প্রদর্শন করতে পারতেন। অভিজ্ঞ মহলের খবর যে, মাদ্রাজের টেস্টে সুব্রত গুহকে খেলার সুযোগ দেওয়া হবে। এ ছাড়া সুব্রত গুহকে ইংলণ্ড সফরে নিয়ে গেলে ভারত একজন পরিণত মিডিয়াম পেস বোলার পাবে।

শোনা যাচ্ছে রমেশ সাক্সেনাকে মাদ্রাজে খেলার সুযোগ দেওয়া হবে। বর্তমানে ভারতের স্বীকৃত টেস্ট ব্যাটসম্যানরা যে-ভাবে ব্যর্থতা প্রদর্শন করছেন, তাতে মনে হয় সাক্সেনার মত সম্ভাবনাপূর্ণ খেলোয়াড়দের সুযোগ দিলে ভারতীয় ক্রিকেটেরই কল্যাণ হবে। কলকাতার মাঠে কিন্তু ভেঙ্কটরাঘবনের মত ভাল বোলারকে উপেক্ষা করা হয়েছে এবং নির্বাচকমণ্ডলীর মতিগতি দেখে মনে হচ্ছে মাদ্রাজে ভেঙ্কটরাঘবনের পরিবর্তে প্রসন্নকে খেলানো হতে পারে।

পতৌদি অধিনায়ক হিসাবে এবং খেলোয়াড় হিসাবে ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা হারাচ্ছেন। কলকাতায় আমাদের অধিনায়ক এবং ভারতীয় দলের কয়েকজন খেলোয়াড়ের কার্যকলাপ সম্বন্ধে ক্রীড়ামোদী মহলে যথেষ্ট সমালোচনা হয়েছে। টেস্ট খেলা চলার সময় টেস্ট খেলোয়াড়রা মাঠের বাইরে সংযমের পরিচয় যদি না দেন এবং বেপরোয়া আচরণ যদি করেন তার জন্য পরোক্ষভাবে দল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শোনা গিয়েছে কলকাতার দ্বিতীয় টেস্ট খেলা চলার সময় ভারতীয় দলের অনেক খেলোয়াড় গভীর রাতে হোটেলে ফিরেছেন। একমাত্র চন্দ্রশেখর, ভেঙ্কটরাঘবন, বেদী এবং সুব্রাহ্মণীয়মের সম্বন্ধে কোন অভিযোগ শোনা যায় নি আর বাংলার সুব্রত গুহ কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে বাড়িতে ছিলেন। ভারতীয় দলের ম্যানেজার এবং স্থানীয় ম্যানেজারেরা কি চোখ বুজে ঘুমিয়ে ছিলেন [illegible] তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে অত রাত্রে খেলোয়াড়েরা কিভাবে হোটেলে আসেন যখন পরের দিন তাঁদের আবার খেলতে হবে। আর একটা কথা না বলে পারছি না; খেলোয়াড়দের মাঝে চিত্রতারকাদের প্রভাব দিন দিন বাড়ছে ফলে তার বিষময় ফলও আমরা দেখতে পাচ্ছি। ভবিষ্যতে খেলোয়াড়রা যদি সংযত না হন এবং চিত্রতারকাদের প্রভাব থেকে তাঁদের দূরে রাখা না যায় তবে একথা নিশ্চিত যে, আমাদের ক্রীড়াজগতের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

মাদ্রাজ টেস্টে ভারতীয় দলের ষোলজনের মধ্যে আছেন—পতৌদির নবাব (অধিনায়ক), বোরদে, জয়সীমা, কুন্দেরন হনুমন্ত, ওয়াদেকার, সরদেশাই, সুব্রাহ্মণীয়ম, ভেঙ্কটরাঘবন, সুর্তি, চন্দ্রশেখর, বেদী, সুব্রত গুহ, ফারুক, প্রসন্ন এবং রমেশ সাক্সেনা।

—সুদর্শন

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কালকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

17 JAN 1967

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের

অমূল্য গ্রন্থরাজ

কালীসিংহ মহাভারত	— ১ম	— বোর্ড বাঁধাই	(যন্ত্রস্থ)	—১২-০০
,, ,,	— ২য়	—	,,	—১০-০০
,, ,,	— ৩য়	—	,,	—১০-০০
,, ,,	— ৪র্থ	—	,,	—৬-০০
,, ,,	— ৫ম	—	,,	—৬-০০
বাল্মীকি রামায়ণ	— ১ম	— বোর্ড বাঁধাই		—৮-০০
,, ,,	— ২য়	—	,,	—৮-০০
কৃত্তিবাসী রামায়ণ			,,	—৮-০০
শ্রীরামচরিত মানস	— ১ম	— লিনু বাঁধাই		—২-০০
,,	— ২য়	—	,,	—২-০০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী — উপন্যাস	— ১ম	—	,, যন্ত্রস্থ	—৩-০০
,, — ,,	— ২য়	—	,,	—৩-০০
,, — ,,	— ৩য়	—	,,	—৩-০০
,, — সাহিত্য	— ১ম	—	,,	—৩-০০
,, — ,,	— ২য়	—	,,	—৩-০০
,, — ,,	— ৩য়	—	,,	—৩-০০
[illegible]ভাষা — উর্দু-ইংরাজী				—৩-০০
,, — বাংলা-ইংরাজী			বোর্ড বাঁধাই	—৩-৫০
দীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলী	— ১ম	—		—২-০০
,, ,,	— ২য়	—		—২-০০
মানিক গ্রন্থাবলী	— ১ম	—		—২-০০
,,	— ২য়	—		—২-০০
মাইকেল গ্রন্থাবলী	— ১ম	—	বোর্ডবাঁধাই	—৪০০
,,	— ২য়	—	,,	—৩-৫০
দীনেন্দ্র গ্রন্থাবলী	— ১ম	—	,,	—৩-৫০
,,	— ২য়	—	,,	—৩-৫০
যোগেন্দ্র গ্রন্থাবলী	— ।—		,,	—২-৫০
সুরেন্দ্র গ্রন্থাবলী	— ।—		,,	—৩-৫০
রামপদ গ্রন্থাবলী	— ।—		,,	—৩-০০
রামনাথ গ্রন্থাবলী	— ।—		,,	—৩-০০
শিবরাম গ্রন্থাবলী	— ।—		,,	—২-৫০
বিভূতি মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাবলী	— ।—		,,	—৩-৫০
প্রভাবতী দেবী গ্রন্থাবলী	— ।—		,,	—৩-৫০
শ্রীমদ্ভাগবত (পয়ার)	— ।—		,,	—৫-০০
মীমাংসাদর্শন (দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ)		প্রতি খণ্ড		—৮-০০

আমার দেখা মেয়েরা	— ।—	— (বোর্ড বাঁধাই)		—৪-০০
নেপোলিয়ান	— ।—	—	,,	—৪-৫০
কবিকঙ্কণ চণ্ডী	— ।—	—	,,	—৪-৫০
ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী	৪র্থ হইতে ৮ম	— প্রতি খণ্ড		—২-৫০
[illegible]শ্যকাব্য পরিচয়		— (বোর্ড বাঁধাই)		—১০-০
বিদগ্ধ মাধব				—৩-০০
জ্যোতিষ রত্নাকর				—২-৫০
পরলোক				—২-০০
পরলোক ও প্রেততত্ত্ব				—১-৫০
পরলোকরহস্য				—১-০০
প্রতাপাদিত্য		(বোর্ড বাঁধাই)		—২-০০
মহারাজা নন্দকুমার			,,	—২-০০
ছত্রপতি শিবাজী			,,	—২-০০
সেক্সপীয়র গ্রন্থাবলী	— ১ম	—	,,	—৩-৫০
,, ,,	— ২য়	—	,,	—৩-৫০
অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী		—	,,	—৩-০০
ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী				—৩-০০
কালিদাস গ্রন্থাবলী	— ১ম	— (বোর্ড বাঁধাই)		—৪-৫০
,, ,,	— ২য়	—	,, যন্ত্রস্থ	—৫-০০
,, ,,	— ৩য়	—	,,	—৬-৫০
যৌনমনোদর্শন	— ২য়	—	,,	—৪-০০
,,	— ৩য়	—	,,	—৪-০০
,,	— ৪র্থ	—	,,	—৪-০০
,,	— ৫ম	—	,,	—৪-৫০
,,	— ৬ষ্ঠ	—	,,	—৪-০০
মরুর বুকে মেঘনা		—	,,	—৩-০০
কুট্টনীমতম্		—	,,	—৪-০০
ক্রিয়াকাণ্ড বারিধি	— ১ম	—		—৮-০০
চৈতন্যভাগবত				—৩-০০
ভক্তমাল গ্রন্থঃ				—৩-০০
যোগশাস্ত্র		— বোর্ড বাঁধাই		—৩-০০
আত্মানুসন্ধান				—২-৫০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী	— ১ম	—		—২-৫০
,, ,,	— ২য়	—		—২-৫০
,, ,,	— ৩য়	—		—২-৫০

দি বসুমতী প্রাইভেট্‌ লিঃ

১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সাপ্তাহিক

বসুমতী

চীন : গৃহযুদ্ধের পথে ?

বর্ষ : ৩২শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৫ই মাঘ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ • 19th Jan., 1967 * Vol. 71, No.

ফেমিলা স্নো
একালের রূপ-কথায় শেষ কথা

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	১৯৮৭
আজকের মানুষ	...	১৯৮৮
ভারতদর্শন	...	১৯৮৯
আন্তর্জাতিক	...	১৯৯৪
প্রত্যাশার মৃত্যু ও দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা	কৃত্তিবাস ওঝা	১৯৯৮
ভারতে ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতা (প্রবন্ধ)	নির্মল ভট্টাচার্য	২০০১
কোথায় আছো কোন্ কবরে সতী (কবিতা)	আবুলকাশেম রহিমউদ্দীন	২০০৫
সুবর্ণলতা (ধারাবাহিক উপন্যাস)	আশাপূর্ণা দেবী	২০০৬
গ্রন্থমেলা	—	২০০৮
'অন্তত একবার যদি' (কবিতা)	হরিজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়	২০০৯
গ্রামবাংলার কথা	পারুল ভট্টাচার্য	২০১০
একটি প্রত্যাশার মৃত্যু (কবিতা)	কুমারেশ নিয়োগী	২০১২

সাহিত্য-সম্রাট—বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের ঋষি

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

—উপন্যাস—

প্রথম খণ্ড :—রাজসিংহ, বিষবৃক্ষ, যুগলাঙ্গুরীয়, মৃণালিনী, রজনী। [সচিত্র] মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড :—দুর্গেশনন্দিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, ইন্দিরা, রাধারাণী, সীতারাম। মূল্য—তিন টাকা

তৃতীয় খণ্ড :—আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা, দেবী চৌধুরাণী। [সচিত্র] মূল্য—৩, টাকা।

—সাহিত্য—

প্রথম খণ্ড :—কৃষ্ণচরিত্র, লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ (১ম)। মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড :—(১ম ভাগ অনুশীলন), মুচিরাম গুড়, বিবিধ প্রবন্ধ (২য়), বিজ্ঞান রহস্য। মূল্য—তিন টাকা

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগ :—মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, পদ্মাবতী নাটক, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা? (বোর্ড বাঁধাই)—সাড়ে চার টাকা।

দ্বিতীয় ভাগ :—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্মিষ্ঠা নাটক তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য, মায়া কানন, হেক্‌টর বধ। (বোর্ড বাঁধাই) সাড়ে তিন টাকা

সাহিত্য-জগতের গৌরবপ্রভা—হাস্যরসাবতার—
নাট্যসাহিত্যের প্রবর্তক—রস-সাহিত্যের স্রষ্টা—
রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের

দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—জীবনী ও কবির সমালোচনা, নীলদর্পণ, জামাই বারিক, বিয়ে পাগলা বুড়ো, নবীন তপস্বিনী, কমলে কামিনী।

২য় ভাগে—সধবার একাদশী, যমালয়ে জীবন্ত মানুষ, পোড়ামহেশ্বর, কুঁড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ, লীলাবতী, সুরধুনী কাব্য, দ্বাদশ কবিতা, পদ্য সংগ্রহ।

প্রতি ভাগ দুই টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড: ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
[illegible]ের প্রার্থনা (কবিতা)	শিপ্রা পাল	২০১২
রূপদর্শন		২০১৩
অবরুদ্ধ	চন্দ্রগুপ্ত	২০১৫
অনুসরণ (গল্প)	রাম রায়	২০১৭
আন্দামানের একটি অধ্যায়	অনন্ত সিংহ	২০২১
অধ্যয়নং তপঃ (প্রবন্ধ)	ডঃ রমা চৌধুরী	২০২৭
বিশ্বসাহিত্যের আদিপর্ব	ডঃ নরেন ভট্টাচার্য	২০২৮
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	শিলালি	২০৩২
রঙ্গজগৎ		২০৩৯
পাঠকমন		২০৪৩
খেলাধুলো	শ্রীঅমিতাভ	২০৪৫

বৈষ্ণব-সাহিত্যের অমূল্য অবদান

ভক্তিজগতের কৌস্তুভরত্ন, ভগবদ্ভক্তগণের সাধনার ধন, ভক্তের তুলসী-মালা সদৃশ মহাপবিত্র ভক্তিশাস্ত্র সমন্বয়।

বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপ ও শিক্ষাষ্টক

শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীকৃষ্ণলাভের জন্য যে উৎকণ্ঠা, এই 'প্রলাপে' তাহা অভিব্যক্ত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত 'শিক্ষাষ্টক শ্লোকই' তাঁহার একমাত্র রচনা। শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামীর সুললিত পদ্যানুবাদে এই অমিয় মাধুরী লীলায়িত।

নরোত্তম বিলাস

বৈষ্ণবগণের পরম উপভোগ্য উপজীব্য ভক্তিচরিতামৃত।

দুর্লভসার

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা শ্রীল লোচনদাস বিরচিত, বৈষ্ণবগণের সংপূজিত।

আত্মতত্ত্ব

বৈষ্ণব দর্শনের সূক্ষ্মতম অনুসরণ।

মনঃশিক্ষা

শ্রীপ্রেমানন্দ দাস ঠাকুর বিরচিত। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত সাধন-ভজনের নিগূঢ় মর্মসমাহিত।

শ্রীচমৎকার চন্দ্রিকা

পরম পণ্ডিত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য পরম বৈষ্ণব শ্রীল কৃষ্ণদাসের সুললিত পদ্যানুবাদ।

পাষণ্ড-দলন

মূর্তিমান বৈরাগ্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বিরচিত প্রেমভক্তির লহর-লীলা।

ভক্তিতত্ত্বসার

হাটপত্তন, শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা, নাম-সংকীর্তন, চৌত্রিশ পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম, নরোত্তম দাসের প্রার্থনা, প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। সুলভে নামমাত্র মূল্যে বিতরিত।

মূল্য : ৩্ টাকা।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

মোহন মেলা

মূল্য এক টাকা

কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রধান কথা-শিল্পীর রস-সাহিত্য-সম্ভার ছাড়াও গল্পে ভরপুর।

—ইহাতে আছে—

গল্প—বোনির দিনে, বুদ্ধদেবের বুদ্ধি, কাঠুরের কপাল, হাঙর মানুষের চোখের জল, ভুলুর ভুল, মুর্গী চাচা, বুদ্ধদেবের গল্প, একটার বদলে দুটো, নতুন সিনেমার ছবি, দাদুর গল্প, ইঁদুরের কীর্তিকাহিনী, বাঁদরের মেটুলিচচ্ছড়ি।

ছড়া—হট্টমালার বরবাড়ী, হোহোহো বৃষ্টি ঝরে, পালোয়ান প্যালারাম, উলটো বাজির দেশে, আজব দেশ, বাঁকা শ্যামের ব্যায়রাম, হাবুবাবুর মনের কথা, আদ্দি কালের বদ্দি বুড়ি।

প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী সূর্য রায় কর্তৃক সুচিত্রিত

উপহার দিবার মত বই।

হৃষিকেশ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

মঞ্জুষা ২॥০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

৭১ বর্ষ : ৩২শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ৫ই মাঘ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

Price : 25 Paise
Thursday, 19th January, 1967

কলকাতার যানবাহন সঙ্কট

যা আছে তাই নিয়েই যদি সুব্যবস্থা করা সম্ভব না হয়, তাহলে সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করে চক্রবেড়ে রেলের পরিবর্তে লোক্যাল ট্রেন বা অন্য কোনো কিছুর আশার বাণী শোনালেও তাতে ভরসা পাবার কারণ নেই।

আপাতত যা চলছে—তা কতটা সার্থক হচ্ছে সেদিকে দৃষ্টিপাত দিতে অক্ষম বা সেই সমস্যাকে আরো ঘোরালো করার জন্যেই ভিন্ন দিকে দৃষ্টি ফেরানোর চেষ্টা হয়। আমরা বলছি না যে, কলকাতার যানবাহনের একটি স্থায়ী মীমাংসার প্রয়োজন নেই; তার দাবি ত' আমাদের বহুদিনের। বরং কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলা দেশের প্রতি তুচ্ছতাচ্ছিল্য ভাব ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক দাবি আদায়ের অক্ষমতার জন্যেই যানবাহন সমস্যার কোনো উন্নতি হয় নি। কিন্তু যানবাহন কর্তৃপক্ষের অস্থিরমতিত্ব ও ট্রামকর্মীদের ধর্মঘটের জন্যে—জনসাধারণের যে দুর্ভোগ সুরু হয়েছে—তার কিছুটা সুরাহা হবে কবে?

ট্রাম বা স্টেট বাস কর্মীদের ধর্মঘটের আগেই সরকার শহরে প্রাইভেট বাস চলাচলের অনুমতি দেন, যদিও এর ফলে জনসাধারণের বিশেষ কোনো সুবিধা হয় নি। এর কারণ, ট্রাম ধর্মঘট এখনো চলছে, বর্তমানে চালু স্টেট বাসের সঠিক সংখ্যা কত তাও জানবার উপায় নেই। এ ছাড়া প্রাইভেট বাসের চলাচলে সময়ের নিয়মানুবর্তিতা কিছুটা পরিলক্ষিত হলেও, এখনো পর্যন্ত গম্য পথের অদলবদল প্রায়ই হচ্ছে এবং বহু পথে প্রাইভেট বাস নিয়মিতভাবে চলে না। এ ছাড়া প্রাইভেট বাস চলার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের মতিগতি কি—তাও দুর্বোধ্য।

তবু সরকারের নিজের হাতে যা রয়েছে, তার চলাচলের কোনো স্থিরতা ও নিয়মানুবর্তিতা আছে বলে আমরা মনে করি না।

বর্তমানে চালু স্টেট বাসের সংখ্যার যে হিসেব স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ থেকে জানানো হয়—তা ঠিক নয়। আমাদের মতে, তা আরো অনেক কম। এবং স্টেট বাস ধর্মঘটের দুই মাসাধিক পূর্বে আমরা বিভিন্ন দায়িত্বশীল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত হিসেব তুলে সম্পাদকীয় মারফৎ দেখিয়েছিলাম যে, প্রত্যহ যে সংখ্যক স্টেট বাস চলে তার হিসেবের মধ্যে গুরুতর কারচুপি আছে। এখন যে এই কারচুপি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই কারচুপির ফলে যাত্রীসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা প্রত্যহই বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ সরকারী কাজে কেরানী-পিয়নের কয়েক মিনিট বিলম্ব কি—সরকারের যে সব উপরঅলা কর্মী গাড়ি হাঁকিয়ে আপিসে আসেন, তাঁরা সহ্য করতে পারেন তাছাড়া জনজীবনেও বহু গুরুতর কাজ আছে। ধর্মঘট চলার সময় সরকার যাত্রীদের দুঃখ-কষ্ট সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে যেভাবে বিজ্ঞাপন মারফৎ ওকালতি করেন, তার কিছুটা যদি স্বাভাবিক সময়ে প্রকাশ করতেন—তাহলে বোঝা যেত জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি সরকারের দরদ ও আন্তরিকতা কতটা সত্য। আমরা সরকারকে অনুরোধ করবো, তাঁরা স্টেট বাসের কর্তৃপক্ষকে নিয়মিতভাবে প্রতিটি রুটে পাঁচ মিনিট অন্তর বাস চলাচলে বাধ্য করুন।

কিন্তু আসল কাজ করা যেখানে প্রয়োজন সেখানে সরকারের হুকুম পৌঁছায় না। প্রসঙ্গত সরকারের হুকুমের বদলে আমরা লক্ষ্য করছি ট্রাম কর্তৃপক্ষের হুমকি। এমনই আস্পর্ধা যে, ট্রাম কোম্পানির জনৈক সাহেব ডিরেক্টার বিদেশ থেকে আলোচনা করবার জন্যে এসেও সরকারের মুখদর্শন করেন নি। ট্রাম কর্তৃপক্ষের গোঁসা হবার কারণ আছে। প্রথম কারণ, তাদের রাস্তা মেরামত করতে বাধ্য করা হচ্ছে; দ্বিতীয় কারণ কর্পোরেশন তাদের কাছে লাইসেন্স বাতিলের নোটিশ দিচ্ছে, তৃতীয় কারণ, ট্রামের মালিক ভাড়া বৃদ্ধি করতে চাইলে সরকার বাধা দিচ্ছে। চতুর্থ কারণ, ট্রামের সংখ্যা হ্রাস করার ফলে তাদের কথা শোনানো হচ্ছে। কারণ আরো অনেক আছে। কিন্তু এই মুনাফালোভী বিদেশী কোম্পানিটির ক্রমাগত আব্দার মেনে নেওয়ার ফলে, সেই আজ হুকুম করতে চায় এবং যাত্রীসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা বৃদ্ধিতেই তাদের আনন্দ। জানি না, সরকার শেষ পর্যন্ত তোয়াজ করে এই কোম্পানিটির মান ভাঙাবেন কি না। কিন্তু এদিকে সব গাড়ি অচল হলে রাজ্যটাও অচল হয়ে যেতে পারে—একথা সরকার একবারও কি ভেবেছেন?

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

'যে-ঘটনার আড়ালে স্ত্রীলোক আছে, সে-ঘটনা গোলমেলে হবেই'—বলে একটা চলতি প্রবাদ রয়েছে। প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস এ-প্রবাদের সমর্থনে সাক্ষ্য দিয়েছে, হাল-আমলেও এর নজীর মিলছে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে চীনে যা ঘটে যাচ্ছে, তার মূলেও নাকি একটি মহিলা, অবশ্য যেমন-তেমন মহিলা তিনি নন, স্বয়ং মাও সে-তুঙের সহধর্মিণী চিয়াঙ চিঙ।

চীনে যে আজ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বান ডেকেছে, তার উৎস নাকি মাদাম চিঙ, ইনিই নাকি লালরক্ষীদের পরিচালনা করছেন, নির্দেশ দিচ্ছেন কোথায় বিপ্লব ঘটাতে হবে। আর এই বৈপ্লবিক বিপ্লবের মানেই তো পার্জিং বা বিশুদ্ধিকরণ। দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা খ্যাতি নিয়ে ক্ষমতায় আসীন রয়েছেন, হঠাৎ শ্রীমতী চিঙ আবিষ্কার করলেন যে তাঁরা শোধনবাদী, বিপ্লববিরোধী, বুর্জোয়া মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়েছেন, কাজেই ওঁদের অপসারণ দরকার। পিকিঙের মেয়র গিয়েছেন, পিকিঙ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর-প্রেসিডেন্টকে যেতে হয়েছে, রাজনৈতিক নেতা, অধ্যাপক, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী বহু লোককে এক এক করে গদী ছাড়তে হয়েছে। গদী ছাড়ার মধ্যেই যদি ওই বিপ্লবকর্ম সীমাবদ্ধ থাকতো তাহলেও বুঝতাম নীতির পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু ওই অপরাধীদের যে হিড় হিড় করে চরম লাঞ্ছনার মধ্যে দিয়ে রাস্তায় টেনে আনা হচ্ছে ঘর থেকে! এ-কেমনতরো সংস্কৃতি, কেমনতরো বিপ্লব?

সংস্কৃতির এ-হকদারী চিয়াঙ চিঙ পেলেন কোত্থেকে, এ-নেতৃত্বের উচ্চ শিখরে তিনি উঠলেন কেমন করে? এর পেছনে ইতিহাস রয়েছে, রয়েছে মজাদার কাহিনী। শ্রীমতী চিয়াঙ সাংহাই-এ এককালে অভিনেত্রী ছিলেন, সুন্দরী ও পটীয়সী বলে যথেষ্ট খ্যাতিও অর্জন করেছিলেন। পঁচিশ বছর আগে সাংস্কৃতিক জীবনের সংগে জড়িত ছিলেন বলেই কি মাদাম চিঙ আজ সংস্কৃতির একমাত্র বোদ্ধা হিসেবে নিজেকে জাহির করতে চাইছেন?

না, শুধু তাই নয়, চিঙ এক মুহূর্তের জন্যে ভুলতে পারেন না সমগ্র চীনে তাঁর মর্যাদার কথা। সে-মর্যাদা তিনি নিজে না অর্জন করুন, তাঁর স্বামী তো করেছেন! সমগ্র চীনের কাছে যিনি ঈশ্বর-সমান সেই মাও সে-তুঙের স্ত্রী হয়ে তিনি কেমন করে অতিথি পরিচর্যায় জীবন ব্যর্থ করতে পারেন? আর রাজনৈতিক ক্ষমতাই যদি হাতে না এলো তো তাঁর দরকার কি ছিলো সিনেমা-জীবন ছাড়ার, অভিনেতা-স্বামীকে ছাড়ার? শুধু আদর্শের জন্যেই কি সুন্দরী চিঙ বিলাসের জীবন ছেড়ে কৃচ্ছ্র তার জীবনকে বেছে নিয়েছিলেন?

আদর্শ সেদিন অবশ্যই ছিলো, নইলে জাঁকজমকপূর্ণ রংগালয় ছেড়ে, সহজ স্বচ্ছন্দ জীবন পেছনে রেখে ইয়েনানের

মাদাম চিয়াঙ চিঙ

দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে পাড়ি তিনি জমাতেন না। স্বল্পভাষী, দৃঢ়চেতা চিঙ ঘৃণা করতেন সিনেমা-থিয়েটার জগতের নোঙরামি, বেলেল্লাপনা, স্থূলতা। বিপ্লবী মাও সে-তুঙের নাম শুনেছিলেন তিনি; তাঁর বৈপ্লবিক আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। নাম লেখালেন চিয়াঙ; অভিনেত্রী থেকে স্কুল-ছাত্রী হলেন, কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক স্কুলের, মাও সে-তুঙ যেখানে সপ্তাহে একদিন ক্লাস নিতেন।...একদিন তো একদিনই সই, তাই ঢের ছিলো চিয়াঙের পক্ষে, মাও-র পক্ষে। শ্রেষ্ঠ নেতার মন গলালেন সুন্দরী চিঙ, মাও তাঁকে তুলে নিলেন বিনা দ্বিধায়, থাক না কেন চিঙের অভিনেতা-স্বামী, থাক না কেন মাও-র ঘরে বৌ! চিঙের ভালোমানুষ স্বামীটিকে আমেরিকা পাঠিয়ে দেওয়া হলো, মাও-র স্ত্রীকে রাশিয়ায়, চিয়াঙ চিঙ হলেন মাও সে-তুঙে-র তৃতীয়পক্ষ।

কিন্তু মাও কি সেদিন জানতেন যে চিয়াঙ চিঙ লেডি ম্যাকবেথেরই নবতম সংস্করণ, তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা আকাশ-ছোঁয়া? দীর্ঘ পঁচিশ বছর মাদাম চিঙ অন্তঃপুরে ছিলেন, তাই ছিলো শর্ত, বাইরের সংগে সম্পর্ক ঘটতো তাঁর কেবল বিশিষ্ট অতিথি-অভ্যাগত এলে। কিন্তু হাঁফিয়ে উঠলেন তিনি, বহু মহিলাই তো রাজনৈতিক জগতে মাতব্বরি করছেন, মাদাম চিঙ কেন তবে ঘর-বন্দী থাকবেন? লিউ শাও-চি, চৌ এন-লাই, চেন-ঈ—ইত্যাদি ভদ্রলোকদের গিন্নীরা তো বেশ দিব্যি রাজনীতি করছেন, নেত্রী সেজে বসে আছেন, আর কেবল মাদাম চিঙের বেলাতেই যত দোষ? অসহ্য লাগলো চিঙের, তাঁর সম্মানে বাধলো এমন ঘর-কুনো হয়ে থাকতে।

লিউ শাও-চি, চৌ এন-লাই কিম্বা চেন ঈ-র স্ত্রী—এঁরা সকলেই দীর্ঘদিন থেকে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সংগে জড়িত আছেন, কাজেই মাদাম চিঙ পারলেন না এক লাফে ওঁদের ডিঙিয়ে যেতে—কমিউনিস্ট দুনিয়ায় বোধ হয় এটা সম্ভবও নয় হলেনই বা তিনি চেয়ারম্যানের অর্ধাঙ্গিনী। কিন্তু এই অক্ষমতাই মাদাম চিঙের মনে উৎপাদন করলো ঈর্ষা। তিনি পণ করলেন, শত্রুদের খতম করতে হবে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে সংস্থা গড়লেন মাদাম চিঙ ১৯৬০ সনে, অচিরে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি দ্বারা গঠিত সাংস্কৃতিক উপসমিতির অন্যতমা ভাইস-চেয়ারম্যান; আর এই পদের জোরেই তিনি সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটাতে সুরু করলেন।

কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষী চিঙ কেবল ওই পনেরো জনের একজন ভাইস-চেয়ারম্যান হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে রাজী হলেন না, তাঁর নজর গোটা চীনের নেতৃত্বের ওপর! তাঁর যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্যে তিনি অন্য কোন পথ খুঁজে পেলেন না, গালিবর্ষণ ছাড়া, অপসারণ ছাড়া, আর রক্তবীজের মতো অসংখ্য লালরক্ষী যখন তাঁর পাশে রয়েছে তখন আর ভাবনা কিসের? প্রেসিডেন্ট লিউ শাও-চি নিন্দিত হলেন, চৌ এন-লাই দেশের পয়লা নম্বরের শত্রু বলে চিহ্নিত হলেন, মাদাম চৌ বুর্জোয়া, বিলাসিনী বলে অভিহিতা হলেন, মাদাম লিউ-কেও চরিত্রহীনা কলংক দিয়ে তাঁদের রাজনৈতিক জীবনে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিলেন চিঙ। কিন্তু এখানেই কি শেষ? চীনের নারী-জগৎ তিনি দখল করেছেন, শত্রু নিপাত করেছেন, কিন্তু ওইটুকুতে তিনি শান্তি পাচ্ছেন কোথায়? শোনা যাচ্ছে, তিনিই আগামী দিনে চীনের সর্বময় কর্ত্রী হবেন! তা যদি হন, তবে তিনি লেডি ম্যাকবেথকেও টেক্কা দেবেন সন্দেহ নেই; কিন্তু সত্তর কোটি চীনা কি একজন প্রাক্তন অভিনেত্রীকে মাথায় করতে রাজী হবে?

ভারত দর্শন

আসাম পার্বত্য নেতৃবর্গের সঙ্গে আলোচনারত শ্রীচ্যবন

বলিষ্ঠ মানুষ লালবাহাদুর

গত বছর এগারই জানুয়ারী ভারতের লড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী তাসখন্দে শান্তি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর রেখে অকালে পরলোকগমন করেন। শাস্ত্রী বিয়োগে ভারত শুধু হতচকিতই হয়ে পড়ে নি, ভারতে যে ব্যক্তিত্বসমৃদ্ধ নেতৃত্ব বর্তমান ছিল, স্বল্পকালের ব্যবধানে নেহরুজী এবং শাস্ত্রীজীকে হারিয়ে সেই ধারায় অকস্মাৎ ছেদ পড়ল। পাক হাঙ্গামাকে শাস্ত্রী-বলিষ্ঠতার কাছে মাথা নোয়াতে হয়েছিল, কিন্তু শাস্ত্রী-নেহরুর অনুপস্থিতি স্বদেশে যে প্রচণ্ড হাঙ্গামার জোয়ার ডুবিয়ে ভাসিয়ে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করল, পাক্কা এক বছরের চেষ্টায়ও ক্ষমতাসীন দল তাকে আয়ত্তে আনতে সফল হন নি। শাস্ত্রীজীর আত্মত্যাগী দেশব্রতী নেতৃত্বের স্মৃতির সঙ্গে আজ এ কথাও মনে হচ্ছে যে, নেহরু-শাস্ত্রী ভারতের কর্ণধাররূপে কতদূর মূল্যবান ছিলেন। ধূমায়িত স্বার্থসন্ধিৎসু নানা মত নানা পথের ভারতবাসীকে তাঁদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বই কেবলমাত্র নিয়ন্ত্রিত করতে পেরেছিল। শাস্ত্রীজীর পরে ক্ষমতাসীন দলে ক্ষমতাদ্বন্দ্ব এবং আসন কাড়াকাড়ির এমন নির্লজ্জ এবং উৎকট প্রত্যক্ষ প্রয়াস শুরু হয়ে গেল যে, পার্টির মধ্যে দেখা দিল গুরুতর ভাঙন। যে শাস্ত্রীজী নেহরুসদৃশ বলিষ্ঠতার সঙ্গে বিদেশী কুরুপাকে সগর্বে অস্বীকার করতে পেরেছিলেন, সক্ষম নেতৃত্বহীন ভারত সে বলিষ্ঠতা দেখাতে পারে নি। শিথিল কেন্দ্রীয় শক্তি ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্যে সমস্যা ও বিপর্যয়কে অবাধ হতে সাহায্যই করেছে। কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের জন্য অনুরোধ উপরোধ কার্যকরী হয় নি। নেহরু-শাস্ত্রীহীন ভারতবর্ষের বিগত বছরটি যেন এখনও দপদপ করছে।

লালবাহাদুর শাস্ত্রী

শাস্ত্রীজীর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আমাদের এসব কথাই মনে পড়ছে। নেতৃবর্গের মনে পড়েছে, "জয় জওয়ান, জয় কিষাণ" ধুয়োর সুর। স্বাভাবিক। নেহরুজীর জন্মদিনে বা মৃত্যুবার্ষিকীতে বিস্মৃত সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজের স্মৃতিও নেতাদের উত্তেজিত করে। গান্ধীজীর জন্মদিবসে গুলীখেকো ভারত অহিংসার জয় গান গায়।

উপায় নেই। কারণ বর্তমান নেতৃত্ব পূর্বসুরীদের বাণী ভাঙিয়েই চালাচ্ছেন।

শাস্ত্রীজীর স্বল্পকাল নেতৃত্ব ভারতকে যে গর্ব ও জাতীয়তাবোধের শিখরচূড়ায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। শাস্ত্রী বিয়োগের একটি বছর সেখান থেকে বহু দূরে ভারতবাসীকে নিক্ষেপ করেছে।

শাস্ত্রীজীর স্মৃতিদিবসে এই আক্ষেপই আসল বাণী।

কর্মচারী আন্দোলন

কেরালায়ঃ

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কেরালায় কংগ্রেস নির্বাচনী সফর বক্তৃতায় বাম কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতি আনুগত্যের অভিযোগ উত্থাপন করে জনগণকে কংগ্রেসকে ক্ষমতাসীন করার জন্য আহ্বান জানান। শান্তি স্থায়িত্ব এবং ঐক্যের জন্যই

কংগ্রেসকে প্রয়োজন শ্রীমতী গান্ধীর কণ্ঠে এই শেলোগান শোনা যায়।

কেরালার সাধারণ মানুষ এই সময় রাজ্যব্যাপী নন-গেজেটেড অফিসরদের মাহিনাবৃদ্ধি আন্দোলন প্রত্যক্ষ করছেন। এই আন্দোলন শ্রীমতী গান্ধীর কেরালা পদার্পণের কালে দ্বিতীয় সপ্তাহে পড়ল। অফিসের দোরে দোরে এখন পিকেটিং চলছে, গেজেটেড অফিসরদের ঢুকতে না দেওয়ার জন্য। পুলিশও তাড়িয়ে ফিরছে পিকেটারদের। গ্রেপ্তারও চলেছে সমান তালে। সম্প্রতি এন জি ও য়ুনিয়নের রাজ্য সভাপতি শ্রী ই জে ফ্রান্সিস গ্রেপ্তার হয়েছেন। সাধারণ সম্পাদক শ্রীপদ্মনাভনকে খুঁজে বার করার জন্যও পুলিশের প্রয়াস অক্লান্ত। ওদিকে সরকারী প্রশাসনে সাহায্যের জন্য অফার আসছে রাজন্যবর্গের পার্টি স্বতন্ত্র দলের তরফ থেকে। কর্মচারী গরহাজিরির ফলে কেরালার রেশন ব্যবস্থাও টলমল করছে। রাজ্যব্যাপী একটা অনিশ্চিত এবং আশঙ্কার ছায়া।

রাজ্য সরকার উত্তরপ্রদেশী ঢঙ কপি করছেন। সরকারী আদেশ প্রচার করে বলা হয়েছে যে, ধর্মঘটে যাঁরা যোগ দেন নি তাঁদের আগাম ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে প্রলোভন তুলে ধরা হয়েছে পুলিশের সামনেও। জানা গেছে পুলিশের বরাতেও আগাম ইনক্রিমেন্ট জুটবে। আর যাঁদের—ধর্মঘটে জড়িত যে ব্যক্তিরা গ্রেপ্তার হয়েছেন, পি এস সি-র সঙ্গে যুক্ত করে—তাঁদের আগাপাস্তালা ছাঁটাই করা হবে।

এই বিভীষিকার আবহাওয়ায় প্রধানমন্ত্রী এসেছেন ভোট চাইতে। মানুষ চাইছে মাগ্গীর বাজারে সর্বনিম্ন আয়ের ভিত্তিতে খেয়ে-পরে বাঁচতে।

কংগ্রেস-বিরোধী দলের ছয়জন সভ্যসহ প্রাক্তন বাম কম্যুনিস্ট মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ রাজভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে কর্মচারীদের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন ভাতা এবং একটি কমিশন নিয়োগের দাবি করেন। প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন, রাজ্যপালের সঙ্গে এ বিষয়ে কথাবার্তা বলবেন।

ত্রিবান্দ্রাম থেকে ইউ এন আই রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, কেরালা সার্ভিস অরগানাইজেশন একটি মারাত্মক অভিযোগ আনয়ন করেছেন এই বলে যে, যে পাঁচশত ধর্মঘটী স্বেচ্ছাসেবককে বিগত ১২ই জানুয়ারী গ্রেপ্তার করা হয় তাঁদের গভীর রাত্রি পর্যন্ত কিছুই খেতে দেওয়া হয় নি।

কেরালার সংগ্রামী কর্মচারীদের দাবি যে অন্যায্য এ কথা সমাজে সমতা আনয়নের জন্য বক্তৃতা দেন যে ক্ষমতাসীন দল, সে দলের সরকার বলতে পারেন না। কেন না কর্মচারীরা ভারতের অধিবাসী হয়ে কেবলমাত্র ভারত সরকারের দেয় হারে ভাতা দাবি করেছেন।

আজ দেশব্যাপী যে কর্মচারী আন্দোলনের আওয়াজ, তার মূল দাবিও তাই। ভারত সরকারের কর্মচারীদের হারে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের শ্রমের মূল্য নির্ধারিত করা হোক। এই দাবি উত্থাপনের জন্য রাজ্য সরকারের নির্যাতন ও হুমকির শেষ নেই।

কিন্তু তার ফল কি হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ এবং কেরালার সংগ্রামী কর্মচারীদের পক্ষে সারা ভারতের রাজ্য কর্মচারীরা একযোগে সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন। রাজ্য স্তরে কেন্দ্রীয় কর্মীরাও সমর্থন জানাতে এগিয়ে এসেছেন। সরকারের সৃষ্ট এই অসমতার প্রতি কারও বিন্দুমাত্র সমর্থন নেই।

মহারাষ্ট্রে :

উত্তরপ্রদেশ এবং কেরালার সরকারী কর্মী আন্দোলনের সমর্থনে বোম্বে শহরে এক বিপুলাকার বিক্ষোভ মিছিলে যোগদান করেন রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় কর্মচারীরা। ব্যাঙ্ক বীমা এবং মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন।

সর্বভারতীয় রাজ্য সরকারী কর্মচারী কনফেডারেশনের সম্পাদক শ্রী ই এল্ল যোশেফ সভাপতির ভাষণে বলেন, যে আন্দোলনের দীর্ঘস্থায়িত্বের জন্য কেরালা এবং উত্তরপ্রদেশ সরকার দায়ী সেই আন্দোলনে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ করা উচিত।

চব্বিশ তারিখের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার হস্তক্ষেপ না করলে সারা ভারতের প্রশাসনিক ব্যবস্থা বানচাল করে বিভিন্ন রাজ্য সরকারী কর্মীরা ধর্মঘট করবেন বলে এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এ আই টি ইউ সির সাধারণ সম্পাদক শ্রী এস এ ডাঙ্গে বলেন, কর্মচারী আন্দোলনকে দমন করার সরকারী অভিপ্রায় একটা চূড়ান্ত বোকামি। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের দ্বারা সরকার অন্য পক্ষে বর্ধিত অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন।

পাঞ্জাবে :

মুখ্যমন্ত্রী মুসাফির রাজ্য সরকারী কর্মীদের আগামী তেইশে থেকে পঁচিশে জানুয়ারী ধর্মঘট না করার জন্য যে আবেদন জানিয়েছিলেন, পাঞ্জাব অধস্তন কর্মী ফেডারেশন তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। অন্যপক্ষে সরকারী স্কুলের শিক্ষকরাও ঐ কদিন পুরো ধর্মঘট করে তাঁদের সমর্থন জ্ঞাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে রাজ্যব্যাপী প্রায় ৫৫ হাজার শিক্ষক ফেডারেশনকে তাঁদের পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করবেন।

উত্তরপ্রদেশে :

উত্তরপ্রদেশ ধর্মঘটী সরকারী কর্মচারীদের ওপর পুলিশের বর্বর আক্রমণে একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ ঘটেছে যে, রাজ্যের কুটিল রাজনীতির আবর্তে কর্মীদের এখন নিমজ্জিত করা হচ্ছে। দলবাজ নেতাদের (কংগ্রেসী) ক্ষমতা দম্ভ প্রকাশের এও একটা উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গত সপ্তাহে পুলিশ নির্মমভাবে লাঠি পিটিয়ে পঞ্চাশজন ব্যক্তিকে (এঁদের মধ্যে একজন পনের বছরের নাবালকও ছিল) গুরুতরভাবে আহত করে। জনতা। জি পি ও-তে আশ্রয় গ্রহণ করলে পুলিশী তাণ্ডব জি পি ও-র মধ্যে অনুপ্রবেশ করতেও দ্বিধা করে নি। ফলত সেদিন পোস্ট অফিসেও কাজ-কর্ম বন্ধ করে দিতে হয়। স্বয়ং পি এম জি পুলিশী অতিরেকের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের এজলাসে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।

প্রকাশ, পুলিশ কতিপয় মহিলা কর্মীকে ঘেরাও করলে ফায়ার ব্রিগেড সুখে নারীদেহ হোস পাইপের সাহায্যে ভেজাতে শুরু করে। বর্বরতার প্রতিবাদে জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়।

পুলিশ যাঁদের পিটিয়ে ঘায়েল করে তাঁদের গ্রেপ্তারও করে নিয়ে যায়।

পুলিশের আচরণ সমর্থন করে শ্রমমন্ত্রী বারানসীদাস বলেছেন, কর্মী বিক্ষোভে নারী ও শিশুদের এগিয়ে দেওয়া কাপুরুষতা।

বারানসীদাস ক্ষমতালাভের পর যে কতদূর বীরপুরুষ বনে গেছেন, উত্তরপ্রদেশবাসী তার পরিচয়, সুতরাং, ভালোভাবেই পেলেন। বারানসীদাসের বক্তব্যই প্রমাণ করে যে, তিনি কর্মচারীদের সঙ্গে যুদ্ধে নেমেছেন। নারী ও শিশু মাঝপথে এসে পড়ায় ঠেঙানোর সুখে কিছু বাধা পেয়ে তাঁর অন্তরের বীরপুরুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। বারানসীদাসদের বীরত্বে কর্মচারিবৃন্দ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় বসতে ব্যর্থ হয়েছেন। উত্তরপ্রদেশের ক্ষমতাগর্বী গুপ্ত গ্রুপ কর্মচারীদের সম্নত মস্তকে সামনে এসে দাঁড়াতে দিতে চান না, চান তাঁদের শিরদাঁড়া বাঁকিয়ে প্রার্থিরূপে হাজির করতে। রাজা জমিদারের মেজাজ, সুতরাং, উত্তরপ্রদেশের প্রশাসন ব্যবস্থাকে পর্যুদস্ত করেছে।

শ্রী এস এম ব্যানার্জী, এম পি

বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব শ্রী এস কে কার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাঁকে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয় যে, কেন্দ্র এ ব্যাপারে কিছুই করবে না। প্রয়োজনবোধ করলে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার কেন্দ্রের মূল্যবান পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন।

মালব্যের মন্তব্য

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী কৃপালনীর কাছে লিখিত পত্রে শ্রী কে ডি মালব্য কয়েকটি সময়োপযোগী মন্তব্য করে আজকের সমাজতান্ত্রিকতার বুলিসর্বস্ব শ্রেণীবাদী শাসনতন্ত্রের তীব্র ও যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা করেছেন। তিনি সরকারী চাকরিতে 'সাব অর্ডিনেট', জুনিয়র, সিনিয়র প্রভৃতি শ্রেণীভেদ বিলোপের যৌক্তিকতার উল্লেখ করে বলেছেন, এই শ্রেণীপ্রথার অবলোপ সাধন করে দেশকে সমাজতান্ত্রিকতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন।

শ্রীমালব্য যথার্থ বিষয়টিকেই আলোচ্য করে সরকারের স্বেচ্ছাসৃষ্ট ভাওতার মুখোস খুলে ধরেছেন। জুনিয়র সিনিয়র গ্রেড খাড়া রেখে সরকার এক শ্রেণীর কর্মীকে বছরের পর বছর প্রাপ্য শ্রমমূল্য থেকে বঞ্চিত করে যাচ্ছেন। আসলে শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং কর্মগত জটিলতা ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে জুনিয়র এবং সিনিয়র স্টাফে কিছুমাত্র উনিশ-বিশ ফারাক থাকে না। একই কাজ পনের-কুড়ি বছর করেও এক শ্রেণীর কর্মী জুনিয়র গ্রেডেই পড়ে থাকেন। তখন বিশ-বাইশ বছর সরকারের দপ্তরে বিনীত বিশ্বাসী কর্মীর একনিষ্ঠ উদ্যম প্রদর্শন করে এঁরা কর্মজীবনের শেষে উপস্থিত হয়ে হতাশা ও ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েন। কেন না বাৎসরিক তিন-চার টাকা ইনক্রিমেন্টও তখন তাঁদের বিশ্বস্ত কর্মজীবনের পুরস্কারস্বরূপ বন্ধ হয়ে গেছে। স্কেলের শেষ সীমায় পৌঁছে হতভাগ্য কেরানী তখন দিন গুণছেন অবসর গ্রহণের সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তের জন্য। নির্দয় সরকার এঁদের কথা ভাববার অবসর পান না। বারানসীদাসের মত শ্রমমন্ত্রীরা জানেন কেমন করে শ্রমিক শোষণ করতে হবে। জানেন না কেমন করে শ্রমশক্তিকে বাড়ানো যেতে পারে, শ্রমিকের সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তুলে ধরে।

শ্রীমালব্য বলেছেন, সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে অর্থ সংস্থানের যে প্রশ্ন তার থেকে কেন্দ্রীয় সরকার সাবধানে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারেন না।

গায়ের জোরে সব কিছুই পারা যায় তা অবশ্য যেমন আজ কেন্দ্রীয় সরকার করে চলেছেন। কিন্তু এই জবরদস্তি বিস্ফোরণের মুহূর্তকেই কাছিয়ে আনে। নীতিগত প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকারের এ প্রশ্ন রাজ্যের কাঁধে চাপিয়ে পালাবার পথ নেই। দেশের মানুষকে সুস্থ এবং সমৃদ্ধতর জীবনযাত্রার স্বপ্ন দেখিয়ে দোহন করার নীতি বেশিদিন জনগণের সহনশীলতার ওপর টেক্কা মেরে চলতে পারে না। চলা সম্ভবও হচ্ছে না। তাই রাজ্যস্তরে কর্মীদের গলা টিপে ধরার নীতিই সরকারকে অন্তিম মুহূর্তে গ্রহণ করতে হয়েছে, যা সরকারের প্রতি সাধারণ মানুষের বিষ নজরকে প্রতিদিন উন্মোচিত করাচ্ছে। সরকারী নীতিই স্বখাত সলিল রচনা করেছে। এখন প্রশাসনিক অবস্থা ডুবু-ডুবু। এ নীতির সলিল সমাধিও তাই অবশ্যম্ভাবী।

বিহার :

মোরারজী দেশাইয়ের অভয় বাণী

রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ প্রবেশের বিরুদ্ধে উপাচার্য যে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন, শ্রীমোরারজী দেশাই সে সম্পর্কে সাফ জবাব দিয়েছেন সাংবাদিকদের কাছে। বলেছেন, "বিশ্ববিদ্যালয় কি একটা স্টেটের অভ্যন্তরে অপর একটি স্টেট!" পুলিশ শক্ত হাতে বজ্জাতি সব সময়ই দমন করবে।

কংগ্রেসীরা ভয়ে নির্বাচনী সভা করতে পারছেন না, গান্ধীটুপি ধারণেও তাঁরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন, এই সংবাদ শুনেই শ্রীদেশাই বললেন, কংগ্রেসীদের বুকে সাহস রাখার দরকার। এ সমস্তরই মুখোমুখি হতে হবে তাঁদের (যেমন পুলিশকেও)। এই সময় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী কে বি সহায় মন্তব্য করে ওঠেন, বটেই তো। শ্রীসহায় টুপী ত্যাগ করার আগে বরং কংগ্রেসই ত্যাগ করবেন।

যথার্থ বটে। একমাত্র দশাননই বলতে পেরেছিলেন, আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে! বস্তুত, দশানন ডরাবেন কেন। তিনি রক্ষ বক্ষ সমাবিষ্ট হয়ে দুর্গ প্রাকারের অন্তরালে থাকেন। তা ছাড়া তিনি নিজেও বীরপুরুষ। আর নেতৃবর্গই বা ভিখারী জনগণকে ভয় করবেন কেন, সাথে আছে পুলিশম্যান। আছে কণ্ট্রোলরুম সান্ত্রী প্রহরা। তদুপরি দশাননদের যেমন ফিল্ডে নামতে হ'ত, এঁদের তাও হয় না। অনেকক্ষেত্রে মিটিং করতে গিয়ে বিফল হলে পুলিশবেষ্টনীর মধ্য দিয়ে নির্বিঘ্নে রাজভবনে প্রত্যাবর্তন করা যায়। সুতরাং মোরারজী-সহায়রা এসব লম্বা কথা অবশ্যই বলবেন বটে। কিন্তু যে কংগ্রেসী সদস্য বিহার রাজ্যে তাঁদের সাম্প্রতিক দুরবস্থার সাচ্চা কাহিনী শোনাতে গেছলেন, নেতৃবর্গের দশাননী বক্তব্যে তিনি কি ম্রিয়মাণ বোধ করেছিলেন। এবং মোরারজী-সহায়ের মা ভৈঃ মন্ত্রে অতঃপর তিনি কি হৃত সাহস পুনর্লাভ করেছেন।

সন্দেহের অবকাশ আছে।

গদীতে যাঁরা বসে আছেন এবং আদেশ দিতেই যাঁরা অভ্যস্ত হয়েছেন, সাধারণ কর্মীদের অসুবিধা তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করবেন এমন আশা রাখা যায় না। আজ কংগ্রেসী নীতির ব্যর্থতায় যাঁরা সর্বাপেক্ষা ভুক্তভোগী তাঁরা হলেন কংগ্রেসের সাধারণ কর্মিগণ। জনতার কাছে জবাব দেবার দায়িত্ব এঁদেরই। নেতারা তো জবাব 'রিসার্ভড' করেও তরে যেতে পারেন। না হলে কড়া-কড়া কথা বলে ক্ষমতার আস্ফালন করতে পারেন। কিন্তু বেচারা কর্মীরা কী করবেন।

এঁদের তো কণ্ট্রোলরুম নেই। পুলিশ প্রহরা নেই, বাণী নিষ্কাশনের জন্য নির্ভয় মুখস্থ বুলিও জানা নেই। কংগ্রেসী নেতৃবর্গের কৃপায় এঁরাও নিঃসহায়।

কংগ্রেসী নেতৃত্ব আজ কতদূর চক্ষু-কর্ণ বিহীন হয়ে পড়েছে, বোঝা যাচ্ছে, বিহারের কংগ্রেসকর্মীরা তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন।

মোরারজী-সহায়ের সাম্প্রতিক অভয়-বাণী তা এবার শিরায় শিরায় টের পাইয়ে দিল।

শ্রীদেশাই বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদাকে নস্যাৎ করে উপাচার্যের মর্যাদাকেই খর্ব করেছেন। ইংরেজ আমলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুলিশকে প্রবেশ করতে হলে অধ্যক্ষের অনুমতি ভিক্ষা করতে হত। আমাদের নেতারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পবিত্রতাকেও ভূলুণ্ঠিত করতে চান, চান পুলিশী বুটের তলায় রাখতে। এঁদের মতিগতি ভবিষ্যৎ মেঘলা আকাশের ইশারা। একমাত্র ফ্যাসিস্টরাই সব কিছু সশস্ত্র বাহিনীর বুটের নিচে রাখার পক্ষপাতী। শ্রীদেশাই কংগ্রেসী। কংগ্রেস আবার সমাজতন্ত্র আনয়নের স্বপ্ন দেখে। সুতরাং মন্তব্যের সময় শ্রীদেশাইদের মতো বিচক্ষণ নেতারা তাঁদের দম্ভোক্তির সুদূর-প্রসারী ফলাফল সম্পর্কে একটু অবহিত থাকতে পারেন। গণতন্ত্রে ক্ষমতার অধীশ্বর চিরকাল যে তাঁরাই থাকবেন, বিরোধীদের বর্তমান দুর্বলতা ও বিসম্বাদ লক্ষ্য করে তাই স্বতঃসিদ্ধ এবং অনন্তকাল প্রবাহে একমাত্র ঘটনা বলে ধরে নেওয়াও যুক্তি-যুক্ত নয়।

কংগ্রেসী নেতাদের এক শ্রেণীর মধ্যে যে প্রচন্ড ক্ষমতাগর্বী বিক্রম প্রকাশ পাচ্ছে, দুঃখ হয়। কংগ্রেসের ভবিষ্যতের পক্ষে তা মোটেও স্বাস্থ্যকর নয়।

হুমকি যে সাধারণ মানুষকে কিছুই করে, শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের বিফল মনোরথ

হয়ে মুঙ্গের এবং সন্ন্যাসিরাই জনসভা থেকে প্রত্যাবর্তনে তাঁর কিছু টাটকা নিদর্শন পাওয়া গেছে। শ্রীদেশাই অবশ্য জামশেদপুরে এসে সভা করে বলেছেন যে, তাঁর গাড়ির ওপর ইষ্টক বর্ষণ এবং তাঁর সভা পন্ড করার মূলে অন্যান্য দলের হাত আছে। তিনি ধানবাদে তাঁর সভায় উচ্ছৃংখলতা প্রসঙ্গে একথা বলেন।

অন্যান্য দলের ওপর সভা ভাঙার দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে বাস্তবকে তিনি যেমনই ব্যাখ্যা করুন, কথাগুলি সঠিক বিশ্বাস-যোগ্য বলে বোধ হয় না। যদি বিভিন্ন স্থানে তাঁর জনসভা পন্ড করার মূলে অন্যান্য দল আছেন বলেই ধরে নিতে হয় তবে তো স্বীকার করতেই হবে জন-গণ আর শ্রীমোরারজীর বক্তব্য শুনতে রাজী নন। তাঁরা অন্যান্য দলের নির্দেশে ওঠ-বোস করছেন। কেন না জনরোষ ব্যতীত ক্ষমতাসীন দলের সভা ভাঙা চাট্টিখানি কথা নয়। কিন্তু এ সব সত্যকে এড়িয়ে গিয়ে রাজনীতি করার মোহে এখনও নেতারা অন্ধ।

কতবার আর বলা যাবে, অন্ধ হলেই বন্ধ থাকে না প্রলয়।

আসাম :

গামলার মধ্যে বাটি

নেহরু-পরিকল্পিত স্কটিশ স্বায়ত্ত-শাসনের প্রস্তাব এবং পটাশকর কমিশনের সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করে পার্বত্য নেতৃ সম্মেলন আসামে যে পার্বত্য রাজ্যের দাবি জানিয়ে আসছিলেন, সে সম্পর্কে নয়া-দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকার ও পার্বত্য নেতৃবর্গের মধ্যে সর্বশেষ আলোচনা হয়ে গেছে। আলোচনার তাৎক্ষণিক ফলাফল হিসেবে পর্বতীয়গণ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিয়েছেন এবং আগামী ১৮ই জানুয়ারী (অদ্য ১৪।১।৬৭) পার্বত্য নেতাদের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সংগে আলোচনার ফলশ্রুতি বিচার করে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন।

বর্তমান দিল্লী আলোচনায় কেন্দ্রীয় সরকার আসাম পুনর্গঠনের যে নয়া পরি-কল্পনা হাজির করেছেন তাকে ভারতীয় ফেডারেশনের মধ্যে আর একটি ফেডারেশন গঠনের প্রস্তাবরূপে দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ বড় একটি গামলার মধ্যে ছোট একটি বাটি বসিয়ে সমস্যার কাঁটা চাপা দেওয়া হয়েছে।

পুনর্গঠনের নয়া প্রকল্প এইভাবে করা হচ্ছে : আসামের সমতল এবং পার্বত্য এই দুই অঞ্চলকে সমান স্বতন্ত্র মর্যাদায় একটি ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ভারতীয় য়ুনিয়নই একটি ফেডারেল ধাঁচের সরকার। রাজ্যগুলি সম মর্যাদা বিশিষ্ট। এই কাঠামোর মধ্যে আসাম হবে অন্যতর একটি ক্ষুদ্র ফেডারেশন, যাতে নাগাল্যান্ড, নেফা, মণিপুর এবং ত্রিপুরাকেও যোগদানের আহ্বান জানিয়ে রাখা হয়েছে।

এই পরিবর্তন সম্ভব করতে হলে সাংবিধানিক সংশোধনও প্রয়োজনীয়। অবশ্য সেটা খুব বড় কথা নয়, এদেশে হাঁচতে কাশতেও অনায়াসেই পবিত্র সংবিধান ওলট-পালট করা যায়।

ভারতে যখন রাজ্য ভাঙাগড়ার ঢেউ চলেছে তখন এমন একটি নয়া প্রকল্প আবার কি জট বাঁধতে শুরু করবে তা এখনই কল্পনা করা অসম্ভব। তবে আমাদের মধ্যে যে তীব্র স্বাতন্ত্র্যবোধ আন্তরিক তাতে ফেডারেশনের মধ্যে ফেডারেশনের পরি-কল্পনা কতদূর টেকসই হবে তাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। পাঞ্জাব হরিয়ানা 'কমন' চন্ডীগড়েই মন কষিয়ে ফেলল, আর আসামে অসম ভাষা সংস্কৃতির ধারা কি কোন সাধারণ বিষয় নিয়ে নিরুত্তাপে রাজকর্ম চালাতে পারবে!

এই সীমান্ত রাজ্যে মতৈক্য এবং সদা শান্তির পরিবেশই কাম্য। কিন্তু প্রস্তাবিত ফেডারেশন সে কামনা কতদূর পূরণ করবে বর্তমানে সে প্রশ্নই চিন্তার মেঘ সৃষ্টি করছে।

পাঞ্জাব :

সাধারণ নির্বাচনের টোপ

সন্ত ফতে সিং বেঁচে গেলেন বটে, কিন্তু পাঞ্জাবী সংকট অদ্যাপি মুমূর্ষু। সম্প্রতি পাঞ্জাব কংগ্রেস কমিটির প্রধান গিয়ানি জাইল সিং ভোটধরা জালে নয়া টোপ ফেলেছেন। তিনি পাঞ্জাবের অধিকারে পুরো হিমাচল প্রদেশটাকেই দাবি করে বসেছেন একটি সাংবাদিক সম্মেলনে।

সন্তজীর দলকে পিঠ থাবড়ে তারা সিং-এর জাতীয় ঐক্য-বিনাশী শিখি-স্তানের প্রতি বিস্ফোরণ করে গিয়ানি জাইল সিং নির্বাচনী প্রচারের চাঁছা-ছোলা লাইন ধরেছেন। জাইল সিং জানেন, সমস্যায় যত বেশি পাক ধরানো যাবে, জট ছাড়াতে সময় হরণের সুযোগও আসবে ততখানি। সুতরাং পাকাও জট। ঘোলাও জল।

রাজস্বমন্ত্রী হরিন্দর সিং কংগ্রেসী কীর্তির কিছু আভাষ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, কংগ্রেসকে কৃষকদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে হলে ছোট জোত-জমির মালিকের ওপর থেকে রাজস্বের চাপ সরিয়ে নিতে হবে। বস্তুত কংগ্রেস এমত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অনেক বিধি-নিষেধও একে একে উঠে যাচ্ছে। গণতন্ত্রের ভোট লোটায় ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলের এ-তরফে একটা প্রচন্ড সুযোগ আছে। এ সময় দিল দরাজ করলে সাধারণের থেকে দরাজ ভোটও পাওয়া যায়। এজন্য নির্বাচনের প্রাকালে অনেক ক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টি করেও ঠিক চরম মুহূর্তে সংকট মোচন করলে ভোটারদের ওপর নেগেটিভ মোচড়ের প্রভাব খাটানো যায়। ইলেকশনে সরকারী মেশিনারী স্বপক্ষে এমন মদত দিয়েই থাকে। পাঞ্জাবের ক্ষুদ্র জমি-মালিকরা, সুতরাং, এখন খাজনা মাপের স্বপ্ন অবশ্যই দেখতে পারেন।

মুখ্যমন্ত্রী গুরুমুখ সিং মুসাফির খুব সাবধানে চলছেন। তিনি সন্ত ফতে সিংকে প্রধানমন্ত্রীর পাঞ্জাব-হরিয়ানা-হিমাচল রাজ্য ভাঙাগড়ার প্রশ্নে চূড়ান্ত মধ্যস্থ হিসেবে (লিখিতভাবে) মেনে নেও-য়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। নিজেকে প্রধানমন্ত্রীর আজ্ঞাবাহী যন্ত্রের আকারে খাড়া করেছেন।

হিমাচলের মুখ্যমন্ত্রী পারমার ছেড়ে দেওয়া ধরে রাখার শক্ত প্রশ্নে না গিয়ে বলেছেন, ত্রিরাজ্য সম্মেলনের বৈঠকে মত-দ্বৈধ উপস্থিত হলে বিতর্কিত প্রশ্ন উত্তর আঞ্চলিক কাউন্সিলের ওপর ছেড়ে দেওয়াই (বুদ্ধিমানের) উচিত কাজ হবে। হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভগৎ দয়াল সমস্ত ব্যাপারটা নির্বাচনের মুখে জোড়া-তালি দেওয়ার পক্ষপাতী নন। তিনি বলেছেন, ভালয় ভালয় নির্বাচনটা উৎরে যাক তার পর একটা ভাগ বাঁটোয়ারায় বসলেই হবে।

কিন্তু সন্তজী তা শুনবেন কেন। তিনি তো কংগ্রেসী নন। নির্বাচনের আগে উত্তাপ সৃষ্টিতেই তো তাঁর অভীষ্ট পূরণ সম্ভব।

পাঞ্জাব মুখ্যমন্ত্রী গুরুমুখ সিং-ই আশাবাদী। বলেছেন, জল যতই ঘোলা হোক, শেষ বেশ থাকলেই ভোট দিয়ে কংগ্রেসের হাতেই শাসনের লাগাম তুলে দেবে।

সব কথার হক কথাই বটে। ধীর গতিই বলদে টানা শকটের লক্ষণ। ঠিক মত জাবর কাটতে পারলেই গতি অব্যর্থ। আর গরুর গাড়িতে এ্যাক্সিডেন্ট হয় না বললেই চলে। যে যানে যেমনই যান, গো-শকট গন্তব্যে পৌঁছাবেই।

মাদ্রাজ :

আশানীরে

২৩৪টি আসন বিশিষ্ট মাদ্রাজ বিধান সভায় কংগ্রেস এবং ডি এম কে নেতৃত্বাধীন সপ্তবিরোধী দল উভয়েই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের স্বপ্ন দেখছেন।

কংগ্রেস ক্ষমতার মুঠো দরাজভাবে উপুড় করে ধরে ভোটের আশায় আছে।

ভূমিরাজস্ব মাপ করে এবং প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করার প্রতিশ্রুতি রেখে কংগ্রেস তরে যাবে বলে আশা করছে। তিরু চিরাপল্লি, তাঞ্জোর এবং দক্ষিণ আরকোটে কংগ্রেসের অধিকতর সম্ভাবনা গণনা করা হচ্ছে।

ওদিকে ডি এম কে-র আশা, বিরোধী দলে ভোট ভাঙাভাঙি না হলে জয় সুনিশ্চিত। ১৯৬২-র নির্বাচনে কুড়িটি আসনে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কংগ্রেস ও ডি এম কে উভয়ে নয়টি করে আসন লাভ করে।

ডি এম কে-র নির্বাচনী শ্লোগান হ'ল দাও দ্রাবিদাম ভারতভূমে। মাদ্রাজ, সালেম, উত্তর আরকোট রিংলেপাত এবং দক্ষিণ আরকোটের কয়েকটি জেলা ডি এম কে-র শক্তিশালী ঘাঁটি হিসেবে গণনা করা হচ্ছে। এই সব অঞ্চল থেকে গত নির্বাচনে ৮৬টি আসনের তেত্রিশটি ডি এম কে-র দখলে যায়। আগামী নির্বাচনে ৮৬ আসনের ৮৪টিতেই ডি এম কে তার প্রার্থী দিয়েছে। আর এ ছাড়াও ডি এম কে কংগ্রেসী ঘাঁটি অনেক কটিতেই জয়ের সম্ভাবনা আছে বলে মনে করে। গত নির্বাচনে এমন অঞ্চলের তেষট্টি আসনের মধ্যে ডি এম কে অধিকার করে চারটি।

সপ্তরথী বিরোধী ব্লকের মধ্যে আছেন ঃ ডি এম কে। (আসন ভাগ ১৬৮), স্বতন্ত্র, এফ বি (৩০), বাম কম্যুনিস্ট (২০) পি এস পি, মুসলিম লীগ, আমরা তামিল (প্রত্যেকে চারটি) লোকসভায়, ডি এম কে (২৫), স্বতন্ত্র (সাত) বাম কম্যুনিস্ট (পাঁচ) আর মুসলিম লীগ (এক)।

জনসংঘ, টি টি পি, রিপাবলিকান এবং ওয়াই পি ভিন্ন ফ্রন্ট গঠনের চেষ্টা চালাচ্ছেন।

কংগ্রেসপ্রধান শ্রীকামরাজ বিগত নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বীর ওপর এক লাখ ত্রিশ হাজার ভোটে জিতেছিলেন। এবার তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছেন শ্রী পি শ্রীনিবাসন, হিন্দী-বিরোধী আন্দোলনের নেতা। ডি এম কে প্রার্থী দিয়েছে খাদ্যমন্ত্রী সুব্রহ্মণিয়ম এবং অপর দুই উপ-মন্ত্রীর বিরুদ্ধে। ডি এম কে নেতা শ্রী এন আন্নাদুরাই দাঁড়াচ্ছেন দক্ষিণ মাদ্রাজে। এই আসনে '৫২ এবং '৫৭-র নির্বাচনে টি টি কে জয়লাভ করেছিলেন। ১৯৬২-র নির্বাচনে আসনটি ডি এম কে-র অধিকারভুক্ত হয়।

মধ্যপ্রদেশ ঃ

ছেঁড়া কাঁথা ফুটো চাল এবং লাখ টাকা

স্বতন্ত্র প্রার্থী মহারাণী গায়ত্রী দেবী যিনি থাকেন প্যালেসে, এবং ভারতবর্ষে প্রাসাদতন্ত্র জীইয়ে রাখার জন্য যে স্বতন্ত্র দল গঠিত, যিনি সেই দলেরই প্রার্থী, তাঁকে হঠাৎ প্রকাণ্ড গাড়ি ভিড়িয়ে বস্তীতে উপনীত হতে দেখা গেল। ছিন্ন কন্থা ভাঙা ঘরের বাসিন্দারা এই রোমহর্ষক দৃশ্য দেখতে খোলা আকাশের নিচে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। মহারাণীর সদিচ্ছা ছিল কিছু জ্ঞান দানের (এঁরা আর কীই-বা দিতে পারেন)। কিন্তু বাধ সাধলেন জনৈক কয়েক লাখপতি ব্যবসায়ী। এই কুবের মশায় ঠিক তক্কে তক্কে ছিলেন। ভিড় ঠেলে তেড়ে এলেন তিনি। নাম এম পি সিংহনিয়া। রাগে ফুঁসছেন ভদ্রলোক। রাজ্যসভায় স্বতন্ত্র দলের মনোনয়ন পাবেন আশা করে দলের তহবিলে ইনি এক লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন। লক্ষপতিদের দল টাকাটি বেমালুম হজম করে দিয়েছে। পাত্তা দেয় নি সিংহনিয়াকে। বহু আবেদন-নিবেদনেও কাজ হয় নি। মহারাণীর প্রাসাদেও সিংহনিয়া এই জোচ্চুরির সংবাদ পেশ করেছিলেন, সাড়া পাওয়া যায় নি।

সিংহনিয়া স্বতন্ত্র দলের হাঁড়ির খবর হাটের মাঝে ভেঙে দিলেন। মহারাণীর আর জ্ঞান দান ও ভোট ভিক্ষা করা হল না। দেবী গাড়ি ঘুরিয়ে চম্পট দিলেন।

বস্তীবাসীরা এ-পর্যন্ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাঁদর খেলানোই দেখেছেন, লাখপতিদের বাঁদরামোর সংগে পরিচয় ছিল না। আগামী সাধারণ নির্বাচন তারও সাক্ষ্য রাখল হতভাগ্যদের সামনে।

ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন অগণিত ভারতবাসী দেখে আসছে। স্বতন্ত্র পার্টিরা বেঁচে-বর্তে থাকলে সেই স্বপ্নের রাত্রি আরও কত যে গভীর হবে, মহারাণী-সিংহনিয়া কথোপকথনে নিশ্চয় তা জয়পুরীয়া বস্তীবাসিগণ উপলব্ধি করে থাকবেন। মহারাণীকেও ... বলিহারি। প্রাসাদ ছেড়ে তিনি কিনা বস্তীতে গেছেন পাবলিক কন্ট্যাক্ট করতে।.. এঁরা কি ভাবছেন, চেম্বার অব কমার্সগুলো এবার বস্তীতে গজাবে।

এ্যাডাল্ট ফ্যানচাইজ এতো ভেল্কিও কপালে লিখেছিল! আহা!!

মহারাণী গায়ত্রী দেবী

আন্তর্জাতিক

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের তাণ্ডবে বিধ্বস্ত সাংহাই শহরের সাম্প্রতিক চিত্র। কাস্টমস হাউসের ওপর থেকে লাল রক্ষীর দল মাও-এর জয়ধ্বনি করছে।

চীন ঃ

গত ক'দিন এখানে যে-কাণ্ড হয়ে গেলো তা সারা দুনিয়াকে হকচকিয়ে দিয়েছে। নানকিং, সাংহাই, ক্যান্টনের রাস্তায় রাস্তায় দু'দলে খণ্ডযুদ্ধ, রাজধানী পিকিংও বাদ যায় নি। এতদিন যেটা একতরফা লড়াই ছিলো এবারে যেন পাল্টা প্রত্যাঘাতেরও রূপ নিয়েছিলো। এতদিন যা স্লোগান, বিক্ষোভ প্রদর্শন বা মিছিল-শোভাযাত্রা, এমন কি পোস্টারের মধ্যে সীমিত ছিল এবার তা হাতাহাতি খুনোখুনিতে পরিণত হয়েছিলো। অবস্থা অবশ্য অপেক্ষাকৃত শান্ত এখন, তবে শান্তি ফিরে এসেছে বলা চলে না, কারণ বিরোধ যা নিয়ে তার মীমাংসা এখনো হয় নি।

হাঙ্গামার প্রথম পর্বে যে-সংবাদ পাওয়া যায় তাতে জানা গিয়েছিলো যে, নানকিং-এ দু-দলের খণ্ডযুদ্ধে অন্তত ৪০ জন লোক নিহত এবং ৫০০ জন আহত হয়েছে। হাঙ্গামা বেধেছিলো মাও সে-তুং-পন্থীদের সঙ্গে মাও-বিরোধীদের। গোলযোগ সৃষ্টির দায়ে দু'দিনে প্রায় ৬ হাজার লোককে বন্দী করা হয়েছে বলেও খবর প্রচারিত হয়েছিলো। পরে আরো খবর পাওয়া গিয়েছিলো যে নানকিং-এ কার্যত সন্ত্রাসের রাজত্ব সুরু হয়েছে যেখানে উভয়পক্ষের ৬০ হাজার বন্দীর ওপর অকথ্য নির্যাতন করা হয়েছে ঃ কারো নাক, কারো কান কেটে দেওয়া হয়েছে, কারো আঙুল কেটে দেওয়া হয়েছে বা নিষ্ঠুরভাবে থেঁৎলে দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি। হাঙ্গামা নানকিং থেকে সাংহাই ক্যান্টন এবং পিকিং পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে বলেও নানা সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে এবং পিকিং সরকারও তা শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যদিও তার ব্যাপকতা খাটো করে দেখানোর চেষ্টার কোনো ত্রুটি সরকারী পক্ষে করা হয় নি।

প্রচার-যুদ্ধ সুরু হয়েছিলো এখানে বেশ কিছুদিন আগে থেকেই, তবে তা যে এ-রকম উগ্র রূপ ধারণ করবে তা খুব বেশি লোক ভাবতে পারেন নি। লাল রক্ষীদের আক্রমণস্থল এতদিন কয়েকজন নেতার ওপরই সীমাবদ্ধ ছিলো, এবার কিন্তু আরো কয়েকজন আক্রান্ত হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী আগেই চীনের 'পয়লা শত্রু' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলেন, এবার দেখা গিয়েছে ৪০-৫০ ফুট উঁচু পোস্টার রাজপথের "শোভা বৃদ্ধি" করেছে যেখানে চৌ-কে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী লি সেইন-এন, পার্টি সেক্রেটারী তেং শিয়াও-পিং এবং প্রচারসচিব তাও চু এবং বাণিজ্যসংক্রান্ত একজন উপ-প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্রয় বা আশ্রয় দেবার অপরাধে প্রধানমন্ত্রী চৌ'কে অপরাধী সাব্যস্ত করেছে লাল রক্ষীরা। চৌ এন-লাই'এর আরো অপরাধ তিনি প্রেসিডেন্ট লিউ শাও-চি'র বিরুদ্ধে লাল রক্ষীদের লড়াইয়ের তীব্রতা কমাতে বলেছিলেন। এর দ্বারা প্রধানমন্ত্রী অর্থনীতি এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের গতিরোধ করেছেন বলে লাল রক্ষীদের অভিযোগ।

তাও চু

প্রেসিডেন্ট লিউ শাও-চি'র ওপর লাল রক্ষীরা তো অবশ্য আগে থেকেই ক্ষেপে গিয়েছে এবং তাঁকে প্রেসিডেন্ট পদটি ত্যাগ করার দাবিও জানিয়েছে। এবারে পররাষ্ট্রসচিব চেন-ঈ'র বিরুদ্ধেও বিরাট বিরাট

চীনের লাল ফৌজ—মাও-এর 'সাংস্কৃতিক বিপ্লবের' সঙ্গে এরা জড়িয়ে পড়েছে?

পোস্টার পড়েছে এবং হাজার হাজার লাল রক্ষী শ্লোগান তুলে নগর পরিক্রমা করেছে। লিউ এবং পার্টি সেক্রেটারী তেং'কে বিপ্লব-বিরোধী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। লিউ শাও-চি'কে তো ব্যক্তিগত আক্রমণ করতে ছাড়ে নি। কমিউনিস্ট দুনিয়া ও কমিউ-নিজম আদর্শের এই পন্ডিত থিয়োরীটি-শিয়ান বা তত্ত্ববিদকে আক্রমণ করা হয়েছে বুর্জোয়া বিলাসপরায়ণ ও দুশ্চরিত্র বলে। চার বছরের এক পুরোনো ছবি দাখিল করে লাল রক্ষীরা দেখিয়েছেন যে প্রেসি-ডেন্ট লিউ ইন্দোনেশিয়া সফরের সময় এক তরুণীর সঙ্গে বল-নাচ করেছেন।

আক্রমণ এসেছে উপপ্রধানমন্ত্রী লি ফু-চুন, লি সিয়েন-লিন এবং তৈলমন্ত্রী ইউ চিউ-লি'র ওপরেও। তবে, জন-নিরাপত্তামন্ত্রী শিয়ে ফু-চিন-এর ওপর আঘাতটা ছিলো আরো তীব্র, ইনি আবার একজন উপপ্রধানমন্ত্রীও বটেন। তাহলে কি হয়। লাল রক্ষীরা এতটা ক্ষেপেছে যে এঁ'র ওপর প্রকাশ্যে দাবি তুলেছিলো যে, শিয়ে

তেং শিয়াও-পিং

মাদাম চিয়াং চিং

চৌ এন-লাই

লো জুই-চিং

ফু-চিনকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হোক এবং তাঁর দপ্তরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হোক! অন্যতম উপ-প্রতিরক্ষামন্ত্রী লিয়াও হান-শেন'কেও 'বিপ্লব-বিরোধী' বলে নিন্দা কুড়োতে হয়েছে লাল রক্ষীদের হাতে।

তবে আগেই বলেছি, এবারকার লড়াই একতরফা হয় নি, লাল রক্ষীরা খালি পোস্টে গোল দিয়ে যেতে পারে নি, তাদের পাল্টা আঘাত খেতে হয়েছিলো। অর্থাৎ এবারকার হাঙ্গামায় যে কয়েকটি পাবলিক ইউটিলিটি বা জনস্বার্থমূলক প্রতিষ্ঠান যেমন জল সরবরাহ, যোগাযোগ ব্যবস্থা বা বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার মূল কারণই ছিলো মাও-পন্থীদের সঙ্গে শক্তির পরীক্ষা করার জন্যে মাও-বিরোধীরা এগিয়ে এসেছিলো। মাও-বিরোধীরা লিউ শাও-চি'র ভক্ত না চৌ এন-লাই-এর অনুরক্ত পরিষ্কার বোঝা না গেলেও তারা যে উগ্রচণ্ডার বিরোধী এটুকু বুঝতে কষ্ট হয় নি। এই মাও-বিরোধীরা শক্তিতে নেহাৎ ফেলনা নয় তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিলো দ্রুত গতিতে বেতারকেন্দ্র সহ কয়েকটি গুরুত্ব-পূর্ণ দপ্তর ও কারখানায় দখল করে ফেলার মধ্য দিয়ে।

লি ফু-চুন

শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনী নেমে না পড়লে এবং চারটি কেন্দ্রীয় সংস্থা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, পার্টির রাষ্ট্রীয় পর্ষদ, পার্টির সামরিক পর্ষদ এবং সাংস্কৃতিক পর্ষদের যৌথ আবেদন প্রচার করা না হলে এ-হাঙ্গামা কোথায় গিয়ে যে শেষ হতো কেউ বলতে পারে না। কারণ, হাঙ্গামা শুধু ছাত্রদের মধ্যে বা যুবকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো না, গ্রামাঞ্চল থেকে হাজার হাজার লোক এসেছিলো শহরে লড়াইয়ের সামিল হতে, শ্রমিকেরা যোগ দিয়েছিলো, এমন কি সেনা-বাহিনীর মধ্যে পর্যন্ত মাও-বিরোধী একটা অংশ রয়েছে প্রকাশ হয়ে পড়েছিলো। এবং মাও-বিরোধীরা নানকিং সহ কয়েকটি শহরও অবরোধ করে ফেলেছিলো অল্প সময়ের মধ্যে।

মাও সে-তুঙ-এর ভাগ্য ভালো এজন্যে যে সেনাবাহিনীর বড় অংশ তাঁর পিছনে ছিলো, আর রয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লিন পিয়াও। সেনাবাহিনী যদি হাঙ্গামার সঙ্গে জড়িয়ে পড়তো তবে তাকে রোধ করা দস্তুরমতো শক্ত হতো এমন কি দেশে একটা ওলট-পালট হয়ে যেতে পারতো। সেনাবাহিনীর অধিকাংশের সমর্থন লাভ করে এবং চারটি কেন্দ্রীয় সংস্থার সাহায্য নিয়ে দেশে ঘোষণা করা হলো কঠোর হস্তে মাও-বিরোধীদের দমন করার জন্যে। এর জন্যে সরকার আরো স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন নতুন একটা উচ্চ ক্ষমতা-সম্পন্ন কমিটি গঠন করে। সেনাবাহিনীকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে সাংস্কৃতিক বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকার নির্দেশ দিয়ে যে নতুন সামরিক সাংস্কৃতিক বিপ্লব কমিটি গঠন করা হয়েছে তার প্রধান নিযুক্ত হয়েছেন শু শিয়াং-চিয়েন এবং মাদাম মাও সে-তুং (চিয়াং চিং : 'আজকের মানুষ' দেখুন) মনোনীতা হয়েছেন এ-কমিটির প্রধানা উপদেষ্টা। কমিটির সাম-রিক চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও এটা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বারাই পরি-চালিত হবে। সাংস্কৃতিক উপসমিতির প্রধানের পদ দেওয়া হয়েছে চেন পো-তা'কে যার কাজ হবে সেনাবাহিনীতে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কর্মসূচীকে শক্তি-শালী করা।

এখানে বাস্তবিক কি চলছে তার সঠিক পূর্ণ বিবরণ পাওয়া শক্ত—গুজব রটছে প্রতি মিনিটে। এমনি এক গুজবে প্রকাশ পেয়েছে যে লাল রক্ষীরা নাকি এই মর্মে ক্যান্টনে পোস্টার ছড়িয়েছে যে, পিকিংয়ের প্রাক্তন মেয়র পেং চেন এবং

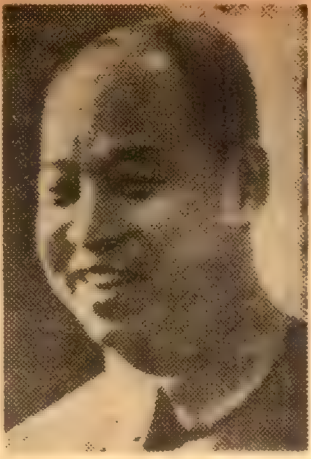

পেং চেন

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী-জেনারেল আত্মহত্যা করেছেন লাঞ্ছনার হাত থেকে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে এবং সেনাবাহিনীর প্রাক্তন চীফ অফ স্টাফ লো জুই-চিং আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। তাও-চু'কে লাল রক্ষীরা গ্রেপ্তার করেছে বলেও সংবাদ প্রচারিত হয়েছে।

সে যাই হোক, মাও-পন্থীরা এখন বিপদ সামলে উঠেছে, হাতের মুঠো শক্ত করছে তারা। আরো কঠোর ব্যবস্থা যে "শত্রুদের" বিরুদ্ধে নেওয়া হবে তা বলাই বাহুল্য, গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পদে রদ-বদলও করা হয়েছে। ঘন ঘন উচ্চ-পর্যায়ের কমিটিগুলির মিটিং বসছে, হয়তো শত্রুদের তালিকাও রচনা করা হচ্ছে নিত্য-নতুন। কিন্তু এ-ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই যে ভূমিকা নিয়েছেন তা সত্যি প্রশংসনীয়। চৌ নিজে লাল রক্ষীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন, কিন্তু তবুও দেশবাসীর ওপর তাঁর প্রভাব অসামান্য। চৌ গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে এসে যারা হাঙ্গামা সৃষ্টি করেছিলো

চেন পো-তা
(সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নেতা)

তাদের ফিরে যেতে আবেদন করেছেন এবং কারখানাগুলিতেও শান্তি ফিরিয়ে আনার কথা বলেছেন। সরকারের পক্ষ থেকে এ-কথাও বলা হয়েছে যে যারা নাশকতামূলক কার্যে লিপ্ত হবে তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। কিন্তু চৌ একথাও বলেছেন যে লাল রক্ষীরা বা মাও-লিনপন্থীরা "চোখ বুজে" যে অপরাধী তালিকা রচনা করেছেন সেটা বাতিল করতে হবে; অপরাধ সকলেরই সমান নয়, যাদের অপরাধ গুরুতর নয় সামান্যমাত্র, তাদের রেহাই দিতে হবে ইত্যাদি।

আপাতত শান্ত হলেও চীনের খণ্ড-যুদ্ধ আসলে যে গৃহযুদ্ধের রূপ নিয়েছিলো তা আর অস্বীকার করার উপায় নেই এবং এ-যুদ্ধের কোন চূড়ান্ত মীমাংসাও যে এখনো হয় নি সেকথাও মনে রাখা দরকার। হাঙ্গামার মূল কারণ ক্ষমতার লড়াই, মাও সে-তুং বার্ধক্যগ্রস্ত, After Mao—who বা মাও-এর পরে কে—এ-প্রশ্ন স্বভাবতই এখানে দেখা দিয়েছে জরুরীভাবে। এতদিন চৌ এন-লাইকে মনে করা হতো মাও-এর স্থলাভিষিক্ত হবেন বলে, কিন্তু লাল রক্ষীরা (অর্থাৎ মাও সে-তুং নিজেই) তাঁর ওপর চটেছেন, মতের মিল হচ্ছে না দুই পুরোনো বন্ধুতে। প্রেসিডেন্ট লিউ শাও-চি'র অবস্থা তো আরো করুণ, কোন প্রশ্নই ওঠে না তাঁর গদীর দিকে হাত বাড়ানোর। লঙ মার্চ খ্যাত প্রধান নেতা চুতে এতদিন আঁচের বাইরে ছিলেন, কিন্তু এবার লাল রক্ষীদের শ্যেন দৃষ্টি তাঁর ওপরেও গিয়ে পড়েছিলো। হাল আমলে প্রতিরক্ষামন্ত্রী লিন পিয়াওকেই মাও-এর উত্তরাধিকারী বলে মনে করা হচ্ছে, কিন্তু লাল রক্ষী বাহিনী মাঝে-মধ্যে তাঁকেও আক্রমণ করতে ছাড়ছে না। এদিকে মাও সে-তুংয়ের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী চিয়াং চিং অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী মহিলা, স্বামীর আসনটি যাতে তাঁর জুটে যায় তার জন্যে চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখছেন না তিনি। কারণ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে লাল রক্ষীদের প্রেরণা যোগাচ্ছেন তিনিই।

কিন্তু লিন পিয়াও-ই হোন আর মাদাম চিং-ই হোন—দেশের সর্বময় কর্তৃত্ব দখল করা যে বড় সহজ হবে না তা সকলেই উপলব্ধি করতে পারছেন। অর্থাৎ চৌ এন-লাই, লিউ শাও-চি বিনা যুদ্ধে ভালো মানুষটির মতো তাঁদের হক ছাড়তে রাজী হবেন বলে মনে করার কারণ নেই। চীনের সাম্প্রতিক হাঙ্গামা তারই মহড়া-মাত্র।

এদিকে বিশ্বের অন্যান্য রাজধানীর কথা যেমন-তেমন, মস্কো কিন্তু চীনের রকম-সকম দেখে সতর্ক না হয়ে পারছে না। চীনের নেতারা বা তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় লাল রক্ষীরা আজ যাঁদের সমালোচনা-নিন্দা করছে তারা একটা সাধারণ বিশেষণ দিয়েই সকলকে ভূষিত করছে যে এঁরা শোধনবাদী অর্থাৎ মস্কো-পন্থী। এতে মস্কোর রুষ্ট না হবার কারণ নেই; চীন উগ্র নীতি ধরে চলেছে, সোভিয়েট রাশিয়া নরম নীতির বাহক। চীন সরাসরি রাশিয়াকে যে-ভাষায় আক্রমণ করছে, যেভাবে কথায় কথায় রুশ সাংবাদিকদের চীন থেকে বহিষ্কার করছে তাতে মস্কো শঙ্কিত না হয়ে পারে নি। সোভিয়েট রাশিয়া সন্দেহ করে যে, চীন একটা দুষ্ট মতলব নিয়ে এগিয়ে চলেছে, রাশিয়ার সঙ্গে সীমান্তে সংঘর্ষ বাধাবার জন্যে সে বারবার প্ররোচনা দিচ্ছে। সে-জন্য আজ ব্রেজনেভ কোসিগিন প্রমুখ সোভিয়েট নেতারা শহরে-শহরে গ্রামে-গ্রামে গিয়ে চীনের কার্যকলাপ সম্পর্কে রুশ জনগণকে সতর্ক করে দিচ্ছেন। মাও সে-তুংয়ের বিরুদ্ধে তাঁরা পাল্টা প্রচার-যুদ্ধ সুরু করে দিয়েছেন, মাও যে একজন ভণ্ড বিপ্লবী ছাড়া আর কিছুই নন—একথা সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ বলতে ছাড়ছেন না। মাও-এর বিরুদ্ধে এ-অভিযোগও তাঁরা আনছেন যে মাও-এর মৌলিকত্ব কিছুই নেই, তাঁর গেরিলা যুদ্ধকৌশল বিষয়ক রচনাগুলিও সোভিয়েট রচনা থেকে চুরি করা! অর্থাৎ দুই কমিউনিস্ট রাষ্ট্র এখন চরম শত্রুতে পরিণত হয়েছে, এরা যে-কোন মুহূর্তে পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলেও বিস্ময়ের কিছু থাকবে না!

প্রত্যাশার মৃত্যু ও দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা

কৃত্তিবাস ওঝা

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির বর্তমান রাজনীতির রূপরেখা আর এই দলের প্রধান নেতা শ্রীনরেন দাসের রাজনীতিক জীবনের রূপরেখা প্রায় একইরকম অষ্টাবক্র মুনির অবয়ব গ্রহণ করেছে। শ্রীনরেন দাস পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান প্রবীণ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে অন্যতম। আর এই দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে শ্রীদাস আস্বাদ গ্রহণ করেছেন অনেক দলের আর অনেক মতের। এবং তাই সম্ভবত নিজের বহু আস্বাদ গ্রহণের লাইনেই দলকে নানা রঙীন পাত্র থেকে নানা রঙের মতবাদের পানীয় পান করিয়ে চলেছেন। শ্রীনরেন দাস জীবনে যুগান্তর পার্টি, অনুশীলন পার্টি, কংগ্রেস পার্টি, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি করে ১৯৪১ সালে আর. এস. পি. দলের প্রতিষ্ঠায় নিজেকে যুক্ত করেন। কিন্তু মাত্র সাত বছরে তিনি আবার ভিন্ন স্বাদ গ্রহণের জন্য সোস্যালিস্ট পার্টি, প্রজা-সোস্যালিস্ট পার্টি, সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি এবং সর্বশেষে বর্তমান সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। সন্ত্রাসবাদ, মার্ক্সবাদ, সমাজবাদ, গান্ধীবাদ, সর্বোদয় সমাজ—সব বাদ হজম করে এখন লোহিয়াবাদ নিয়ে রাজনীতি করছেন। এই যে দল আর মতের দ্রুত পরিবর্তন এর পিছনে শ্রীদাসের অদম্য দেশপ্রেমের সঙ্গে অদম্য নেতৃত্বপ্রেম একই লাইনে কাজ করেছে। আর. এস. পি. দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য কেন দলত্যাগ করেছিলেন—আবার কেন সর্বোদয়ে বিনোবাজীর আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন—আবার কেন লোহিয়াজীর আদর্শ গ্রহণ করলেন—এর সঠিক জবাব হয়তো একমাত্র শ্রীদাস নিজে দিতে পারেন। কিন্তু বাহ্যত আমাদের মত অনভিজ্ঞ লোকেরা শুধু একটি কথাই বুঝতে পারে—সে কথাটি হল একদা শ্রীদাসকে তাঁর জেল-জীবনের সঙ্গীরা 'ডিস্যাপয়েণ্টেড লীডার' আখ্যা দিয়েছিলেন যে কারণে সেই কারণেই শ্রীদাসকে বারে বারে এ ঘাট থেকে ও ঘাটে নৌকা ভেড়াতে হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সার্বিক বামপন্থী ঐক্যবদ্ধ ফ্রণ্ট গঠনে শ্রীদাস ছিলেন প্রথম শ্রেণীর নেতা। কিন্তু এই নেতৃত্ব এত বিরাট ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও জগাখিচুড়ি আদর্শে প্রণোদিত ছিল যে শ্রীদাসের নেতৃত্ব সম্ভবত দুইটি ফ্রণ্ট গঠনে প্রধান সহায়ক হয়ে ওঠে। অবশ্য সমগ্র ঘটনার নেপথ্যে একটি কাহিনী আছে যে কাহিনী শ্রীদাসের বাহ্য ভূমিকা আর অন্তর্লোকের ভূমিকা দুই বিপরীতমুখী চুম্বকের টানে অগ্রসর হয়েছে! এখানে একটি কথা সর্বাগ্রে বলে রাখা প্রয়োজন—পশ্চিমবঙ্গে বাম কম্যুনিস্ট পার্টি যে ফ্রণ্ট গঠন করেছেন সেই ফ্রণ্ট গঠনের ভিত্তি রচনা কখনই খুব সহজে হতে পারত না, যদি না পশ্চিমবঙ্গের বাম কম্যুনিস্ট নেতৃবৃন্দ জানতেন বাইরে যে ঘটনাই ঘটুক—যত টাল-মাটাল হোক—যত লম্ফ-ঝম্ফ দেখা যাক এস. এস. পি. দলের নরেন দাস তাদের সঙ্গে থাকবেনই। কিন্তু কেন? যদি এস. এস. পি. দলের নীতি বিচার করা যায় তবে পশ্চিমবঙ্গে যদি কোন দলের বামপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে কোন মুচলেকায় বিরোধী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল তবে সেই দল এস. এস. পি.। বাম কম্যুনিস্ট পার্টি কিছু কিছু দল সম্পর্কে সর্বদা খড়্গহস্ত—তার কারণ উক্ত দলগুলি চীনা আক্রমণের সময় বামপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টির নীতি ও নেতৃত্বের বিরোধিতা করেছিল। কম্যুনিস্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক, বাংলা কংগ্রেস এই দলগুলি বাম কম্যুনিস্ট পার্টির কাছে যে যে কারণে তীব্র সমালোচনার ও নানা অশ্রাব্য কটূক্তির লক্ষ্য হয়েছে তার কারণ ১৯৬২ থেকে '৬৫ সালের চীন সম্পর্কিত প্রশ্নে উক্ত দলগুলির নীতি। চীনা আক্রমণের পর শ্রীনরেন দাসের দল এস. এস. পি. সম্ভবত উক্ত দলগুলি অপেক্ষা সামান্যতম কম সমালোচনামুখর ছিল না কম্যুনিস্ট চীন ও ভারতের বামপন্থী কম্যুনিস্টদের সম্পর্কে। তাই যে দোষে আজ দক্ষিণ কম্যুনিস্ট, ফরওয়ার্ড ব্লক বাম কম্যুনিস্টদের কাছে অচ্ছুৎ তার-চেয়ে শতগুণ অচ্ছুৎ হবার সম্ভাবনা ছিল সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টির। কিন্তু সেটা হয় নি। এবং পশ্চিমবঙ্গে শ্রীনরেন দাসই বাম কম্যুনিস্ট দলের অন্যতম প্রধান বন্ধু, সুহৃদ এবং ক্ষেত্রবিশেষে ত্রাতা। নিশ্চয় করে বলা যেতে পারে কম্যুনিস্ট চীন সম্পর্কে বিরূপ মনোভাবের কারণে বাম কম্যুনিস্ট দলের কোমল হৃদয়ে যদি আঘাত লাগে ডান কম্যুনিস্ট ও ফরওয়ার্ড ব্লকের ভূমিকায়, তবে শক্তিশেল বেঁধা উচিত এস. এস. পি.-র ভূমিকায়। কিন্তু প্রেম যদি গভীর হয় তাহলে কাঁটার আঘাতও বুঝি ফুলের পরশে পরিণত হয়। যে সমস্ত রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে কোন দলের ইস্তাহারে সম্ভবত সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টির মত কম্যুনিস্ট চীন সম্পর্কে কঠোর ও নির্মম ভাষা প্রয়োগ করা হয় নি। এস. এস. পি.-র নির্বাচনী ইস্তাহার 'আদর্শ ও নীতি' নামক পুস্তিকার একাদশ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে—'সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি চীনকে রাক্ষুসে রাষ্ট্র বলিয়া মনে করে।" হায়—হরেকৃষ্ণ কোঙার!—আপনি চীন সম্পর্কে সর্বত্র বিভিন্ন জনসভায় যে সকল মহৎ উক্তি উচ্চারণ করছেন তার পাশে আপনারই ফ্রণ্টের অন্যতম শরিক এস. এস. পি.-র চীন সম্পর্কে উক্তিটি অনুধাবন করুন। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। চীন শুধু রাক্ষুসে রাষ্ট্র নয়—যে চীন-ভারত সীমান্ত সম্পর্কে এবং চীন সম্পর্কে ভারত সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে,

বাম কম্যুনিস্ট দলের সমালোচনার অন্ত নেই—এবং যখন বামপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি শর্তহীনভাবে চীনের সঙ্গে বৈঠক করে সীমান্ত বিরোধ মেটাবার জন্য আকাশ-বাতাস মুখর করেন তখন সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি তার আদর্শ ও নীতিতে ঘোষণা করেছে "ভারতের সীমানা মানস-সরোবর অবধি অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে।" আর চীনের সঙ্গে বৈঠক নয়—আলাপ-আলোচনা নয়, মতবিনিময় নয়। ভারত সরকার কেন চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করেছে তার জন্যে এস. এস. পি. ক্ষুব্ধ। এস. এস. পি. তার নির্বাচনী ইস্তাহারে সক্ষোভে উল্লেখ করেছে "জাতীয় সীমানার অখণ্ডতা রক্ষা করতে অক্ষম কংগ্রেস সরকার আক্রমণকারী দেশের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে নি।" —শুধু কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করাই নয়—এস. এস. পি. চিয়াং কাইশেককেও সমমর্যাদায় স্বীকৃতি দিতে আগ্রহী। তাই এস. এস. পি.-এর মতে "পূর্ব জার্মানী ও ফর্মোজাকে ভারত স্বীকৃতিদানের ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত" বলে উল্লেখ করা হয়েছে শুধু চীনের প্রশ্নেই নয়—নির্বাচনী নীতির প্রশ্নে এস. এস. পি. যে নীতি গ্রহণ করেছে, পশ্চিমবঙ্গের এস. এস. পি. সেই নীতি থেকে কিন্তু অনেক দূরে সরে গেছে। এস. এস. পি.-র নির্বাচনী কৌশল সম্পর্কে নির্বাচনী ইস্তাহারের সপ্তম পৃষ্ঠায় লেখা আছে "কংগ্রেসের পরাজয়ে এস. এস. পি. কারও সঙ্গে কোয়ালিশন গভর্নমেণ্ট করবে না।" কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কোয়ালিশন গভর্নমেণ্ট তো বটেই—গভর্নমেণ্ট গঠনের পরে মন্ত্রী হবার তোড়জোড়েতেও শ্রীনরেন দাস তাঁর পার্টিকে প্রধান শরিক করেছেন। সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্টের নির্বাচনী কর্মসূচীতে তৃতীয় স্বাক্ষরকারী ছলেন শ্রীনরেন দাস। কোয়ালিশনে গভর্নমেণ্ট গঠনের প্রশ্নেই শুধু নয়—এস. এস. পি. দলের কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টারী বোর্ডের প্রায় প্রতিটি নির্দেশ লঙ্ঘিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে এস. এস. পি. দলের কর্মসূচীতে। কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টারী বোর্ডের নির্দেশ ছিল "নির্বাচনের আগে কোন প্রোগ্রাম যেন করা না হয় (নির্বাচনী)।" পশ্চিমবঙ্গের সেই নির্বাচনী প্রোগ্রাম করা হয়েছে। এস. এস. পি.-এর নির্দেশ ছিল "কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একজন প্রার্থী দেখতে চাই এবং গত নির্বাচনে যে দল দ্বিতীয় স্থান দখল করেছিল আসনের ব্যাপারে অগ্রাধিকার সেই দলের।" এস. এস. পি. পশ্চিমবঙ্গ কমিটির এই নির্দেশগুলি সম্পূর্ণভাবে লঙ্ঘন করেছে। ফ্রন্টে যোগদানের প্রশ্নে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা পর্যন্ত করে নি। তাই পাটনায় অনুষ্ঠিত পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সভায় শ্রীনরেন দাসকে জবাবদিহি করতে হয়েছিল। শুধু তাই নয় পাটনার সভায় পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে গৃহীত সাত দফা প্রস্তাবে ছিল 'দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি সহ সকল দলের সঙ্গে আপোষ করতে হবে', কৃষ্ণনগর-পশ্চিম কেন্দ্রে শ্রীসত্য দাশগুপ্ত দলের প্রার্থী থাকছে। কিন্তু অন্য দলের সঙ্গে আপোষ করার প্রশ্ন দূরে থাক, কংগ্রেসের পরাজয় দূরে থাক, গত নির্বাচনে দ্বিতীয় স্থান অধিকারীর অগ্রাধিকারের প্রশ্ন দূরে থাক—শ্রীনরেন দাস নিজের অষ্টবক্র নীতিতে দলকে টেনে নিয়ে গেছেন। পাটনায় যেখানে শ্রীসত্য দাসগুপ্তকে দলের প্রার্থী বলে ঘোষণা করা হ'ল, দলের সর্বভারতীয় প্রধান নেতা শ্রীমধু লিমায়ে যখন কৃষ্ণনগর ধুবুলিয়া পৌঁছে শ্রীসত্য দাশগুপ্তের নির্বাচনী অভিযানের উদ্বোধন করলেন, তখন রাজ্য কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত ২৪শে তারিখের তালিকায় শ্রীসত্য দাশগুপ্তকে প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করল না, দ্বিতীয় তালিকার সময় এবং সর্বশেষে অতি বিনীতভাবে ঘোষণা করলো "কৃষ্ণনগরে আমরাও লড়ব আর বাম কম্যুনিস্টরাও লড়বে। গত ২০শে ডিসেম্বর শ্রীমধু লিমায়ে যখন কৃষ্ণনগরের পথে কলকাতা আসেন তখন টেলিফোনে শ্রীনরেন দাস চিবিয়ে চিবিয়ে শ্রীলিমায়েকে একবার শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের সঙ্গে দেখা করে কৃষ্ণনগর আসন সম্পর্কে একটা মীমাংসা করতে বলেছিলেন। উদ্দেশ্য আর কিছু নয় যদি শ্রীলিমায়ে কোনভাবে ঐ আসনটা বাম কম্যুনিস্টদের দিয়ে যান। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য কোনক্রমেই সিদ্ধ হয় না কারণ শ্রীলিমায়ে স্পষ্টভাষায় বলেছিলেন, তাঁর কারো সঙ্গে দেখা করার বা আলোচনা করার কোন প্রয়োজন নেই।

'ও তোর আপনজনে ছাড়বে তোরে তা বলে ভাবনা করা চলবে না, তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে হয়ত রে ফল ফলবে না তা বলে ভাবনা করা চলবে না'। শ্রীনরেন দাস ১৯৪২ সালের পর জেলে থাকবার সময় শ্রীঅরবিন্দ পোদ্দারের সঙ্গে এক সাথে প্রচুর রবীন্দ্র সাহিত্য সম্পর্কে পড়া-শোনা করেছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথের এই গানটি বুঝি তাঁর অনুপ্রেরণার বা আদর্শের দিগদর্শন হয়ে রয়েছে। শ্রীদাসের দল পরিচালনা নীতিতে শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র, শ্রীদীনেশ দাশগুপ্ত সহ কতজন পদত্যাগ করলেন, কত প্রতিষ্ঠাবান নেতা দলত্যাগ করলেন, কত কর্মী দলের নীতি গ্রহণ অস্বীকার করে প্রকাশ্যে জেহাদ ঘোষণা করলো; কিন্তু শ্রীনরেন দাসের মনে কোন ভাবনা এল না। ১২৬ জন ডেলিগেট সদস্য গত ৭ই জানুয়ারী দলের তলবী সভা আহবানের নোটিশ দেন, গত ৯ই জানুয়ারী রাজ্য কমিটির সদর দপ্তরে কর্মী সম্মেলনে হাতাহাতি হয়েছে, গত সপ্তাহে রেশন কাটার প্রতিবাদে রাজভবনে গণমিছিলে টালিগঞ্জ কেন্দ্রের কয়েকজন শিশু নিয়ে শ্রীশান্তি পাল ছাড়া কেউ যোগদান করে নি, তবু শ্রীনরেন দাস বিচলিত নন। শ্রীদাস জানেন, গত ২৬শে দলের বর্ষীয়ান নেতা শ্রীশিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুবোধ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিধান মৌলিক দলত্যাগ করেছেন। আর এঁরা সকলেই সংযুক্ত বামপন্থী গণ বাম ফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী হয়েছেন। অনেকগুলি জেলা কমিটির প্রধান নেতারা পদত্যাগ করেছেন, ফাঁসিদেওয়ার মত অনেকগুলি শাখা কমিটি সম্পূর্ণভাবে সকল সদস্যসহ দলত্যাগ করেছে—তবু শ্রীনরেন দাস বিচলিত হন নি। অবশ্য শ্রীদাস একটু নরম হওয়াতে অনেকে তাদের পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করেছেন কিন্তু দলের সঙ্কট সামান্য হ্রাস পায় নি। এস. এস. পি.-র কেন্দ্রীয় কমিটি পশ্চিমবঙ্গ কমিটির এই মতিগতি অতি নিপুণভাবে লক্ষ্য করে যাচ্ছেন আর নির্বাচনের পরে—সমগ্র অবস্থার ফল ফলবে। কেন্দ্রীয় কমিটি এই নির্বাচনের মুখে হস্তক্ষেপ করে ঝামেলা করতে চান না তাই নির্বাচন পর্যন্ত শ্রীদাসের গতি বিরতিহীন থাকতে পারবে। কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি বা আমার মত কম বুদ্ধির লোক হঠাৎ প্রশ্ন করতে পারেন শ্রীদাস অন্য কোন ভূমিকা না নিয়ে বর্তমান ভূমিকা নিয়েছেন বা নিলেন কেন? তার সম্ভবত একটি মাত্র জবাব—গত মে মাসে শ্রীদাস যখন বিধান পরিষদে সদস্য প্রার্থী হন তখন যে প্রতিশ্রুতিগুলি তিনি দিলেন বর্তমান কার্যকারণ সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার ফলশ্রুতি মাত্র। শ্রীনরেন দাস গত মে মাসে কলকাতা স্নাতক কেন্দ্রে প্রার্থীরূপে বিধান পরিষদে প্রতিদ্বন্দিতা করেন। শ্রীদাসের প্রতিদ্বন্দ্বীদের অন্যতম ছিলেন এস. ইউ. সি. দলের শ্রীসুকোমল দাশগুপ্ত। অবশ্য নিজের দলের মধ্য থেকে মনোনয়ন পেতেও শ্রীদাসকে বেগ পেতে হয়েছিল, কারণ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নেতা শ্রীদিলীপ চক্রবর্তীও ছিলেন এই আসনের একজন দাবিদার। কিন্তু শ্রীদিলীপ চক্রবর্তীকে যদিও শ্রীদাসের টপকানো সম্ভব হলো কিন্তু দায়ে পড়লেন শ্রীসুকোমল দাশগুপ্তকে নিয়ে। এস. ইউ. সি. দল আকৃতি অবয়বে ছোট হলেও তার চরিত্রে একটু ধানি লঙ্কার লক্ষণ আছে। শ্রীসুকোমল দাশগুপ্ত শ্রীদাসের পক্ষে নাম প্রত্যাহার করলেন কিন্তু দুইটি প্রতিশ্রুতি

শ্রীদাসের কাছ থেকে আদায় করেন। সেই দিনের অতি-গোপন প্রতি-শ্রুতি ছিল এস. এস. পি. দল ভবিষ্যতে শিউড়ী বিধানসভার আসনটি শ্রীনীহার মুখার্জীর ভগ্নী শ্রীমতী প্রতিভা মুখার্জীর জন্য ছেড়ে দেবেন এবং সেই আসন শ্রীমিহির চট্টোপাধ্যায়ের জন্য কোন-ক্রমে দাবি করবেন না, আর কলকাতার কালীঘাট কেন্দ্রটি ভবিষ্যতে যাতে এস. ইউ. সি. পায় তার জন্য চেষ্টা করবেন। শ্রীনরেন দাস কথার মর্যাদা রেখেছেন। শ্রীদাসের আর এক প্রতিশ্রুতি ছিল বাম কম্যুনিস্টদের উদ্দেশ্যে। কলকাতা স্নাতক কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে ডান ও বাম দুই কম্যু-নিস্ট পার্টির সঙ্গে সমান আঁতাত ছাড়া জয়যুক্ত হওয়া সম্ভব ছিল না, কিন্তু সেই সময় শ্রীনির্মাল্য বাগচি আর শ্রীআমোদ বসুকে নিয়ে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল যে দুই কম্যুনিস্ট পার্টিকে এক ঘাটে জল খাওয়ানো অতি দুরূহ কাজ ছিল। শ্রীদাস সেই দুরূহ কাজটিও করেছিলেন। বহুবাজার স্ট্রীটে ডান কম্যুনিস্ট পার্টির দপ্তরে গিয়ে শ্রীনির্মাল্য বাগচিকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ডান কম্যুনিস্ট দলের সমর্থন আদায় করেই সেই রাত্রেই বাম কম্যুনিস্ট দলের হয়ে শ্রীআমোদ বসুর সমর্থনে বিবৃতিতে সই করেছিলেন। হ্যাঁ, আর এই সময়েই শ্রীদাসের প্রতিশ্রুতি ছিল যত বিরূপ প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি হোক, এস. এস. পি. দল ভবিষ্যৎ নির্বাচনে বামের পাশে থাকবেই। এস. এস. পি. কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ ছিল যে, তাদের দল সর্বত্র কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একজন মাত্র প্রার্থী দেখতে চায় আর পূর্ববর্তী নির্বাচনে দ্বিতীয় স্থান দখলকারীকে আসনের ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিতে চায়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি নির্বাচনী মোর্চায় (বাম কম্যুনিস্টদের) যোগদান করে এই নীতিটিকেও পায়ে মাড়ালেন নির্মমভাবে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একজন প্রার্থী রাখতে এস. এস. পি. কতটা চেষ্টা করেছে সে প্রশ্ন ভবিষ্যতে বিচার হবে কিন্তু গত নির্বাচনে দ্বিতীয় স্থান অধিকারীকে অগ্রাধিকার দেবার প্রশ্নে এই দল সর্বাপেক্ষা বড় ক্ষতি করেছে তাতে সম্ভবত সন্দেহের অবকাশ নেই। ১৯৬২ সালের নির্বাচনে শ্রীঅতুল্য ঘোষ জয়যুক্ত হয়েছিলেন তার একমাত্র কারণ হল, শ্রীদেবেন সেন দাঁড়িয়ে শ্রীকেতনারায়ণ মিশ্রের ভোট কেটে শ্রীঅতুল্য ঘোষের জয়ের পথ সুগম করেছিলেন। শ্রীদেবেন সেন ১৯৬২ সালের নির্বাচনে তৃতীয় স্থান গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু এইবার এস. এস. পি. দলের লোকসভার প্রার্থী তালিকায় শ্রীসেনের নামই আসানসোল কেন্দ্রে সর্বাগ্রে ঘোষিত হয়েছে। কেন? দ্বিতীয় স্থান অধিকারী শ্রীমিশ্রই এস. এস. পি. দলের বিচারে যোগ্য প্রার্থী হওয়া উচিত কিন্তু সেই নীতি ভঙ্গ করা হ'ল কেন? এর জবাব সহজে পাবার নয়। আবার ঠিক জবাব পাওয়া যাবে না যখন প্রশ্ন করা যাবে—শ্রীঅতুল্য ঘোষ যখন কেন্দ্র পরি-বর্তন করে বাঁকুড়া লোকসভার কেন্দ্রে দাঁড়িয়েছেন এবং যখন তাঁর বিরুদ্ধে শ্রী জে এম, বিশ্বাস নামে একজন তরুণ ছাঁটাই রেল শ্রমিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, তখন হঠাৎ এস. এস. পি. শ্রীকানাই দেকে প্রার্থী দিল কেন? বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের তলার আসনগুলিতে মাত্র দুটি আসনে এস. এস. পি. প্রার্থী দিতে পারে, যখন শ্রী জে এম বিশ্বাস বেশ কিছুটা ফিল্ড করে ফেলেছেন, তখন এস. এস. পি. (এত পরে) একটা নাম ঘোষণা করল কেন? এই কি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একজন প্রার্থী দেবার নমুনা, আর সেই প্রার্থী যখন শ্রীঅতুল্য ঘোষের মত প্রার্থী। এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া সহজে যাবে না, কারণ এর কোন জবাব নেই। শ্রীনরেন দাস ধীরে ধীরে দলকে এমন স্থানে নিয়ে এসেছেন যেখান থেকে অনেক প্রশ্নেরই জবাব তিনি দিতে পারবেন না।

আবার ১৯শে ডিসেম্বরের পরের কথায় ফিরে আসা যাক। ১৯শে ডিসে-ম্বর সাত বামের ফ্রন্ট গণফ্রন্টের বিরুদ্ধে ৩৩টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে, আর গণ বাম ফ্রন্ট ২১শে ডিসেম্বর বামফ্রন্ট ৩৫টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে বলে পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললো। পূর্বেই বলেছি এই সময়ে শ্রীমাখন পাল উদ্যোগ গ্রহণ করেন যদি দুই ফ্রন্টের মধ্যে বিরোধটা সীমিত রাখা যায়। এই চেষ্টায় শ্রীপাল সর্বাগ্রে যোগাযোগ করেন ফর-ওয়ার্ড ব্লকের শ্রীঅশোক ঘোষের সঙ্গে। সম্প্রীতিতে দল-মত আর ফ্রন্টের লড়াই-এর মধ্যে থেকেই এই দুই ব্যক্তি কখন সামনাসামনি বসেন বা টেলিফোনে ৩৪-৩৯৫৬ আর ২৪-৩৫৩৫—এই দুইটি লাইনে যখন যোগাযোগ হয়, তখন কিন্তু এ'রা দুজন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মানুষ হয়ে যান। এটা শুধু আজকের ঘটনা নয়, শ্রীমাখন পাল আর শ্রীঅশোক ঘোষ আজ দীর্ঘ বৎসর সর্বপ্রকার মালিন্যের মধ্যেও নিজেদের বন্ধুত্বের পবিত্রতা রক্ষা করে চলেছেন। শ্রীমাখন পাল আর শ্রীঅশোক ঘোষ দুজনে আলোচনা করে স্থির করলেন আর একবার চেষ্টা করে দেখবেন দুই ফ্রন্টের বিরোধকে সীমিত রাখা যায় কি না। তবে ঠিক হ'ল তাঁদের দুজনের সঙ্গে শ্রীনরেন দাস ও শ্রীজাহাঙ্গীর কবীরও থাকবেন। ২৬শে ডিসেম্বর সোম-বার প্রথম আর-এস-পি দপ্তরে উক্ত চার নেতা এক বৈঠকে বসলেন। প্রথম এই বৈঠকের পর তাঁরা ২৭শে ডিসেম্বর ও ২৮শে ডিসেম্বর এবং সর্বশেষে ৩০শে ডিসেম্বর কয়েকটি বৈঠকে মিলিত হ'ন। এই চার নেতা দুই ফ্রন্টের বিরোধ সীমিত রাখতে একটা সূত্রও আবিষ্কার করেন। ৩১শে ডিসেম্বর ছিল সংযুক্ত বামপন্থী গণফ্রন্টের শেষ সভার দিন। কারণ গণ বাম ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ ৩১শে তারিখে একদিনের জন্য কলকাতা আসবেন আবার ফিরে যাবেন নির্বাচনী প্রচার অভিযানে এবং পরে আর কোন ফ্রন্টের সভা অনুষ্ঠিত হবে না। ৩০শে ডিসেম্বর রাত ১১টা পর্যন্ত আর-এস-পি অফিসে বাম বিরোধ সীমিত রাখার সূত্র ঠিক হ'ল আর ঠিক হ'ল ৩১শে বেলা পাঁচটার মধ্যে এই সূত্র বামপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি তথা সংযুক্ত ফ্রন্ট গ্রহণ করবে কি না সেটা শ্রীঅশোক ঘোষকে জানিয়ে দেবেন শ্রীমাখন পাল। ৩১শে সন্ধ্যা ৬টায় বাংলা কংগ্রেসের দপ্তরে গণ বামফ্রন্টের সভা, আর ৫টায় শ্রীমাখন পাল শ্রীঅশোক ঘোষকে জানাবেন বাম কম্যুনিস্ট পার্টির মনোভাব এবং শ্রীঅশোক ঘোষ সেই মনোভাব জানাবেন তাঁর ফ্রন্টের সভায়। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে। শ্রীমাখন পাল বসে আছেন ধর্ম-তলা স্ট্রীটে আর-এস-পি দপ্তরের সামনে টেলিফোন নিয়ে আর বহুবাজার স্ট্রীটে বসে আছেন ফরওয়ার্ড ব্লক দপ্তরে শ্রীঅশোক ঘোষ। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে গেল কিন্তু দুই নেতা কেউই টেলিফোনটা তুলতে সুযোগ পেলেন না, বিরোধ সীমিত রাখার শেষ সুযোগও বুঝি শেষ হয়ে গেল। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে গেল কিন্তু দুই নেতা এগুতে পারলেন না। আর শ্রীমাখন পাল ও অশোক ঘোষের সঙ্গে সারা বাংলাদেশও বুঝি পিছিয়ে গেল। এই পিছিয়ে যাওয়ার কাহিনীও কম চমকপ্রদ নয়—এবার সেই কাহিনী বলবো। (ক্রমশঃ)

মাত্র ৮৲ টাকায়

আধুনিক ডিজাইন ও রঙের অতি সুন্দর সাড়ী মূল্যে ৮৲ টাকা, ২টি সাড়ী ১৫৲ টাকা, ৩টি সাড়ী ২১৲ টাকা। ডিল্যুক্স ১০৲ টাকা, ২টি সাড়ী ১৯৲ টাকা, ৩টি সাড়ী ৩১৲ টাকা, ৩টি সাড়ী ৪৫৲ টাকা। যে কোন ২টি বা তদধিক সাড়ীর সহিত বিনামূল্যে ব্লাউজ পীস এবং কানের টাপ।

Ambika Saree Bhandar (BOW)
6815—Mandelia Road, Delhi-7

ভারতে ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতা

নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য

একটি বিশ্বজনীন সমস্যা

ছাত্র উচ্ছৃংখলতার সমস্যা বর্তমান-কালে সমাজের সকল স্তরেই গভীর উদ্বেগের সঞ্চার করেছে। প্রায় বছরখানেক ধরেই সংবাদপত্রে বড় বড় শিরোনামায় ছাত্র-উচ্ছৃংখলতার সংবাদ পরিবেশিত হচ্ছে, যা শুধু কোন একটি নির্দিষ্ট রাজ্যে বা এলাকায় আবদ্ধ নয়, সারা ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে যা শাসক-বৃন্দ, শিক্ষাবিদ ও নাগরিকদের কাছে গভীর উৎকণ্ঠার কারণ হয়েছে। সকল অগ্রগতিসম্পন্ন দেশেই এটা একটা সাধারণ অবস্থায় দাঁড়িয়েছে, এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যসম্পন্ন দেশেও ছাত্র-উচ্ছৃংখলতার কদর্য চেহারাটা ফুটে উঠেছে। সমষ্টিবাদী রাষ্ট্রগুলি অবশ্য ছাত্র-অশান্তির দায় থেকে মুক্ত, কেননা সেইসব দেশে ছাত্রদের মত প্রকাশ ও তদনুরূপ কাজ করার স্বাধীনতা নেই। মোটামুটি বলতে গেলে, আজ যারা ক্ষমতার চূড়ায় বসে আছে, দেশে ও জগতের সমস্যাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের কর্মধারার প্রতি আধুনিক যৌবনের অসহিষ্ণুতার মূর্ত প্রকাশ এই ছাত্র উচ্ছৃংখলতা। এর দ্বারা সূচিত হচ্ছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যৌবনের বিদ্রোহ।

সমস্যার জটিলতা

ভারতে এই সমস্যা অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করেছে, যা নিয়ে উচ্চস্তরে কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনার অন্ত নেই। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও শিক্ষামন্ত্রক, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপাচার্যগণ, বিশ্ব-বিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও পুলিশের বড়কর্তারা সম্প্রতি এই ছাত্র সমস্যা সমাধানের একটা নীতি খুঁজে বার করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন। ১৯৬৪ সালেই মুখ্যমন্ত্রীরা মিলিত হয়ে কতকগুলি সুপারিশ করেছিলেন। এই জাতীয় গণ-তন্ত্রসম্মত আলাপ-আলোচনা ও প্রচেষ্টা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু সত্য বলতে কি আমরা এখনো পর্যন্ত এমন কোন সুসংহত নীতি প্রণয়ন করতে পারি নি যা দিয়ে এই আপাত অসাধ্য সমস্যার সমাধান সম্ভব। অবশ্য একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে যে, এই জাতীয় একটি অবস্থার কোন সহজ সমাধান নেই কেননা এগুলির সঙ্গে জড়িয়ে আছে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক প্রভৃতি নানা বিষয়। সর্বোপরি এ থেকে উদ্ভূত শাসমতান্ত্রিক সমস্যাও জটিলতা মুক্ত নয়। সকল দিক থেকেই জটিল এইরূপ একটি প্রশ্ন বিশ্লেষণকে কষ্টকর করে তোলে এবং সহজ সমাধানকে নস্যাৎ করে দেয়।

গতকাল এবং আজ : সাদৃশ্য ও পার্থক্য

রক্ষণশীল বৃদ্ধেরা তাঁদের পুরাতন সুন্দর দিনগুলির কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন যে, সেযুগে ছাত্ররা পিতামাতা ও বয়োজ্যেষ্ঠদের শ্রদ্ধা করত এবং ছাত্র-জীবন ছিল শান্ত ও শীতল। একথা শুনে হয়ত কেউ প্রশ্ন করতে পারেন সেটা সরোবরের মতই শান্ত ও শীতল ছিল কিনা। প্রাচীনেরা স্বাভাবিকভাবেই একালের বর্বরতা ও হিংস্রতা, ধর্মঘট, শ্লোগান, ঘেরাও, লক-আউট প্রভৃতির বিরোধী। এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে, ছাত্র-উচ্ছৃংখলতা কি এদেশে এই নতুন ঘটছে? আমি যখন কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের আমার অতীত দিন-গুলির কথা ভাবি এবং তৎসংলগ্ন ইডেন হোস্টেলের জীবন, যেটা ১৯১৪ থেকে ১৯২০ সালের কথা, তখন মনে হয় না যে, সে যুগের ছাত্র-উচ্ছৃংখলতার সঙ্গে বর্তমান ভারতের কোন গুণগত প্রভেদ আছে। আজকের ছাত্রদের মতই আমরাও ভাল অথবা মন্দ, প্রশান্ত অথবা আবেগপ্রবণ অপরিণামদর্শী ছিলাম। সেযুগে আমরাও দুর্বুদ্ধিপ্রণোদিত হয়ে অনেক কাজ করেছি, ধর্মঘটও করেছি, একবার পুলিশের সঙ্গেও মারামারি করেছিলাম, ফুটবল খেলার বিজয়োৎসব সম্পন্ন করতে গিয়ে একবার হোস্টেলের আসবাবপত্রও পুড়িয়ে-ছিলাম। কলেজ এবং হোস্টেলের কর্তৃ-পক্ষদের বোকা বানাবার চেষ্টাও আমরা কম করি নি, এবং একবার একজন কলেজ-শিক্ষককে কাপুরুষের মত প্রহারও করে-ছিলাম।

তথাপি আবহাওয়ার কিছু পার্থক্য আছে। স্বাধীন ভারতের ছেলেমেয়েরা আমাদের যুগের ছেলেমেয়েদের চেয়েও নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন। গণতান্ত্রিক ভারতে তারা বাধা পেয়েছে অল্প, কাজেই তারা যা চিন্তা এবং অনুভব করে তা প্রবলভাবে ব্যক্ত করে এবং প্রায়শই আইন ও শৃংখলার সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের যুগের ছাত্রদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ হয় কংগ্রেসী রাজ-নীতিতে, না হয় বিপ্লবী দর্শনে, না হয় উভয়ক্ষেত্রেই লিপ্ত হয়ে পড়ত। রাজনীতি-সচেতন ছেলেদের উপর কংগ্রেস এবং বিপ্লবী সংগঠনগুলির প্রভাব ছিল অপরিসীম। কংগ্রেস ছাত্রদের আদর্শবাদ ও দেশপ্রেমের সুযোগ নিয়ে তাদের নিজেদের রাজনৈতিক প্রয়োজনে নিযুক্ত করত। বলা হত স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য ছাত্রমূল্যে মুনাফা করার প্রয়োজনীয়তা আছে। ১৮৯৫ থেকে ১৯৪৫, প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে, তিলক থেকে গান্ধী যুগ পর্যন্ত, প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে কংগ্রেসের স্বার্থে ছাত্রদের টেনে আনা হয়েছে অবিচ্ছিন্নভাবে। এই নীতির মূল সুরটি বাজিয়ে দিলেন গান্ধী, ১৯২১ সালে, যখন তিনি লিখে-ছিলেন, "যখন যুদ্ধ বাধে, কবি তখন তাঁর বীণাযন্ত্র সরিয়ে রাখে, আইনজ্ঞ সরিয়ে রাখে তাঁর আইনের রিপোর্ট, ইস্কুলের ছাত্র সরিয়ে রাখে তার পাঠ্যপুস্তক...যখন কোন বাড়িতে আগুন লাগে, বাড়ির লোকেরা প্রত্যেকেই বেরিয়ে যায়, প্রত্যেকে এক এক বালতি জল নিয়ে এসে সেই আগুন নেভাবার চেষ্টা করে। এটা আমার দৃঢ় ধারণা যে ভারতবর্ষ যেন সেইরূপ একটি প্রজ্বলন্ত গৃহ যেখানকার মানবসমাজ প্রতিনিয়ত জ্বলছে...।" (ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৯১৯-২২, লেখক মহাত্মা গান্ধী; প্রকাশক জি ন্যাটেশন, মাদ্রাজ, ১৯২২)। সেদিনের মত আজকেও পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রসমাজ রাজনৈতিক দলগুলির দ্বারা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, এবং শেষোক্তের দ্বারাই সম্পূর্ণভাবে পরিচালিত। প্রত্যেকটি পার্টিরই নিজস্ব ছাত্রফ্রন্ট আছে। অন্যান্য রাজ্যের ছাত্র-সংগঠনগুলি পশ্চিমবঙ্গের মত এত বেশি রাজনীতিতে আচ্ছন্ন এবং রাজনৈতিক দল-গুলির দাস নয়। কিন্তু যেখানেই সুযোগ পেয়েছে, বিবেকবোধকে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিয়ে এই রাজনৈতিক দলগুলি দলীয় স্বার্থে ছাত্রদের উপর দিয়ে মুনাফা লুঠছে।

কিশোরদেরও বাদ দিচ্ছে না, যেমন পশ্চিম বঙ্গে।

নৈতিক এবং মানসিক পটভূমি

সমকালীন ছাত্র-উচ্ছৃংখলতার নৈতিক এবং মানসিক পটভূমি ভাল করে বোঝা দরকার। বাংলাদেশে ১৯০৫ থেকে ১৯৪৫-এর মধ্যবর্তী সময়ে ছাত্রসমাজের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বিপ্লবী সংগঠনসমূহের সদস্য ছিল। স্বাধীন ভারতে এই জাতীয় আদর্শবাদের কোন স্থান নেই যা সেদিনের দেশপ্রেমিক যুবককে উদ্দীপিত করেছিল। ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন যে একজন কমিউনিস্ট যুবকও কমিউনিস্ট বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতে পারে না। রাজনীতি সচেতন ছাত্ররা তাদের নেতাদের মতই ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে সব কিছু চিন্তা করে। যাই হোক তারা ভারতের সমগ্র ছাত্রবাহিনীর একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র। কিন্তু ছাত্রসমাজের অধিকাংশই বিদ্বেষপ্রবণ ও আত্মকেন্দ্রিক এবং বর্তমানের বিবেকহীন বস্তুবাদে ভারাক্রান্ত রাজনীতি, বাণিজ্য, পেশা, এককেন্দ্রিক গৃহকোণসর্বস্ব জীবনধারার দৃষ্টান্তে নীতিভ্রষ্ট। স্বাধীনতার প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্ব থেকে বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, তিলক, গান্ধী, আজাদ ও নেহরু, লজপত রায়, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র ছাত্রদের মানসিক ভিত্তিভূমিকে পুষ্ট করেছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বা তার পরে যারা জন্মেছে তাদের কাছে এগুলি নিছক নামমাত্র। আজকের যুবকের উপাসনার স্থান ভিন্ন। তারা মার্কস-লেনিন ও মাও-সে-তুং, ফ্রয়েড সার্ত্র ও লরেন্সের নামে শপথ নেয়, তাদের জীবনীশক্তির উৎস যৌনসর্বস্ব ফিল্ম ও সাহিত্য। সে যুগের নেতারা তবু ছাত্রদের সামনে বেঁচে থাকা অথবা মৃত্যুবরণ করার মত একটা আদর্শ রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু এযুগের রাজনীতির ও সমাজের নেতারা ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। পক্ষান্তরে সাংবাদিক, আইনপ্রণেতা, রাজনীতিক, শিক্ষক, আইনজীবী, ব্যবসায়ী এবং চিকিৎসকগণ যা দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছেন তা যুবকদের বিপথগামী করার জন্য যথেষ্ট। পেশার ক্ষেত্রে মাত্রাজ্ঞানের অভাব জীবনের সর্বস্তরেই পরিব্যাপ্ত হয়েছে। রাধাকৃষ্ণণ, বিনোবা, জয়প্রকাশ বা জাকির হোসেনের মত শেষ ব্যক্তিত্বগুলি আজ নিঃসঙ্গ, অরণ্যে রোদনরত। তাই দেখা যাচ্ছে, আধুনিক ভারতের যুবকেরা একটি নৈতিক নৈরাজ্যবাদী আবহাওয়ায় বাস করছে। সমাজ থেকে তারা যে বেঁচে থাকার খোরাক পাচ্ছে তা সার্বিকভাবে শৃংখলা ও নৈতিক উন্নতির উপযোগী নয়।

রাজনৈতিক প্রচ্ছদ

আজকের ছাত্ররা ভারতের স্বাধীনতালাভের পরে জন্মেছে। স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম এবং জনসাধারণের আনুষঙ্গিক দুঃখবোধ তাদের বিচলিত করতে পারে নি। তারা স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীনতাকে খোলাখুলি স্বীকার করে নিয়েছে এবং তারা স্বাধীনতার ফলভোগী হতে চায়, জগতের অপর সকল উন্নতিশীল দেশের ছাত্রছাত্রীদের সমতালে। তারা এটা বুঝতে পারে না যে একটি জাতিকে দীর্ঘ পরাধীনতার পর দাঁড়াতে হলে অনেক ত্যাগ ও তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এই সহজ সত্যটি শাসকদল যুবকদের বোঝাতে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে যে, একটি জাতি একদিনে গঠিত হয় না। অবশ্য পরিকল্পনা ও শাসনের ক্ষেত্রে ত্রুটি যে নেই তা নয়, দক্ষতার মান বহুক্ষেত্রেই হতাশাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে, নৈতিকতার অভাবের জন্য প্রগতি বিঘ্নিত হয়েছে। তথাপি ভারতবর্ষ স্থির জলের বদ্ধ জলাশয় নয়। পরিকল্পনা ও গণতান্ত্রিক সমাজবাদ, শান্তি জোটনিরপেক্ষতা এবং আন্তর্জাতিকতাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সাংস্কৃতিক সমন্বয় ইত্যাদি নিশ্চয়ই আদর্শ হিসাবে অনুসরণের অযোগ্য নয়। এই সকল ক্ষেত্রে ভারতের কিছু অবদান আছে, যা রুশ বা আমেরিকান বৈদেশিক পর্যবেক্ষকগণও স্বীকার করেন। কিন্তু যুবশক্তির সঙ্গে যথাযথ যোগাযোগের অভাবে ছাত্ররা এ বিষয়ে আদৌ সচেতন হবার সুযোগ পায় না যে গত দুই দশকে ভারত কি করেছে। ফলে জাতি আজ যে প্রচেষ্টায় লিপ্ত সেদিকে তারা বিশেষ কোন আগ্রহবোধ করে না।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ

অপরদিকে রাজনৈতিক ও সামাজিক তথা অর্থনৈতিক কয়েকটি বিষয় যা ছাত্রদের দৈনন্দিন জীবনধারার উপর আঘাত করছে এবং তাদের অসন্তোষকে ধূমায়িত করছে। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, খাদ্যের দুষ্প্রাপ্যতা, অসমবণ্টন, শাসনযন্ত্রের বিভিন্ন স্তরে সংহতির অভাব, দক্ষতার নিম্নমান, জাতীয় কর্তব্যের সর্বস্তরে অবহেলা, এইসব বিরক্তিকর বিষয়গুলি তাদের চোখে অত্যন্ত পীড়াদায়ক। অবাক হবার কিছুই নেই যে তারা সহজে মাথা গরম করে ফেলে এবং আইন ও শৃংখলার সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। সারা দেশজোড়া সহিংস ছাত্রবিক্ষোভ শুধু যৌবনের উত্তেজনার বশে যে ঘটে তা নয়। এগুলির পিছনে রাজনৈতিক নেতাদের গোপন হস্তও হয়ত আবিষ্কার করা যায়, কিন্তু শুধুমাত্র এই কথা বললে তা অতিসরলীকরণের দোষে দুষ্ট হবে যদি না আমরা সামাজিক তথা অর্থনৈতিক বিষয়গুলিকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনি। ডঃ আলফ্রেড স্কেনকমান যিনি ইউট্রেক্টের (হল্যান্ড) ইনটারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশনাল সায়েন্সের ডেপুটি ডিরেক্টর, এই শতাব্দীর পঞ্চম দশকের মাঝামাঝি সময়ে ভারতে এসেছিলেন। ভারতের ছাত্রসমস্যাকে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করে তিনি বলেছিলেনঃ "আজকের ভারতীয় ছাত্রের যা অবস্থা তা তার চরিত্রের অন্তর্নিহিত দোষের জন্য নয়, পক্ষান্তরে সে যে জটিল যুগে বাস করছে সেটাই বহুলাংশে দায়ী। দোষ শুধু যে পদ্ধতির তাই নয়, এর সংগে আরও যুক্ত হয়েছে ভারতীয় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে মানসিক সম্পর্কসমূহের ত্রুটি এবং এই নৈরাশ্যকর যুগ যেখানে আমরা বাস করছি, যা আজকের ভারতের ছাত্রদের মনে প্রতিকূল প্রভাবের সৃষ্টি করছে অপর যে কোন জায়গার মতই।" ভারত ও অপরাপর স্থানের ছাত্রদের নিবিড় পর্যবেক্ষণ করে ডঃ স্কেনকামান এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, "এদেশের ছাত্রদের অন্তর্নিহিত দক্ষতা কারোর চেয়ে কম নয়।" তিনি আরও বলেছেন যে, তাদের যে প্রতিকূল পরিবেশে কাজ করতে হয়, তাদের যেভাবে উৎপীড়িত হতে হয় শেষ পর্যন্ত জাতি কর্তৃক আরোপিত হীনমন্যতার শিকার হয়ে, প্রকৃত সুযোগের অর্ধেকটুকু পেলেও তারা সত্যই পরিবেশের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে। পঞ্চম দশকের মাঝামাঝি সময়ের ক্ষেত্রে যা সত্য, আজকের দিনেও তাই।

(ক) স্যাডলার কমিশন

প্রবীণদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ একথা স্বীকার করতে চান না যে সকল দেশেই ছাত্রদের শৃংখলার প্রকৃতি সামাজিক অবস্থার দ্বারা নির্ধারিত। আধুনিক ছাত্রদের একটি বড় অংশের আর্থিক অস্বচ্ছলতা, স্কুল ও কলেজসমূহের ত্রুটি, পরীক্ষার গতানুগতিক পদ্ধতি, এবং সর্বোপরি নৈতিক নৈরাজ্যবাদ সমাজের সর্বস্তরে যেভাবে ব্যাপ্ত হয়ে আছে তা হিসাবের মধ্যে না আনলে বর্তমানকালের ছাত্র-উচ্ছৃংখলতা সম্বন্ধে কোন পাকাপাকি সিদ্ধান্তে আসা যাবে না। বাংলাদেশের ছাত্রদের কঠিন জীবন সম্বন্ধে স্যাডলার কমিশন (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন, ১৯১৬-১৮) বলেছিলেন যে, তারা বহুবিধ উদ্বেগের দ্বারা আচ্ছন্ন, তাদের গৃহের অবস্থাও শোচনীয়। এই পরিবেশে ছাত্ররা বিমর্ষ, নৈরাশ্যবাদী ও আত্মকেন্দ্রিক হবেই। এই কারণেই তাদের প্রয়োজন চিত্তবিনোদন ও খেলাধুলার যথোপযুক্ত

ব্যবস্থা। তার আগ্রহের বিষয়বস্তু নেই বললেই চলে যা তাকে তার সীমার বাইরে নিয়ে যেতে সক্ষম এবং যা তাকে অপরাপর লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবে। তার কোন শখই নেই, কেননা তা সময় ও অর্থ উভয়-দিক থেকেই ব্যয়সাধ্য। এমন কোন অভিজ্ঞ ও প্রবীণ লোকের সাহচর্য থেকে সে বঞ্চিত যে তার উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার বছরগুলিতে সান্ত্বনা দিতে পারে। কাজেই এটা মোটেই আশ্চর্যজনক নয় যে তার মানসিক সংকটতম মুহূর্তে সে অপ্রতিরোধ্য উত্তেজনার শিকার হয়ে পড়ে, কখনো কখনো যা অত্যন্ত ভয়াবহ সহিংসরূপে ফেটে পড়ে।

(খ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীক্ষা

স্যাডলার কমিশনের ৩৬ বছর পরে প্রখ্যাত শিক্ষাব্রতী ও বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য, পরলোকগত ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে যে স্নাতক স্তর পর্যন্ত ছাত্রদের জীবনযাত্রার উপর যে সমীক্ষা হয়েছিল তার শুরুতেই লেখা হয়েছে যে, "অবস্থা সত্যই শোচনীয়। একটি স্বাধীন জাতীয় সরকার আজ সাত বছর ধরে গদীতে আছে। কিন্তু এমন কোন প্রমাণ নেই যে আমরা এই সমস্যাটিকে ভাল করে চিন্তা করেছি। ব্যাপারটা সত্যই শোচনীয় হবে যদি মধ্যবিত্তদের হাসিমুখ ছেলেরা শুধুমাত্র যত্ন, সহানুভূতি ও সুপরিচালনার অভাবে বিমর্ষ, সন্দেহপ্রবণ ও হতাশ যুবকে পরিণত হয়। এই জাতীয় যুবকেরাই হবু-ডিক্টেটারদের ঢাকের কাঠি হবে এবং দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রগতিকে সমূলে বিনাশ করার যন্ত্রে পরিণত হবে। আমাদের যেন তা দেখতে না হয়।"

উপরি-উক্ত সমীক্ষা ১৯৫৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সাধিত হয়েছিল ২৮,৮০০ আন্ডারগ্রাজুয়েট ছাত্রদের জিজ্ঞাসাবাদ করে, যাদের মধ্যে ১৩,০০০ এমন পরিবার থেকে এসেছে যাদের মাথাপিছু মাসিক আয় ৩০ টাকারও কম, এবং ১৪,০০০ যাদের মাথাপিছু মাসিক আয় ৩০ থেকে ৫০ টাকার মধ্যে। এই সমীক্ষায় আরও উদ্ঘাটিত হয়েছে যে, এই মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির শতকরা ৮৮ ভাগ বঙ্গবিভাগের ফলে রীতিমত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আরও জানা গেছে এই ২৮,৮০০-র মধ্যে ২৩,৬০০ ছাত্র এমন বাড়িতে বাস করে যার মেঝের আয়তন ২৪ বর্গফুটও নয় এবং সেইরকম ঘরে তারা গাদাগাদি হয়ে বাস করে। সমীক্ষকরা আরও দেখেছেন যে, শতকরা ৮৪·৬ ভাগ ছাত্রদের কোন পড়ার ঘর নেই এবং শতকরা ৪২·৯ ভাগ ছাত্রের কোন পাঠ্যপুস্তক কেনবার সামর্থ্য নেই। এই ছাত্রদের শারীরিক অবস্থাও ভীতিজনক। ৪২·৭ ভাগ ছাত্র অত্যন্ত অপুষ্টিকর খাদ্যের উপর জীবনধারণ করে। অধিকাংশ বাঙালী ছাত্রের খাদ্যের মান ১৯২৮ সালের তুলনায় রীতিমত অবনত হয়েছে। মাছ ও দুধের পরিমাণ এত কম যে, দেহের দৈনিক প্রয়োজনটুকু তার দ্বারা মেটে না। মাখন ও ফল এই শ্রেণীর ছাত্রদের খাদ্যতালিকায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এই অবস্থায় যে ছেলে-মেয়েরা সারাদিন কাজ করছে তারা তাদের আকস্মিক দুর্বিনীত ব্যবহারের জন্য নিশ্চয়ই ক্ষমার যোগ্য কেননা তারা একটা নিষ্করুণ সামাজিক অবস্থার বলিমাত্র। এমন কি যদি তারা ক্ষেত্রবিশেষে শালীনতা ও ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করে সে ক্ষেত্রেও তারা ক্ষমার যোগ্য। উপরে বর্ণিত অবস্থা পশ্চিমবঙ্গে বারো বছর আগেকার। তার পরে আর কোন সমীক্ষা হয় নি। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এই নিম্ন-মধ্যবিত্তদের আর্থিক অবস্থা ইতিমধ্যে উন্নত হওয়া দূরে থাক, আরও অবনত হয়েছে। এই সব ঘর থেকেই বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রী স্কুল-কলেজে আসে।

(গ) রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা বিশেষ ধরণের সমস্যা যা আরও জটিল ও আয়ত্তের বাইরে, কেননা এখানে ছাত্রসংগঠনগুলি সম্পূর্ণভাবেই রাজনৈতিক দলগুলির অধীন যারা ছাত্রদের মধ্যে সৎ সংগঠকদের দলীয় আওতায় এনে ফেলে। কংগ্রেস কোন যোগ্য নেতৃত্ব দিতে পারে নি এবং মেধাবী ও সংগঠনদক্ষ তরুণ-তরুণীদের উদ্দীপ্ত করতে পারে নি। ফলে ছাত্রসংগঠনের অধিকাংশই বামপন্থী মনোভাবসম্পন্ন। পূর্ববর্ণিত সামাজিক তথা অর্থনৈতিক পটভূমির নিরিখে এই বিষয়টিও ধর্তব্য।

সাংস্কৃতিক নৈরাজ্যবাদ

ভারতের বর্তমান অবস্থা শুধু সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলির দ্বারাই ব্যাখ্যা করা যাবে না। বর্তমানের ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতা সেই সঙ্গে একটি নৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকটের প্রতিচ্ছবি। বর্তমানের ছাত্রদল সনাতন ভারতীয় মূল্যবোধসমূহের সঙ্গে পরিচিত নয়, পক্ষান্তরে তারা পশ্চিম থেকেও কিছু সংগ্রহ করতে পারে নি। ভারতীয় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারের সঙ্গে তারা সম্পর্কশূন্য। পশ্চিমী বন্ধুগণ বিদেশে অধ্যয়নরত ভারতীয় ছাত্রদের প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে পর্বতপ্রমাণ অজ্ঞতা দেখে বিস্ময়াভিভূত হন। পশ্চিমী মূল্যবোধসমূহ সম্বন্ধেও তারা সমান অন্ধকারে পড়ে আছে। এই নৈতিক শূন্যতা পূর্ণ হয়েছে, শস্তা শ্লোগান ও বদহজমী ভাবধারাসমূহের দ্বারা যেগুলি পশ্চিম থেকে আমদানী করেছে অনুকরণ-সর্বস্ব লেখকেরা, রাজনৈতিক প্রচারবাদীরা এবং ব্যবসায়িক সংবাদপত্রগুলি। এই কারণেই আমাদের ছেলেমেয়েদের কোন সাংস্কৃতিক ভিত্তি নেই। অধিকন্তু আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা গুণগত দিক থেকে স্বাধীন চিন্তা বিকাশের অনুকূল নয়। এই কারণেই আধুনিক যুগের ছাত্ররা সহজেই সুপরিকল্পিত প্রচারের শিকার হয়ে পড়ে। এই অবস্থার মধ্যে তারা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।

সম্প্রতি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় এক প্রবল ছাত্র বিক্ষোভের শিকার হয়েছিল, যাতে প্রভূত সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছিল, এবং সাংবাদিক ও অপরাপর অনেকেই লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। ১৯৫৬ সালে গউয়ের-হল নিবাসী দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ছাত্রদের জীবনযাত্রার সামাজিক তথা অর্থনৈতিক একটি সমীক্ষা করা হয়। এই সমীক্ষায় দেখা গেছে যে শতকরা তিন ভাগ ছাত্র মাসে ১২৫ টাকার কম ব্যয় করে, ২৮ ভাগ ব্যয় করে মাসে ১৫১ থেকে ১৭৫ টাকা, ২৯ ভাগ ব্যয় করে ১৭৬ থেকে ২০০ টাকা, এবং বাকি ১৮ ভাগ ব্যয় করে মাসে ২০০ টাকার বেশি। এটা অনুমান করা যায় যে বর্তমানকালে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যয়ের পরিমাণ আরও বেড়েছে। এইসব ছাত্ররা সঙ্গতিসম্পন্ন ঘর থেকে এসেছে এবং তারা সর্বোত্তম ধরণের শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। অথচ এরাই ১৯৬৬-র সেপ্টেম্বরের ভয়াবহ হাঙ্গামায় নিজেদের লিপ্ত করেছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম হানি করেছিল। এক্ষেত্রে অবশ্য অর্থনৈতিক কারণটা খুব বড় ভূমিকা অবলম্বন করে নি। এক্ষেত্রে শিক্ষাজগতের নৈরাশ্যকর আবহাওয়া এবং নৈতিক নৈরাজ্যবাদ এই বিস্ফোরণের সবচেয়ে বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

শিক্ষকের ভূমিকা

ইস্কুল ও কলেজের বর্তমান পাঠক্রম ছেলেমেয়েদের চরিত্র গঠন করে না। পরীক্ষার পদ্ধতি একেবারেই যান্ত্রিক। বেশির ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত, কম-বেশি যাই হোক না কেন, মোটেই সন্তোষজনক নয়। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় কোন দায়িত্ববোধ বা সামাজিক চেতনা গড়ে ওঠে না। ছাত্র-শিক্ষক ঘনিষ্ঠতা প্রবলভাবে অনুপস্থিত।

তদুপরি শিক্ষকদের একটা বিরাট অংশই আজ ততখানি সজাগ নন। তাঁরা নিজেদের সুযোগ-সুবিধার কথাই বেশি করে চিন্তা করেন, এবং নিজেদের দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য শিক্ষা তথা ছাত্রদের স্বার্থকে থোড়াই কেয়ার করে ধর্মঘটাদি নানা প্রকার বিক্ষোভের আশ্রয় নেন। এভাবে তাঁরা ছাত্রদের সামনে যে দৃষ্টান্ত দেখান তা ছাত্রদের শৃংখলার আদর্শের প্রতিকূল। তদুপরি শিক্ষাজগতের প্রথম দিককার সোপানগুলি এমন লোকেদের দিয়ে পূর্ণ করা হয় যারা অন্য কোন জায়গায় কাজ না পেয়ে শিক্ষা বিভাগে আসে। এর আবার কারণ হচ্ছে এই যে কলেজ, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন এত কম যে সহজে কেউ এই বিভাগে আসতে চায় না। শিক্ষাপ্রথা এবং শৃংখলার মান কখনোই উন্নত হবে না যদি না বেশি বেতন দিয়ে যোগ্যতর পুরুষ বা নারীকে এই বিভাগে আকর্ষণ করা হয়।

শৃংখলার অর্থ

আমাদের দেশের খুব কম লোকেরই শৃংখলা সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা আছে। নিয়মনিষ্ঠ প্রগতির সার হচ্ছে শৃংখলা। কিন্তু স্বাধীন মানুষের শৃংখলা দাসের শৃংখলার চেয়ে ভিন্ন ধরণের। স্বাধীন দেশের শিক্ষায়তনের শৃংখলা এবং ব্যারাকের মিলিটারীর শৃংখলা কখনোই বিষয়বস্তু ও গুণের দিক থেকে এক নয়। সকল স্বাধীন দেশেই স্বাধীনতা শৃংখলার ভিত্তি হওয়া উচিত। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে শিক্ষার জগতে প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রভাব বেশি। ছাত্রদের এভাবে দেখা হয় যেন তারা সর্বদা খারাপের দিকেই ঝুঁকে আছে। সমগ্র ছাত্রসমাজকে সম্ভাব্য দুর্বৃত্ত-শ্রেণী হিসাবে মনে করা হয়। এই জাতীয় মনোভাব প্রকৃত শৃংখলার পথে অন্তরায়। আমরা সর্বদাই ভুলে যাই যে শিক্ষা শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই সাধারণ অভিযান। প্রায়শই আমরা ছাত্রসমাজকে বিশ্বাস, মানবিক স্পর্শ এবং শিক্ষক-সম্পর্ক থেকে বঞ্চিত করি, যা তারা ন্যায়ত পেতেই বাধ্য। আমরা তাদের প্রকাশের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করি এবং বন্ধুত্বপূর্ণ বোঝাপড়ার আবহাওয়ার বদলে সংঘর্ষের আবহাওয়া সৃষ্টি করি। পূর্ব ভারতের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকদের মধ্যে কয়েকজন শিক্ষক সদস্য দাবি করেছিলেন যে, স্নাতকোত্তর ছাত্র সমিতিগুলিকে যেন চলতি রাজনৈতিক প্রসঙ্গ নিয়ে বিতর্ক করতে না দেওয়া হয়, তারা যেন শুধুমাত্র কেতাবী রাজনৈতিক মতবাদসমূহের মধ্যেই বিতর্ক করতে বাধ্য থাকে। স্বাধীনতার পরে এই। এই ধরণের মনোভাব জগতের অন্যান্য স্বাধীন দেশের শিক্ষাতত্ত্ব ও আচরণের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। শিক্ষার মূল কথাই হচ্ছে চিন্তার স্বাধীনতা। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ছাত্রদের চলতি রাজনীতি আলোচনা করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। তদুপরি তাদের মানসিক ঝোঁক অনুযায়ী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার স্বাধীনতাও দেওয়া উচিত। মুক্ত জিজ্ঞাসা এবং স্বাধীন কর্মের মনোভাবই বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রাণশক্তি। এই আদর্শের যথোপযুক্ত উপলব্ধি স্বাধীন চেতনা ও বুদ্ধিগত শক্তিকে বৃদ্ধি করারই কাজ করবে এবং জাতির শক্তি এখানেই নিহিত। এইচ, জি, ওয়েলস তাঁর 'অ্যানাটমি অফ ফ্রাস্ট্রেশন' গ্রন্থে প্রকৃতই দেখিয়েছেন যে, জীবনের পরিধি যতই বাড়ে, প্রতিটি যুগকে পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে অধিকতর বিপ্লবী, অধিকতর অনুসন্ধানী এবং অধিকতর সৃজনীশক্তিশীল হতে হয়। স্বাধীনতা, সৃজনমূলক স্বাধীনতা এই নতুন চেতনার নির্যাস।

মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর একটি প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান যুগে শৃংখলারক্ষার জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করার কথা হয়েছে। এই এই জাতীয় ব্যবস্থাপকেরা ভুলে যান যে শৃংখলা একটি মানবিক সমস্যা। শৃংখলার গোপন কথাটি হচ্ছে সমবেদনা ও বোঝাপড়া। প্রকৃত বন্ধুত্বমূলক আবেদনে ছাত্রসমাজ সহজেই সাড়া দেয়। এই জাতীয় আবেদনের কয়েকটি সূত্রের উল্লেখ করা চলতে পারে। ছাত্র-সংগঠনগুলিকে শৃংখলারক্ষা ও অপরাপর শিক্ষামূলক কাজ-কর্মের সাধনের জন্য গণতন্ত্রসম্মত অস্ত্র হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া চলতে পারে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ছাত্রসংগঠনসমূহকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। এগুলির প্রতি সন্দেহের দৃষ্টি না দিয়ে যা প্রায়ই করা হয়, এটাই বাঞ্ছনীয় যে শিক্ষা বিভাগের কর্তারা এগুলির সঙ্গে যেন বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক রেখে চলেন, বিশেষ করে যেখানে শৃংখলারক্ষা ও ছাত্রদের শিক্ষাগত মঙ্গলামঙ্গলের প্রশ্ন জড়িত রয়েছে। অধিকন্তু কতকগুলি বিষয়ে যেখানে ছাত্রদের শিক্ষাগত ও সংঘবদ্ধ জীবনের প্রশ্ন জড়িত এটাই বাঞ্ছনীয় যে ছাত্রসংগঠনগুলি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শদানরূপ সহযোগিতা করবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে ছাত্রদের অংশগ্রহণ তাদের দায়িত্বশীল নাগরিক হতে শেখাবে এবং এতে তাদের সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশ হবে...এতে তাদের প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য ও দায়িত্ববোধ বাড়বে, সমাজসেবার মনোভাবও বৃদ্ধি পাবে, সর্বোপরি এই রকম স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে বোঝাপড়ার যে শিক্ষা তারা লাভ করবে সমাজজীবনে তার ফল খুবই মূল্যবান হবে। বস্তুত অগ্রসর দেশগুলিতে এই জাতীয় নীতি আচরিত হয়ে আসছে।

সমাজসেবার ক্ষেত্রেও কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য ফল পেতে পাওয়া যেতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা মেটাতে ছাত্রদের সমাজসেবা শিবিরগুলি ভাল কাজ করতে পারে, যেমন ফিল্ম, লণ্ঠন বক্তৃতা, পোস্টার প্রদর্শনী, খেলা, আলোচনা, নিরক্ষরতা দূরীকরণে অভিযান ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের অনেক কিছু করার আছে। তৃতীয় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা গ্রাম্য যুবকদের নানাপ্রকার সেবামূলক কাজে সংগঠিত করতে পারে।

শৃংখলা এবং সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা

এটা প্রায়ই ভুলে যাওয়া হয় যে শৃংখলা সমাজের অন্যূন ছয়টি শ্রেণীর সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল—ছাত্র, রাজনৈতিক দল, শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অভিভাবক এবং সরকার। ছাত্রদের এখানে দুভাগে ভাগ করা যায়, একদল যারা সংখ্যালঘিষ্ঠ কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং সুসংগঠিত; অপরদিকে আছে বৃহত্তর ছাত্রসমাজ যারা বিশেষ কোন ব্যাপারের মধ্যে নেই। যখনই কোন গোলমালের সৃষ্টি হয় তখনই প্রথমোক্ত সংগঠিত সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্রেণীটিই এগিয়ে আসে। তাদের পিছনে থাকে রাজনৈতিক দলগুলির মুরুব্বিরা, যারা ছাত্র নয়, অথচ বিভিন্ন ধরণের (প্রত্যক্ষ সংগ্রামের) কাজে বিশেষ দক্ষ। ছাত্রদের দ্বিতীয় শ্রেণীটি, যাদের মধ্যে বেশির ভাগ ছাত্রই অন্তর্গত, নিছক দর্শক হিসাবেই দাঁড়িয়ে থাকে। অথচ ওই সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্রেণীটিই রাজনৈতিক নেতাদের নির্দেশে মিছিল বার করে আইন ও শাসনের সমস্যা সৃষ্টি করে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাদের নানান রাজনৈতিক বিষয়ে মত প্রকাশের স্বাধীনতা কেউ অস্বীকার করে না, কিন্তু কোন বন্ধু দেশের জাতীয় পতাকা পোড়ানো, বৈদেশিক কূটনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির দরজা-জানালা ভাঙা, শালীনতা-বিবর্জিত বিক্ষোভ ইত্যাদি প্রদর্শন করে নিজেদেরই ছোট করে। শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে মর্মান্তিক অবস্থা তখনই সৃষ্ট হয় যখন দেখা যায় যে এরাই কোন দোষী ছাত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করলে

কোথায় আছো কোন্ কবরে সতী

আবুলকাশেম রহিমউদ্দীন

মাঠের পর মাঠের নিশিডাক,
কোথায় আছো কোন্ কবরে শুয়ে!
ছুঁলেই আমি যে-তুমি নির্বাক
সারাদেহের প্রাচীন মাটি ধুয়ে
উঠবে জেগে আমায় ভালোবেসে—
জানি এমন প্রবাদ আছে দেশে!

তন্দ্রচারী আকাশ বার বার
অন্ধকার খড়্গে কাটে দিশা,
পাশেই হাঁটে পা টিপে চুপিসার
যোগিনী হাওয়া, অজানা তার তৃষা!
ডাইনে-বাঁয়ে অজানা ভয় দোলে,
কাপালিকের হাজার চোখ জ্বলে।

এবং বুঝি পায়ের নিচে ভাসে
অনিশ্চিত পাথারে হায়-হায়,
মাথার কাছে খড়্গ নেমে আসে,
বলির মন কাঁপে আশঙ্কায়।
তবুও আমি অকাল পরবাসী
প্রাচীন সেই প্রবাদে বিশ্বাসী।

কোথায় আছো কোন্ কবরে সতী;
তোমারই খোঁজে আজীবনের আশা
নদীর মুখে রেখাপথের গতি
বুনো ঘাসের গভীরে বাঁধে বাসা।

হাঁটছে তবু আজও
মাঠের পর মাঠের সীমা ছুঁয়ে,
কোথায় আছো কোন্ কবরে শুয়ে?

রুখে দাঁড়ায়, পরীক্ষার প্রশ্ন শক্ত হলে চেয়ার-টেবিল ভাঙে। খুবই দুঃখের সঙ্গে দেখা যায় যে এসব ক্ষেত্রে এরা স্বাভাবিক সৌজন্যবোধের সীমাটুকুও লঙ্ঘন করে। কবে রাজনৈতিক সংগঠনগুলি রাজনৈতিক দলগুলির লেজুড় হওয়া ত্যাগ করবে, কবে তারা নিজেদের জন্য চিন্তা করবে এবং তাদের কাজকর্ম গঠনমূলক পথে নিয়ে আসবে?

রাজনৈতিক দলগুলি এর কুফল বুঝবে না......ফলে অভিভাবক ও জনসাধারণই এক্ষেত্রে একমাত্র ভরসা। অভিভাবকদের সহযোগিতা ভিন্ন শৃংখলারক্ষার কোন পরিকল্পনাই সফল হবে না, শৃংখলাহীনতার জন্য একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেই দায়ী করলে চলবে না। অভিভাবকেরা যাতে নিজেদের ছেলেদের উপর শৃংখলার উপযোগী প্রভাব রাখতে পারেন সে বিষয়টাও দেখতে হবে......। কয়েকটি শিক্ষক সংগঠন এই রাজ্যে যে উদাহরণ দেখিয়েছে তা শৃংখলারক্ষার মোটেই অনুকূল নয়। শিক্ষক সংগঠনসমূহেও রাজনীতি অনুপ্রবিষ্ট... যতদিন না পর্যন্ত শিক্ষকেরা অধিকতর দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হন ততক্ষণ পর্যন্ত ছাত্র-শৃংখলার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। সরকারের উপরও ছাত্রদের শৃংখলারক্ষার বিশেষ দায়িত্ব আছে। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের মনোযোগ আরও বেশি বাড়া উচিত। ১৯৫১ সালে খের কমিটি মন্তব্য করেছিলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার আদায়ীকৃত রাজস্বের শতকরা ১০ ভাগ এবং রাজ্য সরকারগুলি শতকরা ২০ ভাগ ব্যয় করবে। বাস্তবে তা হয় নি। সরকার শিক্ষকদের বেতন পর্যাপ্ত বৃদ্ধি করতে পারেন নি......অসন্তুষ্ট শিক্ষক ছাত্রদের শৃংখলারক্ষার বিষয়ে একান্তই অনুপযোগী। সরকার ছাড়াও শিক্ষা বিভাগের কর্তাদের অনেক কিছু করবার আছে। ছাত্রদের অভাব-অভিযোগসমূহের প্রতি কর্তৃপক্ষের মনোভাব, মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, সহানুভূতিহীন। কোন কোন রাজনৈতিক দল বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসনকার্য কুক্ষিগত করেছে। এই সমস্ত অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া দূর করা এখনই প্রয়োজন। বহুক্ষেত্রেই স্কুলের ও কলেজের গভর্নিং বডিতে কায়েমী স্বার্থ আসন গেড়ে বসেছে, ফলে সেগুলি রাজনৈতিক দলাদলির আখড়া হয়েছে। সর্বত্রই 'ক্লিক'। এগুলি নিশ্চয়ই শৃংখলার উপযোগী নয়।

কয়েকটি সাম্প্রতিক সুপারিশ

এ বিষয়ে কয়েকটি সাম্প্রতিক সুপারিশের নমুনা দেওয়া হল। (১) বলা হয়েছে যে শৃংখলাভঙ্গের ব্যাপারে পুলিশের হস্তক্ষেপ চলবে না। কিন্তু ছাত্র যখন আইন ও শাসনের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় তখন পুলিশের না এসে উপায় কি? (২) বলা হয়েছে যে ভাইস-চ্যান্সেলারদের ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া উচিত। কিন্তু সে ক্ষমতা তিনি কিভাবে কার্যকরী করবেন যদি না তাঁর নিজস্ব বাহিনী থাকে? (৩) বলা হয়েছে যে শিক্ষকেরা কোন শৃংখলাবিরোধী ব্যাপারে উৎসাহ দেবেন না, এটা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। (৪) বলা হয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসগুলি থেকে বাইরের পুলিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করা চলবে না। এটি কাজে পরিণত করা অবশ্য রীতিমত কষ্টকর। (৫) বলা হয়েছে যে ছাত্র সমস্যা সমাধানের জন্য ছাত্র-শিক্ষক যুগ্ম কমিটি চিরস্থায়িভাবে থাকবে, এটি খুবই ভাল প্রস্তাব। (৬) বলা হয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে "শিক্ষালাভ কর এবং উপার্জন কর" এই নীতি চালু করা দরকার। এটাও খুব বাঞ্ছনীয় প্রস্তাব। (৭) এবং সর্বশেষে একটি ভাল প্রস্তাব করা হয়েছে যে, একমাত্র শিক্ষক থেকেই ভাইস-চ্যান্সেলার নিয়োগ করতে হবে।

ছাত্র-উচ্ছৃংখলতার সমস্যা জাতীয় নেতা ও শিক্ষাব্রতীদের বিশেষভাবে চিন্তিত করেছে। এটা একটা বৃহত্তম জাতীয় প্রশ্ন কেননা ছাত্ররাই হচ্ছে জাতির ভবিষ্যৎ। এই সমস্যার কোন দ্রুত সমাধান নেই, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা মারফত এই সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। সহানুভূতি বোঝাপড়া ও সদয় মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হলে তবেই অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। এর সাফল্য নির্ভর করছে সরকার, ছাত্র-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, অভিভাবক, রাজনৈতিক দল সকলেরই উদ্দেশ্যের সততা ও সহযোগিতার উপর। এই সকল শ্রেণীকে একই উদ্দেশ্যে উদ্বুদ্ধ করাটাকে হয়ত কেউ অলীক কল্পনাবিলাস মনে করতে পারেন, কিন্তু কান্ট যা বলেছিলেন, যা কিছু সুন্দর স্বপ্ন সেগুলিকে বাস্তবায়িত করার জন্য নিরন্তর কাজই নাগরিক ও রাষ্ট্রনেতাদের কর্তব্য হওয়া উচিত।*

(*মূল ইংরেজীর ঈষৎ সংক্ষিপ্ত অনুবাদ)

ধারাবাহিক উপন্যাস

আশাপূর্ণা দেবী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

কী বলছে, সে কথা শুনতে পাচ্ছে সুবর্ণলতা।

'তাড়িয়ে দিলে? তোমরা আমার বাবাকে তাড়িয়ে দিলে? আমাকে নিয়ে যেতে দিলে না? কেন? কেন? কী করেছি আমি তোমাদের. তাই এত কষ্ট দেবে আমাকে?......কে বলেছিল আমাকে তোমাদের বৌ করতে? শুধু শুধু ঠকিয়ে ঠকিয়ে বিয়ে দিয়ে...চলে যাব। আমি তোমাদের বাড়ি থেকে চলে যাব—তোমাদের মতন নিষ্ঠুরদের বাড়িতে থাকলে মরে যাব আমি!'

সুবর্ণলতা অন্য আর এক গলার উচ্চ নিনাদও শুনতে পাচ্ছে, ওর নিজের কলমের অক্ষরগুলোই যেন সশব্দ হয়ে ফেটে পড়ছে; 'ওমা আমি কোথায় যাব! এ কী কালকেউটের ছানা ঘরে আনলাম গো আমি! চলে যাবি? দেখ না একবার চলে গিয়ে! খুন্তি নেই আমার? পুড়িয়ে পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দিতে জানি না?...... 'বাপকে তাড়িয়ে দিলে!' দেব না তো কি ওই বাপের সঙ্গে নাচতে নাচতে যেতে দেব তোকে?......সইমা আমার পূর্ব-জন্মের শত্রু ছিল, তাই তোকে আমার গলায় গছিয়ে পরকাল খেয়েছে আমার! তার মুখও হতে দিচ্ছি না তোকে।...... ইহজীবনে কেমন আর বাপের বাড়ির নাম মুখে আনিস, দেখবো! বাপের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক তোর যদি না ঘোচাই তো আমি মুক্তরামনী নই। বাপ চলে যাচ্ছে বলে ঘোমটা খুলে রাস্তায় ছুটে আসা বার করছি!'

সেই ঘোমটা খোলা বালিকা সুবর্ণকে টেনে হিঁচড়ে ঘরে এনে পুরে শেকল তুলে দিয়ে গেল ওরা, বলে গেল, মুখ থেকে আর টুঁ শব্দ বার করবি না।'

সুবর্ণ স্তব্ধ হয়ে গেল।

এই অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুরতায়, যেন নিথর হয়ে গেল।......তবু তখনো সত্যি বিশ্বাস হয় নি তার সেই নিষ্ঠুরতার কারাগারেই চিরদিনের মত থাকতে হবে তাকে।......মনে করেছিল কোনমতে এক-বার এদের কবল থেকে পালিয়ে যেতে পারলেই সব সোজা হয়ে যাবে।

তাই পালাবার মতলবই ভেঁজেছিল বসে বসে।

রাস্তা চেনে না? তা'তে কি? রাস্তায় বেরোলেই রাস্তা চেনা যায়। রাস্তার লোককে জিজ্ঞেস করলেই হবে।...সুবর্ণ-দের বাড়িটা রাস্তার লোক যদি না চেনে তো, সুবর্ণ তার ইস্কুলটার নাম করবে। ইস্কুলটাকে নিশ্চয় সবাই চেনে। বেথুন ইস্কুল তো নামকরা জায়গা!......হে ঠাকুর একবার সুবর্ণকে সুযোগ দাও পালিয়ে যাবার।...সুবর্ণ রাস্তার লোককে জিজ্ঞেস করে করে একবার ইস্কুলে গিয়ে পেঁছে যাক। তারপর আর বাড়ি চেনা আটকায় কে?......রোজ যেমন করে চলে যেতো, তেমনি করেই চলে যাবে।

চলে গিয়ে?

চলে গিয়ে বাবাকে বলবে, 'দেখলে তো বাবা, তুমি আনতে পারলে না, আমি নিজে নিজেই চলে এলাম।' আর মাকে বলবে—মা? মা কোথায়? এরা তো কেবলই বলে তার মা চলে গেছে। কোথায় চলে গেছে মা? এতদিনেও আসে নি? ঠিক আছে, সুবর্ণ গিয়ে পড়ে দেখবে কেমন না আসে মা? দাদার বিয়ে হবে, কত মজা, আর কত কাজ মা'র, কোথায় গিয়ে বসে থাকবে শুনি?......

ইস্ ভগবান, একবার এদের বাড়ির লোকগুলোর দৃষ্টি হরে নাও, সুবর্ণকে পালাতে দাও। কে জানে সুবর্ণর দাদার বিয়ের সময়ও হয়তো যেতে দেবে না এরা সুবর্ণকে।

আচ্ছা, ইস্কুলের মেয়েরা যদি জিজ্ঞেস করে 'এতদিন আসিস নি কেন?' যদি সুবর্ণর মাথায় সিঁদুর দেখে হেসে উঠে বলে, 'এ মা তোর বিয়ে হয়ে গেছে?' কী উত্তর দেব?

বলব কি—আমার ঠাকুমা আমাকে জোর করে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে!......নাঃ সে কথা শুনলে ওরা আরো হাসবে।...... তার চাইতে সিঁদুরটা আচ্ছা করে মুছে নেব রাস্তায় বেরিয়ে। রাস্তার কলে ধুয়ে ঘসে সাদা করে ফেলবো।......ও বাড়ির দিদি—জয়াবতী দিদি, ওকেই শুধু বলে যাব আমি চলে যাচ্ছি।......ও আমায় যা ভালবাসে, ঠিক মুক্তারামবাবুর স্ট্রীটে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবে। ওর শ্বশুর-বাড়ি এমন বিচ্ছিরি নয়, ও কত বাপের বাড়ি যায়।

'পালাবো পালাবো' এই ছিল ধ্যান-জ্ঞান।

কিন্তু পালাতে পারে নি সুবর্ণ। জীবনভোর পারল না।...দেখেছে পালানো

টাকে যত সোজা ভেবেছিল, তত কঠিন। একদণ্ডের জন্যে পাহারা সরায় না এরা।

ক্রমশই তাই বেথুন ইস্কুল, ঠনঠনে কালীতলা, মুক্তারামবাবুর স্ট্রীট, আঠারো হাত কালীর মন্দির সব কিছুই ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে......স্পষ্ট আর প্রখর হয়ে উঠছে সিঁথির ওই সিঁদুরটা। ওটাকে ঘসে ঘসে মুছে ফেলার কথা যেন অবাস্তব মনে হচ্ছে।......সেই তার নিজের জীবনে, সত্যিকার জীবনে যে আর ফিরে যাওয়া যাবে না, সেটা যেন স্থিরীকৃত হয়ে যাচ্ছে।

সুবর্ণর বই খাতা শ্লেট পেন্সিল সব যে তাদের সেই কুলুঙ্গিটার মধ্যে পড়ে রইল, সেকথা তো কেউ ভাবলো না? সামনেই যে সুবর্ণর হাফ-ইয়ার্লির এক-জামিন ছিল সেকথা মা'রও তো কই মনে পড়ল না?

সুবর্ণর সমস্ত প্রাণটা যেন ওই কুলুঙ্গিটার উপর আছড়ে পড়তে যায়।

এতদিন না পড়ে পড়ে সুবর্ণ যে সব ভুলে যাচ্ছে।

ভগবান, সুবর্ণ তোমার কাছে কি দোষ করেছিল যে এত কষ্ট দিচ্ছ তাকে? রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে কি তোমাকে নমস্কার করে নি? রোজ ইস্কুলে গিয়ে 'প্রার্থনা' করে নি?......রাত্তিরে শুতে যাবার সময় বলে নি 'ঠাকুর, বিদ্যে দিও, বুদ্ধি দিও, সুমতি দিও।'

যা যা শিখিয়েছিল মা, সবই তো করেছে সুবর্ণ, তবে কেন এত শাস্তি দিচ্ছ সুবর্ণকে?

কেন? কেন? কেন?

বালিকা সুবর্ণ হারিয়ে যাচ্ছে—তার খোলস থেকে যুবতী সুবর্ণ জন্ম নিচ্ছে, তবু সেই 'কেন'টা ধূসর হয়ে যাচ্ছে না। সে যেন আরো তীব্র হয়ে উঠছে।

আমি কি এত পাজী হতে চাই?......

আমি কি গুরুজনদের মুখের ওপর চোপা করতে ভালবাসি? আমি কি বুঝতে পারি না আমি চোপা করি বলেই আমার ওপর আক্রোশ করে করেই ওরা আমাকে আরো বেশি বেশি কষ্ট দেয়।

কিন্তু কি করবো?

এত নিষ্ঠুরতা আমি সহ্য করতে পারি না, সহ্য করতে পারি না এত অসভ্যতা। আমার ওই বর, ও কেন এত বিচ্ছিরি, এর থেকে ও যদি খুব কালো আর খুব কুচ্ছিৎ দেখতে হতো তাও আমার ছিল ভালো। কিন্তু তা হয় নি। ওর বাইরের চেহারাটা দিব্যি সুন্দর অথচ মনের ভেতরটা কালো কুচ্ছিৎ বিচ্ছিরি।.. ও মিছিমিছি করে আমাকে বলেছিল লুকিয়ে আমাকে আমার বাপের বাড়ি নিয়ে যাবে। সেই কথা বিশ্বাস করে ওকে ভালবেসেছিলাম আমি। ভক্তি করেছিলাম, ওর সব কথা রেখেছিলাম।——খারাপ বিচ্ছিরি সব কথা।......কিন্তু ওর কথা ও রাখে নি। রোজ ভুলিয়ে ভুলিয়ে শেষ অবধি একদিন হ্যা হ্যা করে হেসে বলেছিল, 'ও বাবা একবার গিয়ে পড়লে কি আর তুমি আসতে চাইবে? নির্ঘাৎ সেখানে থেকে যাবে। এমন পরীর মতন বৌটি আমি হারাতে চাই না বাবা।'

কত দিব্যি গাললাম যে আবার ফিরে আসবো, তবু বিশ্বাস করল না!

ও আমায় বিশ্বাস করে না, আমিও ওকে বিশ্বাস করি না। ও নাকি আমায় ভালবাসে, বলে তো তাই সব সময়, কিন্তু— ভগবান আমার অপরাধ নিও না, আমি ওকে ভালবাসি না। ওকে ভালবাসা আমার পক্ষে অসম্ভব। ওর সঙ্গে এক বিন্দু মিল নেই আমার!

তবু চিরদিন ওর সঙ্গে ঘর করতে হবে আমায়!

আজ আবার সেই হলো!

আজ আবার ওরা আমার ছোড়দাকে তাড়িয়ে দিল!

আমার সঙ্গে দেখা করতে দিল না।

দাদার বিয়েতে নাকি ঘটা করে নি বাবা, মা চলে গেছে বলে নমো নমো করে সেরেছে। দাদার মেয়ের 'মুখেভাতে' একটু ঘটা করবে। তাই ছোড়দা আমায় নিতে এসেছিল। বাবা নাকি অনেক মিনতি করে চিঠি লিখে দিয়েছিল ওর হাতে। ওরা সে চিঠি ছিঁড়ে ফেলেছে, ছোড়দাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে দেয় নি।

বলেছে, 'ছেলের বিয়ে শুনলাম না নাতনীর ভাত! এমন উনঘটে বাড়িতে আমাদের ঘরের বৌ যাবে না।'

ছোড়দা নাকি ভয় করে নি, ছোড়দা নাকি এ বাড়ির সেজ ছেলের মুখের ওপর চোটপাট শুনিয়ে দিয়ে গেছে। নাকি বলেছে 'আপনাদের মত লোকের জেল হওয়া উচিত।'

এ বাড়ির সেজ ছেলে সেই অপমান সহ্য করবে?

উল্টো অপমান করবে না?

তবু তো এ বাড়ির মেজ ছেলে তখন বাড়ি ছিল না, থাকলে ছোড়দার কপালে আরো কি ঘটতো কে জানে।

বাড়ি ফিরে শুনে তো অদৃশ্য লোক-টাকেই—এই মারে তো সেই মারে। বলে কি, 'শুধু চলে যেতে বললি? ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে বার করে দিতে পারলি না শালাকে।'

আমি যখন ঘেন্নায় কথা বলি নি তখন হ্যা হ্যা করে হেসে বললো, 'শালাকে শালা বলবো না তো কি বেয়াই বলবো?' হ্যাঁ আমি প্রশ্ন করেছিলাম, 'তোমার ভাইয়েদের মান আছে, আমার ভাইয়ের মান নেই?'

সেই শুনে এমন হাসি হেসেছিল ও আমি কাঠ হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর সবাইকে ডেকে ডেকে বলেছিল, 'আরে শুনেছ, শালাকে নাকি সম্মান করা উচিত ছিল আমার। পাদ্য অর্ঘ্য দেওয়া উচিত ছিল।'

ঠিক আছে ভগবান যখন আমাকে এই নিষ্ঠুর আর অসভ্যদের কাছেই রেখে দিয়েছে, তখন তাই থাকবো। আর যেতে চাইব না এ বাড়ির বাইরে। ভুলে যাব আমারও মা ছিল বাপ ছিল ভাই ছিল বাড়ি ছিল। এদের বাড়ি থেকে বেরোবো একেবারে নিমতলাঘাটের উদ্দেশ্যে।

তাই, তাই, হোক।

মরেই দেখিয়ে দেব. আটকে রাখবে বললেই আটকে রাখা যায় না।

কিন্তু শুধু এইসব কথাই লিখেছে সুবর্ণ তার স্মৃতিকথায়?

সুবর্ণ যেন ছাপাখানায় পাঠিয়ে দেওয়া খাতাখানার পাতাগুলোর মধ্যে ডুবে যাচ্ছে হারিয়ে যাচ্ছে।........

সুবর্ণ দেখতে পাচ্ছে সিঁড়ির ঘুলঘুলি থেকে বেরিয়ে আসছে একটা বই, তার সঙ্গে মিষ্টি একটু কথা। মানুষটাকে দেখা যায় না, শোনা যায় শুধু কথা? হাসি হাসি গলার ঝঙ্কার।

'এই নে এ বইটা আর তোকে ফেরৎ দিতে হবে না।' তুই পদ্য পড়তে ভাল-বাসিস শুনে তোর ভাসুর তো মোহিত। বলেছে এটা তুমি উপহার দিও বন্ধুকে।'

পৃথিবীতে এই মানুষও আছে ভগবান।

তবে তোমার ওপর রাগ করে কি করবো?

'আমার ভাগ্য' এ ছাড়া বলার কিছু নেই। (ক্রমশঃ)

গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৩, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা-১
ফোন: ২২-৬৫৮০

গ্রন্থমেলা

ট্র্যাজেডী—অধ্যাপক সাধনকুমার ঘোষ। প্রকাশক ঃ অক্সব্রিজ পাবলিশার্স (কলকাতা ও লন্ডন), ২৮।২বি, এন বি লেন, কলকাতা-২৬। মূল্য ঃ দশ টাকা

বইটি ইংরাজীতে লেখা। যে সামান্য কয়েকজন লোক ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে রচনা করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন অধ্যাপক সাধনকুমার ঘোষ তাঁদের অন্যতম। পাশ্চাত্যের বিখ্যাত বিদগ্ধ শ্রেণীর লোকেরা—যথা জে বি লিউইস-গ্যান, স্যার এস সি রবার্টস, এফ এল লুকাস, জি উইলসন নাইট, ক্লিফোর্ড লিচ, ফ্র্যাঙ্ক স্যুইনারটন প্রভৃতি—বইটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। এ বইতে সাধনবাবু যে শীর্ষকে আলোচনা করেছেন তা হচ্ছে এই ঃ ট্র্যাজিক ইমপ্রেশন, ড্রামাটিক আয়রনি, শেক্সপীরিয়ন ট্র্যাজেডী, দি রোমান প্লেজ, দি প্লেজার অভ্ ট্র্যাজেডী, ট্র্যাজেডী, হিউব্রিজ, রিভেঞ্জ প্লে, কিং লিয়ার এ্যাজ এ কজমিক ট্র্যাজেডী এন্ড দি হিউম্যান সিচুয়েশন্। ট্র্যাজেডীর স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে অধ্যাপক ঘোষ ইসকাইলাস, সোফোক্লিস, ইউরিপিডিস, এ্যারিস্টটল, সেনেকা, শেক্সপীয়ার, মারলো, কিড, ফ্রাই, লিল্লো, গল্স্ওয়ার্দি, ইবসেন, এলিয়ট, ও'নিল, মিলার, অসবর্ন, বেকেট, ব্রেখ্ট, আয়োনেস্কো, জেনেট এবং ওয়েস্কারের রচনা নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন। বইটি পড়ে আমরা মুগ্ধ হয়েছি বললেই সব কথা বলা হবে না—ট্র্যাজেডী সম্বন্ধে বহু তথ্য এবং তত্ত্বও এই সঙ্গে জানতে পেরেছি।

আমাদের নাট্য সমালোচনার বইগুলিতে বাংলা নাটকের করুণ রসের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখকেরা কথায় কথায় এ্যারিস্টটলের পোয়েটিকসের উল্লেখ করে ট্র্যাজেডী সম্বন্ধে যে সব অপব্যাখ্যা করেন, তার ফলে ছাত্রদের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। সেদিক দিয়ে অধ্যাপক ঘোষ একটা বিরাট কাজ করেছেন। ট্র্যাজেডীর গুণাগুণ, বৈশিষ্ট্য এবং বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে ভালভাবে জানতে হলে এ বইটি একটি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হবে বলেই আমাদের ধারণা।

ট্র্যাজেডীতে মানবজীবনের প্রহেলিকার দিকটাকেই তুলে ধরা হয়। কিন্তু এ প্রহেলিকার কোন সমাধান ট্র্যাজেডীতে পাওয়া যায় না। অধ্যাপক ঘোষ বলেছেন ঃ

> "Tragedy represents the individual at cross-purposes within scheme of things....the entire question of tragedy bristles with paradoxes.

এ্যারিস্টটল ব্যবহৃত নানা বিখ্যাত শব্দ, যথা—'ট্র্যাজিক ফ্ল' 'পিটি এন্ড টেরর', 'ক্যাথারসিস', 'হিউব্রিজ'—নিয়েও সাধনবাবু পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন এবং এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রীক, শেক্সপীরীয়ান-এর রিনাসেন্স ট্র্যাজেডীর বিচার করে দেখিয়েছেন।

শেক্সপীয়ারের ট্র্যাজিক হীরোদের সাধনবাবু দেখেছেন "এ্যাজ মেন পারপ্লেক্সড্ ইন দি এক্সট্রিম"। এই মতবাদ ব্রুটাস, হ্যামলেট, ওথেলো, ম্যাকবেথ, লিয়ার, টাইমন, এ্যান্টনী প্রভৃতি সবার সম্বন্ধেই খাটে। একমাত্র ব্যতিরেক বোধহয় কোরিওলেনাস। এদের ভেতর আবার লিয়ারই একমাত্র নায়ক যিনি অনুতাপানলে দগ্ধ হয়েছেন—বলেছেন সাধনবাবু এবং খুবই খাঁটি কথা বলেছেন।

গ্রীক কোরাস সম্বন্ধে অনেকেরই ধারণা খুব স্পষ্ট নয়—অধ্যাপক ঘোষ কোরাসের স্বরূপ অতি সহজভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন এইভাবে ঃ

> The Greek chorus really stood between the spectator and the action, identifying itself now with one and now with the other.

অধ্যাপক ঘোষের মতে—মানবজীবনের অসারতা ট্র্যাজেডীর প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু,—একথা একদিকে সার্ত্রে, কামু প্রভৃতি অস্তিত্ববাদীরাও বিশ্বাস করেন এবং অন্য দিকে থিয়েটার অভ্ দি এ্যাবসার্ডের প্রতিনিধিরাও, যথা—বেকেট, জেনেট, আয়োনেস্কোও মেনে নিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি লাইনে এক্জিস্টেনসিয়ালিজম্ সম্বন্ধে প্রফেসর ঘোষ যে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার তুলনা হয় না। সাধনবাবু লিখেছেন ঃ

> Sartre's Existentialism is a confession of despair, but it is a mood rather than a philosophy. In so far as it is a philosophy it can be summarised thus : 'Man comes into a totally undifferentiated meaningless universe. Man turns the universe into a habitable place by the exercise of his mysterious consciousness which Satre called ne'ant. Such significance as the world has, come from man's existential choice. These choices differ from one individual to another. Tragedy shares Sartre's emphasis on the uniqueness of the human situation.

ওয়েটিং ফর গোডোর আলোচনায় অধ্যাপক ঘোষ নাটকটির মূল বক্তব্য অতি সহজভাবে তুলে ধরেছেন পাঠকদের সামনে —"নাটকের থিম গোডো নয়—দীর্ঘ প্রতীক্ষার ব্যাপারটাই মানবজীবনের

বি, সি, মাইতি এণ্ড কোং

—ইলেকট্রো প্লেটিং সামগ্রী—

নিকেল ভ্যাট ও ব্যারেল * ডাইনামো * পলিশিং মেসিন এবং প্লেটিং করিবার জন্য যাবতীয় সামগ্রীর আদি সরবরাহক।

শো রুম ঃ—৯৪, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কলি-১২। ফোন ঃ ৩৪-৩১৭৩

৩, রাধামোহন পাল লেন, কলি-১২ ঃ অফিস-ফোন—৩৪-৪৪৪৬

'অন্তত একবার যদি'

হরিজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্তত একবার যদি মধ্যাহ্ন সূর্যের মতন
জ্বালাময়ী উত্তাপ পেতাম! অন্তত একবার যদি
সহস্র দাহিকা শক্তি
বৈশাখের আতপ্ত দুপুরে—
তবে অনায়াস মুছে দিতে পারি মুখের বেদনা
বেদনার ছায়া ঢাকা অসুখী মলিন মুখ
মুখময় ব্যথার প্রলেপতলে রোজ।

অন্তত একবার যদি ঐ স্রোতবহ নদীর মতন
যৌবন জোয়ারাবেগে উদ্বেলিত সমস্ত শরীর।
সাবলীল গতির ধারায়
মনের ময়লাগুলো সব
মুছে নিতে ভীষণ উত্তাল হত আমার ঊর্মিরা।
প্লাবিত চোখের জলে প্লাবনের ঘনঘটা একাকার করে
আগামী ফসলময় দিনগুলো বরণে সাজাই।

চেয়ে বড় সমস্যা।" সারা জীবন ধরে আমরা শুধু অপেক্ষা করেই থাকি—যার জন্য অপেক্ষা করি তারই প্রতীক হচ্ছে গোডো—বিশেষ বিশেষ মানুষের কাছে গোডোরও বিশেষ বিশেষ রূপ—কখনও একটি ঘটনা, কখনও একটি বস্তু, কখনও একটি ব্যক্তি আবার কখনও বা মৃত্যু।

জ্ঞানপিপাসু পাঠক সাধনবাবুর এই বইটিতে প্রচুর চিন্তার খোরাক পাবেন। আর সাহিত্যের ছাত্ররা ট্র্যাজেডী বিষয়ে মনে মনে একটা সামগ্রিক ধারণা করে নিয়ে জগৎ-সাহিত্যের সেরা সেরা ট্র্যাজিক নাটকগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অধ্যয়ন করতে পারবেন।

বিখ্যাত ইংরাজ সমালোচক আইভর ব্রাউন অধ্যাপক ঘোষের বইটির সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

> English literature and English Drama in particular has a wise and devoted friend in India, Professor S. K. Ghose who has read the work of all ages with assiduity, is as much concerned with the far out Left Wing theatre of to-day as with the far away Classics and Elizabethians. .. ..
> There must be pessimism in the dark heart of any tale of disaster. The author has analysed the various reactions of various times and talent to what is now commonly called the Human Predicament. .. ..
> Down the centuries Professor Ghose charts the sad tramp of the tragedians, quoting, perhaps excessively, the academic auothorities. His own opinions are usually more valuable than theirs. He not only writes very good English ; he adds brevity to clarity and many scholars have failed in both. More about a huge subject, could not be said more concisely than in this book.

ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে অমিতাভ—শ্যামল দত্তচৌধুরী। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড্। ১১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য—তিন টাকা।

হাস্যরসপ্রধান সাহিত্য সাহিত্যেরই একটি বিশেষ অঙ্গ। এই সাহিত্য জীবনকে নিকষণ বা পর্যালোচনা করে থাকে। এর বিশেষ গুণ এই যে এর মধ্যে মানুষের সুগোপন ব্যথা ও নৈরাশ্যকে বিশুদ্ধ রঙ্গরসে পরিণত করা হয়। এই রসানুভূতিও আমাদের সুখদুঃখের ও আশা-আকাঙ্ক্ষার বন্ধন থেকে মুক্তি দেয়। হাস্যরসপ্রধান সাহিত্যের উপর পাঠক সাধারণের একটা অহৈতুকী প্রীতি আছে, তার কারণ এই অহেতুক রসের আস্বাদন। তা ছাড়া এই সাহিত্য মনোজগৎ থেকে বুদ্ধিজগতে আমাদের উন্নীত করে। সার্থক সূক্ষ্ম ব্যঙ্গরস আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে সক্রিয় করে তোলে। বৈষম্য ও অসঙ্গতি দেখলে তার উপর অট্টহাস্যের বাণবর্ষণ করতে শিক্ষা দেয়; হোক না সে বৈষম্য ও অসঙ্গতি আমাদের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত।

হাস্যরসপ্রধান উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে বিরল বললেই হয়। সেদিক থেকে শ্যামল দত্তচৌধুরীর "ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে অমিতাভ" বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ সংযোজন সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

অমিতাভ নামক জনৈক ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্র তাঁর পাঁচ বৎসরের ছাত্রজীবনের কাহিনী বর্ণনা করেছেন এই বইটিতে। রচনাভঙ্গী শ্লেষাত্মক ব্যঙ্গরচনা গোত্রীয়। কিন্তু শ্লেষ-ব্যঙ্গের অন্তরালে আবাসিক ছাত্রজীবনের সুখ-দুঃখের একটি সুস্পষ্ট ছবি ফুটে উঠেছে রচনাটির মধ্যে। উঠতি বয়সের "পাঁচ বছরের দায়িত্বহীন জীবন" কিন্তু যৌবনের উচ্ছলতায় আবেগময়, নানা তুচ্ছ কারণে সংঘাতময়, নানা অকিঞ্চিৎকর পাওয়া না-পাওয়ার হর্ষবিষাদে ছন্দোময়।

বইটির মধ্যে শ্লেষাত্মক ব্যঙ্গ প্রহসনের ছড়াছড়ি, একাধিক ক্ষেত্রে সেগুলি রসোত্তীর্ণ হিউমারের সৃষ্টি করেছে এবং সকল ক্ষেত্রেই লেখকের রুচিবোধ ও সংযম প্রশংসার দাবি রাখে। কাহিনী-প্রবক্তার চরিত্রটি সুন্দরভাবে ফুটেছে। এ ছাড়া রচনার পরিকল্পনা অনুযায়ী অত্যন্ত অল্প পরিসরে বহু চরিত্র উপস্থাপিত করা হয়েছে। তার মধ্যে মিঃ ও মিসেস তরফদার, গোপালন, শশাঙ্ক প্রভৃতি অধিকাংশই টাইপ চরিত্র এবং তদনুযায়ী সুচিত্রিত। ভাষা বিষয়ানুগ এবং সাবলীল। বহু ইঞ্জিনীয়ারিং টেকনোলজির শব্দ ও শব্দগুচ্ছের ব্যবহার রচনাটিকে একটি নিখুঁত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তব কাহিনীর রূপ দিয়েছে। সংলাপগুলিও যথোপযোগী। বইখানি পাঠকদের কাছে হাস্যরস পরিবেশন করে যেমন আনন্দ দিতে পারবে, তেমনি উচ্ছৃঙ্খল-অপবাদে ভূষিত ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্রদের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে পারবে। পরিচ্ছদ, মুদ্রণ ও বাঁধাই বেশ পরিচ্ছন্ন।

গ্রাম বাংলার কথা

পারুল ভট্টাচার্য

॥ দশঘরার ইতিপর্ব ॥

চুঁচুড়া-তারকেশ্বর ভায়া দশঘরা, বর্ধমান তারকেশ্বর ভায়া দশঘরা, নশাগ্রাম তারকেশ্বর ভায়া দশঘরা; যে রুটের যে বাসেই আপনি চড়ে বসুন না কেন, দশঘরা আপনাকে ছুঁয়ে যেতেই হবে। তারও পরে আছে ২৩ নম্বর চুঁচুড়া দশঘরা। বস্তুত পথ এবং পরিবহনের এমন বহুমুখী সুবিধা পল্লীগ্রাম তো দূরের কথা, বাংলা দেশের অনেক মফস্বল শহরেও পাওয়া দুষ্কর।

ধনেখালি থানার সবচেয়ে বড় অঞ্চল দশঘরা। এলাকাতেও বটে জনসংখ্যাতেও বটে। ১২টি অঞ্চলে বিভক্ত সমগ্র ধনেখালি থানার এলাকা যেখানে ১০৬ বর্গমাইল, সেখানে কেবলমাত্র দশঘরা অঞ্চলের এলাকাই ৯৮২ বর্গমাইল। জনসংখ্যা ১৯৬১-র সেন্সাসে ছিল ১৩ হাজার। বাড়তে বাড়তে এখন দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৮ হাজারের কাছাকাছি।

গ্রামসভা আছে নয়টি।—উত্তর শ্রীকৃষ্ণপুর, দক্ষিণ শ্রীকৃষ্ণপুর, দশঘরা, দিঘীড়, গঙ্গেশনগর, মাদপুর, রোজিপুর, পশ্চিম বনপুর আর দেধারা। অঞ্চল সদস্য মোট ৩৫ জন। ২৬ জন নির্বাচিত এবং ৯ জন অধ্যক্ষ মনোনীত হয়ে এসেছেন পদাধিকারবলে।

আয়-অঞ্চলের ১৯৬৪-৬৫তে ছিল ৮৬৬০ টাকা। ব্যয় ১২ থেকে ১৩ হাজার টাকা। চৌকিদার, দফাদার, সম্পাদকের মাইনের অর্ধাংশ প্রভৃতি মিলিয়ে মাইনে দিতে হয় বছরে ৩৬০ টাকা। বাদবাকী সব সংগঠন, উন্নয়ন আর উদ্যোগে যায়।

রাস্তা আছে অনেক। নানা রুটের পাকারাস্তা প্রায় ৭।৮ মাইল করে পড়ে অঞ্চলের ভিতর। কাঁচারাস্তাও ১৪ থেকে ১৬ মাইল। দেধারা-দশঘরা, আর দশঘরা-দিঘীড় এই দুটি রাস্তা বাদে বাকী সবগুলির অবস্থা মোটামুটি ভালই। পথের সংস্কার এবং সংরক্ষণের দিকে গ্রামবাসীর নজর আছে দেখা গেল। তাছাড়া একটি বিশেষ প্রাকৃতিক সুবিধাও এঁরা পেয়েছেন। পাণ্ডুয়া এবং ধনেখালি থানার প্রান্তবর্তী এইসব এলাকা হুগলী জেলার বিখ্যাত মগরা স্যান্ড রেঞ্জের মধ্যে পড়ে। মাটি-বালি মিশ্রিত। স্বভাবতই কাদা হয় কম। হলেও চটচটে এঁটেল নয়। তাই শুকোয় তাড়াতাড়ি। কিন্তু কাদা না হলেও ধুলো হতে বাধা নেই। এখন শীতকাল। আধা বালির দোঁয়াশ মাটি। ভেঙে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়েছে অনেকদিন আগেই। আর এখন শীতের এলোমেলো হাওয়ায় সেই ধুলো উড়ছে আকাশ জুড়ে। বাতাসে তার ভার। নিশ্বাসে নাক জ্বালা করে এমন অবস্থা।

উচ্চ বিদ্যালয় দুটি। দেধারা অন্নদাপ্রসাদ হাইয়ার সেকেন্ডারী আর দশঘরা উচ্চ বিদ্যালয়। এটিও হাইয়ার সেকেন্ডারী। অন্নদাপ্রসাদ নতুন। মাত্র এক বছর হলো প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তার ছাত্র সংখ্যা মোটামুটি। পড়াশুনা কেমন বলা সহজ নয় এত তাড়াতাড়ি। দশঘরা উচ্চ বিদ্যালয় অনেককালের। প্রতিষ্ঠা ১৮৫৮-য়। ১৯৫৮-য় শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে। শোনা যায় আদিতে এটি একটি মাদ্রাসা ছিল। তারপর তিন বিঘা জমি এবং গৃহ নির্মাণের টাকা দান করে ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীমানগোবিন্দ বিশ্বাস। বস্তুত বর্তমানে দশঘরার উন্নতি ও অগ্রগমনে বিশ্বাস পরিবারের দান অতুলনীয়। তাঁরা শুধু প্রাচীন ভবনখানিই নির্মাণ করিয়ে দেন নি। বর্তমান বিজ্ঞানভবনটিও প্রধানত তাঁদেরই অর্থে নির্মিত হয়েছে। বিজ্ঞান ও কারিগরী ভবন বাবদ মোট খরচ হয়েছে প্রায় ৫০ হাজার টাকা। তারমধ্যে কর্তৃপক্ষ দিয়েছেন মাত্র ১৫ হাজার টাকা। বাদবাকী সবই বিশ্বাসদের দান। তাছাড়াও আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, কাঁটা কম্পাস, বোর্ড, গোলক, ম্যাপ এবং মধ্যে মধ্যে মোটা অঙ্কের এককালীন খরচ যা কিছু সবই বহন করে থাকেন বিশ্বাস পরিবার। বর্তমানে বিদ্যালয়ের নিজস্ব জমির পরিমাণ প্রায় ১৮ বিঘা। যার মধ্যে শ্রীবীরেশ্বর বিশ্বাস এবং দশঘরার রায়বাবুদেরও কিছু দান আছে। ছাত্রদের জন্য আবাসিক ব্যবস্থা আছে। ছাত্রীদের জন্য নবম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাতঃকালীন বন্দোবস্ত আছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয় মোট ১৬। নিম্ন বুনিয়াদী দুটি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘরবাড়িগুলি ভাল। যদিও মাটির তথাপি দেওয়ালগুলি নিকানো পরিষ্কার। মেঝেটি সযত্ন সংস্কৃত। ছিদ্রহীন চালে রোদ-বৃষ্টির অনধিকার প্রবেশ নিষেধ। জানালার নামে কয়েকটি ফোকর মাত্র নয়। সেগুলি প্রকৃতই জানালা। শতছিদ্র চালের আচ্ছাদন, আর হেলে পড়া বাঁশের খুঁটিতে আটকে থাকা ছিটেবেড়ার উইঢিবি দেওয়াল দেখে অভ্যস্ত চোখে এ এক নতুনত্বই মনে হলো আমার। সর্বোপরি দুজন মাত্র মাস্টারমশাই দিয়ে শ-দুই বালখিল্য ম্যানেজ করবার দুশ্চেটা এখানে নেই। পড়ুয়া অনুযায়ী শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী আছেন যথাযথ। ফলে লেখাপড়াটা মোটামুটি ভালই হয়। দশঘরা অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শেষ পরীক্ষার ফল, আর উচ্চ বিদ্যালয়ের ফলাফল দেখেও বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই।

সরকারী রুর‍্যাল লাইব্রেরী স্কীমে গ্রন্থাগার আছে দুটি। দশঘরা অ্যাসোসিয়েশান আর কানানদী গ্রন্থাগার স্যাওড়ায়। পুস্তক সংখ্যা দুটিরই ভাল। সদস্য সংখ্যা মন্দ নয়। তবে সারা অঞ্চলের চাহিদা পূরণ করবার পক্ষে দুটি মাত্র গ্রন্থাগার যথেষ্ট নয় বলেই মনে হয়। আরও অন্তত একটির প্রয়োজন আছে।

প্রধান ফসল পাট আর আলু। ধান হয়, তবে কম। শাক-সব্জী রবিশস্যও হয় কিছু কিছু।

দশঘরাবাসীর ভাগ্য ভাল। সেচের সুবিধা বারোমাস এখানে। ডি ভি সি-র ক্যানেল জল দেয়। ছোটখাট খাল-খন্দ, মজা নদী, নালা পুকুরও বিস্তর। মাটি দেয়ালো দোআঁশ। আলুর বীজ ডাকলে কথা কয়। পাট গাছে ডাল নেই, ফেঁকড়ী নেই, লম্বা হাত কয়েক, রংও ভাল। বিঘা পিছু ১০০ মণ আলুর ফলন এখানে। খাটলে-খুটলে, মাপ মতো সার খোল যত্ন-আত্তি করলে বাড়ে বই কমে না। ফল-পাকড়ের মধ্যে মাদপুরের আনারস আর কাঁঠাল বিখ্যাত। আকারে, রং-এ, গন্ধে এবং সুস্বাদেও বটে।

মাছের চাষ আছে। বালি তোলার খাদ আছে। প্রকাণ্ড পুকুর কিংবা ছোটখাটো ডোবা-গাবাও বিস্তর। মাছ চাষে পয়সা আছে, মনোযোগও তাই আছে গ্রামবাসীর।

হাট হয় দুটি। একটি দশঘরায় সপ্তাহে দুদিন—রবিবারে আর বুধবারে। অপরটি শ্রীকৃষ্ণপুরে, শনি আর মঙ্গলে। দশঘরার হাটের বয়স অনেক। ১২৩৮ সনের সরকারী ম্যাপে দশঘরার হাটের উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণপুর খুব বেশি দিনের নয়। বিশ বছর, কি বড় জোর বছর পঁচিশেকের হতে পারে।

দর-দামও মন্দ নয়। অন্তত কাছাকাছি অপরাপর হাটবাজারের তুলনায় ভালই বলতে হবে। চাল ১·৫০ পয়সা কিলো। আলু ৭০ পয়সা। মাঝারি আকারের বেশ খাসা ফুলকপি ৪০ পয়সা। ডিম টাকায় পাঁচটা, আর প্রতি কিলো ৩·৫০ টাকাতে যে কাটা পোনা বিক্রি হচ্ছে, কলকাতা তো পরের কথা—অনেক পল্লী-বাসীর পক্ষেও তা স্বপ্নেই সম্ভব।

ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে কোল্ড স্টোরেজ আছে দুটি। মালিক অবাঙালী। দেড়, দেড় তিন লাখ মণ আলু থাকে এখানে। হ্যান্ডমেড পেপার সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বছর পাঁচেক। আগে খাদি ও গ্রামোদ্যোগের উদ্যোগে প্রায় ৫০ জন শিল্পী কাজ করে এখানে। মজুরী কাজ-বুঝে ৩-৪-৫ টাকাও পেয়ে থাকেন কেউ কেউ।

নলকূপ আছে সমস্ত এলাকায় মোট ১৩০টি। যদিও তার অনেকগুলিই বিকল হয়ে পড়ে থাকে প্রায় বারমাস। মহিলা সমিতি আছে, সার্ভিস কো-অপারেটিভ আছে, খেলাধুলা, নাট্যোৎসব এবং সংস্কৃত-মূলক আরও নানা অনুষ্ঠানের চর্চা রেখে থাকেন দশঘরা এ্যাসোসিয়েশন।

অভাব শুধু একটি কলেজের। ১২টি হাইয়ার সেকেন্ডারী স্কুল শুধু ধনেখালি থানায়। এপাশে পোলবা দাদপুর, ওপাশে তারকেশ্বরেও কোন কলেজ নেই। কাছে-পিঠে কলেজ বলতে হরিপাল। এতগুলি হাইয়ার সেকেন্ডারী স্কুলের কয়েকশত ছাত্র-ছাত্রীর প্রতি বাৎসরিক এ্যাডমিশনের ধাক্কা-সামলাতে-সামলাতে কলেজ কর্তৃপক্ষ হিম-সিম। সিট সমস্যা কঠিন থেকে কঠিনতরই হচ্ছে দিন দিন।

একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার পক্ষে দশঘরা একেবারে আদর্শ স্থান। নানা দিকের নানা বাসরুট এসে মিশেছে এখানে। বর্ধমান থেকে হাওড়ার প্রায় সরাসরি যোগা-যোগ বললেও চলে। অথচ পৌর এলাকার বাইরে। ভিড়-ভাড়, গণ্ডগোল, নিত্য-নূতন হামলাবাজী থেকে দূরে স্বতন্ত্র, নিরি-বিলি। বিশেষত দশঘরা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন বিদ্যালয়ের নিজস্ব যে জমি রয়েছে, তার সঙ্গে আরও সামান্য কিছু সংযোজন করলেই একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজ আপাতত শুরু করা যেতে পারে এখানে। গ্রামবাসী এবং কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি এদিকে।

আর প্রয়োজন একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের। এতগুলি লোকের চিকিৎসা ব্যবস্থা বলতে একটি মাত্র চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারী। বি কে রায় চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারী। রায় পরিবারের দানে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৫ সনে। আগে ছিল ইউনিয়ন বোর্ডের এখন আছে জেলা বোর্ডের হাতে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ বড় মনোরম দশ-ঘরার। যদিও একদা আকীর্ণ আমধাগান আজ অন্তর্হিত। ঘনছায়াময় বাঁশবন কেটে-কুটে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নতুন জনপদ। যদিও কংক্রীটের কঠিন রাস্তায় লরির ঘর্ঘর, কিংবা হ্যাজাক জ্বালা চা-পানের দোকানে রেডিওর চটুল হিন্দী গানের ফিল্মী সুর শোনা যাবে এখানেও, তথাপি প্রান্তর প্রসারিত শস্যক্ষেত্রে, নির্জন নদী-গুলির নিরিবিলি জলধারার তীরে তীরে, বেতবনে আর পদ্মবিলে আজও আত্ম-গোপন করে আছে এমন একটি নিভৃত পল্লীশ্রী, যা শুধু চোখকেই টানে না, মন-কেও মোহিত করে, বিশ্রামের আশ্বাস আনে কর্মক্লান্ত জনতা জর্জর সত্তার কাছে।

বস্তুত ছুটির দিনে বেড়িয়ে আসবার একটুখানি অবসরকে অনেকখানি আনন্দে ভরিয়ে নেবার পক্ষেও এমন চমৎকার জায়গাও আর খুব বেশি পাওয়া যাবে না বোধ করি। কলকাতা থেকে এতকাছে, অথচ এমন নির্জন নিরিবিলি এবং মনোরম।

দর্শনীয়ও অনেক কিছুই রয়েছে এখানে। প্রাচীন এবং নতুন ইতিহাস এবং উপকথার গন্ধেভরা, সত্য আর কিংবদন্তীর মিশ্রণে-মিশ্রিত রায়বাড়ির ঘড়ি, বিশালাক্ষীর মন্দির (বাংলার নিজস্ব প্রাচীন জোড়বাংলা পদ্ধতিতে এটি নির্মিত), বুড়ো হজরতের আস্তানা—অতীতের এক মহা বিপর্যয়ের নীরব সাক্ষী। বিখ্যাত পঞ্চানন ঠাকুর,—কোলের ছেলের মানসিকের চুল শোধ করতে আজও সেখানে শত-শত যাত্রীর ভিড় হয় নিত্য। আষাঢ় মাসে দশঘরার রথের মেলাতেও ঘুরে যেতে পারেন আপনি। মস্ত মেলা, অনেকদিনের পুরনো। অনেক সওদা, অনেক পসারী, ব্যাপার আর ব্যাপারী মিলিয়ে লাখো লোকের ভিড় হয় প্রতি বছর। চরকী, ঝুলন, নাগরদোলা, যাত্রা, সার্কাস, ম্যাজিক বাজী হয়। পাখী আসে, কলমের চারাগাছ আসে, আম-কাঁঠালের বাজার বসে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। মাদপুরের আনারস বিখ্যাত স্বাদে গন্ধে আর বর্ণে। সেই অনারসের পাহাড় দেখতে পাবেন দশঘরার রথের মেলায়। দাম কিন্তু সস্তা নয়, বরং চমকে ওঠবারই মতো।

রথযাত্রা বিশ্বাসদের। কিন্তু যাত্রা-কালে রথে চড়ানো হয়—আর এক কুলীন কায়স্থ ঘোষ পরিবারের গৃহদেবতা শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউকে। এ সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

দশঘরার বিশ্বাসরা মৌলিক কায়স্থ। কিন্তু সামাজিক বিচারে সেকালে এঁরা গোষ্ঠীপতি ছিলেন। আদিতে এঁরা শাক্ত ছিলেন, অন্তে বৈষ্ণব হন। ১৬৫১ শকাব্দে এঁদেরই বংশের ২২তম পুরুষ ভৃগুরাম, আনন্দীরাম, সহস্ররাম প্রতিষ্ঠা করেন গোপীনাথের এই বিগ্রহ এবং মন্দির। ২৪তম পুরুষ যুগোলকিশোর বিশ্বাস আন্দাজ—১৭০০ শকাব্দের কিছু আগে তের চূড়ো এবং প্রায় ৪০ ফুট উঁচু এই রথখানি নির্মাণ করিয়ে মহাসমারোহে শুরু করেন গোপীনাথের প্রথম রথযাত্রা। কিন্তু আনন্দে বজ্রপাত। মর্মান্তিক এক দুর্ঘটনা ঘটলো। প্রকাণ্ড চাকায় পিস্ট হয়ে মারা গেলেন যুগোলকিশোরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। এবং কনিষ্ঠ যিনি বিদেশে আত্মীয় বাড়িতে ছিলেন, সেই দিনই এলো তাঁরও মৃত্যু সংবাদ। একইদিনে যুগল পুত্র হারালেন যুগোলকিশোর। মুহূর্তে সব আনন্দ উৎসব ধুমধাম বন্ধ হয়ে গেল। শোকের ছায়া নামলো সমগ্র গ্রামখানি ঘিরে। শেষ-রাত্রে শ্রান্ত তন্দ্রাচ্ছন্ন শোকসন্তপ্ত যুগোল-কিশোর স্বপ্ন দেখলেন—নব-ঘন-শ্যামবর্ণ এক পরমসুন্দর তরুণ কিশোর তাঁকে বলছেন—রথচক্রে আমার ভয় করে, আমার অঙ্গ কাঁপে, তুই গোবিন্দজীউকে রথে চড়াস। আমি মণ্ডপে থাকবো। চমকে জাগলেন যুগোলকিশোর। খুঁজে পেলেন দৈব আর দুর্ঘটনার হদিস এবং তারপর থেকেই প্রচলন হলো এই অভিনব রীতির।

কাছেই দেবী বিশালাক্ষীর জোড়া বাংলা-মন্দির। বাংলার মন্দির শিল্পের প্রাচীনতম পদ্ধতি। পাশেই শিব আছেন গঙ্গাধর, দেবী-প্রসন্না শান্ত মূর্তি বিশাল নয়নী। শারদীয়া নবমীতে ধুমধামের সঙ্গে পূজা হয়, বলিদান হয়, মেলা বসে।

আর আছেন বিশ্বাস বংশের কুল-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউ। কষ্টি পাথরের কৃষ্ণমূর্তি; বংশীধারী রাধা-মোহন। সঙ্গে আছেন অষ্টধাতুর রাধারাণী।

মন্দির এবং বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাকাল ১৬৫১ শকাব্দ। প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বাস বংশের ২২তম পুরুষের ভ্রাতৃত্রয় ভৃগুরাম সহস্ররাম ও আনন্দীরাম।

নিত্যকালের বক্ষে সৌন্দর্যের স্মরণ স্বাক্ষর এঁকে অক্ষয় হয়ে আজও টিকে আছে বাংলা দেশের যে কয়টি মঠ-মন্দির, কিম্বা মূর্তিশিল্প; দশঘরার বিশ্বাস বংশের প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরটি শুধু তাদেরই মধ্যে অন্যতমই নয়; অনন্যও বটে। শিল্পের উৎকর্ষ আর শিল্পীর প্রতি-ভার স্বাক্ষরই শুধু নয়, নিত্যকৃত দৈনন্দিনের সকল তুচ্ছতর বেড়া পার করে জীবনের সব ক্লান্তি, সব গ্লানি, পীড়া, পীড়ন আর অন্ধকার এড়িয়ে মানুষের অন্তরকে এক অনন্ত অমৃত স্বাদে প্রলুব্ধ করে, এক মৃত্যুঞ্জয়ী মহিমার সাক্ষাৎ মেলায়, যে এরা এই সব কালাতীত কাল-জয়ী রূপময় বৈচিত্র্য সম্ভার।

একটি প্রত্যাশার মৃত্যু

কুমারেশ নিয়োগী

চরুটের বিশ্বাসহন্তা ধোঁয়াটা অনবরত পাক খেয়েই
চলছিল।

চতুর্দিক ঢাকা শুধু ধোঁয়ায়। সেখানে কেবল
কতগুলো মুঠের মুষ্টিবন্ধ হাত উত্তোলিত
ছিল কিছুর প্রত্যাশায়। পোষা ময়নার মতো।
বিক্ষুব্ধ তেজী হাতগুলো আর
কালো মাথার ভিড়ের আওয়াজ,
দুর্দান্ত নিনাদে প্রকম্পিত করেছিল
মিছিলের শহরটাকে। বেশ কিছুদিন ধরে।
কিছুর প্রত্যাশায়। তাতেই জ্বলছিল চরুটটা।
আশার ছলনায় ভুলল
বোকা লোকগুলো। আঁৎকে উঠল বিশ্বাসঘাতককে দেখে
হৃদয়ের মধ্যেকার পোষা ময়নাটা।
এবং আস্তে আস্তে চরুটের ধোঁয়ায়
ঢেকে গেল মুষ্টিবন্ধ হাতগুলো।
এবং মৃত্যু ঘটল ময়নার প্রত্যাশার।
কিন্তু চরুটটা নিভল না। তখনও;

কেন না তাতে তখনও আগুন বর্তমান।

রক্তের প্রার্থনা

শিপ্রা পাল

যখন তোমার রক্ততরলে আমি
ডুবে যেতে চাই ঃ নিঃসীম ফাল্গুনে,
সূর্য যেখানে সন্ধ্যার অনুগামী;
রাত ফিরে আসে রোদের কান্না শুনে।

যেখানে তোমার নিবিড় অহংকার
কান্না ঝরিয়ে হৃদয় জ্বালিয়ে জ্বলে;
বাউল ব্যথার ধূসর অঙ্গীকার
ভেঙেচুরে ভাসে উন্দাম লোনাজলে।

সেখানে তোমার প্রণয়ের ছলাকলা
আমিও বুঝি না ঃ হৃদয়ে যতই ক্ষত
গভীর হোক না ঃ বৈশাখী রোদে জ্বলা,
সাধ ছিলো নাকি—তাপিত মাঠের মতো?

রুক্ষ প্রাণের অরণ্যে অনুগামী
হৃদয় জ্বলবে রোদ্দুরে কতকাল!
তোমার রক্ততরলে ডুববো আমি;
যে রক্ত লাল, পলাশের মতো লাল।

মন্দিরগাত্রে পোড়ামাটির অলংকরণ বাংলা দেশের একটি প্রিয় প্রাচীন এবং পরিচিত শিল্প-পদ্ধতি। ক্রমাগত চর্চা ও প্রয়োগে এই শিল্প যে উৎকর্ষের কোন চূড়ায় গিয়ে পৌঁছেছিল দশঘরার মন্দিরটিকে তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বললেও অত্যুক্তি হবে না। সাধারণত অপরাপর দিনের তুলনায় মন্দিরের সামনের অংশের অলংকরণই সবচেয়ে উজ্জ্বল ঘন সন্নিবিষ্ট এবং সৌন্দর্যময় হয়ে থাকে। এখানেও তাই হয়েছে। চতুষ্কোণ পঞ্চচূড় এবং চৌচালা পদ্ধতিতে নির্মিত মন্দিরের সমগ্র অলংকরণ সজ্জাটিকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে। তলদেশ বা ভিত্তিভূমির অলংকরণ। এখানে সাধারণত পাল্কী বা তাঞ্জামে আরোহী বিলাসী বাবু; অশ্বরথ কিম্বা গজারোহী যুদ্ধরত সৈন্যদল। নাচের আসর, ছোট ছোট তেলাঙ্গাগুলি লাল কুর্তি গায়, বন্দুকধারী ফিরিঙ্গী পল্টন এবং আহত যোদ্ধার সেবায় নিয়োজিত উৎকণ্ঠিত রমণীকুল প্রভৃতি নিয়ে খন্ড খন্ড চারকোণা ঈষৎ লম্বা ধাঁচের টালিতে উৎকীর্ণ সঙ্ঘবদ্ধ মূর্তিশ্রেণী।

পার্শ্বদেশ বা কোণ সমূহ। এখানে উপর থেকে নিচে অশ্বারোহী গজারোহী তীর-তরবারি-ভল্ল-বল্লমধারী এবং কোথাওবা নখে-দন্তে হননকারী সারিবদ্ধ যোদ্ধাদল। বস্তুত দশঘরার মন্দিরে যোদ্ধা এবং যুদ্ধদৃশ্যের কিছু বাড়াবাড়িই দেখা গেল।

উপরিভাগ বা শিরোদেশ। চূড়ার-নিচে খিলানে উপরে চালের ঢালু গড়ন নিচু হয়ে নেমে এসে যেখানে শেষ হয়েছে সেইখানে বঙ্কিমলম্বিত ধনুকাকার ডিজাইন কতকগুলি। সেকালের নানা গহনা—বালা, অনন্ত, হাঁসুলী চন্দ্রহার ইত্যাদি।

মধ্যভাগ মুখোদেশ। এখানে সাধারণত ছোট ছোট চৌকোণা টালিতে পৃথক পৃথক একক মূর্তির সংখ্যাই বেশি। কিছু যূথবদ্ধ মূর্তিও আছে।

সৌন্দর্যে এই মূর্তিগুলি পৃথিবীর যে-কোন শিল্পীর স্বপ্ন যে-কোন শিল্পের সম্পদ। বিশেষত সুগ্রীব সুতনুকা সুধাংশুহাসিনী রমণীকুল। বীণাবাদিনী আর বাতায়নবর্তিনী, করঙ্কবাহিনী আর নৃত্যপরা রাসবিলাসিনী ওদের বঙ্কিম কটাক্ষপাতে আজও ত্রিভুবন যৌবন চঞ্চল। অধরোষ্ঠ ভঙ্গিমায় পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা নাচে রক্তধারা।

দুঃখের বিষয় মন্দিরটি সংরক্ষণের কোন সুপ্রচেষ্টা আজও হয় নি। বিশ্বাস বংশের বর্তমান জ্যেষ্ঠপ্রতিম শ্রীবীরেশ্বর বিশ্বাস অবশ্য স্বয়ং কিছু কিছু চেষ্টা করেছেন। কলকাতার কুমারটুলির বিখ্যাত শিল্পী শ্রীতারাপদ পালকে আনিয়ে অনেক নোনাধরা টালি, ক্ষয়িত ইঁট সরিয়ে নতুন টালি এবং ছাঁচে ঢালিয়ে অলংকৃত নতুন ইঁট বসিয়েছেন কিছু কিছু। তবু তাঁরও সাধ্য কম, সামর্থ্য সীমিত। বিশেষত এত বড় একটি শিল্পকীর্তির সামগ্রিক রক্ষণাবেক্ষণ কোন একজন মানুষের চেষ্টায় সম্ভব নয়। জাতীয় সরকারের সক্রিয় হস্তক্ষেপ এর জন্য অতি আবশ্যিক।

ফলে জরা জীর্ণতা আজ মন্দিরটির সর্বাঙ্গে। ইঁটগুলিতে নোনা ধরেছে, টালিগুলিতে ক্ষয়ময়তা, মূর্তিগুলির অসাধারণ গঠন সম্পদ অনেক স্থলেই বিলুপ্তপ্রায়। শীর্ষে যে সামান্য শ্যাম আভা আপাতদৃষ্টিতে আজ তা শুধুই একগোছা ঘাস কিম্বা একটি আগাছা। কিন্তু কে জানে ওর আড়ালেই হয়তো বিস্তৃত হচ্ছে বনস্পতির বিশাল শিকড়।

জরা জীর্ণতা আজ দশঘরার প্রায় সর্বত্রই। রায়েদের প্রকান্ড প্রাসাদে, বিশ্বাসদের বিশাল হর্ম্যে স্তম্ভগুলি ভাঙা, দেওয়ালগুলি ভূলুণ্ঠিত, একদা বলদৃপ্ত ফটকের প্রকান্ড সিংহের লেজ ফুঁড়ে গজিয়েছে অশ্বত্থের অঙ্কুর। প্লাস্টার খসা প্রাচীন প্রাচীরে কীর্তির কঙ্কাল যেন দাঁত মেলে হাসছে। কিন্তু আন্তরিক বেদনা এমন একটি ব্যাকুল অনুভূতি জাগে না আর কোথাও। বুক ছাপিয়ে হারানোর এমন এক হায় হায় হাহাকারও শুনতে পাওয়া যাবে না আর। ঐ চিরস্তব্ধ, চির অচঞ্চল, মূক মৌন মূর্তির মিছিল—যেন মাথা কুটে মিনতি জানায় যে অনিবার্য, যে এখনও আসে নি, কিন্তু অচিরে আগতপ্রায়, সেই সর্বব্যাপী, কাল করগ্রাস থেকে রক্ষা করো রক্ষা করো আমাদের*—।

[*পরের বারে ইটাচুনা]

রেশনে চাল কমানোর প্রতিবাদ

সারা পশ্চিমবঙ্গ জ‍ুড়ে নির্বাচনী ডংকা বেজে উঠলেও আসর এখনো বিশেষ জমে নি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল অবশ্য ইতিমধ্যেই প্রচার অভিযান স‍ুর‍ু করে দিয়েছে, কোন কোন দলের ইতিমধ্যেই এক রাউণ্ড হয়ে গেছে। কিন্তু পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে, বাসে এখনো নির্বাচনী উত্তাপ ও উত্তেজনার সঞ্চার হয় নি। জনসাধারণ বোধ হয় আসন্ন নির্বাচনের উপর ভরসা রাখতে পারছেন না। বস্তুত যে পরিবেশে নির্বাচন হতে চলেছে তাতে কারো পক্ষেই বিশেষ কোন আশা পোষণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তা সেখানেই সম্ভব যেখানে চলতি অবস্থা পরিবর্তনের কোন স‍ুযোগ থাকে। বস্তুত সার্বিক বামপন্থী ঐক্য না হবার দর‍ুণ একটা হতাশার মনোভাব সর্বত্রই স‍ৃষ্টি হয়েছে। বিগত তিনটি নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের আগামী নির্বাচনের একটি সমীক্ষা আমরা বঙ্গদর্শনে করব। বিভিন্ন দলের প্রার্থীদের চ‍ূড়ান্ত তালিকা হাতে না আসা পর্যন্ত তা সম্ভব হচ্ছে না। আমরা সেটির অপেক্ষায় রয়েছি।

এরপরে আসছে খাদ্যপ্রসংগ। শহরাঞ্চলে রেশনে সপ্তাহে যে মাত্র তিনশো গ্রাম করে চাল দেবার কথা ঘোষিত হয়েছিল, তাও সব জায়গায় দেওয়া হয় নি। এদিকে আবার দেখা যাচ্ছে যে চোরাচালানদারের গতিপথের বাধাসম‍ূহ অনেকাংশে অপস‍ৃত হয়েছে। কলকাতা শহরে প্রকাশ্য রাস্তায় প‍ুলিশের চোখের সামনে পর্যাপ্ত পরিমাণে চাল বিক্রি হচ্ছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গ সরকার সারা দেশে কোথাও এক কণা চালও দেখতে পাচ্ছেন না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সামগ্রিক খাদ্যনীতি দেশকে যে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে, কিভাবে রাজনীতির স্বার্থে দেশবাসীর স্বার্থ বিসর্জিত হতে চলেছে তার পরিচয় আমরা প্রায় প্রতিটি সংখ্যার বঙ্গদর্শনে দিয়ে আসছি।

প্রকৃতি দেবী সত্যই এ বছর পশ্চিমবঙ্গের প্রতি বড়ই নিষ্কর‍ুণ, এ সপ্তাহের অকাল বর্ষণ তারই ইঙ্গিত। অবশ্য এই ক'দিনের ব‍ৃষ্টিতে কৃষির কতখানি ক্ষতি হল তার কোন পাকাপাকি হিসাব পাওয়া যায় নি। তবে যে সব ধান মাঠে কাটা অবস্থায় পড়েছিল তার প্রচ‍ুর ক্ষতি হয়েছে বলে প্রকাশ। প্রায় এক সপ্তাহ আকাশ রৌদ্রহীন থাকার পর শ‍ুক্রবার থেকে তা প‍ুনরায় পরিষ্কার হয়েছে। এরপর শীতটা চেপে পড়বে বলেই মনে হয়।

কলকাতার রাজপথে ট্রামের চাকা বন্ধ হয়ে আছে প্রায় মাসখানেক ধরে। জনসাধারণের দ‍ুর্গতির অন্ত নেই। যে পরিমাণ বাস রাজপথে চলছে তা মোটেই প্রয়োজনের অন‍ুর‍ূপ নয়। এই অবস্থা যে কতদিন চলবে তা বলা দ‍ুষ্কর। পশ্চিমবঙ্গ সরকার গোড়ার দিকে তম্বিহম্বি করলেও শেষ পর্যন্ত চ‍ুপ করে গেছেন। একটা এতবড় শহরে যানবাহনের ক্ষেত্রে এরকম অরাজকতাকে জীইয়ে রাখা মোটেই দায়িত্বশীলতার পরিচায়ক নয়।

প্রেসিডেন্সি কলেজও একনাগাড়ে বন্ধ হয়ে আছে কয়েক মাস। সকল পক্ষই নির্বাক, নিশ্চ‍ুপ হয়ে বসে আছে। এ নিয়ে মাথাব্যথা কোন তরফেরই আছে বলে মনে হচ্ছে না। এদিকে এই বন্ধের মাঝখানেও স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তি স‍ুর‍ু হয়েছে, তা নিয়ে আবার বিক্ষোভের স‍ূচনা হচ্ছে। সব মিলিয়ে বর্তমান সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গের এই চিত্র।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সমাচার

দীর্ঘকাল বন্ধ থাকার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আবার চাল‍ু হয়েছে, যদিও এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম স্বাভাবিক অবস্থায় আসে নি। এম-এ ও এম এসসি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়ে গেছে, এবং যদি কোন দৈবদ‍ুর্বিপাক না ঘটে তাহলে পরীক্ষা স্বাভাবিকভাবেই গ‍ৃহীত হবে এটা আশা করা যায়। এখানে আমরা একটা গ‍ুর‍ুত্বপ‍ূর্ণ বিষয়ের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের দ‍ৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রতি বছর কয়েক সহস্র ছাত্রছাত্রী প্রাইভেটে পরীক্ষা দেন। কয়েকটি এমন প্রতিষ্ঠান আছে যেগ‍ুলি অর্থের বিনিময়ে এই সব ছাত্রছাত্রীদের নোট ও সাজেসান প্রেরণ করে। এই প্রতিষ্ঠানগ‍ুলির তরফ থেকে প্রতিটি প্রাইভেট পরীক্ষার্থীর নামে তাঁদের বাড়ির ঠিকানায় ব্যক্তিগত চিঠি যায়। এইরকম কয়েকটি চিঠির নম‍ুনা আমরা হস্তগত করেছি। আমাদের বক্তব্য এই যে, পরীক্ষার্থীর রোল নম্বর ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর একটি গোপনীয় বিষয়। তা বাইরের কোন প্রতিষ্ঠান জানতে পারে কিভাবে? নিশ্চয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই কোন কোন অসাধ‍ু কর্ম-

চারী কিঞ্চিৎ দক্ষিণার বিনিময়ে এই সব বাইরের প্রতিষ্ঠানকে সেগুলি প্রেরণ করে। তাহলে, যদি ব্যাপারটা এইরকমই হয়, পরীক্ষার গোপনীয়তা কিভাবে রক্ষা করা সম্ভব? বিশ্ববিদ্যালয়ের যে চক্রটি এই-ভাবে বাইরের প্রতিষ্ঠানের নিকট পরীক্ষার্থীদের নাম, বাড়ির ঠিকানা ও রোল নম্বর প্রেরণ করে, তারা যে কোন প্রশ্ন এদের কাছে পাঠায় না তার প্রমাণ কি? পরীক্ষার রেজাল্টের ক্ষেত্রেও যে তাদের অদৃশ্য হস্তের খেলা নেই সে কথাই বা আমরা বিশ্বাস করি কিভাবে? যতদূর মনে হয় এই ব্যাপারটা চলে কর্তৃ-পক্ষের অগোচরে। এই কারণেই আমরা কর্তৃপক্ষের, বিশেষ করে রেজিস্ট্রার ও কন্ট্রোলার অফ এক্জামিনেশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর যদি তাঁরা জেনে-শুনেই এই ব্যবসা চালাতে দিয়ে থাকেন তাহলে অন্য কথা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে লিখতে গেলে আবার অনেকে ক্ষেপে ওঠেন। আমরা একটি বিশেষ বিভাগ সম্বন্ধে কিছু অপ্রিয় সত্য বলে একবার তার প্রমাণ পেয়েছি, কিছুকাল আগে। তবুও আমাদের বিশ্বাস, এই বিষয়টির উপর যথোপযুক্ত তদন্ত হবে এবং যাদের মারফৎ পরীক্ষার গোপনীয়তা এভাবে ক্ষুন্ন হচ্ছে তাদের যথোপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে।

ছাত্রদের নতুন বছর

গত সংখ্যার বঙ্গদর্শনে লিখেছিলাম যে, ছাত্রদের নতুন বছরে বই কেনার ব্যাপারে অভিভাবকদের যে সমস্যায় পড়তে হয় তার মূল কারণ সম্বন্ধে একটু বিশদ আলোচনা করব।

আগেকার দিনে এত ঘন ঘন বই বদলানোর রীতি ছিল না, ফলে বেশির ভাগ বই-ই পুরাতন পাওয়া যেত, ছেলে-দের বই কেনার জন্য বছরের গোড়াতেই অভিভাবকদের টাকা ধার করার জন্য এখানে-ওখানে ছুটে বেড়াতে হত না। বড় ভাই-এর বইগুলি পর্যায়ক্রমে ছোট ভাইরা ব্যবহার করবার সুযোগ পেত।

এখন যে ঘন ঘন বই বদলানো হয় তার কারণ এই নয় যে চলতি বইটির বদলে অধিকতর উৎকৃষ্ট বই দেওয়া হচ্ছে। ইস্কুলের পাঠ্যতালিকায় বই বদলানো হয় নানা রকম স্বার্থের মুখ চেয়ে। একই বিষয়ের উপর অজস্র পাঠ্যপুস্তক প্রতি বছরই রচিত হচ্ছে এবং নভেম্বর মাস থেকেই প্রতিটি প্রকাশকের এজেন্টরা ইস্কুলে ইস্কুলে ক্যানভাস শুরু করে দেয় যাতে তাদের প্রকাশিত বইগুলিকেই ইস্কুলের পাঠ্যতালিকায় স্থান দেওয়া হয়। বই-এর গুণগত উৎকর্ষ এখানে গৌণ বিষয়। যে প্রকাশক ইস্কুলকে বেশি সুযোগ দেবে তার বই-ই পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কোন প্রকাশক হয়ত ইস্কুলের বুক-লিস্ট বিনা পয়সায় ছেপে দিতে রাজী হল, কোন প্রকাশক ইস্কুল ফাণ্ডে কিছু দান করতে রাজী হল, কোথাও আবার কোন প্রকাশক হেডমাস্টারমশাই বা সংশ্লিষ্ট শিক্ষকমশাইকে পান খেতে কিছু দিলেন। ফলে প্রতি বছরেই এক ধরণের অকশন বা নীলামের অভিনয় প্রতিটি বিদ্যালয়ে অভিনীত হয় এবং তুলনামূলক বিচারে যে তরফ সর্বাধিক সুযোগ সুবিধা ইস্কুলকে বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দিতে রাজী হয় তাদের প্রকাশিত বই-ই পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হয়, তা সে বই-এর ভিতরে যতই ভুল থাকুক না কেন। ফলে প্রতি বছরেই সেই একই নোংরা খেলা, প্রতি বছরেই পরিবর্তন, প্রতি বছরেই অভি-ভাবক পীড়ন।

অজস্র প্রকাশকের অসংখ্য পুস্তক স্পেসিমেন কপি হিসাবে যে ইস্কুলে জমা পড়ে সেগুলি কি হয়? আগেকার দিনে এই স্পেসিমেন কপিগুলি দরিদ্র ছাত্রদের বিতরণ করা হত। তাতে দরিদ্র ছেলেমেয়ে-দের সত্যকারের উপকার হত। আমি নিজে ছাত্রাবস্থায় এরকম অনেক বই পেয়েছি। কিন্তু এযুগে হালচাল অনেক বদলেছে। এখন এই স্পেসিমেন কপি কেনার বিশেষ লোক আছে এবং এই নিয়েও ব্যবসা গড়ে উঠেছে। জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই এইসব ব্যবসায়ীরা ইস্কুলে ইস্কুলে হানা দেয় এবং অর্ধেক বা তার চেয়ে কিছু কম দামে সেই বইগুলি কিনে নেয়, তার কারণ একটা বই একটা ইস্কুলে পাঠ্য না হলেও অন্য একটা ইস্কুলে তা হয়ত পাঠ্য হয়েছে। এইভাবে বই-এর সংগ্রহগুলি বিভিন্ন দোকানে বা ফুটপাতে চলে যায় এবং দু-চার আনা কম দামে বিক্রি হয়। আমি একটি ইস্কুলের খবর জানি যেখান থেকে প্রতি বছর হাজার টাকারও বেশি এই স্পেসিমেন কপিগুলি বিক্রি করে লাভ ওঠে।

প্রাইমারীর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আরও নিদারুণ। ইস্কুলবোর্ড বা মিউনিসি-প্যালিটি পরিচালিত প্রাইমারী ইস্কুল-গুলিতে বই মনোনয়নের দায়িত্ব শিক্ষক-মশাইদের নয়। মিউনিসিপ্যালিটি পরি-চালিত বিদ্যালয়গুলির পাঠ্যপুস্তক নির্ধা-রিত করে ওই পৌর প্রতিষ্ঠানই। অর্থাৎ এখানে একটি বই গৃহীত হলে সেই বই সব ক'টি ইস্কুলেই চলবে। কাজেই এখানে প্রকাশকদের মধ্যে রীতিমত কম্পি-টিসন পড়ে যায়। বই-এর গুণ চুলোয় যাক, যে যত বেশি খরচ করতে পারবে তার বই-ই নেওয়া হবে। এবারকার একটি বিশেষ মিউনিসিপ্যালিটির খবর জানি যেখানে নির্বাচন ফাণ্ডে কোন্ প্রকাশক কত টাকা দিতে পারবে তারই উপর নির্ভর করে পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণ করা হচ্ছে।

অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রেই অন্যায়, অসাধুতা ও কালোবাজার। কোন্ বই গৃহীত হবে তা সেই বই-এর উৎকর্ষের উপর নির্ভর করে না। সংশ্লিষ্ট প্রকাশক কত খাওয়াতে পারবে তাই হচ্ছে বিচারের মানদণ্ড। সত্য সেলুকস, কী বিচিত্র এই দেশ!

আবার মত পরিবর্তন

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর একটি মস্ত বড় গুণ হল যে তিনি ঘন ঘন বৈঠকে বসেন এবং ক্ষণে ক্ষণে তাঁর মত বদলায়। আর এই বদলের ক্ষেত্রটি খাদ্যনীতির ক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশি। অন্তত দু-তিন সপ্তাহ পর পর এমন এক একটি ফতোয়া তাঁর শ্রীমুখ থেকে নির্গত হয় যে কোন্‌টা লেটেস্ট সেটা মনে রাখতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত।

আমরা এতাবৎকাল বলে এসেছি যে ফুড কর্পোরেশন একদানা চালও সংগ্রহ করতে পারে নি। সরকারী হিসাবে প্রকাশ যে এ পর্যন্ত ফুড কর্পোরেশন মাত্র দু হাজার মণ ধান সংগ্রহ করতে পেরেছে। এ অবস্থায় সরকার ও কর্পো-রেশন উভয় তরফই চোখে সরষের ফুল দেখছেন। ফলে এরপর কি করা কর্তব্য তা ঠিক করার জন্য উভয় তরফ একটি বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। সেই বৈঠকে স্থির হয়েছে ধান-চালের পাইকারী কার-বার বন্ধ করতে হবে। এই সিদ্ধান্তের প্রকৃত তাৎপর্য এই যে অতঃপর যেসব জায়গায় খোলাবাজার চালু আছে সে-গুলিকে কার্যত বন্ধ করে দেওয়া হবে। খোলাবাজারে চালের সঙ্কট দেখা দিলেই কালোবাজারীদের পোয়া বারো।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্য চাইছেন অথচ তার সাধারণ নীতিগুলি গায়ের জোরে না মানার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। ফুড কর্পোরেশন ভাল বক্তব্যই রেখে-ছিলেন। যেখানে ধানের বাজার দর পঁচিশ টাকার কম নয় সেখানে এমন কে মূর্খ আছে যে সতের-আঠার-উনিশ টাকা মণ দরে ফুড কর্পোরেশনকে ধান বেচবে? এই কারণেই ফুড কর্পোরেশন সঙ্গত-ভাবেই প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে তাঁরা ধান কেনবার দর বাড়িয়ে দেবেন। কিন্তু প্রস্তাবটি মুখ্যমন্ত্রীর মনঃপুত হয় নি। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে তাহলে ওরা কেনবার দর আরও বাড়াবে। তাতে ক্ষতি কি ছিল? পাইকারদেরও ক্ষমতার একটা সীমা আছে যার বাইরে যাওয়া তাদের পক্ষেও সম্ভবপর নয়। এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করলে শেষ পর্যন্ত সর-কারেরই জয় হত এবং সেটাই হত অনেক

অবক্তব্য

চন্দ্রগুপ্ত

গত ৫ই জানুয়ারীর 'সাপ্তাহিক বসুমতী'তে চন্দ্রগুপ্ত এ. বি. টি. এ-র মাও সে-তুঙ শ্রীযুক্ত সত্যপ্রিয় রায়কে কতকগুলি সরাসরি প্রশ্ন করেছিল। তার মধ্যে যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা হলো ঃ সত্যপ্রিয় রায় এ. বি. টি. এ-র মতো অরাজনৈতিক গণপ্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসাবে কি ক'রে একটি রাজনৈতিক দলের টিকিটে পার্লামেন্টে নির্বাচন-প্রার্থী হন?' সুখের বিষয়, ৮ই জানুয়ারীর এ. বি. টি. এ-র কার্যকরী সমিতির এক সভায় এই একটি প্রশ্নের আঘাতেই রায় মহাশয় আহত হয়েছেন খবর পাওয়া গেছে। ৯ই জানুয়ারীর খবরে প্রকাশ ঃ

''এ. বি. টি. এ-র নেতা শ্রীসত্যপ্রিয় রায় যদি কোন রাজনৈতিক দল থেকে নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তবে এ. বি. টি. এ থেকে তাঁকে বহিষ্কৃত হতে হবে। রবিবার এ. বি. টি. এ অফিসে কার্যকরী সমিতির এক সভায় উত্তপ্ত আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বলে প্রকাশ। সিদ্ধান্তে বলা হয় যে, শ্রীসত্যপ্রিয় রায়কে নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। কোন দলের পক্ষ থেকে তিনি মনোনয়ন নিতে পারবেন না।'

শ্রীরায় হাজার হোন শিক্ষক; রাজনীতির খেলায় তাই তিনি সহজেই 'কট আউট' হয়ে গেলেন। রাজনৈতিক বুদ্ধিতে বলীয়ান হ'লে তিনি বিশিষ্ট রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সাহায্য পেয়েও প্রকাশ্যে নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াতেন, নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবেই পোস্টারে তাঁর নাম ছাপা হতো, বিধানসভার দলবিশেষের প্রার্থীদের সঙ্গে তাঁর নাম বার করতে দিতেন না এবং কোন বিশেষ দলের নির্বাচনী কার্যালয়গুলিও উদ্বোধন করতেন না বা প্রকাশ্যে এমন কোন কাজ করতেন না যাতে তাঁকে বিশিষ্ট দলটির সঙ্গে একাত্ম মনে হ'তে পারে। কিন্তু শিক্ষক সত্যপ্রিয় রায় গাছে চড়ার আগেই কাঁদি দেখছিলেন, ক্ষমতা পাবার আগেই ক্ষমতার বহর বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন এবং রাজনীতি-অনভিজ্ঞের মতো উৎসাহের আতিশয্যে ইতিমধ্যে এমনভাবে আমাদের তাঁর মাছ-গুলি দেখিয়ে ফেলেছেন, যার ফলে এখন হাজার কথার শাক ছড়িয়েও সে মাছ আর ঢাকা যাচ্ছে না। যেমন, ৮ই জানুয়ারীর এ. বি. টি. এ-র কার্যকরী সমিতির সভায় তিনি অসহায়ের মতো বলেছেন, তিনি কোন রাজনৈতিক দলের টিকিটে দাঁড়াচ্ছেন না, তিনি নিখিল ভারত ফেডারেশন থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন। তাঁর এই উক্তি হাস্যকর বোধ হয় এজন্য, ফেডারেশন হঠাৎ সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র সত্যপ্রিয় রায়কেই পার্লামেন্টে যাবার মতো উপযুক্ত-তম শিক্ষক-প্রতিনিধি মনে করতে গেল কেন? তিনি কি ফেডারেশনের মনোনয়ন-সংক্রান্ত কোন প্রমাণ তাঁর শিক্ষকবন্ধুদের

মীনস বা সৎ পদ্ধতি। সরকার পাইকারদের কিনতে দেবেন না, নিজেও বেশি দর দিয়ে কিনবেন না, গায়ের জোরে বাণিজ্যের স্বাভাবিক পথ বন্ধ করে দিয়ে আখেরে কালোবাজারীদেরই সুবিধা করে দেবেন। সত্যিই বিচিত্র এই নীতি!

সরকার এবং কর্পোরেশন উভয় তরফই হাস্কিং মেশিনের উপর দারুণ চটেছেন। শেষোক্ত সংস্থা হাস্কিং মেশিন জাতীয়করণের দাবি জানিয়েছেন। কিন্তু বৃহদায়তন ধানের কলগুলির প্রতি তাঁরা অন্ধের দৃষ্টি দিয়ে আছেন। অথচ এই-গুলির জাতীয়করণই সর্বাগ্রে প্রয়োজন এবং এইখানেই কায়েমী স্বার্থের আসল বাস। কথা ছিল ধানকলগুলির শতকরা পঞ্চাশ ভাগ চাল ফুড কর্পোরেশনের নিকট নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করতে বাধ্য থাকবে। তা যদি বাস্তবে সত্যই ঘটত তাহলে ফুড কর্পোরেশনের ভাণ্ডারে মাত্র দু' হাজার মণ ধান জমা পড়ত না। এরা জেনেশুনেই ফাঁকি দিয়েছে অথচ এদের প্রতি কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থাই ইতি-মধ্যে অবলম্বিত হয় নি। এসব যে কেন, কিসের স্বার্থে সে কথা গত সপ্তাহের বঙ্গদর্শনে লিখেছি, নতুন করে বলবার আর কোন প্রয়োজন নেই।

মোদ্দা কথা মুখ্যমন্ত্রী ও ফুড কর্পোরেশনের সাম্প্রতিক বৈঠক কোন নতুন পথেরই সন্ধান দিতে পারে নি। আবার প্রস্তাব উঠেছে যে কর্ডনিং-এর বেল্ট নতুন করে কষে বাঁধতে হবে, গত বছরের অবস্থাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। গতবারের কর্ডনিং-এর তবু একটা তাৎপর্য ছিল। সেবারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজে হাতে সংগ্রহের ভার নিয়েছিলেন। সেবার ধানকলগুলি শতকরা একশো ভাগ লেভি দিতে বাধ্য ছিল। এবারের সিদ্ধান্ত করা হয়েছে বহু বিলম্বে। গ্রামের সব ধানই মহাজনদের গুদামে উঠে গেছে এবং যথারীতি কালোবাজারী করার জন্য তা ইতিমধ্যেই বিকেন্দ্রিত করে দিয়েছে। এখন কর্ডনের বেষ্টনী যতই কঠিন হোক না কেন, তাতে কি চাল পাওয়া যাবে?

রাধাবিনোদ পাল স্মরণে

বৃহৎ ব্যক্তিত্ব একে একে দেশ থেকে বিদায় নিচ্ছে, প্রখ্যাত আইনবিদ ডঃ রাধা-বিনোদ পালের মৃত্যুতে এই কথাটি নতুন করে আবার মনে জেগে উঠল। রাধাবিনোদ পাল ছিলেন সেই জাতীয় আইনবিদ, যাঁরা আইনকে আইন হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন, অর্থোপার্জনের হাতিয়ার হিসাবে নয়। আইনের সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করার পর তিনি দীর্ঘকাল আইনের অধ্যাপনা করে-ছেন। আন্তর্জাতিক আইনের তিনি ছিলেন একজন বিশেষজ্ঞ। দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের অন্তে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সময় তিনি অন্যতম বিচারপতি ছিলেন, এবং সেই সময় তাঁর নিজস্ব চিন্তাগর্ভ মতামত পৃথিবীব্যাপী চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। তাঁর আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধি তখন থেকেই সুরু হয়েছিল। পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে তাঁর মন্তব্য ও ভাষ্যসমূহ আইনশাস্ত্রের ইতিহাসে বিশিষ্ট নজীর স্থাপন করেছে। জনজীবনের সঙ্গেও তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়েছিলেন, এবং সরকারের অনেক গণতন্ত্রবিরোধী কাজের তিনি প্রতিবাদ করেছেন আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে। পরিণত বয়সে তাঁর মৃত্যু হলেও তাঁর অভাব কখনো পূর্ণ হবে না। আমরা তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি।

দেখাতে পেরেছেন বা পারেন? তিনি কি, ফেডারেশনকে জানিয়েছেন, ফেডারেশন নয়, রাজনৈতিক দলবিশেষই তাঁর একমাত্র আশা-ভরসা, সেই দলের সক্রিয় সাহায্যের উপরেই তিনি তাঁর ভাগ্য নির্ভরশীল মনে করেন?

খবরে প্রকাশ, 'শ্রীরায় সদস্যদের চাপে নির্দলীয় সদস্য হিসাবে প্রার্থীরূপে দাঁড়াতে সম্মত হয়েছেন। কিন্তু সদস্যরা আশঙ্কা করছেন যে শেষ পর্যন্ত হয়তো শ্রীরায় এই সিদ্ধান্ত মানবেন না এবং বাম কম্যুনিস্টদের পক্ষ থেকে প্রার্থী হবেন। তা যদি হয় তবে সদস্যরা পরবর্তী সভায় সর্বসম্মত প্রস্তাব দিয়ে শ্রীরায়কে এ. বি. টি. এ থেকে বহিষ্কার করবেন বলে স্থির করেছেন।'

এ. বি. টি.-এ থেকে যা পাবার, সত্যপ্রিয় রায় তা পেয়ে গেছেন। সুতরাং বর্তমানে তিনি এ. বি. টি.এ.-র বিন্দুমাত্র পরোয়া করেন না। নির্বাচনের লগ্ন ঘনিয়ে আসছে। তাঁর এখনকার রাজনৈতিক দলের মূল্য তাঁর একদা-প্রিয় এ. বি. টি. এ-র চাইতে অনেক অনেক বেশি। অতএব এ. বি. টি. এ-র পরবর্তী সভা অনুষ্ঠিত হবার আগেই তিনি তাঁর আখের গুছিয়ে নিতে পারবেন, এবং তিনি নিজেই এ. বি. টি. এ.-র কুল ত্যাগ ক'রে কম্যুনিস্ট শ্যামের সঙ্গে নতুন ঘর বাঁধবেন, এটি আপাতত ভবিষ্যদ্বাণী শোনালেও সত্য, এবং কঠোর সত্যরূপে আত্মপ্রকাশ করবে বলেই চন্দ্রগুপ্তের দৃঢ় বিশ্বাস।

*

বারোই জানুয়ারীর একটি বাংলা খবরে প্রকাশ : শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, প্রেসিডেন্সী কলেজ উঠে যেতে পারে। শিক্ষামন্ত্রীর এই মন্তব্যে অসন্তুষ্ট চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয়েছিল, রবি সিংহী শিক্ষামন্ত্রী হতে পারলে প্রেসিডেন্সী কলেজও উঠে যেতে পারে। বস্তুত শিক্ষামন্ত্রী এবং তাঁর অপদার্থ সাঙ্গোপাঙ্গদের জন্যই প্রেসিডেন্সী কলেজ আজ উঠে যাওয়ার মুখে। কয়েকটি ছাত্রের হাতে ইডেন হিন্দু হোস্টেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট নির্যাতনের সময় এবং তারও পরে বেশ কিছুদিন যাবৎ সরকারী শিক্ষাদপ্তর সম্পূর্ণ নীরবতার মাধ্যমে যে কর্মতৎপরতার প্রমাণ দিয়েছিলেন, 'তুলনা তার নাই'। তাঁদের সেদিনকার আচরণে সাধারণ লোকের কারও কারও মনে এ সন্দেহও উঁকি মেরেছিল, হোস্টেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট বা প্রেসিডেন্সী কলেজ কর্তৃপক্ষের লাঞ্ছনাই বুঝি তাঁদের অভিপ্রেত ছিল এবং শিক্ষাদপ্তরের কেউ কেউ নাকি এতে আনন্দবোধও করছিলেন। আশ্চর্য লাগে ভাবতে, প্রায় সমসময়ে শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের গোলমাল থামাবার এবং সরেজমিনে গোলমালের কারণ তদন্ত করার জন্য শিক্ষাদপ্তরের সেক্রেটারি যে ভবতোষ দত্ত একাধিকবার শিবপুরে ছুটে গিয়েছিলেন, সেই মহামতি দত্তমশাই একটিবারও প্রেসিডেন্সী কলেজকে—যে কলেজে তিনি দীর্ঘকাল শিক্ষক ছিলেন ব'লে গর্ববোধ করেন এবং যেখানে কাজ করার দরুণ তিনি খ্যাতিমান ও অধুনা সেক্রেটারি—তাঁর পদধূলি পাবার সুযোগ দিলেন না। প্রেসিডেন্সী কলেজ ও শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ দুইই পয়লা নম্বরের সরকারী কলেজ অথচ দুই কলেজের প্রতি সরকারের ব্যবহারের কি আশ্চর্য বৈষম্য! সব দেখেশুনে তাই মনে হয়, রবি সিংহী এবং তাঁর খ্যাতিমান সেক্রেটারির চরম অকর্মণ্যতার জন্যই আজ, রবি সিংহীর ভাষাতেই, 'প্রেসিডেন্সী কলেজ উঠে যেতে পারে।' প্রেসিডেন্সী কলেজ উঠে গেলে প্রফুল্ল সেন বা রবি সিংহীর কিছু আসবে যাবে না, কারণ তাঁরা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বরাবরই দূরে ছিলেন, আজও দূরে আছেন এবং এই জন্মে তার কাছে আসার সম্ভাবনা নেই!

সরকারের কাছে চন্দ্রগুপ্তের একটি পরামর্শ : প্রেসিডেন্সী কলেজ-হেয়ার স্কুলের আঙিনায় ডেভিড হেয়ার নামক যে সাহেবটির মূর্তি আছে, সেটিকে ভেঙে কিংবা সরিয়ে অবিলম্বে সেই জায়গায় কংগ্রেস-জীবী কোন স্বদেশী 'বাবু'র মূর্তি বসান। বর্তমান শিক্ষা পরিস্থিতিতে হেয়ারের স্মৃতির উপস্থিতি বড়ই বেমানান, বড়ই পীড়াদায়ক!

*

স্ট্যাটিস্টিকসের হিসাবে, দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। কিন্তু যথার্থ শিক্ষিতের সংখ্যা আনুপাতিকভাবে অনেক কম। আমাদের সংবাদপত্রগুলি তৃতীয় শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতার চতুর্থ শ্রেণীর বক্তৃতা ফলাও ক'রে ছাপেন, অথচ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কোন মনীষীর মৃত্যুসংবাদ বিলম্বে শুধু নয়, অবহেলার সঙ্গেই প্রকাশ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারমাইকেল অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এমনই একজন মনীষী, যাঁর মৃত্যুসংবাদ প্রকাশে আমাদের সংবাদপত্রগুলি তাঁদের খেদজনক ঔদাসীন্যের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। যতদূর মনে পড়ে, একটিমাত্র ইংরেজী পত্রই অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে কিছুটা সশ্রদ্ধ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিল। অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে যেটুকু তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল, তাও শুনেছি, ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মীয় ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে। জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো পণ্ডিত কোন দেশেই ভূরি-ভূরি জন্মগ্রহণ করেন না, অথচ যে-দেশে তাঁর জন্ম সেই দেশ তাঁর স্মৃতির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে পারল না, এর চাইতে দুঃখের আর কি হ'তে পারে?

তবু কখনো কখনো শ্রাবণ মেঘের আড়ালে যেমন সূর্যের স্মিতহাসি বিভাসিত হয়, তেমনি স্বর্গত বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার উদ্দেশে তাঁর কিছু সংখ্যক ছাত্রের একটি বিনীত প্রচেষ্টার খবর পাওয়া গেল। আমাদের মতে, শ্রদ্ধা জানাবার এইটিই প্রকৃষ্ট উপায়। ভারতীয় মূর্তিতত্ত্বের ক্ষেত্রে অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী এবং বিদেশের মাটিতে পদার্পণ না ক'রেও বিদেশী পণ্ডিতদের হৃদয়ে অক্ষয় স্থান লাভ করেছেন। সামান্য দৃষ্টান্তস্বরূপ, কিছুকাল আগে মূর্তিশাস্ত্রের এক ফরাসী মনস্বিনী, 'দি ডেভেলাপমেণ্ট অফ হিন্দু আইকনোগ্রাফি' নামক মহাগ্রন্থের স্রষ্টা ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়কে যিনি কখনও চাক্ষুষ দেখেন নি, তাঁর একটি গ্রন্থ ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেছিলেন। এবং শুনেছি, শুধু সেই ফরাসী মহিলাই নন, বিদেশে ভারতবিদ্যায় পণ্ডিতমাত্রের কাছেই ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় অসাধারণ শ্রদ্ধার পাত্র।

অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো একজন মনস্বীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশে সম্প্রতি-প্রতিষ্ঠিত 'স্কুল অফ হিস্টোরিক্যাল অ্যান্ড কালচারাল স্টাডিজ' (২২ স্ট্রান্ড রোড, কলকাতা ১)-এর সভ্যরা যখন ভারতীয় মূর্তিশাস্ত্রের উপর আলোচনা-চক্রের ব্যবস্থা করেন, তখন কিছুটা আশান্বিত এবং অনেকটা তৃপ্তিবোধ করতে হয় বৈ কি। আগামী ৩০শে জানুয়ারী ৫-৩০-এর সময় সংস্কৃত কলেজে অনুষ্ঠেয় এই আলোচনা-চক্রে সভাপতিত্ব করছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সরসীকুমার সরস্বতী। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, অধ্যাপক সরস্বতী স্বর্গত বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম কৃতী ছাত্র এবং ভারতীয় শিল্প ও মূর্তিকলায় বিশিষ্ট পণ্ডিত। আলোচনা-চক্রে অংশগ্রহণকারীরাও স্বর্গত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাত্র। ভারতীয় শিল্পকলায় উৎসাহী মাত্রেই আশা করি এই আলোচনা-চক্রে যোগদান করবেন।

অনুগমন

রমেন রায়

গায়ে খয়েরী রং-এর কোট, গলায় সবুজ মাফ্‌লার, পায়ে মোজার সঙ্গে টায়ারের চটি। হাড়-কাঁপানো শীতের নির্জন রাতে, নিজের সম্বন্ধে ভ্রূক্ষেপ-হীন, এমনি সাজ-পোশাকে কোন মানুষকে চার-ঘড়ির সামনে সদর রাস্তা দিয়ে হাঁটতে দেখলে থমকে একটু দাঁড়িও। জামার পকেট থেকে জড়সড় দু'টি হাত বার করে, শীতের জখম থেকে বাঁচতে সঙ্কুচিত, আনত ঘাড় মুখ ঈষৎ তুলে মানুষটার দিকে একটু তাকিও।

না না, ওকে অনুকম্পা করতে যেও না! তুমি হয়তো এই পৌষের মধ্যরাতে, শহরতলির এই অতি নির্জন নিঃসাড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে শীতে হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে নিজের কথা ভেবে মনে করছ—জীবনে কি বিড়ম্বনা! কারণ তোমাকে এখনো অনেকটা পথ হাঁটতে হবে। দায়ে পড়ে চার-ঘড়ির কাছ থেকে হাসপাতাল, রেল-পুল ছাড়িয়ে সেই বালির মোড়! অনেকখানি পথ।

পানের দোকানে গ্যাস বাতিগুলো নিবে গেছে। সিনেমা ভেঙেছে অনেকক্ষণ। এই রুটে শেষ বাসটি স্ট্যান্ডে ভিড়ে তার ডেরায় ফিরে গেছে। রিক্সাগুলো ফেরার। জনপ্রাণী নেই। তার মানে এগারোটা বেজে গেছে।

তুমি ঘড়ির দিকে তাকালে। ত্রিকাল-দর্শী ব্রহ্মার মত অভ্রান্ত সময় জানালো চতুর্মুখ এই ঘড়ি।

তুমি ব্যস্ত হলে। নির্দিষ্ট একটা সময়ের ভেতর বাড়ি তোমাকে পৌঁছতেই হবে। বুড়ি ছোঁয়ার তাড়া তোমাকে বাঁধা স্রোতের মত ঠেলে নিয়ে যায়।

তুমি বলবে এটা তোমার দায়। তুমি ভুলতে পার না বাড়িতে তোমার বুড়ি মা হাঁ-করে তোমার জন্যে পথ চেয়ে আছে। ভুলতে পার না তোমার এক বোনের বিয়ের দেনা এখনো পুরো শোধ হয় নি। ভাইয়ের পরীক্ষা, তার টাকা তোমাকেই জমা দিতে হবে।

তুমি দায়িত্ববান। পাড়াঘরে একটি নিটোল আদর্শবান ছেলে। তোমার দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন কাউকেই করে দিতে হয় না। তুমি জেনে নিয়েছ এটাই নিয়ম। এই নিয়মেই তোমাকে চলতে হবে।

ওকে দেখে চমকে উঠলে তাই। মানুষটা নিয়ম ছাড়া। তোমার মনে হল তাই। নিজেকে ওর সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারছ না।

ওর খয়েরী রঙ-এর কোট, গলায় সবুজ মাফ্লার, পায়ে মোজার সঙ্গে টায়ারের চটি। স্বভাবতই ভেবেছিলে ও তোমার সগোত্রীয়। কারণ টায়ারের চটি না পরলেও যত্র-তত্র তাপ্পি মারা তোমার এই সেকেলে বুটজোড়া এমন কিছু আহা—মরি নয়। তুমি কোট গায়ে দাও না, চাদর জড়াও। বলতে পার এই চাদরে ক'টা সেলাই-এর নক্সা আছে! তোমার মাফ্লারের রঙ এতই বিবর্ণ যে, ওর সঠিক রঙ তুমি নিজেই চিনতে পার না।

তুমি খুশি হলে। এই খুশির কারণ বুঝি। তোমার এক ধরণের হীনমন্যতা আছে। কেউ তোমার দিকে তাকালে তুমি দারুণ অস্বস্তিতে ভোগ। তোমার এই সংশয় জাগে, তোমার চাদরের ভাঁজে লুকোনো সেলাইগুলো, জুতোর প্রকট তাপ্পিগুলো কেউ দেখে ফেলেছে। অবশ্য তুমি এ বিষয়ে পুরুতঠাকুরের মত সচেতন। তোমার ভুল হয় না।

তুমি মুখ তুলে চাও না। ঘাড় হেট করে, বুকের কাছে চিবুক নামিয়ে হাঁটো। স্থানবিশেষে হাঁটার গতির তারতম্য ঘটে। চকচকে গাল, টেরেলিনের জামা দেখলে একটা নন্কেয়ার, বেপরোয়া গতি এসে যায়। ঐ মানুষটার মতই তখন ভ্রুক্ষেপহীন। কিন্তু নিজের কাছে যখন নিজে এসে দাঁড়াও, যখন এমনি একটা রাত, তখন তুমি ক্লান্ত—ভীষণ ক্লান্ত!

চতুর্মুখ ঘড়ি হুঁশিয়ার করল। তোমাকে এখনো অনেক পথ হাঁটতে হবে। দায়ে পড়েই। নির্দিষ্ট একটা সময়ের ভেতর বাড়ি তোমাকে পৌঁছতেই হবে। তুমি ভুলতে পার না, বাড়িতে তোমার বুড়ি মা হাঁ-করে তোমার জন্যে পথ চেয়ে আছে। তুমি ভুলতে পার না.....

সালের উল্লেখ আছে। এ ইতিহাসের উল্লেখ নেই, কোন নিরেট মস্তিষ্ক চার মাথার এই মোড়ে এমন ঢাউস দোতলা সমান ঘড়ি বসানোর পরিকল্পনা এসেছিল। সন্দেহ নেই লোকটা বেরসিক।

তুমি যখন চমকে উঠে ঘড়ির গোল ডায়ালে বারোটার ঘরে পৌঁছতে ছোট বড় কাঁটা দুটোর তৎপরতা লক্ষ্য কর—স্বভাববশত তোমার মনে মনে একটা হিসেব এসে যায়। ভোর ছ'টায় বেরুতে হবে। অতএব তুমি দেখলে তোমার জীবনের সময়টুকু নির্ভুল অঙ্কে কষা। ঘরেই যেতে হয়। অর্থাৎ তুমি খেয়াল-খুশিমত কিছু করতে পার না। একটা আঙ্কিক নিয়মে চলতে হয়। কারণ তোমার দায় আছে। তুমি তা ভুলতে পার না!

কিন্তু ঐ মানুষটা। বারলাইব্রেরীর পাশ দিয়ে এক্ষুণি যে বেরিয়ে এলো। এসে দাঁড়াল হাড়-কাঁপানো শীতের নির্জন কুয়াশাচ্ছন্ন এই চার-রাস্তার মোড়ে।

মরণ! রসিকতা হচ্ছে। তুমি কান করে স্পষ্ট শুনলে। ও বলল।

তুমি কিছু বুঝলে না। তাই বোকার মত হেসে ফেললে।

সারাদিনের মধ্যে এই প্রথম হাসলে। মেঘলা দিনে একটুকরো রোদের মত। সকালবেলা নাকে-মুখে চারটি কোনরকমে গুঁজে স্টেশন থেকে প্রায় লাফ দিয়ে নির্দিষ্ট ট্রেনটি ধরা, অতঃপর বাস কিম্বা ট্রামে বস্তার আলুর মত গাদাগাদি হয়ে পনেরটা মিনিট কোনরকমে কাটিয়ে আপিসের দরজার সামনে এক সময় নেমে পড়া, এ্যাটেনডেন্সের খাতায় সই করা; আপিসে ছুটির পরও আরো পাঁচ ঘণ্টা ওভারটাইম, তারপর বাড়ি ফেরার চিন্তা, কাজেই... ...

ঠোঁটের ফাঁকে ঝুলন্ত হাসিটুকু ইলাস্টিকের মত টেনে তুমি বাড়তে সুরু করলে। একটা সীমায় এসে তা ছিড়ে গেল। আর তখনই তোমার মুখ কি বিশ্রী ভাবে কুঁচকে গেল। এ সব তোমার অর্থহীন মনে হল। পৌষের কুয়াশাচ্ছন্ন রাতে দ্যুতিময় একটি নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে; হাড়হিম শীতেও জীবনের একটা অর্থ পেতে পেতে-ও তা হারিয়ে ফেললে!

মানুষটার দিকে একপলক তাকিয়ে তুমি আবার ঘড়ির দিকে মুখ ফেরালে। বড় কাঁটাটা মিনিটের ঘর বদল করেছে। গতির তারতম্যে ছোট কাঁটাটাও ঘণ্টার একটি ঘর ছুঁতে চলেছে। জামার পকেট থেকে দ্রুত তুমি হাত বার করলে। নিজের ঘড়ি নির্ভুল মিলিয়ে নিতে চাইলে।

মাত্র পাঁচ মিনিট স্লো। কিন্তু তাতেই এমন একটি অব্যয় ধ্বনিত হল যেন, বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ঘটে গেছে!

ঘড়িটা তুমি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছ। বাবা মারা যাবার ক' মাস আগে দিয়ে গিয়েছিল। আশ্চর্য, এটাকে তুমি ফেলতে পার নি। সেই শিশুকাল থেকে অদম্য কৌতূহল ছিল তোমার। বাবার টেবিলে ঘড়িটাকে ছুঁতে কোন-দিনই সাহস করতে না। উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখতে। কি যেন বিরাট এক রহস্যকে ধরা আছে ঐ ছোট গোল বস্তুটির মধ্যে!

বাবার সঙ্গে মায়ের খিটিমিটি লাগতো। বাবার জন্যে অর্ধেক রাত জেগে বসে থেকে, শেষরাতে চোখের পাতা একটু মুড়তে না মুড়তেই পুবে পাড়ায় রোদ উঠে যেত। রাতে শুতে যাবার আগে ঘড়িটায় রোজ দম দিয়ে রাখতো বাবা। সকালবেলা উঠে আগে ঘড়ি দেখতো। তারপর দাড়ি কামাতে বসতো। তেল মাখতো। চান করতে যেতো। মা পেরে উঠতো না। ভাতে বসবার আগে বাবার সঙ্গে ভীষণ খিটিমিটি লেগে যেত।

এক-একদিন কান্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলতো বাবা। মা হয়ত ক'টা কথা বলেছে। এই সংসারে ঢোকা ইস্তক ঘানির মত ঘুরে চলেছি। আমাকে দুয়ে-মুয়ে নেবার জন্যেই ঘরে এনেছ!. বাবা ফোঁস করে উঠতো। আর আমি গতর পাত করছি কার জন্যে! মরার সময় থাকে না! রক্তপাত করছি বলে এখনো আছ। ভেসে যাও নি।

বাবাকে বড় নিষ্ঠুর মনে হোত। আর তার সব আক্রোশ, নিষ্ঠুরতা ছিল মা'-এর ওপর।

এই ঘড়ির জন্যে যে এত সব ঘটতো তা তুমি বুঝতে। কিন্তু এই ঘড়ির সঙ্গে বাবার জীবনের যোগসূত্রের রহস্য সেই বয়সটাতে তুমি বুঝতে পার নি।

কিন্তু এখন তো তুমি সব বোঝ। দুটি কাঁটা একটু এদিক ওদিক হয়ে গেলে কি অঘটন ঘটে, হাড়ে হাড়ে তোমার চেয়েও কে তা আর বোঝে!

এক বোনের বিয়ের দেনা শোধ করতে কিছুদিন আগে সাইকেল বেচেছ। তোমার সেই প্রাণে-ধরা প্রিয় সাইকেলটি দু'পাশে ধান ক্ষেত রেখে জি. টি. রোডের মসৃণ পিচের রাস্তায় উদ্দামগতিতে ছুটিয়ে দিতে। সময় বুঝি তখন তোমাকেই অনুসরণ করতো। তাই পৌষের কোন দুপুরে, সাইকেলটি পাশে নামিয়ে, শীতের মিঠে রোদ শরীরে নিয়ে মাঠের ওপারে আকাশ দেখতে কোন দ্বিধা থাকতো না। এই জি. টি. রোডে দাঁড়িয়ে আকাশে কত সন্ধ্যাতারা গুণেছ।

মাত্র ক'টা টাকার জন্যে সেই-সাইকেল বিক্রি করলে। আপিসে উপরি কাজ নিয়েছ। তবু এই ঘড়ি বিক্রি কর নি। করতে পার নি। ঘড়িটা খোয়াতে তোমার ভয় ছিল।

ঘড়ি মিলিয়ে তুমি দম দিয়ে নিলে। মনে মনে হিসেব কষে দেখলে আর কুড়ি মিনিটের মধ্যে বাড়ি পৌঁছতে পার—যদি আরো দ্রুত হাঁটতে থাক। চাদরটা কোমর থেকে তুলে বুকে জড়িয়ে নিলে তাই। হাতের তেলো দু'টি বারকয়েক ঘষে নিয়ে; বুকে-নতুন করে দম ভরে আবার প্রস্তুত হলে।

তখনই তুমি তাকে আবার দেখলে। তোমাকে ভ্রুক্ষেপ না করেই সে ততক্ষণে একটু এগিয়ে গেছে। মনে মনে হাসলেই

ও ধরণের ইন্ফিরিয়রিটি কম্প্লেক্স তোমারও আছে। এই তো কিছুদিন আগে তোমার এক বন্ধু সিনেমার সামনে দাঁড়িয়ে তোমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলো। বন্ধুটি ডান্লপে কাজ করে। প্রতি হপ্তায় মোটা টাকা ঘরে তোলে। টেরেলিনের জামা পরে। সিনেমা দেখে। রবিবারে লেঠু সেনের দোকানে বসে কোর্মা ওড়ায়। তুমি তার ডাকে সাড়া দিলে না। না দেখার ভান করে চলে গেলে। এমন তো প্রায়ই কর।

ওর এই ভ্রূক্ষেপহীনতায় তাই হাসলে। বিশ্বাস করতে পারলে না ও তোমায় দেখে নি। তোমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে একেবারেই অসচেতন।

হঠাৎ কি বদ খেয়াল চাপলো। তুমি যা কর নি, তাই করলে। একটু মজা পাবার জন্যে মানুষটার কাছে কাছে এগিয়ে এলে। অগ্রবর্তী দু'টি পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে থাকলে।

মানুষটা আকাশে তারা দেখছে। যেমন করে একদা নির্জন জি. টি. রোডে দাঁড়িয়ে তুমি মেঠো তারা দেখতে। দেখতে, গুণতে। এবং একটা উজ্জ্বল তারার মুখ চিন্তা করতে। তোমার বুকের কাছে হৃদয় ছুঁয়ে থাকত একগুচ্ছ ফুল—যা তুমি রেল-ব্রীজের ওপারে নাম-না-জানা এক গাছ থেকে চয়ন করে আনতে।

তুমি দাঁড়িয়ে পড়লে। কারণ সেও দাঁড়িয়ে পড়েছে।

হাসপাতাল পেরিয়ে এসেছে। রাতের নির্জনতা এখানে আরো গভীর। রাস্তার আলোগুলো কুয়াসায় ম্লান। তুমি আর ও ছাড়া কোন জাগ্রত প্রাণীর অস্তিত্ব নেই। পৃথিবীর কোন কোন জায়গায় এই নির্জনতা নামে। তুমি ভাবলে মানুষটা দাঁড়ালো কেন। হয়তো ওর কোমরের কষি আল্গা হয়ে গেছে। কিম্বা চটির কোন অংশের বিচ্যুতি ঘটেছে। যা তোমার মাঝে মাঝে হয়।

এতখানি পথ হেঁটে এসেছ। প্রায় এক মাইল পথ। একটা কথাও তোমরা বল নি। এমন কি কোন স্বগতোক্তিও কর নি। তুমি ভাবলে কোন মানেই হয় না। মজা করার ইচ্ছেটা এখন আর নেই। এখন তোমার কথা বলতে ইচ্ছে করল। জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করল—রোজ এই গাড়িতে ফেরেন বুঝি? সকালে ক'টায় বেরোন? ন'টা সতের? বেশ মজায় আছেন, মশাই। আমাকে ছ'টার মধ্যেই বেরুতে হয়।

মনে মনে একটা উত্তর-ও খাড়া করে নিলে। ঐটুকুই সুবিধে মশাই। রাতে ত ফেরার ঠিক থাকে না। আর বলবেন না! অতবড় একটা সংসারের দায়িত্ব ঘাড়ে এসে পড়েছে। বাজারে ধার-দেনা হয়ে গেছে!......

তুমি হাঁচলে। হেঁচেই মানুষটার দিকে আবার তাকালে। এবার তোমার কেমন সন্দেহ হ'ল। মানুষটা কালা হতে পারে তো। চোখেও কম দেখে। বোবা হওয়াও বিচিত্র নয়। কিন্তু অমন করে দাঁড়িয়ে রইলো কেন—এই ঠান্ডায় একটু দাঁড়ালেই যখন রক্ত জমে যাবার যোগাড় হয়! ভাবতে গিয়ে আর এক সন্দেহ চাবুকের মত তোমার চেতনায় আঘাত করল।

বুক পকেটে তুমি হাত ছোঁয়ালে। মুঠো করে ধরলে। অন্যদিন তোমার পকেটে কিছু থাকে না। আজ তোমার পকেট গরম। এক মাসের পুরো মাইনে, তার সঙ্গে উপরি রোজগারের টাকাটাও আছে।

টাকাটা পাওয়া মাত্রই হিসেব করে নিয়েছিলে। কার ঘরে কত যাবে।

শেষ বিয়োগফলের দিকে তাকিয়ে খুবই মুষড়ে পড়েছিলে। একজনের ঋণ শোধ করতে গিয়ে আর একজনের কাছে ঋণ তোমাকে করতেই হবে। কারণ এক সংসারের ভর্তা তুমি। তোমার বুড়ি-মা তোমার মুখ চেয়েই বসে আছে।

ও ঠিক জানতে পেরেছে। তোমার পকেট ভারী। করকরে অনেকগুলো টাকা আছে। কালা বোবা ভালো মানুষটি সেজে তাই এতটা পথ অনুসরণ করে আসা। তাই এত নিস্পৃহ নিরাসক্ত ভাব। বেড়াল তপস্বী! আসলে তুমি মতলব ভাঁজছিলে। তেমন সুবিধে পাও নি বলে এতটা পথ ভালোমানুষের মত এসেছ। এবং শেষকালে এখানে এসে, এই নির্জন জায়গায়, অন্ধকারে......হায় ঈশ্বর তোমার মনে এই মতলব ছিল নাকি! টাকাগুলো তুমি মুঠোর মধ্যে পুরে নিলে। প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিজের মধ্যে একটু স্থির হলে। প্রথমে কি করতে পারে? তোমার পেছনে নেই ও। ওর সম্বন্ধে এখন তুমি খুবই সচেতন। তাই অতর্কিত আক্রমণের সম্ভাবনা নেই। ওকে সামনে দিয়েই আসতে হবে। এবং তাই যদি আসে খুব সহজে তোমাকে কাবু করতে পারবে না। এই মুহূর্তে তোমার মনে পড়ে গেল, একদা পাড়ায় একটি ব্যায়ামাগার তুমিই প্রতিষ্ঠা করেছিলে। আর কিছু না হোক, আধমণি একটি বার্বেল ছ' মাস নিয়মিত সেখানে তুলেছিলে। হুগলি-নদীটা একবার সাঁতরে পেরিয়ে আসা এমন কিছু শক্ত ব্যাপার ছিল না তোমার কাছে।

কিন্তু ওর কাছে যদি অস্ত্র থাকে? ওর দলের লোক যদি আশেপাশে লুকিয়ে থাকে?

তুমি ওর মতলব বুঝতে চাইলে। তোমার উত্তর-দক্ষিণ তাকিয়ে নিয়ে, পুবের দিকে মুখ ফেরাতে তুমি আর এক ধাক্কা খেলে। তুমি খেয়াল কর নি, সামনেই ইউক্যালিপ্টাস্ গাছটা। অতি দীর্ঘ মসৃণ গাছ। গাছের শীর্ষে নিটোল রুপালী ডিমের মত চাঁদ।

তুমি খেয়াল কর নি, কুয়াসার মধ্যে যে অস্পষ্ট আলো—তা ঐ চাঁদের। পৌষের হিমশীতল চরাচরে জ্যোৎস্নার নিঃশব্দ স্রোত বয়ে যাচ্ছিল! কুহকিনী রাতের ছলনায় তুমি ভুললে না। বাস্তব সংসার তোমায় পোড় খাইয়ে দিয়েছে। তোমার অনুভূতি এখন সজাগ। না, তুমি আর ভুল করছ না। কারণ তোমার দায় আছে। তোমার বুড়ি-মা তোমার পথ চেয়ে বসে আছে।

হায় ঈশ্বর মানুষটা নড়ে না কেন! ওর পাশ দিয়ে সন্দিগ্ধ মন নিয়ে ওকে অতিক্রম করে এলে। নিরাপদ দূরত্বে এগিয়েও এসেছ। সামনেই কিছু দূরে একটা দোকান খোলা দেখতে পেয়েছ। তোমার পরিচিত দোকান। এখন সেই ভয় নেই। আর কিছুদূর এগুলেই তো তোমার এলাকা এসে পড়বে।

সাহস সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার কৌতূহল জাগল। আবার সেই মজায় পেয়ে বসল। তুমি তাই আবার দাঁড়ালে। এবার সামনে থেকে ওকে দেখতে চেষ্টা করলে।

হে ঈশ্বর! আমার বাম কলিজায় আঘাত কর! ও যে চাঁদের দিকে চেয়ে! ওকি নিজেই ষড়যন্ত্রের মধ্যে পা দিল! তুমি ওকে সতর্ক করতে চাইলে। ওর

কাঁথি

পি, টী, সার্ভে স্কুল

গভঃ রেজিস্টার

এই স্কুল ১৯০৯ সাল হইতে নিয়মিত চলিয়া আসিতেছে— শিক্ষা ও ভাবিফল সবই ভাল; বহু পাস করা ছাত্রগণ গভর্ণমেণ্ট অফিসে, নানা প্রজেক্টে ও সেটেলমেণ্টে নিযুক্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন। জানুয়ারী সেসন জন্য ২৫।১।৬৭ তাং পর্যন্ত ছাত্র ভর্তি নেওয়া হইবে।

১৯৬৮ সালে পশ্চিম বাংলায় সেটেলমেণ্ট কার্য আরম্ভ হইবে।

১৫ পঃ খাম সহ লিখিলে, প্রসপেকটাস পাঠান হইবে।

হেডমাস্টার
পি, টী, সার্ভে স্কুল
পোঃ কাঁথি, মেদিনীপুর

নিশ্চয়ই একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। যে সময়ের মধ্যে ওকে পৌঁছতেই হবে।

তুমি ওর দিকে এগিয়ে এলে। ওকে কিছু বলার আগেই ও হাঁটা সুরু করে দিল। তোমাকে আবার অতিক্রম করে গেল। তুমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে।

দোকানের সামনে এসে ও আবার দাঁড়াল। তুমিও দাঁড়ালে। এবার তুমি ওকে স্পষ্ট দেখলে। মোজার সঙ্গে টায়ারের চটি। খয়েরী রঙ-এর কোট। সবুজ মাফলার।

কি কিনবে? এক খিলি পান, দু' পয়সার নস্যি, না কড়া একটি চারমিনার? চাদরের ভেতর থেকে দুটো হাত বেরুল। ওর এক হাতে কিছু বই, আর ডায়েরী—যা তোমার লক্ষ্যের অগোচরে ছিল। ও হাত বাড়াল। তুমি তীক্ষ্ন নজর রাখলে।

হা ঈশ্বর! এই ব্যাপার! চাঁদের আলোর দিকে চেয়ে তুমি তাহলে এতক্ষণ নিজের ঘরের অন্ধকারের কথা ভাবছিলে! মোমবাতি না কিনলে তোমার ঘরে আলো জ্বলবে না। কারণ তোমার ঘরে কেরোসিন নেই। বাজারে লাইন দিয়ে তেল কেনার অবসর নেই। কিম্বা কালই ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানীর লোক এসে তোমার বাড়ির কানেক্‌শন কেটে দিয়ে গেছে। বিলের টাকা যোগাতে পারছ না।

তুমি হাসলে। সেই টুক্‌রো নিঃশব্দ হাসি। এবং হাসিটা ইলাস্টিকের মত টেনে বাড়াতে লাগলে। কিন্তু তা একটা সীমায় পৌঁছে ছিঁড়ে গেল।

ও গান ধরল। আজ জোছ্‌না রাতে সবাই গেছে বনে, বসন্তের এই মাতাল সমীরণে—

জোছনা রাত সন্দেহ নেই, কিন্তু কালটা যে বসন্ত নয় তা হাড়ে মজ্জায় টের পাচ্ছ। উত্তুরে হাওয়া দিতে সুরু করেছে। বরফের মত রক্ত জমে যেতে চাইছে।

হা ঈশ্বর! ওযে গেয়েই চলেছে! শরীরটাকে যদি নিতান্তই গরম করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, ও অন্য গান গাইলে পারতো। কেন এই গান গাইলো!

আমি জানি, এই গান তুমি একদা গাইতে। নির্জন জি. টি. রোড তখন জ্যোৎস্নার প্লাবনে ভরে থাকতো। তোমার বুকের কাছে হৃদয় ছুঁয়ে থাকতো একগুচ্ছ ফুল। তারার দিকে চেয়ে তুমি গান গাইতে। সেদিন তারা তো তোমার পাশে পাশে হাঁটতো। চৈত্রের হাওয়ায় শাড়ির আঁচল তার উড়তো। বসন্তের এই গান গাইতে গাইতে তোমরা জ্যোৎস্নার শরীরে মিশে যেতে চাইতে।

তুমি কপাল কোঁচকালে। বিরক্ত হলে। অবশেষে কানে আঙুল দিলে। আশ্চর্য। তবু ঐ সুর শুনতে পাচ্ছ। ওকে তুমি থামিয়ে দিতে চাইলে। এবং সেইরকম এক সঙ্কল্পে তুমি চোখ-কান খুলে এক প্রচন্ড চিৎকার করতে উদ্যত হচ্ছিলে। এবং তখনই তুমি লক্ষ্য করলে তোমার নাগাল পেরিয়ে মানুষটা বহুদূর চলে গেছে। তুমি বিশ্বাস করতে পারলে না। তাহলে কে এতক্ষণ গানটা গাইছিল!

তুমি ছুটে ওকে ধরতে চাইলে। পারলে না। তুমি তোমার নির্দিষ্ট সীমারেখায় এসে পৌঁছেছ। ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজলো। সামনেই তোমার বাড়ি।

খাদ্যচিত্র

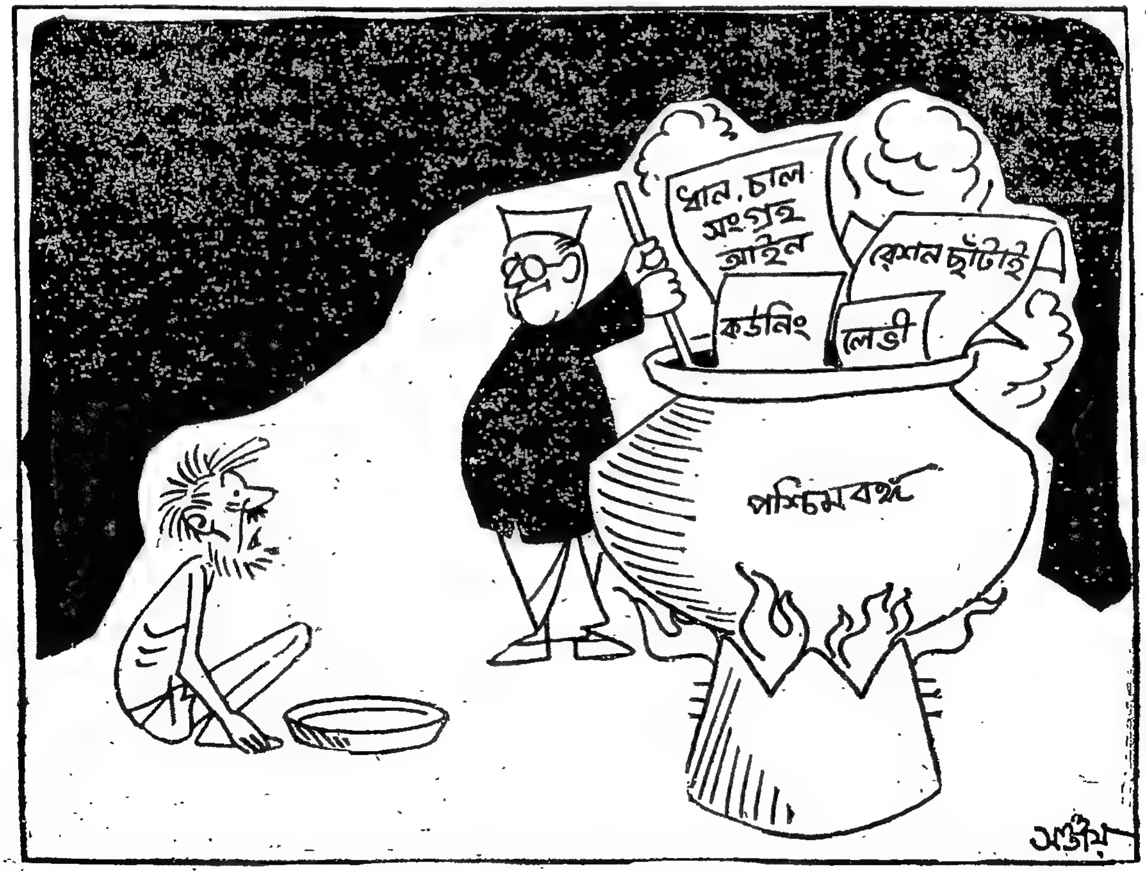

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

সাধারণের মাঝে অসাধারণ

অযাচিতভাবে স্বদেশ রায় গণেশের বাসায় হঠাৎ এল। হরিপদ মহাজন সেই সময় পাহারা ছেড়ে একটুক্ষণের জন্য ভেতরে জল খেতে গিয়েছে আর সেই ফাঁকে রোজ যেমন আসে তেমনি স্বদেশ এসেছে এবং কোন বাধা না পেয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছে। হরিপদর একটু গাফিলতির জন্য এইরূপ একটা অবাঞ্ছনীয় ঘটনা ঘটে গেল। আমরা অবশ্য নানা কথা ভেবে স্বদেশকে ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার সুযোগ দিলাম। স্বদেশ হয়ত শত অভিমান বুকে চেপে চলে গেল। তবু আমাদের মন থেকে অশুভ চিন্তা একেবারে দূর হয় নি—পুলিশ-লাইনে যাওয়ার জন্য ট্যাক্সি এসে পৌঁছবার আগে যদি পুলিশ এসে হানা দেয়! বিচার করে দেখলে পুলিশ এসে পৌঁছানোর কোন সম্ভাবনাই ছিল না—তবু সেই অশুভ চিন্তা থেকে আমরা রেহাই পাই নি।

এই বিভ্রাটের মূল দায়িত্ব হরিপদ মহাজনের—সে যদি তার পোস্টে হাজির থাকত তবে নিষেধ করলে স্বদেশ তো আর ঘরে ঢুকত না! হরিপদ তার ত্রুটি বুঝতে পেরে নিজেকে অপরাধী ভেবে একেবারে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। যারা একসঙ্গে প্রথম আক্রমণকারী দলে যাবে তাদের মধ্যে যদি একজনও অবসাদগ্রস্ত বা নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে তবে তার প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া দলের অন্যদের ওপর প্রতিফলিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেই কারণে হরিপদ মহাজনকে তার অমার্জনীয় ত্রুটির জন্য আমরা কোন প্রকার তিরস্কার করি নি। বরঞ্চ তার অপরাধী মনোভাবকে দূর করবার জন্য তাকে উৎসাহ দিয়ে বলেছি—"ভুল মানুষের হয়। ভুল বুঝে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হওয়া কর্তব্য। তুমি তোমার ত্রুটি বুঝতে পেরেছ, তাই যথেষ্ট। এখন এইভাবে মনমরা হয়ে থাকবে কেন? অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের আক্রমণ করতে হবে। সর্বতোভাবে প্রস্তুত হতে হবে। Cheer up!"

এমনিভাবে হরিপদকে তাতিয়ে তুললাম। সবাই এখন উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি—কতক্ষণে হিমাংশু ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে আসবে! নিখিল বঙ্গ মুসলিম্ কন্‌ফারেন্সে প্রায় সব ট্যাক্সি আগে থেকে বিভিন্ন নেতার জন্য বা কন্‌ফারেন্সের কাজে নিযুক্ত হয়ে গেছে। চট্টগ্রামে ১৯৩০ সালে সর্বসাকুল্যে পঞ্চাশটি ট্যাক্সি ছিল কিনা সন্দেহ। কাজেই ট্যাক্সি যদি পাওয়া না যায় তবে অবাক হবার কিছু ছিল না। কিন্তু যে কোন ভাবে ট্যাক্সি একটি পাওয়া যাবে না তাও যেন ভাবতে মন চাইছিল না।

প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের দারুণ উৎকণ্ঠায় কাটছিল। স্থির থাকতে পারছিলাম না। এক একবার রাস্তার ওপর গিয়ে দাঁড়াচ্ছি আর একদৃষ্টে দূর পথের দিকে চেয়ে দেখছি, যদি কোন মোটরের আলো দেখতে পাই। প্রতিবার নিরাশ হয়ে ফিরে ঘরে এসেছি। দেখতে দেখতে সময় চলে যাচ্ছে। প্রায় সাড়ে ন'টা বাজতে চলল। এখনও হিমাংশুর দেখা নেই—ট্যাক্সিরও কোন খবর নেই। আমাদের বলা ছিল হিমাংশু যদি শেষ পর্যন্ত ট্যাক্সি নাও পায় সে যেন একটি ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে চলে আসে। বলা হয়েছিল সাড়ে ন'টার মধ্যে তাকে ফিরে আসতেই হবে। আমাদের আক্রমণের 'জিরো আওয়ার' রাত দশটা। তাই সাড়ে ন'টা নাগাদও যদি ট্যাক্সি না পাই তবে আমাদের ঘোড়ার গাড়িতেই রওনা হতে হবে। এখন সাড়ে ন'টা বাজতে মাত্র কয়েক মিনিট বাকি।

এই ক'টি মুহূর্ত যেরূপ উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা নিয়ে কাটিয়েছি জীবনে সেরূপ অভিজ্ঞতা আর কখনও হয় নি! কে বুঝবে বা কি করে বোঝাব তখন আমাদের উৎকণ্ঠার পরিধি কতখানি ও কত গভীর! বিয়ের লগ্ন যখন পেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, আর তখনও যদি বর এসে পৌঁছানোর সংবাদ পাওয়া না যায় তবে কনের পিতার মানসিক অবস্থার কথা চিন্তা করুন! এটা তো একটি সামান্য বিয়ে! পিতার অস্থিরতা—লগ্ন পেরিয়ে যাচ্ছে এই যা! লগ্ন পেরিয়ে গেলেও আর একটি লগ্নে বিয়ে হবে। আমাদের কিন্তু এই লগ্নটি পেরিয়ে গেলে সমূহ বিভ্রাট। যুগপৎ একসঙ্গে আক্রমণ হবে রাত দশটায়। একবার সময় পরিবর্তন করেছি—সবাইকে বলা হয়েছে আক্রমণের পূর্বে দেখা হওয়ার আর প্রয়োজন নেই, যে যার নির্দিষ্ট কাজ করে যাবে—আক্রমণ করা হবে রাত দশটার সময়। এইরূপ অবস্থায় পুলিশ-লাইন আমাদের দশটার সময় আক্রমণ করতেই হবে। এই লগ্নটি বয়ে গেলে আর ফিরে পাওয়া যাবে না। লগ্ন বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে কনের বাবার যেমন উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতার সীমা-পরিসীমা থাকে না, সেই অনুপাতে বিচার করে দেখলে বোঝা যাবে কতখানি অস্থিরতার মধ্যে আমরা ছিলাম—কতখানি ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রতিটি সেকেন্ড গুণেছি।

দু-তিন মিনিটের বেশি বাকি নেই। আধ ঘণ্টা আগে ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে না গেলে সময় মত পৌঁছান যাবে না। হিমাংশু কি তবে একটা ঘোড়ার গাড়িও পাচ্ছে না? কি আশ্চর্য? মোটর বা ঘোড়ার গাড়ি না পাক হিমাংশু তো চলে আসবে! আমরা সাড়ে ন'টার পর আর এক মিনিটও অপেক্ষা করব না। হিমাংশু আসুক আর নাই আসুক, ঘোড়ার গাড়িও যদি পাওয়া না যায় তবু আমরা সাড়ে ন'টায় পায়ে হেঁটেই রওনা হব স্থির করলাম।

আমরা রওনা হবার উপক্রম করছি এমন সময় মনে হ'ল যেন মোটরের লাইট দেখা যাচ্ছে। রাস্তাটা একটু বাঁকা তাই এক ঝলক আলো যেন চোখে পড়ল তারপর

আবার হারিয়ে গেল। মোটরের আলো নাও হ'তে পারে। তবে কি মোটর আর পাওয়া গেল না! হিমাংশু এল না! এক সেকেন্ডও নয়—এরই মধ্যে কত কি ভেবে ফেল্লাম। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আবার মোটরের হেড্লাইট দেখা গেল। মনে আশা হ'ল, হিমাংশু নিশ্চয়ই ট্যাক্সি নিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে আবার মনে হ'ল যদি না হয়? মাত্র পনেরো-কুড়ি সেকেন্ডের ব্যবধান—তারপরই সন্দেহভঞ্জন হবে মোটর গাড়িটি কার। তবু এই অল্প সময়ের মধ্যেই এইরূপ আশা-নিরাশার মানসিক প্রতিক্রিয়া হ'তে লাগল।

একেবারে ধৈর্যের শেষ সীমায় যখন পৌঁছেছি তখন আমাদের এতক্ষণের আশা-নিরাশা, উৎকণ্ঠা-অস্থিরতা-ব্যাকুলতা প্রভৃতির সমাপ্তি ঘটিয়ে একটি ট্যাক্সি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। হিমাংশুই ট্যাক্সি থেকে নেমে সোজা ঘরের ভেতর গেল। আমাদের হাতে সময় একেবারে নেই। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে কোথায় বেঁধে রাখব সেই চিন্তা অনেক আগেই করে ফেলেছিলাম। হিমাংশুকে বললাম ড্রাইভারকে ঘরে ডেকে আনতে—"বাবুরা তোমার সঙ্গে ভাড়া নিয়ে কথা বলতে চান। বেশিক্ষণের জন্য তোমার ট্যাক্সি তাঁরা ভাড়া করবেন। তুমি একটু ভেতরে এস"—হিমাংশুর কথা শুনে সরল বিশ্বাসে ট্যাক্সি-চালক ঘরের ভেতরে ভাড়া নিয়ে কথা বলতে ঢুকলো। যেমনি দরজার মধ্যে সে পা বাড়াল, একজন পাশ থেকে এসে ড্রাইভারের বাইরে পালাবার পথ রুদ্ধ করে দরজা আটকে দাঁড়াল। আর একজন তাকে ভেতরের কামরায় অনুসরণ করতে ইঙ্গিত করল। দু'জনকেই খাকি মিলিটারী ইউনিফর্মে দেখতে পেয়ে ও তাদের চালচলন লক্ষ্য করে ড্রাইভার ঘরে ঢুকতে ইতস্তত করছিল। কিন্তু তার ফিরে যাওয়ার পথ একেবারে রুদ্ধ। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেচারা ড্রাইভারকে নির্দেশ মানতে হ'ল।

দ্বিতীয় কামরায় ঢোকার মুখেই গণেশ ও আমি ড্রাইভার সাহেবকে "অভ্যর্থনা" জানালাম। আমাদের উপায় ছিল না, কঠোর কর্তব্যের তাগিদে ড্রাইভারকে বেঁধে রেখে ট্যাক্সি নিয়ে চলে যেতে হবে। বড় রাস্তার ওপর গণেশের দোকান। ড্রাইভার যদি অসম্ভব জেনেও ভয়ে পালাতে চেষ্টা করে বা ধস্তাধস্তি অথবা চেঁচামেচি সুরু করে দেয় এবং সেই ক্ষেত্রে অনিচ্ছাসত্ত্বেও যদি পিস্তলের আওয়াজ হয়ে যায় তবে আমাদের পক্ষে তা' খুবই অপ্রীতিকর হবে। কারণ, গোলমাল শুনে পথচারীরা যে ছুটে আসবে না তা' কে বলতে পারে? এইরূপ বিভিন্ন অনিশ্চয়তা ও প্রতিকূল অবস্থার সম্ভাবনা মনে রেখে অতীত অভিজ্ঞতার শিক্ষা অনুযায়ী ড্রাইভারকে সহজে বশ করা ও বেঁধে রাখবার কৌশল প্রয়োগ করি।

গণেশ ও আমার ইউনিফর্মের বিবরণ আগেই দিয়েছি। বুট, লেগিং, ক্রস্ বেল্ট, মাথায় হেলমেট আর আমাদের দু'জনের হাতে দু'টি গুলীভরা রিভলভার—আঙুল ট্রীগার স্পর্শ করে আছে। আমাদের এই মূর্তি দেখে যে কোন নিরীহ লোক তার জীবন-সংশয় মনে করে ভীষণ ঘাবড়ে যেতে বাধ্য। কিন্তু যদি রিভলভার নিয়ে লাফিয়ে ড্রাইভারের ওপর পড়তাম তবে সে চীৎকার, চেঁচামেচি করে বিভ্রাট ঘটাত বা তাকে মেরে ফেলা হবে মনে করে একেবারে মরীয়া হয়ে আত্মরক্ষার জন্য যে-কোনরূপ প্রতি-আক্রমণ করে বসত। সেই-রূপ মনস্তাত্ত্বিক কারণে আমরা আমাদের রিভলভারের মুখ তার বুক লক্ষ্য করে ধরি নি।

ড্রাইভার আমাদের দেখেই হাঁপাতে লাগল। প্রায় চার হাত দূরে দাঁড়িয়ে রিভলভারের মুখ একেবারে অন্য দিকে ঘুরিয়ে ধরলাম—তাকে মারবার বা আহত করবার ইচ্ছে যে আমাদের একেবারেই নেই তা' প্রথমেই বুঝিয়ে দিলাম। ডান হাতে রিভলভারটি ধরেছি আর বাঁ হাতের আঙুল ঠোঁটের ওপর চেপে রেখে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলাম—"চুপ, চিৎকার করো না।"

তারপর পিস্তলটির মুখ অন্য দিকে রেখে সেটিকে হাতের ওপর ধীরে ধীরে নাচাতে লাগলাম এবং চট্টগ্রামের ভাষায় বললাম—

"ইয়ান কি দেখ্যস্ নি মিঞা?" (এটা কি দেখেছিস্) ড্রাইভার কাঁপতে কাঁপতে বলছিল—"হঃ বাউ, হঃ বাউ!" (হ্যাঁ বাবু, হ্যাঁ বাবু) তারপর তাকে সম্মোহিত করে ফেলার জন্য বলি—"আঁরে চিন্যস্ নি, আঁই কন্? আঁর নাম জানস্ নি? অনন্ত সিংহর নাম হুন্ন্যস্ নি? আঁই অনন্ত সিং!" (আমাকে চিনেছিস্ আমি কে? আমার নাম জানিস্? অনন্ত সিংহের নাম শুনেছিস্? আমিই অনন্ত সিং!)। আমার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে তার মুখ থেকে কলের পুতুলের মত আপনা থেকে প্রতিবার বেরিয়ে আসছিল—"হঃ বাউ, হঃ বাউ!" তার চোখ একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, হাত দুটি কাঁধ থেকে সোজা নিচে ঝুলছে—যেন একটুও জোর নেই, ঘন ঘন নিঃশ্বাস বইছে, পা দুটি থর থর করে কাঁপছে—যেন এখনই সে পড়ে যাবে।

ড্রাইভারকে অভয় দিয়ে সেইরূপ দেশীয় ভাষায় আবার বললাম, যার অর্থ এই—"তোমার কোন ভয় নেই—কোন ভয় নেই। তোমাকে আমরা মারব না—একটু আহতও করব না। তুমি আমাদের ভাই। তোমাকে কষ্ট দিচ্ছি বলে খুব দুঃখ হচ্ছে। তোমার সঙ্গে যদি আগে জানা থাকত, তোমাকে যদি বিশ্বাস করতে পারতাম তবে এইটুকু কষ্টও দিতাম না।"

আমার কথার ফাঁকে ফাঁকে সে কেবল "হঃ বাউ, হঃ বাউ" বলে চলেছে। তারপর তাকে আমাদের আসল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বললাম—

"দেখ ভাই, আমরা ডাকাতি করতে যাচ্ছি। তোমার গাড়ি আমরা নিয়ে যাব। তোমাকে বিশ্বাস করে ছেড়ে দিতে পারছি না—যদি তুমি পুলিশে খবর দাও তাই তোমার হাত-পা বেঁধে রেখে যাব। আমরা ফিরে এসে তোমাকে ছেড়ে দেব—গাড়িও তুমি ফেরৎ পাবে। আর আমরা তোমাকে অনেক টাকাও দেব।" সে কি শুনেছে না শুনেছে বলা কঠিন। মোটামুটি সে বেশ বুঝেছে যে তাকে আমরা প্রাণে মারব না কিন্তু তার গাড়ি নিয়ে ডাকাতি করতে যাব এবং তাকে বেঁধে রেখে যেতে চাই। এতক্ষণে হয়ত সব অবস্থাটা সে বুঝতে পারল। প্রাণে মারা হবে না জেনে মৃত্যুভয় থেকে পরিত্রাণ পেল। সে যেন এখন অনেকটা শান্ত। তক্ষুণি আবার চট্টগ্রামের ভাষায় বলি—"আঁরা আর দেরি করিৎ ন পারিব। চল ভাই চল—এই ঘরৎ আস্তক।" (আমরা আর দেরি করতে পারছি না। চল ভাই চল—এই ঘরে এস)। সে মন্ত্রমুগ্ধের মত পাশের ঘরে এল। তারপর আমাদের শেষ ইচ্ছা তাকে জানালাম—"তুই এডে হুতি পড়।" (তুমি এখানে শুয়ে পড়) কাঁপতে কাঁপতে সে মেঝেতে শুতে যাচ্ছিল। বিধু একটা মাদুর বিছিয়ে দিল। ঘর থেকে একটা বালিশও এনে তাকে দেওয়া হ'ল। সে জল খেতে চাইল। আমরা তাকে জল দিলাম। তারপর বললাম—"ভাই তোমার হাত-পা আমরা বাঁধব!" সে বুঝেছিল এই শেষ কাজটি না করে আমরা ছাড়ব না। কোন আপত্তি না করে সে তার দুটি হাত বাড়িয়ে দিল। তার হাত-পা বেঁধে এবার আমরা রওনা হব।

সাড়ে ন'টা বেজে দু-এক মিনিট বেশি হয়ত হয়েছে। যাওয়ার সময় ছ' জোড়া বুটের আওয়াজ আমাদের ফিল্ড হেড-কোয়ার্টারটি (গণেশের দোকান) কাঁপিয়ে তুলল। পদধ্বনি শুনে আমাদের এই নিরীহ ড্রাইভারটি বুঝল এবার আমরা আমাদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে চলেছি। ড্রাইভারকে উদ্দেশ্য করে চেঁচিয়ে বললাম—"দেখ, পালাবার চেষ্টা করো না। যদি পালাতে চাও তবে গুলী করা হবে। বিধু তুমি পাহারায় থাক। যদি পালাতে চেষ্টা করে তবে তাকে গুলী করবে।"

এই সমস্ত কাজ—অর্থাৎ ড্রাইভারকে

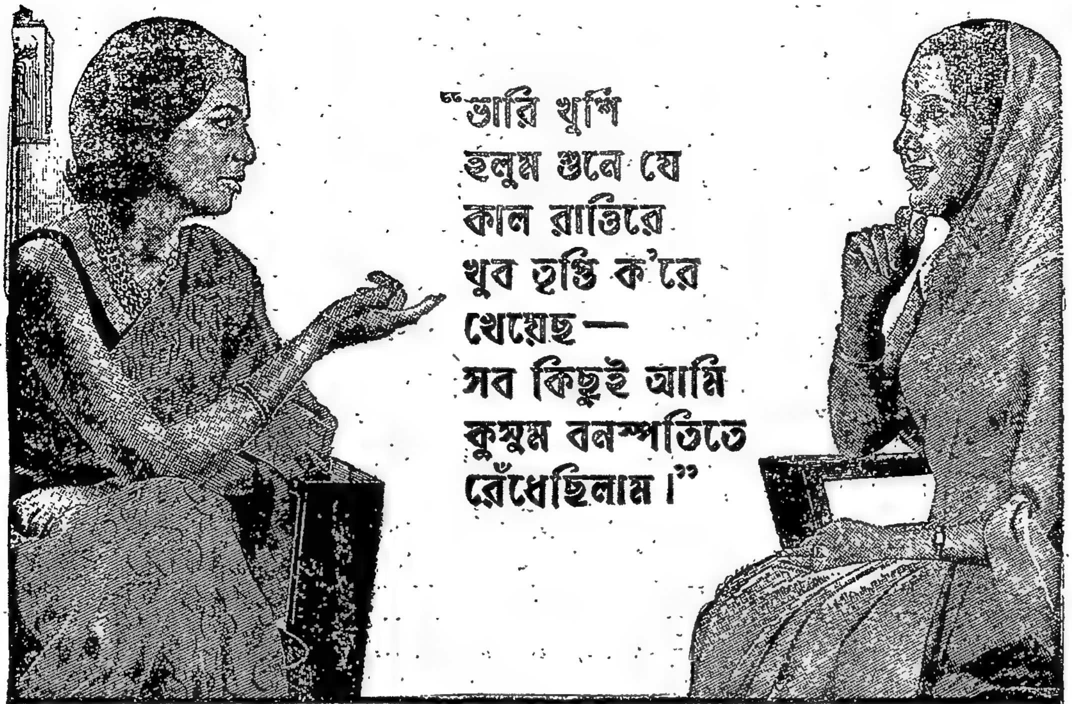

"বলতে চাও লুচি, তরকারি···সব কিছুই ?"

"হ্যাঁ ভাই, এমন কি মিষ্টি খাবারগুলোও। দেখ্ মালা, রাঁধবার পক্ষে কুসুম সত্যিই খুব ভালো। যেমন টাটকা, তেমনি খাঁটি। ২-কেজি ৪-কেজির সীল-করা টিনেই পাওয়া যায়। আনতে-নিতেও খুব সুবিধে।"

"শুনে আমার লোভ হচ্ছে। কুসুম কিনে দেখতে হবে তো!"

"দেখিস। তোর রান্নার স্বাদ দেখবি আগের চেয়ে আরও ভাল হয়ে গেছে।"

কুসুম বনস্পতি 'এ' আর 'ডি' ভিটামিনে সমৃদ্ধ। এর উৎকর্ষ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, কারণ কুসুম বনস্পতি উৎপাদনের প্রত্যেকটি স্তরে ল্যাবোরেটারীতে পরীক্ষিত। স্বাস্থ্যসম্মত রীতিতে টিনে ভ'রে কারখানায় সীল করা হয়। সব জায়গায় টাটকা পাবেন।

খাঁটি স্বাদ পেতে হ'লে
কুসুম
বনস্পতি দিয়ে রাঁধুন

কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড
কলিকাতা-১

JWTKPK-2964A

psychologically বশ করে বেঁধে রেখে রওনা হওয়া পর্যন্ত—দু' মিনিটের বেশি সময় লাগে নি। এই বর্ণনা পড়তে যতক্ষণ সময় লাগবে তার চাইতে অনেক কম সময়ে আমরা এই সামান্য কাজটি শেষ করেছিলাম।

ড্রাইভারের কাছে আমার নাম প্রকাশ করাটা ষড়যন্ত্রমূলক কাজের পরিপ্রেক্ষিতে হয়ত মনে হবে নীতিবহির্ভূত হয়েছে। গণেশের নিজের বাড়িতে ড্রাইভারকে বেঁধে রাখা; অকেজো বন্দুক সব বাড়িতে ফেলে যাওয়া; বাড়ির গাড়ি ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করতে ব্যবহার করা; সদরঘাট ক্লাবের বাছাই-করা সব ক'টি ছেলের একসঙ্গে অন্তর্ধান, প্রভৃতি ব্যাপার আপাতদৃষ্টিতে ষড়যন্ত্রমূলক কাজের পরিপ্রেক্ষিতে নীতিবহির্ভূত বলে মনে হওয়া খুব স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতীয় গণতন্ত্রবাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার ষড়যন্ত্রমূলক কাজের গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজন ছিল আক্রমণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। যুব-বিদ্রোহের পর আমাদের গোপনীয়তা রক্ষার কোন অভিপ্রায় ছিল না—ভারতবাসীকে তখন জানাবার প্রয়োজন মনে করেছিলাম যে আমরাই সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে যুবক-সেনাবাহিনী গঠন করে সশস্ত্র বিদ্রোহ করেছি। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে যখন "খণ্ডযুদ্ধের রণকৌশল" অনুসরণ করি তখন আবার কোন চিহ্ন বা প্রমাণ না রেখে বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রমূলক কাজ করবার নীতি ও কৌশল নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছি।

ড্রাইভারকে যত কম কষ্ট দিয়ে তার গাড়িটি নিয়ে যেতে পারি সেই উদ্দেশ্যে আমার নাম বলে তাকে সম্মোহিত করেছি। যেভাবে তার সঙ্গে প্রথম থেকে আমরা ব্যবহার করেছি তাতে সাময়িকভাবে তাকে সামান্য কষ্ট দিলেও সে আমাদের ওপর একেবারে অসন্তুষ্ট হয় নি। তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি আমাদের মামলার সময়। সে আমাদের কাউকে সনাক্ত করে নি। পরদিন সকালে গণেশের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে সে সোজা পুলিশের কাছে যায় নি এবং যতদূর সম্ভব পুলিশকে এড়িয়ে চলেছে।

একজন ড্রাইভারকে কাবু করা কি খুব কঠিন কাজ? তা'ছাড়া সেই সময়ে আমরা প্রায় সকলেই প্রচণ্ড শারীরিক শক্তির অধিকারী ছিলাম। আমাদের পক্ষে নিরীহ ও নিরস্ত্র একজন সাধারণ মানুষকে রিভলভারের সাহায্যে ভয় দেখিয়ে কাবু করা কোন কঠিন ব্যাপারই ছিল না। ঠাণ্ডা শীতল মস্তিষ্কে আমরা আবদুল রসিদ সাহেবের সঙ্গে ঐরূপ পরিস্থিতিতে যদিও কঠোর ও অমার্জিত ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছি তবু আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও যে তাঁকে বেঁধে রাখতে বাধ্য হচ্ছি তা' ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে পেরেছি। অতি সাহসী ও শক্তিশালী ব্যক্তিও স্নায়বিক দুর্বলতার জন্য সহজ কাজকেও জটিল করে ফেলেন। আমাদের পূর্বের অভিজ্ঞতা ছিল বলেই ড্রাইভার সাহেবের সঙ্গে ঐরূপ সহজ কথাবার্তা বলা সম্ভব হয়েছে। আমরা কোনরূপ অতিরিক্ত কষ্ট তাঁকে দিই নি বা প্রয়োজনাতিরিক্ত একটুও রূঢ় ব্যবহার করি নি। আমরা এই সামান্য একটি কাজে শান্ত ধীর স্থির থাকতে পেরেছি বলেই রসিদ সাহেবের সঙ্গে ঐরূপ রূঢ় ব্যবহার করা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাঁর বন্ধুত্ব হারাই নি।

ড্রাইভার যে পরেও আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন তার প্রমাণ পাই আমাদের মামলার সময়। সরকারী পক্ষের কথা, আমাদের ইংরেজীতে ছাপানো জাজমেন্টের ৪৩—৪৪ পৃষ্ঠা থেকে উধৃত করছি—.

> "How this car came to be in the police lines we learn from Abdul Rashid (P.W 16). He was employed as driver of taxi No. 20469 by its owner Fajlur Rahaman of Agrabad. On the evening of the 18th April he and his assistant Sultan Ahmed were waiting in the car in the taxi-stand near the Laldighi when about 8-30 or 9 p.m. a Hindu youth whom he did not know before came up and engaging the taxi asked him to drive on. He was about to take his assistant with him but the passenger objected saying there would be no room for him as there would be others coming. So Sultan was left behind."

জনাব আবদুল রসিদ ফজলুর রহমান সাহেবের ট্যাক্সি চালাতেন। ১৮ই এপ্রিল সাড়ে আটটা অথবা ন'টার সময় একজন যুবক লালদীঘির ট্যাক্সি-স্ট্যাণ্ড থেকে ২০৪৬৯ নম্বরের ট্যাক্সিটি ভাড়া করে নিয়ে যায়। যুবকটিকে তিনি (ড্রাইভার) চেনেন না বলেছেন। জনাব আবদুল রসিদ তাঁর সহকারীকে সঙ্গে নিতে চাইলে যে যুবকটি ট্যাক্সি ভাড়া করতে এসেছিল সে, গাড়িতে আরও আরোহী আছে এই অজুহাতে সহকারীকে সঙ্গে নিতে নিষেধ করে।

হিমাংশুকে আমাদের বলা ছিল সে যেন কেবল একা ড্রাইভারকে সঙ্গে আনে। কোন সহকারী যদি ড্রাইভারের সঙ্গে আসতে চায় তবে তাকে যে কোন প্রকারে হোক্ নিরস্ত করবে। হিমাংশুর বিচক্ষণতার ওপর আমাদের খুব ভরসা ছিল।

জজ সাহেব তারপর লিখছেন—

> "Under the direction of his passenger Abdul Rashid drove the car into the Sadarghat Road and was ordered to stop opposite a house on the left hand side of the road, about 200 paces from Ezekiel's shop. The passenger entered this house and after a little time came out and asked the driver to come inside as the Babu wanted to speak to him. Abdul Rashid left the car and passed through the door by which he noticed, a man dressed in khaki uniform (shorts, tunic and topi) levelled a pistol at him and ordered him to keep quite .. ... . They took him into a small room inside the house and binding his hands and feet. .. .. left him lying on the floor. Then they pointed their pistols at his chest and asked if he recognised any of them. Terror stricken, he shook his head. As they went off they warned him that they were leaving a guard to watch him and shoot him if he made the slightest sound. He next heard them starting up his car outside."

আমি নিজে যে বর্ণনা আগে দিয়েছি মোটামুটি ঠিক তাই জনাব আবদুল রসিদের জবানবন্দীতে পাচ্ছি। ইজিকেলের দোকানের ২০০ কদমের মধ্যে সদরঘাট রাস্তার বাঁ দিকে একটি বাড়ির সামনে জনাব আবদুল রসিদ ট্যাক্সিটি আরোহীর নির্দেশ মত থামালেন।

সেই আরোহীটি গৃহে প্রবেশ করে আবার তক্ষুণি বেরিয়ে বাইরে এল ও বাবুরা তাঁর সংগে কথা বলতে চান বলে ড্রাইভারকে ভিতরে ডাকল। জনাব আবদুল রসিদ ঘরে ঢুকে খাকি পোষাক-পরা যুবকদের দেখতে পান। তাঁরা পিস্তল দেখিয়ে আবদুল রসিদ সাহেবকে চুপ থাকতে বলেন। তারপর তাঁকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে হাত-পা বেঁধে মেঝেতে শুইয়ে রাখেন। সেখানে কয়েকজন তাঁর বুক লক্ষ্য করে পিস্তল টিপ করে জিজ্ঞাসা করেন তিনি কাউকে চিনতে পেরেছেন কিনা। ভয়-বিহ্বল আবদুল রসিদ চেনেন না বলে মাথা নাড়লেন।

জনাব আব্দুল রসিদ আমাকে নিশ্চয়ই চিনেছিলেন। আমার নাম অন্তত আমার নিজ মুখে তিনি শুনেছিলেন। তার পরদিন আমাদের নাম চট্টগ্রামের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। আব্দুল রসিদ সাহেবের আমাদের চিনতে না পারবার কোন কারণই ছিল না। তা ছাড়া পুলিশ যে তাঁকে আমাদের নাম জবানবন্দীতে স্বীকার করাবার জন্য যথেষ্ট প্ররোচিত করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর সংগে কত অবাঞ্ছিত ব্যবহারই না আমরা করেছি! তবু তিনি তাঁর নিজগুণে আমাদের ক্ষমা করেছিলেন। তাঁর স্বদেশ-ভক্তি তাঁকে মুক্তি-যুদ্ধের সৈনিকদের প্রতি যে শ্রদ্ধাবান করেছিল তাতে কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে? ধন্য জনাব আব্দুল রসিদ, আজ এই সুযোগে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পেরে আমিও নিজেকে ধন্য মনে করছি।

তাঁর সম্বন্ধে আরও একটু জানতে পারলে পাঠকবর্গের ভাল লাগবে। তাই তাঁর সম্বন্ধে মামলার জাজ্‌মেন্ট থেকে বিশেষ অংশটুকু তুলে দিচ্ছি— "..At the A. F. I. headquarters Mr. Lewis went inside leaving Abdul Rashid to wait in the car but as Mr. Lewis was long in returning he got tired of waiting and went off home."

মিঃ লুইস্ চট্টগ্রামের সহকারী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। তারপর Eastern Frontier Rifles-এর ব্যাটালিয়ান কমাণ্ডার নিযুক্ত হন। তাঁরই মোটর গাড়িতে আব্দুল রসিদ সাহেবকে বসিয়ে রেখে মিঃ লুইস্ A. F. I. হেড্‌কোয়ার্টার্সে গেলেন। সাহেবের ফিরতে অনেক দেরি দেখে, বসে বসে ক্লান্ত হয়ে আব্দুল রসিদ সাহেব সোজা তাঁর নিজ বাড়িতে চলে গেলেন।

'সামান্য' একজন ড্রাইভার পুলিশ সাহেবকে কিরূপ অবজ্ঞা করে চলে গেলে না! লুইস্ সাহেবের দেরি হচ্ছে আর বসে বসে ক্লান্ত হয়ে জনাব আব্দুল রসিদ পুলিশ সাহেবকে অতি সহজে উপেক্ষা করে বাড়ি চলে গেলেন! ইংরেজ শাসনের আমলে 'সামান্য' একজন ড্রাইভারের এই-রূপ বেপরোয়া ভাব সত্যি অত্যন্ত বিরল। সামান্য একজন ড্রাইভারের কী অসামান্য সাহস! আব্দুল রসিদের তুলনাহীন স্বদেশপ্রেম দীর্ঘজীবী হোক! যতদূর মনে পড়ে তিনি আমার থেকে বয়সে কিছু ছোট ছিলেন। আশা করি তিনি আজও বেঁচে আছেন। আমি তাঁকে আমার বিপ্লবী অভিবাদন জানাই।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কে সে?

ড্রাইভারকে হাত-পা বেঁধে রেখে আমরা ছ'জন গাড়িতে এসে উঠলাম। বিধু, হিমাংশু, হরিপদ, সরোজ, গণেশ ও আমি—প্রত্যেকে আমরা পদ-মর্যাদা অনুযায়ী খাকি সামরিক পোষাক পরেছি। প্রত্যেকের সংগে রিভলভার বা পিস্তল ছিল।

ট্যাক্সিটি ছিল খুব পুরোনো, একেবারে ঝরঝরে, একটি শেভ্রোলে-টুরার। আমরা সবাই মোটর গাড়ি চালাতে জানতাম। তবু মোটর চালাবার ভার আমার ওপর দেওয়া হয়েছিল। আমি ড্রাইভারের আসনে গিয়ে বসলাম। আমার ঠিক পাশে ছিল হিমাংশু। গণেশ ঘোষ পেছনের সীটের ডানদিক ঘেঁষে উপবিষ্ট।

হাঁচিতে বাধা, কাশিতে বাধা, টিকটিকিতে বাধা, উঠতে-বসতে সংস্কারের কত সহস্র বাধা! গাড়িতে উঠে দেখি স্টার্ট দেওয়ার চাবিটি নেই। মহা মুস্কিল! আবার ফিরে গিয়ে ড্রাইভার সাহেবকে জিজ্ঞেস করি—"গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার চাবি কোথায়?" উনি বলে দিলেন চাবি নেই—দুটো তারের মুখ জোড়া দেওয়া আছে তা' খুলে দিতে হবে স্টার্ট দেওয়ার সময় এবং ইঞ্জিন বন্ধ করবার সময় আবার ঐ তারের মুখ দুটো জুড়ে দিতে হবে। মোটর গাড়ির এইসব সামান্য বিষয় জানা ছিল। এক নিমেষে আবার গাড়িতে ফিরে এসে গাড়ি স্টার্ট দিলাম। সহজেই গাড়ি স্টার্ট হল। তখনও দশটা বাজতে প্রায় বিশ পঁচিশ মিনিট বাকি। যথেষ্ট সময়।

এত পুরোনো গাড়ি প্রথম উঠেই চালান একটু মুস্কিল। যাঁদের সামান্য গাড়ি চালাবার অভিজ্ঞতাও আছে তাঁরাই জানেন খুব পুরোনো গাড়ির অনেক আবশ্যকীয় ছোট-খাটো কলকব্জা ঠিকমত কাজ করে না—তা ছাড়া ক্লাচ, ব্রেক, গিয়ার ও এক্সেলেরেটার প্রভৃতি ব্যবহারের ঠিক আন্দাজ পাওয়া যায় না। সেই কারণে গাড়িটি খুব ভালভাবে চালাতে পারছিলাম না—জোরে চালাবার কথাই ওঠে না। তবু মোটর গাড়ি তো একটা পেয়েছি! পুরোনো গাড়ির ধর্ম—তার অসংখ্য ত্রুটি থাকবেই, তা'তে কি আসে যায়? কোনমতে যদি গাড়ির চারটি চাকা ঘোরে এবং শেষ পর্যন্ত দশটার সময় পুলিশ-লাইনের গার্ডরুমের কাছে গিয়ে উপস্থিত হতে পারি তবেই যথেষ্ট। এখনও পর্যন্ত সময় আছে—এভাবে মন্থর গতিতেও যদি এগোতে পারি তাহলেও ঠিক সময়ে উপস্থিত হওয়া সম্বন্ধে ভাবনার কিছু থাকে না।

দশটা বাজবার মিনিট দশ আগে আমরা সাহেবদের বড় পল্টন মাঠের কাছে এসে পেঁছাই। এখান থেকে মোটর গাড়িতে আস্তে গেলেও দু'-তিন মিনিটের মধ্যে পুলিশ-লাইনে গিয়ে উপস্থিত হতে পারি। আর দশ মিনিট আগে যদি এখান থেকে পদব্রজে রওনা হই তবুও ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দশটার সময় পুলিশ-লাইন আক্রমণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে। এই এলাকায় যখন এসে পেঁছলাম তখন গাড়ির নানা অবাধ্যতা থাকা সত্ত্বেও একটা অনিশ্চয়তার অশান্তি থেকে বাঁচলাম। ভাবলাম—যদি গাড়ি একেবারে বিগড়েও বসে তবু আমরা আর পরোয়া করি না—যে-কোন উপায়ে, প্রয়োজন হলে ডবল মার্চ করেও, ঠিক কাঁটায় কাঁটায় ধার্য সময়ে আক্রমণ করতে পারব।

গাড়িটির গাঁটে গাঁটে ব্যথা। প্রাণটি যেন ধুক্-ধুক্ করে চলেছে। যে-কোন সময়ে যেন হার্টফেল করবার সম্ভাবনা। গাড়ির এইরূপ শোচনীয় অবস্থা, যে-কোন প্রতিকূল সম্ভাব্যতার জন্য প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। সত্যি, এতক্ষণ intution—একটা অনুভূতি যেন সুপ্ত-মনে কাজ করছিল। এবার গাড়িটি বিদ্রোহ করল। কোনমতেই আর এগোবে না। গাড়ি না হয়ে যদি যুদ্ধের ঘোড়া, উট বা হাতী রণ-প্রাঙ্গণে যাওয়ার আগে অবাধ্যতা প্রকাশ করত তবে হয়ত বা ভাবতাম, প্রাণী বলেই তারা আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় ভীত-গ্রস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্ত এই জড়পদার্থ গাড়িটির কি প্রাণ আছে? সেও কি আতঙ্কগ্রস্ত? না কি তার চালক স্নায়ুবিক দুর্বলতার জন্য মোটর গাড়িটি ঠিকমত চালাতে পারছে না?

রামকৃষ্ণের বিস্ফোরণে দগ্ধ হওয়ার পর যখন আরও দু'জন বোমা তৈরি করবার সময় বিস্ফোরণে সাংঘাতিকভাবে আহত হলেন, তখন ডাক্তার জগদাবাবু গোপনে তাঁদের চিকিৎসা করতে এসে এক সুযোগে আমাদের বলেছিলেন—"এইসব তোমাদের প্রতি একটার পর একটা ভগবানের সতর্কতার ইঙ্গিত। তোমরা এই দুর্গম পথ পরিহার কর।" তখন ভগবানে বিশ্বাস করতাম না, তবু তাঁকে বোঝাবার জন্য বলেছিলাম—"ভগবান এইসব বাধা সৃষ্টি

করে তাঁর ভক্তদের দৃঢ়তা ও মনোবলের পরীক্ষা করেন।"

এতদিন ধরে কোন বাধাই মানি নি। কোন সন্দেহ নিষেধই আমাদের ধরে রাখতে পারে নি। 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার' যখন এতদিন পেরিয়ে এসেছি, তখন আক্রমণের দশ মিনিট পূর্বে সামান্য একটি মোটর গাড়ি আমাদের অচল-অটল দৃঢ়তাকে ভেঙে দেবে—তা' কি সম্ভব?

গাড়ি না থাকলে অনেক দূর থেকে সান্ত্রী আমাদের চ্যালেঞ্জ করতে পারে। এই অনিশ্চয়তার দুর্বলতাকে অপসারণ করার উদ্দেশ্যে একটি মোটর গাড়ি যোগাড়ের জন্য এত চেষ্টা করেছি। এই শেষ মুহূর্তে যদি আমাদের পদব্রজেই যেতে হবে, তবে এত চেষ্টা ও পরিশ্রম সবই যে ব্যর্থ হয়ে গেল।

ভাববার সময় ছিল না। যেমনি গাড়িটি একেবারে থেমে গেল আমাদের সাথীরা সকলে চট্ করে গাড়ি থেকে নেমে মোটরটি ঠেলতে লাগল। আমি স্টীয়ারিং-এ বসেই ছিলাম। প্রায় পনেরো-কুড়ি হাত তাঁরা মোটরটি ঠেলে স্টার্ট দিতে সাহায্য করল। গাড়ি স্টার্ট নিল।

সবাই গাড়িতে উঠবে—কিন্তু দেখা গেল সরোজ গুহের হোলস্টার থেকে তার রিভলভারটি রাস্তায় কোথায় পড়ে গেছে।

পাঠকদের মনে হচ্ছে কি বিরক্তিকর পরিস্থিতি! এই অভিজ্ঞতার শিক্ষাই হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। খুব ভাল সার্বিক প্ল্যান অনুযায়ী যখন যত বিপ্লবী অ্যাক্শন বা যুদ্ধ হয়েছে, প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করলে জানতে পারা যায় extensive details-এ (বিস্তারিত ছোট-খাটো কাজে) এইরূপ সামান্য সামান্য বিষয়ে নানা ত্রুটি ছিল। এইসব বিচ্যুতি বা বাধাকে ভগবানের "না করার" ইঙ্গিত মনে করা বা "এইরূপ ত্রুটি কেন আছে" —এই ভেবে অবাস্তবতার জগতে ঘুরে বেড়াবার মানসিক বিকৃতি কোন বিপ্লবীর শোভা পায় না। চারজন যুবকের চার জোড়া চোখের দৃষ্টির আড়ালে সরোজের রিভলভার বেশিক্ষণ আত্মগোপন করে থাকতে পারল না—রিভলভারটি এক মিনিটের মধ্যে তারা খুঁজে পেল।

যখন গাড়ি ঠেলার ব্যাপারে সকলেই ব্যাপৃত এবং বড় পল্টনের সদর রাস্তার ওপর ইউনিফর্ম পরে ও অস্ত্রাদি নিয়ে রিভলভারটি খোঁজাখুঁজি করা হয় তখন রাত প্রায় দশটা। এই সময় এই রাস্তাটি একেবারে নির্জন ও জনমানবশূন্য ছিল। সচরাচর এই পথ দিয়ে এত রাত্রে লোক চলাচল করে না বললেই হয়। কোন মোটর গাড়ির রাস্তা অতিক্রম করা অসম্ভব ছিল না। সাহেব জেলা-কর্তাদের এইদিকে বাড়ি। তাই আশঙ্কা ছিল—হঠাৎ কোন বড় সাহেবের গাড়ি চলে আসতে পারে। সেইরূপ পরিস্থিতির জন্য যে আমরা সদাসর্বদা প্রস্তুত ছিলাম তা বলাই বাহুল্য। যা হোক, এই অল্প সময়ের মধ্যে সেইরূপ অবাঞ্ছনীয় কোন ঘটনা ঘটে নি।

এই সময় হঠাৎ একটি ছায়ামূর্তির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল— ডান দিকে রাস্তার ধারে যেন একজন কে দাঁড়িয়ে আছে। ডান দিকের রাস্তার গা ঘেঁষে একটা ফলের বাগান। নানা ধরণের বড় বড় আম, কাঁঠাল, সুপারি প্রভৃতির গাছ ছিল। গাছের ছায়া এসে রাস্তার ওপর পড়েছে। তাই সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। সেই জন্য অত্যন্ত ব্যগ্রতা ও অস্বস্তির মধ্যে এতক্ষণ আমাদের দৃষ্টি এই লোকটার ওপর পড়ে নি। যখন স্পষ্ট বুঝলাম যে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করেছে তখন প্রথমেই মনে হল হয়ত কোন পুলিশের ওয়াচার তার ডিউটিতে আছে। পুলিশ রিপোর্ট থেকে আগে উদ্ধৃত করেছি পল্টনের এই স্থানটিতে আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য তাদের একটি পোস্ট ছিল। তাই প্রথমেই পুলিশ ওয়াচার বলে তাকে ধরে নিয়েছি। মনে মনে তক্ষুণি হিসেব করে ফেললাম, যদি সে আমাদের এই সময়ে এইরূপ বেশে দেখে সত্যি সন্দেহ করে বসে যে আমরা সরকার-বিরুদ্ধ কোন অ্যাক্শনে যাচ্ছি তবে সে এই পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যে কোন অনর্থ ঘটাতে পারবে না।

সন্দেহভঞ্জন করতে তার সামনে দিয়ে তাকে ভাল করে দেখে যাব বলে গাড়িটি খুব আস্তে আস্তে চালালাম। এ কি! এ যে আমাদের স্বদেশ রায়! গণেশের বাড়ি থেকে অপমানিত লাঞ্ছিত হয়ে অভিমান-ভরে সে চলে এসেছে অনেকক্ষণ। এখানে সে এত রাত্রে কি করছে? সে কি তবে পুলিশের কাছে খবর দেয় নি? তবে কি সে পুলিশের চর নয়?

এইসব বিস্তারিত ভাববার সময় ছিল না। আমাদের এত চেনা—এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু—আজ সকাল থেকে এত পর এত অপরিচিত সে কেন হল? স্বদেশ এই অর্থহীন ব্যবহারের জন্য ব্যথিত মর্মাহত হয়েছে। তার সঙ্গে অপরিচিত লোকের মত ব্যবহার করাটা আমাদেরও কোনমতেই ভাল লাগে নি। তবু কি জানি আক্রমণের এই কয়েক মিনিট আগেও তার সঙ্গে এইরূপ রূঢ় ব্যবহার কেন করলাম? আর হয়ত তার সঙ্গে দেখাই হবে না! তাই শেষ বিদায়টুকু নিলে কি ক্ষতি হোত? সে যদি পুলিশের চরও হোত তবু এই কমিনিটের মধ্যে তার পক্ষে কোন ক্ষতি করা সম্ভব ছিল না। তখন এইসব ভেবে দেখবার মত মনের অবস্থা ছিল না।

আমরা তার দিকে তাকালাম। সেও তাকালো। আমরা কেউ তার সঙ্গে কথা বললাম না। বিদায়সূচক বার্তা বিনিময় করাও প্রয়োজন মনে করি নি কেউ। স্বদেশও একেবারে নির্বাক, স্থির একটি পাথরের মানুষ হয়ে গেল। তার অন্তরে তখন ঝড় উঠেছে। তার প্রতি এত অবজ্ঞা কেন? কেন তাকে প্রত্যাখ্যান করা হল? কোন্ বৈপ্লবিক উপযুক্ততার অধিকারী সে নয়? কেন তবে তার প্রতি এই অবিচার—এত অশোভন ব্যবহার! শত অভিযোগ, শত বেদনা, শত অভিমান নিয়ে স্বদেশ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমাদের গাড়ি তাকে উপেক্ষা করে চলে গেল! বন্ধুদের কাছ থেকে সমস্ত উপেক্ষা, সব উপহাস স্বদেশ মুখ বুজে সহ্য করেছে। স্বদেশের অতলস্পর্শী গভীর স্বদেশ-প্রেমের খোঁজ করবার সময় বা মনের অবস্থা আমাদের তখন ছিল না। ধীরে ধীরে আমাদের গাড়ি পুলিশ-লাইন অভিমুখে এগোতে লাগল। স্বদেশ এক-দৃষ্টে আমাদের গাড়ির দিকে তাকিয়ে রইল। তার মনের খবর কে রাখে? আমরা চলে গেলাম।

(ক্রমশঃ)

সাপ্তাহিক বসুমতীর
গ্রাহক হবার নিয়মাবলী

		টা, প,
বার্ষিক	চাঁদা (সডাক)	১৪·০০
ষাণ্মাসিক	" "	৭·০০
ত্রৈমাসিক	" "	৩·৫০

তিন মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক হতে হলে আপিসে অগ্রিম টাকা জমা দিতে অথবা মনিঅর্ডারে পাঠাতে হবে। কর্মাধ্যক্ষ

লেখা পাঠাবার নিয়মাবলী

লেখকদের কাছে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, অবশ্যই লেখার নকল রেখে তাঁরা সাপ্তাহিক বসুমতীতে লেখা পাঠাবেন। লেখা মনোনীত হলে পর সে-সংবাদ আমরাই যথাসময়ে পাঠিয়ে থাকি। নাম ঠিকানাসহ ডাকটিকিটযুক্ত খাম থাকলে একমাত্র অমনোনীত গল্প ফেরৎ পাঠাবার চেষ্টা করা হয়। কবিতা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। —সম্পাদক

অধ্যয়নং তপঃ

ডঃ রমা চৌধুরী

"ছাত্রাণাম্ অধ্যয়নং তপঃ!"

"অধ্যয়ন ছাত্রছাত্রীগণের তপস্যাস্বরূপ।"

এর চেয়ে সুন্দরতর সংজ্ঞা "শিক্ষার" আর কি হতে পারে? শিক্ষা কেবল পুঁথিগত বিদ্যামাত্রই নয়, শিক্ষা কেবল অর্থকরী বৃত্তিমাত্রই নয়, শিক্ষা "তপস্যা"— কি রোমাঞ্চকর কথা এটিঃ "তপস্যা",— পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের যুগ-যুগান্তব্যাপী সভ্যতা - সংস্কৃতি - সাধনার মূলমন্ত্রঃ "তপস্যা"!

সত্যই, যে শিক্ষা দ্বারা মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য-মাধুর্য-ঐশ্বর্য পূর্ণ বিকশিত হয়, সেই শিক্ষা "তপস্যা" ব্যতীত আর কি? কারণ "তপস্যা" আত্ম-বিকাশের, আত্মোপলব্ধির সাধনা— আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই যে অনন্ত গুণ ও শক্তি নিহিত হয়ে রয়েছে, তাদেরই বিকশিত করে তোলার, তাদেরই উপলব্ধি করার অনলস প্রচেষ্টা! সেই আলোক, সেই অমৃত, সেই আনন্দ পরিপূর্ণভাবে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি পদে, প্রতি ক্ষণে প্রকটিত করবার সানন্দ প্রয়াস।

কিন্তু আমাদের পরমাদরের ছাত্রছাত্রীরা কি আজ এই মহা-তপস্যায় ব্যর্থ হচ্ছেন? হয়ত তাই—কারণ, কোথায় তাঁদের স্থৈর্য, কোথায় তাঁদের শান্তি, কোথায় তাঁদের আনন্দ?

কিন্তু দোষ কার? ছাত্র যদি জীবন-তপস্যায় ব্যর্থ হন, উদ্‌যাপন করতে না পারেন তাঁর প্রাণ-ব্রত, তাহলে দোষ কার?

শিষ্যকে তপস্যা-শিক্ষা দেবেন কে, কে করবেন তাঁকে ব্রত পালনের পন্থা নির্দেশ? গুরু। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের হোমধূম-কম, ঋষি-পাদরজঃপূত, মন্ত্রমন্দ্রিত তপোবনে যখন সমিধ্‌পাণি শিষ্য এসে নতমস্তকে দাঁড়াতেন শ্রীগুরুর পাদপদ্ম-তলে, তখন কে তাঁকে সস্নেহে, সাগ্রহে, সানন্দে, তপস্যা-শিক্ষা দিতেন স্বহস্তে? গুরু। যদি তিনি তা না দিতেন, তা হলে শিষ্য তপস্যাধারী, ব্রতচারী না হতে পারলে, দোষ হত কার? গুরুর।

আজ চতুর্দিকের তথাকথিত "ছাত্র আন্দোলনের" দিনে আমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কি সর্বাগ্রে এই কথাটিই ভেবে দেখা উচিত নয়?

আমরা যদি আমাদের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দিতে না পারি, তাদের সার্থক করে তুলতে না পারি, তাদের শান্ত-সংযত-সুখী করতে না পারি—তা হলে দোষ নিশ্চয় সর্বাগ্রে আমাদেরই। আমাদের কর্তব্যে আমরা ব্যর্থ হলে, তা আমাদেরই শক্তিহীনতার পরিচায়ক—অন্যদের নয়।

সত্যই, কি অপূর্ব এই গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ—মাতা-পিতা-সন্তানের সম্বন্ধের অপেক্ষাও একদিক থেকে মধুরতর, মোহনতর—কারণ এতে নেই আত্মীয়তার বন্ধন; অথচ রয়েছে আত্মীয়তার নিগূঢ়-তম স্নেহ-ভালবাসা, মায়া-মমতা, শ্রদ্ধা-সম্মান। জগতে অতুলনীয় এই সম্বন্ধ কেন আজ ভারতবর্ষেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে, যে পুণ্যদেশে গুরু-শিষ্য-পরম্পরাই ছিল সমাজের মূলভিত্তি?

এই অনুপম সম্বন্ধের মূল কথা হল— নিকটতম, নিগূঢ়তম ব্যক্তিগত সম্পর্ক! এই অতুলনীয় শিক্ষাপ্রণালীর মূল-মন্ত্র হল—প্রাণের সঙ্গে প্রাণের স্পর্শ, মনের সঙ্গে মনের মিলন, আত্মার সঙ্গে আত্মার সমতা। এইভাবে গুরু নিজের প্রাণের প্রদীপ থেকে জ্বালিয়ে দিতেন শিষ্যের প্রাণের প্রদীপটিকে: নিজের মনের বীণা থেকে বাজিয়ে দিতেন শিষ্যের মনের বীণাটিকে; নিজের চিত্তের আলোক দিয়ে ফুটিয়ে দিতেন শিষ্যের চিত্তের শত-দলটিকে: নিজের আত্মার সুধা দিয়ে ভরিয়ে দিতেন শিষ্যের আত্মার পাত্রটিকে। এরূপে, তিনি কেবল মুখের কথায় দ্বারাই শিষ্যকে শিক্ষা দিতেন না; দিতেন তাঁর নিজের জ্বলন্ত জাগ্রত পুণ্য উদাহরণ দ্বারা; প্রাত্যহিক ধন্য আচারা-চরণ দ্বারা; সমগ্র, অনন্য জীবন দ্বারা।

আমরা কি সত্যই আজ তাই করতে পারছি—এককণাও তাই করতে পারছি? পারছি আমাদের অশেষ স্নেহভাজন ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মুখে সত্য-শিব-সুন্দরের উদাহরণরূপে দাঁড়াতে? পারছি তাদের শ্রদ্ধা-ভালবাসা আকর্ষণ করতে? পারছি তাদের প্রাণপ্রদীপটিতে আলো দিতে, মনোবীণাটিতে ঝঙ্কার তুলতে, চিত্ত-শতদলটিতে বিকাশ জাগাতে, আত্মপাত্রটিতে মধু ভরতে?

না পারছি না—কারণ, আমাদের নিজে-দেরই প্রাণপ্রদীপ আজ নির্বাপিত, নিজে-দেরই মনোবীণা আজ নীরব, নিজেদেরই চিত্তশতদল আজ শুষ্ক, নিজেদেরই আত্ম-পাত্র আজ শূন্য! আজ আমরা নিজেরাই কত অসত্য বলছি, কত অন্যায় আচরণ করছি তাদেরই সম্মুখে—তা হলে কি করে আর তাদের শ্রদ্ধা-ভালবাসা আমরা আকর্ষণ করব, তাদের সম্মুখে উদাহরণস্বরূপ হয়ে দাঁড়াব, তাদের শিক্ষারূপে "তপস্যা" শিক্ষা দেব?

তবে, আসুন, অন্যদের বৃথা দোষ না দিয়ে, আজ আমরা আত্মপরীক্ষা করিঃ কেন শিক্ষকরূপে আমাদের আজ এই ব্যর্থতা? কেন আমাদের শিক্ষণীয় শিষ্যেরা শিক্ষা পাচ্ছে না, সংযম-সহন-শীলতা-সুখ-শান্তি লাভে ধন্য, পুণ্য, পূর্ণ হচ্ছে না? আসুন, আজ আমরা নিজে-দের সংস্কার করি; সত্যই ছাত্রছাত্রীদের শ্রদ্ধা-ভালবাসা আকর্ষণ করি: সত্যই তাদের উদ্বুদ্ধ করি; সত্যই তাদের "অধ্যয়নং তপঃ" ব্রতে অনুপ্রাণিত করি, আমাদের নিজেদের সৎ, স্নেহশীল, সহানু-ভূতিকোমল আচার-ব্যবহার দিয়ে!

এবং এটি আমাদের ব্যর্থ আশা নয়, এটি অতি সম্ভাব্য সত্য। সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কেটে গেল একটি অটুট সুখ-স্বপ্নের মতই ছাত্রীদের মধুর সংস্পর্শে। সেই মনোরম অভিজ্ঞতা থেকেই স্থির-বিশ্বাসভরে বলতে পারি যে, ছাত্রছাত্রীদের মন পূর্বের মতই কোমল-মধুর-সুন্দর রয়েছে—কেবল চাই তাদের জ্বালানো, কেবল চাই তাদের বাজানো, কেবল চাই তাদের ফোটানো কেবল চাই তাদের ভরানো। এবং এ কাজ তো আমাদেরই করতে হবে;, প্রধানত আমাদেরই! বস্তুত, কি স্নেহলোলুপ সম্মুখী তাদের মন! কত সহজেই তাদের শান্ত-সংযত-সুখী করা যায়—একটুখানি সততা, একটুখানি স্নেহ, একটুখানি সহানুভূতি, এতেই তো তারা গলে হয়ে যাবে জল!

স্মরণ করুন, ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাতত্ত্ববিদ্ স্বামী বিবেকানন্দের মহাবাণী—

"Believe in the omnipotent power of love. Have you love? Then you are omnipotent. Are you perfectly unselfish? Then you are irresistible."

"ভালবাসার সর্বশক্তিসত্তায় বিশ্বাস কর। তোমার মনে কি ভালবাসা আছে? তাহলে তুমি সর্বশক্তিমান্। তুমি কি সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থ? তাহলে তুমি অপরাজেয়।"

বিশ্বসাহিত্যের আদিপর্ব

ডঃ নরেন ভট্টাচার্য

৬৫ ॥

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য

ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দুটি মূল ধারা প্রবাহিত হয়েছে—বৈদিক ও অবৈদিক। বোধ হয় অবৈদিক ধারাটির প্রভাবই ভারতীয় জীবনে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, যদিও আর্যব্যাতিকের মোহে পণ্ডিতেরা এই সত্যটাকে সহজে মেনে নিতে নারাজ। সে যাই হোক, সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কৃত হবার পর অন্তত একথা প্রমাণিত হয়েছে যে আর্যদের আগমনের বহু পূর্বে এদেশে একটি প্রাক-আর্য সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল এবং সম্ভবত সেই সভ্যতার অধিবাসীরা এমন একটি ভাষায় কথা বলত যা দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং যা থেকে দক্ষিণ ভারতের তামিল, তেলেগু, মালয়লম ও কন্নড়ীয় ভাষাসমূহের এবং বালুচিস্তানের ব্রাহুই ভাষার উদ্ভব হয়েছে। ইউরোপের নিম্নাঞ্চল থেকে শুরু করে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতবর্ষের অধিকাংশ অঞ্চল জুড়ে একদা দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর আধিপত্য ছিল।

প্রাক-আর্য সিন্ধু সভ্যতার যুগের সাহিত্যগত নিদর্শন খুব সামান্যই পাওয়া গেছে, কিন্তু তা পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। তবে অনুমান করতে অসুবিধা নেই যে পরবর্তীকালের অনেক কথা ও কাহিনীর উৎস এখানেই।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী

ষোড়শ শতাব্দীর জনৈক ফ্লোরেন্স-দেশীয় বণিক ফিলিপো সাসেটি প্রথম ঘোষণা করেছিলেন যে, সংস্কৃতের সঙ্গে ইউরোপের কয়েকটি প্রধান ভাষার সাদৃশ্য আছে। ১৭৮৬ সালে সার উইলিয়ম জোন্স বললেন যে গ্রীক, ল্যাটিন, গথিক, কেলটীয়, সংস্কৃত, পারসিক প্রভৃতি ভাষার মধ্যে আশ্চর্যরকম সাদৃশ্য আছে এবং এই সাদৃশ্যের কারণ হিসাবে তিনি জানালেন যে এই ভাষাগুলি আসলে একটি মূল ভাষা থেকে সৃষ্ট হয়েছে (পরবর্তীকালে যার নামকরণ করা হয়েছে ইন্দো-ইউরোপীয়) এবং সেই মূল ভাষাটি ছিল আর্যজাতির ভাষা, যে জাতি কালক্রমে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং ভারতীয় আর্যরা ছিল যে জাতির একটি শাখা।

সেই থেকে আমাদের দেশে আর্য-বাতিকের শুরু। আমরা সেই বিশুদ্ধ আর্যজাতির শাবক, সেই আর্যসংস্কৃতির ধারক ও বাহক, শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে এই ধারণাটা যেন মজ্জাগত হয়ে আছে। শুধু এদেশেই নয়, একদা এই আর্যবাতিকের মোহ বহু দেশকেই পেয়ে বসেছিল; হিটলারের আর্যবাতিক যে কি মর্মান্তিক ফল প্রসব করেছিল সাম্প্রতিক ইতিহাসের ছাত্রমাত্রেই তা অবগত আছেন। কিন্তু আমরা কেউই আর্য নেই, জগতে কারো দেহে ছিটে-ফোঁটা আর্যরক্ত নেই, কোনদিন ছিল না, ভবিষ্যতেও থাকার কোন সম্ভাবনা নেই। কেন না আর্য একটি ভাষাগোষ্ঠীর নাম, এবং আদি আর্য ভাষা কোন একটি বিশেষ জাতির ভাষা ছিল না। ম্যাকসমুলার স্পষ্ট করেই একথা বলেছেন যে, আর্য শব্দটির কোন জাতিগত তাৎপর্য নেই।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়—যথা গ্রীক বা হেলেনীয়, ইন্দো-ইরানীয়, ইটালীয়, আর্মেনীয়, বালটীয়-শ্লাভীয়, আলবেনীয়, কেলটীয়, টিউটনীয় ইত্যাদি। আমরা এখানে ইন্দো-ইরানীয় বংশটির উপর গুরুত্ব আরোপ করব। এই বংশ থেকে উদ্ভূত হয়েছে (ক) ইন্দো-এরিয়ান, যথা সংস্কৃত ও অন্যান্য উত্তরভারতীয় আর্য ভাষাসমূহ; (খ) ইরানীয় ভাষাসমূহ যেমন ফারসী, কুর্দী, ওসসেতী, পশতো, বলোচ ইত্যাদি; (গ) দরদ শ্রেণীর ভাষাসমূহ যেমন কাশ্মীরী, শীনা ইত্যাদি।

বৈদিক সাহিত্য ঃ ঋগ্বেদ

বৈদিক সাহিত্যের সাধারণ পরিচয় এখানে দেওয়া নিরর্থক কেন না আজকের বিদ্যালয়ের ছাত্রমাত্রেই সে কথা জানে। একথা সকলেই অবগত আছেন যে বৈদিক সাহিত্যকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা হয়—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। অবশ্য কোন বিশেষ রীতি অবলম্বন করে এ রকম বিভাগ করা হয় নি; ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের মধ্যে সীমারেখা সব সময় সুস্পষ্ট নয়।

যে চারটি সংহিতা ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ নামে পরিচিত, সেগুলির মধ্যে ঋগ্বেদের অধিকাংশ অংশ এবং অথর্ববেদের কিয়দংশই সবচেয়ে প্রাচীন। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে ঋগ্বেদের রচনাকাল আনুমানিক ২০০০ খৃস্ট-পূর্বাব্দ, এবং সেই হিসাবে ঋগ্বেদ বিশ্বসাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ। ঋগ্বেদের পাঁচটি শাখার নাম পাওয়া যায়—শাকল, বাষ্কল, আশ্বলায়ন, সাংখ্যায়ন এবং মাণ্ডুক। এখন শুধুমাত্র শাকল শাখাটিই টিকে আছে। এতে মোট ১০২৮টি অধ্যায় বা সূক্ত সংকলিত হয়েছে। এই অধ্যায়গুলি বিন্যস্ত হয়েছে দশটি খণ্ডে বা মণ্ডলে।

এতগুলি অধ্যায়ের অন্তর্গত দশ সহস্রাধিক শ্লোক নিশ্চয়ই একজনের রচনা নয়, এমন কি মধ্যযুগের টীকাকার সায়নাচার্য পর্যন্ত তা বিশ্বাস করতেন এবং তিনিও ১১টি সূক্ত বা অধ্যায়কে (যেগুলিকে বালখিল্য বলা হয়) উপেক্ষা করেছিলেন। বাকি ১০১৭টি অধ্যায়ও বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন হস্তে রচিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিতেরা বলেন যে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলটি অপরগুলির তুলনায় অনেক পরবর্তীকালের রচনা, দ্বিতীয় থেকে সপ্তম মণ্ডল সর্বাপেক্ষা প্রাচীন অংশ, এবং প্রথম ও অষ্টম মণ্ডল এ দুই-এর মধ্যবর্তী। নবম মণ্ডলটি একটি পৃথক সংকলন যা পরবর্তীকালে ঋগ্বেদে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। প্রথম, নবম ও দশম মণ্ডলের অধিকাংশ অধ্যায়ের কবি বা ঋষি হিসাবে এক-একটি স্বতন্ত্র নাম পাওয়া যায়, কিন্তু দ্বিতীয় থেকে সপ্তম মণ্ডলের কবি হিসাবে পাওয়া যায় ছয়টি গোত্রনাম যথা, গৃৎসমদ, বিশ্বামিত্র, বামদেব, অত্রি, ভরদ্বাজ এবং বশিষ্ঠ।

ঋগ্বেদের ভাষা প্রাচীনতম ভারতীয় আর্যভাষার নিদর্শন, কিন্তু এই ভাষা সর্বত্র একরকম নয়, এবং ভাষার বিচারে ঋগ্বেদের কোন কোন অংশ প্রাচীন এবং কোন কোন অংশ অর্বাচীন তা সহজেই নিরূপণ করা যায়।

এখানে আমরা ঋগ্বেদের সাহিত্যগত দিকটাই বিশেষ করে আলোচনা করব। বিষয়বস্তু হিসাবে ঋগ্বেদের শ্লোকসমূহকে প্রথম শ্রেণীবদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন যাস্ক তাঁর নিরুক্ত গ্রন্থে। এই শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী শ্লোকগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় পরোক্ষ, প্রত্যক্ষ এবং আধ্যাত্মিকী। যে শ্লোকগুলিতে প্রত্যক্ষভাবে দেবতাদের গুণগান করে তাদের করুণা ভিক্ষা করা হয়েছে সেগুলি প্রত্যক্ষ। কিন্তু যেখানে দেবতাদের গুণগান করা হয় নি সেগুলি পরোক্ষ। দুঃখের বিষয় এই জাতীয় পরোক্ষ শ্লোকের উল্লেখ যাস্ক করেন নি।

সে যাই হোক, যে উদ্দেশ্যেই দেবতাদের উদ্দেশ্যে ছন্দে প্রার্থনা জানানো হোক না কেন, ঋগ্বেদের কাব্যগুণ অন্য সমস্ত বিষয়কে ছাপিয়ে গেছে। এই কাব্যগুণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটি বলিষ্ঠ সারল্য। সব কিছুর উপরে আছে প্রকৃতি ও মানুষের প্রতি ঋগ্বেদের কবিদের আশ্চর্য মমত্ববোধ। ১০২৮টি সূক্ত থেকে অনেক কিছুই উদ্ধৃত করার লোভ জাগে, কিন্তু আমাদের পরিসর সীমাবদ্ধ, কাজেই এখানে অল্প কয়েকটির নিদর্শন তুলে দেওয়া হল।

প্রথমেই আমি যে কবিতাটি উদ্ধৃত করছি সেটির মধ্য দিয়ে একটি মৃতের প্রতি ঋগ্বেদের কবির মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। মৃত্যুকে এখানে দেখা হয়েছে একান্তই সহজভাবে, কোন তত্ত্বকথা নেই, কোন দার্শনিক জিজ্ঞাসা নেই, স্বর্গ, পরলোক, মুক্তি, মোক্ষ, নির্বাণ সমস্ত কিছুই অনুপস্থিত। মৃতদেহটিকে শ্মশানে নিয়ে আসা হয়েছে পোড়ানোর জন্য। সেই পরিবেশে কবি অগ্নিকে উদ্দেশ্য করে বলছেন ঃ

তাকে দগ্ধ করো না, হে অগ্নি
তাকে একেবারে ভস্ম করো না,
তার দেহটিকে ছিন্নভিন্ন করো না
হে জাতবেদা—
যখন তুমি তাকে গ্রাস করবে,
তুমি তাকে পাঠিয়ে দিও পিতৃগণের
কাছে।

* * *

তোমার চক্ষু যাক সূর্যে
তোমার নিঃশ্বাসের মধু বায়ুতে টেনে
নিক.
তোমার পুণ্য তোমায় নিয়ে যাক
আকাশে
অথবা নিয়ে আসুক পৃথিবীতে
অথবা জলেই যাও
যদি তোমার সেখানেই মঙ্গল হয়;
তোমার প্রত্যঙ্গগুলি মিশে যাক
তরুতে বা তৃণে॥ (১০।১৬।১, ৩)

আমার মনে হয় না উপরি-উক্ত কবিতাংশের মধ্যে কোন গূঢ় তত্ত্ব আছে। অত্যন্ত সহজভাবে এখানে মৃত্যুকে উপলব্ধি করা হয়েছে। এখানে আছে জীবনের জন্য আকুতি, আর মৃত্যুর জন্য মানুষের স্বাভাবিক খেদ। মৃত ব্যক্তি যে একেবারেই নেই, বা ভবিষ্যতে তার কিছুই থাকবে না, এটা আশা করি মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারছেন না, তাই একবার তিনি ভাবছেন যে হয়ত ওই মৃত ব্যক্তি স্বর্গে যাবে, আবার ভাবছেন যে যেসব জাগতিক উপাদান দিয়ে ওই দেহটি নির্মিত হয়েছে সেই পঞ্চভূতেই দেহটি আবার মিশে যাবে।

এরপর আমি যে কবিতাটির উল্লেখ করব সেটি ঋগ্বেদের বিখ্যাত নাসদীয় সূক্ত। এখানে বলা হয়েছে সৃষ্টিতত্ত্বের মূল কথা। এখানে পাওয়া যাবে যুক্তিবাদী সরল মনের পরিচয়। ঋগ্বেদের কবিরা প্রথম থেকেই স্রষ্টা হিসাবে কোন ঈশ্বরকে খাড়া করেন নি। নিবিড় পর্যবেক্ষণের দ্বারা তাঁরা বিশ্বসৃষ্টির কারণ অনুধাবন করার চেষ্টা করেছিলেন। এখানে কবিতাটির অনুবাদ দেওয়া হলঃ

তখন ছিল না যা আছে এবং যা নেই,
দুই-ই—
না পৃথিবী, না বিস্তীর্ণ আকাশ,
না কোন আবরণ।
তখন কে কোথায় ছিল?
ছিল কি অতল দুর্গম,
জলরাশির বেষ্টনী?

তখন না ছিল মৃত্যু, না ছিল অমৃত
না ছিল দিবারাত্রির কোন ব্যবধান।
কেবল ছিল সেই সর্বত্যাগী এক
যার নিঃশ্বাসের জন্য ছিল না বায়ু,
বা অন্য কিছু।

আঁধার ছিল আঁধারের দ্বারাই আবৃত,
চরাচর ছিল অস্পষ্ট ও তরল।
সেই সর্বব্যাপী একের উদ্ভব
হয়েছিল
উত্তাপের আবর্তে অবিদ্যমান থেকে।

প্রথম যা দীপ্ত হয়েছিল মনের উপর
সেই কাম যা সৃষ্টির আদি কারণ
যা অবিদ্যমান থেকে বিদ্যমানকে
উৎপন্ন করেছিল।
উদ্ভূত হয়েছিল রেতোধা পুরুষেরা
আর মহিমা সকল যাদের রশ্মিজাল
চারদিক বিদীর্ণ করে উপরে ও নিচে
প্রযুতি ও স্বধারূপে প্রবাহিত
হয়েছিল।

কিন্তু মূল কথাটি কে জানে,
কে বর্ণনা করবে?
কোথা থেকে জগৎ জন্মাল?
কেননা দেবতারাও জন্মেছিলেন
অনেক পরে।
কোথা থেকে সৃষ্টি হয়
কেউ তা জানে না।

এ বিশ্বজগৎ কোথা থেকে এল?
কেউ কি সৃষ্টি করেছে?
অথবা করে নি?
এ কথা হয়ত একমাত্র তিনিই জানেন
যিনি এই বিশ্বচরাচরের প্রভু বলে
পরিচিত।

অথবা তিনিও জানেন না॥
(১০।১২৯)

এখানে কবি কোন পূর্বধারণা দ্বারা প্রভাবিত হন নি। নিজের জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী জগতের আদি অবস্থাটা তিনি কল্পনা করে নিয়েছেন, কিন্তু এ জগতের সৃষ্টি কিভাবে হল তা নিয়ে তাঁর মনে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। তিনি খোলাখুলি বলেছেন যে, জগৎসৃষ্টির মূল কথাটি কেউ-ই বলতে পারবে না, দেবতাগণও পরে জন্মেছে, তারাই বা কি করে জানবে? এমন কি যিনি খোদ পরমেশ্বর বলে পরিচিত, তিনি পর্যন্ত না জানতে পারেন।

কিন্তু ঋগ্বেদের বিষয়বস্তু শুধুমাত্র ধর্মে ও দর্শনেই আবদ্ধ নয়। বৈদিক আর্যদের জাগতিক জীবনের পরিচয়ও ঋগ্বেদের ছত্রে ছত্রে। বৈদিক আর্যরা জুয়া খেলতে বড় ভালবাসতেন, জুয়ার বাজিতে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে অনেক ক্ষতিও হত। ঋগ্বেদের একটি সমগ্র অধ্যায় এই জুয়াখেলার উপরেই রচিত। সমগ্র অধ্যায়টি উত্তমপুরুষেই কথিত, দ্যূতকার স্বয়ং বক্তা। এখানে সংক্ষেপে অধ্যায়টি বা সূক্তটি উদ্ধৃত করা হলঃ

"পাশাগুলি যখন এখানে-ওখানে চলে বেড়ায়, আমি পুলকিত হয়ে উঠি। মুজবান পাহাড়ের সোমলতার রসের চেয়েও কাঠের তৈরি পাশা আমার বেশি প্রিয়। যে কখনো আমার প্রতি বিরক্ত হয় নি, আমার কাজে কখনো লজ্জিত হয় নি, আমার ও বন্ধুদের যে বিশেষ সেবাযত্ন করত, সেই রূপবতী ও অনুরাগিণী পত্নীকে পাশার অনুরোধে আমি ত্যাগ করেছি। যে পাশা খেলে তার শাশুড়ি তার উপর বিরক্ত হয়, স্ত্রী তাকে ত্যাগ করে, কারো কাছে সে কিছু চেয়ে পায় না;

বুড়ো ঘোড়াকে যেমন কেউ দাম দিয়ে কেনে না, জুয়াড়িও তেমনি কারো সমাদর পায় না।......আমি যখন মনে ভাবি আর পাশা খেলব না, তখন খেলার সঙ্গীদের এড়িয়ে চলতে চাই। কিন্তু পাশাগুলি সুন্দর পিঙ্গলমূর্তিতে ছকের উপর বসে আছে দেখে আর থাকতে পারি না। ভ্রষ্টা নারী যেমন উপপতির কাছে যায়, আমিও তেমনি খেলার সঙ্গীদের বাড়িতে যাই......যে জয়ী হয় তার পক্ষে পাশাগুলি যেন পুত্রজন্মের তুল্য, যেন তাকে মধুর বাক্যে সম্ভাষণ করে, আর পরাজিত ব্যক্তিকে যেন তারা নিধন করে। এই যে তিপ্পান্নটি পাশা দেখছ, এরা মিলিত হয়ে ছকের উপর বিহার করে বেড়ায়, যেমন সত্যস্বরূপ সূর্যদেব বিশ্বভুবনে বিহার করেন। যিনি যতই দুর্ধর্ষ হোন, এরা কারো বশীভূত নয়। রাজা পর্যন্ত এদের নমস্কার করে। এরা কখনো উপরে উঠছে, কখনো নিচে নামছে। এদের হাত নেই, কিন্তু যার হাত আছে সে-ও এদের কাছে পরাজয় স্বীকার করে। এরা দেখতে সুন্দর, জ্বলন্ত অঙ্গারের মত ছকের উপর বসে আছে, স্পর্শ করলে শীতল, কিন্তু হৃদয়কে দগ্ধ করে।" (১০।৩৪) একালের জুয়াড়িদের ক্ষেত্রেও কথাগুলি খাটে। রচয়িতার রসবোধও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

দেবী ঊষাকে উদ্দেশ্য করে যে সূক্তগুলি রচিত হয়েছে, কাব্যগুণ ও সৌন্দর্যের দিক থেকে সেগুলি অতুলনীয়। ঊষার উদ্দেশ্যে ঋগ্বেদের কুড়িটি পৃথক সূক্ত আছে। এখানে সংক্ষিপ্তাকারে একটি উদ্ধৃত করছিঃ

আমাদের আনন্দে অভিষিক্ত কর
হে ঊষা স্বর্গের দুহিতা।
রূপসী কুমারীর মত ঊষার আগমনে
চরাচর মেতে ওঠে আনন্দে
চতুষ্পদ জেগে ওঠে,
পাখীরা শূন্যে দেয় পাড়ি।
তোমার ঔজ্জ্বল্যের আভায়
তুমি বিকশিত হও
হে স্বর্গকন্যা ঊষা,
প্রাত্যহিক যজ্ঞশালায় তোমার কান্তির
ছাপ পড়ুক।
পৃথিবীর প্রাণবায়ু তোমাতেই নিহিত
হে মহান, হে দীপ্তা রথারূঢ়া
আমাদের প্রার্থনায় কান দাও।

দেবরাজ ইন্দ্রের বীরত্বপূর্ণ কীর্তিকলাপের বর্ণনায় ঋগ্বেদের অধিকাংশ অংশ ব্যয়িত হয়েছে। এখানে ইন্দ্রের বৃত্রবধের বর্ণনাটি তুলে ধরছি। বৃত্র কথাটির অর্থ বাঁধ। অনেকেই অবগত আছেন, বৈদিক আর্যরা এদেশে আসার আগে এখানে একটি সুউন্নত অনার্য সভ্যতা ছিল, যাকে সিন্ধু সভ্যতা বলা হয়। ইন্দ্র সম্ভবত ছিলেন বৈদিক আর্যদের যুদ্ধনেতা—যাঁর নেতৃত্বে বৈদিক আর্যরা সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীদের তৈরি করা বাঁধগুলি ধ্বংস করে ওই সভ্যতার পতন ঘটিয়েছিল। এখানে কবি ইন্দ্রের সেই কীর্তির প্রশংসা করছেনঃ

আমি ইন্দ্রের বীরত্বের কাহিনী বলব
সেই বজ্রধর যা প্রথমেই করেছিলেন—
দৈত্যকে সংহার করে তিনি
জলসমূহকে মুক্ত করেছিলেন
পাহাড় ফাটিয়ে।
পর্বতে বাসকারী সেই শত্রুকে
তিনি সংহার করেছিলেন
ত্বষ্টা তাঁর জন্য তৈরি করেছিলেন বজ্র
এবং জলসমূহ মুক্ত হয়ে
সাগরের দিকে ছুটেছিল
যেমন বাছুরকে দেখে গরু হাম্বারবে
ছোটে।

পরিসরের স্বল্পতার জন্য সমগ্র সূক্তটি উদ্ধৃত করা গেল না। ঋগ্বেদে উপাখ্যানের সংখ্যা খুব কম নয়। কতকগুলি উপাখ্যান, যেমন যম-যমীর উপাখ্যান বা উর্বশী ও পুরূরবার উপাখ্যান কথোপকথনের ছলে ব্যক্ত। শেষোক্ত উপাখ্যানটির বিষয়বস্তু হচ্ছে স্বর্গের অপ্সরী উর্বশী মর্তের মরণশীল মানুষ পুরূরবার প্রেমে পড়ে তাঁর সঙ্গে কিছুকাল বাস করেছিলেন। কিন্তু মানুষের সঙ্গে প্রেমের সখ মেটাবার পরেই উর্বশী তাঁর প্রেমিককে প্রবঞ্চনা করে স্বর্গে চলে গেলেন। যাবার আগে বিলাপরত প্রেমিককে তিনি নিম্নোক্ত চরম শিক্ষাটুকু দিয়ে গেলেনঃ

পুরূরবা, মৃত্যু কামনা করো না,
উচ্ছন্নে যেও না
দুর্দান্ত বৃকেরা তোমাকে যেন
ভক্ষণ না করে।
স্ত্রীলোকের প্রণয় কখনোই
স্থায়ী হয় না
তারা অন্তরে বৃকেরই অনুরূপ।

বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য থাকলেও ঋগ্বেদের প্রধান অংশ দেবদেবীর বন্দনাতেই নিযুক্ত। কাজেই ঋগ্বেদে কোন কোন দেবতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের প্রতি ঋগ্বেদের কবিদের মনোভাব কেমন ছিল, তাদের উদ্দেশ্যে কবিরা কি বলেছেন সেগুলি জানা উচিত। জগতের অন্যান্য জায়গার সাহিত্যের মত ভারতের প্রাচীন সাহিত্যও ধর্মমূলক এবং পরবর্তীকালের হিন্দুধর্মের একটি প্রধান উৎস যে ঋগ্বেদ এ কথা অস্বীকার করা যায়।

ঋগ্বেদের দেবতারা মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত। স্বর্গের দেবতা, অন্তরীক্ষের দেবতা ও পৃথিবীর দেবতা। স্বর্গের দেবতাদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় আকাশরূপী দেবতা দ্যোঃ-এর কথা। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে দ্যোঃ গ্রীক জিউসকে স্মরণ করিয়ে দেয়, কিন্তু প্রকৃতির দিক থেকে ইউরেনাসের সঙ্গে তাঁর মিল বেশি। দ্যোঃ-এর প্রণয়িনী হচ্ছেন পৃথিবী এবং তাঁরা একত্র দ্যাব্যা-পৃথিবী বলে পরিচিত। দ্যোঃ-এর পরেই আসছে বরুণের কথা, ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে যিনি গ্রীক ইউরেনাসের সঙ্গে অভিন্ন, যদিও চরিত্রের দিক থেকে উভয়ে পৃথক। পূর্ববর্তী প্রবন্ধে দেখিয়েছি যে, ইরানীর দেবগোষ্ঠীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন এই বরুণ, যাঁর নাম পরবর্তীকালে হয়েছিল অহুরমজদা বা অসুর মেধা। ঋগ্বেদেও বরুণের স্থান খুব উচ্চে। এখানে বরুণ ঋত বা নিয়মশাসিত বিশ্বের পরিচালক, যদিও পরবর্তীকালে এই দেবতার গৌরব হ্রাস পেয়েছে এবং তিনি শুধুমাত্র জলের দেবতা হয়েই কোনক্রমে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। মিত্র, সূর্য, সবিতা ও পূষণ চারজনেই সৌরদেবতা, এবং ঋগ্বেদে বর্ণিত বিষ্ণু আসলে সূর্যই। শেষোক্ত দেবতাটির প্রভাব ঋগ্বেদে সামান্যই যদিও পরবর্তীকালের ধর্মে তাঁর প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল। অদিতি আদিতে ছিলেন দেবগণের মাতা, পরবর্তীকালে তিনি একটি অনন্তবাচক শব্দে মাত্র রূপান্তরিত হয়েছিলেন। ঊষা প্রাতঃকালের প্রতীক দেবী, এবং নাসত্য বা অশ্বিদ্বয় সম্ভবত শুকতারা ও সন্ধ্যাতারা।

অন্তরীক্ষের দেবগণের মধ্যে প্রথমেই আসে ইন্দ্রের কথা, ঋগ্বেদের যিনি প্রকৃতপক্ষে নায়ক। তিনি বীর, নিষ্ঠুর, মদ্যপ ও কামুক, কিন্তু সেই সঙ্গে উদার, দাতা ও রাজোচিত গুণসম্পন্ন। নামের দিক থেকে না হলেও চরিত্রের দিক থেকে গ্রীক দেবরাজ জিউস বা টিউটন দেবরাজ ওডিনের সঙ্গে তাঁর প্রচুর মিল। আদিতে সম্ভবত ইন্দ্র ছিলেন বজ্র, বিদ্যুৎ ও বৃষ্টির দেবতা। ঋগ্বেদের নায়ক এই দেবতাটি পরবর্তীকালে উপেক্ষিত হয়েছিলেন। মরুৎ, পর্জন্য, বায়ু ও বাত—চারজনেই মূলত বায়ুর দেবতা, কেউ মলয় বাতাসের, কেউ বা ঝড়ের, এই রকম। জলরূপী আপঃনামক এক দেবতা মাতৃরূপে স্তুত হয়েছেন। এছাড়া এই পর্যায়ের দেবগণের মধ্যে ত্রিত আপ্ত্য, অপাং-নপাত, মাতরিশ্বন, অহি বুধ্ন্য ও অজ একপাদের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা প্রত্যেকেই অপ্রধান দেবতা।

পৃথিবীর দেবতাদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য পৃথিবীরূপিণী দেবী যিনি দ্যোঃ-এর প্রণয়িনী। তার পরেই আসছে অগ্নি ও সোম। মাদকদ্রব্য হিসাবে

বৈদিক আর্যরা সোমলতার রস সেবন করত এবং সেইজন্য সোমলতাও তাদের দেবতা হয়েছিল। সমগ্র নবম মণ্ডলটি সোমের প্রশস্তিতে রচিত।

ঋগ্বেদের দেবতাদের উপরি-উক্ত ধরণের শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন যাস্ক আজ থেকে বহু শতাব্দী পূর্বে। বর্তমানকালের পণ্ডিতেরা অন্যভাবে শ্রেণীবিভাগ করেছেন, তা হচ্ছে স্বচ্ছ, অর্ধস্বচ্ছ এবং অস্বচ্ছ। যে দেবতাদের প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলটিকে সহজেই অনুধাবন করা যায়, তাঁরা হচ্ছেন স্বচ্ছ, যেমন ঊষা, অগ্নি, সূর্য, পৃথিবী ইত্যাদি। যেগুলির প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল একটু কষ্ট করে বুঝতে হয় তাঁদের কীর্তিকলাপ ও গুণাবলী দেখে, যেমন ইন্দ্র, বরুণ ইত্যাদি—এঁরা হচ্ছেন অর্ধ-স্বচ্ছ। আর যেগুলির প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল জানবার কোন উপায়ই নেই, শুধুমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয় সেগুলি অস্বচ্ছ, যেমন নাসত্য বা অশ্বিদ্বয়। এইসব দেবতাদের উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার স্তুতি, এবং এইসব দেবতাদের ক্রিয়াকলাপ বর্ণনাই ঋগ্বেদের অধিকাংশ অংশ জুড়ে আছে।

খরচা কমানো... উৎপাদন বাড়ানো

টাটা স্টীলের কারখানায় লোহা গলানোর ছ'টা ব্লাস্ট ফার্নেসকে কয়েক বছর অন্তর অন্তর ঢেলে মেরামত করতে হয়। কারখানার লোকেরা যাকে বলেন রিলাইনিং করা। এই রিলাইনিং একটা বিরাট কাজ এবং এতে হাজার হাজার টন রিফ্রাক্টরি ইঁট, ইস্পাত, ঢালাই লোহা, বহু মাইল ইলেকট্রিক কেবল আর পাইপ লাগে। আর লাগে ইঞ্জিনিয়ার আর পাকা কর্মীর বড় দল। এই কাজের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি, প্রত্যেকটি ধাপ আগে থেকে ছ'কে নেওয়া হয় এবং তারপর দিনরাত্তির ইঞ্জিনিয়ার আর কর্মীরা একজোটে ঘড়ির কাঁটার মতন কাজ চালিয়ে যান যাতে যত কম সময়ে এবং কম খরচায় এই মেরামতির কাজটি নিখুঁতভাবে হয়।

এই কাজে টাটা স্টীল গত কয়েক বছরে অভাবনীয় উন্নতি করেছেন। যেমন ধরুন, ১৯৫৭ সালে একটি ব্লাস্ট ফার্নেস রিলাইনিং করতে ৯৯ দিন সময় লাগে। ১৯৬৩ সালে সেই কাজ যখন ৭৪ দিনে করা হয় তখন অনেকে ভাবলেন যে এ রেকর্ড সহজে ভাঙা যাবে না। কিন্তু ছ'মাস না যেতেই আর একটি ব্লাস্ট ফার্নেসকে মাত্র ৬৪ দিনে রিলাইনিং করা হয়।

কিন্তু এই শেষ নয়। যে ব্লাস্ট ফার্নেসকে ১৯৫৭ সালে রিলাইনিং করতে ৯৯ দিন লেগেছিল সেটাকে কিছুদিন আগে মাত্র ৫৭ দিনে রিলাইনিং করা হয়েছে। ফলে, মেরামতিতে যে সময়টা বাঁচলো তাতে প্রতিদিন দেশের অতি প্রয়োজনীয় আরও লোহা তৈরি হয়েছে।

ক্রমান্বয়ে কম সময়ে কাজ করা ও অন্যভাবে রেকর্ড করার এই আপ্রাণ ও অবিরত চেষ্টার উদ্দেশ্য হ'ল টাটা স্টীলের ব্যবসায়ের মূলমন্ত্র: খরচা কমানো, উৎপাদন বাড়ানো।

টাটা স্টীল

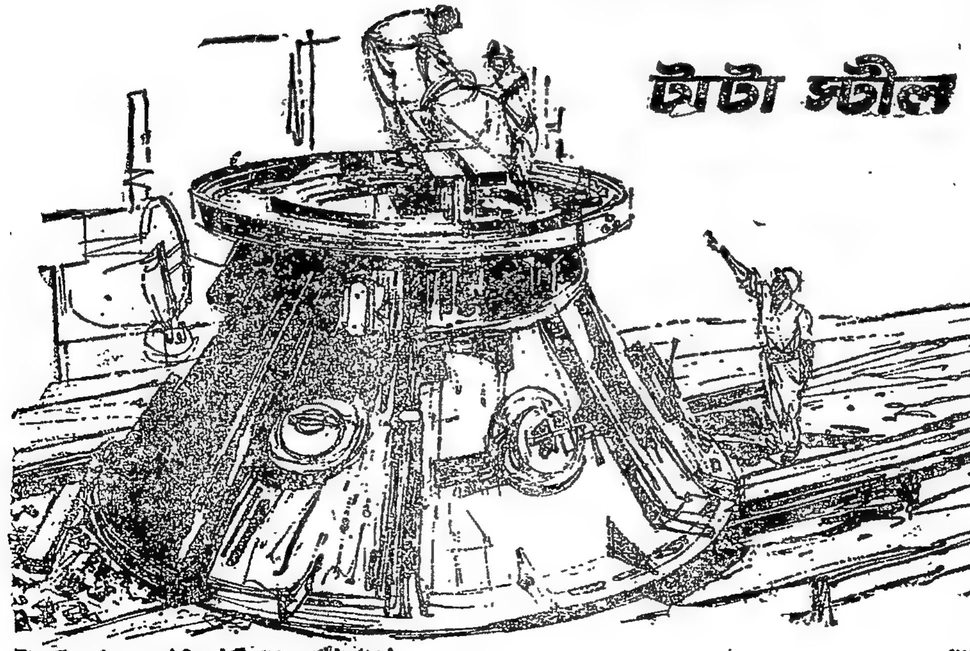

The Tata Iron and Steel Company Limited

IWT/TN2824

রঙ্গমঞ্চে দেশে বিদেশে

বিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপের নাট্য-সাহিত্যকে যিনি নূতনভাবে রূপায়িত এবং প্রাণবন্ত করে নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে একটা বিরাট আন্দোলন এবং আলোড়নের সৃষ্টি করেছেন তিনি হচ্ছেন বিখ্যাত জার্মান নাট্যকার বারটল্ট ব্রেখ্ট্। নাট্যকার ব্রেখ্টের রচনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আমি আগেও কয়েকবার 'বসুমতী' সাপ্তাহিকে আলোচনা করেছি। এবারে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক 'দি গুড্ ওম্যান অভ্ সেজুয়ানের' ভাবানুবাদ এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই নাটিকাটির বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষত্ব নিয়ে আলোচনা করবো। এর ফলে নাট্যকার ব্রেখ্টের নাট্য-রচনারীতি বুঝতে পাঠকদের অনেক সহজ লাগবে। ব্রেখ্ট তাঁর এপিক থিয়েটার এবং বার্লিনার আসেম্বল পার্টির অভিনয়ের সাহায্যে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে আগামী বিজ্ঞানভিত্তিক এবং সমাজতান্ত্রিক যুগে নাট্যরচনারীতি এবং অভিনয়-পদ্ধতি কোন্ পথ ধরে অগ্রসর হবে। 'সেজুয়ানের মহৎ নারী' নাটকে ব্রেখ্ট যেন আজকের পৃথিবীর মানুষদের সম্বন্ধেই প্যারাবলের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন। নাটকটির মূল বক্তব্য হচ্ছে :

In our country
The capable man needs
luck. Only
If he has mighty backers
Can he prove his capacity.
The good
Have no means of helping
themselves and the gods
are powerless. etc.

নাটকটির সুরু হয়েছে এইভাবে :

সেজুয়ানের মহৎ নারী—পূর্বরঙ্গ।

সেজুয়ানের রাজধানীর একটি রাস্তা। সময় সন্ধ্যা। ভিস্তী ওয়াং দর্শকদের কাছে এইভাবে আত্মপরিচয় দিতে থাকবে।

ওয়াং—আমি সেজুয়ানের রাজধানীর একজন ভিস্তী। আমার কাজটা খুবই একঘেয়ে। যখন জলের অভাব দেখা দেয় তখন আমাকে বহু দূরে দূরে ছুটোছুটি করতে হয়। আর জলের যখন প্রাচুর্য হয়, আমার রোজগার যায় বন্ধ হ'য়ে। এ দেশটা গরীব। ভয়ানক রকম গরীব। সবাই বলে আমাদের উদ্ধার করতে পারেন একমাত্র দেবতারা। বহু দেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন, এমন একজন গো-ব্যবসায়ী আমাকে বলেছেন যে কয়েকজন খুব উচ্চশ্রেণীর দেবতা পৃথিবী পরিক্রমায় বেরিয়েছেন এবং তাঁরা সেজুয়ানেও আসতে পারেন। একথা শুনে যে আমার কি আনন্দ হয়েছে কি বলব! স্বর্গে নাকি খুব গোলমাল সুরু হয়েছিল। পৃথিবী থেকে অনেক নালিশ এবং অভিযোগ উপরে ভেসে উঠে সেখানকার শান্তি ভঙ্গ করেছে। শহরে ঢোকবার এই পথ—গত তিনদিন ধরে আমি এখানে অপেক্ষা করছি, বিশেষত সন্ধ্যার দিকে—দেবতারা এলে যাতে আমিই প্রথম তাঁদের অভিনন্দন জানাতে পারি। কারণ পরে আমি বিশেষ সুযোগ পাব না। বিখ্যাত লোকেরাই তাঁদের চারিপাশে ঘিরে থাকবে এবং অনেকের অনেক কিছু চাহিদা মেটাতে তাঁরা ব্যস্ত থাকবেন। দেবতারা এলে আমি কি তাঁদের চিনতে পারব? তাঁরা একসঙ্গে দল করে আসবেন না এক একজন আসবেন, যাতে লোকের নজর তাঁদের ওপর গিয়ে না পড়ে। (রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে এমন কয়েকজন শ্রমিকের ওপর দৃষ্টি পড়াতে) এইসব লোক তো নিশ্চয়ই তাঁরা নন। এরা কাজ সেরে ফিরছে। বোঝা কাঁধে থাকাতে এরা কাঁধ নুইয়ে হাঁটছে। ওই লোকটাও দেবতা হতে পারে না। ওর হাতে আঙুলে কালি মাখানো। বড় জোর ও সিমেন্টের কারখানার কেরানী। (দুটি ভদ্রলোক হাঁটতে হাঁটতে চলে যাবেন) একজন ভদ্রলোককেও আমি দেবতা বলে মানতে রাজী নই। এদের পাশবিক মুখভাব দেখেই বোঝা যায়, এরা দরকার মনে করলে লোকজনকে পিটি দিতেও অভ্যস্ত। দেবতাদের প্রহার করবার দরকার হয় না। কিন্তু ওই যে তিনজন আসছে? এদের দেখে তো সম্পূর্ণ অন্য ধরণের মনে হচ্ছে। বেশ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। কখনও খেটে খেতে হয়েছে বলে মনে হয় না, জুতোগুলো ধুলোয় ভরা—নিশ্চয় নানা দেশ ভ্রমণ করে আসছেন ওঁরা। এঁরাই সেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত দেবতারা! (আভূমি আনত হ'য়ে) মহিমান্বিত প্রভুরা! আদেশ করুন কি করতে হবে।

১ম দেবতা—(বেশ খুশি মনে) তুমি কি আমাদের প্রতীক্ষা করছিলে?

ওয়াং—(সকলকে জলপান করিয়ে) বহু দিন থেকে অপেক্ষা করছিলাম। আমিই শুধু জানতাম যে আপনারা আসছেন।

১ম দেবতা—আজকের রাতটা থাকবার জন্যে একটা আস্তানা চাই। তুমি একটা ঘরের সন্ধান দিতে পার?

ওয়াং—একটা কি বলছেন প্রভু! কত ঘর চাই? সারা শহরটাই আপনাদের আতিথ্য করবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠবে। আপনারা কোন্ দিকে থাকতে চান বলুন?

[দেবতারা অর্থসূচক দৃষ্টি বিনিময় করবেন।]

১ম দেবতা—বৎস, প্রথম বাড়িটায় চেষ্টা করে দেখ। প্রথম বাড়ি থেকেই সুরু করা উচিত।

ওয়াং—আমার ভয় হচ্ছে যেই একজনের বাড়িতে প্রভুদের থাকবার ব্যবস্থা করবো, শহরের গণ্যমান্য ক্ষমতাশালী লোকেরা তাঁদের ওখানে আপনাদের না নেওয়ার জন্যে আমার ওপর ক্ষেপে উঠবেন।

১ম দেবতা—আমি যা বললাম সেটাকে আমার আদেশ হিসেবে নাও—তা হলেই আর তোমার ওপর দায়িত্ব পড়বে না। প্রথম বাড়িটাতেই প্রথম চেষ্টা করো।

ওয়াং—ওই বাড়িটা মিঃ ফো-র—একটু অপেক্ষা করুন।

[একটি বাড়ির কাছে গিয়ে কড়া নাড়বে। দরজা খুলে যাবে এবং গৃহস্বামী তাকে তাড়িয়ে দেবে। এখানে মূকাভিনয় হবে। সঙ্কুচিতভাবে ওয়াং ফিরে আসবে।]

ওয়াং—চাকরগুলো কি বোকা! মিঃ ফো বাইরে গেছেন—তাই ওরা আপনাদের আশ্রয় দিতে সাহস পেলো না। মিঃ ফো নাকি এসব বিষয়ে ভয়ানক কড়া। আবার বলি চাকরগুলো কি বোকা! ঘরে ফিরে মিঃ ফো যখন জানতে পারবেন কাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তখন তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠবেন—বাছাধনেরা তখন বুঝতে পারবেন কত ধানে কত চাল।

দেবতারা—(হাসতে হাসতে) বটেই তো!

ওয়াং—দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন। পাশের বাড়িটা হচ্ছে বিধবা সু'র। উনি আপনাদের পেলে আহ্লাদে ডগমগ হ'য়ে উঠবেন।

[ওয়াং পাশের বাড়িতে গিয়ে ধাক্কা দেবে এবং সেখান থেকেও তাড়া খেয়ে ফিরবে।]

ওয়াং—রাস্তার ওপাশে গিয়ে খোঁজ করতে হবে। মাদাম সু বলছেন, তাঁর একটিমাত্র ছোট্ট বাড়ীতে ঘর আছে, আর সেটা এমন অবস্থায় রয়েছে যে কারোকে থাকতে দেওয়া যায় না। আমি এবার সোজা মিঃ চেঙের বাড়ি যাচ্ছি।

২য় দেবতা—ছোট ঘরেই আমাদের খুব চলে যেত। মহিলাকে বল আমরা তার ওখানেই যাব।

ওয়াং—ও ঘরটা একেবারে নোংরায় ভর্তি—চারিদিকে মাকড়সা—

২য় দেবতা—তাতে কিছু এসে যাবে না। বেশি মাকড়সা থাকলে মাছির দৌরাত্ম্য থাকবে না।

৩য় দেবতা—(বেশ মোলায়েমভাবে) মিঃ চেঙ বা অন্য যেখানে তোমার ইচ্ছে হয় চেষ্টা কর বৎস। আমি মাকড়সা একেবারে সহ্য করতে পারি না।

[ওয়াং আর একটি দরজায় গিয়ে কড়া নাড়বে এবং ঢুকবে। বাড়ির ভেতর থেকে কণ্ঠস্বর শোনা যাবে—তোমার দেবতারা সব চুলোয় যাক—বলি নিজেদের ঝঞ্ঝাট নিয়েই অস্থির হয়ে আছি, তার ওপর আবার—যতো সব— —]

ওয়াং—(দেবতাদের কাছে ফিরে এসে) মিঃ চেঙ অত্যন্ত দুঃখিত, তাঁর বাড়ি একেবারে আত্মীয়স্বজনে ভরে আছে। শুধু আপনারা বলেই বলছি—আমার মনে হয় ঐসব লোকের ভেতর কিছু সত্যিকার খারাপ লোক আছে। মিঃ চেঙ চান না আপনারা গিয়ে তাদের দেখেন। আপনাদের মতামতকে উনি এত ভয় পান বলেই আপনাদের আতিথ্যের দায়িত্ব নিতে চান না।

৩য়—আমরা কি তাহলে এতই ভয়াবহ!

ওয়াং—খারাপ লোকেদের পক্ষে তাই নয় কি? আমরা সবাই জানি কোয়ান্স শহরে বছরের পর বছর বন্যায় ভয়ানক ক্ষতি হয়েছে।

২য়—তাই বুঝি? কিন্তু কেন?

ওয়াং—কারণ আমার মনে হয় এদেশের লোকেরা দেবদেবীতে বিশ্বাস করে না বলেই ওদের এই দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়।

২য়—সম্পূর্ণ বাজে কথা। এই দুর্ভোগের মাত্র কারণ হচ্ছে ওরা ভালোভাবে ড্যামগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের দিকে মন দেয় নি।

১ম—(ওয়াং-এর প্রতি) আর কোথাও কোনো আশা আছে বৎস?

ওয়াং—এ আপনি কি প্রশ্ন করছেন প্রভু? ওই সামনের বাড়িতে গিয়ে শুধু জিজ্ঞেস করার অপেক্ষা—আমাকেই ওদের ভেতর থেকে বেছে নিতে হবে। আপনাদের সৎকার করবার জন্যে ওদের ভেতর কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে—একটু অপেক্ষা করুন—

[দ্বিধাগ্রস্তভাবে ওয়াং এগিয়ে গিয়ে রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে পড়বে। আসলে এই অবস্থায় কি করা উচিত, তাই ও ভেবে ঠিক করতে পারছে না]

২য়—আমি কি বলেছিলাম?

৩য়—হয়তো ঘটনাচক্রেই এমন হচ্ছে।

২য়—তা বটে! ঘটনাচক্রেই আমরা সুন-এ কোনো আশ্রয় পাই নি, ঘটনাচক্রেই কোয়ানেও ওই এক অবস্থা হয়েছে, আবার এই সেজুয়ানেও ঘটনাচক্রেরই প্রভাব দেখতে পাচ্ছি। দেবতাদের ভয়-ভক্তি করে এমন একটি মানুষও আজ পৃথিবীতে নেই—তোমরা স্বীকার করবে না কিন্তু এটাই হচ্ছে খাঁটি সত্য। আসল কথা আমাদের পরিক্রমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিফল হয়ে গেছে এবং তোমাদের পক্ষেও এখন সেটা মেনে নেওয়া উচিত।

১ম—এখনও যে কোনো মুহূর্তে আমরা সৎমানুষের সংস্পর্শে আসতে পারি। আমাদের পরিকল্পনামাফিকই সবকিছু ঘটবে, এ তো আশা করা যায় না।

৩য়—সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয়েছিল পৃথিবী এইভাবেই চলতে পারে—যদি আমরা এই পরিক্রমায় যথেষ্ট সৎলোকের সাক্ষাৎ পাই—যারা সুন্দরভাবে জীবন-যাপন করবার ক্ষমতা রাখে। এই ভিস্তীটি সেই জাতের লোক। যদি অবশ্য আমি প্রতারিত না হয়ে থাকি।

[৩য় দেবতা, ওয়াং যেখানে অনিশ্চিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, সেদিকে যাবেন।]

২য়—উনি সব সময়ই প্রতারিত হন। জল-ওয়ালা আমাদের যখন তার মাত্রাকাটা জলপাত্র থেকে জল দিচ্ছিল, একটা জিনিস আমার নজরে পড়েছিল, এই দ্যাখো—(প্রথম দেবতাকে পাত্রটা দেখাবে)।

১ম—পাত্রের তলায় একটা মিথ্যা পীঠিকা আছে।

২য়—লোকটা জোচ্চোর।

১ম—বেশ, ওর কথা না হয় বাদ দিলাম। একজন লোক যদি জোচ্চোর হয়, তাতে কিছু যায় আসে না—কিছু সময়ের ভেতরেই হয়তো এমন অনেক লোকের দেখা পাবো, যারা আমাদের নিয়মকানুনের সঙ্গে খাপ খেয়ে যাবে। যাই হোক্ কোনো একজনকে খুঁজে বার করতেই হবে। দু' হাজার বছর ধরে এই একই অভিযোগ শুনতে হচ্ছে—এভাবে পৃথিবীকে চলতে দেওয়া যেতে পারে না। এমন কয়েকজন লোককে খুঁজে বের করতেই হবে যারা পৃথিবীতেও বাস করে এবং আমাদের সমস্ত বিধিবিধান মেনে চলে।

৩য়—(ওয়াংকে) তোমার বোধহয় আমাদের আশ্রয়ের জায়গা খুঁজে বার করতে কষ্ট হচ্ছে।

ওয়াং—আপনি বলছেন কি প্রভু! আপনাদের মতো অতিথি! আমার দোষেই দেরি হচ্ছে—আমি অত্যন্ত অপদার্থ বলেই—

৩য়—না না, তা মোটেই নয়।

[তৃতীয় দেবতা সঙ্গীদের কাছে চলে যাবেন।]

ওয়াং—এ'রা সবই বুঝতে পারছেন। (এগিয়ে গিয়ে এক পথচারী ভদ্রলোককে বলতে থাকবে) দেখুন মশায়, কিছু মনে করবেন না, তিনজন নাম-ডাকওয়ালা দেবতা—যাঁদের সেজুয়ানে আসার কথা লোকের মুখে মুখে গত কয়েক বছর ধরে শোনা যাচ্ছিল, সত্যিসত্যিই এখানে এসে হাজির হয়েছেন—রাত্রিটা থাকবার জন্যে তাঁদের বাসস্থান দরকার। চলে যাবেন-না মশায়—নিজেই একবার ওঁদের দিকে চেয়ে দেখুন, এক নজরেই সবকিছু আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। ঈশ্বরের দোহাই, এ বিষয়ে একটা কিছু ব্যবস্থা করুন। জীবনে এ সুযোগ দু'বার আসে না। এই তিনজন দেবতাকে আপনার বাড়িতে যাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করুন—অন্য কেউ এ সুযোগ নেবার আগেই। আমি জোর গলায় বলছি ওঁরা নিশ্চয় আপনার আমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন।

[ভদ্রলোক ওয়াং-এর কথায় কান না দিয়ে এগিয়ে গেলেন—ওয়াং আর একজন পথ-চারীকে সম্বোধন করে বলল।]

ওয়াং—আপনি তো মশায় সবই শুনলেন। আপনার বাড়িতে একটা ঘর দিতে পারবেন? সাধারণ ঘর হলেই চলবে—দেবতারা তো আড়ম্বর চান না—উদ্দেশ্য মহৎ হলেই তাঁরা খুশি হয়ে যান।

ভদ্রলোক—তোমার দেবতারা কোন্ শ্রেণীর কি করে বুঝব? কি করে জানব

কাদের নিয়ে অন্দরমহলে ঢোকাচ্ছ? (এগিয়ে তামাকের দোকানের দিকে যাবে। ওয়াং দেবতাদের দিকে ফিরে যাবে।)

ওয়াং—একজনকে পেয়েছি, যে নিশ্চয়ই আপনাদের রাতের আশ্রয় দেবে (হঠাৎ তার নজরে পড়বে জল পরিমাপ করবার পাত্রটি মাটিতে রাখা রয়েছে। বিব্রতভাবে দেবতাদের দিকে চেয়ে ওটি তুলে নিয়ে আগের জায়গায় ফিরে যাবে।)

১ম—লোকটির কথায় খুব উৎসাহ পাওয়া যাচ্ছে না।

ওয়াং—(ভদ্রলোকটি দোকান থেকে ফিরছেন দেখে) এই যে মশায়, তাহলে ওঁদের রাতে থাকার ব্যবস্থাটা?

ভদ্রলোক—তুমি কি করে জানলে আমি বাসায় থাকি? আমিও তো একটিমাত্র ঘরেই থাকতে পারি—

১ম—লোকটি আমাদের জন্যে কোনো আশ্রয়স্থলই খুঁজে পাবে না। সেজুয়ান শহরকেও আমাদের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়াই ভাল।

ওয়াং—এঁরা প্রথম শ্রেণীর তিনজন দেবতা। মন্দিরে এঁদের যে প্রতিমূর্তি আছে তার সঙ্গে এঁদের চেহারা একেবারে মিলে যায়। এখনও আপনি আমন্ত্রণ জানালে এঁরা নিশ্চয়ই গ্রহণ করবেন।

ভদ্রলোক—(হেসে উঠে) আমার মনে হচ্ছে এরা একদল জোচ্চোর আর তুমি চেষ্টা করছ আমার কাঁধে এদের চাপাতে—

[চলে যাবে]

ওয়াং—(চিৎকার করে) হতভাগা, হৃদয়হীন, অভদ্রলোক কোথাকার! দেবতাদের অসম্মান করার জন্যে আজীবন তোমাকে নরকে পচতে হবে। সেজুয়ান শহরের তুমি কলঙ্কবিশেষ। (কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর) আর তা হলে কার কাছে যাই—এখন একমাত্র ভরসা স্বৈরিণী শেন্‌টে। সে কিছুতেই আমার কথায় রাজী না হয়ে পারবে না।

[চিৎকার করে ডাক দেবে 'শেন্‌টে!' উপরের জানলা খুলে যাবে—শেন্‌টে মুখ বার করে দেখবে।]

তাঁরা এসেছেন—কিন্তু ওঁদের জন্যে কেউ ঘর দিতে চাইছে না। এক রাতের জন্যে তুমি কি ওঁদের আশ্রয় দেবে?

শেন্‌টে—আমার এখানেও অসুবিধা আছে. ওয়াং। একজনের আসবার কথা আছে। কিন্তু বলছ কি? তুমি ওঁদের জন্যে একটা ঘরও খুঁজে পেলে না?

ওয়াং—কি করব বল, সারা সেজুয়ান শহরটা আজ গোবরগাছায় ভরে গেছে।

শেন্‌টে—আমার তো তাহলে লুকিয়ে থাকতে হয়। যার আসার কথা ছিল সে আমাকে না দেখে ফিরে যাবে। ঠিক ছিল সে আমাকে নিয়ে বেড়াতে বেরোবে।

ওয়াং—আমরা তাহলে আসব কি?

শেন্‌টে—এস, কিন্তু জোরে কথা বোলো না। আচ্ছা, ওঁদের সামনে আমাকে কি ভেবেচিন্তে কথা বলতে হবে?

ওয়াং—নিশ্চয়ই। ওঁরা যেন বুঝতে না পারেন তুমি কিভাবে জীবিকা চালাও। আমরা নিচে অপেক্ষা করছি। তুমি তাহলে সেই লোকটির সঙ্গে বাইরে যাবে না তো?

শেন্‌টে—গত কয়েকদিন কিছুই রোজগার হয় নি। কালকে ঘর ভাড়া দিতে না পারলে আমাকে তাড়িয়ে দেবে।

ওয়াং—এই শুভক্ষণে টাকার চিন্তা মনে স্থান দিও না।

শেন্‌টে—জানি কি করব—খিদেয় যখন পেট চোঁ চোঁ করে তখন অন্য কথা মনে আসতে চায় না। যাই হোক, ওঁদের আমার বাড়িতেই আশ্রয় দেব। (জানলা বন্ধ করে দেবে।)

১ম—নাঃ, এখানে আশ্রয় পাবার কোন আশাই নেই।

[দেবতারা ওয়াং-এর দিকে এগিয়ে যাবেন।]

ওয়াং—(হঠাৎ ওদের পেছনে দেখতে পেয়ে চমকে উঠবে) আপনাদের রাতের থাকবার জায়গা ঠিক হয়ে গেছে। (হাত দিয়ে মুখের ঘাম মুছবে।)

দেবতারা—তাই নাকি? তা হলে যাওয়া যাক্।

ওয়াং—তাড়া কি ধীরে-সুস্থে গেলেই হবে। ঘরটা একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে নিচ্ছে।

৩য়—আমরা এখানেই বসে একটু অপেক্ষা করি।

ওয়াং—এখানে বড্ড লোকের ভিড়—চলুন রাস্তার ওপারে যাওয়া যাক্।

২য়—না, এখানে বসেই লোকের যাতায়াত দেখি। এই কাজের জন্যেই আমরা এসেছি।

[ওঁরা রাস্তার ধারে বসবেন, ওয়াং একটু দূরে বসবে—

ওয়াং—একজন মহিলার বাড়িতে আপনারা থাকবেন—উনি একলা থাকেন এবং ওঁকে খেটে খেতে হয়। সেজুয়ান শহরের সেরা মহিলা বলতে এই মহিলাকেই বোঝায়।

৩য়—খুবই ভাল কথা।

ওয়াং—(দর্শকদের প্রতি) আমার জলপাত্রটা তুলে নেওয়ার সময় দেবতারা অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। আপনাদের কি মনে হয় তাঁরা কিছু বুঝতে পেরেছেন? আর ওঁদের মুখের দিকে তাকাতে আমার সাহস হচ্ছে না।

৩য়—তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

ওয়াং—সামান্য. অনেক ঘোরাঘুরি করতে হয় তো।

১ম—এখানকার লোকেরা জীবনকে কিভাবে নেয়—খুব কষ্টকর লাগে?

ওয়াং—ভাল লোকেদের তাই লাগে?

১ম—তোমার নিজের কেমন লাগে?

ওয়াং—আপনারা কি জানতে চান বুঝতে পেরেছি। আমি ভাল লোক নই। তবে আমারও এখানকার জীবনকে দুর্বিষহ বলে মনে হয়।

[এবার একজন ভদ্রলোক শেন্‌টের বাড়ির কাছে এসে দাঁড়াবে এবং কয়েকবার শিস দেবে—প্রত্যেক শিসের সঙ্গে সঙ্গে ওয়াং চমকে উঠতে থাকবে।]

৩য়—(মৃদুস্বরে) মনে হচ্ছে লোকটি এবার হাল ছেড়ে দিয়েছে।

ওয়াং—(সবকিছু যেন গুলিয়ে গেছে) তাই তো মনে হচ্ছে।

[ওয়াং লাফিয়ে এগিয়ে আসবে—তার জলপাত্র বহন করার দণ্ডটি পেছনে পড়ে থাকবে—ওয়াং উইংস দিয়ে বেরিয়ে যাবে—শেন্‌টে দরজা খুলে মৃদুস্বরে 'ওয়াং' বলে ডাকবে তারপর স্টেজের অন্যধার দিয়ে ওয়াং-এর খোঁজে যাবে। ওয়াং এদিক থেকে মৃদুস্বরে 'শেন্‌টে' বলে ডাকবে—কোনো জবাব না পাওয়াতে—]

ওয়াং—আমাকে বিপদে ফেলে ও চলে গেছে। ও গেছে বাড়ি ভাড়ার টাকা রোজগার করে আনতে। মহৎ ব্যক্তিদের স্থান দেবার মতো জায়গা কোথায় পাই। পরিশ্রান্ত হয়ে ওরা এখানে অপেক্ষা করছেন। আমি আর ওঁদের কাছে গিয়ে বলতে পারি না—দুঃখিত, আশ্রয় মিলল না। আমি যে আস্তাকুঁড়ে থাকি, সেখানে তো আর ওঁদের নিয়ে যেতে পারি না। তা ছাড়া আমি যে লোক সে কথাও ওঁরা বুঝতে পেরেছেন। আমার সঙ্গে ওঁরা থাকবেনও না। জলপাত্র বইবার দণ্ডটা পড়ে রইল। ওদিকে আর যাব না। সব পারি। যাঁদের ভক্তি করি, তাঁদের একটু সাহায্য যখন করতে পারলাম না তখন ওঁদের দৃষ্টির আড়ালে চলে যাওয়াই ভাল।

[হঠাৎ কেটে পড়বে। শেন্‌টে ফিরে এসে ওকে খুঁজতে থাকবে—তার দৃষ্টি দেবতাদের দিকে পড়বে।]

শেন্‌টে—আপনারাই কি সেই মহৎ দেবতারা? আমার নাম শেন্‌টে। আমার ছোট ঘরটিতে যদি এসে

রাতের মতো আশ্রয় নেন, আমি বাধিত হব।

৩য়—জল বিক্রেতা কোথায় গেল?

শেন্‌টে—তাকে তো দেখতে পেলাম না।

১ম—ও বোধহয় ভাবল তুমি আসবে না, তাই আমাদের কাছে কি বলবে ভেবে সরে পড়েছে।

৩য়—(দণ্ডটি তুলে নিয়ে) এটি যত্ন করে রেখে দিও—ওর পরে দরকার হবে।

[এরপর শেন্‌টের সঙ্গে ওরা ভেতরে ঢুকবেন—আলো নিভে যাবে এবং অল্পক্ষণ বাদে জ্বলবে। ভোরের আবছা আলোয় শেন্‌টে লণ্ঠন হাতে ও'দের পথ দেখাচ্ছে। দরজার বাইরে এসে ও'রা বিদায় নেবেন।]

১ম—প্রিয় শেন্‌টে, তোমার এই অতিথিপরায়ণতার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা কখনও ভুলব না যে তুমি আমাদের রাতের আশ্রয় দিয়েছিলে। জল বিক্রেতাকে তার দণ্ডটা ফিরিয়ে দিও। তাকে বোলো অন্তত একজন সৎ মানুষের সঙ্গে আমাদের দেখা করিয়ে দেবার জন্যে আমরা তার কাছেও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

[শে]ন্‌টে—প্রভু, আমি সৎ নই। আপনাদের কাছে আমার একটা স্বীকারোক্তি করবার আছে। ওয়াং যখন আপনাদের আশ্রয় দেবার কথা বলেছিল, আমি ইতস্তত করেছিলাম।

[১ম]—ইতস্তত করার জন্যে কোনো অপরাধ হয় নি। কারণ দ্বিধাকে শেষ পর্যন্ত তুমি জয় করেছিলে। তুমি তো শুধু আমাদের রাতের আশ্রয়ই দাও নি—সেই সঙ্গে আরও অনেক কিছু দিয়েছ। অনেকেই সন্দেহ করেছেন—এর ভেতর দেবতারাও আছেন—যে পৃথিবীতে আজকাল আর সৎব্যক্তি বলে কেউ নেই। এ ব্যাপারটা যাচাই করবার জন্যেই আমরা সফরে বেরিয়েছি। আমরা খুবই আনন্দ পেয়েছি যে তোমার মতো একজন সৎ মানুষের সাক্ষাৎ আমরা পেয়েছি। বিদায়।

[শে]ন্‌টে—প্রভু, একটু অপেক্ষা করুন। আমি সৎ একথা আমি জোর দিয়ে কি করে বলি! আমি ভাল হ'তে চাই, কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই তো ভাল হওয়া যায় না। বাড়িতে থাকি, সুতরাং বাড়ির ভাড়া দিতে হবে। কিন্তু টাকা পাব কোথায়? আমি আপনাদের কাছে স্বীকার করছি জীবিকার্জনের জন্যে আমার নিজেকে বিক্রী করতে হয়—তাতেও যা আয় হয় তাতে চলে না—কারণ আরও অনেকে বাধ্য হ'য়ে এ কাজ করছে—সুতরাং...অন্য কাজ পেলে তখনই নিতাম। এ পথে যারা এসেছে সবাই তাই করতো। আপনাদের সব কিছু বিধি-বাঁধন-নির্দেশ মেনে চলতে চাই—কিন্তু সময় সময় বাধ্য হয়েই...

১ম—সৎ লোকের মনেই এসব দ্বিধা আসে শেন্‌টে। জল বিক্রেতাকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানিও। সে আমাদের সত্যিকার বন্ধুর কাজ করেছে।

২য়—ওর প্রতি আমরা কোনো মহত্ত্ব দেখাবার সুযোগ পেলাম না।

৩য়—তোমার মঙ্গল হোক।

১ম—সব সময় সৎ থাকবার চেষ্টা করবে—শেন্‌টে, আচ্ছা বিদায়।

[তাঁরা যাবার উদ্যোগ করবেন এবং হাত নেড়ে বিদায় অভিনন্দন জানাবেন।]

শেন্‌টে—কিন্তু আমি নিজের সম্বন্ধে যে নিশ্চিন্ত হতে পারি না—কি করে সৎ থাকব বলুন, সমস্ত জিনিসের যখন আগুনের মতো দাম—

২য়—অত্যন্ত দুঃখিত। ও বিষয়ে আমাদের হাত বাঁধা। অর্থনীতির ব্যাপারে আমাদের মাথা গলাবার উপায় নেই।

৩য়—দাঁড়াও। এক মিনিট। একে কিছুটা আর্থিক সুবিধা করে দিলে, এর ভাল থাকবার পক্ষে যথেষ্ট সুবিধে হবে।

২য়—ওকে তো আমরা কিছু দিতে পারি না। দিলে উপরে ফিরে গিয়ে সেজন্যে আমাদের কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

১ম—কেন দিতে পারি না?

[তিনজন দেবতার কিছুক্ষণ সলা-পরামর্শ হবে।]

১ম—শেন্‌টে, আমরা জানি বাড়ি ভাড়া দেবার টাকা তোমার হাতে নেই। আমরা গরীব নই—সুতরাং এখানে রাত্রে থাকার জন্যে তোমাকে খরচ বাবদ টাকা দেব এটাই স্বাভাবিক। এই নাও (শেন্‌টে-কে অর্থ প্রদান) কিন্তু কারোকে একথা জানিও না। লোকে ভুল বুঝবে।

[দেবতারা বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে চলে যাবেন এবং ধীরে ধীরে যবনিকা নেবে আসবে।]

দৃশ্যটির প্রথমেই দেখা যাচ্ছে সনাতন প্রচলিত ধারায় 'ইলিউশন অভ্ রিয়ালিটি'র প্রতিষ্ঠা করবার কোনরকম প্রচেষ্টা ব্রেখ্‌ট করছেন না—দর্শকরা পরিষ্কার বুঝতে পারবেন তাঁরা থিয়েটার দেখতে এসেছেন এবং এ নাটকে নাট্যকারের একটা বিশেষ বক্তব্য আছে—অথচ অভিনয় দেখবার আনন্দ থেকেও তাঁরা বঞ্চিত হবেন না। ব্রেখ্‌ট বিশ্বাস করতেন থিয়েটারে একই সঙ্গে আনন্দদান এবং শিক্ষাদান করাটাই নাট্যকারের কর্তব্য। এপিক থিয়েটার বলতে কি বোঝায়? Lawrence Ryan বলেছেনঃ The term 'epic' undergoes a considerable shift in meaning. Its interpretation is made more difficult, especially for the non-Germanist, in that it implies a specific radition of German critical thought. This difficulty is exemplified by the frequently encountered English practice of defining 'epic' theatre—justly enough—in terms of its 'narrative' element, but then proceeding to interpret this element principally as an indication of the 'episodic' nature of the plays, which some critics have even likened to the form of the so-called 'hicaresque' novel. It is well to recognize that in German the term 'epic' has a wider meaning than in English, and is regularly used to embrace all narrative writings, even the novel—hence the tripartite division between the epic, Lyric and dramatic as the three basic literary forms.

এরপর আসছে প্রথম দৃশ্যটি—

—প্রথম দৃশ্য—

একটি ছোট তামাকের দোকান—এখনও দোকান খোলে নি

শেন্‌টে—(দর্শকদের প্রতি) দেবতারা আসার পর তিনদিন হয়ে গেল। তাঁরা বলেছিলেন রাত্রে থাকার জন্যে আমাকে টাকা দেবেন। যা দিলেন, হিসেব করে দেখি এক হাজার ডলারেরও বেশি তাঁরা আমাকে দিয়েছেন। সেই টাকা দিয়ে এই তামাকের দোকানটা কিনেছি। গতকাল এখানে উঠে এসেছি—এখন আশা হচ্ছে অনেক কিছু সৎ কাজ করতে পারব। এই দোকানের পুরোনো মালিক মিসেস সিনের ব্যাপারটাই দেখুন না। গতকাল মহিলা এসেছিল আমার কাছে ছেলেপিলেদের জন্যে চাল চাইতে। আবার দেখছি সামনের রাস্তা দিয়ে পাত্র হাতে এদিকে আসছে।

[মিসেস সিন আসবে—দুজনে দুজনকে বাউ করবে।]

শেন্‌টে—শুভ সন্ধ্যা মিসেস সিন।

মিসেস সিন—শুভ সন্ধ্যা মিস শেন্‌টে। নতুন বাড়ি লাগছে কেমন?

শেন্‌টে—ভালই লাগছে। আপনার ছেলে-মেয়েরা নতুন জায়গায় কেমন রাত কাটালো?

মিসেস সিন—অন্যের বাড়ি, অবশ্য ঐ লড়ঝড়ে মাথা গোঁজবার ঠাঁইটিকে ঠিক বাড়ি বলা যায় না। বাচ্চাটা যা কেশেছে সারা রাত।

শেন্‌টে—এটা তো ভাল খবর নয়।

মিসেস সিন—কতোটা খারাপ, সে তুমি ধারণাও করতে পারবে না। তোমার এখন ভাল সময়—কিন্তু এখানে থাকলে অনেক রকম অভিজ্ঞতা হবে। এখানকার সারা পল্লীটাই নোংরা এবং জঞ্জালে ভর্তি।

শেন্‌টে—ঠিকই বলেছ। দুপুরে সিমেন্ট কারখানার লোকগুলো এসেছিল।

মিসেস সিন—আর কেউ কিনতে আসে না। কাছাকাছি যারা থাকে তারাও না।

শেন্‌টে—দোকানটা আমাকে বিক্রী করবার সময় কিন্তু এসব কিছুই বলো নি।

মিসেস সিন—বলো, বলো, যা মন চায় বলে নাও। আমার বাচ্চাদের মাথা গোঁজবার ঠাঁইটা প্রথমত টাকার জোরে ছিনিয়ে নিলে—এখন যা মন চায় বলো। বলো আমি ঠগ, জোচ্চোর—আমাকে সবই সহ্য করতে হবে—(কান্নায় ভেঙে পড়বে।)

শেন্‌টে—একটু দাঁড়াও, তোমাকে চাল এনে দিচ্ছি।

মিসেস সিন—আমি কিছু টাকা ধার নিতে এসেছিলাম।

শেন্‌টে—(ওর পাত্রে চাল দিয়ে) টাকা দিতে পারব না। এখন পর্যন্ত কোনো কিছু বিক্রীই করতে পারি নি।

মিসেস সিন—টাকা না হলে চলবে কি করে? আমার সব কিছু তুমি নিয়ে নিয়েছ। তুমি যদি এভাবে আমার গলায় ছুরি চালাতে চাও, তাহলে আমার বাচ্চাদের তোমার দোরগোড়ায় ফেলে রেখে যাব। বুঝলে রক্ত-পিশাচিনী?

[এক টান দিয়ে শেন্‌টের হাতের চালের পাত্রটা কেড়ে নেবে।]

শেন্‌টে—এত মেজাজ করো না—টানা-টানিতে চালগুলো মাটিতে পড়ে নষ্ট হবে।

[এক বয়স্ক দম্পতি ও একজন নোংরা-পোষাক-পরা লোক ঢুকবে।]

মহিলা—এই যে প্রিয় শেন্‌টে—আমরা শুনলাম তুমি ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলেছ। এখন দেখছি তুমি ব্যবসা সুরু করে দিয়েছ। ভাবতে পারো আমরা আজ ঘরছাড়া। আমাদের তামাকের দোকানটা বন্ধ করে দিতে হয়েছে। ভাবলাম একটা রাত তোমার কাছে নিশ্চয় আশ্রয় পাবো। আমার ভাইপোকে তো জানো—ও আবার আমাদের ছেড়ে থাকতে পারে না।

ভাইপো—(চারিদিকে চেয়ে) বেশ চমকদার দোকান তো!

মিসেস সিন—এরা আবার কারা?

শেন্‌টে—আমি যখন প্রথম গ্রাম থেকে এ শহরে আসি, এরাই ছিল আমার প্রথম বাড়িওয়ালা। (দর্শকদের প্রতি) আমার জমা টাকা ফুরিয়ে গেলে, এরা আমাকে রাস্তায় বার করে দিয়েছিল। এখন বোধহয় ভয় পাচ্ছে আমি ওদের রাস্তা দেখিয়ে দেব। কিন্তু ওরা সত্যিই গরীব।

এদের না আছে কোনো আশ্রয়
না কোনো বন্ধুবান্ধব
এদের দরকার সাহায্যের
এদের কি করে দূর করে দিই?

(মহিলাকে বন্ধুত্বপূর্ণ স্বরে) তোমাদের আমি স্বাগত জানাচ্ছি, আমি খুশি মনে তোমাদের আশ্রয় দেব। কিন্তু দোকানের পেছনে আমার যে ঘরটি আছে, সেটি কিন্তু খুব ছোট।

পুরুষটি—ওতেই আমাদের চলে যাবে। এ নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। (শেন্‌টে ওদের চা এনে দেবে) আমরা পেছনের দিকে চললাম—তোমার কাজের বাধা হবো না। তোমার প্রথম আশ্রয়স্থলের কথা মনে থাকতেই নিশ্চয়ই তামাকের দোকান নিয়েছ। এ ব্যাপারে আমিও তোমাকে দু'-চারটে উপদেশ দিতে পারব—আর খানিকটা সেই কারণেই তুমি তামাকের দোকান খুলেছ শুনে এখানে এলাম।

মিসেস সিন—(কাষ্ঠ হাসির সঙ্গে) এই সঙ্গে সঙ্গে দু-একজন খরিদ্দার যদি আসতো?

মহিলা—এ কি আমাদের উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে?

পুরুষ—চুপ চুপ, একজন খরিদ্দার সত্যিই আসছে।

[ছিন্নভিন্ন পোষাকে একটি লোকের প্রবেশ]

লোকটি—ক্ষমা করবেন মিস, আমি বেকার।

[মিসেস সিন হেসে উঠবেন]

শেন্‌টে—আমি তোমার জন্যে কি করতে পারি বল তো?

বেকার লোকটি—শুনলাম তুমি কাল দোকান খুলছ? বাঁধা জিনিসপত্র খুলতে গিয়ে অনেক সময়ই দেখা যায় ভেতরের মাল খানিকটা নষ্ট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, একটা সিগরেট দাও না?

মহিলা—কতদূর বেয়াদপ! তামাক ভিক্ষে করছেন। তামাক তো রুটি নয়—

বেকার—রুটির তো অনেক দাম। সিগরেটে দু'-তিনটে টান দিলেই নতুন মানুষ বনে যাব—এ তো মিইয়ে গেছে।

শেন্‌টে—(সিগারেট দিয়ে) দামী কথা বলেছ—নতুন মানুষ বনে যাবে। কাল তোমাকে নিয়েই দোকান খুলব—হয়তো তোমার থেকেই সৌভাগ্য আসবে।

[বেকার খুব তাড়াতাড়ি সিগারেট ধরিয়ে কয়েক টান দেবে এবং কাশতে কাশতে বেরিয়ে যাবে।]

মহিলা—এটা কি ভাল কাজ হ'ল?

মিসেস সিন—এইভাবেই যদি তুমি দোকান খোলো, তাহলে তিনদিন যেতে না যেতেই তোমাকে দোকান বন্ধ করতে হবে।

পুরুষ—আমি বাজী রেখে বলতে পারি ও লোকটার হাতে পয়সা ছিল।

শেন্‌টে—কিন্তু ও-যে বলল ওর কিছু নেই।

মহিলা—শেন্‌টে না করতে জানে না। তুমি বড় ভাল শেন্‌টে। দোকান চালাতে হ'লে বাজে লোকেদের হটিয়ে দিতে হবে।

পুরুষ—ওসব লোককে বলবে দোকানটা তোমার নয়—একজন আত্মীয়ের। আর সে হিসাব-নিকাশ ব্যাপারে ভয়ানক কড়া। এইভাবে কাজ চালিয়ে যাও তো?

মিসেস সিন—দয়ার অবতার হ'য়ে না বসে ঐভাবেই লোককে তাড়িয়ে দেবে, বুঝলে?

শেন্‌টে—(হাসতে হাসতে) বিরক্তি দেখাবো তো? তাহলে তোমরাও ঘর পাবে না—আর আমার চালও আমি ফিরিয়ে নেব।

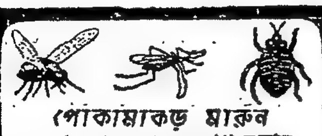
পোকামাকড় মারুন
এরা অনেক রকম রোগ ছড়ায়
মারাকিট
আরসোলা, ছারপোকা, মশা প্রভৃতির নির্ঘাত প্রাণ-ঘাতক
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

মহিলা—সে কি, ওই চালটা তুমি বুঝি দিয়েছ?

শেনটে—(দর্শকদের)
এরা কিন্তু ভাল নয়
এদের কোনো বন্ধু নেই
অন্যকে কিছু দিলে এরা বিরক্ত হয়
সব কিছু নিজেরাই নিতে চায়
এদেরই বা দোষ দিয়ে লাভ কি?

[একটি ছোটখাট লোককে আসতে দেখা যাবে। মিসেস সিন তাকে দেখেই সরে পড়বে এবং যাবার সময় বলবে]

মিসেস সিন—আচ্ছা, আবার কাল আসব।

[খাটো মানুষটি মিসেস সিনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে]

ছোট মানুষটি—মিসেস সিন, তোমার খোঁজেই এসেছিলাম।

[মিসেস সিন ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে]

মহিলা—মিসেস সিন কি রোজই আসে? তোমার কাছে কিছু দাবি-দাওয়া আছে না-কি?

শেনটে—না দাবি নেই। খিদের তাড়ায় আসে—আর এত বড় দরকারটাকে তো তাড়িয়ে দেওয়া যায় না।

ছোট মানুষটি—ও জেনেশুনেই পালিয়ে গেল। তুমি বুঝি নতুন মালিক—শোনো, আমি হচ্ছি ছুতোর মিস্ত্রী—ওই বদমাইস মহিলা আমাকে দিয়ে কাজ করিয়ে—এখন পর্যন্ত আমার পাওনা টাকা দেয় নি। টাকা না পেলে ওইসব সেল্‌ফ আমি তোমার দোকান থেকে তুলে নিয়ে যাব।

শেনটে—কিন্তু দোকান কেনবার সময় আমি তো এ-সবের দাম ওকে দিয়েছি।

ছুতোর—আমি সেসব জানি না—একশো রুপোর ডলার আমার পাওনা আছে। সেটা আমি আদায় করে ছাড়বো—তা না হ'লে আমার নাম লিনটো নয়।

শেনটে—আমি কি করে দেব। আমার আর টাকা নেই।

ছুতোর—তাহলে তোমার দোকান যাতে বিক্রি হয়ে যায় সে-ব্যবস্থা আমি করবো।

পুরুষ—(শেনটেকে প্রম্পট্ করবে) তোমার সেই কাজিন......

শেনটে—আসছে মাসে এস।

ছুতোর—(চিৎকার করে) না।

শেনটে—এত নির্দয় হয়ো না মিস্টার লিনটো। একসঙ্গে সবার পাওনা কি করে আমি মেটাবো বল। একটু ধৈর্য ধরো।

লিনটো—আমার সঙ্গে বা আমার পরিবারের বেলায় তো কেউ ধৈর্য ধরে না। আমার পাওনা চুকিয়ে দাও, নইলে ওইসব সেলফের তক্তাগুলো খুলে নেব।

তোমার সেই কাজিনকে জানিয়ে দাও। (ছুতোরকে) তোমার দাবি-দাওয়া লিখিতভাবে জানাও—শেনটের কাজিন দেনা চুকিয়ে দেবে।

ছুতোর—ওইসব কাজিনের ধাপ্পা আমার কাছে চলবে না—
(হো হো করে হেসে উঠবে।)

ভাইপো—বোকার মতো দাঁত বার করে হেসো না। ওই কাজিন আমার বিশেষ বন্ধু।

পুরুষ—কাজিনের স্বভাবটা কিন্তু তীক্ষ্ণধার ছুরির মতো।

ছুতোর—আচ্ছা, আচ্ছা, তাকেই বিল পাঠিয়ে দেবো।

[একধারে এসে বিল তৈরি করতে মন দেবে।]

মহিলা—(শেনটের প্রতি) ওকে এখন থেকে থামাতে না পারলে তোমার গায়ের জামা পর্যন্ত খুলে নেবে। আমি বলি কি—সত্য হোক, কি মিথ্যে হোক, কোনো দাবি-দাওয়া তুমি মেনে নিও না—তাহলে কিছুতেই সামলাতে পারবে না। রাস্তায় রুটির টুকরো ছুড়ে দাও, দেখবে কুকুরের দল এসে কামড়া-কামড়ি সুরু করে দিয়েছে—পাওনাদাররাও সেইরকম—তা ছাড়া সলিসিটররা রয়েছে কেন?

শেনটে—লোকটি কাজ করেছে—পয়সা না নিয়ে তো সে চলে যেতে পারে না। তারও সংসারের ভরণপোষণ চালাতে হয়। কি বিশ্রী ব্যাপার—ওকে দেবার মতো টাকা আমার হাতে নেই। দেবতারাই বা কি ভাববেন?

পুরুষ—আমাদের যে মুহূর্তে আশ্রয় দিয়েছ, তখনই তোমার যথেষ্ট সৎ কাজ করা হয়ে গেছে। আর কিছু ভাল কাজ করবার তোমার বিশেষ দরকার হবে না।

[একটি খোঁড়া লোক এবং একজন সন্তান-সম্ভবা নারী এসে ঢুকবে—পুরুষ এবং মহিলার উদ্দেশ্যে বলবে—]

খোঁড়া—এই যে তোমরা এখানে চলে এসেছ। আমাদের ফেলে রেখে এভাবে চলে আসাটা সত্যিই বাহাদুরির কাজ......

মহিলা—(অস্বস্তির সঙ্গে) এ হচ্ছে আমার ভাই উং আর আমার ভাইয়ের বৌ। চেঁচামেচি কোরো না, দূরে ওইখানে গিয়ে বোসো—আমাদের পুরোনো বন্ধু শেনটের কাজের ব্যাঘাত হবে তোমাদের গোলমালে। (শেনটেকে) ওদেরও আমাদের সঙ্গে থাকতে বলি, কি বল?

শেনটে—তোমাদের আমি এখানে থাকতে স্বাগত জানাচ্ছি।

মহিলা—(ওদের প্রতি) শেনটেকে ধন্যবাদ জানাও। আর এই চায়ের কাগজগুলো নিয়ে যাও। (শেনটেকে) ওদের কোথাও যাবার জায়গাও ছিল না। তুমি দোকানটা কিনে ভালই করেছ।

শেনটে—(দর্শকদের উদ্দেশ্যে হাসবে) হ্যাঁ, দোকানটা নিয়ে ভালই করেছি।

[এবার ঢুকবেন মিসেস মিৎসু—ইনি এখানকার বাড়ির মালিক। তাঁর হাতে থাকবে একটি ডকুমেণ্ট।]

মিসেস মিৎসু—মিস শেনটে, আমি হচ্ছি মিসেস মিৎসু, এই বাড়ির মালিক। আমার মনে হয় আমাদের ভেতর কোনো গোলমাল হবে না। লিজের এগ্রিমেণ্টটা আমি নিয়ে এসেছি—এই দ্যাখো। (শেনটে এগ্রিমেণ্টটা পড়ে দেখবে) ছোট একটা ব্যবসা চালু হ'ল—তার মানেই এটা একটা খুবই শুভ মুহূর্ত—তোমরা কি বলো? কিন্তু শেনটে, তোমার সম্বন্ধে দু'একটা পরিচয়পত্র আমার দরকার।

শেনটে—না হলে চলবে না?

মিসেস মিৎসু—তোমার সত্যিকার পরিচয় তো আমার জানা নেই।

পুরুষ—মিস শেনটে সম্বন্ধে আমরা সার্টিফাই করতে পারি। এ শহরে আসবার প্রথম অবস্থা থেকেই আমরা ওকে জানি।

মিসেস মিৎসু—তোমাদের পরিচয়ও তো আমি জানি না।

পুরুষ—আমি তামাক ব্যবসায়ী মা ফু।

মিসেস মিৎসু—কোনখানে তোমার দোকান?

পুরুষ—বর্তমানে আর আমার দোকান নেই—ক'দিন আগেই সেটা বিক্রি করে দিয়েছি।

মিসেস মিৎসু—বটে! (শেনটের প্রতি) আর কেউ নেই যে তোমার পরিচয় দিতে পারে?

মহিলা—কাজিন, তোমার কাজিন।

মিসেস মিৎসু—কি রকম ভাড়াটে রাখছি, সে বিষয়ে আমার আগে থেকে জানা চাই—আর সে ব্যবস্থা তোমাকে আগে থেকে করতেই হবে। আমার বাড়িটা হচ্ছে ভদ্রলোকের থাকবার জায়গা—তোমার পরিচয় না পেলে এগ্রিমেন্টে সই করতে পারবো না।

শেনটে—(ধীরে, মাথা নিচু করে) আমার একজন কাজিন আছে।

মিসেস মিৎসু—ও, কাজিন আছে? কাছাকাছি থাকে নাকি? তাহলে তো সোজা আমরা তার কাছে যেতে পারি? সে করে কি?

শেন্‌টে—সে অন্য শহরে থাকে।
মহিলা—তুমি তো বলেছিলে সঙ্গে থাকে?
শেন্‌টে—হ্যাঁ, সঙ্গ-এর মিস্টার সুইটা।
পুরুষ—তাই বলো, আমি তো তাকে চিনি। লম্বা রোগা ধরণের দেখতে—
ভাইপো—(ছুতোরকে) ভায়া, তোমাকেও শেন্‌টের কাজিনের সংগে মোকাবিলা করতে হবে, মনে আছে তো— তোমার বিলের ব্যাপারে?
ছুতোর—(বিরক্তিভরে) বিলটা তৈরি করছি। এই নাও। কাল সকালে প্রথমেই এখানে আসবো।
(বেরিয়ে যায়।)
ভাইপো—(ছুতোরের উদ্দেশ্যে এবং বাড়ির মালিক মিসেস মিৎসুও যাতে শুনতে পায় এইভাবে) ভাবনা কোরো না শেন্‌টের কাজিন তো পাওনা দিয়েই দেবে।
মিসেস মিৎসু—(শেন্‌টের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে) ভাল কথা, আমিও তার সংগে দেখা হলে খুশি হবো। শুভ ইভনিং মাদাম—
(বেরিয়ে যাবে।)
মহিলা—(অল্প বাদে) সব প্রকাশ হ'য়ে পড়বে। বাজী রেখে বলতে পারি সকালবেলার ভেতরেই বাড়িউলি তোমার সম্বন্ধে সব খবর খুঁজে বের করে নেবে।
ভাইয়ের বৌ—(ভাইপোকে) এইখানেও বেশি দিন থাকা চলবে না মনে হচ্ছে।

[একটি বৃদ্ধ এবং তার পথপ্রদর্শক একটি বালক ঢুকবে।]
বালক—এই যে এরা সব এখানে এসেছে।
মহিলা—কি ঠাকুর্দা, কি খবর? (শেন্‌টের প্রতি) বৃদ্ধ বড় ভাল লোক। নিশ্চয় আমাদের সম্বন্ধে ভেবে ভেবে আকুল হয়েছে। আর ছোট ছেলেটা, দেখছ কত বড় হয়েছে! প্রচুর খেতে পারে। সংগে আর কেউ আছে নাকি?
পুরুষ—(একবার চারিদিকে তাকিয়ে) শুধু তোমার ভাইঝি আসছে। (শেন্‌টেকে) আমাদের দলটা কি অনেক বেশি হয়ে গেল? তুমি যখন আমাদের ওখানে ছিলে, তখন আমাদের সংসার বড় ছিল না। তারপরে পরিবার বৃদ্ধি পেতে সুরু হ'ল। যত অবস্থা খারাপ হয়, বাড়িতেও বেশি লোক দেখা যায়—পরিবার বাড়ে আর অবস্থাও আরও খারাপের দিকে যায়।
[শেন্‌টে দোকান বন্ধ করবে—সবাই বাইরে এসে ছড়িয়ে বসবে।]
মহিলা—সব থেকে বড় কথা হ'ল, তোমার দোকান চালানোর পথে আমরা বাধা হবো না। তোমাকেই তো বাড়ির ভাবনা ভাবতে হবে। আমরা ঠিক করেছি, দিনের বেলায় আমরা সব বেরিয়ে যাবো। বাড়িতে থাকবে শুধু বৃদ্ধ ঠাকুর্দা আর ভাইয়ের বৌটি। আমিও হয়তো থাকতে পারি। অন্যরা হয়তো দু-এক সময় এসে উঁকি দিয়ে যেতে পারে। ছোক্‌রারা সব আলোটালোগুলো জ্বালাবার ব্যবস্থা করো। এ বাড়ি তোমাদের নিজেদেরই ভেবে নিয়ে সব দিক দেখে-শুনে নিতে ক্ষতি কি?
ভাইপো—(ঠাট্টার ছলে) আশা করি নির্মম কাজিনটি আজ রাতে এখানে এসে হাজির হবেন না।

[ভাইয়ের বৌটি হেসে উঠবে—এবার সবাই কোনো না কোনো রকমের ধূমপান সুরু করে দেবে।]

ভাইপো—এস সবাই মিলে কাজিনের স্বাস্থ্য পান করা যাক্‌।
[এক জাগ মদ নিয়ে সবাইকে দেবে।]
ভাইপো—মদটা কোথা থেকে পাওয়া গেল?
ভাইয়ের বৌ—উনি তামাকের বস্তাটা আসবার আগে বাঁধা দিয়ে এসেছিলেন।
পুরুষ—বল কি? ওই তামাকের বস্তাটাই তো আমাদের একমাত্র সম্বল ছিল। কি সর্বনেশে বলো তো?
ভাই—আমাকে গালাগাল দিচ্ছ, আবার মদের পাত্রে চুমুক দিতেও মুখে বাধছে না।
মহিলা—থামো, গোল করো না। দোকানটা যা ভেবেছিলাম তার থেকে অনেক ছোট। আমার আন্ট এবং অন্য কয়েকজনকেও আসতে বলেছিলাম—কিন্তু এতজন এলে চলবে কি করে?

[বাইরে থেকে চিৎকার শোনা গেল—'দরজা খোলো'।]

মহিলা—(চিৎকার করে) আন্টি তোমরা নাকি? (আস্তে) কিন্তু এতজন লোক এলে খরচ চলবে কি করে?
শেন্‌টে—আমার এই সুন্দর দোকানটা—কত আশা আমার মনে বাসা বেঁধেছিল—কিন্তু খুলতে না খুলতেই মনে হচ্ছে এটাকে বন্ধ করতে হবে। (দর্শকদের)
যে নৌকা আমাদের পারে নিয়ে যেতে পারতো
সেটা প্রথমেই গেল ডুবে
জলে যারা হাবুডুবু খাচ্ছিল
সবাই নৌকোটাকে আঁকড়ে ধরতে গিয়ে
সেটাকেও দিল ডুবিয়ে—

[বাইরে থেকে চিৎকার—'দরজা খোলো'।

দেশ সেবায় নিয়োজিত,
এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড
কলিকাতা—৫০
নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকরণের অগ্রণী
—ব্রাঞ্চ সমূহ—
বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর
বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গৌহাটী

রঙ্গজগৎ

বিশ্বজিৎকে প্রত্যাভিবাদন

নাটকের সংলাপ

নাটকে সংলাপের গুরুত্ব খুবই বেশি। বাংলার নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সংলাপ। সাহিত্যধর্মিতায়, বাস্তববোধ এবং সংযমে সংলাপ নাটকের অনেকখানি স্থান দখল করে থাকে। নাটকের মূল্য নিরূপণে সংলাপ বিশেষভাবে বিবেচিত হয়। কোন নাটক বিষয়বস্তুর দিক থেকে হয়ত ভাল, অভিনেতারাও সার্থক অভিনয় করলেন, কিন্তু সংলাপ যদি হৃদয়গ্রাহী না হয়, অথবা অর্থবহ যথাযথ শব্দের ব্যবহার যদি না থাকে তখন দর্শকমন তুষ্ট হতে পারে না। অথবা কোন সার্বজনীন সমস্যা নিয়ে নাটক লেখা হল, দর্শকরা সপরিবারে সেই নাটক দেখতে গেলেন, কিন্তু নাট্যকার এমন সংলাপ প্রয়োগ করেছেন যা পরিবারের সকলে একসঙ্গে বসে উপভোগ করতে পারেন না। ছোটদের পাশে নিয়ে বয়স্করা সেই নাটক উপভোগ করতে বিব্রতবোধ করবেন। আজকাল এরূপ ঘটনা প্রায়ই দেখা যাচ্ছে।

সর্বভারতে খ্যাতিসম্পন্ন একজন অভিনেতা কিছুকাল আগে কলকাতার একটি নাটক দেখেছিলেন। সঙ্গে ছিল তাঁর ভগিনী, কলেজের ছাত্রী। নাটকটি দেশাত্মবোধক এবং মহৎ বক্তব্যসম্পন্ন; আঙ্গিকের দিক থেকে বিস্ময়কর। কিন্তু একস্থানে এমন কয়েকটি সংলাপ রয়েছে যা ভগিনীর পাশে বসে শুনতে তিনি বিব্রতবোধ করছিলেন। সর্ববিষয়ে উপভোগ্য হলেও এই সংলাপের জ্বালায় তিনি অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। খুব খেদের সঙ্গে এই কথা তিনি বলেছেন। 'নাট্যকারের সন্ধানে ছয়টি চরিত্র' নাটকটি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন এই নাটকে কিরূপ সংলাপ প্রয়োগ করা হয়েছে। কাঁচা আদিরসের কথায় নাটকটির অঙ্গ রসাক্ত। এই রস কেবলমাত্র বয়স্ক দর্শকরা উপভোগ করতে পারেন। নাট্য সম্প্রদায়ের উচিত তাঁদের বিজ্ঞাপনে সিনেমার মত 'এ' যোগ করা অর্থাৎ কেবলমাত্র বয়স্কদের প্রবেশাধিকার আছে এ কথা জানান। নতুবা ভাই-বোন, বাপ-ছেলে একসঙ্গে এই ধরণের নাটক দেখতে গেলে কানে জ্বালাধরা নিয়ে ফিরে আসতে হবে।

সম্প্রতি 'বিস্ফোরিত বিবর' নামে একটি নাটক দেখলাম। নাটকটির বিষয়বস্তু খুবই ভাল। নাট্যকার আজকের দিনের বাস্তবের মুখোসধারী প্রকৃতিবাদী সাহিত্যিকদের মুখোস উদ্‌ঘাটন করেছেন, এবং এদের ভবিষ্যৎ ও ভবিষ্যৎ সমাজে তাদের কি স্থান হবে তার স্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় দৃশ্যে এক ধর্ষকাম যুবক অর্থাৎ ইচ্ছার দাস একালের এক যুবকের সঙ্গে এরূপ এক নারীর কথোপকথনে যে সব কথা ব্যবহার করেছেন তা যে দশজন শিক্ষিত রুচিসম্পন্ন লোক একসঙ্গে বসে শুনতে পারে তা আমি ভাবতে পারি না। এই কথোপকথনের সময় দেখছিলাম পাশের সীটে উপবিষ্টা এক প্রবীণা ও এক তরুণী মাথা নিচু করে আছেন। দৃশ্যের বিরতি ঘটতে তাঁদের দেখলাম হল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। পরবর্তী দৃশ্যগুলিতে আরো কি শুনতে হয় তার জন্য তাঁরা ভীত হয়ে উঠেছেন। আজকালকার নাটকে নানা রকম গালাগালি এবং অশালীন কথার ব্যবহারের তুলনা নেই। যে সব কথা শিক্ষা ও নীতিহীন মানুষের মুখে অথবা রকবাজদের মুখে শোনা যায় সে সব কথা এখন মঞ্চে শোনা যাচ্ছে।

বাস্তবধর্মিতার নামে যাঁরা এরূপ সংলাপ মঞ্চে উপস্থিত করেছেন তাঁরা প্রগতিশীল নাট্য সংস্থা। বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকে বাংলার নাট্যমঞ্চকে তাঁরা যে সমৃদ্ধ করেছেন সে কথা সর্বজনস্বীকৃত। নাট্য আন্দোলনের প্রভাবে কলকাতার পেশাদারী নাট্যশালার পরিবর্তন ঘটেছিল। শিশির যুগের বলিষ্ঠ ধারাকে এঁরাই আরো এগিয়ে নিয়ে গেছেন। বাস্তবধর্মী নাটক প্রযোজনায় এই দলগুলি বাংলার নাট্যমঞ্চকে সমৃদ্ধ করেছেন। কিন্তু সম্প্রতি বিষয়বস্তুর বলিষ্ঠতা নিয়েও আদিরসাত্মক খিস্তি পর্যায়ের সংলাপের দিকে কেন যে এঁরা ঝুঁকেছেন সে কথা বোঝা যাচ্ছে না। বিবর সাহিত্যকে নিন্দা করতে গিয়ে সেই সাহিত্যের রস ও কথাগুলি হুবহু পরিবেশনের মধ্যে সেই একই বিকৃত মানসিকতা কি প্রকাশ পায় না? প্রগতিশীল দলগুলির পদাঙ্ক অনুসরণ করে অন্য দলগুলিও এ পথে অগ্রসর হচ্ছে। পেশাদার মঞ্চেও এই খিস্তির ছোঁয়া লেগেছে। তা আরো বিশ্রী শোনাচ্ছে, কারণ সে সব নাটকে বিষয়ের গভীরতা নেই, গভীরতায় পৌঁছাবার মত শক্তিও তাদের নেই। সুতরাং আদিরসাত্মক কথাগুলি দুর্গন্ধময় কর্দমের মত নাটকের অঙ্গে লেপ্টে আছে মনে হয়। নাটক দেখে হতাশ হতে হয়।

যে পরিবেশ বা চরিত্র বোঝাবার জন্য আদিরসাত্মক এ সব নিম্নস্তরের কথা ব্যবহার করা হয়—তা বোঝাবার জন্য শিল্পসম্মত শব্দ প্রয়োগ নিশ্চয় করা যায়। আকারে-ইঙ্গিতে অর্থবোধক শব্দের প্রয়োগে বোঝাতে পারাই শিল্পবুদ্ধির সার্থকতা। নতুবা এই স্থূল বাস্তববোধের যুক্তি অনুযায়ী নাটকে কোন চরিত্রে প্রকৃতির ডাকের কথা থাকলে তা বুঝি মঞ্চেই সমাধা করতে হবে। অবশ্য এই বাস্তববাদীরা এদিক থেকেও পিছিয়ে নেই। সম্প্রতি একটি নাটকে বলাৎকারের দৃশ্য দেখান হয়েছে মঞ্চের উপর। শুধুমাত্র মঞ্চ অন্ধকার করে দিয়ে তাঁরা দর্শকদের ভাববার সুযোগ দিয়েছেন। অথচ এই বক্তব্য আরো সঙ্গতভাবে সাজেস্‌টিভ উপায়ে দেখান যেত।

এরূপ সংলাপ ও দৃশ্য অবতারণার পরিণতি কি তা বোধ হয় এখনো এই বাস্তববাদীরা ভাবতে পারছেন না। কিছুদিন পর ফলাফল তাঁরা বুঝতে পারবেন। আসলে এসব বাস্তববাদিতা নয়, বাস্তববাদের বিকৃতি মাত্র। মুখে বৈজ্ঞানিক বাস্তববাদের নাম উচ্চারণ করে এঁরা প্রকৃতিবাদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন। বাস্তববাদের নামে বাংলার মঞ্চে এখন প্রকৃতিবাদ প্রবেশ করতে চাইছে।

—সুজন

চিত্র-আলোচনা

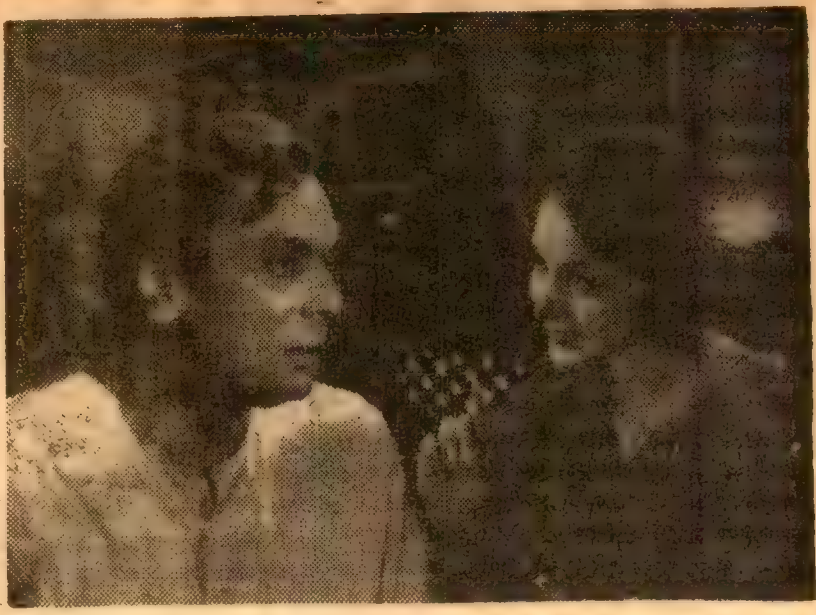

ছায়াছবি প্রতিষ্ঠানের 'প্রস্তরস্বাক্ষর'-এ বিকাশ রায় ও সন্ধ্যা রায়

দেবীতীর্থ কামরূপ কামাখ্যা
(পরিচালনা—মানু সেন)

১৯৬৭ সালে প্রথম বাংলা ছবি মুক্তি-লাভ করল 'দেবীতীর্থ কামরূপ কামাখ্যা'। একটি ধর্মমূলক কাহিনী নিয়ে বাংলার চলচ্চিত্র-বছর সুরু হল। ভক্তিরসাত্মক এই ছবি বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের রচিত চিত্রনাট্য অবলম্বনে নির্মিত।

অতীতের প্রাগজ্যোতিষপুর—বর্তমানের আসামে কামরূপ কামাখ্যা হিন্দুদের একান্ন তীর্থের অন্যতম তীর্থস্থান। কথিত আছে—বিষ্ণুচক্রে কর্তিত হয়ে সতীর যোনি-অঙ্গ আসামে পতিত হয় এবং সেস্থানে তীর্থস্থান গড়ে ওঠে। দেবীর অমরত্ব লাভ করে নরকাসুর দেবী কামাখ্যার সেবকরূপে ত্রিভুবন কম্পিত করে, কিন্তু কালচক্রে দেবীদ্রোহী হওয়ায় তার পতন ঘটে। তারপরে বহুযুগ পরে দেবী কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে শিবসিংহ বর্তমান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মাতৃভক্ত কেন্দুকেলাই নিযুক্ত হন প্রধান পুরোহিত। এই ভক্ত পূজকের সহায়তায় মায়ের মাহাত্ম্য চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে রামেশ্বর নামে এক দুষ্ট এসেছে মন্দিরে। রামেশ্বর কেন্দুকেলাইর নামে অপবাদ রটনা করে শিবসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র নরনারায়ণকে দিয়ে তাকে শাস্তি দিতে চাইলে শিবসিংহের বংশ মায়ের কোপে পতিত হয়; দেবী অভিশাপ দেন —সিংহ পরিবারের কেউ কোনদিন মন্দিরে প্রবেশ করলে সবংশে ধ্বংস হবে। পরে কেন্দুকেলাই মাতৃঅঙ্গে বিলীন হয়ে যায়।

কিংবদন্তী আশ্রিত এইরূপ অলৌকিক কাহিনী কেবলমাত্র বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কাহিনীকে রূপ দেবার এবং দর্শকমনকে চমকিত করার জন্য পরিচালক অনেক ট্রিক সটের আশ্রয় নিয়েছেন। পরিচালক ছবিটিকে হৃদয়গ্রাহী করার জন্য যথেষ্ট যত্ন নিয়েছেন। গানগুলি সু-গীত। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছেন অসিতবরণ (শিবসিংহ), মহেন্দ্র গুপ্ত (বিশ্বসিংহ), গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (কেন্দুকেলাই). কমল মিত্র (নরকাসুর), ভারতী দেবী, যমুনা সিংহ, গীতা দে এবং দেবী কামাখ্যার বিভিন্নরূপে শমিতা বিশ্বাস, গীতা প্রধান ও রত্না ঘোষাল। অন্যান্য চরিত্রে আছেন গঙ্গাপদ বসু, শিশির মিত্র, জয়নারায়ণ মুখার্জী, শ্যাম লাহা, রেণুকা রায়, বেবী গুপ্তা, নৃপতি চ্যাটার্জী। বনানী চৌধুরী প্রমুখ।

'চান্দু গোয়েন্দা অহর এসিস্ট্যান্ট' ছবিতে নৃপতি চ্যাটার্জী ও লিলি চক্রবর্তী

নাটকের কথা

সি এন টি'র নাট্যানুষ্ঠান

গত ১০ই জানুয়ারী সি এন টি'র শিশুরা বিবেকানন্দ হলে তাদের 'নকল রাজা' মুখোস নাটিকা ও 'পুটুরাণী' অভিনয় করল। 'নূপুর' পর্যায়ে ছিল চারখানি সুন্দর নাচ নকল রাজায় কাকলি চ্যাটার্জী, শুক্লা চক্রবর্তী, সুপ্রিয়া গাঙ্গুলী, তাপস চ্যাটার্জী, জয়তি গুপ্তা সুন্দর অভিনয় করে। নৃত্যে সুপ্তা মুখার্জী, দীপা চৌধুরী, পলি রায় উল্লেখযোগ্য। 'পুটুরাণী' নামভূমিকায় কাকলি দাসের অভিনয় সকলের ভাল লেগেছিল। সঙ্গীতে কণ্ঠদান করে গৌরী সেনগুপ্তা, তপতী দাস, শুভ্রা মুখার্জী, সন্ধ্যা মিত্র। প্রভাতভূষণ সঙ্গীত পরিচালনা করেন।

উজবেকিস্তানের বাখোর নৃত্য সম্প্রদায়ের ষাট জন সদস্য। নয়াদিল্লীর পালাম বিমান বন্দরে ছবিটি গৃহীত হয়

গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতা

বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ আয়োজিত ষষ্ঠ বার্ষিক পূর্ণাঙ্গ গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতার আবেদনপত্র দাখিলের শেষ তারিখ আগামী সাতাশে জানুয়ারী ১৯৬৭। আঠারটি বিভিন্ন বিষয়ে পুরস্কার প্রদান করা হবে। নিয়মাবলী সহ আবেদনপত্র বিশ্বরূপা থেকে পাওয়া যাচ্ছে।

উজবেক নৃত্যশিল্পীদের কলকাতায় আগমন

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের জন-শিল্পী ও বিখ্যাত উজবেক নৃত্যশিল্পী ও নৃত্য-রচয়িতা মুকাররাম তুরগুনবায়েভার নেতৃত্বে "বাখোর" (বসন্ত) নৃত্যশিল্পী দলটি এখানে এসেছে।

"বাখোর" লোক-নৃত্যশিল্পী দলের সংগঠন, নেত্রী মুকাররাম তুরগুন তাঁর সারা জীবন এই নৃত্য পরিকল্পনার পেছনে ব্যয় করেছেন। আলিসের নাভোই অপেরা ও ব্যালে থিয়েটারেরও তিনি একজন শিল্পী এবং তাসখন্দ নৃত্য পরিকল্পনা বিদ্যালয়েরও তিনি একজন শিক্ষয়িত্রী।

উজবেক প্রজাতন্ত্রে নৃত্যশিল্পীকে উন্নত করার জন্য তরুণ ব্যালে নৃত্যশিল্পী দল তৈরি করার মধ্য দিয়েই 'বাখোর' নৃত্য-শিল্পী দল সৃষ্টি করার কথা তাঁর মনে এলো, সেই থেকেই সৃষ্টি হল এই দল।

বর্ণাঢ্য ও সুন্দর পোষাকে সজ্জিত এই দলটি ফারঘানা, বুখারা, তাসখন্দ, খোরেম, আন্দিজান, ভিগুর ও কোকন্দ ইত্যাদি নৃত্য দেখাবে।

এই বছর দলটির দশম বর্ষ পূর্ণ হল। উজবেকিস্তান ও অন্যান্য মধ্য এশীয় প্রজাতন্ত্রগুলির, সেইসঙ্গে পৃথিবীর বহু দেশের নাচও তাঁরা দেখাবেন।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে 'বাখোর' নৃত্য খুবই জনপ্রিয়। গত বছর বসন্তকালে এই দলটি আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ, লিবিয়া, সুদান, মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া ও সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র পরিভ্রমণ করে।

ব্রজেশ্বর মঞ্চ

কলকাতায় আর একটি মুক্ত অঙ্গন মঞ্চ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে দক্ষিণ কলকাতার সন্দীপনী নাট্যসংস্থা। ৭১ নম্বর ডবলিউ, সি, ব্যানার্জী স্ট্রীটে (হেদুয়ার পশ্চিম দিকে) এই মঞ্চের উদ্বোধন হবে আগামী ২৬শে জানুয়ারী। মুক্ত অঙ্গন মঞ্চের নাম রাখা হয়েছে ব্রজেশ্বর মঞ্চ। ব্রজেশ্বর সঙ্গীতসমাজের সৌজন্যে এই মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এঁদের প্রথম নাটক হবে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প 'শেষ কথা'-র নাট্যরূপ। অভিনয়ে থাকছেন ঃ পীযূষ চক্রবর্তী, সত্য দাস, বাসুদেব চক্রবর্তী, বাসুদেব দাস, দেবেন গাঙ্গুলী, রমা সরকার, পুতুল চক্রবর্তী। নাটকের নির্দেশনায় থাকছেন—বিজয় চট্টোপাধ্যায়। এই নাটকটি এঁরা নিয়মিত অভিনয় করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

স্টুডিও খবর

বালিকা বধূ

তরুণ মজুমদার পরিচালিত 'বালিকা বধূ' সেন্সর কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র লাভ করেছে। বিমল করের রচনা অবলম্বনে নির্মিত এই ছবিতে কিশোরী মনের নানাভাবের ও নানারঙের বিকাশ ঘটেছে। এই কিশোরীর চরিত্রে অভিনয় করেছে নবাগতা মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়। এইসঙ্গে আছেন পার্থ মুখোপাধ্যায়, জুঁই বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্তা প্রমুখ।

আকাশছোঁয়া

রাজেন তরফদারের 'আকাশছোঁয়া' মুক্তি প্রতীক্ষায় রয়েছে। সার্কাসের বিভিন্ন ঘটনা অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচিত। অভিনয়ে আছেন দিলীপ মুখার্জী, অনিল চ্যাটার্জী, হারাধন ব্যানার্জী, সুপ্রিয়া দেবী, ছায়া দেবী, বিনতা রায়, শিখা ভট্টাচার্য। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন সুধীন দাশগুপ্ত।

কুবলা খান

বৃটিশ ছবি 'কুবলা খান'-এর চিত্রগ্রহণের জন্য জয়পুরের অম্বর প্রাসাদ ও দুর্গকে নির্বাচিত করা হয়েছে। ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন উমেশ মল্লিক। তিনি বৃটেনে চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে

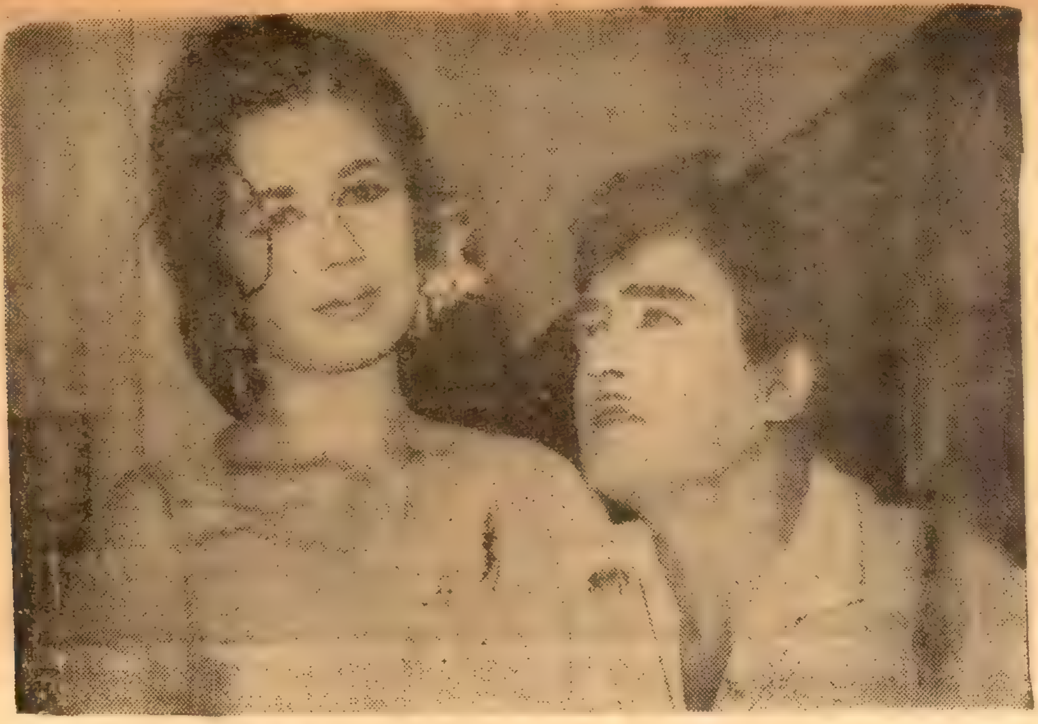

হিন্দীছবি 'পতিপত্নী'র দুটি চরিত্রে নন্দা ও সঞ্জীবকুমার

জড়িত আছেন। ছবিটির বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন সোরাব মোদী, চার্লি চ্যাপলিনের কন্যা জেরালডিন চ্যাপলিন, ডানা এন্ড্রুজ, লুস রেনস্ প্রমুখ। ছবিটি পরিচালনা করেছেন ব্রায়ান ডেসমন্ড হার্স্ট। কাহিনীর পটভূমিকা ত্রয়োদশ শতকের ভারত। স্বভাবতই ছবিটি ইতিহাসভিত্তিক হবে। এই ধরণের ছবির চিত্রনাট্য—বিশেষ করে বিদেশী প্রযোজনার ক্ষেত্রে ভারত সরকার কর্তৃক পূর্বেই মঞ্জুরী করে দেওয়া ভাল। সম্ভবত এই কাজ সম্পন্ন করার পরেই চিত্র গ্রহণ করা হচ্ছে।

'জীবন নৃত্য' ছবির একটি দৃশ্যে মণ্টু ব্যানার্জী ও শামতা বিশ্বাস

পাঠক মন

আপনাদের ৫ই জানুয়ারীর সংখ্যায় পান্নালাল দাশগুপ্তের রচনা—'একটি আদর্শ দাও' পড়লাম। এ ধরণের প্রবন্ধ যে সময়োচিত সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। দেশে আজ যে আদর্শের সঙ্কট হয়েছে এ সম্পর্কেও দ্বিমত হবার কি আছে? শুধু ছাত্রের সামনে আদর্শ নেই এমন নয়, দেশবাসীর কারুর সামনেই কি আদর্শ আছে? সমস্যাটি অবশ্য আমার কাছে আলাদা।

যুগে যুগে মানুষের সামনে কত আদর্শ এসেছে এবং কালক্রমে মিলিয়ে গেছে। অতীতের এমন অনেক আদর্শকে আজও মানুষের সামনে তুলে ধরা যায়। কিন্তু তাতে কাজ হবে না। সে আদর্শ কাগজে-কলমে এবং বচনে-উপদেশে সীমাবন্ধ থাকবে মাত্র। তাই দরকার জীবন্ত আদর্শ—এমন আদর্শ হবে যা কেউ নিজের জীবনে ধারণ করে অপরকে দেখাতে পারে। কথাটা আরও সোজাভাবে রাখতে চাই।

যেমন ধরুন, সব ছাত্রই সততা সম্পর্কে অনেক কথা বইয়ে পড়ে। তারা পড়ে Honesty is the best policy—সততাই শ্রেষ্ঠ পথ। কিন্তু বাস্তব জীবনে তারা দেখে অসৎ লোক দিব্যি আরামে জীবন কাটাচ্ছে, সমাজে পাঁচজনের কাছে খাতির পাচ্ছে, প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। সততার কথা বলে এমন লোকের অভাব নেই, কিন্তু সততা জীবনে পালন করে এমন লোকের সংখ্যা কম। লোকে সততার প্রতিমূর্তি না দেখতে পেলেই হতাশ হয়।

দ্বিতীয়ত, যুক্তিশীলতা সম্পর্কে ছাত্ররা নানা ধরণের ব্যাখ্যা শুনে থাকে। কিন্তু সমাজে যখন তারা যুক্তিশীল মানুষ খোঁজে, তখন দেখে মুখে যে যুক্তির বড়াই করে আসলে সে কপট, যুক্তির ধার দিয়েও যায় না; কেবল নিজের ফন্দি বা অভিসন্ধিকে চরিতার্থ করবার জন্যেই যুক্তির ছলনার আশ্রয় নেয়।

তৃতীয়ত, সহযোগিতা ও সমবায়ের কথা বাজারে ছড়াছড়ি। অথচ চোখ মেললেই দেখা যাবে সমবায়ের আদর্শে গঠিত প্রতিষ্ঠান ভেঙে যাচ্ছে। সহযোগিতাকে বাইরে খাড়া করে রেখে বেশ কিছু লোক ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্র প্রসারিত করছে।

চতুর্থত, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, ন্যায় বিচার, শোষণহীন সমাজ প্রভৃতি উচ্চারণ ও ঐরকম কত কিছুর আমদানিতে দেশে কান পাতা দায়। অথচ ক'জন এমন আছে যারা অপরের ব্যক্তি-স্বাধীনতা সহ্য করতে পারে, অপরের ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার করে যদি নিজে শাস্তি পেতেও হয় তবুও তা স্বীকার করতে প্রস্তুত, নিজে অপরকে শোষণ করবার কথা ভাবে না?

পঞ্চমত, যারা একসময় কমিউনিস্ট তারাই অন্য সময় কমিউনালিস্ট। মুখে সাম্য প্রগতি সেকুলারিজমের বুলির শেষ নেই। অথচ একবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধলে হয়! আর আছে কোথায়? তাতেও বীরেরা পিছ্‌পা হবে না। যে দৈনিক পত্রিকা একসময় পোড়াবার বা বর্জন করবার কথা যে-অঞ্চলে সর্বাধিক সোচ্চার হয়, সাম্প্রদায়িক বুলি কপ্‌চালে সেই পত্রিকারই আবার সেই অঞ্চলে সর্বাধিক কাট্‌তি হয়।

ষষ্ঠত, সমাজের ঐতিহ্যের আপত্তিকর নিয়মকানুন ও প্রথা সম্পর্কে প্রতিবাদ বড় কম হয় না। যেন সকলে ফেটে পড়ছে। অথচ বিয়ের সময় মেয়ের বাপের কাছ থেকে পণ আদায় করবার সময় ক'জন পিছ্‌পা হয়?

সপ্তমত, ছাত্ররা জাতিভেদ সম্পর্কে পরীক্ষার খাতায় রচনা লেখে। মাস্টার মশায়রা ক্লাশে ব্যাখ্যার অংশ দাগ দিয়ে দেন: স্বামী বিবেকানন্দের সেই উক্তি—'মুচি মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই'। পরীক্ষাতে প্রশ্নও আসে তার ওপর। অথচ ছাত্র দেখে মাস্টার মশায় মেথরকে ছুঁলে স্নান করেন। মাস্টার মশায়ের মেয়ের বিয়ে দেবার সময় শিক্ষিত উপার্জনশীল মেথর বা মুচির ছেলের খোঁজ পেলে আদপেই তা গ্রাহ্য করেন না।

এই কয়েকটা মাত্র উদাহরণ দিলাম। এই রকম শত সহস্র উদাহরণ দেওয়া যায়। আসল কথাটা হলো মুখের কথায় ও আচরণে আস্‌মান-জমিন ফারাক থেকে যাচ্ছে। বিশেষ করে আজ যারা সমাজে নেতা অর্থাৎ রাজনৈতিক নেতা বলে গণ্য তাদের মধ্যে কথায়, আদর্শে ও কাজে কী দুস্তর ব্যবধান তা লক্ষ্য করবার মতো। জাতীয় সম্পদের ন্যায্য বণ্টন হচ্ছে না, সম্পদের কেন্দ্রিকরণ হচ্ছে বলে কত নেতাই না গলা ফাটান, অথচ নিজেরা ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বাড়াতে এবং স্থাবর সম্পত্তি সংরক্ষণ ও সংবর্ধন করতে সতত ব্যগ্র। পরের ছেলে বুলেটের আঘাত খেয়ে শহীদ হোক, নিজের এবং নিজের ছেলের জীবনে যেন উট্‌কো বিপদ না আসে! এই তো হচ্ছে অবস্থা। এই অবস্থায় দরকার এমন মানুষ যিনি অনেক মূল্যবোধগুলিকে জীবনে কার্যকরী করবেন। ক্ষতি স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকবেন। এমন লোক আছেন যিনি জাতিভেদ মানেন না, কিন্তু ঘুষ নেন অথবা ঘুষ নেন না কিন্তু স্বজনপোষণ করেন। তাই আদর্শ নেতার চরিত্রে বহুবিধ মূল্যবোধ রূপায়িত হওয়া চাই। এই জীবন্ত আদর্শই আজ দরকার, শুধু কতকগুলো বিমূর্ত (abstract) আদর্শ হলেই হবে না।

শ্রীসুনীতিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
৩, চাতরা চাঁপাতলা
শ্রীরামপুর, হুগলী।

* * *

গত ২০শে পৌষের ৩০শ সংখ্যায় বর্তমান ছাত্রবিক্ষোভের উপর শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্ত, শ্রীনারায়ণ চৌধুরী এবং শ্রীবিনোদবিহারী দত্তের তিনটি লেখা পড়লাম। প্রথম দুজন লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে এককথায় বলা চলে প্রশংসনীয়। কিন্তু শ্রীদত্তের লেখা পড়ে নিরাশ হয়েছি। সমস্ত লেখাটি অবাস্তব এবং অগভীর চিন্তার ফল। সুরুতে যেখানে শ্রীদত্ত লিখছেন, "ইহার (ছাত্র-বিক্ষোভের) মূল অতি গভীরে।" সেখানে খুব আশা করেছিলাম যে, দীর্ঘ প্রবন্ধটিতে যথার্থ কারণেরই অনুসন্ধান করা হবে। যদিও তিনি বলে নিয়েছেন আগে যে, এই সমস্যাকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করলে অন্যায় হবে, তবুও সমস্ত প্রবন্ধে বিচ্ছিন্নভাবে বহু ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়েছেন। এমনভাবে সেসব ঘটনা তিনি বর্ণনা করেছেন যা পড়ে মনে হয়েছে যে, ছাত্রদের অপরাধের সমস্ত দায়িত্ব তিনি তাদেরই ঘাড়ে চাপাতে চেয়েছেন। আসলে ছাত্রদেরই দোষে এত অঘটন ঘটছে না। সমস্ত সমাজব্যবস্থার জ্বালা-যন্ত্রণার একমুখী প্রকাশ এইসব ঘটনা। সেসব কথা না ভেবে শুধু শুধু ছাত্রদের দোষী করে বৃদ্ধেরা নির্দোষ সাজতে চান সাজুন কিন্তু সমস্যা সমাধানের কোন পথ তাতে বাতলান যাবে না।

বিচ্ছিন্নভাবে ছাত্রদের অপরাধের ঘটনাগুলো উল্লেখ করতে গিয়ে শ্রীদত্ত এমন সমস্ত যুক্তিহীন কথাবার্তা বলেছেন যার কয়েকটির অন্ততপক্ষে উল্লেখ না করে পারছি না। শিক্ষার উন্নতির কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, বহু স্কুল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে। এটা স্বীকার্য বটে, তবে স্কুল কলেজের সংখ্যা বাড়লে বা নানা রকমের course চালু করলেই শিক্ষার উন্নতি হবে, এ কেমন কথা। মান্ধাতার আমলের শিক্ষাব্যবস্থায় যত বেশি সুযোগ-সুবিধাই দেওয়া হোক না কেন তা শিক্ষার উন্নতি সূচনা করে না। এত কথা না বুঝে ছাত্ররা সিগারেট, সিনেমার পেছনে মাসে পঁচিশ-ত্রিশ টাকা খরচা করে, ঝাণ্ডা উড়িয়ে সরকারকে গালি দেয়, এইসব সস্তা কথা বলে সমস্যার কোন তল পাওয়া যাবে না।

ছাত্রদের নৈরাশ্যের কথা আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর মনে হয় অর্থনৈতিক ব্যাপারে অর্থাৎ চাকরীর বাজারে আগেকার

তুলনায় অবস্থা অনেক ভাল। যদি তাই-ই হয় তবে নৈরাশ্যের আবার কারণ কি? একটু পরেই বলছেন, "নৈরাশ্যের অন্য কারণ আছে, সেইটা হলো আমাদের নেতাদের প্রপ্যাগেন্ডা।" তাহলে বোঝা যাচ্ছে, নৈরাশ্যের কোন কারণ নেই, সবই নেতাদের পলিটিক্যাল প্রচার। তবে অনেক বিচ্ছিন্ন কথাবার্তা বলার পর আসল কারণটি তিনি বলেছেন, আদর্শের অভাবেই এমনটি হয়েছে। পচনধরা সমাজব্যবস্থায় আদর্শের অভাবের জন্য যে সামগ্রিক যন্ত্রণা তারই একটি বিশেষ প্রকাশ ছাত্রদের ভিতর থেকে অভিব্যক্ত হচ্ছে। সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা যদি পরিবর্তিত না হয়, তবে কতকগুলো অবাস্তব প্রতিকারের (যেমন শ্রীদত্ত এক, দুই করে একুশটি অবাস্তব প্রতিকারের কথা বলেছেন) কথা বলে কি হবে? এই শিক্ষাব্যবস্থায় রিপু করে কোন ফললাভ হবে না। আর যদি তার দরকারও হয় তো কে করবে সেই চুনকামের কাজ? এত কথা ভাবতে হবে এবং খুব গভীরভাবেই ভাবতে হবে।

সমর দাশ
১৮৩, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড
ঢাকুরিয়া, কলিকাতা-৩১

* * *

'একটি আদর্শ দাও' লেখাটি পড়ে মনে হল, অনেক কথা বলেও শেষ পর্যন্ত কিছুই বলা হয় নি। কেন হয় নি এর সদুত্তর পাওয়া যাবে লেখাটিতে : পান্নালালবাবু এর দায়িত্ব নিতে পারলেন না। প্রথম অংশের লেখা পড়ে মনে হয়েছিল, বুঝিবা লেখক একটা কাঠামো শেষ পর্যন্ত তৈরি করে যেতে পারবেন। কিন্তু সমস্তটাই অস্পষ্ট থেকে গেল যখন দেখা গেল, লেখক তাঁর দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়ে কতকগুলো মামুলি কথা জড়ো করেছেন। ফলে গোটা প্রবন্ধটা হৃদয়কে আচ্ছন্ন করলেও বুদ্ধিবৃত্তির কাছে নিরুত্তর রইল, অথচ একটা জবাবদিহি হওয়া উচিত ছিল যে জবাব আজকের মানুষ পেতে চাইছে।

আমার এত কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে—পান্নালালবাবু নতুন কিছু বলেন নি। ছাত্র হিসেবে অন্তত আমি নতুন কিছু পাই নি—কারণ 'এ উদাস এ বিষাদ' তো একেবারে চেনা, কিন্তু সেই 'গ্রীন ইজিয়ান আইলস্' ('green Aegian isles') কোথায় যা বিষাদসিন্ধুর একমাত্র সান্ত্বনা ও আশ্রয়।

ছাত্র হিসেবে কোন ইউনিয়ন করি নি, কোন পার্টির খাতায়ও নাম লেখাই নি—সেইজন্য বোধহয় কোন কিছুর সহজ সমাধানও পাই নি। বুঝি না কত সহজে অমুকটা করলে অমুকের ফল পাওয়া যায় হাতেনাতে। সহজ, সরল, পরিষ্কার চোখে (চশমা নিই নি) যতটুকু দেখতে পাই সে হল গাঢ় অন্ধকার, সভ্যতার কেরামতিই বলি আর যাই বলি। কিন্তু মাঝে মাঝে বিদ্যুতের মত 'কেন' যে ঝিলিক মারে।

কেন এমন হল? সভ্যতার সঙ্কট কি সঙ্কটই থেকে যাবে, মেনে নিতে হবে 'ক্রমবর্ধমান একঘেয়েমি বা boredom ও অর্থহীনতা'। তাহলে আজ মানুষের ইতিহাসও শেষ হল! মানুষ হার মানল! কোন্ দানবরূপী সভ্যতা আজ গ্রাস করছে সমস্ত কিছুকে? অথচ...থামতে হয়। সভ্যতা মানুষই সৃষ্টি করছে না? কোন ঈশ্বর নয়, কোন ধর্ম নয়, কোন কমুনিজমের ইউটোপিয়া নয়, কালেক্টিভ্ ইগো (জনতার অশরীরী সত্তা) নয়, তথাকথিত গণতন্ত্রের পার্টিও নয়—মানুষ : ব্যক্তিমানুষ individual human being, শুভবুদ্ধিপ্রণোদিত দায়িত্বসম্পন্ন সত্যানুসন্ধী, স্বাধীনতাকামী মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ মানুষ, যে মানুষ নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে নিজের ইতিহাস নিজেই সৃষ্টি করতে পারে।

কিন্তু মানুষকে এই স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবে কে? এমন এক আদর্শ যা জীবনের মূল্যবোধকে সজাগ করে তুলবে, যুগের সমস্যাকে যথাযথ বিশ্লেষণ ও সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে মানুষকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবে। কি সেই নবমানবতাবাদ?—'a system of reflections about man which recognises him as a highest good and is concerned to create in practice the best conditions for his happiness ?

মানুষ চাঁদে পা দিতে চলেছে, আবার মানুষকে একমুঠো অন্নের জন্য ইঁদুরের মতো লুকোচুরি করে গুঁড়িশুঁড়ি মেরে চাল পাচার করতে হয়—এ দুটো চরমের মধ্যে 'মানুষ মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা, মানুষই পারে ইতিহাস সৃষ্টি করতে' এ কথা 'শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস'। তাহলে সমাজ কি যেই সেই থেকে যাবে?—কোন আদর্শ, কোন সমাজবিজ্ঞান, কোন মতবাদ কি মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারল না স্বমর্যাদায়? আর অবকাশ নেই—সব আদর্শ, সব মতবাদ তার নগ্নরূপ নিয়ে ইতিহাসের আনাচেকানাচে উঁকি মারছে—একটিও মতবাদ, আজ বলতে পারে নি আমি মানুষকে 'হাইয়েস্ট গুড্' হিসেবে জেনেছি, প্রতিষ্ঠিত করেছি, শুধু তাই নয় 'বেস্ট কণ্ডিসনস্ ফর হ্যাপিনেস্' সৃষ্টি করেছি? কোন্ মতবাদ যৌবনের রোমান্টিসিজম্‌কে পেরেছে পরিচালিত করতে সুষ্ঠুভাবে, সাময়িকভাবে নয়? পারে নি, কেন না মূল্যবোধে বিশ্বাসী আদর্শ আচ্ছন্ন হয়েছে হয় রহস্যময় ঈশ্বরতত্ত্বের ধূম্রজালে, ধর্মের উদগ্র গোঁড়ামিতে হয়ত বর্তমান যুগের পার্টিতন্ত্র (জনতার ঈশ্বর), জনতার রথচক্র (collective ego) তাকে বিপিষ্ট করেছে।

এক নতুন আদর্শ, নতুন জীবনদর্শন দরকার—যে আদর্শ আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান করে মানুষের নতুন সমাজ গড়ার রোমান্টিসিজমকে জীইয়ে রাখবে। যে আদর্শ বা দর্শন নির্ভীক কণ্ঠে ঘোষণা করতে পারবে মানুষই সমাজের একমাত্র 'আর্কিটাইপ', সে মানুষ ব্যক্তিমানুষ, তার উন্নতিই সমাজের একমাত্র মাপকাঠি, ইতিহাস থেকে প্রমাণ করতে পারবে, মানুষের অস্তিত্বের ও উন্নতির মূলে প্রেরণা স্বাধীনতাকামনা ও সত্যানুসন্ধিৎসা। শুধু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তার লক্ষ্য নয়, তার লক্ষ্য অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তার লক্ষ্য নয়, তার লক্ষ্য অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ছাড়িয়ে সুদূরপ্রসারী।

পরিশেষে আমরা চাই জীবন আদর্শ (লিভিং আইডিয়াল)। মতবাদ, আদর্শ কি শুধু কতকগুলো বইয়ের জিনিস—উগরানো ও গেলবার জন্য? কথার উপরে কথা সাজিয়ে ইমারত গড়া যায়, কিন্তু প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা যায় না, রক্তমাংসের মানুষ গড়া যায় না। পড়াশুনো লেখালেখি ইন্টেলেকচুয়াল সফিস্টিকেসনের সবই তো হল, কাজের মানুষ, চরিত্রবান মানুষ কই? আদর্শবান মানুষ না গড়ে-ওঠা পর্যন্ত আদর্শের আগুনে বুকে না জ্বলা পর্যন্ত আদর্শ শুধু থিয়োরীই থাকবে, সভ্যতার অন্ধকার আরো ঘনীভূত হবে।

আজকের দিনের মানবতাবাদ বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি বিদ্যা থেকে যে মানবিক মূল্যবোধের নির্যাস বের করেছে তার বাস্তব রূপায়ণ ছাড়া মানুষের মুক্তি নেই।

সবশেষে, কোন বিপ্লব বা রেভল্যুশনের গোড়ার কথা হল, প্রচলিত পুরাতন চিন্তা, ধ্যানধারণার বিচূর্ণন। সেটা সম্ভব তখনই যখন সমাজের প্রতিটি মানুষ তার সৃজনীশক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে পৃথিবীকে নতুন করে গড়ে তোলার অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে জাগিয়ে তুলবে। আইডিয়ার ক্ষেত্রে অ্যাডভেঞ্চার রোমান্টিসিজম্ তার সাক্ষ্য রেখে চলবে মুক্ত মানুষ নিয়ে মুক্ত সমাজ গড়ার আদর্শে। তবেই তো মানুষ তার নিজ মর্ত্যসীমা চূর্ণ করতে পারবে।

স্বপনকুমার দাসমহাপাত্র
ইংরাজী বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

গুর্খা ব্রিগেড ডুরাণ্ড বিজয়ী

দিল্লীর ডুরাণ্ডের আসরে কলকাতার সর্বভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন দলগুলি এবার যে অখ্যাতির পরিচয় দিল তা সত্যই বিস্ময়ের সঞ্চার করে। কলকাতার শেষ গতবারের ডুরাণ্ডে বিজয়ী মোহনবাগান ক্লাবও শেষ পর্যন্ত সেমিফাইন্যালে ২-০ গোলে পরাজিত হয়ে বিদায় নিল গুর্খা ব্রিগেডের বিপক্ষে। কলকাতার দুটি শক্তি-শালী দল বি এন রেল এবং ইস্টার্ন রেল এ বছর ডুরাণ্ডের আসর থেকে নাম প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় আন্তঃরেল ফুটবল প্রতিযোগিতার জন্য। ইস্টবেঙ্গলের পরাজয় সত্যই আকস্মিক। কারণ ইস্ট-বেঙ্গলের খেলোয়াড়দের মধ্যে কয়েকজন বাংলার বাইরের খেলোয়াড় আছেন এবং আশা করা গিয়েছিল যে কলকাতা লীগ ও শীল্ড জয়ী ইস্টবেঙ্গল ডুরাণ্ডের খেলায় উল্লেখযোগ্য ফলাফল প্রদর্শন করতে পারবে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন খেলোয়াড়ে পূর্ণ মোহনবাগান দলের কাছ থেকেও এই ধরণের ফলাফল আশা করা যায় নি।

এবারের ডুরাণ্ডের আসর মাতিয়ে দিয়েছে গুর্খা ব্রিগেড দল। গুর্খা ব্রিগেড কোয়ার্টার ফাইন্যালে কলকাতার মহামেডান দলকে ৪-০ গোলে পরাজিত করে। পর-বর্তী খেলায় সেমিফাইন্যালে তারা ২-০ গোলে পরাজিত করে মোহনবাগানকে। গুর্খা ব্রিগেডের সংঘবদ্ধ উচ্চাঙ্গের ক্রীড়াধারার বিপক্ষে মোহনবাগানের রক্ষণ-ভাগ নতি স্বীকারে বাধ্য হয়। মোহন-বাগানের পুরোভাগের খেলোয়াড়েরা গোলের সুযোগ লাভ করেও নিজেদের দোষে সে সুযোগ নষ্ট করেছেন। গুর্খা ব্রিগেডের পক্ষে প্রথম গোল করেন সেন্টার ফরোয়ার্ড ভূপিন্দার সিং রাওয়াৎ এবং দ্বিতীয় গোল করেন লেফ্‌ট হাফ নর সিং।

মধ্য মাঠে মোহনবাগান দলের খেলা ভালই হয় কিন্তু গোলের সম্মুখেই মোহন-বাগানের খেলোয়াড়দের জড়তাই তাদের পরাজয়ের অন্যতম কারণ। গোলের সম্মুখে সুযোগ লাভ করেও মোহনবাগানের ফরো-য়ার্ডের খেলোয়াড়েরা সরাসরি গোলে সট করেন নি, সর্বদা অন্যকে বল ঠেলে নিজের দায়িত্ব এড়াতে চেয়েছেন।

গুর্খা ব্রিগেড ২-০ গোলে শিখ রেজিমেণ্টাল সেন্টারকে ফাইন্যালে পরা-জিত করে প্রথম ডুরাণ্ড কাপ জয়ের গৌরব অর্জন করে। ১৯৫৮ সালে গুর্খা ব্রিগেড একবার ডুরাণ্ড কাপের ফাইন্যালে উন্নীত হয়েছিল কিন্তু সেবার তারা পরাজিত হয় মাদ্রাজ রেজিমেন্টাল সেন্টারের কাছে।

এ বছরের ফাইন্যাল খেলায় খেলার সুরুতেই ভূপিন্দার সিং রাওয়াৎ গুর্খা ব্রিগেডকে অগ্রগামী করে। দ্বিতীয়ার্ধে বারো মিনিটে ভূপিন্দার সিং রাওয়াৎ দলের পক্ষে দ্বিতীয় গোল করেন। খেলার শেষে উপরাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন পুরস্কার বিতরণ করেন।

ডুরাণ্ড কাপের সেমিফাইন্যালে মোহনবাগান এবং গুর্খা ব্রিগেডের খেলার একটি দৃশ্য

একটি অবিশ্বাস্য বিজয়

শ্রীঅমিতাভ

বাম্পার আর বিমারের ঝুলি এবার ভারত সফরে ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ দল একে-বারেই খোলে নি। হল আর গ্রীফিথের ফাস্ট বলেই এত ভয়, এরপর দেখা গেল গীবসের স্পিনে আমাদের বাঘা বাঘা ব্যাটসম্যানের শোচনীয় ব্যর্থতা কলকাতার মাঠে। কিন্তু ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের দুই পেস বোলার গ্রীফিথ আর কিং বাম্পার বিমারের ধাক্কায় দক্ষিণাঞ্চলের ব্যাটসম্যানদের কুপো-কাৎ করে দক্ষিণাঞ্চলের জেতা ম্যাচ ছিনিয়ে নিল।

বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত দক্ষিণাঞ্চল এবং ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ দলের প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলাটিতে দুই দলের অধিনায়ক সোবার্স এবং পতৌদি অংশগ্রহণ করেন নি। এ'দের অনুপস্থিতিতে অধিনায়কত্ব করেন হান্ট এবং জয়সীমা। ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ দল প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ গ্রহণ করে, কিন্তু মাত্র ২২৪ রানে তাদের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। মহীশূরের অফ স্পিনার প্রসন্নর মারাত্মক বোলিং ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ দলের ব্যাটিং বিপর্যয় ঘটায়। প্রসন্ন মাত্র ৮৭ রানে ৮টি উইকেট দখল করেন। ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ দলের পক্ষে উল্লেখযোগ্য রান সংগ্রহ করেন বায়নো ৩৩ রান, হান্ট ৩৪ রান এবং বুচার ৪১ রান।

প্রত্যুত্তরে কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলের ব্যাটস-

ডুরান্ড কাপ বিজয়ী গুর্খা ব্রিগেড দল ট্রফি সহ মাঠ প্রদক্ষিণ করছেন

ম্যানেরা ভালই খেলল এবং জয়সীমা ৮ উইকেটে ২৩৬ রান সংগ্রহের পর ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। বুধি কুন্দরান সেঞ্চুরী করলেন, ১১৩ মিনিটে সংগ্রহ করলেন ১০৪ রান। তাঁর রানের মধ্যে ছিল ১১টি বাউন্ডারী এবং ৪টি ওভার বাউন্ডারী। ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হল মাত্র ১৬৮ রানের মধ্যে। বুচার করলেন ৫৭ রান। এবার ভেঙ্কটরাঘবন দখল করলেন ৭৩ রানে ৫টি উইকেট এবং ভি ভি কুমার ৪৫ রানে ৩টি উইকেট।

দক্ষিণাঞ্চল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা সুরু করল এবং জয়ের জন্য তাদের প্রয়োজন মাত্র ১৫৭ রান। হাতে পুরো একটা দিন। সকলেই নিশ্চিত যে জয় দক্ষিণাঞ্চলের হাতের মুঠোর মধ্যে। কিন্তু এই অবস্থার মধ্যে থেকেও শেষ দিন দেখা গেল ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ দল জয়ী হল ৯৪ রানে। দক্ষিণাঞ্চল দল দ্বিতীয় ইনিংসে শোচনীয় ব্যর্থতা প্রদর্শন করল মাত্র ৬২ রানে সকলে আউট হয়ে। মাত্র ২১ ওভারের মধ্যে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শেষ হয়। গ্রীফিথ মাত্র ৩৩ রানে ৫টি উইকেট এবং কিং ১৬ রানে ৩টি উইকেট দখল করেন।

প্রেমজিৎ নতুন চ্যাম্পিয়ান

নতুন জাতীয় টেনিস চ্যাম্পিয়ান হলেন প্রেমজিৎ লাল, নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে রমানাথন কৃষ্ণানকে পরাজিত করে। খেলার চতুর্থ সেটে পিঠে পেশী সঙ্কোচনের ফলে কৃষ্ণান খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হন।

এবারের জাতীয় টেনিসে প্রেমজিৎ লাল অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। কোয়ার্টার ফাইন্যালে প্রেমজিৎ ব্রেজিলের পয়লা নম্বর খেলোয়াড় টমাস ককে স্ট্রেট সেটে পরাজিত করেন। সেমি-ফাইন্যালে এশীয় চ্যাম্পিয়ান জয়দীপ মুখার্জী তাঁর কাছে পরাজিত হন।

ফাইন্যালে কৃষ্ণান ৬-৩ গেমে প্রথম সেট দখল করেন, কিন্তু দ্বিতীয় সেটটি ৭-৫ গেমে প্রেমজিৎ লাভ করে। তৃতীয় সেটটি কৃষ্ণান পুনরায় লাভ করেন ৭-৫ গেমে। তৃতীয় সেটের পরই পিঠের পেশীতে ব্যথা অনুভব করতে থাকেন কৃষ্ণান এবং প্রেমজিতেরও পায়ের পেশী সঙ্কুচিত হয়। ম্যাসেজের জন্য দুজন খেলোয়াড়ই ইচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু আশ্চর্যের কথা যে কোন ম্যাসুর পাওয়া যায় না। কৃষ্ণান এবং প্রেমজিতের খেলা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়। তৃতীয় সেটের খেলায় কৃষ্ণানের আক্রমণের ধারায় কোণঠাসা হয়ে পড়েন প্রেমজিৎ। পায়ের পেশী সঙ্কোচনের ফলে দুবার মাটিতে পড়ে যান তিনি।

তৃতীয় সেটের পর দশ মিনিটের বিরতি, কিন্তু খেলা বন্ধ থাকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট। চতুর্থ সেটের প্রথম তিনটি গেমই খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়। কারণ তিনবার ডিউস হবার ফলে অতিরিক্ত পয়েন্টের সাহায্যে গেমের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। প্রেমজিৎ লাল অবশ্য তিনটি গেমের মধ্যে দুটি গেমে জয়ী হয়েছিলেন। চতুর্থ গেমে সার্ভিস করার সময় কৃষ্ণান পিঠের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়েন এবং কোর্ট থেকে চলে যান।

কৃষ্ণান খেলার মধ্যপথে অবসর

লেস্টার কিং

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সেমিফাইন্যালে বোম্বাই এবং ওসমানিয়া যথাক্রমে কলকাতা ও দিল্লীকে পরাজিত করে ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ লাভ করেছে। কলকাতা-বোম্বাই দলের খেলায় কলকাতা দল প্রথম ইনিংসে ২১৬ রান এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেটে ৯৪ রান সংগ্রহ করে। বোম্বাই দল প্রথম ইনিংসে ৩২৬ রান সংগ্রহ করে। বত্রিশ বছরের প্রতিযোগিতায় বোম্বাই একুশবারের বিজয়ী।

* * *

বৃষ্টির জন্য ইডেন উদ্যানের পিচ খেলার উপযোগী না হওয়ায় ভারত ও অস্ট্রেলিয়া স্কুল দলের চতুর্থ টেস্ট খেলা পরিত্যক্ত হয়। ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত তিনটি টেস্টের একটিতে ভারত জয়ী হয়েছে এবং দুটি টেস্ট ড্র হয়েছে।

* * *

আসানসোলের রেলওয়ে স্টেডিয়ামে ত্রয়োদশ বার্ষিক জাতীয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা সুরু হয়েছে। সার্ভিসেস এবং রেলওয়ে ছাড়া মোট আটটি রাজ্য দল এবারের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে।

চার্লি গ্রীফিথ

টমাস কক

করায় প্রেমজিৎ লালকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। প্রেমজিৎ লাল এই প্রথম এই সম্মান লাভ করার কৃতিত্ব অর্জন করলেন।

সমাচার দর্পণ

ইডেন উদ্যানের ইনডোর স্টেডিয়ামে ভারত বনাম রাশিয়ান দলের তৃতীয় টেবিল টেনিস টেস্টে রাশিয়া দল মহিলা বিভাগে ৩-০ ম্যাচে এবং পুরুষ বিভাগে ৩-১ ম্যাচে জয়লাভ করে। ইতিপূর্বে কোয়েম্বাটুর এবং বোম্বাইয়ের দ্বিতীয় টেস্টে এই একই ফলাফলে রাশিয়ান দল জয়ী হয়।

এবার এশিয়ান টেনিস

উডবার্ন পার্কের টেনিস লনে আবার টেনিসের মেলা। কিছুদিন পূর্বে এই সাউথ ক্লাবের সবুজ ঘাসের বুকে এক নব ইতিহাস রচিত হয়েছে ডেভিস কাপের আন্তঃআঞ্চলিক ফ্যাইন্যালে ব্রেজিলের বিপক্ষে ভারতের বিজয়ের দ্বারা। এবার সুরু হল এশিয়ান টেনিস প্রতিযোগিতা। গতবারের এশিয়ান টেনিস প্রতিযোগিতার কথা কলকাতার ক্রীড়ামোদীদের স্মৃতির মণিকোঠায় অক্ষয় হয়ে থাকবে। গতবছর পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইন্যালে বাংলার জয়দীপ মুখার্জী এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের গৌরব-মুকুট ছিনিয়ে নেন রমানাথন কৃষ্ণানের কাছ থেকে।

রমানাথন কৃষ্ণন

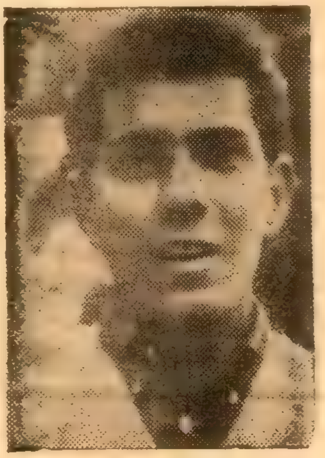

জয়দীপ মুখার্জী

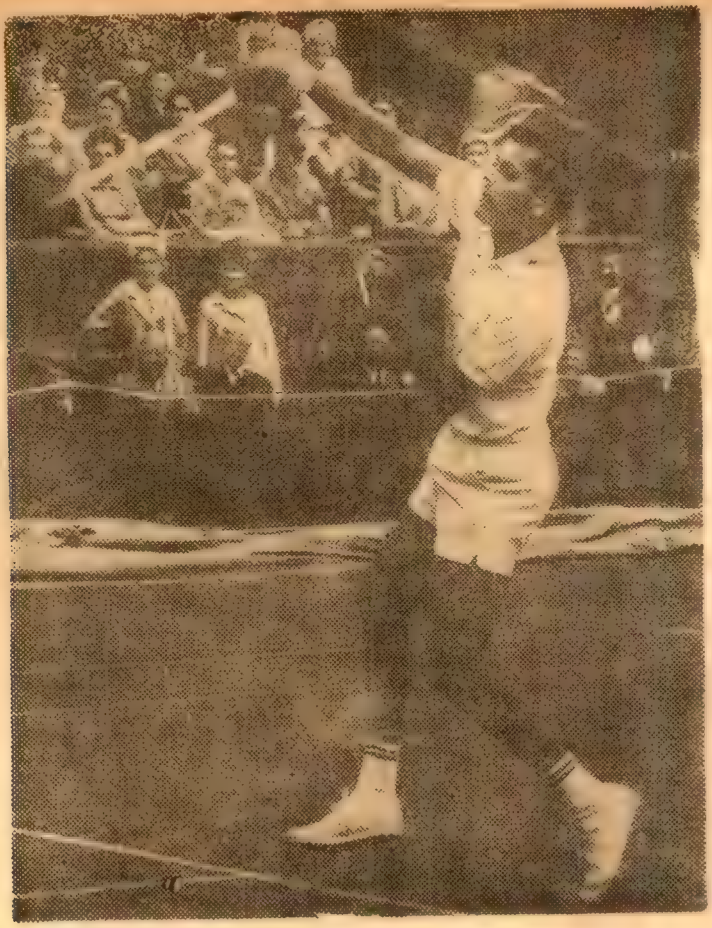

প্রেমজিৎ লাল

এ বছরের এশিয়ান টেনিস প্রতি-যোগিতায় বিদেশের উনিশ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করবেন। এ'দের মধ্যে আছেন ব্রেজিলের দুই ডেভিস কাপ খেলোয়াড় টমাস কক এবং এডসন ম্যান্ডারিনো। রাশিয়ার পয়লা নম্বর খেলোয়াড় আলেক-জান্ডার মেত্রেভেলী এবং কাকুলিয়া। জার্মানীর এবং সুইডেনের দুজন ডেভিস কাপ খেলোয়াড় হ্যারাল্ড এলসেনবার্চ এবং লারস্ অরল্যান্ডারস। অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছেন বব কারমাইকেল। ইরান, আরব সাধারণতন্ত্র এবং সিংহলের কয়েকজন খেলোয়াড়কেও এবার সাউথ ক্লাবে খেলতে দেখা যাবে।

কিন্তু খুবই দুঃখের কথা যে ভারতের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণানকে এবার খেলতে দেখা যাবে না। কয়েকদিন পূর্বে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় এবং উত্তর ভারত টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে প্রেমজিৎ লালের বিপক্ষে ২—১ সেটে অগ্রগামী থেকে চতুর্থ সেটে পিঠের পেশী সংকোচনের ফলে পরাজয় স্বীকার করে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হন। দিল্লী থেকে মাদ্রাজে প্রত্যাবর্তন করে কৃষ্ণান বর্তমানে চিকিৎসকের চিকিৎসাধীন আছেন। চিকিৎ-সকের মতে কৃষ্ণানের পক্ষে আগামী আট সপ্তাহ বিশ্রাম প্রয়োজন, কারণ কৃষ্ণানের আঘাত বেশ গুরুতর। গত বছর এশিয়ান টেনিস প্রতিযোগিতার আসরেও সিঙ্গলস ফাইন্যালের শেষভাগে কব্জির আঘাতের জন্য তিনি বাধ্য হয়ে কোর্ট ত্যাগ করেন।

১৯৫৫-৫৬ সাল থেকে ভারতে অনু-ষ্ঠিত এশিয়ান টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপের প্রতিটি আসরে রমানাথন কৃষ্ণান অংশগ্রহণ করেছেন এবং গতবছরের পূর্ব পর্যন্ত তিনি একমাত্র ভারতীয় খেলোয়াড় হিসাবে প্রায় একচ্ছত্র অধিকার ভোগ করেছেন এই সম্মান।

আমাদের টেনিস পরিচালকদের উচিত বিদেশী আরও খেলোয়াড়দের আমন্ত্রণ জানান এবং খ্যাতনামা খেলোয়াড়রা যাতে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সেই ব্যবস্থা করা। ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে ভারত অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে বলে আমাদের আনন্দে এবং গৌরবে চোখ বুজে বসে থাকলেই চলবে না। চেষ্টা করতে হবে যাতে আমরা ডেভিস কাপের সম্মান লাভ করতে পারি। ব্যাংককের এশিয়ান গেমসের আসরে এবার ভারত থেকে কয়েকজন তরুণ খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেন। এই তরুণ খেলোয়াড়রা সেখানে যে ফলাফল প্রদর্শন করেছে তা দেখে এখন থেকেই আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত। কৃষ্ণান-জয়দীপ-প্রেমজিৎ যুগের অবসানের পর আমাদের দেশের টেনিস ঐতিহ্যকে বিদেশের আসরে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ভবিষ্যতের খেলো-য়াড়দের এখন থেকেই তৈরি করে নিতে হবে।

ডেভিস কাপের দুটি শেষ খেলায় ভারতের জয়দীপ-কৃষ্ণান ডাবলস জুটি যে ফলাফল প্রদর্শন করেছেন তাতে মনে হয় যে এই দুই খেলোয়াড় একসঙ্গে জুটি হিসাবে অনুশীলন করলে বিশ্বের সেরা ডাবলস খেলোয়াড়ের সম্মান লাভ করতে পারেন। এবছর ব্রেজিলের বিপক্ষে ডেভিস কাপের খেলায় কৃষ্ণানের ইচ্ছায় জয়দীপ ডাবলসে অবতীর্ণ হন কক-ম্যান্ডারিনো জুটির বিপক্ষে। অনেক বিশেষজ্ঞের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করে জয়দীপ-কৃষ্ণান জুটি ডাবলস জয়ী হলেন এবং সবচেয়ে গৌরবের কথা যে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে এই জয়দীপ-কৃষ্ণান জুটি অস্ট্রেলিয়ার উইমবল্-ডেন বিজয়ী নিউকোম্ব-রোচে ডাবলস জুটিকে পরাজিত করে বিস্ময়ের সৃষ্টি করলেন টেনিস জগতে। জয়দীপ এবং কৃষ্ণান জুটি একথাও প্রমাণ করলেন যে পরপর দুটি শ্রেষ্ঠ জুটির বিরুদ্ধে বিজয় আকস্মিক নয়।

এবারের প্রতিযোগিতায় আশা করা যাচ্ছে ব্রেজিলের খেলোয়াড়দ্বয় আশানু-রূপ ক্রীড়াধারা প্রদর্শন করতে সক্ষম হবেন। সদ্য জাতীয় চ্যাম্পিয়ানশিপ বিজয়ী প্রেমজিৎ লাল এবারের আসরে উল্লেখযোগ্য ফলাফল দেখাবেন বলেই মনে হয়। গতবারের বিজয়ী জয়দীপ মুখার্জী এবারও সম্মান রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবেন বলেই সকলের ধারণা।

—সৌরভ চ্যাটার্জী

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের

ম হা ভা র ত

প্রথম খণ্ড	বোর্ড বাঁধাই (যন্ত্রস্থ)	ঃ মূল্য—বার টাকা
দ্বিতীয় খণ্ড	,, ,,	ঃ মূল্য—দশ টাকা
তৃতীয় খণ্ড	,, ,,	ঃ মূল্য—দশ টাকা

চতুর্থ খণ্ডঃ মূল্য—ছয় টাকা

পঞ্চম খণ্ডঃ মূল্য—(বোর্ড বাঁধাই) আট টাকা

অন্ন-সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা

চাকরীর উমেদারী না করিয়া বিজ্ঞানবলে
বলীয়ান হউন

বাণিজ্যে লক্ষ্মী লাভ

করিয়া সৌভাগ্যবান হউন

হাজার জিনিষ

সহস্র পণ্য প্রস্তুত করিবার সহজ ও সরল উপায়

প্রতি ভাগ এক টাকা

—প্রথম ভাগে আছে—

রন্ধন-প্রক্রিয়া ১৫৬ রকমের। ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ ৩৪১ প্রকারের। চমকপ্রদ যাদু-বিজ্ঞান ৮৫ প্রকারের। মনোহারী আতসবাজী ৪১ প্রকারের—এতদ্ভিন্ন

বস্ত্ররঞ্জন—ধাতুরঞ্জন
কাষ্ঠরঞ্জন—ধাতুশিল্প
পেন্ট ও বার্নিশ—প্রভৃতির

ব্যবহারিক উপদেশ সহ বিস্তৃত ব্যবহারিক প্রস্তুতপ্রণালী।

—দ্বিতীয় ভাগে আছে—

প্রসাধন সুরভি ১৩২ রকমের; বিস্তৃত সাবান প্রস্তুত প্রণালী; সিরাপ প্রস্তুত প্রণালী; মোমবাতী প্রস্তুত প্রণালী; ফলপ্রদ গৃহ-চিকিৎসা—হেকিমী ও হোমিওপ্যাথি; মন্ত্র-তন্ত্র; ভাগ্যফল; বুননির প্যাটার্ণ। সংসারযাত্রার যে কিছু, যত কিছু, যাহা কিছু আবশ্যক তাহা শিখিবার ও শিখাইবার একমাত্র পুস্তক।

জনসাধারণের বর্তমান অসচ্ছলতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নামমাত্র মূল্য নির্দ্ধারিত।

বিশ্ব-সাহিত্যে বসুমতীর অমর অবদা

শ্রীঅরবিন্দের

ANANDAMATH

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অমর আনন্দমঠের অমর ইংরাজী

০ আনন্দমঠে—স্বাধীনতার সক্রিয় সংগ্রামের পূ

০ আনন্দমঠে—'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের পূত-প্রকাশ।

০ আনন্দমঠে—ঋষি বঙ্কিম ও ঋষি অরবিন্দের আদর্শ

আনন্দমঠের এই মহামন্ত্রের অর্দ্ধশতাব্দীর সাধনে
স্বাধীনতা অর্জিত

ভারতের প্রতি গৃহে এই পবিত্র গ্রন্থ শোভা পাউ

মূল্য—তিন টাকা

গীতিনাট্য-সম্রাট

পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের

ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী

৪র্থ ভাগে—রঞ্জাবতী, নারায়ণী, দুর্গা, ফুলশয্যা, আল
জয়শ্রী, ফুল্লী।

৫ম ভাগে—আলিবাবা, রামানুজ, বাদশাজাদি, পুনরা
বৃন্দাবনবিলাস, রূপের ডালি।

৬ষ্ঠ ভাগে—আলমগীর, অশোক, চাঁদবিবি, বাসন্তী, কু
খাঁজাহান, বিরাটকুঞ্জ, রাধাকৃষ্ণ।

৭ম ভাগে—রঘুবীর, জুলিয়া, বেদৌরা, কুমারী,
কবিকাননিকা, রত্নেশ্বরের মন্দিরে।

৮ম ভাগে—আহেরিয়া, উলূপী, দৌলতে দুনিয়া,
প্রেমাঞ্জলি, মন্দাকিনী, গৃহামধ্যে, প
সিন্ধি, ধ্রুব। মূল্য প্রতি খণ্ড ২৷৷০ টাক

ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বেকার, চাকুরীপ্রার্থী ও শি
রাগীদের ভাষা শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য একমাত্র

॥ বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সহায়

* * স্বল্পশ্রমে পর্য্যাপ্ত ফল অবশ্যম্ভাবী *

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

রা জ ভা ষা

(ইংরাজী ভাষা সহজে শিক্ষার অদ্বিতীয় সাহায্য গ্র

এক আধারে ঃ ভাষা - ব্যাকরণ - শব্দার্থ

ইংরাজী হইতে বাঙলা—(বোর্ড বাঁধাই) ৩·৫০

ইংরাজী হইতে উর্দু—৩·০০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

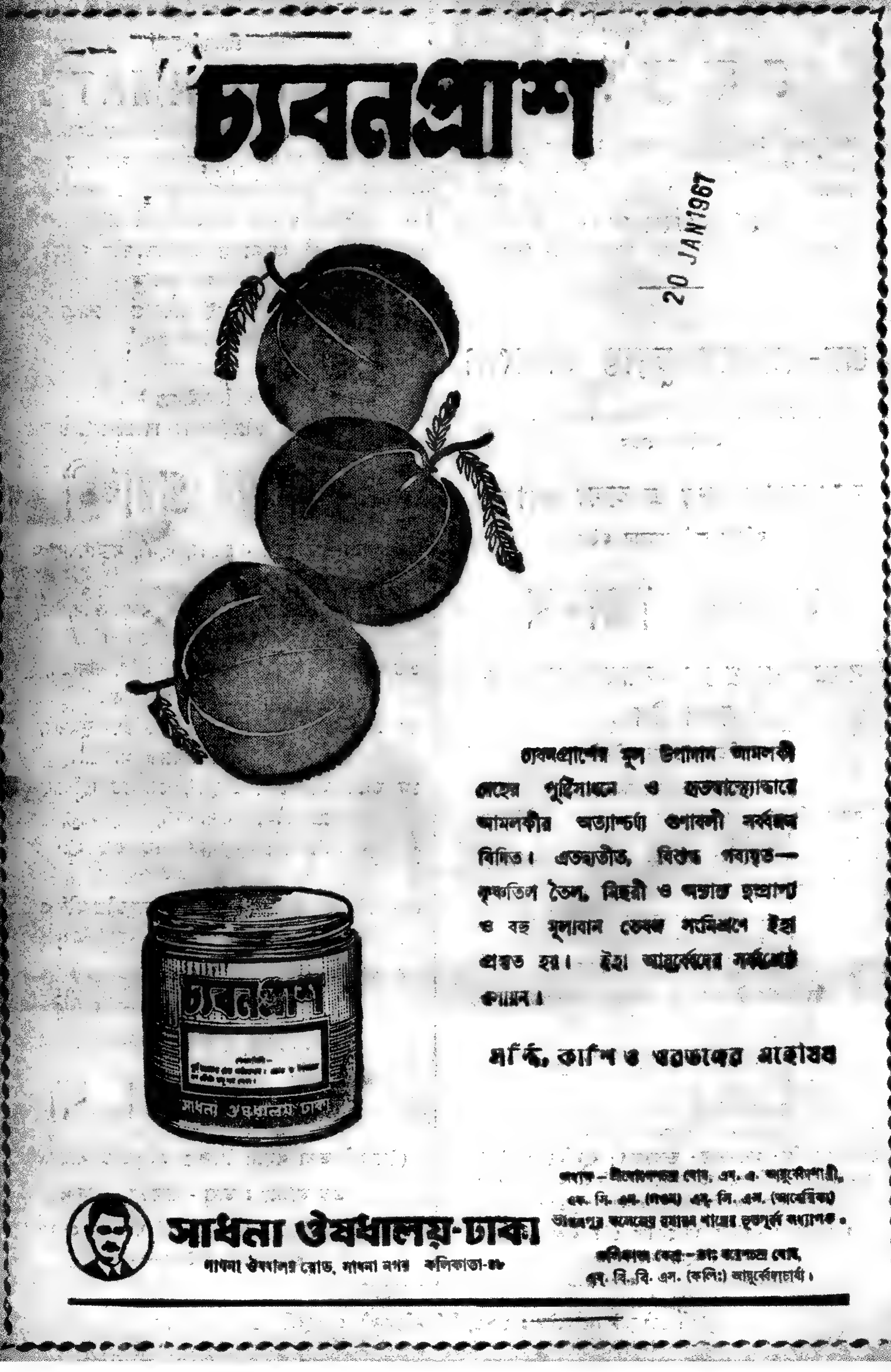
চ্যবনপ্রাশ
20 JAN 1967
চ্যবনপ্রাশের মূল উপাদান আমলকী দেহের পুষ্টিসাধনে ও স্বাস্থ্যোদ্ধারে আমলকীর অত্যাশ্চর্য্য গুণাবলী সর্বজন বিদিত। এতদ্ব্যতীত, বিশুদ্ধ গব্যঘৃত— কৃষ্ণতিল তৈল, মিছরী ও অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য ও বহু মূল্যবান ভেষজ সংমিশ্রণে ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা আয়ুর্বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ রসায়ন।
চ্যবনপ্রাশ
সাধনা ঔষধালয় ঢাকা
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর কলিকাতা-৪৮
এম. বি. বি. এস. (কলি:) আয়ুর্বেদাচার্য্য।

সাপ্তাহিক বসুমতী

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র

(এলগিন রোডের বাড়িতে ১৯৩৮ সালে শ্রীপরিমল গোস্বামী কর্তৃক গৃহীত ফোটোগ্রাফ)

৭১ বর্ষঃ ৩৩শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১২ই মাঘ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ • 26th Jan., 1967 * Vol. 71, N

শীতে যিনি একবার বোরোলীন

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		২০৫১
আজকের মানুষ		২০৫২
কয়েকটি পত্রের কাহিনী	শঙ্করীপ্রসাদ বসু	২০৫৩
ভারতদর্শন		২০৫৭
আন্তর্জাতিক		২০৬১
ভবিষ্যদ্বক্তা মানবেন্দ্রনাথ ও বর্তমান ভারত (প্রবন্ধ)	ডঃ নরেন ভট্টাচার্য	২০৬৩
সুবর্ণলতা (ধারাবাহিক উপন্যাস)	আশাপূর্ণা দেবী	২০৬৮
পাক-ভারতের রূপরেখা (প্রবন্ধ)	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী	২০৭১
তোমার সেই ভালবাসার দেশ (কবিতা)	দুর্গাদাস সরকার	২০৭৪
প্রত্যাশার মৃত্যু ও দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা	কৃত্তিবাস ওঝা	২০৭৫

সাহিত্য-সম্রাট—বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের ঋষি

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

—উপন্যাস—

প্রথম খণ্ড ঃ—রাজসিংহ, বিষবৃক্ষ, যুগলাঙ্গুরীয়, মৃণালিনী, রজনী। [সচিত্র] মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ—দুর্গেশনন্দিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, ইন্দিরা রাধারাণী, সীতারাম। মূল্য—তিন টাকা

তৃতীয় খণ্ডঃ—আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা, দেবী চৌধুরাণী। [সচিত্র] মূল্য—৩্ টাকা।

—সাহিত্য—

প্রথম খণ্ড ঃ—কৃষ্ণচরিত্র, লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ (১ম)। মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ—(১ম ভাগ অনুশীলন), মুচিরাম গুড়, বিবিধ প্রবন্ধ (২য়), বিজ্ঞান রহস্য। মূল্য—তিন টাকা

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর

গ্রন্থাবলী

রবীন্দ্রনাথ বলেন—"আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সংগীত এরূপ সহস্রধারে উৎসের মত কোথাও প্রোৎসারিত হয় নাই। এমন সুন্দর ভাবের আবেগ, কথার সহিত এমন সুরের মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না।"

বাঙ্গালার নব গীতিকবিতার প্রবর্তক, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির কাব্যগুরু ঋষি কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর রচনার সমাবেশ।

কবির জীবনী, সুবিস্তৃত সমালোচনা সহ সুবৃহৎ গ্রন্থ মূল্য তিন টাকা

ডঃ মতিলাল দাশ প্রণীত

মতিলাল গ্রন্থাবলী

মূল্য—দুই টাকা

—ইহাতে আছে—

১। চলার পথে (উপন্যাস)
২। মনীষা (উপন্যাস)
৩। বিদ্যুৎশিখা (১১ খানি গল্প সমষ্টি)
৪। দীপশিখা (কবিতা সংকলন)
৫। চার্বাক (নাটক)

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বঙ্গদর্শন		২০৭৮
সুভাষচন্দ্র ও বাংলার বিপ্লবীরা (প্রবন্ধ)	— অনন্ত সিংহ	২০৮১
একটি চরিত্র—একটি প্রতিজ্ঞা (প্রবন্ধ)	— অপরাজিতা গোপ্পী	২০৯৩
ঠাকুর-চাকর (গল্প)	— রণজিৎকুমার সেন	২০৯৫
রাত্রি, কালরাত্রি (কবিতা)	— বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২০৯৮
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	— শিলালি	২০৯৯
রূপাজগৎ	—	২১০৩
খেলাধূলা	— শ্রীঅমিতাভ	২১০৯

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল এম, এস, সি প্রণীত

আমার দেখা মেয়েরা

(রহস্য রোমাঞ্চের স্বর্ণখনি)

'রক্তনদীর ধারা', 'অপরাধ বিজ্ঞান' ও 'বিখ্যাত বিচার রূপদান। মেয়েদের মন আর মতি স্বয়ং দেবাঃ ন জানন্তি। কাহিনী' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলির লেখকের সত্যঘটনামূলক বিভিন্ন ও বিচিত্র নারী-চরিত্রের রহস্য উদ্ঘাটন ও যথাযথ অভিজ্ঞ ও দক্ষ লেখকের রচনার বৈশিষ্ট্যে বাংলা দেশের নারী-সমাজের এক অজানা অংশ সাধারণের চোখে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে। পড়তে পড়তে বই শেষ না করে ওঠা যায় না। বইয়ের আদ্যোপান্ত রুদ্ধশ্বাস উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা। উপন্যাসের চেয়েও সুখপাঠ্য।

মূল্য চার টাকা

পৃথিবীর তরুণ-সমাজের হৃদয়জয়ী

স্যার ওয়াল্টার স্কটের গ্রন্থাবলী

দ্বিতীয় ভাগ

শরৎচন্দ্র মিত্র অনূদিত

আইভ্যানহো, হাইল্যান্ড উইডো, ফেয়ার মেড অফ পার্থ, সার্জনস্ ডটার

মূল্য—৩·০০

তৃতীয় ভাগ

সরোজনাথ ঘোষ অনূদিত

দি ব্রাইড অব ল্যামারমুর, লিজেন্ডস অব মনট্রোজ, দি এ্যান্টিকোয়ারি

মূল্য ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভাগবত

প্রাচীন ভক্তদের রচিত সুললিত বাংলা পয়ারে

মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র

এই সুবৃহৎ গ্রন্থে আছে—শ্রীল সনাতন গোস্বামীর 'ভাগবতামৃত' গ্রন্থের কবিচন্দ্রের বঙ্গানুবাদ এবং শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়তম ভাগবতাচার্য্য রঘুনাথ পণ্ডিতের প্রেমতরঙ্গিণী।

ইহাতে আছে দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভাগবতামৃতের অনুবাদ

কবিচন্দ্রের

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত

এবং

ভাগবতাচার্যের বিশ্বপ্রসিদ্ধ

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী

সমগ্র ভারতে প্রথম বঙ্গানুবাদ

"...শুনিয়া তাহার ভক্তিযোগের পঠন।
আবিষ্ট হইল গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥"

ইহা কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারতের ন্যায় বাংলার প্রতি গৃহস্থের অবশ্যপাঠ্য হউক, এই নিবেদন। এই মূল্যবান গ্রন্থ বাংলার প্রতি ঘরে প্রতিষ্ঠিত করুক।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

৭১ বর্ষঃ ৩৩শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ১২ই মাঘ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

Price : 25 Paise
Thursday, 26th January, 1967

সার্থক হোক সংকল্প

নেতাজীর জন্মদিবস পালিত হোল। ২৩শে জানুয়ারী এলেই নেতাজীর জন্ম-দিবস পালিত হবে—এ আর এমন কি নতুন কথা। দেশের মানুষ অবশ্য নতুন পথে নতুন মতে নতুন করে চিন্তা করতে আজ আর অভ্যস্ত নয়। হয়তো পেটে যখন আগুন জ্বলে তখন প্রাথমিক অবস্থায় লোকে চোখে অন্ধকারই দেখে। যার পেটে আগুন, তারি চোখে অন্ধকার—এও এক চমৎকার ব্যাপার। কারণ সেই আগুনের শিখা চোখে এসে পৌঁছলেই তো তার দাহিকা শক্তিতে অনেক কিছুই ছারখার হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সহজে তা হবার নয়। সুতরাং পেটের আগুনে হাত চাপা দিয়েই একালে পার্কে ময়দানে যেতে হয়, অনেক রকম আদর্শের বাণীও শুনতে হয়। একথা নিষ্ঠুর হলেও সত্য যে, যাঁরা বাণী দান করেন, তাঁদের কাজ শুধু বাণী দান করাই, 'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শেখায়'—এ সত্যের সন্ধান তাঁদের জীবনে শূন্য।

নেতাজীর আদর্শ গ্রহণ করতে হবে জনসাধারণ দীর্ঘকাল ধরে একথা শুনে আসছে, এতে তেমন কোনো নতুনত্ব নেই। তাই আজ পাল্টা প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয় যে, যে নেতারা নেতাজীর আদর্শ গ্রহণের জন্য দেশের নাগরিকদের উপদেশ দান করেন, তাঁরা নেতার আসনে আসীন থেকে নেতাজীর নেতৃত্বের আদর্শ কতটুকু গ্রহণ করতে পেরেছেন?

এ কথা ঠিক যে, নেতাজীর মতো সেই বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তির নেতৃত্বের কল্পনা করা অন্যের মধ্যে কদাচিৎ সম্ভব। তবু নেতা হতে গেলে ভালবাসা দিয়ে, স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে, অন্যায় আপোষের বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রাম করে দেশের মানুষকে যেভাবে আপন করা যায় বা এক করা যায় তার দীক্ষা তাঁরা কি কোনোদিন গ্রহণ করেছেন? আঠারো বছর হোল যে-দেশে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে সে-দেশে জনগণের কল্যাণ কতটুকুই বা সাধিত হয়েছে!

স্বাধীন ভারত প্রজাতন্ত্রে পরিণত হলেও এই প্রজাতন্ত্রের স্বাদ থেকে কোটি কোটি মানুষ বঞ্চিত। কিন্তু সবচেয়ে রূঢ় সত্য যে, গ্রামময় ভারতের অশিক্ষিত মানুষ প্রজাতন্ত্র শব্দটির সঙ্গে যেমন অপরিচিত, তেমনি এমন কোনো কাজ করা হয় নি যদ্দ্বারা প্রজাতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য তাদের বোধগম্য হতে পারে। সংবিধানের প্রধান এক শর্ত, সর্বজনীন শিক্ষা। আঠারো বছরেও তা সম্ভব হয় নি। আর দু' মুঠো অন্নের জন্য আজো আমরা অপরের দ্বারস্থ যার জন্যে আমাদের মর্যাদা বারবার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। পদে পদে ঠেকেও আমাদের শিক্ষা হয় নি। ফলে এমন কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, 'প্রজাতন্ত্র'-এর পবিত্র বোধ যাদের মনে নেই তারাই আমাদের বিপাকে ফেলে।

সুতরাং এই ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে এবং সর্বদাই মনে রাখতে হবে সর্ব-শ্রেণীর মানুষের সামগ্রিক কল্যাণই হচ্ছে প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। দেশকে স্বাধীন করা ছিল আমাদের প্রধান কর্তব্য। তাকে প্রজাতন্ত্রে পরিণত করায় প্রমাণিত হয়েছে জনসাধারণের প্রতি আমাদের দায়িত্ববোধ। স্বাধীন দেশে উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ থাকতে পারে—যেমন রয়েছে আমাদের দেশে। এক কোটিতে কোটি কোটি তথাকথিত নিচুস্তরের বুভুক্ষু মানুষ আর এক কোটিতে অর্থে সম্পদে ভোগবিলাসে রত উচ্চস্তরের কোটিপতি। এই ধরণের প্রজাতন্ত্র কি আমাদের কাম্য ছিল?

তাই প্রজাতান্ত্রিক হিসেবে আমাদের রাষ্ট্র আঠারো বছরে পদার্পণ করেও এখনো এদেশের শিশুদের জন্য কিছু ব্যবস্থা করতে পারলো না। না আছে তাদের শিক্ষা না আছে তাদের দীক্ষা। লক্ষ লক্ষ এই শিশুর দুরবস্থা দেখেই এই দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কা হয়। সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বার্থেই তো এদের স্বার্থ রক্ষার কথা বিবেচনা করা উচিত ছিল। হায়, তা কেউ বিবেচনা করে নি। আর বিবেচনা করে নি বলেই এই সব হতভাগ্য শিশুদের একাংশকে বহু সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যায় ক্ষুধার বিরুদ্ধে পাল্লা দিতে কর্ডনিং ফাঁকি দিয়ে চাল পাচার করতে। এই যে অন্যায় তারা করছে, সেই অন্যায় রোধ করার শক্তিও আমাদের নেই। কেন না নাগরিকদের দুমুঠো অন্ন যোগাবার শক্তি থেকে যে দেশ বঞ্চিত তার চোখের সামনে এ অন্যায় ঘটবেই। শুধু আদর্শের বাণী যাঁরা ছড়ান তাঁদের মোহ কোনোদিন কাটবে না। সেই মোহভঙ্গের জন্য দেশের মানুষকেই এক-দিন এগিয়ে আসতে হবে। দেশের মানুষই তখন সার্থক করবে নেতাজীর দেশ গঠনের মন্ত্র। সার্থক হবে নেতাজীর জন্মদিন ২৩শে জানুয়ারী ও প্রজাতন্ত্র দিবস ২৬শে জানুয়ারী।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

শিল্পে অনগ্রসর ভারতের পক্ষে পূর্ব ইয়োরোপের সবচেয়ে শিল্পোন্নত দেশের সহযোগিতা লাভ করা ভাগ্যের কথা বৈকি। গত ১৯৫৮ সাল থেকে ভারতকে নানাভাবে সাহায্য করে আসছে চেকোশ্লোভাকিয়া, এ পর্যন্ত টাকার অঙ্কে সে-সাহায্যের পরিমাণ বিলিয়ন-এর কোঠা ছাড়িয়ে গিয়েছে। পরিমাণ আরো বাড়বে, দু-দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হবে, সহযোগিতার ক্ষেত্র আরো প্রসারিত হবে সেই উদ্দেশ্য নিয়েই ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী জোসেফ ক্রেজসি ভারতে এসেছেন বিরাট এক প্রতিনিধি-দলের নেতা হয়ে।

দু-দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং কারিগরি সহযোগিতা বাড়াতে হলে, ভারতের চতুর্থ পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মেশিনারী যোগাতে হলে, যে বৈষয়িক বুদ্ধি ও বিবেচনার দরকার জোসেফের সে সবই আছে। কারণ, তিনি শুধু ডেপুটি প্রধানমন্ত্রীই নন, চেকোশ্লোভাকিয়ার ভারী শিল্প দপ্তরেরও তিনি মন্ত্রী বটেন। বস্তুত তিনি প্রকৃত অর্থেই একজন টেক্‌নোক্র্যাট, পেশাদার রাজনীতিবিদ মাত্র নন। শিল্পের ক্ষেত্রে জোসেফ সেরা, আগাগোড়াই তিনি নিজেকে নিয়োগ করেছেন শিল্পকর্মে। মন্ত্রী হয়ে তিনি শিল্প-জগতে বিচরণ সুরু করেন নি, শিল্প-জগতে হাত পাকিয়েই ওই দপ্তর তাঁকে পেতে হয়েছে, নিজের কর্মনিপুণতার প্রমাণ দাখিল করে অর্জন করতে হয়েছে ওই দায়িত্বপূর্ণ পদটি।

আজ থেকে ৫৪ বছর আগে এই জানুয়ারী মাসের (২৯শে) ইং জোসেফ ক্রেজসির জন্ম। ইঞ্জিনীয়ারিং ও কারিগরি বিদ্যার দিকে ঝোঁক তাঁর ছোটবেলা থেকেই। মাধ্যমিক স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়ে ভর্তি হলেন তিনি প্রাগের ফ্যাকাল্টি অফ মেকানিক্যাল এ্যান্ড ইলেক্ট্রো-টেকনিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে। কাজও পেয়ে গেলেন তরুণ ইঞ্জিনীয়ার প্রাগের বিখ্যাত স্কোডা কারখানার ডিজাইন বিভাগে, পরে কিছুদিনের জন্যে টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাও করেছিলেন। কিন্তু আবার ফিরে এসেছিলেন জোসেফ-অল্পদিনের মধ্যে স্কোডা ওয়ার্কস-এর প্লেজেনস্থ শাখার ডিজাইনারের কাজ নিয়ে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চেকোশ্লোভাকিয়াকে প্রচন্ড রকমের আঘাত হেনেছিলো, তার বহু শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠান

জোসেফ ক্রেজসি

বোমার ঘায়ে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিলো, নতুন করে দেশকে গড়ে তোলার তাগিদ এলো। জোসেফ যোগদান করলেন কোমুটভের টিউব রোলিং মিলস-এ, দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে সাধনা করে চললেন তিনি, নিত্য নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন, প্রাণ ঢেলে দিলেন শিল্পসাধনায়। প্রথমে উৎপাদন বিভাগের প্রধান ছিলেন, পরে সমস্ত কারখানার চীফ ইঞ্জিনীয়ার আর ১৯৫৬ সনে প্রধান পরিচালক। তাঁর কর্মনিপুণ প্রতিভা ও শিল্পনৈপুণ্যের কথা অচিরে প্রকাশিত হয়ে পড়লো, গেলো চেক সরকারের কানেও। 'অর্ডার অফ লেবার' সম্মানে ভূষিত করলেন তাঁকে সরকার।

কিন্তু সম্মান দিয়েই সরকার সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না, তাঁকে চাই সরকারের, দেশের বিরাট শিল্পযজ্ঞে তাঁকে যে পৌরোহিত্য করতে হবে। ১৯৬১ সনে জোসেফকে চেক সরকারের ফার্স্ট ডেপুটি মিনিস্টারের পদ দেওয়া হলো, দপ্তর: ধাতু ও লৌহ খনি শিল্প। পরের বছরই তাঁর পদোন্নতি হলো, পুরোদস্তুর মন্ত্রী হলেন তিনি ওই দপ্তরেরই। ১৯৬৫ সালে যখন দেশে পরিকল্পিত শিল্প পরিচালনা ও সংগঠন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়, তখন জোসেফ ক্রেজসিকে আরো কয়েক ধাপ ওপরে তোলা হলো—ডেপুটি প্রধানমন্ত্রীর পরম সম্মানীয় পদ পেলেন তিনি।

জোসেফ মনে-প্রাণে ইঞ্জিনীয়ার, শিল্পী ও কারিগর। কিন্তু এই ইঞ্জিনীয়ার-মন্ত্রীটির অন্য জীবনও আছে। জোসেফ ইতিহাসের একজন আগ্রহী ছাত্র, ইতিহাস-আশ্রিত শিল্পকর্মের তিনি উৎসাহী সমঝদার। ব্যক্তিগত জীবনে জোসেফ আবার ভাবুকও, শিকারের নেশাও আছে তাঁর। স্ত্রীর নাম ভেরা, তাঁদের কন্যা ইভাও ইঞ্জিনীয়ারিং-এর ছাত্রী।

জোসেফের নেতৃত্বে যে-চেক প্রতিনিধিদল ভারতের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় ব্যাপৃত হয়েছেন তা সফল ও সার্থক হবে—এটাই স্বাভাবিক। গত পাঁচ বছরে ভারত চেকোশ্লোভাকিয়ার কাছ থেকে যে-পরিমাণ সাহায্য পেয়েছে চতুর্থ পরিকল্পনায় সেই-পরিমাণ দ্বিগুণিত হবে বলে স্থির হয়েছে। দু-দেশের সহযোগিতায় তৃতীয় দেশে শিল্পোদ্যোগের যৌথ প্রচেষ্টা চালানো হবে, পণ্য উৎপাদন থেকে সুরু করে পণ্য চালান দেওয়া ও বিক্রয় করা পর্যন্ত সবই যৌথ উদ্যোগে করা হবে। অর্থাৎ একটা সত্যিকারের আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাগে দুই রাষ্ট্রই শরিক হবে। ভারতকে ইতিমধ্যেই চেকোশ্লোভাকিয়া শিল্পগতভাবে প্রভূত সাহায্য করে দুই দেশ মিত্রতার সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে, জোসেফ ক্রেজসির ভারত সফরের ফলে ভারত-চেকোশ্লোভাক মৈত্রী বন্ধন দৃঢ়তর হলো।

কয়েকটি পত্রের কাহিনী

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

॥ ১ ॥

কয়েকটি পত্র, যার একটি লেখা হয় নি, একটি লেখা হয়েও যথাস্থানে পৌঁছায় নি, কয়েকটিকে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল এবং একটি যথাস্থানে পৌঁছেছিল।

যেটি লেখা হয়েও যথাস্থানে পৌঁছায় নি তার কথা জানিয়েছেন শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র। পত্রটি সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে ১৯৩৩ সালে জেল থেকে।

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্রের কথা উদ্ধৃত করা যাক ঃ

"ম্যাকডোনাল্ড অ্যাওয়ার্ডের অংশ-বিশেষের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর অনশনের সময়ে রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন যারবেদা জেলে গান্ধীজীর কাছে। রবীন্দ্রনাথের হাতে লেবুর রস খেয়ে গান্ধীজী অনশন ভাঙেন। সুভাষ তখন জেলে। যে-পুণা প্যাক্ট করে গান্ধীজী অনশন ভাঙলেন, তাতে বাংলা দেশের ও অন্যান্য প্রদেশের বর্ণহিন্দুদের উপর গভীর অবিচার করা হয়েছিল। গান্ধীজী নিজের জীবনকে বাজি ধরে সেই অবিচারকে চাপিয়ে দিয়েছিলেন বাংলা দেশের উপরে। তখন মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ যেন সেই অন্যায়ের সহায়ক। সুভাষ জেল থেকে গোপনে একটা চিঠি পাঠালেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। সে চিঠি আমরা রবীন্দ্রনাথকে দিই নি—সেটা এতই তীব্রভাবপূর্ণ ছিল। রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য তখন ভাল নয়, তাঁর মনে প্রতিক্রিয়া গুরুতর হতে পারত। আমরা অবশ্য সুভাষের নাম না করে তাঁর চিঠির মূল বক্তব্য লোক-মারফৎ রবীন্দ্রনাথের কাছে পেশ করেছিলুম।"

শ্রীযুক্ত মিত্র যোগ করলেন—"আপনি নিশ্চয় জানেন, পুণা প্যাক্টের ক্ষতিকর রূপ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ পরে কি রকম সচেতন হয়ে উঠেছিলেন?"

গান্ধীজীর পুণা প্যাক্ট, সে-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীজীর বিনিময়, এবং সুভাষচন্দ্রের মনোভাব পরে আমরা বিস্তৃতভাবে বর্ণনার চেষ্টা করব, এখানে একটি তথ্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি। রবীন্দ্র-জীবনীর তৃতীয় খণ্ডে আছে—

"কলিকাতা হইতে এতদিন পরে কয়েকজন বিশিষ্ট লোক (অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, তুলসীচরণ গোস্বামী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি) শান্তিনিকেতনে আসিয়া কবিকে পুণা-চুক্তি গ্রহণ করায় বাঙালী হিন্দুর কোথায় ক্ষতি বুঝাইয়া গেলেন।"

জানি না, উপরিউক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা 'এতদিন পরে' শান্তিনিকেতন গিয়েছিলেন যে-উদ্দেশ্যে, তার পিছনে সুভাষচন্দ্রের পত্রের তাগিদ ছিল কি না।

॥ ২ ॥

যে-পত্রটি কোনোদিন লেখা হয় নি, সে পত্রের পিছনকার বেদনাদায়ক কাহিনী ঐতিহাসিক সত্যের খাতিরেও সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত করতে পারব না। শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সী আমাকে সে কাহিনী বলেছেন। অনেক কিছু বর্জন করে, অনেক সাবধান হয়ে তবে সে ইতিহাস বলতে হচ্ছে। অলিখিত পত্রটি গান্ধীজীর—সুভাষচন্দ্র যা কোনোদিন পান নি।

কাহিনীটি সংক্ষেপে এই ঃ

"১৯৩৩ সালে অসুস্থ ও বন্দী সুভাষচন্দ্রকে সরকার জানালেন, তিনি স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য বিদেশে যেতে পারেন। জাহাজে উঠবার পরে তাঁর বন্দীত্বের পরোয়ানা ছিঁড়ে ফেলা হবে। সুভাষচন্দ্র অনেক ভেবে রাজী হলেন। স্বাস্থ্যোদ্ধার করার প্রয়োজন আছে,—স্বাস্থ্যের যে অবস্থা তাতে জেলে থাকা মানে মৃত্যুবরণ,—সে স্বাস্থ্যোদ্ধার বিদেশে স্বাধীন জীবন ছাড়া সম্ভব নয়। কিন্তু সুভাষচন্দ্র একথাও বুঝলেন, সরকার তাঁকে সহজে দেশে ফিরতে দেবেন না। অন্ততঃ একটা বোঝাপড়ার আগে নয়। তার মানে তিন-চার বছরের বিদেশবাস নিশ্চিন্তে। অথচ নিশ্চিন্তে থাকতে তিনি জন্মান নি। সুতরাং বিদেশবাসকে স্বাধীনতার প্রয়োজনে লাগাতে হবে। ইতিহাস পড়ে তাঁর ধারণা হয়েছিল—স্বাধীনতা সংগ্রামে বিদেশীর আনুকূল্যের প্রয়োজন আছে। তাই বিদেশে থাকাকালে ভারতের পক্ষে প্রচারকার্যের এবং সম্ভবক্ষেত্রে বিদেশীদের সাহায্য কিভাবে সংগ্রহ করা যায় তারই চেষ্টা করবেন। তার জন্য ইউরোপের বিশিষ্ট মানুষ, বিশেষ করে বিপ্লবী রাজনীতিকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজন। সুভাষচন্দ্র ভারতে সুপরিচিত, ইউরোপে নন। সুতরাং বিখ্যাত বিদেশীদের বিশ্বাসভাজন হতে গেলে পরিচয়পত্র থাকা চাই। তিনি স্থির করলেন, তিনজন বিখ্যাত ভারতীয়ের প্রদত্ত পরিচয়পত্র বিশেষভাবে নেবেন ঃ এক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, যিনি কবি ও মানবতাবাদীরূপে ইউরোপে সুবিদিত; দুই, ডক্টর রাধাকৃষ্ণানের, ইউনিভার্সিটি মহল এবং প্রাচ্যদর্শনে আগ্রহী ব্যক্তিরা অনেকে যাঁর কথা জানেন; তিন, মহাত্মা গান্ধীর, অহিংস আন্দোলনের জন্য ইউরোপের উদারনৈতিক মহলে যিনি বিখ্যাত। রবীন্দ্রনাথ ও রাধাকৃষ্ণানের পরিচয়পত্র পাওয়া গেল।* সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর পরিচয়পত্র চেয়ে পাঠালেন।

সুভাষচন্দ্রের বিদেশযাত্রার বেশি দেরি নেই, তিনি গান্ধীজীর পরিচয়পত্রের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। চিঠির পর চিঠি পাঠাতে লাগলেন। এমন কি বিভাবতী বসু, যিনি জব্বলপুরে জেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, তাঁকেও পাঠালেন গান্ধীজীর কাছে। প্রতি মুহূর্তে তিনি আশা করতে লাগলেন চিঠি এসে যাবে; বিশ্বাস করতে লাগলেন যাত্রার আগে চিঠি পাবেনই।

জব্বলপুর থেকে বোম্বাইয়ের মুখে ট্রেনে যাত্রা করেছেন তিনি—সেখান থেকে জাহাজে যাবেন ইউরোপে। বন্ধুবান্ধব ও গুণমুগ্ধরা প্রায় প্রতি স্টেশনে এসেছেন দেখা করতে। তাঁরা মালা পরাচ্ছেন, কুশল জিজ্ঞাসা করছেন, শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন,—সুভাষচন্দ্রের কিছুতে মন নেই—তাঁর অস্থির চোখ ঘুরছে—ওয়ার্ধা থেকে কেউ

লেখকের প্রকাশিতব্য গ্রন্থ 'রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র'-এর একটি অধ্যায় এই রচনা। সংলগ্ন কয়েকটি অধ্যায় কয়েক সংখ্যা পর থেকে ধারাবাহিকভাবে সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশিত হবে।

—সম্পাদিকা

*রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত পরিচয়পত্র সুভাষচন্দ্রের মনঃপূত হয় নি। এ বিষয়ে পরে আলোচনা আছে।

এল নাকি? সুভাষচন্দ্র সত্যরঞ্জনকে বলেছিলেন পরে—'জানেন, সবচেয়ে পাগলামি করেছিলুম বোম্বাই স্টেশনে। ভুলাভাই এসেছেন দেখা করতে—তাঁকে দেখেই প্রায় লাফ দিয়ে কামরা থেকে নেমে সোজা জিজ্ঞাসা করলুম—আর ইউ ফ্রম ওয়ার্ধা? ভুলাভাই অবাক! বললেন, না তো, আমি বোম্বাইতেই আছি। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—অমন প্রশ্নের কারণ? —না, কিছু নয়, বলে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালুম, ভদ্রতা করার চেষ্টা করতে লাগলুম, আলাপ-আলোচনা-আপ্যায়ন সব চলতে লাগল—আর সারা দেহ-মন পুড়তে লাগল ক্ষোভে, তারই মধ্যে একটা অস্পষ্ট আশা রইল—হয়ত এখনি কেউ এসে যাবে ওয়ার্ধা থেকে গান্ধীজীর চিঠি নিয়ে! জাহাজঘাটায় সবকিছু ফর্মালিটির পাট চুকিয়ে জাহাজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আর বার বার তাকাচ্ছি পিছন দিকে—যদি কেউ আসে—জেটির উপর পেঁছে গেছি—জাহাজ ছাড়বার পরে যে পাটাতন তুলে নেয়, সেই শেষ জায়গাটায় হাজির হয়েছি, তখনো ফিরে তাকাচ্ছি পিছন দিকে—এমন সময়ে দেখি দূরে মহাদেব দেশাই! আমি বিদ্যুৎবেগে একেবারে ঘুরে তাঁর দিকে ছুটে গেলুম —give me the letter! মহাদেব অবাক—চিঠি? কোন্ চিঠি?—যে চিঠি গান্ধীজী পাঠিয়েছেন।—সে রকম কোনো চিঠি তো নেই। —আপনি ওয়ার্ধা থেকে আসছেন না?—হাঁ, তা তো আসছিই!"

সুভাষচন্দ্র বললেন,— "প্রাণপণে নিজেকে সংযত করে, মহাদেব দেশাইকে যথোচিত সম্ভাষণ জানিয়ে যখন পিছন ফিরে জাহাজের দিকে হাঁটতে সুরু করলুম তখন চোখের সামনে ঝাঁ ঝাঁ করছে। নৈরাশ্যে বেদনায় চারদিক আচ্ছন্ন। কাঁধে ছিল একটা ওভারকোট, তার পকেটে চিঠিপত্র। মালপত্র ঠিকমত উঠল কি না ভাল করে লক্ষ্যও করলুম না। ক্যাবিনেও গেলুম না। আর কোনো কথা বললুম না কারো সঙ্গে। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আরব সমুদ্রের দিকে মুখ করে বসে রইলুম। যারা নানাভাবে বিদায় নিচ্ছে ও বিদায় দিচ্ছে, যারা হাসছে বা কাঁদছে, তারা নিশ্চয় অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিল। আমার কিন্তু বাহ্যজ্ঞান ছিল না। সেইভাবে কতক্ষণ কেটেছে সংবিৎ ছিল না—বেশ কয়েক ঘণ্টা—সারাক্ষণ একটা যন্ত্রণা মোচড় দিয়েছে—কেন, কেন এই ব্যবহার? এই ব্যবহার কি আমার প্রাপ্য? মতে মিলতে না পারে, দেশের সেবা তো আমিও করি, পাশে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম তো আমিও করেছি,—আমি কি অন্য রকম ব্যবহার পেতে পারতুম না?—আমার জ্ঞান ফিরল অপরাহ্ণের শেষে—শেষ সূর্যের আলোয় লাল হয়ে গেছে সমুদ্র—প্রকৃতির মহান ঐশ্বর্যে চারিদিক পূর্ণ—হঠাৎ সেই মহিমা অনুভব করলুম, আর যেন শক্তি ফিরে পেলুম নিজের মধ্যে।—আমি কারো উপর নির্ভর করব না, নিজের শক্তিতে দাঁড়াবো, মরি আর বাঁচি আমাকে নিজের উপর নির্ভর করতে হবে—। পকেট থেকে চিঠিগুলো বার করলুম, টুকরো টুকরো করে ছিঁড়লুম—ছুঁড়ে ফেলে দিলুম সমুদ্রের উপরে। আমার গা থেকে যেন অনেক দিনের জ্বর নেমে গেল—আমি আবার বেঁচে উঠলুম—নতুন মানুষ এখন 'আমি!"

তন্ময় কণ্ঠে শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সী আমার কাছে বলে গিয়েছিলেন এক বিরাট পুরুষের অন্তর্বেদনা ও আত্মবিশ্বাস পুনরুদ্ধারের কাহিনী।* অভিভূত হয়ে শুনেছিলুম। সুভাষচন্দ্র কিভাবে আত্মনির্ভরতার প্রতিজ্ঞা রাখবার চেষ্টা করেছিলেন তার দৃষ্টান্ত সত্যবাবু দিয়েছিলেন; কিভাবে তিনি নাহাস পাশা ও ওয়াফদ নেতাদের সঙ্গে পরিচিত হন ও কিভাবে তাঁরা এঁর বন্ধু হয়ে ওঠেন, সেই-সব কাহিনী। তার বর্ণনার প্রয়োজন নেই এখানে, শুধু সত্যবাবুর উক্তির সমর্থক প্রমাণরূপে সুভাষচন্দ্রের এই-কালের এক রচনাংশ উপস্থিত করছি যার মধ্যে মানবের কীর্তিমহিমার বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের শ্রদ্ধাপূর্ণ বিস্ময়ের পরিচয় আছে। এই যাত্রাতেই সুভাষচন্দ্র মিশরের পিরামিড দেখেছিলেন—তারই বর্ণনা—

"পরদিন পিরামিডের দিকে যাত্রা করলুম। আবহাওয়া অতীব শীতল। নীল নদী অতিক্রম করে, প্রভাতী আকাশের পটে স্থাপিত ভুবনবিখ্যাত পিরামিডের দিকে যখন হুহু করে চলতে লাগলুম—তখন তীব্র বাতাস এসে দংশন করতে লাগল। অল্প পরেই পিরামিডের পাদদেশে পেঁছে তাকালুম উপরের দিকে।—তাহলে এ-ই-গু-লি-ই সেইসব পাথরের কীর্তি যা নেপোলিয়ানের কল্পনায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল! পিরামিডের এই পাদদেশেই ফরাসী সম্রাট নিজের সেনাবাহিনীকে জড়ো করেছিলেন, তারপর বলেছিলেন—ভেবে দেখো, পাঁচ হাজার বছর তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে!! সম্রাটের সেই আহ্বান যাদুমন্ত্রের মত কাজ করেছিল—সৈন্যদের ক্লান্ত দেহে এসেছিল বিদ্যুৎপ্রবাহ—এবং ম্যামেলুকেরা ঝড়ের সামনে ধুলোর মত ছড়িয়ে পড়েছিল তার ফলে। পিরামিডের, সেই-সঙ্গে কয়েকটি খননকার্যের আশেপাশে ঘুরে বেড়াবার সময়ে একটা চিন্তা সর্বক্ষণ আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল—আমাদের কী শেখাতে পারে এই পিরামিডগুলি? উত্তর পেলুম—হাঁ, আমরা প্রেরণালাভ করতে পারি। বিষণ্ণ-ভীষণ, সীমাহীন মরুভূমির পটভূমিকায় দণ্ডায়মান ঐ অতিকায় সৃষ্টিগুলির সামনে দাঁড়ালে মানুষের মহিমা এবং আত্মার অমরতার উপলব্ধি ঘটে। এই প্রস্তর-সৌধের নির্মাতারা কালকে পরাভূত করেছেন। তাঁরা পাথরের মধ্যে গেঁথে রেখেছেন নিজেদের, এবং যাঁরই কিছু অন্তরানুভূতি আছে তিনিই তাঁদের সঙ্গে নিভৃত বাক্যের বিনিময় করতে পারবেন।"

সত্যরঞ্জন-কথিত পূর্বোক্ত বিবরণ না জানলে সুভাষচন্দ্রের রচনার পিছনকার হৃদয়স্পন্দনের যথার্থ রূপ অনুভব করা যাবে না।

॥ ৩ ॥

শেষ প্রসঙ্গরূপে সুভাষচন্দ্রের একটি চিঠি উদ্ধৃত করছি। চিঠিটি রবীন্দ্রনাথকে লেখা। নানা কারণে মূল্যবান এই পত্র।—

C/o. American Express
Company
Viena

৩রা অগস্ট, ১৯৩৪

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

একটা বিশেষ কারণে আপনাকে বিরক্ত করিতেছি, আশা করি তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করিবেন।

লণ্ডনের জনৈক প্রকাশকের অনুরোধে আমি এখন একটি পুস্তক লিখিতেছি। পুস্তকের বিষয়—'The Indian Struggle, 1920-34'। প্রকাশকের নাম—Wishert and Company, 9, John Street, Adelphi, London W. C.-2। আগস্ট মাসের মধ্যেই আমার লেখা শেষ হইবে এবং অক্টোবরের মধ্যে বই প্রকাশিত হইবে। যে-সময়ে Joint Select Committee-র রিপোর্ট সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত হইবে ঠিক সেই সময়ে আমার বইটিও প্রকাশিত হইবে। পুস্তকের গোড়ায় 'Historical background' শীর্ষক এক অধ্যায় থাকিবে। প্রকাশকের আশা যে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় খুব বেশি

*এই ঘটনার একটি বিবরণ শ্রীযুক্ত নলিনীকিশোর গুহ'র 'বাংলায় বিপ্লববাদ' গ্রন্থে পরে লক্ষ্য করেছি। ঘটনা মোটামুটি এক, কিন্তু কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য তফাতও আছে।

বিক্রি হইবে এবং তাঁহারা জার্মান ও ফরাসী অনুবাদেরও চেষ্টা করিতেছেন। আমি এখন চাই কোনো বিশিষ্ট ইংরেজী লেখকের কাছ থেকে আমার পুস্তকের জন্য সূচনা বা forward.

আমি নিজে খুব সুখী ও সন্তুষ্ট হইব যদি Bernard Shaw'-র লেখনী হইতে কয়েকটি ছত্র পাই। এ বিষয়ে হয়তো আপনি সাহায্য করিতে পারিবেন। আপনি যদি Bernard Shaw মহাশয়কে এ বিষয়ে লিখিতে পারেন তাহা হইলে বড় উপকৃত হইব। তবে আপনি যদি কোনো প্রকার সংকোচ বা অনিচ্ছা বোধ করেন তাহা হইলে আমি আপনাকে অনুরোধ করিতে চাই না এবং আপনি যদি লেখা স্থির করেন, তাহা হইলে এমনভাবে অনুগ্রহ করিয়া লিখিবেন যাহাতে প্রকৃতপক্ষে কিছু কাজ হয়। কেবল আমার অনুরোধ রক্ষার জন্য লিখিয়া কোনো লাভ নাই। আমি যখন ইউরোপে আসি, আপনি তখন অনুগ্রহ করিয়া Romain Rolland মহাশয়কে আমার সম্বন্ধে পরিচয়পত্র দিয়াছিলেন, কিন্তু সে পরিচয়-পত্র যেন অনুরোধ রক্ষার জন্য লেখা। সুতরাং সে পত্রের আমি সদ্ব্যবহার করিতে পারি নাই এবং নিজেই Rolland মহাশয়ের সহিত পত্র ব্যবহার আরম্ভ করি।* Bernard Shaw মহাশয় বোধ হয় আমার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, সুতরাং তাঁহাকে ভাল করিয়া লেখা দরকার হইবে।

আমি ভরসা করি যে, আমার পুস্তকের আদর হইবে, কারণ প্রকাশক মহাশয় আমার সহিত advance contract করিয়াছেন এবং royalty-র টাকা লইয়া আমি লেখা আরম্ভ করিয়াছি।

Bernard Shaw ব্যতীত আর একজনের কাছ থেকে Forward পাইলেও কাজ হইতে পারে—H. G. Wells। Rolland মহাশয়ের কথাও আমার মনে হইয়াছিল, কিন্তু তিনি প্রচণ্ড রকমের "গান্ধী ভক্ত", অথচ আমি তাহা নহি এবং তাঁহাকে সেকথা আমি জানাইয়াছি। সুতরাং Rolland মহাশয় যে আমার পুস্তকের সূচনা লিখিতে রাজী হইবেন সে আশা করিতে পারি না। Bernard Shaw বা Wells মহাশয় মহাত্মাজী সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন কিন্তু তাঁহারা অন্ধ ভক্ত নন—সুতরাং তাঁহারা হয়তো রাজী হইতে পারেন। আপনার কথাও আমার মনে হইয়াছিল কিন্তু আমি জানি না আপনি রাজনীতি-বিষয়ক পুস্তকের জন্য কিছু লিখিতে ইচ্ছুক হইবেন কি-না? তদ্ব্যতীত আপনি নিজে সম্প্রতি মহাত্মাজীর অন্ধ ভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন—অন্ততপক্ষে আপনার লেখা পাঠ করিলে সেরূপ ধারণা মানুষ স্বভাবত পোষণ করিতে পারে। এরূপ অবস্থায় মহাত্মাজীর সমালোচনা আপনি বরদাস্ত করিতে পারিবেন কি-না আমি জানি না। আমার পুস্তকটা হইবে—

'An objective study of the Indian movement from the standpoint of an Indian rationalist'.

Bernard Shaw মহাশয়ের ঠিকানা—4, Whitehall Court, London S. W. আপনি ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে লিখিতে পারেন অথবা চিঠিটা আমার নিকট পাঠাইতে পারেন। আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি—

আপনার অনুগত
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

পুনঃ—আমার ব্যক্তিগত মতামত আমি শেষ অধ্যায়ে লিখিব। ঐ অধ্যায়ে ভবিষ্যতে ভারতের আন্দোলন কি আকার ও রূপ ধারণ করিবে সে বিষয়ে আমার মত ও ধারণা প্রকাশ করিব।

সুভাষ।

(পত্রটির অনুলিপি নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর কর্তা ডাঃ শিশিরকুমার বসুর সৌজন্যে প্রাপ্ত)।

রবীন্দ্রনাথকে লেখা সুভাষচন্দ্রের এই পত্রটিকে মূল্যবান বলেছি, ইতিহাসের কোনো গুরুত্বপূর্ণ দলিলরূপে নয়—সুভাষচন্দ্রের তৎকালীন কতকগুলি ধারণার প্রকাশরূপেই এর মূল্য।

প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল, এই পত্রে লেখক সুভাষচন্দ্র ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না। এমন সুস্পষ্ট বক্তব্য, এমন সতেজ মন, শ্রদ্ধার সঙ্গে সমালোচনার এমন কঠিন শক্তি তখনকার ভারতবর্ষে অপর কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির মধ্যে ছিল কি-না সন্দেহ। পত্রের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি আর কেউ নন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যিনি ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কবি, দেশে-বিদেশে সম্মানিত পুরুষ—প্রতিভার জন্যই নয় শুধু মানবতাবাদী জীবনদর্শনের জন্যও বটে। ভারতবর্ষে যে-কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বলেন—পরিপূর্ণ বিনয় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তা বলেন, রাজনীতিক হলে তো কথাই নেই—কেন না রবীন্দ্রনাথের সমর্থন তখন সৌভাগ্যের জিনিস। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অধিকন্তু কথা বলতে গেলে সকলেই সতর্ক থাকেন ভাষা ব্যবহারে, পাছে কবির অতি-স্পর্শকাতর মনে আঘাত লাগে। কিন্তু সুভাষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রতি সবিশেষ শ্রদ্ধা সত্ত্বেও যখন পত্র লিখছেন—তার মধ্যে সহজ ভাষায় মনের সহজ কথাটা খুলে বলতে একটুও দ্বিধা করছেন না—তাঁর সে বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথের প্রতি পরিষ্কার অভিযোগও বাদ যাচ্ছে না। সুন্দর শব্দ নির্বাচনের পরিবর্তে সুস্পষ্ট শব্দ নির্বাচনের প্রতি সুভাষচন্দ্রের পক্ষপাত তাঁর জীবনদৃষ্টিরই অন্তর্ভুক্ত ব্যাপার।

পত্রটির মধ্যে একটি কৌতুককর দিক আছে। পত্রের উদ্দেশ্য—সুভাষচন্দ্রের কোনো বইয়ের জন্য কোনো বড় ইংরাজ লেখকের ভূমিকা লাভ—রবীন্দ্রনাথ যেন সেই ইংরাজ লেখকের কাছে এ বিষয়ে সুপারিশ করে কিছু লেখেন। সুভাষচন্দ্রের পক্ষে ব্যাপারটি প্রার্থনার। কিন্তু যিনি প্রার্থী, তাঁর মেজাজ চমৎকার। যাঁর কাছে প্রার্থনা, তাঁকে কার্যত ধমক দিয়ে বলছেন, মশায়, ইচ্ছা হলে লিখবেন,

---

*শ্রীনেপাল মজুমদারের একটি প্রবন্ধ থেকে (দেশ, ৮ই মাঘ, ১৩৭২) রবীন্দ্রনাথ-প্রদত্ত পরিচায়ক পত্রটি পেয়েছি ঃ

6, Dwarkanath Tagore Lane,
Calcutta
Feb. 18, 1933

My friend Subhas Chandra Bose is going for his treatment. I earnestly hope my friends will be kind to him and help him.

Rabindranath Tagore

'আমার বন্ধু সুভাষচন্দ্র বসু' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই পত্র অবশ্যই বন্ধুত্বের দৃষ্টিভিক্ষা। রবীন্দ্রনাথের অন্য বন্ধুরা সুভাষচন্দ্রের প্রতি 'অনুগ্রহ' দেখাবেন চিঠিতে এই আশা পোষণ করা হয়েছিল, যদিও সেই অনুগ্রহ সবচেয়ে কম দেখিয়েছিলেন স্বয়ং কবি।

কিন্তু যদি লেখেন যা-তা করে লিখবেন—যেমন একবার লিখেছিলেন।

যে-কেউ এখন বলতে পারেন—রবীন্দ্রনাথ যদি একবার যা-তা করে লিখে থাকেন, তাহলে আবার তার কাছে চিঠি চাওয়া কেন—তাও অমন ধমকের ভাষায়?

এর যা উত্তর, তার মধ্যে রবীন্দ্র-সুভাষ সম্পর্কের প্রকৃতি ধরা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কি কারো একলার—এমন কি রবীন্দ্রনাথ কি রবীন্দ্রনাথের? সুভাষচন্দ্র যেন বলতে চান—রবীন্দ্রনাথ সকলের, সকল সত্য ও ন্যায়ের; সেকথা রবীন্দ্রনাথ নামক জীবিত দেহধারী মানুষটি যেন মনে রাখেন! অতএব আমার প্রয়োজনে, যে-প্রয়োজন আসলে সকলের, আমি দাবি জানাব, তাতে লজ্জিত হবার কি আছে? বলা বাহুল্য, এমন করে দাবি তিনিই জানাতে পারেন, যিনি জানেন, রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে তাঁর একটা স্থান আছে। রবীন্দ্রনাথের স্নেহ-ভাজন ভিন্ন ও চিঠি আর কারো পক্ষে লেখা সম্ভব নয়।

অনুরোধ না এড়াতে পেরে রবীন্দ্র-নাথ রোমাঁ রোলাঁকে দায়সারা গোছের চিঠি লিখেছিলেন—সুভাষচন্দ্রের এই বক্তব্যের দিকে এবার দৃষ্টি দেওয়া যায়। আমি আগে সত্যরঞ্জন বক্সী-কথিত যে ঘটনাটির উল্লেখ করেছি, তার সঙ্গে এই বক্তব্যের সম্পর্ক থাকতে পারে। গান্ধীজীর ব্যবহারে ক্ষুব্ধ সুভাষচন্দ্র ইউরোপে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের ব্যাপারে আত্মশক্তিতে নির্ভর করবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন—সত্যরঞ্জন এ-কথা জানিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথকে লেখা পত্রের মধ্যেও সেই প্রতিজ্ঞারক্ষার পরবর্তী চেষ্টার কথা আছে। সুভাষচন্দ্র লিখেছেন, তিনি নিজেই রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে পত্র ব্যবহার সুরু করেন। তার কারণ, রোলাঁকে রবীন্দ্রনাথের 'পরিচয়পত্র যেন অনুরোধ রক্ষার জন্য লেখা'। এখানে চিঠি ছিঁড়ে ফেলার কথা নেই। থাকার কথাও নয়। ওকথা লিখলে রবীন্দ্রনাথকে অনাবশ্যক বেদনা দেওয়া হত। কিন্তু চিঠি ছিঁড়ে ফেলার কথাটা সম্ভবত ঠিক। রবীন্দ্রনাথের নিস্পৃহ ক্ষুদ্র পত্রটি সুভাষচন্দ্রকে পূর্ব থেকে ক্ষুব্ধ করে রেখেছিল—গান্ধীজীর পরবর্তী ব্যবহার সেই ক্ষোভের আগুনে ঘৃতাহুতি দেয়, তার ফলে সব কয়টি চিঠির সমুদ্রপ্রাপ্তি ঘটে।

শেষ জিজ্ঞাসা থাকে—সুভাষচন্দ্র যদি বৈদেশিক সংযোগের ব্যাপারে আত্মনির্ভরের প্রতিজ্ঞাই নেন, তাহলে পুনশ্চ সুপারিশ পত্রের জন্য রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন কেন? একটা উত্তর আগেই দিয়েছি—রবীন্দ্রনাথ 'জাতীয় সম্পত্তি'। দ্বিতীয় উত্তর—আত্মনির্ভরতা মানে অপরের সাহায্য নেওয়ার চেষ্টা ত্যাগ করা নয়—ঐ সাহায্যের উপরেই দাঁড়িয়ে না থাকা।

সুভাষচন্দ্রের পত্রের মধ্যে একটি কথা বিশেষভাবে বড় হয়েছে—প্রকাশিতব্য গ্রন্থের গান্ধী-সমালোচনা সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতা। সুভাষচন্দ্র বুঝতে পেরে-ছিলেন, তিনি এতদিন বিবৃতি বা ভাষণে গান্ধীনীতির যে সমালোচনা করে এসে-ছেন, তার থেকে অনেক গুরুতর ও গুরুত্বপূর্ণ হবে একটি বিস্তৃত গ্রন্থে জাতীয় আন্দোলনের পটভূমিকায় গান্ধী-নীতি ও আন্দোলনের ত্রুটি-দুর্বলতার উন্মোচন করা। ভারতবর্ষের বড় অংশে গান্ধী দেবতা। অপর পক্ষে সুভাষচন্দ্র দেবমূর্তির খড়-মাটি দেখাচ্ছেন—তার প্রতিক্রিয়া তীব্র হতে পারে, বিশেষত রবীন্দ্রনাথের কাছে, যিনি বিখ্যাততম বাঙালী, ভারতের মহাকবি এবং বিশ্বের মহান নাগরিক—এবং যিনি নিদারুণ গান্ধী-প্রেমিক, সুভাষচন্দ্রের ভাষায় 'অন্ধ গান্ধীভক্ত'। পুণা প্যাক্টের কালে রবীন্দ্র-নাথের ভূমিকা ও রচনাদির কথা মনে রেখেই সুভাষচন্দ্র অমন কঠিন কথা প্রয়োগ করেছেন। এ বিষয়ে জেল থেকে লেখা সুভাষচন্দ্রের পত্রের কথা আগেই জানিয়েছি। একটি তথ্য এখানে জানিয়ে দেওয়া যায়, সুভাষচন্দ্রের পত্রের কয়েকদিন পরে (সম্ভবত সুভাষচন্দ্রের পত্র পাবার আগেই) রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ্য বিবৃতিতে বাংলা দেশে গান্ধী সমালোচনার ফ্যাশানের সমালোচনা করেন। (রবীন্দ্র-জীবনী দ্রষ্টব্য)।

সুভাষচন্দ্র তাঁর গ্রন্থ সম্বন্ধে কেবল 'অন্ধ গান্ধীভক্ত' রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়াই আশা করেন নি, 'প্রচন্ড রকমের গান্ধী-ভক্ত' রোমাঁ রোলাঁর মনোভাবও একই ধরণের হবে বলে মনে করেছিলেন। রোমাঁ রোলাঁ সত্যই কি রকম ধারণা করেছিলেন, সে বিষয়ে আমরা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলো-চনা করব।

দুটি প্রশ্ন উত্থাপন করে এই অধ্যায় শেষ করা যায়। প্রথম প্রশ্ন—সুপারিশ পত্র দেওয়ার ব্যাপারে গান্ধীজীর আচরণ সুভাষচন্দ্রের শেষ মোহভঙ্গ করে কি তাঁর 'ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল' গ্রন্থে গান্ধীনীতির নির্মম সমালোচনায় তাঁকে কিছু প্ররোচিত করেছিল? দ্বিতীয় প্রশ্ন—রবীন্দ্রনাথ কি সুভাষচন্দ্রের পত্রের উত্তর দিয়েছিলেন?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর—না। এ ধরণের ব্যাপার সুভাষচন্দ্রকে সাময়িকভাবে বিচলিত করলেও একেবারে অপ্রত্যাশিত নয় তাঁর কাছে। তা ছাড়া মূল নীতির ব্যাপারে ব্যক্তির প্রশ্নকে তিনি জড়িয়ে ফেলতেন না। গান্ধীনীতির যে সমা-লোচনা উক্ত গ্রন্থে করেছেন—তার সব বক্তব্যই বিচ্ছিন্নভাবে বলেছেন পূর্বে নানা স্থানে।

দ্বিতীয় উত্তর—হাঁ, রবীন্দ্রনাথ একটা উত্তর দিয়েছিলেন, সুভাষচন্দ্রের আশঙ্কাকে সত্য প্রমাণ করে। পত্রটি শ্রীযুক্ত নেপাল মজুমদার তাঁর প্রবন্ধে উদ্ধৃত করেছেন, আমি পুনরুদ্ধৃত করছি—

স্নেহভাজনেষু,

Bernard Shaw-কে আমি ভাল-মতো জানি; তোমার বইয়ের পূর্বভাষণ লেখবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করতে আমি সাহস করি নে। করলেও ফল হবে না, এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তোমার পান্ডুলিপিখানির এক কপি তুমি নিজেই তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেখতে পার। এতদিনে সংবাদপত্রযোগে নিশ্চয় তিনি তোমার পরিচয় পেয়েছেন।

এই উপলক্ষে একটা কথা তোমাকে বলা আবশ্যক বোধ করি। মহাত্মা গান্ধী অতি অল্পকালের মধ্যে সমস্ত ভারত-বর্ষের মনকে এক যুগ থেকে আর এক যুগে নিয়ে যেতে পেরেছেন। কেবল এক-দল রাষ্ট্রনীতিকের নয়, সমস্ত জনসাধা-রণের মনকে তিনি বিচলিত করতে পেরে-চেন—আজ পর্যন্ত আর কেউ তা পারে নি। এর পূর্বে ভারতবর্ষের এখানে-ওখানে ইংরেজি শিক্ষিতদের মধ্যে দুর্বল রকমের রাষ্ট্রনৈতিক সুড়সুড়ি লেগেছিল মাত্র। মহাত্মাজীর চরিত্রের মধ্যে এই একটা প্রবল নৈতিক শক্তিকে ভক্তি যদি না করতে পারি তবে সেইটেকেই বলব অন্ধতা। অথচ তাঁর সঙ্গে আমার স্বভাবের বুদ্ধির ও সংকল্পের বৈপরীত্য অত্যন্ত প্রবল। মনের দিকে, কল্পনার দিকে, ব্যবহারের দিকে তিনি আর আমি সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর জীব। কোনো কোনো বিষয়ে তিনি দেশের ক্ষতি করেছেন—কিন্তু দেশের নির্জীব চিত্তে হঠাৎ যে বল এনে দিয়েছেন একদিন সেটা সমস্ত ক্ষতিকে উত্তীর্ণ হয়ে টিকে থাকবে। আমরা কেউই সমস্ত দেশকে এই প্রাণশক্তি দিই নি।

শান্তিনিকেতন। ইতি—১৭ আগস্ট ১৯৩৪

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আন্দামান বন্দীশালার দিকে তাকিয়ে আছেন নেতাজী
(আজাদ হিন্দ্ বাহিনী কর্তৃক আন্দামান দখলের পর)

প্রজাতন্ত্র দিবস

প্রজাতান্ত্রিক সমাজবাদী সমাজ গঠনের পবিত্র প্রতিজ্ঞা নিয়ে ছাব্বিশে জানুয়ারী বার বার অষ্টাদশ বার আমাদের সামনে সমুপস্থিত হয়েছে। বিধি বাম, প্রতিজ্ঞার গুরুভার এ পর্যন্ত শুধু বহনই করে আসছি ভারবাহীর মত। প্রতিজ্ঞা পালনের সেই সমাধিত-কর্তব্যের আনন্দে ছাব্বিশে জানুয়ারীকে অদ্যাবধি, যাকে বলে নিশ্ছিদ্র মনে, আলিঙ্গন জানাতে এবং প্রাণ-উজাড় উৎসবে মেতে উঠতে পারি নি। কেন না ব্যর্থতার হিসাব কষতে কষতেই বছর ভোর হয়েছে। একটি নিটোল উৎসবের বছর বলতে সেই ছাব্বিশে জানুয়ারীর জন্মক্ষণকেই মনে পড়ে। তারপর থেকে প্রতিজ্ঞা স্মরণেরই পালা।

গত কয়েক বছর বিধি বাম—ভারতের সম্মুখে ছাব্বিশে জানুয়ারী এসেছে টিম টিম করতে করতে। আমরা উৎসব করতেও ভয় পেয়েছি। হয় নতুন সমস্যা, নয় নতুন কিছু করতে না পারার গ্লানিতে মনের মতো করে সাজাতে পারি নি পবিত্র প্রজাতন্ত্র দিবসের সূর্যস্নাত দিনটিকে, জ্বালাতে পারি নি কোটি কোটি উজ্জ্বল দীপবর্তিকা রাত্রির তমিস্রাজাল ছিন্ন-ভিন্ন করে। কেবল পাখি পড়ার মত উচ্চারণ করে গেছি সঙ্কল্প বাক্য।

এবারও তার ব্যত্যয় ঘটছে না।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়, খরা দুর্ভিক্ষ আর দেশব্যাপী অরাজক অবস্থার মাঝখানে দাঁড়িয়ে উৎসবের আলোকসজ্জায় ছাব্বিশে জানুয়ারীর শরীর সাজাতে এবারও সঙ্কোচের মালিন্য অনুভব করছি।

সমাজবাদী সমাজের স্বপ্ন আমরা ক্রমেই দুঃস্বপ্ন বলে ভাবতে শিখেছি এবং প্রজাতন্ত্রের ছায়ায় আমাদের সামনে ক্রমশ দৃশ্য হয়ে উঠেছে প্রজা-উৎপীড়কের বিকটাকার মূর্তি। গোটা দেশটা বিক্ষোভে বিদ্বেষে ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক অসহায়ভাবে ইতিহাসের পাতা উল্টে পশ্চাতে প্রত্যাবর্তন করে সান্ত্বনা খোঁজার চেষ্টা করছেন। কেন না হাতের কাছে অথবা দূর ভবিষ্যতে কোন আলোকিত দিবসের চিহ্ন আর দৃষ্টিগোচর হয় না।

যে জাতীয় কংগ্রেসের ওপর পরিপূর্ণ আস্থা রেখে ভারতবাসী একদিন কৌপীনধারী গান্ধীজীর সঙ্গে পদযাত্রা সুরু করেছিল সেই কংগ্রেস এখন ভোল বদল করেছে। নেতৃত্বহীন এবং ক্ষমতাদম্ভী কংগ্রেস আজ দুয়ার দু'ফাঁক করে রাজন্যবর্গ এবং ব্যক্তিস্বার্থবাদী ব্যবসায়িকুলকে আহ্বান জানিয়েছে। প্রজাতন্ত্রী ভারতে রাজতন্ত্রীরা আসছেন নির্বাচনে প্রার্থীরূপে। সেই সঙ্গে কংগ্রেস ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। অনেক শ্রদ্ধেয় নেতা সদলবলে কংগ্রেস ত্যাগ করে বিষন্ন অসহায়তার সঙ্গে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছেন। চতুর্দিকে হতাশা। যা চেয়েছিলাম, তা পাই নি; তথাচ এতোকাল যা আশা করে টিকেছিলাম সেই আশার মুখেও ছাই পড়েছে। কংগ্রেস তার প্রতিশ্রুতি কার্যত প্রত্যাহারের পথ গ্রহণ করতে চলেছে। আবার নতুন করে নতুন শপথ নিয়ে সুরু করতে হবে। অন্যথা দ্রুত প্রতিজ্ঞা বিনাশের পথেই আমরা এগিয়ে চলব।

প্রজাতন্ত্রী ভারত বিস্ময়ে এবং বিমূঢ় বেদনার সঙ্গে বিফল নেতৃত্বের হতাশ্বাস শুনছে। আর চারিদিক তাকিয়ে হতাশা দ্বিগুণিত হচ্ছে, যখন দেখছি টাল-খাওয়া প্রজাতন্ত্রে হাল ধরার মত উপযুক্ত দলের অভাব। ভেদ এবং বিসম্বাদ দুঃস্বপ্নকে

দাপিয়ে চলেছে অসহায় দেশবাসীর চোখের সামনে।

শিথিল প্রশাসন রাজ্যে রাজ্যে সামগ্রিক নৈরাজ্যের সৃষ্টি করেছে। কাজকর্ম শিক্ষা সংস্কৃতি একই সঙ্গে পর্যুদস্ত হচ্ছে। এই দুর্বল পরিস্থিতির সুযোগে মাথা তুলছে সর্বনাশা উচ্ছৃঙ্খলতা, জাতির অগ্রগতির পথে যা প্রচন্ড বাধা স্বরূপ। কে কবে শৃঙ্খলাহীনতার দ্বারা প্রতিষ্ঠা দিয়েছে সুস্থ সমাজজীবনের। বহু ক্ষেত্রেই আন্দোলন বিপথচালিত এবং নেতৃত্বহীন। এই নেতৃত্বহীন উম্মা মূর্খের স্বর্গরাজ্য স্থাপনের প্রয়াস পায়, যার রাজনৈতিক দুর্নাম, ফ্যাসিজম।

বিমূঢ় ভারতের বুকে প্রজাতন্ত্র দিবস এলো অন্ধকার মুখে। উপহার দেওয়ার মত তেমন কোন সঞ্চয় নেই। আছে মিথ্যা আশ্বাসের স্তূপীকৃত শব্দসম্ভার। প্রজাতন্ত্র দিবসে তার একটি শব্দ উচ্চারণের অহমিকা আমাদের নেই।

ভারতমাতার পদাম্বুজে প্রজাতন্ত্র দিবসে দুই অঞ্জলি ভর্তি করে আমরা এনেছি তাই বেদনা এবং আশাভঙ্গের নীলোৎপল।

প্রজাতন্ত্রের প্রদীপ

প্রজাতন্ত্রের প্রদীপ এখন টিম টিম করে জ্বলছে নির্বাচন নামক সলিতার অগ্রভাগে। এবারে নির্বাচকের সংখ্যা ১৯৬২ সাল অপেক্ষা সাড়ে চোদ্দ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। কেন্দ্র-শাসিত দিল্লীতে এই বর্ধিত হার সর্বোচ্চ। প্রায় ২৫ দশমিক ৪০ শতাংশ বেড়েছে সেখানে। বিহারের আনুপাতিক বর্ধিত সংখ্যা হল ২৫ দশমিক ২৬ শতাংশ। ভোটার সংখ্যা সর্বত্র বর্ধিত আকার নিলেও কেন্দ্র-শাসিত পণ্ডিচেরীতেই একমাত্র ভোটারের আনুপাতিক হারে এক দশমিক আটচল্লিশ শতাংশ বিযুক্ত হয়েছে দেখা যায়।

ওদিকে ভোট প্রদান ক্ষমতার প্রয়োগও ক্রমশ বাড়ছে। যার থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, লোকের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির দিকে। কিন্তু আগামী নির্বাচনের দিন দ্বারে এসে করাঘাত করলেও এখনো পর্যন্ত এবার তেমন উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে না বা আলোচনার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে না। চতুর্দিকে কেমন একটা থমথমে নিঝুম হাব ভাব। ভোটদাতারা হয় হতাশ, নয় অনেক বেশি সংযত। তত্রাচ অভিজ্ঞমহলের ধারণা, বিগত দুইটি নির্বাচনে ভোটদানের ক্রমবর্ধিত উৎসাহ লক্ষ্য করে এ বছর ষাট শতাংশেরও অধিক ব্যক্তি যে ভোট প্রয়োগ ক্ষমতা ব্যবহার করবেন এমন আশা, অন্যান্য পরিস্থিতি সমান থাকলে, অমূলক নয়। কেন না ১৯৫৭ সালে যে ক্ষেত্রে মাত্র ৪৭·৫৪ শতাংশ ভোট দেন, ১৯৬২ সালে তখন ভোটদাতার সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৪·৮০ শতাংশ। এ হিসাব লোকসভার। রাজ্য বিধানসভাগুলিতে ভোটদাতার সংখ্যা ছিল ১৯৫৭ সালে মাত্র ৪৮·২৩ শতাংশ; আর ১৯৬২তে সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৫৬·২৯ শতাংশ। এজন্য এবারের নির্বাচনে ৬০ শতাংশের অধিক ভোটদাতাকে ভোট প্রদানের ক্ষমতা ব্যবহার করতে দেখা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

সাধারণত একাগ্রভাবে বামপন্থী সমর্থকগণকে তাঁদের ভোট প্রদানের ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য অত্যুৎসাহী দেখা যায়। কেন না তাঁরা ভোটের রায় দিয়ে আপন ইচ্ছাকে রূপায়িত করতে আগ্রহী থাকেন। সে হিসেবে রাজনীতি-সচেতনার ক্ষেত্রেও এ'রা যে অগ্রগামী সে কথা স্বীকার করতে হয়। ভোট শক্তি যাঁরা প্রয়োগ করেন না, তাঁদের বৃহদংশই রাজনীতি-অসচেতন। কিছু বা হতাশ। কোন দলের প্রতিই আস্থা না থাকাই তাঁদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণে বিমুখ করে তোলে। এবং আর কিছু আছেন, যাঁরা মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগছেন। অর্থাৎ আপন প্রতিনিধি সন্ধান করতে অক্ষম। এ জন্য ভোটারদের মধ্যে উপযুক্ত প্রচার ও রাজনীতি চেতনার অভাবই দায়ী।

ভোট প্রদানের লক্ষ্য, কেবলমাত্র সরকার গঠন করাই নয়; সকল দলই সরকার গঠন করতে পারেন না। অথচ আমার মনোমত প্রার্থী সরকার গঠন করতে পারবেন না বলেই হতাশ হয়ে ভোটের ক্ষমতাটি আমার পক্ষে নষ্ট করা অনুচিত। কেন না গণতন্ত্রে যেমন সরকারী দলের মূল্য, ঠিক ততখানিই মূল্য বিরোধীদলের। শক্তিশালী বিরোধীদল ব্যতীত কোন গণতন্ত্রই সুগঠিত হতে পারে না। বিরোধী শক্তি ক্ষীণ হলে গণতন্ত্রে কায়েমী শক্তির জয়জয়কার উপস্থিত হয়; তখন প্রজাতন্ত্রের বুকের ওপর মালিকতন্ত্র চেপে বসে। বিরোধীশক্তিহীন গণতান্ত্রিক সরকার ভুলে যান জনগণের কথা, এবং জনগণের কথা প্রচন্ড শক্তিমত্তার সঙ্গে উপস্থাপিত করতে পারেন না বিরোধীদল। আর আইন সভার মাধ্যমে সরকারের কাছ থেকে গণস্বার্থের অনুকূলে কাজ আদায় করে নেওয়ার জন্য যে বিরোধীদল তা শক্তিহীন হলে দেশে আইনভঙ্গ, আন্দোলন, বিক্ষোভ প্রভৃতি মুহুর্মুহু ঘটনারূপে জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূল অবস্থার অনেকক্ষেত্রে কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য আন্দোলনের দায় তত নয়, নির্বাচনকালে ভোটারদের গণনার ভ্রান্তি যতখানি। শক্তিশালী বিরোধী দল থাকলে জনপ্রতিনিধিরা আইন সভাতেই যে কোনো প্রশ্নের মোকাবিলা করতে পারেন।

একটি বলিষ্ঠ গণতান্ত্রিক সরকার তাই সেদিনই প্রতিষ্ঠা সম্ভব, যেদিন সরকারের বিপরীতে থাকবেন একটি মাত্র শক্তিশালী এবং প্রগতিশীল বিরোধী দল। এ ছাড়া গণতন্ত্রের নগণ্য রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব যত লুপ্ত হয়ে আসে, দেশের রাজনৈতিক চেতনা ততই সুস্থ সৃষ্টিশীল পথ খুঁজে পায়, দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল।

এজন্য একটি বলিষ্ঠ প্রগতিশীল বিরোধী দলকে আইন সভায় পাঠাবার জন্য প্রত্যেক ভোটারের মনে উপযুক্ত রাজনৈতিক চেতনার প্রয়োজন। ভোটের ক্ষমতা নষ্ট করা অথবা তার অপপ্রয়োগ করার অর্থ আগামী কয়েক বছরের জন্য আপন দুর্ভাগ্য আপনি ডেকে আনা। যে কোন একটি বাক্সে ভোটপত্রটি ফেলে আসার আগে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে তার ফলাফলকে বিচার করে নেওয়া উচিত। এ কারণ মনোযোগী প্রস্তুতির প্রয়োজন। সর্বদলীয় বক্তব্যকে বিশ্লেষণ ও বিচার করে দেখার দরকার। চমকদার ও চটকদার কথায় ভুললে চলে না। প্রতিটি নাগরিকের আঙুলের ফাঁকে এক এক টুকরো ভোটপত্রই জাতির জীবনে দিক পরিবর্তনের সুযোগ এনে দিতে পারে। প্রত্যেকটি ভোটপত্র পবিত্র এবং মূল্যবান। দয়া করে এ পত্র বিলোবার বস্তু নয়; খাতির করে ভোটপত্র বাক্সে ঢেলে আসার জিনিস নয়; কারও দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভোটপত্র প্রদান অসংশোধনীয় অপরাধ। কারণ এ শুধু ভোটদাতার ভাগ্য নয়, সমগ্র জাতির তথা ভবিষ্যৎ বংশধরের ভাগ্য নির্ণয়ের উপায় এই ভোটপত্র।

প্রজাতন্ত্রের প্রদীপে এই সলতেটি ঠিকমত পাকিয়ে দিতে পারলে, জাতির জীবনকে ঠিকমত রচনা করা সম্ভব।

এই কথা মনে রেখে প্রত্যেক নাগরিক তাঁর ভোটপত্রটি উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে ব্যবহার করলে সার্থক প্রজাতন্ত্র রচনা সম্ভব হবে।

জয়তু নেতাজ!

বীরত্ব দেশপ্রেম আত্মত্যাগ এবং আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা এবং অকুতোভয় তেজস্বিতার ওপর ঈশ্বরের অজস্র আশীর্বাদ, এইসব গুণাবলী স্বার্থান্ধ শতকে একমাত্র যাঁর জীবনে ও কর্মে মূর্ত হয়েছিল, সমগ্র বিশ্বে সেই প্রচন্ড বিস্ময়কর চরিত্রই একটি বিরাট জাতির হৃদয়ে একমেব 'নেতাজী'; নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

নেতাজী কোথায় আছেন, কেমন আছেন জানি না। এই না জানাটাই, এক এক সময় মনে হয়, শুভ। তিনি আমাদের

মধ্যে অমৃত-সমান। আমাদের আত্যন্তিক আত্মমোহে তাঁকে ভুলে থাকি হয়ত বা গোটা যুগ ধরে। তাঁর মহান দেশাত্মবোধ এবং জাতীয় ঐক্যচেতনা আমাদের ক্ষুদ্র মনে সমান অধিকার নিয়ে সব সময় সমাসীন থাকে না। তখন তাঁকে আমরা হারিয়ে বসি। কিন্তু তিনি আমাদের ত্যাগ করেন না। অন্তরের গভীর অন্তস্তলে তাঁর সতত অবস্থান। মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টিকে সংস্কার করলেই তাঁর উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কসম বীরত্বব্যঞ্জক দেহরেখা আমাদের সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়। বুঝতে পারি, বড় নিঃসহায় দিনে তাঁকেই প্রয়োজন। খন্ড-বিচ্ছিন্ন স্বার্থপর জাতির সামনে তাঁর আদর্শ সমুজ্জ্বল না থাকলে ঐক্য স্বাধীনতা মর্যাদাবোধ অটুট থাকে না। নেতাজী আমাদের সেই সব গভীরতম বেদনার মুহূর্তে অনন্য কান্ডারী।

২৩শে জানুয়ারী সেই মহান পুরুষের পুণ্য আবির্ভাব দিবস। ২৩শে জানুয়ারী ঐক্য স্বাধীনতা এবং জাতীয় মর্যাদা রক্ষার শপথ দিবস।

পবিত্র ২৩শে জানুয়ারী চিরজীবী হোক! মহান নেতাজী প্রতি ২৩শে জানুয়ারীর মধ্যাহ্নসূর্যের রেণুতে আবির্ভূত হন। জয়গান তাঁর জন্য। জয় আমাদের। এই সব বিশ্বাসেই আজও আমরা অনুব্জ। আমরা বলি, জয়তু নেতাজী; আর তারই মানে, জয় ভারতের; জয় নেতাজীর ঐক্যবন্ধ মর্যাদাসন্নত উন্নত-স্বাধীন ভারতবর্ষের।

নির্বাচনের হাওয়া

এ পর্যন্ত আমরা তিনটি নির্বাচনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। দেশের বাইরে শান্ত আবহাওয়ায় ভারতের মতো এক বিপুল জনসমষ্টি সম্বলিত বিরাট দেশের নির্বাচন অভিনন্দিত হয়েছে। আমরাও সেকথা বার বার উচ্চারণ করে আহ্লাদে আটখানা হয়েছি: কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনটি নির্বাচনের চেহারায় কি আমাদের রাজনৈতিক সচেতনা সপ্রমাণিত হয়েছে? কৈ আমরা তো নির্বাচনের মাধ্যমে সমাজ-জীবনে কোন রকম প্রগতিকে আবাহন করে আনতে পারি নি। অবশ্য তার জন্য নির্বাচনের প্রথা দায়ী নয়, দায়ী আমাদের অজ্ঞতা এবং অন্ধত্ব।

নির্বাচনে জাতির স্বার্থকে ছাপিয়ে গেছে আমাদের মনের মধ্যযুগীয় সঙ্কীর্ণতা। নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছে এ্যাডাল্ট ফ্রনচাইজ বা প্রাপ্তবয়স্কের ভোটদানের নামে আমাদের যুগ যুগ সঞ্চিত অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও সংস্কার। মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের পরামর্শে সংখ্যাধিক অশিক্ষিত মানুষকে পিঠ থাবড়ে বলা হয়েছে সরকার গঠন করতে। ফলত দল ব্যক্তি রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্বাচনে কোন নিষ্পত্তিমূলক (decisive) উপাদান (factor) রূপে সামনে এসে দাঁড়ায় নি। আমাদের অধি-কাংশকেই নির্বাচনে যা আকর্ষণ করেছে তা হল ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত রাজ্যগত কিম্বা গোষ্ঠিগত স্বার্থ। এজন্য প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় নির্বাচনে আমরা বাছাই করে অনেক ক্ষেত্রে তাঁদেরই হাতে ক্ষমতা এবং প্রতিনিধিত্বের টিকেট তুলে দিয়েছি, যাঁরা সঙ্কীর্ণ স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত।

লোকসভায় জনসঙ্ঘের মতো দল, স্বতন্ত্র পার্টির মতো দল শক্তিবৃদ্ধি করে গেছে। তৃতীয় নির্বাচন পর্যন্ত প্রথম দল তিন থেকে চোদ্দ, দ্বিতীয়টি বাইশটি আসনের অধিকার লাভ করেছে; যেখানে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক মতাদর্শ আছে এমন বেসরকারী দলের আসন সংখ্যা তৃতীয় নির্বাচনের পর উনত্রিশে এসে ঠেকেছিল।

বিধানসভায় অবিভক্ত কম্যুনিস্ট সংখ্যা ১০৬ থেকে তৃতীয় নির্বাচনে ১৯৭টি আসনের মালিক হয়েছিল। সেক্ষেত্রে বিধানসভাগুলিতে জনসঙ্ঘের মোট উন্নতি লক্ষণীয়ঃ ৩৫টি আসন থেকে ১১৬টি আসন। স্বতন্ত্র তৃতীয় নির্বাচনে লাভ করেছে ১৭০টি আসন।

ব্যক্তিস্বার্থবাদী প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং ধর্মান্ধতার পুরস্কার আমরা যেখানে এইভাবেই দিয়ে এসেছি, বলা বাহুল্য, সেখানে চেতনার অপমৃত্যু ঘটেছে একথা বললে বোধহয় অত্যুক্তি হয় না। কংগ্রেসের বিপক্ষেও জনসঙ্ঘ বা স্বতন্ত্রের আসর জাঁকানোর লক্ষণই দেখিয়ে দিচ্ছে এদেশের নির্বাচক ফিউডাল ক্যাপিটালিস্টদের কুক্ষিগত হওয়ার জন্য কেমনভাবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। দ্বিতীয় পরি-কল্পনাকালেই সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ কল্পনায় এনেছিল কংগ্রেস এবং পরি-কল্পনার আকারেও তারই জন্য অগ্রসর হওয়ার উদ্দেশ্যে পাদুকা উত্তোলন করে-ছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনা দ্বিতীয় নির্বাচনের কাল দ্বারা চিহ্নিত। তৃতীয় নির্বাচন কালেও জনগণের মনে পরি-কল্পনার আশা এবং সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার কল্পনা শিকেয় ওঠে নি। স্বয়ং নেহরুজী তখনও জীবিত। এবং তিনি জনগণের মাঝখানে এসে একথা বলছেন যে, সমাজ-বাদের লক্ষ্য থেকে আমাদের বিচ্যুতির কোন কারণ ঘটে নি; কিন্তু কংগ্রেসের ঘরে বাইরে সমাজবাদ বিরোধীশক্তি নিয়ত বাধার সৃষ্টি করছে। এমতাবস্থায়ও ভারতের নাগরিক প্রতিক্রিয়াশীল এবং ধর্মোন্মাদনার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। নির্বাচনের পালে প্রগতির হাওয়া বয় নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গুজরাট মাদ্রাজ মহারাষ্ট্রে ভাষা এবং আঞ্চলিকতার শ্লোগান এবং বিহারে জাতিবর্ণের প্রশ্ন রাজনৈতিক প্রশ্নকে ছাপিয়ে উঠেছে।

অর্থাৎ তিন তিনটি নির্বাচন রাজ-নৈতিক মতাদর্শকে তেমন করে হালে পানি দেয় নি। নির্বাচনী তরণীতে তাই এসে জায়গা করে নিয়েছে গণস্বার্থবাদী নয়, ক্ষুদ্র স্বার্থোপাসক দলবল। কংগ্রেসের সৌভাগ্য, তখনও নেহরুজী জনগণের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালে জনতা মন্ত্রশান্ত হয়েছে। কংগ্রেস বহুক্ষেত্রে নেহরু-ব্যক্তিত্বের দ্বারাই নির্বাচক আকর্ষণ করে নিয়ে গেছে।

আজ নেহরুজী নেই। তাঁর স্বপ্নও কংগ্রেসীকণ্ঠে কেবলমাত্র বুলির মতই বাজছে। আর পূর্ববর্তী নির্বাচনের পশ্চাদমুখী হাওয়া লক্ষ্য করেই বোধহয় কংগ্রেস নেহরু-স্বপ্নের শরিকদেরও ক্রমেই এবং সদম্ভে কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করছে এবং করেছে। শ্রী ভি কে কৃষ্ণমেননকে একবাক্যে সকলে নেহরু-প্রত্যয়ে একান্ত-বিশ্বাসী বলেই গণনা করেন। কংগ্রেসের কতিপয় নেতা তাঁকেই কম্যুনিস্ট বলে নির্দেশ করে নেহরু-স্বপ্নকেও যে সমান বৈরিতার সঙ্গে পরিহার করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন তা স্পষ্টত উপলব্ধি করা যাচ্ছে। কংগ্রেসী নেতৃত্বে এই ভোল বদলের মূলেও কি পূর্ববর্তী নির্বাচনের হাওয়া ক্রিয়া-শীল? নচেৎ যে নেহরুকে সামনে খাড়া না রাখতে পারলে দল হিসেবেও কংগ্রেস নিজেকে দুর্বল জ্ঞান করেছে, আজ নেহরু-সদৃশ নেতার অভাব সত্ত্বেও সেই কংগ্রেসী নেতাদের কণ্ঠে এতো দম্ভ এতো আস্ফালন এতো বিশ্বাস ধ্বনিত হতে শোনা যায় কী করে? অথচ কংগ্রেস আজ প্রত্যক্ষভাবে কোন্ পথে পা বাড়িয়েছে তাও তো অস্পষ্ট নয়। রাজারাজড়া এবং ধনী ব্যবসায়ীর জন্য মনোনয়নপত্রের হরিরলুঠ হয়েছে। এ সমস্ত কার ভরসায়। বিগত নির্বাচনে নির্বাচকদের মতিগতি লক্ষ্য করে কি?

বস্তুত, নির্বাচনের হাওয়া প্রগতিশীল প্রজাতন্ত্রের মাথায় লগুড়াঘাত করতেই উত্তরোত্তর আগ্রহী হয়েছে। আগামী নির্বাচনে স্বতন্ত্ররূপী দল সংখ্যায় বেড়েছে বই কমে নি। এমতাবস্থায় নির্বাচনের হাওয়া না ঘুরলে প্রজাতন্ত্রী ভারত যে স্বখাত সলিলে ডুবতে বসবে, নির্বাচনের প্রাক্কালে এই প্রশ্নই দুশ্চিন্তার ছায়ায় চিন্তাশীল নাগরিককে আচ্ছন্ন করছে।

একাধিক দল এবং ক্ষুদ্র স্বার্থ

ক্ষুদ্র স্বার্থই ভারতে বহু বিশিলষ্ট দলের এবং উপদলের জন্মদাতা। আঞ্চলিকতা ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী এবং ভাষা ও সামাজিক বৈসাদৃশ্যই ভারতবর্ষকে বহু

দলে বিভক্ত করেছে, এই মর্মে একটি সমীক্ষায় মন্তব্য করেছেন সংবাদ সংস্থা ইউ এন আই।

সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছেঃ ১৯৫২ সালে নির্বাচন কমিশন সর্বভারতীয় দল হিসেবে ১৪টি দলকে এবং রাজ্য-ওয়ারী স্থান হিসেবে ৫২টি দলকে স্বীকৃতি দেন।

১৯৬২ সালে পূর্ববর্তী নির্বাচনে তিন শতাংশ ভোট সংগ্রহের ভিত্তিতে কমিশন সর্বভারতীয় দল হিসেবে নয়টি এবং রাজ্যস্তরে সাতটি দলকে স্বীকৃতি দেন। এ ছাড়া লোকসভা বিধানসভার নির্বাচনী এলাকায় কিছু কিছু ভোট সংগ্রহের ভিত্তিতে আরও ১৮টি দল স্বীকৃতি লাভ করে।

এগুলির মধ্যে ২২টির অস্তিত্ব এক-একটি মাত্র রাজ্যেই সীমাবদ্ধ। তাদের মধ্যেও আবার মাত্র ছ'টি দলই আপনাপন রাজ্যে উল্লেখযোগ্য সমর্থক সৃষ্টিতে সক্ষম।

সর্বভারতীয় দল হিসেবে বর্তমানে যে ক'টি দলকে গণ্য করা যায়, তারা হলঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট পার্টি (দুই পক্ষ), এস এস পি, স্বতন্ত্র, জনসঙ্ঘ, পি এস পি।

পি এস পি-র অস্তিত্ব ক্রমেই অবলুপ্তির দিকে।

প্রসঙ্গত পশ্চিমবঙ্গের চিত্রটি কিছুটা টানা যেতে পারে, কারণ এই রাজ্যেই উল্লিখিত আঞ্চলিকতা, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা প্রভৃতি ক্ষুদ্র স্বার্থগুলি রাজনীতির প্রাঙ্গণে আসর জাঁকিয়ে বসার তেমন সুযোগ পায় নি।

বিগত নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন দলের স্থান ছিল এই রকমঃ কংগ্রেস ১৫৬, অবিভক্ত কম্যুনিস্ট ৫০, এফ বি ১৩, আর এস পি ৯, পি এস পি ৫, লোকসেবক সঙ্ঘ ৪, গোর্খা লীগ ২ এবং নির্দলীয় ১২।

এবারের নির্বাচনে কংগ্রেস এবং বিপরীতে দুই পক্ষ বিরোধী ফ্রন্ট। কংগ্রেস বিধানসভার ২৮০টি এবং সংসদের ৪০টি আসনেই প্রার্থী দিয়েছে। বাম কম্যুনিস্ট নেতৃত্বে গঠিত সংযুক্ত বাম ফ্রন্ট দিয়েছে বিধানসভায় ২০০টি এবং সংসদে ২৯টি প্রার্থী আর দক্ষিণ কম্যুনিস্ট বাংলা কংগ্রেস গঠিত পি ইউ এল এফ খাড়া করেছে বিধানসভায় ১৯২ এবং সংসদের জন্য ২৭ জন প্রার্থী।

অর্থাৎ মাত্র ৮০টি বিধানসভা এবং ১৩টি সংসদীয় আসনে দুই ফ্রন্ট পরস্পরের বিরুদ্ধতা করছে না।

ইউ এল এফ-এ আছেন, রাম কম্যুনিস্ট, এস এস পি, আর এস পি, মার্কসিস্ট ফরওয়ার্ড ব্লক, আর সি পি, এস ইউ সি, এবং ওয়ার্কার্স পার্টি। অর্থাৎ বাম কম্যুনিস্ট এবং এস এস পি ছাড়া সর্বভারতীয় মর্যাদা কারও নেই।

পি ইউ এল এফ-এ সর্বভারতীয় মর্যাদা আছে শুধু দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট দলের। এ ছাড়া অপর তৃতীয় বাম হলেন বাংলা কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং বলশেভিক পার্টি।

জনসঙ্ঘ স্বতন্ত্র দলগুলির মতো বা হিন্দু মহাসভা মুশ্লিম লীগের মতো দল পশ্চিমবঙ্গে পাত পায় নি।

অন্যান্য রাজ্যে সঙ্কীর্ণ স্বার্থকে শ্লোগান করে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন দল যাদের অস্তিত্ব অপর রাজ্যে নেই। মাদ্রাজে ডি এম কে, পাঞ্জাবে শিরোমণি আকালি দল, বিহারে ঝাড়খণ্ড পার্টি ও রাজস্থান মধ্যপ্রদেশে রামরাজ্য পরিষদ। মহারাষ্ট্রে কৃষক শ্রমিক দলের মতো এক রাজ্যে অস্তিত্বসম্পন্ন দল আছে। ফরওয়ার্ড ব্লকের অস্তিত্বও মাত্র দুটি রাজ্যেই সীমাবদ্ধ মাদ্রাজ ও পশ্চিমবঙ্গে। রিপাবলিকান পার্টি আছে মহারাষ্ট্র পাঞ্জাব ও ইউ পি-তে। মুশ্লিম লীগ টিকে আছে কেরালায়। আর এস পি-র অস্তিত্ব কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গে। হিন্দু মহাসভা সমর্থক এখনো আছে মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর প্রদেশে। আসামে এ পি এইচ এল সি পার্বত্য অঞ্চলের দাবিদার। এ ছাড়া রাজ্য সীমা নির্ধারণের প্রশ্নে গজিয়ে উঠেছে মহারাষ্ট্র একীকরণ সমিতির মত মরশুমি দল।

ওপরের এই সুবিস্তৃত তালিকা থেকেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষুদ্র স্বার্থই নির্বাচনে লড়তে নামে, প্রকৃত রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে নির্বাচন নিয়ন্ত্রিত হয় না।

বিরাট দেশের বিপুল গণভোটের দ্বারা আমরা এক বিস্ময়কর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করছি। এমন আত্মপ্রসাদ সুতরাং ভিত্তিহীন। আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার অভাবই আমাদের বহু ক্ষুদ্র স্বার্থের টানা-পোড়েনে পরিচালিত করছে, যার ফলে বিমূঢ় জনসাধারণ তার মনোমত সরকার নির্বাচনের সুযোগ যথারীতি পেয়েছে, পাচ্ছে এবং পাবে প্রকৃত অর্থে সে কথা বলা যায় না। এরই বিষময় ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের বারম্বার কায়েমী স্বার্থের হাতেই আত্মসমর্পণ করতে হচ্ছে। আর তা হবেও ততকাল, যতদিন না ক্ষুদ্র স্বার্থের ওপর সমগ্র জাতির স্বার্থ প্রতিষ্ঠা লাভ করছে।

গোয়া-দমন-দিউ কেন্দ্রীয় শাসন চায়

মহারাষ্ট্র বড়ই টানা-পোড়েন করছিল। গোয়ানিজদের এক বিরাট অংশও টান পেয়ে টাল খেয়েছিলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রে, না কি কেন্দ্রীয় শাসনে (?) এ প্রশ্নের মীমাংসার জন্য রেফারেণ্ডাম গৃহীত হলে দেখা গেল ৩৪ হাজারেরও বেশি ভোট পড়েছে মহারাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্তির বিপক্ষে। হাজার সাতেক ভোট বাতিল হয়েছে। গোয়া-দমন-দিউ-এর ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য সাড়ে চারশ বছর পর্তুগিজ শাসিত এই অঞ্চলত্রয়ে যে বিস্ময়কর সাড়া পড়ে গেছল, সাধারণ নির্বাচনে ভারত ভাগ্যবিধাতাগোষ্ঠী বাছাই-এর কালেও তেমন উৎসাহ কখনো দেখা যায় নি। তিন লাখ অষ্টআশি হাজার চারশ ভোটদাতার মধ্যে তিন লাখ সতের হাজার সাড়ে ছ'শ'র মতো ভোটই বাক্সে পড়েছে। অর্থাৎ 'পোল' হয়েছে প'চাশি শতাংশেরও অধিক। মানে, ঘরে কপাট দিয়ে কেউ আর বসে ছিলেন না। আবালবৃদ্ধবনিতা ভোটপত্র নিয়ে 'বুথে' এসে হাজির হয়েছিলেন প্রায় প্রত্যেকেই। অথর্ব এবং অসুস্থ যাঁরা পারেন নি, ঘরের মধ্যে নিশ্চয় তাঁরাও অধীর আগ্রহে রেফারেণ্ডামের ফলাফল শোনবার জন্য অপেক্ষায় মুহূর্ত গণনা করেছেন। ভারতে এ এক অভূতপূর্ব ঐতিহাসিক নির্বাচন। চেতনা কতদূর তীব্র হলে এ জিনিস সংঘটিত হয় তা সহজেই অনুমেয়।

মহারাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্তির পক্ষে যাঁরা ছিলেন, গণরায়ের পরে দেখা গেল সংযুক্তি বিরোধীদের অপেক্ষা গোয়ায় তাঁরা সংখ্যায় ৩৪ হাজারেরও কম।

ফলাফলে নেতৃবর্গ এমন কি গোয়াবাসীরা নিজেরাই চমৎকৃত হয়েছেন। নেতারা বলেছেন, এই অভূতপূর্ব গণরায়কে উপযুক্ত মর্যাদা সহকারে মেনে নেওয়া উচিত। কেউ কেউ বলেছেন, এই 'রায়' ঘোষণার দ্বারা গোয়াবাসী প্রমাণ করলেন যে তাঁরা স্বাধীনতাকামী শক্তিগুলিরই শরিক। আর সংযুক্তিবাদীরা যার-পর-নাই ঘা খেয়ে এখন বলছেন, গণরায় যাই হোক, নৈতিক জয় সংযুক্তিবাদীদের যথাযথ বজায় আছে।

গোয়াবাসীরা তাঁদের ইচ্ছাকে দৃঢ়ভাবে রূপায়িত করেছেন। এই ইচ্ছার প্রতি সুতরাং বিমুগ্ধ শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়। গোয়ার দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায়, জবরদস্তি কোন অঞ্চলকে একটি রাজনৈতিক-ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ করা কতবড় অন্যায়। জনগণের ইচ্ছাকে সেক্ষেত্রে প্রচণ্ডভাবে প্রহৃত করা হয় এবং তার ফল কখনোও সন্তোষজনক হতে পারে না। বহু স্বার্থের প্রশ্ন মামীংসায়, সুতরাং রেফারেণ্ডামের ব্যবহারই যে একমাত্র ন্যায়সঙ্গত এবং বিধেয় অতঃপর এই নজীর সেকথা বলিষ্ঠভাবে উত্থাপনের সুযোগ দেবে।

হায় সোয়েকার্নো!

ইন্দোনেশিয়া ঃ

সোয়েকার্নোর আন্তমকাল একেবারে ঘনিয়ে এসেছে, শুধু রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট হিসেবেই নয়, আয়ুও যদি অতর্কিত আক্রমণে নিঃশেষিত হয় তাতেও বিস্ময়ের বিশেষ কিছু থাকবে না। প্রেসিডেণ্ট সোয়েকার্নো এখন মারডেকা প্রাসাদে কার্যত বন্দী জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছেন, জাকার্তার উপকণ্ঠে তাঁর অগুন্তি প্রিয় বান্ধবীদের সঙ্গে মিলিত হবার উপায় নেই আর, এমন কি 'সারিনা' বিভাগীয় বিপণির চতুর 'সেলসগার্ল'দের সপ্রতিভ মুখগুলোও না। সেনাবাহিনী কড়া নজর রেখেছে প্রেসিডেণ্টের ওপর, - নির্দেশ রয়েছে তাঁর ওপর প্রাসাদ ছেড়ে কোথাও না যাবার। আর সৈন্যদের দৃষ্টি যদি এড়াতেও পারেন, হাজার হাজার ছাত্রের ঈগল-চোখ রয়েছে না? ওরাই তো প্রথম দাবি তুলেছিলো ইন্দোনেশীয় বিপ্লবের এই জনকটিকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে, '৬৫ সনের ব্যর্থ অভ্যুত্থানে তাঁর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে হবে।

সেনাবাহিনী সেদিন ছাত্র-বিক্ষোভ দমন করেছিলো, সোয়েকার্নোকে সত্যি কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় নি, ও'র পেছনে যে বিরাট জনসমর্থন রয়েছে তাকে উপেক্ষা করা যুক্তিযুক্ত মনে করে নি সেনাবাহিনী। কিন্তু এক বছরে অবস্থার গুরুতর পরিবর্তন ঘটেছে, সেনাবাহিনী, জেনারেল সুহার্তোর নেতৃত্বে নতুন সামরিক সরকার নিজেদের শক্তি অনেক সংহত করেছেন। ইতিমধ্যে সামরিক ট্রাইবুন্যাল প্রাক্তন পররাষ্ট্রসচিব- ডঃ সুবান্দ্রিয়োর প্রাণদণ্ডের বিধান দিয়েছেন, বিমানবাহিনীর প্রাক্তন অধ্যক্ষ ওমর দানীও মৃত্যুর দিন গুণছেন একই ব্যর্থ অভ্যুত্থান ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অপরাধে। সোয়েকার্নোর দুই প্রধান স্তম্ভকে ঘায়েল করার পর সেনাবাহিনী স্বভাবতই স্বয়ং কর্তার দিকে হাত বাড়াতে ইতস্তত করে নি। কিন্তু এটা সত্যি যে, প্রথমে প্রেসিডেণ্ট সোয়েকার্নোকে বলা হয়েছিলো যে তাঁকে গত ব্যর্থ অভ্যুত্থানের সময়ে তাঁর রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক পলিসী কি ছিলো তার ব্যাখ্যা করতে হবে যার জন্যে অভুত্থান ঘটতে পেরেছিলো দেশে। প্রেসিডেণ্ট সোয়েকার্নো একেবারে কাঁচা নন, দীর্ঘ ২২ বছর ধরে তিনি একনাগাড়ে দেশের অবিসম্বাদী নেতার আসনে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। চার-পৃষ্ঠাব্যাপী কৈফিয়তে তিনি জানালেন যে অভ্যুত্থানের দায়িত্ব তাঁর নয়; দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্যেও তিনি দায়ী নন। সামরিক সরকার, মনে হয়, এ-জবাবে খুশি হতে পারেন নি। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ আদম মালিক তাই প্রেসিডেণ্ট সোয়েকার্নোকে সরাসরি জানিয়ে দিলেন যে জাতির মর্যাদা রক্ষার খাতিরে তাঁর উচিত এখুনি গদী ছেড়ে দেওয়া। এ-উপদেশ যদি তিনি না মানেন তবে পরিণাম কী হবে তার ইঙ্গিত দিতে ভোলেন নি মালিক। একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীর পক্ষ থেকে সোয়েকার্নোর কাছে ওই প্রথম অনুরোধ গিয়েছিলো, কিন্তু শ্রীমালিকের হুমকীতেও আপোষের সুর ছিলো, ভবিষ্যতেও প্রেসিডেণ্টকে যাতে রক্ষা করা যায় তার আভাস তাতে ছিলো।

কিন্তু তারপরেই জেনারেল সুহার্তো সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছেন সজাগ থাকতে এবং প্রেসিডেণ্ট সোয়েকার্নোকে মারডেকা প্রাসাদ না ত্যাগ করতে। সোয়েকার্নো এখন কি করবেন? দুটো পথ আছে তাঁর সামনে। এক, জাপানে চলে যাওয়া যেখানে তাঁর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী তাঁদের সন্তান-আগমনের প্রতীক্ষা করছেন। আর, একবার যদি সোয়েকার্নো দেশ ত্যাগ করেন তাঁর ফেরা যে আর কখনই সম্ভব হবে না এ-ও তিনি বেশ ভালো করেই বুঝেছেন। দুই, দেশে থেকে সামরিক আদালতের সম্মুখীন হওয়া। আর তদন্ত কমিটি যখন একবার রায় দিয়েছেন যে ওই ব্যর্থ ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সোয়েকার্নোর জড়িত থাকার যথেষ্ট প্রমাণপত্র তাঁদের হাতে এসেছে, তখন তো তাঁর ভবিষ্যৎ সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে। হায় আত্মম্ভরিতা, মাত্র তিন বছর আগে যিনি চিরকালের প্রেসিডেণ্ট বলে নিজেকে জাহির করেছিলেন তাঁর আজ কী করুণ অবস্থা!

ভিয়েৎনাম ঃ

আমেরিকানদের অভিধানে কি 'শান্তি' বলে কোন শব্দ নেই? সন্দেহ জাগে ওদের রকমসকম দেখে। অথচ ভিয়েৎনামে শান্তি ফিরিয়ে আনার যে-সুযোগ এখন উপস্থিত এ-সুযোগ আবার কবে আসবে কিম্বা আদৌ আসবে কিনা বলা খুবই শক্ত। উপদেশ, পরামর্শ, নিন্দা, গালিগালাজ, অপমান-লাঞ্ছনা বা উপহাস আমেরিকার উদ্দেশে বর্ষিত হচ্ছে না এমন কোন বিশেষণই আজ আর বাকি নেই, কিন্তু তবুও গোঁয়াতুর্মি সে ছাড়তে চাইছে না, আপোষ-আলোচনার পথে আসছে না, গায়ের জোরে অবাধ্য ঘোড়াকে জল খাওয়ানোর জেদ তার!

সামনে ভিয়েৎনামীদের 'টেট' বা নববর্ষ আসছে, এ-উপলক্ষে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব এসেছে দু-পক্ষ থেকেই। কিন্তু ভিয়েৎকংরা যেখানে ৮ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারী সাত দিনের যুদ্ধবিরতিতে রাজী সেখানে মার্কিন কর্তৃপক্ষ বা দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সরকার চার দিনের বা দু'দিনের বেশি যুদ্ধ বন্ধ রাখতে রাজী নয়। অথচ প্রেসিডেন্ট জনসন এদিকে শান্তির জন্যে ব্যাকুল!

প্রেসিডেন্ট জনসনের ওপর চাপ কোন্ দিক থেকে না আসছে। সোভিয়েট য়ুনিয়ন কিম্বা হ্যানয়ের কথা বাদই দেওয়া গেলো, স্বদেশেও যে তাঁর ভিয়েৎনাম নীতিকে কঠোর সমালোচনার মুখোমুখি হতে হচ্ছে সে-কথাও বহুবার এখানে লেখা হয়েছে। সম্প্রতি ২২৩টি মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪,০০০ জন অধ্যাপক বিখ্যাত নিউ ইয়র্ক টাইমস-এ এক বিজ্ঞাপন মারফত প্রেসিডেন্ট জনসনকে বোমাবাজী

বন্ধ করার আবেদন জানিয়েছেন। আন্তর্জাতিক আইনের শত শত বিশেষজ্ঞ এ-অভিমত প্রকাশ করেছেন যে ভিয়েৎনামে মার্কিনী হস্তক্ষেপ সম্পূর্ণ বেআইনী।

এদিকে বার্ট্রান্ড রাসেলের 'আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধী ট্রাইবুন্যাল'-এর সদস্যেরা উত্তর ভিয়েৎনাম গিয়ে প্রাথমিক তদন্তের পর যে-রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে আমেরিকা ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে আগ্রাসন বা আক্রমণাত্মক যুদ্ধ চালাচ্ছে। জাপানের একটা তদন্ত কমিটিও উত্তর ভিয়েৎনামের কয়েকটি যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করে রায় দিয়েছেন যে, আমেরিকা উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানো এবং ইচ্ছে করে শান্তি ব্যাহত করার, মানবতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অপরাধে অপরাধী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নতুন নতুন মারণাস্ত্র ব্যবহার করে ব্যাপক ধ্বংস ও মানবতা-বিধ্বংসী কার্যকলাপে লিপ্ত বলেও জাপানী তদন্ত কমিটির রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে।

আর নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজিং এডিটর হ্যারিসন স্যালিসবারীর মারাত্মক বিবরণ তো রয়েছেই। নিউ ইয়র্ক ফিরে গিয়ে তিনি হ্যানয়ে দেখা তাঁর আরো বিবরণ দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, শক্তি প্রয়োগ করে বা ভয় দেখিয়ে উত্তর ভিয়েৎনামকে কাবু করা

এ অবস্থায় দশ বিলিয়ন ডলার থেকে কুড়ি-পঁচিশ বিলিয়ন ডলার যুদ্ধ বাজেট না বাড়িয়ে, শতকরা ছয় ভাগ সারচার্জ না বসিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র প্রসারিত না করে শান্তি আলোচনায় কেন বসছে না আমেরিকা, কেন বোমাবর্ষণ বন্ধ করছে না?

হ্যানয়ের ত্রিশ মাইলের মধ্যে বোমাবর্ষণ করার আগে হোয়াইট হাউসের অনুমতি নেবার কথা বলা হয়েছে মার্কিন পাইলটদের, কিন্তু আবার কি শিল্প এলাকাগুলিতে বোমাবর্ষণ সুরু হয়ে যায় নি? এভাবে চাপ দিয়ে কি শান্তি আদায় করা যাবে?

ওদিকে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রধানমন্ত্রী এয়ার মার্শাল কাও কী গিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ায়। কিন্তু সেখানে তাঁকে যে বিরূপ সম্বর্ধনা পেতে হয়েছে তার জন্যে তিনি কিম্বা অস্ট্রেলিয়ার সরকার প্রস্তুত ছিলেন? অস্ট্রেলিয়ার কিছু যুবক কাও কীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শোভাযাত্রা করেছে, বলেছে ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটরের পদস্পর্শে অস্ট্রেলিয়ার মাটি অপবিত্র হয়েছে।

চীন:

এখানকারঘটনা ও তার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা গত সপ্তাহে যা অনুমান ও আশংকা করেছিলাম স্বয়ং প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী এবং দু-নম্বর নেতা বলে বর্ণিত লিন পিয়াও শেষ পর্যন্ত তার সমর্থন করেছেন; তিনি স্বীকার করেছেন যে চীনে বাস্তবপক্ষে গৃহযুদ্ধ চলছে। এ গৃহযুদ্ধ ক'দিন চলবে, তার শেষ পরিণতিই বা কি, এ সম্পর্কে কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারছেন না, কারণ যে সংবাদ এখান থেকে বহির্জগতে পাঁচিল টপ্‌কে আসছে তা অত্যন্ত গোলমেলে, অনেক সময় পরস্পরবিরোধী, কাজেই বিভ্রান্তিকর।

চীনা ভাষার ওপর দখল থাকায় এখানকার জাপানী সাংবাদিকদের সংবাদ সংগ্রহে সুবিধে প্রচুর। তাই 'আসাহী সিংবুম' সংবাদপত্রটির সংবাদের জন্যে চেয়ে থাকেন আগ্রহী পাঠকেরা। পূর্ব ইয়োরোপের সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে চেক এজেন্সি 'চেটেকা'-র সংবাদগুলিরও মৌলিকত্ব রয়েছে কারণ পরে অন্যান্য এজেন্সি দ্বারাও তা সমর্থিত হয়। কিন্তু চীনের সর্বশেষ সংবাদ দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। তবে কি লিন পিয়াও-র পতনও আসন্ন? কারণ দু-জন সাকরেদ ইতিমধ্যে লালরক্ষীদের বিষ নজরে পড়েছেন; একজন হলেন সেনাবাহিনীর জন্যে সদ্যগঠিত সাংস্কৃতিক বিপ্লব কমিটির প্রধান শিয়াও হুয়া যিনি স্টেট কাউন্সিলেরও একজন সামনের সারির সদস্য; আর অন্যজন লিউ চেং-শেং সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক বিভাগের ডেপুটি চীফ। এঁদের ওপর লালরক্ষীবাহিনীর আক্রমণকে লিন পিয়াও-এর ওপরেই পরোক্ষ আঘাত বলে মনে করা হচ্ছে, এর পরে হয় তো লিন পিয়াও নিজেই তাঁর দুধ-কলা দিয়ে পোষা কালসাপের শিকার হবেন!

সাপকে বিশ্বাস করে কে? তার সংশোধনাতীত চরিত্রের জন্যেই তো বেদেরা আগে তার বিষদাঁত ভেঙে তবে চুবড়িতে পোরে। বিশ্বাস যদি করতে পারতেন তবে কেন দুই শ্রদ্ধেয় নেতা আত্মহত্যার মধ্যে মুক্তির সন্ধান করবেন? ভাইস প্রিমিয়ার বা অন্যতম উপপ্রধানমন্ত্রী পো ই-পো এবং সেনাবাহিনীর প্রাক্তন অধ্যক্ষ জেনারেল লো জুই-চিং নাকি আত্মহত্যা করেছেন লালরক্ষীদের হাতে লাঞ্ছনা ও অপমানের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী তেং শিয়াও-পিং এবং পিপলস সুপ্রীম কোর্টের প্রেসিডেন্ট ইয়াং শিউ-ফেং-ও নাকি আত্মহননের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে তাঁদের প্রচেষ্টা।

এদিকে রাষ্ট্রপ্রধান লিউ শাও-চি'র নেতৃত্বে মাও-বিরোধীরা জোর প্রতিরোধ করছে। মাও-পন্থীদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ এখন আর কোন শহরে সীমাবদ্ধ নেই, বিভিন্ন প্রদেশ রাজধানী, শহর উপকণ্ঠে, মিল-কারখানায় তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। শক্তিতে মাও-পন্থীরা বলবান সন্দেহ নেই, সেনাবাহিনী রয়েছে মাও-র পেছনে যদিও সেনাবাহিনীতেও মাও-বিরোধীর সংখ্যা নগণ্য নয় নেহাৎ। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপকভাবে ধরপাকড়ও চলছে, লিউ শাও-চি'র এক ছেলে নাকি বন্দী বর্তমানে, অথচ এ ছেলেটি পিতৃ-বিরোধী এবং মাও-পন্থীই ছিলেন। কিন্তু তার মাথায় যে আবার রুশ শিক্ষা রয়েছে, সোভিয়েট রাশিয়ায় শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তিনি. এখনো কিছু বন্ধু সে দেশে তাঁর রয়েছে। কাজেই অপরাধের বোঝা কি তাঁর কম ভারী।

তবে মাও-পত্নী মাদাম চিংয়ের অসীম দয়া বলতে হবে। 'চেটেকা'র খবরে জানা গিয়েছে যে মাদাম চিং পররাষ্ট্রমন্ত্রী চেন-ঈ'কে জোর একখানা সার্টিফিকেট দিয়েছেন ভালো লোক বলে। চেন-ঈ'র বিরুদ্ধে লালরক্ষীরা আক্রমণ সুরু করেছিলো এবং তাঁর গদীত্যাগের দাবি তুলেছিলো। কিন্তু সম্প্রতি মাদাম চিং না কি বলেছেন যে চেন-ঈ আসলে সৎ ও সরল প্রকৃতির লোক, কেবল অত্যুৎসাহিতার ঝোঁকে মাও-বাদকে কার্যকর করতে গিয়ে মাঝে মাঝে বাড়াবাড়ি করে ফেলেন। মাদাম চিং চেন-ঈ সম্পর্কে একথাও বলেছেন যে তিনি দোষ স্বীকার করতে কোনরকম ইতস্তত করেন না, সোজাসুজি প্রকৃতির লোক তিনি, মুখে এক মনে আর —এ ধরণের দু'মুখো নীতি তাঁর নেই। বর্তমানে তিনি দীর্ঘ আত্মসমালোচনা রচনায় নাকি ব্যস্ত রয়েছেন।

চেন-ঈ ছাড়াও মাদাম চিং আভ্যন্তর-মন্ত্রী শি ফু-চিহ্, কৃষি ও বনবিভাগ মন্ত্রী তান চেন-লিন এবং রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী লি ফু-চুনকেও ক্ষমার চোখে দেখে বলেছেন যে এঁরা সৎ এবং এঁদের নীতি-বোধ রয়েছে, আগে ভুল করলেও এখন তাঁরা মাও-ভক্ত। এখনো পর্যন্ত মাও-ভক্তদেরই অবশ্যি জয়লাভ ঘটছে, তারা গুরুত্বপূর্ণ রেডিও স্টেশন, সংবাদপত্র অফিস এবং কারখানাগুলি নিজেদের কবজায় এনে ফেলছে বিদ্যুৎগতিতে। গৃহযুদ্ধ চলছে এটা ঠিকই, কিন্তু লিন-চিং যুদ্ধও কি আসন্ন? মাদাম চিংয়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষা কিন্তু আকাশ-ছোঁয়া, দীর্ঘ তিরিশ বছর মাও সে-তুং-এর অন্তঃপুরে অসূর্যম্পশ্যার জীবনযাপন করার পর তিনি কি আজ স্বামীর আসনটিই দখল করতে চাইছেন? ক্ষমতার লড়াই কি তবে শেষ হবে মাদাম চিংয়ের অভিষেকের মধ্য দিয়ে? তা যদি হয়, তবে তাকে শেষ না বলে লড়াইয়ের নতুন ধাপের সুরু বলাই ভালো।

ভবিষ্যদ্বক্তা মানবেন্দ্রনাথ ও বর্তমান ভারত

ডঃ নরেন ভট্টাচার্য

অনেককেই আজ বলতে শুনি, যদি এম. এন. রায় এ যুগে বেঁচে থাকতেন দেশের এই নিদারুণ সঙ্কটজনক মুহূর্তে দেশবাসীকে সঠিক পথটি দেখিয়ে দিতে একমাত্র তিনিই পারতেন। দূরদৃষ্টি, চিন্তাশীলতা ও প্রজ্ঞার দিক থেকে তাঁর সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মত কোন নেতা ভারতবর্ষে জন্মান নি, ভবিষ্যতেও জন্মাবেন কি না সন্দেহ। গান্ধীজী ও নেহরুজী অত্যন্ত হৃদয়বান মানুষ ছিলেন সন্দেহ নেই, ভারতবাসীর মানসরাজ্যে তাঁদের প্রভাব অপ্রতিহত, কিন্তু যে অভিজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টি থাকলে অনাগত ভবিষ্যৎকে বর্তমানের মত করে দেখা যায় সেই অভিজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টির একান্ত অভাব তাঁদের ছিল।

মানবেন্দ্রনাথ রায় বেশিদিন মারা যান নি, ১৯৫৪ সালের ২৫শে জানুয়ারী তিনি প্রায় নিঃশব্দেই ইহলোকের মায়া কাটিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশব্যাপী শোকের ছায়া নেমে আসে নি, কেন না জনসাধারণের হৃদয়ে তিনি কোনদিনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন নি। মানবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা খুব কম লোকেরই আছে। তার কারণ বহুবিধ। প্রথমত, সার্বিকভাবে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার, এবং বিশেষভাবে হিন্দুসমাজের নানাবিধ অনাচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়িয়েছিলেন মূর্তিমান কালাপাহাড়ের মত। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন নাস্তিক, জাতিভেদ প্রথা, নারীর পরাধীনতা কোন কিছুই স্বীকার করতেন না এবং তাঁর জীবনধারাও ছিল সনাতন ভারতীয় জীবনধারার ব্যতিক্রম। দ্বিতীয়ত, কায়েমী স্বার্থ ও ধনিক শ্রেণীর তিনি ছিলেন আজন্ম শত্রু, কাজেই যে মহলের দাক্ষিণ্যের দৌলতে উচ্চে আরোহণ করা যায় তিনি সে পথ কোনদিনই মাড়ান নি। কংগ্রেসী নেতাদের তিনি ছিলেন দুশ্চিন্তা ও অশান্তির কারণ, গান্ধীজীর মধ্যযুগীয় ভাবধারাসমূহকে তিনি তীব্রতম ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন, অপর নেতাদের তিনি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতেন না। তৃতীয়ত, বামপন্থীদের সংগেও তাঁর বনতো না। এ দেশের বামপন্থী নেতাদের চিন্তার দৈন্য ও বাস্তবজ্ঞানের অভাব তথা সংকীর্ণ দলীয় মনোবৃত্তির সংগে আপোষ করার মত লোক তিনি ছিলেন না। চতুর্থত, মানবেন্দ্রনাথের রাজনীতি ছিল আগাগোড়াই বুদ্ধি-কেন্দ্রিক যা ভারতের ভাবাবেগসর্বস্ব রাজনীতির সংগে খাপ খায় নি। তিনি বরাবরই স্রোতের উল্টোদিকে সাঁতার কেটেছেন, কাজেই জনপ্রিয়তা তাঁর জোটে নি। সেজন্য অবশ্য তাঁর কোন আফশোষ ছিল না।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

একজন সাধারণ বিপ্লবীর মতই অস্ত্রের সন্ধানে মানবেন্দ্রনাথ বিদেশে যাত্রা করেছিলেন। তখন তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেই তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্র বেছে নিয়েছিলেন। তারপর ঘটনাচক্র তাকে নিয়ে গেল আমেরিকায়। সেখানে মানবেন্দ্রনাথ উপলব্ধি করলেন যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতিরেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। বলা বাহুল্য তিনি তখন হয়ে উঠলেন কমিউনিস্ট, মার্ক্সের ভাবধারায় দীক্ষিত। জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীর রূপান্তর ঘটল কমিউনিস্টে। এই অবস্থায় তিনি গেলেন মেক্সিকোয়। সেইখানেই তিনি রাশিয়ার বাইরে জগতের মধ্যে প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করলেন। এই সংবাদ পেয়ে লেনিন বোরোডিন নামক একজন দূতের মাধ্যমে তাঁকে রাশিয়ায় ডেকে পাঠালেন

মানবেন্দ্রনাথ রায়

রাশিয়ায় এসে মানবেন্দ্রনাথের জীবন-ধারা অন্য খাতে প্রবাহিত হল। এই ভারতীয় যুবকটির মার্ক্সবাদে পাণ্ডিত্য ও সংগঠন শক্তি দেখে লেনিন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেন এবং লেনিনের বিখ্যাত উপনিবেশ সংক্রান্ত নীতির বিরোধিতা করে নিজের বিকল্প মতবাদ পেশ করে তিনি রুশ কমিউনিস্ট নেতৃ মহলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হলেন। তিনি কমিউনিস্ট ইনটারন্যাশানালের প্রেসি-ডিয়াম ও সেক্রেটারীয়েটের সদস্য নির্বাচিত হলেন এবং ওই সংস্থার পূর্ব বিভাগীয় দপ্তরের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত হলেন। ওই পদে থাকাকালীন তিনি পূর্ব ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি পরিভ্রমণ করেন এবং রাশিয়ার বাইরের কয়েকটি স্থানে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। মস্কোর ইউনিভার্সিটি অফ দি টয়লার্স অফ দি ইস্ট-এর তিনি ছিলেন ডিরেক্টর। এখানে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে আগত যুবক-দের কমিউনিজমে দীক্ষিত করা হত। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে উত্তর ভিয়েত-নামের বর্তমান প্রেসিডেণ্ট হো-চি-মিন তাঁর অধীনে একদা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলেন। রাশিয়ায় তাঁর শত্রুর সংখ্যাও কম ছিল না। এক শ্রেণীর জাতীয়তাবাদী ভারতীয় বিপ্লবী তখন ইউরোপের নানা স্থানে ছড়িয়ে ছিলেন, এ'দের মধ্যে কেউ কেউ মানবেন্দ্রনাথের প্রতিপত্তি সহ্য করতে না পেরে স্বদেশে ও বিদেশে তাঁর নামে অনেক কুৎসা রটনা করেছিলেন, তাতে অবশ্য মানবেন্দ্রনাথের কোন ক্ষতি হয় নি।

১৯২৬-২৭ সালের চীন বিপ্লবে নির্দেশদানের জন্য তিনি কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশানাল কর্তৃক চীনে প্রেরিত হয়ে-ছিলেন। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন নেতাদের দূরদৃষ্টিহীন ভ্রান্ত কার্যকলাপের জন্যই সেই বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছিল এবং তারই ফলে চিয়াং কাইশেকের ক্ষমতালাভের পথ সুগম হয়ে গেছল। মানবেন্দ্রনাথ যখন চীনে প্রেরিত হয়ে-ছিলেন তখন সুবিধাবাদ বিপ্লবী শক্তিগুলিকে গ্রাস করেছিল এবং সমগ্র বিষয়টই একটি নীতিভ্রষ্টতার শিকার হয়েছিল। মানবেন্দ্রনাথ যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন বিপ্লবের নেতাদের উন্মাদ-সুলভ কার্যকলাপের হাত থেকে বিপ্লবকে রক্ষা করার জন্য। মস্কোয় ফিরে গিয়ে মানবেন্দ্রনাথ কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশানালে চীনা কমিউনিস্টদের ভ্রান্ত নীতি ও দায়িত্বজ্ঞানহীন কার্যকলাপের একটি তথ্য-সম্বলিত রিপোর্ট পেশ করেন যা পরবর্তীকালে মস্কো থেকে ফিটাইয়াস্কায়া রিভোলিউৎসিয়া নামে প্রকাশিত হয়।

তার মস্কোয় ফেরার পর কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশানালের প্রেসিডিয়াম ও কমিউ-নিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর যুগ্ম অধিবেশনে গৃহীত একটি প্রস্তাবে চীনে মানবেন্দ্রনাথের কার্যাবলী সমর্থিত ও উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল, এবং সেই প্রস্তাবের রচয়িতা ছিলেন স্ট্যালিন।

কিন্তু মানবেন্দ্রনাথের সৌভাগ্যরবি রাশিয়ার আকাশে চিরকালই এক জায়গায় থাকে নি, নানান কারণে তা পশ্চিম দিগন্তে ঢলতে শুরু করেছিল। কমিউ-নিস্ট ইণ্টারন্যাশানালের জার্মান নীতি নিয়ে স্ট্যালিনের সংগে তাঁর বিরোধ উগ্র আকারে দেখা দেয় যার পরিণামে তিনি কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশানাল থেকে বিতা-ড়িত হন। পরে যখন জার্মানী হিটলারের হাতে গিয়ে পড়ে তখন কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশানাল তার ভুল ও মানবেন্দ্র-নাথের দূরদৃষ্টি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল যদিও মানবেন্দ্রনাথকে আর আহ্বান করা হয় নি। মানবেন্দ্রনাথ অতঃপর দু' বছর জার্মানীতে কাটান এবং সেখান থেকে ডাঃ মামুদ নাম নিয়ে ভারতে ফিরে আসেন। এখানে কিছুকাল আত্মগোপন করে থাকবার পর তিনি ধরা পড়েন এবং রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁর ছয় বছর কারাদণ্ড হয়ে যায়।

মানবেন্দ্রনাথ ও ভারত

ভারতের স্বাধীনতার উদ্দেশ্যেই মানবেন্দ্রনাথ একদিন দেশান্তরে পাড়ি দিয়েছিলেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সম্বন্ধে মানবেন্দ্রনাথের ধারণা কোনদিনই খুব ভাল ছিল না। তিনি কংগ্রেসকে ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য করতে নারাজ ছিলেন কেন না তাঁর মতে কংগ্রেস ধনী ও উচ্চমধ্যবিত্তদের প্রতিষ্ঠান, কৃষক শ্রমিক ও অপরাপর মেহনতী মানুষের সংগে সম্পর্কশূন্য। কিন্তু এই প্রসংগে লেনিনের ধারণা ছিল ভিন্নরূপ, সাম্রাজ্যবাদীদের উপনিবেশ সমূহে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলির প্রগতিশীল ভূমিকা লেনিন অস্বীকার করেন নি। এই মতদ্বৈধতার ফলে ভারত সম্বন্ধে কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশানাল কোন সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম অনুসরণ করতে পারে নি।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা মানবেন্দ্রনাথ করেছিলেন তাসখন্ডে, খিলাফত ফেরত কয়েকজনকে নিয়ে যাঁরা ভারতে ফিরে এসে কয়েকজনকে দীক্ষিত করেন যাঁদের মধ্যে আজও কেউ কেউ বেঁচে আছেন। উত্তরকালে মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেছল, রাশিয়ার সংগে তাঁর সম্পর্কচ্যুতির পর। আজকের অনেক প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতাই এককালে তাঁর অনুগামী ছিলেন।

ছয় বছর কারাদণ্ডের পর মুক্তিলাভ করে মানবেন্দ্রনাথ তাঁর অনেক বিপ্লবী অনুচরসহ কংগ্রেসে যোগদান করে-ছিলেন এই আশায় যে কংগ্রেসকে তিনি একটি বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করতে পারবেন। কিন্তু গান্ধীবাদী নেতৃত্বের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রতিক্রিয়া-শীলতারই জয় হয়েছিল, কাজেই মানবেন্দ্র-নাথের স্বপ্ন সফল হয় নি। কয়েক বছর পরে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হলে, কংগ্রেসের যে প্রখ্যাত কয়েকজন নেতা যখন তাঁর ওয়ার্কিং কমিটিতে থাকতে রাজী হলেন না, তখন মানবেন্দ্র-নাথ তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন যে তিনি যেন বামপন্থী মনোভাবসম্পন্ন নেতাদের নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করেন। তাঁর সেই অনুরোধ সেদিন রক্ষিত হয় নি। যদি হত, আমার অনুমান, কংগ্রেস থেকে দক্ষিণপন্থী উপাদানগুলি তখনই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত, এবং পরবর্তীকালের ইতিহাস হয়ত অন্যরূপ ধারণ করত।

কিন্তু কংগ্রেসের সংগে মানবেন্দ্র-নাথের সম্পর্ক চূড়ান্তভাবে ছিন্ন হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে কংগ্রেসের কি ভূমিকা হওয়া উচিত তা নিয়ে মতপার্থক্যের জন্য। বস্তুত আসন্ন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরি-প্রেক্ষিতে মানবেন্দ্রনাথ স্পষ্টই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে এই যুদ্ধের অন্তেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে, অবশ্য যদি ইংরাজ তথা মিত্রপক্ষ যুদ্ধে জয়লাভ করে। কিন্তু তদানীন্তন কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ যুদ্ধের দ্বারা ভারতবর্ষের কি সুবিধা হবে সেটা উপলব্ধি করতে পারেন নি। ১৯৩৫ সালেই মানবেন্দ্রনাথ দেখে-ছিলেন যে ভারতের স্বাধীনতা লাভের সমস্ত লক্ষণগুলিই প্রকাশিত হয়েছে। সেই বছরেই তিনি বার করেছিলেন তাঁর পত্রিকা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া, যখন ভারতের স্বাধীনতা আর সকলের কাছে স্বপ্নমাত্রই ছিল।

যুদ্ধ শুরু হলে কংগ্রেস যে নীতি অবলম্বন করেছিল তার মূল কথা হচ্ছে, গান্ধীজীর ভাষায়, এক পাই ভি নেই, এক ভাই ভি নেই। অর্থাৎ কোনরকমেই ইংরাজকে সাহায্য করা হবে না, যেখানে মানবেন্দ্রনাথ কর্তৃক ইতিমধ্যেই গঠিত র‍্যাডিকাল ডেমোক্রাটিক পার্টি সর্বতো-ভাবে ইংরাজকে এই যুদ্ধে সাহায্য করেছিল। এতে মানবেন্দ্রনাথের জন-প্রিয়তা অত্যন্ত কমে গেছল, সারা দেশ তাঁর নিন্দাবাদে ভরে উঠেছিল, কিন্তু তার জন্য তিনি মনোবল হারান নি।

যুদ্ধ চলাকালীন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়ার

প্রতিটি সংখ্যায় থাকত যুদ্ধের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে মানবেন্দ্রনাথের নিজস্ব রচনা যা রাজনীতি ও সমরবিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই রচনাবলীর প্রতি তৎকালীন সুধিবৃন্দের দৃষ্টি বড় বেশি আকৃষ্ট হয় নি। আজ যদি কোন কৌতূহলী পাঠক সেগুলি পড়ে দেখেন তাহলে তিনি মানবেন্দ্রনাথের আশ্চর্য প্রতিভা ও দূরদর্শিতার নিদর্শন দেখে অবাক হয়ে যাবেন। এ প্রসঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের সর্বশেষ কথা ছিল এই যে যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত মিত্রপক্ষ জয়লাভ করবে ও যুদ্ধান্তে নির্বাচনে ইংলন্ডের লেবার পার্টি জয়ী হবে এবং তার অর্থই হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা লাভ। কংগ্রেস অবশ্য শেষ পর্যন্ত তার 'অ্যান্টি-ওয়ার' নীতি পরিত্যাগ করে। অর্থাৎ অবশেষে কংগ্রেসকে মানবেন্দ্রনাথের লাইনে আসতে হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম না করতে পারার দরুণ এই যুদ্ধকে ভারতের স্বার্থে ঠিকমত কাজে লাগানো সম্ভবপর হয় নি। মানবেন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল এই যুদ্ধ এমন একটা সুযোগ এনে দিয়েছে যাতে ভারতকে রাতারাতি শিল্পায়িত করা সম্ভব হবে। বস্তুত ভারতের মত কৃষি-প্রধান দরিদ্র দেশের পক্ষে শিল্পায়নের এ এক আশ্চর্য সুযোগ ছিল, যেদিকে তৎকালীন নেতৃবর্গের দৃষ্টি মোটেই আকৃষ্ট হয় নি।

... পরিকল্পনা

... ধীন ভারত ... ও যুদ্ধোত্তর ... রিকল্পনা পেশ ... রেন। সেই পরি- ... তিনি ভারতের জন্য ... যোগ্য একটি দশম- ... ক পরিকল্পনা প্রস্তুত ক ... স প্লান' নামে বিখ্যাত। ১৯৪৫ ... এপ্রিলে এই পরিকল্পনা প্রকাশিত ... র পর মাত্র তিনমাসের মধ্যেই সমস্ত কপিগুলি বিক্রি হয়ে যায়, এবং বিভিন্ন মহল থেকেই এই পরিকল্পনাটিকে স্বাগত জানানো হয়। এমন কি বৃটেনের বিখ্যাত সংবাদপত্রসমূহ এই পরিকল্পনাটিকে বিশেষভাবে অনুমোদন করেন এবং তৎকালীন ভারতের সেক্রেটারী অফ স্টেট, এল-এস আমেরি হাউস অব কমন্স-এ ভারত সম্পর্কিত বিতর্কের সময় এই প্লানটিকে পাঠিয়ে দেন। অবশ্য স্বাধীন ভারতের পরিকল্পনা কমিশন এই পিপলস প্লানকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনেন নি, যদিও জওহরলাল নেহরু এই প্লানটির জন্য মুখে খুব উৎসাহ দেখিয়েছিলেন।

পিপলস প্লানে একটি বস্তুর উপরেই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপিত করা হয়েছিল। সেটি হচ্ছে ভারতের দারিদ্র্যের সমস্যা। এতে বলা হয়েছিল যে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির দ্বারা ভারতের দারিদ্র্যের সমস্যা সমাধান করা যায় না, কেন না ধনতন্ত্রে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার দ্বারাই উৎপাদনের পরিমাণ সীমাবদ্ধ থাকে। এই ব্যবস্থায় কেবলমাত্র ততটুকু পরিমাণ পণ্যই উৎপন্ন হয় যা লাভজনক মূল্যে বিক্রি হতে পারে। এই ব্যবস্থায় মূলধনের সৃষ্টিও সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য এবং ভারতবাসীর দারিদ্র্যের পরিপ্রেক্ষিতে এখানে অতি উৎপাদনের সমস্যা সৃষ্টি না করে উৎপাদন বাড়ানো অসম্ভব। এই কারণেই পিপলস প্লানে প্রয়োজন-ভিত্তিক উৎপাদনের সুপারিশ করা হয়েছিল, জীবনযাত্রার মৌল চাহিদাগুলির প্রকৃত অনুধাবন এবং সেগুলির সঙ্গে উৎপাদনের সমতাবিধান তথা সুসম বন্টন, এইগুলিই ছিল পিপলস প্লানের মূল উদ্দেশ্য। খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা এই পাঁচটি জীবনযাত্রার মৌল দাবিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল।

পিপলস প্লানে পরিকল্পনার জন্য বৈদেশিক ঋণগ্রহণ বা মুদ্রাস্ফীতি ঘটানোর পদ্ধতিকে বিপজ্জনক আখ্যা দেওয়া হয়েছিল (আজকের যুগে যা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করা হচ্ছে) এবং মূলধন সংগ্রহের জন্য একটি অভিনব নীতি অবলম্বিত হয়েছিল। আমাদের পরিকল্পনা কমিশন যদি এই নীতিটি অবলম্বন করতেন তাহলে বিদেশের কাছে হাত পাতার কোন প্রয়োজনই দেখা দিত না। এই দশম-বার্ষিক পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দ করার প্রস্তাব করা হয়েছিল ১৫,০০০ কোটি টাকা। কিন্তু এই টাকাটা আসত কোথা থেকে? এখানে মানবেন্দ্রনাথ 'রি-ইনভেস্টমেন্ট' পদ্ধতির সুপারিশ করেছিলেন। সমগ্র পরিকল্পনাটি কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছিল, একটি পর্যায়ের দ্বারা সৃষ্ট মূলধন পরবর্তী পর্যায়ে লগ্নীকৃত হবে এইভাবে স্তরে স্তরে পরিকল্পনার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মূলধন যোগানের ক্ষেত্রও পরিবর্ধিত হতে হতে সামগ্রিক বরাদ্দের মূল লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত হিসাব-নিকাশ পিপলস প্লান গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ৩৩ থেকে ৪২ পাতার মধ্যে দেওয়া আছে, কৌতূহলী পাঠক দেখে নিতে পারেন।

পিপলস প্লানে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়েছিল কৃষির উপর, যার উপর গুরুত্ব আরোপ করার প্রয়োজনীয়তা আমরা চতুর্থ প্লানের প্রাক্কালে নতুন করে উপলব্ধি করছি। সেখানে বলা হয়েছিল যে, যে দেশের শতকরা সত্তর ভাগ লোক কৃষিজীবী সেখানে যতই উচ্চাকাঙ্ক্ষা শিল্পকেন্দ্রিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হোক না কেন দারিদ্র্যের সমস্যার কোন সমাধানই হবে না। কৃষিক্ষেত্রে বর্তমানে যে পরিমাণ লোক নিযুক্ত আছে, কৃষি-ব্যবস্থা আধুনিক ও যান্ত্রিক হলে তার মাত্র দশ ভাগের এক ভাগ লোক দিয়েই কাজ চলবে, তাহলে বাকি ষাট ভাগ লোককে কৃষি থেকে শিল্পের ক্ষেত্রে নিয়ে আসতে হবে, তার উপর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সমস্যা আছে। যতই কলকারখানা বাড়াও না কেন একশো বছরেও তা হবে না, অধিকন্তু দ্রুত শিল্পায়নের তাগিদে বর্ধিত মূল্যে মূলধনের প্রয়োজনে আভ্যন্তরীণ চলতি স্থিতিশীল মূল্যান্তরকে মুদ্রাস্ফীতির দ্বারা বিপর্যস্ত করে এবং বিদেশের কাছে টিকি পর্যন্ত বাঁধা দিয়ে শেষ পর্যন্ত দেখবে যে পেটের ভাতটুকু জুটছে না। মানবেন্দ্রনাথ কথিত এ সত্য যেন মর্মান্তিক অভিশাপের মতই আমাদের জীবনে সত্য হয়েছে।

"ইউ কান্ট বিলড এ হাউস বিগিনিং টু বিলড ইট ফ্রম দি রুফ"—এই সাবধান-বাণী মানবেন্দ্রনাথ উচ্চারণ করেছিলেন বহুদিন আগে পরিকল্পনা কমিশনকে উদ্দেশ্য করে। মানবেন্দ্রনাথ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার অনন্ত সুযোগ দেখেছিলেন। এই বিশাল দেশ ও তার উর্বর জমিকে ঠিকমত আবাদ করলে যে সোনা ফলতে পারে, এবং আঞ্চলিক, এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের দাবি করা এবং ব্যাপক জলসেচের সুযোগ করে দেওয়া। তাহলেই আমরা আমাদের বাড়তি ফসল বিদেশে বিক্রি করে সেই লাভের টাকায় শিল্প গড়ে তুলতাম। তাহলেই পরনির্ভরশীলতার হাত থেকে চিরতরে মুক্ত হয়ে প্রকৃত স্বাধীনতাকে উপলব্ধি করার সুযোগ ঘটত।

মানবেন্দ্রনাথ ও ভারতের সংবিধান

১৯৪৪ সালেই মানবেন্দ্রনাথ ভারতের সংবিধানের একটি খসড়া প্রস্তুত করেন এবং পরবর্তীকালে সাংবিধানিক পরিষদের সদস্যবৃন্দের মধ্যে এই খসড়া সংবিধান বিতরিত হয়। বলা বাহুল্য মানবেন্দ্রনাথ রচিত এই সংবিধান, সংবিধান প্রণেতাদের নিকট বিশেষ সমাদর পায় নি। তদুপরি এখানে মানবেন্দ্রনাথ একটি মোক্ষম জায়গায় আঘাত করেছিলেন, ভারতের সাংবিধানিক পরিষদের সদস্যবৃন্দ সার্বজনীন ভোটের

দ্বারা নির্বাচিত হন নি। মানবেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত এই খসড়ায় ভারতের সংবিধান রচনার সমস্যাগুলিই বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে, এবং প্রথমেই প্রশ্ন তোলা হয়েছে বৃটিশ সরকার কাদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরিত করবে, এবং কিভাবে সেই হস্তান্তর সম্ভব হবে। ওই খসড়ায় ভারতবর্ষের জন্য অবিমিশ্র ফেডারেল ধরণের শাসনব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়েছে, কেন না তিনি মনে করতেন যে ভারতের মত বিরাট দেশে বিভিন্ন ধরণের আঞ্চলিক, এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের দাবি ক্রমশ সোচ্চার হয়ে উঠবে, এবং কার্যত এখন তাই ঘটছে। যাতে রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর জনসাধারণের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকে সেদিকে তাঁর সংবিধানের খসড়ায় তিনি বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়েছিলেন, কেন না তাঁর মতে রাষ্ট্র হচ্ছে 'পলিটিকাল অর্গানাইজেশন অফ সোসাইটি' সমাজের রাজনৈতিক সংগঠন এবং সেই অর্থে রাষ্ট্রের হওয়া উচিত জনসাধারণের সমগ্রতার প্রতিমূর্তি, কোন দ্বিতীয় সত্তা নয়। এই সংবিধানে তিনি শুধু জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকারের উপরেই গুরুত্ব আরোপ করেন নি, অর্থনৈতিক অধিকারসমূহের প্রতিও সমান গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি লিখেছিলেন "পলিটিকাল ফ্রীডম ইজ নো মোর পসিবল ইন দি অ্যাবসেন্স অফ ইকনমিক ফ্রীডম দ্যান দি ম্যাটার ইন অ্যাবসেন্স অফ দি ফর্মার।"

সাপ্তাহিক বসুমতীর

গ্রাহক হবার নিয়মাবলী

		টা, প,
বার্ষিক	চাঁদা (সডাক)	১৪·০০
ষান্মাসিক	" "	৭·০০
ত্রৈমাসিক	" "	৩·৫০

তিন মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক হতে হলে আগিসে অগ্রিম টাকা জমা দিতে অথবা মনিঅর্ডারে পাঠাতে হবে। কর্মাধ্যক্ষ

লেখা পাঠাবার নিয়মাবলী

লেখকদের কাছে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, অবশ্যই লেখার নকল রেখে তাঁরা সাপ্তাহিক বসুমতীতে লেখা পাঠাবেন। লেখা মনোনীত হলে পর সে-সংবাদ আমরাই যথাসময়ে পাঠিয়ে থাকি। নাম-ঠিকানাসহ ডাকটিকিটযুক্ত খাম থাকলে একমাত্র অমনোনীত গল্প ফেরৎ পাঠাবার চেষ্টা করা হয়। কবিতা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। —সম্পাদিকা

ভারতের গণতন্ত্র ও সংবিধান সম্বন্ধে মানবেন্দ্রনাথের মতামত বিশেষভাবে উল্লেখ করার পরিসর এখানে অল্প। পার্লামেন্টীয় গণতন্ত্রে তিনি মোটেই আস্থাশীল ছিলেন না কেন না তাঁর মতে পার্লামেন্টীয় গণতন্ত্র দলীয় একনায়কতন্ত্রেরই রকমভেদ মাত্র। একটি রাজনৈতিক দল, তার আদর্শ যতই ভাল হোক না, কোন কিছুই করতে অক্ষম যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই দল হাতে ক্ষমতা পাচ্ছে, কাজেই ক্ষমতাসীন নয় এমন যে কোন দলেরই রাজনৈতিক কার্যকলাপ একটিমাত্র উদ্দেশ্যের দ্বারাই পরিচালিত হতে বাধ্য, এবং সেই উদ্দেশ্যটি হচ্ছে কি করে ক্ষমতা দখল করা যায়। পক্ষান্তরে যে দল ক্ষমতায় আসীন রয়েছে তারও একমাত্র লক্ষ্য ক্ষমতায় টিকে থাকা, ক্ষমতা বজায় রাখা, কেন না প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলি তাকে সর্বদাই ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা করছে, কাজেই তার যা কিছু কার্যকলাপ সমস্তই একটিমাত্র উদ্দেশ্যে পরিচালিত, তা হচ্ছে ক্ষমতা বজায় রাখা। বর্তমান ধরণের গণতন্ত্র এই কারণে যা অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে তা হচ্ছে দলীয় রাজনীতি, ক্ষমতার রাজনীতি, কোন বিজ্ঞানসম্মত রাজনীতি নয়। যদিও বলা হয় সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র জনসাধারণ কিন্তু কার্যত একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর একটি করে কাগজের টুকরো একটি বাক্সে ফেলে দিয়ে আসা ভিন্ন প্রকৃত আর কোন রাজনৈতিক অধিকার বর্তমানে জনসাধারণের নেই। জনসাধারণ নিজেদের প্রতিনিধি নিজেরা নির্বাচন করতে পারে না, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের প্রার্থীর কপালে একটা করে ছাপ মেরে বাজারে ছেড়ে এবং জনসাধারণকে বলা হয় এদেরই মধ্যে একজনকে পছন্দ করে নিতে। যে নির্বাচিত হয় নির্বাচনের পর জনসাধারণের কাছে সে তার কোন কাজের কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নয়, সে তার কাজের কৈফিয়ৎ দেবে তার রাজনৈতিক দলের কাছে। পরিণামে সবটা দাঁড়ায় 'অফ দি পার্টি, বাই দি পার্টি, ফর দি পার্টি'—জনসাধারণের কোন কার্যকরী ভূমিকা এখানে নেই, থাকতে পারে না। তাছাড়া বর্তমানকালের নির্বাচন এতই ব্যয়বহুল যে দরিদ্রের পক্ষে নির্বাচনে দাঁড়ানো প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এখানে তথাকথিত ব্যক্তিস্বাধীনতা মৌলিক অধিকার ইত্যাদি, মানবেন্দ্রনাথের ভাষায়, 'লিগাল ফিকশন' ছাড়া আর কিছুই নয়।

মানবেন্দ্রনাথ ও কমিউনিজম

কমিউনিস্ট জগতের রাজধানীতে মানবেন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল বাস করেছিলেন একথা আগেই বলেছি। মার্কসবাদ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানের কোন তুলনা ছিল না। তাঁর মার্কসবাদী আওতায় রচিত গ্রন্থগুলি আজও পর্যন্ত মার্কসবাদীদের কাছে অমূল্য বলে বিবেচিত হয়।

কিন্তু চল্লিশের দশক থেকেই মানবেন্দ্রনাথ আস্তে আস্তে কমিউনিস্ট পদ্ধতি সম্বন্ধে ধারণা পরিবর্তন করতে শুরু করেন। কমিউনিস্ট জগতের রাজধানীতে থেকে তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার বড় কম পূর্ণ হয় নি। তিনি সেখানেও দেখেছেন নেতৃত্বের জন্য সংঘাত, উচ্চস্তরে দলাদলি, ক্ষমতার লড়াই, নতুন শাসক শ্রেণীর জাগরণ। উৎপীড়িতের নামে ক্ষমতা দখল করা এক জিনিস, কিন্তু উৎপীড়িতকে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী করে তোলা আর এক জিনিস। রাশিয়ায় থাকাকালীন তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে যদিও কাগজে-কলমে কমিউনিস্ট পার্টি ও জনসাধারণ অভিন্ন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অবস্থা ভিন্নরূপ, সেখানেও সর্বহারার নামে ব্যক্তিবিশেষের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। শ্রেণীসংগ্রামের শত্রু বলে যে সব পুরাতন বিপ্লবী নেতাদের ধরাপৃষ্ঠ থেকে অবলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে তাঁরা কি সত্যই বিপ্লবের শত্রু ছিলেন? না কি ব্যক্তিবিশেষের ক্ষমতাপ্রিয়তার স্বার্থে তাঁরা বলি হয়েছেন? ইত্যাদি প্রশ্ন মানবেন্দ্রনাথকে রীতিমত চিন্তিত করেছিল। প্রথম দিকে মানবেন্দ্রনাথ নিজেকে বুঝিয়েছিলেন যে শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে তোলার পক্ষে প্রাথমিক পর্যায়ে হয়ত কিছুটা সাবধানতা ও জবরদস্তির প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্ত [illegible] অপেক্ষা করেও [illegible] লোহ যবনিকা [illegible] স্ট্যালিনী একনায় [illegible] এর পরেও শ্লথ হল না, [illegible] নিজের ধারণাসমূহকে নতুন [illegible] বিচার করার তাগিদ বোধ করলেন, যা থেকে জন্ম নিল এক নতুন দর্শন, বিয়ন্ড কমিউনিজম, তাঁর ভাষায় নবমানবতাবাদ।

মানবেন্দ্রনাথ কমিউনিস্ট জগৎ সম্বন্ধে একজন অথরিটি ছিলেন একথা বলাই বাহুল্য, কিন্তু দুঃখের বিষয় কমিউনিস্ট জগৎ সম্বন্ধে তাঁর অতুলনীয় জ্ঞানকে ভারত সরকার কাজে লাগান নি। মানবেন্দ্রনাথ বহু আগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে সুদূর ভবিষ্যতে রুশ মার্কা কমিউনিজমের সঙ্গে চীনা মার্কা কমিউনিজমের সংঘাত অনিবার্য। মাও সে-তুং-এর অতি বামপন্থী মনোভাবের সঙ্গে তিনি রীতিমতই পরিচিত ছিলেন। ১৯২৬-২৭-এর চীনা বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে মাও সে-তুং সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন: The present leader of the Communist Party of China, Mao-Tze-tun, was one of those who persistently and deliberately sabotaged all

plans of revolutionary action in 1926-27. After ten years of romantic ultra-left adventures, he does not seem to have forgotten his opportunist past. তিনি এটা স্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন চীনা কমিউনিজম আসলে উগ্রজাতীয়তাবাদ যা শুধুমাত্র লালরঙে রঞ্জিত, এবং তিনি এটাও স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে চীনা কমিউনিজম আগ্রাসী হতে বাধ্য। চীন ভারত আক্রমণ করার দশ বছর আগেই এই ঘটিতব্য আক্রমণের উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন "এটাই হবে তার (ভারতের) স্বপ্নবিলাসী প্রধানমন্ত্রীর চরমতম মর্মান্তিক আঘাত, যিনি মাও-সে-তুং-এর সঙ্গে নবজাগ্রত এশিয়ার অথবা স্ট্যালিনের সঙ্গে নবজাগ্রত জগতের নায়কত্ব করার স্বপ্ন দেখছেন।"

নবমানবতাবাদ

নবমানবতাবাদ মানবেন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের চিন্তার সর্বশ্রেষ্ঠ ফল। অনেকের ধারণা মানবেন্দ্রনাথ মার্ক্সবাদ একেবারেই পরিত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু আমার বিবেচনায় সেটা ঠিক নয়। মার্ক্সবাদের মূল লক্ষ্যের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের আদর্শের কোন বিরোধ নেই, এবং মার্ক্সবাদকে ভিত্তি করেই তাঁর দর্শন গড়ে উঠেছে। মূলত মার্ক্সবাদের প্রয়োগগত দিকেই তাঁর আপত্তি ছিল, এবং এখানেই তিনি ছিলেন সোচ্চার। তাঁর সায়েন্টিফিক পলিটিক্স গ্রন্থে তিনি বলেছেন মার্ক্সবাদী হবার চেয়েও বড় প্রয়োজন মার্ক্সবাদের পিছনের ঐতিহ্যকে জানা, সেই রেনেসাঁস-প্রসূত মানবতন্ত্রের মর্মকথাটি উপলব্ধি করা। চিন্তায় বিপ্লব না ঘটলে সমাজে বিপ্লব ঘটে না।

মানবেন্দ্রনাথের রচিত দর্শন যা তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রীজন রোমাণ্টিসিজম এণ্ড রিভোলিউশনে ব্যক্ত হয়েছে তা আধুনিক জগৎ ও জীবনের সামনে একটা নতুন আলোর সন্ধান দিয়েছে। আজকের যুগে এমন মানুষের সংখ্যা অজস্র যাঁরা প্রচলিত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি বীতশ্রদ্ধ, অথচ প্রচলিত ধরণের কমিউনিজম যাঁদের হতাশ করেছে। অথচ মানবেন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন কমিউনিজমের বাইরে, তাকে অতিক্রম করে চিন্তা করার অনেক কিছুই আছে, নতুন আদর্শ ও চিন্তার দিন আজও ফুরিয়ে যায় নি। নবমানবতাদের বিস্তৃত বিবরণ দেবার পরিসর এখানে নেই, কৌতূহলী পাঠক উপরি-উল্লিখিত বইটি পাঠ করতে পারেন।

মানবেন্দ্রনাথ রায়কে আধুনিক ভারতের একমাত্র দার্শনিক বললে বোধহয় অত্যুক্তি করা হয় না। আমাদের যা কিছু দর্শন তা তো মধ্যযুগেই রচিত হয়ে গেছে, একালে কোন দার্শনিক জন্মান নি, জন্মেছেন দর্শনের ইতিহাসকার। কাণ্ট বা হেগেল বা মার্ক্স যে অর্থে দার্শনিক সে অর্থে ভারতবর্ষে একমাত্র মানবেন্দ্রনাথেরই নাম করা যেতে পারে, যিনি সেখান থেকে শুরু করেছেন যেখানে মার্ক্স থেমেছিলেন।

যথা পূর্বং তথা পরম্

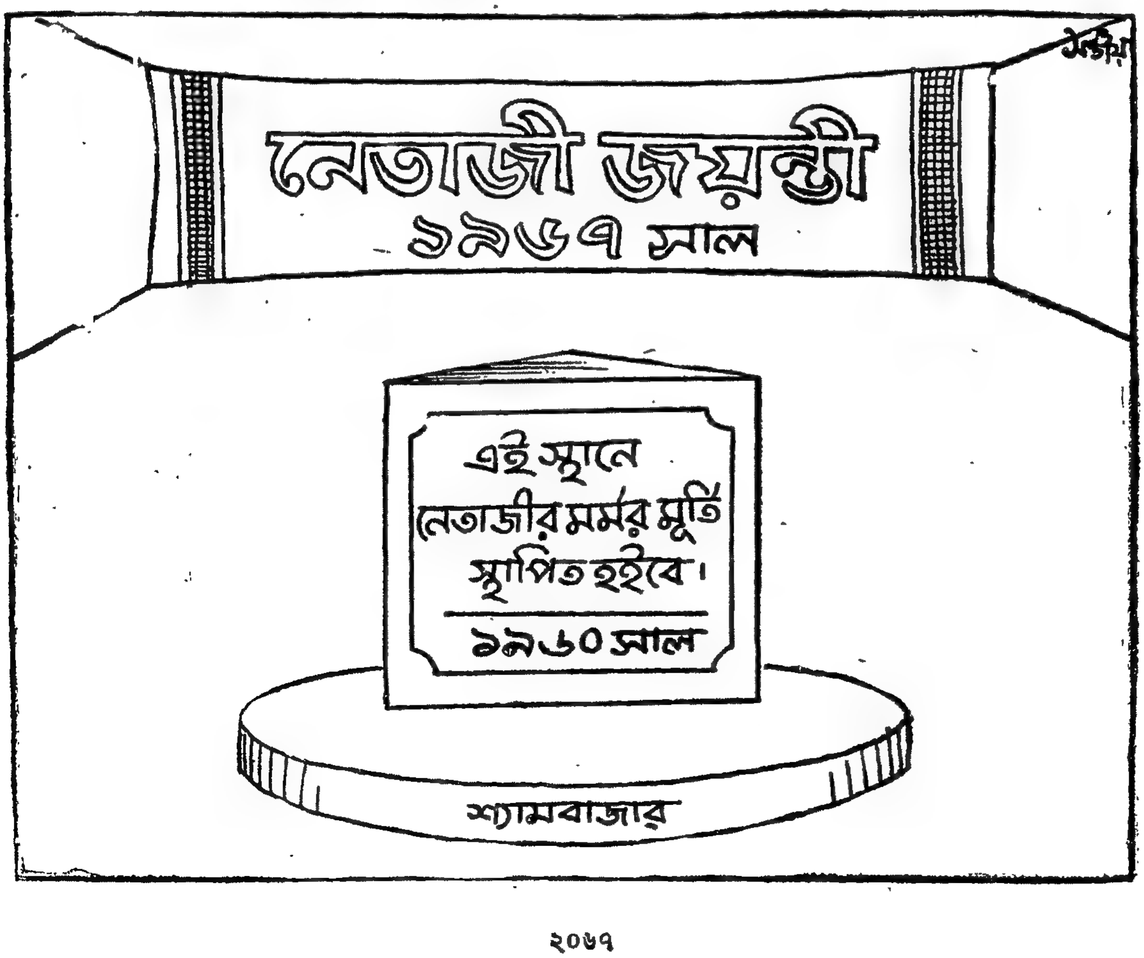

সুবর্ণলতা

ধারাবাহিক উপন্যাস

আশাপূর্ণা দেবী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

কিন্তু কী বই দিল জয়াদি!

এ কী জিনিস!

মানুষে এমন লিখতে পারে?

এ যে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়বার, লোককে ডেকে ডেকে শোনাবার।

এ কি সেই কবির কথা? না আমার কথা?

এ যে আমি মনে মনে পড়ে মনের মধ্যে ধরে রাখতে পারছি না গো—

"আজি এ প্রভাতে রবির কর,
কেমনে পশিল প্রাণের পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত পাখীর গান।
না জানি কেমনে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ।'

এর কোন লাইনটাকে বেশি ভাল বলবো আমি, কোন লাইনটাকে নয়?

কেশ এলাইয়া ফুল কুড়াইয়া
রামধনু আঁকা পাখা উড়াইয়া
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া
দিব রে পরাণ ঢালি—'

এ পদ্য আমি সবটা মুখস্থ করবো।

আমি ওদের সংসারের জ্বালায় আর কষ্টবোধ করবো না। ওরা যা চায় তাই করে দিয়ে নিজের মনে এই বই নিয়ে বসবো। আরো যে সব পদ্য আছে সব শিখে ফেলবো।

জয়াদি দেবী, তাই এই স্বর্গের স্বাদ এনে দিল আমায়। জয়াদির স্বামী দেবতা, তাই তাঁর মনে পড়েছে আমি পদ্য ভালবাসি। ভগবান ওঁদের বাঁচিয়ে রাখো, সুখে রাখো।

'আজি এ প্রভাতে রবির কর,
আজি এ প্রভাতে রবির কর—'

এর সব কথা আমার, সব কথা আমার জন্যে লেখা!

'কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন
চারিদিকে তার বাঁধন কেন?
ভাঙরে হৃদয় ভাঙরে বাঁধন...'

উঃ কী চমৎকার, কী অপূর্ব! আমি কী করবো!

....

'স্বর্গ' বলে কি সত্যিই কোনো রাজ্যপাট আছে? সত্যিই মাটি থেকে অনেক উঁচুতে মেঘেরও ওপরে সেই জগৎ, যেখানে দুঃখ নেই, শোক নেই, অভাব নেই নিরাশা নেই, খলতা কপটতা নেই, এককথায় বলতে গেলে এই পৃথিবীর ধুলো-ময়লার কোনো কিছুই নেই।

না কি ওটা শুধুই কবি কল্পনা? আমাদের এই মনের মধ্যেই স্বর্গ, মর্ত, পাতাল এই মনের 'অনুভবই' পৃথিবীর ধুলোমাটি থেকে অনেক উঁচুতে, মনের যত মেঘ তারও ওপরে উঠে গিয়ে স্বর্গ-রাজ্যে পৌঁছয়?

কে জানে কি। আমার তো মনে হয় শেষের কথাটাই বুঝি ঠিক। আর উঁচু-দরের কবিরা পারেন সেই অনুভবের উঁচু স্বর্গে নিয়ে যেতে। যেখানে গিয়ে পৌঁছলে মনেই পড়ে না পৃথিবীতে দুঃখ আছে জ্বালা আছে, ধুলো-ময়লা আছে।

শুধু আনন্দ, শুধু আনন্দ।

চোখে জল এসে যাওয়া অন্য এক-রকমের আনন্দ।

কিন্তু সব মানুষকে কেন নিয়ে যেতে পারেন না কবিরা? পারেন না বলেই না সেই আনন্দের দেশ থেকে হঠাৎ আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়তে হয়।

অন্তত সেদিনের সেই সংসার বুদ্ধি-হীনা বালিকা সুবর্ণলতা তাই পড়েছিল। সেই আছাড় খাওয়ার দুঃখে তার বিশ্বাসের মূল যেন আলগা হয়ে গিয়েছিল। মানুষের ওপর বিশ্বাস, ভাগ্যের ওপর বিশ্বাস, ভগবানের ওপর বিশ্বাস।

সুবর্ণর স্বামী রূঢ়, রুক্ষ, সুবর্ণ জানে সে কথা, কিন্তু সে যে এত বেশি নীরেট নির্বোধ, এত বেশি ক্রূর সে কথা বুঝি জানত না তখনো।

জানলো, আছাড় খেয়ে জানলো।

এই বহুদূরে এসে সেই সংসার-বুদ্ধিহীন আবেগপ্রবণ মেয়েটার দিকে তাকিয়ে করুণা হয়, ওর আশাভঙ্গের আর বিশ্বাসভঙ্গের দুঃখে চোখে জল আসে। মেয়েটা যে একদার 'আমি' ভেবে ভেবেও মনে আনতে পারি না।

এই 'আমি'টার মত এত ভয়ঙ্কর পরিবর্তনশীল আর কি আছে? 'আমি'তে 'আমি'তে কী অমিল!

তবু তাকে 'আমি'ই বলি—

অবোধ আমি ভেবেছিলাম এই আনন্দের স্বাদ ওকেও বোঝাই। আমার স্বামীকে। তখনো তার ওপর আশা ছিল।

আশা করেছিলাম ওরও হয়তো মনের

দরজা খুলে যাবে। তাই বলেছিলাম, 'তোমার খালি 'শুয়ে পড়া যাক, শুয়ে পড়া যাক!' বোসো তো একটু, শোনো কী চমৎকার—'

প্রদীপটা উস্কে দিয়েছিলাম, তার সামনে ঝুঁকে পড়ে পড়েছিলাম—

'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি,
ধরায় আছে যত, মানুষ শত শত,
আসিছে প্রাণে মম হাসিছে গলাগলি!'

ও আমাকে থামিয়ে দিলো, বেজার গলায় বললো 'জগৎসুদ্ধ সবাই এসে কোলাকুলি করছে? তাই এত ভাল লাগছে? বঃ বঃ বেড়ে চিন্তাটি তো! শত শত মানুষ এসে প্রাণে পড়ছে? তোফা। এমন রসের কবিতাটি লিখেছেন কোন মহাজন?'

বললাম, 'আঃ থামো না! শেষ অবধি শুনলে বুঝবে—'

আবার পড়তে সুরু করি। পড়ছি—হঠাৎ ও ফস্ করে বইটা কেড়ে নিল, বলে উঠলো, 'তোফা তোফা, এ যে দেখছি রসের সাগর। কি বললে, 'এসেছে সখাসখি, বসছে চোখাচোখি? আর যেন কি, 'দাঁড়িয়ে মুখোমুখি!' বলি—এ সব মাল আমদানী হচ্ছে কোথা থেকে?'...... ব্যঙ্গের সুর গেল, ধমক দিয়ে বলে উঠলো, 'কোথা থেকে এল এ বই?'

চোখে জল এসে গেল আমার সেটা দেখতে দেব না, তাই কথার উত্তর দিই নি।

ও বইটা নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখল। তারপর সাপের মত হিস্হিসিয়ে বলে উঠলো, এই যে প্রমাণ পত্তর তো হাতেই। 'প্রাণাধিকা ভগিনী শ্রীমতী সুবর্ণলতা দেবীকে স্নেহোপহার—' বলি এই প্রাণাধিক ভ্রাতাটি কে? কোথা থেকে জোটানো হয়েছে এটিকে?'

লেখাটা যে মেয়েমানুষের হাতের, তা কি ও বুঝতে পারে নি? নিশ্চয় পেরেছিল। সত্যি বেটাছেলে ভাবলে বইটাকে কি আস্ত রাখতো? কুচি কুচি করে ছিঁড়েতো, পা দিয়ে মাড়াতো! এ শুধু আমাকে চারটি বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি কথা বলে নেবে বলেই ছল করে—

আমার চোখ দিয়ে খুব জল আসছিল, তবু আমি জোর করে চোখটা শুকনো রেখেছিলাম। শক্ত গলায় বলেছিলাম, 'দেখতে পাচ্ছো না মেয়েমানুষের হাতের লেখা? ওবাড়ির জয়াদি দিয়েছেন।'

ওর মুখটা শক্ত হয়ে উঠলো, 'ও বাড়ির জয়াদি মানে? জয়াদিটি কে?'

'জানো না, তোমাদের নতুনদার বৌ! জয়াবতী দেবী।'

'বটে! নতুনদার বৌ! বলি তিনি কি আসা-যাওয়া করছেন না কি? আশ্চর্য বেহায়া মেয়েমানুষ তো। এদিকে জোর তলবে মামলা চলছে, আর ওদিকে তিনি প্রাণাধিকা ভগিনীকে স্নেহ-উপহার ঘুষ দিতে আসছেন!'

আমি রেগে গিয়েছিলাম।

আমি বলেছিলাম, 'মামলা ওরা করে নি, তোমরাই করেছ। জানতে বাকি নেই আমার। আর—'ভালবাসা' জিনিসটা জানো না বলেই ঘুষ বলতে ইচ্ছে করছে তোমার!'

'ভালবাসা? ওঃ!' ও বইখানা পাকিয়ে মোচড় দিতে দিতে বললো, 'তুমি যে জিনিসটা খুব জানো তা' আর আমারও জানতে বাকি নেই। যারা আমাদের শত্রুপক্ষ, উনি ঘর জ্বালানে পর ভোলানে মেয়ে যাচ্ছেন তাদের সঙ্গে ভালবাসা জমাতে। যাকে বলে দিতে হচ্ছে, ও বাড়ি থেকে লোকের আসা বন্ধ করছি।'

বলে বইটা নিয়ে নিল ও।

বললো, 'থাক, আর কাব্যি তে দরকার নেই। এমনিতেই তো সংসারে মন নেই। এসো—'

বলে প্রদীপটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে ঘরটাকে অন্ধকার করে দিল ও।

কিন্তু শুধু কি ঘরটাই অন্ধকার করে দিল?

...

ন বছর বয়সে এদের বাড়িতে এসেছিলাম, আর এই তেরো বছর পার করতে চললাম, অনবরত শুনছি 'সংসারে মন নেই'। শাশুড়ী বলেন, তাঁর ছেলে বলেন। দ্যাওররাও তো বলতে ছাড়ে না। কি জানি 'সংসারে মন' কাকে বলে। কাজকর্ম সবই তো করি। আমার গায়ে জোর বেশি বলে তো বেশি বেশিই করি। আর কি করতে হয়? আমার ওই বড় জায়ের মত—সব সময়ে রান্নাঘরে ভাঁড়ার ঘরে থাকতে পারি না, এই দোষ। তা' আর কি করবো?

ও আমার ভাল লাগে না।

কিন্তু দিদিরই কি সত্যি ভাল লাগে? ওর ইচ্ছে করে না দোতলায় উঠে আসে, নিজের ঘরে এসে বসে, মেয়েকে দেখে!

করে ইচ্ছে। বুঝতে পারি।

তবু দিদি সুখ্যাতির আশায় ওই-রকম রাতদিন নিচের তলায় পড়ে থাকে। কি না লোকে বলবে 'কী লক্ষ্মী বৌ! সংসারে কী মন!'

আচ্ছা কী লাভ তাতে?

ওই সব স্বার্থপর আর নিষ্ঠুর লোকেদের মুখের একটু সুখ্যাতি পেয়ে লাভ কি? আর—চিরকালই কি ওরা সুখ্যাতি করে? দিনের পর দিন 'ভাল' হয়ে হয়ে আর খেটে খেটে যে সুনামটুকু হয় তা' তো এক দণ্ডেই মুছে যায়। দেখি নি কি? এত কন্না করে দিদি, একদিন দ্বাদশীতে ভোরবেলা উঠে এসে শাশুড়ীকে তেল মাখিয়ে দিতে দেরি করে ফেলেছিল বলে কী লাঞ্ছনাই খেলো! দ্বাদশীতে না কি নিজে হাতে তেল মাখতে নেই। জানি না এই সব 'এই করতে নেই। আর ওই করতে নেই' এর মালা কে গেঁথেছিল বসে বসে।

মাও বলতেন বটে 'করতে নেই'।

সে আর কি, 'বেলা অবধি ঘুমোতে নেই, ইস্কুলের মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া করতে নেই, বড়দের সামনে বেশি কথা বলতে নেই। গরীব মানুষকে তুচ্ছ করতে নেই, ভিখিরিদের তাড়িয়ে দিতে নেই,' এই সব। মিষ্টি করে বুঝিয়ে দিতেন মা সে সব।

তার তো তবু মানে আছে।

আর এদের বাড়িতে?

এদের বাড়িতে যে কী অনাছিষ্টি সব কথা। মানে নেই। শুধু করতে নেই সেটাই জানা।

আর বৌ মানুষদের যে কত-ই নেই।

বৌ মানুষের তেষ্টা পেতে নেই, খিদে পেতে নেই, ঘুম পেতে নেই, আবার হাসিও পেতে নেই। 'লক্ষ্মী বৌ' নাম নিতে হলে কথাও বলতে নেই। এত সাধনার শেষ মূল্য অথচ শেষ পর্যন্ত ওই। একদিন একটু দোষ করে ফেললেই, সেই ছুতোয় চিরদিনের সব নম্বর কাটা।

কী লাভ তবে ওই বৃথা কষ্টে?

আর ওই ভাল হওয়াটা তো মিথ্যে, বানানো, বলতে গেলে একরকম ছলনা।

গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৩, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট
কলিকাতা-১
ফোন: ২২-৬৫৮০

হ্যাঁ ছলনাই। আমি যত ভাল নই, ততটা 'ভাল' দেখানো মানেই তো ছলনা। তবে তা—দেখাবো কেন আমাকে?

ও সব মিথ্যে আমার ভাল লাগে না। দিদি অবিশ্যি সত্যিই ভাল মেয়ে। তবু আরো দেখাতে চেষ্টা করে। তাই সে দিন শাশুড়ীর পায়ে ধরে—আবার তেল মাখাবার অধিকার—অর্জন করে নিয়ে-ছিল।

ওই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে এত ঘটা দেখলে আমার হাসি পায়। দিদি কেঁদে মরছে দেখে হেসে মরছিলাম আমি। কিন্তু সেদিন?

যেদিন সেই স্বর্গ থেকে আছাড় খেয়ে পড়েছিলাম?

যেদিন নিশ্চিত জেনেছিলাম, আমার স্বামীর সঙ্গে কোনোদিনই মনের মিল হবে না আমার। সেদিন কি হাসতে পেরেছিলাম? ওর বোকামী দেখে, ওর নীরেটত্ব দেখে? পারি নি। রাত্তিরে লুকিয়ে কেঁদে বালিশ ভিজিয়েছিলাম।

অবশ্য জীবনের এই দীর্ঘপথ পার হয়ে এসে জেনেছি. 'মনের মিল' শব্দটা একটা হাস্যকর অর্থহীন শব্দ।

ও হয় না।

মনের মিল হয় না, মনের মত হয় না।

নিজের রক্তে-মাংসে গড়া, নিজের আপ্রাণ চেষ্টায় গড়া সন্তান, তাই কি মনের মত হয়?

হয় না, হয় নি। আমার ছেলে-মেয়েরা?

ওরা আমার অচেনা।

শুধু আমার শেষের দিকের তিনটে ছেলে-মেয়ে, পারুল, বকুল আর সুবল, যাদের দিকে আমি কোনোদিন ভাল করে তাকাই নি, যাদের 'গড়বার' জন্যে বৃথা চেষ্টা করতে যাই নি, তারাই যেন—মাঝে মাঝে আশার আলো দেখায়। মনে হয় ওই দর্জিপাড়ার গলিতে বোধহয় ওদের শেকড় বসে নি, ওরা স্বতন্ত্র। ওরা নিজের ভাবতে জানে।

তবু ওদের সঙ্গেই কি আমার পরি-চয় আছে?

ওরা কি আমার অন্তরঙ্গ?

নাঃ। বরং মনে হয় ওরা আমাকে এড়ায়, হয়তো বা—হয়তো বা আমাকে ঘেন্না করে।

আর ভয় তো করেই, আমাকে নয়, আমার আচরণকে। ওরা হয়তো আমাকে বুঝতে চেষ্টা করলে বুঝতে পারতো। কিন্তু তা' করে নি।

ওরা অনেক দূরের।

তবু ওরা যে ওদের দাদা-দিদির মতন নয়, সেইটুকুই আমার সান্ত্বনা, আমার সুখ।

(ক্রমশঃ)

পাক-ভারতের রূপরেখা

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী

পূর্বাভাষ

(এক)

ভারতবর্ষ! একটি মহান দেশ, এই ভারতবর্ষ—এই দেশের সঙ্গে কত যুগ-যুগান্তরের কত মধুর স্মৃতিই না জড়িয়ে আছে! সুদূর অতীতের কত গৌরবময় কথা—তার কীর্তি, তার কৃষ্টি, তার সভ্যতার কত না কথা বেদ-পুরাণে ও কিংবদন্তিতে আজও ছড়িয়ে আছে—জড়িয়ে আছে তালপত্রের ও ভূর্জপত্রের পুঁথিতে বা পর্বতগাত্রে ও শিলাস্তূপে। বিশ্বের ইতিহাসও ভারতবর্ষের সেই গৌরবময় যুগের কৃষ্টি ও সভ্যতা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্বীকার করে নিয়েছে। এই ছিল ভারতের অতীত দিনের ইতিহাস। প্রাকৃতিক নিয়মেই আলো ও অন্ধকার পিছু পিছু চলে—সেই নিয়মেই ভারতবর্ষের গৌরবময় আলোর যুগের পরে নেমে আসে এক অন্ধকার যুগ—পরাধীনতা ও দাসত্বের যুগ। আমরা যাঁরা ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই ভারতবর্ষে জন্মেছিলাম, তাঁরা সকলেই অন্ধকার যুগের সন্তান। অন্ধকার যুগের সন্তান আমরা ভুলে গিয়েছিলাম, ভারতবর্ষের অতীত দিনের গৌরবের কথা—বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের ঘৃণ্য অনুকরণই সেদিন হয়েছিল আমাদের চরম ও পরম কাম্য আদর্শ ও উপজীব্য। প্রাকৃতিক নিয়মেই আবার এই অন্ধকার যুগেরও দিন ঘনিয়ে আসে। ভারতবর্ষের মাটিতেই জন্ম নেন মহামতি রানাডে, গোখলে, তিলক, সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, রাজা রামমোহন, মহাত্মা শিশির কুমার, মতিলাল ঘোষ, মহাত্মা গান্ধী, লালা লাজপৎ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রমুখ মনীষিগণ, যাঁরা ভারতবাসীর কাছে তাঁদের উদাত্ত কণ্ঠের আহ্বান জানান, ভারতের অতীত গৌরবের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে। দেশের তরুণের বুকে সাড়া জাগে—নূতন ঊষার আলো ভারতবর্ষে আবার দেখা দিতে শুরু করে। মুষ্টিমেয় তরুণ সেদিন স্বাধীনতার সূর্য দেখার জন্য পাগল হয়ে ওঠেন—তাঁরা সেদিন বাড়ি-ঘর, আত্মীয়-স্বজন, নিজেদের ব্যক্তিগত ভবিষ্যৎ জীবনের সকল সুখ-সম্পদের আশাকে গৌণ স্থান দিয়ে দেশকে ও দেশের স্বাধীনতাকেই মুখ্য স্থান দেন। ভারতবর্ষের অন্ধকারময় দিনের এমনই এক যুগ-সন্ধিক্ষণে আমিও জন্ম গ্রহণ করি, ভারতবর্ষের মাটিতেই ভারতবাসী হিসাবে।

ভারতবর্ষের মাটি ও আমার মা-ই তাঁদের কোলে আমাকে প্রথম আশ্রয় দেন। তারপর থেকে প্রতিদিনে, প্রতিমুহূর্তে তাঁরা উভয়েই আমার জীবনে তাঁদের অপরিমিত সেবা-যত্ন-রস ও আহার জুগিয়ে এই দেহের পুষ্টিসাধন করেছেন। মায়ের সেবা প্রত্যক্ষভাবেই পেয়েছি; তাই, তাঁকে জেনেছি, বুঝেছি, ভালবেসেছি এবং তাঁকে ভালবেসেই বাড়ির সকলকে—তারপরে, গ্রামের সকলকে ভালবাসতে শিখেছি। মাটির দান—মাটির সেবা অপ্রত্যক্ষ—তাঁকে দেখতে পাই নি, তাই, তাঁকে তখনও ভালবাসতে এবং তাঁকে ভালবেসে দেশকে তখনও ভালবাসতে শিখি নি। অবশেষে সেই সুদিনও আমার জীবনে আসে—মাটির দান, মাটির সেবা বুঝতে ও জানতে পারি—মাটিকে ভালবাসতে শিখি এবং তাঁকে ভালবেসেই গোটা দেশকে ভালবাসি। আমার জীবনে এই দিনটি আসে ১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনকে উপলক্ষ করে, উপর্যুক্ত মনীষীদের কারো কারো ব্যক্তিগত সম্পর্কে এসে, কারো কারো বা অগ্নিবর্ষী, জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনে বা কারো কারো বক্তৃতা পড়ে। দেশকে ভালবেসে সেদিন আমি স্বাধীনতার শপথ নিই। আমার আগেও অনেক মহাপ্রাণ তরুণ ও যুবকই ঐরূপ সঙ্কল্প নিয়ে, তাঁরা স্বাধীনতা লাভের ক্ষুরধার পথে পা বাড়িয়েছিলেন—তাঁরা তৎকালীন কংগ্রেস নেতাদের মত আবেদন-নিবেদনের পথ নেন নি—তাঁরা নিয়েছিলেন বিপ্লবের পথ—যে পথে আদর্শের জন্য নিঃশেষে দিতে হয় মানুষের কাছে যা সবচেয়ে প্রিয়, সেই প্রিয় প্রাণের ও সর্বস্ব ত্যাগের কোরবানি বা বলি। এইরূপ সঙ্কল্পিত প্রাণ মানুষের কাছে, তাঁর আদর্শই হয় বড়, আর সবই তুচ্ছ—সেই আদর্শ, আদর্শ-সিদ্ধির পথে যা কিছু প্রতিকূল—যা কিছু প্রতিবন্ধক, তার সবকিছুকে নির্মমভাবে নাশ করে তাঁরা হন সবনাশী সন্ন্যাসী। বিপ্লবী দলের সেই তরুণ যুবকদের একমাত্র আদর্শ হয়, দেশের স্বাধীনতা: তাই, স্বাধীনতার যারা পরিপন্থী—স্বাধীনতার যারা শত্রু, তাদের প্রাণ নিতেও তাঁরা দ্বিধা করেন না—তাতেও তাঁদের হাত বা বুক একটুও কাঁপে না। অস্ত্র তাঁদের ছিল না অহিংসার মহামন্ত্র(!)—তাঁদের অস্ত্র ছিল, অগ্নি-নালিক (পিস্তল ও রিভলভার) বা শাণিত ছুরিকা। এই গুপ্ত বিপ্লবী দলে যাঁরা গিয়েছিলেন—আমার আগে ও আমার পরে—তাঁরা অনেকেই স্বাধীনতার শত্রুর প্রাণ নিয়েছেন এবং নিজেদের প্রাণ অকাতরে নির্ভীকভাবে দেশ-মাতার চরণে আহুতি দিয়েছেন। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, কানাইলাল, সত্যেন বোস, আস্‌ফাকুল্লা, যতীন দাস, রামরক্ষা, নলিনী বাগ্‌চি, রাজেন লাহিড়ী, রোসান সিং, রামপ্রসাদ বিসমিল, কর্তার সিং, জওলা সিং, কাশীরাম, যতীন মুখার্জি, নীরেন দাসগুপ্ত, ভগৎ সিং, রাজগুরু, সুখদেও, সূর্য সেন, প্রীতিলতা, বিনয় বোস, বাদল গুপ্ত, দীনেশ গুপ্ত, দীনেশ মজুমদার, তারিণী মজুমদার, প্রমোদ, অনন্তহরি, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য ও তারকেশ্বর দস্তিদার প্রমুখ আরও—আরও অনেকেই তাঁদের নিজেদের প্রাণ বলি দিয়েছেন। এই স্বাধীনতার জন্যই আরও একজন শ্রেষ্ঠ সংগ্রামী বীর যোদ্ধা—শ্রীরাসবিহারী বোস—জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সংগ্রাম ক'রে নিঃশেষে প্রাণ দিয়ে গেলেন। এই বিপ্লব-যুগেরই শ্রেষ্ঠ দান স্বাধীনতার সর্বশ্রেষ্ঠ মহানায়ক নেতাজী বোস সশস্ত্র সংগ্রামের পথেই শেষ আঘাত হেনে বৃটিশ-সিংহকে এমন বিপর্যস্ত করলেন যে "সিংহ" লেজ গুটিয়ে ক্ষত-স্থান চাট্‌তে চাট্‌তে ভারতবর্ষ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হ'ল। নেতাজী বোসই সর্বপ্রথমে ভারতের মাটিতে স্বাধীনতার পতাকা তুলে জগৎকে বিস্মিত ও চমকিত করেন। যাঁর মরণ-জয়ী সংগ্রামের ফলেই ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন, সেই "নেতাজী" আজ নিরুদ্দিষ্ট! মাইকেল এডওয়ার্ডস, তাঁর একখানি সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত গ্রন্থে বলেছেন যে ভারতের স্বাধীনতার জন্য যদি ভারতবাসীর কারো কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে হয়, তবে তিনি হলেন—নেতাজী বোস। এই নেতাজীরও ছাত্রাবস্থায়ই রাজনীতিক জীবন সুরু হয়, বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে ও মাধ্যমে।

বিপ্লবী দলের আরও কত শত শত কর্মীকে দেখেছি ইংরেজের জেলে অমানুষিক নির্যাতনে দিন কাটাতে—কেউ বা সে অত্যাচার ও নিপীড়নে জেলখ গার

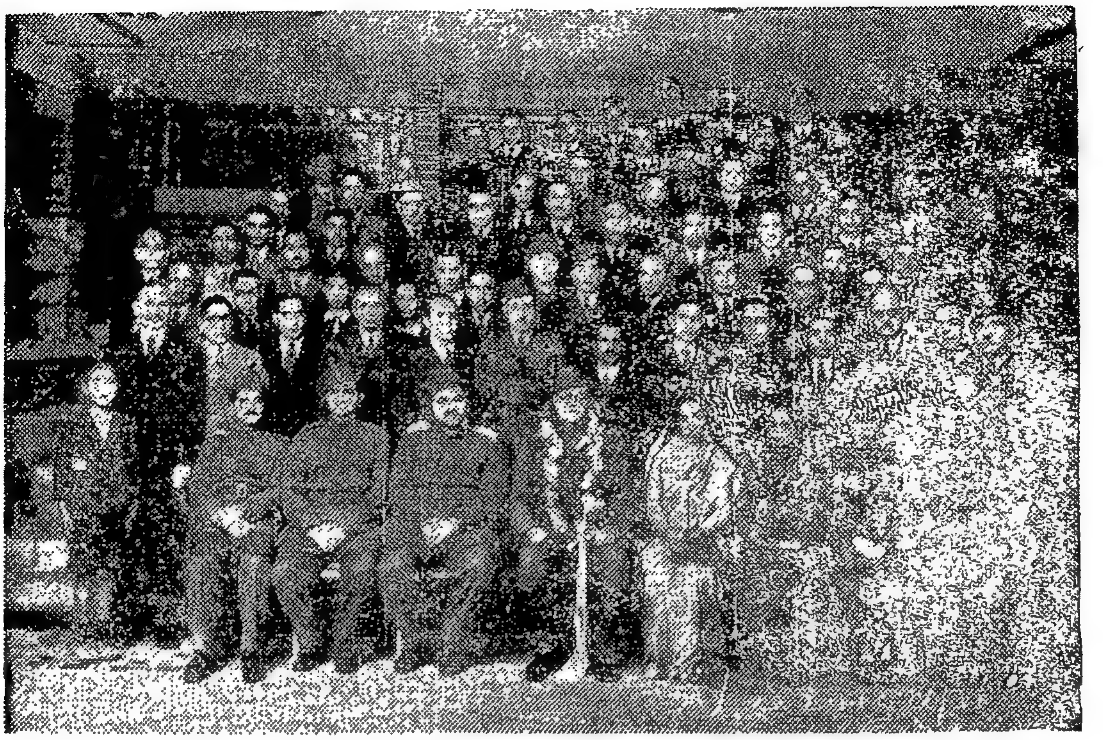

টোকিওতে এক সম্বর্ধনা সভায় নেতাজী ও আজাদ হিন্দ সরকারের কয়েকজন মন্ত্রীকে দেখা যাচ্ছে।

মধ্যেই তিল তিল ক'রে মৃত্যুবরণ করেছেন—আবার এও দেখেছি যে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে এসেও অনাহারে, অর্ধাহারে, অচিকিৎসায় তিল তিল করে মৃত্যুবরণ করেছেন। বিপ্লবী কর্মীরা জেলখানায় সরকারের কাছ থেকে যে ব্যবহার পেতেন, তা তথাকথিত অহিংস সত্যাগ্রহী বন্দীদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের। বিপ্লবী বন্দীদের জেলখানায় দেখেছি, তেলের ঘানি টানতে, ছোব্‌ড়া পেটাতে—জেলখানার যেসব কাজ সবচেয়ে কঠিন তা-ই করতে। আলিপুর জেলের সুপারিন্‌টেনডেন্ট—মিঃ মলভেনী সাহেব—জেল-কমিশনের কাছে যে গোপন সাক্ষ্য দেন, তা'তে তিনি বলেছিলেন যে সরকার থেকে ঐ শ্রেণীর বন্দীদের উপর অযথা অন্যায় উৎপীড়ন করার জন্য গোপন নির্দেশ দেওয়া হ'ত।

আজও দেখছি, এই শ্রেণীর অনেক মুক্ত বন্দীই স্বাধীন ভারতেও অবহেলিত জীবন যাপন করছেন—কেউ বা, উপযুক্ত খাদ্য ও চিকিৎসার অভাবে কঠিন যক্ষ্মা রোগে মরেছেন, কেউ বা এখনও ধুঁকছেন!

এই তো গেল, এক শ্রেণীর স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের আত্মত্যাগের কথা, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতীয় কংগ্রেসের ডাকেও পরাধীন ভারতের কম লোক চরম আত্মত্যাগ করেন নি। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের (বর্তমানে, পাকিস্তানের অন্তর্গত) বীর পাঠান-সন্তানেরা—খান আবদুল গফুর খানের নেতৃত্বে মশা-মাছির মত ঝাঁকে ঝাঁকে ইংরেজের পুলিশের গুলীতে অহিংসার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বীরের মত মরেছেন কিন্তু প্রাণ-ভয়ে কেউ পেছু হটেন নি।

বাংলাদেশের বীর নারী মাতঙ্গিনী হাজরাও সিপাহীর গুলীতে প্রাণ দিয়েছেন কিন্তু তবু হাত থেকে জাতীয় পতাকা ছাড়েন নি বা তার অসম্মান হ'তে দেন নি।

সারা ভারতবর্ষে পুনঃ পুনঃ যাঁরা জেলে গিয়েছেন, তাঁদের সংখ্যাও কয়েক লক্ষ হবে।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে ভারতবর্ষ কম ত্যাগ স্বীকার করে নি—রক্তও নেহাৎ কম দেয় নি। ভারতবর্ষে ইংরেজ-রাজত্বের বনিয়াদ গড়ে ওঠার পর থেকে ইংরেজ-বিতাড়নের জন্য সর্বভারতীয় ও স্থানিক সংগ্রাম পুনঃ পুনঃ অনেকই হয়েছে—জীবন ও অর্থহানিও অনেকই হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলা ও বিহারে মুসলমান ফকির ও হিন্দু সন্ন্যাসীরা বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে তাঁদের কর্মতৎপরতা পুরোদমে চালান। ১৭৬৩ খৃস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংসের একটি পত্রে দেখা যায় যে তিনি লিখেছিলেন—"ফকিররা বাংলাদেশের বাখরগঞ্জ জেলায় প্রবেশ ক'রে সেখানে 'কেলি' সাহেবকে ঘিরে ফেলে তার জীবন বিপন্ন করেছেন। সেই বছরই তাঁরা ঢাকা ও রামপুর গোয়ালিয়ার (বর্তমান, রাজশাহীর) কুঠী দখল ক'রে কুঠীয়াল 'বেনেট' সাহেবকে পাটনায় নিয়ে গিয়ে হত্যা করেন।" শেখ মজনু ছিলেন, ঐ বিদ্রোহী ফকিরদের নেতা। প্রথম দিকে হিন্দু সন্ন্যাসীরাও ঐ ফকিরদের সাথে একসাথেই বিদ্রোহের ঝাণ্ডা তুলে এগিয়ে চলেছিলেন কিন্তু পরে, সন্ন্যাসীরা মোহনগিরির নেতৃত্বে পৃথক দল করেন। মোহনগিরির পরে ভবানী পাঠক ঐ দলের নেতৃত্বে আসেন এবং লেঃ ব্রেনান সাহেবের নেতৃত্বে পরিচালিত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একদল সিপাহীর সাথে সংঘর্ষে মারা যান। মুসলমান সম্প্রদায়ের ওয়াহাবি নামধেয় এক উপ-সম্প্রদায়ও আমীর খানের নেতৃত্বে ঊনবিংশ শতাব্দীতে "কোম্পানীর" বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এই দলেরই দণ্ডিত কয়েদী শের আলি আন্দামান দ্বীপে লর্ড মেয়োকে ছুরিকাঘাতে নিহত করেন। এই ওয়াহাবি সম্প্রদায়েরও প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল, বাংলা দেশ। ঊনবিংশ শতাব্দীতেই গুরু রাম সিং-এর নেতৃত্বে পাঞ্জাবে নামধারী শিখরা একটি স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা ক'রে কোম্পানীর কর্তৃত্বকে অস্বীকার ও অমান্য

ক'রে চলেন। এই বিদ্রোহ "কুকা"-বিদ্রোহ নামে ইতিহাসে পরিচিত। কুকা-বিদ্রোহীরা পাঞ্জাবকে ২৩টি প্রদেশে ভাগ ক'রে তাঁদের "গভর্নর" নিযুক্ত ক'রে "কোম্পানীর" রাজত্বের পাশাপাশি একটা সমান্তরাল সরকার চালান। তাঁদের নিজেদের "কোর্ট", নিজেদের পরিচালিত স্কুল ও ডাকঘর প্রভৃতিও সমানভাবে কাজ চালিয়ে যায়। এই কুকারা দাবি করেন যে তাঁরাই, পরবর্তীকালে মহাত্মা পরিচালিত কংগ্রেসের অসহযোগ-আন্দোলনের পথিকৃৎ।

এই সবগুলিই স্থানিক বিদ্রোহ। ঐতিহাসিকরা এইগুলোকে স্বাধীনতার সংগ্রাম আখ্যা দেন নি। আমি ঐতিহাসিক নই—আমি ছিলাম, স্বাধীনতা-সংগ্রামের একজন ক্ষুদ্র সৈনিক মাত্র। স্বাধীনতা-সংগ্রামী সৈনিকের দৃষ্টিতে ও বিচারে আমি মনে করি, পরবশতার বিরুদ্ধে যে কোনও বিদ্রোহ-ই হোক না কেন, তা-ই স্বাধীনতা-সংগ্রামের অংশ—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ; কারণ, ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের তারা প্রেরণা জোগায়, যেমন ঈস্টার-বিদ্রোহ সংগ্রামী আয়র্লণ্ডে এবং চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ভারতীয় বিপ্লবী সমাজে একটা আলোড়ন ও প্রেরণা জুগিয়েছিল। সেই প্রেরণাই এনে দেয় মহত্তর ব্যাপক সংগ্রামের উৎসাহ ও উদ্দীপনা।

ঐসব স্থানিক বিদ্রোহ ছাড়াও ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে ভারতবর্ষে এক ব্যাপক সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে। ঐতিহাসিকরা এই সিপাহী বিদ্রোহকে ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম ব'লে বর্তমানে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। সেই সিপাহী বিদ্রোহও বাংলা-দেশেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে।

আগাগোড়া সংগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বাংলার অবদান সর্বাপেক্ষা বেশি। স্বাধীনতার আধুনিককালের সংগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও দেখা যাবে, ভারতবর্ষের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলই বোধ হয় সবচেয়ে বেশি রক্ত ঢেলে দিয়েছে, স্বাধীনতা দেবীর পদতলে। বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের তরুণরা তাঁদের বুকের তপ্ত তাজা রক্ত অকাতরে যেমন দিয়েছেন, তেমনই, ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বীর পাঠান সন্তানরাও অহিংস সত্যাগ্রহী সৈনিক হিসাবে তাঁদের রক্ত অকাতরে ঢেলে দিয়েছেন—তাঁরা ঝাঁকে ঝাঁকে মশা-মাছির মত মরেছেন কিন্তু কিন্তু প্রতিপক্ষকে একটি আঘাতও করেন নি।

এই যে এত রক্তদান—এত ত্যাগ—এত দুঃখ-কষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগের ফলে যে স্বাধীনতা শাসক ও শাসিতের মধ্যে আপোষে এসেছে, তার ফলে আর অতীতের গৌরবময় ভারতবর্ষ নেই—ভারতবর্ষ হয়েছে, পাক-ভারত-উপমহাদেশ! সংগ্রামী বাংলার প্রাণকেন্দ্র পূর্বাঞ্চল, "পূর্ব-পাকিস্তান" নামে ও ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলের খণ্ডিত পাঞ্জাবসহ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নিয়ে "পশ্চিম পাকিস্তান" নামে এক নূতন রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। ফলে, আজ পাঠান-বীর খান আবদুল গফুর খান দেশত্যাগী এবং পূর্ব পাকিস্তানের শত শত বীর যোদ্ধা বাস্তুহারা! যেদিন স্বাধীনতার সংগ্রামে আমরা প্রথম নেমেছিলাম, সেদিন আমরা সকলেই ছিলাম, ভারতবাসী। দেশকে ভালবেসে ভারতবাসী হিসাবে গর্বও বোধ করতে শিখেছিলাম এবং সেই ভালবাসা, সেই প্রেম, সেই গর্ববোধই স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রেরণা জুগিয়েছিল কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, স্বাধীনতা যেদিন এল সেদিন সংগ্রামী ভারতীয়দের কেউ বা হলেন—ভারতীয়, আর কেউ বা হলেন—পাকিস্তানী! যে জাতীয়তাবাদকে ভিত্তি করে, স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেমেছিলাম—যার উপরে ভিত্তি ক'রে সব সময়েই ভেবেছি—"আমি সর্বপ্রথমে ভারতবাসী, তারপরে আমি হিন্দু বা মুসলমান"—সেই জাতীয়তাবাদ ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সাথে সাথেই খণ্ডিত হ'য়ে গেল। সংগ্রামী সৈনিকের সেই মর্মবেদনা কি বর্তমান কালের ভারতীয় সংগ্রামী নায়করা অন্তর দিয়ে অনুভব করেন? খান আবদুল গফুর খান সেই কথা স্মরণ ক'রে অতীতের সংগ্রামী সহকর্মীদের কাছে কেঁদেছেন। পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামী সৈনিকরা আজও মনে মনে কাঁদছেন—তাঁদের বুক ফেটে যাচ্ছে কিন্তু মুখ ফুটে সেকথা প্রকাশ করতে পারছেন না!

স্বাধীনতার পরের একটি ঘটনা আমার মনে সব সময়েই জেগে ওঠে। কলকাতায় এসেছি। দেখা হ'ল এক লেখা-পড়া না-জানা বৌদির সঙ্গে। আমার দাদা (মাসতুতো) ছিলেন, সিরাজগঞ্জের উকিল। সেখানে তাঁদের পাকা-বাড়ি ও জোত-জমা সবই ছিল কিন্তু তাঁরা দেশত্যাগ ক'রে আস্তে বাধ্য হয়েছেন। বৌদি আমাকে বলেন—"এত জেল খেটে; এত দুঃখ-কষ্ট বরণ ক'রে ইংরেজকে তাড়িয়ে এমন স্বাধীনতাই আনলেন, যে স্বাধীনতার ফলে লোককে বাড়ি-ঘর ছেড়ে ভিক্ষুকের বেশে দেশান্তরী হ'তে হ'ল।" ইংরেজ এদেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছে ব'লে আমি কোন অনুশোচনা করি না, বরং সেজন্য গর্বই বোধ করি কিন্তু আমার গর্ব সত্ত্বেও আমি কিন্তু বৌদির প্রশ্নের উত্তর সেদিন দিতে পারি নি—আজও ভেবে কূল-কিনারা পাই না—উত্তর খুঁজে পাই না।

আজ জীবনের প্রান্তসীমায় এসে পেছনে ফিরে দেখছি, এই দেহের উপর দিয়ে তিয়াত্তরটি শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা কেটে গিয়েছে—পারিবারিক ও রাজনীতিক ঝড়-ঝঞ্ঝাও অনেকই গিয়েছে। পারিবারিক ক্ষেত্রে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে আমি যখন জেলে; তখন আমার পিতামহ মারা গিয়েছেন—তাঁর সাথে শেষ দেখা হয় নি। দেখা না-হওয়ার ফলে পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছি। আমার বাবা আগেই মারা গিয়েছিলেন। ১৯৩১-এ আমি যখন রাজশাহী জেলে, তখন আমার কাকা মারা গিয়েছেন। তারপরে ১৯২৯ সালে আমার স্ত্রী ৪ বছরের এক মেয়ে রেখে বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়েছে। দেশ-সেবায় নেমে দেশকে ভালবেসেছিলাম, কিন্তু অর্থকরী বিদ্যা শিখি নি; তাই, আমি আগেও যেমন ছিলাম, আজও তেমনই অর্থহীন। এক এক জনের মৃত্যু-খবর পেয়েছি বা স্বচক্ষে দেখেছি, মনে ব্যথাও পেয়েছি। পর মুহূর্তেই সামলিয়ে উঠেছি, এই ভেবে যে আমি তো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ স্বাধীনতা সৈনিক—আমার তো দুর্বলতা সাজে না! সর্বশেষ আঘাত পাই, ১৪৪২ খৃস্টাব্দে, আমি যখন ঢাকা জেলে। খবর পেলাম, আমার সেই মাতৃহারা মেয়েটি, যার বিয়ে আমি জেলে থাকা কালেই ১৯৪১ সালে আমার ছোট ভাই—জিতেশ দিয়েছিল, সেই মেয়েটিও তার শ্বশুরবাড়ি দিনাজপুর শহরে একদিনের জ্বরে মারা গিয়েছে। ১৯৪০ সালে যেদিন আমি আমার গ্রামের বাড়ি থেকে ধৃত হয়ে রাজশাহী জেলের দিকে রওনা হই, মেয়েটি আমার পাশেই দাঁড়িয়ে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করছিল। আমার বিদায় অভিনন্দনের জন্য গ্রামের সহস্রাধিক হিন্দু-মুসলমান গ্রাম্য সব রকমের বাদ্যযন্ত্র—ঢাক-ঢোল প্রভৃতি নিয়ে বাজনা বাজাচ্ছিলেন এবং জিন্দাবাদ ধ্বনি দিচ্ছিলেন। আমার দৃষ্টি সামনে সেই দিকেই ছিল, পিছনে যে আমার মেয়ে দাঁড়িয়ে অশ্রু বিসর্জন করছে, তার দিকে সেদিন ফিরেও তাকাই নি। সেই দেখাই আমার তাকে শেষ দেখা। ঢাকা জেলে খবর পেয়ে বুকে দারুণ ব্যথা পেয়েছিলাম—সেটা ঠিকই কিন্তু বুক ফেটে গেলেও চোখ ফেটে জল বের হয় নি। এই তো গেল পারিবারিক ঝড়-ঝঞ্ঝা। রাজনীতিক ঝড়-ঝঞ্ঝার ফলে প্রায় ২২ বছর কাল জেলে; অন্তরীণে বা ফেরারী অবস্থায় কাটাতে হয়েছে। জাঙিয়া-কুর্তা পরে গলায় মোটা লোহার হাঁসুলি ও কাঠের তক্তি পরে ডাণ্ডা-বেড়ি পায়ে নিয়েও জেল খেটেছি। ইংরেজের পুলিশের সাথে সশস্ত্র রাইফেলের গুলীতে আহতও হয়েছি।

স্বাধীনতা-সংগ্রামের বীর সৈনিকদের মধ্যে বাংলা দেশেই আরও অনেকেই

তোমার সেই ভালবাসার দেশ

দুর্গাদাস সরকার

দুয়ার যদি বন্ধ রাখে, দু'চোখ খোলা থাক,
শুনেছি যেন তোমার পদধ্বনি।
কেউ জানে না কোথায় আছে ঘুলঘুলিতে ফাঁক,
মেঘমন্দ্রে হঠাৎ রণরণি......।

* * *

চতুর্দিকে মঞ্চ জুড়ে বেবাক কথা শুনে
অবাক লোক খাচ্ছে পাতা সেঁকে।
পকেট কেটে কে রাজা হ'ন উঁচু কপাল-গুণে।
চড়া বাজার শেয়ার মার্কেটে।

সেই যে ছিল ছিন্ন ঝুলি, গায়েও নামাবলী,
সে-পাখিটার এখন রামনাম।
দেশের নামে ফাঁসিমঞ্চে কেউ যাচ্ছে বলি।
তোতাপাখির বন্ধু শুধু শ্যাম।

কালোবরণ শ্যামের আছে কালোবাজার নাক!
ব্যাপার বুঝে সবাই চুপচাপ।
হুকুম বিলি করে' রাজার পয়সা লোটে ঢাকী;
অন্ধ লোক করে মনস্তাপ।

সাগুক ঝড় ভাঙা চালায় উঠুক নদী ক্ষেপে-
তারি মধ্যে তোমার পদধ্বনি।
এই যে মাটি ঘুমিয়ে ছিল— সেও ওঠে যে কেঁপে
তোমার নামে অস্ত্রে ঝনঝনি।

* * *

দুয়ার যদি বন্ধ রাখে, দু'চোখ খোলা রয়,
তখনি হয় এ-নাটকের শেষ,
দেখবে তুমি দাঁড়িয়ে আছে তেমনি দুর্জয়
তোমার সেই ভালবাসার দেশ।

আছেন, যাঁদের জীবনে আমার চেয়েও আরও অনেক বেশি ঝড়-ঝঞ্ঝা এসেছে। তাঁদের ত্যাগ, তাঁদের দুঃখ-কষ্ট ও লাঞ্ছনা বরণের ইতিহাসের কাছে আমার ইতিহাস অতি অকিঞ্চিৎকর। এত ত্যাগ, এত দুঃখ-কষ্ট বরণ, এত রক্ত দানের পরেও কিন্তু স্বাধীনতা যখন এল, তখন ভারত ভেঙে দু'খানা হল! এই দেশ-ভাগের দারুণ মর্মবেদনার একটি অতি করুণ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন ভূতপূর্ব আই-সি-এস (I.C.S.) একজন জেলাশাসক ও প্রধান সাহিত্যিক—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়, তাঁর অমর একটি কবিতায়। সেই কবিতাটির কিছুটা অংশ এখানে উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না।

"তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর 'পরে রাগ করো,
তোমরা যে-সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো!
তার বেলা?

তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর 'পরে রাগ করো,
তোমরা যে সব ধেড়ে খোকা
বাঙলা ভেঙে ভাগ করো!
তার বেলা?"

স্বাধীনতা এল কিন্তু ভারত ভেঙে দ্বিভাগ—ভারত ও পাকিস্তান হল। পরিণতিতে সাথে সাথেই নিহত হল, ভারতবর্ষের জাতীয়তা বোধ—যে জাতীয়তা বোধ ছিল, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রাণ—স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের সংগ্রামের উৎস। আজ ভারতের জাতীয় নেতারা পুনঃ পুনঃ তারস্বরে দেশবাসীর কাছে আহবান জানাচ্ছেন, জাতীয় সংহতি বজায় রাখতে। এ যেন গাছের গোড়া কেটে মাথায় জল ঢালা! জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে চিন্তাশীল দেশবাসীর মনোবল শিথিল হয়ে গিয়েছে। বেরুবাড়ির অধিবাসীরা আজ পর্যন্ত ভারতীয় নাগরিক আছেন, কিন্তু তাঁদের নাগরিকত্ব লোপ করে বিদেশীর পর্যায়ভুক্ত করার কথাবার্তা সবই পাকা হয়ে আছে। এমনিভাবে আরো কে যে কখন তাঁর নাগরিকত্ব হারিয়ে বিদেশী হবেন, তার ঠিক কি? দেশ ভাগের পর আমি একাদিক্রমে চৌদ্দ বছর পূর্ব পাকিস্তানে থেকে দেখেছি, সেখানে জনসাধারণের মধ্যে যেটা প্রথমে গুজবরূপে শোনা যায়, তা-ই পরে বাস্তবরূপে দেখা দেয়। পূর্ব পাকিস্তানের রাজশাহীতে থাকতে সেখানে মাঝে মাঝেই গুজব শুনেছি যে, মুর্শিদাবাদ জেলা পাকিস্তানে আসবে। আজও সে গুজব বাস্তবরূপে দেখা দেয় নি ঠিকই, কিন্তু ভবিষ্যতে তা বাস্তবে পরিণত হবে কি-না, তা কে বলতে পারে? দেশ বিভাগের ফলে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়েছে—জাতীয় কংগ্রেসকে শক্তিহীন দুর্বল করা হয়েছে। শুধুই কি তাই? ক্ষয়-ক্ষতিও কম হয় নি—জনগণের দুর্ভোগও কম হয় নি। লিওনার্ড মোসলে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে "The Last Days of the British Raj" লিখেছেন—১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসের (স্বাধীনতা লাভের সময়) পর পরবর্তী ৯ মাসের মধ্যে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ থেকে এক কোটি ষাট লক্ষ হিন্দু, শিখ ও মুসলমানকে তাঁদের বাস্তুত্যাগ করতে হয়েছে এবং ঐ সময়ের মধ্যে ছয় লক্ষ লোক নিহত হয়েছেন। এই ছয় লক্ষ লোকের হত্যার এক ভয়াবহ পৈশাচিক বিবরণও তিনি দিয়েছেন। তাঁর ভাষাতেই সেই বিবরণটি তুলে ধরছি—

"But no, not just killed. If they were children, they were picked up by the feet and their heads smashed against the wall. If they were female children, they were raped. If they were girls, they were raped and then their breasts were chopped off. And if they were pregnant, they were disembowelled."

এই বিবরণটা শুধু ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চল সম্পর্কেই দেওয়া। পূর্বাঞ্চলের পূর্ব পাকিস্তানে পরে যেসব ঘটনা ঘটেছে, তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমি ভারতে চলে আসার পরে ১৯৬৪ সালের আগস্ট মাসে "India partitioned and minorities in Pakistan" নামে একখানি বই প্রকাশ করে তাতে কিছু দিয়েছি। চৌদ্দ বছরে পাকিস্তানে থেকে অনেক কিছুই দেখেছি এবং শুনেছি। ভারতে আসাও আমার ৪ বছর হয়ে গেল। এখানেও অনেক কিছুই দেখছি ও শুনছি। "পাক-ভারতের রূপ-রেখা"-য় সেই চিত্রটাই নিরপেক্ষ মন নিয়ে তুলে ধরতে চাই।

প্রত্যাশার মৃত্যু ও দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা

কৃত্তিবাস ওঝা

'কখনও কোন অবস্থাতেই কম্যুনিস্ট তার ব্যক্তিগত স্বার্থ আগে দেখবে না, নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে তাকে জাতি ও জনগণের স্বার্থ স্থাপন করতেই হবে। স্বার্থপরতা, শিথিলতা, দুর্নীতি, নাম কেনার চেষ্টা প্রভৃতি একান্ত ছোট কাজ'—কথাগুলি বলেছেন চীনের নায়ক মাও সে-তুং নির্বাচিত রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে। এই একই সঙ্গে মহান বিপ্লবী লেনিনের একটি কথাও মনে পড়ছে। লেনিন বলেছেন, "ব্যবহারিক কাজ ছাড়া তত্ত্ব বন্ধ্যা এবং তত্ত্ব ছাড়া ব্যবহারিক কাজ অন্ধ। ব্যবহারিক কাজ কম্যুনিজম্-এর মহান তত্ত্বের সমন্বয়ের দ্বারাই সাচ্চা কম্যুনিস্ট হওয়া যায়। মার্কস, লেনিন আর মাও সে-তুং-এর দর্শনগুলি মাঝে মাঝে তুলে ধরতে হয় এই কারণে যে, এই লিপির যারা ধারক (?) ও বাহক (?), তাঁরা সকলেই কমবেশি উক্ত চিন্তা-নায়কদের দর্শনে নিজেরা বিশ্বাসী বলে জাহির করেন ও উক্ত নেতৃবৃন্দের মতবাদের অনুগামী বলে প্রচার করেন। কিন্তু উপরের দুইটি বক্তব্য আর তার পাশে যদি পশ্চিমবঙ্গের মার্কস্-লেনিন- মাও-পন্থীদের কার্যধারা রাখা যায়, তাহলে যে সত্য ধরা পড়বে, তাতে বোঝা যাবে মুখে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যতই মার্কস, লেনিন, মাওপন্থী বলুন কেন, তাদের কার্যধারা বিপরীতমুখী। এই কথাগুলি মনে এল এই কারণে যে, সব আশা শেষ হলেও চরম সময়ে শ্রীমাখন পাল আর শ্রীঅশোক ঘোষ প্রদীপে তেল দিয়ে নিভন্ত পলতেকে আবার প্রজ্বলিত করেছিলেন। দুই ফ্রন্ট হয়ে গেছে, একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াইতে নেমে পড়েছে, কুৎসা আর খেউরের বন্যা বয়ে শহর-গ্রাম ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আর প্রধান শত্রু কংগ্রেস অপেক্ষা বিষোদ্গার চলছে দুর্বলের প্রতি সবলের, সংযতের বিরুদ্ধে বেপরোয়ার, শালীনের প্রতি বাচালের। কোথায় 'স্বার্থের ঊর্ধ্বে জাতি ও জনগণের স্বার্থ স্থাপন', কোথায় 'ব্যবহারিক কাজ আর কম্যুনিজমের মহান তত্ত্বের সমন্বয়' দ্বারা সাচ্চা কম্যুনিস্ট সুলভ কাজ?

আজ পশ্চিমবঙ্গের আকাশ-বাতাস গরম হয়ে উঠেছে নির্বাচনী উত্তাপে। কিন্তু যে উত্তাপে রাজ্যের কংগ্রেসকে খড়কুটোর মত পুড়িয়ে ফেলতে পারতো সেই উত্তাপ আজ বামপন্থীদের নিজেদের ঘর পোড়াচ্ছে, মুখ পোড়াচ্ছে। কিন্তু এমনটি হবার কোন সঙ্গত কারণ বা যুক্তি তো ছিল না—বামপন্থীদের এই "হারিকিরি" নীতি তো দেশের মানুষ চায় নি।

শ্রীমাখন পাল আর শ্রীঅশোক ঘোষের টেলিফোন নিয়ে বসে থাকবার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কেউ জানে না আর জানবার কথাও নয় এই দুই নেতার সেই দিন—প্রতি সেকেন্ড, প্রতি পল অনুপলও কেটেছিল কি উদ্বেগ আর প্রত্যাশায়।

শ্রীঅশোক ঘোষ

চার নেতা—শ্রীমাখন পাল, শ্রীঅশোক ঘোষ, শ্রীজাহাঙ্গীর কবীর, শ্রীনরেন দাস দুই ফ্রন্টের বিরোধ সীমিত রাখতে চারটি সূত্র বের করেছিলেন এবং এই সূত্র চারটি যদি কার্যকরী করা সম্ভব হতো তবে হয়তো সর্বনাশের মধ্যে জীবনের সন্ধান পাওয়া যেতো। সূত্র চারটি ছিল—(১) ২৫শে অক্টোবরের ১৩ দলের সভায় যে প্রার্থী তালিকা পেশ করা হয়েছিল, সেই তালিকা যেন বাড়ানো না হয় এবং কোন দলই যেন বাড়তি কোন আসনে প্রার্থী না দেন। (২) মুক্ত আসনে একে অপরকে যেন সমর্থন করেন। (৩) কোন দল কোন দলের বিরুদ্ধে কুৎসা-মূলক প্রচার করবেন না। (৪) শেষ দিন পর্যন্ত বিরোধ কমাবার চেষ্টায় আলাপ-আলোচনা চালাতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের দুর্ভাগ্য এই চারটি সূত্র গ্রহণ কোনক্রমেই সম্ভব হয় নি। সেই দিন ৩১শে ডিসেম্বরে মাখন পাল আর অশোক ঘোষের টেলিফোন নিয়ে বসে থাকা ব্যর্থ হল এবং সন্ধ্যা ৬টায় শ্রীঅশোক ঘোষ বাংলা কংগ্রেসের দপ্তরে চলে গেলেন গণ-ফ্রন্টের সভায় যোগ দিতে।

৩১শে বাংলা কংগ্রেস দপ্তরে বামপন্থী গণফ্রন্টের সভায় কয়েকটি আসনের জন্য প্রার্থী স্থির করা হল। গণফ্রন্ট গত ১২ই ডিসেম্বর যে তালিকা প্রকাশ করেছিল, সেই তালিকায় কিছু প্রার্থীর নাম শূন্য ছিল। এই সেই শূন্য স্থান পূর্ণ করা হয়। আর দুইটি বাড়তি আসনের জন্য প্রার্থী স্থির হয়। এই দুইটি আসন পূর্বে বিরোধমুক্ত ছিল বলা চলে। প্রথম কেন্দ্র বালী—যেখানে বর্তমান বিধানসভা সদস্য ফ্রন্টে যোগদান করেছেন, আর অপর আসন ময়ূরেশ্বর এখানেও বর্তমান এম এল এ বাম-কম্যুনিস্ট দল ছেড়ে ডান কম্যুনিস্ট দলে যোগদান করেছেন। একটি লোকসভা আসনের জন্য গণ-বাম ফ্রন্টের প্রার্থীর নাম স্থির হয়। এই আসনটি

হল বর্ধমান লোকসভা কেন্দ্রের আসন—বর্তমান সদস্য শ্রী এন সি চট্টোপাধ্যায়। এখানে ফরওয়ার্ড ব্লক সদস্য শ্রীসুবিমান ঘোষকে প্রার্থী দেওয়া হয়। শ্রী এন সি চট্টোপাধ্যায়ের আসনে শ্রীসুবিমান ঘোষকে প্রার্থী দেওয়াতে নানা প্রকার সমালোচনা উঠেছিল এবং অনেকে এই প্রার্থী দেওয়া ভালো চোখে দেখেন নি। কিন্তু অন্য কাহিনী বলবার পূর্বে শ্রীসুবিমান ঘোষকে কেন প্রার্থী দেওয়া হল তার নেপথ্য চিত্রটি তুলে ধরতে চাই। কারণ পরে যে তথ্যগুলি তুলে ধরা হবে তার সঙ্গে এই প্রসঙ্গ স্বতন্ত্র। শ্রীসুবিমান ঘোষ ১৯৫২ সাল থেকে বর্ধমান লোকসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। ১৯৫৭ সালে তিনি কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীদুর্গাপদ চৌধুরীকে পরাজিত করে জয়ী হন। ১৯৬২ সালে কংগ্রেস প্রার্থী জি বাসুর নিকট পরাজিত হন। ১৯৬৪ সালে শ্রীঘোষ নির্বাচনী মামলায় জয়যুক্ত হন এবং শ্রী জি বাসুর প্রার্থী পদ খারিজ হয়ে বর্ধমান লোকসভা আসনে উপ-নির্বাচন হয়। এই উপ-নির্বাচনে স্বতঃই শ্রীসুবিমান ঘোষের প্রার্থী হওয়ার সঙ্গত কারণ ছিল, কিন্তু তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বিরত থাকেন এবং শ্রী এন সি চট্টোপাধ্যায় এই কেন্দ্রে উপনির্বাচনে প্রার্থীরূপে জয়যুক্ত হন। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে বর্ধমানের লোকসভা আসন ভাগ হয়ে দুইটি আসন হয়। একটি কালনা-কাটোয়া অঞ্চল নিয়ে, অপরটি বর্ধমান সদর নিয়ে। কালনা-কাটোয়া অঞ্চলটি বাম কম্যুনিস্ট পার্টির একাধিপত্যের অঞ্চল এবং এই অঞ্চলের একমাত্র পূর্বস্থলী ছাড়া সব আসনে শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার, শ্রীসুবোধ চৌধুরী প্রমুখ বামপন্থী কম্যুনিস্ট নেতৃবৃন্দ নির্বাচিত প্রতিনিধি আছেন। অপরপক্ষে বর্ধমান সদর নিয়ে গঠিত লোকসভা আসনটিতে ফরওয়ার্ড ব্লক, পি-এস-পি, দলত্যাগী কম্যুনিস্ট ও বাংলা কংগ্রেসের মিশ্র প্রভাব আছে। তাই দুইটি আসন হবার পরই শ্রীসুবিমান ঘোষ দাবি করলেন যে, শ্রী এন, সি চট্টোপাধ্যায় যেহেতু বাম-কম্যুনিস্ট দলের সমর্থিত প্রার্থী, তাই তাঁকে কালনা-কাটোয়া অঞ্চলে লোকসভা আসনে প্রার্থী দেওয়া হোক এবং বর্ধমান সদর আসন তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হোক। কিন্তু বামপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি কাটোয়া-কালনা কেন্দ্রে 'স্বাধীনতা' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীসরোজ মুখোপাধ্যায়কে প্রার্থী দিয়ে শ্রী এন, সি চট্টোপাধ্যায়কে বিরোধের আসন বর্ধমান সদরে দাঁড় করিয়ে দিলেন। অর্থাৎ বাম কম্যুনিস্ট দলের নিশ্চিত আসনটি নিজেদের হাতে রেখে শ্রীঘোষের সঙ্গে দ্বন্দ্বে নামাতে শ্রী এন, সি চট্টোপাধ্যায়কে বর্ধমানে বদল করে দিলেন। এই দিকে ফরওয়ার্ড ব্লকের পক্ষ থেকে যখন সার্বিক ঐক্যের কথা চলছিল তখন ফরওয়ার্ড ব্লক শ্রীঘোষকে প্রার্থীরূপে মনোনয়ন দিতে অস্বীকার করলেন এবং শ্রীঘোষ দল থেকে পদত্যাগ করে বসলেন। ফরওয়ার্ড ব্লক দলের সকল প্রকার চাপ অগ্রাহ্য করে এবং শ্রীসুবিমান ঘোষের মত একজন প্রবীণ নেতাকে হারাবার ঝুঁকি নিয়ে বাম ঐক্যের স্বার্থে চুপ করে ছিলেন। কিন্তু সার্বিক ঐক্য যখন হল না এবং অপর পক্ষে যখন বেপরোয়াভাবে দলের বিরুদ্ধে প্রার্থী দিয়ে চলেছেন, এমন কি শ্রীহেমন্ত বসুও যখন এই আক্রমণ থেকে রেহাই পেলেন না, তখন শ্রীসুবিমান ঘোষকে প্রার্থী দিতে ফরওয়ার্ড ব্লক স্বীকৃত হল।

শ্রীমাখন পাল

বামপন্থী গণফ্রন্ট ৩রা জানুয়ারী তাদের দ্বিতীয় দফা প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে একটা হৈ হৈ পড়ে গেল। ইতিমধ্যে বাম কম্যুনিস্ট দলের নিজস্ব মুখপত্র প্রকাশিত হয়েছে। এই মুখপত্রের পৃষ্ঠা ভরে গেল গণফ্রন্টের বিরুদ্ধে উন্মত্ত জেহাদে। এইবার আবার নূতন করে আর একটা আওয়াজ উঠলো বিরোধ সম্প্রসারিত হয়েছে, বিরোধ সম্প্রসারিত হচ্ছে কিন্তু নানা আওয়াজে আর ডামাডোলে আজ অনেককেই খেই হারিয়ে ফেলতে হচ্ছে—সত্যিই বিরোধের সম্প্রসারণ কে করছে আর ঐক্য হল না কি কারণে। ঐক্য হল না কেন সেই সম্পর্কে লেখক ইতি-পূর্বে প্রকৃত সত্য পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। এবার দেখা যাক বিরোধ সম্প্রসারণে সত্যই কার দায়িত্ব বেশি। বামপন্থী গণফ্রন্ট ১২ই ডিসেম্বর তাদের প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করার পর দ্বিতীয় দফায় প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করে ৩রা জানুয়ারী। কিন্তু সংযুক্ত ফ্রন্ট ফ্রন্টগত হিসেবে গত ১৯শে ডিসেম্বর ও ২৮শে ডিসেম্বর দুইবার গণবামফ্রন্টের বিরুদ্ধে বিশেষ সম্প্রসারণের অভিযোগ করে এবং ৩রা জানুয়ারী বিবৃতি দিয়ে আরো প্রার্থী দেবার হুমকি দেয়, কিন্তু এই হুমকি ফ্রন্টগতভাবে নিতান্তই হুমকি ছিল আর ফ্রন্টের অভ্যন্তরে ১৯শে ডিসেম্বর থেকেই বামপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে ক্রমাগত প্রার্থীসংখ্যা বাড়াবার চাপ সৃষ্টি করা হতে থাকে। ১৯শে তারিখের সংযুক্ত ফ্রন্টের সভাতেই বাম কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে ৯টি কেন্দ্রে প্রার্থী অনুমোদনের জন্য চাপ পড়ে। এই কেন্দ্রগুলি হল শ্রীহীরেন মুখোপাধ্যায়, শ্রীহেমন্ত বসু শ্রীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্রসহ অন্য কয়েকটি কেন্দ্র। কিন্তু প্রকৃত খেলা অন্যত্র সুরু হয়েছে অনেক আগেই। সংযুক্ত বামপন্থীফ্রন্ট আরো আসনে প্রার্থী দেবে এই ঘোষণা করে—৩রা জানুয়ারী আর ৪ঠা জানুয়ারী সন্ধ্যায় ফ্রন্টকে পরোয়া না করে লাজলজ্জার মাথা খেয়ে শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত ২৫টি বিধানসভা, আর ৪টি লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে দেন। সংযুক্ত ফ্রন্ট যেখানে একদিন আগে বলছে—'আমাদের প্রার্থীতালিকা বিকল্প সরকারের কর্মসূচীর সঙ্গে প্রকাশ করা হবে' তার একদিন পরে সন্ধ্যার অন্ধকারে গণশক্তি পত্রিকায় কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত পশ্চিমবঙ্গের আরো কয়েকটি বিধানসভা ও লোকসভার আসনে পার্টির প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছেন'। অনেকে চিন্তা করতে পারেন বামপন্থী গণফ্রন্ট যখন ১৯টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে তাহলে তার প্রতিক্রিয়ায় বুঝি বাম কম্যুনিস্ট পার্টি এই তালিকা প্রকাশ করেছে। তাই হয়ত বলা যায় গণফ্রন্ট 'জল ছিটিয়ে লগির গুঁতো খেয়েছেন' কিন্তু নেপথ্যচিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত। গণফ্রন্ট ২৯টি আসনে প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করেছে ৩রা জানুয়ারী আর বামপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি তাদের প্রার্থীতালিকার অনেক আগে থেকেই বিভিন্ন বিরোধমুক্ত আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছেন। সামান্য দুই-একটি নজীর মাত্র এইখানে উপস্থিত করছি। তাহলে দেখা যাবে, গণবামফ্রন্ট যখন হয়ত অতিরিক্ত প্রার্থীর কল্পনা করেন নি, তখন শ্রীজ্যোতি বসু, শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত, শ্রীসমর মুখোপাধ্যায় বিভিন্ন কেন্দ্রে তাঁদের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছেন। কেউ হয়ত বলবেন, না, সংযুক্তফ্রন্ট ১২ই জানুয়ারী তাদের

তালিকা প্রকাশ করেছে। এই কথা নির্জলা অসত্য। কারণ যে নামগুলি নিয়ে বাম কম্যুনিস্ট পার্টি ১৯শে ডিসেম্বর থেকে ফ্রন্টের অভ্যন্তরে চাপ দিচ্ছিল, সেই নামগুলি তারা প্রথমে বিভিন্ন কেন্দ্রে একতরফা ঘোষণা করেছে, ৪ঠা জানুয়ারী একক দলের নামে ঘোষণা করেছে আর ১২ই জানুয়ারী শুধুমাত্র ফ্রন্টের সভায় তাদের মহান কাজকে অনুমোদন করিয়ে নিয়েছে। এই অনুমোদন না করলেও বাম কম্যুনিস্ট পার্টির কিছু এসে যেতো না। কারণ তারা জানে, তারা যে কাজ করেছে সেই কাজ সুবোধ বালকের মতো শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনরেন দাস শুধু মেনে নেবে না বাহবা দিয়ে বলবে "আহা বেশ বেশ"। তাই ১২ই জানুয়ারীর বহু আগে ৩১শে ডিসেম্বরের আগে ৩রা জানুয়ারীর আগে, ৪ঠা জানুয়ারীর আগে ২৫শে ডিসেম্বর নিউ বারাকপুর অগ্রগামী সঙ্ঘের মাঠে এক সভায় শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত খড়দহ কেন্দ্রে শ্রীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসনে শ্রীসাধন চক্রবর্তীকে প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করেন। ২৫শের সভার ৪ দিন আগে সারা খড়দহ এলাকায় যে লিফলেট বিলি করা হয়, তাতে সপ্তবামফ্রন্টের প্রার্থী শ্রীসাধন চক্রবর্তীর সমর্থনে জনসভা অনুষ্ঠানের কথা ছিল, আর লেখা ছিল—"কংগ্রেসী দুঃশাসন ধ্বংস করুন, ডাঙ্গেপন্থী বিভেদনীতি পরাস্ত করুন"। বক্তা—প্রমোদ দাশগুপ্ত, মহম্মদ ইসমাইল। লিফলেটের প্রচারক ছিলেন, "বিকলকান্দা লোকাল কমিটি"-র শ্রীনির্মল মজুমদার। এই উপলক্ষে যে পোস্টার পড়ে তাতে প্রথম দেখা যায় একটি নূতন বক্তার নাম—"বক্তা কমরেড যোগেন মণ্ডল"। ২৫শের পর ২৬শে। ২৬শে ডিসেম্বর ১০ই পৌষ সিঙ্গুর বিধানসভা কেন্দ্রে বাবুর ভেড়িহাটতলায় এক জনসভার শ্রীসমর মুখোপাধ্যায় এই কেন্দ্রে ডাঃ গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করেন। সিঙ্গুর কেন্দ্রের এই সভার প্রচার সুরু হয় পাঁচদিন আগে। এরপর আসুন ১৯শে জানুয়ারী। ১৯শে জানুয়ারী বনগ্রাম টাউন হল ময়দানে আর নলহাটা হাটখোলায় জনসভায় শ্রীজ্যোতি বসু বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রে শ্রীযোগেন মণ্ডলকে ডাঃ রণেন সেনের বিরুদ্ধে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেন। ডাঃ রণেন সেন কলকাতা পূর্ব লোকসভা আসনে দুইবার জয়যুক্ত হয়ে বারাসাতে কেন্দ্র পরিবর্তন করে আসেন। কারণ এই আসনে দুইবার শ্রীভবানী সেন প্রার্থী ছিলেন এবং এই কেন্দ্রে অন্য কোন দলের দাবি ছিল না। কিন্তু কপাল যায় সঙ্গে। এই দুই সভাতে শ্রীজ্যোতি বসু বাংলার রাজনীতিতে চিরকালের অচ্ছুৎ, পাকিস্তানের প্রাক্তনমন্ত্রী দেশ ভাগের অন্যতম নায়ক, যুক্ত বঙ্গজননীর জঠরের লজ্জা বলে কুখ্যাত ব্যক্তিকে প্রথম জাতে তুললেন। শ্রীজ্যোতি বসু শ্রীযোগেন মণ্ডলকে পরিচিত করিয়ে বলেন, "রিপাবলিকান পার্টি নিপীড়িত মানুষের দল আর তাদের আমরা সাম্প্রদায়িক মনে করি না, সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট ও কম্যুনিস্ট পার্টি শ্রীযোগেন মন্ডলকে সমর্থন করবে"। হায়! পশ্চিমবঙ্গের জননেতা শ্রীজ্যোতিবাবু, আপনার দলের কাছে ডাঙ্গেপন্থীরা অচ্ছুৎ, ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ, শ্রীঅজয় মুখার্জী, শ্রীহেমন্ত বসু অচ্ছুৎ—আর শ্রীযোগেন মন্ডল হলেন নিপীড়িত মানুষের নেতা। কোন কথা না বলে শুধু যদি সাদা বাংলায় বলা যায় "শালুক চেনে গোপাল ঠাকুর" তাহলে বোধ হয় অপরাধ হবে না। এর পর আরো আছে। ২রা জানুয়ারী বিদ্যাসাগর কেন্দ্রে ডাঃ নারায়ণ রায়ের সমর্থনে কেশব সেন স্ট্রীটে অনুষ্ঠিত এক সভায় শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের উপস্থিতিতে শ্রীহীরেন মুখার্জীর বিরুদ্ধে শ্রীঅমিয়ভূষণ চক্রবর্তীকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানানো হয়।

এই সামান্য কয়েকটি নজীর থেকেই বোঝা যায় সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট অথবা সংযুক্ত বামপন্থী গণফ্রন্ট যখন কোন প্রার্থীর কথা ঘোষণা করা দূরে থাক, কখনো করে নি, তার আগেই বাম কম্যুনিস্ট পার্টি একের পর এক কেন্দ্রে বিরোধমুক্ত আসনে প্রার্থী দিয়েছে, প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে, সরকারীভাবে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করার অনেক আগেই তথাকথিত প্রার্থীর পক্ষে প্রচারের নামে মাঠে নেমেছে—এই সত্যগোপন রাখা সম্ভব নয়।

কিন্তু শেষ এইখানেই নয়। সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট যে একটি নামকোওয়াস্তে সংগঠন এবং বাম কম্যুনিস্ট দলের নির্বাচনী যুদ্ধের মুখোশমাত্র সেই কথা বহুভাবে প্রমাণিত হয়েছে। কোথায় ১২ই জানুয়ারী সংযুক্ত ফ্রন্টের তালিকা প্রকাশ, আর কোথায় ২০শে ডিসেম্বর থেকে একের পর এক কেন্দ্রে প্রার্থী-তালিকা ঘোষণা ও প্রচার অভিযান সুরু। এর দ্বারাই বোঝা যায় বাম কম্যুনিস্ট পার্টি নিজেও যেমন জানে তারা যে কাজই করুক না কেন ফ্রন্টভুক্ত দলগুলির দুই বাহু তুলে তালিম দেওয়া ছাড়া একটু জোরে নিশ্বাস পর্যন্ত ফেলবার বুকে বল নেই। অন্য সব দল সম্পর্কে এই মনোভাবের সৃষ্টি কোন অসঙ্গত কারণে হয় নি। তার পেছনে অনেক যুক্তি আর দর্শন আছে। বাম কম্যুনিস্ট পার্টি যখন ফ্রন্টের পরামর্শ না নিয়ে ফ্রন্টের শরিকদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে একের পর এক কেন্দ্রে দস্যুতা শুরু করে, তখন সম্ভবত একমাত্র আর-এস-পি'র শ্রীমাখন পালই একটু অস্বস্তি প্রকাশ করেছিলেন এবং পরে যে দুইদিন ফ্রন্টের সভায় তালিকা অনুমোদন মুলতুবী থাকে, সেটাও আর-এস-পি'র শ্রীমাখন পাল ও শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কারণে। শ্রীযতীন চক্রবর্তী তো ক্ষেপে গিয়ে দু-চারটে বেফাঁস কথাও এই সময় বলেছিলেন, তবে ভাব ভুলবার নয়। কিন্তু তখনও বোধ হয় অনেকে জানতেন না, বাম কম্যুনিস্ট দলের প্রার্থী দেওয়া শেষ হয় নি, ফ্রন্টকে কলা দেখিয়ে তাঁরা আরো প্রার্থী দেবেন। বর্ধমানের "ভাতার" কেন্দ্রে বর্তমান এম-এল-এ, শ্রীঅশ্বিনী রায় সম্ভবত স্বপ্নেও ভাবেন নি তাঁর কেন্দ্রে বাম কম্যুনিস্টরা প্রার্থী দেবে, পাঁশকুড়ায় শ্রীমতী গীতা মুখোপাধ্যায় সম্ভবত কল্পনাও করেন নি একজন কংগ্রেসী বাম কম্যুনিস্টদের সমর্থন নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন, মালদায় শ্রীশচী রায় সম্ভবত স্বপ্নেও ভাবেন নি খাঁটি গান্ধীবাদী, গান্ধী স্মারকনিধি সদস্য ও ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের ঘনিষ্ঠ অনুচর শ্রীসুবোধ মিশ্র বাম কম্যুনিস্ট সমর্থনে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন। জোড়াসাঁকোর শ্রীগীতেশ শর্মা ২০শে জানুয়ারীর সন্ধ্যার আগেও জানেন নি তাঁর বিরুদ্ধে বাম কম্যুনিস্ট পার্টি প্রার্থী দেবে,—কারণ মাত্র দুইদিন আগে শ্রীগীতেশ শর্মাকে ডেকে আলিমুদ্দিন স্ট্রীটে শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত ৪০ মিনিট ধরে যে কথা বলেছিলেন তারপর আর কোন ব্যক্তির বিশ্বাস করা সম্ভব নয় যে, শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত যখন শ্রীগীতেশ শর্মাকে বাজিয়ে দেখছিলেন, তখন তাঁর পাশের ঘরেই শ্রীগীতেশ শর্মার ভাবী প্রতিদ্বন্দ্বী মুখ টিপে হাসছিল,—শ্রীগীতেশ শর্মার সঙ্গে শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের যে ৪০ মিনিট কথা হয়েছিল—ঠিক সেই ধরণের কথা হয়েছিল শ্রীজ্যোতি বসুর সঙ্গে শ্রীঅমিয়নাথ বসুর। সব কথা বলবার আগে শ্রীজ্যোতি বসু আর শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের শ্রীগীতেশ শর্মার সঙ্গে ও শ্রীঅমিয় বসুর সঙ্গে গোপন আলাপের কথাগুলি শোনাতে চাই।

[ক্রমশঃ]

সোনার আনারস

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

মূল্য ঃ দুই টাকা

কিশোর-কিশোরীদের উপযুক্ত রোমাঞ্চকর উপন্যাস। ছাপা, বাঁধাই চমৎকার।

উপহার দিবার মত বই

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

বঙ্গদর্শন

ভারতবাসীর, বিশেষ করে বাঙালীর, মানসরাজ্যের যিনি প্রধান অধীশ্বর সেই নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন ২৩শে জানুয়ারী বাংলা দেশের সর্বত্রই সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়েছে। দেশবাসীর কাছে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পরিচয় নতুন করে দেবার কোন প্রয়োজন নেই, বীর্যের প্রতিমূর্তি হিসাবে সমাজের সকল শ্রেণীর মনে তাঁর স্মৃতি আজও অম্লান। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর গৌরবময় অবদানের কথা দেশবাসীর মনে আজও স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে, যদিও সমকালীন ইতিহাসে তাঁকে অস্বীকার করার প্রবণতাও পর্যাপ্ত। নেতাজী যে কংগ্রেসের নেতৃত্বকে অস্বীকার করেছিলেন, সেই জ্বালা আজও পর্যন্ত শাসককুলের মন থেকে বিদূরিত হয় নি। প্রসঙ্গত, খুবই দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ে এই বছরেই যে নেতাজীর মূর্তি স্থাপনের কথা ছিল, নানান স্বার্থের ও উদ্দেশ্যের চাপে তা ঘটে উঠল না। যাঁদের বিরুদ্ধাচরণের ফলে নেতাজী সুভাষের স্মৃতি এভাবে অপমানিত হচ্ছে তাঁরা নিঃসন্দেহে জনসাধারণের ধিক্কারের পাত্র।

২৫শে জানুয়ারী তারিখটিও বাংলা দেশের আর একটি বরেণ্য সন্তানের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত, যিনি হচ্ছেন বিপ্লবী ও চিন্তানায়ক মানবেন্দ্রনাথ রায়। যাঁর বিপ্লবী জীবন রোমাঞ্চকর উপন্যাসের চেয়েও বিচিত্র এবং কার্ল মার্ক্সের পরে রাজনৈতিক তথা দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে যিনি নবদিগন্তের উন্মোচন করেছেন, সেই মানবেন্দ্রনাথকে আমরা বিস্মৃতির অতল গহ্বরে ফেলে দিয়েছি, এটা খুবই লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়।

২৬শে জানুয়ারী ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস। এই দিনটিতেই আমরা আমাদের গণতান্ত্রিক সংবিধান গ্রহণ করেছি এবং ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ যা পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র। দুঃখের বিষয়, এই গণতান্ত্রিক জীবনবোধ আমাদের মর্মে আজও প্রবেশ করে নি, যার জন্য আমাদের বর্তমান নেতৃত্বই একমাত্র দায়ী। গণতন্ত্র কখনো ক্ষুধিত জনসাধারণের জীবনদর্শন হতে পারে না। বিরাট দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে জর্জরিত আপামর জনসাধারণ যে পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের নাগরিক হিসাবে গর্ববোধ করে না এ অপরাধ তাঁদের নয়। তদুপরি কাগজে-কলমে গণতান্ত্রিক সংবিধান মেনে নিলেও আমাদের নেতারা কোন গণতান্ত্রিক নজীর সৃষ্টি করেন নি। গণতন্ত্র একটি সর্বাঙ্গীণ জীবনদর্শন, কাজেই সর্বস্তরে যদি তা অনুভূত না হয়, তাহলে তা সত্যই দুঃখের বিষয় হয়ে ওঠে। এই কারণেই, যাঁরাই শাসক থাকুন না কেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে নিবেদন এই যে, তাঁরা তাঁদের চিন্তা, কর্ম ও আচরণের দ্বারা এমন নজীর সৃষ্টি করুন, যাতে দেশের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জেগে ওঠে। তা না হলে প্রজাতন্ত্র দিবসের তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাবে না।

* * *

বর্তমান সপ্তাহটি বিগত সপ্তাহের মতই একই বৈচিত্র্যহীন ঘটনার ছকে বাঁধা, শুধু সংবাদ একটিই যে রেশনের চালের মাথাপিছু পরিমাণ সপ্তাহে ৩৫০ গ্রাম থেকে ৪০০ গ্রামে উন্নীত হয়েছে। আরও একটি সংবাদ এই যে গত কয়েক সপ্তাহের নতুন খাদ্যনীতির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার বেসরকারীভাবে কালোবাজারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভাবখানা হচ্ছে এই যে, নিজেরা যখন চাল যোগাতেই পারছি না, তখন যদি কালোবাজারকে একটা ইনফরমাল স্বীকৃতি দিয়ে দেওয়া যায় এবং যদি চোরাচালান ধরার কাজটাকে শিথিল করে দেওয়া যায়, আহলে আপাতত কিছুকাল বিক্ষোভের মুখে ছাই পড়বে। এ অবস্থাটা ইলেকসান পর্যন্ত টানতে পারলেই চলবে, তারপরে কি হবে সেটা আর ভাবার দরকার নেই।

কলকাতা শহরের সেই দুটি গতানুগতিক বিষয় আজও পর্যন্ত একই অবস্থায় পড়ে আছে। তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে প্রেসিডেন্সি কলেজ। মাসের পর মাস গড়িয়ে চলল অথচ এ সমস্যার কোন সমাধানই হবার লক্ষণ দেখা গেল না। শিক্ষামন্ত্রী মশাই তো সাফ বলে দিলেন যে দরকার হলে প্রেসিডেন্সি কলেজ তুলেই দেবেন। এই রকম দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি একজন মন্ত্রী পর্যায়ের ব্যক্তির কাছ থেকে কোন কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ আশা করতে পারে না। এঁরা শুধু তুলে দিতে আর ভাঙতেই শিখেছেন, গড়তে কিছুই পারেন নি।

এরপর ট্রামের কথা অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে। ট্রামের চাকা আর ঘুরবে বলে মনে হচ্ছে না। এদিকে কলকাতায় পরিবহন সমস্যা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। প্রাইভেট বাসগুলির মাথায় চেপে লোক যাচ্ছে, বাম্পারে দাঁড়িয়ে লোক যাচ্ছে। এগুলি যে কত বিপজ্জনক তা কল্পনা করা যায় না। আকস্মিকভাবে ব্রেক কষলেই বাসের মাথা থেকে ছিটকে পড়া অনিবার্য, আর বাম্পারে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় যে কোন মুহূর্তে পিষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে। ট্রাফিক আইনেও এইসব জায়গায় চড়ে যাওয়া নিষিদ্ধ, শুধু নিষিদ্ধ নয়, শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অথচ পুলিশের চোখের সামনে তা হচ্ছে, কোন দিক থেকেই কারো কিছু বলবার নেই। এখনো যে এই কারণে কোন রকম দুর্ঘটনা ঘটে নি তার জন্য বোধহয় কলকাতা শহরের সামগ্রিক পুণ্যফলই দায়ী।

একটা এত বড় শহরের পরিবহন ব্যবস্থায় এই নৈরাজ্যবাদ দেখে সরকার যে কি করে চুপ করে থাকতে পারেন সেটা ভেবেই পাওয়া যায় না। কোন সভ্যদেশের সরকারই এতখানি, "ক্যালাস" নয়। আমরা পূর্বে বার বার বলেছি যে একমাত্র ট্রাম কোম্পানীর জাতীয়করণের দ্বারাই বর্তমান পরিবহন সমস্যার অনেকখানিই মেটানো যায়। সরকার গোড়ার দিকে খুব তড়পে ছিলেন ট্রাম কোম্পানীকে উদ্দেশ্য করে, কিন্তু তখনই আমরা বলেছিলাম যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যতখানি গর্জান ততখানি বর্ষণ না। ট্রাম কোম্পানীর বিরুদ্ধে কোনরকম ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে অক্ষম হবেন সেটা আগেই বোঝা গেছল। কলকাতা শহরের পরিবহন সমস্যা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, অথচ সকল তরফই নীরব।

প্রতিটি দিন যাচ্ছে, আর নির্বাচন ততই এগিয়ে আসছে, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে এখনো নির্বাচনী উত্তাপ তেমন সঞ্চারিত হয় নি। এ নিয়ে জনসাধারণের বেশির ভাগ অংশই মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন বোধ করছেন না। গত সংখ্যায় লিখেছিলাম যে আগামী সংখ্যা থেকে পশ্চিমবঙ্গের একটা নির্বাচনী সমীক্ষা করব। সেই কথামত বর্তমান সংখ্যা থেকে তা শুরু করা গেল।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক-নির্বাচনী সমীক্ষা—(১)

বর্তমান সপ্তাহের মধ্যেই নির্বাচন-প্রার্থীদের একটা সামগ্রিক তালিকা প্রকাশিত হবে, আশা করা যায়। কিন্তু আজ বঙ্গদর্শন লেখার সময় পর্যন্ত সে তালিকা প্রকাশিত হয় নি। অথচ আর বেশি দেরি করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না, তার কারণ আর বেশি দেরি করতে গেলে কুলিয়ে উঠতে পারা যাবে না, যেদিন বর্তমান সংখ্যাটি প্রকাশিত হবে তারপর থেকে বোধ হয় নির্বাচন পর্যন্ত তিনটি সপ্তাহও অবশিষ্ট থাকবে না।

গত ১৯৬২ সালের নির্বাচনের একটি সামগ্রিক সমীক্ষা করেছিলেন শ্রীযুক্ত আর কে ভাসিল, এবং সেই সমীক্ষাটি ইনস্টিটিউট অফ পলিটিকাল এন্ড সোসাল স্টাডিস কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান আলোচনার অনেক তথ্যই উপরি-উক্ত পুস্তক থেকে সংগৃহীত হয়েছে, সেইজন্য আগের থেকেই ঋণ স্বীকার করছি।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬২ সালের নির্বাচনে ১ কোটি ৮০ লক্ষ ভোটারদের মধ্যে প্রায় ১ কোটি ভোটার ভোট দিয়েছিলেন। অর্থাৎ মোট ৫৫·৩% ভোট গতবারে বাক্সে পড়েছিল। ১৯৫৭ সালের তুলনায় ১৯৬২ সালের পোলিং-এর হার অনেক কম। ১৯৫৭ সালে ভোটদাতাদের সংখ্যা শতকরা ৬৮·৮%, যা ১৯৬২-র চেয়ে অনেক বেশি। ১৯৫৭ সালে ১৫,২১৬,৫৩২টি ভোটের মধ্যে ১০,৪৬৯,৮০৩টি ভোট দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ১৯৬২ সালে ১৭,৯৭০,০০০টি ভোটের মধ্যে মাত্র ৯,৯৪১,৫৮৫টি ভোট বাক্সে পড়েছিল। শতকরা ১৩·৫ ভাগ ভোট কমে যাওয়া মোটেই তাৎপর্যহীন ব্যাপার নয়। ১৯৫৭ সালের নির্বাচন জনসাধারণের মধ্যে যে উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে ১৯৬২-র নির্বাচন তা করতে পারে নি, তার একমাত্র কারণ দেশের বৈষয়িক অবস্থার ক্রমাগত অবনতি, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ঝঞ্ঝাট এবং ব্যয় বৃদ্ধি, সর্বাত্মক অবক্ষয়ের ও নৈরাশ্যের ব্যাপকতা ইত্যাদি। বিগত পাঁচ বছরে এগুলি আরও বেড়েছে। এবং এই নৈরাশ্যের বৃদ্ধি যত বেশি ঘটবে ততই জনসাধারণ ভোটদানের প্রতি আস্থা হারাবে। ১৯৬৭-র নির্বাচনে কাগজে-কলমে ভোটার ১৯৬২-র চেয়ে অনেক বেশি, কিন্তু আশঙ্কা হয় পূর্বের তুলনায় আরো অনেক কম ভোটদাতা এবারে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে। ৬৮·৮% থেকে ৫৫·৩%-এ নেমে এসেছে ১৯৬২-তে, এবারে কমপক্ষে আরও ১০% পোলিং কমবে। আমরা আগেই দেখিয়েছি যে এবারে নির্বাচনী আবহাওয়া মোটেই উত্তপ্ত হয় নি, জনসাধারণের মধ্যে অনাগ্রহের চিহ্ন ব্যাপকভাবে স্পষ্ট।

১৯৬২ সালের নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য ছিল নেতিমূলক ভোটদান (ব্যাপারটা পরে বুঝিয়ে বলছি), সাম্প্রদায়িক ও দক্ষিণ-পন্থী দলগুলির মোটামুটিরকম উচ্ছেদ, এবং কমিউনিস্ট পার্টির উল্লেখযোগ্য শক্তি-বৃদ্ধি। নেতিমূলক ভোটদান ব্যাপারটা

উপরে : কুচকাওয়াজরত আজাদ হিন্দ ফৌজের নারীবাহিনী (ঝান্সীবাহিনী)
নীচে : নারীবাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করছেন নেতাজী

কি? এর অর্থ হচ্ছে শাসকদলকে পরাজিত করার জন্য যে কোন বিরোধী দলকে ভোট দেওয়া সেই দলের আদর্শ ও কর্মপদ্ধতির কোন খোঁজখবর না রেখেই। বস্তুত ভারতীয় ভোটদাতাদের এটাই প্রধান বৈশিষ্ট্য, অমুক দল বা ব্যক্তিকে জেতাতে হবে কিংবা হারাতে হবে, তার পক্ষে বা বিপক্ষে আমি অন্ধের মত ভোট দেব, ভেবেও দেখব না সত্যই তার জেতার বা হারার কোন প্রয়োজন আদৌ আছে কি না। এই ধরণের মনোভাব বিশেষ করে গড়ে উঠেছে এই কারণে যে বর্তমান শাসকদল অযোগ্যতার এমন একটি নজীর তৈরি করেছে যে, তাকে হটানোর জন্য তার চেয়েও প্রতিক্রিয়াশীল পার্টিকে ভোট দিতেও শিক্ষিত ব্যক্তিরও অরুচি হয় না। তবে সুখের বিষয় এই যে, ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ এই নেগেটিভ ভোটিং-এর ব্যাপারে একটু বেশি ক্রিটিক্যাল।

সাম্প্রদায়িক ও দক্ষিণপন্থী দলগুলি ১৯৬২-র নির্বাচনে তেমন সুবিধা করতে পারে নি, বরং চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়েছে। জনসংঘ ও হিন্দুমহাসভা ১৯৬২-র নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভায় একটি আসনও সংগ্রহ করতে পারে নি। জনসংঘ পেয়েছিল মোট ৪০,৮৯৭টি ভোট। অর্থাৎ সমগ্র ভোটের ০·৪২% ভাগ। সর্বভারতীয় বলে পরিচিত এই পার্টির ব্যর্থতা সত্যই দেখবার মত। গত নির্বাচনে হিন্দুমহাসভা পেয়েছিল ৭৫,০৭৩টি ভোট, অর্থাৎ মোট ভোটের ০·৭৯% ভাগ। এমন কি মালদহ জেলায়, যেখানে গত ভোটের আগে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হয়েছিল, সেখানেও হিন্দুমহাসভা বিশেষ কোন সুবিধা করতে পারে নি। এবারের আসন্ন নির্বাচনে ভারতের অন্যত্র জন-সংঘের প্রভাব বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এই দল কোন-রূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারবে বলে মনে হয় না, যদিও গতবারের তুলনায় এবারে তারা বিধান সভায় অনেক বেশি প্রার্থী দিয়েছে। গো-হত্যা বন্ধের ইস্যুটি পশ্চিমবঙ্গে মাঠে মারা গেছে। তথাপি, কর্পোরেশনের একটি উপনির্বাচনের ফল দেখে যা মনে হয়, এবারে তারা হয়ত দু' একটি আসন সংগ্রহ করতে পারবে।

পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম জনসংখ্যার পরি-মাণ শতকরা ১৯ ভাগ, যারা রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। মোটামুটি হিসাব করলে তাদের সংখ্যা মুর্শিদাবাদে ৫৫%, মালদহে ৩৭%, পশ্চিম দিনাজপুরে ৩০%, কুচবিহারে ২৮%, বীরভূমে ২৬%, চব্বিশ পরগনায় ২৫% এবং নদীয়ায় ২৩%। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে কোন মুসলিম রাজনৈতিক দল গত নির্বা-চনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নি। ১৯৫৭-তে বিভিন্ন দলের মুসলিম প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৯৯ জন, ১৯৬২ সালে তা বেড়ে হয়েছিল ১২৪ জন। নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে যে মুসলমান প্রার্থীরা ১৯৫৭ ও ১৯৬২ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন তাঁদের সংখ্যা দুবারই ছিল ৫৯ জন। ১৯৫৭-র নির্বাচনে কংগ্রেসের মুসলিম প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ২৮ জন ১৯৬২-তে তা বেড়ে হয়েছিল ৩৩ জন, কমিউনিস্ট পার্টির ৮ জন থেকে বেড়ে হয়েছিল ১৩ জন, প্রজা সোসালিস্ট পার্টির ৪ জন থেকে ৮ জন, স্বতন্ত্র, আর-এস-পি, সোসালিস্ট ও ফরোয়ার্ড ব্লকের ১৯৫৭-র নির্বাচনে কোন মুসলিম প্রার্থী ছিল না, ১৯৬২-র নির্বাচনে তারা প্রার্থী দিয়ে-ছিল যথাক্রমে ৭, ২, ১ এবং ১ জন।

১৯৫৭-এ মুসলিম প্রার্থীরা সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন ৯৭২,৬৪৮টি ভোট মোট ভোটের শতকরা ৯ ভাগ, ১৯৬২-তে তা বেড়ে হয়েছিল ১,০৬৪,৫৮৯টি ভোট অর্থাৎ সমগ্র ভোটের শতকরা ১১·১ ভাগ। অপরপক্ষে ১৯৫৭ সালের নির্বা-চনে যেখানে জয়ী হয়েছেন ২৭ জন সেখানে ১৯৬২-তে জয়ী হয়েছেন ২৮ জন। ১৯৫৭ সালে মুর্শিদাবাদ থেকে ২৪ জন মুসলমান প্রার্থীর মধ্যে ৮ জন জয়ী হয়েছিলেন, ১৯৬২-তে ৩৩ জনের থেকে মাত্র ৭ জন। এ থেকে বোঝা যায় এই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাটিতে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচনের গণ্ডী সঙ্কুচিত হয়ে আসছে, অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিবর্তন হচ্ছে সেটা খুবই স্বাস্থ্যকর বিষয়। মালদহে যেখানে মুসল-মানদের সংখ্যা মুর্শিদাবাদের পরেই, সেখানেও দেখা যাচ্ছে যে ১৯৫৭ সালে যেখানে ৯ জনের মধ্যে ৩ জন নির্বাচিত হয়েছিলেন সেখানে ১৯৬২ সালে ১২ জনের মধ্যে ২ জন মাত্র নির্বাচিত হয়ে-ছেন। পক্ষান্তরে, যে সমস্ত এলাকা মুসলিম প্রধান নয় সেইসব জায়গাতে মুসলিম প্রার্থীরা তুলনামূলক বিচারে অধিকতর সংখ্যায় নির্বাচিত হয়েছেন, যেমন ২৪ পরগনায়। মেদিনীপুর থেকে ১৯৫৭ সালে কোন মুসলিম নির্বাচিত হন নি কিন্তু ১৯৬২ সালে হয়েছেন। এ থেকে এটুকু সিদ্ধান্ত করা যায় যে মুসলিম ভোটারদের যথেষ্ট মানসিক পরিবর্তন হয়েছে এবং এই পরিবর্তনের লক্ষণ আরও বেশি করে প্রতিভাত হবে ১৯৬৭-র নির্বাচনে।

একমাত্র সাম্প্রদায়িক দল যা বিশুদ্ধ সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনেই উদ্ভূত তা হচ্ছে গোর্খা লীগ। মোটামুটি দার্জিলিং জেলাতেই এই দলটির আধিপত্য। এই জেলাটির বিধান সভার আসন ছিল মোট পাঁচটি। ১৯৫৭-র নির্বাচনে এই দল মাত্র একটি আসন সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিল, ১৯৬২-র নির্বাচনে তাদের আসন সংখ্যা আরও একটি বাড়ে। ১৯৬২-র নির্বাচনে দার্জিলিং জেলায় গোর্খা লীগ সর্বাধিক সংখ্যক ভোট সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়। গোর্খা লীগ পেয়েছিল ৩৮,০৭৬টি ভোট যেখানে কংগ্রেস পেয়ে-ছিল ৩৭,৮৬০টি।

১৯৬২-র নির্বাচনে এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গে চরম দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির কোন স্থান নেই। স্বতন্ত্র পার্টি ১৯৬২-র নির্বাচনে পশ্চিম-বঙ্গে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। বিহার, রাজস্থান ও গুজরাটে যে দলটি প্রধান বিরোধী দল পশ্চিমবঙ্গে সেই দলের বরাতে গত নির্বাচনে কয়েক সহস্র ভোটও জোটে নি।

কলকাতা উন্নয়ন পরিকল্পনা

কলকাতার দীর্ঘদিনের নানান জটিল রোগ সারানো নিতান্তই দুরূহ ব্যাপার। এর জন্য দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী উভয়বিধ পরিকল্পনার প্রয়োজন দীর্ঘ-দিন ধরেই অনুভূত হচ্ছিল। কলকাতার সামগ্রিক উন্নয়ন সম্বন্ধে সি-এম-পি-ও যে চতুর্মুখী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে তা গ্রন্থাকারে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

আগামী ১৯৮৬ সালের মধ্যে কল-কাতার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় এক কোটি তেইশ লক্ষে দাঁড়াবে এটা ধরে নিয়েই এই পরিকল্পনা রচিত হয়েছে। এতে কলকাতা শহরের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও যথোচিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা ইত্যাদি জোরদার করার কথা বলা হয়েছে। পরি-কল্পনার তৃতীয় স্তরে কলকাতা শহর, প্রস্তাবিত হলদিয়া বন্দর, আসানসোল-দুর্গাপুরের শহরতলী এবং উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ির বাণিজ্য কেন্দ্রগুলির আশু উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বস্তি উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ গড়ে তোলার সুপারিশ করা হয়েছে। তা ছাড়া আছে শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়গুলি। এই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মধ্যে পানীয় জল সরবরাহ, বাসস্থান, পরিবহন, পয়ঃ-প্রণালী প্রভৃতি ব্যবস্থার উন্নয়নের সুদূর-প্রসারী ব্যবস্থা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বস্তুত কলকাতার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য এই ধরণের পরিকল্পনা এই প্রথম। বর্তমানে কলকাতা শহর এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের কেন্দ্রস্থল এই কলকাতা শহরের উন্নতির উপর ভারতের ভবিষ্যতও নির্ভরশীল।

সুভাষচন্দ্র ও বাংলার বিপ্লবীরা

অনন্ত সিংহ

যদি কর্পোরেশনের প্রধান-কর্মসচিব ফৌজদারী অপরাধে অপরাধী বলে গণ্য হয় তবে মেয়রও সেই একই দোষে দোষী নিশ্চয়ই—*"If love of country is a crime, I am a criminal. If the Chief Executive Officer is a criminal, the Mayor is a criminal also."*

বাংলার লর্ড লিটন্, ১৯২৪ সালে ৩নং রেগুলেশন ও অর্ডিন্যান্সের সাহায্যে বিপ্লবীদের বন্দী করল এবং সেই একই সঙ্গে কর্পোরেশনের প্রধান-কর্মসচিব (Chief Executive Officer) সুভাষচন্দ্রকেও যখন বিনা বিচারে কারাকক্ষে নিক্ষেপ করল তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কলকাতা কর্পোরেশনে মেয়রের আসন থেকে উচ্চকণ্ঠে ও কঠোর ভাষায় সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন।

বাংলার লাট লর্ড লিটন্ ১৯২৪ সালের ২৫শে অক্টোবর বিনা বিচারে আটক করবার জন্য অর্ডিন্যান্স জারী করলেন। সেইদিন সারা বাংলা থেকে আমাদের চুরাশি জনকে বিনা বিচারে বন্দী করে কারারুদ্ধ করা হ'ল। সেই একই দিনে ভোর রাত্রে সুভাষচন্দ্র, অনিলবরণ, সত্যেন মিত্র, গণেশ ঘোষ প্রমুখ বিশেষ বিশেষ ক'জনকে Bengal Ordinance-এ গ্রেফ্‌তার না করে কর্তৃপক্ষ ভারতরক্ষা তিন নম্বর রেগুলেশন অনুসারে বন্দী করা বাঞ্ছনীয় মনে করে। তাই বিনা বিচারে সুভাষচন্দ্রকে কারারুদ্ধ করার বিরুদ্ধে দেশবন্ধুর প্রতিবাদ বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল—"যদি সুভাষচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম অপরাধ হয় তবে আমিও অপরাধী।"

১৯২২ সালে বৃটিশ সরকারের দমন-নীতিতে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন যখন ব্যর্থতায় পরিণত হ'ল, তখন বাংলাদেশের তরুণদের হাতে আবার বোমা-পিস্তল গর্জন করে ওঠে। বিপ্লবী সমিতির কার্যকলাপ ও প্রস্তুতির ঝাঁঝঃ রেল কোম্পানী ও পোস্ট অফিসের টাকা লুঠ হতে লাগল। গুপ্ত-পুলিশ বিভাগের সাব-ইন্সপেক্টার প্রফুল্ল রায় অনন্ত সিংকে গ্রেপ্তার করবার অপরাধে বিপ্লবীদের হাতে নিহত হলেন। নাগরখানা পাহাড়ে পুলিশের সঙ্গে খন্ডযুদ্ধ, গোপীনাথের পিস্তলের গুলীতে সার চার্লস টেগার্ট ভ্রমে মিঃ আর্নেস্ট ডে-র মৃত্যু প্রভৃতি বৃটিশ সরকারকে শঙ্কিত করে তুলল।

ক্ষুব্ধ জনতা চৌরিচোরাতে পুলিশ ঘাঁটি আক্রমণ করে পুলিশদের হত্যা করে। গান্ধীজী এতে অত্যন্ত বিচলিত হলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি "বরদলই" প্রস্তাব পাশ করলেন। অসহযোগ আন্দোলন যখন তীব্ররূপ গ্রহণ করে এগোতে যাচ্ছে তখন প্রস্তাব পাশ হ'ল—অহিংস অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ কর। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে যেমন বিপ্লবীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, তেমনি আবার দেশবন্ধুর নেতৃত্বে ও সুভাষচন্দ্রের সহযোগিতায় স্বরাজ্য পার্টি গড়ে উঠেছে। বঙ্গীয় জেলা ও প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিতে বিপ্লবীরা খুব শক্তিশালী হয়ে উঠল। দেশবন্ধুর সঙ্গে বাংলার তরুণ বিপ্লবীদের, ১৯০৮ সালের আলিপুর মামলার সময় থেকে, ঐতিহাসিক যোগাযোগের কথা সকলেরই জানা আছে। ১৯২২ সালে দেশবন্ধুর দক্ষিণ হস্ত—সুভাষচন্দ্র স্বভাবতই বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। ধরে নেওয়া যায় স্বরাজ্য পার্টি তখন বাংলার বিপ্লবীদের এক অংশের প্রকাশ্য সংগঠন ছিল। স্বরাজ্য পার্টির প্রকাশ্য সংগঠন ও গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির পরস্পরের যোগাযোগ ও নির্ভরশীলতা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে যে অত্যন্ত ত্রস্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পুলিশের গোপন দলিল থেকে এই মর্মে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। দলিল থেকে উদ্ধৃত করছি:—

2. 1922.

Terrorists represented in Bengal Provincial Congress Committee and All India Congress Committee—

"The Chouri Choura massacre followed in February 1922. The Working Committee then passed the famous Bardoli resolution suspending mass disobedience. This and the imprisonment of Mahatma Gandhi caused a lull in the non-co-operation movement. The extremist party, however, which had no faith in the non-violent cult, was steadily increasing. In Bengal this section was composed of terrorists who succeeded in capturing a large number of seats in the Executive Committee of the various District Congress Organisations and became represented in the Bengal Congress Executive Committee and the All India Congress Committee. They made several attempts to commit the Bengal Congress Committee to a violent programme."

(R. E. A. Ray Special Superintendent, I.B., C.I.D., The 25th January 1932. Page I).

পুলিশের বক্তব্য বাংলাদেশের বিপ্লবীরা জেলা কংগ্রেস কমিটির বহু সভ্যপদ অধিকার করে এবং প্রাদেশিক ও নিখিল ভারত কমিটিতেও তাঁদের প্রচুর আসন লাভ হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে বিপ্লবীরা সহিংস প্রোগ্রাম গ্রহণ করবার জন্য বার বার চেষ্টা করেছে। বলা বাহুল্য, বাংলা কংগ্রেসে যুগান্তর পার্টি দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রেখে চলত।

১৯২২ সালে গয়া অধিবেশনে কংগ্রেস কর্মী ও নেতারা বিভক্ত হয়ে গেল। শ্রীরাজাগোপালাচারী প্রমুখ নেতারা "no-changer হিসেবে গান্ধীজীর নেতৃত্বের অনুরক্ত ছিলেন। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে সেই সময় কংগ্রেসের আর একটি অধিবেশনে স্বরাজ্য পার্টি গঠন করা হ'ল। মতিলাল নেহরু, এন, সি, কার্লেকার প্রমুখ নেতারা ১৯১৯ সালের ভারত সরকারের

অ্যাক্ট অনুযায়ী কাউন্সিল বর্জন না করে ভোটযুদ্ধে কাউন্সিল অধিকার করা সাব্যস্ত করলেন। ১৯১৯ সালের অ্যাক্ট অনুসারে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের পূর্বাহ্নে স্বরাজ্য পার্টি ১৯২৩ সালে ম্যানিফেস্টো মারফৎ ঘোষণা করল যে যদি তারা এসেম্ব্লি ও কাউন্সিলে অধিকসংখ্যায় আসন লাভ করে তবে তারা "Uniform, Continuous and Consistent" ভাবে (সমান তালে; নিরবচ্ছিন্নভাবে ও সংগতির সঙ্গে) কাউন্সিলে ও এসেম্ব্লিতে ঘোর প্রতিরোধ সৃষ্টি করবেন। দ্বিতীয়ত যদি তাঁরা ১৯১৯ সালের অ্যাক্টের গ্রহণযোগ্য পরিবর্তন সাধন করতে অপারগ হন তবে গান্ধীজীর ডাকে আবার আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দেবেন।

১৯২৩ সালের কাউন্সিলে ও কেন্দ্রীয় এসেম্ব্লিতে স্বরাজ্য পার্টি সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নানা আইন প্রণয়ন বিষয়ে ও বাজেট পাশ করার ব্যাপারে সফলতার সঙ্গে প্রবল বাধার সৃষ্টি করে। স্বরাজ্য পার্টির কাউন্সিল ও এসেম্ব্লির আভ্যন্তরীণ শক্তি ও বিপ্লবী দলের সঙ্গে দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্রের সংযোগ সম্বন্ধে বাংলাদেশের পুলিশ বিভাগ বিভীষিকাপূর্ণ অবস্থা বলে মনে করেছে। তারা কিরূপে এই বৈপ্লবিক সম্পর্ককে বিনষ্ট করবার জন্য বেপরোয়া হয়ে তিন নম্বর রেগুলেশন প্রয়োগ করেছে তার বিবরণ পুলিশের গুপ্ত নথি থেকেই পাওয়া যায়—

"3. 1923: Terrorists support Mr. C. R. Das's 'Swarajya Party', in return for Mr. C. R. Das's connivance at the secret conspiracy—

In 1923 Congress ranks in Bengal were torn by faction over the question of Council entry which Mr. C. R. Das and his Swarajya Party were sponsoring. Mr. C. R. Das was supported by the terrorists without whose help he could never have won his victory for Council entry over the non-changer. It is known that the leader of the Swarajya Party was aware that his terrorist-allies were engaged in criminal conspiracy. It is also known that his connivance at it was the price that the terrorists demanded for their support which was essential to his success in elections. Government attacked this conspiracy by arresting the ring leaders under Regulation III. Most of them were members both of the terrorist party, known as the 'Jugantar Party' and of the Swarajya Party. The Swarajya Party immediately accused Government of using Regulation III to crush the Swarajya Party and demanded the *repeal* of Regulation III and the release of the persons arrested under it. It is interesting to record therefore that in 1923 it was noticed that the Headquarters of both parties in Calcutta were at one and the same place."

(Secret, Page I, 12th Jan. 1932 by R. E. A. Ray, Special Superintendent, I.B., C.I.D.)

তদানীন্তন বৃটিশ নিয়ন্ত্রিত বাংলা সরকারের Political Secretary কর্তৃক যদি এই সম্বন্ধীয় কোন document বা নথিপত্র মুদ্রিত হয়ে থাকে তবে তা কূটনৈতিক ভাষায় প্রণীত হয়েছে। কিন্তু উপরের পুলিশ বিভাগের secret document থেকে বৃটিশ সরকারের স্বরাজ্য পার্টি ও বৈপ্লবিক দলের ঐক্যের বিরুদ্ধে জঘন্য চক্রান্তের নগ্ন স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়। তারা লিখেছে—

"Government attacked this conspiracy by arresting the ring leaders under Regulation III. Most of them were members both of the terrorist party known as 'Jugantar Party and of the Swarajya Party."

১৯১৯ সালের বিধি অনুযায়ী কাউন্সিল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা কি conspiracy—ষড়যন্ত্র?

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকার ১৯১৯ সালের Montegu-Chemsford Reform আইনে পাশ করে নিয়ে তথাকথিত "আইনসভা" (কাউন্সিল) সরকারভজা Liberals-দের (উদারপন্থীদের) নিয়ে পরিচালিত করার আশা পোষণ করেছিল। দুটি বছর, ১৯২০-২২ সাল, ইংরেজ শাসক অবাধে উদারপন্থীদের সমর্থনে ভারতবর্ষ শাসন করেছে। কিন্তু ১৯২৩ সালের নির্বাচনে স্বরাজ্য পার্টি কাউন্সিল ও এসেম্ব্লির অধিক সংখ্যক ভোট অধিকার করে। তাদের "obstructionist policy"তে সরকার ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। সেই সময় দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে বাংলার বিপ্লবী দলের এক অংশের ঘনিষ্ঠ বৈপ্লবিক সম্পর্কের বিষয় পুলিশের অজানা ছিল না। পুলিশের সেই ইংরেজীতে মুদ্রিত secret document থেকে পাওয়া যায়—

"Early in 1925 a prominent member of the Congress party admitted during an interview with a high Government Official that HE knew personally of the existence in Bengal of a terrorist movement, the members of which, were hand in glove with the Swarajist." (Ibd: P. 2, Para. 5).

ঘরের শত্রু বিভীষণের অভাব নেই। পুলিশের এই গুপ্ত রিপোর্টে সেই বিশ্বাসঘাতক কংগ্রেসীর নাম সযত্নে গোপন রাখা হয়েছে। জানি না সেই কংগ্রেসী আজও নেতা হিসেবে বেঁচে আছে কি না এবং জীবিত অবস্থায় বর্তমানে কোন একটি কংগ্রেসী মন্ত্রীপদের শোভাবর্ধন করছে কি না!

১৯২৩ সালে স্বরাজ্য পার্টি ও বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ বৈপ্লবিক সম্পর্ক—যা তখন সরকারের বিরুদ্ধে Revolutionary Strategy (বৈপ্লবিক রণনীতি)—সেইটিকে সেই সময় বৃটিশ নিয়ন্ত্রিত পুলিশের কাছে গোপনে প্রকাশ করা গুরুতর অপরাধ—নিকৃষ্টতম দেশদ্রোহিতা! কিন্তু সেইদিন বাংলার বিপ্লবী দলের সঙ্গে দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্রের যে নিবিড় সম্বন্ধ ছিল সেই ঐতিহাসিক তথ্য বর্তমানে যদি জানা না যায় তবে স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবময় অপরিহার্য অধ্যায় রচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

সুভাষচন্দ্র ১৯২১ সাল থেকে বিপ্লবীদের তাঁর কর্মজীবনে বেছে নিয়েছিলেন, আর বিপ্লবীরাও সুভাষের সংস্পর্শে এসে বৈপ্লবিক সংগঠন সুদৃঢ় করতে সুযোগ পেলেন। Morning shows the day! ভোরের আলো আগত দিনের রেখাপাত করে! সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন, খদ্দর ও চরকার মহিমা এবং গান্ধীজীর অহিংসা ধর্মের মধ্যে জন্মলাভ করে নি। তাঁর বলিষ্ঠ রাজনীতির প্রথম প্রভাত দীপ্ত ও উদ্ভাসিত হয়েছে ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, যতীন মুখার্জী ও শত শহীদের রক্তসিঞ্চিত বাংলার মাটিতে। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এক আকস্মিক ঘটনা নয়—এই বৈপ্লবিক সম্পর্ক—স্বদেশপ্রেমের চরম স্বার্থত্যাগ, সাহসী ও

নিরহঙ্কার প্রেরণার স্বাভাবিক প্রকাশ। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চির সমাধি রচনার জন্য সুভাষচন্দ্র আপোষহীন বিপ্লবের সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করলেন বাংলার প্রবীণ ও তরুণ বিপ্লবীদের সঙ্গে সাংগঠনিক যোগসূত্র স্থাপন করে।

পুলিশের সেই একই গোপন মুদ্রিত নথি থেকে উদ্ধৃত করছি—

"....In 1924 the terrorist members of the Swarajya party supported the candidature of Mr. Subhas Chandra Bose as Chief Executive Officer of the Corporation and it is note-worthy that after his appointment to that post many jobs in the Corporation were given to terrorists."

সরকারী মহল তাদের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিপ্লবীদের সঙ্গে সুভাষের গভীর বৈপ্লবিক সম্পর্কের ব্যাখ্যা এর চাইতে বেশি করতে পারে নি। তখন কি বৃটিশ সরকার নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের "দিল্লী চল" অভিযানের ইতিহাস কল্পনা করতে পেরেছিল?

মিঃ আর্নেস্ট ডে, স্যার টেগার্ট ভ্রমে গোপীনাথ সাহার পিস্তলের গুলীতে প্রকাশ্য দিবালোকে চৌরঙ্গীর প্রশস্ত রাস্তার উপর নিহত হলেন। ১৯২৪ সালের ১লা মার্চ গোপীনাথ ফাঁসীর মঞ্চে মরণের জয়গান গেয়ে গেল—"আমার প্রতিটি রক্তবিন্দু ঘরে ঘরে স্বাধীনতার বীজ বপন করবে।"

সেই দিন বিকেলে গোপীনাথের ফাঁসীর প্রতিশোধ নিতে আমি ও দেবেন দে ফুটবল খেলার মাঠে, পুলিশ গ্রাউণ্ডে, অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ কমিশনার মিঃ কিড্‌কে হত্যা করবার জন্য হরিদার (হরিনারায়ণ চন্দ্র) অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সেই সময় হরিদার কোন এক গোপন আশ্রয়ে আমি, দেবেন ও গোপীনাথ একসঙ্গে থাকতাম ও তাঁর নির্দেশ মতই তখন আমরা চলতাম। গোপীনাথের ফাঁসীর দিন জনসাধারণের কাছে বিলি করবার জন্য হরিদা আমাদের নিজস্ব ছোট্ট গোপন প্রেসে তরুণ বিপ্লবী বাংলাকে আহ্বান জানিয়ে প্রচারপত্র ছাপালেন। প্রচারপত্র বিলি করা হলো কিন্তু মিঃ কিড্ আমার ও দেবেনদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেলেন—সেই দিন কিড্ সাহেব তাঁর ১০০ নম্বরের গাড়িখানা পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখে অন্য গাড়িতে চলে গেলেন। সুভাষচন্দ্র সেই সময় দেশবন্ধু ও স্বরাজ্য পার্টির ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা—Forward-এর প্রধান পরিচালক ও কর্মসচিব। সেইদিন সকালে গোপীনাথের শবদেহ আনবার জন্য সুভাষচন্দ্র জেল গেটে যান। গোপীনাথের শবদেহ নিয়ে কোন মিছিল করবার অনুমতি দিতে সরকার অস্বীকার করল। জেল গেট থেকে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে সুভাষ সোজা Forward দৈনিক সংবাদপত্র অফিসে ফিরে এলেন। কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন তাঁর 'সুভাষচন্দ্র' গ্রন্থটিতে লিখেছেন—"তাঁর অফিসঘরে দেওয়ালে টাঙানো একখানা ভারতবর্ষের মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন আর গুন্‌গুন্ করে গান গাইছেন—"তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি"। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে যখন চাইলেন, তখন সে মূর্তি দেখে আমি চমকে উঠলাম। সারা মুখে কে যেন সিন্দুর লেপে দিয়েছে। অনেকক্ষণ ধরে গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদলে যেমন মুখের চেহারা হয় ঠিক তেমনি। দু'চোখের কোণায় জল।.........সুভাষবাবু আবেগকম্পিত গম্ভীরকণ্ঠে বললেন—গোপীনাথ সাহার ফাঁসী হয়ে গেল, জেলের গেট থেকেই বরাবর এখানে এসেছি।"

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

শহীদ গোপীনাথের প্রাণদান, বাংলার তরুণদের মধ্যে বিপ্লবী প্রেরণা জাগাল। বিপ্লবী বাংলা—সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কনফারেন্সে গোপীনাথের প্রতি শ্রদ্ধা জানাল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সভাপতির আসন হ'তে গান্ধীপন্থীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান জানিয়ে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—"আমি শহীদ গোপীনাথের স্বদেশপ্রেমের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রস্তাব করছি যদি কারও বাধা দেওয়ার শক্তি থাকে তবে বাধা দিন......" স্বদেশের জন্য গোপীনাথের চরম স্বার্থত্যাগ ও আত্মদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রস্তাব পাশ হলো। তারপর আবার ১৯২৪ সালের ১লা জুন কংগ্রেস অধিবেশনে দেশবন্ধু জন্মভূমির জন্য গোপীনাথের চরম স্বার্থত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রস্তাব

উপস্থিত করতে চাইলেন। গান্ধীজী খুব বিরক্তি প্রকাশ করলেন ও সেইরূপ কোন প্রস্তাব আনবার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ জানালেন। তবু দেশবন্ধু এই বিষয়ে এক সংশোধনী প্রস্তাব আনলেন—

"This Committee while denouncing and dissociating itself from violence and adhearing to the principle of non-violence, appreciates Gopinath Saha's ideal of self sacrifice, misguided though it is, in respect of the country's best interest and expresses respect for his self sacrifice."

এই সংশোধনী প্রস্তাব গান্ধীজীর বিরোধিতায় মাত্র আট ভোটের জন্য পরাজিত হলো।

তবু বৃটিশ সরকার শঙ্কিত হয়ে উঠল পাছে ক্রমে ক্রমে কংগ্রেস বিপ্লবী নেতৃত্বের প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে। বৃটিশ সরকারী মহল সেইজন্য দেশবন্ধু ও সুভাষের প্রতি ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হয়ে উঠল। তাদের গোপন নথিতে উল্লেখ পাওয়া যায়—

"at the Swarajya Congress Conference Mr. C. R. Das with the help of terrorist supporters succeeded in passing his Hindu-Moslem pact resolution enlogising Gopinath Saha, the assassin of Mr. Day, which was a clear incitement to the youth of Bengal to follow that assassin's example."

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ দু'শ বছর ধরে আমাদের দেশের উপর বসে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে যে অত্যাচার, নিপীড়ন ও হত্যালীলার তাণ্ডব চালিয়েছে তাদের সেই নির্লজ্জতার সীমা অতিক্রম করে বলছে—হত্যাকারী গোপীনাথ! বিপ্লবী বাংলার তরুণ দল প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মূলে আঘাতের পর আঘাত হানতে প্রস্তুত। বিভীষিকাগ্রস্ত হতবুদ্ধি বৃটিশ সরকার সন্ত্রস্ত ও ভীত হয়ে ১৯২৪ সালে ordinance (বিনা বিচারে আটক আইন) পাশ করল।

পুলিশের সেই একই গোপন নথিতে পাওয়া যায়—

"—The terrorists continued their criminal conspiracies during the year, and the matter was so imminent that the Government found it necessary to promulgate in 1924 Ordinance. Many terrorists among whom there were also many Congress workers were arrested. The Swarajya party immediately accused Government of deliberately attacking not the terrorists but the Swarajists, and many meetings were held all over Bengal under the auspices of the Bengal Provincial Congress Committee at which prominent leaders of the Swarajist party enlogised assassins."

১৯২৪ সালে ২৬শে অক্টোবর লর্ড লিটনের আমলে আমিও বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হয়ে বর্ধমান জেলে আছি। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে বাংলার বিপ্লবীদের সম্পর্ক তখনও আমি প্রত্যক্ষভাবে কিছু জানতাম না। জেলে বসে এই প্রথম দেশবন্ধুর বক্তৃতা কাগজে পড়ি—"ঘুম থেকে উঠে শুনতে পাই চারিদিকে শিকল ঝন্‌ঝনা আর দেখতে পাই জেলের অভিযান!" অন্তরে তীব্র জ্বালা নিয়ে কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়রের আসন থেকে তাঁর ক্রুদ্ধ কণ্ঠের প্রতিবাদ জেল প্রাচীরের অভ্যন্তরে প্রতিধ্বনিত হতে শুনতে পাই—

"If the Chief Executive Officer is a criminal, the Mayor is a criminal also."

সেইদিন সুভাষচন্দ্রের প্রতি আমার বৈপ্লবিক শ্রদ্ধা জানাই। তখন বুঝতে পারলাম প্রবীণ নেতাদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের যোগসূত্র আছে।

১৯২৫ সালের ১৬ই জুন দার্জিলিং-এ দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণে বাংলাদেশ শোকে মুহ্যমান। সুভাষচন্দ্র তখন বর্মায় মান্দালা জেলে কারারুদ্ধ হয়ে আছেন। বহু বিপ্লবী বিনা বিচারে জেলে ও গ্রামে আটক বন্দী হয়ে দিন কাটাচ্ছেন। বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাময়িক অবসাদ ও হতাশা হয়ত দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সেই প্রতিকূল অবস্থায় স্বরাজ্য পার্টির নেতৃত্বের ভার পড়ল দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের সবল স্কন্ধে। পুলিশের নথি অনুসারে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনও বাংলার বিপ্লবীদের সমর্থন করে গেছেন।

সেই একই secret Police Document থেকে উদ্ধৃত করছি—

"After Mr. C. R. Das died in June, Mr. J. M. Sengupta, his successor, pursued the same policy with terrorists... The terrorists depended on the financial support of the Swarajya party. It is thus clear that the Swarajya party and the terrorists were interdependent and were component parts of the same revolutionary machine...."

বৃটিশ সরকার ও পুলিশের চোখে স্বরাজ্য পার্টি ও বাংলার বিপ্লবীদল অবিচ্ছেদ্যভাবে একই সংগঠন—একে অপরের উপর নির্ভরশীল। ১৯২৬ সালে বাংলা কংগ্রেসে কর্মীসঙ্ঘের প্রাধান্য ছিল। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন তাঁদের সঙ্গেও সমঝোতা করে চলবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি পদ পরিত্যাগ করেন। মেদিনীপুরবাসী দেশনেতা বি, এন, শাসমল দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের স্থলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্বাচিত হন।

বাংলার লাট লর্ড লিটন, বহু অত্যাচারের নিদর্শন রেখে ইংলণ্ডে ফিরে গেলেন। তাঁর স্থলে বাংলা দেশের শাসন দায়িত্ব নিয়ে এলেন স্যার স্ট্যান্‌লী জ্যাক্‌সন। নতুন লাট দায়িত্ব গ্রহণ করবার কিছুদিনের মধ্যে সুভাষচন্দ্রকে বিনা শর্তে মুক্তি দিলেন। কর্মীসঙ্ঘ তদানীন্তন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি বি, এন, শাসমলকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে এবং ১৯২৭ সালে সুভাষচন্দ্রকে সভাপতি পদে নির্বাচিত করবার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করে।

সরকারের গুপ্ত দলিল থেকে প্রাপ্ত তথ্যটি এইরূপ—

"In August J. M. Sengupta compromised with the Karmi-Sangha....and appointed 12 of them in the Executive Committee of the Congress. In December he resigned and was succeeded as President of the Bengal Congress Committee by Mr. B. N. Sasmal who nominated only four Karmis to the Executive Committee. ....In 1927, however, the Karmi Sangha were able to force Mr. B. N. Sasmal to resign, and of 60 members of the new Executive Committee 20 were terrorists. The Karmi Sangha agreed to work under the Congress with Subhas Bose, who succeeded Mr. B. N. Sasmal as President."

সুভাষচন্দ্র ১৯২৭ সালে বঙ্গীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন।

সময় বাংলার বিভিন্ন দলের বিপ্লবীরাও কারামুক্ত হয়ে সুভাষচন্দ্রের চারপাশে জড় হতে লাগলেন। বলা বাহুল্য বাংলা দেশে বিপ্লবীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিলেন। জেলের বাইরে তাঁদের মধ্যে প্রতিযোগিতা—অনেক ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে শত্রুতাও লেগে ছিল। কিন্তু বৃটিশ সরকারের রাজরোষে বিপ্লবীদের জেলে বন্দী হওয়া পক্ষান্তরে একটি আশীর্বাদ। সাময়িকভাবে হলেও জেলে বসে সর্বভারতের বিপ্লবী দায়িত্ব সম্বন্ধে বিরাট ও ব্যাপক চিন্তা তাঁদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি ও মনোভাবের পরিবর্তনে বহুল পরিমাণে সাহায্য করেছে। জেলের বাইরে এসে সারা বাংলার বিপ্লবী দল সুভাষের নেতৃত্বে একত্র ও সংঘবন্ধ হয়ে কাজ করবার চেষ্টা করল।

সেই একই সরকারী গোপন তথ্য থেকে আমরা জানতে পারছি—

"At this time there was an agreement between Subhas Bose and the terrorists that the latter should run the Bengal Provincial Congress Committee under his guidance. They drew up a scheme for a Worker's League, the basis of which was complete independence. This scheme was discussed at the Madras Congress of 1927 and the Bengal Revolutionary Group persuaded Pandit Jawaharlal Nehru to move the Independent resolution which was however defeated by Mr. Satyamurti's amendment."

১৯২৭ সালে মাদ্রাজ কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপিত করার পিছনে বাংলার বিপ্লবীদের প্রচেষ্টা ছিল। মাদ্রাজ কংগ্রেস অধিবেশনে বাংলার বিপ্লবীরা যে কাজ সম্পন্ন করতে পারেন নি তা' পরের বছর ১৯২৮ সালে সম্পূর্ণ করতে চাইলেন। তাঁরা কলকাতা কংগ্রেস সমাবেশে সুভাষের নেতৃত্বে আরও সক্রিয় ও সঙ্ঘবন্ধভাবে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাশ করবার জন্য সর্বতোভাবে সচেষ্ট হলেন। ১৯২৮ সালের জাতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠানের পূর্বে সকলেই জেল ও অন্তরীণ হ'তে মুক্তি পেলেন। বাংলার বিপ্লবীরা প্রায় সমস্ত দল নির্বিশেষে সাময়িকভাবে হলেও সুভাষের নেতৃত্বে সঙ্ঘবন্ধ হয়ে "Independence League" গঠন করলেন।

সারা বাংলায় তথা সারা ভারতে সুভাষের নেতৃত্বে সঙ্ঘবন্ধ বাংলার বিপ্লবী দল এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগাল। এই প্রথম ১৯২৮ সালের কংগ্রেস অধিবেশনের সময় সম্পূর্ণ নতুন ধরণের বিরাট স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী সুভাষের নেতৃত্বে গঠন করা হ'ল। এর পূর্বাবধি সব কংগ্রেস অধিবেশনেই স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠিত হয়েছে। এতদিন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদল বলতে আমরা বুঝতাম—মাথায় খদ্দরের গান্ধী টুপি, গায়ে ছোট-হাতা ও কম ঝুলের পাঞ্জাবী, মালকোচা দিয়ে হাঁটু পর্যন্ত ধুতি পরা ও খালি পা—এই রকম এক যুবকদল।

কলকাতার এই কংগ্রেস অধিবেশন সারা ভারতে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষ ঘটাবার জন্য ভলাণ্টিয়ারবাহিনী গঠনের পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন আনলো। সৈনিকের বেশে খাকী পোষাকে সুসজ্জিত এক হাজারেরও বেশি ভলাণ্টিয়ারের একটি বাহিনী গঠন করা হল। অফিসাররাও বৃটিশ সামরিক অধিনায়কদের মত uniform পরলেন। অশ্বারোহী ও মোটর সাইকেল দলও গঠন করা হল। তাদের হাতে ছিল না কেবল বন্দুক—নইলে বৃটিশ সৈন্যদের সঙ্গে এই এক হাজার কংগ্রেস ভলাণ্টিয়ারবাহিনীর আর কোন পার্থক্যই ছিল না। সুদূরপ্রসারী বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সুভাষের নেতৃত্বে বৃটিশ সামরিক বাহিনীর model-এ এই "বাংলা ভলাণ্টিয়ার ব্রিগেড" গঠন করা হয়েছিল। গান্ধীপন্থী কংগ্রেসীরা সামরিক বাহিনীর অনুকরণে এইরূপ ভলাণ্টিয়ার দল গঠন করাকে তখন নানাভাবে উপহাস করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শত্রু এইরূপ সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও বৃটিশ সৈন্যের অনুকরণে সুসজ্জিত এই বিরাট ভলাণ্টিয়ার দলকে ভবিষ্যতের এক অশুভ লক্ষণ মনে করে যে চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিল তার কিঞ্চিৎ সাক্ষ্য তাদের গোপন নথিতে পাওয়া যায়। নিম্নে সেই secret document থেকে উদ্ধৃত করছি:—

"Early in 1928 the Bengal Terrorist Party formed the Independence League for India and determined to capture the Bengal Provincial Congress Committee, in which they had largely succeeded by the end of the year, and formed a Congress Volunteer Corps called the Bengal Volunteers, which they intended to be their fighting force when the rising was brought about. Binoy Bose, Dinesh Gupta and Sudhir Dutta, the assassins of Colonel Simpson in 1930, were members of this Corps in Dacca, which was indeed largely, if not entirely composed of terrorists."

সর্বসম্মতিক্রমে সুভাষচন্দ্র এই ভলান্টিয়ার বাহিনীর সর্বাধিনায়ক G. O. C. —General - Officer - Commanding, নিযুক্ত হলেন। তিনি এই গুরুদায়িত্ব নিজ স্কন্ধে তুলে নিলেন। ভারতের কংগ্রেস ইতিহাসে সর্বপ্রথম বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর অনুকরণে সুভাষের এই ভলান্টিয়ার দল যাদের কাছে উপহাসের বস্তু ছিল, তারাই চোদ্দ বছর পরে আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিযান দেখে, নিজেদের মূর্খতার জন্য যে লজ্জা অনুভব করেছে তাতে কোন সন্দেহ ছিল না! Bengal Volunteer-এর অনুকরণে চট্টগ্রামে আমরাও এক সুসজ্জিত ও সুসংগঠিত ভলান্টিয়ার দল গঠন করি। চট্টগ্রামে যুববিদ্রোহের দিন পর্যন্ত শহরে সামরিক বেশে আমরা ঘোরাফেরা করেছি এবং এই সুযোগ নিয়ে আমরা পাহারাদার সেপাইদের বিভ্রান্ত করে বৃটিশ অস্ত্রাগার আক্রমণ করি ও চট্টগ্রাম শহর দখল করে অস্থায়ী বিপ্লবী গণতন্ত্র সরকার স্থাপন করতে সমর্থ হই।

আমাদের বিরুদ্ধে মামলার যে রায় দেওয়া হয়েছে তা থেকে একটু উদ্ধৃত করছি—

"In December, 1928, the All India Session of the Congress was held in Calcutta, which was attended by Ambika Chakrabarti, Surjya Sen, Nirmal Sen, Ananta Lal Singh, Harigopal Bal and Tarakeswar Dastidar (another absconding accused). At this Congress numerous volunteers were in evidence, wearing Khaki military uniform and commanded by Subhas Bose and Jatin Das wearing the uniform of military officers. The prosecution suggestion is that these Chittagong visitors after witnessing this display of psendo-militarism returned home filled with a spirit of emulation which was soon to be translated into practice. (P.W. 149)".

আমিও কলকাতা কংগ্রেস সমাবেশে যাই। জেল থেকেই অবশ্য সংঘবন্ধ যুব-

বিদ্রোহের একটি পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে এসেছিলাম। তবু সামরিক সজ্জায় সজ্জিত সুভাষের নেতৃত্বে "বেঙ্গল ভলান্টিয়ারের সুবিশাল বাহিনী আমার চোখের সামনে ভবিষ্যতের এক রঙিন বাস্তব স্বপ্ন সৃষ্টি করেছিল। এর আগে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না—তাঁকে সামনা সামনি দেখিও নি। খবরের কাগজে দেখেছি তাঁর বিভিন্ন ছবি। এই প্রথম সুভাষকে G.O.C. বেশে বিশাল ভাবী সৈন্যবাহিনীর পুরোভাগে দেখলাম। রণবেশে সুভাষের যেরূপ অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও নির্ভীক সৈনিক-রূপ ফুটে উঠেছিল তা প্রাণভরে দেখলাম—স্বাধীন ভারতের সর্বাধিনায়কভাবে মনে মনে সুভাষকে কল্পনা করে যেন গর্বে অন্তর ভরে উঠল। সেইদিন ভবিষ্যৎ স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী সৈনিকের প্রধান সেনাপতির অসামান্য নির্ভীক ব্যক্তিত্ব অবলোকন করে অন্তরে বিপ্লবী স্পন্দন অনুভব করেছি। রণবেশে অশ্বপৃষ্ঠে সুভাষ! সূর্যের আলো এসে পড়েছে তাঁর চোখে-মুখে—দৃপ্ত উদ্ভাসিত তাঁর চোখ-মুখ জ্বলজ্বল করছে! বিপ্লবী বাংলার সেনাপতি এই কংগ্রেস অধিবেশনেই পূর্ণ স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

মতিলাল নেহরু ১৯২৮ সালের কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি। সুভাষচন্দ্র ও জওহরলাল নেহরু বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে একত্র হয়ে স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করবার জন্য তোড়জোড় করতে লাগলেন। গান্ধীজী পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করলেন যে বর্তমান অধিবেশনে "পূর্ণ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের" প্রস্তাবই পাশ করাবেন এবং "ডোমিনিয়ান স্টেটাস্" লাভের জন্য বৃটিশ সরকারের সদিচ্ছার উপর নির্ভর করে আরও এক বছর অপেক্ষা করবেন। কংগ্রেসের কর্ণধার গান্ধীজীর সদিচ্ছা—শুভ প্রস্তাব! কিন্তু সুভাষচন্দ্র ও জওহরলালজী তাতে কোনমতেই রাজী নন অনুমান করে গান্ধীজী তাঁদের দুজনের সঙ্গেই পৃথকভাবে আলোচনা করলেন এবং পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব যেন তাঁরা কংগ্রেস অধিবেশনে উত্থাপন না করেন তার জন্য বিশেষ অনুরোধও জানালেন। জওহরলালজী গান্ধীজীর অনুরোধ মেনে নিলেন—মানলেন না অচল-অটল-দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সুভাষচন্দ্র।

সুভাষচন্দ্র পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করলেন। ভোটাভুটি হলো। ভোটের জোরে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাবই পাশ হয়ে গেল। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের এই গৌরবময় পরাজয় তাঁকে বিপ্লবী ভারতের কাছে যে মহিমান্বিত করে তুলেছিল তা অস্বীকার করা যায় না।

১৯২৯ সালের লাহোর কংগ্রেসের আগে ভারতের বড়লাট বাহাদুর লর্ড আরউইন, মহামান্য সম্রাটের পক্ষে এক ঘোষণায় জানালেন যে মহামান্য সম্রাটের বিবেচনায়—

"It was implicit in the Declaration of 1917 that the natural issue of India's Constitutional progress as there contemplated, is Dominion Status."

আর যায় কোথায়! আপোষবাদী কংগ্রেস নেতারা উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। ইংরেজ সরকার স্বীকার করছেন—১৯১৭ সালের ঘোষণায় Dominion Status প্রবর্তন করার কথাও পরিকল্পনায় আছে!

১৯১৭ সালের Montegu Chamsford Report অনুযায়ী ইংরেজ সরকার যে ঘোষণা করেছিলেন তারই ব্যাখ্যা করে ১৯২৯ সালের ৩১শে অক্টোবর বড়লাট কংগ্রেস কর্ণধারদের কাছে এই লোভনীয় টোপটি ফেললেন। এই ঘোষণায় Dominion Status কখন দেবে তার কোন উল্লেখ ছিল না। আর-সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির আবেদনও সরকার মেনে নিলো না। তবু গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতারা গোলটেবিলের মারফৎ Dominion Status প্রণয়নের সদিচ্ছার প্রতি মহামান্য সম্রাটের সরকারকে ধন্যবাদ জানালেন। কিন্তু সেইরূপ গোলটেবিলে যোগদানের পূর্বশর্ত অনুযায়ী তাঁরা সরকারের কাছে দাবি জানালেন যেন কংগ্রেসের প্রাধান্যই তাঁরা মেনে নেন ও রাজনৈতিক বন্দীদের ব্যাপক মুক্তির আদেশ দেওয়া হয়। কংগ্রেসের তরুণ নেতারা প্রবীণদের আপোষজনিত মনোভাব দেখে খুব বিচলিত হলেন। সুভাষচন্দ্র ও জওহরলাল প্রতিবাদ জানিয়ে কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সভ্যপদ হতে ইস্তফা দেন।

১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেস অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব পাশ হ'ল। স্বাধীনতার এই প্রস্তাব যদি ইংরেজ সরকার প্রত্যাখ্যান করে তবে সেই ক্ষেত্রে কংগ্রেস কি প্রোগ্রাম গ্রহণ করবে—তার উত্তরে একা সুভাষচন্দ্রই জানালেন—"আমাদের পাল্টা সরকার গঠন করতে হবে।"

সুভাষচন্দ্রের আপোষহীন স্বাধীনতার ঘোষণা ও বাংলার বিপ্লবীদের অকুণ্ঠ সমর্থন তরুণদের মধ্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি করে তার প্রতিধ্বনি বাংলা সরকারকে সচকিত করে তুলেছিল। তাদের গোপন নথিতে উক্ত আছে—

"at the Calcutta Congress in 1928 Subhas Chandra Bose moved an amendment to Mr. Gandhi's resolution. His amendment was to the effect that there could be no freedom as long as the British connection remained and that the goal of the Congress should be complete independence. His amendment was lost, however, by 1,350 votes to 973. Two-thirds of the Bengal delegates voted for the amendment. The Bengal revolutionaries had strived hard to get this resolution carried."

বাংলার বিপ্লবীদের পূর্ণ সমর্থনে সুভাষচন্দ্রের খুব চেষ্টা সত্ত্বেও ১৯২৮ সালে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব কংগ্রেসে পাশ হ'ল না। কিন্তু বিক্ষুব্ধ ভারতকে ভুলিয়ে রাখা কংগ্রেসী নেতাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এক বছর পরে লাহোর কংগ্রেসে স্বয়ং গান্ধীজীকেই পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব উপস্থিত করতে হল।

১৯২৮—১৯২৯ সালের মধ্যে বাংলার বিপ্লবীরা চুপ করে বসে থাকতে পারে নি। কংগ্রেসের আপোষ মনোভাবের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে তারা সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতির কাজ চালাচ্ছিল। কংগ্রেসের মধ্যে ১৯২৮ সালে সুভাষচন্দ্র পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করার পর থেকে বাংলা কংগ্রেসে দুটি চিন্তাধারা—দুটি মত অতি প্রকট হয়ে উঠল। সুভাষচন্দ্রের মত ও পথ বাংলার গান্ধীপন্থীদের সঙ্গে স্বভাবতই ভিন্ন গতিতে ও ধারায় প্রবাহিত হ'ল। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন গান্ধীজীর মতবাদ ও Dominion Status প্রস্তাবের অনুগত ও সমর্থক ছিলেন। বাংলা কংগ্রেসের দ্বিমুখী রাজনৈতিক trend বা ধারা বিপ্লবীদের মধ্যেও প্রতিফলিত হ'ল—তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করল।

আমরা চট্টগ্রামের ভারতীয় গণতন্ত্র বাহিনীর শাখা, মাস্টারদার নেতৃত্বে সুভাষচন্দ্রের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলাম। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতার মধ্যে একটা বিশেষত্ব ছিল। চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের অপ্রতিহত প্রতিপত্তি ছিল। যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে আমরা বুলক ব্রাদার্স ও আসাম বেঙ্গল রেল ধর্মঘট সার্থকতার সঙ্গে পরিচালনা করেছিলাম। 'নাগরখানা

যুদ্ধের অপরাধে সরকারী মামলার বিরুদ্ধে—মাস্টারদা, অম্বিকাদা, ও আমার পক্ষ সমর্থন করেছেন যতীন্দ্রমোহন এবং আমরা তিনজনেই তাঁরই কৃতিত্বে সেই মামলায় মুক্তি পাই। তারপর আমাদের সাথী প্রেমানন্দকেও তিনি আই. বি. পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টার প্রফুল্ল রায় হত্যার মামলা থেকেও বাঁচিয়েছিলেন। তবু আমরা বাংলা কংগ্রেসের নির্বাচন দ্বন্দ্বে যতীন্দ্রমোহনকে সমর্থন করতে পারি নি। আমরা আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে সুভাষচন্দ্রের সমর্থন করে জয়ী হই। আমাদের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা দিতে হলো তখন—যখন আমরা বিপিনদা, জ্যোতিষদা, হরিদা (হরিনারায়ণ চন্দ্র) ও অনুকূলদার প্রস্তাব মানতে অস্বীকার করলাম।

যুগান্তর পার্টি নামে বহু ছোট ছোট দল নিজেদের প্রাধান্য বজায় রেখে চলতেন। যাঁদের নাম উপরে বলা হ'ল তাঁদের সঙ্গে ভারতের গণতন্ত্র বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল ১৯৩০ সাল থেকে। ১৯২৮ সালের কংগ্রেসের সময়েও তাঁদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। আমি তখন অনুকূলদার সঙ্গে সময়ে অসময়ে—রাতে-দিনে—প্রাণ খুলে মিশছি—রিভলবার পিস্তল ইত্যাদি স্মাগলারদের কাছ হতে যোগাড় করা হচ্ছে। এমন সময় একদিন সন্ধ্যায় জ্যোতিষদা ও বিপিনদা একসঙ্গে মোটরে করে এলেন। আমার ও গণেশের সঙ্গে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের কাছে রাস্তার উপরে গাড়িতে বসেই কথা বললেন। জ্যোতিষদাই কথাটা পেড়েছিলেন—কথাগুলি প্রায় এই ধরণের—"দেখ আমরা এতদিন একসঙ্গে পথ চলে এসেছি—আজ আমাদের বোঝাপড়া করবার দিন এসেছে। এখন বুঝে নিতে হবে আমাদের অতীত সম্পর্ক অটুট আছে না কি—তার মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা দিয়েছে।" জ্যোতিষদা এইভাবেই কথার সূচনা করলেন। তারপর স্পষ্ট করে জানতে চাইলেন—"খুলে বল প্রাদেশিক কংগ্রেস নির্বাচনে তোমরা কাকে সমর্থন করবে—সুভাষকে না যতীন্দ্রমোহনকে?" বলা বাহুল্য যুগান্তর পার্টির অন্যান্য নেতারা তাঁদের গ্রুপ-প্রাধান্য বজায় রেখেও সুভাষকে সমর্থন করে চলেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ভূপেনদা ছাড়া অন্যান্যদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক মোটেই ঘনিষ্ঠ ছিল না। তাঁরা—অর্থাৎ 'যুগান্তরের অন্যান্য দল' সুভাষকে সমর্থন করেছেন বলেই আমাদের সুভাষচন্দ্রের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবার কোন বিশেষ কারণ ছিল না।

সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও তাঁকেই সমর্থন করার সিদ্ধান্তের কারণ কি তবে ভূপেনদা বা যুগান্তরের 'অন্যান্য দল' সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করেছিলেন বলে? যুগান্তরের যে দলটির সঙ্গে জ্যোতিষদা, বিপিনদা, অনুকূলদা, হরিদা, সন্তোষদা প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে ১৯২০ সাল থেকে বৈপ্লবিক কার্যকলাপে জড়িত ছিলাম, তাঁদের সম্পর্ক ছেড়ে কংগ্রেসে যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বকে স্বীকার না করে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বকে শ্রেয় বলে বেছে নেওয়ার জন্য সুরেন্দ্রমোহন, অমর চ্যাটার্জী, ভূপেন দত্ত, অরুণ গুহ, কিরণ মুখার্জী প্রমুখ দাদারা কোন বিশেষ আকর্ষণের কারণ ছিলেন না। মাস্টারদার পরিচালনায় আমরা বিশ্লেষণ ও বিচার-বুদ্ধি নিয়ে সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রতি একনিষ্ঠভাবে আনুগত্য দেওয়ার সিদ্ধান্তে উপনীত হই এবং যাঁরা বা যে কোন দলেরই নেতারা বা কর্মিবৃন্দ সুভাষকে সমর্থন করেছিলেন বাস্তব কর্মক্ষেত্রে তাঁদের সঙ্গে, অবস্থা অনুযায়ী, কংগ্রেসের মধ্যে আমাদের ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমরা তখন যতীন্দ্রমোহনকে রাজনীতি ক্ষেত্রে সমর্থন করতে না পেরে সুভাষকেই সমর্থন করেছি। এমন কি কংগ্রেসের রাজনীতি ক্ষেত্রে বিপিনদা, জ্যোতিষদা, হরিদা ও অনুকূলদার গ্রুপের সঙ্গেও বন্ধন ছিন্ন করতে আমরা বাধ্য হয়েছি। মাস্টারদার পরিচালনায় আমরা সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্বে অটল ছিলাম।

সুভাষ ও আমাদের পরস্পরের প্রতি এই বৈপ্লবিক আকর্ষণ ও ঘনিষ্ঠ মিলন কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। আদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গী ও অন্তরের বিপ্লবী প্রেরণার উপলব্ধি অভিন্ন না থাকলে সেইদিন সেই অবস্থায় "সবাইকে" ছেড়ে আমরা সুভাষের পাশে এসে দাঁড়াতাম না। জাতীয় কংগ্রেসে সুভাষের নেতৃত্ব নতুন প্রাণ সঞ্চার করুক—এই ছিল আমাদের অন্তরের কামনা। আমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য। আমাদের সঙ্গে সুভাষের নিবিড় বৈপ্লবিক সম্পর্কের মূল তত্ত্ব Lenin-এর ভাষায় সুস্পষ্ট করে বলি—

"The old proverb says : 'Tell me who your friends are and I will tell you what you are.' Tell me who your political ally is, who votes for you—and I will tell you what your political complexion is." (One step Forward, Two steps Back :—Lenin).

১৯২৯-৩০ সালে সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। আমরা চট্টগ্রামে জেলা কংগ্রেসের রাজনৈতিক সম্মেলনে সুভাষচন্দ্রকে আহ্বান করি। তিনি এলেন। সামরিক কায়দায় Bengal Volunteers-এর অনুকরণে গড়া আমাদের সুসজ্জিত ভলান্টিয়ার বাহিনী তাঁকে অভিবাদন জানাল। তিনি তাঁর ওজস্বিনী ভাষায় তরুণ বাংলাকে আগামী কালের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকতে ডাক দিলেন। আমাদের মামলার মুদ্রিত জাজমেন্ট কপি থেকে উদ্ধৃত করছি—

"That day (12th May 1929) the presidential speech was delivered by Mr. Subhas Bose, its tenor being that he had faith in Mahatma Gandhi but he could not see how the country could be saved by non-violence. The volunteers wearing Khaki Khaddar shirts and shorts were present in force at the conference under the command of Ganesh Ghosh who was styled as G.O.C. and wore a military uniform similar to that worn by Subhas Bose at the Calcutta Congress.

সেইদিন দুপুরে মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্কের এক নির্জন কক্ষে গণেশ ঘোষ, আমি ও ত্রিপুরা সেন (জালালাবাদ যুদ্ধের শহীদ) সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করি। তিনিই আমাদের তিনজনকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার এই প্রথম সাক্ষাৎ। মাস্টারদা, অম্বিকাদা ও গণেশ ঘোষের সঙ্গে আগে থেকেই তাঁর পরিচয় ও আলাপ ছিল—পরিচয় ছিল না কেবল আমার সঙ্গে।

ঘণ্টা দুই আমরা নানা বিষয়ে আলোচনা করি। সকালে কনফারেন্স এলাকার মধ্যে বিপক্ষ দলের সঙ্গে আমাদের ছোটখাটো সংঘর্ষ হয়। তাই প্রথমে সুভাষবাবু আমাদের সাংগঠনিক ও ভলান্টিয়ার বাহিনীর শক্তি সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। তাঁকে আমাদের শক্তি প্রাধান্যের কথা জানিয়েছিলাম। তারপর ভবিষ্যৎ বিপ্লবী কর্মসূচী নিয়ে সাধারণভাবে আলোচনা হয়। রাসবিহারী বোস, লালা হরদয়াল, গদর পার্টি এবং যতীন মুখার্জী প্রমুখ নেতারা সারা ভারত জুড়ে বিপ্লবের প্রচেষ্টা করেছেন—কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার জন্য কোন প্রচেষ্টাই সফল হয় নি। বিভিন্ন দলের সাংগঠনিক ক্ষমতা এক স্তরের নয় বলে এবং পুলিশের গুপ্তচর বিভিন্ন দলের মধ্যে বহুপূর্ব থেকে অবস্থান করার বহু নিদর্শন থাকার জন্য ভারত জুড়ে বা সারা বাংলায় সশস্ত্র

বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা কতখানি তা নিয়ে আলোচনা হল। সফলতার সঙ্গে কোন একটি জেলায়ও যদি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের পুলিশ ও মিলিটারী ঘাঁটি দখল করে সাময়িকভাবে বিপ্লবী গণতন্ত্র সরকার স্থাপন করে আদর্শ স্থাপন করা যায় তবে বিপ্লবী তরুণদের মনে আস্থা ফিরে আসবে বলে আশা করা যায়। সেইহেতু আদর্শ স্থাপন করার জন্য—সফলতার সঙ্গে একটি জেলাতেও যদি যুব-বিদ্রোহ পরিচালনা করা সম্ভব হয় তবে আমাদের তা করা উচিত কি না! অতীতের বিপ্লব প্রচেষ্টার ধারাবাহিক নিষ্ফলতার ইতিহাস যুবকদের মনে অবসাদ ও নিরাশা সৃষ্টি করেছে। তাই জড়তা ও হতাশা ভাঙবার জন্য খুব ছোট সফল বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার নিদর্শন একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সেইদিন আমরা এইভাবে আমাদের আলোচনা সমাপ্ত করেছিলাম।

বাংলা দেশে তখন ১৯৩০-৩১ সালে প্রধানত দুইটি বিপ্লবী পার্টি—অনুশীলন ও যুগান্তর আবার ভাগ হয়ে গেল। গুপ্ত পুলিশ রিপোর্ট থেকে পাচ্ছি—

"When (1930-31) the agreement between Subhas Bose and the terrorist parties were hoping to resume their terrorist campaign in concert with each other. SUBSEQUENTLY, however, the LEADERS quarrelled and in this quarrel Subhas Chandra Bose supported the Jugantar party. The result was that the leader of the Dacca Anusilan Samiti resigned from the Executive of the Bengal Provincial Congress Committee. This split in the Congress came to a head in 1931 when the supporters of the rival leaders actually came to blows. In these incidents Subhas Bose and his party were supported by members of the Jugantar party and J. M. Sengupta by members of the Dacca Anusilan Samity."

কর্তব্যের খাতিরে বাংলা দেশের অতীত দলাদলির ইতিহাস থেকে সামান্য উল্লেখ করলাম বলে আজ লজ্জা পাওয়ার কোন কারণ নেই। সকল দেশের ইতিহাসেই রাজনৈতিক দলাদলি ও সঙ্ঘর্ষের বহু নজির আছে। তা ছাড়া বর্তমান রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রেও আদর্শগত মতভেদ ও তীব্র প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শত্রুতা যখন বাস্তব সত্য ও অনিবার্য, তখন অতীতের সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ঐতিহাসিক তথ্যের প্রয়োজনে যদি রাজনৈতিক দলাদলির বৃত্তান্ত উল্লেখ করা হয় তবে পাঠকবর্গের কাছে তা মার্জনীয় বলে আমি নিশ্চয়ই মনে করতে পারি।

১৯৩০ সালে অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করল। সরকার বেপরোয়াভাবে আক্রমণ চালালো—নির্বিচারে লাঠি, গুলী ব্যবহার করলো। হাজার হাজার কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবককে বন্দী করা হল। অসহযোগ আন্দোলনের তীব্রতা ক্রমেই কমে আসতে লাগল। এই সময় বাংলার বিপ্লবী দল সশস্ত্র প্রতি আক্রমণ চালাবার প্রয়োজন মনে করে এবং তার উপযোগী সময় বলেও বিবেচনা করে। এইরূপ একটি অবস্থার জন্য বিপ্লবীরা আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল।

পুলিশের গোপন তথ্য থেকে লিপিবদ্ধ করছি—

"The Bengal terrorists took an active part in the Civil Disobedience Movement in 1930 and many of them were imprisoned for picketing. When this movement was wanning they considered that it was time for them to give effect to their policy of Violence. The armoury raids took place at Chittagong in April and there the raiders used the Congress Office as a centre of preparation and a jumping-off ground for the raiding parties...."

আমাদের বিরুদ্ধে মামলা চলছে। ভগৎ সিং, রাজগুরু, সুখদেও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে ফাঁসীর অপেক্ষায় আছে। বাংলা দেশে বিপ্লবীরা নিরবচ্ছিন্নভাবে সশস্ত্র আক্রমণ চালাতে লাগলেন। গান্ধীজীর Individual Satyagraha (ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ) যেমন স্থিতাবস্থারও আন্দোলন বা সত্যাগ্রহের প্রেরণাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন বলে গণ্য, তেমনি তরুণদের প্রাণে বিপ্লবী স্পন্দন জাগিয়ে রাখার জন্য ব্যক্তিগত ইংরেজ রাজপুরুষদের হত্যা অপরিহার্য বলে বিপ্লবীরা যদি মনে করে থাকেন তবে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের সেইরূপ রণকৌশলের মধ্যে ত্রুটি ছিল না বলেই আমার মনে হয়।

বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্ঘবদ্ধ ও খণ্ড খণ্ড আক্রমণ যেরূপ অপ্রতিহত গতিতে চলেছিল তার আতঙ্কে ক্ষুব্ধ সরকার গান্ধীজীর অহিংসা আন্দোলনের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেওয়াটা তাঁদের পক্ষে বিজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হবে বলে মনে করলেন। ২৫শে জানুয়ারী ১৯৩১ সালে সরকার কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দিলেন। ২৬শে জানুয়ারী গান্ধীজীর সঙ্গে লর্ড আরউইনের আলোচনা শুরু হল। ৫ই মার্চ ১৯৩১ সালে গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট সই হল। গান্ধীজী দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে সম্মত হলেন। তার পরিবর্তে কয়েকটি বিভিন্ন শর্তের মধ্যে, অহিংস আন্দোলনের বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার শর্তও বড়লাট মেনে নিলেন।

তখন সারা ভারতে—বিশেষ করে তরুণদের দাবি ছিল—ভগৎ সিং, রাজগুরু ও সুখদেও-র ফাঁসী যেন রদ করা হয়। হিংসাত্মক কাজের জন্য বন্দীদের ছাড়তে সরকার রাজী ছিল না এবং গান্ধীজীও সেইজন্য মাথা ঘামান নি। বিপ্লবীদের ফাঁসী রদ হওয়া আর মুক্তি পাওয়ার শর্ত এক নয়। অহিংসার প্রতীক গান্ধীজী যদি ভগৎ সিং, রাজগুরু ও সুখদেও-র মৃত্যুদণ্ড রদ করার জন্য বড়লাটকে সামান্যতম অনুরোধ জানাতেন তবে আমাদের বিশ্বাস তিনজন বিপ্লবীর নিশ্চয়ই প্রাণরক্ষা হত। গান্ধীজী—অহিংসার উপাসক গান্ধীজী! কেন তিনজন বিপ্লবীর প্রাণরক্ষা করার জন্য বড়লাটকে অনুরোধ বা রাউণ্ড টেবিলে যোগ দেওয়ার শর্ত হিসাবে প্রস্তাব করেন নি—বিপ্লবী ভারতের সেই ক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসা চিরকাল স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে লেখা থাকবে।

আমরা তখন চট্টগ্রাম জেল হাজতে আছি। আমাদের বিরুদ্ধে মামলা চলছে। সেই সময়ে গোপনে Smuggle করে গান্ধীজীর নিকটে আমরা একটি চিঠি পাঠাই। অনুরোধ জানাই তিনি যেন সেই তিনজন বিপ্লবীর ফাঁসী রদ করার জন্য বড়লাটকে অনুরোধ করেন। আমরা জানি তিনি আমাদের অনুরোধ সরাসরি উপেক্ষা করেছিলেন। কেবল তা নয়—তিনি আমাদের সেই চিঠি পুলিশের নিকট পাঠিয়েও দেন। অবশ্য এতে আমাদের কোন অনুযোগ নেই। গান্ধীজী—জেল থেকে সেইরূপ গোপনে লেখা চিঠির অস্তিত্ব কর্তৃপক্ষকে তাঁর পদমর্যাদার জন্য জানিয়ে ভালই করেছেন। আমাদের উপায় ছিল না বলেই সেইভাবে গান্ধীজীর কাছে লিখতে হয়েছিল। বড়লাটকে ফাঁসী রদ করার আবেদন জানাবার মূল বিষয়বস্তুটি গোপন রেখে পুলিশের গুপ্ত নথিতে ঐ চিঠির উল্লেখ আছে দেখতে পাওয়া যায়—

"In March 1931 the under trial accused in Chittagong

আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনানায়কগণের সঙ্গে সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র

Armoury Raid Case sent a letter to Mr. Gandhi....they wrote as follows :—

"You can certainly not deny the fact that in almost all the provinces the Congress Programme has been worked out by the men most of whom have got violence as their policy in heart and specially in Bengal where the disobedience Campaign has achieved the highest amount of success, ninety per cent of the Congress workers are open revolutionaries to whom no doubt all the credit of the success goes."

এই [illegible] বাদ দিয়ে পুলিশ তাদের গোপন রিপোর্টটি তৈরি করেছে। গান্ধীজীর মনোভাব ও প্রতিক্রিয়া আমাদের ও সুভাষচন্দ্রের ওপর কিরূপ ছিল তার একটি সঠিক ধারণা পাওয়ার উদ্দেশ্যেই আমার এই তথ্যটি প্রকাশ করা।

আমাদের দ্বীপান্তরের সাজা হয়ে গেল। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে বহু বছরের

জন্য যোগাযোগ ছিন্ন হ'ল। আন্দামান জেলে অনশন ধর্মঘট করলাম। দেউলি, বাক্সা, হিজলী, বহরমপুর প্রভৃতি বন্দী-শিবিরে একসঙ্গে মুক্তির দাবিতে অনশন আরম্ভ হ'ল। ভারতে, বিশেষ করে বাংলা দেশে, প্রবল 'বন্দীমুক্তি' আন্দোলনের ঢেউ দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অ্যাক্ট অনুযায়ী প্রথম ফজলুল হক মন্ত্রিসভা গঠিত হ'ল। ১৯৩৭ সালের ১৭ই মার্চ ফজলুল হক সরকার সুভাষচন্দ্রকে বিনা শর্তে মুক্তি দিলেন। তিনি ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করে ইউরোপ থেকে ফিরে এলেন। ১৯৩৮ সালের ১৮ই মার্চ তিনি হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন।

আমরাও জনগণের সংঘবদ্ধ দাবির জোরে আন্দামান জেল থেকে প্রায় সেই সময় বাংলার জেলে ফিরে এলাম। ইতি-মধ্যে বিনা বিচারে আটক বন্দীরা অনেকে মুক্তি পেলেন। জেলে আমাদের দু' ভাগে রাখা হয়—এক ভাগ ছিল আলিপুর জেলে ও অন্য অংশ দমদম জেলে স্থানান্তরিত হয়। গান্ধীজী সেই সময় আমাদের সঙ্গে জেলে দু'বার দেখা করেন। প্রায় ঘণ্টা দেড়-দুই আমরা প্রতিবার গান্ধীজীর সঙ্গে জেল কর্তৃপক্ষ বা পুলিশের অনুপস্থিতিতে আলোচনা করি। তিনি আমাদের মুক্তির দায়িত্ব নিয়েছিলেন। আমাদের সকলের মুক্তির জন্য এক বছরের সময় তিনি দিলেন এবং আমরা তাঁকে জানিয়েছিলাম যে যদি এক বছরের মধ্যে মুক্তি না পাই তবে আমাদের অনশন করা ছাড়া অন্য কোন পথ থাকবে না।

সুভাষচন্দ্র তখন কংগ্রেসের সভাপতি। তিনিও আমাদের সঙ্গে জেলে দেখা করলেন। কত বছর পরে আমাদের সুভাষের সঙ্গে দেখা! এই বিরাট সময়ের ব্যবধানে কতকিছু ঘটে গেছে—কতজন আমাদের মধ্যে তখন নেই! সুভাষবাবুর সঙ্গে আমাদের প্রাণ খুলে কথা হ'ল। শারীরিক অবস্থার কথাই তিনি সকলের কাছ থেকে জানতে চাইলেন। জেলের সুখ-সুবিধা সম্বন্ধেও নানা বিষয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানলেন। যতদিন আমরা মুক্তি না পাচ্ছি ততদিন কিভাবে জেলের সুখ-সুবিধেটুকু পাবো তার জন্য তিনি যত্নবান হন। আমাদের সঙ্গে গান্ধীজীর যা কথা হয়েছে তা' তাঁকে জানালাম—মুক্তি না পেলে ঠিক এক বছর পরে আমরা আমরণ অনশন করব।

১৯৩৯ সাল। ত্রিপুরী কংগ্রেসে রাষ্ট্র-পতি পদের জন্য সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার প্রার্থী হলেন। দেশবাসী পট্টভী সীতা-রামিয়াকে পরাস্ত করে অধিক ভোটে সুভাষকে রাষ্ট্রপতি পদে দ্বিতীয় বছরের জন্য নির্বাচিত করল। গান্ধীজী সুভাষের বিরুদ্ধে পট্টভীজীকে সমর্থন জানিয়ে-ছিলেন। তাই গান্ধীজী প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করে ঘোষণা করলেন যে সুভাষের কাছে এইটি তাঁর নিজেরই পরাজয়। প্রকাশ্যে ও অন্তরালে গান্ধীজী এমন একটি সুভাষ-বিরুদ্ধ অবস্থার সৃষ্টি করলেন যে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা প্রায় সবাই সভাপদ থেকে ইস্তফা দিলেন। সুভাষবাবু এইরূপ বিরূপ অবস্থার জন্য রাষ্ট্রপতি পদ পরিত্যাগ করলেন।

গান্ধীজীর কথামত আমরা ধৈর্য ধরে এক বছর অপেক্ষা করেছি। আমাদের মুক্তির কোন আশা আর আমরা দেখতে পেলাম না। তাই দমদম ও আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে মুক্তির দাবিতে আমরা অনশন আরম্ভ করলাম। গান্ধীজী মহা-দেব দেশাইকে পাঠালেন আমাদের অনু-রোধ জানাতে—আমরা যেন অনশন ভঙ্গ করি। বিধানবাবু, মধুদা (সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ) ও মহাদেব দেশাই আমাদের সঙ্গে জেলে দেখা করে অনশন ভঙ্গ করবার জন্য গান্ধীজীর অনুরোধটি জানালেন। কতদিনের মধ্যে আমরা সবাই মুক্তি পাব তার সঠিক অঙ্গীকার না পাওয়া পর্যন্ত অনশন ভঙ্গ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় বলেই গান্ধীজীকে জানাবার জন্য মহাদেব দেশাইকে অনুরোধ করলাম। খুব দুঃখ ও সঙ্কোচের সঙ্গে আজ জানাচ্ছি মহাদেব দেশাই রেগে গেলেন এবং তাঁরা তিনজনই আমাদের ওপর বিরক্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করলেন। তাঁরা বিরক্তি প্রকাশ করে রেগে চলে গেলেন বলে অনুযোগ করবার কিছুই নেই। আমরা গান্ধীজীর অনুরোধ রাখতে অক্ষম ছিলাম বলে নিজেরা মনে মনে খুবই সঙ্কোচ অনুভব করেছি। কিন্তু বছরের পর বছর সুদীর্ঘকাল জেলে বসে অথর্ব হয়ে মরার চাইতে—মুক্তি নয় তো মৃত্যু শ্রেয় মনে করে অনশন আরম্ভ করেছি, মুক্তির সুস্পষ্ট ঘোষণা ছাড়া অনশন ভঙ্গ করলে নিজেদের শক্তি ক্ষয় হবে, ভবিষ্যতে আবার একত্রে মুক্তির জন্য অনশন করা সম্ভব নাও হতে পারে। তাই সরকারের অনমনীয় মনোভাব লক্ষ্য করে আমরা আমাদের সিদ্ধান্তে দৃঢ় থাকা সমীচীন মনে করেছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁরা রেগে চলে গেলেন। কেবল তা নয়—গান্ধীজী আমাদের অনশন করার বিপক্ষে সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দিলেন।

বাংলার তরুণ বিপ্লবীরা এতে বিক্ষুব্ধ হ'ল। সুভাষের ওপর বৈপ্লবিক দায়িত্ব এসে পড়ল।

এই সন্ধিক্ষণে স্বয়ং সুভাষচন্দ্র তাঁর দাদা শরৎবাবুকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে জেলে দেখা করলেন। গান্ধীজীর বিবৃতির প্রতিবাদ জানিয়ে সুভাষচন্দ্র সংবাদপত্রে তাঁর বিবৃতি ইতিমধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাঁর বিবৃতির typed copy সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। আমাদের তিনি তা দেখালেন। সেই বিবৃতিতে আমাদের মুক্তি দাবির প্রতি তরুণ বাংলার আন্তরিক সমর্থন ছিল এবং সরকারকে আমাদের দাবি মানবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

এই তৃতীয়বার সুভাষের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ। দুজনেই—সুভাষবাবু ও শরৎবাবু, আমাদের অনমনীয় মনো-ভাবের কারণ বুঝেছিলেন—সরকার আমা-দের মুক্তি দিতে কোনমতে প্রস্তুত ছিল না। সুভাষবাবু আমাদের অনশন ভঙ্গ করতে অনুরোধ করলেন এবং তাঁর প্রতি-শ্রুতি জানালেন যে তিনি সরকারকে চরম পত্র দেবেন আমাদের এক মাসের মধ্যে মুক্তি দিতে, যদি সরকার এই দাবি অস্বীকার করে তবে তিনি 'বন্দীমুক্তির দাবিতে ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করবেন।.........সেই রাত্রে প'য়ত্রিশ দিন পর আমরা অনশন ভঙ্গ করি। সুভাষবাবু ও শরৎবাবু আমাদের সবার খাওয়া-দাওয়ার পর বাড়ি ফিরলেন অনেক রাত্রে। নেতাজীর সঙ্গে আমার সেই শেষ দেখা! আর দেখা হ'ল না! কিছুদিনের মধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। তার-পর নেতাজীর বিপ্লবী জীবনের পট খুব দ্রুত পরিবর্তিত হতে লাগল।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সুভাষ-চন্দ্রের বৈশিষ্ট্য বুঝতে গেলে গান্ধীজীর অহিংস মতবাদের বিরুদ্ধে সুভাষের সশস্ত্র বিপ্লবের মতপার্থক্যের মূল খুঁজে পাওয়া প্রয়োজন। সুভাষচন্দ্র consistently অচল-অটলভাবে সামঞ্জস্য বজায় রেখে গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ও বাইরে বাস্তব সংগ্রামী-নীতি গ্রহণ করতে চেষ্টা করেছেন। সুভাষ-চন্দ্র এবং বাংলার বিপ্লবীরা কখনও গান্ধীজীর শান্তিপূর্ণ অহিংস আন্দো-লনের প্রচণ্ড ক্ষমতাকে অস্বীকার করেন নি বা উপেক্ষা করবার কোনরূপ চেষ্টাও তাঁদের ছিল না। ভারতবর্ষের মত একটা উপমহাদেশে দু'শ বছরের ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের অভিনব 'রণ-কৌশল' ও 'রণ-নীতি'-র বিরাট সম্ভাবনাকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছি এবং সুভাষবাবু ও বাংলার বিপ্লবীরাও সক্রিয়-ভাবে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের বিরাট সাফল্যের সম্ভাবনাকে স্বীকার করা সত্ত্বেও সুভাষবাবু ও আমরা বুঝেছিলাম যে গান্ধীজীর এই আন্দোলন খুব অল্প সময়ে যদিও সারা ভারতের নিপীড়িত জনগণকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে

বিদেশে আমাদের
বড়ো দশজন খরিদ্দার

ভারতীয় বাটার জুতো বিদেশে যে সব জায়গায় রপ্তানি করা হয়, তাদের প্রথম দশটির নাম : যুক্তরাজ্য, কানাডা, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, বেলজিয়াম, অস্ট্রেলিয়া, সৌদি আরব, ফ্রিটাউন এবং হল্যাণ্ড। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর এই দশটি দেশে মোট ৫,৫৬০,০০০ জোড়া জুতো রপ্তানি করা হয়েছে।

Bata

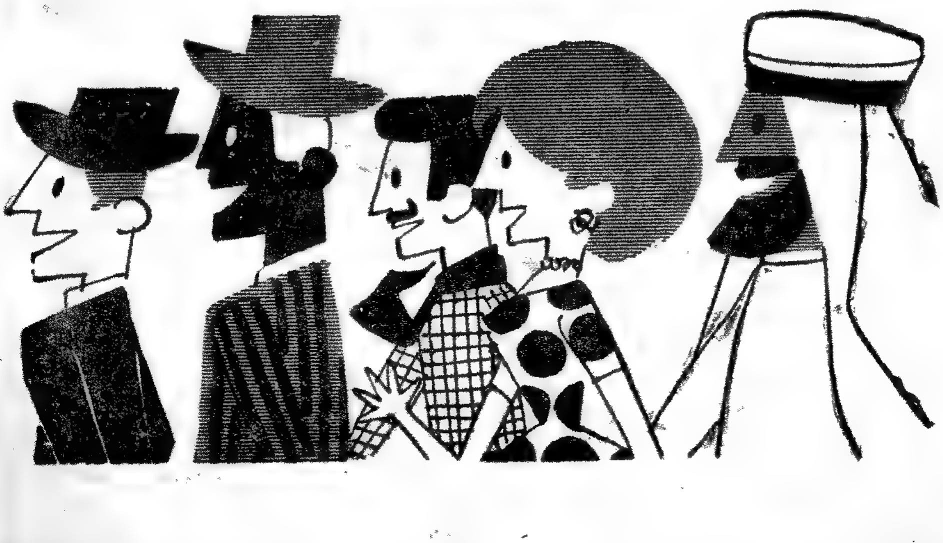

বিক্ষুব্ধ [illegible] এই আন্দোলনে নিয়োগ করতে পা[illegible] তবু এই অহিংস সংগ্রামের দ্বারা বৃটিশ সরকারকে পরাভূত করে স্বাধীন গণতন্ত্রী সরকার স্থাপন করা সম্ভব নয়। প্রথমত গান্ধীজীর অহিংসাবাদকে স্বধীনতা সংগ্রামে creed হিসেবে—ধর্ম মনে করে মেনে নেওয়াকে—আমরা utopian (অবাস্তব) বলে মনে করি। কারণ, অবাস্তব কল্পনায় বা কেবল theoryতেই ভাবা সম্ভব যে সারা ভারতের বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ সংগ্রামের সময় ইংরেজের অভাবনীয় বর্বর অত্যাচারের বিরুদ্ধেও সংযত, স্থির ও অহিংস থাকবে। দ্বিতীয়ত এই কারণে—বিপ্লবী জনসাধারণের চরিত্র বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বুঝে, সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের উৎখাত যে সম্ভব নয় তা সুভাষবাবু ও আমরা নির্ভুলভাবে বুঝেছিলাম।

ইতিহাস প্রমাণ করেছে গান্ধীজীর "অহিংসা-ধর্ম" স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতিপর্বে ও সংগ্রামের প্রথম স্তরে অনেকখানি কার্যকরী হলেও চূড়ান্ত জয়-পরাজয়ের ক্ষেত্রে নিষ্ফল হয়েছে। বিক্ষুব্ধ জনসাধারণের অহিংস সংগ্রাম ১৯২১-২২ সাল বা ১৯৩০ সাল অথবা ১৯৪২ সালের "ভারত ছাড়" অসহযোগ আন্দোলনে গান্ধীজীর সদিচ্ছাপূর্ণ নেতৃত্ব থাকা সত্ত্বেও, ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সহিংস রক্তাক্ত সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। গান্ধীজীর অহিংসা মন্ত্র ইংরেজ শাসকবর্গকে আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করা থেকে কিছুকাল পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় বা nutralise করে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। অহিংসার বাণী বা চরকার প্রত্যক্ষ অভিযানের ন্যূনতম প্রোগ্রাম সামনে রেখে এক বছরের মধ্যে স্বরাজ লাভের প্রস্তুতিকে সুভাষচন্দ্র একটি বাস্তব 'রণ-কৌশল' বলে মেনে নিয়েছেন এবং আমরাও তাই মনে করেছি।

বাস্তবতার গণ্ডী ছাড়িয়ে সুচিন্তিত গবেষণা করা সম্ভব নয়। তাতে ইতিহাসের সত্যকে অস্বীকার করা হয়—বিকৃত করা হয়। গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রকৃত মূল্যায়ন করতে অস্বীকার করলে ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের সঠিক অবদান কি, তা যেমন নির্ণয় করা যায় না; আবার তেমনি ভারতের নিরবচ্ছিন্ন বৈপ্লবিক ঘটনা প্রবাহ—১৮৯৭ সালে পুনায় চাপেকার ভ্রাতৃযুগলের ফাঁসীর মঞ্চে প্রাণদান করার সূচনা থেকে বাংলা ও ভারতের বিপ্লবী তরুণদের বোমা পিস্তলের তাণ্ডব ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যে বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল, আজাদ হিন্দ বাহিনীর "দিল্লী চল" সশস্ত্র অভিযান এবং সর্বশেষ ভারতীয় নাবিক পরিচালিত নৌ-বিদ্রোহের সহিংস ও সশস্ত্র সংগ্রাম বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সিংহাসনকে যে চরম আঘাত দিয়েছে তার সঠিক স্বরূপ নির্ণয় করতে অস্বীকার করলে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট হয়ে থাকবে।

গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের বিশ বছরেরও আগে থেকে সহিংস বিপ্লবী প্রচেষ্টা ও বীর শহীদদের আত্মদানের প্রভাব, ভারতবাসীকে ইংরেজের বিরুদ্ধে সাহস যুগিয়েছে, সশস্ত্র সংগ্রামের প্রেরণা দিয়েছে, স্বদেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুত ও উর্বর ভারতভূমিতে বিশ বছর পরে গান্ধীজীর ন্যূনতম প্রোগ্রাম—এক কোটি কংগ্রেস সদস্য, চরকা, খদ্দর, বিলাতি কাপড় বর্জন, অহিংস অসহযোগ আন্দোলন এবং তারপর এক বছরে স্বরাজ—দুশ' বছর বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলনের এইটি যে একটি বাস্তব, নির্ভুল ও প্রচণ্ড শক্তিশালী রণ-নীতি ও রণ-কৌশল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই রণ-নীতি ও কৌশলের সঙ্গে যখন অহিংসবাদকে গান্ধীজী আপোষহীনভাবে ধর্ম বলে কংগ্রেস সেবকদের অন্তরে অন্তরে স্বীকার করে নিতে বললেন, তখন গান্ধীজীর "অহিংসা" creed-কে সুভাষচন্দ্র, আমরা অবাস্তব বলে মনে করেছি এবং সুভাষচন্দ্র তা অন্তর থেকে কখনই মেনে নিতে পারেন নি।

সুভাষচন্দ্রের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য যদি বুঝতে হয় তবে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর মূল প্রভেদ কোথায় সে সম্বন্ধে সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের সর্বশেষ সফলতার জন্য অহিংসাবাদকে নীতি ও ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করা কি বাস্তবতাকে অস্বীকার করা নয়? এই মূলগত দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের জন্য সুভাষচন্দ্রকে ধারাবাহিকভাবে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে গান্ধীজীর মতবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়েছে। ১৯২২ সালে ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে দেশবন্ধু কংগ্রেস পরিত্যাগ করে স্বরাজ্য পার্টি গঠন করলেন এবং সুভাষচন্দ্র স্বরাজ্য পার্টির মুখপত্র—'Forward' দৈনিক কাগজের প্রধান কর্মসচিব নিযুক্ত হলেন। আরও আঠারো বছর পরে, ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার পর স্বয়ং গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতারা নির্বাচিত প্রেসিডেণ্ট সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে অসহযোগ করলেন। ১৯৩৯ সালে, কলকাতায়, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র [illegible] ইস্তফা দিলেন ও তাঁরই নেতৃত্বে কংগ্রেসের ভেতরেই 'ফরোয়ার্ড ব্লক' গঠিত হল। ১৯৪০ সালের ১৮ই মার্চ রামগড় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সেই সময় গয়া কংগ্রেসের ঐতিহ্য বহন করে সুভাষচন্দ্র ফরোয়ার্ড ব্লকের কর্মীদের নিয়ে রামগড় কংগ্রেস অধিবেশনের পাশেই আপোষ-বিরোধী পাল্টা কংগ্রেস সম্মেলনের সমাবেশ করেন।

সুভাষচন্দ্র সেই বছরেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্ধকূপ-হত্যার কল্পিত ও মিথ্যা নিদর্শন—হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের জন্য জেহাদ ঘোষণা করলেন। সুভাষচন্দ্রের এই সংগ্রাম জয়যুক্ত হয়। ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হয়। ৫ই ডিসেম্বর সুভাষচন্দ্র প্রায়োপবেশন করে মুক্তি পান। ১৭ই জানুয়ারী ১৯৪১ সাল—সুভাষচন্দ্র পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে জার্মানীতে উপস্থিত হন এবং শেষে তিনি আজাদ-হিন্দ সরকার ও আজাদ-হিন্দ বাহিনী গড়ে তোলেন। নেতাজী সুভাষের "দিল্লী চল" ধ্বনি ভারতের আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে। আজাদ-হিন্দ বাহিনীর মুহুর্মুহু কামান গর্জন বজ্র-নির্ঘোষে ভারতে বৃটিশ শাসনের নিপাত ঘোষণা করেছে। সহিংস "ভারত ছাড়" সংগ্রাম "দিল্লী চল" অভিযানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যে দুর্বার দুর্জেয় ও অপ্রতিহত বৈপ্লবিক শক্তির সৃষ্টি করেছিল তার বিভীষিকা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সরকারকে কমনওয়েলথের আওতায় "স্বাধীন পাকিস্তান" ও "স্বাধীন ভারতের" দুটি পূজার অর্ঘ্য দুটি সোনার থালায় সাজিয়ে লর্ড মাউণ্টব্যাটনের হাতে পাঠাতে তরান্বিত করল।

বৃটিশ সরকার ভাবী বিপ্লবের আশঙ্কায় 'বিভক্ত ভারতের' 'স্বাধীনতার' উপহার দিতে যেরূপ ব্যগ্র হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের সশস্ত্র বিপ্লবের রণধ্বনি উদগ্রীব করে তুলেছিল "বিভক্ত-স্বাধীন-ভারতের" সাম্রাজ্যবাদী উপঢৌকন দু' হাতে তুলে নিতে।

নেতাজীর "দিল্লী চল" রণ-হুঙ্কার কি চিরকালের জন্য নিস্তব্ধ? ভারতে শহীদদের বিপ্লবী আহ্বান কি আর শোনা যাবে না? আজাদ-হিন্দ বাহিনীর দুর্জয় অভিযানের পদধ্বনি কি চিরতরে শান্ত, নিশ্চল, নিস্পন্দ ও স্তব্ধ হয়ে গেল?*

---

*দীঘা-রামগড় নেতাজীর সপ্ততিতম জন্মবার্ষিকী কমিটির সৌজন্যে

একটি চরিত্র—একটি প্রতিজ্ঞা

অপরাজিতা গোপ্পী

"যা কিছু অন্যায়, যা কিছু অসঙ্গত, বে-আইনী তারই বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ। ঘটনাস্রোতে গা ঢেলে দেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কোন অন্যায় করার চাইতে সে অন্যায়ের কাছে মাথা নোয়ানো আরও বেশি ঘৃণ্য অপরাধ। কাজেই তেমন অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ আসবেই।"

জীবনের শুরু থেকে এই দৃঢ়তা—এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে যে জীবন শুরু হয়েছিল, পরিণত বয়সে সেই জীবন হয়ে উঠেছিল অনন্য-অসাধারণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে নেতাজীর আবির্ভাব ভারত ইতিহাসে অপ্রত্যাশিত নয়। বাংলাদেশে ঊনবিংশ শতাব্দী একটি স্বর্ণযুগ। বহু মনীষার সঞ্চিত ভাবাদর্শে মূর্ত হয়ে উঠেছিলেন নেতাজী। একদিকে জ্বলন্ত দেশপ্রেম অন্যদিকে সর্বস্ব ত্যাগের মহানব্রত। একদিকে সন্ন্যাসী আর একদিকে বিপ্লবীর অমিত তেজ। এমন সমন্বয় পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এক লক্ষ্য—এক পথ। ব্যক্তিজীবনের কোন আকাঙ্ক্ষা নয় শুধু দেশের মুক্তি মানুষের মুক্তি। পরাধীনতার সুতীব্র যন্ত্রণা থেকে চল্লিশ কোটি আত্মাকে—সে আত্মা অমর সে আত্মার মৃত্যু নেই। যুগে যুগে শাশ্বত বাণীর মত সে আত্মার বাণী ভারতে প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

রামমোহন থেকে শুরু করে স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত ভারতীয় চিন্তার জগতে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল—তারই মূর্তরূপ গ্রহণ করেছিল নেতাজীর কর্মময় জীবনের মধ্যে দিয়ে। একটু একটু করে ভারত-আত্মার হৃদয় থেকে সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে ভবিষ্যতের বিপ্লবী নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন। পরবর্তী কালে পৃথিবীর মানুষ অবাক হয়ে দেখেছিল শৈশবের শান্তশিষ্ট শিশুটি—কৈশোরের গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী কেমন করে কবে সবার অলক্ষ্যে দেশপ্রেমের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবীরূপে শানিত তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অবাক হয়েছিল সেদিন শত্রু-মিত্র সবাই—কিন্তু অবাক হয় নি তাঁর ভাগ্য নিয়ন্তা "বিচিত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর জাতকেরা তারা জন্ম হতেই জানত জাতির জন্য দেশের জন্য তাদের জীবন উৎসর্গীকৃত। জীবন দেবার জন্য—এ জীবন বিলাসে, বৈভবে লালসায়, ভোগের জন্য নয়।" সর্বস্ব দিয়ে তবেই তাকে পাওয়া যায়, তবে এ পাওয়া শুধু নিজের জন্য নয়, এ অভীষ্ট সিদ্ধির পেছনে কোন নামের মোহ নেই, নেই কোন ঐশ্বর্যশালী হয়ে বিলাসে ব্যসনে জীবন কাটাবার আকাঙ্ক্ষা। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। চিন্তায় ধ্যানে বিবেকানন্দের উত্তরসাধক।

তিনি জীবনকে দেখেছেন বিবেকানন্দের দৃষ্টি দিয়ে। অভীঃ মন্ত্রের উদ্গাতা যখন ডাক দিয়ে বলেছিলেন—"এই জাতি ডুবিতেছে, অগণন লক্ষ লক্ষ প্রাণীর অভিশাপ আমাদের মস্তকে রহিয়াছে—ওঠ—জাগো, সময় চলিয়া যাইতেছে। আর আমাদের সমুদয় শক্তি বৃথা বাক্যে ক্ষয় হইতেছে। ওঠো জাগো—তোমাদের সামনে খুব বড় কাজ রহিয়াছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ ডুবিতেছে—তাহাদিগকে উদ্ধার কর।"

বৈদান্তিক বিবেকানন্দ নেতিবাদী ছিলেন না। অধ্যাত্ম সাধনায় নিজের মুক্তিই তাঁর একমাত্র কাম্য ছিল না, তিনি ভালোবেসেছিলেন ভারতের মাটি ও মানুষকে। বৈদান্তিক ঋষি কুসংস্কারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন ভারত-আত্মার বাণী। ক্লীবত্বের পঙ্কিল আবর্ত থেকে ক্ষত্রিয়ের অমিত তেজে যৌবনশক্তিকে জাগাতে, সত্য ও সুন্দরের আলোকে জীবনকে বিকাশ করতে।

নেতাজী বলতেন—"ভারতের একটি বাণী আছে, ইণ্ডিয়া হ্যাজ এ মিশন টু ফুলফিল এবং এই মিশনকে তুলে ধরতে হবে বিশ্বের কাছে। ভারতের সংস্কৃতির মধ্যে এমন কিছু আছে যা বিশ্বমানবের পক্ষে একান্ত আবশ্যক এবং যা গ্রহণ না করলে বিশ্বসভ্যতার প্রকৃত বিকাশ হবে না। অনেক মৃত্যু ও পুনর্জাগরণের ভিতর দিয়ে ভারত এগিয়ে এসেছে কারণ ভারতের আছে একটি মিশন, একটি জীবন বাণী।"

বিবেকানন্দ যে যুগে বেদান্ত প্রচারের মধ্যে দিয়ে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে ভারতের যৌবনশক্তিকে বিদ্রোহের আহ্বান জানিয়েছিলেন—পরবর্তীযুগে সেই উদাত্ত আহ্বানে একটি অগ্নিশিখা প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল। শুধু ধর্মীয়, শুধু সামাজিক মুক্তি নয় রাজনৈতিক মুক্তি। পরাধীনতার গ্লানি থেকে চল্লিশ কোটি মানুষের মুক্তির জন্য সেদিন তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। নেতাজীর রাজনৈতিক আদর্শ, তাঁর সমাজবাদী চিন্তাধারা, তাঁর আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠেছে খাঁটি ভারতীয় জীবনছন্দে। অতীতের পথ চয়ে তিনি আহরণ করেছিলেন ভবিষ্যতের জীবনীশক্তি?

সুভাষচন্দ্র একদিন নেতাজীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন কিন্তু সেই সুভাষচন্দ্র থেকে নেতাজী এই যে সময়ের ব্যবধান, এই যে পথ পরিক্রমা, সে পথ পরিক্রমা অতি সহজলব্ধ নয়। সে পথ ছিল বন্ধুর পথ—সে পথ ছিল সংগ্রামের পথ। নিঃসঙ্গ একাকী—লক্ষ্যারে করি ধ্রুবতারা ভারত পথিক পাড়ি দিয়েছিলেন একদিন 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু।' ১৯১৪ সালে আরও একবার পাড়ি দিয়েছিলেন তিনি। পরিব্রাজকরূপে ভারত তীর্থে তীর্থে সত্যের সন্ধান করেছিলেন—আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে দিয়ে জীবনের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে।

কিন্তু যাঁর জন্ম হয়েছে চল্লিশ কোটি পরাধীন মানুষের মুক্তিযোদ্ধারূপে তিনি কি আর নিজের মুক্তির জন্য হিমালয়ে বসে ধ্যান করতে পারেন! তাই তো তিনি তাঁর বন্ধু দিলীপ রায়কে বলেছেন—

"আমিও এককালে চেয়েছিলাম সর্বদর্শী ঈশ্বরের কাছে দুর্গত মানবতার সহায় হবার প্রার্থনা জানাতে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত থাকতে পারি নি। যাদের ছেড়ে যেতে চেয়েছিলাম তাদের আর্তবেদনা আমায় অস্থির করে তুললো। ভারত-মাতার দুর্দশা দেখে স্থির থাকতে পারি সাধ্য কি।"

ঠিক এই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটে কেমব্রিজে ১৯২১ সালে। সেদিন বিস্মিত দৃষ্টি গিয়ে পড়ে এই তরুণটির

ওপর। সে এতদিন তিলে তিলে শক্তি সঞ্চয় করে নিজেকে প্রস্তুত করছিল ভারতমাতার সেবার জন্য—পরাধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবার জন্য।

সমস্ত বিশ্ব সেদিন এই তরুণটির হঠকারিতা দেখে বিস্মিত হয়েছিল কিন্তু তিনি ছিলেন প্রতিজ্ঞায় অটল, তাঁর আদর্শ ছিল অভ্রান্ত তাই তিনি দাদাকে লিখলেন—"তাঁর পক্ষে ইংলন্ডের রাজার কাছে আনুগত্য এবং বশ্যতার শপথ নেওয়া অসম্ভব; যে প্রতিজ্ঞা তার মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে এমন সংকল্প মৌখিক ভাবেও সে গ্রহণ করতে পারে না।" এই তো সেই ভারতপথিকের কথা। আর্ত মানুষের হাহাকারে যিনি একদিন গৃহত্যাগী হয়েও সন্ন্যাসী হতে পারেন নি তিনি কি করে আই-সি-এস হয়ে চল্লিশ কোটি পরাধীন মানুষের বুকের উপর বিদেশীর দেওয়া পদমর্যাদা নিয়ে ঐশ্বর্যের সৌধ গ'ড়ে তুলবেন—এ যে অসম্ভব।

১৯২১ সালে ১৬ই ফেব্রুয়ারী সুভাষচন্দ্র কেমব্রিজ থেকে একটি চিঠি লেখেন—সে যুগে স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম ঋত্বিক এবং বাংলার প্রাণস্বরূপ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসকে। সে চিঠির প্রতিটি ছত্রে দৃঢ়তা এবং দেশপ্রেমের একনিষ্ঠতা ছিল—তা বুঝতে দেশবন্ধুর এতটুকু ভুল হয় নি। এতদিনে সুভাষচন্দ্র তাঁর গুরু খুঁজে পেলেন। দুই মহাত্যাগীর মিলন দ্যুতিতে সেদিন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরও দুর্বার হয়ে উঠেছিল—তরুণেরা মেতে উঠেছিল প্রাণবন্যায়। বন্ধন-মুক্তির যন্ত্রণা হ'তে মুক্তির আর্তনাদ—বিদেশী শাসকদেরও পর্যন্ত শঙ্কিত করে তুললো। তারা তীক্ষ্ম দৃষ্টি মেলে দেখতে লাগলো বাংলার দামাল ছেলেটিকে।

দেশবন্ধু বললেন—"I have given Subhas to the country." আরও একজন এই কথা সেদিন সমগ্র দেশবাসীকে বলেছিলেন—তিনি হলেন সত্যদ্রষ্টা ঋষি, মানবপ্রেমিক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যিনি ছিলেন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা—যিনি বুঝেছিলেন এই বিদ্রোহী তারুণ্যের অন্তরালে যে মানবপ্রেম অনিবার্য শিখার মত জ্বলছে তা নিভবে না, তা কারও কাছে নতিস্বীকার করবে না। কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত রাষ্ট্রপতিকে—তাই তিনি দু'হাত প্রসারিত করে আহ্বান জানালেন, "বাংলার কবি আমি, বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে 'দেশনায়কে'র পদে বরণ করি। দুর্গতির জালে রাষ্ট্র যখন জড়িত হয়, তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হয় দেশের অধিনায়ক।" সত্যদ্রষ্টা ঋষি তাঁকে দেশনায়কের পদে বরণ করে ভবিষ্যতের পথকে সুনির্দিষ্ট করেছিলেন—তাই তো তাঁর দেশনায়ক একদিন সমস্ত রাজনৈতিক সংকীর্ণতার আবিলতা থেকে নিজেকে মুক্ত করে সেই দুর্গম পথে—নিঃসঙ্গ একাকী যাত্রা করেছিলেন। সেই যাত্রার উদ্দেশ্য—সেই যাত্রার লক্ষ্য এক—"তারা বলে আমি স্বপ্ন দেখি, আমি স্বাপ্নিক! কেমন? তারা বলে—কিন্তু আমি স্বীকার করি আমি স্বাপ্নিক! আমি চিরকাল স্বপ্ন দেখেছি কিন্তু আমার সকল স্বপ্নের সেরা স্বপ্ন, আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রিয় স্বপ্ন ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন।"

এর পর সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর নেতৃত্বে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কর্মস্রোতে। আই-সি-এসে'র সোনার মুকুট ফেলে কিছু না পাবার প্রত্যাশা নিয়েই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন দেশের কাজে। নানান কর্মস্রোতের মধ্যে দিয়ে নিত্য-নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ভবিষ্যতের নেতাজী তৈরি হচ্ছিল এমনি করে সবার অলক্ষ্যে। শান্ত সৌম্য লাজুক সুভাষচন্দ্র কেমন করে কোথা থেকে এত শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন, এত তেজ—এত দৃঢ়তা কোথা থেকে এল তা ভেবে অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন। ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনে, সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন—"আমাদের সংগ্রাম কেবলমাত্র বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নয়, পৃথিবীর সমস্ত সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ করাই হোল আমাদের লক্ষ্য। কেবলমাত্র ভারতবর্ষের জন্য নয় পৃথিবীর সমগ্র মানবতার মুক্তির জন্য আমাদের এই সংগ্রাম। কারণ আমি বিশ্বাস করি ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়া মানেই পৃথিবীর অন্যান্য পরাধীন মনুষ্যজাতির মুক্তি।" প্রকৃত নেতৃত্বের অধিকারী তাঁরই আছে যিনি দেশ কালের ভৌগোলিক সীমাকে অতিক্রম করে বিশ্বের নিপীড়িত মানবাত্মার মুক্তির আহ্বান জানাতে পারেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই বিপ্লবী দেশপ্রেমিক মানুষটিকেও নিকটতম সহকর্মী এবং বন্ধুদের কাছ থেকে যে আঘাত সহ্য করতে হয়েছিল এমন কি তৎকালীন ভারতের অবিসম্বাদী নেতা মহাত্মা গান্ধীও সুভাষচন্দ্রের আপোষহীন দৃঢ় মনোভাবের পরিচয়ে শঙ্কিত হয়ে কংগ্রেস নেতৃত্ব থেকে তাঁকে সরাবার জন্য সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন—সেদিনের সেই কলঙ্কিত অধ্যায় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আজও চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। নেতাজীর আপোষহীন সংগ্রামী নেতৃত্ব হয়ত সেদিনের কংগ্রেসের গতিমুখ পরিবর্তিত করতে পারতো—যার ফলে অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার গৌরব ভারতবর্ষের জনজীবনকে দৃপ্ত এবং দৃঢ় করে তুলতো, হয়ত সে পথ রক্তাক্ত পদক্ষেপে অতিক্রমণের স্বাক্ষর বহন করতো—কিন্তু সে স্বাধীনতার রূপ ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতায় অম্লান হয়ে থাকতো।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে যত আত্মত্যাগের কাহিনী রয়েছে তেমনি রয়েছে বিশ্বাসঘাতকতার কলঙ্কিত কালিমা। ১৯৩৯ সালে সেদিন ত্রিপুরী কংগ্রেসে তাই ভারতের সর্ব জনপ্রিয় তরুণ বিপ্লবী নেতাকে গভীর এক ষড়যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে সরে আসতে হয়েছিল। কিন্তু সেদিন যাঁরা তাঁকে কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করে তাঁর রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং জনপ্রিয়তাকে খর্ব করতে চেয়েছিলেন তাঁরা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেন নি এই বিশ্বাসঘাতকতা একজন বিপ্লবীর জীবনে কত দৃঢ়তা নিয়ে আসতে পারে। সুভাষচন্দ্রর চরিত্রের বজ্রকঠিন দিক তাঁরা তখনও দেখেন নি—তাই কংগ্রেসের তদানীন্তন নেতৃবৃন্দ যখন ইংরেজের সঙ্গে আপোষ করে স্বাধীনতার কথা ভাবছেন তখন কংগ্রেসের বিতাড়িত বাংলার দামাল ছেলে রাত্রির অন্ধকারে অজানা বিপদসঙ্কুল পথে মৃত্যুকে তুচ্ছ করে পাড়ি দিলেন—সেই এক লক্ষ্য—এক স্বপ্নে। হয় মৃত্যু নয় ভারতের স্বাধীনতা।

১৭ই জানুয়ারী ১৯৪১, রাত্রির অন্ধারে সুভাষচন্দ্রের গৃহত্যাগের কাহিনীকে অনেকে সাধনপথের যাত্রা বলে প্রচার করতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। মিত্রশক্তি শঙ্কিত হয়েছিল মহা শত্রুর অজ্ঞাত স্থান থেকে তীব্র আক্রমণের আশঙ্কায়। অনমনীয় বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রকে সেদিন কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ চিনতে ভুল করলেও বৃটিশ রাজশক্তি তাঁর বিপ্লবী চরিত্র আর সর্বস্বের বিনিময়ে স্বাধীনতা লাভের সেই উজ্জ্বল প্রতিজ্ঞার জন্য সচেতন ছিল।

নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ী বলতেন—'Subhas is freedom personified'. সরোজিনী নাইডু বলেছেন—'Subhas is a flaming sword'—বহুজনে বহু বিশেষণে অভিহিত করে সুভাষ চরিত্রের পূর্ণ রূপ প্রকাশ করতে পারে না, সুভাষচন্দ্র অতুলনীয়, সুভাষচন্দ্র দেশপ্রেমিক, সুভাষচন্দ্র সর্বাধিনায়ক অথবা সুভাষচন্দ্র সর্বত্যাগী এই সীমায় সুভাষ চরিত্রকে সীমায়িত করা চলে না। সুভাষচন্দ্র একটি নাম—একটি মন্ত্র একটি অকম্পিত প্রতিজ্ঞা।

ঠাকুর-চাকর

রনজিৎ কুমার সেন

শৈলপতিবাবুর চাকর বিহারীর বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে ঃ বাড়িতে লোকের অভাবে জমি থেকে ধান কাটা হচ্ছে না; এখন ধানের মরশুম, পত্রপাঠ তার বাড়ি যাওয়া দরকার।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর একসময় সংবাদটা নিয়ে দাঁড়ালো সে শৈলপতিবাবুর স্ত্রী চারুশীলার সামনে। ঘর-সংসারের কোনো ব্যাপারে শৈলপতিবাবুর কিছু করণীয় নেই, সেখানে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব চারুশীলার। বললেন ঃ 'আমার বাপু লোক না হলে একদণ্ডও চলবে না। বাড়ি যেতে হলে আগে থেকে এখানে লোক বহাল করে তবে যাবে।'

বাড়ির সর্বময়ী কর্ত্রী চারুশীলা। কোনো বিষয় নিয়ে কিছু বললে তার আর নড়চড় নেই। এ কথা গত পাঁচ বছরের চাকরীর অভিজ্ঞতায় জেনে নিয়েছে বিহারী। দু-একটা দিন তাই বেশ ব্যস্ততা দেখা গেল তার। লোক একজন খুঁজে বার করারই দরকার। নইলে শৈলপতিবাবুর সংসার থেকে ছুটি পাওয়া তার কঠিন হবে, সেই সাথে মাইনেটাও। তাছাড়া চারুশীলার কাছে গচ্ছিত রয়েছে গোটা কুড়ি টাকা। প্রতিমাসের খরচ বাঁচিয়ে তিল তিল করে জমিয়ে রেখেছে এই টাকা ক'টা সে চারুশীলার কাছে, বলেছে ঃ 'আপনার কাছে জমা থাক মা, একসঙ্গে অনেকগুলো হলে বাড়ি নিয়ে গিয়ে জমির কাজে লাগাতে পারবো।'

চারুশীলাও স্বচ্ছন্দে তা হাতে নিয়ে বিহারীর নামে হাতবাক্সে আলাদা একটা খোপ করেছেন। এবারে সেই টাকাগুলোর একসঙ্গে দরকার বিহারীর।

খুঁজেপেতে লোক একজন তাই ঠিক করে ফেললো সে।

চারুশীলা জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'চোর-চোট্টা বদমাস নয় তো?'

—'আজ্ঞে না, চোরচোট্টা হতে যাবে কেন?' বিহারী বললো ঃ 'নাম মহাদেব; চোরচোট্টা হলে কি আর এরকম নাম হয়?'

—'ছোট খুকীকে আগ্‌লাতে পারবে তো?' যেরকম দুরন্ত, ওকে নিয়ে হয়েছে আমার সব চাইতে বেশি দুশ্চিন্তা।' বড় বড় চোখ করে একবার তাকালেন চারুশীলা বিহারীর মুখের দিকে।

মাথা নিচু করে নিয়ে বিহারী বলল ঃ 'আজ্ঞে, খোকাখুকুদের আগ্‌লানো ওর অভ্যাস আছে; এর আগেও এমন কত—'

কথা শেষ হল না। চারুশীলা এবারে সোজা জিজ্ঞেস করলেন মহাদেবকে ঃ 'কি রে, পারবি তো?'

অস্ফুটকণ্ঠে মহাদেব বলল ঃ 'এ আর এমন কি কঠিন কাজ? খুব পারব।'

খুশি হলেন চারুশীলা।

কাজে বহাল হলো মহাদেব।

ভাঙা সুটকেশটাকে কোনোরকমে সাজিয়ে-গুছিয়ে বাড়ি যাবার জন্যে তৈরি হয়ে নিল বিহারী। তার গচ্ছিত টাকাটা এনে হাতে তুলে দিলেন তাকে চারুশীলা, বললেন ঃ 'মাইনের টাকাটা তুমি বাড়ি থেকে ঘুরে এসেই নিয়ো। মাসটা তো আর কাবার করে গেলে না, বাবু মাইনে পাবেন, তবে তো পাঁচজনকে দেবো-থোবো।'

পাঁচজন অর্থে এতদিনের পুরনো বিহারী আর বছরখানেক আগে এসে বহাল হওয়া রাঁধুনী বামুন পাঁচু মিশ্র। এদের পাওনা চুকিয়ে দিতে কি আর মাসকাবারের অপেক্ষায় থাকতে হয় রানুকে? কথাটা উল্লেখ করতে গিয়েও কেন যেন পারলো না বিহারী। বললো ঃ 'আপনার কোনো চিন্তা নেই মা, খামার থেকে ধান এলে উঠোনে ফেলেই আমি রওনা হয়ে আসবো।'

—'তাই এসো, নইলে বড্ড মুশকিলে পড়তে হবে আমাকে। মহাদেব নতুন লোক, ওকে যদি সবকাজেই ক-খ শিখিয়ে নিয়ে আমায় চালাতে হয়, তবে আর আমি নেই।' নরম সুরে মিষ্টি করে বললেন কথাগুলো চারুশীলা।

উপুড় হয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে সোজা রওনা হয়ে পড়লো বিহারী। ট্রেনের ঘন্টা তখন তার বেজে উঠেছে।

কাজ সুরু হলো মহাদেবের। এখানে তার মনের আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠতে বেশি বেগ পেতে হলো না।

কিন্তু দিন কয়েক যেতে-না-যেতেই

তাকে নিয়ে বেগ পেতে সুরু হলো চারুশীলার। কাজে এমন ঢিলে লোক তিনি জন্মে কখনও দেখেন নি। অতিরিক্ত ঘুমকাতুরে মহাদেব। ইতিমধ্যেই রাঁধুনী বামুন পাঁচু মিশ্র কয়েকবার নালিশ জানিয়েছে তাঁকে : 'যদি বলি মসলাটুকু পিষে দে, বসলো এসে মহাদেব শিল-নোড়া নিয়ে, কিন্তু ঐ বসা পর্যন্তই; মসলার নামে মসলা পড়ে রইলো, শিলের উপর নোড়া হাতে অমনি নাক ডাকতে সুরু হলো মহাদেবের। এমন লোক নিয়ে আমি কাজ করতে পারব না মা। আপনি অন্য লোক দেখুন।'

বিপদে পড়লেন চারুশীলা। এরকম কিছু আশঙ্কা করেই বিহারীকে পই-পই করে বলেছিলেন তিনি দেখে-শুনে লোক আনতে। শেষ পর্যন্ত আচ্ছা লোকই জুটিয়ে দিয়ে গেল বিহারী। এদের কারুর কথায় যদি বিশ্বাস করা যায় একতিলও। এরা সব একজাতের, একদরের। তবু বিহারীটাকে এত বছরে শিখিয়ে পড়িয়ে নেওয়া গিয়েছিল, অনেকটা বাড়ির লোকের মতই হয়ে গিয়েছিল বিহারী; কিন্তু যেটি এলো, আচ্ছা কুম্ভকর্ণ যা হোক। স্বয়ং কুম্ভকর্ণ নিজেও সম্ভবত এরকমটা ছিল না! কাছে ডেকে বেশ করে একবার সমঝে দিলেন তিনি মহাদেবকে : 'এমন দিনরাত চব্বিশঘন্টা ঘুমোবি তুই, তবে কাজ করবি কখন? মন দিয়ে কাজ না করলে এখানে তোর থাকা চলবে না, এই বলে রাখছি।'

—'কেন, মন দিয়েই তো কাজ করি মা!' মহাদেব বললো : 'ঠাকুর আপনাকে মিথ্যে লাগিয়েছে। ওর স্বভাব বড় ভালো বলে মনে হয় না।'

ঠাকুরের স্বভাব যে ভালো নয়, তা অজানা নেই চারুশীলার। পাঁচু মিশ্রকে বাড়িতে রাখার পর থেকেই কিছু-না-কিছু একটা খোয়া যাচ্ছে। এমন কি দোকানের সওদায় পর্যন্ত টান পড়ে প্রায় মাসেই। এই নিয়ে এতদিন বিহারীকেই গালমন্দ করেছেন তিনি। ঠাকুরকে বলে বলে তিনি হার মেনেছেন। এসব ব্যাপারে যেটুকু বা বাংলা জানে পাঁচু মিশ্র, সেটুকু ইচ্ছে করেই চেপে গিয়ে নিজের সহজাত উড়ে ভাষায় কথা সুরু করে সে। বাধ্য হয়েই নিজের বক্তব্যে ছেদ টানতে হয় চারুশীলাকে। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও পাঁচু মিশ্রকে তুলে দিয়ে নতুন কোনো পাচকের ব্যবস্থা করে উঠতে পারেন নি তিনি বাড়িতে। এ অঞ্চলে যদিও চাকর পাওয়া মুশকিল নয়, কিন্তু রাঁধুনী ঠাকুর পাওয়া ভার। বাধ্য হয়েই সহ্য করে যেতে হচ্ছে তাঁকে ঠাকুরকে। কিন্তু এখানে তাকে নিয়েই প্রশ্ন নয়। মহাদেব যদি পাঁচ দিক দেখেশুনে সব চালাতে পারে, তবে পাঁচু মিশ্র আপনা থেকেই সায়েস্তা হয়ে যায়। রাঁধার ব্যাপারটা আর কতটুকু! তার সঙ্গে যোগান দেওয়াটাই তো বড় কথা। বললেন : 'মন দিয়ে কাজ করিস না হাতী। ঠাকুরের যেন মাথা-ব্যথা পড়েছে গায়ে পড়ে এসে তোর নামে লাগাতে। এমন অলক্ষুণে ঘুম কেন তোর, বলতো? ছোট খুকুকে পর্যন্ত অবকাশ মতো তোর কোলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি নে। পথে চলতে চলতে কখন হঠাৎ ঘুম পেয়ে বসবে, অমনি কিছু একটা গাড়ি এসে চাপা দিক আর কি!'

—'কি যে বলেন মা, তার ঠিক নেই। আমাকে কি শেষ পর্যন্ত এতখানিই বোকা ঠাওরালেন?' বলে চোখ দুটোকে পিট্‌পিট্ করে একবার দৃষ্টি তুলে ধরলো মহাদেব চারুশীলার মুখের দিকে।

চারুশীলা বললেন : 'প্রতিমাসে দোকান থেকে আমাদের যা সওদা আসে, তার বাইরে আর নতুন করে কিনতে হয় না। অথচ দেখতে পাচ্ছি—প্রায় প্রত্যেক মাসেই কিছু-না-কিছু ঘাটতি পড়ছে। এদিকে দৃষ্টি রাখবি। তাছাড়া যতক্ষণ ঠাকুরের অবসর না হচ্ছে, ততক্ষণ ওর সঙ্গে সঙ্গেই থাকবি, বুঝলি? আর যেন শুনি না—ঠাকুর এসে নালিশ করেছে।'

ঘাড় কাৎ করে সম্মতি জানিয়ে পুনরায় নিজের কাজেই কোথায় একদিকে সরে গেল মহাদেব।

অলক্ষ্যে একটা নতুন আশঙ্কায় মনে মনে বড় বিরক্তিবোধ করতে লাগলেন চারুশীলা। ঠাকুর যদি শেষ পর্যন্ত লোভ দেখিয়ে মহাদেবকেও দলে টানে, তবে আর উপায় নেই। দুটোকেই তবে একসঙ্গে ঝেঁটিয়ে তাড়াতে হবে। অনেকক্ষণ ব'সে ব'সে নানাভাবে কথাগুলো চিন্তা করলেন চারুশীলা, তারপর ব'সে গেলেন ছোট খুকুকে সারা গায়ে পাউডার মাখিয়ে সাজিয়ে দিতে। বিকেল প্রায় গড়িয়ে এসেছে, এর পর ছোট খুকুকে নিয়ে সামনের ফাঁকা মাঠে বেড়াতে বেরোবে মহাদেব।...

রাত্রে ঠাকুরের তাড়াহুড়োয় সকাল সকালই খাওয়া-দাওয়া চুকে গেল। কিন্তু শৈলপতিবাবু প্রতিদিনের মতো আর খেয়ে উঠেই হাতের কাছে তামাকসুদ্ধ গড়্‌গড়া পেলেন না। তামাকের সরঞ্জাম পাশেই বারান্দার একটা কোণ ঘেঁসে। বারকয়েক ডাকলেন শৈলপতিবাবু : 'বলি মহাদেব কোথায় গেলি, ওরে মহাদেব!'

কিন্তু কোনো সাড়া নেই মহাদেবের। পাশ থেকে স্ত্রীকে একবার ঠেলে দিয়ে শৈলপতিবাবু বললেন : 'উঠে দেখ না একবার মহাদেব কোথায় গেল! খেয়েদেয়ে উঠে এক ছিলিম তামাক না টানতে পেরে গলার ভিতরটা কী যে করছে, বুঝতে পারছি না।'

কিন্তু এটুকু বলবার আগেই কর্তার অবস্থাটা বুঝে নিয়েছিলেন চারুশীলা। উঠে তাই একবার বারান্দার দিকে উঁকি দিলেন তিনি এবং সঙ্গে সঙ্গেই চোখ তাঁর কপালে উঠলো। দেখলেন—কল্‌কেয় তামাক সেজে দেশলাইয়ের একটা কাঠি হাতে নিয়ে নির্বিবাদে ব'সে ব'সে ঘুমে টলছে মহাদেব। তিনি হাসবেন, না চেঁচাবেন, বুঝতে পারলেন না। আরও খানিকটা কাছে এগিয়ে গিয়ে সজোরে একটা কান টেনে ধরলেন তিনি মহাদেবের।—'বলি, কাঁড়ি কাঁড়ি খাবি আর ঘুমোবিই যদি, তবে আর এখানে কেন এমনি ক'রে জ্বালাতে এলি, গেলেই তো পারিস দূর হ'য়ে! বলি তোর আক্কেলখানা কি, বল্ তো? কর্তা খেয়ে উঠে এক ছিলিম তামাকের জন্যে গলা ফাটাচ্ছেন, আর ভাত-খাওয়া মাতালের মতো চোখ বুজে তুই ব'সে ব'সে এখানে টল্‌ছিস? পাজি হতচ্ছাড়া কোথাকার! এই তোর কাজের ছিরি?'

হাতেনাতে একেবারে অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়লো মহাদেব। এখানে আসা অবধি এমন ঘটনা তার কোনোদিন ঘটে নি। কর্তা-মা'র মুখের উপর কি ব'লে যে রেহাই পাবে সে, ভেবে পেলো না মহাদেব। তেম্‌নি হতভম্বের মতই কিছুক্ষণ ব'সে থেকে হাতের কাঠিটা দিয়ে ডিবাটা ধরিয়ে নিয়ে চিম্‌টের মাথায় একজোড়া টিকেকে এঁটে ধরলো তার উপর,. তারপর এক সময় উঠে কর্তাবাবুর সামনে নিয়ে গড়্‌গড়াটা বসিয়ে দিল।

এবারে শৈলপতিবাবুর পালা। চারুশীলা মুখে কিছু তাঁকে না বল্‌লেও বারান্দার ঘটনাটা তিনি ঘরে ব'সে স্পষ্টই প্রত্যক্ষ করেছেন। বললেন : 'হারামজাদা কোথাকার! আবার যদি কখনও দেখি তুই ঘুমোচ্ছিস, মাথা ভেঙে তবে গুঁড়িয়ে দেবো।'

এতটুকুও প্রতিবাদ করতে পারলো না মহাদেব, এমন কি কর্তাবাবু কিম্বা কর্তামা'র মুখের দিকেও ভালো ক'রে একবার মুখ তুলে তাকাতে পারলো না। এক-পা দু-পা ক'রে ধীরে ধীরে এক সময় সে অন্যত্র স'রে পড়লো।......

এর পর পুরো তিনটে দিনও কাটলো না। রান্নাঘরে ব'সেই মস্‌লা পিষ্‌বার অবকাশে এক সময় পাঁচু মিশ্রের মুখে মুখে মুখিয়ে উঠতে দেখা গেল মহাদেবকে। ব্যাপারটা সামান্য। ছোট খুকুর দুধ খাবার বাটিটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মহাদেব নিজের হাতে ঝিনুকসুদ্ধ বাটিটা এনে শিল-নোড়ার পাশে রেখে দিয়েছিল, মেজে ধুয়ে পরিষ্কার ক'রে নেবার জন্যে। কিন্তু মস্‌লা পিষ্‌তে এসে বসতে গিয়ে নজরে পড়লো—ঝিনুকটাই কেবল প'ড়ে আছে, বাটিটা উধাও। পাঁচু

মিশ্র যত বলে—সে দেখে নি, সে জানে না কিছু, ততই জ্বলে ওঠে মহাদেব।—'সেই থেকে হেঁসেল আগলে ব'সে আছো তুমি, আর বলছো কি না, জানো না? তুমিই জানো, বার ক'রে দাও বাটি, নইলে আজ আর মা'র কাছে নিস্তার নেই।'

—'বার ক'রে দেবো মানে, আমাকে তবে কি তুই চোর বলতে চাস?' খিঁচিয়ে উঠলো পাঁচু মিশ্র ঃ 'এক বছর আজ এখানে কাজ করছি, বিহারী পর্যন্ত যা বলতে সাহস পায় নি, আজ তুই তাই ব'লে সেরে যাবি ভেবেছিস? কোথায় নিজে রাখ্‌বি বাটি, তার ঠিক নেই, উল্টে চোর বানাতে আসিস অন্যকে! এমন ক'রে আমার পিছনে লাগলে কিন্তু ভালো হবে না ব'লে রাখছি।'

'ইস্, ভালো হবে না হাতী। কেন, মারবি নাকি?' চোখ দুটোকে খুব বড় বড় ক'রে তাকালো এবারে মহাদেব পাঁচু মিশ্রের মুখের দিকে।

পান খাওয়া লাল টক্‌টকে দাঁত বার ক'রে খেঁকিয়ে উঠলো ঠাকুর ঃ 'মারবো ছাড়া কি, আগুনে হাতা গরম ক'রে দেবো তোর অমন ডাঁসালো জিভ পুড়িয়ে, পাজি নচ্ছার।'

মহাদেবও এবারে প্রায় ধূর্জটির মতই জ্বলে উঠলো ঃ 'এস না, কেমন জিভ পোড়াবে দেখি; এই নোড়া দেখেছ তো, মাথা গুঁড়িয়ে দেবো, মুখ থেঁত্‌লে দেবো, উড়ে ভূত কোথাকার।'

কিছুতেই নিবৃত্ত হ'তে চাইল না ঝগড়া। মহাদেবের আগে গিয়েই পাঁচু মিশ্র পাঁচখানাকে সাতখানা ক'রে লাগালো চারুশীলার কাছে।—'এমন ক'রে জাত নিয়ে কথা বললে আমি আর থাকবো না এখানে। হয় ওকে রাখুন, নয় আমাকে। আমি আর হেঁসেলে গিয়ে বসতে পারবো না।'

ডাক পড়লো মহাদেবকে।

—'কি ব্যাপার কি, দুটো জানোয়ারে মিলে আমাকে তোরা স্বর্গে পাঠাবি, এই ভেবেছিস?' অসহিষ্ণুকণ্ঠে বললেন চারুশীলা।

তড়বড় ক'রে খই ফুটলো অমনি মহাদেবের কণ্ঠে ঃ 'মাজাঘষা করবো ব'লে খুকুরাণীর দুধের বাটি আর ঝিনুক নিয়ে রেখেছি শিল-নোড়ার কাছে, গিয়ে বসতে-না-বসতেই দেখি বাটি উধাও। এ কথা যেমনি বলা, আর উদ্ধার নেই। কেন, আমি কি ওর চাকরি করি, না ওরটা খাই? যখন-তখন যা মুখে আসবে, তাই বলবে! বলে কি না—গরম হাতা দিয়ে জিভ আমার পুড়িয়ে দেবে, দিক না কেন, ওর ক'টা মাথা দেখি! আমরাও বাবু-বাড়িতেই চাকরি ক'রে খাই, মান-ইজ্জতের বালাই আমাদেরও আছে। হেঁসেলে দু'জন তো আমরা লোক, এ ছাড়া এমন কে এলো যে হাতে ক'রে অমনি বাটিটা নিয়ে পালাবে! ঠাকুর জানবে, না জানতে আসবে আর পাঁচজন? আপনিই বলুন, আপনিই বিচার ক'রে বলুন তো মা?'

এতক্ষণে কথার ছেদ টানলো মহাদেব।

কিন্তু কাকে রেখে কার বিচার করবেন চারুশীলা? বিশ্বাস নেই দুটোর এক-টাকেও। অথচ—এই নিয়ে কিছু বলতে গেলেও বিপদ। যদি বিগড়ে গিয়ে ঠাকুর চাকর দু'জনেই একসঙ্গে ভেগে পড়ে, তবে তার ঝাল পোহাতে হবে চারুশীলাকেই। স্থূল শরীর নিয়ে আজকাল আর বড় বেশি নড়তে পারেন না তিনি। সংসারে এমন দ্বিতীয় লোক নেই যে তাঁকে সাহায্য করবে। নিজেই চিন্তা ক'রে পান না চারুশীলা, কি ক'রে হঠাৎ এত মুটিয়ে গেলেন তিনি? তা যাক্। কিন্তু উপস্থিতমতো ছোট খুকুর দুধের বাটিটা হারানো সম্পর্কে বিষণ্ণতায় সারা মুখখানি তাঁর ভ'রে উঠলো। বাটিটা ছোট খুকুর জন্মদিনে উপহার দিয়েছিল তার সেজ মাসি। সে এখন সম্বলপুরে তার স্বামীর কাছে। ছোট খুকুর সবচাইতে বেশি আদর ছিল তার এই সেজ মাসি সরমার কাছেই। এখনও সম্বলপুর থেকে সরমা নিয়মিত প্রতি সপ্তাহে চিঠি দিয়ে আদর জানায় ছোট খুকুকে। সরমার দেওয়া রূপোর দুধের বাটিটা শেষ পর্যন্ত হারিয়ে যাবে? চুরি যাওয়া আর হারিয়ে যাওয়া তো একই কথা। বাটিটার ইতিহাসটুকু মনে পড়ে যাওয়ায় হঠাৎ ক্ষেপে উঠলেন তিনি। ঝাঁঝিয়ে উঠলেন চারুশীলা দু'জনের উপরেই ঃ 'কে কি ক'রেছে, তা আমার জানবার দরকার নেই। বাটি খুঁজে বার করা চাই, এই ব'লে রাখছি। ও বাটি হারালে চলবে না! দু'জনে তবে এক পয়সাও মাইনে পাবে না এ মাসে। যত বেয়াক্কেল আর ইতর নিয়ে হয়েছে আমার জ্বালা।'

জ্বালাটা উপস্থিতমতো এই পর্যন্ত থেকে গেল চারুশীলার।

কিন্তু দু-একটা দিন যেতে-না-যেতে ঘুণ ধরলো এবারে হেঁসেলে। ঠাকুরের কিছুটা উন্মনা ভাব লক্ষ্য করা গেল। শেষ পর্যন্ত কয়েকটা দিনের ছুটি চেয়ে বসলো পাঁচু মিশ্র। তারও দেশে যাবার দরকার। এখানে পুরো এক বছরের চাকরীর মধ্যে দেশে যাবার নামও করে নি সে। এখন একবার দিন কয়েকের জন্যে সে ঘুরে আসতে চায়। স্ত্রী-পুত্র তার দেশে। পুরো একটা বছর তাদের চোখে দেখে নি সে। এতে মন খারাপ না হয় কার?

কথাটা কানে যেতেই শৈলপতিবাবু জানিয়ে দিলেন—এখন তাকে ছুটি দেওয়া সম্ভব নয়। সামনের শীতকালটা না কাটিয়ে তাকে ছুটি দিতে পারেন না তাঁরা এখান থেকে।

তর্ক তুললো এবারে পাঁচু মিশ্র ঃ 'কেন, আমার বেলাতেই এত আঁটি-সাঁটি কেন? বিহারীও তো ছুটি পেয়েই দেশে গেল, তার তো কোথাও আটকালো না!'

চারুশীলা বললেন ঃ 'তার সংগে তুলনা করছো তুমি নিজেকে? এ বাড়িতে তোমার স্থান যে তার উপরে, একথাটাও কি তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে? বাবু যখন শীতকালটা কাটিয়ে যেতে বলেছেন, তাই যেয়ো। নইলে বাবু রাগ করবেন।'

কিন্তু দেশে যাবার নামে উড়ে আর পদ্মাপারের লোকেরা একেবারে একপায়ে খাড়া। কথা তুলে তাকে আর মুলতুবি রাখতে রাজী নয় পাচু মিশ্র। বললো ঃ 'বাবু রাগ করলে কি হবে, আমিও না হয় দিন কয়েকের জন্যে নতুন একজন কাউকে দিয়ে যাই—কাজ চালাবার মতো। ফিরতে আমার দিন পনেরোর বেশি দেরি হবে না।'

ফেরা অর্থে সরে পড়বার মতলব পাঁচু মিশ্রের। সে জানে—এখানে এভাবে আর থাকা চলবে না তার। বিহারীর উপর তবু তার কিছুটা প্রভাব ছিল, কিন্তু মহাদেব একেবারে উল্টো প্রকৃতির লোক।

কর্তাবাবু আর কর্তামা'র একরকম অমতেই সে উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়লো দেশে যাবার জন্যে।

ইতিমধ্যে হঠাৎই একটা বজ্রপাত ঘটলো বাড়িতে।

বাইরের দুয়ারে ছোট খুকুকে নিয়ে বসে বসে খেলাচ্ছিল মহাদেব। বেশ হেসে হেসে থির্ থির্ করে দাঁড়িয়ে বারবার এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল ছোট খুকু মহাদেবের প্রসারিত দুই হাতের মধ্যে। কিন্তু কত-ক্ষণ পারে এমনি করে ঠায় বসে থাকতে মহাদেব! ঘুমে দু'চোখ তার কেবলই বুজে আসছিল। আলস্যে ভেঙে আসছিল

ভালোবেসেছিলাম
রোমাঞ্চকর সত্যঘটনার কাব্যগ্রন্থ পড়ুন ও উপহার দিন। — মূল্য: ৩-৫০
রচনা-মোহিনীমোহন কাঞ্জিলাল
প্রাপ্তিস্থান:-
দাশগুপ্ত এণ্ড কোং
কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

রাত্রি, কালরাত্রি

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভুবন ভ'রে গিয়েছে আজ
চোখের জলের সমারোহে;
যে দিকে চাই ক্ষুধার সভা
নরক যেন যায় বিবাহে।

অথচ দশ দিক বিধবা
বোবার মতো দাঁড়িয়ে দূরে।
বধির যারা, দেয় বাহবা
একটি দুটি পয়সা ছুড়ে।

বিবসনা বসুন্ধরা
সপ্ত ঋষির অন্ন জুড়ায়;
গন্ধে বাতাস শিউরে ওঠে
আলোর দেশে ঝড় ব'য়ে যায়।

অনেক দূরে অরুন্ধতীর
ওষ্ঠ জ্বলে চোরের চুমায়;
আর সমস্ত আকাশ জুড়ে
যুধিষ্ঠিরের কুকুর ঘুমায়॥

সমস্ত শরীরটা। কিছুতেই পারছিল না সে এমনি করে বসে থাকতে। অনবরত হাই উঠছিল তার। একসময় সেখানেই সে কাৎ হয়ে শুয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গেই নাসিকাগর্জন।

কিছুক্ষণ কাটতে-না-কাটতেই হঠাৎ তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠলো মহাদেব। সামনে দাঁড়িয়ে ছোট খুকুকে কোলে নিয়ে চিৎকার করছেন চারুশীলা।—'হারামজাদা, ঘাটের মড়া, ঘুমোবার আর সময় নেই তোর? এমনি করে খুকুকে মাটিতে ছেড়ে দিয়ে দিব্যি নিশ্চিন্ত হলি! ওকে সাপে কাটুক আর বিছাতেই কামড়াক্, খেয়াল রইল না সেদিকে? তাছাড়া খুকুর গলার হার গেল কোথায়? দেড় ভরির সোনার হার, কোথায় গেল খুকুর গলা থেকে হার?'

স্তম্ভিত বিস্ময়ে উঠে বসে চোখ রগ্ড়াতে লাগলো মহাদেব। জবাব দেবে যে, এমন কিছু একটা কথাও সে চিন্তা করে পেলো না। মনে মনে বুঝলো—একাজ ঠাকুর ভিন্ন দ্বিতীয় লোকের নয়। বাটিটাও নির্ঘাৎ ঠাকুরই সরিয়েছে। পাঁচু মিশ্রের বাড়ি যাবার আগে তাকে আচ্ছা মতো জব্দ না করতে পারলে গায়ের ঝাল মিটবে না মহাদেবের।

রাগে তখন ফেটে পড়লেন চারুশীলা। এতদিন বাটি চুরি গেছে, চুরি গেছে এজাতীয় আরও কত কি, দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে এসেছেন তিনি আগাগোড়া। কিন্তু খুকুর গলা থেকে হার চুরি, এ যে অসহ্য! একশো সত্তর টাকার কম নয় এখন বাজারে সোনার ভরি, আর সোনাই কি আছে ছাই দেশে! এখন আর ইচ্ছে করলেও অমন একটা হার গড়ানো যাবে না।—ইচ্ছে হলো—নিজের হাতে গায়ের ঝাল মিটিয়ে মেরে বাড়িছাড়া করেন তিনি মহাদেবকে।

গজ্ গজ্ করতে করতে বাড়ির ভিতরে গিয়ে চারুশীলা ফেটে পড়লেন শৈলপতির সামনেঃ 'সামলাও গে এবার তোমার মহাদেবকে। খুকুর গলা থেকে হার উধাও। এরপর তোমার ঘরে আগুন লাগিয়ে তবে হারামজাদা পালাবে।'

শান্তপ্রকৃতির মানুষ শৈলপতিবাবু। শুনে চন্ করে তাঁর মাথা গরম হয়ে উঠলো। তৎক্ষণাৎ তিনি সজোরে হাঁক দিলেন মহাদেব আর পাঁচু মিশ্রের উদ্দেশে।

মহাদেব ততক্ষণে ফাঁকা হেঁসেলে ঢুকে তন্ন তন্ন করে খুঁজছে ঠাকুরের জিনিষপত্রে গুছানো নড়বড়ে সুটকেশটাকে। ঠাকুর ঘরে নেই। কিছুক্ষণের জন্যে কোথাও হয়তো বেরিয়ে থাকবে! কথা আছে—শেষরাত্রে সে রওনা হবে এখান থেকে। কিন্তু সুটকেশটা তার গেল কোথায়? উপরে নিচে তন্ন তন্ন করে ত্রস্ত দৃষ্টিক্ষেপে খুঁজে দেখতে লাগলো মহাদেব। শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার হয়ে গেল সুটকেশটা চালের স্তূপীকৃত চটের থলের পিছনে। দেখলো—ঠাকুরের অসাবধানে তালাটা ভালো করে আটকানো নেই। ডালাটা খুলে নির্ভয়ে হাত ঢুকিয়ে দিল তার মধ্যে মহাদেব। স্তরে স্তরে ভাঁজানো রয়েছে কাপড়, গামছা, গেঞ্জি। অকস্মাৎ তার নিচে থেকে আবিষ্কৃত হয়ে গেল হারটাঃ ছোটখুকুর দেড় ভরির সোনার হার। তৎক্ষণাৎ সে সোল্লাসে বাবুর ডাকে সাড়া দিয়ে সুটকেশটা-সুদ্ধ গিয়ে সোজা উপস্থিত হলো কর্তাবাবু আর কর্তামা'র সামনে। তারপর এক রকম হাঁপাতে হাঁপাতেই বললোঃ 'মহাদেব ঘুমতে পারে; আমার দোষ আছে মা, স্বীকার করি, কিন্তু চোর নই। মহাদেব কোথাও কোনোদিন কিছু চুরি করে নি। বাড়ি-ঘর ছেড়ে বিভুঁয়ে চাকরী করতে এসেছি, আপনারাই মা-বাপ। দরকার মতো চেয়ে-চিন্তে নেবো, চুরি কেন করতে যাবো?'

শৈলপতিবাবু হাত বাড়িয়েই ছিলেন মহাদেবকে কিছু একটা উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্যে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর সেই প্রচন্ড ক্রোধ বরফের মতো জল হয়ে গেল। দেখতে দেখতে চারুশীলা ও শৈলপতিবাবুর চোখ দুটো কেমন এক অভূতপূর্ব দৃষ্টিতে ভরে উঠলো। এমন দৃষ্টি কোনোদিন দেখে নি মহাদেব।

শৈলপতিবাবু বললেনঃ 'সুটকেশটা এখানে এইভাবেই খোলা থাক। নিজের কাজে যা তুই মহাদেব।'

এ ঘটনার ঠিক পনেরো দিন পরে এসে উপস্থিত হলো বিহারী। মহাদেবকে বাড়ি থেকে উঠিয়ে দিয়ে আবার পূর্বের মতো কাজে প্রতিষ্ঠিত হবার ইচ্ছে তার।

চারুশীলা বললেনঃ 'আপাতত মহাদেবই এখানে থাক। তুমি বরং অন্য কোথাও কাজ খুঁজে নাও বিহারী। দরকার মতো তোমাকে আমরা খবর দেবো।'

একথার পর কেন যেন বিহারী আর কোনো পাল্টা প্রশ্ন করতে পারলো না। স্বল্পক্ষণের জন্য একবার চোখ দুটোকে দৃঢ় করে কি যেন ভাবতে চেষ্টা করলো সে। কর্তামা'র কাছে এখনও মাইনেটা তার বাকি পড়ে আছে, অথচ চেষ্টা করেও সেটুকু মুখে আনতে পারলো না বিহারী।

মুহূর্তের জন্য একবার স্ত্রীর মুখের দিকে দৃষ্টি তুলে ধরে কি যেন লক্ষ্য করলেন শৈলপতিবাবু, এবং পরক্ষণেই আবার চোখ দুটোকে ঘুরিয়ে নিয়ে নিজের কাজে মন দিলেন তিনি। আপিসের এখনও অনেকগুলো ফাইলের কাজ তাঁর বাকি॥

সেজুয়ানের মহৎ নারীঃ স্টাইল বলতে কি বোঝায়? অনেকে মনে করেন স্টাইল হচ্ছে সহজ জিনিসকে জটিলভাবে রচনায় প্রকাশ করা—বলেছেন কক্‌তো। কিন্তু তা তো নয়। জটিল জিনিসকেই সহজভাবে প্রকাশ করার ভংগীকে ভাল স্টাইল আখ্যা দিতে হয়—যেমন করেছেন ব্রেখ্‌ট তাঁর এই নাটকটিতে। দারিদ্র্যের অভিশাপ মানুষকে কিভাবে পশুতে পরিণত করে তারই ছবি দিয়েছেন ব্রেখ্‌ট এ নাটকের প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্যে। তবে সেটাই বড় কথা নয়। ব্রেখ্‌ট এ নাটকে বোঝাতে চেয়েছেন যে ইম্‌পারফেক্ট সোসাইটিতে পারফেক্ট থাকবার প্রচেষ্টাটাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বিখ্যাত সমালোচক কেনেথ টাইনানের মতেঃ

The epilogue poses the question to the audience, inviting it to choose between changing human nature and changing the world. Brecht implies, of course, a Marxist solution : let us change human nature by changing the world ; and China embarked on just such an experiment several years after he wrote the play.

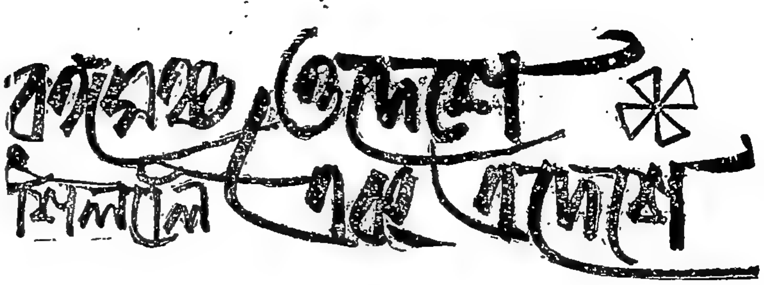

মধ্যবর্তী দৃশ্য

সদরপ্রান্তে রাস্তার ধারে

[ভিস্তি ওয়াং বসে আছে]

ওয়াং—(চারদিকে চেয়ে) গত চারদিন ধরে দেবতাদের দৃষ্টি এড়িয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি— সব দিকে নজর রেখেছি—কেউ আমাকে খুঁজে বের করতে পারবে না। একদিন প্রায় সামনাসামনি পড়ে গিয়েছিলাম আর কি। যাক, এতদিনে ওঁরা নিশ্চয় অন্য কোনো জায়গায় চলে গিয়েছেন—আর ভয় নেই।

[দেওয়ালে হেলান দিয়ে ওয়াং ঘুমোতে থাকবে—মৃদু সংগীতের ধ্বনি শোনা যাবে—তারপরে দেবতারা এসে সামনে দাঁড়াবেন। হঠাৎ চোখ খুলে ওঁদের দেখতে পেয়ে ভয়ে দু-হাত মুখের সামনে ঢাকা দিয়ে বলতে থাকবে—]

ওয়াং—দোহাই আমাকে বকাবকি করবেন না—আমি স্বীকার করছি, আপনাদের জন্যে সে রাত্রে কোনো আশ্রয় যোগাড় করতে পারি নি। আমি অপরাধ স্বীকার করলাম—দয়া করে আমাকে রেহাই দিন।

১ম দেবতা—তোমার ভুল হয়েছে। একটা আশ্রয় তুমিই ঠিক করে দিয়েছিলে। তুমি চলে যাবার পর সে এসেছিল। রাত্রের জন্যে আমাদের তার ঘরে নিয়ে গিয়েছিল—আমাদের সুখ-নিদ্রার সব ব্যবস্থা এবং তদারক করেছিল। ভোর হবার সংগে সংগে আলো দেখিয়ে যাত্রা-পথে নিয়ে এসেছিল। তুমি বলেছিলে সে সৎ মানুষ, আমরাও দেখলাম সে প্রকৃত সৎ মানব।

ওয়াং—তাহলে শেন্‌টেই প্রভুদের আশ্রয় দিয়েছিল?

৩য়—নিশ্চয়ই।

ওয়াং—আর আমি কি না পালিয়ে এসেছিলাম। তার ওপর এতটুকু আস্থা রাখতে পারি নি। আমার মনে হয়েছিল সে আসতে পারবে না। কারণ অর্থাভাবে সে তখন ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছিল। এবং রাত্রে টাকা রোজগারে না বেরোলে পরদিন ভাড়া বাকীর জন্যে তাকে বাসা ছাড়তে হতো।

দেবতারা—(একসংগে) দুর্বল চরিত্রের মানুষ—মনোভাবটা খারাপ নয়, কিন্তু অন্তরটা দুর্বল। কঠোর জীবন সংগ্রামের মাঝে পড়ে মনে করে তার ভেতরে ভালো বলে কিছু নেই। বিপদে পড়লে সাহস হারিয়ে ফেলে। শক্তিহীনতা কোনো কিছু শুভতে বিশ্বাস করে না। না ভেবেচিন্তে হঠাৎ কাজ ক'রে বসে, আগে থেকেই আশা হারিয়ে ফেলে।

ওয়াং—হে মহানুভব দেবতার দল, আমি সত্যি সত্যিই খুব লজ্জা বোধ করছি।

১ম—ওহে জলওয়ালা, তাড়াতাড়ি শহরে ফিরে গিয়ে শেন্‌টে কিভাবে জীবন কাটাচ্ছে, সে বিষয় খবরদারি করো—তাহলে আমাদের দরকার হ'লে তোমার থেকেই সব জানতে পারবো। দেখবে শেন্‌টের এখন ভালই হচ্ছে—সে নাকি একটি ছোট মতন দোকান চালাবার টাকা পেয়েছে—তাই এখন তার মনের সব সৎ ইচ্ছা অনুসারে সে কাজ করতে পারবে। ভাল কাজ করবার সুযোগ পেলেই, ভাল হওয়া যায়। আমরা আরও দূরে দূরে ঘুরে বেড়াবো এবং আমাদের পরীক্ষার কাজ চালাবো। এরই ফলে সেজুয়ানে শেন্‌টের মতো আরও অনেক সৎ মানুষ আমরা আবিষ্কার করতে পারবো। এর ফলে সেই বিশ্রী গুজবটা—অর্থাৎ সৎ মানুষেরা এই পৃথিবীতে বাসের অনুপযোগী—এটাকে চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া যাবে।

[আলো নিভে যাবে।]

কার্টেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

শেন্‌টের তামাকের দোকান ঃ

[চারিদিকে সব শুয়ে রয়েছে—একটা আলো জ্বলছে—দরজায় ধাক্কার আওয়াজ পাওয়া যাবে—]

মহিলা—(কোনোরকমে ঘুম থেকে উঠে) শেন্‌টে, কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। শেন্‌টে গেল কোথায়!

ভাইপো—আমাদের প্রাতরাশ তৈরি করছে বোধহয়—কাজিনের খরচে।

[মহিলা উঠে দরজা খুলে দেবে—একটি যুবক এবং তার পেছনে ছুতোর ঘরে ঢুকবে।]

যুবক—আমিই শেন্‌টের কাজিন।

মহিলা—(অবাক হয়ে) কি বল্‌লে?

যুবক—আমার নাম সুইটা।

[পরিবারের একে অপরকে ধাক্কা দিয়ে তুলে দেবে—তাদের মধ্যে এভাবে কথাবার্তা হবে—]

একজন—ওর কাজিন!

অন্যজন—সমস্ত ব্যাপারটাই তো ঠাট্টার ছলে কথা হয়েছিল, ওর তো কেউ কাজিন নেই।

ভাইপো—তুমি যদি আমাদের শেন্‌টের কাজিন হও, তা হলে তাড়াতাড়ি গিয়ে আমাদের প্রাতরাশের ব্যবস্থা করো, বুঝলে?

সুইটা—এখন যে কোনো মুহূর্তে দোকানের খরিদ্দাররা আসতে শুরু করবে। সব তৈরি হও গিয়ে...... আমাকে এখন আমার দোকানটা খুলতে হবে।

পুরুষ—তোমার দোকান? আমার ধারণা এ দোকানটা আমাদের বন্ধু শেন্‌টের সম্পত্তি। (সুইটা মাথা

নেড়ে অসম্মতি জানাবে) তুমি কি বলতে চাও দোকানটা ওর নয়?

ভাইয়ের বউ—ও তো তাই বলেছিল—কোথায় নিখোঁজ হ'ল শেন্‌টে?

সুইটা—ওর ফিরতে দেরি হবে। আমাকে দিয়ে সে তোমাদের জানিয়েছে—এখন আমি যখন এখানে আছি, তার পক্ষে আর তোমাদের জন্যে কিছু করা সম্ভব হবে না।

মহিলা—তাই না কি! অথচ আমরা ভেবেছিলাম সে কত ভাল মেয়ে।

ভাইপো—ওর কথায় বিশ্বাস করো না, শেন্‌টেকে খুঁজে বার করো।

পুরুষ—ঠিক কথা, তাই করতে হবে। (কয়েকজনকে উদ্দেশ ক'রে) তোমরা দু'জন এইদিকে চলে যাও, আর তোমরা কেউ এদিকে, কেউ ওদিকে—আমি আর ঠাকুর্দা এখানে বসে ঘাঁটি রক্ষা করবো। বালকটি বেরিয়ে গিয়ে আমাদের জন্যে কিছু খাবার জোগাড় করে আনুক। (বালককে) এই ছোক্‌রা, ওই কোণে রুটির দোকানটায় চলে যাও—যতোটা পারবে পকেটে ঠেসে নিয়ে আসবে।

ভাইয়ের বউ—কয়েকটা ছোট গোল কেক্‌ আনতে ভুলো না।

পুরুষ—কিন্তু সাবধান! দোকানদার যেন ধরে না ফেলে। আর পুলিশের ধারকাছ দিয়ে যাবে না।

[বালকটি মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে চলে যাবে। অন্যরাও যে যার পোশাক পরে নেবে।]

সুইটা—এভাবে কেক্‌ চুরি করলে যে দোকানে তোমরা আশ্রয় নিয়েছ সেখানকার বদনাম হবে।

ভাইপো—এর কথা কেউ শুনো না। আমরা শেন্‌টেকে এখুনি খুঁজে বের করবো, সে একে আচ্ছা করে শিক্ষা দিয়ে দেবে।

[ভাইপো, বালক, ভাইয়ের বউ, ভাই-ঝি বেরিয়ে যাবে।]

ভাইয়ের বউ—(যেতে যেতে) আমাদের প্রাতরাশের জন্যে কিছু খাবার রেখে দিও।

সুইটা—(শান্তভাবে) শেন্‌টেকে তোমরা খুঁজে পাবে না। আমার কাজিন তোমাদের আতিথেয়তা করতে না পেরে সত্যিই খুব দুঃখিত—আর তোমরা তো দলে কম নও। এটা একটা ছোট তামাকের দোকান—আর এই থেকেই শেন্‌টেকে জীবিকা চালাতে হবে।

পুরুষ—শেন্‌টে এ ধরণের কথা কখনও আমাদের বলতো না।

সুইটা—হয়তো তোমার কথাই সত্যি। (ছুতোরকে) এ শহরের সবচেয়ে বেশি দুর্ভাগ্য কি জান? এখানে এত দারিদ্র্য যে কোনো একজন লোকের পক্ষে তা সামলানো অসম্ভব। (দর্শকদের) এগারোশো বছর আগে আমাদের এক কবি এদেশ সম্বন্ধে যা লিখে গেছেন আজও তা সমানভাবে সত্যি—

হাজার হাজার লোক যখন ঠাণ্ডায় জমে মরছে,
তার প্রতিবিধান হবে কি করে—
একজন বা দুজনের শরীর গরম রাখবার ব্যবস্থা
করে লাভ কি হবে?
দশ হাজার ফুট লম্বা একটা কম্বল যদি পেতাম
একই সঙ্গে শহরের প্রতিটি ইঞ্চি জমি—
তা দিয়ে ঢেকে দেওয়া যেত।

["The Big Rug"—from 170 Chinese Poems by Arthur Waley.]

[সুইটা দোকানের জিনিসপত্র গুছোতে থাকবে।]

ছুতোর—দেখতে পাচ্ছি তুমি তোমার কাজিনের সমস্ত ব্যাপার নিয়ে মোকাবিলা করছ! এই দোকানের কাজ করবার জন্যে আমার পাওনা একটা ছোট্ট বিল আছে—তোমার কাজিন এদের সবার সামনে আমার পাওনাটাও মেনে নিয়েছে—একশো রুপোর ডলারের বিল।

সুইটা—(নিজের পকেট থেকে বিলটা বার করে) একশো ডলারের সংখ্যাটা বড্ড বেশি হয় নি কি?

ছুতোর—এর কমে হবে না—আমাকে স্ত্রী পরিবারের ভরণ-পোষণ চালাতে হবে তো?

সুইটা—তোমার ক'জন ছেলে-মেয়ে?

ছুতোর—চারজন।

সুইটা—কুড়ি ডলার পাবে।

ছুতোর—(হেসে ওঠে) তুমি কি পাগল! আখরোট গাছের তক্তা দিয়ে সেল্‌ফ্‌-গুলো বানিয়েছি জান?

সুইটা—ওগুলো নিয়ে যাও।

ছুতোর—তার মানে?

সুইটা—অত পয়সা আমি দিতে পারব না—ওগুলো নিয়ে যাও।

মহিলা—এইবার সেয়ানে সেয়ানে কোলা-কুলি—(খিক্‌ খিক্‌ করে হেসে উঠবে)।

ছুতোর—(সঙ্কুচিতভাবে) মিস শেন্‌টে আসুক—তখন কথা হবে— সে তোমার থেকে অনেক ভাল।

সুইটা—তা তো বটেই। তা না হলে তার সর্বনাশ হবে কেন?

ছুতোর—তুমি কি চাও আমার পরিবারের লোকেরা না খেয়ে মরুক?

সুইটা—আগে যা বলেছিলাম, আবার বলছি—কুড়ি ডলার নিয়ে আমাকে রেহাই দাও।

ছুতোর—একশো ডলার।

সুইটা—আগেই বলেছি হবে না।

ছুতোর—মাপ নিয়ে তক্তাগুলো কাটা—অন্য কাজেও লাগবে না—সুবিধায় পেয়েছ, যাক্‌ গে যা ইচ্ছে দাও—

সুইটা—এই তো বুদ্ধিমানের মতো কথা—

[মহিলা খিক্‌ খিক্‌ করে হাসতে থাকবে।]

সুইটা—এই নাও কুড়ি ডলার।

[ছুতোর টাকাটা নিয়ে চলে যাবে।]

মহিলা—(খিক্‌ খিক্‌ করে হেসে উঠে) "একশো ডলার আমার পাওনা—কমে চলবে না—পরিবার রয়েছে—চারজন ছেলেপিলে" আর শেষ পর্যন্ত কুড়ি ডলারেই হিসেব-নিকেশ হয়ে গেল। (খিক্‌ খিক্‌ করে হাসি)।

সুইটা—এবার তোমরাও এখান থেকে কেটে পড়ো।

পুরুষ—আমরা......যাবো—?

সুইটা—হ্যাঁ—তোমরা—যাবে। যতসব জোচ্চোর আর পরগাছার দল। আর দেরি না ক'রে তাড়াতাড়ি কেটে পড়ো দেখি।

পুরুষ—ওর কথা কানে না তোলাই ভাল। খালি পেটে কথা বলতেও ভাল লাগে না। ছোঁড়াটা গেল কোথায়?

সুইটা—রুটি কেক্‌ চুরি করে ও ছোঁড়াটা যে এখনে এসে আশ্রয় নেবে, এ সব চলবে না। (চিৎকার করে) আবার বলছি এখান থেকে বেরিয়ে যাও সব।

[সব চুপচাপ বসে থাকবে।]

সুইটা—দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি। (উইংস্‌-এর কাছে গিয়ে) পুলিশ অফিসার!

পুলিশ অফিসার—(ভেতরে ঢুকে) বলুন মিঃ সুইটা।

সুইটা—আমি আর আমার কাজিন এই দোকানটা খুলেছি। কখনও কোনো আইনবিরোধী কাজ যাতে এ দোকান থেকে না হয় সে বিষয়ে আমরা খুব কড়া নজর রাখব ঠিক করেছি।

পুলিশ—খুবই ভাল কথা।

সুইটা—এ'রা সবাই আমাদের অতিথি। আমার কাজিনের সঙ্গে এ'দের একসময় অল্প-স্বল্প পরিচয় ছিল—এ'রা এখন চলে যাচ্ছেন। আপনি আসবার আগে আমরা পরস্পরের থেকে বিদায় নিচ্ছিলাম।

পুরুষ—(রুষ্টভাবে) বেশ বেশ, আমরা তবে চলি।

সুইটা—আমি আমার কাজিনকে বলব, তোমরা তার আতিথেয়তার জন্যে তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছ—কিন্তু তার ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলে না।

[দূর থেকে শোনা গেল "চোর চোর—ধর"—]

পুলিশ—এ আবার কি ব্যাপার?

[ছেলেটা দৌড়ে আসবে, তার পকেট থেকে কেক্ এবং রুটির রোল বেরিয়ে আসতে চাইবে। মহিলা তাকে পালিয়ে যেতে ইংগিত করবে—বালক ফিরে পালাতে যাবে—]

পুলিশ—এখানে দাঁড়াও। (ওকে ধরে) কোথায় কেকগুলো পেলে?

বালক—ঐখান থেকে।

পুলিশ—চুরি করে এনেছ তো?

মহিলা—এ বিষয়ে আমরা কিছুই জানতাম না। সবই এই ছেলেটার বজ্জাতি। ক্ষুদে শয়তান!

পুলিশ—মিস্টার সুইটা, এ বিষয়ে আপনি কিছু জানেন?

[সুইটা চুপ করে থাকবে।]

পুলিশ—আচ্ছা ঠিক আছে, তোমাদের সবাইকে আমার সংগে থানায় আসতে হবে।

সুইটা—আমি অত্যন্ত দুঃখিত। এখানে এ ধরণের কিছু ঘটতে পারে, এ আমি ভাবতেও পারি নি। তা ছাড়া বুঝতেই পারছেন চুরির ব্যাপারটা লুকোতে হলে আপনাকে আমি এখানে আসতে অনুরোধ করতাম না।

পুলিশ—আমি সবই বুঝতে পেরেছি মিঃ সুইটা। কিন্তু আমাকেও আমার কর্তব্য করতে হবে। এদের ধরে নিয়ে যেতেই হবে। (সুইটারাও করবে) চল হে সবাই—(সবাইকে ঠেলে নিয়ে চলে যাবে।)

[একা সুইটা—মিসেস মিৎসু ঢুকবে।]

মিৎসু—তুমিই বোধহয় সেই কাজিন। আমার বাড়ি থেকে পুলিশ লোক ঠেঙিয়ে বের করছে, ব্যাপারটা কি? এখানে তোমার বোন বোর্ডিং হাউস খুলেছিল কি উদ্দেশ্যে বল তো? যতো সব ছোটলোককে বাড়িতে এনে ওঠালে এমনটাই হ'য়ে থাকে। এ সব আমার আগে থেকেই জানা আছে।

সুইটা—সবাই নিশ্চয় আমার কাজিনের বিরুদ্ধে অনেক কথাই তোমাকে বলেছে। ও খেতে পায় না, ও গরীব, ওর সুনাম নেই—

মিৎসু—অতি নিচুস্তরের—

সুইটা—ও সত্যিই অত্যন্ত গরীব।

মিৎসু—আমার মন নরম করবার চেষ্টা করো না। ও কতো রোজগার করছে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। কিভাবে ও জীবন কাটিয়েছে সেটাই ভাববার কথা। আমি বুঝতে পারছি কোনো জায়গা থেকে সে কিছু টাকা পেয়েছে—তাই দিয়ে দোকানটা কিনেছে। কিন্তু এখানকার ভাড়াটেরা সবাই ভদ্রলোক। এদের সংগে এক বাড়িতে থাকবার মতো লোক বলে তোমার কাজিনকে আমি মনে করি না। (একটু থেমে) ভেবো না আমার মনে দয়ামায়া নেই, কিন্তু আমার একটা দায়িত্ববোধও তো আছে।

সুইটা—(তিক্তস্বরে) মিসেস মিৎসু, আমাকে সব সময় কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়, স্পষ্ট করে বলুন আপনার এই সম্ভ্রান্ত বাড়িটিতে থাকতে কত দিতে হবে—টেবিলের ড্রয়ার থেকে এগ্রিমেণ্টটা নিয়ে) ভাড়াটা খুবই বেশি। মাসিক ভাড়া দিতে হবে তো?

মিৎসু—তোমার কাজিনকে ছ' মাসের ভাড়া আগাম দিতে হবে। দুশো রুপোর ডলার।

সুইটা—দু'শো রুপোর ডলার! বল কি? এত টাকা পাবো কোথায়? এত টাকা তো এই দোকান থেকে রোজগার হতে পারে না।

মিৎসু—সে কথা আগে ভেবে দেখা উচিত ছিল।

সুইটা—মিসেস মিৎসু, এত কঠিন হয়ো না—আমি স্বীকার করছি আমার কাজিন কয়েকজন হতভাগ্যকে এখানে আশ্রয় দিয়ে অমার্জনীয় অপরাধ করেছে। কিন্তু ও ঠকে শিখবে—আমি বলছি ও যাতে এসব বুঝতে পারে সে চেষ্টা আমি করবো। আমি এ কথাও বলছি ওর মতো ভাড়াটে তুমি পাবে না। এত ধীর-স্থির পরিশ্রমী শান্ত প্রকৃতির মানুষ সহজে দেখা যায় না। নিয়মিতভাবে ও তোমার ভাড়া যুগিয়ে যাবে। ওর মতো ভাড়াটে লক্ষে একজন মিলবে কি না সন্দেহ!

মিৎসু—দুশো রুপোর ডলার আগাম দিতে হবে। না হলে যে রাস্তায় ওর স্থান সেখানেই ফিরে যেতে হবে।

[পুলিশ অফিসার ঢুকবে।]

পুলিশ—আমি আপনাকে ডিসটার্ব করতে চাই না মিঃ সুইটা।

মিৎসু—এ দোকানটার ওপর দেখছি পুলিশের নজর লেগেই রয়েছে।

পুলিশ—মিসেস মিৎসু, ভুল ধারণা করবেন না। মিঃ সুইটা আমাদের কাজে সাহায্য করেছেন এবং সেই জন্যেই পুলিশের তরফ থেকে আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিতে এসেছি।

মিৎসু—আমার সংগে এ সব ব্যাপারের

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

অ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর
বেজওয়াড়া - শ্রীনগর - গৌহাটী

কোনো সম্পর্ক নেই। মিঃ সুইটা, আশা করি তোমার কাজিন আমার প্রস্তাবে রাজী হবে। ভাড়াটেদের সঙ্গে যাতে বনিবনা থাকে সেটাই আমি চাই। আচ্ছা গুড মর্নিং।

[বেরিয়ে যাবে।]

সুইটা—গুড মর্নিং মিসেস মিৎসু।

পুলিশ—মিসেস মিৎসুর সঙ্গে কি আপনার গোলমাল হচ্ছে?

সুইটা—আমার কাজিনের কাছ থেকে ভাড়া আগাম চাইছে। ও মনে করে আমার বোন সম্ভ্রান্তশ্রেণীর নয়।

পুলিশ—আপনি কি টাকাটা যোগাড় করতে পারছেন না? (সুইটা চুপ করে থাকবে) কিন্তু মিঃ সুইটা আপনি নিশ্চয় টাকাটা কারুর কাছ থেকে ধার নিতে পারেন।

সুইটা—তা পারি। কিন্তু শেনটেকে কে টাকা ধার দেবে?

পুলিশ—আপনি কি এখানে থাকছেন না?

সুইটা—না। তাছাড়া এখানে আর আসতেও পারব না। এদিক দিয়ে সফরে বেরিয়েছিলাম বলেই শেনটেকে সাহায্য করার সুযোগ পেলাম। ওর কি হবে ভেবে সত্যিই চিন্তিত হচ্ছি।

পুলিশ—মিঃ সুইটা ভাড়ার ব্যাপারে গোলমালে পড়েছেন শুনে সত্যিই দুঃখিত হলাম। জানেন, এ দোকানটাকে আমরা একটু সন্দেহের চোখেই দেখছিলাম—আপনি ওই লোকগুলোকে আমাকে ধরতে সাহায্য করার পর থেকে বুঝলাম, আইন রক্ষার ব্যাপারে আমরা আপনাকে বন্ধু হিসেবে দেখতে পারি।

সুইটা—অফিসার, আমার কাজিন এই ছোট দোকানটাকে দেবতাদের উপহার বলে মনে করে। আমিও এটাকে যে করে হোক বাঁচাতে চাই। যাক্ গে, আপনি কি ধূমপান করেন?

পুলিশ—(দুটি সিগার নিয়ে পকেটে ভরবে) মিঃ সুইটা, আমাদের থানার সবাই আপনি চলে যাচ্ছেন শুনে দুঃখিত হবে। কিন্তু মিসেস মিৎসুর চিন্তাধারাটা আপনি বুঝতে চেষ্টা করবেন। দেখুন সত্যিকে অস্বীকার করে কোনো লাভ নেই—শেনটে দেহ বিক্রি করে জীবিকা অর্জন করতো। আপনি হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন এ ছাড়া আর তার কি উপায় ছিল? কিন্তু সে যাই হোক, এটা তো খুব সম্মানের ব্যাপার নয়। কেন নয়? কারণ প্রেমের সাহায্যে টাকা রোজগার করা চলে না—ওইভাবে রোজগার করলে লোকে তাকে স্বৈরিণীবৃত্তি বলবে। নর-নারীর সম্পর্ক যখন টাকাকে বাদ দিয়ে গড়ে ওঠে সেটাই প্রেম এবং তাকেই মহৎ সম্পর্ক আখ্যা দেওয়া চলে—নচেৎ নয়। প্রেমের তাগিদেই নারীর পুরুষের সঙ্গে মেশা উচিত, খাবার পয়সা আদায়ের জন্যে নয়। আপনি হয়তো প্রশ্ন করবেন, ও তাহলে কি করবে? ছ' মাসের ভাড়া তো যোগাড় করতে হবে? মিঃ সুইটা, এর উত্তর আমার জানা নেই। (বেশ চিন্তামগ্নভাবে) মিস্টার সুইটা উত্তর খুঁজে পেয়েছি। যে করে হোক আপনার কাজিনকে বিয়ে করবে, এমন একজন লোক খুঁজে বের করুন।

[একটি ছোটখাট ধরণের বৃদ্ধা মহিলা ঢুকবেন।]

বৃদ্ধা—আমার স্বামীর জন্যে সস্তায় একটি ভাল সিগার চাই। কাল আমাদের বিয়ের চল্লিশ বছর পূর্ণ হবে—আমরা একটা ছোটখাট উৎসব করবো।

সুইটা—(নম্রভাবে) চল্লিশ বছর হ'য়ে গেছে, তা সত্ত্বেও উৎসব করবে?

বৃদ্ধা—আমাদের সাধ্যে যা কুলোবে সেই অনুসারেই করবো। রাস্তার ওই ধারে আমাদের কার্পেটের দোকান। আমরা প্রতিবেশী হিসেবে পরস্পরের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করব— আজকালকার এই দুর্দিনে এটারই সব থেকে বেশি দরকার।

[সুইটা কয়েকটি সিগারের বাক্স খুলে দেবে।]

পুলিশ—মিঃ সুইটা, এক্ষেত্রে দরকার টাকার—সেই জন্যেই আপনার কাজিনের বিয়ের প্রস্তাব করছি।

সুইটা—(বৃদ্ধার প্রতি) আমি একটা ব্যক্তিগত গোলমালের ব্যাপার নিয়ে এই অফিসারের সঙ্গে পরামর্শ করছিলাম।

পুলিশ—ছ' মাসের ভাড়া যোগাড়ের ব্যাপার। বিয়ে করেই এ টাকাটা আদায় করতে হবে।

সুইটা—অত সহজ হবে না।

পুলিশ—কেন হবে না—ও তো ভাল পাত্রী। তা ছাড়া ছোট হলেও ওর ব্যবসাটা ভবিষ্যতে ভাল দাঁড়াবে। (বৃদ্ধার প্রতি) আপনি কি বলেন?

বৃদ্ধা—(ইতস্তত করে) হ্যাঁ...তা বটে...

পুলিশ—ব্যক্তিগত বিভাগে বিজ্ঞাপন দেওয়া দরকার।

বৃদ্ধা—যুবতীটি রাজী হলে তবে তো?

পুলিশ—রাজী হবে না কেন? আমি বিজ্ঞাপনের একটা খসড়া করে দিচ্ছি। আমাদেরও অন্যকে সাহায্য করবার ইচ্ছে হয়। ছোট ছোট দোকানদারদের প্রতি পুলিশের কর্তাদের কত সহানুভূতি আমার কাজ দেখেই তা বুঝতে পারবেন।

[হা হা করে হেসে উঠবে তার পর নোটবুক আর পেন্সিল বার করবে পকেট থেকে—পেন্সিলের শিষটা একবার চুষে নিয়ে লিখতে থাকবে।]

সুইটা—এটা মন্দ আইডিয়া না!

পুলিশ—(পড়তে থাকবে) "কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুরুষ—অল্প-স্বল্প বিত্তের অধিকারী—মৃতদার হলেও চলবে—যদি বিয়ে করতে সম্মত হন—তামাকের দোকানের মহিলা স্বত্বাধিকারিণীকে?" এর পরে যোগ করে দিতে হবে—মনোহারিণী পিঙ্গলকেশী—যুবতী—কি, কি মনে হচ্ছে?

সুইটা—একটু বাড়িয়ে বলা হচ্ছে না?

বৃদ্ধা—না না, ঠিক আছে। মোটেই বাড়িয়ে বলা হচ্ছে না। আমি শেনটেকে অনেকবার দেখেছি।

[পুলিশ অফিসার নোটবই থেকে পাতাটা ছিঁড়ে শেনটেকে দেবে।]

সুইটা—জীবনরথের চাকার তলায় পড়ে পিষ্ট হ'য়ে যাবার থেকে বাঁচতে হ'লে বহু সৌভাগ্য থাকা দরকার। কি চমৎকার সব প্রস্তাব। কি সব বিশ্বস্ত বন্ধুর দল! (পুলিশকে) ভাড়ার টাকা কিভাবে পাবো তার কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আপনি এসে সত্যিকার ভাল উপদেশ দিয়ে সাহায্য করলেন। এবার মনে হচ্ছে একটা উপায় হবেই।

ব্ল্যাক আউট

মাত্র ৮৲ টাকায়

আধুনিক ডিজাইন ও রঙের অতি সুন্দর সাড়ী মূল্য ৮৲ টাকা, ২টি সাড়ী ১৫৲ টাকা, ৩টি সাড়ী ২১৲ টাকা। ডিল্যুক্স ১০৲ টাকা, ২টি সাড়ী ১৯৲ টাকা, ৩টি সাড়ী ৩১৲ টাকা, ৩টি সাড়ী ৪৫৲ টাকা। যে কোন ২টি বা তদধিক সাড়ীর সহিত বিনামূল্যে ব্লাউজ পীস এবং কানের টাপ।

Ambika Saree Bhandar (BCW)
6815—Mandelia Road, Delhi-7

রঙ্গজগৎ

'জাগো' নাটকে জয়শ্রী সেন

চলচ্চিত্র সেন্সর নীতি

রাষ্ট্রনীতি এবং সমাজব্যবস্থার সঙ্গে চলচ্চিত্র সেন্সর ব্যবস্থার সম্পর্ক থাকে। দেশের স্বরাষ্ট্রনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি অনুযায়ী সেন্সর বিধি স্থির হয়। সমাজতান্ত্রিক দেশের সেন্সর ব্যবস্থার লক্ষ্য হল—ছবিতে যাতে ধনতন্ত্রের প্রতি কোনরূপ মোহ সৃষ্টি করা না হয়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি অনেক রক্ত দিয়ে, অনেক ত্যাগের পরে সমবণ্টন ব্যবস্থামূলক সমাজ গঠন করেছে এবং ধনবৈষম্য দূর করেছে। সুতরাং কোন ব্যক্তি বিশেষের খেয়ালে ধনতান্ত্রিক মনোভাব যেন প্রশ্রয় না পায়। ধনতান্ত্রিক দেশের সেন্সর ব্যবস্থা ঠিক উল্টো নীতির। সেখানে একটা ধারা থাকে শ্রেণী-বিদ্বেষমূলক বক্তব্য বা দৃশ্য যেন ছবিতে না থাকে। অর্থাৎ শ্রেণীসংগ্রামের চেতনাকে ছবিতে প্রচার করতে দেওয়া হবে না। এই সঙ্গে যৌনতার ব্যাপারে এক এক দেশে এক এক নিয়ম থাকে। ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে আজকাল নগ্ন নারী-পুরুষ দেখান হয়ে থাকে। চুম্বন এবং অন্যান্য যৌন প্ররোচনামূলক অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শনে ওসব দেশে বাধা নেই। সমাজতান্ত্রিক দেশের ছবিতে নগ্নতা প্রদর্শন চলে না। দীর্ঘ চুম্বন এবং অশালীন পোষাক-পরিচ্ছদ যা যৌনতা প্রদর্শক—এমন জিনিস সেখানে চলে না। তবে সম্প্রতি কোন কোন সমাজ-তান্ত্রিক দেশে পুরনো নিয়মের ব্যতিক্রম হচ্ছে। নগ্ন নারী ও যৌনতার দৃশ্য ছবিতে দেখাতে দেওয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে পোল্যাণ্ডের নাম সর্বাগ্রগণ্য। এদের ছবির সঙ্গে এখন ধনতান্ত্রিক দেশের ছবির কোন তফাৎ বোঝা যায় না। ছবির বিষয়বস্তু যখন সমষ্টিগত ব্যাপার থেকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে তখনই আসে যৌনতার প্রশ্ন।

আমাদের দেশের ব্যাপার বড় অদ্ভুত। রাষ্ট্র পরিচালকরা বলে থাকেন আমাদের দেশ নাকি সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের, এবং আমরা দ্রুত সমাজতন্ত্র গঠনের পথে এগিয়ে চলেছি। কিন্তু ছবিগুলি দেখলে মনে হবে আমরা অতিদ্রুত ধনতান্ত্রিক সমাজের দেউলিয়া ব্যবস্থা অনুসরণ করছি। আমাদের ছবির আদর্শ হলিউড। আমাদের ছবিতে সব সময় ধনিকশ্রেণীর গুণগান করা হয়। ধনীদের দয়ামায়া এবং মহৎ গুণে কাহিনী পল্লবিত। ধনীদের ছেলেমেয়ে ছবির নায়ক-নায়িকা। ওদের প্রেম, বিলাসিতা জীবনযাপনকে উজ্জ্বল করে কাহিনীতে তুলে ধরা হয়। এই সঙ্গে রয়েছে যৌনতার কথা। মার্কিন ছবির বিকিনি থেকে স্ল্যাকস, টাইট পোষাক আমাদের ছবির নায়িকাদের ভূষণ। যদিও সমাজে এ সব পোষাক বা রক এন রোল, টুইস্ট ইত্যাদি নাচের প্রচলন নেই, কিন্তু ছবিতে এসব হামেশা দেখা যাবে। ছবির প্রযোজক, পরিচালকদের দুঃখ ভারতীয় ছবিতে চুম্বনের দৃশ্য গ্রহণ করতে দেওয়া হয় না। এই অভাব পূরণ করার জন্য তাঁরা নানা ছলাকলার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। সম্প্রতি বোম্বাইতে একদল পরিচালক এই অভাব মেটাবার জন্য অদ্ভুত দৃশ্য সৃষ্টি করছেন। বাংলা দেশেও এরূপ পরিচালক দেখা যাচ্ছে। যদিও এসব পরিচালক অর্ধশিক্ষিত এবং দেশ ও সমাজ চেতনাহীন কিন্তু সেন্সর ব্যবস্থাকে ফাঁকি দেবার কায়দা কৌশল এদের জানা আছে। সুতরাং মুখে যতই সমাজতন্ত্রের কথা হোক না কেন ভারতীয় ছবি ধনতান্ত্রিক ভাবধারা এবং মার্কিনীদের বিকৃত যৌন চিন্তার ধারক। আমাদের সেন্সর ব্যবস্থা এই বিকৃত। চিন্তাকেই প্রতিদিন ছাড়পত্র দিচ্ছে।

আমাদের রাষ্ট্রনীতির আরো স্পষ্ট চেহারা ধরা পড়ে আজকালকার আন্তর্জাতিক অপরাধমূলক কাহিনীচিত্রগুলি দেখলে। এ সব মার্কিন পুঁজির ছবিতে সোভিয়েত রাশিয়া থেকে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে বোকা বানান হয়, প্রকারান্তরে নিন্দা করা হয় এবং আমেরিকার সর্ব বিষয়ে প্রাধান্য ও মহত্ত্ব প্রচার করা হয়। প্রকারান্তরে এগুলি মার্কিন সমরদপ্তরের প্রচারচিত্র। কিন্তু আমাদের সেন্সর ব্যবস্থায় এই ছবিগুলি উদারভাবে ছাড়পত্র পাচ্ছে, এবং এদেশ মার্কিন প্রচারের অবাধ স্বাধীনতা লাভ করেছে।

—সুজন

চিত্র আলোচনা

'পতি পত্নী'

এই হিন্দী হাসির ছবিটি দেখে মনকে এই বলে প্রবোধ দেওয়া যেতে পারে যে, হিন্দী ছবি মানেই যেখানে কার্যকারণ যোগসূত্রহীন, সেখানে 'পতি পত্নী'-র মত হাসির ছবিতে কার্যকারণের যোগসূত্র সন্ধান করা একান্তই অর্থহীন। যেসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাসির ছবি গড়ে ওঠে তাতে নানা রকম অসঙ্গতি অনেক সময় থাকে। হিন্দী ছবিতে তার মাত্রা ঠিক না থাকারই কথা। 'পতি পত্নী' ছবিটিতে সেই মাত্রার বাহুল্যই লক্ষ্য করা যায়। উপরন্তু স্থূল রসিকতাও সেই মাত্রার মাপকাঠির সীমা ভেদ করে গেছে।

অথচ মূলত যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনটি দাম্পত্য কাহিনী তিন শাখায় পল্লবিত হয়েছে, তা নিয়ে সূক্ষ্ম রুচির চিত্র নির্মাণ করা কঠিন কাজ ছিল না। কিন্তু হিন্দী সিনেমা যারা নিয়মিত দেখে তাদের কাছে তা হয়তো গ্রহণযোগ্য হোত না মনে করেই সেই চিরাচরিত নাচ-গান-হৈ-হল্লা ও লড়াই আমদানী করা হয়েছে। আর পরস্পর পতি পত্নীকে নিয়ে যখন সেই হৈ-হল্লা সুরু হয় তখন তা থেকে মজা লুটতে দর্শকদের বিলম্ব হয় না এবং এক শ্রেণীর দর্শকের শিস ও হাততালিতে কাহিনী মুখর হয়ে ওঠে এবং তার মাত্রাও এমনি অধিক যে চিত্র প্রদর্শন শেষ হলেও কোলাহল মুখর দু-এক শ্রেণীর দর্শকের হাসি-হল্লায় জাতীয় সঙ্গীত শ্রবণ করাও সম্ভব হয় না। অন্তত 'পতি

শ্রীজয়দ্রথ পরিচালিত '৮০তে আসিও না' ছবিতে শান্তি গাঙ্গুলী, ভানু ব্যানার্জী ও রেণুকা রায়

পত্নী' দেখতে গিয়ে এ অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে। প্রেক্ষাগার পূর্ণ। দর্শকরাও খুশি, হয়তো প্রযোজকও নিজেকে সাফল্য-মণ্ডিত দেখে ধন্য। তবু কাহিনীর মধ্যে যে সত্যটুকু হাসির মধ্য দিয়েও তুলে ধরা হয়েছে, তা যদি উপরোক্ত শ্রেণীর দর্শকরা গ্রহণ করতে পারতেন তাহলে কখনই চলচ্চিত্রকারের মূল উদ্দেশ্যটুকু ব্যর্থ হয়ে যেত না। কারণ পতি পত্নীর সম্পর্কের কথা তিনি অকপটে বলেছেন। অতি আধুনিকা পত্নীর কবলে পড়লে পতির কি দশা হয় তাও তিনি দেখিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ নারী চরিত্রের বিকাশও তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। আবার পতি পত্নী চিত্রে আধুনিকতার মোহাচ্ছন্ন মাতা ও কন্যার সম্পর্কটুকুও অপ্রত্যক্ষভাবে সতর্কতার সঙ্গে বলেছেন। সর্বশেষে 'লালী'-র মত বহুভোগ্যা নারীর জীবনের মর্মবেদনা দেখিয়ে তার প্রতি সহানুভূতির সৃষ্টি করেছেন। এই বিচারে পতি পত্নী একটি উল্লেখযোগ্য ছবি। কারণ হিন্দী সিনেমায় বক্তব্য বলে কিছু থাকে না। কিন্ত 'পতি পত্নী' বক্তব্য প্রধান। তবু পরিচালক দর্শকের মুখ চেয়ে অন্যত্র চড়া সুর যোজনা করে লক্ষ্য ভেদ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই এক শ্রেণীর দর্শক মনে করেছে এ থেকে মজা লুটবার অনেক খোরাক আছে। পতি পত্নীর অভিনয়াংশ সুন্দর। নন্দা, মমতাজ, ওমপ্রকাশ, জনি ওয়াকার, মেহমুদ, স্ব স্ব ভূমিকায় পূর্বতন গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। তাঁরা কেউ হাসাতেও পারেন, কাঁদাতেও পারেন কেউ। হাসি-কান্নার অম্ল-মধুর ছবি পতি পত্নী তাই সতর্ক ও সচেতন দর্শকদের খুশি করতে সক্ষম হবে।

'বাখোর' দলের বসন্ত নৃত্য

উজবেকিস্তানের শিল্পীদের অপূর্ব নৃত্য পরিবেশন

কলকাতার সংস্কৃতি-রসিকরা এ বছর শীতে এমন এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ পেয়েছেন যা তাঁরা বহুকাল স্মরণে রাখবেন। ভারতের প্রতিবেশী দেশ উজবেকিস্তান থেকে এসেছিলেন এক নাচের দল। এই দল বাখোর নামে পরিচিত। বাখোর কথার অর্থ বসন্ত, বাস্তবিকই এ'রা বসন্তের দূত। নাচে, গানে, যন্ত্রসঙ্গীতে ও'রা বসন্তকেই মূর্ত করে তুলেছিলেন মঞ্চে, আর লাস্যময়ী তরুণীদের নাচে, গানে বসন্তের রঙ ধরিয়ে দিয়েছিল প্রতিটি দর্শকের মনে। কাঁচা কচি থেকে প্রবীণ—সকলেই মনে-প্রাণে বসন্তের রঙে-রসে মেতে উঠেছিলেন। অনেককে দেখেছি—প্রথম দিনের অনুষ্ঠান দেখে দ্বিতীয় দিনের টিকেট কেনার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠতে। প্রথম দিন দেখেছেন একা, দ্বিতীয় দিন দেখতে এসে বাড়ির সবাইকে নিয়ে। চমৎকার, অপূর্ব এই নাচ।

উজবেকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বহু যুগের। উজবেকরা অতীতে এদেশে এসেছে কখনো শত্রু হয়ে—কখনো বন্ধু হয়ে। যারা তলোয়ার হাতে এসেছিল তারাও এদেশের মাটিকে নিজের দেশ বলে গ্রহণ করে এদেশে থেকে গেছে। তারপরে বহুকাল উজবেকিস্তানের উপর দিয়ে অন্ধকার যুগের কালো পরদা বিছানো ছিল। রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লব আবার উজবেকিস্তানের ঘুম ভাঙিয়েছে। শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী

লাল নিশানের নিচে উজবেকিস্তান তার সমস্ত বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে নতুন জীবনের বসন্তে পত্র-পুষ্পে ফুটে উঠেছে। সেই বসন্তের উপহার নিয়ে উজবেকিস্তান আজ ভারতে এসেছে বন্ধুত্বের ও বিশ্ব-শান্তির কামনা নিয়ে। বন্ধুত্বের প্রতীক এই শিল্পী দলের মধ্যে আমরা নবজাগ্রত সমাজতান্ত্রিক উজবেকিস্তানের বলিষ্ঠ জীবন ও উদার অন্তরকে অনুভব করলাম। অনুভব করলাম ভারতের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতিকে।

এই বাখোর দল গঠিত হয়েছে ১৯৫৭ সালে। এই দলের পরিচালিকা বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী মুকারামা তুরগুনবায়েভা। তিনি সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের একজন পিপলস্ আর্টিস্ট। উজবেকিস্তান প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শিক্ষামন্ত্রক দপ্তর দ্বারা এই বাখোর দল পরিচালিত হয়। নৃত্য-শিল্পী মুকারামা তুরগুনবায়েভা উজবেক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিভিন্ন আঞ্চলিক লোক-নৃত্যগুলিকে সংগ্রহ করে, ঐতিহ্য এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গী সমন্বয় ঘটিয়ে নৃত্যরূপ দিয়েছেন। এই নৃত্যের মধ্যে পুরাতন এবং নতুনের এমন সমন্বয় ঘটেছে যে লোক-নৃত্যধারা অনুভব করার সঙ্গে নতুনের উচ্ছ্বাস ও জীবনবোধ এতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ কারণে সাধারণ লোক-নৃত্যের মত এখানে কখনো এক মুহূর্তের জন্যও একঘেয়ে মনে হবার মত অবস্থা হয় নি। সংগীতের ক্ষেত্রেও এ'দের এই বৈশিষ্ট্য অনুভব করা গেল। এই বাখোর দলের যাঁরা শিল্পী তাঁদের অধি-কাংশ সুন্দরী, লাস্যময়ী তরুণী। দলের নেত্রী ছাড়া ৩৬ জন নর্তকী এবং একজন পিয়ানো বাদিকা সহ দোভাষী, রূপ-সজ্জাকর ইত্যাদি সব কাজের দায়িত্বে আছেন মেয়েরা। কেবলমাত্র ১২ জন বাদক ও ২ জন গায়ক ছাড়া। সুতরাং বাখোরকে মেয়েদের দল বলা যেতে পারে। দলের মেয়েরা নাচে এবং গানে পার-দর্শিনী। কারো কারো চেহারার সঙ্গে ভারতীয় নারীর সাদৃশ্য দর্শকদের আরো কৌতূহলী করে তুলেছিল। একজন শিল্পীকে নিয়ে তো অনেককে আলোচনা করতে শোনা গেল। গায়ের রঙে ও চেহারায় এই তরুণী একেবারে ভারতীয়। গানের সুরে এবং কোন কোন নাচের সঙ্গে আমাদের নৈকট্য অনুভব করে আনন্দ লাভ করা গেছে। নর্তকীরা প্রায় সকলেই উঁচু মানের শিল্পী।

উজবেকিস্তানের বাখোর নৃত্যশিল্পীদের বসন্ত নৃত্যের একটি দৃশ্য

১৪ই, ১৫ই ও ১৬ই জানুয়ারী রবীন্দ্র সদনে এই অনুষ্ঠান হয়েছে। অনুষ্ঠানটি দর্শকে পরিপূর্ণ ছিল। ভারতীয়দের সঙ্গে বহু বিদেশী দর্শকও উপস্থিত থেকে এই মনোরম সন্ধ্যাগুলি উপভোগ করেছেন। শিল্পীরা প্রথম পরিবেশন করলেন বাখোর নাচ। সবার হাতে পুষ্প-গুচ্ছ নিয়ে ছন্দোবদ্ধভাবে মঞ্চে তালে তালে প্রবেশ করলেন। শীতে প্রকৃতির শক্তি ছিল ঘুমন্ত। বসন্তের সঙ্গে সঙ্গে রঙে, রসে, গন্ধে প্রকৃতি জেগে উঠে যৌবনের জয়গানে মাতিয়ে তুলেছে। তারপরে একটা হাসির নাচ 'ডল' নাচলেন মুকা-রামা। একে একে মঞ্চে দেখা গেল ইয়ালা, সোবোলার, রোখাৎ, বায়েত, পিল্লা প্রভৃতি

বাখোর নৃত্যদলের শিল্পী নেলী বাসয়েভা

নাচ। দলের নেত্রী মুকারামা 'মুনোজ্জাট' নামের ক্ল্যাসিক্যাল নাচ নাচলেন। দ্বিতীয়ার্ধে আবার সমবেত নৃত্য সুরু হল। নামনগণ্ড নাচে একদল তরুণী খোঁজ করছে তাদের প্রেমিকদের। সঙ্গে গেয়ে চলেছে গান। কিন্তু যখনই প্রেমিকরা তাদের দিকে তাকাতে চায় তক্ষুণি তারা মুখ লুকিয়ে ফেলে রুমালে। প্রেমিকরা যখন কাছে এল তখন তারা একঝাঁক পাখির মত উড়ে চলে গেল। মঞ্চে কিন্তু প্রেমিকরা আসে নি, মেয়েরাই অভিব্যক্তিতে প্রেমিকদের কথা বুঝিয়ে দিয়েছে। দাওরা নাচে বুখারার মেয়েরা একটা ফুলের মালার মত এক সঙ্গে থেকে অত্যন্ত দ্রুত অঙ্গ সঞ্চালনে মঞ্চ-চমক সৃষ্টি করেছে। চীবন বা পশুচারক নৃত্যে সেপ্তানা শারিপোভা পশুচারকের বেশে নেচে দর্শকদের চমক সৃষ্টি করেছে। কলকাতার কিছু সংখ্যক দর্শক শারিপোভার এই নাচটি পূর্বে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। শারিপোভা ইতিপূর্বে কলকাতায় এসেছিলেন এবং তাঁকে আমাদের মনে হয়েছে বহু দিনের চেনা, আত্মীয়ের মত। সর্বশেষে ফেস্টিব্যাল অব কটন বা কার্পাসের উৎসব বাখোর দলের এক অপূর্ব সৃষ্টি। সাদা কার্পাস তুলোর মধ্যে যেন পরীদের নৃত্য উৎসব। অফুরন্ত প্রাণের ধারায় কার্পাস তুলোগুলি থেকে যেন জীবনের আনন্দধারা প্রবাহিত হচ্ছে। উজবেকিস্তানের অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসল তুলো। এখান থেকে সারা সোভিয়েতে তুলো চালান যায়। আমাদের যেমন ধান কাটার পরে পৌষ পার্বণ, উজবেকদের তেমন তুলো গুদামে তোলার পরে কটন ফেস্টিব্যাল। সারা উজবেকিস্তান তখন আনন্দে মেতে ওঠে। সেই আনন্দধারায় রবীন্দ্র সদনের দর্শকরা সেদিন একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন।

উজবেকিস্তানের সংগীতের কথাও কিছু বলা দরকার। লোক-সংগীত যে কত সুন্দর করে পরিবেশন করা যায় তা এঁদের কাছে শিক্ষণীয়। এঁদের বাঁশি—এবং তারের যন্ত্র আমাদের দেশের যন্ত্র। রাবিদ খামদামভের বাঁশিতে আমরা বিমোহিত। দুটি ভারতীয় সংগীত তাঁরা শোনালেন। অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সুর পরিবেশন করলেন। তার একটি ফিল্মি গান। আমরা বুঝি না রবীন্দ্র নজরুলের এত গান, আমাদের এত বৈচিত্র্যময় লোকসংগীত থাকতে বিদেশীরা ফিল্মি গান গ্রহণ করে কেন!

বাখোর সম্প্রদায় একটি নতুন নাচ দেখালেন। ভারত-উজবেকিস্তান মৈত্রীর নাচ। ভারতীয় তরুণীদের অভ্যর্থনার জন্য ফুলের মালা নিয়ে এসেছে উজবেক তরুণীরা, ভারতীয় তরুণীরা এসেছে উজবেকদের প্রীতি জানাতে। বন্ধুত্বের এক প্রীতিময় অভিব্যক্তিতে নাচটি হৃদয়স্পর্শী।

অনুষ্ঠান শেষে এই নৃত্য সম্প্রদায়ের শিল্পীদের মুখগুলি বার বার মনে পড়ছিল; তাদের নাচ, গান ও বাদ্যের অফুরন্ত আনন্দের ধারায় অবগাহন করে সবাই বাড়ি ফিরেছিলেন। মনে হচ্ছিল মাত্র তিন দিনের পরিবর্তে আরো বেশি দিনের প্রোগ্রাম থাকা উচিত ছিল, তাহলে দেশের আরো বেশি মানুষ দেখতে পারত।

নাটকের কথা

আয়কর কর্মচারীদের সাংস্কৃতিক উৎসব

আয়কর অফিসের কর্মচারীদের স্পোর্টস এণ্ড রিক্রিয়েশন ক্লাব সপ্তাহব্যাপী এক নাট্য ও সংস্কৃতি উৎসবের আয়োজন করেছিল। গত ১৬ই জানুয়ারী আয়কর অফিসের মালটিপারপাস হলে এই উৎসবের উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়। এই উৎসবের অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে ছিল তিনদিনব্যাপী একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা, রবীন্দ্রসংগীত প্রতিযোগিতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। সংগীতের আসরে বিশিষ্ট শিল্পীদের সংগীত পরিবেশনের ব্যবস্থা হয়েছিল। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন ঃ নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, কানাই দত্ত, অর্ঘ্য সেন, সুমিত্রা

সেন, দ্বিজেন মুখার্জী, নির্মলেন্দু চৌধুরী, আরতি মুখার্জী, শ্যামল মিত্র।

১৬ই তারিখে সুরু হয়ে ২১শে জানুয়ারী অনুষ্ঠান শেষ হয়। নাটকের প্রতিযোগিতায় দশটি নাটক অভিনীত হয়েছে। এই দশটির মধ্যে ছিল : আর এক চড়াই ভেঙে—মনোরঞ্জন বিশ্বাস, অন্তরালে—বিমল রায়, প্রাইভেট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ—শৈলেশ গুহনিয়োগী, ছেঁড়া তমসুক—রবীন্দ্র ভট্টাচার্য, মুনল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন—সত্যেন রায়, আদাব—মিহির সেন, আজকের উত্তর—অজিত গঙ্গোপাধ্যায়, অভিনয়—বিমল রায়।

নাটকের প্রতিযোগিতায় বিচারকের কাজ করেছেন : গঙ্গাপদ বসু, মৃণাল সেন, কল্পতরু সেনগুপ্ত ও উমানাথ ভট্টাচার্য।

নাটকের প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে মিহির সেন লিখিত 'আদাব'। পূর্ববঙ্গের পটভূমিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্যে চারিদিকে নারকীয় পরিস্থিতি ও পশুদের তাণ্ডবের মধ্যে—এক মুসলমান মাঝি আর এক হিন্দু মজুরের পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। অতি সংক্ষিপ্ততার মধ্যে শ্রমজীবী মানুষের মানবিকতাকে এখানে উজ্জ্বল করে তোলা হয়েছে।

পরিচালনায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন 'আজকের উত্তর' নাটকের পরিচালকদ্বয় রণজিৎ মুখার্জী ও সুনীল সরকার। অভিনয়ে প্রথম হয়েছেন 'আর এক চড়াই ভেঙে' নাটকের প্রধান অভিনেতা গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়। প্রথম অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন 'শুধো ছায়া' নাটকের অভিনেত্রী মায়া দাস। 'মুনল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন'-এর নাট্যকার কালোপযোগী কৌতূহলজনক এবং সুচিন্তিত নাটক রচনার জন্য বিচারকদের বিশেষ পুরস্কার লাভ করেছেন।

থানা থেকে আসছি

মুকুর প্রযোজিত এবং শ্রীশ্রদ্ধানন্দ ভট্টাচার্য পরিচালিত 'থানা থেকে আসছি' (অজিত গঙ্গোপাধ্যায় বিরচিত) গত ১৩ই জানুয়ারী থিয়েটার সেন্টারে সন্ধ্যা সাতটায় অভিনীত হয়। জানা গেল, এঁরা নিয়মিতভাবে প্রতি মাসে একটি করে অভিনয় করে যাবেন।

মানুষের যে শুভবুদ্ধি অথবা মনুষ্যত্ব পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল, আরও নির্ভরযোগ্য সমাজ গড়ে তোলার প্রেরণা যোগায় তারই প্রতীক হিসাবে তিনকড়ি হালদার ইদানীংকালের এক ধনী এবং আত্মকেন্দ্রিক পরিবারের চক্ষু উন্মিলিত করতে চেয়েছেন। একটি মেয়ের আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে নাটকের বিধৃতি বড়ই বিচিত্র, কিঞ্চিৎ পরিমাণে জটিল এবং অত্যন্ত আধুনিক।

নাটকটি শ্রীশ্রদ্ধানন্দ ভট্টাচার্য পরিচালনা করেছেন। পরিচালনার গুণে এবং সমষ্টিগত অভিনয়ে সাবলীল হয়ে উঠেছে।

নিজে তিনি চন্দ্রমাধব সেনের ভূমিকাটি অভিনয় করেন। চরিত্রটি দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। মিসেস সেনের ভূমিকায় সবিতা মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় সহজ এবং আভিজাত্যপূর্ণ।

অনিল চট্টোপাধ্যায়

শিলার ভূমিকায় দীপা হালদার এবং তাপসের ভূমিকায় শ্রীঅমলেন্দু ভট্টাচার্য মানানসই এবং সপ্রতিভ। অভিনয়ের গুণে শ্রীসন্তোষ নন্দী অমিয় চরিত্রটিকে বেশ রোমান্টিক করে তুলেছিলেন এবং

'হঠাৎ দেখা' ছবিতে সন্ধ্যা রায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

প্রহেলিকাময় তিনকড়ি হালদারের ভূমিকায় বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় সার্থক। গোবিন্দের ভূমিকাকে শ্রীকমল দাস অনায়াসেই যথাযথ রূপ দিতে পেরেছিলেন।

সবুজসাথীর প্রতিষ্ঠা দিবস

সবুজসাথীর আসরে ১৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ২৮ ডিসেম্বর '৬৬ থেকে ১লা জানুয়ারী '৬৭ পাঁচ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠান শোভাবাজার রাজবাটিতে সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনে সোমেন ঘোষের পরিচালনায় ঋতুরঙ্গ ও পরে সাথী ভাই ও বোনেদের "কল্পনার ফুলঝুরি" নামক নাটকটি নতুনদার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় দিন ছিলো ক্রীড়া বিষয়ক চলচ্চিত্র ও নবীন যাত্রা চলচ্চিত্র প্রদর্শন। তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠান ছিলো প্রথমে শ্রীমতী রেখা ঘোষের পরিচালনায় "তুমি নারী মহীয়সী" নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করে সাথী বোনেরা। (শ্রী মা চরিত্রে) সোনালী নন্দী ও (ভগ্নী নিবেদিতা চরিত্রে) রেখা দেব অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করেছেন। নাটকটির রচয়িতা উমাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৌতুক নাটক "সূক্ষ্ম বিচার" অভিনীত হয়। সূক্ষ্ম বিচারে শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায় ও রবীন ভট্টাচার্যের অভিনয় উপস্থিত দর্শকদের আনন্দ দিতে পেরেছে।

স্টুডিও খবর

জ্যোতি

নিরঞ্জন পাল রচিত 'ফেথ অব এ চাইল্ড'-এর হিন্দী চিত্ররূপ 'জ্যোতি'র কাজ আরম্ভ হয়েছে। ছবিটি পরিচালনা করছেন দুলাল গুহ। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করবেন : সঞ্জীবকুমার, নিবেদিতা, অভি ভট্টাচার্য, জগদীশ প্রমুখ। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন : শচীনদেব বর্মণ।

প্রথম বসন্ত

নির্মল মিত্র পরিচালিত ছায়ারূপার 'প্রথম বসন্ত' ছবির চিত্র গ্রহণের কাজ এগিয়ে চলেছে। প্রতিভা বসু রচিত কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন : মাধবী মুখার্জী, লিলি চক্রবর্তী, অঞ্জনা ভৌমিক, অনিল চ্যাটার্জী, শুভেন্দু চ্যাটার্জী, বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, ছায়াদেবী,

কখনো মেঘ

রাধা ফিল্ম স্টুডিও-তে 'কখনো মেঘ' ছবির চিত্র গ্রহণ চলেছে। অগ্রদূত গোষ্ঠী পরিচালিত এই ছবির চিত্রনাট্যের অবলম্বন প্রশান্ত দেব রচিত কাহিনী। ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করছেন সুধীন দাশগুপ্ত। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন : উত্তমকুমার, অঞ্জনা ভৌমিক, কালী ব্যানার্জী, শোভা সেন, সুব্রতা চ্যাটার্জী প্রমুখ।

সংবাদকণিকা

সিনে সেন্ট্রাল কলকাতা

'সিনে সেন্ট্রাল কলকাতা'র উদ্যোগে পোলিশ দূতাবাসের সহযোগিতায় ২৭শে জানুয়ারী থেকে ৩১শে জানুয়ারী অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস প্রেক্ষাগৃহে ও কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে পোলিশ চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। চারটি ছবি—'ব্যাটল', 'মাচ অ্যাডো অ্যাবাউট লিটিল বারবারা', 'টু নাইট এ সিটি ডায়েজ' ও 'নাইফ ইন দি ওয়াটার' এই উৎসবের অন্তর্ভুক্ত।

মঞ্জরী দেবীর জীবনাবসান

লোকশিল্পী মঞ্জরী বৈষ্ণবী দীর্ঘকাল অভাব-অনটনের মধ্যে দিনযাপন করে সম্প্রতি গরানহাটায় পরলোকগমন করেছেন। তিনি দীর্ঘকাল ধরে বেলেঘাটার এক অখ্যাত বস্তিতে রোগে ভুগছিলেন।

মঞ্জরী দেবী প্রকৃত গ্রাম্য শিল্পীদের মধ্যে অন্যতমা ছিলেন। যে মেঠো পরিবেশ একটি লোকশিল্পীর পক্ষে প্রয়োজন, সেই মেঠো পরিবেশে মঞ্জরী দেবীর জন্ম পূর্ব বাংলার ঢাকা জেলার কাইন্দাবাইল্যা গ্রামে। বিয়ের পর চোদ্দ বছর বয়স থেকেই মঞ্জরী দেবী ঢাকা ছেড়ে ফরিদপুর জেলার ট্যাপাখোলা গ্রামে ১৯৪৬ সনের আগস্ট মাস পর্যন্ত বাস করে এসেছেন। গত '৪৭ সনের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মঞ্জরী দেবী ফরিদপুর থেকে পায়ে হেঁটে বাস্তুভিটে ত্যাগ করে কলকাতায় চলে আসতে বাধ্য হন। কলকাতায় এসে বহু দিন পর্যন্ত শিয়ালদহ স্টেশনে দুই পুত্রসহ দিনযাপন করেন। অবশেষে বেলেঘাটায় এক অখ্যাত বস্তিতে মাথা গুঁজে থাকবার একটু স্থান করে নেন আর ভিক্ষালব্ধ অন্নে দিনযাপন করেন। বহু দিন তাঁকে অনশনেও থাকতে হয়েছে। অভাব-অনটনই তাঁর মৃত্যুর অন্যতম কারণ।

মঞ্জরী দেবী আজ আর নেই। কিন্তু তাঁর রচিত লোকগীতি ও কণ্ঠের সুমধুর গান চিরদিনই আমাদের মনে বিরাজ করবে।

মঞ্জরী বৈষ্ণবীর মত প্রকৃত একজন লোকশিল্পীর মৃত্যু লোকসঙ্গীত তথা লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে অপূরণীয় হয়ে রইল।

মঞ্জরী দেবী

অনিশ্চয়তায় ভরা ক্রিকেট

একেই বলে ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ক্রিকেট। ঘোর বিপদের মুখে ওয়েস্ট-ইন্ডিজের বলিষ্ঠ ক্রীড়াধারা দেখে সত্যিই মনে হচ্ছিল কেন ওয়েস্ট-ইন্ডিজ দলকে বিশ্ব-জয়ী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আর ওয়েস্ট-ইন্ডিজ দলপতি গ্যারী সোবার্স যে বর্তমানে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় এবং সর্বকালের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় তার পরিচয় দিলেন মাদ্রাজের চীপকের উইকেটে।

নিশ্চিত একটি জয়ের সুযোগ যেভাবে ভারত হারিয়েছে মাদ্রাজের মাঠে তার তুলনা মেলা ভার। ক্রিকেটে কথাই আছে যে, "ক্যাচেস উইন ম্যাচেস" আর মূল্যবান ক্যাচ ভূপতিত করার ফলেই জেতা ম্যাচ হাতছাড়া হয়েছে। ভারতীয় দলের ফিল্ডারদের ফিল্ডিং এখন অনেক উন্নত হয়েছে এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু গ্রাউন্ড ফিল্ডিং উন্নত হলেও ক্যাচ ধরার ক্ষেত্রে ভারতীয় ফিল্ডাররা কিঞ্চিৎ দুর্বল। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সহজ ক্যাচ না ধরতে পারলে হাতের মুঠোর মধ্যে এসেও জয় ফস্কে গেলে আশ্চর্যের কিছুই থাকবে না।

চীপকের মাঠে ভারত-ওয়েস্ট-ইন্ডিজ তৃতীয় এবং শেষ টেস্টে ভারত অল্পের জন্য জয়ী হবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে? অথবা সময়ের জন্য পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে? এই দুটি প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে পাঁচ দিনের পুরো খেলাটিকে ভাল করে বিশ্লেষণ করতে হবে। মাদ্রাজের এই টেস্ট ম্যাচের খেলার বিচিত্র গতির জন্য খেলার ভাগ্য সম্বন্ধে কোন কিছু ধারণা করা বিশেষজ্ঞদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। জয়লক্ষ্মী উভয় দলের সঙ্গে বলতে গেলে লুকো-চুরি খেলেছেন।

মাদ্রাজের তৃতীয় টেস্টে টসে জয়ী হয়ে ভারতের অধিনায়ক পতৌদি প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ভারতের পক্ষে ইনিংস সুরু করেন সরদেশাই এবং ফারুক ইঞ্জিনিয়ার। ফারুক ইঞ্জিনিয়ার তাঁর দ্বাদশ টেস্ট ম্যাচে লাভ করলেন বহু আকাঙ্ক্ষিত প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী। প্রথম থেকে ফারুক নির্মমভাবে ওয়েস্ট-ইন্ডিজ দলের দুরন্ত বোলিং শক্তিকে আক্রমণ করে চূর্ণ করে দেন। মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতির সময় ইঞ্জিনিয়ার মাত্র দু' রানের জন্য সেঞ্চুরী করতে পারেন নি। ১·৫৯ মিনিট উইকেটে অবস্থান করে ১০৯ রান সংগ্রহ করেন ফারুক। ইতি-পূর্বে ফারুকের টেস্ট খেলায় সর্বোচ্চ রান ছিল নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৯০ রান। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় বিনা উই-কেটে ভারতের রান সংখ্যা ছিল ১২৫। প্রথম উইকেটে সরদেশাই-ইঞ্জিনিয়ার

মাদ্রাজের তৃতীয় টেস্টে ফিল্ডিং করতে মাঠে নামছে সোবার্সের নেতৃত্বে ওয়েস্ট-ইন্ডিজ দল।

জুটি ১২৯ রান সংগ্রহ করে ওয়েস্ট-ইন্ডিজের বিপক্ষে ১৯৫৮ সালে কানপুরে পঙ্কজ রায়-কণ্ট্রাক্টর জুটির ৯৯ রানের প্রতিষ্ঠিত রেকর্ডটি ভঙ্গ করেন। প্রথম দিনের শেষে ৫ উইকেটে ভারত সংগ্রহ করে ২৭৮ রান। পতৌদি হলের বলে ৪০ রানে আউট হন। চান্দু বোরদে ৭২ রানে এবং সুব্রহ্মনিয়ম ১১ রানে অপরা-জিত থাকেন। অজিত ওয়াদেকার এবং

অমিতাভ

হনুমন্ত অল্পেই ওয়েস্ট-ইন্ডিজের বোলারদের ফাঁদে ধরা দেন। অজিত ওয়াদেকার শূন্যে রানে এবং হনুমন্ত সাত রানে আউট হন।

দ্বিতীয় দিন চান্দু বোরদে ভারতকে একটি সেঞ্চুরী উপহার দিলেন। বোরদে এবং সুর্তির দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিংয়ে ভারত রানের সংখ্যা বাড়াতে লাগল। চান্দু বোরদে ৩৩৫ মিনিট উইকেটে অবস্থান করে ১২৫ রান সংগ্রহ করেন। এই সেঞ্চুরী চান্দু বোরদের চতুর্থ টেস্ট সেঞ্চুরী। চান্দু বোরদের তিনটি টেস্ট সেঞ্চুরী ওয়েস্ট-ইন্ডিজের বিপক্ষে এবং একটি পাকিস্তানের বিপক্ষে। এ বছর বোম্বাইয়ের টেস্টেও ওয়েস্ট-ইন্ডিজের বিপক্ষে বোরদে সেঞ্চুরী করেন। ভারত প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ করে ৪০৪ রানে। ল্যান্স গীবস ৮৭ রানে ৩টি উইকেট লাভ করেন। হল এবং সোবার্সের ভাগ্যে জোটে দুটি করে উইকেট।

ওয়েস্ট-ইন্ডিজ প্রথম ইনিংসের খেলা সুরু করে এবং দ্বিতীয় দিনের শেষে দলের বিনা উইকেটে ৯৫ রানে হান্ট ৪৫ রানে এবং বাইনো ৪২ রানে অপরাজিত থাকেন।

তৃতীয় দিন থেকে বলতে গেলে সুরু হল সোবার্স ডে। সোবার্স ব্যাটের যাদু দেখালেন এবং প্রমাণ করলেন যে কত বড় ব্যাটসম্যান তিনি। দিনের সুরুতেই দলীয় ১১৫ রানে তিনটি উইকেটের পতন ঘটে। হান্ট ৪৯ রানে, বাইনো ৪৮ রানে এবং বুচার কোন রান করার পূর্বে আউট হন। কানহাই মাত্র বারো রানে ক্যাচ তোলেন কিন্তু এই অমূল্য ক্যাচটি সর-দেশাই মিড অফে ধরতে অসমর্থ হন। একটি জীবন লাভের পর কানহাই ব্যক্তি-গত ৭৭ রানে আউট হন। লয়েড করেন ৩৮ রান এবং নার্স ২৬ রান। ওয়েস্ট-ইন্ডিজের ২৫১ রানে সাত উইকেটের সময় সোবার্স ধরেন ওয়েস্ট-ইন্ডিজ দলের ব্যাটিংয়ের হাল। শেষের দিকের লেজুড়ে ব্যাটসম্যান গ্রীফিথ, হল, গীবসকে নিয়ে সোবার্স তৃতীয় দিনের শেষে নয় উইকেটে ৪০৫ রান সংগ্রহ করতে সাহায্য করেন। হল এবং গ্রীফিথ সংগ্রহ করেন যথাক্রমে

৩১ রান এবং ২৭ রান। সোবার্স অপরাজিত থাকেন ৯৫ রানে গীবসকে সঙ্গে নিয়ে।

চতুর্থ দিনের সুরুতে প্রথম ওভারেই গীবস একটি রান সংগ্রহ করলে, চন্দ্রশেখরের এই ওভারের শেষ বলে ১৪ রানেই ইঞ্জিনিয়ারের হাতে ক্যাচ দিয়ে সোবার্স বিদায় নেন। ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসের রান সংখ্যা হয় ৪০৬।

দু' রানে পেছনে থেকে ভারত দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা সুরু করে। শূন্য রানে সরদেশাই আউট হন। অজিত ওয়াদেকার দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর সুনাম অনুযায়ী খেলে ৬৭ রান সংগ্রহ করেন এবং ফারুক ইঞ্জিনিয়ারও অল্প সময়ে পিটিয়ে খেলে ২৪ রানে আউট হন। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় ভারতের ২ উইকেটে ১০২ রান ওঠে। চান্দু বোরদে ৪১ রান সংগ্রহ করে এবং হনুমন্ত সিং ৫০ রান সংগ্রহ করে ভারতীয় দলের রান সংখ্যা বাড়াতে সাহায্য করেন। অধিনায়ক পতৌদি মাত্র পাঁচ রানে আউট হন। সুব্রহ্মনিয়ম দ্বিতীয় ইনিংসে অনবদ্য ব্যাটিংয়ের সাহায্যে ৬১ রান সংগ্রহ করেন। ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ বোলারদের বিন্দুমাত্র সমীহ না করে তিনি পিটিয়ে খেলেন। দিনের শেষে ভারত ৯ উইকেটে ৩০৩ রান সংগ্রহ করে। প্রসন্ন এবং চন্দ্রশেখর অপরাজিত ছিলেন।

খেলার পঞ্চম এবং শেষদিন অনিশ্চয়তায় ভরা ক্রিকেট তীব্র আকর্ষক হয়ে ওঠে। প্রসন্ন এবং চন্দ্রশেখর প্রশংসনীয়ভাবে খেলে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস টেনে নিয়ে গেলেন ৩২৩ রান পর্যন্ত। ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের বোলারদের মধ্যে সাফল্য অর্জন করেন ল্যান্স গীবস এবং চার্লি গ্রীফিথ। গীবস লাভ করেন চারটি উইকেট এবং গ্রীফিথ চারটি উইকেট।

ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা সুরু করল, জয়ের জন্য তাঁদের প্রয়োজন তখন ৩২২ রান, সময় হাতে মাত্র ২৮৫ মিনিট। খুবই কৃতিত্বের কথা যে ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ জয়ের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে দ্রুত উইকেটের পতন ঘটা সত্ত্বেও। কারণ সাত উইকেটে ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ শেষ পর্যন্ত ২৭০ রান করে ২৮৫ মিনিটে। আর কিছুক্ষণ সময় হাতে পেলে ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ হয়ত জয়লাভ করতে পারত; কারণ ভারত যেভাবে ক্যাচ ফেলে সুযোগ হারিয়েছিল তাতে জয়লক্ষ্মী ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের দিকেই কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করতেন।

দ্বিতীয় ইনিংসে হান্ট করেন ২৬, বাইনো ৩৬ এবং কানহাই ৩৬ রান। মাত্র ১৩১ রানে ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের পাঁচটি উইকেটের পতন ঘটলে মনে হয় যে ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ দলের পরাজয় আসন্ন। কিছুক্ষণ পর স্কোর বোর্ডে দেখা যায় ফলাফল ৭ উইকেটে ১৯৩ রান। ভারতীয় বোলারেরা এই সময় আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন অবশিষ্ট তিনটি উইকেটের পতন ঘটানোর জন্য। কিন্তু উইকেটে দাঁড়ালেন অধিনায়ক স্বয়ং গ্যারফিল্ড সোবার্স সঙ্গে গ্রীফিথকে নিয়ে। সোবার্সের উপস্থিতি অনুপ্রাণিত করল বোলার চার্লি গ্রীফিথকে। দৃঢ়তার সঙ্গে পাকা ব্যাটসম্যানের মত খেলতে লাগলেন গ্রীফিথ। খেলা শেষ হল চরম উত্তেজনার মধ্যে দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের রান হল ২৭০ সাত উইকেটে। সোবার্স ৭৪ রানে এবং গ্রীফিথ ৪০ রানে অপরাজিত থাকলেন। চীপকের তৃতীয় এবং শেষ টেস্ট অমীমাংসিতভাবে শেষ হল। বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ন এবং কলকাতার ইডেনে জয়ী ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ দল রাবার নিয়ে দেশে ফিরবে।

রাশিয়ান টেনিস প্রতিযোগিতায় রাশিয়ার দুই মহিলা খেলোয়াড় আবজানদেজ এবং আইভানোভা।

হকির বর্তমান রূপ

জার্মান ডেমোক্রাটিক রিপাবলিকের হকি দল বর্তমানে ভারত সফরে এসেছে। পূর্ব জার্মানীর এই হকি দলের সুগঠিত দেহী খেলোয়াড়রা সূক্ষ্ম কলাকৌশলের চেয়ে দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করে খেলতেই অভ্যস্ত। শুধু পূর্ব জার্মানী কেন ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলি এবং আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানও বর্তমানে হকি খেলায় শক্তি প্রয়োগ করে খেলায় বেশি আগ্রহশীল। শক্তি প্রয়োগ করে "হিট এন্ড রান" পদ্ধতিতে খেলার সঙ্গে নিজেদের অভ্যস্ত করে তুলতে না পারার ফলে ভারত রোম অলিম্পিকে হকিতে ব্যর্থতা প্রদর্শন করে। বিশেষ

অন্য দেশগুলি যখন "হার্ড হিটিং" পদ্ধতিতে খেলছে তখন আমাদের খেলোয়াড়দের স্টিকের কলাকৌশল এবং ড্রিবলিংয়ের যাদুর সঙ্গে শক্তি প্রয়োগের কৌশলও আয়ত্ত করতে হবে।

ভারত এখন পর্যন্ত এই পূর্ব জার্মানী হকি দলের সঙ্গে তিনটি টেস্ট খেলায় অংশগ্রহণ করেছে। প্রথম টেস্ট ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয় বোম্বাইয়ে। ভারত এই প্রথম খেলায় অনায়াসে ৩—০ গোলে জয়ী হয়। ভারত প্রথমার্ধে এক গোলে অগ্রগামী ছিল। ভারতের পক্ষে প্রথম গোল করেন লেফট আউট আলী সৈয়দ। দ্বিতীয় গোলটি করেন লেফট ইন ইন্দার সিং এবং তৃতীয় গোলটি পেনাল্টি কর্নার থেকে করেন পৃথ্বীপাল সিং।

নাগপুরের মাঠে দ্বিতীয় টেস্টে কিন্তু পূর্ব জার্মানী ১—০ গোলে ভারতকে পরাজিত করল। পূর্ব জার্মানীর পক্ষে এই একমাত্র বিজয়সূচক গোলটি করেন লেফট ইন এরলিচ। খেলার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেও গোলরক্ষক স্টিফানের দৃঢ়তার জন্য ভারতের পক্ষে গোল দেওয়া সম্ভব হয় নি।

তৃতীয় টেস্ট খেলায় ভারত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর ২—১ গোলে জয়ী হয়। ভিলাইয়ে অনুষ্ঠিত এই খেলায় বারো হাজার দর্শক এক উচ্চাঙ্গের হকি প্রত্যক্ষ করার সুযোগ লাভ করে। এবারের সফরে পূর্ব জার্মানীর সঙ্গে মোট সাতটি টেস্ট খেলায় অংশগ্রহণ করবে।

অবশেষে ভারত জয়ী

ভারত চারটি টেস্টে রাশিয়ান টেবল টেনিস দলের কাছে পরাজিত হবার পর, দিল্লীর পঞ্চম টেস্ট খেলায় জয়ী হয়েছে। ভারত এই টেস্টে ভারত-সফরকারী রাশিয়ান দলটিকে ৩—২ ম্যাচে পরাজিত করে। পুরুষ বিভাগে জয়ী হলেও অবশ্য ভারত মহিলা বিভাগে ৩—০ খেলায় পরাজিত হয়।

পুরুষদের প্রথম দুটি খেলায় ভারতীয় খেলোয়াড়েরা পরাজিত হয় রাশিয়ান খেলোয়াড়দের কাছে। একটি ডাবলস এবং শেষ দুটি সিঙ্গলসে ভারত জয়ী হয়। ডাবলসে ভারতের পক্ষে খেলেন খোদাইজী এবং চাচাদ। মার্চেন্ট এবং খোদাইজী ভারতের পক্ষে একটি করে সিঙ্গলসে জয়ী হন।

এশিয়ান টেনিস

উডবার্ন পার্কে এশিয়ান টেনিস প্রতিযোগিতা প্রায় শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এবারের খেলা কিন্তু ক্রীড়ামোদীমহলে তেমন সাড়া জাগাতে পারে নি। দর্শকের গ্যালারীও তেমন ভরা নয়। অবশ্য অন্যান্যবার এশিয়ান টেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে। আর কিছুদিন আগে ডেভিস কাপের খেলা দেখার পর আর অল্প কিছুদিন পূর্বে ইডেনের ক্রিকেটের পর ক্রীড়ামোদীরা অতটা উৎসাহী হয়ে উঠতে পারেন নি। কৃষ্ণানের অনুপস্থিতিও প্রতিযোগিতার আকর্ষণ কিছুটা ক্ষুন্ন করেছে। এ ছাড়া আশা করা গিয়েছিল জয়দীপ, কক, ম্যাণ্ডারিনো প্রমুখ নামী খেলোয়াড়েরা উচ্চাঙ্গের টেনিস দেখাতে পারবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এঁদের কেউই সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারছেন না।

কোয়ার্টার ফাইন্যালের ধাপ অতিক্রম করে প্রতিযোগিতার খেলা সেমি-ফাইন্যালে

চাঁদু বোরদে

এসে উপস্থিত হয়েছে। সদ্য জাতীয় চ্যাম্পিয়ান প্রেমজিৎলালকে স্ট্রেট সেটে পরাজিত করে আরব প্রজাতন্ত্রের এল সাফি কিছুটা বিস্ময়ের সঞ্চার করেছেন। কোয়ার্টার ফাইন্যালের অন্যান্য খেলায় রাশিয়ার মেত্রেভেলী ৩—১ সেটে পরাজিত করেন ব্রেজিলের ম্যাণ্ডারিনোকে। টমাস কক এবং জয়দীপ মুখার্জী যথাক্রমে বব কারমাইকেল এবং সুরুক আলীকে পরাজিত করে সেমি-ফাইন্যালে উঠেছেন।

ডাবলসের খেলাতেও বাছাই জুটিরা এখন পর্যন্ত ঠিক জয়ী হয়ে চলেছেন। মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইন্যালে রাশিয়ার আইভানোভা ভারতের রীতা সুরাইয়াকে পরাজিত করে উন্নীত হয়েছেন।

জাতীয় ফুটবলে অন্ধ্র পরাজিত

হায়দ্রাবাদে চলছে জাতীয় ফুটবলের সন্তোষ ট্রফির খেলা। এবারের প্রতিযোগিতায় প্রথম বিস্ময়ের সঞ্চার হয়েছে গতবারের বিজয়ী অন্ধ্রপ্রদেশ দলের পরাজয়ে। কোয়ার্টার ফাইন্যাল খেলায় মাদ্রাজ দল ২—১ গোলের ব্যবধানে অন্ধ্রপ্রদেশ দলকে পরাজিত করেছে। অন্ধ্রপ্রদেশ দল এ বছর কিছুটা শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। কারণ তাদের তিনজন নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় নঈম, হাবিব এবং আফজল এ বছর কলকাতার ইস্টবেঙ্গল দলে চলে এসেছেন। পূর্বের খেলায় বিহারের অনুপস্থিতিতে মাদ্রাজ দল ওয়াক ওভার লাভ করে। সন্তোষ ট্রফির উদ্বোধনী খেলায় অন্ধ্রপ্রদেশ ২—০ গোলে উত্তরপ্রদেশকে পরাজিত করে এবং পরবর্তী খেলায় গুজরাটকে ৯—০ গোলের ব্যবধানে।

ভারতীয় রেল দল উড়িষ্যাকে কোনক্রমে ২—০ গোলে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইন্যালে উন্নীত হয়েছে। জাতীয় ফুটবলে এবার প্রথম হ্যাট্রিক করার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন বোম্বাইয়ের ডেরিক ডি সুজা। বোম্বাই দল ৬—০ গোলে দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলায় জম্মু-কাশ্মীর দলকে পরাজিত করেছে।

ইংলণ্ড সফরে ভারতীয় দল

আগামী গ্রীষ্মে ইংলণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা সফরকারী ভারতীয় দলের ষোলজন খেলোয়াড়ের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। দলের নেতৃত্বের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে পতৌদির নবাবের ওপর এবং বোরদে সহ-অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। আগামী ২৩শে এপ্রিল ভারতীয় দল দু'মাসব্যাপী সফরের জন্য ইংলণ্ড রওনা হবে। নতুন তিনজন খেলোয়াড় যাঁরা ইতিপূর্বে নিজের দেশে টেস্ট খেলেন নি তাঁরা এই সফরে দলভুক্ত হয়েছেন। এঁরা হলেন বাংলার সুব্রত গুহ, রমেশ সাক্সেনা এবং মোহন। জয়সীমা দল থেকে বাদ পড়েছেন। নির্বাচিত খেলোয়াড়দের নাম নিম্নে দেওয়া হল :

পতৌদির নবাব (অধিনায়ক), চাঁদু বোরদে (সহ-অধিনায়ক), ইঞ্জিনিয়ার এবং কুন্দেরন (উইকেট রক্ষক), চন্দ্রশেখর, হনুমন্ত, প্রসন্ন, সরদেশাই, সুব্রহ্মনিয়ম, সুর্তি, ভেঙ্কটরাঘবন, ওয়াদেকার, বেদী, সুব্রত গুহ, রমেশ সাক্সেনা এবং মোহন।

ভারতীয় ফুটবলের সমস্যা

ফুটবল আমাদের দেশের জাতীয় খেলা। ভারতের প্রতিটি শহরে প্রতিটি গ্রামের মাঠে মাঠে ফুটবলের ছায়া। কিন্তু ফুটবলে আমাদের ভারত মানের মাপ-কাঠিতে উল্লেখযোগ্য স্থানে উপনীত হয়েছে কি? এই প্রশ্নের উত্তর হল সোজাসুজি নেতিবাচক। এশিয়ার দেশ-গুলির মধ্যে ভারত অবশ্য ফুটবলে অগ্রগণ্য। ইস্রায়েল, ইরান, বার্মা, দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি দেশগুলির ফুটবলের মান বেশ উন্নত পর্যায়ের। এশিয়ান গেমসে ভারত আজ পর্যন্ত দুবার শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা লাভ করেছে। ১৯৫১ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রথম এশিয়ান গেমসে প্রথমবার এবং ১৯৬২ সালে জাকার্তায় এশিয়ান গেমসে দ্বিতীয়বার ভারত ফুটবলে বিজয়ী হবার গৌরব অর্জন করে। অলিম্পিকের আসরে ফুটবলে ভারত অংশ গ্রহণ করেছে ১৯৪৮ সালের লন্ডন অলিম্পিকের পর থেকে। কিন্তু এবার ১৯৬৪ সালে টোকিও অলিম্পিকের আসরে ভারত মূল প্রতিযোগিতায় যোগ-দানের যোগ্যতা অর্জন করতে না পারার ফলে এ কথাই প্রমাণিত হল যে ফুটবলে ভারতের মান নিম্নগামী।

জার্নাল সিং

ভারতীয় ফুটবল হায়দ্রাবাদের স্বর্গত ফুটবল শিক্ষক রহিম সাহেবের কাছে সত্যই বিরাট ঋণী। মূলত রহিম সাহেবের অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ভারতীয় ফুটবল এক নব রূপ পরিগ্রহ করে। ভারতীয় ফুটবল দলকে রহিম সাহেব উন্নতির বেশ কয়েকটি সোপান উচ্চে নিয়ে গিয়েছিলেন। তার প্রমাণ আমরা পাই ১৯৫৬ সালের মেলবোর্ন অলিম্পিকের পর থেকে ১৯৬২ সালের জাকার্তার এশিয়ান গেমস পর্যন্ত সময়ের মধ্যে। রহিম সাহেব জানতেন আন্ত-র্জাতিক ফুটবলে অংশ গ্রহণ করতে গেলে একটি জাতীয় দলকে কিভাবে কোন শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে।

রহিম সাহেবের মৃত্যুর পর ভারতীয় ফুটবলের দ্রুত অধোগতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। বর্তমানে ভারতে এমন কোন ফুটবল শিক্ষক নেই যিনি যোগ্যতার সংগে একটি জাতীয় দলের শিক্ষার ভার গ্রহণ করতে পারেন। এছাড়া আমাদের ভারতীয় ফুটবল পরিচালকদের ত্রুটিপূর্ণ কর্মপন্থাও আমাদের দেশের ফুটবলের মানের উন্নতির পথে বিরাট বাধার সৃষ্টি করেছে। আমাদের দেশে কোন আন্ত-র্জাতিক প্রতিযোগিতার পূর্বে ট্রেনিং ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয় দিন দশেকের জন্য। এত অল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যের এবং বিভিন্ন দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে বোঝাপড়া করে নেওয়া কি করে সম্ভব জানি না।

আমাদের দেশে প্রথম শ্রেণীর ফুটবল প্রতিযোগিতার সংখ্যা খুবই কম। একমাত্র দিল্লীর ডুরান্ড, বোম্বাইয়ের রোভার্স এবং কলকাতার আই এফ এ শীল্ড। কিন্তু কলকাতার আই এফ এ শীল্ডের জৌলুস অনেক কমে এসেছে, নানা কারণে আই এফ এ শীল্ডে বাংলার বাইরের দলগুলি এখন আর অংশ গ্রহণে তত ইচ্ছুক নয়।

ফুটবলে সন্তোষ ট্রফির খেলার মূল্য অনেক। কারণ এই জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় দেশের সেরা খেলোয়াড়রা নিজ নিজ রাজ্যের হয়ে অংশ গ্রহণ করেন। এতদিন এই সন্তোষ ট্রফির খেলায় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল বাংলার প্রাধান্য এবং বাংলার প্রায় সাথে সাথেই ছিল অন্ধ্রপ্রদেশ বা পূর্বের হায়দ্রাবাদ দল। কিন্তু খুবই সুখের বিষয় যে, কয়েক বছর থেকে দেখা যাচ্ছে, অন্য কয়েকটি রাজ্যদলও ফুটবলে প্রভূত উন্নতি করেছে এবং এই রাজ্য দলগুলি যোগ্যতার সংগে বাংলা বা অন্ধ্রের সংগে লড়াই করছে।

ভারতীয় রেল, সার্ভিসেস, মাদ্রাজ, মহীশূর প্রভৃতি রাজ্য দলগুলি আজ জাতীয় ফুটবলের সম্মানের যোগ্য দাবি-দার। পাঞ্জাবও ফুটবলে আজ আর অতীতের মত পেছনে পড়ে নেই। পাঞ্জাবের দুটি ক্লাব পাঞ্জাব পুলিশ এবং জলন্ধর লীডার্স ক্লাব ভারতীয় ফুটবলে পাঞ্জাবকে প্রতিষ্ঠিত করতে উঠে পড়ে লেগেছেন।

এই জাতীয় ফুটবলের আসরে ভারত-বিখ্যাত কয়েকটি ক্লাবের আড়ংগঠির উপস্থিতি কিন্তু পরোক্ষভাবে আমাদের দেশের ফুটবলের ক্ষতি করছে। উঠতি এবং সম্ভাবনাপূর্ণ খেলোয়াড়দের লোভ দেখিয়ে এ'রা নিজেদের ক্লাবের শক্তি বৃদ্ধি করছেন বটে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে এর ফলে কয়েকটি তরুণ প্রতিভা নষ্ট হতে চলেছে। কারণ একটি রাজ্যদলে ভাল

পরিমল দে

খেলোয়াড়ের ভিড় অত্যন্ত বেড়ে যাচ্ছে আর যে সব রাজ্য থেকে খেলোয়াড়দের ভাঙিয়ে আনা হচ্ছে তাদের হচ্ছে প্রভূত ক্ষতি। অবশ্য এ বিষয়ে কোন কিছু করার নেই। অবশ্য দল পরিবর্তনের নিয়মকানুনের কিছু অদল-বদল করলে কিছুটা উপকার হতে পারে।

এশিয়ার দেশগুলি আন্তর্জাতিক ফুটবলের আসরে ভাল ফলাফল প্রদর্শন করতে পারে তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি ১৯৬৬ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব কাপের আসরে উত্তর কোরিয়া দলের খেলায়। এশিয়ার অন্য দেশগুলিকও উত্তর কোরিয়ার সাফল্যে অনুপ্রাণিত হওয়া উচিত।

—মানবেন্দ্র পালচৌধুরী

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

-8 FEB 1967

আজকালকার
স্থপতিরা
গৃহনির্মাণে
এইচ পি জি
গ্লাস
ব্যবহার করেন

আজকের দিনের বাড়ীঘর ও অফিস-কাছারি, কলকারখানা, ইস্কুল ও হাসপাতালে সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়াররা সর্বত্রই এইচ পি জি গ্লাস লাগান, কেননা তাঁরা জানেন যে এইচ পি জি গ্লাস উৎকর্ষের নিখুঁত মান বজায় রেখে তৈরী হয়। বিলাতের শতাধিক বৎসরের কাঁচনির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান পিলকিংটন ব্রাদার্স-এর কারিগরী কুশলতার সাহায্য নিয়ে হিন্দুস্থান পিলকিংটন গ্লাস ওয়ার্কস এই এইচ পি জি গ্লাস তৈরী করেন।

এইচ পি জি কেনা মানেই নির্ভরযোগ্য ভাল জিনিস কেনা।

হিন্দুস্থান
পিলকিংটন
গ্লাস ওয়ার্কস
লিমিটেড

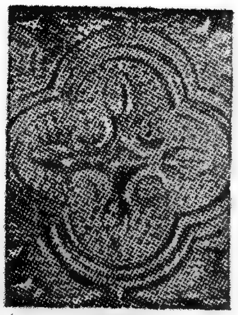
মরেস্ক

হেক্স্যাগোনাল ওয়্যারড

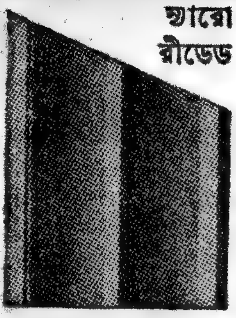
ফ্যারো রীডেড

শীট গ্লাস

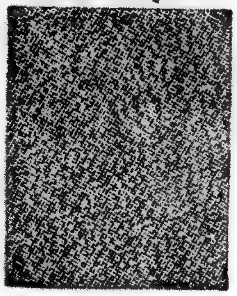
মরক্কো পিনহেড

জর্জিয়ান ওয়্যারড

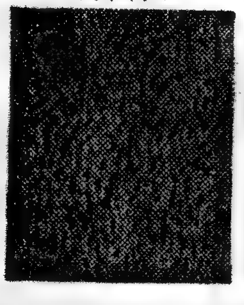
রাফকাস্ট

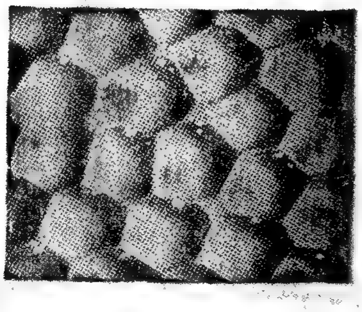
হ্যামার্ড

ম্যানেজিং এজেন্টস
তালুকদার ল'
অ্যাণ্ড কোম্পানী
প্রাইভেট লিমিটেড
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ,
কলিকাতা-১৩

HTHP 1779A

বসুমতী

নেতাজী জন্মদিবস ও প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান

বর্ষ : ৩৪শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৯শে মাঘ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ • 2nd Feb., 1967 * vol. 71, No. 3

মসৃণতা ও কোমলতার জন্য শীতে যিনি একবার **বোরোলীন** ব্যবহার করেন সবাইকে ব্যবহার করতে বলেন।

সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	২১১৫
আজকের মানুষ	...	২১১৬
ভারতদর্শন	...	২১১৭
আন্তর্জাতিক	...	২১২১
সুবর্ণলতা (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— আশাপূর্ণা দেবী	২১২৪
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	২১২৮
বিপন্ন মাটি ॥ একটি প্রত্যয় (কবিতা)	— অপূর্ব কর	২১৩২
মুখ দেখছি (কবিতা)	— শচীন দত্ত	২১৩২
নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস (প্রবন্ধ)	— প্রফুল্লরঞ্জন চক্রবর্তী	২১৩৩
প্রত্যাশার মৃত্যু ও দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা	— কৃত্তিবাস ওঝা	২১৩৫
যা কিছু তোমার আমার (কবিতা)	— স্বপ্নেন্দু ভৌমিক	২১৩৭
অবক্তব্য	— চন্দ্রগুপ্ত	২১৩৮

ধনেখালি
সিল্ক ও তাঁত বস্ত্র
ছিট কাপড়

শৈললাল মনিলাল
বড়বাজার · শ্যামবাজার
ফোন ৩৪-২১২৬ · টামডিপোর দক্ষিণে

মির্জাপুর
বিছানা
শাল ও আলোয়ান

সাহিত্য-জগতের গৌরবপ্রভা—হাস্যরসাবতার—
নাট্যসাহিত্যের প্রবর্তক—রস-সাহিত্যের স্রষ্টা—
রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের

দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—জীবনী ও কবির সমালোচনা, নীলদর্পণ, জামাই বারিক, বিয়ে পাগলা বুড়ো, নবীন তপস্বিনী, কমলে কামিনী।

২য় ভাগে—সধবার একাদশী, যমালয়ে জীবন্ত মানুষ, পোড়ামহেশ্বর, কুঁড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ, লীলাবতী, সুরধুনী কাব্য, দ্বাদশ কবিতা, পদ্য সংগ্রহ।

প্রতি ভাগ দুই টাকা

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর
গ্রন্থাবলী

রবীন্দ্রনাথ বলেন—"আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সংগীত এরূপ সহস্রধারে উৎসের মত কোথাও প্রোৎসারিত হয় নাই। এমন সুন্দর ভাবের আবেগ, কথার সহিত এমন সুরের মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না।"

বাঙ্গালার নব গীতিকবিতার প্রবর্তক, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির কাব্যগুরু ঋষি কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর রচনার সমাবেশ।

কবির জীবনী, সুবিস্তৃত সমালোচনা সহ সুবৃহৎ গ্রন্থ
মূল্য তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
গ্রন্থমেলা		২১৩৯
রঙ্গদর্শন		২১৪০
ফানুস (গল্প)	হরেন ঘোষ	২১৪৫
দিল্লী থেকে	বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য	২১৪৯
চোমংলামার চোখে উত্তরবঙ্গ		২১৫২
এইচ, জি, ওয়েলস্-এর গল্প	ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	২১৫৫
পেন্ডুলাম (কবিতা)	মুক্তি দাশগুপ্ত	২১৬০
স্বপ্নের প্রাসাদে নয় (কবিতা)	সবুজ নবী	২১৬০
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	শিলাদিত্য	২১৬১
রূপজগৎ		২১৬৬
পাঠকমন		২১৭১
খেলাধুলা	শ্রীঅমিতাভ	২১৭৩

বৈষ্ণব-সাহিত্যের অমূল্য অবদান

ভক্তিজগতের কৌস্তুভরত্ন, ভগদ্ভক্তগণের সাধনার ধন, ভক্তের তুলসী-মালা সদৃশ মহাপবিত্র ভক্তিশাস্ত্র সমন্বয়।

বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপ ও শিক্ষাষ্টক

শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীকৃষ্ণলাভের জন্য যে উৎকণ্ঠা, এই 'প্রলাপে' তাহা অভিব্যক্ত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত 'শিক্ষাষ্টক শ্লোকই' তাঁহার একমাত্র রচনা। শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামীর সুললিত পদ্যানুবাদে এই অমিয় মাধুরী লীলায়িত।

নরোত্তম বিলাস

বৈষ্ণবগণের পরম উপভোগ্য উপজীব্য ভক্তিচরিতামৃত।

দুর্লভসার

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা শ্রীল লোচনদাস বিরচিত, বৈষ্ণবগণের সংপূজিত।

আত্মতত্ত্ব

বৈষ্ণব দর্শনের সূক্ষ্মতম অনুসরণ।

মনঃশিক্ষা

শ্রীপ্রেমানন্দ দাস ঠাকুর বিরচিত। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত সাধন-ভজনের নিগূঢ় মর্মসমাহিত।

শ্রীচমৎকার চন্দ্রিকা

পরম পণ্ডিত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য পরম বৈষ্ণব শ্রীল কৃষ্ণদাসের সুললিত পদ্যানুবাদ।

পাষণ্ড-দলন

মূর্তিমান বৈরাগ্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বিরচিত প্রেমভক্তির লহর-লীলা।

ভক্তিতত্ত্বসার

হাটপত্তন, শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা, নাম-সংকীর্তন, চৌত্রিশ পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম, নরোত্তম দাসের প্রার্থনা, প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। সুলভে নামমাত্র মূল্যে বিতরিত।

মূল্য ঃ ৩৲ টাকা।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

মোহন মেলা

মূল্য এক টাকা

কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রধান কথা-শিল্পীর রস-সাহিত্য-সম্ভার ছাড়াও গল্পে ভরপুর।

—ইহাতে আছে—

গল্প—বৌনির দিনে, বুদ্ধদেবের বুদ্ধি, কাঠুরের কপাল, হাঙর মানুষের চোখের জল, ভুলুর ভুল, মুর্গী চাচা, বুদ্ধদেবের গল্প, একটার বদলে দুটো, নতুন সিনেমার ছবি, দাদুর গল্প, ইঁদুরের কীর্তিকাহিনী, বাঁদরের মেটুলিচচ্চড়ি।

ছড়া—হট্টমালার যজ্ঞবাড়ী, হোহোহো বৃষ্টি ঝরে, পালোয়ান প্যালারাম, উলটো বাজির দেশে, আজব দেশ, বাঁকা শ্যামের ব্যায়রাম, হাবুবাবুর মনের কথা, আদ্দিকালের বদ্দি বুড়ি।

প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী সূর্য রায় কর্তৃক সুচিত্রিত

উপহার দিবার মত বই।

হংসেশ্বর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

মঞ্জুষা

২৷৷০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

CENTRAL LIBRARY

৭১' বর্ষ ঃ ৩৪শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পয়সা
বৃহস্পতিবার; ১৯শে মাঘ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা

Price : 25 .
Thursday, 2nd February, 1967

সাধারণ নির্বাচনের মুখে

নির্বাচন অনুষ্ঠানপর্বের আর বেশি দেরি নেই। প্রতিটি দলের মধ্যে তোড়-জোড় সুরু হয়েছে, কিভাবে ভোট আদায় করা যায়। এবারের নির্বাচনে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে, নেতাদের বহু সাধাসাধিতেও জনসাধারণ অত্যন্ত নিস্পৃহ। ভোট তারা কাকে দেবে—এ এক জটিল প্রশ্ন।

সর্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন, ভোট যাঁরা প্রার্থনা করছেন, কোন প্রত্যাশায় তাঁদের সেই প্রার্থনা? জনসাধারণ বর্তমানে যে জীবন সমস্যায় ঘুরপাক খাচ্ছে, সেই সমস্যাই বা তাঁরা কতটা অনুধাবন করেছেন?

আমরা ভেবেছিলাম, নির্বাচনের মুখ চেয়ে সরকার জনসাধারণের সংকটের কথা বিবেচনা করবেন। দুঃখের কথা, তাদের সংকট সম্পর্কে প্রায় সকলেই উদাসীন, আর এই উদাসীনতা আজ এমন এক চরম অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে, দু-মুঠো মুখের গ্রাস থেকেও তারা ধীরে ধীরে বঞ্চিত হচ্ছে।

রেশন দোকানের মারফত সরকার অগ্নিমূল্যে যে মুষ্টিভিক্ষা দিচ্ছেন, তার অবস্থা কোনো বিবেচক জনদরদীর পক্ষে চোখ বুজে সহ্য করা সম্ভব ছিল না। অথচ নির্বাচনের মুখে অনেক জনদরদীর সাক্ষাৎ হামেশাই লাভ করা যাচ্ছে। জনসাধারণের হয়তো সৌভাগ্য যে, নির্বাচনের সময় তাঁরা দিন তারিখ দেখে আবির্ভূত হয়ে জনসাধারণকে ধন্য করেন। আর পরিবর্তে জনসাধারণ তাঁদের ভোট দিলেই তাঁরা একদিন পিঠ চাপড়ে দেবেন।

কিন্তু পেট যাদের খালি তারা কি করবে—এবার তা নিদারুণ দুশ্চিন্তায় ব্যাপার। আর এই পেট খালি (যা অনশনেরই নামান্তর) থাকার জন্যে যেন কারো দায় দায়িত্ব নেই। দেশে অন্নাভাব একথা সম্পূর্ণভাবে অনেকেই মেনে নিতে চান না। কারণ যার অপরিমিত অর্থ আছে, অন্নাভাব তার নেই; কালোবাজার তার জন্যে দরজা খুলে রেখেছে। স্বভাবতই অল্প রোজগেরে মধ্যবিত্তরাই নিরুপায়।

নিরুপায় মধ্যবিত্ত পরিবারে এখন হা অন্ন, হা অন্ন রব। তাদের একমাত্র অবলম্বন রেশনের দোকান। বিধিবদ্ধ এলাকার সেই রেশনের দোকানগুলিই বা কোন উপকার করছে?

গত পুজোর আগে থেকেই এই দোকানগুলি মানুষের ক্ষুধার অন্ন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা সুরু করেছে। সেপ্টেম্বর মাসের আগে থেকেই যে রকম চাল সরবরাহ সুরু হয়েছে তা মানুষের অখাদ্য। এই অখাদ্য চালের ভাল-মন্দ বিচার সম্পর্কে ভুক্তভোগীরা হাতে নাতে প্রমাণ পেলেও কোনো রকম সুব্যবস্থা হয় নি।

তারপর একেবারেই সেই 'হাতে নয়, ভাতে মারা'র ব্যবস্থা অর্থাৎ দু সপ্তাহ রেশন দোকান থেকে চাল সরবরাহ একদম বন্ধ। এরপর চাল যদি বা দেওয়া হচ্ছে তা মুষ্টিভিক্ষার মতোই। চলতি সপ্তাহে অধিকাংশ রেশন দোকান থেকে যে চাল সরবরাহ করা হচ্ছে তা মানুষের খাবার অযোগ্য। এই আতপচাল শুধু দুর্গন্ধ-যুক্তই নয়, এ খেয়ে শরীরে বিষক্রিয়া হচ্ছে। এ খেয়ে এখন আন্ত্রিক রোগ ভীষণ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে বহু বিশেষজ্ঞের অভিমত।

প্রসঙ্গত আমরা স্মরণ করতে পারি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিগত আশ্বাস। বিগত বছর বিধিবদ্ধ রেশনিং এলাকার সম্প্রসারণের সিদ্ধান্তের পর সরকারের এক ঘোষণায় আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে, রেশনিং ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হবে না। এমনি আশ্চর্যের ব্যাপার, সেই আশ্বাস এখন গতায়ু। এখন চালের বদলে তাগিদ আসছে ভোটের।

ভোটরঙ্গে জয়ের বিজয়বাদ্য কার বাজবে—তা জনসাধারণই হয়তো বলতে পারেন। তবে নির্বাচনের আগে চালের যে দুরবস্থা গেল, তাতে নির্বাচনের পর চাল আর পাওয়া যাবে না এ সম্বন্ধে সবাই নিঃসন্দেহ হতে পারেন।

একালে কোনো দলের প্রতিশ্রুতি প্রায় অর্থহীন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। জনসাধারণের সম্মুখে একমাত্র বড় সমস্যা—প্রাত্যহিক জীবনধারণের সমস্যা। চাল নেই, ডাল দুর্মূল্য, তরিতরকারীর বাজারে আগুন, মাছের কথা বাঙালীরা ভুলতে বসেছে, সম্প্রতি গত বারের মতোই সুরু হয়েছে সর্ষের তেল নিয়ে রীতিমতো খেল। তার দাম হুহু করে বেড়ে চলেছে। বাদাম তেলের আমদানী নেই। সর্বাপেক্ষা দুর্বোধ্য ব্যাপার এই যে, নতুন সর্ষে ওঠার সময় যদি বাজারে তার মূল্য এতো বেশি হয়, তাহলে পরবর্তী সংকটময় দিনগুলির কথা গভীরভাবে চিন্তা না করে উপায় নেই। অন্তত দুমুঠো খেয়ে বেঁচে থাকার আশায় আগামী নির্বাচনকে জনসাধারণের পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। জনসাধারণ কতোটা সুখে আছে, তাদের নিজেদের এই বিচার—তারা নিজেরা না করলে, তা আর করবে কে?

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

চিন্তাধারার মৌলিকত্ব প্রমাণ করার জন্যে কি না জানি না, কোনো কোনো নেতা মাঝে মাঝে এমন উক্তি করে বসেন সাধারণের কাছে যা উদ্ভট ঠেকে। জনাব ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ সম্প্রতি তেমনি একটা অদ্ভুত প্রস্তাব রেখেছেন আসাম-সীমান্তের পাক-অনুপ্রবেশকারী বিতাড়ন প্রসঙ্গে। আলি সাহেব বলেছেন যে, আসামে আবার লোক গণনা করা হোক, কারণ ১৯৬১ সনের আদমসুমারীর কাজে গুরুতর ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিলো।

হাজারো সতর্কতা সত্ত্বেও যে-কোনো বড়ো কাজে ভুল-ভ্রান্তি থেকে যেতেই পারে, কিন্তু তাই বলে কি গোটা কাজ-টাকেই পণ্ডশ্রম বলে নস্যাৎ করে দিতে হবে? একেবারে বাতিল ঘোষণা করে নতুন করে লোক গণনা করতে হবে? এমন তো নয় যে, লোক গণনার কাজ কোন সংস্থা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে করেছে,—ও যে দল-মত নিরপেক্ষ সকল প্রভাবমুক্ত এক সংস্থার স্বার্থশূন্য কর্মনিষ্ঠার স্বাক্ষর, তাকে অগ্রাহ্য করা যাবে কেমন করে? যায় না যে—সে কথা ফকরুদ্দিন সাহেবও বেশ ভালো করেই জানেন, আর জানেন বলেই তিনি নতুন একটা চাল চেলেছেন। অর্থাৎ আদমসুমারীর রিপোর্টে বর্ণিত সীমান্ত অঞ্চলের লোকসংখ্যার সংগে আজকের বর্তমান লোকসংখ্যার মধ্যে যে দুস্তর ফারাক রয়েছে এটুকু বুঝতে আর তাঁর বাকি নেই। এবং বাড়তি লোকসংখ্যা যে পাক-অনুপ্রবেশকারীদের কারণেই ঘটেছে একথাও ফকরুদ্দিন সাহেব ভালো করেই জানেন। কিন্তু এটুকু স্বীকার করতেই তিনি নারাজ, তিনি মানতে চান না যে, আদমসুমারীর রিপোর্টে দেওয়া মুসলমান-দের সংখ্যা ইতিমধ্যে অবিশ্বাস্যরকম স্ফীত হয়েছে এবং আসাম সরকার তথা ভারত সরকারের অভিমত, এই স্ফীতি পাকিস্তান থেকে বেড়া-ডিঙিয়ে-আসা মুসলমানদের কারণেই ঘটেছে।

অথচ মজা এই, ফকরুদ্দিন আলি কেবল একজন ব্যক্তিমাত্র নন, তিনি একজন সাধারণ নাগরিক কেবল নন, যে সরকারী ভাষ্যে সন্দেহ পোষণ করবেন, তিনি সেই কেন্দ্রীয় সরকারেরই একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী, আসাম সরকারেরও তিনি গুরুত্ব-পূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, মাত্র কয়েক মাস আগেও। ফকরুদ্দিন সাহেব এ-আই-সি-সি'রও একজন প্রভাবশালী সদস্য। দীর্ঘ দিন ধরে তিনি কংগ্রেসে রয়েছেন, প্রদেশ কংগ্রেসের বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদ পূরণ করে এসেছেন, কংগ্রেস রাজনীতি করার বাবদে কারাবরণও করতে হয়েছিলো আলি সাহেবকে।

এমনও নয় যে, ফকরুদ্দিন আলি কিছু অজ্ঞতাবশত ওই উক্তি করে ফেলেছেন, পরে প্রথম সুযোগেই তার ভুল শোধরাবেন। ফকরুদ্দিন একজন বিদগ্ধ ব্যক্তি, লেখা-পড়ায়ও ভালো ছাত্র ছিলেন। ১৯০৫ সনে

ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ

তাঁর জন্ম, দিল্লীর সরকারী স্কুল ও স্টিফেন কলেজে শিক্ষালাভ করেছিলেন। এর পরে উচ্চ শিক্ষার জন্যে ফকরুদ্দিন সাগরপাড়ি দিলেন, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সসম্মানে এম-এ পাশ করেন উনি ১৯২৭ সনে। লণ্ডন থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করে তিনি পাঞ্জাব হাইকোর্টে অ্যাড-ভোকেট হিসেবে কর্মজীবন সুরু করেন। পরে তিনি কর্মস্থল পরিবর্তন করলেন, পেশা নয় যদিও। অর্থাৎ উচ্চতর ও নিরাপদ সিনিয়র অ্যাডভোকেট এবং পরে অ্যাডভোকেট জেনারেলের পদ পেয়ে আসাম হাইকোর্টে এলেন ফকরুদ্দিন।

বিচক্ষণ ব্যক্তি ফকরুদ্দিন, দেশের রাজনৈতিক হাওয়ার ভাষা বুঝেছিলেন তিনি। তাই ১৯২৮ সনে ওকালতি করতে করতে রাজনীতিতেও অংশ নিলেন, আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সদস্যপদ লাভ করতে বেগ পেতে হলো না ওই তরুণ ব্যবহারজীবীকে, ১৯৩৭ সালে এ-আই-সি-সি'র সদস্যপদও পেলেন। এই বছরেই জাতীয় কংগ্রেস নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ গ্রহণ করলে ফকরুদ্দিনও আসাম বিধানসভার সদস্য-পদের জন্যে নির্বাচন প্রার্থী হয়ে জয়লাভ করেছিলেন; সেই থেকে স্বাধীনতার প্রাক-মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এখানকার এম-এল-এ ছিলেন।

১৯৪৬ সালে তাঁকে কারাবরণ করতে হয়, কিন্তু পরের বছরই দেশ স্বাধীন হলে তিনি মুক্তিলাভ করেন। এই শিক্ষিত তরুণটি শীগ্‌গিরই নেতাদের এবং অনগ্রসর আসামের জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, বিশেষত এখানকার মুশিলম সমাজের ওপর তাঁর প্রভাব ও প্রতাপ অসামান্য। কাজেই বরদলুই মন্ত্রিসভায় তিনি সহজেই স্থান করে নিলেন, অর্থ ও রাজস্বমন্ত্রী হলেন তিনি। চালিহা মন্ত্রিসভায়ও তিনি বর্তমান পদ না পাওয়া পর্যন্ত অর্থমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেছেন। লালবাহাদুর শাস্ত্রীর আকস্মিক লোকান্তরে যখন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রীর পদ নিলেন, তখনই ফকরুদ্দিনের কপাল আরো ফিরলো, নেহরু আমল থেকে ভারতে যে-ট্র্যাডিশন চলে আসছে, নেহরু-তনয়া তাই অক্ষুণ্ণ রেখে শিক্ষাদপ্তরটি এই মুসলমান প্রতিনিধির হাতে দিলেন।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করার রেকর্ডও ফকরুদ্দিন আলির রয়েছে, ১৯৫৫ সনে সোভিয়েট য়ুনিয়ন এবং পরে রাষ্ট্রসংঘের ভারতীয় প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি।

এহেন কৃতী পুরুষ কেন আজ এমন এক উদ্ভট প্রস্তাব করে বসলেন? ১৯৬৪ সনে আসামে যখন বাঙালী-বিরোধী এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধেছিলো, তখন ফকরুদ্দিন আলি আহমেদকে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো, সে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় তাঁর ভূমিকা অমলিন ছিলো না বলে অভিযোগ শোনা গিয়ে-ছিলো বিভিন্ন দায়িত্বশীল মহলে। ফকরুদ্দিন সাহেব কি আজ তাঁর নতুন প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে সেই সন্দেহকে ঘনীভূত করছেন না?

প্রজাতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা

আবাদী কারখানায় নির্মিত ভারতের ট্যাঙ্ক বৈজয়ন্তী অষ্টাদশ সাধারণতন্ত্র দিবসে তে-রঙা জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন জানিয়ে রাজধানীর আকর্ষণীয় সামরিক কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করলে উপস্থিত দর্শকবৃন্দের মধ্যে উৎসাহ এবং উদ্দীপনা উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। নাগরিকগণ অভিনন্দিত করেন পাক-ভারত যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কয়েকটি কুচকাওয়াজরত সামরিক ইউনিটকে।

নাগরিকবৃন্দের সেই বিজয়োল্লাস দেখে-শুনে কার না রোমকূপে রোমাঞ্চ জেগেছে। আঠার বছর ধরে আমাদের প্রজাতন্ত্র যেখানে যতটুকু জাতীয় কৃতিত্ব স্থাপন করেছে, দেশের মানুষের ততটুকুকে নিয়েই গর্বের সীমা নেই। এই মহান ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে দেশপ্রেমের তীব্রতা যেন অতি সামান্য জাতীয় কৃতিত্বের জন্যও সর্বদা লোলুপ হয়ে আছে, আছে সর্বপ্রকার আত্মত্যাগেও প্রস্তুত হয়ে। আঠার বছরের আর্থিক নিপীড়নের মধ্যে ভারতের নাগরিক খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অন্যত্র-দুর্লভ আশাবাদে বুক বেঁধে। জাতির পক্ষে গর্ব করার মত সংবাদ কোথাও সে পেলে সাগ্রহে লুফে নিচ্ছে।

তবু কী নিষ্করুণ নির্দয় ভারতের স্বার্থঘন-নেতৃত্ব। যে তেজ, যে শক্তি, যে প্রেম নিয়ে 'পঞ্চাশ কোটি নরনারী' জাতি গঠনের সমস্ত রকম ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য উন্মুখ অপেক্ষায় সতত নেতৃমুখাপেক্ষী, তারা বারম্বার ব্যর্থতায় ন্যুব্জ হয়েছে, একান্ত আত্মপর নেতৃত্বের নির্মম অবহেলায়। পঞ্চাশ কোটির অমিত বিক্রমকে আমাদের নেতৃবর্গ কাজে না লাগিয়ে চেয়েছেন শুধু দাবিয়ে রাখতে। "আমার দেশকে আমি গঠন করার" যে আনন্দ, প্রতিদিন সে আনন্দে বঞ্চিত হয়েছে লক্ষ কোটি ভারতবাসী। কেন না পঙ্গু নেতৃত্ব চায়, তার নেতৃত্ব রক্ষার কোলাহলে ব্যাপৃত থাকতে। উন্মুখ জনগণের সর্বস্ব সমর্পণের আকাঙ্ক্ষা তাই তাঁদের নজরে পড়ে না। লোভীর চোখে কি ধরা পড়ে আকাঙ্ক্ষার মহান আকৃতি! যিনি আপনাকে নিয়েই সর্বাধিক ব্যস্ত, তিনি আ-ভারতভূমির হৃৎস্পন্দন অনুভব করবেন কেমন করে!

আঠার বছর ধরে ভারতের সাধারণতন্ত্র তাই যাঁদের দেশের মুকুটমণি করে তুলে ধরেছে; তাঁরা এসেছেন ভারতবাসীকে 'শাসন করার' আকাঙ্ক্ষা নিয়েই। আসেন নি প্রত্যেক ভারতবাসীর কাঙ্ক্ষিত বস্তুটির জন্য প্রত্যেকের পাশে দাঁড়িয়ে দেশ-গঠনের মহান ব্রতপালন করতে। তাই দিনে দিনে নেতৃত্বের সঙ্গে জনগণের ব্যবধান শুধু বেড়েই গেছে।

আমাদের রাষ্ট্রপতি

ভারতবাসীর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তো এই ছিল না যে, স্বাধীনতা মানে কেবলমাত্র শাসকের শোষকের চামড়ার রঙ পাল্টে দেওয়া। তেত্রিশ কোটি ভারতবাসী চেয়েছিল একই পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে কাস্তে, কুঠার, গাঁইতি, শাবল, লাঙল বলদ নিয়ে দলে দলে ভারতের অফুরন্ত সম্পদশালায় সমবেত হয়ে ভারতমাতার অঙ্গ ভরে নতুন আভরণের সজ্জা সাজিয়ে দিতে। আর সেই স্বেদসিক্ত কর্মঠ অঙ্গনে চেয়েছিল তার নেতৃবর্গকে, একেবারে দেহের ছোঁয়ার স্পর্শে একান্ত পাশাপাশি। লক্ষ বুকের শোণিতধারায় ভারতমাতার সর্বাঙ্গ রঞ্জিত করা হয়েছিল। এক জলদগম্ভীর প্রতিজ্ঞা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষের কণ্ঠে কম্পিত আদৃত হয়েছিল ঃ

"আমরা ভারতের জনগণ ভারতকে একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্ররূপে গড়িয়া তোলার, ভারতের সকল নাগরিকের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় বিচার, চিন্তা, মত প্রকাশ, ধর্মমত, বিশ্বাস ও উপাসনার স্বাধীনতা ও সামাজিক মর্যাদা ও সুয়োগলাভের সমান অধিকার দানের এবং ব্যক্তির মর্যাদা ও জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের জনগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগাইয়া তোলার পবিত্র সংকল্প গ্রহণ করিতেছি।"

সঙ্কল্পের পবিত্রতা অবশ্যই যথাযথ আছে। নেই সঙ্কল্প পালনের পবিত্র প্রতিজ্ঞা। সে প্রতিজ্ঞা প্রতি পদে প্রতি দিন কলুষিত হয়েছে। যার চূড়ান্ত অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি জাতির মনে বিদ্বেষ; চৈতন্যহীনতা এবং আত্মহননের ভ্রান্ত ইচ্ছাকে লালন করে যাচ্ছিল এতোকাল ধরে। বিগত বছর সেই বিভ্রান্ত মনোভাবকেই আসমুদ্র হিমাচল নাড়া দিতে দেখেছি আমরা। আমাদের মিতভাষী, স্থিরপ্রজ্ঞ রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রাক্ রাত্রে জাতির প্রতি প্রদত্ত ভাষণে সে কথাই উচ্চারণ করেছেন। তাঁর সচেতন কণ্ঠস্বরে সতর্কবাণী আমরা, বিশেষত আমাদের আত্মসুখী নেতৃবর্গ ইতিপূর্বেও শুনেছেন, কিন্তু মন যখন বিষয়-বিষে মাতাল তখন স্বভাবতই রাষ্ট্রপতির সতর্কবাণী ক্ষমতান্ধ নেতৃত্বকে সচেতন করতে পারে নি।

আমাদের নেতৃত্ব এমনি বাধর, এমনি অন্ধ, এমনি আত্মমদে প্রমত্ত।

রাষ্ট্রপতি বলেছেন ঃ বিগত বছরের উচ্ছৃংখলতার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সামগ্রিক আবহাওয়াকে বিচার করতে হবে এবং দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে আর ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার এবং পদাধিকারে টিকে থাকার আরামে মশগুল হয়ে থাকলে চলবে না।

না তা চলে না। ইতিহাসও কোনদিন এমনতর আত্মপরায়ণ নেতৃত্বকে যুগ যুগ টিকে থাকার সুযোগ দেয় নি। সুখী পরিবারকে সরে দাঁড়াতে হয়েছে। অবশ্য কোটি মানুষের আকাঙ্ক্ষা তাতে পুরোপুরি ফলবতী হয়েছে এমন নয়। তবু হাওয়া বদলের প্রাথমিক মুহূর্তে সাধারণের ভাগ্যে কিছু জুটেও গেছে এবং সহস্রাধিকের শক্তি বারম্বার সপ্রমাণিতও হয়েছে তারই ফলে। কে জানে, আমাদের আত্মসুখী নেতৃত্বও হয়ত বা ইতিহাসের এই শিক্ষাটুকুই গ্রহণ করেছেন যে, যতকাল টিকে থাকা যায় কামড়টা ততকালই শক্ত করে রাখতে হবে। বলা বাহুল্য, তাতে কামড় হয়ত দন্তমূলে পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু সে কামড়ে জাতির জীবনে ঘা এবং পচন শুরু হয়। সেই রুগ্ন জাতিকে উঠে দাঁড়াতে হলে পুনরায় প্রচুর কসরতের প্রয়োজন।

নেতাজীকে নিয়ে প্রাদেশিকতা

গোটা দেশটার দিকে তাকালে লজ্জায় শিরদাঁড়া বেঁকে যায়, এ এক বিরাট নিমকহারামের জন্মস্থান। না, নিমকহারামি বলতে আমি সারমেয় স্বভাবের অনুপস্থিতির কথা বলছি না। ওগুণে আমরা বরং সবাই পারদর্শী, কিম্বা এককাঠি অগ্রসর। অর্থাৎ কুকুরে প্রভুর মৃত্যুতে ম্রিয়মাণ হয়, মানব-সারমেয় পুরাতন প্রভু হটিয়ে নতুন প্রভুর আবির্ভাব ঘটলে নয়নাশ্রু বিসর্জন দূরের কথা, অধিকতরভাবে লাঙুলনৃত্যের প্রদর্শন করে প্রভুপাদ লাভের কম্পিটিশনে শিরোপা পাওয়ার জন্য ছট্‌ফট্ হাঁসফাঁস করে ওঠে। সুতরাং যে অর্থে নিমকহারামি এবং সারমেয়স্বভাবীকে আমরা চিনি, আমরা সে জাতের সারমেয়ও নই। আমরা অতি-নিমকহারামের, অতি-সারমেয়স্বভাবী, অর্থাৎ নেড়ি কুত্তার বদগুণাবলী সদ্‌গুণাবলী হিসেবে টপাটপ গ্রহণ করে আসছি।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নিমক খায় নি এমন ভারতবাসী কে আছে। কে বলতে পারে, ইংরেজ হটিয়ে যে নয়া প্রভুপাদকে তখ্‌তারূঢ় করেছি আমরা, সেই কঠিন কর্মের চূড়ান্ত সাফল্যলাভের মুহূর্তটিতে নেতাজী-শোণিতধারার লবণাক্ত স্বাদই সর্বিশেষ মিশে নেই। বীরের মত 'স্বাধীনতা' শব্দ উচ্চারণ করতে যাঁর কাছে ভারতবাসীর দীক্ষা, তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বৈ আর কে। হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ খৃস্টান শিখ জৈন নির্বিশেষে সকলে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হয়ে কার উদাত্ত আহ্বানে অখণ্ড নয়া ভারত রচনার 'জয় হিন্দ' মন্ত্রোচ্চারণ করেছে। কার স্বদেশ-চেতনায় ছিল না আত্মভোগের বাসনা, ক্ষমতালাভের মোহ এবং দেশের কোটি কোটি অশিক্ষিত মানুষের বুকের ওপর জমিদারির ফরাস তাকিয়া বিছানোর আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত থেকে কার সর্বত্যাগী নেতৃত্ব দেশের নগণ্য সাধারণ মানুষটির পাশে দাঁড়িয়ে এক তেজদৃপ্ত সৈনিকের মতই দেশকে বিদেশী কবলমুক্ত করার জন্য বিশ্বঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ পৃথিবীর সব থেকে দুর্যোগের দিনে অসংখ্য গোলাবর্ষণের মধ্যে পাগলের মত এক মেরু থেকে অপর মেরুতে অকুতোভয়ে বিচরণ করে এসেছে। সে তো সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ পুরুষকার, নেতাজী সুভষচন্দ্র বসুই।

ইংরেজ জেলের নিরাপদ আশ্রয়ে বসে ইংরেজ বন্দুকের মুখে দেশবাসীর বিপ্লবকে অনুভব করা আর ইংরেজের বিরাট শক্তির বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে লড়তে লড়তে ভারতের মাটিতে প্রবেশ করার বাসনার, মধ্যে যে চারিত্রিক বৈসাদৃশ তাতেই নেতাজী ভারতের বিপ্লব যুগের একমাত্র 'হিরো'; একমাত্র সৈনিক নেতা।

ক্রাইস্ট যদি নিজের রক্ত দিয়ে মানুষের পাপ প্রক্ষালন করে গেছেন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র নিজের রক্ত ঢেলেছেন ভারতের মুক্তি যুদ্ধে। প্রত্যেক শহীদের রক্ত কণিকায় আজও অনুভব করতে পারি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের গরম তাজা রক্তেরই নোনতা আস্বাদ।

মূঢ় এবং নিমকহারাম এক শ্রেণীর ভারতবাসী সেই রক্তের স্বাদকে ইচ্ছাকৃতভাবে এবং নির্লজ্জ বিদ্বেষপরায়ণতার সঙ্গে ভুলতে চাইছে। ভুলতে চাইছে কারণ, বিপ্লবের শরিক এরা কেউই ছিল না। এদের নজর ছিল শাসনযন্ত্র অধিকারের সুবর্ণ সুযোগের দিকে। সে স্বাধীনতার মেওয়া আজ নেতাজী সুভাষের বীর্যে, তাঁর অবিনশ্বর দেহের শোণিত ক্ষরণে এবং গান্ধীজীর মার-হজমের অসম্ভব মানসিক বল্ প্রদর্শনে অর্জিত হয়েছে। আর সেই শ্রেণীর নিমকহারামি দেশবাসীর হয়েছে স্বর্গলাভ। কেন না দুই মহান নেতার কেউ আর আমাদের মধ্যে নেই। গান্ধীজীকে তো বুলেটের আঘাতেই বিদায় করে আপদ চুকিয়ে দিয়েছি। আর নেতাজী? যিনি কেবলমাত্র আত্মদানের জন্যেই তাঁর সূর্য-সতেজ জ্যোতির্ময় মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন দেশবাসীর তখ্‌তলোভী লালসা দেখে তিনি আপনিই অজ্ঞাতবাসে অদৃশ্য হয়েছেন।

লালসার লালা আজ গলায় সারমেয় বকলেস (নেকটাই) এবং পরনে কোট-পাতলুন চাপিয়ে অাফসার বনেছে। দেশের লাড়য়ে মানুষগুলোর ওপর খবরদারি করার ভার এখন তাদের ওপর। মুখে বুকনি এবং বুকে ধূর্তামিতে নষ্ট এরা গান্ধীজীকে স্মরণ করে কেন না গান্ধীজী এখনও তখ্‌তাধিকারীর কারও কারও মাথায় চরকাসঞ্জাত সুতার টুপি চাপিয়ে রেখেছেন। নেতাজীকে স্মরণের এলাকায়ই স্থান দেয় না; ইচ্ছে করে, নষ্টামি করে নেতাজীর স্মৃতিকে মুছে ফেলতে চায় দেশবাসীর স্মৃতিরাজ্য থেকে (হায়, কূপমণ্ডুক বাসনা কি এতই সহজে পারে ইতিহাসের সত্যকে বিস্মরণের কবরে শুইয়ে দিতে)।

না জানি, নেতাজী-বিদ্বেষের আড়ালে এ ছাড়াও অন্য কিছু আছে না কি।

আছে কি সেই সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা, যা আজ ভারতের জাতীয় ঐক্যকে টুকরো টুকরো করছে। এই সংকীর্ণতাবাদীরা কস্মিনকালেও জাতীয় বিপ্লবের শরিক ছিল, বিশ্বাস হয় না। তাহলে দৈনিক পত্রিকা করে নেতাজী-বিস্মরণের অভিযানে এরা এমন নির্লজ্জ প্রকট কেন। এদের ক্ষুদ্রতা সেই মহান জ্যোতির্ময়সদৃশ নেতাকে স্মরণে আনতে ভয় পায়। এক নম্বর, তিনি জাতির ঐক্যসাধক মহানায়ক হলেও তাঁর জন্ম বিপ্লবী বাঙলার সর্বংসহ মাটিতে। দু' নম্বর, নেতাজী সুভাষ ছিলেন মানুষের রাজ্যে ত্যাগ আদর্শের মহত্তম জবাকুসুম সঙ্কাশ মহাদ্যুতি। তাই নেতাজীকে স্মরণে রাখতে স্বার্থপর ক্ষুদ্রচৈতন্য ভয়েই বিবর্ণ হয়।

২৩শে জানুয়ারী বাঙলাদেশ আজও নেতাজী বন্দনা করে জয় হিন্দ বাণী উচ্চারণ করে। প্রভাতী পত্র-পত্রিকা ভবিষ্যৎ বঙ্গবাসীর কাছে উপস্থিত করে সেই মহাত্যাগীর জীবনকাহিনীর বিস্ময়কর পরিচ্ছেদগুলি। কিন্তু ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে? নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বলে জীবিত বা মৃত কোন মানুষ এই আসমুদ্র-হিমাচলের বুকে একদিন যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছেন; আজকের আই-এ-এস-ই ভারতবর্ষে তিনি যে কত অবলীলাক্রমে সারমেয়-বকলেস নেকটাই ত্যাগ করে এবং আই-সি-এস-এর মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করে ভারতপথিকের পদযাত্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন আমাদের নিমকহারামি তা সর্বাংশে ভুলতে চায়। তাই

২৩শে জানুয়ারী কিম্বা তার পরের দিনও ভারতের অন্যান্য স্থানের সর্বাধিক প্রচারিত সংবাদপত্রে নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে একটি ছত্রও প্রকাশ করা কেউ প্রয়োজন মনে করেন নি। আর দরকার কি। ভারতের প্রশাসন যন্ত্রের স্টিয়ারিং-এ এখন যে ইংরেজ 'মামি' 'ড্যাডি'-র দল অধিকার বিস্তার করেছে; ভারতের অর্থনীতির নিয়ামক হয়েছে যে তারাই। নেতাজী তো একটা সময় এদের ইংরেজকে তখ্‌ত থেকে তাড়াবার কাজ করে গেছেন। আজ আর সেই বংগালী ভদ্রলোকের সংগে সম্পর্ক কী।

যে তেইশে জানুয়ারী জাতির জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে সূর্যসদৃশ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাব ঘোষণা করেছিল ভারতের সংবাদপত্র জগৎ তাকে কোন স্বীকৃতিই জানাল না। না তাঁর স্মরণে কিছু, না সম্পাদকীয় কলমে কিছু। না-শুধু সংবাদের আকারে দুটো কথা। এরা যেন এদের এই নৈঃশব্দ দিয়ে বোঝাতে চাইল, সুভাষচন্দ্র নামে কারও নাম এদের জানা নেই। সুভাষচন্দ্র নামে এমন কেউ ভারতের বুকে জন্মগ্রহণ করেন নি যাঁকে স্মরণ করার একটা জাতীয় দায়িত্ব অফিসর জন্মদাতৃ অঞ্চলেরও আছে। হাতের কাছে যে কটা বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র পাচ্ছি, এক ডাকে যাদের নাম এক নামে যাদের ভারতব্যাপী প্রচার তাদের নাম সাজিয়ে দিলাম। এইসব কাগজগুলোর অনেকেরই সার্কুলেশন এবং বিজ্ঞাপনের অফিস এই কলকাতার বুকেই আছে।

১। মাদ্রাজের 'হিন্দু', এ কাগজের নামের তলায় লেখা থাকে, 'ভারতের জাতীয় সংবাদপত্র'।

২। বোম্বাই-এর 'দি টাইমস অব ইণ্ডিয়া'। এই কাগজটাই নাকি ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত।

৩। নতুন দিল্লীর 'দি ইণ্ডিয়ান এক্স-প্রেস'।

৪। 'দি পেট্রিয়ট'।

দিল্লী বোম্বেই যথেষ্ট। বাকি স্থানীয়। তাদের নিয়ে আর তালিকাবৃদ্ধির প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া উপরোক্ত কাগজগুলিই কলকাতা শহরে বেশ কিছু দৈনিক খরিদ্দার জুটিয়েছে। এরা যেন পরস্পরে বলাবলি করেই নেতাজীকে খবর কাগজের পাতা থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছে। বলুন তো কি দুঃসাহসী আশা! বীর হনুমান নাকি সূর্যদেবকে বগলদাবা করে প্রত্যূষকালকে পিছিয়ে দিয়েছিলেন রাম-সেবক লক্ষ্মণের ধড়ে প্রাণ সঞ্চারের মুহূর্ত-কাল বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু এদের যে সেই বীরত্বটুকুও নেই। নেতাজীর যে জ্যোতি ইতিহাসকে সমুজ্জ্বল করেছে বলা বাহুল্য কোন হনুমানী উচ্চাশায় তা মুছে যাওয়ার নয়। কিন্তু দুঃখ হয়, প্রচণ্ড দুঃখ হয়, যখন দেখতে পাই জাতির প্রিয় নেতার এই স্বেচ্ছাসৃষ্ট অব-মাননার জন্য এরা ক্ষেপে উঠেছে বংগাল বিদ্বেষে।

এদের এই ক্ষুদ্র চেতনাকে নেতাজী ক্ষমা করুন। এরা বাস্তবিকই নিতান্ত করুণার পাত্র।

বাংলা দেশের এক শ্রেণীর পত্রিকা-ওয়ালা আছে, যারা নেতাজী সম্পর্কে অধিক জায়গা ছাড়তে উৎসাহ বোধ করে নি।

দৈনিক পত্রিকার মধ্যে 'দি স্টেটসম্যান' কাগজ তেইশে জানুয়ারীর অনুষ্ঠানের ওপর তেইশ তারিখে আধ কলমেরও কম একটা সংবাদাংশ রেখেছে। সম্পাদকীয় মন্তব্যের স্তম্ভে নেতাজীকে জায়গা ছাড়তে কিম্বা নেতাজী স্মরণে দুটো কথা লিখে বিজ্ঞাপন কণ্টকিত এই কাগজ তার মহামূল্য নিউজ প্রিন্ট নষ্ট করতে চায় নি। একটা ছবিও ছাপা হয়েছে। নেতাজী ভবনের দেওয়ালচিত্রের। বলা বাহুল্য, এটাও ব্যবসায়িক। সংবাদপত্র খবর বেচে। এরা নেতাজীর খবর বেচেছে। নেতাজীকে স্মরণ করে নি। আমাদের দুর্ভাগ্য।

পার্বত্য নেতৃ সম্মেলনে সন্তোষ

সর্বদলীয় পার্বত্য নেতৃ সম্মেলন দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে আলোচনায় সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। গারো পাহাড়ে প্রস্তাবিত আসাম ফেডারেশনের প্রতি তাঁদের সাংগঠনিক সম্মতি জ্ঞাপন করে এক বিরাট জনসভায় নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন। তাঁরা ভারত সরকারের প্রস্তাবকে অভিনন্দিত করে দুর্নীতিমুক্ত আদর্শ পার্বত্য রাজ্য গঠনের জন্য পর্বতীয়াগণের সহযোগিতা আহ্বান করেন।

মূলত দুটি সর্তে পার্বত্য উপজাতিরা সরকারী প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। সর্ত দুটিঃ

(১) প্রস্তাবিত আসাম যুক্তরাজ্যে পার্বত্য রাজ্যের মর্যাদা এবং বক্তব্য (ভয়েস) থাকবে সমান সমান।

(২) উভয় ইউনিটের অনুমতি অনুসারে যুক্ত রাজ্যীয় ক্ষমতার হাতে রাখা হবে সর্বনিম্ন বিষয়াবলী।

নেতৃ সম্মেলন আগামী নির্বাচনে পার্বত্য অঞ্চলের ষোলটি আসনের মধ্যে তেরটিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সংসদে মাত্র একটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। মিজো পার্বত্য অঞ্চল এবং খাসি জয়ন্তিয়ার জেলা কংগ্রেস নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবেন না বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। খাসি জয়ন্তিয়ার জেলা কংগ্রেস এক প্রস্তাব গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় সরকারী প্রস্তাবিত যুক্ত রাজ্যীয় ব্যবস্থায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এঁরা নাগাল্যাণ্ডের খাসি জয়ন্তিয়ার জন্য পৃথক রাজ্যের দাবিদার। ওদিকে জাতীয়তাবাদী মিজোরাও প্রস্তাবিত ফেডারেশনে সম্যক সন্তুষ্ট নন। এঁরা মিজো য়ুনিয়ন চাইছেন। বিদ্রোহী মিজোরা চাইছে স্বাধীন মিজো রাজ্য। বিদ্রোহী মিজোদের অসংগত জাতীয়তা-বিরোধী দাবিকে জাতিদ্বেষী বিদ্রোহ বলে এঁদের দাবি ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য হওয়া উচিত নয়; কিন্তু ভারতীয় য়ুনিয়নের মধ্যে স্বতন্ত্র মিজো রাজ্যের দাবি প্রস্তাবিত আসাম-পর্বত জেলা ফেডারেশনের মধ্যে যে পরিতৃপ্তি খুঁজে পাচ্ছে না, এ প্রশ্নটি দুশ্চিন্তার অবসান ঘটাতে সাহায্যে আসে নি। খাসি জয়ন্তিয়ার প্রশ্নও অনুরূপ।

ভারত সরকার তত্রাচ আশাবাদী। তাঁরা মনে করেন প্রস্তাবিত ফেডারেশনে ক্রমে নাগাল্যাণ্ড মণিপুর ও ত্রিপুরাকেও সংযুক্ত করা যাবে।

কিন্তু অবস্থাগতিক পর্যালোচনায় অভিজ্ঞমহল এতো দূর আশাবাদ পোষণ করতে যথেষ্ট ভরসা পাচ্ছেন না।

সুতরাং আসাম ফেডারেশনের প্রস্তাবে অধিকাংশ পার্বত্য জেলা সন্তুষ্ট হলেও বিষবৃক্ষের মূলোৎপাটন সম্ভব হয় নি। ফেডারেশন যদি পর্বতীয়াদের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে ও দ্রুত উন্নয়নে সত্যই সহায়ক হয়, তবে হয়ত এই অভিনব যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যুক্তরাজ্যের প্রতি অদ্যাবধি বিমুখ আঞ্চলিকতাবাদীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে পারে। অন্যথা তারপরও ঝঞ্ঝাট থেকে যাচ্ছে।

পর্বতীয়া সমস্যার প্রতি সুতরাং এখনও সজাগ দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় নি। দেশের সর্বত্র বিচ্ছিন্নতা-বাদীরা সক্রিয়। এঁদের অপপ্রচারের বিভ্রান্তি থেকে মানুষের মনকে জাতীয়তা-বাদী চেতনায় পরিশীলিত করার জন্য উপযুক্ত প্রচার ও কর্মের যে প্রয়োজন, তেরটি পার্বত্য জাতির সম্মতিদানের ফলে সেই কাজকে দ্রুত সংগঠিত করে তোলার দরকার। সরকারী তরফেও একই প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশের সরকার যেন শুধুই প্রতি প্রভাতে জনগণের সংগে মুখোমুখি হতে শিখেছেন মল্লরংগভূমে। কিন্তু শুধু দাবি অস্বীকার ও দাবি পূরণ করাই কোন সরকারের কাজ নয়।

সমস্যা সৃষ্টির মধ্যেই অস্তিত্ব অনুভব করার জন্য সরকার গঠিত হয় না। সমস্যাকে অঙ্কুরে সমাধান করে গণ-জীবনকে উন্নতির লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই ক্ষমতাবান একটি সরকারকে আমরা প্রতিষ্ঠা দিয়ে থাকি।

তাই দেশের যে কোন সমস্যার মতই পূর্বতীয়া সমস্যার শিকেয় টাঙানো অবস্থা এবার শিথিল হয়েছে ভেবে পরিতৃপ্ত হওয়ার সময় হয় নি। সরকারী তরফে জনকল্যাণের জন্য সদা জাগ্রত দৃষ্টি অনেক সমস্যা ও অনেক তৈরি-করা সমস্যাকে পূর্বাহ্ণেই সমাধান করে ইতি কর্তব্য সমাধা করতে পারে। এই কথা এই মুহূর্তে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে।

মধ্যপ্রদেশে জনসঙ্ঘের অভিযান

মধ্যপ্রদেশে বিরোধী দল বলতে বর্তমান বিধানসভায় জনসঙ্ঘকেই বোঝাত। জনসঙ্ঘই বিরোধী-গোষ্ঠীতে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। এবার কংগ্রেসের সঙ্গে সমতালে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে মধ্যপ্রদেশকে মধ্যযুগে আকর্ষণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে জনসঙ্ঘ। মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায় মোট আসন ২৯৬টি, কংগ্রেস প্রার্থী স্বভাবতই সব কটিতে খাড়া আছেন; উচ্চাভিলাষী জনসঙ্ঘও প্রার্থী দিয়েছে ২৬৫টি। সংসদে মধ্যপ্রদেশের আসন সংখ্যা ৩৭টি; জনসঙ্ঘ ৩২টি প্রার্থী দিয়েছে। জনসঙ্ঘের আশা আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসকে কাৎ করে অনায়াসেই ক্ষমতা দখল করতে পারবে।

গুজরাটে স্বতন্ত্রের সম্ভাবনা

মধ্যপ্রদেশে যেমন জনসঙ্ঘ গুজরাটে তেমনি স্বতন্ত্র পার্টির আশা ক্ষমতালাভের জন্য যথেষ্ট অনুভব করছে। গুজরাট বিধানসভার ১৬৮টি আসনে স্বতন্ত্র পার্টি খাড়া করেছে ১৪৫ জন প্রার্থী। লোকসভার ২৪টি আসনে স্বতন্ত্র পার্টি নির্বাচনী দ্বন্দ্বে নেমেছে ১৯ জন প্রার্থীর শক্তি নিয়ে। বলা বাহুল্য কংগ্রেস প্রত্যেক আসনেই প্রার্থী রেখেছে।

স্বতন্ত্র জনসঙ্ঘ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী

ভূপালে তাঁর নির্বাচনী সফরকালে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী অন্যান্য প্রসঙ্গের সঙ্গে জাতির স্বার্থের পক্ষে জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র পার্টির অস্তিত্ব যে কত দূর ক্ষতিকর এবং ভয়াবহ তা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। কোনও কংগ্রেসী নেতা যখন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে অপর দলের প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকার কথা বিশ্বাসযোগ্য হিসেবে উত্থাপন করেন, তখন এটা আর অস্পষ্ট থাকে না যে, বাস্তবিক প্রতিক্রিয়াশীলতায় কত দূর পিছু হটলে কংগ্রেসীর মনেও তা আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

স্বতন্ত্র যে জনস্বার্থ বিরোধী এটা অবশ্য তার নিজের জন্য নাম বাছাই করার মধ্যেই পরিস্ফুট। রাজন্যবর্গ এবং ধনী ব্যবসায়ীরা সর্বাংশেই জনগণের সঙ্গে স্বতন্ত্র। সুতরাং দলের নামেই এঁদের চেনা যায়। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যখন বলছেন, স্বতন্ত্রের কোন ভবিষ্যৎ নেই, তখন দুদন্ড চিন্তা করতে হচ্ছে বৈকি। স্বতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নেই, বুভুক্ষু ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে, অধিকাংশ ভোটদাতাকে অশিক্ষার অন্ধকারে আবদ্ধ রেখে একথা কি সত্যিই গায়ের জোরে বলা যায়। স্বতন্ত্রের স্বরূপ জানতে বেগ পেতে হয় না। কারণ এঁরা এঁদের অবাধ সর্বগ্রাসী ইচ্ছাকে কোন মুখোসের আড়ালে রাখেন না। দরিদ্র ও অশিক্ষিত মানুষের দুর্বলতায় এবং ধনী ও সমাজপতিদের সহায়তায় এঁরা দলের জন্মাবধিই বেশ ত্বরিতগতিতে আপনাদের স্থান করে নিচ্ছেন। লোকসভায় এঁদের স্থান অল্প প্রয়াসেই ফেঁপে উঠেছে, বহুকাল দেশের জনমনে নানা-রকমভাবে চেতনা সঞ্চারের চেষ্টা করেও প্রগতিশীল দলগুলি যা সম্ভব করতে পারে নি, স্বতন্ত্র সোনা রূপোর চেকনাই দেখিয়ে তাই করেছে। প্রধানমন্ত্রীর তবে এমত আশা কেমন করে জাগ্রত হল। তিনি কি এই আশাই করেন যে কালক্রমে স্বতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কংগ্রেসের মধ্যেই! অসম্ভবও নয়। কেন না কংগ্রেসের মনোনয়নপত্র বহু ক্ষেত্রে ধনিক মালিক এবং রাজন্যবর্গের প্রতি বর্তমান নির্বাচনে অকাতরে বিলি করা হয়েছে। স্বতন্ত্র দলে তাঁরাই ভিড়েছেন, এককালে যাঁরা কংগ্রেসের ছত্রচ্ছায়ায় জনগণের নেতা ছিলেন। এঁরা কংগ্রেসের মতো মুখোস এঁটে রাজনীতিতে নামেন নি। বেশ প্রকট এবং স্পষ্ট। কিন্তু কংগ্রেস নিজেও যে চলেছে স্বতন্ত্র পদাঙ্ক অনুসরণ করতে এই চিত্রটি কি শ্রীমতী গান্ধীর চোখে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হতে এখনো সময় লাগবে। দেশের সাধারণ মানুষ দুই দলকে নিয়েই আতঙ্কিত। কংগ্রেস স্বতন্ত্র একই বস্তুর এপিঠ আর ওপিঠ। তবে হ্যাঁ, এখনো পর্যন্ত কংগ্রেসকে মন্দের ভাল বলতেই হবে, কেন না কংগ্রেসী ম্যানিফেস্টোয় জনগণের সামনে আজও একটি ঝুলন্ত মোয়া টাঙানো আছে। তবে শ্রীমতী গান্ধীর মতো ভবিষ্যৎ বাণীতে অতটা সুস্থির হওয়া যাচ্ছে না। কে জানে, কে কার ভবিষ্যৎ। কংগ্রেস স্বতন্ত্রের, অথবা স্বতন্ত্র কংগ্রেসের।

জনসঙ্ঘ সম্পর্কে প্রশ্নটা অবশ্য অত জটিল নয়। জনসঙ্ঘ সম্পর্কে শ্রীমতী গান্ধী তাই অধিকতর আতঙ্কিত। তিনি বলেছেন। স্বতন্ত্র অপেক্ষা জনসঙ্ঘের ভূমিকা ভয়াবহ। জনসঙ্ঘ ফ্যাসিস্টদের পার্টি। অবশ্য এই মারাত্মক ফ্যাসিস্ট-অভ্যুদয়কে রোখার জন্য তিনি আইনত কোন বিধিনিষেধের পক্ষপাতী নন। কেন যে এ ব্যাপারে তাঁর এমন ঔদার্য, সাধারণ মানুষ অবশ্য তা সম্যক উপলব্ধি করতে যথার্থই বেগ পাবেন। কেন না শ্রীমতী গান্ধী মনে করেন জনসঙ্ঘ একটি "ডেঞ্জারাস" পার্টি।

শ্রীমতী গান্ধীর ভাষণে বিস্মিত হলেও, ঐ ভাষণেই কংগ্রেসের মানসিক দ্বন্দ্বকে বোঝা সহজ হয়ে পড়ে।

স্বতন্ত্রকে অপেক্ষাকৃত কম ভয়াবহ দল হিসেবে বর্ণনা করার কালেই শ্রীমতী গান্ধীকে বলতে হয়েছে, কংগ্রেসের মনোনয়নপত্র ভারতের প্রাক্তন রাজন্যবর্গের মধ্যে বিলি করে দিয়ে কংগ্রেস বস্তুত কোন অন্যায় করে নি।

হায়, কংগ্রেসের ন্যায় অন্যায় বিচারের ক্ষমতা কি হতভাগ্য দেশবাসীর আছে? ভোটের বাক্সে মাইনরিটির সংখ্যাধিক্যে কংগ্রেস যা করে তাই অন্যায়ের ঊর্ধ্বে। এ যেন বৃটিশদের সেই 'দি কিং ক্যান ডু নো রং'-এর মত, বরং বলা উচিত, তারও থেকে শক্তিমান আওয়াজ। বৃটেনে রাজমুকুট কিছুই করে না, সুতরাং অন্যায় করার অধিকারটুকুও তার নেই। কিন্তু ভারতে কংগ্রেসই সব করে, অথচ অন্যায় করে না। শ্রীমতী গান্ধীর বক্তব্যের সামগ্রিক ফলশ্রুতি তাই খুবই দুর্বোধ্য ঠেকল।

বিশেষ তিনি আরও বলেছেন, কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রী এস কে পাতিল যথা ইচ্ছা স্বেচ্ছাচারী মন্তব্য অনায়াসেই রাখতে পারেন। তাঁর মন্তব্য কংগ্রেস নির্বাচনী ইস্তাহারের বিরোধী হলেও, পাতিল সাহেব যখন মন্তব্য করেন, তখন তাকে ইস্তাহার লঙ্ঘনকারী মন্তব্য বলে গণ্য করতে শ্রীমতী গান্ধী গররাজী।

কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারের সঙ্গে বিরোধযুক্ত বক্তব্য, অর্থাৎ ব্যাঙ্কের ওপর সামাজিক কর্তৃত্ব স্থাপনার বিরোধী বক্তব্য হাজির করে শ্রীপাতিল অধিকার লঙ্ঘন করেছেন বলে সাংবাদিকগণ অভিযোগ উত্থাপন করলে শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন, ব্যাঙ্কের ওপর সমাজের কর্তৃত্বের বিরোধিতার দ্বারা কংগ্রেস ম্যানিফেস্টোকে শ্রীপাতিল লঙ্ঘন করেন নি।

অর্থাৎ এমন বিরোধ, বিরোধই নয়।

বস্তুত এদেশে কংগ্রেসী কখনো কোনোই ভ্রমাত্মক আচরণ করতে পারেন না। সুতরাং ঃ

লং লিভ কংগ্রেস?

সোভিয়েট য়ুনিয়ন ঃ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট য়ুনিয়ন মহাকাশ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে মস্কোতে যার গুরুত্ব অপরিসীম বলা চলে। কারণ এ চুক্তির দ্বারা শান্তিপূর্ণ কাজের জন্যেই মহাকাশের ব্যবহার করা চলবে, চাঁদ ও অন্যান্য উপগ্রহ সহ মহাকাশে পরমাণু অস্ত্র নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মস্কোর পর ওয়াশিংটন ও লন্ডনেও চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে এবং রাষ্ট্রসংঘের অন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলিও এ চুক্তি মেনে নিয়ে সই করবে বলে আশা করা যায়, যদিও ফ্রান্স, আলবেনিয়া কী করে বলা যায় না, হয়তো আলবেনিয়া সায় দেবে না।

১৯৬৩ সালের মস্কো আংশিক পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ চুক্তির পর এত বড় ঘটনা আর ঘটে নি। মস্কো চুক্তিকে যদি শান্তি স্থাপনের এবং নিরস্ত্রীকরণের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে বর্ণনা করা চলে তবে মহাকাশ চুক্তিকে অনায়াসে তার পরবর্তী ধাপ বলা যায়। অবশ্য সামগ্রিক নিরস্ত্রীকরণ এখনো বহু দূরে, কিন্তু যেটুকু মতৈক্য এ ব্যাপারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে বাধা কোথায়?

মহাকাশ চুক্তিপত্রে ১৭টি মূল বিষয় রয়েছে; সেগুলি হলো ঃ

(১) চাঁদ ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ-মহাকাশের রহস্য উদ্ঘাটন ও তার ব্যবহার মানব-জাতির কল্যাণের জন্যই করা হবে;

(২) সাম্যের ভিত্তিতে মহাকাশ ও গ্রহ-উপগ্রহাদির তথ্যানুসন্ধান ও ব্যবহারের স্বাধীনতা থাকবে;

(৩) মহাকাশ ও গ্রহ-উপগ্রহে মানুষের কার্যকলাপ রাষ্ট্রসংঘের সনদ সহ আন্তর্জাতিক আইনের নিয়ন্ত্রণসাপেক্ষ হবে;

(৪) সার্বভৌম অধিকার ও জাতীয় আত্মসাতের দাবি চলবে না;

(৫) একমাত্র শান্তি স্থাপনের উপযোগী কাজেই চাঁদ ও গ্রহ-উপগ্রহগুলোকে ব্যবহার করা যাবে;

(৬) কেউই মহাকাশ ও কোন গ্রহ-উপগ্রহে ব্যাপকভাবে ধ্বংসক্ষম কোন পারমাণবিক বা অন্য অস্ত্র রাখতে পারবে না;

(৭) চাঁদ ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহে সামরিক ঘাঁটি ও দুর্গ বানানো আর সাজসরঞ্জাম বসানো চলবে না; আরও চলবে না অস্ত্র-পরীক্ষা ও গ্রহ-উপগ্রহে সামরিক মহড়া দেওয়া। তবে গ্রহ-উপগ্রহে সামরিক লোকজন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা বা অন্যান্য শান্তির পরিপোষক সাজসরঞ্জাম ও সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগানো নিষিদ্ধ নয়;

(৮) চাঁদ ও গ্রহ-উপগ্রহাদির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার যাচাই করার জন্য ওইগুলোতে অবস্থিত তাবৎ ঘাঁটি, সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও মহাকাশযান অবাধে পর্যবেক্ষণ

জাকার্তায় আদম মালিকের সঙ্গে চাগলা

করা যাবে; তবে সতর্কতামূলক নিরাপত্তার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার জন্য ন্যায়সংগত নোটিশ দিতে হবে;

(৯) পূর্বে পরিকল্পনা বহির্ভূত কোন স্থানে মহাকাশচারীরা নামলে তাঁদের সাহায্য করার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়ে দেবার আর তাঁদের নিরাপত্তাসম্পর্কিত তথ্যাদি বিনিময় করার শর্তহীন বাধ্যবাধকতা থাকবে;

(১০) মহাকাশে বৈজ্ঞানিক গবেষণা আর ওই উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা স্বাধীনতা থাকবে;

(১১) মহাকাশ ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহে যাবতীয় কার্যকলাপ যথাসাধ্য বেশিমাত্রায় রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী-জেনারেলকে জানাতে হবে;

(১২) অনিষ্টজনক তেজস্ক্রিয়তা এড়ান আর সম্ভাব্য ক্ষতিকর মহাকাশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আলোচনার কার্যপদ্ধতি চুক্তিতে বিহিত হয়েছে;

(১৩) উৎক্ষেপণকারী কোন রাষ্ট্রের মহাকাশযানের দরুণ যে-ক্ষতি হবে, তার জন্য দায়ী হবে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রই;

(১৪) মহাকাশে উৎক্ষেপণকারী রাষ্ট্রের অধিবাসীদের ওপর তারই এক্তিয়ার থাকবে আর মহাকাশযানে রক্ষিত সম্পত্তির মালিকানাও তাতেই বর্তাবে; তা' ছাড়া উৎক্ষেপক রাষ্ট্রের বাইরে কোন বস্তু নামলে তা মালিককে ফিরিয়ে দিতে হবে;

(১৫)মহাকাশ-ঘটিত কাজকর্ম চালাবে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো; আর খসড়া চুক্তির বিধান ওইসবে প্রযোজ্য—চুক্তিপত্রে এ বিষয় মেনে নেওয়া হয়েছে;

(১৬) মহাকাশে উৎক্ষেপ করা রাষ্ট্রের অধিবাসী ও তথাকার আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কর্মতৎপরতার পরিণাম-ফলভাগী হবে ওই রাষ্ট্রই; আর—

(১৭) মানব-জাতির মহাকাশ রহস্যভেদ ও তার ব্যবহারের ক্ষেত্র প্রসারের উদ্দেশ্যে সমতার ভিত্তিতে সন্ধানী ঘাঁটি স্থাপনের অনুরোধ বিবেচনা করতে হবে। তবে বিষয়টি চুক্তি-সাপেক্ষ আর ওই সব ঘাঁটির পর্যবেক্ষণের প্রকৃতি ও শর্তাদির উল্লেখ তাতে থাকবে।

তবে স্বীকার করতেই হবে যে চুক্তিটি ত্রুটিমুক্ত নয়। আর সেজন্যেই ভারত সহ আফ্রো-এশীয় পরমাণু অস্ত্রহীন কয়েকটি রাষ্ট্র এ চুক্তিটির খসড়া আলোচনার সময় কয়েকটি সংশোধনী রেখে বিরোধিতা করেছিলো। কারণ, চুক্তিটি কেবল সেই সব রাষ্ট্রের পক্ষেই প্রযোজ্য যাদের পরমাণু-অস্ত্র রয়েছে, কিন্তু ওই পাঁচটি পরমাণু-অস্ত্রধারী রাষ্ট্র ছাড়া (তাদের মধ্যেও চীন ও ফ্রান্স হয়তো চুক্তিতে স্বাক্ষর করবে না) বাকি শতাধিক সদস্য রাষ্ট্রের এতে লাভ কি? মহাকাশে পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা কি নিষিদ্ধ হয়েছে? দ্বিতীয়ত পরমাণু অস্ত্র তো এখনো নিষিদ্ধ হয় নি, কিম্বা যাঁদের ঘরে এই আয়ুধের পাহাড় জমা রয়েছে তা নষ্ট করে ফেলতেও তো তাঁরা রাজী হচ্ছেন না। নিরস্ত্রীকরণের আলোচনাও তো মাঝপথে গতিরুদ্ধ হয়ে আছে। অর্থাৎ চাঁদ বা অন্য উপগ্রহ হয়তো পরমাণু অস্ত্রের আক্রমণ থেকে আপাতত রক্ষা পেলো, কিন্তু মাটির পৃথিবীর মানুষের ভবিষ্যৎ কি?

ইন্দোনেশিয়া ঃ

সোয়েকার্নো যে শক্ত মানুষ তাতে আর সন্দেহ করার কারণ নেই, কারণ গত এক বছর ধরেই দেখা যাচ্ছে তিনি পাড়ি-পাড়ি করেও পড়ছেন না। তবে সেনাবাহিনী এখন প্রেসিডেন্টের অবস্থা যা করে এনেছেন তাতে তিনি জীবন্মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন কেবল বলা যায়। কারণ, মারডেকা প্রাসাদে তিনি অন্তরীণ, এখান থেকে কোথাও (মানে তাঁর প্রিয় বান্ধবী-দের সঙ্গে অভিসারের উদ্দেশ্যে) বেরুনো নিষিদ্ধ। এতদিন তবুও তিনি সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধিদের কাছে বিরাট বিরাট বিবৃতি দিতে পারতেন, কিন্তু সেনাবাহিনী হুকুম দিয়েছেন, কোনো সাংবাদিক মারডেকা প্রাসাদে ঢুকতে পারবেন না, প্রাসাদের চারদিকে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এ নতুন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে পিপলস কানসালটেটিভ কংগ্রেসের চেয়ার-ম্যান জেনারেল নাসুসন-এর প্রেস কনফারেন্সের পর। জেনারেল নাসুসন সাংবাদিকদের কাছে বলেছিলেন যে, প্রেসিডেন্ট সোয়েকার্নো যে ব্যর্থ অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তা অভ্রান্তরূপে প্রমাণিত হয়েছে। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সুপার্দিয়ো সামরিক আদালতে নাকি স্বীকার করেছেন যে, অভ্যুত্থানের পরের দিন প্রেসিডেন্ট সোয়েকার্নো এবং অন্যান্য মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর পরামর্শ হয়েছিলো। ব্রিগেডিয়ার সুপার্দিয়োকে ওই ব্যর্থ অভ্যুত্থানের নায়ক বলে বর্ণনা করা হচ্ছে।

বস্তুত জেনারেল নাসুসনের উপায় ছিলো না এ বিবৃতি দেওয়া ছাড়া। সেনাবাহিনী দেশের দ্বৈত শাসনের অবসান চায়, প্রেসিডেন্ট সোয়েকার্নোও থাকবেন এবং জেনারেল সুহার্তোও থাকবেন—এ বিষম অবস্থা চলতে দেওয়া যেতে পারে না। সেইজন্যে সোয়েকার্নোকে বার বার অনুরোধ করা হয়েছে দেশের ঐক্য ও সংহতির স্বার্থে প্রেসিডেন্টের গদি ত্যাগ করার জন্যে। ইতিপূর্বে তিনি ব্যর্থ অভ্যুত্থানের সময় তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে কোনো কৈফিয়ৎ দিতে রাজী হন নি, উল্টে বার বার বলে এসেছেন যে দেশের সর্বময় কর্তা তিনিই। এদিকে জনতার চাপ প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে তাঁর পদ-ত্যাগের দাবিতে। প্রেসিডেন্ট সোয়েকার্নো অবশ্য বলেছেন যে আগামী বছরে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনের মাধ্যমে ছাড়া তাঁকে গদি থেকে অপসারণ করা যাবে না। তাঁর স্থির বিশ্বাস যে জনগণ এখনো তাঁকেই চায়। যদিও ছাত্রেরা নির্বাচন পর্যন্ত জেনারেল সুহার্তোকে প্রেসিডেন্টের গদিতে বসানোর জন্যে দাবি জানিয়েছেন কিন্তু জেনারেল নাসুসন বলেছেন যে নিয়মতান্ত্রিক পন্থা ছাড়া হিংসাত্মক বা আরেকটা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে সোয়েকার্নোকে হঠানো সমীচীন হবে না। দেখা যাক, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

এই অশান্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেও একটা শুভ কাজ হয়েছে। অর্থাৎ সামরিক নেতারা যদিও দেশের শাসনভার গ্রহণ করেছেন তবুও তাঁরা যে সমরবাদী নন তার প্রমাণ দিয়েছেন ভারত-ইন্দোনেশিয়া যৌথ ইস্তাহারের মধ্য দিয়ে। ভারতের পররাস্ট্রমন্ত্রী শ্রী এম সি চাগলা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সফরে গিয়ে কয়েক-দিন ইন্দোনেশিয়ায় অবস্থান করেছিলেন। ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ আদম মালিকের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা সফল হয়েছে। ডঃ মালিক জানিয়েছেন যে ইন্দোনেশিয়া কোন রাজনৈতিক বা সামরিক জোটে যোগ দেবে না, সে পঞ্চ-শীলের নীতিতে জোট-নিরপেক্ষই থাকবে। তবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য ডঃ মালিক একটা আঞ্চলিক সংস্থা গঠনের প্রস্তাব করেছেন যে সংস্থার সদস্য থাকবে মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, দক্ষিণ ভিয়েত-নাম, দক্ষিণ কোরিয়া, লাওস, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, ব্রহ্মদেশ এবং সিংহল। প্রস্তাবিত সংস্থায় ভারত ও পাকিস্তানের নাম করা হয় নি তবে ভারতের মতামত চাওয়া হয়েছে। শ্রী চাগলা জানিয়েছেন যে, যদিও ভারতের এখনই এ-সংস্থায় যোগদানের ইচ্ছে নেই তবুও একে সাহায্য করতে সে দ্বিধা করবে না। ডঃ আদম মালিক তাঁর প্রস্তাবিত সংস্থা থেকে উত্তর ভিয়েতনাম এবং উত্তর কোরিয়াকেও বাদ দিয়েছেন, হয়তো কমিউনিস্টদের সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা তিক্ত বলে।

চেকোশ্লোভাকিয়া ঃ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জনসন তাঁর 'স্টেট অফ দি য়ুনিয়ন' ভাষণে পূর্ব-ইয়োরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন বা ঘনিষ্ঠ করার কথা বলেছিলেন। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সংবাদপত্র রুদে প্রাভো মার্কিন সদিচ্ছায় কিঞ্চিৎ সংশয় প্রকাশ করেছেন। কারেল ডুডেরা লিখিত এক প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে যতদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ চালাবে ততদিন তার সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে না।

ভিয়েতনামের প্রশ্নটিই একমাত্র বাধা নয়, এমন কি প্রেসিডেন্ট জনসন যদি চান তবে চেক সরকার বর্তমান শতকের পঞ্চম দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক এজেন্ট পাঠানো এবং লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের রোলিং মিল জবরদখল করার ঘটনাও চেকরা ভুলে যেতে রাজী, কিন্তু ন্যায়-যুদ্ধের অন্য ক্ষেত্র কি নেই?

মিঃ জনসন নিজেই স্বীকার করেছেন যে পূর্ব-পশ্চিম বাণিজ্য-সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বিলটি পাশ করাবার জন্যে তিনি কংগ্রেসে যথেষ্ট চাপ দিয়ে-ছিলেন। এর দ্বারা কি এটা পরিষ্কার হয় না যে সেখানে সহজ সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে যথেষ্ট আপত্তিও রয়েছে?

দ্বিতীয়ত পত্রিকাটি একথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে আমেরিকা ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর প্রতি এখনো বেশি অনুগ্রহ করছে, অথচ চেকোশ্লোভাকিয়া জেনারেল এগ্রিমেন্ট অফ ট্রেড এ্যান্ড ট্যারিফ (গ্যাট) এর সদস্য হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ অনু-গৃহীত দেশ বলে গণ্য হচ্ছে না।

তৃতীয়ত আমেরিকা এখনো সেই সোনা ফেরৎ দেবার কোন আগ্রহ দেখাচ্ছে না যে-সোনা একদিন নাৎসীরা লুঠ করে-ছিল বরং পরোক্ষে সে হিটলারের লুণ্ঠন নীতিকেই সমর্থন করে চলেছে। পত্রিকা অবশ্য একথা বলতে চায় না যে ফোর্ট নক্স থেকে যে সোনা বেরিয়ে গিয়েছে তা যে চেক সোনা দিয়ে পূরণ করতে চায়।

একজন দাগী আসামীকে গ্রেপ্তার করেছে বলে আমেরিকা চেক সরকারের বিরুদ্ধে যেন প্রতিশোধ নিতে চাইছে। মার্কিন সরকার কি এজন্যেই কয়েকজন চেককে ভিসা দেন নি বা গড়ে-ওঠা বিজ্ঞান-বিষয়ক লেন-দেন বিনিময় বন্ধ করেছেন—প্রশ্ন করেছেন ডুডেরা। তবে একথাও বলা হয়েছে যে অনেক বাস্তব-বাদী আমেরিকান সমাজতান্ত্রিক দেশ-গুলোর সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপনে এবং বাড়ানোর বিষয়ে যথার্থই আগ্রহী। কারণ তাঁরা জানেন যে মধ্য আমেরিকার রাষ্ট্রগুলিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার যেভাবে দাবিয়ে রাখতে এবং হুকুম মানাতে পেরেছেন সমাজতান্ত্রিক দেশ-গুলোকে দিয়ে তা মানানো যাবে না। প্রেসিডেন্ট জনসন যদি পূর্ব ইয়োরোপের সঙ্গে সেতু রচনা করতে আগ্রহী হন তবে ভালো যন্ত্রপাতি দিয়েই তা তৈরি করতে হবে নইলে ওপার পর্যন্ত সে-সেতু পৌঁছুবে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঃ

অজানাকে জানার এবং অদেখাকে দেখার আগ্রহ মানুষের চিরকালের। এ আগ্রহ মেটাতে গিয়ে মানুষ বার বার বিপদে পড়েছে, জীবন তার বিপন্ন হয়েছে, কিন্তু

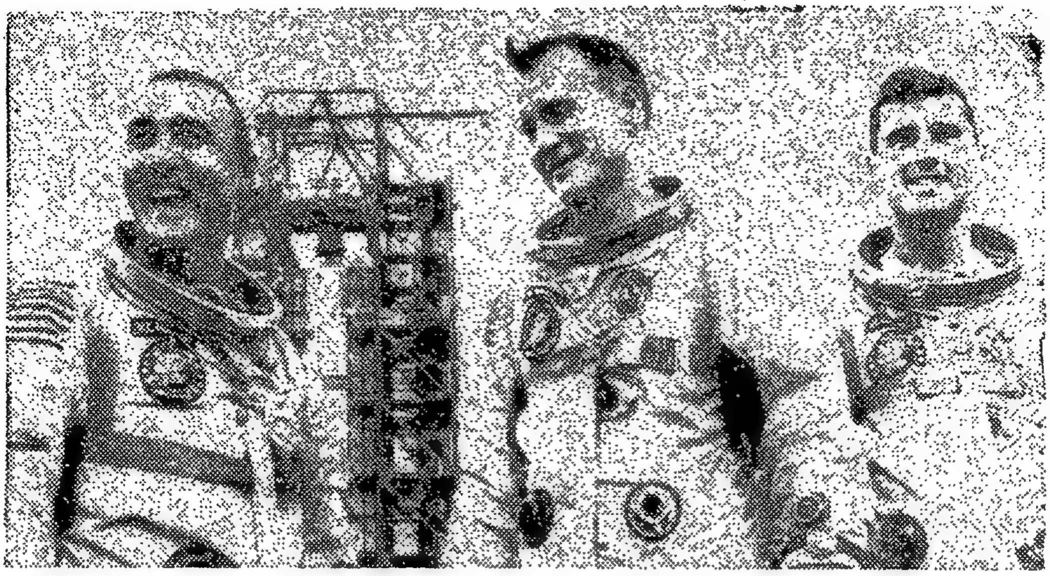

ভার্জিল গ্রিসম — এডওয়ার্ড হোয়াইট — রোজার শেফী

তবু তাকে নিবৃত্তি করা যায় নি, দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে সে এগিয়ে গিয়েছে বার বার ব্যর্থতার পরেও। ২৮শে জানুয়ারী তিনজন মার্কিন মহাকাশচারীর অগ্নিদগ্ধ হয়ে নিহত হবার মতো শোচনীয় ও মর্মান্তিক ঘটনা আর কী হতে পারে? কিন্তু তাই বলে কি চাঁদে অভিযান প্রচেষ্টা বন্ধ থাকবে?

তিনজন মহাকাশচারী ছিলেন ভার্জিল গ্রিসম (৩৯), এডওয়ার্ড হোয়াইট (৩৫) এবং রোজার শেফী (৩১)। এঁরা সেদিন চাঁদে পাড়ি দেবার জন্যে মহড়া দিচ্ছিলেন। সোভিয়েট রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুই দেশই পাল্লা দিয়ে চলেছে, কার আগে কে চাঁদে গিয়ে পৌঁছুতে পারে। আগে বলা হয়েছিলো যে ১৯৬৯ সালের শেষাশেষি আমেরিকা সাফল্য অর্জন করতে পারবে, কিন্তু ইতিমধ্যে এখানকার মহাকাশ সংস্থা নির্ধারিত সময়ের এক বছর আগেই সাফল্যকে করায়ত্ত করতে চেয়েছিলো। তাঁরা নতুন কার্যক্রম নিয়েছিলেন যে আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারী চাঁদের দেশে পাড়ি জমাবেন এবং এর জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন দুই প্রবীণ মহাকাশচারী গ্রিসম ও হোয়াইটের সঙ্গে নবীন শেফী। ওই দিন মহড়া হচ্ছিল মহাকাশে নভশ্চরদের যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে তারই তালিম নেওয়া। শক্তিশালী রকেট স্যাটার্ন নিয়ে পৌঁছে দেবে এ্যাপোলো মহাকাশযানকে। এ্যাপোলোর রুদ্ধ কেবিনে বসে তিন মহাকাশচারী প্রস্তুতিকার্যে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ আগুন লেগে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে সব ছাই হয়ে গিয়েছে, তিন মহাকাশচারীর দেহের আর কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় নি! ঘটনাটি এতই আকস্মিকভাবে বা আচম্বিতে এবং নিমেষের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে যে মহাকাশচারীরা কেবিনের দরজা খুলে বেরিয়ে আসার সময়ই পান নি, কিম্বা অপেক্ষমাণ বিজ্ঞানী বা ত্রাণকর্মীরাও সাহায্যের বিন্দুমাত্র সুযোগ পান নি।

আগুন লাগার প্রকৃত কারণ কি তা এখনো সঠিক জানা যায় নি, অর্থাৎ যান্ত্রিক গোলযোগ কিম্বা মানবিক ভুল-ত্রুটির জন্যে এই শোচনীয় অগ্নিকাণ্ডটি হতে পেরেছে তা এখনো নির্ণীত হয় নি। এ্যাপোলো মহাকাশযানটিতে ত্রুটি থাকতে পারে, কিম্বা স্যাটার্ন রকেট বা বুস্টারটি যার দ্বারা রকেটের গতিবেগ বাড়ানো চলে তার মধ্যে কোনো দোষ থাকতে পারে, কিম্বা মহাকাশচারীরা কোনো ভুল করেও বসতে পারেন অজান্তে। এ-বিষয়ে মহাকাশ সংস্থা তদন্ত কমিশন নিয়োগ করছেন এবং মার্কিন সেনেটও একটা তদন্ত কার্য চালাবেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

যদিও আমেরিকা এ-পর্যন্ত ১৬ বার মহাকাশে মানুষ পাঠিয়েছে এবং গ্রিসমই প্রথম মার্কিন মহাকাশচারী যিনি দু-দুবার মহাকাশ সফর করে এসেছেন এবং হোয়াইট শুধু মহাকাশযাত্রাই করেন নি মহাশূন্যে বিচরণও করেছেন মহাকাশযান থেকে মহাশূন্যে লাফিয়ে পড়ে—তবুও এতদিন কোন বড় বিপদ ঘটে নি বা কেউ হতাহত হন নি। সোভিয়েট প্রচেষ্টায়ও কোন দুর্ঘটনা ঘটে নি একমাত্র লাইকার (কুকুর) মৃত্যু ছাড়া। গত বছর জেমিনী মহাকাশযানটি আশংকার কারণ ঘটালেও শেষ পর্যন্ত নিরাপদে তা দুই মহাকাশচারী আরোহীকে নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসতে পেরেছিলো।

তবে একথা সত্যি যে, এ-ধরণের প্রচেষ্টা সব সময়ই বিপদসংকুল, এতদিন যে বিপদ ঘটে নি তার কারণ প্রয়োগ-বিজ্ঞানের অগ্রগতি। মানুষ মুক্ত বিহঙ্গের মতো আকাশে ওড়ার চেষ্টা করছে বহুদিন থেকে, এ-কাজে সে সফল হয়েছে, কিন্তু বহু ব্যর্থতা ও ত্যাগ স্বীকারের পর। কত দুঃসাহসীকে যে এর জন্যে জীবন দিতে হয়েছে! গ্রিসম, হোয়াইট এবং শেফীর আত্মদানও মহাকাশ-বিজ্ঞানের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে এবং চাঁদের দেশে মানুষের অভিযান যেদিন সফল হবে সেদিনই এই তিনজনের আত্মত্যাগ সার্থক হবে। সর্ব দেশের সর্ব কালের দুঃসাহসী তরুণদের কাছে এই তিন মহাকাশচারী চিরদিনই অফুরন্ত উৎসাহ ও প্রেরণা সঞ্চার করবে।

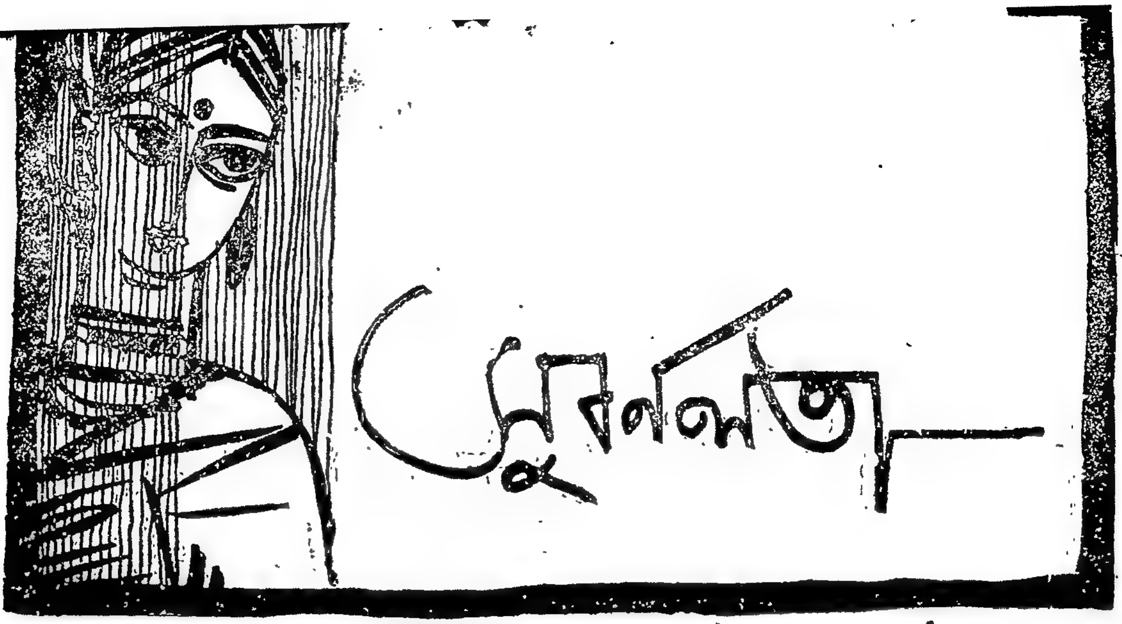

আশাপূর্ণা দেবী

ধারাবাহিক উপন্যাস

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

পারুর মুখে আমি মাঝে মাঝেই আর এক জগতের আলো দেখেছি, পারু লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা লেখে এ আমি বুঝতে পারতাম। কিন্তু পারুর জন্যে আমার দুঃখ হয়। পারুর জন্যে আমার ভাবনা হয়। বড় বেশি অভিমানী ও। ওর ওই অভিমানের মূল্য কি এই সংসার দেবে? বুঝবে ওর স্বার্থবুদ্ধিহীন কবিমনের মূল্য?

হয়তো আমার মতই যন্ত্রণা পাবে ও। অভিমানের জ্বালাতেই আমি—

তবু আমি চিরদিনই প্রতিবাদ করেছি, চেঁচামেচি করেছি, অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি।

ও তা' করবে না।

ও ওর মায়ের মত অসভ্য হবে না, রূঢ় হবে না সকলের অপ্রিয় হবে না। কারণ ও-শান্ত, ও মৃদু, ও সভ্য। ও শুধু অভিমানীই নয়, আত্মাভিমানী! ও ওর প্রাপ্য পাওনা না পেলে নীরবে সে দাবি ত্যাগ করবে, ও অন্যায় দেখলে নিঃশব্দে নিজেকে নির্লিপ্ত করে নেবে। ও অপরকে 'ভালো' করে তোলবার বৃথা চেষ্টা করবে না।

জানি না—পারুকে যার হাতে তুলে দিয়েছি, সে পারুকে বুঝতে চেষ্টা করেছে কি না। ওকে বোঝা শক্ত। নিজের সম্পর্কে ওর ধারণা খুব উঁচু। ও আমার এই—শেষ দিকের অবহেলার মেয়ে, চাঁপা চন্ননের মত অত রূপও নেই, বিদুষী হবার সুযোগও পায় নি, তবু নিজেকে ও 'তুচ্ছ'-ভাবতে পারে না। ওর এই মনের 'দায়' কে পোহাবে? হয়তো সেই দায় ওকে নিজেকেই পোহাতে হবে। আর সেই ভার পোহাতে পোহাতেই ওর সব-সুখ শান্তি যাবে। নিজেকে বইবার কষ্ট যে কী, সে তো আমি জানি। 'পারুকে আমরা রীতিমত সুপাত্রের হাতে দিতে পেরেছি' এই আমার স্বামীর গর্ব। আরও দু' জামাইয়ের থেকে অনেক বিদ্বান আর রোজগারী পারুর বর।

বিদ্বান আর রোজগারী, কুলিন আর বনেদী ঘর, এই তো 'সুপাত্রে'র হিসেব, এই দেখেই তো বিয়ে দেওয়া। কে কবে দেখতে যায় তার রুচি কি, চিন্তা কি, জীবনের লক্ষ্য কি!

দেখতে যায় না বলেই এত অমিল।

তলায় তলায় এত কান্না।

শুধু যে মেয়েমানুষই কাঁদে তাও তো নয়। পুরুষেও কাঁদে বৈ কি। তার অন্তরাত্মা কাঁদে।

সবাই তো সমান নয়, কেউ হয়তো ছোট সুখ, ছোট স্বস্তি, ছোট গণ্ডি, এইতেই পরম সন্তুষ্ট, কারো বা অনেক উচ্চাশা—নিয়ে ছুটোছুটি।

দোষ কাউকেই দেওয়া যায় না।

কোনোটাই নিন্দের নয়।

শুধু ভাগ্যদেবী যখন দুটো দু' প্রকৃতির মানুষকে এক ঘানিতে জুড়ে দিয়ে মজা দেখেন, তখনই অশেষ কষ্ট।

আমার স্বামীকে স্বামী পেয়ে সুখী হবার মত মেয়েই কি জগতে ছিল না?

অথচ তারা হয়তো—উদার হৃদয়বান, পণ্ডিত স্বামীর হাতে পড়ে, সে স্বামীকে অতিষ্ঠ করে মারছে।

বিরাজের কথাই ধরি না।

বিরাজ তো তার ভাইদের মতই স্বার্থপর সঙ্কীর্ণচিত্ত পরশ্রীকাতর আর সন্দেহবাতিকগ্রস্ত, অথচ তার স্বামী কত ভাল, কত উদার কত ভদ্র।

বিরাজ মৃতবৎসা।

ডাক্তারে বলেছে এটা বিরাজেরই দেহের ত্রুটি, তবু বিরাজ তার স্বামীকেই দোষ দেয়, স্বামীর চরিত্রে সন্দেহ করে। বিরাজকে নিয়ে ঠাকুরজামাই চিরদিন দগ্ধাচ্ছে।

প্রকৃতির পার্থক্য। এর বাড়া দুঃখ নেই।

তাই মনে হয়, হয়তো পারুর কপালেও দুঃখই আছে।

কিন্তু বকুল?

বকুল একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির।

বকুল নিজের তুচ্ছতার লজ্জাতেই সদা কুণ্ঠিত। ছেলেবেলা থেকেই দেখেছি ও যেন নিজের জন্মানোর অপরাধেই মরমে মরে আছে। ও যে ওর মায়ের বুড়ো বয়সের মেয়ে, ও যে অনাকাঙ্ক্ষিত, ও যে অবহেলার, ও যে অবান্তর, এই দুঃখময় সত্যটি বুঝে ফেলে, সংসারের কাছে ওর না আছে দাবি, না আছে আশা। তাই এতটুকু পেলেই ও যেন বর্তে যায়। পারুর ঠিক উল্টো।

পারুও মুখ ফুটে কোনদিনই কিছু চায় না, কিন্তু পারুর মুখের ভাবে ফুটে

ওঠে, ওর প্রাপ্য ছিল অনেক, শুধু খেলোমি করার রুচি নেই বলেই ও তা' নিয়ে কথা বলে না।

—আশ্চর্য! একই রক্তমাংসে তৈরি হয়ে একই ঘরে মানুষ হয়ে, এমন সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতি কি করে হয়?

কোথা থেকে আসে নিজস্ব চিন্তা ভাব, ইচ্ছে পছন্দ?

অথচ দুইবোনে মনান্তরও নেই কখনো। বেচারী বকুলের যা কিছু কথা, সবই তো তার সেজদির সঙ্গে। আবার পারুলেরও যা কিছু স্নেহ মমতা, তা বকুলেরই ওপর।

মাবাপের কাছে কোনোদিন আশ্রয় পায় নি ওরা, বড় ভাইবোনের কাছে পায় নি প্রশ্রয়, তাই ওরা যেন নিজেদের একটা 'কোটর' তৈরি করে নিয়ে তার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল।

সে কোটর থেকে চলে যেতে হয়েছে পারুকে, বকুল একাই নিজেকে গুটিয়ে রেখেছে তার মধ্যে।

তবে পারুর মত নিজের মধ্যেই নিজে নিমগ্ন নয় বকুল, সকলের সুখবিধানের জন্যে যেন সদা তৎপর।

সংসার জায়গাটা যে নিষ্ঠুর তা জেনে বুঝেও ও যেন সংসারের ওপর মমতাময়ী! ওর মধ্যে ওর বিধাতা একটি মাতৃহৃদয় ভরে দিয়েছেন; ছোটবেলা থেকে তার প্রকাশ বোঝা গেছে। ভীতু ভীতু নীরব প্রকাশ।

ওকে কাছে ডেকে গায়ে হাত বুলোতে ইচ্ছে হয় আমার। কিন্তু চিরদিনের অনভ্যাসের লজ্জায় পারি না। যদি ও অবাক হয়, যদি আড়ষ্ট হয়।

আর সুবল?

সুবলকে ঘিরে পাথরের পাঁচিল!

সুবলের মধ্যে 'বস্তু' আছে, সুবলের মধ্যে 'হৃদয়' আছে, কিন্তু সুবল যেন সেই 'থাকাটুকু' ধরা পড়ে যাবার ভয়ে একটা পাথরের দুর্গ গড়ে, তার মধ্যে আত্মগোপন করে থাকতে চায়।

হয়তো—

এদের বাড়িতে 'হৃদয়' জিনিসটার চাষ নেই বলেই সেটাকে নিয়ে এত সংকোচ আমার ছোট ছেলের।

কিন্তু সুবল কি পৃথিবীর এই ঝড় ঝাপটা সয়ে বেশিদিন টিকবে? দুর্বল স্বাস্থ্য ক্ষীণজীবী এই ছেলেটার দিকে তাকাই আর ভয়ে বুক কাঁপে আমার। কিন্তু প্রতিকারের চেষ্টা করবো সে উপায় আমার হাতে নেই।

যদি বলি 'সুবল তোর মুখটা লাল লাল দেখাচ্ছে কেন, জ্বর হয় নি তো? দেখি—'

সুবল মুখটা আরো লাল করে বলবে আঃ, দেখবার কি আছে? শুধু শুধু জ্বর হতে যাবে কেন!'

যদি বলি, 'বড্ড কাসছিস সুবল, গায়ে একটা মোটা জামা দে!'

সুবল গায়ে পরা পাতলা কামিজটাও খুলে ফেলে শুধু গেঞ্জি পরে বসে থাকবে।

রোগা বলে সুবলের জন্যে একটু বেশি দুধের বরাদ্দ করেছিলাম, তদবধি দুধ একেবারে ত্যাগ করেছে সে। সেবার ভানুকে দিয়ে এক বোতল টনিক আনিয়েছিলাম, বোতলটার মুখ পর্যন্ত না খুলে যেমনকে তেমন লেপের চালিতে তুলে রেখে দিল সুবল, বললো, 'থাক দামী জিনিস উঁচু জায়গায় তোলা থাক।'

অদ্ভুত এই অকারণ অভিমানের সঙ্গে লড়াই করতে পারি, এমন অস্ত্র আমার হাতে নেই।

আমার বড়জা হলে পারতো হয়তো।

হাউ হাউ করে কাঁদতো, মাথার দিব্যি দিতো, নিজে 'না খেয়ে মরবো—' বলে ভয় দেখাতো! সেই সহজ কৌশলের কাছে প্রতিপক্ষ হার মানতো।

কিন্তু আমি তো আমার বড় জায়ের মত হতে পারলাম না কোনোদিন।

সহজ, আর সস্তা।

তা' যদি পারতাম; তাহলে জয়াদির ভালবাসার উপহার সেই বইটাকে চিরকালের জন্যে হারাতাম না! চেয়ে চিন্তে কেঁদে কেটে, যেভাবেই হোক আদায় করে নিতাম। কিন্তু আমি তা' পারি নি। সেই যে ও কেড়ে নিল, কোথায় লুকিয়ে রাখলো, আমি আর তার কথা উচ্চারণও করলাম না। বুক ফেটে যেতে লাগলো, তবু শক্ত হয়ে থাকলাম। পাছে ও বুঝতে পারে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে আমার বইটার জন্যে, তাই সহজভাবে কথা কইতে লাগলাম। কাজেই ও বাঁচলো।

বইটাই চিরতরে গেল।

চিরটাদিন এই জেদেই অনেক কিছু হারিয়েছি আমি। অনেক অসহ্য কষ্ট সহ্য করেছি। ও আমাকে কষ্ট দিয়েছে। আমি অগ্রাহ্য করেছি। অন্তত অগ্রাহ্য ভাব দেখিয়েছি।

ভেবেছি গ্রাহ্য করলেই তো ওর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো। আমাকে যন্ত্রণা দেওয়ার উদ্দেশ্য। ও কি আমার মনোভাব বুঝতে পারে নি?

পেরেছে, তাই আরো হিংস্র হয়ে উঠেছে।

আশ্চর্য, আশ্চর্য!

দুই পরম শত্রু বছরের পর বছর একই ঘরে কাটিয়েছি, এক শয্যায় শুয়েছি, এক ডিবেয় পান খেয়েছি, কথা কয়েছি গল্প করেছি, হেসেওছি।

ওর বেশি অসুখ করলে আমি না খেয়ে না ঘুমিয়ে সেবা করেছি, আমার একটুকানো অসুখ করলে, ও ছটফটিয়ে বেড়িয়েছে, আর তারই ফাঁকে ফাঁকে ও আমাকে, আর আমি ওকে ছোবল দেবার চেষ্টা করে ফিরেছি।

অদ্ভুত এই সম্পর্ক, অদ্ভুত এই জীবন।

দর্জিপাড়ার সেই বাড়িতে আরো তিন তিন জোড়া স্বামী-স্ত্রী ছিল, জানি না তাদের ভিতরের রহস্য কি!

বাইরে থেকে দেখে তো মনে হতো, ওদের স্ত্রীরা স্বামীদের একান্ত বশীভূত ক্রীতদাসীর মত। স্বামীদের ভয়ে তটস্থ, তাদের কথার প্রতিবাদ করবার কথা ভাবতেও পারে না।

আমার ভাসুর অবশ্য এদের মত নয়, সরল মানুষ, মায়া মমতাওলা মানুষ, কিন্তু দিদির প্রকৃতিই যে ভয় করে মরা। ও জানে শশুরবাড়ির বেড়াল কুকুরটাকে পর্যন্ত ভয় করে চলতে হয়, স্বামীকেও করবে, তা'তে আর আশ্চর্য কি!

কিন্তু এদের?

এদের মধ্যে সম্পর্ক যেন প্রভুভৃত্যের।

তবু মাঝে মাঝে মনে হয় বাইরে থেকে যা দেখতে পাওয়া যায় সেটাই কি সত্যি? আমার স্বামীকেও তো বাইরে থেকে দেখে লোকে বলে, স্ত্রীর 'দাসানুদাস', বলে 'কেনা গোলাম', বলে 'বংশবদ!'

... ...

গিরিবালা সাবিত্রীব্রত উদযাপন করলো; গিরিবালা স্বামীর সঙ্গে একত্রে গুরুদীক্ষা নিয়ে তীর্থযাত্রায় বেরোলো। গিরিবালা সেই যাত্রাকালে মেজভাসুরের

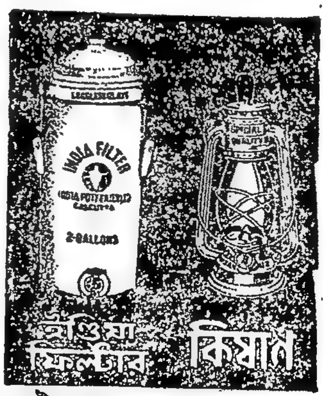

গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৩, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা-১
ফোন: ২২-৬৫৮০

ঘাড় বেড়াতে এলে [illegible] করে সেজ, কাশীতে ক'দিন থাকবে ক'দিন বা বৃন্দাবনে মথুরায়।

গিরিবালার মুখে সৌভাগ্যের গর্ব ঝলসাচ্ছিল।

আমি মূঢ়ের মত তাকিয়ে ছিলাম সেই মুখের দিকে। ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না এ কী করে সম্ভব। আমার সেজ দ্যাওরকে তো আমি জানি।

চরিত্র দোষের জন্যে খারাপ অসুখ হয়েছিল ওর। একথা লুকোছাপা করেও লুকোনো থাকে নি। তাছাড়াও—মানুষের শরীরে যত অসৎ বৃত্তি থাকা সম্ভব যত নীচতা, যত ক্রূরতা, তার কোন্‌টা নেই ওর মধ্যে?

তবু গিরিবালা আহ্লাদে ডগমগ করছে, লোককে দেখিয়ে দেখিয়ে সৌভাগ্যকে ভোগ করছে।

একে কি 'সত্যি' বলবো?

না এ শুধু মনকে চোখ ঠারা?

কে জানে মন ঠকানো, না লোক ঠকানো।

... ...

বিন্দু আবার আর এক ধরণের।

ওর রাতদিন কেবল হা হুতাশ আর আক্ষেপ। ও প্রতিপন্ন করতে চায় জগতের সেরা দুঃখী ও।...যেমন করতে চায় আমার বড়মেয়ে আর মেজমেয়ে, চাঁপা আর চন্দন।

কিন্তু সত্যিই কি ওরা আমার মেয়ে?

ওই চাঁপা আর চন্নন।

আমার বিশ্বাস হয় না। মনে হয় নিতান্তই দৈব দুর্ঘটনায় ওরা পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হবার আগে কিছুদিনের জন্যে আমার গর্ভে আশ্রয় নিয়েছিল। ওদের থেকে বুঝি আমার ননদরা আমার অনেক বেশি নিকট।

কিন্তু তার জন্যে আর আক্ষেপ নেই আমার, আক্ষেপ শুধু এই পোড়া বাংলা দেশের হাজার হাজার—লক্ষ লক্ষ মেয়ের জন্যে। আজও যারা চোখে ঠুলি এঁটে অন্ধ নিয়মের দাসত্ব করে চলেছে।

আজও যারা জানে তারা শুধু 'মানুষ' নয় 'মেয়েমানুষ'।

... ...

সুবর্ণলতার স্মৃতিকথায় স্থানকালের ধারাবাহিকতা নেই কেন? অতীতে আর বর্তমানে এমন ঘেঁসাঘেঁসি কেন?

অনেক 'সুবর্ণলতা' একসঙ্গে মুখর হয়ে উঠতে চেয়েছে বলে? যে যখন পারছে কথা কয়ে উঠছে?...কিন্তু সূত্র কই?

গোড়ার দিকের পাতাগুলো তবু ভরাট ভরাট, তারপর সবই যেন খাপ্‌ছাড়া ভাঙা-চোরা।

... ...

হঠাৎ লিখে রেখেছে 'মানুষের ওপর শ্রদ্ধা হারাবো কেন? জগুবটঠাকুরকে তো দেখেছি, দেখেছি বড় ননদাইকে, দেখলাম অম্বিকা ঠাকুরপোকে।' আবার তার পরের পাতায় এ কোন জনের কথা?

'বাবাকে...অপমান করে চলে এলাম!...বাবার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। কিন্তু কি করবো? ও ছাড়া আর কিছু করার ক্ষমতা ছিল না আমার।...

'নিকট জনদের দুঃখের কারণ হবো', এই হয়তো আমার বিধিলিপি।

আমার নিষ্ঠুরতাই দেখতে পাবে সবাই আমার ফেটে যাওয়া বুকটা, কেউ দেখবে না। শুধু জানবে সুবর্ণ কঠোর, সুবর্ণ কঠিন।

জানুক! তাই জানুক।...

ভেবেছিলাম এই অপমানিত জীবনটার শেষ করে দিয়ে এ জন্মের দেনা শোধ করে চলে যাব।

হল না।

ভগবানও আমাকে অপমান করে মজা দেখলেন; যম আমাকে ঠাট্টা করে গেল। দেখি তবে এর শেষ কোথায়। নিজের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তাকিয়ে দেখছি চারদিকে, দেখতে পাচ্ছি শুধু আমি একা নয়, সমস্ত মেয়েমানুষ জাতটাই একটা অপমানের পঙ্ককুণ্ডে পড়ে ছটফটাচ্ছে। কেউ টের পাচ্ছে, কেউ টের পাচ্ছে না।

কারণ?

কারণ তারা রোজগার করে না, অপরের ভাত খায়। হ্যাঁ এই একমাত্র কারণ।

আর স্বার্থপর পুরুষ জাত সেই অবস্থাটাকেই কায়েমী রাখতে, মেয়েমানুষকে শিক্ষার সুযোগ দেয় না, চোখ-কান ফুটতে দেয় না। দেবে কেন? বিনি-মাইনেয় এমন একটা দিনরাতের চাকরাণী পাওয়া যাচ্ছে এমন সুযোগ ছাড়ে কখনো?

[illegible] রেখে বলবো [illegible] হাঁটতে পারে না,' চোখ বেঁধে রেখে বলবো, 'রাম রাম দেখতে পায় না।' আর সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে বলবো, 'ঠুঁটো, ঠুঁটো!'

চিরদিন এইরকমই তো করে আসছে পুরুষসমাজ আর সমাজপতিরা।

'মেয়েমানুষ পরচর্চা করে, মেয়েমানুষ কোঁদল করে, আর মেয়েমানুষ ভাত সেদ্ধ করে', এই হলো তোমাদের ভাষায় মেয়েমানুষের বিবরণ, ভেবে দেখ না, আর কোন্‌ মহৎ কাজ করতে দিয়েছ তোমরা মেয়েমানুষকে?

দেবে না, দিতে পারবে না।

দুবেলা দুমুঠো ভাতের বদলে আস্ত একটা মানুষকে নিয়ে যা খুশি করতে পারার অধিকার, এ কি সোজা সুখ? ওই দু' মুঠোর বিনিময়ে; সেই মানুষটার দেহ থেকে, মন থেকে আত্মা থেকে খাজনা আদায় করা যাচ্ছে, তার ওপর উপরি পাওনা নিজের নীচতা আর ক্ষুদ্রতা বিস্তার করবার একটা অবারিত ক্ষেত্র।

মেয়েমানুষ যে পুরুষের 'পায়ের বেড়ি' 'গলগ্রহ' 'পিঠের বোঝা' উঠতে বসতে এসব কথা শোনাবার সুখ কোথায় পাবে পুরুষ, মেয়েমানুষ যদি লেখাপড়া শিখে ফেলে নিজের অন্নসংস্থান করতে সক্ষম হয়?

তাই পাঁকের ভরা পূর্ণ আছে।

মুখ্যু মুখ্যু, বুঝছে না ওই পাঁকে নিজেরাও ডুবছে।

তবু—

বুঝতে একদিন হবেই।

... ...

তীব্র দৃষ্টি তীক্ষ্ণকণ্ঠ এক জ্বলন্ত দৃষ্টি মেয়ে যেন আঙুল তুলে বলছে, 'এই মেয়েমানুষদের অভিসম্পাত একদিন লাগবে তোমাদের। সেদিন বুঝতে পারবে চিরদিন কারুর চোখ বেঁধে রাখা যায় না। 'পতি পরম গুরুর মন্তর চিরদিন চলবে না।'

আরো কত কি যেন বলছে সেই মেয়ে, আগুন ঝরা চোখে রূঢ় কঠিন গলায়, 'প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। অত্যাচার, অবিচার, এর মাপ হয় না।'

... ...

কিন্তু দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর হচ্ছে, সেই অগ্নিমূর্তি মেয়ের এ আবার কোন রূপ?

উদাস বিহ্বল স্বপ্নাচ্ছন্ন!

কী বলছে ও?

অদ্ভুত অসম্ভব।

ও না তিন তিনটে ছেলেমেয়ের মা!

ও কি ভুলে গেছে তাদের কথা? তাই ওই মেঘলা দুপুরে হাতের বইখানা মুড়ে

মাত্র ৮৲ টাকায়

আধুনিক ডিজাইন ও রঙের অতি সুন্দর সাড়ী মূল্য ৮৲ টাকা, ২টি সাড়ী ১৫৲ টাকা, ৩টি সাড়ী ২১৲ টাকা। ডিল্যুক্স ১০৲ টাকা, ২টি সাড়ী ১৯৲ টাকা, ৩টি সাড়ী ৩১৲ টাকা, ৩টি সাড়ী ৪৫৲ টাকা। যে কোন ২টি বা তদধিক সাড়ীর সহিত বিনামূল্যে ব্লাউজ পীস এবং কানের টাপ।

Ambika Saree Bhandar (BOW)
6815—Mandelia Road, Delhi-7

রেখে স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে ভাবছে, 'প্রেম, প্রেম। কি জানি কেমন সেই জিনিস, কেমন তার স্বাদ! সে কি শুধুই নাটক নভেলের জিনিস? মানুষের জীবনে তার ঠাঁই নেই! প্রেম ভালবাসা, সবই মিথ্যে, অসার?

আমার ইচ্ছে হয় কেউ আমায় ভালবাসুক, আমি কাউকে ভালবাসি।

জানি এসব কথা খুব নিন্দের কথা, তবু চুপি চুপি না বলে পারছি না,—

প্রেমে পড়তে ইচ্ছে হয় আমার।

যে প্রেমের মধ্যে কবিরা জগতের সমস্ত সৌন্দর্য দেখতে পান, যে প্রেমকে নিয়ে জগতের এত কাব্য গান নাটক।...

একটা শিশুকে ধরে জোর করে বিয়ে দিয়ে দিলে, আর একটা বালিকাকে ধরে জোর করে 'মা' করে দিলেই তার মনের সব দরজা বন্ধ হয়ে যেতে বাধ্য? (ক্রমশঃ)

নূতন!

মাথাধরা? সর্দি? ফ্লু?

অবেদন®

আশ্চর্য্যজনক 'অ্যাপেপ'যুক্ত দ্রুত, নিরাপদ, নিশ্চিত আরাম এনে দেয়

মাথাধরায়

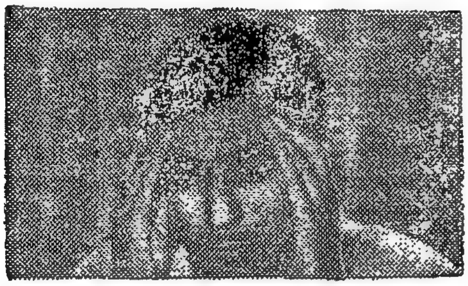

সর্দিতে

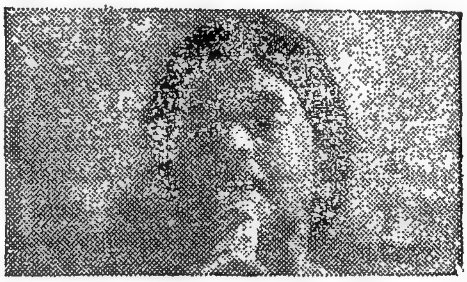

ফ্লুতে

অবেদন নতুন—তাই পরীক্ষা ক'রে দেখুন। মাথাধরায়, দাঁতব্যথায়, পিঠের ব্যথায়, ও পেশীর বেদনায়, সর্দিতে ও ফ্লুতে এবং বিশেষ যন্ত্রণাদায়ক দিনগুলিতে দ্রুত কার্যাকরী, দীর্ঘস্থায়ী আরাম এনে দেবার জন্য স্কুইবের এই আবিষ্কার, **অবেদন**।

অবেদন অতুলনীয়! এতে আছে আশ্চর্য্যজনক **'অ্যাপেপ'** ও সেইসঙ্গে নিরাপদ, দ্রুত ফলদায়ক ব্যথা-দূরকারী অন্যান্য উপাদান।

অবেদন ব্যথা দূর করবার জন্য বিশেষ ফলপ্রদ এবং অত্যন্ত সহজে গ্রহণযোগ্য। এতে ক্ষতিকারক কিছু নেই এবং অভ্যাসে পরিণত করে না।

SQUIBB® **অবেদন®**

'অ্যাপেপ'-যুক্ত
কয়েক মিনিটের মধ্যেই কাজ করে—
বহুক্ষণের জন্য আরাম দেয়!
সারাভাই কেমিক্যালস্

মাত্রা: ১-২ ট্যাবলেট

® ই. আর. স্কুইব এণ্ড সন্স ইনকর্পোরেটেডের রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক ব্যবহারকারী লাইসেন্সপ্রাপ্ত [illegible] প্রাইভেট লিমিটেড।

Shilpi SC-112ABen

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

টেলিফোন ভবন বিধ্বস্ত

স্বদেশ রায় আমাদের কাছে এক আপদ বিশেষ হ'য়ে উঠলো; না পারি তাকে সংগে নিতে, না পারি তাকে বেঁধে রাখতে, না পারি তার সংগে সহজ ব্যবহার করতে। অশোভন ব্যবহার করে তাকে পল্টন মাঠের কাছে ফেলে রেখে চলে গেলাম।

তখন খুব বেশি হলেও দশটা বাজতে মিনিট দশেক বাকি। মফস্বল শহর। লোক চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। শহরের বাইরের রাস্তাগুলি আরও নিঝুম। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সারা শহরটি ঘুমিয়ে পড়বে। সব রাস্তায় ইলেকট্রিক লাইট নেই। যেসব রাস্তায় ইলেকট্রিক আছে সেখানেও আলো খুব উজ্জ্বল নয়। প্রায় সব রাস্তার পাশে বড় বড় গাছ—জায়গায় জায়গায় খোলা মাঠ। তা'ছাড়া কর্ণফুলী নদীর তীরে চট্টগ্রাম শহরটি যদিও প্রায় সমতলভূমির ওপর অবস্থিত তবু এই শহরের বৈশিষ্ট্য—তার সারাটা বুক জুড়ে আছে ছোট ছোট সুন্দর পরিষ্কার সাজানো পাহাড় বা টিলা। এই-সব পাহাড়ের ওপরে আছে সদর আদালত, সরকারী হাসপাতাল, টেলিগ্রাফ-ভবন; আর কোনটার ওপর জেলা-শাসকের বাংলো বা ডাক্তার সাহেবের কুঠি, না হয় বিভাগীয় কমিশনারের "প্রাসাদ"। কোন একটি পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে চার পাশের রাস্তাগুলিকে দেখলে মনে হবে যেন বড় অজগর চক্রাকারে এই পাহাড়গুলিকে জড়িয়ে আছে। শহরের মাঝখানে কোন কোন জায়গায় দু'টি পাহাড়ের বুক চিরে রাস্তা বেরিয়ে গেছে। রাত্রে গাছের ছায়া, পাহাড়ের আড়াল, মাঠ, মাঠের চারি পাশের গাছ-গাছড়া—সব মিলিয়ে চট্টগ্রাম শহরের topography গেরিলা যুদ্ধ বা আমাদের যুব-বিদ্রোহের পক্ষে বাংলাদেশের বেশি শহরের চাইতে যে অপেক্ষাকৃত বেশি উপযুক্ত ছিল তা'তে কোন সন্দেহ নেই।

দার্জিলিং শহরের পাহাড়ের প্রাকৃতিক অবস্থানের সংগে চট্টগ্রামের সমতলভূমির ওপর ছড়ানো পাহাড়গুলির অবস্থানের অনেক পার্থক্য। চট্টগ্রামের পাহাড় দার্জিলিং-এর পাহাড়ের মত খাড়াই নয়। তা'ছাড়া চট্টগ্রাম একটি সামুদ্রিক বন্দর। শহরের দক্ষিণপ্রান্তে কর্ণফুলী নদী প্রবাহিত, পূর্বদিক হতে শহরের দক্ষিণ কূল বিধৌত করে পশ্চিমদিকে কলকল রবে ছুটে চলেছে। উত্তরে সারি সারি পর্বতমালা উত্তর কোণ থেকে পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়েছে। যুদ্ধে পর্বতশ্রেণী ও নদীর বিশেষ অবস্থান যে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক অবস্থার সৃষ্টি করে তা' আত্মরক্ষা বা আক্রমণের জন্য ব্যূহ রচনার অনুকূলে। শত্রুর বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশের জন্য চট্টগ্রামের এই প্রাকৃতিক অবস্থার সুযোগ আমরা খুব ভালভাবেই নিয়েছি।

আমাদের সংগঠন যখন গড়ে উঠল তখন জানি না অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে কা'রা আশীর্বাদ করেছিলেন চট্টগ্রামের মুক্তিফৌজের সৈনিকদের! চট্টগ্রামের এই প্রাকৃতিক অবস্থার সুযোগ আমরা বাস্তবে গ্রহণ করতে পারলাম সেইদিন, যখন কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ উপকূল সংলগ্ন প্রখ্যাত উকিল শ্রীরঞ্জনলাল সেনের শহরের বাসভবন আমাদের বৈপ্লবিক প্রস্তুতিকার্যে ও পরে গোপন আস্তানা হিসেবে অবাধে ব্যবহার করতে পেরেছি। এই ঐতিহাসিক বাড়িটির প্রতিটি ঘর, প্রতিটি কোণ, প্রতিটি বালুকণা শহীদ রজত সেনের আত্মবলিদানে পূত, ধন্য ও পবিত্র! রজতের সাহস বিক্রম ও প্রাণদানের অপূর্ব দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ সমস্ত পরিবারটির সক্রিয় সমর্থন আমরা পেয়েছি। চট্টগ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে এই বাড়িটি যেন আমাদের একটি স্টেটেজিক কেন্দ্র তেমনি আবার শহরের একেবারে উত্তরপ্রান্তে পর্বতশ্রেণীর সংগে সংযুক্ত আর একটি বাড়ি যুব-বিদ্রোহের অমূল্য ইতিহাসের সংগে অংগাংগিভাবে জড়িত। শহীদ দেবপ্রসাদ গুপ্ত—আনন্দ গুপ্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ছোট্ট টিলায় ওপর অবস্থিত তাদের এই বাসভবনটির অধিবাসীদের যে বিপ্লবীমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে গেছে তার পরিচয় পেয়ে দেশবাসী যে চিরকাল গৌরব অনুভব করবে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

আমাদের কিন্তু হেডকোয়ার্টার (গণেশের বাড়ি), হেডকোয়ার্টার, (কংগ্রেস অফিস—যেখানে মাস্টারদা থাকতেন) আর রজত সেন ও দেবপ্রসাদ গুপ্তের বাড়ি দুটি নদী ও পাহাড়ের সান্নিধ্যে যেরূপ প্রাকৃতিক সুযোগ গ্রহণের সুবিধা করে দিল সেরূপ সুবিধা অন্যান্য যুবক সাথীদের বাড়ি থেকে পাওয়া সম্ভব হয় নি। এই চারটি প্রধান কেন্দ্র থেকে চারটি প্রধান আক্রমণকারী দল—টেলিফোন ভবন, ইউরোপীয়ান ক্লাব, A.F.I. অস্ত্রাগার ও পুলিশ লাইন, ঝটিকাবেগে আকস্মিক আক্রমণ করার জন্য বেরিয়ে পড়েছে। অস্ত্রশস্ত্র, হাতবোমা, যন্ত্রপাতি ও বিভিন্ন মারাত্মক অস্ত্রাদি নিয়ে ধাপে ধাপে স্থান বদলে পথ পরিবর্তন করে গাড়ি ও পায়ে হেঁটে বিভিন্ন দলগুলি ইতিমধ্যেই প্ল্যান অনুযায়ী আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুর দিকে সন্তর্পণে এগিয়ে গেছে।

প্রধান চারটি আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুর পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান এক মাইলের বেশি হয়ত ছিল না। সরকারী ভাষ্যে বলা হয়েছে—

"The Telephone Office, the Police Lines and the A.F.I. Head Quarters stand roughly speaking at the apices of an equilateral triangle, approximately one mile distance from another. The Telephone Office is situated in the centre of the town while the Police Lines and the A.F.I. Head Quarters are situated on the outskirts—

the former to the north of the Golf Course locally known as Paltan maidan and the latter by the side of the road leading from Chittagong to Pahartali.” (Judgment of the Chittagong Armoury Raid Case—No. 1)

সমভুজ ত্রিকোণ ক্ষেত্রের শেষ তিনটি কোণের, এক মাথায় টেলিফোন অফিস, আর দুটো কোণের শেষ সীমানায় পুলিশ লাইন ও A.F.I. হেড কোয়ার্টার মোটামুটি এক মাইলের মধ্যে অবস্থিত। চট্টগ্রামের কেন্দ্রস্থলে টেলিফোন ভবনটি বিরাজ করছে, আর পুলিশ লাইন ও A.F.I. হেড কোয়ার্টারস্ দুটির অবস্থান শহরের সীমানা থেকে একটু বাইরে। পল্টন ময়দানের (গল্ফ্ খেলার মাঠ) উত্তর দিকে হ'ল পুলিশ লাইন, আর A.F.I. হেড কোয়ার্টার্স (শহরের দক্ষিণে) পাহাড়তলী রাস্তার ধারে বিস্তৃত স্থান জুড়ে আছে।

এই ত্রিভুজ ত্রিকোণ ক্ষেত্রের যে বাহুটি পশ্চিম দিকে পুলিশ লাইন ও A.F.I. হেড কোয়ার্টারকে সংযুক্ত করেছে, সেই বাহুর ওপর পুলিশ লাইনের খুব সন্নিকটে ইউরোপীয়ান ক্লাবটি শহরের বাইরে নির্জন স্থানে কৃষ্ণচূড়া গাছে ঘেরা একটি ছোট্ট টিলার শোভাবর্ধন করে আছে। এই ক্লাবটির অবস্থান সম্বন্ধে আমাদের মামলার জাজমেন্টে অন্যত্র উল্লেখ আছে। মামলার বিবরণী থেকে যা আমি ওপরে লিখেছি তা'তে ক্লাবগৃহটি সম্বন্ধে এই স্থানে কিছু ব্যক্ত করা হয় নি।

আর মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই টেলিফোন ভবন ধ্বংস করবার জন্য আক্রমণ সুরু হবে। অম্বিকাদার নেতৃত্বে—কালী চক্রবর্তী, আনন্দ গুপ্ত ও আরও তিনজন বন্ধু নতুন শেভ্রোলে গাড়ি করে টেলিফোন ভবনের পাহাড়টির উত্তর দিকে এসে একত্র হয়েছে। টেলিগ্রাফ অফিসের উত্তর দিকের রাস্তা জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। এই পথেই কিন্তু টেলিফোন ভবনে সহজে যাওয়া যায়। তাই আক্রমণ কৌশলের ওপর ভিত্তি করে এই পথ ব্যবহার করা সাব্যস্ত করা হয়। জনসাধারণের ব্যবহারের পথটি "দুর্গম" বললেও অত্যুক্তি হয় না। ছোট টিলার ওপর খাড়া সিঁড়ি বেয়ে কারও টেলিগ্রাম করতে যাওয়া বিশেষ পরিশ্রম সাপেক্ষ। আমরা অবশ্য টেলিগ্রাম পাঠাবার উদ্দেশ্য নিয়ে যাব না তবু খাড়া পাহাড়ে পেট্রলের টিন, বড় বড় হাতুড়ি, (Sledge hammer) প্রভৃতি নিয়ে ওঠা খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার। পেছনের রাস্তাটি খুবই নির্জন। দু'টি পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে এই রাস্তাটি গেছে—তাই পথটির নামও কাটাপাহাড়-রাস্তা। শহরের মধ্যে এইরূপ রাস্তা দুধারে দু'টি ছোট ছোট পাহাড়—দক্ষিণের টিলার ওপর টেলিগ্রাফ-টেলিফোন ভবন, আবার রাস্তার অপর দিকে ফরেস্টার্স-এর অফিস। একটি সুবিধাজনক জায়গা পূর্ব থেকে চিহ্নিত ছিল যেখানে আক্রমণের ঠিক আগে এই গ্রুপটি প্রস্তুত হয়ে নেবে। ৯-৫০ মিনিটে আক্রমণ আরম্ভ হবে আর ৯-৫৫ মিনিটে ধ্বংসকার্য শেষ করা হবে। ইশারায় হুকুম দিয়ে আকস্মিক আক্রমণ করা হবে। হুইসেল বাজবার সঙ্গে সঙ্গে কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া আছে।

৯-৫৫ মিনিটে যখন টেলিফোন অফিস ধ্বংস করা শেষ হবে তখনই মাস্টারদার সঙ্গে আমাদের চট্টগ্রাম ওয়াটার ওয়ার্কসের কাছে দেখা করবার সময় ঠিক করা ছিল। ওয়াটার ওয়ার্কসের কম্পাউন্ডের পাশ দিয়ে যে রাস্তা গেছে তারই ধারে, রাস্তার অপর দিকে ছোট একটি পাহাড়। সেই টিলার ওপরটা সমতল করে নিয়ে পুলিশ লাইনের অস্ত্রাগার ও ম্যাগাজিন ঘর এবং গার্ড রুম, অর্থাৎ, সশস্ত্র সান্ত্রীদের জন্য ঘর তৈরি করা হয়েছে। গার্ড রুমটি ওয়াটার ওয়ার্কসের দিকে মুখ করে আছে। সেখানে দাঁড়িয়ে সশস্ত্র সান্ত্রী পাহারা দেয়—তাদের দৃষ্টি দূর রাস্তার দিকে নিবদ্ধ থাকে। ওয়াটার ওয়ার্কসের কম্পাউন্ডটি ঘুরে যে রাস্তাটি শহরের দিকে গেছে তারই কোন একটি বিশেষ স্থানে সান্ত্রীদের চোখের অন্তরালে আক্রমণের কয়েক সেকেন্ড আগে আমাদের দলটির উপস্থিত হওয়ার কথা। সেই বিশেষ চিহ্নিত স্থানটিতে মাস্টারদা এক মিনিট আগে পদব্রজে উপস্থিত হবেন। তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েই আমরা গাড়িতে এগিয়ে যাব আক্রমণ করতে—খুব বেশি হলেও সেই স্থানটি থেকে গার্ড রুমের দূরত্ব দেড়শ' গজের বেশি হবে না।

ঘড়ির কাঁটা ৯-৫৫কে ছুঁতে চলেছে—এতক্ষণে নিশ্চয় টেলিফোন অফিসের ধ্বংসকার্য প্রায় শেষ হয়ে এলো—মাত্র কয়েক সেকেন্ড বাকি। আমরা একত্র হব মাস্টারদার সঙ্গে আক্রমণের জন্য ঠিক করা সেই সর্বশেষ স্থানটিতে। ২৪৪৪ নম্বরের বেবী-অস্টিনটি ধীরে ধীরে কৃষ্ণচূড়া গাছের আড়ালে ক্লাবগৃহের পাহাড়ের নিচের রাস্তা দিয়ে এগোচ্ছে। মিলিটারী পোষাক-পরা আমাদের একজন যুবক-সাথী একা গাড়িটি চালাচ্ছে। গাড়িতে বোঝাই আছে রীচ্-লোডার বন্দুক, কুড়ুল, তরবারি, বোমা ইত্যাদি। গাড়ির গতি মন্থর—অতি মন্থর হয়ে আসছে। বেবী-অস্টিনটিকে অনুসরণ করে আগে ও পাশে এককভাবে এই দলের আর পাঁচজন গাছের ছায়ায় ও আড়ালে আক্রমণের ঠিক পূর্বে শেষ মিলিত হওয়ার স্থানটিতে এসে জড়ো হয়েছে। গাড়িটিও সামান্য একটু দূরে এসে একেবারে নিশ্চল হয়ে গেল।

আক্রমণের পূর্ব মুহূর্তে প্রত্যেক দলের জন্য বিশেষ বিশেষ jumping off ground (লাফ দেওয়ার জন্য শেষ চিহ্নিত স্থান) ধার্য করা ছিল। সেইমত পায়ে হেঁটে নিজাম পল্টনের বিস্তীর্ণ অন্ধকার মাঠের মধ্যে আমাদের A.F.I. হেড কোয়ার্টার্স আর্মারী আক্রমণকারী দলের এক অংশ ধীরে ধীরে পেট্রোল, দড়ি, গাঁইতি, মই প্রভৃতি নিয়ে নিঃশব্দে এগোয়ে চলেছে। তারপর যখন বেবী-অস্টিনটি সর্বশেষ স্থানে উপস্থিত হয়েছে এবং দলের আর পাঁচজনও এসে গেছে আক্রমণ শুরু করবার শেষ মুহূর্তে, তখন A.F.I. হেড কোয়ার্টার্স আক্রমণকারী দলও তাদের লক্ষ্যবস্তুর সামনে উপস্থিত। এই পায়ে-হাঁটা দলের নেতৃত্ব করবে নির্মলদা ও লোকনাথ। ডজ্ গাড়িটি করে নির্মলদারাও নির্ধারিত স্থানে এসে উপস্থিত হলেন।

ইতিমধ্যে ছোট ছোট পাঁচটি দল পদব্রজে গাছের আড়ালে অন্ধকারের মধ্যে শেষ একশ' দু'শ' গজ অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চলেছে। তারা সিগন্যাল পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ লাইনে এসে প্রধান আক্রমণকারী দলের সঙ্গে যোগ দেবে। তাই গোপনে, ব্যারাকের পুলিশদের চোখের অন্তরালে ঝোপ-ঝাড় ও গাছের ছায়ার সুবিধা নিয়ে একেবারে পুলিশ লাইনের কাছে অর্ধচক্রাকারে এসে পজিশন নিল।

চট্টগ্রামের রাজশক্তি তখনও ঘুমোচ্ছে। জানে না তারা—জানবার সম্ভাবনাও ছিল না কিছুক্ষণের মধ্যে তাদের বৃটিশ দম্ভে বাংলার যুবশক্তি এক প্রচণ্ড আঘাত হানবে। ১৯৩০ সাল, ১৮ই এপ্রিল, রাত দশটা বাজবার ঠিক পাঁচ মিনিট আগে প্রধান প্রধান তিনটি ঘাঁটির সম্মুখে, আক্রমণের জন্য মিলিত হবার সর্বশেষ স্থানে, আমাদের সৈন্যরা এসে হাজির। ইতিমধ্যে প্ল্যান অনুযায়ী টেলিফোন অফিস ধ্বংস করার কাজ শুরু হয়ে গেছে। মামলার জাজমেণ্টে ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেণ্ট এ সম্বন্ধে লিখছেন—

"The photograph (Ex. XXXV) taken by the S.D.O. Telegraphs (P.W. 48) and the enlargement (Ex. CLXX) by P.W. 4 show more fully and

forcibly than any witness could describe, the extent of the damage done. The telephone switch-board and all the connected apparatus were reduced to a smouldering wreck. Curiously enough, the fire blackened dial of the clock which hung on the wall behind the switch-board, with its hands arrested at 9-50 p.m. (standard time) offers its own silent testimony as to the time at which the outrage was committed." (Judgment of Ctg. Armoury Raid Case No. I).

(৪৮ নম্বর সরকারী সাক্ষী টেলিগ্রাফ S.D.O.-র তোলা পঁয়ত্রিশ নম্বর নিদর্শনীয় ফটোগ্রাফ্ ও ৪ নম্বর সাক্ষীর তোলা বড় ফটো (Ex. CLXX) যে ব্যাপক ক্ষতির সাক্ষ্য বহন করছে তার চাইতে কোন সাক্ষীই অধিক জোরের ও সম্পূর্ণতার সঙ্গে তা ব্যক্ত করতে পারত না। আরও মজার কথা, সুইচ্-বোর্ডের পেছনে ঝোলান দেওয়াল ঘড়ির অগ্নিতাপে দগ্ধ কালচে ডায়ালের ওপরে ৯-৫০ মিনিটের সময় নিবদ্ধ কাঁটা দুটি তাদের নির্বাক সাক্ষ্যে দুর্ঘটনা কখন ঘটেছিল তার অকাট্য প্রমাণ দিচ্ছে)।

টেলিগ্রাফের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ স্কট্ সাহেবের কোয়ার্টারের পাশ দিয়ে পেছনের রাস্তা ধরে অম্বিকাদার সঙ্গে কালী চক্রবর্তী, আনন্দ গুপ্ত ও আরও তিনজন বিদ্যুৎ বেগে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ঘরের সামনে এসে পড়ল। এই ঘরটি টেলিগ্রাফ বিল্ডিং-এর উত্তর-পূর্ব কোণে। এই ঘরটির সম্মুখে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ ফুট লম্বা ও দশ ফুট চওড়া একটি বারান্দা সোজা দক্ষিণ দিকে টেলিগ্রাফ্ গৃহের পূর্বদিকের দেওয়াল ঘেঁষে চলে গেছে। এই বারান্দাটিই নব্বই ডিগ্রী সমকোণ করে টেলিগ্রাফ অফিস ও ট্রান্সমিশন ঘরের সম্মুখে দিয়ে পশ্চিমে গেছে। এই সমকোণটিতে পজিশন নিলে দু'দিকেই লক্ষ্য রাখা যায়। প্ল্যান অনুযায়ী অম্বিকাদা দু'দিকে দৃষ্টি রাখবার জন্য এই টেকনিকাল পজিশন নিলেন। অম্বিকাদার পাশে আর একজন দাঁড়িয়ে দক্ষিণের বারান্দা ও টেলিগ্রাফ্ ঘরের দিকে লক্ষ্য রাখছে। বাকি চারজন টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ঘরটির মধ্যে ও বাইরে মুহূর্তে নিজ নিজ কাজে নিযুক্ত হয়ে পড়ল। এই ঘরের দরজা রোধ করে বারান্দার ওপর একজন পিস্তল হাতে দাঁড়াল।

রাত্রে সুইচ্-বোর্ডে মাত্র একজন অপারেটারের ডিউটি। ছোট্ট চট্টগ্রাম শহরে আজ থেকে প্রায় ছত্রিশ বছর আগে তিন-শ'র বেশি টেলিফোন ছিল বলে মনে হয় না। তাই রাত্রের ডিউটির পক্ষে একজন অপারেটারই যথেষ্ট ছিল। বলাই বাহুল্য এই তথ্য আমরা পূর্বেই সংগ্রহ করেছি। সেই অনুসারে আক্রমণের পরিকল্পনাও করা হয়েছে। আনন্দ গুপ্ত তখন খুবই ছোট—মাত্র পনেরো বছর ছ' মাস বয়স। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে—তখনও ফল গেজেটে প্রকাশিত হয় নি। ছোট হলেও সে দু' বছর ধরে শরীরচর্চা করেছে। নানা ধরণের আক্রমণ পদ্ধতি সবার মত তাকেও শেখানো হয়েছে। টেলিফোন এক্সচেঞ্জ আক্রমণে কি তার ডিউটি এবং অপারেটারকে আহত না করে কিভাবে কাবু করবে সেই বিশেষ শিক্ষায় তাকে পারদর্শিতা অর্জন করতে হয়েছিল।

বিপ্লবী যুবকদের যেমন অনেক সাহস ও বিক্রমের ইতিহাস আছে তেমন আবার অনেক ভীরুতা ও দুর্বলতারও শোচনীয় নজির দেখতে পাওয়া যায়। তাদের আক্রমণ ও আত্মরক্ষার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হয় নি বলে অনেকে বিভিন্ন ঘটনা-স্থলে প্রয়োজনের অধিক বলপ্রয়োগ করেছে—এমন কি বিনা প্রয়োজনে তাদের হাত থেকে পিস্তলের গুলী involuntarily (আপনা আপনি) বেরিয়ে গেছে। এইরূপ অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ কর্মচারী, নিরস্ত্র দরোয়ান, কেরানী, গৃহস্বামী, ড্রাইভার—হত বা আহত হয়েছেন। যুবকেরা একেবারে প্রথম যখন কোন সশস্ত্র আক্রমণে অংশ গ্রহণ করে তখন যতই সাহসী তারা হোক না কেন, যদি আক্রমণ-কৌশলের বিশেষ শিক্ষা না থাকে, তবে একপ্রকার স্নায়বিক দুর্বলতার কারণবশত তাদের আঙুল ট্রিগারে আর স্থির থাকে না—involuntarily ট্রিগারে চাপ পড়ে অনর্থ ঘটায়। আমাদের নিজেদের সামান্য পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছিল বলে আক্রমণ ও আত্মরক্ষার বিপ্লবী রণকৌশল কেবল যুদ্ধের কায়দায় না শিখিয়ে মনস্তাত্ত্বিক ও দৈহিক কৌশলের সমন্বয়ে শিক্ষাপদ্ধতি পরিচালনা করি। আমার এই অভিমত থেকে যদি কেউ অর্থ করেন যে আধুনিক যুদ্ধে যে-প্রকার "কমাণ্ডো-ট্রেনিং" বা "গেরিলা" ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা আছে সেই-যুগে আমাদের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে যেরূপ সামান্য ট্রেনিং দিতে সমর্থ হই তা বর্তমান কালের এই বিশেষ রণ-কৌশলের চাইতে শ্রেষ্ঠ, তাহলে ভুল হবে।

বাংলা দেশের অগ্নিযুগের এই অধ্যায়টি আলোচনা করতে গিয়ে এই প্রসঙ্গে আমাদের বিপ্লবী দাদাদের ঔদাসীন্য ও ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করে আজ এতদিন পরে কারও প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করবার ইচ্ছে আমার নেই। আমার লেখার ধারা যাঁরা প্রথম থেকে অনুসরণ করে আসছেন তাঁরাই বুঝবেন কেবলমাত্র অতীত ইতিহাসের জাবর কাটার মধ্যে আমার আলোচনা বা ঐতিহাসিক বিবৃতি নিবদ্ধ রাখার ইচ্ছা নেই। তাই এই প্রসঙ্গে টেলিগ্রাফ্ অফিস আক্রমণ ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ধ্বংস করার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার আছে তার উল্লেখের প্রয়োজন আছে মনে করেই আনন্দের রণ-কৌশল শিক্ষার ভূমিকা সম্বন্ধে বলতে হল। বয়সে খুব ছোট হলেও যদি উপযুক্ত শিক্ষা পায় তবে তারা miracle করতে পারে।

আমরা ভাবতেও শিউরে উঠতাম, টেলিফোন অফিস ধ্বংস করতে গিয়ে নিরীহ টেলিগ্রাফ্ পিওন, টেলিফোন অপারেটার, অফিসের কেরানী, সিগ্‌নেলার প্রমুখ ব্যক্তিরা যদি নিহত বা আহত হন! তাঁরা সবাই নিরস্ত্র! সশস্ত্র হয়ে হঠাৎ তাঁদের আক্রমণ করা হবে খুন করবার জন্য নয়—টেলিফোন অফিস ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে মাত্র। যদি এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য-বস্তু আমাদের স্থির থাকে তবে সেইরূপ আক্রমণস্থলে কেন একজনও হত বা আহত হবেন? অবশ্য কোন অতি বৃটিশ-ভক্ত ভারতীয় কর্মচারী যদি আমাদের পাল্টা আক্রমণ করে বসে তবে নিশ্চয়ই আত্মরক্ষা করা হবে এবং সেইরূপ কোন আক্রমণের আশঙ্কা অনুমান করার সম্ভাবনা থাকলে শত্রুকে আঘাত হানতে সুযোগ দেওয়ার আগেই তাকে নিশ্চল ও শক্তিহীন করা হবে—প্রয়োজন হলে সেইরূপ ক্ষেত্রে তাকে বা তাদের হত্যা করাও সার্থক রণকৌশল বলে আমরা গণ্য করব।

এই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী সামনে রেখে আমরা টেলিগ্রাফ্ ও টেলিফোনভবন আক্রমণ ও ধ্বংস করবার প্ল্যান রচনা করি। লক্ষ্যবস্তুর বাস্তবতা অনুযায়ী আমরা ধরে নিয়েছিলাম যদি ঝটিকাবেগে আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ধ্বংসকার্য শেষ করে চলে আসতে পারা যায় তবে নিরীহ কর্মচারীদের কেউ আমাদের বাধা দিতে পারবে না—দেবেও না। সেই ক্ষেত্রে একজনকেও হত বা আহত না করে এমন কি পিস্তলের একটি গুলীও না চালিয়ে চট্টগ্রামের কেন্দ্রীয় টেলিফোন ভবনটি ধ্বংস করা কি সম্ভব নয়? আমরা বুঝেছিলাম যদি প্ল্যানটি সুচারুরূপে রচনা করতে পারি এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যবস্তুর বাস্তব প্রয়োজনীয়তা ভুলে না গিয়ে বিশেষভাবে উপযুক্ত শিক্ষা নিয়ে চট্টগ্রামের বিপ্লবী যুবকেরা তৈরি হয় তবে কাউকে জখম না করেই এই ধ্বংসকার্য

সম্ভব; এইটি যদি আমরা করতে পারি তবে তা একটি অমূল্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

এইরূপ চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা এই দলটিকে টেলিগ্রাফ ভবন আক্রমণ ও ধ্বংস করার জন্য থিয়েটারের স্টেজ রিহার্সেলের মত শিক্ষা দিয়েছি। নকল টেলিফোন ভবন আমরা গোপন স্থানে তৈরি করি, যেমন থিয়েটারের স্টেজে দেখতে পাই। তারা কোন্ পথে যাবে, কে কোন্ স্থানে দাঁড়াবে, কে কি করবে—কে পাহারা দেবে, অপারেটারকে কে অভিভূত করবে, কারা স্লেজ্ হ্যামার (বড় হাতুড়ি) দিয়ে সুইচ্-বোর্ড ভাঙবে, কখন কে কিভাবে পেট্রোল ছড়িয়ে দেবে, তারপর কিভাবে সবার নিরাপত্তা বজায় রেখে পেট্রোলে আগুন লাগাবে, আর কিভাবে অম্বিকাদার হুইসেলের সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ আরম্ভ হবে এবং আবার হুইসেলের শব্দ শুনে ধ্বংস কাজ শেষ করে তড়িৎ বেগে উধাও হবে তার শিক্ষা তারা নিয়েছে এবং এই নাটকীয় দৃশ্যটি সার্থক করবার জন্য বার বার রিহার্সেল দিয়ে রপ্ত করেছে।

অপারেটারকে আহত বা নিহত না করে অভিভূত করবার দায়িত্ব আনন্দ গুপ্তের ওপর ন্যস্ত করা যে কতখানি কঠিন সিদ্ধান্ত তা আমরা ছাড়া আর কেউ বলতে পারবে না। সে এই দলটিতে সবার চাইতে ছোট—কেবল এই দলটিতে কেন যুব-বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আনন্দরা কয়েকজন খুবই অল্প বয়সের ছেলে। তাদের মত ছোট ছেলেদের একজনকে এই দায়িত্ব দেওয়া আমাদের বিবেচনার ওপরেই যে নির্ভর করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আনন্দ তার কর্মদক্ষতার প্রমাণ দিয়ে গৌরব অর্জন করেছে।

মুহূর্তে আনন্দ আর দুজনের সঙ্গে টেলিফোন ঘরে ঢুকে পড়ল। হাতে রিভলভার—ট্রিগারে আঙুল। অপারেটার সাহেবের পেছনে দাঁড়িয়ে খুব চাপা কণ্ঠে হুকুম দিল—

"হাত তুলুন। ভয় নেই। বাইরে আসুন। Quick !" ভয়ে বিহ্বল অপারেটার থর থর করে কাঁপছিলেন। মুখে তাঁর কথা বলার শক্তি ছিল না। কেউ ভয়ে চেঁচায়—তিনি চেঁচান নি। হুকুম শোনা মাত্র তিনি মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন। ইতিমধ্যে দমাদম হাতুড়ির আঘাতে সুইচ্-বোর্ড ভাঙা শুরু হয়েছে। অপারেটার সাহেব আনন্দের ইঙ্গিতে ঘরের বাইরে এলেন। আনন্দের গুলীভরা রিভলভার তাঁর পিঠ লক্ষ্য করে আছে। ঘরের মধ্যে সুইচ-বোর্ড ভাঙার দারুণ শব্দ। উত্তেজনা উৎকণ্ঠা ও স্বাভাবিক স্নায়বিক প্রতিক্রিয়ার অবধি ছিল না। তবু—তবু আনন্দের হাত থেকে গুলী চলে নি। এইজন্য কেবল রিভলভার চালানো শিখলেই সব শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না—শিক্ষার সম্পূর্ণতার জন্য চাই মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষার culture। অপারেটর সাহেবকে ঘরের বাইরে নিয়ে এসে আবার হুকুম দিল—"দাঁড়ান। দেওয়ালের দিকে মুখ করুন। হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকুন। ভয় নেই।"

বেচারা অপারেটর একেবারে কলের পুতুলের মত অক্ষরে অক্ষরে আনন্দের আদেশ পালন করে গেলেন। তখনও তিনি কি বুঝতে পেরেছিলেন কেন এই ধ্বংস-লীলা? কি অপরাধ এই প্রাণহীন টেলিফোনের সুইচ-বোর্ডের! আমাদের কেন এই সুইচ-বোর্ডের প্রতি আক্রোশ? কিসের জন্য আমরা এই প্রতিশোধ নিচ্ছি? টেলিফোন সার্ভিস সম্বন্ধে দারুণ অসন্তোষ বা বিক্ষোভই কি ধ্বংসের কারণ? তিনি হয়ত এইসব সাত-পাঁচ ভেবেছেন। তখনও কি তিনি ভাবতে পেরেছেন যে বৃটিশ সরকার আজ চট্টগ্রাম থেকে বিপ্লবীদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে বিদায় নেবে?

অম্বিকাদা ঐ বারান্দার সমকোণ স্থানটিতে তাঁর কম্যাণ্ডিং পজিসন থেকে বজ্রকণ্ঠে সকলকে ভীত-চকিত করে হুকুম দিলেন—"কেউ চিৎকার করবেন না! যে-যার জায়গায় বসে থাকুন! ভয় নেই!"

রাত্রের নির্জনতার মধ্যে অম্বিকাদার উচ্চকণ্ঠের আদেশনামা টেলিগ্রাফ্ অফিস প্রকম্পিত করে তুলেছে। সবাই ভয়ে নিজ নিজ জায়গায় বসে আছেন। পালানোর চেষ্টা, কোন দিকে ছোটাছুটি বা প্রতি-আক্রমণের অভিপ্রায় তাঁদের কারও ছিল না। সশঙ্কিত প্রাণে প্রমাদ গুণেছেন—হতবাক হয়ে ভেবেছেন, এ কি হ'ল, কেন এই ধ্বংসলীলা!

অম্বিকাদা সব দিক লক্ষ্য রাখছেন এবং মাঝে মাঝে ঘড়ির দিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন। রিহার্সেল দিয়ে আমরা সময় ঠিক করেছিলাম কতক্ষণ লাগবে গাড়ি থেকে নেমে এসে এই ধ্বংসকার্য শেষ করে আবার গাড়িতে উঠে স্টার্ট দেওয়া পর্যন্ত। ধ্বংসকাজ ও আগুন দেওয়া পর্যন্ত, যা মনে আছে, বোধহয় তিন মিনিট সময় ধার্য ছিল। তিন মিনিট সময় অনেকখানি সময়। এরই মধ্যে যে কতখানি কাজ করা যায় তা' বাস্তবে প্র্যাকটিস্ না করলে বোঝা যায় না। একেবারে প্রথমে আমাদের আন্দাজে মনে হয়েছিল সুইচ্-বোর্ডগুলি ধ্বংস করে আগুন দিতে দশ-পনেরো মিনিট সময় লাগবেই। কিন্তু ঘড়ি ধরে যখন রিহার্সেল দিলাম তখন দেখেছি তিন মিনিট সময়ও অনেক বেশি। দু' মিনিটেই তা' করা সম্ভব—কিন্তু, যেহেতু নকল টেলিফোন ভবনে রিহার্সেল দিয়েছি তাই আমরা আরও এক মিনিট বেশি সময় হাতে রাখি।

আক্রমণ সুরু হওয়ার দু' মিনিট পরেই অম্বিকাদা হুকুম দিলেন—"পেট্রোল ঢাল। আগুন দাও।" পেট্রোল ছিটান হ'ল। আগুন দেওয়া হ'ল। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠ্‌ল। অম্বিকাদা হুইসেল দিলেন। সকলে প্ল্যান অনুযায়ী একত্র হলেন এবং গাড়ির দিকে দ্রুত এগিয়ে গেলেন।

যাওয়ার সময় টেলিগ্রাফ্ ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্টের জানালার আড়াল থেকে একটি রাইফেলের শব্দ এল। অম্বিকাদা মুহূর্তে তার জবাব দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দুটি শব্দ কাটাপাহাড়ের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে প্রতিধ্বনি তুলে আবার মিলিয়ে গেল। কোন পক্ষেই কেউ আহত হলেন না। বিশ্লেষণ করে যা' বুঝেছি তাতে মনে হয় দুই পক্ষকেই Blind fire করতে হয়েছে। অম্বিকাদা ঠিক বুঝতেই পারেন নি কোথা থেকে কে বন্দুক ছুঁড়েছে তাই শব্দ লক্ষ্য করে আন্দাজে তিনি গুলী ছুঁড়েছিলেন। আর শত্রুপক্ষ থেকে যে গুলী চালায় সে যে ভয়ে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। গুলী করে কাউকে আহত করার ইচ্ছা যত না ছিল, তার চাইতে চাকরীর উন্নতির জন্য রাইফেল ফায়ার করে প্রমাণ রাখবার ইচ্ছাই ছিল অনেক বেশি।

আমাদের মামলার জাজমেন্টে লেখা আছে—

"Mr. Scott, the Deputy Superintendent of Telegraphs was in his quarter that night when about 10 p.m. Mr. Horn, the Telegraph Master who also lived in the building, came running to him, gave him some information and asked for a rifle. Mr. Scott gave him a rifle and some ammunition.."

টেলিগ্রাফ্ মাস্টার ছুটে এসে টেলিগ্রাফ্ সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ স্কটের কাছ থেকে রাইফেল ও টোটা নিয়ে গেলেন। সাক্ষী দেওয়ার সময় মিঃ স্কট্ আরও বলেছিলেন যে তিনি একটি ফায়ার করেন এবং তার প্রত্যুত্তরও তিনি সঙ্গে সঙ্গেই পেয়েছিলেন।

ভারতবর্ষে আর একটিও এইরূপ নজির আছে কি না আমার জানা নেই। অনেক সামান্য অ্যাক্শনেও বিনা প্রয়োজনে কেউ না কেউ নিহত বা আহত হয়েছে। ডিস্ট্রিক্ট টাউনের সেন্ট্রাল টেলিফোন ভবন আক্রমণ ও ধ্বংস করে চলে আসা হ'ল একেবারে বিনা রক্তপাতে। অপারেটর ও

বিপন্ন মাটিতে একটি প্রত্যয়

অপূর্ব কর

দেউড়িতে ঘণ্টা বেজে গেছে অনেকক্ষণ;
অথচ আয়নায় সে মুখ দেখছিল
—ভাবছিল একটি প্রত্যয়ের জন্ম
কিংবা মৃত্যুদিন আসছে
—গরুর গাড়ির মত মাঠ পেরিয়ে।

অথচ সে মাঠটায় ওরা সবুজ আশায়
ফসল বুনেছিল, আলোর স্পর্শ চেয়ে,
তারপর, নদী শুকিয়ে গেছে; হায় মেঘদেবতার ও বদান্যভরা কার্পণ্য;
ফসলের কঙ্কালগুলো হাসছে ঃ
—ও ভাবছিল চৌচির বুকভাঙা মাটির ওপর দিয়ে
গরুর গাড়িটা আলো কিংবা মৃত্যুর স্বপ্ন নিয়ে আসবে কি না!

কিন্তু একদিন ও মাটির বুকে প্রাণ জাগতো,
সৃষ্টির ঘুমপাড়ানী মন্ত্র উঠতো ঘুম ভেঙে,
পায়ে পায়ে পথ হতো আল ধরে,—সাদা মাটির পথ,
সূর্যের মুখোমুখি লক্ষ মানুষ গান গাইত
সারে জাঁহাসে....... ও আমার ......
নিজেদের মনের শৃংখলে বাঁধা ছিল যেদিন ওদের গানের সুর,
আর প্রাণের ধ্যান এক হয়ে।

আজ দেউড়িতে ঘণ্টা বেজে গেছে।
ক্যালেণ্ডারের পৃষ্ঠা ছেঁড়ার মতো অতীতকে সে মুছে ফেলল,
—ও নিশ্চয়ই ভাবছিল
ভুলের মাশুল মিটিয়ে দিয়ে অজস্র ফটকে
কালের গাড়ি নিশ্চয়ই এগিয়ে আসছে—
তারপর সওয়ার বলবে মন্দ্র সুরে
আমি তোমার শুকনো বাগান সাজিয়ে দেব।

ও আবার আয়নায় চোখ বুলিয়ে নিল
আসন্ন নবীন কিংবা মৃত্যু দেখা যায় কি না এই ভেবে!
বাইরের উঠোনে তখন পাটভাঙা রোদ্দুর কাঁপছে।

মুখ দেখছি

শচীন দত্ত

নান্দন,

আমার দেয়ালে তোমার হাতে টাঙিয়ে দেওয়া সেই আর্শিটায় মুখ দেখছি। আমার মুখ দেখছি—তোবড়ানো চোয়ালে জখম-খাওয়া কালো কালসিটে দাগ। পেছন-ফেরা যুগগুলো ফের ঢুকছে হুড়মুড় করে আমার জানালায় দরজায়—পর্দার ফাঁকে ফাঁকে। টেবিলের ফুলদানিটার শুকনো রজনীগন্ধার ঝাড় উল্টেপাল্টে নতুন-কেনা বইগুলোর আরামগন্ধটুকু বেমালুম নষ্ট করে দিচ্ছে......আমি মুখ দেখছি।

কলেজ স্ট্রীট মহাত্মা গান্ধী রোড জংশনের জল-জমাট জাম এখনো স্থির দাঁড়িয়ে। সেই তো সেই দুপুর-পোড়া দু'টো ছাত্র মিছিলের বিক্ষোভ আর এখন সন্ধ্যে গড়িয়ে আটটা...... জংধরা ধুলট ট্রামের চাকায় যে লাল রঙের ছোপ সে কি সেই সবার আগের ফেস্টুন-ধরা ছেলেটার! নাকি কোনো-এক গাড়িঠেলা গাড়োয়ানের!!

উঃ; মিশকালো খাঁচাগাড়িগুলো হুস্ হুস্ করে ছুটছে আমার মগজের ভেতরে। ঢুকছে এ্যাম্বুলেন্স-হাসপাতাল, ব্যাঙের পিঠের মতো এস্‌প্লানেডের সাময়িক ছাউনি, তাজা তাজা ছেলেমেয়েদের কোমল-কচি মাথা, পিছু ছোটা মানুষ মারা দল দল নেকড়ে, কতো কী যে ছাইভস্ম......

আমার সম্মুখে ঝুলন্ত আর্শি। অঘ্রানের শীত-শীত হাওয়ায় নিঃস্ব স্তব্ধতা। মুখ দেখছি আমার। ভাঙা তোবড়ানো একটা মুখ—দেখাচ্ছে অজস্র-অগুণ্তি। আর্শির শাদা কাচটা চৌচির। কাচটা বড়ো পুরনো॥

এত সব কর্মচারী, কেউ এগিয়ে এল না বাধা দিতে এবং বিনা কারণে উত্তেজনা-বশত আমাদের কেউ ওদের কাউকেও আহত পর্যন্ত করে নি। অপারেটরের প্রতি সামান্য একটু রূঢ় ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছে, তবু অতি সম্মানের সঙ্গে তাঁকে সম্বোধন করেছে আনন্দ। সেইরূপ বিপদসংকুল পরিস্থিতিতে টেলিফোন অপারেটর, জনাব আহম্মদউল্লা, যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমাদের পেয়েছিলেন তাতেই তাঁর হৃদয় আমরা জয় করেছি। একা তিনিই ইচ্ছে করলে আমাদের দলের কাউকে কাউকে সনাক্ত করতে পারতেন কিন্তু তিনি তা' করেন নি। আমাদের বাড়ির সঙ্গে সংলগ্ন বাড়ি ওহাব সাহেবের। তিনি Telegraph Lines Superintendent ছিলেন। আমি ১৯৪৬ সালে মুক্তি পাওয়ার পর যখন চট্টগ্রামে তাঁর সঙ্গে দেখা করি তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন অপারেটর আহম্মদউল্লা সাহেব আনন্দকে চিনতে পেরেছিলেন এবং আমাদের মামলা চলা কালে পুলিশ তাঁকে গোপনে আনন্দকে চিনিয়ে দিয়েছিল সনাক্ত করবার জন্য। কিন্তু তবু তিনি সেইরূপ "মিথ্যা" সাক্ষী দিতে রাজী হলেন না। তিনি এক কথাই সব সময় বলেছেন—তাঁর মাথা ঘুরছিল, কিছু দেখতে পান নি, তিনি কাউকে চেনেন নি।

জজ সাহেব তাঁর রায়ে লিখেছেন—
"....and he became unconscious and did not see what happened after that....He shouted, he says, but nobody came, so he went to the 'basha' of the telegraph line-man Jonab Ali...."

এইটুকু পড়লেই বোঝা যায় ইংরেজ জজ আহম্মদউল্লা সাহেবকে বিশ্বাস করেন নি। তাই তিনি উপহাসের ভঙ্গীতে লিখলেন—

"He shouted, he says...."
—সে চেঁচিয়েছে তাই সে বলল। তারপর দেখতে পাচ্ছি আহম্মদউল্লা সাহেব সোজা টেলিগ্রাফ লাইনম্যান জনাব আলির বাসায় চলে গেলেন। ইংরেজ জজ সাহেবের যথেষ্ট ক্ষোভের কারণ আছে বৈকি!

স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন যুদ্ধ-ক্ষেত্রে ক্ষণিকের পরিচয়ের মধ্যেও এমন বহু সত্যিকার স্বদেশপ্রেমিকের সন্ধান পাওয়া যায়। আমরা ভাগ্যবান—আমরা অপারেটর আহম্মদউল্লা সাহেবকে আমাদের সমর্থনে পেয়েছি। আজ এই সুযোগে আহম্মদউল্লা সাহেবের প্রতি আমার অন্তরের বিপ্লবী অভিনন্দন জানিয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। (ক্রমশঃ)

নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস

শ্রী প্রফুল্লরঞ্জন চক্রবর্তী

সাধারণ নির্বাচনের পূর্ব অধ্যায়—প্রার্থী মনোনয়ন। পাঁচ মাস ধরে সাত নম্বর জন্তর-মন্তরে কর্ম-কোলাহল। বিপুল আয়োজন। কংগ্রেস কর্মীর ভিড়। তদ্বির-তদারকের আপ্রাণ চেষ্টা। মফস্বল ছেড়ে রাজধানীতে শুভাগমন। পাঁচ বৎসরের ব্যবধানে উৎসব মুখরিত কংগ্রেস দপ্তরে নতুন কর্মাবেগ। ব্যাপক প্রস্তুতি।

কেন্দ্রীয় নির্বাচন সমিতির মেম্বরদের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে দর্শনাথীর ভিড়। এক মিনিটের দর্শন লাভের প্রত্যাশায় ঘন্টার পর ঘন্টা প্রতীক্ষা। কি অপূর্ব সাধনা।

পথচারী কৌতুক বিস্ময়ে চোখ তুলে দেখে প্রশ্নব্যাকুল ঔৎসুক্যে—কেন কিসের এই উৎসব?

সত্যিকার প্রশ্ন এই এঁরা কারা? এখানে কেন? এঁরাই কি জনতার প্রতিনিধি? কোটি কোটি ভারতবাসীর প্রতিভূ? সমাজের ভাগ্যবিধাতা? রাষ্ট্রের অধিনায়ক?

অন্তত এঁদের দাবির মূলসূত্র ঠিক এখানে। এক্ষেত্রে তত্ত্বনির্ণয়ের অবকাশ কোথায়? একবার প্রার্থনা স্বীকৃত হলে আবার চলবে অভিযান মাঠে-ঘাটে, বাজারে-হাটে গাঁয়ের সুদূর বিস্তৃতিতে বা শহরের অলিগলিতে। কিন্তু প্রাথমিক পর্বে এ যে কঠোর পরীক্ষা। মণ্ডল থেকে জিলা, জিলা থেকে প্রদেশ এবং সর্বোপরি প্রদেশ থেকে নিখিল ভারত কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় দপ্তর। কত পরিখা ও প্রাচীর ডিঙিয়ে দিল্লীতে হাজিরা। 'কে জানে ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কতটুকু? ভাগ্যবিধাতা কামরাজ ও তাঁর সহকর্মীর দল। কথা কইবার অবসর নেই। শুধু 'পারকালাম' তামিলী ভাষায়। যার তাৎপর্য দেখা যাবে। কিন্তু এই দুটি কথা শুনবার সৌভাগ্য হবে কার? চার নম্বর জন্তর-মন্তরে তাঁর বাসস্থান। গাড়িতে-গাড়িতে সম্মুখের প্রাঙ্গণে ঠেসাঠেসি। পথ নিরুদ্ধ। মুখ্যমন্ত্রীর দল ড্রয়িংরুমে ভিড় জমিয়ে আছেন। ওঁদের সঙ্গে রয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ও সম্পাদক। বিরাট আমেরিকান মোটর গেট পার হয়ে এগিয়ে এলো। ছোট গাড়ি রাস্তা ছেড়ে দিতে বাধ্য। বিশিষ্ট ভি-আই-পি। ওঁদের জাত-গোত্রের খোঁজ নেওয়া অসামাজিক। সৌজন্যের নিয়মিত বন্ধন স্বীকার করে শুধু মৌন কৌতুকে পথ ছেড়ে দিতে হয়। কে বা কেন এ প্রশ্ন করা চলে না।

দিনের পর দিন এই চলেছে আগমন ও প্রস্থান। জনতার প্রতিভূ দূরে দাঁড়িয়ে অবকাশ খুঁজছে কখন পাওয়া যাবে শুভ অবসর? একটিরার প্রণতি জ্ঞাপন। পাঁচ বৎসরের এই ক্ষণটি উপলক্ষ করে আশা-আকাঙ্ক্ষার কি অপ্রতিরোধ্য আবেগ? শুধু কি ব্যর্থতায় হবে এর পরিসমাপ্তি?

প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ আপনাদের বিজ্ঞতা ও সুবিবেচনায় ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষাকল্পে নির্বাচন সমিতির বৈঠকে বিশেষ যত্নে ও আগ্রহে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, অন্য পক্ষের অভিযোগ যতই থাক এই সিদ্ধান্ত হেসে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না ওঁরা ভাল করে এ খবরটুকু জেনে নিয়েছেন। তবুও কেন এই আবেদনের বিপুল সম্ভার। কিসের আশ্বাসে ওঁরা ছুটে এসেছেন দিল্লীর দরবারে?

নিঃশঙ্ক চিত্তে এই আবেদনের গুরুত্ব অস্বীকার করা চলে কি? প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ দ্বিধাগ্রস্ত। কে জানে কেন্দ্রীয় নির্বাচন সমিতির সভ্যদের ঝোঁক কোন-দিকে। এটুকু বুঝতে কারুর অসুবিধে নেই এই নির্বাচনের ফলের প্রত্যাশায় কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতাদের কর্মধারা নিয়ন্ত্রিত হতে চলেছে। ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে জাতির ইতিহাসের নব অধ্যায় সুরু হবে। কিন্তু সুচতুর রাজনীতিজ্ঞ কংগ্রেস-সেবী গণিতের ফরমুলায় অনভিজ্ঞ নহেন। গোটা জীবন ভরে হিসেবের খোঁজ রেখেই এতদূর এসে পৌঁছেছেন। আজ হঠাৎ বে-হিসেবের মূঢ়তায় নিজের জীবনধর্ম ব্যর্থ হয়ে যাবে এ কি সম্ভব। অতএব ফেব্রুয়ারীর ফলাফলের গণনা সুরু হয়েছে আগস্ট মাস থেকে। এবং ঐ গণনার প্রত্যাদেশে নিজেদের কর্মক্ষেত্রে শক্তি-সঞ্চয়ের পূর্ণ ব্যবস্থা নির্ণীত হয়েছে। বিধানসভায় বা লোকসভায় মনোনয়ন করার প্রাথমিক অধ্যায়ে প্রশ্ন ওঠে—ইনি আমাকে বিনা দ্বিধায় সমর্থন করবেন কি? এবং আমি যাঁকে আশ্বাস দিয়ে রেখেছি দিল্লীতে পার্লিয়ামেন্টারি পার্টির অধিনায়ক বলে স্বীকার করে নেব—ওঁকে লোকসভার নির্বাচন প্রার্থী মানবেন কি? এখানে প্রার্থীর কর্মক্ষমতা, অধ্যয়ন, শব্দজ্ঞান, নিষ্ঠা ও যোগ্যতার প্রশ্ন থেকে যায় নেপথ্যে। জনসাধারণের সঙ্গে কতটুকু পরিচয় রয়েছে এ কথার সঙ্গতি কোথায়? প্রধান বিবেচ্য বিষয় নেতা নিয়োগ পর্বে স্বীয় মত জ্ঞাপনের প্রগল্ভতা নেই তো। চাই আনুগত্য ও দাসসুলভ প্রবৃত্তি। নইলে এঁদের উপর নির্ভর করা চলে কি?

দরখাস্ত পেশ করা হয়েছে যথারীতি ফিস্‌সহ। অনেক টাকার আমদানি। বিবরণী বিস্তৃত। যোগ্যতার বিভিন্ন পর্যায় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পরিচিতি পত্রে উল্লিখিত রয়েছে। উহাতে নেতা নির্বাচনের উল্লেখ নেই। অলিখিত জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বা ওঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিঃসংশয়ে ও নিশ্চিতভাবে জানাতে হবে উহার নির্দেশ অলঙ্ঘনীয়। প্রাদেশিক সমিতিতে গুণাগুণ বিচারে বড় কথা ঐ আশ্বস্ত প্রতিশ্রুতি।

প্রদেশের তালিকায় কোনও প্রশ্নবোধক চিহ্ন না রেখে যদি নামটি স্থান পেয়ে গেলো তাহলে শতকরা আশীর উপর ফল লাভ নিশ্চিত বলা চলে। দিল্লীতে এক মিনিটের অবকাশে একটি নাম অনুমোদিত হয়ে যাবে। কোনও প্রশ্নের অবকাশ নেই।

মুখ্যমন্ত্রী হেসে বললেন সর্ববাদী-সম্মত লিস্ট। প্রদেশ-কংগ্রেসের অধ্যক্ষ সম্মতি জানালেন। আবার দ্বিধা কেন? কংগ্রেস অধ্যক্ষ নিজের নাম দস্তখত করে দিলেন। পরীক্ষা পাশ।

মুস্কিল দেখা দেয় তখনই যখন দুটি তালিকা প্রদেশের পক্ষে দিল্লীর দপ্তরে উপস্থাপিত হয়। প্রার্থীর দলের জানতে অসুবিধে নেই। প্রদেশ কংগ্রেসের দপ্তরে বাদ-বিসম্বাদ চলে অবিরাম। অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষকের অভাব নেই। ক্ষুদ্র দলের শক্তির পরিমাপ নির্ধারিত হবে প্রার্থীদের সাহচর্যে ও অকুণ্ঠ সমর্থনে। অতএব আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত না হলেও মোটামুটি চুক্তি সম্পন্ন হওয়া বিচিত্র নয়। কে কাকে সমর্থন করবে ঠিক হয়ে যায়।

এই পৃষ্ঠপোষকের ঔদার্যে দিল্লী অভিযান, মাসাধিকাল অবস্থিতি ও মেম্বরদের দর্শন লাভ সম্ভবপর। অন্তত এই আশ্বাসে দিল্লীতে ভিড় দেখা দেয়। ভারতের

জনবহুল দুটি প্রদেশের ভোটাধিক্যের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। উত্তরপ্রদেশ ও বিহার এঁদের মতামতের মূল্য স্বতঃস্বীকৃত। অতএব প্রতিযোগিতার তীব্রতা ও তীক্ষ্মতা এখানেই সব চেয়ে বেশি। দুটি লিস্ট ভিন্ন ভিন্নভাবে পেশ করা হবে জেনেই ওখানকার কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়ে থাকেন। প্রতিটি জিলায় মতদ্বৈধতা। প্রার্থীর সংখ্যা বেড়েই চলে।

বিহারের একটি লোকসভাক্ষেত্রে একুশটি দরখাস্ত পেশ করা হয়েছে। এবং এই একুশজনের তাদ্বির-তদারকের ত্রুটি হয় নি।

অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির পক্ষে এই বিভিন্ন লিস্টভুক্ত প্রার্থীর নাম রীতিমত পরীক্ষা করে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বেগ পেতেই হবে। ইহা সহজেই অনুমেয়। এবং প্রাদেশিক নেতৃত্বের ওজন খুবই বেশি। ওঁদের গুরুত্ব স্বীকার করে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতেই হবে। এ তো ছোট প্রদেশ নয়। আট-দশটি ভোটের অধিকারীকে প্রয়োজনমত সায়েস্তা করা চলে। অনুশাসনের নামে রক্তচক্ষু প্রদর্শন করলে তেমন ক্ষতি নেই।

কিন্তু উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের বেলায় এই অনুশীলিত বিধান প্রযোজ্য নয়। খুব হিসেব করে ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে সৌজন্যের সঙ্গে তাঁদের উভয় দলের নেতাদের খুশি রাখা সমীচীন। অতএব বাস্তববাদী ও কুশলী নেতা শ্রীকামরাজ অভিনব পন্থায় সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এলেন। এ আই সি সি'র সংকট মুক্তি হলো। তিনি নতুন ফরমুলা প্রয়োগ করে নির্দেশ দিলেন—লোকসভায় বা বিধানসভায় যাঁরা বর্তমানে সদস্য রয়েছেন ওঁদের নাম কেন্দ্রীয় নির্বাচন সমিতি বিনা দ্বিধায় মেনে নেবেন। অবশ্য বিশেষ কোন কারণে যদি কারুর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে থাকে—তাঁহার প্রার্থনাপত্র বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে।

কোনও অসুবিধে রইলো না। এতদিন ধরে দরখাস্ত, বিচার, গবেষণা, অভিযোগ, জবাবদিহি, অনুরোধ, উপরোধ, তাদ্বির-তদারক সব ব্যর্থ। একটি সংক্ষিপ্ত ফরমুলায় সর্বসিদ্ধি। প্রাদেশিক নেতাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব যে হিসাবের নিরীক্ষায় পরিমাপ করে ওঁরা অধিক শক্তি আহরণের ব্যাকুলতায় গোটা বৎসর ধরে বিভিন্ন ও বিস্তৃত আয়োজন করেছেন এখন আবার নতুন করে গণনা সুরু করতে হবে। প্রত্যেকের সমর্থিত প্রার্থী নির্বাচনে জয়ী হবে কি না এবং যথারীতি প্রপেগেণ্ডা ও প্রস্তুতি আছে কি না।

শ্রীকামরাজের নব বিধানে বর্তমান সমস্যা মিটেছে বটে। কিন্তু জনতার দাবি মিটবার যোগ্য ক্ষমতা এই অনুমোদিত প্রার্থীদের আছে কি না সেই প্রধান বিচার্য বিষয়। যোগ্যতার মাপকাঠি এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আলাদা। তদ্বির ও তোষামোদের বিধান এখানে অচল। এখানে চাই কর্মক্ষমতা, জনপ্রিয়তা, আদর্শনিষ্ঠা ও সমাজবোধ। কঠিন পরীক্ষা বটে।

কথামালার গল্প—

প্রত্যাশার মৃত্যু ও দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা

● কৃত্তিবাস ওঝা

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট—ঝড়ের বেগে সায়েব হাকিমের এজলাসে ঢুকে 'মিলর্ড' বলে অভিবাদন জানিয়ে 'জাপানের আত্মসমর্পণ ও ইংরাজের জয়—' এই সংবাদ সোল্লাসে যিনি ঘোষণা করেছিলেন তিনি শ্রীশচীন চৌধুরী। আর ১৯৪২ সালে হাইকোর্টের দিকপাল আইনজীবী সারা ভারতে জনপ্রিয় জননেতা শ্রীশরৎচন্দ্র বসুর জেলমুক্তির জন্য তৎকালীন হাইকোর্টের সকল আইনজীবী একখানি আবেদনপত্রে শ্রীবসুর মুক্তি দাবি করেছিলেন। এই আবেদনপত্রে শুধু আইনজীবীরা নন, স্বাধীন ভারতের অন্যতম জনৈক প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি (যিনি তৎকালে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন) পর্যন্ত এই আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন। কিন্তু সই করেন নি শ্রীশচীন চৌধুরী। জাপানের পতন তথা আজাদ হিন্দ ফৌজের পরাজয়ে যিনি উল্লসিত হয়েছিলেন, শ্রীশরৎ বসুর মুক্তিতে যাঁর আগ্রহ ছিল না, তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামলেন নেতাজীর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং শ্রীশরৎ বসুর পুত্র শ্রীঅমিয়নাথ বসু। শ্রীশচীন চৌধুরী সম্পর্কে কলকাতা হাইকোর্টে চলু গল্পটা আবার নতুন করে শোনা যেতে লাগল যখন শ্রীঅমিয়নাথ বসু আরামবাগে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীশচীন চৌধুরীর বিরুদ্ধে বামপন্থী গণফ্রন্টের প্রার্থী হিসাবে মনোনীত হলেন। শ্রীঅমিয়নাথ বসু ব্যারিস্টার হিসাবে কাজের হাতেখড়ি যেমন পেয়েছেন দিকপাল ব্যারিস্টার শ্রীশচীন চৌধুরীর সহকারীরূপে—কিন্তু এর বিপরীত দিকেও আর একটি সত্য আছে—হাইকোর্টের চালু গল্পটি সেই সত্যেরই অংশবিশেষ। শ্রীশচীন চৌধুরী আর শ্রীঅমিয় বসু ঠিকুজী কুলুজীতে একেবারে বিপরীত প্রান্তের অধিবাসী বলা যায়। পুরনো গল্পটা নতুন করে চালু হল সম্ভবত এই দুই বিপরীত প্রান্তে বসবাসকারীর একই নির্বাচনীক্ষেত্রে অবতরণ করায়। শ্রীশচীন চৌধুরীর বিরুদ্ধে শ্রীঅমিয়নাথ বসুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাই সকলের মনেই বেশ কিছুটা আমেজ সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু দুঃখের হলেও সত্য, শ্রীঅমিয়নাথ বসুর বন্ধু শ্রীজ্যোতি বসু এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় খুশি হতে পারেন নি। তাই শ্রীজ্যোতি বসু সেদিন টেলিফোনে শ্রীঅমিয়নাথ বসুকে যে কথাগুলি বলেছিলেন তার দু-একটি লাইন যুগান্তর দৈনিক পত্রিকার ডিসেম্বর মাসের পুরনো ফাইলে পাওয়া যাবে। শ্রীঅমিয়নাথ বসুকে শুধু ধমকেই শেষ হয় নি—মহম্মদ ইউনুসকে অনেক তালিম দেওয়াও হয়েছিল আরামবাগে দ্বিতীয় যোগেন

শ্রীঅমিয়নাথ বসু

মণ্ডল সাজবার জন্য। কিন্তু হুগলী জেলায় লতিফ সাহেব যে কেলেঙ্কারী করে ফেলেছেন তারপর সেই জেলাতেই নতুন করে একটি সংকটজনক আসনে প্রার্থী দেওয়া সম্ভব হল না। শ্রীঅমিয় বসুর বন্ধুভাগ্য প্রসন্ন—তাই সরাসরি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়বার সুযোগ পেলেন।

লতিফ সাহেবের কথাটাও একটু বলে নিই। মালদার প্রবীণ কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীনরেন চক্রবর্তীর পর যদি কেউ কম্যুনিস্ট মার্ক্সবাদীকে আক্কেলগুড়ুম করিয়ে থাকেন তবে তিনি জনাব আবদুল লতিফ। শ্রীনরেন চক্রবর্তী কম্যুনিস্ট পার্টির শুধু প্রবীণ নন, সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা ছিলেন এবং বাম কম্যুনিস্ট পার্টি সৌভাগ্যক্রমে এই নেতাকে তাঁদের ভাগে পেয়েছিলেন। সারা উত্তরবঙ্গে শ্রীনরেন চক্রবর্তী মালদা লোকসভা কেন্দ্রে বাম কম্যুনিস্ট পার্টির প্রার্থী—এই সংবাদে নতুন করে প্রাণ পেয়েছিল। অসুস্থ হয়ে শ্রীচক্রবর্তী প্রায় তিন মাস ছিলেন শ্রীমুজাফফর আহমেদের কড়েয়া রোডের বাসস্থানে 'কাকাবাবু'র সঙ্গে। তিন মাস পরে লোকসভার প্রার্থী হয়ে মালদায় ফিরলেন। কিন্তু কি কুক্ষণেই শ্রীসত্য চক্রবর্তীর মালদার বাসায় নরেন চক্রবর্তী মশায় পদার্পণ করেছিলেন, যার ফল হল ১৯শে ডিসেম্বর শ্রীনরেন চক্রবর্তীর বিবৃতি। এই বিবৃতি বিবৃতি নয়—তাবড় তাবড় কম্যুনিস্ট নেতাদের তাক লেগে গিয়েছিল। অনেকে বিশ্বাসই করতে পারে নি শ্রীনরেন চক্রবর্তী শুধু কম্যুনিস্ট পার্টি ত্যাগ করেন নি—কম্যুনিস্ট পার্টিকে বুর্জোয়া বলে ঘোষণা করে দিয়েছেন। শেষরক্ষার জন্যে স্বয়ং জ্যোতিবাবু ছুটে গিয়েছিলেন মালদায়

এবং হরিশচন্দ্রপুর গিয়ে গান্ধীবাদী নেতা গান্ধী-স্মারকনিধির অন্যতম সংগঠক শ্রীসুবোধ মিশ্রকে নরেন চক্রবর্তীর জায়গায় লোকসভার প্রার্থী হতে রাজী করিয়েছিলেন। কিন্তু নরেন চক্রবর্তীর দেওয়া আঘাত সহজে নিরাময় হবার ছিল না। সেই একই রকমের আঘাত এল পৌণ্ড্রবর্ধন নয় সমতটের গ্রাম চণ্ডীতলা থেকে। মহম্মদ আবদুল লতিফ ১৯৬২ সালে সামান্য ভোটের ব্যবধানে কম্যুনিস্ট পার্টির প্রার্থীরূপে পরাজিত হয়েছিলেন। কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীকানাইলাল দে ২১২০৪ ভোট পেয়েছিলেন আর আবদুল লতিফ ২০৯১৯ ভোট। কিন্তু এইবার নির্বাচনে মনোনয়নদানের ক্ষেত্রে বরাবর দক্ষিণবংগের নির্বাচনপ্রার্থী বাগবাজারের শ্রীকমল বসুকে মনোনয়ন দিয়ে বসলেন। কিন্তু আর যায় কোথায়? চণ্ডীতলা থেকে সুরু করে দ্বারহাট্টার হাটখোলা পর্যন্ত তোলপাড় কাণ্ড। কংগ্রেসীরা পোস্টার দিচ্ছে—"লতিফকে মনোনয়ন দেওয়া হল না কেন—কম্যুনিস্ট পার্টি জবাব দাও।" আর লতিফ সাহেব নিজে তো প্রার্থীরূপে দাঁড়িয়েছেনই পরন্তু শ্রীজ্যোতি বসুকেও কমপক্ষে দুইদিন (তীব্র বিক্ষোভের জন্য) মিটিং অসমাপ্ত রেখে ফিরে আসতে বাধ্য করেছেন চণ্ডীতলা থেকে।

হ্যাঁ—তাই—যা বলছিলাম। শ্রীজ্যোতি বসু বন্ধু শ্রীঅমিয় বসুর আরামবাগে লড়াইতে নামা পুরোপুরি পছন্দ করতে পারেন নি। একইরকম ঘটনা ঘটেছিল জোড়াসাঁকো কেন্দ্রে শ্রীগীতেশ শর্মার ক্ষেত্রে। জোড়াসাঁকো কেন্দ্রটি কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি এবং অবাঙালী প্রধান। স্বর্গীয় আনন্দীলাল পোদ্দার পরবর্তীকালে শ্রীবদ্রী পোদ্দার এবং সর্বশেষ শ্রীরাজেন পোদ্দার একের পর এক এই কেন্দ্রের মনোনীত কংগ্রেসপ্রার্থী। এইবার এই কেন্দ্রে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট ফোরামের পশ্চিমবংগ শাখার সংগঠক ও নেতা শ্রীগীতেশ শর্মা বামপন্থী গণফ্রন্টের প্রার্থী হলেন এবং অনেকেই আশা প্রকাশ করলেন পোদ্দার আর শর্মায় লড়াইটা জমবে ভালো। কিন্তু আকস্মিকভাবে শ্রীগীতেশ শর্মার একদিন ডাক পড়লো আলিমুদ্দীন স্ট্রীটে। শ্রীগীতেশ শর্মা ও শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত দেড় ঘণ্টা আলাপ করলেন। কিন্তু এই আলাপের একটিমাত্র অর্থই ছিল শ্রীশর্মাকে কোন দলবিশেষের প্রতীক নিয়ে দাঁড়ানো থেকে নিবৃত্ত করা—ঠিক যেমনটি ঘটেছিল শ্রীঅমিয়নাথ বসুর ক্ষেত্রে। শ্রীগীতেশ শর্মা অবশ্য সেইদিন নিজেকে খুব চালাক ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলেন। কারণ, শ্রীদাশগুপ্তের সংগে কথা বলে ফিরে আসবার সময় বুঝেছিলেন

শ্রীশচীন চৌধুরী

যা হোক ফাঁড়া কেটে গেছে। কিন্তু শ্রীশর্মা কাল চশমা পরেই বুঝি ভেবেছিলেন তিনি বড় রাজনীতিবিদ হয়ে গেছেন। কিন্তু যথারীতি মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিনে যখন দেখলেন তাঁর কেন্দ্রে জনৈক বাম কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন, তখন শ্রীশর্মার বুঝতে অসুবিধা হয় নি অতীতে শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের সংগে তাঁর আলোচনা কি ফল প্রসব করেছে। তবে হ্যাঁ, শ্রীশর্মার ভাগ্য ভাল গত ২৪শে জানুয়ারী তাঁর কেন্দ্রের ছয়জন প্রার্থীর সংগে বাম কম্যুনিস্ট প্রার্থীও মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন। অবশ্য আজ আর দুই-একজনকে কোন নেতা কি বলেছেন অথবা কোন সুরে ধমকেছেন সেটা বড় কথা নয়। কারণ গুনগুনিয়ে কান্নার পর্ব শেষ করে এবার মৃতকে ঘিরে

শ্রীজ্যোতি বসু

মড়াকান্না সুরু হয়েছে এবং মড়াকান্নায় কোন গ্রামার খুঁজতে যাওয়া অর্থহীন।

কিন্তু ইতিমধ্যে আর একটি ঘটনা বড় বেশি আলোতে চলে আসছে এবং এই ঘটনাটি মোটেই অবহেলার নয়। বাজারে নানা প্রকার অরাজনৈতিক গুজব আছে এবং সেই গুজবে কেউ কান দেন না এবং কৃত্তিবাসও কোন গুজব বা কানাঘুষা আলোচনায় নিজের মনকে ভারাক্রান্ত করেন না। কৃত্তিবাসের সকল বক্তব্য বাস্তবের ঘটনার আলোকে পরীক্ষিত—আর তাই বাস্তবের বাইরে কোন শোনা কথায় তার আস্থা নেই। নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে, ততই রাজ্যের দুই কংগ্রেস প্রধান কোন একটি দল বিশেষকে বড় বেশি সার্টিফিকেট দিচ্ছেন ও তোয়াজের সুরে কথা বলতে সুরু করেছেন।

লেনিন, মাও সে-তুঙ থেকে সুরু করে আজকের বাম কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীরামমূর্তি নিজেদের দলকে শাসক দলের ও নেতার প্রশংসা থেকে দূরে রাখবার উপদেশ দিয়েছেন। মাও সে-তুঙ বলেছেন, "শত্রু যদি আমাদের আক্রমণ করে তবে সেটা তো ভাল কথা, কেন না তাতে এই কথাটাই সপ্রমাণিত হয় যে, শত্রু এবং আমাদের মধ্যে পার্থক্যের সুস্পষ্ট সীমারেখা আমরা টানতে পেরেছি। শত্রু যদি উন্মত্ত হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায় একেবারে অপকৃষ্ট বলে চিত্রিত করে তাহলে সেটা তো আরও ভাল কথা, কেন না তাতে এটাই প্রতিভাত হয় যে, শত্রু এবং আমাদের মধ্যে পার্থক্যের সুস্পষ্ট সীমারেখাই শুধু আমরা টানি নি, আমাদের কাজে বিরাট সাফল্যও অর্জন করেছি।" এ তো গেল মাও সে-তুঙের কথা। এ প্রসংগে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কথা মনে আসছে। নেতাজী

ভালবেসেছিলাম

রোমাঞ্চকর সত্যঘটনার কাব্যগ্রন্থ পড়ুন ও উপহার দিন। — মূল্য: ৩·৫০

রচনা: মোহিনীমোহন কাঞ্জিলাল

প্রাপ্তিস্থান:
দাশগুপ্ত এণ্ড কোং
কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

যা কিছু তোমার আমার

স্বপ্নেন্দু ভৌমিক

একদা ভূ-মণ্ডলে ঘুরে ঘুরে অবশেষে তোমার নিকট
পার্থিব যা কিছু ছিল—দুর্জ্ঞেয়,
যা কিছু তোমার আমার
পদস্খলনের বেলা
অন্য দেশে জলাঞ্জলি দিয়েছিলে সব।
কোথায় গোপনে ছিলে, দুর্নিরীক্ষ্য
শিরে তুলে দু' বাহু তোমার?

অথচ ভ্রমণে গিয়ে তুমি সর্বশেষ—
যা কিছু রক্ষিত ছিল হাতে
পদস্খলনের বেলা—ঝিনুক কুড়াবে ব'লে প্রতি কূলে—
সফর করেছ তীর জুড়ে—আলটপকা
আসক্তি তোমার ছিল সব পেয়ে গেলে
পদস্খলনের বেলা।
পার্থিব যা কিছু ছিল তোমার আমার
একদা ভূ-মণ্ডলে ঘুরে ঘুরে অবশেষে তোমার নিকট।

কালে উঠে সর্বাগ্রে তৎকালের ইংরাজ সরকারের বেসরকারী মুখপত্র 'স্টেটস্‌ম্যান' কাগজ পড়তেন। নেতাজী বলতেন, "আমার কাজের কতটা নিন্দা 'স্টেটস্‌ম্যান' করেছে সেই বিচারে আমি বুঝতাম আমি ঠিক পথে চলেছি কি না। কারণ 'স্টেটস্‌ম্যান' নিন্দা করলেই বুঝতে হবে আমি ঠিকই করেছি আর স্টেটস্‌ম্যান যদি প্রশংসা করে তবে বুঝতে হবে আমার কাজে নিশ্চয়ই গলদ আছে।" শুধু নেতাজী ন'ন কয়েক মাস আগে ময়দানের সভায় বাম কম্যুনিস্ট পার্টির অন্যতম সেরা থিয়োরিটিসিয়ান শ্রী পি রামমূর্তি বলেছিলেন, "শাসক পার্টি বা শাসক পার্টির কোন নেতা যখন আমাদের পার্টির প্রশংসা করবেন তখন বুঝতে হবে আমরা ভুল পথে চলেছি।"

ওপরের কথাগুলি একটু মনে রেখে সম্প্রতিকালে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের দুই প্রধান শ্রীঅতুল্য ঘোষ আর শ্রীপ্রফুল্ল সেনের সাম্প্রতিককালের মন্তব্যগুলি সকলের মনেই কিছু সন্দেহের সৃষ্টি করবে এবং জানি না বাম কম্যুনিস্ট পার্টির নেতারা মন্তব্যগুলি সম্পর্কে ভেবে দেখেছেন কি না! কারণ শ্রীঅতুল্য ঘোষ আর শ্রীপ্রফুল্ল সেন যে প্রকারে বাম কম্যুনিস্ট পার্টিকে সার্টিফিকেট দিয়েছেন আর যেভাবে স্নেহ বর্ষণ করছেন সেটা কি শুভলক্ষণ! আরো বড় কথা হল—দুই নেতাই ঠিক একই দিনে কেন বাম কম্যুনিস্ট পার্টি সম্পর্কে একই সুরে কথাগুলি বললেন? তবে কি বুঝতে হবে—দুইজনেই একমত হ'য়ে একজায়গায় বসে এই সার্টিফিকেটের বয়ান রচনা করেছেন। গত ১৯শে জানুয়ারীর সন্ধ্যায় প্রায় একই সময়ে শ্রীঅতুল্য ঘোষ যখন বাঁকুড়ায় বাম কম্যুনিস্ট পার্টিকে সার্টিফিকেট দিলেন জনসভায় দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে ঠিক সেই একই সময়ে কলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিংসে বসে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেনও সাংবাদিকদের কাছে বাম কম্যুনিস্টদের সার্টিফিকেট দিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, —'বাম কম্যুনিস্টরা খাঁটি কম্যুনিস্ট,' 'বাম কম্যুনিস্টরা কোন গণ্ডগোল করবে না,' 'বাম কম্যুনিস্টরা বিধান সভায় আনুপাতিক শক্তি বজায় রাখতে পারবে।' মুখ্যমন্ত্রীর অনেক কথার মধ্যে এই কয়েকটি কথাই মাত্র উল্লেখ করলাম—এর পরে একবার মিলিয়ে নিন মাও সে-তুঙ থেকে রামমূর্তি পর্যন্ত সকলের কথাগুলি। মাও সে-তুঙ-এর মতে শত্রু যদি আক্রমণ না করে, শ্রীরামমূর্তির মতে শাসক পার্টির নেতা যদি প্রশংসা করে তবে তার অর্থ কি দাঁড়ায়। এমনি বাজারে একটা কথা চালু আছে বাম কম্যুনিস্ট পার্টি বহু কেন্দ্রেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রার্থী দেন নি; তার পর যদি আবার কংগ্রেসই বলে বাম কম্যুনিস্ট পার্টি তার আনুপাতিক শক্তি বজায় রাখতে পারবে তবে এই গা শোঁকা মনোভাব আর দরদভরা কণ্ঠস্বরের উৎস কোথায় সেটা তলিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে।

কিন্তু এই সব কেতাবী কথা কাগজে বয়ান যদি বাদও দেওয়া যায় তাহলেও বাস্তবে যে ঘটনাগুলি ঘটে চলেছে এবং দিবারাত্র চোখে আঙুল দিয়ে যে সত্যকে প্রকাশ করে দিচ্ছে তার দিকেও কি চোখ বন্ধ করে থাকা কারো পক্ষে সম্ভব? পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের আশা-ভরসা যা ছিল সেটা না হয় শেষই হয়ে গেছে কিন্তু নির্বাচনেই সব শেষ হয়ে যাবে না। 'সুকান্ত ভট্টাচার্যের ভাষায়—

"নিরন্ন আমার দেশ
আজ তাই উদ্ধত জেহাদ
টলোমলো এ দুর্দিন
থরো থরো জীর্ণ বনিয়াদ।'

এই জীর্ণ বনিয়াদ উপড়ে ফেলতেই দেশের মানুষ কোমর বেঁধেছিল আর উদ্ধত জেহাদে থরো থরো কেঁপে উঠেছিল সারা দেশ। কিন্তু কি হতে চলেছে! জীর্ণ বনিয়াদকে আবার পাকা বনিয়াদ করে গড়ে তুলছে কারা,—কারাই বা সেই সুযোগ করে দিচ্ছে?"

[ক্রমশঃ]

অবক্ষয়

চন্দ্রগুপ্ত

'স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে এ দেশ তোদের নয়', চারণকবির এই গান যখন রক্তে দোলা জাগাত, সেই কাল থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি। এই পংক্তি আজ বিস্মৃতপ্রায়, এর একদা-খ্যাত স্রষ্টা আজ ঐতিহাসিকের দৃষ্টি-বলয়েই জীবিত। অথচ ইতিহাসের এমনই বিচিত্র পরিহাস, ভিন্নতর পরিস্থিতিতে অধুনা-বিস্মৃত এই পংক্তি আজও নির্মমভাবে সত্য। স্বাভাবিক জীবন-যাপনে আগ্রহী আমার মতো ভারত-বাসীদের কানে বাজে ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল চাকী-প্রীতিলতা-ভগৎ সিংদের করুণ কান্নাঃ 'স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে এ দেশ তোদের নয়।'

এই দীর্ঘ কান্নার অবসান ঘটবে কবে, কে ঘটাবে সেই অবসান?

প্রিয় উপনিবেশ ছাড়ার আগে কূট-বুদ্ধি ইংরেজ 'স্বদেশ'-এর 'দেশ'-কে ভৌগোলিক মানচিত্রেই শুধু নয়, মনের মানচিত্রেও খণ্ডিত করে গেছে।

ভারতবাসীর চেতনায় আজ 'দেশ' বলে কিছু নেই, আছে একমাত্র 'স্ব' অর্থাৎ 'আগে নিজে বাঁচি' তারপর পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব। পাশের বাড়িতে আগুন লেগেছে, লাগুক, নিজের বাড়িতে না লাগলেই হল। ও-বাড়ির সামান্য আয়ের নিরীহ ভদ্রলোককে পাড়ার ছোট গুণ্ডারা স্বাধ্যাতিরিক্ত সার্বজনীন চাঁদা অনাদায়ে অত্যাচারের ভয় দেখাচ্ছে, দেখাক, আমি ইতিমধ্যে নেম-প্লেটে 'আউট' ঘোষণা করে দরজা-জানালা বন্ধ করে প্রহর গুণতে থাকি। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই আজ 'স্ব', অন্যভাবে 'আত্মকেন্দ্রিকতা'। আত্মকেন্দ্রিকতার যূপকাষ্ঠে প্রথম বলি 'দেশ' তথা 'জাতীয়-চেতনা' এবং শেষ বলি 'মানবিক মূল্যবোধ'।

অতএব, যেমন করেই হোক 'আখের গুছাও, জীবন দু' দিন বৈ তো নয়।'

'আখের গুছাবার উপায়, প্রভু?'

'ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়, ছলে-বলে-কৌশলে।'

* * *

ব্যষ্টি ছেড়ে সমষ্টিতে চোখ ফেরানো যাক। ব্যষ্টির রাজনীতি ছেড়ে সমষ্টির রাজনীতিতে। রাজনীতির কারবার সমষ্টি নিয়ে; কিন্তু ভারতবর্ষের রাজনীতিতে সমষ্টিতেও ব্যষ্টি, জনতাতেও জন। সেই কারণেই অদ্যাবধি এই 'ডেমোক্রাটিক' দেশে কোন সুস্থ-সবল "অপোজিশন' গড়ে উঠল না। চমৎকার সুযোগ পেয়েও আসন্ন নির্বাচন-যুদ্ধে বামপন্থীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারলেন না। ফাঁকা মাঠে লাঠি চালিয়ে নিজেদের মাথা ভাঙলেন, কংগ্রেস বলল, 'সাবাস, সাবাস'।

কৃত্তিবাস ওঝার তথ্যনিষ্ঠ বিবরণী থেকে জানা যাচ্ছে বামপন্থী অনৈক্যের জন্য মূলত দায়ী যে দল, তার নাম 'মার্ক্স-বাদী কম্যুনিস্ট পার্টি", চলতি ভাষায়, 'বাম কম্যুনিস্ট পার্টি"। জন্ম ৩১শে অক্টোবর, ১৯৬৪ এবং মৃত্যু—। না, মৃত্যু এখনও হয় নি, তবে 'নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই মৃত্যুযোগ'—ইতি জ্যোতি (ষ)-বচনার্থ!

এই বামপন্থী কম্যুনিস্ট দল বারংবার ঘোষণা করছে, তারাই আদি এবং অকৃত্রিম মার্ক্সবাদী। এদের কথা ভেবে বোধ হয় দূরদর্শী মার্ক্স বলেছিলেন, Thank God I am no Marxist!

* * *

বাম কম্যুনিস্ট পার্টি কেন যে 'দক্ষিণ নয় এবং কোন হিসাবে তা মার্ক্সিস্ট আমি অনেক ভেবেও তার উত্তর পাই নি। আমার চাইতে অধিকতর বুদ্ধিমান এবং রাজ-নীতি-বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত অনেক মহাজন-কেও উপরের প্রশ্ন করে কোন জবাব মেলে নি। ফলে এই পার্টিকে একমাত্র মরশুমী ফুলের সঙ্গেই তুলনা করা যায়, কংগ্রেসী শাজাহানের হাতে শোভা পাবার জন্যই যার সৃষ্টি।

বস্তুত বর্তমান নির্বাচনে বামপন্থী জোট ভাঙার কাজে বাম কম্যুনিস্ট পার্টি যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তাতে বাম কম্যুনিস্ট পার্টিকে কংগ্রেসের বাম হাত বলে যদি কেউ মনে করে তাকে দোষ দেওয়া যাবে না এবং এই বামপন্থী যে আসলে বামাপন্থী তার বহু প্রমাণ ইতি-মধ্যে পাওয়া গেছে।

* * *

কলহপ্রিয়া মেয়েদের মতো বামাপন্থী কম্যুনিস্ট প্যাচর জনেক নেতা অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে আত্মস্থ হয়েছেন! সংবাদে প্রকাশ, অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে উক্ত নেতার বক্তব্যঃ (১) অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতার্থে কানাডার টোরেণ্টো বিশ্ববিদ্যা-লয়ে গমন রীতা ফারিয়ার দক্ষিণ ভিয়েত-নামে মার্কিন সৈন্যদের মনোরঞ্জনের জন্য যাওয়ার সমতুল্য, (২) অধ্যাপক মুখো-পাধ্যায় ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীনের সম্প্রসারণ নীতির বিপদ সম্পর্কে বক্তৃতা করেছেন, সে বক্তৃতা উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে রেকর্ড করা আছে ভবিষ্যৎ বংশধরদের বিভ্রান্ত করবার জন্য এবং (৩) অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে টোরেণ্টো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।

এই অভিযোগগুলি যে কি নিতান্তই বালসুলভ, অশালীন, ঈর্ষাপ্রণোদিত ও তথ্যবিশ্লিষ্ট তা ব্যাখ্যা করতেও শিক্ষিত কলমে বাধে এবং রাজনৈতিক কারণে নিরুপায়ভাবেই বোধ করি একটি দৈনিক পত্রিকার ২২শে জানুয়ারী সংখ্যায় তার যথাযোগ্য উত্তর দেওয়া হয়েছে।

বস্তুত অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখো-পাধ্যায়ের মতো মার্ক্সবাদে পণ্ডিত ও বিশ্বাসী সজ্জন ভারতবর্ষে বিরল সংখ্যক এবং তাঁর ইতিহাস-চেতনা অনেকেরই ঈর্ষণীয়। রাজনীতির সঙ্গে ইতিহাস সোদর-সম্পর্কে যুক্ত, একটির অভাবে অন্যটি ব্যর্থ। ফলত হীরেন্দ্রনাথ একা-ধারে কৃতী ঐতিহাসিক ও সার্থক রাজ-নীতিবিদ, উক্ত নেতার মতো তিনি নিছক রাজনীতিজীবী নন।

* * *

এতক্ষণে মনে পড়ল বাম বা মার্ক্স-বাদী কম্যুনিস্ট পার্টির উক্ত নেতার নামঃ প্রমোদ দাশগুপ্ত। সদাই চীন-তিত খাঁটি মার্ক্সিস্ট শ্রীদাশগুপ্ত এবং তাঁর সহচরদের (এখন কত জন?) চিত্তে ভারতবর্ষ দূর অস্ত্। তাঁদের জন্য তাঁদের একদা-শ্রদ্ধেয় মার্ক্সিস্ট শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ মুখো-পাধ্যায়ের উদ্ধৃতি দিলামঃ

'মার্ক্সবাদী হতে হলে ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান একান্তভাবে অপরি-হার্য। অথচ আমরাই অন্য দেশের ইতি-হাস সম্বন্ধে যতটা তৎপর, নিজের দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে একেবারেই ততটা নই। এটা মার্ক্সবাদ এবং ভারতবর্ষ উভয়েরই ক্ষতিকর, সন্দেহ নেই।......

মার্ক্সবাদ আমাদের এই শিক্ষা দিচ্ছে, জ্ঞান ও কর্ম একই সূত্রে গ্রথিত—জ্ঞান বিনা কর্ম ব্যর্থ, কর্ম বিনা জ্ঞান অসার্থক।

জ্ঞান ও কর্মের এই গ্রন্থিবন্ধন জীবনের মধ্যে রূপায়িত না করলে মার্ক্স-বাদী হিসাবেই আমরা বিড়ম্বিত হব।'

গ্রন্থমেলা

ঈদ-এর সওগাত—সম্পাদক : মজ-হারুল ইসলাম। পরিবেশক : গ্রন্থলোক, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২ মূল্যঃ দু'টাকা।

এলো খুশির ঈদ। সেই খুশি যেন সওগাতের মাধ্যমেও ছড়িয়ে পড়েছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ঈদ মোবারক। অন্নদাশঙ্কর রায়ের ভাঙাগড়ায় দুই বাংলার কথা উচ্চারিত। আবু সৈয়দ আইয়ুব বলেছেন সেকুলারিজম্ ও নেহরু সম্বন্ধে নিজস্ব মত। রেজাউল করিমের 'বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম', পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বিচ্ছেদের বেদনা' ও মুজফ্ফর আহমদের 'রাজদ্রোহ' মূল্যবান রচনা। পাঠকেরা পড়ে নতুন চিন্তার খোরাক পাবেন। এ সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণ নজরুলের একটি কবিতা—যা আমরা আগে পড়ি নি, "জীবনে যাহারা বাঁচিল না।" এতো দীর্ঘ একটি উৎকৃষ্ট কবিতা প্রকাশের জন্য সম্পাদক বিশেষ কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ক্ষ্যাপা' কবিতা-টিতে অভিনব সুর উচ্চারিত। এই বৃহদাকার পত্রিকাটিতে গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, কবিতা লিখেছেন প্রায় ৩৪ জন। এ'দের প্রায় সকলেই খ্যাতিমান, এবং প্রত্যেকেই তাঁদের রচনায় ভাবাদর্শকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন—অধুনা যা দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। লেখকদের মধ্যে আছেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, হুমায়ুন কবীর, শিবরাম চক্রবর্তী, গোলাম কুদ্দুস, গৌরী আইয়ুব, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মৈত্রেয়ী দেবী, দুর্গাদাস সরকার, আবুল কাশেম রহিমউদ্দীন, আজহারউদ্দীন, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (সম্পূর্ণ উপন্যাস) প্রমুখ। খালেদ চৌধুরী অঙ্কিত নজরুলের প্রতিকৃতিটি পেয়েও সওগাতের পাঠকরা লাভবান হবেন।

হেমভাবনা—সম্পাদনাঃ ডাঃ দেবাশীষ সান্যাল। সুবর্ণ জয়ন্তী, পুনর্মিলন উৎসব ১৯৬৬, আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজ, কলিকাতা। দামের উল্লেখ নেই।

কিছুদিন পূর্বে আর, জি, কর মেডি-ক্যাল কলেজে যে সুবর্ণ জয়ন্তী ও পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে সেই উপলক্ষে বাংলাদেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি-সাহিত্যিক এবং **চিকিৎসা-বিজ্ঞানের** বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রদের গল্প-কবিতা নিয়ে আলোচ্য সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছে। চিকিৎসা-জগতে যাঁরা রয়েছেন এবং যাঁরা আসবেন তাঁদের এই ধরণের সফল প্রচেষ্টা শুধু দুর্লভ নয়, অসাধারণ।

'হেমভাবনা'য় প্রকাশিত প্রতিটি রচনাই **চিকিৎসা-বিজ্ঞান** সম্পর্কিত। এতে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা যেমন দেখিয়েছেন যে, তাঁরা রোগীর মনের খবরও রাখেন, তেমনি চিকিৎসা-বিজ্ঞানী যাঁরা ন'ন তাঁরাও প্রমাণ করেছেন যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের তাত্ত্বিকতায় তাঁরা কম অভিজ্ঞ ন'ন। স্বভাবতই এই ধরণের সংকলন পাঠ করে পাঠকেরা তৃপ্ত হবেন এবং বাংলা সাহিত্যের সম্প্রসারিত সীমায় অভি-নব রসের আস্বাদ লাভ করবেন। বর্তমান সংখ্যায় লেখকদের মধ্যে আছেন বনফুল, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিশ্বনাথ রায়, দুর্গাদাস সরকার, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জন কর, দেবাশীষ সান্যাল প্রমুখ বাইশ জন লেখক।

নওরোজ—সম্পাদকঃ আবদুল মজিদ। নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ১৩।৪-বি কলিন লেন, কলিকাতা-১৬। দাম ঃ এক টাকা।

'নওরোজে'র ঈদ সংখ্যায় কাজী নজ-রুল ইসলামের 'ঈদের চাঁদ'-এ একালের মানুষের মনের কথাই অভিব্যক্ত। মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন অন্নদাশঙ্কর রায় (সেতু-বন্ধ), কাজী আব্দুল ওদুদ (শিল্পী মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়), ভবানী মুখোপাধ্যায় (সমরসেট মম), রেজাউল করিম (কবি ব্রাউনিং) প্রমুখ খ্যাতিমান লেখকগণ। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ক্রাইসিস' গল্প জীবন-চেতনায় অনবদ্য। এছাড়া অন্যান্য গল্পগুলিতেও যুগধর্মের কথাই উচ্চারিত। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বিবেকানন্দ' কবিতা মুগ্ধ করে দেয়। এছাড়া বাকী ষোলটি কবিতা রসোত্তীর্ণ।

সচিত্র শ্রীমতী—প্রধান সম্পাদিকা ঃ শ্রীমতী আভা চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদিকা ঃ শ্রীমতী আভা পাকড়াশী। ২৯, ওয়াটারলু স্ট্রীট, কলিকাতা-১। মূল্য ঃ ১·৫০

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকৃষ্ণ ও যীশুখৃস্ট', অমিতাভ চৌধুরীর 'ছোটদের বড়দিন', নীলিমা সেন (গঙ্গোপাধ্যায়)-এর 'ডিসেম্বরের শেষ', হিরণ্যপ্রিয়'র আমে-রিকার বড়দিন, নচিকেতা ভরদ্বাজ অনূদিত পাস্তারনাকের 'ক্রিসমাসের তারা' বড়দিন উপলক্ষে এই সংখ্যার উল্লেখযোগ্য রচনা। 'শ্রীমতী'র বিভাগীয় রচনাতে আছে মহিলা-দের জীবন-চিত্র, কুড়ি কথা, ফ্যাশান, সেলাই বোনা, মিঠে-কড়া, ডাক্তারী, নতুন রান্না, গীতি, নাট্য, অনুষ্ঠান, সংগীত, ও চিত্র সন্দেশ। এছাড়া আছে একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস, রমাপদ চৌধুরী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, আভা পাকড়াশী প্রমুখ খ্যাতিমান লেখক-লেখিকাদের গল্প। কালিদাস রায়, অরুণ সোম, মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত, শান্তনু দাস প্রমুখের রচনা ও বৈচিত্র্যগুণে আকর্ষক।

('চক্ষুষা কাণঃ' গ্রন্থ থেকে, পৃঃ ৪৮ ও ৫৪)।

'"জ্ঞাতুম ইচ্ছা" — জিজ্ঞাসা — যেন আমাদের মন থেকে মুছে গিয়েছে, স্বদেশ-বাসী সম্বন্ধে কৌতূহলও তাই আমাদের অত্যন্ত স্বল্প। এই কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা থাকলেই আজ আমরা দেশকে জানতে পারতাম। আর দেশকে না জানলে যে বদলাতে পারা যায় না, মার্ক্সবাদের এই চূড়ান্ত শিক্ষাকে আয়ত্ত করে কর্মের পথে অগ্রসর হতে পারতাম। কিন্তু আমরা দেশকে জানি না, জানি না বলে বিশেষ যে দুঃখিত তাও নই, বাকচাতুরীর উপরই তাই আমরা এখনও প্রধানত নির্ভর করে থাকছি।' (তদেব, পৃঃ ৩)।

হীরেন্দ্রনাথ যে প্রমোদবাবুর মতো 'দেশ'-কে বাদ দিয়ে 'স্ব'-সর্বস্ব নন, তার প্রমাণ তাঁর 'স্বদেশ'প্রেমে, যার বহু দৃষ্টান্ত তাঁর রচনাবলীতে প্রকীর্ণ। বিদেশে গিয়েও যে তিনি দেশকে ভোলেন নি তার একটি প্রমাণঃ

'হঠাৎ মনে পড়ছে, লন্ডনে বার্লিংটন হাউসে আধুনিক ছবির প্রদর্শনী—গোঁগ্যাঁর একটা ছবি......সঙ্গে সঙ্গে মনে আসছে কোণারকের স্থাপত্যের হীরকদীপ্তি, কি কাণ্ডীর শত্রু স্তম্ভের মৌন মায়া। আর ভাবছি আমাদের মৃত্যুঞ্জয় ভারতবর্ষের কথা, যার মানুষ অবিদ্যা ও অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হয়েও কত মার্জিতচিত্ত......' (তদেব, পৃঃ ১৩৭)।

হীরেন্দ্রনাথের সেই ভারতবর্ষের সব মানুষ যে মার্জিত নন, প্রমোদ দাশগুপ্তের নানাবিধ সাম্প্রতিক আচার-আচরণেই তা সপ্রমাণ।

আর মার্ক্সিস্ট তকমাধারী কোন পার্টি'র নেতা হলেই যদি হওয়া যেত মার্ক্সিস্ট তাহলে প'চিশে বৈশাখ জন্মালেই হওয়া যেত রবীন্দ্রনাথ।

বঙ্গদর্শন

আবার ট্রাম চলল

দীর্ঘ তেতাল্লিশ দিন পরে কলকাতা মহানগরীতে আবার ট্রাম চালু হতে দেখে অনেকে স্বস্তিবোধ করেছেন। এবং তা করারই কথা। আমরা বারবারই বলেছি যে বাস ট্রামের বিকল্প নয়; কেন না ট্রাম এমন কতকগুলি প্রয়োজন সিদ্ধ করে যা বাসের পক্ষে সম্ভব নয়।

ট্রামের চাকা ঘোরাতে গিয়ে দুপক্ষকে নিজেদের দাবি ও জেদের বহর অনেকটা কমিয়ে আনতে হয়েছে। এটা আগে হলে জনসাধারণকে দীর্ঘদিন ধরে এত ভোগান্তি সহ্য করতে হত না। জনসাধারণকে নিজেদের স্বার্থে সকল তরফই ব্যবহার করে, কিন্তু তাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা ভাবে না। আর্থার কোয়েসলারের ভাষায় জনসাধারণ যেন বীজগণিতের "এক্স"। যাই হোক ট্রাম-শ্রমিকরা যে সামান্য কিছুও পেয়েছেন তার জন্য আমরা আনন্দিত।

আমরা একথা আগে বহুবার বলেছি যে বিদেশী ট্রাম কোম্পানীর গায়ে সামান্য আঘাতটুকু করতেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাহস করবেন না। সে কথা যে সত্যে পরিণত হয়েছে তা এবারে আর একবার দেখা গেল। আর কোথায় গেল সেই বিখ্যাত কলকাতা কর্পোরেশন?

এই ধর্মঘট ট্রাম কোম্পানী জাতীয়করণের সুন্দর সুযোগ এনে দিয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার সদ্ব্যবহারে ব্যর্থ হয়েছেন। ট্রাম জাতীয়করণ হলে, এবং একটু ভাল প্রশাসনের আওতায় থাকলে নিঃসন্দেহে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হত। বিদেশী কোম্পানী যেখানে লাভ করতে পারে সেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকসান হবে এ কথাটা যুক্তির ধোপে টেকে না। দেশী মাথা যে বিদেশী মাথার চেয়ে খাটো নয় তার প্রমাণ রুদ্রসাগরের জ্বলন্ত তৈল-কূপ নির্বাপণ।

যে কথাটা আমরা প্রতিটি সংখ্যার বঙ্গদর্শনে লিখে যাচ্ছি, অর্থাৎ ট্রাম কোম্পানী জাতীয়করণ করা হোক, অনুরূপ কথা গত ২৫শে জানুয়ারী বৃটিশ পার্লামেন্টের শ্রমিক সদস্য ডাঃ এম. এস. মিলার বলেছেন। মিলার আরও বলেছেন যে, বৃটিশ পরিচালনায় ট্রাম কোম্পানী ভারতের স্বাধীনতার এতদিন পরেও আর চলতে দেওয়া উচিত নয়। লন্ডন থেকে কলকাতার ট্রাম সম্পর্কিত কোন সমস্যার সার্থক সমাধান করা যায় না।

এবার প্রাইভেট বাসগুলিকে যথাস্থানে ফেরত পাঠানো হোক, এবং গ্যারেজে পড়ে থাকা চারশোরও বেশি স্টেট বাসকে রাস্তায় বার করা হোক। প্রাইভেট বাসগুলিকে রাখার পক্ষে বিভিন্ন সংবাদপত্রে ইতিমধ্যেই ওকালতি শুরু হয়েছে। এ বিষয়ে হয়ত অনেকে বঙ্গদর্শন লেখকের সঙ্গে একমত হবেন না, কিন্তু প্রত্যেককে অনুরোধ করি তাঁরা যেন একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখেন; প্রাইভেট বাসের দ্বারা তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত পরিবহনসমস্যার সমাধান হয়েছে কি না? গত দু মাস ধরে বড় কম সংখ্যক প্রাইভেট বাস রাস্তায় চলছে না, কিন্তু যাঁরা নিয়মিত প্রাইভেট বাস চেপেছেন এই কয়েক মাস ধরে তাঁরা নিশ্চয়ই হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছেন তাঁরা কি অবস্থায় প্রাইভেট বাসে ভ্রমণ করছেন। প্রাইভেট বাসের কণ্ডাক্টাররা অবশ্যই কর্মদক্ষ, কিন্তু তা বাসের স্বার্থে, জনসাধারণের স্বার্থে নয়। পয়সার জন্য এরা মাত্রাতিরিক্ত যাত্রী গাড়িতে তোলে, গাড়ির ছাদে বা বাম্পারেও লোক তুলতে এদের কোন আপত্তি নেই; এবং ভিতরকার যাত্রীদের ক্লেশের কথা বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে, যেখান থেকে পারে, যতজন পারে, হোক তা স্টপেজ, অথবা তা না হোক, শুধুমাত্র যাত্রী হলেই হল। এত বেশি লোক তোলার দরুণ ওঠা-নামায় বেশি সময় লাগে, আমার নিজের অভিজ্ঞতায় যা দেখেছি, হাওড়া থেকে কলেজ স্ট্রীট আসতে কোনদিনই পঁয়তাল্লিশ মিনিটের কম সময় লাগে নি, এবং কোনবারেই ট্রাফিক জাম ছিল না। আজকের দিনের জনসাধারণ সর্বদাই বসে যেতে পারবেন এমন দুরাশা করেন না, কিন্তু ভদ্রভাবে দাঁড়িয়ে যাবার অধিকারটুকু নিশ্চয়ই স্টেট বাস, প্রাইভেট বাস ও ট্রামের কাছ থেকে দাবি করতে পারেন। এই দিক থেকে বিচার করলে কলকাতায় প্রাইভেট বাস যাত্রীসাধারণের কোনই উপকার করতে পারে নি। স্টেট বাস লাভ করতে পারে না প্রাইভেট বাস লাভ করতে পারে অতএব প্রাইভেট বাসের থাকা উচিত, যুক্তির ধারাটা সর্বত্রই যেন এই রকম দাঁড়িয়েছে। যদি এরকম প্রমাণ নিশ্চিত পাওয়া যেত যে প্রাইভেট বাসের দ্বারা হতভাগ্য যাত্রীদের কিছু সুরাহা হয়েছে, একটু স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে তাহলে আমরা শতমুখে প্রাইভেট বাসকে সমর্থন করতে পারতাম। তা যখন হয়ই নি, তখন ওগুলিকে যথাস্থানে ফেরত পাঠানো হোক। এ ছাড়া এ অভিযোগ আমরা পেয়েছি যে অনেক ক্ষেত্রেই এমন ড্রাইভার দিয়ে বাস চালানো হয় যাদের ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই বা যারা অপরের লাইসেন্সে গাড়ি চালায়। এদের আইডেন্টিফিকেশনের বিশেষ সমস্যা আছে, যেটা আশা করি বুদ্ধিমান পাঠকেরা বুঝতে পেরেছেন।

এবারে গমের পালা

প্রতি সপ্তাহেই খাদ্যাবস্থার উপর মুখ্যমন্ত্রীর একটি করে ঘোষণা শুনতে

হয়, এবং আমরা এতে বরাবরই অভ্যস্ত। মুখ্যমন্ত্রী যদি ঘোষণা না করে নিঃশব্দে কাজ করার নির্দেশ দিতেন তাহলে অনেক সমস্যার হাত থেকে দেশবাসী রক্ষা পেত। কথা বলা মানেই খুঁচিয়ে সমস্যা সৃষ্টি করা।

এখানে আমরা সমাজের সেই শ্রেণী-টির অবস্থাই তুলে ধরব যারা অল্পবিত্ত, যারা দিন আনে দিন খায়, যারা কালো টাকা চোখে দেখে নি, এবং তথাকথিত মরাল ভ্যালুর প্রতি যাদের এখনো কিছু আস্থা আছে।

বস্তুত দেশে এখন চালের অভাব নেই, সর্বত্রই খোলা বাজারে চাল পাওয়া যাচ্ছে (অবশ্য আগামী সপ্তাহে পাওয়া যাবে কি না বলা মুস্কিল, কেন না এখানকার বাজারগুলি বহুরূপী, ক্ষণে ক্ষণেই রূপ বদলাচ্ছে)। খোলাবাজারে চাল পাওয়া গেলেও যে দামে তা বিক্রি হচ্ছে তা গরীব মানুষের নাগালের বাইরে। কাজেই গমই তাদের একমাত্র ভরসা. আর একটু চেষ্টা করলে, বা রেশনের দোকানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে, অনেকে যে গম ছেড়ে দেয়, তা থেকে কিছুটা সংগ্রহ করা সম্ভব।

আমি আমার নিজের কথাই বলছি। আমি অল্পবিত্ত মানুষ, কালোবাজারে চাল কিনে খাবার পয়সা আমার কোনদিন ছিল না, আজও নেই। এ-যুগের তুলনায় আমি কিছুটা কাপুরুষ, কেন না বেআইনী কাজ করতে নিজে থেকেই লজ্জা পাই। রেশনে যা চাল পাই তাতে, বলা বাহুল্য একেবারেই কুলোয় না। কাজেই আমরা সকলে সপ্তাহের বেশির ভাগ দিনই দুবেলা রুটি খাই, তাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

রেশন দোকান থেকে আমরা যে গম পাই তাতে দুবেলা রুটি খেতে গেলে কুলোয় না। আমার প্রতিবেশী একজন ধনী ব্যক্তি আছেন যাঁরা গম ব্যবহার করেন না, কালোবাজার থেকে চালই কেনেন। তাঁরা প্রতি সপ্তাহে যে গমটা ছেড়ে দেন সেটা আমরা নিই। তাতে আমাদের চলে যায়।

মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে পশ্চিম-বঙ্গে এবারে গমের সংকটও দেখা গেছে। ফলে আমার প্রতিবেশী আর এ সপ্তাহে গম ছাড়ছেন না।

এখন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার জিজ্ঞাস্য, কোন অপরাধে, পেটের ভাত চুলোয় যাক, দুবেলা কয়েকখানি রুটি খেতে পাবার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হব? মুখ্যমন্ত্রীমশাই বোধহয় এ অবস্থায় আমাকে একটিমাত্রই উপদেশ দিতে পারেন: "বাপু হে তুমি বঙ্গদর্শন লেখা ছেড়ে দিয়ে পর্নোগ্রাফী লিখে কিছু কালো টাকা রোজগারের চেষ্টা কর, আর তা যদি করতে পার তাহলে সেই টাকায় কালো-বাজার থেকে চাল কেন।"

নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ

প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশেই নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দলগুলি কয়েকটি বিশেষ আচরণবিধি মেনে চলেন। পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও সাধারণ ভদ্রতা-জ্ঞানটুকু তাঁরা হারান না। কিন্তু আমাদের দেশে সমস্ত উল্টো, এখানে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির কর্মীদের মধ্যে হাতাহাতি মারামারি তো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, সংশ্লিষ্ট দলগুলির শ্রদ্ধেয় নেতারা পর্যন্ত প্রকাশ্য জনসভায় একে অপরের বিরুদ্ধে যে ধরণের ব্যক্তিগত আক্রমণ ও কুৎসা চালান, এবং সভ্যতা ও শালীনতাবিরোধী কথাবার্তা বলেন, সেই সব অভিধান-বহির্ভূত শব্দের ব্যাপক প্রয়োগ দেখে যে কোন ভদ্রলোক নির্বাচনী-সভা থেকে যেন পালাতে পারলেই বাঁচেন।

তাও মোটামুটি আমাদের দেশের রীতি বলে গণ্য হয়ে গেছে। কিন্তু আর একটি বিষয় বড় মর্মান্তিকভাবে আত্ম-প্রকাশ করছে যার পরিণতি গণতন্ত্রের পক্ষে একান্তই বিপজ্জনক। শাসকদল ক্ষমতায় আসীন থাকার সুযোগে সরকারী প্রশাসনকে দলীয় স্বার্থে নিযুক্ত করার যে বদ ঐতিহ্য স্থাপন করেছেন তার ফলে সমগ্র নির্বাচন ব্যবস্থাটাই কালক্রমে যে একটা প্রহসনে পরিণত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হয়েছি যে চব্বিশ পরগনার বারুইপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বাম গণফ্রন্টের কর্মীদের নানাভাবে ভীতিপ্রদর্শন করা হচ্ছে। পুলিশের লোকেরা বিশেষত **ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের লোকেরা এই কর্মী-দের বাড়িতে হানা দিয়ে নানারকম জিজ্ঞাসাবাদ ও হয়রানি করছে। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও নিন্দনীয় বিষয় হল এই যে জনৈক রাষ্ট্রমন্ত্রী সপ্তাহে গড়ে চারদিন স্থানীয় থানায় বসে নাকি পুলিশ দপ্তরকে এই সমস্ত কাজে নিয়োজিত করছেন।** এই ধরণের উদ্দেশ্যমূলক ও গণতন্ত্রবিরোধী কাজ করার অধিকার তিনি কোথা থেকে পেলেন এই জিজ্ঞাসা আজ ওই অঞ্চলের সর্বত্রই মুখরিত হয়েছে। রাষ্ট্রমন্ত্রী মহাশয়ের এই কার্যকলাপ দেখে আমরা কি এটাই ধরে নেব যে এইভাবেই ফ্যাসীবাদের দরজা খুলে দেওয়া হচ্ছে, নির্বাচন একটি ভেক মাত্র?

স্বাস্থ্যদপ্তরে অপব্যয় ও স্বজনপোষণ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যদপ্তরের প্রতি জনসাধারণের অভিযোগের বোধ হয় অন্ত নেই, এবং আমরা পূর্বে বঙ্গদর্শনে এ বিভাগের অজস্র দুর্নীতি ও কদাচারের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে তা প্রতিকারের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট নিবেদন জানিয়েছিলাম, জানি না তাতে কতটুকু কাজ হয়েছে।

সম্প্রতি আরও একটি গুরুতর অভিযোগের কারণ ঘটেছে। এ অভিযোগ অপব্যয়ের ও স্বজনপোষণের। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হয়েছি যে, স্বাস্থ্য-দপ্তরে দরাজ হাতে কোন কোন ব্যক্তির স্বার্থে অর্থের অপচয় করা হচ্ছে। সর-কারী দপ্তরে নিয়ম আছে যে যদি কোন নন-গেজেটেড কর্মচারী তাঁর নিজের কাজের বাইরে অন্য কোন কাজ করতে বাধ্য হন তাহলে তার জন্য তাঁকে কিছু দক্ষিণা দেওয়া যেতে পারে। **এই ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে স্বাস্থ্যদপ্তরে একটি অনাচারের প্লাবন এসেছে। আমরা একটি তালিকা হাতে পেয়েছি যাতে প্রমাণিত হয় যে অন্যূন কুড়িজন লোককে এই অছিলায় বারে বারে মোটা টাকা পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে এদের কাউকেও কোন বাড়তি কাজ করতে হয় নি। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহোদয় তো এখন নির্বাচনী সফরে ব্যস্ত। কাজেই এ বিষয়ে যে কার দৃষ্টি আকর্ষণ করব সেটা বুঝতে পারা যাচ্ছে না। স্বাস্থ্য অধিকর্তাকে জানিয়ে বোধহয় কোন লাভ নেই, কারণ বিভাগটি নাকি তাঁরই বিভাগ। আমরা বরং মুখ্যমন্ত্রীর সেক্রেটারীয়েটের স্পেশাল অফিসারকে এ বিষয়ে কিছুটা দৃষ্টি দিতে বলছি। বিষয়টি সত্যই তদন্তের যোগ্য।**

পরিকল্পনা কমিশনের কার্পণ্য

সেই পুরাতন বিষয়টাই যখন বঙ্গ-দর্শনের অন্যতম ফীচার হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন প্রতিটি সংখ্যায় তার জের না টেনে উপায় নেই।

আমরা পূর্বে পরিকল্পনা কমিশনের কলকাতা আগমন এবং পশ্চিমবঙ্গ সর-কারের সঙ্গে কমিশনের বিবাদের কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে পরি-কল্পনা কমিশন পশ্চিমবঙ্গের জন্য সর্ব-সাকুল্যে চতুর্থ পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সাহায্য হিসাবে বরাদ্দ করেছেন ২০৫ কোটি টাকা। বলাই বাহুল্য এত অল্প টাকা মঞ্জুর করে পশ্চিমবঙ্গকে নিদারুণ উপেক্ষা করা হয়েছে।

গত ডিসেম্বর মাসে অশোক মেহতা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের সঙ্গে যে বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন তা থেকে কোন সুফল পাওয়া যায় নি। অজস্র তথ্য ও যুক্তি উত্থাপন করেও কমিশনের মন

জলানো যায় নি। শোনা যায় পশ্চিম-বঙ্গের অর্থমন্ত্রী মশাই বিরক্ত হয়ে বৈঠক পরিত্যাগ করে চলে যান। সেই নিষ্ফল বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী পরিকল্পনা কমিশনের নিকট একটি দীর্ঘ পত্রে জানান যে অনুন্নত রাজ্যের অজুহাত দিয়ে যদি আসাম, কাশ্মীর ও নাগাভূমির বেলায় অতিরিক্ত সাহায্য মঞ্জুরের প্রয়োজন হয়, তাহলে মহারাষ্ট্রের মত শিল্পোন্নত রাজ্যের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সাহায্য এত দরাজ হল কেন? ওই পত্রে অজস্র যুক্তি ও তথ্যের সাহায্যে দেখানো হয় যে পশ্চিম-বঙ্গের সমস্যাটা কি এবং তার প্রয়োজনটা কোথায়।

কিন্তু দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। পরিকল্পনা মন্ত্রী অশোক মেহতা পাল্টা একটি দীর্ঘ পত্রে পশ্চিমবঙ্গের নামে কয়েকটি অলীক অভিযোগ আনেন। তাঁর অভিযোগের বিষয়বস্তু হচ্ছে যে, চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম বছরে কৃষিখাতে জরুরী বরাদ্দের টাকা রাজ্য সরকার ব্যয় করতে পারেন নি এবং এই প্রকল্প রূপায়ণে পশ্চিমবঙ্গ শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। অন্ধ্র, বিহার, গুজরাট, মাদ্রাজ ও মহারাষ্ট্র তৃতীয় পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দ অর্থের অনেক বেশি ব্যয় করেছে, এই জন্যই এই রাজ্যগুলিকে চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষি, সেচ ও বিদ্যুৎ খাতে কমিশনকে অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে। সত্যি অপরূপ যুক্তি সন্দেহ নেই। শ্রীমেহতার শ্রীবৃদ্ধি হোক।

অশোক মেহতা আরও লিখেছেন যে, যে-সকল রাজ্য ভাল ফল দেখিয়েছে তাদের উপর পশ্চিমবঙ্গের হিংসা করা উচিত নয়। অবশ্য শ্রীমেহতার কাছে ভাল-মন্দের ক্রাইটেরিয়ন কি সেটা আমাদের জানা নেই। বিহার সরকার কত ভাল ফল করেছে তা সাম্প্রতিক খরাক্লিষ্ট বিহারের অবস্থা দেখলেই বোঝা যায়। মেহতার এই অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি অস্বীকার করেছেন এবং একথা জানিয়েছেন যে, কেন্দ্রের এই ধারণা সম্পূর্ণ অলীক ও কল্পনা-প্রসূত।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গকে যারা টাকা দেবে না বলে স্থির করেছে তাদের হৃদয়কে গলাবার যে-কোন চেষ্টাই ব্যর্থ হতে বাধ্য। মুখ্যমন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দিই, তিনি তো ইতিপূর্বে নয়াদিল্লীতে বহুবার দরবার করেছেন, তাতে কিছু ফল হয়েছে কি? এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রীও তদ্বির-তদারক করেছেন, তা-ও মাঠে মারা গেছে। মাস দুয়েক আগে রাজ্য সরকারের প্রায় আশীজন অফিসার একসঙ্গে পরিকল্পনা কমিশনের কাছে তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন, কোন ফল হয় নি। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে বারবার দিল্লীতে ও কলকাতায় আলোচনা হয়েছে, কোন ফল হয় নি। মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, বার বার তিনবার, কোন ফল হয় নি।

এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের কর্তব্য শক্ত হওয়া। আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার যে শক্তের ভক্ত, নরমের যম, একথা নিশ্চয়ই বুঝিয়ে বলতে হবে না। আসামের পার্বত্য জাতিগুলির সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবহারেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার যা উপার্জন করেন তা বড় অল্প নয়। আয়কর বাবদ ভারত সরকারের বোধ হয় সর্বাধিক আয় হয় পশ্চিমবঙ্গ থেকে, অথচ তার খুব সামান্য অংশই পশ্চিমবঙ্গ সরকার ফেরৎ পায়। ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের সবচেয়ে বড় উৎস পশ্চিমবঙ্গ, কিন্তু তার কোন স্বীকৃতি নেই। ভারতের সবচেয়ে সমস্যাজর্জর রাজ্যটির প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃসুলভ মনোভাব কোনক্রমেই ক্ষমার যোগ্য নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় সরকারকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া উচিত যে, কেন্দ্র যদি তার মনোভাব ইতিমধ্যে পরিবর্তন না করে তাহলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচিত কেন্দ্রের সঙ্গে সর্বপ্রকারে অসহযোগিতা করা। তাতে পশ্চিমবঙ্গের তেমন কোন লোকসান হবার ভয় নেই।

জনৈক বাঙালী ভদ্রলোকের বিপদ

সেদিন ট্রেনে এক বাঙালী ভদ্রলোক শুধুমাত্র বাংলাভাষা জানার, এবং হিন্দী ও ইংরাজী না জানার অপরাধে, অযথা বিড়ম্বিত ও বিপদাপন্ন হলেন। সেই কাহিনীটাই আপনাদের খুলে বলছি। ভদ্রলোক শেয়ালদা থেকে ট্রেনে চড়েছিলেন, যাবেন মাত্র বারো মাইল দূরে টিটাগড়ে। ভদ্রলোক আমার পাশেই বসেছিলেন। ট্রেন যখন টিটাগড় স্টেসন ছাড়িয়ে চলে গেল, তখন আমার হঠাৎ খেয়াল হল যে আমার পার্শ্ববর্তী ভদ্রলোক টিটাগড় স্টেসনে নামেন নি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কি দাদা, টিটাগড় তো পেরিয়ে গেল, আপনি নামলেন না?" ভদ্রলোক বললেন, "কই, টিটাগড় নামের তো কোন স্টেসন দেখলাম না, নামব কি করে?" আমি বললাম, "সে কি মশাই, অমন সাইনবোর্ডে নাম লেখা রয়েছে, স্টেসনের মাথায় বড় বড় করে নাম লেখা রয়েছে, আর আপনি দেখতে পেলেন না?" ভদ্রলোক বললেন, "বিশ্বাস করুন ভাই, আমি সবকটি সাইনবোর্ড দেখেছি, কিন্তু টিটাগড় নামটি কোথাও লেখা নেই।" ততক্ষণে ট্রেন ব্যারাকপুরে চলে এসেছিল, ভদ্রলোক সেখানেই নামলেন।

পরের দিন আবার আমি শেয়ালদায় আসছি। হঠাৎ টিটাগড়ে গাড়ি থামতেই পূর্বদিনের ভদ্রলোকের কথা মনে হল। আমি ট্রেন থেকে প্রতিটি সাইনবোর্ড লক্ষ্য করলাম। দেখলাম যে ভদ্রলোক ঠিকই বলেছিলেন। হিন্দীতে নাম লেখা আছে, ইংরাজীতে নাম লেখা আছে, কিন্তু বাংলায় লেখা স্টেসনের নাম সবচেয়ে নিচে ছিল, কিন্তু তা আলকাতরা দিয়ে মুছে দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, **বাংলাদেশেরই বুকে, কলকাতা থেকে মাত্র বারো মাইল দূরে, বাংলায় লেখা স্টেশনের নাম আলকাতরা দিয়ে মুছে দেওয়া হয়েছে।**

প্রাক-নির্বাচনী সমীক্ষা (২)

এবারে প্রজা সোসালিস্ট পার্টির কথায় আসা যাক। এই পার্টির অবস্থা খুবই শোচনীয় চলছে প্রায় এক যুগ ধরেই। ১৯৫৭-র নির্বাচনে লোকসভায় এই পার্টি দুটিমাত্র আসন সংগ্রহ করতে পেরেছিল, কিন্তু ১৯৬২-র নির্বাচনে দুটো আসনই খোয়া গেছে, একটি গেছে মেদিনীপুরের কন্টাই থেকে কংগ্রেসের হাতে, অপরটি গেছে চব্বিশ পরগনার বারাকপুর থেকে কমিউনিস্ট পার্টির হাতে।

বিধান সভার নির্বাচনেও ১৯৫৭-র তুলনায় ১৯৬২তে প্রজা সোসালিস্ট পার্টি মার খেয়েছে। ১৯৫৭-র নির্বাচনে এই পার্টি পেয়েছিল ২১টি আসন, যেখানে ১৯৬২-র নির্বাচনে তাকে মোট পাঁচটি আসন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। ১৯৫৭-র নির্বাচনে এই পার্টি চব্বিশ পরগনা থেকে চারটি, বীরভূম থেকে একটি, বর্ধমান থেকে তিনটি, কলকাতা থেকে চারটি, হাওড়া থেকে একটি, জলপাইগুড়ি থেকে একটি, এবং মেদিনীপুর থেকে পাঁচটি আসনে জয়ী হয়েছিল। ১৯৬২-র নির্বাচনে এই পার্টি শুধুমাত্র মেদিনীপুরে দুটি আসন বজায় রাখতে সক্ষম হয়, বাকি উনিশটি আসন থেকে এই পার্টি সমূলে উৎপাটিত হয়, তবে ১৯৬২-র নির্বাচনে এই পার্টি তিনটি নতুন আসন সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়, একটি পশ্চিম দিনাজপুরে, একটি মুর্শিদাবাদে, একটি নদীয়ায়। সব মিলিয়ে মোট পাঁচটি।

অবশ্য এই পাঁচটি আসনই প্রজা সোসালিস্ট পার্টি কংগ্রেসের কাছ থেকে আদায় করেছিল। যে একুশটি আসন থেকে এই পার্টি উৎপাটিত হয়েছিল তার মধ্যে পনেরটি নিয়েছিল কংগ্রেস ও তিনটি কমিউনিস্ট।

এবারে পি-এস-পি থেকে এস-এস-পি বেরিয়ে যাওয়ায় এই পার্টির সাংগঠনিক দিক অধিকতর দুর্বল হয়েছে। এস-এস-পি'র শক্তি সামর্থ্যের পরিচয় এ পর্যন্ত

কিছু পাওয়া যায় নি। বাম কমিউনিস্ট পার্টির ছত্রছায়ায় এস-এস-পির বরাতে হয়ত দু-চারটে আসন জুটে যেতে পারে, কিন্তু একথাও ভুললে চলবে না যে, গত-বারে তাদের "অ্যাচীভমেন্ট" প্রজা সোসালিস্ট পার্টির ওই পাঁচটি আসনের নিরিখে বিচার করতে হবে।

গত নির্বাচনে পি-এস-পির শোচনীয় ব্যর্থতা প্রসঙ্গে ভাসিল মন্তব্য করেছেন, "কমিউনিস্ট প্রভাবিত যুক্তফ্রন্টে যোগদান না করে প্রজা সোসালিস্ট পার্টি কংগ্রেসকেই সাহায্য করেছিল। যুক্তফ্রন্টের বাইরে থাকার দরুণ এই পার্টির প্রোপাগান্ডা কমিউনিস্ট বিপক্ষেও পরিচালিত হয়েছিল। বস্তুত এই পার্টি তীব্রতম প্রচার করেছিল কমিউনিস্ট পার্টিরই বিরুদ্ধে। কিন্তু যেহেতু এই পার্টি সংগঠনের দিক থেকে দুর্বল, এবং জনসাধারণের কাছেও বিকল্প কোন বলিষ্ঠ আবেদন রাখতে পারে নি, সেই হেতু কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে এই পার্টির প্রোপাগান্ডা শহরাঞ্চলেও বিশেষ কোন প্রভাব ফেলতে পারে নি। যে সব ভোটাররা এই প্রোপাগান্ডার দরুণ কমিউনিস্টদের প্রতি বীতরাগ হয়েছিলেন তাঁরাও নিজেদের ভোট প্রজা সোসালিস্ট পার্টিকে না দিয়ে কংগ্রেসকেই দিয়ে-ছিলেন।"

এরপর অপরাপর ছোট ছোট পার্টিদের ক্ষেত্রে আসা যাক। প্রথমেই ধরা যাক সোসালিস্ট ইউনিটি সেন্টারের কথা। ১৯৫৭-র নির্বাচনে চব্বিশ পরগনা থেকে এই পার্টি দুটি আসন পেয়েছিল, ১৯৬২-র নির্বাচনে দুটি আসনই মর্মান্তিকভাবে খোয়া গেছে। রিভলিউশনারী সোসালিস্ট পার্টি বা আর-এস-পির অবস্থা এবারে দেখা যাক। ১৯৫৭-র নির্বাচনে চব্বিশ পরগনায় এই পার্টি যে আসনটি পেয়েছিল ১৯৬২-র নির্বাচনে তা খোয়া গেছে। কলকাতায় ১৯৫৭-র নির্বাচনে এই পার্টি একটি মাত্র আসন পেয়েছিল, ১৯৬২-তেও ওই একটি আসন বজায় রাখতে আর-এস-পি সক্ষম হয়। পশ্চিম দিনাজপুরেও অনুরূপভাবে একটি আসন এই পার্টি বজায় রেখেছে। জলপাইগুড়িতে এই পার্টি পেয়েছে বাড়তি দুটি আসন ১৯৬২-র নির্বাচনে। মুর্শিদাবাদেও ১৯৬২-তে এই পার্টি তিনটি অধিক আসন পেয়েছে। অতএব আসনের বিচারে ১৯৫৭-র চেয়ে ১৯৬২-তে আর-এস-পি কিছুটা উন্নতি করেছে। ১৯৬২-তে এই পার্টি লোকসভাতেও একটি আসন অর্জন করতে সমর্থ হয়।

ফরোয়ার্ড ব্লকও ১৯৫৭-র তুলনায় ১৯৬২-তে অধিকতর উন্নতি করেছে। ১৯৫৭-র নির্বাচনে এদের চব্বিশ পরগনার আসনটি ১৯৬২-র নির্বাচনে খোয়া যায়। কিন্তু ১৯৬২-র নির্বাচনে বীরভূম থেকে এই পার্টি দুটি নতুন আসন সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। ১৯৫৭-র কলকাতা থেকে পাওয়া আসনটিও ১৯৬২তে ফরোয়ার্ড ব্লক রক্ষা করতে পারে। কিন্তু ফরোয়ার্ড ব্লক সবচেয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছে কুচবিহারে যেখানে তারা ১৯৬২-তে পাঁচটি নতুন আসন অধিকার করেছে। হুগলীতেও তারা একটি নূতন আসন লাভ করে। হাওড়ায় ১৯৫৭-র নির্বাচনে ফরোয়ার্ড ব্লক চারটি আসন পেয়েছিল, ১৯৬২-তে তার একটি খুইয়েছে। অপরপক্ষে পুরুলিয়াতে ১৯৬২-র নির্বাচনে ফরোয়ার্ড ব্লক একটি নতুন আসন সংগ্রহ করতে পেরেছে। গত নির্বাচনে লোকসভাতেও ফরোয়ার্ড ব্লক একটি নতুন আসন সংগ্রহ করেছে।

এই দিক থেকে বিচার করলে ফরোয়ার্ড ব্লকের উন্নতির রেকর্ড আর-এস-পির চেয়ে ভাল। পক্ষান্তরে মার্কসিস্ট ফরোয়ার্ড ব্লকের অবস্থা সোসালিস্ট ইউনিটি সেন্টারের মতই। এই পার্টি ১৯৫৭ সালে বর্ধমান থেকে একটি ও হাওড়া থেকে একটি আসন পেয়েছিল, ১৯৬২-তে দুটোই গেছে। লোকসেবক সংঘ একটি আঞ্চলিক দল, ১৯৫৭-র নির্বাচনে পুরুলিয়া থেকে সাতটি আসন পেয়েছিল, ১৯৬২-তে তিনটি খোয়া গেছে।

এর পরে আসছে কমিউনিস্ট পার্টির কথা, অর্থাৎ অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির কথা। ১৯৫৭-র তুলনায় ১৯৬২-তে কমিউনিস্ট পার্টি লোকসভা ও বিধান সভায় অধিকতর কৃতিত্ব দেখিয়েছে আসন দখলের ক্ষেত্রে। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে লোকসভায় কমিউনিস্ট পার্টির ছিল ৫টি আসন, সেটা বেড়ে ১৯৫৭-য় দাঁড়িয়েছিল ৬টি এবং ১৯৬২-র নির্বাচনে ৯টি। পক্ষান্তরে বিধানসভার নির্বাচনে কমিউ-নিস্ট পার্টি ১৯৫২, ১৯৫৭ ও ১৯৬২-তে যথাক্রমে পেয়েছিল ২৮, ৪৬ ও ৫০টি আসন। প্রাপ্ত ভোট সংখ্যার হার ছিল শতকরা হিসাবে লোকসভায় যথাক্রমে ৯·৫, ১৯ এবং ২৭·৮ এবং বিধানসভায় যথাক্রমে ৯·৭, ১৭·৮ এবং ২৫·৪।

পশ্চিমবঙ্গের ষোলটি জেলার মধ্যে আটটিতে ১৯৬২-র নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি নিজের অবস্থা অধিকতর ভাল করে-ছিল। সবচেয়ে বেশি লাভ করেছিল বাঁকুড়া ও বর্ধমানে, আর মার খেয়েছিল চব্বিশ পরগনায়। ১৯৫৭ সালের তুলনায় ১৯৬২-তে কমিউনিস্ট পার্টি বাড়তি আসন লাভ করেছিল বাঁকুড়ায় ৪টি, বর্ধ-মানে ৭টি, কুচবিহারে ১টি, পশ্চিম দিনাজ-পুরে ১টি, মালদহে ১টি, মুর্শিদাবাদে ১টি এবং নদীয়াতে ২টি, আর লোকসান দিয়েছে চব্বিশ পরগনায় ৬টি, বীরভূমে ১টি, কলকাতায় ২টি, দার্জিলিং-এ ১টি, জল-পাইগুড়িতে ১টি, হাওড়ায় ২টি এবং মেদিনীপুরে ২টি। আসনের দিক থেকে বিচার করলে বৃদ্ধির পরিমাণ খুব বেশি নয় বটে, কিন্তু প্রাপ্ত ভোটের নিরিখে তাদের যে শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। ষোলটি জেলার মধ্যে ১৫টি জেলায় কমিউনিস্ট পার্টির শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল, শুধু একটিমাত্র জেলায়, বীর-ভূমে তাদের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ১৯৫৭-র তুলনায় কম ছিল। যেখানে কংগ্রেস নয়টি জেলায় পূর্বের তুলনায় অধিক প্রাধান্য অর্জন করেছিল সেখানে কমিউনিস্ট পার্টি পনেরটি জেলাতেই পূর্বের অধিক প্রাধান্য বিস্তার করেছিল।

এরপরে আসছে কংগ্রেসের কথা। ১৯৫৭ সালে বিধানসভায় নির্বাচনে কংগ্রেস ১৫২টি আসন সংগ্রহ করতে পেরে-ছিল যেখানে ১৯৬২ সালে তা বেড়ে ১৫৭-তে দাঁড়ায়। প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যাও ১৯৬২ সালে সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। কংগ্রেস মোটামুটি লাভ করেছিল চব্বিশ পরগনায় (১৩টি আসন), কলকাতায় (৬টি আসন), হাওড়ায় (৪টি আসন) এবং মেদিনীপুরে (৫টি আসন)। দার্জিলিং এবং পুরুলিয়াতেও সামান্য উন্নতি কংগ্রেস করেছিল। জলপাইগুড়িতে যথাপূর্ব অবস্থা, মার খেয়েছিল কুচবিহারে (৬টি আসন), বাঁকুড়ায় (৪টি আসন), নদীয়ায় (৪টি আসন) এবং মুর্শিদাবাদে (৭টি আসন)। তাছাড়া কংগ্রেস ১৯৬২-র নির্বাচনে বীরভূমে ১টি, বর্ধমানে ১টি, পশ্চিম দিনাজপুরে ২টি এবং হুগলীতে ১টি আসন হারিয়েছিল।

প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণ হিসাবে কংগ্রেস নয়টি জেলাতে লাভবান এবং সাতটি জেলাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। মোট ৫৩টি আসন কংগ্রেসের হাত থেকে অন্যান্য দল-গুলি ছিনিয়ে নিয়েছিল ১৯৬২-র নির্বা-চনে, পক্ষান্তরে অন্যান্য দলগুলির কাছ থেকে কংগ্রেস নিয়েছেল ৫১টি আসন।

অতঃপর নির্দলীয় প্রার্থীদের কথাতে আসা যাক। ১৯৫২, ১৯৫৭ ও ১৯৬২-তে লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্দলীয় প্রার্থী দাঁড়িয়েছিলেন যথাক্রমে ৫১, ২৩ ও ১৬ জন, জয়ী হয়েছিলেন যথাক্রমে ১, ৯ এবং ২ জন। বিধানসভার নির্বাচনে নির্দলীয় প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ১৯৫২, ১৯৫৭ ও ১৯৬২ সালে যথাক্রমে ৬০২, ৩৪৬ এবং ৩২৪ জন, কিন্তু জয়ী হতে পেরেছিলেন যথাক্রমে ১০, ১১ এবং ১৪ জন। নির্দলীয় প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা দেখেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে এভাবে নির্বাচন প্রার্থী হওয়ার দিন আস্তে আস্তে ফুরিয়ে আসছে।

এবারের পশ্চিমবঙ্গের দুটি প্রধান

প্রতিদ্বন্দ্বী পার্টিই দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যাঁরা বাংলা কংগ্রেস দল গঠন করেছেন তাঁদের শক্তিসামর্থ্যের মূল্যায়ন আগামী নির্বাচন না দেখলে করা সম্ভবপর নয়, তথাপি এটুকু অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে বাংলা কংগ্রেস সরকারী কংগ্রেসকে বেশ কিছুটা বেকায়দায় ফেলবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বাংলা কংগ্রেস সদস্য ১৬ জন। পক্ষান্তরে কমিউনিস্ট দলেও ভাঙন ধরেছে এবং তা আজ পরস্পরবিরোধী দুটি শত্রুশিবিরে পরিণত হয়েছে।

বর্তমান সংখ্যায় আমরা বিগত দুটি নির্বাচনের নিরিখে কোন দল কি অবস্থায় ছিল তা আলোচনা করলাম। আগামী সংখ্যায় বর্তমান নির্বাচনে কোন কোন দল কোন কোন কেন্দ্রে প্রার্থী দিয়েছে সেই হিসাবে গতবারে সেই সব কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন দলের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভাব্য পরিণতি কোন দলের পক্ষে কি রকম হবে সেই আলোচনাই করব। এবারে বিরোধী দলগুলি পরস্পর বিবদমান দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে যাবার ফলে অবস্থাটা ভিন্ন রকম দাঁড়িয়েছে। পূর্ববর্তী নির্বাচনেও বিরোধী দলগুলি কয়েকটি ফ্রন্টে বিভক্ত হয়ে গেছল, কিন্তু মূল ফ্রন্টটিই সবচেয়ে শক্তিমান ছিল, বাকিগুলির প্রভাব ছিল গৌণ। এবারকার সপ্তবাম ও চতুর্বাম ওজনের দিক থেকে প্রায়ই তুল্যমূল্য, কিছুটা হয়ত উনিশ-বিশ থাকতে পারে। গতবারের যেমন পি এস পি একদিকে কংগ্রেস ও অপরদিকে কমিউনিস্ট পার্টির বিপক্ষে প্রচার করে, কংগ্রেসেরই সুবিধা করে দিয়েছিল, নিজের কিছুই করতে পারে নি, এবারেও এই দুটি বামপন্থী জোট একে অপরের বিরুদ্ধে প্রচার করে নিজেদের ক্ষতিই করছে। উভয় তরফেরই প্রচার অভিযানে অ্যান্টি কংগ্রেস ফীলিং-এর আবহাওয়া গড়ে উঠতে পারছে না, কয়েকটি নির্বাচনী সভায় যোগদান করে যা দেখেছি—এঁরা যে কেন একজোট হতে পারলেন না, সেই কৈফিয়ৎ দিতেই বারো আনা সময় নিয়ে নিচ্ছেন এবং প্রতিপক্ষকে যেভাবে দায়ী করছেন তাতে কংগ্রেসবিরোধী মনোভাবটাকে খুব বেশি তীব্র করে তোলা সম্ভবপর হচ্ছে না।

এবারকার, অর্থাৎ ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে, লোকসভার নয়টি কেন্দ্রে এবং বিধানসভার ছাব্বিশটি কেন্দ্রে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে। কেন্দ্রগুলি হচ্ছে (১) **নবদ্বীপ** (কংগ্রেস বনাম বাংলা কংগ্রেস), (২) **বসিরহাট** (কংগ্রেস বনাম বাংলা কংগ্রেস), (৩) **তমলুক** (কংগ্রেস বনাম বাংলা কংগ্রেস), (৪) **মেদিনীপুর** (কংগ্রেস বনাম বাংলা কংগ্রেস), (৫) **ঝাড়গ্রাম** (কংগ্রেস বনাম বাংলা কংগ্রেস), (৬) **হুগলী** (কংগ্রেস বনাম বাম কমিউনিস্ট), (৭) **আউসগ্রাম** (কংগ্রেস বনাম বাম কমিউনিস্ট), (৮) **বোলপুর** (কংগ্রেস বনাম বাম কমিউনিস্ট), (৯) **আরামবাগ** (কংগ্রেস বনাম ফরোয়ার্ড ব্লক)।

১৯৫৭-র নির্বাচনে লোকসভার আসনে নবদ্বীপ থেকে কংগ্রেস প্রার্থী জয়লাভ করেছিলেন (১৩৪,০৮৪) কমিউনিস্ট প্রার্থীকে (৮৪,৯৮০) পরাজিত করে। ১৯৬২-র নির্বাচনে এই আসনটি কংগ্রেসের হাতছাড়া হয় এবং একজন বামপন্থী সমর্থিত নির্দলীয় প্রার্থী (১৫২,৮৬৯) কংগ্রেসকে (১৩৯,৬৩২) আসনচ্যুত করে। এবারে অবশ্য এখান থেকে একজন বাংলা কংগ্রেসের প্রার্থী সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। বসিরহাট থেকে বিগত নির্বাচনে কংগ্রেস জয়ী হয়েছে, এটা কিন্তু আগে ছিল কমিউনিস্টদের সীট। ১৯৬২-র নির্বাচনে কংগ্রেস পেয়েছিল ১৬৭,০২৮টি ভোট যেখানে কমিউনিস্ট পার্টি পেয়েছিল ১৫৯,৭৬২টি ভোট। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এখান থেকে গতবারে কংগ্রেসের হয়ে যিনি দাঁড়িয়েছিলেন, এবারে বাংলা কংগ্রেসের হয়ে তিনিই কংগ্রেসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। হুগলীতে বিগত দুবারই ত্রিপাক্ষিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল, এবং দুবারই কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী জয়লাভ করেছিলেন। এবারে হচ্ছে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কংগ্রেস বনাম বাম কমিউনিস্ট পার্টি।

পশ্চিমবঙ্গ ও পরিবার পরিকল্পনা

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা শিক্ষণ শিবির চালু হয়েছে। উদ্দেশ্যটা যে কি আশাকরি তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজনীয়তা নেই।

ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা দেশের সার্বিক উন্নতির পথে যে একটি বিশাল অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে এ কথা আমাদের রাজনৈতিক নেতারা পূর্বে অনুধাবন করেন নি। আজ থেকে তিরিশ বছর আগে মার্গারেট স্যাঙ্গার যখন ভারতে পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তৎকালীন নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন, তখন কেউই তাঁকে বিশেষ আমল দেন নি। মহাত্মা গান্ধী নীতিগতভাবে পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা মেনে নিলেও, কোনপ্রকার কৃত্রিম পদ্ধতি ব্যবহারের তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁর মতে কৃত্রিম পদ্ধতি নেওয়া মানেই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করা। একমাত্র বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যকে তিনি জন্মনিয়ন্ত্রণের সঠিক পন্থা হিসাবে অনুমোদন করেছিলেন, এবং তিনি এই অনুশাসন দিয়ে গেছলেন যে পুরুষ যাতে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করতে বাধ্য হয় সে দায়িত্ব নারীদের নেওয়া উচিত। এ দায়িত্ব পালনে মেয়েরা সমর্থ কি না সে প্রশ্ন তাঁর কাছে অবান্তর ছিল, কেন না তিনি নারীদের মনস্তত্ত্ব নখদর্পণে রাখেন এই-রকম দাবি করতেন।

দেশ স্বাধীন হবার পরে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই বিষয়ে খুব একটা নজর দেওয়া হয় নি। এর কিছুকাল পরে হঠাৎ সরকার উপলব্ধি করলেন যে পরিবার পরিকল্পনা বিশেষ প্রয়োজন। যৌবনকালটা বিবাহ না করে কাটিয়ে, প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়ে যেমন কোন কোন লোক বিয়ে করার জন্য ক্ষেপে ওঠে, সরকারের আচরণটাও যেন সেইরকম দাঁড়াল, শুরু হল পরিবার পরিকল্পনার পক্ষে ব্যাপক প্রচার। আগের যুগে যাঁরা পরিবার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে কান্ডজ্ঞানহীন বাড়াবাড়ি দেখিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁরাই পরিবার পরিকল্পনার পক্ষে এমন নির্লজ্জ ওকালতি শুরু করলেন যা আমাদের কল্পনার অতীত ছিল। দাম্পত্য জীবনের গোপনীয়তা বারো বছরের ছেলে-মেয়েদের কাছেও প্রকাশিত হয়ে গেল। বিশাল বিশাল লুপের বিজ্ঞাপনে হাট-বাজার-গঞ্জের মোড় থেকে আরম্ভ করে গ্রাম ও নগরের অলি-গলি পর্যন্ত সুসজ্জিত হয়ে উঠল। "লুপ" নামটির মধ্যেই যে একটি শ্লীলতাহীন ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে আমাদের সরকারী কর্তারা সেটুকুও ভেবে দেখলেন না।

সম্প্রতি লুপের স্রোতে একটু ভাঁটা পড়েছে; এবং বোধ হয় একটা সঠিক পথ অবলম্বিত হতে চলেছে যা আগে থেকেই হওয়া উচিত ছিল। এই পথটি হচ্ছে ভ্যাসেকটমি, একটি ছোট অপারেশন যা পুরুষদের করলেই চলে।

জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এই একমাত্র সার্থক পদ্ধতি বহুদিন ধরেই প্রচলিত ছিল, কিন্তু আমাদের পুরুষপ্রধান সমাজ-ব্যবস্থার দাপটে কখনো সার্থকভাবে এই পদ্ধতিকে প্রয়োগ করা হয় নি। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর দোষেই জন্মনিয়ন্ত্রণের সমস্ত ঝামেলাটা নারীদের পোহাতে হয়, অপারেশন থেকে আরম্ভ করে লুপ পর্যন্ত। অথচ মেয়েদের অপারেশনে ঝুঁকি অনেক এটা জেনেও তাঁদেরই বিপদ ও ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেওয়াটাই যে রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রসঙ্গত এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে পরিবার পরিকল্পনার বিস্তৃতি তাদের মধ্যেই বেশি ঘটছে যারা এ বিষয়ে বরাবরই সচেতন এবং যারা এর জন্য কোন প্রচারের অপেক্ষা করে না। কিন্তু যাদের ক্ষেত্রে এটা বিশেষ প্রয়োজনীয়, বিশেষ করে অল্পবিত্ত কৃষক ও শ্রমিক, সেক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে তেমন সাড়া জাগাতে পারা যায় নি।

ফানুস

হরেন ঘোষ

ওদের দুজনেরই সেইরকম পরিকল্পনা ছিল। এক এবং অভিন্ন। কিন্তু আজ, মনে মনে হিসেব করে দেখছে শিবতোষ, কোথায় যেন চিড় খেয়েছে, ছন্দঃপতন হয়েছে। আজ হিসেব মিলছে না। ঘড়ি দেখল শিবতোষ। সময় পার হয়ে গিয়েছে, এখনো ফিরলো না শর্মিলা। ওর জন্যে আর তো অপেক্ষা করা চলে না। তাহলে কথার ঠিক থাকবে না। ওরা ভাববে শিবতোষ দত্তর অহঙ্কার হয়েছে, একটু নাম হতে না হতেই। এখনি যদি এই হয় ভবিষ্যতে কি হবে।

ঠিকে ঝি আপনমনে তার কাজ শেষ করে চলে গিয়েছে, চেয়ারে বসেই টের পেয়েছে শিবতোষ। একবার ভেবেছিল বলবে স্টোভটা ধরিয়ে দিতে, বলে নি। চা তৈরি করার আলসেমী। তার চেয়ে আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি, শর্মিলা এসে পড়বে।

কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও এলো না। অস্থির হয়ে উঠল শিবতোষ মনে মনে। ও বলে দিয়েছে বারবার আজ সন্ধ্যায় বাণীবিতান সংস্কৃতি-চক্রের সভায় তাকে যেতে হবে, একটি জরুরী আলোচনা সভায় সেও আমন্ত্রিত অতিথি। আধুনিক সমাজ-জীবনের অস্থিরতার পরিপ্রেক্ষিতে তরুণ সাহিত্যিকদের সৃষ্টি সম্পর্কে মতামত দিতে হবে তাকে। এ কম সুযোগ নয়। অনেক রথী-মহারথী থাকবেন সেখানে।

শর্মিলার জন্যেও একটি কার্ড দিয়ে গিয়েছে উদ্যোক্তারা। বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছে উনিও যেন যান। এই সভা-সমিতির মাধ্যমেই তো পরিচয় আলাপ। কখন কোন সুযোগ এসে যায়। এইভাবেই তো খ্যাতি অর্থ ঐশ্বর্য। ঘরের কোণে চুপচাপ বসে লিখে গেলে কোন লাভ নেই, কেউ দাম দেবে না, চিনবে না কেউ, খাতির করবে না। পত্রিকা, প্রকাশক থেকে আরম্ভ করে চলচ্চিত্রের স্বর্ণমিনারে না উঠলে আজ সাহিত্যিক পদবাচ্য হওয়া যায় না। ধাপে ধাপে উঠতে হবে। মনে পড়ল শিবতোষের, শর্মিলাই তাকে বারবার এইসব কথা বুঝিয়েছে, তার ঝিমিয়েপড়া ঘুমন্ত মন জাগাতে চেষ্টা করেছে।

—তুমি দিখে নিও, একদিন কত নাম করবে তুমি। লোকের মুখে মুখে তোমার নাম। সেদিন, তোমার গরবে গরবিনী আমি। কত সুযোগ আজ চারিদিকে, রেডিও, সিনেমা, প্রাইজ। তুমি শুধু মন-প্রাণ ঢেলে লিখে যাবে, সংসারের ভাবনা, ভাবতে হবে না তোমায়।

—কি যে বল শমু, হেসে উঠেছে শিবতোষ, তুমি ছেলেমানুষ, আবেগপ্রবণ তাই এসব বলছ। আজ তোমার চোখে

ওর নেশা রয়েছে তাই এত সহজে এত সুন্দর কথা বলছ, হয়ত একদিন এই তুমিই অন্য কথা বলবে।

—ভারি ইয়ে তোমরা। মুখ ভার হয়েছে শর্মিলার। সবাইকে অবিশ্বাস করা তোমাদের স্বভাব। জানো না তুমি, সেই ছোটবেলা থেকে আমি লেখকদের কি চোখে দেখি। যে কোন যাদুকরের চেয়েও তারা আমার চোখে বিস্ময়কর। তাদের ভয় পাই, শ্রদ্ধা করি, এবার হেসেছে, কোনদিন কি ভেবেছি তাদের এত কাছা-কাছি আসতে পারব। যেন অনেক পুরোন স্মৃতি মনে করার চেষ্টা করেছে। একবার তো প্রায় মাথা খারাপের অবস্থা আমার। বছর চোদ্দ-পনের বয়েস, ইস্কুলে পড়ি, হঠাৎ জানলাম আমার বন্ধু তৃষিতার দাদা কবিতা লেখে। সেই থেকে তাদের বাড়ি যাতায়াত সুরু করি। একটু থেমেছে শর্মিলা, লজ্জায় রঙিন হয়েছে। জানো আমায় অপমানিত হতে হয়েছিল। তৃষিতার দাদা আমায় নিয়ে কবিতা লিখেছিল। শেষে একদিন ওর মা মিঠেকড়া ভাষায় আমায় বলে দিলেন যেন আর কখনো না যাই তাদের বাড়ি। ফিরে এসে খুব কেঁদে-ছিলাম।

—অত নরম মন হলে কাঁদতেই হয়।

—বা রে, তোমরাই তো কঠিন মনও নরম করে ফেল। কত কথাই যে জানো তোমরা। সত্যি সার্থক নাম কথাশিল্পী।

—ওইটুকুই আমাদের সম্পদ। হেসেছে শিবতোষ।

—না বাপু, আর কথা বলে সময় নষ্ট করব না, তুমি লেখো, আমি হাতের কাজ সেরে ফেলি। শেষে কথা শোনাবে, আমার জন্যে লেখা হয় নি।

ওর দিকে তাকিয়ে থেকে তখনো ভেবেছে শিবতোষ আশ্চর্য ছেলেমানুষ। পরম মমতায় ভরে গিয়েছে মন। সত্যি ও আমায় ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে।

তালা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল শিবতোষ। কপালে চিন্তার রেখা। এখনো কেন ফিরছে না শর্মিলা! নিশ্চয় কোন কাজে আটকিয়ে গিয়েছে। একটা চাবি আছে ওর কাছে। সেজন্যে নয়, এসে এতটুকু বিশ্রাম পাবে না। ঘরে বাইরে দুদিকেই খাটুনি ওর। এসে চা তৈরি করবে, তারপর আছে রান্নাবান্না। ভারি কষ্ট হয় ওর। কিন্তু আমি কি করতে পারি! কি বলব! একবার বলেছিলাম একজন রান্নার লোক রাখতে, হেসে উঠেছিল। ভারি তো দুটি প্রাণী, তার জন্যে একজন ঝি, একজন রাঁধুনী বলো একজন চাকর, একজন সঙ্গিনী—অত টাকা আমার নেই বাপু, তাছাড়া কাজকর্ম না করলে হাতে-পায়ে বাত ধরে যাবে যে! সবচেয়ে বড় কথা, সংসারের এসব ব্যাপারে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে।

এরপর বাধ্য হয়ে চুপ করেছে শিবতোষ। আর এ প্রসঙ্গ তোলে নি। মনের জোরও এসে গিয়েছে। কোন কথা থেকে কোন কথায় পেঁছবে কে জানে!

যথাসময়েই সভায় উপস্থিত হল শিবতোষ। নিজেই বলেছিল যাতায়াতের কোন ব্যবস্থা করতে হবে না। আদর-আপ্যায়নে মুগ্ধ হল শিবতোষ। আলাপ পরিচয় হল প্রখ্যাত অগ্রজ সাহিত্যিক এবং প্রবীণ বিদগ্ধ সমালোচকদের সংগে। নিজেও সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে মনে মনে খুশি হল। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে একটা মন-কেমন-করা ভাব ওকে আচ্ছন্ন করে রাখল।

দরজা ভেজান ছিল। ভিতরে ঢুকল শিবতোষ। কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। এ সময়ে রান্নাঘরে টুংটাং আওয়াজ হয়, আজ একেবারে চুপচাপ। পাশের ঘরে গেল শিবতোষ। বিছানায় শুয়ে আছে শর্মিলা। ওর পোষাকের দিকে তাকিয়ে আরো অবাক হল শিবতোষ, অফিসের জামাকাপড় ছাড়ে নি। তবে কি শরীর খারাপ হল ওর? এবার এগিয়ে গিয়ে কপালে হাত রাখল।

—কে? প্রায় চমকে উঠে চোখ মেলল শর্মিলা। ও, তুমি এসে গিয়েছ! উঠে বসল বিছানায়, ভীষণ মাথা ধরেছিল, আর খুব ক্লান্ত লাগছে আজ। ম্লান হাসল শর্মিলা, আজ আর রান্না করতে পারলাম না, তোমার খুব অসুবিধে হবে।

—না, না, ব্যস্ত হয়ে উঠল শিবতোষ, তোমার শরীর খারাপ, আমার জন্যে ব্যস্ত হতে হবে না। এক রাত্রের ব্যাপার, ও ঠিক হয়ে যাবে!

রুটি মাখন আছে, কোনরকমে ওই দিয়ে চালিয়ে দাও আজ। আমার আজ কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না।

—সে কি, ব্যস্ত হয়ে পড়ল শিবতোষ, খুব বেশি শরীর খারাপ হলে ডাক্তার ডাকতে হবে।

—না, তেমন কিছু নয়। এই জন্যেই কিছু বলতে চাই না তোমায়। বড় ব্যস্ত হয়ে পড়। কাল সকালেই ঠিক হয়ে যাবে।

—তা, শরীর খারাপ হতে দোষ কি, যা খাটুনি যাচ্ছে তোমার।

আর বিশেষ কোন কথা হল না রাত্রে। ভাবল শিবতোষ বেশি কথা বলে বিরক্ত করার প্রয়োজন নেই। মনে একটা কাঁটা বিঁধে রইল তবু। আজকের সভা সম্পর্কে এতটুকু আগ্রহ প্রকাশ করল না শর্মিলা। অথচ আগে যে কোন পত্রিকায় একটা লেখা প্রকাশিত হলে কত আনন্দ হত ওর। ফাইল কপি সাজিয়ে রাখা, সমালোচনা করা, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা, এই তো ওর কাজ ছিল। ইদানীং আগ্রহ কমে গিয়েছে। না, এ আমার মনের ভুল। এ সব ভেবে মনে কষ্ট পেয়ে লাভ কি! তবু যেন ঘুরে-ফিরে বারবার এইসব কথা মনে পড়ে।

বয়সে বেশ কিছু বড় হলেও কলেজে একই সংগে পড়ত ওরা। লেখাপড়ার সহজ গতিতে বারবার বাধা পড়েছে শিবতোষের। অপরের দয়া বা মর্জির ওপর নির্ভর করেই এই অবস্থা। টিউশনির টাকার ওপর নির্ভর করা যায় না। তাতে বড়জোর হাতখরচ চলে, দু-চারটে বই কেনা চলে, তার বেশি নয়। তবু তখন নেশার তাগাদায় ঘুরে বেড়াত। কোন ব্যথা কোন দুঃখই বড় করে দেখত না। ছোট থেকেই সাহিত্যের ওপর ঝোঁক তার। গল্প কবিতা লিখত চুপিচুপি। সব ব্যথা ভুলে যেত।

কলেজ পত্রিকা সম্পাদনার ভার পড়ল তার ওপর। অজস্র গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, রম্যরচনা আসছে। এর মধ্যে বাছাই করতে হবে। কম পরিশ্রম নয়। হঠাৎ একটি প্রবন্ধে এসে হোঁচট খেল। জোরালো বক্তব্য, তবে এরকম লেখা ছাপা চলে না কলেজ পত্রিকায়। নানাবিধ প্রশ্ন উঠবে। তার চেয়ে কথা বলে অন্য একটি লিখিয়ে নিলে কেমন হয়! কিন্তু তাতে যদি অন্য কিছু মনে করে! দেখাই যাক না।

—নমস্কার আপনিই তো শর্মিলা। কিছু কথা ছিল আপনার সংগে।

—বলুন। ভ্রূকুটি করল শর্মিলা। বিরক্তির ভাব চোখেমুখে। ঘড়ি দেখল, আমার সময় কম।

সাহসে ভর দিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল শিবতোষ—অবশ্যি যদি কিছু মনে না করেন আর একটি নতুন লেখা দিন। আপনার লেখার হাত আছে বলেই এই অনুরোধ।

ঠোঁট ওল্টাল শর্মিলা—খুব সমঝদার আপনি। ওটা খেয়ালের বশে লেখা, হঠাৎ ইচ্ছে হল। আপনি অনায়াসে অমনোনীত করুন কিছু মনে করব না। বসে বসে অতক্ষণ ধরে লেখার ধৈর্য আমার নেই।

সেই প্রথম। এরপর প্রায়ই দেখা হত, কথাবার্তা হত। ক্রমশ সেই আলাপ ঘনিষ্ঠতায় রূপান্তরিত হল। তবে আলো-চনা ওদের সাহিত্যকেন্দ্রিক। মনের মত উৎসাহী শ্রোতা পেয়ে অনর্গল মতামত জানায় শিবতোষ, মাঝে মাঝে মন্তব্য করলেও ওর মত মেনে নেয় শর্মিলা।

একদিন বলেছিল শিবতোষ—আপনি স্বপ্নবিলাসী, এত ভাবপ্রবণ হলে ব্যথা পেতে হয়। আদর্শ ও বাস্তবে অনেক তফাৎ

যাই বলুন আপনি, আমার ভালো লাগে এইটাই বড় কথা। এ ব্যাপারে কোন যুক্তিতর্কে যেতে আমি রাজী নই। আমার মোহই বলুন, দুর্বলতাই বলুন, আমি স্বীকার করে নিচ্ছি লেখকদের আমি অন্য চোখে দেখি।

—চোখেরও রঙ বদলায়। মৃদুস্বরে বলেছে শিবতোষ।

মুহূর্তে চোখে আগুন জ্বলে ওঠে শর্মিলার—সব রঙই কাঁচা নয়, পাকা রঙও আছে। সে রঙ চট করে বদলায় না।

বাধ্য হয়ে চুপ করেছে শিবতোষ। এরপর আর কি বলবে সে।

ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়া হল না শিবতোষের। চেষ্টা করেছিল কিন্তু সম্পূর্ণ টাকা যোগাড় করতে পারে নি। ধার করার চেষ্টা করেছিল, সুবিধে হয় নি। একমাত্র উপায় ছিল শর্মিলা, শুধু একবার বললেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে কিন্তু যেতে পারে নি তার কাছে। পালিয়ে বেড়িয়েছে। খবর পেয়েছিল তার খোঁজ করছে শর্মিলা, তবু কাছে যেতে পারে নি। এমনিভাবে পরীক্ষার দিন পার হয়ে গেল। তারপরই একদিন হঠাৎ ধরা পড়ে গেল পথের মাঝে। সেদিন আর পাশ কাটাতে পারল না।

—কি হয়েছে তোমার? ঝাঁঝিয়ে উঠল শর্মিলা, এইভাবে আমায় এড়িয়ে চলছ কেন? কি করেছি আমি?

—আঃ শমু, এটা জনপথ।

—ওঃ আচ্ছা, চল ঐ রেস্তোরাঁয় বসি। তোমার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে।

ভয় পেল শিবতোষ। পাছে আরো চেঁচামেচি করে তাই ওর পেছন পেছন এসে রেস্তোরাঁর কেবিনে বসল।

চোখে জল এসে গিয়েছে শর্মিলার। রুমালে চোখ মুছল, চুপ করে রইল অনেকক্ষণ। এবার মুখ তুলল—কি ভেবেছ তুমি! আমি কি তোমার কেউ নই? এতই যদি পর ভাব তাহলে কি প্রয়োজন ছিল। পরীক্ষা দিলে না, আমায় জানালে না পর্যন্ত। কত খোঁজ করেছি, ইচ্ছে করেই তুমি পালিয়ে বেড়িয়েছ, বুঝি না আমি।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল শিবতোষ। এবার হাসল—সত্যি, অপরাধ করেছি আমি। তুমি খুব রেগে গিয়েছ, রাগ হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু আমি পারি নি, তোমার কাছে যেতে পারি নি।

বড় বড় দুটি চোখ টলটল করে উঠল শর্মিলার।

—সেখানেই আমার দুঃখ। তোমরা পুরুষরা ভারি অহঙ্কারী। এতে কি তুমি ছোট হয়ে যেতে? একটা বছর নষ্ট করলে!.

—ও কিছু নয়, জোর করে হেসে উঠেছে শিবতোষ, কত বছর বৃথা ঘুরে যায়, এ তো সামান্য একটি বছর। তুমি ভেবো না, সামনের বছর দিয়ে দেব পরীক্ষা।

—তাহলে আমায় কথা দাও, হাত বাড়িয়ে ওর হাত নিজের মুঠিতে নিয়েছে শর্মিলা, তোমার যখন যা অসুবিধে হবে আমায় জানাবে।

—বেশ, কথা দিলাম। ওর কোমল হাতে চাপ দিয়েছে।

দুজনে হাল্কা মনে বেরিয়ে এসেছে রেস্তোরাঁ থেকে।

এরপরই ঘটল সেই আকস্মিক ঘটনা। তখনো রেজাল্ট বেরোয় নি। হঠাৎ একদিন ঝড়ের গতিতে ঢুকল শর্মিলা ওর ঘরে। ওর চেহারার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল শিবতোষ। এত অল্পদিনে এমন চেহারা হল কিভাবে!

—এলাম তোমার কাছে। প্রায় ভেঙে পড়ল শর্মিলা—আমার আর কোন উপায় নেই, একমাত্র তুমিই পার আমায় উদ্ধার করতে।

—কি ব্যাপার বলো তো। তুমি বড় উত্তেজিত। ওকে ঠাণ্ডা করতে চাইল শিবতোষ।

—এখনো যদি উত্তেজিত না হব তাহলে কবে হব? শোন বাবা বিয়ে ঠিক করেছেন, কোন কথা শুনবেন না, একটা ব্যবস্থা তোমায় করতেই হবে।

প্রচণ্ড ধাক্কা খেল শিবতোষ—আমি, মানে এত তাড়াতাড়ি—

—কাপুরুষের মত কথা বোল না। সাহস নেই তোমার? আমায় যদি সত্যি ভালোবাস, এই মুহূর্তে মনস্থির কর। আমার সঙ্গে চল। একটু থামল শর্মিলা, হয়ত তোমার মনে নানা দ্বিধা আছে, চাকরি কর না ইত্যাদি, তবে একথা জোর দিয়ে বলছি, তোমার বোঝা আমি হব না। আমার চেনামহল অনেক বড়, একটা চাকরি পেয়ে যাব। তোমার চাকরির কথা ভাবতে হবে না, শুধু মনপ্রাণ ঢেলে লিখবে। আর কোন কিছু দেখতে হবে না, ভাবতে হবে না তোমায়।

মুহূর্তে যেন সমস্যার সমাধান করে দিল শর্মিলা। ভাবতে পারছে না শিবতোষ, সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভাবনার অবকাশ পেল না সে। ঝুঁকি নিতে হল এবং নিল। সবকিছু যেন হঠাৎই ঘটে গেল। খুব বেশি চিন্তা করার অবকাশ পেল না শিবতোষ।

চিন্তা তবু দূর করা যায় না। আপাতত বাপের বাড়িতে থাকলেও আলাদা আস্তানার ব্যবস্থা করতে হবে। এবং যথাশীঘ্র সম্ভব। একটা ঝড় এগিয়ে আসছে। শর্মিলার বাবা মেনে নেবেন না অত সহজে। অবশ্য মানতে বাধ্য

M & H M & H M & H M & H M & H M & H M & H

BI-COLATES
REGISTERED TRADE MARK
STEARNS

M&H

পিত্তরস প্রবাহ, পাকস্থলীর সুষ্ঠু ক্রিয়া ও কোষ্ঠকাঠিন্য নিয়ন্ত্রণে দীর্ঘদিনের প্রশংসাধন্য একটি অব্যর্থ ঔষধ।

MARTIN & HARRIS
PRIVATE LTD.
MERCANTILE BUILDING, LALLBAZAR,
CALCUTTA-1

M & H M & H M & H M & H M & H M & H M & H

হবেন। তবু নিজেকে তৈরি রাখা ভালো।

কিন্তু কিছুই করতে হল না শিবতোষের। সব ব্যবস্থা শর্মিলাই করল। এবং তারা নতুন বাড়িতে এল। রেজাল্ট বেরোল। পাশ করেছে শর্মিলা। চাকরি পেতেও অসুবিধে হয় নি।

—জানো, আমি গল্পের প্লট খুঁজে হয়রান হই, অথচ আমার সামনেই এতবড় একটা প্লট, হাসল শিবতোষ, তুমি সত্যি অসাধ্যসাধন করছ। তোমায় নিয়েই গল্প লিখব ভাবছি।

—যাও, ঠাট্টা করতে হবে না। ধমক দিল শর্মিলা। প্রতিদিন তোমায় নিয়ম করে লিখতে বসতে হবে, কোন ওজর চলবে না। নাম করতে হবে। সাহিত্য তো খেয়ালখুশি নয়, সাধনার প্রয়োজন। ধীরে ধীরে নাম খ্যাতি, অর্থ ঐশ্বর্য সব হবে। এমন লিখতে হবে যাতে কালের বুকে ছাপ রাখতে পার।

—নাঃ চমৎকার, শিক্ষিতা নায়িকার মত কথাবার্তা। কাজে লাগবে আমার।

—আবার ঠাট্টা! যাও, অমন করলে কথা বলব না তোমার সঙ্গে।

—সত্যি, আমিও কথা বলতে পারছি না গলা শুকিয়ে লেছে, এক কাপ চা হলে—

—আনছি বস।

হাসল শিবতোষ, একেবারে গিন্নি হয়ে গেছে শর্মিলা, যেন কত বুদ্ধি ওর, কত বয়েস!

অন্যমনস্কভাবেই হাঁটছিল শিবতোষ। কি এমন ঘটল যার জন্যে ক'দিন থেকেই অন্যরকম ব্যবহার করছে শর্মিলা। কি এমন ঘটেছে! তাদের মধ্যে খোলাখুলি আলোচনা হয়ে গিয়েছে এখন সন্তান চায় না ওরা, আরো দু'বছর যাক। এ ব্যাপারে মনান্তরের কোন প্রশ্ন আসে না। তবে কি হল! ও কেন স্পষ্ট করে মনের কথা বলে না?

একেবারে মুখোমুখি হতেই চমকে উঠে মুখ তুলল শিবতোষ।

চিত্রাঙ্কন শিখিবার বই
কে আর্টস
ড্রইং বুক
বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত
আর্টো পাবলিশার্স
১৪ নং রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

—কি রে, পথ চলতেও জানিস না। সাহিত্যিকরা এমনিই হয় বটে, সবসময়ই চিন্তা। হেসে উঠল অরিন্দম রায়—বেশ নামটাম হয়েছে তোর। আরো হবে। একটা বই সিনেমায় লেগে গেলে দেখবি হুহু করে নাম আর টাকা। ক'দিন পর দেখা হল, চল ছাড়ছি না তোকে, অনেক কথা আছে। একরকম জোর করেই ওকে নিয়ে গেল রেস্তোরাঁয়।

ভাবছিল ওর কথা শিবতোষ। কিছুদিন পড়েছে একসঙ্গে। বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল ওর সঙ্গে। বেপরোয়া ডানপিটে গোছের ছেলে। পড়া ছেড়ে দিল। ব্যবসা আরম্ভ করেছিল। পৈতৃক ব্যবসা। ওদের আলাদা এক শ্রেণী আছে, ওরা ভাগ্যবান। তবে ঈর্ষা করে না শিবতোষ।

—সত্যি তোর নাম কাগজে পড়ি, কত আনন্দ পাই। আমাদের তো লাইন আলাদা। কত কথা যে বলতে ইচ্ছে করছে, কোনটা ছেড়ে কোনটা বলি বল তো! ভালো কথা, তোর শ্রীমতীকে দেখলাম সেদিন। আমাদের সেই শর্মিলা দেবী তোর গৃহিণী সে খবর শুনেছি। হাসল এবার। ভাবলাম কাছে গিয়ে দেখা করি কিন্তু ভিড় কাটিয়ে কাছে যাবার আগেই ওরা হলে ঢুকে গিয়েছে। আমি নিউমার্কেটে চলে গেলাম।

প্রায় বিষম খেতে খেতে সামলে নিল শিবতোষ। কই, আমায় তো বলে নি সিনেমায় গেছল। ভুল দেখ নি তো অরিন্দম! ওরা বলল, সঙ্গে আর কেউ ছিল তাহলে। কিন্তু এমন তো হয় নি, হবার কথাও নয়। গোপন করল কেন?

—হ্যাঁ, আমি যেতে পারি নি সেদিন, কলেজ স্ট্রীটে কাজ ছিল। হাসল শিবতোষ।

—কিন্তু সঙ্গে আর এক ভদ্রলোককে দেখলাম, বেশ লম্বা চওড়া চেহারা, সুপুরুষ।

—হ্যাঁ, আমাদের এক আত্মীয় বন্ধু। জোর দিয়ে বলল শিবতোষ। ঘড়ি দেখল —আমার একটু কাজ আছে ভাই, আজ চলি, পরে আবার দেখা হবে।

—এই নে আমার কার্ড। ভারি ভালো লাগল দেখা হয়ে। তোদের মত লোকের সঙ্গে আলাপ থাকাও ভাগ্যের কথা। যাই বলিস, মানসম্মানও আছে তোদের। বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এল ওরা।

বিদায় নিয়ে চলে গেল অরিন্দম। প্রকাশকের দোকানের দিকে গেল শিবতোষ। দুটি পাণ্ডুলিপি দেওয়া আছে, আজ রায় দেবেন প্রকাশক।

অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে সামলাতে পারল না শিবতোষ। অনেকবার ভেবেছে এ সব কথা তুলবে না, কি লাভ অশান্তি বাড়িয়ে। কিন্তু আবার ভেবেছে সব খোলাখুলি আলোচনা করাই ভালো। ছলনার প্রয়োজন কি! মনে মনে গুমরে মরার মানে হয় না।

—সেদিন তুমি সিনেমায় গিছলে বলো নি তো আমায়। অত্যন্ত কোমল স্বরে বলল শিবতোষ।

মুহূর্তে জ্বলে উঠল শর্মিলা।—তার মানে, সব কথা তোমাকে বলতে হবে নাকি? আমার পেছনে স্পাই আছে দেখছি।

—ছিঃ কি বলছ তুমি? অত রাগ করছ কেন? আমি বলছিলাম, আমাদের মধ্যে কোন ভুল-বোঝাবুঝি থাকা উচিত নয়, কোন লুকোচুরি—

—থাক হয়েছে। তোমার কাছে শুনতে চাই না কিছু। যা খুশি তাই করব আমি। তোমায় তো কখনো কিছু জিজ্ঞেস করি না আমি। তবু যদি দু' পয়সা রোজগারের মুরোদ থাকত! ঠোঁট বাঁকাল শর্মিলা। আমি মেয়েমানুষ চাকরি করছি, খেটে মরছি আর তুমি মনের সুখে খেয়েপরে বেড়াচ্ছ। আজ সম্পাদক টাকা দেবে, কাল প্রকাশক দেবে, শুধু কথার ফুলঝুরি।

—আঃ শর্মিলা, তুমি এত নিষ্ঠুর? আর কোন কথা বলতে পারল না শিবতোষ। দু' হাতে মাথা টিপে ধরল।

শর্মিলা তখনো কথা বলে চলেছে। —আমার সখ আনন্দ কিছুই থাকতে পারে না, না?

—দয়া করে থাম তুমি! আহত কণ্ঠে বলল শিবতোষ, আমি আর কখনো তোমায় কোন কথা জিজ্ঞেস করব না। আমায় ভুল বুঝো না।

শর্মিলা তবু থামল না। অনর্গল উল্কাবৃষ্টি হল। তার কথাগুলো গলানো উত্তপ্ত সীসের মত কানে বিঁধল ওর। ও তবু চুপ করেই রইল। এবার কথা শেষ করে হাঁপাতে থাকল শর্মিলা।

অনেক চিন্তা করে তিনতলার সিঁড়ি ভেঙে এল শিবতোষ। অরিন্দম খুশি হয়ে অভ্যর্থনা জানাল।

—কি সৌভাগ্য আমার। আয়, বোস।

—তোর কাছেই এলাম। চেয়ারে ভেঙে পড়ল শিবতোষ। কোন ভূমিকা না করে একটা কাগজ এগিয়ে দিল—আমার একটা চাকরি চাই, যে কোন রকম চাকরি।

কয়েক মুহূর্ত বিহ্বল-বিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল অরিন্দম। এবার হাসল। হাত বাড়িয়ে দিল—দে, দেখি তোর জন্যে কিছু করতে পারি কি না। এবার সশব্দে হেসে উঠল, অত দ্বিধা কিসের, আমি না তোর বন্ধু! বোস চা আনাই। বেল টিপল অরিন্দম।

দিল্লী থেকে—

অর্থ যিনি পেয়েছেন, পরমার্থের অন্বেষণ তিনিই অর্থ ছাড়তে জানেন। যে ভিখারি তার আবার ত্যাগ কি? পরমার্থের সন্ধানে আজ যে জাহান্ আরা সব অর্থ ছেড়ে দিতে পারেন। সে পরমার্থ জীবনের মুক্তি নয়, বেহেস্ত্ নয় এই পৃথিবীতেই যে রয়েছে পরমার্থ। চারিদিকের ফুলরাশি, ঘন সবুজ বনানী, আকাশের হাল্কা মেঘের নৃত্য, কাশের বনে মৃদু-মন্দ বাতাসে কার নৃত্যচ্ছন্দ তার মন মাতায়?

দিল্লীর কেন, সমগ্র হিন্দুস্থানে কোন্ রমণীর আছে এত ব্যক্তিগত ঐশ্বর্য? কে পেয়েছে সব চেয়ে? 'কে দিয়েছে তাহার অধিক?'

রাজভান্ডার তো সম্রাট শাজাহানের। সম্রাটের শুধু কেন? সে যে সমগ্র হিন্দুস্থানের প্রজাবর্গের। তার পূর্ণ অধিকারটুকু ছেড়ে দিলেও শুধু রাজকন্যার ব্যক্তিগত ভাণ্ডারে কি কম ধন? মমতাজ মহল আপন ধন বিতরণ করে দিয়েছিলেন সন্তানদের ভিতর। মমতাজের ছিল এক কোটি টাকা। তার অর্ধেক ধন দিয়েছেন প্রাণের প্রিয়তম সন্তান জাহান্ আরাকে। শুধু কি তাই? সম্রাট শাজাহান যে তাঁকে 'তনখার' বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন, সে সম্পত্তির আয় কি নেহাৎ কম? বছরে চার লক্ষ টাকা যে তাঁর নির্ধারিত সেলামী শুধু।

শুধু কি তাই? মনে পড়ে সেই বসন্তোৎসবের কথা সেদিন ছিল জশন্-ই-নৌরোজের মহান্ উৎসব। সম্রাট মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন জাহান্ আরা শুধু জগতের আলোই নন, তিনিই সম্রাটের জান্। তাঁর জীবন। তাঁর নয়নমণি। তাই উৎসবে যখন সবাই মণি, মুক্তা, হীরা, কাঞ্চন উপহার পেল তখন প্রিয়তম কন্যা জাহান্ আরাকে তিনি কি দেবেন? অনেক ভেবে চিন্তে আপন ব্যক্তিগত ভাণ্ডার উজাড় করে শাজাহান জাহান্ আরাকে সবার অলক্ষ্যে যে উপহারটুকু দিয়েছিলেন তার মূল্য কত ছিল? কত আর হবে? মাত্র পঁচিশ লক্ষ টাকা।

শুধু কি নিয়েই এসেছেন জাহান্ আরা? কখনই নয়। এ হৃদয় যে ফকীরার হৃদয়। সঞ্চয় করবেন কার জন্য? তাছাড়া এ সম্পদের দাম আর কত? যে প্রিয় মুখের হাসিটুকুর জন্য তিনি প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত এ বিরাট সাম্রাজ্যের প্রলোভন যে তাঁর কাছে বড়ই ম্লান! কি হবে এ সম্পদে?

যেদিন সম্রাট শাজাহান সিংহাসনে বসলেন তখন জাহান্ আরার কতই বা বয়স? ষোড়শীর ছোঁয়া তখনও গায়ে লাগে নি? কে তাঁকে এ সব শিখিয়ে দিল? কেউ না। নিজে থেকেই সম্রাট-নন্দিনী সবার অলক্ষ্যে সম্রাটের জন্য যে মণি-মুক্তা দিয়ে তাঁর অভিষেক উৎসবায়োজনকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করেছিলেন, সেটা যে শাজাহান জীবনে ভুলতে পারেন নি। কত লক্ষ টাকার মণি-মুক্তা দিয়ে তিনি সম্রাটের নজরানা দিয়েছিলেন কেউ জানেন? সম্রাটের মুখ দিয়ে সেদিন কোনো কথা বেরোয় নি। নির্বাক শাজাহান তক্ষুণি ডান হাতের পাশে রাখা সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা এ উদার বাদশা-বেগমের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তার মূল্যও যে লক্ষ লক্ষ টাকার অনেক বেশি।

সম্রাট শাজাহান জাহান্ আরাকে শুধু একটা জশন্-ই-নৌরোজে দিলেন পঁচিশ লক্ষ টাকা। জাহান্ আরা কোনো জশন্-ই-নৌরোজে সম্রাটের নজরানা ছাড়েন নি। 'দাও আর ফিরে নাহি চাও থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।'

তিনি যে শুধু দিতেই শিখেছেন। নিতে শেখা আর হলো কোথায়?

শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

শুধু কি জশন্-ই-নৌরোজে? ঈদ্-ই-গুলোবী উৎসবের কথা মনে পড়ে না? গোলাপের সাথে সম্রাট-নন্দিনী মণি-মুক্তা দিয়ে সম্রাটকে জানাতেন অভিবাদন। তাছাড়া জন্মদিনে? সম্রাট শাজাহানের আবার জন্মদিন উৎসব পালিত হত দু'বার। একটা হতো চান্দ্র মতে। আর একটা সৌর মতে। এই দুবারই জাহান্ আরা মণি-মুক্তা স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে সম্রাটকে জানিয়েছেন অভিবাদন। এ কাহিনী দিল্লীর কোন্ নগরবাসীর অজানা?

যুবরাজ দারার পরিণয় উৎসবের আয়োজন কে করেছিলেন? রাণা দিল-এর সাথে যে পরিণয়ে কোনো আড়ম্বরই হয় নি। নাদীরার পরিণয়ে তাই তো এত অনুষ্ঠানায়োজন। তাছাড়া নাদীরার বিয়ের সাথে একটা গোপন ব্যথা যে লেগে রয়েছে মনের গহনে। এ বিয়েটা ঠিক করে গিয়েছিলেন স্নেহের ঝর্ণা মা মমতাজ। নাদীরা যে তাঁরই আত্মীয়া। মা মমতাজ আর নেই। সেই শূন্য আসন পূর্ণ করতেই তো জাহান্ আরার এ অদম্য উৎসাহ, এই কায়িক শ্রম, সেখানে অর্থের খরচের দিকে তাকালে চলবে কেন?

নাদীরার সাথে দারার পরিণয় উৎসবে মোট কত খরচ হয়েছিল মনে পড়ে? সব মিলিয়ে খরচ হয়েছিল বত্রিশ লক্ষ টাকা। আহার, উৎসব, শোভাযাত্রা, দান, পুরস্কার, সেলামী মিলিয়ে। সমস্ত খরচের হিসেব করে দেখা গিয়েছিল এর ভেতর ষোল লক্ষ টাকা এসেছে একমাত্র জাহান্ আরা বেগমের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে। এ কাহিনী যে আবার আব্দুল হামিদ সাহেব ফার্সীতে লিপিবন্ধ করে ফেলেছেন! কি লজ্জার কথা। জাহান্ আরা মনে মনে একাকিনী হেসে ফেলেন। এর ঐতিহাসিক মূল্য আর কি? কি দরকার ছিল এগুলো লিপিবন্ধ করার?

শক্তি চান নি জাহান্ আরা। চান নি প্রতিপত্তি, তবুও এ কি পরিহাস? আজকাল সম্রাটের সীলমোহরটির ভারও এসে পড়েছে জাহান্ আরার ওপর। ওটা যে আজকাল তাঁরই কাছে থাকে গচ্ছিত। এ সীলমোহরটুকু ছাড়া যে বাদশা শাজাহানের সনদ সম্পূর্ণ অর্থহীন। এ কি নতুন পরীক্ষা?

মমতাজ চলে গেছেন সেও বেশ ক'বছর হয়ে গেল। সম্রাটের দিকে তাকানো যায় না। দিন দিন প্রতিদিন বেশ শুভ্রতার দিকে এগুচ্ছে যেমনি এগুচ্ছে তাঁর বার্ধক্য। মণি-মুক্তা খচিত রাজপোষাক, খুসবাই আতর-ই-গুলাব, অগুরু সুবাস রাজপ্রাসাদ থেকে পেয়েছে নির্বাসন। জাহান্ আরা বেগমের হাতেই দিল্লীর রাজভাণ্ডার। এ বিরাট সাম্রাজ্যের চাবিকাঠি রাখা রয়েছে ঐ কোমল চাঁপাকলির দুটি আঙুলে। একটি তর্জনী হেলনে সম্রাট উঠবেন, বসবেন। তামাম্ হিন্দুস্থানের ইতিহাসে কোন্ রমণী পেয়েছেন এত শক্তি? এত প্রতিপত্তি? এতখানি দাপটেও কোন্ যৌবনমদমত্তা নারী নিজেকে হারাতে চেয়েছে শুধু একটি সুন্দরকান্তি পুরুষের পদপ্রান্তে? এ দিল্লীর লালকিলায় দুনিয়ার কোন্ সম্পদ নেই?

হিন্দুস্থানের মাটিতে রয়েছে সোনা। এই কথা শুনেই তো শত-সহস্র যোজন

দূর দেশে এসেছে বণিক দল। এই মোগল রাজভান্ডারের কোহিনূরের তুলনা আছে। কোহ্-ই-নূর মানে আলোর পাহাড়। পৃথিবীর হীরের রাণী। হীরের ছড়াছড়ি এ রাজপ্রাসাদে। দুনিয়ার নাম-করা হীরে।

শুধু আলোর পাহাড় কেন? রয়েছে হীরার অতুলনীয় আলো—দরিয়া-ই-নূর। আলোর সমুদ্র। এ হীরের টুকরো থেকে ঠিকরে পড়ছে সমুদ্রোদ্বেলিত সফেন আলোর ঝলক, ঠিক যে আলোর স্বপ্ন দেখেন দুনিয়ার তাপস মুনি ঋষি। সেই দরিয়া-ই-নূর।

আর একটা হীরের কথা দিল্লীর কে না জানে? তাক্-ই-মা, চাঁদের মুকুট, স্নিগ্ধ শান্ত তার জ্যোৎস্নাস্নাত আলোর ঝর্ণা।

আর রয়েছে হীরের ভান্ডার। ভর্তি শুধু হীরকখণ্ড, নানা দেশের, নানা জাতীয় আলোর দ্যুতির এক অপূর্ব সমন্বয়।

মনে পড়ে স্যান্সি হীরকখণ্ডের কথা? এই দিল্লীর প্রাসাদেই ছিল। নিকোলাস হারলে ডি স্যান্সি ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে এই হীরে সংগ্রহ করেন জীবনের সব সঞ্চয়ের বিনিময়ে। ফ্রান্সের তৃতীয় হেনরি এ হীরের খবরটুকু পেলেন। তাঁর অনুরোধে একটা সুইস্ দেনা মেটাতে তিনি নিকোলাসকে এই হীরকখণ্ড পাঠাবার নির্দেশ দেন। একজন বণিকের হাত দিয়ে নিকোলাস এ হীরকখণ্ড পাঠিয়ে দেন। হীরকখণ্ডের পিছনে ছিল ডাকাতের দলের গৃধ্নু দৃষ্টি। লোভাতুর দৃষ্টি এড়ালো না বণিকের গতিপথ। বণিক ডাকাতের হাতে প্রাণ হারালো। বুদ্ধিমান বণিক। প্রাণ হারালো। হারালো না অমূল্য হীরকখণ্ড। ডাকাতের হাতে পড়েই সে হীরকখণ্ড গিলে ফেলেছিল। স্যান্সি সাহেব তার প্রভুভক্ত ভৃত্যটিকে চিনতেন। তার শবদেহ কেটে তিনি হীরকখণ্ড বের করলেন। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সে প্রভুভক্ত সেবকটির নাম লেখা হয় নি কেন? কেন এ হীরকখণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসে আজও স্যান্সি নামেই অভিহিত? ইংলণ্ডের প্রথম জেমস সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই হীরকখণ্ড কিনে নেন। এই তো কিছুদিন আগে, ষোলশো বিয়াল্লিশ সালে রাণী হেনরিয়েটো মেরিয়া এ হীরকখণ্ড কিনে নিয়েছেন। জাহান্ আরার কি তা জানা নেই?

শুধু কি হীরকখণ্ডের ছড়াছড়ি?

এই দিল্লীর লালকিলাতে কি দুনিয়ার কম সম্পদ সংগৃহীত আছে?

দেওয়ান-ই-খাসের তখ্ত তাউসের কথা কে না জানে? ময়ূর সিংহাসন। একটা দুটো দিন নয় সাত সাতটা বছর ধরে দুনিয়ার সেরা কারিগর জনাব বেবাদিল খানের নির্দেশে এ সিংহাসন তৈরি করেছেন। এ সিংহাসনের চারখানা পায়া তৈরি হয়েছে খাঁটি সোনা দিয়ে। রাজছত্রটা ছিল বারোটা সোনার স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে। প্রতিটি স্তম্ভের গায়ে ছিল দুটো করে মুক্তোর ময়ূর। প্রতি ময়ূর জোড়ার মাঝে ছিল মণি-মাণিক্যের নকল গাছ। পৃথিবীর কোনো রাজা-বাদশা এত মূল্যবান সিংহাসনে বসার সৌভাগ্য পান নি। ভবিষ্যতেও কোনো রাজার ভাগ্যে ঘটবে না এ পরম সৌভাগ্য। এত সম্পদ আছে কোন্ দেশের? কার রাজভাণ্ডারে আছে এত ঐশ্বর্য? তবুও তো সম্রাট শাজাহান জীবনের সাতাশটা বছরই কাটালেন রণাঙ্গনে। এত অর্থ কোনো সম্রাট কোনো দেশে কোনো কালে আপন রাজভাণ্ডারে সংগ্রহ করতে পেরেছেন বলে শোনা যায় নি।

দেশ সেবায় নিয়োজিত,
এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড
কলিকাতা—৫০
নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী
—ব্রাঞ্চ সমূহ—
বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর
বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গৌহাটী

কিন্তু কি হবে অর্থসম্ভার এ ঐশ্বর্য এ বিত্ত, এ মণিমুক্তা মাণিক্য? জীবনে এর তাৎপর্য কতটুকু?

অদূরে কোন্ পীর ফকীর গান গেয়ে চলেছে যমুনার তীরে। গানটার সুর-মূর্ছনায় শব্দ-ঝঙ্কারে রয়েছে কবিশ্রেষ্ঠ শারমাদের পূত স্পর্শ।

হর কস পয়ে নানে
ওয়োজহাঁ দোস্ত বুদ।
এক দোস্ত নদীদেস
জ জাঁ দোস্ত বুদ॥
চুঁ সগ জ পয়ে লুংকমা
বহর বম্বাদ
ঈনস্ত নিশাঁ কি নামে
শাঁ দোস্ত বুদ॥

আমি শুধু সেই দিনটির অধীর প্রতীক্ষায় দিন গুনছি যেদিন এ প্রিয় দেহটি ধরণীর ধুলোয় গ্রহণ করবে অন্তিম শয্যা। পৃথিবীতে এর চেয়ে প্রিয়তম বন্ধু আর কে আছে? এ পৃথিবীতে বাঁচাটাই যে একটা বিড়ম্বনা। তাই মাতা ধরণীর প্রিয় ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণই যে শান্তির প্রকৃত পথ।

অবাকভাবে তাকিয়ে থাকেন জাহান্ আরা। গান গাইতে গাইতে দরিয়ার দিকে চলেছেন ফকীর। এ তো সাধারণ ভিখারী নয়। মুখে যে সংগীতধ্বনি সে যে বিরহিণী জাহান্ আরা বেগমের হৃদয়ের প্রতিটি মুহূর্তে অনুভূত না-বলা-বাণীর প্রতিধ্বনি। রাত অনেক। ঝরোকার ফাঁক দিয়ে আলো যায় না বেশি দূরে। অন্ধকারে পথিক মিলিয়ে গেল। মেলায় নি শুধু তার মন-মাতানো গান। সে গানের সুর-মূর্ছনা এখনও রাজপ্রাসাদের আনাচে-কানাচে যেন লেগে রয়েছে।

প্রহরীর দল ঘোরাঘুরি করছে।

নহবতে শেষ রাজবন্দনাগীতি সমাপ্ত হয়েছে অনেকক্ষণ আগে।

ফুলবাগিচায় ফুটেছে' নার্গিস, চামেলি, রজনীগন্ধা, গোলাপ। সাইপ্রাস-বীথিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে সাথীহারা পাখী। কে জানে তার সাথীটি এখনও ফেরে নি কেন?

রাজধানী দিল্লীতে হিন্দুস্থানের বাদশা-বেগম জাহান্ আরা বিনিদ্র রজনীতে শুধু ভাবছেন এত অর্থ, এত সম্পদ পেয়েও চোখে ঘুম নেই কেন? সাধারণ দরিদ্র নাগরিকের চেয়েও কি তিনি দীন দরিদ্র? কেন?

তেল শক্তি ও সামর্থ্যের উৎস

দেশের শিল্পোন্নতি ত্বরান্বিত করতে এবং গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের সম্প্রসারণের জন্য বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োজন। তেল এবং বিভিন্ন লুব্রিক্যান্ট এই বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদনে সহায়তা করে, যাতে দেশের উন্নতির দ্বারা আমরা এক আধুনিক ও উন্নতিশীল জাতি হতে পারি।

তেল আমাদের জীবনে একটি অপরিহার্য অংশ গ্রহণ করেছে। আমাদের শিল্প, পরিবহন ও কৃষির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার জন্য পেট্রোলিয়াম ও লুব্রিক্যান্টের বিভিন্ন পেট্রোলিয়ামজাত জিনিষ এখন ইণ্ডিয়ানঅয়েল আমাদের উন্নতিশীল অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ, প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

INDIANOIL —অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকল্পে জাতীয় ন্যাস।

ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড

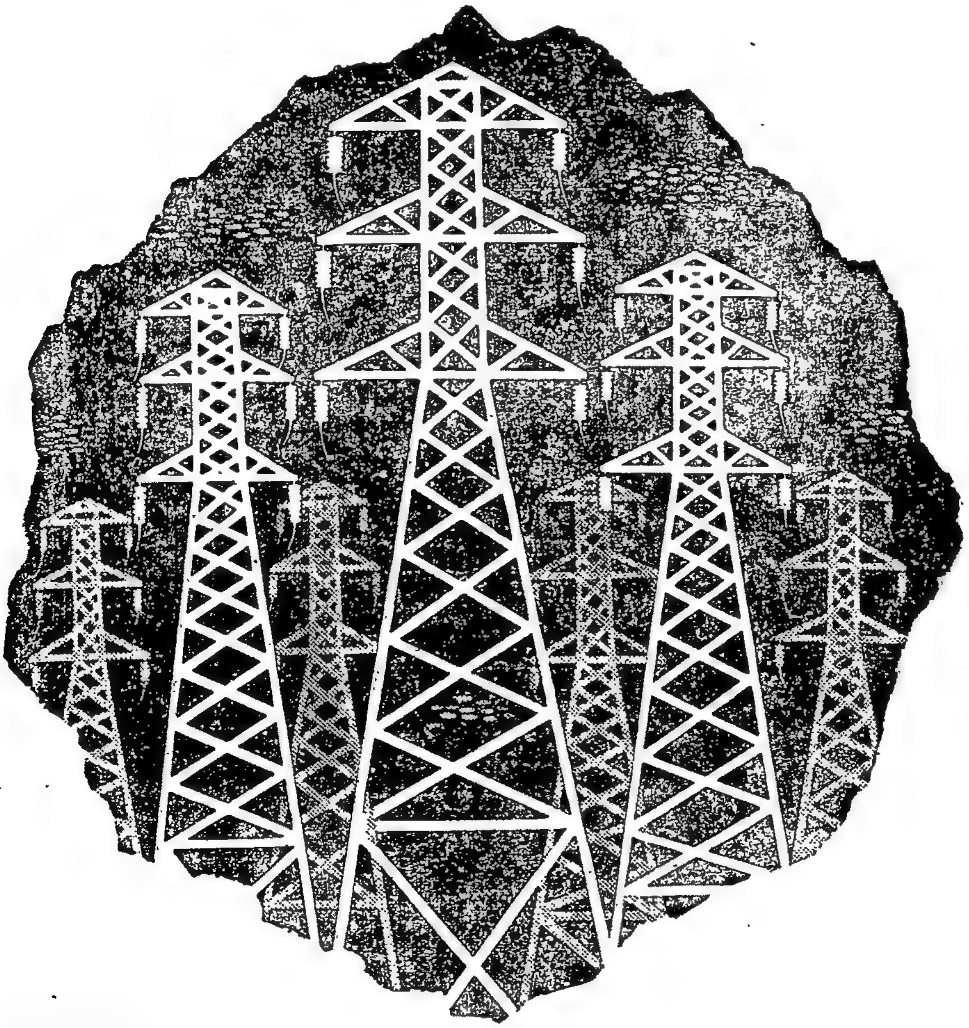

‘চোমংলোমার চোখে উত্তরবঙ্গ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

। পশ্চিম দিনাজপুর—মহাভারতীয় যুগ ॥

তিন হাজার বছর আগের কথা।

তখনও কুরু-পান্ডবের ভারতযুদ্ধ সংঘটিত হয় নি। পূর্ব ভারতের কোটি-বর্ষ বিষয়ের রাজধানী বা কোটিকপুর তখন পান্ডববর্জিত দেশ। কথিত আছে—পান্ডবগণ অজ্ঞাতবাসের জন্য একটি রমণীয় স্থান নির্বাচনের জন্য হিমালয়ের পাদ-দেশ অঞ্চল পরিভ্রমণ করে ফিরছেন। কিন্তু পছন্দমত স্থান পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক স্থান ঘুরে তাঁরা কোটিকপুর বা বাণ-গড়কেও মনোনীত করলেন না। কেন না তাঁদের অজ্ঞাতবাসের স্থান আবিষ্কার করবার জন্য শকুনি প্রেরিত গুপ্তচরও নানা-দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ ছাড়াও দুর্যো-ধনের মিত্র বাণশুর তখন বাণগড়ের একচ্ছত্র অধিপতি। পান্ডব-বৈরী জরাসন্ধও বাণশুরের মিত্র। এ ছাড়া হস্তিনাপুরের রাজ অমাত্য ও অন্যান্য অনেকেই বাণগড়ে যাতায়াত করছে। এই সময়ে বাণগড়ে থাকা নিরাপদ নয় মনে করে পান্ডবগণ স্বর্ণকোশী নদীর অববাহিকা ধরে আরও দক্ষিণাভিমুখে গমন করলেন।

অথচ বাণগড়ের শোভা, সুরম্য নগর-জীবন এবং ঐশ্বর্য দেখে দ্রৌপদী মুগ্ধচোখে চেয়ে রইলেন। তিনি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অনুরোধও করেছিলেন বাণগড়কে অজ্ঞাতবাসের স্থান হিসাবে নির্বাচন করবার জন্য। কিন্তু তা বিপদের কারণ হতে পারে বলে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে বুঝিয়ে আরও অগ্রসর হলেন। বাণশুর অমিতবীর্য রাজচক্রবর্তী।

নিজ বাহুবলে তিনি প্রাগজ্যোতিষ সম্রাটকে পরাস্ত করেছেন এবং তাঁর ভগ্নীকে বিবাহ করেছেন। নিজ রাজধানী বাণগড়ের অতুলনীয় শোভা সৃষ্টি করেছেন।

শুধু তাই নয়—যৌবন সমাগতা কন্যা উষার জন্য বাণশুর এমন এক রমণীয় উপবন তৈরি করেছেন যে—তখনকার দিনে যে কোন সম্রাটের তা ঈর্ষার বস্তু।

রাজপুরী থেকে অদূরে রাজকন্যা উষা তাঁর সখিগণ পরিবৃতা হয়ে থাকেন। উষাবন। পুনর্ভবা নদীর তীরে একটি নির্দিষ্ট স্থান দেখিয়ে আধুনিক যুগের মানুষ এখনও ঊষাবন বলে অভিহিত করে।

অবশ্য প্রকৃত উষাবন কোথায় ছিল তা নিয়ে অবশ্যই বিতর্কের অবকাশ আছে। ঐতিহাসিকরা বলেন—তা কালগর্ভে মিলিয়ে গেছে, ভূতাত্ত্বিকরা বলেন—নদী-গর্ভে। কিন্তু ইতিহাস অমর। তার চেয়েও অবিনশ্বর হল মানুষের হৃদয়।

তিন হাজার বছর আগের স্মৃতির শেষ চিহ্নটুকু মিলিয়ে গেলেও উষার বেদনার অনুরণন আজও মানুষের মনে দোলা দেয়।

যুগ-যুগান্ত ধরেই তা দিয়ে এসেছে। আর এমনি দোলা দিয়েছিল সম্ভবত পশ্চিম দিনাজপুরের এক অখ্যাত পল্লী-কবিকেও। সেই পল্লীকবির ভাষাতেই আজকের প্রস্তাবনা রাখা যাক।

সখি, কি উপ্ দেখিনু মুই নিন্দের ভিতর,
ধরিমু কেমনে ‘পাণ্’ ফুন্‌ঠি সে নাগর।
কি করিমু কুন্‌ঠি যামু মন হল আউল,
কিযোক্ পেরেম ফান্দে এ জীউ ঝাউল!
পাষাণ নিঠুর বিধি কি দশা করিল,
পাষাণ নিঠুর বিধি কি দশা করিল,
স্বপনৎ পানু পতি কিক্কের সে নাতি
বৃন্দাবনে রনিউদ্ধ পামু কি সে পতি!
‘চিত্তন্যাখা’ সখি তুই মায়ের গোড়ৎ যাও,
পাণপতি আনে দিয়ে—এ জীউ বাঁচাও!!

দেবকাম্য উষাবনে বাণকন্যা যুবতী উষা তাঁর সখি চিত্রলেখা এবং অন্যান্যদের নিয়ে সুখেই ছিল। প্রমোদবিহার জল-কেলি, বনবিহার প্রভৃতিতে আনন্দ কলতানে দিন কাটে কুমারী উষার। কিন্তু একদিন ঘুম থেকে উঠে উষার চিত্তবিভ্রম ঘটল।

কেন না স্বপ্নের মধ্যে উষা তার পতির সন্ধান পেয়েছে। কি তার রূপ! দেব-কান্তি, নবযৌবনের স্পর্শে অনিন্দ্যসুন্দর এক মায়াময় রূপ সেই মানুষের। উষার মনের মানুষ! তার নবোদ্ভিন্ন যৌবন-মন্দিরের স্বপ্নসম্ভব পূজারী।

অগত্যা সখিগণের কাছে উষার করুণ আর্তি।

এই রাজপুত্রকে না এনে দিলে এ জীবন বৃথা—এই যৌবনের কোন অর্থ নেই।

সখি চিত্রলেখা হেসেই আকুল। যার নাম নেই—পরিচয় নেই, চিনে নেওয়ার কোনও নিদর্শন নেই—তাকে কি করে এনে দেওয়া যায়। সুতরাং সখি চিত্র-লেখা এবং অন্যান্য সকলেই ঠাট্টা পরিহাসে অতিষ্ঠ করে তোলে উষাকে।

উষা বলে—

“হাসোচেন কেন সখি ছাড়ো এ্যালবাসি
ভাঙ্গার জীউ মনু ডুবে ‘পাণ্‌পতি’ পাসি।
এ্যান্দিনে বুঝিনু মুই বৈরীরে সভাই,
পিরীতি সায়রে সেম’ কি করিমু হায়।
সই যখন পর হইল—পর জগোৎবাসী
পুন্নভবাৎ সাঁধে মুই আত্মা দিব ভাসিয়া
পাণপতি পাণসখা বদন তুলে [illegible]
পাশে আসি পাণসখা এ জীউ [illegible]

অগত্যা প্রিয় সখি চিত্রলেখা [illegible] থামিয়ে বলল—

—এ তোর অন্যায় জিদ্ সখি। স্বপ্নে যার চেহারা মাত্র দেখেছিস তাকে এই বিশ্বব্রহ্মান্ড খুঁজে কি বের করে আনা যায়।

উষা বলে—সে রাজপুত্র!

চিত্রলেখা অনেক চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত একটিমাত্র উপায় বের করল।

বলল—বেশ! আমি ‘ভামতীর’ বেশ ধরে সমগ্র দেশ ঘুরে বেড়াব আর সব দেশের রাজপুত্রদের ছবি এঁকে নিয়ে আসব তাহলে তুই মনের মানুষকে চিনতে পারবি তো?

উষা বলে—পারব।

সুতরাং সখি চিত্রলেখা বেরিয়ে পড়ে। কাঞ্চী, কোশল, চোল ওড্র, সমস্ত দেশের রাজপুত্রদের আলেখ্য নির্মাণ শেষ করে দীর্ঘদিন পরে ফিরে এল।

অসংখ্য রাজপুত্রের ছবি।

সখিরা বলে—দেখি—দেখি--

উষা বলে—দেখি।

একটির পর একটি ছবি দেখে সকলে। না—কোথায়ও সেই স্বপ্নে পাওয়া দয়িতের সন্ধান পায় না উষা। তার সর্বাঙ্গ তখন থর থর করে কাঁপছে। ছবির সংখ্যা শেষ হয়ে আসে। আর শেষ মুহূর্তের একটি ছবি দেখে উষা চিৎ[illegible] করে ওঠে—সখি চিত্তন্যাখা—

আর কিছু বলার সামর্থ্য [illegible] রাজকুমারী উষার। ছবির দিকে [illegible] উষা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে।

সেই স্বপ্নে দেখা রাজপুত্র। যার জন্য ঊষা এতদিন ধরে অপেক্ষা করেছে। স্বপ্নেই যাকে দেখে বাণশুরে কন্যা ঊষা উন্মাদিনী।

সখিরা বলে—দেখি—কে এই রাজপুত্র!

চিত্রলেখা ছবির পরিচয়পত্র পড়ল। আর পরিচয়পত্র পড়েই চিত্রলেখা ভয়ে কেঁপে ওঠে।

সর্বনাশ!

এ যে শ্রীকৃষ্ণের নাতি প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধ!

সখিরা বলে—কি হল সখি চিত্তন্যাখ্যা?

আর কি হল। সর্বনাশ হয়েছে। বাণশুরের আজন্ম বৈরী শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র অনিরুদ্ধকে শেষ পর্যন্ত জীবন যৌবন সমর্পণ করে বসে আছে ঊষা!

ঊষা ততক্ষণে সংজ্ঞা ফিরে পেয়েছে। অনিরুদ্ধের পরিচয় পেয়ে ঊষা কেঁদে সারা।

—কি হবে সখি চিত্তন্যাখা?

"স্বপনৎ পানু পতি কিষ্ণের সে নাতি,
দুষাবনে রনিউন্ধ পামু কি সে পতি!"

এদিকে তখন মহাভারতের আর একটি অধ্যায় রচিত হতে চলেছে। ভারত সংহতি বিধানের জন্য শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন দেশে দূত প্রেরণ করছেন। পান্ডবগণের অজ্ঞাত-বাসের শেষে ভারতব্যাপী সমরানল যাতে না জ্বলে উঠতে পারে সেজন্য শ্রীকৃষ্ণ তৎপর। যদিও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যুদ্ধ অপরিহার্য—তবুও একবার শেষ চেষ্টা করছিলেন তিনি।

আর এই চেষ্টার জন্যই তিনি প্রপৌত্র অনিরুদ্ধকে দূত হিসাবে পাঠিয়ে দিলেন বাণগড়ে—বাণশুরের সভায়।

শ্রীকৃষ্ণ অনিরুদ্ধের মারফৎ জানিয়েছেন—

"ভারতের বড়ই দুর্দিন। আসমুদ্র হিমাচলে সামন্ত নৃপতিগণ স্ব স্ব প্রধান এবং ধর্মচিন্তারহিত হয়ে নিজ নিজ প্রভাব বিস্তারে ব্যস্ত। এর ফলে ভারতের ক্ষাত্রশক্তি বিনষ্ট হচ্ছে এবং অরাজকতার সৃষ্টি হচ্ছে। ধর্মপরায়ণ ঋষিগণ ধর্ম চিন্তা পরিত্যাগ করে ক্ষমতালোভী হচ্ছে—ভূমি শস্য প্রসবিনী নয়—নদী বহমান নয়, অকালমৃত্যু, অনাবৃষ্টিতে দেশে অধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সুতরাং ভারতের ক্ষাত্রশক্তিকে মিলিত ও ঐক্যবন্ধ হয়ে এর প্রতিকার করতে হবে।"

শ্রীকৃষ্ণের পত্রের মর্ম অবগত হয়ে বাণশুরে কোন প্রেরণালাভ করলেন না। কেন না তিনি শিব-উপাসক। শৈবমতে বিশ্বাসী বলে জরাসন্ধের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বিরূপ—একথা বাণশুর ভোলেন কি করে। আর একই কারণে জরাসন্ধ বাণশুরের পরম মিত্র।

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের পত্রের জবাবে বাণশুর লিখলেন—

"তুমি কিষ্ণো গোয়ালার আখাট সন্তান
ভাগ্যগুণে লভিয়াছ আজার সম্মান।
তুমি বৃষ্ণ সেবে মিছা দর্প কর বৃথা,
মুই শিব শম্ভু স্যাবো জগতের পিতা।
তুমার বশ্যতা আমি নিমু অঙ্গিকারী
ইহ নহে গোপীগোপ না আছে চাতুরী।
জরাসিন্ধু মিতা মোর মুই এক হও,
তুমারে ছেচিয়া মুই মদ্যব বানাও।
তুমি যদি হও ছাঁচা মরদ সুহিত
ধরো বজ্র কর 'অন' মোহের সহিত।
না হলে না সাধ্য হবে তুমার বাসনা
মো গোচর যদি পাও ছিড়িব অসনা।
মুই হই আজা বাণ জগতের তাতা
শিবের সেবক মুই তুমার বিধাতা।"

বাণশুরের পত্রের মর্ম জেনে অনিরুদ্ধ নিরুৎসাহ হয়ে পড়লেন। অগত্যা দ্বারকায় ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ করা ছাড়া আর কিছু করণীয় নেই। কিন্তু বাণগড়ের নৈসর্গিক শোভায় এত মুগ্ধ হয়েছেন যে, এই নগরী ছেড়ে যেতে মন চাইছে না। তবুও যেতে হবে।

প্রত্যহ নগর পরিভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন অনিরুদ্ধ। এমন সুন্দর প্রাকৃতিক শোভা এমন মনোলোভা দৃশ্য এর আগে দেখেছেন কি না সন্দেহ। এমনি একদিন উদ্দেশ্য-হীন পরিক্রমার শেষে অনিরুদ্ধ পুনর্ভবা নদীর তীরে একটি বিরাট বৃক্ষের নিচে বসে বিশ্রাম করছিলেন। এমন সময়ে একটি তীর এসে পড়ল তাঁর পায়ের কাছে।

বেঙ্গল কেমিক্যালের

সুবাসিত ব্রাহ্মী
হেয়ার অয়েল
আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে
আয়ুর্বেদ-নির্দেশিত উপকরণে প্রস্তুত

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা ০ বোম্বাই ০ কানপুর ০ দিল্লী
Progressive/BC

তীরে বাঁধা একটি পত্র।

সখি চিত্রলেখার আহ্বান। রাজকুমারী ঊষা অনিরুদ্ধকে দেহমন সমর্পণ করে বসে আছেন। দয়িত বিরহে ঊষা উন্মাদিনী প্রায়। সুতরাং হে কৃষ্ণ কুলোদ্ভব অনিরুদ্ধ, পত্রে বর্ণিত সঙ্কেত স্থানে রাত্রে অপেক্ষা করো—তোমাকে বিরহিণী ঊষার কাছে পৌঁছে দিই। তুমি প্রিয়মিলনকাতরা ঊষার প্রাণরক্ষা করো।

অনিরুদ্ধ রাত্রে ঊষাবনের সন্নিকটে অপেক্ষা করে। চিত্রলেখা সকলের অগোচরে তাকে ঊষাবনের পুরীর মধ্যে নিয়ে যায়।

এমনিভাবেই ঊষা অনিরুদ্ধের মিলন হল।

তার পর শিবচতুর্দশীর দিনে বাণগড় যখন উৎসবমুখর, হাজার হাজার মানুষ পুনর্ভবায় স্নান সেরে মহাকাল মন্দিরে দেবতার পূজার্চনায় রত—তখন সেই অসংখ্য মানুষের ভিড় থেকে ঊষাকে নিজের অশ্বে তুলে নিল অনিরুদ্ধ।

লক্ষ্য—দ্বারকা।

বাণগড়ের গৈরিক ধুলো অশ্ব পদাঘাতে আকাশে উঠল। একটা মায়াময় ধূম্রজালের সৃষ্টি করে অনিরুদ্ধ বাণগড় পরিত্যাগ করল।

বর্তমানকালে বাণগড় বলে অভিহিত প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের কিছু উত্তর-পশ্চিমে বিরূপাক্ষ মন্দির এখনও বিদ্যমান। কমবেশি আড়াই শো বছর আগে দিনাজপুরের রাজা রামনাথ মন্দিরটি সংস্কার করেন। এখনও বিরূপাক্ষ মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বের সড়কটিকে লোকে ঊষাহরণ সড়ক বলে অভিহিত করে।

পরদিন প্রত্যুষে পুনর্ভবায় স্নান সেরে বাণশুর বিরূপাক্ষ মন্দিরে প্রবেশ করলেন শিবার্চনার জন্য। কিন্তু ধ্যানে বসে তাঁর চিত্ত স্থির হল না। যতবারই ধ্যান করেন— ততবারই ইষ্টদেবতার বদলে সামনে যে ছবি ভেসে ওঠে—তা হল—

"আজকুমারী ঊষা বসে আনিউদ্ধ কোলে
একই অশ্বে ছুটে যায় নানা অংয়ে দুলে।"

এই অদ্ভুত দৃশ্যের প্রথমত কোনও অর্থ খুঁজে পান না মহারাজা বাণ। সুতরাং বারংবার তিনি শিবের নিকট প্রার্থনা জানান এই অদ্ভুত দৃশ্যের অন্তর্নিহিত অর্থ জানবার জন্য। শিব দৈববাণীতে বললেন সমস্ত ঘটনা। আর সব তথ্য জানতে পেরে—

"উদ্র ওবে জ্বলি ওঠে বাণ মহাশুর,
পূজা ছাড়ি দৌড়ে ষায় রুষাবনপুর।
পুছি সভা সখিজনে রুষা রুত্তপুরে,
ছাচা কহো রুষা কুন্ঠি কাটিমু সভারে।
সখি কহে আজকন্যা কুনঠি বা গিয়াছে
নিশ্চয় গড়ের মধ্যে নুকে টুকে আছে।
মিছা তুমি চটোছেন তুমি বিজ্ঞ আজা,
হামারা খোজছি কেনে পিছে দিও সাজা।"

কিন্তু গড়ের মধ্যে কোথাও ঊষাকে পাওয়া গেল না। স্নানের স্ফটিক বাঁধানো ঘাটের সিঁড়িতে পাওয়া গেল কাঁকন কেয়ূর, নৃত্যমঞ্চে ছড়িয়ে রয়েছে পায়ের নূপুর, অশোক ডালে দোদুল্যমান দোলনার উপর বাসি গুঞ্জা ফুলের মালা, অথচ রাজকন্যা কোথায়ও নেই।

সখি 'চিত্তন্যাখা' অপরাধীর মত পাষাণ স্তম্ভের সঙ্গে মুখ গুঁজে দাঁড়িয়ে রইল, অন্যান্য সখিরা রুদ্রমূর্তি বাণের সম্মুখে নতমুখী হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু বাণশুর ক্রোধে উন্মত্ত হলেও জানতেন এদের গঞ্জনা দেওয়া বৃথা। সুতরাং—

—শিব ত্যাজে তেজিয়ান আজা বাণশুরে
খরশাল রশ্মি সম সভে করি দূরে,
এড়িলেন নাগপাশ গুণকরা বাণ,
বান্ধিলেন রণিউদ্ধে ঊষার পরাণ।

দ্বারকার পথে অশ্ব ছুটিয়েছিল কুমার অনিরুদ্ধ। একদিনের পথ উত্তীর্ণ হয়েছে সবে। আরও চব্বিশ প্রহর চলতে হবে এমনিভাবে, তবেই দ্বারকার সীমানায় পৌঁছে যেতে পারেন। কিন্তু তা আর সম্ভব হল না। শিব প্রদত্ত বাণ নাগপাশ গিয়ে বন্দী করল দুজনকে।

শুধু বন্দীই করল না সেই বাণ, বন্দী অবস্থাতেই দুজনকে নিয়ে এল বাণশুরের সভায়। নতমুখী ঊষা এবং বিহ্বলচিত্ত অনিরুদ্ধ এসে দাঁড়াল বাণশুরের সামনে।

মহা ক্রোধে বাণ বললেন—তোমাকে আমি এই মুহূর্তে বধ করতে পারি অনিরুদ্ধ, কিন্তু তা করব না এইজন্য যে, তুমি দূত হয়ে বাণগড়ে প্রবেশ করেছিলে। কিন্তু ধিক্ তোমাকে যে তুমি রাজ আচরণ ভুলে গিয়ে পরের কন্যাকে অপহরণ করেছ। অবশ্য তোমার দোষ নেই—কেন না নারীহরণ তোমার বংশগত দোষ।

অগত্যা ঊষা এবং অনিরুদ্ধ পৃথক পৃথক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হল। ঊষা কোনও কূল-কিনারা খুঁজে পায় না। দিনরাত্রি অতিবাহিত হয়ে যায় হতাশ্বাসে। অকস্মাৎ একটি বুদ্ধি শেষ পর্যন্ত ঊষার মনে আসে। একজন প্রহরীকে সে বশ করল উৎকোচ দিয়ে। কথা হল—ঊষার পত্র নিয়ে সে যাবে দ্বারকায়। গোপন পত্র তুলে দেবে সে শ্রীকৃষ্ণের হাতে।

প্রহরী রাজী হল—এবং ঊষার নির্দেশমত পত্র নিয়ে রওনা দিল সে দ্বারকায়।

এ ছাড়া আর কোনও গত্যন্তর ছিল না ঊষার।

ঊষা লিখল—

অক্ষা করো কুনঠি কিস্কো কুলবধু রুষা
পতি রনিউদ্ধ সংগে নাহি পাই দিশা,
পিতা বাণ বান্ধিয়াছে তাহাক্ হামাক্
তাড়ি ঘাড়ি আসি করো রুদ্ধার সভাক্।

গোপন দূত বাহিত পত্রে বলরাম এবং কৃষ্ণ সবই অবগত হলেন। এ এক বিষম সমস্যা দেখা দিল তাঁদের সামনে। তাঁরা দুজনেই অগ্রণী হয়েছেন ভারত সংহতি-বিধানে। সুতরাং এখন তাঁরাই যদি প্রথমে বাণশুরের সঙ্গে কলহে প্রবৃত্ত হ'ন তবে সমগ্র ভারতেই তাঁদের অসম্মানের কারণ ঘটবে। এদিকে গান্ধর্ব মতে বিবাহিত প্রপৌত্র অনিরুদ্ধ এবং কুলবধূ ঊষার নিপীড়ন বার্তা জেনেও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা চলে না।

তবুও কৃষ্ণপত্র লিখলেন বাণশুরকে। লিখলেন—সবই ভবিতব্য। আমি আপনার সঙ্গে সখ্যতা স্থাপনের জন্য অনিরুদ্ধকে পাঠিয়েছিলাম। এখন আপনার কর্তব্য ঊষা-অনিরুদ্ধকে শাস্ত্রমতে পরিণীত করে আত্মীয়তা সম্পর্ক স্থাপন।

কিন্তু বাণশুর এই আত্মীয়তার আহ্বানও প্রত্যাখ্যান করলেন। শ্রীকৃষ্ণের দূতকে অপমান করে ফেরৎ দিলেন বাণশুর।

অবশ্য বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ বাণশুরের কাছে এই আচরণই প্রত্যাশা করেছিলেন। রামকৃষ্ণ তখন কুরু-পাণ্ডবের আসন্ন যুদ্ধের সম্ভাবনায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। এই সময়ে আরও একটি যুদ্ধের সম্ভাবনাকে প্রাণপণেই পরিহার করবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু বাণের ফেরৎ পাঠানো দূতের মুখে সমস্ত বিষয় অবগত হয়ে বিমর্ষ হয়ে পড়লেন তাঁরা।

আর কারাগারে বসে আরও বিমর্ষ হয়ে পড়লেন অনিরুদ্ধ এবং ঊষা।

(ক্রমশঃ)

'গুলাবি চা'

তাজা ও সেরা। একবার খেয়ে দেখুন।

৪৫নং ফ্রী স্কুল স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
(পার্ক স্ট্রীট থেকে মাত্র ৩ মিনিটের পথ)।

এইচ. জি. ওয়েলস-এর গল্প

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

(শেষার্ধ)

দি ইন্‌ভিজিব্‌ল্‌ ম্যান

এইখানে বলে রাখা দরকার, সুরুতেই সিদ্ধান্তের কথা না বলে ধারণার কথা উল্লেখ করে ওয়েল্‌স বৈজ্ঞানিক দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। সে কারণেই গ্রিফিন যখন তার উক্তির পরবর্তী অংশে এই ধারণার কথা ব্যাখ্যা করে, তখন অবিশ্বাসের হাসি হেসে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করি না আমরা; বরং বৈজ্ঞানিক সত্যের রাজ্যে অনুপ্রবেশ করেছি ভেবে নিশ্চিন্ত হই। আমরা জানতে পারি, ওই বৈজ্ঞানিক সূত্র ও ধারণার উপর ভিত্তি করে কোনো কঠিন বা তরল বস্তুর 'রিফ্রাক্‌টিভ্‌ ইন্‌ডেক্‌স্‌' অর্থাৎ প্রতিসরাঙ্ক কমিয়ে বায়ুর সমান করা যায়। এতে করে সেই বস্তুর রঙ ছাড়া অন্য কোনো গুণের পরিবর্তন হবে না। আমাদের দর্শনশক্তি নির্ভর করে আলোর রাজ্যে বিভিন্ন দৃশ্যমান বস্তুর প্রতিক্রিয়ার ওপর। বস্তুর ধর্ম নানা ধরণের। কোনোটি আলোককে শুষে নেয়। কোনোটি থেকে আবার আলোক প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত হয়। এ ছাড়া এমন কোনো কোনো বস্তুও আছে যারা আলোককে শোষণ, প্রতিফলন ও প্রতিসরণের কাজ একই সঙ্গে করে। যদি এমন হয় যে কোনো বস্তু উপরোক্ত এই তিনটি কাজের একটিও করছে না, তবে সেই বস্তুটি নিশ্চয়ই অদৃশ্য অবস্থায় থাকবে।

স্বচ্ছ কোনো পদার্থকে অদৃশ্য করা অপেক্ষাকৃত সহজ। যদি তাকে তার সমান 'রিফ্রাক্‌টিভ্‌ ইন্‌ডেক্‌স্‌' বা প্রতিসরাঙ্ক-বিশিষ্ট কোনো পদার্থের মধ্যে রাখা যায়, তবে সে অদৃশ্য হবে। জলের মধ্যে সচরাচর-ব্যবহৃত পরিষ্কার কোনো কাঁচ ডুবিয়ে রেখে এ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। দেখা যায়, কাঁচ যেন জলের মধ্যে প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেল। আর তরল পদার্থটি যদি জল না হয়ে অপেক্ষাকৃত ঘন কোনো স্বচ্ছ পদার্থ হয়, তবে কাঁচকে ওর মধ্যে রাখলে সম্পূর্ণ অদৃশ্য মনে হবে।

এদিকে মানুষের দেহেরও রক্তের লাল অংশটুকু এবং চুলের কালো অংশটুকু ছাড়া অন্য সব কিছুই স্বচ্ছ। মানবদেহের হাড়, মাংস, চুল, নখ, শিরা-উপশিরা, স্নায়ু সমস্তই বর্ণহীন স্বচ্ছ তন্তু দিয়ে গড়া। রক্তের লাল অংশকেও সাদা এবং বর্ণহীন করা যায়। এরূপ করলে রক্তের গুণের কোনো পরিবর্তন ঘটবে না।

গ্রিফিন-এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এগুলো। এগুলোর সঙ্গে মিলিয়েই সে সিদ্ধান্ত করেছে, দেহের চুল এবং চামড়াকে যদি অস্বাভাবিক রকম সাদা করা যায়, তবে অদৃশ্য হবার পক্ষে আর কোনো বাধাই থাকবে না। দেহের 'রিফ্রাক্‌টিভ্‌ ইন্‌ডেক্‌স্‌' বা প্রতিসরাঙ্ককে বায়ুর সমান করতে পারলেই অদৃশ্য হওয়া যাবে।

গ্রিফিন স্বীকার করেছে, আপন আবিষ্কারের আনন্দে আত্মহারা হয়েছিল সে। অদৃশ্য হয়ে থাকার সুবিধাগুলোর কথাই শুধু সে ভেবেছিল। অসুবিধার কথা একটিও ভাবে নি। গ্রিফিন ভেবেছিল, একবার অদৃশ্য হতে পারলে যে বিরাট শক্তি ও স্বাধীনতা সে ভোগ করতে পারবে, অন্য কিছুর সঙ্গে তার কোন তুলনা চলে না।

এই ভাবনাই তাকে শেষ অবধি সর্বনাশের পথে ঠেলে দিল। গ্রিফিন ভাবল, চিসেলস্টোয়ে কলেজের সামান্য ডেমনস্ট্রেটর সে। অভাবে-অভিযোগে সর্বক্ষণ জর্জরিত। গবেষণায় সাফল্য অর্জন করলে রাতারাতি বিশ্বজোড়া নাম হবে তার। সে হবে প্রভূত অর্থ ও খ্যাতিপ্রতিপত্তির অধীশ্বর।

গ্রিফিন উঠে-পড়ে লাগল। দীর্ঘ তিন বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করল সে। প্রবল এক একটি বাধা ডিঙোল। কিন্তু তবু সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারল না। অর্থের অভাবে তার সমস্ত গবেষণা শেষ ধাপে এসে বানচাল হবার উপক্রম হল।

অগত্যা তার পিতার কাছ থেকে অর্থ চুরি করল সে। স্বার্থসিদ্ধির জন্যে বেপরোয়া হয়ে উঠল। সে অর্থ পিতার নিজের ছিল না। তাই মান বাঁচাবার জন্যে শেষ অবধি তিনি আত্মহত্যা করলেন।

গ্রিফিন লন্ডনে এল। গ্রেট পোর্টল্যান্ড স্ট্রীট-এ সামান্য একটি ঘর ভাড়া নিল সে। ঘরটি ছিল এক বস্তির গা ঘেঁষে। কিন্তু এজন্যে বিশেষ কোনো অসুবিধা বোধ করল না গ্রিফিন। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যই তার কাছে বড় হয়ে উঠেছিল। লন্ডনে এসে পিতার কাছ থেকে সংগ্রহ করা টাকায় সে গবেষণার জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় করল। এমনকি পিতার কথাও অনায়াসেই ভুলে গেল সে। ওই হতভাগ্যকে দুর্নামের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে একটি কথাও সে বলল না। বরং তার মনে হল, অত্যধিক ভাবপ্রবণতার বশে পিতা নিজেই তাঁর মৃত্যু ডেকে এনেছেন।

দেখতে দেখতে প্রীতি ও ভালবাসার জগৎ থেকে অনেক দূরে সরে এল গ্রিফিন। এমন কি যে মেয়েটিকে সে দশ বছর ধরে জানত, সে-ও তার মনে কোনো রেখাপাত করতে পারল না। তার মনে হল, একমাত্র বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিগুলো ছাড়া জগতের অন্য সব কিছুই মিথ্যে। ক্রমেই পোর্টল্যান্ড স্ট্রীটের গবেষণাগারে গ্রিফিন একটা স্বতন্ত্র জগৎ গড়ে তুলল। নিজেকে স্বেচ্ছায় নির্বাসিত করল সেখানে। তার পর প্রস্তুত হতে লাগল চরম পরীক্ষার জন্যে। ওই পরীক্ষাটি কেমন, তার একটা মোটামুটি বর্ণনা সে ডঃ কেম্প্‌-এর কাছে দিয়েছে। বলেছে, যে বস্তুটির 'রিফ্রাক্‌টিভ্‌ ইন্‌ডেক্‌স্‌' বা প্রতিসরাঙ্ক কমাবার কথা, তাকে রাখতে হবে ঈথারে কম্পনসৃষ্টিতে সক্ষম দুটি বিকিরণধর্মী যন্ত্রের মাঝখানে। এজন্যে প্রধানত দুটি ছোট ডাইনামোর প্রয়োজন হবে। গ্রিফিন জানিয়েছে, সস্তা গ্যাস-এঞ্জিন দিয়ে ডাইনামোর কাজ সে চালিয়ে নিয়েছিল। তার বর্ণনার পরবর্তী পর্বে পাই অদৃশ্য-করণের কাহিনী। প্রথমে একখণ্ড উলকে অদৃশ্য করেছে সে, তারপর করেছে একটি বিড়ালকে: এবং পরিশেষে সে নিজে অদৃশ্য হয়েছে।

গ্রিফিন-এর বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে ভিত্তি করে ওয়েলস এইভাবে ক্রমশ চরম পরীক্ষার কথা বলেছেন। ফলে অসম্ভবের দেশে পাঠকরা হঠাৎ করে এগোয় না, এগোয় ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে। অভাবনীয়কে

মেনে নেবার জন্যে প্রস্তুত হবার সময় পায় সবাই। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা না ঘামালেও সবাই এটুকু অন্তত উপলব্ধি করে যে, গ্রিফিন-এর অদৃশ্য হবার মতো পরিবেশ গড়ে উঠেছে। যন্ত্র তার অনুকূলে। মনও তাকে অদৃশ্য হবার জন্যে অনুকূলতা করছে। একদিকে দারুণ অর্থাভাব, অপরদিকে ক্ষমতার দুর্দমনীয় মোহ তাকে ক্রমেই অনির্দেশ্যের পথে ঠেলে দিচ্ছে।

তাই যখন গ্রিফিনকে বলতে শুনি, কেমন করে একটি বিড়ালকে অদৃশ্য করার দু-চার দিন পরেই সে নিজে অদৃশ্য হল, তখন ঘটনার দ্রুত পরিণতিতে আমরা দিশাহারা হই না। বরং সকৌতুকে লক্ষ্য করি, অদৃশ্য হবার অতি দুরূহ পরীক্ষা তরুণ বিজ্ঞানীটি খুব সতর্কতার সঙ্গেই সম্পাদন করেছে। ভাড়াটে বাড়ির অন্যান্য লোকদের এ সম্পর্কে কোনো কিছুই সে জানতে দেয় নি।

অদৃশ্য হবার পর যন্ত্রপাতিগুলো পুড়িয়ে দিয়েছে। সারা বাড়িতে আগুন লাগিয়েছে। সরিয়ে দিয়েছে শুধু সেই নোট-বইগুলো যাদের মধ্যে তার গবেষণার কথা লেখা ছিল। বাড়িতে আগুন লাগা-বার মধ্য দিয়ে গ্রিফিন-এর নিষ্ঠুরতা ফুটে উঠেছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এ ছিল অদৃশ্য হবার অবধারিত প্রতিক্রিয়া। এমন যে হবে, সে সম্বন্ধে ওয়েলস অনেক আগে থাকতেই আমাদের সচেতন করে দিয়েছেন। এদিকে অদৃশ্য হবার পরেই গ্রিফিন যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে, তা'ও কম চিত্তাকর্ষক নয়। চোখ বন্ধ করেও দেখতে পেয়েছে সে; নিজের পা দেখতে পায় নি বলে হাঁটতে গিয়ে অসুবিধায় পড়েছে। এইখানে বলে রাখা দরকার, অদৃশ্য মানুষের এই সব অনুভূতিগুলোর বর্ণনা দিতে গিয়ে ওয়েলস আশ্চর্য সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। এ ছাড়া গ্রিফিন-এর অদৃশ্য হবার বর্ণনাও কম আকর্ষণীয় নয়। সেখানে দেখি, দেহ থেকে জামা-কাপড়গুলো খুলে নিয়েছে সে, রক্তকে সাদা করার ওষুধ খেয়েছে, তারপর বসেছে সেই বিকিরণশীল যন্ত্রের কাছে। তার দেহ সাদা হয়েছে ধীরে ধীরে। ধীরে ধীরে তার অস্থি এবং মজ্জা অদৃশ্য হয়েছে। সবশেষে অদৃশ্য হয়েছে তার চুল, নখ ইত্যাদি। দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টার অক্লান্ত চেষ্টায় গ্রিফিন সফল হয়েছে শেষ অবধি। আপন দেহের 'রিফ্রাক্টিভ্ ইন্ডেক্স্' বা প্রতিসরাঙ্ক বায়ুর সমান করেছে। ফলে তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ধর্ম ও অস্তিত্ব যথারীতি বজায় থেকেছে; কিন্তু কেউ তাকে দেখতে পায় নি।

অদৃশ্য হবার ঠিক পরেই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে গ্রিফিন। তার মন চেয়েছে মানুষকে ভয় দেখাতে, চমকিত করতে। কখন বা লোকজনের পিঠে অকারণে চড় মারবার ইচ্ছে হয়েছে তার। কখনও আবার সে ভেবেছে, পথচারীদের টুপি উড়িয়ে দিয়ে কৌতুক করবার কথা। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কৌতুকসুখ সে আদৌ উপভোগ করতে পারে নি। গ্রেট পোর্টল্যান্ড্ স্ট্রীটে নেমে আসবার পর অথবা অক্সফোর্ড স্ট্রীট দিয়ে চলবার সময় বিপদ পদে পদে ঘিরে ধরেছে তাকে। পথের লোকজনদের সঙ্গে তার সংঘর্ষ হয়েছে মাঝে মাঝে। হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে পথ-চারীরা বিস্ময়ে আতঙ্কে অভিভূত হয়েছে। ওদিকে দারুণ ঠান্ডায় অস্থির হয়ে উঠেছে গ্রিফিন। কেন না অদৃশ্য হবার সময় থেকে সে সম্পূর্ণ নগ্ন ছিল। আর শুধুমাত্র দেহেরই 'রিফ্রাক্টিভ্ ইন্ডেক্স্' বা প্রতিসরাঙ্ক কমিয়েছে সে। আবরণের কথা ভাবে নি। একবারও মনে হয় নি তার, যে দেহ যত স্বচ্ছই হোক না কেন, তা' জলবায়ু ও আবহাওয়ার প্রভাব এড়াতে পারবে না। এদিকে কোনো কিছু গায়ে দিয়েও পথ-চলার উপায় ছিল না। কারণ, সেক্ষেত্রে সবাই কেবল তার গায়ের আবরণটাকে দেখবে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই নিজের অসহায় অবস্থা বুঝে নিল গ্রিফিন। স্পষ্টই অনুভব করল, চরম এক সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে সে; এ থেকে যেমন করে হোক উদ্ধার পেতে হবে। কিন্তু তখন বড় দেরি হয়ে গেছে। উদ্ধারের পথ আর খোলা নেই। গ্রিফিন শিউরে উঠল। প্রচন্ড শীতের মধ্যে সম্পূর্ণ আশ্রয়হীন অবস্থায় পথে পথে ঘুরে বেড়াল সে। পথের কুকুরগুলো ওকে দেখতে পেল না বটে; কিন্তু ঘ্রাণ থেকে ওর অস্তিত্ব ঠাওর করল। ওদের কোনো কোনোটি তাড়া করল ওকে। অনেক কষ্টে আত্মরক্ষা করল গ্রিফিন। এদিকে চলতে গিয়ে তার পায়ে কাদা লেগেছিল। পা অদৃশ্য ছিল তার। কিন্তু কাদা নয়। ফলে কাদা-মাখা দু'টো পায়ের পাতা বিপদ ডেকে আনল। কয়েক-জন ছেলে-ছোকরা দেখতে পেল ওদের; এবং দেখা মাত্রই গ্রিফিন-এর পিছু নিল।

অদৃশ্য মানুষটি অনেক কষ্টে ওই বিপদ থেকে রক্ষা পেল। কিন্তু পরক্ষণেই নতুন এক বিপদ ঘিরে ধরল তাকে। তুষারপাত সুরু হল। খোলা জায়গায় হাড় কন্‌কনে শীতে শোচনীয় হয়ে উঠল গ্রিফিন-এর অবস্থা।

কাহিনীর এই অংশে অদৃশ্য মানু-ষের দুরবস্থার চিত্রটি ওয়েলস অতি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। দারুণ ঠান্ডা, কুকুরের উপদ্রব এবং কাদা-মাখা পা-কে ঘিরে বিপর্যয়ের ছবি অঙ্কনের মধ্য দিয়ে লেখকের অসাধারণ শিল্পসৃষ্টির পরিচয় সুস্পষ্ট। এ ছাড়া অদৃশ্য মানুষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটি অশ্বের যে প্রতিক্রিয়া হল, রসিক পাঠকের চোখে তা' এড়িয়ে যাবার নয়। এইখানে স্পষ্টই অনুভব করবেন ওঁরা যে ওয়েলস অদৃশ্য মানুষের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে দৃশ্য জগতের সত্য-স্বরূপকে ভুলে যান নি।

পরবর্তী অধ্যায়ে 'অদৃশ্যের' ট্র্যাজেডী আরও মর্মান্তিক হয়ে উঠেছে। সেখানে দেখি, আশ্রয় নেই তার, পরিধেয় নেই; পৃথিবীতে এমন একটি লোক নেই যার কাছে সে মনের কথা খুলে বলতে পারে। এদিকে দারুণ শীতে, ক্লান্তিতে ও ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়েছে সে। সামান্য একটু উত্তাপ ও আশ্রয়ের জন্যে মরীয়া হয়ে উঠেছে। চারিদিকে বরফ পড়ছে অবিরাম। তুষার-ঝড় সুরু হয়েছে। কিন্তু গ্রিফিন একা এবং সম্পূর্ণ আশ্রয়হীন। লন্ডনের রাজপথ ধরে মূর্তিমান হতভাগ্যের মতো এগোচ্ছে সে। কোনোরকমে নিজেকে বাঁচাবার পথ খুঁজছে।

শেষ অবধি সাময়িকভাবে আশ্রয় পেয়েছে গ্রিফিন। সকলের অলক্ষ্যে একটি বড় দোকানে ঢুকে পড়েছে। সেখানে ছিল নানা ধরণের জিনিসপত্র। জামা-কাপড় ও লেপ-তোষক থেকে সুরু করে খেলনা, খাবার-দাবার সব কিছু।

গ্রিফিন ঠিক করেছিল, ওই দোকান থেকে কিছু জামা-কাপড় সরিয়ে নেবে সে। কোট-প্যান্ট গায়ে দিয়ে আর দশ-জন মানুষের মতো হবে। পায়ে জুতো-মোজা পরবে; মাথায় ওঠাবে টুপি। তারপর হাতে দস্তানা, চোখে গগ্‌ল লাগাতে পারলে এবং মাফলার দিয়ে কান ও গলা ঢেকে নিয়ে কৃত্রিম একটা নাক সংগ্রহ করতে পারলে ভাবনার আর কিছু থাকবে না। ওই দোকানে একমাত্র গগ্‌ল ছাড়া সব কিছুই সংগ্রহ করেছিল গ্রিফিন। দোকান বন্ধ করে সকলে চলে যাবার পর কিছু খাদ্যও সংগ্রহ করেছিল। গরম কম্বলের ভাঁজে খানিকক্ষণ ঘুমিয়েও নিয়ে-ছিল। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারে নি। আর একটু হলেই ধরা পড়ে যেত সে। ধরা যে পড়ে নি, এজন্যে তার উপস্থিত-বুদ্ধি দায়ী। দোকানের কয়েকজন কর্মচারী তাকে তাড়া করছে দেখে অতি দ্রুত জামা-কাপড়গুলো খুলে নিয়েছিল সে। কোনোক্রমে দোকান থেকে বেরিয়ে এসেছিল। কাহিনীর এই অংশে অদৃশ্য মানুষের দেখা একটি স্বপ্নের বর্ণনা বড় মনোজ্ঞ। ওই দোকানটিতে সকলের অগোচরে কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে থাক-বার সময় 'অদৃশ্যের' মনে হয়েছিল, কা'রা যেন জোর করে তাকে সমাধিস্থ করতে চাইছে। শবাধারে করে তার পিতার মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কবর খোঁড়া

হয়েছে তার।। সবাই বলছে, ওই কবরেই গ্রিফিনকেও সমাধিস্থ করা হবে।

দেহ ও মন উভয় দিক দিয়েই গ্রিফিন যে শোচনীয় অবস্থায় পৌঁছেছিল, তা'তে এই স্বপ্ন অস্বাভাবিক কিছু হয় নি; বরং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং সুসংগতই হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে গ্রিফিন-এর মনোবিকারের চিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

কাহিনীর পরবর্তী পর্বে বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সংগ্রামরত গ্রিফিনকে দেখি আমরা। দেখি, খাদ্য বস্ত্র ও আশ্রয়ের অভাবে ভয়াবহ হয়ে উঠেছে তার অবস্থা। দিনের পর দিন উপবাস করছে সে। কেন না খেলেই ভুক্ত পদার্থগুলো বাইরে থেকে দেখা যাবার সম্ভাবনা। তুষারপাতের সময় অথবা বৃষ্টি বা কুয়াশার মধ্যে সে বাইরে যেতে পারছে না। কারণ গায়ে তুষার বা বৃষ্টির জল লেগে থাকলে সবাই তার অস্তিত্বের কথা জেনে ফেলবে। এমন কি কুয়াশার মধ্যেও দাঁড়াবার উপায় ছিল না গ্রিফিন-এর। সর্বক্ষণ ভয় ছিল, বুঝি তার দেহটা সেখানে অস্পষ্ট বুদ্‌বুদের আকারে ভেসে উঠবে। এ ছাড়া ধরা পড়বার ভয়ে গায়ে ধুলো লাগাবার উপায় ছিল না। অর্থাৎ, সব দিক মিলিয়ে মর্মান্তিক হয়ে উঠেছিল গ্রিফিন-এর অবস্থা। খাদ্য এবং বস্ত্রের জন্যই সবচেয়ে অস্থির হয়েছিল সে। তার সেই অস্থির ও অসহায় অবস্থার চিত্র ওয়েল্‌স এখানে নিখুঁতভাবে এঁকেছেন। আমরা যেন স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি সেই বিজ্ঞানীটিকে, সহায়-সম্বলহীন ও নিরাশ্রয় অবস্থায় সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নামেই মানুষ সে; আসলে মানুষের একটা 'প্যারডি'।

উপায়ান্তর না দেখে শেষ অবধি সাজ-পোষাক-ভর্তি একটা বাড়িতে সে ঢুকে পড়ল। বাড়িটা ছিল লন্ডনের এক এঁদো গলি ড্রারি 'লেইন্‌'-এর পাশে। ছোটখাটো আকারের এক দোকান ছিল সেখানে। দোকানের মালিক বাড়ির ভিতরেই ছিল'

গ্রিফিন দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকা মাত্রই বেল বেজে উঠল! দোকানী এগিয়ে এল হন্তদন্ত হয়ে। কিন্তু কাউকে দেখতে না পেয়ে সে বিস্মিত হল; এবং এর ঠিক পরবর্তী পর্বে যা' ঘটল, তা'তে তার বিস্ময় আরও শতগুণে বাড়বার পালা। সে লক্ষ্য করল, বাড়ির নানা জায়গা থেকে কা'র যেন পদশব্দ ভেসে আসছে। মানুষের আনাগোনার স্পষ্ট প্রমাণ মিলছে; কিন্তু কাউকে চোখে পড়ছে না। কাহিনীর এই অংশে অদৃশ্য মানুষ ও দোকানীর মধ্যে যে লুকোচুরি খেলা চলেছে, তা' বিশেষভাবে আমাদের মুগ্ধ করে। আমরা প্রতি মুহূর্তে সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটবে বলে উৎকণ্ঠা অনুভব করি; এবং পরিশেষে দেখি, দোকানীকে আঘাত করে এবং আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখে অদৃশ্য মানুষ অন্তর্ধান করেছে। কোট-প্যান্ট, জুতো-মোজা পরে আর দশজন মানুষের মতোই বাইরে বেরিয়ে পড়েছে গ্রিফিন। চোখে গগ্‌ল, মাথায় টুপি, হাতে দস্তানা এবং গলায় মাফলার জড়িয়ে বেরিয়েছে। সঙ্গে নিয়েছে ওই দোকান থেকে সংগ্রহ করা কিছু অর্থ। বাইরে গিয়েও নিশ্চিন্ত হতে পারে নি সে। সন্দেহ-শঙ্কা প্রতি মুহূর্তে তার মনে ঝড় তুলেছে। রেস্টুরেন্টে বসে খাবার সময় এবং পথে চলতে গিয়ে বার বার সে শিউরে উঠেছে।

এই অংশে মানুষের ছদ্মবেশধারী গ্রিফিন-এর জীবনচিত্রটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। পরবর্তী অংশে দেখি, গবেষণার তথ্যসম্বলিত নোট-বইগুলো সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছে সে এবং কিছু রাসায়নিক দ্রব্যের অর্ডার দিয়ে ইপিং গ্রামের দিকে যাত্রা করেছে। তারপর ইপিং-এ পৌঁছুবার পর যা' কিছু ঘটেছে, তাদের সবই আমাদের জানা। অদৃশ্য মানুষের মাঝখানের কাহিনীটা প্রথমেই শুনে নিয়েছি আমরা। আর মূল কাহিনীর মাঝখানে এসে প্রথম দিককার ইতিবৃত্ত শুনলাম।

'ইন্‌ভিজিব্‌ল্‌ ম্যান্‌'-এর কাহিনীটি মাঝখান থেকে সুরু করার ফলে ভালই হয়েছে। রহস্য জমে উঠবার অবকাশ পেয়েছে গোড়া থেকেই। আর শেষ দিকেও কাহিনী কোথাও শ্লথ হয়ে পড়ে নি। ডঃ কেম্প্‌-এর কাছে তুলে ধরা অদৃশ্য মানুষের আত্মকথা অংশটুকু তো বটেই, পরবর্তী গল্পকথাটুকুও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। ডঃ কেম্প্‌-এর সঙ্গে মূল ঘটনার যোগসূত্র রচনা করেছেন লেখক এবং কাহিনীটিকে পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে গেছেন। দেখিয়েছেন, গল্প-শোনার ফাঁকে অদৃশ্য মানুষকে ধরিয়ে দেবার আয়োজন করেছেন কেম্প্‌। গোপনে সংবাদ পাঠিয়েছেন বার্‌ডক্‌ শহরের পুলিশ-প্রধানের কাছে। অদৃশ্য মানুষের আত্মকথাও তখন বার্‌ডক্‌ অবধি এসে পৌঁছেছিল। উত্তেজিতভাবেই গ্রিফিন বলেছিল, ওই বন্দর দিয়ে দূরের কোনো উষ্ণ দেশে পালাবার ইচ্ছে ছিল তার। সে চেয়েছিল, মার্‌ভেল্‌-এর কাছ থেকে নোট-বইগুলো উদ্ধার করতে। এ ছাড়া আর একটি বাসনা ছিল গ্রিফিন-এর। ডঃ কেম্প্‌কে সহযোগী হিসেবে পেতে চেয়েছিল সে। একা মানুষ সে কত দুর্বল ও অসহায় এ কথা সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিল। এই প্রসঙ্গে তার কিছু উক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্পষ্টই স্বীকার করেছে গ্রিফিন,—

> "আমি ভুল করেছি কেম্প্‌। এ কাজের সমস্তটা একা করতে গিয়ে মারাত্মক ভুল করেছি। শক্তি নষ্ট করেছি আমি। সময় আর সুযোগের অপব্যবহার করেছি। অথচ কী আশ্চর্য ঃ একা মানুষের ক্ষমতা কত অল্প! একটু প্রতারণা করা, একটু আঘাত করা কাউকে। ব্যাস, ওই পর্যন্তই।
>
> "কেম্প্‌, আমি যা' চাই তা হল একজন রক্ষক। একজন সহযোগী চাই আমি; আর চাই একটু আশ্রয়। এমন কিছু একটা ব্যবস্থা আমার দরকার যা'তে কারও কোনো সন্দেহ উদ্রেক না করে আমি শান্তিতে থাকতে পারি; যা'তে নির্বিঘ্নে খেতে এবং ঘুমুতে পারি আমি। একজন বন্ধু আমার বড় দরকার। বন্ধু যদি থাকে, আর যদি থাকে খাদ্য এবং বিশ্রাম, তবে হাজার কাজ করা সম্ভব।
>
> "এই অবধি ভুল পথে চলেছি আমি।"

গ্রিফিন-এর এই উক্তির মধ্য দিয়ে তার অসহায় অবস্থাটি মূর্ত হয়েছে। আত্ম-সমালোচনার সুরও এখানে সুস্পষ্ট। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সে কল্যাণ ও সুন্দরের পথে ফিরে আসতে চায়। বরং তার উদ্দেশ্য ঠিক উল্টো। ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করতে চায় সে। সে চায় বন্ধুর সহযোগিতায় লোকজনকে হত্যা করে ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হতে। কেম্প্‌-এর কাছে সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেছে গ্রিফিন,—

> "হত্যা আমাদের করতেই হবে। তবে উদ্দেশ্যহীনভাবে নয়, ভেবেচিন্তে। ব্যাপার হ'ল, আমরা যেমন জানবো, অন্য সবাইকেও তেমনি জানাতে হবে, অদৃশ্য মানুষ নামে একজন আছে; এবং সেই অদৃশ্য মানুষ এবার নিশ্চয়ই ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করবে, কেম্প। হ্যাঁ, করবে; অবশ্য সন্দেহ নেই যে এটা খুব আতঙ্কজনক। কিন্তু ঠিক এই কাজের কথাই আমি বলতে চাইছি। আমি বোঝাতে চাইছি, ত্রাসের রাজত্ব। অদৃশ্য মানুষকে তোমাদের এই বারডক্‌-এর মতো কিছু শহর অধিকার করতে হবে। ভয় দেখিয়ে সে অঞ্চলের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে হবে তাকে। নির্দেশ তাকে অবশ্যই দিতে হবে। এ কাজ হাজার রকমভাবে করতে পারে সে। দরজার তলা দিয়ে নির্দেশ-লেখা

টুকরো কাগজ ঢুকিয়ে দিলেই যথেষ্ট। এবং কেউ তার নির্দেশ অমান্য করলেই যেমন করে হোক, হত্যা করা হবে তাকে। এছাড়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করবে যারা, তাদেরও মৃত্যুদণ্ড অবধারিত”।

গ্রিফিন-এর এই উক্তি থেকে একথা বুঝে নিতে আমাদের কষ্ট হয় না যে সে ধ্বংস ও সর্বনাশের পথে পা বাড়িয়েছে। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিই বড় হয়ে উঠেছে তার কাছে; সামগ্রিক কোনো কল্যাণবোধ নয়। বিজ্ঞানশক্তিকে এই তরুণ গবেষকটি উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে। শক্তি ও দম্ভের লালসা উন্মাদ করে তুলেছে তাকে; এবং তার এই পথভ্রষ্ট ও উন্মত্ত কল্পনাকে লেখক এখানে মর্মস্পর্শী করে তুলেছেন। এ ছাড়া ডঃ কেম্প্-এর প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে তিনি শক্তিদম্ভী ক্ষমতালোলুপ বিজ্ঞানীদের সাবধান করে দিয়েছেন যেন। যেন বোঝাতে চেয়েছেন, সমষ্টির স্বার্থকে উপেক্ষা করে ব্যষ্টি কখনও বিজয়ী হতে পারে না। তাই ডঃ কেম্প্‌কে বলতে শুনি আমরা,—

“না, না—গ্রিফিন। তোমার সঙ্গে আমি একমত হতে পারি না। জেনে রাখ, তোমার কথায় সায় নেই আমার। একটা জাতির বিরুদ্ধে এই খেলার স্বপ্ন কেন দেখছ তুমি? কেমন করে তুমি সুখের আশা করবে? লোভী হয়ে দূরে সরে থেকো না। তোমার গবেষণার কথা কাগজে-পত্রে প্রকাশ করো। সমস্ত পৃথিবীকে না হোক, অন্তত দেশের লোককে বিশ্বাস করো। ভেবে দেখ, লক্ষ লক্ষ সহযোগী পেলে কত কী তুমি করতে পারবে”—।

ডঃ কেম্প্-এর এই সুপরামর্শ গ্রিফিন্-এর কানে গেল না। কারণ, মনুষ্যত্বের পথ থেকে সে তখন অনেক দূরে সরে গেছে। ক্ষমতা ও দম্ভের মোহ আলেয়ার রূপ ধরে প্রতিনিয়ত হাতছানি দিচ্ছে তাকে।

কেম্প্ জানতেন এ কথা। তাই বৃহত্তর কল্যাণের খাতিরেই গ্রিফিনকে তিনি ধরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। সন্দেহ নেই, এজন্য বন্ধুটিকে তার প্রতারণা করতে হয়েছে। কিন্তু তা’ না করলে বৃহত্তর মানবসমাজের কাছে তিনি প্রতারক-আখ্যা পেতেন। কিন্তু তবু সব দিক মিলিয়ে দেখলে মনে হয়, কেম্প্ ঠিক কল্যাণব্রতী বৈজ্ঞানিক হয়ে ওঠেন নি।

অবশ্য শেষ অবধি তাঁর বাড়ি থেকে অদৃশ্য মানুষটিকে তিনি ধরিয়ে দিতে পারেন নি। সময় থাকতেই সাবধান হয়েছিল ‘অদৃশ্য’ এবং তাকে প্রচণ্ড আঘাত করে পালিয়েছিল। পুলিশ কর্মচারীরা এসেছিল ঠিকই, ধরবার চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু গ্রিফিন-এর সঙ্গে কেউ পেরে ওঠে নি। এইখানে বলে রাখা দরকার, অদৃশ্য মানুষের আত্মকথা বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে পুলিশ-কর্মীদের আগমনের চিত্রটি লেখক বেশ নিখুঁতভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন। এ ছাড়া অদৃশ্যের প্রস্থানের পর ডঃ কেম্প ও বারডকের পুলিস-প্রধান কর্নেল আদের সলা-পরামর্শের চিত্রটিও জীবন্ত। কেম্প নানা রকমভাবে বুঝিয়েছেন পুলিশ-প্রধানকে। বলেছেন, যেমন করে হোক অদৃশ্য মানুষকে ‘ত্রাসের রাজত্ব’-সৃষ্টির পরিকল্পনা থেকে নিবৃত্ত করতে হবে এবং এ কাজ করার একমাত্র উপায় ওকে প্রত্যাঘাত করা। বারডক অঞ্চলের সমস্ত বাড়ির দরজা-জানালা বন্ধ রাখতে হবে, খাবার-দাবার রাখতে হবে লুকিয়ে; যা’তে করে অদৃশ্য মানুষ খাদ্য ও আশ্রয় না পায়। এ ছাড়া রেল-স্টেশনে, পথে-ঘাটে সর্বত্র রাখতে হবে কড়া নজর। সৈন্যদলকে তলব করতে হবে। আর ‘অদৃশ্যের’ গতিবিধি জানবার জন্যে শিকারী কুকুরদের সাহায্যও একান্ত দরকার। এমনকি পথে কাঁচের টুকরো ছড়িয়ে দেবার পরামর্শও দিয়েছেন কেম্প। এ পরামর্শ আমাদের ভালো লাগে নি; কেম্প-এর দিক থেকে কেমন যেন অখেলোয়াড়ী মনে হয়েছে।

যাক সে কথা। কাহিনীর পরবর্তী পর্বে দেখি, কেম্প-এর পরামর্শ প্রায় অক্ষরে অক্ষরে পালিত হচ্ছে। অদৃশ্য মানুষের অস্তিত্বের কথা বারডক অঞ্চলের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। ছেলে-বুড়ো নির্বিশেষে সকলেই সচকিত হয়ে উঠেছে। প্রায় প্রতিটি ঘর-বাড়িরই দরজা-জানালা বন্ধ। এমনকি আশেপাশের প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলোরও দরজা খোলা নেই। মালগাড়ির চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। স্টেশনে বন্দরে সর্বত্র বসেছে কড়া পাহারা। বিবৃতি দিয়েছেন কেম্প। সবাইকে অদৃশ্য মানুষের বিভীষিকা সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছেন।

কাহিনীর এই অংশে বিরাট একটি অঞ্চল-জোড়া আতঙ্কের ছবি ওয়েল্‌স সম্যকভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন। তাছাড়া অদৃশ্য মানুষের হাতে নিরীহ এক ভদ্রলোক মিঃ উইক্‌স্টীড্-এর হত্যার কথা থাকায় ছবিটি আরও মর্মস্পর্শী হয়েছে। অবশ্য এর আগেও আর একটি হত্যার সঙ্গে ‘অদৃশ্যের’ যোগসূত্র দেখা যায়। কেম্প-এর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবার সময় এক শিশুকে প্রচণ্ড আঘাত করেছিল সে। শিশুটি শেষ অবধি বাঁচে নি।

বলা বাহুল্য, এই সব হত্যাপরাধের চিত্র তুলে ধরে ওয়েল্‌স অদৃশ্য মানুষের নৃশংসতা সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করতে চেয়েছেন। এবং আমরাও যে এক প্রতিভাবান তরুণ বিজ্ঞানীকে খুনী ও নৃশংস হয়ে উঠতে দেখে আতঙ্কিত হয়েছি, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র কোনো সন্দেহ নেই।

এই আতঙ্ক চরমে পৌঁছয় কাহিনীর পরবর্তী পর্বে। সেখানে দেখি, সকলের চোখে ধুলো দিয়েছে অদৃশ্য মানুষ। মূর্তিমান বিভীষিকার মতো এগিয়ে আসছে সে। কেম্প-এর বাড়ির দিকে আসছে। প্রতারক বন্ধুটিকে চরম শাস্তি দেবার জন্যে সে বদ্ধপরিকর। যেমন করেই হোক, প্রতিশোধ নেবে সে।

‘ইন্‌ভিজিব্‌ল ম্যান’-এর শেষ পর্বে প্রতিশোধ গ্রহণে উন্মুখ দুর্বার ও হিংস্র গ্রিফিনকে দেখি আমরা। সাগ্রহে লক্ষ্য করি, প্রথমে সে চিঠি দিয়ে কেম্পকে শাসিয়েছে। ভয়ঙ্কর সে চিঠি। কেম্প-এর প্রতি জ্বলন্ত ঘৃণা ও বিদ্বেষ উদ্গীরিত হয়েছে ওখানে। ওখানে বলা হয়েছে,—

“কেম্প, অদ্ভুত উদ্যমী আর ধূর্ত মানুষ তুমি। যদিও এসব কিছু করে কি যে তুমি লাভ করবে, তা’ আমি জানি নে। আমার বিরোধিতা করছ তুমি। পুরো একটি দিন ধরে আমার অনুসরণ করেছ। রাত্রির বিশ্রাম থেকে বঞ্চিত করতে চেয়েছ আমায়। কিন্তু তোমার এত চেষ্টা সত্ত্বেও খাবার জুটেছে আমার। রাত্রিতে আমি ঘুমিয়েছি; এবং খেলার সুরু হল সবে। সবে সুরু হল খেলা।......

“প্রথম দিনে উদাহরণ হিসেবে একটি মাত্র হত্যা হবে। কেম্প নামে একজন মানুষকে হত্যা করা হবে। আজকেই মৃত্যু আলিঙ্গন করবে তাকে। সে তালা-বন্ধ ঘরে সরে থাকতে পারে, লুকিয়ে থাকতে পারে, প্রহরী রাখতে পারে তার চারিদিকে, ইচ্ছে করলে অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবস্থাও করতে পারে—কিন্তু মৃত্যু, অদৃশ্য মৃত্যু তার দিকে এগিয়ে আসছে।”

এই চরম-পত্রের মধ্য দিয়ে অদৃশ্য মানুষের দম্ভ আক্রোশ ও প্রতিজ্ঞার কথা নির্মমভাবে ব্যক্ত হয়েছে; এবং এরপর থেকে কাহিনীটি পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে অতি দ্রুত।

চিঠি পড়ে আতঙ্কিত হয়েছেন কেম্প। সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদ পাঠিয়েছেন স্থানীয় পুলিশ-প্রধান কর্নেল আদের কাছে। কিন্তু সংবাদ যথাস্থানে পৌঁছুতে পারে নি। তার আগেই সংবাদ-বাহক আহত হয়েছে। পুলিশ-প্রধানের কাছে লেখা চিঠি নিয়ে সরে পড়েছে অদৃশ্য মানুষ।

ওদিকে কেম্প আত্মরক্ষার জন্যে মরীয়া হয়ে উঠেছেন। বাড়ির সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়েছেন তিনি। হাতে রিভলবার নিয়ে চরম কিছু একটার

আশঙ্কায় বসে আছেন। এমন সময় অযাচিতভাবেই পুলিশ-প্রধান কর্নেল আদে এলেন। কেম্প অতি সাবধানে দরজা খুলে দিলেন তাঁকে।

কিন্তু এত সতর্কতা সত্ত্বেও অদৃশ্যের আক্রমণকে প্রতিরোধ করা গেল না। এক একটি করে কাঁচের জানলা ভেঙে চুরমার হতে লাগল; এবং কেম্প-এর বাড়িতে নেমে এল মৃত্যুর বিভীষিকা। পুলিশ-স্টেশনে সংবাদ দেওয়া দরকার, এই ভেবে অসমসাহসী কর্নেল আদে এই দুর্যোগের মধ্যেও বাইরে গেলেন। সঙ্গে নিলেন ডঃ কেম্প-এর রিভলবার।

কিন্তু বেশি দূর যেতে পারলেন না কর্নেল। অদৃশ্য মানুষের অতর্কিত আঘাতে ভূতলশায়ী হলেন। 'অদৃশ্য' তার হাত থেকে রিভলবার ছিনিয়ে নিল। কর্নেল খুব সাহসী, সন্দেহ নেই; শেষ অবধি সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু তবু গ্রিফিন-এর সঙ্গে পেরে উঠলেন না তিনি। তার মারাত্মক আঘাতে নিশ্চল হলেন।

কেম্প-চরিত্রের দুর্বলতা এখানে প্রকট হয়ে উঠেছে। শুভাকাঙ্ক্ষীকে আহত হতে দেখেও তার সাহায্যের জন্যে তিনি এগোন নি। শুধুমাত্র নিজের নিরাপত্তার কথাই ভেবেছেন।

কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও নিরাপদে থাকতে পারেন নি তিনি। 'অদৃশ্যের' আক্রমণ প্রতি মুহূর্তে তাঁকে ভয়ে বিস্ময়ে দিশাহারা করেছে। প্রায় প্রতিটি জানালার কাঁচ এক এক করে ভেঙে লুটিয়ে পড়েছে; 'অদৃশ্য' একটি কুঠার তুলে নিয়েছে হাতে এবং তারপর তা' দিয়ে জানালার গরাদে আঘাতের পর আঘাত করেছে।

শেষ অবধি জানালা ভেঙে ফেলবার উপক্রম করেছে গ্রিফিন। কেম্প চরম সর্বনাশের জন্যে প্রস্তুত হয়েছেন। এমন সময় ঘটেছে এক নাটকীয় ঘটনা। দু'জন পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে কেম্প-এর পরিচারিকা বাড়ি ফিরেছে; এবং প্রধানত ওই-দু'জন পুলিশের চেষ্টায়ই জানালা ভেঙে গ্রিফিন ঘরে ঢোকা সত্ত্বেও কেম্প-এর বিশেষ কোনো ক্ষতি করতে পারে নি। এবং পুলিশদের সঙ্গে 'অদৃশ্যের' সংগ্রাম চলবার অবসরে কেম্প জানালা দিয়ে পালিয়েছেন। সন্দেহ নেই, এই পলায়ন কেম্প-চরিত্রের স্বার্থপরতাকে নগ্নভাবে তুলে ধরেছে। তবে মনে রাখতে হবে, এ ছাড়া অন্য কিছু করার মতো মনের অবস্থাও তখন তাঁর ছিল না।

কেম্প-এর পলায়ন-দৃশ্যের অনেকটাই কেম্প-এর প্রতিবেশী মিঃ হীলাস-এর চোখ দিয়ে দেখি আমরা। ফলে ঘটনাটি আমাদের কাছে যেন বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়। হীলাস অদৃশ্য মানুষের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না। সেদিন বেশ নিশ্চিন্ত মনেই দিবানিদ্রা উপভোগ করছিলেন তিনি। ঘুম ভাঙতেই দেখলেন, কেম্প-এর বাড়ির উপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেছে। সে বাড়ির প্রায় প্রতিটি জানালা ভাঙা; আর ডাইনিং-রুমের এক ভাঙা-জানালার ফাঁক দিয়ে ডঃ কেম্প ও তার পরিচারিকা বেরিয়ে আসছেন। উভয়েরই হাবভাবে আতঙ্কের চিহ্ন। কেম্প বাড়ির বাইরে এসেই প্রাণপণে ছুটতে লাগলেন। হীলাসের স্পষ্ট মনে হল, যেন কেউ অনুসরণ করছে কেম্পকে। অনুসরণকারীর হাত থেকে তিনি বাঁচতে চাইছেন। হীলাস শিউরে উঠলেন এ দৃশ্য দেখে। ভাবলেন, এ নিশ্চয় অদৃশ্য মানুষের কীর্তি। হঠাৎ অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি। বাড়ির লোকজনদের নির্দেশ দিলেন, সব ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে দিতে। ওদিকে ডঃ কেম্প ছুটছেন। ছুটতে ছুটতে হীলাস-এর বাড়ির খুব কাছাকাছি এসে পড়েছেন।

প্রতিবেশীর বাড়ির সামনে আসা মাত্রই সাহায্যের আশায় আর্তনাদ করে উঠলেন কেম্প। বললেন, বাড়ির ভিতরে আশ্রয় চাইছেন তিনি।

কিন্তু শেষ অবধি আশ্রয় তিনি পেলেন না। হীলাস দরজা খুলতে সাহস করলেন না কোনোমতেই। অগত্যা আবার ছুটতে লাগলেন কেম্প। হীলাস স্পষ্ট দেখলেন, ঢালু পথ ধরে ওই বিজ্ঞানীটি ক্রমেই দৃষ্টির বাইরে চলে যাচ্ছেন।

কেম্প-এর পলায়ন-পর্বের পরবর্তী অংশে হীলাস নেই আর। লেখক সরাসরি সে বর্ণনা দিয়েছেন; এবং বর্ণনাটি যে নিবিড় রহস্য-রোমাঞ্চে ঘনীভূত হয়ে উঠেছে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই আমাদের। আমরা দেখেছি, প্রাণভয়ে ছুটে চলেছেন কেম্প। একান্ত অসহায় তাঁর অবস্থা। কোথাও তাঁর আশ্রয় মিলছে না। কেন না তাঁরই নির্দেশে বারডক অঞ্চলের সমস্ত ঘরবাড়ির দরজা-জানালা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নিরুপায় হয়ে তাই কেম্প ছুটছেন। উঁচু-নীচু, এবড়ো-খেবড়ো পথ ধরে ছুটছেন। ছুটতে ছুটতে শেষ অবধি পাহাড়ের পাদদেশে এসে থামলেন তিনি। ওখানে একটি ঘোড়ায়-টানা ট্রাম দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু অদৃশ্য মানুষ খুব কাছে এসে পড়েছে ভেবে ট্রামে আশ্রয় নিতে তিনি পারলেন না। খুব কাছেই 'জলি ক্রিকেটারস্'-দের আড্ডা। ওখানেও আশ্রয় মিলল না তাঁর। চারিদিকে সোরগোল শুনে ক্রিকেটারস্‌রা ওদের আস্তানার দরজা-জানালা বন্ধ করে দিচ্ছিল।

কেম্প তাই অন্য পথ ধরলেন। স্পষ্ট শুনতে পেলেন তিনি, চারিদিকে প্রচণ্ড কোলাহল সুরু হয়েছে। অদৃশ্য মানুষের আবির্ভাবে সচকিত হয়ে উঠেছে সবাই। কেউ কুঠার হাতে এগিয়ে আসছে। কারও হাতে আবার লাঠি।

প্রাণভয়ে আবার ছুটলেন কেম্প। সাক্ষাৎ যমদূতের হাত থেকে আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টা করলেন। কিন্তু শেষ অবধি আত্মরক্ষা করতে তিনি পারেন নি। যমদূত তাঁর ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। টুঁটি চেপে ধরল তার। ঘাড়ে, মাথায় মারাত্মক আঘাত করল। ঠিক সেই মুহূর্তেই এগিয়ে এল অদৃশ্য মানুষের এক অনুসরণকারী। 'অদৃশ্য'কে কুঠার দিয়ে সাংঘাতিক আঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গেই বজ্রমুষ্টি শিথিল হল গ্রিফিন-এর। তার দেহ ক্রমেই যেন অসাড় হয়ে এল। এদিকে সুযোগ বুঝে কেম্প চেপে ধরলেন 'অদৃশ্যে'র হাত। দেখতে দেখতে আরও সব লোকজন এল। সবাই মিলে ঘেরাও করল 'অদৃশ্য'কে।

শেষ অবধি ডাক্তার এলেন একজন। গ্রিফিনকে পরীক্ষা করে বললেন, তার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেছে।

এইখানেই 'ইন্‌ভিজিব্‌ল্ ম্যান'-এর সবচেয়ে আকর্ষণীয় অধ্যায়। মৃত্যু হয়েছে গ্রিফিন-এর; এবং ঠিক তার পরেই—

"এক বৃদ্ধা নারী নৌ-বিভাগের জোয়ান মজুরটির বাহুর তলা দিয়ে উঁকি মারতে গিয়ে আর্তনাদ করে

বি, সি. মাইতি এণ্ড কোং

—ইলেকট্রো প্লেটিং সামগ্রী—

নিকেল ভ্যাট ও ব্যারেল * ডাইনামো * পলিশিং মেসিন এবং প্লেটিং করিবার জন্য যাবতীয় সামগ্রীর আদি সরবরাহক।

শো রুম ঃ— ৯৫, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কলি-১২। ফোন ঃ ৩৪-৩১৭৩

৩, রাধামোহন পাল লেন, কলি-১২ ঃ অফিস-ফোন—৩৪-৪৮৪৬

পেণ্ডুলাম

মুক্তি দাশগুপ্ত

পেণ্ডুলাম, পেণ্ডুলাম, রাত্রি এগারোটা
ঠক ঠক, কিছু নয়, উপকৃত চিল
উন্নাসিক উদ্দাম উঠোনে।

হে যৌবন, তুমি তো উদ্দাম,
বিশেষত মধ্যবিত্ত চোরাকুঠুরীতে,
বেহদ্দ হাসির দাঁত নীরক্ত ওষ্ঠ-দংশনে
কী সুশিক্ষিত!

টিং টং সাড়ে এগারোটা
শেয়ালেরা ডেকে ওঠে, কুকুর-বিড়াল
কেঁদে কেঁদে কঁকিয়ে কঁকিয়ে
হে ক্রন্দসী রাত!

হুড় হুড় দুদ্দাড় উঠোন দখল করে,
দুবর দখল,
চৌচির ভারাটে দালান, ইঁট সুরকি কাদা গ্রন্থ
সব একাকার, এ রাত্রি কোথায় কাটাবো!!

স্বপ্নের প্রাসাদে নয়

সবুজ নবী

স্বপ্নের প্রাসাদে নয়, জনতার মিছিলে এবার
দৃষ্টিটাকে ছুঁড়ে দাও শ্মশানের দিকে
জনতা জনবিরল ওখানেই শবের পাহাড়—
হে কবি, ওদের কথা মনোপটে নাও আজ লিখে।

ওই সব বহুরূপী শৃগাল শকুন আর কাক
কেমন তৃপ্তিতে ছেঁড়ে আমাদের শবদেহে বসে
অরক্ষিত নাভিস্থল, তবু আজ আমরা নির্বাক!
ভাবে ওরা, এ নাভির অন্তরীণ প্রতি কোষে কোষে
বুঝি বা লুকিয়ে আছে সেই সত্তা অনন্ত ব্রহ্মার—
তাই তো ওরাও চায় ব্রহ্ম-নাভি উদরস্থ ক'রে
মিটাতে সকল ক্ষুধা, আহা, এ-কী আনন্দ অপার!
কুটিল ও-অক্ষিপুটে কালচক্র অবিরাম ঘোরে,
বুঝি ওরা জন্ম দেবে আরো এক নতুন শিবের
যে শিব পুরাণ আর বেদের সে কুম্ভীপাক থেকে
মুক্তি নিয়ে নবজন্মে ইতিহাসের পৃষ্ঠাতে ফের
বারবার প্রতিষ্ঠার সংবিধানী দাবি যাবে রেখে॥

উঠল। বলল, 'দেখ ওখানে!' বলেই সে তার বলিচিহ্নিত একটি আঙুল তুলে ধরল; এবং তারপরেই সেই আঙুল বরাবর তাকিয়ে সবাই দেখল, অস্পষ্ট ও স্বচ্ছ একটা পদার্থ, কাঁচে তৈরি যেন; যেন সেখানে শিরা, ধমনী, হাড় ও স্নায়ুগুলোকে আলাদা করে বোঝা যাচ্ছে। একটা হাতের সীমারেখা চোখে পড়ছে, যেন; স্তব্ধ ও উপুড় হয়ে থাকা একটা হাত সবাই তাকিয়ে থাকতে থাকতেই দেখল, হাতটা অনচ্ছ ও ধূসর হয়ে উঠছে।

"'এই যে!' চীৎকার করে উঠল একজন কনস্টেবল, 'এইখানে ওর পায়ের পাতা দেখা দিচ্ছে।'

"এবং এইভাবে ধীরে ধীরে তার হাত-পা থেকে সুরু করে ক্রমশ অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং দেহের প্রধান কর্ম-কেন্দ্রগুলি মজ্জা মাংসসহ দেখা দিতে লাগল। ক্রমেই চলল সেই আশ্চর্য পরিবর্তন। মনে হল, এ যেন ধীরে ধীরে কোনো বিষ ছড়িয়ে পড়ার মতো। প্রথমে দেখা দিল ছোট এবং সাদা সাদা ধমনীগুলো। মনে হল, ওরা যেন অস্পষ্ট ধূসর কোনো অঙ্গের নক্সা। এরপরেই হাড়গুলো স্বচ্ছ হয়ে ভেসে উঠল। জটিল শিরাগুলোকে দেখা গেল এবং সবশেষে এল মাংস ও চামড়া। প্রথমে অস্পষ্ট ঝাপসা মনে হচ্ছিল ওদের। কিন্তু একটু পরেই ওরা অনচ্ছ ও ধূসর হয়ে উঠল।......

"অবশেষে সমবেত লোকজনেরা কেম্পকে উঠে দাঁড়াবার সুযোগ দিতে গিয়ে যখন সরে দাঁড়াল, তখন দেখা গেল, ওখানে পড়ে আছে একটি তিরিশ বছরের যুবকের বিক্ষত ও ভগ্ন-দেহ। সম্পূর্ণ নগ্ন ও অসহায় অবস্থায় মাটির উপরে পড়ে আছে ওই যুবকটি।......

"হাত দুটি মুষ্টিবদ্ধ ছিল তার, চোখ খোলা ছিল। আতঙ্কিত ও ক্রুদ্ধ একটা ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল তার চোখ-মুখ থেকে।"

এই মর্মস্পর্শী দৃশ্য দেখে কেউ কেউ আঁৎকে উঠল। তাড়াতাড়ি একটি চাদর দিয়ে আচ্ছাদিত করা হল গ্রিফিন-এর দেহ, এবং তারপর তাকে নিয়ে যাওয়া হল 'জলি ক্রিকেটারস্'-দের ঘরে এক অপরিচ্ছন্ন শয্যায় শোয়ান হল তাকে। আলোক অল্প ছিল সে ঘরে। কিন্তু মানুষ ছিল অনেক। একদল অশিক্ষিত ও উত্তেজিত মানুষ এসে ভিড় করেছিল গ্রিফিনকে দেখবে বলে। তামাসা দেখছিল সবাই। কিন্তু ভুল-পথে চলতে গিয়ে সত্যিকারের এক প্রতিভাবান বিজ্ঞানীর জীবন যে অকালে নষ্ট হয়ে গেল, এ কথা অনুভব করবার মতো বুদ্ধি ওখানকার কারও ছিল না।

এইভাবে শেষ হয়েছে 'ইন্‌ভিজিব্‌ল্ ম্যান'-এর কাহিনী। শেষাংশটি যে বর্ণনায় গুণে অপরূপ হয়ে উঠেছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই আমাদের। গ্রিফিন যন্ত্রণা, আক্রোশ ও হতাশার যে স্তরে গিয়ে পৌঁছেছিল সেখান থেকে জীবন নিয়ে ফিরে আসা যায় না। অতএব তার মৃত্যু অসংগত কিছু হয় নি। বরং যেভাবে তার অদৃশ্য দেহটি আবার দৃশ্য হয়ে উঠেছে, তা বলতে গিয়ে লেখক অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। শেষ অবধি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছি আমরা যে বিজ্ঞানের অমিত শক্তিকে আপন স্বার্থসিদ্ধি ও দম্ভ-প্রকাশের কাজে লাগালে ধ্বংস ও সর্বনাশ অবধারিত।

এই বক্তব্যটি আলোচ্য কাহিনীর মধ্য দিয়ে সার্থকভাবে পরিস্ফুট। এ ছাড়া পথভ্রষ্ট বিজ্ঞানী গ্রিফিন-এর জন্যে বেদনা অনুভব করেছি আমরা। আমাদের মনে হয়েছে, নিজের প্রতিভার আগুনে নিজেই জ্বলেপুড়ে মরল সে। আগুন জ্বালাতে গিয়ে মরল। ভুল-পথে চলতে গিয়ে সর্বনাশের অতল গহ্বরে পা দিল এক তীক্ষ্ণধী ও মহিমময় বিজ্ঞানসাধক।

বঙ্গরঙ্গ ওদেশে এদেশে
শিলাদিত্য

সেজুয়ানের মহৎ নারীঃ এবার আসছে তৃতীয়, মধ্যবর্তী এবং চতুর্থ দৃশ্য—শেনটের জীবনে প্রেমের আবির্ভাব, প্রেমিক ইয়াং সুনের স্বার্থপরতা ইত্যাদি সুন্দরভাবে এসব দৃশ্যে দেখানো হয়েছে। দেবতাদের কাছে ওয়াং ইঙ্গিত দেয় যে মহৎ নারী শেনটে তার ভালমানষী দেখাতে গিয়ে প্রায় পথে বসতে চলেছিল এবং তার বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন কাজিন সুইটা এসে তার সমস্তরকম মুস্কিলের আসান করে দিচ্ছে। দেবতার দল কাজিন সম্বন্ধে ভালভাবে না জেনে তার সম্বন্ধে কোন মতপ্রকাশ করতে চান না। সুফুর ওয়াংকে প্রহারের ব্যাপারটাও চতুর্থ দৃশ্যে দেখানো হয়েছে—এ ব্যাপারটার পরিণতি থেকে শেনটে এবং সুইটাকে বুঝতে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায়।

ব্রেখ্‌টের নাটক বুঝতে হলে একটি কথা মনে রাখা দরকার ঃ

(১) সমাজের গঠন বদলিয়ে দেওয়া যায়
(২) মানুষের স্বভাব বদলিয়ে দেওয়া সম্ভব
(৩) মানুষের স্বভাব শ্রেণীভিত্তিক
(৪) নাটকীয় সংঘাত হওয়া উচিত সামাজিক সংঘাত
(৫) ডায়েলেক্‌টিক্যাল মেটিরিয়ালিজম্‌ হচ্ছে আনন্দ আহরণের উৎস
(৬) বাস্তবতা এবং কাব্যের সমতা রাখতে পারলেই নাটকীয় সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়।

তৃতীয় দৃশ্য

একটি পাব্লিক পার্ক—সন্ধ্যা সন্ধ্যা

[ছিন্নভিন্ন পোষাক পরিহিত একটি যুবক—মাথার উপরে একটি এরোপ্লেনের চালনা কৌশল লক্ষ্য করছে। সে পকেট থেকে একটি দড়ি বার করবে এবং চারিদিকে চেয়ে দেখবে। সে যখন সামনের দিকে একটি উইলো গাছের দিকে যেতে থাকবে, তখন দুজন স্বৈরিণী তার দিকে আসবে—এদের ভেতর একজনের বয়স হয়েছে, অন্যজন যুবতী এবং পূর্ববর্ণিত আটজনের সংসারের ভাইঝি।]

যুবতী—ওহে যুবক, তোমাকে শুভসন্ধ্যা জানাচ্ছি। চল, আমার বাড়িতে যাবে নাকি?

যুবক—আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে আমার রাত্রের খাবার বন্দোবস্ত করতে হবে তোমাদের।

বয়স্থা—(যুবতীকে) আরে কাকে কি বলছিস, এ হচ্ছে সেই বেকার পাইলটটা।

যুবতী—সবাই পার্ক থেকে চলে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে এখুনি বৃষ্টি শুরু হবে।

বয়স্থা—হ্যাঁ, তা হতে পারে।

[তারা হেঁটে বেরিয়ে যাবে। সুন দড়িটা নিয়ে একটা উইলো গাছের দিকে একটা দিক ছুঁড়ে আটকে নেবে—স্বৈরিণী দুজন ফিরে আসবে—সুন ওদের নজরে পড়বে না।]

যুবতী—মনে হচ্ছে খুব এক পশলা বৃষ্টি হবে।

[শেন্‌টেকে এদিকে হেঁটে আসতে দেখা যাবে।

বয়স্থা—ওই দ্যাখো, সেই হতচ্ছাড়া মেয়েটা এদিকে আসছে। ওর জন্যেই তো তোমরা সবাই বিপদে পড়েছিলে?

যুবতী—ওর জন্যে নয়—ওর কাজিনের শয়তানীতে। ওর বিরুদ্ধে আমার কোন নালিশ নেই।

বয়স্থা—আমার আছে। (চিৎকার করে) এই হচ্ছে শেন্‌টে—স্বৈরিণীবৃত্তি করতে করতে হঠাৎ কোথা থেকে টাকা পেয়ে দোকানের মালিক হয়ে বসল। কিন্তু কথায় বলে না, স্বভাব যায় না ম'লে। এখনও নিজের বৃত্তি ও ছাড়তে পারছে না। আমাদের শিকার ছিনিয়ে নেবার জন্যে এখানে ঘুর ঘুর করছে।

শেন্‌টে—কেন মিছিমিছি আমাকে গালাগাল করছ—আমি ওই লেকের ধারের চায়ের দোকানটায় যাচ্ছি।

যুবতী—(হাসতে হাসতে) শুনেছি তুমি নাকি তিন ছেলের বাপ এক বিধবা পুরুষকে বিয়ে করবে বলে ঠিক করেছ?

শেন্‌টে—ঠিকই শুনেছ। চায়ের দোকানে তারই সঙ্গে দেখা করবার কথা।

সুন—তোমাদের বক্‌বকানি বন্ধ করবে? কোনো জায়গায় গিয়ে এতটুকু শান্তি পাবার উপায় নেই?

বয়স্থা—চোপরাও হতভাগা (দুজনে চলে যেতে থাকবে)।

সুন—(ওদের উদ্দেশ্যে) সমাজের সব আবর্জনা। (দর্শকদের প্রতি) যে-কোন জায়গায়, যে-কোন অবস্থায়, এমন কি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভেতরেও দেখবেন এরা শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছে—এই হচ্ছে ওদের স্বভাব।

শেন্‌টে—(রাগতভাবে) কেন ওদের কেচ্ছা করছ? ওই দড়িটা কিসের জন্য?

সুন—সরে পড় তো এখান থেকে—আমার কাছে পয়সা-কড়ি কিছু নেই—আর থাকলেও খাবার জল কেনবার জন্যে সেটা খরচ করতাম, তোমার জন্যে নয়।

শেন্‌টে—দড়িটা কিসের জন্যে? ভেবো না আমি কিছু বুঝতে পারি নি।

সুন—নিজের চরকায় তেল দাও। ভালয় ভালয় এখান থেকে সরে পড় তো।

শেন্‌টে—আমি এখান থেকে এক পা-ও নড়ছি না।

সুন—কেন মিছিমিছি ঝামেলা করছ বল দেখি। তুমি যা কুৎসিত, আমাকে কিছুতেই তোমার ফাঁদে ফেলতে পারবে না। সরে পড়ো।

শেন্‌টে—তুমি গলায় দড়ি দিতে চাও কেন বল দেখি?

সুন—এ তো আচ্ছা নাছোড়বন্দা—নেহাৎই যদি জানতে চাও, তবে শোন—এবং শোনবার পর কেটে পড়ো। উড়োজাহাজের চালকদের কথা শুনেছ কখনও?

শেন্‌টে—চায়ের দোকানে একবার কয়েকজন উড়োজাহাজের চালককে দেখেছিলাম।

সুন—তারা সত্যিকারের আকাশচারী নয়। ওপরওয়ালাদের ঘুষ-ঘাস দিয়ে পাইলট সেজে বসেছে। আকাশযানের যন্ত্রপাতি এবং ইঞ্জিনকে অন্তর দিয়ে বোঝবার ক্ষমতা পর্যন্ত তাদের নেই। কতকগুলো বাঁধাধরা নিয়ম অনুসারে প্লেনকে চালাতে এবং নামাতে এবং ওঠাতে পারে। আমি হচ্ছি সত্যিকার আকাশচারী—হাজার হাজার ফুট উঁচু থেকে প্লেনকে যখন মাটিতে নামাবো কেউ টের পাবে না। কিন্তু তবুও আমি স্বীকার করবো, আমিই হচ্ছি সব থেকে বড় ইডিয়েট। পেকিং এর ফ্লাইং স্কুলে আকাশবিহার সংক্রান্ত সবগুলো কেতাব আমার কণ্ঠস্থ। শুধু একটি বইয়ের একটি পাতা আমার নজর এড়িয়ে গেছে। যে পাতাটিতে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে, "পাইলটদের কোন দরকার নেই।" ওই পাতাটা না পড়ার ফলে আমার অবস্থাটা কি দাঁড়িয়েছে জান? আমি আকাশচারী, অথচ আমার কোন আকাশযান নেই। মেইল নেই, অথচ মেইল-পাইলট—এর মানে বোঝবার ক্ষমতা তোমার নেই।

শেন্‌টে—যদি বলি আমি বুঝতে পারছি।

সুন—আমি বলছি তুমি বুঝবে না।

শেন্‌টে—(হাসি-কান্না মিশ্রিতকণ্ঠে) ছেলেবেলায় আমাদের একটা সারস পাখি ছিল। তার একটা ডানা ছিল ভাঙা। ওর স্বভাব ছিল খুব শান্ত, আমরা ক্রমাগত বিরক্ত করলেও ও চটতো না। কিন্তু শরৎকালে বা বসন্তকালে আমাদের গ্রামের আকাশ দিয়ে যখন দলে দলে পাখি উড়ে যেতো, সারসটা তখন খুবই চঞ্চল হয়ে উঠতো। আমি কিন্তু কিছুতেই ওর চাঞ্চল্যের কারণ বুঝতে পারতাম না।

সুন—তোমার চোখের জল ফেলাটা বন্ধ করবে?

শেন্‌টে—না, না, আর কাঁদবো না।

[জামার হাতা দিয়ে চোখ মুছবে। ওর থুৎনিতে হাত দেবে সুন, তারপর নিজের রুমাল দিয়ে ওর চোখ মুছে দিতে দিতে বলবে]

সুন—ঠিকভাবে চোখমুখ মুছতেও জানো না তুমি? (কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ থাকবে) আমি যাতে গলায় দড়ি দিতে না পারি সেই জন্যেই তুমি এখানে অপেক্ষা করছ—তাহলে চুপ করে না থেকে অন্তত কথাবার্তা বল।

শেন্‌টে—কি বলব ভেবে পাচ্ছি না।

সুন—তোমার নিজের কথা বল।

শেন্‌টে—ও বিষয়ে বলবার আছেই বা কি! আমি একটি ছোট্ট দোকানের মালিক। তার আগে আমি ছিলাম রাস্তার আবর্জনা।

সুন—দোকানটা কি তাহলে আশমান থেকে দেবতারা এসে উপহার দিয়ে গেল নাকি?

শেন্‌টে—ঠিক বলেছ।

সুন—একদিন সন্ধ্যায় বোধ হয় দেবতারা তোমার সামনে এসে দাঁড়ালো, বলল, এই নাও কিছু টাকা।

শেন্‌টে—(হাসতে হাসতে) ঐভাবেই টাকাটা দিয়েছিল কিন্তু সকালবেলায়।

সুন—এইবার তাহলে একটা বিয়ে করে ফেল। যে লোকটা লেকের পাশে টি-হাউসে এসে বসে—

[শেন্‌টে চুপ করে থাকবে]

সুন—প্রেমের কথা কিছু বোঝ?

শেন্‌টে—ও সম্বন্ধে সব কিছুই আমার জানা আছে।

সুন—বটে! আচ্ছা, ও ধরণের প্রেম ভাল লাগতো?

শেন্‌টে—না।

[ওর গালে ঠোনা মেরে সুন জিজ্ঞেস করবে।]

সুন—কেমন লাগল?

শেন্‌টে—খুব মিষ্টি।

সুন—তোমাকে তো খুব সহজেই খুশি করা যায়। আমাদের এ শহরটার মতো হতভাগা জায়গা কোথাও দেখেছ?

শেন্‌টে—তোমার কোন বন্ধু-বান্ধব নেই?

সুন—একদল বন্ধু আছে—কিন্তু তাদের ভেতর এমন কেউ নেই যে এখনও আমি বেকার আছি শুনতে চাইবে—যাক্‌গে, তোমার কোন বন্ধু নেই?

শেন্‌টে—(ইতস্তত করে) একজন কাজিন আছে।

সুন—তাকে বুঝি বিশ্বাস করো না?

শেন্‌টে—সে এ শহরে শুধু একবার এসেছিল—আর কখনও ফিরে আসবে না। কিন্তু তুমি এমন মনমরা হয়ে আছ কেন? মানুষের জীবন থেকে আশা চলে গেলে সেই সঙ্গে সমস্ত মহত্ত্ব চলে যায়।

সুন—তুমি বকর বকর করে চলো। তবু মনটা ভাল লাগবে এই ভেবে যে মানুষের গলা শুনতে পাচ্ছি।

শেন্‌টে—(আকুলভাবে) জীবনে যতই দুর্যোগ আসুক, কিছু ভাল বন্ধুর দেখা আমরা পাবোই পাবো। আমি যখন ছোট ছিলাম এক বাণ্ডিল কাঠের টুকরো বয়ে নিয়ে যেতে গিয়ে পড়ে যাই। একটি বুড়ো মতন লোক এসে আমাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন—আমার দুরবস্থা দেখে কিছু পয়সাও তিনি আমাকে দিয়েছিলেন। পরে এ ব্যাপারটা আমি মাঝে মাঝে ভেবেছি—আসলে গরীবদের জন্যে গরীবদেরই প্রাণ কাঁদে—গরীবের দুঃখ গরীবেই বোঝে।

সুন—দু'দিন ধরে পানাহার কিছুই করতে পারি নি পয়সার অভাবে। সুতরাং ইচ্ছে থাকলেও তোমার সঙ্গে প্রেমের খেলা করবার সামর্থ্য আমার নেই।

[ভিস্তী ওয়াং তার জলপাত্র নিয়ে ঢুকবে—শেন্‌টে তাকে দেখে তার কাছে ছুটে যাবে।]

শেন্‌টে—এই যে ওয়াং, তাহলে তুমি ফিরে এসেছ। তোমার জল বহন করবার দণ্ডটা আমি যত্ন করে তুলে রেখে দিয়েছি।

ওয়াং—সেজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি শেন্‌টে, তারপর আছ কেমন?

শেন্‌টে—একজন খুব চালাক আর সাহসী ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে ওয়াং—আমি এককাপ জল কিনতে চাই তোমার থেকে। বেশ বুঝতে পেরেছি ও আমার মনের মানুষ।

[ওয়াং এককাপ জল দেবে এবং শেন্‌টে কাপটি নিয়ে সুনের কাছে এসে কাপটি দেবে—সুন জলপান করতে থাকবে—ধীরে ধীরে যবনিকা।]

মধ্যবর্তী দৃশ্য

শহর প্রান্তের রাস্তা

[ওয়াং ঘুমিয়ে আছে—মিউজিক বাজছে—হঠাৎ চারিদিক আলো করে দেবতাদের আবির্ভাব হবে—ওয়াং জেগে উঠে বিস্মিতভাবে দেবতাদের দিকে চেয়ে থাকবে—তার মনে হবে সে স্বপ্ন দেখছে—]

ওয়াং—(উচ্ছ্বসিতভাবে) আমার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে দেবতাত্মার দল, শেন্‌টে একটুও বদলায় নি, সে ঠিক আগের মতই আছে।

১ম দেবতা—তোমার কথা শুনে সত্যিই আমরা প্রীত হলাম।

ওয়াং—ও একজন মনের মানুষ খুঁজে পেয়েছে। তাকে আমার সঙ্গে পরিচয়ও করিয়ে দিয়েছে। সবদিক দিয়েই ওর খবর ভাল।

১ম—তোমার খবরগুলো শুনে খুশি হলাম। আশা করি সততাকে মূলধন করে—ক্রমাগত মহৎ এবং ভাল কাজ করে চলবে।

ওয়াং—তা তো বটেই। ওর দয়া-দাক্ষিণ্যের কোনো তুলনা হয় না। ওর দাতব্যের কথা এখন সকলের মুখে মুখে শোনা যাচ্ছে।

১ম—তাই নাকি? আচ্ছা, কি ধরণের দয়া-দাক্ষিণ্যের কাজ ও করছে বল দেখি ওয়াং?

ওয়াং—সবার সঙ্গেই ও মধুরভাবে কথা বলে।

১ম—আর কি করে?

ওয়াং—পয়সা নেই বলে কারোকে ওর দোকান থেকে ফিরে আসতে হয় না। কিছু না কিছু ধূমপানের জিনিস ও তাদের দেবেই দেবে।

১ম—খুব ভাল কথা। আরও কিছু বলতে পারো?

ওয়াং—আটজনের এক পরিবারকে শেন্‌টে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছে।

১ম দেবতা—(বিজয়গর্বে ২য় দেবতাকে) শুনলে তো, আটজনের এক পরিবারকে শেন্‌টে নিজের সংসারে গ্রহণ করেছে। ওহে ওয়াং, শেন্‌টে সম্বন্ধে আর কিছু তোমার জানা আছে?

ওয়াং—আমার কাছ থেকে সে আর একজনের জন্যে এক গ্লাস জল কিনে নিয়েছিল।

১ম—এটা অবশ্য খুচরো দাতব্যের মধ্যে পড়ে।

ওয়াং—কিন্তু তার জন্যে তাকে পয়সা খরচ করতে হয়েছিল। ব্যবসা বলতে তো ছোট্ট ওই দোকানটা। তা থেকে কতই বা আয় হয়। প্রত্যেক দিন সকালে ও গরীবদের চাল বিতরণ করে। দোকান থেকে যা আয় হয়

তার অর্ধেক এতেই খরচ হয়ে যায়। আর একটা কথা মনে রাখবেন—আজকাল দিনকাল বড় খারাপ। শেন্‌টে নিজের ভালমানুষীর জন্যে ক্রমশ বিপদজালে জড়িয়ে পড়ছিল। দোকানটারও যায় যায় অবস্থা হয়েছিল—শেষে বাধ্য হয়ে ও ওর কাজিনের সাহায্য চায়—অর্থাৎ ওই দোকানটা চালানো ওর ক্ষমতার অতিরিক্ত হয়ে পড়েছিল। সবাই এ কথা স্বীকার করে যে ওর মতো ভাল মেয়ে এ তল্লাটে নেই। ছুতোর লিন্‌টো ওর নামে যতো অপবাদই দিক, কেউ তার কথায় কান দেয় না।

১ম—লিন্‌টো ওর নিন্দা করে বুঝি?

ওয়াং—না তা নয়, সে বলে ওই দোকানের কাজ করে সে ঠিকমতো পাওনা টাকা আদায় করতে পারে নি।

২য়—এসব তুমি কি বলছ! কাজ করিয়ে নিয়ে শেন্‌টে ছুতোরের পাওনা টাকা দেয় নি?

ওয়াং—আমার মনে হয় তার হাতে আর টাকা ছিল না।

২য়—এ তো আর কোনো যুক্তি হোল না। পাওনা টাকা মানেই ঋণ—প্রত্যেক সৎ লোকেরই ঋণের টাকা শোধ করা উচিত।

ওয়াং—কিন্তু প্রভু, এ কাজের জন্যে শেন্‌টে দায়ী নয়—দায়ী তার কাজিন।

২য়—সেক্ষেত্রে তার কাজিনকে আর শেন্‌টের বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া উচিত হবে না।

ওয়াং—(একটু মুসড়িয়ে গিয়ে) শেন্‌টের হয়ে আমি একটা কথা নিবেদন করব প্রভু। তার কাজিন খুব নামডাকওয়ালা ব্যবসায়ী। এমন কি পুলিশের লোকেরাও তাকে সম্মান করে।

১ম—ভালভাবে না শুনে আমরা এই কাজিনের বিচার করতে বসব না। ব্যবসার ব্যাপারে আমরা একেবারে অজ্ঞ। যাক্‌গে, আগে ভালভাবে জেনে নিতে হবে ব্যবসার ব্যাপারে সৎ-অসৎ-এর পরিমাপটা কিভাবে করা হয়। তোমাদের পৃথিবীতে এসে দেখছি লোকেরা আর সব কাজ ছেড়ে দিয়ে এই ব্যবসা নিয়েই সব সময় ব্যস্ত। আমি তো বুঝতে পারি না সৎ এবং সম্মানজনকভাবে জীবন কাটাতে হলে ব্যবসার সঙ্গে মানুষের কি সম্পর্ক থাকতে পারে।

২য়—যাক্‌গে, শেন্‌টেকে বোলো আর ওই ধরণের ঘটনা না ঘটলেই আমরা খুশি হব।

[দেবতারা অন্যদিকে ফিরবেন চলে যাবার জন্যে]

৩য়—(ঘুরে দাঁড়িয়ে) আমাদের আজকের কড়া কড়া কথা শুনে তুমি কিছু মনে কোরো না ওয়াং। আমরা বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—রাত্রে ভাল ঘুমও হয় না। রাত্রির কথা মনে হলেই শিউরে উঠি। বড়লোকেরা তো আমাদের আশ্রয় দিতে চায় না—বিশেষভাবে সুপারিশ করে দেয় কোন্‌ কোন্‌ গরীব লোক খুব সৎ এবং আমাদের আশ্রয় দিতে পেরে তারা তাদের নিজেদের কি রকম ধন্য মনে করবে। সৎ গরীব লোকদের মহত্ত্বের পরিচয় পেয়ে আমরা মনে মনে খুবই গর্ব বোধ করি। কিন্তু বেচারাদের গরীবখানায় ঘরও কম—আর সে ঘরে থাকাও মানে সারা রাত্রি ধরে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করা।

২য়—(যেতে যেতে) জানলার পাল্লা ভাঙা। হু হু করে ঠান্ডা বাতাস ঢুকে আমাদের শীতে কাঁপিয়ে তোলে। খাটগুলো ভাঙা—পাশ ফিরলেই মচ্‌-মচ্‌ শব্দ হয়, মনে হয় এই বুঝি সব ভেঙে পড়ল। ঘর ভর্তি আবর্জনা, মাকড়সা, ইঁদুর, আরশোলার দৌরাত্ম্যে সারা রাত চোখের দুপাতা এক করা মুস্কিল। যাক্‌গে, তবু স্বীকার করতে হবে গরীবদের অন্তরটা মহৎ—

১ম—ওরাই পৃথিবীর খাঁটি লোক—

৩য়—যা কিছু সৎ, তা শুধু ওদের ভেতরেই দেখা যায়।

[এরা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাবে। যবনিকা]

৪র্থ দৃশ্য

[শেন্‌টের দোকানের সামনে কিছু দূরে একটি নাপিতের দোকান। তার পরে একটি কার্পেটের দোকান। আজ সোমবার। শেন্‌টের দোকানের সামনে আটজনের সংসারের দুজন—অর্থাৎ ঠাকুরদা ও ভাইয়ের বৌ দাঁড়িয়ে আছে। আর আছে বেকার লোকটি এবং মিসেস সিন।]

ভাইয়ের বৌ—শেন্‌টে কাল রাত্তিরে ফেরে নি।

মিসেস সিন—অদ্ভুত ব্যবহার। কাজিনটির হাত থেকে উদ্ধার পেলাম—ভাবলাম বাধা দেবার কেউ নেই, এবার শেন্‌টের হাত থেকে একমুঠো চাল পেতে কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু কাল সারা রাত ধরে মেয়েটা কোথায় কোথায় চু দিয়ে বেড়াচ্ছে কে জানে!

[নাপিতের দোকান থেকে চিৎকার শোনা যাবে। ওয়াং টলতে টলতে বেরিয়ে আসবে, আর তার পেছনে ষণ্ডামার্কা নাপিত মিঃ সুফু। তার হাতে একটা সাঁড়াশি।]

সুফু—আমার দোকানে এসে খরিদ্দারদের তোর ওই পচা জল খাবার জন্যে যদি ফের জ্বালাতে আসবি, এমন ডাচত শিক্ষা দিয়ে দেব—এই নে হতভাগা তোর মগ—বেরো এখান থেকে।

[মগটা নেবার জন্যে ওয়াং হাত বাড়িয়ে দেবে এবং কি বলতে যাবে—এক ঘা সাঁড়াশির বাড়ি তার হাতের উপর পড়বে—মগটা ছিট্‌কে পড়বে।]

সুফু—এই এক ঘা দিয়ে দেখিয়ে দিলাম আমার দোকানের কাছে এলে কিভাবে মার খাবি।

[সুফু নিজের দোকানে চলে যাবে]

বেকার—(মগটা কুড়িয়ে ওয়াংকে দেবে) এভাবে তোমাকে মারবার জন্যে পুলিশে নালিশ করো।

ওয়াং—হাতটা একেবারে গেছে।

বেকার—ভাঙে নি তো?

ওয়াং—একেবারে নাড়তে পারছি না।

বেকার—তুমি বোস, আমি ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিচ্ছি হাতটার ওপর।

বৌ—আটটা বাজতে চললো, মেয়েটার দেখা নেই। কোথায় হুল্লোড় করে বেড়াচ্ছে কে জানে।

মিসেস সিন—আমাদের কথা ও ভুলেই গেছে।

[রাস্তা দিয়ে শেন্‌টেকে আসতে দেখা যাবে—হাতে একপাত্র চাল]

শেন্‌টে—(দর্শকদের) ভোরবেলায় উঠে শহরটাকে দেখবার সুযোগ কোনোদিন হয় নি। এই সময়টায় চিরকাল বিছানায় শুয়ে কাটাতাম—মাথা পর্যন্ত নোংরা কম্বলটা দিয়ে ঢাকা থাকতো। ঘুম ভেঙে উঠতে ভয় হতো। আজ ভোরে রাস্তায় কত লোকের সঙ্গে আলাপ হোল। খবরের কাগজ বিক্রি করছে যেসব ছেলেরা, রাস্তায় ময়লা ধুয়ে যারা সাফ করছে, বলদে-টানা গাড়িতে যারা মাঠ থেকে টাটকা সব্‌জি নিয়ে আসছে শহরে। সুনের পাড়া থেকে এখানে আসতে লম্বা রাস্তা। কিন্তু বেশ লাগছিল এই পথটা হাঁটতে—পা ফেলবার তালে তালে মনটা খুশিতে ভরে উঠছিল। শুনেছি লোকে যখন ভালবাসতে শেখে তার দেহ-মন একেবারে বাতাসের থেকেও হাল্কা হয়ে যায়। এখানে আপনাদের মধ্যে যাঁরা প্রেমে পড়েন নি তাঁদের বলি—অনেক কিছুই আপনারা miss করছেন। (দোকানের সামনের লোকেদের প্রতি) এই নাও তোমাদের চাল—(সবাইকে চাল ভাগ করে দিতে থাকবে—ওয়াং-এর দিকে নজর পড়াতে) গুড মর্নিং ওয়াং, আজ আমার মনটা একেবারে হাল্কা হয়ে গেছে। সারা রাস্তায় দোকানের জানলার কাঁচগুলোতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখেছি—দেখতে দেখতে বুঝতে

পেরেছি আমার একটা শাল কেনা-দরকার। গায়ের ওপর একটা শাল জড়িয়ে দিলেই আমি আরও সুন্দর হয়ে উঠব।

[শেন্‌টে কার্পেটের দোকানে চলে যাবে। সুফু নিজের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াবে এবং দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলবে]

সুফু—বুঝলেন মশায়রা! আজ ঐ তামাকের দোকানের মালিক মিস শেন্‌টের সৌন্দর্য দেখে আমি একেবারে, যাকে বলে, অভিভূত হয়ে গেছি। এর আগে ওঁকে ভাল করে নজর করেই দেখি নি। তিন মিনিট ধরে নিজের দোকানে দাঁড়িয়ে ওঁর রূপমাধুরী পান করলাম। আর তার ফল হলো এই—আমার মনে হচ্ছে আমি ওঁর প্রেমে পড়ে গেছি। সম্পূর্ণ মনোহারিণী চেহারা! (হঠাৎ ওয়াংকে দেখে) এই হতভাগা, এখুনি এখান থেকে দূর হয়ে যা।

[নিজের দোকানে ফিরে যাবে সুফু। শেন্‌টে এবং এক অতিবৃদ্ধ দম্পতি অর্থাৎ কার্পেট ব্যবসায়ী এবং তার স্ত্রী তাদের দোকান থেকে বেরিয়ে আসবে। শেন্‌টের হাতে একটি শাল, বৃদ্ধের হাতে আয়না।]

বৃদ্ধা—এ শালটা ভারি সুন্দর। অথচ সস্তা দামের। নিচের দিকে অবশ্য একটা ছোট ফুটো আছে।

শেন্‌টে—(কার্পেটওয়ালীর হাতের ওপর শালের একটা দিক রেখে দেখবে কেমন দেখতে লাগছে) আমার সবুজ শালটাও ভাল লেগেছিল।

বৃদ্ধা—(হাসির সংগে) ওটা একেবারে নতুন—দাম বেশি।

শেন্‌টে—না, অত দাম দিয়ে কেনবার টাকা আমার নেই। ছোট্ট দোকান, আয়ও অল্প—তার ওপর কত রকমের যে খরচ।

বৃদ্ধা—অত দাতব্য কোরো না তুমি। নতুন দোকান খুলেছ—প্রতিটি পয়সা বুঝে-শুনে খরচ করবে।

শেন্‌টে—(শালটা গায়ে দিয়ে) রংটা আমাকে কেমন মানাচ্ছে?

মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা বলেন, সুকুমার বয়সে যে-অভ্যাস গড়ে ওঠে তা টিঁকে থাকে আজীবন। সঞ্চয়ের অভ্যাস এমনি একটি অভ্যাস যার পত্তন হওয়া উচিত অল্প বয়সেই। তাছাড়া, ঐ বয়সে নিজের নামে একখানা চেকবই হাতে পেলে কচি মনে বাড়বে আত্মপ্রত্যয়—চরিত্র গঠনে যা একটি অত্যাবশ্যক উপাদান।

তেরো বা তদূর্ধ্ব বয়সের ছেলেমেয়েরা নিজের নামে সেভিংস ব্যাংক, মেয়াদী আমানত (ফিক্সড ডিপোজিট) অথবা পৌনঃপুনিক আমানত (রেকারিং ডিপোজিট) অ্যাকাউন্ট খুলতে এবং সে-অ্যাকাউন্ট চালাতে পারে।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস : ৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

আমরা সেবার সাথে দিই আরও কিছু

পশ্চিমবঙ্গে ৮০টির অধিক শাখা আছে

বৃদ্ধা—(বিনীতভাবে) ভারি সুন্দর লাগছে।

[শেন্‌টে দাম দিয়ে দেবে।]

বৃদ্ধা—এটা যদি তোমার ভাল না লাগে, আমাকে বললেই বদলে দেব। তোমার ওই প্রেমিকের টাকা-পয়সা আছে তো?

শেন্‌টে—(হাসতে হাসতে) একেবারে কপর্দকশূন্য।

বৃদ্ধা—তুমি ছ' মাসের ভাড়া দেবে কি করে?

শেন্‌টে—এই দ্যাখো, ভাড়া দেবার কথাটা একেবারে ভুলে গেছিলাম।

বৃদ্ধা—আমিও তাই ভাবছিলাম। আর সোমবারই তো মাসের প্রথম দিন। আমি একটা কথা বলি—শোন, আমি আর আমার স্বামী তোমাকে জানবার সুযোগ পেয়েছি এই ক'দিনেই—তোমার বিয়ের ওই বিজ্ঞাপনটা দেখেই আমরা সন্দিহান হয়ে উঠেছি। তারপর আমরা ঠিক করেছি, দরকার হলে তোমাকে আমরা সাহায্য করবো। আমাদের কিছু জমানো টাকা আছে, তার থেকে দু'শ' রুপোর ডলার আমরা তোমাকে ধার দিতে পারি। তোমার ইচ্ছা হলে দোকানের মাল সিকিওরিটি হিসাবে রাখতে পারো। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো কিছু লিখিত চুক্তি করবার দরকার হবে না।

শেন্‌টে—আমার মতো বোকা মেয়েকে টাকা ধার দেবে?

বৃদ্ধা—তোমার কাজিন তো বোকা নয়—কিন্তু তাকেও ধার দিতে হলে আমরা দু'বার করে ভাবতাম। কিন্তু তোমাকে আমরা খুশি মনেই ধার দেব।

বৃদ্ধ—(এগিয়ে এসে) কি, তোমাদের কথাবার্তা হয়ে গেছে?

শেন্‌টে—মিস্টার ডেঙ, আমি ভাবছিলাম দেবতারা যদি একটু আগে তোমার স্ত্রী-র কথাটা শুনতে পেতেন! দেবতারা নাকি সৎ এবং ভাল লোক খুঁজে বেড়াচ্ছেন। যাক্, আমি প্রেমে পড়ে যে বিপদে পড়েছি, তোমরা খুশি হয়ে টাকা দিয়ে আমাকে সে বিপদ থেকে উদ্ধার করছ।

[ওরা দু'জনে দু'জনের দিকে চেয়ে হাসবে।]

বৃদ্ধ—এই নাও টাকা।

[একটা খাম শেন্‌টেকে দেবে—শেন্‌টে সেটা নিয়ে বাও করবে। ওরাও বাও করে নিজেদের দোকানে চলে যাবে।]

শেন্‌টে—(ওয়াংকে খামটা দেখিয়ে) এই দ্যাখো ছ' মাসের ভাড়া—একটা মিরাকল্-এর মতো ব্যাপারটা ঘটল। আমার নতুন শালটা কেমন হয়েছে ওয়াং?

ওয়াং—এটা কি তোমার সেই প্রেমিকের জন্যে কিনলে?

শেন্‌টে—ঠিকই বলেছ।

মিসেস সিন—ওর হাতটা যে মারের চোটে ভেঙে গেছে—সেটা দেখেছ?

শেন্‌টে—(ভয়ে ভয়ে) তোমার হাতে কি হয়েছে ওয়াং?

মিসেস সিন—ওই নাপতে ব্যাটা সাঁড়াশি দিয়ে ওকে মারাত্মকভাবে পিটিয়েছে, আমরা সবাই দেখেছি।

শেন্‌টে—শীগ্‌গির ডাক্তারের কাছে যাও ওয়াং, চিকিৎসা না করলে হাতটা শক্ত হয়ে যাবে। ও হাত দিয়ে আর কোনো কাজ করতে পারবে না।

বেকার—ডাক্তারের দরকার নেই। ওর এখন যাওয়া দরকার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। নাপতেটা বেশ ধনী। ওর কাছ থেকে প্রচুর খেসারৎ আদায় করে নিতে পারবে ওয়াং।

মিসেস সিন—তোমার একজন সাক্ষীর দরকার হবে, যে নিজের চোখে মারপিটটা দেখেছে।

ওয়াং—তোমরা সবাই তো এখানে ছিলে—তোমরাই তো সাক্ষী হতে পারবে।

[ওখানকার কেউ ওর দিকে মুখ তুলে তাকাবে না।]

শেন্‌টে—মিসেস সিন, তুমিও তো এখানে নিজের চোখেই সব দেখেছ?

মিসেস সিন—পুলিশের ব্যাপারে আমি মাথা গলাতে চাই না।

শেন্‌টে—(ভাইয়ের বৌকে) তুমি কি বল?

বৌ—আমি! আমি সে সময় অন্যদিকে চেয়েছিলুম—আমি কিছু দেখি নি।

মিসেস সিন—মিছে কথা বোলো না। আমি দেখেছি তুমি এই দিকেই চেয়েছিলে—নাপতে ব্যাটার অনেক টাকা আছে। ওর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে তুমি ভয় পাচ্ছো।

শেন্‌টে—(ঠাকুর্দাকে) তুমি নিশ্চয়ই সত্যি কথা বলতে ভয় পাবে না।

বৌ—কেউ ও'র কথায় বিশ্বাস করবে না—উনি তো চোখেই দেখতে পান না।

শেন্‌টে—(বেকারকে) তুমি?

বেকার—আমার সাক্ষ্যে ফল হবে না। দু'বার ভিক্ষে করবার অপরাধে থানায় আমার নাম তোলা আছে।

শেন্‌টে—(অবিশ্বাসভরে) তোমরা কি বলতে চাও চোখের ওপরে এই মারাত্মক কান্ডটা দেখেও তোমরা কেউ সাক্ষ্য দেবে না?

[বিরক্তিভরে দর্শকদের প্রতি]

এই সব হতভাগারা
চোখের ওপর এদের একজন
নির্যাতিত হ'ল
তবু সবাই চুপ করে আছে—
আহত লোকটা ছটফট করছে
এরা তবু নির্বাক এবং নিস্তব্ধ
দাম্ভিক অত্যাচারী লোকটা নির্ভয়ে
ঘুরে বেড়াচ্ছে—
আর এরা বলছে ব্যাপারটা গোপন
রাখাই ভাল
নইলে আবার আমাদেরও অত্যাচার
সহ্য করতে হবে।
এটা কি ধরণের শহর এখানকার
মানুষেরা কি দিয়ে গড়া!
অত্যাচার দেখলেই তার বিরুদ্ধে সবাই
যদি মুখ তুলে না দাঁড়ায়।
সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার না
করে দেয়,
তবে অত্যাচারও কখনও থামবে না।

ওয়াং, যারা দেখেছে, তারা যখন সাক্ষী দেবে না, তখন না দেখেও আমি বলবো—আমি নিজে দেখেছি।

মিসেস সিন—তাতে পারজারি হবে।

ওয়াং—হাতের ফোলাটা কি কমে আসছে?

বেকার—না, একটুও কমে নি।

ওয়াং—(এক হাত দিয়ে অন্য হাতটা ধরে) আমি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেই চললাম। [চলে যাবে]

শেন্‌টে—তোমরাও আমার চোখের সামনে থেকে চলে যাও।

[সবাই বেরিয়ে যাবে]

[সুন-এর মা মিসেস ইয়াং এসে হাজির হবে।]

মিসেস ইয়াং—তুমি মিস শেন্‌টে। আমার ছেলে সুনের কাছ থেকে সব শুনেছি। শোন, ভাল খবর আছে—সুন বোম-হর পাইলটের চাকরি পাবে। পেকিং থেকে আজ সকালে একটা চিঠি এসেছে—ডাক বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট লিখেছেন।

শেন্‌টে—খুব ভাল খবর—সুন তাহলে আবার আকাশে উড়তে পারবে।

মিসেস ইয়াং—কিন্তু এর জন্যে অনেক টাকা খরচ করতে হবে। পাঁচশো রুপোর ডলার।

শেন্‌টে—অনেক টাকার ব্যাপার—কিন্তু টাকার কথা ভাবলে চলবে না। অন্ততঃ আমার দোকানটা যতক্ষণ আছে।

মিসেস ইয়াং—তুমি ভারি ভাল মেয়ে।

শেন্‌টে—কিন্তু দোকান থেকে তো সব টাকা উঠবে না। যে দুশো রুপোর ডলার আমার কাছে আছে তাও ধার করা টাকা। দোকানের মালপত্র বেচে দিয়ে ধারটা শোধ করে দেব।

[টাকার খামটা মিসেস ইয়াংকে দেবে। ধীরে ধীরে যবনিকা]

(ক্রমশঃ)

রঙ্গজগৎ

সন্ধ্যা রায় 'হঠাৎ দেখা'র নায়িকা

'ডাঃ জিভাগো' ছাড়পত্র পেয়েছে

ডেভিড লীন পরিচালিত 'ডাঃ জিভাগো' অবশেষে প্রদর্শনের জন্য ছাড়পত্র পেয়েছে। তবে ছবিটি থেকে প্রায় ত্রিশ ফুট কাটা গেছে। এইভাবে অংগহীন হয়ে ছবিটি দেখাতে দিতে পরিচালক আপত্তি করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত এভাবেই ছবিটি দেখান হবে এবং জানা গেছে ফেব্রুয়ারী মাসের দিকে ছবিটি মুক্তি পাবে। 'ডাঃ জিভাগো' রাশিয়ার কবি বরিস প্যাস্টারনাকের রচিত উপন্যাসের চিত্ররূপ। এই উপন্যাসে তিনি নবেম্বর বিপ্লবের রক্তক্ষয়ের নিন্দা করেছেন। এই উপন্যাসটিকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এই উপন্যাস নিয়ে যথেষ্ট ক্ষোভ হয়েছিল, এবং ধনতান্ত্রিক জগতে হৈ-চৈ শুরু হয়েছিল। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ধারকরা প্যাস্টারনাককে নোবেল পুরস্কার দিয়েই শান্ত হন নি, ডেভিড লীনের মত শক্তিশালী পরিচালককে দিয়ে চলচ্চিত্ররূপও দিয়েছেন।

এই ছবি ভারতে দেখান সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা ভাল মনে করেন নি। ভারত সরকারও শংকা করেছেন—ছবিটি দেখাতে দিলে হয়ত সোভিয়েটের সংগে তাঁদের সম্পর্ক ভাল থাকবে না। তাই সেন্সর বোর্ডকে মাঝপথে দাঁড় করান হয়েছিল। সেন্সর বোর্ড আমাদের পররাষ্ট্র নীতির দিকে লক্ষ্য রেখে বার বার আপত্তি জানিয়েছেন। কিন্তু অপর দিক থেকেও চাপ কম ছিল না। আমেরিকানরাও চেয়েছে 'ডাঃ জিভাগো' ভারতে দেখান হোক। দুই রাষ্ট্রের মুখের দিকে চেয়ে কোন কুল রক্ষা করা যাবে এ নিয়ে আমাদের সরকারকে বেশ ভাবতে হয়েছে। ছবির পরিবেশক মেট্রো গোল্ডুইন ছয় মাস আগে থেকে দর্শকদের কাছে অগ্রিম টিকেট কেনার ইচ্ছা জাগানোর জন্য প্রচার করেছিলেন। এই প্রচারে তাঁরা সাড়াও পেয়েছেন। আমাদের সেন্সর বোর্ড এবং সরকারের ওপর এও একরকম চাপ। ইতিপূর্বে আমরা লিখেছিলাম শেষ পর্যন্ত আমাদের সেন্সর বোর্ডকে ছাড়পত্র দিতেই হবে। কারণ মার্কিনরা যখন ইচ্ছা করছে ছবি দেখান হবে তখন সে ছবি বন্ধ রাখার মত অবস্থা আমাদের নয়। তার ওপর কি যুক্তিতে রাখা যাবে? 'ডাঃ জিভাগো' বইটি বাজারে বিনা বাধায় বিক্রি হচ্ছে। বই যদি কিনে পড়তে আপত্তি না থাকে তবে ছবি দেখাতে দিতে আপত্তি থাকবে কি করে! মাঝখানে যত দোষের ভাগী হল সেন্সর বোর্ড। সেন্সর বোর্ড সরকারী নীতিকেই তো অনুসরণ করে। অন্তত এ ধরণের রাজনৈতিক বক্তব্যপূর্ণ ছবির ক্ষেত্রে। আজকাল যেভাবে ঢালাও আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা-সিরিজের ছবি মুক্তি পাচ্ছে—সেসব ছবি কোন রকমেই 'ডাঃ জিভাগো' অপেক্ষা কম ক্ষতিকর নয়। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বন্ধুত্ব এবং ভারতের নিরপেক্ষতা বিবেচনা করলে এরকম ছবি আমাদের দেশে দেখাতে না দেওয়া ভাল। সেসব ছবি দেখাতে না দেবার মত সৎ সাহস আমাদর সরকার তথা সেন্সর বোর্ড দেখাতে পারেন নি। আমাদের মুরোদ আরো দেখা গেছে রীতা ফারিয়ার দক্ষিণ ভিয়েতনামের যাবার ব্যাপারে। সেক্ষেত্রে আমেরিকার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জনসাধারণ বিক্ষোভ জানালেও সরকারিভাবে কিছু করার সাহস হয় নি। রীতার ব্যাপার 'ডাঃ জিভাগো' অপেক্ষা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সেক্ষেত্রে যখন আমরা হার মেনেছি তখন 'ডাঃ জিভাগো'-কে দেখাতে দেবার দাবি মেনে নেওয়াতে তেমন কিছু আসে যায় না। বরঞ্চ এই ঘটনার পর চিন্তা করা উচিত—সেন্সর বোর্ড নামক সংস্থার প্রয়োজন আছে কি না। আমাদের যদি নির্দিষ্ট নীতি না থাকে এবং কোন নীতিকে কার্যকরী করার মত দৃঢ়তা না থাকে তবে সেন্সরের বাধা সৃষ্টি করে অথবা ছবির অংগহানি করে অনর্থক লোক হাসাবার মত অবস্থা না করাই ভাল।

—সুজন

চিত্র আলোচনা

৮০তে আসিও না

(পরিচালনা : শ্রীজয়দ্রথ)

একটি অনাবিল হাসির ছবি রুদ্রাণী ফিল্মসের '৮০ তে আসিও না'। হাসির উচ্ছ্বাসের মধ্যে অবশ্য একটি বক্তব্য রয়েছে। যে বক্তব্যে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে বৃদ্ধ পিতামাতা বা নির্ভরশীল বৃদ্ধদের প্রতি পরিবারের সকলের কর্তব্য। এক সময় যাঁদের আয়ে ও শ্রমে ছেলে-মেয়েরা মানুষ হয়, পরবর্তীকালে তাঁরা যখন বয়সের ভারে অচল হয়ে পড়েন তখন সকলের করুণার পাত্র হয়ে তাঁদের শেষ দিনের অপেক্ষা করতে হয়। এই কাহিনীর নায়ক সদানন্দের অভিজ্ঞতায় চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক তাই বলতে চেয়েছেন—৮০-তে আসিও না।

তপন সিংহের 'গল্প হলেও সত্যি'-তে এরূপ বৃদ্ধের একটি চরিত্র ছিল। সে ছবিতে কল্পনার জগৎ থেকে হঠাৎ এক পরিচারক এসে পরিবারের গতি ফিরিয়ে দিয়েছিল। এখানে বৃদ্ধ সদানন্দ দৈনন্দিন জীবনের চরম অবহেলার মধ্যে থেকে এক-দিন স্বপ্নের জগতে বিচরণ করে এক জলাধারে অবগাহন করে যৌবন ফিরে পেয়েছিল। নিজে যৌবন ফিরে পেয়ে স্ত্রী সরোজিনীকেও সেই জলাশয়ে স্নান

চিত্রভারতীর 'তীর্থভূমি' ছবির একটি দৃশ্যে মাধবী মুখার্জী ও মঞ্জু দে

করিয়ে জরামুক্ত করেছিল। তারপরে কল্পনা ও বাস্তবের সংঘাত দেখা দেয় স্বপ্নের ঘোরে। ব্যবসায়ীরা এসে জলাশয় দখল করে—মুনাফার ফন্দি আঁটে। পুলিশ ও সরকার তাদের সহায়ক। সুতরাং জনসাধারণ এই যৌবন উদ্ধারক জলাশয় ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হয়। তারা বিক্ষুব্ধ। তাদের অতিলোভের ফলও তারা পেয়েছে। এদিকে যৌবন ফিরে পাওয়ায় বাড়িতে ছেলেদের কাছে সদানন্দের কদরও বেড়ে গেছে। পুলিশের ঘাঁটি থেকে সরোজিনীকে উদ্ধার করতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে মারামারির মধ্যে সদানন্দের ঘুম ভেঙে যায়। দেখা যায় সে যা ছিল তাই রয়েছে, জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছে মাত্র।

এই কাল্পনিক কাহিনীচিত্র দর্শকদের আনন্দ দেবে। তবে পরিচালক এত খুঁটিনাটি কাজ না দেখালেই পারতেন। কারণ সবটাইতো স্বপ্ন ও কল্পনা। ছবির চিত্রগ্রহণ এবং সংগীতের কাজ উপভোগ্য। সদানন্দের চরিত্রে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সরোজিনীর চরিত্রে রুমা গুহঠাকুরতা রূপ দিয়েছেন। এক জাঁদরেল ব্যবসায়ী বা আমলার (যে চরিত্রের পরিচয় স্পষ্ট নয়) চরিত্রে রবি ঘোষ অভিনয় করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন তরুণকুমার, জহর রায়, কমল মিত্র, অসিতবরণ, গঙ্গাপদ বসু, অমর মল্লিক, রেণুকা রায়, সুব্রতা চ্যাটার্জী, শান্তা গাঙ্গুলী, সঞ্চিতা ব্যানার্জী, শীতল ব্যানার্জী, মণি শ্রীমানি, গৌর শী প্রমুখ আরো অনেকে।

ছবির চিত্রনাট্যের অবলম্বন গৌর শী রচিত 'যযাতির স্বপ্ন'। চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনার কাজ করেছেন শ্রীজয়দ্রথ।

ওড়িয়া ছবি

মাটির মনিষ
(পরিচালক: মৃণাল সেন)

পশ্চিমবঙ্গের কৃতী চলচ্চিত্র পরিচালক মৃণাল সেন একটি ওড়িয়া ছবি পরিচালনা করেছেন। ছবিটি দেখার সুযোগ পেয়ে আমরা পরম আনন্দলাভ করেছি। কেবলমাত্র ওড়িয়া চলচ্চিত্রের কথা নয়, বাংলা দেশেও এরূপ উন্নতমানের ছবি কমই হয়েছে। কাহিনীর বলিষ্ঠতায়, অভিনয়ের বিস্ময়ে এবং আঙ্গিক সৌকুমার্যে ছবিটি সর্বভারতীয় চলচ্চিত্র-দৃষ্টি সম্পন্ন দর্শকদের মুগ্ধ করবে। এই ছবি 'মাটির মনিষ' ওড়িয়া চলচ্চিত্র শিল্পে পথের পাঁচালী; সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রামাণিক মূল্য ও শিল্পবুদ্ধিসম্পন্ন এক সার্থক কাহিনীচিত্র।

ছবির চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে উড়িষ্যার বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীকালিন্দীবরণ পাণিগ্রাহীর 'মাটির মনিষ' উপন্যাস অবলম্বনে। এই কাহিনীর চরিত্রগুলি উড়িষ্যার দূরবর্তী পল্লী অঞ্চলের মানুষ। যাদের কাছে রেল, এরোপ্লেন তখনো স্বপ্নের জিনিস। কৃষি-জীবন, মহাজনের শোষণ, অলসপ্রহরে যাদের দিন কাটে। ঘটনাকাল ত্রিশ দশক। ওরা মাটির মানুষ—সহজ সরল জীবনের গতি। এই নিস্তরঙ্গ জীবনে একদিন বাইরের বিরাট ধাক্কা লাগল। ফ্যাসিস্টরা বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়েছে, সাম্রাজ্যবাদী শাসনের রজ্জু-বাঁধা ভারতীয় জীবনে এই যুদ্ধের ঢেউ লেগেছে। ধান-চালের আকাল সুরু হয়েছে। চারিদিকের স্বার্থবুদ্ধির আঘাতে প্রধানদের দুই ভাইয়ের একান্নবর্তী পরিবার ভাঙনের মুখে। একজন নবীন—টাকার স্বপ্ন জেগেছে তার মনে, সে মহাজনের পরামর্শে পৃথক হয়ে ধান বেচে দিতে চায়, আর এক ভাই পুরনো ঐতিহ্যের অনুসারী—যুদ্ধ যুগের টাকার ক্ষুধা তাকে পায় নি। সে কিছুতেই পৃথক হতে দেবে না। এই দুই মানসিকতার সংঘাতে দুই যুগ, দুই আদর্শের নাটকীয় দ্বন্দ্ব চরম রূপ গ্রহণ করল।

মৃণাল সেন বিস্ময়কর নৈপুণ্যের সঙ্গে ত্রিশ দশকের সরল গ্রাম্যজীবন; এক কৃষক পরিবারে মৃত্যু ও বিবাহের মধ্যে দিয়ে পুরুষানুক্রমিক উত্তরণ; কৃষকদের দৈনন্দিন জীবন, সুখ-দুঃখ, শোষণ ও তারই অবসরে মহৎ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সৃষ্টিকে প্রকাশ করেছেন। উড়িষ্যার গ্রাম্য-জীবনের সৌন্দর্য ও প্রাকৃতিক বর্ণালী শোভার সঙ্গে গ্রামের মানুষগুলিকে তিনি ঘড় দরদের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। এযাবৎ আমরা যত উড়িষ্যার ছবি দেখেছি কোন ছবি এত বেশি ওড়িয়া জীবনের গভীরে প্রবেশ করতে পারে নি। এত মর্যাদার দৃষ্টিতে কৃষক-জীবনকে তুলে ধরতে পারে নি। অবশ্য কালিন্দীবরণ পাণিগ্রাহীর সাহিত্যপ্রতিভা ও দরদীদৃষ্টি এই চিত্রনাট্যের পরম সহায় হয়েছে। এদিক থেকে বলা চলে মৃণাল সেনের 'মাটির মনিষ' ওড়িয়া চলচ্চিত্রের এক নতুন দিগনির্দেশ। এই সার্থকতায় পৌঁছতে পরিচালককে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন তাঁর ক্যামেরাম্যান এবং শিল্প-নির্দেশক। প্রামাণিকচিত্রের মেজাজে তাঁরা উড়িষ্যার গ্রাম্য-জীবনকে তুলে ধরেছেন। এই সঙ্গে সঙ্গীত পরিচালকের কৃতিত্বও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উড়িষ্যার পল্লীসঙ্গীতের সুরের প্রয়োগে তিনি গ্রাম্য-জীবন ও গ্রামের মানুষের উপলব্ধিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। কোনরূপ পরিচয়লিপি না পাওয়ায় এবং পর্দায় প্রতিফলিত ওড়িয়া ভাষায় চরিত্র পরিচয় পড়তে না পারায় এই কৃতী শিল্পীদের নাম আমরা প্রকাশ করতে অক্ষম হওয়ায় দুঃখিত।

অভিনয়ের কথা সবার শেষে উল্লেখ করছি—বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বোঝাবার জন্য। এই ছবি না দেখলে আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না যে উড়িষ্যায় এমন উচ্চমানের শিল্পীরা আছেন। একমাত্র শরৎ পুজারী ছাড়া আর কারো নাম আমাদের জানা নেই। শরৎ পুজারী কলকাতায় এসেছিলেন এবং আধুনিক প্যান্ট-কোট পরা, টাই-বাঁধা লোকটিই যে এমন নিখুঁতভাবে কৃষক-চরিত্রকে রূপায়িত করেছেন তা দেখে বিস্মিত হয়েছি। ছোটভাইয়ের চরিত্রে যিনি রূপ দিয়েছেন তাঁর অভিনয় ক্ষমতা আমাদের অনেকদিন মনে থাকবে।

ছোটভাইয়ের স্ত্রী নিতার চরিত্রে এবং বড় ভাইয়ের স্ত্রীর চরিত্রে অভিনেত্রী দুজনও আমাদের মুগ্ধ করেছেন। অন্যান্য অভিনেতাদের দিয়েও পরিচালক চমৎকার কাজ আদায় করেছেন। সুন্দর, সহজ ও স্বাভাবিক চরিত্র রূপায়ণে 'মাটির মনিষ' আমাদের বহুদিন মনে থাকবে। আমরা মনে করি ওড়িয়া ভাষায় হলেও এই ছবিটি বাঙালী চিত্ররসিকরাও উপভোগ করবেন। এবং আমরা আশা করি রাষ্ট্রপতি চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রতিযোগিতায় ছবিটি বিশেষ স্থান অধিকার করবে।

ওয়ার্ল্ড উইদাউট সান

লাইট হাউস সিনেমায় বিজ্ঞানচিত্র 'ওয়ার্ল্ড উইদাউট সান' মুক্তিলাভ করেছে। এই ছবির পরিচালক ইতিপূর্বেও সমুদ্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ওপর ভিত্তি করে ছবি নির্মাণ করে প্রশংসা লাভ করেছেন। এই ছবিটি নির্মাণে পরিচালক, দু'জন সাবমেরিন নাবিক ও সাতজন বৈজ্ঞানিক কর্মীর সহযোগিতা গ্রহণ করেছেন। তাঁরা একমাস কাল লোহিত সাগর ভারত মহাসাগরের অভ্যন্তরে কাজ করেছেন। এই কাজের জন্য বিশেষ ধরণের সাবমেরিন এবং বৈজ্ঞানিক সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহার করেছেন, এমন কি জলের নিচে অস্থায়ী একটি শিবিরও নির্মাণ করেছিলেন। মানুষ অজানাকে জয় করবার জন্য মেতে উঠেছে। একদিকে মহাকাশ অভিযান চলেছে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাবার,

মৃণাল সেনের ওড়িয়া ছবির 'মাটির মনিষ'-এ কৃষক-চরিত্রে শরৎ পূজারী

নিত্যানন্দ দত্ত পরিচালিত 'হঠাৎ দেখা' ছবিতে সৌমিত্র, অনুপ ও সন্ধ্যা রায়

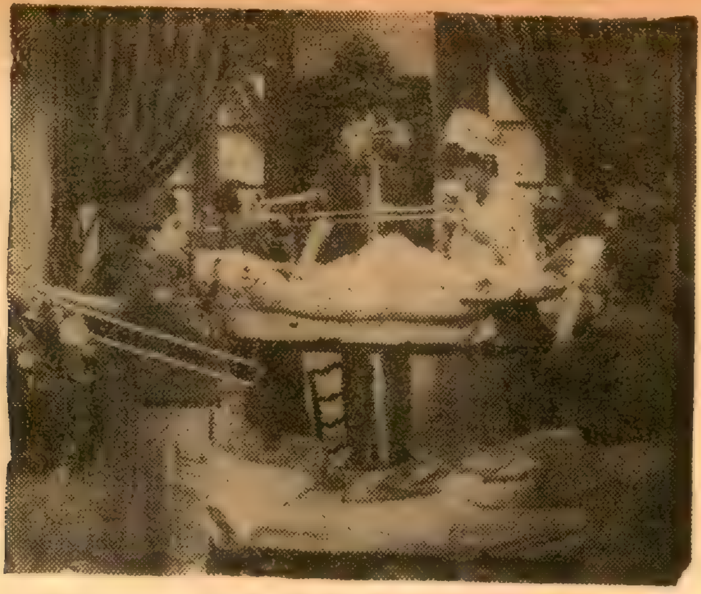

চেকোস্লোভাক ছবি 'ইফ এ থাউজেন্ড ক্লারিনেটস্' ছবির একটি দৃশ্য

আর একদিকে মানুষ সমুদ্রের রহস্য-উদ্ধার করবার জন্য উদ্যোগী হয়েছে। বর্তমান ছবিটি মানুষের সমুদ্র রহস্য-উদ্ধার চেষ্টার একটি প্রামাণিকচিত্র। এই ছবিতে সমুদ্র জগতের অনেক অজানা তথ্য উদ্ধার হয়েছে। এমন অনেক প্রাণীর সন্ধান পেয়েছে—যাদের কথা মানুষের অজানা ছিল। সর্বাধিক বিস্ময়কর সমুদ্র জগতের কোন কোন প্রাণীর আচরণ। সমুদ্রবিজ্ঞানীরা দিনে-রাতে ধৈর্য সহকারে এদের আচরণ লক্ষ্য করেছেন এবং তা মুভি ক্যামেরায় তুলে এনেছেন। ছবিটি ছোট বড় সকলের কাছে শিক্ষণীয়। মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধকারী এই ছবিটি শিক্ষামূলক প্রামাণিক ছবি হিসাবে একাডেমি পুরস্কার লাভ করেছে। ছাত্র-ছাত্রীরা ছবিটি দেখলে সমুদ্র জগৎ সম্পর্কে অনেক অজানা কথা জানতে পারবেন। ছবিটি রঙিন।

আন্তর্জাতিক এ্যামেচার ফিল্ম উৎসব

বৃটেনে (হাই উইকম্ব) অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক এ্যামেচার ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে লেনিনগ্রাডের মভাসন প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন তাঁর 'এ প্রেজেন্ট টু মাদার' ছবির জন্য।

টেলিভিশন ফিল্ম উৎসব

প্রাগে অনুষ্ঠিত টেলিভিশন ফিল্ম উৎসবে 'গোল্ডেন প্রাগ' পুরস্কার পেয়েছে সোভিয়েট ছবি 'দি ম্যাসেজ'। রাশিয়ার গৃহযুদ্ধকালে বীরত্বের কাহিনী নিয়ে এই ছবি।

কার্টুন ছবির উৎসব

রুমানিয়ার মামাইয়ায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কার্টুন চলচ্চিত্র উৎসবে 'গোল্ডেন পেলিক্যান' পেয়েছে সোভিয়েট ছবি 'বনিফেসেস্ হলিডে'। 'সিলভার পেলিক্যান' পুরস্কারটিও পেয়েছে সোভিয়েট ছবি 'উইনডো'।

স্টুডিও খবর

এই তীর্থ

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর নতুন ছবি 'এই তীর্থ'র কাজ আরম্ভ করেছেন। শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য লিখিত হয়েছে। ছবির জন্য সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সুনীলবরণ দত্ত রচিত দুটি গানে হেমন্ত মুখার্জী সুর দিয়েছেন এবং তিনিই গেয়েছেন। অন্য গানগুলি গাইবেন মান্না দে ও প্রতিমা ব্যানার্জী। 'এই তীর্থ' ছবিতে অভিনয় করবেন অনিল চ্যাটার্জী, কালী ব্যানার্জী,

আমেরিকার পলটেলর ড্যান্স কোম্পানীর আধুনিক নাচের একটি দৃশ্য। ফেব্রুয়ারী মাসে এই দল রবীন্দ্রসদনে নৃত্য পরিবেশন করবে।

সংবাদিকী

পশ্চিম বার্লিনে সোভিয়েট চলচ্চিত্র সপ্তাহ

পশ্চিম বার্লিনে সম্প্রতি সোভিয়েট চলচ্চিত্র 'লেনিন ইন পোল্যান্ড', 'আই এম টুয়েন্টি', 'আর্লি মর্নিং' এবং পুরনো দিনের ছবি 'লেনিন ইন অক্টোবর', 'ম্যাক্সিমস্ ইয়থ', 'কাউন্টার প্ল্যান', 'এ লোন সেইল লুমস হোয়াইট'।

সন্ধ্যা রায়, অনুপকুমার, সন্ধ্যারাণী, জহর রায়, প্রসাদ মুখার্জী, প্রেমাংশু বসু।

ছুটি

অরুন্ধতী দেবীর পরিচালনায় 'ছুটি' কাজ শেষ হয়েছে। ছবির চিত্রনাট্যের অবলম্বন বিমল করের লেখা 'খড়কুটো'। 'ছুটি'র শিল্পীরা 'তারকা' পর্যায়ের নন, নতুন শিল্পী নিয়ে অরুন্ধতী দেবী কাজ করেছেন। এ'দের মধ্যে আছেন নন্দিনী মালিয়া, মৃণাল মুখার্জী ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পান্না

চিত্র সংগঠনের প্রথম প্রচেষ্টা 'পান্না'র কাজ প্রায় শেষ হয়ে আসছে। এক সাহসী বালকের জীবনকে কেন্দ্র করে এই ছবির চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে। এই চিত্রনাট্যের বিস্তার ঘটেছে শুশুনিয়া গ্রামে, শালতোড়ার পাহাড়ে, শালবতী নদীর খাঁড়িতে। এসব স্থানে ছবির বহির্দৃশ্য তোলা হয়েছে। ছবির নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছে শ্রীমান রামপ্রসাদ। অন্যান্য ভূমিকায় আছে কুমারী কৃষ্ণকলি, শ্রীমান তরুণকুমার। একটি ভূমিকায় রূপ দিয়েছেন শম্ভু মিত্র। ছবিটি পরিচালনা করছেন অমিত মৈত্র। চিত্রগ্রহণে বিশু চক্রবর্তী এবং সংগীতে ভি বালসারা কাজ করছেন। ডি লুক্স ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্সের পরিবেশনায় ছবিটি মুক্তি পাবে।

পদ্মভূষণ রবিশংকর

সঙ্গীতকথা

মলয় গীতবীথির সঙ্গীত পরিবেশন

সম্প্রতি মলয় গীতবীথি সঙ্গীত সংস্থা দেশপ্রিয় পার্কে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করে সমাগত দর্শকবৃন্দের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন। অনুষ্ঠানে মানবেন্দ্র মুখার্জী ছাড়া অতুলপ্রসাদের গান এবং দ্বিজেন্দ্র গীতি পরিবেশন করেন এ সংস্থার অধ্যক্ষা শ্রীমতী শেলী সান্যাল।

সংঘমিত্র

গত ২৩শে জানুয়ারী পূর্ব পুঁটিয়ারীর সংঘমিত্রের ত্রয়োদশ জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে সংঘ সদস্যগণ কর্তৃক আয়োজিত মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠু ও পরিচ্ছন্নভাবে পরিবেশিত হয়।

উদ্বোধন সংগীত অন্তে কলিকাতা আকাশবাণীর সুরকার ও গীতকার শ্রীকমলেশ বসু তিনখানি বাউল সংগীত পরিবেশন করেন। সংঘের অন্যতম সদস্য শ্রীস্বদেশমোহন মুখার্জী "বিদ্রোহী" কবিতা আবৃত্তি করেন। নৃত্যশিল্পী শ্রীনীলমণি ভট্টাচার্যের সুনিপুণ পরিচালনায় ও নির্দেশনায় গুরুদেবের ছয় ঋতু অবলম্বনে "ঋতুরঙ্গ" গীতিনৃত্যটি সাফল্যমণ্ডিত হয়।

শিশু ও কিশোর শিল্পী সম্মেলন

"কৃষ্টি"র অষ্টম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উৎসব ও দ্বিতীয় বার্ষিক শিশু ও কিশোর শিল্পী সম্মেলন গত ১৩ই ও ১৪ই জানুয়ারী, হাওড়া অক্ষয় শিক্ষায়তন হলে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম অধিবেশন সুরু হয় ১৩ই জানুয়ারী অপরাহ্ণ ৩॥ ঘটিকায়। শ্রীঅশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্বোধন সঙ্গীতের পর সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে বরণ করা হয় যথাক্রমে শ্রীঅখিল নিয়োগী (স্বপন-বুড়ো) ও নাট্যকার রমেন লাহিড়ীকে। এর পর প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী রবীন বসু ও তারাকালী বসুর সুষ্ঠু বিচারে প্রায় একশত রবীন্দ্রসঙ্গীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় অধিবেশন সুরু হয় ১৪ই জানুয়ারী অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকায়। শ্রীজ্যোৎস্না সিংহের উদ্বোধন সঙ্গীতের পর সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে বরণ করা হয় শ্রদ্ধেয় শ্রীবিমলানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীবেলা দে-কে। এর পর শিশু ও কিশোর শিল্পীরা সঙ্গীত ও আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করেন। আবৃত্তি ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতার সফলকামী প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীবেলা দে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী পাপিয়া প্রামাণিক, জয়শ্রী মুখার্জী, সুস্মিতা দাস, দীপ্তি ঘোষ, ইসাবেলা রায়, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপেন দে, জ্যোৎস্না সিংহ, রমা সিংহ, দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায়, প্রলয় মিত্র, শিখা ভট্টাচার্য, মহুয়া চৌধুরী ও অজয় গাঙ্গুলী (হরবোলা)

পাঠক মন

সাপ্তাহিক বসুমতীর দুটি পৃথক সংখ্যায় শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় ও শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দত্তের ভিন্নসুরের রচনাদুটি পাঠ করে স্বস্তি লাভ করেছি। মনে হচ্ছে এতদিনে অন্তত দুজন ব্যক্তিও বাংলাদেশের ছাত্রদের প্রাপ্তবয়স্ক বলে গণ্য করলেন। সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলন নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত অজস্র সংবাদ ও প্রবন্ধের যেগুলি চোখে পড়েছে তাদের ধরণে মনে হয়েছে সকলেই কিছুটা গুরু-জনসুলভ প্রশ্রয়ের ভঙ্গীতে ছাত্রদের 'বৈপ্লবিক' ছেলেমানুষীর পিঠ চাপড়েছেন—কারও কারও মধ্যে ছাত্রদের প্রশংসাভাজন হওয়ার, অন্তত বিরাগভাজন না হওয়ার সশঙ্ক বা সুচতুর প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই নিতান্ত অন্যমনস্ক পাঠকেরও দৃষ্টি এড়ায় নি। সেক্ষেত্রে যুক্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে ছাত্রদের রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে শ্রীরায় ও শ্রীদত্ত ছাত্রসমাজের প্রকৃত শুভানুধ্যায়ীর কাজ করলেন বলে ছাত্রী হিসেবে আমাদের মনে হয়েছে।

বেশ কিছুদিন ধরেই একধরণের ভাবাবেগের স্নেহশীল প্রশ্রয়ে আদুরে ছেলের মতই বাংলাদেশের ছাত্রসমাজকে 'বালকভাবে' পেয়ে বসেছে। এর উদাহরণ যত্রতত্র। সাম্প্রতিক ঘটনায় 'ছাত্র বলে তাঁরা অবশ্যই ক্ষমার্হ'—এই ধুয়া শুধু যে ছাত্ররাই তুলেছেন তা নয়, আশ্চর্যের বিষয়, চিন্তাশীল বলে পরিচিত অনেকেরই লেখায় এই দাবি সোচ্চার হয়ে উঠেছে। একমাত্র নিজেদের নাবালক বলে মেনে নিলেই ছাত্ররা এই উক্তিতে অপমানিত বোধ না করে পারেন। অধিকারের প্রশ্নে তাঁরা লড়াই করছেন—অধিকার বজায় থাকে সমানে সমানে, অধিকার লাভ করা যায় সাবালকত্ব অর্জন করলে। সেখানে সব ভুলে গিয়ে ক্ষমা করার প্রশ্ন ওঠে কি করে?

চিন্তার এই শিশুসুলভ অসঙ্গতি ও যুক্তিহীনতার স্বাক্ষর তাঁরা রেখেছেন পদে পদে। কি বালখিল্য চপলতায়ই না 'গণতান্ত্রিক অধিকার' রক্ষার জন্য আহূত সংগ্রাম ঠিক অনুরূপ অধিকারটিই কেড়ে নিয়েছে অগণিত ছাত্রের কাছ হতে। সাধারণ বুদ্ধিতে স্বভাবতই মনে হয় লক্ষ্য যখন 'গণতান্ত্রিক', পন্থাটিও তখন হওয়া উচিত ছিল 'গণতান্ত্রিক'। "গণতন্ত্রে বিশ্বাস থাকলে একই সময়ে কেউ বৈপ্লবিক পন্থা অনুসরণ করে না। আর বৈপ্লবিক পন্থা অনুসরণের পর গণতন্ত্রের সুফল আশা করে না।"—অন্নদাশঙ্করবাবুর এই সুচিন্তিত মন্তব্য তো যুক্তিবাদী মাত্রেরই মনের কথা। কিন্তু বিলম্বিত শৈশবের লীলাচাপল্যে যুক্তির অস্তিত্ব আশা করবে কে? 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কুক্ষিগত' শিক্ষাব্যবস্থাকে উদ্ধার করতে এঁরা অবলীলায় স্মরণ নেন 'মাও সে-তুং—লাল সেলাম' ধ্বনির, নির্দ্বিধায় 'সাংস্কৃতিক বিপ্লবের' পাদপীঠ রচনা [illegible] বিজ্ঞানের শ্মশানভূমিতে। 'বিপ্লবের' গাম্ভীর্যে দীক্ষা আমাদের সার্থক হয়েছে—এই মোক্ষম ইয়ার্কিতেও হাসি আসে না। কিমাশ্চর্যমতঃপরম্।

অভিভাবকদের তথা বর্ষীয়ানদের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ স্বভাবতই মনে আসে। ঋষিবাক্য তো তাঁরা সবই ভুলেছেন, মনে রেখেছেন শুধু অপ্রিয়সত্যভাষণের জবরদস্ত নিষেধটি! সস্তা পিঠ চাপড়ানো মনোভাবের চেয়ে যুক্তিপূর্ণ সমালোচনাই তো কাম্য বলে মনে হয়। তবে এই মূঢ় অসঙ্গতির (কিংবা সুচিন্তিত চতুরালির?) প্রতিবাদ করতে দ্বিধা কোথায়? এঁরা 'ছাত্র' এবং 'ভাল ছাত্র' বলে? এই 'প্রিভিলেজ'-টি দূর হলে একটি সামাজিক উপকার হোতো। যতদূর মনে পড়ে অধ্যাপক হলডেন একটি পত্রে লিখেছিলেন অন্য যে কোনও ব্যক্তির মত ছাত্রদের কার্যকলাপের বিচারও একই মানদণ্ডে হওয়া উচিত। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? 'বনবিহারী মুখোপাধ্যায় বেঁচে থাকলে এবং সক্রিয় থাকলে হয়তো কিছু বলতেন। আর পারেন শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী। পারেন না কি এককলমী মশায় কিংবা বনফুল? শ্রীনিত্যপ্রিয় ঘোষও তো (সাহিত্য ও শিল্প প্রসঙ্গে) কিছু অপ্রিয়সত্যভাষণের বদভ্যাস দেখিয়েছেন। জানি না এই লেখা তাঁদের চোখে পড়বে কি না। আবেগ-সঞ্জাত ক্ষমাদৃষ্টির বদলে তীক্ষ্ণ, তীব্র, কঠোর ব্যঙ্গের অগ্নিস্ফরা কশাঘাতে হয়তো আমাদের আত্মবিস্মৃতি ঘুচত।

সুনন্দা দাশগুপ্ত, মৈত্রেয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়
(কলকাতা)

* * *

বিগত ৫ই জানুয়ারী তারিখের সাপ্তাহিক বসুমতীতে শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত মহাশয় লিখিত 'ছাত্র-বিক্ষোভ' প্রবন্ধটি পড়লাম। শ্রীদত্ত বিদ্বান ব্যক্তি, তারপর শিক্ষা বিভাগেরই একজন, কলেজের ইন্সপেক্টর ছিলেন। চল্লিশটি কলেজের জন্মদাতা। সাবডিভিসানে, সাবডিভিসানে, সুন্দরবনে এমন কি গাছতলায় কলেজের মঞ্জুরি দিয়েছেন। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটু কারচুপি করেও একদিনে দেড়শ' স্কুলের মঞ্জুর দিয়েছেন। এতগুলো বিদ্যায়তনের জন্মদাতা দেশের বিপুলসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জীবনধারণ ও পুষ্টি ব্যবস্থায় নিজের হাত না থাকলেও পরম পরিতুষ্ট।

শিক্ষকের বেতন আট-দশগুণ বেড়েছে, ফ্রি-স্টুডেন্টশিপ ও হাফফ্রী-স্টুডেন্টশিপের হার বেড়েছে। মেধাবৃত্তির ব্যবস্থা হয়েছে। স্কুল প্রতি সরকারী সাহায্য একশ' দেড়শ' থেকে হাজার টাকার ওপরে উঠেছে। বাংলায় শিক্ষাখাতে চার কোটির জায়গায় চল্লিশ কোটি টাকা ব্যয়িত হচ্ছে। (তবে একটু দুঃখের কথা দেশে যখন অর্থাভাব নেই—নাপিতে ট্রানজিস্টার হাতে করে ঘুরে বেড়ায়, চাষী আলের ওপর ট্রানজিস্টার রেখে জমি চষে—আমরা বিশ গুণ মূল্যে চালডাল কিনছি, তখন ছাত্রবেতন মাত্র দু-তিন গুণ বাড়লেই অভিভাবকের অপ্রসন্ন বদন। পরিতাপের কথাই বটে)। মোট কথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির জীবনধারণ বা অস্তিত্ব রক্ষার ব্যবস্থা সন্তোষজনক। পুষ্টির দিকটাও স্পষ্টতর—বিশ্ববিদ্যালয় একটির পরিবর্তে সাড়ে সাতটি, টেকনোলজি ও ইঞ্জিনীয়ারিং দুটি শাখার স্থলে বহু শাখায় পড়ান হচ্ছে। এখন কত বিষয়ে যে শিক্ষাব্যবস্থা হয়েছে, শ্রীদত্তও তার খোঁজ রাখেন না।

মাত্র আঠারো বছরে আমাদের এই অভাবনীয় উন্নতি দেখে বিদেশীগণ, এমন কি রাশিয়াও উচ্চ প্রশংসা করেছে, বিদেশীর প্রশস্তিবচন উদ্দেশ্যপ্রণোদিতই হয়ে থাকে। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তাদের প্রশংসাবাণী দত্ত মহাশয়ের মতে সৌজন্য ভাষণ নয়, একথা বিশ্বাস না করে উপায় নেই কেন না স্বয়ং শ্রীদত্ত যে এই উন্নয়নকর্মের একজন বিশিষ্ট কর্মী।

যদি আমাদের শাসকবর্গ চৈনিক বা রাশিয়ান পদ্ধতিতে জনসাধারণের মুখ থেকে টুঁ শব্দটি বের করা একদম বন্ধ করে দিতে পারতেন তাহলে আর আফশোসের কোন কারণ ছিল না। শ্রীদত্ত দেশের শিক্ষা উন্নয়নকর্মে নিজ কৃতিত্বে তাঁর জীবন সার্থক বলে মনে করতে পারতেন। কিন্তু কি বিড়ম্বনা, দিকে দিকে ছাত্রবিক্ষোভ, দিল্লীর প্রধানমন্ত্রী থেকে পল্লীর প্রধান শিক্ষকটি পর্যন্ত সবাই ছাত্রবিক্ষোভে শিরঃপীড়াগ্রস্ত হয়ে আর্তনাদ করছেন। তমলুক কলেজের প্রতিষ্ঠাতার মত একজন নিষ্ঠাবান শিক্ষাব্রতীকেও ছাত্র-বিক্ষোভে বিক্ষুব্ধচিত্তে নিজ প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হচ্ছে, শ্রীদত্তের এখন আর অনুশোচনার অন্ত নেই। স্কুল কলেজের মঞ্জুরি দেওয়াটা পাপকাজ জ্ঞানে নিজেকে অপরাধী জ্ঞান করছেন।

ছাত্র-বিক্ষোভ এমনি তীব্রভাবে তাঁর চিত্ত-বিক্ষোভ ঘটিয়েছে যে তিনি একেবারে দিশেহারা হয়ে যা যখন মনে উঠেছে একধার থেকে বলে গিয়েছেন।

চারধারে স্বার্থ নিয়ে কাড়াকাড়ি, মারামারি, দুর্নীতি ভণ্ডামীর ছড়াছড়ি—এই পরিবেশে ছাত্রসমাজের ভেতর অসংযম, ঔদ্ধত্য, উচ্ছৃঙ্খলতা ছাড়া অন্যকিছু আশা করা যায় না। পরিবেশের প্রভাব অনস্বীকার্য। ছাত্রগণের প্রতিকূল পরিবেশটিকে পরিস্ফুট করে তুলতে লেখক অনেক কিছুই বলেছেন।

মন্ত্রিগণ ছেলেদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে নেতৃত্ব লাভ করেছেন, অসহযোগ আন্দোলনের মত আধ্যাত্মিক—রাজনীতিসম্মত আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় নেতৃগণও কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানহীন দুর্দান্ত বিপ্লবীদের অনুকরণে সজ্জনকে শিহরিত করবার মত উক্তি করেছেন যে, "উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে অতি জঘন্য কাজও জঘন্য নহে, অতি পবিত্র বিষয়ও পবিত্র নহে।" শুধু কি এই। বিগত ষাট বছর ধরে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে যত উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়েছে কোন দেশীয় সংবাদপত্রেই তার একটিরও নিন্দা করা হয় নি, বরঞ্চ উস্কানি দেওয়া হয়েছে। তারপর জাপান, ইন্দোনেশিয়া ও আরও অনেক দেশের ছাত্রগণের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগদান করে অঘটন ঘটানোর দৃষ্টান্তও আমাদের ছেলেদের প্রভাবিত করছে।

এইসব পারিবেশিক প্ররোচনায় পরিপ্লুত উন্মার্গগামী পড়ুয়াদল বিদ্যালয়ে, পরীক্ষা মন্দিরে, সভাসমিতিতে—যত্রতত্র যেসব জঘন্য আচরণ করছে 'ছাত্র-বিক্ষোভ' প্রবন্ধে তার বিশদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ছেলেরা পড়ানো শুনানো হচ্ছে না বলে অভিযোগ জানাচ্ছে না বরং ফাঁকিবাজ মাস্টারকে পদচ্যুত করা হলে ধর্মঘট করছে। ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতার দৃষ্টান্তের কি আর অভাব আছে?

এইবার একটু জিজ্ঞাস্য আছে। পাকিস্তানের ছাত্রদল বলতে গেলে রাতারাতি দোর্দণ্ড প্রতাপ মুসলিম লীগকে ধরাশায়ী করেছিলেন। কালিজার খুন দিয়ে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা করেছেন। বাংলার ছেলেরাও যদি এখানে কংগ্রেস তথা হিন্দেল (হিন্দীওয়ালা = হিন্দীয়াল = হিন্দেল) পদলেহীদের শাসন নস্যাৎ করে দেয়, সর্বাত্মকভাবে হিন্দীবর্জন করে, তারপর সত্যিকারের মহাভারত রচনার অনমনীয় সংকল্প নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান প্রবর্তনের দাবি নিয়ে আন্দোলন শুরু করে দেয় তাহলে কি শ্রীদত্ত শিহরিয়া উঠিবেন?

স্বদেশী আন্দোলনে যোগদানে ছাত্রগণের উৎসাহদাতা ছিলেন স্বয়ং কবিগুরু। তিনি বলেছিলেন—"......ছাত্রেরা যে সকল সময় সকল বিষয়ে শিক্ষাগুরুদিগের অনুবর্তী হইয়া চলিবে তাহা সম্ভবপরও নয়, সমাজের পক্ষে স্বাস্থ্যকরও নহে,......ছাত্রেরা যদি বর্তমান আন্দোলনে যোগদান করিয়া থাকে তবে আনন্দেরই কথা।" (১৯০৫ ২৭শে অক্টোবর বক্তৃতা)। রাজনৈতিক আন্দোলনে ছেলেদের সক্রিয়ভাবে যোগদানের এই সুস্পষ্ট উস্কানি সম্পর্কেই বা শ্রীদত্ত কি বলেন? জবাবটা পেলে তাঁর প্রবন্ধটির মর্মগ্রহণ অনেকটা সহজসাধ্য হতো।

তবে এসব প্রশ্ন উত্থাপন বা মন্তব্যাদি প্রকাশ এখন থাক। কেন না প্রবন্ধটির উত্তরকাণ্ডে শিক্ষাসংস্কার সম্পর্কে শ্রীদত্তের সুপারিশ বা আকাশকুসুম রচনার বিষয়ে কিছুই বলা হয় নি, দু-একটা কথা বলা যাক।

বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্মদাতা প্রতিষ্ঠানগুলির সরকারী ভরণপোষণ ব্যবস্থায় পরিতুষ্ট হলেও, পরিচালন বা শিক্ষাদান ব্যবস্থার একেবারে হতাশায় ভেঙে পড়ে আমাদের প্রাচীন গুরু-পদ্ধতির গুণগান করেছেন, তবে সেটি পুনঃপ্রবর্তনের কথা বলেন নি, বর্তমান ব্যবস্থার সংস্কারে কতকগুলি প্রস্তাব করেছেন। সেগুলিকে জীর্ণ পর্ণকুটীরে শুয়ে শুয়ে মর্মর প্রাসাদ নির্মাণের পরিকল্পনা বলা চলে।

শিক্ষকদের টিউশানি বন্ধ করে দিয়ে তাঁদের ডেপুটি সাব-ডেপুটিদের স্কেলে বেতন দিতে হবে। ছেলেদের হোমটাস্ক্ দিতে হবে। তা সংশোধন করে দিতে অন্য লোক নিযুক্ত করতে হবে। সুব্যবস্থার সুদীর্ঘ ফিরিস্তি দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ধর্মঘটী ছাত্রের নাম কর্তন আর মাস্টারের নোকরি খতম করা চাই। স্বাস্থ্য-আনন্দ লাভার্থে ছাত্রদের গ্রামে গিয়ে রাস্তা নির্মাণ ও পুকুরের পঙ্কোদ্ধারাদি কার্যে হাত লাগাতে হবে, ঠাকুর-চাকর সমস্যার সমাধানে রন্ধনাদি কার্যে নৈপুণ্য লাভ করতে হবে। মাঝখানে হঠাৎ দেশের ঘুষ বন্ধ করার কথা মনে হওয়ায় সরকারী দপ্তরের করণিকগণ যাতে রোজকার ফাইল রোজ খালাস করেন সরকারকে এরূপ নির্দেশদানের সুপারিশ করা হয়েছে।

শ্রীদত্ত হয়ত অনেক কিছু আশা করেই অনেক কিছু বলেছেন কিন্তু সেই আশার সুস্পষ্ট রূপটি কি, আর কথাগুলি কার উদ্দেশে বলছেন তা হয়ত তিনি নিজেই জানেন না, দেশের বর্তমান আবহাওয়ায় ভগবানের চরণে প্রার্থনা জানান ছাড়া নাকি তিনি অন্য পথ দেখতে পাচ্ছেন না। তাই যদি, তবে শ্রীভগবানচন্দ্র সাপ্তাহিক বসুমতীর নিয়মিত গ্রাহক কিনা সেটা সুনিশ্চিতভাবে না জেনে এই প্রবন্ধ রচনার পণ্ডশ্রম কেন?

শ্রীদত্ত যে উঁচু মহলের এক গণ্যমান্য লোক সে পরিচয় প্রবন্ধের একাধিক স্থলে পাওয়া যায়। এহেন ব্যক্তির হৃদয়াবেগ উৎসারিত নানা দিক দিয়ে মূল্যবান এই প্রবন্ধটি নিয়ে লঘুভঙ্গির আলোচনা নিচু মহলের কোন অজ্ঞাত-অখ্যাত লোকের পক্ষে চরম ধৃষ্টতা—অমার্জনীয় অপরাধ। তবে এই অধম লেখক মার্জনা পাইবার কিঞ্চিৎ দাবি রাখে। প্রথমত আমি একজন পঁচাত্তুরে বুড়ো, বৃদ্ধের বাচালতা উপেক্ষণীয়। তারপরেও একটু কথা আছে, মাত্র ৫।৬ বছর আগে বই লিখতে প্রথম লেখনী ধারণ করি এই 'ছাত্রবিক্ষোভ' নিয়ে আলোচনা করতে। বইখানি একাধিক পত্র-পত্রিকায় প্রশংসিত হয়। 'সাময়িকী বসুমতী' দীর্ঘ আলোচনা করে বইখানিকে প্রত্যেক বাঙালীর অবশ্য পাঠ্য বলে মত প্রকাশ করেন। শ্রীদত্ত দয়া করে তাঁর ঠিকানাটি জানালে এই প্রথম লিখিত বইখানির এক কপি পাঠিয়ে দিতে পারি। তাহলে তিনি হয়ত বুঝবেন যে আমরা একই ভাবের ভাবুক, সুতরাং পরস্পর বন্ধুলোক। অবস্থা বিপাকে পড়ে বন্ধু যখন তাঁর মনের কথাটা স্পষ্ট করে বলতে পারেন না আবার চুপ করেও থাকতে পারেন না তখন তাঁর বন্ধু তাঁকে আক্রমণও করেন না, বিদ্রূপও করেন না; পরিহাসতরল কণ্ঠে অবচেতন মনে একটু খোঁচা দিয়ে সামান্য একটা মন্তব্য করতে পারেন, তাতে পরস্পরের ঘনিষ্ঠতা নষ্ট হয় না, হওয়া উচিতও নয়।

শ্রীদত্ত বর্তমানেও শিক্ষা বিভাগে কোন উচ্চপদ অধিকার করে আছেন বা সরকারী পেন্সন ভোগ করছেন জানি নে, তিনি যতদূর বলেছেন তার বেশি অগ্রসর হওয়া তাঁর পক্ষে হয়ত সম্ভব নয়। তবে তিনি অন্তরে অন্তরে অবশ্যই জানেন যে কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম হয়। তিনি যেসব শিক্ষালয়ের মঞ্জুরি দিয়েছেন তিনি তার জন্মদাতা নহেন। সুতরাং সেসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাব্যবস্থায় তাঁর সুপারিশ অরণ্যে রোদনমাত্র। শ্রীদত্ত এটাও জানেন বা সামান্য একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন যে যদি কেউ ভূতের বাসা ভেঙে দিয়ে দেশ-জোড়া অনাচার উচ্ছৃঙ্খলতার অবসান ঘটাতে চাহেন তাহলে তাঁকে উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রদলকেই সুশৃঙ্খল করে নিয়ে ঐ 'ছাত্র-বিক্ষোভ'-এর পথ ধরেই অগ্রসর হতে হবে। তাইতো ভূতেরা নানা ছলে নানাভাবে ছাত্রসমাজের রন্ধ্রগত হয়েছেন—সর্ষের ভেতর গিয়ে বসে আছেন। এখন তাড়াতে হলে উঁচু দরের সর্ষাসিদ্ধ ওঝা চাই।

জনৈক মাস্টারমশাই

৬৯।১ ডাক্তার লেন, কলি-১৪

বর্ণ-বৈষম্যনীতির অবসান চাই

বেসিল ডি ওলিভিয়েরা এখন এম, সি, সি-র এক বিরাট সমস্যা। দক্ষিণ আফ্রিকার এই কৃষ্ণকায় ক্রিকেট খেলোয়াড় বর্তমানে ইংলন্ডের নাগরিক এবং ইংলন্ড ক্রিকেট দলের অমূল্য সম্পদ। ১৯৬৮-৬৯ ক্রিকেট মরশুমে ইংলন্ড দলের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের কথা। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা এখন থেকেই গোঁ ধরেছে যে বেসিল ডি ওলিভিয়েরাকে ইংলন্ড টেস্ট দলে স্থান দিলে তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হবে। ওলিভিয়েরার অপরাধ! তাঁর গায়ের রং কালো, কৃষ্ণকায় তিনি।

বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে একমাত্র দুষ্টক্ষত হল এই দক্ষিণ আফ্রিকা। এখনও পর্যন্ত এই দেশটি খেলার মাঠে পর্যন্ত বর্ণ-বিদ্বেষের দূষিত আবহাওয়াকে টিকিয়ে রেখেছে। ফলে দক্ষিণ আফ্রিকা একঘরে এবং অপাংক্তেয়। একমাত্র ইংলন্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড ছাড়া অন্য কোন দেশ এদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলে না। শ্বেতকায় ছাড়া অন্য কারুর বড় খেলোয়াড় হবার অধিকার নেই বলেই দক্ষিণ আফ্রিকার মনোভাব।

খেলার জগতের চতুর্দিক আলো করে আছে কালোর দলই। ক্রিকেটে বিশ্বজয় করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, হকিতে ভারত, এ্যাথলেটিক্সে অলিম্পিকের আসরে কালোদেরই অখন্ড প্রতাপ। আর ফুটবলের মাঠে দুই কালো মাণিক হলো পেলে আর ইউসেবিও। আজ এই সভ্যতার এবং অগ্রগতির যুগে দক্ষিণ আফ্রিকার সেই মান্ধাতার আমল থেকে পোষণ করে রাখা মনোভাব দেখে সত্যই অত্যন্ত অবাক লাগে।

এম, সি, সি-র সেক্রেটারী মিঃ গ্রীফিথ অল্প কিছুদিন পূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে যান। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট পরিচালকরা আলোচনা প্রসঙ্গে জানান যে স্থানীয় সরকার বিদেশী দলে কালো খেলোয়াড় থাকলে তাঁদের সম্বন্ধে ততটা কঠোর মনোভাব গ্রহণ করবেন না। কিন্তু বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকার আন্তর্বিষয়ক মন্ত্রী মহাশয় যে কথা বলেছেন তা থেকে বেশ স্পষ্ট বোঝা গেছে যে ক্রীড়া পরিচালকরা সরকারের অনমনীয় মনোভাব সম্বন্ধে ততটা অবহিত নন। মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে বিশ্বের সব দেশই আমাদের নীতি সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল আছে, বেসিল ডি ওলিভিয়েরাকে ইংলন্ড ক্রিকেটদলে অন্তর্ভুক্ত করলে তাঁকে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। কারণ দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতকায় দল সাদা-কালোয় মিশ্রিত দলের সঙ্গে খেলতে প্রস্তুত নন।

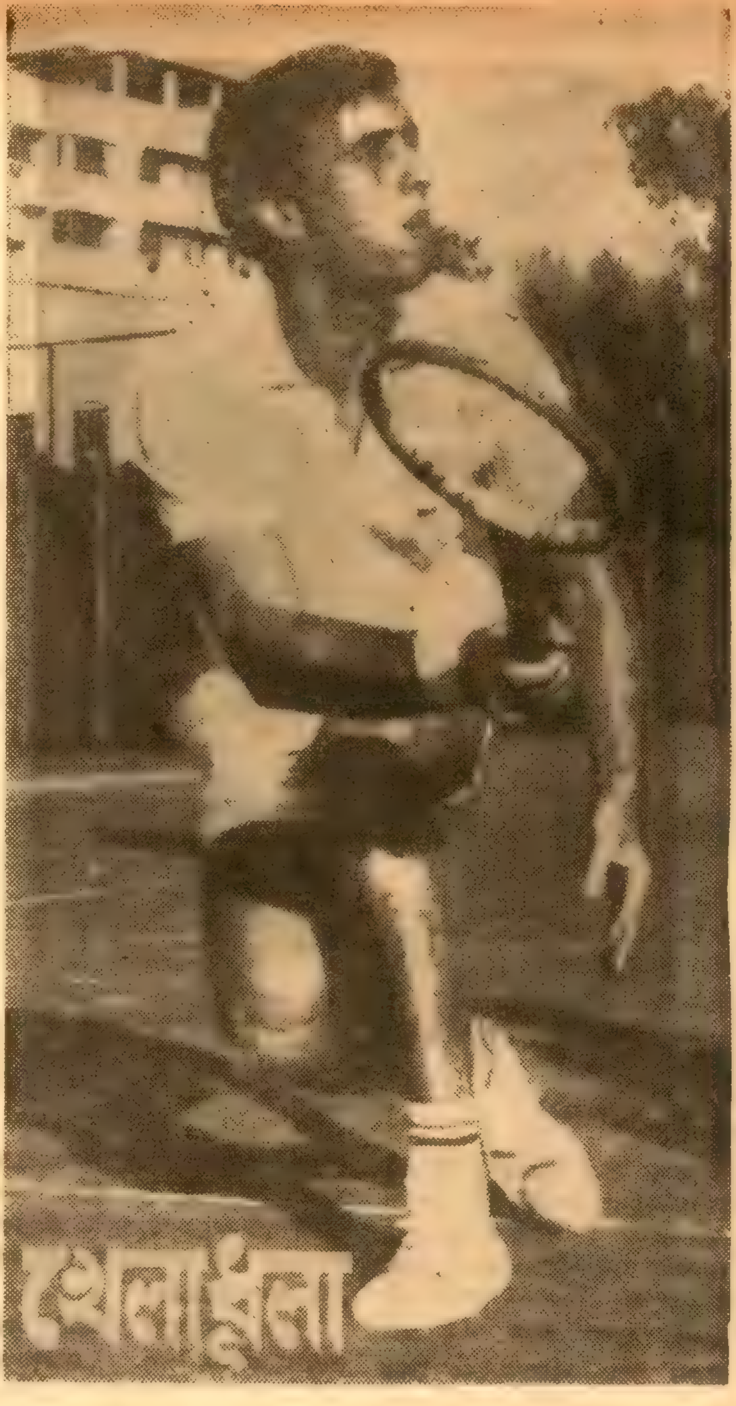

এশিয়ান টেনিস চ্যাম্পিয়ান আলেকজান্ডার মেত্রেভেলী

বত্রিশ বৎসর বয়স্ক খেলোয়াড় ওলিভিয়েরাকে যদি দক্ষিণ আফ্রিকার একগুয়েমীর জন্য এম, সি, সি টেস্টদল থেকে বাদ দেয় তবে ভবিষ্যতে অন্যদিক থেকে

শ্রীঅমিতাভ

জল আরও ঘোলা হবার সম্ভাবনা। অবশ্য আরও দুটো মরশুম সামনে আছে।

ইংলন্ডের খ্যাতনামা ক্রীড়া সাংবাদিক আয়ান উলরিজ লিখেছেন যে একমাত্র এম, সি, সি এই সমস্যা এড়াতে পারে যদি ইতিমধ্যে ওলিভিয়েরার খেলার মানের এমনই অবনতি হয় যাতে তিনি টেস্টদলে স্থান পাবার যোগ্যতা হারান। কিন্তু ওলিভিয়েরা সে জাতের ব্যাটসম্যান যে নন একথাও উলরিজ স্বীকার করেছেন। উলরিজের মতে এম, সি, সি বর্ণ-বৈষম্যনীতির জন্য আইনভঙ্গ না করলে দক্ষিণ আফ্রিকা সফর বাতিল না করে কোন উপায় নেই।

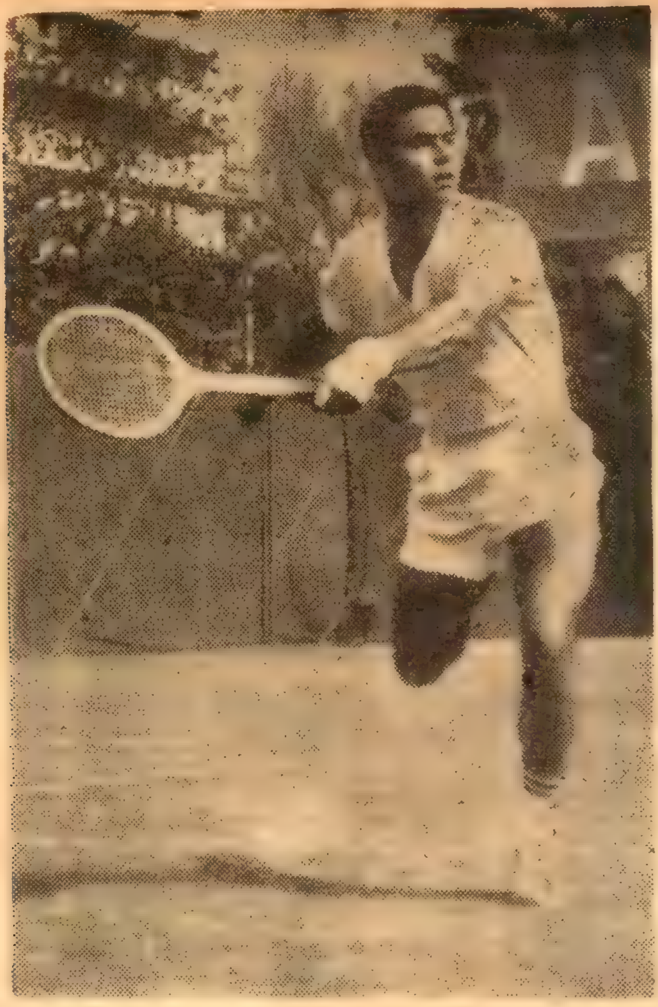

এল সাফ

ইংলণ্ডের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক রেভারেণ্ড ডেভিড শেফার্ড স্পষ্ট বলেছেন যে যদি বেসিল ডি ওলিভিয়েরার ওপর দক্ষিণ আফ্রিকা বাধা-নিষেধ আরোপ করে, তবে এম, সি, সি-র সে দেশে কোন ক্রিকেটদল পাঠান উচিত হবে না। রেভারেণ্ড শেফার্ড বলেছেন খেলা-ধূলার অঙ্গন থেকে রাজনীতিকে দূরে রাখার জন্য অনেক চেষ্টা করতে হয়েছে। কিন্তু যেহেতু একজন খেলোয়াড় কালো সেইজন্য তাঁকে দলে স্থান দেওয়া না হয়, তবে তা নোংরা রাজনীতির থেকে আরও মারাত্মক হবে।

রাশিয়ান খেলোয়াড়দের সাফল্য

উডবার্ন পার্কে শেষ হল এশিয়ান টেনিস প্রতিযোগিতা। এবারের আসরে বলতে গেলে রাশিয়ার খেলোয়াড়দেরই জয়জয়কার। পুরুষদের সিঙ্গলস, মহিলাদের সিঙ্গলস্ আর মিক্সড ডাবলসে বিজয়ীর সম্মান করায়ত্ত করেছে রাশিয়ানরা। সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের খেলোয়াড় এল সাফ শেষ পর্যন্ত বিজয়ীর সম্মান লাভ করতে পারেন নি বটে, কিন্তু কলকাতার ক্রীড়ামোদীদের মন জয় করতে তিনি সক্ষম হয়েছেন।

বাছাই তালিকার পয়লা নম্বর ভারতের ডেভিস কাপ খেলোয়াড় জয়দীপ মুখার্জী সেমি-ফাইন্যালে রাশিয়ার আলেকজাণ্ডার মেত্রেভেলীর কাছে পরাজিত হয়ে বিদায় নেবার ফলে ভারতের শেষ আশাও অন্তর্হিত হল। গতবারের এশিয়ান চ্যাম্পিয়ান জয়দীপ যেভাবে পরাজয়কে বরণ করেছেন তা সত্যই খুব দুঃখের। জয়দীপ উঁচু দরের টেনিস খেলোয়াড় বটে, কিন্তু তাঁর খেলার মানের কোন ঠিক নেই। মাঝে মাঝে টেনিস মাঠে জয়দীপ মুখার্জী অসম্ভবকে সম্ভব করেন, আবার কখনও কখনও জয়দীপের খেলা দেখে মনেই হয় না যে এই খেলোয়াড় ভারতকে ডেভিস কাপের খেলায় প্রতিনিধিত্ব করেন। একাগ্রতার বিরাট অভাব জয়দীপ মুখার্জীর খেলোয়াড়ী জীবনের একটি অন্যতম বড় দোষ। এ বছরই ব্রেজিলের বিপক্ষে ডেভিস কাপের খেলায় প্রথম দিন টমাস ককের বিপক্ষে সিঙ্গলসে জয়দীপের কি ম্রিয়মাণ, নিষ্প্রভ খেলা; কিন্তু দ্বিতীয় দিন ডাবলসে জয়দীপের অন্য রূপ, যেন টেনিসের একজন সুনিপুণ শিল্পী।

মেত্রেভেলীর বিপক্ষে জয়দীপ সার্ভিসের সময় চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বহু প্রথম সার্ভিস নষ্ট করেছেন এবং কয়েকবার ডাবলফল্টে পয়েন্টও হারিয়েছেন। জয়দীপের দুর্বল দ্বিতীয় সার্ভিস অনায়াসে খেলেছেন মেত্রেভেলী। অনেকগুলি সহজ ভলি নেটে লাগিয়েও জয়দীপ পয়েন্ট নষ্ট করেছেন। মেত্রেভেলী এমন কিছু উচ্চাঙ্গের খেলা দেখাতে পারেন নি বটে, কিন্তু জয়দীপের দুর্বলতা এবং ত্রুটির সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করেছিলেন। জয়দীপ-মেত্রেভেলীর খেলা প্রায় দু'ঘন্টা স্থায়ী হয় এবং ৬—৪, ৬—২, ৪—৬, ৬—৮, ৬—১, সেটে জয়দীপকে পরাজিত করে মেত্রেভেলী উপস্থিত হন ফাইন্যালে।

এল সাফ এবং টমাস ককের সেমি-ফাইন্যাল খেলাটি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে শেষ হয়। আড়াই ঘন্টার এই খেলায় কে শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে তা বলা খুবই মুস্কিল ছিল। উনিশ বছর বয়স্ক এই মিশরবাসী ন্যাটা টেনিস খেলোয়াড় সাফ কিন্তু ব্রেজিলের ন্যাটা খেলোয়াড় টমাস ককের সঙ্গে খেলার শুরুতে তেমন সুবিধে করে উঠতে পারছিলেন না। বয়সে তরুণ এল সাফির চেয়ে টমাস' ককের অভিজ্ঞতার পুঁজি অনেক বেশি। প্রথমে সুবিধে করতে না পারলেও এল সাফ কৃতিত্বের সঙ্গে প্রাথমিক বিপর্যয় থেকে উঠে এসে ধীরে ধীরে খেলার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন। এরপর সাফ দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে জয়ের পথে এগিয়ে গিয়েছেন। সাফ এবং ককের সোয়া দু-ঘণ্টার টেনিস দর্শকদের যথেষ্ট আনন্দ দেয়। এশিয়ান টেনিসের বাছাই তালিকার সাত নম্বর খেলোয়াড় এল সাফ সত্যই এবারের একটি উজ্জ্বল আবিষ্কার। এশিয়ান টেনিসের ফাইন্যালে উন্নীত হবার পথে সাফ পরাজিত করেছে জাতীয় টেনিস চ্যাম্পিয়ান প্রেমজিৎ লাল এবং সেমি-ফাইন্যালে টমাস ককের মত খেলোয়াড়কে। সাফ ৮—৬, ৭—৫, ৪—৬, ১—৬, ৯—৭ সেটে কককে শেষ পর্যন্ত পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস ফাইন্যালে বাছাই তালিকার সঙ্গে তাল রেখে ফাইন্যালে এক নম্বর এবং দু'নম্বর জুটি উন্নীত হন।

শেষ পর্যন্ত এক নম্বর রোজেলের ম্যান্ডারিনো-কক জুটি পরাজিত করেন দু' নম্বর ভারতের জয়দীপ-প্রেমজিৎ জুটিকে। ম্যান্ডারিনো-কক জুটি অনায়াসে ৬—৪, ৭—৫, ৮—৬ সেটে জয়ী হন।

তরুণ খেলোয়াড় এল সফির কাছ থেকে যে খেলা আশা করা গিয়েছিল পুরুষদের সিংগলস ফাইন্যালে সে খেলা দেখাতে তিনি ব্যর্থ হন। মাত্র ৬৫ মিনিটের মধ্যেই রাশিয়ার আলেকজান্ডার মেত্রেভেলী এশিয়ান টেনিস চ্যাম্পিয়ানের গৌরবমুকুট লাভ করেন। ফাইন্যাল খেলায় বলতে গেলে প্রথম থেকেই ছিল মেত্রেভেলীর প্রভাব। এল সফি মেত্রেভেলীর উচ্চাঙ্গের ক্রীড়াধারার বিপক্ষে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার পূর্বেই খেলার ভাগ্য নির্ধারিত হয়। মেত্রেভেলী স্ট্রেট সেটে ৬—৩, ৮—৬, ৬—৪ ফলাফলে জয়ী হন। ফাইন্যাল খেলা দেখে বেশ বোঝা গেল যে তরুণ এল সফির এখনও অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের প্রয়োজন আছে। বিপদের মুখে স্থিরভাবে নিজেকে দাঁড় করবার কলাকৌশল তাঁকে আয়ত্ত করতে হবে।

মহিলাদের সিংগলসে অল রাশিয়ান ফাইন্যালে মিসেস আবজানদেজ অনায়াসে পরাজিত করেন মিস আইভানোভাকে। মিস আইভানোভা বেশ আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে খেলেন বটে. কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় দোষ হল যে সটগুলি এলোমেলো হবার ফলে অনেক মূল্যবান পয়েন্ট নষ্ট করে নিজের পরাজয়ের পথ নিজেই তৈরি করে দেন তিনি।

মিক্সড ডাবলস ফাইন্যালে মেত্রেভেলী-আইভানোভা জুটি মাবরুক আলি-রীতা সুরাইয়া জুটিকে পরাজিত করেন। পরাজিত হলেও মাবরুক-সুরাইয়া জুটি যথেষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন. কিন্তু রাশিয়ান জুটি ছিল অনেক শক্তিশালী।

প্রতিযোগিতার শেষে ইস্টার্ন কম্যান্ডের সর্বাধিনায়ক লেঃ জেনারেল ম্যানেকশর সভাপতিত্বে. মিসেস ম্যানেকশ বিজয়ী খেলোয়াড়দের পুরস্কার বিতরণ করেন।

খেলোয়াড় সম্মানিত

এ বছর প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় খেতাব দ্বারা কয়েকজন খেলোয়াড় সম্মানিত হয়েছেন। সম্মানিত খেলোয়াড়েরা খেলা-ধূলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। সপ্তসিন্ধু বিজয়ী দূরপাল্লার সাঁতারু মিহির সেন এবং ভারতের শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণান লাভ করেছেন 'পদ্মভূষণ' এবং ভারতের ক্রিকেট অধিনায়ক পতৌদির নবাব লাভ করেছেন 'পদ্মশ্রী' খেতাব। অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান ভারতীয় হকি দলের দু'জন সদস্য পৃথ্বীপাল সিং এবং শঙ্কর লক্ষ্মণকেও 'পদ্মশ্রী' খেতাব দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় ফুটবল

সন্তোষ ট্রফির আসরে বাংলা দল প্রথম খেলায় ৫—১ গোলে রাজস্থানকে পরাজিত করে শুভযাত্রা সূচিত করেছে। জার্নেল সিংয়ের অনুপস্থিতিতে বাংলা দলের অধিনায়কত্ব করেন অরুময় নৈগম। বাংলা রাজস্থানের এই প্রাক্ সেমি-ফাইন্যাল খেলাটিতে বলতে গেলে বাংলারই একটানা একচ্ছত্র প্রাধান্য ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। বাংলা দল প্রথমার্ধে ৩—১ গোলে অগ্রগামী ছিল। বাংলা দলের পক্ষে গোল করেন অসীম মৌলিক দুটি, হাবিব দুটি এবং লতিফ একটি। খ্যাতনামা খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত বাংলা দল এদিন ৪—২—৪ পদ্ধতিতে খেলে। বাংলা দল মোট এগারোবার সন্তোষ ট্রফি লাভ করেছে এবং গতবার বাংলা রানার্সের সম্মান লাভ

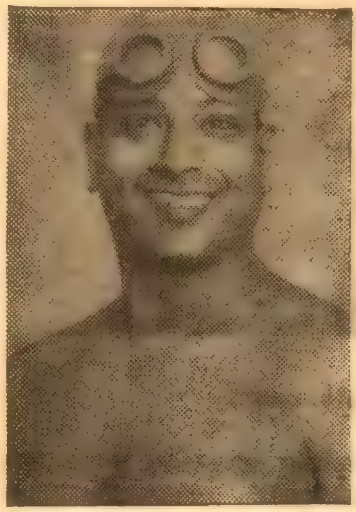

মিহির সেন

করে। বাংলার পরবর্তী প্রতিদ্বন্দ্বী হল মধ্যপ্রদেশ।

মহারাষ্ট্রকে ৩—০ গোলে পরাজিত করে ভারতীয় রেল দল জাতীয় ফুটবলের সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হয়েছে। রেল দলের পক্ষে প্রথম গোল করেন জানকীরাম এবং শেষ দুটি গোল করেন আপ্পালারাজু। মহারাষ্ট্র দল গোল পরিশোধ করার আপ্রাণ চেষ্টা করে কিন্তু অনুপ্রাণিত রেল দল সাফল্যের সঙ্গে আক্রমণ প্রতিহত করে পাল্টা আক্রমণের সাহায্যে গোলের সংখ্যা বৃদ্ধি করে জয়ের পথ সুগম করে।

মহীশূর দল ১—০ গোলে আসামকে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইন্যালে উন্নীত হয়েছে। উভয় দলের শক্তিই প্রায় সমান হওয়ায় খেলাটি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়। প্রথমার্ধে বরঞ্চ আসাম দল খেলার ওপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে মহীশূরের গোলে আক্রমণ চালায় বটে কিন্তু লক্ষ্যভেদ করতে আসামের ফরোয়ার্ডরা ব্যর্থ হন। দ্বিতীয়ার্ধের নয় মিনিটের সময় মহীশূর দলের রাইট হাফ জোরালো হাফ ভলির সাহায্যে বিজয়-সূচক গোলটি করেন।

সার্ভিসেস দলও পাঞ্জাবকে অনায়াসে ৫—০ গোলে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইন্যালে প্রবেশ করে। খেলার সুরুতে প্রথম মিনিটে সার্ভিসেসের প্রথম গোল করেন রণজিৎ। পরবর্তী পঞ্চাশ মিনিট কিন্তু সার্ভিসেস অনেক চেষ্টা করেও কোন গোল করতে পারে না। তবে শেষ উনিশ মিনিট সময়ে সার্ভিসেস চারটি গোল দেয়। রণজিৎ করেন তিনটি গোল, ভূপিন্দার সিং রাওরাও এবং বীরবাহাদুর একটি করে গোল করেন।

ফুটবলের মাঠে একটি যুগ

আন্তর্জাতিক ফুটবলের আসর থেকে বিদায় গ্রহণ নিয়েছেন প্রদীপ ব্যানার্জী। চুনী বিদায় নিয়েছেন আগেই এবার নিলেন প্রদীপ। কিন্তু এ'দের স্থান পূরণের মত যোগ্য খেলোয়াড় আমাদের দেশে এখনও তৈরি হয় নি।

জামসেদপুরের সেই ছোট্ট ছেলে প্রদীপ হঠাৎ বড় হন নি—তিলে তিলে অনেক বিপদসঙ্কুল বন্ধুর পথ অতিক্রম করে তাঁকে উঠতে হয়েছে। খেলোয়াড় হবার জন্যই পি, কের জন্ম তাই শত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়েও প্রদীপ ব্যানার্জী তাঁর চরম লক্ষ্যে উপনীত হতে সক্ষম হয়েছেন। ভারতীয় ফুটবল প্রদীপের ক্রীড়াশৈলীর প্রদীপ্ত শিখায় উদ্ভাসিত হয়েছে।

মাত্র তিরিশ বছর বয়সেই আন্তর্জাতিক ফুটবলের আসর থেকে প্রদীপ ব্যানার্জী বিদায় নেবেন এ কথা অনেকেই চিন্তা করতে পারেন নি। গত ফুটবলের মরশুমেও প্রদীপ ব্যানার্জীর খেলা দেখেছি, তাঁর খেলা দেখে মনে হয় নি এত তাড়াতাড়ি তিনি বড় খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করবেন। ১৯৬৬ সালের লীগে ইস্টবেঙ্গল-ইস্টার্ন রেলের খেলার কথা এখনও স্পষ্ট মনে আছে। সুযোগসন্ধানী প্রদীপ ব্যানার্জী সেদিন থঙ্গরাজকে পরাজিত করে জালের বুকে বল জড়িয়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অপরাজিত আখ্যা ক্ষুন্ন করেছিলেন। প্রদীপের ভাল খেলার নজীর অগুন্তি।

১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ বারো বছর প্রদীপ ব্যানার্জী ভারতের পক্ষে খেলেছেন।

স্ত্রী এবং কন্যাসহ প্রদীপ ব্যানার্জী

আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা সুরু করেছিলেন প্রদীপ মাত্র ঊনিশ বছর বয়সে, ইতিপূর্বে কোন ভারতীয় খেলোয়াড় এত অল্প বয়সে আন্তর্জাতিক খেলায় অংশগ্রহণ করেন নি। ঢাকায় অনুষ্ঠিত চতুর্দলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় সিংহলের বিপক্ষে খেলাটি প্রদীপের জীবনের প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ। ভারতীয় ফুটবল দলে প্রদীপ ব্যানার্জী যে কি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করেছিলেন—এই দীর্ঘদিন তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর গোল দেবার খতিয়ান দেখে। আজ পর্যন্ত প্রায় ৮৪টি সরকারী এবং বেসরকারী আন্তর্জাতিক খেলায় তিনি ভারতের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং গোল দিয়েছেন মোট ৯টি।

প্রদীপ ব্যানার্জী ১৯৫৬ সালের মেলবোর্ন অলিম্পিক এবং ১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিক ঘুরে আসেন। বিশেষত ১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিক প্রদীপের জীবনের স্মরণীয় বছর। কারণ রোম অলিম্পিকে ভারতীয় ফুটবল দলের নেতৃত্বের ভার অর্পিত হয় তাঁর ওপর। প্রদীপের নেতৃত্বে ভারতীয় দল রোমের মাঠে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে। অবশ্য স্বর্গত ফুটবল শিক্ষক রহিমের অমূল্য অবদানের কথা প্রদীপ ব্যানার্জী সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেন। ভারত রোমে হাঙ্গেরীর সঙ্গে সমান পাল্লা দিয়ে ওই দুর্ধর্ষ দলের বিপক্ষে মাত্র ২—১ গোলে পরাজিত হয়, ফ্রান্সের সঙ্গে ১—১ গোলে খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করে এবং শেষ খেলায় পেরুর কাছে ভারত ৩—১ গোলে পরাজিত হয়। অথচ সেবার হাঙ্গেরী পেরুকে পরাজিত করেছিল ৭—১ গোলে এবং ফ্রান্সকে ৬—০ গোলে।

খুবই দুঃখের বিষয় যে প্রদীপের মত অমূল্য রত্নকে কলকাতার ভারতবিখ্যাত দু'টি দল প্রথম দর্শনে চিনতে পারে নি। একটি দল তো প্রদীপকে ডেকে এনে আশ্বাসবাণী শুনিয়ে শেষ মুহূর্তে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। অচেনা এই কলকাতার মাটিতে সহায় সম্বলহীন নিরুপায় এই কিশোর প্রচণ্ড আঘাত পেলেও ভেঙে পড়েন নি, আঘাতের মাঝে নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। ১৯৫৪ সালে এরিয়ান্স ক্লাবে এক বছর খেলার পর প্রদীপ ব্যানার্জী পরের বছর যোগদান করেন ইস্টার্ন রেলওয়ে ক্লাবে। এই সময় তিনি ইস্টার্ন রেলে চাকুরীতে যোগদান করেন।

১৯৫৩ সালে সন্তোষ ট্রফির খেলার কথা যাঁদের মনে আছে, তাঁরা নিশ্চয়ই বিহারের সেই ষোল বছরের ছেলেটির কথা খুব ভাল করেই মনে রেখেছেন। সেবার কলকাতার মাঠেই সন্তোষ ট্রফির খেলা অনুষ্ঠিত হয়। বিহার-বাংলার খেলা তৃতীয় দিন পর্যন্ত গড়িয়েছিল। বাংলা দলে তখন ভারতবিখ্যাত খেলোয়াড়দের সমাবেশ। প্রথমদিন খেলায় বাংলা এক গোলে এগিয়ে আছে, ঠিক শেষ মিনিটে বিহার দলের সেই কিশোর প্রদীপ হাফ লাইন থেকে বল নিয়ে ভরম্বাজকে পরাজিত করলেন। দ্বিতীয় দিন খেলা আবার ড্র, তৃতীয় দিনে বাংলা কোনক্রমে ২—১ গোলে জয়ী হল।

ফুটবলের মাঠের সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাঁরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে প্রদীপ ব্যানার্জী একজন পরিণত এবং জাত ফুটবলার। সুগঠিত দেহী প্রদীপ বিপক্ষের রক্ষণভাগের বিভীষিকা। ড্রিবলিং তাঁর চমৎকার, পাশগুলি নিখুঁত আর গতিবেগ অদ্ভুত ক্ষিপ্র, দু' পায়ে আছে প্রচণ্ড সট।

প্রদীপ ব্যানার্জী ভারতের পক্ষে শেষ আন্তর্জাতিক খেলায় অংশ গ্রহণ করেন ব্যাংককের এশিয়ান গেমসের আসরে

—সুদর্শন

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট্স্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের

ম হা ভা র ত

প্রথম খণ্ড বোর্ড বাঁধাই (যন্ত্রস্থ) : মূল্য—বার টাকা
দ্বিতীয় খণ্ড „ „ : মূল্য—দশ টাকা
তৃতীয় খণ্ড „ „ : মূল্য—দশ টাকা

চতুর্থ খণ্ড : মূল্য—ছয় টাকা

পঞ্চম খণ্ড : মূল্য—(বোর্ড বাঁধাই) আট টাকা

অন্ন-সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা

চাকরীর উমেদারী না করিয়া বিজ্ঞানবলে বলীয়ান হউন

বাণিজ্যে লক্ষ্মী লাভ

করিয়া সৌভাগ্যবান হউন

হাজার জিনিষ

সহস্র পণ্য প্রস্তুত করিবার সহজ ও সরল উপায়

প্রতি ভাগ এক টাকা

—প্রথম ভাগে আছে—

রন্ধন-প্রক্রিয়া ১৫৬ রকমের। ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ ৩৪১ প্রকারের। চমকপ্রদ যাদু-বিজ্ঞান ৮৫ প্রকারের। মনোহারী আতসবাজী ৪১ প্রকারের—এতদ্ভিন্ন

বস্ত্ররঞ্জন—ধাতুরঞ্জন
কাষ্ঠরঞ্জন—ধাতুশিল্প
পেন্ট ও বার্ণিশ—প্রভৃতির
ব্যবহারিক উপদেশ সহ বিস্তৃত ব্যবহারিক প্রস্তুতপ্রণালী।

—দ্বিতীয় ভাগে আছে—

প্রসাধন সুরভি ১৩২ রকমের; বিস্তৃত সাবান প্রস্তুত প্রণালী; সিরাপ প্রস্তুত প্রণালী; মোমবাতী প্রস্তুত প্রণালী; ফলপ্রদ গৃহ-চিকিৎসা—হেকিমী ও হোমিওপ্যাথি; মন্ত্র-তন্ত্র; ভাগ্যফল; বুননির প্যাটার্ণ।

সংসারযাত্রার যে কিছু, যত কিছু, যাহা কিছু আবশ্যক তাহা শিখিবার ও শিখাইবার একমাত্র পুস্তক।

জনসাধারণের বর্তমান অসচ্ছলতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নামমাত্র মূল্য নির্ধারিত।

শ্রীঅরবিন্দের

ANANDAMATH

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অমর আনন্দমঠের অমর ইংরাজী অনুবাদ

o আনন্দমঠে—স্বাধীনতার সক্রিয় সংগ্রামের পূর্বাভাস
o আনন্দমঠে—'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের পূত-প্রকাশ।
o আনন্দমঠে—ঋষি বঙ্কিম ও ঋষি অরবিন্দের আদর্শ সমন্বয়

আনন্দমঠের এই মহামন্ত্রের অর্ধশতাব্দীর সাধনে ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত

ভারতের প্রতি গৃহে এই পবিত্র গ্রন্থ শোভা পাউক

মূল্য—তিন টাকা

গীতিনাট্য-সম্রাট

পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের

ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী

৪র্থ ভাগে—রত্নাবতী, নারায়ণী, দুর্গা, ফুলশয্যা, আলাদিন, জয়শ্রী, ফুলী।

৫ম ভাগে—আলিবাবা, রামানুজ, বাদশাজাদি, পুনরাগমন, বৃন্দাবনবিলাস, রূপের ডালি।

৬ষ্ঠ ভাগে—আলমগীর, অশোক, চাঁদবিবি, বাসন্তী, কুলভঙ্গ, খাঁজাহান, বিরাটকুঞ্জ, রাধাকৃষ্ণ।

৭ম ভাগে—রঘুবীর, জুলিয়া, বেদৌরা, কুমারী, বহ্নিশিখা, কবিকাননিকা, রত্নেশ্বরের মন্দিরে।

৮ম ভাগে—আহেরিয়া, উলুপী, দৌলতে দুনিয়া, নিয়তি, প্রেমাঞ্জলি, মন্দাকিনী, গৃহমধ্যে, পতিতার সিদ্ধি, ধ্রুব। মূল্য প্রতি খণ্ড ২৷৷০ টাকা।

ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বেকার, চাকুরীপ্রার্থী ও শিক্ষানুরাগীদের ভাষা শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য একমাত্র গ্রন্থ

॥ বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সহায়ক ॥

* * স্বল্পশ্রমে পর্যাপ্ত ফল অবশ্যম্ভাবী *

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

রা জ ভা ষা

(ইংরাজী ভাষা সহজে শিক্ষার অদ্বিতীয় সাহায্য গ্রন্থ)

এক আধারে : ভাষা - ব্যাকরণ - শব্দার্থ

ইংরাজী হইতে বাঙলা—(বোর্ড বাঁধাই) ৩·৫০
ইংরাজী হইতে উর্দু—৩·০০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

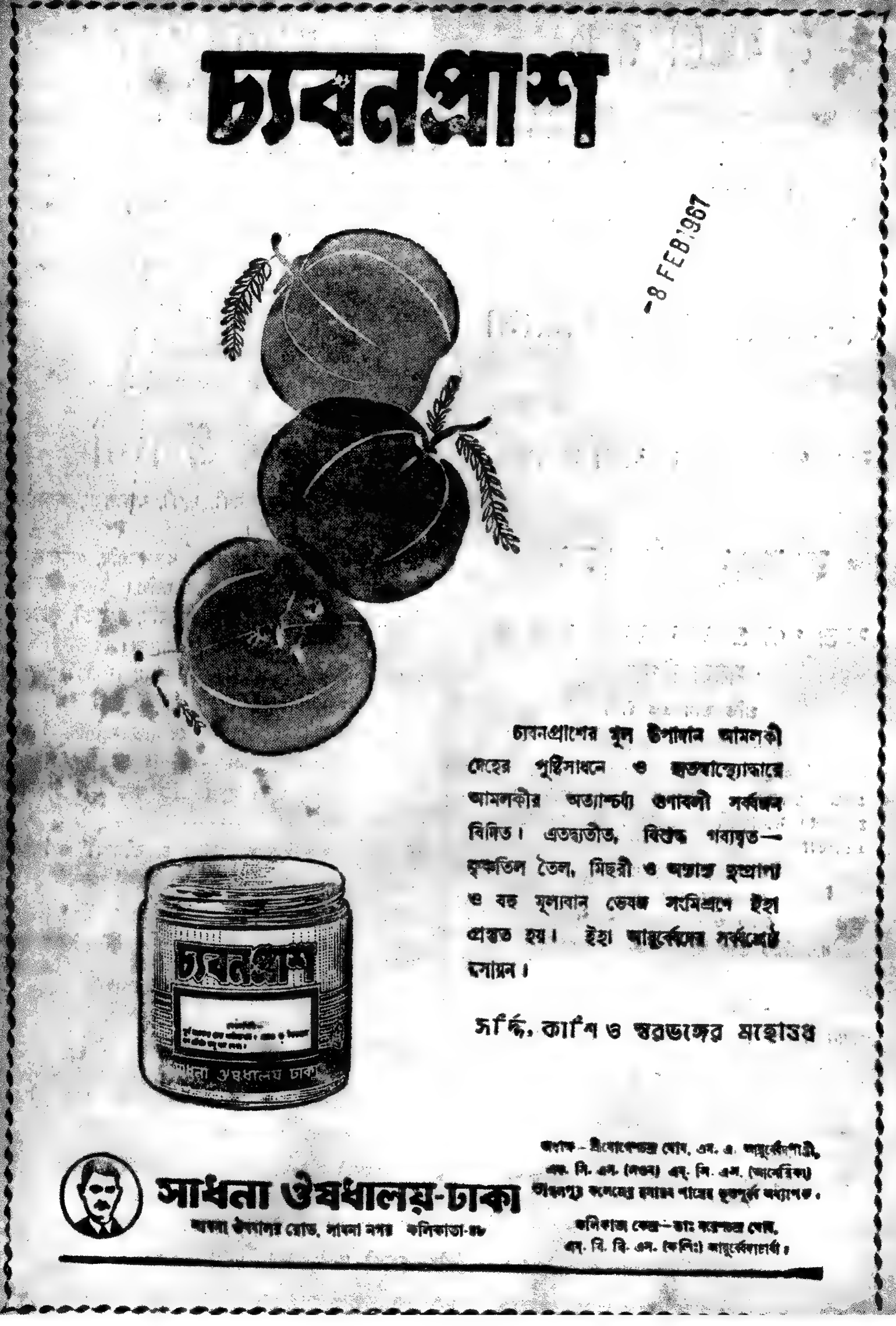
চ্যবনপ্রাশ
চ্যবনপ্রাশের মূল উপাদান আমলকী
দেহের পুষ্টিসাধনে ও হৃতস্বাস্থ্যোদ্ধারে
আমলকীর অত্যাশ্চর্য্য গুণাবলী সর্বজন
বিদিত। এতদ্ব্যতীত, বিশুদ্ধ গব্যঘৃত—
কৃষ্ণতিল তৈল, মিছরী ও অন্যান্য সুপ্রাপ্য
ও বহু মূল্যবান ভেষজ সংমিশ্রণে ইহা
প্রস্তুত হয়। ইহা আয়ুর্বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ
রসায়ন।
সর্দ্দি, কাশি ও স্বরভঙ্গের মহৌষধ
চ্যবনপ্রাশ
সাধনা ঔষধালয় ঢাকা
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর কলিকাতা-৪৮
অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ. আয়ুর্বেদশাস্ত্রী,
এফ. সি. এস. (লণ্ডন) এম্. সি. এস. (আমেরিকা)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।
কলিকাতা কেন্দ্র—ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম. বি. বি. এস. (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য।

8 FEB 1967

বসুমতী

ভোটযুদ্ধে পোস্টারের ছড়াছড়ি

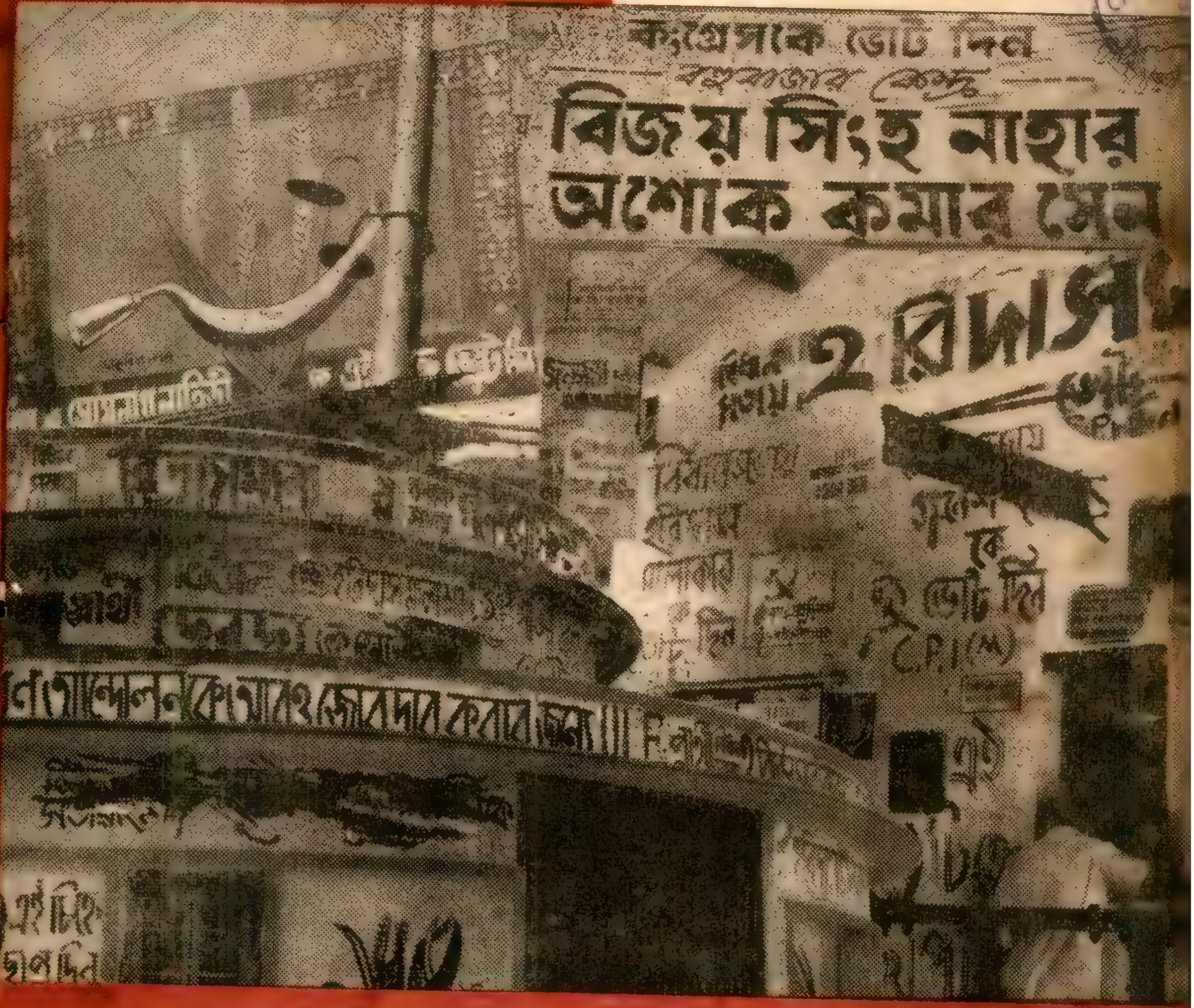

বর্ষঃ ৩৫শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৬শে মাঘ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ • : • • : • 9th Feb., 1967 * vol. 71, No.

বোরোলীন

সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	২১৭৯
আজকের মানুষ	...	২১৮০
ভারতদর্শন	...	২১৮১
আন্তর্জাতিক	...	২১৮৫
অব্ত ..	চন্দ্রগুপ্ত	২১৮৮
প্রত্যাশার মৃত্যু ও দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা	কৃত্তিবাস ওঝা	২১৮৯
বিপ্লব প্রচেষ্টার একটি বিস্মৃত অধ্যায়	সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	২১৯২
খেলা (কবিতা)	সুদীপা ভাদুড়ী	২১৯৪
প্রত্যয় (কবিতা)	জীবন দত্ত	২১৯৪
বিজ্ঞান-বিচিত্রা—রমণের জিজ্ঞাসা	বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	২১৯৬
চাতক (গল্প)	দুলাল পাল	২১৯৯
'বাঁশরী ও রণতূর্য' এর কবি নজরুলঃ একটি সোভিয়েত মূল্যায়ন (প্রবন্ধ)	ই, বোরোভিক	২২০২
গ্রন্থমেলা	...	২২০৩
বঙ্গদর্শন	...	২২০৫
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	অনন্ত সিংহ	২২০৯

সাহিত্য-সম্রাট—বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের ঋষি

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

—উপন্যাস—

প্রথম খণ্ড ঃ—রাজসিংহ, বিষবৃক্ষ, যুগলাঙ্গুরীয়, মৃণালিনী, রজনী। [সচিত্র] মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ—দুর্গেশনন্দিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, ইন্দিরা, রাধারাণী, সীতারাম। মূল্য—তিন টাকা

তৃতীয় খণ্ডঃ—আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা, দেবী চৌধুরাণী। [সচিত্র] মূল্য—৩, টাকা।

—সাহিত্য—

প্রথম খণ্ড ঃ—কৃষ্ণচরিত্র, লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ (১ম)। মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ—(১ম ভাগ অনুশীলন), মুচিরাম গুড়, বিবিধ প্রবন্ধ (২য়), বিজ্ঞান রহস্য। মূল্য—তিন টাকা

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগ ঃ—মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, পদ্মাবতী নাটক, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা? (বোর্ড বাঁধাই)—সাড়ে চার টাকা।

দ্বিতীয় ভাগ ঃ—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্মিষ্ঠা নাটক, তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য, মায়া কানন, হেক্টর বধ। (বোর্ড বাধাই) সাড়ে তিন টাকা

ডঃ মতিলাল দাশ প্রণীত

মতিলাল গ্রন্থাবলী

মূল্য—দুই টাকা

—ইহাতে আছে—

১। চলার পথে (উপন্যাস)
২। মনীষা (উপন্যাস)
৩। বিদ্যুৎশিখা (১১ খানি গল্প সমষ্টি)
৪। দীপশিখা (কবিতা সঙ্কলন)
৫। চার্বাক (নাটক)

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সুবর্ণলতা (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— আশাপূর্ণা দেবী	২২১৪
ইতিহাস (কবিতা)	— মালবিকা ঘোষ	২২১৬
প্রতিকৃতি (কবিতা)	— জয়ন্ত সাহা	২২১৬
বিশ্বসাহিত্যের আদিপর্ব	— ডঃ নরেন ভট্টাচার্য	২২১৭
"হাতে রাখি হাত" (কবিতা)	— তারক দত্ত	২২২১
চোমংলামা'র চোখে উত্তরবঙ্গ		২২২২
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	— শিলালি	২২২৫
রঙ্গজগৎ	—	২২৩০
পাঠকমন		২২৩৪
খেলাধূলা	— শ্রীঅমিতাভ	২২৩৬
ক্রিকেট নয়	— শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়	২২৩৯

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল এম, এস, সি প্রণীত

আমার দেখা মেয়েরা

(রহস্য রোমাঞ্চের স্বর্ণখনি)

'রক্তনদীর ধারা', 'অপরাধ বিজ্ঞান' ও 'বিখ্যাত বিচার কাহিনী' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলির লেখকের সত্যঘটনামূলক রূপদান। মেয়েদের মন আর 'স্ত্রীয়াশ্চরিত্রং দেবাঃ ন জানন্তি।' বিভিন্ন ও বিচিত্র নারী-চরিত্রের রহস্য উদ্ঘাটন ও যথাযথ অভিজ্ঞ ও দক্ষ লেখকের রচনার বৈশিষ্ট্যে বাংলা দেশের নারী-সমাজের এক অজানা অংশ সাধারণের চোখে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে। পড়তে পড়তে বই শেষ না করে ওঠা যায় না। বইয়ের আদ্যোপান্ত রুদ্ধশ্বাস উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা। উপন্যাসের চেয়েও সুখপাঠ্য।

মূল্য চার টাকা

পৃথিবীর তরুণ-সমাজের হৃদয়জয়ী

স্যার ওয়াল্টার স্কটের গ্রন্থাবলী

দ্বিতীয় ভাগ

শরৎচন্দ্র মিত্র অনূদিত

আইভ্যানহো, হাইল্যাণ্ড উইডো, ফেয়ার মেড অফ পার্থ, সার্জনস্ ডটার

মূল্য—৩·০০

তৃতীয় ভাগ

সরোজনাথ ঘোষ অনূদিত

দ্য ব্রাইড অব ল্যামারমুর, লিজেণ্ডস অব মনট্রোজ, দি এ্যান্টিকোয়ারি

মূল্য ৩৸৹ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত

প্রাচীন ভক্তদের রচিত সুললিত বাংলা পয়ারে

মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র

এই সুবৃহৎ গ্রন্থে আছে—শ্রীল সনাতন গোস্বামীর 'ভাগবতামৃত' গ্রন্থের কবিচন্দ্রের বঙ্গানুবাদ এবং শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়তম ভাগবতাচার্য্য রঘুনাথ পণ্ডিতের প্রেমতরঙ্গিণী।

ইহাতে আছে দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভাগবতামৃতের অনুবাদ

কবিচন্দ্রের

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত

এবং

ভাগবতাচার্যের বিশ্বপ্রসিদ্ধ

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী

সমগ্র ভারতে প্রথম বঙ্গানুবাদ

"...শুনিয়া তাহার ভক্তিযোগের পঠন।
আবিষ্ট হইল গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥"

ইহা কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারতের ন্যায় বাংলার প্রতি গৃহস্থের অবশ্যপাঠ্য হউক, এই নিবেদন। এই মূল্যবান গ্রন্থ বাংলার প্রতি ঘরে প্রতিষ্ঠিত করুক।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

৭১ বর্ষ : ৩৫শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ২৬শে মাঘ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ
বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা
Price : 25 Paise
Thursday, 9th February, 196

নির্বাচনী লড়াই

নির্বাচনী আসরে অনেক সময় যে সব ঘটনা ঘটছে তা রীতিমতো লজ্জাকর। নির্বাচনী আসরে পারস্পরিক বিপক্ষদলগুলির মধ্যে কেউ দ্বন্দ্বযুদ্ধ কামনা করে না। ঐ সব সভায় শ্রোতারা যায় দলের নেতাদের কাছ থেকে সেই দলের কার্যক্রম অবগত হবার জন্যে। হঠাৎ যদি দেখা যায় যে, সভামণ্ডপে ইট পাটকেল বর্ষিত হচ্ছে—তাহলে শ্রোতারাই বা কোন ধারণা নিয়ে ভোট দেবার জন্যে প্রস্তুত হবেন? এবার এমনিতেই তো সাধারণ মানুষের কাছে নির্বাচনে ভোটদানের খুব একটা তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। এর পর যদি এই অবস্থা হয় যে, বিপক্ষদলগুলি নির্বাচনী রঙ্গমঞ্চকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করবেন—তাহলে ভোট দেবার আগে ভোটদাতাদের হয়তো অনেক কথাই ভাবতে হবে। সাধারণ নির্বাচনের সুযোগ প্রতি পাঁচ বছর অন্তর একবার আসে। এই সুযোগেও বিবদমান দলগুলি যদি পরস্পর খেয়োখেয়ির জন্যে সাধারণ মানুষকে বিপথে চালিত করে এবং সেই সুযোগ যদি কায়েমী স্বার্থের পথ পরিষ্কার করে দেয়—তাহলে একথা আমরা বলতে বাধ্য যে ভারতের গণতন্ত্রের বনিয়াদ একদিন চোখের সামনেই ধসে পড়বে।

নির্বাচনের জন্যে যে সব দল প্রস্তুত তারা নিশ্চয়ই কেউ গণতন্ত্রে অবিশ্বাসী নয়। তাছাড়া তারা এমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, নির্বাচন উপলক্ষে যাবতীয় বিধিবিধান মেনে চলবে। অবশ্য এই ভদ্রলোকের চুক্তি বহু ক্ষেত্রেই ধোপে টেকে নি। তবে আমেদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রে এমন ঘটনা ঘটেছে তা শুধু সুসংবাদই নয়, রীতিমতো চমকপ্রদ। সেখানে দেখা গেছে যে একটি আসনের জন্যে বিভিন্ন দলের সাতজন প্রার্থী একই সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা পরস্পর কেউ কাদা ছোড়াছুড়ি করেন নি। তাঁরা শ্রোতাদের কাছে জানিয়েছেন নিজেদের দলের অতীত কার্যাবলী এবং আগামী পাঁচ বছরে তাঁরা যা করতে পারবেন—তার বিশদ কার্যক্রম।

এই ধরণের নির্বাচনীসভা সর্বত্র কল্পনাই করা যায় না। প্রথম কারণ দলগুলির মধ্যে যেখানে পরস্পর মুখ দেখাদেখি বন্ধ সেখানে দেখা হলেই যে হাতাহাতি হবার উপক্রম হবে। এবার নির্বাচনকে উপলক্ষ করে নায়কোচিত গোলাগুলীও কেউ চালিয়েছেন, আহতও হয়েছেন—এ খবর এখন পুরনো হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন এই, গণতন্ত্র-বিধিসম্মত নির্বাচনকে যাঁরা মনে প্রাণে মেনে নিয়েছেন—তাঁরা আকস্মিক জেহাদ সৃষ্টি করছেন কেন? পরস্পর গালাগালি, চরিত্রহনন, মারামারিকে কেউ বিপ্লব বলবে না। আর ঐ সব দুর্মুখো নীতির ধারকদের ভোটও কেউ দিতে চাইবে না।

সেই কারণে আমরা মনে করি, নির্বাচনে অবতীর্ণ নেতাদের ... নির্বাচকমণ্ডলীর সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। অবশ্য অনেক সময় দেখা যায়, বাবু যতো রলে, পরিষদ দলে বলে তার শতগুণ। অর্থাৎ আসল নেতাদের চেয়ে ক্ষুদে নেতারাই খিস্তি-খেউড়ে সবচেয়ে বেশি আসর মাৎ করতে উদগ্রীব। এসব স্থলে স্ব স্ব দলের নেতারা এগিয়ে এসে যদি বিপক্ষদলের নেতাদের চরিত্রহনন ও গালাগালি করতে বাধা বা উপদেশ দান করেন—তাহলে তা থেকে শুভ ফল কিছু ঘটতে পারে।

সত্যি কথা বলতে কি, জনসাধারণ এখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ভোটদানের গরজ তাদের মধ্যে বড় একটা লক্ষ্য করা না গেলেও দেশের দুরবস্থা সম্বন্ধে তারা পূর্ণ সজাগ। ট্রামে বাসে অলিতে গলিতে কান পাতলেই শোনা যায় তাদের বর্তমান মনের কথা। আর এই অবস্থায় কি না রাজনীতি করার জন্যে দলগুলি পরস্পর লড়াই সুরু করেছে।

মোট কথা জনসাধারণ আজ বিভ্রান্ত, আর ভ্রান্ত বুদ্ধিতে এগিয়ে চলেছে অধিকাংশ রাজনৈতিক দল। রাজনীতির পথ বড়ই কঠিন এবং সচেতন বা নিরক্ষর জনসাধারণের কাছে রাজনৈতিক দলগুলির দায় ও দায়িত্ব কোনো অংশে নগণ্য নয়—এই সুবুদ্ধির উদয় কি কোনোদিনই হবে না?

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

মার্কিন আর রুশ অস্ত্রাগারে যে-পরিমাণ পারমাণবিক অস্ত্র মজুত করা রয়েছে তা থেকে রোজ যদি ছয় মেগাটন করে বোমা ফেলা হয়, তবে ১৪৬ বছর ধরে যুদ্ধ চালানো যাবে—বলেছেন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ও মানবপ্রেমিক ডক্টর লাইনাস পলিং। ডঃ পলিং এমন একজন বিজ্ঞান-সাধক যিনি নিজেকে ল্যাবরেটরির মধ্যে আবদ্ধ করতে পারেন নি' যিনি বিজ্ঞানকে মানবকল্যাণে নিয়োগ করার জন্যে প্রয়োজনবোধে রাজপথে এসে দাঁড়ান।

এমনি একবার দাঁড়িয়েছিলেন পলিং খোদ হোয়াইট হাউসের সামনে, আমেরিকার ভিয়েতনাম নীতির প্রতিবাদ করে তিনি বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র সরকার অবজ্ঞাভরে তাঁর ওপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারেন নি, পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে তাঁকে নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। স্টান্ট দেওয়া বা চমক সৃষ্টি করার দিকে ডঃ পলিংয়ের কোন উৎসাহ নেই, শান্তির প্রতি তাঁর আগ্রহ ঐকান্তিক, নিখাদ। দ্বেষ, ঘৃণা ও হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে তিনি সত্য ও যুক্তি, মৈত্রী ও করুণা ফিরিয়ে আনার জন্য প্রাণপাত করে চলেছেন।

সম্প্রতি এই মনীষীর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ ঘটেছিল ভারতবাসীর। নতুন দিল্লীতে আজাদ স্মৃতি বক্তৃতা দেবার জন্যে এসেছিলেন ডঃ পলিং—'বিজ্ঞান ও বিশ্ব শান্তির ওপর তিনটি বক্তৃতা দিলেন পলিং —বিস্ময়ে-বিমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন শ্রোতৃমণ্ডলী। যেমন তাঁর চিন্তাধারায় স্বকীয়তা, মৌলিকত্ব, তেমনি বক্তব্যের স্পষ্টতা ও বলিষ্ঠতা। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় এই মানব-দরদী বিজ্ঞানীকে সম্মানসূচক ডি-এসসি ডিগ্রীতে ভূষিত করে নিজেই সম্মানিত হল।

সামরিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব নেওয়া ভারতের পক্ষে সম্ভব নয়, পলিং বলেছেন, ভারত নেতৃত্ব নেবে বিশ্বে শান্তি ও নীতিবোধ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে—শান্তিকামী দুনিয়া ভারতের কাছে তাই চায়। ডঃ পলিং চান ভারত আত্মনির্ভরশীল হোক, বিদেশী সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার অর্থ বিদেশীদের দ্বারা শোষিত হওয়া। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার দেশগুলি বিদেশী মূলধনকে দূরে সরিয়ে রেখেছে, তাদের উন্নতিও থল্লেখযোগ্য দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। লাতিন আমেরিকায় ধীরে ধীরে বিদেশী মূলধনের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, আজ লাতিন আমেরিকার সম্পদেই বিদেশীদের বাবুয়ানা চলেছে—বলেছেন ডঃ পলিং।

শান্তিবাদী হয়ে পলিং কেমন করে আমেরিকার বিপজ্জনক ভিয়েতনাম নীতি সমর্থন করবেন? বিভিন্ন দেশে অস্ত্র সাহায্য করে আমেরিকা শান্তির সম্ভাবনাকে ব্যাহত করছে বলে তাঁর অভিমত। প্রতিরক্ষা খাতে বাজেট বাড়ানোরও তিনি

ডঃ পলিং

ঘোর বিরোধী। বেশি অস্ত্র বেচতে পারার জন্যে পুরস্কার দেওয়ার তিনি তীব্র নিন্দা করেছেন, তিনি চানঃ অস্ত্র বিক্রি বন্ধ করার জন্যে আন্তর্জাতিক চুক্তি। মস্কোর পারমাণবিক চুক্তিকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও বলেছেন যে, চীন এবং ফ্রান্স সে-চুক্তিতে অংশ না নেওয়ায় এর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। চীনকে রাষ্ট্রসঙ্ঘে এবং তাকে নিরাপত্তা পরিষদে না নিলে পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের আশা করা বৃথা বলে তিনি মনে করেন।

ডঃ পলিং-এর দুঃখ এখানে যে, আজকের বিজ্ঞানীরা তাঁদের ভূমিকা যথার্থভাবে পালন করছেন না। শান্তি প্রতিষ্ঠাই বিজ্ঞানীদের প্রাথমিক কাজ, কিন্তু বিজ্ঞানীরা রাজনৈতিক নেতার নির্দেশে ধ্বংসাত্মক অস্ত্র নির্মাণে নিজেদের শক্তির, প্রতিভার অপচয় ঘটাচ্ছেন। যুদ্ধকে বে-আইনী ঘোষণা করেই সভ্যতার সংরক্ষণ সম্ভব—আর বিজ্ঞানীরা ইচ্ছে করলেই তা করতে পারেন। শুধু তাই নয়, পৃথিবী থেকে অভাব ও অপুষ্টিকেও বিজ্ঞানীরা চিরতরে নির্বাসন দিতে পারেন, আজকের বিজ্ঞান সে-পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে বলে ডঃ পলিং মত প্রকাশ করেছেন।

ডঃ পলিং-এর মতামতের মূল্য অপরিসীম। তাঁর পাণ্ডিত্য, জ্ঞান ও বুদ্ধির যাচাই হয়ে গিয়েছে, দু'বার নোবেল প্রাইজ খুব কম ভাগ্যবানের কপালেই জুটেছে, তিনি সেই স্বল্পসংখ্যক ভাগ্যবানদের একজন। রসায়ন শাস্ত্রের জন্যে ১৯৫৪ সালে এবং শান্তির জন্যে ১৯৬২ সালে ডঃ পলিং আবার নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন।

আমেরিকার অরেগন স্টেট কলেজে লাইনাস কার্ল পলিং-এর শিক্ষালাভ, ক্যালিফোর্নিয়ার টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউটেও রসায়ন অধ্যয়ন করেন তিনি। এখান থেকে জার্মানীর মিউনিকে, সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখে তিনি উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেন। কোপেনহেগেনেও রসায়ন শাস্ত্র পড়েন। প্রথম জীবনে ক্যালিফোর্নিয়াতেই শিক্ষকতা করেন, পরে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। মৌলিক গবেষণার জন্যে তাঁর উচ্চ পদ লাভে অসুবিধে হয় নি, প্রথমে রসায়ন এবং রাসায়নিক ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান, পরে রাসায়নিক গবেষণাগারগুলির ডাইরেক্টর। বর্তমানে রয়েছেন সাণ্টা বারবারায় স্টাডি অফ ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউশনস কেন্দ্রের অধ্যাপক হয়ে। এছাড়াও দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসরও বটেন।

কিন্তু গবেষণাগার এবং অধ্যাপনা ছাড়াও ডঃ পলিং-এর অন্য জীবন রয়েছে, সে-জীবন শান্তির জন্যে সংগ্রাম করা। ১৯৫৮ সালে তাঁরই নেতৃত্বে ৪৯টি দেশের এগারো হাজার বৈজ্ঞানিক পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ করার জন্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘে আবেদন করেছিলেন। রাসায়নিক হিসেবে ডঃ পলিং অণু-পরমাণুর রহস্য আবিষ্কার করেছেন, মানবতাবাদী হিসেবে পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করে তোলার সাধনায় ব্যস্ত রয়েছেন এই বাষট্টি বছরের তরুণ বিজ্ঞানী। তাঁর 'নো মোর ওয়ার' বিশ্ব শান্তি প্রচেষ্টায় একখানা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

নির্বাচনী প্রতীক

নির্বাচনী প্রতীকই একমাত্র আঁধারে আলো

পঞ্চাশ কোটি ভারতবাসীর প্রায় পঁচিশ কোটিই প্রাপ্ত-বয়স্কের ভোটাধিকারে নাগরিকরূপে গণ্য। তামাম দুনিয়ায় এমনটির জোড়া নেই। সেই সংগে এমন অবস্থাও কোথাও নেই যেখানে, ভোটদাতা-কুলকে একটি হিমবাহরূপে গণ্য করলে, আইসবার্গের নিম্নভাগের অধিকাংশটুকুই যেমন জলের তলায় থাকে,–এদেশে তেমনি অধিকাংশই নিরক্ষর এবং অন্ধকারের তলায় নিমজ্জিত। অতি স্বল্পাংশের কিয়দংশ সাক্ষর বটে, তবে নিতান্তই এক অতি-ক্ষুদ্রাংশ নাগরিক চেতনাসম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তি। সুতরাং এই সুবৃহৎ গণতান্ত্রিক নির্বাচনের দেশে নাগরিকগণ অন্ধকারেই ঢিল ছুঁড়ে আসছেন।

এদেশের খুব অল্প সংখ্যক ভোট-দাতাই নির্বাচনপ্রার্থী রাজনৈতিক দলের স্বরূপ সম্বন্ধে অচেতন। তাদের কার্য-কলাপের সংগেও কোন পরিচয় ভোটদাতাদের নেই। সাক্ষাতে তো থাকার কথাই নয়, কারণ নির্বাচনের গরম বাজার ছাড়া নিরক্ষর অশিক্ষিত দরিদ্র জনসাধারণের কথা কারও মনে থাকে না। নির্বাচনী মাসে রাজা-মহারাজাও পূতিগন্ধযুক্ত বস্তিগৃহে প্রবেশ করে বিবস্ত্র মানুষের গায়ে তাঁদের পাঁচ আঙুলের হীরক-অঙ্গুরীয়ের স্পর্শ বুলিয়ে তোয়াজ করে যান। পরের দিনই ভোট কুড়িয়ে স্বগৃহের ফটকে কুকুর প্রহরা মোতায়েন করেন। জনগণের পক্ষে এঁদের উদয় এবং অস্ত-গমনের অতঃপর কোন খোঁজখবর রাখা আর সম্ভব হয় না। কেন না দৈনিক পত্রিকা পাঠের বা তাতে চক্ষু বুলিয়ে তার হরফগুলি বাংলা না ইংরেজি না উর্দু কিম্বা ফার্সি বোঝার ক্ষমতা এঁদের নেই। নির্বাচন তাই এঁদের কাছে একটা সমা-রোহপূর্ণ জাতীয় জাঁক-জমক মাত্র।

বিভিন্ন দলও সেজন্য নির্বাচনে যার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন তা হ'ল তাঁদের প্রতীক চিহ্ন, নির্বাচনী ইস্তাহার নয়। ইস্তাহারে পড়ার, বোঝায় এবং তা নিয়ে বিতর্ক করার ক্ষমতা জন-গণকে দেওয়া হয় নি। এঁরা অন্ধকারে একমাত্র আলোকদ্যুতির মত প্রার্থীদলের প্রতীকচিহ্ন কিছুটা বোঝেন, যেমন স্বাক্ষ-রের বদলে টিপসই এঁদের দৈনন্দিন কাজকর্ম চালায়, তেমনি দলের বদলে দলীয় চিহ্নই এঁদের নির্বাচনী হুজুগের সময় দল বাছাইয়ে সাহায্য করে। টিপ-সইয়ের ওপর নির্ভরশীল নিরক্ষর মানুষকে মহাজন থেকে ফড়ে পর্যন্ত প্রতিদিন যেমনভাবে প্রতারিত করে, নির্বাচনে তেমনি মহাদল থেকে কাগুজে দল পর্যন্ত এই মহাদেশের মানুষকে প্রতারিতই করে আসছে। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না।

কিন্তু নান্যঃ পন্থা। অধিকাংশ মানুষই যখন প্রতীকের মাধ্যমে দল চিনতে অভ্যস্ত তখন তাঁদের কাছে সব থেকে বড় প্রচার হ'ল বিভিন্ন দলের প্রতীকের সংগে পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

আমরা পশ্চিমবঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী দল ও দলহীনদের প্রতীকগুলি ওপরে সাজিয়ে দিলাম। অবশ্য এ-ও সমান ব্যর্থ প্রচেষ্টা। কারণ প্রতীক-পরিচয় যাঁদের ক্ষেত্রে অপরিহার্য, দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের কোন কাগজই তাঁদের কাছে বোধ্য নয়। সুতরাং এই প্রচেষ্টাও সুবিধাভোগী শিক্ষিতজনের প্রয়োজনেই আসবে। নিরক্ষর অনালোকিত ভোটাধিকারীর জন্য

আমরা অসহায় সমবেদনা রাখতে পারি মাত্র।

গত তিনটি নির্বাচনে এদেশে যে দু'টি প্রতীকচিহ্ন জনগণের মধ্যে প্রত্যেকেরই পরিচিত সে দু'টি হ'ল ঃ (১) লাঙল কাঁধে জোড়া বলদ এবং (২) কাস্তে ধানের শিষ। প্রথমটি যথাযথ কংগ্রেসেরই প্রতীক। কিন্তু দ্বিতীয়টিকে যথার্থভাবে কম্যুনিস্ট প্রতীক বলা যাচ্ছে না। যদিও 'কাস্তে ধানের শিষ'ই ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতীক; কিন্তু ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি এখন দ্বিধাবিভক্ত এবং পশ্চিমবঙ্গের কম্যুনিস্ট দলের মধ্যে মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্টরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুতরাং এক নম্বর জোড়া বলদের পরেই নাম করতে হলে দু' নম্বরের প্রমোশন পেতে পারে মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্টদের প্রতীকচিহ্ন (৩) কাস্তে হাতুড়ি এবং তারা।

(৪), (৫) এবং (৬) নম্বর হিসেবে অপেক্ষাকৃত স্মরণীয় প্রতীকগুলি হল, (৪) বটবৃক্ষ—সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি (জম্মু ও কাশ্মীরের গণতান্ত্রিক জাতীয় সম্মেলনেরও এই চিহ্ন)। (৫) কুঁড়ে ঘর—আজ পশ্চিমবঙ্গে প্রায় অস্তিত্বহীন প্রজাসমাজতন্ত্রী দলের প্রতীকচিহ্ন। (৬) সিংহ—পশ্চিমবঙ্গের ফরোয়ার্ড ব্লক-এর প্রতীক (গোয়া দমন দিউ—এ চিহ্ন দেওয়া হয়েছে মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক দলকে)। এ ছাড়া (৭) প্রদীপের প্রতীক নিয়েছে জনসঙ্ঘ এবং অন্যান্য ছোট দল ও নির্দলীয়গণ গ্রহণ করতে পারেন সাতটি অবাধ নির্বাচনী প্রতীক। যেমন ঃ (১) সাইকেল, (২) নৌকা, (৩) দাঁড়িপাল্লা (৪) কোদাল (৫) দু'টি পাতা (৬) কোদাল ও বেলচা এবং (৭) উট।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নিম্নলিখিত প্রতীকগুলি চালু আছে ঃ

(১) স্বতন্ত্র পার্টি—তারকা। (২) পাঞ্জাব শিরোমণি আকালীদল—হাত। (৩) মাদ্রাজ দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাগাম এবং ইউনাইটেড গোয়াল্‌স দলের—উদীয়মান সূর্য। (৪) কেরল কংগ্রেসের—ঘোড়া। (৫) কেরল মুসলিম লীগের—মই। (৬) ভারতের রিপাবলিকান পার্টি—হাতী। (৭) মহারাষ্ট্রের পেজাণ্টস এন্ড ওয়ার্কার্স পার্টি—ঠেলাগাড়ি। (৮) আসামের এ. পি, এইচ, এল, সি'র—ফুল। (৯) জম্মু ও কাশ্মীরের জাতীয় সম্মেলনের —লাঙল।

নির্বাচনী ইস্তাহার

পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা দেখেছি, এদেশে নির্বাচন জেতার জন্য ইস্তাহারের গুরুত্ব অনধিক। কেন না ইস্তাহার পাঠ ও বিচারের ক্ষমতা অধিকাংশ নাগরিকদেরই নেই। এজন্য ভারতের সাধারণ নির্বাচনে দলীয়গণ প্রতিপক্ষের প্রতি নিন্দাবাদ বর্ষণকেই সর্বোত্তম নির্বাচনী কৌশল বলে গ্রহণ করে থাকেন।

'আমরা কি করব'র থেকে বড় কথা 'ওরা কি করছে' এবং 'করে নি'। এই নিন্দাবাদেই আমাদের তৃপ্তি। কেন না আমরা যুক্তিবাদী হলেও বস্তুবাদী নই। যুক্তিতে ঘায়েল করেই আমাদের আনন্দ, নিন্দায় নিমজ্জিত করেই আমাদের গর্ব। অর্থাৎ নির্বাচনী প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে একদল অপর দলের উৎকুন বাছাই করছেন। যেন অপর দলকে ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করাটাই ইতিকর্তব্য। সমগ্র জাতি কিভাবে পরিত্রাণ পায় নিয়ত নিপেষণের কবল থেকে এজন্য এক দুই তিন করে কর্মসূচী তৈরিতে উৎসাহ অপেক্ষাকৃত কম। এজন্যই হয়ত বা সাধারণ নাগরিকের ধারণা, যে যাবে লঙ্কায় সে হবে রাবণ। বলা বাহুল্য এই ধারণাও নিদারুণ হতাশারই ফলশ্রুতি। কারণ ভারতবর্ষ স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর থেকে আজ পর্যন্ত এক বই দ্বিতীয় রাবণের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে শুভাশুভ বাজিয়ে দেখতে চান নি। কথায় কথায় কেবল ছুঁইয়েও লাভ নেই। কেন না চারদিকে নোনতা সমুদ্র মাঝখানে চোরাবালি কোন কাজের-কথা নয়।

যাই হোক, হতভাগ্য ভারতবাসীর প্রতিনিধিত্বের দাবি করেন (সামগ্রিক এবং খণ্ডিতভাবে) এমন কয়েকটি দল ছাপানো ইস্তাহারও তৈরি করেছেন এবং নিজের নিজের পার্টি আফিসের ফাইলে রেখে দিয়েছেন। এমন কয়েকটি ইস্তাহারের মোটামুটি আলোচনায় নামলে আমাদের ভবিষ্যতের একটা চেহারা দর্শন করে সুখী হতে পারি।

ঔচিত্যবাচক শব্দাবলী
(কংগ্রেস)

কংগ্রেস জনসাধারণের কাছে সরাসরি প্রতিশ্রুতির দায়িত্ব গ্রহণ না করে কিছু ঔচিত্যবাচক শব্দাবলীর সমাবেশ করেছে। এর বাইরে যতটুকু তা বিভিন্ন বিরোধী দলের সমালোচনা। ফলত সাধারণ্যে কংগ্রেসী বক্তব্য খুবই লম্বা-চওড়া (High-sounding) বোধ হবে। কংগ্রেস বলেন ঃ ব্যক্তি-উদ্যোগের হাতে দেশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের উপায় থাকা উচিত নয়। পরিকল্পনার ব্যাপারে রাষ্ট্রের সক্রিয় এবং প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত। সামাজিক নিয়ন্ত্রণাধীনে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে আনয়ন করা দরকার ইত্যাদি। বলা বাহুল্য উচিত এবং প্রয়োজনের অর্থ এই নয় যে, ক্ষমতা হাতে পেলে এগুলি অবশ্যই কার্যে পরিণত করার জন্য কংগ্রেসের অঙ্গীকারাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা থাকবে। সাধারণের সামনে একটি উন্নয়নশীল সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরাই কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য।

নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি
(স্বতন্ত্র পার্টি)

স্বতন্ত্র পার্টি কোন মুখোস রাখতে চায় না। স্বতন্ত্র পার্টি জানে, জনগণের থেকে সে চূড়ান্তভাবে পৃথক এবং মুষ্টিমেয় রাজন্যবর্গ এবং ধনিকশ্রেণীর পয়সার জোরেই সে প্রতিষ্ঠা করবে তার সর্বগ্রাসী শোষণের নীতি। তাই স্বতন্ত্র পার্টি সর্বতোভাবে সমাজবাদ থেকে দূরে সরে দাঁড়াতে চায়।

স্বতন্ত্র পার্টি সুস্পষ্টভাবে বলে ঃ ক্ষমতা পেলে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের মত সাধারণ স্বার্থের অনুকূল কোন নীতি তাঁরা গ্রহণ করবেন না। না, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হবে না। দেশে পরিকল্পনার পাট পুরোপুরি খতম করতে হবে এবং ব্যক্তি-মুনাফার সুযোগ করে দিতে হবে।

স্বতন্ত্র আরও বলে ঃ ক্ষমতা পেলেই তারা দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারকে সমর্থন করবে।

সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার প্রতিশ্রুতি
(জনসঙ্ঘ)

জনসঙ্ঘ এক জাতির সংহতি এবং যে কোন মূল্যে তার সমৃদ্ধি দাবি করে। বলা বাহুল্য এই সংকীর্ণতা বোধ ফ্যাসিজমের জন্মদান করে। জনসঙ্ঘের কোন আন্তর্জাতিক নীতি নেই। আন্তর্জাতিক নীতি বলতে জনসঙ্ঘ বোঝে, আণবিক অস্ত্র তৈরি করে সম্মুখ সমরে ভারতের সীমান্ত রক্ষা করতে প্রয়োজন হলে মিলিটারী আঁতাত করা। জনসঙ্ঘ পাক-ভারতের ভৌগোলিক সীমা মুছে দিয়ে এক ভারত গঠনের উচ্চাশা পোষণ করে এবং দেশে মিলিটারী শক্তি বৃদ্ধি করতে চায়। শেঠ সমাজের হাতে বাণিজ্যের একচেটে অধিকার তুলে দিয়ে দেশের অর্থনীতিকে স্বতন্ত্রীধরণের ধনীদের কুক্ষিগত করাতে চায়। সংস্কৃতকে জাতীয় ভাষা এবং আয়ুর্বেদকে জাতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা জনসঙ্ঘের অন্যতম লক্ষ্য।

লম্বা হাত শক্ত মুঠি
(এস এস পি)

এস এস পি বা সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি দেশের অর্থনীতিকে হাত এবং

দেশের জওয়ান শক্তিকে মুষ্টির রূপকে বর্ণনা করে বলছেঃ দেশে চাই লম্বা হাত (অর্থাৎ সম্প্রসারণশীল অর্থনীতি) এবং শক্ত মুঠি (অর্থাৎ শক্ত মিলিটারী শক্তি)। নিরপেক্ষতাবাদ এস এস পি'র চোখে দুর্বলতা। এস এস পি এ নীতি পরিহার করতে চায়।

এস এস পি দেশে সর্বোচ্চ আয়ের সীমা বেঁধে দিতে চায় মাসিক দেড় হাজার টাকায় এবং সেই সঙ্গে মূল্যস্তরকেও বাঁধতে চায়।

নেহরু আন্তর্জাতিক নীতি পূর্ণ সমাজতন্ত্র এবং সার্বিক জাতীয়করণ
(দঃ পঃ কম্যুনিস্ট)

দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সেই নীতিই রক্ষা করতে চায়, নেহরুজীর মৃত্যুর পর কংগ্রেস কর্তৃক যা পরিত্যক্ত হতে চলেছে।

প্রশাসনিক গলদ ও দুর্নীতি দূর করে দক্ষিণপন্থীরা চাইছেন দেশের প্রকৃত গণতন্ত্রী শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে কংগ্রেসরাজ খতম করতে এবং একটি জনপ্রিয় গণতন্ত্রী সমাজবাদী সরকার প্রতিষ্ঠা করতে।

কর্মসূচী পরিষ্কার এবং গণস্বার্থের দিকে নজর রেখে তৈরি। সমস্ত রকম বৈদেশিক লগ্নী ও শোধনের অবলোপ করে ভারতের সমাজবাদী গণতন্ত্রকে সাবধানে রক্ষা করা এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা এবং স্টক এক্সচেঞ্জ ও শেয়ার বাজার বন্ধ করে ব্যাংক জাতীয়করণের দ্বারা অর্থনীতির প্রাঙ্গণ থেকে ধনবাদী শোষণের সব কটি পথ রুদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি আছে সি পি আই-এর লক্ষ্য। ভূমিস্বত্বের ক্ষেত্রে বর্তমান মালিকানার রদবদল এবং সংখ্যালঘুর সংরক্ষণ এঁদের অন্যতম বিশেষ প্রতিশ্রুতি।

শ্রমিকশ্রেণীর জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র
(কম্যুনিস্ট বামপক্ষ)

দুই কম্যুনিস্ট পার্টিকে আপাতভাবে স্বতন্ত্র করাই এক সমস্যা। এঁরাও চান বুর্জোয়া শোষণমুক্ত জনগণতন্ত্র (শ্রমিক-শ্রেণীর) প্রতিষ্ঠা করতে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এঁরা ভীষণভাবে মার্কিন বিরোধী। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে রোখার জন্য এঁরা চান প্রতিবেশী চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধ মীমাংসা করে মৈত্রী স্থাপনা করতে। ফলত এশিয়ার মুক্তিও এই পথে বলে এঁদের বিশ্বাস। ভিয়েতনামের সংগ্রামী মানুষের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন অন্যতম দাবি।

শহুরে আয়ে নির্দিষ্ট সীমারেখা টেনে এবং ধনীদের ওপর উচ্চতর কর বসিয়ে সাধারণের ওপর থেকে করভারের বিশেষ হ্রাস করা ও প্রতিরক্ষা ব্যয় হ্রাস করা এঁদের লক্ষ্য।

কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে জমি বণ্টন এবং কৃষিঋণ বাতিল বলে ঘোষণা। সমান কাজের জন্য সমান মজুরী, অটোমেশন বন্ধ, ছাঁটাই বন্ধ এবং যথোপযুক্ত মজুরী মাইনা নির্ধারণ করে ব্যয়সূচীর ঊর্ধ্বগামিতার জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা। এ ছাড়াও দক্ষিণপন্থীদের মতো সর্বপ্রকার বিদেশী মূলধন বিনিয়োগ রদ করা ও জাতীয়করণ করা এঁদের লক্ষ্য।

বামপন্থী কম্যুনিস্টগণের আরও দাবিঃ রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতা বাতিল করা এবং জনগণের প্রকৃত ইচ্ছা প্রকাশের সুযোগ দানের জন্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব। সমস্তরকম দমননীতির অবসান এবং জনবিরোধী পুলিশের পুনর্গঠন।

* * *

একমাত্র ইস্তাহারের আলোকেই ভোটপ্রার্থী দলকে চেনা যায়। কিন্তু এদেশের ভোটযুদ্ধ পারস্পরিক বিষোদ্গারেই সমধিক আগ্রহী। পয়সাওয়ালা যে সমস্ত দল দামী পোস্টার আর ফেস্টুনে, হেলিকপ্টার এ্যারোপ্লেনে, ভাড়াটে প্রচারকদের পেছনে মুঠো মুঠো টাকা ওড়ান, তাঁদের জনগণের কাছে উপস্থিত করার মতো কর্মসূচী এবং বক্তব্য আছে বলে বিশ্বাস থাকলে, মনে হয়, সমস্ত খরচ-খরচা বাতিল করে ব্যাপকভাবে ইস্তাহার বিলি করলে অনেক কাজ হত।

দুঃখের বিষয়, যাঁদের তেমন কর্মসূচী আছে এবং যাঁদের তা নেই তাঁরা উভয়তই জনে জনে ইস্তাহার বিলিতে অনুৎসাহী। এর কারণ কি? তবে কি ইস্তাহারের ওপর পূর্ণ আস্থা কেউই স্থাপন করতে পারেন না?

নির্বাচনের প্রাক্কালে
সন্দেহ ঃ অভিযোগ

জম্মু ও কাশ্মীরে বিয়াল্লিশ সদস্যের বিধানসভায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বর্তমান সরকারী দলের পঁচিশজন প্রার্থীই নির্বাচিত হয়েছেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এমনভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা কায়েম করা গেলে নির্বাচনের তথা গণতন্ত্রের অস্তিত্বই যে নিরর্থক হয়ে যায়, এটা সাধারণের বোধগম্য হলেও জম্মু-কাশ্মীর সরকারী দলের মেজাজ আনন্দে ডগমগ হয়ে উঠেছিল। মাঝপথে প্রতিবাদ এই আনন্দবন্যায় একটা প্রচণ্ড ধাক্কার মতো উপস্থিত হয়েছে।

জম্মু-কাশ্মীর ন্যাশনাল ফ্রন্টের সেক্রেটারী. কাশ্মীর জনসঙ্ঘের সভাপতি এবং তদঞ্চলায় পি এস পি সভাপতি সম্পূর্ণ ব্যাপারটাকে জাল ও জালিয়াতী বলে অভিযোগ করেছেন।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে পঁচিশ জনকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হয়েছে, অভিযোগে প্রকাশ, তাঁদের নির্বাচনী এলাকায় বিরোধী প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে বাতিল করে, পঁচিশ জন সরকারী প্রার্থীকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বহুক্ষেত্রে বিরোধী সদস্যগণকে ভীতি প্রদর্শন, প্রলোভন দ্বারা আকর্ষণ এবং মোটা মাইনের চাকরির লোভ দেখানো হয়েছে বলেও অভিযোগ।

অভিযোগকারিগণ জানিয়েছেন যে, জনৈক বিরোধী প্রার্থীকে কাশ্মীর মন্ত্রী শ্রী ডি পি ধরের বাড়িতে আটক রাখা হয়।

অভিযোগ সম্পর্কে প্রধান নির্বাচন কমিশনার শ্রীসুন্দরম বলেছেন, অভিযোগগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হলেও রিটার্নিং অফিসারদের সিদ্ধান্তের ওপর তাঁর কিছু করার নেই। তবে বাতিল প্রার্থীরা আবেদন জানালে তিনি ওটিকে হাইকোর্ট জজদের নিয়ে ট্রাইবুনাল গঠনের চেষ্টা করতে পারেন। ইতিমধ্যে বাতিল প্রার্থীদের তিনি হাইকোর্টের শরণাপন্ন হওয়ার জন্যও পরামর্শ দিয়েছেন।

শ্রীসুন্দরম আরও বলেন যে, রিটার্নিং অফিসারগণ যদি যথাযথ কর্তব্য পালন না করেন, তাহলে কোনক্ষেত্রেই নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা সম্ভব নয়।

বিস্তারিত তথ্য হিসেবে শ্রীসুন্দরম জানান, প্রধানত তিনটি অঞ্চল শ্রীনগর, বরমুল্লা এবং অনন্তনগর থেকে ২২৫টি মনোনয়নপত্র বাতিল বলে ঘোষণা করেছেন রিটার্নিং অফিসারগণ।

প্রায় পঞ্চাশ জন প্রার্থীর ক্ষেত্রে ত্রুটি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রার্থীরা যথা সময়ে শপথবাক্য গ্রহণ করেন নি। অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্থ জমা না পড়া কিম্বা প্রয়োজনীয় বয়ঃসীমায় না-পৌঁছানো কিম্বা সরকারী চাকুরে বা সরকারী কণ্ট্রাক্টর হওয়া প্রভৃতি কারণে মনোনয়নপত্র নাকচ করা হয়েছে। কিন্তু অভিযোগে বলা হয়েছে যে সময়ে শপথবাক্য গ্রহণ না করার অজুহাতে যেখানে মনোনয়নপত্র নাকচ করা হয়েছে সেখানেই আসলে কারচুপি করা হয়।

নির্বাচন কমিশনার জানিয়েছেন, শপথবাক্যের ফ্যাকড়াটি বর্তমান নির্বাচনেই প্রথম চালু করা হল।

জম্মু ও কাশ্মীরের ঘটনায় যে কোন ব্যক্তির মনেই সন্দেহের কারণ দেখা দেয়। এই সন্দেহ সাংবাদিকদেরও নির্বাচন কমিশনারের কাছে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করতে উৎসাহিত করেছিল।

প্রশ্নটা হ'ল, কংগ্রেসী প্রার্থীদের একজনেরও মনোনয়নপত্র বাতিল হ'ল না কেন। এ প্রশ্নের সরাসরি জবাব অবশ্য নির্বাচন কামিশনার দিতে পারেন নি। অথচ সমগ্র প্রশ্নটির গুরুত্ব তাঁকেও স্বীকার করতে হয়েছে।

বস্তুতপক্ষে চল্লিশ সদস্যবিশিষ্ট ভার পঁচিশজনই এবং একমাত্র কংগ্রেস দলভুক্তরাই নির্বাচিত বলে স্বীকৃতি পেলে তারপর কোনও নির্বাচন অনুষ্ঠান নিতান্তই ব্যঙ্গের মত মনে হয়। জম্মু কাশ্মীরের ঘটনা এইভাবেই গণতন্ত্রকে ভঙ্গ করেছে।

ভারতবাসী শোষণের শিকার

নয়াদিল্লীতে 'আজাদ স্মৃতি বক্তৃতামালা'র ভাষণ দিতে উঠে দুই দফা নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ডঃ লাইনাস কার্ল পলিং ভারতের যে অর্থনৈতিক চিত্রকে বড় বড় নেতার বড় বড় বুলির কবরখানা থেকে উদ্ধার করে এনে সমগ্র জাতির চোখের সামনে মেলে ধরেছেন তা প্রত্যেক ভারতবাসীর ক্ষেত্রে গভীরভাবে উপলব্ধ সত্য হলেও সরকারীভাবে সমর্থিত সত্য ছিল না। আমেরিকা থেকে এসে ডঃ পলিং এই বক্তৃতাচাপা সত্যকে প্রকটিত করেদিলেন। সভামণ্ডপে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীচাগলা। সরকারী মুখপাত্রের কর্তব্য হিসেবে তাঁকে অমনি বিশ্ববিশ্রুত ডঃ পলিং-এর বাস্তব মন্তব্যকে অস্বীকার করে বলতে হল, ডঃ পলিং-এর মন্তব্য (স্বাধীনতার পর ভারতে দরিদ্র-শ্রেণী অধিকতর দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হয়েছে) সমর্থন করেন না, তখন সমবেত শিক্ষিত ও গুণী সভাজন সমস্বরে চাগলা সাহেবের মন্তব্যের প্রতিবাদ করে ডঃ পলিংকে সমর্থন জানান।

কংগ্রেসের কপাল মন্দ বাস্তবিক। ডঃ পলিং ঠিক এমন এক সময় ভারতীয় অর্থনীতির পরমুখাপেক্ষিতা এবং শোষণের রূপ ফাঁস করে দিলেন, যখন কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ সমস্বরে ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতির জয়গানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে জনগণের কাছে জনসেবী কংগ্রেসের চেহারা সাজিয়ে ধরে ভোট ভিক্ষা করছেন।

ডঃ পলিং ভারতের পরনির্ভরতার বিশদ চিত্র উদ্ঘাটন করে ভারতবাসীকে সচেতন করে দেন এই বলে যে, ভারতকে ল্যাতিন আমেরিকার উদাহরণ মনে রেখে পরনির্ভরতার ফাঁস গলা থেকে নামিয়ে নিতে হবে। তিনি বলেন, ল্যাতিন আমেরিকার প্রথম দিকে বিদেশী মূলধনের বিনিয়োগ তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। কিন্তু ক্রমশ বিদেশী মূলধন দক্ষিণ আমেরিকাকে গ্রাস করে ফেলে এবং অধিবাসীরা বিদেশী ধনিক-সম্প্রদায়ের দ্বারা শোষিত হতে থাকেন। দেশের সমগ্র সম্পদই কালক্রমে বিদেশের করতলগত হয়। ভারতও উত্তরোত্তর পরনির্ভরশীল হয়ে সেই মারাত্মক পথ অনুসরণ করতে চলেছে।

তিনি বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীরা দরিদ্রসাধারণকে অধিকতর দারিদ্র্যে নিমজ্জিত এবং ধনিক সম্প্রদায়কে অধিকতর সম্পদের অধিকারী করার জন্য নিযুক্ত আছেন। ভারতের মর্মান্তিক অর্থনৈতিক চিত্র তুলে ধরে ডঃ পলিং দেখান যে, জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে ফলাও প্রচারকার্য চালানো হলেও প্রকৃত সত্য অন্যরূপ। ভারতবাসীর প্রকৃত আয় নিম্নগামী। আজকের অর্থমূল্যে পাঁচশত টাকার ক্রয়ক্ষমতা ১৯৪৮ সালের দুই শত টাকার ক্রয়ক্ষমতার সমান। ১৯৬২ সাল থেকে প্রতিবছর ভারতে জিনিসপত্রের মূল্য শতকরা নব্বই ভাগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং ১৯৪৮ সাল থেকে আজ ভারতে মাথাপিছু জাতীয় আয় আড়াই শত থেকে পাচশ'তে বৃদ্ধি পেয়েছে মানেই প্রকৃত আয় বাড়ে নি। বরং তা বহুলাংশে কমেই গেছে। গত আঠারো বছরে মুদ্রাস্ফীতির অঙ্ক একশত চল্লিশ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ডঃ পলিং-এর মত জ্ঞানী ব্যক্তির এই তীব্র সমালোচনায় সংখ্যাতত্ত্বের ভ্রম স্বাভাবিক নয়। তথাপি চাগলা সাহেব ফাঁস করা তত্ত্ব এতোকাল যেমন তাঁর সরকার ঢেকে এসেছেন তেমনিভাবেই ঢাকতে চেয়েছিলেন, কিন্তু যে বিদ্বৎসমাজ শ্রোতৃমণ্ডলীর আসনে উপবিষ্ট ছিলেন (অবাধে মনে করা যেতে পারে যে এঁদের বেশির ভাগই সমাজের উপরতলার মানুষ) তাঁরা চাগলা সাহেবের এই ঢাক ঢাক ভাবকে মেনে নিতে পারেন নি। উচ্চনাদে শ্রীচাগলার মন্তব্যের প্রতিবাদে সভামণ্ডপ প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

বস্তুতপক্ষে বিদেশী পুঁজির শোষণটা কেবলমাত্র সমাজের নির্জিত শ্রেণীর ওপর এসেই পড়ে না, এই শোষকযন্ত্র সমগ্র দেশের অস্থিমজ্জা চুষে খায়। এবং সেই মহাভোজে দেশীয় ধনিকসমাজও কালক্রমে ভোজ্যেই পরিণত হন।

এজন্য বিদেশী পুঁজি আলিঙ্গনের বিভীষিকায় কেবলমাত্র দরিদ্র জনসাধারণই নন, ধনিকশ্রেণী এবং সাধারণ ব্যবসায়ীকুলেরও চিন্তিত হওয়ার সবিশেষ কারণ আছে।

বিদেশী পুঁজি সমাজের অতি নগণ্য এক অংশকে মোটা মাহিনার চাকরির আরাম দিতে পারে মাত্র।

কিন্তু আমাদের বর্তমান সরকার এ সমস্ত যুক্তি বারম্বার অগ্রাহ্য করে চলেছেন এবং দেশ বিদেশের নজীর টেনে বিদেশী পুঁজির স্বপক্ষে যুক্তি সাজাবার প্রয়াস পেয়ে আসছেন।

ডঃ পলিং-এর ন্যায় গুণিজনের সমালোচনা নিঃসন্দেহে দেশবাসীর মুদিত নয়ন উন্মোচনে প্রভাব বিস্তার করবে। কেন না দেশের বিরোধী নেতারা তারস্বরে এই কথাই বার বার বলে আসছেন এবং কংগ্রেসী নেতারাও মাঝে মধ্যে ধর্মের ভাব ছেড়ে বলছেন, ভারতকে স্বাবলম্বী হতে হবে; পরনির্ভরশীলতার নাগপাশ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসতেই হবে।

পাক মৎলব

গত বৃহস্পতিবার দুপুর একটা নাগাদ একটি পাকিস্তানী বিমানপোতকে ভারতের আকাশসীমা লঙ্ঘন করে চল্লিশ কিলোমিটার মতো ভারতীয় সীমানায় প্রবেশ করতে দেখে বেতারযোগে উক্ত প্লেনের পাইলটকে অবতরণের জন্য বারম্বার অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু বিমানটি সেই অনুরোধ গ্রাহ্য না করে পাকিস্তানে চম্পট দেওয়ার চেষ্টা করলে বিমানটিকে গুলী করে নামানো হয়। বিমান চালকের কাছ থেকে যে সমুদয় কাগজপত্র উদ্ধার করা গেছে তাতে পাকিস্তানী জবাবদিহি একেবারেই বিশ্বাস্য বলে বোধ হয় না। বিমানখানি স্পষ্টত গোয়েন্দা বিমান এবং বিমানের গায়ের মার্কাও পাক সামরিক বিমানের অনুরূপ। এক্ষেত্রে পাকিস্তানী বক্তব্য, বিমানটি বেসামরিক এবং লাহোর ফ্লাইং ক্লাবের প্রশিক্ষণ বিমান। কিন্তু সংগৃহীত তথ্য প্রমাণাদি এ বক্তব্যে সায় দেয় না।

ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ও এ সব যুক্তি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছেন, তাসখন্দ ঘোষণার পর পাক বিমান ২৭ বার ভারতের আকাশসীমা লঙ্ঘন করেছে, সত্তরবার আনুষ্ঠানিক লঙ্ঘনের হিসেবও আছে।

পাকিস্তান কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যাপারটার একটা সাজানো ব্যাখ্যা তৈরি করে ভারতীয় আচরণকে পাশবিক আন্তর্জাতিক রীতি লঙ্ঘনকারী কার্য বলে চিহ্নিত করার প্রয়াস পাচ্ছে।

তাসখন্দের তাস সুতরাং আবার ভেস্তাতে শুরু করেছে। অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে, পাকিস্তানের অভ্যন্তরে গোলযোগ উপস্থিত হলেই ভারতীয় সীমান্তে একটা গরম হাওয়া তৈরির প্রয়োজন হয়। পাকিস্তান এ চাল ইতিপূর্বেও চেলে এসেছে আবারও তারই প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে বা হচ্ছে কি না বোঝা মুস্কিল

দ্যগলের সঙ্গে।

ফ্রান্স ঃ

প্রধানমন্ত্রী উইলসনের সফর কার্যত ব্যর্থ হয়েছে, কমন মার্কেটের সদস্যপদ বৃটেন এবারও পেলো না। প্রেসিডেন্ট দ্য গল বড় জোর বৃটেনকে কমন মার্কেটের সহযোগী সদস্য করে নিতে রাজী আছেন, কিন্তু সদস্যের পুরো মর্যাদা আগামী দু' বছরের মধ্যে দিতে তিনি নারাজ।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ ব্রাউনকে নিয়ে হ্যারল্ড উইলসন সফরে বেরিয়েছিলেন, সফর-তালিকায় ছিলো কমন মার্কেটভুক্ত ছ'টা দেশ। রোমে গিয়ে মিঃ উইলসন আশান্বিত হয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রী আলডো মোরোর সংগে আলোচনা করে তাঁর বুঝতে কষ্ট হয় নি যে, ইতালী বৃটেনের কমন মার্কেট প্রবেশে বাধা দেবে না, এবং সমর্থন করবে। কিন্তু ইতালী, পশ্চিম জার্মানী, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, লাক্সেমবার্গ কমন মার্কেটের সদস্যই কেবল, সংস্থার চাবিকাঠিটি এদের কারোর হাতেই নেই, রয়েছে ফ্রান্সের হাতে। ফ্রান্সেই ১৯৬৩ সালে বৃটেনকে 'না' বলে দিয়েছিলো, বৃটেনের মুখের ওপর কমন মার্কেটের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলো।

চার বছর আগে যে ঘটনা ঘটেছিলো এবারও কি তার পুনরাবৃত্তি হবে? প্রধানমন্ত্রী উইলসন কিন্তু খুব আশা করে বেরিয়েছিলেন এবার, প্রেসিডেন্ট দ্য গলের কাছে তিনি কী যুক্তি রাখবেন তাও বার বার মহড়া দিয়ে নিয়েছিলেন। অবশ্য স্বীকার করতেই হবে, দ্য গলের মন গলাবার জন্যে মিঃ উইলসন চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেন নি. কিন্তু গললো কৈ? প্রধানমন্ত্রী জানতেন বৃটেনের ওপর ফ্রান্স এত চটেছে কেন? ফ্রান্স একটা ইয়োরোপীয় গোষ্ঠী গঠন করতে চায়: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খবরদারী সে কোনমতেই বরদাস্ত করতে পারে না। সেজন্যেই মিঃ উইলসন প্রেসিডেন্ট দ্য গলের কাছে এবং স্ট্রসবার্গের সাংবাদিক সম্মেলনে সত্যিকারের সংযুক্ত ইয়োরোপ গঠনে বৃটেনের ভূমিকার উল্লেখ করেছিলেন। শক্তিশালী মার্কিন মূলধনের প্রভাবমুক্ত ইয়োরোপ গড়ে তুলতে হলে টেকনলজি বা প্রয়োগবিজ্ঞানে অগ্রগামী বৃটেনের সহযোগিতা অপরিহার্য বলে তিনি বুঝিয়েছিলেন। "আমরা আন্তরিকভাবেই কমন মার্কেটের সদস্যপদ চাই— We mean business—বলেছিলেন মিঃ উইলসন। তিনি এ বক্তব্যও পেশ করেছিলেন যে, সারা ইয়োরোপে আজ মার্কিন মূলধন এবং শিল্পসামগ্রীর আধিপত্য, এ-আধিপত্যকে যদি খর্ব করতে হয় তবে শিল্পের দিক দিয়ে ইয়োরোপকে শক্তিশালী হতে হবে। আর বৃটেনকে ইয়োরোপের (কমন মার্কেটের) বাইরে রেখে কখনই সমৃদ্ধশালী ইয়োরোপ গঠন সম্ভব নয়।

কিন্তু দ্য গল অত সহজে ভোলবার পাত্র নন, উইলসনের প্রচ্ছন্ন হুমকী সত্ত্বেও। উইলসন বলেছিলেন যে, যদি আমরা প্রবেশাধিকার না পাই তো সে দোষ বৃটেনের ঘাড়ে ফেলা যাবে না। ফ্রান্স বৃটেনকে সদস্যপদ দেবার আগে লাভ-ক্ষতিটা খতিয়ে দেখতে চায়। অর্থাৎ সে জানতে চায় বৃটেন কমন মার্কেটে এসে ফ্রান্সের কৃষিদ্রব্য কিনতে রাজী আছে কি না। ফ্রান্স তার উদ্বৃত্ত কৃষিদ্রব্য বেচে প্রচুর লাভ করে, বৃটেন কৃষিদ্রব্য আমদানী করে তার কমনওয়েলথভুক্ত শ্বেতাঙ্গ দেশগুলি থেকে। ফ্রান্সের কাছ থেকে চড়া দামে কৃষিজাত পণ্য কেনার মানে লোকসান গোণা। কিন্তু ফ্রান্সের শর্ত ঃ বৃটেন যদি কমন মার্কেট থেকে না কেনে তবে তাকে এ-বাবদে ফ্রান্স ও ইতালীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে যার পরিমাণ বছরে ৭৫০ মিলিয়ন ডলারের কম হবে না। কিন্তু বৃটেনের পক্ষে অসুবিধে হলো যে যদি চড়া দামে পণ্য খরিদ করে তবে দেশে খাদ্যশস্যের দাম শতকরা ১৫ ভাগ বেড়ে যাবে। এ-ঝুঁকি সে নেয় কেমন করে?

দ্বিতীয়ত ফ্রান্স আন্তর্জাতিক বাজারে মার্কিন ডলার এবং বৃটিশ পাউন্ডের আধিপত্যও স্বীকার করতে চায় না, সে চায় ফ্রান্সের ফ্রাঁ-ও সমান মর্যাদালাভ করুক। এ-বিষয়ে বৃটেন চট্ করে রাজী হবে কি না ফ্রান্সের সন্দেহ রয়েছে। তৃতীয়ত ফ্রান্সের ধারণা, বৃটেনকে কমন মার্কেটে নিলে তাদের বোঝাই বাড়বে, লাভ হবে না কিছুই কারণ বাজারে বৃটেনের দেনা রয়েছে প্রচুর, ১৩ বিলিয়ন ডলার আর মজুত স্টার্লিং-এর পরিমাণ মাত্র ৩ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু এ-ব্যাপারে বৃটেনের বক্তব্য হলো, বিদেশে বৃটেনের কোটি কোটি স্টার্লিং মূলধন নিয়োগ করা রয়েছে।

এ-কথা সত্যি যে, কমন মার্কেটের আর পাঁচ জন সদস্য বৃটেনকে ক্লাবে নিতেই চান। [illegible] লোক যথেষ্ট আছেন যাঁরা সম্মিলিত ইয়োরোপে বৃটেনকে পেতে চান। অবশ্য অন্যদিকে কমন্সের বিশিষ্ট সদস্য এবং লেবার পার্টির চেয়ারম্যান মিঃ শিনওয়েল কমন মার্কেটের সদস্য পদের জন্যে বৃটেনের কাঁদুনির বিরোধী, কমন্সে তিনি একটা জোরালো বক্তৃতাও দিয়েছেন। কিন্তু বৃটেনের অধিকাংশ লোকই কমন মার্কেটের পক্ষে। কিন্তু কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম, সে-কর্তাকে চটাবার সাহস যে কোন সদস্য রাষ্ট্রের নেই। কারণ কমন মার্কেটে থেকে তাদের যে আর্থিক সুবিধে হচ্ছে তা তারা ত্যাগ করতে কিছুতেই রাজী নয়।

ফ্রান্স বৃটেনকে হয়তো সহযোগী সদস্যপদ নিতে বলবে। কিন্তু এই জন্যেই কি প্রধানমন্ত্রী উইলসন এত দৌড়-ঝাঁপ করেছিলেন? সহযোগী সদস্যপদ নেওয়া মানে ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া। কিন্তু কমন মার্কেটে বৃটেনের কোনো প্রভাব থাকবে না—এ-অবস্থা সে চিন্তাই করতে পারবে না। কারণ, আর যাই হোক, বৃটেন বৃটেন, সে গ্রীস, ইস্রায়েল কিম্বা নাইজেরিয়া তো নয়।

জাপান ঃ

সাধারণ নির্বাচন শেষ হলো, ফলাফল যা হয়েছে তা মোটের ওপর আশানুরূপ হলেও কয়েকটি চমকপ্রদ ঘটনাও ঘটেছে। ইশাকু সাতোর লিবারেল ডেমোক্রেটিক দল আবার সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে, তার চেয়েও বড়ো কথা, পার্টিতে মিঃ সাতোর অবস্থার উন্নতি ঘটেছে।

এ-নির্বাচনটা নির্ধারিত সময়ের দশ মাস আগে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগিয়ে দেবার কারণ হলো, মিঃ সাতো তাঁর নিজের এবং দলের জনপ্রিয়তার প্রমাণ দিতে চেয়েছেন যেমন চেয়েছিলেন ১৯৬৩ সালে সেদিনকার প্রধানমন্ত্রী মিঃ ইকেদা। মিঃ সাতোর উদ্দেশ্যও সফল হয়েছে। কারণ দেখা গিয়েছে যে নির্বাচনে তাঁর দল, ক্ষমতাসীন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি ডায়েট (নিম্নতর পরিষদ)-এর মোট ৪৮৬টি আসনের মধ্যে ২৭৭টি দখল করেছেন। যদিও তাঁরা গত '৬৩-র নির্বাচনের চেয়ে ৬টি আসন কম পেয়েছেন, তবুও অনুমান করা যাচ্ছে যে, নির্বাচিত নির্দলীয়দের মধ্যে অন্তত ৬ জন এই দলে যোগ দিয়ে দলের শক্তি আবার ২৮৩'তে তুলবেন। মিঃ সাতোর ব্যক্তিগত জয়লাভ এখানে যে নির্বাচিত ২৭৭ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র সাতো-বিরোধীর সংখ্যা ৫০-এর বেশি হবে না।

জাপানের প্রধান বিরোধী দল জাপান সোস্যালিস্ট পার্টি পেয়েছেন ১৪০টি আসন, অর্থাৎ আগের চেয়ে ৪টি আসন কম। ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট পার্টি জাপান সোস্যালিস্ট পার্টির দল-ছুট দল। কিন্তু ১৯৫৯ সনে তাঁরা নতুন দল গঠন করার পর নিজেদের শক্তি ক্রমশ বাড়িয়েই চলেছেন। কারণ, ১৯৬০ সালে এঁদের ছিলো ১৭ জন সদস্য, ১৯৬৩ সনের নির্বাচনে এঁরা পেয়েছিলেন ২৩টি আসন, আর এবার পেলেন আরো ৭টি অর্থাৎ ৩০টি। সবচেয়ে কৃতিত্ব বেশি কোমিতো (পরিচ্ছন্ন, দুর্নীতিমুক্ত সরকার) দলের। পশ্চিমবঙ্গের বাংলা কংগ্রেসের মতো এঁরাও শাসকপার্টি থেকে বেরিয়ে এসে এই প্রথম নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেন; আর মাঠে নেমেই গোলের ছড়াছড়ি! ২৫টি আসন দখল করেছেন এঁরা। জাপানের কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটে নি, ১৯৬৩ সালের মতো এবারও তাঁরা মাত্র ৫টি আসন লাভ করেছেন ১২৩টি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

সাতো এবং লিবারেল ডেমোক্রেটিক দলের জয়লাভের ফলে জাপানের পররাষ্ট্রনীতি অপরিবর্তিত থাকবে বলেই মনে হচ্ছে, যদিও আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এখানে-সেখানে কিছুটা অদল-বদল করে নেওয়া দরকার। নতুন ডায়েটে দলের ৬৮টি আসনের মেজরিটি থাকবে সন্দেহ নেই, কিন্তু নির্বাচনী যুদ্ধে তাঁদের যে কী বাধা সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো তা তাঁরা ভুলবেন কেমন করে? বাস্তবপক্ষে, লিবারেল ডেমোক্রেটিক দল যে এত আসন লাভ করবে এতটা বোধ হয় তাঁরা নিজেরাও আশা করতে পারেন নি। প্রথমত দলের মধ্যে বিভেদ দেখা গিয়েছিলো, উপদলীয় কোন্দল কয়েকটি ক্ষেত্রে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিলো। দ্বিতীয়ত মিঃ সাতোর জনপ্রিয়তাও অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছিলো, তাঁর দলের নেতাকেই শোনা গিয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সমালোচনা করতে। অর্থাৎ সাতোর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে একটা গ্রুপ

সাতো

গড়ে উঠেছিলো। আর দলের যাঁরা বাইরে, তাঁরা তো কঠোর ভাষায় আক্রমণ করতে ছাড়েন নি সাতোকে।

তৃতীয়ত সাতো সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির বহু অভিযোগ শোনা গিয়েছিলো: স্বজনপোষণ বা দলের অযোগ্য লোককে চাকরী দেওয়া বা নানারকমের সুযোগ-সুবিধে দেওয়ার জন্যে সাতো সরকারের বিরুদ্ধে সারা জাপানে সমালোচনার ঝড় উঠেছিলো। এবং এই কারণেই কিছু সংলোক দল থেকে বেরিয়ে যান এবং নতুন দল করে লিবারেল ডেমোক্রেটিক দলের বিরোধিতা করেন। চতুর্থত সাতো সরকারের মার্কিন তোষণ নীতি বিরোধী সোস্যালিস্ট কমিউনিস্ট দলগুলি ছাড়াও জাপানের বহু সাধারণ লোকও অবমাননাকর বলে মনে করছিলেন। যে জাপ-মার্কিন চুক্তিটির ১৯৭০ সনে পুনর্বিবেচনার কথা আছে তা যেন সাতো সরকার না করতে পারেন তার জন্যেও বিরোধী দলগুলি প্রচার করেছিলেন। জাপ-মার্কিন চুক্তির কারণেও সাতো সরকার জনপ্রিয়তা যথেষ্ট হারিয়েছিলেন। পঞ্চমত জাপানে যে বিদেশী মূলধন বা শিল্প-বাণিজ্য রয়েছে তা রাষ্ট্রায়ত্ত করছেন না বলেও সাতো সরকার সমালোচিত হয়েছিলেন। সাতো সরকারের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ ছিলো, চীনের সঙ্গে তিনি জাপানের স্বাভাবিক, কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করছেন না যদিও বাণিজ্য তিনি ঠিকই করছেন।

এগুলি ছিলো সাতো সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী সোস্যালিস্ট পার্টির প্রধান অস্ত্র এবং টোকিও'র পৌর নির্বাচনের ফলাফল দেখে অনেকে ভেবেছিলেন যে হয়তো সাধারণ নির্বাচনেও শাসকদল লিবারেল ডেমোক্রেটিক দল হেরে যাবেন এবং সোস্যালিস্ট দল শক্তি সঞ্চয় করবেন। সোস্যালিস্ট দল পুরোপুরি রাজনৈতিক পর্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, কিন্তু সাতোর দলের জয়লাভে বোঝা গেলো যে, সরকার তাঁদের প্রধান নীতিগুলির বিশেষ পরিবর্তন করবেন না, আমেরিকার সঙ্গে তার গাঁটছড়া অবিচ্ছেদ্য থেকে যাবে আরো কয়েক বছর। তবে দুর্নীতি ইত্যাদির প্রশ্রয় যদি তিনি এখনো দেন তবে দলের মধ্যে আবার ভাঙন ধরতে কতক্ষণ? কারণ, আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে সাধারণ ভোটার মাথা ঘামায় না ঠিকই, কিন্তু চুরি-জোচ্চুরি তাঁরা বোঝেন বিলক্ষণ!

চীন ঃ

সোভিয়েট-চীন সম্পর্ক এমন পর্যায়ে এসেছে যে যার পরবর্তী স্তর দুই কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে সংঘর্ষ। গত দশ দিন ধরে পিকিঙের সোভিয়েট দূতাবাস কার্যত অবরুদ্ধ; প্রত্যেক দিন লালরক্ষীরা তাকে ঘিরে পাহারা দিচ্ছে, অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করছে সোভিয়েট য়ুনিয়নের বিরুদ্ধে, দূতাবাসের কাউকে বেরুতে দেওয়া হচ্ছে না, কিম্বা কোন অতিথিকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। এ-অবস্থা অকল্পনীয়, কূটনৈতিক শিষ্টাচারের সম্পূর্ণ বিরোধী। সোভিয়েট সরকার চীনের কাছে তীব্র প্রতিবাদ নোট পাঠিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত দূতাবাসের মহিলা ও শিশুদের দেশে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে, সাংবাদিক এবং অন্যান্য রুশ নাগরিককেও ফিরিয়ে আনার কথা ভাবছেন সোভিয়েট

মাও সে-তুঙ

সরকার। সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাইয়ের কাছে এক ব্যক্তিগত চিঠি লিখে চীন ত্যাগকারী রুশ নাগরিকদের সমস্তরকম নিরাপত্তা ব্যবস্থার আবেদন করেছেন।

মস্কোর রেড স্কোয়ারে গত ২৫শে জানুয়ারী কয়েকজন চীনা ছাত্র সোভিয়েট-বিরোধী শ্লোগান দিলে সোভিয়েট পুলিশ তাদের বাধা দেয়। কিন্তু ছাত্ররা সোভিয়েট সরকারের কাছে অভিযোগ করে যে পুলিশ তাদের আঘাত করেছে। ছাত্ররা যখন প্রতিবাদ জানিয়ে রাস্তায় পরিক্রমা করছিল তখন নাকি এখানকার চীনা দূতাবাসের দুজন প্রতিনিধিও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন যা কূটনৈতিক শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ রীতি। এখানকার চীনা—ছাত্রেরা সব চীন ফিরে এলেই সোভিয়েট দূতাবাসের বিরুদ্ধে আক্রমণ তীব্র হয়।

শুধু সোভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধেই নয়, চীন ফ্রান্স সরকারের বিরুদ্ধেও লেগেছে। প্যারিসের চীনা ছাত্ররা এখানকার সোভিয়েট দূতাবাসের বিরুদ্ধে মিছিল করলে ফ্রান্স সরকার তাতে বাধা দেয়। ব্যস, আর যায় কোথায়! পিকিঙের বিপ্লবী ছাত্ররা ফ্রান্স দূতাবাসের একজন কূটনীতিককে প্রচন্ড ঠান্ডার রাত্রে সাত ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখে এবং তাঁর স্ত্রীকে গাড়িতে অন্তরীণ রাখে।

দূতাবাস কূটনৈতিক রীতি-নীতি অনুযায়ী আক্রমণের ঊর্ধ্বে—কিন্তু চীনের বীরপুরুষরা নিজেদের দেশে এই দূতাবাসগুলির ওপর হামলা চালানোই নিরাপদ মনে করেছে। যুগোশ্লাভ দূতাবাসও আক্রান্ত হয়েছে কয়েকটি পশ্চিমের রাজধানীতে। স্বভাবতই সোভিয়েট রাশিয়া ঘটনাগুলিকে সহজ মনে নিতে পারছে না, সোভিয়েট সরকার মনে করছেন যে চীনের মতলব সোভিয়েট রাশিয়াকে চটিয়ে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করুক। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া কখনই আগে এ ধরণের চরম ব্যবস্থা—চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদ করা—নেবে বলে মনে হয় না।

ওদিকে মাও সে-তুঙ তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছেন বলে মনে হয়, লাল রক্ষীরা যে উৎসাহের চোটে বাড়াবাড়ি করে ফেলছে এটুকু তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছেন। তাই তিনি ডাক দিয়েছেন আর যেন চীনা "শোধনবাদীদের" বিরুদ্ধে আক্রমণ করা না হয়, তাঁদের প্রকাশ্যে অপমান, গাধার টুপি পরিয়ে রাস্তায় মার্চ করানো না হয়।

সিংকিয়াঙে প্রচন্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে মাওপন্থীদের। মাও-বিরোধীরা এ-চরমপত্র দিয়েছিলো যে যদি তাদের ওপর বলপ্রয়োগের চেষ্টা হয় তবে তারা সিংকিয়াঙে অবস্থিত চীনের পারমাণবিক অস্ত্র কারখানা দখল করে নেবে বা উড়িয়ে দেবে। শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাইয়ের উদ্যোগে সিংকিয়াঙের শক্তিশালী মাও-বিরোধীদের সঙ্গে একটা রফা হবে বলে মনে হচ্ছে।

অন্যদিকে প্রধান শহরগুলি মাও-পন্থীরা আবার দখল করে নিচ্ছে, যদিও কয়েকটি জায়গায় বিরোধিতা এখনো প্রচন্ড। মাও এখন পিকিঙে নতুন সরকার গঠন করেছেন, যেখানে মাও-বিরোধীদের একেবারে উচ্ছেদ করা হয়েছে। মাও অবশ্য বলেছেন, সহনশীলতার সময় এসেছে, বিরোধীরাও দেশে থাকতে পারেন। আবার সেই 'একশো ফুল ফুটুক' শ্লোগান বোধ হয়। কিন্তু লাল রক্ষীদের নজর পড়েছে এবার ব্যাংক, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, খাদ্য ও শস্যভান্ডারের ওপর। পিকিঙ এবং চীনের শহরে-শহরে নাকি দোকান-পাট লুঠ করে বেড়াচ্ছে লাল রক্ষীরা। ওরা যে একেবারে ক্ষেপে গিয়েছে, উত্তেজনা ছাড়া বাঁচতে পারে না তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে।

অবক্তব্য

চন্দ্রগুপ্ত

বাম কম্যুনিস্টদের প্রতি কংগ্রেসের ব্যক্তিবিশেষের পৃষ্ঠপোষকতা এতই সুবিদিত, সন্দেহ হয়, বাম কম্যুনিস্ট পার্টি আসলে বুঝি কংগ্রেসেরই বাম হাত এবং বাম হাতের কাজগুলি যথানিয়মে চমৎকার সমাধা করে যাচ্ছেন।

তা না হলে কংগ্রেসকে সাহায্য করবার জন্য প্রমোদ দাশগুপ্তেরা তাঁদেরই একদা শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে জনৈক অমিয় চক্রবর্তীকে দাঁড় করাতে যাবেন কেন? কিংবা হঠাৎ যোগেন মন্ডলের মধ্যে জনতার জনকেই বা তাঁরা আবিষ্কার করতে পারবেন কেন? আপাতত অমিয় চক্রবর্তীর প্রসঙ্গেই আসা যাক।

শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তী সম্পর্কে যে-টুকু সারবান তথ্য আমাদের জানা, তা হলো ঃ এক, তিনি এখন আর কোন কলেজের অধ্যক্ষ বা অধ্যাপক নন; দুই, শোনা যায়, জীবনে নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সময়ে এডিশন্যাল কন্ট্রোলার অব একজামিনেশনস-এর পদ লাভ করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতির সম্পাদক শ্রীধীরেন্দ্র-প্রসন্ন সেনগুপ্তের চাকরী খতমে নাকি প্রধান অংশগ্রহণ করেছিলেন (সমিতির প্রাসঙ্গিক পুস্তিকা দ্রষ্টব্য); এবং তিন, তাঁর অধ্যক্ষতাকালীন বিজয়গড় কলেজ সম্পর্কে অনেকগুলি অভিযোগ আছে, যেগুলি বর্তমানে আদালতের বিচারাধীন।

বাম কম্যুনিস্টদের দৃষ্টি সত্যই প্রখর ও সুদূর-বিস্তৃত ঃ অমিয় চক্রবর্তীর মধ্যে তাঁরা যোগেন মন্ডলের শিক্ষক-সংস্করণ খুঁজে পেয়েছেন।

আর সেই হিসাবে একমাত্র বাম কম্যুনিস্ট পার্টিকেই 'শোধনবাদী'র সম্মান দেওয়া যায়।

* * *

অমিয় চক্রবর্তী নামক কোন ব্যক্তি-বিশেষের বিরুদ্ধে আমার কোন ব্যক্তিগত ক্ষোভ নেই। কারণ যে-দেশে যে-কালে প্রায় সবাই আখের গুছতে ব্যস্ত, সেখানে একজন অমিয় চক্রবর্তীকে সনাক্ত করে লাভ নেই। আমার ক্ষোভ বাম কম্যুনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে, যে-পার্টি প্রতি মুহূর্তে নীতিহীনতা এবং দুর্নীতির আশ্রয়ে প্রাতঃস্মরণীয় কার্ল মার্ক্সের নামকে কলঙ্কিত করছেন। একাধারে মার্ক্সবাদ, মাওবাদ, সাম্প্রদায়িকতাবাদ, পুঁজিবাদকে মেলানোর যে চেষ্টা বাম কম্যুনিস্ট পার্টি করে চলেছেন তা কবি অমিয় চক্রবর্তীর একটি কবিতার বিখ্যাত পংক্তি স্মরণ করিয়ে দেয় ঃ 'মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া আর পোড়া বাড়িটার ঐ ভাঙা দরোজাটা/ মেলাবেন।' একই নামের দু'জন লোক কবি অমিয় চক্রবর্তী এবং রাজনৈতিক অমিয় চক্রবর্তী—সংস্কৃতি জগতের দুই প্রান্তের বাসিন্দা, এ কথা বলাই বাহুল্য। তবে দ্বিতীয়জন সময়মতো নিজেকে বাম কমের (বারংবার পুরো নাম লিখতে হলে সময় ও জায়গা লাগে) সঙ্গে মেলাতে পারার কৃতিত্বে প্রথমজন অর্থাৎ কবি অমিয় চক্রবর্তীর বিশ্বাসের সমীপবর্তী হয়েছেন বৈ কি!

কলকাতার বহু প্রেসে বিয়ের পদ্য পাওয়া যায়। সবার বয়ানেই পদ্য তৈরি থাকে—দাদা, বৌদি, মামা, মামীমা, মাসীমা, ছোট ভাইবোন। যার যেমন প্রয়োজন, সে তেমন পদ্য ছাপিয়ে নেয়। ছোটদের ক্ষেত্রে নামগুলি শুধু বসিয়ে নিতে হয়। বাম কমের মুখপত্রগুলির প্রেসেও না কি কিছু ম্যাটার কম্পোজ করা থাকে যেগুলি কখনো ভাঙা হয় না। অর্থাৎ কতকগুলি নির্দিষ্ট শব্দের বুধুনির ম্যাটার আছে যেগুলি প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন লোকের কীর্তিব্যাখ্যানে লাগানো হয়। যেমন, 'এমন মানুষকে, শিক্ষাব্রতীকে, ছাত্রদরদীকে, শিক্ষক ও গণ-আন্দোলনের শরিককে জয়-যুক্ত করে প্রগতিশীল শক্তিকে বাঁচিয়ে রাখুন।' এই পার্মানেন্ট ম্যাটারটি অমিয় চক্রবর্তীর পিছনেই শুধু নয়, শিক্ষার সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ যুক্ত তাবৎ প্রার্থীর গরিমা কীর্তনেই ব্যবহার হয়ে থাকে। কিংবা ধরুন আর একটি অধিক চলতি বয়ান ঃ 'মেহনতী জনতার স্বার্থে যিনি নিজের সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েছেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করে যিনি দেশকে সত্য ও ন্যায়ের পথে নিয়ে যেতে প্রাণপাত দেশের প্রগতিশীল শক্তিকে বাঁচিয়ে রাখুন'; বলাই বাহুল্য এই বয়ান শিক্ষক-অশিক্ষক সকলের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়। সুতরাং বাম কমের প্রার্থীদের প্রচার-ঘনঘটার জন্য ভাবতে হয় না, কারণ সেখানে যোগেন মন্ডল থেকে প্রমোদ দাশগুপ্ত, অমিয় চক্রবর্তী থেকে জ্যোতি বসু সকলেই সমান প্রগতিশীল। সকলেই মেহনতী জনতার প্রতিনিধি, দেশের প্রগতিশীল শক্তির প্রতীক।

বাম কমের প্রতীকটিও তাই খুবই অর্থবহ ঃ এই পার্টির কিছু প্রার্থীর ধার 'কাস্তে'র মধ্যে এবং বাকিদের ভার 'হাতুড়ি'র মধ্যে রূপায়িত। অশোভন শোনাবে কি না জানি না, বাম কমের প্রার্থীদের অনেকের মাথায় ঐ হাতুড়ির ঘা মারলে, মাথা নয়, গোটা হাতুড়িই ভেঙে যাবে।

অতএব সেই হাতুড়ির শক্তিপরীক্ষা অন্যান্য অকংগ্রেসীদের মাথার উপরেই হোক।

* * *

বাম কমের প্রচন্ড রাগ ডাঙ্গে, হীরেন্দ্র নাথ মুখার্জী, রেণু চক্রবর্তী, ভবানী সেন, সোমনাথ লাহিড়ী প্রমুখদের উপর। বুঝতে অসুবিধা হয় না, এ'রা বাম কমের ভীতির কারণ। এবং এ'দের সংগ্রামী ঐতিহ্য এবং মার্ক্সবাদের পাণ্ডিত্য দেশ-বাসীর এতই সুপরিচিত যে এ'দের জীবিতকালে বাম কমের প্রার্থীদের-মার্ক্সীয় নেতা হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া অত্যন্ত দুরূহ। বাম কমকে অগত্যা এবং স্বাভাবিকভাবেই তাই পঙ্কিল পথে নামতে হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত কুৎসা রটনা, মিথ্যা প্রচার ইত্যাদির সাহায্যে তাঁরা দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করবার যত চেষ্টাই করুন না কেন তাতে বিশেষ ফল হবে বলে মনে হয় না। **সম্প্রতি বাম কমের মিথ্যার বেসাতি এতই আকাশস্পর্শী হয়ে উঠেছে, তাতে তিন ধরণের মিথ্যা-সংক্রান্ত যে প্রবচন প্রচলিত, তাকে পাল্টাবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। মিথ্যা প্রসঙ্গে অতঃপর আমাদের প্রবচন ঃ** Lies, Damned Lies and Left Communist Lies.

জানি না এই Lies-এর **সঙ্গে** Chou-en-lie-র কোন সম্পর্ক আছে কি না।

* * *

আমি চন্দ্রগুপ্ত একজন সাধারণ, অতি সাধারণ, ভারতবাসী। রাজনীতির অলি-গলি আমি চিনি না, রাজপথও নয়। সাধারণ শিক্ষিতজন যে-টুকু রাজনীতি বোঝে, আমি তার চাইতে একবিন্দু বেশি বুঝি না। আমার কাছে রাজনীতির অনেক ঊর্ধ্বে দেশ, দেশের মানুষ, সংখ্যায় যারা অগণ্য। এই অসংখ্য মানুষের কথা কি রাজনৈতিকরা ভাবেন? যাঁরা ভাবেন

প্রত্যাশার মৃত্যু ও দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা

কৃত্তিবাস ওঝা

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

মাছের শরীরে আগে পচন ধরে মাথায়। সেই পচন ধরেছিল তাঁদের যাঁরা পশ্চিমবঙ্গের মাথায় বসে আছেন। তাই পরিষ্কার হিসাবে দেওয়ালের লেখায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস পরাজিত হবে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোন একদলের একটি রাজ্যে জয়-পরাজয়ে দেশের কোন ক্ষতি হয় না বরং গণতন্ত্র মজবুত হয়। একনাগাড়ে বিশ বৎসর শাসনযন্ত্র কংগ্রেসের হাতে থাকায় শাসনব্যবস্থা গতানুগতিক হয়ে গেছে এবং রাজ্যের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের দেশকে নূতন কিছু দেবার ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে গেছে। এই অবস্থায় কংগ্রেসের হাত থেকে ক্ষমতা বিরোধী দলের হাতে গেলে পচাধরা মাথায় কিছু নূতন রক্ত জন্মাবার সুযোগ হ'ত, অপরপক্ষে বামপন্থীরা আর কিছু না পারুক নূতন কিছু করবার চেষ্টা করতো। এই কথা কে অস্বীকার করবেন যে, ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত পরিকল্পনা রূপায়ণে শাসকদল কংগ্রেসের যে উৎসাহ-আগ্রহ ছিল আজ সেই উৎসাহ-আগ্রহ একেবারে নেই বললেই চলে। বিস্ময়ের কথা এবং এটা চিন্তাতীত সত্য যে, ভারতবর্ষে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে এমন এক সময় যখন পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার গতি স্তব্ধ হয়ে গেছে।

চতুর্থ পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনার নির্দিষ্ট কার্যকালের কয়েকমাস অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু পরিকল্পনা রূপায়ণে দূরে যাক কাঠামো তৈরি পর্যন্ত হয় নি। যা হোক, এই একটি অসহনীয় অবস্থায় প্রয়োজন ছিল হাত বদলের আর ঢেলে সাজাবার। ক্ষেত্রও প্রস্তুত ছিল, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে ভোটের রায় প্রকাশ করার জন্য বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু, হায়, সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।"

রাজ্যের বামপন্থী দলগুলি এই নির্বাচনের মুখে দাঁড়িয়ে যদি হিসেব করেন, তবে দেখতে পাবেন তাঁরা সকলেই যুদ্ধ করছেন, সকলেই শত্রুর বিরুদ্ধে পাশুপত-শক্তিশেল ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করছেন কিন্তু সেই অস্ত্র যত না নিধন করছে শত্রুকে, তার চেয়ে বেশি নিধন করছে স্বজাতি স্বগোত্র, সংগ্রামসাথীকে। রাজ্যের সবচেয়ে বড় বামপন্থী দল মার্কসবাদী তকমার কম্যুনিস্ট 'পার্টি যতটা উল্লসিত হবেন শ্রীঅতুল্য ঘোষ, শ্রীপ্রফুল্ল সেন, শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ, শ্রীমতি আভা মাইতি, জনাব ফজলুর পরাজিত হলে তার চেয়ে অনেক বেশি আনন্দিত হবেন শ্রীহীরেন মুখার্জি শ্রীইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, শ্রীরণেন সেন, শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী, শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী, শ্রীহেমন্তবসু, ডাঃ কানাই ভট্টাচার্য, শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র পরাজিত হলে। তকমাহীন কম্যুনিস্ট পার্টি যতটা আনন্দিত হবেন শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়, শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশৈল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ পরাজিত হলে তার চেয়ে অনেক বেশি আনন্দিত হবেন—মহম্মদ ইসমাইল, শ্রীমনোরঞ্জন রায়, শ্রীসমর মুখোপাধ্যায় পরাজিত হলে। ফরোয়ার্ড ব্লক যতটা

তাঁদের সংখ্যা ক'জন? গত কয়েক বছরে দিনের-পর-দিন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়ে চলেছে, ক'টা রাজনৈতিক দল সেই দামকে ঠেকানোর চেষ্টা করেছে? দিনের-পর-দিন খাবারে-ওষুধে ভেজাল দিয়ে যারা ফেঁপে উঠেছে, একটি রাজনৈতিক দলও কি অদ্যাবধি ঐ সমাজবিরোধীদের একজনকেও প্রকাশ্যে রাস্তায় এনে জনতার আদালতে দাঁড় করাতে পেরেছে? মুমূর্ষু রোগীকে যখন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ফিরিয়ে দেবার মতো নির্মম দুঃসাহস দেখায়, তখন আমাদের একটি রাজনৈতিক নেতারও সাক্ষাৎ মেলে না কেন? জনৈক রবি সিংহী যখন বলেন 'প্রেসিডেন্সী কলেজ তুলে দেব' তখন কলেজের তথাকথিত রাজনীতি-সচেতন অধ্যাপকদের একজনও সরকারী চাকুরী ছেড়ে প্রতিবাদ জানাবার মতো সাহস দেখাতে পারেন না কেন? যে-রাজনৈতিক নেতারা প্রেসিডেন্সী কলেজের সামান্য কয়েকটি ছাত্রকে গোটা কলেজ বন্ধ রাখতে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ উৎসাহ দিয়ে এসেছিলেন, এখন তাঁরা সেই ছাত্রদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কি একবারও চিন্তা করেন?

হাজার প্রশ্ন। উত্তর একটিঃ বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের রাজনীতি মূলত ব্যক্তির স্বার্থে এবং অতঃপর দলের স্বার্থে পরিচালিত হয়। জনসাধারণ এখানে রাজনৈতিকদের দৃষ্টিবলয়ের বাইরেই অবস্থান করে।

এইজন্যই বাম কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে আমার ক্ষুব্ধ অভিযোগ। তাঁরা যদি দেশের মঙ্গল চিন্তা করতেন, এবং হতেন আর একটু সহনশীল, তাহলে এই নির্বাচনে যে ফল দেখা দিত, তা সারা বিশ্বের শিক্ষণীয় হতে পারত।

কিন্তু বাম কম্যুনিস্টরা ইতিহাসের শিক্ষা ভুলে মীরজাফরের পথ ধরলেন। ভুলে গেলেন, সিরাজের সমাধির উপর স্থাপিত সিংহাসনে মীরজাফর বেশিদিন বসতে পারেন নি। মীরজাফরের পায়ের তলার মাটি অনতিবিলম্বে কেঁপে উঠেছিল। তাঁরও সমাধি রচনা করেছিল।

এবং অনতিবিলম্বেই কংগ্রেসের হাতে বাম কম্যুনিস্টরা যদি চূড়ান্ত লাঞ্ছিত না হন, তাহলে বুঝতে হবে ইতিহাসের চাকা কখনো কখনো থেমে পড়ে।

ইতিহাস কিন্তু কখনো থামে না।

আনন্দিত হবে শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, শ্রীচিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিজয়সিংহ নাহার পরাজিত হলে তার চেয়ে বেশি আনন্দিত হবে শ্রীপীযূষ দাশগুপ্ত, শ্রীহরিদাস চক্রবর্তী, শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য পরাজিত হলে। এস এস পি যতটা আনন্দিত হবে শ্রীঈশ্বরদাস জালানকে হারিয়ে তার চেয়ে অনেক বেশি আনন্দিত হবে কৃষ্ণনগরে শ্রীঅমৃতেন্দু মুখার্জীকে হারিয়ে। এইভাবে আজ সকলে সকলের জয় যতটা কামনা করছে পরাজয় কামনা করছে তার চেয়ে অনেক বেশি। আর এই পরাজয় কামনা করছে এমন ন্যক্কারজনক পথে, যাতে শুধু আজকের নির্বাচনে নয়, ভাবীকালেও কোনদিন সহজে কারো সম্পর্কে আস্থা ফিরে আসবে সেই সম্ভাবনাকে লুপ্ত করে দেওয়া হচ্ছে। আজ এক কম্যুনিস্ট পার্টি আর এক কম্যুনিস্ট পার্টি সম্পর্কে যে সকল তথ্য পরিবেশন করছে, সাধারণ মানুষ যদি সেসবকে সবই অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করে তবে তারা দেখবে গত চল্লিশ বছর যে সকল কম্যুনিস্ট নেতা আমাদের দেশের সামনে আশার আলো ধরেছেন, সেসব মরীচিকা—আর সেই আলোকধারীরা ভণ্ড নীতিহীন-বিশ্বাসঘাতক ও আরো বহু জঘন্য বিশেষণে ভূষিত হবার যোগ্য। নির্বাচনে কংগ্রেসকে পরাজিত করা নয়, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রার্থীকে পরাজিত করা এবার নির্বাচনে কংগ্রেস বিরোধীদের নির্বাচনী যুদ্ধের একমাত্র ফলশ্রুতি। সমস্ত বামপন্থী দলের পশ্চিমবঙ্গে যেসব জননেতা আছেন, যাঁরা কংগ্রেসকে পরাজিত করতে শক্তিশালী, হিসেব করে দেখা যাবে তাঁদের বেশির ভাগ আজ জ্ঞাতিশত্রু দ্বারা আক্রান্ত। একে অপরের চরিত্র হননের শিকার।

এই যে চরিত্র হননের রাজনীতি এই কাজে নিশ্চয়ই বাম কম্যুনিস্ট পার্টির বাহাদুরী সর্বাপেক্ষা বেশি। এই চরিত্র হননের রাজনীতি সৃষ্টিতে এমন কোন প্রশ্ন নেই যে প্রশ্ন বাম কম্যুনিস্ট নেতারা তোলেন নি তাঁদের বক্তৃতা ও পত্রিকা মাধ্যমে। অবশ্য পরে সেই রোগ সংক্রামিত হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বীজানু আমদানীর দায়িত্ব বামপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টির। গত ২৭শে নভেম্বর ময়দানে সর্বপ্রথম শ্রীজ্যোতি বসু শ্রীসোমনাথ লাহিড়ীর বিরুদ্ধে প্রাদেশিকতার কুৎসা বমন করেন।

তারপর একে একে ডান কম্যুনিস্ট নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে কুৎসার জোয়ার আসে। ময়দানের সভায় শ্রীজ্যোতি বসু বলেছিলেন—শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী অবাঙালীর ভয়ে আলিপুর ছেড়ে ঢাকুরিয়া গেছেন। কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে বহু অভিযোগ বহু সময় উঠেছে, কিন্তু কম্যুনিস্টরা প্রাদেশিক বা সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন এই অভিযোগ কম্যুনিস্ট পার্টির শত্রুরাও কখনও করতে পারে নি। কিন্তু যে কাজ অতীতে কম্যুনিস্ট পার্টির ঘোরতর শত্রুরা করতে পারেন নি, সেই কাজ চল্লিশ বছরের ইতিহাসে কম্যুনিস্ট পার্টির এক শরিকরা আর এক শরিকদের বিরুদ্ধে করলেন। 'দেশহিতৈষী' আর অন্ধকারের মুখপত্র 'গণশক্তি' পড়ুন, দেখবেন—রেণু চক্রবর্তী, হীরেন মুখোপাধ্যায়, মহম্মদ ইলিয়াস, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, রণেন সেন, সোমনাথ লাহিড়ী প্রমুখ নেতাকে দেশের লোক এতদিন যা জেনেছে বা ১৯৬৪ সালের আগে পর্যন্ত কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে উক্ত নেতাদের সম্পর্কে যেসব কথা বলা হয়েছে তা সব মিথ্যা। এই নেতারা, সাম্প্রদায়িক, এই নেতারা প্রাদেশিক, এই নেতারা নীতিভ্রষ্ট, এঁরা কেউ জনসংঘ, কেউ নেহরুর দালাল। এঁরা পুলিশের চর, এঁরা বেনামদার কংগ্রেসী। এই সত্যগুলি এতকাল চাপা ছিল এবং বর্তমানে সকলের স্বরূপ প্রকাশ পাচ্ছে। এইসব নেতারাই কিন্তু মাত্র কয়েক বছর পূর্বে, যাঁরা কুৎসা করছেন তাঁদের নেতা ছিলেন এবং যে ক্যাডাররা আজ ক্ষেপে গিয়ে পানিহাটির দেওয়ালে দেওয়ালে রেণু চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে অশ্লীল পোস্টার মারছেন, তাঁরাই এঁদের (রেণু চক্রবর্তী প্রমুখ নেতাদের) দেশের সামনে আদর্শবাদীরূপে উপস্থাপিত করে দেশ ও জনগণের সমর্থন লাভ করেছেন। **কি নির্মম ও নিষ্ঠুর রাজনীতি! কি পঙ্কিল, কি কদর্য ভোটার শিকারের লড়াই! যেখানে অকথ্য কোন কথা থাকে না, অশ্রাব্য কোন ভাষা প্রয়োগ বন্ধ থাকে না।** বেচারা শ্রীহীরেন মুখোপাধ্যায়। হীরেনবাবু কম্যুনিস্ট হলেও এমন মার্গের লোক যেখানে শ্রদ্ধা—দল-মতের মাপে হয় না, যেখানে পাণ্ডিত্য মতবাদের নিরিখে বিচার হয় না এবং যে লোকের মনীষা সর্বস্তরের মানুষের মস্তক নত করায়। কিন্তু সেই লোক আজ চিত্রিত হচ্ছেন সংগ্রামবিমুখ বুর্জোয়া সংশোধনবাদের ঘৃণ্য জীব রূপে। হীরেনবাবু সম্পর্কে বাম কম্যুনিস্ট পার্টির সর্বাপেক্ষা ভদ্র ও শালিন মন্তব্য হল—"হীরেনবাবু আর আগেকার হীরেনবাবু নেই, তিনি বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি রাজনীতির বিষাক্ত আলিঙ্গনে স্বেচ্ছায় ধরা দিয়ে সংশোধনবাদের পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে শাসক পার্টির ও শ্রেণীর স্তাবকে পরিণত হয়েছেন, তিনি নৈতিক আত্মহত্যা করেছেন আজ সম্ভবত শাসক পার্টির ও শাসক শ্রেণীর পরামর্শ মত তাদেরই স্বার্থরক্ষার জন্য মার্ক্সবাদের ও কম্যুনিজমের খোলসটুকু আঁকড়ে ধরে জলুস দেখিয়ে ভোট ভিক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন।"

শ্রীহীরেন মুখোপাধ্যায় সহ কম্যুনিস্ট নেতাদের বিরুদ্ধে যে চার্জসীট প্রচার করা হয়েছে তার মধ্যে প্রধান অভিযোগ হল এই নেতারা কেউ নেহরু-গান্ধীর স্তাবকতা করেছেন, কেউ বিধান রায়ের প্রশস্তি গেয়েছেন, এঁরা চীনের ভারত আক্রমণে সরকারী নীতিকে সমর্থন করে চীনা আক্রমণের প্রতিবাদ সমর্থন করেছেন, এঁরা ট্রেড ইউনিয়নে শ্রমিক স্বার্থ না দেখে মালিক স্বার্থ দেখেছেন। শ্রীহীরেন মুখোপাধ্যায় শ্রীনেহরুর উপর একখানি গ্রন্থ লিখেছিলেন। যে গ্রন্থের নাম "জেন্টেল কলোসাস"। এই বইতে হীরেনবাবু নেহরুর প্রশংসা করে মহা অপরাধ করেছেন। ধরে নিলাম শ্রীনেহরু ছিলেন একজন ছদ্মবেশী শয়তান, তাই শয়তানের জয়গান করে শ্রীমুখোপাধ্যায় শয়তানের কাজ করেছেন, কিন্তু যাঁদের কাছে নেহরু শয়তান আর হীরেনবাবু তাঁর স্তাবকতা করে শয়তানের চরের কাজ করেছেন, সেই দলে কি এই একই অপরাধে অপরাধী কিছু কম আছেন। হীরেনবাবু যদি আজ বুর্জোয়া হয়ে থাকেন (অবশ্য যাঁরা অনেকেই হীরেনবাবুর লেখা সোভিয়েত সম্পর্কিত ও মার্ক্স বিষয়ে পুস্তক পড়ে কম্যুনিস্ট ও মার্ক্সবাদী হয়েছেন) তবে অপরাধের অনেক অপরাধীকে তাঁরা মাথায় করে নাচেন কোন্ আনন্দে। নেহরু সম্পর্কে হীরেনবাবু যখন তাঁর "জেন্টেল কলোসাস" বইতে বলছেন, **"তিনি যথেষ্ট দৃঢ় মত ছিলেন না...তিনি আমাদের সবচেয়ে সুন্দর কিন্তু বিফলকাম দেবদূত, যিনি তাঁর আলোকউজ্জ্বল ডানা দুইটি বৃথাই ঝাপটিয়ে গেছেন"।** একজন **মানুষের জীবন ও তাঁর ব্যর্থতা সম্পর্কে এত নগ্ন সমালোচনা আর কি হতে পারে? কিন্তু এরই বিপরীত দিকে বাম কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ নেহরু সম্পর্কে "নেহরু—এ স্টাডি" প্রবন্ধের ২০২ পৃষ্ঠায় কি বলেছেন শুনুন। "এ কথা যেন ভুলে না যাই যে ভারতবর্ষের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচনায় প্রধানমন্ত্রী নেহরু যে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তা শুধু ভারতে নয়, অন্যান্য অনুন্নত দেশের পক্ষেও প্রগতিশীল তাৎপর্যমণ্ডিত।" হায়! শ্রীনেহরুকে বিফলকাম দেবদূত বলে শ্রীহীরেন মুখোপাধ্যায় আদর্শচ্যুত নেহরু স্তাবক, আর শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ সাচ্চা মার্ক্সবাদী বিপ্লবী কম্যুনিস্ট। শুধু নাম্বুদ্রিপাদ একাই নন, [১৯৬৪ সালের ২৮শে মে তারিখের টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া পত্রিকার অষ্টম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমটি দেখুন] শ্রীএ, কে গোপালন, বি, বাসবপুন্নিয়া, পি, সুন্দরাইয়া, শ্রীজ্যোতি বসু স্বর্গত নেহরুর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে কি বলেছিলেন, "নব ভারতের অন্যতম স্রষ্টা, স্বাধীন ভারতের নির্মাতা, দূরদর্শী রাষ্ট্রবিদ এবং**

ভারতের শ্রেষ্ঠ সন্তানের আজ মৃত্যু হয়েছে। জাতির ইতিহাসে একটা যুগের শেষ হল।" এইখানেই শেষ নয়, শ্রীএ, কে, গোপালন, লোকসভায় স্বর্গত নেহরুর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন কবে বলেন, "তার মত লক্ষ লক্ষ তরুণের রাজনীতিক জীবন শ্রীনেহরুর আদর্শেই গঠিত হইয়াছিল।" এর বেশি আর কতখানি সম্মান, কতখানি শ্রদ্ধা একজন মানুষকে জানানো যায়। শুধু নেহরুর মৃত্যুর পর কেন, দলিল অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কোন প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় জননেতা আছেন যিনি কখনও না কখনও নেহরুর প্রতি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকান নি, নেহরুর প্রতি শ্রদ্ধা জানান নি, নেহরুর নিকট সান্নিধ্যলাভ করে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করেন নি। তাই আজ যদি বিচার করা হয় যে নেহরুর প্রশংসা করলেই তাঁকে বুর্জোয়া হতে হবে, তবে বর্তমান শতাব্দিতে নিখাদ ভেজালহীন একজনকেও কি সংগ্রহ করা যাবে? কিন্তু কথা সম্ভবত তা নয়—এই হীরেন মুখোপাধ্যায় যদি কোনক্রমে বাম দলে নাম লেখাতেন, তবে তিনি কি আজ নিজের দলের মধ্যে এই সমালোচনার সম্মুখীন হতেন। অপমৃত্যু হয়েছে বলে যে হীরেন মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সাচ্চা মার্ক্সবাদী বলে যাকে হীরেনবাবুর বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছেন—তিনি কম্যুনিস্ট হলেন কবে আর মার্ক্সবাদীই বা হলেন কবে? মুন্সীগঞ্জ কলেজের অধ্যাপনা থেকে সুরু করে হিন্দুমহাসভা নেতা ডাঃ মাখনলাল রায়চৌধুরীর ও হিন্দুমহাসভা সমর্থক ডাঃ শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগ্রহ লাভের কাহিনী যদি মনে নাও রাখি, তবুও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতির সম্পাদক শ্রীসুনীল দাস কর্তৃক প্রকাশিত "ইজ দিস্ জাস্টিস?" বইখানিকে কি করে ভুলতে পারি? কেমন করে শ্রীত্রিগুণা সেন আর শ্রী পি কে বসুর ৭।১২।৫৮ তারিখের তদন্ত রিপোর্টটির কথা ভুলে যাই? যা হোক এইসব কথা যাঁরা তুলেছেন, তাঁরা যে দলেরই হোন না কেন, বুদ্ধিমানের কাজ করেন নি। কারণ নির্বাচন প্রার্থীদের এক হাজার জনের মধ্যে বাছাই করলে—কি রাজনীতিতে, কি ব্যক্তিজীবনে কতজন আছেন, যাঁরা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন ও নিজেকে সাচ্চা বলে সার্টিফিকেট দিতে পারেন।

এই রাজনৈতিক চরিত্র হননের পর এসেছে চীনের ভারত আক্রমণে কোন দল আর কোন নেতা কি ভূমিকা নিয়েছিলেন। যাঁরা আজ সমালোচনা করছেন তাঁরা ঐ সময় অনেকে জেলে ছিলেন। তাই তাঁদের কোন বক্তব্য প্রকাশ পায় নি, কিন্তু জেলে থেকেও কি অনেকে জওয়ানদের জন্য রক্ত দেন নি? বিবৃতি দিয়ে সরকারের দেশরক্ষা নীতিকে সমর্থন জানান নি?

কৃত্তিবাস ওঝা সীমিত স্থানের জন্য কোনক্রমেই ১৯৬২ সালের ১৬ই নভেম্বরের বিধানসভার বক্তৃতা তুলে ধরতে সমর্থ নয়। উৎসাহী পাঠকদের অনুগ্রহ করে বিধানসভার ৩১নং সেসনের ৩৩নং বই-এর ১৫ পৃষ্ঠা থেকে ৫১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিধানসভার বিভিন্ন বক্তার বক্তৃতাগুলি পড়তে অনুরোধ করি। সে-দিন কংগ্রেস দলের সদস্য ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র একটি মোশান আনেন। সেই মোশানের উপর একটি সংশোধনী প্রস্তাব এনে শ্রীজ্যোতি বসু, সোমনাথ লাহিড়ী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন। শ্রীজ্যোতি বসু সেদিন তাঁর বক্তৃতায় যে কথাগুলি বলেছিলেন সেই কথাগুলি দেশপ্রেমিক জননেতার বলেই জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আজ যাঁরা অতীতে প্রদত্ত বক্তৃতার পোস্টমর্টেম করছেন তাঁরাও দয়া করে সেই বক্তৃতার মর্মকথাগুলি পোস্টমর্টেম করে দেখবেন নিশ্চয়ই। শ্রীজ্যোতি বসু বলেছিলেন—"আমরা প্রয়োজনের সময় যেখান থেকে খুশি অস্ত্র আনবো, আমরা সার্বভৌম রাষ্ট্র। আমরা কোন অস্ত্র কোথা থেকে আনবো এ নিয়ে কারো বলবার কিছু নেই।" শ্রীজ্যোতি বসু সম্ভবত সেইদিন মনেপ্রাণে ভারতকে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত করে চীনের আক্রমণ প্রতিরোধের ভাবনাতেই এই কথা বলেছিলেন। সেই কথায় কোন দোষ কেউ সেদিন খোঁজেন নি, কিন্তু আজ যত দোষ পড়েছে অন্য দলের উপর। শুধু কি শ্রীজ্যোতি বসু, ১৯শে নভেম্বর বিধান পরিষদের সভায় কম্যুনিস্ট দলের সদস্য ভট্টপল্লীর প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শ্রীজানকীবল্লভ ভট্টাচার্য, শিক্ষকনেত্রী শ্রীমতী অনিলা দেবী যে কথাগুলি বলেছিলেন একটু কার্যবিবরণী খুলে দেখলে ধরা পড়বে সে কথাগুলি দেশের মানুষেরই মনের কথা। আজ অবশ্য অনেকেরই মনে হতে পারে-সবই মায়া, সবই ভূয়া, সেই দিনের কথাগুলি ছিল বুঝি নিতান্তই চামড়া বাঁচাবার তাগিদে। শ্রীমতী অনিলা দেবীর বক্তৃতাটি শুধু বর্তমানে নয়, ভাবীকালের জন্যও স্মরণীয়, কারণ তাঁর মত মাতৃসমা মহিলা সেইদিন ভারতের বীর জওয়ানদের জুতা পালিশ করতে পর্যন্ত চেয়েছিলেন। তিনি একা নন, সমগ্র শিক্ষকসমাজের হয়েই সেইদিন এই কথা রাজ্যের বিধান পরিষদে রেখেছিলেন।

ধনী পিতার কুরূপা বিবাহযোগ্যা কন্যা নিয়ে বড়ই বিপদ। আরো বিপদ যদি গরীব প্রতিবেশীরও বিবাহযোগ্যা একটি সুন্দরী কন্যা থাকে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান নির্বাচনে প্রায় একই সমস্যা দেখা দিয়েছে। ধনী পিতা কুরূপা কন্যাকে বিবাহ দিতে যেমন বরাভরণ বরসজ্জায় ও পণের টাকায় ও গলার ভারে কন্যাকে পাত্রস্থ করতে চান অপরপক্ষে প্রতিবেশীর কন্যাকে নির্গুণা প্রমাণ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন এই ক্ষেত্রেও সেই একই অবস্থা বলা যায়। তাকিয়ে দেখুন পোস্টারে আর প্রচারে চারদিকে এলাহি কান্ড। রেল স্টেশন থেকে সুরু করে শহরের কোন বাড়ির পাশের সাদা দেওয়াল আর খালি নেই। নির্বাচনে এত বেশি দেওয়াল জোড়া পোস্টার, স্টেশনের প্লাটফরম জোড়া নানা রং-এর লেখা, এত বেশি প্রচারপত্র ও পুস্তিকা অতীতে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয় নি। এ বছর এত মাত্রাধিক্যের কারণ কি? এর একমাত্র কারণ কুরূপা মেয়ে পার করার চেষ্টা। সভা ডাকলে মানুষ তেমন ভিড় করে না, কোন বড় বক্তাই আর জনসমাগমের আকর্ষণ নন, কারণ মানুষ আর বক্তৃতার নামে খিস্তি-খেউড় শুনে সময় নষ্ট করতে এবং কান ও মনকে বিড়ম্বিত করতে প্রস্তুত নন। মানুষ যখন সভায় আসবেন না, বক্তৃতা শুনবেন না, তখন তাঁদের শোনাবার জন্য, পড়াবার জন্য এই দেওয়ালই হয়েছে একমাত্র ভরসা। প্রত্যাশার মৃত্যুর এই হলো শেষ পরিণতি। ক্রমাগত একে অপরের বিরুদ্ধে কুৎসা গেয়ে আর মেহের আলির মত "সব ঝুট হ্যায়" বলে জনগণের কাছে নিজেদেরই ঝুটা প্রমাণিত করে ছেড়েছে। মেহের আলি তুমি সত্যই অমর।

এই সব ঝুটা হ্যায় আর একবার শোনা গিয়েছিল নতুন অন্ধ্র রাজ্য গঠিত হওয়ার পর, উপনির্বাচন উপলক্ষে। সাংবাদিক শ্রীরণমিত্র সেনের অন্ধ্রের উপনির্বাচন সম্পর্কে যে রিপোর্টগুলি সেদিন 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, তা আজও মনে পড়ে। রণমিত্র সেন লিখেছিলেন, "মায়াভরমে যাহা দেখিলাম এমনটি আর দেখি নাই"। আবার ভোট গণনার পূর্বে শ্রীরণমিত্র সেন রিপোর্ট করলেন "বেজওয়াদায় রাজ্যের ভাবী মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ লক্ষ জনতার সামনে দর্শন দিলেন আর বললেন—আর মাত্র সাতদিন বাকী, সাতদিন পরে আমরা সরকার গঠন করবো"। সেইদিনের এই ভাবী মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, শ্রী পি সুন্দারাইয়া, আজকের মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির সম্পাদক। নির্বাচনের পরে ভোটফল গণনায় দেখা গেল কম্যুনিস্ট পার্টি পেয়েছে মাত্র ১৫টি আসন। রণমিত্র সেন ছিলেন সেইদিন 'স্বাধীনতা' পত্রিকার রিপোর্টার। আজ স্বাধীনতা নেই তার স্থানে রয়েছে 'গণশক্তি'। হ্যাঁ গণশক্তিও আজ সব ঝুটা হ্যায় বলে আওয়াজ তুলেছেন। মেহের আলি অমর রহে।

—সত্যেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বিপ্লবী প্রভাসের একটি বিস্মৃত অধ্যায়

জাহাজ থেকে পিস্তল উধাও
ও
প্রভাসচন্দ্র দে

আমারে না যেন করি প্রচার
আমার আপন কাজে;
তোমারই ইচ্ছা করো হে পূর্ণ
আমার জীবন মাঝে।
(গীতাঞ্জলি......পৃঃ ১)

কবির গানের এই স্তবকগুলি সেদিন যে সমস্ত বিপ্লবীদের জীবনে অত্যন্ত প্রকট হয়েছিল প্রভাসচন্দ্র যে তাঁদেরই অন্যতম, তার আভাস পাওয়া যায় এই জীবনটির গতিভঙ্গির একটু গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করলে। (ক)

১৯১৬ সাল। সমসাময়িক খবরের পাতা ওল্টালে দেখা যায় এই বছরের জুলাই মাসে, বুধবার, ৫ই তারিখে নিউ ইয়র্ক শহর থেকে "কাসেলমুর" নামে একটি জাহাজ খিদিরপুরের ডকে এসে ১নং শেডে নোঙর করে। প্রকাশ এই জাহাজে ৪০টি করে পিস্তলভরা দুটি বাক্সের চালান এসেছিল মেসার্স ম্যান্টন্ কোম্পানীর নামে। প্রতিটি পিস্তল এক-একটি পিসবোর্ডের বাক্সে মোড়া ছিল। কিন্তু সোমবার, ১০ই জুলাই মাল খালাসের সময় উক্ত দুটি বাক্সের মধ্যে একটি বাক্সে ৪০টি পিস্তল উধাও হয়ে যায়। আর ৪০টি খালি পিসবোর্ডের বাক্সে ভরা একটি শূন্য প্যাকিংকেস কাস্টমস্ হাউসে গিয়ে পৌঁছয়। সংবাদ-পত্রে এই খবরগুলি পরিবেশন করে সেদিন লেখা হয়েছিল—

"The Arms Act Dept. are enquiring"—অর্থাৎ আরমস্ অ্যাক্ট বিভাগ অনুসন্ধান চালাচ্ছে। (এ বি পত্রিকা—১২-৭-১৯১৬) কিন্তু এই অনু-সন্ধানের ফলাফল বা পরিসমাপ্তি কি ভাবে, কোথায় হয়েছিল সেই বিষয়ে আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কেবল দেখা যায় প্রায় দু' বছর পরে উক্ত ম্যান্টন্ কোম্পানীর একজন কর্মচারী ধরা পড়েন একটি পিস্তল সরানোর ব্যাপারে। তিনি ছিলেন ৬৭নং মলঙ্গা লেনের ললিতমোহন দাস। আর তাঁর সঙ্গে আর একজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল, হুগলী জেলার খানা-কুলের মহেশগলি গ্রামের অধিবাসী শ্রীলিপদ ব্যানার্জী, ওরফে রামপদ ব্যানার্জী। অভিযোগ, তাঁরা নাকি ডাকাতির উদ্দেশ্যে ম্যান্টন কোম্পানী থেকে ২৬শে জানুয়ারী ১৯১৮ সালে একটি রিভলবার সরিয়েছিলেন। (এ বি পত্রিকা—১৩।১২।১৯১৮)। ৪ঠা মার্চ ১৯১৮ সালে চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে আরো প্রকাশ যে পূর্বোক্ত ললিতমোহন, ম্যান্টন কোম্পানীতে 'ভাইস্‌ম্যানের' পদে কাজ করতেন আর রামপদ ব্যানার্জী ছিলেন ৪নং মলঙ্গা লেনের একজন গৃহশিক্ষক (খ)। (স্টেট্‌সম্যান—৫-৩-১৯১৮)। আলোচ্য ৪০টি রিভলভার অপসারণের কাজে উক্ত রামপদ ব্যানার্জী, ওরফে রামপদ মুখার্জী, ওরফে রামপদ সরকার, ওরফে রামপদবাবুর প্রচ্ছন্ন কৃতিত্ব কতখানি ছিল এবং ঐ পিস্তলগুলি কিভাবে কাজে লাগান হয়ে-

ক) অধ্যাপক নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন—"আত্মোন্নতির বক্সিং বিভাগ স্থাপিত হইল।...আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী বক্তার রাজমোহন দাশ।...সম্প্রতি তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তাহার এক শোকসভায় উপস্থিত ছিলাম। সেখানে বঙ্গের কংগ্রেসের শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ এক বক্তৃতা করিলেন।......প্রভাস দে সেখানে ......উপস্থিত ছিল। সুরেন্দ্রবাবু তাহার দিকে হস্ত নির্দেশ করিয়া বললেন, 'ইনিই আমার রাজনৈতিক শিক্ষাগুরু'।" (রামধনু—আশ্বিন, ১৩৫৩, পৃঃ ৫১৭)।

(খ) ব্যক্তিগত অনুসন্ধানে জানা যায়, এই রামপদবাবুই ছিলেন অন্যত্র আলোচিত রডা কোম্পানীর পিস্তল লুঠের সময় 'কান্তি মুখার্জী এণ্ড সন্সের' সরকারবাবু। পরবর্তীকালে তিনি উক্ত পল্লীতে রামপদ মাস্টার নামে পরিচিত ছিলেন। তবে বর্ত-মানে তাঁর আর কোন হদিশ পাওয়া যায় না। বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্রের এক নিকট আত্মীয়ের কাছে শোনা তিনি সম্ভবত দেহত্যাগ করেছেন।

ছিল সেই বিষয়ে অপর তথ্য সংগ্রহ করা আজ একটু কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। কারণ এই সমস্ত বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের মূলে যে ব্যক্তিটির প্রচ্ছন্ন সহযোগিতা সংযুক্ত থাকত, বিপ্লবী জগতে গুরুদেব নামে খ্যাত সেই অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (গ) এখন আর ইহজগতে নেই। তবে এই অস্ত্রগুলিও যে যথাসময়ে বিভিন্ন গুপ্ত সমিতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল সেই আন্দাজ করার যথেষ্ট কারণ আছে। আর সেই কারণেই আবার ধরপাকড় শুরু হয়েছিল দেশের চতুর্দিকে পূর্ণ উদ্যমে।

The total number of compulsorily domiciled at present in Bengal under Defence of India Act is 193" অর্থাৎ "ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্টের আওতায় বাংলা দেশে বাধ্যতামূলক নিবেশিতের সংখ্যা মোট ১৯৩ জন।" (এ বি পত্রিকা ২-৮-১৯১৬) এইটি হচ্ছে আগস্ট ১৯১৬ সালে প্রকাশিত রাজবন্দীর পরিসংখ্যান। ম্যান্টন কোম্পানীর উক্ত রিভলভার অপসারণের খবর প্রকাশিত হয়েছিল ১২ই জুলাই ১৯১৬ সালে। অতঃপর ঐ ভারত-রক্ষা আইনের বলে উক্ত ব্যাপারে জড়িত সন্দেহে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন বাংলার সুপ্রাচীন বিপ্লবী নেতা অধ্যাপক প্রভাসচন্দ্র দে ১৯১৬ সালের ২০শে নভেম্বর। (এ বি পত্রিকা ২০।১১। ১৯১৬)। ১২ই জুলাই থেকে ২০শে নভেম্বর—কিঞ্চিদধিক চার মাস সময়ের ব্যবধান। তার কারণ ছিল অনেক গভীরে। ১৯১৬ সালের জুলাই বরাবর সময়ে প্রভাস-চন্দ্র ছিলেন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপক (কৃষ্ণনাথ কলেজ সেন্টেনারি কমেমোরেশন ভলুম, ১৮৫৩-১৯৫৩, পৃঃ ১১০)।(ক) আর এই

(গ) অনুকূলচন্দ্র সম্বন্ধে চট্টগ্রামের বিপ্লবী শ্রীঅনন্ত সিংহ লিখেছেন—"বাংলার সে যুগের বিপ্লবী আন্দোলনের ইতি-হাসে অনুকূলদার দান সর্বোত্তম।.....অনুকূলদা ছিলেন গোপনে অস্ত্র সর-বরাহের কাজে বাংলার বিপ্লবীদের মধ্য-মণি......" (সাপ্তাহিক বসুমতী—১৭-৩-১৯১৬, পৃঃ ২৬০০, ২৬০৪)।

(ক) উল্লেখযোগ্য, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বিপ্লবী বীর সূর্য সেন ওরফে মাস্টারদাও ঐ কলেজের ছাত্র ছিলেন আলোচ্য সময়ে আর ঐ কলেজ থেকেই বি-এ পাশ করেছিলেন ১৯১৮ সালে। (কৃষ্ণনাথ কলেজ সেন্টেনারি ভলুম, ১৮৫৩-১৯৫৩, পৃঃ ৩০৭)। কাজেই ঐ সময়ে তিনিও যে বিপ্লবী-গুরু প্রভাসচন্দ্রের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা লাভ করেছিলেন তার আর সন্দেহ কোথায়। অন্যত্র সেই আলো-চনা করা হয়েছে।

কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন রেভারেন্ড এডওয়ার্ড মন্টেগো হুইলার। (পূর্বোক্ত ভলুম, পৃঃ ১১১)। প্রকাশ হুইলার সাহেব নিজেকে ভারতীয় জ্ঞান করতেন, আর ভারতবাসীকে তাঁর স্বজাতি বলেই গ্রহণ করেছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি ভবিষ্যতের সমস্ত দায়িত্ব নিজের ওপর নিয়ে, পুলিশের রোষ-রুষ্ট সেদিনকার বহু ছাত্রকে আশ্রয় দিয়ে নিজের কলেজ হোস্টেলে ভর্তি করে নিতেন। ঐ কলেজেরই এক প্রাক্তন ছাত্রের ভাষায় (অধ্যাপক মহিতোষ রায়চৌধুরী, এম-এ, বি-এল)—

"Mr. Wheeler who called himself an Indian and a nationalist gave protection to many such students against the wrath of the Police and admitted them in the College as well as in the hostel, taking upon himself the responsibility for their peaceful conduct." (পূর্বোক্ত ভলুম—পৃঃ ১৭৪)।

আবার হুইলার সাহেব ছিলেন প্রভাসচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু। কাজেই রডা কোম্পানীর অস্ত্রলুঠের পর থেকে আলোচ্য সময় পর্যন্ত প্রভাসচন্দ্রকে গ্রেপ্তারের নানা প্রকার ইঙ্গিত পেয়ে হুইলার সাহেবের পরামর্শে ও সম্ভবত চেষ্টাতেও, তিনি কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যাপনা গ্রহণ করে চলে যান ইংরাজীর সিনিয়র প্রফেসর হিসাবে একটি ফ্রি স্টেটের উক্ত কলেজে, বৃটিশ নাগালের খানিকটা বাইরে। কিন্তু আত্মোন্নতি সমিতির প্রথম কর্মসচিব, একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক সংগঠক, বিপ্লবের লেলিহান শিখা যাঁর অণু-পরমাণু থেকে নিঃশব্দে সতত স্ফুরিত, যাঁর নামে সেদিনকার পুলিশের কনফিডেনসিয়াল রিপোর্টের পাতা পরিপূর্ণ, অথচ হাতে-কলমে প্রমাণ সাপেক্ষ, এমন মানুষকে আর তো ছেড়ে রাখা যায় না। তাই তো আলোচ্য ঘটনার বছর দুই পরে রাওলট্ সাহেব বলেছিলেন —যথেষ্ট সাক্ষ্য তাঁদের এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য করেছে যে, বাংলার সেকেন্ডারি ইংলিশ স্কুল ও কিছুমাত্রায় কলেজগুলি বিপ্লবী সংগ্রহের উর্বর কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। (সিডিশন কমিটি রিপোর্ট—প্যারা ১০০, পৃঃ ৭৫)। অস্ত্রসংগ্রহের চেষ্টা ইত্যাদিতে প্রচ্ছন্ন সাহায্য ছাড়াও সেকেন্ডারি ইংলিশ স্কুলে পাঠাবার জন্যে উপযুক্ত শিক্ষক গড়ার কাজে যাঁরা গুরুদায়িত্ব নিয়েছিলেন প্রভাসচন্দ্র ছিলেন তাঁদের মধ্যেও একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

এই কারণেই পুলিশ কর্তৃপক্ষ এবার কুচবিহারের মহারাজাকে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন, প্রভাসচন্দ্রকে তাঁর কাজ থেকে বরখাস্ত করে স্টেটের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যে। ফলস্বরূপ এইভাবে ব্যতিব্যস্ত হয়ে মহারাজা ও দেওয়ানবাহাদুর, শোনা যায় তাঁদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও, প্রভাসচন্দ্রকে শেষে স্টেটের বাইরে পাঠাতে বাধ্য হয়েছিলেন। অতঃপর সংবাদে প্রকাশ—

"Babu P. C. De. . was relieved of his appointment as Professor of CoochBehar College under order of the Maharaja on the 16th and was deported from the State on that date."

অর্থাৎ "১৬ই তারিখে মহারাজার হুকুমে বাবু পি সি দে কুচবিহার কলেজের অধ্যাপকের পদ থেকে অব্যাহতি পেয়ে সেই দিনেই স্টেট থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন।" (এ বি পত্রিকা—২১।১১।১৯১৬)। কিন্তু এই হুকুমের কারণ সম্বন্ধে কোন তথ্যের প্রকাশ দেখা যায় নি। প্রভাসচন্দ্রের নিজের উক্তি—"অনিচ্ছা সত্ত্বেও মহারাজাকে পুলিশ এই কাজে বাধ্য করেছিল।" তারপরেই ১৯১৪ সালের "ইনগ্রেস অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট" ও "ফরেন অর্ডিনান্স অ্যাক্টের" বলে তাঁর ওপর নোটিশ জারি করে তাঁকে গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ঐ নোটিশের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল—

"..And whereas the Governor in Council is satisfied that in order to protect the State from attempts to disturb the public tranquility, it is desireable to exercise the power under the said Ordinance in respect of Provash Chandra De....of 15-1 Gobinda Sarkar Lane, Calcutta who entered the Presidency of Bengal after the 5th September, 1914.... Governor....is pleased to direct that the said Provash Chandra De shall be interned temporarily in Midnapore Jail...

By Orders of the
Governor in Council
Sd. J. G. Cunning
Addl. Secretary to the
Governor of Bengal"

"......যেহেতু রাজ্যপাল মন্ত্রণাসভায় বসে সন্তুষ্ট হয়েছেন যে, সাধারণ শান্তিভঙ্গ করার চেষ্টার হাত থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্যে উক্ত অর্ডিনান্স তথা জরুরী বিধি প্রদত্ত ক্ষমতা, কলকাতার ১৫।১ গোবিন্দ সরকার লেনের অধিবাসী প্রভাসচন্দ্র দে'র ওপর প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয় এবং যেহেতু ১৯১৪ সালের ৫ই সেপ্টেম্বরের পরে তিনি বাংলায় প্রবেশ করেছেন, সেইহেতু গভর্ণর তথা রাজ্যপালের নির্দেশ অনুসারে প্রভাসচন্দ্র দে-কে মিদনাপুর জেলে সাময়িকভাবে অন্তরীণ করা হোক......

সভাসদ্ সহ রাজ্যপালের
হুকুম অনুসারে
স্বাঃ জে, জি, কানিং

বাংলা গভর্ণরের অতিরিক্ত কর্মসচিব।"
(এ বি পত্রিকা—২১।১১।১৯১৬)।

হায়! যে সমস্ত মহাত্মার অকৃত্রিম সেবায় দেশের যুবচেতনা সেদিন গৌরবান্বিত হয়ে উঠেছিল, তাঁদেরই পুরোধা প্রভাসচন্দ্র সরকারের চোখে হয়েছিলেন সাধারণের শান্তিভঙ্গকারী, দেশের পক্ষে অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তিত্ব। মনে পড়ে কবির রক্ত-করবীতে বর্ণিত যক্ষপুরীর কথা। মানুষের মানুষ বলে পরিচিত থাকবে না, তারা হবে একটা বিরাট সোনা-তোলা যন্ত্রের আসবাব মাত্র। আর রাজার দ্বারায় নিয়োজিত সর্দারের দল হবে তার চালক। জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ নন্দিনীর আবির্ভাব তারা সহ্য করবে কেমন করে। তারা চায় মানুষের মনুষ্যত্বের দিকটা হজম করে, কেবল শুষ্ক জ্ঞান ও ধর্মের বক্তৃতার দ্বারায় দেশের শান্তি বজায় রাখতে, ধর্মের প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু সেটা যে কখনই সম্ভব নয়, কালের উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে দিনের পর দিন একাধিক কিশোর ও রঞ্জনের আবির্ভাব যে হবেই হবে নন্দিনীকে বার বার আহ্বান জানাবার জন্যে তার প্রমাণ বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টার লুপ্ত পাতা।

প্রসঙ্গত পাঠকের নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছা হবে প্রভাসচন্দ্রের জীবনতরঙ্গের গতিপ্রবাহের কথা। অন্যত্র দেখা গেছে, সেদিনকার বিপ্লবী মহলে জ্ঞানের চর্চার একটা বিশেষ আয়োজন থাকত। ম্যাট্সিনির "ডিউটিজ্ অফ্ ম্যান" বইখানি ছিল তাঁদের শ্বেত গীতা। এইভাবেই উক্ত গ্রন্থের মাধ্যমে প্রভাসচন্দ্রের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল ম্যাট্সিনির মূল মন্ত্রে—

"Unity was to be sought for by armed insurrection; social reforms by political action and education."

"একতা আনবার জন্যে চাই সশস্ত্র বিপ্লব; আর সামাজিক উন্নয়নের জন্যে প্রয়োজন রাজনৈতিক ক্রিয়াশীলতা এবং শিক্ষা।" (ডিউটিজ অফ ম্যান—ম্যাট্সিনি......পৃঃ xiv)। এই সত্যে নির্ভরশীল যে সকল মহাত্মার অকৃত্রিম সেবায়

খেলা

সুদীপা ভাদুড়ী

বাগানে ছেলেরা খেলছে; খেলাঘরে ভোট ফর খেলা।
শহর, গঞ্জ ও গ্রাম, দেশসুদ্ধ সাজানো হয়েছে।
কেউ বা ফেস্টুন হাতে, কেউ সাঁটে দেয়ালে পোস্টার।
নানান প্রতীক আছে; এমন কি ব্যালট পেপার।
দেখলে যেন মনে হয়, বদলে যাবে দিন এই বেলা।

একেক দলের মুখে বাচনিক নির্বাচনী ছড়া।
কোথাও শাসকদল; কোথাও বিরোধীপক্ষগুলি
বিচিত্র কলহে মত্ত। তারি মধ্যে দুম্‌ধাম্নে গুলি,
ব্যাক ডোরে পারমিট—যেন সব কিছুরই মহড়া।

দেশের নাড়ীটা ধরে ছেলেদের কী ভীষণ খেলা।।

প্রত্যয়

জীবন দত্ত

অর্ধ শতাব্দীর পথ অতিক্রান্ত। দীর্ঘ বালিয়াড়
কোথায় সীমানা শেষ?—নিরুত্তর উপান্ত দৃষ্টির
একটানা খরস্রোতে বহমান অনাদ্যন্ত নদী
আপন খেয়ালে অন্ধ;—ব্যর্থ পলিমাটির সন্ধান।

মহুয়ার গন্ধ নিয়ে ভেসে আসে দূরের বাতাস
আনমনা নদীস্রোতে ভেঙে পড়ে জ্যোৎস্নার আলো
ময়না কাঁটার ঝাড় সুবিন্যস্ত দ্যোতনায় ঋজু
অশরীরী আগন্তুক চেতনার দুয়ারে প্রহত।

অন্বিষ্ট জীবনকাব্য; অসমাপ্ত তুলিধৃত রেখা
কবিতা, তোমার প্রাণ-সঞ্চারিত যে-আবেগ-স্রোতে
ফুলের কুঁড়ির বুকে আজো তার শুনি দৃপ্ত ভাষা
সম্মুখের বালিয়াড়ি আঁধিয়ারী দীপ্ত সে প্রত্যয়ে।

বিদ্যুৎপ্রবাহ যদি জলদের সমাপ্তি-সূচনা—
ঘন প্রত্যাশার মেঘে প্রতিশ্রুত বজ্রের নির্ঘোষ।

দেশের যুবচেতনা গৌরবান্বিত হয়েছিল, তাঁদেরই মধ্যে প্রভাসচন্দ্র ছিলেন একটি বিশিষ্ট দিগ্‌দর্শী। পিতা যোগেন্দ্রনাথ দে সরকার আর মাতা সুরবালার গর্ভে প্রভাসচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল ১৮৮৫ সাল, মে মাসের ১৯শে তারিখে—মধ্য কলকাতার ১৫।৩ গোবিন্দ সরকার লেনের পৈত্রিক ভিটায়। পিতামাতার একমাত্র স্নেহের দুলাল প্রভাসচন্দ্রের পাঠাভ্যাস শুরু হয় বঙ্গবাসী কলেজিয়েট স্কুলে। আবাল্য বিপ্লব-চেতনায় প্রাণবন্ত ছেলেটি প্রথম বিভাগেই এন্ট্রেন্স পাশ করেন ১৯০০ সালে, আর আই-এ ও বি-এ পাশ করে নেন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে যথাক্রমে ১৯০২ ও ১৯০৪ সালে। উল্লেখযোগ্য শেষোক্ত দুটি পরীক্ষাতেই তিনি বৃত্তিলাভ করেছিলেন আর তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন স্বনামধন্য অধ্যাপক রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ (পরবর্তীকালে রিপন তথা সুরেন্দ্রনাথ কলেজের প্রিন্সিপাল), নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য, নৃপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী জোতিষচন্দ্র ঘোষ (বিপ্লবী জ্যোতিষচন্দ্র) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। আত্মোন্নতি সমিতির সভ্য-তালিকায় এই নামগুলি দেখা যায়। অতঃপর ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ঘনিষ্ঠভাবে লিপ্ত থাকায় প্রভাসচন্দ্রের পক্ষে আর যথাসময়ে এম-এ পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় নি। তাই শেষে তিনি ১৯০৭ সালে এম-এ ও বি-এল দুটি পরীক্ষাই একসঙ্গে পাশ করে নিয়ে আলিপুর কোর্টে বিখ্যাত আইনজীবী গোপাল সরকার (শাস্ত্রীর) জুনিয়ার হিসেবে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন।

অন্যত্র আলোচিত 'বাংলার গুপ্ত সমিতি ও আত্মোন্নতির গোড়ার কথা' শীর্ষক অধ্যায়ে (সাপ্তাহিক বসুমতী—২১-৪-১৯৬৬, পৃঃ ২৯০৪-২৯০৮) আত্মোন্নতি সমিতির আদি সভ্য হিসেবে হরিশ্চন্দ্র শিকদার; ইন্দ্রনাথ নন্দী প্রমুখ বিপ্লবীদের নাম দেখা গেছে। তাঁদেরই সংস্পর্শে এসেছিলেন প্রভাসচন্দ্র ১৮৯৯ সালের কোন সময়, আর তারই ফলস্বরূপ আত্মোন্নতি সমিতির গুপ্ত সমিতিতে রূপান্তর ঘটে উক্ত খৃস্টাব্দেই। আবার অনেকটা শুরু থেকেই এই গুপ্ত সংস্থার হৃৎপিণ্ডে পরিণত হন ঐ মানুষটি তথা প্রভাসচন্দ্র। অতঃপর আলিপুরের উকিল অবস্থাতেই তাঁর ওপরে পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি পড়ায় তাঁকে ক্রমে আইন ব্যবসা ত্যাগ করতে হয় এবং বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের প্রিন্সিপাল ও বন্ধু মিস্টার হুইলারের আমন্ত্রণে উক্ত কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপকের পদে যোগ দেন। অনেকটা এই সময়ে, ১৯১২ সাল, প্রভাসচন্দ্র কলকাতার মাণিকতলা নিবাসী রমেশচন্দ্র ঘোষের প্রথমা কন্যা জগৎলক্ষ্মীর পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু অন্যত্র আলোচিত হুইলার সাহেবের ওপর উপর্যুপরি ইঙ্গিতের ফলে তিনি শেষে কৃষ্ণনাথ কলেজ ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং কুচবিহারের ভিক্টোরিয়া কলেজে ইংরাজীর সিনিয়র প্রফেসরের পদে যোগ দেন। কিন্তু সেখানেও তিনি যে স্থিরভাবে বসবাস করতে পারেন নি সেই আলোচনা আগেই করা হয়েছে। অতঃপর জেনারেল অ্যাম্নেস্টির সময় জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর অধীনে ইংরাজী দৈনিক 'সারভেন্ট্' পত্রিকার সম্পাদনা করেন কয়েক বছরের জন্যে। এই সময় দেশবন্ধুর প্রেরণায় ও অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ বিপ্লবীদের সহযোগিতায় 'মহাজন ব্যাঙ্ক' নামে এক প্রতিষ্ঠানের সূচনা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ ব্যাঙ্ক কয়েক বছরের মধ্যেই দেউলিয়া ঘোষিত হয়। অতঃপর বন্ধু ও অধ্যাপক রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের চেষ্টায় এবং ক্যাপ্টেন জে এন ব্যানার্জীর সৌজন্যে (ভারতের রাজনৈতিক কর্ণধার সুরেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ) প্রভাসচন্দ্র রিপন কলেজে (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) অধ্যাপনা করেন ১৯৩১ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত। তারপরে তিনি অধ্যাপনা করেন মণীন্দ্র কলেজে ১৯৫১ সাল অবধি। ১৯শে জুলাই ১৯৫৪ সালে একমাত্র সন্তান শ্রীমান প্রশান্তের কাছে ব্র্যাসান্ কোলে অবস্থানের সময় প্রভাসচন্দ্র শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। (এই তথ্যের অধিকাংশই শ্রীমান প্রশান্তের সৌজন্যে ব্যক্তিগতভাবে সংগৃহীত)।

জীবনটির এই সংক্ষিপ্ত আলেখ্য থেকে এখন মনে হয়, এটা ছিল যেন কবির গানেরই স্পষ্ট প্রতিফলন—

আমার মাঝে তোমার লীলা হবে,
তাই তো আমি এসেছি এই ভবে।
এই ঘরে সব খুলে যাবে দ্বার,
ঘুচে যাবে সকল অহংকার,
আনন্দময় তোমার এ সংসারে
আমার কিছু আর
বাকি না রবে।

(গীতাঞ্জলি, পৃঃ ১৪৯)

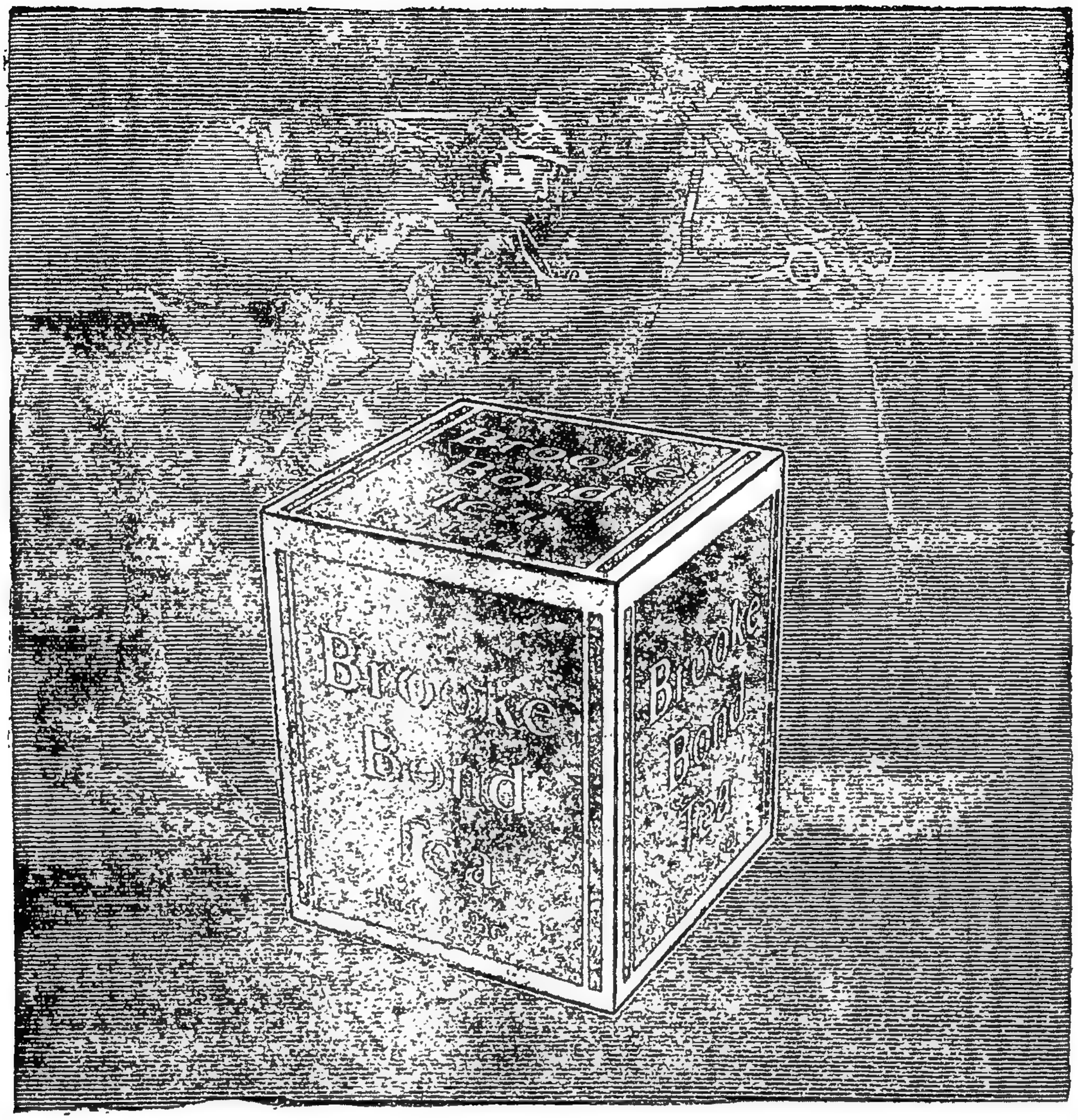

বাজি ধরলেই জিতবেন

স্বাদ-গন্ধের দৌড়ে ব্রুক বণ্ড রেড লেবেল না জিতেই পারে না। সেরা সেরা চায়ের ব্লেণ্ড। প্যাকেট পিছু ঢের বেশী কাপ মনের মত চা পাবেন। আপনার জন্য ব্রুক বণ্ড রেড লেবেল চা।

BB 3676 A

রমণের জিজ্ঞাসা

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

আলোর পাশে আঁধার যেমন, বিজ্ঞানের পাশেও ঠিক তেমনি অজ্ঞানের সহাবস্থান। সাধারণরা এ নিয়ে মাথা ঘামান না; কিন্তু অসাধারণদের কেউ কেউ কদাচিৎ আলোর সামনে এসে দাঁড়ান। আঁধারকে দেখিয়ে বলেন, ওই হল অজ্ঞান। সম্প্রতি সি ভি রমণ বিজ্ঞানের প্রতিবেশী অজ্ঞানের চিত্রটা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। কয়েক মাস আগে এক সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছেন, রকেট ছুটিয়ে জগতের কল্যাণ কিছু হবে না; বরং অকল্যাণের পথই প্রশস্ত হবে। কৃত্রিম উপগ্রহ আর রকেট গড়তে গিয়ে মানুষ যে কোটি কোটি টাকা খরচ করছে, তা' নিছক পাগলামী ছাড়া কিছু নয়। চাঁদ বা মঙ্গলগ্রহকে জানবার জন্যে এত উতলা হবার সময় এখনও আসে নি। মানুষ পৃথিবীকে জানুক আগে; আগে পৃথিবীর মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করুক। তারপর গ্রহে-উপগ্রহে পাড়ি দেবার কথা ভাবা যাবে।

সন্দেহ হচ্ছে, রমণের এই কথায় অনেকেই রুষ্ট হবেন। সবাই যখন বানের জলে ভেসে চলেছে, তখন তাঁকে উল্টো পথে চলতে দেখে অনেকেই বিরক্তি বোধ করবেন। হয়তো বলবেন, রমণ প্রগতিকে বরণ করতে নারাজ। তাই বিজ্ঞানের জয়যাত্রার ভুল ব্যাখ্যা করেছেন।

আমাদের ধারণা কিন্তু অন্যরকম। আমরা বলবো, রমণ ভুল ব্যাখ্যা কিছু করেন নি। বরং রকেট-গড়ার নামে বিশ্ব-জুড়ে যে ছলনা চলছে, সে কথা প্রকাশ করে সত্যিকারের বিজ্ঞানীর কাজ করেছেন। অতএব তাঁকে প্রগতি-বিরোধী বলবো কোন্ সাহসে? সারা জীবনের অক্লান্ত সাধনার মধ্য দিয়ে অজানার তমসাচ্ছন্ন বন্ধুর পথে আলোক হাতে নিয়ে পথ দেখালেন যিনি, আজ কোন্ যুক্তিতে তাঁকে অপবাদ দেবো? বরং আজ অপবাদ দেবার প্রশ্ন ওঠে তাদের, বিজ্ঞান যাদের হাতে ক্ষমতা ও শক্তি-প্রকাশের হাতিয়ার হয়ে উঠছে। অথচ বিজ্ঞানের প্রকৃত ধর্ম আত্মতুষ্টির নয়, আত্মত্যাগের। যথার্থ ধার্মিক যেমন, প্রকৃত বিজ্ঞানীও তেমনি নিষ্কাম ধর্মের সাধনা করেন। বিশ্ব-বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে নিজের ঘরেই শুধু বৈদ্যুতিক আলো জ্বালান নি। বেতারযন্ত্রও আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও মার্কনির ঘরেই বন্দী হয়ে থাকে নি। আলেকজান্ডার ফ্লেমিং-এর পেনিসিলিন নামক ওষুধটি আমার-আপনার সকলেরই কাজে লাগে। রঞ্জন-রশ্মি রঞ্জন সাহেবের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে গণ্য হয় না। এই-রকম আরও অজস্র উদাহরণ দিয়ে দেখান যায়, বিজ্ঞানীর সাধনা যথার্থ নিষ্কাম ধর্মের সাধনা। আদর্শ ধার্মিকের সাধনাও ঠিক তাই। গৌতম-বুদ্ধ বলি, অথবা বলি যীশুখ্রীস্ট বা শ্রীরামকৃষ্ণ,—কেউই শুধুমাত্র নিজ নিজ মুক্তির জন্যে সাধনা করেন নি। প্রত্যেকেরই সাধনার লক্ষ্য ছিল বিশ্বজগতের কল্যাণ। ফলের জন্যে উতলা হন নি এঁদের কেউ; কর্মের জন্যই জীবন উৎসর্গ করেছেন। অতএব যথার্থ ধার্মিকের সঙ্গে বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গীর কোনো পার্থক্য নেই। বিজ্ঞানী মানেই পরহিতব্রতী। আবার পরহিতব্রতী মানেই ধার্মিক। তবে তো বলা চলে, বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের কোনো বিরোধ নেই। উভয়েরই প্রতিষ্ঠা যখন ব্যক্তিগত লাভলোভহীন মঙ্গলাদর্শের উপর; বিরোধের অস্তিত্ব তখন মনগড়া।

আসলেও ঠিক তাই। বিজ্ঞান ও ধর্মের বিরোধটা সত্যি মনগড়া। এই মন-গড়া বিরোধকে প্রাধান্য দিয়ে কালক্রমে আমরা বিরোধের একটা বাস্তব-প্রাচীর গড়ে তুলেছি। বিজ্ঞানকে ধর্ম থেকে আলাদা করেছি এবং বিজ্ঞানবুদ্ধিকে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে শিখেছি। ফলে, বিজ্ঞান নিষ্কাম ধর্মকে ছেড়ে সকাম কর্মকে আশ্রয় করছে এবং বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে ভুল-বোঝাবুঝি ক্রমেই বাড়ছে। কোনো দেশ বিজ্ঞানবিদ্যার কোনো একটা বিশেষ শাখায় এগিয়ে গিয়ে বিশ্বজগতের কল্যাণ কতটা হল, তা' ভাবছে না; ভাবছে, নিজের অহঙ্কার ও শক্তিমত্তার পতাকাটা আকাশ ভেদ করে কত দূর অবধি উঠল, সে কথা। তাই আজ প্রতিযোগিতা চলছে স্পুটনিক পাঠাবার জন্যে; দুঃখ-দারিদ্র্যকে দূর করবার জন্যে নয়। কার স্পুটনিক কতবার কত তাড়াতাড়ি পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করল, তাই নিয়ে আজ রেষারেষি; কিন্তু এ থেকে মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ কতটা হল, তা' নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। চাঁদে যাবার নামে বিচিত্র সব রকেট তৈরি হচ্ছে; অর্থ ব্যয় হচ্ছে জলের মতো; অথচ পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশি মানুষ আজও দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় না। তাছাড়া এই পৃথিবীরই অনেক কিছু জিনিসকে জানা এখনও বাকী থেকে গেছে। এখনও অনেক আলোকের খবর পাই নি আমরা; অনেক অসুখকে সারাবার ওষুধ আবিষ্কার করতে পারি নি। আমরা চলেছি উল্টো পথে। মানুষকে বাঁচাবার আয়োজন না করে মারবার পথটা উন্মুক্ত করে রাখছি। পারমাণবিক বোমা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইতিমধ্যেই বেশ জমে উঠেছে। এখন শুধু মল্ল প্রতিযোগিতায় নেমে বাজী মাৎ করার প্রতীক্ষা।

বলা বাহুল্য এই প্রতীক্ষা মৃত্যুর প্রতীক্ষা।—চরম সর্বনাশ ও ধ্বংসের প্রতীক্ষা। বাজী মাৎ করে যিনি প্রথম হবেন তাঁকে পদক দেবার জন্যে কেউ সেদিন উপস্থিত থাকবেন না। সেদিন উঁচু কোনো বিজয়-মঞ্চের উপর দাঁড়াবেন না তিনি; দাঁড়াবেন তাঁরই নিজের হাতে গড়া কবরের উপর।

সেই কবর খোঁড়ার কাজ ইতিমধ্যেই সুরু হয়েছে। কয়েক লক্ষ করে কবর এক একটি পারমাণবিক বোমার মধ্যে স্তব্ধ হয়ে আছে। রকেটও স্বর্গ-সম্ভাবনা নিয়ে হাজির হচ্ছে না। বরং চাঁদে যাবার অছিলায় ঘরে বসে দূরের মানুষকে নিশ্চিহ্ন করার পথ খুলে দিচ্ছে। বিজ্ঞানের আশীর্বাদ ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে না; কয়েকটি বোতামের মধ্যে আবদ্ধ হচ্ছে। মুষ্টিমেয় মানুষ খেয়াল-খুশি-মাফিক সে বোতাম টিপবে। এবং তারপর চাঁদে-পাওয়া কিছু উন্মাদ মানুষের পাল্লায় পড়ে পৃথিবীরও দশা হবে চাঁদের মতো।

কিন্তু এমন সর্বনাশ না হয় যেন। এত হাজার বছরের এত কঠিন সাধনায় গড়ে তোলা এই সভ্যতাকে ফাঁসী দেবার মতো ট্র্যাজেডী আর যে কিছু নেই! সত্য-দ্রষ্টা বিজ্ঞানীরা তাই সময় থাকতেই সাবধান করে দিচ্ছেন। আইনস্টাইন দিয়েছিলেন। দুঃখ করে একবার তিনি বলেছিলেন, মানুষ পারমাণবিক শক্তিকে নিয়ে এমন ছেলেখেলা করবে জানলে পরমাণুর তত্ত্ব তিনি কিছুতেই প্রকাশ করতেন না। সেদিন চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমণও আবার সাবধান করে দিলেন।

কিন্তু বিজ্ঞানীর কথা আজ কে শুনছে? বিজ্ঞানের ক্ষমতা আজ যদি সাধারণ মানুষের হাতে থাকত অথবা যদি থাকত বিজ্ঞান-সাধকদের হাতে, তবে শোনার প্রশ্ন উঠত। কিন্তু তা' তো নেই। রাষ্ট্রশক্তি আজ বিজ্ঞানশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করছে। রাষ্ট্রের মুষ্টিমেয় কর্ণধার স্থির করছে, বিজ্ঞানকে কীভাবে প্রয়োগ করা হবে। ফলে, বিজ্ঞানী যেমন, জনসাধারণও তেমনি রাষ্ট্রের দিকে তাকিয়ে আছে। আর রাষ্ট্র তাকিয়ে আছে দম্ভ দিয়ে গড়া

নিশানটার দিকে; লক্ষ্য রাখছে কত দূরে সেটা উঠল। নিশান ওড়াবার জন্যে অর্থ ব্যয় করছে অকাতরে; কিন্তু দূরে থেকে নিশানকে যারা দেখছে; তাদের সংশয় কিছুতেই কাটছে না।

অথচ বিজ্ঞানের ধর্ম ঘরে ঘরে কল্যাণের নিশান ওড়াব'র ধর্ম। ব্যষ্টির কুক্ষিগত শক্তিকে সমষ্টির মধ্যে ছড়িয়ে দেবার ধর্ম। এই ধর্ম থেকে মানুষকে বঞ্চিত করার জন্যে কিছু কুটচক্রী রাষ্ট্রনায়কই যে প্রধানত দায়ী এ কথা আজ কোনো মতেই অস্বীকার করা চলে না। ওঁরা মুখে শান্তির কথা বলেন; কিন্তু দূরে ওঁদের জিঘাংসা হিংস্র নেকড়ের মতো ওৎ পেতে আছে। প্রায় ওঁরা পৃথিবীর মানুষকে শান্তির পথে চলবার উপদেশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু প্রশ্ন, শান্তি কে না চায়? সাধারণ-অসাধারণ ছোট-বড় নির্বিশেষে পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষ শান্তিকামী। শান্তি সকলেই চায়; চায় না শুধু শান্তির পরিপন্থী হিংসা, লোভ ও দম্ভকে ত্যাগ করতে। রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে ক্ষমতার লোভ সাধারণের চেয়ে অনেক বেশি। অতএব আগে ওঁরা নিজেদের হৃদয়ের দিকে তাকান। তারপর জনসাধারণের কথা ভাববেন। জনসাধারণকেও শান্তির উপদেশামৃত বর্ষণ করে লাভ নেই। বরং শান্তির পরিপন্থী হিংসা ও লোভকে দমন করবার উদ্যোগ-আয়োজন করলেই ভাল হয়।

কিন্তু সে আয়োজন হচ্ছে কি? বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে কি অগ্রগতির পথে নিয়ে যাচ্ছে? এ সকল প্রশ্নের উত্তরে 'হ্যাঁ' বলতে পারলে খুশি হতুম। কিন্তু মানুষের কয়েকটি বিশেষ ধর্মের কথা ভেবে সে কথা বলতে পারলুম না। সেই ধর্মগুলো হল স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, দয়া, মায়া ইত্যাদি। মানুষ আজ এই নীতিবোধগুলোকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে না; আজ গুরুত্ব পাচ্ছে বিজ্ঞানের বাহিক চাকচিক্য। অথচ ট্র্যাজেডী এই, কা'র ঘরে ক'টা বৈদ্যুতিক আলো জ্বললো তা' দিয়ে তো মনুষ্যত্ব-বিচার চলে না। টেলিভিসনের সামনে বসলেই কেউ বিবেকবান হবেন, এমন কোনো কথা নেই। বিবেকবান হতে গেলে নিজেরা অন্তরের করুণার প্রদীপটিকে আগে জ্বালাতে হবে। নিজের মনের পর্দায় লোভ-ক্ষোভের যে খেলা চলেছে, সে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে হবে।

দুঃখের বিষয়, বিজ্ঞানবিদ্যার বাহ্যিক চাকচিক্যের দৌলতে মানুষের আজ সে অবকাশ নেই। অধিকাংশেরই দৃষ্টি আজ বিজ্ঞান-প্রদত্ত সম্পদের উপর নিবদ্ধ, বিজ্ঞান-লব্ধ সত্যের উপর নয়। কা'র ঘরে কত বেশি আলোক জ্বলল তা' দিয়েই উন্নতির পরিমাপ চলছে এখন। এখন স্পুটনিক ও ক্ষেপণাস্ত্রের মাপকাঠিতে উন্নতির হিসেব নেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু আমাদের প্রশ্ন, স্পুটনিক বা কৃত্রিম উপগ্রহ নিয়ে এত হৈ চৈ কেন? উন্নত দেশগুলোর অনেকে বলে থাকেন, এ হৈ চৈ মানুষেরই কল্যাণের জন্যে। মহাশূন্যে স্পেশ স্টেশান তৈরি করবো আমরা। সে স্টেশান থেকে দূরের গ্রহে-উপগ্রহে পাড়ি দেবো। অজানাকে জানবো। অদেখাকে কাছে দাঁড়িয়ে দেখবো।

কথাগুলো শুনতে খুব ভালো লাগে। মনে হয়, এ তো তবে যথার্থ বিজ্ঞানের ধর্ম। বিজ্ঞানী তো যুগ যুগান্ত কাল ধরে অজানাকে জানবার সাধনায় করে আসছেন। কিন্তু তবু একটা প্রশ্ন থেকে যায়। বিজ্ঞানী অজানাকে জানবার সাধনা করে আসছেন নীরবে; হৈ চৈ করে নয়। সত্যিকারের বিজ্ঞানী মাত্রেই প্রচারবিমুখ ত্যাগনিষ্ঠ ও কল্যাণব্রতী। অথচ স্পুটনিকের বেলায় তা' তো হচ্ছে না! বরং 'উন্নতি করেছি, আমাকে দেখো'—ঢাক বাজিয়ে এই কথা প্রচার করবার আয়োজনটা বেশ নিখুঁতভাবেই হচ্ছে। 'আত্মরক্ষার জন্যে ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করছি, ঘর সামলাব বলে পারমাণবিক বোমা ঘরে রেখেছি', এসব কথাও বেশ ফলাও করেই প্রচার করা হয়। তাই শান্তিপ্রিয় মানুষের মনে মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগে, এ সব কিছু নেহাৎ-ই জঙ্গীবাজী নয় তো? স্পেশ স্টেশান থেকে রকেট মঙ্গলগ্রহের দিকে না গিয়ে পৃথিবীর দিকেই ছুটে আসবে না তো? আত্মরক্ষার জন্যে যে ক্ষেপণাস্ত্রগুলো মজুত করে রাখা হয়েছে, রাষ্ট্রনায়করা ক্ষেপে গিয়ে সেগুলো একদিন নিরীহ মানুষকে তাগ করেই ছুঁড়বে না তো?

জানি নে, চক্রান্তকারী ফন্দীবাজরা মনে কী মতলব আঁটছেন। তবে এটা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি, বিজ্ঞান-বিদ্যার বাইরের জৌলুষকে নিয়ে যতটা মাতামাতি চলছে, ভিতরের সত্যকে নিয়ে ততটা নয়। স্পুটনিককে করে পৃথিবী-প্রদক্ষিণ করছেন যাঁরা, ফুলের মালা জুটছে তাঁদের ভাগ্যে। আর যাঁরা দিনের পর দিন ধরে অক্লান্ত নিষ্ঠা ও অপরিসীম আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে স্পুটনিক আবিষ্কারের পথটিকে সুগম করেছিলেন কেউ তাঁদের নামও করছে না। উদাহরণ দিয়ে বক্তব্যটা খোলসা করা যাক। ধরা যাক গ্যাগারিন ও টিটভের কথা। আজ কে তাঁদের নাম না জানে! একটি বালকও বলে দিতে পারে, এ'রা মহাকাশযাত্রী। স্পুটনিকে করে পৃথিবী-প্রদক্ষিণ করেছেন এ'রা। কিন্তু এ'দের পথ-পরিক্রমার পথটি যাঁরা তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন, ক'জন তাঁদের নাম জানে? ক'জন রাশিয়ার দুই মহাবিজ্ঞানী টিসিয়লকোভস্কি ও জুকোভস্কিব সত্যসাধনার সঙ্গে পরিচিত? সকলের অলক্ষ্যে নিজের ক্ষুদ্র ঘরটিতে বসে টিসিয়লকোভস্কি যখন রকেটের স্বপ্ন দেখতেন তখন ক'জন তাঁকে বাহবা দিত? জুকোভস্কির রাত্রি-জাগরণের সময় ক'জন অনুরাগী ফুলের মালা হাতে নিয়ে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করত?

উত্তরে বলবো, একজনও নয়। কেউ তাঁদের বাহবা দেয় নি। কেউ তাঁদের জন্যে সম্বর্ধনা-সভার আয়োজন করে নি। কিন্তু তবু তাঁরা এগিয়েছেন। অন্তরের

দেশ সেবায় নিয়োজিত,
এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড
কলিকাতা--৫০
নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী
—ব্রাঞ্চ সমূহ—
বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর
বেজওয়াড়া - শ্রীনগর - গৌহাটী

ধ্রুব আদর্শটিকে অনির্বাণ রেখে সারা জীবন পথ চলেছেন।

অপরপক্ষে দশজনের বাহবা পাচ্ছেন যাঁরা তাঁদের পক্ষে এগোন তো খুব সহজ। কোটি মানুষের হাততালির আশায় দুঃসাহসী অভিযাত্রী অনেকেই হতে পারেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, দশজনের বাহবা পেলে কাপুরুষও অনায়াসে প্রাণ দেয়। বলা বাহুল্য, স্বামীজীর আর দশটি কথার মতো এ কথাটিও শাশ্বত সত্য। হলপ করে বলতে পারি, গ্যাগারিন ও টিটভ হবার মতো যুবক আমাদের ভারতবর্ষেও কয়েক লক্ষ মিলবে। কিন্তু তামাম দুনিয়া ঘুরে এলে আজ একজনও টিসিয়লকোভস্কি মিলবে কি না সন্দেহ। ঠিক একই কথা প্রযোজ্য কোভালেভস্কায়া সম্বন্ধে। গণিত-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাশিয়ার এই নারীর অবদান বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। কিন্তু কোভালেভস্কায়া হবার স্বপ্ন নিশ্চয় আজ রুশ মেয়েরা দেখে না। যদি দেখত তবে মহাকাশযাত্রী মেয়ে ভ্যালেনটিনা টেরেশকোভাকে নিয়ে নাচানাচির সময় একবারও অন্তত তাঁর নাম উচ্চারিত হত।

কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, কোভালেভস্কায়াদের আমরা ভুলে যাচ্ছি। টেরেশকোভাদের নিয়ে মাতামাতির যুগ এটা। এ যুগে কৃত্রিম উপগ্রহে উঠে যিনি যত বেশি বার পৃথিবী-প্রদক্ষিণ করে সার্কাস দেখাতে পারবেন, তিনিই তত বেশি বরেণ্য। এটা খুব আশঙ্কার কথা। কেন না এ থেকে সাধারণ মানুষের রুচির যে দিকটি দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠছে, তা' খুব উচ্চাঙ্গের নয়। বেশ বুঝতে পারছি, আমরা যে, বিজ্ঞানের টেকনিক্যাল দিকটিকে বড় করতে গিয়ে মানুষের সাধারণ নীতিবোধগুলো ক্রমেই সংকুচিত হয়ে পড়ছে। আসল সত্যটি আবিষ্কার করেছেন যাঁরা তাঁরা রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' নাটকের বেঙ্কটবর্মার মতো অনাদৃত থাকছেন। আর আদর-অভ্যর্থনার সিংহভাগ পাচ্ছেন যন্ত্ররাজ 'বিভূতি'র দল। ফলে, ক্রমেই আমরা যান্ত্রিক হয়ে পড়ছি। বিজ্ঞান-শক্তিকে সর্বসাধারণের কল্যাণে প্রয়োগ না করে মুষ্টিমেয়ের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে লাগাচ্ছি; এবং এর পরিণতি দাঁড়াচ্ছে বিষময়। বিজ্ঞানবিদ্যায় বলীয়ান কোনো কোনো দেশের স্পর্ধা আকাশস্পর্শী হয়ে উঠছে। আর অবশিষ্ট দেশগুলো অভাবে অভিযোগে ও ব্যর্থতায় মাটির সঙ্গে মিশে যাবার উপক্রম করছে। বছর কয়েক আগে নিরাপত্তা পরিষদ থেকে প্রকাশিত এক পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিগুলো রকেট, স্পুটনিক ও পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র তৈরির কাজে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে তার এক দশমাংশ পেলেও অনুন্নত ও অর্ধোন্নত দেশগুলোর বার্ষিক আয় দশ 'বিলিয়ান' ডলার করে বাড়ত।

কিন্তু এইভাবে দরিদ্র কোনো দেশের জাতীয় আয় বাড়াবার কোনো ব্যবস্থা আজও অবধি হয়েছে কি? উত্তরে বলবো, এরূপ ব্যবস্থা হওয়া তো দূরের কথা, বরং এর উল্টোটাই হয়েছে। উন্নত দেশগুলোর বাজেটে রকেট-স্পুটনিক ও পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের জন্য ব্যয়-বরাদ্দ ক্রমেই বেড়েছে। আর অনুন্নত দেশগুলো সার্কাসে সমাগত গ্যালারীর দর্শকদের মতো উপগ্রহের চরকীবাজী দেখে হাততালি দিয়েছে।

কিন্তু এইভাবে আর ক'দিন? সার্কাস কি রোজ ভাল লাগে? প্রতিনিয়ত হাততালি দিলে হাতে কি ব্যথা ধরে না? মাদ্রাজের সমাবর্তন উৎসবে বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানী সি ভি রমণ এই জিজ্ঞাসাই আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। আমাদেরও ঠিক এই একই জিজ্ঞাসা,— সার্কাস কি রোজ ভাল লাগে?

ভোটের ভেট—

চাতক

দুলাল পাল

ক্রীং-ং-ং-ং.....

চট্ করে বিছানায় উঠে বসলেন সুখেনবাবু। না ঘড়িটা ঠিকমত সজাগ আছে। আলো জ্বাললেন, অন্ধকারে যারা হারিয়ে গিয়েছিল, তারা আলোয় আবার দেখা দিল। সুখেনবাবু দেখলেন, তাঁর স্ত্রী-ছেলে-মেয়েরা ঘুমের রাজ্যের নিশ্চিন্ত অধিবাসী। ওদের দিকে তাকিয়ে সুখেনবাবুর একচোখে তৃপ্তি এবং আর চোখে ব্যথার জল বেরিয়ে আসতে চাইলঃ ওদের এই শান্তি একান্তভাবে তাঁরই সৃষ্ট, কিন্তু এই শান্তি ক'দিন ওরা ভোগ করবে?

দুধের বোতলগুলো খুঁজে যোগাড় করে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় বললেন—দরজাটা বন্ধ করে দিও গো?

রীণার মা'র ঘুম বেশ পাতলা।

সেই অত ভোরে মানে, রাত চারটের সময়, মানুষের লাইন একটা মালার মত রাস্তার ওপর ছড়িয়ে রয়েছে। সুখেনবাবু ব্যস্ত হয়ে নিজেকে সেই মালার অদৃশ্য সুতোয় গেঁথে ফেললেন। ঘরবাড়ির আড়ালে সূর্যের শরীরটাকে দেখা না গেলেও তার আলোর তীব্রতা বাড়ল। অন্ধকার সরে যেতে লাগল। ভাঁটার পরে নদীতীরের ছোটখাটো গাছপালা-ঢিবি জেগে ওঠার মত অন্ধকারের শেষে বাড়ি-ঘরগুলো ভেসে উঠল। যে দিদিমণিরা দুধ দেবেন, তাঁরা এলেন। সুখেনবাবু দেখলেন, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সামনের লাইন দৈর্ঘ্যে বেড়ে চলেছে। বিরক্তিতে তাঁর রগের শিরা এই ভোরবেলাতেই ফুলে উঠল। কিন্তু কি করবেন?

ও দাদা, আপনি আবার কোত্থেকে?

লুঙ্গি-পরা গেঞ্জি-গায়ে চটি-পায়ে ভদ্রলোক সুখেনবাবুর সামনেই বিনা বাক্যব্যয়ে বিনানুমতিতে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাই সুখেনবাবু কথাটা না বলে পারলেন না।

ওই তো—ওই বাড়ি থেকে। ভদ্রলোক নির্বিকারভাবে দুধের দোকানের পাশের লালবাড়িটা আঙুল দিয়ে দেখালেন। ভদ্রলোক ভাল করে দাঁড়িয়ে একটা চ্যাপ্টা টিনের কৌটা থেকে বিড়ি বার করে সুখেনবাবুর দিকে এগিয়ে দিলেন—চলবে নাকি দাদা?

রাগে সুখেনবাবুর শরীরের রক্ত টগ্‌বগ করে ফুটছিল, কিন্তু ভাষায় সেটা প্রকাশ করতে পারলেন না, শুধু বললেন, না।

ভদ্রলোক নিজের মনে বিড়িটা ধরিয়ে

ফুক ফুক করে টানতে লাগলেন। খানিকক্ষণ বিড়িটা টানার পর মেজাজ এল তাঁর; সুখেনবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, খুব রাগ করলেন?

সুখেনবাবু লজ্জায় সঙ্কুচিত হলেন—সেই সকাল চারটে থেকে দাঁড়িয়ে আর আপনি এই......

ছ'টার সময় আসি কেন জানেন? ভদ্রলোক আরম্ভ করলেন, আপনারা তো রাত দশটা থেকে চারটে পর্যন্ত বেমালুম ঘুমুতে পারলেন, কিন্তু আমার ভাগ্যে সেটা নেই। আ রে মশাই, আমার চরম শত্রুর ভাগ্যেও যেন এমন চাকরী না জোটে! এক হোটেলে কাজ করি, সেই সকাল ৮।৯টার সময় বেরিয়ে যাই, ফিরতে ফিরতে রাত ১২টা। তারপর শুতে শুতে রাত ১টা। তা' শুলেই যদি পোড়া চোখে ঘুম আসে? তারপর ঘুমটা যখন বেশ জমজমাট হয়ে আসে, সেই সময় যত ঝামেলা! আপনাদের এই দুধের লাইনের কথা বলছি! আগে ওই বস্তির মুরগির ডাকে ঘুম ভাঙত! সে একরকম ভাল ছিল, কয়েকবার ডেকে চুপ করে যেত। আর এই মানুষের কিচিরমিচির! এ একেবারে বিরামহীন। সেই ভোর চারটে থেকে বিছানায় স্রেফ গড়াগড়ি করি। ঘুমোবার উপায় নেই, মশাই কি পাপ যে করেছি গতজীবনে?

সুখেনবাবু কি আর বলবেন? ভদ্রতার খাতিরে শুধু বললেন, তবু আমাদের কথা তো একবার ভাববেন?

ভাবতাম তো! কিন্তু ভেবে কি করব বলুন? ভদ্রলোক যতদূর সম্ভব নরম হয়ে বললেন, রোজ রোজ আমাকে এই বে-লাইনে ঢুকে সব বে-আইনী কথা-বার্তা শুনতে হয়। তাই ঠিক করেছি আর কিছু ভাবব না।

ইতিমধ্যে ভদ্রলোকের দুধ নেবার পালা এল। উনি দু'বোতল দুধ নিয়ে সুখেনবাবুকে নমস্কার দিতে দিতে বল-লেন, আবার কাল দেখা হবে।

সুখেনবাবু জবাব দিতে গিয়েও হাসলেন না।

॥ ২ ॥

আবার বেরোলেন সুখেনবাবু বাড়ি থেকে। এবার হাতে বাজারের থলে। পথে দেখা হারুবাবুর সঙ্গে।

বাজার- হয়ে গেল?

না হয়ে উপায় কি, সাড়ে আটটায় কারখানায় হাজিরা দিতেই হবে। আপনাদের মত তো আর 'দশটার' বাবু নই আমরা!

তা' মাছটাছ আছে তো? সুখেনবাবু ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করলেন।

থাকবে না কেন? আছে, তবে সেখানে মশাই শকুনের ভিড়। কাঁহাতক আর লাইনে দাঁড়ান যায় এই সক্কালবেলা!

কতবড় লাইন? সুখেনবাবু সময়ের হিসেব পাওয়ার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন।

আপনি যেতে যেতে আবার খানিকটা লম্বা হয়ে যাবে। কি আর বলব আপনাকে?

লাইন দিয়ে দিয়ে হয়রান হয়ে গেলাম!

এতেই হয়রান হয়ে গেলেন? হারু-বাবু সুখেনবাবুকে হয়রানির পাত্তা দিলেন না, থাকেন কোঠাবাড়িতে; ঝামেলা কত কম। আর আমরা? বস্তির লোক মানে নরকের অধিবাসী। বাড়িতে জলের কল। বাইরে জলের জন্য লাইন লাগাও। সুইচ টিপলে আলো জ্বলে না। কেরোসিনের জন্য লাইন লাগাও। আরো কত কিছুর জন্য যে লাইন দিতে হবে, কে জানে?

তা' যা বলেছেন, সুখেনবাবু সহানু-ভূতি প্রকাশ করলেন।

না! আর গল্প করব না। কারখানায় শেষে আবার লাইন লাগাতে হবে। হারুবাবু ব্যস্ত হয়ে পা চালালেন।

সুখেনবাবু বাজারে গিয়ে দেখলেন, তিন-চার জায়গায় বেশ শাঁসালো লাইন হয়েছে। ভাবছিলেন কোনটায় দাঁড়াবেন; ভাবতে ভাবতে পাও কিছুটা চালালেন।

ও দাদা, বলি চোখজোড়া কি আই-ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে এসেছেন? এক অল্প-বয়েসী ছোকরার কণ্ঠস্বর বাজারের কলরব ছাপিয়ে সুখেনবাবুকে সজাগ করল।

সুখেনবাবু পেছন ফিরে আলতো করে তাকালেন।

আহা, দাদা আমার ভোলানাথ! কিচ্ছু বুঝতে পারছেন না! এবার অন্য-জনের গলা।

মাছ কিনতে এসে মাছের মত চোখ খুলে ঘুমোচ্ছেন নাকি? এবার মন্তব্যটা সরাসরি সুখেনবাবুর দিকে ছোঁড়া হল।

সুখেনবাবু এতক্ষণে একটু তেতে উঠলেন, বলছেন কি?

বলছি, এত বড় লাইনটাকে কি মায়া বলে উড়িয়ে দিতে চাইছেন? মাঝ-বয়েসী এক ভদ্রলোক জবাব দিলেন।

মাছের দামটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, সুখেনবাবু জবাবদিহি করলেন।

আহা, ন্যাকাচৈতন আমার! যান! যান! পেছনে গিয়ে লাইন মারুন! গাল-তোবড়ানো রুক্ষ চুল এক বুড়ো লাইনের লেজটা দেখিয়ে দিতে দিতে বললেন।

সুখেনবাবু আর কিছু না বলে থলিটা মুঠোয় শক্ত করে ধরে অন্য একটি লাইনে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

॥ ৩ ॥

কিছু মাছ-তরি-তরকারি কিনে মুদির দোকানে হাজির হলেন সুখেনবাবু। তেল-ডাল-মসল্লার ফর্দটা শুনিয়ে দিলেন মুদিকে। মুদি গম্ভীরভাবে রায় দিলেন—তেল নেই!

নেই! কি বলো হে—আমার বাড়িতে যে......

কি আর করব বলুন? বাজার থেকে তেল উধাও।

সুখেনবাবু ভগবানবিশ্বাসী লোকের মত বললেন, ঠিকমত চেষ্টা করলে তিনি দেখা দেন।

আমাকে শেখাচ্ছেন সুখেনবাবু, মুদি মহাজ্ঞানীর মত বাণীবর্ষণ করতে লাগলেন, দেশে পয়সা দিলে বাঘের দুধ পাওয়া যায় তো সরষের তেল!

সে তো পাওয়া যায়, সুখেনবাবু সখেদে বললেন, কিন্তু বাঘের দুধ তো রাঘব-বোয়ালে-খাবে, আমরা চুনোপুঁটিরা কি খাব?

কেন অষ্টরম্ভা! জবাবটা মুদির জিভে শুধু প্রকাশের অপেক্ষায় ছিল।

ঘণ্টাবাবু, শুনছি নাকি তেল পাওয়া যাচ্ছে না? ঢোলা-ঢালা পাজামা-পাঞ্জাবী পরা পরণে, রুক্ষ বাবরী-চুলধারী ললিত-বাবু হন্তদন্ত হয়ে দোকানে ঢুকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন মুদির দিকে। (ললিতবাবু সৌখীন নাটক করেন)

শুনেছেন কি মশাই। সুখেনবাবু মুদিকে সাহায্য করলেন, এটা রীতিমত ঘটনা। তেলের বোতলটা ললিতবাবুর দিকে উঁচু করে ধরলেন।

ফেলে দিন মশাই তেলের বোতল বাজারের থলে। ঘরে গিয়ে শুধু প্রার্থনা করুন। ললিতবাবু উত্তেজিত হয়ে পড়লেন।

মুদি আগ্রহী হল, কি প্রার্থনা ললিতবাবু?

আর কি প্রার্থনা? এ যুগের প্রার্থনা কি দেবদেবীর কাছে হবে? ওঁরা পৃথিবীকে ত্যাগ করেছেন!

তবে কার কাছে? সুখেনবাবু নিরা-সক্তভাবে প্রশ্নটা করলেন।

সরকারের কাছে। ললিতবাবু মুদির খানার বেঞ্চটায় ভালভাবে নিজেকে স্থাপন করলেন, হ্যাঁ, প্রার্থনা করবেন সরকারের কাছে। বলবেন, হে প্রভো! তোমার স্পর্শ কি পরম শীতল, কি কোমলকুঙ্ক, কিবা অদৃশ্যকরণক্ষম! তুমি তন্ডুল স্পর্শ করেছ, তাই তিনি মর্তলোকে অদৃশ্য; তুমি মৎস্য স্পর্শ করেছ, তাই ধরণী নির্মৎস্য, তুমি সর্ষপ স্পর্শ করেছ, তাই তিনি বৈকুণ্ঠনিবাসী। হে অঘটনঘটন-কারী পরম শক্তিশালী সরকার বাহাদুর,

এই অধমের প্রাণের একমাত্র বাসনা—তোমার ঐ পরম কল্যাণময় হস্তখানি একবার এদের বক্ষদেশে স্থাপন কর, আমার জনম সার্থক হোক।

এই পর্যন্ত বলেই ললিতবাবু হন্ হন্ করে চলে গেলেন।

॥ ৪ ॥

তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে রান্নাঘরে বাজার দিয়ে ছেলেমেয়েদের নিয়ে বসলেন পড়াতে। এদিকে ঘড়ির কাঁটা টিক্ টিক্ করে এগিয়ে চলেছে। ওর সংগে পাল্লা দিয়ে সুখেনবাবু হাঁফিয়ে উঠেছেন। মাথায় তেল দিতে দিতে কলতলায় গেলেন। কোনরকমে 'চান্' সেরে ঝটপট মুখে কিছু দিয়ে, জামার বোতাম আঁটতে আঁটতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু তিনি শান্ত হয়ে বেরোলে কি হবে? বাস-স্ট্যাণ্ডে এক বিশাল জনতা সর্পরূপ ধারণ করে বাসের উদরে যাবার জন্য অপেক্ষা করছে। ঘড়িটা দেখতে দেখতে তিনি লাইনের মাথার দিকে গিয়ে পড়েছেন, আর অমনি—

ও দাদা, আপনি একাই কি অফিসে যাচ্ছেন?

দেওয়ালে আঘাত-খাওয়া রবারের বলের মত সুখেনবাবু চট করে ঘুরে লাইনের শেষে চলে গেলেন। অফিসে তাঁর নামের শেষে লালকালির দাগ পড়ল; কেন না যিনি দাগ মারেন তিনি গাড়ি করে ঠিক সময়ে অফিসে আসেন। বিরক্তিতে সারা দুনিয়াটা তেতো বোধ হল সুখেনবাবুর। নিজের জায়গায় বসেছেন, পিয়ন একাগাদা ফাইল হাজির করল। সুখেনবাবুর ইচ্ছে করল, ওগুলোয় আগুন জেবলে দেন। দিনের শেষে মাতালের মত টলতে টলতে বাসে উঠলেন। ভাগ্য-ক্রমে বসার জায়গা পেলেন বাসে। বাসের দোলানিতে আমেজ আসছিল চোখে।

থামান! থামান!

সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, অনেক কণ্ঠ। এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক ও'র সঙ্গিনীকে নিয়ে উঠলেন বাসে, মহা ব্যস্তসমস্তভাবে। উঠেই কন্ডাক্টরকে নিয়ে পড়লেনঃ

থাবড়ে মাথাটা ঘুরিয়ে দেব, পেয়েছেন কি আপনারা?

বেল কি আমি দিয়েছি। ভিড়ের ভেতর থেকে কে......কন্ডাক্টর একটা জবাব খাড়া করতে যাচ্ছিল।

ফালতু কথা বেশি বলবেন না, প্রৌঢ় ভদ্রলোক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, বলি আপনি আছেন কি করতে? রূপ দেখাতে? আমার মেয়ে যদি মারা যেত......

মারা যাওয়া অত সহজ নয়। ধীর স্থির মেজাজের এক রসিক ভদ্রলোক আস্তে আস্তে কথাটা বললেন।

কি বললেন মশাই? আগুনে ঘি পড়ল।

কি হবে আর ঝগড়া করে? ভদ্রলোক আরো ধীরে ধীরে বললেন, আমরা তো কিছুক্ষণের জন্য বাসে উঠে নেমে যাই, আর ওই কন্ডাক্টর ভদ্রলোক? ও'র কথা একবার ভাবুন তো!

প্রৌঢ় ভদ্রলোক ঠান্ডা হলেন; তবু দেখবেন তো, একটা মেয়েছেলে উঠছে!

আপনি মারা যাওয়ার কথা বলছিলেন না? সে আর এখন সহজ নয়। ধীর-মেজাজী ভদ্রলোক বলে চললেন, সেদিন একটা সাপ্তাহিকে কার্টুন দেখছিলামঃ

একটা মিনার। মিনারের নিচে দশ-বারোজন লাইনে দাঁড়িয়ে। তাদের পরে একগাদা ইটের সারি। এক ছোকরা, বিভ্রান্ত তার চেহারা। সে এসে দাঁড়াতে, একটা রকবাজ ছেলে এসে বলল, লাইন বিক্রি আছে। বিভ্রান্ত ছোকরা জবাব দিল—সেই পয়সাই যদি পকেটে থাকবে, তবে এখানে মরতে আসব কেন? অপূর্ব লাগল কার্টুনটা।

সুখেনবাবুও কার্টুনটার অপূর্বত্ব অনুভব করলেন।

বাড়ি ফিরে জামাকাপড় খুলে হাত-পা ধুয়ে বিছানায় কাৎ হয়েছেন। চোখটা দেয়ালের ক্যালেন্ডারের ছবিতে আটকে গেলঃ বিশাল ধানের ক্ষেত। তারপর নদী। নদীর ধারে ভেড়ীর ওপর দিয়ে চাষীরা চলেছে। নদীর অপর তীরে গাছপালার আড়ালে সকালবেলার সূর্য। দু-একটা পাখি অলসভাবে আকাশে পাখা মেলে।

দেখতে দেখতে সুখেনবাবুর চোখটা জড়িয়ে এসেছিল। রীণার মা একটা ভারী থলে-হাতে দাঁড়াল, ওগো শুনছ? গমটা তাড়াতাড়ি ভাঙিয়ে এনে দেবে?

ছবিটার কথা ভাবতে ভাবতে সুখেনবাবু তাঁর অনিচ্ছুক পা দুটোকে বাড়ির বাইরে বাড়িয়ে দিলেন।

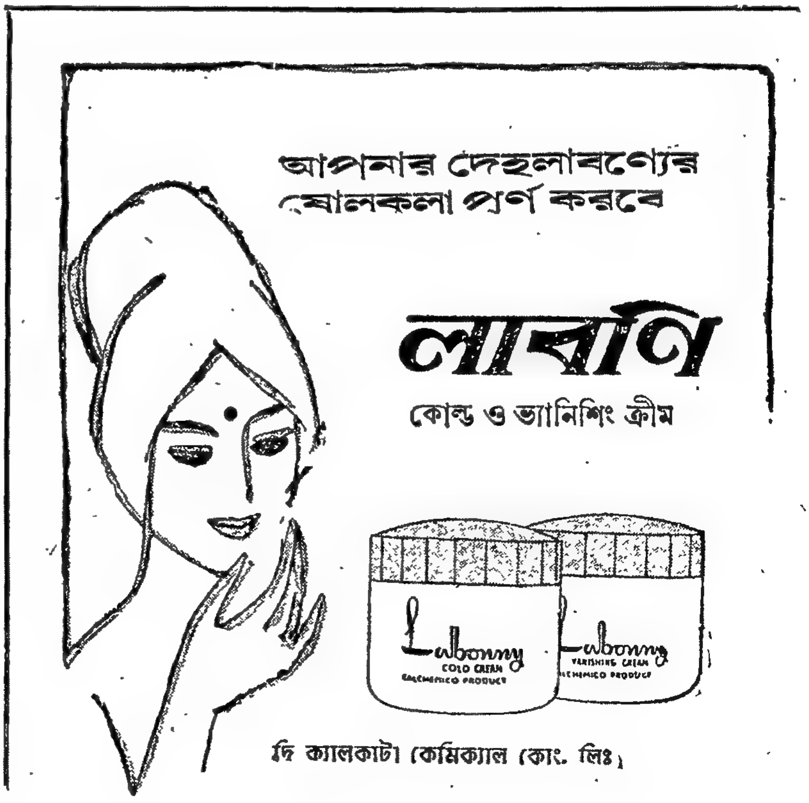

বাঁশরী ও রনতূর্য এর কবি নজরুল : একটি সোভিয়েত মূল্যায়ন

ই· বোরোভিক

কাজী নজরুল ইসলাম একই সঙ্গে বিদ্রোহ ও প্রেমের কবি। দারুণ "অগ্নি-বীণা"—"সর্বহারা", আর মধুর "দোলন-চাঁপা"—"ছায়ানট"-এর সুর একই কাব্য-বীণায় তাঁর হাতে বেজে উঠেছে। নজরুল নিজেই বলেছেন, "আমি কভু প্রশান্ত কভু অশান্ত..."। তাঁর কাব্যে সন্তানহারা বিধবার দীর্ঘশ্বাস, প্রথম চুম্বনস্পর্শের শিহর, মরু ঝরণার কুলুকুলুধ্বনি, চল-চপলা কিশোরীর স্বপ্ন-কামনা সবই এক-সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। কবি সর্বদাই কান পেতে শুনেছেন সেই মানুষেরই কণ্ঠস্বর : ক্রুদ্ধ-ক্ষুব্ধ, আবার মিনতিভরা, ক্লান্ত আবার রুদ্র-প্রচণ্ড, নবীনের আবার প্রবীণের গলা, নারী ও পুরুষের নিভৃতালাপ এবং শিশুর কলস্বর।

মর্মান্তিক পীড়ায় পঙ্গু ও নিশ্চুপ হয়ে যাবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্তও কবির দুই চোখে সর্বদা জাগত দৃষ্টি-খরশান ও ছিল সদাসৃষ্টিশীল হাতে ধরা তাঁর সেই অফুরান লেখনী :

"আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে—
মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে
মোর টগবগিয়ে খুন হাসে...'

আর, এই সৃজনময় রূপেই কবি নজরুল সোভিয়েট জনগণের কাছে প্রতিভাত হয়েছেন ; খুব সম্প্রতিই এদেশে বেরিয়েছে মূল বাংলা থেকে রুশ অনুবাদে তাঁর একটি কাব্যসংকলন।

নজরুল ইসলাম নিজেকে অভিহিত করেছেন, "সত্যের চারণ" রূপে। এর থেকে আর চরম আত্ম-পরিচয় কবির কি হতে পারে? তাঁর সারা জীবনের সৃজন ও কর্ম এই 'সত্যে'রই জন্য সংগ্রামের অসমসাহসী কাহিনী, আর সে 'সত্য' হল ভারতবর্ষের অগণিত সাধারণ মানুষের জীবনসত্য—যে মানুষ খাটে কলে-কার-খানায়, ক্ষেতে-খামারে, নদীতে, খালে-বিলে, গঞ্জে-জনপদে। এই মেহনতী মানুষের জন্যই তিনি গান বেঁধেছেন, গেয়ে গেছেন। তাদের কথাই তিনি বলতে চেয়েছেন, খ্যাতির সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠেও নিজের ব্যক্তিগত খ্যাতির মোহের পিছনে তিনি কোনদিন ছোটেন নি। তিনি লিখেছেন।

"প্রার্থনা করো যারা কেড়ে খায়
তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায়
তাদের সর্বনাশ।"

তাঁর এইসব অনন্য বীরত্বপূর্ণ সাহসিক পঙক্তিগুলি একদিন তাঁর স্বদেশের হাটে-মাঠে-বাটে লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে-ছিল, দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামী বিপ্লবী যোদ্ধারা "ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান"—তাঁর এইসব মহান গানের কলি গলায় নিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে দেশজননীর মুক্তির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

স্বাধীনতার আগে ভারতের অবস্থা ছিল এইরকম। একদিকে বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদের শাসন-পীড়ন-শোষণ ও অন্যদিকে স্বাধীনতার জন্য মরণপণ লড়াই, কবি নজরুল নিজ দেশের জনজীবনের সেই আলোড়নকে, বিদ্রোহকেই ভাষা দিয়ে-ছিলেন। তিনি নিজে এই সংগ্রামে অংশ-গ্রহণ করেছিলেন, নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন বৃটিশের কারাগারে।

এবং শুধু দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্যই নয়, সামাজিক ন্যায়ের জন্যও নজরুলের লেখনী শাণিত তরবারির মত ঝলসে উঠেছিল। সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা ও সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ ছিল নির্মম, ক্ষমাহীন :

"হিন্দু না ওরা মুসলিম?"
ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কাণ্ডারী! বল ডুবিছে মানুষ
সন্তান মোর মার!"

এবং স্বয়ং ভগবানকেও কবি অভিযুক্তের কাঠগড়ায় না দাঁড় করিয়ে পারেন নি, কারণ ওই নাম নিয়েই তো এতো দ্বেষ, হানাহানি ও অন্যায়ের পসরা পূর্ণ করা হচ্ছে :

"এতো অনাচার সয়ে যাও তুমি,
তুমি মহা মহীয়ান!
পীড়িত মানব পারেনাক' আর,
সবে না এ অপমান—
ভগবান! ভগবান!"

বলেন : "আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান
বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন!
আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব
ভিন্ন!"

বাংলার বিদ্রোহী কবি নজরুলের সুবিখ্যাত ও সুদীর্ঘ "বিদ্রোহী" কবিতাটি যখন আমরা পাঠ করি, তখন তার বিপুল প্রাণময়তায় আমাদের স্বতই মনে আসে আমাদের মহান সোভিয়েট কবি মায়া-কভস্কির কবিতা। অক্টোবর মহা-বিপ্লবের প্রাক্কালে মায়াকভস্কি যেসব অগ্নিময়ী কবিতা লিখেছিলেন, যেমন তাঁর নাম-কবিতা "ভ্লাদিমির মায়াকভস্কি", "ট্রাউজার-পরা মেঘ" প্রভৃতি, নজরুলের কবিতায় আমরা সেরকমই এক বিদ্রোহী মানবাত্মার পরিচয় লাভ করি। মায়া-কভস্কিও তাঁর কবিতায় বিদ্রোহের আবাহন করেছিলেন, এই মাটির পৃথিবীতেই মানবস্বর্গ গড়ে তোলার জন্যে জনগণকে সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন। "বিদ্রোহী" নজরুলের কবিতা, আমরা মনে করি, "বিপ্লবী" মায়াকভস্কির কবিতারই নিকট-আত্মীয়,—তার ভাষণমুখরতায়, ধ্বনি-সৌকর্যে, কবিতার চরণগুলির দীর্ঘ ও অবিন্যস্ত বিন্যাসে এবং প্রচলিত কাব্য-রীতিকে অস্বীকার করে বিপ্লবী আবেগ প্রকাশের মহনীয়তায়।

নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতায় মানুষ-কেই সর্বোচ্চ স্থানে বসিয়েছেন। "বিদ্রোহী"তে গেয়েছেন :

"বল বীর
বল উন্নত মম শির......
মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি
চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা ছাড়ি
ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া
খোদার আসন 'আরশ ছেদিয়া'
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি
বিশ্ব-বিধাত্রীর!
বল বীর..."

ভারতীয় নটরাজ-শিবের উপমা দিয়ে তিনি বলেছেন :

"আমি ধূর্জটি, আমি এলোকেশে
ঝড় অকাল-বৈশাখীর!
আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত
বিশ্ব-বিধাত্রীর!
বল বীর..."

"সাম্যবাদী" কবিতায় বলেছেন :

"গাহি সাম্যের গান—
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব
বাধা-ব্যবধান..."

গ্রন্থমেলা

ক্যালেন্ডার কাহিনী—অজিত সেন। গ্রন্থবিতান। ৭৩বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড। কলিকাতা-২৬। দামঃ দুই টাকা।

অতি প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন দেশে ক্যালেন্ডারের উৎপত্তি ও তার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে লেখক অজিত সেন সুললিত ভাষায় এই বইতে আলোচনা করেছেন। ক্যালেন্ডারের প্রচলন পৃথিবীর মানুষ সভ্যতার পথে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলতে পারা যায়। বস্তুত অতীতে মানবের কর্মতৎপরতা ক্রমশ কিভাবে দেশ ও কাল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দেশে ক্যালেন্ডার প্রচলন হয়েছে তারই সম্যক আলোচনা সমগ্র গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য।

পৃথিবীর সব জায়গাতেই নিজস্ব ভঙ্গিতে ক্যালেন্ডার রচনার চেষ্টা চলেছে। ক্যালেন্ডারের উপকরণ তিনটি—প্রথমটি পৃথিবীর আহ্নিকগতি, দ্বিতীয়টি চান্দ্রমাস, তৃতীয় সৌরবৎসর। এর উপর ভিত্তি করেই বিভিন্ন দেশের ক্যালেন্ডারের প্রচলন হয়েছে। কিন্তু বছরের দিন মেলাতে গিয়ে নানারূপ সমস্যায় জড়িত হয়ে পড়েছে বিভিন্ন দেশের পন্ডিতেরা। কোনরূপ সর্বগ্রাহ্য ক্যালেন্ডার তৈরি করতে সক্ষম হন নি। পৃথিবীর সর্বদেশে সর্বপ্রথম সৌর চান্দ্রমাস ক্যালেন্ডার প্রচলন ছিল। পরে অনেক দেশে চন্দ্রকে বাদ দিয়ে সূর্যকে নিয়ে ক্যালেন্ডার রচিত হয়। রোমান ক্যালেন্ডার সূর্যকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি। এখানে পূর্ণিমা বা অমাবস্যার কোন স্থান নেই। আবার ইসলামীয় ক্যালেন্ডারে সূর্যকে বাদ দিয়ে চাঁদের সাহায্যে বছর গোনা হয়। এ ক্যালেন্ডারে আর জুড়ে দেওয়া মাস নেই। ৩৫৪ বা ৩৫৫ দিনে এদের বছর হয়। ব্যাবিলনীয় ক্যালেন্ডারে ১৯ বছরে ৭টি অধিক মাস নেবার ব্যবস্থা ছিল এবং এই ১৯ বছরের চক্রে কোন্ কোন্ বার অধিক মাস আসবে তাও ঠিক করা ছিল। এইরকম পদ্ধতির ক্যালেন্ডারের দিন গণনার নিয়ম খুব সহজ হত। পরে গণনায় জটিলতা প্রবেশ করে। ভারতবর্ষে বৈদিক যুগে আর্যরা সৌর বছর গণনা করলেও মাস গুণত চাঁদের হিসেবে। চান্দ্রবছর ও সৌরবছরে তফাৎ হত বারোদিন। আর সব প্রাচীন দেশের মত তারা জুড়ে দেওয়া মাসের সাহায্যে চান্দ্র ও সৌরবছরের মিল আনবার চেষ্টা করত। শক ক্যালেন্ডারেই ভারতে প্রথম সৌরবছর ও সৌরমাস গোনা হল। এর জ্ঞান এসেছে গ্রীকদের নিকট থেকে। সূর্যের গতিকে বারোটি রাশিতে ভাগ করে এক এক রাশিতে সূর্যের অবস্থানের সময়কে একমাস ধরে সৌরবছরকে বারো সৌরমাসে ভাগ করা হল। রাশির নামেই হল মাস নাম। অবশ্য চান্দ্রমাসও গোনা হত ধর্মীয় কাজের জন্য। শকই ক্যালেন্ডারই ভারতের সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মত ক্যালেন্ডার। ভারতে যে নতুন ক্যালেন্ডার প্রচলন হয়েছে তা শকীয় ক্যালেন্ডারের নতুন রূপ। আমরা যে বাংলা সাল ব্যবহার করি, তা আসলে বাংলা সাল নয়। আকবরের সময়কার হিজলি সালের সঙ্গে সৌরবছর যোগ করে হয়েছে আজকের সাল। আজকের সাল আসলে পাঁচমিশালী আর খাপছাড়া।

দেখা গেল বিভিন্ন দেশের ক্যালেন্ডারের প্রচলনে নানারূপ অসুবিধের সম্মুখীন হয়েছে। শুধুমাত্র বার ও দিন সংক্রান্ত অসুবিধে নয়—ব্যবহারের দিক থেকেও অসুবিধে রয়েছে। পার্থিব সমস্ত মানুষ সকল প্রয়োজনেই যে ক্যালেন্ডার ব্যবহার করে তা নয়। য়ুরোপ ও আমেরিকায় এটি ব্যবহৃত হয় বৈষয়িক ও ধর্মসংক্রান্ত প্রয়োজনে। য়ুরোপের অন্যান্য দেশে ব্যবহার কেবল অর্থনৈতিক প্রয়োজনে। এ ছাড়াও বিভিন্ন দেশে ক্যালেন্ডার ব্যবহারে আরও অনেক বৈচিত্র্য আছে।

যাই হোক এই ক্যালেন্ডারের সমস্ত বৈষম্য ও অসঙ্গতি দূর করবার জন্য কয়েক বছর পূর্বে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এক অভিনব ক্যালেন্ডারের পরিকল্পনা করেন। এই ক্যালেন্ডারটিকে ওয়ার্ল্ড ক্যালেন্ডার বা বিশ্বপঞ্জী নামে অভিহিত করা চলতে পারে। এতে সুপারিশ করা হয়েছে ক্যালেন্ডারকে চারটি সমান ভাগ করার, প্রতিটি ভাগে থাকবে ১৩ সপ্তাহ বা তিন মাস। প্রতি বছর ও প্রতি কোয়ার্টার শুরু হবে রবিবার। কিন্তু প্রতি কোয়ার্টারে ৯১ দিন থাকলে বছরে পাওয়া যাচ্ছে ৩৬৪ দিন। বাড়তি দিনটি বাড়তি শনিবার ধরার ব্যবস্থা হবে ডিসেম্বর ৩০ তারিখের পরদিনটি। লিপ ইয়ারের বাড়তি একদিন বাড়তি শনিবার ধরবার ব্যবস্থা হবে ৩০-এ জুন তারিখের পরদিনটি। এ দু'দিন সারা পৃথিবীতে ব্যবসায়িক কোন কাজ হবে না।

ওয়ার্ল্ড ক্যালেন্ডারের সুবিধে অনেক। তার প্রতি বছর চেহারা এক—সেটা সনাতন ও ধ্রুব। বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক দিক

"ইন্টারন্যাশনাল" সংগীতও অনুবাদ করেন স্বীয় মাতৃভাষায়ঃ

"জাগো—
জাগো অনশন-বন্দী, উঠরে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত!"

রুশ-অনুবাদে শ্রীমিখাইল কুর্গানেত্‌সফ্ অত্যন্ত সযত্ন মনোযোগে লক্ষ্য রেখেছেন যাতে রুশভাষায় বাংলার কবি কাজী নজরুলের কণ্ঠস্বর ও ব্যক্তিত্ব যতটা সম্ভব ধরা পড়ে, উপলব্ধি করা যায় তাঁর কাব্যের মৌল আবেগ ও গুণাবলী, যা হল বিদ্রোহের, সংগ্রামের এবং শান্তির। একটি মাত্র কাব্যসংকলনেই নজরুলের সোভিয়েট পাঠকরা কবিকে চিনে নিতে পেরেছেন। বইটি এদেশে খুবই জনপ্রিয় হয়েছে।

এই রুশ নজরুল-সংকলনের ভূমিকা লিখেছেন সোভিয়েট ভারতবিদ সাহিত্য-সমালোচক ইয়েভগেনি চেলিশেভ্। তিনি কয়েকবারই ভারতে গিয়েছেন এবং কলকাতাতেও তিনি সুপরিচিত। ভূমিকায় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও সংগ্রামের কথা তিনি বর্ণনা করেছেন, যা নজরুল-কাব্য বোঝার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কেন না নজরুলের কবিতা হল তাঁর স্বদেশীয় জনগণ তথা বিশ্ব জনগণের জন্য এক সুখী-সমৃদ্ধ শান্তিময় ভবিষ্যতের স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে নিরলস সংগ্রামের কবিতা, যে কবি নিজেকে বলেনঃ "এক হাতে মোর বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণতূর্য" এবং বলেনঃ

"মহা-বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল
আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণ ভীম রণভূমে
রণিবে না
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত।"

সোভিয়েটের মানুষ এই সংগ্রাম ও শান্তির চারণ বাঙালী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যকে তাই এত আদরনীয় স্থান করে। মনে করে তিনি সোভিয়েটজনের এক পরম অন্তরঙ্গ বন্ধু।*

অনুবাদঃ সিদ্ধেশ্বর সেন

---

*গত ৩১শে জানুয়ারী বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের গৃহে অনুষ্ঠিত 'নজরুল-সন্ধ্যা'য় কবির সম্মুখে অনুবাদক কর্তৃক পঠিত।

দিয়েও প্রতি বছর রবিবার শুরু হওয়াতে সে আমাদের অনেক উপকারে আসবে। সত্যি কথা বলতে কি বাস্তবে এ জাতীয় ক্যালেন্ডার প্রবর্তিত হলে আমরা নিঃসন্দেহে উপকৃত হবো।

দেশবিদেশের ক্যালেন্ডার সম্বন্ধে এ জাতীয় আলোচনা বাংলা ভাষায় হয় নি। তাই আলোচ্য গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য ও মূল্য যথেষ্ট। লেখকের যথাযথ তথ্য সংগ্রহের নৈপুণ্য আদর্শরূপে বিরাজিত থাকবে সন্দেহ নেই। সেদিক থেকে উদ্যোগী ও তরুণ লেখক শ্রীঅজিত সেনের 'ক্যালেন্ডার কাহিনী' বাংলা সাহিত্যের একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। গ্রন্থটি ভাষার লালিত্য ও সাবলীল প্রবাহে একটা স্বতন্ত্র সৌন্দর্য সৃষ্টি করে অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের আকৃষ্ট করতে পারবে সেটা বলাই বাহুল্য। ছোটরা কেন বড়রাও আলোচ্য গ্রন্থখানি পাঠ করে নানা দেশে ক্যালেন্ডারের প্রচলন সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করতে পারবেন—সেটা সংশয়াতীত।

পুরাতনী—শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত। দেবোধি পাবলিকেশানস্ প্রাঃ লিঃ, ২২, স্ট্র্যান্ড রোড, কলিঃ-১। দাম ঃ ৬·৫০।

'পুরাতনী' নামকরণের সাহায্যে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় উপলব্ধি করা না গেলেও, অধ্যাপক নলিনীনাথ দাশগুপ্তের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে বাংলা ভাষার প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য। সাহিত্যের পীঠস্থান ও স্মরণীয় সাহিত্যিক। অধ্যাপক দাশগুপ্তের গ্রন্থে ঐ দুই যুগের সাহিত্য-বিচার ছাত্রলক্ষ্য নয়, বরং বলা যায় ঐ দুই যুগের যে সব দিকে অগাধ পাণ্ডিত্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার প্রয়োজন, সেদিকেই দাশগুপ্তের দৃষ্টি নিবদ্ধ। ফলে, গ্রন্থটি গবেষক ছাত্র ও পণ্ডিতদের কাছে অপরিহার্য বিবেচিত হওয়াই উচিত। শ্রীদাশগুপ্তের রচনার বিষয়-বৈচিত্র্য প্রসঙ্গে অবশ্যই নাম করা যেতে পারে (ক) 'প্রাচীন বাঙ্গালায় কাব্যচর্চা',, (খ) 'প্রাচীন বাঙ্গালার আদি কাব্যের কবি', (গ) 'প্রাচীন বাঙ্গালার বৈদ্যক সাহিত্য' (ঘ) 'স্মার্ত রঘুনন্দন,' (ঙ) 'জ্বরমন্ত্র,' (চ) 'তামাকু-মাহাত্ম্য' প্রভৃতি। গ্রন্থ-অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধের সংখ্যা মোট কুড়িটি। অবশ্য প্রাচীন গ্রন্থের প্রতি অনুরাগবশতই প্রবন্ধকার দু-একটি সাধারণস্তরের প্রাচীন পুস্তিকার নামমাত্র আলোচনা করেছেন, সে বিষয়ে বিশেষভাবে আলোকপাত করেন নি, যেমন 'রামেশ্বরদাসের হাটের প্রবন্ধ'। এ ধরণের পুঁথি হয়তো সংগ্রহ করা অসম্ভব নয়, তবে, একালের ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন অধ্যাপকগোষ্ঠীর তা' বেশি কাজে লাগে না, কারণ তা' ছাত্রোপযোগী নয়; সেই কারণে সেগুলি লুপ্তির পথে। সেই বিবেচনায় শ্রীদাশগুপ্তের "রামেশ্বরদাসের হাটের প্রবন্ধটি' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা অন্যায় হয় নি। তবে শ্রীদাশগুপ্তের অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' সম্পর্কিত দুটি প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন, "বাঁকুড়ায় প্রাপ্ত পুঁথিখানির মূল্য ও গুরুত্ব মধ্য-এশিয়ায় আবিষ্কৃত পুঁথিগুলির মূল্য ও গুরুত্বের প্রায় সমান।" শ্রীদাশগুপ্ত বহু মতামতের খণ্ডন ও বহু ভুলভঞ্জন করে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যথার্থ লিপিকাল বিচার করে তার আদর্শ ও সামাজিক তথ্য উদ্ঘাটিত করেছেন। স্মার্ত রঘুনন্দনের আলোচনায় গয়ায় পিণ্ডদান সম্পর্কে রঘুনন্দনের যে গল্প-কথার উল্লেখ তিনি করেছেন, তা প্রমাণ-সম্বলিত না হলেও, এই কিম্বদন্তীর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে সে যুগে রঘুনন্দনের প্রভাব কি রকম ছিল। দ্বিজশঙ্করের সত্যনারায়ণের পাঁচালী' মূল্যবান গবেষণামূলক রচনা। সত্যনারায়ণ-পাঁচালী রচনার ধারাবাহিক ইতিহাস এই রচনায় থাকলেও দ্বিজশঙ্করের পাঁচালীর মূল্যায়ন ও পরবর্তী কালে তার প্রভাবের কথা প্রমাণসংযোগে আলোচিত হয়েছে। নন্দকিশোর দাসের 'রস-কলিকা' পুঁথিখানির সর্বপ্রথম আলোচনা অধ্যাপক দাশগুপ্তই করলেন। যদিও গ্রন্থটি উজ্জ্বলনীলমণির উপর ভিত্তি করে লিখিত, তবুও বলা যায়—বৈষ্ণবরস কৌতূহলী বাঙালী পাঠক একদা এই পুঁথির দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ধর্মপ্রধান হলেও সেকালের কবিরা 'তামাকু মাহাত্ম্য'-ও রচনা করেছেন। পড়তে পড়তে বেশ রসোপভোগ করা যায়। এর রচনাকার কবি রামপ্রসাদ। অধ্যাপক দাশগুপ্ত বলেছেন যে, সাধক রামপ্রসাদ থেকে এই রামপ্রসাদ ভিন্নতর ব্যক্তি। কিন্তু সাধক রামপ্রসাদ ত' শুধু সাধনার গানই লেখেন নি। সুতরাং এই গ্রন্থ তাঁরই বা না হবার কারণ কি? "প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে খেলাধূলা" প্রবন্ধটি 'মধ্যযুগ' বিভাগে সন্নিবেশিত হলে ও বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের খেলাধূলার কোনো উল্লেখ এতে নেই। তবে রচনাটিতে অধুনা প্রচলিত ও অপ্রচলিত খেলার উৎসগুলির সন্ধান তিনি করে দিয়েছেন। মোট কথা, 'পুরাতনী'কে কয়েকটি প্রবন্ধের সমষ্টি বলে মনে করা হলে ভুল হবে, এ গ্রন্থ গবেষকদের পথানুসন্ধানে সাহায্য করবে।

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা—সম্পাদকমণ্ডলী ঃ গৌরাঙ্গ ভৌমিক, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবকুমার বসু, সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। অরুণিমা পাবলিশার্স, ৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম ঃ ৫·০০।

ভূমিকায় বলা হয়েছে, "...সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা কোনো বার্ষিক সঙ্কলন নয়, একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনায় পর পর কয়েকটি খণ্ডে বর্তমানে জীবিত এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখেছেন এমন খ্যাত-অখ্যাত কবিদের কবিতা সংগ্রহ করে পাঠকদের হাতে উপহার দেওয়াই এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য।" আর এক জায়গায় বলা হয়েছে, "যাঁদের কবিতা এই সঙ্কলনে গৃহীত হয় নি, পরবর্তী কোনো না কোনো সঙ্কলনে তাঁদের কবিতা গ্রহণের পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। ফলত বয়স নির্বিশেষে, আমরা সকল স্তরের কবিকেই একটা সাধারণ ও নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখবার চেষ্টা করেছি।" ভূমিকা-উদ্ধৃত প্রথমাংশ সম্বন্ধে দ্বিমত হবার কারণ নেই, কিন্তু দ্বিতীয় অংশ সম্বন্ধে তীব্র মতভেদ হওয়াই স্বাভাবিক। বর্তমান সঙ্কলনটিতে দিনেশ দাস, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত প্রমুখ কবির কবিতা থাকা উচিত ছিল। বরং তাঁদের কবিতা না থাকার কি কারণ সেই প্রশ্ন পাঠকদের মনে জাগবে। আর সাধারণ ও নিরাসক্ত দৃষ্টির পক্ষে এর দ্বারা রক্ষা করা কি সম্ভব হয়েছে? এ ছাড়া কবিতা গ্রহণ-এর ব্যাপারেও কোনো মাপকাঠি রক্ষা করা হয় নি। হয়তো সেই কারণেই কারো একটি, কারো-বা একাধিক কবিতা গৃহীত হয়েছে। সঙ্কলন যাতে সুনির্বাচিত হয়—সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা উপর্যুক্ত কথাগুলি বলতে বাধ্য। এতদ্সত্ত্বেও বলা যায়, সঙ্কলকদের উদ্দেশ্য সাধু। তাঁরা অন্তত কিছু ভালো কবিতা উপহার দিতে পেরেছেন।

সাহিত্য সেতু—সম্পাদক ঃ শ্রীশীতল বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঁশবেড়িয়া কুণ্ডুগলি, পোঃ—বাঁশবেড়িয়া, জেলা—হুগলী। দাম ঃ ১·৫০।

মফস্বল থেকে যে সব পত্রিকা বের হয় তাতে গল্প কবিতা বা সাধারণ স্তরের প্রবন্ধই একমাত্র কাম্য নয়, আমরা আশা করবো তাতে যেন আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য তথা ঐতিহ্য এবং সে অঞ্চলের মানুষগুলির কথা মুখর হয়ে ওঠে। এই বিচারে শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য, পারুল ভট্টাচার্য প্রমুখের রচনা উল্লেখযোগ্য। সাহিত্যসেতুর এই বিশেষ সংখ্যায় নবীন লেখকের সংখ্যাই বেশি এবং তাদের লেখাগুলি বহুলাংশে রসোত্তীর্ণ। যাদুসম্রাট পি, সি, সরকারের কবিতাটি বাচ্যার্থেই সমাদৃত হবে। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে আছেন নরেন্দ্র দেব শৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, অতুলরঞ্জন দেব, ইন্দুমতী ভট্টাচার্য, নীতিশচন্দ্র বাগচি, বীরেশ্বর বসু প্রমুখ।

বঙ্গদর্শন

কয়েক বছর ধরেই দেখা যাচ্ছে, প্রতি বছরেই একটা নির্দিষ্ট সময়ে কয়েকটি পণ্যের কৃত্রিম অভাব ঘটিয়ে বাজারদর চড়িয়ে দেওয়া হয়। এবারেও সেই রীতির ব্যতিক্রম হয় নি। ইলেকশানের ডামাডোলে এ সমস্যাটা নিয়ে তেমন কিছু আন্দোলন হচ্ছে না বটে, কিন্তু ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন যে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা আজ কি রকম দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

সরষের তেল নিয়ে সেই পুরাতন খেলটা বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে নতুন করে জমে উঠেছে। প্রথমবারে অর্থাৎ আজ থেকে দু' বছর আগে সরষের তেলের কৃত্রিম অভাব ঘটিয়ে যে ন্যক্কারজনক অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং সরকার সবকিছু দেখে-শুনে যে ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, সে কথা নিশ্চয়ই অনেকের স্মরণে আছে। সেবার অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের তৈলাভাবের পরিত্রাতার ভূমিকা নিয়েছিল বাদাম তেল। গতবারের তেলের বাজারের কারবারীরা আরও একটু আটঘাট বেঁধে এগিয়েছিল এবং তারা আগে থেকেই বাদাম তেলের দরটাও সরষের তেলের চেয়েও বেশি চড়িয়ে রেখেছিল। এবার তারা আরও একধাপ অগ্রসর হয়েছে, বনস্পতিকেও দলে টেনেছে। নতুবা মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে বিজ্ঞাপন মারফৎ যে বনস্পতিওয়ালারা দাম কমাবার 'আনন্দ সংবাদ' ঘোষণা করেছিল, আজ তারা ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন মারফৎ জানাচ্ছে যে বনস্পতির দাম তারা আবার চড়িয়েছে। সব দিক থেকেই এইভাবে আটঘাট বেঁধে তেলওয়ালারা আসরে নেমেছে। সরষের তেলের দর প্রতিমুহূর্তেই চড়ছে। আজ, বঙ্গদর্শন লেখার সময় পর্যন্ত, সরষের তেলের দাম সাড়ে পাঁচ টাকা কিলোয় উঠেছে।

ভাবতে পারেন, রাতারাতি মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার ব্যবধানে শুকনো লংকার দাম কিলো প্রতি তিন টাকা বেড়ে গেছে? এটাও কি সরষের তেলের দাম বৃদ্ধির সংগে সম্পর্কিত? কুলোকে বলে শেয়ালকাঁটার বীজের সংগে লংকার দানা পেষণ করে নাকি আগমার্কা বিশুদ্ধ সরষের তেল তৈরি হয়, যার সংগে ভেজাল হিসাবে কিছু সরষে মেশানো হয়। ডালের দাম যদিও সাম্প্রতিককালে বাড়ে নি, তথাপি কিলো এক টাকা ষাট পয়সা যাচ্ছে, যার ফলে অল্পবিত্ত মানুষ ডালের মত সাধারণ খাদ্যসামগ্রীও প্রয়োজনানুযায়ী কিনতে পারছেন না। পেট ভরে ভাত খাবার বিলাস অল্পবিত্ত মানুষের তো বহু আগেই উঠে গেছে, তবে সংগতিসম্পন্ন লোকেদের পর্যাপ্ত চাল পেতে কোনই অসুবিধা হয় না। রেশন এলাকায় সর্বত্র ঠিকমত গমের যোগানও দেওয়া হচ্ছে না, কোন কোন জায়গায় এমন গম দেওয়া হয়েছে যে তা মনুষ্য খাদ্যের একান্তই অনুপযোগী।

এদিকে সাধারণ নির্বাচন তো প্রায় এসেই পড়ল। বিরোধী দলগুলি জনসাধারণের প্রাত্যহিক জীবনের এই দুর্বিষহ অবস্থার চিত্রটা প্রকৃত তুলে ধরে জনসাধারণের বর্তমান সরকার বিরোধী মনোভাবকে তীব্রতর করার পরিবর্তে নিজেরাই এক পক্ষ অপর পক্ষের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন। নির্বাচনী আবহাওয়া এবারে মোটেই উত্তপ্ত নয়, জনসাধারণের মধ্যে সকল স্তরেই হতাশার চিহ্ন প্রকট।

প্রাক্-নির্বাচনী সমীক্ষা

গত সংখ্যায় আমরা লোকসভায় ১৯৫৭ ও ১৯৬২-র নির্বাচনের নিরিখে কোন কোন দল তাদের পুরাতন আসনগুলিতে ডিগবাজী খেয়েছিল তার একটা বিবরণ দেবার চেষ্টা করেছি। যে ক'টি বাকি আছে সেগুলির উল্লেখ এখানে করছি। ১৯৫৭-র নির্বাচনে কুচবিহার লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস যে আসনটি লাভ করেছিল, ১৯৬২-র নির্বাচনে তা' ফরোয়ার্ড ব্লকের করায়ত্ত হয়। এবারেও এখানে প্রায় সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে কংগ্রেস ও ফরোয়ার্ড ব্লকের মধ্যে, তবে স্বতন্ত্র পার্টির একজন প্রার্থীও এই কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বালুরঘাট কেন্দ্রে গত নির্বাচনে কংগ্রেস তার আসনটি কমিউনিস্ট পার্টির কাছে হারিয়েছে, এবারেও সেখানে কংগ্রেসের সংগে বাম কমিউনিস্টের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে, তবে দু'জন নির্দলীয় প্রার্থীও আছেন। মুর্শিদাবাদ কেন্দ্র থেকে গতবারে একজন নির্দলীয় প্রার্থী কংগ্রেসের আসনটি কেড়ে নিয়েছিলেন। ওই নির্দলীয় অতি প্রভাবশালী ব্যক্তিটি এবারও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রে এবারে একজন জনসংঘের প্রার্থীও আছেন। অনুরূপভাবে কাটোয়া কেন্দ্রটিতে কংগ্রেসের স্থায়ী আসনটি ১৯৬২-র নির্বাচনে একজন নির্দলীয় প্রার্থীর হাতে খোয়া গেছে। এবারে কাটোয়া কেন্দ্রে কংগ্রেসের সংগে বাম কমিউনিস্টের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে, একজন নির্দলীয় প্রার্থীও আছেন। শ্রীরামপুর কেন্দ্রে ১৯৫৭ সালে কংগ্রেস যে আসনটি পেয়েছিল ১৯৬২-তে তা' কমিউনিস্টদের অধিকারে আসে। এবারকার নির্বাচনে এখানে কংগ্রেস ছাড়া বাম কমিউনিস্ট ও দক্ষিণ কমিউনিস্টের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে।

এবারে অন্য দলগুলির কথা বলা যাক যাদের ১৯৫৭ সালের আসন ১৯৬২ সালে হাতছাড়া হয়েছে। আমরা গত সংখ্যাতেই বসিরহাটের উল্লেখ করেছি। ব্যারাকপুরে ১৯৫৭-র নির্বাচনে পি. এস. পি জয়লাভ করেছিল, ১৯৬২-র নির্বাচনে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কংগ্রেস ও পি. এস. পি.-কে হারিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি ব্যারাকপুরের আসনটি দখল করে। এবারে ব্যারাকপুরে আবার ত্রিদলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে, এখানে দক্ষিণ কমিউনিস্টের সঙ্গে বাম কমিউনিস্টের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। কাঁথিতে পি. এস. পি.-র আসনটি ১৯৬২ সালে কংগ্রেস দখল করেছিল, এবারেও এখানে ত্রিদলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কংগ্রেস তো আছেই, তদুপরি পি. এস. পি. ও এস. এস. পি.-র মধ্যে গৃহযুদ্ধ।

এবারের লোকসভা নির্বাচনে বারাসত কেন্দ্রে কংগ্রেস, দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট, বাম কমিউনিস্ট সমর্থিত প্রার্থী ও একজন নির্দলীয় প্রার্থীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে। জয়নগর কেন্দ্রেও ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা তার মধ্যে এস. ইউ. সি.-র সঙ্গে বাংলা কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ১৯৬২-র নির্বাচনে এস. ইউ. সি. লোকসভা বিধানসভা কোথাও একটিও আসন পায় নি। বাঁকুড়ায় কংগ্রেস প্রার্থীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন দক্ষিণ কমিউনিস্ট, তদুপরি একজন জনসংঘের ও দু'জন নির্দলীয় প্রার্থী এই কেন্দ্রে আছেন। আসানসোলে একদিকে কংগ্রেস প্রার্থী, অপরদিকে দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট বনাম এস. এস. পি। দার্জিলিং-এ কংগ্রেস প্রার্থীর সঙ্গে বাম কমিউনিস্ট, জনসংঘ ও একজন একদা কংগ্রেসী বর্তমানেও প্রভাবশালী নির্দলীয় প্রার্থীও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। হাওড়ায় একদিকে কংগ্রেস প্রার্থী, অপরদিকে দক্ষিণ বনাম বাম কমিউনিস্ট। উলুবেড়িয়াতেও ত্রিমুখী সংগ্রামে ফরোয়ার্ড ব্লক, বাম কমিউনিস্টের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। আরামবাগে অবশ্য বলতে গেলে দ্বিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে, কংগ্রেসের সঙ্গে

চতুর্বাম সমর্থিত নির্দলীয়। ডায়মণ্ড-হারবারে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাম কমিউনিস্ট ও বাংলা কংগ্রেস মুখোমুখি হচ্ছে। রায়গঞ্জে পঞ্চমুখী সংগ্রাম—কংগ্রেস, ফরোয়ার্ড ব্লক, এস. এস. পি. পি. এস. পি ও নির্দলীয়। বিষ্ণুপুরে কংগ্রেস, জনসংঘ এবং বাম কমিউনিস্ট বনাম বাংলা কংগ্রেস। বহরমপুরে বলতে গেলে সরাসরি লড়াই কংগ্রেস বনাম আর. এস. পি., অবশ্য দু'জন নির্দলীয় আছেন। জঙ্গীপুরে কংগ্রেসের সঙ্গে পাঁচজন নির্দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বর্ধমানে একদিকে কংগ্রেস, অপরদিকে ফরোয়ার্ড ব্লক বনাম বাম কমিউনিস্ট সমর্থিত নির্দলীয়। বর্ধমান তপশিলী কেন্দ্রে অবশ্য কংগ্রেসের সঙ্গে বাম কমিউনিস্টের সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে। আলিপুর কেন্দ্রে কংগ্রেসের সঙ্গে দক্ষিণ বনাম বাম কমিউনিস্ট, তদুপরি তিনজন নির্দলীয়। কলকাতা উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্রে কংগ্রেস, বাম কমিউনিস্ট ও জনসংঘ, নির্দলীয় তিনজন। কলকাতা উত্তর-পূর্বে একদিকে কংগ্রেস অপরদিকে দক্ষিণ বনাম বাম কমিউনিস্ট। কলকাতা দক্ষিণ কেন্দ্রে একদিকে কংগ্রেস, অপরদিকে বাম কমিউনিস্ট বনাম বলশেভিক।

উপরিউক্ত তালিকা দেখে একটা সোজা ধারণাই করা যায় যে সপ্তবাম ও চতুর্বামের মধ্যে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে এমন আসনের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। বহু কেন্দ্রে জনসংঘ যে প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে তাতে কংগ্রেসের কিছুটা ক্ষতি হবে এটা মনে করা খুবই সম্ভব, সেদিক থেকে পরস্পর বিবদমান হওয়া সত্ত্বেও উভয় বাম ব্লকই এতে কিছুটা উপকৃত হবে, এবারে জনসংঘ লোকসভা ও বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে গত দু'বারের তুলনায় পর্যাপ্ত প্রার্থী দিয়েছে, তাদের আসন লাভ করা দুরূহ হলেও ভোটের কিছুটা অংশ তারা অবশ্যই টানবে। বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও আর দু-একটি কেন্দ্র ছাড়া নির্দলীয় প্রার্থীরাও ভোট ভাঙানো ছাড়া আর কিছুই করবেন না, সেদিক থেকে বামদেরই কিছুটা সুযোগ বাড়বে। বাম দু'টি ব্লকই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জেদের বশবর্তী হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে প্রার্থী দিয়েছে, এক্ষেত্রে ভোটদাতারা অবশ্যই প্রার্থীদের ব্যক্তিত্বের উপরেই বেশি নির্ভর করবেন। যেখানে দু'টি ব্লক একে অপরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সেখানে ভোটাররা আধাআধি ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবেন না, এক্ষেত্রে প্রার্থীদের ব্যক্তিত্ব তথা সাংগঠনিক শক্তিই ভোটের নিয়ামক হবে। বিধানসভার আসনগুলির ক্ষেত্রেও এই কথাই প্রযোজ্য। তবে কয়েকটি আসনের ব্যাপারে দুই ফ্রণ্টের লড়াই সত্যই দুর্ভাগ্যজনক, যেমন বারাকপুর, কলকাতা উত্তর-পূর্ব ইত্যাদি।

*

এবারে বিধানসভার আসনগুলির ক্ষেত্রে আসা যাক। ১৯৫৭-র নির্বাচনের ভিত্তিতে বিচার করলে ১৯৬২-তে ৪৮টি আসনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দলগুলির বিপর্যয় ঘটেছিল। আমরা বর্ধমান জেলা দিয়েই আরম্ভ করছি। আসানসোল কেন্দ্রে এবারে কংগ্রেস ছাড়া প্রার্থী দাঁড়িয়েছে জনসংঘ, বাম বনাম দক্ষিণ কমিউনিস্ট ও একজন নির্দলীয়। ১৯৫৭-র নির্বাচনে এই আসনটি কংগ্রেস পেয়েছিল, কিন্তু ১৯৬২-র নির্বাচনে কংগ্রেসকে হারিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি এই আসনটি লাভ করে। রাণীগঞ্জ কেন্দ্রে কংগ্রেসের আসনটি ১৯৬২ সালে কমিউনিস্টের হাতে খোয়া যায়। এবার সেখানে কংগ্রেসের সঙ্গে বাম কমিউনিস্টের সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে, অবশ্য জনসংঘের প্রার্থীও একজন আছে। তাহলেও আসনটি বজায় থাকবে আশা করা যায়। হীরাপুর কেন্দ্রে ১৯৫৭ সালের কমিউনিস্ট পার্টির আসনটি ১৯৬২-তে কংগ্রেস দখল করে নেয়। এবারে এখানে কংগ্রেসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে দক্ষিণ বনাম বাম কমিউনিস্ট পার্টি, তদুপরি আছে জনসংঘ, পি. এস. পি. ও একজন নির্দলীয়। কুলটি কেন্দ্রে ১৯৫৭-র নির্বাচনে পি. এস. পি. জয়লাভ করেছিল, ১৯৬২-র নির্বাচনে কংগ্রেস আবার ফিরে এসেছে। এবারে ওই কেন্দ্রে কংগ্রেসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে বাংলা কংগ্রেস বনাম এস. এস. পি.। অনুরূপভাবে জামুরিয়ার পি. এস. পি.-র আসনটিও ১৯৬২-তে কংগ্রেসের অধিকারে আসে। এবারে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে কংগ্রেসের সঙ্গে এস. এস. পি.-র। অবশ্য একজন নির্দলীয়ও আছেন। গত নির্বাচনে কাটোয়া আউশগ্রাম ও ভাতারেও কংগ্রেসের ভাগ্যবিপর্যয় হয়েছিল, কমিউনিস্ট এবং নির্দলীয় প্রার্থীর হাতে।

হুগলী জেলার নির্বাচন কেন্দ্রগুলির দিকে এবারে একটু দৃষ্টি দেওয়া যাক। চুঁচুড়া কেন্দ্রে কংগ্রেসের আসনটি ১৯৬২-তে ফরোয়ার্ড ব্লক কর্তৃক অধিকৃত হয়। এবারেও এখানে কংগ্রেসের সঙ্গে ফরোয়ার্ড ব্লকের সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অবশ্য একজন জনসংঘেরও প্রার্থী আছেন। ভদ্রেশ্বর কেন্দ্রের কংগ্রেসের আসনটি ১৯৬২ সালে কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক অধিকৃত হয়। এবারে অবশ্য কেন্দ্রের নাম বদলে চাঁপদানী হয়েছে, এখানে এবার দক্ষিণ ও বাম কমিউনিস্ট পার্টি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, অবশ্য নির্দলীয়

একজন আছেন। আবার বলাগড়ে কমিউনিস্ট পার্টির আসনটি কংগ্রেস কর্তৃক ১৯৬২ সালে অধিকৃত হয়। এবারে এখানে কংগ্রেসের সঙ্গে বাম কমিউনিস্ট বনাম বাংলা কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে এই ডিগবাজীর চিহ্ন বিশেষ করে চোখে পড়ে। কুচবিহারের তুফানগঞ্জের কংগ্রেসের আসনটি কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা ১৯৬২-র নির্বাচনে অধিকৃত হয়। এবারে এখান থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে দক্ষিণ বনাম বাম কমিউনিস্ট প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। স্বতন্ত্র পার্টির প্রার্থীও একজন আছেন। এই ধরণের ওলোট-পালোট কুচবিহার উত্তর ও কুচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রেও ঘটেছে। ১৯৫৭-র নির্বাচনে এই দু' জায়গা থেকেই কংগ্রেস প্রার্থী জয়লাভ করতে পেরেছিলেন, কিন্তু ১৯৬২-তে দু'টি আসনই ফরোয়ার্ড ব্লক কেড়ে নেয়। এবারে অবশ্য কুচবিহারে তিনটি আসন। কুচবিহার উত্তর কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে ফরোয়ার্ড ব্লক বনাম বাম কমিউনিস্ট। কুচবিহার পশ্চিম কেন্দ্র থেকে ফরোয়ার্ড ব্লক সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে কংগ্রেসের সঙ্গে এবং কুচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রে কংগ্রেসের সঙ্গে দক্ষিণ বনাম বাম কমিউনিস্টের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে। এখানে অবশ্য স্বতন্ত্র পার্টির প্রার্থীও একজন আছেন। দিনহাটাতেও গত নির্বাচনে কংগ্রেসের আসনটি ফরোয়ার্ড ব্লক নিয়েছে। এবারেও ওখানে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে কংগ্রেসের সঙ্গে ফরোয়ার্ড ব্লকের। মেখলিগঞ্জেও গত নির্বাচনে ফরোয়ার্ড ব্লক কংগ্রেসের কাছ থেকে আসন ছিনিয়ে নিয়েছে। এবারেও এখানে বলতে গেলে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে কংগ্রেসের সঙ্গে ফরোয়ার্ড ব্লকের, যদিও স্বতন্ত্র পার্টির একজন প্রার্থী সেখানে আছেন।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় তপন কেন্দ্রে কংগ্রেসের আসনটি ১৬৯২-র নির্বাচনে আর. এস. পি. কেড়ে নিয়েছিল, এবারেও আর. এস. পি.-র সঙ্গে কংগ্রেসের সরাসরি লড়াই হবে। গঙ্গারামপুর কেন্দ্রে কংগ্রেসের আসনটি ১৯৬২-র নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি দখল করেছিল, এবারে এখানে ত্রিপাক্ষিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দক্ষিণ বনাম বাম কমিউনিস্ট। কুশমান্ডী কেন্দ্রেও গত নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি জয়লাভ করেছিল, এবারে দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট প্রার্থীর সঙ্গে আর. এস. পি.-র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে।

উপরে উল্লিখিত কেন্দ্রগুলি ছাড়া নিম্নলিখিত কেন্দ্রগুলিতে কংগ্রেস গত নির্বাচনে পরাজিত হয়েছে : বাঁকুড়া, রাণীবাঁধ, বিষ্ণুপুর, বড়জোড়া, মুরারাই, রাজনগর, বোলপুর, কেতুগ্রাম, গোয়ালপোখের, হাওড়া (পশ্চিম), কালচিনি, মালদহ, কালিয়াচক, দাশপুর, ঘাটাল, রামনগর, কন্টাই (দক্ষিণ) মুর্শিদাবাদ, ভগবানগোলা, জলঙ্গী, বহরমপুর, বেলডাঙা, ভরতপুর, খরগ্রাম, রাণাঘাট, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, চাপরা ও কুলপি।

কুচবিহারের পরে সবচেয়ে বেশি ওলটপালট তাহলে হয়েছে মুর্শিদাবাদে। এবারে বহরমপুর কেন্দ্রে শুধুমাত্র ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে, দক্ষিণ বনাম বাম কমিউনিস্ট। তাছাড়া এখানে একজন শক্তিমান নির্দলীয় আছেন। তাছাড়া বাকি কেন্দ্রগুলিতে দু-একটি বাদ দিয়ে, কংগ্রেসের সঙ্গে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যেমন ডোমকাল কেন্দ্রে কংগ্রেস বনাম বাম কমিউনিস্ট, বেলডাঙায় কংগ্রেস বনাম আর. এস. পি., হরিহরপাড়া কেন্দ্রে কংগ্রেস বনাম বাংলা কংগ্রেস, নাওদা কেন্দ্রে কংগ্রেস বনাম আর. এস. পি., জলঙ্গী কেন্দ্রে কংগ্রেস বনাম বাংলা কংগ্রেস, কান্দিতে কংগ্রেস বনাম আর. এস. পি. খরগ্রামে কংগ্রেস বনাম আর, এস, পি, সাগরদীঘি কেন্দ্রে কংগ্রেস বনাম বাংলা কংগ্রেস। এ ছাড়াও সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে ইটাহার, বালুরঘাট, তপন, কুচবিহার (পশ্চিম), মাথাভাঙা, মেখলীগঞ্জ, সিতাই, আলিপুরদুয়ার, কালচিনি, মাদারিহাট, ফাঁসিদেওয়া ও দার্জিলিং কেন্দ্রে। অর্থাৎ সমগ্র উত্তরবঙ্গেই (মুর্শিদাবাদ সমেত) অধিকাংশ কেন্দ্রেই সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে।

গতবারের নির্বাচনে কংগ্রেস সবচেয়ে বেশি সাফল্য লাভ করেছিল চব্বিশ পরগনায়। বজবজ, বিষ্ণুপুর, বারুইপুর, হাসনাবাদ, বনগাঁ ও ভাটপাড়া কেন্দ্রে কমিউনিস্ট পার্টিকে কংগ্রেস পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিল। ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রে ১৯৬২-র নির্বাচনে কমিউনিস্ট ও পি. এস. পি., উভয় প্রার্থীকে হারিয়ে কংগ্রেস রীতিমত সাফল্য অর্জন করেছে, তা ছাড়া কলকাতা ও তার নিকটস্থ এলাকাসমূহে কংগ্রেসের সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যেমন তালতলা, বেলিয়াঘাটা, বালিগঞ্জ, কালীঘাট, গার্ডেনরীচ। এবারে চব্বিশ পরগনায় সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে গোসাবা, হাড়োয়া, গাইঘাটা, কাকদ্বীপ, সাগর, কুলপী, মগরাহাট (পূর্ব), বারাসত, দেগঙ্গা, স্বরূপনগর এবং কলকাতায় টালিগঞ্জ, আলিপুর, কালীঘাট প্রভৃতি কেন্দ্রে। মোটের উপর উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির তুলনায় কলকাতা ও চব্বিশ পরগনা জেলায় সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা কম হচ্ছে। অনুরূপভাবে হাওড়া ও হুগলীতে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংখ্যা কম।

আমরা এখানে সেই সব আসনগুলির কথাই বলছি যে সব আসনে গত নির্বাচনে ওলট-পালট হয়েছিল। তা ছাড়া আরও বহু আসন আছে যেখানে বিভিন্ন দলগুলি তাদের পূর্বতন অধিকার গত নির্বাচনে বজায় রেখেছে। এখানে আমরা সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলতে কংগ্রেস বনাম সপ্তবাম অথবা চতুর্বামকেই বুঝেছি। জনসংঘ, স্বতন্ত্র পার্টি ও নির্দলীয়দের বাদ দিয়েছি কেন না জনসংঘ যতই প্রার্থী দিক না কেন, পশ্চিমবঙ্গে এখনো তারা পা রাখার মত মাটি পায় নি। স্বতন্ত্র পার্টি মাত্র দু-একটি জায়গাতেই প্রার্থী দিয়েছে। আমরা আগেই বলেছি, এই দুটি পার্টি কংগ্রেসেরই কিছু অসুবিধা ঘটাবে, বাম দলগুলির কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। পক্ষান্তরে দু-একজন শক্তিমান নির্দলীয় ছাড়া বাকিরা কোনই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অভিনয় করতে পারবে না।

তবে দুটি ফ্রন্টে ভাগ হয়ে যাবার দরুণ বামপন্থী দলগুলির কয়েকটি ক্ষেত্রে ক্ষতি হলেও সামগ্রিকভাবে বিশেষ ক্ষতি হবে না। কেন না বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন আসনে অযৌক্তিকভাবে বিরোধ বাড়ানো হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে জেদের বশবর্তী হয়ে অতি অযোগ্য ব্যক্তিকেও বিভিন্ন আসনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে, এরা আগাছার মত সহজেই নির্মূল হয়ে যাবে। ত্রিপাক্ষিক নির্বাচন হলেই সর্বদা দু-পক্ষের বিরোধের সুযোগে তৃতীয় পক্ষ লাভবান হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ গত নির্বাচনে ডায়মন্ডহারবারে কংগ্রেস পেয়েছিল ১৭,০৩১টি ভোট, যেখানে কমিউনিস্ট পার্টি পেয়েছিল ৯১০৬টি এবং পি. এস. পি. ৫৪২৩টি ভোট। এখানে কমিউনিস্ট ও পি, এস, পি-র ভোট যুক্ত হলেও, কংগ্রেসই জয়লাভ করত। পক্ষান্তরে দমদমে গত নির্বাচনে কংগ্রেস ও পি. এস,

পি. যথাক্রমে পেয়েছিল ৩১,৩৫৭ ও ২,৯৩১টি ভোট যেখানে কমিউনিস্ট পার্টি পেয়েছিল ৪৮,৮০৮টি ভোট। কাজেই অযোগ্য প্রার্থী, তা সপ্তবাম ফ্রন্টেরই হোক বা চতুর্বাম ফ্রন্টেরই হোক, আপনা আপনিই অবলুপ্ত হয়ে যাবে, কেন না ভোটাররা একান্তই অন্ধ নয়, এবং পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে বিশুদ্ধ দলবাজি এখনো কার্যকরী নয়। কোন দল কপালে ছাপ দিয়ে যে প্রার্থীকেই আসরে নামাক না কেন, জনসাধারণ তার ব্যক্তিত্ব ও অতীতের কার্যকলাপসমূহ অবশ্যই বিচার করে। এবারও ব্যক্তিত্বের বিচার অবশ্যই কার্যকরী হবে, কাজেই কোন আসনে সপ্তবাম চতুর্বাম মুখোমুখি হলেও, যদি আসনটি কোন বাম দলেরই প্রাপ্য হয়, তাহলে উভয় বামের মধ্যে ব্যক্তি হিসাবে যোগ্য বামই জয়ী হতে সক্ষম হবে। আর কয়েকটি ক্ষেত্রে এই দুই ফ্রন্টের বিরোধ বড়ই দুর্ভাগ্যজনক ও পরিতাপের বিষয়, যেমন বারাকপুর লোকসভা কেন্দ্র। এখানকার দু'জন বাম প্রার্থীই যোগ্য পৃথক পৃথক কেন্দ্রে দাঁড়ালে দু'জনেই নির্বাচিত হতেন, কিন্তু একজনকে অবশ্যই সরে যেতে হবে। তবে দুটি ফ্রন্ট যদি একজোট হত তাহলে অবশ্যই যে আবহাওয়া সৃষ্টি হত তাতে কংগ্রেস ভেসে যেত: কিন্তু গতস্য শোচনা নাস্তি।

এবারকার নির্বাচনী প্রচারের যে বৈশিষ্ট্যটি সবচেয়ে বেশি করে চোখে পড়ছে সেটি হচ্ছে বিবদমান দুটি বাম ফ্রন্টের পারস্পরিক কটূক্তি বর্ষণ। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নির্বাচনী সভাগুলিতে জনসাধারণের উপস্থিতির স্বল্পতা। এবারে ভোটারের হৃদয়ও বোঝা দুষ্কর। ভোটাররাও তাঁদের মনোভাব তথা পক্ষপাতের বিশেষ কোন প্রকাশ ঘটাচ্ছেন না। এবারের নির্বাচনী উত্তাপ গতবারের তুলনায় অনেক কম বটে, কিন্তু এবারে ভোটাররা তুলনায় অনেক বেশি সিরিয়াস।

মিষ্টান্নের রাহুমুক্তি

এটা কি ইলেকশান স্টান্ট না অপর কিছু? পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি শেষ পর্যন্ত এই ভেবেছেন সন্দেশ-রসগোল্লাকে আবার কালোবাজার থেকে সাদাবাজারে ফিরিয়ে এনে ভোটারদের মন গলাবেন? অন্তত সরকারের হালচাল দেখে সেই কথাটাই মনে হয়।

বেশ কিছুকাল আগে সরকার ক্ষীর ও ছানাজাত মিষ্টান্নদ্রব্যের বিক্রয় আইন করে বন্ধ করেছিলেন। সরকারের বক্তব্য ছিল যে এর ফলে যে বিরাট পরিমাণ দুধের সাশ্রয় হবে, তারই ফলে সরকারী দুগ্ধ-কেন্দ্রগুলিতে দুধের যোগান বাড়বে, শিশু, বৃদ্ধ ও রোগীদের কিছুটা পথ্যের সুরাহা হবে, তদুপরি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঘি ও মাখন তৈরি করে দেশবাসীর ব্যাপক পুষ্টিহীনতার ঘাটতি কিয়দংশে মেটাতে সক্ষম হবে।

কিন্তু হায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার কোন পরিকল্পনাটা ভালভাবে সফল করতে পেরেছে? চরিত্রহীন আমলাতন্ত্র এদেশে অকর্মণ্যতার যে নজীর সৃষ্টি করেছে তার তুলনা জগতে কোথাও নেই। দূরদৃষ্টির অভাবের দ্বারা এদের সকল পরিকল্পনাগুলি চিহ্নিত এবং চূড়ান্ত অকর্মণ্যতায় সব কিছুই পরিণামে নিষ্ফল। কি কেন্দ্রে, কি রাজ্যে সর্বত্রই সমান নির্বুদ্ধিতার প্রকাশ, সহজবুদ্ধির সঙ্গে আপোষ নেই কোথাও।

সরকার বলেছিলেন ক্ষীর ও ছানাজাত মিষ্টান্ন তৈরি বন্ধ করলে দুধের যোগান বাড়বে। বাড়ে নি। আমরা তখনই বলেছিলোম যে যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে পরিবহন ব্যবস্থা জঘন্যতম, দূর দূরান্তের গ্রামগুলি থেকে অবিকৃত অবস্থায় কলকাতা শহরে দুধ নিয়ে আসা অসম্ভব। সে উপদেশে সরকার কর্ণপাত করেন নি। সরকার মিষ্টান্ন-শিল্পের সর্বনাশ করে ঘি ও মাখন তৈরি করতে গেছলেন। এবং তা করতে গিয়ে চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছেন। "ক্যাগিস" লেবেলধারী মাখন ও ঘি কিছুদিন বাজারে বেরিয়ে ছিল, এবং সেগুলির কিছুটা চাহিদাও সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছিল বটে, কিন্তু সরকার শেষ পর্যন্ত কোনটিই সরবরাহ করতে পারেন নি। অথচ যাদের খামখেয়ালে এতগুলি পরিবার বৃত্তিচ্যুত হল এই বেকারীর যুগে তাদের কোন শাস্তির ব্যবস্থা হয় না।

ছানার মিষ্টান্ন তৈরি করা বন্ধ করতে সরকার শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। এই আইনের ফলে অসংখ্য মিষ্টান্নের কারিগর বেকার হয়েছে, আর কিছু সৎ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সর্বস্বান্ত হয়েছে। কিন্তু বেশির ভাগ মিষ্টান্নের দোকানেই সন্দেশ-রসগোল্লা সর্বদাই পাওয়া গেছে, অবশ্য ডবল দামে। এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ীকে মাঝখান থেকে কিছু কালো টাকা পাইয়ে দিতে সরকার সাহায্য করেছেন। মিষ্টান্ন নিয়ন্ত্রণ আদেশের এই হচ্ছে সামগ্রিক ফলশ্রুতি।

অবশ্য সন্দেশ-রসগোল্লা রইল কি গেল তা নিয়ে আমাদের মত ইতরজনেদের মাথাব্যথা নেই। সংশোধিত আইন অনুসারে সন্দেশ-রসগোল্লায় ৪৫ ভাগ ছানা (চোদ্দ ক্যারেটের সোনার মত) ব্যবহার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সরকার খোলাখুলি বলে দিচ্ছেন বাকি ৫৫ ভাগ ভেজাল দাও। দেশে বোধ হয় একটা ভেজাল বিরোধী আইন এখনো চালু আছে যা ইংরাজ সরকার রচনা করেছিলেন। সেই আইনে কি এবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে কোর্টে দাঁড় করানো যায় না? এমন কথা কি কেউ কখনো শুনেছেন যে, যে দেশ নিজেকে সভ্য বলে জাহির করে, যে দেশের নেতারা কথায় কথায় পাঁচ হাজার বছরের গৌরবময় ট্রাডিশানের কথা বলতে ক্লান্ত হন না—সেই দেশেরই সরকার খোলাখুলি ভাবে বলছেন, ভেজাল দাও, খোলাবাজার বন্ধ করে দিয়ে বলছেন কালোবাজারে যাও কেন!

বালিকা বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ

গড়ফা ডি. এন. মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের কতিপয় শিক্ষিকার বিরুদ্ধে আমাদের নিকট কতকগুলি অভিযোগ এসেছে। প্রকাশ যে উক্ত বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষয়িত্রী স্কুলের মধ্যেই একটি কোচিং ক্লাস খুলেছেন, এবং ছাত্রীদের, বিশেষ করে নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রীদের সেই ক্লাসে যোগদান করতে বাধ্য করছেন, বলাই বাহুল্য বেশ ভাল রকম দক্ষিণার বিনিময়ে, গড়ফা স্কুলে পড়তে গেলে কোচিং ক্লাসেও পড়তে হবে, যেন বাধ্যতামূলক নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোচিং ক্লাসে ভর্তি না হলে স্কুল ছেড়ে চলে যাও এমন হুমকিও কয়েকজন দায়িত্বশীল শিক্ষিকা দিচ্ছেন। যদিও আমাদের কাছে বর্তমানে এই একটি স্কুল সম্পর্কে অভিযোগ এসেছে, তথাপি এটা নিশ্চিত যে পশ্চিমবঙ্গের বহু বিদ্যালয়েই আজ এই ব্যবস্থা চালু রয়েছে দীর্ঘকাল ধরে। সেই হিসাবে গড়ফা স্কুল কোন ব্যতিক্রম বিষয় নয়। কিন্তু এই ধরণের কাজ যাঁরা করছেন, শিক্ষক বা শিক্ষিকা হিসাবে তাঁরা দায়িত্বশীলতা বা নৈতিকতার পরিচয় দিচ্ছেন না। প্রাইভেট টুইশানী করা বা কোচিং ক্লাস খোলা কোন বে-আইনী কাজ নয়। কিন্তু স্কুল কম্পাউণ্ডের মধ্যে তা অবশ্যই করা চলতে পারে না, আর ছাত্র-ছাত্রীদের চাপ দিয়ে কোচিং ক্লাসে ভর্তি হতে বাধ্য করাটা একান্তই নীতিবিরুদ্ধ। আইন করে এঁদের এই অবৈধ কার্যকলাপ বন্ধ করা সম্ভব নয়, যদি না দায়িত্বশীল শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিজের থেকে এই সব কার্যকলাপের প্রতিবাদ না করেন। অভিভাবকদের দ্বারা এ বিষয়ে কিছুই করা বোধ হয় সম্ভব নয়, কেন না আমাদের অভিজ্ঞতায় যা বলে, সকল স্কুলেরই কায়েমী স্বার্থের চক্রটি, ম্যানেজিং কমিটি ও অভিভাবকদের একটি শ্রেণীকে হাত করে রাখে। শিক্ষকসমাজের অনাচার শিক্ষক ভিন্ন আর কেউ দমন করতে পারবে না।

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

সর্বপ্রথম শত্রুঘাঁটি দখল

১৯৩০ সাল, ১৮ই এপ্রিল, চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের সামরিক প্ল্যান অনুযায়ী শত্রুঘাঁটি সরকারী টেলিফোন ভবনটি দশটা বাজবার পাঁচ মিনিট পূর্বে অম্বিকাদার নেতৃত্বে সর্বপ্রথম বিধ্বস্ত ও ভস্মীভূত হোল। চট্টগ্রামের কেন্দ্রস্থলে ছোট্ট একটি টিলার উপর এই বৃটিশ নিয়ন্ত্রিত টেলিফোন ভবনটি। এই টিলার উপরেই সর্বপ্রথম বিদ্রোহের আগুনে টেলিফোন ভবনের চিতাগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। দেখতে দেখতে আগুনের ছটায় সারা আকাশ লাল হয়ে গেল। বৃটিশ ঘাঁটি টেলিফোন ভবনটির ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে অম্বিকাদা যুব-বিদ্রোহের প্রথম জয় ঘোষণা করলেন!

অম্বিকাদার পরিচালিত দলটি বিনা রক্তপাতে টেলিফোন ভবন অধিকার, ধ্বংস ও ভস্মীভূত করে বিজয় গৌরবে শেভ্রোলে গাড়িতে এসে উঠল। দশটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে কাটা-পাহাড়ের রাস্তা মোটরের লাইটে আলোকিত করে অম্বিকাদাদের দলটি প্ল্যান অনুযায়ী পুলিশ লাইনে আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য এগোচ্ছে। ঠিক এই সময় দশটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে পুলিশ লাইনের খুব কাছে—পাহারারত সান্ত্রীর দৃষ্টির বাইরে রাস্তার বাঁকে আমাদের সঙ্গে মাস্টারদার দেখা হবে।

ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় আমাদের গাড়ি ওয়াটার ওয়ার্কসের কাছে এসে পড়লো। হেড্ লাইট জ্বালিয়েই আসছিলাম রাস্তাটির বাঁকে পূর্ব চিহ্নিত স্থানে মাস্টারদা একজন বডিগার্ডের সঙ্গে উপস্থিত। রাস্তার ধারে বড় একটি গাছের ব্যাক-গ্রাউন্ডে—মোটরের হেড্ লাইটের আলোতে—আপাদ-মস্তক সাদা পোশাকে সজ্জিত মাস্টারদাকে অপূর্ব দেখাচ্ছিল! মাথায় তাঁর খদ্দরের সাদা গান্ধীটুপীর মত শক্ত ইস্তিরী করা উষ্ণীষ। টুপিটির সম্মুখভাগের ডানদিকে টাকার সাইজের উজ্জ্বল ধাতু নির্মিত ভারতবর্ষের প্রতীক। পরনে খদ্দরের লম্বা সাদা কোট। কোটের বোতামগুলি উজ্জ্বল ধাতু নির্মিত—বাঁদিকে বুকের উপর ভারতীয় গণতন্ত্র বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার প্রেসিডেন্টের জন্য বিশেষ ডিজাইন করা একটি উজ্জ্বল মেডেল শোভা পাচ্ছে—তা ছাড়া বুকে-পিঠে কালো ভেলভেটের উপর ঝক্‌ঝকে জরীর কাজ করা আমাদের তৈরি বিশেষ ব্যাজটি চোখ ঝল্‌সে দিচ্ছে। এই পোশাকের সঙ্গে মালকোঁচা দিয়ে পরা সাদা ধপধপে ধুতি ও টেনিস খেলার সাদা জুতো পায়ে মাস্টারদার এই অপরূপ বেশ দেখে মনে হচ্ছিল—সমুদ্রে ভাসমান একটি হিমশৈল। তার প্রচন্ড সংঘাতে আজ বৃটিশ রণতরীর সমাধি রচনা করবে—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রভুত্ব খর্ব হবে!

মাস্টারদার পাশে এসে আমাদের গাড়ি থামলো। নিমেষে আমরা ছয়জন নেমে এক সারিতে দাঁড়ালাম। গণেশের কমান্ডে আমরা ছ' জন মিলিটারী কায়দায় মাস্টারদাকে অভিবাদন জানাই। মাস্টারদা স্যালুট গ্রহণ করলেন; তারপরে প্রশ্ন করলেন—"সব ঠিক আছে?" গণেশ উত্তর দিল—"সব ঠিক।"

মাস্টারদা—এতক্ষণে টেলিফোন ভবন ধ্বংস হওয়ার কথা। ধ্বংস না হওয়ার কি কোন সম্ভাবনা আছে?

আমি—টেলিফোন ভবন ধ্বংস না হওয়ার পার্থিব কোন কারণ নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস টেলিফোন ভবন ধ্বংস হয়েছে।

মাস্টারদা—A.F.I. অস্ত্রাগার আক্রমণকারী দলটির শেষ মুহূর্তে কোন বিচ্যুতির কারণ আছে কি?

গণেশ—না, কোন ত্রুটি আছে বলে আমি মনে করি না।

মাস্টারদা—ইয়োরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণকারী দলের আপোষহীন মনোভাবের কোন পরিবর্তনের সম্ভাবনা কি আছে!

গণেশ—না, না, অসম্ভব! জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকান্ডের প্রতিশোধ আজ তারা নেবেই।

খুব সংক্ষেপে এইরূপ দু-চারটি কথা হোল। আমাদের সবার মনে তখন প্রশ্ন—টেলিফোন অফিসটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে তো? যদিও সেইরূপ চিন্তার কোন অবকাশ ছিল না তবু সার্বিক পরিকল্পনার মধ্যে টেলিফোন ভবনের সুনিশ্চিত ধ্বংসের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছি বলেই—সেই প্রশ্নে আমাদের মন আলোড়িত হচ্ছিল।

আমরা ছয়জন গাড়িতে উঠে বসলাম। পরস্পর জেনে নিলাম প্রত্যেকের পিস্তল বা রিভলবারের চেম্বারে টোটা ভর্তি আছে কি না। এতক্ষণ চেম্বারে কার্তুজ ভর্তি ছিল বলে সেফ্‌টি ক্যাচ্ দিয়ে সকলে নিজ নিজ রিভলবার সঙ্গে রেখেছি যেন আকস্মিকভাবে হঠাৎ গুলী ছুটে না যায়। মাস্টারদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, অ্যাকসনের এক মিনিট আগে গাড়িতে স্টার্ট দিলাম। এখান থেকে অস্ত্রাগারের কাছে গার্ডরুমে আমাদের পৌঁছাতে এক মিনিটের বেশি সময় লাগবে না। গাড়ি চলার সঙ্গে সঙ্গে হুকুম হলো "কাট্ অফ সেফটি"। সবাই আমরা পিস্তল ও রিভলবারের সেফটি বোতামগুলি টিপে দিলাম। এখন ট্রিগারে চাপ দিলেই গুলী ছুটবে। পাছে সেফ্‌টি চাবি খুলতে কেউ ভুলে যায় এবং সেই ভুলের জন্য আক্রমণ করতে গিয়ে ট্রিগার টেপার সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার না হয় তবে ভেবে দেখুন কি সাংঘাতিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। আমাদের অভিজ্ঞতা ছিল—স্নায়বিক দুর্বলতার জন্য কেউ কেউ safety catch ভুলে না সরিয়ে রিভলবার ফায়ার করতে ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। সেইরূপ মারাত্মক গাফিলতির দোষে যেন আমরা সশস্ত্র সান্ত্রীর বন্দুকের মুখে বিপদে না পড়ি তার জন্য সবাইকে safety catch খুলে নিতে বলা হোল।

গাড়ি পঞ্চাশ-ষাট গজ এগিয়ে যেতেই

দেখা গেল টিলার উপর রাইফেলধারী প্রহরী নিঃশব্দে পায়চারী করছে। স্লোপ-আর্ম অবস্থায় প্রহরীর স্কন্ধে রাইফেল—কটিবন্ধে সঙ্গীনের খাপ—বুকের উপর আড়াআড়িভাবে বেল্টুলিয়ার (কার্তুজের বেল্ট) বাঁধা আছে। পাহারা দেওয়ার সময় বন্দুকে সঙ্গীন চড়ানো ছিল। সঙ্গীনের উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ ফলা অন্ধকারে ঝক্ ঝক্ করছে—প্রতি পদক্ষেপে বৃটিশ প্রভুত্বের দম্ভের প্রকাশ! বুট, পট্টি, খাকী পোশাক, বন্দুক ও বেয়নেটের জোরে দু'শ বছর ধরে ইংরেজ ভারত শাসন করেছে! বৃটিশ বেতনভোগী পুলিশ ও সৈন্য খাকী পোশাক ও বন্দুকের প্রভাবে ও নেশায় তাদের স্বাধীন সত্তা হারিয়েছে। বৃটিশ প্রভুত্বের ঔদ্ধত্যে—তার বন্দুক ও সঙ্গীন অপরাজেয়—এই দম্ভভরে নির্ভীক সান্ত্রী পাহারারত! পিছনের গার্ডরুমে খাকী সশস্ত্র পুলিশবাহিনী হয়ত বিশ্রাম করছে বা ঘুমে অচেতন। সান্ত্রীর বাঁ-পাশে অস্ত্রাগার ও ম্যাগাজিন ঘর দু'টি এতদিন ধরে বৃটিশ পাশবিক শক্তির ঘৃণ্য পরিচয় বহন করে এসেছে—আমাদের বিপ্লবী মন আজ বৃটিশের পাশবিক বলে রচিত বুনিয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। এখনই আমাদের সশস্ত্র আক্রমণের মুখে তাদের ঔদ্ধত্য, গর্ব, দম্ভ সমস্ত ধুলিসাৎ হবে!

সেইদিন সেই সময়ে পাহারায় নিযুক্ত সেই সান্ত্রীর বিরুদ্ধে আমাদের কোন আক্রোশই ছিল না। আমরা কেউই জানি না তার কি নাম—কি জাত বা কি ধর্ম! হোক্ না সে হিন্দু বা মুসলমান বা খৃস্টান—ধর্ম বা জাতির বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ নয়—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই আমাদের সশস্ত্র যুব-বিদ্রোহ—। বৃটিশের সৈনিক, পোশাক ও রাইফেলের বিরুদ্ধেই আমাদের পিস্তলের গুলী ছুটবে—আক্রমণের সূচনাতেই বিদ্যুদ্বেগে প্রচণ্ড আঘাত হানতে হবে! পাহারায় নিযুক্ত সান্ত্রীকে পরাভূত করে নিমেষের মধ্যে আমাদের গার্ডরুম দখল করে নিতে হবে।

চকিতে আমাদের ছয়জনের পিস্তল দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হলো। প্রত্যেকের তর্জনী পিস্তলের ট্রিগার স্পর্শ করে আছে। সান্ত্রী বন্দুক কাঁধে ছোট টিলার উপর দাঁড়িয়ে সব দেখছে। ঠিক তার সামনেই টিলার নিচে আমাদের গাড়ি এসে থামল। সোজা দশ-বারো ফুট টিলা বেয়ে উপরে উঠলে তবেই সমতল জায়গায় সান্ত্রীর সামনাসামনি এসে দাঁড়ানো সম্ভব। মোটর থামার সঙ্গে সঙ্গে ইলেক্‌ট্রিক পরিচালিত কলের মানুষের মত আমরা ছয়জন তড়াক্ করে প্ল্যানমত নেমে পড়লাম। তড়িৎ-বেগে গাড়িতে ওঠা ও নামার শতাধিক রিহার্সাল আমরা আগে দিয়েছি। আক্রমনের এই দারুণ সঙ্কটময় মুহূর্তে প্রতি সেকেণ্ডের ছোট ভগ্নাংশও অতি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান সময়। সান্ত্রী ও গার্ডরুমের পুলিশ প্রহরীর কোন কিছু আন্দাজ করার আগেই,—সান্ত্রীকে তার বন্দুক ব্যবহার করার সুযোগ বা অন্যান্য সেপাইদের সঙ্কেত দেওয়ার পূর্বেই পুলিশ লাইনের অস্ত্রাগার ও পুলিশ লাইন আমাদের অধিকার করে নিতে হবে। তাই ক্ষিপ্রতার প্রয়োজন অনেক বেশি।

সান্ত্রী দেখছে আমাদের গাড়ি হঠাৎ এসে থেমে গেল। কোন কিছু ভাববার আগেই সে দেখতে পায় মিলিটারী ইউনিফর্মে খুব উচ্চপদস্থ কয়েকজন সামরিক অফিসার গাড়ি থেকে নামল। নকল অফিসার না সত্যিকার উচ্চপদস্থ বৃটিশ সৈনিক তা সে কি করে বুঝবে! বৃটিশ সামরিক কর্মচারীর অসময়ে এই অপ্রত্যাশিত আগমন কেন? অফিসাররা কি ইনসপেকশনে এসেছেন? তবে বাঁ-দিকের গাড়ি চলার রাস্তায় মোটরে না এসে খাড়া টিলা বেয়ে তাঁরা উঠছেন কেন? নানা প্রশ্ন, সংশয় বা চিন্তা—বেচারী সান্ত্রীর মনে তখন কি জেগেছিল তা অবশ্য সে ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না। তবে এই অপ্রত্যাশিত ঘটনা সান্ত্রীকে বিচলিত করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের প্রত্যেকের ডান হাতটি ঘুরিয়ে পিছনের দিকে নিজ শরীরের আড়ালে রেখেছি। বলা বাহুল্য হাতে ধরা পিস্তল যেন সান্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ না করে সেই উদ্দেশ্যে ডান হাত শরীরের আড়াল করে রাখা। কি যে আমাদের পিছনে লুকিয়ে রেখেছি তা সান্ত্রীর না বোঝার কোন কারণ নেই। কিন্তু বুঝলেও তার কিছু করার ক্ষমতা ছিল না।

যখন গাড়ি এসে থামল তখন থেকে আমাদের দৃষ্টি প্রতিটি মুহূর্তের জন্য সান্ত্রীর উপরে নিবদ্ধ ছিল। সান্ত্রী ঘাড় থেকে বন্দুক নামিয়ে সামরিক কায়দায় আমাদের প্রতি লক্ষ্য করে—Halt! Who comes there! আদেশ দেওয়ার সুযোগ যেন না পায় তার জন্য আমরা একেবারে প্রস্তুত ছিলাম। এত কাছে এসে হঠাৎ গাড়ি থামাবার পূর্বে ওয়াটার ওয়ার্কসের রাস্তা দিয়ে যখন আমরা আসছিলাম তখন যদি সান্ত্রী আমাদের মোটর থামাতে আদেশ দিত তাহলে আমরা খুব অসুবিধায় পড়তাম। পঞ্চাশ ষাট ফুট দূর থেকে সান্ত্রীর আদেশ না মেনে গুলী চালিয়ে লক্ষ্যভেদ করার মধ্যে অনিশ্চয়তা থাকার সম্ভাবনা অনেক বেশি এবং সেইরূপ অবস্থায় যদি প্রথমটা আমাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট হত তবে সান্ত্রী ও গার্ডরুমের প্রত্যেকে প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ পেতো না তার নিশ্চয়তা কোথায়? তারা প্রথম আক্রমণ সামলে নিতে পারলে ঘরের মধ্যে থেকে জানালা ও দরজার দেওয়াল আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহার করে প্রতি-আক্রমণের প্রচুর সুযোগ পাবে। এইরূপ প্রতিকূল অবস্থার যদি সৃষ্টি হয়, তবে আমাদের প্ল্যান সার্থক না হওয়ার নব্বই ভাগ সম্ভাবনা—, বহু অনিশ্চয়তা ও আশঙ্কা সেইরূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থাকবে। কিন্তু সান্ত্রী যখন পূর্বে কোন আশংকা করে নি এবং বিনা বাধায় আমরা যখন তার ঠিক সামনে টিলার নিচে এসে পড়লাম—আর এখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েই যখন দশ বারো ফুট খাড়াই টিলা বেয়ে উঠছি তখন আমাদের জয়ের অনিশ্চয়তার আর কোন কারণ ছিল না।

সান্ত্রীর উপর ছয় জোড়া চোখ একেবারে নিবদ্ধ। যদি সে তার বন্দুক তুলতে একটুও চেষ্টা করে, তবে দশ ফুট ব্যবধানের মধ্যে একসঙ্গে দুটি পিস্তলের গুলী তার বুক তখনি বিদীর্ণ করবে। গণেশ ও আমি সামনে, আর আমাদের পিছনের সারিতে—বিধু, হরিপদ, সরোজ ও হিমাংশু লক্ষ্য স্থির রেখে ধাপে ধাপে দ্রুত উঠতে লাগলাম। দশ বারো ফুট টিলাটি উঠতে পাঁচ ছয় সেকেণ্ড সময়ও লাগে নি। এই পাঁচ সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে সান্ত্রীর মনে কোন অশুভ চিন্তা এসেছে কি না কে বলবে! তার বুক কেঁপে উঠেছিল কি না কে জানে! সান্ত্রীর তিন হাতের ব্যবধানে আমাদের দুজনের পিস্তল (আমার ও গণেশের) এক সঙ্গে গর্জন করে উঠলো। দুটি গুলী তার হৃদয় ভেদ করে চলে গেল। তার মুখে একটিও শব্দ শোনা গেল না। মূল উৎপাটিত গাছের মত কাঁপতে কাঁপতে সান্ত্রী মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। বন্দুকটি একধারে ছিটকে পড়লো, মাথার পাগড়ী মাটিতে গড়াতে লাগল। আমাদের একজন মুহূর্তে তার বন্দুক তুলে নিল।

প্রথম পিস্তল ফায়ারের সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে বলেছি—"হটো! ভাগো! জান বাঁচাও! গান্ধীজীকা রাজ হো গয়া!" লবণ আইন ভঙ্গের আন্দোলনের সংবাদ পুলিশ ও সৈন্যদের মধ্যে খুব প্রচলিত। তাই গান্ধীরাজের অর্থ তাদের পক্ষে বোঝা সহজ—ইংরেজের রাজত্ব গেছে আমরা স্বাধীন হয়েছি। সান্ত্রীকে গুলী করার পর তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে বিশেষ কোন লক্ষ্য না করেই দুই তিন লাফে এগিয়ে গিয়ে আমরা গার্ডরুম আক্রমণ করি। আমাদের পিস্তল থেকে পর পর আরো পাঁচ ছয়টি ফায়ার হয়েছে।

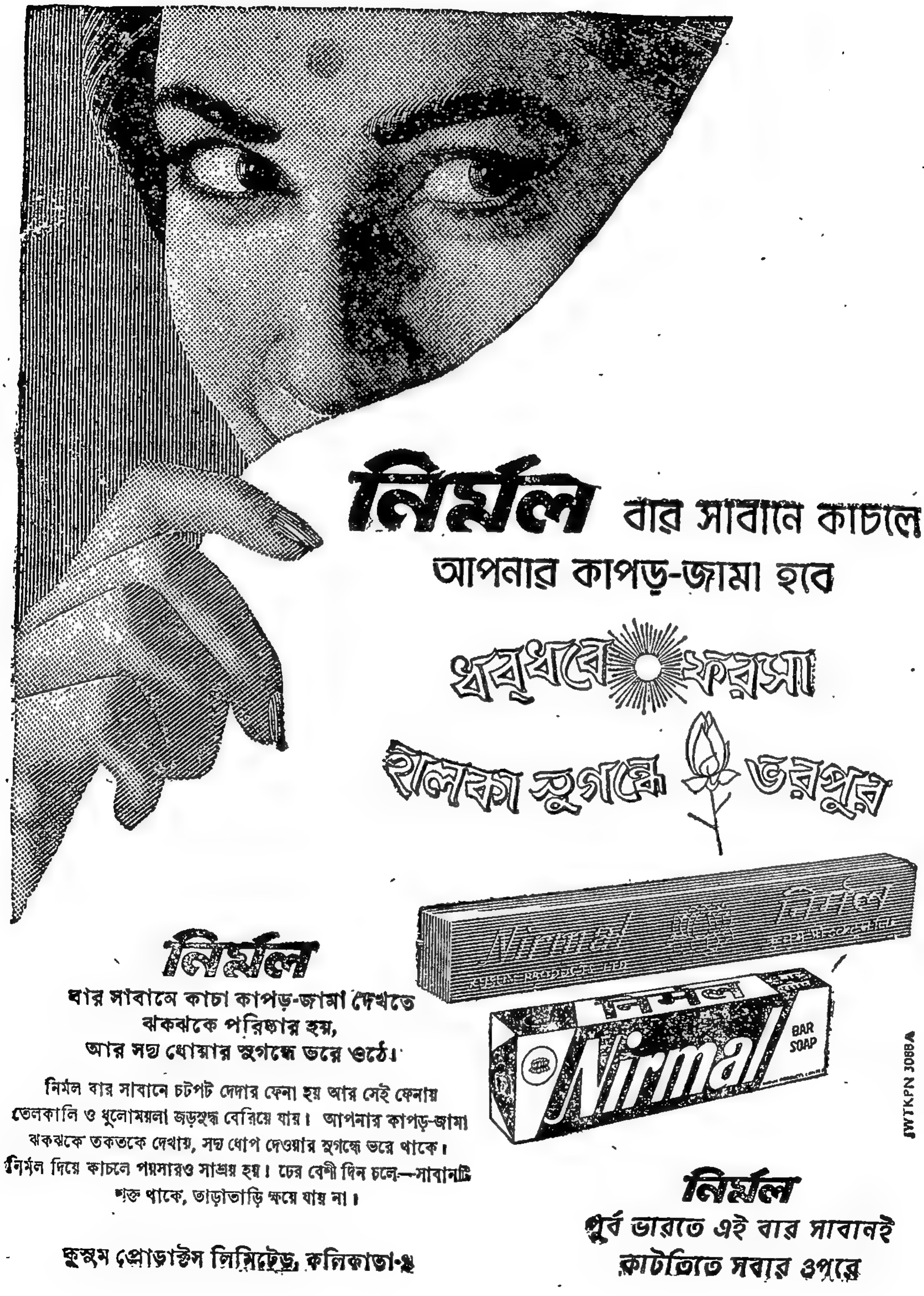
নির্ম্মল বার সাবানে কাচালে
আপনার কাপড়-জামা হবে
ধবধবে ফরসা
হালকা সুগন্ধে ভরপুর
Nirmal
BAR SOAP
JWTKPN 3088A
নির্ম্মল
যার সাবানে কাচা কাপড়-জামা দেখতে
ঝকঝকে পরিষ্কার হয়,
আর সদ্য ধোয়ার সুগন্ধে ভরে ওঠে।
নির্মল বার সাবানে চটপট দেদার ফেনা হয় আর সেই ফেনায়
তেলকালি ও ধুলোময়লা জড়শুদ্ধ বেরিয়ে যায়। আপনার কাপড়-জামা
ঝকঝকে তকতকে দেখায়, সদ্য ধোপ দেওয়ার সুগন্ধে ভরে থাকে।
নির্মল দিয়ে কাচলে পয়সারও সাশ্রয় হয়। ঢের বেশী দিন চলে—সাবানটি
শক্ত থাকে, তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যায় না।
কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড, কলিকাতা-১
নির্ম্মল
পূর্ব ভারতে এই বার সাবানই
কাটতিতে সবার ওপরে

বিশেষ কাউকে লক্ষ্য করে গুলী করি নি। গার্ডরুমের দিকে ছুটে যাওয়ার সময় ফায়ার করতে করতে এগিয়েছি পুলিশদের ভয় দেখাবার উদ্দেশ্যে। আর লক্ষ্য ছিল কোন প্রহরীই যেন তার রাইফেল তুলে নিতে না পারে। অতর্কিত আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে যেমন "হঠো, ভাগো, গান্ধী-রাজ হো গয়া—" বলেছি,—তেমনি আবার আক্রমণের প্ল্যান অনুযায়ী আমরা সমস্বরে গগন বিদারী শ্লোগান দিয়ে পুলিশ লাইন মুখরিত করে তুলেছি—ইনক্লাব জিন্দাবাদ! সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক! Long live Revolution! Down with Imperialism! Up with Revolution! বিপ্লব দীর্ঘ-জীবী হোক! রণধ্বনি আমরা সঙ্কেত অনুযায়ী প্রথম সুরু করি এবং সেই অনুসারে পুলিশ লাইনের চারি পাশে আমাদের ছোট ছোট সাতটি দল গুপ্ত স্থান থেকে অন্ধকারের নির্জনতা ভংগ করে রব তোলে "ইনক্লাব জিন্দাবাদ!" রাত্রে অতর্কিত আক্রমণ, পিস্তলের গুলী, সান্ত্রীর পতন, গার্ডরুমের দিকে ফায়ার, শ্লোগান এবং পর পর ও এক সঙ্গে চারিদিক থেকে পাহাড়ে ঘেরা পুলিশ লাইন প্রকম্পিত করে শ্লোগানের পর শ্লোগান যে দারুণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তাতে পুলিশ—কেবল গার্ডরুম থেকে নয়, পুলিশ ব্যারাক থেকেও ভীত গ্রস্ত হয়ে—'যঃ পলায়তি স জীবতি' ভেবে, যে যেখানে পেরেছে পালিয়েছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে গার্ডরুম ব্যারাক সব শূন্য হয়ে পড়ে রইল।

আমাদের গুলীতে আর একজন পুলিশও আহত হয়। সে আহত অবস্থায় ভয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে। এই ঘটনা পরে মামলার সময় তারই জবানবন্দীতে আমরা জানতে পেরেছি। মামলা চলা-কালে আমরা আরো জানতে পারি—অনেকে একেবারে বাড়ি চলে যায়—তিনচারদিন তারা কেউ শহরে ছিল না। কেউ কেউ দশ পনেরো দিন বা মাসখানেক পরেও ফিরে এসেছে।

এই আক্রমণ ও গার্ডরুম অধিকার করতে আমাদের সাত সেকেণ্ডের বেশি সময় লাগে নি। তারপর দু' মিনিটের মধ্যে সমস্ত পুলিশ-ব্যারাক ও লাইন ছেড়ে আত্মরক্ষার জন্য কে কোথায় পালিয়ে গেল তার ঠিক নাই! অন্যদিকে প্রথম জয়ের পরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাতটি দল প্ল্যান অনুযায়ী আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিল। আমরা খুব বড় বড় টর্চ লাইট সঙ্গে নিয়ে যাই। টর্চ হাতে পাঁচ ছয়জন আগমন পথে বা মাঠের দিকে পজিশান নিল—শত্রুর গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখবার জন্য। প্রথম জয়ের পর এইরূপ সতর্কতার প্রয়োজন ছিল। তার চেয়েও অনেক বেশি প্রয়োজন ছিল অস্ত্রাগার ও ম্যাগাজিন গৃহের দরজা ভেঙে সকলকে অস্ত্র সজ্জায় সজ্জিত করা। পূর্ব থেকেই অস্ত্রাগার ও ম্যাগাজিন ঘর ভাঙার সব রকম ব্যবস্থা করা ছিল। প্রহরীরা পরাস্ত হওয়ার পরই অস্ত্রাগারের দরজার তালার উপর মস্ত বড় বড় হাতুড়ীর দমা দম ঘা পড়তে লাগল। ম্যাগাজিন কক্ষের রুদ্ধ দরজার ভারী ভারী তালার উপরেও আঘাতের পর আঘাত পড়ছে। মুহুর্মুহু হাতুড়ীর দারুণ শব্দ পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে। সবল বাহুর প্রচণ্ড আঘাতের কাছে প্রত্যেকটি ভারী ভারী তালা নিমেষে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো—ঝর ঝর ঝন্ ঝন্ করে তালা-গুলি টুকরো টুকরো হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

খুব সহজেই দু'চার মিনিটের মধ্যে অস্ত্রাগার ও ম্যাগাজিন কক্ষের দরজা ভাঙা শেষ হলো। দরজা উন্মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে থরে থরে সাজানো মাস্কেট্রী (পুলিশ রাইফেল) ও রিভলবারের প্রতি বিপ্লবী যুবকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। কি অপূর্ব দৃশ্য! আমাদের কতদিনের সেই স্বপ্ন আজ সফল হলো! সেইদিন আমরা যে আনন্দ অনুভব করেছি সেইরূপ আনন্দ জীবনে আর কোনদিন পাই নি! পুলিশ লাইনের সব অস্ত্রের অধিকারী আজ আমরা! আনন্দে উল্লাসে আমরা সকলেই আত্মহারা—অনেকে আনন্দে নৃত্য করছে!

সৈনিক আমরা। অস্থায়ী গণতন্ত্রী বিপ্লবী সরকার গঠন করতে হবে। প্রচুর দায়িত্ব। প্রথম জয়কে যত দূর সম্ভব সুসংবদ্ধ করা চাই। ক্ষণিক জয়োল্লাসের অভিব্যক্তি আমাদের বিপ্লবী প্রেরণা সহস্র-গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। জয়োল্লাস ও জয়ধ্বনি যে পরিমাণে আমাদের মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছে—চট্টগ্রামের শত্রু শিবিরে ততোধিক হতাশা ও নিরাশার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

অস্ত্রাগার ভেঙে ফেলার পর স্বাভাবিক আনন্দ উৎসবের মাঝখানে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠের কম্যাণ্ড শোনা গেল—"কম্পানি-ফল-ইন"! কম্যাণ্ড দিচ্ছে স্বয়ং গণেশ ঘোষ। তখনকার দিনের ফরমেশন অনুযায়ী দুই সারিতে লাইন বেঁধে সবাই সামরিক কায়দায় দাঁড়িয়ে পড়ল। আদেশ অনুসারে আর ছয়জন যুবক মাস্কেট্রী ও রিভলবার সবাইকে দ্রুত সরবরাহ করতে লাগল। ম্যাগাজিন থেকে কার্তুজ সরবরাহ করল অন্য চারজন বিপ্লবী সৈনিক। আমার যত দূর মনে পড়ে অধিকাংশ বিপ্লবী যুবকেরা দুটি করে রিভলবার ও একটি মাস্কেট্রী সঙ্গে নিল। আজ মনে নেই কে একজন দৌড়ে এসে আমার হাতে একটা রিভলবার ও কতগুলো কার্তুজ দিয়ে গেল। দু'এক মিনিটের মধ্যে আর একজন তরুণ বন্ধু ছুটে এসে আমাকে আর একটা রিভলবার দিল। আমার হাতে মাস্কেট্রী ছিল না। লোভ হলো—দুটি রিভলবারই আমি সঙ্গে রাখলাম। আমাদের সঙ্ঘের সংগৃহীত 'নয়-সটের' পিস্তলটি আমি কখনও কাছ ছাড়া করি নি—পিস্তলটি আমার খুব প্রিয়। যুব-বিদ্রোহে পিস্তলটির অব্যর্থ গুলী পুলিশ লাইন অধিকার করতে সাহায্য করেছে। পিস্তলটি হোলস্টারে রেখে দিলাম—আর দু' হাতে দুটি খোলা রিভলবার নিয়ে আমি সব সময়ের জন্য প্রস্তুত রইলাম।

সবাইকে রিভলবার, মাস্কেট্রী ও টোটা সরবরাহ করার পর গণেশ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মাঝামাঝি একটি উঁচু জায়গায় উঠে দাঁড়ালো। সেইখান থেকে কম্পানিকে সম্বোধন করে মাস্কেট্রী ব্যবহার করার পদ্ধতি ভালোভাবে দেখিয়ে ও বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিল। সবাইকে ফাঁক ফাঁক হয়ে দাঁড়াতে বলল—সবাই বন্দুকের মুখ উপরের দিকে করে ধরেছে। কি করে লিভারটি চেপে কার্তুজ ভর্তি করার চেম্বারের মুখ খুলতে হয়, কার্তুজ কিভাবে চেম্বারে ভর্তি করতে হয়—তারপর লিভারটি চাপ দিয়ে বন্ধ করলেই কি করে স্ট্রাইকিং পিন স্প্রীং-এর সাহায্যে টোটার ক্যাপটিকে আঘাত করার জন্য প্রস্তুত থাকে; এবং বন্দুক শক্ত করে Aiming Position-এ ধরার পর ট্রিগারটি টিপে দিলে মাস্কেট্রী ফায়ার করা যায় তার প্রাথমিক কৌশল গণেশ তাদের শিখিয়ে দিল। তারা সবাই কমাণ্ড অনুসরণ করে কাজ করল। গণেশ হুকুম দিল—"Load"! সবাই টোটা ভর্তি করল। আবার আদেশ দিল—"Aim"! সকলে উপরের দিকে লক্ষ্য করল! তৃতীয় কমাণ্ড হলো—"Fire"! এক সঙ্গে প্রায় পঞ্চাশটি মাস্কেট্রী গর্জন করে উঠলো। এইভাবে তিনবার তারা ফায়ার করা অভ্যাস করল।

যদি কেউ ভাবেন এত সহজেই মাস্কেট্রী চালানো শেখা যায় তবে ভুল হবে। আমাদের প্রত্যেকটি ছেলের বন্দুক চালানো খুব ভালো করে শেখা ছিল। তা ছাড়া সামরিক কায়দায় কি ভাবে বন্দুক ধরতে হয়, তুলতে হয়, এবং লক্ষ্য করা ও ফায়ার করার পদ্ধতি কি সেই সম্বন্ধে শিক্ষা তাদের পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। আর অনেক আগে থেকেই বন্দুকের ক্যাটালগ থেকে ছবি দেখিয়ে তাদের খুব ভালো করে মাস্কেট্রীর ক্রিয়া

বিষয় শেখানো হয়েছিল। তবু মাস্কেট্রী হাতে পাওয়ার পর প্রাক্টিক্যাল (হাতে নাতে) তাদের ফায়ার করতে শেখানো হলো। চার পাঁচ মিনিটের মধ্যে খুব প্রাথমিক শিক্ষা এতজনকে এক সংগে দেওয়া হলো—কিন্তু একটি অ্যাকসিডেন্টও হয় নি। সামরিক শিক্ষা পদ্ধতির যেরূপ ধারা আছে সেই পদ্ধতি অনুসরণ করলে তিনমাসের কম সময়ে রাইফেল চালানো শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। মিলিটারীতে শিক্ষার সময় অ্যাকসিডেন্ট থেকে বাঁচার জন্য নানা ধরণের সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থার বিধান আছে। কাজেই পাঁচ মিনিটের মধ্যে গণেশ যে শিক্ষা তাদের দিতে পেরেছিল তার মধ্যে অনেক ত্রুটি ছিল তাতে সন্দেহ নেই। তবে বিনা অ্যাকসিডেন্টে মোটামুটিভাবে তারা মাস্কেট্রী ব্যবহার শিক্ষালাভ করতে পেরেছিল তার একমাত্র কারণ অনেক আগে থেকে বহুদিন ধরে তারা ব্রীচলোডার বন্দুক দিয়ে রিহার্সাল দিয়েছে এবং মাস্কেট্রী চালানোর বিষয়েও অনেক কিছু theoritically শিখেছে।

এবার মাস্টারদা হুকুম দিলেন—"বৃটিশ ইউনিয়ন জ্যাক খুঁজে বার করে পুড়িয়ে ফেল।" রাত্রে ইউনিয়ন জ্যাক নামানো থাকতো। মাস্টারদার আদেশের সংগে সংগে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঘৃণ্য ইউনিয়ন জ্যাকের বহ্নি-উৎসব হলো। মাস্টারদা হুকুম দিলেন জাতীয় পতাকা তোলা হোক। দুজন তরুণ বিপ্লবী বীরদর্পে এগিয়ে গেল। বিজয় গৌরবে জাতীয় পতাকা তোলা হলো। আমাদের বিউগল বেজে উঠলো। গণেশ কম্যান্ড দিল Load! Aim! Fire! তিন তিন-বার পঞ্চাশটি বন্দুক আকাশের দিকে মুখ করে এক সংগে গর্জন করে উঠল। পুলিশ লাইনের প্রায় চারিদিক ঘেরা পাহাড়ের শিখরে শিখরে বন্দুকের গর্জন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে দূর গগনে মিলিয়ে গেল। আবার আর একটি সুর বাজলো বিউগলে—চট্টগ্রামের আকাশ বাতাস আলোড়িত করে আমরা তিনবার রণধ্বনি দিলাম—"বন্দেমাতরম্!" "ইনক্লাব জিন্দা-বাদ"। সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক।

এই ছোট্ট অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হওয়ার পর গণেশ হুকুম দিল—"চারিদিকে পজিশান নাও!" সবাই হুকুম শুনে গার্ডরুম, ম্যাগাজিন ও অস্ত্রাগার ঘিরে পজিশান নিল। তারপর আদেশ হলো—"বাইরের দিকে লক্ষ্য রাখো!" তৃতীয় আদেশ—"Lie down!" সবাই হুকুম শুনে শুয়ে পড়ল।

প্রথম গুলী করার পর থেকে এখন পর্যন্ত যে যে ঘটনার বর্ণনা দিলাম তা ঘটেছে খুব বেশি হলেও নয় মিনিটের মধ্যে। এবারে আর একটি কাজ করা আমাদের বিশেষ বিপ্লবী দায়িত্ব বলে মনে হল। গুলীবিদ্ধ হয়ে পড়ে আছে একজন সেপাই। সে ভারতবাসী। অভাবের তাড়নায় সে পুলিশ কনেস্টবলের কাজ নিয়েছে। তার সংগে তো আমাদের কোন শত্রুতা ছিল না। তবু প্রয়োজনের খাতিরে তাকে আমাদের গুলী করতে হয়েছে। টেলিগ্রাম টেলিফোন ভবন আক্রমণের সময় যেন কোন রক্তপাত না হয় তার জন্য যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। কোন ড্রাইভারকে কাবু করার সময় যেন কোন দুর্ঘটনা না ঘটে—যেন কেউ আহত না হয় তার জন্য আমাদের সতর্কতার অন্ত ছিল না। কিন্তু পুলিশ লাইন আক্রমণ করার সময় আমরা সেই নিয়মের ব্যতিক্রম করেছি। আমরা সশস্ত্র সান্ত্রী ও গার্ড-রুমের সশস্ত্র সেপাইদের কোন প্রকার প্রতি-আক্রমণের সুযোগ না দিয়ে অতর্কিত আক্রমণে পুলিশ লাইন অধিকার করতে চেয়েছিলাম। ব্যারাকে প্রায় দুশো সেপাই উপস্থিত থাকে। এরূপ অবস্থায় একেবারে বিনা রক্তপাতে এই আক্রমণ পরিচালনা করা যুক্তিযুক্ত মনে করি নি—সম্ভবপরও ভাবি নি। বিশেষ করে প্রথম আক্রমণের পর্যায়ে যদি আমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু ঘটতো বা কেউ আহত হতো তবে জয়ের ফলাফল অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকার সম্ভাবনা ছিল। তাই সব দিক বিবেচনা করে আগে থেকেই আমরা ঠিক করেছিলাম এই বিশেষ ক্ষেত্রে বিনা রক্তপাতে পুলিশ লাইন অধিকার করার রণ-কৌশলের পরিবর্তে, যত কম রক্তপাতের বিনিময়ে পুলিশ লাইন চূড়ান্তভাবে অধিকার করতে পারি সেই চেষ্টা করবো।

এই কারণবশত এই সেপাই বেচারীর মৃত্যু ঘটেছে। আমি একেবারে প্রথমেই লিখেছি—আমরা জেল থেকে ঠিক করে আসি, বাংলার অতীত বৈপ্লবিক কর্মসূচীর মত ভবিষ্যতে ভারতীয় সরকারী কর্মচারীদের আমরা আর মৃত্যুদণ্ড দেবো না। তাতে ইংরেজ প্রভুদের মোটেই কোন ক্ষতি হয় না। "রায় বাহাদুর", "খাঁ বাহাদুর" প্রভৃতি উপাধি বিতরণ করে এবং চাকরীর প্রমোশন ও কোন ভারতীয় কর্মচারীর মৃত্যু হলে তার পরিবারকে পুরস্কার ও পেনসন প্রভৃতির প্রলোভন দেখিয়ে এই গরীব দেশে সরকার ভজা কর্মচারী যোগাড় করা ইংরেজ কর্তাদের পক্ষে কিছুমাত্র শক্ত কাজ নয়। ভারতের বুকে বসে ভারতের স্বার্থের বিরুদ্ধে ভারতীয়কে দিয়ে ইংরেজের শাসনকার্য পরিচালনার জঘন্য নীতির চাতুর্য বুঝতে হলে কোনো বিশেষ গবেষণা করার প্রয়োজন হয় না। অতীতে এই সহজ ব্যাপারটি বুঝতে পেরে বিপ্লবীরা অত্যাচারী ভারতীয় কর্মচারীদের উপর প্রতিশোধ নিয়েছে—আর মাঝখান থেকে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ নিস্কৃতি পেয়ে গেছে। তাই মূল অত্যাচারীর প্রতি লক্ষ্য রেখে ভবিষ্যতে ভারতীয় কর্মচারীদের অত্যাচার নীরবে সহ্য করে আমরা খাস বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীদেরই বিনাশ করবো বলে স্থির করেছিলাম। বেচারা এই সেপাইটি কোন কারণেই আমাদের টার্গেট ছিল না—টার্গেট ছিল—খাকী পোষাক, রাইফেল ও অত্যাচারী উদ্ধত বৃটিশ বেয়নেট!

পরাধীন দেশের মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ সেপাইকেও ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক প্রথম অবস্থায় প্রাণ দিতে হয়। পরবর্তীকালে জেলে পাহারারত আমার বন্ধু সেপাই একজন দুঃখ করে বলেছিল—"বাবু আপনারা পুলিশ লাইন আক্রমণের পূর্বে যদি সেই সান্ত্রীকে আপনাদের অভিপ্রায় জানাতেন, তবে সে আপনাদের সংগে যোগ দিত—তাকে আর আপনাদের গুলীতে প্রাণ দিতে হতো না।" বন্ধু সেপাইটি সরল মনেই তার নিজ মনের অভিব্যক্তি এইভাবে আমার কাছে প্রকাশ করেছিল। উত্তরে তাকে আমি বলেছিলাম—"হয়ত আমরা সে প্রহরীকে আমাদের স্বপক্ষে পেতাম—কিন্তু ঐরূপ গুপ্ত আক্রমণ পরিকল্পনা কি সাহস করে তাকে আগে বলা উচিত হোত? সে যদি নিজ স্বার্থে ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করতো? বৃটিশের রাজ্য পরিচালনা ব্যবস্থা এমন চাতুর্যপূর্ণ যে—তাকে পরাস্ত করতে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের স্বপক্ষের ক্ষতি স্বীকার করতেই হবে।" আমার বাস্তব যুক্তি বন্ধু সেপাইটি মেনে নিয়েছিল।

আমাদের গুলীতে এই সান্ত্রীর মৃত্যু same side, স্বপক্ষের ক্ষতি। কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্রের ভাষায়—"মহামানবের মুক্তি সাগরে মানবের রক্তধারা তরংগ তুলে ছুটে যাবে সেই তো আমাদের স্বপ্ন!" মুক্তিযুদ্ধে এই সান্ত্রীর রুধিরধারায় সিঞ্চিত হয়েছে বাংলার মাটি! তার প্রাণ-হীন দেহ পুলিশ লাইনে গার্ডরুমের সামনে নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে! আমরা ছয় জন সারি দিয়ে মৃত সেপাইয়ের পাশে দাঁড়ালাম—জাতীয় পতাকাযুক্ত ভেলভেটের ব্যাজ গণেশ তার নিজের ইউনিফর্মের বুক থেকে খুলে সম্মানের সংগে মৃত সেপাই-এর বুকের উপর রাখল। তারপর উঠে এক পা পিছনে সরে এসে আমাদের সামনে দাঁড়ালো। আমরা ছয় জন গণেশের কম্যান্ডে মৃত সৈনিকের প্রতি বিপ্লবী অভিবাদন জানালাম।

সৈনিক! তুমি আমাদের শত্রু নও। তোমার প্রতি আমাদের কোন আক্রোশ নাই—তবু তোমাকে প্রাণ দিতে হয়েছে—দাসত্বের নিষ্ঠুর এই পরিহাস! পরাধীনতার শৃংখল মোচনের মহা যজ্ঞে তোমার প্রাণদান অক্ষয় অমর হয়ে থাকুক! (ক্রমশঃ)

ধারাবাহিক উপন্যাস

আশাপূর্ণা দেবী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বড় ইচ্ছা হচ্ছিল সুবর্ণর আর একবার জগু বটঠাকুরের বাড়িতে বেড়াতে যায়। নিজের চোখে একবার দেখে কেমন করে ছাপা হয়। কেমন করেই বা সেই ছাপা কাগজগুলো মলাট বাঁধাই হয়ে বই আকারে বেরিয়ে আসে আঁট-সাঁট হয়ে।

বই বাঁধাইয়ের কাজও না কি বাড়িতেই হয় ওঁর, বাড়িতে দপ্তরী বসিয়ে। ঘুঁটে-কয়লা রেখে নিচের তলার যে ঘরখানাকে বাতিলের দরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল সেটাই জগুর দপ্তরীখানা।

সবই সেদিন মামীশাশুড়ীর কাছে শুনে এসেছে সুবর্ণ, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিগ্যেস করে। কোনো কিছু খুঁটিয়ে তো দূরস্থান, জিগ্যেস করাই স্বভাব নয় সুবর্ণর, তাই আশ্চর্যই হয়েছিলেন বোধহয় শ্যামাসুন্দরী, তবু বলেও ছিলেন গুছিয়ে গুছিয়ে, কোনখানে কি হয়।

সুবর্ণর প্রাণটা যেন সর্বদাই শতবাহু বাড়িয়ে ছুটে যেতে চায় সেই জায়গা-গুলোয়। কী পরম বিস্ময়কর ঘটনাই ঘটছে এখন সেই চিরকালের পরিচিত জীর্ণ বাড়িখানার ভাঙা নোনাধরা বালিখসা দেয়ালের অন্তরালে। টানবেই তো সেই অলৌকিক স্বর্গলোক সুবর্ণকে, তার সহস্র আকর্ষণ দিয়ে।

তাছাড়া শুধুই যে কেবলমাত্র একবার দেখবার বাসনাতেই তাও ঠিক নয়, কেবলই ইচ্ছে হচ্ছে ওই 'স্মৃতিকথার' খাঁজে খাঁজে আরও দু-চার পাতা 'কথা' গুঁজে দিয়ে আসে

সুখস্মৃতিও আছে বৈকি কিছু কিছু। লিখতে ইচ্ছে হচ্ছে সেটা।

যেবার সেই প্রথম থিয়েটার দেখতে গিয়েছিল সুবর্ণ প্রবোধের সঙ্গে—

হ্যাঁ তেমন অঘটনও ঘটেছিল একবার। সেই যেবার সুরাজ এসে কতদিন যেন ছিল বাপের বাড়ি, সেবার। বিরাজ বেড়াতে এসে ধরে পড়লো, 'থিয়েটার দেখাও দিকি মেজদা। সেজদি সেই কোথায় না কোথায় পড়ে থাকে—'

মেজদাকে ধরার উদ্দেশ্য, মেজবৌদির কলকাঠি নাড়ার গুণে ঘটবেই ব্যাপারটা! নচেৎ আর কে এই 'খরচের' আব্দার বহন করবে?

সুবোধের তো সংসার টানতে টানতেই সব যাচ্ছে, সেজদাটি কিপটের রাজা, ছোড়দা তো নিজেই রাতদিন নিজেকে 'গরীব' বলে বাজিয়ে বাজিয়ে সংসারের থেকে সব কিছু সুখ-সুবিধে আদায় করে নিচ্ছে। অতএব মেজদা। কর্তব্যপরায়ণা আর চক্ষুলজ্জাবতী মেজবৌদি যার কর্ণধার।

বিরাজের শ্বশুরবাড়ির অবস্থা ভাল, যাত্রা-থিয়েটার, এসব তারা দেখে, বলা বাহুল্য বৌদেরও দেখায়। কিন্তু কথাটা তো তা' নয়। বাপের বাড়িতে এলাম, ভাইয়েরা আদর করলো, এসব দেখানোর একটা মহৎ সুখ নেই? 'যা করছো, তোমরাই করছো', এমন দৈন্য ভাবটা তো গৌরবের নয়।

তা' বোনের সেই আব্দার রেখেছিল প্রবোধ, নিয়ে গিয়েছিল দুই বোনকে, আর তার সঙ্গে বৌগুলোকেও। এমন কি উমাশশীও তার হাঁড়ির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে স্পন্দিত হয়েছিল। দুপুরবেলাই রান্নাবান্না সেরে নিয়েছিল সে—লুচি আলুর দম বেগুন ভাজা করে। সুরাজ রাবড়ি আর রসগোল্লা আনিয়েছিল।

অতএব ব্যাপারটায় যেন একটা উৎসবের সমারোহ লেগেছিল।

আর সেদিন যেন প্রবোধকে একটু সভ্য আর ভদ্র মনে হয়েছিল সুবর্ণর। হয়েছিল ভদ্র সেদিন প্রবোধ।

কেন?

কে জানে!

কে জানে সুবর্ণরই ভাগ্যে, না প্রবোধেরই ভাগ্যে। মোট কথা প্রভাস যখন ওদের, বেরোবার প্রাক্কালে বলে উঠেছিল, 'থিয়েটার দেখতে যাওয়া হচ্ছে না করতে যাওয়া হচ্ছে?' এবং প্রকাশ তাকে 'দোয়ার' দিয়ে আর একটু ব্যাখ্যানা করেছিল, 'যা বললে সেজদা মাইরী, থিয়েটার-উলিদের বেহদ্দ হয়ে বেরুচ্ছেন দেখছি বিবিরা—' তখন প্রবোধই ভদ্র কথা বলেছিল। বলেছিল, 'যা মুখে আসে বললেই হল নাকিরে পেকা? গুরু-লঘু জ্ঞান নেই তোদের? এ বা কি, আরো কত কত সেজে আসে মেয়েরা। আর কত বেহায়াপনাই করে। দোতলার জালগুলো তো কেটে 'ওয়ার' করে দিয়েছে ছুঁড়িরা। এ বাড়ির বৌ-ঝি'র মতন সভ্য তুই কটা পাবি?'

সুবর্ণ বিগলিত হয়েছিল সেদিন সেই মহান কথা শুনে। বিনিময়ে তার খাটো

ঘোমটার ফাঁক থেকে একটি সকৃতজ্ঞ দৃষ্টি-ক্ষেপ করেছিল ওই সহসা ভদ্র হয়ে ওঠা স্বামীর চোখে চোখে। আর সেইদিনই যেন প্রথম মনে পড়েছিল সুবর্ণর, তার স্বামীর রূপ আছে।

রূপ ছিল প্রবোধের, বয়সের তুলনায় এখনও আছে। আর আছে এবং ছিল সাজসজ্জার সৌখিনতা। ঢিলে হাতা গিলে করা পাঞ্জাবী পরেছিল সেদিন প্রবোধ, পরেছিল তুলটকরা ফরাসডাঙা ধুতি, কানে আতরমাখা তুলো, মাথায় পরিপাটি টেরি। যদিও পুরুষমানুষের এত সাজ হাসির চোখেই দেখতো সুবর্ণ, তবু সেদিন যখন সুরাজ বলেছিল, 'বাবাঃ, মেজদার কী বাহার গো, যেন বিয়ে করতে যাচ্ছে।' আর তার মেজদা হেসে বলে উঠেছিল, 'থাম তো পোড়ারমুখী, ভারি ফক্কড় হয়েছিস।' তখন সত্যি বলতে বেশ ভালই লেগেছিল সুবর্ণর সেই হাসিটুকু।

হয়তো প্রবোধেরও সেদিন মেজাজ শরীফ ছিল ওই নারীবাহিনীতে দ্বিতীয় আর কোনো পুরুষ ছিল না বলে। আর কোনো 'লোভী চক্ষু' তার একান্ত নিজস্ব সম্পত্তিটির ওপর দৃষ্টি দিচ্ছিল না অতএব।

তাছাড়া নিজে খরচ খরচা করে গাড়ি-ভাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে এদের, এর মধ্যে একটা আত্মপ্রসাদের সুখও ছিল। তাই সেদিন উদার হয়েছিল প্রবোধ, সভ্য হয়েছিল, সুন্দর হয়েছিল।

তাই সুবর্ণর সেদিনের স্মৃতিখানি পরিচ্ছন্ন করে মাজা একটি গ্লাশে এক গ্লাশ জলের মত স্নিগ্ধ শীতল।

তা' সেই জলের কথাটাও না হয় থাকুক সুবর্ণর আগুনের অক্ষরের পাশে পাশে। নইলে হয়তো বিধাতার কাছে অকৃতজ্ঞতা হবে। একটি সন্ধ্যাও তো তিনি সুধায় দিলেন ভরে।

মূল বইটা ছিল 'বিল্বমঙ্গল', তার আগে কি যেন একটা হাসির নাটক ছিল ছোট্ট একটুখানি। নাম মনে নেই, কিন্তু পাঁচ ননদ-ভাজে মিলে যে হাসতে হাসতে গড়িয়ে ছিল তা' মনে আছে।

তারপর 'বিল্বমঙ্গল'! প্রেম আর ভক্তির যুগপৎ আবেগে গড়া সেই নাটক অশ্রুর মালা ঝরিয়েছিল চোখ দিয়ে। হাসি ও অশ্রুতে গড়া সেই সন্ধ্যাটির প্রত্যেকটি ঘটনা, প্রতিটি শব্দও যেন জীবন্ত হয়ে আছে।

শ্বশুরবাড়ি থেকে একটা কায়দা শিখেছিল বিরাজ, থিয়েটারে আসতে কৌটো ভর্তি ভর্তি পান সেজে আনতে হয়। পান খাবে মুঠো মুঠো, আর 'ড্রপসিন' পড়ার অবকাশকালে লেমনেড খাবে, কুলপি খাবে, ঠোঙা ঠোঙা খাবার খাবে, তবে না থিয়েটার দেখা!

তা' করেছিল এসব প্রবোধ।

একদিনের রাজা হয়ে মেজাজটাই রাজসই হয়ে গিয়েছিল তার।

নিচে থেকে ঝিকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল শালপাতার ঠোঙা ভর্তি হিঙের কচুরি, আলুর দম খাস্তা গজা আর অমৃতি এবং পাঁচ বোতল লেমনেড্।

উমাশশী বার বার বলেছিল, 'ও মা বাড়িতে যে ছিষ্টি রেঁধে বেড়ে রেখে আসা হয়েছে গো—এখন এই সব এত খাওয়া!'

বিরাজ বলেছিল, 'ভয় নেই গো বড়গিন্নী সে সবও উঠবে। ফুর্তির চোটে পেটে ডবল খিদে।'

আশ্চর্য, সুবর্ণরও সেদিন ওই নেহাৎ মোটা কৌতুকের কথাগুলোও দিব্যি উপভোগ্য মনে হয়েছিল, খেয়েছিল সকলের আগে আর কখনো যা করে নি তাই করেছিল, মুঠো ভর্তি পান খেয়েছিল।

প্রথমে খেতে চায় নি, সুরাজই জোর করেছিল, 'খাও না বাবা একটা, জাতটা যাবে না? কেয়া খয়ের, জৈত্রি জায়ফল, অনেক কিছু দিয়ে নবাবী পান বানিয়ে এনেছে বিরাজ—'

'তবে দাও তোমাদের নবাবী পান একটা, দেখি খেয়ে বেগম বনে যাই কি না—' বলে হেসে একটা পান নিয়েছিল সুবর্ণ। তার পরই কেমন ভাল লেগে গেল, পর পর খেয়ে নিল অনেকগুলো। তার পর ঝাঁজ ঝাঁজ লেমনেড্। তর স্বাদটা কি লেগে আছে গলায়?

থিয়েটারের সেই ঝিটার ভাঙা কাঁসরের মত গলার স্বরটা যেন হঠাৎ সেই দূর অতীত থেকে এসে আছড়ে পড়লো, 'দর্জিপাড়ার সুবোধবাবুর বাড়ি গো'—'দর্জিপাড়ার সুবোধবাবু পেবোধ বাবুর বাড়ি গো'।

অভ্যাসবশত প্রথমে দাদার নামটা বলে ফেলে শেষে আবার নিজের নামটাও গুঁজে দিতে সাধ হয়েছিল প্রবোধের।

... ...

থিয়েটার দেখা হল, খাওয়া-দাওয়া হল, শেষ অবধি আবার ঘোড়ার গাড়িতে উঠে ও হাতে হাতে এক একটা 'অবাক জলপানের' খিলি গুঁজে দিয়ে, গাড়ির মাথায় উঠে গাড়োয়ানের পাশে গিয়ে বসলো প্রবোধ নেহাৎই উমাশশী গাড়িতে আসীন বলে। তবু বিরাজ যখন বলে উঠলো, 'যাই বল বাপু মেজদার সঙ্গে বেরিয়ে সুখ আছে,' তখন বড়ভাজের উপস্থিতি ভুলে বলেই ফেলল প্রবোধ, 'সুখ না দিয়ে রক্ষে আছে? মহারাণীর মেজাজ তা হলে সপ্তমে উঠবে না?'

থিয়েটার কি আর কখনো দেখে নি তারপর সুবর্ণ?

দেখেছে বৈকি। দেখে নি বললে পাতক। কিন্তু সে আস্বাদ আর আসে নি। ' দেখেছে মানে 'দেখিয়েছে'। যখনই ননদরা এসেছে গেছে, অথবা কাউকে আদর জানানোর প্রয়োজন পড়েছে, 'থিয়েটার দেখানো' হয়েছে। আর কে সেই দায় নেবে সুবর্ণ ছাড়া।

অতএব মাঝে মাঝে নিজেকেও যেতে হয়েছে তাদের সঙ্গে।

একবার তো 'প্রহ্লাদ চরিত' দেখাতে মুক্তকেশী এবং তস্য সখী হেমাঙ্গিনীকে নিয়েও যেতে হয়েছিল। আর সঙ্গে ছিল সুশীলা। এবং প্রবোধ।

মা মাসী দিদির সঙ্গে বৌকে নিয়েছিল প্রবোধ। এ বেহায়াপনাটুকু করেছিল সে। সন্ধ্যেবেলা বাড়িতে অতক্ষণের জন্যে রেখে যেতে যেন মন সায় দেয় না। তাস খেলতে খেলতে তবু এক-আধবার ছুতো করে উঠে এসে দেখে যাওয়া যায়, এতে তো সে উপায়ও নেই। অতএব চক্ষু-লজ্জার দায়মুক্ত হওয়াই শ্রেয়।

পাঁচজনকে অবশ্য শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে হয়েছে, 'মা তো জানেই না কোথায় বসতে হয়, কখন উঠে আসতে হয়। মেজবৌ তবু ওতে পোক্ত।'

সুবর্ণ অবশ্য এই একা সুযোগ নেওয়ার পক্ষপাতী নয়, কিন্তু ইদানীং সেজবাবু ছোটবাবু তাঁদের বৌদের হ্যাংলার মত অপরের পয়সায় থিয়েটার দেখতে যাওয়ায় মানের হানি বোধ করছিলেন, তাই নানা অজুহাত দেখিয়েছে তারা। আর উমাশশীর তো 'সংসারের অসুবিধে' ভাবলেই মাথায় আকাশ ভাঙে!

তাই ইদানীং যা যাওয়া হয়েছে, যেন কর্তব্য করতে। সেই প্রথমদিনের

গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৩, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা-১
ফোন: ২২-৬৫৮০

ইতিহাস

মালবিকা ঘোষ

সভ্য জগতে ভব্যতা মানে হার,
আদিম বৃক্ষ দ্যাখে।
বর্বরতার এখনো হয় নি শেষ,
ধারালো অস্ত্র ট্যাঁকে।

তবু ইতিহাসে তাদেরি জয়ধ্বনি
রাজধানী মুখরিত;
রক্তের তৃষ্ণা মিটবে না কোনোদিন
প্রকাশ্যে সঞ্চিত
তাদের কথায় বিরচিত সংহিতা
বহুধা ভাষ্যে ভারী।

নিহত বালকে ভর্তি অন্ধ গাড়ি।
অদূরে জ্বলছে চিতা,
ঘোলাটে মেঘটা তাই টকটকে লাল;
ইতিহাসই দ্যাখে পাল্টায় কি না কাল॥

প্রতিকৃতি

জয়ন্ত সাহা

কী নামে সনাক্ত আমি, কী নাম আমার!
গোটাকয় অক্ষরের সমাহারে পিতৃদত্ত নাম
বিচিত্র শব্দের মোহ রক্তের ভিতরে
ধ্বনির ঝংকার।

নামের অনেক ঊর্ধ্বে বিশেষ্য বিশেষ
আমি যেন হ্রদ
চারবাহু মাটির বন্ধনে
আবদ্ধ ব্যূহের মাঝে নিঃসঙ্গ একাকী।
অন্তরালে আর্তনাদ ধ্বনির গহ্বরে
আজন্মের পরিচিত নাম
বিশেষ্যের প্রতিকৃতি নয়।
নাম নয় কাল নয় বিশেষ্য বিশেষ আমি কোন্ ধ্রুবতারা!

মাটির বন্ধন ছেড়ে আকাশে বিস্তার চায় প্রতিকৃতি
সীমাহীন পরিধিতে নিরন্তর অন্য সুর ধ্বনিত অন্তরে
অখণ্ডমণ্ডলে দিন আনন্দে হারায়
রাতের আকাশে জাগে প্রভাতের নতুন ইশারা।
নাম নয় কাল নয় বিশেষ্য বিশেষ আমি কোন্ ধ্রুবতারা!
কোন্ ধ্রুবতারা আমি সৌরমণ্ডলের!!

উচ্ছল আনন্দ অনুপস্থিত থেকেছে। সেদিনটি আছে সোনার অক্ষরে লেখা।......

কারণ—কারণ সে সন্ধ্যার রাত্রিটাও হয়েছিল বড় সুন্দর। সুরাজ বলেছিল, 'আজ রাতটা আমরা ননদ-ভাজে গল্প করে কাটাবো ঠিক করেছি মেজদা, তোমার ঘরেই আমাদের স্থিতি। তুমি বাপু কেটে পড়। শুয়ে পড়গে ওঘরে।'

আর আশ্চর্যের ব্যাপার প্রবোধ জ্বলে ওঠে নি, কটু কিছু বলে ওঠে নি, এবং কলে-কৌশলে শেষ অবধি সুবর্ণকে কবলিত করবার চেষ্টা করে নি। বরং একটা হাই তুলে বলেছিল, 'গল্প করে রাত জাগবি কি বল? এতক্ষণ থিয়েটার দেখে এসে? আমার তো ঘুমে শরীর ভেঙে আসছে।'

আর তারপর হঠাৎ একটু হেসে উঠে বলেছিল, 'আর যা নাটক দেখে এলাম বাবা', মনে হচ্ছে স্ত্রী-পুত্রের ওপর এতটা আসক্তি না রেখে ভগবান-টগবানের কথাই ভাবা উচিত।'

'ওরে বাস, একেবারে কা তব কান্তা কস্তে পুত্র?' অনুচ্চ হাসি হেসে বলে উঠেছিল সুবর্ণ, আর প্রবোধ অলক্ষ্যে তার পিঠে একটা চিমটি কেটে সত্যিই চলে গিয়েছিল শয়নকক্ষের দুরন্ত আকর্ষণ ত্যাগ করে।......

... ...

কী মুক্তি!

কী মুক্তির আস্বাদ!

সুবর্ণর বিবাহিত জীবনের মধ্যে সে মুক্তির স্বাদ আর কবে এসেছে তার আগে অথবা পরে?

কবে এমন স্বেচ্ছায় দাবি ত্যাগ করে ঘুমোতে চলে গেছে প্রবোধ? কাজেই বাড়ি-টাড়িতে অসুবিধেয় পড়ে ঘরের অকুলান হলে, গজরেছে, ছুতো করে এসে শুয়ে থেকেছে।

... ...

যারা গল্প করে রাত কাটাবে বলে আহ্লাদ জানিয়েছিল, তারা তো তখুনি গড়াগড়ি। সুবর্ণ ঘুমোয় নি সে রাতে। এই মধুর অবকাশটুকু তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছিল। আর—অদ্ভুত একটা কাজ করে বসেছিল সে সেই রাতে।

সেই প্রথম।

হ্যাঁ সেই প্রথম একটা পদ্য লিখে ফেলেছিল সুবর্ণ।

এখন অবশ্য, সে পদ্য ভাবলে হাসি পায়, তবু সেই তো প্রথম। পুরনো পচা একখানা খাতার হলদে হয়ে যাওয়া পৃষ্ঠায় আজও আছে সেটা। ছিঁড়ে ফেলে দিতে মায়া হয়েছে।......

এবং আশ্চর্য, আজও মুখস্থ আছে সেটা।

কালটা তো আগের, ভাষাটাও অতএব তদ্রূপ!......কিন্তু সেদিন সেই কবিতা লিখে ফেলে কী অপূর্ব পুলক স্বাদে ভরে গিয়েছিল মন। মনে হয়েছিল কবিদের মতই তো হয়েছে ঠিক। ওঁরাও কি এই রকমেরই লেখেন না?

> অনন্ত নক্ষত্রপুঞ্জ আকাশেতে থাকি,
> পৃথিবীর পানে কি গো মেলে থাকে আঁখি?
> দেখিলে দেখিতে পাবে তারই দিকে চেয়ে,
> জাগিয়া কাটায় এক পৃথিবীর মেয়ে।
> পিঞ্জরের পাখী সম বন্দী অন্ধ প্রাণ,
> ঊর্ধ্ব আকাশেতে যেন কি করে সন্ধান!
> কিন্তু হায় কাটে সুর, ভেঙে যায় মন,
> রুদ্ধ করি দিতে হয় মুক্ত বাতায়ন।
> নিষ্ঠুরা পৃথিবী আর প্রভাত নিষ্ঠুর।
> নিশীথের সব স্বপ্ন করে দেয় চুর।
> জেগে ওঠে শত চক্ষু আসে দুঃখ গ্লানি,
> নীরবে ঘোরাতে হয় নিত্যকার ঘানি।

তা' এই সেকেলে ভাষার পদ্যকে আর একালের খাতায় স্থান দেবার বাসনা নেই, কিন্তু সেই দিনটাকে দিতে ইচ্ছে করে ঠাঁই।

জীবনের প্রথম পদ্য লেখার দিন।

সেই দিনটির পুলক স্বাদ নিয়ে আর একবার মামীশাশুড়ির বাড়ি যাবার সংকল্প স্থির করলো সুবর্ণ। তবু হচ্ছেও না যেন।

কারুরই কিছু মনে করবার কথা নয়, মা একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে বাড়ির ঝিয়ের সঙ্গে কোথাও যাচ্ছে, এতে আর এখন অবাক হয় না ছেলে-মেয়েরা। মুক্তকেশীর মৃত্যু ও শ্রাদ্ধকার্যের ব্যাপারে ওটা হঠাৎ কেমন চালু হয়ে গেছে। কিন্তু সুবর্ণলতার যেন মনে হচ্ছে ওরা সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে ভাববে, হঠাৎ মামীশাশুড়ির ওপর এত ভক্তির হেতু? এই তো সেদিন গেলেন!

যাই যাই করেও তাই দিন গড়ায়।

[ক্রমশঃ]

বিশ্বসাহিত্যের আদিপর্ব

ডঃ নরেন ভট্টাচার্য

॥ ১৬ ॥

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য

ঋগ্বেদের পর আর যে তিনটি বেদের কথা আমরা জানি সেগুলি হচ্ছে অথর্ববেদ, সামবেদ ও যজুর্বেদ। এই তিনটির মধ্যে অথর্ববেদই সবচেয়ে প্রাচীন, যার কোন কোন অংশ প্রাচীনত্বের দিক থেকে ঋগ্বেদের প্রায় সমকালীন। ভারতীয় সাহিত্যে অথর্ববেদের প্রাচীনতম নাম হল অথর্বাঙ্গিরসঃ, অর্থাৎ অথর্বন এবং আঙ্গিরস। এই দুটি শব্দের তাৎপর্য আমরা পরে ব্যাখ্যা করব। অথর্ববেদের বর্তমানে দুটিমাত্র শাখা টিকে আছে—শৌনক ও পৈপ্পলাদ। অথর্ববেদে মোট ৭৩১টি সূক্ত আছে যেগুলি ২০টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। অথর্ববেদের প্রায় এক-সপ্তমাংশ ঋগ্বেদ থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

সামবেদের মাত্র তিনটি শাখা টিকে আছে—কৌথুম, রাণায়নীয় এবং জৈমিনীয় বা তালবকার। সামবেদে মোট ঋক্ বা স্তবকের সংখ্যা ১৫৪৯টি, এবং এগুলির মধ্যে মাত্র ৭৫টি বাদ দিয়ে বাকিগুলি ঋগ্বেদের অষ্টম ও নবম মণ্ডল থেকে গৃহীত হয়েছে। অতএব স্বতন্ত্র সাহিত্য সংকলন হিসাবে সামবেদের বিশেষ কোন মূল্য নেই।

যজুর্বেদ দু ভাগে বিভক্ত—শুক্ল ও কৃষ্ণ। শুক্ল-যজুর্বেদের একটিমাত্রই শাখা পাওয়া যায় যার নাম বাজসনেয়ী সংহিতা। কৃষ্ণ-যজুর্বেদের শাখা চারটি—কাঠক সংহিতা, কপিষ্ঠল-কঠ-সংহিতা, মৈত্রায়নী সংহিতা ও তৈত্তিরীয় সংহিতা। এগুলির প্রত্যেকটিরই বিষয়বস্তু এর পর আমরা বর্ণনা করব।

অথর্ববেদ

আগেই বলেছি অথর্ববেদ কুড়িটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম সাতটি অসংখ্য ছোট ছোট সূক্তের সমষ্টি, প্রতিটি সূক্ত কয়েকটি করে শ্লোকে বিভক্ত। অষ্টম থেকে চতুর্দশ অধ্যায় এবং সপ্তদশ অধ্যায়ের সূক্তগুলি দীর্ঘ ধরণের। পঞ্চদশ ও ষোড়শ অধ্যায় দুটির অধিকাংশই গদ্যে রচিত। নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে অধ্যায়গুলি বিভক্ত হয় নি, শুধু দুটি অধ্যায় ব্যতিক্রম, চতুর্দশ অধ্যায়টি বিবাহ সংক্রান্ত এবং অষ্টাদশ অধ্যায়টির সামগ্রিক বিষয়বস্তু হচ্ছে মৃতের সৎকার। মোটের উপর অথর্ববেদের ভাষা ও ছন্দ ঋগ্বেদের অনুরূপ হলেও, কয়েকটি ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত আধুনিকত্বের নিদর্শন আছে।

অথর্ববেদের কোন কোন অংশ ঋগ্বেদের সমকালীন হলেও অধিকাংশই যে পরবর্তীকালে রচিত তার প্রমাণ হিসাবে বলা যায় যে ভারতবর্ষের এমন সব স্থানের উল্লেখ অথর্ববেদে আছে যেগুলির কথা ঋগ্বেদে বলা হয় নি, অর্থাৎ ঋগ্বেদের যুগের লোকেরা যেগুলির সম্বন্ধে কোন ধারণার অধিকারী ছিল না। দ্বিতীয়ত জাতিভেদ প্রথা ঋগ্বেদে কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করে নি, কিন্তু অথর্ববেদে দেখা যায় যে এই প্রথা বেশ শিকড় গেড়ে বসেছে। তৃতীয়ত অথর্ববেদে ঋগ্বেদের দেবতাদের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটেছে। এগুলি পরে আমরা আর একটু খুঁটিয়ে বিচার করব।

কিন্তু অথর্ববেদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যাদুমন্ত্র, যেগুলির উদ্দেশ্য অপদেবতাদের তুষ্টিবিধান, বন্ধুদের আশীর্বাদ—এবং শত্রুদের অভিসম্পাত প্রদান। এই সব তন্ত্রমন্ত্র যারা প্রয়োগ করত তারা নিশ্চয়ই একটি পৃথক শ্রেণী ছিল, যদিও পরবর্তীকালের ভারতের ইতিহাসে এই শ্রেণীটির প্রভাব অনেকাংশে লুপ্ত হয়েছিল, কেন না অথর্ববেদোক্ত তন্ত্রমন্ত্রের যারা প্রয়োগ করত তারা শুধু বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থেই নয়, ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক রচিত শাস্ত্রগ্রন্থসমূহেও নিন্দিত হয়েছে। এই কারণেই রীতি অনুযায়ী 'ত্রয়ী বিদ্যা' বলতে অথর্ববেদ ছাড়া আর তিনটি বেদকে বোঝায়। কিন্তু সেকালের বিজ্ঞ লোকেরা অথর্ববেদকে কোন মূল্য না দিলেও, এযুগে আমাদের কাছে অথর্ববেদের ঐতিহাসিক মূল্য বর্তমান, কেন না অথর্ববেদে আছে তৎকালীন সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের প্রতিচ্ছবি, যা পুরোহিত শ্রেণীর ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত নয় এবং যা একালের নৃতত্ত্ববিদদের কৌতূহলের বিষয়।

এই জাতীয় তন্ত্রমন্ত্রগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় রোগ সারানোর মন্ত্র। এই মন্ত্রগুলির কোনটি কোন রোগটিকে উদ্দেশ্য করেই রচনা করা হয়েছে অথবা রোগের কারণ হিসাবে কোন অপদেবতার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে। রোগের এক অপদেবতার নাম তকমন, যার উদ্দেশ্যে এই জাতীয় অনেক মন্ত্র আছে। অনেক সময় কোন ঔষধকেও শ্লোকের দ্বারা বন্দনা করা হয়েছে, এবং প্রকৃতই কয়েকটি ঔষধের উল্লেখও অথর্ববেদে আছে। এই দিক থেকে অথর্ববেদকে ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের আদিতম উৎসও বলা যেতে পারে। এখানে আমরা অথর্ববেদোক্ত রোগ সারানোর একটি মন্ত্রের অংশবিশেষ উল্লেখ করছি :

> যে তুমি সকল মানুষকে হলুদ করে দাও
> অগ্নির মত উত্তাপের বশ করে—
> হে জ্বর, তোমার বিলুপ্তি হোক
> যথা ইচ্ছা তুমি অদৃশ্য হও।
>
> *
>
> হে জ্বর তুমি মূজবন পর্বতে যাও
> অথবা বাহ্লীক দেশে।
> সেখানে একটি ডাগরপানা শূদ্র মেয়েকে
> পাকড়াও করে যদৃচ্ছা নাচাও॥
>
> ৫।২২।২৭

এরপরে সেই মন্ত্রগুলির উল্লেখ করব যেগুলির বিষয়বস্তু হচ্ছে মন দেওয়া নেওয়া। প্রেমাস্পদকে বশীভূত করার মন্ত্রতন্ত্রের যে চাহিদা চিরদিনই আছে একথা বলাই বাহুল্য. সেদিক থেকে অথর্ব-

বেদের যোগানও প্রচুর। শুধু মনের মানুষকে পাওয়ার জন্যই নয়, সপত্নীবিনাশ বা প্রতিদ্বন্দ্বীর নিধনের উদ্দেশ্যেও প্রচুর মন্ত্র রচিত হয়েছে। এই রকম একটি মন্ত্রের উল্লেখ এখানে করছি। এই মন্ত্রটি পাঠ করছে নায়িকা। মন্ত্রটি হচ্ছে ঃ "হে মরুৎ তাকে পাগল করে দাও। হে অগ্নি, হে বায়ু, আমার ভালবাসার জন্য সে পাগল হোক (৬।১৩০।৪)।" অবশ্য মন্ত্রপাঠের আগে কিছু কিছু আচার-অনুষ্ঠানও আছে, যেমন যাকে ভালবাসবে তার একটি মূর্তি তৈরি করে একটি জ্বলন্ত শলাকা দিয়ে সেই মূর্তিটির হৃদয়দেশ বিদ্ধ করে নিম্নলিখিত মন্ত্রটি বলতে হবে ঃ "প্রেম তোমাকে উত্তপ্ত করুক, যেন বিছানায় তোমায় সুস্থির হয়ে থাকতে না হয়, আমি কামের তীর দিয়ে তোমার হৃদয় বিদ্ধ করেছি। এই তীরের ফলায় আছে প্রত্যাশা, প্রেমের বিষ যেখানে লাগানো আছে, তীরের দণ্ডটি হচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন কামনা, ঠিকমত নিক্ষেপ করায় কাম তোমার হৃদয় বিদ্ধ করবে, ইত্যাদি।" (৩।২৫)

মন্ত্রগুলি সর্বক্ষেত্রেই রূপকধর্মী বা অলীক বা অর্থহীন নয়। অনেকক্ষেত্রেই সেগুলির বিশেষ কাব্যগুণ প্রাপ্ত হয়েছে। পারিবারিক শান্তির উদ্দেশ্যে একটি মন্ত্র অথর্ববেদে (৩।৩০) আছে, যার অনবদ্য বঙ্গানুবাদ করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। দুঃখের বিষয় সেটি হাতের কাছে না পাওয়ায় স্বকৃত অনুবাদ এখানে তুলে দিলাম ঃ

আমি তোমাদের ঘৃণা থেকে মুক্ত করে
একই হৃদয় এবং মনে দীক্ষিত করব।
একে অপরকে দেখে পুলকিত হও—
যেমন গাভী তার বৎসকে দেখে হয়।
পুত্র তার পিতার বাধ্য হোক
তার মাতার সঙ্গেও সে একমত হোক।
পত্নী তার স্বামীর সঙ্গে
মিষ্ট এবং নম্র কথা বলুক।
ভাই যেন তার ভাইকে হিংসা না করে,
অথবা বোন, বোনকে;
সকলের হৃদয় একই উদ্দেশ্যে বাঁধা
পড়ুক
তোমরা শুধু প্রিয়বাক্য উচ্চারণ কর॥

অথর্ববেদের দেবতারা মোটামুটি ঋগ্বেদের দেবতাদের সঙ্গে অভিন্ন, তবে তাঁদের চরিত্রের রীতিমত পরিবর্তন ঘটেছে। ঋগ্বেদের প্রায় প্রতিটি দেবতারই প্রাকৃতিক প্রচ্ছদপট আবিষ্কার করা যায়। ঋগ্বেদের ইন্দ্রের সঙ্গে অথর্ববেদের ইন্দ্রের চরিত্রগত পার্থক্য প্রচুর। এখানে ইন্দ্র নিতান্তই দানবহন্তা, তাঁর পিছনের প্রাকৃতিক প্রচ্ছদপট অদৃশ্য হয়েছে। অন্যান্য দেবতাদের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। অথর্ববেদে হরেকরকম নতুন দার্শনিক তত্ত্ব উল্লিখিত হয়েছে যেগুলির উল্লেখ ঋগ্বেদে নেই। বেশিরভাগই সৃষ্টি সম্বন্ধীয়, তবে এখানে ঋগ্বেদের অনুসন্ধিৎসা নেই, সমস্তই কৃত্রিমতায় ভরা, আগাগোড়াই রহস্যময়তায় পূর্ণ। স্রষ্টা হিসাবে প্রজাপতি নামক এক নতুন দেবতা এখানে কল্পিত হয়েছে। কখনো বা জগৎ সৃষ্টির আদি কারণ হিসাবে কাল বা সময়, কখনো বা প্রাণ, কখনো বা তপঃ ইত্যাদি অথর্ববেদে কল্পিত হয়েছে। এগুলির বর্ণনাও উদ্ভট, একটির সঙ্গে অপরটির কোন সামঞ্জস্য-বিধান করা যায় না। এইগুলি বেশি করে উল্লিখিত হয়েছে অথর্ববেদের উনবিংশতিতম অধ্যায়ে।

জগৎ সৃষ্টির কারণ হিসাবে অথর্ববেদে যত রকম উদ্ভট কল্পনা আছে সেগুলির মধ্যে রোহিত সূক্তটি বিশেষভাবে। এখানে রোহিতকে (অনুমানে মনে হয় সূর্য) জগৎ সৃষ্টির কারণ বলা হয়েছে আবার সেই একই বস্তুকে ওই নামে একজন রাজার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। আবার একটি সূক্ত (অথর্ববেদ ৪।১১) একটি ষাঁড়কে জগৎ সৃষ্টির মূল কারণ বলা হয়েছে। তবে একথা অবশ্যই বলতে চাই না যে অথর্ববেদের সকল তত্ত্বচিন্তাই এইরকম উদ্ভট। যদিও ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তের (১০।১২৯) মত উচ্চমানের দার্শনিক জিজ্ঞাসা অথর্ববেদে নেই, তথাপি অথর্ববেদেরও কোন কোন স্থানে সে রকম নিদর্শন যে একেবারে নেই তা নয়। এই প্রসঙ্গে অথর্ববেদের পৃথিবী-সূক্তটি (১২।১) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ৬৩টি শ্লোকে রচিত এই সূক্তটি দার্শনিক চিন্তা ও কাব্যগুণের অপূর্ব সমন্বয়।

অথর্ববেদের প্রধানতম মূল্য নৃতত্ত্বমূলক। আদিম পর্যায়ের ধ্যানধারণা ও আচার-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত সাহিত্যগত নিদর্শন অথর্ববেদ ছাড়া ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় আর নেই। অথর্ববেদ-বর্ণিত মন্ত্রতন্ত্র ও আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে পৃথিবীর নানা উপজাতির আচার-অনুষ্ঠানের বিস্ময়কর সাদৃশ্য চোখে পড়ে।

সামবেদ

আগেই বলেছি সামবেদের মোট তিনটি শাখা—কৌথুম, রাণায়নীয় এবং জৈমিনীয় বা তালবকার, কিন্তু এগুলির মধ্যে কৌথুম শাখাটিই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। —এই শাখাটির দুটি অংশ—আর্চিক এবং উত্তরার্চিক। উভয় অংশ মিলিয়ে মোট শ্লোকের সংখ্যা ১৮১০টি, এবং পুনরুক্তি বাদ দিলে ১৫৪৯টি, কিন্তু মাত্র ৭৫টি ছাড়া বাকি সবগুলিই ঋগ্বেদের অষ্টম ও নবম মণ্ডলে পাওয়া যায়। শ্লোকগুলি গায়ত্রী বা প্রগাথ ছন্দে রচিত, একান্তই সঙ্গীতের প্রয়োজনে।

সামবেদের প্রথম অংশ, যাকে আর্চিক বলা হয়, মোট ৫৮৫টি স্তবক বা ঋক নিয়ে গঠিত হয়েছে। সাম বা সামন্, যে কথাটি দিয়ে সমগ্র সংহিতাটিকেই সূচিত করা হয়, তার অর্থই হল গান। সামবেদের স্তবক বা ঋকগুলিকে যোন আখ্যাও দেওয়া হয়। সামবেদের দ্বিতীয় অংশ, যাকে বলা হয় উত্তরার্চিক, একটি বিশেষ ধরণে রচিত। উত্তরার্চিক হল বিশেষ ধরণের স্তোত্র সংকলন, প্রতি স্তোত্রে সাধারণত তিনটি করে ঋক বা স্তবক। উদ্গাতা (প্রাচীনকালের যজ্ঞে চার ধরণের পুরোহিতের প্রয়োজন হত—হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্যু এবং ব্রহ্মণ, এঁদের মধ্যে উদ্গাতার কাজ ছিল যজ্ঞস্থলে গান গাওয়া) প্রথমে আর্চিক অংশ মারফৎ সুরগুলি আয়ত্ত করবেন এবং তারপর উত্তরার্চিক অংশের সাহায্যে তিনি ঋগ্বেদের স্তোত্রগুলি সুর করে গাইবেন। তবে সামবেদের সকল গানই জনসমক্ষে গাওয়া হত না, দু'ধরণের গান ছিল গ্রামগেয় ও অরণ্যগেয়।

বিশুদ্ধ সাহিত্যগত দৃষ্টিকোণে সামবেদ ঋগ্বেদের কতকগুলি শ্লোকের সংকলন মাত্র, কিন্তু তা সত্ত্বেও সামবেদের ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক মূল্য অসাধারণ। আদিম সমাজ জীবনে সঙ্গীতের তাৎপর্য ছিল ভিন্ন, তা ছিল যাদু-আচার বা ম্যাজিকাল-রিচুয়ালের একটি অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। সামবেদের সঙ্গীতের সার্থকতা ততটা সঙ্গীতে নয় যতখানি সঙ্গীতের আচার বা রিচুয়াল-এ। উত্তরকালে পুরোহিতেরা এই গানগুলিকে যে উদ্দেশ্যেই প্রয়োগ করুন না কেন, সামগানের প্রকৃত উৎস অনুসন্ধান করতে গেলে আমাদের সামবেদের যুগের চেয়ে অনেক পিছনের দিকে যেতে হবে।

যজুর্বেদ

সামবেদ যেমন উদ্গাতা নামক পুরোহিতশ্রেণীর সঙ্গীতের পুস্তক, যজুর্বেদ সেইরকম অধ্বর্যু নামক পুরোহিতশ্রেণীর কর্মকাণ্ডের উপযোগী গ্রন্থ। আগেই বলেছি যজুর্বেদ দু' ভাগে বিভক্ত—শুক্ল ও কৃষ্ণ। শুক্ল যজুর্বেদের একটিমাত্রই শাখা পাওয়া যায় যার নাম বাজসনেয়ী সংহিতা। কৃষ্ণ যজুর্বেদের শাখা চারটি যথা—কাঠক সংহিতা, কপিষ্ঠল-কঠ-সংহিতা, তৈত্তিরীয় বা আপস্তম্ব সংহিতা এবং মৈত্রায়নী সংহিতা।

বাজসনেয়ী সংহিতা এই গ্রন্থের তথাকথিত প্রবক্তা যাজ্ঞবল্ক্য বাজসনেয়র

বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার
ব্যথা-বেদনা তাড়াতাড়ি দূর করবার আধুনিক উপায়

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'

এখন আমাদের দেশে পাওয়া যাচ্ছে !

যে কোনো ব্যথা-বেদনাই আমাদের সমস্যা: 'অ্যাসপ্রো' রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিকরা অনেক গবেষণার পর ব্যথা-বেদনা দূর করার জন্য আবিষ্কার করেছেন নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'—আরো তাড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করার নতুন উপায় !

মাইক্রোফাইণ্ড বলতে কি বোঝায় ? মাইক্রোফাইণ্ড বলতে বোঝায় যে, ব্যথা-বেদনা দূর করার যে উপাদানগুলি 'অ্যাসপ্রো'-তে মেশানো হয়, তা ৩০ গুণ বেশী সূক্ষ্ম করা হয়েছে। এক বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী এই নতুন ট্যাবলেটে এখন প্রায় ১৫ কোটি সূক্ষ্ম কণা রয়েছে। এর ফলে বেদনা নাশ করবার শক্তি দ্বিগুণেরও বেশী তাড়া শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং মুহূর্তের মধ্যে ব্যথা-বেদনা দূর করে।

মুহূর্তের মধ্যে কাজ শুরু হয়ে যায়—অনেকক্ষণ ধরে কাজ চলতে থাকে: নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'-র ব্যথা দূর করবার সক্রিয় উপাদানটি অতি সহজেই এবং খুবই শীগগির শরীরের সঙ্গে মিশে গিয়ে ৫ থেকে ৭ ঘণ্টা পর্যন্ত শরীরের মধ্যে থাকে। সেইজন্যেই মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' আরও তাড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর ক'রে দেয় এবং তার ফল অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়।

অতি সহজেই আপনি খেতে পারেন: নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' আপনি যেভাবে খুশী খেতে পারেন—শুকনো, জলের সঙ্গে মিশিয়ে অথবা এক গ্লাস জল বা যে কোনো গরম পানীয়ের সঙ্গে।

নিম্নোক্ত প্রকারের যন্ত্রণায় নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' খাবেন: ব্যথা-বেদনা • মাথাধরা • গা-ব্যথা • দাঁতব্যথা • বাতে বেদনা • জ্বর-জ্বর-ভাব • ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর • গলাব্যথা।

মাত্রা: প্রাপ্তবয়স্ক: দুইটি ট্যাবলেট। প্রয়োজন হলে আবার খাবেন। শিশুদের জন্য: একটি ট্যাবলেট বা আপনার ডাক্তারের নির্দেশমত।

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' কিভাবে কাজ করে দেখুন

ট্যাবলেটের কণাগুলির আকার যত বড় হয়, ততই শরীরের সঙ্গে মিশে যেতে দেরী হয়—আপনার আরাম পেতেও সময় লাগে।

'অ্যাসপ্রো' মাইক্রোফাইণ্ড হওয়ার ফলে নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'-র প্রতিটি ট্যাবলেটে প্রায় ১৫ কোটি সূক্ষ্ম কণা রয়েছে। তাই শরীরের সঙ্গে সঙ্গে-সঙ্গে মিশে যায় এবং খুব তাড়াতাড়ি ব্যথার উপশম হয়।

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' ব্যথা-বেদনা দূর করার সর্বাধুনিক উপায়।

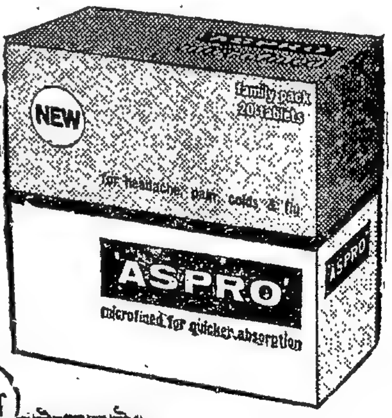

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'

তাড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করে

নিকোলাস-এর (N) তৈরী

B.G.6.67 BN.

নামানুসারী। এই সংহিতার আবার দুটি সংস্করণ আছে **কাণ্ব** এবং **মাধ্যন্দিন,** অবশ্য উভয়ের মধ্যে প্রভেদ অতি সামান্য। বাজসনেয়ী সংহিতা মোট ৪০টি অধ্যায়ে বিভক্ত, কিন্তু যতদূর মনে হয় শেষের ২২টি অধ্যায় পরবর্তীকালে রচিত হয়েছে। প্রথম দুটি অধ্যায় আছে **দর্শপূর্ণমাস** অর্থাৎ অমাবস্যা-পূর্ণিমার যজ্ঞ, এবং তৃতীয় অধ্যায়ে গার্হস্থ্য যজ্ঞসমূহ স্থান পেয়েছে। চতুর্থ থেকে দশম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হচ্ছে সোমযজ্ঞ, একাদশ থেকে অষ্টাদশ অধ্যায়ে আছে অসংখ্য মন্ত্র ও ক্রিয়াপদ্ধতির বর্ণনা বিশেষ করে অগ্নিচয়ন পদ্ধতি, ঊনবিংশ থেকে একবিংশ অধ্যায়ে আছে সৌত্রামনী অনুষ্ঠানের কথা, দ্বাবিংশ থেকে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে আছে অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা। মূল সংহিতা এখানেই শেষ হচ্ছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলিকে বলা হয় **খিল** বা পরিশিষ্ট।

কৃষ্ণ যজুর্বেদের চারটি শাখার নামই পূর্বে করেছি যেগুলির মধ্যে কপিষ্ঠল-কঠ-সংহিতার যৎসামান্য অংশই এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। বাকি তিনটির বিষয়বস্তু বাজসনেয়ী সংহিতার অনুরূপ তবে এখানে আচার-অনুষ্ঠানের বিশদ বর্ণনা আছে যা পূর্বোক্ত সংহিতায় অনুপস্থিত। এই কারণেই পণ্ডিতেরা বলেন যে কৃষ্ণ যজুর্বেদ অধিকতর প্রাচীন, এবং কৃষ্ণ যজুর্বেদের বিষয়বস্তুকে প্রয়োজনানুযায়ী সাজিয়ে গুছিয়ে শুক্ল যজুর্বেদ বা বাজসনেয়ী সংহিতা রচিত হয়েছিল।

যজুর্বেদের মন্ত্রসমূহ স্থানবিশেষে শ্লোকে এবং স্থানবিশেষে গদ্যে রচিত হয়েছে। যজুর্বেদ মূলত ব্রাহ্মণদের 'গাইড-বুক', বক্তব্যে ঋগ্বেদের সারল্য একেবারেই অনুপস্থিত। আগাগোড়া রহস্যময়তা ও দুর্বোধ্যতায় ভরা এই গ্রন্থ সাধারণ পাঠকের পক্ষে একেবারেই দুষ্পাঠ্য, বক্তব্যসমূহের সামঞ্জস্য বিধান করাও একেবারে অসম্ভব, একমাত্র কষ্টকল্পনার আশ্রয় ছাড়া। যজুর্বেদের দেবতাদের মধ্যে অগ্নিরই প্রাধান্য বেশি, কারণ আদিতে অগ্নি দেবগণের পুরোহিতই ছিলেন।

তবুও আমার মনে হয়, শুধুই পুরোহিতদের উপযোগী গ্রন্থ বলে ঘোষণা করে যজুর্বেদের প্রতি কিছুটা অবিচার করা হয়েছে। ধর্মের ইতিহাসে প্রার্থনা, মন্ত্রপাঠ ও আচার-অনুষ্ঠান তথা যাগযজ্ঞাদির উৎস যাঁরা অন্বেষণ করতে চান, তাঁদের কাছে যজুর্বেদ অবশ্যই আকর্ষণীয় হবে। তবে আমাদের বর্তমান আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা অবশ্যই বলতে হবে যে যজুর্বেদের সাহিত্যগত মূল্য যৎসামান্য।

ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহ

চলতি ধারণা অনুযায়ী ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিকে বেদের ব্যাখ্যা বলা হয়। এই পর্যায়ের গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে ম্যাকসমূলার বলেছিলেন, "ভারতীয় সাহিত্যের ছাত্রদের কাছে এই ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির যতই আকর্ষণ থাক না কেন, সাধারণ পাঠকের কাছে এগুলির আকর্ষণ যৎসামান্য। এগুলির অধিকাংশ অংশই নিছক বকবকানি, এবং শুধু বকবকানি হলেও বা কথা ছিল, আধ্যাত্মিক বকবকানি। ভারতীয় মনের ইতিহাসে এই ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিকে কোন স্থান পূর্ণ করে সেটা আগে থেকে জেনে না নিয়ে কেউ যদি এগুলি পড়ার চেষ্টা করে তাহলে সে বিরক্ত না হয়ে দশ পাতার বেশি পড়তে পারবে না।"

আসলে কিন্তু সামবেদ যেমন উদ্গাতা নামক পুরোহিতদের আশ্রয়স্থল, যজুর্বেদ যেমন অধ্বর্যুদের, তেমনি হোতাদের জন্য এই ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহ। এক একটি বেদের সঙ্গে কয়েকটি করে ব্রাহ্মণ গ্রন্থ জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ঋগ্বেদের দুটি ব্রাহ্মণ—**ঐতরেয় ব্রাহ্মণ** এবং **কৌষীতকি** বা **সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণ।** ঐতরেয় ব্রাহ্মণ চল্লিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত, প্রতিটি অধ্যায় আটটি করে পঞ্চকে বিভক্ত। সম্ভবত মহিদাস ঐতরেয় এই গ্রন্থটির সংকলক। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু সোমযাগ, অগ্নিহোত্র এবং রাজসূয় যজ্ঞ। এই গ্রন্থের শেষ দশটি অধ্যায় সম্ভবত পরবর্তীকালে রচিত হয়েছে। কৌষীতকি বা সংখ্যায়ন ব্রাহ্মণ ত্রিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত, বিষয়বস্তু ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুরূপ, প্রথম ছয়টি অধ্যায়ে আছে সাধারণ গার্হস্থ্য যাগযজ্ঞ বিশেষ করে অগ্নিযজ্ঞ এবং সপ্তম থেকে ত্রিংশ অধ্যায় পর্যন্ত বিস্তৃতভাবে সোমযাগের খুঁটিনাটি বর্ণিত হয়েছে।

সামবেদকে কেন্দ্র করে যে ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছে তার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় **তাণ্ডমহাব্রাহ্মণের** কথা। এই গ্রন্থটির অপর নাম **পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ,** এবং এটি একটি অত্যন্ত প্রাচীন গ্রন্থ যেখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন কথা ও কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে বিশেষভাবে ব্রাত্যষ্টোম যজ্ঞের কথা আছে। সামবেদের আর একটি ব্রাহ্মণের নাম হচ্ছে **ষড়্বিংশ ব্রাহ্মণ,** এটি পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণেরই পরিশিষ্ট। সামবেদের তৃতীয় ব্রাহ্মণটির নাম হচ্ছে **জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ** যা পূর্ববর্তী গ্রন্থ দুটি থেকে আরও অনেক বেশি পুরাতন, এবং যা ধর্ম ও কথা-কাহিনীর ক্ষেত্রে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই গ্রন্থের অতি সামান্য অংশই মাত্র পাওয়া গেছে।

কৃষ্ণ যজুর্বেদের প্রধান ব্রাহ্মণ হচ্ছে **তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ,** যা পূর্বকথিত তৈত্তিরীয় সংহিতার অনুসৃতি। এতে **পুরুষমেধ** বা নরবলিদান সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য দেওয়া আছে। কৃষ্ণ যজুর্বেদের আর একটি ব্রাহ্মণের নাম হল **কঠ ব্রাহ্মণ।** শুক্ল যজুর্বেদের একটি মাত্রই ব্রাহ্মণ আছে যার নাম **শতপথ ব্রাহ্মণ** যা এই শ্রেণীর গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহদায়তন। এই গ্রন্থটিরও দুটি শাখা আছে কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন। সমগ্র গ্রন্থটি চোদ্দটি খণ্ডে বিভক্ত। অথর্ববেদের সঙ্গে সংযুক্ত ব্রাহ্মণের নাম **গোপথ ব্রাহ্মণ।**

ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিকে সংহিতার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হলেও, দুই শ্রেণীর গ্রন্থের চরিত্র সম্পূর্ণ পৃথক। আসলে ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি ব্রাহ্মণদের নানাপ্রকার স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছিল। প্রায় প্রতিটি ব্রাহ্মণগ্রন্থের বিষয়বস্তুই একই রকম। প্রাচীনতম ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি বহুলাংশে পরবর্তী সংহিতাগুলির কোন কোন অংশের সঙ্গে সমকালীন, রচনাকাল আনুমানিক ৮০০ থেকে ৬০০ খৃস্টপূর্বাব্দের মধ্যে। ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির মধ্যে যে ধর্মব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে তার সঙ্গে ঋগ্বেদের ধর্মের পার্থক্য সুস্পষ্ট। যাগযজ্ঞ ও ব্রাহ্মণ প্রাধান্যই এখানে পাকাপাকি স্থানলাভ করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ শতপথ ব্রাহ্মণ থেকে একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করা যায় ঃ "দু'রকমের দেবতা আছে, তার মধ্যে ব্রাহ্মণ মানুষরূপী দেবতা। দেবতারা লাভ করেন যজ্ঞের ভাগ, এবং ব্রাহ্মণ দক্ষিণা। এই দু'তরফকে সন্তুষ্ট না করলে বিপর্যয় অনিবার্য।" ব্রাহ্মণদের সম্পত্তিতে রাজা হস্তক্ষেপ করতে পারবে না, ব্রাহ্মণের কেশাগ্র স্পর্শ করার ক্ষমতা তার নেই।

ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহের বিষয়বস্তু মোটামুটি দু'ভাগে বিভক্ত, **বিধি** ও **অর্থবাদ।** প্রথমটি হচ্ছে নির্দেশ, দ্বিতীয়টি হচ্ছে ব্যাখ্যা। নির্দেশগুলি বহুক্ষেত্রেই অর্থহীন, পরস্পরবিরোধী। এক কথায় ব্রাহ্মণসাহিত্যে যজ্ঞানুষ্ঠানের চেয়ে বড় আর কিছুই নেই, গ্রন্থকর্তাদের একমাত্র আদর্শ ছিল যজমান, এবং অবশ্যই পুরোহিতদের, ঐহিক সুখসমৃদ্ধিলাভ করা।

তবে ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহে ইতিহাস, আখ্যান ও পুরাণেরও কিছু কিছু স্থান আছে। এদিক থেকে ওল্ড টেস্টামেন্টের তালমুদ-এর সঙ্গে ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির কিছু কিছু চরিত্রগত মিলও আছে। ঋগ্বেদ কথিত উর্বশী ও পুরুরবার কাহিনী শতপথ ব্রাহ্মণে স্থান পেয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে বিখ্যাত শুনঃশেপের কাহিনী, এ ছাড়া সৃষ্টিরহস্য নিয়েও অনেক কাহিনী ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়।

...“হাতে রাখি হাত”...

তারক দত্ত

জ্যোৎস্নার শুচি স্নানে ঋতুমতী পৃথিবী আবার
শান্তির শহর খুঁজে খুঁজে
দিশাহারা হৃদয়ের স্বপ্ন-নীল-নদে
আকুল আগ্রহে ভাসে—দিকে দিগন্তরে
প্রত্যয়ের প্রশান্ত আশ্বাসে।

মানুষেরা কবে ত্রাস পৃথিবীর বুকে
সমষ্টির সেতু বন্ধে পারাপার স্রোতে
দিনের একান্ত প্রার্থনায়
একতারার সমারোহে তুলেছিল বাউলের সুর
বিশ্বাস আঁকড়ে রেখে পৃথিবীর গতির বর্তনে।

আমিও অনন্য পিপাসায়
সংঘবদ্ধ মানুষের দলে
প্রতিবাদী—পুঞ্জীভূত ধিক্কারের বেপরোয়া ঢেউ ভেঙে ভেঙে
স্থিতধী বিশ্বাসে
সকলের হাতে রাখি হাত।

আরণ্যক ও উপনিষদ

বৈদিক সাহিত্যকে যে চারটি মূল শ্রেণীতে ভাগ করা হয় তার মধ্যে আরণ্যকের স্থান তৃতীয়। অনেক সময় ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের এবং আরণ্যক ও উপনিষদের মধ্যে সীমারেখা সুস্পষ্ট নয়। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী আরণ্যকসমূহ কোন না কোন ব্রাহ্মণগ্রন্থের সঙ্গে সংযুক্ত, পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহ কোন না কোন সংহিতার সঙ্গে সংযুক্ত। উপনিষদগুলি আবার একইভাবে কোন না কোন আরণ্যকের সঙ্গে সংযুক্ত।

অর্থাৎ গুছিয়ে বলতে গেলে ঋগ্বেদের দুটি ব্রাহ্মণ, **ঐতরেয় ব্রাহ্মণ** ও **কৌষীতকি ব্রাহ্মণ**; দুটি আরণ্যক, **ঐতরেয় আরণ্যক** ও **কৌষীতকি আরণ্যক**; এবং দুটি উপনিষদ, **ঐতরেয় উপনিষদ** এবং **কৌষীতকি উপনিষদ**। সামবেদের তিনটি ব্রাহ্মণ, **পঞ্চবিংশ, ষড়বিংশ** এবং **জৈমিনীয়**; তিনটি আরণ্যক, **আরণ্যক সংহিতা, আরণ্যক গান** এবং **জৈমিনীয়-উপনিষদ-ব্রাহ্মণ**; এবং দুটি উপনিষদ, **ছান্দোগ্য** এবং **কেন**। যজুর্বেদের মোট তিনটি ব্রাহ্মণ, **কঠ, তৈত্তিরীয়** ও **শতপথ**; তিনটি আরণ্যক, **কঠ, তৈত্তিরীয়** ও **শতপথ**; এবং ছয়টি উপনিষদ, **কঠ, তৈত্তিরীয় মৈত্রী** বা **মৈত্রায়নীয়, শ্বেতাশ্বতর, বৃহদারণ্যক** ও **ঈশা**। অথর্ববেদের ব্রাহ্মণ একটিই, তার নাম **গোপথ ব্রাহ্মণ**, এই বেদের কোন আরণ্যক নেই, তবে উপনিষদ আছে তিনটি, **মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য** এবং **প্রশ্ন**।

কিন্তু কাগজে-কলমে পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলির সঙ্গে যুক্ত হলেও আরণ্যক ও উপনিষদসমূহের চরিত্র পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলির চেয়ে পৃথক। আরণ্যক শব্দটিই সূচিত করে যে এই জাতীয় গ্রন্থগুলি অরণ্যে রচিত হয়েছে। সে যুগে রাজ-রাজড়া ও ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে রীতি ছিল প্রৌঢ়ত্বে ও বার্ধক্যে বানপ্রস্থ অবলম্বন করার, একালে যেমন সংগতিসম্পন্ন লোকেরা কাশীবাস করে। অবশ্য যাদের উদরান্নের সংস্থানের জন্য আজীবন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাটাতে হত তাদের এই জাতীয় বিলাস থাকার কথা নয়। মূলত ক্ষত্রিয় শ্রেণীর অর্থাৎ রাজপুরুষ বা শাসক শ্রেণীর মধ্যেই বানপ্রস্থের রীতি ছিল।

যাই হোক সমাজ-জীবনের বাইরে অরণ্যবাসের ফলে এই বানপ্রস্থী রাজা বা রাজপুরুষেরা কিছুটা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পেরেছিলেন। তাঁরা সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন তুলেছিলেন তাঁরা যে আজীবন ব্রাহ্মণদের মন্ত্রণায় যাগ-যজ্ঞ ক্রিয়াকলাপ করে এসেছেন তার কোন সার্থকতা আদৌ আছে কি? এই প্রশ্ন আরণ্যকেই প্রতিফলিত হয়েছিল কিন্তু উপনিষদসমূহে তা' আরও দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়। অবশ্য আরণ্যক ও উপনিষদে যে যাগ-যজ্ঞ ক্রিয়াকলাপের কথা নেই তা' নয়, বরং প্রচুরই আছে। ব্রাহ্মণ এবং পুরোহিত সম্প্রদায় রচিত এই সমস্ত অংশগুলি আরণ্যক ও উপনিষদসমূহে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। কিন্তু সব মিলিয়ে, বিশেষ করে উপনিষদের ক্ষেত্রে, আমরা পরিষ্কার একটি ক্ষত্রিয় ট্রাডিশান দেখতে পাই, যা চেপে রাখার কোন উপায় নেই।

উপনিষদ কথিত ব্রহ্মবাদ সম্পূর্ণভাবেই ক্ষত্রিয়দের সৃষ্টি। এই কথাটা খুব সহজেই প্রমাণ করা যাবে তাই দায়িত্ব নিয়ে বলতে কোন আপত্তি নেই। আমরা পরে আরও দেখব যে উপনিষদের ব্রহ্মবাদ যাগ-যজ্ঞকেন্দ্রিক ব্রাহ্মণ ঐতিহ্য থেকে শুধুই যে পৃথক তাই নয়, ব্রাহ্মণ ঐতিহ্যের বিরোধী। ইউরোপে এবং অন্যত্র ইতিহাসের কোন না কোন যুগে রাষ্ট্র ও গীর্জা, স্টেট এবং চার্চ-এর সংঘাত বেধেছিল, এবং পরিণামে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রই জয়ী হয়েছে, যাজকশক্তিকে পরাজিত হতে হয়েছে। এখানেও সেই একই স্টেট ও চার্চ, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণশক্তির সংঘর্ষ এবং শেষ পর্যন্ত এই সংঘর্ষে স্টেট অর্থাৎ ক্ষত্রিয়শক্তি জয়ী হয়েছে। বৈদিক ধর্মকে অস্বীকার করে পরবর্তীকালে যে একেশ্বরবাদী ভাগবত-ধর্ম এবং নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম গড়ে ওঠে, সেগুলির প্রবক্তা যাঁরা ছিলেন তাঁরা কেউই ব্রাহ্মণ ছিলেন না। উত্তরকালে এই সংঘাতে যে ক্ষত্রিয়শক্তি জয়ী হয়েছিল যার প্রমাণ পরবর্তীকালে ওই তিনটি ধর্মের সার্বিক বিজয়লাভ, ও বৈদিক ধর্মের ক্রমিক অবলুপ্তি। গৌতম বুদ্ধ জাতিভেদ প্রথা অস্বীকার করেন নি, শুধু ব্রাহ্মণ প্রাধান্যকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন এবং ক্ষত্রিয়দের ব্রাহ্মণদের উপরে স্থান দিয়েছিলেন।

বস্তুত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম ব্রাহ্মণ্য ক্রিয়াকাণ্ড ও অনাচারের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ জানিয়েছিল, সে প্রতিবাদের আসল বীজ কিন্তু উপনিষদেই পাওয়া যায়। পরবর্তী প্রবন্ধে তা' আলোচনা করব।

চোমংলামার চোখে উত্তরবঙ্গ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

পশ্চিম দিনাজপুর—মহাভারতীয় যুগ ও সাধারণ পরিচয়

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় বসে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন।

হস্তিনাপুরে কুরু-পান্ডবের মধ্যে বিবাদ আসন্ন। পান্ডবগণ তাদের অজ্ঞাত-বাস শেষ করে শীঘ্রই ফিরে আসছে হস্তিনাপুরে। ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ শীর্ষ-স্থানীয় নেতৃবৃন্দ দুর্যোধনকে পরামর্শ দিচ্ছেন—পান্ডবদের ন্যায্য অংশ দিয়ে শান্তিতে বসবাস করবার জন্য। কিন্তু দুর্যোধনের প্রতিজ্ঞা কঠিন, 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী!'

অগত্যা কুরুবৃদ্ধগণ শরণাপন্ন হয়েছেন শ্রীকৃষ্ণের। তাঁরা দূত পাঠিয়েছেন দ্বারকায়। আসন্ন জ্ঞাতিবিরোধে শ্রীকৃষ্ণ মধ্যস্থতা করে যেন রাজ্যের শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখেন।

কিন্তু তার পূর্বেই—কুলবধূ ঊষার গোপন চিঠি।

বাণশূরের উদ্ধত জবাবের অর্থ হল—যুদ্ধ। আর এই যুদ্ধকেই এড়াতে চাইছিলেন শ্রীকৃষ্ণ।

না—আর কোন উপায় নেই।

অগত্যা নারায়ণী সেনা সুসজ্জিত হল বাণগড় আক্রমণ করবার জন্য। কৃষ্ণ-বলরাম অগণিত সৈন্য নিয়ে মহানন্দা নদীর তীরে এসে উপস্থিত হলেন। শিবির স্থাপন করলেন মহানন্দার তীর জুড়ে। এদিকে বাণশূরও বসে নেই। শূরসেন, বীরভদ্র, রুদ্রভোট, তক্ষক, অগ্নিবর্মা প্রমুখ প্রধান প্রধান আমাত্যগণকে ডেকে নিয়ে মন্ত্রণা-সভায় বসলেন। ঠিক হল,—বীরভদ্র, রুদ্রভোট ও তক্ষক তিনজন পুনর্ভবা নদীর তীরে ব্যূহ রচনা করে নারায়ণী সৈন্যকে বাধা দেবেন। অগ্নিবর্মা ও বাণশূর নিজে বাণগড় রক্ষা করবেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই গুপ্তচরের মুখে খবর পাওয়া গেল বলরাম দু-হাজার নারায়ণী সেনা নিয়ে টাঙ্গন নদী পার হয়ে বংশীহারীতে উপস্থিত হয়েছেন। বাণশূর তাড়াতাড়ি অগ্নিবর্মাকে পাঠালেন সসৈন্যে মালিনী দীঘির পারে আত্মগোপন করে থাকবার জন্য। এইভাবে যখন মন্ত্রণাসভায় গভীর বিষয়ে আলোচনা চলছে, তখন অন্তঃপুরের দূত এসে জানাল—প্রধানা মহিষী সুরঙ্গমা মহারাজের সাক্ষাৎ প্রার্থী।

মহারাজ বাণ বিরক্ত হলেও প্রধানা মহিষী সুরঙ্গমার আহ্বান উপেক্ষা করতে পারলেন না। মন্ত্রণাসভা থেকে উঠে তিনি চলে গেলেন প্রধানা মহিষী সুরঙ্গমার মহলে।

সুরঙ্গমাই শুধু প্রধানা মহিষী নন—বাণশূরের অন্য একজন মহিষী মেরুমতীও অপেক্ষা করছিলেন সেখানে। সুরঙ্গমা প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজার ভগ্নী এবং মেরুমতী ভোটরাজার কন্যা। বাণশূর আসন্ন যুদ্ধের সম্ভাবনার বিষয় শ্বশুর ভোটরাজ এবং প্রাগজ্যোতিষপুরে শ্যালককে জানিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু উভয় রাজাই কৃষ্ণভক্ত বলে—তারা এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চায় নি।

সুরঙ্গমা কালোরাণী এবং মেরুমতী ধলোরাণী নামেও পরিচিতা ছিলেন। এই দুই রাণীর নামানুসারে বাণগড়ের অদূরে কালোদীঘি ও ধলোদীঘি নামে দুইটি জলাধার তৈরি হয়েছিল প্রাচীনকালেই। আজও দুইটি মজে যাওয়া দীঘিকে দেখিয়ে লোকে কালোদীঘি ও ধলোদীঘি বলে প্রাচীন কাহিনী স্মরণ করে।

যাই হোক বাণশূর অন্তঃপুরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন দুই রাণীকে, অসময়ে এমনভাবে তাঁরা ডেকে পাঠিয়েছেন কেন?

সুরঙ্গমা অনুনয় করলেন—

—শুন শুন পাণপতি মিনতি তুমারে,
খঞ্জনা না নাচে কেন উড়ি গেল দূরে।
কুলবধূ বাঁও চক্ষু থাকি থাকি নাচে,
এলা সভি কুনক্ষণ বুঝিনু মু আঁচে।
এলায় না যাওগো তুমি কিষ্ণের গোড়ৎ,
কাজিয়া মিটায়ে ফেল হয়ে দন্ডবৎ॥

সুরঙ্গমার আশংকা অমূলক নয়।

তাঁর বাম চোখ থেকে থেকে নেচে উঠছে। খঞ্জনা পাখি না নেচে না গেয়ে উড়ে চলে গেল। সুতরাং এ সবই কুলক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সুতরাং কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। আপোষে আলোচনা করে এ দাঙ্গা মিটিয়ে ফেলা ভাল।

সুরঙ্গমার এই অনুরোধের কারণ ছিল।

রাজকন্যা ঊষা সুরঙ্গমারই মেয়ে। সুতরাং তাকে নিয়েই যখন এই যুদ্ধের সূত্রপাত, তখন সুরঙ্গমা এর একটা শান্তি-পূর্ণ পরিণতি চান।

কিন্তু বাণশূর অবিচল।

বাণ বললেন—

"কি কহচেন 'আনি' তুমি আচানক্ কথা,
দেখামু যুদ্ধৎ মুই কাটা কিষ্ণোক মাথা।
বিউপাক্ষ উদ্রপূজি নিমু মুই চাহি
পাশুপাত বাণ পালে কহাকো না চাহি।
মিটামু কালিকা মুই আম-কিষ্ণো সাথে
ডরোচেন কেন বিথা উদ্রের পসাদে।
হমু মুই মহাশূর যুদ্ধৎ অমর
অস্নাক্ দেখামু কালি অকথা সমর।"

রাণী সুরঙ্গমা এবং মেরুমতীকে প্রবোধ দিয়ে চলে গেলেন মহারাজা বাণ। অতি প্রত্যূষে উঠে তপনদিঘীতে (বর্তমানে তপন থানায় অবস্থিত) স্নান শেষ করে মহাকালের মন্দিরে গিয়ে পূজায় বসলেন।

কিন্তু এ কি হল—ধ্যানে আজ ইষ্ট-দেবতার আবির্ভাব ঘটছে না কেন। নতুন করে আচমন করলেন প্রবল প্রতাপান্বিত বাণশূর। প্রতিদিনই ইষ্টদেবতার পূজা সেরে এবং তাঁর প্রসাদ গ্রহণ না করে কোন কাজেই হাত দেন না বাণ। কিন্তু আজ এ কি করুণা!

বিচলিত হলেন তিনি।

পুনরায় হোমকুন্ড জ্বালানো হল। আর সেই যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দেবার আগেই মন্দিরে এসে উপস্থিত হলেন শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম।

বলরাম ব্যঙ্গ করে বললেন—

—মহারাজ বাণ, তোমার টাঙ্গন, পুনর্ভবা, মহানন্দার ব্যূহ ছত্রভঙ্গ হয়েছে। ভগ্ন সৈন্যদল পালিয়ে যাচ্ছে। নারায়ণী সৈন্য এসে অবরোধ করেছে তোমার স্বর্ণপুরী বাণগড়। সুতরাং মহারাজ বাণ; তোমার প্রাণ এবং রাজ্য এখন আমার হাতের মুঠোয়।

মহারাজ বাণ বললেন—কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর রামকৃষ্ণ; আমি আমার ইষ্ট-দেবতার পূজার্চনার শেষে যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়ে তবে তোমাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করব।

কিন্তু ততক্ষণে কৃষ্ণের হাতে বিষ্ণুচক্র ঘুরে উঠেছে বিদ্যুদ্বেগে। আর সেই ঘূর্ণনের বেগে অতীত, ভূত, ভবিষ্যৎ সব কিছু একাকার হয়ে যাচ্ছে। মহারাজ বাণ দেখলেন—বিষ্ণুচক্রের আবর্তন পরিধির মধ্যে মহাকাল তার প্রশান্ত মূর্তিতে অধিষ্ঠিত, কিন্তু অসহায় দৃষ্টি তাঁর চোখে বরঞ্চ বেদনার্ত।

বাণ বুঝতে পারলেন—তাঁর ইষ্টদেবতা দেবাদিদেব মহেশ্বরও বিধিনির্দিষ্ট দেবতা মাত্র। আর এক্ষেত্রে স্বয়ং ভগবানই যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী—সেখানে শিব অক্ষম হয়েছেন তাঁর প্রিয় ভক্তকে রক্ষা করতে।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—মহারাজা বাণ, আমি তোমার শিবভক্তিতে অত্যন্ত প্রীত হয়েছি। আমি এই বর দিচ্ছি, পরলোকে তুমি শিবের পার্শ্বচর রূপে বিরাজ করতে পারবে।

বাণশূর নিহত হলেন।

কৃষ্ণ-বলরাম নিজে গিয়ে কারাগার থেকে উন্মুক্ত করলেন—ঊষা এবং অনিরুদ্ধকে। শুধু তাই নয়—যুদ্ধে যে সব ভগ্ন সৈন্য নিহত হয়েছে তাদের সৎকার এবং বাণগড়ের উত্তরাধিকারী ও নির্বাচন শেষ না করে দ্বারকায় ফিরতে পারেন না।

কিন্তু বাণসৈন্যদলের সৎকার করতে গিয়ে বিপদে পড়লেন রামকৃষ্ণ। কেন না যুদ্ধে এত সৈন্য নিহত হয়েছে যে—তাদের সকলের সৎকার করা সম্ভব নয়।

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ দিলেন—সমস্ত মৃত সৈন্যের হাতের একটি 'কর' সংগ্রহ করে তাই দাহ করা হোক এবং মৃতদেহ মাটিতে প্রোথিত করা হোক।

আত্রেয়ীর তীরে করাংশ দাহ করা হল অগত্যা।

বর্তমানে তপন থানার থেকে সাত মাইল দূরে একটি স্বল্পখ্যাত স্থানের নাম হল—করদাহ। পুনর্ভবা নদীর তীরে প্রাচীন দাহস্থানটি এখনও লোকে দেখিয়ে দেয়।

কথিত আছে বাণশূরের মৃত্যুর পর কোটিবর্ষ বিষয়ে শৈব মত প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং সেখানে ক্রমশ বিষ্ণু মত প্রতিষ্ঠিত হয়। আর বৈষ্ণব ধর্ম এবং বিষ্ণু মত এত প্রবল হয়ে দেখা দেয় যে—এখনও পর্যন্ত প্রাচীন কীর্তি ও ধ্বংসাবশেষ খননকালে বহু মূর্তি পাওয়া যায়। এই সব মূর্তির খুব সামান্যই দেশের মধ্যে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে—বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিদেশী মূর্তি সংগ্রাহকরা দরিদ্র গ্রামবাসিগণের কাছ থেকে অল্পমূল্যে কিনে বিদেশে পাচার করে দিয়েছে। পাল আমলের কীর্তি—গড়, দুর্গ প্রাকার, ও স্তূপ খননকালেও বিষ্ণুমূর্তি ও বৈষ্ণব ধর্মের চার সম্প্রদায়ের বহু প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছিল।

বলা বাহুল্য দেশবিভাগের সময়ে যে কয়টি জেলার ওপর বিভাগের অস্ত্র নেমে আসে—তার মধ্যে দিনাজপুর জেলা অন্যতম। জেলার পশ্চিম অংশের এক তৃতীয়াংশ ভারতের সঙ্গে যুক্ত করে স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ যে মন্তব্য করেছিলেন, তা' নিচে উদ্ধৃত করা গেল,—

"The Line shall run along the boundery between the following thanas :—Haripur and Raiganj, Haripur and Hemtabad Ranisankail and Hemtabad, Pirganj and Kaliaganj, Biral and Kaliaganj, Biral and Kusmandi, Biral and Gangarampur, Dinajpur and Gangarampur, Dinajpur and Kumarganj, Chirirbandar and Kumarganj, Phulbari and Kumarganj, Phulbari and Balurghat.

It shall terminate at the point where the boundery between Phulbari and Balurghat meets the North-South line of the Bengal-Assam Rly. in the Eastern corner of the thana of Balurghat. The line shall turn down the Western edge of the railway lands belonging to the railway and follow that edge until it meets the boundery between the Thana of Balurghat and Panchbibi."

র‍্যাডক্লিফের এই মন্তব্য থেকে মোটামুটিভাবে বর্তমান পশ্চিম দিনাজপুরের একটি আভাষ পাওয়া যেতে পারে। দ্বিভক্ত অংশের জেলার পরিমাণ—যা ভারতের সঙ্গে যুক্ত হল—তার পরিমাণ দাঁড়াল দু-হাজার বাহান্ন বর্গমাইল। বিভাগের পর দেখা যায়—যে মূলনীতি নিয়ে দেশবিভাগ—সেই জনসংখ্যার দিক থেকে এমন সমস্ত থানা বিভক্ত হল কিংবা পাকিস্তানের অংশে পড়ল—যা কিনা হিন্দুপ্রধান। শুধুমাত্র বিভাগের লাইন সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখতে এই অসঙ্গত বিভাগ মেনে নিতে হয়েছিল বলে মনে হয়।

১৯৫৬ সালে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের রায় অনুযায়ী বিহারের পূর্ণিয়া জেলা থেকে কিষেণগঞ্জ, চোপড়া ও ইসলামপুর নিয়ে পশ্চিম দিনাজপুরের সঙ্গে যুক্ত করার ফলে শুধুমাত্র পশ্চিম দিনাজপুরেরই আয়তন বাড়ে নি—বস্তুত পশ্চিমবঙ্গের বিচ্ছিন্ন অংশ উত্তরবঙ্গও মূল

ভারতের
আদিতম
রসায়ন
চ্যবনপ্রাশ
আয়ুর্বেদোক্ত বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত
চ্যবনপ্রাশ নূতন ও পুরাতন সর্দ্দি কাশি,
স্বরভঙ্গ ও শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় বিশেষ উপকারী।
টনিক হিসাবে নিয়মিত ব্যবহারে দেহের
দৌর্ব্বল্য ও রুগ্নতা দূর করে ও শরীরের পুষ্টি
সাধন করিয়া স্বাস্থ্যশ্রীর পুনরুদ্ধার করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা বোম্বাই কানপুর.

ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হল। সংযোজিত অংশ বা নতুন বাংলার অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা বিরানব্বইজন বাংলাভাষাভাষী। বিভাগকালে পশ্চিম দিনাজপুরের মহকুমা দাঁড়াল মাত্র একটি—বালুরঘাট। ১৯৪৮ সালে রায়গঞ্জ থানাকে মহকুমা হিসাবে রূপান্তরিত করা হল প্রশাসনিক প্রয়োজনে। সম্প্রতি ইসলামপুরকেও মহকুমা হিসাবে পুনর্গঠনের দাবি দেখা দিয়েছে।

পশ্চিম দিনাজপুরের ইতিহাস কবে থেকে সুরু তার সঠিক কাল নির্ণয় করা সম্ভব নয়। মহাভারতের যুগে দেখা যায়—পাণ্ডবগণ তাঁদের মহাপ্রস্থানের পথে পশ্চিম দিনাজপুরের পথ অতিক্রম করেছিলেন এবং তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র এই স্থানেই কোনও একটি দীঘিতে রেখে গিয়েছিলেন। এই স্থানটিকে লোকে এখনও পাঁচভাইয়া বলে অভিহিত করে। অসুরাগড় বলে আরও একটি গ্রামের নাম পাওয়া যায়—এবং গ্রামবাসীদের অভিমত হল এই যে, পাণ্ডবগণ তাঁদের স্বর্গ যাত্রা-পথেও স্থানীয় অত্যাচারিত লোকের অনুরোধক্রমে—উক্ত স্থানের জনৈক অসুর বধ করেন। ভীমভার নামে গ্রামের সঙ্গেও ওই একই কাহিনী জড়িত। ভীমসেনও এখানে এক দুর্বৃত্তকে সংহার করেন। অথবা মতান্তরে ভীমসেন এইস্থানে এসে নিজের পদযুগল প্রক্ষালন করেন বলে উক্ত নামের উৎপত্তি।

করণদীঘি নামে আরও একটি স্থান আছে। লোকে বলে মহারাজা 'কর্ণ' এখানে সময়ে সময়ে বসবাস করতেন। মহাভারতীয় যুগ, মৌর্যযুগ, গুপ্তযুগ, বৌদ্ধ ও পালযুগের সমগ্র ইতিহাসের প্রামাণিকতা এখন পাওয়া সম্ভব নয়। রমেশচন্দ্র মজুমদার ও যদুনাথ সরকার মহাশয় এ বিষয়ে যেটুকুমাত্র আলোকপাত করেছেন—এছাড়া এই জেলার বিস্তৃত ইতিহাস পর্যালোচনা আর হয় নি বলেই মনে হয়। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সোসাইটি থেকে শুধুমাত্র পালযুগের তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে।

তাহলেও ইতিহাস অমর। যুগ যুগ থেকে মানুষের মুখে মুখে, গানে, গল্পে, যে সব কাহিনী চলে আসছে তার মধ্যে ঐতিহাসিক উপাদান আছে বৈকি। হয় তো কালের বিবর্তনে সেই কাহিনী এবং সত্যতারও রূপান্তর ঘটে গেছে, তবুও তা' ইতিহাস! আর এই ইতিহাস এখনও বেঁচে আছে পশ্চিম দিনাজপুরের অশিক্ষিত গ্রাম্য গীতিকারের কণ্ঠে, লোক-কবির কাব্যগাথায়। অনিরুদ্ধ ও ঊষার প্রেম কাহিনীকে রূপ দিতে গিয়ে রাজবংশী গ্রাম্য কবি এই ইতিহাসের এক অংশকেই পরিস্ফুট করে তুলেছেন। আর এমনি করেই অন্যান্য যুগ বেঁচে আছে মানুষের মুখে মুখে।

পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ এই জেলা পরিক্রমা করেছিলেন বলে জানা যায়। হিউয়েন সাঙ্ তাঁর বিবরণীতে পশ্চিম দিনাজপুরের বিষয় সবিশেষ উল্লেখ করে যান নি। একদা মহারাজ শশাঙ্ক হর্ষবর্ধনের সঙ্গে যুদ্ধে মহানন্দা, টাঙ্গন, পুনর্ভবা প্রভৃতি নদীর তীর দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। শশাঙ্কের সময়েই—এই জেলায় বৌদ্ধধর্মের জোয়ার আসে বলে ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন। তার পর পালযুগ আসে বাংলায়। গৌড়ভুক্তির অন্তর্গত হিসাবে, তখন পশ্চিম দিনাজপুরের কোনও পৃথক সত্তার উল্লেখ পাওয়া যায় না। পালরাজগণ মন্দির, দীঘি, দীপাধার, গড়, দুর্গ ইত্যাদি এমনভাবে নির্মাণ সুরু করেছিলেন যে—এই অংশের কোনও পৃথক সীমারেখা তখন নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি। অথচ স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় তাঁর 'গৌড় রাজমালা' গ্রন্থে পালরাজগণের কীর্তিসমূহকে স্থানগতভাবে যে বিভাগ করেছেন—তার মধ্যে দিনাজপুর জেলাকে পৃথকভাবে দেখানো হয়েছে। যাই হোক্—গৌড়ভুক্তির অন্তর্গত হলেও পশ্চিম দিনাজপুর যে তৎকালে কোন অংশেই অবহেলিত অংশ ছিল না— তা প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ, দীঘি, দীপাধার, মন্দির প্রভৃতির দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায়।

এখনও পর্যন্ত চাষের জমিতে, পুকুর খননকালে কিংবা সামান্য মাটি খুঁড়লেই অকস্মাৎ বেরিয়ে আসে প্রাচীন নিদর্শন, হয়তো ভগ্ন বিষ্ণুমূর্তি, কিংবা, মাটির দীপাধার কিংবা পালযুগীয় মুদ্রা—'শ্রীশ্রীধর্মপালস্য' নামাঙ্কিত।

পশ্চিম দিনাজপুর কৃষিনির্ভর জেলা। জেলার সর্বাংশই বিস্তৃত সমতলভূমি। কিন্তু ভূ-সমীক্ষকদের মতে উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে ঢালু। এর ফলে হিমালয়াগত নদীসমূহের বহমানতা সাবলীল এবং সরল। জেলার প্রধান নদীই উত্তর থেকে দক্ষিণে সরলভাবে প্রবাহিত হয়েছে। একমাত্র হিলি শহরকেই জেলার উচ্চতম স্থান বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে হিলির উচ্চতা চুরাশি ফুট। নদীগুলির গতিপথ সরল এবং সবগুলিই গঙ্গার দিকে প্রবাহিতা। প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে এবং নদীগুলির নাব্যতার দরুণ জেলা অনেকাংশেই বন্যা প্লাবিত হয়—এবং এই সমস্ত বন্যা যথেষ্ট পলিমাটি বহন করে।

পশ্চিম দিনাজপুরের জমি দো-ফসলী। বলাই বাহুল্য ধান প্রধান কৃষি। রাঢ়বঙ্গের পরেই ধানের ফলনের জন্য পশ্চিম দিনাজপুরের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের একটি উল্লেখযোগ্য চাল 'বংশীহারী' এই জেলার বংশীহারী নামক স্থানের ঐতিহ্য বহন করে।

জেলা নানা জাতি ও উপজাতি অধ্যুষিত। কোচ, রাজবংশী, পলিয়া, সাধু পলিয়া, বাবু পলিয়া, খেন্, সাঁওতাল প্রভৃতি উপজাতিগণের সঙ্গে প্রাচীন ঐতিহ্য বিবর্তিত হয়ে চলেছে। বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় গোষ্ঠীর সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। তবে দেশ বিভাগের পরই পশ্চিম দিনাজপুরের বসতি পুনর্বিন্যাস সাধিত হয়েছে। উত্তরবঙ্গের প্রাচীন রাজবংশ কোচ জাতির বিভিন্ন ধারা গোষ্ঠী উত্তরবঙ্গের নানাস্থানে নানাসময়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। পশ্চিম দিনাজপুরের কোচ ধারার উপস্থিতি ও বসতি স্থাপনের পিছনে যদিও কোনও প্রামাণিক ইতিহাস পাওয়া যায় না—তবে মনে হয়—সপ্তদশ শতকে কোচবিহারের সঙ্গে ভূটানের সংঘর্ষ সময়ে এবং ষোড়শ শতকে মোগল আক্রমণের সময়ে কোচ জাতির এক এক অংশ বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল।

পলিয়া, সাধু পলিয়া, বাবু পলিয়া প্রধানত মালদহের গঙ্গাতীরবর্তী স্থানসমূহ থেকে বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে, এবং জাতির নামের সঙ্গে অনুষঙ্গ শব্দ ব্যবহারের দরুণ স্বভাবতই প্রমাণ হয় যে—ইংরাজ আমলে এই জাতিগোষ্ঠী নানাতর জীবিকা গ্রহণ করার ফলে জাতিসত্তাও বিভিন্ন ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। সাঁওতাল এই জেলার একটি প্রাচীন জাতিগোষ্ঠী। পালযুগে—রামপালের আমলে ইতিহাসখ্যাত কৈবর্ত বিদ্রোহের সময়ে পশ্চিম দিনাজপুরের সাঁওতাল ও অন্ত্যজশ্রেণীগুলি একটি সবিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ক্রমপর্যায়ে সেই ইতিহাস পর্যালোচনা করা হবে।

মাত্র ৮৲ টাকায়

আধুনিক ডিজাইন ও রঙের অতি সুন্দর সাড়ী মূল্য ৮৲ টাকা, ২টি সাড়ী ১৫৲ টাকা, ৩টি সাড়ী ২১৲ টাকা। ডিল্যুক্স ১০৲ টাকা, ২টি সাড়ী ১৯৲ টাকা, ৩টি সাড়ী ৩১৲ টাকা, ৩টি সাড়ী ৪৫৲ টাকা। যে কোন ২টি বা তদধিক সাড়ীর সহিত বিনামূল্যে ব্লাউজ পীস এবং কানের টাপ।

Ambika Saree Bhandar (BCW)
6815—Mandelia Road, Delhi-7

কোন কোন মার্কিনী সমালোচক প্রমাণ করবার চেষ্টায় আছেন যে সব সমস্যা নিয়ে ব্রেখট তাঁর নাটকে আলোচনা করেছেন, আজ সে সব সমস্যা পুরনো হয়ে গেছে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? এর পরের দৃশ্যে সুন যেভাবে চাকরি জোগাড় করবার চেষ্টা করছে দেখা যাবে, তাকে কি অতীতের ছবি বলে অগ্রাহ্য করা যায়?

ওয়াং-এর হাত ভেঙে দেবার ব্যাপারটারও যে পরিণতি এ দৃশ্যে দেখা যায় বাস্তব জীবনে অহরহই কি সে ধরণের ব্যাপার ঘটছে না। সুফু জাতীয় বড়লোকেরা যখন গরীবের ওপর অত্যাচার করে তার বিপক্ষে কে মাথা তুলে দাঁড়াবে? সরল বোকা শেনটে প্রথমটায় তাই করতে গেছিল—কিন্তু তার দ্বৈতসত্তা সুইটা জাগতিক বুদ্ধিসম্পন্ন। তাই শেনটে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও সুইটা জানালো যে তার কাজিন, ওয়াং পিট্টি খাবার সময় উপস্থিত ছিল না—সুতরাং সে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না।

পঞ্চম দৃশ্য
শেনটের তামাকের দোকান

[সুইটা দোকানের সামনে একটা চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছে—মিসেস সিন সামনের জায়গাটা পরিষ্কার করছে আর সেই সংগে কথা বলে চলেছে।]

মিসেস সিন—মালিকের নামে স্থানীয় লোকেদের কাছে যদি বিশ্রী গুজব রটে যায়, তবে এ ধরণের ছোট ব্যবসা দুদিনেই উঠে যাবে। শেনটে এবং ইয়াং সুনের মেলামেশাটা এমন বিশ্রী এবং রহস্যজনক হয়ে উঠেছে কি বলব। এই সময়ই আপনার মতো বুদ্ধিমান আর বিবেচক লোকের দরকার। আপনি সহজেই সমস্ত নোংরামিকে ঝেঁটিয়ে সাফ করে দিতে পারবেন। আর ভুলে যাবেন না পাশের দোকানের কেশসজ্জাকর মিস্টার সুফুকে—বারোটা বাড়ির মালিক ইনি—একবার মাত্র বিয়ে করেছেন, তারও বয়স হয়েছে। আমাকে স্বয়ং এই ভদ্রলোক ইঙ্গিত দিলেন শেনটেকে উনি যথেষ্ট স্নেহের চোখে দেখেন—এমন কি তার আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধেও খোঁজ নিচ্ছিলেন। এটাকে ভাগ্যের কথা বলতে হবে বৈকি!

[বাইরে থেকে সুনের কণ্ঠস্বর শোনা যাবে।]

সুন নেপথ্যে—এটা কি মিস শেনটের দোকান?

মিসেস সিন—(চিৎকার করে) হ্যাঁ, শেনটের

বঙ্গমঞ্চে ওদেশের শিল্পী এদেশে

দোকান তবে এখন এখানে আছেন তাঁর কাজিন মিস্টার সুইটা।

[সুন ঢুকবে এবং মিসেস সিন পেছনে গিয়ে কাজ করতে থাকবেন।]

সুন—আমার নাম হচ্ছে ইয়াং সুন।

[সুইটা এবং সুন পরস্পরকে বাউ করবে।]

সুন—শেনটে বাড়িতে আছে?

সুইটা—না, সে বাইরে গেছে।

সুন—তাই নাকি? যাক্ গে, আপনি বোধ হয় আমাদের সম্পর্কটা জানেন। (দোকানটা ভালভাবে দেখে নিয়ে) এ যে দেখছি একটা সত্যিকার ভাল দোকান। আমি ভেবেছিলাম শেনটে দোকান সম্বন্ধে একটু বাড়িয়ে বলেছিল। তাহলে তো আর আমার আকাশবিহারে যাবার কোনো বাধা থাকল না। (একটা বাক্স থেকে সিগার বার করে ধরিয়ে নেবে) আপনার কি মনে হয় এই দোকানটা থেকে আরও তিনশো ডলার পাওয়া যাবে?

সুইটা—মশায়ের কি এখুনি দোকানটা বেচে দেবার ইচ্ছা?

সুন—কেন? ক্যাশে কি তিনশো ডলার আছে নাকি?

[সুইটা মাথা নেড়ে বোঝাবে—টাকা নেই।] শেনটে খুব ভাল মেয়ে। আগেই দুশো ডলার পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমার যে আরও তিনশো ডলারের দরকার। না পেলে সব পণ্ড হয়ে যাবে।

সুইটা—তোমাকে টাকাটা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমার কাজিন একটু হঠকারিতার কাজ করেছে। এ জন্যে দোকানটাকে পর্যন্ত ওর বেচে দিতে হতে পারে। তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।

সুন—টাকাটা এখনি আমার দরকার—পরে হলে চলবে না, সমস্ত পণ্ড হয়ে যাবে। আর আমি জানি আমাকে কোনো কিছু দিতে শেনটের আপত্তি হবে না।

সুইটা—তাই নাকি!

সুন—অবশ্য এটা সবই তার নিজস্ব গুণে।

সুইটা—আচ্ছা আমি যদি জিজ্ঞেস করি, এই পাঁচশো ডলার কিভাবে খরচ করা হবে?

সুন—নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবেন। পিকিং-এর এয়ার পোর্টের সুপারিন্টেন্ডেন্ট হচ্ছে আমার বন্ধু। ফ্লাই স্কুলে আমরা দুজনে একই সময় ছাত্র ছিলাম। পাঁচশো ডলার পেলে সে আমাকে চাকরিটা জোগাড় করে দেবে।

সুইটা—এত টাকা সে দাবি করছে?

সুন—আর একটা দিকও তো ভাবতে হবে। একজন অত্যন্ত বিবেকসম্পন্ন পাইলটকে কর্তব্যের অবহেলার ছুতো দেখিয়ে তাকে পদচ্যুত করতে হবে। এই লোকটার আয়ের ওপর নির্ভর করে সংসার চলছে অনেকগুলো প্রাণীর। এই লোকটাকে সরিয়ে আমার বন্ধু আমার চাকরির ব্যবস্থা করবে—এই জন্যে তার দায়িত্বও যেমন বড়, সেই অনুসারে সে বড় অঙ্কের টাকাও হেঁকেছে। যাক্‌গে এ সব কথা আপনার আমার মধ্যে থাকাই ভাল। শেনটেকে কিছু বলবেন না।

সুইটা—হ্যাঁ, না বলাই বোধ হয় ভাল। কিন্তু একটা কথা—তোমাকে যে তোমার বন্ধু এক মাস বাদে এই-ভাবেই পথে বসাবে না কে বলতে পারে।

সুন—না না, সে কখনও সম্ভব—সে হল আমার বন্ধুলোক।

সুইটা—আমার মনে হয় তুমি অসম্ভব রকম বড় দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে চাইছ। তাছাড়া মিস্টার ইয়াং সুন, তুমি আমার কাজিনকে তার এই ছোট্ট ব্যবসাটা বেচে দিয়ে, বন্ধুবান্ধব ছেড়ে সম্পূর্ণভাবে তোমার ওপর নির্ভর করতে অনুরোধ করছ। তোমার আসল উদ্দেশ্য কি? তুমি কি শেনটেকে বিয়ে করবে?

সুন—সে জন্যে আমি প্রস্তুত হবো।

সুইটা—এটা কি খুবই দুঃখের কথা নয়, যে সামান্য কিছু টাকার জন্যে আমার কাজিনের এই ব্যবসাটা নষ্ট হয়ে যাবে, তাড়াতাড়ি বিক্রি করবার গরজ দেখলে লোকে ঝোপ বুঝে কোপ মারবার চেষ্টা করবে। ফলে দামও বিশেষ উঠবে না! যে দুশো রুপোর ডলার তুমি পেয়েছ, সেটা দিয়ে দোকানের ভাড়া দেওয়া যায়। তোমার কি ইচ্ছে হচ্ছে না অন্য কোনো

কাজে না গিয়ে এই দোকানের ব্যবসাটাই চালাতে?

সুন—কি যে অদ্ভুত কথা বলেন মশায়! লোকে দেখলে কি ভাববে? পাইলট ইয়াং সুন কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে তামাক বেচবে?

সুইটা—আকাশবিহারটাই তা হলে বিংশ শতাব্দীর একমাত্র সম্মানজনক বৃত্তি বল?

সুন—(পকেট থেকে চিঠি বের করে) ওরা আমাকে প্রতি মাসে মাইনে দেবে আড়াইশো ডলার করে। এই যে ওদের চিঠিটা দেখুন—টিকিটের ওপর পিকিং-এর পোস্ট মার্ক রয়েছে।

সুইটা—আড়াইশো ডলার। সে তো অনেক টাকা!

সুন—আপনি কি ভাবছিলেন আমি বিনে মাইনেয় ওদের কাজে ঘুরে বেড়াবো?

সুইটা—মনে হচ্ছে কাজটা ভালই। মিস্টার ইয়াং সুন, আমার কাজিন আমাকে অনুরোধ করেছে, তোমাকে তোমার এই বহু আকাঙ্ক্ষিত কাজটা পেতে সাহায্য করতে। তার এই আন্তরিক ইচ্ছাতে বাধা দেবার মতো কোনো কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি না। নরনারীর স্বর্গীয় প্রেমের আনন্দ থেকে আমি তাকে বঞ্চিত করতে চাই না। ওই যে বাড়িওয়ালী মিসেস মিৎসু আসছেন—দোকান বিক্রির ব্যাপারে ও'র পরামর্শ নেওয়া যাক।

মিসেস মিৎসু—(ভেতরে ঢুকে) সুপ্রভাত মিস্টার সুইটা। কাল বাদে পরশু বাড়ি ভাড়া দিতে হবে—সে বিষয়ে পরামর্শ করতে চান না কি?

সুইটা—মিসেস মিৎসু, এখন এমন একটা পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে, যার ফলে দোকানটা আর শেনটে চালাবে কি না, ঠিক করতে পারছে না। শেনটে এখন বিয়ে করবার কথা ভাবছে। এই তার ভাবী স্বামী মিস্টার ইয়াং সুন। সুন ওকে পিকিং নিয়ে যাবে। সেখানে ওরা নতুন জীবন শুরু করতে চায়। ভাল দাম পেলে এই তামাকের দোকানটা আমি বেচে দেব।

মিসেস মিৎসু—কত টাকা চান আপনি?

সুন—নগদ তিনশো ডলার।

সুইটা—(বাধা দিয়ে) না না, পাঁচশো রুপোর ডলার।

মিৎসু— (সুনের প্রতি) মনে হয় আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারবো। তোমাদের এই দোকানের মাল কিনতে কত খরচ পড়েছিল?

সুইটা—আমার কাজিন হাজার রুপোর ডলার দিয়ে দোকানটা কিনেছিল। যা স্টক ছিল তার থেকে এখন পর্যন্ত অতি অল্পই বিক্রি হয়েছে।

মিৎসু—হাজার রুপোর ডলার। বল কি, তোমার বোনকে ঠকিয়েছে। আমি প্রস্তাব করছি পরশু যদি এখান থেকে চলে যেতে রাজী হও, তাহলে মাল্-পত্র সহ দোকানটার জন্যে তোমাকে তিনশো রুপোর ডলার দিতে পারি।

সুন—খুব ভাল প্রস্তাব—আমি রাজী।

সুইটা—এ অত্যন্ত কম দাম।

সুন—যথেষ্ট যথেষ্ট—

সুইটা—পাঁচশো ডলারের কমে হবে না।

সুন—কেন হবে না?

সুইটা—(মিৎসুকে) আমার কাজিনের ভাবী স্বামীর সঙ্গে আমি একটু পরামর্শ করে নিই। (একান্তে সুনকে) এ দোকানের সমস্ত মাল এক বৃদ্ধ দম্পতির কাছে দুশো রুপোর ডলার দিয়ে বাঁধা দেওয়া আছে। সেই দুশো ডলারই কালকে তোমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

সুন—(ধীরে ধীরে) এ সম্বন্ধে লিখিত-ভাবে কিছু আছে কি?

সুইটা—না।

সুন—(একটু থেমে মিসেস মিৎসুকে) তিনশো ডলার হলেই আমাদের চলবে।

মিৎসু—কিন্তু আমার জানা দরকার এই ব্যবসাটার দরুণ কোনো ধার বা অন্যের পাওনা টাকা আছে কি না?

সুন—(সুইটাকে) উত্তর দিন।

সুইটা—সে রকম কোনো ধার নেই।

সুন—কবে তিনশো ডলারটা পেতে পারি?

মিৎসু—কাল বাদে পরশু। কিন্তু তার আগে ভাল করে ভেবে দেখ। এক মাস বাদে দোকানটা বিক্রি করলে অনেক বেশি টাকা পাবে। আমি তিনশো ডলার দিতে রাজী, আর তার একমাত্র কারণ—এই তরুণ তরুণীর ব্যাপারে আমি ওদের সাহায্য করতে চাই। (মিসেস মিৎসু চলে যাবে।)

সুন—দুদিন বাদে বিক্রি করলে বোধ হয় আরও ভাল দাম পাওয়া যাবে। আর সে ক্ষেত্রে ধার করা দুশো ডলারও শোধ করে দিতে পারব।

সুইটা—এ সময় তিনশো ডলারের বেশি দাম কিছুতেই উঠবে না। তোমাদের দুজনের টিকিট কেনার এবং কিছুদিন চলবার মতো টাকা তোমার কাছে আছে তো?

সুন—চিন্তা করবেন না। যে করেই হোক পিকিং-এ পৌঁছবই।

সুইটা—দুজনের টিকিটে কিন্তু যথেষ্ট খরচ লাগবে।

সুন—দুজন? শেনটে এখন এখানে থাকবে। প্রথমটায় ওকে নিয়ে গেলে ও তো আমার বোঝা-বিশেষ হয়ে দাঁড়াবে।

সুইটা—তোমার কথাটা বুঝতে পারছি—কিন্তু আমার কাজিন কিভাবে তার খাওয়া-পরা চালাবে?

সুন—আপনি তার ভার নিতে পারেন না?

সুইটা—দেখি কি করা যায়। (একটু থেমে) মিস্টার ইয়াং সুন ওই দুশো ডলার আমাকে ফেরং দাও। পিকিং-এর দুটো টিকিট কিনে আমাকে দেখিয়ে টাকাটা নিয়ে যেও।

সুন—প্রিয় কাজিন, আমার একটা কথা শুনুন—নিজের চরকায় গিয়ে তেল দেবার ব্যবস্থা করুন।

সুইটা—মিস শেনটে—

সুন—আমাদের ব্যাপারে আপনার মাথা গলিয়ে লাভ কি?

সুইটা—সমস্তটা শুনলে সে দোকান বিক্রি করতে রাজী না-ও হতে পারে।

সুন—আমি বলছি সে রাজী হবে।

সুইটা—তুমি কি মনে করো আমি না করলেও—

সুন—আপনি নেহাৎ গোবেচারী।

সুইটা—ভুলে যেও না সেও রক্তমাংসে গড়া মানুষ—তারও একটা নিজস্ব চিন্তা-শক্তি আছে।

সুন—(মৃদু হেসে) আমার সত্যিই আশ্চর্য লাগে যখন পুরুষেরা মনে করে তাদের সংসারের যুবতী মেয়েদের যুক্তি দিয়ে তারা সব কিছু বুঝিয়ে দেবে। মেয়েরা যখন প্রেমে পড়ে তখন কোনো যুক্তি দিয়েই তাদের ঠেকিয়ে রাখা যায় না। তাদের সমস্ত বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি, যুক্তি সব লোপ পেয়ে যায়। বুঝলেন? শুনুন, আমাদের বিয়েতে আপনি বাধা দিতে পারবেন না, আর সেই সঙ্গে তিনশো রুপোর ডলারও সে আমাকে এনে দেবে—আচ্ছা আমি চললাম।

(প্রস্থান)

[দোকানের পেছন দিক থেকে মিসেস সিন এগিয়ে আসবে।]

মিসেস সিন—কি বিশ্রী ব্যাপার। আরে সারা শহরের লোক এখন জানে যে এই হতভাগা শেনটেকে হাতের মুঠোয় ভরে ফেলেছে।

সুইটা—(কেঁদে উঠে) সব নষ্ট হয়ে গেল—দোকানটা উঠে যাবে। সুনও সত্যিকার প্রেমিক নয়—ও ওর নিজের স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত।

মিসেস সিন—আমার মনে হয় নাপিত সু-ফুকে ডেকে আনি—ওর সঙ্গেই কথা বলুন—আপনার কাজিনের ওই হচ্ছে যোগ্য পাত্র।

[মিসেস সিন চলে যাবে এবং সুফুকে সঙ্গে করে এনে নিজে সরে যাবে।]

সুইটা—আমি খবর পেলাম আমার কাজিন

শেন্‌টেকে আপনার ভাল লাগে—তাই আপনাকে জানাচ্ছি ও বড় বিপদে পড়েছে।

সুফু—তাই নাকি!

সুইটা—কয়েক ঘণ্টা আগে যে ছিল এই দোকানের মালিক এখন তার অবস্থা পথের ভিক্ষুকের থেকে খুব ভাল নয়। মিস্টার সুফু, এই দোকানটা দেনার দায়ে একরকম বিকিয়ে গেছে।

সুফু—মিস্টার সুইটা, আপনার ভগ্নী আমাকে মোহিত করেছেন তাঁর অন্তরের মহত্ত্ব দিয়ে—দোকানের জাঁকজমক থাক বা না থাক, সেটা আমার কাছে অতি তুচ্ছ ব্যাপার। আশেপাশের লোকজনেরা আপনার কাজিনের কি নামকরণ করেছেন জানেন? দি এঞ্জেল অব দি স্লাম্‌স্‌!

সুইটা—এই মহত্ত্বের কি মূল্য দিতে হয়েছে আমার কাজিনকে জানেন? একদিনে দুশো ডলার। প্রত্যেক ব্যাপারেই একটা সীমা-পরিসীমা থাকা দরকার।

সুফু—আমি বলি কি সেই সীমা-পরিসীমার গণ্ডীটা উঠিয়ে দেওয়া যাক। শেন্‌টের স্বভাবটা হচ্ছে সুন্দর, মহৎ, এবং নিষ্পাপ। প্রত্যেক দিন সকালে সে যেখানে চারজনকে ক্ষুধার অন্ন দিয়ে আমাকে মুগ্ধ করে দেয়, সেক্ষেত্রে আমার মনে হয়, যদি এমন বন্দোবস্ত করা যায় যে সে স্বচ্ছন্দে চারশো লোককে খাওয়াতে পারবে তবে কেমন হয়? শুনলাম? গৃহহারা কয়েকজন লোকের থাকবার ব্যবস্থা করবার জন্যে সে মরীয়া হয়ে উঠেছে। ওই তো কিছুটা এগিয়ে গেলেই আমার কয়েকটা বাড়ি খালি পড়ে রয়েছে। শেন্‌টে ইচ্ছে করলেই ওগুলো ব্যবহার করতে পারে। শেন্‌টে সম্বন্ধে আমার মনোভাবের কথা নিশ্চয় আপনার অজানা নেই—আপনার ভগ্নী কি আমার প্রস্তাবে রাজী হবেন?

সুইটা—মিস্টার সুফু আপনার প্রস্তাব নিশ্চয় সে মনোযোগ দিয়ে শুনবে।

[ওয়াং ও পুলিশ অফিসার ঢুকবে। সুফু দোকানে ঢুকে জিনিষপত্র দেখায় মনোযোগ দেবেন।]

ওয়াং—মিস শেন্‌টে এখানে আছেন?

সুইটা—না।

ওয়াং—আমি ভিস্তী ওয়াং। আপনি বোধহয় মিস্টার সুইটা?

সুইটা—ঠিকই ধরেছ। সুপ্রভাত ওয়াং।

ওয়াং—আমি শেন্‌টের বন্ধু।

সুইটা—আমি জানি তোমাদের বন্ধুত্ব অনেক কালের।

ওয়াং—(পুলিশ অফিসারকে) দেখছেন তো? আমি আমার আহত হাতের ব্যাপারটা নিয়ে এসেছি।

পুলিশ—এটা সত্যি কথা যে ওর হাতটা অকেজো হয়ে গেছে।

ওয়াং—নাপতে ব্যাটা যে আমাকে মেরেছিল তার সাক্ষী একমাত্র শেন্‌টে।

পুলিশ—ওয়াং বলেছে যে আপনার কাজিন স্বচক্ষে দেখেছেন যে নাপিত সুফু ওকে সাঁড়াশি দিয়ে বেদম পিটি দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে আপনি কিছু জানেন?

সুইটা—আমি যা জানি তা হচ্ছে, যে সময় এই মারামারিটা হয়, সে সময় আমার কাজিন সেখানে ছিল না।

ওয়াং—কোথাও একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে—শেন্‌টে আসুক — সেই বুঝিয়ে বলবে আমার কথা সত্যি কি না।

সুইটা—মিস্টার ওয়াং, আপনি বলছেন আপনি আমার কাজিনের বন্ধু। আমার কাজিন এখন নানা ধরণের বিপদ-আপদ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত রয়েছেন। নানাভাবে নানা লোকে এসে তাঁকে এতরকম ভাবে exploit করছে যে আর কোনোরকম দুর্বলতা দেখালে এবার তার সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমি মনে করি আপনার কেস-এ মিথ্যা সাক্ষী দেবার জন্য অনুরোধ করে আপনি তার সর্বনাশ করবেন না।

ওয়াং—কিন্তু সেই তো আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যেতে বলেছিল।

সুইটা—কেন, ম্যাজিস্ট্রেট কি আপনার হাতের চিকিৎসা করবেন বলে ঠিক হয়েছিল?

পুলিশ—ম্যাজিস্ট্রেট নাপিত সুফুকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করবেন বলেই বোধহয় ওখানে গিয়েছিল।

[মিঃ সুফু ঘুরে দাঁড়াবেন।]

সুইটা—মিস্টার ওয়াং, বন্ধুদের গোলমালে মাথা গলাতে আমি ভালবাসি না।

[সুইটা এবং সুফু পরস্পরকে বাউ করবে।]

পুলিশ—তার মানে হচ্ছে এখানে আমার আর কোনো কাজ নেই। (ওয়াংকে) দেখতে পাচ্ছি মিছিমিছি এক ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে নালিশ করে তাকে বিপদে ফেলতে চেয়েছিলে। (ওয়াং বিষণ্ণভাবে মাথা নোয়াবে) ভবিষ্যতে এ ধরণের নালিশ করবার আগে একটু ভেবেচিন্তে কাজ কোরো। মিঃ সুফু ইচ্ছা করলে তোমার বিরুদ্ধে ডিফামেশন কেস করতে পারেন জান?

সুইটা—উনি এবারের মতো ওকে ক্ষমা করে দিলেন, কি বলেন মিঃ সুফু?

সুফু—আপনি যখন বলছেন।

পুলিশ—(ওয়াংকে) তুমি সরে পড়ো এখান থেকে। (ওয়াং বেরিয়ে যাবে) আপনি কিছু মনে করবেন না মিঃ সুফু।

সুফু—আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে।

[পুলিশ অফিসার বেরিয়ে যাবে।]

সুইটা—বুঝলেন মিঃ সুফু, আপনার সঙ্গে যেসব কথা হ'ল, আমার কাজিনকে গিয়ে বলছি। এই দোকানটা সম্বন্ধে সে বড়ই চিন্তিত। এটাকে সে দেবতাদের থেকে পাওয়া উপহার বলে মনে করে। আপনি

শ্রীরামচরিত-মানস

ভক্তকবি তুলসীদাস

অধ্যাপক শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গানুবাদ

শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা-গানে ভারতবর্ষের বহু গুণী ও জ্ঞানীজন লেখনী ধারণ করিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। সেই সকল অমর লেখনীর প্রতিভা-নির্ঝরে ভারতবর্ষের মহাকাব্য পৃথিবীর সাহিত্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ভক্তকবি গোস্বামী তুলসীদাস তন্মধ্যে অন্যতম—যিনি সহজ সরল ভাষায় পতিতপাবন সীতা-রামের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন সুমধুর সঙ্গীতের মাধ্যমে। তুলসীদাসের জীবনসর্বস্ব মহামানব শ্রীরামচন্দ্রের সেই বন্দনা-গানের সুললিত বাংলা অনুবাদ এই প্রথম—বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের অপূর্ব কীর্তির নূতন এক পরিচয় এই শ্রীরামচরিত-মানস। বহু রঙীন চিত্রে সুশোভিত।

মূল্য—১ম খণ্ড দুই টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

দু-চার মিনিট অপেক্ষা করুন, আমি ভেতর থেকে আসছি।

(ভেতরে চলে যাবে।)

মিসেস সিন—(ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে) আপনাকে অভিনন্দন জানাতে পারি?

সুফু—তা পারেন। মিসেস সিন, শেনটের পোষ্যদের আজ রাত্রের আগেই খবর দেবেন—আমার ওই দিককার বাড়ি-গুলোতে আমি ওদের থাকবার ব্যবস্থা করবো।

মিসেস সিন—(হাসতে হাসতে মাথা নেড়ে) আপনি যেমনটা চেয়েছিলেন, সেই-ভাবেই সব হয়েছে তো?

সুফু—আচ্ছা মিসেস সিন, ইয়াং সুন সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?

মিসেস সিন—ও একটা কুঁড়ে, নোংরা—

সুফু—যেতে দিন, ওকি আবার একটা মানুষ, ওর কথা আমি ধরিই না।

[সুনের প্রবেশ।]

সুন—এখানে কি সব ব্যাপার হচ্ছে?

মিসেস সিন—মিস্টার সুফু, আপনি যদি বলেন তো মিস্টার সুইটাকে ডেকে আনি। অপরিচিত লোকেরা এসে দোকানের আশেপাশে ঘুর ঘুর করবে, এসব মিস্টার সুইটা পছন্দ করেন না।

সুফু—মিস শেনটে মিস্টার সুইটার সঙ্গে বসে কি নিয়ে পরামর্শ করছেন—এখন ওখানে না যাওয়াই ভাল।

সুন—শেনটে ভেতরে আছে? কিসের পরামর্শ হচ্ছে? আমাকে বাদ দিয়ে শেনটে আবার কি আলোচনা করতে বসেছে!

[ভেতরে যেতে চেষ্টা করবে—সুফু বাধা দেবে।]

সুফু—একটু ধৈর্য ধরতে হবে মশায়। আপনি কে আমি বুঝতে পেরেছি। আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি মিস শেনটে এবং আমার বিয়ের কথা-বার্তা একরকম পাকাপাকি হয়ে গেছে।

সুন—কি বললেন?

মিসেস সিন—এ-কথা শুনে খুবই অবাক লাগছে বুঝি?

[শেনটে এসে ঢুকবে।]

সুফু—আচ্ছা, শেনটের মুখ থেকেই শুনুন।

সুন—ব্যাপার কি শেনটে? এরা কি বলছে জান? তুমি নাকি এই লোকটাকে বিয়ে করতে যাচ্ছ? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি?

শেনটে—সুন, আমার কাজিন এবং মিস্টার সুফু কথাবার্তা বলে এই ঠিক করেছেন। মিস্টার সুফু বলেছেন আমাদের বিয়ের পর আমার সমস্ত আশ্রিতদের তিনি সাহায্য করবেন। আমার কাজিন তোমার সঙ্গে আমাকে মিশতে পর্যন্ত বারণ করে দিয়েছেন।

সুন—তুমি তার কথায় রাজী হয়েছ?

শেনটে—হ্যাঁ, রাজী হয়েছি।

[একটু থেমে সুন ফের বলবে।]

সুন—ওরা বোধ হয় বলেছে আমি বদ চরিত্রের লোক?

[শেনটে চুপ করে থাকবে।]

সুন—হয়তো কথাটা সত্যি। আর সেই জন্যেই তো আমার তোমাকে দরকার। আমি একটা খুব আদর্শ চরিত্রের লোক নই। আমার না আছে টাকা পয়সা, না আছে ভদ্রতাবোধ। কিন্তু I can put up a fight. ওরা তোমার সর্বনাশ করতে চাইছে শেনটে। (এগিয়ে ওর কাছে গিয়ে) ওই লোকটার দিকে একবার নজর করে দেখো। ও কি তোমার স্বামী হবার যোগ্য। আমি মানছি ওর টাকা আছে—কিন্তু টাকাটাই কি সব? আমি না থাকলে তুমি ওকেই নিশ্চয় বিয়ে করতে?

শেনটে—তা করতাম।

সুন—যাকে ভালবাস না তাকেই বিয়ে করতে?

শেনটে—হ্যাঁ, করতাম।

সুন—তোমার আমার প্রথম আলাপের দিনটা কি ভুলে গেলে? আমি মরতে চাইছিলাম—তুমি বাধা দিলে?

শেনটে—(কাঁপতে কাঁপতে) তুমি কি চাও?

সুন—আমার সঙ্গে চলে এস।

শেনটে—মিস্টার সুফু, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি সুনের সঙ্গে চলে যাচ্ছি।

সুন—আমরা পরস্পরকে ভালবাসি। চল শেনটে।

সুফু—কিন্ত এ তো ভুলিয়ে সরল শেনটেকে নিয়ে আপনি পালিয়ে যাচ্ছেন। (চিৎকার করে) মিস্টার সুইটা!

সুন—ওকে চিৎকার করতে বারণ করো।

শেনটে—দয়া করে আমার কাজিনকে ডাক-বেন না। এ বিষয়ে ও'র মতের সঙ্গে আমার মত মিলছে না—আর এখন আমি বুঝতে পারছি যে, আমার মতটাই ঠিক (দর্শকদের প্রতি)।

I would go with the man
whom I love.
I would not reckon
what it costs me.
I would not consider
what is wiser.
I would not know
whether he loves me.
I would go with the man
whom I love.

[সুন এগিয়ে গিয়ে ওর হাত নিজের হাতে নিয়ে দুজনে ধীরে ধীরে চলে যাবে।]

যবনিকা।

মন্তব্যঃ গুড্ ওম্যান অব সেজুয়ানের অনুবাদ আমি করছি না—আমাদের দেশে বাংলা ভাষার মাধ্যমে যাতে নাটকটি মঞ্চস্থ হতে পারে সেই অনুসারে নাটকটির ভাবানুবাদ দেওয়া হচ্ছে। এই ভাবানু-বাদটি দু' একমাসের মধ্যেই দক্ষিণ কল-কাতার সন্ধ্যানীড় সংস্থা আমারই পরি-চালনায় মঞ্চস্থ করবেন বলে ঠিকও হয়েছে। ষষ্ঠ দৃশ্যটি খুব সংক্ষিপ্ত আকারে মূল নাটকের রুলিং আইডিয়াকে পাঠক-দের সামনে তুলে ধরেছে। ওয়াং-এর সঙ্গে দেবতাদের কথাবার্তায় খুব সুক্ষ্মভাবে যেন 'বুক অব যোবের' প্রতিই শ্লেষ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ দৃশ্য

[অন্ধকার স্টেজ। বাঁদিকে স্টেজের শেষ প্রান্তে শেনটে দাঁড়িয়ে আছে। ডান দিকের প্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুন ও তার মা মিসেস ইয়াং। প্রথমটায় আলোর ফোকাস এসে পড়বে শেনটের ওপর এবং সে কথা বলতে শুরু করবে।]

শেনটে—একটা ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হল। মাত্র বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়েছি—সারা মনটা আশা এবং আনন্দে ভরে উঠেছে— হঠাৎ নজরে পড়ল সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে সেই বৃদ্ধা কার্পেটওয়ালী। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে আমাকে বললে তার স্বামী আমাকে টাকাটা ধার দেবার পর থেকেই দুশ্চিন্তা এবং উত্তেজনায় অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বৃদ্ধা তাই টাকাটা ফিরিয়ে দেবার জন্যে আমাকে অনু-রোধ করতে এসেছিল। আমি অবশ্য তখনই তাকে টাকাটা ফিরিয়ে দেব বলে আশ্বস্ত করলাম—সে আমাকে আশীর্বাদ করে চলে গেল। সুনকে গিয়ে বলতে বাধ্য হলাম—[আলোর ফোকাস ঘুরে গিয়ে সুন এবং তার মা মিসেস ইয়াং-এর ওপর পড়বে।]

সুন—খুবই খারাপ খবর মা। এই একটু আগে শেনটে এসে বললে তার পক্ষে দোকানটা বিক্রি করা সম্ভব হবে না। যে দু'শো টাকা ঋণ করে সে তোমার হাতে আমাকে পাঠিয়েছিল তার পাওনাদারেরা সেই টাকার জন্যে তাগাদা দিচ্ছে।

মিসেস—তুমি তাকে কি উত্তর দিলে? এরপর আর ওকে বিয়ে করতে পারবে না জানিয়ে দিয়েছ তো? ওর ভাইটা তো চায় সেই নাপতে বেটার সঙ্গে ওর বিয়ে দিতে।

সুন—নাপতে বেটা জানে মেয়েটা আমাকে ভালবাসে। সুতরাং সে আর ঘেঁষবে না। ওর দিক থেকে আমার আর ভয় নেই। আমি দু'শো ডলার ফেরৎ না দিলে ওর পক্ষে ওই দোকান চালানো অসম্ভব। পাওনাদারেরা এসে দোকান আগলে বসবে। কিন্তু এ-দিকে যদি আমি এখনি আরও তিন-শো ডলার না পাই তাহলে আমার চাকরির দফাও রফা।

(আলো নিবে যাবে।)

[আলো জ্বললে দেখা যাবে রাস্তার ধারে ওয়াং শুয়ে ঘুমোচ্ছে—মিউজিক চলতে থাকবে। দেবতাদের আবির্ভাব হবে—ওয়াং উঠে বসবে, এঁদের দেখবে হাত দিয়ে চোখ কচলে আরও ভালভাবে দেখবে— তারপর বলতে শুরু করবে—]

ওয়াং—প্রভুরা এসেছেন ভালই হল।

২য়—দেবতা—আমাদের দেখে তুমি এত অভিভূত হয়ে পড়লে কেন?

ওয়াং—প্রভু, শেন্‌টের জন্যে। আপনাদের নির্দেশ আছে প্রতিবেশীদের ভাল-বাসতে হবে। সেই নির্দেশ মানতে গিয়ে শেন্‌টে তার প্রেমাস্পদকে হারাল। আমার মনে হয় তার মত মহৎ নারীর থাকবার জন্যে এ পৃথিবীটা তৈরি করা হয় নি।

১ম দেবতা—কেন আজে-বাজে কথা বলছ। সৃষ্টি-রহস্য বোঝবার মত বুদ্ধি তোমার মাথায় নেই। কুসংস্কার এবং দ্বিধায় তোমার মগজটা একেবারে ঠাসা হয়ে আছে।

ওয়াং—আপনারা যা বলবেন আমাকে মাথা পেতে স্বীকার করে নিতে হবে প্রভু। বিপদে পড়ে শেন্‌টে সরে পড়ে তার কাজিনকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে কাজিন সুইটার পক্ষেও আর শেন্‌টের ব্যবসার গোলমাল সামলে দেওয়া সম্ভব হবে না। দোকানটাতে লালবাতি জ্বলল বলে।

৩য় দেবতা—তোমার কি মনে হয় আমাদের তাকে সাহায্য করা উচিত।

১ম দেবতা—আমার মত হচ্ছে তার নিজেরই নিজেকে সাহায্য করতে হবে।

২য়—বিপদ যত বাড়বে, সত্যিকার মহৎ মানুষ সেই অনুপাতেই নিজের শক্তির পরিচয় দেবার সুযোগ পাবে। আঘাত এবং পীড়ন মহৎ মানুষকে মহত্তর করে তোলে।

ম দেবতা—আমাদের সমস্ত আশার চরি-তার্থতা এখন নির্ভর করছে শেন্‌টের ওপর।

—যে অন্বেষণের কাজে আমরা বেরিয়ে-ছিলাম, তা বিশেষ কার্যকরী হচ্ছে না। এখানে ওখানে যাই—মনে হয় ভাল লোক দেখতে পেলাম—কিছু পরেই বুঝি আমাদের ভুল হয়েছে।

ওয়াং—একটা অনুরোধ করছি। আপনারা যদি অন্তত—

দেবতারা—না, না, কোন অনুরোধ আমরা রাখতে পারব না। আমরা শুধুমাত্র পর্যবেক্ষক। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস সত্যিকার মহৎ ব্যক্তি নিজের শক্তির ওপর নির্ভর করেই নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখে। যত বাধা-বিপত্তি আসে ততই সে আরও শক্ত, আরও ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে। আরও কিছু-দিন ধৈর্য ধরে দেখ বৎস—বুঝতে পারবে সব ভাল যার শেষ ভাল।

(দেবতাদের কথা বলার শেষ দিকটায় আলো নিভে যাবে।)

যবনিকা।

সাধনা দশন নিয়মিত ব্যবহার করিলে কোন দন্তরোগের ভয় থাকে না। দন্তরাজী সুস্থ, সবল ও সুন্দর হয়।

দেশীয় গাছগাছড়া হইতে ইহা প্রস্তুত হয়।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর, কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ, সি, এস (লণ্ডন), এম, সি, এস (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতাকেন্দ্র-ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম, বি, বি, এস (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য্য

রঙ্গজগৎ

বাংলা ছবির দুঃসময়

১৯৬৮ সালের সুরুতেই বাংলা চলচ্চিত্রের জন্য দুঃসময় সূচনা করছে। শোনা যাচ্ছে কলকাতার আরো তিনটি সিনেমায় হিন্দী ছবি মুক্তির কথাবার্তা চলছে। এই তিনটি সিনেমায় এতকাল কেবলমাত্র বাংলা ছবি মুক্তিলাভ করত। বাংলা ছবির রিলিজ চেন হিসাবে এই তিনটি সিনেমা নির্দিষ্ট ছিল। এই তিনটি সিনেমার মালিক বাঙালী, এবং তাঁরা এতকাল বাংলা ছবির পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছিলেন। অবাঙালী ব্যবসায়ীর কাছে হিন্দী ছবি মুক্তির জন্য এই তিনটি সিনেমা লীজ দেওয়ার পেছনে কি কারণ আছে আমরা জানি না। এমন নয়, যে এই তিনটি সিনেমার ব্যবসায় খারাপ ছিল। শ্রমিক-মালিক বিরোধ ঘটিত কোন কারণও এখানে ঘটে নি। বরঞ্চ শ্রমিকদের সঙ্গে সম্পর্ক এ'দের ভালই চলছিল, এবং শহরের প্রথম শ্রেণীর সিনেমা হিসাবে এ'দের আয়ের অঙ্ক সন্তোষজনক বলেই আমরা জানি। তবে কি কারণে এই বাঙালী সিনেমা মালিকরা তাঁদের সিনেমা অবাঙালীর কাছে লীজ দিচ্ছেন। যতদূর শোনা যাচ্ছে মোটা টাকা সেলামীর বিনিময়ে এই মালিকরা বাংলা রিলিজ চেন এই তিনটি সিনেমাকে হিন্দী রিলিজ চেনের জন্য ছেড়ে দিচ্ছেন। এতে ব্যক্তিগতভাবে হয়ত এ'রা লাভবান হতে পারেন কিন্তু বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প এবং বাঙালী জাতির কথা বিবেচনা করলে ভয়ানক ক্ষতির কথা। এই ক্ষতির ক্ষত থেকে এই সিনেমা মালিকরাও ভবিষ্যতে রক্ষা পাবেন না। আজ হয়ত কাঁচা টাকা হাতে পেয়ে এ'রা নিজেদের লাভবান মনে করছেন; কিন্তু একদিন বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প ধ্বংস হয়ে গেলে শিল্প ও জাতির স্বার্থের দিক থেকে যে ক্ষতি হবে তা থেকে তাঁরাও রক্ষা পাবেন না।

দেশ বিভাগের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে যেমন বহু সিনেমা নির্মিত হয়েছে, তেমন ধীরে ধীরে বাঙালীর সিনেমা ব্যবসায় অবাঙালীরা গ্রাস করেছে। সারা পশ্চিমবঙ্গব্যাপী এখন হিন্দী ছবির আধিপত্য। বাংলা ছবির রিলিজ চেন কমতে কমতে আটটায় এসে ঠেকেছিল। সেই আটটার মধ্যে এবার তিনটিতে যদি হিন্দী ছবি মুক্তিলাভ করে, তাহলে বাংলা ছবির মুক্তির জন্য রইল মাত্র পাঁচটি সিনেমা। এই পাঁচটিতে আর কয়টি বাংলা ছবি মুক্তিলাভ করবে? তার ফলে বহু ছবি নির্মিত হয়েও মুক্তিলাভ করতে পারবে না। এভাবে ঠেকে যাওয়ার জন্য যেসব প্রযোজক ধার-দেনা করে ছবি করেন তাঁরা সর্বস্বান্ত হবেন। ছবির মুক্তির দিন পিছানো মানে ওঁদের ধারকরা টাকার সুদের অঙ্ক বাড়া, এবং মূলধন উঠে আসতে দেরি হলে চলচ্চিত্র শিল্পে সেই টাকা বিনিয়োগ করার কথা তাঁরা ভাবতেই পারবেন না। এভাবে বাধা পেয়ে বাংলা ছবির প্রযোজনাক্ষেত্রে যে অসুবিধা দেখা দিচ্ছে সে কারণে বছরে বছরে বাংলা ছবির সংখ্যা কমে আসছে। এই তিনটি সিনেমাও যদি বাংলা ছবির পৃষ্ঠপোষকতা না করে তবে এ বছরে ২০।২৫টার বেশি বাংলা ছবি মুক্তি পাবে না। ক্রমে মারাঠি ছবির মত বাংলা ছবি বছরে দশ-বারটায় গিয়ে ঠেকবে। তার পরিণতিতে বাঙালীর চলচ্চিত্র ব্যবসায় থেকে হাত গোটাবে, এবং বাংলার চলচ্চিত্র টেকনিশিয়ান ও শিল্পীরা বেকার হবেন।

বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের স্বার্থে এই তিনটি সিনেমাকে বাংলা ছবির রিলির্জ চেন হিসেবে রাখার জন্য চেষ্টা করা উচিত। এ কেবল চলচ্চিত্র শিল্প সংশ্লিষ্টদের বিষয় নয়, রাজ্য সরকারকেও এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হবে। কোন সিনেমার কে মালিক হল সেটা বড় কথা নয়, প্রধান কথা হল বাংলা ছবির রিলিজ চেন বাড়াতে হবে এবং প্রত্যেক সিনেমায় একটা নির্দিষ্টকাল বাংলা ছবি প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করতে হবে। —সুজন।

'হঠাৎ দেখা' ছবিতে শিবানীর ভূমিকায় সন্ধ্যা রায়।

চিত্র-আলোচনা

হঠাৎ দেখা

(পরিচালক ঃ নিত্যানন্দ দত্ত)

সত্যজিৎ রায়ের সহকারী নিত্যানন্দ দত্তের প্রথম ছবি 'বাক্সবদল' দেখে পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র-দর্শকরা খুশি হয়েছিল। তাঁর প্রথম হাসির ছবিতে বুদ্ধির দীপ্তি ও আঙ্গিক সৃষ্টিতে অভিনবত্ব ছিল। আশা করা গেছল বাংলা হাসির ছবি গতানুগতিক স্থূলতার পথ পরিহার করে নতুন পথে অগ্রসর হবে। তাই বিশেষ প্রত্যাশা নিয়ে তাঁর দ্বিতীয় ছবি 'হঠাৎ দেখা' দেখতে গিয়েছিলাম। কিন্তু চরম হতাশ হয়েছি। নিত্যানন্দ দত্তের প্রথম ছবির সঙ্গে এই ছবির কোনদিক থেকেই সংগতি নেই। সুবুদ্ধি ও সুরুচি এখানে হিন্দী ছবির স্থূলতার চোরাগলিতে আটকে পড়েছে। বিশ্বাস করা কঠিন যে 'বাক্স-

বদল' আর 'হঠাৎ দেখা'র পরিচালক একই ব্যক্তি।

এই ছবির নায়ক এক বড়লোকের দায়িত্ববোধহীন লঘুবুদ্ধির ছেলে। বাপের টাকায় মোটর চড়া, আর মেয়েদের পেছনে ধাওয়া করা তার একমাত্র কাজ। অভ্যাস মত সে শিবানীর সঙ্গে অপমানজনক ব্যবহার করতে গিয়ে প্রথমে তিরস্কৃত হয়, তার পরে চপেটাঘাত খায়। সিনেমার ছক অনুযায়ী চপেটাঘাতের পরের পর্যায় উভয়ের প্রেম। এখানে নায়ক গৌতম শিবানীর বাড়িতে গিয়ে জানায় সে অনুতপ্ত। আর একদিকে নিজের সম্পর্কিত বোন পিয়ালীকে দিয়ে দেখা সাক্ষাতের যোগাযোগ করে। নানা মিথ্যার জালবুনে সে শিবানীর মন জয় করে। এই মিথ্যার মধ্যে একটি প্রধান কথা ছিল, শিবানীকে বিয়ে করার ব্যাপারে গৌতমের বাবার মত আছে। এই মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এক অভিনেতাকে সে তার বাবা সাজিয়ে উপস্থিত করে। কিন্তু একদিন শিবানীর বাড়িতে এবং গৌতমের বাবার কাছে সব ফাঁস হয়ে যায়। তখন দু-পক্ষের অভিভাবক এক সঙ্গে যুক্তি করে কি করে তাদের জব্দ করেছিল—সেই দৃশ্যে ছবির শেষ।

এক অসার কাহিনী এবং সেই কাহিনীর বিকৃত বুদ্ধি নায়ক এবং তার কাজ কর্ম ইত্যাদি ছবির দ্বিতীয়ার্ধে যথেষ্ট হাসি জুগিয়েছে, এই হাসি হিন্দী ছবির স্থূল গতিপথে যত সহজ মনে হতে পারত বাংলা ছবিতে তেমন মনে করা যায় না। নায়কের ধনী অভিজাত বাবা কেবল স্নেহবশত গরীব স্কুল মাস্টারের মেয়েকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করল, ছবির জগতের এসব ইলিউশনের আশ্রয় দায়িত্বশীল পরিচালকরা না নিলেই ভাল করবেন। হলিউড ছবির ধরণে মেয়েদের পেছনে তাড়া করা ছেলেকে নায়ক রূপে উপস্থিত করে দর্শকদের সমর্থন সৃষ্টি করাতে হাসির কথা থাকতে পারে, সে হাসি পরবর্তীকালে বড় বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।

এই ছবিতে অভিনয় করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, অনুপকুমার, সুমিতা সান্যাল, পাহাড়ী সান্যাল, প্রসাদ মুখার্জী, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতালী রায়, রেণুকা রায় প্রমুখ। ছবির সঙ্গীত যোজনা করেছেন শ্যামল মিত্র। আলোকচিত্র ও সম্পাদনার কাজ ভালভাবে করেছেন যথাক্রমে শৈলজা চট্টোপাধ্যায় ও দুলাল দত্ত। শব্দ ধারণের কাজ ত্রুটিপূর্ণ।

পোলিশ চলচ্চিত্র উৎসব

সম্প্রতি 'সিনে সেন্ট্রাল, কলকাতা'র উদ্যোগে পোলিশ চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গত ২৭শে জানুয়ারী অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই উৎসবের উদ্বোধন করেন পোলিশ কনসালেটের প্রতিনিধি মিঃ জে ন্যালেওয়াজ্‌কো। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ, প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীঋত্বিক ঘটক। পাঁচদিন ধরে অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস প্রেক্ষাগৃহে ও কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। চারটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ছবি—রোমান পোলানস্কি পরিচালিত 'নাইফ ইন দি ওয়াটার', জ্যান রিবকাওস্কি পরিচালিত 'টু নাইট এ সিটি ডাইজ', ম্যারিয়া কানিওস্কা পরিচালিত 'মাচ অ্যাডো অ্যাবাউট লিট্‌ল বারবারা' ও জারজি স্কালিমাওস্কি পরিচালিত 'আইডেন্টিফিকেশন মার্কস নান' এই উৎসবে প্রদর্শিত হয়। শেষোক্ত ছবি দুটির প্রদর্শন কলকাতায় প্রথম।

'তিন অধ্যায়' ছবির একটি ভূমিকায় নবাগতা বিদিশা চৌধুরী।

'জো' ব্যঙ্গাত্মক চেকোস্লোভাক ছবির একটি দৃশ্য

নাটকের কথা

প্রাচীতীর্থের নতুন মৌলিক নাটক

আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় অন্ধ্র হলে অসিত গুপ্ত রচিত "নরকের অধীশ্বর" নাটকটি প্রাচীতীর্থ কর্তৃক অভিনীত হবে। পরিচালনা ও সঙ্গীতে অমল কর ও মুকুলেশ চট্টোপাধ্যায়। মঞ্চ ও আলোয় তাপস সেন।

সংবাদ বিচিত্রা

চেক চলচ্চিত্র উৎসব

সিনেক্লাব অব ক্যালকাটা এবং চেকোস্লোভাক দূতাবাসের যুক্ত উদ্যোগে

দ্বিতীয় চেক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১০ই হতে ১৬ই ফেব্রুয়ারী। এই উৎসবে সাতটি পূর্ণাঙ্গ ও কয়েকটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি দেখান হবে। পূর্ণাঙ্গ ছবিগুলির মধ্যে থাকবে ঃ ১। এ ব্লন্ডস লাভ ২। এ জেস্টার্স টেল ৩। লেমোনেড জো ৪। ভার্টিগো ৫। ইফ এ থাউজেন্ডস ক্লারিও-নেটস ৬। ক্রাইমস এ গার্লস স্কুল ৭। সেন্ট এলিজাবেথস স্কোয়ার।

একটি বিস্ময়কর জার্মান চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্র সম্বন্ধে প্রতি দেশেই নানা পরীক্ষানিরীক্ষা চলেছে। পশ্চিম জার্মানীতেও চলেছে। সম্প্রতি ভিয়েনা চলচ্চিত্র উৎসবে "ফেয়ারওয়েল টু ইয়েস্টার-ডে" নামে জার্মান ছবিটি আন্তর্জাতিক জুরিদের বিচারে মোট আটটি পুরস্কার পেয়েছে। ছবিটির পরিচালক হলেন আলেকজান্ডার ক্লুগে এবং ছবিতে অভিনয় করেছেন তাঁরই ভগ্নী আলেকজান্ড্রা ক্লুগে যিনি ইতিপূর্বে অন্য কোন ছবিতে অভিনয় করেন নি এবং পেশায় পশ্চিম বার্লিনের কোন হাসপাতালের একজন ডাক্তার। পরিচালক আলেকজান্ডার নিজেই এই ছবির স্ক্রিপ্ট লিখেছেন; আদালতের নথিপত্রের ওপর ভিত্তি করে ছবির কাহিনী রচিত। অনিতা নামে একটি মেয়ে সমাজের নীতি ও আইন উপেক্ষা করে ছুটে চলেছিল এবং যাদের কাছে সে আশ্রয় চেয়েছে, উপদেশ চেয়েছে তারা কেউ

'এ ব্লন্ডস লাভ' চেকোস্লোভাক ছবির নায়িকা হানা ব্রেচোভা

পশ্চিম জার্মান ছবি 'ফেয়ারওয়েল টু ইয়েস্টারডে'-র নায়িকার ভূমিকায় আলেকজান্ড্রা ক্লুগে

'আফসানা' চিত্রের একটি দৃশ্যে—প্রদীপকুমার ও পদ্মিনী

তাকে সৎপথে ফিরিয়ে আনার কষ্ট স্বীকার করে নি। অনিতা নিশ্চয়ই দোষী কিন্তু অন্যরা যারা তাকে বিপথে নিয়ে গেছে তারাও সমান দোষী, তাদেরও কঠিন শাস্তি দেওয়া দরকার।

পরিচালক অন্য কাউকে না পেয়ে শেষে নিজের ভগ্নীকে দিয়েই অনিতার চরিত্র অভিনয় করান কিন্তু ভগ্নী আলেকজান্ড্রা যেভাবে অনিতার চরিত্র জীবন্তভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা এক কথায় অবিস্মরণীয়। অনিতার ভূমিকায় শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের জন্য তিনি "গোল্ডেন রোজ" বা স্বর্ণ গোলাপ পুরস্কার পেয়েছেন।

সঙ্গীতকথা

নজরুল-সন্ধ্যা

পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমির উদ্যোগে আয়োজিত নজরুল-সন্ধ্যার তৃতীয় অধিবেশন গত ৩১শে জানুয়ারী বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের গৃহে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবারের অনুষ্ঠানে একমাত্র গায়িকা ছিলেন শ্রীমতী পূরবী দত্ত। তিনি মধুময় কণ্ঠে কবিকে প্রথম গান শোনালেন—'কে তুমি দূরের সাথী'। বাকশক্তিহারা কবি, কিন্তু গানের সময় কি অভিব্যক্তি, ইচ্ছা। তারপরে শ্রীমতী দত্ত গাইলেন—'পথ হারা পাখী কেঁদে ফেরে একা', 'কেন দিলে এ কাঁটা যদিগো কুসুম দিলে', 'রুম ঝুম রুম ঝুম', 'ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি'। তিনি শেষ গান গাইলেন—'মোর না মিটিতে আশা ভাঙিল খেলা'। গানে গানে প্রত্যেক শ্রোতার মন বেদনায় ভরে উঠেছে, কবিও শুনে চলেছেন। তাঁর চোখে সেদিন কি যেন বিস্ময়। শ্রীমতী পূরবী দত্তের সঙ্গে তবলা সংগত করেন শ্রীগোপাল পোড়েল।

অনুষ্ঠানে কবি সিদ্ধেশ্বর সেন কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য সম্পর্কে সোভিয়েত রাশিয়ার জনৈক সমালোচকের আলোচনা পাঠ করেন। মূল রুশ ভাষা থেকেই এই আলোচনা অনূদিত। এই আলোচনায় কাজী নজরুল ইসলামকে রুশ কবি মায়াকভস্কি প্রমুখের সংগে তুলনা করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানান্তে নজরুল একাডেমির কোষাধ্যক্ষ বিচারপতি শ্রী এস এ মাসুদ সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। কবির জ্যেষ্ঠপুত্র কাজী সব্যসাচী ও পুত্রবধূ শ্রীমতী উমা কাজী সমাগতদের অভ্যর্থনা জানান।

পদ্মভূষণ আলি আকবর খান

পাঠক মন

গত ৬ই পৌষের ('৭০) সাপ্তাহিক বসুমতীতে 'আমি যাঁদের দেখেছি' বিভাগে জ্যোতির্ময়ী দেবীকে 'দেখা' পড়ে আমিও শ্রীযুক্ত নীরদ চৌধুরী মশায়ের মত অভিভূত হয়েছি। তার সঙ্গে খুব অপ্রতিভ ও সঙ্কোচ বোধ করেছি। কিন্তু নীরদ চৌধুরী মশাই গুণী ও বিখ্যাতদের শ্রেণীতে পড়েন।

আমরা মেয়েরা যে ও শ্রেণীদের ওই মহত্তম ও বৃহত্তম এবং বিখ্যাত ও প্রখ্যাতদের সারিতে দাঁড়াবার মত নই, তা' আমি খু বিশেষভাবেই জানি এবং স্বীকার করি।

তবু কি করে যে শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী মহাশয়ের এই বিভাগে এসে পড়লাম সেটা আমারো হতবুদ্ধি হওয়ার বিষয়।

পরিমলবাবু আমার প্রায় অচেনা এবং অজানা মানুষ। বার দুই মাত্র তাঁকে দেখেছি। ওই চেনাও হয় স্বর্গীয় গ্রন্থের লেখক বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের লেখা সম্বন্ধে কিছু তাঁকে লিখে পাঠানোর জন্য।

এবং ঘটনাক্রমে আমার বয়সও ৭০ তিনি জানতে পারেন। এই সত্য ভাষণের পুরস্কারস্বরূপই বোধহয় আমাকে ওই বিরাট ও বিখ্যাত মানুষের সারিতে দাঁড়াতে হয়েছে।

আমার নিজের বিশ্বাস এ পর্যন্ত পৃথিবীতে 'বিরাট নারী' কেউ জন্মান নি। বিশেষ আছেন মাত্র কয়েকজন। মৈত্রেয়ী (উপনিষদ) মীরাবাঈ, আঙ্কল টমস্ কেবিনের লেখিকা মিসেস হ্যারিয়েট বীচার স্টো, ম্যাডাম কুরী এবং নিবেদিতা।

তাই একটু কৌতুক ও অপ্রস্তুত বোধ করছি।

কিছু লিখেছি সামান্য। তাও প্রবাসী ও ভারতবর্ষ পত্রিকার পাঠিকারাই পড়ে থাকবেন। (পাঠক নয়)।

তবে আশা করছি যদি কখনো আমার চেনা ও অচেনা মানুষদের কথা লিখতে পারি, তখন শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী মশাইয়ের এই সশ্রদ্ধ ও সহৃদয় বিরাট, বিখ্যাত ও সাধারণ মানুষ আমার মত মানুষকে দেখার কথা বলব।

তবে পরিমলবাবু যে মুড়ি আর মিছরীকে এক করে দেখেছেন তাতে সন্দেহ নেই। মুড়ির খুব উপযোগিতা আছে মানি তবু সে মুড়ি ছাড়া আর কিছু নয়।

জ্যোতির্ময়ী দেবী
২জি, কার্তিক বোস লেন,
কলিকাতা-৬

* * *

শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্তের "একটি আদর্শ দাও" শীর্ষক প্রবন্ধটি অবশ্যই সময়োচিত। এ বিষয় বিশেষভাবে আলোচনার প্রয়োজন আছে।

আদর্শের কি সত্যই অভাব? আদর্শ বা উদ্দেশ্য ছাড়া চিন্তাশক্তিবিশিষ্ট জীব মানুষ কী বাঁচে? কিছু না কিছু আদর্শ সকলেরই আছে, তবে সে আদর্শ হয়তো কল্যাণের পথ নয়—হয়তো ক্ষতি করে; ধ্বংসের মুখে নিয়ে যায়। সম্ভবত পান্নালালবাবু সেইরূপ কল্যাণকর আদর্শেরই অভাব বলতে চেয়েছেন। এখন প্রশ্ন সেইরূপ কল্যাণকর আদর্শ কি হতে পারে, যে আদর্শ সামনে রেখে ছাত্র ও তরুণের দল এগিয়ে যাবে?

জীবনাদর্শ সম্বন্ধে অনুসন্ধান সভ্যতার আদি থেকেই শুরু হয়েছে এবং সে জিজ্ঞাসা আজো তেমনি আছে। দর্শনের ইতিহাস এই জীবনজিজ্ঞাসারই উত্তর-প্রচেষ্টা। মানুষের চিন্তাশক্তির, জ্ঞান-বুদ্ধির পরিধি যত বেড়েছে দর্শনের বিকাশও তেমনি ঘটেছে; অর্থাৎ আজকের মানুষের জীবনজিজ্ঞাসা কি? কী তার আদর্শ? এটাই ত' প্রশ্ন।

একদিন ধারণা ছিল ইহলোক দুঃখময়, সুখশান্তি আছে পরলোকে। অতএব পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য ইহলোক ছেড়ে পরলোকেই মুক্তিলাভ সম্ভব; কিংবা ইহলোকের সকল কামনা-বাসনা ত্যাগ করে সর্বইন্দ্রিয়-দ্বার রুদ্ধ করে যোগাসনে অতীন্দ্রিয়লোকে মনকে প্রেরণ করে সমাধিলাভের বা নির্বাণলাভের মধ্যেই সকল কল্যাণ ও সুখশান্তি নিহিত আছে। সুতরাং পারলৌকিক জগতে সর্বদুঃখমুক্তির প্রচেষ্টাই পরমপুরুষার্থ, চরম আদর্শ।

দর্শন-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এই জীবনবিমুখ আদর্শের পরিবর্তে জীবন-মুখী আদর্শের উদ্ভব ঘটে। এই জীবন-মুখী দার্শনিকরা বলেন,

> বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়—
> অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময় লভিব
> মুক্তির স্বাদ।"

সব গণ্ডগোল বেধেছে এই জীবনমুখী দর্শনের তাৎপর্যের সম্যক উপলব্ধির অভাব থেকে। ভোগবাদ যদি নীতিতত্ত্বের (Ethics) সঙ্গে সমন্বয়সাধন করতে না পারে, তাহলে উলঙ্গ ভোগবাদে ব্যক্তির তথা সমাজের মঙ্গল হয় না। এর দ্বারা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কাড়াকাড়ির প্রতিযোগিতা শুরু হয়, প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্বন্ধ মধুর হয় না। শেষ হিসাবে উৎসন্ন হয় সমাজ-সংসার-পৃথিবী। ফলে সমাজ ধ্বংস হয় অর্থাৎ ব্যক্তিসমূহও ধ্বংস হয়। আজকালকার সমাজদর্শনের (রাজনীতি ও অর্থনীতি) সঙ্গে এই নীতিতত্ত্বের সামঞ্জস্যবিধানের প্রশ্নই সমাজবিজ্ঞানীর কাছে সবচাইতে বড় সমস্যা। এ সমস্যার সমাধান করতে হবে। পান্নালালবাবু একজন সমাজবিজ্ঞানী। তাঁর কাছে আমরা এটা আশা করতে পারি। কিম্বা যদি এ বিষয় নিয়ে একটা Symposium ডাকা হয় তবে কেমন হয়? পান্নালালবাবু কি পুরোধার কাজ করবেন?

অরুণ মণ্ডল
দর্শন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

* * *

সাপ্তাহিক বসুমতীর ৭১ বর্ষ ৩০শ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দত্ত মহাশয়ের বহু উদাহরণ ও উপদেশ সমন্বিত লেখাটি (প্রবন্ধ?) পড়লাম। কিছুদিন আগে দৈনিক বসুমতীতেও ওঁর দু'একটি লেখা দেখেছিলাম এবং তাতে দেখেছিলাম (যতদূর মনে পড়ে) যে উনি একসময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি দায়িত্ব-পূর্ণ পদে বহাল ছিলেন। উক্ত পত্রিকায় তাঁহার লেখায় দেখলাম তিনি বর্তমান ছাত্র-আন্দোলন নিয়ে বহু কিছু ভেবেছেন এবং সব কিছু তালগোল পাকিয়ে অসংলগ্ন-ভাবে অনেক কিছুই বলেছেন। অবশ্য কিছু যে সঠিক কথা না বলেছেন এমন নয়। তবে অধিকাংশ উদাহরণের মধ্যেই দেখলাম যা সাধারণত ঘটে তার যেগুলি ব্যতিক্রম তারই খবর তিনি বেশি রাখেন; কিংবা সেগুলিই ঠিক বলে মনে করেন। কিন্তু আজ বেশ কয়েক বছর ধরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও তার অধীনস্থ কলেজ-গুলির শিক্ষক ও পরিচালকদের কিছু সংখ্যকের অসম ব্যবহার, দুর্ব্যবহার, খামখেয়ালী, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, ঔদাসীন্য ইত্যাদির ফলে যে বহু ছাত্র জীবনসংগ্রামে মুখ থুবড়ে পড়েছে তার সব না হলেও কিছু খবরও কি তিনি রাখেন না? তারও কোন ইঙ্গিতই তাঁর লেখার মধ্যে পেলাম না। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করবেন কি আজকের ছাত্র বিক্ষোভের অনেক কিছু কারণের মধ্যে এটিও অন্যতম। আরও একটি কারণ যা তাঁর চিন্তার ঠাঁই পায় নি তা হচ্ছে ইদানীংকালে সমস্ত ব্যাপারের পরিচালনার ভার যাঁদের ওপর তাঁদের মধ্যে যে-কটি বা সৎ ও ন্যায়পরায়ণ, তাঁদেরও অধিকাংশের চিন্তাশক্তি সীমিত এবং Orthodox ভাব-ধারায় আচ্ছন্ন। যদি ধৃষ্টতা মাপ করেন তবে উক্ত লেখককেই তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণস্বরূপ ধরা যেতে পারে বলে মনে করি।

তবে দেশে যে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তি শেষ হয়ে যায় নি তা ঐ পত্রিকাটির আরও কয়েকটি পাতা ওল্টালেই প্রমাণ পাওয়া যায় শ্রীযুক্ত পান্নালাল দাশগুপ্ত মহাশয়ের "একটি আদর্শ দাও" এই সুচিন্তিত প্রবন্ধটিতে। সত্যি আজ আদর্শের অভাব। তালি দিয়ে তাই কোন ফল হবে না। দত্ত মহাশয়ের পরিচিত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কথাটি "গোল পাকিয়ে দে মা লুটেপুটে খাই।" আজ ভয়ঙ্করভাবে সত্য। তার ফলে সৃষ্টি হয়েছে বিভ্রান্তি। আর তার ফলশ্রুতি চরম বিশৃঙ্খলা। আজ এই বিশৃঙ্খলা এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যেখানে মামুলি উপদেশের জোড়াতালিতে কোন সুরাহাই সম্ভব নয়। চাই একটি প্রাণবন্ত আদর্শ। আর সেই আদর্শ কেবল খাড়া করলেই চলবে না। যে কোন আদর্শই হোক না কেন তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সকলক্ষেত্রেই সে পদ্ধতিটির প্রয়োজন তাকে বলা যেতে পারে "শাস্তি ও পুরস্কার" পদ্ধতি। আদর্শচ্যুত ব্যক্তিকে সঠিক সাজা ও আদর্শবানকে স্বীকৃতি ও পুরস্কার। তা না হলে যত আদর্শই ঠিক করা হোক না কেন কোনটিই টিকবে না। তবে দেশের যা অবস্থা—পদ্ধতি দূরের কথা আদর্শ ঠিক করাই কঠিন। তারপর আবার গ্রহণ ও বর্জনের প্রশ্ন উঠবে। তারপর সুষ্ঠু পদ্ধতিতে প্রয়োগ। এই তিনটি স্তর যদি ন্যায় নিষ্ঠার সঙ্গে অতিক্রম করা যায় তবেই অবস্থার উন্নতি হতে পারে। নচেৎ পাতার পর পাতা লিখলেও কোন ফল হবে না। তাতে চিঁড়ে ভিজবে না, কেবল কথাই বাড়বে।

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়
দারহাট্টা রাজেশ্বরী ইনস্টিটিউশন,
দারহাট্টা, হুগলী

* * *

গত ২০শে পৌষের ৩০শ সংখ্যায় ছাত্র-বিক্ষোভ সম্বন্ধে শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্ত মহাশয়ের 'একটি আদর্শ দাও' নামক প্রবন্ধটি খুবই সময়োচিত হইয়াছে। বিশেষত তাঁহার প্রবন্ধের শিরোনামাতেই সমস্যা সমাধানের পথ রহিয়াছে। এই সুচিন্তিত পথনির্দেশের জন্য তাঁহাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলাম। শুধু ছাত্র-বিক্ষোভ নয় দেশের নানাবিধ সমস্যাই আমাকেও ভাবাইয়া তোলে। শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্ত মহাশয়ের নির্ধারিত পথে আমি তথাকথিত সকল সমস্যা সমাধানেরই পথ দেখিতে পাইতেছি। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে আমার বক্তব্য এই যে আমরা আমাদের অতীতের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাইতে পারি। অর্থাৎ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার সহায়তা গ্রহণ করিতে পারি। পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন যুগের দিকে তাকাইলে দেখা যায় যে সেই সময়কার দেশোদ্ধারব্রতীগণের একমাত্র লক্ষ্য ছিল দেশকে পরাধীনতার গ্লানি হইতে মুক্ত করা। পরাধীনতা জাতির মেরুদণ্ড ভাঙিয়া দেয়। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, সভ্যতায়, সংস্কৃতিতে সমগ্র জাতিকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতে হইলে প্রথমেই প্রয়োজন স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা-যজ্ঞের মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তৎকালীন যুগের অগণিত নরনারী—শিক্ষিত, অশিক্ষিত, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে এই দেশোদ্ধার ব্রতে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সকলেই জানেন অসংখ্য দেশপ্রেমিক প্রাণ দিতেও দ্বিধা করেন নাই। এই যে প্রেরণা ইহার মূল উৎস হইল সকলের স্বার্থে নিজেকে নিয়োজিত করিবার আকাঙ্ক্ষা। দেশ উদ্ধারের মহান লক্ষ্য জনমনে এই পরার্থে আত্মদানের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিয়া জনগণকে আপন সঙ্কীর্ণ স্বার্থের গণ্ডী হইতে দিয়াছিল মুক্তি। এই মুক্তিই দেশের মুক্তিকে করিয়াছিল ত্বরান্বিত। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে দেশ স্বাধীন হইবামাত্র এই চিত্তমুক্তির স্রোত পুনরায় ব্যক্তিগত স্বার্থের কূপের গভীরে তলাইয়া গেল। স্বাধীন দেশটাকে গড়িয়া তোলার দায়িত্ব আজ কেহই মনে প্রাণে গ্রহণ করিতেছেন না। এই জন্যই দেশের সর্বক্ষেত্রে এত বিক্ষোভ, এত বিশৃঙ্খলা, এত পীড়ন। ছাত্র-বিক্ষোভের মূল উৎসও এইখানে। তাই আমি বলিতে চাই যে বর্তমানে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হউক 'দেশ গঠন'। বলা বাহুল্য 'দেশ গঠন' বলিতে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের কথাই বলা হইতেছে। সম্মুখে নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকিলে কর্ম ও চিন্তা আপনা হইতেই লক্ষ্যে পৌঁছাইবার উপযোগী হইবে। ছাত্র-বিক্ষোভ একটা বিশেষ সমস্যা হইলেও দেশের অন্যান্য সমস্যা হইতে পৃথক নয়। অন্যান্য সমস্যার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দেশের অন্যান্য ক্ষেত্রে সমস্যা জীয়াইয়া রাখিয়া ইহার সমাধান সম্ভব নয়।

আশা ভট্টাচার্য
উত্তর বনমালীপুর, আগরতলা
(ত্রিপুরা)

* * *

'সাপ্তাহিক বসুমতী' ছাত্র-আন্দোলন সম্পর্কে বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশ করে বর্তমান জটিল সমাজের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছেন তাতে এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটির বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেলে।

তবে কোন কোন বিষয়ে এইসব প্রবন্ধকারদের সঙ্গে আমাদের মত পাঠক-মনের মতৈক্যের অভাব ঘটে। মনে হয় কোন কোন বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টির স্বচ্ছতা নেই। গত ৩২শ সংখ্যায় নির্মল ভট্টাচার্যের 'ভারতে ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতা' প্রবন্ধ অনেক সময় বিরক্তির সৃষ্টি করেছে। নির্মলবাবু নৈতিক নৈরাজ্যের কথা অনেক বেশি করে বলেছেন। কিন্তু আমরা দেখেছি রাষ্ট্রিক ও সামাজিক নৈরাজ্যই ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতার মূল কারণগুলির মধ্যে অন্যতম। কিছুদিন আগে কাটোয়া কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে হোমগার্ড ও এস, ডি, ও-র বিরুদ্ধে খণ্ড গোলযোগ এর বড় প্রমাণ। এমন অন্যায় ও কলুষিত শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র-আন্দোলন ঘটতে প্রায়ই দেখা যাচ্ছে। সকল সময়ই ছাত্ররা রাজনৈতিক পার্টির শিকার হয় না। অন্যায়পরায়ণতা ও অসততা নিয়ে শাসক পার্টি তরুণ-তরুণীদের উদ্দীপ্ত করতে পারবেন কি না তাও চিন্তার বিষয়। সামগ্রিকভাবে দেশে শান্তি, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ন্যায়পরায়ণতা ফিরে না এলে এসব সমস্যার সমাধান কি সম্ভব? এইরূপ সঙ্কটময় যুগে রাজনীতিতে ছাত্রদের, অভিভাবকদের এবং শিক্ষকদের অধিকার নেই এমন কথা কোনক্রমেই বলা যেতে পারে না। অপরদিকে রাজনীতি বাধ্য করাচ্ছে তাঁদের রাজনীতিতে নামতে। পত্রিকার ৩২শ সংখ্যার 'ভারতের ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতা'-র চাইতে ৩০শ সংখ্যার নারায়ণ চৌধুরীর প্রবন্ধ অনেক দিক থেকেই আমাদের সমর্থনযোগ্য। পাঠকমনের স্বল্পপরিসর পাঠকের সকল চিন্তা প্রকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র নয়। তাই সকল কথা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা সম্ভব নয়।

'অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়' আমাদের মনকে দেশের প্রতি সজীব, জাগ্রত ও পবিত্র রেখেছে। আমরা স্বাধীনোত্তর ভারতের ছেলেমেয়ে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত পবিত্র ভারতভূমিকে ও তাঁর সন্তান বিপ্লবী মহানায়কদের আমরা দেখি নি। কখনও আশা করি নি যে চট্টগ্রাম বিদ্রোহের কাহিনী, এই বিদ্রোহের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত কোন বিপ্লবী মহানায়কের মুখ থেকে শুনব বা তাঁর লেখা পড়ব। বিপ্লবী বীর অনন্ত সিংহের লেখা পড়ে মনের সেই আশা পূরণ হল। পাঠকমনের ভেতর দিয়ে আমি তাঁকে অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভক্তি জানাচ্ছি।

সনৎকুমার নাথ
পোঃ ও গ্রাম—সমুদ্রগড়
(বর্ধমান)

আন্তঃরেল হকি প্রতিযোগিতায় সেন্ট্রাল রেল এবং রেলওয়ে বোর্ডের খেলার একটি দৃশ্য

সফরের শেষ খেলা

নাগপুরে বিজয় হাজারের সাহায্য ভাণ্ডারের জন্য অনুষ্ঠিত এক প্রদর্শনী ক্রিকেটে ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ দল সফরের শেষ খেলায় নিখুঁত ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ স্টাইল অফ ক্রিকেটের এক রেশ রেখে ভারত থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ দলপতি গ্যারফিল্ড সোবার্স এই খেলায় অংশ গ্রহণ না করায় দল নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করেন কনরাড হাণ্ট।

ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ দল তিন দিনের এই প্রদর্শনী খেলায় প্রথম ব্যাট করার সুযোগ লাভ করে এবং ৮ উইকেটে ৪০৫ রান সংগ্রহ করে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। হাণ্ট ১৩২ রান সংগ্রহ করে সেঞ্চুরী করার কৃতিত্ব অর্জন করেন। এর পর উল্লেখ-যোগ্য হল বুচারের ৮৪ রান এবং লয়েডের ৫১ রান। বোর্ড প্রেসিডেণ্টের একাদশের পক্ষে সুব্রত গুহ এবং হনুমন্ত সিং ২টি করে উইকেট দখল করেন।

বোর্ড প্রেসিডেণ্টের একাদশ মাত্র ৩০৬ রানে প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ করে। চান্দু বোরদে ৮২ রান সংগ্রহ করেন, আর উল্লেখযোগ্য হল ভারতের প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড় বিজয় হাজারের ৬৮ রান। ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ দল দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ উইকেটে ৩৩৫ রান সংগ্রহ করে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। মাত্র ১৭০ মিনিটে ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ দল ৩৩৫ রান সংগ্রহ করে দ্বিতীয় দিনের শেষে ৪৩৪ রানে অগ্রগামী থাকে। ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের এই ঝড়ের গতিতে রান তুলতে সাহায্য করেন লয়েড, গ্রীফিথ এবং ডেভিস। লয়েড মাত্র পাঁচ রানের জন্য সেঞ্চুরী করতে পারেন নি, গ্রীফিথ সংগ্রহ করেন ৭০ রান। জয়সীমা তিনটি ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ উইকেট দখল করার কৃতিত্ব অর্জন করেন।

তৃতীয় দিন দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা সুরু করে ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে বোর্ড প্রেসিডেণ্টের ব্যাটস-ম্যানরাও রানের পেছনে ছুটতে থাকেন।

শ্রীঅমিতাভ

শেষ পর্যন্ত ৪১২ রানে ইনিংস শেষ করেন তাঁরা। কুন্দেরন ৫০ রান, রমেশ সাক্সেনা ৭৪ রান এবং হনুমন্ত সিং ৮৫ রান সংগ্রহ করেন। শেষের দিকের খেলোয়াড়দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ভেঙ্কট রাঘবনের ৩৭ রান এবং সুব্রত গুহর অপরাজিত ৩৩ রান। হনুমন্ত মাত্র ৫৭ মিনিটে ৮৫ রান সংগ্রহ করেন এবং সাক্সেনা ৭৪ রান সংগ্রহ করেন ৯০ মিনিটে।

ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ এই চিত্তাকর্ষক খেলায় জয়ী হয় মাত্র বাইশ রানের ব্যবধানে।

আন্তঃরেল হকি

কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে সুরু হয়েছে আন্তঃরেল হকি প্রতি-যোগিতা। এবারের প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন ইস্টার্ন রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী ভি টি নারায়ণন এবং উদ্বোধনী খেলায় অংশগ্রহণ করে ইস্টার্ন রেল এবং ওয়েস্টার্ন রেল দল। প্রথমার্ধের ষোল মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে ইস্টার্ন রেল দলের বিক্রম সিং একটি গোল করেন এবং এই বিজয়সূচক গোলই খেলার ভাগ্য নির্ধারিত করে। তরুণ খেলোয়াড়ে গড়া ইস্টার্ন রেল দল যোগ্য দল হিসাবেই জয়ী হয়।

বোম্বাইয়ের সেন্ট্রাল রেল দল দিল্লীর রেলওয়ে বোর্ডকে ৭—২ গোলে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইন্যালে উন্নীত হয়েছে। সেন্ট্রাল রেল দলের এই বিরাট জয়ের জন্য মূলত তাঁদের দুই কৃতী ফরোয়ার্ড মনোহর এবং মুলচাঁদই কৃতিত্বের দাবি রাখেন। সেন্টার ফরোয়ার্ড কমল মনোহর একাই দেন ৪টি গোল এবং লেফট ইন মুলচাঁদ ৩টি গোল।

সাউদার্ন রেল দল ৪—০ গোলে কলকাতার পোর্ট কমিশনার্সকে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইন্যালে ইস্টার্ন রেলের সম্মুখীন হয়। সাউদার্ন রেলের বিপক্ষে পোর্ট দল খুবই দুর্বল ক্রীড়াধারার পরিচয় দেয়।

নর্থ ইস্টার্ন রেল দল ৫—০ গোলে চিত্তরঞ্জন লোকোকে পরাজিত করে এবং বারাণসীর ডিজেল লোকো ৪—১ গোলে রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশনকে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইন্যালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। প্রতিযোগিতার প্রথম হ্যাট্রিক লাভের গৌরব অর্জন করেছেন বারাণসীর ডিজেল লোকোর সেণ্টার ফরোয়ার্ড তেওয়ারী। ডিজেল দলের দুজন খেলোয়াড় দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন; একজন হলেন হকি যাদুকর ধ্যানচাঁদের পুত্র রাজকুমার এবং অপরজন হলেন তুলসীদাস।

হান্ট

জাতীয় এ্যাথলেটিকস

পঞ্চম আন্তঃরাজ্য জাতীয় এ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা শেষ হল কেরালার কোট্টায়ামে। এবারের প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা লাভ করেছে রাজস্থান রাজ্যদল। রাজস্থান দল ঊনিশটি স্বর্ণ-পদক, তেরটি রৌপ্যপদক এবং বারোটি ব্রোঞ্জপদক লাভ করে। বাংলার এ্যাথলেট দলও এবার মোটামুটি উল্লেখযোগ্য ফলাফল প্রদর্শন করেছে। বাংলা দল মোট আটটি স্বর্ণপদক দশটি রৌপ্যপদক এবং নয়টি ব্রোঞ্জপদক লাভ করার কৃতিত্ব অর্জন করে।

মানের দিক থেকে এবার এ্যাথলেটরা তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ফলাফল প্রদর্শন করতে পারে নি। কেরালার রাজ্যপাল শ্রীভগবান সহায় প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। তেরটি রাজ্যের প্রায় চারশ' এ্যাথলেট প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।

উদ্বোধনী দিনে একটিমাত্র বিষয়ে নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। দিল্লীর কোহলী ৮০০ মিটার দৌড়ে ১ মিনিট ৫৭·৯ সেকেণ্ডে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেন। বাংলার এ সোম পঞ্চাশ কিলো-মিটার ভ্রমণে এশিয়ান রেকর্ড ভঙ্গ করেন। কুড়ি কিলোমিটার ভ্রমণেও সোম তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ১৯৫১ সালে দিল্লীর প্রথম এশিয়ান গেমসে প্রতিষ্ঠিত ৫ ঘন্টা ৪৪ মিঃ ৭·৪ সেকেণ্ডের রেকর্ডটি ভঙ্গ করেন ৫ ঘন্টা ২৪ মিঃ ১৭·৫ সেকেণ্ডে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে। বাংলার খ্যাতনামা এ্যাথলেট প্রণব ব্যানার্জী লং জাম্পে এবং দীপঙ্কর ঘোষ বর্শা নিক্ষেপে স্বর্ণপদক লাভ করেন।

বাংলার এ্যাথলেট দলের অন্যতম সদস্যা হেনা গাঙ্গুলী কোট্টায়ামে যাবার পথে এক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে স্থানান্তরিত হন। গত ২৩শে জানুয়ারী কোয়েম্বাটুর জংশনে কোচিন এক্সপ্রেস যখন প্রবেশ করেছিল তখন হঠাৎ কুমারী হেনা গাঙ্গুলী ট্রেন থেকে ছিটকে বাইরে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পান। তাঁকে কোয়েম্বাটুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে অবশ্য তিনি আরোগ্যের পথে।

বাংলার পরাজয়

ভাগ্যই সন্তোষ ট্রফির দুটি সেমি-ফাইন্যাল খেলার ভাগ্য নির্ধারিত করল। ভাগ্যের জোরেই অভিনব এক টসে জয়ী হয়ে একদিকে ভারতীয় রেলওয়ে এবং অপরদিকে সার্ভিসেস দল ফাইন্যালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল। দুর্ভাগ্য পশ্চিম বাংলা দল এবং মাদ্রাজের কারণ ভাগ্যলক্ষ্মীর অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হয়ে তাদের বিদায় নিতে হল সন্তোষ ট্রফির আসর থেকে।

ফাইন্যালে উন্নীত হবার পথে কোয়ার্টার ফাইন্যালে সার্ভিসেস পরাজিত

হাবিব

করে মহীশূরকে ৩—০ গোলে। রণজিৎ সিং থাপা দুটি গোল এবং ভুপিন্দার সিং রাওয়াৎ একটি গোল করেন। অপর একটি কোয়ার্টার ফাইন্যালে পশ্চিম বাংলা মধ্যপ্রদেশকে পরাজিত করে সেমি-ফাইন্যালে সার্ভিসেসের সম্মুখীন হয়। খ্যাতনামা খেলোয়াড় সমন্বিত পশ্চিম বাংলা দলের বিপক্ষে মধ্যপ্রদেশ যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিচয় দেয় তা' উচ্ছ্বসিত প্রশংসার দাবি রাখে। পশ্চিম বাংলার খেলোয়াড়েরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছে মধ্যপ্রদেশের ব্যূহ ভেদ করার জন্য। খেলায় বাংলার পক্ষে একটিমাত্র বিজয়সূচক গোল করেন হাবিব দর্শনীয় হেডের সাহায্যে।

সেমি-ফাইন্যালে সন্তোষ ট্রফির খেলায় দুটি করে খেলা অনুষ্ঠিত হয় প্রথম লেগ এবং দ্বিতীয় লেগ। গোলের গড়-পড়তায় যে দল বেশি হয়, সেই দলই ফাইন্যালে খেলার সুযোগ লাভ করে। কিন্তু এবার দুটি সেমি-ফাইন্যালের প্রথম এবং ফিরতি খেলার ফলাফলের কোন মীমাংসা না হবার ফলে অভিনব এক টসে দুটি দল ফাইন্যালে উন্নীত হয়েছে। টসে জয়ী হয়ে এইভাবে দুটি দলের ফাইন্যালে খেলার যোগ্যতা অর্জন সন্তোষ ট্রফির ইতিহাসে একটি রেকর্ড।

রেলওয়ে এবং মাদ্রাজের সেমি-ফাইন্যালের প্রথম খেলা গোলশূন্যভাবে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। উভয় দলের ফরোয়ার্ডেরা গোলের সহজ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে অসমর্থ হন। ফিরতি খেলায় ফলাফল হয় ১—১ গোল। প্রথমার্ধে আপ্পালারাজু প্রথম গোল করে রেলকে অগ্রগামী করেন কিন্তু তিন মিনিট পরেই ধনপতি গোলটি পরিশোধ করে দেন। খেলার ফলাফল ড্র হওয়ায় উভয় দলের নাম লেখা দুটি কাগজ থেকে লটারী প্রথায় একটি কাগজ তুলে নেওয়া হয় এবং রেল দল ফাইন্যালে উন্নীত হয়।

অন্য সেমি-ফাইন্যাল খেলাটিতে বাংলা প্রথম দিনের খেলায় ১—০ গোলে সার্ভি-সেসের বিপক্ষে জয়ী হয়। খেলার প্রথমার্ধের দশ মিনিটে কানন বিজয়-সূচক গোলটি করেন। উভয় দলের শক্তি প্রায় সমান সমান হওয়ায় খেলার মানটি খুব উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়। সার্ভি-সেসের ফরোয়ার্ডরা তীব্র গতির সঙ্গে সুন্দর আক্রমণধারা রচনা করলেও বাংলার রক্ষণভাগের দৃঢ়তার জন্য এবং গোলের কাছে ঢিলে দেওয়ার ফলেই গোল করতে পারে নি। সেমি-ফাইন্যালের ফিরতি খেলায় কিন্তু ফলাফল হয় বিপরীত— সার্ভিসেস জয়ী হয় ১—০ গোলে। দলের পক্ষে একমাত্র বিজয়সূচক গোল করেন সেণ্টার ফরোয়ার্ড ভুপিন্দার সিং রাওয়াৎ। খেলাটি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়, কারণ উভয় দলই উভয় দলের গোলে সমানভাবে হানা দিয়েছে।

রমেড

ক্লের জীবনের চরম পরীক্ষা

ক্যাসিয়াস ক্লের জীবনের অগ্নি-পরীক্ষা! এবার ক্লের প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেউ নন স্বয়ং আর্নি টেরেল; বিশ্ব বক্সিং ফেডারেশান কর্তৃক সরকারীভাবে স্বীকৃত বিশ্ব হেভীওয়েট মুষ্টিযুদ্ধের চ্যাম্পিয়ানের খেতাবধারী। সাধারণ বিশ্বের চোখে কিন্তু মহম্মদ আলি ক্লে সেইদিন থেকে বক্সিং জগতের মসনদে আসীন আছেন, যেদিন তিনি দৈত্যসম মুষ্টিযোদ্ধা সোনী লিস্টনকে হেলায় পরাভূত করেন। এই সময় লিস্টনের সঙ্গে আবার ফিরতি লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে বিশ্ব বক্সিং ফেডারেশানের কয়েকটি নির্দেশ তিনি অমান্য করার ফলে, ফেডারেশান তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। অবশ্য গত বছর ক্লে তাঁর ওপর থেকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নেবার আবেদন করলে ফেডারেশান তাঁর আবেদন মঞ্জুর করেন। কিন্তু আর্নি টেরেলকে প্রদত্ত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানের গৌরব মুকুট ক্লে দিতে স্বীকৃত হন না, অবশ্য ক্লেকে বিশ্ব খেতাবের জন্য টেরেলের পয়লা দাবিদার হিসাবে স্বীকৃত দান করে বিশ্ব বক্সিং ফেডারেশান।

গত বছর মানে ১৯৬৬ সাল বলতে গেলে ক্লের জীবনের একটি অন্যতম কর্ম-ব্যস্ত সন। ক্লে একে একে অনেকগুলি লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেন এবং সাফল্যের সঙ্গে তাঁর অপরাজিত আখ্যা অক্ষুণ্ণ রাখেন। সব ক'টি লড়াইয়ে কিন্তু অনায়াসে তিনি জয়ের মুখ দেখতে পারেন নি। দুটি লড়াইয়ে বেশ বেগ তাঁকে পেতে হয়েছে।

ক্লে কানাডার শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা জর্জ শিভালোর সঙ্গে ম্যাপেল লিফ গার্ডেনে মিলিত হন গত বছর মার্চ মাসে। কানাডার ২৯ বৎসর বয়স্ক এই মুষ্টিযোদ্ধা শিভালোকে পরাজিত করতে ক্লেকে পনেরো রাউণ্ড পর্যন্ত লড়তে হয়। শিভালোর একটি বিরাট রেকর্ড হল যে আজ পর্যন্ত লড়েছেন প্রায় আটচল্লিশটি লড়াই কিন্তু একবারও নক আউট বা ধরাশায়ী হন নি। ক্লেকে শিভালো দ্বিতীয় এবং চতুর্থ রাউণ্ডে যথেষ্ট বেকায়দায় ফেলেন। লড়াইয়ের শেষে প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান জো লুই বলেন ১৯৫৬ সালে আর্চিমুর এবং রকি মার্শিয়ালোর ঐতিহাসিক লড়াইয়ের পর এত ভাল লড়াই আজ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় নি।

এর পরই মে মাসে ক্লের সাক্ষাৎ মিলল লণ্ডনে আর্সেনল ফুটবল ক্লাবের স্টেডিয়ামে, প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রিটেনের সেরা মুষ্টিযোদ্ধা হেনরী কুপার। ১৯৬৩ সালে এই কুপারকে একটি বেসরকারী মুষ্টিযুদ্ধে ক্লে পরাজিত করেন পঞ্চম রাউণ্ডে। কিন্তু লড়াইয়ের মাঝে হেনরী একটি প্রচণ্ড ঘুসিতে রিং থেকে ছিটকে ফেলে দিয়েছিলেন ক্যাসিয়াস ক্লেকে। এবার ষষ্ঠ রাউণ্ডে টেকনিক্যাল নক আউটে হেনরী কুপার পরাজিত হন। ক্লের ঘুসির আঘাতে কুপারের বাঁ চোখের নিচে এক মারাত্মক ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং এত বেশি রক্তক্ষরণ হতে থাকে যে তাঁর দৃষ্টিশক্তিই ব্যাহত হয়। আবার আগস্ট মাসে লণ্ডনে এলেন ক্লে ইংলণ্ডের আর এক মুষ্টিযোদ্ধা ব্রায়ান লণ্ডনের সঙ্গে লড়তে। বত্রিশ বৎসর বয়স্ক হেনরী কুপার ক্লের বিপক্ষে প্রশংসনীয়ভাবে লড়েছিলেন; কিন্তু ব্রায়ান

ক্যাসিয়াস ক্লে

লণ্ডন এমন শোচনীয় ব্যর্থতা প্রদর্শন করলেন যে নিজেই তিনি ভয়ানক লজ্জা পেয়ে লড়াইয়ের শেষে অনেক দুঃখে বলেই ফেললেন, দৈহিক আঘাতের চেয়ে তাঁর বেশি আঘাত লেগেছে সম্মানে।

এক মাস যেতে না যেতেই মহম্মদ আলি ক্লে উঠলেন ফ্রাঙ্কফুর্টের রিংয়ে। ক্লের বিপক্ষে সমানে সমানে বারো রাউণ্ড লড়াই চালিয়ে যাবেন মিল্ডেনবার্জার একথা অনেকেই চিন্তা করতে পারেন নি। কিন্তু আটাশ বছরের এই জার্মান মুষ্টি-যোদ্ধা অনেক বিশেষজ্ঞের ভবিষ্যদ্বাণীকে ওলট-পালট করে দিয়েছিলেন প্রায়। একেবারে বারো রাউণ্ড পর্যন্ত ক্লেকে টেনেছেন মিল্ডেনবার্জার। মহম্মদ আলি ক্লে নিজেও স্বীকার করেন যে জয়ী হতে তাঁকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। এবছর মার্চ বা এপ্রিল মাসে আবার একবার ক্লে-মিল্ডেনবার্জার [illegible] হবার সম্ভাবনা আছে।

১৯৬৬ সালের শেষ লড়াই লড়লেন ক্লে টেক্সাসের বিগ ক্যাট নামে খ্যাত ক্লীভ-ল্যাণ্ড উইলিয়ামসের সঙ্গে। ক্লীভল্যাণ্ড উইলিয়ামসকে পরাজিত করতে ক্লের সময় লাগে মাত্র এক মিনিট আট সেকেণ্ড। ক্লীভল্যাণ্ডের মুষ্টিযুদ্ধের রেকর্ড কিন্তু খারাপ নয়। আজ পর্যন্ত বাহাত্তরটি লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে পরাজিত হয়েছেন তিনি তিনটি মাত্র লড়াইয়ে।

চব্বিশ বছরের এই নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধা মহম্মদ আলি ক্লে পেশাদারত্ব গ্রহণের পর আজ পর্যন্ত লড়েছেন মোট সাতাশটি লড়াই এবং পরাজয় আজ পর্যন্ত তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি। বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষায় যোগদানের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য যে সময় তিনি আমেরিকান সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে লাভ করে-ছিলেন তাঁর মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে এবং তিনি আরও সময় প্রার্থনা করেছেন। তাঁর বক্তব্য হল যে ব্ল্যাক মুসলিম সম্প্রদায়ের একজন ধর্মপ্রচারক হিসাবে তাঁকে এই বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা গ্রহণ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হোক।

সমাচার দর্পণ

দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের বর্ণবৈষম্য নীতির জন্য এবং বেসিল ডি ওলিভিয়েরা সম্বন্ধে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের একজন মন্ত্রীর মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ার ফলে তিনজন খেলোয়াড় কলিন ব্র্যাণ্ড, পিটার পোলক এবং গ্রীম পোলক অবশিষ্ট বিশ্ব ক্রিকেট একাদশ থেকে বাদ পড়েছেন। আগামী মার্চ মাসে এই বিশ্ব একাদশের বার্বাডোজের বিরুদ্ধে খেলার কথা আছে। এই প্রদর্শনী খেলার উদ্যোক্তারাই দক্ষিণ আফ্রিকার এই তিনজন খেলোয়াড়ের আমন্ত্রণ প্রত্যাহার করেছেন।

* * *

বাংলা এবং রেলওয়ে দলের মধ্যে আন্তঃআঞ্চলিক রঞ্জী ট্রফির খেলার দিন পিছিয়ে দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। এই খেলা অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল কলকাতার ইডেন উদ্যানে ৩রা থেকে ৬ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। পশ্চিমাঞ্চলের বোম্বাই এবং বরোদার রঞ্জী ট্রফির খেলা শেষ হবার পর বাংলা-রেলের খেলার নতুন দিন স্থির করা হবে।

ক্রিকেট নয়

শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

স্যার নেভিল কার্ডাস ক্রিকেটের স্কোর-বোর্ডকে গাধা বলেছিলেন।

আজ তাই ভাবি যে স্কোর-বোর্ড যদি গাধা হয়, তাহলে রেকর্ডসকে কি বলা হবে! বিশেষ করে যে রেকর্ডস-এর পাতায় শুধু পরাজয় আর অমীমাংসার স্মৃতি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে ক্রিকেট মাঠে কত অপরিণত আমরা।

আর অপরিণত বলেই বোধ হয় মাদ্রাজ টেস্টে বেড়ালের ভাগ্যে শিকে শেষ পর্যন্ত ছিঁড়লো না। অথচ শেষ দিন চা পানের বিরতির সময়ও ওয়েস্ট-ইন্ডিজের অতি-বড় সমর্থকও আশা করতে পারেন নি যে তৃতীয় টেস্টে পরাজয়ের হাত থেকে ওয়েস্ট-ইন্ডিজ রেহাই পাবে।

অর্থাৎ জয়লাভ তখন ভারতের হাতের মুঠোয়। চা পানের আগেই সাতটা উইকেট পড়ে গেছে। সোবার্সের সঙ্গে তাল দিচ্ছেন তখন বোলার গ্রিফিথ। প্যাড পরে প্যাভেলিয়নে বসে আছেন হল আর গিবস। যাঁরা বল হাতে নিয়ে ভেল্কি দেখাতে পারেন, কিন্তু তাঁদের ব্যাটিং ধর্তব্যের মধ্যে নয়। তবু গ্রিফিথ খেলে গেলেন শেষ পর্যন্ত। নিশ্চিত পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচালেন ওয়েস্ট-ইন্ডিজকে।

তাই মাদ্রাজ টেস্টের পর স্যার ফ্রাঙ্ক ওরেল বলেছিলেন, এ টেস্টে ভারতের জেতা উচিত ছিল। কিন্তু ফিল্ডিংটা একটু ভালো করার দরকার। আর ও-ভাবে ক্যাচ ফেললে কি জেতা যায়!

ঠিকই তো ক্যাচেস উইন ম্যাচেস। সেদিন যদি হনুমন্ত সিং আর ইঞ্জিনিয়ার ওভাবে দু'-দুবার সোবার্সের ক্যাচ ফেলে না দিতেন তাহলে হয়তো মাদ্রাজের চীপক মাঠেই ঘটতো ওয়েস্ট-ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম টেস্ট জয়। কিন্তু অনিশ্চয়তাই যে ক্রিকেটের সব থেকে বড় গুণ, তারই প্রমাণ আর একবার হাতে-নাতে পাওয়া গেল মাদ্রাজের মাঠে।

তবে ক্রিকেটের এই অনিশ্চয়তাই ভারতের বরাতে বড় বেশি নৈরাশ্যজনক-ভাবে দেখা দেয় বার বার। বেশি পিছোতে হবে না। ১৯৬২ সালে ভারতের ওয়েস্ট-ইন্ডিজ সফরের কথাই ধরা যাক। তৃতীয় টেস্ট ম্যাচের শেষ দিনের খেলা প্রায় শেষ হয়ে এলো। খেলা শেষ হতে আর ঘণ্টা আড়াই বাকী। মিনিটের হিসেবে মাত্র মিনিট। ভারতের হাতে আছে আটটা উইকেট। সুতরাং খেলার যে মীমাংসা হবে না সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কারো। চরম নৈরাশ্যবাদীরাও বোধ হয় সে মুহূর্তে ভারতের পরাজয়ের কথা কল্পনাও করতে পারেন নি।

কিন্তু ঘটলো সেই অভাবনীয় অঘটনই। গিবসের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে বলগুলো ঘুরতে লাগলো লাট্টুর মত। আর তাই দেখে মাথা ঘুরে উঠলো ভারতীয় ব্যাটস-ম্যানদের। যতক্ষণ না ভারতের বাকী আটটা উইকেট পড়লো সে মাথা ঘোরা আর থামলো না। যে খেলায় পরাজয়ের কোন সম্ভাবনাই ছিল না, সে খেলাতেই ভারত হারলো বিশ্রীভাবে। শেষ দিনের খেলায় গিবসের বোলিং-এর হিসেব দাঁড়ালো—১৬·৩ ওভার ১৪ মেডেন ৬ রান ৮ উইকেট।

সেলিম দুরাণী

সুতরাং মাদ্রাজ টেস্টে ভারত জয়লাভ করতে পারে নি বলে অবাক হবার কিছু নেই। কারণ জয়লাভের জন্যে যে মনো-বল আর দলগত সংহতির প্রয়োজন ভারতীয় খেলোয়াড়দের যে তা নেই। এ অভাব দিনের পর দিন বড় বেশিভাবে প্রকট হয়ে উঠছে। সেই সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেট কর্তৃপক্ষরা কাটা ঘায়ে দিচ্ছেন নুনের ছিটে।

ভালো খেলোয়াড়দেরও যদি এক বা দু' ইনিংসে সুবিধে করতে না পারার জন্যে দল থেকে বাদ পড়তে হয়, তাহলে খেলোয়াড়দের খেলার মান বজায় থাকে কি করে। কি করে তাঁরা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে খেলে মনোবল বাড়াতে পারবেন?

এ শুধু আমাদের দেশেই সম্ভব। কই স্যার লেন হাটন তো একবার ছ'টা ইনিংস খেলে যখন এক রান সংগ্রহ করেছিলেন কিম্বা ডেনিস কম্পটন যখন একের এর এক শূন্য করে চলেছিলেন তখন তো তাঁদের দলে স্থান পাবার কথা চিন্তা করতে হয় নি।

কেউ হয়তো বলবেন—কার সঙ্গে কাদের তুলনা! কোথায় লেন হাটন, ডেনিস কম্পটন আর কোথায় ভারতীয় খেলোয়াড়! কিন্তু একটা কথা তো ভুলে গেলে চলবে না যে খেলোয়াড়দেরও মন বলে একটা জিনিস আছে। আর পৃথিবীর সমস্ত খেলোয়াড়দের মনের একটি বিশেষ ক্ষেত্র একটি নির্দিষ্ট ধারায় প্রবাহিত হয়। সেখানে লেন হাটনের সঙ্গে কোন পার্থক্য নেই আব্বাস আলী বেগের, নেই ডেনিস কম্পটনের সঙ্গে সেলিম দুরানীর।

সেলিম দুরানীর কথাই ধরা যাক। বম্বের প্রথম টেস্টে সেলিম কি খুব একটা খারাপ খেলেছিলেন? রান তো তিনি ভদ্রগোছেরই করেছিলেন। তবু তাঁকে কলকাতার দ্বিতীয় টেস্টে বাদ দেওয়া হল। তৃতীয় টেস্ট দলেরও আশে-পাশে ঘেঁষলেন না দুরানী। শুধু তাই নয় ইংলণ্ডগামী ভারতীয় দলেও স্থান হল না তাঁর।

এর পরে আসবে আব্বাস আলী বেগের কথা। সত্যি অবাক হবার বিষয়। যে খেলোয়াড়টি ইংলণ্ডে খেলে নাম করলেন তাঁরই কিনা ইংলণ্ডগামী দলে স্থান নেই। ইংলণ্ডের আবহাওয়া আর পিচের সঙ্গে বেগ যথেষ্ট পরিচিত। তার

ওপর এবার তাঁর খেলা খুব যে একটা খারাপ হয়েছে তাও নয়। শুধু নিখুঁত ফিল্ডিং-এর জন্যেই বেগের দলে আসা উচিত। বেগ যদি শূন্য রানে আউট হন, তাহলে প্রতিপক্ষ দলের একশো রান তাঁর

জয়সীমা

চমৎকার ফিল্ডিং-এর জন্যে বাঁচিয়ে দেন। তবু বেগ বাদ।

নাদকার্নীর কথা না হয় ছেড়ে দিলাম। বয়েস হয়ে গেছে। কিন্তু কি বলে জয়সীমাকে দল থেকে বাদ দেওয়া হল? অস্বীকার করি না জয়সীমার বড় বেশি আত্মবিশ্বাসী মনোভাব দেখান আর ব্যাটিং-এর সময় দায়িত্বজ্ঞানহীনের মত ব্যবহার করেন। সেই জন্যে মাদ্রাজ টেস্টে তাঁকে বাদ দেওয়া ঠিকই হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে ইংলণ্ডগামী ভারতীয় দল থেকে তাঁকে বাদ দেওয়া কোন মতেই উচিত হয় নি।

ইংলণ্ডের পত্র-পত্রিকায় ভারতীয় দলে এই তিনজন খেলোয়াড় না থাকায় যথেষ্ট ঝড় বয়েছে। কোন একটি পত্রিকার মতে জয়সীমা বর্তমান বিশ্বের সেরা ওপনিং ব্যাটসম্যানদের অন্যতম। দুরানীর বিষয়ে বলা হয়েছে, ব্যাটে, বলে পারদর্শী দুরানী ইংলণ্ডের খেলোয়াড়ের কাছে ভীতি-সঞ্চারক। আব্বাস আলী বেগের স্থান না পাওয়াও তাঁদের কাছে যথেষ্ট বিস্ময়ের ব্যাপার।

এখন কি আমরা সবিনয়ে ভারতীয় নির্বাচকমণ্ডলীকে এই তিনজন খেলোয়াড়কে বাদ দেবার কারণ জিজ্ঞাসা করতে পারি? আমরা কি জানতে পারি কোন অজ্ঞাত কারণে এঁদের মত পরম নির্ভর-যোগ্য ও খ্যাতিসম্পন্ন খেলোয়াড়দের ইংলণ্ড ভ্রমণকারী ভারতীয় দলে স্থান হল না? ভারতীয় ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতা সর্বজনবিদিত। কিন্তু সব কিছুরই যে একটা সীমা আছে এ কথা ভুলে গেলে চলবে না তো। এই ভুলের জন্যেই ইডেনের ক্রীড়াঙ্গন এবার পরিণত হয়েছিল রণাঙ্গনে।

ইডেন রণাঙ্গনের পুরোন কাসুন্দি আর না ঘাঁটাই ভালো। বিস্তর লেখা-লেখি হয়েছে ঐ বিষয়ে। সেদিন অর্থাৎ নববর্ষের প্রথম দিনে পুলিশ বীরদের বাহন লাঠি আর গ্যাস সমন মাথা পেতে নিয়ে এখন দিন গুণছে তদন্ত-ফয়সালার। তাই একই লেবু বার বার কচলে তেতো না করে আমরা বরঞ্চ সেন তদন্ত কমিশনের কাজ-কর্মের দিকে নজর রাখি।

কিন্তু একটা বিষয়ে জানার বড় প্রয়োজন। কলকাতায় ভারত ও ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের দ্বিতীয় টেস্টে যে কেলেঙ্কারী হয়েছে তার প্রধান হোতা সি-এ-বি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন? এ বিষয়ে তাঁদের চুপ করে থাকা তো বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ ক্রিকেট মঞ্চে ভারতের নাম যেভাবে ক্রিকেট-বিশ্বে কলঙ্কিত হল, তার দোষী তালিকার বাইরে যে ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডও যেতে পারেন না। কারণ সি-এ-বি যে তাঁদেরই অধীন একটি প্রাদেশিক সংগঠন মাত্র। তাই আমরা জানতে চাই ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড কি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে চলেছে ক্রিকেট এ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের বিরুদ্ধে।

কিন্তু সেন কমিশনের তদন্তে যাই হোক না কেন, কিম্বা ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড সি-এ-বি'র ওপর যে ব্যবস্থাই গ্রহণ করুন না কেন, যা হবার তা সেই রবিবারের সোনালী রোদের সকালে ইডেনের বুকে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আর সেই ছাই ভারতের পঞ্চাশ কোটি লোকের মুখে মাখিয়ে মজা দেখেছেন বিশ্বের অনেকগুলি দেশের লোক।

জানি না এ শোক সামলাবার আর

আব্বাস আলী বেগ

কোন উপায় আছে কি-না! অবশ্য সি-এ-বি কিম্বা ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের কর্তৃপক্ষের কথা স্বতন্ত্র। তাঁরা হয়তো এখনো সেই ছাই-মাখা মুখে নেপথ্যে বসে হাততালি দিচ্ছেন.....

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত